৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রতিষ্ঠিত

সচিত্র মাসিকপত্র

নবম বর্ষ—প্রথম খণ্ড

আষাঢ়—অগ্রহায়ণ

১৩২৮

সম্পাদক—শ্রীজলধর সেন

প্রকাশক—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্—২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভারতবর্ষ

সূচীপত্র

নবম বর্ষ—প্রথম খণ্ড, আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩২৮

বিষয়ানুসারে বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচি

আষাঢ়—১৩২৮।

বহুবর্ণ চিত্র

১। জননী। ২। দস্যু রত্নাকর।

শ্রাবণ—১৩২৮।

বহুবর্ণ চিত্র

নিঃসঙ্গ। ২। দিনান্তে।

ভাদ্র—১৩২৮।

বহুবর্ণ চিত্র

১। অবতরণ। ২। ষ্টীমার ও গাধা বোট।

আশ্বিন—১৩২৮।

বহুবর্ণ চিত্র

কার্ত্তিক — ১৩২৮

বহুবর্ণ চিত্র

১। বিশ্বরূপ। ২। দুরাকাঙ্ক্ষা। ৩। ঐ বুঝি বাঁশী বাজে।

অগ্রহায়ণ—১৩২৮।

বহুবর্ণ চিত্র

১। নিয়ম সেবা। ২। চায়ের আত্মকথা।

দস্যু রত্নাকর

শিল্পী—শ্রীঅশ্বিনীকুমার রায়

Emerald Ptg. Works.

[Blocks by—BHARATVARSHA HALFTONE WORKS.

আষাঢ়, ১৩২৮

প্রথম খণ্ড] নবম বর্ষ [প্রথম সংখ্যা

রাণী-সন্দর্শন

[আচার্য্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু]

একদিন সম্মুখের গলির মোড়ে দেখিলাম এক ভিক্ষুক বিকট অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া পথযাত্রীর করুণা উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিতেছে। লোকটা একেবারেই ভণ্ড; প্রতারণা করিয়া সকলকে ঠকাইতেছে বলিয়া আমার রাগ হইল। এই সময় সেখান দিয়া একটী স্ত্রীলোক যাইতেছিল। তাহার পরনে ছেঁড়া কাপড়। ভিক্ষুকের কান্না শুনিয়া স্ত্রীলোকটী থমকিয়া দাঁড়াইল; এবং তাহার দিকে কাতর নয়নে চাহিয়া দেখিল। তাহার অঞ্চল-কোণে একটী মাত্র পয়সা বাধা ছিল;—হয় ত তাহাই তাহার সর্ব্বস্ব। বিনা বাক্যব্যয়ে সে সেই পয়সাটী ভিক্ষুককে দিয়া চলিয়া গেল। সেই দিনেই আমার প্রকৃত রাণী-সন্দর্শন লাভ হইয়াছিল—মাতৃরূপিণী জগদ্ধাত্রী রাণী! এই জন্যই ত বয়স নির্ব্বিশেষে, ছোট মেয়ে হইতে বর্ষীয়সী পর্য্যন্ত, সকলকে আমরা মা বলিয়া সম্বোধন করি।

বাঘিনী মাতৃস্নেহে মমতাপন্ন হয়। একবার ১০।১২ বৎসরের একটি ছেলে দেখিলাম। শিশুকালে নেকড়ে বাঘিনী তাহাকে লইয়া যায়। ক্ষুধার্ত্ত শিশু বাঘিনীর স্তন্য পান করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাতেই তাহার প্রাণরক্ষা হইল। সেই অবধি বাঘিনী স্বীয় শাবকের ন্যায় তাহাকে পালন করিয়াছিল। কিন্তু শাবকদিগের প্রাণরক্ষার জন্য সে অন্য মূর্ত্তি ধরিয়াছিল, এবং শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া মরিয়াছিল। মাতৃস্নেহে দুইটা রূপ দেখা যায়,—উভয়ই

আশ্রিতের রক্ষা হেতু। একটি মমতাপন্না করুণাময়ী, অন্যটি সংহাররূপিণী শক্তিময়ী।

নারীর হৃদয়ের যে সন্তান-স্নেহ উথলিত হইয়া সমস্ত দুস্থজনকে সন্তান জ্ঞানে আগুলিয়া রাখিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। এতদ্ব্যতীত নারী স্বতঃই অভিমানিনী; প্রিয়জনের অপমান ও লাঞ্ছনা তাহাকে মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ করে। হে অভিমানিনি রমণি, ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, তুমি যাহার গৌরবে গৌরবিণী, এ জগতে তাহার স্থান কোথায়? পৃথিবী হইতে শান্তি পলায়ন করিয়াছে, সম্মুখে ঘোর দুর্দ্দিন। যাহার উপর তুমি নির্ভর করিয়া আছ, সে কি সেই দুর্দ্দিনে তোমাকে ঘোরতর লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে? বাক্য ছাড়া যে তাঁহার আর কোন অস্ত্র নাই। কে তাহার বাহু সবল করিবে, হৃদয়ের শক্তি দুর্দ্দম রাখিবে এবং মৃত্যুর বিভীষিকার অতীত করিবে? এ সকল শিক্ষা ত মাতৃক্রোড়েই হইয়া থাকে। কি তোমার দীক্ষা, যাহা দিয়া তুমি সন্তানকে মানুষ করিয়া গড়িবে? কৃচ্ছ্র সাধনা অথবা বিলাসিতা—ইহার কোন পথ তুমি গ্রহণ করিবে? রাণী হইয়া জন্মিয়াছিলে, দাসী হইয়াই কি তুমি মরিবে?

পুরাতন-প্রসঙ্গ

[অধ্যাপক শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত এম-এ]

দোলপূর্ণিমা, ১৩২৭।

আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মুখ হইতে পুরাতন কাহিনী শুনিবার জন্য তাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া কুশল প্রশ্ন করিলাম। তিনি বলিলেন, "এখন আর আমি সকালে সন্ধ্যায় বেড়াইতে পারি না; শরীর বড় দুর্ব্বল। তুমি আমার কাছে আমাদের দেশের পুরাতন কথা শুনিবার ইচ্ছা কর; কিন্তু আমি কখনও বাহিরে কাহারও সঙ্গে মিশি নাই; বিশেষ কিছু বলিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না; তবে বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে যে খুব বেশী পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে পারি।

"তখন একান্নবর্ত্তী পরিবার খুব দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল। ভাই-ভাই যে শুধু একত্র থাকিত, তাহা নহে; বেশ সদ্ভাবে থাকিত। প্রীতির বন্ধন বাস্তবিক খুব শক্ত ছিল। পরস্পর কলহ করিয়া আদালতের আশ্রয় লওয়া কাহারও কল্পনায় স্থান পাইত না। বিষয় সম্পত্তি লইয়া যে দিন প্রথম আদালতে মোকদ্দমার কথা শুনিলাম, সে দিন আমার প্রাণে যে কি আঘাত লাগিল, তাহা তুমি কল্পনা করিতে পারিবে না। আমারই আত্মীয়দিগের মধ্যে এইরূপ বিচ্ছেদ প্রথম দেখিলাম।"

আচার্য্য মহাশয় একটু চুপ করিলেন। আস্তে-আস্তে ইংরাজি-ভাষায় তিনি এই পুরাতন সমাজের অবস্থার বিবৃতি করিতে লাগিলেন; কারণ, আমাদের কথোপকথনের প্রারম্ভেই মিঃ এণ্ড্রুজ আসিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন; মিঃ এণ্ড্রুজও নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার পিতামহকে মনে পড়ে কি?"

আচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—"মনে পড়ে বৈ কি! আমি তখন ছয়-সাত বছরের ছেলে ছিলাম। সে বয়সে তাঁহার সম্বন্ধে আমার কোনও নিজের অর্জ্জিত জ্ঞান নাই; তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত যাহা কিছু জানি, তাহার অধিকাংশ পরের নিকট হইতে শোনা। তিনি ইয়োরোপে গিয়া ফরাসী অভিজাতবর্গের মধ্যে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন।

"বিলাসিতা আমাদের দেশের অভিজাত-শ্রেণীর মধ্যে খুব বেশী ছিল। বড়লোকদের যেন একটা ধারণা ছিল যে, ভালমন্দ বিচার না করিয়া খুব খরচ করিতে পারিলেই সমাজের মধ্যে প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইবে। কে কত বেশী খরচ করিতে পারে, এই লইয়া যেন পরস্পরের একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তখনকার সমাজ-চিত্রের এই অংশটাই মন্দ ছিল। এখন সে রকম বিলাসিতা নাই বটে, কিন্তু এমন অনেক নূতন দোষ সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, যাহা তখন ছিল না। পূজার সময় আমাদের বাড়ীতে যে উৎসব দেখিয়াছি, সে রকম উৎসব পরে আর কখনও দেখি নাই। বোধ হয় আমাদের প্রতিমা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে

সুন্দর হইত। পূজার অনেক আগে হইতেই আমাদের বাড়ীতে দর্জী বসিয়া যাইত; জহুরীর আগমন হইত। দর্জী ও জহুরী মিলিয়া বাড়ীর সকলের পোষাক-পরিচ্ছদ অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিত। গৃহ-প্রাঙ্গণে যে যাত্রা প্রভৃতির আয়োজন হইত, তাহাতে যোগদান করিবার অধিকার আপামর সাধারণ সকলের ছিল। দরজা বন্ধ করিয়া কড়া পাহারা রাখিয়া, কাহাকেও প্রবেশ করিতে না দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত। ধনী গৃহস্থের বাড়ীর পূজার আয়োজন কেবল মাত্র সেই পরিবারের ও নিমন্ত্রিত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের জন্য এরূপ হইত না। প্রত্যেক গৃহস্থের পূজার উৎসব একটা বড় সামাজিক উৎসব ছিল; সমাজের ছোট বড় সকলেই অবাধে সেই উৎসবে মাতিয়া উঠিত। আমার পিতৃদেব দক্ষিণেশ্বরবাস বশতঃ পূজার সময় বাড়ী থাকিতেন না। তিনি কিছু আগে হইতেই বিদেশ পর্য্যটনে বাহির হইতেন।" ঠাকুর মহাশয় একটু চুপ করিলেন। মিঃ গুপ্ত ও শ্রীমান সন্তোষকুমার তাঁহার পদধূলি লইয়া বিদায় হইলেন। অতঃপর তিনি বাঙ্গালায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক ক্ষণ ইংরাজীতে কথা কহিয়া বোধ হয় তিনি কিছু ক্লান্তি অনুভব করিতেছিলেন। আমি একটু অপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার কথার সূত্র ধরাইয়া দিলাম;—"আপনার পিতৃদেব সে সময়ে বিদেশ-ভ্রমণে বাহির হইতেন?"

"হাঁ। তিনি অনেক জায়গায় বেড়াইতেন। কিন্তু তাই বলিয়া বাড়ীর পূজার উৎসবের কোনও ত্রুটি, কোনও ব্যতিক্রম হইত না। ভিড়ের মধ্যে কোনও কারণে কখনও পুলিসকে কিছুতে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হইত না। একবার আমাদের বাড়ীতে আমাদের এক বন্ধুর গাড়ী আসিয়া দাড়াইল। গাড়ী লালমোহরাঙ্কিত ছিল দেখিয়া এক জন পুলিস-প্রহরী গাড়ীখানা আটক করিবার চেষ্টা করিল। আমাদের বাড়ীতে তখন অনেকগুলি ভদ্র সন্তান আমাদের পরিবার মধ্যে অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের মত বাস করিতেন; তন্মধ্যে গাঙ্গুলী মহাশয় বোধ করি সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কনেষ্টবলকে প্রহার করিয়া হাঁকাইয়া দিলেন। কলিকাতা সহরে পুলিস পাহারাওয়ালাকে বড় একটা কেহ ভয় করিত না। এবং এই পুলিসের প্রতি বল-প্রয়োগের জন্য ভবিষ্যতে আমাদের কোনও বেগ পাইতে হয় নাই।

"আমাদের দেশে এই পূজা ও এই উৎসব একেবারে ফাঁকা ও অন্তঃসারশূন্য ছিল না। বিদেশীরা না জানিয়া শুনিয়া যাহাকে idolatry বলিয়া অবজ্ঞা করিত, তাহা বাস্তবিক idolatry নহে। ব্রাহ্মণাদি ভদ্রসন্তানের কথা আমি বিশেষ করিয়া বলিতেছি। কোথাও কোথাও যে bigotry ছিল না, তাহা নহে; বাস্তবিক ভক্ত উপাসক সমাজের মধ্যে ছিল, সংখ্যায় অবশ্যই অল্প। সেই সকল খাঁটি ভক্তদের কথা ছাড়িয়া দিলেও এ কথা খুব ঠিক যে, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর সকল শ্রেণীর মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান কিছু না কিছু নিহিত ছিল। ছিল বলিয়াই তখনকার প্রতিমা পূজাকে কিছুতেই আমি superstition বা idolatry বলিতে প্রস্তুত নহি। সমাজের এই ভাবটাকে যদি ধর্ম্মভাব বলা যায়, তাহা হইলে আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি যে, আমাদের দেশের সমাজের সকল স্তরেই এই ধর্ম্মভাব কিছু না কিছু ছিল, এবং এখনও আছে। এ হিসাবে, আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোক ও ইয়োরোপের নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী। এই ধর্ম্মভাব আছে বলিয়া মহাত্মা গান্ধী এত সহজে জনসাধারণকে ধর্ম্মে মতি রাখিয়া প্রবুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

"আমাদের বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে যে এই ধর্ম্মভাব, এই সহজ ব্রহ্মজ্ঞান ছিল এবং আছে, এ ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল। দূর দূর পল্লীগ্রাম হইতে অনেক লোক মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আমার বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। তাঁহারা আমাদের বাড়ীর তেতালার উপরে থাকিতেন। সেই সমস্ত খাঁটি পল্লীবাসীদিগের কথাবার্ত্তায়, আচরণে, ব্যবহারে তাঁহারা কেমন ধর্ম্ম ভাবাপন্ন, কেমন cultured, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইত। তোমাদের ইস্কুল-কলেজের শিক্ষা-প্রণালীর ও হষ্টেল-বাসের ফলে সেই খাঁটি ধর্ম্মভাব, সেই আমাদের স্বদেশী culture, ও সঙ্গে সঙ্গে একান্নবর্ত্তী পরিবারের দৃঢ় বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে। ইস্কুল-কলেজগুলা উঠিয়া গেলে যে বাস্তবিক আমাদের সমাজের লোক-শিক্ষার কোনও ক্ষতি হইবে, এমন ত মনে হয় না; বরং সমাজের কল্যাণকর সুশিক্ষার প্রবর্ত্তনে সুফল ফলিতে পারে। নহিলে আমরা যতই কেন 'স্বদেশী' 'স্বদেশী' বলিয়া চীৎকার করি, আমরা কিছুতেই স্বদেশী হইতে পারিব না। এ কথাটা বোধ হয় তোমাদের ভাল করিয়া বুঝাইতে পারা

শক্ত। তোমাদের মনের গতিক এত বদলাইয়া গিয়াছে যে, তোমরা সহজে ধারণা করিতে পারিবে না, কেন আমি এ কথা বলিতেছি। বিদেশী শিক্ষায় বাল্যকাল হইতে পরিপুষ্ট হইয়া এখনকার বাঙ্গালী সন্তান যে ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে তাহারা কেমন করিয়া স্বদেশী হইবে? তাহা এটা কেবল শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। আমার পিতামহের সঙ্গে আমার ছোটকাকা বিলাত গিয়াছিলেন। ইয়োরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি বিলাতি বেশ ভূষা চাল-চলন সমস্ত ছাড়িয়া দিলেন; তাঁহার বিলাত প্রবাসের কোনও চিহ্ন লেশমাত্র পরিলক্ষিত হইল না। ইয়োরোপের সভ্যতা তখন এতই বিজাতীয় বলিয়া গণ্য হইত, যে, তখন উহা কিছুতেই আমাদের হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হইতে পারে, এ কথা কাহারও মনে হইত না। তবে ডিরোজিও যে সকল বাঙ্গালী যুবকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন, যাহাদিগকে তখন 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে অভিহিত করা হইত, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।" আচার্য্য মহাশয় একটু চুপ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের যে দল ছিল, তাহার বাহিরে হিন্দু-সমাজের যুবকগণের মধ্যে মদ্যপান কি সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত?" তিনি বলিলেন, "না; উহা সমাজে দূষণীয় বলিয়া গণ্য হইত। মদ্যপানাসক্তি চিরকাল নিন্দনীয় ছিল। ঐ যে রাজনারায়ণ বসুর কথা বলিতেছ, তিনি ঐ ইয়ংবেঙ্গল দলভুক্ত ছিলেন। সেই দল ছাড়িয়া তিনি আমার বাবার কাছে আসিলেন। আজ তিনি জীবিত থাকিলে তোমাকে অনেক কথা বলিতে পারিতেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"রাজনারায়ণবাবু যখন আপনার পিতৃদেবের কাছে আসিলেন, তখন কি তিনি স্কুল মাষ্টার?" উত্তর হইল,—"না; যতদূর স্মরণ হয়, তখনও তিনি কলেজের ছাত্র। তাঁহার পিতার সহিত রামমোহন রায়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল; সেই সূত্রে তিনি আমাদের বাড়ীর সহিত পরিচিত হইলেন। কিছুকাল পরে রাজনারায়ণবাবু ও আমি, আমরা পরস্পর উভয়ের প্রতি খুব আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তিনি সদানন্দ পুরুষ ছিলেন। আজ আমার সমবয়স্কদিগের মধ্যে কেহই জীবিত নাই। বয়ঃকনিষ্ঠদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই গিয়াছেন; একা কৃষ্ণকমল এখনও আছেন। তাঁর কাছ থেকে ত অনেক কথা তুমি শুনিয়া লইয়াছ। তাঁর মত সুপণ্ডিত প্রায় দেখা যায় না। তাঁকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি ও ভালবাসি। রাজনারায়ণবাবু আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন। কৃষ্ণকমলকে আমরা সকলেই শ্রদ্ধা করিতাম। একবার বোধ করি বীটন সোসাইটির এক অধিবেশনে আমি একটা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। কৃষ্ণকমল সভাপতি ছিলেন। প্রবন্ধের বিষয় ছিল - 'আমাদের বিদ্যা ফলবতী হয় না কেন?' আমি বলিয়াছিলাম যে বিদেশীয় ও বিজাতীয় ভাব পরিবর্জ্জন না করিলে আমাদের বিদ্যা কিছুতেই ফলবতী হইবে না। কৃষ্ণকমল বলিলেন—'বক্তা আমাদিগকে বিদেশীয় ভাব পরিবর্জ্জন করিতে বলিলেন। ভাল কথা। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে কিছু স্বদেশী রীতির পরিহরণ আবশ্যক। শুধু আলো চাল আর কাচকলায় চলিবে না।' পরিহরণ শব্দটা এই আমি প্রথম শুনিলাম। সভাপতি মহাশয়ের সঙ্গে তর্ক করা ত চলে না; ইচ্ছা হইয়াছিল যে, বাহিরে আসিয়া বলি যে ইয়ং বেঙ্গলের বীফ্ ব্রাণ্ডির চেয়ে আলো চাল আর কাচ কলা ঢের ভাল! কিন্তু সমালোচক যে স্বয়ং কৃষ্ণকমল! আমার আর কিছুই বলা হইল না।

"একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে যে প্রীতি ও সদ্ভাব ছিল, এখন আর তাহা দেখা যায় না। আমার খুল্লতাতগণ সংসারে ও বিষয়কর্ম্মে বিশেষ মনোযোগ দিতেন না; আমার পিতৃদেব সমস্ত দেখাশুনা করিতেন; কোনও প্রকার গোলযোগ ছিল না। আমরা সব খুড়তুতো, জাঠতুতো ভাই ঠিক সহোদর ভাইয়ের মত পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত ছিলাম। সামাজিক রীতি-নীতি মানিয়া চলিলে এই প্রকার পারিবারিক ব্যবস্থা খুব হিতকর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম, রীতি, নীতি সম্বন্ধে সকলে একমত হইয়া চলিলে কোথাও কিছু বাধে না। কিন্তু যদি কেহ ধর্ম্ম-সম্বন্ধে নূতন মত অবলম্বন করিবার প্রয়াসী হন, তাহা হইলে এই একান্নবর্ত্তী পরিবার বাধা দেয়। সে কিছুতেই ব্যক্তিবিশেষের মত মানিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে চায় না; অথবা তাহার মত মানিয়া না লইয়াও, তাহাকে বৃহৎ পরিবারের মধ্যে থাকিতে দিয়া, স্বাধীন ভাবে তাহাকে তাহার নিজের স্বতন্ত্র জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে দেয় না। এইখানে এই joint family-system এর সঙ্কীর্ণতা। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার পর হইতে যে একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল, নানা কারণে সে

ভাঙ্গা আর জোড়া দেওয়া গেল না। যে individualism ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রকট হইয়া উঠিল, তাহা সমাজের মধ্যে একান্নবর্ত্তী-পরিবারকে কিছুতেই টিকিতে দিতে চাহিল না। আজ সর্ব্বত্রই সেই disintegration-এর লক্ষণ দেখিতেছি। আমি যে সময়ের ও যে সমাজের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহার কোনও চিহ্ন এখন আর বর্ত্তমান নাই; তাহা এত পুরাতন যে, রবি তাহা দেখে নাই।

"ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে পরস্পরের খুব প্রীতি ছিল। একের বেদনায় অন্যে কষ্ট বোধ করিতেন। Orthodox সমাজ হইতে তাঁহারা একটু দূরে সরিয়া গেলেন বটে, কিন্তু বিদেশীর আক্রমণ হইতে স্বদেশের মানরক্ষা করিবার সময় সকলে একত্র হইয়া কাজ করিতেন। যখন 'কালা-আইন', black act-এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় চঞ্চল হইয়া উঠিল, স্যর রাধাকান্ত দেব ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্য এক বৃহৎ সভা আহ্বান করিলেন। আমার বাবা যখন সেই সভায় উপস্থিত হইলেন, স্যর রাধাকান্ত তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"আপনি না এলে শিবহীন যজ্ঞের মত এ সভা পণ্ড হোতো।

"একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষের স্বাধীন চিন্তা সম্পূর্ণরূপে বাধা পাইত, এ কথা আমি বলিতেছি না। সে সম্বন্ধে সমাজের এক-প্রকার toleration বরাবর ছিল। শুধু ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তা অপ্রতিহত ভাবে চলিতে পারিত; কিন্তু সামাজিক রীতি-নীতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চলিতে চেষ্টা করিলে সমাজ তাহা সহ্য করিত না। কলিকাতায় তখন সমাজ বন্ধন অনেকটা দৃঢ় ছিল। সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত ছিল,—ধনী অভিজাত বংশ ও মধ্যবিত্ত সাধারণ নিম্ন-শ্রেণী গৃহস্থ। আমার পিতামাতাকে কলিকাতার সকল গৃহস্থই মানিয়া চলিত। সকল পক্ষের দোষ-গুণ বিচার করিয়া তিনি সমাজ-শাসন করিতেন। এ যে ঠিক মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় ফিউড্যাল্ ব্যবস্থার মত ছিল, তাহা নহে। সকল গৃহস্থই সমাজের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ছিলেন; কেহ কাহারও বশতাপন্ন vassal ছিলেন না। অথচ কেহ সমাজের মধ্যে অত্যাচার বা অন্যায় আচরণ করিলে তাহার প্রতীকার সমাজের নিজের হাতেই ছিল। এখন এই উৎকট individualism ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দিনে তোমরা পুলিস ও ইংরাজের আদালতের আশ্রয় লইয়া তোমাদের নিজের সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা কর। এখন সমাজের নিজের কোথাও এমন শক্তি নাই যে, সে নিজের ভিতরকার দোষ সারিয়া লইতে পারে। তখন সমাজের মধ্যে সে শক্তি ছিল, এবং অনেক সময়ে সাধারণ কল্যাণের উদ্দেশ্যে তাহা নিয়োজিত হইত। আমার পিতামহের কথা বলিয়াছি; তাঁহাকে সকলেই মানিত। তাঁহার মৃত্যুর পরে কলিকাতায় একাধিক সমাজশাসক দলপতি দেখিতে পাওয়া গেল। সকলেই অভিজাত শ্রেণীর বড়লোক। তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রভাব কলিকাতার সমাজের এক এক অংশের উপর বিস্তৃত ছিল। স্যর রাধাকান্ত দেব, ছাতু বাবু (আশুতোষ দেব) প্রত্যেকেই এক এক দলপতি ছিলেন। আমাদের যে স্বদেশী সভ্যতা culture পুরুষ-পরম্পরাগত চলিয়া আসিতেছিল, ইহারা তাহার পোষকস্বরূপ ছিলেন। ইঁহারা প্রত্যহ রীতিমত সভা করিয়া বসিতেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী সেই সভা অলঙ্কৃত করিতেন। কত সুমিষ্ট শ্লোকের আবৃত্তি হইত, রস সাহিত্যের কত ঢেউ খেলিয়া যাইত, তাহা তোমায় আর কি বলিব। ভাল-ভাল গায়ক ও বাদ্যকর সভায় যে গান-বাজনা শুনাইতেন, তাহা সভাস্থ সকলেই উপভোগ করিতে পারিতেন। কারণ, এই সকল সংস্কৃত রস-সাহিত্যের আখ্যান-বস্তু, এই সমস্ত গান-বাজনা, আমাদের স্বদেশী সভ্যতার মর্ম্মস্থান হইতে উৎসারিত হইয়াছে; আর স্মরণ রাখিও যে, সেই স্বদেশী culture সমাজের সকল স্তরেই ছিল। ছিল বলিয়াই সকলের স্বভাব-চরিত্রে, আচার ব্যবহারে তাহার প্রভাব প্রকাশ পাইত। ছিল বলিয়াই এই সমস্ত গান-বাজনা ও রসসাহিত্যের সকলেই সমজদার ছিল। অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে বিনয়, নম্রতা ও অন্যান্য সদ্গুণ ছিল, তাহাতেই বুঝা যাইত যে, সেই স্বদেশী সভ্যতার প্রভাব কত বেশী ছিল। আসল কথা এই যে, সর্ব্বত্রই authority মানিয়া চলার অভ্যাস এমন দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে, দলপতির সমাজ-শাসন-কার্য্য খুব সহজেই নিষ্পন্ন হইত। তবে দলপতিদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল; কখন-কখনও দলাদলির ও বিরোধের লক্ষণ দেখা যাইত। ছাতুবাবুর দলের সঙ্গে আমাদের দলের বিরোধ মাঝে-মাঝে প্রকাশ পাইত; কিন্তু দু' এক জন ভদ্রলোক দুই সভাতেই যাতায়াত করিত; ক্রমশঃ হয় ত তাঁহারা এক দল

ছাড়িয়া অন্য দলভুক্ত হইয়া পড়িত। এই অভিজাতশ্রেণীর বড়লোকদের চরিত্রে যে কোনও দোষ ছিল না, তাহা নহে। একটা মহৎ দোষ ছিল; অনেকেরই উচ্ছৃঙ্খল ছিল। কিন্তু তখনকার সমাজ তাহা নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচনা করিত না, এবং তজ্জন্য তাঁহাদের authorityর কিছুমাত্র লাঘব হইত না; সমাজের উপর তাঁহাদের প্রভাব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইত না। তাঁহাদের চরিত্রে অন্য অনেক ভাল গুণ ছিল; সুতরাং কেহ তাঁহাদের শাসন মানিয়া চলিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিত না।

"আজকালকার ডিমোক্রেসির দিনে কেহ কাহারও authority মানিতে প্রস্তুত নহেন। সকলেই স্ব স্ব প্রধান। সকলেরই চরিত্রে যেন একটা উদ্ধতা প্রকাশ পায়; সেইটাকে তাঁহারা স্বাধীনতা বলিয়া মনে করেন, এবং সেই কল্পিত independenceএর গর্ব করেন। এই স্বাধীনতা তাঁহার, কোথায়, কোথায়? — ঘরের মধ্যে। জ্যেষ্ঠের authority মানিয়া চলিলে এই স্বাধীনতা বজায় থাকে না। অতএব যত কিছু স্বাধীনতা প্রকাশ কর ঘরের মধ্যে, বয়োজ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে। ঘরের বাহিরে অকারণে অথবা সামান্য কারণে বিদেশীর পদানত হইতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ কর না। সেখানে তোমার কিছুমাত্র স্বাধীনতা দেখাইবার চেষ্টা নাই। যত তোমার independence of spirit ঘরের মধ্যে! তুমি স্বদেশী হইবার স্পর্দ্ধা কর কিসে? তোমার স্বদেশ বলিয়া কোনও কিছু জ্ঞান থাকিলে তবে ত তুমি স্বদেশী বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতে। তুমি patriotismএর আস্ফালন কর। তোমরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রধান, স্বদেশের সঙ্গে কোথায় তোমাদের সংযোগ আছে? দেশের সমাজের কোনও ঘরের কাহারও বেদনায় কখনও ব্যথা বোধ করিয়াছ কি? স্বদেশী সভ্যতাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছ কি? আমাদের এই ডিমোক্রেসির যুগের পূর্ব্বে যাঁহারা স্বদেশী cultureএর মধ্যে গড়িয়া উঠিতেন, যাঁহারা সমাজের ভিতর authority মানিয়া চলিতেন, আভিজাত্যের সংস্পর্শেও তাঁহাদের প্রকৃত স্বাধীনতা খর্ব হয় নাই; তাঁহারা খাঁটি স্বদেশী ছিলেন; patriotism তাঁহাদের শুধু কথার কথা ছিল না। তোমরা এখন স্বদেশী ফলাও, patriotism ফলাও, কোনও কিছু বিশেষ পড়াশুনা না করিয়াও বিদ্যা ফলাও! এই ফলানো তোমাদের একটা রোগে দাঁড়াইয়াছে। আর মজা এই যে, তোমরা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছ যে, তোমরা খুব স্বদেশী, খুব patriot, খুব পণ্ডিত! কেন তোমরা এমন করিয়া আত্মবঞ্চনা কর, এইটাই আশ্চর্য্য! সমাজের disintegrationএর দরুণ তোমরা দায়ী না হইতে পার; কিন্তু প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রকাশ করিবার জায়গা কি ঘরের মধ্যে? যেটা উচ্ছৃঙ্খলতা, সেটাকে স্বাধীনতা, independence of spirit বলিয়া জাহির করিতে লজ্জাবোধ কর না কেন? দেশের হাওয়া যে কত বদলাইয়া গিয়াছে, লোকের মতিগতি কতদূর বিকৃত হইয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারি; এবং বুঝিতে পারি বলিয়াই বেদনাবোধ করি। তোমরা সহজে বুঝিতে পার না যে, তোমাদের পক্ষে স্বদেশী হওয়া, patriot হওয়া কত শক্ত। ইহার জন্য তোমাদের ইস্কুল কলেজের শিক্ষাব্যবস্থা কতটা দায়ী, তাহাও তোমাদের বুঝিবার সামর্থ্য নাই।

"ইস্কুল কলেজের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব অল্প। লেখাপড়া বাড়ীতেই করিতাম। কিছুদিন বাঙ্গালা পড়িয়া একেবারে সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আরম্ভ করিয়া দিলাম। তখন ছোট-ছোট ছেলেদের পড়িবার উপযোগী বাঙ্গালা বই বড় বেশী ছিল না। একখানা বইয়ের নাম আমার মনে আছে, 'নীতিকথা'। বাড়ীতে পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে পড়িতাম। ক্রমশঃ মুগ্ধবোধ পার হইয়া রঘুবংশ, কুমারসম্ভব শেষ করিলাম। আর বাড়ীতে লেখাপড়া অগ্রসর হওয়া গেল না। এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য ইংরাজি ইস্কুলে ভর্ত্তি হইতে হইল। এই যে পরীক্ষা দিবার জন্য লেখাপড়া করা, ইহা আমার কখনই ভাল লাগিত না। দুই বছর সেণ্ট পল্‌স্ ইস্কুলে পড়া হইল। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে প্রবেশ করিলাম। প্রেসিডেন্সি কলেজের তখন কি নাম ছিল মনে নাই, যাহা হৌক্ সেই কলেজে পড়াশুনা আরম্ভ হইল। পাস করিবার জন্য পড়িতে হইবে, এ আমি কিছুতেই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ইতিহাসের পুস্তকখানা এত নীরস ছিল, সে বইখানার একটি পাতাও উল্টাইয়া দেখিলাম না। অঙ্ক আমার ভাল লাগিত; কিন্তু ক্লাসের বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে অঙ্ক কসা ও গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার ভাল লাগিত Trigohometry ও Mensuration; বাড়ীতে ইচ্ছামত আমি তাহাই আলোচনা করিতাম। মেট্‌কাফ্ হল্ হইতে যত ইচ্ছা বই লইতে

পড়িতাম; কারণ ঐ লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার সময় আমাদের বাড়ী হইতে অনেক টাকা দেওয়া হইয়াছিল। এখন আর সে রকম বই আমি বোধ করি চলে না; লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষীয়েরা সম্ভবতঃ গোড়ার কথা সব ভুলিয়া গিয়াছেন। আমার যাহা ভাল লাগিত, আমি তাহা বাড়ীতে বসিয়া পড়িতাম; হয় ত কোন-কোনও দিন স্কুল কামাই করিতাম। ইংরাজ যখন আমাদের বলে 'তোমাদের home বলিয়া একটা জিনিষ নাই; আমাদের home sweet home, আমাদের fireside এর সমান তোমাদের কিছু নাই',—তখন আমার মনে হয় যে, এরা বলে কি! আমাদের home নাই, এ কথা আছে? অন্ততঃ আমার কাছে আমার বাড়ী যে কি আনন্দের জিনিষ ছিল, সে আর তোমাকে কেমন করিয়া বোঝাইব? আমার বাড়ী আমার কাছে স্বর্গ ছিল। তবে কলেজের পড়া একেবারে না করিয়া পরীক্ষা দিয়া উপরের ক্লাসে উঠা দুষ্কর। বাঙ্গালার অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র আমাকে বাঙ্গালায় বেশী নম্বর দিয়া সে দায় উদ্ধার করিলেন। এই রামচন্দ্র মিত্র একটি character! সে যে কি রকম character তা' আমি তোমাকে বুঝাইতে পারিব না, গড় বলিলেও ঠিক হয় না; অথচ সে এক কিম্ভূত কিমাকার ব্যাপার! তিনি মাঝে-মাঝে আমাদের বাড়ীতে দাদাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। ভাগ্যে কোনও রকম করিয়া প্রোমোশন পাইলাম; নহিলে বাড়ীতে কৈফিয়ৎ দেওয়া শক্ত হইত। কিন্তু পুনরায় বাৎসরিক পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে কলেজ পরিত্যাগ করিলাম। উত্তরপাড়ার প্যারী-মোহন মুখোপাধ্যায় কলেজে আমার সতীর্থ ছিলেন। আর একজন আমার সহপাঠী ছিলেন,—রমেশচন্দ্র মিত্র। সিপাহী বিদ্রোহের বছর দুই পূর্ব্বে আমি কলেজ ত্যাগ করিলাম।

"সিপাহী বিদ্রোহের কিছু পরে আমার 'মেঘদূত' প্রকাশিত হইল। আগে বরাবর আমি বাঙ্গালা কবিতা লিখিতাম। কবিতা রচনার দিকে আমার খুব ঝোঁক ছিল; তা'র মধ্যে হয় ত হাল্কা রকমের রঙ্গরসের কবিতাও ছিল। বাল্যকাল হইতে ছবি আঁকার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম; আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল আমি painter চিত্রকর হইব; কিন্তু ভাল করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করার অভাবে আমার সাধ পূর্ণ হইল না। মেঘদূতে আমার নাম ছিল না। অনেকেই নিজের নিজের কবিতাপুস্তকে একটু আধটু করিয়া লইয়া বেমালুম চালাইয়া দিতে লাগিলেন; এমন ভাবে চালাইলেন যেন উহা তাঁহাদের স্বরচিত জিনিষ। কেহ একটু চেষ্টা করিলেই যে আমার নাম জানিতে পারিতেন না এমন নহে। বিদ্যাসাগর কেমন করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি প্রশংসাও করিয়াছিলেন।

"এই যে পরের জিনিষ বেমালুম নিজের বলিয়া চালাইয়া দেওয়া, এ দোষ আমাদের দেশে আছে। অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিক হইয়া গেল, আমার 'তত্ত্ববিদ্যা' বাহির হইয়াছিল। আমাদের দেশে আমি যে ভাবে বাঙ্গালায় দার্শনিক আলোচনা করিয়াছিলাম, সে রকম আমার পূর্ব্বে আর কেহ করেন নাই। 'তত্ত্ববিদ্যা' প্রকাশিত হইবার অনেক পরে কালীবর বেদান্তবাগীশের লেখার সমালোচনা করিয়া, 'তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক?' নাম দিয়া একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। কিন্তু আমার 'তত্ত্ববিদ্যা' সকলের পূর্ব্বে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে পর নবগঠিত সমাজের জন্য একটা philosophy আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল। কি করিয়া সেই philosophy খাড়া করান যায়, তাহা লইয়া অনেকেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি তাঁহাদিগকে 'তত্ত্ববিদ্যা' পড়িতে বলেন। ব্রাহ্মদের দল যাহা খুঁজিতেছিলেন পাইলেন। তাঁহাদের নূতন philosophy প্রকাশিত হইল। বেশ; তাহা লইয়া কোনও বাদবিসম্বাদের কথা হইত না, যদি সব দিক বজায় রাখিয়া কাজ করা হইত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের ইতিহাস-পুস্তকে কোথাও ঋণ স্বীকার করেন নাই! অথচ এত বেশী মিল আছে,—শুধু যে ভাবের তাহা নহে, আগাগোড়া তর্কের ধারার—যে তুমি দেখিলে বিস্মিত হইয়া যাইবে। আমার খুব ইচ্ছা হইয়াছিল যে আগাগোড়া সমস্তটা আমি ধরাইয়া দি। তবে ও-সব কাজ আমার কখনই ভাল লাগে না, তাই কিছু করি নাই। আমি আপন আনন্দে লিখিয়া যাই; কে কোন্ জিনিষটা না বলিয়া গ্রহণ করিল, সে সব খোঁজ রাখা কি আমার কাজ! তবে কথাগুলো ক্রমশঃ আমার কাণে আসিলে, আমি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখি যে ঠিক বটেই ত! কিন্তু সে কথা লইয়া আর গোলমাল করিতে ভাল লাগে না।

"তবে ঋণ স্বীকার না করিয়াও এমন ভাবে একটা idea নিজের রচনার মধ্যে চালাইয়া দেওয়া যায় যে, তাহাকে বিস্ময় হইতে পারে, কিন্তু রাগ হয় না। আমি যখন প্রথম 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' রচনা করিতে আরম্ভ করি, তাহার কোন্-কোনও অংশ বঙ্কিম বাবুকে পাঠাইয়াছিলাম, তাহার 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ করিবার জন্য। তখনকার 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' আর এখনকার 'স্বপ্ন-প্রয়াণে' অনেক তফাৎ। আমার পুস্তকে কতকগুলো কাল্পনিক ছবির সমাবেশ ছিল। বঙ্কিম বাবু বোধ হয় সেগুলো ছাপান নাই, এক-আধটা ছাপাইয়াছিলেন কি না আমার স্মরণ নাই। কিন্তু তাহার 'বিষবৃক্ষের' মধ্যে ঠিক সেই রকম ছবির অবতারণা করিয়া বসিলেন। তফাতের মধ্যে দাড়াইল এই যে, যাহা স্বপ্নে অশোভন হয় না, তাহা বাস্তব জগতে, গৃহস্থচিত্রে, বিশেষতঃ হিন্দু গৃহস্থ-চিত্রে অত্যন্ত অশোভন হইয়া দাড়াইল। নগেন্দ্রনাথের ঘরের মধ্যে সেই রকম ছবি থাকিতে পারে; কিন্তু বাড়ীর মধ্যে গৃহস্থ-বধূ গাড়ী হাকাইলেন; এ চিত্র একেবারেই সুশোভন হইল না। কিন্তু এই রকম চিত্র-সমাবেশের ideaটা যে তিনি আমার রচনা হইতে পাইয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু অন্যং গুরুশিষ্য খাড়া করিয়া যে ভাবে দার্শনিক আলোচনা করিতে বসিলেন, তাহার বহু পূর্ব্বে ঠিক ঐভাবে ঐরকম আলোচনা আমিও করিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবু ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন যখন তাহার 'কৃষ্ণ-চরিত্রে'র সমালোচনা আমি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় করিলাম। তিনি তখন 'প্রচারে'র সম্পাদক, আমি পত্রিকার সম্পাদক। পত্রিকায় সমালোচনা বাহির হইবার পর তিনি প্রচারে এমনভাবে লিখিলেন যেন সমালোচনা আমার লেখা নহে—কর্ত্তা স্বয়ং লিখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বাবা তখন অত্যন্ত পীড়িত। তাঁহার সঙ্গে তখন আমি চুঁচুড়ায় ছিলাম বটে; কিন্তু তিনি দোতালার উপরে শয্যাগত ছিলেন। তিনি আমাকে এইটুকু মাত্র বলিয়াছিলেন—'দেখ, বঙ্কিম যে রকম করে কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনা করছে, তা'র একটা প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক।' তাই আমি প্রতিবাদ করিয়া পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম। সে সমালোচনায় কর্ত্তার কোনও হাত ছিল না; আগাগোড়া আমার নিজের।

"কেন বঙ্কিম দুটো কৃষ্ণের অবতারণা করিলেন এবং এক কৃষ্ণকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া দাড় করাইতে চেষ্টা করিলেন? বঙ্কিমচন্দ্র শেষাশেষি যতই গীতাভক্ত হউন না কেন, তিনি অনেক দিন ধরিয়া পাকা positivist ছিলেন। Positive philosophy যাহাই হোক না কেন, শুধু মানুষকে লইয়া একটা positive religion দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিলে চলিবে কেন? Religion কি অমনি গড়িয়া তুলিলেই হয়? Positivist চাহিল একজন grand man মহাপুরুষ। বঙ্কিমবাবু ভাবিলেন, এই ত আমার হাতের কাছে একজন grand man রহিয়াছেন; যেমন বিষয়বুদ্ধি, তেমনি পরমার্থজ্ঞান, এই রকম চৌকোস মানুষ দরকার। অতএব আমাদের দেশে positivist religion দাঁড় করাইতে হইলে শ্রীকৃষ্ণকে grand man করিলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। তবে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে আর মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে এক করিলে চলিবে না। ফলে দাঁড়াইল বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র।

"আর্য্য সভ্যতার অতি প্রাচীন তথ্যগুলি সম্বন্ধে ভাল করিয়া আলোচনা হওয়া আবশ্যক। নানাদিক হইতে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচিত হইলে একদিন আসল সত্য বাহির হইয়া পড়িবে। এই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বও সেই রকম আলোচনার জিনিস।"

আচার্য্য মহাশয় একটু চুপ করিলেন। বারাণ্ডার বাহিরে কানন প্রান্তর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত। আমি বলিলাম, "ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীনন্দন বাসুদেবের উল্লেখ দেখিতে পাই; ঘোর আঙ্গিরস ঋষি দেবকীনন্দন বাসুদেবকে অমৃতের আস্বাদ দিয়াছিলেন।"

তিনি বলিলেন "দেবকীনন্দন বাসুদেব আছে? তা' হবে; আমার ঠিক স্মরণ নাই। অনেক পরে শ্রীকৃষ্ণের যে tradition গড়িয়া উঠিল, তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই এই দেবকী-নন্দন বাসুদেব ঢুকিয়া গেল। অতি প্রাচীন tradition এই রকমেই গড়িয়া উঠে। যাহা হোক, কেন যে দুটো শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হইবে তা' ত আমি বুঝিতে পারি না। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে মিলাইয়া লওয়া যায় না কি? আমার মনে ত কোনও জায়গায় বাধা লাগে না। এ সম্বন্ধে আমার একটা থিওরি আছে। আমার মনে হয়, কোন এক অতি প্রাচীন যুগে ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ অত্যাচারী ক্ষত্রিয় রাজাদের হাত হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য আভীর গোপ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর

লোকের সঙ্গে খুব মিশিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই মিশিয়াছিলেন। রাজার অনুচরগণ তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল। তিনি পুতনা রাক্ষসী, কালীয় নাগকে নষ্ট করিলেন। গোড়া হইতেই তাঁর একটি বড় গোছের দল ছিল। তাই তিনি উৎপীড়িত প্রজাবর্গের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দুষ্টের দমন করিয়া জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয় হইলেন। তিনি নিশ্চয়ই আভীর গোপ-পল্লীমধ্যে সকলের সঙ্গে খুব মিশিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ ও ব্রাহ্মণগণ বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নামে নানা অপবাদ রটাইতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহার চরিত্রে নানাপ্রকার কলঙ্ক দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। ব্রাহ্মণ ভৃগু তাঁহার বক্ষে পদাঘাত করিলেন। তিনি তাহাতেও বিচলিত হইলেন না। রামচন্দ্র যেমন ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিতেন; যাহাতে ব্রাহ্মণের যজ্ঞ নষ্ট না হয় সে বিষয়ে যত্ন করিতেন; দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ত সে রকম কিছুই করিলেন না; তিনি বরং দুষ্ট ক্ষত্রিয় রাজগণকে দমন করিতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণের আদেশমত চলা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না; নিম্নশ্রেণীর আভীর গোপ প্রভৃতির সঙ্গে মিশিয়া গেলেন। ক্ষত্রিয়ের ছেলে হইয়া নিম্নশ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। ফরাসি বিপ্লবের প্রারম্ভে ডিউক অভ অলিন্‌স্ যদি জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে না মিশিতেন, তাহা হইলে ফরাসি বিপ্লব অত জোরের সহিত হইত কি না সন্দেহ। আর শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র যদি খারাপ হইবে, তাহা হইলে সহসা অত সহজে একেবারে বৃন্দাবন ত্যাগ করা যাইত কি? মথুরা হইতে দূত আসিল, আর অমনি তিনি চলিয়া গেলেন! একটুও ইতস্ততঃ করিলেন না! মথুরায় তিনি রাজা হইলেন। বৃন্দাবনে আবার তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হইল। জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই যে ফিরাইবার চেষ্টা, ইহা কি কখনও দুশ্চরিত্র লম্পটের জন্য সম্ভবপর হয়? পরবর্ত্তী যুগের বুদ্ধ অবতারের পথ শ্রীকৃষ্ণ অবতার প্রশস্ত করিয়া দিলেন। রামচন্দ্র ব্রাহ্মণের যজ্ঞরক্ষা করিয়াছিলেন; ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সমাজের নিম্নশ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া দুষ্ট ক্ষত্রিয়ের দমন করিলেন; ব্রাহ্মণের ক্রোধ উদ্দীপিত করিলেন; জনসাধারণ তাঁহাকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তিনি শেষ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের সংসর্গ ত্যাগ করেন নাই। দুষ্টের দমন করা তাঁহার জীবনের ব্রত; বিশেষতঃ দুষ্ট ক্ষত্রিয়ের দমন আবশ্যক। শিশুপাল গেল, জরাসন্ধ গেল, কুরু-কুল ধ্বংস হইল। তিনি স্বয়ং মহাপরাক্রান্ত ছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ক্রমশঃ তাঁহার সখ্য লাভ করিবার জন্য সকলের খুব চেষ্টা হইল। দুর্য্যোধনকে তিনি তাঁহার নারায়ণী সেনা দিয়া কতকটা সন্তুষ্ট করিলেন; নিজে পাণ্ডবের সখা হইয়া রহিলেন। শেষ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ দুষ্ট ক্ষত্রিয়ের নিধনে সহায়তা করিলেন, এমন কি দ্বারকায় যদুবংশের ধ্বংস পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিতে হইল। বুদ্ধ অবতারের আবির্ভাবের আর কোনও বাধা রহিল না। ব্রাহ্মণের যজ্ঞরক্ষা করার আবশ্যকতা আর নাই; দুষ্ট ক্ষত্রিয়ের দমন হইয়া গিয়াছে; এখন যিনি অবতার হইবেন, তিনি সমগ্র জনসাধারণকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবেন। হয় ত তাঁহাকেও রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু রাজার দুষ্কৃতির বিচার-ভার তাঁহাকে লইতে হইবে না। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আরও একটু ভাবিয়া দেখ। মুক্তির জন্য ভক্তের কোনও যাগ-যজ্ঞ, সন্ধ্যা-গায়ত্রীর প্রয়োজন নাই। শুধু নামকীর্ত্তন করিলেই মুক্তি হইবে। মুক্তির এমন সহজ উপায় না করিয়া দিলে ব্রাহ্মণেতর সমস্ত শ্রেণীর পক্ষে সুবিধা হইত না।

"এই ত মোটামুটি আমার থিওরি। হয় ত সব দিক হইতে কৃষ্ণতত্ত্ব ভাল করিয়া বিচার করিলে নূতন আলো পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমি যতদূর বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতে ব্রজের কৃষ্ণ ও মহাভারতের কৃষ্ণকে দুজন সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করার চেষ্টা অনাবশ্যক। যদি বাস্তবিক কোনও এমন বিষম অসামঞ্জস্য থাকে যে, কিছুতেই দুয়ের মধ্যে চরিত্রগত ঐক্য সম্ভাবিত হইতে পারে না, তাহা হইলে অবশ্যই জোর করিয়া মিলাইবার চেষ্টা করা বৃথা। কিন্তু আমার ত মনে হয় না যে, দুইয়ের মধ্যে এমন কিছু অনৈক্য আছে। Positivist religionএর জন্য যদি আদর্শ পুরুষ দরকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে আবশ্যক মত শ্রীকৃষ্ণকে ছাটিয়া-ছাঁটিয়া দাঁড় করান কেন চাই, ইহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। বঙ্কিমবাবু রাগ করিলেন; এবং অকারণ কর্ত্তার নাম করিয়া শ্লেষ করিবার চেষ্টা করিলেন।"

রাত্রি ক্রমশঃ অধিক হইল, অথচ উঠিতে ইচ্ছা করে না। এ সকল কথা শুনিবার সুযোগ সহজে হয় না। অথচ বুঝিতে পারিতেছি, বক্তা ক্লান্ত হইয়াছেন। তবু একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল। অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয় কেমন করিয়া হইল?

তিনি বলিলেন "সে আমি কেমন করিয়া বলিব? বহু পূর্ব্ব হইতেই তিনি আমাদের বাড়ী আনাগোনা করিতেন; কবে যে তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছি, সে কথা আমার স্মরণ নাই। অনেক দিন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তিনি একজন প্রধান লেখক ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য বলিয়া তাঁহাকে আমরা জানিতাম। ক্রমে তিনি নাস্তিক হইয়া বিদ্যাসাগরের দলে মিশিলেন। বিদ্যাসাগরের কথায় তিনি চারুপাঠ প্রভৃতি বই লিখিতে আরম্ভ করিলেন। আমাদের বাড়ীতে তাঁর যাতায়াত প্রায় বন্ধ হইল।"

প্রশ্ন করিলাম—"বিদ্যাসাগর কি বাস্তবিক নাস্তিক ছিলেন?" উত্তর হইল—"ঐ এক রকমের নাস্তিক ছিলেন, যাকে বলে অজ্ঞেয়বাদী। এই অজ্ঞেয়বাদী আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারি না। অজ্ঞেয় বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিব কেন? অচিন্তনীয় বলিতে পার; কিন্তু তাঁহাকে অজ্ঞেয় বলিব কেন? যেটা আমার অনুভূতির সামগ্রী, সেটাকে হয় ত আমি বাহিরে present করিতে পারি না; খানিকটা represent করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতে পারি। সব জিনিষই কি বাহিরে আমরা present করিতে পারি? Represent করা ছাড়া আমাদের উপায় কি আছে? তোমার বেদনা হইয়াছে, সেটা তুমি কেমন করিয়া আমার কাছে present করিবে বল দেখি? তোমার অশ্রু, তাহা represent করে মাত্র। কিন্তু তোমার বেদনা তোমারই অনুভূতির সামগ্রী হইয়া রহিল; তাহার presentation হওয়া অসম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া কি তোমার বেদনাকে অজ্ঞেয় বলিব? ইউক্লিডের লাইনকে present করিতে পারা যায় কি? কাগজে কসি টানিলেই তাহার breadth থাকিয়া যাইবে। কিন্তু তবুও ত আমরা সেটাকে represent করিবার চেষ্টা করি। ইউক্লিডের লাইন কি আমাদের অজ্ঞেয় রহিয়া গেল? Materialism চাও? আচ্ছা; ক্ষতি নাই; একবার চেষ্টা করিয়া দেখ দেখি। আমাকে, তোমাকে, প্রত্যেক sentient beingকে বাদ দিয়া শুধু material জগৎ একবার খাড়া করিয়া রাখিবার চেষ্টা কর দেখি। কিছু কোথাও থাকে কি? জর্ম্মাণ পণ্ডিত কাণ্ট বুদ্ধির সাহায্যে এই জগৎ-তত্ত্ব বুঝিতে গিয়া একটা vicious circleএর বিষম আবর্ত্তে ঘোরপাক খাইয়া, শেষে হাল ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার অন্ধকার কিছুতেই ঘুচিল না। শঙ্কর কিন্তু যে পথ ধরিলেন, সেখানে অন্ধকার নাই, পরিষ্কার আলো। তিনি বলিলেন,—ঐ প্রকৃতির লীলা দেখিয়া তত্ত্বজ্ঞান পাইবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। প্রকৃতির লীলার কোন্‌খানে সত্য আছে, আজও তোমরা বলিতে পার কি? Electricity, space, atom প্রভৃতি যে সকল শব্দ ব্যবহার করিয়া একটা কিছু বুঝাইবার চেষ্টা কর, আজ পর্য্যন্ত তাহা ধ্রুব এবং সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে কি? প্রকৃতির কোন্ জিনিষটা শেষ পর্য্যন্ত খাঁটি, অভ্রান্ত, সৎ বলিয়া দাঁড়াইয়াছে? শঙ্কর বলিলেন,—প্রকৃতির লীলাকে খবরদার বিশ্বাস করিও না; ওকে বুঝিবার সাধ্য কাহারও নাই। এই জন্য ওকে আমি অবিদ্যা বলিতে চাই। বুদ্ধির দ্বারা উহার ভিতর হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা নিষ্ফল হইবে;—উহা অবিদ্যা, মায়া। মায়া, illusion তোমাকে ফাঁকি দিবেই দিবে। কাণ্ট যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেলেন। শঙ্কর ও-পথ একেবারেই ধরিলেন না। প্রমাণ ও প্রমেয়, উভয়ের সত্ত্বা এক বলিয়া তিনি ধরিলেন। আগাগোড়া বিচার করিয়া তিনি যেখানে দাঁড়াইলেন, সেখানে আর কিছুমাত্র অন্ধকার নাই। ওত কথাটা শঙ্কর যেমন ধরিয়াছেন, তেমন আর কেহ ধরিতে পারেন নাই। এখন, যে-আমি না থাকিলে জগৎ থাকে না, সৃষ্টি মিথ্যা হয়, সে-আমি কি একটা accident? সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্বটা কি একটা accident-এর উপর নির্ভর করিতেছে? তা, যদি না হয়, তবে?"

আমি বলিলাম—"যখন শঙ্করের কথাটা উঠিল, তখন আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। উপনিষদে যে সত্যকাম জাবালের উপাখ্যান আছে, তাহাতে লেখা আছে 'নাহমেতদ্ বেদ তাত যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহমেতন্ন বেদ যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি'; শঙ্কর ব্যাখ্যা করিতেছেন,—জবালা বলিলেন, বৎস, যৌবনে দরিদ্র, স্বামিগৃহে বহু অতিথির পরিচর্য্যা করিতে হইত; সেই সময় তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম; গোত্র জানি না। কেন জানি না? এই প্রশ্ন যদি উঠে, তদুত্তরে শঙ্কর বলিতেছেন,

অতিথিসেবায় দিন-রাত এত ব্যস্ত থাকিতে হইত যে, স্বামীকে গোত্রের কথা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। অবশ্য আসল textএর ভিতর এ সকল কিছুই নাই। কালীবর বেদান্তবাগীশও এই ব্যাখা গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু আমার যেন মনে হয়, এটা একটা white-washingএর চেষ্টা। আপনার কি মনে হয়?"

কিঞ্চিৎ উত্তেজিত স্বরে তিনি উত্তর করিলেন—"আমার কি মনে হয়? শঙ্কর ঐ রকম ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়াই কি তাহা নির্ব্বিচারে মানিয়া লইতে হইবে? দরিদ্র স্বামিগৃহে জবালার যদি পুত্র জন্মিয়া থাকে, তবে অত ঘুরাইয়া আভাসে সে কথা জানাইবার আবশ্যকতা কি ছিল। উপনিষদের ভাষায় ত কোথাও বিশেষ ঘোরপ্যাচ নাই। সমস্তটার context-ছাড়া একটা মানে করিলে চলিবে কেন? যৌবনে দরিদ্র পরিচারিকার একটি ছেলে হয়েছিল; এটা ত কিছু বিশেষ অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। স্বামিগৃহে পরের সেবা করিতে এত ভুল হইয়া গেল যে, গোত্র পর্য্যন্ত জানা হইল না? ও-ব্যাখ্যা আমি কিছুতেই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নই। সত্যবাদী জাবাল সত্যকামের ব্রাহ্মণত্বের বিশিষ্টতা উপনিষদের ভাষায় যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমন আর কিছুতে হইতে পারে না। বাস্তবিক যদি বিবাহিতা পত্নীর গর্ভে জন্ম হইয়া থাকে, তাহা খুব সহজেই বুঝান যাইতে পারিত। হৌক উহা শঙ্করের ব্যাখ্যা, তবু ও-ব্যাখ্যা আমি মানিতে পারি না।

"শঙ্করের কথা আলোচনা করিতে-করিতে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে reformএর কথা আমার মনে আসে। পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, আমাদের সে-কালের সমাজের একটা প্রধান দোষ ছিল; ঐ সব reformএর বিরুদ্ধে সে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইত। কিন্তু তাই বলিয়া কখনও কি এ দেশের ধর্ম্মে বা সমাজে সংস্কারের movement হয় নাই? সে সকল movement সমাজের ভিতর হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া তবে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। একেবারে পুরাতন সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া নূতন কিছু করিবার চেষ্টা করিলে তাহা নিঃসন্দেহ ব্যর্থ হইবে। ফুলকে ডালসুদ্ধ গাছ হইতে ছাড়িয়া লইয়া কাচের ফুলদানির মধ্যে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিলে তাহার যে অবস্থা হয়, আমাদের গত শতাব্দীর বাঙ্গালার reform movementএর সেই অবস্থা হইয়াছে। রামমোহন রায়ের সময়ে কিন্তু কেহ কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, এ-রকমটা দাঁড়াইবে। সমাজের ভিতর হইতে সমাজকে সংস্কার না করিলে, কিছুতেই সফল-প্রযত্ন হওয়া যাইবে না, ইহা তিনি বেশ বুঝিতেন। তাই তিনি অনেকটা সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পরে ঘটনা-পরম্পরায় যাহা দাঁড়াইল, তাহার জন্য অনুশোচনা করা বৃথা। ছেলেবেলায় আমার মনে কত আশা, কত আনন্দ, কি enthusiasm ছিল! ভাবিতাম, দেশ ক্রমশঃ প্রবুদ্ধ হইবে, উন্নত হইবে, আপনাকে চিনিতে পারিবে। তাহা হইল না। কেশবচন্দ্র সেন সমস্ত reform movementটাকে এমন একটা twist, এমন একটা মোচড় দিলেন যে, সব গোলমাল হইয়া গেল। সে সব কথা স্মরণ করিলে মনে বড় ব্যথা পাই। কেশবচন্দ্র উপনিষদের কোনও ধার ধারিতেন না; ভারতবর্ষের প্রাচীন cultureএর ভিতরকার কথা ভাল করিয়া জানা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না; যতটুকু বুঝিতে পারিলেন, সেটুকুকেও পাশ্চাত্য পরিচ্ছদে মণ্ডিত না করিলে তিনি লজ্জিত বোধ করিলেন; নূতন সমাজ গঠিত করিয়া বিলাতি ছাঁচে তাহার নাম দিলেন—New Dispensation—নববিধান। এই যে কেশবচন্দ্র বিদেশের দিকে মুখ ফিরাইলেন, একটা উৎকট বিলাতি attitude লইলেন;—এই খানেই সমস্ত reform movementটা পণ্ড হইবার আয়োজন হইল। তিনি উপনিষদ ছুঁইলেন না, বাইবেল পড়িলেন। তাই কি হিব্রু অথবা গ্রীক শিক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন? নব্য, ইংরাজি-শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায় দলে-দলে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। তবুও তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা-শুনা বন্ধ হয় নাই। কিছুদিন বেশ কাটিল। ক্রমশঃ তিনি একটা অভাব অনুভব করিলেন। Music না থাকিলে কিছুতেই চলে না। একদিন আমার কাছে আসিয়া তিনি বলিলেন,—'আমি একটু music শিখ্‌তে চাই; তুমি আমাকে হার্ম্মোনিয়ম শেখাও।' আমি বলিলাম—'বিলাতি হার্ম্মোনিয়ম শিখে তোমার কি হবে? দেশী কীর্ত্তন বরং একটু শেখো, যাতে তোমার একটু কাজ হবে।' কথাটা তাঁর মনে লাগিল। তিনি কীর্ত্তন শিখিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ তাঁর নববিধানে কীর্ত্তনের প্রসার বাড়িয়া গেল। এ দিকে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে আনাগোনা করিতে লাগিলেন। যা'ক সে সকল কথা। পরিতাপের বিষয় এই যে, কেহ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন

না; অথবা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন না যে, reform movementএর গলদ কোথায় হইল। আমি কিন্তু গোড়া হইতে বেশ বুঝিতে পারিতেছি, যে কোথায় একটা মস্ত ভুল করা হইয়াছে। বহু দিন পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছি; এবং যাঁহারা বড় গোছের চাঁই হইয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহাদিগকে 'মহাত্মা' বলিয়া রঙ্গরস করিতাম। কিন্তু তাঁহারা উল্টে ঐ শব্দ সকলে মিলিয়া আমার উপর এমন ভাবে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন যে, ক্রমশঃ তাঁহাদের কাছে আমার নাম শুধু 'মহাত্মা' হইয়া গেল। কেশবচন্দ্রকে লইয়া কিন্তু কখনও আমি রঙ্গ রহস্য করি নাই। মতের অমিল হইলেও তাঁহার সঙ্গে আমার মনের অমিল কখনও হয় নাই। বাবা যখন প্রথম হার্ম্মোনিয়ম আনাইলেন, সহরের মধ্যে বাঙ্গালী সমাজে তখন আর কোথাও ঐ বাদ্য-যন্ত্রের চর্চ্চা হইত কি না সন্দেহ। সত্য (সত্যেন্দ্রনাথ) ও আমি প্রথম হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতে শিখি। বাঙ্গলায় প্রথম স্বরলিপি যে আমার রচিত, তাহা একেবারে নিঃসন্দেহ। সৌরীন্দ্রমোহন তাহার পরে তাড়াতাড়ি একটা স্বরলিপি প্রস্তুত করিয়া ছাপাইয়া দিল। দেখ, এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, কতকগুলা বিষয়ে আমি pioneerএর কাজ করিয়াছি; আমার পরে কেহ-কেহ সেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে। আমি যখন মেঘদূত লিখি, তখন ও-ধরণের বাঙ্গালা কবিতা কেহ লিখিতেন না। ঈশ্বর গুপ্তের ধরণটাই তখন প্রচলিত ছিল। মাইকেল তখন ইংরাজিতে কবিতা লিখিতেন। একদিন হাইকোর্টে আমার ভগিনীপতি সারদাকে তিনি বলিলেন 'আমার ধারণা ছিল, বাঙ্গালায় ভাল কবিতা রচিত হইতে পারে না; 'মেঘদূত' প'ড়ে দেখ্‌ছি, সে ধারণা ভুল।' মাইকেল বাঙ্গালা কাব্য-রচনায় মন দিলেন। ঐ যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনি লিখিলেন, ও আমার কিছুতেই ভাল লাগিল না। রাজনারায়ণবাবুর কিন্তু খুব ভাল লাগিত। ইংরাজি সাহিত্যে তাঁর খুব অনুরাগ ছিল কি না, তাই তাঁ'র ঐ ছন্দ অত পছন্দসই হইয়াছিল। আমি অনেক লিখিয়াছি; এই লেখা-পড়া ছাড়া আর আমি জীবনে বড় একটা কিছুই করিতে পারিলাম না; কখনও আমি বিষয়-কর্ম্ম ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না;—বাবা ইদানীং আমাকে কোনও বিষয়-কর্ম্মে থাকিতে দিতেন না। কিন্তু কখনও কোথাও আমার লেখার মধ্যে বিদেশী হাবভাব idiom তুমি খুঁজিয়া পাইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মনে যদি এমন কোনও ভাব উদিত হয়, যাহা প্রকাশের উপযুক্ত খাঁটি দেশী ভাষায় প্রকাশ করা যায়,—তাহাকে প্রকাশের জন্য বিদেশী idiom-এর অনুবাদ করিতে যাইব কেন? আমি কখনও ও-পথ মাড়াই নি। আমার লেখার এই বিশিষ্টতা আর কেহ বুঝিতে পারিবে কি না জানি না; কিন্তু কৃষ্ণকমল পারিবে। এক একবার বক্তৃতা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। আমার লেখাতেও যে কোনও বিশেষ ফল হইয়াছে, তাহা বলিতেছি না। জ্যোতির ঝোঁক হইল, একখানা নূতন মাসিক-পত্র বাহির করিতে হইবে। আমার কিন্তু ততটা ইচ্ছা ছিল না। আমার ইচ্ছা ছিল, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে ভাল করিয়া জাঁকাইয়া তোলা যাক। কিন্তু জ্যোতির চেষ্টায় 'ভারতী' প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনের' মত একখানা কাগজ করিতে হইবে, এই ছিল জ্যোতির ইচ্ছা। আমাকে সম্পাদক হইতে বলিল। আমি আপত্তি করিলাম না। আমি কিন্তু ঐ নামটুকু দিয়াই খালাস। কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর পড়িল। আমি দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিতাম। মলাটের উপরে একটি ছবির design আমি দিয়াছিলাম; কিন্তু সে ছবি ওরা দিতে পারিল না। আমি চিরকাল স্বদেশী। বিদেশী পোষাক-পরিচ্ছদ ভাব-ভাষ আমার দু-চক্ষের বালাই। এইজন্য অনেক সময়ে আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার মতের বিরোধ হইয়াছে। স্ত্রী-স্বাধীনতা আমি অপছন্দ করি না; কিন্তু আমার ব[illegible] ভয় হয়, পাছে কিছু বাড়াবাড়ি হইয়া যায়। আমি গে[illegible] থেকে সেই স্বদেশী culture ধরিয়া বসিয়া আছি; ঘরের মধ্যেই বসিয়া আছি। আমার ঘর, আমার home যে কি জিনিষ, তা' তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেন্টপল্‌স্ স্কুলের ইংরাজ হেডমাষ্টার একদিন শনিবারে ছুটির পর আমাকে আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই যে সকলের সঙ্গে বাড়ী যাওয়া হইল না, তা'তে আমার যে কি ছট্‌ফটানি ধরিল সে আমি বলিতে পারি না। খানিকক্ষণ পরে হেডমাষ্টারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য দৌড়িয়া তাঁহার bath-room—স্নানাগারের-এর দরজা খুলিয়া বেগে ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলাম—'আমাকে ক্ষমা করুন'। সাহেব তখন মুখ ধুইতেছিলেন; চমকিয়া আমার দিকে মুখ ফিরাইলেন; বলিলেন—'এ কি? তোমাদের বাড়ীর ঘরে কি দরজা নেই? তুমি এই দরজায় টোকা দিতে পারলে

না?' আমি কাতর স্বরে বলিলাম,—'আমাদের বাড়ীর ঘরেতে খুব বড়-বড় দরজা আছে; আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি; আপনি আমাকে বাড়ী যেতে দিন।' তিনি আমরি, please let me go home শুনিয়া আমাকে ক্ষমা করিয়া বিদায় দিলেন। আমি বাড়ীতে আসিয়া বাঁচিলাম।

"কখনও আমি বাড়ীর বাহিরে কোনও একটা বড় কাজ করিতে পারিলাম না। বক্তৃতা দিলাম, কিন্তু কাহারও মন ভিজিল না। রবি তখন কবিতা লিখে বেশ সুখ্যাতি পাইতেছিল; তাহাকে বলিলাম—'তুমি বেশ মিষ্ট ভাষায় লিখিতে পার; আমাদের স্বদেশী সভ্যতার ভিতরকার কথাটা আমাদের দেশের লোককে ভাল করিয়া শুনাইতে পার? আমি ত চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, কিছুই হইল না। তোমার কথা তাহারা মন দিয়া শুনিতে পারে।' দেখ, একরকম স্বদেশী আমাদের দেশের ফ্যাশান হইয়াছিল; কিন্তু তাহার মধ্যে একটা বিলাতি গন্ধ ছিল। রঙ্গলালই বল, আর রাজনারায়ণবাবুই বল, তাঁহাদের patriotism এর বার আনা বিলাতি, চার আনা দেশী। ইংরাজ যেমন patriot, আমিও সেই রকম patriot হব—এই ভাবটা তাঁদের মনে খুব ছিল। বল দেখি, আমি তোমার মত patriot হইব কেন? আমি আমার মত patriot হইতে না পারিলে কি হইল! নবগোপাল একটা ন্যাশনাল ধুয়া তুলিল; আমি আগাগোড়া তা'র মধ্যে ছিলাম। সে খুব কাজ করিতে পারিত; কুস্তি জিম্‌ন্যাষ্টিক প্রভৃতির প্রচলন করার চেষ্টা তা'র খুব ছিল; কিন্তু কি রকম কি হওয়া উচিত, সে সব পরামর্শ আমার কাছ থেকে লইত। একটা মেলা বসাইবার কথা বলিল,—তাঁতি, কামার, কুমার ইত্যাদি লইয়া। আমি বলিলাম—'ও সব ত দেশের সকলের জানা আছে; দেশী painting দেখাতে পার?' সে এক painter নিযুক্ত করিয়া ছবি আঁকাইল। মেলার ক্ষেত্রে গিয়া দেখি, প্রকাণ্ড ছবি। ব্রিটানীয়ার সম্মুখে ভারতবাসী হাতজোড় করিয়া বসিয়া আছে। আমি বলিলাম—'উল্টে রাখ, উল্টে রাখ; এই তুমি দেশী painting করাইয়াছ? আর আমাদের ন্যাশনাল মেলায় এই ছবি রাখিয়াছ?' ছবিখানা সরাইয়া উল্টাইয়া রাখা হইল। তা'র ঝোঁক ছিল, বড়-বড় ইংরাজকে নিমন্ত্রণ করা। আমি অনেক বলিয়া কহিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করাইলাম। সে বড়-বড় ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের ও দেশী রাজাদের কাছে খুব যাতায়াত করিতে পারিত। একখানা ন্যাশনাল কাগজ বাহির করিল; একেবারেই সুপাঠ্য নয়। কিন্তু নবগোপালের সময় থেকে এই 'ন্যাশনাল' শব্দটা দাঁড়াইয়া গেল। ন্যাশনাল সঙ্গীত রচিত হইতে আরম্ভ হইল।

"এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমি ত' একেবারে হতাশ হইয়া গিয়াছিলাম। এখন আমার আর কিছু করিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু এখন একটু আশা হইয়াছে। এখন আমাদের দেশের মধ্যে খাঁটি patriot-এর আবির্ভাব হইয়াছে—মহাত্মা গান্ধী। ইনি আমাকে আমার মত patriot হইতে বলেন; তোমার মত, বিদেশীর মত নয়। দেখি কি হয়।"

ভুল

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

সবারে ডাকিয়াছিনু, ডাকিনি তোমারে
অভিমানে মুখ করি' ভার,
সেদিন গেছিলে তুমি তাই প্রিয়তমে,
এসে এসে, ফিরে বারবার;

তুমি কি বোঝনি আজো কণ্ঠ যবে ছলে
অন্য নাম করে উচ্চারণ;
শ্রবণ শুনিতে চাহে কার পদধ্বনি
আঁখি যাচে কার দরশন।

পথহারা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

নবম পরিচ্ছেদ

ফুল শুকাইয়া গেলেও তাহার সমুদয় পরিচয়টুকুকে সে নিঃশেষ করিয়া দিয়া যায় না,—শুধু সঙ্গে লইয়া যায় তাহার সুবাসটুকু। তেমনই, পতিহীনা হইয়াও ইন্দ্রাণী আবার সেই স্বামিহীন সংসারেই ঘর করিতে লাগিল বটে, কিন্তু সব থাকিতেও তাহার যেন আর কোন কিছুই রহিল না। জগৎটা যে এত বড় শূন্য, জীবনটা যে এতখানি বিস্বাদ—কোন দিনই বা ইহা কল্পনা করিতে পারা গিয়াছিল? অথচ সেই অচিন্তনীয় কাণ্ডই যখন ঘটে, তখনও আবার তেমনি করিয়াই জীবন-যাত্রার পথকে স্বাচ্ছন্দেই গড়িয়া লয়। ইন্দ্রাণীর জীবনে প্রথমাবধিই আলোর সঙ্গে ছায়া পাশাপাশি হইয়াই দেখা দিয়াছিল। নিরবচ্ছিন্ন আলোর আভা একদিনও তাহাতে ফুটিয়া উঠে নাই। ছোটবেলায় তাহার মা মরিয়াছে; বিবাহের পর দেবী মঙ্গলার বিষদৃষ্টি তাহার সুখের চাঁদকে রাহুগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু মা যেমন ছিল না—বাপের স্নেহের বন্যা সে দুঃখকে যে ছাপাইয়াছিল; স্বামীর প্রেমের অক্ষয় আলো—সে যে সব কালোকেই আলো করিয়া দিয়াছিল। ফুলের সঙ্গে কাঁটা—সে চিরদিনই তো গাঁথা থাকে। তা থাক না!—কিন্তু আজ কোথায় আলো?—কোথায় ওরে আলো? আজ অন্ধকারময় কালো ছায়াতেই যে চারিদিককার সব আলোর রেখাটুকুই ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। কোথাও যে এর কোন কূল-কিনারাই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! প্রাণ যে আজ থাকিয়া থাকিয়া তাই রুদ্ধ কাতর স্বরে উর্দ্ধে চাহিয়া আর্ত্ত চীৎকারে কাঁদিয়া উঠে; ডাকিয়া বলে, "কোথায় আলো,—কোথায় ওরে আলো!"—কিন্তু কোথায়? ওরে কোথায় সেই ঈপ্সিত কাঙ্ক্ষিত আরাধিত আলোকের এতটুকু একটুখানি রশ্মিরেখা। কোথায় রে, কোথায়? ইন্দ্রাণীর সারা জীবন এ কি নির্ম্মম অন্ধকারের বিরাট জঠর-গহ্বরে চিরসমাহিত হইয়া গেল! কেমন করিয়া এ অসহ্য আঁধার ঠেলিয়া সে তাহার এই নবযৌবনে বিকশিত জীবনকে অবসানের অস্তাচলে পৌঁছাইয়া দিতে পারিবে? সে যে বড় দীর্ঘ পথ,—পাথেয় তাহার বড় যে কম!

খুব বড়-রকম একটা আঘাত লাগিলে, প্রথম যখন সেটা পাওয়া যায়—অনুভূতি তাহাকে ভাল করিয়া গ্রহণ করিতেই পারে না। অসাড় চিত্তবৃত্তি যতই সজাগ হইয়া উঠিয়া সেই আঘাত-ব্যথাকে সমস্ত অন্তর দিয়া অনুভব করিতে থাকে, বেদনা ততই অসহ্য হইতে অসহনীয় হইয়া উঠে। ইন্দ্রাণীর সুবিপুল বেদনাভারে বিদ্ধ অসহ্য ব্যথায় ব্যথিত চিত্ত দিনে-দিনে পলে-পলে যেন মরণ-যন্ত্রণা অনুভব করিয়াই জীবিত রহিল; তাহার মরণ হইল, তাহার বিশ্বে যেন মহাপ্রলয় হইয়া গিয়াছে। এ যেন কোন্ একটা নূতন যুগ-সন্ধি! এর মধ্যে যেন তাহার চিরপরিচিত জীবনের কোন খেই খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না।

সবই যেন ঠলমলে, সবই যেন ঝাপসা। এই রকম ছায়াময় জীবন লইয়াই সংসারের সাড়ে তিন ভাগ লোকে বাঁচিয়া থাকে—সেও রহিল। না থাকিয়াই বা উপায় কি?

মঙ্গলা ঠাকুরাণী যথা পূর্ব্বং তথাপরম্—বরঞ্চ জামাই মরায় সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগেই নিজের কর্ত্তৃত্ব-শক্তিটাকে কাজে লাগাইতে পারিয়াছেন। পূর্ব্বে পূর্ণেন্দু বাড়ী থাকিলে মাথায় একটুখানি আঁচল চাপা দিতে হইত—দাসী, চাকর, প্রতিবেশিনী, কাক, পক্ষী, গোরু, বাছুর অথবা ইন্দ্রাণী এতন্মধ্যে কাহারও প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ কালীন পূর্ণেন্দুর কাণকেও কথঞ্চিৎ বাঁচাইবার প্রয়োজন ঘটিত;—এখন সে সবের পাঠ ত নাই-ই,—অধিকন্তু জামাইএর বিষয়-সম্পত্তিগুলা ইন্দ্রাণীর দলের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য চব্বিবশ ঘণ্টাই তিনি নিজের খাটো থান-কাঁড়ায় অর্দ্ধাবৃত হইয়া ভিন্ন পাড়ায় উকিলের পরামর্শ খুঁজিতে যাইতেও দ্বিধাগ্রস্তা নহেন। পূর্ণেন্দুর মরণে তাঁর শ্বশ্রূমাতা ঠাকুরাণীকে কেহ-কেহ যে সন্তুষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকেন, সে তাদের একদেশদর্শিতাই বলা উচিত,—এমন কথাটা আমরা বলিতে পারিব না। তবে এই দুর্যোগটাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার জীবনে যে কতকটা সুযোগ আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, সে কথাটাকে চাপা দিলেই কি তা চাপা থাকিবে বলিতে পার?

আর একজন যথার্থ করিয়াই এই মর্ম্মান্তিক অকাল বিয়োগে অত্যন্ত লঘু বোধ করিয়াছিল। সে পূর্ণেন্দুর একমাত্র পুত্র বিমল। বিমলেন্দু এ সংসারের মধ্যে একমাত্র নিজের বাপকেই একটুখানি যা ভয় করিত, সে কথা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। তাঁহার অবিদ্যমানে সে যতখানি উদ্দাম ভাবে অত্যাচার চালাইত, পিতার উপস্থিতিতে সেরূপ ভরসা করিত না। বিশেষতঃ পড়াশোনায় অবহেলা, স্কুল কামাই, স্কুল পালান, বাড়ীতে ইন্দ্রাণীর কাছে পড়া না দেওয়া—এই সব বিষয়গুলায় পূর্ণেন্দুর অবিদ্যমানেও যে কিছু গলদ ঘটিত,—বিমল দেখিত, তার জন্য তাহার আদৌ নিস্তার ছিল না। পূর্ণেন্দু বাড়ী আসিয়া সর্ব্বপ্রথমই এইগুলির তদারক করিতেন; এবং ইন্দ্রাণীই যে তাঁহার গুপ্তচর ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি! ফলে, প্রায়ই সে এই সব অপকর্ম্মের জন্য মার খাইত। এ লইয়া তাহারা দিদিমা-নাতিতে অনেক কাণ্ডই করিয়াছে; কিন্তু সৎমায়ের এই খলোমীটুকু কিছুতেই ছাড়াইতে পারেন নাই। বিমল বাপের কাছে ভৎর্সিত ও প্রহৃত হইয়া আসিয়া তাহার সাতগুণ শোধ মায়ের উপর তুলিত। তার পর কাঁদিয়া গিয়া দিদিমাকে লাগাইত, "দেখ দিদা, বাবা এলেই বৌ সব কথা ওকে বলে দেয়, আর আমায় মার খাওয়ায়।"

দিদিমা ইন্দ্রাণীকে শুনাইয়া, মুখ ঘুরাইয়া ছেলেকে সান্ত্বনা দিতেন, "ভালুথাকি ঐ করতেই তো এসেছে যাদু! নৈলে আর সৎমা বলেছে কেন?"

তা সে সব জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়াছিল। বিমল দেখিল, দিনের পর দিন চলিয়া গেল, মাসের পর মাস কাটিল—তাহাকে শাসন দমন করিবার সেই যে একটি মাত্র লোক এ পৃথিবীর মাটিতে হাঁটিত, সে আর এ বাড়ীতে পা দিল না। সে এখন নিরুদ্দেশ হইয়া কোথায় গেল? মনে তাহার কৌতূহল যে জাগিত না, তা নয়। তথাপি সে সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করিতে গেলে, যদিই বা হঠাৎ সে ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াই, কঠিন হস্তে কাণ ধরিয়া টান দিয়া বলে, 'পাজি নচ্ছার ছেলে! ঘুড়ি ওড়ানোর যে বড্ড সখ হয়েছে দেখছি!' ফলং অত কষ্টের বোতল-চূরের মাঞ্জা দেওয়া সুতাশুদ্ধ লাটাই ঘুড়ি সব কাড়িয়া লইয়া পুকুরের জলে ফেলিয়া দেন! অথবা অহিফেন-প্রসাদাৎ ঝিমাইতে তৎপর পণ্ডিতমশাইএর মস্তকের দীর্ঘ শিখাটা তাঁহারি চৌকির সহিত দড়ি দিয়া বাঁধিয়া সেই যে সে এক করুণরসের অবতারণা করিয়াছিল, অথবা স্কুলের পড়ায় কি অবহেলা করায়, স্কুলের মাষ্টার তাহাকে এক ঘা বেত মারায়, সেই বেত কস্ করিয়া মাষ্টারের হাত হইতে টানিয়া লইয়া, তাঁহাকে সপাসপ করিয়া সেই যে সে পিটাইয়া দিয়াছিল, যা লইয়া রামদয়াল আসিয়া অনেক হাঁটাহাঁটি, ঘাট-মানামানি করিয়া মিটাইলেন, অথচ সে একটা চড়ও পাইল না,—এ সবের জন্য কি জানি কি ভয়ানক শাস্তি দিয়াই বসেন, কাজ কি? তবে বিমল নেহাৎ কচি ছেলেটী নয়; পিতা যে হঠাৎ কলিকাতায় চিকিৎসা করিতেই গিয়াছেন, এও সে ঠিকমত বিশ্বাস করিতে পারে নাই। তা ভিন্ন, পাঁচজনের মুখেও কিসের একটা আভাস সে পাইত! তাই একদিন তারা যখন হঠাৎ বলিয়া বসিল, "দাদি! আমাল বাবা কখন অসবে দাদি?" তখন নিজের সন্দেহ অনুসারেই বিমলের মুখ দিয়া আচমকা বাহির হইয়া গেল, "বাবা তো আর আসবে না তারা, বাবা যে মরে গেছে।"

মৃত্যু কি, তারার তাহা ধারণা ছিল না; কিন্তু ঐ 'আর

আসিবে না' কথাটা তাহাকে বিঁধিল। সে তৎক্ষণাৎ দুই চোখে জল ভরিয়া, ফুলা ঠোঁটে কাঁদো-কাঁদো হইয়া বলিল; "তবে আমায় কে আদর করবে?"

বিমলের এ কথাটা ভাল লাগিল না। সে অভিমান-ক্ষুণ্ণ অনুযোগে জবাব দিল, "কেন, বাবা ছাড়া কি তোকে কেউ আদর করবার নেই? কেন, আমি কি তোকে কিছুই আদর করিনে?"

তারা সে কথায় কাণ না দিয়াই, ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিতে লাগিল, "না দাদি! বাবা আসবে, বাবা আসবে, বাবা যে আমায় ভালবাসে, বাবা যে আমায় আদর করে। বাবা আসবে দাদি?"

ঘোর অভিমানে পরিপূর্ণ হইয়া বিমল কহিল, "আসিতে হয় আসুক না, তার আমি কি জানি? বাবা কি আমায় ভালবাসতো যে আমি তার জন্য তোর মতন আসবে আসবে করে নাকে কাঁদতে বসব? তুই বাবার আদুরী মেয়ে, তুই তার জন্য কাঁদগে যা।"

এই বলিয়া রাগ করিয়া সে বোনটার নিকট হইতে জোরে-জোরে পা ফেলিয়া চলিয়া গেল; এবং হাঁকডাক করিয়া দিদিমাকে গিয়া জানাইল যে, তার লাটাইটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—নূতন লাটাই কিনিবার জন্য তাহার এই মুহূর্ত্তেই একটা আস্ত টাকা চাই। দিদিমা বলিলেন, "ওমা, সে কি কথা! ওই বলে যে এই কালকেই একটা টাকা নিয়ে গেলি, কি করলি সে টাকা?"

বিমলেন্দু বলিল "সেটায় যে বোনটিকে একটা কাঁচের পুতুল কিনে দিয়েছি, আর একটা আজ শিগ্‌গির করে বার করে দাও।"

মঙ্গলা ঠাকুরাণী দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন "তাই তো গা! ছেলের আমার বড় যে আবদার দেখি! আমি ওঁকে টাকা বার করে করে দেব, আর উনি তাই দিয়ে দিয়ে ওঁর সোহাগের বোনের পা পুজো করবেন। বলে বাঁচিনে বাঁদরের জ্বালায়—তাই হয়েছে আমার!"

বিমলেন্দু মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল, "না, এবার তো আর সে হবে না। বোনটার সঙ্গে ঝগড়া করিছি যে। দিয়ে দাও, লাটাই কিনে আনি। এখন ও কিনে এনে তোমায় দেখিয়ে যাব'খন।"

দিদিমা টাকাটি বাহির করিয়া আনিয়াও অর্দ্ধ অ-বিশ্বাসে সংশয়ের স্বরে কহিলেন, "হেঁঃ, তোমার ঝগড়া তো এক্ষুনি সে ছোট-ডাইনীর চাঁদমুখ চোখে পড়লেই ঘুরে যাবে। ওর মা তোর বাপকে তুক করেছিল,—তার মেয়েকে দিয়ে তোকে করিয়েছে—তা তো জানিস নে?"

বিমল বিরক্ত-ঔদাস্যে মাথা নাড়া দিয়া কহিয়া উঠিল "হ্যাঃ, 'তুখ' করালে তো বড্ডই হোল, আমি কি না আমার বাপের মতন। আর কি না সাতজন্মেও বোনটার সঙ্গে কথা কবো? দাও দাও, টাকা দাও শিগ্‌গির করে, ঘুড়ি নাটাই নিয়ে কানাই বিশুদের সঙ্গে ঘুড়ির 'প্যাঁচ' লাগিয়ে আসি, সন্ধ্যার আগে কিন্তু আজ বাড়ী আসচিনে, তা বলে রেখে গেলুম।"

দিদিমা হৃষ্ট হইয়া টাকা দিলেন, আদর করিয়া বলিলেন "তা এসো না, ছেলেমানুষ একটু খেলতে না পেলে প্রাণ বাঁচবে কেন? এলেই তো তোমার 'লীলাবতী' 'কলাবতী' সৎমা বই নিয়ে ঠেঙ্গাঠেঙ্গি লাগিয়ে দেবে। তুমি দেরি করেই এসো।"

বিমল লাফ দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল। টাকাটা একবার ঝন্ ঝন্ খন্ খন্ শব্দ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল, কুড়াইয়া লইল।

সে শব্দটা ইন্দ্রাণীর কাণে গিয়াছিল। সে ঘরের মধ্যে কি করিতেছিল, তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিয়া ডাকিল— "বিমল!"

বিমলের কর্ণে সে ডাক পৌঁছিলেও, তাহার জবাব দেওয়া দরকার বলিয়া সে বোধ করিল না; যেহেতু আহ্বানের কারণ সে না বুঝিয়াছিল তা নয়। বরং বামালশুদ্ধ ধরা পড়ার ভয়ে ছুটিয়া পলাইল।

বিমলের বদলে ইন্দ্রাণীর ডাকের উত্তর দিলেন বিমলের দিদিমা। তিনি 'মিলিটারী' চালে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, যেন সেনাপতির মত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ভাবে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন গা?"

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ওকে আজও আবার টাকা দিয়েছেন?"

মঙ্গলা জবাব দিলেন, "হুঁ, দিয়েছি।"

জবাব দিবার ধরণ দেখিয়াই ইন্দ্রাণীর এ লইয়া আর কথা কহিতে ভরসা বা প্রবৃত্তি রহিল না। তখন তাহাকে বাক্য-বিমুখ ও প্রস্থানোদ্যতা দেখিয়া, মঙ্গলাই আবার ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিয়েছি তো, তাতে হয়েছে কি?"

ইন্দ্রাণী এবার উত্তর করিল, "কালও একটা টাকা দিলেন, আবার আজও দিলেন,—ছোট ছেলের হাতে অত টাকাকড়ি দেওয়ায়—" কথাটা সে শেষ করিল না।

মঙ্গলা শান্তভাবে প্রশ্ন করিলেন, "ওর বাপ কি এমন দুটো টাকা রেখে যায় নি, যাতে করে ও দুটো-একটা খরচ করতে পারে?"

ইন্দ্রাণী মুখ নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জবাব আর এর কি আছে?

"বলি, তোমরা তো ওর বাপের সবই লুটে নেবে, আর ওকে ভিখিরির মতন দুটো-দুটো খেতে দেবে—এই ঠিক করেচ। তার উপর আমি যদি আমার নিজের পয়সা থেকে দুটো-একটা দিই, তাতেও তোমায় বুক কেন ধসে যায় বলো তো? কচি ছেলে, মা নেই, বাপ নেই—এতটুকু একটু সখও করবে না—মারা যাবে যে" এই বলিয়া কান্নাভরা স্বরে "হায় রে সুমি, পুণ্য!" বলিয়া একটা ঝড়ের মত দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াই চাহিয়া দেখিলেন, ইন্দ্রাণী ধীরে-ধীরে ঘরের মধ্যে চলিয়া যাইতেছে। তৎক্ষণাৎ কি কথা স্মরণ করিয়া ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ওগো, শোন শোন! কালকের টাকাটা দিয়ে তুমি তোমার মেয়েকে যে পুতুল কিনে দিয়েচ, তার দামটা তুমি আমায় দিয়ে দিও। আর আজকের এই টাকাটা, তার মাটাই কেন্‌বার টাকাটাও দিও আমাকে। ওর বাপ ঢের টাকা রেখে গেছে। যতদিন না সাবালক হচ্চে, দুঃখ ওকে পেতেই হবে। তবে অত দিও না, যা ধর্ম্মে সয় তাই করো।"

এই ভাবেই তারা ও বিমল বাড়িতে লাগিল। দিন কাটিয়া বৎসরের পর বৎসর আসা-যাওয়া করিতে লাগিল। স্বামী হারাইয়া যেখানে কেমন করিয়া একটা বেলা কাটাইবে, এই ভাবনা ইন্দ্রাণীর আত্মীয়-জনে ভাবিয়া পায় নাই, সেই আশ্রয়ের মধ্যেই পতিহীনা ইন্দ্রাণীর দীর্ঘ-দীর্ঘ বৎসর সকলও গত হইতে লাগিল যে কেমন করিয়া, সেই কথাটাই ইন্দ্রাণীও যেন ভাবিয়া পায় না! অথচ দিনও তো কাটিয়া যায়! প্রথম-প্রথম কিছু দিনাবধি নিজের কথা সে ভাল করিয়া ভাবিতেই পারে নাই;—আচ্ছন্ন, মোহাবিষ্ট ভাবেই পিতার আদেশ পালন করিয়া গিয়াছে। তার পর যেদিন সর্ব্বপ্রথমে রামদয়াল তাহার দুর্দ্দশার ভয়ে তাহাকে নিজের সঙ্গে বাড়ী লইয়া যাইতে চাহিলেন, সেই দিনই সর্ব্বপ্রথম ইন্দ্রাণীর স্বপ্নাভিভূত চিত্তে বাস্তবের রেখাপাত হইল। বৈধব্য-যন্ত্রণার অসহ্য দাহ-জ্বালা তাহার কোথাও গিয়াই তো জুড়াইবার নয়, সে সত্য। তথাপি, ক্ষতকে লবণাক্ত করার যাতনা, সেও তো বড় কম নহে! মন তাহার মুহূর্ত্তেই কাঙ্গাল হইয়া উঠিয়া, যেন এই প্রস্তাবকে দুই হাত বাড়াইয়া সাদরে বরণ করিয়া লইতে গেল। এই অগ্নিদগ্ধ পীড়িত হৃদয়টাকে পিতার স্নেহ প্রলেপের অমৃত-নিষেকে যদি এতটুকুও সে জুড়াইয়া লইতে পারে! কিন্তু পরক্ষণেই সে কি এক অতীত চিত্র তাহার দুই অশ্রু-অন্ধ কাতর দৃষ্টিতে যেন আগুনের দাহ জ্বালাইয়া দিয়া ফুটিয়া উঠিল! কি সে করুণ আবেদন, ওরে কি সে সকরুণ আবেদন! ইন্দ্রাণী যে আর কাণ পাতিতে পারে না! "আমি যে আর পারি নে ইন্দু! আমার উপরেও তো তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে!" সেই দুঃখ দারুণ হতাশা-আশার সুরটুকু যেন সকরুণ মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার দুই কাণের কাছে ফিরিয়া-ফিরিয়া ক্রমাগতই ওই দুটি কথা বলিয়া যাইতে লাগিল, 'আর যে আমি পারিনে ইন্দু!' এই না পারার আবেদনটার মধ্যে একটা অপরিতৃপ্ত তরুণ প্রাণের কত বড় আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা যে সুপ্ত ছিল, —সব থাকিতেও সেই সর্ব্ব বঞ্চিত লোকটার সেই যে শুধু তাহাকেই বুকে টানিয়া লইয়া একটা ভালবাসার শান্তি-নীড় রচনার উদ্দেশ্যে সর্ব্ব ছাড়িয়া বিবাগী হইয়া যাইবার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা, এ যে সেই দিনই সে না বুঝিয়াছিল তা নয়; কিন্তু আজ তাহার বিরহ-বেদনার তাপে একান্ত সন্তাপিত চিত্ত সেই উপবাসী ক্ষুধিত চিত্তের কাঙ্গালপনা যেমন করিয়া নিজের বুক দিয়া অনুভব করিল, সে দিন তাহারই বুকের তপ্ত আদরের ধারার মধ্যে সে কি তেমন করিয়া পারিয়াছিল! কর্ত্তব্য স্থির করিতে সেদিনও তাহার দেরি হয় নাই, আজও হইল না। নিজের বাঁধন-ছেঁড়া প্রাণকে সে সেই ছেঁড়া জুতার পাকে জড়াইতে চাহিয়া মনকে এই কথা বলিল, "যখন তাঁকে একটু সুখী করতেই যেতে পার নি, তখন নিজে তুই শান্তি পেতে আজ যেতে চাচ্চিস্ কোন মুখ নিয়ে?"

দুঃখকেই সে বরণ করিবে স্থির করিল, বাপের কোলকে সে প্রত্যাখ্যান করিল, এবং সেই দুঃখের সঙ্গেই শুধু মুখোমুখি করিয়া স্বামীর ভিটায়ই পড়িয়া রহিল। এখানে থাকিয়া বিমলের সে যে বেশী কিছু উপকারে লাগিতে পারিবে, এমন ভরসাও তাহার ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়াই বা সে যার জন্য স্বামীকে পর্য্যন্ত সুখী করিতে পারে নাই, তাকেই আজ ছাড়ে কেমন করিয়া? নিজে অপমান এবং অত্যাচার সহ্য করিয়াও প্রচণ্ড দুঃখের মধ্যেও একটা জ্বালাময়ী উন্মাদ সুখানুভবে সে স্বামীর স্মৃতির মধ্যে তাঁহার কর্ত্তব্যের এক-বিন্দুও প্রতিপালন-সুখে তন্ময় হইয়া ডুবিয়া রহিল। কালচক্র আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

উন্মেষ

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

স্ফটিক ঘরে শেজ জ্বলেছে
ফুল গালিচা পাতা,
আজকে থেকে আরম্ভ যে
'আরব-নিশির' কথা।
কে যেন ঐ ডাকছে এসে
আলাদীনের দীপের দেশে,
রূপ জহুরীর রাজ্যে আজি
খুলছে নূতন খাতা।

২

সুন্দর চাঁদের টান পেয়েছে
সাগর সলিল আজ,
বনস্থলীর বুক ছুঁয়েছে
মোহন ঋতুরাজ।
উঠলো হঠাৎ পর্দা চিকের,
জাগ্‌লো রে স্বর কণ্ঠে পিকের,
নীপের শাখে দুললো আজি
ঝুলন ঝুলার সাজ।

৩

শেষ করেছে শিল্পী ছবি
ঘাম-তেলেতে মাজি',
অধিবাসের গন্ধ আসে,
শঙ্খ উঠে বাজি'।
প্রাচী সোহাগ্ ফাগ্ মেখেছে,
পরীর ভোজের ডাক্ ডেকেছে
পলে পলে খুলছে রে মুখ
ভোরের কমলরাজি।

মেঘনাদ

[শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল]

(১৯)

মেঘনাদ সেই দিনই কলিকাতায় ফিরিবার ইচ্ছা করিয়াছিল; সেই সিদ্ধান্ত করিয়াই সে কলিকাতা হইতে আসিয়াছিল; এখানে আসিয়া সকালেও সে সেই সিদ্ধান্ত বহাল রাখিয়াছিল। কিন্তু, আদালত হইতে যখন ডাক-বাঙ্গালায় ফিরিয়া গেল, তখন তাহার মন টলমল করিতে লাগিল। একবার মনোরমার সঙ্গে দেখা না করিয়া যাইবে? দেখা করাটা তা'র কর্ত্তব্য! মনোরমা তা'র ভরসা করিয়া বসিয়া আছে; সেও তা'কে ভরসা দিয়াছে। দেখা না করিয়া যাওয়াটা বিশ্বাসঘাতকতার কাজ হইবে। এই বলিয়া সে মনকে বুঝাইল। তা'র হৃদয় যে আগে হইতেই এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছে এবং সে সিদ্ধান্তের হেতু যে এ সব কিছু নয়, এ কথা সে চাপা দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তবু সত্যটা মনের আনাচে-কানাচে উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া তাহাকে উত্ত্যক্ত করিতে লাগিল।

কাজে-কাজেই মেঘনাদ সে দিন রহিয়া গেল। যখন সে শুনিল যে মনোরমার দণ্ড হইয়াছে, তখন সে আরও খাতের-জমা হইয়া বসিল—এ অবস্থায় তার একটা আপীলের ব্যবস্থা না করিয়া সে কিরূপে যায়। তখন সে ভাবিতে লাগিল, কি উপায়ে এবং কি ওজুহাতে মনোরমার সঙ্গে দেখা করা যায়? এমন সময় জেল হইতে একটি ওয়ার্ডার আসিয়া তাহাকে একখানা পত্র দিল যে, মনোরমা আপীলের বন্দোবস্ত করিবার জন্য তা'র সঙ্গে দেখা করিতে চায়। জেলার মহাশয় মেঘনাদকে পরের দিন সকালে ৮টার সময় দেখা করিবার

জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। সে তৎক্ষণাৎ তাহার উকীল জগদীশবাবুর সঙ্গে আপীল সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে গেল।

সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরিয়া সে দেখিতে পাইল, যতীন সুনীতিকে লইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদের সঙ্গে সুনীতির তিনটি ছেলে। বড় দুইটিকে সে তাদের ঠাকুরমার কাছে রাখিয়া আসিয়াছে।

সুনীতি বলিল, "বাবা, এখন আমার কি উপায় হবে? আমার যে বড় ভয় ক'রছে বাবা!"

মেঘনাদ মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে বলিল, "আপনি যতীনের সঙ্গে যান; ইয়াসিন মির্জা আপনার বাবার বন্ধু; তিনি আপনাকে রক্ষা ক'রতে পারবেন। তা'ছাড়া আমার মনে হয় না, সতীশবাবু এই বিপদ থেকে উদ্ধার হ'য়েই আপনার উপর কোনও অত্যাচার ক'রতে সাহস করবেন।"

"তুমি তা'কে চেন না বাবা! সে জেল থেকে বেরিয়েই আমাদের বাসায় এসেছিল। আমাকে ব'লে গেছে, কাল ভোরের ট্রেণেই আমাকে নিয়ে যাবে। নিয়ে সে যাবেই—আর সেখানে গেলে আমার ধড়ে প্রাণ থাকবে না। আর এই অভাগাগুলির যে কি দশা হবে, ভগবান জানেন।" বলিতে-বলিতে সুনীতি কাঁদিয়া ফেলিল।

মেঘনাদ অনেকক্ষণ ভাবিয়া উত্তর করিল, "দেখুন মা, আপনি অত ভয় পাবেন না,—উপরে ভগবান আছেন। অতি বড় পাপী যে, সেও তাঁকে ভয় করে। যেমন করে এতদিন কাটিয়েছেন, ছেলে কটার মুখ চেয়ে তেমনি ক'রেই দিন কাটিয়ে দিতে হবে মা! তবে আমার খুব ভরসা আছে, ভগবান আপনার স্বামীকে সুমতি দেবেন, আপনার দুঃখ থাকিবে না।"

"তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক বাবা, তাই যেন হয়; কিন্তু আমার মন যে মানতে চায় না। আমার কেবলি মনে হ'চ্ছে, কোন্ দিন আমি ঘুমিয়ে থাকবো, আর সেই ওষুধটা শুঁকিয়ে আমায় মেরে ফেলবে।"

মেঘনাদের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তাহারও আশঙ্কা হইল যে, সুনীতিকে স্বামীর ঘরে ফিরিতে বলিয়া সে তাহাকে মৃত্যুর হাতে সঁপিয়া দিতেছে। সুনীতিকে উৎসাহ বা উপদেশ দিতে আর তার সাহস হইল না। অথচ কোনও একটা উপায় সে ভাবিয়া পাইল না। দুই হাতের ভিতর মাথা গুঁজিয়া সে ভাবিতে লাগিল।

সুনীতি ও মেঘনাদ ঘরের ভিতর বসিয়া কথা বলিতেছিল, যতীন বারান্দায় বসিয়া ছিল। হঠাৎ সতীশ একখানা ছড়ি হাতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সতীশকে দূর হইতে দেখিয়াই যতীন ঘরের ভিতর ছুটিয়া আসিল,—তার পিছুপিছু সতীশ আসিয়া প্রবেশ করিল।

সতীশ ঘরে ঢুকিয়া কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সুনীতি ও মেঘনাদের দিকে চাহিল। তার ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল। সুনীতি লাফাইয়া উঠিয়া ঘরের অপর কোণে গিয়া সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইল। যতীন পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

মেঘনাদ এ অবস্থায় একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। এখন তাহার কি করা বা বলা উচিত, তাহা সে কিছুতেই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

সে খুব তীব্রভাবে অনুভব করিতেছিল যে, এই অবস্থায় তাহার ও সুনীতির সম্ভাষণ জিনিসটা দেখিতে বড়ই খারাপ। এ কথা ভাবিতে তার প্রাণ জ্বলিয়া উঠিল, ভয়ানক রাগ হইল;—কিন্তু কার উপর, তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না। সতীশের দৃষ্টিতে যে একটা তীব্র অভিযোগ আছে, তাহা সে অনুভব করিল; এবং সে এই অন্যায় অভিযোগে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সতীশ কোনও কথা বলে নাই—কেবল চাহিয়া ছিল। এই দৃষ্টির প্রতিবাদ যে কি রকমে করা যায়, মেঘনাদ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কিছুক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া সে সিদ্ধান্ত করিল যে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তার মনটা শান্ত রাখা সর্ব্বাগ্রে দরকার। সে রাগের মাথায় কোনও একটা এমন কাজ করিয়া বসিতে পারে, যাহাতে সুনীতির সর্ব্বনাশ হইবে,—তাহাকেও চিরজীবন অনুতাপ করিতে হইবে। তাই সে মাথা ঠাণ্ডা করিতে চেষ্টা করিল।

সতীশ রক্তচক্ষু সুনীতির দিকে ফিরাইয়া শেষে বলিল, "চল।"

সুনীতি ভয়ে একেবারে মুশড়িয়া গিয়াছিল। তার মুখ একখানা কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছিল। সে সেই মুহূর্ত্তে অপমৃত্যুর আশঙ্কায় ভিতরে-ভিতরে কম্পিত হইতে-ছিল। সতীশের কথা শুনিয়া সে সভয়ে মেঘনাদের দিকে চাহিল,—মেঘনাদও তাহার দিকে চাহিল। ছেলে তিনটি

ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া মায়ের হাত ধরিয়া বাপের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সুনীতি নড়িল না।

সতীশ গলা চড়াইয়া বলিল, "চল।"

আবার কিছুক্ষণ সকলে স্তব্ধ রহিল। তার পর ধীরে-ধীরে সুনীতি স্বামীর দিকে অগ্রসর হইল;—মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী যেমন মরিয়া হইয়া ফাঁসিকাঠের দিকে অগ্রসর হয়, তেমনি করিয়া সুনীতি অগ্রসর হইল। তাহার সমস্ত শরীর তখন স্পন্দহীন; মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির মত সতীশের দৃষ্টির দ্বারা চালিত হইতে লাগিল।

তখন মেঘনাদের চমক ভাঙ্গিল। সে বলিল, "সতীশবাবু, একটু স্থির হ'য়ে বসুন। অত ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন?"

সতীশ কেবল কটমট দৃষ্টিতে মেঘনাদের দিকে চাহিল, কিছু উত্তর করিল না।

মেঘনাদ একটু হাসিয়া বলিল, "সতীশবাবু, আপনাকে উদ্ধার ক'রতে আমি একটু সাহায্য করেছি, তার জন্য একটা ধন্যবাদও তো পেতে পারি।"

সতীশ ভ্রূকুটি করিয়া একটা বিকট হাস্যের সহিত বলিল, "ধন্যবাদের অপেক্ষা তো রাখেন নি—আমার স্ত্রীর উপর দিয়ে তো আঠার আনা দাম উশুল ক'রে নিয়েছেন?" বলিয়া সুনীতির হাত ধরিয়া মেঘনাদের দিকে পিছন ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল।

সতীশের কথায় এক নিমেষে মেঘনাদের সমস্ত রক্ত ছুটিয়া মাথায় উঠিল। সে ক্ষিপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল "scoundrel!"

সতীশ ফিরিয়া দাঁড়াইল। সুনীতি বেগে আপনার হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "তুমি দূর হও! যদি আমি আর তোমার ছায়া স্পর্শ করি, তবে আমি বাপের মেয়ে নই।"

মেঘনাদ বলিল, "এই মুহূর্ত্তে তুমি এখান থেকে বেরোও, —হতভাগা, নির্লজ্জ, ছুঁচো কোথাকার— বেরোও ব'লছি।"

সতীশ রাগে কাঁপিতে-কাঁপিতে তাহার ছড়ি উঠাইয়া মেঘনাদকে আক্রমণ করিল।

সতীশ স্বভাবতঃ বলবান নয়; তার পর দীর্ঘকাল কারাবাসে সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে মেঘনাদ বলিষ্ঠ যুবক। মেঘনাদ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সতীশের হাত হইতে লাঠিখানা ছিনাইয়া লইয়া ফেলিয়া দিল; আর তাহাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া এক ধাক্কায় বারান্দায় ঠেলিয়া দিল; এবং আর এক ধাক্কা দিয়া একেবারে নীচে নামাইয়া দিল।

ক্রুদ্ধ, আহত, পীড়িত সতীশ অক্ষম রোষে গর্জ্জন করিতে-করিতে মেঘনাদের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল; তার পর গড়গড় করিতে-করিতে চলিয়া গেল।

সতীশ চলিয়া গেলে, মেঘনাদ ঘরের ভিতর দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া, একখানা ইজি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। সুনীতিও মেঝের উপর বসিয়া চক্ষের জল মুছিতে লাগিল। সতীশ চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া, যতীন চুপি চুপি ঘরের ভিতর আসিয়া, খাটের উপর বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ কেহ কোনও কথা বলিল না।

কিছুক্ষণ বাদে মেঘনাদ সুনীতিকে বলিল, "আপনি আমাকে একটা খবর দিলেই তো আমি যেতে পারতাম। আপনার এখানে আসা অত্যন্ত অন্যায় হ'য়েছে।"

সুনীতি মাথা নীচু করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহারও মনে হইতেছিল, কাজটা বড় অন্যায় হইয়াছে। আজ সে যে কাজ করিয়া বসিয়াছে, জীবনে আর তাহার প্রতিবাদ করিবার অবসর সে পাইবে না। পরক্ষণেই মেঘনাদ বুঝিল সে সুনীতির পীড়িত হৃদয়ে এ কথায় সে অযথা বেদনা দিয়াছে। তাই সে বলিল, "যা' হবার তা'তো হ'য়ে গেছে মা, এখন আর কেঁদে কি হবে? ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক। আজ থেকে আমিই আপনাদের সম্পূর্ণ ভার নিলাম। আপনি চিন্তা ক'রবেন না।"

সুনীতি কাঁদিতে লাগিল।

যতীনকে সম্বোধন করিয়া মেঘনাদ বলিল, "তুমি এখনি ওঁকে নিয়ে ষ্টেশনে যাও—আজ রাত্রের ট্রেণেই ওঁকে ঢাকায় নিয়ে যাও। সেখান থেকে কালকের ট্রেণে কলকাতায় যেও। আমিও কাল ক'লকাতা যাব। সেখানে গিয়ে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।"

সুনীতি কোনও কথা বলিতে পারিল না। কাঁদিতে-কাঁদিতে সে গিয়া গাড়ীতে উঠিল।

(ক্রমশঃ)

ধাতব মুদ্রা ব্যবহারের সার্থকতা

[শ্রীদ্বারকানাথ দত্ত এম-এ, বি-এল্]

ধাতব মুদ্রার ব্যবহারে সমাজের দুইটী অতি গুরুতর প্রয়োজন সাধিত হয়। এই দুই মুখ্য ও প্রাথমিক কার্য্য সাধন জন্য মুদ্রার অভ্যুদয় ঘটিয়া থাকিবে। বর্ত্তমানে ধাতব মুদ্রা দ্বারাই এই কার্য্য সাধিত হইয়া আসিতেছে। প্রথমতঃ, উহাকে বিনিময়ের মধ্যবর্ত্তী যন্ত্র (medium of exchange) রূপে ব্যবহার করা হয়। যখন যাহার যে সামগ্রীর অভাব হয়, সে অনায়াসে মুদ্রার যোগে তাহা অর্জ্জন করিয়া লইতে পারে। যাহার নিকট যে সামগ্রী উদ্বৃত্ত আছে, তাহার পরিবর্ত্তে সাক্ষাৎ বিনিময়ের দ্বারা অন্যের উদ্বৃত্ত দ্রব্য লাভ করিতে যে সকল স্বাভাবিক অসুবিধা বর্ত্তমান আছে, মুদ্রার মধ্যবর্ত্তিতায় সেই কার্য্য সাধন করিলে, তাহাকে ঐ সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। আর শ্রম-বিভাগে যে সকল সামগ্রীর আয়োজন করা হয়, মুদ্রার সাহচর্য্যে তাহাদের বহু বিস্তার সাধিত হইয়া থাকে; সাক্ষাৎ বিনিময়ে সে রূপ বিস্তার সাধন করা সম্ভব নহে। মুদ্রার ব্যবহারে অতি দূরবর্ত্তী স্থানের উৎপন্ন সামগ্রীও অনায়াসলব্ধ হয়। তবে কোন অপরিমিত মুদ্রা দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে কাহারও কোন অভাব মোচন হয় না ও হইতে পারে না, এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। লোকে বিনা বিচারে এবং বিনা আপত্তিতে তাহার বিনিময়ে আপনার অধিকারগত সামগ্রী দিতে সম্মত হয় বলিয়াই অর্থ ধন লাভের অধিকার জ্ঞাপন করে। যদি কোন অপরিমিত মুদ্রা দিয়াও এক মুষ্টি তণ্ডুল না মিলিত, তবে কেহই উহা ব্যবহার করিত না। লোকে উহা গ্রহণ করে বলিয়াই বিনিময়ের মধ্যবর্ত্তীরূপে উহার ব্যবহারের সুযোগ ঘটিয়াছে। আর তাহার এই অভ্যুদয় ঘটিয়াছে বলিয়াই উহার ব্যবহারে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়া আসিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, উহা পণ্যদ্রব্যসমূহের মূল্য-পরিমাপক যন্ত্র-রূপেও ব্যবহৃত হয়। উহা দ্বারা পণ্য-সাধারণের মূল্য প্রকাশ করা হয়। যখন যে তাহার অনধিকারগত সামগ্রী দিয়া অপরের অধিকারগত সামগ্রী লইতে চায়, তাহাদের এই বিনিময়ে কোন পক্ষকে কোন ক্ষতি স্বীকার করিতে না হয়, তৎপ্রতি তাহাদের উভয়েরই দৃষ্টি থাকা একান্ত স্বাভাবিক। সাক্ষাৎ ভাবে বিনিময় করিতে হইলে, কাহারও পক্ষে ক্ষতি স্বীকার করিয়া আপনার অধিকারগত সামগ্রী ছাড়িয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে। আর মুদ্রার মধ্যবর্ত্তিতায় সে কার্য্য সাধন করিতে হইলে, তাহারা যে তাহাদের সেই সাক্ষাৎ বিনিময়-সমতা রক্ষা করিবার জন্য সতর্ক থাকিবে না, এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। বরং পরোক্ষ বিনিময়ে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বিত হওয়াই স্বাভাবিক। রাম তাহার অধিকারগত সামগ্রী দিয়া শ্যাম হইতে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী লাভ করিতে পারিত, মুদ্রার যোগ পরোক্ষ ভাবে তাহা সংগ্রহ করিতে যাইয়া সেই পরিমাণ পাইতে না পারিলে, তাহার পক্ষে মুদ্রার মধ্যবর্ত্তিতায় সে কার্য্য করা সম্ভবপর নহে। আর শ্যামই কি ক্ষতি স্বীকার করিয়া তাহার অধিকার পরিত্যাগ করিবে? এই মধ্যবর্ত্তী বস্তুর বিনিময়ে ব্যবহারোপযোগী কত সামগ্রী অর্জ্জন করিতে পারা যাইবে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই লোকে মুদ্রা ব্যবহার করে। সুতরাং সাক্ষাৎ বিনিময়ের ভাগ বা মূল্য সমতা রক্ষা করিবার জন্য মুদ্রার মাপে পণ্য-সাধারণের মূল্য প্রকাশ করা হয়। মুদ্রা এখানে মূল্যের মাপকাটি বা মানদণ্ড রূপে কার্য্য করে। সাক্ষাৎ বিনিময়ে বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে যে ভাগহারের উদ্ভব হয়, তাহাই তখন মুদ্রার দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সুতরাং মুদ্রা এই মূল্য-মাপক আদর্শ (Standard of value)।

মুদ্রার এই দুই ব্যবহারের মধ্যে কোনটী প্রাথমিক, ইহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মত বৈষম্য দৃষ্ট হয়। কেহ-কেহ মনে করেন যে বিনিময়ের মধ্যবর্ত্তিতায় প্রয়োজনেই মুদ্রার অভ্যুদয় হইয়া থাকিবে। কালক্রমে তাহার অপর ব্যবহারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মুদ্রার এই দুই ব্যবহারের মধ্যে অগ্র-পশ্চাৎ কল্পনা করার কোন সার্থকতা দেখা যায় না। আর এইরূপ অগ্র-পশ্চাৎ কল্পনা করাও দুরূহ। এই দুই ব্যবহার ছায়াতপের ন্যায় অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বদ্ধ।

মুদ্রার প্রচলনের সঙ্গে-সঙ্গেই এই দুই প্রধান কার্য্য সাধিত হইয়া আসিতেছে, এইরূপ অনুমান করাই বরং যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। ব্যাবহারিক হিসাবে বা বিজ্ঞানের প্রয়োজনে তাহাদের অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করারও কোন সার্থকতা নাই। সুতরাং এতদুভয় ব্যবহারকেই তাহার প্রাথমিক ব্যবহার বলিয়া কল্পনা করিব।

(২) মুদ্রার আনুষঙ্গিক ব্যবহার।

(The derived functions of money)

মুদ্রার এই দুই মুখ্য কার্য্য সাধনের আনুসঙ্গিক ফলস্বরূপে তদ্দ্বারা আরও তিনটী বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। সাক্ষাৎ ভাবে এই সকল কার্য্য সাধনের উদ্দেশ্যে মুদ্রার অভ্যুদয় না হইলেও একবার উহা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে, তাহার আনুসঙ্গিক ভাবে এই সকল কার্য্য সাধন জন্যও উহার ব্যবহার হইয়া থাকে, এবং এই সকল কার্য্য সাধিত হইয়া সমাজ উপকৃত হয়।

প্রথমতঃ, বর্ত্তমান পণ্যের মূল্য জ্ঞাপন জন্য যেমন উহার ব্যবহার হয়, তদ্রূপ কোন সামগ্রী ধারে বিক্রীত হইলে তাহার মূল্য স্বরূপ কি দিতে হইবে, তদ্দ্বারা তাহার পরিমাণও নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এইরূপ ভবিষ্যৎ দেয় পরিমাণের নির্দ্দেশ থাকায়, ভবিষ্যৎ দায়েরও স্থিরতা রক্ষিত হয়। বর্ত্তমান বিনিময়ের সহিত ধারে বিনিময়ের পার্থক্য এই যে,- বর্ত্তমানে বিনিময়ে মুদ্রার সাক্ষাৎ আদান প্রদানে দায় পরিশোধ করিতে হয়; কিন্তু ভবিষ্যৎ দায় আদায়ের সময়ে মুদ্রা ব্যবহার না করিয়াও বর্ত্তমান মূল্য-জ্ঞাপক কোন নির্দ্দিষ্ট সামগ্রীর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দ্বারা সেই দায় আদায় করা যায়; এবং ইতিমধ্যে মুদ্রা মূল্যের ইতর-বিশেষ হইলেও এই নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের সাহায্যে দায় আদায় হওয়ায়, পাওনা দেনার সমতা রক্ষিত হইতে পারে। আজ যদি কেহ তাহার প্রতিবাসীর নিকট হইতে কোন সামগ্রী ধারে ক্রয় করিয়া লইয়া, দুই বৎসর পরে একশত মণ ধান্য দিয়া সেই দায় পরিশোধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে, এবং ইতিমধ্যে ধান্যের অজন্মা হেতু অথবা অন্য কোন কারণে ধান্যের মূল্য বাড়িয়া যায়, তবে দায়িক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু এই দায় টাকায়, কিংবা এই সময়ের মধ্যে যে দ্রব্যের মূল্যের ইতর বিশেষ হওয়ায় সম্ভাবনা কম, সেই বস্তু দ্বারা এই দায় আদায়ের কথা থাকে, তবে দায়িক কি মহাজন কেহই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। টাকার মূল্যেই এই বস্তুর পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে। আর এই সঙ্কীর্ণ সময় মধ্যে অন্যান্য কোন-কোন সামগ্রীর মূল্যের ইতর-বিশেষ হওয়া যত স্বাভাবিক, মুদ্রার মূল্যের ইতর-বিশেষ হওয়া তেমন স্বাভাবিক বা সম্ভবপর নহে। অতি দীর্ঘ সময় ভিন্ন টাকার ক্রয়-শক্তির উত্থান পতন হয় না। কিন্তু যদি সেই দায় দীর্ঘ সময়ে আদায়-যোগ্য হয়, তবে এই সময়ের মধ্যে টাকার ক্রয়-শক্তিরও ত উত্থান পতন হইয়া পাওনা-দেনার সমতা ভঙ্গ হইতে পারে? এইরূপ হওয়া যে একান্ত অস্বাভাবিক, তাহা নহে। তখন বর্ত্তমান মূল্যে অপর যে সামগ্রী পাওয়া যায়, তন্মধ্যে যেটার মূল্য সহসা পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভাবনা নাই, অথবা থাকিলেও তাহার পরিবর্দ্ধিত অবস্থার তুলনায় যাহা দিতে হইবে তাহা স্থির থাকিলে, সেই বস্তুর দাবী আদায়ের আদর্শ (standard) রক্ষা করা যায়। মুদ্রার মূল্য সহসা পরিবর্ত্তিত হয় না বলিয়া, মুদ্রার দ্বারাই এই সমতা রক্ষিত হয়। সুতরাং মুদ্রা ভবিষ্যৎ দায়ের আদর্শ রক্ষার একটী প্রধান যন্ত্র। সাধারণতঃ মুদ্রার যোগে ভবিষ্যৎ দায় আদায় হইলে, অথবা তাহার পরিমাণে কোন সামগ্রী দিলে, কোন পক্ষের কোন ক্ষতি হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, এক স্থান হইতে অপর কোন দূরবর্ত্তী স্থানে কোন মূল্যবান সামগ্রী প্রেরণ করার কোন প্রয়োজন পড়িলে, সেই নির্দ্দিষ্ট সামগ্রী প্রেরণ না করিয়া তাহার মূল্য-জ্ঞাপক অর্থ পাঠাইলেই তাহার বিনিময়ে এই সামগ্রী ক্রয় করিয়া লওয়া যায়, এবং তদ্দ্বারা সামগ্রী প্রেরণের যে সকল স্বাভাবিক বা আকস্মিক অসুবিধা আছে বা হইতে পারে, তাহা হইতে অনায়াসে মুক্ত হওয়া যায়। যাহারা কলিকাতায় কি অন্য সহরে থাকিয়া অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার সামগ্রী বাড়ী হইতে প্রেরণ করা ত সহজ ব্যাপার নহে। পিতা বা অন্য অভিভাবকের প্রেরিত অর্থ পাইলেই, ছাত্রগণ তাঁহাদের সকল অভাব মোচন করিতে পারেন। সুতরাং মুদ্রার যোগে এক স্থান হইতে অপর স্থানে মূল্যবান সামগ্রী প্রেরণের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ, মুদ্রা দ্বারা ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে সঞ্চয়ের কার্য্যও সাধিত হইয়া থাকে। ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া যদি কাহাকেও দ্রব্য-সামগ্রী সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়, তবে সে কতই বা

কি সঞ্চয় করিয়া পারে? অধিকাংশ ব্যবহার্য্য সামগ্রী দীর্ঘ সময় সঞ্চয় করিয়া রাখা চলে না। বিশেষতঃ, ভবিষ্যতে যে কোন্ দ্রব্যের কখন আবশ্যক পড়িবে, তাহাও স্থির করা মানব জ্ঞানের অতীত। এই অনিশ্চিত ও অস্থায়ী দ্রব্যের পরিবর্ত্তে তাহাদের মূল্য ও অধিকার-জ্ঞাপক অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াই, উপস্থিত প্রয়োজনমত দ্রব্যের আয়োজন করিয়া লওয়া যায়। সুতরাং মুদ্রা দ্বারা লোকের এই গুরুতর অভাব পূর্ণ হইয়া থাকে।

অবস্থা-ভেদে মুদ্রার আকস্মিক কার্য্য-সাধকতা।

(Contingent functions of money)

সামাজিক অবস্থা-ভেদে মুদ্রা দ্বারা মানুষের আরও কয়েকটী প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। বৈষয়িক অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল প্রয়োজনের অনুভূতি ঘটে; এবং সমাজ ও তাহার উন্নতির বৈষম্যানুসারে ঐ সকল প্রয়োজনের তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

প্রথমতঃ, যে সকল সমাজে শ্রম বিভাগে কার্য্য সাধনের বিশেষ বিস্তৃতি ও বিশিষ্টতা সাধিত হইয়াছে, তথায় যে সামাজিক আয় হয়, তাহার বিভাগ ও বিস্তৃতি মুদ্রার যোগেই করিতে হয়। বর্ত্তমানে যাহারা ফ্যাক্টরী বা অন্য কোন কারবার বা কারখানায় জন খাটাইয়া থাকে, তাহারা তাহাদের সম্পূর্ণ পারিশ্রমিক নগদ টাকায় লাভ করিয়া, তাহার বিনিময়ে আপন আপন জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের সামগ্রী অর্জ্জন করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। আর যাহারা টাকা খাটাইয়া তাহার সুদের উপর জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহারাও সেই সুদ সম্পূর্ণ অর্থে লাভ করে। এইরূপ যাহারা যে ভাবে দেশের উৎপাদন কার্য্যে ব্রতী, তাহারা সকলেই নগদ টাকায় তাহাদের প্রাপ্যাংশ লাভ করিয়া থাকে। যে সমাজে যে পরিমাণে শ্রম-বিভাগের বিস্তৃতি ও বিশিষ্টতা সম্পাদিত হইয়াছে, তথায় ঠিক সেই পরিমাণেই এই জাতীয় আয় টাকার যোগে বিভক্ত ও বিস্তৃত হইয়া আসিতেছে। মুদ্রার প্রচলন না থাকিলে এইরূপ বিশিষ্টতা সম্পাদনের সুবিধা ও অবসর ঘটিত কিনা বিশেষ সন্দেহের বিষয়। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, যে সকল সমাজে এই শ্রম-বিভাগের বিশিষ্টতা সম্পাদিত হইয়াছে, তথায় মুদ্রার প্রচলন না থাকিলে, ধন-বিভাগ করা অসম্ভব হইত। এই ভাবে মুদ্রা সামাজিক অভ্যুদয়ের কারণ ও কার্য্য রূপে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, পারিবারিক ব্যয় তালিকায় এবং শিল্প অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের বিভিন্নাঙ্গের শেষোপযোগিতার (marginal utility'র) সমীকরণ করা, এই মুদ্রা ব্যবহারের ফলে সম্ভবপর হইয়াছে। টাকার সাহচর্য্য ভিন্ন কোন অনুষ্ঠানকে ব্যবস্থান (organization) রূপে গড়িয়া তোলা যাইত না টাকার সামান্য ইতর-বিশেষ করিয়াই তাহাদের বিভিন্ন অঙ্গের শেষোপযোগিতার সমীকরণ করিতে হয়।

তৃতীয়তঃ, ঋণ শক্তির বা ক্রেডিটের (credit-এর আশ্রয়ে ধারে বিনিময়ের যে সকল জটিল সম্বন্ধের ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহাদের প্রতিষ্ঠা-ভূমি মুদ্রা লোকের বিশ্বাস ও প্রত্যয় আকর্ষণ করিবার জন্য ধারের বা ক্রেডিটের ভিত্তি রূপে মুদ্রা বা সোণা রূপা মজুদ করিয়া তাহার সাহায্যে দেশ বিদেশে ধারে ক্রয় বিক্রয় কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষও তাহাদের নিজ নিজ সঞ্চিত অর্থ ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দিয়া, সেই জমার উপর ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালন করিয়া আসিতেছে। এই ক্রেডিট সম্বন্ধে যথাস্থানে বিস্তৃত আলোচনা হইবে।

মুদ্রা ও মূলধন।

মূলধন বলিতে ধনই বুঝায়, মুদ্রা নহে। আমরা স্থানান্তরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এই স্থলে ইহাই বক্তব্য যে দেশে যে সকল ধন মজুদ থাকে, তাহাদের সকলই যে সাক্ষাৎ ব্যবহারে নিয়োজিত করা আবশ্যক হয়, তাহা নহে; তন্মধ্যে কতক নিয়তই মূলধন রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু এই সকল ধন একত্র করিয়া মূলধন রূপে প্রয়োগ করা সহজ-সাধ্য নহে। আর কোন যৌথ কারবার আরম্ভ করিতে হইলে, অংশিগণের প্রদত্ত মূলধন একত্র করা অতি দুরূহ ব্যাপার। এই সকল গুরুতর কার্য্য মুদ্রার যোগে অনায়াসে সম্পন্ন করা হইয়া থাকে। টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে যে কোন অবয়ব প্রদান করা যায়। সুতরাং ব্যবসায় ক্ষেত্রে টাকা বা তাহার উপর অধিকার লাভের এত উদ্দাম চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। টাকাকে যে কোন ভাবে ব্যবহার ও তাহাকে যে কোন আকৃতি বা অবয়ব দেওয়া যায় বলিয়া উহাকে ইংরেজিতে fluid capital বলে; আমাদের ভাষায় তাহাকে অবিশিষ্টাবয়বী মূলধন বলা চলে।

কোন জাতির জন্য কত ধাতব-মুদ্রার আবশ্যক।

এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়া দুরূহ। বর্ত্তমানে কোন জাতিই একমাত্র ধাতব মুদ্রা ব্যবহার করে না। ক্রেডিট বা ধারে বিনিময়ের এমন জটিল সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে যে, তাহার ফলে ধাতব মুদ্রার ব্যবহার যথাসাধ্য নিম্ন-সীমায় আনিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। এই প্রশ্নের যথাযথ মীমাংসা ব্যাঙ্কিংএর আলোচনাসহ একত্র হওয়া আবশ্যক। আমরা সময়ান্তরে এই আলোচনা করিব। ধাতব-মুদ্রা বলিলে, নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যবহারের ও ধারের ভিত্তি রক্ষার জন্য যে পরিমাণ মুদ্রা ব্যবহার করা আবশ্যক হয় তাহাই বুঝাইবে। এই স্থানে এই মাত্র বক্তব্য যে, বিনিময়ের যে সকল উপায় বর্ত্তমান আছে, তাহার ব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের শেষোপযোগিতার (marginal utilityর) সমীকরণ করিয়াই, প্রত্যেক সমাজ তাহার ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়াদি কার্য্য সম্পন্ন করে। যেটী যখন কম ব্যয়সাধ্য বলিয়া গণ্য হয়, তাহা অবলম্বন করিতে করিতে তাহাদের অন্তিম বা শেষোপযোগিতার (marginal utilityর) সমীকরণ হইয়া যায়।

লঙ্কাপ্রাশন

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, রায় বাহাদুর বি-এল]

চতুর্দ্দিকে কি যেন একটা গোলযোগ।

সরকার মহাশয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিকপত্র ও পত্রিকাবলীর গ্রাহক। ইজি, চেয়ারে ঠেস দিয়া, ও মধ্যে-মধ্যে এক পেয়ালা চা পান করিয়া খবরগুলি প্রত্যহ হজম করিতেন।

'আজকালকার সংবাদগুলি যেন তেলে-ভাজা পেঁয়াজের ফুলুরি। এই যে নন-কো-অপারেশনের ঢেউ উঠেছে, এ সম্বন্ধে তোর কি মত?'

হরিদাস একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, 'খবরের কাগজে আজকাল একটু তেজের কথা বের হয়। ওটা সময়ের গুণে।'

সরকার মহাশয়। হজম করা শক্ত।

হরিদাস কাপড় কোঁচাইতেছিল। বলিল, 'লঙ্কাপ্রাশন এখন ঘরে-ঘরে ঢুকেছে। মা কাল্ একটা চরখা কিনে সুতো কাটছেন।'

সরকার মহাশয় ত্রস্ত হইয়া—'থেলে যাঃ! এ কথা আগে বলিস্ নাই কেন?'

বিলক্ষণ ভাবনার কথা! একে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, তার সঙ্গে চরখা। রাষ্ট্রবিপ্লব না হইয়া যায় না।

বালক খানসামা হরিদাসের, ঠিক যে 'স্লেভ্ মেণ্টলিটি' ছিল, তা বলা যায় না। কারণ, সে সরকার মহাশয়ের অতিশয় প্রিয়। তবে চরখার কথাটা লুকাইয়া রাখাতে, প্রভুর মনে একটু সন্দেহ হইল। তিনি আবার বলিলেন,

'থেলে যাঃ! রাত্রিকালে আমি ত চরখার কোন শব্দ শুনতে পাই নাই।'

হরিদাস। আপনি আড্ডা হ'তে ফিরে এসে নাকরে শুয়ে পড়েন, সেই অবসরে মা চরখায় সুতো কাটেন।

সরকার। নিঃশব্দে?

হরিদাস। হ্যাঁ। আমার ঘুম পেয়েছিল, তাই শব্দটা ঠিক কি রকম তা শুনতে পাই নাই।

সরকার। রামায়ণ ও মহাভারত পড়ে?

হরিদাস। হাঁ।

সরকার। থেলে যাঃ—

ভাবিলেন—'এ ত দেখ্ ছি ভয়ানক একটা জঞ্জাল! অন্দর-মহলে পলিটিক্স্!'

এ সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করিবার দারুণ ইচ্ছা সত্ত্বেও বিনয় সরকার সেটা চাপিয়া গেলেন। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। 'তাদের সোল্ ফোর্স্ খুব বেশী।' চট্ করিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গেলে, কিংবা একটা কাপড়ের দোকান খুলিয়া বসিলে, একেবারে সমাজের ধ্বংস—দাম্পত্য-জীবনের অবসান!

সুতরাং মিষ্ট কথায় বুঝানই ভাল।

দ্বিপ্রহর রাত্রি! সর্ব্বভূত নিদ্রাগত। সেই সময় সরকার মহাশয় জাগ্রত। বিমলা রান্নাঘরে চরথা সযত্নে রাখিয়া শয়ন করিতে আসিল। হঠাৎ স্বামীকে দেখিয়া—

"আজ তুমি যে এখানে?"

বিনয়। মাথা ধরেছে।

বিমল। দেখি—

সে তৎক্ষণাৎ মাথা টিপিতে বসিল। বিনয় সরকার দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ভাবিয়া দেখিলেন, 'এ ত ঠিক নন্-কো অপারেশন নয়।'

কিন্তু সরকার মহাশয় একটা দারুণ ভ্রমে পতিত হইয়া বলিলেন, 'আজ যে বড় ভালবাসা দেখ্‌ছি—এটা কি চরথার গুণে?'

সরকার মহাশয় জানিতেন না যে, চরথা একটা অগ্নিময় কাণ্ড বিশেষ। হাতে-হাতে পরিচয় পাইলেন। গৃহিণী চটিয়া পার্শ্বের ঘরে খুকির নিকট গিয়া শয়ন করিল।

দশ বার বৎসর পূর্ব্বে সাধা-সাধনা করা সরকার মহাশয়ের জুরিস্‌ডিক্‌সনের মধ্যে ছিল। অধুনা অভ্যাসটি একেবারে গিয়াছে। একে ত শরীরে বল নাই। অগ্নিমান্দ্য প্রবল। এবং যে সব কথা পূর্ব্বে বলিতেন, সেগুলি পুরাতন হইয়া গিয়াছে।

কেবল মাত্র একবার বলিলেন, 'কাজ্‌টা ভাল হয় নাই।'

পার্শ্বের গৃহ হইতে বিমলা বলিল, 'বকাবকির দরকার নেই। ঘুমিয়ে পড়।'

ঘণ্টা তুই নিদ্রার পর, বোধ হয় তখন রাত্রি শেষ প্রহর—সরকার মহাশয়ের বোধ হইল যেন চরথার শব্দ! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

'সুতো কাট্‌ছ?'

বিমলা পার্শ্বের ঘর হইতে উত্তর দিল, 'নিজের মুখে আগুন দিচ্ছি।'

(২)

একটা ফার্সী বয়েতে আছে,—'দিন-তুনিয়ার খেলার মূলে কেবল পেটের জ্বালা। অতএব হে খোদা, বৎসর-বৎসর রক্ষে যেন খর্জ্জুর ফলে।'

আরব্য মরুভূমির খর্জ্জুর আমাদের দেশের ডাল-ভাতের ন্যায় দরকারি। গত শতাব্দীতে আহারের তারতম্য ঘটিয়া দেশের লোকের মেজাজের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা বোধ হয় বলা বাহুল্য। যার যেমন আহার, তার তেমন মেজাজ্। সরকার মহাশয়ের এক সময় টাকা-কড়ি ছিল, সুতরাং তিনি কাবোর মত আহার রচনা করিতেন। পটল, বেগুন, উচ্ছে, ঝিঙে, আলু, পাঁচরকম মাছ, সাত রকম মাংস, বিশ রকম মশ্‌লা একত্র করিয়া প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সাহায্যে তিনি অনেক নূতন রকমের অন্ন-ব্যঞ্জন আবিষ্কার করিয়াছিলেন। স্ত্রী-বিয়োগের পর সেগুলির চর্চ্চা উঠিয়া যাওয়াতে, তিনি সন্ধ্যার পর হোটেলেই জগন্নাথক্ষেত্রের আচার-ব্যবহার রক্ষা করিতেন। বিমলা রন্ধনে পটু নহেন। ছেলেবেলা হইতে অনেক চেষ্টা করিয়া তিনি কেবল মোটামুটি এক রকম সন্দেশ শিখিয়াছিলেন,—তাহা অর্দ্ধেক কাঁচাগোল্লা ও অর্দ্ধেক রসগোল্লার মত। আদা দিয়া এক রকম মাছের ঝোল তিনি শিখিয়াছিলেন, কিন্তু সরকার মহাশয়ের তাহা খাইয়া পক্ষাঘাতের সম্ভাবনা হওয়াতে, ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন করিয়া পক্ষাঘাত হওয়া সমাজের চক্ষে একটা হাস্যাস্পদ ব্যাপার। দশ বৎসর পূর্ব্বে সুরাপানও একটু অভ্যাস ছিল। এখন আফিং ধরিয়াছিলেন।

সুতরাং কোন কারণে মস্তিষ্ক আন্দোলিত হইলে তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিত। সরকার মহাশয়ের বসত-বাটী যেন ভারতবর্ষের একটা ইতিহাস। ত্রেতা ও দ্বাপরের দেব-দেবী ও অবতার, বুদ্ধ, চৈতন্য, সাজাহান, লর্ড ক্যানিং ও প্রিন্স অফ ওয়েলস্, বিদ্যাসাগর ও কৃষ্ণদাস পাল, এমন কি মহাত্মা গান্ধির ছবি—যত রকম বাজারে পাওয়া যায়—দেওয়ালে সাজানো ও ঝুলানো। পুরানো ছবির অন্তরালে বড়-বড় মাকড়সা। নূতনগুলির পার্শ্বে টিকটিকি। সকলের মাঝখানে তাঁহার পরলোকগতা প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ফটোগ্রাফ। তাহারই মাথার উপর জনক-জননীর অয়েল-পেন্টিং।

আলমারিতে অনেক কেতাব। জজ সাহেবের সেরেস্তাদারি করিয়া সরকার মহাশয় অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিছু জমিজিরাতও ছিল। লাইব্রেরীতে আইনের কেতাবই বেশী। দাওয়ার মোকদ্দমায় নথীপত্র ক্রমাগত নাড়িয়া-চাড়িয়া ফৌজদারী আইনও বিলক্ষণ জানিতেন। দেওয়ানীর ত কথাই নাই। সুতরাং বিষয় রক্ষা করা ও বর্দ্ধন করা, তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়া পড়িয়াছিল।

আজ সেই সব গৃহ-সামগ্রী দেখিয়া, তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি,

আহার্য্য দ্রব্য ও প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে লইয়া মানসপটের সম্মুখে উপস্থিত করিল। এবং সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়িল—ভারতবর্ষ!

ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কোন বিশেষ সম্বন্ধ ছিল কি না, তাহা সরকার মহাশয় ঠিক বুঝিতে পারিলেন না; তবে আফিংএর নেশায় হয় ত মনে হইয়াছিল—

সেকালের ভারতবর্ষে প্রথম পক্ষের স্ত্রী—

একালের ভারতবর্ষে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—

তাহার কারণ বোধ হয়, প্রথম পক্ষের সময়ে আহারের সরঞ্জামটা ছিল ভাল। কেবল নিজের আহার না, দশজনে মিলিয়া আহার। দ্বিতীয় পক্ষের সময়ে নিজের আহারের যেমন অবস্থা, দশজনেরও তাই।

আহার ও ভারতবর্ষ ও প্রথম পক্ষের স্ত্রী—ও দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ও ভারতবর্ষ ও আহার—একবার ওটা, একবার এটা, ক্রমাগত মনে উদয় হওয়াতে, সরকার মহাশয়ের ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল নিশ্চয়; নচেৎ হরিদাসকে ডাকিতেন না।

'ওরে হরি রে—'

হরি। (নেপথ্যে)—'হুজুর!'

'একবার শুনে যা!—'

হরি উপস্থিত।

'এবেলা খাবার কি বন্দোবস্ত?'

হরিদাস নতমুখে বলিল, 'আজ্ঞে হরতাল।'

সরকার মহাশয়। খেলে যাঃ—

(৩)

এসব গোলযোগ বিনয় সরকারের ভাল লাগিল না। বোধ হইল যেন শরীরের ব্যাধির মত, সমাজে ও দেশে একটা ব্যাধির সূত্রপাত।

'এর মানে কি? তোরা রাত্রিতে কি খাস্?'

হরিদাস। আমরা গরীব লোক, মুড়ি ও লঙ্কা খেয়ে থাকি।

বিনয়বাবু। ওঁরা কি খান?

হরিদাস। অনেকটা সেই রকম। তবে দিন-কতক ছাতু ধরেছেন।

বিনয়বাবু। সর্ব্বনাশ! খুকি কি খায়?

হরিদাস। বার্লি।

বিনয় সরকারের বোধ হইল যে, এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে ভাল করিয়া খবর না লওয়া তাঁহার পক্ষে অন্যায় হইয়াছে। তিনি নিজে হোটেলে খাইলেও, বাটীর লোকে খায় কি, তাহার অনুসন্ধান করা উচিত ছিল। তাঁহার মনে হইল যে, খাওয়ার চর্চ্চার হ্রাস হওয়াতে, প্রেমের চর্চ্চাও উঠিয়া গিয়াছে।

বিনয় সরকার। বামুন ঠাকুরকে ডেকে আন্!

হরিদাস। তিনি কাজে জবাব দিয়ে চলে গিয়েছেন।

বিনয়। খেলে যাঃ। কবে চলে গেল?

হরিদাস। এক মাস।

বিনয়। এক মাস! রাঁধে কে?

হরিদাস। মা নিজে রাঁধেন—আর আমরা 'সাহায্য' করি, 'আহার্য্য'ও করি।

বিনয়। এ সব খারাপ কথা। বিদ্রোহের কথা—বিপ্লবের কথা—শান্তি ভঙ্গের কথা—গৃহস্থ পরিবার না হ'লে, ১৪৪ ধারার নোটিশ জারির কথা। ফৌজদারি কাণ্ড!

হরিদাস। হুজুর, মা-বাপ।

বিনয়। (রাগিয়া) হতভাগা ছোঁড়া—এসব কথা আমাকে খবর না দিয়ে, তুই ঐ দলে মিশেছিস্।

হরিদাস কাঁদিয়া উঠিল। বিনয় সরকার বলিলেন, 'চুপ'। নেপথ্যে চরখার শব্দ হইতেছিল।

সরকার মহাশয় ভাবিলেন, 'ছেলেটার দোষ কি? সে যেখানে চারটি খেতে পাবে, সেই দিকে ঝুঁকবে।' তাই সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, 'কাঁদিস্ নে—তোর খাবার বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি; আর, দু জোড়া কাপড় কিনে দেব—ধুতি চাদর—বুঝলি ত?'

হরিদাস কৃতজ্ঞতাভরে একটা প্রণাম করিয়া করযোড়ে—

'হুজুর, মা একখানা মোটা কাপড়, তাঁর তৈরি সুতোয় তাঁতির কাছে বুনতে দিয়েছিলেন, আমাকে সেখানা বখ্শিশ দিয়েছেন।'

বিনয়। এটা ঘুস্—আমাকে জব্দ করা বৈ আর কিছু না। তোর তেল মাথার মাত্রা—আর সেই মোটা কাপড়, এ দুটো একসঙ্গে মিললে, আমার বেশ বোধ হচ্ছে, তোর গায় পোকা জন্মাবে—দেশটা আবার কলুর ঘানির মধ্যে গিয়ে পড়ছে।

তবে সরকার মহাশয়ের অভ্যাসবশতঃ মনে হইলে যে, পেণ্টুলন ও চাপ্‌কান্ পরিধান ক'রে ঘানি টানার চেয়ে, এ ঘানিতে একটু রস-কস্ আছে।

চতুর্দ্দিকে যথার্থই গোলযোগ।

প্রতিবাসী অন্নদাবাবু ডিপুটী, কাছারি হইতে আসিয়া চীৎকার করিতেছিলেন। সরকার মহাশয়ের কাণে গেল। ভাবিলেন 'ভায়ার ও বৌদ হয় কলাহার'।

দেখিতে গেলেন। সরকার মহাশয়কে দেখিয়া অন্নদা-বাবুর গলাবাজি কমিয়া গিয়া 'নর্ম্যালে' দাড়াইল।

বিনয়। ব্যাপারখানা কি?

অন্নদা। আপনাদের খবর কি?

বিনয়। তাই বলতে আসছিলম—বাড়ীর মধ্যে লঙ্কাপ্রাশন। যদি আপনার স্ত্রী একবার অনুগ্রহ ক'রে বুঝিতে সুঝিয়ে দেন—

অন্নদা। সব একদল একজোট—ধর্ম্মঘট। আমার উনি একেবারে সৌকাত্ আলির মেজাজ পেয়ে কুপোকাত হয়ে বসেছেন। আপনার উনি বোধ হয় অনেকটা নন্ ভাওলেন্ট?

বিনয়। অনেকটা। কিন্তু এখন উপায় কি? আপনার রাঁধুনি বামুনি কাজ ক'চ্চে ত?

অন্নদা। তা বুঝি জানেন্ না? সে আপনার বামুনের সঙ্গে চম্পট দিয়েছে।

বিনয়। এসব ইয়ারকি না আনারকি?

অন্নদা। দুই-ই—

'একটা বিজ্ঞাপন দিলে কি হয়?'

বিনয়। কিসের জন্য?

অন্নদা। রাঁধুনি বামনের জন্য?

বিনয়। দিন।—

(৪)

বিজ্ঞাপন—"দুজন কো-অপারেটিভ্ রাঁধুনি ব্রাহ্মণের শীঘ্র দরকার। ভদ্রলোকের বাটী। কর্ত্তা সরকারী কর্ম্মচারী;—ভাল খাওয়া-পরা—বেতন যাহা ন্যায্য, দেওয়া যাইবে। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, কিংবা কায়স্থ কিংবা শূদ্র—যে কোন জাতি হইলেই হইবে—সস্ত্রীক আসিতে পারেন।"

দরখাস্ত—বিজ্ঞাপন দেখিয়া বুঝা গেল আপনি বিপদ্-গ্রস্ত, তবে টাকাকড়ি আছে। ইহা অনুমান করতঃ এই দরখাস্ত লেখা গেল। যে রকম পাকশাক সেই রকম বেতন দাবী করিতে চাহি—সেটা বিজ্ঞাপনে প্রকাশ নাই। নিতান্ত কম, মাসে ত্রিশ টাকা ও পছন্দ-সই কাপড় চোপড়।

আবেদন পত্র, সস্ত্রীক।

শ্রীমোতিলাল চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীমতী নন্দকুমারী

অন্নদাবাবু ডেপুটি বলিলেন 'ত্রিশ টাকা অসম্ভব মোলার!'

সরকার। আপাততঃ আমি কুড়ি টাকা ক'রে দেব, আপনি দশ টাকা দিন্।

যথাসময়ে একজন দীর্ঘাকৃতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও একজন খর্ব্বাকৃতি বৃদ্ধা আসিয়া উপস্থিত হইল।

সরকার মহাশয় তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন। থিয়েটারের নারদের মত একটা খসিখলা শ্লোক দেখিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন।

'আপনাদের নিবাস?'

বৃদ্ধ। ভারতবর্ষ!

সরকার। ভারতবর্ষ ত একটা মস্ত জায়গা।

বৃদ্ধ। বাবা, কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে ছোট; দিন কতক পরে পৃথিবী খুঁজলেও পাচক ব্রাহ্মণ পাবে না। তোমার বিজ্ঞাপন দেখে মায়া হয়েছিল, তাই আমরা এসেছি।

সরকার মহাশয় বুঝিতে পারিলেন, যে (১) ইহারাই দরখাস্তকারী ও (২) উভয়েই কসমোপলিটান্।

সরকার। পূর্ব্বে কোথায় চাকরি করা হ'ত?

বৃদ্ধ। প্রায় একশ জায়গায়,—ছত্রিশ জাতির ভাত রেঁধেছি।

বৃদ্ধা। মহৎ আশ্রম ও সেই রকম হোটেলে ও ধর্ম্মশালায় ছিলেম। তবে আগুনের তাপে এক জায়গায় তিন মাসের বেশী টিকতে পারি নি। এখন কুকারে রাঁধি। অভাবে কয়লার উনুন, কাঠের জ্বাল্ সহ্য কত্তে পারি নি।

সরকার। উভয়েই রাঁধেন?

বৃদ্ধ। তা না হলে কি আজ-কাল সামলান' যায়?

বৃদ্ধা। হাত ব'দলে নিই। কখন উনি রাজ্ঞন, আমি ভাত, কখনো উনি জলখাবার, ও আমি কেবল র'সে' থাকি।

কথাবার্ত্তা শুনিয়া কেবল সরকার মহাশয় নহে, অন্নদা-

বাবু পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, ইঁহারা পুরাতন ভারতবর্ষের পাচক ব্রাহ্মণ হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ।

ক্রমে সরকার মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন যে, দুই বাটীর পাক একই রন্ধনশালায় করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। এবং অন্নদা বাবু বুঝাইয়া দিলেন যে, যদিও মাসে ত্রিশ টাকা খুব 'হাই চার্জ' তথাপি তাহারা দিতে প্রস্তুত।

বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে বলিল, 'আপনি বাড়ীর মধ্যে যান।'

অন্নদাবাবু। আপনি সহধর্ম্মিণীকে খুব সম্মান করেন দেখ্‌ছি?

বৃদ্ধ। সেকালের একটা মস্ত দোষ ছিল, স্বামী স্ত্রীকে অবহেলা ক'রে অসভ্য কথা বলত। এখন বোধ হয় সেটা আপনারা বুঝ্‌তে পেরেছেন।

সরকার মহাশয়ের চক্ষে জল আসিল।

বৃদ্ধ। বুঝেছি বাবা! তোমার প্রথম পক্ষের লক্ষ্মীর কথা মনে পড়েছে! তাকে যদি একটু সম্মান ক'রে চল্‌তে, তবে কি হ'ত' কে বলতে পারে?

বৃদ্ধা অন্দর-মহলে গিয়া দেখিল যে, বিমলা চরথায় সূতা কাটিতেছে। সে নিমীলিত নয়নে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল

'মা, আমি সূতো কাটবার কৌশল খুব সহজে শিখিয়ে দেব। তুমি একছটাক তুলোর সূতো কাটতে পারছ না, আমার কাছে শিখ্‌লে আধসের কাটতে পারবে।'

বিমলা। আপনি কোথা হ'তে আসচেন?

সুচতুরা বৃদ্ধা, কথার ভাবে বাটীর আভ্যন্তরিক অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিল, 'আপনি জানেন্ না, আমরা বিপদে পড়ে রাঁধুনি বামুনের কাজে হাত দিইছি—তাই কর্ত্তার কাছে কেঁদে কেটে পড়েছিলেম, তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

বিমলা কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া, রন্ধনশালার ভার বৃদ্ধের হস্তে দিয়া, বৃদ্ধাকে চরখার শিক্ষয়িত্রীরূপে নিযুক্ত করিল।

(৫)

বৃদ্ধ চাটুর্য্যে মহাশয়ের রান্না একটা অদ্ভুত জিনিস্। কর্ত্তার ত কথা নাই, উভয় গৃহের গৃহিণীদ্বয়ও স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, ইহার মধ্যে যাদুকরী বিদ্যা আছে। ক্ষুধানল নির্ব্বাপিত হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে বর্দ্ধিত হয়, অথচ আত্মা প্রফুল্ল!

চাটুর্য্যে মহাশয় বুঝাইতে ওস্তাদ! তিনি বলিলেন, 'দেখ বাবা, কতকগুলো রাঁধিলেই হয় না; বত্রিশ রকম অন্নব্যঞ্জন চাই, প্রত্যেকটার সঙ্গে আর একটা মিশে, পরস্পরকে কাউনটারাক্‌ট' করে ফেল্‌বে, ফলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হবে না, যেমন আজকালকার বক্তৃতা। আজকাল আত্মার দিন। শরীর ও মন দুটোই কাবু হয়ে পড়েছে। আমার মত বৃদ্ধ হ'লে এর মর্ম্ম বুঝতে পারবে।

আজ রবিবার, আহারের পর সরকার মহাশয় ও অন্নদাবাবু চেয়ারে ঠেস্ দিয়া বৃদ্ধের বিজ্ঞ বচন শুনিতেছিলেন। হরিদাস কাপড় কোঁচানো ও তামাকু দিতে ব্যস্ত ছিল।

সরকার। হরা—

হরিদাস। হুজুর!

সরকার। কথাগুলো ভাল করে শোন্—লেখাপড়ার কাজ এতেই হয়ে যাবে।

সরকার চাটুর্য্যে মহাশয়কে ইশারায় বুঝাইলেন যে হরিদাস 'ঐ' দলে।

চাটুর্য্যে। বাবা, বোধ হয় তোমাদের একটু আতঙ্ক হয়েছে?

অন্নদাবাবু। নিশ্চয়। আমার ত রাত্রিকালে ঘুম হয় না। মনে করুন, দেশে যদি একটা বিপ্লব্ ঘটে, তবে ছেলেপুলে নিয়ে রাস্তায় ভিক্ষে করতে হবে। চাস্ করতে জানি নে। জমি নাই। বরং সরকার মহাশয়ের কিছু আছে।

চাটুর্য্যে। (হরিদাসের প্রতি) তোর ভয় হয়?

হরিদাস। মোটেই না।

চাটুর্য্যে। ঐ দেখুন। ঝড় এলে গাছের ডগায় বাঁদরের ভয় হয় না। তারা আঁকড়ে ধরে থাকে। কিন্তু মানুষের ভয় হয়। কেন না তার বাসতি গাছে নয়, কেবল চড়তে জানে। সেই রকম হাতী গা-ঝাড়া দিলে মাহুত ভয় পায় না, চড়নদার ভয় পায়। আপনার জমিজিরাত আছে, লাঙ্গল নিয়ে জমি দখল করবেন। আর লাঙ্গল ধরতে যদি লজ্জা হয়, কি সামর্থ্য না থাকে, তবে একবার কলম হাতে করে' কৃষকের দলে মিশ্‌লে তারা লুফে নেবে। তাদের এক হাতে কলম দিলে, আর এক হাতে লাঙ্গল ছেড়ে দেবে! একটা ইতিহাসের কথা বলি—দিল্লীর বাদশাহ একবার ভয় পেয়ে বীরবলকে বলেছিলেন :মুন্সীজি, যদি চাষাভূষো ধর্ম্ম-বিপ্লবে যোগ দেয়, তবে আমরা খাব কি?'

অন্নদাবাবু (সোৎসুকে)—'বীরবল্ বল্লেন কি?'

বৃদ্ধা। বীরবল বল্লেন 'আমরাও তাই ত চাই। একজন আপনার পেশা ছেড়ে দিলে, আর একজন তার স্থান টপ্ করে অধিকার করবে।' যত বিপ্লব হয়, রাজা ও মুন্সীর ডিমাণ্ড্ তত বাড়ে। রাষ্ট্রতন্ত্রওয়ালারাও দিন-কতক ব্যাগার খেটে, আবার ব্যাগারটা একটা শাসনকর্ত্তার ঘাড়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হতে চায়। সন্ন্যাসাশ্রমেও শিষ্যেরা গুরুর ঘাড়ে ফেলে।

এদিকে যেমন বৃদ্ধ মোহিতলাল চাটুর্য্যে কর্ত্তাদিগকে আশাবাণী দিয়া খুসি করিতেছিলেন, অন্দরমহলে বৃদ্ধা নন্দরাণী তেমনি উভয় বাটীর গৃহিণীদ্বয়ের মনোরঞ্জন করিতেছিল।

'মা, তোমরা ত লক্ষ্মী, অধর্ম্মের পথে যাবে কেন? কর্ত্তাদের ধর্ম্মের পথে নিয়ে এস'। অভিমান্ ও চরখা তার দুটো অসুধ। আমার সঙ্গে চাটুর্য্যেমহাশয়ের একবার ঝগড়া হয়েছিল।'

বিমলা। কেন?

বৃদ্ধা। ঠিক মনে নাই, তবে একদিন সিদ্ধি খেয়ে পাঁচুর মার সঙ্গে তাঁকে ইয়ারকি করতে দেখেছিলুম।

অন্নদাবাবুর গৃহিণী। ঝেঁটিয়ে লাস্ করে' দিতে পারলে না?

বৃদ্ধা। মা, তত শক্তি কি আছে? বক্তৃতা কত্তে বসে গেলুম। কিন্তু পাড়ার লোক ক্রমে একত্র হতে লাগ্ল। সকলের মত এক নয়। কেউ-কেউ বল্লে পুলিশে খবর দিয়ে বুড়ীকে তাড়িয়ে দে। তাই মনের দুঃখে—

বিমলা। তোমার এক সময় চাঁদের মত রূপ ছিল। যদিও পাকাচুল—

অন্নদাবাবুর গৃহিণী। তবুও চাঁদের—বুড়ীর মত—

বিমলা। সুন্দর চরখার হাত!

বৃদ্ধা। মা, তোমরাই লক্ষ্মী। প্রবৃত্তির পথে যেও না। ধর্ম্ম ছেড় না। মুস্কিলে পড়্বে।

বিমলা। আমি পার্শী সাড়ীগুলো পুড়িয়ে সুলতে পাকাতে আরম্ভ করেছি।

অন্নদাবাবুর গৃহিণী। আমি এসেন্স্গুলো বেড়ালের গায় মাখাই। ছেলেটাকে স্কুল হ'তে ছাড়িয়ে ছাগল পুষ্তে দিইছি। এরিই মধ্যে বারটা বাচ্ছা হয়েছে। এবার গো-সেবা করবে।

বৃদ্ধা। এই ত ধর্ম্ম। এটুকু বিদিশী সভ্যতা বোঝে না। মাটীর সেবা, গাছপালার সেবা, জানোয়ার ও পোকামাকড়ের সেবা, এতেই মানুষের ভাত-কাপড়ের সংস্থান। তার পর নারী-সেবা, ও ব্রাহ্মণ ও দেবতার সেবা। এ যে কটা জিনিস্ বল্লুম, এদের ওপর দৌরাত্ম্য করলে সংসার রসাতলে যাবে।

উভয় পক্ষের কমিটীতে সাব্যস্ত হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষের অবস্থা নিতান্ত খারাপ, এবং আহার্য্য দ্রব্যের ভয়ানক অভাব। যা পাচ রকম পাওয়া যায়, তাহাতে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। বাজারের দর অগ্নিময়। মেহনত করিবার লোক নাই। বেশী ভাগ রুগ্ন কিংবা বসিয়া খাইতে চায়।

উভয় দলের মত অনেকটা মিলিয়া যাওয়াতে, একটা 'জয়েণ্ট ইনকোয়ারি কমিটির' প্রস্তাবনা হইল। চাটুর্য্যে মহাশয় তাহার প্রেসিডেণ্ট। আগামী কল্য তাহার অধিবেশন।

যাহাতে কমিটির বক্তৃতা সতেজ হয়, ও হৃদয়ের কথা তীব্র ভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে চাটুর্য্যে মহাশয় রাত্রিকালের অন্নব্যঞ্জনে অপর্য্যাপ্ত লঙ্কাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়াছিলেন। ঝালের ঝোল, মৎস্যের ঝোল, আলুর দম, আলুপটলের ডালনা, পাঠার ঝোল, লাউয়ের ঘণ্ট, ন'টের শাক, যত রকম কিছু রেঁধেছিল, সকলিই লঙ্কাকাণ্ড। তাহা এমনিই সূক্ষ্মভাবে মিশ্রিত, যে হঠাৎ আহারের সময় কেহই বুঝিতে পারেন নাই। শেষ রাত্রি হইতে প্রদাহ আরম্ভ হইয়াছিল।

(৬)

সে জয়েণ্ট ইনকোয়ারিটা সম্পূর্ণ ভাবে গার্হস্থ্য—অর্থাৎ গৃহস্থধর্ম্ম পালন করিতে হইলে, উভয় পক্ষের বিবাদ যাহাতে মিটিয়া যায়, ও সংসার আপাততঃ স্বাস্থ্যে রক্ষা হয়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ।

১। পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব। স্থির হইল যে, গৃহিণীই যখন গৃহলক্ষ্মী, তখন সম্পূর্ণ ভাবে স্বায়ত্ত-শাসন তাঁহাদের করে ন্যস্ত করিতে হইবে। ছেলেপিলে গোলযোগ আরম্ভ করিলে, তাহাদের কম্পলসারি বিবাহই শাস্তি। পূর্ব্বযুগের ব্রহ্মচর্য্য এখন চলিবে না। গার্হস্থ্য কমিটীতে পুত্রবধূ ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হইবেন।

২। শান্তিস্থাপন। গৃহস্থাশ্রমে শান্তিভঙ্গের, এমন কি মারামারি আরম্ভ হইলে, ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইন প্রযুক্ত হইবে না, কারণ ইহা সদ্ভাবের বিরোধী। গোলমাল আরম্ভ হইলেই গৃহকর্ত্তা গাছে গিয়া বসিবেন। এই জন্য প্রত্যেক বাটীতে অন্ততঃ একটা কদম্ব, কিংবা বেল বৃক্ষ অচিরাৎ রোপণ করা উচিত।

৩। পরিধেয়। প্রত্যেক গার্হস্থ্য মেম্বর, অন্য মেম্বরের জন্য একখণ্ড বস্ত্রোপযোগী সূতা কাটিয়া তিন দিনের মধ্যে বস্ত্র বুনিয়া লইবেন। পক্ষান্তরে একজন তাঁতিকে কিংবা জোলাকে প্রত্যেক গ্রামের চৌকিদারস্বরূপ বাহাল করিবেন। অন্য কোন জাতি চৌকিদার হইতে পারিবেন না। এসম্বন্ধে গৃহস্থগণ আবেদন-পত্র দিবেন।

৪। মামলা মোকদ্দমা। 'বাটির মধ্যের' মামলা আত্মীয় কুটুম্ব আনিয়া বিচার করিবেন। 'মেজরিটি'র ভোট লওয়া হইবে। শাস্তি—কর্ত্তার, গৃহিণীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা। প্রিভিয়স্ কনভিক্‌শন্ থাকিলে একাদশী ও অমাবস্যা পূর্ণিমায় আহার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। সামাজিক মামলা—পুরাতন ভারতবর্ষের বিধানে চলিবে। দায়বিবাদ আত্মীয় কুটুম্বের বিবাদ—ইহারই অন্তর্গত।

৫। আহার। মধ্যশ্রেণী যখন চাষ করিতে অপারগ এবং অনেকস্থলে সহজে চাষোপযোগী উর্ব্বর ভূমির অভাব, তখন কেবল আহার্য্য ফলের বৃক্ষ, ও তুলা ও বাঁশ, এই ত্রিবিধ পদার্থ রোপণ করিলেই সমাজ কিছু দিনের জন্য টেঁকিয়া যাইতে পারে। বেল, আম, কাটাল, পেয়ারা, জাম, পেপে, নাসপাতি, আপেল, মোসম্বি, তাল, খর্জ্জুর, কলা ও নারিকেল, অপর্য্যাপ্ত ভাবে রোপণ করিতে হইবে, এমন কি, যেন পাঁচ বৎসরের মধ্যে এক কাঠাও পতিত জমি বাকি না থাকে। তুলা ও বাঁশের ত কথাই নাই। এটা কিছুই অসাধ্য নয়, এবং সাধিত হইলে ভবিষ্যতে কোন দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা থাকিবে না। জমিদার, প্রজা, ও মধ্যশ্রেণী মিলিয়া সমাজের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৬। ক্রয়-বিক্রয়। যাহার কিছু জমি আছে—সহরের দোকানদারের কিংবা ব্যবসাদারের নিকট ধারে কোন জিনিস ক্রয় করিলে, সুদের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে শস্যের অংশ কিংবা গাছে চড়িয়া ফলাহার করিতে দিবেন। সকল ব্যবসাদারই প্রাণপণে জমি সংগ্রহ আরম্ভ করিবেন।

৭। যুগের লীলা সাঙ্গ হইতেছে দেখিয়া সকলে সস্ত্রীক সন্ধ্যার সময় উপাসনা করিবেন, ও ক্রন্দন-ধ্বনি দ্বারা সহর ও গ্রাম আলোড়িত করিবেন। মনে করিতে হইবে সন্ন্যাসাবস্থা সন্নিকট। প্রদীপ জ্বালা যতদূর সম্ভব বন্ধ করিয়া দিবেন (কেবল ছাপাখানার কাজ চলিবে)।

শেষোক্ত রিজলিউশন, বিমলা 'প্রোপোজ' করিয়াছিলেন ও অন্নদাবাবুর গৃহিণী 'সেকেণ্ড' করিয়াছিলেন। ইহাতে তুমুল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল। অবশ্য চুদিন, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু ঘরে ঘরে দীপ নিভিলে লোকালয় শ্মশানের মত হইবে—সংসারে আনন্দ থাকিবে না। (বিনয়বাবুর মত)

বৃদ্ধা নন্দকুমারী রিজল্যুশন সমর্থন করিয়া বলিল, "বাবা, এটা খুব ভাল 'রিজল্যুশন্'। বিষাদ—বিষাদ—বিষাদেই ঈশ্বর-সন্দর্শন। ঘর অন্ধকার হইলে, রাস্তা ঘাট ও মাঠ অন্ধকারে ভরিয়া গেলে করুণা ও সদ্ভাব—জীবের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ—স্বভাবসিদ্ধ। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা বাড়িবে। কেবল একাহার করিয়া সন্ধ্যার সময় ঈশ্বরোপাসনা করিয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া ঘুমাইয়া পড়। চোর, দস্যু, যম, নিকটে আসিবে না।

'যা নিশা সর্ব্বভূতেষু তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী'।

অসীম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

ঊনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

"কাল বিড়ালের লেজ একতোলা, কাণা হরিণের শিং একতোলা, আর বাদুড়ের ডানা একতোলা—এই তিনটি মিলাইয়া দুইসের জলে নূতন হাঁড়ীতে চাপাইবে। যতক্ষণ জ্বাল দিবে, বামদিকে ফিরিবে না, বাম অঙ্গ দিয়া স্পর্শ করিবে না, যাটি এক পোয়া থাকিতে নামাইবে।"

"জী, এমন জিনিস কোথায় পাইব?" "সমস্ত মৌজুদ বিবিজান, একমাত্র কড়ির কথা। কড়ি ফেলিলেই সমস্ত হাজির। আর এই একখানা তাবিজ বোগদাদের পীর মক্কাসরিফ হইতে আজমীরসরিফে আনিয়াছিলেন; এবং ইহার জোরে আলমগীর বাদশাহ তখ্‌ত পাইয়াছিল, দারাশেকোর কাফেরী ছুটিয়া গিয়াছিল।"

"আমি বড় গরীব, এত পয়সা কোথায় পাইব যে এখন

তাবিজ কিনিয়া লইয়া যাইব?" "বিবিজান, আমার ওস্তাদের হুকুম, যে যেমন লোক, তাহার কাছে সেই রকম দাম লইবে,—তাহা না হইলে কি আমাদের ব্যবসা চলে? খোদা যাহাকে বুলন্দ করিয়াছেন, সে যদি আমার মত গরীবের নিকট কোনও উপকার পায়, তাহা হইলে সে তাহার ওজন-মাফিক দেয়;—আর দেওয়ানা ফকীর, সে আর কি দিবে,—দোয়া করিয়া যায়।" যাহারা বুজরুককে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, "ওঃ নবীবখ্‌শ মিঞা কি মেহেরবান!" বুজরুক তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল, "বিবিজান, ঔষধের জন্য এক টাকা, আর তাবিজের দুই টাকা দিয়া তুমি জিনিষ লইয়া যাও,—মতলব হাসিল হইলে যাহা তোমার মনে আসে দিয়া যাইও।"

মণিয়া তিনটাকা দিয়া তাবিজ ও ঔষধ লইয়া গৃহে ফিরিল। উপরে উঠিয়া দেখিল যে, তাহার কন্যা কেশ বিন্যাস করিতেছে। সে প্রথমে তাহাকে তিরস্কার করিতে যাইতেছিল; তাহার পরে কি ভাবিয়া আর কোনও কথা কহিল না,—তাবিজ ও ঔষধ লুকাইয়া রাখিয়া, গৃহকর্ম্মে মন দিল। প্রসাধন শেষ হইলে মণিয়া ডাকিল, "আম্মা!" মণিয়া মশলা পিষিতে পিষিতে কহিল, "কেন?" "ওস্তাদেরা আসিবে না?" "কেমন করিয়া জানিব বল?" "ডাকিতে পাঠাও।" "কেন, তোমার কি মজুরা আছে না কি?" "আছে।" "কোথায়? কেহ ত বায়না করিয়া যায় নাই!" "ফরীদ খাঁ যে আমাকে বায়না দিয়া রাখিয়াছে,—কাল অনেক রাত্রিতে আসিয়াছিলাম বলিয়া দিতে মনে ছিল না।" মণিয়া বস্ত্রাঞ্চল হইতে দুইটা নূতন আশরফী খুলিয়া লইয়া মাতার হস্তে দিল। বৃদ্ধা অর্থ লইয়া, মশলা ফেলিয়া রাখিয়া, ওস্তাদ ডাকিতে চলিল।

মণিয়া নীচে নামিয়া আসিল; এবং এক প্রতিবেশীর পুত্রকে একটা ডুলি আনিতে বলিয়া দুয়ারে দাঁড়াইল। বালক ডুলি ডাকিতে গেল, মণিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল। ক্ষণকাল পরে সে দেখিতে পাইল যে, সরস্বতী বৈষ্ণবী আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া মণিয়া হাসিল, কিন্তু নড়িল না। সরস্বতী তাহার সম্মুখ দিয়া যাইবার সময়ে দুই তিনবার তাহার দিকে চাহিল। মণিয়াও তাহাকে দেখিল; কিন্তু সে যে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে, এমন ভাব প্রকাশ করিল না। সুতরাং সরস্বতীও তাহার সহিত কথা কহিতে ভরসা করিল না। সরস্বতী চলিয়া গেল; কিন্তু মণিয়া তখনও দাঁড়াইয়া রহিল। এক মুহূর্ত্ত পরে তালপত্রের এক ছত্র মাথায় দিয়া এক ব্যক্তি সেই পথে আসিল। সেও মণিয়াকে দেখিয়া একবার দাঁড়াইল এবং তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া চলিয়া গেল। মণিয়া তাহার সহিতও কথা কহিল না। ডুলি আসিল, ওস্তাদও আসিল; মণিয়া ফরিদ খাঁর উদ্যানে চলিয়া গেল। মণিয়া আশ্বস্ত হইয়া ঔষধ জ্বাল দিতে বসিল।

সরস্বতী সন্ধ্যাকালে নগরপ্রান্তে এক ঠাকুরবাড়ীতে প্রবেশ করিল। সেটা বৈষ্ণবদিগের একটা আখড়া,—একজন মহান্ত তাহার একটি সেবাদাসী এবং অনেকগুলি চেলা ও চেলী সেই আখড়ার অধিবাসী। মহান্ত অঙ্গনে বসিয়া গঞ্জিকা সেবন করিতেছিলেন। দুই একজন চেলা প্রসাদের প্রত্যাশায় নিকটে বসিয়া ছিল। সরস্বতী আখড়ায় প্রবেশ করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। মহান্ত হিন্দুস্থানী ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বৈষ্ণবী দিদি, কি হোইলো, মতলব হাসিল?" সরস্বতী কহিল, "ছাই হাসিল বাবা! আমি যে আর কতদিন এমন করিয়া বসিয়া থাকিব, তাহা বলিতে পারি না। বাবা, একটা জরুরী কাজ আছে, একখানা চিঠি পাঠাইতে হইবে।" "বৈষ্ণবী দিদি, তোমার সমস্ত কামই জরুরী! এখন সন্ধ্যাবেলা চিঠি লিখিবে কে, আর ভেজিবে কে?" "না বাবা, বড় জরুরী কাজ, এখনই একজন লোক পাঠাইয়া দাও।" "লোক এখন আসিলে বহুত পয়সা লাগিবে।" "লাগুক, নগদ একটাকা দিব।" "আরে মহাদেবপ্রসাদ, এ মহাদেব!" একজন চেলা উঠিয়া আসিল এবং মহান্তের আদেশে মুন্সী ডাকিতে গেল। যথা-সময়ে মুন্সী আসিল, পত্র লিখিয়া একটি টাকা লইয়া আখড়ার বাহির হইল। পথে একজন লোক দাঁড়াইয়া ছিল,—সে মুন্সীর অনুসরণ করিল।

পথে চলিতে চলিতে মুন্সীর জেব হইতে টাকাটি পড়িয়া গেল। অনুসরণকারী তাহা দেখিতে পাইয়া, টাকাটি উঠাইয়া মুন্সীর হস্তে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "টাকাটি বোধ হয় আপনার?" মুন্সী আশ্চর্যান্বিত হইয়া কহিল, "আমার?" "হাঁ, আপনারই; কারণ, এইমাত্র আপনার জেব হইতে পড়িয়া গেল।" মুন্সী জেবে হাত দিয়া দেখিল টাকা নাই। তখন সে টাকাটি লইয়া তাহার অনুসরণকারীকে বহু ধন্যবাদ দিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি এই সময়ে মুন্সীকে জিজ্ঞাসা করিল,

"আপনি কি আখড়ায় থাকেন ?" মুনশী কহিল, "রাম রাম, আমি শকসেনা কায়স্থ,—আমি আখড়ায় থাকিতে যাইব কেন ? এক বাঙ্গালী আউরং একখানা জরুরী খৎ লিখাইবার কবুল করিয়া ডাকাইয়া লইয়া গিয়াছিল। আখড়ায় কি ভদ্রলোক থাকে ?" "মহাশয় কি এই দেশের লোক ?" "রাম রাম, বাবুজী, এই পাটনা সহর দোজখ্, নরক। আমার নিবাস লখনউ, ওয়াকিয়ানবীশের নকলনবীশ।" "কত দিন আছেন ?" মুনশী দরিদ্র; সহানুভূতি পাইয়া সে একেবারে গলিয়া গেল এবং তাহার মনে যত দুঃখ সঞ্চিত ছিল তাহা আগন্তুককে জানাইয়া দিল। ওয়াকিয়ানবীশের দফ্তর আলমগীর বাদশাহের আমলে বড় দফ্তর ছিল, বেতনও প্রচুর ছিল। ওয়াকিয়ানবীশ তখন সুবাদার ফৌজদার দূরে থাকুক, শাহজাদা সাহিবজাদাদেরও সম্মানের পাত্র ছিল। এখন সে আওরঙ্গজেবের আলমগীর নাই, সে আমলও নাই, ওয়াকিয়ানবীশের সে খাতিরও নাই সুতরাং মুনশীখানার রোজগারও বহুত কম। এই দুর্দ্দিনে কখন কাহার গর্দ্দানা যায় তাহার ঠিকানা নাই। বৎসরে দুইবার বাদশাহ বদল হইতেছে সুতরাং পয়সার মুখ দেখাই মুস্কিল। মুনশীর বেতন দশটাকা; তাহার বড় সংসার। অবস্থা যখন উন্নত ছিল, তখন সে অকর্ম্মা করিয়া দুসরা নেকা বসিয়াছিল। এখন আর উপায় নাই, কারণ সন্তান অনেকগুলি। মুনশী এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া ফেলিল, আগন্তুক কিন্তু একটি কথাও কহে নাই। এইবারে সে একটি আশরফী বাহির করিয়া মুনশীকে দেখাইল এবং কহিল, "মুনশীজী, এইটি দেখিতেছ ?" অন্ধকারে মুনশী আশরফী চিনিতে পারিল না এবং বলিল, "টাকা কি হইবে ?" লোভে কিন্তু মুনশীর চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আগন্তুক কহিল, "টাকা কি মুনশীজী; আশরফী, সোনার মোহর। যদি আমার একটু কাজ করিয়া দাও, তাহা হইলে এক লহমায় এইটি রোজগার করিতে পার।" "কি, কি ?" "যে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের চিঠি লিখিতে গিয়াছিলে, সে কি লিখাইল ?" "অতি সামান্য কথা; সে চিঠি লিখিল সরস্বতী বৈষ্ণবী, নবীন নাপিতকে, গ্রাম ডাহাপাড়া, ইলাকা মুরশিদাবাদ খাস, সুবা বাঙ্গালা। খবর জানাইল, সে অসীম বাদশাহের সহিত আছে, তার রণ্ডী দুর্গার সহিত হররোজ মুলাকাৎ করে। রণ্ডীও তাহার ওয়ালিদও এইখানেই আছে এবং বনারস যায় নাই। কবে যাইবে তাহারও ঠিকানা নাই। অনেক মৎলবে সওয়াল করিয়াও সে জানিতে পারে নাই যে ইহারা কবে বনারস যাইবে। বোধ হয় বনারস যাইবার ইচ্ছা ইহাদের কোন কালেই ছিল না এবং ইহারা অসীম রায়ের সঙ্গেই চলিবে। খরচা ফুরাইয়া গিয়াছে; অতএব শেঠের কুঠীতে যেন দশ আশরফীর হুণ্ডি জলদি ভেজা যায়।" কথা শেষ করিয়া মুনশী লোলুপ দৃষ্টিতে মোহরের দিকে চাহিল;—আগন্তুক কিন্তু হাত গুটাইয়া কহিল, "ঠিক যে এই কথা লিখিয়াছ, তাহার প্রমাণ কি ?" মুনশী কহিল, "হক কথা, হক কথা। প্রমাণ আমার এই দফ্তরে। চিঠি লিখিবার পূর্ব্বে একখানা খশড়া করিতে হয়, সেখানা ছিঁড়িয়া ফেলি নাই।" মুনশী দফ্তর খুলিয়া এক টুকরা কাগজ বাহির করিল; আগন্তুক এক গৃহের বাতায়নের নিকটে গিয়া দীপালোকে তাহা দেখিল। মুনশী তাহা পড়িয়া শুনাইলে আগন্তুক তাহাকে মোহর দিয়া কহিল, "দেখ মুনশীজী, নিত্য এই আখড়ায় যাইবে এবং সেই বাঙ্গালী আউরংকে জিজ্ঞাসা করিবে, সে আর পত্র লিখাইবে কি না। যদি পত্র লিখে, তাহার নকল রাখিবে এবং চকে মনোহর সাহু বণিয়ার দোকানে দিলে এক আশরফী পাইবে।" এই বলিয়াই আগন্তুক অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ-প্রসঙ্গ

ভারতের প্রাচীন মান-মন্দির

[অধ্যাপক শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাসগুপ্ত এম-এ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জয়পুর মানমন্দিরের দৃশ্য

রাশি-বলয় যন্ত্র
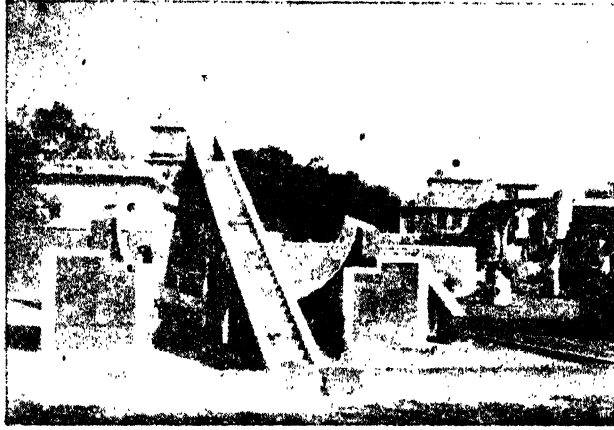
পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা দিল্লী, কাশী ও মথুরা নগরীর মান-মন্দিরগুলির সম্যক্ পরিচয় দিয়াছি। এক্ষণে এই প্রবন্ধে জয়পুর ও উজ্জয়িনীর মান-মন্দিরের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি এবং সঙ্গে-সঙ্গে হিন্দুদিগের মানযন্ত্রসমূহের নির্ম্মাণ-প্রণালী ও ব্যবহার-বিধি বুঝিতে চেষ্টা করিব।

১। জয়পুরের মান-মন্দির

প্রায় ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুর নগরটি স্থাপিত হয়। এই স্থলের মান-মন্দিরটি ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। প্রাচীন ভারতের ইহা একটি মহাকীর্ত্তি। এই জয়পুর মান-মন্দিরের যন্ত্রসমূহ এমন সুগঠিত ও পর্য্যবে-

রামযন্ত্র—জয়পুর
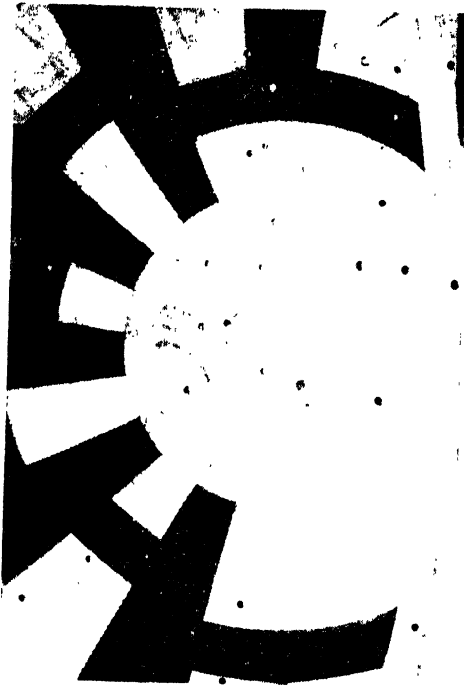
জয়প্রকাশ—জয়পুর

নাড়ীবলয়—জয়পুর

কপালযন্ত্র—জয়পুর

দক্ষিণোত্তরভিত্তি-যন্ত্র—জয়পুর

ক্রান্তিবৃত্ত যন্ত্র—জয়পুর

চক্রযন্ত্র—জয়পুর

উজ্জয়িনী—মানমন্দির, সাধারণ দৃশ্য

উজ্জয়িনী মানমন্দির—দিগংশ যন্ত্র
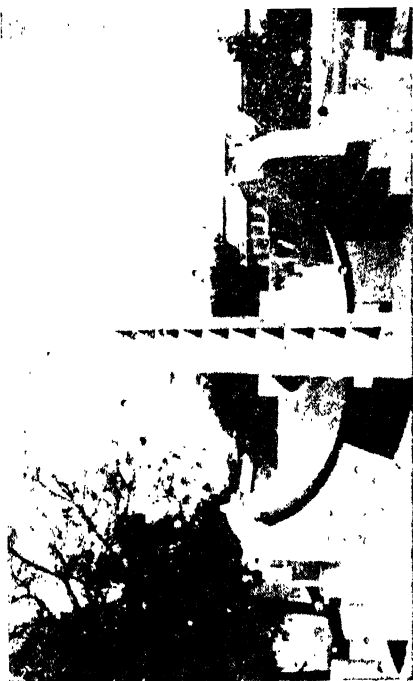
রাশিবলয় যন্ত্র

উজ্জয়িনী মানমন্দির—সাধারণ দৃশ্য
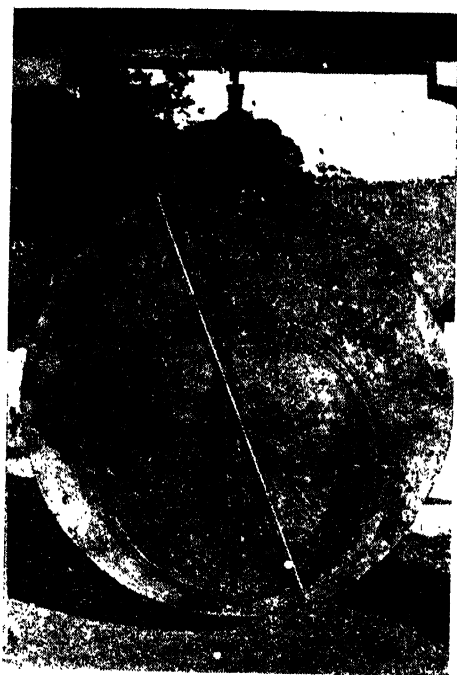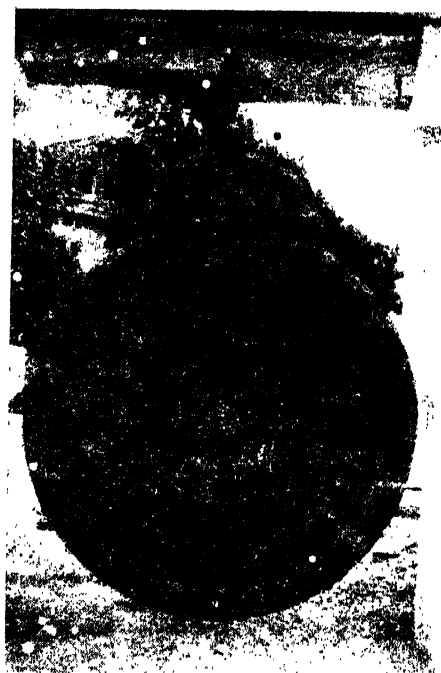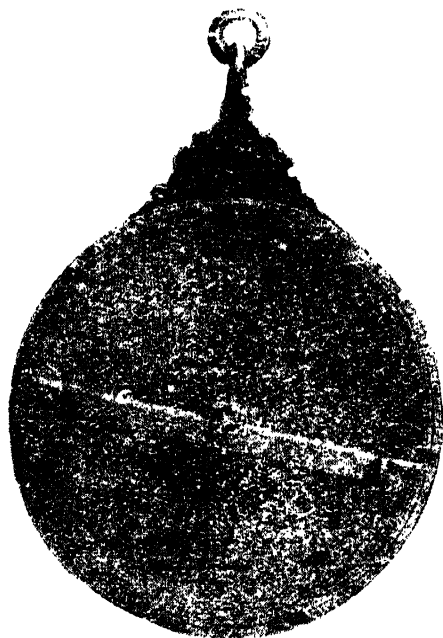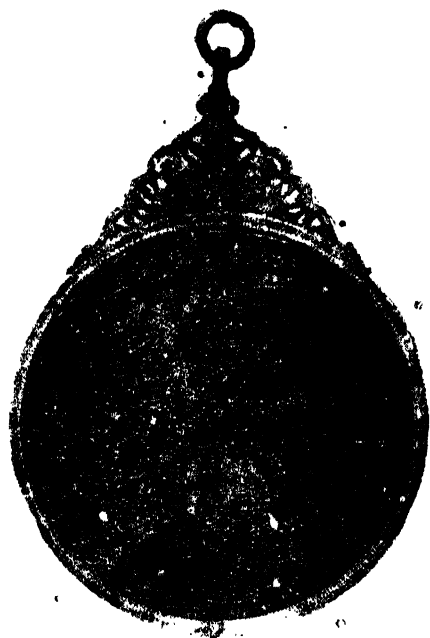
উজ্জয়িনী মানমন্দির—দূর হইতে দৃশ্য

পিত্তল যন্ত্ররাজ

লৌহ যন্ত্ররাজ

জয়পুর যন্ত্ররাজের সম্মুখভাগ

জয়পুর যন্ত্ররাজের পশ্চাদ্ভাগ

জয়পুর যন্ত্ররাজের সম্মুখভাগ
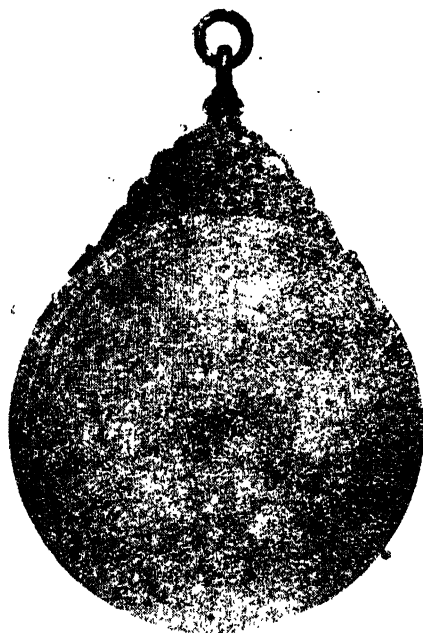
জয়পুর যন্ত্ররাজের পশ্চাদ্ভাগ
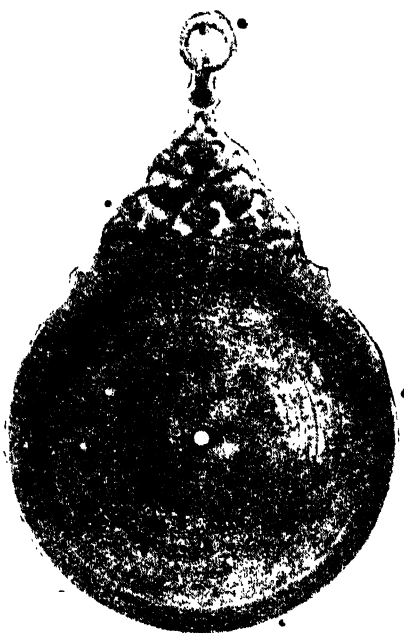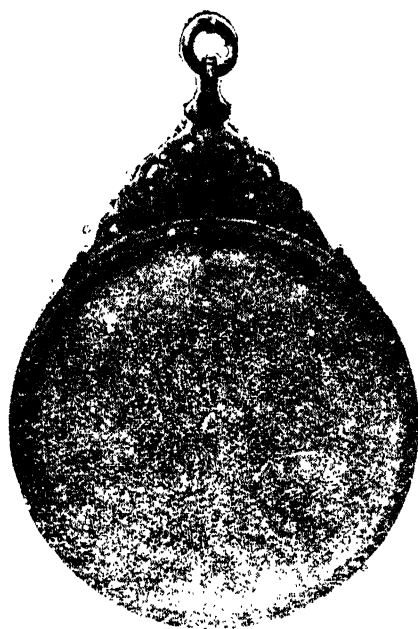
জয়পুর যন্ত্ররাজের বেস্তর

জয়পুর যন্ত্ররাজের বেস্তর

জয়পুর যন্ত্ররাজের সম্মুখভাগ
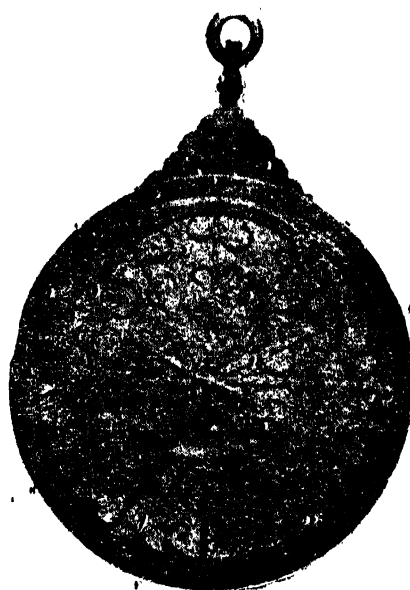
জয়পুর যন্ত্ররাজের পশ্চাদ্‌ভাগ
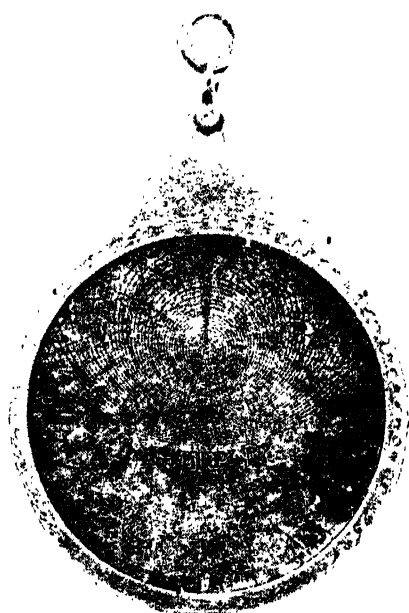
৩২ ও ২৮ ডিগ্রী অক্ষাংশের অনুসারে তালিকা ফলক
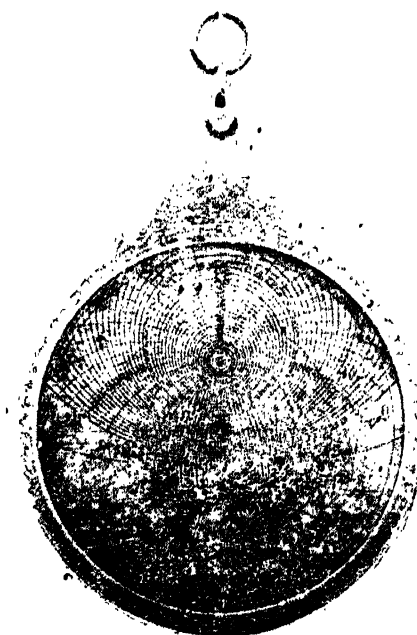
৩২ ও ২৮ ডিগ্রী অক্ষাংশের অনুসারে তালিকা-ফলক

অক্ষভুজের মূর্ত্তি

যন্ত্ররাজের পশ্চাদ্ভাগ

অপোপযোগী যে, ইহাদের নূতনত্ব ও নির্ম্মাণ-কুশলতা দেখিয়া বিস্ময় মুগ্ধ হইতে হয়। রাজ-প্রাসাদের সন্নিকটে প্রাচীর-বেষ্টিত এক বিস্তৃত প্রান্তরে এই বিশাল মান-মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল গ্রহ তারাদির পর্য্যবেক্ষণ। প্রবেশ-পথে কঠিন চূণে নির্ম্মিত এক প্রকাণ্ড বৃত্তে অঙ্কিত রাশি চক্রের দ্বাদশ রাশি প্রথমেই চোখে পড়ে। তার পর কতকগুলি ছোট-বড় বিষুব-যন্ত্র, কয়েকটি যন্ত্ররাজ (astrolabe) রহিয়াছে; এবং একটি বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডে একটি মাধ্যাহ্নিক রেখা ও একটি ক্ষিতিজ বৃত্ত খোদিত আছে। কিন্তু সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি বড় শঙ্কু - প্রায় ৭৫ ফিট উঁচু: ইহা ইট আর চূণে নির্ম্মিত এবং মাধ্যাহ্নিকের সমতলে অবস্থিত। এই শঙ্কুর উপর উঠিয়া চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিবার স্থান আছে। ইহা এত উঁচু যে, সমস্ত জয়পুর সহরটা এখান হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিশাল শঙ্কুর ছায়া একটি প্রকাণ্ড বৃত্তাঙ্কের উপর আসিয়া পড়ে। ঐ বৃত্তাঙ্কের কোণ দুইটি আকাশের দিকে মুখ করিয়া আছে। খুব ধবধবে সাদা চূণ দিয়া ইহা অতি সুন্দর ভাবে নির্ম্মিত; এবং ইহার উপর ডিগ্রী ও মিনিট অঙ্কিত রহিয়াছে। প্রাতঃকালে ইহার পশ্চিমভাগে ছায়া আসিয়া পড়ে, এবং সন্ধ্যার সময় পূর্ব্বের দিকে সরিয়া যায়। আর শঙ্কুটি দুইটি ভাগের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া, যে কোনও সময়ে সূর্য্যের উন্নতাংশ সহজেই জানিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত যে সকল যন্ত্র জয়পুরের মান-মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে, সেই গুলিতেও ডিগ্রী ও মিনিট অঙ্কিত আছে। প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড তিনটি যন্ত্ররাজ (astrolabe) বড় বড় লোহার আংটা হইতে ঝোলান রহিয়াছে। ঐ যন্ত্রগুলি তামা ঢালাই করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, সূর্য্যের ক্রান্তি নির্ণয় করিবার জন্য একটি দণ্ড-সংযুক্ত তাম্র গঠিত বৃত্তযন্ত্র রহিয়াছে। এই যন্ত্রটি উত্তর দিকে লক্ষ্য করিলে, ভূমিতে সূর্য্যের ক্রান্তি লক্ষিত হইবে।
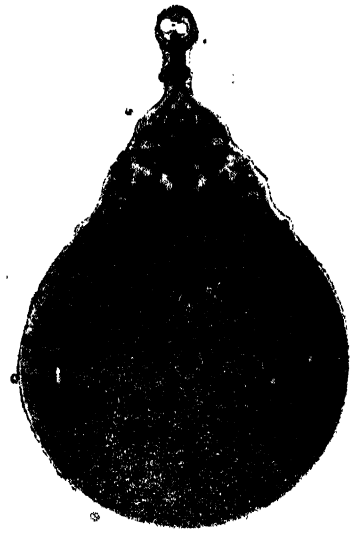
জয়পুরের মান মন্দিরটি রাজ-প্রাসাদের মধ্যে স্থাপিত বলিয়া, ইহা বেশ যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়াছে; এবং সময়ে সময়ে নূতন-নূতন যন্ত্র আনিয়া যোগ দেওয়াও হইয়াছে। রাজ-প্রাসাদ হইতে প্রায় চারিশত হাত দূরে গম্বুজের পূর্ব্বদিকে এই মান-মন্দিরটি অবস্থিত। বাস্তবিক, ইহা এমন সুরক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে যে, ইহাকে জয়পুর সহরের সর্ব্বপ্রধান দৃশ্য বলা যাইতে পারে। এই মান-মন্দিরে ভিত্তিগাত্রে প্রোথিত যন্ত্র ছাড়াও কতকগুলি পিত্তল-নির্ম্মিত বিশেষ যন্ত্র আছে। এতদ্ভিন্ন নগর-প্রাচীরের বাহিরে যাদুঘরে (museum) আরও কতকগুলি পিত্তল-নির্ম্মিত যন্ত্র রহিয়াছে। এই যন্ত্রগুলি পর্য্যবেক্ষণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সম্ভবতঃ জয়সিংহের সময়ে এগুলিও মান-মন্দিরে রক্ষিত ছিল। এক্ষণে আমরা জয়পুর মানমন্দিরের যন্ত্রগুলির বিশেষ পরিচয় লইব।

১। সম্রাট্-যন্ত্র

মানমন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশে এই বৃহৎ সম্রাট্-যন্ত্রটি স্থাপিত আছে। জয়সিংহ যতগুলি যন্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহা প্রায় ৯০ ফিট উঁচু এবং ১৪৭ ফিট লম্বা। প্রত্যেক বৃত্ত-চতুর্থের ব্যাসার্দ্ধ প্রায় ৫০ ফিট। ইহাতে সেকেণ্ডের চিহ্ন অঙ্কিত আছে। ইহার সাধারণ গঠন-প্রণালী দিল্লীর সম্রাট্-যন্ত্রের মত; প্রভেদের মধ্যে এই যে, ইহা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং ইহার অংশগুলি অধিকতর সুশৃঙ্খল। দিল্লীর সম্রাট্-যন্ত্রের ন্যায় ইহাও খানিকটা মৃত্তিকা-প্রোথিত; কিন্তু মেজেটা পাকা এবং পাশেও ড্রেণের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এই যন্ত্রের ব্যবহার-পদ্ধতি আমরা দিল্লী ও কাশীর মান-মন্দিরের বর্ণনাকালে সবিশেষ বিবৃত করিয়াছি।

৩। ষষ্ঠাংশ যন্ত্র।

মাধ্যাহ্নিকের সমতলে স্থাপিত ইহা একটী ৬০ ডিগ্রী প্রশস্ত বক্র ধনু (arc)। ইহার ব্যাসার্দ্ধ ২৮ ফিট ৪ ইঞ্চি। সম্রাট্-যন্ত্রের পূর্ব্ব ও পশ্চিম ...স্থ যে ভিত্তির উপর স্থাপিত, সেই ভিত্তির সহিত গ্রথিত এইরূপ ...টি ধনু আছে। একটি অন্ধকারাবৃত কক্ষে এই ধনু দুইটি স্থাপিত। ...ই কক্ষের ছাদে ছোট-ছোট রন্ধ্র রহিয়াছে। ঐ সকল রন্ধ্রের ভিতর ...য়া মধ্যাহ্ন-কালে সূর্য্যালোক ধনু দুইটির উপর আসিয়া পড়ে, এবং ...ার ছায়া হইতে সূর্য্যের উন্নতাংশ নির্ভুল ভাবেই বাহির করা যায়। ...ই যন্ত্রটির গঠন নির্ভুল পর্য্যবেক্ষণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

৪। রাশিবলয়-যন্ত্র।

অপর কথায়, ইহা একটি ক্রান্তিবৃত্ত-যন্ত্র। সম্রাট্-যন্ত্রের পশ্চিমে একটি ...চু ভূমিখণ্ডের উপর কতকগুলি শঙ্কু লইয়া এই যন্ত্রটি গঠিত। রাশি-চক্রের প্রত্যেক চিহ্নের নির্দ্দেশক এক-একটি করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশটি এইরূপ শঙ্কু আছে (মকররাশির নির্দ্দেশক শঙ্কুটি রাশিবলয়-যন্ত্রের ...তীয় চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে)। প্রত্যেক যন্ত্র সম্রাট্-যন্ত্রের মত গঠিত। প্রভেদ এই যে, ইহার বৃত্ত-চতুর্থগুলি নিরক্ষ-বৃত্তের সমতলে না হইয়া ক্রান্তিবৃত্তের সমতলে স্থাপিত; অথচ চিহ্নগুলি ক্ষিতিজের সমতলে স্থিত। ...ঙ্কুর পার্শ্বটি তখন ক্রান্তিবৃত্তের - ধ্রুববিন্দুর নির্দ্দেশ করে। সুতরাং ...র্য্যবেক্ষণের সময়ে যন্ত্রটি সূর্য্যের অক্ষাংশ ও ভুজাংশ জ্ঞাপন করে। দ্বাদশটি শঙ্কুর মধ্যে চারিটির বৃত্ত-চতুর্থের ব্যাসার্দ্ধ ৫½ ফিট, অবশিষ্ট ...টির— বৃত্ত চতুর্থের ব্যাসার্দ্ধ ৪ ফিট ১½ ইঞ্চি।

৩। জয়প্রকাশ।

জয়পুরের জয়প্রকাশ-যন্ত্রটি দিল্লীর যন্ত্রটির মত অবিকল একপ্রকারেরই ...িত। এই যন্ত্রের ব্যবহার-বিধি ও বিশেষ পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই ...য়াছি। ইহার ব্যাসের পরিমাণ ১৭ ফিট ১০ ইঞ্চি। এই যন্ত্রে ক্রান্তি ও সময় নির্দ্দেশ করে।

৪। কপাল-যন্ত্র।

এই কপাল-যন্ত্রটি একটি অর্দ্ধগোলাকৃতি যন্ত্র। কেবল জয়পুর মান-মন্দিরেই ইহা রক্ষিত আছে। দুই প্রকারের দুইটি এইরূপ যন্ত্র রহিয়াছে— একটির উপরিভাগ জয়প্রকাশ-যন্ত্রের ন্যায় ক্ষিতিজের তল-নির্দ্দেশক। ...টিতে ক্রান্তিচক্র (solstitial colur) দেখান হইয়াছে। প্রত্যেকটিই অর্দ্ধগোলাকার। ইহার ব্যাসার্দ্ধ ১১½ ফিট। ইহার মাঝামাঝি কিন্তু জয়প্রকাশ-যন্ত্রের ন্যায় কোনও পথ কাটা নাই। অঙ্কচিহ্ন-যুক্ত ইহার পরিধিটি প্রস্তর-নির্ম্মিত; কিন্তু অবশিষ্ট উপরিভাগ চূণ দিয়া ...ত।

৫। রাম-যন্ত্র।

এই নামে শ্বেতবর্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত চারিটি যন্ত্র আছে। এগুলি ...পেক্ষাকৃত আধুনিক কালের যন্ত্র। জগন্নাথের নির্দ্দেশ অনুসারে উহারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাদের গঠন প্রণালীও দিল্লীর রাম-যন্ত্রের গঠনের অনুরূপ; কিন্তু ইহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি। পর্য্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য প্রত্যেকটি ১৮টি বৃত্তখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের নির্মাণবিধি দিল্লীর মান মন্দিরের বর্ণনা কালে সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে।

৬। দিগংশ-যন্ত্র।

কাশীর মান-মন্দিরের বর্ণনাকালে দিগংশ যন্ত্রের বিশেষ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। জয়পুরের দিগংশ-যন্ত্র কাশীর যন্ত্রের ন্যায় অবিকল একরূপ। ইহার ব্যবহার-বিধিও পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। উন্নতাংশ ও কোটি অংশ বাহির করিবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৭। নাড়ী-বলয়-যন্ত্র।

এই নাড়ী-বলয় যন্ত্রটি ভিত্তি-সংলগ্ন বেলনাকার একটি গোল যন্ত্র। ইহার বৃত্তের ব্যাস প্রায় দশ ফিট। ইহার অক্ষটি মাধ্যাহ্নিকের সমতলে ক্ষিতিজের সমানান্তরালে স্থিত, উপরের আর নীচের তলভাগ নিরক্ষ-বৃত্তের সমতলে অবস্থিত। শঙ্কু দুইটিতে ঘটি পল ঘণ্টা ও মিনিট অঙ্কিত আছে।

৮। দক্ষিণোবৃত্তি-যন্ত্র।

ইহার আর এক নাম ভিত্তি যন্ত্র। কাশীর মান-মন্দিরে এইরূপ একটি যন্ত্র রহিয়াছে। ইহার গঠন প্রণালী কাশীর যন্ত্রটির গঠনের অনুরূপ। এই যন্ত্রের পূর্ব্বমুখে ২০ ফিট ব্যাসার্দ্ধ লইয়া দুইটি বৃত্ত-চতুর্থ এবং পশ্চিম মুখে ১০ ফিট ১০ ইঞ্চি ব্যাসার্দ্ধ লইয়া একটি বৃত্তার্দ্ধ অঙ্কিত আছে। মাধ্যাহ্নিকের উন্নতাংশ স্থির করিবার জন্য এই যন্ত্রটি ব্যবহৃত হইত।

এই ত গেল ভিত্তি-সংলগ্ন যন্ত্রগুলির পরিচয়। এখন আমরা জয়পুর-মান-মন্দিরের ধাতুনির্ম্মিত যন্ত্রগুলির বর্ণনা করিব।

(১) চক্র-যন্ত্র।

ইহা একটী ভ্রমণশীল লৌহচক্র। ইহা নিরক্ষ-বৃত্তের সমতলে অবস্থিত। জয়পুরে এইরূপ দুইটি যন্ত্র আছে। প্রত্যেকটির ব্যাস ৬ ফিট। ইহার তলভাগ দৃঢ়-সংলগ্ন, এবং ইহা পৃথিবীর অক্ষের সমানান্তরালে স্থিত একটি অক্ষ-দণ্ডের চতুর্দ্দিকে পরিক্রম করে। এই অক্ষ-দণ্ডের দক্ষিণ প্রান্তে একটি অঙ্কচিহ্ন যুক্ত বৃত্ত পৃথক ভাবে রহিয়াছে। যে স্তম্ভটি এই যন্ত্রটিকে ধারণ করিয়া আছে, তাহার সহিত এই বৃত্তটি দৃঢ় সংলগ্ন।

(২) ক্রান্তিবৃত্তি-যন্ত্র।

এই যন্ত্রটি কেবল জয়পুরের মান-মন্দিরেই আছে। ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। সম্ভবতঃ জগন্নাথের নির্দ্দেশ অনুসারে ইহা প্রস্তুত করা হয়। আর একটি ক্রান্তিবৃত্তি যন্ত্র বেশ বৃহৎ আকারে নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল,—তাহারও নিদর্শন রহিয়াছে। কোন জ্যোতিষ্কের অক্ষাংশ ও ভুজাংশ নির্ণয় করিবার জন্য এই

ক্রান্তিবৃত্তি যন্ত্রটি ব্যবহৃত হইত। ইহাতে দুইটি পিত্তল-নির্ম্মিত চক্র রহিয়াছে এবং ঐ দুইটি এমন ভাবে পরস্পর সংলগ্ন যে, একটা যখন নিরক্ষবৃত্তের সমতলে পরিক্রম করে, অপরটি তখন ক্রান্তিবৃত্তের সমতলে ঘুরিতে থাকিবে। মোটের উপর, এ যন্ত্রটা দেখিতেই বেশ সুন্দর এবং দেখাইবার মতনও বটে; কিন্তু পর্য্যবেক্ষণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়।

(৩) উন্নতাংশ-যন্ত্র।

এই যন্ত্রটি জয়সিংহের নিজের উদ্ভাবনার ফল। ইহা একটি অঙ্ক-চিহ্ন-যুক্ত পিত্তল নির্ম্মিত চক্র-যন্ত্র। ১৭½ ফিট ব্যাসের উপর ইহাটি অবস্থিত। একটা ঊর্দ্ধাধঃ লম্বমান অক্ষদণ্ডের চতুর্দ্দিকে ইহা সহজে পরিক্রম করিতে পারে, এমন ভাবে ইহা ঝোলান রহিয়াছে। এখন আর এ যন্ত্রটা পর্য্যবেক্ষণের উপযুক্ত নাই।

(৪) ধ্রুববন্ধ যন্ত্র।

ইহা একটি সদোদিত যন্ত্র; অর্থাৎ ইহার দ্বারা সদোদিত (Curcum-polar) নক্ষত্র সকল পর্য্যবেক্ষণ করা হয়। ইহা তেমন সুগঠিত যন্ত্র নয়। একটি চতুষ্কোণ পাতের এক পার্শ্বের নিকটে এবং সমানান্তরাল ভাবে একটি ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্র দিয়া একটি ভারী কাঁটা সহজ ভাবে ঝোলান রহিয়াছে; এবং ঐ কাঁটার সহিত চারিটি নির্দ্দেশক রেখা সংযুক্ত আছে। যদি ঐ চতুষ্কোণ পাতটিকে এমন ভাবে উর্দ্ধোধঃভাবে লম্বমান করিয়া রাখা হয় যে, ধ্রুব নক্ষত্র ও মর্কট নক্ষত্র (Ursae minoris) ঐ ছিদ্রের সহিত সমরেখায় স্থিত থাকে, তাহা হইলে ঐ ঘটিচিহ্নিত নির্দ্দেশক নাক্ষত্রিক সময় নির্ণয় করিবে। অবশিষ্ট নির্দ্দেশকগুলি নক্ষত্রের উদয় চিহ্ন, মাধ্যাহ্নিক অতিক্রমের চিহ্ন ও অস্ত চিহ্ন নির্দ্দেশ করিবে। যন্ত্রটির পশ্চাতে তুরীয় যন্ত্র (quadrant instrument) অঙ্কিত আছে। তাহাতে একটি সুদৃঢ়ভাবে সংলগ্ন দণ্ড সংযুক্ত আছে এবং ছিদ্রের সমানান্তরাল পার্শ্বে দুইটি পর্য্যবেক্ষণ চক্র রহিয়াছে। উহার সঙ্গে ১১টি অঙ্কচিহ্ন-যুক্ত একটি বৃত্ত-চতুর্থ অঙ্কিত আছে। যখন একটি পর্য্যবেক্ষণ চক্রের মধ্য দিয়া সূর্য্যকিরণ আসিয়া পড়ে, তখন পূর্ব্বোক্ত কাঁটাটি সেই সময় ও সূর্য্যের তৎকালীন উন্নতাংশ নির্দ্দেশ করিবে। আরও, অশ্বিনী হইতে আরম্ভ করিয়া ২৮টি নক্ষত্রের তালিকা উহাতে দেওয়া আছে; এবং প্রত্যেক নক্ষত্রপুঞ্জের ধারে ১২° হইতে ১৮°, এর মধ্যে একটা সংখ্যা লিখিত আছে।

(৫) যন্ত্ররাজ—(Astrolabe)

ধাতুনির্ম্মিত যন্ত্রগুলির মধ্যে এই যন্ত্ররাজই জয়সিংহের মান মন্দিরে প্রধান স্থান পাইয়াছে। এমন কি, মধ্যযুগেও ইহা শ্রেষ্ঠ মান-যন্ত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। সাধারণতঃ ইহা পিত্তলে গঠিত ছিল। মধ্যযুগের সাহিত্যেও না কি এই যন্ত্রের অনেক উল্লেখ আছে। জয়পুরের মান-মন্দিরে প্রধানতঃ দুই দিক চাপা এমন ধরণের যন্ত্ররাজ রক্ষিত আছে।

ইহা একটি চক্র-যন্ত্রের মত দুই পাশ তোলা। উহাতে এই এই অংশগুলি ছিল :—

(১) মধ্যের চক্রটিকে মাতা বলা হয়। ইহার মধ্যদেশের নাম বেস্তর; উন্নত পার্শ্ব কুফ্‌ফ্‌। বেস্তরে বিশিষ্ট দেশ সকলের অক্ষাংশ ও ভুজাংশ লিখিত আছে।

(২) অঙ্কভূত একটি বাহিরের চক্র। ইহাতে রবিমার্গ, ক্রান্তি-বৃত্তের দ্বাদশ রাশি ও কতকগুলি নক্ষত্র অঙ্কিত আছে। ইহা বেস্তরের সহিত সংলগ্ন, এবং ইচ্ছামত ইহাকে ঘোরান যায়। ইহার যে অংশে নক্ষত্রের নাম লেখা আছে, এবং যাহার উপরিস্থিত বিন্দুগুলি নক্ষত্রের অবস্থিতি সূচিত করে, তাহাকে চেয়াড়ী (splinter) বলে। অঙ্কভূতের শীর্ষদেশস্থ যে বিন্দু কর্কটরাশির প্রথম নক্ষত্রকে নির্দ্দেশ করে, তাহাকে মুরি বলে।

(৩) কয়েকটি সূক্ষ্ম চক্র বা তালিকা ফলকে যন্ত্ররাজের সহিত সংলগ্ন আছে। উহাতে বিশেষ-বিশেষ অক্ষাংশের অনুসারে কোটি অগ্রা-বৃত্ত অঙ্কিত রহিয়াছে—

(৪) মধ্যচক্রের মাতার পশ্চাদভাগে কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে একটি পর্য্যবেক্ষণ-দণ্ড পরিক্রমণ করে।

(৫) তালিকাগুলি ও পর্য্যবেক্ষণ-দণ্ডটি একটি পিনের দ্বারা দৃঢ়-বদ্ধ আছে। পিনটী একটী কীলকে সংলগ্ন। আরবেরা ইহাকে অশ্ব বলে। ইহা অনেকটা অশ্বের মস্তকের ন্যায় আকার বিশিষ্ট।

(৬) সমস্তটা একটা আংটীতে ঝোলান আছে। উহা একটি হাতলে আবদ্ধ। কখন কখনও ঐ আংটীতে একটা রজ্জু সংলগ্ন থাকে।

(৭) যন্ত্ররাজের পশ্চাদভাগে অঙ্কচিহ্নবিশিষ্ট একটী মান আছে। এখানে যে তালিকা আছে, তাহা ফলিত জ্যোতিষের উপযোগী।

যন্ত্ররাজের পশ্চাতের পর্য্যবেক্ষণ দণ্ড ও অঙ্কচিহ্নিত বৃত্ত ঠিক পর্য্য-বেক্ষণের সময় ব্যবহৃত হয়; তালিকাগুলি, অঙ্কভূৎ আর কুফেফ্‌র উন্নত পার্শ্বে অঙ্কযুক্ত বৃত্ত নির্ভুল গণনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই সব যন্ত্ররাজ ব্যতীত জয়পুরে আরও দুইটী যন্ত্ররাজ আছে—একটী লৌহ-নির্ম্মিত, আর একটী পিত্তল নির্ম্মিত।

২। উজ্জয়িনীর মান-মন্দির।

উজ্জয়িনীর আর এক নাম অবন্তী। হিন্দু জ্যোতিষগ্রন্থে ইহার বিশেষ উল্লেখ আছে। "ইহা প্রধান মাধ্যাহ্নিকের সমতলে অবস্থিত ছিল বলিয়া কথিত আছে। উজ্জয়িনী প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। ইহার সহিত কত কাব্য, কত জ্ঞান-গরিমার কথা এবং কত কিংবদন্তী জড়িত রহিয়াছে। পঞ্চসিদ্ধান্তিকার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে—"উজ্জয়িনী লঙ্কার নিকটে উত্তরদিকে একই মাধ্যাহ্নিকের সমতলে অবস্থিত; এই জন্য দুই স্থানেরই মধ্যাহ্ন-কাল একই সময়ে হইয়া থাকে, কেবল তাহাদের দিনের পরিমাণ সমান নহে, শুধু বিষুবসংক্রান্তির দিনগুলি সমান।" আরও ঐ গ্রন্থে কথিত হইয়াছে, "যবনদেশের সহিত ভুজাংশের প্রভেদের জন্য নাড়িকার সংখ্যা সাত এবং বারাণসীতে সংখ্যা নয়।" সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রথম অধ্যায়েও লিখিত আছে, "লঙ্কা

রাক্ষসভূমি) ও সুমেরু পর্ব্বতের (দেবভূমি) সমসূত্রপাতে যে রেখা কল্পিত হয়, ইহার নাম মধ্যরেখা। ঐ রেখাতে রোহীতক নগর, উজ্জয়িনী ও কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি দেশসকল অবস্থিত আছে। আলবারুণি তাঁহার ভারত ভ্রমণ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, "উজ্জয়িনীর অবস্থিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলেন, লঙ্কা ও মেরুকে যে কাল্পনিক রেখা সংযুক্ত করে, তাহা উজ্জয়িনী নগরী, রোহীতকদুর্গ, যমুনা নদী, থানেশ্বরক্ষেত্র ও সুমেরু পর্ব্বতের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া যায়। কোনও দেশের ভুজাংশ এই কাল্পনিক রেখা হইতে ইহার দূরত্বের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে।" আর্য্যভট্ট কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের একস্থানে ইহাতে একটু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "লোকে স্থির করিয়াছে বটে, লঙ্কা আর মেরু যে কাল্পনিক রেখার দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে, এবং যাহা উজ্জয়িনীর মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে কুরুক্ষেত্র বা থানেশ্বরের ক্ষেত্রে অবস্থিত আছে; গ্রহণের সময় পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় এ সিদ্ধান্তটা একেবারে ভুল। পুলিস্বামীও বলিয়াছেন যে কুরুক্ষেত্র ও উজ্জয়িনীর ভুজাংশের পার্থক্য ১২০ যোজন। অথচ হিন্দু-জ্যোতিষী মাত্রেই এ বিষয়ে একমত যে, উজ্জয়িনীর অক্ষাংশ ২৪ ডিগ্রী এবং কর্কটক্রান্তির সময়ে (summer solstice) অর্থাৎ সূর্য্য যখন কর্কট-রাশিতে আইসে তখন সূর্য্য উজ্জয়িনীর মাধ্যাহ্নিক অতিক্রম করে। ভাস্করাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধান্তশিরোমণির গণিতাধ্যায়ের মধ্যমাধিকারে বলিয়াছেন—"যে রেখা লঙ্কা ও উজ্জয়িনী নগরীর উপর দিয়া কুরুক্ষেত্রাদি দেশ স্পর্শ করিয়া মেরুতে উপস্থিত হইয়াছে, পণ্ডিতগণ সেই রেখাকে পৃথিবীর মধ্যরেখা বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন।" আরও কয়েক স্থানে ভাস্করাচার্য্য উজ্জয়িনীর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, উহার ভুজাংশ শূন্য এবং অক্ষাংশ নিরক্ষতলের উত্তরের সমগ্র পরিধির ষোল ভাগের এক ভাগ। ইহাতে ২২½ ডিগ্রী হয়; কিন্তু বর্ত্তমান নগরের অক্ষাংশ প্রায় ২৩° ১০′ এবং জয়সিংহের মান-মন্দিরের অক্ষাংশ প্রায় ২৩° ১০′ ২৪″। আধুনিক পণ্ডিতগণ উজ্জয়িনীর লণ্ডন হইতে দেশান্তর অংশ ৭৫° ৫২′, অক্ষাংশ ২৩° ১১′ এবং রোহীতকের দেশান্তর অংশ ৭৬° ৩৮′, অক্ষাংশ ২৮° ৫৫; লঙ্কা-শব্দে বিষুবস্থিত দেশ-বিশেষ বুঝাইতেছে।

যদিও উজ্জয়িনী প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানকেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, তথাপি জয়সিংহের মান-মন্দির-নির্ম্মাণের পূর্ব্বের কোনও জ্যোতিষযন্ত্র এখন সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। জয়সিংহের মান-মন্দিরও ঠিক কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা যথার্থ রূপে নির্ণয় করা এখন কঠিন। তবে সম্ভবতঃ যে উহা ১৭৩০ সালের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া চাই। এই মান-মন্দিরটি কিন্তু ঠিক পর্য্যবেক্ষণের জন্ত তেমন ব্যবহৃত হইত না। কেন যে, তাহার কারণ বুঝা যায় না; তবে ইহা নিশ্চিতই যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ দিয়া উহার ব্যবহার একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

নগরের এক প্রান্তে মালব রাজ জয়সিংহ এই মান-মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা করেন। উহাতে সিমেন্টনির্ম্মিত কতকগুলি যন্ত্র আছে—দুইটি বিষুব-চক্র—একটি বড় আর একটি ছোট। মাধ্যাহ্নিকের সমতলে অবস্থিত সেই স্থানের ধ্রুববিন্দুর উন্নতাংশের অনুপাতে দীর্ঘ একটি শঙ্কু। ইহার দুই ধারে দুইটি বৃত্ত চতুর্থ যন্ত্র এবং মাধ্যাহ্নিকসূচক একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীর।

বর্ত্তমান নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে জয়সিংহপুর নামক স্থানে সিপ্রানদীর তীরে উজ্জয়িনীর মান মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত।

নদীর তটটি ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সেই ভাঙ্গনের মধ্যে এই মান-মন্দিরের সম্পূর্ণ আত্মরক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে; ইহার প্রায় সিকি মাইল পূর্ব্বে একটা কূপের ভগ্নাবশেষ ছিল, তাহা এক্ষণে নদীর কুক্ষিগত হইয়াছে। মান মন্দিরটি নদীর ১২৫ ফিট উত্তরে। অতি নিকটে একটি ছোট নালা আছে। এই মান-মন্দিরে, এখন এই চারিটি যন্ত্র রক্ষিত আছে—(১) সম্রাট্ যন্ত্র, (২) দক্ষিণবৃত্তি যন্ত্র, (৩) নাড়ী-বলয় যন্ত্র ও (৪) দিগংশ-যন্ত্র। প্রায় সবগুলিই ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে। দিগংশ-যন্ত্রের ভিত্তিতল নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং প্রাচীরগুলিও ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে। দক্ষিণবৃত্তি-যন্ত্রটি বাঁকা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সম্ভবতঃ এত প্রকাণ্ড যন্ত্রের পক্ষে ভিত্তি তেমন দৃঢ় হয় নাই। সম্রাট্-যন্ত্রও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; এবং অঙ্কচিহ্নও প্রায় মুছিয়া আসিয়াছে।

(১) সম্রাট্ যন্ত্র।

এই যন্ত্রটি এখানে একেবারে জীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। উজ্জয়িনী মান-মন্দিরের সাধারণ দৃশ্যে ইহার বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্ট হইবে। কাশীর সম্রাট্-যন্ত্রের ন্যায় এবং জয়পুরের ছোট যন্ত্রটির মত ইহার আকার ছিল। ইহা ২২ ফিট উঁচু ইহার শঙ্কুর পার্শ্ব ৪৭½ ফিট এবং ইহার প্রত্যেক বৃত্ত-চতুর্থের ব্যাসার্দ্ধ ৯ ফিট ১ ইঞ্চি। ইহার অঙ্কচিহ্নগুলি প্রায়ই মুছিয়া গিয়াছে। তবে বৃত্তচতুর্থগুলি যে ঘটিতে বিভক্ত ছিল, এবং পার্শ্বদেশে যে স্পর্শরেখা অঙ্কিত ছিল, তাহার নিদর্শন রহিয়াছে।

(২) দক্ষিণবৃত্তি যন্ত্র

ইহার ভিত্তিটি অল্প দৃঢলগ্ন থাকিলেও অঙ্কচিহ্নগুলি প্রায়ই লোপ পাইয়াছে। জয়পুরের দক্ষিণবৃত্তি যন্ত্রের মতই ইহার গঠন ছিল। মাধ্যাহ্নিকের সমতলে একটি প্রাচীর আছে; এবং ইহার পূর্ব্ব মুখে দুইটি বৃত্তি-চতুর্থ রহিয়াছে, উহাদের কেন্দ্র প্রাচীরের শীর্ষদেশের প্রান্তের নিকটে এবং ২৫ ফিট তফাতে। একটি বৃত্ত-চতুর্থের খানিকটা অংশ এখনও প্রাচীরের চূণ-বালির মধ্যে অঙ্কিত আছে দেখা যায়; কিন্তু সম্ভবতঃ ইহার অঙ্কচিহ্ন পূর্ব্বে অন্যরূপ ছিল। পশ্চিম দিকে উপরে একটি ক্ষুদ্র মঞ্চে উঠিবার জন্য সোপানশ্রেণী রহিয়াছে। এই মঞ্চের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে দুই ফিট ব্যাসের একটি ছোট স্তম্ভ দাঁড়াইয়া আছে। ইহাতে গ্রহ-নক্ষত্রের উদয়াস্ত সময়ের উন্নতাংশ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য অঙ্ক চিহ্ন ছিল। ইহাকে অগ্রযন্ত্র বলা হইত। পূর্ব্বোক্ত মঞ্চের মধ্যস্থলে পূর্ব্ব দিকে ২ ফিট ৪½ ইঞ্চি দীর্ঘ একটি শঙ্কু ছিল। এখন কিন্তু ইহার চিহ্ন মাত্র নাই।

(৩) নাড়ী-বলয় বা চক্রযন্ত্র।

ইহার গঠন-প্রণালী কাশী ও জয়পুর মান-মন্দিরের নাড়ীবলয়ের গঠন-প্রণালীর অনুরূপ। সম্রাট্ যন্ত্রের কয়েক ফিট দক্ষিণে ইহা অবস্থিত। এখানে ৭১/২ ফিট দীর্ঘ একটি বেলনাকার স্তম্ভ রহিয়াছে। ৩ ফিট ৭১/২ ইঞ্চি ব্যাস ওয়ালা উহা গঠিত। ইহার অক্ষ মাধ্যাহ্নিকের সমতলে দৃঢ় সংলগ্ন। ইহার উপর ও নীচের প্রায় দুইটি নিরক্ষতলের সমানান্তরালে স্থিত। প্রত্যেক প্রান্তের কেন্দ্র হইতে লম্বভাবে একটি লৌহদণ্ড রহিয়াছে। উহাতে ঘটিকাচিহ্ন অঙ্কিত আছে। এসগুলি এখন ধ্বংসের কবলে নিহিত।

৪। দিগংশ-যন্ত্র

ইহা কাশীর এই নামের যন্ত্রটির মত। সম্রাট্-যন্ত্রের অতি নিকটে ও পূর্ব্বদিকে ইহা অবস্থিত। ইহাতে একটি বৃত্তাকার প্রাচীর সংলগ্ন আছে। উহা ৪ ফিট ৬ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং উহার ব্যাসার্দ্ধ ১২ ফিট ২ ইঞ্চি। পূর্ব্বে কেন্দ্র স্থলে একটা স্তম্ভ রহিয়াছে, এখন উহা অপসৃত হইয়াছে। উত্তর হইতে দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পরস্পর কাটাকাটি করিয়া দুইটি তার প্রাচীর গাত্রে রক্ষিত আছে। প্রাচীরের বাহিরের দিকটা ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে; এবং ভিত্তিরও অনেকটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আসল কথা, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে উজ্জয়িনীর মান-মন্দিরটি গ্রহ-নক্ষত্রের পর্য্যবেক্ষণ স্থলের পরিবর্ত্তে দেবমন্দিরে পরিণত করা হইয়াছিল; তাই এখানকার যন্ত্রগুলির এই দুর্দ্দশা।

জয়সিংহের উজ্জয়িনী মান-মন্দির কি প্রকারে সুসংস্কৃত অবস্থায় পর্য্যবেক্ষণের উপযোগী করিয়া রাখা যায়, এ সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা হইয়াছে; এবং অনেকেই মনে করেন যে, এই মান-মন্দিরের সংস্কার ও উন্নতি-বিধান করিয়া, ইহাকে হিন্দুদিগের পঞ্জিকার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত নিয়োজিত করা আবশ্যক। যন্ত্রগুলি এখন যেমন জরাজীর্ণ হইয়া আছে, তাহাতে এগুলিকে কার্য্যের উপযোগী করিয়া তোলা সংস্কারের দ্বারাও সুকঠিন। তবে প্রাচীন যুগের জ্ঞান-গরিমার প্রধান কীর্ত্তির চিহ্ন বলে উহাদের রক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত; এবং এতটুকু সংস্কার করিয়া রাখা উচিত যে, নির্ম্মাণকালে উহারা কেমন ছিল; ইহা মোটামুটি জানিতে পারা যায়। এগুলি লইয়া ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু করিতে গেলে পণ্ডশ্রম হইবে। যন্ত্রগুলির ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেকের এইরূপ ধারণা;—(১) জলনিষ্ক্রমণ পথটি অন্য দিকে চালাইয়া দিতে হইবে; এখন ইহা যন্ত্রগুলির ভিত্তির মধ্য দিয়া চলিয়াছে—উহাকে সরাইয়া দেওয়া কিছুমাত্র কষ্টসাধ্য নহে। (২) যন্ত্রগুলির চারিধারের ভূমিকে সমতল করিয়া ধারে কাছের বৃক্ষসকল দূর করা উচিত। (৩) সম্রাট্-যন্ত্রটিকে কাশীর সম্রাট্ যন্ত্রের মত করিয়া সংস্কৃত করিতে হইবে। উহাতে কিন্তু আধুনিক ইয়োরোপীয় অঙ্ক চিহ্ন ব্যবহার করা উচিত নহে। (৪) দক্ষিণ বৃত্তি যন্ত্রটির সম্বন্ধেই বিশেষ গোলযোগ। ইহার সংস্কার করিতে হইলে, প্রত্যেক প্রস্তরটির আরম্ভ হইতে বেশ দৃঢ়রূপে পুনরায় সংস্থাপন করা আবশ্যক। (৫) দিগংশ-যন্ত্রের বেশী কিছু সংস্কার আবশ্যক নাই,—খানিকটা প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহাই তুলিয়া দিতে হইবে। ইহার রক্ষার ব্যবস্থা জল নিষ্ক্রমণের উপায়ের উপর নির্ভর করিতেছে। আর সর্ব্বশেষে (৬) নাড়ী-বলয়ের অঙ্কচিহ্নগুলি স্পষ্ট করিয়া দিতে হইবে, এবং সেই সঙ্গে দণ্ডগুলিও পুনরায় সংস্থাপিত করা উচিত।

আসল কথা, উজ্জয়িনীতে একটি নূতন মান-মন্দির নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন; কারণ, ইহা জগতের জ্যোতিষের ইতিহাসে প্রাচীনতম বিজ্ঞান কেন্দ্র। মনে হয়, এই নূতন বেধালয়ে হিন্দু-জ্যোতিষের অধ্যাপনা হইলে, একটা নূতন উৎসাহ ও প্রেরণা আনিয়া দিবে। সেই জন্য এমন একটা স্থান নির্ব্বাচিত করিতে হইবে যাহার ভুজাংশ প্রকৃতই শূন্য। সম্ভবতঃ, বর্ত্তমান নগরীর উত্তরে প্রাচীন নগরীরই এইরূপ ভুজাংশ হইবে। তবে মহারাজ জয়সিংহ কেন যে বর্ত্তমান নগরীর দক্ষিণদিকে মান-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। মোট কথা, নূতন মান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়া, জনশ্রুতির উপর নির্ভর না রাখিয়া, ইহার অক্ষাংশ ও ভুজাংশ বাহির করিতে হইবে। তার পর আবার উজ্জয়িনীকে বিজ্ঞান গরিমায় বিমণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারা যাইবে।

ভারতের এই মান-মন্দিরগুলির আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, ইহারা এক ক্ষণজন্মা মনীষীর অদ্ভুত কীর্ত্তি; এবং ভারতীয় জ্যোতিষালোচনার ধারাবাহিক ইতিহাসে ইহাদের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। জ্ঞান প্রচারের দিক দিয়াও ইহাদের উপযোগিতা অল্প নয়; কারণ এতগুলি পর্য্যবেক্ষণের উপযুক্ত যন্ত্র এক সঙ্গে কোনও বেধালয়ে ছিল কি না সন্দেহ। মোট কথা, এই মান-মন্দিরগুলি এখনও ভারতের একটা গৌরবের সামগ্রী।

পাল-রাজগণের মন্ত্রিবংশ

(আলোচনা)

[শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

১৩২৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিষতীর্থ মহাশয়, পালরাজগণের মন্ত্রিগণ গ্রহ-বিপ্র ছিলেন বলিয়া বিতণ্ডা উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার বিতণ্ডার প্রায় সম্পূর্ণ অংশই শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের উক্তির প্রতিবাদ-মাত্র। কেবলমাত্র প্রসঙ্গ-ক্রমে আমার প্রতি শ্লেষ-কটাক্ষ করিয়াছেন; কিন্তু তাহার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ প্রদর্শন করেন নাই। আমরা আশা করিয়াছিলাম, মৈত্রেয় মহাশয় প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন। কিন্তু গত ছয়মাসের মধ্যে কোন প্রতিবাদ বাহির না হওয়ায়, আমরা অতি সংক্ষেপে উক্ত লেখক মহাশয়ের উক্তির প্রত্যুত্তর দিতে বাধ্য হইলাম। এখন দেখা যাউক, পালরাজগণ কি জাতি ছিলেন। পালরাজগণ যে কি জাতি ছিলেন, তাহা মৎপ্রণীত "ভ্রান্তিবিজয়" (২য় সংস্করণ) গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে প্রত্নতত্ত্ব সহ বিশেষভাবে আলোচিত

হইয়াছে। লেখক মহাশয় প্রদর্শিত যুক্তিগুলির খণ্ডনের প্রয়াস স্বীকার করেন নাই।

পালরাজারা জাতিতে মাহিষ্য ছিলেন। তাঁহারা মগক্ষত্রিয় নহেন—তাহা রামচরিতের বর্ণনা দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। রামচরিতে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে, রামপাল ভীমরূপ রাবণ বধ করিয়া জনকভূ (পৈতৃক বরেন্দ্রভূমি সীতাদেবী) উদ্ধার করিয়াছিলেন। অতএব ভীম বরেন্দ্রবাসী ছিলেন; এবং তিনি যে কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য জাতীয় ছিলেন তাহাও রামচরিতে সুস্পষ্ট রূপে লিখিত আছে। আবার পালরাজগণ যে মাহিষ্য জাতীয় ছিলেন, ধারাবাহিক ঐতিহাসিক উপাদানই তাহা প্রমাণ করিতেছে। ঢাকা জেলার সাভারের স্বাধীন রাজা হরিশ্চন্দ্রপালের কীর্ত্তি কাহিনী অনেকেই অবগত আছেন। তাঁহার রাজধানীর বিপুল ভগ্নাবশেষ, দীঘি, পুষ্করিণী এখনও বিদ্যমান আছে। বরেন্দ্র হইতে পালরাজ্য ধ্বংস হইলে পালবংশীয়গণের কতকাংশ আসাম অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন, কতকাংশ সাভারে যাইয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সাভারের পালবংশেই মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের জন্ম। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র হইতেই পালবংশ শেষ হয়। তৎপরে হরিশ্চন্দ্র পালের ভাগিনেয় দামোদর রায় বা দামু রায় সাভারের রাজা হ'ন। সেই বংশধারা অদ্যাপি ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাভার থানার ভাকুর্ত্তা, কোণ্ডা, গান্ধারিয়া গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহারা সযত্নে আপনাদের কোলিনাম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে ঐ বংশে একচত্বারিংশ পুরুষ চলিতেছে। ঐ বংশের শেষ পুরুষ অনুকূলচন্দ্র রায় এবং অনন্তকুমার রায় বর্ত্তমান আছেন। মাহিষ্য স্মৃতি ৪র্থ সংস্করণ ২৭৩ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 'প্রবাসী' পত্রে এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় ঢাকার ইতিহাস ১ম ও ২য় খণ্ডে ঐ রাজগণের উল্লেখ করিয়াছেন।

অপর, রামচরিতের প্রথম পরিচ্ছেদের ১৭শ শ্লোকে আছে—"বিধিরিব ধাতা জগতো যঃ শ্রীপতিনাভি সম্ভূতঃ"। এই উপমা দ্বারা পালরাজগণ যে মাহিষ্য ছিলেন তাহা উপলব্ধি হয়। কারণ, বিষ্ণুর নাভি-সম্ভূত ব্রহ্মার সঙ্গে উপমা দেওয়ায় বুঝিতে পারা যায়, বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা যেমন পৃথক্‌গুণ সম্পন্ন, ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত,—তেমনি নাভিঃ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় হইতে জাত অথচ ক্ষত্রিয় হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। পালরাজগণ মাহিষ্য ছিলেন বলিয়া, মহাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী ক্ষত্র শব্দ পর্য্যন্ত ব্যবহার না করিয়া "নাভিঃ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং ক্ষত্র শব্দ এখানে অতি দুর্ব্বল ভাবে উপন্যস্ত। তবেই হইল, পালগণ ক্ষত্রবীর্য্য সম্ভূত, কিন্তু ক্ষত্রিয় নহেন।

তৃতীয়তঃ, যে জাতি যে দেশে রাজত্ব করেন,—রাজত্ব লোপ হইলেও, সেই দেশে সেই জাতির বাহুল্য ও ক্ষমতা থাকে। বারেন্দ্র ভূমিতে, মেদিনীপুর অঞ্চলে, অদ্যাপি সেই কারণে মাহিষ্য জাতির ক্ষমতা ও সংখ্যাধিক্য ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিক দৃষ্ট হয়।

চতুর্থতঃ, দিব্বোক প্রভৃতি মাহিষ্য রাজগণ পালরাজগণের হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী জ্ঞাতি ছিলেন বলিয়া, সন্ধ্যাকর ভীমাদিকে স্পষ্টতঃ নিন্দা করিতে সাহসী হ'ন নাই। কারণ, তাহাতে পালরাজগণের অসন্তোষ উৎপত্তির সম্ভাবনা।

পঞ্চমতঃ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও প্রাচীন প্রমাণ আলোচনা করিয়া কৈবর্ত্তরাজ ভীমকে ভীমপাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব পালরাজগণও কৈবর্ত্ত জাতীয় দিব্যকাদির সহিত এক জাতীয়। রামচরিতের ইংরাজী ভাষায় লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

প্রবন্ধ লেখক মহাশয়, মানবরাজগণের মন্ত্রী শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ মনোরথ পালরাজগণের মন্ত্রিকন্যা বিবাহ করিয়াছেন, এই যুক্তিতে পালরাজের মন্ত্রি-বংশকেও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। এই প্রকার বিবাহ হইলেও, তাহা সমশ্রেণীর কারণ নহে। কারণ, বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে যে এইরূপ ২। টা বিবাহ না ঘটিতে পারে এমন নহে। পূর্ব্বকালে ও বর্ত্তমান কালেও বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যৌন সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে। সমাজে অনুসন্ধান করিলেই তাহা জানিতে পারা যাইবে। এক পূর্ব্ব বঙ্গেই ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলায় শতাধিক মাহিষ্যযাজী গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের কন্যা রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর পাত্রে সমর্পিত হইয়াছে। তাহাতেই মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র হইয়া যান নাই। এই প্রকার গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ-কন্যায় বিবাহের তালিকা এবং ঐরূপ বিবাহজাত সন্তানের মাতামহ সম্পত্তি লইয়া কুমিল্লার কোর্টের মোকর্দ্দমায় বিবরণ মৎপ্রণীত ভ্রান্তিবিজয় পুস্তকের ১৮৫ পৃঃ—১৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পালরাজগণের মন্ত্রিবংশ, যাহা বাদল-স্তম্ভে লিখিত আছে, তন্মধ্যে গয়া জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে প্রাপ্ত শিলালিপির লিখিত মনোরথের শ্বশুর দেব শর্ম্মার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং ঐ শিলালিপি কতদূর প্রামাণ্য তাহাও বিবেচ্য। যদিও কেহ ছিলেন, তিনি পালরাজগণের মন্ত্রিবংশের কেহ নহেন। লেখক মহাশয় গুরবমিশ্র প্রভৃতির জমদগ্নি গোত্র উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন; উক্ত গোত্র বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে নাই, আচার্য্য ব্রাহ্মণের মধ্যে আছে। অতএব উক্ত গোত্রীয় গুরবমিশ্র প্রভৃতি শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় গুরবমিশ্রের জমদগ্নি গোত্র কোথায় পাইলেন? এখানে ভগবান পরশুরামের জমদগ্নি বংশে উৎপত্তি লিখিত হইয়াছে। এবং তিনিই সম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের নিধন চিন্তক। এখানে শ্লেষ রক্ষার জন্যই "সম্পন্নক্ষত্রচিন্তক" শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। গুরবমিশ্রের পক্ষে এই শব্দের অর্থ সম্পৎ নক্ষত্রের চিন্তক। যেহেতু রাজার কল্যাণকামী মন্ত্রী রাজার সম্পৎ নক্ষত্র দেখিয়াই কার্য্যারম্ভ করিতেন—পাছে কার্য্যারম্ভ করিয়া বিফল মনোরথ না হন। পালরাজবংশের মন্ত্রিগণ যে শাণ্ডিল্য গোত্রিয়, তাহা গরুড়-স্তম্ভের প্রথম শ্লোকেই * লিখিত হইয়াছে। সুতরাং সরল অর্থ পরিত্যাগ করিয়া টানিয়া-টুনিয়া জমদগ্নি গোত্র বলিবার কারণ কি? জমদগ্নি গোত্র নহে, জামদগ্ন্য গোত্র বটে। অতএব পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, পালমন্ত্রিগণ গ্রহবিপ্র নহেন, গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বটেন।

যদি ক্ষত্র চিন্তক শব্দ না ধরিয়া নক্ষত্র চিন্তক শব্দই লওয়া যায়, তাহা হইলে নক্ষত্র চিন্তক শব্দের অর্থ জ্যোতিষ গণনাকারী। ব্রাহ্মণ মাত্রকেই

---

* "শাণ্ডিল্য বংশেথতুর্বীরদেব গুদম্বরে।
পাঞ্চালো নাম তদয়গাত্রে গর্গস্তস্মাদজায়তে

জ্যোতিষ শিক্ষা করিতে হয়; নতুবা শুভাশুভ নক্ষত্রের গণনা, শুভাশুভ দিন গণনা, শুভাশুভ গ্রহের সঞ্চার গণনা করিয়া বৈদিক যজ্ঞাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারা যায় না। জ্যোতিষ শাস্ত্র বেদের একটি অঙ্গ যথা—

"ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোহথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে॥
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতং।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

(পাণিনি শিক্ষা)

জ্যোতিষ শিক্ষা করিলেই কি প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়ের মতে তাঁহাকে শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্র মনে করিতে হইবে? তাহা হইলে, ভট্ট-পল্লীর পাশ্চাত্য বৈদিক ঠাকুরগণের অনেকেই জ্যোতিষবেত্তা, তাঁহাদিগকেও কি গ্রহবিপ্র বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে?

রামগুরব মিশ্র কেবল জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পণ্ডিত নহেন। তিনি যুদ্ধ-বিদ্যাতেও পারদর্শী ছিলেন। তজ্জন্যই জমদগ্নি কুলোৎপন্ন সম্পন্ন ক্ষত্র চিন্তক পরশুরাম সহ উপমিত হইয়াছেন—

জমদগ্নিকুলোৎপন্ন সম্পন্নক্ষত্রচিন্তকঃ।
যঃ শ্রীগুরব মিশ্রাখ্যো রামো রাম ইবাপরঃ॥

শ্লোকের মধ্যে দুইবার রাম শব্দ লিখিত থাকায় বুঝিতে কাহারও সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী ২১ শ্লোকেও রামগুরব মিশ্রের ক্ষাত্রশক্তি অভিব্যক্ত হইয়াছে; যথা—

"শাস্ত্রানুশীলন গভীর গুণৈরচোদি
বিদ্বৎ সভাসু পবনাদি মদাবলেপঃ।
উদ্ভাসিতঃ সম্পদি যেন যুধি দিশাং
নিঃসীম বিক্রমধনেন জ্যোতিভিদোনঃ।"

সুতরাং 'নক্ষত্র চিন্তক' শব্দের বলেই তাঁহাকে গ্রহবিপ্র শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলা যায় না। গরুড়-স্তম্ভে প্রত্যেক মন্ত্রীর বিশেষ বিশেষ গুণ বর্ণিত হইয়াছে। গর্গের 'মন্ত্রণাবল' দর্ভপাণির 'নীতি-কৌশল' কেদার মিশ্রের 'বৈদিক যজ্ঞশক্তি' গুরবমিশ্রের 'জ্যোতিষে অধিকার' পর-পর শ্লোকে কথিত হইয়াছে। অতএব যে মন্ত্রীর যে গুণ প্রবল, তাহাই গরুড়স্তম্ভে ব্যক্ত হইয়াছে। জ্যোতিষ বিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া রামগুরব মিশ্রকে যদি 'আচার্য' ব্রাহ্মণ করা হয়, তবে অন্যান্য মন্ত্রীকে কোন্ জাতি গণ্য করা হইবে? তাঁহাদের জ্যোতিষ-বিদ্যার কোন পরিচয় নাই। কেবল "সম্পন্নক্ষত্র" শব্দ দেখিয়া রাম গুরবমিশ্রের জাতি নির্ণয় হয় না। এইরূপ ভাবে রামগুরবকে গ্রহবিপ্র সম্প্রদায়ে পরিণত করিলে, নিজের গরজ প্রচার করা হয় মাত্র। স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য একজনের বিশেষণ লইয়া অন্যান্য মন্ত্রীর বিশেষণ পরিত্যাগ করা যায় না।

মাহিষ্য জাতির চিরন্তন রীতি এই যে, ইঁহারা যখন যেখানে উপনিবিষ্ট হন বা যে দেশে আধিপত্য স্থাপন করেন, তখন সেই দেশে পুরোহিত বসবাস করেন, এবং আপন পুরোহিতদিগকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেন। সেই কারণ মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণ পালরাজগণের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহারাই গৌড়ের আদি ব্রাহ্মণ। বঙ্গদেশে অনির্দ্দেশ্য কাল হইতে মাহিষ্য জাতির আধিপত্য। তাঁহারা পুরোহিত বিহীন ছিলেন না। তাঁহারা নবাগত কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণেরও যাজ্য হন নাই বা পরবর্ত্তী কালের বৈদিকগণের আশ্রয়ও গ্রহণ করেন নাই। বঙ্গের সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের সহিত মাহিষ্যগণের যাজ্য-যাজক সম্বন্ধ।

প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন,—"নগেনবাবু ব্রাহ্মণ নহেন, তাঁহার এ বিষয়ে লাভ-লোকসান কিছুই নাই। সুতরাং তিনি নিরপেক্ষ ভাবে এই মন্ত্রী বংশকে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বংশই বলিয়াছেন।"

এই লেখা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে—নগেনবাবুর লাভ-লোকসান থাকিলে তিনি সত্যের রূপান্তর করিতে পারিতেন। আমরাও বলি, তাঁহার স্বার্থসংযুক্ত আছে বলিয়াই তিনি পাল-মন্ত্রী-বংশকে ইচ্ছাপূর্ব্বক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। তিনি বঙ্গীয় মাহিষ্য-জাতিকে ও তৎপুরোধাকে তাঁহার "বিশ্বকোষে" যেরূপ ঘৃণিত ভাবে অযথা আক্রমণ করিয়াছেন, সেইটী বাহাল রাখিতে হইলে, গৌড়ীয় আদি বৈদিকগণকে অন্য জাতিতে পরিণত না করিলে তাঁহার স্বমত বিরোধ ঘটে; সুতরাং তিনি স্বার্থ রক্ষার জন্য গৌড়ের আদি বৈদিককে গ্রহ-বিপ্র জাতিতে পরিণত করিয়া স্বার্থ-রক্ষা করিয়াছেন।

এখনও বরেন্দ্র ভূমিতে বা দক্ষিণবঙ্গে মাহিষ্যযাজী গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন প্রাচীন ব্রাহ্মণ নাই। কি বারেন্দ্র, কি রাঢ়ী বা কি পাশ্চাত্য-বৈদিক সকলেই বঙ্গদেশে নবাগত উপনিবিষ্ট ব্রাহ্মণ—ইহা আমি "ভ্রান্তিবিজয়" পুস্তকে বিশেষ ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছি। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় মনোযোগ দিয়া উক্ত পুস্তক পাঠ করিলে, তাঁহার ভ্রান্তি দূর হইত এবং নগেন্দ্রবাবুর স্বার্থ আছে কি না তাহাও দেখিতে পাইতেন। এক্ষণে আশা করি, সুধী পাঠকগণ পাল-রাজবংশের এবং তাঁহাদের মন্ত্রিগণের জাতির প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া উদারতা প্রদর্শন করিবেন।

মহাকবি কালিদাসের বাস্তুভিটা

[শ্রীমন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য]

প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া "মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন"—এই তথ্য আমি বাঙ্গালা দেশের অনেক সভা-সমিতি ও পত্রিকাদিতে প্রকাশ করিতেছি। তাহাতে এ যাবৎ প্রকাশ করা হইয়াছে যে,—"মহাকবি কালিদাস বীরভূম ও নবদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী তালীবন শ্যামদেশ বা উত্তর রাঢ় দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কথা তাঁহার নিজের লেখনী হইতেই প্রতীয়মান হয়; এবং এই কথাই আমি "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের" হাওড়ার অধিবেশনে প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমার আবাস স্থান কলিকাতা হইতে উত্তর রাঢ় অনেক দূরবর্ত্তী হওয়ায়, ঠিক কোন্ গ্রাম কালিদাসের জন্মভূমি, তাহা এতদিন অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। তদ্দেশবাসী বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় এম এ জ্যোতিভূষণ মহাশয়ের নিকট এই বিষয় অনুসন্ধানের জন্য প্রার্থনা করায়, তিনি বর্ত্তমান বর্ষের "আলোচনা" নামক মাসিক-

পত্রে, এ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি তদ্দেশ, অনুসন্ধান করিয়া, আহামোদপুর কাটোয়া রেল ল্যাইনের, রামজীবনপুর ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী, "কোলোমোক্ক গ্রাম" নামক পল্লীকে, প্রাদেশিক জনপ্রবাদ অনুযায়ী, মহাকবি কালিদাসের জন্মপল্লী বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন।

তদনুযায়ী আমি ৯ই চৈত্র মঙ্গলবার ঐ প্রদেশে গিয়া, প্রথমতঃ কীর্ণাহারের নিকটবর্ত্তী, সারস্বত পীঠ ও সারস্বত কুণ্ড অনুসন্ধান করি। কীর্ণাহার ষ্টেশন হইতে ৩। ক্রোশ দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে "গান বেলুনি" গ্রাম। ঐ গ্রামে পার্শ্বপার্শ্বে একটি ভগ্ন ইটের স্তূপ আছে। জন-প্রবাদে এই স্তূপ মহাকবি কালিদাসের টোল-বাড়ী। তাহার দক্ষিণে তমালবীথির নিম্নে একটি ভগ্ন ইটের দেওয়াল দেওয়া দুইখানি ভগ্ন পাথর-প্রতিমা আছে। জন-প্রবাদে তাহাই কালিদাস স্থাপিত সরস্বতী পীঠ। তৎপূর্ব্বে একটি শুষ্ক খাত আছে। তাহাই সরস্বতী কুণ্ড। এই কুণ্ডে স্নান করিয়া কালিদাস অমর কবি হইয়াছিলেন। এখানে জন-প্রবাদ,—কাটোয়া মঙ্গলকোট থানার অধীন উজানির রাজকন্যা বিদ্যামালা কালিদাসকে পণ্ডিত ভ্রমে বরমালা দিয়াছিলেন। পশ্চাৎ তাঁহাকে মূর্খ জানিতে পারিয়া বিতাড়িত করেন। কালিদাস এখানকার এই বিল্ব-বাটিকায় উপস্থিত হইলে, মা সরস্বতী তাঁহাকে এই কুণ্ডে স্নান করিতে বলেন। স্নান-শুদ্ধ কালিদাস অমর কবি হইয়া উঠিলেন। এই কথা তৎ-গ্রামবাসী প্রত্যেকে, এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী দূর গ্রামের অনেকেই বলিলেন।

তৎপরে কয়দিনে আমি, শ্রীযুক্ত ভূদেববাবুর লিখিত "মোর গ্রামের" পার্শ্ববর্ত্তী পুরুলিয়া, শ্রীপুর, খন্না ও জাঙ্গালা প্রভৃতি চারিখানি গ্রামের প্রাচীন অধিবাসিগণের কালিদাসের বাস্তুভিটা সম্বন্ধে কি জ্ঞান আছে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া, ১২ই চৈত্র গুড্‌ফ্রাইডের দিনে মোরগ্রামে অনুসন্ধানার্থ প্রবেশ করিলাম। মোর গ্রামের মধ্যে এক কালীবাড়ী আছে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ও স্থানীয় জন-প্রবাদ অনুযায়ী, এই মোর-গ্রামের কালীবাড়ীই মহাকবি কালিদাসের বাস্তুভিটা। পূর্ব্বে এখানে ভিটামাত্র ছিল। এখন এখানে প্রতি বৎসর কার্ত্তিকী অমাবস্যায় কালীপূজা হয়। বিসর্জ্জনান্তে সেই প্রতিমার কাঠাম নিত্য পূজা করা হয়। এখানকার মা কালী জাগ্রত দেবতা। দূর দূরান্তর হইতে ভক্তগণ এখানে অভীষ্টলাভের নিমিত্ত আসিয়া থাকে। বেলুনি সারস্বত কুণ্ড যেরূপ মহিমান্বিত ও অভীষ্টপ্রদ, এখানকার কালীর কাঠামও তদ্রূপ মহামহিমান্বিত ও সর্ব্বাভীষ্ট-ফলপ্রদ। এই স্থান কালিদাসের নিজের লিপি অনুযায়ী, প্রত্যাশ্ব ও হুন্নদেশের মধ্যবর্ত্তী তালীবন-গ্রাম; এবং মহোদধি বা বড়কান্দর নামক নদীর তীরবর্ত্তীও বটে। ইহা কণ্ব মুনির আশ্রম বা কর্ণ-সুবর্ণ হইতে ৫।৭ ক্রোশের মধ্যে। বশিষ্ঠাশ্রম হইতেও ১০।১৫ ক্রোশের মধ্যে। এখানকার গোপগণ প্রথমে হৈয়ঙ্গবীন প্রস্তুত করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছিল।

ইত্যাদি নানা কারণে আমি এই স্থানকে মহাকবি কালিদাসের জন্মপল্লী বলিয়া মনে করিতেছি। যাঁহারা বিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন, বা বাদ-প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দয়া করিয়া আমায় সংবাদ দিলেই, আমি তাঁহাদের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া, আমার যাহা কিছু প্রমাণ আছে, তাহা শুনাইয়া দিয়া আসিব।

সাতটাকা ছ-আনা

[শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী]

সাতটাকা ছ-আনা মাত্র আমার সম্বল ছিল। তার মধ্যে থেকে মুদিকে দিতে হবে দশটাকা, বাড়ী ভাড়া পনেরোটাকা, অনুগত ভৃত্য রামদাসের মাইনে আটটাকা, আরও কতক-গুলো ছোট-খাট খুচরো খরচ ছিল। কিছুতেই টাকা কটাকে বাগিয়ে এই হিসেবের মধ্যে ফেলতে পারছিলুম না। চাকরীটা যাবার আগে দিনকয়েকের জন্য আমাকে হিসেব বিভাগে বদলী করা হোয়েছিল। সেখানে প্রত্যহ আমাকে প্রায় সাতলাখ টাকার হিসেব-নিকেশ কোরতে হোত। প্রত্যহ হিসেব-নিকেশ করবার কথা ছিল, তাই প্রত্যহই গোল হোত।

মনিব একদিন বেড়াল-চক্ষু রক্তবর্ণ কোরে বল্লেন—বাবু কেন তোমার এত ভুল হয়?

মনিবকে বুঝিয়ে বল্লুম—হুজুর মাইনে দেন চল্লিশটী টাকা; চল্লিশ টাকার হিসেব আমায় কোরতে দিন, দেখতে না দেখতে কোরে দেব; কিন্তু এই চল্লিশ টাকার মগজে সাতলাখ টাকার হিসেবটাকে ঠিকমতে বাগাতে পারি না, তাই একটু ভুলচুক হোয়ে যায়।

এমন অকাট্য যুক্তিটা মনিবের মনে কেন যে ধরল না, তা বুঝতে পারলুম না, বোধ হয় ওটা মনিব জাতেরই দোষ। চাকরীটা সেই দিনই গেল—

সাতটী টাকা নিয়ে যখন এই রকমে সাত সমুদ্রে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি, সেই সময় মনে পড়ল অনেক দিন আগে এক বন্ধুকে গোটাকয়েক টাকা ধার দিয়েছিলুম। বন্ধু সেই থেকে দেখা-শোনা বন্ধ কোরে দিয়েছিল; সেজন্য মধ্যে মধ্যে মনে

দুঃখ হোত; কিন্তু সে দিন মনে হোল দেখা না কোরে বন্ধু ভালই কোরেছে, কারণ দেখা হোলে বন্ধুবিচ্ছেদ হওয়াটা বোধ হয় অসম্ভব হোত না।

অনেক ভেবে চিন্তে কোন কিনারা কোরতে না পেরে উঠে পড়লুম। আজই সন্ধ্যেবেলা পাওনাদারদের সব মিটিয়ে দেবার কথা দিয়েছি; টাকা না দিতে পারলে তারা এবার বে-ইজ্জত কোরবে।

বন্ধুটি থাকেন হাওড়ায়, আমার বর্ত্তমান বাসা থেকে মাইল চারেক হবে। রামদাসকে বলে গেলুম যে, যদি কেউ টাকার তাগাদায় আসে, তবে তাকে কাল সকালে আসতে বলে দিবি।

চলেছি আর ভাবছি টাকা কটা পাওয়া যাবে কি না? ভাবতে ভাবতে গঙ্গার পোল বরাবর এসে হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখি আমার সাধের সাতটি টাকা জামার পকেট অন্ধকার কোরে কোন নিপুণ গাঁটকাটার ট্র্যাক আলো কোরে বসেছেন।

নিরাশায় একটা দমে গেল। কিন্তু ভগবানের ন্যায় বিচারের প্রশংসা না কোরে থাকতে পারলুম না। অতগুলো পাওনাদারের মধ্যে কেউ টাকা পেত, কেউ বা পেত না। বড় সমস্যাই চলেছিল; কিন্তু টাকা কটা মারা গিয়ে সব সমস্যার সমাধান হোয়ে গেল। আমার পকেটমারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের টাকাও মারা গেল। বেচারী পাওনাদারদের জন্য একটু কষ্ট হোতে লাগল; কিন্তু আমি কি কোরব! আসলে ভগবানই তাঁদের মেরেছেন, আমি নিমিত্ত মাত্র।

বন্ধুর বাড়ী আর যাওয়া হোল না। হিসেব কোরে দেখলুম যে-পয়সা পকেটে রাখতে না রাখতে বেহাত হোয়ে যাচ্ছে, সেই পয়সা, আপনা হোতেই যা বেহাত হোয়ে গিয়েছে, তা কি আর ফিরে পাবার সম্ভাবনা আছে! মনকে সান্ত্বনা দিতে লাগলুম যে—ধন জিনিষটা বড়ই চঞ্চল;—মন কিন্তু সে-সব কথায় কান না দিয়ে সেই সাতটা টাকার জন্য আমার পেছু পেছু ঘুরে মরতে লাগল।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, উপেন নামক এক ব্যক্তির ঋণের দায়ে সমস্ত জমিজমা বিকী হোয়ে মাত্র দুই বিঘা জমি আর ভিটেটুকু অবশিষ্ট ছিল। দেশের রাজা যখন তার সে জমিটুকুও কেড়ে নিলেন, তখন উপেন মনে কোরলে যে, সেই দুই বিঘার পরিবর্ত্তে সমস্ত পৃথিবীর জমিদারীই তার হাতে এসে গেল। এই ভেবে উপেন সেইদিনই বগল বাজিয়ে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। আমিও উপেনের দৃষ্টান্ত মত একবার মনে কোরলুম যে, বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকাই আমার। কথাটা মনে হোতেই চোখের সামনে দিয়ে কতকগুলো সঙ্গীনধারী সেপাই, লালবাজারের একখানা বাড়ী, মেয়ে স্কুলের গাড়ীর মত একখানা বন্ধগাড়ী, এই রকম কতকগুলো কি সব আবোল-তাবোল জিনিষ চোখের সামনে দিয়ে সরষের ফুলের মতন চিকমিক কোরে খেলে গেল। মনে মনে ভাবলুম, দরকার নেই বাবা আমার বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের টাকা; আমার সাতটাকাই ভাল। উপেন ভায়ারও নাকি এই দশাই হোয়েছিল, সমস্ত পৃথিবীর জমিদারী ভোগ কোরেও সেই দুই বিঘের মায়া কাটাতে সে পারেনি।

প্রায় সন্ধ্যের সময় বাসায় এসে পৌছলুম। মোমবাতিটা জ্বালিয়ে নিয়ে লম্বা হোয়ে শুয়ে পড়া গেল। ঘরে আমার বহু পুরাতন একটা ছেঁড়া টাইম-টেবল পড়ে ছিল। সঙ্গিহীন অবসর কালে সেখানাই আমার কাব্য, উপন্যাস ইত্যাদির তৃষ্ণা নিবারণ কোরত। পায়ের কাছে থেকে বইখানাকে তুলে নিয়ে পাতা উল্টাচ্ছি, এমন সময় রামদাস একখানা চিঠি দিয়ে গেল। চিঠির নাম শুনে বুকখানা ধড়াস কোরে উঠল; চিঠি লিখতে পারে দুনিয়ায় এমন কোন লোক আমার ছিল না। মনে কোরলুম হয় ত কোন পাওনাদার উকীলের চিঠি পাঠিয়েছে।

অনেক দিন আগে এক জায়গায় চাকরী করতুম, সেই ঠিকানায় চিঠিখানা এসেছিল। দেখলুম খামখানার সর্ব্বাঙ্গে ছাপ মারা, কোণগুলো ছিঁড়ে গিয়েছে, ডাক বাক্সের অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে সেখানার দম বেরিয়ে যাবার পূর্ব্বাবস্থা—

এক গেলাস জল খেয়ে নিয়ে সন্তর্পণে চিঠিটা খুলে ফেললুম। তাতে লেখা আছে—

বন্ধু,

এই চিঠি পেয়ে তুমি বোধ হয় বিস্মিত হোয়ে যাবে, কিন্তু অত সহজে বিস্মিত হোয়ো না। তোমার হাতে যেদিন এই চিঠিখানা গিয়ে পৌছবে, যে অবস্থায় থাক না কেন সেই দিনই আমার কাছে চলে আসবে। তোমাকে আমার প্রয়োজন আছে। আশা করি বাল্যবন্ধুর এই অনুরোধ অবহেলা কোরবে না। ইতি,

সীতাপুরের অরবিন্দ।

চল্লিশ বছরের পুরোণ আমার এই ভাঙ্গাচোরা খাঁচা-খানার মধ্যে একটা পাখী বাস করে; সে চির নবীন। তাল মাফিক তাকে ডাকতে পারলে সে ঠিক সাড়া দেয়! এই সীতাপুরের অরবিন্দের সাড়া পেয়ে সেটা জবাই করা মুরগীর মত ধড়ফড় কোরে উঠলো। ত্রিশ বত্রিশ বছরের পুরোণ একখানা ছবি সজীব মূর্ত্তি ধরে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

আমরা তখন রোহিলখণ্ডের একটা ছোট সহরে থাকতুম। আমার বাবা ছিলেন সেখানকার পোষ্টমাষ্টার। চাকরী উপলক্ষে অনেক বাঙ্গালীকেই সেখানে থাকতে হোত। সীতাপুর বেশ স্বাস্থ্যকর জায়গা, সেজন্য সেখানে অনেক বাঙ্গালী মাঝে মাঝে হাওয়া খেতে আসতেন। এই সব প্রবাসী বাঙ্গালী ছেলেদের পড়াশুনার জন্য সেখানে একটি স্কুলও ছিল। এই স্কুলে বেশী ছেলে ছিল না, এক একটা ক্লাশে দশ বারো জনের বেশ নয়।

আমার তখন আট কি ন' বছর বয়স, সেই সময় অরবিন্দেরা সেইখানে বেড়াতে এল। অরবিন্দের বাবা ছিলেন জমিদার; তিনি তাঁর রুগ্না স্ত্রীকে নিয়ে সেখানে বেড়াতে এসেছিলেন। মনে পড়ল সেই রক্তহীন রুগ্ন মূর্ত্তি, সেই আস্তে আস্তে হাঁপাতে হাঁপাতে কথা বলা, থেকে থেকে বিদ্যুতের মতন ভুবন ভোলান হাসি। অত রুগ্ন অথচ সেই মুখের উপর এমন একটা স্নিগ্ধ অনুপম সৌন্দর্য্য ছিল যে প্রথম দর্শনেই ছোট ছেলে মেয়েরা তাঁকে ভাল না বেসে থাকতে পারতো না।

অরবিন্দ সেদিন আমাদের ক্লাশে এসে ভর্ত্তি হোল— সেই গৌরবর্ণ সুপুষ্ট প্রিয়দর্শন ছেলেটী—মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সে ক্লাশশুদ্ধ ছেলেদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিলে।

দিন কয়েকের মধ্যেই অরবিন্দের সঙ্গে আমার খুব ভাব হোয়ে গেল। তার মধ্যে এমন কি একটা জিনিষ ছিল, যা আমাকে একেবারে মুগ্ধ কোরে ফেল্লে। ক্লাশে যে কয়জন ছাত্র ছিল, তাদের মধ্যে দুষ্টুমিতে আমিই ছিলাম সেরা, দিন কয়েক যেতে না যেতেই অরবিন্দ আমার প্রধান সাকরেদ হোয়ে দাঁড়াল। আমাদের দুষ্টুমিটা বেশী কোরে জমত পণ্ডিত মশায়ের ক্লাশে। পণ্ডিত মশায়ের সেই চকচকে নেড়া মাথার ওপর বোঁটার মতন টিকিটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলেই আমি আর হাসি সামলাতে পারতুম না। তিনি আমায় যত প্রহার দিতেন, আমার হাসি যেন ততই বুকের ভেতর থেকে গুমরে গুমরে উঠতে থাকত। দিন কয়েক দেখে শুনে অরবিন্দও আমার দলে যোগ দিল। এই দুটি অশান্ত ছেলেকে নিয়ে পণ্ডিত মহাশয়ের যে কি দুর্দ্দশা হোত, তা মনে হোলে এখন লজ্জা হয়। এক একদিন আমাদের দুজনাকে মারতে মারতে তিনি দমশম হোয়ে পড়তেন। কোন কোন দিন তাঁর রাগ এত চড়ে যেত যে, তাঁর প্রহারের বহর দেখে পাশের ক্লাশের মাষ্টারেরা ছুটে আসতেন, আমরা কিন্তু জেদ বজায় রাখবার জন্য কেঁদে কেঁদেও হাসতুম। এই রকম আনন্দে আমরা বছর দুয়েক কাটিয়েছিলাম।

একদিন সকাল বেলা বাড়ীতে শুনলাম যে, কাল রাত্রে অরবিন্দের মা হঠাৎ মারা গেছেন। সেদিন অরবিন্দ আর স্কুলে এল না, তার পরদিনও তাকে কেউ দেখতে পায় নি। দু দিন পরে সে স্কুলে এল শাদা থান পরে, গলায় কাছা দেওয়া—

আমরা ক্লাশ শুদ্ধ ছেলে তাকে ঘিরে বসলুম। কারো মুখে কোন কথা নেই, সবাই নির্নিমেষে তার দিকে চেয়ে রইলুম। সবাই আমরা তখন ছেলে মানুষ; সহানুভূতির সাজানো গোছান চুবন করা ভাষা তখনো আমাদের কারোই মুখস্থ হয়নি; কিন্তু আমাদের বুকের মধ্যে যে একটা তোলপাড় চলছিল, তার চিহ্ন সবারই মুখে প্রকাশ হয়ে পড়তে লাগল। স্কুল বসবার ঘণ্টা পড়ল, পণ্ডিত মশায় ক্লাশে এসেই অরবিন্দকে ডাকলেন - আয় এদিকে আয়।

অরবিন্দ নিজের জায়গা ছেড়ে আস্তে আস্তে পণ্ডিত মশায়ের কাছে গিয়ে বল্লে—আমার মা মারা গেছেন স্যর, আজ রাতে আমরা বাড়ী যাব। অকস্মাৎ বৃদ্ধের সেই কাটখোট্টা তোবড়ান মুখের ওপর দিয়ে বিদ্যুতের মত দুটো তিনটে ঝিলিক খেলে গেল, তার পর তাঁর দুই চোখ দিয়ে ঝর ঝর কোরে জল পড়তে লাগল, মাঝে মাঝে তিনি অরবিন্দকে জড়িয়ে ধরে তার মাথায় চুমু খেতে লাগলেন। সে দৃশ্য দেখে আমাদের সবার চোখ ছলছল করতে লাগল। অনেকক্ষণ তিনি অরবিন্দরে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে শেষে তাকে বল্লেন—তোকে ঢের মেরেছি বাবা, কিছু মনে করিস নি, এ বুড়োকে ক্ষমা করিস—পণ্ডিত মশায় আরও কথা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অশ্রু এসে তাঁর কণ্ঠ রোধ করে ফেল্লে।

পণ্ডিত মশায়ের কথা শুনে অরবিন্দ ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে লাগল।

তারপর সে আমাদের প্রত্যেকের কাছে এসে বলতে লাগল, ভাই আমার বাবা এসেছেন, আজ আমরা চলে যাব।

সারা স্কুল ছেলে কেউ হাতে মাথা লুকিয়ে, কেউ বা কোঁচার খোঁট চোখে দিয়ে কাঁদতে লাগল। ত্রিশ বছর পূর্ব্বেকার সেই বিদায়ের দৃশ্য আমার চোখের সামনে জল জল কোরে ফুটে উঠে আবার চোখের জলেই মিলিয়ে যেতে লাগল।

অরবিন্দর সেইদিন সন্ধ্যার সময় সীতাপুর ছেড়ে চলে গেল। কয়েক সপ্তাহ [illegible] হয়েছিল, তারপর বাবার সীতাপুর থেকে বদলী হওয়ায় আমরাও অন্য জায়গায় চলে গেলুম;—আর তার কোন সংবাদ পাইনি।

বাল্যের সেই বন্ধু আমার, আজকে বন্ধুত্বের দাবী জানিয়ে তার কাছে আমায় আহ্বান করেছে। কি দুঃখ তাকে আজ এত দিন পরে আমার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে? নিষ্ঠুর সংসার তাকে কোন দণ্ডে দণ্ডিত করেছে? তার বুকে এমন কি ক্ষত হোয়েছে, যার বিশল্যকরণী তার এই বাল্যবন্ধুর কাছে আছে? বন্ধু—বন্ধু—

তাড়াতাড়ি টাইমটেব্‌ল্‌খানা তুলে নিয়ে চিঠিখানা যেখান থেকে আসছে, সেখানকার ভাড়াটা দেখলুম—দেখলুম স্পষ্ট অক্ষরে লেখা রয়েছে—**সাতটাকা ছ আনা**।

অচকিতা

[শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ, বি-এল]

নিষ্ঠুর আমার,
এ প্রাণের শেষ নাই আর?
এ জীবন কিছু নয়, শুধু শব্দময়
চিরোত্থিত কোলাহল, চির হাহাকার।
অশ্রু চোখে শুধু হাস, তপ্ত বুকে দীর্ঘশ্বাস
চক্রতলে চূর্ণ হয় সারাটা সংসার।
কোথা শান্তি, কোথা প্রীতি, কোথায় সান্ত্বনা গীতি,
কোন দিক হইতে উঠে মঙ্গল ঝঙ্কার?
নিষ্ঠুর আমার!
চির প্রবাসি,
বাঁশী কেন হয়ে যায় অসি?
সুখ কেন লাগে হেন? হাস এত ক্ষীণ কেন?
চিত্তহীনা অকরুণা নিত্য যায় গ্রাসি।
এ চিত্তে প্রবল আশা, গড়ে সে গড়ে সে বাসা,
প্রাণের শ্মশানে বসি, মাখায় সে মসী।
ঊর্দ্ধ নীল মহাকাশে, সূর্য্য হাসে, চন্দ্র হাসে
নিয়ে শুধু নিবে গেছে মোর রবি শশী,
চির প্রবাসি!
হে মনোহারিণি,
প্রাণ দিয়ে লইয়াছি কিনি,
তবে আর কেন তারে মুক্তি দিতে চাও হায় রে,
কোন্ সাধে পুনর্ব্বার তারে লব কিনি?

দুঃখ সুখে, স্বপ্ন সাধে অভিশাপে, আশীর্ব্বাদে
সাড়া দিয়ে বাজে আর বাজে না কিঙ্কিনি।
প্রাণহীন এই প্রাণে জাগাস্ নে তোর গানে,
ফেলে দেওয়া ফুলে মালা গাঁথে না মালিনী,
হে মনোহারিণি।
একাকিনী নারী,
তোর কাম আমি কিগো প্যার?
দুঃখ আসে রাজবেশে সুখ আসে ম্লান হেসে,
অচকিতা চেয়ে আছ রাজার কুমারী।
কারে ছাড়ি, কারে রাখি, ইঙ্গিতে বলিবে না কি?
বিমূঢ় ভাবিয়া মরে অপ্রতিভ দ্বারী।
প্রাসাদের পূর্ব্বভাগে বাঁশীতে পূরবী রাগে
ক্লান্তি কেঁদে লুটে পড়ে, বিশ্রান্তি বিথারি,
মহীয়সী নারি!
হে চির নিষ্ঠুরে
ক্ষমা নাই ক্ষমা নাই দূরে?
করুক অম্বর ধূ ধূ বিধান বন্ধন শুধু
ক্রন্দনে ক্রন্দনে বুক দীন হয় ক্রমে।
আমি বন্দী বিদ্রোহী সে, শান্তি? শুধু জ্বালা বিষে।
শয়ন করিতে চাই, শ্রান্ত আমি শ্রমে।
থেমে যা নিষ্ঠুর স্বর! দে আমারে অবসর!
সব ছেড়ে চলে যাই অপর আশ্রমে,
নিৰ্দ্দয় নিষ্ঠুরে!

মাতৃ-জীবন*

[ডাক্তার শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায়]

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

জননীগণ! আমি আপনাদের সন্তান। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া থাকি; এবং ছেলে পিলে লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর কন্না করিতে পারি। জননী সন্তানের সকল দোষ, সকল ত্রুটীই মার্জ্জনা করেন। সেই ভরসাতেই আজ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি। আশা করি, মাতৃস্নেহ লাভে বঞ্চিত হইব না।

মাতৃ-জীবনের উদ্দেশ্য কি এবং কিরূপেই বা সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্যই আমি নারী শিক্ষা সমিতির সেক্রেটারী মাননীয়া শ্রীমতী লেডি বোসের নিমন্ত্রণে আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছি। প্রার্থনা করি, সন্তান জ্ঞানে আমার সকল ত্রুটীই আপনারা মার্জ্জনা করিবেন।

আমার বিশ্বাস, সুস্থ শরীরে ছেলে পিলে লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-কন্না করাই মাতৃ-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। কবি কি সুন্দর কথাই বলিয়াছেন:—

"না মাগি সুন্দর কায়, অর্থে মন নাহি ধায়,
ভোগ-সুখে চিত্ত রত নহে,
ঈশ্বর এ বর দিন, সুস্থ থাকি চিরদিন
যেন মোর ধর্ম্মে মতি রহে।"

এ জগতে ইহার অপেক্ষা অধিকতর বাঞ্ছনীয় আর কি হইতে পারে? ধর্ম্মে মতি রাখিবার প্রথম ও প্রধান উপায় শারীরিক সুস্থতা। প্রাচীন কবি ভগবতী জগন্মাতা গৌরীকেও উপদেশ দিতে সাহসী হইয়া কুমারসম্ভবে বলিয়াছিলেন:—

শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।

এখন যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে সুখে থাকা ত দূরের কথা, বাঁচিয়া থাকাই আশ্চর্য্য। বিশেষতঃ, ছেলে পিলে লইয়া যাঁহাদিগকে ঘর কন্না করিতে হয়, তাঁহাদের ভাগ্যে সুখে থাকা সম্ভবপর কি না, আপনারাই তাহা বিবেচনা করুন। আজ আমাদের ঘরে ঘরে রোগ,—ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, নিউমোনিয়া প্রভৃতি ব্যাধিতে সকল গৃহস্থই ব্যতিব্যস্ত। এই সকল ব্যাধিতে প্রতিদিন শত শত লোকের মৃত্যু হইতেছে; আর সহস্র সহস্র লোক রোগশয্যায় শায়িত হইয়া [illegible] করিতেছে। বর্ত্তমানে দেশের এমনই অবস্থা যে, রোগে ঔষধ নাই, তৃষ্ণায় জল নাই, উদরে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই।

---

* কলিকাতা নারী-শিক্ষা-সমিতিতে ডাক্তার শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত "মাতৃ-জীবন" শীর্ষক বক্তৃতাবলীর প্রথম বক্তৃতা—তারিখ ২২শে চৈত্র ১৩২৭ সাল, ৪ঠা এপ্রিল ১৯২১।

জননিগণ! একবার ভাবিয়া দেখুন, আমাদের দশা চিরদিনই কি এমনি ছিল?

আজ কোথায় আমাদের সেই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, মলয়জশীতলা বঙ্গভূমি? হায়, কাহার দোষে আজ আমরা সেই মাকে হারাইয়াছি?—দোষ আমাদের অদৃষ্টের। হারাইয়াছি বটে, কিন্তু আর কি ফিরিয়া পাইবার আশা নাই? "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি"—যত্নে কি না সিদ্ধ হয়? লুপ্ত সামগ্রী হয় ত ফিরিয়া পাইব, কিন্তু কি উপায়ে?—সাধনায়। যদি কালবিলম্ব না করিয়া আমরা সকলেই একান্ত মনে সাধনায় প্রবৃত্ত হই, আমাদের সেই বাঙলাকে আবার ফিরিয়া পাইব। এই বাঙলা আবার সেই সোণার বাঙলা হইবে—ঘরে ঘরে সুখ শান্তি বিরাজ করিবে। তাই ব্যাকুল প্রাণে কবির ভাষায় বলিতেছি—

"অভাব দশায় নরে উন্নতির গতি,
সেই ধন্য যেই করে অভাবে উন্নতি।"

আমরা যে দারুণ অভাবে পড়িয়াছি, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। অভাবে পড়িয়া চেষ্টার ফলে, কবির আপ্ত বাণীতে যদি আমরা উন্নতি করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা যথার্থই ধন্য হইব। আসুন, মায়ে পোয়ে মিলিত হইয়া একাগ্র চিত্তে আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। ঘরে ঘরে সুখ শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হউক। কর্ম্ম বিনা এ সংসারে কিছুই সাধিত হয় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন:—অর্জ্জুন, তুমি নিয়তই কর্ম্ম কর, কর্ম্ম না-করিলে অন্য কিছু ত দূরের কথা, তোমার শরীরযাত্রাই চলিবে না। তাঁহার শ্লোকটী এই

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ॥

এই শ্লোকে আমাদের মুক্তিতত্ত্ব নিহিত আছে। আমরা মুমুক্ষু হইলে সে তত্ত্বকথা বুঝিতে পারিব, আর মুক্তি-পথেরও সন্ধান পাইব।

সে যাহা হউক, আমি পূর্ব্ব ভাগেই বলিয়াছি, সুস্থ শরীরে ছেলে-পিলে লইয়া ঘর-কন্না করাই মাতৃ-জীবনের উদ্দেশ্য। কিরূপ ভাবে কার্য্য করিলে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, এখন তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে সাধারণতঃ কি কি প্রয়োজন?

১। শরীর সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান।
২। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।
৩। শারীরিক ব্যায়াম।
৪। সূর্য্যালোক।
৫। বিশুদ্ধ বায়ু।
৬। নির্ম্মল পানীয় জল।
৭। বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্য।
৮। মাদক দ্রব্য বর্জ্জন।
৯। সংযম।
১০। সংক্রামক রোগ নিবারণ।
১১। রোগীর শুশ্রূষা সম্বন্ধে জ্ঞান।
১২। আহতের আশু প্রতিকার সম্বন্ধে জ্ঞান।

প্রথমে উপরি-উক্ত বিষয়গুলি আলোচনা করা যাউক। পরে

১৩। নারী-জীবনের বিশেষত্ব কি, এবং তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়াদিই বা কি—বিশদভাবে তাহার আলোচনা করিব।

সন্তানের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি পরিশেষে আলোচিত হইবে।

১। শরীর সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান। মানব দেহ কতকগুলি কল যন্ত্রের সমষ্টি মাত্র। ইহাতে দিবারাত্র কল চলিতেছে। কতকগুলি কল শরীরের পুষ্টি সাধনের কার্য্য করে; কতকগুলি দেহের বিষাক্ত পদার্থ বাহির করে; কতকগুলি বাহ্য-জগতের সংবাদ আনয়ন করে ও সর্ব্ববিধ অনুভূতির কার্য্য করে; আর ভগবানের সৃষ্টি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কতকগুলি কলের দ্বারা সন্তানোৎপাদনের কার্য্য চলিতেছে। সেই সকল কলের কার্য্য দ্বারাই শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। যে-দিন কলগুলি কাজ বন্ধ করিবে, সেই-দিন বুঝিতে হইবে যে, দেহ হইতে দেহের মালিক পলায়ন করিয়াছে। যাউক সে কথা। এখন শরীরস্থ প্রধান-প্রধান কলগুলির নাম শুনুন। সেগুলি—

(ক) ফুসফুস্—(Lungs) শ্বাস-প্রশ্বাসের কল।
(খ) হৃদ্‌যন্ত্র—(Heart) রক্ত-চালনার কল।
(গ) পাকস্থলী ও অন্ত্র—(Stomach and Intestines) পরিপাক-ক্রিয়ার কল।
(ঘ) মূত্রগ্রন্থি ও মূত্রাশয় (Kidneys and Bladder) প্রস্রাবের কল।

মানব-দেহ (১)

(১) ফুস্-ফুস্ (Lungs); (৪) অন্ত্র (Intestine);
(২) হৃদযন্ত্র (Heart); (৫) যকৃৎ (Liver);
(৩) পাকস্থলী (Stomach); (৮) মস্তিষ্ক (Brain)।

মানব-দেহ (২)

(২) হৃদযন্ত্র (Heart); (৭) মূত্রগ্রন্থি (Kidneys)
(৮) মূত্রাশয় (Bladder)

(ঙ) মস্তিষ্ক ও বাহ্যেন্দ্রিয়াদি (Brain and Sensory organs) অনুভূতির কল। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি।

(চ) জরায়ু ও ডিম্বকোষ (Uterus and Ovaries) সন্তানোৎপাদনের কল।

(ক) ফুস্‌ফুস্ (Lungs) এই যন্ত্র দেহের বক্ষ মধ্যে অবস্থিত। শরীরের দূষিত রক্তকে শোধন করাই ইহার কাজ। আমরা নিশ্বাস দ্বারা যে বায়ু গ্রহণ করি, তাহা শ্বাস-নালী দিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে। শরীরের দূষিত রক্ত হৃদযন্ত্রের সাহায্যে ফুসফুসে প্রেরিত হয়। তথায় নিঃশ্বাস দ্বারা আনীত বায়ুর "অম্লজান" নামক পদার্থ (oxygen) দূষিত রক্তের সহিত মিলিত হয় এবং দূষিত রক্তস্থিত "অঙ্গার-অম্লজান" নামক পদার্থ (Carbon-dioxide) ফুসফুসে উদ্গিরিত হইয়া প্রশ্বাস-বায়ুর সহিত দেহ হইতে বাহিরে আসে। এই-

রূপে দিবারাত্র শরীরের দূষিত রক্ত শোধিত হইতেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যেক মিনিটে ১৮ হইতে ২৪ বার শ্বাস-ক্রিয়া হয়। পীড়িত অবস্থায় এই সংখ্যার কম বেশী হইতে দেখা যায়। শিশুদের শ্বাস ক্রিয়ার সংখ্যা স্বভাবতঃই কিছু বেশী।

(খ) হৃদয় (Heart)। ফুসফুসের ন্যায় হৃদয়ও বক্ষমধ্যে অবস্থিত। ইহা ফুসফুস দুইটির মধ্যস্থলে থাকে। শরীরের সকল স্থানে বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহ করা ও সর্ব্বশরীর হইতে দূষিত রক্ত সংগ্রহ করিয়া শোধনের জন্য ফুসফুসে প্রেরণ করাই ইহার কার্য্য। এই যন্ত্র মাংসপেশী দ্বারা গঠিত। উক্ত মাংসপেশীর পুনঃ পুনঃ আকুঞ্চন ও প্রসারণ (Intermittent Contraction) দ্বারাই রক্ত-চালনার কার্য্য সাধিত হয়। হৃদয়ের [illegible] রক্তপ্রবাহে নাড়ীর যে স্পন্দন (Pulsation) [illegible]। হৃদয়ের আকুঞ্চন ও প্রসারণের [illegible] কোন কারণে হৃদয় দুর্ব্বল হইলে, নাড়ী (Pulse) ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সুস্থাবস্থায় নাড়ীর গতি প্রত্যেক মিনিটে [illegible] হইতে [illegible] বার। পীড়িতাবস্থায় এই সংখ্যার অনেক ব্যতিক্রম ঘটে।

(গ) পাকস্থলী ও অন্ত্র (Stomach and Intestines)। এই যন্ত্রগুলি উদরের মধ্যে অবস্থিত। আমরা যে সকল দ্রব্য ভোজন করি, তাহা অন্ননালী দিয়া প্রথমে পাকস্থলীতে যায়। সেখানে নানাপ্রকার জারক রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া রক্তে পরিণত হইতে আরম্ভ হয়। এই ক্রিয়াকে পরিপাক ক্রিয়া বলে।

আহারের পর [illegible] সাধারণতঃ [illegible] ঘণ্টা কাল পাকস্থলীতে থাকে। যে অংশ রক্তে পরিণত হয়, তাহা হৃদয়ের সাহায্যে সমস্ত শরীরে প্রেরিত হইয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করে। অবশিষ্টাংশ অন্ত্রে প্রবেশ করিয়া যকৃৎ প্রভৃতির রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া রক্তে পরিণত হয় ও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে হৃদয়ের সাহায্যে শরীরের পুষ্টি-সাধন করে। পরিপাকের পর যে অসার অংশ পড়িয়া থাকে, তাহা মলরূপে দেহ হইতে বহির্গত হয়। এই স্থানে বলিয়া রাখি যে, এই মলের সহিত শরীরের অনেক বিষও বাহির হইয়া যায়। যদি কোনও কারণে জারক রসের অল্পতা বা অভাব ঘটে, তাহা হইলে ভুক্ত দ্রব্যের সারাংশও রক্তে পরিণত হইবার সুযোগ না পাইয়া, মলের সহিত বহির্গত হইয়া পড়ে।

"যকৃত" (Liver) নামক যন্ত্র পাকস্থলীর দক্ষিণ ভাগে এবং প্লীহা (Spleen) বাম ভাগে অবস্থিত। ইহাদের কার্য্য পরিপাক-ক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট।

(ঘ) মূত্রগ্রন্থি ও মূত্রাশয় (Kidneys and Bladder)। কটিদেশের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে মূত্রগ্রন্থি দুইটী অবস্থিত। রক্তস্থিত কতিপয় দূষিত পদার্থ (uric acid etc.) মূত্ররূপে নিষ্কাশিত করাই ইহার কার্য্য।

(ঙ) মস্তিষ্ক :—এই যন্ত্র শরীরের শিরোভাগে অবস্থিত। ইহা সর্ব্বপ্রকার অনুভূতি ও জ্ঞানের কেন্দ্র-স্থান। টেলিগ্রাফের তারের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাসকল মস্তিষ্ক হইতে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া শরীরের সর্ব্বস্থানে বিস্তৃত হইয়াছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি বহিরিন্দ্রিয়গুলিও উক্তরূপ স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত আছে। বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যাবতীয় জ্ঞান ঐ সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা মস্তিষ্কে অনুভূত হয়। রূপ, গন্ধ, শীত, উষ্ণতা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধর্ম্ম সকল মস্তিষ্কের সাহায্য ব্যতীত অনুভব করা যায় না। কোন দুইটী টেলিগ্রাফ ষ্টেশনের মধ্যস্থিত তার ছিঁড়িয়া গেলে যেমন এক ষ্টেশন হইতে অন্য ষ্টেশনে সংবাদ প্রেরণ করা যায় না, তদ্রূপ যদি কোন কারণে মস্তিষ্কের সহিত বহিরিন্দ্রিয়ের সংযোগ ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্ক উভয়ই অক্ষুণ্ণ থাকা সত্ত্বেও সেই সেই ইন্দ্রিয়ের কার্য্য অনুভূত হয় না—হইতে পারে না।

অনুভূতি ভিন্ন মস্তিষ্কের আরও নানারূপ ধর্ম্ম (কার্য্য) আছে। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাদের সে সকল জানিবার বিশেষ প্রয়োজন হইবে না।

(চ) জরায়ু ও ডিম্বকোষ (uterus and ovaries).

এই সকল যন্ত্রের আলোচনা "নারী-জীবনের বিশেষত্ব" নামক প্রসঙ্গে করা হইবে।

মানব-দেহ সম্বন্ধে এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহাতে আমাদের এই জ্ঞান হইল যে, ভিন্ন ভিন্ন কল ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতেছে। সে সকল কল ও কলের কার্য্যাবলির কথা আর একবার আবৃত্তি করি।

(১) কতকগুলি যন্ত্র (পাকস্থলী, অন্ত্র, হৃদযন্ত্র ইত্যাদি) শরীরের পুষ্টিসাধনের সহায়তা করিতেছে।

(২)

ঘরে ঢুকে সুলোচনা পশমি বোনা আসনখানা বিছিয়ে দিল ভুঁয়ে;
তখনও তার নাবার পরের পরিপূর্ণ রসে, ছাপিয়ে ছিল ছন্দে গীতে সকল অঙ্গ ছুঁয়ে!
বাজিয়ে দু'টী চিকণ হাতে চুড়ি কাঁকণ বালা—
যে নিখিলের সকল নরের প্রাণের তারে সেটি রাগে রাগে সবার চেয়ে সুধামৃত ঢালা!
ছোট্ট রূপোর রেকাবীতে গুছিয়ে দিয়ে পাঁচ রকমের গরম জিনিস তাজা,
সুলোচনার নিজের হাতে ভাজা,
শ্বেত পাথরের পদ্মপাতে—
সাজিয়ে দিয়ে আপন হাতে
টাট্‌কা কাটা ফল,
একটী কাচের গেলাস ভ'রে গড়িয়ে দিয়ে গোলাপ দেওয়া ঠাণ্ডা বরফ জল,
হাতে নিয়ে হাত পাখাটা,
আর এক হাতে পানের বাটা,
পত্নী আমার বসল এসে কাছে,
আমি উঠে পড়ি পাছে
অবশিষ্ট খাদ্য কিছু পাতে আমার ফেলে,—
সুলোচনার তৃপ্তি যেন হয় না কিছুতেই আমি সব ক'টি না খেলে!
হাসি মুখে হাত পাখাটা নাড়্‌তে লাগল বটে, সামনে আমার, ব'সে সুলোচনা,
তবু কিন্তু একটা কিসের চিন্তাভারে যেন, মুখখানি তার ঈষৎ অন্যমনা,
হঠাৎ একটু ন'ড়ে চ'ড়ে, একটু আরও আমার দিকে ঘেঁসে,
মুখের পানে ফিরিয়ে দু'টী নিবিড় ঘন উজল কালো চোখ, একটু কেমন মচ্‌কে মধুর হেসে,
বল্লে "হ্যাগা, কেমন ক'রে, আছ এমন তুমি, নিভাবনায় পদ্য লেখা নিয়ে?
মনে নেই কি সুধার এবার পাত্র একটি দেখে দিতেই হবে বিয়ে!
কেবল আছ দিবারাত্র মাসিক পত্রের পিছু,
মেয়ের বিয়ের চেষ্টা তোমার একটা দিনও কই দেখছিনে তো কিছু!"
মুখরোচক জল খেয়ে আমি তখন নিবিড় মনে রত,
উদাস ভাবে জানতে চাইলেম "এত কিসের তাড়া? মেয়ের আমার বয়স হ'ল কত?"
ডান হাতটী গালে দিয়ে, বিস্ফারিত চ'খে, চম্‌কে উঠে গিন্নী বল্লেন "কি?
অবাক্ করলে তুমি যে গো! তাও জানো না—ছিঃ!
এ ক'মাসে ছাই দিয়ে যে সুধা এবার পেরিয়ে যাবে বারো!"
হেসে বল্লেম "তবে আর কি, ভাব্‌না কিসের এতো? যেতে দাওনা দু'চার বছর আরো!"
স্ত্রী বল্লেন "সে কি কথা হিঁদুর ঘরের মেয়ে—
আইবুড়ো কি রাখতে আছে আরো বারোর চেয়ে?"
আমি বল্লেম "ওটা তোমার মস্ত একটা ভুল, এখন ও-সব সেকেলে চাল চল্‌ছে নাকো আর,
দেখাও দেখি বারোর আগে কারোর ঘরে আজ হ'চ্ছে মেয়ে পার?"

গিন্নী বল্‌লেন "শাস্ত্রে আছে—" হাসি এল শুনে,—বল্‌লেম সেটা চেপে—
"মেয়ের বিয়ের ভাব্‌না ভেবে যাবে দেখ্‌ছি ক্ষেপে!
মজুদ যখন দামি-সামগ্রী, হাতে নগদ টাকা, তৈরি যখন সকল অলঙ্কার,—
সময় হ'লেই শুভদিনে দেখে নিও তুমি, মেয়ে তোমার ক'র্‌বো আমি পার।"
গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লেন স্ত্রী "বাজে কথা ছাড়ো,
যদি নিজের ভালো চাও তো কাজের কথা পাড়ো;
উৎরে গেছে বারো বছর রাখা যায় না আর,
যত শিগ্‌গীর পারো আমার মেয়ে করো পার।"
এবার আমি কঠিন হ'য়ে বল্‌লেম "দেখ, এখন নয়,
মেয়ের আমার শরীর খারাপ, বয়েস বারো হ'লে কি হয়,
বছর দু'এক গেলে আরো, শরীরটা তার সার্‌বে যখন,
মেয়ের বিয়ের সময় কিনা বিবেচনা করবো তখন।"
পত্নী এবার সপ্তমে তাঁর চড়িয়ে দিয়ে গলা,
হঠাৎ নিজের নাকে কাণে দিয়ে বিষম মল
বল্‌লেন "তোমায় দণ্ডবৎ—
এই দিচ্ছি নাকে খৎ,
আর যদি কই ভুলেও কভু মেয়ের বিয়ের কথা,
তবে আমার অস্থি বড় দিব্যি রইল যথা—"
বাধা দিয়ে বল্‌লেম "আহা, থাক্‌-থাক্‌ আরে কর কি?
না হয় দেবো বোশেখেই বে', দিব্যি আবার কেন ছিঃ।
তোমার কথা ঠেলে আমি যাবো কি শেষ অধঃপাতে?
সতীর মনে কষ্ট দিলে অনিষ্ট যে হাতে হাতে!
দোহাই তোমার রাগের মাথায় দিয়ে বোস না অভিশাপ
অকারণে এই অবেলায় ঘটিয়োনা আর মনস্তাপ!
তোমার আঁখির রোষানলে
আমি স্বামী ভস্ম হ'লে
তোমারই সে লাগ্‌বে মহাপাপ!
মিছে কেন এই বয়সে সইবে বল' নিজের দোষে বৈধব্যের অসহ্য সেই তাপ!"
গলায় আঁচল দিয়ে তখন সমস্ত সুলোচনা মাথাটা তার লুটিয়ে দিতে পায়,
আদর ক'রে তুলে ধ'রে, প্রিয়ারে মোর বুকের পরে, হাত বুলিয়ে রুষ্ট সতীর মিষ্ট কোমল গায়,
বল্‌লেম "তুমি পাঁচটা টাকা, এখনই আজ হাত বাক্সে তুলে রাখো বাজার—
এই বোশেখের প্রথম লগ্নেই, যে ক'রে হোক্‌ জামাই তোমার ক'র্‌বো আমি হাজির!"
অম্‌নি কোথায় তলিয়ে গেল অভিমানের বান,
যাদুকরের মন্ত্রে যেন জুড়িয়ে যাওয়া প্রাণ,
উঠ্‌লো হেসে এক নিমিষে ভাসিয়ে সকল রাগ
ছড়িয়ে দিয়ে আমার দিকে পটল-চেরা ডাগর চ'খে কী পুলকে নিবিড় অনুরাগ!

পরিয়ে দিলে সুলোচনা কণ্ঠ ঘিরে মোর
নিটোল ছুটি মোমের মতো মৃণাল ভুজ-ডোর
সে কি পরশ হর্ষ-বিহ্বল—সোহাগ-সরস সে কি ফাঁসি !
নয়ন-কোণে কোন্ চাহনি—অধরে তাঁর সে কি হাসি ?
জাগিয়ে দিলে মত্ত-মাতাল চিত্ত মাঝে মোর
হারিয়ে যাওয়া যৌবনটারি প্রথম উষার সুর, সুখ নিশার স্বপ্ন-স্মৃতির ঘোর !
বলছিল সে "বলিহারি ! মুখখানি এই ধন্যি যা হোক্ !
তোমার সঙ্গে কথায় পারে, কোথায় বল এমন লোক ?
থাক্‌তো যদি আমার ঘটে একটু কিছু বাক্‌চাতুরী
জব্দ হ'য়ে থাক্‌তে তুমি, চল্‌তো না আর জারিজুরি !"
উত্তরে তার মুখখানিকে আদরে মোর অধর-পুটে ধ'রে,
গোটা কয়েক গাঢ় চুম্বা, তপ্ত সবার মতো, দিলাম এঁকে জোরে !

(৩)

মাস পাঁচ-ছয় কেটে গেছে সুধার বিয়ের পর,
মেয়ে আমার ক'রছে আজও সেই থেকে তার শ্বশুর ঘর,
তার জন্যে মনটা আমার বড়ই উদাসপানা—বাড়ীখানা ঠেকছে ফাঁকা ফাঁকা
পাচ্ছিনে আর এমন ক'রে মেয়েটাকে ছেড়ে, মা-বাপে এই একলা ঘরে থাকা,
আরাম কেদারে এলিয়ে সেদিন ভাব্‌ছি যখন কাল
বেইকে দেবো কড়া চিঠি, বেনকে এবার গাল,
পুরুত ডেকে, পাঁজি দেখে, স্থির করব নিজেই দিন একটা ভালো
আন্‌তে আমার সুধা মাকে বাপের বাড়ী তার, আমাদের ওই একমাত্র স্নেহদীপের আলো !
এমন সময় গিন্নী হঠাৎ উচ্ছ্বসিত-সুখে, হাস্যমুখে এসে আমার কাছে
বল্লে "ওগো শোনো শোনো, মেয়ের তোমার আজ, একটা বড় জবর খবর আছে !
পঞ্চামৃতের যোগাড় কর, ন'মাস পড়লেই দেবো সাধ,
সুধা আমাদের পোয়াতী গো, নাতি আস্‌বে সোনার চাঁদ !"
শুনে আমি অবাক্, আমার রাগে শরীর হ'লো কাঁটা,
মনে করলুম বলি তোমার জামাইটাকে ধ'রে, ক'সে দু'ঘা দাওগে মুড়োঝাঁটা,
অবিশ্বাসের হাসি হেসে বল্লেম কিন্তু পরে, "তাই নাকি গো ? সে কি সর্ব্বনাশ ?
এ নিশ্চয় মিথ্যে কথা, আমার সঙ্গে তুমি হুজুগ ক'রে কর্‌ছো রুজু রঙ্গ-পরিহাস !
ওই একটা বাচ্ছা মেয়ে, পুষ্ট নয় ক' দেহ, বড়ই রোগা যেন পাখীর ছাঁ !
ও ক'খনো হোতে পারে ওই শরীরে তার, এর মধ্যেই কচিছেলের মা ?
প্রসব বেদনা উঠ্‌লে হয়ত' আঁতুড় ঘরেই ম'রে যাবে,—"
মুখে আমার হাত চাপা দে' স্ত্রী বল্লেন "মাথা খাবে !
ফের্ যদি ক'ও ও-সব কথা-দেখ্‌বে আমার মরা-মুখ !
অলুক্ষুণে কথাগুলো ক'য়ে তোমার কি হয় সুখ ?"

যাহোক্ ক্রমে ভালোয় ভালোয় দীর্ঘ ন'মাস হোলো যখন গত—
সুলোচনা মেয়ের সাধে, মিটিয়ে নিলে মনের সাধে, সাধ আহ্লাদ ছিল মনে যত,
পশম বুনে দিবারাতি, তৈরি হোলো ভাবি-নাতির পোষাক টুপি মোজা,
ছোট্ট ক্ষুদে মাথার বালিশ, হরেকরকমের কাঁথা, সেলাই করা নয়ক' সে সব সোজা!
না দিতে পা দশমাসেতেই, সুধার প্রথম উঠলো প্রসব ব্যথা, ছুটে গিয়ে নিয়ে এলেম দাই,
বারো বছরের মেয়ে আমার কোকিয়ে কেঁদে ওঠে, বলে "ও মা এবার মরে যাই!—"
ধাত্রী অনেক চেষ্টা করে বললে শেষে, "শুনুন মশাই,
আমার একার সাধ্য নয় যে এ মেয়েকে প্রসব করাই
কেস্‌টা একটু ঠেক্‌ছে বেঁকা, ভাল একজন ডাক্তার ডাকুন
মেয়ে বড্ডই ছেলেমানুষ, মা-ঠাকরুণ কাছে থাকুন;
সহজভাবে প্রসব হ'তে কিছুতে এ পারবেনাকো!"
ব্যাকুল হ'য়ে সুলোচনা বললে "ওগো! ডাক্তার ডাকো—"
অগত্যা এক মিড্‌উইফারি-স্পেশালিষ্ট্‌কে ডাকতে হোলো,
মেয়ে আমার বাঁচ্‌লো বটে, কিন্তু বাছার ছেলে মোলো!
মৃত জাত নাতির শোকে
সুলোচনা কাতর চোখে
বল্‌তে লাগ্‌ল' অশ্রু মুছে "ডাক্তারটাই আসল যমের ধাবা!"
বুঝ্‌লে না সে, সেইতো এসে বাঁচিয়ে দিলে মেয়েটাকে ফর্সেপেতে করিয়ে ডিলিভারি!

(৪)

তারপরেতে একে একে চারটি বছর গেছে কেটে,
শশব্যস্তে সুলোচনা নাতি নাত্‌নীর সেবা খেটে,
সুধার প্রথম ছেলে যাওয়ায় পরের তিনটি আমার কাছে,
তাগা তাবিজ কবচ প'রে কোনও রকমে বেঁচে আছে!
পেটের অসুখ, লিভার, পিলে, সর্দ্দিকাশি, নানানখানা,
ছেলেগুলোর লেগেই আছে, পথ্য প্রায়ই সাবুদানা!
হর্লিক্‌স্ আর এলেন্‌বারী,
জমে গেছে এক আলমারী,
তাদের জন্যেই কিনিছি এক হোমিওপ্যাথিক বাক্স, বই,
কেউ খাচ্ছে পোরের ভাত, কেউ পাচ্ছে দুধ আর খই;
সুধা আজকাল উপোস দিচ্ছে মাসের মধ্যে চৌদ্দ দিন
হজম হয় না মনটা মরা, ঘুস্‌ঘুসে জ্বর, মাথাধরা, অম্বলে তার বুকটা জরা, হচ্ছে ক্রমেই দেহ ক্ষীণ।
এর ভেতরেও খবর পেলেম আবার আমার হবে নাতি?
স্ত্রী বললেন "তাইতো এবার বাঁচানো ভার পো-পোয়াতি!
মেয়ের আমার দেহ খারাপ, শরীরে আর কিচ্ছু নেই,
কেমন ক'রে খালাস হবে ভেবে আমি পাইনে থেই!

গেলবারেই আঁতুড়ে সে তাপ নেয়নি মোটে, সয় না বাছার আঁচ—"
আমি বল্লেম "এর মধ্যেই ভাবনা কেন অত, এইতো সবে হবে এবার পাঁচ ?"
গিন্নী বল্লেন "চার আঁতুড়েই মেয়ে আমার এলিয়ে গ্যাছে,
জানোনা তো পুরুষমানুষ, বছর-বেনে শরীর ছাঁচে!
সুধা এখন বড্ড কাহিল, সামলাতে কি পারবে শেষ ?"
খোঁচা মেরে বল্লেম আমি "এখন কেমন ? বুঝছো বেশ ?
ওই জন্যেই চাইনি আমি বে দিতে তার অত আগে,
মেয়ের কষ্ট এখন দেখছি বড্ড তোমার প্রাণে লাগে!
কচিমেয়ের সাঁঝ সকালে বায়না ধরে দিলেন বে'
তখন কেন ভাবেননি সব, ম্যাও ধরবে এখন কে ?—"
নতমুখে নীরব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো সুলোচনা অপরাধীর মতো,
বুঝতে পারলুম মেয়ের জন্যে মায়ের প্রাণটি তার দুর্ভাবনার বইছে বোঝা কত ?

(৫)

সেবার সুধা প্রসব হ'য়ে একেবারে শয্যা নিলে,
তিনটি মাস আর উঠলো না, শেষ ডাক্তারে সব জবাব দিলে;
কেউ বললেন 'এনিমিয়া' রক্ত নেই আর বিন্দু গায়ে,
কেউ বল্লেন 'প্যারালিসিস্' 'ওভেরি' আর দু'টো পায়ে!
কারুর মতে 'হেমারেজটা' বন্ধ হ'লে হোতো ভাল',
বুঝতে পারলুম মেয়ের আমার ঘণিয়ে আসছে দিন; নিভছে ক্রমে জীবন-দীপের আলো!
দুর্বলতায় শয্যাগত,
শুখিয়ে কাঠি মড়ার মত,
এক পলা দুধ সারাদিনেও তলায় না আর পেটে,
এমনি ক'রেই দিনগুলো তার, কোনও রকমে যেন, অসাড় ভাবে যাচ্ছিল রোজ কেটে!
খাদ্য শুধু ছানার জল, বেদানা কি আঙ্গুর-রস,
দিনকের দিন শরীর বাছার হ'য়ে আসছে ক্রমেই অবশ।
হতাশ হ'য়ে আমি তখন, সাহেব ডাক্তার আনলেম ডেকে,
সাহেব এসে সুধার শরীর বিশেষ করে দেখে দেখে—
বল্লে "রুগীর বয়স কত ?" আমি বল্লেম "সবে ষোলো,—"
সবিস্ময়ে বল্লে সাহেব "এর মধ্যেই এমন হোলো ?
কোন্ বয়সে এই মেয়েটির হ'য়েছিল প্রথম 'বয়' ?"
লজ্জানত মুখে বল্লেম "বারো বছরেই প্রথম হয়"!
অবাক হ'য়ে বল্লে সাহেব "কোন্ সাহসে বাবু, সেই বয়সে দিলেন মেয়ের বে ?
কোথা আপনার জামাই, আমি দেখতে চাই এর স্বামীকে!"
পাশেই ছিলেন বাবাজীবন, দেখিয়ে দিলেম "ইনিই সেই—"
সাহেব তাঁকে বল্লে ডেকে "বাবু, তোমার লজ্জা নেই ?

জননী

শিল্পী শ্রীবিপিনচন্দ্র দে

Emerald Ptg. Works

Blocks by [illegible] Halftone Work

তৃপ্ত করতে পশুবৃত্তি মত্ত হ'য়ে দেহ সুখে,
অসময়ে এই বালিকায় এগিয়ে দিলে মৃত্যু-মুখে !
পুত্র প্রসব-প্রবল জাঁতায় প্রতি বছর পিষে,—
এই বেচারীর কাঁচা শরীর জরিয়ে দেছো রোগের বিষে !
ফোটার আগে এই যে মুকুল ফেললে ছিঁড়ে তুমি,
এই যে ক'টি ছেলে মেয়ে জন্মেছে আজ রুগ্ন হ'য়ে দেহ হ'য়ে ব্যাধির লীলাভূমি,
এই মেয়েটির মুখের দিকে আজকে যে আর যায় না ফিরে চাওয়া—
তোমার মত লোকের উচিত আদালতের হাতে খুনীর যোগ্য কঠিন শাস্তি পাওয়া !
এই বয়সে এই শরীরে, কেবল তোমার অত্যাচারে, বালিকা আজ মরণ শয্যাশায়ী ;
এই যে জীবন অভাগিনীর মিলিয়ে যাচ্ছে আজ, তরুণ উষার আগে, এর জন্যে তুমিই কেবল দায়ী।
বারে, বারে, প্রসব হবার পরে, তিনটি মাসও দাওনি ছুটি একে—
তাহ'লে আর এই বেচারি মরতো না আজ এমন ক'রে শোচনীয় মরণ ডেকে ডেকে ;
এমনি কোরে তোমার দেশে না জানি হায়, নিত্য কত মরছে কচিমেয়ে—
তোমাদের এই বিরাট সমাজ এসব ব্যাপারগুলো দেখে না কি চেয়ে ?"

নারীর কথা

[শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী]

"ফণীর মুখে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী ;
ইচ্ছা সুখে পান করে, বিষের জ্বালায় ছটফটি।"
(ভক্ত কবি রামপ্রসাদ রচিত)

সেদিন এই গানটীর ছ'লাইন আমার কোন ভক্তিভাজন আত্মীয়ের মুখে শুনিতেছিলাম,—অবশ্য একটু শ্লেষের সুরে গাওয়া হয়েছিল। সে শ্লেষটা যে কাকে করা হয়েছিল, ঠিক বুঝতে পারলাম না। যাঁরা ঐ সব সম্মানসূচক কথা বলে জনসাধারণকে উপদেশ দেন,—তাঁদের, না সেই নিরীহ, স্নেহাকুলা মাতা ধরিত্রীর চেয়ে সহিষ্ণু, (এটা বললে অত্যুক্তি হবে না হয় ত) নিজেদের প্রাপ্য অধিকার বঞ্চিতা, কুণ্ঠা-লজ্জা-সরম-সঙ্কুচিতা আমাদের জননী, ভগিনী, সহধর্ম্মিণী, কন্যাকে বলা হয়েছে ? যাঁরা নিজেদের অভাব অভিযোগ, লাঞ্ছনা সম্বন্ধে কখনও কিছু বলেন না ; চিরদিন মানুষের, শাস্ত্রের, পিতার, স্বামীর, পুত্রের কাছে ভয়-সঙ্কোচ-পরায়ণ।—সেই মৃত জাতিকে খড়্গাঘাত করা হয়েছে ?

গানটী যাঁর রচিত, তাঁকে আমরা খুব শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি ; কিন্তু তবু মুখে আসে, "ভগবন, এমন বন্ধুর হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের উপদেশে কামিনী কাঞ্চন শব্দটার অনাবশ্যক প্রাদুর্ভাব অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন। নব্য বঙ্গের পূজ্য, ভক্তিভাজন বিবেকানন্দের উপদেশেও ঐ মূল্যবান উপদেশটার অভাব নাই। এই সব দেখলে স্বতঃই মনে আসে, তাহলে কি আমাদের দেশের জ্ঞানী সাধকদের কাছে তাদের মাতা, কন্যা, ভগিনীরা পিশাচী, স্বৈরিণী ? তাঁদের মধ্যে মাতৃত্ব, নারীত্ব নাই ? নারীদের মহিমা হয় ত শাস্ত্র বুঝিতেন, তাই তাতে আছে—"নারীদের পূজা করিলে দেবতা সন্তুষ্ট হন।" আবার মাঝে-মাঝে দেখি, নারীদের মহিমা এমনি ঠুনকো জিনিস যে, "বাল্যে পিতার অধীনে, যৌবনে স্বামীর অধীনে, বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীনে নারীর থাকিতে হইবে—কদাচ স্বাতন্ত্র্য দেওয়া উচিত নাই।" কি সুন্দর কথা ! এ থেকে যে কি প্রকাশ পায়, তা আর লিখে বা বলে নিজেকে কলঙ্কিত করতে ইচ্ছা হয় না। এত ভঙ্গপ্রবণ, এমন ঠুনকো ধর্ম্ম নাই থাকল ? যার নিজেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা নাই বা প্রবৃত্তি নাই, তাকে ধর্ম্ম বলা চলে না—আর যা ইচ্ছা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। হিন্দু-

শাস্ত্ররূপ 'মহা-জলধি'তে এই রকম কত রত্নেরই সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, যা আমাদের কাছে অমূল্য (?)। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বুঝে উঠতে পারলাম না, এই অপূর্ব সম্মান বা অসম্মানটা কাকে করা হয়। বাপ। ভয় আনন্দ-শোক-দুঃখ-সুখ-বিজড়িত, রক্তমাংসময় দেহবিশিষ্ট ভগবানের সৃষ্টি (মানুষের নয়) এই হতভাগিনী নারীদের, না তাদের সমাজ-ধর্ম্ম পালনকে?

যাঁরা কখনও নিজের সামান্য অভাব ত্রুটীর কথাটাও মুখে বলতে সঙ্কোচ বোধ করেন, যাঁরা সমাজের উৎপীড়ন, অত্যাচারকে বিধাতার আশীর্ব্বাদের মত মাথা পেতে নেন, নিজেদের মানসিক, শারীরিক কোন কষ্টই গ্রাহ্য করেন না, তবু আপনাদেরই বাপ, আপনাদেরই কোলে করে মানুষ করা ভাই, পতিদেবতা (হোন বা না হোন) আপনাদেরই বুকের স্নেহধারা দিয়ে লালিত পুত্র—সকলের কাছেই উৎপীড়িত হন না কি? আমার মাঝে মাঝে ভয় হয়—মনে হয়, হয় ত বা এই অধম হতভাগিনীরা ভগবানের সৃষ্টি নয়, এদের মানুষে গড়েছে; তাদের দুষ্প্রবৃত্তি, পৈশাচিক লিপ্সা, নিষ্ঠুর পীড়নের উপকরণ স্বরূপ করে। তাই এঁরা কোনও অন্যায়, কোনও উৎপীড়নের প্রতিবাদ করতে সাহস করেন না—স্রষ্টার অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে বাধ্য হন। মানুষ হয়ে যিনি অত্যাচার সহ্য করেন, আর যে অত্যাচার করে,—উভয়েই মানুষ নামের অযোগ্য।

আমাদের পুরাণ, মহাভারত - সকলের মধ্যেই বেশীর ভাগ এই রকম সম্মানের নমুনা দেখা যায়। নারদ নারীচরিত্র জিজ্ঞাসা করছেন,—কাকে? না, রম্ভাকে! স্বেচ্ছাচারিণী রম্ভাও আনন্দে ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন। সে বর্ণনা পড়লে আমাদের-পুরুষদের, মেয়েদের ত কথা সে লজ্জায় ধিক্কারে ঘৃণায় শরীর-মন সঙ্কুচিত হয়ে যায় না, তাকে ধর্ম্মপুস্তক বলে কেমন করে যে পড়েন, আমি ভেবেই পাই না। কেন যে তাঁদের মনে হয় না, "মা ধরিত্রি, দ্বিধা হও—তোমার কোলে লুকাই।" তাতে এমন ঘৃণিত, দুঃসহ, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে, যার প্রতিবাদ করতেও লজ্জা হয়। নারদ কি সাবিত্রী, দময়ন্তী, গান্ধারী, সুভদ্রা, উত্তরা, চিন্তা, চিত্রাঙ্গদা—কারুকেই পান নি? অবশ্য জায়গায়-জায়গায় সতী মাহাত্ম্য দেখা গেছে, কিন্তু সে কি শুধু "নরপূজার মাহাত্ম্য" কীর্ত্তন নয়? শুধু পতি-দেবতার সন্তুষ্টি সাধন নয়?

আমাদের মায়েদের, মেয়েদের অধিকার নাই, আশা নাই, আনন্দ নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই। আছে কি? আছে শুধু নির্জীব দাসীত্ব—যার প্রতিকার কেউ করতে পারবেন না স্বার্থহানির আশঙ্কায়।

আমাদের মায়েরা—নারীরা, মাদ্রাজের পঞ্চমার, বঙ্গের নমঃশূদ্রের, আমেরিকার নিগ্রোর, ইয়োরোপের আইরিশের—সমস্ত বিশ্বের যেখানে যত উৎপীড়িত আছেন, সকলের—চেয়ে লাঞ্ছিতা। তবু তাঁদের লাঞ্ছনার অন্ত নাই। মহিলা-শিক্ষার কথা উঠলেই পুরুষেরা ভয় পেয়ে যান, —পাছে ঐ উৎপীড়িতারা উৎপীড়ন বুঝতে পারেন, পরে বিদ্রোহী হয়ে উঠেন; যথেচ্ছাচার সহ্য না করেন! তাই কত রকম করে বলা হয়, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে আমরা পবিত্র ভারতবর্ষের পুণ্য আদর্শ থেকে বিচ্যুত হচ্ছি। সৌভাগ্যক্রমে মহিলারা এখনও পাশ্চাত্য শিক্ষা পান নি; তাই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের কঙ্কালটা আজো আছে (কঙ্কালই বটে!)। অতএব তোমরা আর শুদ্ধান্তঃপুরে স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিও না; তা'হলে এমন পবিত্র মহিমান্বিতা হিন্দুমহিলা, এমন পবিত্র সনাতন ধর্ম্ম—সবই রসাতলে যাবে। পবিত্র বৈ কি, নিশ্চয়ই পবিত্র! নারী-হত্যা, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারী,—পুণ্যের নামে, ধর্ম্মের নামে উৎপীড়ক যে ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম পবিত্র নয়? অবশ্য আগের কথা জানিতে না পারি; কিন্তু এখন ত সনাতন ধর্ম্মের রূপ এই রকম। যে ধর্ম্মের নামে প্রচারিত সমাজের অনুশাসনে অবিবাহিতা কন্যা আত্মহত্যার আশ্রয় লয়; বিবাহিতা প্রহৃতা, পরিত্যক্তা, লাঞ্ছিতা; বিধবা অনশন-ক্লিষ্টা অবস্থায় কটু বাক্য-ভূষিতা হয়েও প্রতিকার-অক্ষম—সেই সমাজ, সেই শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে যে ধর্ম্ম আমরা প্রচার করি, তার পবিত্রতায়, মহত্ত্বে কি কিছু সন্দেহ আছে? উৎপীড়িতা মহিলা যদি তেজস্বিনী হন, তবে তাঁকে আত্মরক্ষার্থ আত্মহত্যার আশ্রয় নিতে হয়। যদি ভুল করে এক পা'ও ঘরের বাইরে আসেন, জীবন্তে অনন্ত নরকের ব্যবস্থা। আর মাঝামাঝি কোনো স্থান নেই। আমি শুধু ভাবি, ভগবান আমাদের কেন কন্যা জন্মান?

আমাদের ধর্ম্মপুস্তক যে কেহ ইচ্ছা করেন পড়ে দেখবেন—বেশীর ভাগই এই রকম ব্যবস্থা। আবার পঞ্জিকা খুলে দেখুন, মাছ-মাংস-তৈলের সঙ্গে কোন্ হতভাগ্য জাতির নাম করা হয়েছে কি জন্য? সম্ভোগার্থ। আমি জানি না,

এর চেয়ে লজ্জা-ঘৃণার কথা আর আছে কি না? ভগবান কি একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই এই হতভাগিনীদের সৃষ্টি করেছিলেন

তুলসীদাস পড়ুন, কবীর পড়ুন, যাঁরা যুগে-যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন, লোকে বলে জনগণের উদ্ধারের জন্য, সেই সব মহাপুরুষ নামে অভিহিত মহাত্মা বা তাঁদের জননী-ভগিনীর (হয় ত অবিবাহিত কি স্ত্রী-পরিত্যাগী তাই স্ত্রী বল্লাম না) উদ্দেশে বলে গেছেন—

"দিনকো মোহিনী রাতকো বাঘিনী
পলক পলক লহু চোষে।
তুনিয়া সব বাউরা হো'কে ঘর-ঘর
বাঘিনী পোষে॥"

যারা মার বুকে মানুষ, বোনের কোলে শৈশব কাটিয়েছেন, সন্তানের জননী স্ত্রীকে, ঘরের গৃহিণী স্ত্রীকে দেখেছেন—তাঁদের মুখে এমন কথা আসে? আমার ত ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাঁদের মহিমা উপলব্ধি হয় না। সব চেয়ে বড় ত্যাগ কামিনী-কাঞ্চন—তা না হলে আর সাধক হওয়া যায় না, ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করা যায় না। আবার লক্ষ্য করে দেখলে বুঝা যাবে, কি রকম নীচ কদর্য অর্থসূচক নাম আছে নারীদের। সব চেয়ে দুর্ভাগ্য এই যে, এই হতভাগিনীরা নিজের অবস্থা জানেনও না, বোঝেনও না; হয় ত বা সমর্থনও করেন এই নিয়মের। যাক, ঐ থেকে বেশ বুঝা যায়, যে উদ্দেশ্যে মেয়েদের অঙ্গ করে রাখা হয়েছে, তা সিদ্ধ হয়েছে। শেষে শুধু মনে হয়, ভগবন, এই নিষ্ঠুর হতভাগ্য দেশ থেকে নারীত্ব বিলুপ্ত করে দাও।

স্বপ্নাদ্য মাদুলি

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম-এ]

(১)

সোণাডাঙ্গার ইন্দ্রভবন তুল্য জমিদার ভবন আজ নিরানন্দ। চাকর-দাসী, আমলা-ফায়লা, আত্মীয়-স্বজন, সকলেই আজ শোকাচ্ছন্ন। জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত রমাকান্ত রায় মহাশয় মূর্চ্ছিত। তাঁহার সর্ব্বসুখের আধার, আনন্দ-নির্ঝর, সুরূপা সুশীলা পত্নীর আজ জীবনান্ত ঘটিয়াছে। সেই সুবর্ণ-প্রতিমা আজ নিস্পন্দ ভাবে শয্যায় পড়িয়া আছে।

শোকের বেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, দেওয়ান লোকজন ঠিক করিয়া মৃতদেহ সৎকারার্থ গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। পত্নীবিয়োগবিধুর রমাকান্ত বাবু তখন মূর্চ্ছাভঙ্গে মৃতদেহের পার্শ্বে নিশ্চল, নিস্তব্ধ, মূক, পাষাণমূর্ত্তিবৎ উপবিষ্ট। দেওয়ান গলদশ্রুলোচনে তাঁহার হাত ধরিয়া কক্ষান্তরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন, লোকজন সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া মৃতদেহ বহন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। রমাকান্ত বাবু একবার সকলের মুখপানে চাহিয়া হঠাৎ যেন চমকাইয়া উঠিলেন; তাহার পর দুই বাহু দিয়া প্রিয়তমার দেহ আগুলিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমি কিছুতেই এ দেহ উঠাইতে দিব না।"

দেওয়ানজি, পুরোহিত ঠাকুর ও দুই একজন প্রবীণ আত্মীয় তাঁহাকে বিস্তর বুঝাইলেন; কিন্তু তিনি অটল ভাবে সেই দেহ ধরিয়া রহিলেন। কাহার সাধ্য তাঁহার বাহুপাশ হইতে তাহা ছিনাইয়া লয়? বিশেষতঃ তাঁহার তখনকার উন্মত্তের মত মূর্ত্তি দেখিলে অতি সাহসিকেরও হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়।

এই ভাবে অর্দ্ধদণ্ড কাল কাটিল। তাহার পর পুরোহিত ঠাকুর ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া আস্তে-আস্তে রমাকান্ত বাবুর পার্শ্বে মৃতদেহের সম্মুখীন হইয়া বসিলেন। দৈবাৎ তাঁহার নজরে পড়িল যে মৃতদেহের বাম বাহুতে একটি সুবর্ণ-মাদুলি রহিয়াছে। এই মাদুলিটির ইতিহাস গৃহিণীর প্রমুখাৎ তিনি শ্রুত ছিলেন। রমাকান্ত বাবু বিবাহের পর হইতেই পত্নীর একরূপ অনুরাগী ছিলেন না। এমন কি, যৌবনে বিলাসী জমিদার বাবু রাত্রে গৃহে থাকিতেন না, এমন দিনও গিয়াছে। তাহার পর, জমিদার-গৃহিণী একটি স্বপ্নাদ্য মাদুলি ধারণ করিয়া স্বামীর প্রণয় আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। সেই অবধি স্বামী আর কখনও তাঁহার আঁচল-

ছাড়া হয়েন নাই। পুরোহিত ঠাকুর বুঝিলেন, এ সেই মাদুলি। ইহাতে ভবিষ্যতে অপর কাহারও উপকার দর্শিতে পারে, এই ভাবিয়া পুরোহিত ঠাকুর অতি সন্তর্পণে ঘুনসী-সহ মাদুলিটি খুলিয়া লইয়া আপাততঃ সেটি নিজের দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিলেন এবং একজন পরিচারিকাকে অবশিষ্ট স্বর্ণালঙ্কারগুলি খুলিয়া লইতে ইঙ্গিত করিলেন। ইহার পরেই রমাকান্ত বাবুকে যেন শান্ত দেখা গেল। এবার একবার-মাত্র অনুরোধে তিনি পুরোহিত ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে কক্ষান্তরে গেলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে গঙ্গাতীরে গিয়া যথাশাস্ত্র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিতেও আপত্তি করিলেন না। তাহার পরে গঙ্গাস্নানান্তে তিনি পুরোহিত ঠাকুরের সঙ্গে-সঙ্গে গৃহে ফিরিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি শোকে যেরূপ মুহ্যমান হইবেন বলিয়া সকলে আশঙ্কা করিয়াছিল, সেরূপ দেখা গেল না। সকলে ইহা পুরোহিত ঠাকুরের জ্ঞানগর্ভ সান্ত্বনাবাক্য ও উপদেশের ফল বলিয়াই বুঝিলেন।

(২)

পরদিন হইতেই কিন্তু রমাকান্ত বাবুর ইহা অপেক্ষাও বিস্ময়জনক পরিবর্ত্তন সকলে লক্ষ্য করিল। তিনি কর্ম্মচারীদিগের বা আত্মীয়বর্গের কথা কাণ করিয়া শুনেন না, দেওয়ানকে নিতান্ত অবহেলা করেন, কিন্তু পুরোহিত ঠাকুরকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিতে চাহেন এবং তাঁহার সঙ্গেই সাংসারিক ও জমিদারি সংক্রান্ত সকল কথার আলোচনা করেন। শেষে একদিন দেওয়ান, কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে আদেশ পাইলেন এবং তৎপদে ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত ঠাকুর নিযুক্ত হইলেন।

পুরোহিত ঠাকুর এই উচ্চপদ লাভ করিবার জন্য কোনও রূপ কৌশল অবলম্বন করেন নাই, এরূপ উচ্চাভিলাষ তাঁহার কোনও দিনই ছিল না। তবে তিনি প্রতিপালক যজমানের অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়াই অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের পরামর্শ লইয়া জমিদারির কার্য্য চালাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ভূতপূর্ব্ব দেওয়ানের মোটা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া কাশীবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কিছুদিন এই ভাবে কার্য্য চলিতে লাগিল। কিন্তু সাত্ত্বিক-প্রকৃতি ব্রাহ্মণ যতই জমিদারি-কার্য্যের ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার এ বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল। প্রজাপীড়ন, উৎকোচ-গ্রহণ, কূটকৌশল প্রভৃতি তাঁহার নিতান্তই প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তিনি প্রায়ই মনিবের নিকট কার্য্যত্যাগের ইচ্ছা জানাইতেন, কিন্তু মনিব সে কথায় কর্ণপাত করিতেন না। পরন্তু সর্ব্বদাই তাঁহাকে কাছে-কাছে রাখিতে চাহিতেন বলিয়া ব্রাহ্মণের নিত্যকৃত্যের অনেক ব্যাঘাত হইত। তিনি কি উপায়ে এই কর্ম্মভোগ হইতে নিষ্কৃতি পান, কিছুই স্থির করিতে পারিতেন না।

এই ভাবে কয়েক মাস গেল। জমিদার গৃহিণীর স্বপ্নাপ্ত মাদুলিটি পুরোহিত ঠাকুর সেই যে খুলিয়া লইয়া নিজের বাহুতে ধারণ করিয়াছিলেন, তদবধি তাহা আর অন্যত্র রাখিবার কথা তাঁহার মনে পড়ে নাই। কিন্তু একদিন ঘুনসী পচিয়া যাওয়াতে মাদুলিটি পড়িয়া গেল। পুরোহিত-ঠাকুর সেটি কুড়াইয়া লইয়া যে কমণ্ডলুতে তাঁহার জপের মালা প্রভৃতি থাকিত, সেইখানে রাখিলেন।

পরদিন তিনি যখন জমিদার-বাড়ী গেলেন, তখন তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, রমাকান্ত বাবু আর তাঁহার প্রতি পূর্ব্বের মত অনুগত ভাব দেখাইলেন না, তেমন আগ্রহের সহিত তাঁহার কথা শুনিলেন না বা তাঁহার সঙ্গলাভ করিবার চেষ্টা করিলেন না। ইহাতে পুরোহিত ঠাকুর বিস্মিত হইলেন, কিন্তু ক্ষুণ্ণ হইলেন না। মনিবের নিকট তিনি যে অতিরিক্ত আদর পাইতেন, তাহা তাঁহার ভাল লাগিত না। এখন যেন তিনি একটু স্বস্তি বোধ করিলেন। এই ভাবে দু-চার দিন গেলে তিনি আবার কর্ম্মত্যাগের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। এবার তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। তিনি সাবেক দেওয়ানকে কাশীধাম হইতে আনাইয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং এত দিনের পর হাঁফ ছাড়িয়া আবার চিরাভ্যস্ত পূজাহ্নিক-প্রভৃতিতে অধিক সময় ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন।

(৩)

কিন্তু বেশী দিন না যাইতেই পুরোহিত ঠাকুরের আর এক অশান্তির কারণ উপস্থিত হইল। প্রৌঢ় রমাকান্ত বাবু হঠাৎ একদিন পুরোহিত ঠাকুরের অষ্টবর্ষা কন্যা অলকাকে বিবাহ করিবার জন্য উপযাচক হইলেন! ব্রাহ্মণ ত প্রস্তাব শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত! পঞ্চাশদ্‌বর্ষীয় জমিদারের নিকট

...লিকা কন্যাকে বলি দিয়া একটা খুব দাঁও মারিতে বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন অনেকে হয় ত খুবই রাজি হইত; কিন্তু পুরোহিত ঠাকুর সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। এদিকে রমাকান্ত বাবু ক্রমেই বেশ একটু পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। পুরোহিত ঠাকুর কি উপায়ে প্রবলপ্রতাপ জমিদার মহাশয়কে প্রত্যাখ্যান করিবেন অথচ তাঁহার ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হইবেন না, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়া পড়িলেন।

একদিন জমিদার বাটী হইতে ঐ প্রস্তাব সম্বন্ধে অপ্রিয় আলোচনা করিয়া পুরোহিত ঠাকুর গৃহে ফিরিতেই দেখিলেন, কন্যা অলকা তাহার শিশু ভ্রাতাকে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, শিশুটি দিদির বাহুসংলগ্ন একগাছি ঘুনসি ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, কিছুতেই ছাড়িতেছে না। এই দৃশ্য দর্শনে তাঁহার মনে একটা খটকা, একটা আশঙ্কা জাগিল। তিনি কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর হাতে ওটা কি খোকা টানাটানি করছে?" কন্যা হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাবা, ও একটা মাতুলি।" "কোথায় পেলি?" এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, "কুলগাছের নীচে মাটিতে প'ড়ে পেয়েছি।" পিতা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কবে থেকে ধারণ করেছিস?" কন্যা বলিল, "এই দিন দশেক হ'ল।" তিনি চিনিলেন, এ সেই জমিদার গৃহিণীর স্বপ্নাদ্য মাতুলি। অলকা সেটি কুড়াইয়া পাইয়া কোথা হইতে একগাছি ঘুনসি সংগ্রহ করিয়া ছেলেমানুষি-খেয়ালে উহা ধারণ করিয়াছে, আর সেই দিন হইতেই পত্নীবৎসল রমাকান্ত বাবুর অলকার উপর নজর পড়িয়াছে, তাহাকে পূর্ব্ব পত্নীর স্থলাভিষিক্তা করিতে মন গিয়াছে, এই কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ এখন তিনি যেন নখদর্পণে দেখিলেন। তিনি কন্যাকে 'ঠাকুরদের জিনিস, হাতে দিতে নেই' বলিয়া মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া অবিলম্বে মাতুলিটি কন্যার বাহু হইতে খুলিয়া লইলেন এবং শীঘ্রই এটিকে গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিবেন সঙ্কল্প করিয়া আপাততঃ গুপ্ত স্থানে রাখিয়া দিলেন।

বলা বাহুল্য, তাহার পর হইতে রমাকান্ত বাবু আর বিবাহ-সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। পুরোহিত ঠাকুর এই পরিবর্ত্তনের নিগূঢ় কারণ বুঝিয়া মনে-মনে হাসিলেন।

ইহার পর একদিন প্রাতে পুরোহিত ঠাকুর মাতুলিটি গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিবার অভিপ্রায়ে গঙ্গাস্নানে যাত্রা করিলেন। পথে জমিদারপুত্র রমাকান্ত বাবুর সহিত দেখা হইল, রমাকান্ত বাবু তখন প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। 'ভট্টাচার্য্য মহাশয়, কোথায় যাইতেছেন', 'অনেক দিন গঙ্গাদর্শন হয় নাই, তাই যাইতেছি', এইরূপ কথোপকথনের পর রমাকান্ত বাবু বলিলেন, 'চলুন, আমিও যাইব', এই বলিয়া তিনি পুরোহিত ঠাকুরের অনুগমন করিলেন। পুরোহিত ঠাকুর একটু বিব্রত হইলেন, কিন্তু সঙ্গীর অজ্ঞাতে মাতুলিটির গতি করিতে পারিবেন, মনকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া অগত্যা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সঙ্গত আপত্তি করিবারও ত কিছু ছিল না।

যথাকালে গঙ্গাতীরে পৌঁছিয়া উভয়ে গঙ্গাগর্ভে অবতরণ করিলেন। পুরোহিত ঠাকুর পর পর তিনটি ডুব দিলেন এবং তৃতীয় ডুবে মাতুলিটি গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিলেন। এত দিনে মাতুলির জড় মরিল ভাবিয়া তিনি মনে মনে তৃপ্তি অনুভব করিলেন এবং গঙ্গাস্তব পাঠ, সন্ধ্যা আহ্নিক প্রভৃতি সমাধা করিয়া তীরে উঠিলেন।

রমাকান্ত বাবুর কিন্তু গঙ্গাগর্ভ হইতে উঠিবার কোনও তাড়া দেখা গেল না। তিনি বারবার ডুব দিতে লাগিলেন। বড়-মানুষের সুখী শরীর, অধিকক্ষণ জলে থাকিলে ও অধিক ডুব দিলে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িবে, পুনঃ পুনঃ এই অনুযোগ করিয়া পুরোহিত ঠাকুর কোনও প্রকারে তাঁহাকে তীরে তুলিলেন। কিন্তু পুরোহিত ঠাকুর যখন গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন, তখন রমাকান্ত বাবু একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন। তিনি গঙ্গাতীরে বাস করিবেন, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া এক পাও অগ্রসর হইবেন না, এই অভিমত প্রকাশ করিলেন। তাঁহাকে টলান অসাধ্য ব্যাপার বুঝিয়া পুরোহিত ঠাকুর ক্ষুণ্ণমনে একাকী স্বগৃহে ফিরিলেন এবং দেওয়ানজিকে সংবাদ দিলেন।

দেওয়ানজি সদলবলে প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া বহু সাধ্যসাধনা করিলেন, কিন্তু তিনিও প্রভুকে এই সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া তখনকার মত একটি দোকানে প্রভুর বসবাসের বন্দোবস্ত

করিয়া দিয়া দেওয়ানজি তাঁহার হুকুমে তথায় গঙ্গাবাসের উপযোগী গৃহনির্ম্মাণের জন্য লোকজন লাগাইলেন। যত দিন গৃহ প্রস্তুত না হইল, জমিদার মহাশয় সেই দোকানেই নির্ব্বিকারচিত্তে বাস করিতে লাগিলেন। পরে গৃহ প্রস্তুত হইলে পুরোহিত ঠাকুরকে দিয়া শুভদিন দেখাইয়া তিনি গৃহ-প্রবেশ করিলেন। তদবধি তিনি যে কয় বৎসর জীবিত ছিলেন, সে কয় বৎসর কেমন যেন উদ্ভ্রান্তভাবে গঙ্গাজলে অবগাহন করিতেন বা, গঙ্গাতীরে পরিভ্রমণ করিতেন। অনেক চেষ্টায় তাঁহাকে আহারাদি-ব্যাপারে প্রবৃত্ত করিতে হইত। শেষে একদিন গভীর রাত্রে তিনি রক্ষিবর্গের সতর্ক পাহারা কোনও প্রকারে এড়াইয়া গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সকল জ্বালা জুড়াইলেন। যে হারানিধির অন্বেষণে তিনি এরূপ 'উদ্‌বিগ্নচিত্ত পরিখেদিতমনাঃ' হইয়া এই দীর্ঘ কয় বৎসর কাটাইয়াছিলেন, কে জানে জীবনান্তে তাঁহার সে নিধি মিলিয়াছিল কি না? *

* একটি ইয়োরোপীয় কিংবদন্তী অবলম্বনে লিখিত।

মুহূর্ত্তের ভুল

[শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু]

(১)

নিভৃতে বসিয়া বিলাত-ফেরত দুই বন্ধুতে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। এই আলাপের যতটুকু পাঠকবর্গের জানা প্রয়োজন, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিব। কিন্তু তার আগে দুজনের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

নন্দ ব্যারিষ্টার। ফণিভূষণ ডাক্তার। দুইজনে বাল্যবন্ধু, সহপাঠী। তারপর এক সঙ্গে বিলাত যাওয়া, একত্র ইউরোপ্ বেড়ান। দেশে আসিয়াই ফণিভূষণ আবার ভ্রমণে বাহির হইয়া গেল। এবার সমগ্র ভারত তাহার প্রোগ্রাম্ ভুক্ত। তাহাকে ট্রেণে তুলিয়া দিবার সময় নন্দ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ব্যাপার কি? ক্রমে ভবঘুরে হ'য়ে পড়্‌লে যে!

নইলে ঘোর কাটে কই! এই উক্তির পশ্চাতে প্রেম, প্রত্যাখ্যান দুই-ই ছিল। কিন্তু এ আখ্যায়িকার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

এক বৎসর ভ্রমণ করিয়া ফণি কাল কলিকাতায় ফিরিয়াছে। ইতিমধ্যে নন্দর জীবনে একটু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নন্দ বিবাহ করিয়াছে। শুনিবামাত্র সন্ধ্যাকে অভিনন্দন করিয়া ফণি জিজ্ঞাসিল, হার-ম্যাজেষ্টীর নাম কি?

সুহাসিনী।

নামটা ত খুব পোয়েটিক্ হে?

হাঁ বিবাহটাও বেশ রোমান্টিক্।

কি রকম, কি রকম? কোর্ট্‌শিপ্ থেকে সুরু কর।

এতে ভাই পূর্ব্বরাগ নেই—একেবারে অপূর্ব্ব-রাগ! প্রথম দর্শনেই প্রাণ-মন-চিত্ত সব প্রবল বেগে আকর্ষণ!

যাকে বলে ললাটের লেখা।

হাঁ! একবার দেখাতেই সে দেখা যে মুছ্‌লেকা নিয়ে ছাড়্‌বে তা নভেলেই পড়্‌তুম।

এখন বুঝ্‌ছ সেটা ভেল নয়। তারপর?

তারপর, বিবাহের প্রস্তাব।

অতঃপর মেম্‌সাব?

না। অতঃপর সওয়াল-জবাব। প্রস্তাব শুনে শ্বশুর মহাশয় বল্‌লেন, বিবাহ দিতে আমি প্রস্তুত আছি, তবে এক সর্ত্তে। তুমি যদি প্রতিশ্রুত হও যে, আমার কন্যার অনিচ্ছায় তাকে স্পর্শ করবে না, তাহলে আমার কোন আপত্তি নাই। শুনে, আমি হতভম্বের মত সেই মালা-গলায়, টেলক-কাটা, চস্‌মা-আঁটা লোকটার পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলুম।

বেশ করেছ! আমি হলে অধিকন্তু মনে মনে বল্‌তুম, অহো নিষ্ঠুর! তারপর তিনি কি বল্‌লেন?

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বুঝ্‌তে পেরেছ? আমার কন্যার অনভিমতে তুমি তার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী ভাবে কোনরূপ আচরণ করবে না বলে যদি অঙ্গীকার কর, আমি তোমায় কন্যাদান কর্‌তে প্রস্তুত। আমার আশঙ্কা হল, নিশ্চয় কোন ব্যারাম

আছে। জিজ্ঞাসা করলুম, কেন এরূপ সর্ত্তের আবশ্যক, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? তিনি বললেন, অবশ্য। আমার গুরুদেবের একটী গোপাল মূর্ত্তি ছিল। মৃত্যুকালে আমার কন্যাকে সেটীর লালন-পালন ভার দিয়ে আমাকে তিনি আদেশ করে গেছেন যে, যদি কেউ ঐরূপ প্রতিশ্রুতি করেন, তাঁকেই কন্যাদান কোর, নচেৎ নয়।

তারপর?

তারপর ঐ সর্ত্তে আমিও স্বীকার হ'লুম।

এ ত বেজায় হাঙ্গাম বাধিয়েছ হে! বাপের বংশ নির্ব্বংশ করে আইবুড়ো নাম ঘোচানো। এমন বিদ্‌কুটে সর্ত্তে রাজি হলে কি ভেবে?

ভাবলুম, স্ত্রী যদি আমার ভালবাসায় স্বেচ্ছায় আত্ম-সমর্পণ না করে, ভালবাসা দিয়ে যদি তার ভালবাসা না পাই, সুধু প্রাণহীন দেহটা নিয়ে করব কি? মানুষই বিবাহ করে ভালবাসার কার্‌কারবার করে। পশুর ত বিবাহ হয় না।

যা হ'ক, একটা নূতন কাণ্ড করেচ।

না। বিবাহ যে পাশবাচারের লাইসেন্স্ নয়, সেইটেই সুধু মুখে স্বীকার করেছি। কি ভাবছ?

ভাবছি, তোমার পুঁজিপাটা যা কিছু ছিল, সবই ত এই কারবারে ঢেলেছ, যদি মূলে-হাভাৎ হয়।

হয়, হার-ম্যাজেষ্টির মত আমিও চিরজীবনটা পুতুল খেলে কাটিয়ে দেব।

পারবে? এ যে রক্ত-মাংসের পুতুল। কথা কইতে পারে, কাছে বসে হাসি-চাউনিতে মন ভোলাতে পারে!

তা ত প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি। কিন্তু, ভাই, সংযম কি এতই কঠিন? যদি ভালবাসা না-ই পাই, সুধু ভালবেসে কি সুখী থাকা যায় না?

ভগবান্ জানেন! কিন্তু, মনে হয়, তিনিও ভালবাসার কাঙ্গাল।

কথাবার্ত্তা হইতেছিল, বালীগঞ্জে নন্দলালের বাগান-বাটীতে একটী মালতী-মণ্ডপের ভিতরে। নন্দ কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু দুইটি অনিন্দ্য-সুন্দরী তরুণীর ত্বরিত আবির্ভাবে তাহার মুখের কথা মুখে রহিয়া গেল।

ওগো, দেখনা গো, আমার মালা কেড়ে নেবে বলছে!

অভিযোগ-কারিণী তারপর সঙ্গিনীকে কহিল, তুই মালা নিয়ে কি করবি? তুই ত আর নীলুকে ভালবাসিস নি যে তাকে পরাবি! (টীকা—নীলু ওরফে নীলমণি, গুরুদেব-প্রদত্ত গোপাল মূর্ত্তি)।

সঙ্গিনী উত্তরিল, কেন, আমি যাকে ভালবাসি, তাকে পরাব।

কাকে? তোর দাদাকে?

দূর পোড়ারমুখী! তারপর পোড়ারমুখীর কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, বোকারাম, ও কথা বলতে আছে?

কেন, কেন তুই তোর দাদাকে ভালবাসিস নি? তবে যে বলিস, আমি দাদাকে ভালবাসি, আর কাউকে নয়।

সঙ্গিনী এই কথা কাটাকাটীর পালাটা এড়াইয়া গিয়া স্বত্বের দাবী উপস্থিত করিল, মালার সূত আমার।

অপরা কহিল, ফুল আমার।

তোর কিসে? আমার দাদার বাগান, ফুল আমার দাদার।

সূতা, ফুল, উভয়েরই অধিকার হারাইয়া রৌদ্র-তপ্ত কিসলয়ের ন্যায় অভিযোগ কারিণীর মুখখানি মলিন হইয়া গেল। তথাপি ভাঙা বুকে বল সঞ্চয় করিয়া বলিল, আমি যে গেঁথেছি।

আঃ ভারি করেচ। তার জন্যে তোকে মজুরি ধরে দেব। দে, আমার মালা দে—বলিয়া সঙ্গিনী হাত বাড়াইল।

অপরা ছলছল চক্ষে কাঁদকাঁদ স্বরে আপনা আপনি বলিতে লাগিল, আমার সব জিনিসেই ওর ভাগ, কেড়ে নিতে পারলে বাঁচে। পোড়ারমুখী যেন আমার সতীন হয়ে জন্মেছে।

পোড়ারমুখী আর যদি কক্ষণ তোর সঙ্গে কথা কই—বক্তব্য সম্পূর্ণ না করিয়াই সঙ্গিনী বেগে রণস্থল ত্যাগ করিল। নন্দ পিছু ডাকিল, মুঞ্জ, শোন্ শোন্! তুই ফণিকে চিনতে পারিলি নি? ফণ্, তুমিও নিশ্চয় পার নি।

তরুণী দুইজনে স্নেহের কলহে অন্যমনা থাকায় এই অভ্যাগতটীকে লক্ষ্য করে নাই। এ বয়সে বড় করেও না। উভয়ে লজ্জায় নতমুখী হইল।

ফণি বলিল, প্রথম দেখেই পারিনি, সে কথা সত্য। পাঁচ বছর দেখিনি, আর সেই এতটুকুটী দেখে গেছি! কিন্তু নন্, মুঞ্জ এখনও আমাকে চিনতে পারছে না। তাহলে লজেঞ্চেসের জন্যে ছুটে এসে নিশ্চয় আমার পকেট্ ওট্‌কাত!

মুঞ্জ এতক্ষণ অবাক হইয়া ভাবিতেছিল, ফণিদাদার সে

তরুণ গোঁফ কোথায় গেল। সে কুঞ্চিত ঘনকৃষ্ণ কেশরাশির মাঝে মাছের কাঁটার মত সিঁথাটা! ঐ কি ফণিদাদার সেই আয়নার মত তক্‌তকে কপাল! আহা, কে ওর উপর অমন করে আঁকজোক কেটে দিয়েছে! দুই পাঁচ বছরে ফণিদা যেন পঞ্চাশ বছরের বুড়ো হয়ে এসেছে! একটা মস্ত ঝড় যে ফণির জীবনের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তাহা এই তরুণীরও বুঝিতে বাকী রহিল না। সে কোমল সহানুভূতি-সূচক স্বরে কহিল, কিন্তু তোমাকেও ত চেনা যায় না ফণিদা!

নন্দ স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, হাসি, তুমি এঁকে দেখনি। আমার ছেলে বেলার বন্ধু, ফণিভূষণ।

সুহাসিনী অন্যমনে তাহার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। ফণি কহিল, তোমার সঙ্গে বৌদিদি পাতালুম, বৌদি, মনে রেখ। আমাকে বোল ঠাকুরপো। এখন চললুম। মঞ্জু, কাল ভাই, তোমার জন্যে লজেঞ্জেস্ আনব, পকেট খুঁজলেই পাবে। বৌদি, আজ যেমন মালা নিয়ে দুজনে ঝগড়া করলে, কাল তেমনি লজেঞ্জেস্ নিয়ে কাড়াকাড়ি কোর। নমস্কার!

নন্দ ফণির সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে উঠিয়া গেল।

মঞ্জু উঠিয়া হাসির কণ্ঠ জড়াইয়া জিজ্ঞাসিল, ও কে বল দিকি?

হাসি কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে ননদের মুখ চাহিয়া বলিল, তোর বর, বুঝি!

যেৎ! কিন্তু মঞ্জুর মুখখানি হঠাৎ রাঙা টুক্‌টুকে হইয়া উঠিল।

২

ভাই হাসি, তুমি আমার চাঁদ মুখখানি আলো করে দিন রাত ঠোঁটের আগায় লেগে থেক।

আ-গেল! তা হলে যে, ভাই, আমি এঁটো হয়ে যাব, নীলুকে চুমু খাব কেমন করে?

তা তুই জানিস!

আচ্ছা ঠাকুরঝি, সত্যি বলনা, ভাই, তোমার কি নীলুর ওপর একটুও টান নেই?

এক-টু-ও না, একতিল এক রত্তি নয়।

সত্যি! কে জানে ভাই! আমার ত মনে হয় নীলুকে না ভালবেসে থাকা যায় না।

ওলো দেখ্‌ব, দেখ্‌ব! আর দুদিন পরে যখন একটি সোনার পুতুল কোলে পাবি, তখন তোর ঐ পিতলের পুতুল কোথা থাকে, দেখ্‌ব।

নীলুকে পুতুল বলিলে সুহাসিনীর অভিমানের সীমা থাকিত না। মুখ ভার করিয়া উঠিয়া গেল। পথে নন্দকে পাইয়া প্রশ্ন করিল, সত্যি বলবে?

কি?

নীলু কি পুতুল?

কে বল্‌লে?

তার নাম আর আমি মুখে আনব! যেই বলুক না! তুমি বল না?

নীলু পুতুল? কক্ষণ না।

মেঘ কাটিয়া আবার সূর্য্যকর দেখা দিল। নন্দর হাতখানি সহসা চাপিয়া ধরিয়া হাসি বলিল, সত্যি বলছ?

নন্দ মুহূর্ত্তের জন্য ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, সত্যি নয়?

সত্যিই ত! আচ্ছা তুমি অত করে নীলুর কথা কও কেন?

তুমি শুনতে ভালবাস বলে।

আমি শুনতে ভালবাসি বলে? কেন? কেন? তুমি নীলুকে ভালবাস না?

তুমি যাকে ভালবাস, আমি তাকেই ভালবাসি। কোথায় যাও?

নীলুকে একবার দেখে আসি।

আচ্ছা নীলু কি তোমায় ভালবাসে?

বাসে বৈকি!

কি করে জান্‌লে?

তা জানি।

তোমাকে বলে বুঝি?

ওমা, তুমি কি গো! হা-হা, এ কি আবার বলতে হয়! মা ছেলেকে বলে না ছেলে মাকে বলে, ভালবাসি। ভালবাসা মনে মনে বোঝা যায়। তুমি যে আমাকে ভালবাস, তা কি মুখে বল? আমি জানি।

জান? সত্যি বল্‌ছ জান?

তুমি একটা আস্ত পাগল! বলিয়া হাসি চলিয়া গেল। একটা বুক-ভাঙ্গা দীর্ঘ নিশ্বাস চাপিতে চাপিতে নন্দ ভাবিতে লাগিল, পাগল, পাগল! সত্যই আমি পাগল। নইলে

এই পাগলের জন্য পাগল হ'ব কেন ? কিন্তু সময় সময় মনে হয়, আর যেন পারি না। বছরের পর প্রায় বছর ঘুরে এল, আমার তৃষ্ণা যত ছুটছে, মরীচিকা যেন ততই দূরে সরে যাচ্ছে।

দূর হইতে হাসির উদাস ভাব, স্বপ্নাচ্ছন্নের ন্যায় গতি দেখিয়া ফণি ভাবিতে লাগিল, এ কি সম্মোহন-বিদ্যাবলে আবিষ্ট ? হিপ্নটিক ট্রান্স্ (Hypnotic trance) ?

মঞ্জু প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ফণিদা, আমাদের বৌ পাগল, না ?

কেন বল দিকি ?

দাদা কত রকম কাপড়-গয়না এনে দেয়, তা কালামুখী ভুলে একখান একবার গায় ঠেকায় না! বিল্বমঙ্গলের সেই পাগলীর মত একখানা লাল কস্তাপেড়ে সাড়ী পরে বেড়ায়! চুলই বাঁধে না। বলে আমি মা, ছেলের সামনে সাজগোজ করতে লজ্জা করে। ছেলের সামনে না পরিস, আর সবার সামনে পরতে দোষ কি ? পোড়ারমুখী বলে কি জান ? সবাই আমার ছেলে। আমার বাপু অতশত সয় না। বলি, এ সবে তবে কি তোর শ্রাদ্ধ হবে ? বলে, না, ওসব আমার নীলুর বৌ এসে পরবে। না বিইয়ে কানাইয়ের মা! খালি নীলু—নীলু—নীলু! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপন দেখে! এই আদর করছে, এই খিল্ খিল্ করে হাসছে!

তুমি কেমন করে জানলে ?

বাঃ, আমার পাশে শুয়ে থাকে যে!

এ বন্দোবস্ত কতদিন ?

সেই ফুলশয্যা থেকে। পোড়ারমুখী বলে কি জান ? বলে, আমার গা ছম্‌ছম্ করে!

ফণি হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তুমি হাস্‌ছ, ফণিদা! আমার গা জ্বলে যাচ্ছে!

কিসে গা জ্বলে যাচ্ছে ? আমি হাস্‌ছি বলে!

তুমি ত বেশ দেখ্‌ছি!

কিসে আমি বেশ ?

যাও!

তা যাচ্ছি।

ও কি, চল্‌লে যে! দাদার সঙ্গে দেখা করবে না ?

তুমি যেতে বল্‌লে, যাব না ?

ওঃ, কি শিষ্ট শান্ত!

কেন, আমি কি দুষ্ট, দুর্দ্দান্ত!

অমন কর ত আমি চল্‌লুম।

তা বেশ ত যাওনা। আমার সঙ্গে যদি কথা কইতে ভালই না লাগে, আমি কি জোর করে ধরে রাখ্‌ব ? আগে আগে লজেঞ্জেসের লোভ ছিল, কাছে কাছে ঘুরতে!

মঞ্জু বড় মধুর হাসিল—হাহা তখন কি ছোট্ট ছিলুম!

এখন বুঝি খুব লক্ষ্মীটী হয়েছ ? বলিয়া প্রশংসমান চক্ষে ফণি মঞ্জুকে দেখিতে লাগিল। সে দৃষ্টিতে মঞ্জুর চক্ষু নত হইয়া পড়িল।

(৬)

দাদার খাওয়া হয়েছে, বৌ ?

আমি কি জানি।

জাননা ? খবর রাখিসনি কেন ? আমি কি চিরকাল এই বাড়ীতে থাকব ?

থাকবে না ত কোথা যাবে ?

তুই কোথা ছিলি, কোথা এসেছিস ?

আমার বরের বাড়ী।

আমারই বুঝি বর হবে না ?

কবে হবে, ঠাকুরঝি, কবে হবে ? কে তোমার বর হবে, ঠাকুরঝি ? ঠাকুরপো ? তা হলে বেশ মজা হয়!

মজা কি হয়, শুনি ?

ঠাকুরপোর সঙ্গে ঠাকুরঝির বে—মজা নয় ?

আমার মাথা ধরেছে—উঠতে পারছিনি। আমাকে এখন জ্বালাস নি, হাসি! যা, দাদাকে খাওয়াগে যা। কি চায় না-চায় দেখিস। আর দাদার কাছে কিছু বলিস্‌নি যেন!

কি, তোর বরের কথা ? ওমা, এমন মজার কথা না বল্‌লে হয়!

দেখ্, হাসি, তা হলে তোর সঙ্গে ইহজন্মে আর কথা কইব না।

হাসির বোল তুলিয়া হাসি চপল চরণে নন্দর নিকটে উপস্থিত হইল।

কি হাসি, আজ যে আপনাকে আর ধরে রাখ্‌তে পারছ না, চারদিকে বিলিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছ। আমাকে একটু দাও।

তোমাকেই ত দিতে এলুম। ভারি মজা হবে, জান ? ঠাকুরঝির বর হবে।

কেগো ?

বল দিকি ? বলতে পারলে না ? পারলে না ?—ঠাকুর-পো।

নন্দ একটুখানি ভাবিয়া বলিল, সত্যি ? তা হলে বেশ চমৎকার হয় ! কোথা চললে ?

নীলুকে বলিগে, বলিয়া কিছুদূর গিয়াই হাসি ফিরিয়া আসিয়া কহিল, ঐ যাঃ, ভুলে গেছি !

কি ?

তোমার যে এখনও খাওয়া হয়নি। ভাত আনতে বলি ?

নিরতিশয় আনন্দে নন্দের হৃদয় উথলিয়া উঠিল। বলিল, আজ যে আমার উপর এত সদয় !

স্বামীর উল্লাসের আতিশয্যে হাসি বিস্মিত হইয়া বলিল, ঠাকুরঝি যে বললে !

যেন ফুৎকারে নন্দর মুখের দীপ্তি নিবিয়া গেল ! ওঃ ! ঠাকুরঝি বললে ! তাই !

আহারে বসিয়া নন্দ তাহার প্রিয় সামগ্রীগুলির একটাও স্পর্শ করিল না। নীলুর কথা লইয়া হাসি গলগল করিয়া বকিয়া যাইতে লাগিল। কখন যে স্বামীর অন্ন-ব্যঞ্জন লইয়া নাড়াচাড়া সমাপ্ত হইয়া গেল, জানিতেও পারিল না। জিজ্ঞাসিল, খাওয়া হল ?

খুব, খুব, বলিয়া নন্দ অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

যাই, মুঞ্জকে বলিগে। মঞ্জু নামটা বেশ, না? যেন ফুল ফুটে রয়েছে !

নন্দ নাম বুঝি তোমার পছন্দ নয় ?

নন্দ নাম আবার মন্দ ? কার নাম বল দিকি ?

তুমি বল দিকি ?

আমি বুঝি জানিনি ? মনে করেছ, বোকারাম কিছুই জানে না। সব জানি গো মশাই, সব জানি ! গোপরাজ নন্দ।

সে ত সেকেলে নন্দ।

সেকেলে আবার কি ? সেই চিরকেলে নন্দ।

তা হক, তবু ত সত্যিকার নন্দ নয়।

ওমা, এমন পাগল নিয়েও মানুষে ঘর করে ! নীলু কচি ছেলে, সেও শুনলে হাসবে যে ! হা হা হা ! নন্দ সত্যি নয় ?

না। আর সব সত্যি, কেবল নন্দ মিছে।

পরিহাসের সূচনা করিয়া নন্দর মন ক্রমশঃ বাঁকিতে লাগিল। হাসি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিল, কে বললে, মশাই নন্দ মিছে ?

আমি বলছি। নন্দ যদি সত্যি হত তা হলে কি তুমি একবার তার দিকে ফিরে চাইতে না ?

তুমি কার কথা বলছ ?

যে সত্যি হয়েও তোমার কাছে মিছে, তার কথা বলছি।

হাসি, আমি কি তোমার কেউ-ই নই ?

কেন ? তুমি ত আমার বর।

না। আমি তোমার কেউ নই। যদি কেউ হতুম, তুমি আমার দুঃখ বুঝতে।

ব্যথিতস্বরে হাসি প্রশ্ন করিল, দুঃখ। তোমার কি দুঃখ ?

তোমাকে যে আমার দুঃখ বলতে হয়, বোঝাতে হয়, এই দুঃখ।

সত্যিই আমি বুঝতে পারিনি, আমাকে বুঝিয়ে দাও !

কেমন করে বোঝাবো ? এ দুঃখ প্রাণ দিয়ে না বুঝলে বোঝা যায় না। হাসি একবার, একদিন, এক মুহূর্তের জন্য তোমার ঐ আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে এস। প্রাণময়ী হয়ে প্রাণ দিয়ে আমার প্রাণের কথা বোঝ। বোঝ, এই দুবছর আশায়-নিরাশায় দারুণ হৃদয়-দ্বন্দ্বে শুধু তোমার মুখ চেয়ে কি করে দিন কাটাচ্ছি।

হাসি বিহ্বল হইয়া ভাবিতে লাগিল, কি উপায়ে তাহার স্বামীর এই নিদারুণ মর্ম্মবেদনার প্রতিকার হয়। সহসা যেন অন্তরের অন্ধকার ঘুচিয়া তাহার মুখ আলোকিত হইয়া উঠিল। কহিল, আমার একটি কথা শুনবে ? মনের মত দেখে তুমি আবার একটা বে কর।

নন্দর মুখের উপর সহসা কে যেন কশাঘাত করিল। তাহার বিবর্ণ, বিকৃত মুখ দেখিয়া হাসি উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, কি, কি ? কেন অমন করছ ?

যা মনে করতে, মুখে বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে, সেই বে করলে তুমি সইতে পারবে ? আমি আর কাউকে ভাল-বাসলে তোমার ক্লেশ হবে না ?

হাসি তৎক্ষণাৎ নন্দর করস্পর্শ করিয়া কহিল, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, তোমার দিব্যি, না। কেন তুমি তা মনে করছ ? মুঞ্জকে কি তুমি ভালবাস না ? তাতে কি

আমি অসুখী ? তুমি বে' কর। এখন আমরা দু'বোনে ঘরকন্না করছি, তখন তিন বোনে করব।

হাসি, আজ নিঃসন্দেহ বুঝলুম, সত্যিই আমি তোমার কেউ নই। নইলে স্বামী বিলিয়ে দিতে চাইতে না। এ কথা মুখে আনতে পারতে না,—ব'লে আমায় বেদনা দিতে না। আর বোলনা। তোমার নীলুকে কি বিলিয়ে দিতে পার ? আর বোলনা।

যদি বুঝতে পারি সে সুখে থাকবে, তাও পারি।

তোমার পারা তোমারই থাক, আমায় মাপ কর, হাসি!

নন্দর আর্ত্তস্বরে বিচলিত হইয়া হাসি বলিয়া উঠিল, কেন তুমি আমায় এত ভালবাসলে ?

সে কথা তুমি তোমাকে জিজ্ঞাসা কর। দোষ আমার নয়, তোমার। ফণির নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান চোখে দেখে আমি ত স্থির করেছিলুম, এ ফাঁদে পা দেব না। কেন তুমি ঐ সরলোর প্রতিমা নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়েছিলে ? কোথায়, কবে, কখন, আমার কিছুই স্মরণ নেই, কেবল মনে আছে, আমি নৌকা করে যাচ্ছিলুম, আর তুমি তীরে দাঁড়িয়ে ছিলে। তারপর কেমন করে তুমি এক মুহূর্ত্তে আমার সব কেড়ে নিলে তা তুমিই জান। আমাকে কি জিজ্ঞাসা করছ ? ভালবাসা অত 'কেন'র ধার ধারে না। বল দিকি তুমি নীলুকে অত ভালবাস কেন ?

সে যে আমার ছেলে।

তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব! তুমি আমার হবে, তোমার ভালবাসা পাব বলে আমি জীবনের সব সাধ বিসর্জ্জন দিয়েছি। তুমিই আমার সাধনা।

আমি কি তোমায় ভালবাসিনি ?

সে কথা তোমার মুখ বলে, চোখ বলে কই ?

চোখ ?

হাঁ, চোখ! একবার চোখে চাও। তোমার প্রাণ দিয়ে আমার প্রাণের ভাষা বোঝ।

হাসি একবার চকিতে চাহিল, কিন্তু আর চোখ তুলিতে পারিল না।

নন্দ অগ্রসর হইয়া তাহার একখানি হাত ধরিয়া বলিল, হাসি, এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে আমার বলে আমার হও।

একটা অপরিচিত লজ্জার আবেশ হাসির মাথার কেশ পর্য্যন্ত কণ্টকিত করিয়া তুলিল। বলিল, ছি ছি! হাত ছাড়, নীলু রয়েছে যে!

শ্বশুরের নিকট পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়া দিয়া নন্দ ভাবিতে লাগিল, এই শরীরিণী সুষমা-রূপে শিখা, পবিত্রতায় পাবক, নির্ম্মলতায় দেবনির্ম্মাল্য স্বরূপা—এই কল্পলোক সম্ভূতা কিশোরী প্রকৃতই কি কামনার আকাশকুসুম! ভাবিতে ভাবিতে একটা বিজাতীয় ঈর্ষায় নন্দর হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল—নীলুই আমার সকল পথের কাঁটা।

(৪)

আচ্ছা ফণিদা, বিলাতে নাকি অনেক মেয়ে চিরকুমারী থাকেন ?

তা থাকেন।

তাঁরা কি রকমে থাকেন ?

বেশ সুখেই থাকেন; তবে এক কষ্ট, তাঁদের বে হয় না!

আহা বে যে কত সুখের, দাদাকে দেখলেই তা বেশ বোঝা যায়।

আহা, একেই বলে বুদ্ধি! বিবাহের আস্বাদটা দাদাকে দিয়েই পরীক্ষা করে নিয়েছ।

তুমি আমাকে জ্বালাবে, না, ভাল করে দু'টা কথা কবে ? বিয়ে না করার কষ্টটা কি, মশাই! আমি ত মনে করেছি চিরকুমারী থাকব!

আমিও—

তুমি কি দুঃখে বে করবেনা, শুনি ?

কথাটা মুখ দিয়া বাহির হইতেই মৃণ্ময়ী জিভ কাটিল। বিলাতী-বালার প্রত্যাখ্যানে ফণির মর্ম্মবেদনার ইতিহাস, দাদার কাছে সে কতক কতক শুনিয়াছিল। অতর্কিতে সেই ক্ষত-মুখ উদ্ঘাটিয়া দিয়া তাহার লজ্জার সীমা রহিল না। তার উপর পরিহাস করিতে করিতে ফণির আকস্মিক অন্যমনস্কতায় মৃণ্ময়ী অতিশয় অশান্তি বোধ করিতে লাগিল।

কিন্তু ফণি বাস্তবিক অন্যমন হইয়াছিল, মনস্তত্ত্ব আলোচনায়! বিধাতার কি বিচিত্র সৃষ্টি—মানুষের মন! সমগ্র নারীজাতির উপর বিজাতীয় বিদ্বেষ ও বুকভরা বিরাগ লইয়া যে দিন সে তাহার বিমুখ বাগ্দত্তার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসে, সে দিন কে ভাবিয়াছিল, পৃথিবীতে আবার চন্দ্র-সূর্য্য উঠিবে, ফুল ফুটিবে; এই ধূলিমুষ্টি ধরিত্রী আবার

আকার ইন্দ্রধনুরাগে অনুরঞ্জিত হইবে ; আর তাহার অসাড়, জমাট-বাঁধা জীবন-স্রোত আবার এমনি চঞ্চল হইয়া ছুটিবে! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কুসুমে আজ কি সুবাস, বাতাসে আজ কি মাদকতা, পাখীর মুখে আজ এ কি ভাষা, জোৎস্নায় কি অপূর্ব্ব মাধুরী, আলোকে কি অপরূপ উজ্জ্বলতা! আর ঐ নিরুপমা ষোড়শী, সৃষ্টিতে যা কিছু সুন্দর,—প্রভাতের হাসি, বিহঙ্গের স্বর, কুসুমের সুষমা, আলোকের দীপ্তি, মলয়ের মাধুর্য্য,—সকলের সার সৌন্দর্য্য হরণ করিয়া তাহার নয়নাগ্রে আজ কি অলৌকিক ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতেছে! দেশে দেশে, দিকে দিকে এই প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক যখন তাহার হারা-মন অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছিল, তখন সে স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই যে, বালীগঞ্জের এক নিভৃত কুঞ্জে সেই হৃত বস্তুর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে!

ফণিকে অনেকক্ষণ নীরব দেখিয়া মুঞ্জ আবার এক অসংলগ্ন প্রশ্ন করিয়া বসিল, আচ্ছা ফণিদা, একজনকে ভালবাসলে কি আর একজনকে ভালবাসা যায় না ?

হরি-হরি! তুই মনস্তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতের মধ্যে প্রশ্নটা অত্যন্ত সরল এবং স্বাভাবিক! কিন্তু পূর্ব্বপক্ষ এক অনূঢ়া যুবতী, উত্তরপক্ষ এক বিমূঢ় যুবা। উভয়ের মধ্যে এ প্রশ্ন মীমাংসার সকল সূত্র এলোমেলো করিয়া দিয়া এমন খাপছাড়া বিশ্রী আকার ধারণ করে যে, লজ্জায় অধোমুখ হইতে হয়। মুঞ্জ ত মরমে মরিয়া গেল! ছি ছি! ফণিদা যদি মনে করে, আমি তাহার ভালবাসা ভিক্ষা করিতেছি। এই লজ্জাস্কর ভুল শুধরাইয়া দিবার জন্য মুঞ্জ তাড়াতাড়ি বলিল, কেন বলছি জান, ফণিদা, দাদা যদি আর একটা বিয়ে করে, তাহলে কি সুখী হতে পারে না ?

তোমার দাদাকে অসুখী দেখলে কিসে ?

দাদা যা চাচ্ছে তা পাচ্ছে না।

চাইলেই কি পায় ?

এক জায়গায় না হক, আর এক জায়গায় পেতে পারে।

সত্য বলছ, মুঞ্জ, এক জায়গায় না পেলে আর এক জায়গায় পাওয়া যায় ?

ফণির মুখে যেমন ব্যাকুল ভাষা, চোখে তেমনি আকুল পিপাসা! মুঞ্জ চঞ্চল হইয়া অঞ্চল লইয়া খেলিতে লাগিল। এই সময় হাসি সহসা ছুটিয়া আসিয়া মুঞ্জের পায় লুটাইয়া পড়িয়া আর্ত্তস্বরে বলিল, আমার নীলু ?

তাহার মর্ম্মভেদী কণ্ঠস্বরে মুঞ্জ সত্যই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। হাসিকে সযত্নে তুলিয়া জিজ্ঞাসিল, কি হয়েছে ?

নীলুকে কে চুরি করে নিয়ে গেছে।

পোড়ারমুখী দিনুকে প্রলয় দেখে! কে আবার চুরি করবে ? চল দেখিগে।

কিন্তু ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিতে সত্যই দেখা গেল, সিংহাসন শূন্য!

ঐ দিক পানে দেখছি আর আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! মুঞ্জ, আমার নীলুকে এনে দে, নইলে আমি, খাবনা, উঠবনা, অনাহারে আত্মঘাতী হব—বলিয়া হাসি ভূমিশয্যা গ্রহণ করিল।

ফণি সান্ত্বনাস্বরে কহিল, বৌদিদি, তুমি শান্ত হও। আমি তোমার নীলুকে খুঁজে এনে দিচ্ছি।

দেবে! দেবে! ঠাকুরপো, আমি জন্মশোধ তোমার কেনা হয়ে থাকব! তুমি যাও, যাও! আর দেরী কোর না। কচি ছেলে, এখনও সে কিছু খায় নি। তুমি শীগ্‌গির যাও, এতক্ষণ হয় ত তাকে—

হাসি আর বলিতে পারিল না। একটা আকুল আশঙ্কায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই তাহার করুণ কণ্ঠোচ্ছ্বাসে সমস্ত কক্ষ আলোড়িত হইতে লাগিল।

মুঞ্জ বলিল, কে আবার তার কি করবে ?

ও দিদি, তার গায় যে এক গা গয়না! গয়না কেড়ে নিয়ে তাকে কোথায় ভাসিয়ে দেবে।

জান ফণিদা, নীলুর গরমী করছে বলে কাল সারারাত বসে বাতাস করেছে, কখন তবে নিয়ে গেল ?

ভোরের বেলা ঠাণ্ডা হাওয়া দিতে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। মরণ-ঘুম ঘুমিয়েছিলুম, দিদি, নইলে এমন সর্ব্বনাশ হয়!

তুই থাম পাগলী! অলুক্ষুণে কথা কসনি।

তারপর সেই নীরব কক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সহসা তীক্ষ্ণ স্বর ছুটিল, ওরে আয়রে আয়রে!

সে মর্ম্মভেদী ক্রন্দন সহ্য করিতে না পারিয়া, বৌদিদি চুপ কর আমি এখনি খুঁজে আনছি, বলিয়া ফণি দ্রুতগতি নন্দর অন্বেষণে গেল। কিন্তু নন্দ তখন গৃহে অনুপস্থিত। নীলুর গায় মূল্যবান রত্নালঙ্কার ছিল, ফণি তাহা জানিত। ভাবিল, নিশ্চয় চুরি হইয়াছে। চোর গহনা খুলিয়া লইবার

...কাশ পায় নাই, বিগ্রহ লইয়া পলাইয়াছে এখন উপায় কি ?

সচরাচর যে সকল বালগোপাল মূর্ত্তি বাজারে পাওয়া যায়, নীলু তাহাদেরই অন্যতম। হাসিকে ভুলাইবার জন্য ফণি তেমনি এক বিগ্রহের সন্ধানে ছুটিল। কয়েক দোকান অনুসন্ধানের পর অবিকল নীলুর অনুরূপ একটী মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া ত্বরায় বালীগঞ্জে ফিরিল।

হাসি ওঠ্, ঐ দেখ্ ফণিদা তোর নীলুকে ফিরিয়ে এনেছে।

কই কই, বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া হাসি আকুল আগ্রহে দুইটী ব্যগ্র কর প্রসারিত করিয়া দিল।

বৌদিদি, চোর সব গয়না খুলে নিয়ে নীলুকে দোকানে বেচে গিয়েছিল।

তা নিক্‌গে, ঠাকুরপো! কাজ কি জড়োয়ার গয়নায় ? নীলু আমার অমনি সুধুগায়ে বেঁচে থাক্। আর ত আমি কখন চোখের আড় করব না।

কিন্তু নীলুকে কোলে লইয়াই হাসির হাসিমুখ একেবারে মসী মণ্ডিত হইয়া গেল। এ কাকে এনেছ! এ নয়, এ নয়, এ আমার নীলু নয়! এ তুমি কাকে আনলে, ঠাকুরপো! আমাকে ভোলাবার জন্যে তুমি একটা পুতুল এনেছ ? আমি মা—আমাকে কি ভোলাতে পার ? নীলুর গায়ের বাতাসে আমি টের পাই!

একটা উচ্ছলিত মর্ম্মভেদী ক্রন্দন কক্ষ মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ফণি প্রথমে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তারপর নিজের জুয়াচুরিটুকু ঢাকিবার জন্য জোর করিয়া বলিল, সে কি বৌদি! দোকানী যে বললে চোর একেই বেচে গেছে! নিশ্চয় এই নীলু, তুমি চিনতে পারছ না!

এই নীলু? কৈ, একে বুকে ধরে আমার বুক জুড়াল কৈ? কৈ, এর মুখে সে হাসি কৈ? গায়ে সে পদ্মগন্ধ কৈ? সে চাউনি কৈ? আমি চিন্‌তে পারছিনি? যাকে পেটে ধরেছি, আমার নাড়ী-ছেঁড়া ধন—যাকে বুকে করে মানুষ করেছি, তাকে বুকে নিয়ে চিন্‌তে পারছিনি? আমার সাতরাজার ধনকে আমি চিন্‌তে পারছিনি? ঠাকুরপো, মা ছেলে চিন্‌তে পারছে না, এ কথা কেবল পুরুষমানুষেই বল্‌তে পারে।

ফণি অবাক্ হইয়া হাসির মুখ চাহিয়া রহিল। এ কি পরম মোহ—যাহা অলীক কল্পনাকে সত্যে পরিণত করে। ভাব ঘনীভূত হইলে সত্যই কি মৃন্ময় চিন্ময় হয়।

নন্দ অন্তরালে অবস্থান করিতেছিল, এই সময় কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। হাসি ছুটিয়া গিয়া তাহার পায়ের উপর মুখ রাখিয়া অশ্রুসিক্ত করিতে করিতে কহিল, ওগো, আমার নীলুকে এনে দাও! আর বেশীক্ষণ তাকে দেখ্‌তে না পেলে আমি বাঁচ্‌ব না। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আমাকে বাঁচাও। তোমার পায় পড়ি, আমার নীলুকে খুঁজে এনে দাও! তুমি ছাড়া কেউ তাকে খুঁজে আন্‌তে পারবে না।

অনেক বেলা হয়েছে, তুমি কিছু খাও। নইলে আমি স্থির হয়ে তাকে খুঁজ্‌তে পারব না।

চল, আমি খাচ্ছি, বলিয়া হাসি মুক্ষরসঙ্গে উঠিয়া গেল। কিন্তু অন্নপাত্র সম্মুখে দিতেই কাঁদিয়া উঠিল, ওগো এতখানি বেলা হল, সে যে কিছু মুখে দেয়নি, আমি কি করে অন্নজল মুখে দেব।

শরবিদ্ধা বিহঙ্গিনীর ন্যায় হাসি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

(৫)

হাসি, আমার এ অপরাধ কি তুমি ক্ষমা করতে পারবে?

বেশী কথা কইলে অসুখ বাড়বে! আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দি, একটু ঘুমোও। তোমায় ত বলেছি, নীলুকে যখন তুমি ফিরে দিলে, তখন আহ্লাদেই আমি উন্মত্ত, রাগ করব কখন?

আজ তিন দিন নন্দর জ্বর। ফণিভূষণ অতি সাবধানে চিকিৎসা করিতেছে, পাছে হতাশে হৃদিভঙ্গে পীড়া সাংঘাতিক হইয়া উঠে।

হাসি, নীলুকে কেন চুরি করেছিলুম জান?

নীলুর কথা উঠিতে হাসি ডাক্তারের সতর্কতা ভুলিয়া গেল। প্রশ্ন করিল, কেন?

তোমারই জন্যে। ভেবেছিলুম, নীলু চোখের আড়াল হলে তোমার মোহ কেটে যাবে। আর রাগে। মনে হত, আমার কাছ থেকে তোমাকে দূরে রেখেছে—ঐ।

এখনও কি তাই মনে হয়? তবে ফিরে দিলে কেন?

তোমার যন্ত্রণা দেখে। কিন্তু তুমি যত ছট্‌ফট্ করেছ, তার অনেক বেশী কষ্ট আমি পেয়েছি। এখন মনে হয়, কেমন করে আমি এমন নিষ্ঠুর হয়েছিলুম। তোমার কান্না শুনে বাড়ীতে টিক্‌তে পারতুম না। হোটেলে খাবার নাম করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতুম, কিন্তু খাবার মুখে তুল্‌তে গেলেই

মনে হত, তুমি অনাহারে পড়ে রয়েছ। তারপর তিন দিন যখন তুমি দাঁতে কুটো কাটলেনা—

না, না, আমি ও খেতুম। রাত্তিরে যখন বড় নিৰ্জ্জীব হয়ে পড়তুম, তখন কে এসে আমাকে খাওয়াত। বলত, নীলু ফিরে আসবে, কিন্তু না খেয়ে মলে কি তাকে দেখতে পাবি?

নন্দ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, কে খেতে দিত?

তাকে ত চিনিনি। কখন দেখিনি। রোজ দুধ খাওয়াত।

স্বপ্নে?

স্বপ্নে হক্, জেগে হক্, খেয়েছি ত?

নন্দ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। স্বপ্নে জাগরণে যার ভেদ নেই, এ বাস্তব সংসারের স্নেহ ভালবাসা তাহাকে বাঁধিবে কিরূপে? কি শোচনীয় ভ্রান্তি! যা হবার নয়, হবে না; পাবার নয়, পাব না; তার জন্যে, মিছে যন্ত্রণা পেলুম, যন্ত্রণা দিলুম! ধীরে ধীরে কহিল, হাসি একটা কথা বিশ্বাস কোর, যা কিছু অত্যাচার তোমার ওপর করেছি, তোমাকে পাব বলে। আগে মনে করতুম, না-ই বা ভালবাসা পেলুম, আমি ভালবেসেই সুখী হব। দেবতাদের কি হয়, জানিনি। কিন্তু রক্ত-মাংসের শরীরে তা হয় না। ফণি বলেছিল, ভগবানও ভালবাসার ভিখারী। তখন ঠিক বুঝতে পারিনি যে, মানুষের মন এমন ভালবাসার কাঙাল। ভালবাসা না পেলে জীবন বিস্বাদ। আমার এই ঘর, বাড়ী, ঐশ্বর্য্য—সবই মিছে। আমার কেউ নেই, কেউ নেই।

স্বামীর গভীর বৈরাগ্যব্যঞ্জক ভগ্ন কণ্ঠস্বর শুনিতে শুনিতে করুণাময় হাসির হৃদয় কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল।

নন্দ বলিতে লাগিল, যার নেই সে দুঃখী, কিন্তু যার থেকেও নেই, তার কি জ্বালা—যে জানে, সেই জানে! কেবল এক সান্ত্বনা, জ্বালারও শেষ আছে। বড় গলা শুকিয়ে গেছে, একটু জল দাও!

জল কেন, একটু বেদানার রস দি—

বেদানার রস পান করিয়া নন্দ কহিল, হাসি, যখন আমি এখান থেকে চলে যাব—

হাসি চকিত হইয়া জিজ্ঞাসিল, কোথায় যাবে তুমি?

প্রাণ-হীন ক্ষীণ হাসি হাসিয়া নন্দ উত্তরিল, কোথায় তা ত জানিনি, হাসি! কোথায় ছিলুম, হেথায় এসেছি, এখানকার কারবারে নিয়ে গেলুম কেবল বুকভরা যাতনার বোঝা—

হাসি আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, বোলনা, বোলনা, আমি তা হলে বড় কাঁদব। তুমি আমার জন্যে বড় ব্যথা পেয়েছ, আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি ভাল হও, আমাকে মনের মতন করে গড়ে নিয়ো।

ডাক্তারের সাড়া পাইয়া হাসি পাশের কক্ষে গেল।

পত্নীর অনির্ব্বচনীয় প্রীতি সিঞ্চিত স্বরে নন্দ পুলকিত হইয়া উঠিল; কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। পরক্ষণেই ফণি আসিতে সে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ফণি, তুমি ত ডাক্তার, অনেক জীবন বাঁচিয়েছ—

বাঁচিয়েছি, আবার পাকা ঘুঁটিও অনেক কাঁচিয়েছি। এক আধটা নয়, অনেক! আমি হলপ করে বলতে পারি, আমার ওষুধ না খেলে তারা মরত না।

সে তাদের অদৃষ্ট। আমি তা বলছি না। আমি জানতে চাই, জীবন-মৃত্যু নিয়ে এত যে নাড়াচাড়া করেছ, তার রহস্য কিছু বুঝেছ? কেন আমরা বার বার মরি, বার বার জন্মগ্রহণ করি।

ভাই, কেমন করে বলব? একটা লোককে ত বার বার জন্মাতে, মরতে দেখিনি। আর ধর, যদি তাই হয়, তা হলে আমার দেখার সম্ভাবনা খুব কম। কেননা, আমার হাতে যে একবার মরেছে, সে আমাকে দেখলেই—'স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জনঃ'—আর আমার ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না।

আলোচনাটাকে পরিহাসে হাল্কা করিবার প্রয়াস পাইলেও ফণি মনে মনে শঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল—এ কি বিকারের সূচনা!

নন্দ কহিল, সেই ত ধোঁকা! বার বার শিখি, বার বার ভুলি।

ফণি দেখিল, রুগ্ন কক্ষের আব্-হাওয়া ক্রমশই গুরু-ভারাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। ফুর্ত্তির দমকায় তাহাকে লঘু করিবার জন্য সে অনর্গল বকিতে সুরু করিল, ধোঁকা কি, বলছ, নন্! সেইটেই ভগবানের দয়া—তাতে আর ঝাপ্সা কিছু নেই। একে ত চিত্রগুপ্তের চল্‌তী খাতা। তার ওপর যদি স্মৃতির জের টানতে হয়, তা হলে ত মরেও সুখ নেই। ধর, যদি টিটিকাকা, টেরাডেল-ফিউগো, নিজ্নী নভ-

...রেড্, নেবুকাড্‌নেজার, পিছনে পিছনে ধাওয়া করে, ...হলে ত বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা ?

মন্দ যেন ফনোগ্রাফ-যন্ত্রের ন্যায় ভগ্ন কণ্ঠে প্রতিধ্বনি করিল, বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা।

ফণি বলিতে লাগিল, শুধু কি তাই ? মনে কর, দিব্বি সুখে স্বচ্ছন্দে আছ ? ফস্ করে একজন এসে তোমার রূপের বিষম দাবী করে বসল ! এ জন্মের স্ত্রীর সঙ্গে যখন প্রেমালাপ বেশ জমে উঠেছে ; তুমি প্রিয়তমার হাতখানি ধরে বলছ, প্রিয়ে, জনম জনম হম্ রূপ নেহারনু—ঠিক সেই সঙ্গীন মুহূর্তে তোমার কোন্ পূর্ব্ব জন্মের প্রেয়সী চাচার বেশে এসে, চোখ ঘুরিয়ে ফোক্‌লা দাঁতে ফিক্ করে হেসে প্রশ্ন করে বসলেন, প্রাণনাথ, পড়ে মনে ? তখন কি তুমি পূর্ব্ব পক্ষের চাপ্‌দাড়ি ধরে চুম্বন করবার জন্যে উতলা হবে, না এ পক্ষকে সামলাবে ? বাপ্‌রে ! কি বিভীষিকা ! ধার নিয়ে মলেও ভাববার যো নেই। হাজার ইন্‌সল্‌ভেন্ট্ নিয়েও পাওনা দারকে ফাঁকি দেওয়া চল্‌বে না। কৃতোপকার—এ জন্মেই ...দুঃসহ ভার —সেটা কাঁঠালের আঠার মত তোমাকে ...টে ধরবে ! বাপ ! কোন্ পূর্ব্ব পক্ষের মেয়ের বিয়ে দিয়েছ, ...দই-ক্ষীর-সন্দেশের হিসাব মেটাতে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ, ...র ওপর এ পক্ষের গয়নার জন্য খেদ ! আর যদি আপিসের ...বাবু হও, তা হলে বিশ-বাইশ জন্মের শালা-শালী চাকরীর উমেদারি হয়ে এসে তোমাকে বুঝিয়ে দেবে যে, বসুধৈব কুটুম্বকম্ কথাটা কেবল বকবকম্ নয়, তার একটা সাংঘাতিক অর্থ আছে !

ফণি বেদম্ হইয়া থামিল। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে সে এত ...বাব্য করিল, তাহা সফল হইল না। তাহার সকল কথা নন্দর কর্ণগোচর হইতেছিল কিনা, তাহাও বলা দুষ্কর। ...কণ্ঠস্বর নীরব হইবামাত্র সে তাহার মুখের পানে তীব্র ...টাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল, ঘোর সমস্যা। অতি জটিল ...স্যা ! এ কি জব্দ করা, বেঁধে মারা ! আবার জন্ম, আবার ...; আবার সেই কৌমার-যৌবন-জরা ! এম-এ পাস্ করে ...র সেই ক খ থেকে সুরু ; ফের সেই গুরু ; বেত খাওয়া ; ...ের জলে নাওয়া ; অকূল পাথারে ছেঁদা নৌক বাওয়া ; ... স্বর্ণমৃগের লোভে অনিশ্চিতের পেছনে ধাওয়া ; হাওয়ার ...র ভর করে ছাওয়ার মুখ চাওয়া ! তবে এ ভাঙ্গা ঘর ...র ফিরে ছাওয়া কেন ? কেন আমাকে গুচ্ছির ওষুধ গেলাচ্ছিস ? মরুর মাঝে তরুর মত এই জ্বালাময় জীবন —এ জ্বালা বেশী দিন ভোগায় লাভ কি ? এ বিষেভরা মাটীর ভাঁড় ভেঙে ফেলে দে ! এই দেখ, আপনা আপনি ফেনিয়ে ফেঁপে উঠ্‌ছে ! টগ্‌বগ্ করে ফুটছে ! ওঃ, সমুদ্রমন্থন করে যত বিষ উঠেছিল, সব এর ভেতর ঢেলেছে ! হাসি, হাসি, আমায় বাঁচাও, হাসি !

রোগীর যন্ত্রণাক্লিষ্ট করুণ কণ্ঠস্বর, তীক্ষ্ণাশির তীরের মত হাসির হৃদয়ে বিঁধল। ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর মস্তক কোলে তুলিয়া লইয়া বসিল। তাহার দিব্যভাব-দীপ্ত মুখমণ্ডল দেখিয়াই ফণি বুঝিল, এই ওষধ।

ফণি বাহিরে আসিতেই মঞ্জু উৎকণ্ঠিত মুখে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। ফণি গম্ভীর হইয়া বলিল, একটা সুখবর দিতে পারি, যদি কিছু পাই।

তা হলে দিতে পার না কেন ? বেচেরে বল ?

বেশ, তাই সই।

আচ্ছা, ফণি—

ফণি মঞ্জুর মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, এই অবধি, আর এগিয়ো না। কেন, আমি কি এমন বড়োহাবড়া হয়েছি যে, তোমার ঠাকুরদাদার পদ অধিকার করব !

ঠাকুদ্দা কেন ? তুমি

আমি কি ?

যাও !

তুমি ভারি দুষ্ট

এ কথা ত অনেকবার বলেছ। একটা নূতন কিছু বল।

আচ্ছা, তাই বলছি। শুনেছি, ডাক্তারে খুব আপনার লোককে চিকিৎসা করতে ভয় পায়, পাছে উৎকণ্ঠায় গুলিয়ে ফেলে !

অর্থাৎ তোমার চিকিৎসা আমার দ্বারা হবে না ?

আমার রোগটা কি, মশাই ?

সাংঘাতিক ! কটা বলব ? রূপ, যৌবন, বিকারের সব লক্ষণই দেখা দিয়েছে।

যে আজ্ঞে মশায়, আর বিদ্যা জাহির করতে হবে না। এখন আর একজন ডাক্তার আনবার কথা স্থির কর।

কেন, আমাকে পছন্দ নয় ? তা কাকে তোমার পছন্দ, বল ? কিন্তু ভাল বুঝছ না। আমি ছেলেবেলা থেকে তোমার ধাত জানি।

আমার ধাত ছাড়বার এখনও দেরী আছে। সত্যি বল্‌ছি, দাদার জন্যে একজন সায়েব ডাক্তার আনা দরকার মনে কর্‌ না? এতদিন হয়ে গেল—

না, তার দরকার নেই। সায়েবের চেয়ে বড় ডাক্তার তার চিকিৎসার ভার নিয়েছে।

মুঞ্জ অতিশয় আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল কে? কে?

বাঃ, ফাঁকি দিয়ে খবরটা নিতে চাও? বলেছি ত কিছু না পেলে দিচ্ছিনে।

আচ্ছা, খবরের মতন খবর হয় ত দর দিয়েই নেব?

রাজি?

রাজি।

তোমার দাদার চিকিৎসার ভার তোমার বৌদিদি নিয়েছে। আর কোন ভাবনা নেই, কাউকে ডাকতে হবে না। মর্ফিয়া দিয়ে যে ঘুম আনতে পারিনি, বৌদি অনায়াসে সে ঘুম এনে দিয়েছে।

মুঞ্জ অতিশয় উৎফুল্ল হইয়া কহিল, খুসীর খবর বটে!

ফণি তাহার হাত ধরিয়া বলিল, দর?

আদায় না করে ছাড়বে না! দরটা কি শুনি?

দর—মুঞ্জ।

মুঞ্জ সহসা হাত ছিনাইয়া লইয়া বলিল, দাদা ভাল হ'ক, দর তার কাছে চেয়ে নিয়ো।

কেন? তুমি কি তোমার দাদার—?

মুঞ্জ কুন্দদন্তে নলিনাধর চাপিয়া, মৃণাল-ভুজে ছোট্ট একটা কিল দেখাইয়া, বেণী দুলাইয়া ফণির সাম্‌নে হইতে সরিয়া গেল।

(৬)

বালীগঞ্জের বাগানবাড়ীতে যেদিন এই অভিনব পরিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়, সেদিন নিরীহ মনুষ্যজাতির সর্ব্বনাশ-সাধন-সঙ্কল্পে সৃষ্টির যত দুরন্ত শক্তি ষড়যন্ত্র-সভা করিয়াছিল। যাদুবিদ্যার জড় চাঁদ ছিলেন—সভাপতি। কোকিল ছিল—প্রধান বক্তা। যে নিজে কাল কুৎসিৎ, সে কারুর ভাল দেখিতে পারে না। সভাস্থ সকলকে দুর্ম্মতি দিতেছিল, সেই। ফুলকে বলিতেছিল—গন্ধ ঢাল। আকাশকে বলিতে-ছিল—তোমার বাতিগুলা জ্বাল। বাতাসকে বলিতেছিল—ব্যস্ত হইলে হইবে না। সারাদিন রৌদ্রে পুড়েছ, খানিক ফুলল্‌ তেল মেখে ঐ পুকুরের জলে গা ধুয়ে একটু ঠাণ্ডা হও। জ্যোৎস্নার ঐ ফিন্‌ফিনে চাদরখানা গায় দাও। জুঁই, বেলা, চামেলী, গোলাপ, সব রকমের আতর একটু একটু নাও, মানুষকে মজাও, মজাও, মজাও! চড়াই হইয়া বাজপাখীর বড়াই যার মুখে, শশক হইয়া সিংহের গর্ব্ব যার বুকে, সেই কীটস্য কীটকে টিট্‌ করিয়া দাও। মেদিনীকে বলিতেছিল, তুমি যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই মাটী হইয়া গেলে! মুখে কথাটী নেই! তুমি সর্ব্বংসহা না হলে মানুষের এত দর্প থাটে! সব জীবই নত হয়ে চলে; আর তোমার খেয়ে, তোমার প'রে মানুষই কেবল তোমার বুকে পা দিয়ে হাঁটে। করবে কি? মোহিনী মূর্ত্তি ধর, ত্যাগীর সংযম নষ্ট কর, যোগীকে যোগভ্রষ্ট কর; ভোগীর ভোগতৃষ্ণা বাড়াও; বিয়োগীকে নরকের পথ দেখাও; ধৈর্য্যের বন্ধন শ্লথ করে দাও, রোগীর রক্তে তোমার বুকের তাপ সঞ্চার ক'রে মাতাল করে তোল।

এই ষড়যন্ত্রের তথ্য মিথ্যা নহে। যার চোখ আছে, দেখে; কাণ আছে, শুনে; হৃদয় আছে, সে অনুভব করে।

বালীগঞ্জের একটা সুসজ্জিত কক্ষের গবাক্ষ-পথে দাড়াইয়া নন্দলাল শিরায় শিরায় তন্ত্রে তন্ত্রে এই গুপ্ত ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাইতেছিল। অদূরে একখানি সোফার উপরে একটা অনিন্দ্যসুন্দরী ষোড়শী অর্দ্ধশয়নে তন্দ্রামগ্ন। নন্দ একটু নিকটে সরিয়া গিয়া সেই এলায়িত মাধুরী দেখিতে লাগিল। আধ-হাসিতে হাসির অধরযুগল আধ-বিকশিত। মন্দ পবনে যুবতীর কেশ-বেশ ঈষৎ স্রস্ত। চাঁদ সে এলো-চুলে রূপা গুলে আলোয়-কালোয় কি অপূর্ব্ব কুহকজাল রচনা করিয়াছে! মরি মরি! নন্দর প্রতি রক্তবিন্দু কোলাহল করিয়া বলিতে লাগিল, এ আমার, আমার, আমার! ফুলের মদির গন্ধে অন্তরীক্ষ-বায়ু যেন মাতাল হইয়া উঠিয়াছে—নন্দও মাতাল হইয়া উঠিল। কখন্ যে দূরত্বের ব্যবধান দূর হইয়া তরুণীর তরুণ অধরে তাহার তৃষিত অধর মিলিত হইল, মুহূর্ত্তপূর্ব্বেও সে জানিতে পারিল না। অস্ফুট চীৎকারে চকিত হইয়া ঘৃণ্য অপরাধীর ন্যায় কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে মুঞ্জ আসিয়া দেখিল, বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় দুঃসহ যন্ত্রণায় হাসি ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। মুঞ্জ পার্শ্বে বসিতেই হাসি তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, আঃ তোর গা কি ঠাণ্ডা! আমার বুকের ভিতর কাঁটা ফুটেছে। বিষ, বিষ, জ্বলে গেল, জ্বলে গেল!

মুঞ্জ রোদনস্বরে ডাকিল, দাদা, দাদা, হাসি কেন এমন করে?

ডাকিস্‌নি, ডাকিস্‌নি, আমার ভয় করে। তুই আমার কাছে বোস্, তা হলেই ভাল হব।

সেই রাত্রেই প্রবল জ্বর হাসির চেতনা হরণ করিল। জ্বরের তাপ নিজ শরীরে আকর্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে মুঞ্জ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া পড়িয়া রহিল।

নন্দর যেন শয্যা-কণ্টকী উপস্থিত হইল। তীব্র অনুশোচনায় সারারাত্রি সে রুগ্নকক্ষে ও নিজকক্ষে পদচারণ করিয়া ফিরিতে লাগিল।

পরদিন প্রভাত হইল, কিন্তু হাসির চেতনা হইল না। নন্দ দারুণ উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞাসিল, ফণ্, আর কি হাসির চেতনা হবে না?

না হবার ত কারণ দেখি না। অনাহারে অনিদ্রায় নীলুকে পর্যান্ত দূরে রেখে, যে করে তোমার সেবা করেছে, সেই জন্য হয় ত জ্বরটা বেশী হয়েছে! কিন্তু তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? ডাক্তারখানার বিল বাড়াবার জন্য?

ফণ্, যদি একবার চোখ চেয়ে আমাকে ক্ষমা চাইবার অবসর দেয়—এ জ্বালা বুকে নিয়ে আমি বেঁচে থাক্‌ব কেমন করে?

রুদ্ধরোদনে নন্দর হৃৎপিণ্ডটা যেন ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। বুক চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আমি মহা অপরাধী। মুহূর্ত্তের ভুলে এই সর্ব্বনাশ ডেকে এনেছি।

পূর্ব্ব রাত্রির বিবরণ শুনিতে শুনিতে ফণির মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। কহিল, তোমার শ্বশুর কেন ওর অনিচ্ছায় স্পর্শ করতে বারণ করেছিলেন, এখন বেশ বোঝা গেল। বেহালার তাঁত যদি খুব চড়িয়ে বাঁধা থাকে, দমকা হাওয়ায় ছিঁড়ে যায়। এমন কোমল সূক্ষ্ম ধাত আছে, সত্যিই ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যায়।

নন্দ কাতর ব্যস্ততায় বলিয়া উঠিল, ভাইরে, তোমার ডাক্তারী যাই বলুক, আমি বুঝেছি, অপার্থিব পবিত্রতায় ব্যভিচার স্পর্শ করলে এমনি সর্ব্বনাশ হয়।

এ সব আধ্যাত্মিক কৈফিয়ৎ রেখে, চল এখন দেখিগে।

তিন দিন পরে চক্ষু মেলিয়া হাসি যেন কি খুঁজিতে লাগিল। মুঞ্জ জিজ্ঞাসিল, কি খুঁজ্‌ছিস্, হাসি?

মুঞ্জ, যা ভাই, বাগানে ছুটোছুটি করছে। গাছ থেকে পড়ে হাত-পা ভাঙ্‌বে, না পুকুরেই পড়বে। যা ভাই, কোলে করে ধরে নি'আয়! মারধোর করিসনি যেন, লক্ষ্মীটী! ঐ শোন্ চেঁচাচ্ছে!

কে চেঁচাচ্ছে?

কে আবার? নীলু! তোকে বলব কি, ঠাকুরঝি, যেদিন চুরি গিয়েছিল, সেদিন থেকে চোখের দুটা পাতা এক করিনি। এমন করে কি চব্বিশ ঘণ্টা চোখে-চোখে রাখা যায়!

চুরির অপরাধ নন্দকে নূতন করিয়া বিঁধিতে লাগিল। তাহার নির্যাতনে এই অসহায়া তরুণী দিনের পর দিন যক্ষের মত সজাগ থাকিয়া আপনার অঞ্চলের নিধিকে আগ্‌লাইয়াছে! একটা মর্ম্মভেদী তীব্র যাতনার স্বর তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল—ও-ও-ওঃ!

হাসি চকিত দৃষ্টি ফিরাইয়া নন্দর মুখ চাহিয়া কহিল, সেই অবধি বসে আছ? সেদিন রোগ থেকে উঠেছ। একটু শোওগে! কেঁদনা, কেঁদনা! তুমি আমাকে বড় ভালবাস, জানি। তেমনি তোমায় জ্বালিয়ে গেলুম!

ফণি বলিল, সে কি বৌদি! তুমি কোথায় যাবে! ব্যারাম কি হয় না? এইত নন্দকে তুমিই আরাম করে তুলেছ। তেমনি তুমিও ভাল হবে।

হাসি ভুবনমোহিনী হাসি হাসিয়া বলিল, ভাল হব? বেশ! তারপর যেন ভয়ে কণ্টকিত হইয়া বলিতে লাগিল, ওগো দেখ, দেখ, ঐ কৃষ্ণচূড়া গাছে উঠে ফুল পাড়ছে।

কৃষ্ণচূড়া গাছ রুগ্নকক্ষের গবাক্ষের পার্শ্বেই অবস্থিত। হাসি সেই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিতে লাগিল, ওরে ও ডান্‌পিটে, ওখান্ থেকে ঝাঁপ খাসনি! তুমি এস একবার! হবে এখন! দেখ্‌ছ, দেখ্‌ছ, যেন কে কাকে বল্‌ছে— হতভাগা, কথা কাণে তুল্‌ছ না! আজ ধরতে পারলে আর আস্ত রাখব না। লক্ষ্মী ধন আমার, যাদু আমার, আয় দিকি আমার কাছে, এসে একটু শু'সে। ঘুম পাড়াই! দেখ্‌লে দেখ্‌লে? ঐ গাছটা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘরে এল! আয় হতভাগা, আয়! কিচ্ছু বলব না। ওরে আমার নীলু! শো দিকি! ঘুমো, আমিও একটু ঘুমুই।

হাসি ঝিমাইয়া পড়িল। নন্দ ফণির নিকট আসিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, ফণ্, এ কি!

ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলে হয় ত বলবে ডিলিরিয়ম্—

এমনি কত কি। কিন্তু এখন আর আমি ডাক্তার নই। আমি তোমার সেই বাল্য বন্ধু। তোমার এই চরম দুর্দ্দিনে তোমার গলা ধরে কাঁদতে এয়েছি। আমায় কি জিজ্ঞাসা করছিস্। নন্, নন্, বুঝতে পারছিনে, এ ফুল কেনই বা ফুটল, আর অকালে শুকলই বা কেন?'

হাসি আবার চোখ মেলিয়া চাহিয়া নন্দকে বলিল, তুমি যদি আমার একটা ভার নাও, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুই।

কি হাসি, কি ভার?

আমার নীলুর ভার! সে যখন আব্দার করবে, তুমি যদি তা শোন, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুই।

শুনব হাসি, শুনব। কিন্তু নীল তোমায় যেমন করে বলে আমার কাছে কি তেমনি করে চাইবে? আমি তার আব্দার বুঝব কেমন করে?

পারবে, পারবে। যখনই ক্ষুধাতুর অন্ন চাইবে, তখনি জেনো আমার নীলুর ক্ষিদে পেয়েছে। শতগ্রন্থি বস্ত্র পরে, কি শীতে হি হি করতে করতে যখনই কেউ তোমার সামনে এসে দাঁড়াবে, তখনি বুঝবে আমার নীলু কাপড় চাইছে। যেখানে শুনবে ব্যথিতের কান্না, তাপিতের হাহাকার, জেনো আমার নীলু কাঁদছে। যেখানে দেখবে অনাথ, তাকেই জেনো আমার নীলু। তাকে বুকে তুলে নিয়ো, তার চোখের জল মুছিয়ো। যেখানে রোগ-শোক-যন্ত্রণা সেইখানেই আমার নীলুকে খুঁজো! আমার নীলু ত লুকিয়ে নেই, ভুবন ভরে রয়েছে।

হাসি, আজ থেকে এই আমার ব্রত। শুধু ব্রত নয়, প্রায়শ্চিত্ত। ফণি, মুঞ্জর ভার তোমার।

পরম স্নেহে মুঞ্জর হাত ধরিয়া হাসি বলিতে লাগিল, মুঞ্জ মুঞ্জ, আমার বড় আদরের মুঞ্জ! ঠাকুরপো, তুমি যত্নে রেখ। ঠাকুরঝি, তোর একটা সাধ আজ আমি মিটিয়ে যাব। আমায় গয়না পরাবার জন্যে বড় ঝগড়া করতিস্। আজ ফুলের গয়না পরিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিস।

বৌদি, এমনি করে কি তোমাকে আমি সাজাতে চেয়েছিলুম। হামান্দীস্তের ঘা আর কত মারবি, হাসি! বুক যে পিষে গেল।

যেন প্রতি সম্ভাষণে সুধা গলাইয়া হাসি শেষ আদরের ডাক ডাকিল—ঠাকুরঝি, মুঞ্জ, দিদি, পোড়ারমুখীকে কখন মনে করিস!

সবার মুখ থেকে হাসি কেড়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিস ভাই! বলিয়া হাসির বুকের উপর মুখ রাখিয়া শোকের শেষ সম্বল অজস্র চোখের জল ঢালিয়া মুঞ্জ সে স্বর্ণতনু সিক্ত করিতে লাগিল।

নন্দ অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, হাসি, আমায় একটা কথা বলে যাও! বুকের ভিতর যে চিতা জ্বেলে দিয়ে যাচ্ছ, দিন রাত ধু-ধু-করে জ্বললে আমি কেমন করে কি করব?

হাসি স্বর্গীয় হাসি হাসিয়া বলিল, তোমায়? বলবার কি আছে? তুমি আমার আমার—আমার! নীলুকে নিয়ে দুদিন থাক। তোমার যেটুকু ময়লা আছে, ধুয়ে যাবে। আমি এসে নিয়ে যাব। নীলু, চল, বাবা। এখানকার খেলা—

কথা সমাপ্ত না হইতে হাসির মুখে দিব্য জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল।

ভারতে বিদেশী ভাগ্যান্বেষী

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

সুদূর ইউরোপ হইতে উদ্যোগী পুরুষেরা যখন ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য দলে দলে সোনার ভারতে উপস্থিত হইতে লাগিল, তখনও এদেশের জনসমাজে শৌর্য্য বীর্য্য ও পাণ্ডিত্য-প্রতিভা একেবারেই লোপ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মহাদজী সিন্ধিয়া, পরশুরাম ভাউ পটবৰ্দ্ধন, তুকোজী হোলকর ও হায়দর আলীর মত বীরপুরুষেরা তখনও দেশ-জননীর অঙ্কশোভারূপে বর্ত্তমান। এমন কি রাজনৈতিক গগনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক চতুর-চূড়ামণি নানাফড়্নবিস্ও অন্তর্হিত হ'ন নাই। নানাদিকে এদেশের লোকের বল ও

* গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত ॥০ আনা সংস্করণের সপ্তদশ গ্রন্থ "বেগম সমরু" পাঠ করিয়া, দুই চারিজন বন্ধু আমাকে প্রশ্ন করিয়া পাঠান,—'কি গুণে বিদেশী ভাগ্যান্বেষীরা এদেশে আসিয়া প্রভাব বিস্তার করিত?' কথাটি ভাবিয়া দেখিবার মত, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধটি তাঁহাদের উত্তরে লিখিত।

বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইত; তথাপি বিদেশী আগন্তুকেরা ভাগ্যপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, বড় বড় রাজপদে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন;—ইহার কারণ কি?

মনে রাখিতে হইবে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ভারত বর্ষের ইতিহাসে এক মহাপরিবর্ত্তনের যুগ;—নূতন আসিতেছে, পুরাতন যাইতেছে। প্রাচীন মোগল-সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর মারাঠা-শক্তির পত্তন। সেই মারাঠা-শক্তি এতদিন বাড়িয়াই চলিয়াছিল, হঠাৎ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ যেন তাহাকে স্তম্ভিত করিয়া দিল। তারপর উত্তর-ভারতে মহাদ্‌জী সিন্ধিয়া অসাধারণ প্রতিভাবলে নূতন মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই সাম্রাজ্যের রক্ষা বা বিস্তারসাধন করিবার মত উপযুক্ত উত্তরাধিকারী তাঁহার ছিল না। দাক্ষিণে কতকগুলি ছোটখাট রাজ্য ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া এক করিয়া, হায়দর মহীশূরের শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ভারতের বাকি অনেক অংশেই ছোট-বড় খণ্ড খণ্ড স্বতন্ত্র রাজ্য, আর তার ছোটবড় রাজা। স্বার্থের বা মর্য্যাদার হানি কেহ বরদাস্ত করিতে অসম্মত, সুতরাং এরূপ দেশে যুদ্ধবিগ্রহ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এই অবস্থাটা বিদেশী ভাগ্যান্বেষীগণের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

কিন্তু শুধু বিদেশীদের নাম করিলেও চলিবে না, এদেশী লোকের মধ্যেও স্বার্থান্বেষী 'সুবিধাবাদী' লোকের অভাব ছিল না। ইহাদের মধ্যে যশোবন্ত রাও হোলকর ও পিণ্ডারী সর্দ্দার আমীর খাঁর নাম সমধিক প্রসিদ্ধ।

যশোবন্ত রাও তুকোজী হোলকরের জারজ-পুত্র; কাজেই তাহার দেহে রাজরক্ত ছিল। নাগপুরের রাজ-কারাগার হইতে আপনার বাহুবল সম্বল করিয়া তিনি পলায়ন করেন। তারপর ধার নগরের পবার-বংশীয় সর্দ্দারের অনুগ্রহে সাতটি মাত্র ঘোড়সওয়ার লইয়া নিজের চেষ্টায় পিতৃরাজ্যে আপনার শক্তি দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়া, অবশেষে পিতৃপ্রভু পেশবাকে পর্য্যন্ত রাজ্যচ্যুত করেন। ভাগ্যান্বেষী ছাড়া তাঁহাকে আর কি বলিব?

তারপর গোমান্তকের (গোয়ার) সুদূর পল্লীনিবাসের শেণবী-ব্রাহ্মণদিগকেও এই তালিকায় স্থান দেওয়া যাইতে পারে। তাহারা নিতান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় উত্তর-ভারতে সিন্ধিয়া ও হোল্‌করের রাজ্যে আপনাদের ভাগ্য পরীক্ষা করিতে আসিত। অনেকের সফলতার পরিচয়ও আছে। সামান্য সৈনিকরূপে সেনা-বিভাগে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের কেহ কেহ সিন্ধিয়া সরকারের সর্ব্বোচ্চ সেনাপতির পদ পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিল। এই ভাগ্যপরীক্ষার্থীদের সাহায্য পাইয়া জিবুবা দাদা বখ্‌শী এবং বল্লোভা তাঁত্যা সত্যসত্যই একদিন সিন্ধিয়ার রাজ্যে হর্ত্তাকর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছিল। লাখোবা দাদা, আম্বাজী ইঙ্গলিয়াও মারাঠা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। দৌলত রাও সিন্ধিয়ার শ্বশুর শর্জ্জা রাও ঘাটগে ও দ্বিতীয় বাজীরাও-এর নিতান্ত প্রীতিভাজন বালাজী কুঞ্জরকেইবাকেও স্বার্থসর্ব্বস্ব সাধারণ শ্রেণীর লোক ছাড়া আর কি বলিব? এইরূপ ছোটবড় অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা বাহুল্য।

এই ত গেল স্বদেশীয় লোকদের কথা। এইবার ইউরোপীয়দের কাহিনী।

সোনার ভারতের ধনধান্যের কাহিনী, ভাগ্যলোলুপ ইউরোপীয়দের কাণে যে অমৃত বর্ষণ করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর তাহারা ইহাও বিলক্ষণ বুঝিত যে 'উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।' কাজেই তাহারা ঘর ছাড়িয়া বাহিরের ডাকে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের যাহারা বিদেশের নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করে, তাহারা এই শ্রেণীরই পুরুষসিংহ; ইহাদেরই যত্নে ও চেষ্টায় আজ আমেরিকায়, দক্ষিণ আফ্রিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায় ও অন্যান্য স্থানে ইউরোপীয়ের বসবাস।

যাহারা ভারতে শুভাগমন করিয়াছিল, তাহারা পরিশ্রমী ও চেষ্টাশীল হইলেও, প্রভুভক্তিতে চরিত্র-গৌরবে ও কুলে-শীলে-মানে বড় ছিল বলিয়া মনে হয় না। কর্ণেল ম্যালিসন্ তাঁহার *Final French Struggle in India* গ্রন্থে কতকগুলি ভাগ্যার্থীর যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্টই মনে হয়, ইহাদের অধিকাংশই ভদ্রবংশীয় বা শিক্ষিত-পরিবারের লোক নহে।

ডি বয়ে, আর রেমণ্ড নামক দুই ব্যক্তিরই যৎকিঞ্চিৎ সামরিক শিক্ষার কথা শুনা যায়। পেরোঁ পলাতক নাবিক, পেদ্রোঁ বোরকুঁই ও জর্জ্জ টমাস্‌ও জাহাজের সাধারণ মাল্লা। বেগম সমরুর স্বামী রাইনহার্ট (সমরু) ও মেডক্ একেবারে সাধারণ নগণ্য সৈনিক। সমরু নামজাদা পুরুষ, কিন্তু তা'র সে নাম বিশ্বাসঘাতকতা ও নৃশংসতার জন্য। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, বিশ্বাসঘাতকতা

শুধু তাহারই চরিত্রের নিজস্ব বিশেষত্ব নহে। হতভাগ্য গোলাম কাদির যখন ঘোড়ার পিঠে ধনরত্ন লুকাইয়া পলাইতেছিল, তখন একজন পল্লীবাসী তাহাকে ধরিয়া মারাঠাদের হস্তে সমর্পণ করে। গোলাম কাদিরের ঘোড়া বা ধনরত্নের আর সন্ধান মিলে নাই। সেই সঙ্গে আরও একজন লোক বেমালুম অদৃশ্য হয়;—তিনি জাঠরাজার ফরাসী সেনানায়ক লিস্‌টেনু। কার্য্য এবং কারণের অনুসন্ধান করিতে গিয়া সকলেই এইরূপ বুঝিল যে, আট্‌লান্টিক্ পার হইয়া লিস্‌টেনুর হিন্দুস্থানে আসিবার একমাত্র কারণ—সুবর্ণ। যে মুহূর্ত্তে সেই সুবর্ণ তাঁহার করতলগত হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি এদেশ হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।

ডুদ্রেনেকের উপাধি—'শিভালিয়ার'; এই আখ্যা দেখিয়া তাহাকে ভদ্রবংশের সন্তান বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহার আচরণ কিরূপ সেনা বা ভদ্রজনোচিত ছিল, পরীক্ষা করা যাক। তুকোজী হোলকর তাহাকে সেনানায়ক পদে নিযুক্ত করেন। তুকোজীর মৃত্যু হইলে, উত্তরাধিকার লইয়া তাঁহার দুই পুত্র—কাশী রাও ও মল্‌হর রাও-এর মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। পিতৃবৈরী সিন্ধিয়ার সাহায্যে কাশী রাও রাজ্যলাভ করেন; আর শত্রুপক্ষের অতর্কিত নৈশ-আক্রমণে অসতর্ক মল্‌হর রাও প্রাণ হারান। ডুদ্রেনেক্ কাশী রাও এর প্রভুত্বই স্বীকার করে। ইহার পরে যশোবন্ত রাও এর অভ্যুদয়। অল্পমাত্র সেনা লইয়া যশোবন্ত যখন ডুদ্রেনেকের এক বাহিনীকে পরাস্ত করেন, তখন বিনা বাধায় ডুদ্রেনেক্ সৈন্যসামন্ত লইয়া যশোবন্তের দলে যোগদান করে। তারপর যশোবন্তের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের সময়ে, ডুদ্রেনেক্ আবার নিঃসঙ্কোচে হোলকরের শত্রু সিন্ধিয়ার পক্ষ অবলম্বন করে; আবার সিন্ধিয়ার সহিত ইংরেজদিগের বিবাদ বাধিলে, সে ইংরেজদিগের সঙ্গে রফা করিয়া, সিন্ধিয়াকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

সিন্ধিয়ার প্রধান সেনাপতি, বাণিজ্যপোতের পলাতক মাল্লা, পেরোঁ ইংরেজের সহিত সিন্ধিয়ার সঙ্ঘর্ষের (তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধের) সময়, নিমকের সম্মান ক্ষুণ্ণ করিয়া, প্রভুভক্তির উপর পদাঘাত করিয়া, ফরাসীর জাতীয় বৈর ভুলিয়া, স্বার্থ-রক্ষার জন্য জনকয়েক ইউরোপীয় সেনানীর সহিত প্রভুর (সিন্ধিয়ার) সৈন্যদল পরিত্যাগ করিয়া, ইংরেজ-অধিকারে চলিয়া যায়। বলা বাহুল্য, যুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব্বেই ইংরাজ-সরকারের সহিত গোপনে তাহার একটা চুক্তি হইয়াছিল।

ইংরেজ-লেখকেরা এই সব ইউরোপীয়-যোদ্ধার চরিত্রের মাহাত্ম্য যতই কেন বর্ণনা করুন না, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ইহারা চরিত্রবলে দেশীয় রাজ্যসমূহের সেনাবিভাগে প্রভুত্ব লাভ করেন নাই।

তবে কোন্ গুণে তাহারা প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি লাভ করিয়া সফলতার বরমাল্যে ভূষিত হইল? ইহারা যে উদ্যোগী পুরুষ, সে কথা আগেই বলিয়াছি। উন্নতিলাভের যে আকাঙ্ক্ষা তাহাদিগকে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে উত্তীর্ণ করাইয়াছিল, তাহারই প্রেরণা তাহাদের সম্মুখে-উপস্থিত কোন সুযোগই হেলায় হারাইতে দেয় নাই। এই সুযোগলাভের প্রধানতম হেতু তাহাদের সামরিক খ্যাতি। ইউরোপীয়েরা বড় যোদ্ধা, এই ধারণা ভারতবাসীর মনে বিশেষভাবে স্থান পাইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এ ধারণা অমূলক নহে। এদেশবাসীর চোখের সম্মুখেই ফরাসী গভর্ণর ডুপ্লে মুষ্টিমেয় ফরাসী ও সিপাহী সেনা লইয়া কর্ণাটকের নবাব আন্‌ওয়ার উদ্দীনের বিরাট্ সেনাবারিধির বিপুল তরঙ্গবেগ রোধ করিলেন। তারপর বোম্বাই-এর ইংরেজ-বণিক্‌গণ মাত্র দেড় হাজার সৈন্য লইয়া, মারাঠা-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। সে যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে ইংরেজেরই পরাজয় হয়।

কিন্তু সে'বার ইংরেজ-সৈন্যগণ যে শিক্ষার—ইংরেজ সেনানায়কগণ যে রণকৌশল ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিল, গুণজ্ঞ সিন্ধিয়া তাহা কখনও ভুলিতে পারেন নাই। তাই তিনি ইউরোপীয়-প্রণালীতে আপনার সৈনিকগণকেও শিক্ষা দিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। হোলকর ও পেশ্‌বা রণচতুর সিন্ধিয়ার রণনীতির অনুকরণে ইউরোপীয় সেনানায়ক নিযুক্ত করেন। ছোট ছোট রাজ্যের রাজারা আগে হইতেই ইউরোপীয়গণের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া, ইউরোপীয় সেনানায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

আক্‌বর বাদ্‌শার আমলে, (ষোড়শ শতাব্দীতে) ইউরোপ ও এসিয়া অস্ত্রবিদ্যায় সমকক্ষ ছিল। কিন্তু, তাহার পর উন্নতিশীল ইউরোপীয়েরা যত্ন ও চেষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহার বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিল; আর ভারতীয়-সৈনিকেরা আক্‌বরী-আমলের সামরিক প্রথায় পরিতুষ্ট থাকিয়া, তাহারই জের টানিতে লাগিল। আক্‌বর, এমন কি আওরংজীবের আমলেও দেখা যায়, ইউরোপীয়েরা সেনা-বিভাগে উচ্চপদ লাভ করিতে পারে

নাই, অনেক নীচু স্থানে অবস্থান করিতেছে। এদেশীয়েরাই তাহাদের প্রভু, এবং তাঁহাদের কাছে ইহারা যেন নিতান্ত কৃপার পাত্র। প্রমাণস্বরূপ বার্নিয়ার সাহেবের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি আওরংজীবের মন্ত্রী দানিশ্‌মন্দ্‌কে 'আঘা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। 'আঘা' নিরতিশয় সম্মানসূচক সম্বোধন, কোনও পদস্থ ব্যক্তি বাদশাহ ভিন্ন অপর কাহাকেও নিজের 'আঘা' বলিতে পারেন না। যে অপরকে 'আঘা' শব্দ ব্যবহার করে, সে তাঁহার অনুগত, দাস বা ভৃত্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত অবস্থা,—ইউরোপীয় উদ্যোগী পুরুষেরাই কর্ত্তা, আর এদেশীয়েরা যেন তাহাদের অঙ্গুলী হেলনে পরিচালিত। মীর কাসিমের দরবারে গুর্গিন খাঁ, নিজামের রাজ্যে বুসী, ইহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

সুতরাং পূর্ব্বাপর বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়, ইউরোপীয়দের যে Progressive spirit অর্থাৎ, উন্নতিপ্রবণ স্বভাব, তাহাদিগকে ধনে-মানে শৌর্য্যে বীর্য্যে জগতে বরেণ্য করিয়াছে, ভারতে প্রতিষ্ঠালাভের মূলেও ঠিক তাহাই। ইহার জন্যই তাহারা দেখিতে দেখিতে সর্ব্বাংশে ভারতবাসীদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইল, আর ইহার জন্যই তাহারা সুযোগের স্বর্ণ মুহূর্ত্তগুলির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর হইয়া উঠিল।

কিন্তু এখানে ইহাও অস্বীকার করিলে চলিবে না যে কেবলমাত্র Progressive spiritই সকল সময় উন্নতিলাভের কারণ হইতে পারে না; উপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধা চাই। এই সুযোগ ও সুবিধা তখন তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত ছিল। ভারতের তখন পতনের অবস্থা। দেশের নানাস্থানেই অরাজকতার তাণ্ডব লীলা সুরু হইয়াছিল। নানাদিকে ভারতবাসীর ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেলেও, কোন কেন্দ্রগত বিরাট শক্তি অখণ্ডভাবে দেশের উপর ক্রীড়া করে নাই। যে-সকল কাজে এদেশের স্বার্থ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, পরিণাম শোচনীয় হইয়া উঠে, তাহার প্রতিবিধান করিবার মত ভবিষ্যদ্দৃষ্টিপূর্ণ সতর্ক দৃষ্টি তখন কাহারও ছিল না। সুতরাং সহজেই ইউরোপীয়েরা বড় বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ সহজে গ্রহণ করিয়া, নিজেরাই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, এবং স্বজাতিগণের কর্ত্তৃত্বলাভের পথও উন্মুক্ত করিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিল।

বিশ্ব-ভারতী

[শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল্]

মিথ্যা লজ্জা

অনেক বৎসর পূর্ব্বে এক দিন নটকুলচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখরের সহিত একত্র আলমবাজার হইতে আসিতেছিলাম। আমার হাতে 'সুজনন বিদ্যা' সম্বন্ধীয় একখানি ইংরাজী পুস্তক দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'মাষ্টার, দেশের হাওয়াটা একটু বদ্‌লেছে। তোমার ন্যায় কৃতবিদ্য লোকের হাতে এসব বই দেখে খুব আশা হয়, দেশটা মিথ্যা লজ্জার হাত থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু তুমি যদি আমাদের প্রাচীন ঋষিদের সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে এগুলি মিলিয়ে দেখ, তাহ'লে দেখ্‌তে পাবে বিষয় পাশ্চাত্যদের সবে এই হাতে খড়ি হচ্ছে। ব্যোমকেশের বিবাহের দু'এক বছর পরেই, আমি তাকে এ বিষয়ে শিক্ষা দিতে লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করি নাই। তুমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে পার। দেশের এই রুগ্ন, শীর্ণ, চোখ-বসা ছেলেগুলোকে দেখ্‌লে প্রাণটা আমার বড় কেঁদে উঠে। মনে হয়, জাতটা উচ্ছোন্ন হয়ে যাবে। যৌন ব্যাপার সম্বন্ধে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া প্রত্যেক বাপ-মায়েরই কর্ত্তব্য।' তার পর অনর্গল সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করিয়া, পাশ্চাত্য মতের সহিত মিলাইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে বুঝিয়াছিলাম, এ বিষয়ে তিনি কত চিন্তা করিয়াছেন, কত পড়িয়াছেন। যাক্‌ সে কথা। তিনি যে সব কথা বলিয়াছিলেন, তাহার কতকটা আভাস সেদিনকার একখানা ইংরাজী পত্রে দেখিলাম। ইংলণ্ডের জনৈক মন্ত্রী দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন, "দেশের বাপ-মা'রা ছেলেদের যৌন সম্বন্ধের বিষয়ে কিছুমাত্র শিক্ষা দেন না। ফলে নানাবিধ রোগের সৃষ্টি হইতেছে। এই যে দেশব্যাপী ছেলেদের জীবনী-শক্তির হ্রাস, চোখ-মুখ-বসা, শরীর ও মনের

অবসাদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ বাড়ীতে বাপ-মা'রা এ সব বিষয়ে শিক্ষা দেন না, বা দিতে লজ্জা বোধ করেন। এই মিথ্যা লজ্জার ফলে দেশটা উৎসন্ন যাইতেছে। মনে করিও না, আমি অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতেছি। আমার সংগৃহীত তালিকা হইতেই এ কথা বলিতেছি। অনেক বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষ, তাহাদের বাপ-মা'র বা অভিভাবকদের নিকট হইতে সময়ে শিক্ষা না পাওয়ায়, যে সর্ব্বনাশের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা আর লিখিয়া বলিবার নয়। সময়ে যদি তাহারা উপদেশ পাইত, তাহ'লে সুস্থ সবল পুত্র-কন্যার জন্ম দান করিয়া দেশটাকে শক্তিশালী করিতে পারিত। এখন যৌন ব্যাপার সম্বন্ধে অনেক পুস্তক বাহির হইয়াছে। প্রত্যেক বাপ-মা'র কর্ত্তব্য, সেগুলি মনোযোগ দিয়া পড়িয়া তাহাদের ছেলে-মেয়েদের সময় মত শিক্ষা দেওয়া। এই ভীষণ যুদ্ধে দেশের লোকসংখ্যা যেরূপ কমিয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয়, প্রত্যেক নরনারীরই কর্ত্তব্য, মিথ্যা লজ্জা ত্যাগ করিয়া তাহাদের ছেলেমেয়েরা যাহাতে ভবিষ্যতে সুস্থ সবল ছেলেমেয়েদের বাপ-মা হইতে পারে, সে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া। আর যাহাতে রোগের বীজাণু উত্তর-পুরুষে সংক্রামিত না হয়, তাহাও দেখা প্রত্যেক বাপ-মা'র কর্ত্তব্য।"

কথা-সাহিত্যে আর্ট ও চরিত্র

বাস্তবতার যুগে ঔপন্যাসিকের কর্ত্তব্য হচ্ছে নিখুঁত ছবি আঁকা। যাহা মনস্তত্ত্বের পরিপন্থী, যাহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সঠিক বর্ণনাই তাঁহাদের কাজ। এক কথায় বলতে গেলে, তাঁরা যেন হাতে সমাজের দর্পণ ধরে রেখেছেন। সেখানে যেটি যেমন ভাবে প্রতিভাত হচ্ছে, তাঁরা তেমনি ভাবে অঙ্কন করছেন। সেদিন Nineteenth Century পত্রে নারী-ঔপন্যাসিক Mrs. Champion de Crespigny বলতে চান, আজকালকার কথা-সাহিত্য-লেখকেরা লোকমতের পোষকতা করিয়াই লিখে থাকেন,—তাঁরা সৃষ্টি করেন না। প্রকৃত সাহিত্যের উদ্দেশ্য কেবল সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করা নয়—কেবল পটুয়ার মত ছবি আঁকা নয়—কেবল যদৃষ্ট তালিপিতং গোছের নকলনবীশের কার্য্য করা নয়। তাঁর কার্য্য হচ্ছে মহান্ লোকমতের সৃষ্টি করা—নূতন ভাবের সন্ধান দেখাইয়া দেওয়া—নূতন বাণীর প্রচার করা;—পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়া নূতন সমাচার প্রদান করাই ঔপন্যাসিকের প্রধান কর্ত্তব্য (The true mission of literature is, to bring a message, not merely to reflect it, from its own environment)। বাস্তবিকই কথাগুলি প্রণিধান-যোগ্য। চরিত্রের যথাযথ বর্ণন ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি যেমন ঔপন্যাসিকের কর্ত্তব্য, মহান্ আদর্শের সৃষ্টিও তেমনি তাঁহার অন্যতম কর্ত্তব্য। উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া আমরা কি শিক্ষা করিলাম, তাহাও দেখিতে হইবে—তাহার ফলশ্রুতিকে বাদ দিলে চলিবে না।

মেটারলিঙ্ক

কিছু দিন পূর্ব্বে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইকাউন্ট বারণ্হামের সভাপতিত্বে M. Emile Commaerts মেটারলিঙ্ক সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দান করিয়াছেন, তাহার সারাংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

বেলজিয়ামের স্বনামধন্য কবি মেটারলিঙ্কের লেখনীর ভিতর আমরা তিনটী স্তর দেখিতে পাই। ১ম, অতীন্দ্রিয়বাদ (১৮৯০—১৮৯৮)। এ যুগের শ্রেষ্ঠ নাটক La Princess Maleme। ইহা একখানি রূপক নাট্য (Symbolic drama)। দ্বিতীয় স্তরে মেটারলিঙ্ক রূপক ছাড়িয়া বাস্তবতার দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। এ স্তরকে বাস্তববাদ বলা যাইতে পারে। (১৮৯৮—১৯০৯) Mary Magdalene প্রভৃতি উৎকৃষ্ট নাটক এ যুগের লেখা। তৃতীয় স্তরে আবার তাঁহাকে অতীন্দ্রিয়বাদী রূপে দেখিতে পাই। প্রথম ও তৃতীয় স্তরের ভিতর পার্থক্য এই—প্রথমে তাঁহাকে আমরা বিয়োগান্ত নাট্য (tragedy) লিখিতে দেখি; পরিশেষে তিনি মিলনান্ত নাটক (comedy) লিখিয়াছেন। প্রথম যুগের লেখনী হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, যে জিনিষ আমরা জানি, অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের উপর অজানা অতীন্দ্রিয়ের প্রভাব বিদ্যমান। যাহা আমরা দেখিতে পাই, তাহার চেয়ে যাহা আমরা দেখিতে পাই না, তাহা অধিক শক্তিশালী—তাহার প্রয়োজনীয়তাও অধিক। তাই এ যুগের নাটকের বিশেষত্ব—বাণী-প্রচার,—কার্য্যের আবশ্যকতা এখানে নাই। এসব লেখায় নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়া অদৃষ্টের গোপন বাণী শুনিতে পাওয়া যায়। এই আদর্শের জন্য তিনি সেক্সপীয়রের নিকট কতকটা ঋণী।

Pellas et Melisande নাটকখানি অভিনীত হইবার উপযোগী নয় বলিয়া অনেকেরই ধারণা ; কারণ, অনেক ভূমিকার অংশ ঠিক মত মানুষের দ্বারা অভিনীত হওয়া সম্ভবপর নয়। ইহার অপর একটা কারণও আছে। স্বয়ং নাট্যকার কয়েক বৎসর পরে তাঁহার পূর্ব্বতন নাটকগুলিকে পুতুল-বাজির খেলা (plays for puppets) নাম দিয়াছিলেন। প্রথমে জার্ম্মানিতে ও পরে ইংলণ্ডেও মূর্ত্তিসহ এগুলির মূকাভিনয় হইয়াছিল। আমাদের কিন্তু এরূপ অভিনয়ের আবশ্যকতা কিছুমাত্র ছিল বলিয়া মনে হয় না ; কারণ, নট যদি মেটারলিঙ্কের ভাবে অনুপ্রাণিত হ'ন, তাঁর ভূমিকাকে নিজস্ব করিয়া ল'ন; তাহা হইলে সুফল ফলিবেই ফলিবে। আর তাহা না হইয়া নট যদি কেবল দর্শকের মনোরঞ্জন ও ইংরাজীতে যাহাকে stage effect বলে, তাহার অনুরাগী হ'ন, তবে সব ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় স্তরে 'অজানা'র প্রভাব, 'জানা'র উপর দেখিতে পাওয়া যায় না—ঠিক ইহার বিপরীতটাই দেখিতে পাওয়া যায়। 'জানা'র প্রভাব 'অজানার' উপর—'দর্শনীয়ের' প্রভাব 'অদর্শনীয়ের' উপর—'কায়ের' প্রভাব 'বাণীর' উপর দেখিতে পাওয়া যায়। এ যুগের নাটক ঠিক সাধারণ নাটকের মত। নাট্যকারের এই পরিবর্ত্তনের কোন কারণ জানিতে পারা যায় না। তবে ১৯০৪ সালে তিনি একবার বলিয়াছিলেন, আধুনিক নাটক সাময়িক হওয়া উচিত। ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক হইলে চলিবে না; কেন না, সেগুলি কাল্পনিক। আমি বাস্তব জগতে থাকিতে চাই, —যেমন ইংরাজের ভিতর সেক্সপীয়র ও গ্রীকদের ভিতর ইউরিপিডেস ছিলেন।

১৯০৯ সালে আবার তিনি কতকটা প্রথম যুগের দিকে ফিরিয়া যান। প্রথম যুগের দার্শনিক মতের সহিত এ যুগের কোন মিল নাই। প্রথম যুগে যাহা মিলনান্ত ছিল, এ যুগে তাহা বিয়োগান্ত হইয়া উঠিল। এ যুগের শ্রেষ্ঠ নাটক Blue Birds (নীলপাখী) ও Betrothal.

এখন কথা হচ্ছে, অতীন্দ্রিয়বাদী মেটারলিঙ্ককে কেন বস্তু-তন্ত্রের পুরোহিতরূপে দেখিতে পাই। ইহার উত্তরে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন ; কিন্তু সে সব কথা সমীচীন বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। একটা মত এখানে বলি। ১৮৯৮ সালে তিনি জন্মভূমি বেলজিয়ম ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন ; এবং জনৈক অভিনেত্রীকে বিবাহ করিয়া ঘরসংসার পাতেন। তাঁহার পত্নীর অনুরোধে তিনি কয়েকখানি বাস্তব নাটক লিখিয়াছিলেন। আমাদের মতে, তিনি যে দার্শনিক মত লইয়া নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন, তাহা খুব উচ্চাঙ্গের। তিন ঘণ্টা ধরিয়া বিয়োগান্ত নাটকের দৃশ্যাবলী দেখিয়া দর্শকের মনে একটা অবসাদ আসিত বলিয়া তিনি একটু রকম ফের করিলেন • বাস্তব নাটক লিখিলেন ; কিন্তু ইহাতে তাঁহার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইল দেখিয়া আবার তিনি অতীন্দ্রিয়বাদের দিকে ঝুঁকিলেন। কিন্তু এবারও তিনি একটু রকম ফের করিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ যুগের উৎকৃষ্ট নাটকগুলি সর্ব্বজনাদৃত হয় নাই। অনেকেরই ধারণা, তিনি যদি আবার বেলজিয়মে ফিরিয়া যাইতেন, তাহা হইলে প্রথম যুগের মত সর্ব্বজনাদৃত নাটক লিখিতে পারিতেন।

১৯২০-২১ সালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজী উপন্যাস

প্রতি বৎসর কথাসাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইংরাজী গ্রন্থকারকে দুইখানি ফরাসি পত্রিকা "Femines" ও "Vie Henreuse" একটা পারিতোষিক দিয়া থাকেন। পুরুষ ও রমণী লেখক লেখিকা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারেন। Miss Constance Holmes এর "Splendid Fairing" এ বৎসরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। গত বৎসরও একজন রমণীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়াছিল। তাঁহার নাম Miss Cicely Hamilton ; আর তাঁর উপন্যাসের নাম William an Englishman। এই দুই বৎসরের পূর্ব্বে কোন লেখিকাই এই সম্মানাই পারিতোষিক পান নাই।

সারা বার্ণহার্ড

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী সারা বার্ণহার্ড বিলাতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ১৮৭৯ সালে প্রথমবার যখন তিনি বিলাতে আসিয়া 'গেইটী' থিয়েটারে অভিনয় করিতে থাকেন, তখন তিনি ৭৭ নং চেষ্টার স্কোয়ারে বাস করিয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁর আশ-পাশের লোকেরা তাঁর জানোয়ার-প্রীতি দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পোষা কুকুর, তোতাপাখী, বাঁদর তাঁহার ছিল। বাঁদরের নাম সখ করিয়া রাখিয়াছিলেন

'ডারউইন'! এসবগুলির জন্য তাঁহাদের ভয়ের কোন কারণ ছিল না; কিন্তু খোলা নেকড়ে বাঘ যখন তাঁহার বাগানে বেড়াইত, তাহা দেখিয়া অনেকের অন্তরাত্মা শুকাইয়া যাইত। আবার তিনি তাহার সখের চিতাটাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতে চাহিতেন।

বিলাতের অভিনেত্রীরা সেদিন তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছে। বিলাতের বিখ্যাত অভিনেত্রী Mrs. Kendal ও Miss Ellen Terry অভিনেত্রীদিগের মুখপাত্রী হইয়া প্রিন্সেস্ থিয়েটারে 'নটীয়সী সারাকে যে অভিনন্দন পত্র দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের আন্তরিকতা ও ভালবাসা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। এক স্থলে তাঁহারা বলিয়াছেন, আপনার কলা-চাতুর্য্য, অদম্য উৎসাহ ও নির্ভীকতার উজ্জল দৃষ্টান্ত ফ্রান্সের গুণাবলীর নিদর্শন স্বরূপ। আপনার এই পূজার দ্বারা, কলা কুশলা এ যুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীকে বরণ করিয়া, আমরা আমাদের প্রধান সহায়ক ফ্রান্সকে অভিনন্দিত করিতেছি।

এই অভিনন্দনের আন্তরিকতায় সারা এতদূর মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, ইহাদিগকে ধন্যবাদ দিতে গিয়া, তিনি কিছুই বলিতে পারেন নাই; কেবল বলিয়াছিলেন, আমি আপনাদের নিকট চিরঋণী।

বিয়োগান্ত নাটকে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখাইতে তাঁহার তুল্য কেহ নাই। জীবনে দশ হাজার ভূমিকায় স্বহস্তে বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বিভলভারের সাহায্যে পাঁচ হাজার বার তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন, সাতাইশ বার নানারূপ নৈসর্গিক কারণে মারা গিয়াছেন। মৃত্যুর দৃশ্য অপর কেহ তাঁহার ন্যায় সহজ সরল ভাবে দেখাইয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। তুরস্কের আবদুল হামিদ ইয়ালদিজে একবার তাঁহার মৃত্যু-দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া চলিয়া যান, এবং বলিয়া যান, 'মৃত্যুকে এরূপ অনুকরণ করিতে কাহাকেও দেখি নাই; আর স্ত্রীলোকের দ্বারা এরূপ অনুকরণও জীবনে দ্বিতীয়বার দেখিতে চাই না।'

মার্ক-টোয়েন

ঠিক এগার বছর পূর্ব্বে ২১শে এপ্রেল তারিখে রসরাজ মার্ক টোয়েনের মৃত্যু হয়। রস-রচনায় তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। আজ পর্য্যন্ত তাহার ত্যক্ত সিংহাসন শূন্যই রহিয়াছে। তাঁহার রস-রচনার মধ্যে কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ, এ বিষয় লইয়া অনেক মতভেদ আছে। কাহার-কাহারও মতে 'নীচমনা হানিবল'ই শ্রেষ্ঠ। হানিবল তাহার জামাতাকে দুগ্ধবতী গাভীর উত্তমাংশ বিক্রয় করিয়াছিল; বেচারী তাহাকে ঘাস, জল, বিচালী খাওয়াইয়া যখন দুগ্ধ দিবার মত করিল, তখন তাঁহাকে দুগ্ধের ভাগ দিতে হানিবল কিছুতেই রাজি হইল না; কেন না গাভীর পশ্চাৎ-ভাগটা ত সে জামাইকে বিক্রয় করে নাই। জামাই বেচারা গরুর সেবা করিত,—গরুটা তাহাকে বেশ চিনিয়াছিল। পরে যখন গাভী বৃদ্ধকে গুঁতাইয়া দিয়াছিল, তখন সে জামাইএর নামে ক্ষতিপূরণের দাবীতে নালিশ করিয়াছিল।

অল্পদিন হইল মার্কের একটা নূতন রস-কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এটা তাঁহারই লেখা। মার্ক লিখিতেছেন, এক সময়ে আমি হানিবলে ছিলাম। একটা বাড়ীর ছ-তোলায় আগুন লাগিয়া যায়। বৃদ্ধ ছেনেসি সেখানে ছিল। অত উচুতে মই যায় না। বৃদ্ধ জানালার ধারে মুখ বাড়াইয়া দাড়াইয়া ছিল। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলাম। অগ্নিশিখা তাহার চারিদিকে লক্‌লক্ করিতেছিল। তার পর আমি বলিলাম, এটা বড় একঘেয়ে হইয়া পড়েছে, একটা দড়ি লইয়া এস। জনৈক লোক দড়ি আনিয়া দিল। তার পর আমি ছুঁড়িয়া বুড়োর কাছে দিলাম; এবং চীৎকার করিয়া বলিলাম, তোমার কোমরে জড়াও। সেও তাহাই করিল, এবং আমি তাহাকে টানিয়া আনিলাম,—ভূমিসাৎ করিলাম।

গেটের বিশেষত্ব

Contemporary Review পত্রে গুচ সাহেব, গেটের বিশেষত্ব কিসে, এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। সিলারের মতে তাঁহার প্রাণ (spirit), তাঁহার রচনাবলী, তাঁহার সর্ব্বদিকেই সত্যের অনুসন্ধিৎসা, এবং তাঁহার ব্যষ্টিকে সমগ্র ভাবে দেখিবার শক্তিই তাঁহাকে বরেণ্য করিয়াছে।

তাঁহার কাব্যে, তাঁহার সূত্রে (Aphorism), তাঁহার পত্রে, তাঁহার কথাবার্ত্তায় জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারের আহৃত রত্ন সমুদায়ের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বায়রণের মতে এই কারণে তিনি পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ভাব-রাজ্যের

একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। লেখার প্রাচুর্য্যে, জ্ঞানের উৎকর্ষে ও ব্যাপকতায় আধুনিক জ্ঞান ও ভাব-রাজ্যে গেটে মস্তক উত্তোলন করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান।

বল্‌শেভিক ধ্বংসবাদ

রুসিয়ার প্রসিদ্ধ লেখক Maxim Gorky সোভিয়েট গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারীদের যে অত্যাচারকাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কতকাংশের সার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। গোরকি বলশেভিকবাদের একজন অগ্রদূত। তাঁহার লেখনী হইতে বলশেভিকদিগের ভাবের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি অত্যাচারের সম্পূর্ণ বিরোধী;—নূতনের সৃজন করিবার আশায় তিনি পুরাতনকে ধ্বংস করিতে চান না। 'কাজের লোক কে? সেই কাজের লোক, যে প্রকৃতির বিকৃতি সাধন করিয়া মানবের উপকার করিতে পারে;—সেই কাজের লোক, যে লৌহ, মৃত্তিকা বা কাষ্ঠের অংশবিশেষ লইয়া সুন্দর ও শোভন দ্রব্য গঠন করিতে পারে, মানুষের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে। এক কথায় বলিতে গেলে, কাজের লোক সে-ই, যে মানুষের পরিশ্রমের লাঘব করিয়া দেয়—মানুষের সৌন্দর্য্য-বোধকে যে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেয়;—সঙ্গে সঙ্গে যে তাহাকে আনন্দ দান করে। আমাদের চারিদিকে যা কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস দেখিতে পাই, তাহাই শিল্পীর দান।'

'এ কথা খাঁটি সত্য। আর এ কথা সত্য বলিয়া, কাজের লোকদের—শিল্পীদের জানা উচিত যে, তাদের কাজের দাম আছে। তাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমলব্ধ দ্রব্য তাদের প্রাণের জিনিস।'

'রুসিয়ার বিপ্লবের (Revolution) পূর্ব্বে শিল্পীর দ্রব্য-সম্ভার কেবল তাহাদের ধনী মনিবদেরই ভোগ্য ছিল; এক্ষণে তাহা সমস্ত দেশের জিনিস হইয়াছে। শিল্পীকে এ কথাটা বেশ করিয়া বুঝিতে হইবে। শিল্পীর হাতে-গড়া কাজগুলিকে ধ্বংস করিয়া যাহারা নূতন করিয়া গড়িতে চাহিতেছে, তাহাদিগকে অসভ্য ব্যতীত আর কি বলিয়া অভিহিত করিব? তাহাদের সৌন্দর্য্য বোধ ত নাই-ই,—ব্যবহারিক জ্ঞানও নাই। শিল্পীর কত পরিশ্রম, কত রক্ত যে ঐ সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত করিতে ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা কি তাহারা একবার ভাবিয়া দেখে না? এ সব জিনিস কেবল তাহাদের নয়; তাহারা প্রস্তুত করে নাই বলিয়া কি তাহারা একূপ নৃশংস অত্যাচার করিবে? এই সকল অসভ্যেরা নূতন করিয়া সুন্দর ভাবে গড়িবার অজুহাতে ভাঙ্গিতেছে। ভাঙ্গন সোজা, গড়নটা সোজা নয়। বহু শতাব্দী ধরিয়া যাহা মানবকে সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে,—মানবের উপকারে আসিয়াছে, তাহা ভাঙ্গা কিছুতেই উচিত নয়।'

'যাহারা ভাঙ্গিতেছে, তাহারা আমাদের শত্রু। ধনীর স্বার্থের জন্য তাহারা একূপ করিতেছে। ধনীরা ভাবিতেছে, শিল্পীরা না খাইতে পাইয়া ও না পরিতে পাইয়া, আবার তাহাদের দুয়ারে ছুটিয়া আসিবে। বিপ্লব রুসিয়ার যে উন্নতির সূচনা করিয়াছে, এই অত্যাচারে তাহার অনেকটা ক্ষতি করিবে। দৈনিক ব্যবহারোপযোগী জিনিসের ধ্বংস করা সামাজিক ও রাজনৈতিক পাপ ও দোষ (political and social crime)।

প্রেম ও জাতি

[শ্রীনিশিকান্ত সেন]

নহি মুসলমান আমি
আমি যে গো পুতুল পূজারি,
প্রণমি চরণে মোর প্রেম প্রতিমারি
পূজারতি করি যে তাহারি।

নহি গো ব্রাহ্মণ আমি,
যজ্ঞসূত্র দূর করি দিয়ে
মাথার বেণীটি তাঁর সোহাগে যতনে
কণ্ঠ বেড়ি লয়েছি পরিয়ে।

(দিওয়ান্—জেব্-উন্নিসা)

রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি

(শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের উদ্দেশে তথাকার সর্ব্বাধ্যক্ষকে লিখিত)

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ—

এবার তোমাদের ছুটি কবে আরম্ভ হবে জানিনে ;—তাই এই চিঠিগুলি তোমার জিম্মায় পাঠাচ্চি—যথামত বিলি করে দিয়ো। আমার দেশে ফেরবার সময় কাছে এসেছে। একদিকে মন যেমন খুসী হচ্চে, তেমনি আর একদিকে ভয় লাগ্‌চে, পাছে দেশের লোকের সঙ্গে আমার সুর না মেলে। Nationalism হচ্চে একটা ভৌগোলিক অপদেবতা,—পৃথিবী সেই ভূতের উপদ্রবে কম্পান্বিত ; সেই ভূত ঝাড়বার দিন এসেছে। কিছুদিন থেকে আমি তারি আয়োজন করচি। দেবতার নাম করলে ভূতেরই অপমান লাগে। আমাদের শান্তিনিকেতনের দরজায় সেই দেবতার নাম লেখা ; আমাদের বিশ্ব-ভারতীতে সেই দেবতার মন্দির গাঁথ্‌চি। দেশের নাম করে এখানে যদি আমরা কোনো বাধা দেবার বেড়া তুলি, তা'হলে আমাদের দেবতার প্রবেশ-পথে বাধা দেওয়া হবে। যে ভারতবর্ষকে বহুকাল সমস্ত পৃথিবী একঘরে করে রেখেছে, সেই ভারতবর্ষে সমস্ত পৃথিবীকে নিমন্ত্রণ করবার পত্র নিয়ে আমি বেরিয়েছিলুম—পাছে কিছুতে এই নিমন্ত্রণের পথ রোধ করে সেই আমার ভয়। অন্যায়কে অত্যাচারকে আমি কারো চেয়ে কম ঘৃণা করি, এ কথা মান্‌তে পারবো না—পঞ্জাবের ঘোর দুর্দ্দিনের সময়ে সমস্ত দেশে আমি ছাড়া আর একজনও একটি কথাও বলেনি। আমার শরীরে রক্তের পরিবর্ত্তে বরফ-জল প্রবাহিত হচ্চে, একথাও সত্য নয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস, দেশের চেয়েও বড় জিনিস আছে ; সেই বড় জিনিসকে পেলে তবেই দেশ বড় হবে। যে মানুষ নিজের বাড়ীর সমস্ত দরজা-জানলার পথ বন্ধ করে তুলে দেয়াল গাঁথা সুরু করে, সেই যে নিজের বাড়ীকে ভালবাসে একথা মিথ্যা। যে গৃহস্থ বিশ্বের আকাশকে আলোককে নিজের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবার পথ উন্মুক্ত করে দেয়, সেই ঘরকে যথার্থ ভালবাসে। সেদিন যখন খবরের কাগজে পড়লুম মহাত্মা গান্ধী আমাদের মেয়েদের বলেছেন, তোমরা ইংরেজি পড়া বন্ধ কর, সেইদিন বুঝেছি আমাদের দেশে দেওয়াল গাঁথা সুরু হয়েছে, অর্থাৎ নিজের ঘরকে নিজের কারাগার করে তোলাকেই আমরা মুক্তির পথ বলে মনে করচি—আমরা বিশ্বের সমস্ত আলোককে বহিষ্কৃত করে দিয়ে নিজের ঘরের অন্ধকারকেই পূজা করতে বসেছি—এ কথা ভুলেছি, যে সব দুর্দ্দান্ত জাতি পরকে আঘাত করে' বড় হতে চায় তারাও যেমন বিধাতার ত্যাজ্য, তেমনি যারা পরকে বর্জ্জন করে' স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ক্ষুদ্র হতে চায় তারাও বিধাতার ত্যাজ্য। এর পরে কোন্ দিন কথা উঠবে এণ্ড্রুজকে, পিয়ার্সনকে ত্যাগ করতে হবে কেননা তারা ইংরেজ। এখানকার এক কলেজে, হিন্দু ছাত্রেরা সেই দোহাই দিয়ে পিয়ার্সনকে বক্তৃতায় আহ্বান করতে অসম্মত হয়েছিল। এর মানে হচ্চে আমরা একবার যখন "না"-মন্ত্র সাধন করতে বসি, তখন তার প্রচণ্ডতা মরু-বালুকার সীমানা কেবলি প্রসারিত করতে থাকে। আমি হাঁ-মন্ত্রের উপাসক—তার দেবতা হচ্চেন বিষ্ণু ; তিনি দূর নিকট আত্মীয় পর সমস্তর মধ্যে প্রবেশ করে আছেন—তাঁর সাধনা যাঁরা করেন তাঁরা "সর্ব্বমেবাবিশন্তি"—তাঁদের অধিকার সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হয়—তিনি "বিচৈতিচান্তে বিশ্বমাদৌ" এবং আমার একমাত্র প্রার্থনা এই—"স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু"। ইতি ২৪শে ফাল্গুন, ১৩২৭। (প্রবাসী)

আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য

[শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী]

(Leon Chenoy-এর ফরাসী হইতে)

এস আমরা আর সব ভাবনা ভুলে শুধু কাজ করে' যাই ; সে কাজের উপর কোন্ নামের ছাপ দেব, সে জন্য যেন ব্যস্ত না হই। যদি দৈবাৎ আমাদের কাজ স্থায়ী হবার যোগ্য হয়, তাহলে উত্তরকালের লোকে তাকে ঠিক কোঠায় ফেলবে এখন।

আমরা কেবল নিশ্চিন্ত মনে কাজ করে' যাব। এ কথা বুঝতে বেশি সময় লাগে না যে, সত্য সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান কারো নেই। আমাদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, তাঁরা সত্যের আংশিক রূপ দেখতে পান, সত্য খণ্ড-ভাবে তাঁদের আশ্রয় করে, কিন্তু কেউ কখনো সমগ্র ভাবে সত্যকে আয়ত্ত করে নি। তবুও সত্যের অস্তিত্ব মানতেই হবে।

তাই বলে' যদি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, একপ্রকার নির্লিপ্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ নাস্তিকতাই বিজ্ঞতাসঙ্গত মনোভাব,—তাহলে কিন্তু বড় স্থূল দৃষ্টির পরিচয় দেওয়া হয়। সন্দেহ, শ্লেষ, সূক্ষ্ম সৌখীন সংশয় যে সৃষ্টির মূলে বর্ত্তমান, সে সৃষ্টি কেবলমাত্র নেতিবাচক। নেতিবাচক ভাব কখনো কখনো ভাঙ্গে বটে, কিন্তু কখনো কিছু গড়ে' তোলে না ; আর আমার ত মনে হয় ইতিবাচক মনোভাব বা গঠনের প্রবৃত্তিই সৌন্দর্য্যের মূলবিশেষ।

সাহিত্য বা শিল্পকলার কোন্ প্রকৃত মহান্ ও শক্তিশালী রচনা যে মানব-সমাজের পরম সম্পদ্ রূপে থেকে যায়, তার কারণ এ নয় যে, সত্য তাতে মূর্ত্তিমান্ হয়ে উঠেছে ; তার কারণ এই যে, সেই রচনায় রচয়িতার উৎসাহ, সত্যনিষ্ঠা এবং ব্যক্তিবিশেষত্বকে মানুষে উপলব্ধি করে। অর্থাৎ—সার সত্য বা অখণ্ড সত্য সম্বন্ধে তাঁর অনন্য সীমাবদ্ধ ধারণায় তিনি যা-কিছু বুঝতে বা অনুভব করতে পেরেছেন, সেই জিনিসটিকে আমরা পাই।

যদিও উক্ত রচনা ব্যক্তিগত ও সেই কারণেই অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য ; তবুও যে সত্যবাণী তার স্রষ্টার কম্পিত অধরে সবপ্রথম স্ফুরিত হয়েছিল, সেগুলি পূর্ণরূপেই তাতে প্রকাশ লাভ করে। সেই রচনা কেবলমাত্র একটি মনোভাবের, একটি মূলমন্ত্রের, একটি অপূর্ব্ব বিশ্বাসের জীবন্ত প্রকাশ,—আর কিছুর নয়। সে বিশ্বাস যেন জেদ করে' সঙ্গে লেগে থাকে, সারাজীবন ধরে' বারম্বার ছাড়ালেও যেন সে ছাড়তে চায় না। এ স্থলে বুঝিয়ে বলা দরকার যে, রচয়িতার বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতাবশতঃ যে এমনটি হয় তা' নয়,—বরং তিনি যা বুঝেছেন তা' অভ্রান্ত রূপে বুঝেছেন বলেই কেবলমাত্র এইপ্রকার রচনাই রক্ষা পায়। অথবা "অভ্রান্তরূপে বুঝেছেন" বলাও আমার ভুল ;—সাধারণতঃ একটা শক্তি, একটা চির-অদম্য বিরাট সংস্কার সর্ব্বদা একই দিকে, একই লক্ষ্যের প্রতি স্রষ্টিক্ষম মনকে চালনা করে।

যাঁরা জ্ঞাতসারে নিজের রচনার লক্ষ্যের ঐক্য প্রতিপন্ন করেন, তাঁদের সংখ্যা কম। তাঁরা যে ভুল করেন, সে কথা বলছি নে ;—কেনই বা তাঁরা যুক্তিপূর্ব্বক নিজমতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে ব্রতী হবেন না ?—কিন্তু এক অজ্ঞাত শক্তির বলে স্বভাবতঃ নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশে চলা,—সেইটিই হল আদর্শ ; স্বীয় বুদ্ধিগত ইচ্ছা শুধু অক্লান্ত ভাবে সেই শক্তির সমর্থন করবে, তার পথে আলো ধরবে।

এই দুয়ের সংযোগে যে রচনা উৎপন্ন, তাতে পরম গভীর সাফল্যসহ সত্যের সেই অংশ অঙ্গীকৃত হয়, যা পূর্ব্বেই বলেছি শ্রেষ্ঠ মানবের পুরস্কার।

কায়ার পিছনে ছায়ার মত, এক ভাগ মিথ্যাও এই খণ্ডসত্যের অনুগামী হয়। কিন্তু সে জন্য দুঃখ যেন না করি। রচনাবিশেষের মধ্যে বোঝবার ভুল কত কম আছে, তার উপর তার প্রভাব, ঔজ্জ্বল্য বা চরম মনোহারিত্ব তত নির্ভর করে না,—সে ত কেবল অভাবাত্মক হত ;—কিন্তু তার মধ্যে ব্যক্তিগত ধারণার তেজ কত, উদারতা কত, সত্য কত গভীর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তার উপর অনেক নির্ভর। এই গুলিই থেকে যায়, ও শিল্পীর পরিচয় প্রদান করে।

আমাদের এই খণ্ডসত্যগুলি মিলেমিশে, এই বাস্তবের খণ্ডদৃশ্যগুলি পাশাপাশি সজ্জিত হয়ে অবশেষে একদিন হয়ত সত্যের পরিপূর্ণ স্বরূপ গঠিত হয়ে উঠবে।

এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে নিষ্ঠাপূর্ব্বক আনন্দমনে দৃঢ়ভাবে কাজ করে' যাওয়া,—এর সৌন্দর্য্য কে না বুঝতে পারে ?—যেন ভবিষ্যতে সেই বিকাশটি সম্ভব হয়, যাতে করে' বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ন্যায়ের বিধান প্রভৃতি বুদ্ধি ও হৃদয়দ্বারা সৃষ্ট বস্তুর সারাংশ একটি সুমহৎ সমষ্টিরূপে পরস্পরকে একদিন সম্পূর্ণ করে' তুলতে পারে।

নিজের অসম্পূর্ণতার জ্ঞানবশতঃ যেন আমরা হতাশভাবে হাল ছেড়ে দিয়ে নির্ব্বিকার হয়ে বসে' না থাকি। বরং সে কথা মনে করে' আমাদের ক্ষমাশীল হওয়া কর্ত্তব্য এবং অক্লান্ত চেষ্টায় উৎসাহিত হওয়া উচিত।

পরের সমালোচনা, নাস্তিকতা বা সুলভ বিদ্রূপে আমাদের ভোলাতে পারবে না, কারণ সে-সব হচ্ছে সৃষ্টি করবার অক্ষমতারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। সে সবের মানে হচ্ছে বিশ্বমানবের কাজে ও সংগ্রামে যোগ দেবার অনিচ্ছা ; তার আমরা যে যাই করি না কেন, স্ব স্ব ক্ষেত্রে সকলেই সেই এক পথের পথিক।

যথাসাধ্য ভাল করে', মন দিয়ে, ধৈর্য্য ধরে' কাজ করে যাব,—একমাত্র এই সঙ্কল্প দ্বারাই', আমরা এই যে মনুষ্যনাম ধারণ করেছি, সেই মহৎ ও দুঃখময় নাম সার্থক করতে পারব ;—যেমন করে' সার্থক করে মাঠের কাজে কৃষাণ, এবং হাতের কাজে কারিগর। (সবুজ পত্র)

জন-সাধারণের শিক্ষা

[শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দাসগুপ্ত, বি-এ, বি-টি]

আজকাল শিক্ষা-সম্বন্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন চলিতেছে। আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলে শিক্ষার উন্নতি। দেশে

বহু লোক নিরক্ষর। ১৯১১ সালের আদমসুমারীতে দেখা যায়, শতকরা ৯২ জনের উপর লোক আমাদের দেশে লিখিতে ও পড়িতে জানে না। এতগুলি লোক নিরক্ষর হইলে সামাজিক কোন উন্নতি হইতে পারে না। জনসাধারণের শিক্ষা সাধারণতঃ পাঠশালাতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং পাঠশালাগুলিকে জনসাধারণের শিক্ষার উপযোগী করিতে না পারিলে, উন্নতির কোন আশা করা যায় না। পাঠশালাগুলির বর্ত্তমান অবস্থা ও কিরূপে উহাদের উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে, তাহাই এখনকার আলোচ্য বিষয়।

বর্ত্তমান পাঠশালাগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণ ছাত্র কেন পড়ে না?

আমরা দেখিতে পাই, পাঠশালাগুলিতে ছাত্র সংখ্যা অতি অল্প। গ্রামে যত ছেলেমেয়ে বাস করে, তাহার অধিকাংশই পাঠশালায় উপস্থিত হয় না। ইহার কারণ কি?

(১) কৃষিকার্য্য—গ্রামের অধিকাংশ বালকই কৃষিজীবী। কৃষিকার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া, অনেক পিতামাতা পাঠশালাতে তাহাদের ছেলেমেয়ে পাঠাইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করা হয়। এই ব্যবস্থা কৃষকের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। অধিকাংশ রাখাল-বালকেরই সকাল-বেলা বিশেষ কোন কাজ থাকে না, কিন্তু অপরাহ্নে তাহারা গরু চরায়। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও উল্লিখিত সময়ে পাঠশালায় উপস্থিত হইতে পারে না। ইহা ছাড়া কৃষকের বাড়ীতে বেলা ১১টার পূর্ব্বে খাবার প্রস্তুত হয় না; সুতরাং যাহারা পাঠশালায় পড়িয়া থাকে, তাহাদের তাড়াতাড়ি ভাত গলাধঃকরণ করিয়া ছুটিতে হয়, নতুবা স্কুলে উপস্থিত হইতে খুব বিলম্ব হইয়া যায়। এইজন্য শিক্ষকের তিরস্কারে বা শাস্তি-প্রয়োগে কোন ফল হয় না। এই অসুবিধা দূর করিতে হইলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক।

(ক) দিবসে পাঠশালার কার্য্য দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। (১) ছোট ছেলেদের জন্য, (বিশেষতঃ রাখাল বালকের জন্য,) প্রাতে ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত। (২) বিকালে ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বড় ছেলেদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে। গ্রীষ্মকালে সকাল ১ ঘণ্টা পূর্ব্বে (৬টা হইতে ৯টা) পাঠশালার কার্য্য চলিবে। উল্লিখিত ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিলে রাখাল বালকদিগের বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবার অসুবিধা দূর হয়; এবং আমার বিশ্বাস ইহাতে বালকগণ নিয়মিত সময়ে স্কুলে উপস্থিত হইতে পারে।

অবশ্য উল্লিখিত তিন ঘণ্টা কাল পাঠশালার কার্য্য চলিলে সকল বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সময় দেওয়া যাইতে পারিবে না। কিন্তু যে দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক এবং যে দেশের অধিকাংশ বালককে পিতামাতার কার্য্যের সহায়তা করিতে হয়, সে দেশে, অল্প সময়ের জন্য কয়েকটি বিষয় শিক্ষাদানই সুবিধাজনক। এই প্রস্তাবিত পাঠশালার জন্য নিম্নলিখিত রূপ সময়-তালিকা বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে করি।

বাঙ্‌লা সাহিত্য	(ঐতিহাসিক গল্পসহ)	৪ ঘণ্টা
অঙ্ক	... ...	৪ "
লিখন	(রচনা, পত্র দলিলসহ)	৪ "
ভূগোল	... ...	২ "
চিত্রাঙ্কন	... ...	২ "
বস্তুপাঠ	... ...	২ "
	প্রতি সপ্তাহে মোট	১৮ ঘণ্টা

উপরের শ্রেণীতে আবশ্যক বোধ করিলে, ২ ঘণ্টা ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। তৎপরিবর্ত্তে লিখনের সময় ৪ ঘণ্টা স্থলে ২ ঘণ্টা করিলেও ক্ষতি নাই। পদার্থ-পাঠের পরিবর্ত্তে উক্ত শ্রেণীগুলিতে স্বাস্থ্যনীতি, সমবায়-নীতি, মিতাচার, এবং প্রকৃতি-পাঠ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

(খ) স্কুলের বর্ত্তমান অবকাশের ব্যবস্থা কৃষকদিগের উপযোগী নহে: কারণ, পাঠশালার দুইটি দীর্ঘ অবকাশ। তাহার একটি—জ্যৈষ্ঠমাসে গ্রীষ্মাবকাশ, অপরটি—আশ্বিন কার্ত্তিকে পূজার অবকাশ। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে মাঠে কৃষকের প্রায়ই কাজ থাকে না, এবং পাঠশালায় যাইবার রাস্তাগুলি কর্দ্দমাক্ত বলিয়া, অনেক ছেলেই পাঠশালায় যাইতে অসমর্থ হয়। বস্তুতঃ এই কয়মাসের উপস্থিতির গড় নিতান্ত কম হয়। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, যদি দুইমাস ব্যাপী দুইটি পৃথক্ পৃথক ছুটি না দিয়া, আষাঢ় হইতে ভাদ্র তিন মাস-ব্যাপী একটি ছুটির ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় কৃষকবালকদের বিশেষ সুবিধা হয়। পূজার ছুটি ১০ দিন দিলেই চলিতে পারে; কারণ, বালকগণ স্থানীয় ছাত্র। রমজান সম্বন্ধে একটু অসুবিধা হইতে পারে বটে, তবে স্থানীয় অবস্থানুসারে ছুটির সময়ের কিছু ব্যতিক্রম করা যায়। এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিলে কৃষকবালকগণ তাহাদের পিতামাতাকে কৃষিকার্য্যে সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে এবং পাঠশালার অনিয়মিত অনুপস্থিতির সংখ্যাও হ্রাস পাইবে।

২। যথেষ্ট পরিমাণে পাঠশালার অভাব।

পাঠশালার বর্ত্তমান সংখ্যা সকল ছাত্রের পক্ষে যথেষ্ট নহে। নিম্নলিখিত উপায়ে ইহার প্রতিকার করা যাইতে পারে।

(ক) দিবসে দুইবার পাঠশালার কার্য্য চলিলে, বিদ্যালয়ে ছাত্র-সংখ্যা দ্বিগুণ হইতে পারে।

(খ) কিন্তু গ্রামে একটি পাঠশালার উন্নতি হইলে, অপর কোন শিক্ষক নিকটেই আর একটি পাঠশালা স্থাপন করিয়া লাভবান্ হইতে চেষ্টা করেন। এইরূপে অনেক অনাবশ্যক পাঠশালার সৃষ্টি হইয়াছে। আবশ্যকমত পাঠশালাগুলিকে দূরে স্থানান্তরিত করিয়া যথোপযুক্তরূপ সাহায্য প্রদান করিলে, এই অসুবিধা অনেকটা দূর করা যায়।

৩। দরিদ্রতা

কৃষকের ছেলের শিক্ষার আর একটি অন্তরায় দরিদ্রতা। রাখাল বালকেরা পাঠশালার বেতন, পাঠ্যপুস্তক ও কাগজের দাম ইত্যাদি দিতে অসমর্থ; সুতরাং তাহারা বর্ত্তমান পাঠশালাগুলিতে অধ্যয়ন করিতে পারে না। এই জন্য (ক) অবৈতনিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা

দরকার ; শিক্ষকদিগের বেতন, স্থানীয় বোর্ডের বা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দ্বারা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

(খ) গরীব ছেলেদের জন্য একটি দরিদ্র-ভাণ্ডার স্থাপন করিতে হইবে। পর্ব্ব, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি উপলক্ষে চাঁদা তুলিয়া এই ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা যায়।

(গ) পাঠ্য-পুস্তকের সংখ্যা হ্রাস করিতে হইবে। শিশুশ্রেণীতে পাঠ্য-পুস্তকের আবশ্যকতা নাই। তাহারা বৎসরে অনেক পুস্তক নষ্ট করে, এবং ইহার ব্যয় বহন করিতে পিতা-মাতাকে হয়রাণ হইতে হয়। দেওয়ালে পাঠলিপি টাঙ্গাইয়া বালকদিগকে বর্ণপরিচয় ও পড়া শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

(ঘ) হস্তলিপি শিক্ষার জন্য পুনরায় কলা-পাতা ও তালপাতা ধরাইতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে কাগজের দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৃষকের পক্ষে ইহার ব্যয় বহন করা অসাধ্য। উপরের শ্রেণীতে আবশ্যকমত কাগজের ব্যবহার চলিবে।

(ঙ) উপরের শ্রেণীতে কাগজের পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে শ্লেট ও ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করা যায়। ইহাতে ছেলেদের নোংরা হইবার আশঙ্কা আছে বটে, কিন্তু শিক্ষকমহাশয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখিলে ইহা দূর হইবে। তিনি দেখিবেন, বালক যেন শ্লেটের উপর থুথু না ফেলে। এক টুকরা ভিজা নেকড়া প্রত্যেক বালক সঙ্গে রাখিবে, ও উহার দ্বারা শ্লেট পরিষ্কার করিবে। ব্ল্যাকবোর্ড পরিষ্কার করিবার জন্যও নেকড়া রাখা আবশ্যক।

(চ) বালকগণ বেঞ্চে না বসিয়া মাদুরের উপর বসিতে পারে। বাঙ্গালী ছেলেরা মাদুরে বসিয়া অধিকতর আরাম অনুভব করে এবং ইহার ব্যবস্থায় বেঞ্চ ও ডেস্ক প্রস্তুত করিবার অতিরিক্ত খরচ বাঁচিয়া যায়। আবশ্যক বোধ করিলে ছোট, নীচু ডেস্ক সম্মুখে রাখিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

(ছ) বালকগণ সাধারণ বেশে স্কুলে আসিবে। জুতা জামা ইত্যাদি ব্যবহার করিবার জন্য জিদ করা অকর্ত্তব্য। কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি রাখা চাই। প্রত্যেক রবিবারে ছেলেরা বাড়ীতে তাহাদের বস্ত্র পরিষ্কার করিবে। আবশ্যক বোধ করিলে শিক্ষক-মহাশয় কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে কাপড় কাচার জন্য বালকদিগকে উপস্থিত করিবেন ও নিজে উহার তত্ত্বাবধান করিবেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে বড় বড় ছেলেরা সাহায্য করিবে। ইহা দ্বারা শৈশবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার অভ্যাস জন্মিবে।　　(শিক্ষক)

স্বাস্থ্যের অবস্থা ও ব্যবস্থা

[ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম-বি]

বঙ্গদেশ ক্রমশঃ শ্মশান হইতে চলিল। মৃত্যুর হার জন্মের হার অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। সম্প্রতি "বসুমতী" কাগজে ২৩টি জেলার জন্ম হইতে মৃত্যুর আধিক্য বুঝিবার যে তালিকা বাহির হইয়াছে, তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

জিলার নাম	হাজারকরা জন্মের হার	হাজারকরা মৃত্যুর হার	মৃত্যুর হারের আধিক্য
বর্দ্ধমান	২১.২	৫০.২	২৯.০
বীরভূম	২৩.৭	৬২.৩	৩৮.৬
বাঁকুড়া	২৫	৩৬.৫	১১.৫
মেদিনীপুর	২৪.২	৪০.১	১৫.৯
হুগলী	২১.৫	৩৬.১	১৪.৬
হাওড়া	২৭	৩৫.১	৮.১
২৪ পরগণা	২২.৫	৩৩.৪	১০.৯
নদীয়া	২৫.৬	৪৩	১৭.৪
মুর্শিদাবাদ	২৮.৯	৪৭.৩	১৮.৪
যশোহর	২১	৩০.২	৯.২
খুলনা	২৭.৮	৪১.২	১৩.৪
রাজসাহী	৩২.৮	৪১.৫	৮.৭
দিনাজপুর	৩১.৬	৪৩.৭	১২.১
জলপাইগুড়ী	৩২.৪	৪২.৬	১০.২
দার্জ্জিলিং	৩০	৪৮.৪	১৮.৪
রঙ্গপুর	৩২.৬	৩৩.৪	১
পাবনা	২৫.৭	৩৬.১	১০.৪
মালদহ	৩০.৫	৩৯	৮.৫
ময়মনসিংহ	২৭.৩	২৭.৭	.৪
বাকরগঞ্জ	২৯.৮	৩৪.৭	৪.৯
চট্টগ্রাম	৩০.৩	৪১.৪	১১.১
নোয়াখালি	৩২.৮	৩৩.৪	.৬
ত্রিপুরা	২৭.৮	২৯.৪	১.৬

এ দিকে ভাত ও কাপড়ের দাম ক্রমশঃই বাড়িতেছে ; ভৈরবী মৃত্যু পল্লীতে পল্লীতে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। রোগ-যন্ত্রণা ভোগ, অর্দ্ধমৃত অকর্ম্মণ্য অবস্থায় সমাজের গলগ্রহরূপে জীবনধারণ ও মৃত্যুকে অকালে আলিঙ্গন করা এক্ষণে বাঙ্গালা দেশবাসীর নিত্য নৈমিত্তিক অবস্থা হইয়াছে।

ইহার জন্য কে দায়ী ; কাহার দোষে এই সকল বিপদ্ ও অবস্থা বাঙ্গালীর নিত্য সহচর হইয়াছে, তাহা প্রকৃতরূপে নির্ণয় করিতে পারিলে, ব্যবস্থা যে সহজ হইবে তাহার আর কোন ভুল নাই।

আমরা বিদেশী রাজাকে দোষ দিতেছি, আমরা তাহাদের ক্রীড়া-পুতুল দেশীয় বড় বড় রাজকর্ম্মচারীকে দোষ দিতেছি ; কিন্তু অপরের দোষ না দেখিয়া আমরা নিজে আমাদের এই অবস্থার জন্য কতদূর দায়ী তাহা নির্ণয় করিতেছি না। এক্ষণে আমরা "অগাধ সলিলে ডুবিয়া মরিতেছি।" দেশের "রাজা করুন" "মন্ত্রিগণ করুন" একপ চীৎকার করিয়া এবং এইরূপ রাজনৈতিক বিষয় লইয়া দলাদলি, ঝগড়া তর্ক ও বাক্‌যুদ্ধ করিয়া

যে প্রাণটুকু আছে তাহা শেষ না করিয়া সময় থাকিতে নিজেরা সাবধান হইয়া, নিজেদের ত্রুটী নিজেরা দেখিয়া তাহার ব্যবস্থা ও দোষ সকল দূর করা এক্ষণে বঙ্গের প্রত্যেক নরনারীর কর্ত্তব্য হইয়াছে। কথায় বলে "Physician heal thyself" "চাচা নিজের প্রাণ বাঁচা।" কিন্তু আমরা প্রায় সকলেই নিজেদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া নানারূপ কদভ্যাস ও বিলাসিতার দাস হইয়া দারিদ্র্য নিজেরাই বাড়াইতেছি। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি স্বাস্থ্যনাশ-পদ্ধতি বলিলে বেশী অত্যুক্তি হয় না।

"Heaven helps those who help themselves" "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ" এক্ষণে আমাদের সকলের নিজে নিজে স্বাবলম্বন মন্ত্রে দীক্ষা লইতে হইবে এবং অহরহই তাহার ধ্যান করিতে হইবে। ইহাই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় একমাত্র ব্যবস্থা।

আমরা এই প্রবন্ধে আমাদের নিজকৃত দোষ ও যাহার জন্য আমাদের অভ্যাস বিরত হইতেছে, আয়ু কমিয়া যাইতেছে, শরীর রোগপ্রবণ হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার আভাস দিব। আমাদের গ্রাহক ও পাঠকবর্গ এই সকল বিষয় সম্বন্ধে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় নিজ নিজ অভিজ্ঞতা সবিস্তারে আলোচনা করিলে দেশবাসিগণ বিশেষ উপকৃত হইবে।

শরীর রক্ষার জন্য আবশ্যকমত পুষ্টিকর আহার, ঋতুর উপযোগী বস্ত্রাদি ও নিদ্রার জন্য সাড়ে তিন হাত পরিমাণ স্থানের আবশ্যক। "পওয়াভর আটা তিন হাত কাপড়া ও সাড়ে তিন হাত জমিনই আপনা কাফী" এই বাক্য কোন মহাপুরুষের মুখে শুনিয়াছি। আমরা প্রত্যেককেই এই মহা সত্যের অনুসরণ করিয়া সুস্থ ও সবল দেহে জীবন যাপন করিবার জন্য অনুরোধ করি।

১। আহারের দোষ।—আহারের মাত্রা নির্ণয় প্রবন্ধে আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। খাদ্যদ্রব্য নির্দ্ধারণ সময়ে দেখিতে হইবে যে, উহা সারবান হয়, সস্তা হয় এবং সহজে হজম হয়। এবং তাহার আবশ্যক ওজনও ঠিক করিতে হইবে।

আহারের আধিক্য ও গুরুতা জন্য বা খাদ্য ভক্ষণ করিবার দোষে, অজীর্ণ, পাথরী, ডায়াবেটীস শোথ, উদরী ইত্যাদি রোগ হইয়া থাকে। এই দোষটী এক্ষণে আধুনিক সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে বদ্ধমূল হইয়াছে।

আহারের অভাব—দুইবেলা আবশ্যকমত পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে না পাইয়া আমাদের দেশের লোকেরা রোগপ্রবণ হইতেছে এবং সর্ব্বপ্রকার সংক্রামক ব্যাধি দেশের মধ্যে রাজ্য বিস্তার করিয়া জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার বাড়াইয়া তুলিয়াছে। অভাব ও দারিদ্র্যই রোগ বৃদ্ধির প্রধান কারণ এবং এইজন্যই বঙ্গে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার বাড়িতেছে ও পল্লীগ্রাম শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

২। পরিচ্ছদের দোষ—কাপড় ক্রমেই মহার্ঘ হইতেছে। অনেক স্থলে আমাদের ভগিনী ও জননীগণ শতগ্রন্থি জীর্ণবাস পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেছেন। যতদিন মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় দেশ ছাইয়া না ফেলিবে, যতদিন আমাদের ঘরের চরকার সূতায় প্রস্তুত কাপড়সকল পণ্য-দ্রব্য রূপে বিদেশে বিক্রীত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা যথাসম্ভব স্বল্প ও অল্পমূল্যের পরিচ্ছদ ব্যবহার করিব।

অধিক পোষাক পরিচ্ছদ পরার জন্য শরীর রোগ-প্রবণ হয়; সহজেই সর্দ্দি, কাসি, পেটের অসুখ প্রভৃতি রোগসকল হইয়া থাকে। এই দোষটী আধুনিক সভ্য মহলেও বাড়িয়াছে। রোগপ্রবণতা কমাইতে হইলে এবং শরীরকে রোগ হইতে রক্ষা করিতে হইলে আবশ্যকমত আচ্ছাদন হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে আমাদের গ্রাহক ও পাঠকবর্গকে বিস্তারিত ভাবে প্রবন্ধ লিখিতে ও তদনুরূপ কার্য্য করিতে অনুরোধ করিতেছি।

৩। অভ্যাস দোষ—এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা দোষাবহ। পান খাওয়া, চা খাওয়া, নেশার দ্রব্য ব্যবহার করা, ক্রমশঃই দেশে বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার দ্বারা স্বাস্থ্যহানি, ব্যক্তিগত খরচ বৃদ্ধি এবং এই বর্দ্ধিত খরচ জন্য দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইতেছে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পান তামাক, চা চুরুটের, দোক্তা বা জরদার কোন আবশ্যকতা নাই। ইহাদের অপকারিতা সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা হইয়াছে। এই অভ্যাস-দোষই ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রচলিত দেখা যায়। প্রত্যেক জেলাতে ও প্রত্যেক সমাজে এই দোষ কিরূপে বর্ত্তমান তাহার বিচার করিয়া চিত্রসহ সাধারণকে বুঝান আবশ্যক হইয়াছে। এই "স্বখাত সলিলে আমরা ডুবিয়া মরিতেছি।" চায়ের পরিবর্ত্তে বিনা বায়ে ঈষদুষ্ণ গরম জল ব্যবহার করা স্বাস্থ্য-, বিজ্ঞান-সম্মত ও আয়ুর্বর্দ্ধক। এই সকল অভ্যাস-দোষের প্রতিকার আমাদের নিজে নিজে করিতে হইবে। যাহার এরূপ অভ্যাস দেখিবে, তাহাকে বুঝাইয়া অভ্যাস হইতে নিরস্ত করিতে হইবে। ইহাই এক্ষণে আমাদের নিজ নিজ কার্য্য এবং সমাজের কার্য্য।

এই সকল অভ্যাস-দোষ নিবারণ করিলে অনেক অর্থ-ধ্বংস বন্ধ হইবে। আমরা গরীব জাতি; বাজে-খরচের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া এই অর্থ যদি দুই বেলা খাইবার জন্য খরচ করি তাহা হইলে দেশের অর্দ্ধাশন অনেক পরিমাণে দূর হইবে।

৪। শরীর পালন সম্বন্ধে সাধারণের অজ্ঞতা—এই অজ্ঞতাই আমাদের সর্ব্ব-প্রকার অনিষ্টের মূল। যে সকল কদভ্যাস জন্য আমাদের শরীর রোগপ্রবণ হইতেছে, বৃথা অর্থব্যয় হইতেছে, এবং আমরা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছি, তাহা কেবল সাধারণের অজ্ঞতাজনিত। এক্ষণে এই অজ্ঞতা দূর করিবার উপায় কি? মহামান্য সরকার বাহাদুরের অমাত্যবর্গ নিজেদের উদর পূরণ করিয়া অর্থাভাবের দোহাই দিয়া সাফাই গাহিতেছেন। জন্ম হইলেই রোগ ও মৃত্যু বিধির লিখন: টাকা চাই, তবে রোগ দমন হইবে ম্যালেরিয়া দূর হইবে। এই সকল বাদানুবাদ যুক্তি তর্ক ইত্যাদি লইয়াই দেশের অগ্রণীগণ ব্যস্ত। সংবাদ-পত্র সরকারের কার্য্যের টীকাটিপ্পনীতে পরিপূর্ণ।

(স্বাস্থ্য-সমাচার)

ভাষার জ্ঞাতিত্ব

[শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা এম-এ]

বাংলা-ভাষার সহিত হিন্দি, আসামী, উড়িয়া, মাগধী, গুজরাটী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাসমূহের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে—তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। সম্বন্ধটা হইতেছে, ভগিনীর সহিত ভগিনীর যে সম্বন্ধ তাই। একই মূল-ভাষা হইতে ইহারা সকলেই জন্ম লাভ করিয়াছে। সেই মূল-ভাষাটিকে আর্য্য-ভাষা বলাই ভাল; সংস্কৃত বলা অনুচিত। কারণ সংস্কৃত হইতে বাংলা প্রভৃতি কোন ভাষায় হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় প্রাকৃত ভাষা হইতে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহের উদ্ভব হইয়াছে। এই প্রাকৃত ভাষাগুলি মূল আর্য্য ভাষার বিভিন্ন পরিণতি। সেই আদিম আর্য্য ভাষা আর আধুনিক বাংলা, আসামী প্রভৃতি ভাষার মধ্যে বহু ক্রমবিবর্তিত স্তর-পরম্পরা সংযোজন করিলে, তবে বুঝা যাইবে, সেই আদিম ভাষা হইতে ইহারা কি ভাবে উদ্ভূত হইল। যে অর্থে আর্য্য-ভাষা এখানে ব্যবহার করিলাম, সেই অর্থে সাধারণতঃ সংস্কৃত কথাটার ব্যবহার হইয়া থাকে; যদিও সংস্কৃতের অর্থ তাহা নহে। তবে এখানেও সাধারণের অর্থে সংস্কৃত কথাটা ব্যবহার করা যাইবে। ভাষা-তত্ত্ব-বিদ্ পণ্ডিতগণ ইউরোপীয় প্রধান প্রধান ভাষাসমূহের তুলনামূলক আলোচনা ও অনুশীলন দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছেন যে, আদিম-আর্য্য ভাষার সহিত ভারতবর্ষীয় ভাষাবৃন্দের যেরূপ সম্বন্ধ, ইউরোপীয় ভাষা-সমূহেরও ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ। যে মূল ভাষার সন্তান সংস্কৃত ও তাহার বিপুল পরিবার, তাহারই সন্তান গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি।

ইহা পণ্ডিতগণের অনুমান মাত্র নহে। তাঁহারা এ বিষয়ে নানা প্রকার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের কথা অবিশ্বাস করিবার কোন ন্যায়-সঙ্গত হেতু নাই। ইউরোপীয় ভাষাসমূহের মধ্যে এমন বহু শত শব্দ পাওয়া যায়, যাহারা আকারে ও অর্থে, রূপে ও ভাবে, ভারতবর্ষীয় ভাষা-সমূহে ব্যবহৃত শব্দের আশ্চর্য্যভাবে অনুরূপ। শুধু শব্দে নহে, উপসর্গে, প্রত্যয়ে এবং ব্যাকরণ সংক্রান্ত বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়েও এই দুই মহাদেশের ভাষায় ঐরূপ সামঞ্জস্য, সাদৃশ্য এবং ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। এই দুই দেশের ভাষায় ওতপ্রোত ভাবে যে সৌসাদৃশ্য বর্তমান আছে, তাহা হইতেই পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উভয় দেশীয় এই সমস্ত ভাষাই কোন এক আদিম অভিন্ন ভাষা হইতে যুগযুগান্তর-সম্প্রসারিত বিবর্তন ধারাক্রমে ইহাদের বর্তমান বিভিন্ন স্বতন্ত্র স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। দুই ভাষায় শব্দগত সাদৃশ্য বা ঐক্য নানা প্রকার হইতে পারে। কতকগুলি শব্দের আকারে অবিকল মিল আছে, অর্থের কোন সম্পর্ক নাই। বাংলা ফুল এবং ইংরেজী fool, বাংলা ডাল ও ইংরেজী dull, বাংলা বেগ ও ইংরেজী beg, বাংলা রাস ও ইংরাজী rush—বানান-হিসাবে অবিকল এক, কিন্তু অর্থের সম্বন্ধে ইহাদের হাস্য-জনক অনৈক্য থাকায় জন্য ইহারা ভাষার জ্ঞাতিত্বের লক্ষণ হইতে পারে না। এমন কতকগুলি শব্দ 'দেখান' যাইতে পারে যাহাদের মধ্যে অক্ষরের এবং অর্থের উভয়বিধ সামঞ্জস্যই আছে, তবুও ইহা অকস্মাৎ-সংঘটিত ইহা মনে করিবার অনেক কারণ আছে। উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার ও behaviour, ভারি ও very, গলি ও gully প্রভৃতি উল্লেখ করিতে পারি। ইহারাও এক-জাতি বিশিষ্ট নহে।

আবার গেলাস ও glass, কোট ও coat, স্কুল ও school, বাক্স ও box, চেয়ার ও chair, বেঞ্চি ও bench, সেমিজ ও chemise, রসিদ ও receipt, ড্যামেজ ও damage, প্যানেল ও panel, পাইর্য়াম (পূর্ব বাংলা) ও frame, পাদ্রী ও padre, ইত্যাদি শব্দসমূহের মধ্যে যে মিল দেখা যায়, উহার কারণ এই যে এই শব্দগুলি সশরীরে ইংরেজী হইতে ধার বা চুরি করিয়া বাংলার ছদ্মবেশ পরাইয়া আমরা একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছি। সেমিজ খাঁটি ফরাসী, আর পাদ্রী খাঁটি স্পেনীয়। এই সকল শব্দ এই সকল ভাষার সম-মাতৃত্বের সাক্ষী নহে। কিন্তু প্রকৃত সাক্ষী স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইতে এমন শত শত শব্দ, উপসর্গ, প্রত্যয় ও বিভক্তি উপস্থাপিত করা যাইতে পারে, যাহাদের সাক্ষ্য পাইয়া, এই সমস্ত ভাষা কন্যারা যে একই অতি বৃদ্ধা জরা-গ্রস্তা গলিত নখ-দন্তা পলিত-কেশা ভাষা জননীর সন্তান, তাহা অবিশ্বাস করিতে হইলে মনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। (মালঞ্চ)

মঁসিয়ার রেমণ্ড বনাম হাজি মুস্তফা

[শ্রীবিনোদচন্দ্র সেন]

আমরা সাধারণতঃ মনে করিয়া থাকি যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ইংরাজ জাতি সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আমাদের রাজ্য দখল করিয়া বসিল তখন বুঝি ভারতবর্ষের শৌর্য্যরবি একেবারেই অস্তমিত হইয়া গিয়াছিল। যে সময়ে আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা উন্নত কি অবনত ছিল, তাহা ঐতিহাসিকগণ নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন, কিন্তু ভারতবর্ষ সেই পরাধীনতা ও আত্মবিস্মৃতির যুগেও সাহসে, তেজে ও দেশপ্রীতিতে নিতান্ত হেয় ছিল না, সে কথার আভাস একজন প্রত্যক্ষদর্শী ও পক্ষপাতশূন্য ফরাসিবাসী দিয়া গিয়াছেন।

এই ব্যক্তির প্রকৃত নাম ছিল রেমণ্ড, কিন্তু তিনি হাজি মুস্তফা এই পারসানাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এই নামেই তিনি সবিশেষ পরিচিত ছিলেন। হাজি মুস্তফা নোটা মেনাস এই জাল-নামের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া মুসলমান ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক সৈয়র মুতাক্ষরীণ অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদের ভূমিকায় তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য, কারণ সত্যদর্শী ঐতিহাসিকের নিকট তাহার মূল্য নিতান্ত সামান্য নহে।

আমরা ঐ হাজি মুস্তফার বৈচিত্র্যময় জীবনের দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

যৌবনে হাজি মুস্তফার আরবদেশে একটি সুবৃহৎ প্রাচ্যদেশীয় পুস্তকাগার ছিল। তা ছাড়া তাঁহার নিকট নানাপ্রকার কৌতূহলোদ্দীপক ও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সামগ্রী ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে একদিন তাঁহার পুস্তকাগার ও আর সব জিনিসগুলি লুণ্ঠিত হইয়া গেল। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া আরবদেশ হইতে ক্ষুণ্ণমনে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পারস্য ভাষায় তাঁহার বেশ অধিকার ছিল এবং বিদেশে সর্ব্বস্বান্ত হওয়াতেও তিনি সহৃদয় ইংরাজবন্ধুদিগের দয়ায় পুনরায় সৌভাগ্য ও সম্পদের মুখ দেখিলেন। তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন এবং ইংরাজদিগকে তিনি আপন স্বদেশবাসী হইতেও আপনার জন মনে করিতেন।

কয়েকটি রূপসী স্ত্রীলোক একত্র করিয়া একটি রঙ্মহাল গড়িবার খেয়াল তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতে তিনি সেই অদ্ভুত সখ মিটাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রবীণবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও তিনি সত্বরে অনেকগুলি তরুণী জুটাইয়া ফেলিলেন। সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। তাঁহার রঙ্গমহালের একটি রূপসী যুবতী তাঁহারই এক অনুজীবীর সহিত প্রেমে পড়িল। হাজি মুস্তফা অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন ও তাঁহার অন্তঃকরণ উদার ও মহৎ ছিল। তিনি স্থির করিলেন একটি সৎপাত্রের হস্তে যুবতীকে অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইবেন। বহু অন্বেষণের পর একটি সৎপাত্র জুটিয়া গেল। যাহাতে তাহাদের মনে প্রণয়সঞ্চার হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি দেশের প্রচলিত-নীতি অমান্য করিয়াও পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। কিন্তু তরুণীটি কিছুতেই মনোনীত পাত্রটির সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হইল না। যখন সমস্ত অনুনয় বিনয় বিফল হইল, তখন বিদায়ের পূর্ব্বে সে শুষ্ককণ্ঠে বলিয়া গেল "তুমি আমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলে কিন্তু এই কাজের জন্য তোমাকে পরে অনুতাপ করিতে হইবে।" তারপর সে কান্নাকাটি করিয়া চলিয়া গেল। হাজি মুস্তফা তাহার হাতে তিনশ' টাকা গুঁজিয়া দিলেন।

এক মাস না ফুরাইতেই সেই মেয়েটি মুস্তফার নিকট তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে নানারকম নালিশ পাঠাইতে লাগিল এবং একদিন সশরীরে মুস্তফার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। সে বলিল বিবাহের যৌতুকস্বরূপ সে যে টাকা পাইয়াছিল, তাহা সমস্তই তাহার স্বামী জুয়া খেলিয়া নষ্ট করিয়াছে। অর্থের অনটনে তাহারা নিতান্ত কষ্টে দিন কাটাইতেছে, বিশেষতঃ তাহার স্বামী স্বধর্ম্মে অনাস্থাবান্, সুতরাং তাহার সহিত মনের মিল নাই। এইরূপ নানা ওজর আপত্তি করিয়া তরুণীটি তাহার স্বামীর নিকট ফিরিয়া যাইতে রাজি হইল না এবং মুস্তফার গৃহে থাকিবে বলিয়া জিদ ধরিয়া বসিল। মুস্তফা বিবাহিত স্ত্রীলোককে তাঁহার ঘরে ঠাঁই দেওয়া নিরাপদ মনে করিলেন না। কিন্তু মেয়েটির কান্নাকাটিতে তিনি বিগলিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে কাশীতে তাহার জন্য আর একটি পাত্র স্থির করিলেন এবং তাহাকে আরও দুইশত টাকা উপহার দিয়া একখানি গাড়িতে তাহাকে একটি বৃদ্ধলোকের তত্ত্বাবধানে গন্তব্যস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। দিন সাতেক পরে একদিন মুস্তফা প্রাতঃকালে তাঁহার দ্বারের সম্মুখে একটি পুলিন্দা দেখিতে পাইলেন; পুলিন্দাটি খুলিয়া তিনি যাহা দেখিতে পাইলেন তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তাহার মধ্যে ছিল সেই দুঃখাতুরা আশ্রয়ভিখারী তরুণীর একখানি ছিন্ন হস্ত—আর তাহার একটী অঙ্গুলিতে ছিল কেশপাশে জড়ান, সোনার তারে বাঁধান একটি অঙ্গুরীয়। তখন মুস্তফার মনে পড়িয়া গেল, মেয়েটির সেই কয়টা কথা, "তুমি আমাকে তাড়াইয়া দিলে, কিন্তু এজন্য তোমাকে পরে অনুতপ্ত হইতে হইবে।"

এই ঘটনার পর মুস্তফার মানসিক অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া পড়িল। তার উপর বন্ধুবর হেষ্টিংসের ইউরোপ প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদে তাঁর মন আরও অভিভূত হইয়া পড়িল। একদিন দৈবযোগে সৈয়র মুতাক্ষরীণের কয়েকখানি পাতা তাঁহার দৃষ্টিতে পড়িল। একখানি পাতায় তিনি দেখিলেন লেখক ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে এবং ভারতে বৃটিশ শাসন সম্বন্ধে নানারূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। পারসী পুস্তকে এই সকল কথা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইলেন এবং মুর্শিদাবাদে আসিয়া পুস্তকের অবশিষ্টাংশ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। তিনি বইখানা অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাতে তিনি মনে অনেকটা সান্ত্বনা পাইলেন। এই অনুবাদ তাঁহার পরমবন্ধু ইংরাজদিগের উপকারে লাগিবে এই মনে করিয়া তিনি বিশেষ উদ্যোগী হইয়া এই কাজটিতে হস্তক্ষেপ করিলেন।

(ইতিহাস ও আলোচনা)
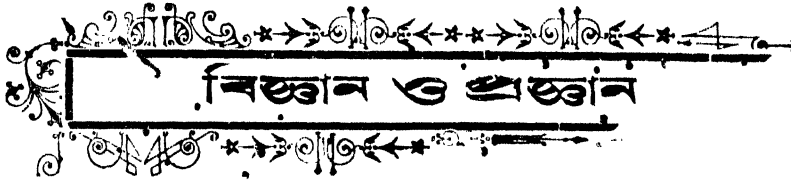
তাপ-বিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ]

ওঁ নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশহেতবে। সবিতাকে নমস্কার করিবে কি না, তাহা বৈজ্ঞানিকের খুসী, কিন্তু সবিতৃ নিঃসৃত তেজ যে আমাদের এই জগতের স্থিতির কারণ, এবং তাহার অবসানেই যে এই পৃথিবীর বিনাশ—বৈজ্ঞানিকগণ এ কথা একবাক্যে স্বীকার করেন। বসন্ত-সমাগমে ধরিত্রী যখন নব-ফুল-ফল-পল্লবে, বর্ণ প্রাচুর্য্যে নূতন সাজে সজ্জিত হইয়া, নবজীবনের স্পন্দন অনুভব করে, আবার শীতকালে একেবারে ম্লান, প্রাণহীন হইয়া যায়, তখন তো এই ধরিত্রীর উপর মার্ত্তণ্ডের প্রভূত প্রভাব আমরা চাক্ষুষ উপলব্ধি করি; কিন্তু সংসারে যাহা কিছু ঘটিতেছে, আমরা যাহা কিছু করিতেছি, সবই এই সৌর-তেজের অনুকম্পা-সাপেক্ষ। আমরা হাঁচি, বা কাসি, বা ভাতের সহিত আলুভাতে মাখিয়া, গ্রাস পাকাইয়া মুখগহ্বরে প্রবেশ করাইয়া, নির্ব্বিকার ভাবে চর্ব্বণ করিতে থাকি—সবই সূর্য্যের কৃপায় এবং এই সূর্য্যের কৃপাতেই বায়ু বহিতি, নদী বহতি, গৌশব্দায়তে। সৌর-তেজের যদি হঠাৎ অবসান হইত, তো বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ—কোথাও জীবনের সাড়া পাওয়া যাইত না; উদ্ধে অনন্ত আকাশে মেঘ উঠিত না; নীচে অসীম সমুদ্রে ঢেউ তুলিত না,—সমস্ত নীরব, নিথর, নিশ্চল, স্পন্দহীন হইয়া থাকিত। আর মানব-সভ্যতার এই শোচনীয় পরিণাম দর্শন করিবার জন্য কোন জীবিত সাক্ষীও মিলিত না। সূর্য্যের এই যে তেজ, তাহা কতকটা আলোক রূপে, এবং বেশীর ভাগ তাপ রূপে আমাদের নিকট পৌঁছিতেছে।

এক রাজার এক হাতী রাস্তায় বাহির হইলে, সহরের তিনজন অন্ধ লোকের মধ্যে তর্ক উঠিল যে, হাতীর দেহটা কিরূপ। তাহারা আস্তে-আস্তে যাইয়া হাতীর গায়ে হাত দিল। যে উহার পা-টা ছুঁইয়াছিল, সে বলিল হাতী একটা থামের মত। যে কাণটা ছুঁইয়াছিল, সে বলিল হাতী একটা কুলার মত। আর যে ল্যাজটা ধরিয়াছিল, সে বলিল হাতী একগাছা দড়ির মত। মিছে কথা কেহ বলে নাই, কিন্তু সমস্ত সত্যটা কেহ দেখিতে পাইল না। আমরা যখন দেখি, ভীষণ ঝঞ্ঝা মহীরুহ-অট্টালিকাদি ভূমিসাৎ করিয়া, বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় সগর্ব্বে চলিয়া যাইতেছে; অথবা শত-শত যাত্রীপূর্ণ ট্রেণ ভীমবেগে ছুটিয়া আসিয়া চক্ষের নিমেষে অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল,—তখন শক্তির একটা মাত্র রূপ আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু এই শক্তি কত না বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইতেছে! কোথাও এক সরু তারের মধ্যে বিদ্যুৎ রূপেও সঞ্চালিত হইতেছে; কোথাও লৌহ-শলাকার মধ্যে চুম্বক রূপে নিবদ্ধ রহিয়াছে; কখনও দেখি আলোক-রূপে, তাপ-রূপে আমাদের ইন্দ্রিয়কে অভিভূত করিয়া ফেলিল; আবার কোথাও বা প্রচ্ছন্ন ভাবে রাসায়নিক শক্তিরূপে পদার্থের মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে—সুযোগ পাইলেই দেখা দিবে।

যে শক্তি তাপ-রূপে প্রকাশ পাইতেছে, এবং যে তাপ এই জগতের প্রাণ—সেই তাপ সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইবে।

মানব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জগতের পরিচয় লয়; এবং তাহার উপর নিজের বুদ্ধি, নিজের বিচার-শক্তি প্রয়োগ করিয়া, বিজ্ঞানকে খাড়া করে। তাপ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার অস্তিত্ব আমাদের মনে; এবং তাহার অনুভূতি আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া। চড় উঠাইলেই, বা লাঠি তুলিলেই, আমাদের আঘাত লাগে না; সেই চড় যখন গালে পৌঁছায়, বা সেই লাঠি যখন মাথায় পড়ে, তখনই আমাদের শরীর আহত হয়, তখনই আমাদের বেদনার বোধ

জন্মে; বাহিরে হয় ত অগণিত বিশিষ্ট রূপের ঈথর-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে; এবং সেই ঈথর তরঙ্গ হয় ত আমার শরীরে ধাক্কা দিয়া আমাতে তাপের অনুভূতি জাগাইতেছে, কিন্তু উহারা আমার কাছে তখনও তাপ নয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমার গায়ে লাগিতেছে।

কিন্তু গোড়াতেই দেখা দরকার, এই স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা তাপ সম্বন্ধে আমাদের কিরূপ ধারণা জন্মে। ঘরের মধ্যে নানাবিধ জিনিসপত্র রহিয়াছে,—বাক্স, তোরঙ্গ, থালা, গেলাস, কাপড়, জামা ইত্যাদি। খুব ঠাণ্ডা কন্‌কনে শীতের দিনে ফ্লানেলের জামাটায় একবার হাত দাও, আর ঐ পিতলের গেলাসটা একবার ধর; দেখিবে, গেলাস জামা অপেক্ষা অনেক ঠাণ্ডা বোধ হইতেছে। কিন্তু ঠিক উল্টা মনে হইবে রৌদ্রতপ্ত এই সব জিনিষ প্রচণ্ড এক গ্রীষ্মের দিনে,—তখন ঐ গেলাসটাকেই অপেক্ষাকৃত গরম বলিয়া মনে হইবে। কেন এরূপ হয়? জামাই বল, গেলাসই বল—কেহই উনানের নিকটে নাই অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ে একই অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। উত্তাপ মাপিবার যে যন্ত্র আছে, সেই তাপমান যন্ত্র দিয়া মাপিয়া দেখ,—জামার বা গেলাসের মধ্যে উত্তাপের কোন প্রভেদ নাই। তবে কেন ছুঁইলে একটা গরম আর একটা ঠাণ্ডা বলিয়া মনে হয়? আসল কথা, স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা উত্তাপ সম্বন্ধে আমাদের সঠিক ধারণা জন্মে না। তবে স্পর্শেন্দ্রিয় আমাদের কি জানায়? ইহা শুধু বলে যে, কি হারে আমাদের শরীর তাপ পায় বা তাপ দেয়। কথাটা একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার। প্রাসাদবাসী ধনী এবং পর্ণকুটীরস্থ নিধন তাহাদের ঐশ্বর্য্যের তারতম্য লইয়া চিরদিন পাশাপাশি বাস করে—সংসারে এ ঘটনা নিত্যই ঘটে; কিন্তু মনোরাজ্যে যেমন কাহার করুণা চন্দন স্পর্শে তাপিত চিত শীতল হইয়া যায়, এই রূপ প্রকৃতির নিয়মে কোন শীতল পদার্থের কাছে থাকিয়া কোন উত্তপ্ত পদার্থ তাহার স্বাতন্ত্র্য, তাহার উত্তাপ বেশীক্ষণ বজায় রাখিতে পারে না। একটা ঘরে খুব গরম, টক্‌টকে লাল একটা লোহার বল রাখ, এবং এক বাল্‌তি ঈষদুষ্ণ জল রাখ। খানিক পরে আসিয়া দেখিবে, বলের আর উত্তাপ নাই; গরম জলও ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। তাপমান যন্ত্র আনিয়া মাপিয়া দেখ, ঘরের বাক্স, বিছানা, কাপড়, জামা, ঘটী, বাটী, ঐ লোহার বল, ঐ বাল্‌তির জল—সকলই সমান উত্তপ্ত। তাপের একটা আদান-প্রদান বরাবর চলিয়াছে, যতক্ষণ না সকলের অবস্থা সমান দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটে, যখন ঐ তাপমান যন্ত্র শরীরে দেওয়া যায়। তখন দেখা যায় দেহের উত্তাপ বাহিরের অপেক্ষা বেশী। কিন্তু কেন? এখানে এই ব্যতিক্রমের হেতু কি? কথাটি সোজা। ঘরে ঐ লাল টক্‌টকে বলের বদলে যদি একটা জ্বলন্ত চুল্লী আনি, এবং তাহাতে যদি বরাবর ইন্ধনের যোগান দিতে থাক, তাহা হইলে তাহার উত্তপ্ততা তো বরাবরই বেশী থাকিবে। ঐ চুল্লীর ন্যায় আমাদের দেহের অভ্যন্তরে এক মৃদু দহন-ক্রিয়া অনুক্ষণ চলিতেছে। তাহার ফলে শরীর মধ্যে অবিরাম তাপের উদ্ভব হইতেছে; এবং সমস্ত ব্যাপারটার এরূপ সামঞ্জস্য বজায় রহিয়াছে যে, বাহিরে লু চলুক, বা বরফ পড়ুক—দেহের উত্তপ্ততা সদাই এক; এবং আমার শরীরে যে দিন এই দহন ক্রিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে, সে দিন আমার এই অসাড় দেহটার উত্তাপের আর ঐ ঘটী-বাটী-বাক্স তোরঙ্গের উত্তপ্ততায় কোন প্রভেদ থাকিবে না। এখন, তাপ সর্ব্বদাই গরম জিনিস হইতে ঠাণ্ডা জিনিসে সঞ্চালিত হয়। সুতরাং শীতের দিনে যখন ঘরের কোন জিনিস স্পর্শ কর, তখন তোমার দেহ হইতে খানিকটা তাপ ঐ বস্তুতে চলিয়া যাইবে, তোমার শৈত্য বোধ হইবে। কিন্তু সব জিনিসের মধ্য দিয়া তো তাপ সমভাবে চলে না—তাপের প্রবাহকে কোন পদার্থ অল্প বাধা দেয়, কোন পদার্থ বেশী বাধা দেয়। জ্বলন্ত কাঠের অপর অংশ বেশ সহজেই ধরা যায়—কাঠের মধ্য দিয়া তাপ আসিতেই চায় না। কিন্তু পিতলের হাতার এক দিক উনানে দিলে, অপর দিক হাত দিয়া ধরা কঠিন হইয়া উঠে। পিতলের ভিতর দিয়া তাপ হুহু করিয়া চলিয়া আসে। তাই পিতলের গেলাস যখন ছুঁই, তখন উত্তপ্ত আমার দেহ হইতে তাপ দ্রুতগতি ঐ শীতল পিতলের গেলাসে চলিয়া যায়। কিন্তু ফ্লানেল তাপ পরিচালনে একরূপ অক্ষম বলিয়া, ফ্ল্যানেলের জামা ছুঁইলে তাপ শরীর হইতে যায়-ই না; এবং এই কারণে, যদিও গেলাসটার ও জামাটার উত্তপ্ততা সমান, তথাপি, একটা ছুঁইলে ঠাণ্ডা মনে হয়, আর একটার হয় না। সেইরূপ, প্রচণ্ড এক গ্রীষ্মের দিনে রৌদ্রতপ্ত জিনিসপত্র যখন আমাদের দেহ অপেক্ষা অধিকতর গরম, তখন স্পর্শে গেলাস হইতে তাপ দ্রুত আমাদের দেহে আসিবে, কিন্তু ফ্লানেল হইতে সেরূপ আসিবে না। সুতরাং ফ্লানেল অপেক্ষা পিতলের গেলাস অধিকতর গরম বলিয়া মনে হইবে, যদিও উভয়ের উত্তপ্ততা এক।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের যে তাপ বা শৈত্যের বোধ জন্মে, তাহা পদার্থের উত্তপ্ততা সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই আমাদের দেয় না; তাহা শুধু জানায় যে, কিরূপ হারে আমাদের শরীর তাপ পাইতেছে বা আমাদের শরীর হইতে তাপ চলিয়া যাইতেছে।

স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা উত্তপ্ততা মাপিবার এই ত হইল গলদ নম্বর এক; কিন্তু আরও এক দফা গলদ আছে। হাতটা বরফ-জলে খানিকক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া, পুকুরের জল ছোঁও দেখি,—জলটা মনে হইবে গরম; কিন্তু সেই একই জল বেশ ঠাণ্ডা মনে হইবে, যদি হাতটা গোড়ায় গরম জলে ডোবান থাকিত। ১৫০ ডিগ্রী জ্বরগ্রস্ত লোক বলিবে ১০১ ডিগ্রী জ্বরগ্রস্তের গা ঠাণ্ডা; কিন্তু সাধারণের কাছে তো আর সেটা ঠাণ্ডা গা নয়। দার্জ্জিলিং আপ্‌ ও ডাউন মেল যখন একই সঙ্গে একই সময়ে কার্সিয়ং ষ্টেসনে পৌছায়, তখন কার্সিয়ং-এর ষ্টেসন মাষ্টার এক মজার দৃশ্য দেখেন;—তিনি দেখেন, দার্জ্জিলিং প্রত্যাগত আরোহী তাহার ওভার কোট্ খুলিয়া ফেলিতেছে; এবং সেই একই সময় একই স্থানে দার্জ্জিলিং অভিমুখী যাত্রী তাহার কোট গায়ে জড়াইতেছে। এই সব হইতে দেখা যায় যে, ঠাণ্ডা বা গরমের বোধ দেহের পূর্ব্বের অবস্থার উপরও নিভর করে।

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ দ্বারা তাপকে চেনা যায় না। ভরসা ছিল স্পর্শ; কিন্তু তাহার দ্বারাও যদি উত্তপ্ততার সঠিক নিরূপণ অসম্ভব হয়, তবে উপায়? বৈজ্ঞানিক সে উপায় তো করিয়াছেন; তাহা ছাড়া, উত্তপ্ততায় পৌছিতে শৈত্য যে বিভিন্ন অবস্থার স্তরের মধ্য দিয়া যাইতেছে, এবং যাহা প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, বৈজ্ঞানিক সেই বিভিন্ন অবস্থার সঠিক নির্দেশ করিবার ভাষাও সঙ্গে সঙ্গে দিয়াছেন। কি সে ভাষা? কি সে উপায়? কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাপের দু'একটা ধর্ম্ম, দু'একটা গুণের বিষয় আলোচনা করা যাউক; কারণ, তাহারই উপর ঐ উপায় প্রতিষ্ঠিত।

তাপের একটা ধর্ম্ম এই যে, উহা পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি করে।

একটা ছেলেকে একবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, গ্রীষ্মকালে দিন বড় হয় কেন? সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল যে, তাপ বাড়ায়। অবশ্য তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারিত যে, শীতকালের রাত তবে ছোট না হইয়া বড় হয় কেন? কিন্তু তাহার যুক্তির গলদ এই যে তাপ বাড়ায় পদার্থকে একটা বৈজ্ঞানিক সত্য বটে, কিন্তু দিন বা রাত্রি তো পদার্থশ্রেণীভুক্ত নয়।

কিন্তু তাপ যে পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি করে, তাহার প্রমাণ কৈ? প্রমাণ অবশ্য আছে বৈ কি, আর প্রমাণের পরই তো বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা।

কয়েকটা সহজ পরীক্ষার কথা বলিতেছি। মোচার শেষ-ভাগটা দেখিয়াছ তো! ডগাটা ছুঁচাল, তলাটা বেশ মোটা হইয়া আসিয়াছে। সেইরূপ একটা পিতলের কোন্ (cone) লও; একটা পিতলের রিং তাহাতে পরাইয়া দেও। রিং খানিকটা নামিয়া আসিয়া আটকাইয়া যাইবে। উপর হইতে কতটা নামিয়া আটকাইয়াছে, ভাল করিয়া মাপিয়া দেখ। আচ্ছা, এইবার রিংটা খুলিয়া লইয়া কোন্ (cone)টা বেশ করিয়া গরম কর এবং আবার রিংটা ছাড়িয়া দেও। মনে থাকে যেন, রিংটা গরম কর নাই, শুধু কোন্ (cone)টা গরম করিয়াছ। দেখিবে, এইবার রিংটা আর অতটা নামিল না। রিং-এর আয়তন তো ঠিকই আছে; সুতরাং কোন্ (cone) এর বেড় নিশ্চয় বাড়িয়া গিয়াছে, আর এটা বাড়াইয়াছে অবশ্য তাপ। পরীক্ষাটা যদি উল্টাইয়া কর—কোন্ (cone)টা গরম না করিয়া যদি কেবল রিংটা গরম করিয়া ছাড়িয়া দেও, দেখিবে রিং প্রথমবারের চেয়েও বেশী নামিয়া গেল; কারণ, এবার শুধু রিংএর ফাঁদটাই বাড়িয়াছে—কোন্ (cone)এর ঘেরটা ঠিক আছে। গৃহলক্ষ্মীরা এই পরীক্ষার কথাটা যেন স্মরণে রাখেন। যদি তাঁহারা দেখেন যে, সোণার চুড়িটা হাতে ঢুকিতেছে না—খুব কসা হইতেছে, তাঁহারা যেন উনানে চুড়িটা বেশ করিয়া গরম করিয়া লইয়া সেই গরম অবস্থায় উহা পরেন; তাহা হইলে হাত পুড়ুক, চুড়িটা বেশ ঢুকিয়া যাইবে। কিন্তু সাবধান! চুড়ির বদলে ভুলিয়া হাতটা না উনানে দিয়া বসেন; তাহা হইলে চুড়িটা আরও কসা হইবে। তাপ যে পদার্থকে বাড়ায়,—গরুর গাড়ীর চাকা যাহারা তৈয়ারি করে, তাহারা কিন্তু এটা বেশ জানে। কাঠের চাকায় লোহার বেড় পরাইবার সময় লোহাটা তাহারা বেশ করিয়া গরম করিয়া লইয়া, সেই গরম অবস্থাতেই লোহাটা পরায়। তখন লোহাটা বেশ বাড়ে। তাহার পর যখন উহা আস্তে-আস্তে ঠাণ্ডা হইতে থাকে, তখন ফাঁদটা একটু একটু ছোট হইয়া আসে। ফলে কাঠের উপর উহা বেশ চাপিয়া বসে—পরে আর সহজে খোলে না।

জীব-বিজ্ঞান

[শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম-বি]

পণ্ডিতেরা সংজ্ঞা করেন, মানুষ বুদ্ধিজীবী জীব। সে বুদ্ধি খাটিয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করে থাকে। মানুষ যে একটা জন্তু তাতে কারুর সন্দেহ নেই। তবে তাঁরা বলেন যে, মানুষের যেমন বুদ্ধি আছে, অন্য জন্তুর সে রকম নেই। এইখানেই অন্য জন্তুর সঙ্গে তার তফাৎ। এই বুদ্ধির অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক প্রাণীতত্ত্ববিদ্ হয় ত সন্দেহ উত্থাপন করবেন; কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ, মানুষ জন্তুটাই আমাদের আলোচ্য।

মানুষের সম্বন্ধে জানতে গেলে, আগে দেখতে হবে, জন্তু বললে আমরা কি বুঝি। আমরা দেখছি, গরুর শিং আছে, পাখীর ডানা আছে, মাছের পা নেই, কেঁচোর চোখ কাণ নেই,—এরা সকলেই জন্তু। শিং, ডানা, হাত, পা, চোখ, কাণ থাকুক বা না থাকুক, তাতে কিছু এসে যায় না। অথচ এদের মধ্যে এমন একটা কি গুণ আছে, যার জন্য এদের সব এক শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে, এবং যে গুণ থাকাতে এরা গাছপাথরের দলে নয়।

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে, আমরা এমন একটা জীব চাই, যার হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্য সকলের চেয়ে কম আছে। পৃথিবীতে এ জাতের জীব অনেক আছে। তারা এত ছোট, যে, অণুবীক্ষণের সাহায্য ভিন্ন তাদের দেখা যায় না। এর মধ্যে একটা জীবের বিষয়ে কিছু বলব। এর নাম এমীবা। অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, এমীবার দেহ সিদ্ধ সাগুদানার মত স্বচ্ছ ও চট্‌চটে এক রকম জিনিষ দিয়ে তৈরি। এই জিনিসটার নাম দেওয়া হয়েছে প্রোটোপ্লাস্‌ম্। এই প্রোটোপ্লাস্‌মের মধ্যে খানিকটা অংশ একটু বেশী গাঢ়—এইটার নাম নিউক্লিয়স্। এই নিউক্লিয়স ঐ জীবের প্রাণবিন্দু বলে মনে হয়।

এমীবা প্রায় গোলাকার। এর চোখ, কাণ, নাক, মুখ, হাত, পা কিছুই নেই। এ খায় সমস্ত দেহ দিয়ে, চলে সমস্ত দেহ দিয়ে। যখন স্থির হয়ে থাকে, তখন একে দেখতে অনেকটা গোলাকার। কিন্তু যখন চলে বেড়ায়, তখন ঐ দেহের খানিকটা এগিয়ে দেয়; তার পর সমস্ত দেহটাকে সেই এগুনো অংশটার ভেতরে নিয়ে গিয়ে হাজির করে।

এরা জলে থাকে। জলে-গোলা অম্লজান-বাষ্প এবং অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে যেগুলো এদের পথ্য, সেইগুলো এরা সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে শুষে নেয়। এদের মুখ নেই, সুতরাং এই ভাবেই এদের আহার। আর, দেহের যত পরিত্যক্ত অংশ এরা সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে বা'র করে দেয়। খাদ্য দ্রব্য পেলে, তার দিকে এগিয়ে যায় এবং এরা অপথ্য পেলে সেখান থেকে পালায়। নিজের দেহের পরিত্যক্ত অংশ যেখানে বেশী করে জমছে, সেখান থেকেও এরা পালায়;—কারণ সেটাও এদের পক্ষে বিষ। পালাতে না পেলে এরা মরে যায়। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই নিকৃষ্ট এমীবা যা জানে, আমরা শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে, "বুদ্ধি" খরচ করে তা ভুলে যাই। আমরা বদ্ধ ঘরে লেপ-মুড়ি দিয়ে আমাদের পরিত্যক্ত বিষাক্ত নিঃশ্বাসের মধ্যে ডুবে থাকতে চাই। যে জল খাবো, তাইতেই মলমূত্র ত্যাগ করি। যাক্ এখন ও কথা।

জল থেকেই তার সমস্ত খাদ্য আসে;—কঠিন বস্তু গ্রহণ ও পরিপাক করিবার শক্তি তার নেই। এই জন্য তাকে জলে বাস করতে হয়। তা ছাড়া, তার শরীরোপাদানের অধিকাংশই জলীয়; এই জন্য একটু ভিজে-ভিজে না থাকতে পেলে সে বাঁচে না—কিন্তু শুকুলেই মরে যায়। পথ্যগ্রহণ ও অপথ্য বর্জ্জন করে সে পুষ্ট হয়। তার পর এর দেহ দুই বা তার বেশী ভাগে ভাগ হয়ে যায়; এবং সেগুলো খসে পড়ে, প্রত্যেকটা বড় হয়ে পরিপুষ্ট পূর্ণ এমীবার আকার ধারণ করে। এই হচ্ছে এর সন্তান উৎপাদন।

এমীবা জীবন পর্য্যালোচনা করে আমরা কয়েকটা জীব-ধর্ম্মের সন্ধান পেলুম। আত্মরক্ষার চেষ্টা, বাহ্যবস্তুকে আত্মসাৎ করে পুষ্টিলাভ এবং আত্মানুরূপ আর একটা জীবের প্রজনন। আরও দেখলুম এমীবার জীবন ধারণের পক্ষে কয়েকটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য, যথা:—জল, দ্রবীভূত খাদ্য,

অম্লজান বাষ্প, স্বদেহজাত এবং অন্যবিধ বিষের অভাব, এবং উপযুক্ত আপ। যে জলে এমীবা বাস করবে, তাকে যদি ফুটান যায় ত ঐ এমীবাগুলো বাচতে পারে না। জলের তাপ কমাতে-কমাতে একটা তাপ পাওয়া যায়, যাতে সেই জলের এমীবাগুলো খুব বেশী সচল ও সক্রিয় হয়। এর চেয়ে তাপ কমাতে-কমাতে, এক সময়ে তারা জড়ভরত হয়ে যায়। তার চেয়েও তাপ কমালে আর বাচতে পারে না।

এই কয়টা কথা মনে রাখতে হবে। এমীবাকে বুঝলেই, বাকী সব জীব চরিত বোঝা সহজ হবে। কারণ, অতিবড় জন্তুর দেহও এই এমীবার মত অগণিত cellএর সমষ্টি;—এই রকম কতকগুলি cell ছাড়া তাতে আর কিছু নেই।

জাতি-বিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ]

মুখবন্ধ

নৃ-তত্ত্বের (Anthropology) অংশবিশেষের নাম জাতি-বিজ্ঞান (Ethnology)। ইহার সাহায্যে, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসারে, মানব-বংশের বিভিন্ন শাখার সম্যক্ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় পাওয়া যায়। এই শাখাগুলির বিবরণ দেওয়াই শুধু এই বিজ্ঞানের কাজ নয়। মানব সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে পরস্পরের কি সম্বন্ধ, তাহাও ইহার সাহায্যে নির্ণীত হইবে। মানবজাতি কত প্রকারের হইতে পারে, মানবজাতির ইতিহাস, ভাষা, শারীরিক ও মানসিক বিশেষত্ব, শ্রেণীভেদে ইহার বিভাগ, কোন্-কোন্ অংশে বিভিন্ন জাতির সাদৃশ্য ও বৈষম্য আছে, তাহার নির্ণয়—এই সমস্ত বিষয় জাতি-বিজ্ঞানের অনুসন্ধেয়। নৃ-তত্ত্বের সঙ্গে জাতি-বিজ্ঞানের একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। মানুষের সঙ্গে অন্য জীবের সম্বন্ধ নির্ণয় নৃ-তত্ত্বের একটা আলোচ্য বিষয়; কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর মানব-জাতির মধ্যে বৈষম্য কোথায়, জাতি-বিজ্ঞান তাহারই আলোচনা করিয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, জাতি-বিজ্ঞান ইতিহাসের আলোচনা করে; কিন্তু সে ইতিহাস সাধারণ ইতিহাসের ন্যায় কার্য্য-পরম্পরার বিবৃতি নয়;—মানুষের উপর জল, বায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে যে কার্য্য হয়, এ ইতিহাস তাহাই বিবৃত করিয়া থাকে। পরিজ্ঞাত তত্ত্ব (data) হইতে আরম্ভ করিয়া, সুপ্রাচীন অতীতের গর্ভে নিহিত অপরিজ্ঞাত তত্ত্বের সন্ধানে এই ইতিহাসের প্রবৃত্তি। এই দিক্ দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে, জাতি-বিজ্ঞানকে, মনীষী প্রিচার্ডের (Prichard) অনুবর্ত্তী হইয়া বলিতে পারা যায়—ইহা মানব-জাতির archæology বা প্রত্নবস্তুতত্ত্ব।

এই জাতি-বিজ্ঞান প্রাচীন শাস্ত্র নয়। অল্পকাল পূর্ব্বে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচীন হইলেই যে তাহা আদৃত হইবে, নূতনের আদর হইবে না,—এরূপ কোন যুক্তিই হইতে পারে না। যাহা সারভূত, তাহাই উপাসিতব্য। এ শাস্ত্র এখনও সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। মনীষিগণ তাঁহাদের অভিজ্ঞতা, পরিদর্শন ও আবিষ্কারের ফল যাহা দিয়াছেন ও দিতেছেন, তাহাই কালে হয় ত সুনিবদ্ধ জাতিতত্ত্ব দর্শন (Ethnological Philosophy) রূপে পরিণত হইতে পারে। বিবর্ত্তনবাদীরা (evolutionists) জাতিতত্ত্ব লইয়া নানা মতবাদের অবতারণা করিতেছেন; ইহাদের মধ্যে কেহ-কেহ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া দেখাইতে চান যে, নিম্নজন্তুর ইন্দ্রিয়-ব্যূহের পরিণতিতে মানব মানবত্ব প্রাপ্ত করিয়াছে। কিন্তু বিরুদ্ধ-বাদীরা বলেন যে, যদি ইহাদের সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আর একটা উদ্ভট সিদ্ধান্তের অবকাশ আসিয়া পড়ে;—আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হয় যে, নিম্ন-জীব ক্রমোন্নতিবশে মানব-আকৃতি লাভ করিবার পর ক্রমোন্নতির ধারা একেবারে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে—মানব আকারের আর ক্রম পরিণতি ঘটিবে না। অন্য কোন জীব-সমাজে আকার ও গঠনের বৈশিষ্ট্যসূচক এরূপ ঐক্য দেখা যায় না। গো, অশ্ব, কুক্কুর প্রভৃতি যে কোন জীবের কথা ধরা যাক্ না কেন, দেখা যাইবে যে, তাহাদের এমন

কতকগুলি গুণ আছে, যদ্দারা তাহাদিগকে প্রায় অনুরূপ (allied) বলা যাইতে পারে ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে ছোট খাট অনেক বিভিন্নতা প্রকটিত রহিয়াছে ; মনুষ্য-জাতির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য প্রায় নগণ্য বলা যাইতে পারে। মানুষের সাধারণ ইন্দ্রিয় বিন্যাস সকল দেশেই যে একই রূপ, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তবে সভ্যতা অথবা জীবনোপায়ের প্রয়োজন অনুসারে কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের শক্তি-তারতম্য হিসাবেই যা কিছু পার্থক্য। ভূতত্ত্বের সাহায্যে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, বর্তমান কালের অনুরূপ ইতর জন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগেও ছিল। কিন্তু তাহাদের গঠন ও ইন্দ্রিয়ব্যূহের বিভিন্নতা খুব বেশী ও অনেক রকমের। প্রাচীনকালের জীবাস্থি পরীক্ষা করিলেও এ বিষয়টী বেশ বুঝিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে, তত্ত্ববিদ্‌গণ কুকুরের আকৃতি একটা ছোট জন্তুর অস্থি পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, তাহা বর্তমান অশ্বের জনক। বিজ্ঞান যতদূর আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার অনুসরণ করিয়া বলিতে পারা যায় যে, প্রাচীন ও অর্বাচীন সর্বকালে মানুষের পরিমাণ মোটের উপর একই প্রকারের। সকল জাতির লোকের উচ্চতায় পার্থক্য আছে। যে সমস্ত মানুষ বিষুবরেখায় বা অয়নবৃত্তে বাস করে, তাহাদের সংখ্যা মকর বা কর্কটক্রান্তিবাসীদের অপেক্ষা কম। এক প্রদেশের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জায়গার স্ত্রী-পুরুষ সাধারণতঃ খর্বাকৃতি হইয়া থাকে। কোন যুগেই এই নিয়মের বড় একটা ব্যত্যয় দেখা যায় নাই। সকল যুগে মানুষের ইন্দ্রিয় একই রকমের ছিল—এখনও আছে। এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা আমরা যথাস্থানে করিব।

অষ্টাদশ শতকে পিটার ক্যাম্পার (Peter Camper) নামক একজন প্রসিদ্ধ ওলন্দাজ শরীরতত্ত্ববিৎ সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মানবজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করিবার উপায় স্থির করেন। ইনি নর-কপালের আকার ও পরিমাণ অনুসারে জাতি-নির্ণয় করিতেন। ইঁহার পদ্ধতির নাম facial angle। এই পদ্ধতির পরীক্ষা তিনি এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন- "The head being viewed in profile, a line is drawn through the *meatus* auditorius of the ear to the base of the nose, meeting another touching the most prominent part of the centre of the forehead, and falling down to the most advanced portion of the upper jaw. The nearer the angle thus formed approaches a right angle the greater, as a general rule, is the intellectual development of the individual, and this is found to be generally the case, not only as regards man, but also among the lower animals—the smaller the facial angle the lower are they in the scale of intelligence." ক্যাম্পারের এই পদ্ধতিতে মাথার খুলির গঠন প্রভৃতি বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকায়, পরীক্ষায় অনেক ভুল হইতে লাগিল। কিছুকাল পরে ব্লুমেনবাখ (Blumenbach) এই ভুল শোধরাইয়া মানবজাতিকে পাঁচটী বিভাগে বিভক্ত করেন। তাঁহার নিরূপিত বিভাগ কয়টী এই—

(১) ককেসীয়
(২) মোঙ্গলীয়
(৩) ইথিয়পীয়
(৪) আমেরিকান
(৫) মলয়

ইহার পর কুভিএর (Cuvier) ব্লুমেনবাখের পাঁচটী বিভাগকে তিনটীতে পরিণত করেন। তিনি আমেরিকান ও মলয় বিভাগকে মোঙ্গলীয় বিভাগের শাখারূপে গ্রহণ করেন। কুভিএর তাঁহার নিরূপিত তিনটী প্রধান জাতির প্রথম লীলা-নিকেতনও স্থির করিয়া ফেলেন। তাঁহার মতে এই তিন জাতি প্রথমে পর্বতে বাস করিত। ককেসীয়গণের ককেসস্ পর্বত, মোঙ্গলীয়গণের অল্‌টাই পর্বত এবং নিগ্রোগণের এট্‌লাস পর্বত আদি-বাসভূমি ছিল। কয়েক বৎসর এই মতের খুব আদর হইয়াছিল। কিন্তু একজন বহুভাষাবিৎ প্রসিদ্ধ চিকিৎসক সপ্রমাণ করিলেন যে, মানবজাতির প্রসূতভূমি পর্বতে ছিল না—নদীসৈকতেই তাহাদের আদি নিবাস ছিল। এই মতের যিনি প্রবর্তন করেন, তাঁহার নাম প্রিচার্ড। ইঁহার সিদ্ধান্ত অনুসারে মানবজাতি নিম্নলিখিত তিনটী ভাগে বিভক্ত।—(১) স্যাইরো-আরেবিয়ান্ বা সেমিটিক জাতি (সিরিয়ান, জু ও আরবজাতি ইহার অন্তর্গত); (২) ইজিপ্‌সিয়ান বা, হামিটীক জাতি, এবং (৩) ইণ্ডো-

ইয়োরোপীয়ান, আর্য্যেটিক বা আর্য্যজাতি (হিন্দুগণ, পার্সীয়ানগণ, আফগান, কুর্দ্দ, আর্মেনিয়ান এবং ইয়োরোপের জাতিসমূহ ইহার অন্তর্গত)। প্রিচার্ডের মতে মধ্য-আসিয়া পাচটী nomad জাতি দ্বারা অধ্যুষিত। সেই জাতিগুলির নাম উগ্রিয়ান, তুরস্ক, মোঙ্গলীয়, তুঙ্গুসীয়, এবং ভোট। প্রিচার্ডের পর ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে সুপণ্ডিত জোনস্ (A. T. Johnes) জাতি-বিজ্ঞানের আলোচনা করেন। ১৮৪৬ সালে তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার দুই বৎসর পরে লণ্ডনে জাতিবিজ্ঞান-সভার প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৫০ সালে লেথামের (R. G. Latham) গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইনি তিনটী মূল শাখার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি বলেন—

১। Mongolidae—আসিয়া, পলিনেসিয়া ও আমেরিকানিবাসী।

২। Atlantidae—আফরিকাবাসী।

৩। Japetidae—ইয়োরোপবাসী।

পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে, ভারতবর্ষই জাতিতত্ত্ব আলোচনার প্রধান ক্ষেত্র। কেহ-কেহ ইহাকে উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রও বলিয়াছেন। ভারতের জাতিতত্ত্ব লইয়া আলোচনা বহুদিন হইতে চলিতেছে। ইয়োরোপীয়দের মধ্যে জন এলিয়টই (১৭৯২ খৃঃ) ভারতীয় জাতিতত্ত্বের আলোচনায় প্রথম প্রবৃত্ত হন। কাপ্তেন রেনল্ড্স্ (১৮৪৯ খৃঃ), ডাঃ মাক্ রে (Dr J. Mc. Rae, ১৮০১ খৃঃ), ওয়ালটার্স (১৮৩২ খৃঃ), উইলকক্স (১৮৩২ খৃঃ), ইয়ুল (১৮৪৪ খৃঃ), হজসন্ (১৮২৮-৫৬ খৃঃ), রাউলাট (১৮৪৫ খৃঃ), ডালটন (১৮৪৫), কাম্বেল্, পিডিংটন্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ গারো, কুকি, খাসিয়া, খাম্‌ডি, নাগা, দ্রবিড় প্রভৃতি জাতি বিষয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। ইহার পর বিলাতে জাতিতত্ত্ব লইয়া আলোচনার বিশেষ উদ্যোগ হয়। ফলে ১৮৬৩ খৃঃ লণ্ডনে Anthropological Society প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বৎসর একখানি সাময়িক পত্রও ঐ সভা হইতে প্রচারিত হয়। ১৮৭৪ সালে Anthropological Society ও Ethnological Society স্বতন্ত্রভাবে না চলিয়া Anthropological Institute নামে চলিতে থাকে।

এই সভার দৃষ্টান্তে পরে নানা স্থানে আরও কয়টী সভা হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে কীন, বোয়াস্, রাস্‌সেল, ব্রাইস্, লেফেভ্‌র, হাডন প্রমুখ কয়েকজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের চেষ্টায় জাতিতত্ত্বের সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতীয় জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ সুধীজনের গবেষণার ফলে অনেক তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। যথাস্থানে তাঁহাদের তথ্যগুলি আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এখন, আর দু' একটী কথা বলিয়া উপসংহার করিব। জাতিতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে, আমাদিগকে কয়েকটী বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পৃথিবীতে অনেক জাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা ইহাদের ভিতর হইতে আমরা কতকগুলি মূল জাতি বাহির করিয়া লইতে পারি। এই সকল জাতি পরস্পর সহিত মিশিয়া গিয়া বহু নূতন ও মিশ্র জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। রসায়ন শাস্ত্রের আলোচনায় দেখা যায়, কতকগুলি মূল পদার্থ আছে; সেইগুলি পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া অসংখ্য মিশ্র পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। মানবজাতি সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য। পৃথিবীতে কতকগুলি মূল জাতি ছিল; তাহাদের পরস্পর সংমিশ্রণে বহুসংখ্যক মিশ্রজাতি উৎপন্ন হইয়াছে। এক জাতি অপর জাতির সহিত মিশিলে, এক নূতন ও মিশ্র জাতি হয়; কিন্তু সেই নূতন জাতিতে দুই মূল জাতিরই বিশেষত্ব পাশাপাশি অবস্থান করে। কোন জাতিই তাহার নিজের বিশেষত্ব হারায় না। যে কোন একটী মিশ্র জাতিকে পরীক্ষা করিলে, কোন্ কোন্ মূল জাতির সংমিশ্রণে তাহা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আমরা স্থির করিতে পারি। শারীরিক গঠন ও আকৃতি এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করে। ভূগর্ভ হইতে খুব পুরাতন মাথার খুলি বাহির করিয়া পুরাণ্ঠা দ্বারা বলা যাইতে পারে, ইহা কোন জাতির মাথার খুলি। ইহা কোন মূল জাতির বা মিশ্র জাতির মানবের মাথার খুলি কি না, তাহাও বলা যাইতে পারে। যদি ইহা কোন মিশ্র জাতীয় লোকের মাথার খুলি হয়, তাহা হইলে কোন্-কোন্ মূল-জাতীয় মানবের মিশ্র রক্ত ঐ মস্তকের অধিকারীর শরীরে প্রবাহিত ছিল, তাহাও বলা যাইতে পারে। ভগবানের রাজ্যে ভেল চালাইতে পারা যায় না,—চালাইলে তাহা ধরা পড়িয়া যায়।

ভাষাও জাতি-নির্ণয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। কিন্তু এক জাতির ভাষা অপর জাতি অনায়াসেই শিখিতে পারে এবং আপনার ভাষাও ভুলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির

নিয়ম এই যে, ভাষাও সেরূপ স্থলে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত ও বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় ; বিশেষ ভাবে লক্ষ্য না করিলে সেটুকু ধরা যায় না। মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। সে সমস্ত মতবাদের কথা এখানে তুলিব না। Wallace, Darwin-এর মতে নিম্নস্তরের প্রাণী হইতে ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে মানবের উৎপত্তি হইয়াছে কি না, সে সম্বন্ধে অনেক তর্ক আছে। আমরা বলির, মানুষ একটা জাতি বা Species। লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেরও নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। সেই সময়ের বনমানুষ ও মানবের কঙ্কালের মধ্যে তখন যে বিশেষত্ব ছিল, এখনও সেই বিশেষত্ব রহিয়াছে। ভূতত্ত্ববিদগণ তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। জাতিতত্ত্বের আলোচনায় যেমন আমরা দেখিতে পাই যে, কতকগুলি মৌলিক জাতি ছিল, সেইরূপ প্রাণিজগতে বহুসংখ্যক Species বরাবরই এই পৃথিবীতে বিদ্যমান রহিয়াছে। মানবজাতি এই সকল Species-এর মধ্যে এক species-এর অন্তর্গত।

প্রাকৃতিক ইতিহাসকুশল পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, এই সকল species-এর মৌলিকত্ব নষ্ট হয় না। তাঁহারা সিংহ ব্যাঘ্রকে বিড়ালজাতীয়, নেকড়ে বাঘকে কুকুর জাতীয় বলিয়া উল্লেখ করেন। মানবজাতি একটা বিশেষ species-ভুক্ত।

কাহারও কাহারও মতে আদিকালে সকল মানবই এক-জাতিভুক্ত ছিল। বিভিন্ন দেশের ভিন্ন-ভিন্ন জল-হাওয়ার প্রভাবে পড়িয়া, ভিন্ন-ভিন্ন প্রকৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক, অধুনা মানুষ এত বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা সম্ভবও হইতে পারে। মানব-সাধারণের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিশ্বাস এই যে, আদিকালে ঈশ্বর এক মানব ও এক মানবীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন; সমস্ত মানবজাতি তাহাদেরই বংশ। Sir Oliver Lodge বলেন, মানব-সাধারণের মত উপেক্ষণীয় নয়। সকল মানবজাতি আদিতে এক জাতীয় ছিল, ইহা যদি সকল মানবেরই বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার মধ্যে সত্য নিহিত আছে। যাহাই হউক, আমাদের বুঝিতে হইবে, মানবজাতি মূলে সর্ব্বত্র এক ও অবিশেষ। মানব-প্রকৃতির বিভিন্নতা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদি এক করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সকল মানবই এক আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া পড়িবে।

ব্যর্থ গান

[শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন, বার-এট্-ল]

(কীর্ত্তনের সুর)

পরাণে তোমায় ডাকিনি, হে হরি,
ডেকেছি শুধুই গানে ;
অই এ জীবনে পাইনি তোমারে,
ফিরেছি শূন্য প্রাণে।

তুমি সবাকার হ'তে আপনার,
সে কথা বুঝিতে বাকি নাহি আর ;
তব শত ঠাঁই শত বার ধাই, চাহি না চরণ পানে।

তুমি চাহ প্রাণ, নাহি চাহ ভাষা ;
চাহ দীন বেশ, নাহি চাহ ভূষা ;
গাহিনি সে গান, যাহা তুমি শোন, আর কেহ নাহি শোনে।

শিখাও আমারে গাহিতে সে সুরে,
যা শুনি থাকিতে পারিবে না দূরে,
আসিবে হৃদয়ে তব বীণা লয়ে, বাজাবে নূতন তানে।

[রচনা—শ্রীঅমিয়নাথ চক্রবর্ত্তী]

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

ছায়া-কামোদ—একতালা।

আমার থাকুক একলা ঘরে
আপন মনে জানাজানি—
এই বাতায়নে চেয়ে দেখা
ঐ আকাশ-ভরা উদার বাণী।
সারাটি দিন কতই সুরে
স্বপন আমার বেড়ায় ঘুরে—
কেই বা জানে? কার কাছে তা
ব্যাকুল গানে দেবো আনি?
থাকুক আমার একলা তবে
আপন মনে জানাজানি।
এই হৃদয়ের অতল নীরে
সন্ধ্যাতারার পড়ুক ছবি—
নানা ক্ষণের ভাবনাগুলি
দিক্ রাঙিয়ে সন্ধ্যা রবি।

আভোগ।

০ ১ ২ ৩
{ পা নধা -া | না -র্সা র্সা | ধা না -র্সা | র্গা নর্রর্সনা -ধনর্সা |
গ ভী০ র রা ০ তে চাঁ০ দে র্ আ লো০০০ ০০০

০ ১ ২ ৩
র্সা র্রা র্গা | পর্মা -পর্মা -পা | র্মা র্গা র্মর্রা | নর্রা -র্সর্রা -র্সনধপা } |
চা ই০ বে আ০ ০মা য় সে ই তো০ ভা০ লো০ ০০০০

১ ৩
{ র্সা -নর্সা নর্সা | নর্রা -া -া | র্সনর্সা ধণা -া | ধা পমা -গরা |
কি০ ০হ বে০ আ০ ০ র্ স০০ বা০ র্ মা ঝে০ ০০

০ ১ ২ ৩
রগা -গমা পা | মপা ধর্না র্সর্রা | না র্সা র্সা | নর্রর্সনা -ধপমগা -রসা } |
ম০ ০ন্ কে নি০ ০০ য়ে০ টা না টা নি০০০ ০০০০ ০০

০ ১ ২ ৩
র্সা নর্সা -নর্সর্রা | র্সা না -র্সনর্সা | ধা -া পধণা | ধা পমা -গরা |
আ মা০ ০০র্ থা কু ০০ক্ এ ক্ লা০০ ঘ রে০

০ ১ ২ ৩
রা গা -া | মা -ধপা -মপা | গমা -পমা -গমা | মরা নরা -নসা || ||
আ প ন্ ম ০নে ০০ জা০ ০না ০০ জা০ নি০

রঙ্গ-চিত্র

বি-শৃঙ্খল

(শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত)

চিত্র পরিচয়—দেশের পা দুখানি নানা শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। যদিও এই শৃঙ্খলভারে দেহ মৃতের ন্যায় অসাড়, তবু এখনও রক্ত ঝরিতেছে। বুঝা যাইতেছে এখনও প্রাণ আছে। এই আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য শৃঙ্খল মোচনের চেষ্টায় নানা উদ্যোগী পুরুষ নানারকম চাবি লইয়া আসিতেছেন, কিন্তু হায়, চাবি এত প্রকাণ্ড যে তাহাতে শৃঙ্খলের কুলুপ খোলা যায় না। ছোট্ট একটি কুলুপ, হয় ত সামান্য একটি চাবিতে খুলিবে—কিন্তু কৈ সেই আসল চাবি।

প্রতিভাবান্ ভাস্কর

[অধ্যাপক শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ এম-এ]

শ্রীবিষ্ণু মূর্ত্তি

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যে শিল্পীর চিত্র-পরিচয় দিতে অগ্রসর হইয়াছি, তিনি একজন বাঙ্গালী। তাঁর নাম শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক। কলিকাতা ৮১ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীটে তিনি বাস করেন। বাল্যকাল হইতে আঁকা জোকার দিকে তাঁর বেশী ঝোঁক ছিল এবং ছাত্রাবস্থায় অনেক সতীর্থের প্রতিকৃতি ও বিকৃতি আঁকিয়া অনেকের প্রীতি ও বিদ্বেষের পাত্র হইয়া ছিলেন। স্কটিশচার্চ স্কুলে পড়িবার সময় তৎকালীন হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথ-মোহন বসু এম. এ. মহাশয় প্রমথনাথের কলানৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে Art Schoolএ পড়িতে উপদেশ দেন। সচরাচর যে সব ছেলের লেখাপড়ায় কিছু হয় না, তাদের আর্ট স্কুলে প্রবেশ করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু প্রমথনাথ এ ধরণের ছেলে ছিলেন না। তিনি ভাল ছেলে ছিলেন এবং শুধু প্রবৃত্তির প্ররোচনায় ভবিষ্যতে বড় জজ বা উকিল বা ডাক্তার বা উচ্চ ধরনের বড়রকম একটা কিছু হওয়ার আশা ত্যাগ করিয়া অল্প বয়সে আর্ট স্কুলে যাইয়া ভর্ত্তি হন। পাঁচবৎসর Jubilee Art Academyতে পাঠ করিয়া তিনি নিজের নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। শিক্ষার প্রারম্ভেই Sir Devaprasad Sarbadhicary Kt. C. I. E. ও Hon'ble. Mr. P. C. Lyon I. C. S, C. S. I. মহোদয়গণের তৈল-চিত্র আঁকিয়া তাঁহাদের নিকট বিশেষ সম্মান ও প্রশংসাপাত্র পান। পরে তিনি ভাস্কর্য্যের দিকে মন দেন এবং বোম্বায়ের খ্যাতনামা ভাস্কর শ্রীযুক্ত বিনায়ক পাণ্ডুরাম কারমাকার তাঁহাকে এই শিল্পশিক্ষায় বিশেষ সহায়তা করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে Oriental Art Exhibitionএ তাঁহার কতকগুলি কাজ দেখান হইয়াছিল। প্রমথনাথ অনেকগুলি Bust বেশ দক্ষতার সহিত প্রস্তুত করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের মধ্যেই প্রমথনাথের নির্ম্মিত কয়েকটি মূর্ত্তির আলোকচিত্র প্রদত্ত হইল; তাহা দেখিলেই পাঠকগণ তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। সাধারণের উৎসাহ পাইলে এই নবীন ভাস্কর যে যশস্বী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পরলোকগত কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

পরলোকগত রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি আই-ই

আচার্য্য শ্রীযুক্ত সার জগদীশচন্দ্র বসু

স্বামী বিবেকানন্দ

ভাস্কর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক

নিখিল-প্রবাহ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

সুলু দ্বীপের সুলতান

সুলতানের নিজস্ব বাদক সম্প্রদায়

ফিলিপাইনের গো-শকট
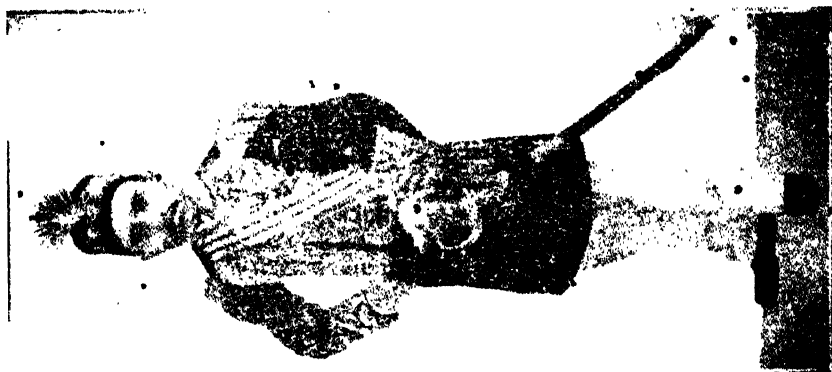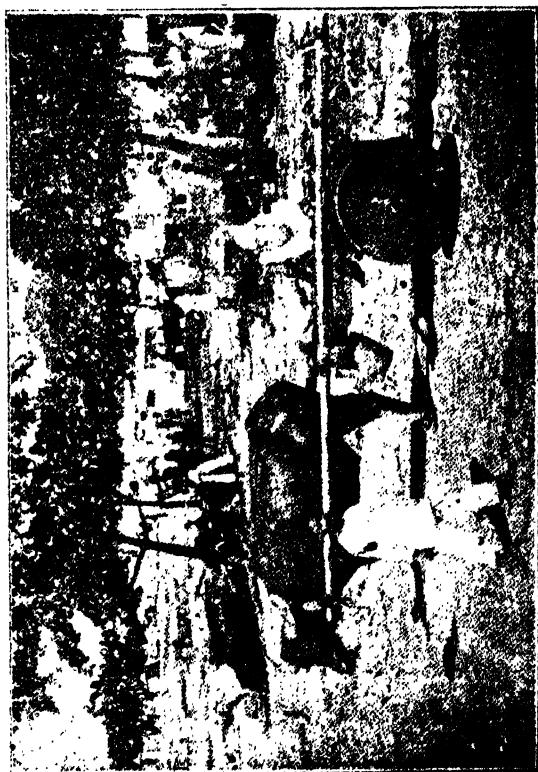
স্থান পরিবর্ত্তন

[ফিলিপাইনেরা এক স্থান হইতে অপর স্থানে বাস উঠাইয়া লইয়া যাইবার সময় তাহাদের কুটীরখানি পর্য্যন্ত তুলিয়া লইয়া যায়। প্রথমে ঘরের চালটি সম্পূর্ণ অবস্থায় সকলে ধরাধরি করিয়া লইয়া যায়, তার পর চারিদিকের চারটি দেওয়ালও একসঙ্গে এইভাবে স্থানান্তরিত করে।]

আইগোরোট

[আইগোরোটরা এখনও সম্পূর্ণ সভ্য হইতে পারে নাই। তাহারা বৃক্ষের উপর কুটীর বাঁধিয়া বাস করে।]
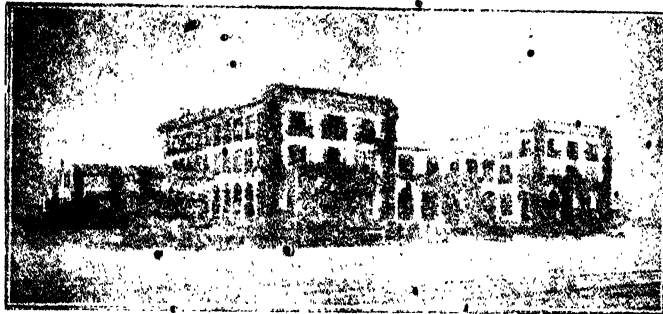
সৈনিক সমাজ-গৃহ—[ফিলিপাইনে অবস্থিতি আমেরিকান সৈনিক ও নাবিকগণ ম্যানিলার এই নবনির্ম্মিত সমাজ গৃহে ক্রীড়াকৌতুক ও হাস্যামোদে তাহাদের অবসর যাপন করে।]

ফ্রেড্রিক্ এ্যাটকিন্সন্

[ইনি ফিলিপাইনের শিক্ষাবিভাগের প্রথম পরিদর্শক ছিলেন। ইহাঁর অসাধারণ চেষ্টায়, অক্লান্ত পরিশ্রমে, ও বিপুল অধ্যবসায়ের গুণে নিরক্ষর অসভ্য ফিলিপাইনদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার রূপ অসাধ্য কার্য্য সম্ভব হইয়াছিল।]

সারঙ্ সাঁকো—[আমেরিকার শাসনাধীনে ফিলিপাইনের নানাস্থানে সুন্দর সুন্দর সাঁকো ও সুদীর্ঘ রাজপথ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। যে স্থানে এক সময় দুর্গম অংশ ছিল, তাহা এক্ষণে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-ভূষিত মনুষ্য-আবাসে পরিণত হইয়াছে। এই সারঙ্ সাঁকো ও তৎসংলগ্ন দীর্ঘ বিস্তৃত বাতাঙ্গা আইবান পথ পূর্ত্ত বিভাগের এক উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি।]

ফ্রান্সিস্ বার্টণ্ হ্যারিসন্
[ফিলিপাইনের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা]

উইলিয়ম টাফ্ট্
[ইনি ফিলিপাইনের প্রথম শাসনকর্ত্তা ; পরে আমেরিকা যুক্তরাজ্যের প্রধান অধিনায়কের পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন]

মুশ্যে এদোয়াদ´ বেলিন।
[ইনি দূরগামী আলোকচিত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন ; সম্প্রতি আর একটা এমন যন্ত্র উদ্ভাবন করিতে নিযুক্ত আছেন, যাহার সাহায্যে লোকে টেলিফোনে কথা বলিবার সময় সেই লোককেও দেখিতে পাইবে ।]

দূরগামী আলোক-চিত্রের যন্ত্র

চিত্রবার্ত্তা প্রেরক যন্ত্র
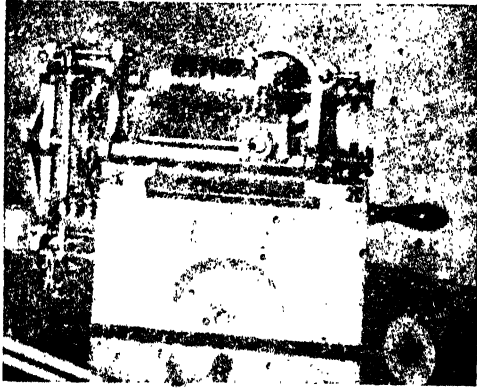
চিত্রবার্ত্তা গ্রাহক যন্ত্র

যন্ত্র-প্রেরিত আলোক-চিত্র

১। ফিলিপাইনের কথা।

১৮৯৮ সালে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়া আমেরিকা ঘোষণা করিয়াছিল যে ফিলিপাইনের অধিবাসিগণকে সুশিক্ষিত ও স্বায়ত্ত শাসনের উপযুক্ত করিয়া, তাহাদিগকে স্বাধীনতা ফিরাইয়া দিবে; এবং যতদিন না ফিলিপাইন আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়, ততদিন আমেরিকা তাহাকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে। আমেরিকা এতদিন অক্ষরে-অক্ষরে তাহার প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া আসিয়াছে। আমেরিকার সহানুভূতি ও সুশাসনের গুণে বিশ বৎসরের মধ্যেই অসভ্য ও বর্ব্বর ফিলিপাইনবাসীরা সভ্য ও ভদ্র হইয়া উঠিয়াছে। আমেরিকার অসাধারণ চেষ্টা

আসামী সনাক্ত

[যন্ত্রপ্রেরিত আলোক চিত্রের সাহায্যে পলাতক আসামীকে দূর হইতে সনাক্ত করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।]

সিক জ্যাক

[এই দুর্দ্দান্ত দস্যু সাউদাম্পটন হইতে পলায়ন করিয়া পোর্টল্যাণ্ডে উপস্থিত হইবামাত্র যন্ত্রপ্রেরিত আলোকচিত্রের সাহায্যে ধরা পড়িয়াছে। সিক জ্যাক পোর্টল্যাণ্ডে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সাউদাম্পটন হইতে থানার চিত্র বাহী গ্রাহক যন্ত্রে পরিচালিত তাহার আলোক চিত্র আসিয়া পৌঁছাইয়াছিল।]

ও অসীম অধ্যবসায়ের ফলে, এই অল্প সময়ের মধ্যেই নিরক্ষর ফিলিপাইনবাসীরা বেশ সুশিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। মিশর চল্লিশ বৎসর এবং ভারত দেড়শত বৎসর ইংরাজের শাসনাধীন থাকিয়া যেটুকু উন্নতি লাভ করিয়াছে, ফিলিপাইন বিশবৎসর আমেরিকার অধীন থাকিয়া তাহার চতুর্গুণ উন্নতি লাভ করিয়াছে। অথচ, ফিলিপাইনের শাসন-সমস্যা ভারতের অপেক্ষা একটুও কম নহে। ভারতের তুলনায় যদিও ফিলিপাইনকে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তথাপি ভাষাভেদ, জাতিগত পার্থক্য ও ধর্ম্মের বিভিন্নতা সেখানেও বড় অল্প নহে। ফিলিপাইনের এক মিন্দানায়ো ও শুলু প্রদেশেই মোরো, শুবানো, তীরুরে, শামাল, বাজায়ো, মানোবা, বাগাবো, বীলান ও আতা প্রভৃতি নয়টি ভিন্ন-ভিন্ন জাতি বাস করে। আরও অসংখ্য পৃথক্ জাতিও আছে বটে, কিন্তু এই নয় দলই সেখানে প্রধান। মোরোদিগের মধ্যে আবার ভিন্ন-ভিন্ন তিনটি শ্রেণী আছে,—মারানায়ো, মাগুইন্দানায়ো এবং তাউসুগ, বা জোলোয়ানো সম্প্রদায়। ভারতের ব্রাহ্মণগণের ন্যায় মোরোরা সেখানে সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করে, তবে শাস্ত্রজ্ঞানের দোহাই দিয়া নয়, অস্ত্র আস্ফালনের জোরে। প্রত্যেক বিভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, পৃথক্ পৃথক্ সামাজিক রীতি-নীতি, এবং বিভিন্ন বিধি ও অনুশাসন। মান্দ্রাজ ব্যতীত ভারতের অপরাপর প্রদেশের লোকেরা তবু হিন্দীতে পরস্পরের সহিত কতকটা আলাপ-পরিচয় করিতে পারে; কিন্তু ফিলিপাইনবাসীদের সে উপায়ও নাই। একজন দ্বিভাষীর সাহায্য ব্যতীত কেহই কাহারও ভাষা বুঝিতে পারে না। ফিলিপাইনবাসীদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ মুসলমান,—বাকি ক্রিশ্চান এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী। বহু দিন স্পেনের শাসনাধীন থাকায়, উহাদের মধ্যে স্পেনীয় আদর্শ, ভাবভাব ও আদবকায়দা এখনও প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখা যায়।

১৯০১ সাল হইতে আমেরিকা ফিলিপাইন দ্বীপে মিউনিসিপাল ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করে; এবং আটশত আমেরিকান শিক্ষক আনাইয়া বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষার প্রচলন আরম্ভ করে। পুলিশ, আদালত, স্কুল, পূর্ত্তকার্য্য, স্বাস্থ্যোন্নতি ও

উত্তর"

"দক্ষিণ"

'পূর্ব্ব'

"পশ্চিম"

ধাকা দেওয়া
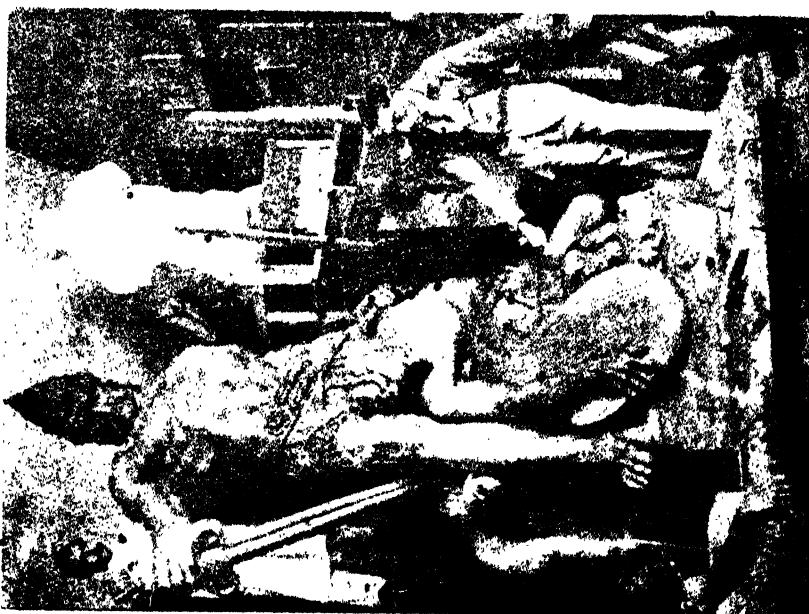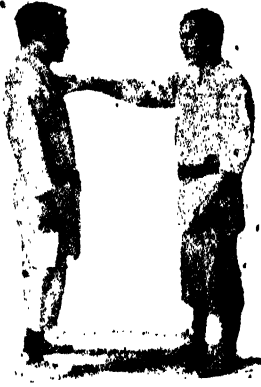
কানের আরাম

ল্যাং মারা

হাত-ধরা ও হাত-ছাড়ানো

হাত-ধরা ও হাত-ছাড়ানো

ভারি লোককে আছাড় দেওয়া

হাত-ধরা ও হাত-ছাড়ানো

ভারি লোককে আছাড় দেওয়া

ভারি লোককে আছাড় দেওয়া

ভারি লোককে আছাড় দেওয়া

ঘুসি বাঁচানো

আক্রমণকারীকে জব্দ করা

টানিয়া ফেলা

শিল্প প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমস্তই প্রথমে মিউনিসিপাল বিভাগের অধীন ছিল, পরে দেশের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহা এক একটা ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে পরিণত হইয়াছে। ১৯০৫ সালের পর হইতে ধীরে-ধীরে সকল বিভাগে দেশীয় লোক নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করা হয়। শিক্ষাবিভাগের ভার এক্ষণে সম্পূর্ণ ফিলিপাইনীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯১২ সাল হইতে শাসন ও বিচার বিভাগের বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে দেশীয় লোক নিযুক্ত হইতেছে। প্রতি বৎসর শতাধিক ফিলিপাইনী ছাত্র আমেরিকান্ গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে আমেরিকা হইতে নানা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া, দেশে ফিরিয়া যাইতেছে। জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার আমেরিকার প্রধান লক্ষ্য ছিল, এবং সে শিক্ষা এদেশের মত শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়। ফিলিপাইন দ্বীপের প্রথম শাসনকর্ত্তা মিঃ উইলিয়াম টাফ্‌ট্, যিনি পরে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রধান অধিনায়কের পদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, তাঁহার শাসনকালে, শিক্ষার সম্বন্ধে তিনি যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, উহার একটি প্রধান নিয়ম ছিল "The Education furnished must be of a practical utilitarian character. What is attempted in the way of instructions must be done thoroughly, and the aim must be in particular to see that the children acquire in school skill in using their hands and heads in a way to earn a livelihood." বরাবর এই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া যাওয়াতে ফিলিপাইনের ছেলেমেয়েদের
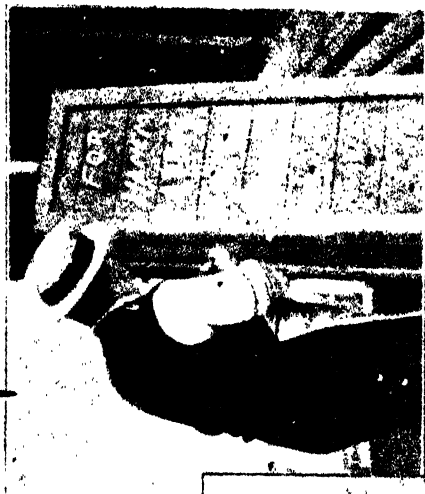
ছাঁচে-গড়া 'মমীর' মুখ

শিংওলা মমী

মমীর চালান

কল মমী

মাউন্ট এভারেষ্ট

এভারেষ্ট ও তাহার চারিপার্শ্বের মানচিত্র

শিখরারোহণের হিসাব
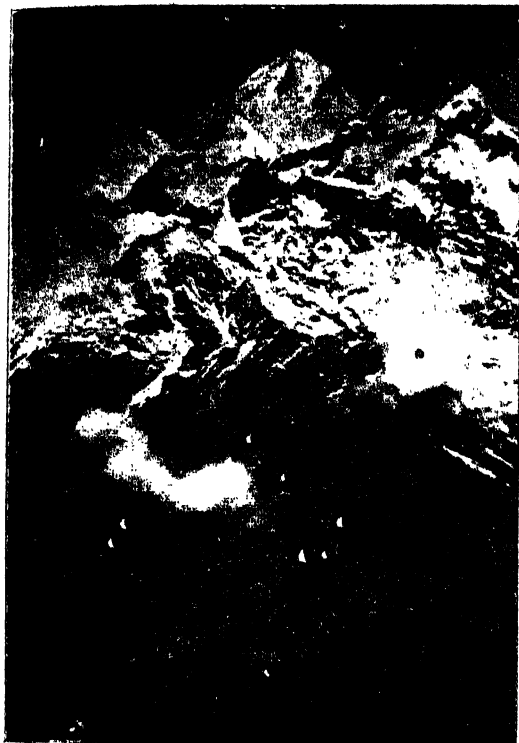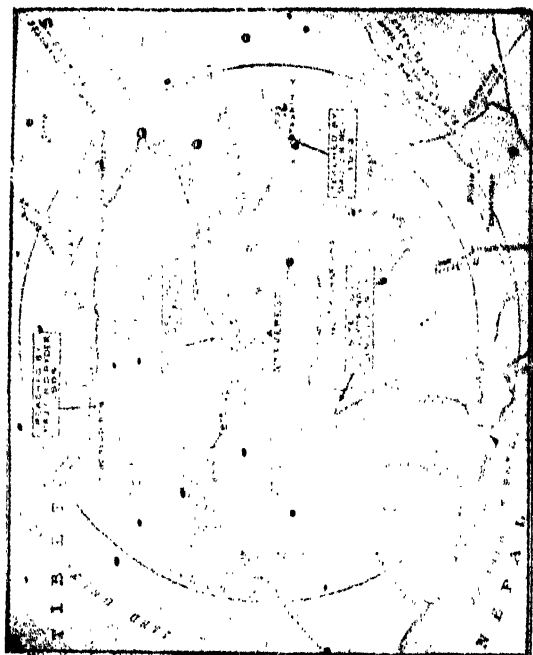
[মানুষ আজ পর্য্যন্ত কোন্-কোন্ পাহাড়ের কত উচ্চে উঠিয়াছে এই চিত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।]

সেলাই কাটিয়া দেওয়া

বলি রেখার ব্যবচ্ছেদ

কোকেন ইঞ্জেক্শন্

কর্ত্তিত অংশ

[এই দুই খণ্ড পাৎলা চর্ম্ম বলিরেখার বর্দ্ধিতাংশ দুইটী টুকরারই আকারে প্রায় সমান।]

নির্বলি মুখ

[এই চিত্রের ডান চক্ষের উপর দিকের সেলাই কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। নীচের দিকের সেলাই কাটা হয় নাই বলিয়া এখনও দেখা যাইতেছে এবং বাম চক্ষের বলি-রেখা এখনও ব্যবচ্ছিন্ন নাই।]

রক্তস্রাব বন্ধ করা

গরম জলের সেঁক দেলে

বাড় বাঁধা

ব্যাণ্ডেজ করা

মূর্চ্ছিতের শুশ্রূষা

ইস্কুল হইতে বাহির হইয়া উপার্জ্জনের জন্য চাকরীর আশায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। ছেলেরা সব্জী, ফলকর, কৃষিবিদ্যা, বয়নশিল্প, ঝুড়ি, চিয়াড়ি, মাদুর, টুপি, জুতো, ছাতা প্রভৃতি ছোটখাটো কুটীর-শিল্প, কাঠের ও বাঁশের কায ইত্যাদি; এবং মেয়েরা সেলাইয়ের কায, লেস-বোনা ও গৃহস্থালীর যাবতীয় কর্ম্ম শিখিয়া চারি বৎসরের মধ্যেই ইস্কুল হইতে স্বাধীন জীবিকা নির্ব্বাহের উপযুক্ত হইয়া বাহির হইতেছে। শিক্ষার গুণে শ্রম-শিল্প সেখানে নিন্দনীয় বা খাটো কাজ বলিয়া বিবেচিত হয় না; বরং গৌরবজনক মনে করিয়া, ছেলেমেয়েরা আগ্রহের সহিত শিক্ষা করে। ভারতের ন্যায় ফিলিপাইনও কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিপ্রধান দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি শ্রমশিল্পের উপরই নির্ভর করে। সুতরাং সে সকল দেশে শ্রমশিল্প যাহাতে অমর্য্যাদার কারণ না হইয়া সম্মানজনক হইয়া উঠিতে পারে, সে বিষয়ে শিক্ষা বিভাগের সর্ব্বাগ্রে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এইরূপ শিক্ষার ফলে মোরো প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ জাতি এবং বর্ব্বর পাহাড়ীয়াও আজ লুঠ-ও লাঠালাঠি ছাড়িয়া শান্ত, শিষ্ট, সুশিক্ষিত ও ভদ্র গৃহস্থ হইয়া উঠিয়াছে।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অনেকটা ত্রিকোণ আকারে অবস্থিত। ত্রিভুজের এক একটি বাহুর দৈর্ঘ্য প্রায় হাজার মাইলের উপর। সর্ব্বোত্তরদিকে লুজন দ্বীপ এবং সর্ব্বদক্ষিণে শুলু দ্বীপ। শুলু দ্বীপের অধিবাসীরা অধিকাংশই জোলোয়ানো মোরো। পূর্ব্বে উহারা জলে-স্থলে দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইত। স্পেন কিছুতেই ইহাদিগকে বশে আনিতে না পারিয়া, অবশেষে নিরুপায় হইয়া, ইহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, প্রত্যেক সহরের মুখে ঘাঁটি আগ্‌লাইয়া বসিয়া থাকিত। স্পেনের আমলের সেই সব থানাবাড়ীর ভগ্নাবশেষ এখনও অনেক সহরের প্রবেশ পথে দেখিতে পাওয়া যায়। সে সময়ে প্রত্যেক দ্বীপেই এক-একজন সর্দ্দার আধিপত্য করিত; এবং প্রায়ই পরস্পরের অধিকার লইয়া তাহাদের মধ্যে দাঙ্গা চলিত। মোরোরা ভীষণ অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর ছিল বলিয়া, সকলেই উহাদের ভয় করিয়া চলিত। শুলুদ্বীপের সুলতান ছিল সকলের প্রধান; কিন্তু ফিলিপাইন আমেরিকার অধিকারভুক্ত হওয়ার পর হইতে তাহার একাধিপত্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ-ফিলিপাইন অপেক্ষা উত্তর-ফিলিপাইন শিক্ষা ও সভ্যতায় অধিক অগ্রসর হইয়াছে। সেখানে এখন শতকরা তেত্রিশ-জনের উপর ইংরাজি-জানা লোক হইয়াছে; কিন্তু শুলু প্রভৃতি দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে অতি অল্প লোকই ইংরাজি জানে। আইগোরোট ও নেগ্রিটো প্রভৃতি জাতিরা এখনও সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হয় নাই; কিন্তু ইহারই মধ্যে ফিলিপাইনীরা ভারত অপেক্ষা অনেক বেশী স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার পাইয়াছে; এবং ম্যানুয়েল কোয়েজন প্রভৃতি জনকয়েক নেতা ফিলিপাইনদের প্রতিনিধি ও মুখপাত্র স্বরূপ আমেরিকায় আসিয়া কংগ্রেসের নিকট সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বরাজ দাবী করিতেছে। ফিলিপাইনকে এইবার স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে কি না, তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার জন্য উপস্থিত আমেরিকা হইতে একটি কমিশন আসিয়া ফিলিপাইনের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

(Current History.)

২। দূরগামী আলোকচিত্র (Telephotograph.)

বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশ দেশান্তরে সংবাদ প্রেরণ যদিও বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর দিগ্বিজয়; কিন্তু আমরা এক্ষণে উহাতে এতদূর অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, বিস্ময়ের দিকটা আমাদের নিকট ক্রমে সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু, আজ আবার যখন ফরাসী বৈজ্ঞানিক মুস্যে এদোয়ার্দ বেলিন ঐ বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে শুধু সংবাদ নয়, হাতের লেখা এবং যে কোনও ব্যক্তির আলোকচিত্র ও মুদ্রণের মধ্যে দূর দেশান্তরে পাঠাইবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন, তখন সমস্ত জগৎ আবার আজ বিস্ময়ে, পুলকে উৎসুক হইয়া সপ্রশংস দৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া দেখিতেছে।

১৮৭৬ সালে প্রাল্ নামে জনৈক ফরাসী সর্ব্বপ্রথম টেলিগ্রাফে চিত্র পাঠাইবার মতলব বাহির করেন। সামরিক ব্যাপার সংক্রান্ত কার্য্যের সুবিধার জন্য স্থানবিশেষের মানচিত্র সুদূরস্থ সৈন্য-শিবিরে সত্বর পাঠাইবার অভিপ্রায়েই তিনি টেলিগ্রাফের সাহায্য লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে তেমন কিছু বিশেষ উন্নত উপায় নহে। মানচিত্রখানিকে কতকগুলি সমচতুষ্কোণ অংশে বিভক্ত করিয়া, পাশাপাশি অবস্থিত ঘর-গুলিকে সংখ্যা দ্বারা, এবং উপর নীচে অবস্থিত ঘরগুলিকে অক্ষরের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া, তিনি এই ভাবে তার করিতেন, "নদী ক, ২ হইতে ভ, ৭, ভ, ৭ হইতে ভ, ১২ ভ, ১২ হইতে ল, ২০। পোল—ছ, ৫। পাকারাস্তা—ত, ৮ হইতে ম, ৪। জলা

হ, ৩, ঘ, ৪ পাহাড়—খ, ৬ বন—গ, ১৪, ঝ, ১১" ইত্যাদি। তার পর আরও অনেকে এই তারযোগে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সাহায্যে দূরদেশে চিত্র প্রেরণের উদ্দেশ্যে নানা উপায় উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করেন; তন্মধ্যে জার্ম্মেণীর প্রফেসর করনই অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি বৈদ্যুতিক প্রবাহের সহিত আলোক চিত্র প্রেরণের জন্য সেলিনিয়ম (Selenium) নামক পদার্থের সাহায্য লইয়াছিলেন। এই পদার্থের একটা বিশেষ গুণ এই যে, ইহার উপর প্রতিফলিত আলোক-রেখার গুরুত্ব অনুসারে বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। তবে এই সেলিনিয়ম পদার্থ অত্যধিক কোমল বলিয়া, এবং ইহার উপর আলোকের প্রভাব অবিচ্ছিন্নত সত্বর কার্য্যকরী না হওয়ায় উহার দ্বারা নিখুঁত ভাবে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছিল না। কিন্তু মুশ্যে বেলিন যে যন্ত্রটির উদ্ভাবন করিয়াছেন, উহার দ্বারা সুচারুরূপে কার্য্য চলিবে বলিয়া আশা করা যায়। তিনি সেলিনিয়ম প্রভৃতি আলোক-প্রভাবে-পরিবর্ত্তনশীল কোনও পদার্থের সাহায্য না লইয়া, সম্পূর্ণ এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহার নির্ম্মিত বার্ত্তা-প্রেরক যন্ত্রের মধ্যে, যে আলোক-চিত্রখানি পাঠাইবার প্রয়োজন, তাহা ভরিয়া দিয়া, বৈদ্যুতিক প্রবাহের চাবিটি ঘুরাইতে হয়। চাবি ঘুরাইবার সঙ্গে-সঙ্গে বার্ত্তা-প্রেরক যন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ একটা সূক্ষ্ম কাঁটা চিত্রখানির প্রত্যেক রেখার উপর দিয়া চলিতে থাকে; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তারের অপর প্রান্তস্থ বার্ত্তা-গ্রাহক যন্ত্রের মধ্যে বার্ত্তা-প্রেরক যন্ত্রস্থ সূক্ষ্ম কাঁটাটির পরিভ্রমণ গতির তরঙ্গ ও চিত্র-স্পর্শানুভূতির একটা ক্ষীণ শব্দ আসিয়া পৌঁছায়। তখন উক্ত শব্দ বোধে ও গতি অনুভবে সক্ষম যে কোনও লোক চিত্রের প্রতিকৃতিটি সঠিক নির্ণয় করিতে পারে। কিন্তু এ যন্ত্রের ভাষা কোনও মানুষই বোঝে না বলিয়া, বার্ত্তা-গ্রাহক যন্ত্রের মধ্যে একটা চিত্রগ্রহণোপযোগী আধারের ব্যবস্থা আছে। প্রেরিত চিত্রের প্রত্যেক রেখাটি তদুপরি প্রতিফলিত হইয়া, একখানি সুন্দর অনুকৃতি আপনা-আপনিই অঙ্কিত হইয়া যায়। তবে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, অন্ধ যেমন কেবল মাত্র কোনও উৎকীর্ণ চিত্রই স্পর্শের দ্বারা অনুভব করিয়া সহজে তাহা বুঝিতে পারে, এ যন্ত্রটিও ঠিক তেমনি—রেখা-স্পর্শের দ্বারা আলোক-চিত্রখানি অনুভব করিয়া, তাহার সঠিক প্রতিকৃতি মুহূর্ত্তের মধ্যে দেশান্তরে পৌঁছাইয়া দিতে পারে। সুতরাং যে কোনও সাধারণ আলোক-চিত্র ইহার মধ্যে ভরিয়া দিলে, এ যন্ত্র তাহা অনুভব করিতে পারিবে না। যাহাতে স্পর্শমাত্রে সহজেই চিত্রের রেখাগুলি অনুভূত হইতে পারে, এই হেতু ইহার জন্য বিশেষ ভাবে ক্রোম জিলেটিনে (chrome-gelatine) ছাপা চিত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

(Popular Science.)

২। বলি বর্জ্জন।

জরাক্রান্ত স্ত্রী পুরুষের গাত্র চর্ম্ম লোল হইয়া যায় বলিয়া, মুখে বলি রেখা দেখা দেয়। শুভ্রকেশ ও স্খলিত দন্ত প্রভৃতি বার্দ্ধক্যের চিহ্নগুলি বিদূরিত করিবার নানা কৌশলের সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু এই বলি রেখা গোপন করিবার এযাবৎ কোনও উপায়ই ছিল না। সম্প্রতি নিউইয়র্কের ডাক্তার ষ্টডার্ড (L. R. Stoddard) অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা বলি-বর্জ্জনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। মনের উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা বা অতিরিক্ত হাস্যের জন্য অল্প বয়সেও অনেকের মুখে বলি-রেখা দেখা দেয়। চর্ম্মের অত্যধিক সম্প্রসারণ হইতেই বলির উৎপত্তি। ডাক্তার ষ্টডার্ড বিশেষ দক্ষতার সহিত মুখের সেই বলি চিহ্নের কারণ স্বরূপ অতি-প্রসারিত চর্ম্মটুকু কাটিয়া বাদ দিয়া, বলি চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিতেছেন। এই অস্ত্র চিকিৎসায় রোগী যাহাতে বেদনা বোধ করিতে না পারে, এই জন্য কাটিবার পূর্ব্বে কোকেন ইনজেকসন দেওয়া হয়। তার পর চর্ম্মের কুঞ্চিত অংশটুকু টানিয়া ধরিয়া, উপরের পাতলা স্তরটি ছাঁটিয়া লওয়া হয়, এবং খুব সূক্ষ্ম করিয়া কর্ত্তিত অংশের উভয় প্রান্ত সেলাই করিয়া দেওয়া হয়। সেলাই শেষ হইবামাত্র উহাতে অরিষ্টল চূর্ণের (Aristol powder) প্রলেপ দেওয়া হয়। এইজন্য অস্ত্র-চিকিৎসার দুই দিন পরে যখন সেলাই খুলিয়া লওয়া হয়, তখন আর কোনও ক্ষত-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না এবং বলি-রেখাও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়।

(Popular Science.)

৪। মোটর গাড়ীর ডাক্তারী।

পথে-ঘাটে মোটর চাপা পড়িয়া প্রায়ই লোকে আহত হয়। সহরে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে, আহত ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ কোনও হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু, সহরের বাহিরে যেখানে হাসপাতালের অভাব, বা হাসপাতাল অনেক দূরে, সেরূপ স্থলে মোটর-চাপা পড়িলে মোটরগাড়ীই

জ্বালিয়া, কেশ-সন্নিবেশান্তে, কাঠের সরু-সরু হাত পা ও দেহ-কঙ্কাল নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে মিশরীয় হরফ ও চিত্র-বিচিত্র ছবি-আঁকা ন্যাকড়া জড়াইয়া দিয়া, কাঠের বাক্সে ভরিয়া ইজিপ্টে চালান হইতেছে। অনেক আমেরিকার পর্যটক বহু ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়া মিশর হইতে যে 'মমী' দেখিয়া আসে, তাহাদের অনেকেই হয় ত জানে না যে, সে মমী তাহাদেরই দেশে তৈয়ারী নকল শব!—আসল 'মমী' নহে। শবের মুখ যত বেশী কুৎসিত ও কদাকার হয়, দর্শকগণের ততই উহা দেখিতে আগ্রহ হয়, বলিয়া, নকল শবের মুখ শিল্পীরা যথাসম্ভব বীভৎস করিয়া গড়ে। অনেকে হয় ত এক জোড়া শিং পর্য্যন্ত লাগাইয়া দেয়। এই নকল মমী দেখাইয়া সাধারণ লোককে বেশ ঠকানো চলে বটে; কিন্তু মিশর তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের চোখে উহার কৃত্রিমতা এক মুহূর্ত্তেই ধরা পড়িয়া যায়। (Popular Science.)

৭। মাউণ্ট্ এভারেষ্ট্।

হিমালয় পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গের নাম 'মাউণ্ট্ এভারেষ্ট্' হইল কেন, ইহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে যখন স্যর্ জর্জ এভারেষ্ট্ নামে প্রসিদ্ধ এঞ্জিনিয়ার ও তাঁহার সহকারী স্যর এণ্ড্রু স্কট ওয়াগ্ (Sir Andrew Scott Waugh) ভারতবর্ষের ত্রিকোণমিতি পরিমাপের দ্বারা জরীপ করিতেছিলেন (Trigonometrical Survey), সেই সময় এঞ্জিনিয়ার ওয়াগ্ হিমালয়ের এই সর্ব্বোচ্চ শিখরটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার গুরুর নামে ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন (Mount Everest) মাউণ্ট্ এভারেষ্ট্। তিনি এই চূড়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহার পৃষ্ঠে পদার্পণ করিতে পারেন নাই। দীর্ঘ কয়েক বৎসর গুরুতর পরিশ্রম করিয়া তিনি হিমালয়ের পরিমাপ শেষ করেন; এবং নব্বইটি বিভিন্ন শৃঙ্গের উচ্চতার পরিমাণ নিরূপণ করেন। এই কার্য্যে তাঁহার দেড়-শতজন সঙ্গীর মধ্যে প্রায় চল্লিশজন ইংরাজ সহকারীর মৃত্যু ঘটায় এবং ভারতে সিপাহী-বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহাকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। তার পর আরও অনেক দুঃসাহসিক পর্ব্বত পর্যটক ভারতে আসিয়া এই চিরতুষারাচ্ছন্ন, রহস্যাবৃত, পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ গিরিচূড়ায় আরোহণ করিবার আশায় হিমালয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই ইহার নিকটস্থ হইতে পারেন নাই। মাউণ্ট্ এভারেষ্ট্‌কে অনেকেই 'গৌরীশঙ্কর' বলিয়া ভয়ানক ভুল করেন। গৌরীশঙ্কর হিমালয়ের অন্যতম চূড়া, এবং উচ্চতায় ২৩৪৪০ ফিট মাত্র! কিন্তু মাউণ্ট্ এভারেষ্ট্ হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ,—ইহার উচ্চতা ২৯১৪১ ফিট! পৃথিবীতে ইহার অপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। সম্প্রতি স্যর ফ্রান্সিস ইয়ংহাজ্‌ব্যাণ্ড্ প্রমুখ কতিপয় রাজকীয় ভৌগোলিক-সমিতির বিশিষ্ট সভ্য মাউণ্ট্ এভারেষ্টের চূড়ায় আরোহণ করিবার কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে তিব্বতের দিক হইতে ইহার উপর উঠিবার চেষ্টা করাই সহজসাধ্য। জেনারেল ব্রুস প্রভৃতি জনকয়েক পার্ব্বত্য-যাত্রায় অভিজ্ঞ এবং বিশেষ ভাবে হিমালয়ের সহিত পরিচিত ব্যক্তি সেদিন ভারতে আসিয়াছেন। তাঁহারা এই জুন মাস হইতেই মাউণ্ট্ এভারেষ্টের চারিপার্শ্বে প্রাথমিক পরিদর্শন কার্য্য আরম্ভ করিবেন, এবং খুব সম্ভবতঃ আগামী বৎসর শৃঙ্গারোহণ সুরু হইবে। ভারত গভর্মেণ্ট্ ইঁহাদিগকে যথাসম্ভব সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

(Literary Digest.)

৮। প্রতিহিংসার প্রতিমূর্ত্তি।

বিগত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া হাঙ্গেরী অষ্ট্রিয়া হইতে বিচ্যুত ও তাহাদের অধিকৃত কতকগুলি রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। সন্ধির ফলে হৃতবল হাঙ্গেরী এ অপমান ভুলিতে পারে নাই। সময় এবং সুযোগ উপস্থিত হইলে, তাহারা যে তাহাদের সেই অন্যায় রূপে হৃত রাজ্য-সম্পদ্ পুনরুদ্ধার করিবে, ইহা শুধু মুখে বলিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হয় নাই; বুদাপেষ্ট্ সহরে 'স্বাধীনতার কুঞ্জ' (Liberty Park) নামক সাধারণ প্রমোদোদ্যানের চারি কোণে তাহারা চারিটি বিরাট্ প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, জেকো শ্লোভাকিয়া, জুগো-শ্লেভিয়া, রুমানীয়া ও অষ্ট্রিয়াকে তাহাদের যে-যে রাজ্যখণ্ড বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই মূর্ত্তি-চতুষ্টয়, আর কিছু না হউক, অন্ততঃ হাঙ্গেরীর ভাস্কর্য্য শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন স্বরূপ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। এই চারিটি মূর্ত্তির নাম দেওয়া হইয়াছে 'উত্তর' 'দক্ষিণ' 'পূর্ব্ব' ও 'পশ্চিম'। নাম দেখিয়া কেহই ইহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে না; কিন্তু মূর্ত্তি-

গুলির সম্যক্ পরিচয় পাইলেই তাহার অন্তর্নিহিত গোপন রহস্যটুকু দর্শকের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

'উত্তর' মূর্ত্তিটি জেকো-শ্লোভেকিয়ার অধিকৃত প্রদেশের প্রতিরূপ। জনৈক বীর যোদ্ধা তাহার শিশু পুত্রের সহিত যে মূর্চ্ছিতা নারীকে রক্ষা করিতে উদ্যত, সে স্বয়ং হাঙ্গেরী; এবং ঐ যোদ্ধা ও তাহার পুত্র শ্লোভাক বীর। হাঙ্গেরীর সন্তান শ্লোভাকরা সে জেক্ অধিকারভুক্ত হইয়া থাকিতে অনিচ্ছুক, তাহাদের প্রাণের টান যে জননী হাঙ্গেরীর প্রতিই প্রবল, এই মূর্ত্তিটিতে সেই ভাব পরিকল্পিত হইয়াছে। 'দক্ষিণ' মূর্ত্তিটি জুগো-শ্লেভিয়ার অধিকৃত প্রদেশের প্রতিরূপ। উন্মুক্ত অসিহস্তে এক অসুরের মত বলিষ্ঠ ম্যাগেয়ার কৃষক জনৈক জার্ম্মাণ্ তরুণীকে রক্ষা করিতেছে। অর্থাৎ দক্ষিণ হাঙ্গেরীর অধিবাসী জার্ম্মাণ্ ও ম্যাগেয়ার জাতিরা একযোগে জুগো-শ্লেভ্ শাসনাধীনে থাকিতে অসম্মত। ম্যাগেয়ার কৃষকের পদতলে পতিত শস্যগুচ্ছ, হাঙ্গেরীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহার দক্ষিণের অতি-উর্ব্বরা প্রচুর শস্য-উৎপাদক গম-ক্ষেত্রগুলির অন্যায় অপহরণ স্মরণ করাইয়া দিতেছে। 'পূর্ব্ব' মূর্ত্তিটি রুমানীয়ার অধিকৃত ট্রান্সিলভেনিয়া প্রদেশের প্রতিরূপ। হাঙ্গেরীর পৌরাণিক উপাখ্যানে বর্ণিত ম্যাগেয়ার সর্দ্দার মহাবীর অর্পদের (Arpad) মূর্ত্তিটি রণশ্রান্ত মূর্চ্ছিত ট্রান্সিলভেনিয়ার রক্ষক রূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। লৌহ-শৃঙ্খলে বিনির্ম্মিত বর্ম্মাচ্ছাদিত-বপু, মস্তকে বাজ-পক্ষ-সংযুক্ত শলাকা-সংবিদ্ধ-শিরস্ত্রাণ বীরশ্রেষ্ঠ অর্পদ রুমানীয়ার অত্যাচারে প্রপীড়িত নিরস্ত্র ও বিবশ সন্তানকে আপনার বলিষ্ঠ বাহুর অভয় আশ্রয়ে টানিয়া লইতেছেন। 'পশ্চিম' মূর্ত্তিটি অষ্ট্রিয়ার অধিকৃত প্রেসবার্গ প্রভৃতি প্রদেশের প্রতিরূপ। ইহাতে পুরাণোল্লিখিত এক ম্যাগেয়ার বীর ভীম অসি হস্তে যেন হাঙ্গেরীর রাজমুকুট-অপহারী শত্রুকে ভীষণ আক্রমণ করিতেছে, এই ভাব পরিকল্পিত হইয়াছে।

(Literary Digest)

ইঙ্গিত

[শ্রীবিশ্বকর্ম্মা]

দেশালাইয়ের প্রসঙ্গে শ্রীহট্ট, কাজিরবাজার হইতে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দস্তরায়, ডাক্তার নন্দী মহাশয়ের দেশালাইয়ের কলের খবর দিয়া লিখিতেছেন, শিলং অঞ্চলে সরল কাঠ নামে একপ্রকার কাঠ পাওয়া যায়, তাহা দেশলাই (কাঠি ও বাক্স দুইই) প্রস্তুত করিবার পক্ষে কদম কাঠ অপেক্ষা অনেক ভাল। কুচবিহার, ডালসিংপাড়া পোঃ, টুরসা টি এষ্টেট হইতে টিম্বার মার্চেণ্ট ও কণ্ট্রাক্টর শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বিশ্বাস লিখিয়াছেন, ওখানকার জঙ্গলে একপ্রকার কাঠ (তাহার নাম লেখেন নাই) পাওয়া যায়, যাহা উত্তমরূপ জ্বলে এবং দেশালাইয়ের খুব উপযোগী; দেখিতেও অতি সুন্দর।

আজ পাঠক-পাঠিকাগণের অনুমতি লইয়া একটু ধাতু লইয়া নাড়াচাড়ি করিব। গোড়াতেই বলিয়া রাখি, এই কাজ বেশ সাবধানে করিতে হইবে। আমি নিজে যখন ধাতু দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা করিতাম, তখন অসাবধানে কাজ করায় দুই একবার বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম, এবং ঠেকিয়া বিলক্ষণ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম।

একটি উনুনে খুব গনগনে আগুন তৈয়ার করুন। তাহার উপর একখানি মজবুত লোহার কড়া চাপাইয়া দিন। কড়াখানি যেন খুব তাপসহ হয়। ঐ কড়ায় খানিকটা সীসা ঢালিয়া দিন। যাঁহারা ছাপাখানার টাইপ ঢালাইয়ের কারখানা দেখিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন, কি করিতে হইবে। কিছুক্ষণ উত্তপ্ত হইবার পর দেখিবেন সীসাগুলি গলিয়া তরল হইয়া গিয়াছে। আরও কিছুক্ষণ পরে দেখিবেন, উহার উপর একটি সর পড়িয়াছে, যেমন দুধের উপর সর পড়ে। যাঁহারা খানিকক্ষণ সীসার অক্ষর ঢালাইয়ের কাজ দেখিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যাহারা অক্ষর ঢালাই করে, তাহারা তাহাদের হাতায় করিয়া তরল সীসা লইয়া ছাঁচে ঢালিবার সময়, প্রথমে ঐ সরগুলি এক-ধারে সরাইয়া দেয়। পরে কেবল সীসার ভিতর হাতা ডুবাইয়া উহা তুলিয়া লয়। আমরা এখন সীসার অক্ষর ঢালাই করিতেছি না, অন্য জিনিস তৈয়ার করা আমাদের অভিপ্রায়; সুতরাং তরল সীসায় আমাদের এখন

কোন দরকার নাই—আমাদের আবশ্যক ঐ সরটি। কিন্তু ঐ একটুখানি সরে আমাদের পেট ভরিবে না। কৃষ্ণনগরের ময়রাদেরা সরভাজা তৈয়ার করিবার সময় যেমন অনেকটা পুরু করিয়া সর পাতিয়া লয়, আমরা তাহাতেও সন্তুষ্ট হইব না। আমরা সমস্ত সীসাটিকে সরে পরিণত করিয়া লইব। সেই জন্য আমাদিগকেও একটা খুব লম্বা হাতলওয়ালা হাতা বা খুন্তি যোগাড় করিতে হইবে। সেই হাতা বা খুন্তির যেখানটা ধরিতে হইবে, সেখানটা কাঠের কিংবা কাঠের দ্বারা ঢাকা হইলে ভাল হয়। কারণ, ঐ খুন্তি বা হাতা বহুক্ষণ ধরিয়া উত্তপ্ত সীসার ভিতর ডুবাইতে হইবে বলিয়া, উহা এমন গরম হইয়া উঠিবে যে, ধরা যাইবে না। কারণ, লৌহ তাপের অত্যন্ত সুপরিচালক।

এখন ঐ সর কেন পড়ে, তাহা বুঝিয়া দেখুন। সীসা উত্তপ্ত হইয়া তরল হইল। সেই তরল সীসাতে যেমন যেমন হাওয়া লাগিতেছে, অমনি ঐ সীসা বায়ুস্থিত অক্সিজেন বা অম্লজান বাষ্প (গ্যাস) খাইয়া ফেলিয়া সরে পরিণত হইতেছে। রসায়ন-বিজ্ঞানের ভাষায় ঐ সরটিকে বলিব সীসার মরিচা; উহার রাসায়নিক নাম অক্সাইড অব লেড্। এই অক্সিডেসন (oxidation) কার্য্য অর্থাৎ অক্সিজেন খাইয়া ফেলার কার্য্য ভাল করিয়া চালাইতে হইলে, খুব ঘন ঘন হাতা বা খুন্তির দ্বারা তরল সীসাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দিতে হইবে—যেন যথেষ্ট পরিমাণে হাওয়া উহাতে লাগিতে পারে, এবং উহা যথাযোগ্য পরিমাণে অক্সিজেন খাইয়া ফেলিতে পারে। এই রকম ভাবে তরল সীসা নাড়িতে নাড়িতে দেখিবেন, সমস্ত সীসাটি সরে পরিণত হইয়াছে। আরও অনেকক্ষণ ঐ কড়াশুদ্ধ সীসার সর আগুনের উপর রাখিলে ক্রমে দেখিবেন, সরের পাঁশুটে রং বদলাইয়া উহা সাদা গুঁড়ায় পরিণত হইতেছে। যখন সমস্ত সীসাটির সর ঐ রকম সাদা গুঁড়া হইয়া যাইবে, তখনই আমাদের কাজ শেষ হইল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ঐ যে সাদা গুঁড়াটি, উহার নাম লিথার্জ্জ (litharge) বা oxide of lead। গৌড়ীয় বাঙ্গালায় উহার নাম সফেদা। পরে আমরা এমন অনেক শিল্প দ্রব্যের আলোচনা করিব, যাহাতে এই লিথার্জ্জ বা সফেদা জিনিসটির দরকার হইবে। সেই জন্য প্রথমে ইহার সহিত আপনাদের পরিচয় করাইয়া দিতেছি।

কবিরাজ মহাশয়েরা অনেক ছাইভস্ম ঔষধ রূপে চালাইয়া থাকেন। স্বর্ণ ভস্ম, রৌপ্য ভস্ম, সীসক-ভস্ম, পারদ ভস্ম, মুক্তা ভস্ম প্রভৃতি। পাশ্চাত্য রসায়ন বিজ্ঞানের এই লিথার্জ্জই প্রায় কবিরাজ মহাশয়গণের সীসক ভস্ম।

এই লিথার্জ্জকে যদি আরও বহুক্ষণ উনানের উপর কড়ায় রাখিয়া আরও উত্তপ্ত করা যায়, তবে উহা আরও অক্সিজেন খাইয়া ফেলিবে উহার ক্ষুধা যেন কিছুতেই তৃপ্ত হইতে চায় না। এইরূপে ভস্ম হইতে হইতে দেখিবেন, লিথার্জ্জের সাদা রং ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া উহা লাল হইয়া আসিতেছে। এই লাল হওয়ার কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে, অর্থাৎ সমস্ত লিথার্জ্জটি লাল হইয়া উঠিলে যে জিনিস তৈয়ার হইবে, তাহার নাম রেড লেড বা মেটে সিঁদুর।

লিথার্জ্জ অনেক শিল্প কার্য্যে লাগে। কাচা মসিনার তেলের সহিত লিথার্জ্জ মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া লইলে boiled linseed oil বা সিদ্ধ করা মসিনার তৈল প্রস্তুত হয়। কাচা মসিনার তৈল অপেক্ষা এই সিদ্ধ করা মসিনার তৈল শীঘ্র শুকাইয়া যায় বলিয়া, ইমারতী রঙের কাজে সিদ্ধ করা মসিনার তৈলের ব্যবহার অনেক বেশী। রেড লেড বা মেটে সিঁদুরও অনেক রঙের কার্য্যে লাগে। সস্তায় লাল রঙের ছাপার কালী তৈয়ার করিতে রেড লেড দিতে হয়। তবে সে কালী তেমন উজ্জ্বল বা তাহার রং তেমন স্থায়ী হয় না।

লিথার্জ্জ সাদা গুঁড়া বটে, কিন্তু উহা ঠিক রং রূপে ব্যবহার করা চলে না। সীসা হইতে স্বতন্ত্র একপ্রকার উজ্জ্বল সাদা ইমারতী রং তৈয়ার হয়। সে রংটা কিন্তু লিথার্জ্জ হইতেই প্রস্তুত করা হয়। কেমন করিয়া, তাহা বলিতেছি। এসেটিক এসিডে লিথার্জ্জ গলাইয়া ফেলিলে এসিটেট অব লেড দ্রব অবস্থায় প্রস্তুত হয়। সেই দ্রব পদার্থের ভিতর দিয়া কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস বা কার্ব্বন ডায়অক্সাইড চালাইলে হোয়াইট লেড বা সাদা ইমারতী রং তলায় থিতাইয়া পড়ে। পরে উপর হইতে এসেটিক এসিড তুলিয়া লইলে বাকী থাকিবে হোয়াইট লেড।

যে উপায়ে সীসা গলাইয়া অক্সিজেন খাওয়াইয়া সফেদা ও মেটে সিঁদুর তৈয়ার করিয়াছেন, ঠিক সেই উপায় অবলম্বন করিয়া দস্তা গলাইয়া অক্সিজেন খাওয়াইতে-খাওয়াইতে জিঙ্ক হোয়াইট তৈয়ার হইয়া যাইবে। ইহাও অতি উজ্জ্বল ইমারতী সাদা রং—হোয়াইট লেডের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়।

এই কয়টি জিনিস প্রস্তুত প্রণালীর সম্বন্ধে আমি মোটামুটি

ইঙ্গিত করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। কোনরূপ বিস্তৃত বিবরণ, রাসায়নিক সঙ্কেত ইত্যাদি, কিছুই দিলাম না। কারণ, যাঁহারা ইহা তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিবেন, তাঁহাদিগকে প্রথমে উচ্চ রসায়ন-শাস্ত্র সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে। এবং যাঁহারা সেই জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন, তাঁহাদিগকে আমার বলিবারও আর কিছুই থাকিবে না। আমার উদ্দেশ্য, এই সকল জিনিস এদেশে বেশ উত্তমরূপে তৈয়ার হইতে পারে, ইহাই পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া। কারণ, শিল্পে এবং নানারূপ ঘরোয়া কাজে ইহাদের ব্যবহার খুব বেশী।

চীনের সিঁদুর নামে যে জিনিসটি হিন্দু সধবা সীমন্তিনীগণের সীমন্তের শোভা উজ্জ্বল করিয়া থাকে, তাহাও একপ্রকার পারদ-ভস্ম; গন্ধক সহযোগে পারদ প্রথমে হিঙ্গুলে পরিণত হয়। পরে তাহা হইতে কবিরাজী মকরধ্বজ প্রস্তুত প্রণালী অনুসারে চীনের সিঁদুর তৈয়ার হয়। চীনের সিঁদুর প্রস্তুত প্রণালী চীনাদের একটা trade secret। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা পারদ ও হিঙ্গুলের সহযোগে এক প্রকার সিঁদুর তৈয়ার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা চীনের সিঁদুর হয় নাই—তাহা হইতে অনেকটা নিরেস হইয়াছে। সেইজন্য চীনারা এখনও এই জিনিসটি প্রস্তুত করিবার অধিকার একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে।

চীনের সিঁদুর প্রস্তুত করিবার মোটামুটি পাশ্চাত্য প্রণালী এই—৫৪০ ভাগ পারা ও ৭৫ ভাগ গন্ধক খলে একসঙ্গে উত্তমরূপে মাড়িয়া ফেলিতে হইবে। সেই গন্ধক মিশ্রিত পারা তখন গুঁড়ার আকার ধারণ করিবে। সেই গুঁড়া একটা মৃৎপাত্রে অল্প উত্তপ্ত করিয়া মিশ্রণ সম্পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ করিলে জিনিসটি তরল অবস্থায় পরিণত হইবে। এখন একটি বোতলের মাঝখানটা ভাঙ্গিয়া বোতলটিকে দুই ভাগ করিয়া লউন। পরে ঐ তরল দ্রব্য বোতলের তলার অংশে রাখিয়া, বোতলের দুই অংশ জোড়া দিন। অনন্তর বোতলটির উপরে বেশ পুরু করিয়া কাদার প্রলেপ দিন। তার পর উহার চারি দিকে কাপড় মুড়িয়া শুকাইয়া লউন। অতঃপর উহাকে বালুকার তাপে (sand bathএ) বসাইয়া দিন। কিছুক্ষণ বাদে বোতলের ভিতরের গন্ধক-মিশ্রিত পারদ বাষ্পাকারে উঠিয়া বোতলের উপরের অংশে উহার গাত্রে সঞ্চিত হইবে। ক্রমে উহা দানায় পরিণত হইলে, তাপ হইতে বোতলটি নামাইয়া, উহার আবরণ খুলিয়া, যোড় ভাঙ্গিয়া লইয়া, ঐ দানা চাঁচিয়া বাহির করিয়া লইতে হইবে। ঐ দানা চূর্ণ করিয়া লইলেই চীনের সিঁদুর প্রস্তুত হইবে।

আর একটা প্রণালী জানাইতেছি। ১০০ ভাগ বিশুদ্ধ পারা ও ১১৪ ভাগ বিশুদ্ধ গন্ধক খলে মর্দ্দন করিলে এক রকম কালো রঙের গুঁড়া পাওয়া যাইবে। পরে ৫০ ভাগ জলে ৫ ভাগ কষ্টিক পটাশ মিশাইয়া সেই জল দিয়া ঐ গুঁড়া আর একবার মাড়িতে হইবে। পরে ৭০ ভাগ কষ্টিক পটাশ ৪০০ ভাগ জলে দ্রব করিয়া ঐ জল ক্রমে ক্রমে উক্ত মিশ্রের সহিত মিশাইতে হইবে। অনন্তর ঐ মিশ্রণ মাটীর বাটে চড়াইয়া ১১৩ হইতে ১২২ ডিগ্রি ফারেনহীট তাপের মধ্যে গরম করিতে হইবে। কয়েক ঘণ্টা এই ভাবে উত্তপ্ত হইলে, ঘোর লাল বর্ণের চীনের সিঁদুর তৈয়ার হইয়া আসিবে। সবটা একেবারে হইবে না, ক্রমে ক্রমে হইবে। লাল হইতে আরম্ভ করিলে ধীরে ধীরে তাপও কমাইতে হইবে।

চীনারা ৪ ভাগ পারার সঙ্গে ১ ভাগ গন্ধক মিশাইয়া লয় এবং মাটীর পাত্রে চুয়াইয়া লয়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহাদের ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু তাহাদের কৌশলটি এখনও কেহ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।

সীসা হইতে মেটে সিন্দুর পর্যান্ত এবং দস্তা হইতে জিঙ্ক হোয়াইট পর্য্যন্ত আমি নিজ হস্তে প্রস্তুত করিয়াছি। কিন্তু পারা হইতে সিঁদুর প্রস্তুত করিবার সুবিধা করিতে পারি নাই। উহা আমি কয়েকখানি ইংরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলন করিয়া দিতেছি—চীনের সিন্দুর মেটে সিন্দুরের কতকটা সমশ্রেণীর জিনিস বলিয়া। একাধিক পুস্তকে ঐ একই রকম প্রস্তুত-প্রণালী দেখিয়া মনে হইতেছে, উহা ঠিক প্রণালী বটে। এখন কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন, কার্য্যক্ষেত্রে কিরূপ দাঁড়ায়।

অপর একটা প্রণালীতে পারদ ২০২ ভাগ ও গন্ধক ৩৩ ভাগ লওয়া হয়। তার পর পূর্ব্বোক্ত উপায়ে সিন্দুর তৈয়ার করা হয়।

সাময়িকী

'ভারতবর্ষে'র নব-বর্ষ

এবারের 'ভারতবর্ষ' নবম বর্ষের প্রথম সংখ্যা। আট বৎসর পূর্ব্বে এই আষাঢ় মাসে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল 'ভারতবর্ষ' প্রকাশের সঙ্কল্প করেন; কিন্তু বিধির বিধানে সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই তিনি অকালে পরলোকগত হন; —আমাদের অযোগ্য স্কন্ধেই 'ভারতবর্ষ' সম্পাদনের গুরুভার ন্যস্ত হয়। এই আট বৎসর আমরা সে ভার যথাশক্তি, যথাসাধ্য বহন করিয়া আসিলাম। বিগত আট বৎসরের 'ভারতবর্ষ' আলোচনা করিয়া আমাদের স্পর্দ্ধার কথা কিছুই দেখিলাম না,—দেখিলাম, শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ,—দেখিলাম, সুধী, সুপণ্ডিত, সুলেখকগণের অনুগ্রহ,—দেখিলাম, পাঠক পাঠিকাগণের সহানুভূতি। ঐ আশীর্ব্বাদ, ঐ অনুগ্রহ, ঐ সহানুভূতি না পাইলে আমরা 'ভারতবর্ষ'কে এই আট বৎসর বাঁচাইয়া রাখিতে পারিতাম না, বাঙ্গালার মাসিক সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইহার আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতাম না। আজ, তাই এই নবম বর্ষের প্রবেশ-দ্বারে সর্ব্বপ্রথম শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিতেছি; তাহার পর আমাদের শুভানুধ্যায়ী লেখকবৃন্দ ও সহানুভূতি-পরায়ণ পাঠক পাঠিকাগণের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আট বৎসর যে অনুগ্রহ, যে সহায়তা, যে সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছি, নবম বর্ষের গন্তব্য পথে তাহাই যেন আমাদের পাথেয় হয়।

কুলী-কাহিনী

আমরা যখন কলেজে পড়িতাম, সে এ যুগের কথা নহে—তখন হইতেই চা-বাগানের কুলীদিগের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া আসিতেছি। যখন 'সঞ্জীবনী' পত্র প্রকাশিত হইল, তখন স্বদেশ-হিতব্রত কয়েকজন ব্রাহ্ম-প্রচারক আসামের কুলীদিগের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া যে সকল মর্ম্মভেদী কাহিনী উক্ত পত্রে প্রকটিত করিতেন, তাহা পড়িয়া আমরা অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতাম না। তাহার পর নাটকে, নভেলে, সংবাদ-পত্রে কত যে হৃদয়-ভেদী ঘটনার কথা এ যাবৎ পড়িয়া ও শুনিয়া আসিতেছি, তাহার আর সংখ্যা করা যায় না। এই সেদিনও খাবল চা-বাগানে একটা গুলি মারার ব্যাপার হইয়া গেল; এবং তাহার বিচার উপলক্ষে এক প্রহসনের এক অঙ্ক অভিনীত হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় এখনও শেষ হয় নাই। কিন্তু, ইহারই মধ্যে এতকালের প্রধূমিত অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে; আসাম অঞ্চলের কতকগুলি বাগানের কুলী ধর্ম্মঘট করিয়া বাগান ছাড়িয়াছে। তাহারা আর চা-বাগানে কাজ করিবে না; দেশে যাইয়া অনাহারে মরিবে তাহাও স্বীকার, তবুও বাগানে কাজ করিবে না। হাজার হাজার লোক মরিয়া হইয়া পথে দাঁড়াইয়াছে; করিমগঞ্জ, চাঁদপুর, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী প্রভৃতি স্থানে দলে দলে এই সকল হতভাগ্য, অনাহারক্লিষ্ট নর নারী, বালক বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক যুবতী উপস্থিত হইয়াছে;—দলে দলে লোক রোগে কষ্ট পাইতেছে, মরিতেছে। স্বদেশহিতৈষী মহাত্মাগণ এই সকল হতভাগ্যের কষ্ট মোচনের জন্য প্রাণপাত করিতেছেন; ইহাদের আহার যোগাইতেছেন, দেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন; যাহারা কর্ম্মক্ষম এবং কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে কয়লার খনিতে ও অন্যান্য স্থানে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, হৃদয়বান্ ব্যক্তিরা অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন; সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় মহাত্মা শ্রীযুক্ত এনড্রুজ সাহেব নিজে এই সকল কুলীর কল্যাণের জন্য অবিরাম পরিশ্রম করিতেছেন; তিনি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা শুনিয়া পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট রোগীর শুশ্রূষা ও রোগ নিবারণের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহারা বাগান ছাড়িয়া আসিয়াছে, তাহাদের গতি করিবার জন্যই সকলে ব্যস্ত; এ সময় এ ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান ও তাহা লইয়া বাদবিতণ্ডা করিবার অবসর কাহারও নাই। তবুও এ ব্যাপার লইয়া কথা-কাটাকাটি হইতেছে। একদল বলিতেছেন, এ সব গোলযোগ ও অশান্তির মূল আন্দোলন-কারীর দল। তাহারাই বাগানের কুলীদিগকে কার্য্যত্যাগে প্ররোচিত করিয়াছে; কুলীদিগের বাগানে কোনই অসুবিধা ছিল না। কিন্তু, যাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শী, তাঁহারা বলিতেছেন,

—সুধু বলিতেছেন কেন—এই সকল রোগজীর্ণ, অনাহার-ক্লিষ্ট, কঙ্কালসার কুলীদিগকে দেখাইয়া দিতেছেন; তাহাদের দেখিলেই উপরিউক্ত মতের অসারতা বুঝিতে পারা যায়। এই উপলক্ষে চাঁদপুরে যে শোচনীয় কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। চাঁদপুর হইতে ষ্টীমারে উঠিবার জন্য দলে-দলে কুলী সেখানে সমবেত হইয়াছিল; কুলীরা কপর্দ্দকহীন,—ষ্টীমার ভাড়া দেওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের ক্ষুধার অন্ন সংস্থানও ছিল না। এদিকে বহুসংখ্যক কুলী চাঁদপুরের ন্যায় ক্ষুদ্র সহরে উপস্থিত হওয়ায়, রোগের প্রকোপ উপস্থিত হইল; কুলীরা ষ্টীমারে উঠিয়া গোয়ালন্দে আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। এদিকে স্থানীয় লোকে যতদূর পারিলেন, তাহাদের ষ্টীমার ভাড়া দিয়া পাঠাইতে লাগিলেন; দুই তিন দিন ষ্টীমার কোম্পানী অল্প ভাড়ায় এবং দুই-এক সময় বিনা ভাড়াতেও কুলীদিগকে চাঁদপুর হইতে চালান করিতে লাগিলেন। দুইদিন কি তিনদিন রাজপুরুষেরাও সরকার হইতে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহার পর সে সাহায্যও বন্ধ হইয়া গেল; কুলীরা অধীর হইয়া পড়িল; কিন্তু কেহই কোন প্রকার উত্তেজনার ভাব প্রকাশ করিল না। এই ভাবেই কয়েকদিন গেল; অকস্মাৎ ২০শে মে তারিখে সন্ধ্যার পর একদল গুর্খা পল্টন চাঁদপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কুলীরা তখন চাঁদপুর রেল ষ্টেশনের প্লাটফরম, তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রাম-স্থান প্রভৃতিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। তাহারা এ কয়দিনের মধ্যে কোনপ্রকার শান্তিভঙ্গের চেষ্টা করে নাই। সেইদিন রাত্রি দশটার সময় বিভাগীয় কমিশনর, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সাহেব প্রভৃতির সম্মুখে গুর্খারা কুলীদিগকে তাহাদের আশ্রয়স্থান হইতে তাড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিল; শুধু মুখের তাড়ানো নহে,—তাহাদিগের উপর বলপ্রকাশও করিল। এইরূপে অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া কুলীরা চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল; বালক, বৃদ্ধ, যুবক যুবতী যে যেদিকে পাইল, পলাইতে লাগিল; একজনও গুর্খার লাঠি ও সঙ্গীনের সম্মুখে সদর্পে দণ্ডায়মান হইল না; ফলে অনেকে আহত হইল; কাহারও আঘাত গুরুতর, কাহারও সামান্য। প্রধান-প্রধান রাজপুরুষ দাঁড়াইয়া এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিলেন, তাহাদের আদেশেই এই নিরপরাধ লোকগুলি নির্যাতিত হইল। পনর মিনিট পরে সরকারের আদেশে আক্রমণ নিবৃত্ত হইল। সেই রাত্রিতেই এই ব্যাপারের সংবাদ সহরময় ছড়াইয়া পড়িল, কুলীদিগের সাহায্যের জন্য, আহতগণের শুশ্রূষার জন্য চাঁদপুরের স্বদেশসেবকগণ অগ্রসর হইলেন। পরদিন এই শোচনীয় সংবাদ দেশময় রাষ্ট্র হইল; পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে 'হরতাল' হইল; দেশের মধ্যে বিশেষ উত্তেজনা পরিলক্ষিত হইল। ইহার শেষ বিবরণ পাঠক পাঠিকাগণ সংবাদপত্রাদি পাঠেই অবগত হইয়াছেন।

কুলীদিগের এমন দুরবস্থার কারণ কি? সকলেই জানেন যে, চায়ের ব্যবসায় অতি লাভের ব্যবসায়। চা-ব্যবসায়ের অংশীগণ যে অত্যধিক লাভের অংশ পাইয়া থাকেন, ইহা আমরা জানি; এমন কি অনেক চা-কোম্পানী কোন কোন বৎসর অংশীদিগকে শতকরা একশত টাকা পর্য্যন্ত লভ্যাংশ দিয়াছেন। বিগত বৎসরেই নানা কারণে চায়ের ব্যবসায় একটু নরম পড়িয়াছে এবং বাগানের কাজ বন্ধ হইয়া যাইবার মত হইয়াছে। কিন্তু, পূর্ব্বে ত এমন অবস্থা ছিল না। তখন চা-করগণ ত অনেক লাভ করিয়াছেন। সেই লাভের অংশ একটু কম করিয়া কি এই সকল শ্রমজীবীর স্বখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা অসঙ্গত হইত? এখন চারিদিকেই মূলধন ও শ্রমের (Capital and Labour) সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। গ্রাসাচ্ছাদনের দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হওয়ায়, শ্রমিকগণের অভাব অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। পৃথিবীময় শ্রমিকেরা ক্ষুধার জ্বালায়, অভাবের তাড়নায় জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহারই ফলে সর্ব্বত্র যখন-তখন ধর্ম্মঘট, হরতাল (Strike) হইতেছে; আমাদের দেশেও তাহাই হইতেছে। ইহার সহিত বর্ত্তমান রাজনীতিক আন্দোলন বা অসহযোগিতার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। যাহাদের প্রাণপাত শ্রমের বিনিময়ে ব্যবসায়ে লাভ হয়, সেই লাভের অংশে তাহারাও স্বত্ববান; একথা এতদিন এ দেশের শ্রমিকেরা না বুঝিলেও, এখন বুঝিতে পারিয়াছে; সেইজন্যই ধর্ম্মঘটের এত বাড়াবাড়ি; সেই জন্যই কুলীদিগের এই বিড়ম্বনা। তাহারা অনশনে, অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইয়া তোমার জন্য খাটিয়া তোমার প্রচুর উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে, আর তুমি তাহাদিগের দিকে মোটেই চাহিবে না, ইহা আর চলিতেছে না। ব্যবসায়ীবৃন্দ এই কথাটা ভাবিয়া দেখিলে, এবং তদনুসারে

কাজ করিলে, এ সকল অশান্তিও কাহাকেও ভোগ করিতে হয় না, এ সকল শোচনীয় দৃশ্যও কাহাকেও দেখিতে হয় না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্যবহারিক শিক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস চেন্সেলর মহোদয়ের আহ্বানে কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালা ও আসামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সমূহের প্রায় পাঁচশত শিক্ষক কলিকাতায় সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সার আশুতোষের সভাপতিত্বে সম্মিলিত হইয়া এই মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে ইংরাজীতে কেবল সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে হইবে; অন্যান্য বিষয়,—অর্থাৎ গণিত, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি নিজ নিজ দেশী ভাষায় শিক্ষা করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত, প্রত্যেক ছাত্রকে (১) কৃষি, ফলমূল ও শাকসব্জীর চাষ, (২) সূত্রধরের কাজ, (৩) কর্ম্মকারের কাজ, (৪) টাইপ রাইটিং ও বুক-কিপিং, (৫) শর্ট হ্যাণ্ড, (৬) সূতা কাটা ও বস্ত্রবয়ন, (৭) দর্জ্জির কার্য্য ও সেলাই, (৮) সঙ্গীত, গৃহস্থালীর কার্য্য, এই সকলের অন্ততঃ একটা কিছু শিখিতে হইবে। প্রস্তাব যে অতি সাধু এবং সর্ব্বাংশেই কর্ত্তব্য, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না; কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত হওয়ার একমাত্র অন্তরায়—অর্থ। টাকা আসিবে কোথা হইতে? এ সম্বন্ধে, একখানি সাপ্তাহিক পত্রে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা আমরা এইস্থানে তুলিয়া দিলাম :—

"আমরা প্রস্তাব সমূহ পাঠ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, যেরূপ নির্দ্ধারণ করিলে বাঙ্গালী ভদ্র লোকদের দরিদ্রতার ক্লেশ নিবারণ হইতে পারিত, সেরূপ করা হয় নাই। আমাদের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে যে, প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করাই দুরূহ হইবে।

(ক) গবর্ণমেন্ট স্কুল ব্যতীত বঙ্গের প্রায় সমস্ত হাই স্কুল এমন দরিদ্র যে, ব্যবসায় শিক্ষা দিবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তাহার সংস্থান করিতে পারিবে না। কোন কোন শিক্ষক অর্থাভাবের কথা বলিয়াছিলেন; কিন্তু সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্য-তালিকা প্রস্তুত, পরীক্ষার আয়োজন ও সার্টিফিকেট দিবার ব্যবস্থা করিবেন, অর্থ সাহায্য করিতে পারিবেন না।

(খ) ব্যবসায় শিক্ষার যে তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহার সকল বিষয় সমীচীন হয় নাই। হাইস্কুলের প্রায় সমস্ত ছাত্রই ভদ্রলোকের সন্তান। তাহারা দর্জ্জির কার্য্য করিয়া, সূতা কাটিয়া, বা বস্ত্র বুনিয়া, অথবা সূত্রধর ও কর্ম্মকারের কার্য্য করিয়া সংসার চালাইতে পারিবে না। তাহাদিগকে যদি দরিদ্রতার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হয়, তবে ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষা দিতে হইবে। তাহাদিগকে—(১) পেন্সিল (২) দেশলাই (৩) বোতাম (৪) চিরুণী (৫) সাবান (৬) পুতুল (৭) কালী (৮) কাগজ (৯) পেষ্টবোর্ড (১০) এনভেলাপ (১১) নিব (১২) বাঁশের জিনিস, (১৩) বেতের বাক্স (১৪) চামড়া (১৫) চিকন (১৬) চিনি (১৭) জমাট দুগ্ধ (১৮) মাখন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে শিখাইতে হইবে। ইহার যে কোনটি শিখিতে পারিলে ক্ষুদ্র একটা কারখানা করিয়া ভদ্রলোকের ছেলেরা অনায়াসে মাসে একশত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি কার্য্য শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমস্ত হাইস্কুলে উহার বন্দোবস্ত হইতে পারিবে না। হাইস্কুলে শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষার আয়োজন করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না। আমাদের মতে বাঙ্গালাদেশের প্রত্যেক জেলায় ও মহকুমায় ব্যবসায় ও ব্যবহারিক-শিল্প শিক্ষাদানের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেশের দরিদ্রতা দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তাহার জন্য যে টাকার প্রয়োজন, তাহা কোথা হইতে আসিবে? তদুত্তরে আমরা বলি, ইনস্পেক্টর, আসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টর, এডিসনাল ইনস্পেক্টর, আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর, ইয়োরোপীয় স্কুল-ইনস্পেক্টর, মহম্মদীয় স্কুল-ইনস্পেক্টর, বালিকা-বিদ্যালয়ের ইনস্পেক্টর, ও ডেপুটী ইনস্পেক্টর, মহকুমার ডেপুটী-ইনস্পেক্টর, সব-ইনস্পেক্টর, গুরু-ইনস্পেক্টর প্রভৃতি পদের বাহুল্য বন্ধ করিয়া দিয়া অনায়াসে অর্থ সংস্থান করা যাইতে পারে। অর্থ সাহায্য না করিয়া হাইস্কুলগুলিকে চরিয়া খাইতে বলিলে কোন ফল হইবে না।"

চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা

হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজী শিক্ষার ব্যবস্থার কথা বাদ দিলে, এই এত বড় বাঙ্গালা দেশে এলোপ্যাথি শিক্ষার জন্য

কেবল দুইটী কলেজ ও দুইটী স্কুল আছে; কলিকাতার মেডিকাল কলেজ, কারমাইকেল কলেজ ও কাম্বেল স্কুল, আর ঢাকার মেডিকাল স্কুল। এই চারিটী ছাড়া আর কোথাও কিছু নাই। বর্দ্ধমানে একটী মেডিকাল স্কুলের আয়োজন হইতেছে; সেটী খুলিবার এখনও কিছু বিলম্ব আছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এই চারিটী কলেজ ও স্কুলে শিক্ষার্থীদিগের প্রবেশাধিকার অতি সঙ্কীর্ণ। শত-শত শিক্ষার্থী প্রতি বৎসর, এই কয়টী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা, সুপারিস করিয়াও সফল মনোরথ হইতেছে না। মেডিকাল কলেজ ও কারমাইকেল কলেজে প্রতি বৎসর যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রের অধ্যাপনার ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহার দশগুণ ঐ দুইটি কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য ছাত্র আবেদন করিয়া থাকে। স্কুল দুইটীর ব্যবস্থাও তথৈবচ। অথচ দেশের প্রকৃত অভাব ডাক্তারের। বি এ, এম এ, উকিল, মোক্তার দেশে যথেষ্ট হইয়াছে; আপাততঃ কিছুদিন তাঁহাদের আবির্ভাব বন্ধ রাখিলেও বিশেষ যে ক্ষতি বা অসুবিধা হইবে, তাহা বোধ হয় না। তৎপরিবর্ত্তে চিকিৎসকের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পায়, তাহাতে এই ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দেশের নরনারী রোগের যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে,—অন্ততঃ বিনা চিকিৎসায় শমন-ভবনে যাইবে না। সত্যসত্যই বাঙ্গালা দেশে চিকিৎসকের সংখ্যা অত্যন্ত কম। যাঁহারা মেডিকাল কলেজ হইতে পাশ করিয়া বাহির হন, পাড়াগাঁয়ে তাঁহাদের পোষায় না, গরীব লোকেও তাঁহাদের উপযুক্ত দর্শনী দিয়া উঠিতে পারে না। এইজন্য তাঁহারা সহর হইতে নড়িতে চাহেনও না, পারেনও না। বাঙ্গালা নবীশ ডাক্তার হইলেই দেশের বিশেষ উপকার হয়; তাঁহারা অল্পেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। আমাদের মনে হয়, যাঁহারা আমাদের শাসন মন্ত্রী হইয়াছেন তাঁহারা এই অত্যাবশ্যক কথাটা একটু প্রণিধান করিবেন। আমরা বলি, বর্দ্ধমানে যেমন একটা ডাক্তারী স্কুল হইতেছে, তেমনই বহরমপুরে, বরিশালে, যশোহরে ও মেদিনীপুরে এই চারিটী স্থানে চারিটী বাঙ্গালা ডাক্তারী স্কুল খোলা হউক। এই চারিটী স্থানেই ভাল-ভাল চিকিৎসক আছেন; তাঁহারা অল্প পারিশ্রমিকেই শিক্ষার ভার গ্রহণে স্বীকৃত হইবেন। তাহার পর এই কয়টী স্থানেই হাসপাতাল আছে; শিক্ষার্থীরা সেই সকল হাসপাতালে রোগী পরিচর্য্যা, রোগ নির্ণয়, ঔষধ প্রয়োগ, শব-ব্যবচ্ছেদ প্রভৃতি বেশ শিক্ষা করিতে পারিবে। এইভাবে কার্য্য করিলে ব্যয়ও যে খুব বেশী পড়িবে, তাহা আমাদের মনে হয় না। আর ব্যয় কিঞ্চিৎ অধিক হইলেই বা কি, প্রজাসাধারণের উপকারের হিসাবে সে ব্যয় নিশ্চয়ই সার্থক ব্যয়। বিদ্যায় কাউন্সিলের মন্ত্রিগণ যদি এই মহাহিতকর কার্য্যটিও না করিতে পারেন, তাহা হইলে আর শাসন সংস্কারে আমাদের কি লাভ হইল?

সম্পাদকের বৈঠক

(১)

গেঞ্জির কল চাই

শ্রীযুত বিশ্বকর্ম্মা সমীপেষু—

জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতবর্ষে সম্পাদকের বৈঠকে দেখিলাম, সূত্র-শিল্পের যন্ত্রাদি ২০।১ নং লালবাজার ষ্ট্রীটস্থ অরিএণ্টাল মেসিনারী সাপ্লাইং এজেন্সি কোং লিমিটেড, সরবরাহ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারাও সকল বিষয় সুন্দর উত্তর দিতেছেন না। সুতরাং নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আমাকে জানাইলে বা কাগজে ছাপিয়া জানিবার পথ সুগম করিয়া দিলে বাধিত হইব। নিবেদন এই—

১। কোন্ কোংএর গঞ্জির কল ভাল?

২। ঐ কল ভারতবর্ষে কোথায় পাওয়া যায়, বা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইলে, কাহাদের মধ্যস্থতায় করিতে হইবে?

৩। পুরাতন কল ব্যবহার উপযোগী কোথাও পাওয়া যায় কি না?

৪। মোজার কল সম্বন্ধেও ঐ কথা।

৫। মোজা ও গঞ্জির উপযোগী দেশী সূতা ও উল এ দেশে কোন্ স্থানে পাওয়া যায়?

শ্রীনিশিভূষণ গাঙ্গুলী
বরিশাল।

(২)

ব্যাটারী

ভারতবর্ষের কোন মানবহিতৈষী পাঠক মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া Ajax Dry Cell Body Battery, "F" Gradeএর ফলাফল সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা নিম্নলিখিত ঠিকানায় লেখককে অবগত করান, তবে তিনি বাধিত হইবেন।

এম, এন, পাল
কিষণগঞ্জ, পূর্ণিয়া।

(৩)

নূতন রকমের তাঁত

বর্দ্ধমান কাটোয়ার অন্তর্গত কেতুগ্রাম থানার অধীন ইচ্ছাপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীগোষ্ঠবিহারী দাঁ নামক মোদক জাতীয় একটী গরীব লোক একপ্রকার হস্তচালিত সুন্দর তাঁত আবিষ্কার করিয়াছেন। এই তাঁতের মাকু অতি ক্ষিপ্রভাবে চলে এবং ইহাতে প্রতি ঘণ্টায় ৬ হাত মোটা কাপড় তৈয়ার হয়। দেশের সর্ব্বত্র এই তাঁতের বিশেষ প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রতিজ্ঞা, ৪।২।২৮

(৪)

চরকা, খেউর, তাঁত

১০৮।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতার সিটি ট্রেডিং সিণ্ডিকেট নিজেরা চরকা তৈয়ার করিয়া নিজেরাই সূতা কাটিতেছেন। তাঁহারা তাঁতও তৈয়ার করিয়াছেন। নিজেদের চরকায় কাটা সূতা দিয়া তাঁহারা নিজেদের হাতে গামছা বুনিতেছেন এবং সেই গামছা একখানি বিশ্বকর্ম্মাকে উপহার দিয়াছেন। গামছা বেশ হইয়াছে। মূল্য দশ আনা মাত্র। গামছা ছাড়া ঐ তাঁতে ঐ সূতায় কাপড়ও বোনা হইতেছে। চরকার মূল্য ৩, ৪, ৫ ও ৬ টাকা। খেউর (বীচি ছাড়াইবার কল) মূল্য ১, ৬ টাকা। তাঁতের মূল্য কত জানি না।

শ্রীবিশ্বকর্ম্মা।

(৫)

Spiral Spinning Wheel

শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিভূষণ সেন ২৫-১ নং অখিল মিস্ত্রীর লেন, চাঁপাতলা, কলিকাতা হইতে শ্রীবিশ্বকর্ম্মাকে জানাইয়াছেন, তিনি Spiral Spinning Wheel তৈয়ার করিয়াছেন। ইহার মূল্য এক টাকা। ইহা চরকার পকেট সংস্করণ—খুব ছোট্ট জিনিস, মাপ ৫" × ৭" মাত্র। ওজন দশ ছটাক।

(৬)

Fibre extracting Machine

কলাগাছ হইতে অথবা পাট হইতে কাপড়ের উপযোগী সূতা তৈরী করিবার কোনও কল (Fibre machine) আমাদের দেশে আছে কি না ? যদি থাকে তাহা হইলে কোথায় কিরূপ কাজ চলিতেছে ?

শ্রীঅম্বিকাচরণ দত্ত রায়
কাজির বাজার, শ্রীহট্ট।

(৭)

আলোচনা

(বৌদ্ধমত)

"বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বর, আত্মা ও জন্মান্তর বাদ (Transmigration of Soul) স্বীকৃত হয় নাই। বেদ-বেদান্তের উপরও বৌদ্ধধর্ম্ম স্থাপিত নহে। বৌদ্ধমতে মৃত্যুর পর ব্যক্তিত্বের (শরীর ও মন) সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটে। বাসনাই জন্মের মূল। সন্তান যেরূপ পিতামাতার কর্ম্মফল ভোগ করে, জাতকও সেইরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের কর্ম্মফল ভোগ করে; কারণ কর্ম্মফল অপরিহার্য্য। "নির্ব্বাণ" অর্থে বিলীন হওয়া বুঝায় না। ইহার অর্থ শূন্যতা নহে। "নির্ব্বাণ" লাভের অর্থ বাসনার বিনাশ দ্বারা পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতিলাভ এবং প্রকৃত জ্ঞানলাভ দ্বারা ইহজীবনেই প্রকৃত শান্তিলাভ। বীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ যেমন বীজ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ হইয়াও বীজেরই ভিন্ন অবস্থামাত্র, তদ্রূপ আমার বাসনাজাত জীব আমা হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। বৌদ্ধমতে এই অর্থে পুনর্জন্ম স্বীকৃত হইয়াছে।"

Buddhism, Hibbert Lectures by Mr. Rhys Davids, Buddhism by Strauss, Sacred Books of the East, ইত্যাদি গ্রন্থ অবলম্বনে ইহা লিখিত আছে।

বিনীত—
শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শিক্ষক
ই, বি, ইনষ্টিটিউসন,
১৬ নং নন্দীর লেন, ঢাকা।

(৮)

গৃহশিল্পের যন্ত্রাদি

"ভারতবর্ষের" জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় ৭৩১ নং পৃষ্ঠায় "গৃহশিল্পের যন্ত্রাদি" ও "তৈয়ার করিবার বন্দরের" যে তালিকা দিয়াছেন, তন্মধ্যে ২।৩।৮ ও ১২ নং দফায় যন্ত্রের বিশেষ বিবরণ ও মূল্য জানা যাইতেছে না; সুতরাং লিখিতেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্ন ঠিকানায় উক্ত যন্ত্রাদির "কেটালগ" ও বিশেষ বিবরণসহ মূল্য জানাইলে সুখিত হইব; ও পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশ করিয়া সুখিত করিবেন। ২ দফায় যন্ত্রে চালাইবার সময় হাতের সাহায্য লাগে কি না, মাকু হাতে চালাইতে হয় কি না কিম্বা কেবল পায়ের সাহায্যে চলে, তাহার বিশেষ বিবরণসহ লিখিবেন। ইতি—

শ্রীরাধাবল্লভ তালুকদার,
শ্রীযুত অন্নদাচরণ ঠাকুরের বাসায়
পোঃ চাঁদপুর, ত্রিপুরা।

(৯)

নূতন ধরণের তাঁতকল

১৩২৭ সালের শেষভাগে কোন একখানি সংবাদপত্রে (বোধ হয় নায়কে) দেখিয়াছিলাম যে, ৫৬নং বিডন ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয় নূতন ধরণের (শুধু হস্ত দ্বারা চালিত) একখানি তাঁতকল বাহির করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ঐ ঠিকানায় চিঠি লিখিয়া কোন উত্তর পাই নাই। আপনার বিশ্বকর্ম্মা মহাশয়ের অনুগ্রহে উক্ত কল সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

ডাক্তার শ্রীনিশিকান্ত সেনগুপ্ত
গলাচিপা, বরিশাল।

মূল্য ৩৫৲ টাকা। কাঠের নলী সহ ৩৬৷৹ টাকা। পিত্তলের নলী সহ ৪৲ টাকা। কাঠের নলী সংযুক্ত ফেটী জড়াইবার জন্য লাটাই সহ ৪৷৹ টাকা। পিত্তলের নলী সংযুক্ত ফেটি জড়াইবার লাটাই সহ ৪।০। পিত্তলের কল সংযুক্ত টেকো ১৲। প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লাইব্রেরী, ২০৩।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(১৫)

গৃহশিল্প

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে এক রকমের যন্ত্র আসিয়াছে, যাহাতে অনেকগুলি অতি আবশ্যক গৃহশিল্পের কাজ হইতে পারে। বিশুদ্ধ খাদ্য জিনিষের অভাবে ভারতবাসীর দিন দিন যে শোচনীয় অবস্থা হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত। চাউল, ময়দা, আটা, ঘি, দুধ মসলা সবই ভেজাল। ময়দা এবং আটায় এক প্রকার মাটী এবং হলুদে ইটের গুঁড়া মিশান হয়। এই সমস্ত ছাই মাটী খাইয়া মানুষ কতদিন বাঁচিতে পারে?

আমেরিকার grinding mill অর্থাৎ গুঁড়াইবার কল একটী ঘরে থাকিলে অনায়াসে বাটীর মেয়েরাও বিশুদ্ধ ময়দা, আটা, ডাল, হলুদ ও মসলার গুঁড়া প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। এই কলটীর দুইটী অংশ বদলাইলেই তাহাতে রসাল পদার্থ যথা আদা মাটা ইত্যাদি পেশাই হইতে পারে। আবার আর দুটী অংশ বদলাইলে সুজিও প্রস্তুত হইতে পারে।

এই কল আর একপ্রকার বড় আকারের আছে। তাহাও হাতে চলে। ইহাতে প্রতি ঘণ্টায় ১৫ সের পর্য্যন্ত আটা এবং ৩০ সের ডাল ভাঙ্গাই হইতে পারে।

এই কল মোটর বা ইঞ্জিন দ্বারা পরিচালিত করিলে অতি অল্প খরচায় অধিক পরিমাণে আটা, বা চাউল হইতে পারে। বিলাতী এইরূপ একটা যন্ত্র টানিতে যত ঘোড়ার জোর লাগে ইহা তদপেক্ষা অর্দ্ধেক জোরে চলে; অথচ মাল অনুপাতে অনেক বেশী প্রস্তুত হয়। সুতরাং এই কলটা ব্যবসায়িগণের পক্ষে বিশেষ লাভজনক। যদি কেহ এই কল সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহেন, তিনি কলিকাতার ২০ নং লালবাজারস্থ ওরিএণ্টাল মেশিনারী সাপ্লাই এজেন্সী লিমিটেডে লিখিলেই জানিতে পারিবেন। কলের ছবি কয়খানি পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-আর-এ এস
(লণ্ডন); এম-সি-ই (জাপান)
ম্যানেজার, চিরুণী কোং, যশোহর।

শ্রীকান্তর ভ্রমণ-কাহিনী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

সকালে উঠিয়া শুনিলাম কুশারী মহাশয় মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া গেছেন। ঠিক এই আশঙ্কাই করিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি একা না কি?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, না, আমিও আছি।

যাবে?

যাবো বই কি।

তাহার এই নিঃসঙ্কোচ উত্তর শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। খাওয়া বস্তুটা যে হিন্দু ধর্ম্মের কি, এবং সমাজের কতখানি ইহার উপর নির্ভর করে রাজলক্ষ্মী তাহা জানে, এবং কতবড় নিষ্ঠার সহিত ইহাকে সে মানিয়া চলে আমিও তাহা জানি, অথচ এই তাহার জবাব। কুশারী মহাশয় সম্বন্ধে বেশি কিছু জানিনা, তবে বাহিরে হইতে তাঁহাকে যতটা দেখা গিয়াছে, মনে হইয়াছে তিনি আচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণ। এবং ইহাও নিশ্চিত যে রাজলক্ষ্মীর ইতিহাস তিনি অবগত নহেন, কেবল মনিব বলিয়াই আমন্ত্রণ করিয়া গেছেন। কিন্তু রাজলক্ষ্মী যে আজ সেখানে গিয়া কি করিয়া কি করিবে আমিত ভাবিয়াই পাইলাম না। অথচ, আমার প্রশ্নটা বুঝিয়াও সে যখন কিছুই কহিল না, তখন ইহারই নিহিত কুণ্ঠা আমাকেও নির্ব্বাক করিয়া রাখিল।

যথাসময়ে গো-যান আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম রাজলক্ষ্মী গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া।

কহিলাম, যাবেনা?

সে কহিল, যাবার জন্যেই ত দাঁড়িয়ে আছি। এই বলিয়া সে গাড়ীর ভিতরে গিয়া বসিল।

রতন সঙ্গে যাইবে, সে আমার পিছনে ছিল; ঠাকুরাণীর সাজ-সজ্জা দেখিয়া সে যে নিরতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল তাহার মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিলাম। আমিও আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম,

কিন্তু সেও যেমন প্রকাশ করিল না, আমিও তেমনি নীরব হইয়া রহিলাম। বাড়ীতে সে কোন কালেই বেশি গহনা পরেনা, কিছুদিন হইতে তাহাও কমিতেছিল; কিন্তু আজ দেখা গেল গায়ে তাহার কিছুই প্রায় নাই। যে হারটা সচরাচর তাহার গলায় থাকে, সেইটি এবং হাতে একজোড়া বালা। ঠিক মনে নাই, তবুও যেন মনে হইল কাল রাত্রি পর্য্যন্ত যে চুড়ি কয়গাছি দেখিয়াছিলাম সেগুলিও যেন সে আজ ইচ্ছা করিয়াই খুলিয়া ফেলিয়াছে। পরণের কাপড়খানিও নিতান্ত সাধারণ, বোধ হয় সকালে স্নান করিয়া যাহা পরিয়াছিল তাহাই। গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া আস্তে-আস্তে বলিলাম, একে-একে যে সমস্তই ছাড়লে দেখ্‌চি। কেবল আমিই বাকি রয়ে গেলাম।

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিল, এমন ত হতে পারে এই একটার মধ্যেই সমস্ত রয়ে গেছে। তাই যেগুলো বাড়্‌তি ছিল সেই গুলোই একে একে ঝরে গেছে। এই বলিয়া সে পিছনে একবার চাহিয়া দেখিল, রতন কাছাকাছি আছে কিনা; তার পরে গাড়োয়ানটাও না শুনিতে পায় যেন অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে কহিল, বেশ ত, সেই আশীর্ব্বাদই কর তুমি। তোমার বড় আর ত আমার কিছুই নেই, তোমাকেও যার বদলে অনায়াসে দিতে পারি আমাকে সেই আশীর্ব্বাদই তুমি কর।

চুপ করিয়া রহিলাম। কথাটা এমন একদিকে চলিয়া গেল, যাহার জবাব দিবার কোন সাধ্যই আমার ছিলনা। সেও আর কিছু না বলিয়া মোটা বালিশটা টানিয়া লইয়া গুটি সুটি হইয়া আমার পায়ের কাছে শুইয়া পড়িল। আমাদের গঙ্গামাটি হইতে পোড়ামাটিতে যাইবার একটা অত্যন্ত সোজা পথ আছে। সম্মুখের শুষ্ক-জল খাদটার পরে যে সঙ্কীর্ণ বাঁশের সাঁকো আছে, তাহার উপর দিয়া গেলে মিনিট-দশেকের মধ্যেই যাওয়া যায়, কিন্তু গরুর গাড়ীতে অনেকখানি রাস্তা ঘুরিয়া ঘণ্টা দুই বিলম্বে পৌঁছিতে হয়। এই দীর্ঘ পথটায় দুজনের মধ্যে আর কোন কথাই হইলনা। সে কেবল আমার হাতখানা তাহার গলার কাছে টানিয়া লইয়া ঘুমানোর ছল করিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

কুশারী মহাশয়ের দ্বারে আসিয়া যখন গো-যান থামিল তখন বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। কর্ত্তা এবং গৃহিণী দুয়েই একসঙ্গে বাহির হইয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং অতিশয় সম্মানিত অতিথি বলিয়াই বোধ হয় সদরে না বসাইয়া একেবারে ভিতরে লইয়া গেলেন। তা ছাড়া, অনতিবিলম্বেই বুঝা গেল সহর হইতে দূরবর্ত্তী এই সকল সামান্য পল্লী-অঞ্চলে অবরোধের সেরূপ কঠোর শাসন প্রচলিত নাই। কারণ, আমাদের শুভাগমন প্রচারিত হইতে না হইতেই প্রতিবেশীদের অনেকেই যাহারা খুড়া, জ্যাঠা, মাসিমা ইত্যাদি প্রীতি ও আত্মীয় সম্বোধনে কুশারী ও তাঁহার গৃহিণীকে আপ্যায়িত করিয়া একে-একে, দুইয়ে-দুইয়ে প্রবেশ করিয়া তামাসা দেখিতে লাগিলেন, তাঁহাদের সকলেই অবলা নহেন। রাজলক্ষ্মীর ঘোমটা দিবার অভ্যাস ছিলনা, সেও আমারই মত সুমুখের বারান্দায় একখানি আসনের উপর বসিয়াছিল; এই অপরিচিত রমণীর সাক্ষাতেও এই অনাহূতের দল বিশেষ কোন সঙ্কোচ অনুভব করিলেননা। তবে সৌভাগ্য এইটুক যে আলাপ করিবার ঔৎসুক্যটা নিতান্তই তাঁহার প্রতি না হইয়া আমার প্রতিই প্রদর্শিত হইতে লাগিল। কর্ত্তা অতিশয় ব্যস্ত, তাঁহার গৃহিণীও তেমনি, কেবল বাড়ীর বিধবা মেয়েটিই রাজলক্ষ্মীর পাশে স্থির হইয়া বসিয়া একটা তালপাখা লইয়া তাঁহাকে মৃদু মৃদু বাতাস করিতে লাগিল। আর আমি কেমন আছি, কি অসুখ, কতদিন থাকিব, জায়গাটা ভাল মনে হইতেছে কিনা, জমিদারী নিজে না দেখিলে চুরি হয় কিনা, হইলে নূতন কোন বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি কিনা, ইত্যাদি অর্থ্য ও ব্যর্থ নানাবিধ প্রশ্নোত্তর-মালার ফাঁকে-ফাঁকে কুশারী মহাশয়ের সাংসারিক অবস্থাটা একটু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। বাটীতে অনেকগুলি ঘর, এবং সেগুলি মাটির; তথাপি মনে হইল কাশীনাথ কুশারীর অবস্থা স্বচ্ছল ত বটেই, বোধ হয় একটু বিশেষ রকমই ভাল। প্রবেশ করিবার সময় বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপের একধারে একটা ধানের মরাই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছিলাম, ভিতরের প্রাঙ্গণেও দেখিলাম তেমনি আরও গোটা দুই রহিয়াছে। ঠিক সম্মুখেই বোধ করি ওটা রান্নাঘরই হইবে, তাহারই উত্তরে একটা চালার মধ্যে পাশাপাশি গোটা-দুই ঢেঁকি, বোধ হইল অনতিকাল পূর্ব্বেই যেন তাহার কাজ বন্ধ করা হইয়াছে। একটা বাতাবী-বৃক্ষতলে ধান সিদ্ধ করিবার কয়েকটা চুল্লী নিকান-মুছান ঝরঝর করিতেছে এবং সেই পরিষ্কৃত স্থানটুকুর উপরে ছায়াতলে দুটি পরিপুষ্ট গো-বৎস ঘাড় কাৎ করিয়া আরামে

নিদ্রা দিতেছে। তাহাদের মায়েরা কোথায় বাঁধা আছে চোখে পড়িলনা সত্য, কিন্তু এটা বুঝা গেল কুশারী-পরিবারে অন্নের মত দুগ্ধেরও বিশেষ কোন অনাটন নাই। দক্ষিণের বারান্দায় দেয়াল ঘেঁসিয়া ছয় সাতটা বড় বড় মাটির কলসী বিঁড়ার উপর বসানো আছে। হয়ত গুড় আছে, কি, কি আছে জানিনা, কিন্তু যত্ন দেখিয়া মনে হইলনা যে, তাহারা শূন্যগর্ভ কিম্বা অবহেলার বস্তু। কয়েকটা খুঁটির গায়েই দেখিলাম ঢেরা সমেত পাট এবং শণের গোছা বাঁধা রহিয়াছে,—সুতরাং এ বাটীতে যে বিস্তর দড়িদড়ার আবশ্যক হয়, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত জ্ঞান করিলাম না। কুশারী গৃহিণী খুব সম্ভব আমাদের অভ্যর্থনার কাজেই অন্যত্র নিযুক্তা,—কর্ত্তাটিও একবার মাত্র দেখা দিয়াই অন্তর্ধান হইয়াছিলেন; তিনি অকস্মাৎ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রাজলক্ষ্মীকে উদ্দেশ করিয়া অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ আর একপ্রকারে দিয়া কহিলেন, মা, এইবার যাই, আহ্নিকটা সেরে এসে একেবারে বসি। বছর পোনর ষোলর একটি সুন্দর সবলকায় ছেলে উঠানের একধারে দাঁড়াইয়া গভীর মনোযোগের সহিত আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল; কুশারী মহাশয়ের দৃষ্টি তাহার প্রতি পড়িতেই বলিয়া উঠিলেন, বাবা হরিপদ, নারায়ণের অন্ন বোধ করি এতক্ষণে প্রস্তুত হল, একবার ভোগটি দিয়ে এসোগে বাবা। আহ্নিকের বাকিটুকু শেষ করতে আর আমার দেরি হবেনা। আমার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, আজ মিছাই আপনাদের কষ্ট দিলাম—বড় দেরি হয়ে গেল। এই বলিয়া আমার প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় আর দেরি না করিয়া চক্ষের পলকে নিজেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

এইবার যথাকালে, অর্থাৎ যথাকালের অনেক পরে আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের ঠাঁই করার খবর পৌঁছিল। বাঁচা গেল। কেবল অতিরিক্ত বেলার জন্য নয়, এইবার আগন্তুকগণের প্রশ্নবাণের বিরতি অনুভব করিয়াই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তাঁহারা আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে শুনিয়া অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য আমাকে অব্যাহতি দিয়া যে যাহার বাড়ী চলিয়া গেলেন। কিন্তু খাইতে বসিলাম কেবল আমি একা। কুশারী মহাশয় সঙ্গে বসিলেন না, কিন্তু সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। হেতুটা তিনি সবিনয়ে এবং সগৌরবে নিজেই ব্যক্ত করিলেন। উপবীত ধারণের দিন হইতে ভোজনকালে সেই যে মৌনী হইয়াছিলেন, সে ব্রত আজও ভঙ্গ করেন নাই। সুতরাং একাকী নির্জ্জন গৃহে এই কাজটা তিনি এখনও সম্পন্ন করেন। আপত্তিও করিলামনা, আশ্চর্য্যও হইলামনা। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর সম্বন্ধে যখন শুনিলাম আজ তাহারও নাকি কি একটা ব্রত আছে,—পরান্ন গ্রহণ করিবেনা, তখনও আশ্চর্য্য না হই, এই ছলনায় মনে-মনে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলাম, এবং ইহার কি যে প্রয়োজন ছিল তাহা ভাবিয়া পাইলামনা। কিন্তু রাজলক্ষ্মী আমার মনের কথা চক্ষের পলকে বুঝিয়া লইয়া কহিল, তার জন্যে তুমি দুঃখ কোরোনা, ভাল করে খাও। আমি যে আজ খাবোনা, এঁরা সবাই জানতেন।

বলিলাম, অথচ, আমি জানতামনা। কিন্তু এই যদি, কষ্ট স্বীকার করে আসার কি আবশ্যক ছিল?

ইহার উত্তর রাজলক্ষ্মী দিলনা, দিলেন কুশারী-গৃহিণী। কহিলেন, এ কষ্ট আমিই স্বীকার করিয়েছি বাবা। মা যে এখানে খাবেননা তা' জানতাম; তবু, আমরা যাঁদের দয়ায় দুটি অন্ন পাই, তাঁদের পায়ের ধূলো বাড়ীতে পড়বে এ লোভ সামলাতে পারলামনা। কি বল মা? এই বলিয়া তিনি রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি চাহিলেন। রাজলক্ষ্মী বলিল, এর জবাব আজ নয় মা, আর একদিন আপনাকে দেব। এই বলিয়া সে হাসিল।

আমি কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কুশারী-গৃহিণীর মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া চাহিলাম। পল্লীগ্রামে, বিশেষ এইরূপ সুদূর পল্লীতে ঠিক এমনি সহজ সুন্দর কথাগুলি যেন কোন রমণীর মুখেই শুনিবার কল্পনা করি নাই। কিন্তু, এখনও যে এই পল্লী-অঞ্চলেই আরও একটি ঢের বেশি আশ্চর্য্য নারীর পরিচয় পাইতে বাকি ছিল, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার পরিবেশনের ভার বিধবা কন্যার উপর অর্পণ করিয়া কুশারী-গৃহিণী তালপাখা হাতে আমার সুমুখে বসিয়াছিলেন। বোধ হয় বয়সে আমার অনেক বড় হইবেন বলিয়াই মাথার উপর অঞ্চলখানি ছাড়া মুখে কোন আবরণ ছিল না। তাহা সুন্দর কিম্বা অসুন্দর, মনেই হইল না, কেবল এই টুকুই মনে হইল ইহা সাধারণ বাঙালী মায়ের মতই স্নেহ ও করুণায় পরিপূর্ণ। দ্বারের কাছে কর্ত্তা স্বয়ং দাঁড়াইয়া ছিলেন, বাহিরে হইতে তাঁহার মেয়ে ডাকিয়া কহিল, বাবা, তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে। বেলা অনেক হইয়াছিল, এবং এই খবর টুকুর জন্যই বোধ হয় তিনি সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন;

তথাপি একবার বাহিরে ও একবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, এখন একটু থাক্ মা, বাবুর খাওয়াটা—

গৃহিণী তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, না তুমি যাও, মিথ্যে ওসব নষ্ট কোরোনা। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তোমার খাওয়া হয়না আমি জানি।

কুশারী সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন, কহিলেন, নষ্ট আর কি হবে,—বাবুর খাওয়াটা হয়েই যাক্‌না।

গৃহিণী কহিলেন, আমি থাকতেও যদি খাওয়ার ত্রুটি হয় ত তোমার দাঁড়িয়ে থাকলেও সারবেনা। তুমি যাও,—কি বল বাবা? এই বলিয়া তিনি আমার প্রতি চাহিয়া হাসিলেন। আমিও হাসিয়া বলিলাম, হয়ত বা ত্রুটি বাড়বে। আপনি যান কুশারী মশায়, অমন অভুক্ত চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে কোন পক্ষেই সুবিধে হবেনা। তিনি আর বাক্যব্যয় না করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন, কিন্তু মনে হইল সম্মানিত অতিথির আহারের স্থানে উপস্থিত না থাকিবার সঙ্কোচটা সঙ্গে লইয়াই গেলেন। কিন্তু এইটাই যে আমার মস্ত ভুল হইয়াছিল তাহা কিছুক্ষণ পরেই আর অবিদিত রহিল না। তিনি চলিয়া গেলে তাঁহার গৃহিণী বলিলেন, নিরিমিষ্যি আলো চালের ভাত খান; জুড়িয়ে গেলে আর খাওয়াই হয়না, তাই জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া। কিন্তু তাও বলি বাবা, যারা অন্নদাতা তাঁদের পূর্ব্বে নিজের বাড়ীতে অন্নগ্রহণ করাও বড় কঠিন।

কথাটায় মনে মনে আমার লজ্জা করিতে লাগিল, বলিলাম, অন্নদাতা আমি নয়। কিন্তু, তাও যদি সত্য হয়, সেটুকু এত কম যে এটুকু বাদ গেলেও বোধ করি আপনারা টেরও পেতেননা।

কুশারী-গৃহিণী ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। মনে হইল তাঁহার মুখখানি ধীরে ধীরে যেন অতিশয় ম্লান হইয়া উঠিল। তার পরে কহিলেন, তোমার কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয় বাবা, ভগবান আমাদের কিছু কম দেননি, কিন্তু এখন মনে হয় এত যদি তিনি নাই দিতেন, হয়ত, এর চেয়ে তাঁর বেশি দয়াই প্রকাশ পেত। বাড়ীতে ওই ত কেবল একটা বিধবা মেয়ে,—কি হবে আমাদের গোলা-ভরা ধানে, কড়া-ভরা দুধে, আর কলসী কলসী গুড় নিয়ে? এ সব ভোগ করবার যারা ছিল, তারা ত আমাদের ত্যাগ করেই চলে গেছে।

কথাটা বিশেষ কিছুই নয়, কিন্তু বলিতে বলিতেই তাঁহার দুই চোখ ছলছল্ করিয়া আসিল এবং ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইয়া উঠিল। বুঝিলাম, অনেক গভীর বেদনাই এই কয়টি কথার মধ্যে নিহিত আছে। ভাবিলাম, হয়ত তাঁহার কোন উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, এবং ওই যে ছেলেটিকে ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি, তাহাকে অবলম্বন করিয়া হতাশ্বাস পিতামাতা আর কোন সান্ত্বনাই পাইতেছেননা। আমি নীরব হইয়া রহিলাম, রাজলক্ষ্মীও কোন কথা না কহিয়া কেবল তাঁহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আমারই মত নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। কিন্তু আমাদের ভুল ভাঙিল তাঁহার পরের কথায়। তিনি আপনাকে আপনি সম্বরণ করিয়া লইয়া পুনশ্চ কহিলেন, কিন্তু আমাদের মত তাদেরও ত তোমরাই অন্নদাতা। কর্ত্তাকে বললাম, মনিবকে দুঃখের কথা জানাতে লজ্জা নেই, আমাদের মাকে বাবাকে নিমন্ত্রণের ছল করে একবার ধরে আনো, আমি তাঁদের কাছে কেঁদে-কেটে দেখি, যদি তাঁরা এর কোন বিহিত করে দিতে পারেন। এই বলিয়া এইবার তিনি অঞ্চল তুলিয়া নিজের অশ্রুজল মোচন করিলেন। সমস্যা অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম সেও আমারই মত সংশয়ে পড়িয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বের মত এখনও দুজনে মৌন হইয়া রহিলাম। কুশারী গৃহিণী এইবার তাঁহাদের দুঃখের ইতিহাস ধীরে ধীরে ব্যক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন। শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া বহুক্ষণ কাহারো মুখে কোন কথা বাহির হইলনা, কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ রহিলনা যে, এ কথা বিবৃত করিয়া বলিতে ঠিক এতখানি ভূমিকারই প্রয়োজন ছিল। রাজলক্ষ্মী, পরান্ন গ্রহণ করিবেনা শুনিয়াও এই মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ হইতে সুরু করিয়া কর্ত্তাটিকে অন্যত্র পাঠানোর ব্যবস্থা পর্য্যন্ত কিছুই বাদ দেওয়া চলিতনা। কিন্তু সে যাই হৌক, কুশারী-গৃহিণী তাঁহার চক্ষের জল ও অস্ফুট বাক্যের ভিতর দিয়া ঠিক কতখানি যে ব্যক্ত করিলেন, তাহা জানিনা, এবং ইহার কতখানি যে সত্য তাহাও একপক্ষ শুনিয়া নিশ্চয় করা কঠিন; কিন্তু আমাদের মধ্যস্থতায় যে সমস্যা আজ তাঁহারা নিষ্পত্তি করিয়া দিতে সনির্ব্বন্ধ আবেদন করিলেন, তাহা যেমন বিস্ময়কর তেমনি মধুর ও তেমনি কঠোর।

কুশারী-গৃহিণী যে দুঃখের ইতিহাসটা বিবৃত করিলেন তাহার মোট কথাটা এই যে, গৃহে তাঁহাদের খাওয়া-পরার

যথেষ্ট স্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও শুধু যে কেবল সংসারটাই তাঁহাদের বিষ হইয়া গেছে তাই নয়, সমস্ত পৃথিবীর কাছে তাঁহারা লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারিতেছেননা। এবং সমস্ত দুঃখের মূল হইতেছে তাঁহার একমাত্র ছোট'যা সুনন্দা। এবং যদিচ তাঁহার দেবর যদুনাথও ন্যায়রত্নও তাঁহাদের কম শত্রুতা করেন নাই, কিন্তু আসল অভিযোগটা তাঁহার সেই সুনন্দার বিরুদ্ধে। এবং এই বিদোহী সুনন্দা ও তাহার স্বামী যখন সম্প্রতি আমাদেরই প্রজা, তখন যেমন করিয়াই হৌক ইহাদের বশ করিতেই হইবে। ঘটনাটা সংক্ষেপে এইরূপ। তাঁহার শ্বশুর-শাশুড়ী যখন স্বর্গগত হন তখন তিনি এ বাড়ীর বধূ। যদু কেবল ছয় সাত বছরের বালক। এই বালককে মানুষ করিয়া তুলিবার ভার তাঁহারই উপরে পড়ে এবং সেদিন পর্য্যন্ত এ ভার তিনি বহন করিয়াই আসিয়াছেন। পৈতৃক বিষয়ের মধ্যে একখানি মাটির ঘর, বিঘা দুই তিন ব্রহ্মোত্তর জমী এবং ঘর কয়েক যজমান। মাত্র এইটুকুর উপর নির্ভর করিয়াই তাহার স্বামীকে সংসার-সমুদ্রে ভাসিতে হয়। আজ এই যে প্রচুরতা, এই যে স্বচ্ছলতা, এ সকল সমস্তই তাঁহার স্বকৃত উপার্জ্জনের ফল। ঠাকুরপো কোন সাহায্যই করে নাই, সাহায্য কখনও তাহার কাছে প্রার্থনাও করা হয় নাই।

আমি কহিলাম, এখন বুঝি তিনি অর্দ্ধেক দাবী করিতেছেন?

কুশারী-গৃহিণী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, দাবী কিসের বাবা, এ তো সমস্তই ওর। সমস্তই সে নিত, সুনন্দা যদি না মাঝে পড়ে আমার এমন সোনার সংসার ছার খার করে দিত।

আমি কথাটা ঠিকমত বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু আপনার ওই ছেলেটি?

তিনিও প্রথমটা বুঝিতে পারিলেননা, পরে বুঝিয়া বলিলেন, ওই বিজয়ের কথা বোলচ? ও ত আমাদের ছেলে নয় বাবা, ও একটি ছাত্র। ঠাকুরপোর টোলে পড়ত, এখনও তার কাছেই পড়ে, শুধু আমার কাছে থাকে। এই বলিয়া তিনি বিজয় সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা দূর করিয়া কহিতে লাগিলেন, কত দুঃখে যে ঠাকুরপোকে মানুষ করি, সে শুধু ভগবান জানেন এবং পাড়ার লোকেও কিছু কিছু জানে। কিন্তু নিজে সে আজ সমস্ত ভুলেচে, শুধু আমরাই ভুলতে পারিনি। এই বলিয়া তিনি চোখের কোণটা হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া কহিলেন, কিন্তু সে সব যাক্ বাবা, সে অনেক কথা। আমি ঠাকুরপোর পৈতে দিলাম, কর্ত্তা তাকে পড়ার জন্যে মিহিরপুরে শিবু তর্কালঙ্কারের টোলে পাঠিয়ে দিলেন। বাবা, ছেলেটাকে ছেড়ে থাকতে পারিনি বলে আমি নিজে কতদিন গিয়ে মিহিরপুরে বাস করে এসেচি,—সেও আজ আর তার মনে পড়েনা। যাক্,—এমন করে কত বছরই না কেটে গেল। ঠাকুরপোর পড়া সাঙ্গ হল, কর্ত্তা তাকে সংসারী করবার জন্যে মেয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন; এমন সময়ে বলা নেই কহা নেই, হঠাৎ একদিন শিবু তর্কালঙ্কারের মেয়ে সুনন্দাকে বিয়ে করে এনে উপস্থিত। আমাকে নাই বলুক বাবা, অমন দাদার পর্য্যন্ত একটা মত নিলেনা।

আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, মত না নেওয়ার কি বিশেষ কারণ ছিল?

গৃহিণী কহিলেন, ছিল বই কি। ওরা আমাদের ঠিক স্বঘরও নয়, কুল-শীলে মানেও ঢের ছোট। কর্ত্তা রাগ করলেন, দুঃখে লজ্জায় বোধ করি এমন মাসখানেক কারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত কইলেননা; কিন্তু আমি রাগ করিনি। সুনন্দার মুখখানি দেখে প্রথম থেকেই যেন গলে গেলাম। তার ওপর যখন শুনতে পেলাম, তার মা মারা গেছে, বাপ ঠাকুরপোর হাতে তাকে সঁপে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছেন, তখন ওই ছোট মেয়েটিকে পেয়ে আমার কি যে হোল তা' তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবনা। কিন্তু সে যে একদিন তার এমন শোধ দেবে, এ কথা তখন কে ভেবেছিল? এই বলিয়া তিনি হঠাৎ ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বুঝিলাম এইখানে ব্যথাটা অতিশয় তীব্র; কিন্তু নীরবে রহিলাম। রাজলক্ষ্মীও এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই; সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, এখন তাঁরা কোথায়?

প্রত্যুত্তরে তিনি ঘাড় নাড়িয়া যাহা ব্যক্ত করিলেন, তাহাতে বুঝা গেল ইহারা আজও এই গ্রামেই আছেন। ইহার পরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কথা হইলনা, তাঁহার সুস্থ হইতে একটু বেশি সময় গেল। কিন্তু আসল বস্তুটা এখন পর্য্যন্ত ভাল করিয়া বুঝাই গেলনা। এদিকে আমার খাওয়াটাও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, কারণ কান্নাকাটি সত্ত্বেও এ বিষয়ে বিশেষ বিঘ্ন ঘটে নাই। সহসা তিনি চোখ মুছিয়া সোজা হইয়া বসিলেন, এবং আমার থালার দিকে চাহিয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, থাক্ বাবা, সমস্ত দুঃখের কাহিনী

বল্‌তে গেলে শেষও হবেনা, তোমাদেরও ধৈর্য্য থাক্‌বেনা। আমার সোনার সংসার যারা চোখে দেখেচে, কেবল তারাই জানে ছোট-বৌ আমার কি সর্ব্বনাশ করে গেছে। কেবল সেই লঙ্কাকাণ্ডটাই তোমাদের সংক্ষেপে বল্‌বো।

যে সম্পত্তিটার উপর আমাদের সমস্ত নির্ভর, সেটা এক সময়ে একজন তাঁতির ছিল। বছর থানেক পূর্ব্বে হঠাৎ একদিন সকালে তার বিধবা স্ত্রী নাবালক ছেলেটিকে সঙ্গে করে বাড়ীতে এসে উপস্থিত। রাগ করে কত কি যে বলে গেল তার ঠিকানা নেই, হয়ত তার কিছুই সত্য নয়, হয়ত তার সমস্তই মিথ্যে,—ছোট-বৌ স্নান করে যাচ্ছিল রান্না ঘরে; সে যেন সেই সব শুনে একেবারে পাথর হয়ে গেল। তারা চলে গেলেও তার সে ভাব যেন ঘুচ্‌তে চাইলেনা। আমি ডেকে বোল্‌লাম, সুনন্দা, দাঁড়িয়ে রইলি, বেলা হয়ে যাচ্চেনা? কিন্তু, হঠাৎ তার মুখের পানে চেয়ে একেবারে ভয় পেয়ে গেলাম। তার চোখের চাহনিতে কিসের যেন একটা আলো ঠিক্‌রে পড়চে, কিন্তু আনন মুখখানি একেবারে ফ্যাকাশে,—বিবর্ণ। তাঁতি-বউয়ের প্রত্যেক কথাটি যেন বিন্দু বিন্দু করে তার সর্ব্বাঙ্গ থেকে সমস্ত রক্ত শুষে নিয়ে গেছে। সে তখন আমার জবাব দিলেনা, কিন্তু আস্তে আস্তে কাছে এসে বল্‌লে, দিদি, তাঁতি বৌকে তার স্বামীর বিষয় তোমরা ফিরিয়ে দেবেনা? তার ঐটুকু নাবালক ছেলেকে তোমরা সর্ব্বস্ব বঞ্চিত করে সারাজীবন পথের ভিখিরী করে রাখ্‌বে?

আশ্চর্য্য হয়ে বোল্‌লাম, শোন কথা একবার। কানাই বসাকের সমস্ত সম্পত্তি দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে গেছে, ইনি কিনে নিয়েছেন। নিজের কেনা বিষয় কে কবে পরকে ছেড়ে দেয় ছোট-বৌ?

ছোট-বৌ বল্‌লে, কিন্তু বট্‌ঠাকুর এত টাকা পেলেন কোথায়?

রাগ করে জবাব দিলাম, সে কথা জিজ্ঞাসা করগে যা তোর বট্‌ঠাকুরকে—বিষয় যে কিনেচে। এই বলে আহ্নিক করতে চলে গেলাম।

রাজলক্ষ্মী কহিল, সত্যিই ত। যে বিষয় নিলাম হয়ে বিক্রী হয়ে গেছে তা ফিরিয়ে দিতেই বা ছোট-বৌ বলে কি করে?

কুশারী-গৃহিণী কহিলেন, বল ত বাছা। কিন্তু এ কথা বা সত্ত্বেও তাঁহার মুখের উপর লজ্জার যেন একটা কালো ছায়া পড়িল। কহিলেন, তবে, ঠিক নিলাম হয়েই ত বিক্রী হয়নি কি না তাই। আমরা হোলাম তাদের পুরুত বংশ। কানাই বসাক মৃত্যুকালে এঁর ওপরেই সমস্ত ভার দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন ত আর ইনি জান্‌তেননা সেই সঙ্গে এক রাশ দেনাও রেখে গিয়েছিল!

তাঁহার কথা শুনিয়া রাজলক্ষ্মী ও আমি উভয়েই কেমন যেন স্তব্ধ হইয়া গেলাম। কি যেন একটা নোঙরা জিনিস আমার মনের ভিতরটা এক মুহূর্ত্তেই একেবারে মলিন করিয়া দিয়া গেল। কুশারী-গৃহিণী বোধ করি ইহা লক্ষ্য করিলেন-না। বলিলেন, জপ, আহ্নিক সমস্ত সেরে ঘণ্টা দুই পরে ফিরে এসে দেখি সুনন্দা সেই খানে ঠিক তেমনি স্থির হয়ে বসে আছে। কোথাও একটা পা পর্য্যন্ত বাড়ায়নি। কর্ত্তা কাছারি সেরে এখুনি এসে পড়বেন, ঠাকুরপো বিনুকে নিয়ে খামার দেখ্‌তে গেছে, তাঁরও ফিরতে দেরি নেই, বিজয় নাইতে গেছে, এখুনি এসে ঠাকুর পূজায় বসবে, —রাগের আর পরিসীমা রইলনা, বোললাম, তুই কি রান্নাঘরে আজ আর ঢুক্‌বিনে? ওই বজ্জাত তাঁতি-বেটীর ছেঁড়া কথা নিয়েই সারা দিন বসে থাক্‌বি?

সুনন্দা মুখ তুলে বললে, না দিদি, যে বিষয় আমাদের নয়, সে যদি তোমরা ফিরিয়ে না দাও ত আর আমি রান্নাঘরে ঢুক্‌বোনা। ওই নাবালক ছেলেটার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে আমার স্বামি-পুত্রকেও খাওয়াতে পারবনা, ঠাকুরের ভোগ রেঁধেও দিতে পারবনা। এই বলে সে তার নিজের ঘরে চলে গেল। সুনন্দাকে আমি চিন্‌তাম। সে যে মিথ্যা কথা বলেনা, সে যে তার অধ্যাপক সন্ন্যাসী বাপের কাছে ছেলেবেলা থেকে অনেক শাস্ত্র পড়েচে, তাও জান্‌তাম; কিন্তু সে যে মেয়েমানুষ হয়েও এমন পাষাণ-কঠিন হতে পারবে তাই কেবল তখনো জান্‌তামনা। আমি তাড়াতাড়ি ভাত রাঁধতে গেলাম, পুরুষরা সব বাড়ী ফিরে এলেন,—কর্ত্তার খাবার সময় সুনন্দা দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল। আমি দূর থেকে হাত জোড় করে বোল্‌লাম, সুনন্দা, একটু ক্ষমা দে, ওঁর খাওয়াটা হয়ে যাক্। সে এটুকু অনুরোধও রাখলে-না। গণ্ডুষ করে খেতে বসছিলেন, জিজ্ঞেসা করলে, তাঁতিদের সম্পত্তি কি আপনি টাকা দিয়ে নিয়েছিলেন? ঠাকুর ত কিছুই রেখে যাননি, এ তো আপনাদের মুখেই অনেকবার শুনেচি, তবে, এত টাকা পেলেন কোথায়?

যে কথনো কথা কয়না, তার মুখে এই প্রশ্ন শুনে কর্ত্তা প্রথমে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, তার পরে বল্‌লেন, এ সব কথার মানে কি বউমা?

সুনন্দা উত্তর দিলে, এর মানে যদি কেউ জানে ত সে আপনি। আজ তাঁতি বউ তার ছেলে নিয়ে এসেছিল, তার সমস্ত কথার পুনরাবৃত্তি করা আপনার কাছে বাহুল্য, কিছুই আপনার অজানা নেই। এ বিষয় যার, তাকে যদি ফিরিয়ে না দেন, ত, আমি বেঁচে থেকে এই মহাপাপের একটা অন্নও আমার স্বামি-পুত্রকে খেতে দিতে পারবনা।

আমার মনে হ'ল বাবা, হয় আমি স্বপন দেখ্‌চি, না হয় সুনন্দাকে ভূতে পেয়েছে। যে ভাশুরকে সে দেব্‌তার বেশি ভক্তি করে, তাঁকেই এই কথা! উনিও খানিকক্ষণ বজ্রাহতের মত বসে রইলেন; তার পরে জ্বলে উঠে বললেন, বিষয় পাপের হোক্ পুণ্যের হোক্, সে আমার, তোমার স্বামি-পুত্রের নয়। তোমাদের না পোষায়, তোমরা আর কোথাও যেতে পারো। কিন্তু বউমা, তোমাকে আমি এতকাল সর্ব্বগুণময়ী বলেই জান্‌তাম, কখনো এমন ভাবিনি। এই বলে তিনি আসন ছেড়ে উঠে চলে গেলেন। সে দিন সমস্তদিন আর কারও মুখে ভাত-জল গেলনা। কেঁদে গিয়ে ঠাকুরপোর কাছে পড়লাম; বোল্‌লাম, ঠাকুরপো, তোমাকে যে আমি কোলে করে মানুষ করেছি,—তার এই প্রতিফল! ঠাকুরপোর চোখ দুটো জলে ভরে গেল, বল্‌লে, বৌঠান্, তুমিই আমার মা, দাদাও আমার পিতৃতুল্য। কিন্তু তোমাদেরও বড় যে, সে ধর্ম্ম। আমারও বিশ্বাস সুনন্দা একটা কথাও অন্যায় বলেনি। শ্বশুর মহাশয় সন্ন্যাস গ্রহণের দিন তাকে আশীর্ব্বাদ করে বলেছিলেন, মা, ধর্ম্মকে যদি সত্যিই চাও, তিনিই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। আমি তাকে এতটুকু বয়স থেকে চিনি বৌঠান, সে কখ্‌খনো ভুল করেনি।

হারে, পোড়া কপাল! তাকেও যে পোড়ারমুখী ভেতরে ভেতরে এত বশ করে রেখেছিল, আজ আমার তার চোখ্ খুল্‌ল। সে দিন ভাদ্রের সংক্রান্তি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, —থেকে থেকে ঝর্ ঝর্ জল পড়চে; কিন্তু হতভাগী একটা রাত্রির জন্যেও আমাদের মুখ রাখলেনা, ছেলের হাত ধরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। আমার শ্বশুরের কালের একঘর প্রজা মরে-হেজে বছর দুই হল চলে গেছে, তাদেরই ভাঙা ঘর একখানি তখনও কোনমতে দাঁড়িয়ে ছিল; শিয়াল-কুকুর সাপ-ব্যাঙের সঙ্গে তাতেই গিয়ে এই দুর্দ্দিনে আশ্রয় নিলে। উঠনের জল-কাদা মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে কেঁদে উঠ্‌লাম, সর্ব্বনাশী, এই, যদি তোর মনে ছিল, এ সংসারে ঢুকেছিলি কেন? বিনুকে পর্য্যন্ত যে নিয়ে চললি, তুই কি শ্বশুর-কুলের নামটা পর্য্যন্ত পৃথিবীতে থাকতে দিবিনে প্রতিজ্ঞা করেছিস্? কিন্তু কোন উত্তর দিলেনা। বোল্‌লাম, খাবি কি? জবাব দিলে, ঠাকুর যে তিন বিঘে ব্রহ্মোত্তর রেখে গেছেন, তার অর্দ্ধেকটাও ত আমাদের। কথা শুনে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছা হ'ল; বোল্‌লাম, হতভাগী, তাতে যে একটা দিনও চল্‌বেনা। তোরা না হয় না খেয়ে মরতে পারিস্, কিন্তু আমার বিনু? বল্‌লে, একবার কানাই বসাকের ছেলের কথা ভেবে দেখ দিদি। তার মত একবেলা এক সন্ধ্যে খেয়েও যদি বিনু বাঁচে, ত সেই ঢের!

তারা চলে গেল। সমস্ত বাড়ীটা যেন হাহাকার করে কাঁদতে লাগ্‌ল। সে রাত্রিতে আলো জ্বললনা, হাঁড়ি চড়লনা; কর্ত্তা অনেক রাত্রে ফিরে এসে সমস্ত রাত ওই খুঁটিটা ঠেস দিয়ে বসে কাটালেন। হয়ত, বিনু আমার ঘুমোয়নি, হয়ত খাছা আমার ক্ষিদেয় ছট্‌ফট্ করেচে; ভোর না হতেই রাখালকে দিয়ে গরু বাছুর পাঠিয়ে দিলাম কিন্তু রাক্ষসী ফিরিয়ে দিয়ে তারই হাতে বলে পাঠালে, বিনুকে আমি দুধ খাওয়াতে চাইনে, দুধ না খেয়ে বেঁচে থাকবার শিক্ষা দিতে চাই।

রাজলক্ষ্মীর মুখ দিয়া কেবল একটা সুগভীর নিঃশ্বাস পড়িল; গৃহিণীর সেই দিনের সমস্ত বেদনা ও অপমানের স্মৃতি উদ্বেল হইয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল, এবং আমার হাতের ডেলে-ভাত শুকাইয়া একেবারে চামড়া হইয়া উঠিল। কর্ত্তার খড়মের শব্দ শুনা গেল, তাঁহার মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাধা হইয়াছে। এবং, আশা করি আজও তাঁহার মৌনব্রত অক্ষুণ্ণ অটুট থাকিয়া তাঁহার সাত্বিক আহারে কোন বিঘ্ন ঘটায় নাই। কিন্তু এ দিকের ব্যাপারটা জানিতেন বলিয়াই বোধ করি আমার তত্ত্ব লইতে আর আসিলেন না। গৃহিণী চোখ মুছিয়া, নাক ঝাড়িয়া, গলা পরিষ্কার করিয়া কহিলেন, তার পরে গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় লোকের মুখে মুখে কি দুর্নাম, কি কেলেঙ্কারি বাবা, সে আর তোমাদের কি বল্‌ব! কর্ত্তা বল্‌লেন, দুদিন যাক্, দুঃখের জ্বালায় তারা আপনিই ফিরবে। আমি বোল্‌লাম, তাকে চেনোনা, সে ভাঙ্‌বে কিন্তু

ছুইবেনা। আর তাই হল। একটার পর একটা করে আজ আট মাস কেটে গেল, কিন্তু তাকে হেঁট করতে পারলেনা। কর্ত্তা ভেবে ভেবে আর আড়ালে কেঁদে কেঁদে যেন কাঠ হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। ছেলেটা ছিল তাঁর প্রাণ, আর ঠাকুরপোকে ভালবাসতেন ছেলের চেয়ে বেশি। আর সহ্য করতে না পেরে লোক দিয়ে বলে পাঠালেন, তাঁদের যাতে কষ্ট না হয়, তিনি করবেন ; কিন্তু সর্ব্বনাশী জবাব দিলে, যা তাদের দ্যায্য পাওনা সমস্ত মিটিয়ে দিলেই তবে ঘরে ফিরবো। তার এক ছটাক কোথাও বাকি থাকতে যাবোনা। অর্থাৎ তার মানে নিজেদের অবধারিত মৃত্যু!

আমি গেলাশের জলে হাতখানা একবার ডুবাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন তাঁদের কি করে চলে ?

কুশারী-গৃহিণী কাতর হইয়া বলিলেন, এর জবাব আর আমাকে দিতে বোলোনা বাবা। এ আলোচনা কেউ করতে এলে আমি কানে আঙুল দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাই,—মনে হয় যেন বা আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে। এই আট মাস এ বাড়ীতে মাছ আসেনা, দুধ ঘি'র কড়া চড়েনা। সমস্ত বাড়ীটার ওপর সে যেন এক মর্ম্মান্তিক অভিশাপ রেখে চলে গেছে। এই বলিয়া তিনি চুপ করিলেন, এবং বহুক্ষণ ধরিয়া তিন জনেই আমরা স্তব্ধ হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে আমরা আবার যখন গাড়ীতে গিয়া বসিলাম, কুশারী-গৃহিণী সজল কণ্ঠে রাজলক্ষ্মীর কানে কানে বলিলেন, মা, তারা তোমারই প্রজা। আমার শ্বশুরের দরুণ যে জমিটুকুর ওপর তাদের নির্ভর, সেটুকু তোমার গঙ্গামাটিতেই।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা।

গাড়ী ছাড়িয়া দিতে তিনি পুনশ্চ বলিয়া উঠিলেন, মা, তোমার বাড়ী থেকেই চোখে পড়ে। নালার এ দিকে যে ভাঙা পোড়ো ঘরটা দেখা যায়, সেইটে।

রাজলক্ষ্মী তেমনি মাথা নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা।

গাড়ী মন্থর গতিতে অগ্রসর হইল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমি কোন কথাই কহিলাম না। চাহিয়া দেখিলাম রাজলক্ষ্মী অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছে। তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া কহিলাম, লক্ষ্মী, যার লোভ নেই, যে চায়না, তাকে সাহায্য করতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা সংসারে আর নেই।

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের প্রতি চাহিয়া অল্প একটুখানি হাসিয়া বলিল, সে আমি জানি। তোমার কাছে আমার আর কিছুই না হোক্ এ শিক্ষা হয়েছে। (ক্রমশঃ)

আমার স্বপ্ন

[শ্রীগোপেন্দ্রনাথ সরকার]

বাংলা দেশের যত 'মাসিক' আমার আশেপাশে,
আমার পানে তাকিয়ে যেন মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসে।
আমায় ডেকে সবাই বলে— ওরে উচ্চমনা!
শুধুই খাবি আর ঘুমুবি, একটা কিছু হ'না ?
তুই ত বড়লোকের ছেলে, টাকাও আছে তোর,
জীবন-যুদ্ধে নাই কোন ভয়, চক্ষে প্রেমের ঘোর।
অজ্ঞাতে হায় কে যেন মোর মনকে দিল নাড়া
বস্‌লুম্ উঠে বুক ফুলিয়ে গোঁফে দিয়ে চাড়া।

ভেবে ভেবে কর্‌লুম্ ঠিক, হতেই হবে কবি,
ছোটখাট নয়, এক্‌বারে কবির সেরা রবি।
কবি হ'লেই অল্পদিনে সুনাম নেওয়া সোজা,
লেখা ? যা' হোক, মিল থাকা চাই, না যা'ক্ মানে বোঝা।
লিখ্‌ব ভাল প্রবন্ধ যে, তেমন ছেলে নই;
যদিও এম-এ-ল্যাজওয়ালা, শক্তি তেমন কই ?

যেমন ভাবা, তেমনি বসা, দোয়াত-কলম নিয়ে,
ভাবলুম্ লিখি—"আমার সঙ্গে বিনোদিনীর বিয়ে।"
বিনোদিনী—পত্নী আমার, পাশেই ঘুমুচ্ছিল,
সুন্দর সে মুখখানি তার, ভাব জাগিয়ে দিল।
ভাব্‌তে ভাব্‌তে কতক্ষণে, বল্‌ব কিরে ভাই,
ভাব্ দীঘীতে আনন্দ-রুই, মারতে লাগ্‌ল 'ঘাই'

যেমনি হাতে কলম নেব, অমনি পেন্ চোট্,
আগায় কিনা দেখি তাহার, বেরিয়ে গ্যাছে ঠোঁট্।
ছুটে ছুটে ঠোঁট দিয়ে সে ঠোকর মেরে ধরে,
কাগজখানা টোপর হয়ে উঠল মাথার 'পরে।
ভাব্ দাঁড়াল কালী হয়ে, ঝুলচে হাতে খাঁড়া,
ছন্দ সেজে কবন্ধ ভূত, দিল বিষম তাড়া।
'দোয়াতটোরো মুখটা যেন, হঠাৎ গেল বেড়ে',
হাঁ-করে সে বিকট রকম, আমায় এল তেড়ে।

আমি তখন প্রাণের ভয়ে, করছি ছুটোছুটি,
নাচতে লাগল 'মাসিক'গুলো, হেসেই কুটি-কুটি।
সবার শেষে পত্র দেবী, কর্ণে দিয়ে মলা,
কিল্ মেরে মোর নাকের উপর, ধরলে টিপে গলা।
ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে তখন, পুলিশ, পুলিশ, ডাকি,
এমন সময় ভাঙ্ল নিদ্রা, চাইনু খুলি আঁখি!
হাত্‌টা ধরে বিনোদিনী, করছে টানাটানি,
বলছে—ওগো, ভোরের বেলায়, এ কি এ চ্যাচানি?
রগড়ে হু'চোখ্ বল্লুম হেসে, ভয় নেইক বিনু,
ঘুমের ঘোরে এইমাত্র, স্বপন দেখ্‌তেছিনু।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত পাঁচুলাল ঘোষ প্রণীত 'মানসী'তে প্রকাশিত "আঁধারের শিউলী" প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৷৹

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন বি এল প্রণীত "আর্ট ও আহিতাগ্নি" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ৸৹

শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "রাজা গণেশ" তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ২৲

শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত এবং আট-আনা-সংস্করণ ভুক্ত "ব্রাহ্মণ পরিবারে"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

দরবেশ কবির নূতন কাব্য-গ্রন্থ "সুষমা" প্রকাশিত হইয়াছে; অঞ্জলী এক মুদ্রা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত নূতন উপন্যাস "সমর্পণ" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ২৲

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম এ প্রণীত "সখী" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য আট আনা। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের অঙ্কিত সখিবৃন্দের চরিত্র সমালোচনা আছে।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "রাজা-বাদশা" শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের ভূমিকা সংবলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য বার আনা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের "কানের দুল" প্রকাশিত হইল। ইহাতে যে কয়েকটি গল্প আছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি ভারতবর্ষ ও মানসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সার্দ্ধ মুদ্রায় "কানের দুল" বিকাইতেছে।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

নিঃসঙ্গ

শিল্পী—শ্রীবিপিনচন্দ্র দে

Emerald Ptg. Works Block by BHARATVARSHA HALFTONE WORKS

শ্রাবণ, ১৩২৮

প্রথম খণ্ড] নবম বর্ষ [দ্বিতীয় সংখ্যা

মায়াবাদ ও IDEALISM বা বিজ্ঞানবাদ

[৺স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী]

…ন আমি সুপ্তোত্থিত হই, তখন আমার নিদ্রাবস্থার স্মরণ … যে বস্তুর অনুভূতি নাই, তাহার স্মরণ হইতে পারে না। …ভব করিতে হইলেই অনুভবকর্ত্তা থাকা আবশ্যক। এই …ভবকর্ত্তাই 'আমি'। সুতরাং 'আমি' অবশ্যই আছি। …ল সংযোগ ছিল না বলিয়াই 'আমি'র বোধ হয় নাই। … আপনাতে আপন ভাবে আমি ছিলাম। জাগরণ এবং …প্নের সন্ধিস্থলেও আমি আছি। স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অন্তরালেও …মি আছি। মানসিক এই অবস্থাত্রয়ের পরিবর্ত্তনেও আমি … এই সকল অবস্থা হইতেছে—তাহা আমি জানি। … জ্ঞানস্বরূপ। অতএব মন প্রকাশ্য। জ্ঞানস্বরূপ আমি … প্রকাশক। আমি চিৎস্বরূপ। মন জড়। জ্ঞানস্বরূপ 'আমি'র কখনও জ্ঞানচ্যুতি হইতে পারে না; কারণ, জ্ঞান আত্মার স্বভাব। স্বভাবের অন্যথা ভাব হইতে পারে না। যতক্ষণ বস্তু আছে, ততক্ষণ স্বভাব আছে। "স্বভাবস্য যাবদ্‌বস্তু ভাবিত্বাৎ।" অতএব সৎচিৎস্বরূপ আমি সর্ব্বাবস্থায়ই আছি। মনের পরিবর্ত্তন হইতেছে। জাগরিত অবস্থায় মন বহির্বস্তু গ্রহণ করে। বিষয় গ্রহণ করিতে মন, দেশ ও কাল সাহায্যে বস্তু উপলব্ধি করে। দেশ এবং কাল দ্বারাই পরিমাণগত, গুণগত এবং প্রকারগত প্রভৃতি সকল ভেদ উপলব্ধ হয়। কিন্তু আন্তরিক সুখ, দুঃখ, দয়া প্রভৃতি অনুভব করিতে দেশের কোনও আবশ্যকতা নাই। কালের সাহায্যেই আমরা আন্তরিক ভাবসকল অনুভব করি। সুখ অনুভব

করিতে দেশের কোনও আবশ্যকতা নাই, স্বপ্নাবস্থায় দেশ এবং কালের সাহায্যে উপলব্ধি হয়। কিন্তু সুখ দুঃখাদি কাল সাহায্যেই বোধ হয়। জাগরণে মন ইচ্ছা করিলে নানা কাজ করিতে পারে। কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় মন কতকটা পরিমাণে অবশ হয়। সে অবস্থায় মন ইচ্ছা করিয়াই কোনরূপ পরিবর্তন অথবা কিছু নিবারণ করিতে পারে না। জাগরণে দৃশ্য বাহিরে। জাগরণ সময়ে কাল্পনিক জগৎ মনে অঙ্কিত করিতে পারি। দৃশ্য জগৎ হইতে এই কাল্পনিক জগতের পার্থক্য বা বিশেষত্ব আছে,- জাগরণের দৃশ্য-জগৎ যেরূপ পরিস্ফুট, কাল্পনিক জগৎ সেরূপ সুস্পষ্ট বা পরিস্ফুট নহে। ইহা তদপেক্ষা অস্পষ্ট। জাগরণের দৃশ্য জগৎ এবং স্বপ্নের দৃশ্য-জগৎ একই প্রকারের। কাল্পনিক জগৎ ও স্বাপ্নিক জগৎ বিভিন্ন। স্বাপ্নিক জগৎ স্পষ্ট। কিন্তু প্রত্যক্ষ দৃষ্ট জাগতিক ব্যাপার বেশ স্মরণ থাকে। স্বাপ্নিক দৃশ্য সহজে বিস্মৃত হই। জাগরণের দৃশ্য হইতে সুতরাং স্বাপ্নিক জগৎ কতকটা পরিমাণে ভিন্ন। প্রত্যক্ষ জগৎ বাধিত হয় না। কিন্তু স্বাপ্নিক জগৎ জাগরণে বাধিত বা মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, জাগরণের দৃশ্যের উপলব্ধি হয়, স্বপ্নের দৃশ্য স্মরণ হয়। স্মরণ ও উপলব্ধির পার্থক্য আছে। বস্তু স্মরণ করি, কিন্তু উপলব্ধি হয় না। স্মৃত বস্তুর উপলব্ধি করিতে ইচ্ছুক হই। দেখিতে পাই, মানসিক অবস্থার ভিন্নতায় দৃশ্য জগতের অনুভূতি প্রভৃতির নানারূপ ভিন্নতা হয়। ক্রোধাদির উদ্রেকে চিত্ত বিচলিত হইলে, দৃশ্য সম্বন্ধে বোধের বিপর্যয় হয়। প্রেমপূর্ণ চিত্তের নিকট জাগতিক দৃশ্য মধুময়, বিচারে পরে, চিত্তের নিকট অন্যরূপ। মনের পার্থক্যে দৃশ্য বোধের পৃথকত্ব উপলব্ধি হয়। সুষুপ্তি অবস্থার বিষয়ও বিবেচনা করা দরকার। সুষুপ্তি অবস্থায় দৃশ্য জগতের একেবারে লুপ্ত হয়। দেশ ও কাল লয় পায়। মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সুপ্ত হয়। কিন্তু এ অবস্থায়ও সংস্কার থাকে। সংস্কার না থাকিলে স্বপ্ন ও জাগরণে পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্মরণ ও উপলব্ধি হইত না।

স্বপ্নাবস্থায় মনই দ্রষ্টা, মনই দৃশ্য। অবশ্যই এস্থলেও আত্মা ও মনের অধ্যাসেই মনকে দ্রষ্টা বলা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে মনও দৃশ্য; আত্মাই দ্রষ্টা। সুষুপ্তি অবস্থায় বহির্দৃশ্য লয় পাইয়াছে। স্বপ্নে বহির্জগতের সহিত ইন্দ্রিয় দ্বারের সংযোগ নাই; তথাপি প্রত্যক্ষবৎ বস্তুর উপলব্ধি হইতেছে। স্বপ্নে স্ত্রী-সঙ্গ করিয়া রেতঃ স্খলন হয়। স্ত্রী নাই, সংযোগ নাই, অথচ কার্য্য হইতেছে। স্ত্রী মিথ্যা। সংযোগ মিথ্যা। কিন্তু রেতঃ স্খলনরূপ কার্য্য সৎ। স্বপ্নে দৃশ্যের ছাপ দৃঢ়তর হইলে সেই ছাপ বহুক্ষণ স্থায়ী হয়। তাহা আমরা সহজে বিস্মৃত হই না। জাগরণের দৃশ্য সম্বন্ধেও তাহাই। যে দৃশ্য মনে দৃঢ়তর ভাবে অঙ্কিত হয়, তৎচিত্র শীঘ্র ভুলি না। যে চিত্রের ছাপ দৃঢ় হয় না, তাহা শীঘ্রই ভুলিয়া যাই। স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুর বাধ হয়, অনেক সময় সহজেও বিস্মৃত হই। স্মৃতির লোপালোপ অনুভবের দৃঢ়তা এবং অদৃঢ়তার উপর নির্ভর করে। স্বপ্নাবস্থার আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি, বাহিরের জগতের সহিত সংযোগ না থাকিলেও মনে জগৎ থাকে। স্বাপ্নিক জগৎ মনোময়। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদি রুদ্ধ করিয়া কল্পনায় জগৎ মনে মনে অঙ্কিত করিতে পারি। কল্পনার জগৎ ও প্রত্যক্ষ জগতের যে পৃথকত্ব, তাহা কেবল মাত্রার তফাৎ (difference of degree)। কল্পনার জগৎ মনোময়। আত্মবোধ না থাকিলে মনও যেমন, বাহিরের জগৎও তেমন। উভয়ই জড়। আত্ম-চৈতন্যের প্রকাশেই মন প্রকাশশীল। বাহিরের জগদাম্বরালেও যে মন, জীবের অন্তরেও সেই মন। মনও জড়। বহিঃপ্রকৃতিও জড়। আত্মাই চেতন। আত্মাই প্রকাশক। মন প্রকাশ্য। মনের সহিত অধ্যাসেই মনকে প্রকাশক বলিয়া ধারণা করি। অধ্যাস নিবৃত্ত হইলে মন দৃশ্য বলিয়াই বোধ হয়। পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি মন ও আত্মা পৃথক।

স্বপ্নাবস্থার দৃশ্য-জগৎ সুষুপ্তিতে লয় পায়। জাগরণ সময়ে স্থানান্তরে গমনাগমনে যেরূপ দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়, স্বপ্নের গমনাগমনে তাদৃশ দীর্ঘকালের আবশ্যকতা থাকে না। বাহিরের ব্যাপারে মন অনেকটা পরিমাণে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। কাল ও দেশের পরিচ্ছেদ জাগরণে যেমন দৃঢ়, স্বপ্নাবস্থায় সেরূপ নহে। তখন বহির্জগতের সহিত সংযোগ শিথিল হওয়ায় মন কতকটা পরিমাণে সীমা অতিক্রম করে। স্থূল শরীর তখন মনের তত বাধা জন্মাইতে পারে না। এইজন্যই স্বপ্নাবস্থায় কালাদির প্রত্যয় অন্যরূপ হয়। সুষুপ্তি অবস্থায় দেশ-কালাদির বোধ থাকে না। দৃশ্য-জগৎ লয় প্রাপ্ত হয়। মন ও বুদ্ধি লয় প্রাপ্ত হয়। সংকল্প বিকল্প, অধ্যবসায় নিশ্চয়, অনুসন্ধান ও অভিমান প্রভৃতি বৃত্তি লুপ্ত হয়। কিন্তু বৃত্তিসকল লোপ পাইলেও উহাদের বিনাশ হয় না। কারণ, পুনরায় উহাদের আবির্ভাব হয়। বৃত্তিগুলি তিরোহিত হয়।

পুনরায় আবির্ভূত হয়। ঘট ভগ্ন হইলে তৎকারণ মৃত্তিকায় লীন থাকে। বৃত্তিগুলিও সেইরূপ কারণে লীন থাকে। সুষুপ্তি অবস্থায় মানসিক বৃত্তিগুলি স্বকারণে লীন হয়, প্রতিবন্ধ হইলে পুনরায় প্রকাশ পায়। অতএব বলিতে হইবে, নিদ্রাবস্থায় বৃত্তিগুলি অব্যক্ত থাকে। জাগরণে ও স্বপ্নে ব্যক্ত হয়। এইগুলির ধ্বংস হয় না। বহির্জগৎ সুষুপ্তি অবস্থায় মনে লয় পায়। জগৎ মনে। মনের বৃত্তি লয় পাইলেই জগৎ স্ব-কারণে লয় প্রাপ্ত হয়। নিদ্রাবস্থায় দেশ, কাল ও বস্তু লয় প্রাপ্ত হইলেও সংস্কার থাকে। এই সংস্কারেই বৃত্তি ও বিষয় লয় পায়। সুতরাং এই সংস্কারকে উহাদের সমবায়ি কারণ বলা যাইতে পারে।

এই সংস্কার কাহার আশ্রিত? এস্থলে বলিতে হইবে, আত্মার আশ্রিত। আমি না থাকিলে সংস্কারকে প্রকাশ করে কে? কারণ, সংস্কারও জড়। মন যখন জড়, মনের সংস্কারও জড়। চিৎ প্রকাশ আত্মাই সংস্কারকে প্রকাশ করে। সুষুপ্তি অবস্থায় আমরা তমোভিভূত থাকি। এ অবস্থায় অজ্ঞানের আধিক্যে বস্তুর পৃথকত্ব বোধ লুপ্ত হয়। সুখ দুঃখ, ভালমন্দ প্রভৃতি বিপরীত ভাব একেতে অন্বিত হয়। কারণ, সুষুপ্তি অবস্থায় কোনও রূপ পৃথকত্ব থাকে না। এস্থলে কেহ বলিতে পারেন, কাণ্টের Highest Synthesis এবং হেগেলের Higher বা absolute spirit এইরূপ একেতে পরিণতি মাত্র। আমরা তদুত্তরে বলিব, কাণ্ট প্রভৃতি জড়ে ও চৈতন্যে সমন্বয় করিতে ইচ্ছুক। তাহাদের মতে মন ও আত্মা অভিন্ন। জড় বস্তুর ধর্ম্ম নানাত্ব। জড়ের মূল এক। এই নানাত্ব এক সংস্কার রূপে মূলে অনেক হইতে পারে। মৃত্তিকারূপ কারণে ঘটশরাবাদি লয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু চৈতন্য ও জড় কখনই সমন্বিত হইতে পারে না। কারণ, বিরুদ্ধ-স্বভাব একত্বে পরিণত হইতে পারে না। জ্ঞান অখণ্ড। জ্ঞান এক। কেবল উপাধির পৃথকত্বে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। চক্ষুর বোধ, কর্ণের বোধ, মনের বোধ—সকল বোধই মূলতঃ এক বোধ। কেবল নানারূপ উপাধিতে অবচ্ছিন্ন বোধকে, ইন্দ্রিয়াবচ্ছিন্ন বোধ হইতে পৃথক্ বলিয়া ভ্রম হয়। উপাধি বিদূরিত হইলে জ্ঞান এক। কাণ্ট ও হেগেল জ্ঞানস্বরূপ আত্মা ও মনকে তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্নরূপে দেখিয়াছেন। জ্ঞান সর্ব্বাবস্থায়ই এক। জড়ই বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাক্রান্ত। জড়-বিজ্ঞানের আলোচনায় জানিতে পারি, পরমাণু এবং অন্য পরমাণুর ভিতরে আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তি (attracting and repelling force) ক্রিয়া করিতেছে। আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ বা বিকাশ মাত্র। মন শক্তি এক। মনেও বিপরীত ভাব বা শক্তির ক্রিয়া হইতেছে। এই বিপরীত ক্রিয়া বা শক্তি মূলে এক শক্তি। এই অর্থে কাণ্ট অথবা হেগেল বিরুদ্ধ বস্তুর সমন্বয় (Synthesis) স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের সমন্বয় চেতন ও জড়ের সমন্বয়। ইহা অসম্ভব। প্রকৃতি, শক্তি অথবা সংস্কার যাহাই বলি, থাকিলেই জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিবে। পৃথকত্ব থাকিবেই। চেতন ও জড় বিরুদ্ধস্বভাব; স্বভাবের নাশ হইতে পারে না। স্বভাবের নাশে দ্রব্যের নাশ। দ্রব্য থাকিবে ও তাহার স্বভাবের নাশ হইবে—ইহা অসম্ভব। বিরুদ্ধ স্বভাব একই বস্তুতে পরিণত বা সমন্বিত হইতে পারে না। জল ঠাণ্ডা ও গরম সমকালে অসম্ভব। জ্ঞান অখণ্ড। উপাধিগুলি খণ্ডিত। কিন্তু উপাধিগুলি সমষ্টি হিসাবে এক। হেগেল এই উপাধিগুলির একত্ব—অবশ্য সমষ্টির দৃষ্টিতে—সাব্যস্ত করিয়াছেন; এবং জ্ঞান সর্ব্বানুস্যূত বলিয়া, জ্ঞান ও উপাধিকে একাত্মরূপে গ্রহণ করিয়া পরস্পর বিরোধী ও বিপরীত বস্তুর সমন্বয় করিয়াছেন। বাস্তবিক এ বিষয়ে হেগেল ভ্রান্ত। জ্ঞান ও জড়ের সমন্বয় হইতেই পারে না। হেগেল উপাধি সমষ্টির একত্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু জ্ঞান ও জড়ের একত্ব দেখাইতে পারেন না। আমরা বলি, আপাত-বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত উপাধিগুলি এক বস্তুতে অন্বিত হইতে পারে; কারণ, জড় মূলতঃ এক হইয়াও নানা। ইহা জড়ের স্বভাব। কিন্তু জ্ঞান স্বভাবতঃ এক। ইহার নানাত্ব অসম্ভব। জ্ঞানের একত্ব (unity) বহুত্ব (plurality) এবং সমষ্টিত্ব (totality) হইতে পারে না,—কেবল আগন্তুক উপাধি যোগেই একত্ব, বহুত্ব ও সমষ্টিত্ব। হেগেল মনোরাজ্যে যে বিপরীত ভাবের একত্ব দেখিয়াছেন, তাহাও জড়ের ধর্ম্ম। বিপরীত শক্তি এক মূল শক্তির বিকাশ। ইহাই জড়ধর্ম্ম।

অতএব হেগেলের 'World Principle' ও জ্ঞান ও জড়ের সমন্বয় সাধন করিতে পারে না। সুষুপ্ত অবস্থায় যে মানসিক একত্ব হয়, তাহাতেও দ্বৈত রহিয়াছে। সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্মরণ হয়, 'আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম'। আমি এবং বিষয়

ছিল। এই বিষয়-রূপ সংস্কারের দ্রষ্টা আমি। দৃশ্যের ভিন্নতা এক সংস্কারে পরিণতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু আত্মার সহিত সম্মিলিত হয় নাই। দ্রষ্টা ও দৃশ্য এক হইতে পারে না। আমি যাহার দ্রষ্টা, সে বস্তু আমা হইতে পৃথক। সুখ, দুঃখ, ভালবাসা প্রভৃতি আমি নাই। চিন্তা করা মনের ধর্ম। আমি যখন "আত্মা"র চিন্তা করি, তখনও অধ্যাসবশে চিন্তা করি। বাস্তবিক "আমি"র চিন্তা হয় না, অথবা আমির ধ্যান আমিই; ধ্যাতা ও ধ্যেয় একই বস্তু; ধ্যানও পৃথক নহে। সুষুপ্তি অবস্থায় আমাদের দেশ কাল বোধ থাকে না। ধ্যানের অবস্থায় কিরূপ হয়, তাহাই বিবেচ্য। বাস্তবিক ধ্যানের অবস্থা এক অর্থে জাগরণের তুল্য। অন্য অর্থে সুষুপ্তির তুল্য। ধ্যানে জ্ঞান থাকে। সুষুপ্তিতে অজ্ঞান থাকে। সুষুপ্তিতে বাহ্য বস্তুর আপেক্ষিক জ্ঞানাদি থাকে না। দেশ-কাল-বোধ থাকে না। ধ্যানেও বস্তুতে তন্ময় হইলে দেশ কাল বোধ লোপ হয়। আপেক্ষিক জ্ঞানও বিদূরিত হয়। কারণ, দেশ কাল দিয়াই আপেক্ষিক বোধ জন্মে।'

স্মরণে

[শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী]

তোমারে আমি যে ভাল কিসের মতন
হে আমার প্রিয়তম, সুন্দর কেমন
ছিলে তুমি, কত খানি ছিলে স্নেহময়,
তুলনায় করি মনে ছিল না সময়
জানিনা ত কিছু আমি; শুধু জানি এই
তোমার মতন আর কিছু মোর নেই।
আপনারে দিয়েছিল সঁপিয়া নিঃশেষে
তোমারেই প্রাণ মম শুধু ভালবেসে
তোমার সে স্নেহপাশে। শান্তিহারা আমি
আবার ফিরিয়া পেতে চাই দিনযামী
জগতের দ্বারে দ্বারে মরি যে ঘুরিয়া
পূর্ণ হয় যদি কভু আতুর এ হিয়া
কোথা আছে নিখিলের সুগভীর স্নেহ,
ভরি যাহা দিবে মোর সারা প্রাণ দেহ।

আজ যেন মনে হয়, আমি কোনো কালে
কোমল স্নেহের স্পর্শ কম্প্র ভালে
দিইনে বুলায়ে তব—শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে
ফিরিয়া আসিতে যবে কর্ম্মশেষে গেহে।
ব্যস্ত হ'য়ে আপনার কথা আর কাজে,
ডুবিয়া ছিলাম সদা সংসারের মাঝে।
আজিকে বেদনা আর নয়নের নীরে
আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগে—এস, এস ফিরে।

সারাটী রজনী ধ'রে কত ভাঙ্গা গড়া
কত স্বপ্ন কল্পনার মাঝে ওঠা-পড়া
কখনো আনন্দে ভরি, কখনো ব্যথায়
উঠে প্রাণ—তবু তার সব মাঝে, হায়
'তুমি নেই' এই কথা ভরিয়া এ বুক
মৌন শান্ত বেদনায় হয় উৎসুক
নির্ম্মল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উচ্ছ্বাসে
আর ত ভরে না প্রাণ—ম্লান ছায়া ভাসে
স্বপনেরও মাঝে; বেদনা পীড়িত হিয়া
স্বপনেই চাহে শুধু তোমারে ফিরিয়া।

আজ অসহায় হিয়া, হে চির-সুন্দর,
পরিশ্রান্ত মন নিয়ে একান্ত বিধুর,
কবে সে আশ্রয় পাবে—কোন্ সুপ্রভাতে,
কোন্ শান্ত দ্বিপ্রহরে, কোন্ অমা রাতে,
নিশীথের স্নেহমুগ্ধ শ্যাম আলিঙ্গনে
আপনারে সঁপে যবে ধরণী গোপনে,
সাক্ষী কেহ থাকেনাক—শুধু স্তব্ধ নিশি
নির্বাক বেষ্টনে রয় ধরণীতে মিশি—
আপনার স্নেহাকুল তিমিরের রাশি
পৃথক অস্তিত্ব সব ফেলে তার গ্রাসি।
অথবা রক্তিম সাঁঝে বিদায়ের ক্ষণে,
তপন চুম্বিয়া যবে ধরার আননে,
ডুবে যায়, প্রাচী-মূলে নামে অন্ধকার—
তখন কি প্রিয়তম আসিবে আবার?
জড়ায়ে লইবে বুকে স্নেহ-বাহুপাশে,
মুক্ত হবে আত্মপ্রাণ অন্তিম নিঃশ্বাসে?
কতদিন কেটে গেছে, কত না নিশীথ,
তোমারি আশায় ওগো, চির-আকাঙ্ক্ষিত!

পথহারা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

দশম পরিচ্ছেদ

[illegible] আড়ম্বরের সহিত বিমলেন্দুর উপনয়ন সমাধা হইয়া গেল। দিদিমার সাধে, এই বিষাদ-ময় পুরে এই উপলক্ষে রসোন চৌকির বাজনা পর্য্যন্ত বাজিতে বাকি ছিল না। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বড় কম হয় নাই। মঙ্গলাদেবীর কয়েকজন অভ্যাগত আত্মীয় এবং আত্মীয়া [illegible] কেহ নয়। সারদা প্রভৃতির উপর ইন্দ্রাণীর সহিত বিবাহ উপলক্ষ করিয়া সেই পর্য্যন্ত মঙ্গলাদেবীর জাতক্রোধ ছিল—তিনি বিশেষ করিয়াই উহাদের এ বাটীতে আসা নিষেধ করিলেন। তাঁহার হুকুমের বিরুদ্ধে কাজ করিবেন—শ্যামদয়াল বা ইন্দ্রাণীর সে শক্তি ছিল না।

ইন্দ্রাণীর পিঠের উপর পড়িয়া বিমল বলিল, "মা, আমায় তোমার সেই বড় গার্ড-চেনটা আর বাবার আঙ্গুলের হীরের আংটীটা তুমি পৈতের যৌতুকে দেবে না কি?"

ইন্দ্রাণী মৃদুস্বরে জবাব দিল "কেন দোব না।" কিন্তু [illegible] তাহার বিবাহের আংটি বাহির করিবার সময়, সেই [illegible] হাতখানি স্মরণে আসিয়া তাহার একটা নিঃশ্বাস পড়িল।

শ্যামদয়াল ইহাদের একমাত্র অভিভাবক। কাজেই, আজ [illegible] বৎসর ধরিয়াই, মঙ্গলাদেবীর নানাবিধ শ্লেষ, বিদ্রূপ ও [illegible] পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াও, তাঁহাকে তাহাদের সকল সুবিধা অসুবিধার, ছোট বড় সব কর্মেরই তদারক করিতে, সকালাই আসা যাওয়া করিতে হয়। আদায় উশুল করিতে নাকাল হইতে হয়। অতিবৃষ্টিতে কলিকাতার একখানা বড় বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িলে, তার চাপে একটা চলন্ত মানুষ খুন হইলে তার ঠেলায় এই বৃদ্ধের প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইলেও, সে সব হাঙ্গামাও তাঁহাকে পোহাইতে হয়। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই একদিন মঙ্গলাদেবী তাঁহাকে ও তাঁহার মেয়েকে শুনাইয়া শুনাইয়া নতুন ঝি নিস্তারের কাছে বলিতেছিলেন, "হাতের সুখে লুটে নিন—তবে সাবালক হলে মামলা করে সুদটি শুদ্ধ বার করবে যখন, তখন না টেরটি পাবেন!"

শুনিয়া নিরভিমান বৃদ্ধ ঈষৎ হাসিয়া ঈশ্বরকে নিবেদন করিয়াছিলেন, যে, যেন তাঁর জামাইয়ের ছেলেটি সাবালক হইতে পায়। তিনি সেই দিনেই তাহাকে কয়েক বৎসরের হিসাব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া যেন নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন। এবং যথাপূর্ব্ব তিনি নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতেই থাকেন। আজ সেই উদ্দেশ্যেই এ বাটীতে পা দিবা মাত্র, কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বিমল হুড়মুড় করিয়া তাঁহার ঘাড়ে পড়িল, "দাদামশাই! দাদামশাই! আমার পৈতেয় আপনি নিজের থেকে আমায় কি দিবেন?"

রামদয়াল সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি নেবে বলো ?"

বিমল যাহা ফরমায়েস করিবে, তাহা সে ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিল ; না করিয়া বলিয়া ফেলিল, "একখানা সাইকেল। কেমন, দেবেন তো ?"

"হুঁ-উঁ।"

তখন বিমল বলিল, "আর স্টেট থেকে ?"

রামদয়াল কথাটা না বুঝিয়াই বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোত্থেকে ?"

বিমল কহিল, "কেন, আমাদের 'স্টেট' থেকে ? সে আপনি কত দিচ্চেন আমায় ?"

রামদয়ালের বিস্ময় বাড়িত হইলেও, তিনি তাহা প্রকাশ না করিয়াই, সহজ ভাবে জবাব দিলেন, "স্টেটের সব খরচই তো দেওয়া হবে ভাই ; মায় তোমার টোপর, চন্দন, টোপর মালা, মল্লমেখলা—সবই।"

বিমল ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "সে তো ভারি খরচ।"

রামদয়াল নাতির বিরক্তিপূর্ণ মুখের উপর কৌতুক দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "তাহলে তুমি কি 'ভারি খরচ' করাতে চাইচো, তাই বলে দাও। নেড়া মাথায় কি একটা নাতবৌ এনে দোবো ?"

বিমল তাঁহার এই রসিকতা আমলে না আনিয়াই ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "তারার বিয়ে কি আপনারা এইটুকু খরচেই সারতে পারবেন ?"

এবার রামদয়ালের সহাস্য দৃষ্টি গম্ভীর হইয়া আসিল। কিন্তু ঠোঁটের হাসি তাঁহার মিলাইল না। শান্ত স্বরে কহিলেন, "তা কি আর হবে রে ভাই ! তোর মতন চোখ নিয়ে তো আর কেউ ওকে বিয়ে করতে আসবে না।"

বিমলের মুখের ললাট হইতে চিবুক, গণ্ড হইতে কর্ণমূল পর্যন্ত ঘোর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তারা সম্বন্ধে এই যে ক্ষুদ্রটুকু বেফাঁস ভাবে তাহার দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহারই লজ্জা তাহার অপরিসীম হইতেও যেন অপরিসীম বোধ হইয়া গেল। মুহূর্তে অগ্নিকুণ্ডের মত জ্বলিয়া উঠিয়া সে, "যাচ্চি কি না দিদার কাছে। কি পাজি হচ্চে এই দিদাটা !" অস্ফোক্তির মত এই কথাটা বলিতে বলিতেই সে ছুটিয়া পলাইল।

রামদয়াল বড় দীর্ঘ করিয়াই নিঃশ্বাসটা ফেলিলেন। মন তাহার এই পথভ্রষ্টের জন্য সত্য-সত্যই আজ আবার একবা বড় বেশী করিয়াই সমবেদনা অনুভব করিল। ব্যথিত চি তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল, "তোমার ভাগ্য আমি করিব কি? আমি তো তোমারই জন্য আমার সর্ব সমর্পণ করিয়াছিলাম। তোমার কপাল মন্দ, তাই লইতে পারিলে না। অথবা লীলাময়ের যেমন ইচ্ছা।"

উৎসবের বাদ্য যখন বড় সোরগোল করিয়া বাজি লাগিল, তখন ইন্দ্রাণীর দুই কর্ণ চাপিয়া ধরিয়া উপুড় হই পড়িবার জন্য অত্যন্ত লোভ হইতে থাকিলেও, সে তা করি না। অঙ্গুলে হীরার আংটি ও গলায় হার পরাইয়া দিয় ছেলেকে নিজের বুক হইতে ক্ষরিত করিয়া প্রাণ দি আশীর্ব্বাদ করিল।

শুভকর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়া গেলে, ক্রমে ক্রমে যে যাহার ঘ চলিয়া গেলেও, এক ব্যক্তি এ বাড়ী ছাড়িয়া যে আর কখন কোথাও যাইবে, তাহার কোনই লক্ষণ দেখাইল না। ে ব্যক্তি মঙ্গলাদেবীর ভাইপো।

ভাইপোটীর চেহারা পিসিমার মত নয়,—দিব্য ফুটফু টুকটুকে কার্ত্তিকটীর মতই তার রূপ। গুণের সম্বন্ধে অ কিছুই বড় একটা জানা নাই,—তাহার পিসিমা তারও ন তবে সে নিজেই তাঁহাকে গোপনে জানাইয়া দিয়াছিল বিষয়-কার্য্যের তদারক করিতে, মামলা মকর্দ্দমার ত করিতে—এ সব বিষয়ে তাহার শক্তি এবং জ্ঞান দুই অনন্যসাধারণ। অতঃপর আর কিছুই বলাবলির প্রয়ো হয় নাই। বাকিটুকু বুঝিবার এবং বুঝিয়া তাহা কা লাগাইবার মত বুদ্ধি দেবী মঙ্গলার ঘটেই যথেষ্ট আছে।

'শুভস্য শীঘ্রম্' এই শাস্ত্র-তত্ত্বকে শিরোধার্য্য করিয়াই, রামদয়ালকে নেপথ্য হইতে, তারাকে সাক্ষ্য রাখিয়া, কহিয়া বলিলেন, "দেখ গা, তুমি বুড় হয়েছ, চার-কাল আর পরের ঝক্কি নিয়ে কত খাটাখাটুনি করবে! চেয়ে আমি বলি কি, এই আদায়-তসিল, হিসেব-পত্তর— আমার এই পুত্রের সম্বন্ধী, বিমুর মামা আমার ভাইপো অমৃতকে ভার দাও। কেমন গা, সেই ভাল না?" ছেলে নাম অমৃত।

রামদয়াল, হাঁ-না, ভালমন্দ কিছুই বলিলেনও না, কিন্ত করিলেনও না। কিন্তু পুনঃ-পুনঃ ঘ্যানঘ্যানানিতে বির না হইলেও, শেষে ইন্দ্রাণী যখন ছলছল চোখে আসিয়া বলি

…মা, ওর হাতেই সব দিয়ে দিলে হয় না?" তখনই …রে আসন টলিল। তথাপি একটু বুঝিতে ছাড়িলেন না, বলিলেন, "কেন মা?" ইন্দু কহিল, "না, এমনি বলছি। তোমার এই শরীর নিয়ে কষ্টের তো অবধি থাকে না। তা' এত দিন না হয় আমাদের কেউ ছিল না, তাই নিরুপায়েই খাটতে হচ্ছিল; এখন যখন একজন করবার লোক পাওয়া গেছে, আর সে যখন নিজে হতে ইচ্ছে করে করে নিচ্ছে, তখন আবার অনর্থক কেন এত দুঃখ পাওয়া।"

রামদয়াল চিন্তিত ভাবে একটু হাসিলেন। মেয়ের মাথায় হাত রাখিয়া কহিলেন, "ইন্দু! বিমলের যাতে ভাল হবে, সেইটেই তোমার দেখা কর্ত্তব্য। কে, কি বলে না বলে সে শোনবার তো তোমার কোন দরকার নেই।"

তার পর আরও গোটাকয়েক মাস এমনি করিয়াই কাটিয়া গেল। বিমলের নেড়া মাথায় আবার চুল গজাইল। সে পূর্ব্বের মতই দুর্দ্দান্তপনা করিয়া, ঘরে উপদ্রব ও বাহিরে অত্যাচার করিয়া, তারার সঙ্গে ক্ষণে-ক্ষণে আড়ি ও পরক্ষণে ভাব করিয়াই চলিতে লাগিল। তারা তাহার হুকুমের অক্ষরেরও শতগুণ বাড়া ভাবে মন যোগাইয়া চলিবে—এই তাহার দাবী। ইহার এতটুকুও যদি ব্যতিক্রম হইবে, তো পৃথিবী রসাতলে যাইতে বাকি থাকিবে না। তাঁহার … মেয়েকে ঘরের কাজকর্ম্ম শিখান আবশ্যক বোধে তাহাকে বিছানা পাতিবার আদেশ করিলেন; এদিকে ঠিক সেই সময়টিই ছিল না কি বিমলেন্দুর চারাগাছে জল দিবার সময়। সে যাই আসিয়া দেখিল, উহার কাযে অবহেলা করিয়া তারা মায়ের কাজ করিতেছে, অমনি ব্রহ্মরন্ধ্র-ভেদী মহাক্রোধে তাহার মাথায় আগুন ধরিয়া গেল। রাগে প্রায় অবরুদ্ধ-বাক্ হইয়াই সে বজ্রধ্বনির অনুকরণে হাঁকিল, "তারা!"

"দাদা!" বলিয়াই তারার অর্দ্ধেক প্রাণ শুকাইয়া গেল। সে ছুটিয়া আসিয়া যোড়হাতে মিনতি করিয়া কহিল, 'যাচ্ছি ভাই, যাচ্ছি ভাই,—এই এক্ষুনি আমি গিয়ে জল দিয়ে আস্‌ছি" —বলিতে-বলিতেই সে দৌড়াইয়া চলিয়া যায়; পিছন হইতে তাহার লম্বা চুলে একটা হেঁচ্‌কা টান মারিয়া, তাহার ব্যথায় ক্লিষ্ট, ভীত মুখখানাকে সামনে করিয়া ও নিদয় কণ্ঠে বিমলেন্দু হুকুম করিল, "খবরদার, তুমি আমার গাছে হাত দিও না, বলে রাখছি!"

তার পর তাহার অলঙ্ঘ্য আদেশের বিরুদ্ধে একটী অঙ্গুলি হেলনেরও সামর্থ্যহীনা, লজ্জা বেদনা বিপন্না বালিকাকে তদবস্থ রাখিয়াই, সে বিছানা টানিয়া মাটিতে ফেলিয়া, তাহার ফরসা চাদর দু'পা দিয়া মাড়াইয়া মাড়াইয়া, বালিসের ওয়াড়গুলা খুলিয়া ছিঁড়িয়া ছড়াইয়া দিয়া, সে নিজের সযত্নে আহৃত ও বহুযত্নে বর্দ্ধিত ফুলের গাছ কয়টিকে টান মারিয়া উপ্‌ড়াইল, এবং সেই শিকড়-ছেঁড়া চারা কয়টা আনিয়া তারার গায়ে ছুঁড়িয়া মারিয়া বলিল, "কেমন, হয়েছে?"

দাদার এতবড় অত্যাচারেও মুখ ফুটিয়া কাঁদিবারও তারার অধিকার নাই। এর উপর যদি তাহার চোখের জল পড়ে, তা' হইলে কি আর রক্ষা থাকিবে না কি? অর্জ্জুনের যেমন প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যুধিষ্ঠিরের রক্তপাতে ভূমি জীবশূন্যা হইবেন—এই ছেলেটিরও বোধ করি সেই রকমই কিছু আছে। একে তো তারাকে শাসন করার পর সমস্ত পৃথিবীটাকেই তাহার যেন নখ দিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে,—এমন কি, বাবা ও মা তাহার হাত হইতে বাদ যায় না। আবার তার উপর ব্যথা পাইয়া সে যদি কাঁদিয়াছে এমন হয়, তা হইলে, 'লণ্ড ভণ্ড হোক বিশ্ব, পুড়ে হোক ছাই ভস্ম' এমনই কিছু একটা হয়ত মনে হয়।

আবার একদিন এমন ঘটিল, ওপাড়ার এক বাড়ীতে দুর্গা পূজার নিমন্ত্রণ ছিল, তারা সেখানে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া ফিরিয়া আসিতে রাত করিল; এবং তাহার বিলম্বে বিরক্ত বিমলেন্দু অভিমান ভরে সেই পূজাবাড়ীতেই যে অনাবশ্যকে গিয়া বসিয়া থাকিয়া, অধিক রাত্রে বাড়ী ফিরিল—সে সব কথা না ভাবিয়াই ক্লান্ত তারা কাপড় ছাড়িয়া বিছানায় ঢুকিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। বিমল বাড়ী ফিরিয়া আশা করিতেছিল, তারা এখনি ছুটিয়া আসিয়া, নিজের বিলম্বের জন্য সমুচিত কৈফিয়ৎ দিয়া, সারা দিনের নব-নব সংবাদে তাহাদের বহুক্ষণের বিচ্ছেদ-নীরবতাকে এখনি সঞ্জীবিত করিয়া দিবে। কিন্তু তেমনটা ঘটিল না। অন্যদিন বিমলের খাবার তারাই আনে। পাঁচ বছর বয়স হইতেই সেই এই কাজটা করিতেছে; যখন ধরিতে পারিত না, তখনও দুহাতে বুকের কাছে ধরিয়া-ধরিয়া সে থালা বহিয়া আনিত। আজ তাহাকে খাবার দিতে আসিলেন ইন্দ্রাণী। দেখিয়াই তাহার চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। মুখ কালো করিয়া সে গুম হইয়া রহিল—খাইতে বসিল না। কারণ বুঝিয়া ইন্দ্রাণী মৃদু মন্দ স্বরে কহিলেন, "তারার

শরীরটা ভাল নেই, সে শুয়ে পড়েছে বিমু। রাত হয়ে গেছে—তুমিই খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।"

বিমল গম্ভীর মুখে জবাব দিল, "তারার শরীর ভাল নেই তো আমি কি এক্ষুনি খাবার ফেলে ডাক্তার ডাকতে ছুটবো না কি, যে আমায় শোনাতে এলে? সংমায়ের মেয়ের জন্য আর মায়ে অত করে না।"

ইন্দ্রাণী নিঃশব্দ পদে সরিয়া গেলেন। একটুক্ষণ মাত্র পূর্ব্বে যে বিমলেন্দু তারার তাহার প্রতি অনবধানতার প্রতিফল স্বরূপে না খাইয়া উঠিয়া যাইবার ইচ্ছা করিতেছিল,—এখন উহাদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য দেখাইবার উদ্দেশ্যেই তাহাকে ভাল করিয়াই খাইতে হইতে লাগিল।

এ ঝগড়া মিটিল কখন বা কেমন করিয়া? সে খবর না রাখিলেও চলে। সূর্য্যের উদয়াস্তের সমতালেই এ ব্যাপার চলিতেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অমৃত বলিল "পিসিমা আমি তাহলে বাড়ী যাই; তুমি ত হারলে, দেখতে পাচ্চি।"

পিসিমা বলিলেন, "দাঁড়া না, এত ব্যস্ত হোস কেন? আমি সব ঠিক করে নিচ্চি কি না। আগে বেমলকে তুই ভাল করে হাত কর দেখ।"

মঙ্গলা বলিলেন "দেখ বৌ, তোমার বাপকে বলে-কয়ে, অমৃতর হাতে মেয়ের সম্পত্তির সব বোঝাপড়া করে দিইয়ে দাও। মিছে বুড়োলোক খেটে খুন হন, সেটাই কি ভাল দেখায়। আর এক কথা—তারি তো বড় হলো,—ওর সঙ্গে তারার বিয়ে দাও দেখি,—তাহলে সকল দিকেই ভাল হয়। সেই খুঁজ করো। ছেলের তো রূপ চোখেই দেখেচো, কুলশীলও কারো না জানা নয়। এক কথা পয়সা;—তা ওরও নেহাৎ ভিক্ষে করবার মতন কিছু দশাও নয়। তা ছাড়া তুমিও দেবে। কেন মন্দ হবে কি?"

ইন্দ্রাণী শুধু মৃদুস্বরে কহিল "তারা এই ন বছরের।"

মঙ্গলা কহিলেন "ওমা; তবে কি আঠারো বছরে বিয়ে দেবে না কি? সে তো বাপু এ বাড়ী থেকে হবে না। তোমার বাপ যেমন তোমায় বাইশ বছর বয়েস পর্য্যন্ত আইবড় রেখে আমার সর্ব্বনাশ টাকাচ্ছিলেন, তেমন আবার কার মাথা খাবে? পূর্ণ থাকলে আমার অমৃতকে সে 'না' করতো না—ওকে সে বড্ড ভালবাসতো যে। ওর রূপটা তো আর সামান্য নয়!"

ইন্দ্রাণী নিরাপত্তিতে চুপ করিয়াই রহিল। বুঝা গেল তাহার মন টলে নাই। সব অমনোনীত কার্য্যই সে যেমন ধীরতা ও দৃঢ়তার সহিতই নিঃশব্দে সম্পন্ন করিয়া যায়, সেই রকমই যে এ এই বিবাহের প্রস্তাবটাকেও করিবে, ইহা মনে করিয়া মঙ্গলার অত্যন্ত রাগ ধরিল। কিন্তু অভ্যাস না থাকিলেও, কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া উঠিয়া গেলেন!

অমৃতকে গিয়া এই যুক্তিটা জানাইতে, সে হাসিয়া ফেলিল। মঙ্গলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসলি যে?" অমৃত উত্তর করিল, "না হেসে কাঁদাই উচিত ছিল বটে! আমার এই সাতাশ বছর বয়সে একটা সাত বছরের খুকি যে গলায় গেঁথে দেবে ঠিক করেচ, তা ওকে মানুষ করে নিতেও তো আমার অন্ততঃ আরও সাতটা বছর বয়েস বেড়ে যাবে। তার পর এর মধ্যে যদি মরে যাই, তা' হলেই তো বিয়ে করা আমার সার্থক হয়ে উঠবে!"

মঙ্গলা বলিলেন, "বালাই, ষাট! মরতে গেলি কিসের দুঃখে। তোর শত্তুর যে, সে মরুক! তা দেখ, ছোট মেয়ে বড় হতে বাকি থাকে না, কিন্তু টাকা থাকে অত ক'জনের? পূর্ণর অর্দ্ধেক বিষয় ওই ডাইনী ছুঁড়ী তাকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় নি? তা সে তো ওর ঐ মেয়েতেই অর্শাবে? তা আমার ভোগে না লাগলেও, তবু যদি তুই পাস, তবু তো আমার প্রাণটা কতকটা সোয়াস্তি হবে।"

অমৃত পুনশ্চ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "অমৃতে অরুচি কার? তবে ওর মা যে মত করবে, সে তুমি মনেও করো না। তা যদি মনে করে থাক, তা' হলে এতদিন একত্রে বাস করে এখনও ওকে তুমি চেন নি।"

মঙ্গলা একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া, চাপা গলায় তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "আমি আবার ওকে চিনি নি! তুই বলিস কি রে পুঁটে? আমি ওকে খুব চিনিছি। ও মেয়ের হাড়ে-হাড়ে বুদ্ধি, পেটে-পেটে বজ্জাতি। ওর নামই 'মিটমিটে ডাইনি' ওকেই বলে ছেলে খাবার রাক্ষস—তা জানিস তুই?"

পিসিমার ব্যথা শুনিয়া অমৃত হাসিতে লাগিল। হাসিতে-হাসিতে কহিল, "ছেলে খাবার মতলব যে ওর বিশেষ কিছু আছে, তা তো বোধ হয় না। তবে ছেলের বিষয়ে যে ওরা আর কারুকে দন্তস্ফুট করতে দেবে, সে তুমি ভেবো না।

... দুটি বাপ-মেয়ে, ওদের হটান বড় সহজ কাজ নয়, এ ... মনে রেখো। ওরা সহজে নাবালকের বিষয় ছাড়বে না।"

মঙ্গলার জিদের বিরুদ্ধে কেহ কথা কহিলেই, তাঁহার জিদ ... যায়। তিনি ভাইপোর ঐ সব নীতিবিদের মত কথাবার্ত্তা, ... ভাব-ভক্তি পছন্দ করিতে পারিলেন না। চটা মেজাজে ... উঠিলেন, "বলিস কি রে পুঁটে? পুরুষ বেটাছেলে ... তোর ঐ একটা টগর-পুঁটে মেয়ের সঙ্গে লড়তে ভয়? ... বল না, এক্ষুনি আমি ওদের খপ্পর থেকে বিষয় উদ্ধার ... পারি কি না পারি, একবার দেখিয়ে দিচ্চি। গালা ... চোটে বলে ছাড়তে তখন পথ পাবে না। তা দেখ, ঐ ... ছুঁড়িকে তোর বে করবার সাধ হয় কি না, এখন ... বল্?"

অমৃত জবাব না দিয়া শুধু একটু হাসিল। শাস্ত্র পড়া না থাকিলেও, মৌনকে সম্মতি-লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে পিসিমাতা ...রাণীর কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।

ইন্দ্রাণী দেখিল, তাহার সুখের উপর স্বস্তিটা এইবার ... ভাগ যোগ হইতে বসিয়াছে। এই যে কন্দর্পকান্তি ... ছেলেটা—সম্পর্কে এ তাহার বড় ভাই হয়। গায়ে পড়িয়া ... আলাপ করিতেও আসে। আবার ভিতরটায় তাহার যেন কি একটা সর্ব্বনাশ-প্রচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর ভাব লুকান আছে। সত্য হোক, মিথ্যা হোক,—এই রকমই একটা সন্দেহে, উঁহাকে দেখিলেই তাহার অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। উঁহাকে দেখিলেই, তাহার আপনা হইতেই, "ফষ্ট" বইখানার নায়ক ...নে-সিদ্ধ 'ফষ্টকে' মনে পড়িয়া যায়। ইহার সান্নিধ্য সে ...ই ত্যাগ করিয়া চলিতে চাহিত। তাহা বুঝিতে পারিয়া ... শুধু একটুখানি হাসিত; কিন্তু তার জন্য সে কখনও ... কোন অনুযোগ করিত না।—অথচ ইন্দ্রাণী দেখিত, ... ধরিবার মত এই লোকটির মধ্যে এমন কিছুই নাই। ... অত্যধিক মাত্রায়ই সে যেন তাহার এই নব-পরিচিতা ...দিদিটির আনুগত্য জানাইতে ব্যগ্র। এ বাড়ীতে এই ... বৎসর ধরিয়া এর মত এক জনও কেহ তাহাকে এতটা ... আপ্যায়ন করে নাই। তথাপি এ মিথ্যা সন্দেহ কেন? ... অন্তরের এ হীনতায় ইন্দ্রাণী নিজের উপরে ঘোর ...ষ্ট হইয়া উঠিতে থাকিলেও, মনের মধ্যের এ সংশয়টুকু ... মনকে যেন ছাড়িতেই চাহিত না। লজ্জিতা ইন্দ্রাণী মনকে বুঝাইতে চাহিত যে, হয় ত এতটা যত্ন পাওয়া অভ্যাস নাই বলিয়াই, ইহা তাহাকে বেসুরা লাগে,—আর কিছুই নয়।

মেঘে আকাশ থমথমে হইয়া আছে। গাছগুলা নিস্তব্ধ, পাখীরা সতর্ক, বলাকার শ্রেণী উদ্ধপথে ঝাঁক বাধিয়া উড়িয়া আসিতেছে। ছাদে বসিয়া বিমল বলিল, "ওই ঝাঁকে সাতটা বক আছে।" তারা গুণিয়া দেখিয়া বলিল, "না, পাচটা।"

বিমল কহিল, "ঈস্, মেয়েরা গুণতে জানেন! পাচটা নয়, সাতটা।"

তারা আবার গণনা করিল; এবং ভয়ে-ভয়ে কহিল, "না দাদা, তুমি ভাল করে গুণে দেখ,—সাতটা নেই, পাচটা।"

বিমল দম্ভ করিয়া বলিয়া উঠিল, "মিথ্যুক! আমি বল্‌চি পাচটা নয়, সাতটা।"

তারার ইন্দীবরফুল্ল দুই চক্ষে দপ্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে সেই সঙ্কুচিতা বালিকা দৃপ্ত ভঙ্গিমায় খাড়া হইয়া উঠিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া কহিল, "আমায় মিথ্যুক বল্লে? আমি কখন মিথ্যা কথা বলি?"

বিমল কহিল, "না বই কি! তবে কি আমিই মিথ্যুক না কি?"

তারা রাগিয়াছিল। সে সহজে রাগে না; কিন্তু রাগিলে মায়ের মত আত্মসম্বরণের শক্তিও তাহার নাই। সে নির্ভীক ভাবেই উত্তর দিল, "তুমি মিথ্যে কথা বলো না? বলো বই কি!"

অবমানিত কোপে বিমলের মুখ কালো হইয়া উঠিল। অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিকে বারেক তারার মুখে স্থাপন করিয়া, ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া সে সেখান হইতে দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল। তারা যে তাহার মুখের উপর এতবড় কথাটা বলিতে পারিবে, এ যেন তাহার ধারণাই ছিল না। যাহারা লোকের উপর অহেতুক প্রভুত্ব চালাইয়া বেড়ায়, নিজেদের স্বার্থ সুযোগ খুঁজিয়া দেখাই যাহাদের অভ্যাস,—অপরেরও যে একটা আত্মমর্য্যাদা-বোধ থাকিতে পারে, সেখানে আঘাত দিলে যে অতি-ভীরুরও দুঃসাহসী হইয়া উঠা সম্ভব, এমন কথাটা প্রায়ই তাহাদের মনে থাকে না। বিমল রাগে অন্ধ হইয়া এই কথাটাকেই মনে করিল যে, আসলে তারা তাহার বিমাতারই মেয়ে তো,—কতই ভাল হইবে, তার পক্ষে তাহার ভালবাসার প্রতিদান কতটুকুই বা সম্ভব?

অভিমান-ভরে সে তারাকে তুচ্ছ করিবার জন্যই জোরে-জোরে পা ফেলিয়া আসিয়া উঁচু গলায় হাঁকিল "দিদা!"

দিদিমা বোধ করি এইমাত্রই অমৃতের সহিত কি একটা পরামর্শ আঁটিতেছিলেন। উহার সাড়া পাইয়া সাগ্রহে ডাকিলেন "কেন রে তুখে?"

বিমল আসিয়া অমৃতকে দেখিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। অমৃত তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল, "এসো বিমল,—এসো, এসো। আমি এই এতক্ষণ পিসিমাকে বলছিলুম যে, তুমি এখন পর্য্যন্ত একবার কলকাতায় যাও নি; একবার তোমায় পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।"

বিমল হৃষ্টচিত্তে আসিয়া বসিয়া পড়িল; সাগ্রহে বলিল, "বেশ তো, তুমি আমায় নিয়ে চলো না।"

"তাই যাবো। তবে তোমার দাদামহাশয়ের অনুমতি-আদেশ-সাপেক্ষ। তিনি যদি দয়া করে মত করেন, তবেই তো হবে। এ তো আর আমার হাত নয় যে, উচিত বোধ করলেই সেই কাজটা করবো!"

বিমল তিক্তস্বরে কহিয়া উঠিল, "আমি কারু অনুমতি চাই নে! কালই তুমি আমায় নিয়ে চলো মামা।" অমৃত জিভ কাটিয়া ত্রস্তে কহিল, "সে কি কথা! ওঁরা হলেন তোমার গার্জ্জেন,—ওঁদের অমতে কোন কাজ কি আমি করতেই পারি বাপু? ওঁর হুকুমটা আগে আনিয়ে নাও,—তার পর আমি তোমায় খুসী হয়ে নিয়ে যাবো। বেটা ছেলে, বড় হচ্চো—জগতের সঙ্গে একটা পরিচয়ে আসা আবশ্যক আছে বই কি। এমন করে যে কূপমণ্ডুক করে রেখেছেন, এতে 'এনার্জ্জী'টা শুধুশুধুই 'ওয়েষ্ট' হচ্চে। কি যে সব ভাবেন।"

বিমল একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়া অমৃত মামার হাত চাপিয়া ধরিল; সাগ্রহে কহিয়া উঠিল, "তুমি আমায় নিয়ে চলো,—আমি কারু কথা শুনবো না,—আমি যাবোই।"

"ব্যস্ত হয়ো না। তা'হলে এক কাজ করো;—তোমার মাকে বলে কিছু টাকা চেয়ে নিয়ে চলো,—কিন্তু আমি যেন বিপদে না পড়ি, দেখো বাপু।"

দিদিমা বলিলেন, "টাকার ছালাতো ওর জন্যে মাঠাকরুণ বার করে বসে রয়েছেন! হতো এ তারির কিছু, তবে না। হায় রে! তবু ওরই বাপের টাকা!"

বিমল ছুটিয়া উঠিয়া গিয়া ইন্দ্রাণীকে বলিল, "আমি কাল কল্‌কাতায় যাবো,—আমায় টাকা দাও।" ইন্দ্রাণী বিস্মিত হইলেন; ছেলেমানুষী আবদার বোধে সান্ত্বনার সহিত বলিতে গেলেন, "যাবে, বেশ তো, যেও। বাবা আসুন, বল্‌বো তোমাকে আর তোমার বোনটীকে একদিন—"

মধ্যপথে গর্জ্জিয়া উঠিয়া বিমল তাহাকে থামাইয়া দিল "তোমার মেয়েকে নিয়ে তোমার বাবার সঙ্গে আমি যাবো, কক্ষনো তা যাবো না। দাও আমার টাকা, আমি কালই যাবো। টাকা কেন তোমরা দেবে না? টাকা তে আমার বাবার।"

ইন্দ্রাণীর বুকের মধ্যে কে যেন তপ্ত লৌহের ছেঁকা দিল। হায়, হায়! এমন করিয়া তাহার স্বামীর সন্তান,—একমাত্র পিণ্ডদাতা বংশধর, তাহারই চক্ষের সামনে নষ্ট হইয়া যাইবে,—আর সে নিরুপায়ের মত নিজের অক্ষমতা লইয়া এ দৃশ্যের দ্রষ্টা হইয়া এখানেই বসিয়া থাকিবে! অথচ এই ছেলের জন্যই না সে এ বাড়ীতে আসিয়াছিল! আজও ইহারই জন্য যে সে বাপের শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান লয় নাই! প্রকাশ্যে ধীর এবং স্থির স্বরে কহিল "বিমল! টাকা সমস্তই তাঁর এবং তাঁর অবিদ্যমানে এখন তোমারই। কিন্তু সে টাকা তো নষ্ট করবার জন্য নয় বাবা! বড় হলে তাঁর মত দেশের উপকারী ভাল কাজে সেই টাকা খাটাবার জন্য তুমি সব হিসেব করে ফিরিয়ে পাবে। এখন ও-সব ভাবনা কেন? কল্‌কাতা তুমি কাল কার সঙ্গে যাবে?"

বিমল চেঁচাইয়া বলিল, "যার সঙ্গে আমার খুসী আমি যাই না, তোমার কি?"

ইন্দ্রাণী কহিল, "যার-তার সঙ্গে আমি তোমায় যেতে দেবো না।"

অমৃত ঘরে ঢুকিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না, না—যার-তার সঙ্গে ও যাবে কেন? আমার কল্‌কাতা যাবার কথা শুনে বিমল যাবার জন্য ধরলে। তা আপনার যদি মত না হয় তো এখন থাক্ না। এর পর এক সময় পিসেমশাইএর সঙ্গে তখন—"

বিমল প্রবল বেগে মাথা নাড়া দিয়া, মাটিতে পা ঠুকিয়া উদ্ধত স্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি নিশ্চয় যাবো,—ছু যাবো না আমি? আমার বুঝি কোন কিচ্ছু হবে ওরা বা' রে!" হবো না।

অমৃত তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া, স্নেহ-সান্ত্বনায় মাখাইয়া কহিতে লাগিল, "আহা, তা তো বটেই। তবে দিদিমণির যখন আমার সঙ্গে পাঠানয় আপত্তি, তখন কাজ কি বাবা! মার অবাধ্য কি হতে আছে? ছিঃ! মার মনে কক্ষণ কষ্ট দিও না।"

প্রবল রোদনোচ্ছাসের সহিত বিমল কহিয়া উঠিল, "ও কি আমার নিজের মা? ও তো তারার মা!" "ছি ছি বিমল, ও কি কথা বল্লে বাবা? না, এ সব আমার পিসিমায়ের কাণ্ড! কচি বাচ্চা একটা—ও কি জানে! বনের পাখীর মতন ওকে যে বুলি শেখাবে, ওরা সেই কপ্‌চাবে বই তো না।"

ইন্দ্রাণীর মনটা যেন একমুহূর্ত্তেই এই সহানুভূতিকারীর উপর গলিয়া পড়িল। নিজের সন্দিগ্ধ অন্তরের সঙ্কীর্ণতায় লজ্জিত হইয়া তাহার প্রায়শ্চিত্তার্থ সে তৎক্ষণাৎ বিমলের কলিকাতা গমনের অনুমতি দিয়া ফেলিল। তারার সহিত মিটমাট হইল না,—চিরনিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল।

(ক্রমশঃ)

মানসিক বিকার

[অধ্যাপক শ্রীরবীন হালদার, এম্‌-এ]

নিষ্পেষণ (Repression)

(আবহমান)

ডাঃ বসুর থিওরি

যে একটি মূল সূত্রের দ্বারা সব চেয়ে অধিক সংখ্যক ঘটনার মানে বোঝা সহজ, তারই সন্ধানে বিজ্ঞানের বাহাদুরি। মনের বিচিত্র ঘটনাবলীর অর্থ ফ্রয়েডের নিষ্পেষণ-তত্ত্বে যেমন ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এমন আর কিছুতে নয়। এই তত্ত্ব দ্বারা শুধু যে মানসিক বিকারের অর্থ স্পষ্ট হইয়াছে তা-ই নয়, প্রকৃতিস্থ মনেরও ক্রিয়াকলাপ আমাদের কাছে পরিষ্কার হইয়া গেছে। সমাজ-তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সাহিত্য ও কলা, ধর্ম্মতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, এবং দর্শনের অনেক তথ্য আমরা এই থিওরি'র দ্বারা বুঝিতে পারি। কিন্তু কোন একটি গ্রন্থেই আমরা নিষ্পেষণের একটা সুশৃঙ্খল বিবৃতি দেখিতে পাই না।

বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে ভারতবর্ষ চিরকালই একটু পিছনে। তবে স্বনামখ্যাত স্যর্ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় এবং যত্নে পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান এখন একটা বিশিষ্ট অধ্যেতব্য রূপে গৃহীত হইয়াছে; এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানায়তনে মানসিক ব্যাপারের নানাবিধ পরীক্ষা ও আলোচনা চলিতেছে। ফলও যথেষ্ট হইয়াছে মনে করিতে হইবে। ইতোমধ্যে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু, ডি এস্ সি, এম্-বি., মহাশয় তাঁর 'Concept of Repression' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা আজ ডাঃ বসু মহাশয়ের 'নিষ্পেষণের থিওরি'র আলোচনা করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোনও একখানি গ্রন্থে নিষ্পেষণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ও ধারাবাহিক আলোচনা দেখিতে পাই না; এবং যে-সব কারণে নিষ্পেষণ ঘটে, তারও সবিশেষ বিশ্লেষণের একান্ত অসম্ভব। ফ্রয়ড্ তাঁর 'Three Contributions to the Theory of Sex'-এ শিশুচিত্তে নিষ্পেষণের প্রসঙ্গে শারীরিক কারণগুলির উপর জোর দিয়াছেন। তাঁর বক্তব্য এই যে, ঐ শারীরিক জৈব কারণগুলির সঙ্গে জুগুপ্সা, লজ্জা, বিরাগ প্রভৃতি মানসিক কারণগুলি দেখা দেয়। যদিও ফ্রয়ড্ এই শারীরিক জৈব কারণগুলির প্রাধান্য স্বীকার করেন, তথাপি কোথাও তিনি তাদের বিশ্লেষণ করেন নাই। আমরা ঐ শারীরিক কারণগুলির ব্যাখ্যা না করিয়া, তাদের আনুষঙ্গিক মানসিক কারণগুলিরই ব্যাখ্যা করিব। সেই মানস-কারণগুলি হয় ত প্রায়শঃ অসংবিদেই অবস্থান করে। অর্থাৎ, কারণগুলিকে আমরা শরীরের দিক্ থেকে না দেখিয়া মনের দিক্ দিয়া দেখিব। নিষ্পেষণের এই শারীরিক ভিতরকার কারণগুলিকে 'নিষ্পেষণের অন্তরঙ্গ' (the inner factors of Repression), এবং পারিপার্শ্বিক (environ-

mental) বহিঃস্থিত কারণগুলিকে 'নিষ্পেষণের বহিরঙ্গ' (the outer factors of repression) বলিব। ফ্রয়ডের মতে অহং-সংস্কার (ego-instincts) হইতেই অন্তরঙ্গের উৎপত্তি, এবং ব্যক্তি ঐ অন্তরঙ্গটাকেই লজ্জা, জুগুপ্সা, বিরাগ প্রভৃতির আকারে চিনিতে পায়। বহিরঙ্গগুলি মানুষের সভ্যতার বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া সামাজিক নানা ব্যাপারে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। মনে করা যাক্, একটি ছেলের homo-sexual tendency রহিয়াছে। এমতাবস্থায় ফ্রয়ডের মতে লজ্জা, জুগুপ্সা ও বিরাগ প্রভৃতি অন্তরঙ্গই তার ঐ homo-sexuality র নিগ্রহ করিবে। আর, সামাজিক সব মানা এবং রাজার আইন ঐ নিগ্রহ ব্যাপারে সাহায্য করিবে। এই-সব সামাজিক মানা এবং বিধি বাহির হইতে চাপানো হয়। এই গুলিকেই বহিরঙ্গ বলা হয়।

ফ্রয়ডের সঙ্গে যাবতীয় প্রতিক্রিয়া অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের মধ্যে ঘটে। বহিরঙ্গটা অন্তরঙ্গের সংস্পর্শ ব্যতীত কোনও কার্যাই করিতে পারে না। কেন না, বাহির হইতে মনের উপরে যতই শিকল পরানো হোক্ না, শুধু বাহির হইতে তাহাকে দমিত করা অসম্ভব। প্যারাডাইস্ লষ্ট্-এর স্যাটান্, বা গ্রীক্ পুরাণের প্রমিথিউস্ এর উপর বাহির হইতে কি কম পীড়ন চাপানো হইয়াছিল ? কিন্তু, কৈ, তাদের সেই প্রবল ইচ্ছার ত কিছুতেই নিগ্রহ হয় নাই। কারণ-কি, বাইরের দ্বারা যে ভিতরের শাসন চলে না, তা' ত আজকের দিনে দেশে-বিদেশে কৃষ্ণধূমের কণ্ঠাটিকাকে ভিন্ন করিয়া রক্ত-লেখায় দীপ্যমান। কাজেই মানসিক বস্তুকে দমাইতে হইলে মানসিক বস্তুই চাই। সুতরাং কেবল বাইরেকার, সমাজের ও সভ্যতার, বিধি নিষেধ ঘটিত কারণগুলিকেই নিষ্পেষণের একমাত্র বা মূল হেতু মনে করিলে ভুল হইবে। কেবল যূথ-সংস্কারের থিওরি'র দ্বারা এ-ব্যাপারের ব্যাখ্যা আর চলিবে না। কারণ, নামাকরণ ব্যাখ্যান্ নহে। ডাঃ বসু যা বলিতে চান তা এই, যে, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির থাপ খাওয়ানোর সমুদয় প্রক্রিয়াটির যে একটি আভ্যন্তরীণ ভিত্তি আছে, যূথ-সংস্কারের থিওরি'র দ্বারা তার একটি অস্পষ্ট আভাসমাত্র দেওয়া হয়,—কোনও পরিষ্কার ধারণা দেওয়া হয় না মোটেই।

এই যূথসংস্কারের ধর্ম্মটা কি ? মনোজগতে এর কিংবিধ প্রকাশ ? এই সব প্রশ্নের অতি অসম্পূর্ণ উত্তরই এ-যাবৎ পাওয়া গেছে। যদি বলি, নিষ্পেষণটা যূথরক্ষামূলক সহজ সংস্কার আর আত্মরক্ষামূলক সহজ সংস্কারেরই সংগ্রামের ফল, তবে ব্যাপারটা সেই ই দাঁড়ায়। এই ব্যাখ্যা বরঞ্চ জীবতত্ত্ব-মূলক ; মনস্তত্ত্বমূলক নহে। এবং নিষ্পেষণ ব্যাপারের মানস-কারণগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা এর-থেকে পাওয়া যায় না।

ফিষ্টার এর (Pfister) 'Psycho-analytic Method'-এ নিষ্পেষণের কারণগুলির সব-চেয়ে বিশদ একটা বিবৃতি পাওয়া যায়। ফিষ্টার বলেন, "যখন্ একটা সহজসংস্কার বাধা প্রাপ্ত হয়, তখনই নিষ্পেষণ ঘটিতে পায়। সহজসংস্কারের কাজটাকে অসম্ভব করিয়া দিয়া, বা প্রথম বাঞ্ছাটাকে দ্বিতীয় একটা বাঞ্ছার দ্বারা প্রতিরুদ্ধ করিয়া, তবে ইহা ঘটিতে পায়।" বহিরঙ্গের মধ্যে ফিষ্টার ধরেন 'বঞ্চনা' (deprivation) ও 'বিরতি' (abstinence)। অন্তরঙ্গসম্পর্কে তিনি নৈতিক কারণের উপর জোর দিয়া থাকেন,—এই নৈতিক কারণকেই আমরা মনোমধ্যে 'বিবেক' রূপে দেখিতে পাই। অ-নৈতিক (non-ethical) কারণের মধ্যে তিনি সুবিধা, এবং অসুবিধা-এড়াইবার-প্রবৃত্তি প্রভৃতি ধরেন। য়ুঙ্ (Jung) ও এই ব্যাপারটার উপরেই জোর দিয়াছেন। অন্তরঙ্গের প্রাধান্যটা আজ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া স্বীকৃত হয় নাই। অবশ্যই এ সত্য, যে, ফিষ্টার বলিয়াছেন, ভিতরকার এই সমস্ত ঠেলাঠেলি না থাকিলে নিষ্পেষণ সম্ভব হইত না। কিন্তু তিনি এর প্রমাণ দেন নাই। ডাঃ বসু বলেন, যদি কোনও একটা বাঞ্ছা বিরুদ্ধ-প্রকৃতির অপর একটা বাঞ্ছার দ্বারা প্রতিরুদ্ধ না হইত, তা হইলে কোনও বহিঃস্থিত সামাজিক প্রয়োজন বা বঞ্চনা বা বিরতি-ই ঐ বাঞ্ছাটাকে অ-চেতন করিতে পারিত না। কেবল মাত্র বাহিরের সব প্রতিবন্ধকের দরুণ কবে আমরা চিরপোষিত কামনাগুলি ভুলিয়া থাকি ? বহিরঙ্গগুলির দ্বারা বাধা প্রাপ্ত ইচ্ছাটা কেবল একটা অপূর্ণ কামনা রূপে কামাসিদ্ধির সুযোগের অপেক্ষায় সংবিদ্-লোকে বসিয়া থাকে। এ-জাতীয় ইচ্ছাকে কখনও অ-সংবিদে নির্বাসিত হইতে দেখা যায় না, ইচ্ছাটার স্মৃতি আমরা হারাই না। যেমন ধরুন, অনেকেরই কুক্কুট-মাংস সম্বন্ধে লুব্ধতা থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু এ-সম্বন্ধে বাহিরের বাধাও প্রচুর। অথচ সে-কারণে যে তাঁরা ইচ্ছাটাকে নেহাৎ-ই পাসরিয়া যান্, তার কোনও লক্ষণ বড় দেখা যায় না।

এখন আমরা নিষ্পেষণের অন্তরঙ্গের কথা বলিব; কারণ, তা'ই নিষ্পেষণের আসল কারণ। বিভিন্ন মনোবিশ্লেষকগণ অন্তরঙ্গগুলিকে বিভিন্ন রূপে বিবৃত করিয়াছেন—যথা, নীতিবোধ, বিবেক, যূথ-সংস্কার, অহং-সংস্কার—বা লজ্জা, জুগুপ্সা, এবং বিরাগের আকারে দেখা দেয়। কিন্তু এই সংস্কারগুলির বিকাশ কেহই পরিষ্কার করিয়া দেখান নাই। এই সহজিয়া ধর্মগুলি (instinctive tendencies) সাধারণতঃ মনোজগতের পরস্পর-বিরোধী সব ইচ্ছা বলিয়া অভিহিত হয়। এই পরস্পর-বিরুদ্ধতার প্রকৃতিটা এখনো রহস্যাবৃত। homo-sexualityর দৃষ্টান্তই লই। কতিপয় মনস্তত্ত্ববিদের মতে লজ্জা, জুগুপ্সা ইত্যাদিই সেই প্রবল সঙ্গলিপ্সাকে নিষ্পেষিত করে। আর কতিপয় পণ্ডিত আছেন—তাঁরা বলিতে চান উচ্চতর heterosexual লক্ষ্য সমুদয় আসিয়া ও-ব্যাপারটার উপর বারণ স্থাপন করে। প্রায় সকল সময়েই অপরাদ্ধ ভাব-গ্রন্থিটিকে অর্থাৎ নিষ্পেষিত বাঞ্ছাটিকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবামাত্রই মনের বিকৃতিটা সারিয়া যায়। কাজেই নিষ্পেষণের গোড়াকার কারণের সন্ধানটা কেবল বিজ্ঞাবত্তার পরিচায়ক ছাড়া আর কিছু নয়। ডাঃ বসু একটা 'কেস্'-এ দেখেন, যে, সমস্ত প্রোথিত ভাবগ্রন্থিগুলির উদ্‌ঘাটন সত্ত্বেও বিকার সারিল না। সমস্তটা প্রতিরোধ (resistance) পরাভূত হয় নাই। প্রতিরোধগুলি কি থেকে কি ভাবে হইতেছে, খুঁজিতে গিয়া, ডাঃ বসু নিষ্পেষণটার গোড়াকার কারণগুলি আঁচিলেন।

বাস্তবিক কি ঘটে, তা ছাড়িয়া, কেবলমাত্র থিওরি'র দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, পরস্পর-বিরুদ্ধতার বিভিন্ন প্রকার আমরা কল্পনা করিতে পারি। যথা, ধরা যাক্, 'ক খ-কে মারিতে চায়'। এখন নিম্নের প্রতিজ্ঞাগুলির যে-কোনওটা এ'র উল্টা :—

(১) ক খ-কে মারিতে চায় না

(২) ক খ-কে ভালবাসিতে চায়

(৩) ক গ-কে মারিতে চায় (খ-কে নয়)

(৪) ক খ-র দ্বারা মারিত হইতে চায়।

কর্ত্তা ক-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধ যতগুলি ইচ্ছা হইতে পারে, তা ঐ।

এখন, মনস্তত্ত্বের দিক্ থেকে এদের প্রত্যেকটাকে আলাদা-আলাদা পরীক্ষা করা যাক্। 'ক খ-কে মারিতে চায় না', এই যে প্রথম উল্টা ইচ্ছাটা, এর মধ্যে খ-কে মারিবার ইচ্ছাটা অভাবাত্মকরূপে নিহিত আছে। অর্থাৎ যদি বলা যায় 'ক খ-কে মারিতে চায় না', তবে এ কথা স্বীকার করিয়া লইতে হয়, যে, ক'র খ-কে মারিবার ইচ্ছা আছে, এবং সেই ইচ্ছার বর্ত্তমানে অভাব। কি শক্তিতে এ অভাববাচী মনোভাবটা জন্মায়, (১) চিহ্নিত প্রতিজ্ঞা থেকে তার কিছু জানিতে পারি না। বস্তুগত্যা (২), (৩) এবং (৪)-এর কল্পনাগুলি (১)-এর অন্তর্গতই হয়। যদি আমরা বলি, যে, 'ক খ-কে মারিতে চায় না' এই ইচ্ছাটা 'ক খ-কে মারিতে চায়' এই ইচ্ছাটার প্রতিরোধ করে, তবে ব্যাপারটার কোনও বিশ্লেষণই হয় না এবং সমস্যারও পূরণ হয় না। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটি ('ক খ-কে ভালবাসিতে চায়') পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই, ভালবাসার ইচ্ছা ও মারিবার ইচ্ছা এক সঙ্গে বর্ত্তমান থাকিতে পারে; সুতরাং প্রতিরোধের কোনও লক্ষণ সেখানে নাই। যেমন, ধরুন, রাম একটা স্ত্রীলোককে ভালবাসে, আবার তাকে মারিতেও চায়। বরঞ্চ না মারিলে তার ভালবাসা থাকে না। 'চণ্ডা' (sadist) জাতীয় ব্যক্তিরা প্রিয়জনকে না মারিলে আনন্দ পায় না। যদি বলা যায়, যে, 'ভালবাসা' আর 'মারা' দুটি বিরুদ্ধ কার্য্য, তবে তাদের বিরুদ্ধতার স্বভাব বা ধর্ম্মের সবিশেষ নির্দ্দেশ দরকার। কিন্তু এ পর্য্যন্ত মনোবিশ্লেষণ দ্বারা এর কোনও মীমাংসা হয় নাই। ডাঃ বসু কাজেই এই বিরুদ্ধতার স্বভাব নিরূপণ করিয়াছেন।

তৃতীয় ইচ্ছাটায় ('ক গ-কে মারিতে চায়') আমরা আদিম ইচ্ছার ('ক খ-কে মারিতে চায়') কোনও বিরুদ্ধ ভাব দেখিতে পাই না। দুটিই এক সঙ্গে বর্ত্তমান থাকিতে পারে। সুতরাং এতাদৃশী উল্টা ইচ্ছা নিষ্পেষণের কারণ হইতে পারে না। এ ক্ষেত্রে একটা রফা সম্ভবপর; আর রফা না হইলেও গ-কে মারায় একটা তৃপ্তি পাওয়া যাইবে, যদিচ গ ব্যক্তিটি খ হইতে স্বতন্ত্র।

শেষ ইচ্ছাটিই ('ক খ-র দ্বারা মারিত হইতে চায়') আসল বিরুদ্ধ ইচ্ছা। এ-ক্ষেত্রে বিরুদ্ধতা সর্ব্বত্রই দেখা যায়। ডাঃ বসু বলেন, যখন নিষ্পেষণ সংঘটিত হয়, তখন এ জাতীয় একটি ইচ্ছা নিষ্পেষণের কারণ হইয়া থাকে।—অন্য কিছুই নিষ্পেষণ ঘটাইতে পারে না। তাঁর মতে প্রাকৃসূচিত

homo-sexuality ক্রিয়ার ইচ্ছা কৃত হইবার ইচ্ছাকে নিষ্পেষিত করে; আবার কৃত হইবার ইচ্ছা ক্রিয়ার ইচ্ছাকে নিষ্পেষিত করিয়া থাকে।

মোট কথা, আসল উল্টা ইচ্ছাই নিষ্পেষণের হেতু। অপর সকল ব্যাপারগুলি সেই উল্টা ইচ্ছার আনুষঙ্গিক মাত্র। লজ্জা, জুগুপ্সা ইত্যাদি এই উল্টা ইচ্ছা থেকেই উৎপন্ন হয়। যদি heterosexual wish-কে নিষ্পেষণের কারণ বলিয়া ধরা হয়, তা হইলেও অসংবিদের বিরুদ্ধ ইচ্ছা থেকেই আদৎ প্রতিরোধ আসে।

আমাদের উদাহরণে যে জায়গায় 'ক খ-কে ভালবাসে' এই ইচ্ছাটা 'ক খ কে মারিতে চায়' ইচ্ছাটাকে দমিত করে, সেখানেও আসলে পূর্ব্বের ইচ্ছাটা, 'ক খ-র দ্বারা মারিত হইতে চায়' এই ইচ্ছা হইতেই শক্তি সঞ্চয় করে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক ইচ্ছা দুটি :—মারা এবং মারিত হওয়া। যখন নীতি এবং সমাজ বলে 'খ-কে মারিয়ো না', তখনও অসংবিদে স্থিত 'খ-র দ্বারা মারিতে হওয়া'র ইচ্ছা থেকেই আসল শক্তি আসে। বিশ্লেষণের দ্বারা জানা যায় প্রেমের ক্ষেত্রেও এ দুটি ইচ্ছাই সক্রিয় কাজ করে। সাধারণতঃ আমরা মনে করি, এই সময়ে রামকে ভালবাসা এবং রামের দ্বারা ভালবাসিত হওয়া খুবই সম্ভবপর, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, রামকে ভালবাসা এবং রামের দ্বারা ভালবাসিত হওয়া, দুটি আসলে দুরকমের।—দুটি একরকমের হইলেই নিষ্পেষণ সুরু হয়।

মনোবিশ্লেষণের দ্বারা জানা যায়, যে, অসংবিদে স্থিত সব নিষ্পেষিত ইচ্ছাগুলিই যৌন। এ ব্যাপারটার নানাবিধ ব্যাখ্যাও আছে। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, যে, আধুনিক সভ্যতায় এই যৌন ইচ্ছাগুলিরই সবচেয়ে বেশী নিগ্রহ হয়। সভ্যতার আসরে সৃষ্টির এই রহস্য লইয়া আলোচনাও অসভ্যতা। এমতাবস্থায় দমিত ইচ্ছাগুলি যে যৌন ইচ্ছা হইবে, তার আর সন্দেহ কি? তা ছাড়া এও বলিয়াছি, যে, জৈব জীবনে এ ইচ্ছাটাই সর্ব্বপ্রধান। যদি তাই হয়, তবে কথা উঠিতে পারে, যে, বর্ত্তমান অভাবের দিনে গরিব লোকেরা অনেক ভাল-ভাল খাদ্যও ত খাইতে পায় না। তাদের ঐ-সব খাদ্য খাওয়ার ইচ্ছা নিষ্পেষিত হইয়া অসংবিদে অবস্থান করে না কেন? কোন একটি খাদ্য খাওয়ার ইচ্ছা তখনই অসংবিদে বাস করে, যখন সেই খাদ্যটি কোন একটি যৌন ব্যাপারের বিগ্রহ। যেমন, ধরুন, একজনের মনোবিশ্লেষণ করিয়া পাওয়া গেল—মর্ত্তমান কলা খাওয়ার প্রবল অভিলাষ। লোকটির প্রচুর অর্থ আছে,—সে অনায়াসে মর্ত্তমান কলা কিনিয়া খাইতে পারে, অথচ অজ্ঞাত মনের গুপ্ত কোঠায় তার এ ইচ্ছাটি দমিত কেন? এ ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে, যাকে আমরা মর্ত্তমান কলা ভাবিতেছি, তা আর কিছুই নয়,—একটি যৌন ব্যাপারের বিগ্রহ। পূর্ব্ব বর্ণিত ব্যাখ্যা দ্বারা এ ব্যাপারের কোন মীমাংসা হয় না। কিন্তু ডাঃ বসুর 'বিরুদ্ধ ইচ্ছা' থিওরি'র দ্বারা এ ব্যাপারের মীমাংসা সহজেই হয়। যৌন ব্যাপারে আমরা 'রামকে ভালবাসা' ও 'রামের দ্বারা ভালবাসিত হওয়া' অথবা সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় homosexualty-র মতন বিরুদ্ধ ইচ্ছার দর্শন পাই। পরন্তু খাদ্য ব্যাপারে তাদৃশ বিরুদ্ধ ইচ্ছার একান্ত অসদ্ভাব। 'আমি ভাত খাইতে চাই' এই ইচ্ছার আদৎ উল্টা ইচ্ছা হইবে 'আমি ভাতের দ্বারা খাদিত হইতে চাই;' কিন্তু আমাদের মনে সেরূপ ইচ্ছার উদয় সম্ভবপর নয়। সুতরাং খাদ্যের ক্ষেত্রে, আসল নিষ্পেষণ বলিতে যা বুঝায়, তা নাই।

যৌন ব্যাপারে পূর্ব্বোক্ত বিরুদ্ধ ইচ্ছা 'দিদৃক্ষা' ও 'দিদর্শয়িষা' (peeping mania & exhibitionism) সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় (active & passive) homo-sexuality, চণ্ডামি ও 'দাস্যামি' (Sadism & masochism) ইত্যাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব ইচ্ছা যোড়ায়-যোড়ায় থাকে এবং একই ব্যক্তির মধ্যে দুটি বিরুদ্ধ ইচ্ছাই দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল সকল মনস্তত্ত্ববিদেরই এ ধারণা, যে, চণ্ডামি, দাস্যামি, দিদৃক্ষা, দিদর্শয়িষা ইত্যাদির শুধু একটি স্বতন্ত্র ভাবে থাকিতে পারে না। একটির সঙ্গে তার বিপরীত ইচ্ছাটির সংযোগ থাকিবেই থাকিবে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে শুধু একটির প্রাধান্য অসম্ভব নয়। যেমন, আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে 'দিদৃক্ষা' (peeping tendency) প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; আর ইয়োরোপীয় মহিলাদের মধ্যে 'দিদর্শয়িষা' (exhibitionism) প্রবল। এক দেশের মেয়েরা অপরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দেখিতে ভালবাসে, আর অপর-এক দেশের মেয়েরা অপরকে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দেখাইতে ভালবাসে। যৌন ব্যাপার সম্পর্কে আমরা এ বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করিব।

তবে এ কথাটা এখানে বলা দরকার, যে, পূর্ব্বোক্ত

ইচ্ছাগুলির মধ্যে এক দিকে মনের সক্রিয় অবস্থা, অপর দিকে মনের নিষ্ক্রিয় অবস্থা দেখা যায় ;—এক দিকে পরকে বশীভূত করিবার বাসনা, অপর দিকে পরের দ্বারা বশীভূত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। ডাঃ বসু এই সক্রিয় অবস্থাকে X ইচ্ছা, আর নিষ্ক্রিয় অবস্থাকে Y ইচ্ছা নাম দিয়াছেন। তিনি বলেন, আমাদের জীবনের যাবতীয় কার্যাকলাপকে এ দুটি নামের অধীনে আনা যায়। জীব-বিজ্ঞানবিদেরা দুইটি সহজ-সংস্কারের দিক্ থেকে আমাদের কার্যাকলাপ বিচার করেন ; সে দুটি (১) আত্মরক্ষা সহজ-সংস্কার, আর (২) যূথরক্ষা সহজ-সংস্কার। ডাঃ বসু বলেন, যদি আমরা 'সহজ-সংস্কার' (instinct) কথাটা বাদ দিয়া কেবল মাত্র 'প্রতিক্রিয়া' (reactions) বলিয়া আমাদের কার্যাদির বর্ণনা করি, তবে ব্যাপারটা বুঝিবার পক্ষে আরো বেশী সুবিধা হয়। প্রাক্-সূচিত X জাতীয় প্রতিক্রিয়ার লক্ষণই হচ্ছে ব্যক্তি কর্তৃক পারিপার্শ্বিকের ওলট্‌পালট্ ; আর Y জাতীয় প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ পারিপার্শ্বিক-কর্তৃক ব্যক্তির ওলট্‌পালট্। প্রতিক্রিয়াগুলিতে কদাচিৎ এই দুইটি ভাব স্বতন্ত্র ভাবে দেখা দেয়। প্রায়শঃ আমরা প্রতিক্রিয়াগুলিতে X এবং Y এই দুই মনোভাবেরই প্রকাশ দেখিতে পাই। অধিকার করিবার ইচ্ছা (acquisition impulses), চণ্ডামি (sadism), পরের উপর প্রভুত্ব করিবার বাঞ্ছা ইত্যাদি সকলই X জাতীয়। দাস্যামি (masochism), পরের সেবা করিবার ইচ্ছা, নিজকে বিলিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা ইত্যাদি Y জাতীয়।

এটা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আমাদের স্বভাব এ দুটি পরস্পর-বিরুদ্ধ জিনিস দ্বারা গঠিত হয়। আবার প্রতিক্রিয়ার যাবতীয় বৈচিত্র্য ও মনোযন্ত্রের জটিলতা এই বিরুদ্ধতার নিকটই ঋণী। বহির্জগতের বহু দুঃখপূর্ণ ঘটনা আসলে এই অন্তর্দ্বন্দ্বেরই 'প্রক্ষেপণ' (projection)। পরে এই 'প্রক্ষেপণ' সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আশা রাখি।

নিয়তির (determinisim) দিক্ দিয়া দেখিলে দেখা যায়, আমরা আসলে ঘটনাবলীর সৃষ্টি করি না ; বরঞ্চ তাদের নিকট আত্ম-সমর্পণ করি। যদি ঘটনাটা এমন হয়, যে, একই সময়ে একই ব্যক্তির X এবং Y মনোভাব জাগিয়া ওঠা সম্ভবপর, তবে ব্যক্তিটি কোন কাজই করিতে পারে না। আর এই সময়েই নিষ্পেষণ সুরু হয়। যে ভাবটি অপেক্ষাকৃত বলবান্ সে সংবিদ্‌লোকে প্রবেশ করে, আর দুর্ব্বল ভাবটি নিষ্পেষণের ঠেলায় অসংবিদে পলাইয়া থাকে।

এখন ধরুন, একটি X। ইচ্ছা আর একটি Y। ইচ্ছার প্রতিরোধ করিল।

যদি X। এবং Y। ইচ্ছা দুটি সমান জোরের হয়, তবে একটি আর একটিকে বাতিল করিয়া দিবে এবং কার্য্যও সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ থাকিবে। যেমন, একটি দড়ির দুই প্রান্তে সমান জোরে টানিলে দড়িটি নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে, মনের অবস্থাও অনেকটা তদ্রূপ হইবে। বাতিল অর্থে ডাঃ বসু এ কথা বলেন না, যে, সে ইচ্ছাটা নষ্ট হইয়া যায়।—তিনি বলেন, পরিতৃপ্তি ছাড়া কোনও ইচ্ছারই বিনাশ হয় না। যদি মনে করা যায় X। ইচ্ছাটি বলবত্তর, তবে তা Y। ইচ্ছাটিকে অসংবিদে নিষ্পেষিত করিয়া গোপন রাখিবে, এবং প্রয়োজন মত সেই গুপ্ত ইচ্ছা তার কাজ করিয়া যাইবে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যে, এই গুপ্ত Y। ইচ্ছাটির পরিণাম কি হইবে ? ইচ্ছাটি নিষ্পেষিত ভাবে থাকিতে পারে, অথবা সমান্তরাল ভাবে এমন করিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারে, যে, X। ইচ্ছা আর তার প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। এক্ষেত্রে ইচ্ছাটির এক প্রকার পরিতৃপ্তি সম্ভবপর।

এই রকম সমান্তরাল ভাবে স্থান পরিবর্ত্তন মনে করিতে হইলে, আর একটা শক্তির কল্পনা করা দরকার—যে শক্তিটা এবম্বিধ স্থান-চ্যুতি ঘটাইতে পারে। ব্যাপারটা এ রকম হইলেই চিদ্-ভেদের (dissociation) সূচনা হয়। ব্যক্তিটি পরস্পর-বিরুদ্ধ কার্য্য করে, অথচ বিরুদ্ধতা তাঁর নজরেই পড়ে না। যেমন আমি একটি ভদ্রলোক দেখিয়াছি, যিনি চাল-চলনে পুরাদস্তুর সাহেব হইয়াও, মনে এই বিশ্বাস পোষণ করিতেন, যে, তাঁর পেটে বাচ্চা হইয়াছে। তিনি বেশ লেখা-পড়া জানেন এবং সব জায়গায়ই ভালমানুসটি, কেবল এক জায়গায় তাঁর বিষম মনোবিকার,—তাঁর মন কিছুতেই বুঝিতে পারে না, যে, তাঁর পেটে বাচ্চা হওয়া অসম্ভব। তিনি যে বুঝিতে পারেন না, তার কারণ এই, যে, পেটে বাচ্চা হওয়ার ধারণাটা মনের এমন একটা কোঠায় পুরিয়া রাখা হইয়াছে, যেখানটায় 'লজিক্' জিনিসটা কিছুতেই ঢুকিতে পারে না। এ কোঠাকে আমরা পূর্ব্বে 'লজিক্-টাইট' কোঠা বলিয়াছি। বস্তুগত্যা ডাঃ বসু এবম্বিধ সমান্তরাল স্থান-চ্যুতির কল্পনা করার কোনও প্রয়োজন দেখেন না ;

কারণ-কি, ছটি বিরুদ্ধ ইচ্ছার একসঙ্গে জ্ঞাতসারে পরিতৃপ্তি একেবারে অসম্ভব। চিদ্-ভেদে ওইটি উল্টা ইচ্ছার এক-একটি এক-একবার নিষ্পেষিত হয়। এটা অনায়াসে কল্পনা করা যায়, যে, Y_1 ইচ্ছাটা ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করিয়া একদিন X_1 ইচ্ছাটাকে পরাভূত করিয়া অসংবিদে ঠাসিয়া দিবে। মনোবিকারে সময়ে-সময়ে যে ভীষণ আবেগের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায় তার কারণ বোধ হয় এখানে।

আবার আমরা এটাও কল্পনা করিতে পারি, যে, Y_1 ইচ্ছা Y_2 নামক সেই জাতীয় আর একটি ইচ্ছাকে মিত্ররূপে পাইতে পারে। এরূপে হইলে Y_1 আর Y_2 ইচ্ছার মধ্যে এমন একটা রফা হইতে পারে, যাতে বিরুদ্ধ X_1 ইচ্ছাটাকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভবপর।

যদি এরূপ কল্পনা করা যায় যে Y_1 ইচ্ছাটির পরিতৃপ্তির পথে X_1 ছাড়া E নামক আর একটি বাহ্যিক বাধা থাকে, তবে Y_1এর পক্ষে Y_2এর সঙ্গে মিলিত হওয়া ছাড়া পরিতৃপ্তির অন্য কোনও উপায় নাই।

এ পর্য্যন্ত সকলেই এ কথা বলিয়াছেন, যে, 'বিগ্রহ' অথবা 'আপোষ নিষ্পত্তি'র জন্য শুধু নিষ্পেষিত এবং নিষ্পেষক ইচ্ছার প্রয়োজন। কিন্তু ডাঃ বসু বলেন, যে, এ ছুটি ছাড়াও নিষ্পেষিত ইচ্ছাটির সমজাতীয় আর একটি ইচ্ছার প্রয়োজন, যে এই আপোষ-নিষ্পত্তিতে সহায়তা করিবে।

নিষ্পেষিত ইচ্ছাটি কেন অজ্ঞাত থাকে, এ বিষয়ের আলোচনা করিতে যাইয়া ডাঃ বসু বলেন, যে, খুব সম্ভব নিষ্পেষণ একটি ইচ্ছাকে 'অচেতন' রাখিতে অত্যন্ত আদিম মনোযন্ত্রের সাহায্য লয়। কাহারো মতে চৈতন্যের উৎপত্তির কারণ কর্ম্মের প্রতিরোধ। জীববিজ্ঞানের তরফ থেকে দেখিলে দেখা যায়, যে, ব্যক্তি এক-একটি উত্তেজনা পাইলে এক-এক রকম প্রতিক্রিয়া করিয়া থাকে। যখন প্রতিক্রিয়া বাধা পায় না তখন চৈতন্যও উৎপন্ন হয় না। 'প্রত্যাবর্ত্তিত' (reflex), 'স্বতশ্চালিত' (automatic) ও 'অভ্যাস সিদ্ধ (habitual) ক্রিয়াগুলিতে আমরা এ-জাতীয় চৈতন্য-হীনতার পরিচয় পাই। ডাঃ বসুর মতে কর্ম্মের অভাব হইলে চৈতন্যেরও অভাব হয়। —কর্ম্ম চলিবার পথে বাধা পাইলেই তবে চৈতন্যের প্রকাশ। তিনি পরীক্ষা দ্বারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে, একটি 'অনুভূতি'র (Sensation) 'অর্থ'কে বাদ দিলে অনুভূতিটি অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। আমাদের নিছক অনুভূতির জ্ঞান হয় না; পরন্তু 'প্রতীতি'র (Perception) জ্ঞান আমাদের পক্ষে সকল সময়েই সম্ভব। প্রতীতি আর কিছুই নয়, অনুভূতি—অর্থ। এই অর্থই চৈতন্যকে ডাকিয়া আনে।

ডাঃ বসু এ-থেকে আন্দাজ করেন, যে, ক্লোরোফর্ম্ম-জনিত অচৈতন্যের কারণ বোধ হয় প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা-লুপ্ত হওয়া। এখান থেকে এ সিদ্ধান্তে অনায়াসেই আসা যায়, যে, ক্রিয়ার নিরোধ করিলে চৈতন্যেরও লোপ হয়। 'উপযোজন' (adaptation) প্রক্রিয়ায় আমরা যে চেতনার অভাব দেখিতে পাই, তা প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজনের অভাব থেকেই উৎপন্ন হয়। ডাঃ বসুর মতে ক্রিয়ার নিরোধই নিষ্পেষণের আনুষঙ্গিক অচৈতন্যের হেতু।

আজ আমরা ডাঃ বসুর থিওরি'র একটা আভাস দিলাম মাত্র। তিনি মনোজগতের যে রহস্যময় কোঠার দরওয়াজা আমাদের নিকট খুলিয়া ধরিয়াছেন, ভবিষ্যতে তার খবর যতটা পারি, বাঙলার সাহিত্যের দরবারে পেশ্ করিব। মোট কথা, শুধু এই মৌলিক থিওরি'র জন্যই তিনি অমর হইয়া থাকিবেন।

মেঘনাদ

[শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল]

(২০)

পরের দিন সকালবেলায় মেঘনাদ মনোরমার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। মনোরমা তাহার কাছে আসিয়াই কাঁদিতে লাগিল। সে কোনও কথা বলিতে পারিল না ; কেবলই মেঝেয় বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মেঘনাদ কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "তুমি কেঁদ না।"

মনোরমা কেবলি কাঁদিতে লাগিল,—আঁচলের ভিতর মুখ গুঁজিয়া বসিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। মেঘনাদ বড় বিরত হইয়া পড়িল। অতি অল্প সময়ের জন্য সে মনোরমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইয়াছে ;—সে সময় এমনি করিয়া নষ্ট হইলে, কাজের কথা কখন হইবে? কাজেই সে মনোরমার মুখ তুলিয়া চক্ষু মুছাইয়া বলিল, "কেঁদ না, ছি! এখনও হাইকোর্ট আপীল র'য়েছে—তোমার ভাবনা কিসের?"

মনোরমা মুখ তুলিয়া মেঘনাদের মুখের দিকে চাহিল। মেঘনাদ দেখিল, গভীর কাতরতায়-ভরা সুন্দর মুখশ্রী—এ হত্যাকারী, এও কি সম্ভব? মেঘনাদের মনের ভিতরটা টলমল করিয়া উঠিল।

মনোরমাকে সে অনেক করিয়া বুঝাইল যে, এখন হাইকোর্টে আপীল করিতে হইবে। উকীল বলিয়াছেন যে, তার আপীলে খুব জোর আছে। হাইকোর্টে ভাল উকীল দিয়া মোকর্দ্দমা করাইলে, সে নিশ্চয় মুক্তি পাইবে। এখন তাহার কেবল জেলার বাবুর সামনে গিয়া, দুইখানা কাগজ সই করিয়া দিতে হইবে। মেঘনাদ তাহার উকীলকে দিয়া সব লিখাইয়া আনিয়াছে।

"আমি ম'লেই ভাল হয়। জজ বেটা আমার ফাঁসীর হুকুম দিলে না কেন? তোমার এ দুর্গতি আমার আর সহ্য হয় না।"

মেঘনাদ হাসিয়া বলিল, "এ আর দুর্গতি কি? আমার ত তারি তো কাজ ক'রতে হ'বে।"

"হ'বে বই কি? তা'ছাড়া, পয়সা খরচ ক'রতে হবে। আমার জন্য তুমি পয়সা খরচ ক'রতে যাবে কেন? আমি তোমার কে?"

মেঘনাদ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত ছিল না। সে পাশ কাটাইবার জন্য হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, সে সব কথা পরে হ'বে এখন। এখন চল, তুমি এটা সই ক'রবে।" বলিয়া সে উঠিল। দ্বারের সামনে ওয়াডারটা এই সময়ে তাহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

মনোরমাও উঠিল ; কিন্তু অগ্রসর হইল না। সে বলিল, "এই বোধ হয় তোমায়-আমায় জন্মের শোধ দেখা।"

মেঘনাদ বলিল, "পাগল! তা' হ'তে যাবে কেন? তোমাকে আমি খালাস ক'রে আনব।"

মনোরমা আবেগের সহিত মেঘনাদের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "না, আর দেখা হবে না—জন্মের শোধ একবার"—আর কিছু বলিল না,—কেবল তৃষিত নয়নে মেঘনাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তার পর মেঘনাদের মনের ভিতর একেবারে তালগোল পাকাইয়া গেল। সে কি ভাবিল, কি করিল—তাহা সে বুঝিল না ; একটা অন্ধ নেশায় বিভোর হইয়া, সে মনোরমাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া চুম্বন করিল ; মনোরমাও তাহাকে চুম্বন করিল। মেঘনাদের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত যেন একটা তড়িৎপ্রবাহ বহিয়া গিয়া, পরমুহূর্ত্তে তাহার শরীর মনকে একেবারে অপ্রসন্ন করিয়া ফেলিল।

যখন তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল, তখন লজ্জায় ঘৃণায় তাহার মনটা ছাইয়া গেল,—তার বুকের ভিতর কি যেন বসিয়া তার হৃৎপিণ্ডটা খুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল।

জেলারের সামনে ওকালতনামা ও আপীলের দরখাস্ত সই করাইয়া, মেঘনাদ তাহা যথাস্থানে পাঠাইয়া জগদীশ বাবুর বাড়ী গেল।

জগদীশবাবু মক্কেল-পরিবৃত হইয়া বসিয়া ছিলেন ;—মেঘনাদকে দেখিয়া, ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়া, তাহাকে পাশের

ঘরে লইয়া গেলেন। মেঘনাদকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, ব্যাপার কি? আজ সতীশবাবু তো এখানে এসে, একরাশ মক্কেলের সামনে তোমার নামে যা নয় তাই কুৎসা ক'রে গেলেন! তাঁর স্ত্রী কোথায়? কি হয়েছে?"

মেঘনাদ অবাক্ হইল। সতীশ যে, তার স্ত্রীকে লইয়া মেঘনাদের নামে এত রকম করিয়া কুৎসা রটনা করিবেন, সে কথা সে কল্পনাও করে নাই। সে জগদীশকে সমস্ত অবস্থা পরিষ্কার করিয়া বলিল।

জগদীশ বলিলেন, "যাই হোক, কথাটা ভাল নয়। এ নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি হওয়াটা বড় দোষের হ'বে। তুমি বুঝিয়ে-পড়িয়ে সতীশের স্ত্রীকে ওঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দেও। তা না হ'লে কেলেঙ্কারী যে কতদূর গড়াবে বলা যায় না। সতীশ তো এসেছিলেন তোমার নামে নালিশ ক'রবেন বলে। আমি অনেক ক'রে তাঁকে আপাততঃ থামিয়ে দিয়েছি। তাঁর স্ত্রীকে তুমি আমার এখানে নিয়ে এসো, আমি সব ঠিক-ঠাক ক'রে দিচ্ছি।"

মেঘনাদ বুঝিল, জগদীশ তার কথাটা ষোলআনা বিশ্বাস করিল না। সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু ক্রোধ দমন করিয়া সে বলিল, "কিন্তু আমি কেমন ক'রে তাঁকে পাঠিয়ে দেব? তিনি তো এখানে নেই। তিনি কালই রাত্রে ঢাকায় চ'লে গেছেন।"

"তবেই তো ব্যাপার কঠিন হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। আচ্ছা, তুমি তাকে টেলিগ্রাম ক'রে এখানে আনাতে পার না?"

মেঘনাদ বলিল, "যদি পারিই, তা আমি ক'রতে যাব কেন? সতীশের কাছে তার স্ত্রীকে এখন পাঠান, মনে হচ্ছে, তাকে মৃত্যুর মুখে পাঠান। আমি কেন সে খুনের দায়ে দায়ী হ'তে যাব?"

জগদীশ ধীর ভাবে বলিলেন, "পাগল হয়েছ? এর পর কি আর তিনি কোনও রকম অত্যাচার ক'রতে সাহস ক'রবেন? আর তা ছাড়া, যদিই করেন, তার উপায় কি? সতীশের কাছে না গেলেই বা তারা দাঁড়াবে কোথায়? খাবে কি? তার পাঁচটা ছেলে র'য়েছে—তাদের যে পথের ভিখারী হ'তে হ'বে।"

মেঘনাদ বলিল, "আমার যদি দুটো অন্ন জোটে, তবে তা'দেরও জুটবে।"

জগদীশ মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন, "এখন তাই মনে করছো বটে, কিন্তু বেশী দিন এ ভাব থাকবে না। আর তুমি তোমার জীবনের আরম্ভটায় এমন একটা বোঝা সাধ ক'রে গলায় ঝুলাতে যাবেই বা কিসের জন্য?"

"বোঝা যদি ভগবান্ ঘাড়ে চাপিয়ে দেন, তবে কি করবো বল? অবস্থার ঘোর-প্যাঁচে আমি এমন জায়গায় এসে পড়েছি যে, আমি এদেরকে ইচ্ছা ক'রলেই ঝেড়ে ফেলতে পারি না।"

"তা ছাড়া, তুমি তাদের আট্‌কে রাখতে পারবে না। সতীশ যদি স্ত্রী ফিরে পাবার জন্য নালিস করেন, তবে কি ওজুহাতে তুমি তাঁকে আট্‌কাবে? আইনে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে যাবার অধিকার আছে।"

গত কয়েক মাসের অভিজ্ঞতায় মেঘনাদ আইনকে ভয় করিতে শিখিয়াছিল। মোকদ্দমার কথায় সে একটু ভড়কাইয়া গেল। শেষে ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে বলিল, "আমি আমার যা কর্ত্তব্য সেটা ক'রতে চেষ্টা ক'রব—সাধ্যমত করবো। তোমার আইন যদি তা না ক'রতে দেয়, যদি বাধ্য হ'য়ে আমাকে এদের ত্যাগ ক'রতে হয়, তবে করবো।"

জগদীশ বলিলেন, "ছেড়ে দিতে তোমায় হ'বেই; সেইটা বুঝে হিসাব ক'রে দেখ। মিছামিছি একটা কলঙ্ক, একটা অপযশ কেনাটা কি কোনও কাজের কথা?"

মেঘনাদ গম্ভীর হইয়া মাটীর দিকে চাহিয়া বলিল, "না ভাই, কলঙ্কের ভয়ে কর্ত্তব্য ছাড়তে পারবো না।"

"আমি তো কর্ত্তব্যের কথাই ব'লছি। তোমার নিজের প্রতিও তো তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে? তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে—বড় হবার শক্তি আছে, সংসারের উৎপাত নাই। তোমার যত বড় হবার শক্তি আছে, তত বড় হওয়াটা কি তোমার কর্ত্তব্য নয়? কিন্তু তোমার বড় হবার যে সুযোগ রয়েছে, সেটা তুমি পরের আপদ ঘাড়ে করে নষ্ট করতে যাচ্ছ! তোমার বন্ধুদের এ বিষয়ে তোমাকে বাধা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।"

"অত হিসাব করতে পারি না ভাই। চক্ষের সামনে যে কর্ত্তব্যটা দেখতে পাচ্ছি, যেটা হাতের উপর এসে পড়েছে, যেটা একটা জঘন্য নীচতা না ক'রে আমার ছাড়বার উপায় নাই, সেই কর্ত্তব্যই আমি ক'রবো, অত সূক্ষ্ম হিসাব করতে পারি না।"

"বুঝছো না মেঘনাদ, তুমি কতটা ক্ষতি স্বীকার ক'রে

নিচ্ছ। তুমি যেটাকে কর্ত্তব্য বলছ, সবাই সেটাকে লাম্পট্য নাম দেবে। সুনীতি যুবতী, তুমি যুবক,—তোমাদের ঘনিষ্ঠতাকে ভাল চোখে কেউ দেখতে পারবে না। লোক যা বুঝবে, সেই ওজনে তোমার সঙ্গে ব্যবহার করবে। তুমি তোমার সম্মান, প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি—সব বিসর্জ্জন দিতে ব'সেছ কিসের জন্য? যার জন্য তুমি এতটা ত্যাগ স্বীকার ক'রছ, সে তোমাকে কি দিতে পারে, সে কি এ ত্যাগের যোগ্য?"

"থাক ভাই, ও কথায় আর দরকার নাই, আমার এখনি ট্রেণ ধ'রতে হ'বে। এ সম্বন্ধে আমি তোমাকে পত্র লিখবো।" বলিয়া মেঘনাদ উঠিল।

ষ্টেশনে প্রহ্লাদবাবুর সঙ্গে দেখা হইল। প্রহ্লাদবাবু ভয়ঙ্কর কাণ্ড করিলেন। তিনি সটান আসিয়া, মেঘনাদের সামনে দাঁড়াইয়া, খুব উঁচু গলায় তার সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ করিলেন। খুব বড় গলায় মেঘনাদের সমস্ত সত্য ও কল্পিত পাপ ব্যক্ত করিয়া, তাহাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে লোক জড় হইয়া গেল। বৃদ্ধের এই কাণ্ডে মেঘনাদ এতটা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল, আর লোকজনের টিট্‌কারীতে সে এতটা লজ্জায় মরিয়া গেল যে, সে একটি কথার প্রতিবাদ না করিয়া নীরবে গাড়ীর ভিতর পলাইল।

ট্রেণে উঠিয়া মেঘনাদ ভাবিতে বসিল। জগদীশের সঙ্গে কথায়-বার্ত্তায় তা'র বর্ত্তমান অবস্থার স্বরূপটা তা'র চক্ষের সম্মুখে বেশ স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার যেন মনে হইল, সে গলায় পাথর বাঁধিয়া জলে ভাসিতে বসিয়াছে। একটি স্ত্রীলোক আর তা'র তিনটি শিশু তা'র ঘাড়ে চাপিয়াছে। তাহাদিগকে লইয়া তাহাকে এখন দস্তুরমত সংসারী হইয়া বসিতে হইবে। তাহাদের অন্নবস্ত্র ও শিক্ষার ভার বহন করিতে যে টাকার দরকার, তাহা রোজগার করিতে মেঘনাদকে মাথার ঘাম পায় ফেলিতে হইবে। তার পর ছোট-ছোট রোগা ছেলেপিলে লইয়া আপদ-বিপদ, উদ্বেগের তো অন্তই নাই। সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল যে, এই সব উপদ্রবে তার যে সময় যাইবে, তাহাতে সে আর বিদ্যাচর্চ্চা বা দেশ-সেবার অবসর পাইবে না। এই সেদিন বসিয়া সে যে সব আকাশ-কুসুম রচনা করিতেছিল, সব একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া, তাহাকে সংসারের ভিতর ডুবিয়া মরিতে হইবে।

আর সে সংসারে তাহাকে লড়িতে হইবে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে একা। সুনীতির সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ লোকে কি চক্ষে দেখিবে, প্রহ্লাদবাবুর কথার পর তাহা বুঝিতে তাহার বাকী ছিল না। কাজেই সুনীতিকে লইয়া বাস করিতে হইলে, তাহার সম্মান, প্রতিষ্ঠা—সব অতল জলে বিসর্জ্জন দিয়া, কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া লড়িতে হইবে। বন্ধুবান্ধবে তাহাকে ঘৃণা করিয়া বর্জ্জন করিবে,—কোনও সম্মানের কার্য্যে সে সহজে অগ্রসর হইতে পারিবে না। তাহার একটি পরিচিত ব্যক্তির কথা মনে পড়িল। তার শক্তি ছিল, প্রতিভা ছিল; কিন্তু একটা পতিতা নারীর প্রেমে পড়িয়া সে তাহার সমাজ ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র ছাড়িয়া দিল। এখন সে অসহায়, কপর্দ্দক-শূন্য;—সেই রমণী ও তাহার পুত্রকন্যাদের লইয়া মহাবিব্রত। শেষে পেটের দায়ে, সেই নারীর গর্ভজাত কন্যার দ্বারা বেশ্যাবৃত্তি করাইয়া, সহরের একটা ঘৃণিত পল্লীতে বাস করিয়া, অতি কষ্টে দিন কাটাইতেছে। মেঘনাদ একদিন তাহার সেই মেয়ের চিকিৎসা করিতে গিয়াছিল; দেখিতে পাইল, জীর্ণ-শীর্ণ, কঙ্কালসার হইয়া, সে অপরিমেয় দৈন্য ও নিরাশার মধ্যে ডুবিয়া, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। মেঘনাদের মনে হইল, তাহার অদৃষ্ট তাহাকে এই পথেই টানিয়া লইতেছে। মান, সম্ভ্রম, খ্যাতি, বন্ধুদের কাছে প্রতিপত্তি,—যাহা কিছু সে জীবনে বরণীয় মনে করিয়াছে, তাহা সব বিসর্জ্জন করিয়া, তাহাকে সারাজীবন সুনীতি ও তাহার শিশুদের সেবার জন্য কেবলি গাধার খাটুনী খাটিয়া মরিতে হইবে।

ত্যাগের গৌরবে সে এখন অতিমাত্র উৎফুল্ল হইয়া উঠিল না। কর্ত্তব্য সাধনের গর্ব্বে তাহার বুকের ছাতি আর ফুলিয়া উঠিল না। তাহাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল তাহার আশাশূন্য, উৎসাহশূন্য জীবনের এই অন্তহীন বেদনা। সে আজ হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে, এতদিন সে যে কর্ত্তব্যনিষ্ঠার স্পর্দ্ধা করিয়া আসিয়াছে, ও ত্যাগের গৌরবে উৎফুল্ল হইয়াছে, তার ভিতর গোপনে একটা অতল অভিমান ও অপরিমেয় যশোলিপ্সা আছে। যখন সে ত্যাগ করিয়াছে, তখন সঙ্গে-সঙ্গে সে সমস্ত জগতের হাততালির আড়ম্বর শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে। যেটুকু সে কর্ত্তব্যের নামে ত্যাগ করিয়াছে, লোকের কাছে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তিতে সে ক্ষতি পোষাইয়া যাইবে, এ কথা সঙ্গে-সঙ্গে অনুভব করিয়াছে। আজ সে যে কর্ত্তব্য মাথা পাতিয়া লইয়াছে, ইহাতে কেবলি

ত্যাগ আছে,—প্রতিষ্ঠা নাই; খ্যাতি নাই; জগৎ ইহাতে হাততালি দিয়া উঠিবে না; বরং সমস্ত জীবন ভরিয়া একটা মিথ্যা ভিত্তিশূন্য কলঙ্ক ও তীব্র অভিসম্পাত ও উপহাস তাহাকে পরিপাক করিতে হইবে। এ কল্পনায় তার প্রাণ উৎসাহিত হইয়া উঠিল না। কর্ত্তব্য সাধনের প্রতিজ্ঞা হইতে সে স্খলিত হইল না সত্য,—কিন্তু কর্ত্তব্যটা তাহার গাধার বোঝার মত হইল। ইহার কল্পনায় সে উৎফুল্ল হইল না, ইহার জন্য জগতের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার উন্মাদনায় সে অভিভূত হইল না। সে কেবল ভগবানের কাছে অভিযোগ করিতে লাগিল। সে কি অপরাধ করিয়াছে যে, তার বর্ত্তমান এমনি কলঙ্কিত ও ভবিষ্যৎ কালিমামাখা ও অন্ধকার হইবে; তাহাকে এমন করিয়া অপার সমুদ্রে বিশ্বের পাপের বোঝা ঘাড়ে করিয়া সাঁতার কাটিতে হইবে।

তাহার মনে হইল যে, তার যা' কিছু অপমান বা লাঞ্ছনা হইতেছে, সে সমস্তই তার ন্যায্য পাওনা। সুনীতিকে লইয়া অন্যায় ভাবে যে কলঙ্ক তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা মনোরমাকে লইয়া খুব ন্যায়সঙ্গত ভাবে তাহার উপর বর্ষিত হইতে পারে। ভাবিতে তা'র মনটা কালি হইয়া গেল,—নিজের দুর্ব্বলতা ও হীনতায় তা'র মনটা নিরাশার অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। আজ যে সে নিজেকে কতখানি খেলো করিয়াছে, ওয়ার্ডারের চক্ষে ধূলি দিয়া কত বড় কাজ করিয়া বসিয়াছে, তাহা ভাবিতে তাহার নিজের উপর দারুণ ঘৃণা জন্মিল। এ দুর্ব্বলতা যে সে কখনও জয় করিতে পারিবে না, এই কথা ভাবিতে সে একেবারে বসিয়া পড়িল। ভাবিতে-ভাবিতে তার মনটা ভয়ানক দীন হইয়া পড়িল। তাহার দম্ভের অন্ত নাই—অথচ সে কি দুর্ব্বল, কি হীন! যে কর্ত্তব্যনিষ্ঠার দম্ভ সে করে, সেটাই বা তা'র কত বড় মেকী জিনিস। নিজেকে সে এতদিন খুব বড় করিয়াই দেখিয়া আসিয়াছে। আজ সে হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে, সে কিছুই না,—একটা সামান্য সাধারণ মানুষ। যার কথা সে ভাবিল, তাকেই তার নিজের চেয়ে আজ বড় মনে হইল। তাহার সকল অহঙ্কার একটা দীনতার খোলসের মধ্যে সারশূন্য শম্বুকের মত সঙ্কুচিত হইয়া ঢুকিয়া গেল।

কেন তার এ দুর্গতি হইল? সংসারে লাখ-লাখ লোক সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইয়া যাইতেছে, ধাপে, ধাপে সফলতার শীর্ষদেশে আরোহণ করিতেছে। বাধা-বিঘ্ন তাহাদের জীবনে আসে না বলিলেই চলে, অথবা যদিও আসে সে নেহাৎ লোক দেখাইবার খাতিরে তাদের হাতে বিধ্বস্ত হইবার জন্যই সঙ্কুচিত ভাবে একটু মাথা উঁচু করিয়া ওঠে। আর তার বেলাই জীবনের পথটা এত বন্ধুর, এত কণ্টকসঙ্কুল হইয়া দাঁড়াইল কেন? কিসের জন্য তার জীবনের সূত্রের মধ্যে বারবার এমন একটা জটিল গ্রন্থি পড়িয়া যাইতেছে? সে কেন সহজ সরল পথে জীবনে সফলতা লাভ করিতে পারিতেছে না? যারা পারে, তারাই বা পারে কেন? আর সেই বা পারিতেছে না কেন?

অদৃষ্ট? এটা একটা মন-ভুলান কথা। ঘটনা-চক্র? তাই কি? তাহার মনে পড়িল এক প্রতীচ্য মনীষির কথা। যখন লক্ষ্য-বেধে ভুল হয়, তখন বুদ্ধিমান্ লোকে তীর-ধনুক বা লক্ষ্যের ভিতর দোষের সন্ধান করে না,—সন্ধান করে আপনার ভিতর। কথাটার সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে পড়িল, তার একটি বন্ধুর কথা; টেনিস খেলিতে গিয়া যখনি তাহার একটা মার ভুল হয়, তখনি সে তাড়াতাড়ি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাকায় তার র‍্যাকেটের দিকে—না হয় বলে, বলটা কিছু ভারী বা হাল্কা। তার নিজের মনের অবস্থা অনেকটা তার এই বন্ধুটার মত বলিয়া মনে হইল। সে তার নিস্ফলতার অপরাধ নিজেকে ছাড়িয়া আর সব জিনিযের উপর চাপাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু দোষটা কি নিজের নয়?

মাঝে-মাঝে মানুষের মনের এমন অবস্থা হয়, যখন নিজেকে পীড়ন বা তিরস্কার করিতে পারিলে, আপনাকে খাটো করিয়া অপমানিত করিতে পারিলেই, মন তৃপ্ত হয়। মেঘনাদের এখন সেই অবস্থা হইয়াছিল। সে এখন নিজের উপর খড়্গহস্ত। তাই তাহার দৃষ্টি আপনার ভিতর ঢুকাইয়া সে নিজের দোষ-ত্রুটীর অন্ত পাইল না। তার মনে হইল, যোগেন্দ্রবাবু ধরিয়াছিলেন ঠিক। তা'র যে জিনিসটা একেবারে নাই, সেটা চরিত্রবল। শুধু তাই নয়। তা ছাড়া, তার আর একটা জিনিসের একান্ত অভাব—সেটা কাণ্ডজ্ঞান। তার মনে হইল, যারা জীবনে সর্ব্বাঙ্গীন সফলতা লাভ করে, তাদের মধ্যে কাণ্ডজ্ঞানটা টনটনে থাকে। তারা একটা স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়া চট্ করিয়া দুনিয়াটাকে বুঝিয়া লয়; আর সেই বুদ্ধির বলে তা'কে নিজের কাজে লাগাইতে পারে—তাহাদের হুকুমের গোলাম করিতে পারে। আর সে জীবনের আরম্ভ হইতে, সংসারটা না চিনিতে পারিয়া,

পদে-পদে তার সঙ্গে লড়াই করিয়া, ঠোকা খাইয়া চলিয়াছে।

এমনি করিয়া খুঁটিয়া-খুঁটিয়া সে তার সব গুণগুলির মাথা কাটিয়া খাটো করিয়া, এবং তার রাশি-রাশি দোষের বোঝা পর্ব্বতের মত কাঁড়ি দিয়া, নিজের অহঙ্কারকে সম্পূর্ণ কাবু করিয়া, কতকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। যখন সে কলিকাতায় আসিয়া নামিল, তার মনের অবস্থা তখন ঠিক লেজ-গুটান প্রহৃত কুকুরের মত—নত, সঙ্কুচিত এবং কতকটা ক্ষুব্ধ।

(২১)

মেঘনাদ অত্যন্ত অপ্রসন্ন চিত্তে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল; কাজকর্ম্মে আর তাহার মন বসিল না। পড়াশুনা ও পরীক্ষাগারের গবেষণার কাজ সে একদম ছাড়িয়া দিয়া হাত-পা গুটাইয়া বসিল। রোগী দেখা, এবং আফিসের কাজ যা না করিলে নয়, সে কেবল তাই করিত; আর অবশিষ্ট সময় গোঁজ হইয়া বসিয়া থাকিত, না হয় বেড়াইয়া বেড়াইত। সে হরিচরণের সঙ্গে আর দেখা করিল না,—তার সঙ্গে কাজ করিবারও আর তাহার ইচ্ছা রহিল না। কোনও কাজেই আর তার উৎসাহ রহিল না। সে মনে ভাবিল, তার আশা-আকাঙ্ক্ষার, উৎসাহের ও কার্য্যের পরিসমাপ্তি হইয়া গিয়াছে; অবশিষ্ট জীবন কেবল তাহাকে পয়সা রোজগার করিয়া দিনগত পাপক্ষয় করিয়া যাইতে হইবে। তার এক কারণ এই যে, তা'র যে অনন্য-সাধারণ ক্ষমতা আছে বলিয়া এতদিন সে বিশ্বাস করিত, এখন সে জানিল সে সব মিথ্যা। সে অতি সাধারণ লোক,—বড়-বড় কাজ করিবার স্পর্দ্ধা তার পক্ষে বাতুলতা। তা' ছাড়া, সে সাব্যস্ত করিয়া বসিয়াছিল যে, তার আর কাজ করিবার সুযোগ বা অবসর নাই। সকলের চক্ষে সে এখন অপরাধী ও হেয়, সবাই তাহাকে ঘৃণা করে; তাহাদের কাছে কাজেই তা'র মুখ দেখাইতে লজ্জা করে। কাজেই সে কোনও কাজের ভিতরও যাইত না, কাহারও সঙ্গে মিশিতও না। মাঝে-মাঝে মনটা যখন খুব ভারী হইয়া উঠিত, তখন সে থিয়েটারে যাইয়া ও বায়স্কোপ দেখিয়া তাহা শান্ত করিতে চেষ্টা করিত।

সুনীতি যতীনকে লইয়া আসিয়াছিল। তার সঙ্গে তিনটি অপোগণ্ড শিশুও ছিল। মেঘনাদ তাহাদিগকে একটা বাসা করিয়া দিয়াছিল, যতীনেরও একটা কম্পাউণ্ডারী চাকরী জুটাইয়া দিয়াছিল। তা ছাড়া তাদের খরচপত্র সবই সে নিজে দিত। নিজে সে বটব্যাল কোম্পানীর আফিসের দোতলায়ই থাকিত, এবং সেইখানেই আহারাদি করিত।

সুনীতি প্রথমে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া থাকিত। সে নিতান্ত অপরাধীর মত আপনাকে মেঘনাদের চক্ষু হইতে যথাসম্ভব গোপন করিয়া রাখিত। সে যে মেঘনাদের ঘাড়ের উপর একটা বোঝা হইয়া রহিয়াছে, তাহা ভাবিয়া সে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া থাকিত। কিন্তু ছেলেদের মুখ চাহিয়া তাহাকে এই হীনতা বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সুনীতি আর এখন তেজস্বিনী বা মুখরা নহে;—তাহার অধিকারের ক্ষেত্র ছাড়িয়া তাহার চরিত্রের উগ্রতা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। সে অত্যন্ত দীন, শান্ত ও নম্র হইয়া উঠিয়াছিল।

কয়দিন যাইতে না যাইতে সুনীতি ভাবিয়া দেখিল যে, তাহাকে যে নিতান্তই মেঘনাদের ঘাড়ের একটা বোঝা হইয়াই থাকিতে হইবে, তাহার কোন মানে নাই। নারীর সেবা-পরায়ণ চিত্ত লইয়া সে দেখিল যে, মেঘনাদের সেবার অত্যন্ত আবশ্যকতা আছে। মেঘনাদ সংসার সম্বন্ধে একান্ত অনভিজ্ঞ ও উদাসীন; কোনও সাধারণ কাজ গুছাইয়া করিতে সে জানিত না,—নিজের শরীর ও নিজের কাপড়-চোপড় পর্য্যন্ত সে ঠিক গুছাইয়া রাখিতে জানিত না। সুনীতি দেখিতে পাইল যে, তাহার সম্মুখে এই কর্ত্তব্য,—মেঘনাদ যেমন সুনীতির খাওয়া পরার ভার লইয়াছে, সুনীতিকেও তেমনি মেঘনাদের ভার লইতে হইবে। এই অনভিজ্ঞ, অসহায় মানুষটির সকল অভাব দূর করিয়া, স্নেহ ও সেবা দিয়া তাহার নিরানন্দ জীবনকে সরস ও শান্তিময় করিয়া, সুনীতি মেঘনাদের দয়ার প্রতিদান করিতে সংকল্প করিল। এমন একটা অপটু ছেলের যত্ন করিয়া যে একটা তৃপ্তি আছে, তাহা সুনীতি শীঘ্র লাভ করিল। সে মেঘনাদের খাওয়া-দাওয়ার উপর প্রথমে নজর দিল। ক্রমে মেঘনাদের আফিসের বামণ-চাকর উঠাইয়া দিয়া সে মেঘনাদকে এ বাড়ীতে খাইতে বাধ্য করিল। তার পর সে তার কাপড়-চোপড়ের ভার লইল। তার পর ক্রমে-ক্রমে সে তার টাকা পয়সারও ভার গ্রহণ করিল।

তার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ও নিষ্ঠাপূর্ণ সেবা দিয়া সে মেঘনাদের জীবন ভরিয়া দিল।

প্রথমে এ সব মেঘনাদ গ্রাহ্য করিত না। কিন্তু ইহাতে তাহার আরাম ও কাজের সুবিধা এতটা বাড়িয়া গেল যে, তাহার বৈরাগী হৃদয়ও এ সেবায় চরিতার্থতা বোধ না করিয়া থাকিতে পারিল না। সে দেখিতে পাইল যে, সে এখন টাকা আনিয়া খালাস,—তার খরচের বিষয় তা'র ভাবিতে হয় না। যখন যে জিনিসটি তা'র দরকার হয়, তা সে হাতের গোড়ায় অনায়াসে পায়। তার বেশ ভূষায়, কাজ-কর্ম্মে, সমস্ত জীবনে সে একটা অপূর্ব্ব সৌষ্ঠবের জন্ম দেখিতে পাইল। সে তৃপ্ত হইল, সুনীতির প্রতি কৃতজ্ঞ হইল। তাহার ও তাহার ছেলেদের প্রতি তাহার কর্ত্তব্য এখন আর ততটা ভার-বোঝার মত মনে হইল না।

কিন্তু তবু তার মনের উপর যে বরফ জমাট হইয়া বসিয়া গিয়াছিল, তাহা ইহাতে একেবারে ভাঙ্গিল না। তাহা ভাঙ্গিয়া দিল সুনীতির ছেলে তিনটি। তারা প্রথম-প্রথম মেঘনাদের কাছে বড় ভিড়িত না;—চোখ বড় করিয়া, তফাৎ হইতে দাঁড়াইয়া, কেবল তাহাকে দেখিত। ইহাদের দেখিয়া মেঘনাদের বড় কষ্ট হইত। সে ইহাদের কাপড়, জামা, খেলনা, লজেঞ্জুস্ প্রভৃতি দিয়া ইহাদের ভিতরকার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিত। ক্রমে, নিত্য-নিত্য তাহার কাছে এই সব মনোজ্ঞ উপহার পাইয়া তাহারা সাহসী হইয়া উঠিল। আর তখন, কেবল কাছে যাওয়া নয়, তাহারা একেবারে মেঘনাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিল। দিনরাত মেঘনাদের উপর তাহাদের আব্দার লাগিয়াই ছিল। এক-একজনের এক-এক রকম আব্দার। বড় ললু কেবল গল্প ও ছবিতেই আনন্দ বোধ করিত। তার ছোট সন্তু মোটে পাঁচ বছরের,—কিন্তু মেঘনাদ ছাড়া অন্য খেলার সাথী তাহার পছন্দ হইত না। মেঘনাদকেও তার স্কুলের খেলনা ও তার চিনামাটির পুতুল, কুকুর, বিড়াল এইগুলির সঙ্গে আত্মীয়তা করিয়া, তাহাকে পরিতৃপ্ত করিতে হইত। ছোটটা মাত্র তিন বছরের—সে ভীষণ লোভী। তার 'দাদা'র সঙ্গে একমাত্র প্রয়োজন ভোজ্যের সন্ধানে; বাতাসা, মিশ্রি, লজেঞ্জুস প্রভৃতি মুখরোচক বস্তু দিয়া মেঘনাদ ইহাকে তৃপ্ত করিত। এই সেবার পুরস্কার স্বরূপ ছটু মেঘনাদের কোলে ও কাঁধে চড়িয়া তাহাকে কৃতার্থ করিত। যতক্ষণ মেঘনাদ এ-বাড়ীতে থাকিত, ততক্ষণ ছটু প্রায় তাহারই কোলে থাকিত; না হইলে কাঁদিয়া অনর্থ করিত।

এই রকম করিয়া এই ছেলে কটি মেঘনাদের ঋষিবৃত্তির উপর ডাকাতি আরম্ভ করিল। ক্রমে তাহার মনের এই নূতন কাটখোট্টা খোলসটা ঝরিয়া পড়িল এবং মাস-তিন-চার যাইতে না যাইতে তাহার মনটা আবার স্বাভাবিক হইয়া পড়িল; বরং সে আগের চেয়ে একটু বেশী লঘুচিত্ত হইয়া পড়িল। সুনীতির স্নেহ ও সেবা এবং শিশুদের খেলায় তাহার হৃদয়ের গোপন রসের উৎস খুলিয়া দিল,—সে হাসিতে তামাসাইতে শিখিল। বিষাদের যে ভীষণ বোঝা তার ঘাড়ের উপর চাপিয়াছিল, তাহাকে সে নামাইয়া ক্রমে একেবারে সমাধি দিয়া ফেলিল। সুনীতিকে সে মায়েরই মত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও স্নেহ করিয়া, হৃদয়ে অপরিসীম তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করিল। এই শিশুদের বুকে ধরিয়া তাহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

মেঘনাদ হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে, সংসারটাকে সে যেমন ভয়াবহ বস্তু ভাবিয়াছিল তাহা নিতান্তই কল্পনা। তার মনে হইল, সংসারটা একটা ঝঞ্ঝাট বা বোঝা নয়,—বোঝা নামাইবার একটা আয়োজন। সে ভাবিয়াছিল যে, সংসারের জন্য খাটিয়া খাটিয়া তাহাকে আর সব কাজ ছাড়িতে হইবে; এখন সে দেখিতে পাইল যে, তার নিজের জন্যও তা'র কোনও ভাবনা বা চেষ্টা করিতে হয় না,—সংসারের তো কথাই নাই। এখন তার গৃহস্থ-জীবনটাকে মোটের উপর বেশ আরামের জিনিস বলিয়াই মনে হইল।

তা ছাড়া, সে আরও একটা জিনিস দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে ভাবিয়াছিল, সুনীতিকে আশ্রয় দিয়া সে সমস্ত সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে,—তাহাকে সকলে ঘৃণা করিয়া তফাৎ করিয়া দিবে। সকলের অপমান ও লাঞ্ছনা ঘাড়ে করিয়া তাহাকে জীবন কাটাইতে হইবে। সে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল যে, জগতের লোকের এ সমস্ত বিষয়ে অভিমত সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের—অন্ততঃ কলিকাতা সহরে। তার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেহ-কেহ তাহাকে একটু মৃদু তিরস্কার করিত, কেহ বা উপদেশ দিত; কিন্তু বেশীর ভাগ লোকে তাহাকে ইহা লইয়া কখন-কখনও একটু তামাসা করা ছাড়া, অন্য কোনও রূপে তাহার কল্পিত পাপের প্রতিবাদ

করিত না। একদিন মহাদেব বাবু মেঘনাদকে বলিলেন, "ডাক্তার বাবুর শরীরে যে দিন দিন চেকনাই বেড়ে যাচ্ছে গো! না হ'বে কেন?" বলিয়া একটু হাসিলেন। একজন বন্ধু বলিলেন, "হাঁ ভাই, তোমার বিদ্যাধরীটি কি খুব রূপসী? একদিন দেখাবে?" ইত্যাদি। মেঘনাদ পাপের যে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছিল, এখন বুঝিতে পারিল, তার কতকটা অন্ততঃ নিছক কল্পনা। পাপীকে বাস্তবিকই বেশীর ভাগ লোকে খুব বেশী ঘৃণা করে না। এ কথা ভাবিয়া সে সংসারের উপর বড় চটিয়া গেল। তার কল্পিত পাপে কৌতুক বোধ না করিয়া, যদি লোকে তাহাকে পীড়ন করিত, তবে সে বেশী খুসী হইত।

প্রথম-প্রথম মেঘনাদের বন্ধুদের ঠাট্টায় বড় রাগ হইত। কিন্তু কষ্টে সে ক্রোধ দমন করিত। তার এখন দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তাহার দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ তাহার কাণ্ডজ্ঞানের অভাব—সে অযথা চটিয়াই তা'র দুঃখের সৃষ্টি করে। কাজেই সে ক্রোধ দমন করিত। শেষে এ সব কথা তা'র গা-সওয়া হইয়া গেল, সে গ্রাহ্য করিত না।

তিন মাসে সুনীতির চেহারা একদম ফিরিয়া গিয়াছিল। সে গায় বেশ ভরিয়া উঠিয়াছিল; এবং মনের শান্তির সঙ্গে সঙ্গে তা'র যৌবনের উপযুক্ত যে রূপ ও স্বাস্থ্য তাহা যেন সে ফিরিয়া পাইয়াছিল। মেঘনাদ একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে, সুনীতি সত্য-সত্যই সুন্দরী। ইহাতে তার কেমন একটু ভয় হইল, সে তার সমুদয় মনোবৃত্তির উপর কড়া পাহারা বসাইল। সকল উপায়ে দুষ্ট প্রবৃত্তিগুলিকে চাপিয়া মারিবার আয়োজন করিল।

এমনি ভাবে কিছুদিন কাটিয়া যাইতে, সুনীতি একটা আব্দার আরম্ভ করিল, যাহাতে মেঘনাদের মনে গভীর চিন্তার ধারা প্রবাহিত হইল। একদিন সে কতকগুলি টাকা আনিয়া বলিল, "নেও গো, এই টাকা কটা তুলে রাখ।"

সুনীতি কপট ক্রোধের সহিত বলিল, "যাও, ফেলে দাওগে ওই নর্দ্দমায়,—এত টাকা কি হ'বে? কে এত বইতে যাবে? এত হেঙ্গাম আমি সহ্য ক'রতে পারি না বাপু!"

মেঘনাদ হাসিয়া বলিল, "সে কি? কলি কি শেষ হ'য়ে গেছে? আমার তো বড্ড ভয় হ'চ্ছে, প্রলয় বুঝি আসে! টাকায় মানুষের এমন বিতৃষ্ণা, এ কথা তো জন্মে শুনি নি।"

সুনীতি। হ'বে না? এত টাকা কি হ'বে? আমি কেন পরের টাকা বইতে যাব? যার টাকা, তাকে দাও গে যাও।

মেঘনাদ শঙ্কিত হইল। পরের টাকা? এমন কথা সুনীতি কেন বলিতে গেল? মেঘনাদ কি অজ্ঞাতসারে তাহাকে কোনও ব্যথা দিয়াছে? সে বলিল, "পরের টাকা কেমন?"

সুনীতি বলিল, "পরের নয় তো কার? এ টাকা তোমারও নয়, আমারও নয়। যার, তা'কে নিয়ে এসো—সে বুঝে নিক।"

মেঘনাদ আরও বিব্রত হইল। কথাটার মানে বুঝিতে পারিল না। আরও শঙ্কিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "কার এ টাকা তবে?"

সুনীতি হাসিয়া বলিল, "বোমার!"

মেঘনাদ বুঝিল না; বলিল, "বোমা! কে সে?"

সুনীতি বলিল, "চেন না? চিনবে গো, চিনবে। দুটো দিন সবুর কর, তাকে ঘরে নিয়ে এস,—তার পর সেই আমাকে তোমায় চিনিয়ে দেবে।"

মেঘনাদ এতক্ষণে কথাটা বুঝিয়া বলিল, "জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলে যে, বড়কু বড় না হ'লে তোমার বোমার মুখ দেখা বরাতে নেই।" বড়কু সুনীতির বড় ছেলে।

সুনীতি গম্ভীর হইয়া বলিল, "ঠাট্টা নয়, তুমি বিয়ে কর। তোমার সোণার সংসার লক্ষ্মীর হাতে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই।"

মেঘনাদ বলিল, "তুমি নিশ্চয় ক্ষেপেছ! কোথায় তোমার বউমা? আমি বিয়ে ক'রতে পারবো না, ক'রবো না।"

কিন্তু সুনীতি চাপিয়া ধরিল। মেঘনাদ তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, যে বিবাহ ছাড়াও জীবনে অনেক কাজ আছে,—সে সেই সব কাজ জীবনের ব্রত করিয়া লইবে স্থির করিয়াছে। সুনীতি সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তার পর অনেক তর্ক, অনেক বচসা হইল। শেষে যখন মেঘনাদ খুব জোর করিয়া বলিয়া বসিল যে, সে বিবাহ করিবেই না,—তখন সুনীতি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল,—মেঘনাদ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তার চক্ষু শুষ্ক নাই!

হঠাৎ বিদ্যুতের মত চমক দিয়া গেল, একটা কথা

মেঘনাদের মনে। মেঘনাদকে বিবাহ করাইতে সুনীতির এত জেদ কেন? মেঘনাদ ও সুনীতির সম্বন্ধ সম্বন্ধে বাহিরে যে নানা কুকথা রটিয়াছে, সে কথা সুনীতি কি কিছু শুনিয়াছে? শোনা বিচিত্র নহে। যদি সে কিছু শুনিয়া থাকে তবে তার এমন কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মেঘনাদ বিবাহ করিলে আর এ কলঙ্কের কোনও ভিত্তি থাকিবে না। তা ছাড়া, ইহাও তো হইতে পারে যে, সুনীতি মেঘনাদের মত একজন কুমার যুবকের সঙ্গে অন্য নারীশূন্য এক গৃহে বাস করিতে ভয় পায়। ভয়! মেঘনাদকে সুনীতি কি ভয় করিতে পারে? মেঘনাদের ব্যবহারের ভিতর সুনীতি কি এমন আশঙ্কার কিছুমাত্র হেতু পাইয়াছে? ভাবিতে মেঘনাদের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল।

কিন্তু ভয়ই হউক, আর কলঙ্কের বেদনাই হউক, এমনি কোনও কারণে যে সুনীতি মেঘনাদের সংসারে থাকিতে অস্বস্তি বোধ করিতেছে, এবং সেই জন্যই যে সে মেঘনাদের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নিশ্চয়। তবে এখন উপায়?

সুনীতির এ আশঙ্কা বা অস্বস্তি দূর করিতেই হইবে। কিন্তু কি উপায়ে? বিবাহ? মেঘনাদ গভীর ভাবে ভাবিতে লাগিল।

বিবাহের কথা মেঘনাদ অনেক দিন ভাবিয়াছে, অনেক রকম করিয়া অনেক দিক হইতে ভাবিয়াছে। কিন্তু যখনই সে ভাবিয়াছে, তখনই কোনও না কোনও যুক্তি ধরিয়া সাব্যস্ত করিয়াছে, বিবাহ করা হইবে না। কিন্তু আজ ভাবিতে বসিয়া দেখিল যে, সেই সব যুক্তির অনেকগুলি এখন আর খাটে না।

সংসারী-জীবনের বন্ধন সম্বন্ধে মেঘনাদের যে ভয় ছিল, এ কয় দিন সুনীতির সংস্রবে থাকিয়া সেটা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল। সে ভাবিত যে, তার ঘাড়ে একটা সংসার চাপিলে তাহাকে দিন রাত সেই সংসার লইয়াই বিব্রত হইয়া থাকিতে হইবে,—আর পড়াশুনা, কাজকর্ম্ম, সব বিসর্জ্জন দিতে হইবে। এখন সে দেখিতে পাইল যে, গৃহিণী যদি উপযুক্ত হন, তবে বন্ধনের চেয়ে সংসারে বরং মুক্তিই পাওয়া যায়। সুনীতি তাহাকে যেমন তাহার অশন-বসন ও টাকার হিসাব সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহার স্ত্রীও তো তাই করিতে পারে।

এত দিন তার একটা মস্ত যুক্তি ছিল এই যে, তার পরিবার প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা এখনো হয় নাই। এখন আর তাহা বলা চলে না। সে যে টাকা রোজগার করে, তাহাতে তাহার সংসারের সমস্ত খরচ স্বচ্ছল ভাবে চালাইয়াও সুনীতি প্রায় তাহাকে হাজার টাকা জমাইয়া দিয়াছে। আর দিন-দিনই তার পসার প্রতিপত্তি বাড়িয়া চলিয়াছে।

তা' ছাড়া, এত দিন তার মনে-মনে একটা স্পর্দ্ধা ছিল যে, তাহার যে অসাধারণ শক্তি আছে, তাহা প্রয়োগ করিয়া সে একটা প্রকাণ্ড কোনও কাজ করিতে পারিবে। সে দিনও সে এই সব বড়-বড় স্বপ্ন দেখিয়াছে। কিন্তু ময়মনসিংহ হইতে ফিরিবার সময় তাহার আত্মাভিমান যে শক্ত ধাক্কা খাইয়াছিল, তাহাতে ক্রমে তাহার বিপুল সৌধ একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছিল। তাহার এখন মনে হইতেছিল যে, কি বিজ্ঞানে, কি লোকহিতে—কোনও দিকেই একান্ত সাধনার দ্বারা কোনও একটা বড় কাজ করা তাহার দ্বারা ঘটিয়া উঠিবে না। তার এই সব উচ্চ আদর্শের দিকে তার চিত্ত একটা বিশাল অন্ধকার ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; তার সমস্ত জীবন একটা বিপুল নিরাশায় ভরিয়া গিয়াছিল।

তাই সে ভাবিল, সব দিকে তার জীবন তো অন্ধকার হইয়াই গিয়াছে। কেবল একটা দিকে তার কর্ত্তব্য খুব স্পষ্ট হইয়া তার ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে। সে কর্ত্তব্য পালন করিবার শক্তিও তার আছে—সে কাজ সুনীতিকে সুখী করা। সুনীতির কায়িক সুখ সম্পাদনের সে যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছে। কিন্তু যে দারুণ অপমান ও কলঙ্কের ভিতর তাহাকে জীবন কাটাইতে হইতেছে, তাহাতে মনের সুখ তার কখনই হইতে পারে না। সে বিবাহ না করিলে সুনীতি সমাজে সম্মান বা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। যখন সে আর কোনও সৎকাজই করিতে পারিবে না, তখন সে এই কর্ত্তব্যটা কেন না পরিপূর্ণ করিবে? সুনীতির সেবাই সে সম্পূর্ণ করিবে। সে বিবাহ করিবে।

কিন্তু মনোরমা! মনোরমাকে বিবাহ করা তার একেবারেই অসম্ভব। স্ত্রীর প্রতি যে শ্রদ্ধা স্বামীর থাকা উচিত, মনোরমার প্রতি মেঘনাদের সে শ্রদ্ধা কখনই থাকিতে পারে না। তাই মনোরমা তার কামনা যতই উদ্রিক্ত করুক, মেঘনাদ তাহাকে স্ত্রী-রূপে কল্পনা করিয়া কখনই সুখী

হইতে পারে নাই। তবে এক সময়ে মনোরমাকে বিবাহ করা সে কর্ত্তব্যের দায় বলিয়া মনে করিয়াছিল। এখন দেখিল, সুনীতির প্রতি কর্ত্তব্য করিতে হইলে, তার মনোরমাকে বিবাহ করা অসম্ভব। সুনীতিকে সে ছাড়িতে পারে না। কাজেই মনোরমাকে সে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য।

কিন্তু কি নীচতার কাজ! মনোরমা অবশ্য ভাল মেয়ে নয়। কিন্তু তাহা জানিয়া শুনিয়াই সে মনোরমার মনে একটা আশা জন্মাইয়াছে। সে মুখে কোনও দিন কিছু বলে নাই; কিন্তু কার্য্যে সে যাহা করিয়াছে, তাহাতে মনোরমা যদি তাহাকে নিজের বলিয়া দাবী করে, তবে মেঘনাদের তাহাতে জবাব দিবার কোনও পন্থা নাই। মনোরমা যদি মুক্ত হয়, তবে সে দাবী সে করিবে। বিবাহের দাবী করুক বা না করুক, প্রেমের দাবী করিবে। মেঘনাদ অন্তরের অন্তরতম স্থল অনুসন্ধান করিয়া দেখিল যে, মনোরমার প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র বিশুদ্ধ প্রেম নাই। কিন্তু মনোরমাকে সে কথা বলিবার মুখ কি সে রাখিয়াছে?

মেঘনাদ ভাবিতে লাগিল। বিবাহ করাই যে তার কর্ত্তব্য, তাহা সে বুঝিল; কিন্তু এই কথায় তার বিবাহের কল্পনায় মনের ভিতর বড় খোঁচা লাগিল। (ক্রমশঃ)

মুদ্রার মূল্য-তত্ত্ব

(Value of Money)

[শ্রীদ্বারকানাথ দত্ত এম-এ, বি-এল]

আলোচ্য বিষয়

পণ্য-দ্রব্যের মূল্য-তত্ত্বে তাহাদের আপেক্ষিক মূল্যের (relative valueর) আলোচনা ও বিচার-বিবেচনা হইয়া থাকে। কোন সামগ্রীর মূল্য এক টাকা, কোন সামগ্রীর মূল্য দুই টাকা হয় কেন,—একই সামগ্রী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দরে বিক্রয় হয় কেন, তাহা জানিতে হইলে, তাহাদের আপেক্ষিক সম্বন্ধ কি তাহা জানিতে হয়। যে-যে কারণে ও অবস্থা বৈষম্যে পণ্য-দ্রব্যের মূল্যের ইতরবিশেষ ঘটে, তাহাই পণ্য-দ্রব্যের মূল্য-তত্ত্বে আলোচিত হয়। কিন্তু কোন্ নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন এক বস্তুর মূল্য পাঁচ টাকা, অপর কোন সামগ্রীর মূল্য দশ টাকা না হইয়া কেন যে তাহার মূল্য যথাক্রমে এক টাকা ও দুই টাকা হয়, তাহা জানিতে হইলে, পণ্যদ্রব্যের সহিত মুদ্রার সম্বন্ধ কি, তাহা জানিতে হয়। দেশে যত পণ্য-সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় হয়, তন্মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট মরশুম হইতে অপর মরশুম পর্য্যন্ত যত প্রকার সামগ্রী বাজারে আমদানী হইয়া ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে, যদি তাহাদিগকে একটা প্রস্থ বা সমষ্টি বলিয়া কল্পনা করা যায়, তবে এইরূপ দুই বা ততোহধিক প্রস্থে বা সমষ্টিতে একটা শ্রেণী বা ক্রম (series) হইবে। এইরূপ এক প্রস্থ সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় সময়ে বাজারের প্রতিযোগিতা-প্রভাবে তাহাদের যে দরের হার (price level) উদ্ভূত হইবে সেই হার তৎপরবর্ত্তী প্রস্থের ক্রয়-বিক্রয় সময়ে স্থির থাকিবে কি না, ব্যবসায়-ক্ষেত্রে ইহা একটা বিশেষ চিন্তনীয় ব্যাপার। যাহারা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত থাকেন, তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ দরের হারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে হয়। আর যাহারা উৎপাদক, তাহাদিগকেও বাজারের ভবিষ্যৎ অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া পণ্য-সম্ভারের আয়োজন করিতে হয়। প্রচলিত দরের হারের আকস্মিক উত্থান-পতনে ব্যবসায়িগণকে বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। কিন্তু এক প্রস্থ পণ্য-সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় হইতে যে সাধারণ দরের হারের (general price levelএর) প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা তৎপরবর্ত্তী সময়ে ঠিক থাকিবে কি না, তাহা জানিতে হইলে, দেশের প্রচলিত মুদ্রার সহিত পণ্য দ্রব্যের সম্বন্ধ কি, তাহা জানা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং দেশের প্রচলিত মুদ্রার প্রত্যেক ব্যষ্টি মাত্রায় পণ্য দ্রব্যের কত অংশ পরিমাণ ক্রয় করার ফলে এই দরের হারের উদ্ভব হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা পণ্য ও মুদ্রার মধ্যে কি সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে, তাহা জানিতে

পারিলে, এই জিজ্ঞাসার নিরসন হয় না। এই সমস্যার সমাধান হইলেই কেবল আমরা জানিতে পারিব, যে, পণ্য দ্রব্যের কিম্বা মুদ্রার পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হইলে, এই দরের হারের কোন উত্থান পতন হইবে কি না। অতএব এই সম্বন্ধের নির্দ্ধারণ হওয়া এই বিজ্ঞানের ও ব্যবসায়ীদিগের সমান স্বার্থ। এই সম্বন্ধ স্থাপনকেই মুদ্রার মূল্য-তত্ত্ব কহে।

ক্রয় শক্তি (Purchasing power)

মুদ্রার মূল্য বা তাহার ক্রয়-শক্তি (Purchasing power) বলিলে দেশের প্রচলিত মুদ্রার ব্যষ্টি-মাত্রায় (unitএ) পণ্য দ্রব্যের যে পরিমাণ ক্রয় করে, তাহা বুঝাইবে। এই পণ্য পরিমাণ দ্বারা বাজারের কোন নির্দ্দিষ্ট পণ্য বুঝাইবে না। তবে তথায় বিক্রয়ার্থ যত প্রকার সামগ্রী উপস্থাপিত হইয়া ক্রয় বিক্রয় হয়, তাহাদের সমবেত দ্রব্যের কোন ব্যষ্টি-পরিমাণ বুঝাইবে; এবং এই ব্যষ্টি-মাত্রাও এমন ভাবে গঠিত হওয়া চাই, যেন সেই সমবেত প্রত্যেক দ্রব্যের মোট মূল্য ও তাহাদের সমষ্টি মূল্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ, যে অনুপাত (proportion) আছে, সেই ব্যষ্টি পণ্য মাত্রাগত প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্য ও ব্যষ্টি মুদ্রার মধ্যে সেই সম্বন্ধ বা অনুপাত বর্ত্তমান থাকে। সেই সম্বন্ধ রক্ষিত হইয়া পণ্য-সাধারণের যে সমবায়ী ব্যষ্টি মাত্রা (composit unit) গঠিত হইবে, তাহাই প্রত্যেক ব্যষ্টি মুদ্রায় ক্রয় করে বলিয়া গণ্য হইবে। ইহাই মুদ্রার ক্রয়-শক্তি (purchasing power)।

পূর্ব্বে কাহার-কাহারও এইরূপ ধারণা ছিল যে, পণ্য-দ্রব্যের দরের হারের সহিত সামঞ্জস্য হইয়া দেশের মুদ্রার পরিমাণ প্রচলিত হয়। এই সিদ্ধান্ত পণ্য ও মুদ্রার মধ্যে একটা আকস্মিক সম্বন্ধের দ্যোতনা করে; তাহা সমীচীন নহে। ক্রয় বিক্রয়ে একটা পরিমিত মুদ্রা ব্যবহৃত হইয়াই ক্রয় বিক্রয় ব্যাপার চলিয়া থাকে। ধারে বা সাক্ষাৎ বিনিময়ে যে যে ক্ষেত্রে কোন প্রকারে কোন মুদ্রার ব্যবহার হয় না, তাহার সহিত মুদ্রার এই ক্রয়-শক্তির কোন সম্বন্ধ নাই। ধারের প্রক্রিয়ায় যে সকল ক্রেডিট পেপার (credit paper) বা ধার-পত্রের অভ্যুদয় হয়, তাহাতে মুদ্রা পাওয়ার দাবী থাকিলেও, অধিকাংশই ক্ষেত্রেই কোন প্রকার টাকার লেনদেন না হইয়া পরস্পর বাদ-কাটাকাটি যায়। তবে যে সকল দেশে দায়-শূন্য পত্র-মুদ্রার (inconvertible paper moneyর) প্রচলন আছে, এবং ধারের শেষ দায় পরিশোধ জন্য যে মুদ্রা মজুদ রাখা হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাতে মুদ্রার বা তাহার নিদর্শক-পত্রের ব্যবহার হয়। সুতরাং বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সমাজে এই মত পরিত্যক্ত হইয়া মুদ্রা ও পণ্য-দ্রব্যের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন যে, দেশের প্রচলিত মুদ্রার সহিত সামঞ্জস্য হইয়াই পণ্য-দ্রব্যের দরের হারের উদ্ভব হয়। এই সম্বন্ধ কি, তাহাই বিবেচ্য।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা দেশের আদর্শ মুদ্রাকেই একমাত্র প্রচলিত মুদ্রা বলিয়া কল্পনা করিব। আমরা অপরাপর যে সকল পরিমাপক যন্ত্রের সহিত সুপরিচিত, এই মূল্য জ্ঞাপক বা মূল্য-প্রকাশক আদর্শ (Standard)ও তাহাদের ন্যায় একটা স্থির যন্ত্র বলিয়া ভ্রম হওয়া অস্বাভাবিক নহে। ফলতঃ, পণ্য-দ্রব্যের মূল্য পরিমাপক আদর্শ যে মুদ্রা, তাহা সেইরূপ একটা স্থির যন্ত্র নহে। ইঞ্চি, ফুট, গজ, হাত, নল, রড প্রভৃতি দৈর্ঘ্য মাপক যন্ত্র, এবং সের, পাউণ্ড, মণ, টন প্রভৃতি ওজন মাপক যে যন্ত্র প্রচলিত আছে, অথবা কোন কার্য্য-সিদ্ধির জন্য নূতন করিয়া একটা যে কিছু গ্রহণ করা যায়, তাহাদের একটাকে একবার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিলে, তাহার মাপ অপর বস্তুর যে পরিমাপ জ্ঞাপন করিবে, তাহার কখনও কোন ইতর-বিশেষ হয় না বা হইতে পারে না। যে পরিমাণ সোণা কিম্বা রূপা লইয়া আদর্শ মুদ্রা নির্ম্মাণ করা যায়, সেই পরিমাণের কখনও কোন ইতর-বিশেষ হইতে পারে না। উহা তাহার (Mint standard) মিণ্ট ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা আদর্শ। আমরা যে আদর্শের আলোচনা করিতেছি, তাহা মুদ্রার ক্রয়-শক্তি। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আদর্শ মুদ্রার যোগে যে পরিমাণ সমবায়ী ব্যষ্টি-পণ্য (Composit unit) ক্রয় করা যায়, তাহার তুলনায় অপর সমস্ত দ্রব্যের দর প্রকাশিত হয়। এই ক্রয়-শক্তি পরিবর্ত্তনশীল। পণ্য ও মুদ্রার পরিমাণের ইতর-বিশেষ সহ তাহার এই আদর্শ ক্রয়-শক্তির কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহাই আলোচ্য।

পণ্য-দ্রব্যের প্রকৃতি ও বাজার-মূল্যের আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, কোন সামগ্রীর বাজার-দরের হ্রাস-বৃদ্ধি হইলে, তাহার টান-যোগানের তারতম্য হয়; আর টান-যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধিতে বাজার-দরেরও উত্থান-পতন হয়। দ্রব্যের

প্রকৃতি বা স্থিতিস্থাপকতার বৈষম্যানুসারে এই উত্থান-পতনেরও প্রভূত ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। তাহাদের এই উত্থান-পতনের মধ্যে কোন স্থির অনুপাত নাই, তাহা কেবল একটা আপেক্ষিক সম্বন্ধ জ্ঞাপন করে। কিন্তু অর্থশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, পণ্যের আপেক্ষিক দরের মধ্যে কোন স্থির অনুপাত না থাকিলেও, বাজারের প্রতিযোগিতা প্রভাবে তাহাদের যে সাধারণ দরের ভাব উদ্ভূত হয়, তাহাতে একটা বিরুদ্ধানুপাত সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়। পণ্য দ্রব্যের পরিমাণ স্থির রাখিয়া মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে, সেই বৃদ্ধির অনুপাতে পণ্য-মূল্যের বৃদ্ধি হয় এবং মুদ্রার মূল্যের হ্রাস হইয়া আসে। উহার পরিমাণ সঙ্কোচ হইলে, তেমনই বিপরীত অনুপাতে পণ্যের মূল্য হ্রাস হয় ও মুদ্রার ক্রয়-শক্তি বাড়িয়া যায়। পণ্ডিতেরা নিম্নলিখিত প্রণালীতে সেই তত্ত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন।

যদি কল্পনা করা যায় যে, কোন দেশে একমাত্র আদর্শ মুদ্রাই প্রচলিত আছে,—তথায় ধারে কিম্বা সাক্ষাৎ বিনিময়ে কোন কার্য্য হয় না,—তবে এই আদর্শ মুদ্রার নগদ আদান-প্রদানেই দেশের সমগ্র ক্রয়-বিক্রয়-কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। তথায় বার্ষিক যে সকল পণ্য-দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় হয়, সেই কার্য্য সম্পন্ন করার জন্য একই মুদ্রা পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে সকলগুলি সমভাবে ব্যবহৃত হওয়া স্বাভাবিক বা সম্ভবপর নহে। আর তাহার কোন একাংশ যদি সেই সময়ের কার্য্য সাধন জন্য একদা ব্যবহৃত নাও হইয়া থাকে, তথাপি দেশের প্রবর্ত্তিত সমগ্র মুদ্রাকে সচল ধরিয়া তাহাদের কর্ম্মশক্তির (efficiency বা circulationএর) একটা গড়পড়তা বাহির করিয়া তদ্দ্বারা সেই মোট মুদ্রাকে গুণ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যাইবে, তাহাকেই সেই কার্য্য সাধনের সমগ্র মুদ্রা বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। তখন এই পরিমাণ মুদ্রা প্রচলিত থাকিলে, দেশের সেই মোট পণ্যের বিনিময়ে নূতন-নূতন মুদ্রা ব্যবহার করা যাইতে পারিবে, কোন মুদ্রাই একবারের বেশী ব্যবহারের প্রয়োজন পড়িবে না। আর একই সময়ে দেশের সমগ্র পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপার সম্পন্ন করিলে এই ব্যষ্টি-মুদ্রার জন্য যে ক্রয়-শক্তির উদ্ভব হইবে, উল্লিখিত সংখ্যা দ্বারা দেশের সমগ্র পণ্যকে বিভাগ করিলেও সেই ক্রয়-শক্তিরই উদ্ভব হইবে। সুতরাং দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদি দেশের প্রচলিত মুদ্রা পরিমাণ "ম" হয় এবং তাহাদের গড়-পড়তা কর্ম্ম-শক্তি "ক" হয়, তবে ম × ক এই পণ্যের বিনিময়ে ব্যবহৃত মোট মুদ্রা বলিয়া গণ্য হইবে। আর পণ্য দ্রব্যের পরিমাণ আমাদের কল্পিত সমবায়ী ব্যষ্টি মাত্রার হিসাবে যদি "প" হয়, অথবা মুদ্রায় ব্যষ্টি মাত্রায় কোন নির্দ্দিষ্ট সামগ্রীর, ধর ধান্যের, যে পরিমাণ ক্রয় করে, তাহাকে যদি এক মাত্রা ধরা যায়, তবে একশত মুদ্রা মূল্যের ঘোড়াকে ১০০ মাত্রা ধরা যাইতে পারিবে। এই ভাবে ধান্যের হারে দেশের পণ্য-পরিমাণ নির্ণয় করিয়া লইলে যদি উহা "প" পরিমাণ হয়; তবে

$$\text{ব্যষ্টি মুদ্রার ক্রয়-শক্তি} = \frac{\text{প}}{\text{ম} \times \text{ক}}$$

হইবে। কিন্তু দেশে একমাত্র আদর্শ মুদ্রাই প্রচলিত থাকে না। বাস্তব জীবনের সহিত তাহার ঐক্য সাধন করিতে হইলে, ক্রয়ের ভিত্তি ও অন্যান্য মুদ্রাও হিসাবে আনিতে হয়। তাহাতে আর কিছুই ইতর-বিশেষ হইবে না, কেবল মুদ্রার পরিমাণের ইতর-বিশেষ করিয়া লইয়া প্রকৃত ক্রয়-শক্তি কি, তাহা বাহির করিতে হইবে। এই সকল অতিরিক্ত মুদ্রার পরিমাণ যদি "ম'" এবং তাহাদের গড়-পড়তা কর্ম্ম-শক্তি "ক'" হয়, তবে তাহাদের মোট পরিমাণ ম' × ক' হইবে।

তখন

$$\text{মুদ্রার ক্রয়-শক্তি} = \frac{\text{প}}{\text{ম} \times \text{ক} + \text{ম}' \times \text{ক}'}$$

হইবে। এই গণিত সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, "আর সব অবস্থা ঠিক রাখিয়া" মুদ্রার পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি করিলে তাহার মূল্যেরও যথাক্রমে উত্থান-পতন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে পণ্য-দ্রব্যেরও মূল্যের যথাক্রমে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। তেমনি "আর সব অবস্থা ঠিক রাখিয়া" পণ্য-পরিমাণের সঙ্কোচ বা প্রসারণ হইলে, তাহার মূল্যেরও যথাক্রমে উত্থান ও পতন হয় এবং সঙ্গে-সঙ্গে সেই অনুপাতে মুদ্রার ক্রয়-শক্তিরও যথাক্রমে হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই যে মুদ্রার পরিমাণ ও তাহার ক্রয়-শক্তির মধ্যে একটা বিরুদ্ধানুপাত (Inverse ratio) সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহাকেই বিজ্ঞানের ভাষায় quantity theory of money কহে। আমাদের ভাষায় উহাকে মুদ্রার পরিমাণবাদ বা সংক্ষেপে পরিমাণ-তত্ত্ব বলা যায়। এই পরিমাণ-তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক সমাজে বিশেষ মর্য্যাদা

লাভ করিয়াছে। উহার সত্যাসত্য ও বাস্তব জীবনের সহিত উহার কতটুকু সামঞ্জস্য, তাহার পরিষ্কার পরিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, এই মূল্য-তত্ত্বের বিস্তৃত বিশ্লেষণ হওয়া আবশ্যক। ফলতঃ এই সিদ্ধান্তকে নিরপেক্ষ সত্য সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। মুদ্রার পরিমাণের সহিত তাহার ক্রয়-শক্তির একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে সত্য, কিন্তু তাহা সাক্ষাৎ ভাবে বিরুদ্ধানুপাত সম্বন্ধ না হইয়া, পরোক্ষ ভাবেই কেবল তাহার পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধিতে তাহার ক্রয়-শক্তির যথাক্রমে উত্থান ও পতনের দিকে একটা স্থির গতি হইয়া থাকে; এবং সেই গতি অনুযায়ী ফলোৎপন্ন হইলেও কোন বিরুদ্ধানুপাতে সে ফলের প্রতিষ্ঠা হয় না। আমরা পরে আমাদের এই বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। এই সম্বন্ধে আমরা বিশেষ ভাবে Prof. D. Kinley মহোদয়ের মতানুসরণ করিলাম। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়াই অনুমিত হয়।

সোনার পাখী

[শ্রীনিশিকান্ত সেন]

রেবা একে রাজকন্যা, তায় বিলাসিনী;—কাজেই সুন্দর, সৌখীন জিনিসের অভাব তাঁর কিছুমাত্র ছিল না। হাতীর দাঁতের সুন্দর খেলেনা, চন্দন-কাঠের কারুকার্য্য খচিত সুন্দর বাঁধাই পুঁথি, সোনার সুদৃশ্য দোয়াত, সুন্দর লেখনী, মণিমণ্ডিত উজ্জ্বল আসন, উজ্জ্বল ভূষণ—এক কথায় সুন্দর বলিতে যা কিছু, তিনি তারই পসরা সাজাইয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু এক মধুর মদির বসন্তে, যখন এক নূতন অচিন পাখী, তার পাখার নিচের শোভায় আকাশের ইন্দ্রধনুকে হার মানাইয়া দিয়া, আর কণ্ঠের আনন্দ ঝঙ্কারে কোকিল কণ্ঠকে লজ্জিত করিয়া, বাগানের বকুল-শাখায় উড়িয়া আসিয়া বসিল, তখন এক মুহূর্তে রেবার আশপাশের সুন্দরের হাটবাজার যেন নিতান্তই ম্লান কুৎসিত বলিয়া বোধ হইল। তিনি বায়না ধরিলেন, 'ঐ পাখী আমার চাই—ঐ অতি সুন্দর পাখী।'

লোকে বলিল, "এদেশেও তো ঢের-ঢের সুন্দর পাখী আছে,—আর বাজারেই ও কিনতে পাওয়া যায়। আকাশের ওড়া পাখী ভারি চঞ্চল। তারপর, বোধ হচ্ছে, ও বিদেশের পাহাড়ে পাখী! ওকে কি ধরা যায় কখনো?"

রেবার হাতে ছিল একখানি গল্পের পুঁথি; সেখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তিনি বলিলেন, "জানি না। কিন্তু পাখী আমার চাই। না পাই যদি, আমি মাথা-মোড় খুঁড়ে মরব।"

জগতে অনেক অসম্ভবও সম্ভবপর হইতে পারে; কিন্তু রাজকন্যার 'মাথামোড় খুঁড়িয়া মরা যে অতি ভয়ানক কথা!—সে কিছুতেই হইতে পারে না। অনেক ছোটাছুটি, ঘোরাঘুরি, ধস্তাধস্তি করিয়া অনেক দিনের পরে লোকেরা সেই পাখী পাকড়াও করিল।

রেবার আর যে সব বিলাসের উপকরণ, তার কোনটির জন্যই কখনো তাহাকে এত তৃষ্ণার জ্বালা, নিরাশের ঝড় পোহাইতে হয় নাই,—একরূপ ইচ্ছামাত্রই পৌঁছিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই যে চোখ জুড়ানো, মন-ভুলানো পাখীটা—এ যেন আকাশের ওপরকার কোন্ স্বপ্নভরা, অসম্ভব, অনিশ্চিতের রাজ্য হইতে তাহার হাতে আসিয়াছে; কি সুন্দর! কি সুন্দর! আহা মরি, কি সুন্দর!

সঙ্গিনীরা ডাকিয়া-ডাকিয়া ফিরিয়া যায়,—দাসদাসীরা খাবার কোলে করিয়া বসিয়া থাকে,—সখের জিনিসগুলি এখানে-সেখানে অনাদরে গড়াগড়ি যায়,—কোনো দিকেই তাঁর খেয়াল নাই।

যেমন সুন্দর পাখী, তেমনি সুন্দর খাঁচা। রেবার গায়ে নাই যে চুনিপান্নার ঝলক, তাই সেই খাঁচার গায়ে—জালের ফাঁকে-ফাঁকে। আর ঘেরাটোপেরই বা বাহার কত! তার সূচিশিল্প দেখিলে, বোধ করি, বিশ্বশিল্পীরও তাক্ লাগিয়া যায়। কিন্তু খাঁচায় পাখীর বেশিক্ষণ থাকিবার জো নাই। রেবা তাহাকে ধরিয়া আনিয়া চুমো খান, কোলে বসান, মাথায় রাখেন, বুকে চাপিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকেন, আর সময়-সময় পড়ান—তাঁর মনের মত যত সব নিজের রচা বুলি।

কিন্তু বনের স্বাধীন পাখীর কি এ-সব ভাল লাগিতে পারে? খাঁচায় থাকাও তার যেমন অসহ্য, হাতের স্পর্শও

তেমনি। খাঁচার ভিতর সে অতিষ্ঠ হইয়া ছট্‌ফট্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত,—খাবার হাজার ভাল হইলেও মুখ দিতে চাহিত না। ধরিতে গেলে চীৎকারে বাড়ী মাথায় করিত; ধরা পড়িলে জড়সড় হইয়া মড়ার মতো পড়িয়া থাকিত। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য মানুষের স্নেহের পরশ—ঠিক যেন যাদুকরের যাদু;—কিছুদিন যাইতে না যাইতেই পাখী যেন আর সে পাখী নয়, তার মধ্যে এমনি এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল। এবার সেই অতি ক্ষুদ্র—কঠিন, ঘেরাটোপে ঘেরা খাঁচায় বসিয়া পাখী ভাবিতে লাগিল,—কি আনন্দ! কি আনন্দ! অসীমের গন্ধে, স্পর্শে, শব্দেও আনন্দ ছিল সন্দেহ নাই,—কিন্তু সে বিক্ষিপ্ত, সে মুক্ত, সে অসংযত। আনন্দের সে রূপ যেন দেখিয়াও দেখি নাই, পাইয়াও পাই নাই। কিন্তু সীমার বন্ধনে সে যেন সঞ্চিত, সংযত এবং সম্বদ্ধ; তাকে ইচ্ছা করিলেই গলায় পরা যায়, চোখে পাওয়া যায়, প্রাণে ধরা যায়। ঐ্যাখো, ফুল এখানে গন্ধের বন্ধনে মালা, কথা ছন্দের বন্ধনে কাব্য, বাতাস বাঁশের বন্ধনে বাঁশরী। এখানকার প্রেমের বন্ধন জীবনের সার্থকতার বন্ধন। এ যদি দুঃখ, এ যদি দাসত্বের পীড়ন হয়,—আনন্দ আমি চাই না, মুক্তির বাতাসে আমার কোনোই প্রয়োজন নাই।

পাখী তাই এবার নূপুরের রুণ্‌ঝুন্ শুনিলেই পুলকিত হইয়া গায়—তাঁরই মুখের শেখানো গান;—

ভুলে গেছি বনের ভাষা,
আকাশ কেমন নীল!
তোমারি ওই নীলাঞ্চলে
প্রাণ পেয়েছে মিল।
তোমার গানে হারিয়ে গেছে
আমার গানের সুর,
আজকে আমি আপন-ভোলা,
তোমায় ভরপুর।

* * * *

কিন্তু একঘেয়ে—একঘেয়ে—বড় একঘেয়ে;—ক্রমশই যে সব নীরস, অরুচিকর, তিক্ত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চের রং চটিয়া কদাকার হইয়া গিয়াছে। দিনের পর রাতের দৃশ্য ব্যর্থতার হাহাকার লইয়া আসিতেছে, যাইতেছে। আলোর জ্বালা আছে দীপ্তি নাই; অন্ধকারের মসি আছে লাবণ্য নাই; ফল স্বাদহীন, ফুল গন্ধহীন, বাতাস নিশ্বাসহীন। আর শোনো ঐ খাঁচার পাখীর গান! গান, না ও নির্ব্বুদ্ধিরের কান্না? পাখীর রং কি খাবড়া! রঙের ফেঁসগুলো, চিত্র রেখার টানগুলো কেমন করিয়া যে মিলিয়া-জুলিয়া একাকার হইয়া গেল, কে বলিবে?

পাখী খাঁচায় বসিয়া গান গায়, রাজকন্যার নাম ধরিয়া ডাকে। তিনি উদাসভাবে আকাশের দিকে চান, অলসভাবে পুঁথির পাতা উল্টান, আর বিড়বিড় করিয়া কি বকেন। যাহাদের ডাকে একদিন তিনি সাড়া দেন নাই, মাঝে মাঝে তাহাদের নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে ইচ্ছা হয়। পাখী বলে, "তোমার কোনো অসুখ করেছে কি রাজকন্যা?"

রাজকন্যা নিরুত্তর।

"কোনো অসুখ করেছে, তোমার?"

জবাব নেই।

"ওষুধ খাও না কেন? কোথাও গিয়ে দিনকতক বেড়িয়ে এলেও তো হয়।"

রাজকন্যা বিরক্ত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যান।

হঠাৎ একদিন বাগানের অশোকগাছের দিকে চাহিতেই তিনি যেন চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন—আর এক পাখী! তার ঠোঁটে, তার পাখায়—তার প্রতি অঙ্গে, ভাবে ভঙ্গীতে কি রূপ-লাবণ্যের কুহক! দেখিতে দেখিতে তাঁর বুকের অন্তস্তল পর্য্যন্ত রঙীন হইয়া উঠিল। ভ্রমর তখন তান ধরিয়াছে, গাছের পাতায় কানাকানি সুরু হইয়াছে, আর হাওয়ায় ফুলের গন্ধে বসন্ত আসিয়াছে! অশোকতরু লালে লাল! বেল-জুঁই চাঁপা মুকুলিত, প্রস্ফুটিত তৃণ সবুজ-লাবণ্যে ঝলমল, বাতাস মাতোয়ারা! কিন্তু কখন্ আসিল বসন্ত? রাজকন্যার মনে হইল, আজ—এই দণ্ডে, ঐ পাখীর পাখার রঙীন অনুরাগে।

তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি পাখী চাই—পাখী—ঐ মন মাতানো নূতন পাখী।"

পাখীর উড়িয়া পলাইবার সাধ্য হইল না। লোকেরা ধরিয়া আনিয়া রাজকন্যার হাতে দিল। তিনি আর এক দিন, আর এক বসন্তে, আর এক পাখী পাইয়া যেমন খুশী হইয়াছিলেন, তাহাকে যেমন করিয়া আদর করিয়াছিলেন, ইহাকে পাইয়াও তেমনি খুশী হইলেন, এবং বলা বাহুল্য, তেমনি করিয়াই আদর করিতে লাগিলেন।

কাজেই পিতলের শিকলে ঝুলানো সোনার খাঁচা।

তারই রূপার দাঁড়ের উপর আগেকার পুরাণো পাখীটা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। দৃষ্টি ছিল রাজকন্যার দিকেই; কিন্তু সে দৃষ্টিতে দেখিবার শক্তি কিরূপ ছিল, অন্তর্যামীই বলিতে পারেন। হঠাৎ কেহ দেখিলে মনে করিতে পারিত, কখনই এ রক্তমাংসে গড়া আসল পাখী নয়—সোলার তৈরী নকল পাখী।

নূতন পাখীটাকে দাসীর হাতে দিয়া, রেবা নিজের হাতেই খাঁচার দ্বার খুলিলেন; তারপর পুরাণো পাখীটাকে উড়াইয়া দিবার জন্য হাততালি দিতে লাগিলেন। কিন্তু সে নড়িল না,—যেমন ভাবে বসিয়া ছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই বসিয়া রহিল।

"কি আপদ! এ যে নড়েও না!"—রাজকন্যা জোরে খাঁচার উপর আঘাত করিতে-করিতে কহিলেন, "দূর হ—দূর হ।"

অতি অস্পষ্ট ক্ষীণ স্বরে পাখী বলিল, "কেন—কি দোষ আমার রাজকন্যা?"

যেখানে প্রাণের সঙ্গে প্রাণের লেন দেন, কার-কারবার, সেইখানেই মানুষের শিষ্টতার প্রয়াস, ব্যবহার তার নম্র, কথা তার মধুর। কিন্তু যেখানে সে কারবার তুলিয়া দিবার জন্য হৃদয়ের দ্বার বন্ধ করিল, সেখানে তার ভদ্রতার অভিনয় সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। রেবা অসঙ্কোচে উত্তর দিলেন, "না হয় দোষ তোমার কিছুমাত্র নেই সবই গুণ; কিন্তু আমার ভাল লাগে না যাও।"

পাখী কহিল, "নিশ্চয় তোমার মনের অসুখ, সারাও,—এখনি আবার আমায় তোমার ভাল লাগবে। অসুখেই অরুচি। এই অরুচির মন নিয়ে কাকেও তোমার ভাল লাগবে না—কাকেও না। যদি লাগে, সে মুহূর্ত্তের জন্যে—মনের প্রতারণায়। মন থেকে অসুখ ঝেড়ে ফ্যালো, দেখ, সেই আমি, না-না তার চেয়েও ভাল। তুমি আমাকে যা শিখিয়েছ, তাই আমি শিখেছি। শোনো একবার মন দিয়ে,—তোমার সেই শেখানো বুলি আমি কত সুন্দর বলতে পারি;—

'ভুলে গেছি বনের ভাষা
আকাশ কেমন নীল,
তোমারি ওই নীলাঞ্চলে,
প্রাণ—'

"চোপ—চোপ রও"—রাগে অস্থির হইয়া রেবা কহিলেন, "শুনে শুনে কান ঝালাপালা—চোপ্।"

পাখী চুপ করিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার আড়ষ্ট পাখা দুটি দেখাইয়া, নিতান্ত কৃপা-ভিখারীর চক্ষে রেবার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "এই ছাখো রাজকন্যা আমার পাখার দশা; এ আজ আমার ওড়বার সহায় নয়—বাধা। তার পর বনের পথ অচেনা, আপনজনেরা পর। আজ আমি কেমন করে কোথায়ই বা যাই, আর কার কাছে গিয়েই বা দাড়াই?"

রেবা কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া কহিলেন, "সে সব আমি কিছু জানি না,—জানবার আমার দরকারও নেই। তুমি যাবে কি না, তাই বলো।"

পাখীও অকস্মাৎ শক্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, "না। এ সোনার খাঁচা আমার। এর অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার ক্ষমতা জগতে আজ কারো নেই—কারো নেই।"

বিবেচনা করিয়া দেখিলে কথাগুলি মুমূর্ষুর প্রলাপের মতোই অর্থহীন ও করুণার উদ্দীপক; কেন না, বাস করিতে দিলেই যে সোনার খাঁচায় পাখীর আমরণ অধিকার বর্ত্তাইবে, এমন কোনো কথা নহে। কিন্তু রাজকন্যার কাছে উহা নিতান্তই স্পর্দ্ধার মতো শুনাইল। অসহনীয় রোষে ফুলিতে-ফুলিতে কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি গলা টিপিয়া ধরিয়া পাখীকে খাঁচা হইতে বাহির করিলেন। খাঁচাতেও বিষম চোট লাগিয়াছিল; সেটা আংটা-মুক্ত হইয়া সশব্দে মেজের উপর পড়িয়া গেল। রাজকন্যা ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। মানুষে যেমন করিয়া অকাজের কাগজপত্র দুই হাতে পিষিয়া তাল-গোল পাকাইয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দেয়, তিনিও তাহাকে তেমনি করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

দাসীর হাতের নূতন পাখীটা ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।—কি কর্কশ, আতঙ্কজনক চীৎকার! রেবা আঁৎকাইয়া উঠিয়া পাখীর দিকে চাহিলেন, "এ কোন্ পাখী?"

দাসী চটিয়া গিয়াছিল। পুরাণো পাখীটার উপর তাহার মমতা জন্মিয়াছিল,—ইদানীং সে-ই তাহাকে দেখিত-শুনিত। কোনো কথা না কহিয়া নূতন পাখীটাকে রেবার চোখের কাছে তুলিয়া ধরিল!—গোলাকার, রক্তহীন স্থির-চক্ষু, পাণ্ডুর-মুখ, উচ্ছৃঙ্খল শিথিল-পক্ষ! এ সৌন্দর্য্য, না বিভীষিকা? মুখ ফিরাইয়া রেবা দাসীর হাতে আঘাত

করিলেন। পাখী পড়িতে-পড়িতে কোনোরূপে উড়িয়া পলাইল।

মুক্ত-দ্বার, শূন্য-পিঞ্জর শানের উপর কাত্ হইয়া পড়িয়া আছে। তার বুক-ফাটা দুঃখের ভাষাহীন গভীর ক্রন্দনে যেন সমস্ত ঘরখানি বেদনায় পরিপূর্ণ। রেবা আকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "পাখী কই?—আমার পুরাণো পাখী—সেই সোনার পাখী আমার?"

দাসী কথা কহিল না; কিন্তু রেবা দৃষ্টিহীন পলকহারা চোখে তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর ঝড়ের বেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

পাখী জানালা গলাইয়া বাগানে পড়িয়াছিল,—রেবা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

দাসীও সঙ্গে-সঙ্গেই গিয়াছিল; কহিল, "এত ভালবাসা এতক্ষণ তোমার কোথায় ছিল রাজকন্যা?"

লজ্জা, ভয় ও অনুতাপ—এই তিনের সংযোগে বিবর্ণ হইয়া রেবা কহিলেন, "বড্ড কঠিন ব্যবহার আমি তার সঙ্গে করেছি—না?"

দাসীর মনের আক্রোশ তখনো মেটে নাই; শক্ত হইয়া কহিল, "সে কথা আবার জিজ্ঞেস কচ্ছ কিগো রাজকুমারী!"

রেবার বুকের ভিতরটা ধুক-ধুক করিতে লাগিল; কি একটা গভীর নেশায় তিনি আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন; কি যে করিয়াছেন, ভাল করিয়া মনে হইতেছে না; ভয়ে-ভয়ে কহিলেন "সত্যই আমি কঠিন—বোধ হয় পাষাণেরি চেয়েও। কিন্তু কত কোমল, কত নরম, কত মধুর আমি হতে পারি, দেখাবো—যদি তাকে পাই, শুধু আর একটিবার।"

বিদ্রূপের একটা রূঢ় হাসিতে বাগানকে চকিত করিয়া দাসী কহিল, "তুমি এখনো জ্যান্ত পেতে চাও তাকে?"

শিহরিয়া উঠিয়া রেবা কহিলেন, "কেন চাইব না!—আমি কঠিন বলে কি এতই কঠিন!—"

প্রতিবাদ অনাবশ্যক; হাতে-হাতে প্রমাণ দিবার জন্য দাসী অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিক অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু পাখী কোথাও পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল, এক জায়গায় মাটিতে খানিকটা রক্ত, আর খানকতক পালক। কহিল, "দেখতো রাজকন্যা!"

রেবার চোখে দৃষ্টি থাকিয়াও ছিল না; মাটিতে বসিয়া পড়িয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই রক্ত, আর সেই পালকের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর হাতে যে সোনার কঙ্কণ ছিল, তারই ঘা তাঁর নিজের কপালে মারিতে লাগিলেন।

মিলনে

[শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ]

যেদিন তোমারে ছেড়ে চলে যাই সরিয়া,—
কত বেজেছিল তব মরমে,—
তোমার ও-ক্ষীণ বাহুলতা দিয়া ধরিয়া
কত বলেছিলে আধ-সরমে!
ডাগর ও-দুটি আঁখি-উৎপল তুলিয়া
কত ভাষাহীন গীতি গাহিলে,
স্নিগ্ধ ক'ফোটা ব্যথা-ভরা জল ফেলিয়া
কত মান-করা বর চাহিলে!
উদাসীর মত আঁচলখানিরে টানিয়া,
দিলে আঙুলে আমার জড়ায়ে,
নীরবে কেবল হাতখানি মোর টানিয়া
দিলে আবার তাহারে সরা'য়ে।
নীরব-নিশাস সঘন-চকিতে আসিয়া
বুকে মিলাল কাঁপিয়া-কাঁপিয়া,—
মুক্ত উদার কম্পিত-রাগে হাসিয়া
তোমা বক্ষে ধরিনু চাপিয়া!
আর আজি—কত অশেষ নরন ধরিয়া
[illegible] বিরহে,—
মুহু বাঞ্ছিত ঘন মিলন সুমুখে করিয়া,
বাধা সন্দেহ তবু কি রহে?
তবে অচপল নয়নে কিসের লাগিয়া
উঠে উছল অশ্রু ভরিয়া,
কেন অবিরল কম্পন বুকে জাগিয়া
তুলে এমন ব্যাকুল করিয়া?—
অকথিত বাণী কণ্ঠে যে যায় থামিয়া
কাঁপে অধরে অধর রাখিতে,
একি বিরহের বেদনা চকিতে নামিয়া
ওগো ঝরে মিলনের আঁখিতে!

স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ

[শ্রীসত্যবালা দেবী]

"But the national movement for the education of girls must be one which meets the national needs, and India needs nobly trained wives and mothers, wise and tender rulers of the household, educated teachers of the young, helpful counsellors of their husbands, skilled nurses of the sick, rather than girl-graduates educated for the learned professions".—Annie Besant.

"কিন্তু জাতীয় স্ত্রীশিক্ষা প্রচার আন্দোলনের লক্ষ্য নিশ্চয়ই তাই, যা জাতীয় দাবী মিটাতে পারে। ভারতবর্ষে জাতি দাবী কচ্ছে,—সুশিক্ষিতা জননী ও জায়ার, স্নেহময়ী গৃহকর্ত্রীর, নিপুণা শৈশব শিক্ষাদাত্রীর, আর্ত্ত ও পীড়িতের সেবিকার, আর, স্বামীর সহায়রূপিণী উৎসাহ-মন্ত্রণাদাত্রী সুহৃদ্ধর্ম্মিণীর। জাতি এখনো চায় না, উচ্চ উপাধিধারিণী হয়ে মেয়েরা বড় বড় জীবিকার উপার্জ্জন-প্রার্থিনী হয়ে দাঁড়াক।"—অন্ন বাসন্তী।

বিদেশিনী রমণীর বাণী বটে, কিন্তু এত অল্পে, এমন স্পষ্ট করিয়া সতেজে কোনও সমাজ-নেতারও মুখ দিয়া জাতির দাবী বাহির হইতে শুনি নাই। যেমন ভাবে জীবন গঠন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে ঐ কাজগুলি সম্পন্ন হইতে পারে, মেয়েরা তেমনি হউক, ইহাই জাতির চিরন্তন প্রার্থনা। সামান্য আচার ও আচরণের তফাৎ ছাড়া, মূল বিষয়গুলি চাওয়ায় দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও অভিমতের মধ্যে কোনও ঠোকাঠুকি নাই। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্ম, এমন কি নাস্তিকও, ইহার বেশী কিছু চান না। মোটামুটি মেয়েদের কাছে চাহিবার বিষয় ঐ। যে ছাঁচে ঢালাই করিলে গৃহলক্ষ্মীগুলি উল্লিখিত গুণসম্পন্না হইয়া উঠিবেন, সেই ছাঁচখানার নামই ছিল স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের আমলে শাস্ত্রের বিধান; এখন—শিক্ষার যুগে, তাহাকেই আমরা স্কিম, প্লানস্, সিলেবস্ প্রভৃতি বলিতে শিখিয়াছি। ভারতে চিরদিন ঐ কর্ত্তব্যগুলি সম্পাদন, মেয়েদের ধর্ম্ম বল, আদর্শ বল, জীবনের লক্ষ্য বল, যাহা কিছু বলা যায়, সকলই বলিয়া আসিয়াছি। আর উহারই পথপ্রদর্শনার্থ, দীক্ষা বল, অনুষ্ঠান বল, মোক্ষ বল, স্নান বল, দান বল—যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে, দিয়া আসিয়াছি। উহাতে উদ্দীপনা প্রদর্শনার্থ, পুরাণ বল, পুঁথি বল, পাতি বল—সমস্তই রচিত হইয়া আসিয়াছে।

কথাই এই, কোনও দেবতা, সিদ্ধ, সার্ব্বভৌম—কেহই সুখ, শান্তি ও যুগপৎ অহিংসা অভ্যুদয়ের সঙ্গে জীবনের ঐ বিশিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে সাম্রাজ্ঞীর গৌরবে মেয়েদের স্থাপনা করা

ছাড়া আর কিছুই চাহেন নাই। এই সংসার, এই ইহলোক মধ্যে ওই সকল কর্ত্তব্য পরার্থপরতার গৌরবে বিমণ্ডিত করিয়া তোলা ছাড়া, যশস্বিনী রমণীর আর কোনও স্বর্গ নাই, কোনও বৈকুণ্ঠ নাই। যাঁহারা ধর্ম্মশিক্ষা প্রবর্ত্তিত—পরিবর্ত্তিত করিতেন, তাঁহারা ইহা জানিতেন। যাঁহারা ধর্ম্মাচরণে কৃতকার্য্য হইতেন, ঠিক্-ঠিক্ ধর্ম্মবস্তু যাঁহাদের লাভ হইত, তাঁহাদেরই কাছে সমস্ত স্পষ্ট হইয়া যাইত। ধর্ম্ম চিরদিনই আছে—স্পষ্টতাও চিরদিনই আছে। কুধর্ম্মের মধ্যেই অজ্ঞানের আবর্জ্জনা।

এত কথা বলিতেছি এই জন্য যে, আজ স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ বুঝাইতে বসিয়াছি। পুরুষেরা শিক্ষার নামে পরানুকরণে অভ্যস্ত হইয়া, আর শিক্ষিত জীবন যাপনের নামে পরানুসরণে ও পরদাসত্বে দীক্ষিত হইয়া, এখন অবশেষে বেশ ঠেকিয়া বসিয়াছেন। ও-পাপে আর মেয়েদের দীক্ষিত করিয়া তুলিতে তাঁহাদের স্পৃহা নাই। তাঁহারা চান জাতীয় শিক্ষা। এ জাতিটা ধর্ম্মপ্রাণ জাতি—ভারতের মেরুদণ্ডই ধর্ম্ম; সুতরাং জাতীয় শিক্ষা বলিতে ধর্ম্মই আসিয়া পড়িবে। ওগো! ধর্ম্ম আকাশকুসুম নহে। দীক্ষা, অনুষ্ঠান, সিদ্ধির মধ্য দিয়া ধর্ম্ম-সাধনাটা এই শিক্ষারই একটা আগাগোড়া ব্যাপার। তাহাকে হারাইলেই দূর-দূর অসাধ্য, অসম্ভব-প্রায় মনে হয়; পাইলে বুঝিবে সে প্রতি নিমেষের। লেখাপড়া, রান্নাবাড়া, সেবাশুশ্রূষা, আত্মীয়তা, আলাপ সমস্তের মধ্য দিয়াই তাহার একটা অবিরত প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে।

বিশেষ আবার, আমাদের খুব একটা স্পষ্ট কথা, আমাদের সমাজে—মাত্র আমাদেরই সমাজে,—পুরুষেরা জোর দিয়া বলেন, চিরদিন বলিবেনও,—আমরা, Girl graduates educated for the learned professions চাহি না। কথাটার অকপট উক্তি হৃদয়ের অফুরন্ত সম্বলেরই দ্যোতনা করে। পাশ্চাত্যে পুরুষ জাতি-হিসাবে ঠিক এই ভাবটাকে ধরিতে পারে না;—সত্যই প্রাচ্য অপেক্ষা সেখানে তাহাদের হৃদয়ের সম্বল কম। যদি পুরুষের মহত্বে অভিভূতা ও ঔদার্য্যে রক্ষিতা নারীর জীবিকা-চিন্তা বাহুল্য মাত্র প্রমাণিত হয়, তবে, এখন, শিক্ষার সমস্তটাই ধর্ম্ম-শিক্ষা দাঁড়াইয়া যাইবে।

অবশ্য ধর্ম্মের অর্থ ব্যাপক;—যে ভাবে ইহার অর্থ ধরিতেছি, তাহা ধরিলে,—নতুবা নহে।

কিন্তু, যদি আমার এ কথা তোমাদের মতের সহিত এক না হয়; যদি তোমরা বল, ধর্ম্ম অত সহজ নহে; আর এত সপ্রতিভ ভাবে ধর্ম্মের কথা বুঝাইবার তুমিই বা কে? "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং"। কত দীর্ঘকাল গহ্বরে, অন্ধকারে যোগানুষ্ঠান, কত ব্রত সংযমানুষ্ঠানে সমস্ত জীবনটা কাটাইয়া, অবশেষে লম্বিত জটা, শুষ্ক দেহ, বল্কলবৎ শরীর মন হইয়া, তবে মানুষ ধর্ম্মশিক্ষা দিবার উপযুক্ত হয়। এ ধর্ম্ম সহজে কেহ দিতে পারে না, সহজে কেহ নিতেও পারে না;—ধর্ম্মটাই যে সহজ জিনিস নয়। মনুষ্য জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টসাধ্য, সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভ বস্তুই যে ধর্ম্ম। অবশ্য, উত্তর দিবার আমার আছে যে, হাঁ, ধর্ম্মলাভ সত্যই সহজ নহে; সত্যই তোমার শতজন্মেও, সহস্র ভেল্কিবাজি ডিগ্‌বাজিতেও হইবে না—যতক্ষণ না ধর্ম্মকে তুমি সহজ বলিয়া বুঝিতে পারিবে। থাকিলেও, সে কথা উপস্থিত ক্ষেত্রে আনিতে চাহি না। আমি ইহাই বলিব, বেশ, আমার মুখে ধর্ম্মের কথা যদি তোমার সংস্কারে আঘাত করে, তাহা আমি উচ্চারণ করিব না। শিক্ষার কথা, স্বার্থের কথা, সুখের কথা—এ ত' শুনিতে পারিবে? যাহা জানিবার জন্য পুরুষানেরও দ্বারস্থ হইতেছ! তোমার শ্রদ্ধা ভক্তি, আপন বুদ্ধি অনুযায়ী, তুমি যেখানে দিতে পার, দাও; মাত্র তোমার মনটুকু পাইলেই, আমি আমার যৎকিঞ্চিৎ যে অবদান আছে, তাহার বোঝা নামাইতে পারিব।

মেয়েদের যাহাই বল,—দেবীই বল, আর নরকের দ্বারই বল,—কার্য্যতঃ, আজ তাহাদের স্থান কোথায়? সংসারেই। নিন্দা করিলেও সেই তাহার কাজ তাহারই দ্বারা চাই; আবার পূজা পীঠে বসাইলেও আপনার কাজ হইতে তাহার ছুটি নাই। যে ভাবেই যাও, উপরে যে কথাটুকু Besantএর লেখা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাকে অস্বীকার করিতে পার না। ওটুকু একেবারে জাতির মর্ম্মের দাবী। সমস্ত বিরোধ-বৈষম্যের মধ্যেও, প্রাণের চাওয়ার মধ্য হইতে সকলকেই ওখানে এক স্থানে পৌঁছিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। অনুভূতির একটু গভীরতম অংশে প্রবেশ কর, কথাটা হৃদয়ে স্পর্শিবে।

সকলে আপনার বুদ্ধিমত উপায় প্রয়োগ করে মাত্র। রক্ষণশীল যেমনটা বুঝিয়াছে, তেমন করিয়া মেয়েদের আপন কাজ শিখাইয়া লইতে চায়। উদার-নৈতিক—অহিন্দু—অনাচারী সকলের পক্ষেই এ কথা প্রযোজ্য। সকলের মধ্যেই অভিজ্ঞতা বলিয়া একটা পরম রহস্যময় বস্তু আছে, যাহার নাম এক, কিন্তু রূপ সহস্রাধিক। সেই ত' প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মানুষের ভিতর পৃথক-পৃথক আচার-ব্যবহারের

সৃষ্টি করিয়াছে। এই অভিজ্ঞতার কুহকেই কেহ মেয়েদের বদ্ধ করিতেছে, কেহ-বা অবাধে ছাড়িয়া দিতেছে। কেহ তাহাদের বিলাসের উপকরণ আহরণে, আপনার-পরের রক্ত-পাতে পৃথিবী ভাসাইয়া দিতে দৃক্‌পাত করে না;—কেহ বা, তাহাদের সংযমের, কৃচ্ছ্রসাধনের অভ্যাসে অটুট রাখিবার জন্য আপনারও সমস্ত জীবনটা তাহাদেরই সঙ্গে চতুর্দ্দিকের অবরুদ্ধতায় বদ্ধ করিয়া, "কর্ম্মে বাধা, ধর্ম্মে বাধা, গতিপথে বাধা"—সহস্র বাধা রচনা করিতে সোৎসাহে প্রস্তুত। মোটের উপর কিন্তু কথা এই,—মেয়েদের দিয়া কেমন করিয়া কাজ করাইয়া লইতে হইবে ও তাহাদিগকে কাজ করার উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে, তাহা লইয়াই মতভেদ, বৈষম্য। কি কাজ তাহাদের দিয়া করাইয়া লইতে হইবে, সে নির্ণয়ে সকল মানুষই এক স্থানে রহিয়াছে।

মোটের উপর তাহা হইলে কথা এই দাঁড়াইল যে, শিক্ষার আদর্শ সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে অনেক দিন হইতে ঠিক হইয়াই আছে। সেটা আর বদলাইবার নয়। জননী, জায়া, গৃহকর্ত্রী, শিক্ষাদাত্রী, সেবাকুশলা এই সকল হওয়াই মেয়েদের কর্ত্তব্য। যদি তাহারা স্বভাবতঃ না হইয়া উঠিতে পারে, সকলে মিলিয়া তাহাদের সাহায্য করিতে হইবে,—যাহাতে তাহারা হইয়া উঠে। এই সাহায্য করাটাই শিক্ষা।

সত্যই, আমরা এইটুকুই বুঝি যে, মেয়েদের যাহা হইয়া উঠা তাহাদের সার্থকতা, সেইটা করিয়া তোলার নামই স্ত্রী-শিক্ষা। এই প্রকার উদার শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, হয় ও হইতেছে। তাহাদের যেটা প্রাপ্য, তাহারই প্রাপ্তি সুগম ও সুশৃঙ্খল করিয়া দেওয়া,—তাহাদের যেটা দাতব্য, সেটা দিবার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া,—নারীজন্মের সার্থকতার পথ প্রস্তুত ইহারই নাম। ধর্ম্মাচরণ এই পথ নহে কি?—এই পথে [illegible] ধরানটুকুই ত শিক্ষার কাজ। বিংশ শতাব্দীতে মুনিঋষির যুগের ব্যবহারের একটা স্মৃতি—এখনও সংস্কারের মধ্যে রাজত্ব করিতেছে না কি? তাই, লেখাপড়ার, শিল্প-গার্হস্থ্যের আবার ধর্ম্মের সামঞ্জস্য আমরা অসম্ভব ভাবি। ভাবি, শিক্ষা, শিল্প—গার্হস্থ্য নয়, ধর্ম্ম—আলাদাই দেওয়া চলে,—এক-সঙ্গে অসম্ভব।

এই বুদ্ধি যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ আমরা, দায়িত্ব ঘাড়ে পড়িলে, শিক্ষার কাজ অপেক্ষা কাজের ব্যবস্থাটাকেই বড় করিয়া তুলিব। কর্ম্মীর সন্ধান করিবার সময়, শক্তি ও অভ্যাস অপেক্ষা, অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যই চাহিয়া বেড়াইব। আমরা সভা করিব, পুস্তিকা ছাপাইব,—লোকের মত ও আমার মত এক হউক—এই অপেক্ষায় পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে থাকিব,—পথ বলিয়া জোর করিয়া একটা কিছু অবলম্বন করিতে পারিব না। ঠিক যদি অনুভব করিতে পারি যে, মানুষ যাঁহাকে চাহিতেছে, তিনি জাগিয়াছেন আমাতে,—আর নিজেকে কোনও কিছুর মোহেই সকল হইতে আড়াল করিব না, সে ভালবাসা শিখিয়াছি,—তখন কি আটকায়?

ঠিক এ ভাব ত শিক্ষাদানের প্রেরণা জাগায় নাই। প্রয়োজন বোধের দিক্ দিয়া একটা অস্পষ্ট ইচ্ছাই এতদিন জাগিয়া আসিতেছে,—আমরা বুদ্ধি ও কাগজ-কলম লইয়া হিসাব ছকিতে বসিয়া যাইতেছি। ভাবিতেছি, কে কবে ক্ষণিক উচ্ছ্বাসে কোথায় কি বলিয়া চীৎকার করিয়াছে। আমার দোকানটী কত রূপ মণিহারী জিনিসে সাজাইলে সকল শ্রেণীর ক্রেতার মনোহরণ করে। ধর্ম্ম, ধর্ম্ম—এ চীৎকার আসর জমাইতে অদ্বিতীয়;—দাও ছুড়িয়া ধর্ম্ম। (Prospectus) অনুষ্ঠানপত্রের গোড়াতেই বাঁকা বাঁকা Italics অক্ষরে চট্‌পট্ করিয়া লিখিয়া ফেল—I. Religious and moral education। তার পর ধর্ম্মের পথের খেজুরশাল গোঁড়ামী। কিন্তু তাহার উপায়ও আগে করিয়া রাখা হইয়াছে,—ভয় কি—ঐ যে কথা বসান হইয়াছে moral—ও একেবারে সর্ব্বব্যাধি-বিনাশন অস্ত্র।—উহারই জোরে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় হইয়া যাইবে—এখন কেবল নিঃসঙ্কোচে বড়-বড় নামগুলি বসাইবার অপেক্ষা। দাও মহাভারত, রামায়ণ, মনু, স্মৃতি, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা—দাও ভগবদ্গীতা, হংসগীতা, অনুগীতা—দাও উপনিষদ, বেদান্ত-সূত্র—দাও পূজা, হোম, বেদগান, যোগ, মুখে মুখে অষ্টাদশ পুরাণ, এমন কি হাতে হাতে প্রত্যেক ব্রতটা পর্য্যন্ত। তার পর Islamic, Zoroastrian, Christian ধর্ম্মের সহিত স্বধর্ম্মের কিঞ্চিৎ-কিঞ্চিৎ তুলনা ও স্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার বিচার। ব্যস্, শিখাইবার আর কিছুই বাকি রহিল না। ধর্ম্মশিক্ষা যাহারা চায়, তাহাদের আর কেহই বলিতে পারিবে না—'আমার অমুকটি বাদ গেল'। আবার শুধু ধর্ম্মশিক্ষা দিলে ত বিদ্যালয় 'মঠ' দাঁড়াইয়া গেল। মেয়েকে ত আর সন্ন্যাসিনী গড়িতে কেহ চায় না। সেটা স্মরণ রাখিয়া এইবার বিস্তার বহর দেখাইতে আরম্ভ কর; লেখ—II. Literary education। জার্ণাকুলার

বলিয়া তাহার মধ্যে হিন্দি উর্দ্দু বাঙ্গালা মারাঠা গুজরাটী তেলেগু তামিল, অন্ততঃ এই কয়টা থাক। Classic এর মধ্যে সংস্কৃত আরবী লাটিন। তার পর compulsory language থাক English—রাজভাষা। তার পর এইবার অন্যান্য বিষয়—Geography, History, গণিতশাস্ত্র ইত্যাদি ইত্যাদি। এইবার, এতক্ষণ ত গেল Theoretic দিক,—Practical দিক চাই ত;—লেখ, III. Scientific education। তার ভিতর—Knowledge of Sanitary laws, Value of foodstuff, Nursing the sick, Simple medicines, 'First aid' in accident, Cookery, Household management, the Hygiene of the household, the value of fresh air, sun-light, and scrupulous cleanliness, the effects of the foodstuffs on the body in the building of muscular, nervous and fatty tissues, their stimulative or nutrient qualities। আবার জীবনের সৌখীন দিক আছে ত; তাহাদের জন্য থাক,—IV. Artistic education। ইহার ভিতর চিত্র-শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি ইত্যাদি। V. Physical education। ইহার ভিতর ও বাহির উভয়বিধ স্থানের উপযুক্ত করিয়াই নানা প্রকারের কসরৎ দেওয়া থাক।

এমন করিয়া কলমের প্রবল তোড়ের মুখে, কাহারা শিখিতেছে সে কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়া, কি-কি শিখান হইবে তাহারই তালিকা প্রস্তুত। তার পর যাঁহারা শিখাইবেন, তাহাদের দীর্ঘ-দীর্ঘ বৎসরের স্বাস্থ্যপাত করিয়া বিদ্যার্জ্জনের সনন্দ-পত্র আছে কি না—যে বাড়ীতে শিখান হইবে সেটা কত বড় করা যায়,—একসঙ্গে কত মেয়ে সেখানে বসিতে পারে, —মেয়ের অভিভাবকদের সম্ভব-অসম্ভব, সত্য-মিথ্যা, কল্পিত-অমূলক সর্ব্বপ্রকার ভয়ের প্রতিকারার্থ কতরূপে কত প্রকারের ব্যবস্থা আমরা করিতে পারি—এই সব লইয়াই আমরা মাথা ঘামাইয়া আসিয়াছি। দেখিলাম, কোনও ফল হইল না। মেয়েরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একদিনের জন্যও এ শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে অগ্রসর হইল না। যে সব মেয়েকে আমরা আমাদের হাতে লইয়া, আমাদেরই মতের অনুযায়ী আমাদের পথে চলাইয়া শিক্ষা দিলাম, তাহারা পরিশেষে, উত্তর-জীবনে—মেয়ে বলিয়া জীবনের যে সার্থকতা প্রচলিত আছে, তাহার সহিত যাহা খাপ খায়, সেই টুকুই পাইল; শিক্ষার সার্থকতাটা তাহাদের মিলিল না।

আজ অবশ্য এটা স্পষ্ট হইয়াছে যে, যে শিক্ষা দিলে, মেয়েদের ঐ মেয়েটুকু যেমন প্রকৃতির নিয়মে জীবনের সার্থকতা পায়, তেমন ঐ শিক্ষাটুকুও প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়া সার্থকতা লাভ করিবে,—সেই শিক্ষাই সার্থক শিক্ষা। তাই দেশ স্পষ্ট বলিতে পারিতেছে learned profession এ মেয়েদের পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। দেশ বুঝিতেছে, পুরুষের হাত হইতে তাহারা মেডেল লইতে পারিবে না, পুরুষেও ছাড়িবে না। মেয়েরাও বুঝে, আমরা কি হইতে পারি;—পুরুষেরও স্পষ্ট ধারণা হইয়াছে, তাহারা কেন ও কোন রূপে মেয়েদের চান। সত্যই ত, পরস্পরের স্বাভাবিক হওয়া ও চাওয়ার শৃঙ্খলায় আঘাত না করিয়া, নারীর উন্নতি ও স্বাধীনতার পথ প্রকৃতই line of least resistance।

তাই বুঝা যাইতেছে, পুরুষালি ধাঁচে মেয়েদের শিক্ষা-প্রবর্ত্তন ভুল;—মেয়েদের আত্ম-সম্মান, উন্নতি, স্বাধীনতা লক্ষ্য করিয়া, তাহাদের self determination এর উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত শিক্ষাই, প্রকৃত শিক্ষার আদর্শ। এ শিক্ষা সম্পূর্ণ মেয়েলী হওয়া চাই। পুরুষের সব যে তাহাদের জন্য নয়, তাহা সকলেই জানে। প্রকৃতই, দেখিতে ত পাইতেছি, পুরুষের সম্মুখে মেয়েদের individuality থাকে না। তাই, আর একদিকের কথা,—প্রকৃতির দিকে তাহাদের একটা নিজস্ব শক্তির খেলা আছে, সেখানে তাহারা আপনার ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে। রবিবাবু চিত্রাঙ্গদায়, মদন ও বসন্তের কাছে রাজ-কন্যার আত্মপরিচয় স্থলে, তাঁহারই মুখ দিয়া একটা জিনিস বাহির করাইয়াছেন। যেটা যিনি বুঝিয়াছেন, আমার কথাটা তাঁহার বুঝা সহজ হইবে;—সেই জিনিসই বিলাসের ভাবটা বাদ দিয়া লইতে পারিলে একটা জিনিস দাঁড়ায়। লজ্জা করিবার কিছু নাই। নারীর সম্বন্ধে যত ধারণা আজ প্রচলিত, সমস্তই পর-কল্পনা, পরের অনুভবের মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে। Self determinationকেই আজিকার অনেক সংস্কারেরই উপরে উঠিতে হইবে, তবেই তাহা ঠিক পরিষ্কার ও সত্য হইয়া একটা নির্দ্দেশের পথে চলিতে আরম্ভ করিবে।

নারী অশিল্প নহে। তরু, লতা, জীব, মানুষ—সকলেরই

মত সেও একেরই একটা বুদ্বুদ বিকাশ। তুমিই বা কে, আমিই বা কে, আর অমুক মহামহোপাধ্যায়ই বা কে, কার এত বড় ক্ষমতা যে তাহাকে গড়িতে পারে? যেটা গড়িবার জিনিস নয়, হইয়া উঠিবারই জিনিস—তাহাকে হইয়া উঠিতেই দাও। কি-কি শিখাইতে হইবে স্থির করা প্রবীণ হইতে মূর্খ সকলেরই অন্ধকারে হাতড়ান। বরং অন্যদিকে নজর দেওয়াই উচিৎ, দেখ কাহারা শিখিতেছে। তাহাদের, তুমি এবং তোমার প্রয়োজন হইতে, স্বতন্ত্র নিজস্ব একটা বিকাশ আছে, অভিমানান্ধতায় অস্বীকার করিও না। যদি সত্যই দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন বিধাতা তোমায় করিয়া থাকেন, সেই স্বতন্ত্র বিকাশটাকেই লক্ষ্য করিতে থাক, বৰ্দ্ধিত করিতে থাক, রক্ষা করিতে থাক, যেন কোনও রূপ আবর্জ্জনায় তাহা রুদ্ধ বা রূপান্তরিত না হয়। তার পর সেই জিনিসটার বিশ্বজীবনে সংযুক্ত হইবার যোগসূত্র ধরাইয়া দাও।

অবশ্য শিক্ষার উদ্যোক্তৃগণের দোষ কি? তাঁহাদের উদ্দেশ্য ভালই থাকে। মঙ্গলের ঈষৎ প্রেরণা, সত্যের অস্ফুট ঈষণা লইয়াই তাঁহারা কর্ম্মোৎসাহ অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা ত সমাজেরই লোক; আর এই সমাজেই চাপে চাপে বিচূর্ণীকৃত নারীর অঙ্গ আপনাকে এমন করিয়া হারাইয়া ফেলিয়াছে যে, তাহার মস্তিষ্কের একটা রেখাও আর দৃশ্যমান নহে। তাঁহাদের দোষ কি? যে জিনিস সমস্ত পিষিতেছে, সেইটাই তাঁহাদের প্রেরণাকেও পিষিতে থাকে। সে ত্রিবিক্রমের একটা পা যে তাঁহাদের মাথায়ও রহিয়াছে। তাহারই প্রভাবের গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া মুক্তির দরজা তাঁহারা কেমন করিয়া খুলিতে পারেন?

স্কিম, প্ল্যান্ ঐ চাপের কাছে সম্ভ্রম প্রদর্শন যতক্ষণ করিবে, তাহারা কা[illegible] কাগজই থাকিবে। শক্তির অদম্য আবেগ কল্পনার স্বর্ণ পটে যে চিত্র আঁকে, তাহাকে, সব সময়ে Arithmetical calculationএর মত ছকিয়া সকল স্তরের লোকের বুদ্ধির উপযুক্ত করিয়া ধরা যায় না।

ত্রিবিক্রমের পদভার তুলনা দিয়া, বিচূর্ণীকৃত করে, পিষিতে থাকে প্রভৃতি অভিযোগ কাহার নামে করিতেছি? আলো-আঁধারের ধূপছায়ায় ফেলিলে অনেকেই মনে করিয়া থাকিবেন, ওখানটায় বুঝি সমাজকে কটূক্তি করিতেছি। আমাদের সমাজে সমাজ-গঠনের যে বৈশিষ্ট্য বিকশিত হইয়াছে, সত্যই আর-আর সকল সমাজ হইতে সেটাকে কম শ্রদ্ধা করি না। আমি ত্রিবিক্রম বলিতেছি সেই গ্লানি, সেই চ্যুতি, সেই অস্বাভাবিকতাকে, যে আমাদের সুমহান্ আদর্শ অতি উৎকৃষ্ট পন্থাগুলিকেও ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। যে সর্ব্ববিকাশের পথকে অবরুদ্ধ করিয়া দিয়া, সর্ব্বনাশের, সর্ব্ব নিরোধের মধ্যে আমাদের জড় মূঢ় অভ্যাসের অচলায়তন গড়িয়া বসিয়াছে।

দেখই না কেন, আমাদের কি নাই? হীরকের অফুরন্ত খনি আমাদের আদর্শের ভাণ্ডার। কি সুমহান্ স্বর্গই না সেখানে প্রতিষ্ঠিত! আর সেই স্বর্গের অধিকারিণী অধিষ্ঠাত্রী কাহারা—দেবাঙ্কে প্রতিষ্ঠিতা দেবীত্বের মার্গানুসারিণী মাতৃকার দল,—যে দলে মহেশ্বরী কমলা ইন্দ্রাণী; আবার তাহাদের অংশ অর্থাৎ সেই আদর্শের অনুবর্ত্তিনী, অরুন্ধতী, প্রকৃতি মেনকা, গৌরী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যা, সুভদ্রা—আর্য্য কল্পনার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সৃষ্টি কৃষ্ণসখী দ্রৌপদী প্রভৃতি—যে সকল পূত চরিত-গরিমা আমাদের শ্রদ্ধার স্বর্ণফলক হইতে মুছিবার নয়। তাঁহাদের জীবনাখ্যায়িকা ভারতকে কোন্ দান দিবার জন্য এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। একটা সুমহান্ ভাব, যে ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক জীবন দেবতা ও স্বর্গের সার্থকতা আনয়ন করিবে। এই সমস্ত লইয়া আমরা বাস্তব জীবনে পরিণত করিতে পারিয়াছি কি? একটা সংস্কার, যে সংস্কার কেবল ভয় আনে—কেবল ভেদ আনে,—আপনাকে খর্ব্ব করিবার, পরকে দাবিবার প্রবল জুলুম, ভালবাসায় নির্যাতনে যেমন করিয়া হয় প্রতিষ্ঠিত করে। মানুষকে মানুষ করে না,—প্রচলিত একটা কিছুর নকল মাত্রই যাহাতে সে থাকে, প্রাণপণে তাহাই করে। এই জিনিসটাকেই আমি ত্রিবিক্রম বলিতেছি। সমাজকে গালি দিলাম, নিন্দা করিলাম বলিতে চাহ বল,—আমি নিরুপায়।

এই ত্রিবিক্রম-গুপ্ততত্ত্ব আমাকে উদ্ঘাটন করিতেই হইবে। আমাকে বলিতেই হইবে ইনি কাল-প্রেরিত রাজপুরুষ আসিয়াছেন। ইনিই কলি। আমরা যে দিন-দিন অন্তর্ধান-মার্গে যাইতেছি, সে, ইঁহারই তর্জ্জনী-নির্দ্দেশে। ইঁহারই চাপে শিক্ষা-ব্যবস্থা করিতে গিয়া উদ্যোক্তৃগণের সদভিসন্ধি, স্বার্থত্যাগ, সত্যবোধ, ঔদার্য্য, মমতা—সমস্তই তলাইয়া যায়, বড় বড় স্কিম-হোল্ডার আপনার বিরাট্ মহিমা শুদ্ধ টাইটানিক নিমজ্জনের দৃশ্যের অভিনয় স্বরূপ

পরিণাম প্রাপ্ত হয়। কিছুরই কোনও ফল হয় না। সত্যের আভাষ মাত্র মানবের চেষ্টায় ফুটিতেছে—সে যেন বিদ্যুদ্দীপ্তি, ত্রিবিক্রমের রোষ ভ্রূকুটি এমন মেঘাড়ম্বর আচ্ছাদন আস্তীর্ণ রাখিয়াছে;—তাহার বিকাশ অসম্ভব। আমরা কি তাহা মানবের মনীষা বুঝিতেছে, তাহার হৃদয় বিকম্পিত হইতেছে; —অভ্যাসের অটল প্রাচীর টলিবার নয়, সংস্কারেরও লৌহ নিগড় ছিন্ন হইবার নয়। ত্রিবিক্রম অপ্রতিহত প্রভাবে আমাদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিনকে চাপিয়া আমাদের গুঁড়াইয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পদতলে নিষ্পেষিত মথিত আমরা পড়িয়া-পড়িয়া গোঙ্গাইতেছি; সচীৎকার কাতরোক্তিরও সাধ্য নাই। রৌরব কি এত জ্বালাময়? মায়ের প্রাণে আপনার কন্যাটির প্রতি অগাধ স্নেহ-নির্ঝর দিন-রাত উদ্দাম আবেগে বক্ষ পিঞ্জরে উথলিয়া উঠিয়া আঘাত করিতেছে, কিন্তু সে উন্মত্ত স্রোতের নির্গমন পথ কতটুক? সমস্ত স্নেহ, সমস্ত আবেগের কাছে তাহাকে নগণ্য, তুচ্ছ, একেবারে কিছু না বলিলেই হয়। ঐ যে মা সদ্যোজাত পুত্র ও কন্যা, দুইটী সন্তানকে পাশাপাশি শায়িত করিয়া তাহাদের মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন,—হৃদয়ের অমৃত-পাথারে ও উভয়ের জন্য পৃথক তরঙ্গ উঠিতেছে না। কিন্তু বাহিরে দেখ। ছেলেটীর আদরে পল্লীবাসী সবাই আসিয়া আনন্দের হাট বসাইয়া দিল। মা জিনিস কি দিয়ে যে গড়া, জ্ঞানীর জ্ঞান যারে কোনও দিন নির্ণয় করিতে পারিবে না। ওই দুনীয়াদারীর হাটে আপনার স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস লুকাইয়া, তাকেও দুই রূপ ধরিতে হইতেছে। এক রূপে হাস্য-মুখ সপ্রতিভ চিত্তে দেখাইয়া—বেটা ছেলে, সোণার চাঁদ, চাঁদের গুঁড়ো, বলিয়া তিনি সন্তানকে বক্ষে চাপিয়া ধরিতেছেন; আর অন্য রূপ,—সে সবার চোখের আড়ালে কুণ্ঠিত নীরব স্নেহের নিঃশেষ বর্ষণ কেবল মায়েই বোঝে আর মেয়েতেই বোঝে। সে অপ্রতিভ প্রসন্ন সুধা বর্ষণের আস্বাদ বাহিরের জগৎ জানে না। এমনি করিয়া অঙ্কুর হইতেই ত্রিবিক্রমের হিংস্র নিঃশ্বাস-জ্বালা! মেয়েদের সমস্ত জীবনটাই উহাতে ঝলসিত! তার-পর দেখ! কুমারী-কোরকে ওই ত্রিবিক্রমের হিংসা-কীট অভিশপ্ত ভাগোর মত প্রবেশ করিল। পিতার কুণ্ঠিত, চিন্তিত ব্যবহার। সে তাহাকে জন্ম 'দানের অপমান অর্থদণ্ড সহ কোথাও না গছান অবধি যে তাঁহার শাপ-মোচন নাই। আর মাতৃ-কণিৎ সংসারের অপর সকলে, আপনাদেরই অকৃত্রিম শঙ্কা শাসনে প্রচুর পরামর্শে তাহার মনো পূর্ণ করিয়া দিতেছেন,—শ্বশুরবাড়ী যাবি, ভয় করে চলতে শেখ্। আমরা বিদেশীদের সহিত এক করি, আমাদের মেয়েরা অক্ষর-জ্ঞান অবধি বঞ্চিত, খোদ্দি অশিক্ষিতা নহেন। ঘরে গুরু-সম্পর্কীয়া রমণীগণের কাছে তাঁহারা বাল্য হইতেই যথেষ্ট শিক্ষা পাইয়া থাকেন। সে শিক্ষা ত্রিবিক্রমের মহিমায় আর কোনও শিক্ষা নহে, এই ভয়েরই অভ্যাস শিক্ষা। সেই জীবনের সহিত সংযোগ সব ঘুচাইয়া দেওয়া, যে জীবনে আমাদের আমার বলিয়া কোনও জিনিষ জোর করিয়া ধরিবার অধিকার নাই, বাঁচিবার জন্যই জন্মিয়াছি বলিবারও অধিকার নাই।

আমি যাহা বলিব, এই ত্রিবিক্রমের চাপ হইতে মুক্ত হইয়াই বলিব। অনেক ঝটিকা ভূমিকম্প সহিয়াই মুক্তি পাইয়াছি। আমার বলার কোনও সার্থকতা হিসাব করিয়া, লোকনায়ের সফলতার একটা ভরসা পাইয়া, আমি বলিতেছি না। তবে হিসাব মিলাইয়া লইয়া দেখিয়াই বলিতেছি। দেখিয়াছি, এই বলার মত চলায় চলার সার্থকতা আছে। আর ভরসাও পাইয়াছি আমার ভগবানের কাছে যে, মা আমায় বুদ্ধির গোলকধাঁধাঁ হইতে মুক্তি দিয়াছেন,—আমার কথার উৎস অনুভূতি, আর সেই অনুভূতিই তাকে দেখা।

স্ত্রীশিক্ষার আদর্শের প্রধান তত্ত্ব—নারীত্বের সত্যস্বরূপ বোধ। নারী কি, তাহা নিরূপিত হইলে, তাহাদের শিক্ষা, অধিকার, স্থান, কর্ম্ম, সমস্তই নিরূপিত হইবে। নতুবা, উদ্ভট চেষ্টার কসরতে এক-এক জনে এক এক প্রকার ব্যবস্থা প্রয়োগ করিয়া, এই হতভাগিনীদের জন্য মিথ্যা বত্রিশ স্বর্গ, আর চৌষট্টি নরকের সৃষ্টি করিও না। মেয়েদের জন্য পুরুষের প্রকৃতিতে কোথায় অভাব তাহাদের প্রাণশক্তিকে মেয়েদের সহযোগে কোন্ উপায়ে বর্দ্ধিত বলশালী করিয়া তুলিতে পারে সে অনুভব, সে আবিষ্কার মেয়েদেরই দ্বারা ভাল করিয়া হইবে। তাহাই হইতে দাও। প্রকৃতি-স্বরূপাকে প্রকৃতি আপনিই গড়িবার চেষ্টা করিতেছেন। সম্পূর্ণ হইলে যাহা দাঁড়াইত, দাঁড়াইতে না দিয়া, তোমাদের অহঙ্কার এতদিন নারীত্বের বিকৃতি সাধন করিয়া আসিতেছে। নারীত্বের সহজ রূপ কেহই এতদিন দেখ নাই। একবার ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া সেটাকে পরিস্ফুট হইতে দাও। দেখ,

তাহাদের মাথায় কোনও ভয়, কোনও ভাবনা না ঢুকাইয়া, তাহাদের কোনও ছাঁচে ঢালাই না করিয়া, এই জগতে ছাড়িয়া দিয়া—তাহারা এটাকে কোন্ চোখে দেখে, কি ভাবে গ্রহণ করে! ঘটে-ঘটে সত্যের একটা স্বাভাবিক বিকাশ, পণ্ডিতেরা যখন উদ্ভিদেও প্রমাণিত দেখিয়া মানিয়া লইতেছে, তখন এখানে অবজ্ঞা কিসের জন্য?

সকলেরই মত এ জাতিটারও দেহ মন আত্মা ইহাদের আপন ব্যক্তিত্বেরই অধিকারভুক্ত। কথাটার একটা স্পষ্টাক্ষর স্বীকৃতি জাতির নিকট হইতে সমষ্টির মঙ্গলার্থেই আজি অবিলম্বে আদায় করার প্রয়োজন হইয়াছে। নতুবা ইহাদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা-পদ্ধতি, স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান রচনার বাধা অপসারিত হইবার নয়। ইহাদের কেমন করিয়া, কোন্ সঙ্গে ব্যবহারে লাগাইব, এই চিন্তাই আজ সংসার নিয়ম ভাবে করিতেছে। ইহাদের সম্বন্ধে তাহার আর কোনও চিন্তা নাই। সেখানে নূতন চিন্তা ঢোকাও। বলাও, নারীর বিকাশ অগ্রে; তাহাকে ব্যবহার, সে ঐ উহারই অনুপাতে; নিয়ম হইয়া এই যে ব্যবহার, বিকাশের দিকে না চাওয়া, ইহাই কাম। নারী সম্পর্কে মনস্তত্ত্বে বাগে জাতি নিষ্কাম হউক।

শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে এই বিকাশেরই আয়োজন করিতে হইবে। শালীনতার মাত্রাতিক্রমে সত্যকার শালীনতা হারাইয়া আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, নারীর দেহটা কত প্রয়োজনের জিনিস। আত্মসঙ্কোচে কেমন আমরা অস্বাভাবিক হইয়াছি, নারী-দেহের প্রতি চাহিতেই আজ পারি না। আপনার দেহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব আজ নারীর আপনার কাছেও লজ্জার কথা। অথচ ইহাদের উপর জাতির যাহা দাবী,—প্রবন্ধের উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি,—তাহার প্রত্যেকটীর জন্যই নির্ম্মল স্বাস্থ্যপূত অটুট দেহ চাই। সুতরাং কি শিখাইতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলে নিঃসঙ্কোচে আমি বলিব, মেয়েদের বাল্যশিক্ষার সর্ব্বপ্রথম পাঠ—স্বাস্থ্য-রক্ষার অভ্যাস, সবল দেহ-গঠনের কৌশল সঞ্চয়। মন সম্বন্ধেও তাই, আপনার মনকে আপনার জানিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারাই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা—স্বাধীন জ্ঞান-সঞ্চয় পথ। এই মন মেয়েদের সর্ব্বপ্রভাব মুক্ত হইয়া যদি দাঁড়ায়, তাহা কোনও রূপ অমঙ্গলেরই লক্ষণ নহে; অমনি অবস্থা পাইলেই মন আপনার বলিয়া আপনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে। আর চাই এই মনের কোমলতা। সরস না হইলে কোমল হয় না; আপনার বিকাশ স্বাভাবিক ভাবে হইতেছে,—তাহাই মূলে রস থাকার প্রমাণ। আত্মার বিকাশে অপরোক্ষানুভূতি পর্য্যন্ত মেয়েদেরও পৌঁছায়।

এ সব শিক্ষার ভাবগত দিক্। ব্যবহারিক দিক্ বাকি রহিল; কিন্তু, তাহার মোট কথা—ভাবের উপরই ব্যবহারের মূল প্রতিষ্ঠা।

দুর্দ্দিনে নারী

[শ্রীক্ষণপ্রভা দেবী]

আমি আজ যাহার আলোচনা করিবার কল্পনা করিয়াছি, তাহার বেশীর ভাগই সামাজিক নিয়মের বন্ধন। সেই জন্য ভয় হয়, পাছে রক্ষণশীলদিগের নিকটে নিগৃহীত হই।

আমরা অশিক্ষিতা হিন্দু নারী.—বহুদিনের নিয়ন্ত্রিত কোন সামাজিক শাসন দূর করিবার ক্ষমতা আমাদের একেবারেই নাই, এবং সে স্পর্দ্ধাও রাখি না। কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষা স্ত্রী-শিক্ষা করিয়া যাঁহারা আজ হিন্দুসমাজভুক্ত আমাদের মত এই অবলা জাতির মনেও, উচ্চশিক্ষার সুযোগ-প্রাপ্ত নারীগণের মতই, উচ্চ আশা জাগাইতেছেন, তাঁহারা দয়া করিয়া ভাবিয়া দেখেন কি, যে সমাজ আমাদের জীবনে শিক্ষা-বিস্তারের পথকে সুগম ও তাহার নানা বিড়ম্বনা দূর না করিলে, সহজে কেহ করিতে পারিবে না?—উচ্চশিক্ষা লাভ তো দূরের কথা।

নারী-জীবনের আলোচনা বলিতে আমি আমাদের সম্ভ্রান্ত বা ধনী শিক্ষিত সমাজের মহিলাদের কথা বলিতেছি না। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের হিন্দুনারীর শিক্ষা ও সময়ের আলোচনা করিতে চাহি। তাঁহাদের জীবনের কথাই আজ একবার

তাঁহাদের পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনের সম্মুখে ধরিতে চাই।

প্রথমে, ছয় বৎসর বয়সে প্রথমভাগ আরম্ভ করিয়া, দশ-বার বৎসর বয়সের মধ্যেই শিক্ষা সমাপন করিয়া, বধূ সাজিয়া তাহাদিগকে পরের ঘরে যাইতে হয়। এই চার-পাঁচ বৎসরই তাহাদের শিক্ষার নির্দ্দিষ্ট সময়। তখন সে চপলা বালিকামাত্র—খেলাকেই সে তখন বড় বলিয়া জানে। কাজেই এই কয়দিনে সে কতটুকু শিখিতে পারে?

তার পর, যদি শ্বশুর-গৃহ আদর্শ ও অবস্থাপন্ন হয়, তাহা হইলে কতকটা শিক্ষালাভ হইতে পারে; কেন না, সে বয়সেও তাহার শিক্ষা গ্রহণের সময় থাকে; আর যদি অশিক্ষিত সংসারে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে কোন ফলই হয় না। এইটাই অধিকাংশ স্থলে ঘটিয়া থাকে। প্রথমতঃ তো সেই মেয়েটির শ্বশুর-বাড়ী গিয়া পিতা মাতা, ছোট বড় ভাই বোন গুলির জন্য মন কেমন করিতে থাকে। যদি তাহার ভাগ্য-গুণে শাশুড়ী-ননদ ভাল হন, তাহা হইলে বধূর মনটিকে নানারূপে ভুলাইয়া, স্নেহে-আদরে তাহাকে নিজেদের সংসারের সুখ-দুঃখের উপযোগী করিয়া গড়িয়া লইতে পারেন; এবং তাহা হইলে সে মেয়ের অদৃষ্ট অনেকটা সুপ্রসন্ন বলিতে হইবে। আবার কোন-কোন অশিক্ষিত সংসারে আসিয়া পড়িয়া বধূর পিতামাতার জন্য সেই মন কেমন করাও অপরাধের মধ্যে গণ্য হইয়া পড়ে; এবং ইহার জন্য তাহার উপর হয় তো অনেক নির্য্যাতনও চলে। তাহার ফলেই আমাদের দেশের নব-বধূরা শ্বশুর-গৃহকে "যমের বাড়ীর" সহিত তুলনা করিয়া থাকে। শ্বশুর-বাড়ীর নির্য্যাতনের ফলটি, পর সময় ও সুযোগ পাইলে হয় তো তাঁহাদের ভোগ করাইয়া ছাড়ে। ইহার দ্বারা তাহার জীবনই হয় তো কদর্য্য ভাবে গঠিত হইয়া যায়।

এই শ্বশুর-বাড়ীতে নব-বধূর মনটি কতকটা স্বামীর উপপাতা, সৌখিন দ্রব্য ও ভালবাসার আলাপে বা (প্রলোভনে) বশীভূত হয়। তারপর অপরিণত বয়সে বধূটির হয় তো ১৩।১৪ বৎসর বয়সের এবং তাহার স্বামীর হয় তো ১৯।২০ বৎসর বয়সের) পুত্রলাভ হইল। তার পর এই হইল যে, অল্প বয়সে ছেলে হওয়ার দরুণ মাতার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া গেল; এবং রুগ্ন, দুর্ব্বল, অপূর্ণ সন্তান জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল।

পুত্র-কন্যা লাভ হইল; কিন্তু শিশুদের পিতার তখনও পাঠ সমাপ্ত হইল না। অল্প বয়সে বধূ পাইয়া, সে বেচারা হয় তো পড়াশুনাতেও তেমন মনোযোগ দিতে পারে নাই,—বধূর মনোরঞ্জন করিতে, বা তাহাকে সান্ত্বনা দিতে তাহার অনেকটা সময় গিয়াছে। আর সে নিজেও নাবালক বই তো নয়, তাহার নিজেরও এ বিষয়ে অনেকটা নেশা বা দুর্ব্বলতা জন্মিবারই কথা।

পুত্র জন্মগ্রহণ করার পর সে তাড়াতাড়ি একটা "কেরাণীগিরির" জোগাড় করিয়া লইল; এবং নিজের সুখ-স্বাস্থ্য সেই চাকরীর পদেই সমর্পণ করিতে বাধ্য হইল।

তার কিছুদিন পরেই "বছর ঘুরিতে না ঘুরিতে" বধূ আর একটি সন্তান লাভ করিলেন। তাহার ফলে প্রথম সন্তানটি "এঁড়ে" লাগিয়া কৃশ, দুর্ব্বল হইয়া ভুগিতে লাগিল, কিংবা তাহার মৃত্যুই হইল। অল্প বয়সে উপরি উপরি সন্তান প্রসব করিয়া বধূও মৃতবৎ। তাহার উপর দারুণ পুত্রশোক! দুর্ব্বল, রোগ শোকার্ত্ত শরীরে ও স্বামীর অল্প আয়ে এই মহাঘোর দুর্দ্দিনে, যথেষ্ট যত্নের ও উপযুক্ত পথ্যের অভাবে, বধূও হয় তো মৃত্যুমুখে পতিত হইল; নয় তো বাঁচিয়া থাকামাত্র সার করিয়া বাঁচিয়া থাকিল। তাহাতে তাহার স্বামী এবং সংসারটি ভারাক্রান্ত এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্যবিহীন হইয়া নিরানন্দ ভাবে দিন কাটাইয়া চলিল মাত্র।

অথবা বিধিচক্র যদি অন্য রূপে পরিবর্ত্তিত হইল, তাহা হইলে নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যে শিশু পুত্র কন্যা রাখিয়া এবং অল্পবয়স্কা স্ত্রী রাখিয়া, রুগ্ন, জীর্ণ স্বামীটিই চিরনিদ্রা লাভ করিলেন। তখন সেই বিধবা জীবন তো শূন্য বোধ করিলই, উপরন্তু শিশু পুত্র কন্যাগুলিকে লালন-পালন করিবে কি করিয়া, তাহা ভাবিয়া বিষম সমস্যায় পড়িল। শ্বশুর-শাশুড়ী হয় তো সেই বধূকে স্নেহের চক্ষে দেখেন নাই, অথবা মৃত।

তখন দেওর-ভাসুররা এই "ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁইয়ের" যুগে সেই বিধবা ভ্রাতৃবধূকে ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে গলগ্রহ ভাবিতে লাগিল। সে বিধবার পিতামাতা হয় তো মৃত; ভাই বিবাহিত, এবং তাহার নিজের স্ত্রী-পুত্র লইয়া সেও বিব্রত। এইরূপ অবস্থায় বিধবা ভগিনীকে তাহারও গলগ্রহ মনে করা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়, এবং বহু স্থানে তাহা ঘটিয়াও থাকে। তখন সেই বিধবাগণ কিরূপে নিজের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ

করে, ও পুত্রকন্যাগুলিকে কিরূপে লালন পালন করিয়া থাকে? আত্মীয় স্বজনের দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়া এবং তাঁহাদের লাথিঝাঁটা খাইয়াই নয় কি? হা, এই আমাদের হিন্দু সমাজের সাধারণ নারী জীবন! একবার কি কেহ ভাবিয়া দেখেন, যে, সেই বিধবা কিরূপে শিশু পুত্রকন্যাগুলিকে লালন পালন করিবে? কি উপায়ে এই দুর্দ্দিনে নিজের ও শিশুদের অন্নবস্ত্রের অভাব সে মোচন করিবে? সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যা যে এইখানেই। জীবনে কি তাহার শিক্ষা হইয়াছিল যে, সে তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে? কবে সে শিক্ষার সময় পাইয়াছিল? সে পাঠ্য-পুস্তকই পড়িতে সময় পায় নাই,—দশ বার বৎসর বয়সে তার কতটুকু শিক্ষা পাইবার কথা? কয়খানি কি পুস্তকই বা সে পড়িয়াছিল? আর তাই কি তাহার পিতামাতা তাহার শিক্ষার জন্য যথাযোগ্য অর্থব্যয় করিতে পারিয়াছিলেন? কি করিয়াই বা পারিবেন? তাঁহারা জানেন যে, এ ব্যয় অনর্থক। ছেলের বাপ এসব কিছুই দেখিবেন না; তিনি চাহিবেন কেবল অর্থ! মেয়েকে পিতামাতা যতই শিক্ষিতা করিয়া রাখুন না কেন, তাহাতে পণের টাকার তো কিছুমাত্র লাঘব হইবে না। তবে আর কেন দোকর খরচ! ছেলের বিদ্যার জন্য, এবং মেয়ের বিবাহের জন্য মাত্র তাঁহারা সর্ব্বস্বান্ত হইতে বাধ্য;—মেয়ের শিক্ষার ব্যয়ে পুনঃ হইতেই কেন আর অনর্থক জ্বালাতন হইবেন?

তার পর বিবাহের পরেই বা সেই বয়সে তাহার কি শিক্ষা হইয়াছিল, যে, তাহা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের দুর্দ্দিনে কাজে লাগিবে? ভাগ্যবশতঃ শিক্ষিত-গৃহে বিবাহ হইলে তখনও তাহার কিছু শিক্ষা লাভ হইতে পারিত; কেন না, তখনও তাহার শিখিবার বয়স ছিল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাহাকে সন্তানের জননী হইতে হইয়াছে; তখনও সে সন্তান পালন করিবার উপযুক্ত হয় নাই। এই অবস্থায় সন্তান হওয়ায় বেশীর ভাগ মেয়ে ভালরূপে তাহাদের প্রতিপালন করিতে পারে না। ফলে বাংলায় শিশুর অকালমৃত্যু ঘরে-ঘরে!! যাহারা বাঁচিল, তাহারাও স্বাস্থ্যহীনতার জন্য সুখহীন-নিরানন্দ প্রাণ, উৎসাহ উদ্দীপনাবিহীন বাঙালী-সন্তান হইয়াই গঠিত হইল।

তাই আমাদের মনে হয়, যদি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী সুধী মণ্ডলী একবার ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, স্ত্রীশিক্ষার গলদ্ কোথায়! স্ত্রীশিক্ষার প্রধান অন্তরায় আমাদের এই বাল্য-বিবাহ। কেহ-কেহ হয় তো বলিবেন—কেন, এই বাল্য-বিবাহেও তো সুন্দর সুফল প্রসব করিত! এরূপ বহু প্রমাণও আমাদের দেশে আছে। সে কথাও সত্য। কিন্তু এখন জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা যেরূপ দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে, তখন এতটা ছিল না। যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, সেইরূপ ভাবে চলাই বোধ হয় উচিত। তখনকার একান্নবর্ত্তী পরিবারে বিধবা লাতৃজায়া বা ভগিনীকে অথবা তাহাদের অনাথ পুত্রকন্যা-গুলিকে কাহারও এত ভার বলিয়া বোধ হইত না। এখন যে লোকে নিজের স্ত্রীপুত্রেরই অভাব মোচন করিতে পারিয়া উঠিতেছে না। দুঃখে পড়িয়া আরো একটা কথা বলিতে হইতেছে;—তখনকার দিনে বিধবা হইয়া সকলকে বাঁচিয়া থাকিতে হইত না, সহমরণ প্রথা ছিল। নারীকে এক যন্ত্রণাই সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিত। এখন সে পথও নাই। কাজেই নারীর অবস্থার কথা দেশের লোকের ভাল করিয়া ভাবিবার দিন আসিয়াছে।

শুধুমাত্র সখের খাতিরে দুইটা বক্তৃতা বা দু কলম লেখা, তাহার আর দিন নাই।

আর এই যে শিশুদের অকাল মৃত্যু আমাদের ঘরে-ঘরে বাড়িয়াই চলিয়াছে, ইহার কারণ কি? অনেকেরই মতে এই বাল্য-বিবাহই ইহার একমাত্র কারণ। এই বাল্য-বিবাহ না হইলে স্ত্রীলোকেরা কিছু শিক্ষা করিতে সময় পায়। কিন্তু বয়স হইয়া বিবাহ হইলে তাহারা স্বাস্থ্যতত্ত্ব, সন্তান-পালন, গার্হস্থ্যধর্ম্ম ইত্যাদির কিছু-কিছুও শিখিয়া লইতে পারিবে; এবং সুগৃহিণী হইয়া নিজ-নিজ সন্তান-পালন বা স্বামীর অল্প আয়ে অভাবের গৃহস্থালীর অনেক প্রকার সাহায্য করিতে পারিবে। শেষে, দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি কখনও অনাটন হইয়া দাঁড়ায়, তখনও যাহাতে সে ও তাহার সন্তানেরা শৃগাল-কুকুরের মত দ্বারে দ্বারে না ফিরিয়া নিজেরাই নিজেদের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহার কথঞ্চিৎ উপায় করিয়া লইতে পারিবে। এরূপ সুযোগ আর তাহাদের না দিলে নয়। এই দুর্দ্দিনের অন্নবস্ত্রের দায়েই আরও স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। স্ত্রী শিক্ষা বলিতে আমরা পুঁথিগত বিদ্যার কথা বলিতেছি না। স্ত্রীলোকদের কতকটা সাধারণ লেখা-পড়ার সহিত শিল্পকলা, ধাত্রীবিদ্যা, সন্তান-পালন, সামা-

...কারী, রোগীর সেবা ও ধর্ম্মনীতি—এইগুলি শিক্ষা দেওয়া উচিত; মেয়েদের এতটুকু শিক্ষা হওয়ার পর বিবাহ দেওয়া উচিত যে, বিপদে পড়িলে, বা প্রয়োজন হইলে, সে যেন নিজের অন্ন সংস্থান করিয়া লইতে পারে। এরূপ একটা কোন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভের পর তাহার বিবাহ দিলে সে ভবিষ্যতে কাহারও গলগ্রহ হয় না। অল্প উপার্জ্জনক্ষম স্বামীর হাতে পড়িলে স্ত্রী যদি অবসর সময়ে কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহা হইলে স্বামীর 'সংসারের' যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে। এরূপ সাহায্য নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোকেরা খুবই করে। তাহাতে তাহাদের স্বামী, স্ত্রী কাহারও মনে কোন লজ্জা বা ক্ষোভের বিষয় হয় না, বা সমাজও চোখ রাঙায় না। পাশ্চাত্য দেশেও এরূপ প্রথা আছে। খৃষ্টিয়ান রমণীদেরও আছে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও আছে। নাই কেবল এই অভাগিনী হিন্দু বঙ্গ-মহিলার! বিধবাকে ভাই, দেবর, ভাসুরের গলগ্রহ ভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে, পরমুখাপেক্ষী হইয়া পরের দয়ায় জীবন কাটাইতে হইবে, অনাহারে জীবন কাটাইতে হইবে, পথের কুক্কুরের ন্যায় গৃহ হইতে গৃহান্তরে ফিরিতে হইবে, হয় তো অনাহারে আত্মহত্যা করিতে হইবে,—কিন্তু তবু এক পয়সা উপার্জ্জনের পথ সে খুঁজিয়া পাইবে না। যদি এই অন্নবস্ত্র সঙ্কটের দিনে, এমন দুই একটি বিদ্যালয় বা শিল্প সম্বন্ধীয় শিক্ষাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে সহজ-সাধ্য, ভদ্রমহিলা জনোচিত কর্ম্ম করিবার উপায় নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে অনেক অনাথা নারী দুটি পেট ভরিয়া খাইয়া পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে ও তাহাদের সন্তানদের পালন করিতে পারে। আজ নারীর জীবন এতই ভারগ্রস্ত যে, যে সময় প্রসূতি সন্তান প্রসব করে, তখনই সে (নিজের মুমূর্ষু অবস্থাতেও) চাহিয়া দেখে যে, সেটি পুত্র কি কন্যা। কন্যা জন্মিলেই মনে হয়—পৃথিবীর ভার, জাতির ভার, দুঃখের কেন্দ্ররূপিণী! তাই তাহা দেখিয়া মাতা শিহরিয়া উঠেন! পুত্র হইলে তাহাকে "ধন, রত্ন, মাণিক" উপাধি দেওয়া হয়। কিন্তু মেয়েটির বেলায় ঠিক ঐ নামটি প্রয়োগ করা হয় না। তবে যত্ন হয় তো দুইটিকেই সমান করা হয়; কিন্তু পালনের বেলাতে তা নয়। ছেলের স্কুল, লেখাপড়া যত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়, মেয়ের বেলায় তা হয় না। ছেলে হয় তো ছয় বৎসরে পড়া আরম্ভ করিয়া দশ বৎসরে স্কুলে ভর্ত্তি হয়। মেয়ে সেই দশ বৎসর বয়সে পাঠ সমাপন করিয়া পিতামাতা ভ্রাতাকে নিশ্চিন্ত করিয়া পর-গৃহে যায়। পুরুষ নানা বিষয়ে উচ্চ শিক্ষিত হইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছেন; আর নারী শুধু ভারবাহী হয় বা গলগ্রহ হইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে! নারীতে কি কোনও প্রয়োজন নাই? ভগবান তো নর ও নারীকে স্বতন্ত্র করিয়া নির্ম্মাণ করেন নাই! নরের আধার নারী! বিশ্বের শক্তিস্বরূপিণী নারী! যাহাকে শাস্ত্রে সহধর্ম্মিণী আখ্যা দিয়াছেন, যাহারা অর্দ্ধাঙ্গিনী নামে কথিত হয়েন, যাহার সহিত স্বামীর দেহ, মন প্রাণ কিছুরই পার্থক্য থাকে না, যাহাকে নরের জননী বলিয়া গৌরব করা হয়, যে মাতার স্তন-দুগ্ধের বলে আজ তুমি গৌরবমণ্ডিত, যাঁহার দয়া গুণে তুমি আজ দয়ার সাগর, যাহার আশীর্ব্বাদে তুমি আজ বিশ্বপূজ্য হইয়া দশদিক আলোকিত করিতেছ, সেই তোমাদের মাতা নারী জাতির জন্য তোমরা আর কত দিন চোখ মেলিয়া না দেখিয়া থাকিবে?

হে সমাজ সংস্কারক! যুগ প্রবর্ত্তক! মহানুভব বঙ্গবাসী হিন্দুগণ! জাগো—জাগো তোমরা! আজ এই দুরবস্থার গভীর পঙ্করাশি হইতে নারী জাতিকে উদ্ধার কর, শিক্ষা দাও, রক্ষা কর! তোমরা মহাবটবৃক্ষ, আমরা লতা; আমাদের আশ্রয় দাও। শিক্ষা দাও, রক্ষা কর। তোমরা সবল, আমরা সমাজের অত্যাচারে চিরদুর্ব্বল! আমাদের হাত ধরিয়া তোলো। এখনও যদি এই দুর্ভাগ্য হইতে তোমাদের জননী, ভগিনী, স্ত্রী ও কন্যাকে না উদ্ধার কর, তাহা হইলে [illegible] নারীর নামই ধ্বংস হইয়া যাক। এমন ভাবে আর তাহারা যেন জগতের ভার বৃদ্ধি না করে—বিধাতার চরণে এই প্রার্থনা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারত-লুণ্ঠন

[শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

কবি গাহিয়াছেন, "অতুলিত ধনরত্ন দেশে ছিল, যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল।" ইতিহাসে ভারতের অতীত ঐশ্বর্য্যের যে কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই যদি সমগ্র ভারতের ধনরত্নের পরিমাপক হয়, তবে উহা বাস্তবিকই "অতুলিত" ছিল। কিন্তু যখন উহা তুলনার অতীত ছিল, তখন কবি-বর্ণিত "যাদুকর জাতি" অর্থাৎ ইংরাজ এদেশে আসেন নাই। বর্ত্তমান সময়ে যদিও এই "যাদুকর জাতি"কেই ভারতের সর্ব্বপ্রকার দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া, অনেক কবি, বক্তা ও লেখক অশ্রুপাত করিয়া থাকেন, তথাপি, যে হিন্দু-সন্তান ইংরাজ-রাজত্বের পূর্ব্বযুগের ইতিহাস নিরপেক্ষ ভাবে পাঠ করিবেন, তিনি এমন বহু-সংখ্যক ঘটনার বিবরণ দেখিতে পাইবেন, যাহাতে তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুর পরিবর্ত্তে রুধিরপাত হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কয়েকটী বড়-বড় লুণ্ঠন-কার্য্যের পরিচয় দিয়া, লুণ্ঠনকারিগণের স্বধর্ম্মী ও স্বদেশীয়গণের বর্ণনা হইতে প্রাচীন ভারতের অতুলনীয় ধনরত্নের আভাস দিতে চেষ্টা করিব। এস্থলে এ কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, "লুণ্ঠন" শব্দ আমি কোন রূপকার্থে ব্যবহার করিতেছি না। রোমহর্ষক আতঙ্কের সৃষ্টি করিবার জন্য পণ্য দ্রব্যের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ, অথবা প্রজাসাধারণের ধন-মান-প্রাণ ও ধর্ম্মরক্ষার মূল্যস্বরূপ কর গ্রহণকে "লুণ্ঠন" নামে অভিহিত করিতেছি না।

ভারতের ঐতিহাসিক-যুগের সূচনার পর প্রথম উল্লেখ যোগ্য বৈদেশিক আক্রমণ—গ্রীক জাতি কর্ত্তৃক সাধিত হয়। গ্রীক বীর আলেক্‌জাণ্ডারের যশোলাভই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল : সঙ্গে সঙ্গে রাজচক্রবর্ত্তিত্বের প্রসারও লক্ষ্য ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী আরব, তুর্কী ও মঙ্গোলীয় আক্রমণকারিগণ ভারতের বক্ষে বসিয়া যে সকল অত্যাচার করিয়াছিল, ভারতভূমির সীমামধ্যে আলেকজাণ্ডার ও তাঁহার সৈন্যগণ কর্ত্তৃক সেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানের প[illegible] ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

এসিয়াবাসী কর্ত্তৃক [illegible] লুণ্ঠন প্রকৃত প্রস্তাবে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বেও শক ও হূণগণ ভারতে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল ; কিন্তু তাহারা অল্প দিনেই এ দেশের সমাজের [illegible]শিয়া গিয়াছিল। বিপরীত-প্রবৃত্তিশালী দুই ধর্ম্মের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে যে ভীষণ অত্যাচারের সৃষ্টি হয়, শক ও হূণ সমাগমের সময় তাহার অস্তিত্ব বেশী দিন ছিল বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, এই শক, হূণ, আরব, তুর্কী—সকলেই পশ্চিম দিক হইতে ভারত আক্রমণ করিয়াছিল ; এবং কেহই ভারতের দ্বারে আসিয়া ফিরিয়া যায় নাই। কথায়ই বলে, "অমোঘাঃ পশ্চিমা মেঘাঃ।"

মহম্মদ বিন্ কাশিম

অষ্টম শতাব্দীতে আরবগণ সিন্ধুদেশ লুণ্ঠন করে। ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণের পর আরবগণ চিরাভ্যস্ত আত্ম-কলহ কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখিয়া, একতাবদ্ধ হইয়া, চারিদিকে রাজ্য জয় করিতে আরম্ভ করে। ৭১১ খৃঃ অব্দে মহম্মদ বিন্ কাশিম সিন্ধুদেশ জয় করেন। কিন্তু ইহার প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে দ্বিতীয় খালিফ ওমরের সময় হইতেই স্বর্ণপ্রসূ ভারত তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জল-পথে আসিয়া মধ্যে-মধ্যে সিন্ধুপ্রদেশের তীরভূমি লুণ্ঠন করাই তাহাদের কার্য্য ছিল। হিন্দু রমণীর সৌন্দর্য্য এ সময়ে আরবগণের লোলুপতা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিল : এবং সম্ভবতঃ হিন্দু রমণী অপহরণ করাই এই সকল আরব-অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল। কারণ, ঐ সকল হতভাগিনী অপহৃতা রমণীকে লাভ করিতে মরুবাসী আরবগণ অত্যন্ত উৎসুক ছিল। (১)

অতঃপর মহম্মদ কাশিমের কার্য্যাবলী আমাদের আলোচ্য বিষয়, কারণ ইহাই বৈদেশিক কর্ত্তৃক ভারতের প্রথম লুণ্ঠন। এই সময়ে আরববিজিত পারস্যের শাসনকর্ত্তা ছিলেন হাজাজ। ইঁহার নিষ্ঠুরতা আরব-ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। সিংহল হইতে একদল আরব সুন্দরী কুমারী ক্রীতদাসী ও পণ্যদ্রব্যপরিপূর্ণ অর্ণবপোত লইয়া সিন্ধু প্রদেশের নিকটবর্ত্তী সমুদ্র পথে পারস্যাভিমুখে যাইতেছিল। দেবল নামক বন্দরের নিকটে জলদস্যু কর্ত্তৃক ঐ পোত লুণ্ঠিত হওয়ায়, হাজাজ সিন্ধুরাজ দাহিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করেন। প্রথমে যে আরব সেনাদল প্রেরিত হয়, ভারতীয়গণের হস্তে তাহা সম্পূর্ণ নিধন প্রাপ্ত হইবার [illegible] সপ্তদশবর্ষীয় যুবক মহম্মদ বিন্ কাশিমকে বৃহত্তর সেনাদলের অধিপতি করিয়া প্রেরণ করা হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে যে চিঠি দিয়া ডাকাতি করা আরম্ভ হইয়াছি[illegible] অষ্টম শতাব্দীর এক শ্রেণীর লোকও এই কৌশল জানিত। আ[illegible] কর্ত্তৃক সিন্ধু-বিজয়ের বৃত্তান্ত অষ্টম শতাব্দীতে লিখিত চাচ্‌নামা নামক গ্রন্থে বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে। (২) গ্রন্থকর্ত্তা মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন যে, সিন্ধু-প্রবেশের প্রাক্কালে কাশিম কতকগুলি দূতকে অ[illegible]

---

(১) Elphinstone p. 258 Pottinger's Travels, [illegible] Havell's Aryan Rule in India.

(২) Ghach namah in Elliot vol. I. মূল আরবী [illegible] ৭৫৩ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে লিখিত।

...করেন। ইহাদিগকে আদেশ করা হয় যে, ইহারা দাহিরের রাজধানী ব্রাহ্মণাবাদে গিয়া হিন্দুগণকে ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উপদেশ করিবে; অন্যথা মুণ্ডকর দাবী করিবে। যদি ইহাতেও হিন্দুরা ...তি করে, তবে দূতগণ তাহাদিগকে শাসাইয়া আসিবে, যেন যুদ্ধের জন্য তাহারা প্রস্তুত হয়। ইতোমধ্যে দেবলনগর আক্রান্ত ও অধিকৃত এবং কিছুকাল পরে দাহির যুদ্ধে হত হন।

যখন রেবার নামক স্থানের দুর্গ আক্রান্ত হয়, তখন দাহিরের এক ... এই দুর্গে ছিলেন। বীর-রমণীর ন্যায় তিনি সৈন্য-পরিচালনা করিয়া ...পর্য্যন্ত যুদ্ধ করেন; এবং শেষ মুহূর্ত্তে সতীধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য অগ্নিতে আত্মোৎসর্গ করিতে বাধ্য হন।

ব্রাহ্মণাবাদে দাহিরের এক পুত্র কিছুকাল নগর রক্ষা করিবার পর, নগরবাসিগণ আত্মসমর্পণ করিবার প্রস্তাব করে। কাশিম তাহাতে ...ত হন, এবং হিন্দুগণ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিলে তিনি ...দুগণের প্রাণনাশ করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু যখন হিন্দু যোদ্ধৃগণ ও নগরবাসিগণ দলে দলে বাহিরে আসিতে লাগিল, তখন বিধর্ম্মিগণকে হত্যা করিবার প্রবৃত্তি আরবগণের মনে বলবতী হইয়া উঠিল। যে সমস্ত হিন্দু সৈনিক নগর-দ্বারের বাহিরে আসিয়াছিল, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাদিগকে বধ করা হইল; এবং ...০০০ ত্রিশ হাজার কর্ম্মক্ষম যুবককে ক্রীতদাসরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইল। ইহা দেখিয়া নাগরিকগণ পুনরায় নগর দ্বার বন্ধ করিল। কাশিমও বলপূর্ব্বক নগর অধিকার করিবেন বলিয়া কৃতসংকল্প হইলেন। দাহিরের বিধবা পত্নী রাধী (৩) স্বীয় অলঙ্কার প্রভৃতি যথাসর্ব্বস্ব ...সৈনিকগণকে দান করিলেন; এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কিন্তু নগরস্থ কতিপয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি যেন আত্ম-... করিতে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাদের শৈথিল্য বিশ্বাসঘাতকতায় যখন দুর্গ আরবগণের হস্তগত হইল, অমনি ঐ সকল ...গার দাহিরের এক পত্নী, অন্য স্ত্রীর গর্ভজাতা দুই কন্যা এবং অপ-পর আত্মীয়গণকে বিধর্ম্মী বিজেতার হস্তে সমর্পণ করিল। দাহিরের রাজধানী এইরূপে কাশিমের হস্তে পতিত হইলে, বহুসংখ্যক ...কে বন্দী করিয়া ক্রীতদাস করা হইল। ইসলামের নিয়ম এই যে, মুসলমানগণ অন্য ধর্ম্মের লোককে যুদ্ধে পরাস্ত করিলে, পরাজিত যোদ্ধৃ-...কে ইচ্ছামত হত্যা অথবা বন্দী করিবে; এবং তাহাদের স্ত্রী-পুত্রগণ বিজেতার ন্যায্য সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে; আর লুণ্ঠিত দ্রব্য-...র পঞ্চমাংশ খালিফের নিকট পাঠাইতে হইবে; এবং অবশিষ্ট ... সৈনিকেরা ভাগ করিয়া লইবে। (৪) ব্রাহ্মণাবাদে যে সকল ...কে বন্দী করিয়া খালিফের পঞ্চমাংশ রূপে রাখা হইয়াছিল, তাহা-...খ্যা ২০০০০ বিশ হাজার। অতএব মোট বন্দীর সংখ্যা ১০০০০০ এক লক্ষ! আরব সৈন্যগণ ৮০০০০ আশী হাজার হিন্দু নরনারীকে মেষপালের ন্যায় ভাগ করিয়া লইল! ব্রাহ্মণ জাতির কলঙ্ক স্বরূপ একটী ঘটনা চাচনামার রচয়িতা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সমস্ত নগর লুণ্ঠিত হইবার পরে, দাহিরের মহিষী রাধী এবং অপর কতিপয় আত্মীয় লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। কাশিম রাজধানীতে প্রবেশ করিবার ২১ দিন পরে, নগরের ব্রাহ্মণগণ দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন; এবং কাশিম কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, লুক্কায়িত মহিষীকে এবং দাহিরের আত্মীয়গণকে আনিয়া কাশিমকে উপহার দেন। দাহির জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন; স্বজাতি কর্ত্তৃক তাঁহার অকলঙ্ক-চরিত্র ভার্য্যার যে ধর্ম্ম-ভ্রংশ ঘটিল, বিশ্বাসঘাতক ব্রাহ্মণগণ সে পাপের শাস্তি পাইয়াছিলেন কি না, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয় না। কিন্তু ইতিহাসে ইহা লেখা আছে যে, সিন্ধুদেশ জয় করিবার পর, আরব বিজেতার শাসনকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে ব্রাহ্মণগণকে শাসন-কার্য্যসংক্রান্ত অনেক উচ্চপদ দিয়াছিল; এবং অনেক বিষয়ে তাহাদের প্রতি উদারতা দেখাইত। চাচ্‌নামাকার আরও বলেন, যে দাহিরের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী "শশাকর" (শশাঙ্ক?) বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই মুসলমানগণের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন; এবং এই সততার জন্য সিন্ধুজয়ের পর কাশিম তাঁহাকেই মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেন।

মুসলমান ঐতিহাসিক হিন্দু বন্দীর যে সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। অপর পক্ষে ইহাও মনে রাখা দরকার যে, খালিফের অনুগত মুসলমান সেনা আবালবৃদ্ধবনিতা সকল শ্রেণীর হিন্দুকে বন্দী করিতে একটু দ্বিধাবোধ করে নাই। যে যুদ্ধে দাহিরের পতন হয়, তাহার ফলে ৩০০০০ ত্রিশ হাজার হিন্দু বন্দী হয়। ইহাদের মধ্যে দাহিরের সামন্ত-রাজগণের কন্যারা ছিলেন,—তাহাদের সংখ্যা ত্রিশ; এবং এই ত্রিশজন হিন্দু রাজকুমারীর মধ্যে একজন ছিলেন দাহিরের ভাগিনেয়ী।

"যখন দাহিরের ছিন্ন মুণ্ড, রাজছত্র, বন্দী রমণীগণ এবং লুণ্ঠিত ধনরত্ন হাজাজের নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি ভগবানের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার স্তব করিলেন।" পরে ঐ সমস্ত দ্রব্য, ছিন্ন-মুণ্ড ও বন্দিনীগণ খালিফা ওয়ালিদের নিকট লুণ্ঠিত দ্রব্যের পঞ্চম অংশ রূপে প্রেরিত হইল। খালিফাও ঐ দ্রব্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন; "তিনি রাজকন্যাদের কাহাকেও বা বিক্রয় করিলেন, এবং কাহাকেও বা পুরস্কার স্বরূপ স্বীয় অনুচরগণের মধ্যে বিতরণ করিলেন। খালিফা স্বয়ং দাহিরের ভাগিনেয়ীর রূপে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহাকে স্বীয় অঙ্কশায়িনী করিতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হইল। কিন্তু অপর এক ব্যক্তি ঐ কন্যাকে প্রার্থনা করায়, খলিফা সন্তান উৎপাদনের জন্য তাহাকে ঐ কন্যা প্রদান করিলেন।" উদ্ধার-চিহ্ন-মধ্যস্থ কথাগুলি মুসলমান ঐতিহাসিকের নিজের। পাঠক ঐ দূরদেশে লোলুপদৃষ্টি বিজাতীয় শত্রুগণের মধ্যে থাকিয়া, আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্না বন্দিনী আর্য্যকুমারীগণের মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, কল্পনা করিয়া দেখুন।

অতঃপর হাজাজ কাশিমকে পত্র লিখিলেন:—"ভগবানের আদেশ

(৩) Lady, ঐ।

(৪) Dictionary of Islam, Hughes; এবং Sale's

এই যে, বিধর্ম্মিগণের প্রতি দয়া করিও না; পরন্তু তাহাদের গলদেশ ছিন্ন করিবে।" ব্রাহ্মণাবাদ সম্পূর্ণ করায়ত্ত হইলে এবং আরবগণের জিঘাংসা ও লুণ্ঠনেচ্ছা কথঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ করিলে, শাসন-কার্য্য তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। প্রথমেই বিধর্ম্মিগণের উপর জিজিয়া বা মুণ্ডকর ধার্য্য করা হইল। ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র এই তিন শ্রেণীর জন্য যথাক্রমে কোরাণ নির্দ্দিষ্ট (৫) ৪৮, ২৪ এবং ১২ দ্রাম (রৌপ্যমুদ্রা) ধরা হইল। কোন-কোন ঐতিহাসিকের মতে, ঐ অর্থের মূল্য যথাক্রমে ৪, ২ এবং ১ পাউণ্ড (৬) অর্থাৎ এখনকার দরে ৬০, ৩০, এবং ১৫ টাকা। এখানে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, অষ্টম শতাব্দীর এক টাকা বিংশ শতাব্দীর অন্যূন পনর টাকার সমান। এখন পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন, যদি আজকাল দরিদ্র হিন্দু কৃষকগণ, হিন্দু থাকিয়া নিজের ধর্ম্মাচরণ করিবে এই অনুগ্রহের মূল্যস্বরূপ বার্ষিক দুইশত পঁচিশ টাকা দিতে বাধ্য হয়, তবে তাহাদের সুখের মাত্রা কতখানি হয়। খালিফের অধীন সিন্ধুদেশের দরিদ্র হিন্দুগণের সুখও ততখানি ছিল। এই বশ্যতা স্বীকার ও করদানের পরিবর্ত্তে সিন্ধুদেশের হিন্দুগণ দামাস্কাসের খালিফার নিকট হইতে যথেষ্ট দয়া লাভ করিয়াছিল; অর্থাৎ "অবিশ্বাসিগণ বুদ্ধমন্দির (আরবেরা ইহা ধর্ম্মাদেশ অনুসারে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল) পুনরায় নির্ম্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করে। কাশিম হাজ্জাজের সম্মতি আনাইয়া (এবং হাজ্জাজ খালিদের অনুমতি লইয়াছিলেন) ঐ অনুমতি দিলেন।"

ইতোমধ্যে কাশিম দাহিরের বিধবা পত্নী বন্দিনী রাণিকে ইসলামভুক্ত করিয়া বিবাহ করেন।

কাশিম সম্বন্ধে একটা বিশিষ্ট ব্যাপার এই যে, প্রায় সকল স্থান অধিকার করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই, আত্মসমর্পণকারী হিন্দু যোদ্ধৃগণকেও তিনি হত্যা করিয়াছিলেন।

ইহার পর উল্লেখযোগ্য ঘটনা মুলতান-লুণ্ঠন। এই নগর একটি প্রকাণ্ড বাণিজ্যস্থান, এবং এখানে এক প্রকাণ্ড মন্দিরে মূল্যবান্ ধাতু-নির্ম্মিত দেব-বিগ্রহ স্থাপিত ছিল। দীর্ঘকাল অবরোধের পর, দাহিরের এক ভাগিনেয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় এই ঐশ্বর্য্যময় নগর আরবগণের হস্তগত হয়; ছয় হাজার অস্ত্রধারী সৈনিককে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হয়, এবং তাহাদের স্ত্রী ও বালকগণকে বন্দী করা হয়। লুণ্ঠিত ধনের পরিমাণ বিপুল। চাচনামাকার বলেন যে, আরব সৈনিকগণকে ষাট হাজার দ্রাম অর্থাৎ কুড়ি হাজার তোলা [১ তোলা ৩ দ্রাম (৭)] ওজনের রৌপ্য বিতরণ করা হইয়াছিল। আবার সেই সঙ্গেই বলেন যে, প্রত্যেক সৈনিক চারিশত দ্রাম অর্থাৎ প্রায় একশত তেত্রিশ তোলা পাইয়াছিল; অথচ সিন্ধু আক্রমণের প্রথমেই কাশিমের অধীন মোট পনের হাজার সৈনিক এবং এমন ৫ পাঁচটী বিরাট নিক্ষেপক যন্ত্র (catapult) ছিল, যাহার প্রত্যেকটী চালাইবার জন্য পাঁচ শত লোক ছিল। পরে সিন্ধু দেশের লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য্যের সংবাদ আরব ও পারস্যে প্রচারিত হইলে, আরবীয় ও পারসিকগণ দলে-দলে কাশিমের সেনাদলে যোগ দিতে আরম্ভ করে। পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া কাশিম মুলতান অধিকার করিয়া বসেন।

যাহা হউক, চাচনামা-কার অন্য স্থানে পরিষ্কার রূপে মুলতানের লুণ্ঠিত স্বর্ণের পরিমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। "স্বর্ণনির্ম্মিত একটী প্রকাণ্ড দেববিগ্রহ, ২৩ মণ স্বর্ণ এবং স্বর্ণরেণু পরিপূর্ণ চল্লিশটী কলসী মন্দিরে পাওয়া যায়। সমস্ত স্বর্ণ ওজন করিয়া দেখা গেল যে তের হাজার দুইশত মণ সুবর্ণ পাওয়া গিয়াছে।" এই 'মণের' ওজন নানাপ্রকার ছিল। আরবের স্থানে-স্থানে উহা ২ পাউণ্ড; মস্কটে ৮৭ পাউণ্ড এবং মধ্য এসিয়ার কোন-কোন স্থানে উহার ওজন ৭½ পাউণ্ড ছিল (৮) যদি ন্যূনতম ওজন অর্থাৎ আরবী মণ ২ পাউণ্ড ধরা যায়, তবে ১৩২ "মণ" প্রায় ১৩২ সের (৮ তোলার) আমাদের ৪ সেরী ৩৩ তিন-শ তিরিশ মণ। প্রাচীনকালে সোনারূপায় প্রায়ই ভেজাল দেওয়া হইত না, ইহা সকলেই জানেন। অতএব ঐ পরিমাণ সোনার বর্ত্তমান মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, আজকালকার দর অনুসারে যদি ভরি ৩০ টাকা ধরা যায়, তবে তিনশ তিরিশ মণ সোনার দাম হয় তিনকোটি ষোল লক্ষ আশীহাজার টাকা। এই বিপুল স্বর্ণভার কি কৌশলে আরবগণের হস্তগত হইয়াছিল, তাহা পাঠকের জানিতে কৌতূহল হইতে পারে। চাচনামা-কার বলেন যে, মুলতানের মন্দিরে গুপ্ত স্বর্ণরাশি মৃত্তিকায় প্রোথিত ছিল। এক ব্রাহ্মণ ঐ স্থান আরবগণকে দেখাইয়া দিলে, ঐ স্থান খনন করিয়া স্বর্ণরাশি উত্তোলিত করা হয়।

যে অসংখ্য হিন্দু পুরুষ বন্দী হইয়া চিরদাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বন্দী হিন্দু-রমণীর কথা ভাবিতে গেলে, হৃদয় ভগ্ন হইয়া যায়। প্রত্যেক স্থানেই যুদ্ধের পর সৈনিকগণকে হত্যা ও স্ত্রী-বালকগণকে বন্দী করা হইয়াছিল। কেন না, ইহাই তখনকার যুদ্ধনীতি। রেওয়ার, আস্কলন্দা, মুলতান প্রভৃতি নগর কাশিমের হস্তে পতিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সমুদয় হিন্দু বালক ও রমণীকে বন্দী করিয়া চির-দাসত্বে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এবম্বিধ লুণ্ঠন কার্য্যের সঙ্গে কাশিম হিন্দু-ধর্ম্মের উপর আরও একটী আঘাত করিয়াছিলেন; মুলতানের অতি প্রাচীন মন্দিরে সূর্য্যদেবের যে প্রতিমূর্ত্তি ছিল, উহার গলদেশে একখণ্ড নিষিদ্ধ-মাংস ঝুলাইয়া দিয়া বিন্‌কাশিম পরম আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন (৯)। এই প্রসঙ্গে আরও একটী

(৫) Sale's Coran. (৬) Lane-Poole's Mediaeval India. Vincent Smith বলেন, জিজিয়া কর ছিল ৪৮, ২৪ এবং ১২ টঙ্কা। Oxford History of India দেখুন।

(৭) Alberuni's Travels translated by Sachau, chap. XV.

(৮) Brigg's Ferista, Vol. I p. 46,

(৯) Chach-namah in Elliot Vol. I,

জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, কাশিমের সেনাদলে জাঠ, মেড় প্রভৃতি ভারতীয় জাতি ছিল ** (১০)।

কাশিমের জীবনের শেষ অধ্যায় উল্লেখযোগ্য। রমণী হরণরূপ মহাপাপই তাঁহার কাল হইয়াছিল। সিন্ধু জয় করিবার পর, খালিফের অনুগত সেনাপতি রাজা দাহিরের পরমা সুন্দরী কুমারী কন্যাদ্বয়কে প্রভুর নিকট উপঢৌকন পাঠান। খালিফ ওয়ালিদ্ তাঁহাদের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাদিগকে হারেমভুক্ত করেন। একদা রজনীযোগে উক্ত রাজকুমারীদ্বয়কে তাঁহার কক্ষে উপস্থিত করা হয়। "জ্যেষ্ঠা কন্যাকে সেই রাত্রির জন্য রাখিয়া, কনিষ্ঠাকে পুনরায় হারেমে পাঠান হয়।" যখন খালিফা তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে উদ্যত হন, তখন জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী বলেন—"হে খালিফ, আমি আপনার স্পর্শের অযোগ্যা। কারণ, আমাদিগকে বন্দী করিবার সময় বিন্ কাশিম আমাদিগের সতীত্বনাশ করিয়াছে। খালিফ ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ যে আদেশ-পত্র পাঠান। তদনুসারে কান্যকুব্জ-বিজয়োদ্যোগী কাশিম আম গো চর্ম্মের সহিত স্বীয় দেহ আপাদ মস্তক সীবন করিয়া আবৃত করেন; এবং সেই অবস্থায় চর্ম্মপেটিকা-বদ্ধবৎ তাঁহাকে খালিফের নিকট পাঠান হয়। খালিফ দাহির-কন্যার সমক্ষে ঐ গো চর্ম্ম-পেটিকা খুলিয়া কাশিমের মৃতদেহ দেখাইলে, রাজকন্যারা সানন্দে বলেন, তাঁহাদের অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা; এবং প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহারা ঐরূপ বলিয়াছিলেন। এক রাজকুমারী খালিফের সমক্ষে এই কথা বলেন—"কাশিম আমাদের মত লজ্জাশীলা একলক্ষ রমণীকে বন্দী করিয়াছিল।" তারপর ঐ রাজকুমারীদ্বয়কে নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল। কাঁহারও মতে তাঁহাদিগকে জীবন্ত অবস্থায় প্রাচীরের সহিত গাঁথিয়া ফেলা হয়। (Chach-namah Elliot, Vol. I)। ফেরেস্তা বলেন, ঐ রাজকন্যাদ্বয়কে ঘোড়ার লেজের সঙ্গে বাঁধিয়া, ঐ ঘোড়াকে দামাস্কাসের রাজপথে দৌড় করান হয়। রাজপথের প্রস্তর সংঘর্ষে ও অশ্বের খুরাঘাতে কোমলাঙ্গী রাজকুমারীর গাত্রমাংস ছিন্ন ও অস্থি খণ্ডিত হইয়া দামাস্কাসবাসীর অসীম আনন্দ উৎপাদন করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্য নিরূপণ করা যায়; কিন্তু অসংখ্য রমণীর সতীত্ব রত্ন, গণনাতীত নিরপরাধ বালকের জীবনের মূল্য কে নিরূপণ করিবে?

এইরূপে সিন্ধু-জয় হইল। আরবগণ সিন্ধুদেশে বাস করিতে আসে নাই; সৈন্য-সামন্ত ও কর্ম্মচারী রাখিয়া, যথেষ্ট কর সংগ্রহ করিয়া, খালিফার ধন-ভাণ্ডার পূর্ণ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। আরব সৈন্য লুণ্ঠন ও হত্যা দ্বারা সমস্ত দেশে আতঙ্কের সৃষ্টি করিতে পারিত বটে, কিন্তু সমগ্র সিন্ধু ও মুলতান প্রদেশ হইতে "মিথ্যাধর্ম্মকে" একেবারে উচ্ছেদ করা তাহাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব ছিল। এ জন্যই বাধ্য হইয়া শান্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। আরব-শাসনাধীন সিন্ধুবাসিগণ যে কঠোরাচরণ সহ্য করিতেন, তাহা সামান্য নয়। জিজিয়া বা মুণ্ডকর তো ছিলই; উত্তরকালে খালিফ দ্বিতীয় ওমর ইহাই তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিলেন যে, সিন্ধুবাসী বিধর্ম্মী প্রজাগণ পরিশ্রম দ্বারা যে অর্থ উপার্জ্জন করিবে, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যৎকিঞ্চিৎ রাখিয়া তাহার সমস্তই জিজিয়ারূপে খালিফকে দিতে হইবে। ঐ মুণ্ডকর এরূপ কঠোরতা ও লাঞ্ছনার সহিত আদায় করা হইত যে, অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বহু লোক ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল (১১)। যে কোন মুসলমান অভ্যাগতকে তিন দিন বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান দিতে প্রত্যেক হিন্দু বাধ্য ছিল। ঘোড়ায় চড়া (বিশেষতঃ রেকাবের উপর), ধর্ম্ম-সংক্রান্ত শোভাযাত্রা, এমন কি সঙ্গীত হিন্দুদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল; অস্ত্রধারণ, এবং মুসলমানের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান বাধ্যতামূলক নিয়ম দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল; এবং বিচারালয়সমূহ নিগ্রহ ও উৎপীড়ন দ্বারা হিন্দুদিগকে ধর্ম্মত্যাগ করাইবার যন্ত্রমাত্র ছিল (১২)।

লুণ্ঠন-ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক রক্তপাত, হত্যাকাণ্ড, ধ্বংসকার্য্য, নারীনির্য্যাতন প্রভৃতি বিষয় শেষ করিয়া, এই লুণ্ঠন দ্বারা আরবগণ কি পরিমাণ ধন সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা এখন দেখা যাউক। বিলাদুরী নামক আরব ঐতিহাসিকের মতে, হাজাজ গণনা করিয়াছিলেন যে, "সিন্ধু অভিযানের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৬ কোটি দাম মুদ্রা; এবং উহার দ্বারা আয় হইয়াছিল ১২ কোটি দাম মুদ্রা" (১৩)। এই বার কোটি দাম খালিফের পঞ্চমাংশ। অতএব মোট সংগ্রহ হইয়াছিল উহার পাঁচগুণ; অর্থাৎ ষাট কোটি দাম। ইলিয়ট গণনা করিয়াছেন, দশলক্ষ দাম = তেইশ হাজার পাউণ্ড (১ দাম = ৫।• পেন্স)। অতএব বার কোটি যদি সিন্ধু-বিজয়ের মোট লাভ হয়, তবে উহার মূল্য হয় সাতাইশ লক্ষ ষাট হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ, পনর টাকা হিসাবে পাউণ্ড ধরিলে, চার কোটি চৌদ্দ লক্ষ টাকা। ইলিয়ট এই অঙ্ককে অতিরঞ্জিত মনে করিয়াছেন। কিন্তু বিলাদুরী নিজে আরবজাতীয় ও মুসলমান; এবং অপর কোন ঐতিহাসিক ঐ কথার প্রতিবাদ করেন নাই। সুতরাং খালিফের পঞ্চমাংশ ১২ কোটি ধরিয়া মোট ষাট কোটি দাম সিন্ধু-লুণ্ঠনের লাভ ধরিলে খুব অন্যায় হইবে না। ষাট কোটি দামের মূল্য কুড়ি কোটি সত্তর লক্ষ টাকা। ইহা অষ্টম শতাব্দীর কথা, এবং ইলিয়টের গণনাও প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে করা হইয়াছে। অষ্টম শতাব্দীর একটাকা ক্রয়কারী ক্ষমতায় এখনকার অন্যূন পনর টাকার সমান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অতএব একমাত্র সিন্ধু-অভিযানের ফলে আরবগণ যে অর্থ ভারত লুণ্ঠন করিয়া পাইয়াছিল, তাহার

(১০) Elliot Vol. I p. 435, সিন্ধুজয়ের পর হইতে খালিফের সেনাদলে সিন্ধুবাসী জাঠ্ প্রভৃতি জাতিরা প্রবেশ করিয়া পারস্য প্রভৃতি দেশেও যুদ্ধ করিয়াছিল।

(১১) Elliot, Vol. X pp. 477-478.

(১২) Elliot, p 478.

(১৩) Futuhul Buldiu of Biladuri, Elliot Vol. I.

পরিমাণ তিন শত কোটিরও কিছু বেশী! আর বৃটিশ ভারত এবং ব্রহ্মদেশের ১৯২১ সালের মোট রাজস্ব ছুইশত এগার কোটি টাকা। অতএব বর্ত্তমানে এ বিষয়ের স্পষ্ট ধারণা করিতে হইলে এই বলিতে হয় যে, বিরাট বৃটিশ ভারত ও ব্রহ্মদেশে এক বৎসর ধরিয়া ভূমিকর, আয়কর, বাণিজ্য, শুল্ক প্রভৃতি বাবদ মোট যে আদায় হয়, ভারতের এক ক্ষুদ্র প্রদেশের কয়েকটা নগর একবার লুণ্ঠন করিয়া, আরবগণ অষ্টম শতাব্দীতে তাহার দেড়গুণ অর্থ হরণ করিয়াছিল!

প্রকৃত প্রস্তাবে, অষ্টম শতাব্দীতেই বৈদেশিক আক্রমণরূপ দাবানলে ভারত দগ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। শান্তিময় ভারতে উত্তরকালে বহু শতাব্দী ধরিয়া যে তাণ্ডবলীলার অভিনয় হইয়াছিল, আরব কর্ত্তৃক সিন্ধুজয় তাহার নমুনা মাত্র; এবং যে নূতন বিভীষিকার ফলে প্রাচীন হিন্দু-লেখকগণ আরবদিগকে "অসুর" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিলেন বৈদেশিক কর্ত্তৃক ভারতীয় আক্রমণের সেই প্রথম বিগ্রহ দ্বারা কি প্রকারে উহা সংসাধিত হইয়াছিল, তাহাও প্রণিধান-যোগ্য।

[স্থান পরিচয় - আলোর—প্রাচীন রোরনগর : উত্তরসিন্ধুর রাজধানী। দেবল বর্ত্তমান করাচি ও ঠাটা নামক স্থানের মধ্যবর্ত্তী; ইহা এখন লুপ্ত। কাহারও-কাহারও মতে বর্ত্তমান করাচির উপরই দেবলের অবস্থিতি ছিল। ব্রাহ্মণাবাদ দাহিরের সময় সমগ্র সিন্ধুদেশের রাজধানী ছিল। এই নগর মধ্যসিন্ধুদেশে অবস্থিত ছিল। আস্কালান্দার—সম্ভবতঃ এরিয়ান, ডিওডোরাস্ প্রভৃতি ভৌগোলিকগণের মতে সিন্ধুদেশের উত্তরভাগে আলেকজাণ্ডার স্বীয় নামে যে নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ইহা সেই নগর। তাহা হইলে আরবগণ যে নগরকে "ভাটিয়া" নাম দিয়াছিল, আস্কালান্দারও সেই "ভাটিয়া" এক এবং মুলতান ও আলোর নগরের মধ্যপথে উহা স্থাপিত ছিল। রেবার বা রেওয়ার—কানিংহামের পুস্তকে এ সম্বন্ধে কিছুই পাইলাম না; বোধ হয় দেবলের দক্ষিণে যে স্থান "জারিবন্দর" বলিয়া চিহ্নিত, উহাই রেবার। মুলতান—প্রাচীন নাম মুলস্থান বা মুলস্থানপুর। অপর নাম, কশ্যপপুর, শাম্বপুর, আদ্যস্থান। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব এস্থানে সূর্য্যদেবের স্বর্ণ-প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করেন। [illegible] আরবেরা ইহার নাম রাখিয়াছিল "স্বর্ণমন্দির"। পূর্ব্বে ইরাবতী নদী এই নগরের পাদদেশে প্রবাহিত ছিল। এখন উহা প্রায় বিশ মাইল সরিয়া গিয়াছে।

[illegible] ক্রমে 'ভারত লুণ্ঠন' সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল একটী ঘটনারই উল্লেখ করা হইল।

পল্লী-সেবা

[শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সরকার, বি-এ]

"সর্ব্বহারা মহাপ্রাণ তাহারে কে রাখে বক্ষ করে'
আলোর ইসারা আসে প্রতিদিন তারই অন্ধ ঘরে,
মৃতদেহ আগুলিয়া সেথা আছে নিশিদিনমান
কে জানে আসিবে কবে এক বিন্দু অমৃতের দান।"

—পল্লীব্যথা।

সত্যই সেই অমৃতের দান আসিয়াছে। দেশে সুবাতাস বহিতেছে—দেশমাতার আহ্বান আসিয়াছে—পল্লী সেবার আয়োজন হইতেছে। এই শুভ মুহূর্ত্তে পল্লী ও পল্লীর প্রাণ কৃষকদের কথার আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তবে এই নন-কো অপারেশনের দিনে এই কো-অপারেশনের কথা ভাল লাগিবে কি না সন্দেহ। নিজেদের মধ্যে এই কো-অপারেশন যত বাড়িবে, তত নন-কো-অপারেশন প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস হইয়া যাইবে। দেশ শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় লইয়া নহে—এ কথা আমরা এখন বুঝিয়াছি। যাহারা মূক, তাহাদের মুখে দিতে হইবে ভাষা,—যাহারা ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত তাহাদিগকে দিতে হইবে অন্ন ও জল,—যাহারা বিবস্ত্র তাহাদিগকে দিতে হইবে পরিধেয়। আমরা ২।৪ জন যদি সুখভোগ করি, জমিদারী চালাই বা কোম্পানীর কাগজের বৃদ্ধি করি, তাহাতে দেশের কি আসে যায়? দেশ যে তিমিরে, সেই তিমিরে। ঐ দেখ, পল্লীতে আর স্বাস্থ্য-সুখ নাই—এখন আর রাখাল-বালক তাহার বংশীধ্বনিতে মন মাতায় না,—চণ্ডীমণ্ডপ আর শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনিতে মুখরিত হয় না; পল্লী-বধূ সন্ধ্যাগমে তাহার পূর্ণ কুম্ভ লইয়া গৃহে ফিরেন বটে—কিন্তু পল্লীমাতার মুখ যেন বিষাদমাখা। গৃহে-গৃহে দলাদলি, সামাজিক স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতা—জমিদার ও মহাজনের অত্যাচারে উৎপীড়িত কৃষকের মুখে আর সে হাসি নাই। তাহার ঘরের চালে খড় নাই, পেটে ভাত নাই, পরিধানে পর্য্যাপ্ত বস্ত্র নাই। দেহে আর পূর্ব্বের সেই বল নাই;—সে দেহ এখন কঙ্কালসার,—প্লীহা ও যকৃৎ তাহার পেট জুড়িয়া বসিয়াছে। গ্রামে পুষ্করিণী, খাল, বিল, ডোবা পানায় পরিপূর্ণ। পল্লী জঙ্গলে ভরা। নৈশ নিস্তব্ধতায় শিবা ও শার্দ্দূলের রবে মনে বিভীষিকার উদ্রেক হয়।—কাল তাহার করাল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া যেন অট্টহাস্য করিতেছে। আমি সহরে বাবু—আমি কৃষকের, শিল্পীর কষ্টার্জ্জিত খাদ্যে ও অর্থে পরিপুষ্ট হইয়া আটতলা বাড়ীতে থাকিয়া মোটরগাড়ী চড়িয়া বেড়াই, কিন্তু স্বার্থপর, বিলাসী আমি আমার পল্লীভ্রাতার (যাহাকে আমি পাড়াগেঁয়ে ভূত বলিয়া ঘৃণা করি) কথা একবার মনেও স্থান দিই না। যদি বা মনে করি, তাহা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় লেখনী-চালনে, কিম্বা উচ্চগলায় সাধারণ সভার বক্তৃতায় পর্য্যবসিত হয়;—ঐ খানেই তাহার যবনিকা। সকলেই বলেন, ভারতের প্রাণ পল্লীতে। জনৈক উদার-হৃদয় ইংরাজ সত্যই বলিয়াছেন—'The *rayat* is India and India is the *rayat*'—কথাটা ঠিক। কিন্তু সেই

নিদ্রিত পল্লী জাগাইবার জন্য কয়জন চেষ্টা করিয়াছেন? আজ দেশমাতার আহ্বানে এই জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তুমি এখনো নিদ্রিত যে? তুমিও মানুষ, চাষাভাইও মানুষ। সে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া সারা বৎসর খাটিয়া তোমাকে তোমার আহার্য্য যোগাইবে—আর তুমি তাহাকে অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখিবে, অন্যান্য সুখের কথা দূরে থাক! দেশ বা জাতি উঠিবে কি করিয়া—যতদিন তোমরা এই নিদ্রিত নারায়ণকে না জাগাইতেছ? দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইলাম, পোষাক পরিলাম, হাওয়া খাইয়া বেড়াইলাম—একটু পান সিগারেট খাইয়া চুলের বাহার দিয়া আসিলাম, তাহাতে মনুষ্যত্ব কোথায়? যদি মানুষ হইয়া মানুষের জন্য প্রাণ না কাঁদে, তবে সে মানুষ থাকা না থাকা সমান। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল;—মনে হইল, জমিদার প্রজার প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য করিবেন। কিন্তু তাহা হইল কৈ? এদিকে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা আরম্ভ হইল—জমিদারের উপর মহাজন ও পাইকার নামধারী আর দুইটি জীবের প্রাদুর্ভাব হইল। তাই পূর্ব্বোক্ত লেখক এক স্থলে বলিতেছেন—"The Collector of the 24 Parganas is not my friend Mr. W. D. Prentice, I.C.S., but Ramcharan, the *mahajan*". ব্যাচারী কৃষকের যে প্রাণ যায়! আহা! তুমি একবার চাহিয়া দেখ—তোমার বুক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, যখন দারিদ্র্যের কশাঘাতে নিপীড়িত, রোগ-শয্যায় শায়িত সেই কৃষকের ভগ্ন কুটীর হইতে শোকের, দুঃখের তপ্তশ্বাস বাহির হইতে দেখিবে। এই ত হইল তাহার অবস্থা। এখন তাহাকে বাঁচাইতে হইলে কি করা উচিত? কথায় বলে—'দশের লাঠি একের বোঝা।' ব্যষ্টিকে যদি সমষ্টিতে পরিণত করিতে পার, সেইখানেই তাহাদের মুক্তি। এই ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিনে—যখন একে অপরের গ্রাস কাড়িয়া লইতে ব্যস্ত—মানুষ মানুষকে সাহায্য না করিলে তাহার দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে হইলে সম্মিলিত চেষ্টা চাই। সভ্য জগতের দিকে চাহিলে দেখা যায়—সকল দিকেই দুর্ব্বল ও প্রবলে ভীষণ দ্বন্দ্ব চলিতেছে। দুর্ব্বলের অন্তরের দেবতা এবার জাগিয়াছেন—তিনি তাহার আত্মবোধ জাগাইয়া দিয়াছেন। তাই দেখিতে পাই শ্রমজীবীদের সঙ্ঘ, সমবায়ের প্রতিষ্ঠা। প্রাচীতেও প্রতীচ্যের হাওয়া আসিয়াছে। ভারতের সঙ্গে পৃথিবীর সম্বন্ধ এখন ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে। ভারত এখন পৃথিবীর বাজারে বেচাকেনা করিতেছে। অন্যান্য জাতি তাহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া বলিতেছে—'অয়মহং ভোঃ'—দ্বার খোল। আর নিশ্চেষ্ট থাকা চলে না। কৃষক ও শিল্পীর ঋণের ভার কমাও—তাহাকে মূলধন যোগাও—তাহাকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া পাইকারের হস্ত হইতে মুক্ত কর—তাহাকে আলোক দাও। অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের কৃষির অবস্থা তুলনা করিলে দেখা যায়—প্রথমতঃ জমি চাষ করিয়া যে পরিমাণে উৎপন্ন-দ্রব্য পাওয়া উচিত, আমরা তাহা পাই না। দ্বিতীয়তঃ কৃষকের যাহা ন্যায্য পাওনা, সে তাহা পায় না—তাহার বেশীর ভাগই জমিদার, মহাজন ও পাইকারের পকেটে যায়। যখন, ইংল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বিঘা-প্রতি পাঁচ ভাগের এক ভাগ, চারি ভাগের এক ভাগ, তিন ভাগের এক ভাগ উৎপন্ন-শস্য আমরা পাই। আবার যে পাটের দাম ইয়োরোপে মণ-প্রতি ৪০৲ টাকা, সেই পাট এখানে ৮।১০৲ টাকায় বিক্রীত হইতেছে। ইহার প্রধান কারণ—কৃষকের অর্থ নাই, বিদ্যা নাই;—সে পরমুখাপেক্ষী হইয়া আছে। তাহার এই সকল অভাব পূরণ করিতে হইলে, গ্রামে-গ্রামে কৃষিসঙ্ঘ স্থাপন করিতে হইবে—তাহাতে ভদ্রলোক ও কৃষক যাঁহাদের চাষ আছে—সমভাবে স্থান পাইবেন। প্রত্যেক সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক থাকিবেন ও সভ্যেরা সামান্য কিছু চাঁদা দিবেন। সমিতির কার্য্য হইবে—কৃষির উন্নতির উপায়ের আলোচনা—সমবায় সমিতি প্রভৃতি স্থাপন করিয়া অর্থাগমের উপায়-নির্দ্ধারণ,—সম্মিলিতভাবে বীজ, সার যন্ত্রাদি সরবরাহ করা,—উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় প্রভৃতি। গ্রাম্য সমিতি, তাহার পর মহকুমা-সমিতি, জেলা সমিতি, প্রাদেশিক সমিতি গঠিত করিতে হইবে। আবার মহকুমা-সমিতি জেলা সমিতি গঠিত করিবেন। এইরূপে জন-প্রতিনিধিগণকে লইয়া এক-একটি প্রাদেশিক সঙ্ঘ গঠিত করিতে হইবে। তখন কৃষক বুঝিবে, সেও সমাজদেহের একটা অঙ্গ এবং তাহারও তথায় একটা স্থান আছে। এইরূপে তাহার দেশাত্মবোধ জন্মিবে; এবং পরস্পরে মিলিয়া পরের জন্য, দশের জন্য সে কাজ করিতে শিখিবে। তাই আইরিশ কবি "এ.ই." বলিয়াছেন—"Man does not live by cash alone, but by every gift of fellowship and brotherly feeling society offers him. The final urgings of men and women are towards humanity." দেশের রাষ্ট্রীয় সভাও তখন তাহাকে পায়ে ঠেলিতে পারিবে না। জাপানে ঠিক ইহাই ঘটিয়াছে। আবার যদি আয়ার্ল্যাণ্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেখানেও দেখিতে পাই, এই একই চেষ্টা চলিতেছে। কৃষক এই সকল সভার মধ্য দিয়া পরস্পরের সঙ্গে ও জগতের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ বুঝিতে পারে। তাহার জিনিস কোথায় যায়, তাহাকে কোথা হইতে নিজের আবশ্যক দ্রব্যাদি কিনিতে হইবে—এই সকল জানিতে পারিবে। এক কথায় পৃথিবীর হাট-বাজার সে নিজে চিনিতে শিখে, সে নিজেই তাহার ক্রয়বিক্রয় করে। মহাজনের ও ব্যবসায়ীর ক্ষমতা কি যে তাহাকে চাপিয়া রাখে। সে এখন একা নহে, তাহার পশ্চাতে সঙ্ঘের বল। সে তখন অবস্থার উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে দশের সহায়তায় তাহার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নৈতিক উন্নতি প্রভৃতির দিকে মন দেয়। সভায় তাহারা স্বাস্থ্যতত্ত্ব, কৃষিবিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, নীতি-কথা প্রভৃতির আলোচনা শুনিবে। মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে (Model farms) লইয়া যাইতে হইবে। ক্রমে ক্রমে সঙ্ঘের উদ্বৃত্ত অর্থে অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় (night school), আমোদ-প্রমোদের স্থান প্রভৃতি স্থাপিত হইবে। সভ্যতার বিস্তৃতির সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের অভাব ও আকাঙ্ক্ষাও বাড়িতেছে—যাহা তাহাকে নগরের দিকে লইয়া যাইতেছে। গ্রামেই তাহার আশা ও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে, তবেই পল্লী রক্ষা পাইবে। আইরিশ কবি সত্যই বলিতেছেন—"The pioneers of a

new social order must think first of the average man in field or factory, and so unite these and so inspire them that the noblest life will be possible through their companionship. Unless the countryside can offer to young men and women some satisfactory food for soul as well as body, it will fail to attract or hold its population, and they will go to the already over-crowded towns." সমবায় সমিতি এ ক্ষেত্রে সূচনা করিয়াছে—সমবায়ের পাকাভিত্তি নির্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু শুধু ঋণদান সমিতিতে কাজ হইবে না। এইরূপ কৃষিমণ্ডল স্থাপন কর, তাহার পর একে-একে সকলই আসিবে। কাজটি প্রথমে খুব সোজা নয়। যদি সমাজের জন্য, দেশের জন্য কাজ করিয়া ধন্য হইতে চাও, কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও—ভারতীয় সভ্যতাকে এইরূপে নিম্নতম স্তর হইতে, ভিতর হইতে গড়িয়া তুল। সাধনায় সিদ্ধিলাভ অনিবার্য। তখন দেখিবে—দেশে স্বাস্থ্য ও সুখ ফিরিয়া আসিবে—কৃষকের মুখে হাসি দেখা দিবে—পল্লী আনন্দে নৃত্য করিবে—দেশ আপনার পায়ে আপনি দাঁড়াইবে। মনে রাখিতে হইবে—"It is not for India to follow the West back blindly, to an effete civilization which is passing, but to lead it along a more excellent way, out of the dark shadows of the past and present, into a new world of brotherhood dyed with God Himself."

জীবিকার্জনোপযোগী শিক্ষা

[অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত, এম এ, বি টি]

শিক্ষার চরম লক্ষ্য ও উচ্চ আদর্শ কল্পনা-রাজ্যে যাহাই হউক না কেন, বাস্তব রাজ্যে জীবিকার্জন যে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য, সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তাই 'বাস্তবের' উপাসক আমেরিকা উর্বরাষ্ট্র-সংস্থানের চিন্তায় ব্যস্ত; তাই উদার শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে দেশমধ্যে যাহাতে জীবিকার্জনোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থাও বহু পরিমাণে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে আমেরিকা আজ এত আগ্রহান্বিত। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্য্যন্ত শিক্ষার উচ্চ নিম্ন সর্ব্ববিভাগেই এই প্রকার কার্য্যকরী শিক্ষার প্রতি আমেরিকার লোকের আগ্রহ দৃষ্ট হয়। পরের গলগ্রহ হইয়া জীবনধারণ বা সমাজের ভারস্বরূপ হইয়া নিষ্কর্ম্মাভাবে দিনযাপন, স্বাধীন দেশের লোকের চিন্তারাজ্যে একেবারে স্থান পাইতে পারে না। সুতরাং নিজ-নিজ জীবন-ধারণ ও স্ত্রী-পুত্রের ভরণ পোষণের জন্য ধনী-নির্ধন-নির্বিশেষে আমেরিকার প্রত্যেক ব্যক্তিই ব্যবসায়গত শিক্ষালাভের জন্য উদ্‌গ্রীব। যে জীবিকা বা বৃত্তি অবলম্বন করিতে গেলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কোনরূপে খর্ব্ব বা ক্ষুণ্ণ হয়, সেইরূপ বৃত্তিকে তাহারা ঘৃণার চক্ষে দেখে। তাই বাঙ্গালীর ন্যায় ত্রিশ টাকার কেরাণী-গিরির জন্য তাহারা লালায়িত নয়।

তাহারা চায় কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে। এ দেশেরই প্রাচীন প্রবাদবাক্য পদে-পদে নিজ দেশে অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া ভয়ে সাতসমুদ্র তের নদী পার হইয়া আজ আমেরিকায় আশ্রয় লইয়াছে।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥"

ইহাই আজ আমেরিকার মূলমন্ত্র হইয়াছে। ইহাকেই বলে অদৃষ্টের বিড়ম্বনা। যে দেশে একদিন বাণিজ্যই অর্থলাভের প্রশস্ত উপায় বলিয়া বিবেচিত হইত, সে দেশে আজ বাণিজ্যের আদর নাই। তাই চিরচঞ্চলা লক্ষ্মীও বাণিজ্যের অন্তর্ধানের সঙ্গে-সঙ্গে দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। বিশেষত বাঙ্গালী জাতি দাসবৃত্তিকে বড়ই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। তাহাদের চক্ষের সম্মুখে তাহাদের দেশে বসিয়াই বিদেশী বণিকগণ ক্রোড়পতি হইয়া রাশিকৃত অর্থের উপর গড়াগড়ি যাইতেছে, আর বাঙ্গালীগণ দুই মুঠা অন্নের জন্য তাহাদের দাসবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই নিজকে কৃতার্থমন্য মনে করিতেছে। "কোন বৈদেশিক হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে নামিয়া গঙ্গার পোল পার হইয়া যদি বড়বাজার অঞ্চলে প্রবেশ করেন, তাঁর প্রথম ধারণা হইবে—এটা মাড়োয়ারীর দেশ। তারপর ক্ষণকাল পরে ক্যানিং ষ্ট্রীট দিয়া মুর্গীহাটা অঞ্চলে যদি তিনি ঘুরিয়া আসেন, তাহা হইলে তিনি ভাবিবেন—একি দিল্লীওয়ালা ও নাখোদা মুসলমানের দেশ? মুর্গীহাটার দক্ষিণধারে এজরা ষ্ট্রীট, পোলক ষ্ট্রীট প্রভৃতির মধ্যে যদি তিনি প্রবেশ করেন, তাহা হইলে তাঁর ধারণা হইবে এটা বোম্বাইওয়ালা, ভাটিয়া ও আর্মেনিয়ানের দেশ। তারপর আপিস পাড়া (Clive street) হইতে বরাবর লালদীঘি অতিক্রম করিয়া গবর্ণমেণ্ট প্লেস দিয়া চৌরঙ্গীতে গেলে দেখিতে পাইবেন, পথের পার্শ্বে সৌধশ্রেণী ধনী ইংরাজ-ব্যবসায়ী ও বণিকের আনাগোনায় মুখরিত।" স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার 'অন্ন সমস্যার' ভূমিকায় কলিকাতার ব্যবসায়ের প্রকৃত চিত্র এইভাবে সর্ব্বসমক্ষে ধারণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ কেরাণীবৃত্তিকে ভারতবাসী আজ জীবিকার্জ্জনের একমাত্র উপায় ধরিয়াছেন। বিবেকানন্দের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—"ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে।... তোমরা কি বল দেখি? আর তোমরা এখন কোরছই বা কি? আহাম্মক তোমরা বই হাতে কোরে সমুদ্রের ধারে পাইচারি কোরছ। ইউরোপীয় মস্তিষ্কপ্রসূত কোন তত্ত্বের এক কণামাত্র—তাও খাঁটি জিনিষ নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছ; আর তোমাদের প্রাণমন সেই ত্রিশ টাকার কেরাণীগিরির দিকে পড়ে রয়েছে। না হয় জোর একটা দুষ্টু উকীল হবার মতলব করছো। ইহাই বাঙ্গালী যুবকগণের সর্ব্বোচ্চ দুরাকাঙ্ক্ষা।"

কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে সেই একই কথা। কৃষিকর্ম্মই ভারতবাসীর প্রধান জীবিকা। কিন্তু সেই কৃষিকার্য্যের উন্নতি সম্বন্ধেও ভারতবাসী উদাসীন। আজ সভ্যদেশে বিশেষতঃ আমেরিকায় বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে নব-নব যন্ত্র উদ্ভাবিত ও আবিষ্কৃত হইয়া কৃষিক্ষেত্রে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। স্থানে স্থানে কৃষিবিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৃষিসংক্রান্ত বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে। অল্প দিনের মধ্যে আমেরিকা কৃষি বিষয়ে এত উন্নতি লাভ করিয়াছে যে, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু আমাদের কৃষি-প্রধান ভারতবর্ষের কৃষকগণের শিক্ষার জন্যে এখনও বিজ্ঞানসম্মত নব শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল না। কাজেই তাহাদের সেই মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতি ও ভূকর্ষণপ্রথা বিবর্ত্তিত হইল না; আর তাহাদের দুর্দ্দশাও ঘুচিল না।

'একটা মান্ধাতার আমলের একটাকা দামের তাঁত ও একটা গর্ত্তের ভিতর পা; এই সরঞ্জামে ২০ টাকা গজের কিংখাপ' এদেশে উৎপন্ন হয় সত্য, কিন্তু এখন এই কঠোর জীবন-সংগ্রামের যুগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে টিকিয়া থাকিতে হইলে সেই প্রাচীন পথা ধরিয়া থাকিলে চলিবে না। অন্যান্য সভ্যদেশের ন্যায় ভারতকেও আজ শিল্পক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে; শিল্পশিক্ষার প্রচার ও প্রসার সাধন করিয়া দেশমধ্যে শিল্পোন্নতি ও কলকারখানা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়, গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ সকলেরই একটা কর্ত্তব্য আছে। বিশেষতঃ, দেশময় এইরূপ ব্যবসায়-গত শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইলে, সকলের সমবেত চেষ্টা অতীব প্রয়োজনীয়।

গত ৭ই মে স্যার আশুতোষের নেতৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর বঙ্গের শিক্ষকগণের যে সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে স্থির হইয়াছে যে—দেশের উচ্চ বিদ্যালয়গুলির পাঠ্য-তালিকার পরিবর্ত্তন করিয়া, তাহাতে জীবিকার্জ্জনোপযোগী কতিপয় শিক্ষা-বিষয়ের সমাবেশ করা হইবে। সুতরাং সেই সভায় এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, প্রত্যেক ছাত্রকেই কৃষি, কাঠের কাজ, লোহার কাজ, টাইপ-রাইটিং, বুককিপিং, সর্টহ্যাণ্ড, সুতাকাটা, তাঁত বোনা, দর্জ্জির কাজ, গান প্রভৃতির যে কোন একটি বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে; এবং সে সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে। এই প্রস্তাবটি খুব সময়োপযোগী হইয়াছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকর প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে কি না জানি না।

বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদনে প্রয়াস পাইলেন বটে, কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে, দেশের স্থায়ী উপকার সাধিত হইবে কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। এই-রূপ ব্যবস্থার সাহায্যে প্রকৃত ব্যবসায়-গত শিক্ষা প্রদত্ত হইতে পারে না। যে পর্য্যন্ত দেশে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন দেশের আর্থিক উন্নতির আশা দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র।

এই প্রকার ব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্য—ব্যবসায়-গত শিক্ষার দিকে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও অনুরাগ জন্মাইয়া দেওয়া, এবং সঙ্গে-সঙ্গে মনোবৃত্তি-বিশেষের বিকাশের সহায়তা করা। সেই হিসাবে ইহার বেশ প্রয়োজনীয়তা আছে। আমেরিকার সকল বিদ্যালয়েই একরূপ ব্যবহারিক শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। তথায় পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষার চরম লক্ষ্য নয়। কাজেই, শিক্ষার প্রতি স্তরেই, শিক্ষার্থী যাহাতে কিছু-কিছু কার্য্যকরী শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আমেরিকায় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে, এবং যেখানে শিশুগণ বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করিতেছে, সেখানেও স্মৃতিশক্তি ও অন্যান্য মনোবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে শিশুর হস্ত, পদ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির যাহাতে উন্মেষ সাধিত হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। তাই নানা প্রকার ক্রীড়নক, চিত্রাঙ্কন ও আদর্শ-নির্ম্মাণ (modelling) প্রভৃতির সাহায্যে শিশুকাল হইতেই সেখানে হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। তার পর প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ছাত্রকে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে কোনও ব্যবসায়-বিশেষের সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। কেহ বা কাঠের কাজ (carpentry), কেহ বা লোহার কাজ (smithing), কেহ বা বই বাঁধার কাজ (book-binding), কেহ বা পাদুকা নির্ম্মাণের কাজ (shoe making), সেখানে শিক্ষা করে। বালিকাগণ সাধারণতঃ সেখানে সেলাই, রন্ধন, গৃহস্থালী প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা করে। কিন্তু এই সকল ব্যবস্থা সাধারণ শিক্ষার অন্তর্গত। ইহাদিগকে কোনমতে ব্যবসায়-গত শিক্ষা প্রচারের প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করা যায় না। তাই এই সকল বিধি-ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া, আমেরিকা ব্যবসায়-গত শিক্ষা প্রদানের জন্য বিভিন্ন প্রকারের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ব্যবসায়-গত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে।

অষ্টবৎসরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, শিক্ষার্থী বা তাহার অভিভাবক স্থির করে যে, সে উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া উচ্চাঙ্গের সাধারণ শিক্ষা লাভ করিবে, না কোনরূপ ব্যবসায়িক শিক্ষা লাভ করিবার জন্য ব্যবসায়-গত বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে। যাহারা উচ্চাঙ্গের সাধারণ শিক্ষা লাভে উৎসুক নয়, তাহারা জীবিকার্জ্জনোপ-যোগী শিক্ষা লাভের জন্য ব্যবসায়-গত বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। সেখানে ব্যবসায়িক ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদানের দিকেই মনোযোগ দেওয়া হয় (যদিও সঙ্গে-সঙ্গে সাধারণ বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হয়)।

যাহারা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করিয়াই কোন ব্যবসায় অবলম্বন করে, তাহারা অনিপুণ শ্রমজীবী (unskilled labourer) রূপে জীবন যাপন করে। আর যাহারা সুনিপুণ শ্রমজীবী (skilled labourer) রূপে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে চায়, তাহারা নিম্নস্তরের একপ্রকার শিল্পবিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। ইহাদিগকে প্রাথমিক শিল্প-বিদ্যালয় বলা যাইতে পারে। যাহারা শিল্পবিষয়ে আরও উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে চায়, তাহারা ইন্‌ষ্টিটিউট অব টেকনোলজি (Institute of Technology) প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের শিল্পবিদ্যালয়ে

রহিয়াছে। ধর্ম্ম-জগতে প্রাচীন আর্য্যগণের কীর্ত্তি অতুলনীয়। আজ তাঁহাদের অধস্তন বংশীয়দের কি শোচনীয় পরিণাম! সেই প্রাচীন ঋষিগণ,—আমাদের পূর্ব্বপুরুষ,—আমরা তাঁহাদেরই বংশধর! আমাদের ছিল সব; কিন্তু এখন কিছুই নাই। আমরা মূলে ও লাভে সব খোয়াইয়া বসিয়াছি। এখন আমাদের গর্ব্ব করিবার সম্বল মাত্র পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনন্যসাধারণ চিন্তাপ্রসূত গ্রন্থরাজি। দুঃখের বিষয়, নবীন শিক্ষার মোহে আমরা এমন অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছি, স্বভাব এমন বিরুদ্ধ পথের যাত্রী হইয়াছে যে, পুরাতনের নাম শুনিলেই আমাদের নাসিকা কুঞ্চিত হয়। চিরনূতন রামায়ণ-মহাভারতের আদর নাই। দর্শন, বিজ্ঞান নামমাত্রে পর্য্যবসিত। এমন দিনে পুরাতন কথা কাহারও মনে লাগিবে কি? ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির সংবাদে জৈন মহাভারত পাণ্ডব-চরিতে রাজনীতির কিছু আভাস পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ণাশ্রমমূলক বেদানুমোদিত সনাতন ধর্ম্ম প্রচলিত। প্রাচীনতার হিসাবে তাহার পরেই জৈন মত। অন্যান্য সম্প্রদায় ইহাদের নিকট নবীন। জৈন মনীষিগণের সাধনার ধন জৈন সাহিত্য-ভাণ্ডারে যে সমস্ত রত্নরাশি সঞ্চিত রহিয়াছে, আমার দেশবাসী কেহ কি তাহার দিকে একবার তাকাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিতে পারেন না? দেখিতে পাইবেন, সে ভাণ্ডারে প্রভূত অমূল্য রত্ন সাজান রহিয়াছে। আমরা আজ সেই ভাণ্ডার হইতে যৎকিঞ্চিৎ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

পল্লী-বৃদ্ধ

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার দত্ত

১

কারও 'জেঠা' কারও 'খুড়ো' কারও বা 'দাদামশায়'
সকলেরই আপন-জনা—বুকটা ভরা মমতায়!
আঁখির কোণে স্নেহ ঝরে, লেগেই আছে মুখে হাসি,
তাজা সরল সরস প্রাণে বাজ্‌ছে যেন ভোরের বাঁশী।
নিজের মানুষ যারা ছিল, দিল ফাঁকি সবাই তারা,
সারা পল্লী নিজেরই আজ—নিজের কথা স্বপন পারা!

২

ঠিক ঠিকানা কে জানে তাঁর বয়স যে তাঁর হ'ল কত,
শৈশব হ'তে সবাই তাঁরে আসছে দেখে একই মত!
ছেলে বুড়ো সবার তিনি চিরকালের খেলার সাথী,
শিশুর রাজ্য কোলে পিঠে চল্‌ছে সদা মাতামাতি!
কালের সাক্ষী অক্ষয় বটে কত পাখী বাঁধ্‌ল বাসা,
সবারই ঠাঁই উদার হৃদে, তৃপ্ত যেন সবার আশা!

৩

ভোর না হ'তেই সারা অঙ্গের পাড় পাড়ার পথি ধরে
শুধাইয়ে কুশল সবার ফিরেন তিনি হর্ষ ভরে!
যখনই যান যাহার বাড়ী, আনন্দেরি মেলা বসে,
সকল চিত্ত উঠে ভরি' নানানতর মধুর রসে!
দুঃখী ভুলে দুঃখ যে তার, রোগের জ্বালা রোগী ভুলে,
নয়ন-ধারা শুষ্ক কখন,—মরুভূমি পূর্ণ ফুলে!

৪

এ-পার হ'তে যাচ্ছে শোনা ও-পারেরি বোধন-গান,
তাই কি তাঁর ক্ষণে ক্ষণে নেচে এমন উঠ্‌ছে প্রাণ!
ভাঙ্গা দেউল পড়ে-পড়ে, দেবতা তার কি খোঁজ রাখে,
না চাহিতে হচ্ছে সুখী যখন যেবা দেখ্‌ছে তাঁকে!
মোদের গাঁয়ের "বুড়ো শিবের" ইনি কিগো সজীব-ছায়
নানান্ ছলে ঘরে ঘরে আপন-হারা বিলান মায়া!

Emerald Eng. Works

অসীম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ.]

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

নগরোপকণ্ঠে এক শুষ্ক সরসী তীর, রক্তবর্ণ পলাশ কুসুমে আচ্ছাদিত হইয়া ছিল। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই, ঊষার স্নিগ্ধ-মধুর, শুভ্র আভায় পূর্ব্বদিক ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। পলাশ বৃক্ষতলে অস্পষ্ট আলোকে এক রমণী দাঁড়াইয়া ছিল। সহসা দূরে পদশব্দ শ্রুত হইল। তাহা শুনিয়া রমণী বৃক্ষতলের অন্ধকারে আত্ম-গোপনের চেষ্টা করিল। পদশব্দ নিকটে আসিল। আগন্তুক পুরুষ। সে পথ পরিত্যাগ করিয়া, পলাশ-তলে আসিয়া রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি কে?" রমণী পলাইবার উদ্যম করিল; কিন্তু তাহার চরণ চলিল না,—যেন কে একটা অদৃষ্ট শক্তি আসিয়া তাহার চরণদ্বয় লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া দিল। রমণী রাশি-রাশি শুষ্ক পলাশ-পত্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া, থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আগন্তুক তাহার অবস্থা দেখিয়া কহিল, "তুমি ভয় পাইও না মা, তুমি কে আমাকে বল।" রমণী নিরুত্তর। তাহা দেখিয়া আগন্তুক পুনর্ব্বার কহিল, "দেখ মা, তোমার সম্বন্ধে আমি অনেক কথা জানিতে পারিয়াছি; সুতরাং তুমি উত্তর না দিলেও, একেবারে পরিচয় গোপন করিতে পারিবে না। আমার পরিচয় শুন, আমার নাম হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার; নিবাস বাঙ্গালাদেশে। আমি ব্রাহ্মণ, অসীম রায়ের পিতার অন্নে প্রতিপালিত। যাহার অত্যাচারে অসীম ও তাহার পিতা দেশত্যাগ করিয়াছে, তাহার জন্য আমিও দেশত্যাগ করিয়াছি। তুমি যদি আমার নিকট কোন কথা গোপন না কর, তাহা হইলে হয় ত আমরা অসীমের উপকার করিতে পারিব।" রমণী তথাপি নিরুত্তর। বিদ্যালঙ্কার পুনরায় কহিলেন, "দেখ মা, কিছুদিন পূর্ব্বে অসীমের আশ্রয়ে তুমি আমার গৃহে আসিয়াছিলে; এবং আমার কন্যা ও পুত্র-বধূর নিকট দুই-তিন দিবস ছিলে, কেমন কি না?" রমণী নিজের অজ্ঞাতসারে মস্তক-চালনা করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। বিদ্যালঙ্কার জিজ্ঞাসা করিলেন, "অসীম কি কখনও তোমার অনিষ্ট করিয়াছে?" এতক্ষণে রমণীর কণ্ঠ মুক্ত হইল; সে কহিল, "অনিষ্ট! এমন কথা মুখে আনিবেন না। তিনি দেবতা, তিনি নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমি যখন আশ্রয়হীনা, তখন তিনি স্বর্গে আশ্রয় দিয়া—" "সে কথা আর বলিতে হইবে না; কারণ, তাহা আমি জানি। এখন বল তুমি কে?" "সে কথা আর আপনার শুনিয়া কাজ নাই।" "কেন বল না মা, পরিচয় দিতে ক্ষতি কি?" "আপনি আমার অপরাধ লইবেন না; যদি আবশ্যক হয় পরে পরিচয় দিব।" "ভাল কথা, আমি যতদূর বুঝিলাম, তাহাতে বোধ হয় তুমি অসীমের অনিষ্ট-কামনা কর না।" "না, কখনই না। আপনি কে তাহা জানি না; আমার বোধ হয়, আপনিও তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আমি সামান্যা রমণী। আমার ক্ষুদ্র জীবন দিয়াও যদি কখনও তাঁহার উপকার হয়, জানিবেন, আমি সর্ব্বদা সর্ব্বস্ব তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিব।" রমণীর নয়ন-কোণ হইতে দুইবিন্দু অশ্রু বিগলিত হইল,—আবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তাঁহাকে প্রকৃতিস্থা হইবার অবসর দিয়া, কিয়ৎক্ষণ পরে বিদ্যালঙ্কার পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আর একটা কথার উত্তর দিবে? যেদিন প্রভাতে সন্ন্যাসিনী সাজিয়া আমার গৃহের দুয়ারে দাঁড়াইয়াছিলে, সেদিন দূর হইতে এক রমণীকে দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছিলে, সে তোমার শত্রু। সে কে, তা কি তুমি জান?" "সে আপনাদের দেশের বৈষ্ণবী।" "সে কি সত্য-সত্যই তোমার দুশ্মন?" "হাঁ, কারণ, সে তাঁহার দুশ্মন।" "তুমি কেমন করিয়া জানিলে যে, সে তাঁহার দুশ্মন?" "বাবুজী, শত্রু-মিত্র চিনিতে পুরুষের যত বিলম্ব হয়, রমণীর তত হয় না।" "ঠিক বলিয়াছ মা। এই সরস্বতী বৈষ্ণবীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেই তোমার নিকট আসিয়াছি। তোমার সহিত বৈষ্ণবীর আলাপ কত দিনের?" "আমি তাহাকে আপনার গৃহেই দেখিয়াছি;—পূর্ব্বে দেখি নাই।" "পরে কয়দিন দেখিয়াছ মা?" "দুই-তিন দিন।"

"সে তোমার নিকট হইতে কি খবর বাহির করিবার চেষ্টা করে?" "সে কথা আমি আপনার নিকট বলিতে পারিব না।" "লজ্জা করিও না মা। যদি অসীমের মঙ্গল চাও, সকল কথা ব্যক্ত কর। সে কি জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি অসীমকে ভালবাস কি না?" "সে কথাও জিজ্ঞাসা করেছে।" "ভাল, তবে আর তোমার বলিতে লজ্জা কি? আর কি জিজ্ঞাসা করে বল।" "একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তিনি রাত্রিতে আপনার গৃহে আসেন কি না?" "আর বলিতে হইবে না মা। দেখ, আমি অন্ধ হইয়াছিলাম। অসীমের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমার বাল্যবন্ধু; অথচ, তাহারই জন্য আমি দেশত্যাগী। সে যদি ইচ্ছা করিত, বাম অঙ্গুলি হেলনে আমার শত্রুদল বিনাশ করিতে পারিত। হরনারায়ণ কেন আমার বিপক্ষ হইয়াছিল, তাহা এত দিনে বুঝিতে পারিলাম। মা, তোমার নাম মণিয়া। তুমি নর্তকী, তুমি বেশ্যাকন্যা; কিন্তু তুমি বেশ্যা নহ। তোমার চরিত্রে যে দৃঢ়তা আছে, তাহা অনেক হিন্দু রমণীরও নাই। আমি জানি, তুমি তাহার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছ,—বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছ। না মা, লজ্জা করিও না। আমি তোমার পিতৃতুল্য। দেখ মা, পবিত্র প্রেম আকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত,—ইহাই হিন্দু শাস্ত্রের মত। যদি অসীমের পদে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া থাক, তাহা হইলে ত্যাগ স্বীকার কর, প্রবৃত্তি দমন কর; তাহা হইলে চিত্তে, একদিন না একদিন, তৃপ্তি আসিবে; কারণ, হিন্দু সমাজে তুমি তাহার অস্পৃশ্যা। কামনা পরিত্যাগ করিয়া প্রেমাস্পদের অর্চ্চনা করিতে শিখ, তাহা হইলে যে তোমার ভবাকাঙ্ক্ষ, তাহাকে উপাস্য দেবতা করিয়া চিত্ত-প্রসাদ লাভ করিবে।" মণিয়া কহিল, "পিতা, এক সন্ন্যাসী আমাকে এই কথাই বলিয়াছিল।" "শুন মা, ইহা ভিন্ন রমণীর অন্য গতি নাই। জগতে মানুষে যাহা চাহে, তাহাই কি পায়? দুরাশা ও দুরাকাঙ্ক্ষা লইয়া মানুষ জগতে বাস করে। মানুষ জানে যে, ইষ্ট ও আকাঙ্ক্ষিত বস্তু দুর্ল্লভ; কিন্তু আশা ও আকাঙ্ক্ষা অসীম। মানুষ জানিয়া শুনিয়া দুর্ল্লভের আকাঙ্ক্ষা লইয়াই দিনপাত করিয়া যায়। মা, যদি মানুষিক প্রেম পবিত্র করিয়া, কামনা পরিত্যাগ করিয়া, ঈপ্সিতকে ভজনা করিতে পার, তাহা হইলে জগতের পথে তোমার ও তাহার পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না। পারিবে মা?" "পারিব।" "ঠিক বলিতেছ পারিবে? বুঝিয়া বলিও, পারিবে?" "পারিব।" "শপথ কর, হিন্দু ও মুসলমানের একমাত্র ঈশ্বরের নাম লইয়া শপথ কর।" "বাপজান, আমি বেশ্যার কন্যা। জীবনে এত মিষ্ট কথা কেহ কখনও আমাকে বলে নাই। শৈশবে পিতৃস্নেহ বঞ্চিত হইয়া যে শিশু পালিত হয়, তাহার দুঃখ কত জান। যদি জান, তাহা হইলে বুঝ। জীবনে প্রথম তাঁহার মুখে মিষ্ট সম্ভাষণ শুনিয়াছিলাম। কসবীর মনে যে দরদ লাগিতে পারে, তাহারও যে প্রাণ আছে, স্নেহ-মমতা আছে, এ কথা তাঁহার সহিত দেখা হইবার পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই,—জটিলা সংসারে কেহ আমাকে বুঝিতে দেয় নাই। বাপ, সেইজন্য, সেই অবধি তিনি আমার দেবতা, আমার একমাত্র ঈশ্বর। আমি না হিন্দু, না মুসলমান। মাতা হিন্দু, পিতা মুসলমান; মাতা বেশ্যা, সুতরাং ঈশ্বরের পবিত্র নাম কখনও শুনি নাই। শুন পিতা, যিনি আমার দেবতা, যিনি আমার একমাত্র ঈশ্বর, তাঁহার পবিত্র নাম লইয়া শপথ করিতেছি, আমি পারিব। আমি, মণিয়া,—কসবীর কন্যা কসবী,—মনের কামনা দূর করিয়া ফেলিয়া দিব, বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা অনলে দগ্ধ করিয়া—" মণিয়া আর বলিতে পারিল না। বৃদ্ধ বিদ্যালঙ্কার তাহার হস্তধারণ করিয়া বসাইলেন; এবং বারে-বারে কহিলেন, "মা, তুমি আমার দুর্গার মত চির দুঃখিনী; আজি হইতে আমার নিকট দুর্গাও যে, তুমিও সে। শুন, শুন,—অসীম শত্রু-বেষ্টিত; কিন্তু সে নিরপরাধ। তাহার শত্রুবর্গ প্রবল; আর অসীম বালকের মত অসন্দিগ্ধ-চিত্ত। আমি ষাট বছরের বুড়া; কিন্তু এ কথা কাল সন্ধ্যাকালে বুঝিতে পারিয়াছি মা। অসীম যখন শিশু, তখন তাঁহার পিতা তাহার অন্ধ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অন্তিম শয্যায়, গঙ্গাতীরে আমার করে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমি অন্ধ হইয়াছিলাম। মোহে আচ্ছন্ন হইয়া প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়াছিলাম, সেই জন্যই অসীম রায় আজ পথের ভিখারী। আর এখন বুঝিতেছি, সেই পাপে আমি আজ দেশত্যাগী। মা, যদি ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহেন, তাহা হইলে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব,—অসীমের পৈত্রিক সম্পত্তি তাহাকে ফিরাইয়া দিব,—তাহাকে সংসারী করিব,—কাশীবাস করিব। তুমি কি সাহায্য করিবে?" মণিয়া মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় কহিল, "আমাকে যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।" "ভাল কথা, এখনই এই পথে সরস্বতী আসিবে,

তুমি তাহার সহিত সমস্ত দিন ঘুরিবে; এবং সন্ধ্যাকালে আসিয়া আমাকে সংবাদ দিয়া যাইবে। আর একটা কথা,—আমার অনুমতি না লইয়া অসীমের সহিত দেখা করিবে না, পারিবে?" "অবশ্য পারিব।"

একপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

যখন হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার পাটনা নগরে মণিয়ার সহিত কথা কহিতেছিলেন, তখন মুরশিদাবাদের পরপারে চাহাপাড়াগ্রামে, গঙ্গাতীরে কানুনগোই হরনারায়ণ রায়ের অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক নাপিত চোপ্দারকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "কর্ত্তা কি খোরা হইবেন?" চোপদারের হৃদয় প্রেমপ্রবণ, সে কহিল, "নবীনদাদা, একবার তামাক চাক্কী করিবে না কি? কলিকা তৈয়ার,—তুমি সেবা কর, আমি কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।" চোপদার তকা হইতে কলিকাটা তুলিয়া লইয়া নবীনের হস্তে দিল। নবীন তাহা লইয়া দ্বারের সম্মুখে উপবেশন করিল। চোপদার অন্দরে প্রবেশ করিল।

অন্দরে সুদীর্ঘ প্রশস্ত ফেনিভ শয্যায় বসিয়া কানুনগোই হরনারায়ণ তামাকু সেবন করিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে বহুল পরিমাণ ভূমি ব্যাপিয়া তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী বিরাজ করিতেছিলেন। একজন দাসী তালবৃন্ত লইয়া গৃহিণীকে ব্যজন করিতেছিল, অপরা একটি প্রকাণ্ড ছিলিমচি স্কন্ধে লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তৃতীয়া এক বিশাল তাম্বূলাধার উভয় হস্তে গৃহিণীর সম্মুখে ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কর্ত্তা কহিলেন, "তাই ত, আপদ যে বিদায়ও যায় না।" গৃহিণী কহিলেন, "তোমার এত ভয় কেন?" গৃহিণী হস্তিশুণ্ডবৎ বিশাল হস্ত বিস্তার করিলেন,—তাহার ভারে তাম্বূলবাহিনী কাঁপিয়া উঠিল। তিনি বিশাল হস্তে কতকগুলা পান লইয়া, বিস্তৃত বদন-গহ্বরে নিক্ষেপ করিলেন; এবং তাহা চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষুদ্রকায় কর্ত্তা একটি তাকিয়ার অন্তরাল হইতে সভয়ে কহিলেন, "কি জান, গৃহিণী, সকল বিষয় ত তোমরা বোঝ না।" কর্ত্তার কথা শেষ হইতে না হইতে মহাপ্রলয়ের সূচনা হইল। বিশালকায়া মসীকৃষ্ণবর্ণা গৃহিণী গর্জ্জিয়া উঠিলেন। গর্জ্জনে অট্টালিকা কাঁপিয়া উঠিল। তাম্বূলবাহিনী পড়িতে-পড়িতে বাঁচিয়া গেল। অপরা ভয়ে তালবৃন্ত নিক্ষেপ করিল। গৃহিণী কহিলেন, "কি, আমি বুঝি না! তুমি যদি এতদিন আমার বুদ্ধিতে চলিতে, তাহা হইলে কি কাঙ্গাল এতদূর বাড়িতে পাইত?" ক্ষুদ্রকায় কর্ত্তা বিশালকায় তাকিয়ার অন্তরালে আত্মগোপন করিতে করিতে কহিলেন, "তা ঠিক। সে কথা যাহা বলিয়াছ—তবে কি না—নবাব দরবারে—" "আবার, তবে কি না কি—নবাব দরবারে কি? যেমন তোমার বুদ্ধি, তেমনই তোমার নবাবের বুদ্ধি। যখন বলিয়াছিলাম, তখন যদি বিদ্যালঙ্কারটাকে বিদায় করিতে, তাহা হইলে জঞ্জাল অনেক দিন পূর্ব্বেই দূর হইত।"

গৃহিণী বিশাল বদন প্রসারণ করিলেন। করঙ্কবাহিনী পর্ব্বতগহ্বর সদৃশ ছিলিমচি সম্মুখে ধরিল। গৃহিণীর বদন হইতে প্রচুর পরিমাণে তাম্বূলরস ছিলিমচিটি আপ্লুত করিল। এমন সময়ে চোপ্দার প্রবেশ করিয়া ক্ষুদ্রকায় কর্ত্তাকে রক্ষা করিল। সে দুয়ারে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুর, নবীন পরামাণিক আসিয়াছে,—কর্ত্তা কি খোরী হইবেন?" কর্ত্তা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই গৃহিণী কহিলেন, "কর্ত্তা খৌরী হইবেন না, তুই নবীনকে লইয়া আয়।" নবীন আসিল; এবং অঙ্গদণ্ড ধারণ করিয়া কর্ত্তা ও গৃহিণীকে প্রণাম করিল। গৃহিণী প্রসন্না হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি নবীন, খবর কি রে?" নবীন তৎক্ষণাৎ করজোড়ে কহিল, "নবীন হুজুরের দাসানুদাস—শ্রীচরণের পদরজঃ; নবীন কি খবর রাখিতে পারে? খবর সমস্তই হুজুরের কাছে।" "নবীন, তোমার বক্তৃতা রাখ, নূতন খবর কিছু আসিয়াছে কি?" "হুজুর রাঙ্গ করেন! খবর আসিলে কি নবীনের নিকট পড়িয়া থাকিতে পায়? তৎক্ষণাৎ হুজুরের দক্ষিণ অঙ্গ বিমলী দাসী হুজুরের শ্রীপাদপদ্মে তাহা নিবেদন করিয়া যায়। হুজুর, নবীন আর যাহাই হউন, নেমকহারাম নহেন।" "তবে সকালবেলায় কি জন্য আসিয়াছ নবীন?" "এই হুজুরদের শ্রীচরণ দর্শন, গঙ্গা স্নান, নাম গান, মহাপুরুষদের শ্রীচরণ দর্শন—" "মহাপুরুষদের শ্রীচরণ দর্শন! নবীন, আজ বড় লম্বা ভণিতা আরম্ভ করিয়াছ! কি চাই বল দেখি?" "হুজুর, আপনার শ্রীচরণ প্রসাদাৎ নবীন গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসী।" হরনারায়ণ এতক্ষণ স্থির হইয়াই ছিলেন। তিনি এই সময়ে বলিয়া উঠিলেন, "নবীন, আজিকার দাবীটা বুঝি লম্বা রকমের?" নবীন জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া বলিল, "রামচন্দ্র! কর্ত্তা বলেন কি? রাধে মাধব, রাধে মাধব, গোবিন্দ,

গোপীনাথ।” গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, “নবীন, কর্ত্তা কাছারী যাইবেন,—মনের কথাটা খুলিয়া বলিয়া ফেল। বিলম্ব হইলে হয় ত সকল কথা বলিয়া উঠিতে পারিবে না।”

গৃহিণীর কথা শুনিয়া নবীন কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিল; এবং পরে কহিল, “হুজুর, সরস্বতী চাকার হইলেও মেয়েমানুষ, মামলাটা কিন্তু ক্রমশঃ গুরুতর দাঁড়াইয়া গেল। বিদ্যালঙ্কার ঠাকুর যখন কোন মতের কথা শুনিতে রাজী নহেন, তখন আমার বোধ হয় যে সরস্বতীকে আর একা বিশ্বাস করা উচিত নহে।” কর্ত্তা কহিলেন, “ঠিক বলিয়াছ নবীন,—ব্যাপারটা ক্রমশঃ গুরুতর হইয়াই উঠিয়াছে। কে জানিত বল যে, করকুৎসিয়র বাদশাহ হইবে! আমি বলি যে তুমি একবার পাটনায় যাও।” নবীন কহিল, “হুজুর অনুমতি করিলে নবীন তলোয়ারের সম্মুখে মাথা রাখিয়া দিতে পারে,—পাটনা যাওয়া আর এমন কি কথা!”

গৃহিণী এইবার কহিলেন, “দেখ নবীন, বিদ্যালঙ্কারটাকে ছোটরায়-ছোঁড়ার কাছ-ছাড়া না করিতে পারিলে আমার মন তৃপ্ত হইতেছে না।” “হুজুর যখন অনুমতি করিয়াছেন, তখন কি আর এ কথা মিথ্যা হইতে পারে? নবীন তবে পাটনাতেই যাইবেন। আর, হুজুর অনুমতি করিলে, বিদ্যালঙ্কারটাকে বারাণসী কেন, বৃন্দাবন-বাস করাইয়া দিতে পারি। তবে কি না—” গৃহিণী মৃদু হাসিয়া কহিলেন, “কি নবীন?” নবীন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিল, “হুজুরের পদরজই আমার সার। তবে কি না—” কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, “খরচপত্র কি লাগিবে বল না? দেখ গৃহিণী, নবীন বড় ভক্ত লোক; ভক্তি ভিন্ন তাহার চিত্তে আর কিছুই নাই।” নবীন অমনি ভক্তিগদ্‌গদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “আহা, কর্ত্তা, হুজুরের এইগুণেই হুজুর নবীনের মাথা কিনিয়া রাখিয়াছেন। ঘোর কলি—কি না। হুজুর, খরচ-পত্র বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে।” কর্ত্তা কহিলেন, “দেখ নবীন, বিদ্যালঙ্কারকে যদি কোন গতিকে অসীমের কাছছাড়া করিতে পার, তাহা হইলে তোমার খরচপত্র বাদে নগদ একশত থান মোহর বকশিস।” নবীন বকশিসের বহর শুনিয়া হরনারায়ণের পদতলে লুটাইয়া পড়িল; এবং কহিল, “হুজুর দেবতা, হুজুরই আমার নারায়ণ। যখন হুজুরের শ্রীমুখপঙ্কজ হইতে এ কথা নির্গত হইয়াছে, তখন ধরিয়া রাখুন যে, বিদ্যালঙ্কার ঠাকুর বৃন্দাবনে গিয়াছেন। তবে কি না—”

কর্ত্তা তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, “নবীন, খরচ বাবদে উপস্থিত দশ আশরফি লইয়া যাও!” নবীন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিল, “যথেষ্ট হুজুর, যথেষ্ট। তবে কি না—” “আবার কি নবীন?” “হুজুর, এই সরস্বতীর—” “ভাল কথা, বিশ আসরফি লইয়া যাও।” নবীন শয্যাপ্রান্তে ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।

নরসুন্দর বিদায় হইলে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি বিদ্যালঙ্কার ঠাকুরকে এত ভয় কর কেন?” কর্ত্তা কহিলেন, “বিদ্যালঙ্কার যত আমাদের ঘরের সন্ধান জানে, এত আর কেহ জানে না। স্বর্গীয় কর্ত্তা মৃত্যুকালে অসীম ও ভূপেনকে তাহারই হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন; এবং কাগজ-পত্রও কিছু বোধ হয় তাহার নিকটে আছে। কারণ, যখন অসীম তাহার অংশ আমাকে লিখিয়া দেয়, তখন সমস্ত কাগজপত্র মিলাইয়া পাই নাই। আমার ধারণা ছিল যে, ব্রাহ্মণের কিছু বুদ্ধি আছে, কিন্তু সে যেরূপ নির্ব্বোধের মত এক কথায় গ্রাম ত্যাগ করিয়া গেল, তাহাতে বুঝিতে পারিলাম যে তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। এখন নারায়ণের ইচ্ছায় কোন গতিকে তাহাকে অসীমের কাছছাড়া করিতে পারিলে হয়।” “তুমি যে বকশিস কবুল করিয়াছ, তাহার লোভে নবীন ব্রহ্মহত্যা না করিয়া বসে!” উত্তরে ক্ষুদ্রকায় হরনারায়ণ কহিলেন, “ক্ষতি কি?” গৃহিণী কহিলেন, “তোমরা অর্থের জন্য না করিতে পার এমন কাজ নাই।”

দ্বিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

বধূ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি গো সরস্বতী দিদি, কেমন আছ?” “কেমন আর আছি বল বৌদি!—আমাদের থাকা না থাকা দুই ই সমান।” বধূ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “এতদিন কোথায় ছিলে দিদি? আমরা ভাবিলাম, তুমি বুঝি পেটের গোলমালে বৃন্দাবনে চলিয়া গেলে!” “এমন কি অদৃষ্ট করেছি বৌদিদি, যে, এত শীঘ্র শ্রীবৃন্দাবনে যাব? সেদিন পেটটা কেমন ক'রে উঠেছিল—” “একদিনে বুঝি সারিয়া গেল?” “এতদিন আর কই ভাই,—এই ত সবে দু'দিন!” “বৈষ্ণবদিদির বুঝি নূতন নাগর জুটিয়াছিল,—সেইজন্য এক সপ্তাহকে দুই দিন মনে হইতেছে?” “ও আবার কি কথা

বৌদিদি, আমার কি আর সে কাল আছে?" "বৈষ্ণব দিদি, প্রেমের কি কালাকাল আছে? বলি, পুরাতন বৈষ্ণব কি ফিরিয়া আসিয়াছিল?" "মুখে আগুন! মুখে আগুন! সে ঘাটের মড়া ঘাটে গিয়াছে,—সে আবার ফিরিবে! সে তাহার নবযৌবনীর সঙ্গে চুলায় গিয়াছে। বলি বৌদিদি, কর্ত্তা কি বাড়ীতে আছেন?" "না, তিনি গঙ্গাতীরে গিয়াছেন।" "কখন আসিবেন?" "তাহা ত বলিতে পারি না।" "তবে এখন আসি বৌ-ঠাকরুণ! আবার একটু বাদে আসিব।" "কেন, তোমার কি কর্ত্তার নিকট কোন প্রয়োজন আছে?" "বড় জরুরী প্রয়োজন বৌ-ঠাকরুণ।" "আমাকে বলিয়া যাও, আমি কর্ত্তাকে বলিব।" "যদি বল, তাহা হইলে বড় উপকার হয় বৌ-ঠাকরুণ। গোটা দুই টাকার বিশেষ দরকার, আমি আবার দু'দিন বাদে ফিরাইয়া দিব।" "এই কথা! তাহার জন্য কর্ত্তাকে প্রয়োজন কি? তুমি আমাদের দেশের লোক, তোমার আবশ্যক হইয়াছে—আমিই দিতেছি। তুমি দাঁড়াও, আমি টাকা আনি।" "না বৌ-ঠাকরুণ, তোমার নিকট হইতে লইলে কর্ত্তা যদি রাগ করেন। তিনি যদি না দেন, পরে তোমার নিকট হইতে লওয়া যাইবে।" "রাগ করিবেন কেন? এ আমার টাকা। আমার কাছে যে টাকা আছে, তাহা কর্ত্তা জানেনও না।" "কি জানি বৌ-দিদি, কর্ত্তা জানিতে পারিলে যদি রাগ করেন! আমি এখন আসি, দুই দণ্ড পরে আবার আসিব।" সরস্বতী বিদায় হইল।

পরমুহূর্ত্তেই হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার গৃহে ফিরিয়া বধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোমার মুখখানা অপ্রসন্ন কেন?" বধূ পাদ-প্রক্ষালনের জল দিয়া শ্বশুরকে কহিলেন, "বাবা, বৈষ্ণব-দিদি আবার আসিয়াছিল।" "কে, সরস্বতী?" "হাঁ বাবা।" "তাহার জন্য মুখ অপ্রসন্ন কেন মা?" বধূ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "তাহার কথাগুলো কেমন গোলমেলে ঠেকিল বাবা। কেন আসিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না।" বিদ্যালঙ্কার বিস্মিত হইয়া বধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোলমেলে কথা কি মা?" "সে প্রথমে বলিল যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, কি প্রয়োজন, তখন সে কহিল যে, আপনার নিকট দুইটা টাকা ধার করিতে আসিয়াছে। কিন্তু আমি যখন টাকা দিতে গেলাম বাবা, তখন সে লইল না। সে বলিল যে, আপনি জানিতে পারিলে রাগ করিবেন। আমি টাকা দিলে আপনি যে কেন রাগ করিবেন, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না!" হরিনারায়ণ হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "মা, এই সামান্য কথাটা বুঝিতে পারিলে না? সরস্বতী টাকা ধার করিতে আসে নাই, সে সংবাদ সংগ্রহ করিতে আসিয়াছিল। তাহার ত টাকার প্রয়োজন হয় নাই, সুতরাং তোমার টাকা সে লইবে কেন?" বধূ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ লইতে আসিয়াছিল বাবা?" "আমরা কি করিতেছি, আমাদের ঘরে কি হইতেছে, ইহা জানিবার জন্যই সে পাটনায় আসিয়াছে।" "সে কি কথা! বৈষ্ণব-দিদি কি তবে বৃন্দাবন যাইবে না?" "আমার বোধ হয় সে যাইবে না। কিন্তু তুমি এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে কেন মা?" "বৈষ্ণব-দিদি মাঝে-মাঝে এমন এক একটা কথা বলিয়া বসে যে, তাহা শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠে। আপদ বিদায় হইলেই বাঁচি বাবা।" বিদ্যালঙ্কার পুনরায় হাসিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "তবে তুমিও বুঝিয়াছ মা! সরস্বতী বৈষ্ণবী বৃন্দাবন যাত্রা করে নাই, সে ঈশ্বরগঞ্জের মহারাণীর চর হইয়া আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছে। খুব সাবধান মা! আমি এতদিন অন্ধ হইয়া ছিলাম, কিছুই বুঝিতে পারি নাই। বিনা কারণে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তোমাদের সকলকে বৃথা দুঃখদান করিয়াছি।" বধূর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। তাহা দেখিয়া হরিনারায়ণ কহিলেন, "কাঁদিও না মা। যদি ঈশ্বর থাকেন, যদি নারায়ণ সত্য হন, তাহা হইলে একদিন না একদিন দর্পের ক্ষয় আছেই। আমরা যে কষ্ট পাইয়াছি, তাহা পূর্ব্বজন্মের ফল। চিন্তা করিও না মা। তোমার ঘর, তোমার সংসার, তোমার সম্পত্তি আবার সমস্তই ফিরিয়া পাইবে।"

বধূ অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া শ্বশুরকে প্রণাম করিলেন। তখন শ্বশুর কহিলেন, "মা, আজি একটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। তুমি পূজার ঘরে একখানা আসন বিছাইয়া, একটা পঞ্চপাত্রে গঙ্গাজল আনিয়া দাও।" বধূ চলিয়া গেলেন। বিদ্যালঙ্কার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, একরাশি পুঁথি পাড়িলেন; এবং তাহা লইয়া পূজার ঘরে চলিলেন। পূজার ঘরে আসনের উপরে বসিয়া হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার একমনে একখানা চণ্ডীর পুঁথির পাতা উল্টাইতে আরম্ভ করিলেন। হরিনারায়ণ নিত্য অন্ততঃ একবার মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পাঠ করিতেন; কিন্তু

আজি চণ্ডীর একটি শব্দও তাঁহার মুখ দিয়া নির্গত হইল না। তিনি এক-মনে তালপত্রের পর তালপত্র উল্টাইয়া যাইতে লাগিলেন। পুঁথি শেষ হইয়া গেল; তাহা একপার্শ্বে রাখিয়া হরিনারায়ণ আর একখানি পুঁথির পাতা উল্টাইতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে গৃহের দুয়ারে দাঁড়াইয়া সরস্বতী বৈষ্ণবী বলিয়া উঠিল, "জয় রাধে কৃষ্ণ, বৌ-ঠাকরুণ কোথা গেলে গো!" "দুর্গা ঠাকুরাণী বাহিরে আসিয়া সরস্বতীকে কহিলেন, "বৈষ্ণব-দিদি ব'স,—বাবা পূজায় বসিয়াছেন, বড়বো রান্নাঘরে।" সরস্বতী কহিল, "দিদি-ঠাকরুণ, আজ আর ভিক্ষায় যাইতে পারিতেছি না, দুটা প্রসাদ পাইব।" "বেশ ত, ব'স, বাবা এখনই আসিবেন।"

সরস্বতী কূপ হইতে জল উঠাইয়া পা ধুইল; এবং উঠানের একপার্শ্বে ছায়ায় বসিল। এই সময়ে দুয়ারে দাঁড়াইয়া অসীম ডাকিলেন, "বড়দাদা বাড়ী আছ!" তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সরস্বতী চমকিয়া উঠিল; কিন্তু তখনই মনের ভাব গোপন করিয়া, সহাস্য বদনে কহিল, "ছোট কর্ত্তা, প্রণাম হই।" অসীম তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, "কে, সরস্বতী দিদি যে! তুমি এখনও বৃন্দাবনে যাও নাই?" "শ্রীবৃন্দাবন দর্শন কি সকলের অদৃষ্টে হয় দাদা? শ্রীমদনমোহন কৃপা করিবেন তবে ত আমাকমত পাপীর অদৃষ্ট প্রসন্ন হইবে?" "তুমি কি অর্থের অভাবে যাইতে পারিতেছ না?" "অর্থের অভাবও বটে, সঙ্গে সঙ্গীর অভাবও বটে।" "আমি তোমার দুই অভাবই দূর করিতে পারি। বৃন্দাবন যাইতে কত টাকা লাগিবে বৈষ্ণব দিদি?" "চারি-পাঁচ-কুড়ি বটে।" অসীম বস্ত্রমধ্য হইতে একটা থলিয়া বাহির করিলেন। তাহা দেখিয়া সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "ছোট কর্ত্তা, সঙ্গী না পাইলে, টাকা লইয়া কি করিব?" অসীম কহিলেন, "সঙ্গীর ব্যবস্থাও করিয়া দিব।" "অজানা-অচেনা লোকের সহিত কি যাইতে আছে ছোট-কর্ত্তা?" "তাহাতে দোষ কি সরস্বতী-দিদি? তুমি ত বৈষ্ণবী, ঘরের কোণের মধ্যে ত ঘোমটা টানিয়া বসিয়া থাক না। আমার একজন বিশ্বাসী লোক দিয়া তোমাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিব।" "সে কি জাতি?" "কেন, মুসলমান। তবে তাহার পূর্ব্বদেশে বাড়ী; সুতরাং বেশ বাঙ্গালা কথা বলিতে পারে।" "জয় রাধে কৃষ্ণ, ছোট কর্ত্তা বলেন কি! মুসলমানের সহিত যাইব! জাতি যাইবে যে!"

অসীম বৈষ্ণবীর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। এই সময়ে বড় বধূ আসিয়া উঠানে দাঁড়াইলেন; এবং চক্ষু টিপিয়া অসীমকে ইঙ্গিত করিলেন। অসীম ইঙ্গিত বুঝিতে না পারিয়া, একটা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলেন,—তাহা দেখিয়া বড় বধূ বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুরপো, কর্ত্তা তোমাকে ডাকিতেছেন। তুমি শীঘ্র ঠাকুর-ঘরের দুয়ারে যাও, আমি আসন লইয়া আসিতেছি।" অসীমের আর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল না! তিনি অঙ্গন পরিত্যাগ করিয়া পূজার ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইলেন। হরিনারায়ণ পুঁথির পাতা উল্টাইতেছিলেন। পদশব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন; এবং অসীমকে দেখিয়া কহিলেন, "কে, অসীম! বড় বিশেষ প্রয়োজন আছে। আসিয়াছ ভালই হইয়াছে,—না আসিলে হয় ত ডাকিতে পাঠাইতে হইত।" তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বড় বধূ আসিয়া পূজার ঘরের দুয়ারে আসন পাতিয়া দিলেন; এবং শ্বশুরকে কহিলেন, "বৈষ্ণব-দিদি আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে।" হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে, সরস্বতী?" বধূ কহিলেন, "হাঁ।" হরিনারায়ণ পুঁথিখানা রাখিয়া বধূকে কহিলেন, "মা, আমি এখনই সরস্বতীর নিকট যাইতেছি।" অসীমকে কহিলেন, "আমি তোমার সম্মুখে যাইব, আমার সহিত আইস।"

অঙ্গনে আসিয়া হরিনারায়ণ সরস্বতীকে দেখিয়া কহিলেন, "কি সরস্বতী, বৌমার নিকট হইতে টাকা লও নাই কেন? আমার নিকট হইতে লওয়া আর বৌমার নিকট হইতে লওয়া একই কথা। সুদর্শন ব্যতীত আমার আর আছে কে বল সরস্বতী? বৌ-মা, সরস্বতীকে দুইটা টাকা আনিয়া দাও।" এই কথা বলিয়া হরিনারায়ণ অসীমের সহিত গৃহত্যাগ করিলেন।

বধূ টাকা আনিলেন। সরস্বতী তাহা তাঁহার হস্ত হইতে প্রায় কাড়িয়া লইয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। বড় বধূ ডাকিলেন, "বলি ও বৈষ্ণব-দিদি, ও সরস্বতী-দিদি, যাও কোথা? বলি, একটা গান শুনাইবে না?" সরস্বতী দূর হইতে কহিল, "কাল আসিব বৌঠাকরুণ—আজি আর সময় নাই।"

(ক্রমশঃ)

দেবরোষ

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি এ]

'পম্পা' নগরী সজ্জিত আজি,
বড় সমারোহ আজ,
গৃহে-গৃহে জ্বলে রঙিন আলোক
এখনো না হতে সাঁঝ,
পথে-পথে ফেরে কোরকের মালা
বিনা মূলে বেচা কেনা,
কুসুম স্তবক সাধি উপহার
হ'ক বা না হ'ক চেনা।
কুসুম শকটে অবাধে ফিরিছে
মদালস নরনারী,
বিলোল আঁখির বাঁকা কটাক্ষ
উৎসবের পিচ্কারী।
চুম্বন আজি বন্ধনহীন
লজ্জা ধূলিতে লীন,
যৌবন মদে উন্মাদ আজ
স্বাধীন প্রেমের দিন।
চপল চাহনি মুচকি হাস্য,
সোহাগে বদল মালা,
অধর-অধরে মধু পরিচয়
তীব্র লালসা ঢালা।
শীলতার ধার ধারে না ক কেহ
সমাজের বাধাহীন,
নগ্ন আজিকে প্রণয় প্রলয়
স্বাধীন প্রেমের দিন।
আহিতাগ্নিকা কুমারীর দল
পলায়ে গিয়াছে আগে,
আগুন জ্বালায়ে পরমেশ কাছে
করযোড়ে শুধু মাগে
'অসংযমের তাণ্ডব লীলা
নয়নে দেখিতে নারি,
থামাও থামাও পাপ অভিনয়
হে প্রভু দর্পহারী!'
সহসা এ কি এ! অগ্ন্যুৎপাতে
নগরী উঠিল কাঁপি,
সহসা দারুণ অনল-বৃষ্টি
দিক্ দিক দিল ছাপি।
জ্বলিয়া উঠিল পুস্তকালয়
কাব্য নাটক যত,
স্বাধীন প্রেমের বিলাস বাগান
ভস্মেতে পরিণত।
থর থর কাঁপে রঙ্গমঞ্চ
থরথর কাঁপে গেহ,
চাপা গেল সব দল বাঁধিতে
পলাতে নারিল কেহ।
বিসুভিয়সের করাল দৃষ্টি
অনল বৃষ্টি করি,
মদনে অসীম পাপ অভিনয়
থামাইয়া দিল মরি।
আহিতাগ্নিকা কুমারী তিনটী
শুভ্র বসনাবৃত,
রহিল অটুট প্রোথিত পুরীর
পুণ্যাঙ্কুর মত।

বরাকরের চিঠি

শ্রীবিনয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী বি-এ]

...ই ফেব্রুয়ারী, ২১।

শ্রীচরণকমলেষু

দাদাবাবু, জান ত, When the wine is in the wit is out। আমার wit ও যে আজ সহসা বেরিয়ে, কাগজের উপর সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে, তার কারণ আর কিছুই নয়—পেটে তাদের থাকবার জায়গা নেই, এইমাত্র একটা বিয়ের নিমন্ত্রণ খেয়ে আসছি। কেমন খেলাম সে কথা নাই বা শুনলে! দুপুর রাতে যদি সমাজের উঠানে যদি উবু হয়ে বসে খেতে হয়, দুজনায় যদি দু'শ লোককে পরিবেশন করে, আর নিমন্ত্রিতেরা শালপাতার উপর ডাল-ভাত মেখে নিয়ে, তরকারির জন্যে তারস্বরে চীৎকার করতে থাকে, তবে তাদের যেমন খাওয়া উচিত, ঠিক তেমনি হয়েছে। পেট যে ভরেছে, তার পরম প্রমাণ হচ্ছে যে, আমার এই চিঠিখানি তোমার করকমলে পৌঁছে যাবে।

তুমি নিশ্চয় চটে যাবে যে, এমন বেয়াড়া দেশে এসে কি দিনরাত চাষাদের সঙ্গে নেচে বেড়াচ্ছি! কিন্তু কি করব! নিতান্ত নাচার হয়ে পড়ে পড়ে, এদের সুখ-দুঃখের ভেতর দিয়ে বেশ মিশে গেছি—মনের মধ্যে কোনই উদ্বেগ অনুভব করি না। এরা সবাই ঠিক ভদ্দর না হলেও মানুষ যে, তাতে সন্দেহ নেই; বরং আমাদের চেয়ে ঢের বেশী সরল—তাই আরো মধুর। এখানে ভদ্দর লোকের অভাব নেই। পাশেই কারখানায় বাবুরা আছেন। বিকেলে ৫টার পর আধ মাইল হেঁটে তাঁদের সঙ্গে দেখা করা যায় বটে, কিন্তু কয়দিন দেখে সে চেষ্টা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। সেই যে একরকম জাপানী খোকা আছে,—টিপ্ দিলে, একই ভাবে টাঁক টাঁয়াঁ—টাঁক করতে থাকে, এঁরা তেমি;—সকালে নটা থেকে বিকেলে ৫টা পর্যান্ত কলম পিষে, এবং সাহেব ঠাণ্ডা করে, সন্ধ্যার পর বাড়ী এসে গৃহিণী আর গৃহ নিয়ে এমি ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, অপর কিছু আলাপ করবার ক্ষমতাই থাকে না। করেন খালি বিলাপ আর বিলাপ। না আছে একটা লাইব্রেরী, না আছে একটা ক্লাব। এখন বুঝতে পারছ—এই চাষাদের সঙ্গে কথা না বললে, আমায় ইটের সঙ্গে কথা কইতে হয়। তাই এদের সঙ্গে মিশে গেছি—বেশ আছি।

যাই হোক, বিয়ে কেমন হল, এটা নিশ্চয়ই তুমি জানতে চাচ্ছ। বর কটা পাশ, মেয়ের বাপকে কত টাকা দিতে হল,—এসব ভদ্দর ঘরের মামলী প্রশ্ন ত এখানে উঠতেই পারে না। এরা হল অভদ্দর—পাশও করে না, মেয়ের বাপকে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে ফাঁসিও যেতে হয় না। বরের নাম পরমেশ্বর; আমরা সবাই তাকে ত ঈশ্বর বলেই জানি। যখন প্রথম দেখেছিলাম, তখন তাকে কোন মতেই কুরূপ বলা চলত না। বয়স তার বছর বাইশ; অতুল স্বাস্থ্যপূর্ণ যৌবনশ্রীর এইটাই কি যথেষ্ট বর্ণনা নয়? কনের বয়স বছর পনর। চারি ওরফে চারুবালাকেও দেখলে কোনমতে কুশ্রী বলা চলত না। গায়ের র অবশ্য ময়লা, কিন্তু নাক, চোখ, মুখ,—সমস্ত অবয়বে এমন একটী সুন্দর লক্ষ্মী শ্রী ফুটে বেরুত, যার জন্যে, একবার চাইলেই, আবার তার দিকে ফিরে চাইতে ইচ্ছে করত। তার প্রত্যেক কাজেই এত স্নেহ, এত যত্ন প্রকাশ পেত, যাতে তাকে ভালো না বেসে থাকা যেত না। ভগবানের এমন জুটী সেরা বড় আজ—যাক্, সে কথা পরে বলছি।

তুমি জান, চিরকাল আমার কীর্ত্তনের কি নেশা! সেবার দেবীগঞ্জে সমস্ত বক্তটা কি ভাবেই না মাতা গিয়েছিল! এখানেও তেমি জুটে গেছে। চারীর বাপ গোবর্দ্ধন দাস ভেকধারী বৈষ্ণব। কাজেই তার গলায় ত্রিকণ্ঠি মালা। সমস্ত দিন সব কাজে মুখে লেগেই আছে—'হরি হে, পার করেক' বুলি, আর সন্ধ্যার পর, খোল নিয়ে, খুব মজলিস্ করে বসে, হরিনাম-সংকীর্ত্তন। প্রায় ছ'মাস হল এখানে এসেছি। এদের সান্ধ্য সম্মিলনীতে ভিড়ে যেতে আমার মোটেই সময় লাগেনি। আর, attendance ও খুব regular। গোবর্দ্ধন আমায় ভক্তিও করে খুব। শুধু যে কীর্ত্তনের খাতিরে, তা নয়। তার একটু-আধটু মহাজনী কারবার আছে; তারই দেনা-পাওনা,

কর্দ্দমা সম্বন্ধে সম্ভব-অসম্ভব অনেক রকম পরামর্শ আমার কাছে চায়। যা পায়, ভাল হোক মন্দ হোক, সবই মাথায় করে নেয়—এম্নি উদার বা বোকা সে।

ঈশ্বর গোবর্দ্ধনের স্বজাতি—অতি দীন। সংসারে তার আপনার বলতে যখন আর কেউ রইল না, তখন গোবর্দ্ধন তাকে এনে নিজের সংসারের গরু-ছাগলের ভার দিয়েছিল; আর দিয়েছিল ক্ষুদ্র বালিকা চারীর বাহন হবার সম্মান। বালক তাই নিয়ে বাড়তে-বাড়তে, ক্রমে পরিবারের সমস্ত কাজই দখল করে বসেচে। এদের সংসারে তার কোনই অধিকার নেই; তবু সমস্ত কাজেই তাকে প্রয়োজন।

গোবর্দ্ধন এখন ঘরেই থাকে—বাড়ীর উপর মুদীর দোকান চালায়। আর ঈশ্বর টাট্টুর পিঠে মসলার থলি বেঁধে, সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ দিন এ হাটে, সে-হাটে জিনিস বেচে বেড়ায়। গোবর্দ্ধনের মাটীর পাঁচীল-ঘেরা বাড়ী, দেওয়াল দেওয়া ঘর, শান বাঁধান ইন্দারা সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে বেশ উন্নত অবস্থার পরিচয় দিত। মোটের উপর তাদের সংসারে বাক্যের চেয়ে কাজ বেশী থাকাতে শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় ছিল।

আমি যখন প্রথম এদের কাছের লোক হলাম, তখন গোলমালের সবে সূচনা হয়েছিল। চারীর কোথায় বিয়ের ঠিক হয়েছিল—তাতে না কি সে মেয়ে সুখী হয় নি। বর, ঘর সবই ভালো—এতেও যদি মেয়ে কাঁদে, তবে ত বড়ই মুস্কিলের কথা। আর এক কথা,—যে ঈশ্বর এতকাল ঝড় জল সব মাথায় করে হাটের পর হাট করে ফিরেছে, সেও যেন হঠাৎ একে সব ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে বসে আছে। কাকে না কি সে বলেছে, পরের গলগ্রহ হয়ে আর কত কাল থাকবে;—এবার নিজে সংসার পাতবে। ভাব দেখি সর্ব্বনাশের কথাটা! একেবারে পশ্চিমে সূর্য্যোদয় না? পরিচয়ের আধঘণ্টার মধ্যেই এ সমস্ত কথা তারা আমায় জানিয়ে দিল—যেন আমিও এদের পরিবারের একজন বহু পুরাতন এবং পরিচিত বন্ধু। আর ত দাদাবাবু, এদের কি ভালো না বেসে পারা যায়?

কয় দিন পরে—রাত্তির তখন নটা। আড্ডা ভাঙ্গল। জ্যোৎস্না রাত্রে, সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে, লাঠি হাতে মাঠের উপর দিয়ে বাসায় ফিরছি,—দেখি, জমির আলের উপর দিয়ে কে বিড়ি ধরিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। তোমাদের ও-দিকে বোধ হয় বেশ শীত। এখানে কিন্তু সব কয়টা ঋতুই একসঙ্গে অনুভব কচ্ছি। শেষ-রাত্রে বেশ শীত; দুপুরে খুব গরম, আবার সন্ধ্যার সময় বড় মধুর ঝিরঝিরে হাওয়া। আর মাঝে মাঝে ঝড়,—তখন ত কথাই নেই। এমন সময়ে যে ঈশ্বর একটু বাহিরে বেড়াবে, সেটা মোটেই আশ্চর্য্য নয়।

তবু কি মনে হল; একটু পরে তার পেছনে গিয়ে ডাকলাম, "ঈশ্বর!" সে থমকে ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে, "বিভূতি বাবু, ঘরকে যান নি?" আমার মাথায় এক বুদ্ধি ঢুকল; বল্লাম, "আমার বড় দেরী করেছে ঈশ্বর; একটু এগিয়ে দাও না।" সে আর কোন কথা না বলে, সোজা চল্ল। খানিক দূর গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "এবার হাটে কি হল? কেমন ধানের দাম—চড়ে গেছে ত আনা—না?" সে যে হাটে যায় নি—সে কথা যেন জানি না, এমি ভাব। সে তেমনি ভাবে হাঁটতে-হাঁটতে উত্তর দিল, "আমার শরীর ভাল নেই; তাই হাটে যাই নি। কোন খবর রাখি না।" তখন বাধ্য হয়ে আরও পরিষ্কার ভাবে কথাটা পাড়তে হল, "আচ্ছা ঈশ্বর—চারীর ত বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে। তোমার পছন্দ হয়েছে ত? কই, তুমি ত কোন মতামত দিলে না?" বাস্! —ঈশ্বর যেন থেমে গেল। "আমি বাইরের লোক, সে কথা কি বলব বাবু!" এর গলাটা যেন ধরা ধরা মনে হল। একটু চুপ করে থেকে বল্লে, "আপনি এখন যেতে পারবেন ত? ও হতে [illegible] উত্তরেই আপনার ঘর সোজা।" বুঝলাম, এ প্রসঙ্গ আলোচনায় তার বড় বড় অনিচ্ছে;—বড় বাধা পায়। কিন্তু আমি কি এত সহজে তাকে ছাড়ি। ডাক্তারেরা যেমন সজীব বেড়াল, ব্যাঙ নিয়ে তাদের দেহ কেটে পরীক্ষা করে, আমারও তেমি খেয়াল হল, দেখি না—যাদের মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছি,—ঈশ্বরের তরুণ প্রাণটাকে নিষ্ঠুর ভাবে খুঁচিয়ে, আমাদের সেই শিক্ষিত সভ্য ভাবের কোন সাড়া পাই কি না। দাদাবাবু—যা দেখলাম, তাতে আমার সমস্ত প্রাণটা ভরে গেল।

স্বরের মধ্যে অনেকটা ভয় ঢেলে বল্লাম, "না—না, ঈশ্বর, তুমি আমাকে ঐ তেঁতুল গাছটা পার করে দিয়ে এস। ওখানটায় বড় অন্ধকার।" সে আবার চল্ল। "আচ্ছা ঈশ্বর, চারীর না কি এ বিয়ে পছন্দ হয় নি। সে না কি চোখের জল ফেলচে—এটা কি সত্যি কথা। তোমার কি মনে হয়—" হঠাৎ সে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। আমার ভয় হল, নিশ্চয় তার গুপ্ত বেদনা নিয়ে আমার এই নিষ্ঠুর পরিহাস সে টের পেয়েছে;—এখনি হয় ত কি কাণ্ড করে বসবে। অসভ্য

পুরীতে সমুদ্র দর্শনে

[শ্রীবিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল]

হে নীলাদ্রি! অন্তরস্থ দুরন্ত গর্জ্জনে,
দীর্ঘ বেদনার জ্বালা করিছ প্রকাশ,
ভীষণ এ কলরব মিলিয়া পবনে
বহে দশাস্বরে যেন হতাশের শ্বাস।
উদ্দাম তরঙ্গরাশি উন্মত্তের প্রায়
উলটি পালটি নাচি পড়িছে আছাড়ি,
স্বচ্ছ, শুভ্র ফেনিলাম্বু ভীম আস্ফালনে
ছুটিয়া আসিছে তীরে গগন বিস্তারী।
এ কি তব রুদ্রলীলা? কেন এ গর্জ্জন?
হে জলধি! তব চির-গাম্ভীর্য্য তেয়াগি
অনাদি অনন্ত যিনি সত্য সনাতন
এই তব উন্মাদনা কি গো! তাঁরি লাগি?
মূঢ় আমি, কি বুঝিব মহিমা তোমার,
বিস্ময় পুলক নেত্রে করি নমস্কার!

নৌ-সঞ্চালনে প্রতিযোগিতা

নৌ-সঞ্চালনে প্রতিযোগিতা বা সাধারণ কথায় 'নৌকা বাইচ' আমাদের দেশে, বিশেষতঃ পূর্ব্ব বঙ্গে সর্ব্বত্র প্রচলিত; নানা পর্ব্ব উপলক্ষে এখনও অনেক স্থানে 'নৌকা বাইচ' হইয়া থাকে। এই 'বাইচ' দেখিবার জন্য লোকেরই বা কি উৎসাহ। পূর্ব্ব বঙ্গের এই 'বাইচে'র জন্য বড়-বড় সুদীর্ঘ নৌকা আছে। এক-একখানি নৌকায় ৫০।৬০ খানি দাঁড় বা বৈঠা। সাধারণতঃ, নৌকার মাঝি-মাল্লারাই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়া থাকে। ভদ্রলোকের ছেলেরা ইহাতে নামে না—তাহারা দর্শক মাত্র। কিন্তু বিলাতে কলেজের ছাত্রেরা এই নৌ-সঞ্চালন প্রতিযোগিতায় (Boat-race) একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে; বিলাতী সংবাদ-পত্রসমূহে ছাত্রগণের এই 'বোট-রেসে'র কাহিনী পড়িয়াই আমরা তৃপ্তি লাভ করি;—ছবি দেখিয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকি।

কিন্তু, আমাদের দেশেও সু-বাতাস বহিয়াছে; ছাত্রদের সন্তরণ-শিক্ষারও আয়োজন হইয়াছে। তাহার পর আজ বৎসরাধিক হইতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উৎসাহে এবং ভূতপূর্ব্ব ভাইসচেন্সেলর শ্রীযুক্ত সার নীলরতন সরকার মহাশয়ের চেষ্টায়, এবং বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ মাইতি এম্-এস্‌সি ও শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু ডি-এস্‌সি, এম বি মহাশয়দ্বয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ নৌ-সঞ্চালন অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বেই বাঙ্গালীর গৌরবস্থল বেঙ্গল কেমিকাল ও ফারমা-সিউটিকাল কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের বিশেষ উৎসাহে উক্ত কারখানার কর্ম্মচারী যুবকগণ নৌ-সঞ্চালন অভ্যাস করিতেছিলেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে বেলিয়াঘাটায় খালে বিশ্ববিদ্যালয় ও বেঙ্গল-কেমিকেল, এই দুই দলের যুবকেরা প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আমরাও এই প্রতিযোগিতা দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রায় সহস্রাধিক দর্শক খালের দুই ধারে উপস্থিত ছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দলই জয়ী হইয়াছেন। প্রতিযোগিতার দুই-খানি চিত্র পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। যাঁহাদের পরিধানে কালো পোষাক, তাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দল; আর যাঁহাদের পরিধানে সাদা পোষাক, তাঁহারা বেঙ্গল-কেমিকেলের দল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দলের ছাত্রদের নাম (১) শ্রীবলাই-চাঁদ বসু (স্কটিস-চার্চ্চ কলেজ, তৃতীয় বার্ষিক আর্ট শ্রেণী) (২) শ্রীসুধাংশুধন বসু (ঐ কলেজের চতুর্থ বার্ষিক বিজ্ঞান-শ্রেণী) (৩) শ্রীহারাধন সেনগুপ্ত (ঐ কলেজের চতুর্থ বার্ষিক বিজ্ঞান-শ্রেণী), (৪) শ্রীঅমরকৃষ্ণ বসু (সিটি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক আর্ট-শ্রেণী), (৫) শ্রীজিতেন্দ্রনাথ

নৌ সঞ্চালন প্রতিযোগিতার দৃশ্য (১)

নৌ সঞ্চালন প্রতিযোগিতার দৃশ্য (২)

বর্ষ) সিটি কলেজের তৃতীয় বার্ষিক আর্ট শ্রেণী)। বেঙ্গল কেমিকেলের প্রতিযোগিদিগের নাম শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, শ্রীমাণিকলাল বিশ্বাস, শ্রীভবানীচরণ দাস, শ্রীরামাপদ দাউদ ও শ্রীসতীশচন্দ্র সেন। এই প্রথম প্রতিযোগিতা; এই প্রথম Boat race; আমরা আশা করি, অতঃপর এই প্রতিযোগিতার প্রভাব আরও বর্দ্ধিত হইবে। সর্ব্বশেষে এ সকল বিশ্ববিদ্যালয় দলের প্রধান উদ্যোগী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ইঁহাকে [illegible] [illegible] ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি; তাঁহার চেষ্টা, উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইয়াছে।

প্রভাতের আহ্বান

[শ্রীযামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত]

খুলি পূর্ব্বাশার দ্বার সতর্ক সঞ্চারে,
প্রভাত দাঁড়ায়ে নিত্য আমার দুয়ারে,
বলে "ওগো, জাগো, জাগো — এসেছি আবার,
সুখের একটি দিন সরায়ে তোমার,
হে দুঃখ সংসার-যাত্রী, আসি প্রতিদিন
সংক্ষিপ্ত করিয়ে পথ হইয়া নবীন।"

ভাস্করের চিত্র-প্রদর্শন

[ভাস্কর—শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক]

জননী

মন্দির-পথে

মিলন

বাঁশীর তানে

মার্কিণ-মুলুক

[শ্রীইন্দুভূষণ দে মজুমদার এম্ এস্‌সি, এফ-আর এস-এ]

নব-জগতের নব্যা নারী।

মার্কিণ-মুলুকের ললনাকুল পৃথিবীর এক অপরূপ সৃষ্টি। তাহারা স্থানভেদে ত্রিবিধ। যুক্তরাজ্যের পশ্চিমাংশের অর্থাৎ ক্যালিফোর্ণিয়া প্রভৃতি প্রদেশের রমণীরা যে রকমের, দক্ষিণাংশের অর্থাৎ ভার্জিনিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের রমণীরা বিপরীত; আর উত্তরাংশের অর্থাৎ নিউইয়র্ক প্রভৃতি প্রদেশের রমণীরা ঐ দুইয়ের মাঝামাঝি।

পশ্চিমবাসিনীরা খাঁটি মার্কিণের সামগ্রী, এমনটা আর কোন দেশে দেখা যায় না। তাহারা পুরুষদিগের গলগ্রহ নহে— তাহাদিগের সমকক্ষ সাথীমাত্র। তাহারা আত্মনির্ভরশীলা, জীবিকা-নির্বাহে কাহারও মুখাপেক্ষিণী নহে; পুরুষ সহচরদিগের রক্ষণাবেক্ষণের তাহারা কোন ধার ধারে না। বনতরুর ন্যায় ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া তাহারা প্রকৃতির ক্রোড়েই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাহারা পুরুষদিগের ন্যায় অশ্বপৃষ্ঠে গরু চরাইয়া বেড়ায়; এবং দরকার হইলে অশ্বারোহণে পঞ্চাশ মাইলের পথও অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিতে পারে। তাহাদের তুলনায় অনেক দেশের পুরুষেরাই স্ত্রীলোক বলিয়া

সেইজ কলেজ—কর্ণেল বিদ্যালয় (ছাত্রীদিগের আবাস-গৃহ)

ওয়েল্‌স মহিলা-কলেজের প্রবেশ-পথ—অরোরা

প্রতীয়মান হইবে। এই জন্যই পুরুষেরা কৌতুক করিয়া এই সকল বীরাঙ্গনাকে "Bachelor Girl" ও "Cow-boy Girl" অর্থাৎ পুরুষালী মেয়ে নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

পক্ষান্তরে, দক্ষিণবাসিনীরা যেন এক-একটী উদ্যানাগারের সযত্ন-পালিত চারা গাছ। তাহারা পশ্চিমবাসিনীদিগের ন্যায় স্বাধীন ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম। পুরুষেরা তাহাদিগের খড়্গের যষ্টি, বিপদে আশ্রয়স্থল। পুরুষদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়াই তাহারা দাঁড়াইতে পারে, বিযুক্ত হইলেই তাহাদিগের পতন অবশ্যম্ভাবী। কোমল লতিকা যেমন মহীরুহকে আশ্রয় করিয়া ঝড়-তুফান হইতে আত্মরক্ষা করে, তাহারাও জীবন-সংগ্রামে তদ্রূপ পুরুষেরই মুখাপেক্ষিণী। স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ কমনীয়তায় মণ্ডিত বলিয়াই দক্ষিণবাসিনীরা পুরুষদিগের বড়ই আদরণীয়া। আজন্ম কুমারী থাকিয়া স্ত্রীজন্ম ব্যর্থ করা তাহাদিগের ধর্ম্ম নহে। বিবাহিত জীবনই তাহাদিগের লক্ষ্য। ইয়োরোপে ও আমেরিকায় অনেক রমণীকে Affinityর অর্থাৎ মনের মতন বরের খোঁজে সারা জীবন কাটাইয়া চিরকুমারী থাকিতে দেখা যায়; কিন্তু আমেরিকার দক্ষিণাংশে old maid অর্থাৎ চিরকুমারীদিগের সংখ্যা বড়ই কম। ঈপ্সিত বর দক্ষিণবাসিনীর অদৃষ্টে না জুটিলেও, জীবনযাত্রার কোন সহচর পাইলেই সে খুসী।

উত্তরবাসিনীরা পশ্চিমবাসিনীদের ন্যায় কঠোর নহে, দাক্ষিণবাসিনীদের ন্যায় কোমলও নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,

ওয়েল্‌স মহিলা-কলেজের প্রেসিডেণ্টের আবাস গৃহ

ওয়েল্‌স মহিলা-বিদ্যালয়ের নৌ-গৃহ,—অরেকা

তাহারা ঐ দুইয়ের মাঝামাঝি। কোন পুরুষ অসদাচরণ করিলে পশ্চিমবাসিনী মার্কিণ রমণী হয় ত তাহাকে স্বহস্তেই চাবুক মারিয়া শিক্ষা দিবে; উত্তরবাসিনী ঐরূপ উগ্র কোন ব্যবস্থা না করিয়া, তাহার সহিত সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিয়া, তাহাকে "বয়্‌কট্" করিবে; আর দক্ষিণবাসিনী নিজের পিতা কি ভ্রাতার শরণাপন্না হইয়া ঐ কু কুরের জন্য "ধনঞ্জয়-বিদায়ের" ব্যবস্থা করিবে। খৃষ্ট্‌মাসের সময় মিসল্‌টোর* নিম্নে যদি কোন যুবক দেশাচার পালনে উৎসুক হয়, আর ললনাটী যদি পশ্চিম দেশ হইতে আগতা হইয়া থাকে, তবে হয় ত সে যুবকের গণ্ডে চপেটাঘাত করিয়া তাহার উপযুক্ত দক্ষিণা দিবে। ঐ ক্ষেত্রে উত্তরবাসিনী ললনা হয় ত কৃত্রিম ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়া উঠিবে, "O, you rogue! how dare you!" "(দুষ্টু, কোথাকার, তোমার সাহস ত কম নয়!) আর দক্ষিণবাসিনী ললনা লাজে জড়সড় হইয়া বাইবেলের নীতি অনুসরণ করিয়া অপর গণ্ডটীও হয় ত ফিরাইয়া দিবে। সাধারণ কথাবার্ত্তায়ও এই ত্রিবিধ রমণীর প্রকৃতিগত পার্থক্য দৃষ্ট হয়। পশ্চিমবাসিনী বিদেশীদের সহিত পরিচিত হইলে, তাহাদের সহিত আলাপ করিতে করিতে, হয় ত ঠিক পুরুষদের মত জিজ্ঞাসা করিবে, "How do you *fellows* like our country?" (আমাদের দেশটা তোমাদের কেমন লাগ্‌চে?) উত্তরবাসিনী সে ক্ষেত্রে হয় ত বিদেশীকে জিজ্ঞাসা করিবে

* খ্রীষ্টমাসের সময় ইয়োরোপ ও আমেরিকায় মিসল্‌টো নামক একপ্রকার পরগাছা কক্ষে-কক্ষে ঝুলান হয়। উহা প্রেমের নিদর্শন রূপে গণ্য হইয়া থাকে। মিসল্‌টোর নিম্নে কেহ দণ্ডায়মান থাকিলে, কিম্বা উহার নীচে দিয়া যাইতে থাকিলে, তাহাকে চুম্বন করার রীতি আছে। এই কারণে অনেক সময় দ্বারদেশেই মিসল্‌টো ঝুলাইয়া প্রেমিকেরা দ্বারের পাশে সুযোগ প্রত্যাশায় লুকাইয়া থাকে এবং অনেক পাত্রী অনামনস্ক ভাবে (?) দরজা দিয়া যাইবার কালীন ঐ প্রথা পালনে বিশেষ তৎপরতা দেখাইয়া থাকে।

কতিপয় গ্রাজুয়েট মার্কিণ ছাত্রী—কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়

ওয়েল্‌স্‌ মহিলা-বিদ্যালয়ের জেন্সি হল অরোরা

"আপনার ও দেশের জন্য মন কাঁদ্‌চে না?" আর দক্ষিণ বাসিনী প্রশ্ন করিয়া উঠিবে (৩৬৬ দিনের বৎসর* হইলে ত কথাই নাই), "আপনি কি দেশে ফিরিয়া যাইবেন, না এদেশেই বাস করা ঠিক করিয়াছেন? দেশে ত কোন তরুণী আপনার পথপানে চাহিয়া নাই?"

পশ্চিমের রমণীরা প্রেরি (prairie) অর্থাৎ বৃক্ষবিহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ক্রোড়ে লালিত-পালিত; দক্ষিণের রমণীদের সূর্যাকরোজ্জ্বল প্রদেশগুলিতে জন্ম; আর উত্তরের রমণীরা যুক্তরাজ্যের তুষারাচ্ছন্ন অংশে বর্দ্ধিত। প্রেরি, রবিকর ও তুষারের কথা মনে কর,—তবেই ঐ তিন রকমের ললনা সম্বন্ধে তোমার ধারণা হইবে। পশ্চিমাংশের সুবিস্তীর্ণ বিজন প্রেরি-গুলিতে মার্কিণ রমণী পুরুষদিগের সমভাবাপন্না comrade (সাথী);—মরুভূমিতে পালিত আরব-রমণীদিগের ন্যায় কষ্ট-সহিষ্ণু ও কর্ম্মঠ। অনতিশীতোষ্ণ দক্ষিণাংশের রমণীরা স্পেন্, ইটালি প্রভৃতি দেশের মেয়েদের ন্যায় কোমলতাপূর্ণ, লাবণ্যময়ী ও পরমুখাপেক্ষিণী। আর শীতপ্রধান উত্তরাংশের রমণীরা বিলাতের মেয়েদের ন্যায়—তাহারা সম্পূর্ণ স্বাবলম্বিনীও নহে, আবার পুরুষদিগের সম্পূর্ণ গলগ্রহও নহে। পশ্চিমে মার্কিণ ললনা কাজের সামগ্রী, দক্ষিণে সে শোভার সামগ্রী, উত্তরে সে কতক পরিমাণে উভয়েরই সমন্বয়। পশ্চিমে সে তেজস্বিনী, দক্ষিণে সে ভাবপ্রবণা, উত্তরে সে ধীশক্তিসম্পন্না।

* পুরুষেরা রমণীদিগের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিবে, ইহাই ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রথা; কিন্তু আমেরিকায় এই একটা পরিহাসোক্তি প্রচলিত আছে যে, লিপ্‌ ইয়ারে (Leap year) অর্থাৎ ৩৬৬ দিনের বৎসরে রমণীরা পুরুষদিগের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলে তাহাতে নাকি শ্লীলতার হানি হয় না।

মেন পার্ক—ওয়েলস মহিলা-বিদ্যালয়

প্রথমা লোকের বিস্ময় উৎপাদন করে, দ্বিতীয়া লোকের হৃদয় আকর্ষণ করে, তৃতীয়া লোকের শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। গুণ-মুগ্ধ লেখক এই ত্রিবিধ রমণী-চরিত্রেরই পক্ষপাতী।

মার্কিণ রমণী সাজসজ্জা সম্বন্ধে সুনিপুণা শিল্পকুশলা। ভারতের ললনারা যেমন চোখে কাজল দিয়া ও পায়ে আলতা পরিয়া প্রসাধন করে, মার্কিণ রমণীরাও তেমন মুখে পাউডার দেয় এবং চুলে নানা বর্ণের কলপ লাগাইয়া খেয়ালমত যখন-তখন চুলের রং পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকে। আজ যাহার সোণালি-রংয়ের চুল দেখিয়া মুগ্ধ হইবে, কয়েকদিন পরে হয় ত দেখিবে তাহার চুল সোণালি নহে, দস্তুরমত কাল। আবার কয়দিন পরে দেখিবে, তাহা বাদামী রংয়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মার্কিণ রমণীদিগের খোপা বাঁধিবার রকমই বা কত! গ্রীষ্ম, শীত, বসন্ত প্রভৃতি বিভিন্ন ঋতুর জন্য তাহারা যেমন অনেক পছন্দ করিয়া নিজেদের মানানসই টুপি কিনিয়া থাকে, সেরূপ তাহারা নিজেদের গোল, লম্বা, চেপ্টা মুখের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া খোঁপাও বাঁধিয়া থাকে। দরকার বোধ করিলে, তাহারা খোঁপার দুই-এক স্থানে একটু পরচুলাও ব্যবহার করিয়া কেশের শোভা বৃদ্ধি করে।

আমেরিকায় Beauty Doctors নামে একদল চিকিৎসক আছেন। কুৎসিতকে সুন্দর করাই উঁহাদের ব্যবসায়। উঁহারা খর্ব্বাকৃতি লোককে দীর্ঘকায় করিতে পারেন; খাঁদা নাক চোখা করিতে পারেন; স্থূল কলেবর ক্ষীণকায় করিতে পারেন। ক্ষীণ ও দীর্ঘ দেহ আমেরিকায় সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক। ক্ষীণা ও দীর্ঘাঙ্গিনী হইবার জন্য মার্কিণ ললনা কোন প্রকার কষ্টই কষ্ট বলিয়া মনে করে না। চীন রমণীরা যেমন পা ছোট রাখিবার জন্য কাঠের জুতা পরিধান করিয়া সমস্ত কষ্ট অম্লানবদনে সহ্য করে, মার্কিণ রমণীরাও তেমনই দেহের স্থূলতা দূরীভূত করিবার জন্য অনশনব্রত অবলম্বন করিতেও পশ্চাৎপদ নহে।

মার্কিণ রমণী বঙ্গরমণী অপেক্ষা স্বভাবতঃই দীর্ঘকায়া। পক্ষি-পালক-পরিশোভিত টুপিতে তাহাকে আরও দীর্ঘ দেখায়। কবির ভাষায় বলিতে গেলে, পালক ও হ্যাটপিন্ পরিবেষ্টিত তাহার আননখানি ঠিক যেন কাঁটায় ঘেরা গোলাপ ফুলটীর মতন। "অত্যুচ্চাভিগমাশ্চ যাদোরত্ন বিবাণবঃ"—উহা দূর হইতেই দেখিবার, দূর হইতেই প্রশংসা করিবার। কিন্তু জনতার ভিড়ে রাস্তা দিয়া যাইবার সময় উহার পশ্চাৎ হস্ত দূর দিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য; কেন না, নিকটে গেলে ঐ সকল পালক কিম্বা পিনের খোঁচা লাগিয়া জখম হওয়া বিচিত্র নহে। রাস্তা দিয়া যাইবার সময় রমণীদের হ্যাটপিনে যে কখনও কখনও লোকের চোখ কাণা হয়, এবং ক্ষতিপূরণের জন্য আদালতে মোকদ্দমাও হইয়া থাকে, তাহা সংবাদপত্র পাঠেই জানা যায়। এই সকল কারণে অনেক স্থানে তীক্ষ্ণ হ্যাটপিনের ব্যবহার নিষিদ্ধ।

মার্কিণ রমণীরা কত রকমের টুপিই না ব্যবহার করিয়া থাকে! আকারে, গঠনে, বর্ণে, উপাদানে ঐগুলি এত বিভিন্ন যে, নানা রকমের টুপির সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। সৌন্দর্য্যের দিক্ দিয়া না ধরিয়া, শিক্ষার দিক্ দিয়া ধরিতে

গেলেও, ঐগুলির সুখ্যাতি না করিয়া থাকা যায় না। মার্কিণ রমণীর টুপিতে উদ্ভিদ্‌-তত্ত্ব, জীব-তত্ত্ব দুইই শিক্ষা করা যাইতে পারে। কোন সম্মিলনে মার্কিণ রমণীদের টুপির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, তোমার মনে হইবে যে, তুমি হয় ত কোন বোটানিকাল গার্ডেন বা জুওলজিকাল্ গার্ডেনে আসিয়াছ। টুপিগুলিতে যে কেবল লিলি, গোলাপ প্রভৃতি লাল, সাদা, হলদে রঙের বিভিন্ন ফুল দেখিতে পাইবে, তাহা নহে,—আঙ্গুরের গুচ্ছ, গমশীর্ষ, ফল, এমন কি, তৃণ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবে। আর প্রাণি-জগতের কেবল যে কবুতর, ঘুঘু ও অন্যান্য পক্ষীই দেখা যাইবে, তাহা নহে, তরঙ্গায়িত কুন্তলের সহিত মিশ্ খাইয়া বক্রগতি ভুজঙ্গমও সেখানে শোভা পাইতেছে। মার্কিণ টুপীওয়ালা মহিলাদিগের টুপী প্রস্তুত করিতে কোন সুন্দর উপাদানই বর্জ্জন করে নাই। ফল, পুষ্প, উদ্ভিদ, বিহঙ্গম সব কিছু দিয়াই সে মার্কিণ রমণীকে অঞ্জলি দিয়াছে। সুন্দরীর কমনীয় মুখখানি একা যদি পৃথিবী-জয়ে অসমর্থ হয়, সেই ভয়ে সে তাহার টুপিতে এমনি করিয়া জগতের সৌন্দর্য্যরাশি ভরিয়া দিয়াছে যে, তাহাতে কাহারও মন না টলিয়া থাকিতে পারে না। ভাবুকের জন্য পাখী আর ফুলের ব্যবস্থা হইয়াছে; পেটুকের জন্য ফল ও উদ্ভিদের আয়োজন আছে; এমন কি, চতুষ্পদগুলির জন্যও ঘাস এবং তৃণের অভাব নাই।

মার্কিণ রমণী নিজের প্রশংসা শুনিতে অভ্যস্ত, সে তাহাতে আহ্লাদে গলিয়া যায় না; নিজের সুখ্যাতি সে সহজ ভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহার পাণিপ্রার্থী জন দশেক যুবকের সহিত সে হয় ত বাক্যালাপ করিতেছে,—তাহারা হয় ত অবিশ্রান্ত ভাবে তাহার রূপগুণের প্রশংসা করিতেছে; কিন্তু ভবী ভুলিবার নহে। "বিবাহ ত কর, অনুতাপ না হয় পরে করিও"— এই নীতিতে তাহার আস্থা নাই। কুমারী অবস্থায়, বেশী দিন কোর্টশিপ্ চালাইতে তাহার আপত্তি নাই; কারণ, দশজনের উপর আধিপত্য ছাড়িয়া একজনের উপর আধিপত্য করার জন্য কে লালায়িত! আহৃত ফুলের মত কেবল একজনের বোতামের ঘরে স্থান পাওয়া অপেক্ষা, সে অনাহৃত ফুলের মত গাছে থাকিয়া সকলকেই গন্ধ বিতরণ করিবার অধিকতর পক্ষপাতিনী।

মার্কিণ রমণীর সৌন্দর্য্য, মনোহারিত্ব ও আকর্ষণী শক্তি প্রশংসনীয় বটে; তাহার অসীম বাক্‌পটুতাও কম প্রশংসনীয় নহে। রসনা-সঞ্চালনের পটুতা দেখিয়া সকল দেশের স্ত্রীজাতি সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে, তাহারা যেন জীবন্ত গ্রামোফোঁ। জাগ্রত অবস্থায় কখনও যদি তাহাদের বাক্যস্রোত বন্ধ থাকে, তবু তাহাদের মুখ নড়িতেই থাকিবে; কেন না, তখন আমাদের দেশের মেয়েরা হয় ত তাম্বুল চর্ব্বণে রত, আর মার্কিণ রমণীরা হয় ত চকোলেট্ কিম্বা ক্যাণ্ডি (Candy আমেরিকা মিষ্টান্নবিশেষ) ভোজনে ব্যস্ত। যেমন নায়েগ্রা প্রপাতের স্রোতোবেগের সাহায্যে ইঞ্জিনীয়ারগণ কলকারখানা চালাইতেছেন, সেরূপ রমণীর সতত-সঞ্চলমান মুখখানি চাকার সহিত ফিতা দ্বারা সংযুক্ত করিয়া বিনা আয়াসে সেলাইয়ের কল চালাইতে পারা যায় কি না, কর্ম্ম-কুশল আমেরিকাবাসী তাহার উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট আছে। রসনা সঞ্চালনের শক্তিতে মার্কিণ রমণী ভারতীয় ললনাকে পরাস্ত করিতে না পারিলেও, তাহারা সকল বিষয়েই বাক্যালাপ করিতে পারে। এইজন্য তাহার সহিত কথা বলিয়া বিশেষ আনন্দ পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, ভারতবর্ষের, এমন কি ইয়োরোপেও, মহিলাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা অনেক সময়ে তাহাদের ছেলেপুলেদের সম্বন্ধেই সীমাবদ্ধ থাকে; কিন্তু মার্কিণ রমণীরা তাহাদের "বেবি" (Baby) ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও বেশ বুদ্ধিমত্তার সহিত আলাপ করিতে পারে। ঘরকন্না হইতে আরম্ভ করিয়া রাজনীতির কথা পর্য্যন্ত তাহাদিগের নখদর্পণে। কিন্তু শ্রোতাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইলে, নীরস দর্শনের কথা বা শাস্ত্রালোচনা বিবাহিতা মহিলাদিগের জন্য রাখিয়া, কুমারীদিগের সহিত থিয়েটার, পার্টি, নাচ সংক্রান্ত সরস আলাপই সঙ্গত।

মার্কিণ রমণী সজীবতার প্রতিমূর্ত্তি। সে যে কাজে হস্তক্ষেপ করে, তাহাই চট্‌পট্ করিয়া সম্পন্ন করে। তাহার দ্রুতগতি দেখিলে মনে হয়

"ঝঞ্ঝা সে তুলনা নয়,
পশ্চাতে পড়িয়া রয়,
তীর তীক্ষ্ণ রশ্মি যেন ক্ষিপ্র দিবালোকে।"

আমাদের দেশের সুন্দরীদিগের চলন, যে আমরা গজেন্দ্র গমনের সহিত তুলনা করিয়া থাকি, তাহা শুনিলে মার্কিণ ললনাদিগের হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইবে। "বল্‌" নাচের সময় দেখিবে, সে কেমন অবিশ্রান্ত নৃত্য করিতেছে,—

তাহার একটুও ক্লান্তি নাই। সে প্রজাপতির স্থায় চপল, চঞ্চল। তাহার মধ্যে একটুও আড়ষ্ট ভাব বা জড়ত্ব লক্ষিত হয় না।

মার্কিণ রমণীর কার্য্যতৎপরতা দেখিতে হইলে, যে কোন আফিসে গমন কর, দেখিবে, সে কতদূর ক্ষিপ্রতার সহিত টাইপ্-রাইটার্ চালাইতেছে। যুক্তরাজ্যের রাজধানী ওয়াশিংটন্ নগরের ধনাগারে গমন কর, দেখিবে, রমণীগণ কেমন তাড়াতাড়ি অথচ কেমন সাবধানে কোন ভুল না করিয়া নোট্ গণনা করিতেছে। তাহাদের গণনায় ভুল বাহির হইলে, তাহাদের অর্থদণ্ড হইয়া থাকে; তথাপি নোট্ গণনা করিবার সময়ও তাহাদিগের মুখে হাসি লাগিয়াই আছে, উদ্বিগ্নতার লেশমাত্র নাই। যে সকল কারখানাতে স্ত্রীলোকেরা কর্ম্ম করিয়া থাকে, সে সকল কারখানায় যাও, দেখিবে, যে কোন কাজেই মার্কিণ রমণীরা নিযুক্ত হউক না কেন, তাহারা সারাদিন অম্লান বদনে কলের ন্যায় কাজ করিয়া যাইতেছে,—কেবল মাঝে তাহাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য অৰ্দ্ধঘণ্টা ছুটি। এই সকল দেখিয়া তোমার মনে হইবে যে, উহাদের রক্ত মাংসের শরীর নহে,—উহারা যেন অশরীরী আত্মা; পৃথিবীর দুঃখ, কষ্ট, ক্লান্তি, বেদনা যেন উহাদের উপর কোন আধিপত্য করিতে পারে না।

মার্কিণ রমণীগণ দেশের বিশেষ গৌরবের বিষয়,—তাহারা জন্মভূমির মুখোজ্জ্বলকারিণী সন্তান। যখন তাহারা পুরুষদিগের কার্য্যেও অনধিকার প্রবেশ করে, তখনও তাহারা দক্ষতার সহিত কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে। স্কুলে মেয়েদিগকে ছুতরের কার্য্য শিক্ষা করিতে দেখিয়াছি; বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন-কোন ছাত্রীকে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়িতেও দেখিয়াছি, আর মেয়েদের কলেজে মেয়ে পরিচালক দ্বারা চালিত লিফ্টেও আরোহণ করিয়াছি। এই সকল দেখিয়া আমি অনেক সময় বিস্ময়ে অবাক্ হইয়াছি।

আমেরিকায় উচ্চ-নীচ ভেদজ্ঞান নাই বলিয়া শুনা যায় বটে, কিন্তু কাজে দেখা যায়, এখানেও শ্রেণী-বিভাগ আছে; এবং এখানে অভিজাত-বংশীয়দিগের স্থান ললনাকুলই অধিকার করে। প্রত্যেক সামাজিক উৎসবে, ভোজে, নিমন্ত্রণে তাহারাই পুরুষদিগের অপেক্ষা অধিকতর সম্মানের স্থান (Precedence) পাইয়া থাকে। এসিয়া মহাদেশে স্ত্রী স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হয়; ইয়োরোপে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে পাশাপাশি চলিতে দেখা যায়; আর আমেরিকায় স্ত্রী অনেক সময় স্বামীর অগ্রে-অগ্রে গমন করিয়া থাকে। এসিয়া-খণ্ডে স্ত্রীজাতি আশ্রিতার ন্যায় পালিতা হয়; ইয়োরোপে স্ত্রী-পুরুষের অনেক বিষয়ে তুল্য অধিকার; আমেরিকায় স্ত্রীজাতি পুরুষের পূজা পাইয়া থাকে। এসিয়ার স্ত্রীজাতি সেবাধর্ম্মনিরতা; ইয়োরোপে তাহারা সাম্য-বাদিনী; আমেরিকায় তাহারা প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষিণী। যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, কোন্ দেশে স্ত্রীজাতির সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি হইয়াছে—আধ্যাত্মিক উন্নতি না হইলেও দৈহিক ও মানসিক উন্নতিতে কোন্ দেশের নারীরা প্রথম স্থান অধিকার করে—কোন্ দেশের ললনারা পুরুষদিগের গলগ্রহ না হইয়া বরঞ্চ অনেক বিষয়ে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী—তবে আমি বলিব, সেই দেশ আমেরিকার যুক্তরাজ্য। যদি আবার জিজ্ঞাসা কর, কোন্ দেশের অঙ্গনারা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা পাইয়াছে—অধিক অধিকার লাভ করিয়া তার সদ্ব্যবহার করিয়াছে—তবে আমি আবার যুক্তরাজ্যের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিব। আমেরিকার স্ত্রীজাতির এতাদৃশ সুখের জীবন দেখিয়াই রসিকপ্রবর ম্যাক্স্ ওরেল (Max O' Rell) বলিয়াছেন "পুনর্জ্জন্ম যদি থাকে, এবং স্ত্রী কি পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করার ও জন্মভূমি নির্ব্বাচন করার অধিকার যদি আমাকে দেওয়া হয়, তবে আমি জগদীশ্বরকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিব, 'হে ভগবন্! পরজন্মে আমাকে মার্কিণ রমণী করিও প্রভু'!"

শেষ চিঠি

[শ্রীপ্রফুল্ল হালদার]

কল্যাণীয়েষু,—

আর যাই হোক, কল্যাণ-কামনার অধিকার আমি হারাই নি।

কাল যখন আমার দোর থেকে, ব্যর্থ রোষের বিপুল জ্বালায়, অভিশাপের পর অভিশাপের বোঝায় আমার আরো কত পাপের ভার দুর্ব্বহ করে তুলতে না পেরে বড় হতাশ হয়েই ফিরেছিলে, তখন আমার মুখ থেকে কথা না বেরুলেও, কাণ থাকলে শুনতে পেতে—বুকে আমার কি স্নেহ, কি মমতা, কি করুণা গুমরিয়ে কাঁদছিল। কিন্তু হায়! ওগো বধির! সে শুনবার মত কাণ তোমার নেই,—তোমার সমস্ত পুরুষ-জাতিরও নেই। এই দুঃখটাই আজ আমার সমস্ত প্রাণ ব্যথিয়ে তুলছে।

কুড়ি বছরের চোখের জল আজ জমাট বেঁধে উঠেছে; শত দিনের হাজার দীর্ঘশ্বাস আজ পাথর হয়ে আমার বুক চেপে ধরেছে; তাই আজ উথলিয়ে উঠ্‌ছে আমার হৃদয়-সিন্ধু তোমাদের ওই মন্থনে। অন্তরের গোপন তলে যে বস্তু জমা হয়ে উঠেছে,—ইচ্ছা করে, ঝরে পড়ার আগে তারই একটু তোমাদের দিয়ে যাই। হতাশ হয়ো না,—অমৃত এতে পাবে না,—এক কণাও না;—গরল, গরল, শুধুই গরল। তোমাদের দেওয়া এ গরল বিষিয়ে দিয়েছে সারা অঙ্গ আমার এই দীর্ঘ বিশ বছর; আজ তা উদ্গমন করব। এই গরলে তোমাদের সাজান কাননের সকল ফুল বিষাক্ত হয়ে উঠুক,—এই গরল গায়ে মেখে বাতাস মরণের চুম্বন দিয়ে যাক্ তোমাদের চোখে-মুখে।

বাইশ বছর আগেকার কথা আজ মনে পড়ছে। স্মৃতির কপাট খুলতে আজ দেখছি,—বাইশ বছর আগেকার দিনে আমার এই জীর্ণ, রোগ-জর্জ্জর দেহটা আপনার দিকে এমনি করে চাইতে জান্‌ত না,—আমার বিক্রীর হাসি সেদিন নিশিদিন ঠোঁটের ওপর ঘুমিয়ে থাকলেও, জান্‌ত না যে, তার দাম আছে। হেসো না,—আমি তোমাদের তাপসের তপোবনের শান্তির নীড়ে জন্মি নি জানি, তোমাদের ছায়াশীতল পল্লীবাটের সরলা বালিকা যে ছিলুম না, তাও জানি। তবু, বল্লে বিশ্বেস করবে না, সহরের পণ্যশালায় যেখানে মানুষের দেবত্বকে কিনে মাড়িয়ে ফেলো, সেখানে আমি জন্মালেও সে বাজারের বিরাট উন্মত্ততা সেদিন পর্য্যন্ত আমায় স্পর্শ করতে পারে নি;—আমার কত-কত পূর্ব্ব-গামিনীর চঞ্চল রক্তধারা শিরায় বইলেও, সেদিন পর্য্যন্ত উদ্দাম নৃত্য জেগে উঠে নি। জীবনের খেয়া যৌবনের ঘাটে এসে লাগল সত্য, মনের গোড়ে আমি কিন্তু কিশোরীই রইলুম। তাই, থিয়েটারের নাচ-গানের বাইরেকার জগৎটা আমার কাছে রইল অজানা ও অচেনা।

চমক্ ভাঙল সেদিন, যেদিন সাজ-ঘরে থিয়েটারের শেষে চশমা-আঁটা একটি বাবু এসে আমার দর্শন প্রার্থনা করলেন। কাঁচা তার বয়স, সারা অঙ্গ ছাপিয়ে পড়ছিল তার যৌবনের একটা চটুল, চঞ্চল হাসি। সেদিনও অবাক্ হয়ে তার কথাই শুনেছিলুম,—অনেক মাথা গুলিয়েও তার মানে বের করতে পারি নি। কিন্তু মানে যখন পরিষ্কার হয়ে গেল,—আর তা' বেশী দেরীতেও হল না,—তখন একসাথে আমার ষোল বছরের বসন্তের সমস্ত ফুল হেসে উঠ্‌ল,—একসাথে আমার রক্তের তালে-তালে নেচে উঠ্‌ল যত রাজ্যের যত কোকিলের কুহু,—গুঞ্জন করে উঠ্‌ল লাখ-লাখ ভোম্‌রার মত আমার এত কালের নিখোঁজ কামনা-বাসনাগুলো। আশা, উৎকণ্ঠা, আবেগের যে নাচুনি সেদিন সুরু হল,—কি মধুর, কি তীব্র!

আমার নতুন ভাবে মসগুল হয়ে দিনগুলো বেশই ভাসিয়ে দিচ্ছিলুম, হেলায় কাগজের নৌকোর মত। কিন্তু হঠাৎ একদিন সে এসে আমায় বল্লে,—বাড়ীতে খবর পৌঁছেচে,—আমারই জন্য তা'র মাসের কল্‌কাতার খরচ বন্ধ হয়ে গেছে। হাওয়া যে দক্ষিণের চিরস্থায়ী সম্পত্তি নয়,—সেদিন তা'র প্রথম অভিজ্ঞতা। তবু ভেবো না, আমি মুসড়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম। আনন্দের আতিশয্যে সে আমার হাত চেপে ধরে যত কথা বলেছিল, তা' আজ আর প্রকাশ করবার প্রয়োজন দেখি নে; তবে সে-দিন প্রাণ আমার গৌরবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

আমার সম্বলের মধ্যে ছিল থিয়েটারের মাস-মাস গুটিকয় টাকা,—আর মায়ের দেওয়া খানকয় গয়না। এই অবলম্বনের মহাগৌরবেই প্রাণ আমার নেচে উঠেছিল। কল্পনার কাজল চোখে পরে' আমি অনেক ছবি আঁকতে বসে গেলুম। কিন্তু হায় রে হায়, বাস্তবের নির্মম কঠিন আঘাত রেণু-রেণু করে উড়িয়ে দিয়ে গেল,—ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে গেল আমার সকল অহঙ্কারকে। তাই, অলঙ্কারেও আমার টান্ পড়তে দেরী হল না। তবু আশঙ্কা আমার মনের দুয়ার পেরিয়ে যেতে কোন দিন পারে নি। মুখে আমি হাসি টেনে, একটা আশা-ভরা শঙ্কা-হরা মূর্ত্তি নিয়ে, চিরদিনই তাকে ভরসা দিয়েছিলুম।

চোখে আমি আঁধার দেখছিলুম। এমনি সময়ে আমার এই কালো মেঘের মালায় হঠাৎ একদিন দিব্য আলোর উৎসব সূচিত হল। আমার সমস্ত নারীত্বকে ধন্য করে নেমে এল এক স্বর্গের পারিজাত-ভার। ফুলের মত কচি সে অঙ্গখানাকে বুকে যখন জড়িয়ে ধরলুম, আমার অন্তরের মধ্যে তখন বেদনার বান ডাক্‌ল; ফুলে-ফুলে দুলে উঠ্‌ল আমার প্রাণের ভিতর সাত-সাগরের যত ঢেউ। ওগো হতভাগিনী! এ যে তোর আশাতীত,—এ যে তোর কল্পনার বাড়া, স্বপ্নের অগোচর! পাতালপুরের মাণিক এ যে, সাত রাজার ধন,—একে তুই ধরে রাখবি কোন্ দাবীর জোরে?

তবু, হায় রে ভাগ্য! সে মেয়েকে আমার ফেলে যেতে হত,—ফেলে যেতে হত ভগবানের দেওয়া আলো-বাতাসের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য সেই রঙ্গমঞ্চে মাতাল চোখের সামনে আমার নারীত্বের কতকটুকু বেচে আসবার জন্যে। চোখ থেকে আমার থিয়েটারের নেশা অনেক দিন আগে ছুটে গেলেও, অভাব আমায় বেঁধে রেখেছিল। সে ত এখন দ্বিগুণ হয়ে উঠল। তাই টাকার জন্যে আমার রং-করা মুখ নিয়ে হাজার-হাজার ক্ষুধিত চোখের সামনে দাঁড়াতেই হত,—এতে মন আমার যতই না বিষিয়ে উঠুক,—চরণ আমার যতই না টলুক,—অঙ্গ আমার মাটির সাথে যতই না মিশিয়ে যেতে চা'ক্;—আর যত না কেঁদে খুন হোক্ আমার শুষ্ক-কণ্ঠ মেয়ে।

কিন্তু হায় রে! এত দুঃখ-লাঞ্ছনার মধ্যেও যে সম্বলটুকু বুকে করে আমি পড়ে ছিলুম,—যক্ষের ধনের মত যে ভালবাসার গৌরব, যে আত্মদানের আনন্দটুকু আমি আগ্‌লে ছিলুম, —তাও মরীচিকার মতই মিলিয়ে যাচ্ছিল। মায়ের প্রাণের যে তৃষ্ণাটাকে আমি ভালবাসার মুখে এমনি বলি দিচ্ছিলুম, যদিও তা'র রক্তে অন্তর আমার রাঙা হয়ে উঠ্‌ছিল,—পিতার সুরার তৃষ্ণা যে তাতে বাধা না মেনে বেড়েই চলল। তারই পানীয় যোগাতে যে আমার বড় সাধের ওই মাণিকের দুধের বরাদ্দও কমে এল!—তবু তার চৈতন্য হল না। বেদনায় প্রাণ আমার ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল,—তবু আমি মুখ তুলে তাকে একটি কথাও কইলুম না।

তার পর সেদিনকার কথা।—তোমরা বোধ হয়, এ আমাদের প্রাপ্য বলে, এতে বিসদৃশ কিছুই দেখবে না,—একে মনে রাখবার মতও মনে করবে না;—আমার মনে তার দাগ কিন্তু অক্ষয় হয়ে রয়েছে। তিনদিন অনাহারের পর, আমি যেদিন মা হয়ে সেই ক্ষুদ্র শিশুর ক্ষুধার তাড়নায় দারুণ চীৎকার সহ্য করতে না পেরে দ্বিধায়, লজ্জায়, শঙ্কায় তার গোলাপী নেশাটাকে বড় অসময়েই মাটি করতে বসেছিলুম, "একটা কিছু চাকুরির চেষ্টা দেখলে হয় না" বলে, সেদিন তার কাছ থেকে যে জবাব পেয়েছিলুম,—তাকে তোমার সতী সাধ্বী হিন্দুকুলবধূরা কেমন করে অভ্যর্থনা করতেন জানি নে,—কিন্তু পতিতা ~~এ হতভাগিনী মুখ বুজে~~ নিঃশব্দে তা গ্রহণ করেছিল। সেদিনকার সে নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতাও আমার ভালবাসার কাছে হার মেনে ফিরে গিয়েছে।

শুনেছি, আজ সে দেশ-বিখ্যাত,—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উদ্ধারক—অকলঙ্ক শুভ্র তার যশ। আমার কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে, ওগো ধার্ম্মিক! একদিন সন্ধ্যায় যখন তুমি বাক্স ভেঙে আমার শেষ টাকা কয়টি নিয়ে আমায় ফেলে' চলে' এসেছিলে, সেদিন তোমার এমন সজাগ ধর্ম্মবুদ্ধি ছিল কোথায়? প্রমোদ-রাতের শুষ্ক মালার মত যাকে মাড়িয়ে গেলে, একবার ফিরে তাকালে দেখতে পেতে—গন্ধ-ভরা বুক তার তখনো তোমার জন্যে শ্বসিয়ে উঠ্‌ছিল;—দেখতে পেতে অনন্ত কালের কুসুমের ঘ্রাণ তখনো সে তার বুকে চেপে তোমারই আশায় বসে ছিল। কি বুঝেছিলে তুমি তার, ওগো নিষ্ঠুর? সেই গুটিকয় টাকার বেশী দেবার মত তার কিছুই ছিল না কি?

তার পর,—তার পর আমার দুঃখের কাহিনীর যে নতুন অধ্যায় সে সুরু করে দিয়ে গেল,—সে তোমাদের কাছে

তাপ-বিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ]

পদার্থকে তিন অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়, কঠিন, তরল ও বায়বীয়। পিত্তলের ন্যায় কঠিন পদার্থ তো উত্তাপে বাড়ে দেখা গিয়াছে। জলের ন্যায় তরল পদার্থ ও বাতাসের ন্যায় বায়বীয় পদার্থেরও আয়তন উত্তাপে বৃদ্ধি পায়। সে সব পরীক্ষার বিষয় পরে বলা যাইবে।

এখন কথা হইতেছে এই যে, উত্তাপ যদি পদার্থকে বাড়ায়, এবং উত্তপ্ততা যত প্রখর হয়, এই বৃদ্ধির পরিমাণ যদি তত বেশী হয়, তবে এই বৃদ্ধির পরিমাণ দেখিয়া তো পদার্থের উত্তপ্ততা সম্বন্ধে সঠিক ধারণায় আসা যাইতে পারে। কথাটা ভাল করিয়া দেখা যাউক। একটা লোহার ডাণ্ডা সীতাকুণ্ডের গরম জলের মধ্যে খানিকক্ষণ রাখিয়া, উহার দৈর্ঘ্য সেই অবস্থায় খুব সূক্ষ্ম ভাবে মাপা হইল। এইবার সেই ডাণ্ডাকে বাড়ীতে আনিয়া, উনানের উপর কেট্‌লির ফুটন্ত জলের ভিতর রাখা হইল; এবং উহার দৈর্ঘ্য আবার একবার ভাল করিয়া মাপা হইল। যদি দেখা যায়, উভয় ক্ষেত্রেই উহার দৈর্ঘ্যের মাপ হুবহু এক, তাহা হইলে জোর করিয়া বলা চলে যে, সীতাকুণ্ডের জল আর কেট্‌লির জল সমান উত্তপ্ত। কিন্তু হাত দিয়া উভয় জল ছুঁইয়া জোর করিয়া এ কথা বলা চলে না। দুইটাই গরম মনে হয় বটে, কিন্তু দুইটাই যে সমান গরম, তাহা হলপ করিয়া কে বলিতে পারে? স্পর্শজনিত বোধ আমাদের এতটা তীক্ষ্ণ নয়। স্পর্শেন্দ্রিয় উত্তপ্ততার সঠিক নিরূপণে অসমর্থ; তাই নির্ভর করিলাম দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর। কাঠিটা মাপে সমান দেখিলাম: এবং যুক্তি প্রয়োগ করিয়া এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম; ঠিক করিলাম, পদার্থ দুটি সমান উত্তপ্ত। ঐ লোহার কাঠিটি এখানে উত্তপ্ততা মাপিবার এক উপায়—এইটাই আমার তাপমান-যন্ত্র—থার্মমিটার।

কিন্তু গোড়া হইতেই একটা বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। উত্তপ্ততা মাপিবার কথা যখনই আমরা বলি, তখনই মাত্র তুলনামূলক আলোচনা করিয়া থাকি। নচেৎ, এ উত্তপ্ততার কোন মানে দেখি না। যেমন ধনী-দরিদ্র, বা উঁচু-নীচু, বলিবার সময়, আমরা মনের মধ্যে শুধু একটা তুলনা করিয়া থাকি—বাহিরে ভাষায় তাহা সব সময় প্রকাশ করি আর না করি—তেমনি গরম-ঠাণ্ডা বলিবার সময় সেই পদার্থ কাহার অপেক্ষা গরম বা কাহার অপেক্ষা ঠাণ্ডা—শুধু এই কথাই ভাবিয়া থাকি; নচেৎ ঠাণ্ডা বা গরম বলিতে কিছু বুঝি না। আচ্ছা, আগেকার ঐ লৌহদণ্ডের মাপ কেট্‌লির জলের অপেক্ষা সীতাকুণ্ডের জলে যদি কম হয়, তাহা হইলে সীতাকুণ্ডের জল নিশ্চয় কেট্‌লির জলের অপেক্ষা ঠাণ্ডা। কিন্তু কতটা ঠাণ্ডা? একটু ঠাণ্ডা, না বেশী ঠাণ্ডা? যদি ধর বলি একটু ঠাণ্ডা, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য, কাহার তুলনায় একটু? আরও একটা জিনিসের কথা অবশ্য ভাবিতে হইবে—যাহার তুলনায় একটু বা বেশী বলা চলিতে পারে। যেমন ধর বলা যাইতে পারে যে, হাঁ, এই সীতাকুণ্ডের জল কেট্‌লির জল অপেক্ষা ঠাণ্ডা বটে, কিন্তু বরফের মত ঠাণ্ডা নয়—বরফের তুলনায় একটু ঠাণ্ডা। কিন্তু বরফের তুলনায় যে একটু বলিলাম, সেই একটু-ই বা কতটুকু? এই সবই ভাষায় প্রকাশ করা যায়। কিরূপে, বলিতেছি। লৌহদণ্ড প্রথমে বরফে খানিকক্ষণ রাখিলাম; তাহার পর বরফ হইতে তুলিয়া কেট্‌লির ফুটন্ত জলের মধ্যে দিলাম। দেখিলাম, ইহা একটু বাড়িয়াছে। যতটুকু বাড়িয়াছে সেই দৈর্ঘ্যটাকে

লোহদণ্ডের সমস্ত দৈর্ঘ্য নয়, শুধু বৃদ্ধিটুকুকে—ধর ১০০ ভাগ করিলাম। এখন কোন পদার্থের মধ্যে দিয়া যদি দেখি যে, লোহদণ্ডের বৃদ্ধি পূরা ১০০ ভাগের সমান, তাহা হইলে অবশ্য আমরা বলিব যে, উহা ফুটন্ত জলের মত উত্তপ্ত। আর একটা পদার্থের মধ্যে দিলে যদি দেখি, উহা মোটেই বাড়ে নাই, তাহা হইলে বলিব এই দ্বিতীয় পদার্থ বরফের মত ঠাণ্ডা। সীতাকুণ্ডের জলের মধ্যে দিয়া যদি দেখি, লোহদণ্ডের বৃদ্ধি ৬০ ভাগ, তাহা হইলে বুঝিব, সীতাকুণ্ডের জল গরম বটে, তবে ফুটন্ত জলের মত গরম নয়; কারণ, ফুটন্ত জলে দিলে বৃদ্ধি হইত পুরা ১০০ ভাগ; এবং ফুটন্ত জল ও বরফের তুলনায় ইহার অবস্থাটা কিরূপ তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। সুতরাং এই লোহদণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে আমরা তাপমান-যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে পারি।

কিন্তু ও কি কথা? তাপমান-যন্ত্র—থার্মমিটার বলিতে তো আমাদের মনে পড়ে, একটা কাচের নল—যাতে দাগ-কাটা-কাটা আছে এবং যার ভিতরে আছে পারা; লোহার একটা ডাণ্ডা হইল থার্মমিটার? তাহা হইলে হাতা-বেড়ী ঘণ্টা সকলেই এক-এক থার্মমিটার!

আশ্চর্য্য হইবার ইহাতে কিছু নাই। উহাদের প্রত্যেককেই এক-একটা তাপমান-যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে পারা যায়। অন্য কোন আপত্তি নাই; আপত্তির মধ্যে শুধু, এই সব ব্যবহারে অসুবিধা আছে, নচেৎ তথ্য হিসাবে কোন গলদ নাই।

তাপে পদার্থ বাড়ে বটে, কিন্তু এই বৃদ্ধি বড়ই কম। লোহদণ্ড বরফ হইতে তুলিয়া ফুটন্ত জলে দিলে উহা বাড়ে সত্য, কিন্তু উহার নিজের দৈর্ঘ্যের প্রায় একলক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র বাড়ে। গোড়া হইতে যতই বড় দণ্ড লও না কেন, এই বৃদ্ধিটা এতই কম হইবে যে, ইহা চোখে দেখা তো দূরের কথা, সুক্ষ্ম যন্ত্র দিয়া মাপাও সুকঠিন হইয়া উঠিবে; সুতরাং, বরফে দিয়া মাপ, ফুটন্ত জলে দিয়া মাপ, অপর এক জলে দিয়া মাপ—এই সব কথা যেমন চটপট করিয়া বলা হইল, কার্য্যতঃ সে সব করিয়া উঠা বড় সহজ ব্যাপার নয়। সাধারণতঃ, তাপে তরল পদার্থ কঠিন পদার্থের অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী বাড়ে। সুতরাং, লোহার ন্যায় কঠিন পদার্থ অপেক্ষা জল বা পারার ন্যায় তরল পদার্থ ব্যবহার করিলে, ঐ বৃদ্ধিটা অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়ায়, উহা মাপা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া আসে। তাই তাপমান-যন্ত্রে সাধারণতঃ আমরা তরল পদার্থ ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু একটা কথা এখানে বলিয়া রাখা দরকার—বায়বীয় পদার্থ আবার তরল পদার্থ অপেক্ষা আরও বেশী বাড়ে; সুতরাং তরল পদার্থ অপেক্ষা বায়বীয় পদার্থ ব্যবহার করা এই হিসাবে আরও বেশী সুবিধা-জনক এ হিসাবে সুবিধাজনক সন্দেহ নাই; এবং সেরূপ তাপমান-যন্ত্র আছেও। কিন্তু এই বায়বীয় পদার্থ লইয়া নাড়া-চাড়া করায় অন্য অনেক অসুবিধাও আছে; তাই সাধারণতঃ তরল পদার্থই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এবং তরল পদার্থের মধ্যে অনেক সময় নানান্ কারণে পারদ ব্যবহার করাই বেশী সুবিধাজনক বলিয়া, সাধারণ তাপমান-যন্ত্রে পারদই থাকে। কেন সুবিধাজনক, সে কথা পরে বলা যাইবে। এখন দেখা যাউক, এই তাপমান-যন্ত্র—ঐ থার্মমিটার কিরূপে তৈয়ারী হয়।

কঠিন পদার্থ অপেক্ষা তরল পদার্থ তাপে বেশী বাড়ে; অতএব তরল পদার্থ লইতে হইবে; ঐ পদার্থ পরিমাণে যতই বেশী হয়, এই বৃদ্ধির পরিমাণও তত বেশী হয় বলিয়া একটু বেশী পরিমাণেই এই পদার্থটি লইতে হইবে। জল, তেল, স্পিরিট প্রভৃতির অপেক্ষা পারা নানান্ কারণে সুবিধাজনক। অতএব একটু বেশী পরিমাণে খানিকটা পরিষ্কার পারা লওয়া হইল। পাত্রস্থিত এই পারদের আয়তনের হ্রাসবৃদ্ধি দেখিতে হইবে; অতএব এই পাত্রটা কাচের হওয়া চাই। কাচের এই পাত্রের আকার সোজা গেলাসের মত না হইয়া, যদি একটা হুঁকার মত হয়,—তলায় বড় খোল, এবং খোলের সহিত একটা সরু নলিচা লাগান, এবং পারা খোলটি বোঝাই করিয়া নলিচার খানিক দূর অবধি আসিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে আরও বিশেষ সুবিধা হয়। কেন, বলিতেছি। পুকুরের জল বাড়িল কি কমিল, তাহা আমরা নিরূপণ করি—পুকুরের সান্ কতখানি ডুবিল বা কতখানি জাগিল দেখিয়া। সেইরূপ, পাত্রস্থিত তরল পদার্থের হ্রাস-বৃদ্ধির বিচার করি উহার উপরটা কতটা নামিল বা কতটা উঠিল দেখিয়া। এই উঠা-নামা যদি একটা খুব চওড়া, খুব বড় ফাঁদের জায়গায় হয়, তো আয়তনের একটু-আধটু পরিবর্তনে এই উঠা-নামা এত কম হইবে যে, উহা ধরা একেবারে সুকঠিন হইবে। পরন্তু, যদি খুব সরু নলের মধ্যে

উহা সংসাধিত হয়, তো আয়তনের ঈষং পরিবর্ত্তনে এই উঠা-নামা খুব বেশী-বেশী হইতে থাকিবে। কুঁজাতে জল যখন খোলের মধ্যে থাকে, তখন এক চামচে জল লইলে বা এক চামচে জল ঢালিলে, জলের উঠা-নামা বড় টের পাওয়া যায় না। কিন্তু এই উঠা নামা বেশ বোঝা যায়, যদি জল চওড়া খোলের মধ্যে না থাকিয়া উপরকার সরু নলের মধ্যে থাকে।

অতএব, একটা খুব সরু কাচের নল লইয়া, তাহার তলাটা বেশ একটা বড় খোলে পরিণত করিয়া লইলাম; হুঁকার মত হইল আর কি! এইবার ঐ খোলটা সমস্ত এবং নলের খানিকদূর অবধি পারা দিয়া বোঝাই করিলাম। কিন্তু বোঝাই করিবার বেশ একটু হাঙ্গামা আছে। নলের মুখের সঙ্গে একটা ফনেল (Funnel) লাগাইয়া সেই ফনেলে খানিকটা পারা ঢালিয়া দেও—দেখিবে, উহা গড়্‌গড়্ করিয়া নামিয়া গেল না। খোলের মধ্যে, নলের মধ্যে, বাতাস রহিয়াছে। নল যদি মোটা হইত, তো বাতাস এক ধার দিয়া বাহির হইত, আর একধার দিয়া পারা সড়্‌সড়্ করিয়া তলায় চলিয়া যাইত। কিন্তু এখানে নলটা খুব সরু; পারার একটা ফোঁটাই সমস্ত মুখটা বন্ধ করিয়া দিল—বাতাস বাহির হইতে পারিল না, কাজেই পারা ঢুকিতে পারিল না। তবে কি করিতে হইবে? এই অবস্থায় যদি তলাটা গরম কর, তাহা হইলে ভিতরের বাতাস গরম হইয়া বাড়িবে; এবং খানিক বাতাস ফনেলের পারার মধ্য দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। এইবার যদি ঠাণ্ডা কর, তো ভিতরের বাতাস ঠাণ্ডা হইয়া সঙ্কুচিত হইবে; ফলে খানিকটা স্থান বায়ুশূন্য হওয়ায়, বাহিরের বাতাসের চাপ খানিকটা পারাকে ভিতরে ঢুকাইয়া দিবে। আবার এইরূপ গরম কর—আবার ঠাণ্ডা কর। এইরূপে গরম ঠাণ্ডা, গরম ঠাণ্ডা করিতে থাক—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তলার খোল ও উপরের নলের খানিকদূর অবধি পারায় ভর্ত্তি হয়। এই বার মুখ বন্ধ করিবার পালা। এইরূপ অবস্থায় যদি বন্ধ করা যায়, তো নলের ভিতরে যে বাতাসটুকু অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা পারার সহজ নড়া-চড়ায় একটু বাধা দিবে। অতএব এই বাতাসটুকুকেও তাড়াইতে হইবে। সমস্তটা বেশ গরম কর; তাহা হইলে পারার বাষ্প এই বাতাসটুকুকে তাড়াইবে। এখন নলের মধ্যে পারা ও পারার বাষ্প ছাড়া আর কিছু থাকিবে না। এইবার এই গরম অবস্থাতেই টপ্ করিয়া মুখটা বন্ধ করিয়া দাও।

এইবার সমস্ত জিনিসটা—যতদূর অবধি পারা আছে, ততদূর পর্য্যন্ত—পরিষ্কার গুঁড়ান বরফের মধ্যে খানিকক্ষণ রাখ; দেখিবে, পারা ক্রমশঃ নামিয়া আসিয়া এক-স্থানে দাঁড়াইল—আর নামে না; এইখানে একটা দাগ দাও। এইবার উহা ফুটন্ত জলের বাপ—ষ্টীমের মধ্যে খানিকক্ষণ রাখ। এমন বন্দোবস্ত চাই যে, সমস্তটা যেন ষ্টীমের মধ্যে ডুবিয়া থাকে। তজ্জন্য বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন। এইবারে পারাটা যতদূর অবধি গিয়া উঠে, সেখানে আর একটা দাগ দাও। এইবার এই দুইটা দাগের মধ্যের স্থানটাকে ১০০ সমান ভাগে ভাগ করা হইল। এক-একটা ভাগকে বলা গেল এক-এক ডিগ্রী। তলার বরফের দাগটা হইল ০ ডিগ্রী, উপরের ষ্টীমের দাগ হইল ১০০ ডিগ্রী; এবং এই সমস্ত স্কেলটার নাম সেন্টিগ্রেড স্কেল। একটা কথা এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন। এই যে ১০০ ভাগ সমান করিলাম,—তজ্জন্য ইহা বিশেষ দরকার যে, নলের ভিতরকার ব্যাস্ সব জায়গায় সমান হইবে। তাহা যদি না হয়, তো দুইটা পর-পর দাগের মধ্যের স্থান কোথাও বেশী, কোথাও কম হইবে; এবং এই যে এক-এক ডিগ্রী, তাহার দাগ সব জায়গায় সমান থাকিবে না। নল বাছিবার সময় এই কথাটা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। ইংল্যাণ্ডে সাধারণতঃ সাংসারিক ব্যবহারে যে তাপমান-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাতে ঐ ভাগটা ১০০র পরিবর্ত্তে ১৮০ ভাগ করা হয়। তলার দাগটাকে বলা হয় ৩২ ডিগ্রী, আর উপরেরটাকে ২১২ ডিগ্রী; সুতরাং এই তাপমান-যন্ত্র অনুসারে বরফের উত্তপ্ততা ২১২ ডিগ্রী; এই স্কেলটার নাম ফ্যারাণ্‌হিট। বিজ্ঞানের সমস্ত কাজ কিন্তু সেন্টিগ্রেড স্কেলেই হইয়া থাকে।

আচ্ছা, আমরা যখন বলি যে, একজন লোকের জ্বর হইয়াছে ১০০ ডিগ্রী, তখন সেটা ফ্যারাণ্‌হিটের ডিগ্রী বলি, না সেন্টিগ্রেডের ডিগ্রী বলি? সেন্টিগ্রেডে জল ফুটে ১০০ ডিগ্রীতে। ১০০ ডিগ্রী জ্বর হইলে, আমাদের দেহের জল নিশ্চয় টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটে না; সুতরাং ঐ ১০০ ডিগ্রী নিশ্চয় সেন্টিগ্রেডের নয়। উহা ফ্যারাণ্‌হিটের। আচ্ছা, ফ্যারাণ্‌হিটের ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের কত হইবে? কিরূপে হিসাব করিতে হয়, বলিতেছি।

ফ্যারাণ্‌হিটে বরফ গলে ৩২ ডিগ্রীতে; সুতরাং ফ্যারাণ্‌হিটের ১০০ ডিগ্রী হইতেছে, এই স্কেলের যে ডিগ্রীতে বরফ

গলে তাহার উপর (১০০—৩২) অর্থাৎ ৬৮ ডিগ্রী। এখন ফারাণ্‌হিটের ১৮০ সেণ্টিগ্রেডের ১০০র সঙ্গে সমান; অতএব ফারাণ্‌হিটের ৬৮ ডিগ্রী হইবে সেণ্টিগ্রেডের $\frac{৬৮ \times ১০০}{১৮০}$; অর্থাৎ প্রায় ৩৭.৮ ডিগ্রীর সমান। সুতরাং ফারাণ্‌হিটের ১০০ হইবে—সেণ্টিগ্রেডের যে ডিগ্রীতে বরফ গলে, তাহার উপর ৩৭.৮ ডিগ্রী। সেণ্টিগ্রেডে বরফ গলে তো ০ ডিগ্রীতে। অতএব ফারাণ্‌হিটের ১০০ হইতেছে সেণ্টিগ্রেডের ৩৭'৮ ডিগ্রী।

এবার একটা উল্টা প্রশ্ন ধর। সেণ্টিগ্রেডের ৫০ ফারাণ্‌হিটের কত হইবে? সেণ্টিগ্রেডের ১০০ ভাগ যখন ফারাণ্‌হিটের ১৮০র সঙ্গে সমান, তখন সেণ্টিগ্রেডের ৫০ ভাগ হইবে ফারাণ্‌হিটের ৯০ ভাগের সঙ্গে সমান। এখন সেণ্টিগ্রেডের ৫০ ডিগ্রী হইয়াছে—যে ডিগ্রীতে বরফ গলে, তাহার উপর ৫০ ভাগ; কারণ, সেণ্টিগ্রেডের বরফ গলে, ০ ডিগ্রীতে; সুতরাং ৫০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড হইবে ফারাণ্‌হিটের যে ডিগ্রীতে বরফ গলে তাহার উপর ৯০ ভাগ। ফারাণ্‌হিটে বরফ গলে ৩২ ডিগ্রীতে; সুতরাং ইহা হইবে ফারাণ্‌হিটের ৯০+৩২ অর্থাৎ ১২২ ডিগ্রী।

পৃথিবীর গতি

[অধ্যাপক শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাসগুপ্ত এম-এ

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জগতে সুধিমণ্ডলী অভ্রান্ত প্রমাণে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন যে, পৃথিবী সচলা ও সূর্য্য চলচ্ছক্তিবিহীন। পৃথিবী নিজ ব্যাসের চতুর্দ্দিকে ২৪ ঘণ্টায় একবার স্বীয় পরিধি পরিক্রমণ করিতেছে;—ইহাই ইহার আহ্নিকগতি। আর পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ৩৬৫ দিবস ৫ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ডে একটি বৃত্তাভাস পথে ভ্রমণ করিতেছে, উহা ইহার বার্ষিক গতি। ইয়োরোপে যখন জ্যোতিষের নাম-গন্ধও ছিল না, তখনই—গ্যালিলিও ও কোপারনিকস প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভ্যুদয়ের বহুকাল পূর্ব্বে—আর্য্যভট্ট পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতে ও ইয়োরোপে ইহার অনুকূল ও প্রতিকূল কত যুক্তিতর্ক উত্থাপিত হইয়াছিল,—কত মনীষী কত প্রকারে ইহার সত্যতা অথবা অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন,—তাহা জ্যোতিষের ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে একটি আমোদজনক অথচ শিক্ষাপ্রদ কাহিনী।

প্রকৃতপক্ষে আর্য্যভট্টের সময় হইতেই ভারতে জ্যোতিষশাস্ত্রের যথার্থ সমাদর আরম্ভ হয়। তিনি গীতিকাপাদ গ্রন্থশেষে বলিতেছেন—"এই নক্ষত্রপঞ্জর মধ্যে ভূগ্রহচরিত যিনি জ্ঞাত হইবেন, তিনি গ্রহভগণ পরিভ্রমণ ভেদ করিয়া পরব্রহ্মে গমন করিবেন।" যাহা হউক, তিনিই প্রথমে দিবারাত্রি ভেদের কারণস্বরূপ পৃথিবীর গতি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তদ্রচিত গীতিকাপাদের প্রথম শ্লোকে তিনি লিখিয়াছেন—"এক চতুর্যুগে (৪৩২০০০০ সৌর বর্ষে) পৃথিবীর পূর্ব্বদিকে গতিসম্ভূত ভগণ ১৫৮২২৩৭৫০০ বার।" অর্থাৎ অত সৌর বর্ষে পৃথিবীর অত দিন হয়, সূর্য্যের নহে। তিনি তার পর ভূ-ভ্রমণের নিদর্শন দিতেছেন—

অনুলোমগতি নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমসং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্॥

অর্থাৎ অনুলোমগতিযুক্ত (পূর্ব্বদিকে গতি বিশিষ্ট) নৌকারূঢ় ব্যক্তি নদীর উভয়পার্শ্বস্থ তটবর্ত্তী অচল বৃক্ষাদি বিলোমগামী (পশ্চিমগামী) দেখেন; তেমনই লঙ্কাতে (নিরক্ষ দেশে) অচল নক্ষত্রসমূহকে সমবেগে পশ্চিম দিকে যাইতে দেখা যায়।

আশ্চর্য্যের কথা, আর্য্যভট্টের টীকাকার পরমেশ্বর এই স্থানের এক বিচিত্র ব্যাখ্যা দিয়াছেন, "পরমার্থতস্তু স্থিরৈব ভূমিঃ। ভূমঃ প্রাগ্‌গমনং নক্ষত্রাণাং গত্যভাবঞ্চেচ্ছন্তি কেচিৎ তন্মিথ্যাজ্ঞানবশাদিত্যাহ"—অর্থাৎ পৃথিবী বাস্তবিকই স্থির। তবে কেহ কেহ বলেন, পৃথিবীর পূর্ব্বদিকে গতি আছে এবং নক্ষত্রসমূহ নিশ্চল। তাহা ঐ দৃষ্টান্তের ন্যায় মিথ্যা জ্ঞান।

পরমেশ্বর অনেক পরবর্ত্তীকালের লোক। বোধ হয় সেই সময়ে পৃথিবীর আবর্ত্তন কেহই সাহস করিয়া প্রকাশ করিতে পারিত না। এইজন্যই বা পরমেশ্বর আর্যাভটের অর্থবিপ্লব ঘটাইয়াছেন।

এমন কি, লল্ল আর্যাভটের শিষ্য হইয়াও, গুরুর ভূ-ভ্রমণবাদ খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "যদি পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছে, তবে পক্ষিসমূহ উড়িয়া গিয়া কিরূপে নিজের নিজের নীড়ে প্রত্যাগমন করিতে পারে? আকাশাভিমুখে নিক্ষিপ্ত বাণ পশ্চিম দিকে পতিত হইতে দেখা যায় না কেন? মেঘসমূহকে কেবল পশ্চিম দিকেই গমন করিতে দেখা যায় না কেন? যদি বল, পৃথিবী মৃদু মন্দ চলিতেছে বলিয়া এ সকল ব্যাপার সম্ভবপর হইতেছে, তাহা হইলে একদিনে উহার কিরূপে একবার আবর্ত্তন ঘটে?" বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতিও এ প্রকার যুক্তি দেখাইয়াই পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে আপত্তি তুলিয়াছিলেন। তবে আশ্চর্য্যের কথা, এই যে, পৃথিবীর সহিত ভূ-বায়ুরও যে আবর্ত্তন ঘটিতে পারে, ইহা তাঁহাদের কাহারও মনে উদিত হয় নাই।

আর্যাভটের ভূ-ভ্রমণবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া ব্রহ্মগুপ্ত আপত্তি তুলিয়াছেন যে "আবর্ত্তনমুর্ব্ব্যাশ্চেন্ন পতন্তি সমুচ্ছ্রয়াঃ কস্মাৎ"; অর্থাৎ সত্য সত্যই যদি পৃথিবীর আবর্ত্তনই থাকে, তবে সমুচ্ছ্রিত বস্তু পড়ে না কেন? তখন পৃথিবীর গতি একটা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এমন কি, আল্‌বেরুণীও স্বভাবতঃ ইহাতে বিস্মিত হন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, পৃথিবী চল বা অচল হউক, উভয় কল্পেই জ্যোতিষিক গণনার ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তের টীকাকার পৃথূদক স্বামী আর্যাভটের মতবাদই গ্রাহ্য করিয়া লন

ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রাতিদৈবসিকৌ।
উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাম্॥

অর্থাৎ নক্ষত্রমণ্ডল স্থির রহিয়াছে; কেবল পৃথিবীর আবর্ত্তি বা পরিভ্রমণ দ্বারা গ্রহনক্ষত্রের প্রাত্যহিক উদয়াস্ত হইতেছে।

পৃথূদক স্বামী ঐ টীকার অন্য এক স্থলে বলিয়াছেন—"পৃথিবীর আবর্ত্তন মতই ঠিক; কেন না, একই সময়ে গ্রহদিগের দুই প্রকার গতি (পশ্চিম দিকে দৈনিক গতি ও পূর্ব্বদিকে স্বগতি) হইতে পারে না। আর পৃথিবীর আবর্ত্তন হইলে উচ্চস্থিত বস্তু পড়িবে কেন এবং পড়িবেই বা কোথায়? কারণ, পৃথিবীর ঊর্দ্ধও যাহা, নিম্নও তাহা। বস্তুতঃ দ্রষ্টার অবস্থিতি অনুসারে ঊর্দ্ধাধঃ ভেদ ঘটিয়া থাকে।"

এই সম্বন্ধে কোলব্রুক সাহেব লিখিয়াছেন যে—"আর্যাভট, পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে যে মত প্রথমে প্রবর্ত্তিত করেন, সাত শত বৎসর পূর্ব্বেও তাহা এদেশের কেহ-কেহ স্বীকার করিতেন। পাশ্চাত্যদেশেও বহুকাল পূর্ব্বে হীরাক্লিদিজ, পিথাগোরাস্‌ ও অপর দুই এক ব্যক্তিও পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু যেমন পাশ্চাত্য প্রদেশে, তেমনি ভারতেও এই মতটি পরে একেবারে পরিত্যক্ত হয়।"

ইয়োরোপে জ্ঞানোন্নতির পুনরুন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে পাশ্চাত্য ভূমিখণ্ড যখন বিজ্ঞানের দীপ্ত কিরণে পুনরায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তখন কোপারনিকস্‌ নামে পোলিয়া দেশীয় এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত টলেমির প্রমাদপূর্ণ ও অনৈসর্গিক মতবাদের খণ্ডন করিয়া, এই অভিনব তত্ত্ব প্রচার করিলেন যে, সূর্য্য স্থির, রাশিচক্রের মধ্যস্থানে অবস্থিত; এবং পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। পাশ্চাত্য জগতে পৃথিবীর গতির বিষয় সর্ব্বপ্রথম কোপারনিকসই স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু ইহারই পরে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্‌ টাইকোব্রাহিও কোপারনিকসের ভূ-ভ্রমণবাদ্‌ সম্বন্ধে আপত্তি তুলিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন "যদি পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে আবর্ত্তন করিতেছে, তবে ঊর্দ্ধ হইতে পতিত লোষ্ট্র পশ্চিম দিকে পড়িতে দেখা যায় না কেন?" যখন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্‌ টাইকোব্রাহি কোপারনিকসের ভূ-ভ্রমণবাদের বিরোধী হইয়াছিলেন, যখন খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেও পাশ্চাত্যদেশে কোন-কোন জ্যোতিষী এই তর্কের মীমাংসা অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, তখন ভারতের অতি প্রাচীন জ্যোতিষীবৃন্দের মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হইবে, এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে তাঁহারা যে পৃথিবীর গতি অস্বীকার করিবেন, ইহা বোধ হয় তেমন আশ্চর্য্যের কথা নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পৃথিবীর সহিত ভূ-বায়ু আবর্ত্তিত হইতে পারে, ইহা তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই। টাইকো-ব্রাহির আপত্তির খণ্ডনে বলা হইয়াছিল যে, মৃণ্ময়ী পৃথিবীর সহিত ভূ-বায়ু ও লোষ্ট্রখণ্ডও ভ্রমণ করিতেছে,—এজন্য লোষ্ট্রটি ঠিক নিম্নেই পতিত হইবে। কিন্তু ইহার দ্বারা উক্ত আপত্তির খণ্ডন হইল মাত্র, ভূ-ভ্রমণ প্রমাণিত হইল না।

টলেমির পৃথিবীর নিশ্চলতা সম্বন্ধীয় মতটি পাশ্চাত্য

ভূমিখণ্ডে সহজ বলিয়াই হউক, অথবা পর্য্যবেক্ষণের অভাব-নিবন্ধনই হউক—এমন দৃঢ় ভাবে সর্ব্বসাধারণের কল্পনারাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছিল যে, ইহার বিরোধী কোনও মতবাদ শুধু যে অগ্রাহ্য ছিল তাহা নয়—ধর্ম্ম বিরুদ্ধ মত বলিয়া অশ্রদ্ধেয়ও ছিল। সেইজন্যই যখন গ্যালিলিও তাঁহার নবাবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রমাণিত করিলেন যে, পৃথিবীই সচল, আর সূর্য্য ও নক্ষত্রসমূহ অচল, —তখন তাঁহাকে আপনার মত প্রচার করিতে গিয়া প্রাণ দিতে হইয়াছিল। মৃত্যুর সময়ে ভূতলে পদাঘাত করিয়া তিনি যে সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "এখনও পৃথিবী চলিতেছে", সে বাণী আজ পর্য্যন্তও বিজ্ঞানের ইতিহাস সোনার নিকষ রেখায় টানিয়া রাখিয়াছে।

তার পর হিন্দুদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে জ্যোতিষ গ্রন্থ, যাহা ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি বহু মনীষীর প্রতিভাসম্ভূত, সেই সূর্য্য-সিদ্ধান্ত পুস্তকেও পৃথিবীর গতির বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি তর্কের অবতারণা করা হইয়াছে। সেই যুক্তিগুলির স্থূল মর্ম্ম এই যে, (১) পৃথিবী যদি সচল হয় এবং কল্পিত বায়ুর উপর অবস্থিত থাকিয়া ২৪ ঘণ্টায় স্বীয় কক্ষ আবর্ত্তন করে, তবে এরূপ প্রবল বেগে বিঘূর্ণনের জন্য ধরাতলস্থ অট্টালিকা ও মঠ মন্দিরাদি প্রতিমুহূর্ত্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হইত সন্দেহ নাই। (২) পৃথিবী অবিরত কম্পিত হওয়ায় মনুষ্য, পশু, প্রাণী, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করা দূরে থাকুক, স্থির হইয়া দাঁড়াইতেও সমর্থ হইত না। (৩) ভূমি কম্পের জন্য প্রবল জলকম্প হওয়ায়, নদনদীর স্রোত, জোয়ার-ভাটা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইত। (৪) উচ্চতম পর্ব্বতশিখর হইতে কোন গুরু পদার্থ নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইলে, তাহা পর্ব্বতপাদমূলেই নিপতিত হয়; কোথাও এই নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায় না। কিন্তু পৃথিবী গতিশীল হইলে তাহা সম্ভবপর হইত কি? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অনুসারে পৃথিবীর পরিধি ২৫ হাজার মাইল এবং আহ্নিক গতি অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্ত্তনের জন্য ঘণ্টায় গতি ১০৪১৬ মাইল বা ১ হাজার ও মিনিটে ১৬ মাইলেরও কিঞ্চিদধিক। সুতরাং পর্ব্বতশিখরচ্যুত দ্রব্য ৩০ সেকেণ্ডে যদি ভূমিস্পর্শ করে, তবে সেই সময়ে পৃথিবীর গতিশীলতার নিমিত্ত ঐ পর্ব্বত ৮ মাইল দূরে সরিয়া যাইবার কথা। (৫) এইরূপ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে কোন স্থূল পদার্থ লক্ষ্য করিয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলেও, পৃথিবীর গতি থাকিলে লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা। এইরূপ আরও অনেক যুক্তি সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। যেমন, (৬) পৃথিবীতে এক সময়ে বৃষ্টিপাত হইতেছে এবং একই স্থানে দুই-তিন ঘণ্টা ধরিয়া বারিবর্ষণ হইতেও দেখা যায়। পৃথিবী সচল হইলে এ নিয়মের ব্যভিচার হইত। কারণ, এক মিনিটে পৃথিবীর গতি ১৬ মাইলের অপেক্ষাও অধিক; তাহাতে নির্দিষ্ট একই স্থানে দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া বারিবর্ষণ হওয়া একেবারে অসম্ভব। কারণ, কোনও স্থানে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিলে, ঐ সময়ের মধ্যে সেই স্থানটি অনেক দূরে সরিয়া যাইবার কথা। মোট কথা, এরূপ ব্যাপার কল্পনার অতীত। তার পর সূর্য্যসিদ্ধান্ত একটি চরম যুক্তি দিয়া এই আলোচনা শেষ করিয়াছে। (৭) পৃথিবী যদি গতিশীলা বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে আকাশমার্গে উড্ডীয়মান পক্ষিসকল, যাহারা নিজের নিজের কুলায় পরিত্যাগ করিয়া বিমানপথে বিচরণ করে, তাহারা ফিরিয়া আসিয়া কখনও নিজেদের নীড় খুঁজিয়া পাইত না। কারণ, যে বৃক্ষে তাহাদের কুলায় নির্ম্মিত ছিল, ফিরিয়া আসিবার সময়ে উহা অনেকদূর সরিয়া যাইবে নিশ্চয়। অথচ এ কথাও প্রত্যক্ষ যে ঠিক ২৪ ঘণ্টার পর পক্ষী প্রত্যেক স্থানেই আসিয়া পৌঁছিবে এবং পাখীটি ফিরিয়া আপনাপন বাসা হইতে কোনও কষ্ট পাইবে না।

এইরূপ অনেক যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া সূর্য্যসিদ্ধান্ত আমাদের ঐ সকলের খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। বাস্তবিক, ঐ যুক্তিগুলি যে কল্পনাবৃদ্ধির পরিচায়ক, সন্দেহ নাই, এবং উহাদের খণ্ডন করিতে উচ্চগণিত বা বিশেষ গণিত জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। বিজ্ঞানের কথায় পাশ্চাত্য সম্প্রদায় সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। স্রোতের জলে যদি পিপীলিকা সন্তরণ করিতে আরম্ভ করে, তবে স্রোতের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার গতি হওয়া নিশ্চিত। সেইরূপ আকাশমার্গে সঞ্চরমান বিহঙ্গও পৃথিবীর গতির অনুকূল দিকেই ধাবিত হইয়া থাকে। স্রোতের বেগের তুলনায় পিপীলিকার বেগ যত সামান্য, পৃথিবীর বেগবলের তুলনায় পাখীর বেগবল তাহা অপেক্ষা অনেকগুণ অল্প। সুতরাং পিপীলিকা যদি স্রোতের বিপরীত দিকে গমনে সমর্থ না হয়, তবে পৃথিবীর প্রবল বেগকে পরাভূত

করিয়া ক্ষীণবেগশালী পাখী কিরূপে প্রতিকূল দিকে গমন করিবে?

আসল কথা, এই যে এত গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার একমাত্র কারণ, গতিসম্বন্ধে আপেক্ষিক গতিতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা। বোধ হয় সে সময়ে গণিতে আপেক্ষিক গতিতত্ত্ব (law of relative velocity) বিষয়টি আবিষ্কৃত হয় নাই। হইলে, সহজেই এ গোল মিটিয়া যাইতে পারিত। কারণ, আমরা জানি, পৃথিবীর সহিত অনন্ত বায়ুমণ্ডলও সমানবেগে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। সেইজন্য পাখী যখন কুলায় পরিত্যাগ করিল, তখন উহার গতিবেগ পৃথিবীর বেগবল ও নিজের বেগবলের সমষ্টি। সুতরাং পৃথিবীর সঙ্গে আপেক্ষিক ভাবে অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলকে নিশ্চল অবস্থায় আনিতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত পাখীর গতিবেগ হইতে বায়ুর গতিবেগ বাদ যাইবে, কাজেই পাখীর বেগবলই একমাত্র গতির পরিচালক থাকিবে। কারণ, সমস্ত ব্যাপারটিই পৃথিবীর সঙ্গে আপেক্ষিক ভাবে হইতেছে; এবং এই যে কুলায়-প্রাপ্তি ইহাও পৃথিবীর সঙ্গে আপেক্ষিক ভাবে সম্পন্ন।

পৃথিবীর গতি-সমস্যা পাশ্চাত্য জগতেও অনেক জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। টাইকোব্রাহির মৃত্যুর পর তদীয় প্রধান শিষ্য কেপ্‌লার যখন অধ্যাপকের অগাধ পর্যাবেক্ষণপূর্ণ গবেষণার উত্তরাধিকারী হইয়া, উহাদের সাহায্যে প্রাচীন নক্ষত্রপর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া, গ্রহগণের গতিবিষয়ে নূতন তথ্যের উদ্ভাবন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন তিনি, পৃথিবী যে গতিবিহীন, এই মত অবলম্বন করিয়া লইলেন বলিয়া, বিশেষ সফলতা লাভ করিতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি, পৃথিবী যে নিশ্চল, এই মতবাদটি পরিত্যাগ করিলেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে, পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন।

বর্ত্তমান জ্যোতিষ-শাস্ত্রে এই পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ ও পরীক্ষা ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া দিয়াছে। উহাদের মধ্যে ফুকোর (Foucault) pendulum পরীক্ষা এবং নিউটনের প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা প্রমাণ—এই দুইটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে ফুকোর পরীক্ষায় এমন কতকগুলি ধারণা মানিয়া লওয়া হইয়াছে, যাহা প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণের অতীত। সুতরাং নিউটনের প্রমাণটিই সহজে বোধগম্য বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য। নিউটনের প্রমাণটি এই—কোন প্রাসাদ-শিখর হইতে একটি গুরুভার দ্রব্য ভূমিতে ফেলিয়া দিলে আমরা দেখিতে পাই, দ্রব্যটি ঠিক প্রাসাদের পাদমূলে না পড়িয়া পূর্ব্বদিকে কিছু সরিয়া গিয়া পড়িয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ভ্রমণ করিতেছে।

যাহা হউক, পৃথিবীর এই গতি-সমস্যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনীষীবৃন্দের কতখানি চিন্তা অধিকার করিয়াছিল, এবং কত কূট তর্ক ও পরস্পর বিরোধী যুক্তির মধ্য দিয়া আপনার মীমাংসা খুঁজিয়া পাইয়াছে, তাহার আলোচনা করিলে, বাস্তবিকই মানুষের চিন্তার ধারা কেমন করিয়া এক পথ হইতে অন্য পথে যায়, ইহা দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

জাতি-বিজ্ঞান

(১)

[অধ্যাপক শ্রীঅনন্তচরণ বিদ্যাভূষণ]

আদিম মানবের সৃষ্টি কোন্ যুগে, কবে, কোথায় হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস আমরা জানি না। সকল জীব জন্তুর সৃষ্টি হইবার পর যে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছিল, এই সিদ্ধান্তটা জীবতত্ত্বজ্ঞগণ মানিয়া লইয়াছেন। আমাদের দেশেও মনু-সংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে ঋষিগণ এই সিদ্ধান্ত খ্যাপন করিয়াছিলেন। ভূতত্ত্ববিদেরা পৃথিবীর আয়ুষ্কালকে তিন যুগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম যুগকে প্রত্নজীবক (Palæozoic), দ্বিতীয় যুগকে মধ্যজীবক (Mesozoic)

ও তৃতীয় যুগকে নব্যজীবক (Cainozoic) নামে তাঁহারা অভিহিত করিয়াছেন। এই যুগগুলি আবার কয়েকটী উপযুগ বা অন্তর্যুগে বিভক্ত। সেইগুলির নাম —

প্রাগাধুনিক - Eocene.
অল্পাধুনিক- Oligocene.
মধ্যাধুনিক—Myocene.
বহ্বধুনিক—Pliocene.
অন্ত্যাধুনিক—Pleistocene.
উপাধুনিক—Subrecent.
আধুনিক Recent.

মানবজাতির পূর্বপুরুষ একই সময়ে একই স্থানে জন্মিয়াছিল কি না, তাহা লইয়াও বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। আদিম মানবের জন্ম যে একই সময়ে হইয়াছিল, সে বিষয়ে ইদানীন্তন নৃতত্ত্ববিদগণের মধ্যে কোন মতদ্বৈধ নাই। শুধু তাহাই নয়, তাঁহারা এ কথাও স্বীকার করেন যে, Pleistocene (quarternary) বা অন্ত্যাধুনিক উপযুগ যখন প্রবর্তিত, তখন মানুষ যে কেবল বর্তমান ছিল, তাহা নয়, জগতের বাসোপযোগী সমস্ত স্থানেই তাহাদের তখন আবির্ভাব হইয়াছিল। বহু নিদর্শন ও প্রমাণ বলে তাঁহারা তাঁহাদের সিদ্ধান্তের সারবত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ব্রিটেন, ফ্রান্স, মিশর, টিউনিসিয়া, সোমালিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, পশ্চিম আসিয়া, ভারতবর্ষ, ইণ্ডোচীন ও আমেরিকার নদীগর্ভে ৫০, ১০০ এমন কি ৪০০ ফুট নীচে অপরিষ্কৃত প্রস্তরাস্ত্রসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। টিউনিসিয়ার নদীগর্ভে পলি পড়িয়া বেলে পাথর অন্ত্যাধুনিক উপযুগে জন্মিয়াছিল। নদী লোপ পাইয়াছে। তবে বেলে পাথরের নীচে এইরূপ প্রস্তরের অস্ত্র বহু পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। মানুষে যখন এই সমস্ত অস্ত্র ব্যবহার করিত, সেই সময়কে পুরাতত্ত্ববিদগণ প্রস্তর-যুগ বলিয়াছেন। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত—(ক) Palaeolithic age বা প্রত্ন-প্রস্তর-যুগ ও (খ) Neolithic age বা নব্য-প্রস্তরযুগ। মানব এই উভয় যুগে কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নের তালিকা পাঠ করিলে বেশ বোঝা যাইবে,—

প্রত্ন-প্রস্তর যুগে

অগ্নি প্রথমে অজানা ছিল মাত্র; পরে কিয়দংশে মানুষের আয়ত্তে আসে। স্বাভাবিক উপায়ে অগ্নি উৎপাদিত হইলে মানুষ তাহা রক্ষা করিতে পারিত।

খাদ্য প্রথমে মানুষ প্রধানতঃ নিরামিষভোজী ছিল, পরে শিকার করিয়া আমিষভোজী হইয়াছিল, আম মাংসই খাইত।

শিল্প — পাথর বা অস্থির অস্ত্র তৈয়ারি করিত; পাথরের অস্ত্র প্রথমে ঘসামাজা হইত না। পরে সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় হস্তী অশ্বাদি সমসাময়িক জন্তুর চিত্র অঙ্কিত করিত।

গৃহাদি ঘর, বাড়ী ছিল না, গুহা পর্বতাশ্রয়ে বাস করিত, কোন প্রকার শ্মশান ছিল না; সুতরাং সমাধিরও ব্যবস্থা ছিল না।

সমাজ—মাতৃ পরিচয়ে পরিবার গঠিত হইত।

ধর্ম — সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না, গুহাদিতে সমাধির ব্যবস্থা ছিল; চিত্রবিচিত্র মূর্তি তৈয়ারি করিত। ইহা হইতে বোধ হয় যে, তাহাদের ধর্মভাব উদ্বুদ্ধ ছিল। Riviere ও Reinach এ বিষয়ে নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন।

নব্য-প্রস্তর যুগে

অগ্নি — কাষ্ঠের ঘর্ষণ, আঘাত, সংঘর্ষের চেষ্টায় উৎপাদিত হইয়া সংরক্ষিত হইত।

খাদ্য — নিরামিষ ও আমিষ। মাছ ধরিত, জন্তু শিকার করিত, পশু পালন করিত, চাষ করিত, সাধারণতঃ খাদ্য রন্ধন করিয়াই খাইত। ইহারা ফল, শাক সব্জি জন্মাইত।

শিল্প — পাথরের নানাপ্রকার অস্ত্র বেশ চকচকে করিত; কাপড় বুনিত, বেতের কাজ করিত, খনিজ দ্রব্য ব্যবহার করিত, মাটির পাত্র হাতে গড়িত, সামান্য মোটা কাপড় তাহারা তৈয়ার করিত; যেমন বর্তমানের শিল্প প্রণালী— পরে শিল্পের উন্নতিও কিছু করিয়াছিল।

গৃহাদি — বিবিধ প্রকারের গৃহাদি ছিল। এই গৃহগুলি নানারূপ উপাদানে প্রস্তুত হইত। তাহাতে থাকিবার বন্দোবস্ত ছিল।

সমাজ—পিতৃ-পরিচয়ে পরিবার গঠিত ছিল। গোত্র, গোষ্ঠীরও সৃষ্টি হইতেছিল।

ধর্ম- ধর্মভাবের বিকাশ বেশ সুস্পষ্ট ছিল; পরজন্মে বিশ্বাস ছিল; ধর্মগত সংস্কার ছিল। দেবতায় শ্রদ্ধা ছিল।

প্রস্তরযুগের পর মানুষ ধাতু, তামা, লৌহ প্রভৃতির ব্যবহার শিক্ষা করে। এই সময় হতে মানুষ ক্রমশঃই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ধাতুর আবিষ্কারের সময় হইতে অক্ষরাবিষ্কারের সময় পর্য্যন্ত যে যুগ, তাহা "প্রাগৈতিহাসিক যুগ" নামে পরিচিত। এই যুগ হইতে মানুষ আস্তে আস্তে ঐতিহাসিক যুগে আসিয়া পড়ে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্দিগের চেষ্টা ও যত্নে অতীতের কত ধ্বংসাবশেষ, কত উৎকীর্ণ লিপি, প্রস্তর-লেখ, কীলকাক্ষর প্রভৃতি মিশর, ব্যাবিলন, দক্ষিণ আরব (মিনিয়া, সাবিয়া), ক্রীট, সাইপ্রাস, ট্রয়, মাইসিনা, আসাম্ পশ্চিম এশিয়ার প্রদেশ, এবং ইতালী ও ইবেরিয়া প্রভৃতি স্থানের কত অজ্ঞাতপূর্ব্ব বিষয় আমাদের জ্ঞানগোচর করিয়া দিতেছে। ইহাদেরই সাহায্যে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, মেসোপোটেমিয়ার নিম্ন প্রদেশ আজও ৮০০০ বৎসরের ইতিহাস বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। এইরূপ বিবিধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্যে মিশর ও ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষ অতীব পুরাতন ঘটনাবলীও আমাদের চক্ষের [illegible]। সেও বড় কম দিনের কথা নয় —অন্ততঃ ১০,০০০ বৎসরের প্রাচীন বিবরণ। মানবেতিহাসের কালের পরিচয় আমরা কিছু পাইলাম। কিন্তু কোন্ স্থানে মানবের প্রথম উদ্ভব হয়, তাহাও জানা দরকার। Dr. Eugene Dubois ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে যবদ্বীপের পূর্ব্বাঞ্চলে ট্রিনিল প্রদেশে সোলো নদীর গর্ভে বহ্বাধুনিক যুগের (Pliocene) স্তর হইতে জীবাশ্মের (fossil) সহিত আদিম মানবের অস্থিমূলক নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা প্রকৃতই মানুষের অস্থির নিদর্শন কি না, তাহা লইয়া কিছুদিন খুব তর্ক চলিয়াছিল। শেষে Manovurier, Deniker, Hepburn প্রমুখ বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ এই অর্দ্ধনর অর্দ্ধবানরাকৃতিকে মানবের পূর্ব্বপুরুষের নিদর্শন বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইহা যে মানবাকৃতি অন্য কোন জীব হইতে পারে না, তাহাও তাঁহারা করোটীর (৯০০ হইতে ১০০ centimetre) প্রসার হইতে সপ্রমাণ করিয়াছেন। Gorilla, Orang, Chimpanzee ও Gibbon জাতীয় বানরদিগের করোটী মানুষের অনেকটা অনুরূপ হইলেও, ইহা যে বানর-করোটী নয়, ইহার femur ও দুইটী molar পরীক্ষায় তাহার শেষ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ইঁহাদের সিদ্ধান্তে স্থির হইয়াছে যে, ইহা সোজা ভাবে দাঁড়াইয়া বেড়াইতে পারিত। ইহার দৈর্ঘ্য অনূন ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি; ইহার মনোবৃত্তি মানবাকৃতি শ্রেষ্ঠ জীব অপেক্ষাও উন্নততর। এই পণ্ডিতগণ ইহার নাম দিয়াছেন—"Pithecanthropus erectus."

উল্লিখিত নিদর্শন পরীক্ষা করিয়া জাতিতত্ত্ববিদ্গণ একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্তটী এই যে, —মানবের উৎপত্তি ও পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিস্তৃতি স্থির করিবার পক্ষে যত প্রকার সূত্র থাকিতে পারে, তন্মধ্যে এইটী একটা প্রকৃষ্ট সূত্র।

পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে এ পর্য্যন্ত যতগুলি আদিম মানবের অস্থির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে এইটীই প্রাচীনতম এবং মনুষ্যের সাধারণ প্রকৃতির বিশেষ অনুরূপ। অন্যান্য স্থানের নিদর্শনে এত মিল নাই। এ ছাড়া আণ্ডামান, অষ্ট্রেলিয়ান, বুসম্যান, ডলপেন, বোটোকুডো, এটা ও সেমাঙ্ এই সমস্ত জীবিত জাতির সাধারণ প্রকৃতির সহিত যবদ্বীপের নিদর্শনের সাদৃশ্য খুব বেশী। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই সমস্ত low race আদিম কোন সাধারণ মূল মানবজাতি হইতে সঞ্জাত। আর এই মূলজাতি এক বিস্তৃত মহাদেশের প্রথম অধিবাসী ছিল। সেই মহাদেশ এখন বিলুপ্ত; তবে ইঁহাদের বিশ্বাস, এই মহাদেশ মাডাগাস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ভারত মহাসাগর, ভারতবর্ষ, মাডাগাস্কার ও দক্ষিণ আফ্রিকা ইহাদের মধ্যে জলের ব্যবধান ছিল না। ইহাদের প্রদত্ত এই মহাদেশের নাম Indo Arican Continent। Indian Geological Surveyর ভূতত্ত্ব-বিদ্গণ এই মহাদেশের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে কেহ-কেহ লেখনী-সঞ্চালন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতে চান যে, অন্য স্থানে বিশেষতঃ ইউরোপের পশ্চিম ও মার্কিণের দক্ষিণ অঞ্চলে জীবাশ্ম অবস্থায় মানব-ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা যবদ্বীপস্থ বহ্বাধুনিক যুগের অর্দ্ধনর অর্দ্ধবানরের অপেক্ষা বিশেষ অগ্রবর্ত্তী। বেলজিয়মের অন্তবর্ত্তী Spy নামক স্থানের প্রত্নপ্রস্তরযুগের মানব-করোটী পরীক্ষা করিয়া এই তথ্যটী জানা গিয়াছে। এই করোটী ১৮৮৬

খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। স্থির হইয়াছে যে, ফ্রান্সের দক্ষিণে দরদোন (Dordogne) নামক স্থানের Cro-magnon নামক নব্য প্রস্তরযুগের জাতি ও আমাদের পরবর্ণিত (Pitheanthropus erectis) অৰ্দ্ধমানব অৰ্দ্ধবানর এই উভয়ের মধ্যে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত কবোটীর স্থান। এই দুইটী পরবর্ত্তী জাতি বহ্বাধুনিক উপযুগের, আদিম নয়, অত্যাধুনিক উপযুগের মানবের নিদর্শন; ইহারা হিমান্ত (interglacial) পৃথিবীর নানা স্থানে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু এই মতাবলম্বীদিগের প্রমাণে যথেষ্ট অসম্পূর্ণতা আছে। অধ্যাপক Broka এবং বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

সম্পাদকের বৈঠক

বয়ন ও শিল্প-বিদ্যালয়

[১]

শ্রীযুক্ত ওবেদদ্দিন আহাম্মদ চট্টগ্রামের সিবিক্সিবাজার পল্লীতে একটী বয়ন ও শিল্প বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। তিনি এখানে নানাবিধ মেসিন, তাঁত, চরকা, টাইস প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং ছাত্রদিগকে এই সকল শিল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটা কারখানা থাকায় শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের আরও বেশী সুবিধা হইয়াছে।

[২]

সুলভ চরকা

শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ মজুমদার (কেয়ার অব বাবু রমণীমোহন ঘোষ, জগধারী গ্রাম, নলহাটি পোঃ, বীরভূম জেলা) লিখিয়াছেন, জগধারী গ্রামের একজন সূত্রধর এক প্রকার চরকা তৈয়ার করিয়াছে, তাহার মূল্য এক টাকা মাত্র। [আমরা যখন এই চরকা দেখি নাই, তখন ইহার ভালমন্দ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারি না। আমরা যেমন সংবাদ পাইলাম, তেমনি প্রকাশ করিলাম।—সম্পাদক, ভারতবর্ষ।]

[৩]

সুদর্শনচক্র চরকা

বেঙ্গল স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কোম্পানীর সুদর্শনচক্র চরকার মূল্য তিন টাকা বার আনা। ঠিকানা ৯১ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এই চরকা বৈদ্যুতিক কলের সাহায্যে প্রস্তুত হয়।

[৪]

চরকা-শিল্প-শিক্ষা-প্রণালী

শ্রীমতী কুমুদিনী সিংহ "চরকা-শিল্প-শিক্ষা-প্রণালী" নামে একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি বিদ্যাসাগর-বাটীতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন-প্রতিষ্ঠাপিত চরকা-বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী। বইখানির প্রকাশক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন মহাশয়ের ঠিকানা ১০৯ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। ইহার মূল্য পাঁচ পয়সা মাত্র। বিদ্যাসাগর বাটীতে শিক্ষালয় বসিয়াছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা চরকায় যে সূতা কাটিতেছে, তদ্বারা শিক্ষালয়ে কাপড় (অবশ্য মোটা) বোনা আরম্ভ হইয়াছে।

[৫]

ঠকঠক তাঁত

বিগত বৈশাখ-সংখ্যা ভারতবর্ষের 'সম্পাদকের বৈঠকে' আমার বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পর, অনেকে দেশীয় মিস্ত্রী-নির্ম্মিত কাঠের তাঁত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়া চিঠি লিখিয়াছেন। সকলের চিঠির উত্তর দেওয়া সহজ নহে বলিয়া, অনেকেরই চিঠির উত্তর দেওয়া হয় নাই। জ্যৈষ্ঠসংখ্যা ভারতবর্ষে দেখিলাম, ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বিদ্যাবিনোদ নামক জনৈক ভদ্রলোক, যে গ্রামে loom ও তাঁত চলিতেছে, তাহার ঠিকানা দেই নাই বলিয়া অনুযোগ করিয়াছেন। তাঁহার ও অন্যান্যের কৌতূহল (?) নিবারণের জন্য তাঁতের কার্য্যপ্রণালী বিশ্বাসযোগ্য লোকের মুখে শুনিয়া ও স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁত সম্বন্ধে যে বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইলাম।

যাঁহারা তাঁত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন, ধরিয়া লইতেছি, তাঁহারা সকলেই শ্রীরামপুরী ঠকঠকি তাঁতের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়াছেন। কথিত দেশীয় মিস্ত্রী নির্ম্মিত তাঁত এই শ্রীরামপুরী তাঁতের উন্নত সংস্করণ। শ্রীরামপুরী তাঁতে যেমন দড়ি টানিয়া মাকু চালাইতে হয়, এই তাঁতেও সেইরূপ দড়ি টানিয়া মাকু চালাইতে হয়। উক্ত শ্রীরামপুরী তাঁতে বয়নকালে কাপড় পুনঃ-পুনঃ খুলিতে ও পেচাইতে হয়। কিন্তু এই তাঁতে বয়নকালে কাপড় আপনা-আপনি এক "নারদ" হইতে খুলিয়া অন্য 'নারদে' পেচাইয়া যায়। সুতরাং তদনুপাতে সময় সংক্ষেপ হয়।

Hatersley's loom এর সঙ্গে এই তাঁতের সাদৃশ্য এই automatic wrapping system এ। কারিকরের দক্ষতা-অদক্ষতা অনুসারে কাপড়ের প্রকার ও পরিমাণের তারতম্য বিশেষ হইয়া থাকে। তবে সাধারণ কারিকরগণ ৩০।৩৫ ন° ইত্যাদি সূতা দ্বারা ৪১।৪০ ইঞ্চি চওড়া ১০ হাতি ১ জোড়া কাপড় অনায়াসেই তৈয়ার করিয়া থাকে। এ বিষয়ে অতিরঞ্জন বা অবিশ্বাসযোগ্য কিছুই নাই।

কুঞ্জমোহন নাথ নামক জনৈক ভদ্রলোক প্রথমতঃ ঢাকাতে এই তাঁত নির্মাণ করে। ইহা তাহার নিজের মস্তিষ্কোদ্ভূত বা অন্য কোনও তাঁতের অবিকল অনুকরণ, বলিতে পারি না; তবে ইহার নির্মাণ-প্রণালী এত সহজ যে, যে কোনও নিপুণ মিস্ত্রী একবার দেখিয়া ইহার একখানা তৈয়ার করিয়া দিতে পারে। দেশের প্রধান demand বলিয়া, বিশেষতঃ উপযুক্ত কাঠ দেশে দুর্লভ বলিয়া কোনও মিস্ত্রীকেই বাঁধা supply করিতে রাজি করান যায় না। অনেক ভদ্রলোক order supply করিতে রাজি হন বটে, তবে সময় নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারেন না। পূর্ব্বে একখানা তাঁত ৭০।৮০ ৲ টাকাতে পাওয়া যাইত। এখন demand বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্য বৃদ্ধি হইয়া এক একখানার মূল্য ১০০।১২৫ ৲ টাকাতে দাঁড়াইয়াছে।

পূর্ব্বের বৈঠকেই বলিয়াছি, তাঁতিগণ বাজার হইতে সূতা কিনিয়া ও আবশ্যকমত তাহা রঞ্জিত করিয়া কাপড় বুনিয়া থাকে। চরকার প্রচলন দেশে প্রভূত পরিমাণে হয় নাই। চরকা কাটা সূতার কাপড় [illegible] যাইতেছে না। বাজারে গেলেই বিলাতী সূতা কিনিতে পাওয়া যায়; আর চরকা কাটা সূতা পাওয়া গেলেও, তাহা কষ্ট ও চেষ্টা করিয়া হাঁটিয়া খাটিয়া বাহির করিতে হইবে। দেশ-ভক্তির খাতিরে কোনও তাঁতিই এই কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক লোকসান দিতে সম্মত নহে। আমাদের বাসস্থানের ঠিকানা দিলাম—পোঃ নওপাড়া, গ্রাম আলগী, ঢাকা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বি এল।

[৬]

প্রশ্ন

Agriculture কোথায় কোথায় পড়ান হয় এবং কয় বৎসর পড়িতে হয়? উহা পড়িতে হইলে কিরূপ qualification এর প্রয়োজন? উহা সবচেয়ে ভাল কোথায় পড়ান হয় এবং pass করিলে কিরূপ prospect? উহা পড়িতে হইলে কলেজের মাহিনা ও বোর্ডিং খরচসহ মাসিক কত খরচ পড়ে?

শ্রীরাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, ময়মনসিংহ।

[৭]

জিজ্ঞাসা

বর্ত্তমান মাসের 'ভারতবর্ষে' দেখিলাম, বর্দ্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার অধীন, ইন্দ্রাপুর গ্রামনিবাসী গোষ্ঠবিহারী দাঁ নামক একব্যক্তি হাত চালিত সুন্দর নূতন রকমের তাঁত আবিষ্কার করিয়াছেন। উহাতে ঘণ্টায় ৬ হাত মোটা কাপড় তৈয়ারী হয়; কিন্তু উহাতে চিকণ কাপড় ঘণ্টায় কয় হাত হইতে পারে? উহার একখানা তাঁতের মূল্য কত? আর উহার জ্ঞাতব্য বিষয় যদি কিছু জানিবার থাকে, তবে তাহাও উপরের ঠিকানায় জানাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি—

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
হরিদেবপুর, তালন্দা, রাজসাহী।

[৮]

পূর্ব্ববঙ্গে তুলার চাষ

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বিদ্যাবিনোদ, মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর:— পূর্ব্ববঙ্গের পাটের মাটিতে তুলার গাছের চাষ হইতে পারে; তবে জলাভূমিতে কাপাসগাছ জন্মে না; জন্মিলেও ফসল ভাল হয় না।

চরকার সূতার ব্যবহার

শ্রীযুক্ত ভবদাস ঘোষ মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর:—চরকায় কাটা সূতা গাব দেওয়া জলে ভিজাইয়া রাখিয়া এরারুট, ময়দা বা চাউলের গুঁড়ার সহ জলে সিদ্ধ করিয়া নাটাইয়ে লইয়া শুকাইলেই ব্যবহার করা যাইতে পারিবে।

তুলার বীজ পাওয়া যায়

মাতিল্লা সাহেবের প্রশ্নের উত্তর:—(১) ভাল তুলার বীজ এখানে পাওয়া যায়। (২) ভাল উইভিং মেসিনে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসের নিকট খবর রাখিবেন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র বিশ্বাস, তত্ত্বরত্ন, পুরাণরত্ন, বি সি ও (Live.)

[৯]

কার্পাসের চাষ

কার্পাস চাষ বা কার্পাস বীজ সম্বন্ধেও অনেক প্রশ্ন করিতেছেন। আমার মনে হয়, সকলে যদি ঘরে-ঘরে গাছ-কাপাসের চাষ করেন, তাহাতে তুলার সমস্যাটার অনেকটা সমাধান হইবে। আমরা নিম্নলিখিত কারণে গাছ-কাপাসের পক্ষপাতী—

(১) ক্ষেতকাপাস উৎপাদন বহু যত্ন-সাপেক্ষ এবং ফলাফল অনিশ্চিত, গাছ-কাপাসের বীজ ভাল হইলে জন্মাইবার বা বাঁচাইবার জন্য কোন প্রয়াস পাইতে হইবে না। ইহা একরকম অযত্নেই জন্মে।

(২) ইহার জন্য পৃথক জমির আবশ্যক হয় না; তরীতরকারীর বাগানের মাঝে-মাঝে একটী করিয়া চারা পুতিয়া দেওয়া চলিতে পারে।

(৩) কোন বাড়ীতে ১০।১২টী গাছ থাকিলে, ১ বৎসরে উপযুক্ত তুলা স্বচ্ছন্দে হইবে। একবার গাছ লাগাইলে ক্রমাগত: ৮।১০ বৎসর তুলা পাওয়া যাইবে।

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য আমরা গাছকাপাসের বীজের /০ আনার প্যাকেট করিয়াছি। প্রতি প্যাকেটে ৩০ হইতে ৪০টী বীজ

থাকে। কেহ ভাল গাছ-কাপাসের বীজ দিতে পারিলে, আমরা তাহা উপযুক্ত মূল্যে কিনিয়া লইতে পারিব।

আমরা ১০, হইতে ১২, মধ্যে আসাম অথবা মণিপুরী ক্ষেত কাপাসের বীজ দিতে পারি। ২৮, টাকা দরে কানপুর ইজিপ্সিয়ান তুলার বীজ দিতে পারি।

(স্বাঃ) শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সেন

১৯ বি বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[১০]

বিশ্বকর্ম্মার প্রতি—

১। আমি শেখরগঞ্জ আলু (আমার বিশ্বাস কলিকাতায় উহাকে শাঁক-আলু কহে) হইতে ময়দা, শটীফুড্, ও গুড় (কিম্বা চিনি) প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমার প্রক্রিয়া মতে আলুর উপরের খোলস ফেলিয়া দিতে হয়। এই খোলস কোনও কাজে লাগিতে পারে কি না, এবং লাগিলে, লাগাইবার উপায় কি ?

২। কলিকাতা রিপণ ষ্ট্রীটস্থ S. M. Bery Co.র Automatic weaving machineএ প্রত্যেক জোড়া কাপড় প্রস্তুত করিতে কি পরিমাণ সময় লাগে ? কোন কোম্পানীর কিরূপ machine সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী ?

৩। শুকনা পেঁয়াজের খোসা হইতে পাকা হলুদ রঙ্গের আবিষ্কার করিতে গিয়া আমি দেখিয়াছি যে, ঝাঁজরীর মধ্যে খোসা রাখিয়া উহাতে জল ঢালার পরিবর্ত্তে একটা বাটীতে গরম জল রাখিয়া উহাতে খোসাগুলি ছাড়িয়া দিয়া ৪।৫ মিনিট সময় ভিজাইয়া রাখিলেই অতি সহজে রঙের উপাদান বাহির হইয়া পড়ে। এখন জিজ্ঞাস্য, উভয় প্রক্রিয়ার ফলাফল সমান কি না ? ও অন্য কোনও জিনিসের সংমিশ্রণে হলুদ-রঙের পরিবর্ত্তে লাল, নীল, বেগুণে, সবুজ অথবা গোলাপী রঙের উৎপত্তি সম্ভবপর কি না ? যদি সম্ভবপর হয়, তবে কি উপায়ে হইতে পারে ?

৪। কচু প্রভৃতি নানা রকম গুল্মাদির পাতা কাগজে কিম্বা অন্য কোনও জিনিসে ঘষিলে দেখা যায় যে, উহার উপর একটা সবুজ রং প্রতিফলিত হয়। কোনও উপায়ে এই রংটীকে উজ্জ্বল ও পাকা করা যাইতে পারে কি ?

৫। আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে সুপারী জন্মে, সাধারণতঃ সুপারীর ছোবড়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। কোনও উপায়ে ঐ ছোবড়াকে কাজে লাগানো যাইতে পারে কি না ?

৬। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে, পুষ্করিণীর পানা পরিষ্কার করিয়া ঐ পানা লাউ, কুমড়া প্রভৃতি গাছের গোড়ায় দেওয়া হয়। অনেকে বলেন, ঐ পানা হইতে একটা সার উদ্ভূত হইয়া লাউ, কুমড়া গাছের পুষ্টি সাধন করে। ঐ কথার সারবত্তা কতটুকু ও পানার সার অন্যান্য শাক, সব্জী প্রভৃতিতে দেওয়া যাইতে পারে কি না ?

৭। আমাদের দেশে এক রকম ঘাসের মত তৃণ বিশেষ আছে। সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে, সর্প দংশন করিলে তাহার পাতার রস দষ্ট স্থানে দিলে মানুষ বাঁচিতে পারে। ঐ কথার সারবত্তা কতটুকু ? যদি ঐ তৃণ দেখিতে ও পরীক্ষা করিতে চান, তবে উহা আদেশ মাত্রই পাঠাইতে পারি।

৮। আম, কাঁঠাল, আমলা প্রভৃতি নানাবিধ ফলের খোসা ফেলিয়া দেওয়া হয় ; ঐগুলি কোনও কাজে লাগিতে পারে কি ?

৯। মাছের পাঁশ (আঁইস ?) হইতে না কি এক প্রকার ঔষধের উপকরণ সংগৃহীত হয়। এ বিষয়ে আপনার কোনও অভিজ্ঞতা আছে কি ?

১০। কলাগাছের খোসা হইতে না কি লবণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ঐ লবণের ও করকচ লবণের মধ্যে quality হিসাবে কি তারতম্য আছে ? ঐ লবণ ব্যবহারোপযোগী কি উপায়ে হইতে পারে ?

১১। বাঁশের যে অবস্থায় শাক-তরকারী পাওয়া যায়, সেই অবস্থায় উহা হইতে না কি লবণ তৈয়ার করা যাইতে পারে। ঐ ভাবে লবণ তৈয়ারের প্রক্রিয়া কি ? ও কিরূপ ব্যয় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ ?

১২। জোঁক, ও মাকড়সাতে না কি কোনও ঔষধের উপাদান আছে। এ বিষয়ে আপনার কিরূপ অভিজ্ঞতা ?

১৩। কালীকচ্ছ নিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] দেশলাইয়ের কল অপেক্ষা অন্য কোনও উৎকৃষ্টতর কল আমাদের দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে কি ? যদি হইয়া থাকে তা সে কোথায় ?

১৪। গরম জলে তারপীন তৈল দিয়া ঐ জলে কাপড় কাচিলে কাপড় নাকি উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হয়। কতটুকু জলে কি পরিমাণ তারপীন তেল দেওয়া প্রয়োজন ? ঐ পরিমাণ অপেক্ষা বেশী কিম্বা কম হইলে, কাপড় নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি ?

১৫। সুপারী গাছের ভিতরে যে শাঁস আছে, তাহা ও সুর্ত্তী বেতের (যাহা হইতে পাটী প্রস্তুত হয়) ভিতরে যে শাঁস আছে, তাহা মুখে দিলে মিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। এগুলি হইতে গুড়, চিনি, কিম্বা অন্য কোনও মিষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে কি ? প্রয়োজন হইলে, সুর্ত্তী-বেতের শাঁস পাঠাইতে পারি।

১৬। তামাক পাতার ডাঁটা ও শিরা দূর ফেলিয়া দেওয়া হয়। ঐ তামাকের গুণে যথেষ্ট ঝাঁঝ থাকে। আমার বিশ্বাস, উহাকে ফেলিয়া না দিয়া কোনও উপায়ে কাজে করা যাইতে পারে। আপনার এ সম্বন্ধে অভিমত কি ?

১৭। মরিচের বোঁটা কাজে লাগিতে পারে কি ?

১৮। দুগ্ধপোষ্য গরু, ছাগল প্রভৃতির যথেষ্ট পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। উহা কোনও মানুষের আহারোপযোগী হইতে পারে কি না ? উহাতে মানুষের পুষ্টি সাধিত হইতে পারে কি ?

১৯। আলু ও কুলিয়াদের চাষের পক্ষে কি-কি সার প্রধানতঃ প্রয়োজ্য ? ও কিরূপ ক্ষেত্রে উহা ভাল হয় ?

২০। চায়ের পাতা হইতে যে কালী হয়, উহা হইতে উৎকৃষ্টতর কালী কোনও সাধারণ বস্তু হইতে উৎপন্ন হইতে পারে কি না?

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

['ভারতবর্ষের পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে যদি কেহ এই প্রশ্নগুলির, বা উহাদের মধ্যে যতগুলির পারেন, উত্তর পাঠাইলে, আমরা তাহা আগামী সংখ্যার 'ভারতবর্ষে' সাদরে প্রকাশ করিব ; ঐ সঙ্গে বিশ্বকর্ম্মার উত্তরগুলিও প্রকাশিত হইবে। — সম্পাদক, 'ভারতবর্ষ']

অনুগ্রহ পূর্ব্বক উত্তরগুলি যথাসম্ভব শীঘ্র দিবেন। প্রত্যেকটি উপকরণ সংগ্রহ কি পরিমাণ ব্যয় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ জানাইবেন। এ বিষয়ে আপনার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ঐ উত্তরগুলি পাইলে আমি আজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞ রহিব। আমার প্রশ্নের মীমাংসার্থ যে সমস্ত দ্রব্য আপনি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন না, সেই সমস্ত দ্রব্য, সম্ভবপর হইলে, আমাকে জানাইলেই আমি পাঠাইব। সত্বরই উত্তরের প্রত্যাশা করি। ইতি

বিনীত

শ্রীসত্যজ্যোতিঃ গুপ্ত।

গ্রাম—দলিয়া, পোঃ—দিদারপার, জিলা—শ্রীহট্ট।

[১১]

দুর্গাবতী শিল্প শিক্ষালয়।

এটী মেয়েদের শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা। শ্রীমতী অশ্রুমালা বসু, ৪৪নং মলঙ্গা লেনে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানে ছাত্রীদের সেলাই, জামার কাপড় কাটা, মোজা ও গেঞ্জি বোনা, চরকা, লেস, ঝালর বোনা, আর মেয়েদের উপযোগী অন্য-অন্য শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রীদের কাছ থেকে বেতন বা কোনরূপ পারিশ্রমিক নেওয়া হয় না। বিদ্যালয়টি ভাল কোরে চালাবার জন্যে এবং শিল্প সম্বন্ধে মেয়েদের যাতে যথার্থ সুশিক্ষা লাভ হ'তে পারে, তার ব্যবস্থা ক'রবার জন্যে যিনি যা পরামর্শ দেবেন, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী তা' আদরের সহিত গ্রহণ কোরে বিবেচনা ক'রতে প্রস্তুত আছেন। এই শিল্প-শিক্ষালয় অতি অল্পদিন প্রতিষ্ঠিত হইলেও সাধারণে বোধ হয় এর উপকারিতা বুঝেছেন ; কারণ, অনেকগুলি ছাত্রী এসে ভর্ত্তি হ'য়েছে, আর শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র ৫০, কুমারী অশোকা ৩০), এমনি হিসেবে অনেকে অর্থ-সাহায্যও ক'রছেন।

[১২]

মার্কিণ তুলার বীজ।

American Cotton Seed বা মার্কিণ তুলার বীজ কোথায় পাওয়া যায়?

পি, চক্রবর্ত্তী।

ম্যানেজার—

রাজা শ্যামশঙ্কর এষ্টেট, গোয়ালন্দ বাজার, কাছারীবাড়ী।

[১৩]

প্রশ্ন।

বিশ্বকর্ম্মা মহাশয় সমীপেষু—

অনেকের মুখেই "চকমকি" পাথরের কথা শুনিতে পাই। আপনি দয়া করিয়া উহা কোথায় পাওয়া যায়, এবং কি দরে উহা বিক্রয় হয়, তাহা আপনাদের কাগজে লিখিবেন ; আমিও অনেকদিন হইতে খুঁজিতেছি ; এখনও পাই নাই। দয়া করিয়া জানাইলে বড় বাধিত হই।

শ্রীবিনয়েন্দ্রকিশোর গুপ্ত।

৩২, তালপুকুর রোড, বেলিয়াঘাটা, কলিকাতা।

[১৪]

পিপুলের চাষ।

সবিনয়েষু—

মহাশয়, আমার একটী নিবেদন এই যে, আপনি ভারতবর্ষে আমার নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী তুলিবেন।

১। পিপুলের চাষ কিরূপ জমিতে হয়?

২। কি কি উপায়ে উহার চাষ করিতে হয়?

৩। কোন্ সময়ে উহার চারা রোপণ করিতে হয়, এবং কোন্ সময়ে বাঁকে?

৪। বিঘা-প্রতি কত পিপুল ফলে?

বিনীত শ্রীইন্দ্রগোপাল চ্যাটার্জ্জি।

রেতপাড়া, বনগ্রাম, যশোহর।

ইতিহাসের মাল-মসলা

[রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, বি এ

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমি ইজিপ্টে বসিয়া ভারতবর্ষের একটি ভৌগোলিক বৃত্তান্ত প্রণয়ন করেন। পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ ঐ বিবরণ হইতে একটি মানচিত্র সঙ্কলন করিয়াছেন। এই ভৌগোলিক বিবরণ যে সব বিষয়ে সত্য ও সর্ব্বাঙ্গ-নির্দ্দোষ এ কথা কেহ বলেন না। সেকালের মাপকাটি এখনকার দিনের মত বৈজ্ঞানিক প্রণালী বিশুদ্ধ ছিল না। বিশেষ, টলেমি দূর হইতে এই মানচিত্রের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, এই বিবরণটিকে ভারতীয় প্রাচীন ভৌগোলিক তত্ত্বের একটা আলোক-স্তম্ভ বলা যাইতে পারে।

ইজিপ্টে বসিয়া খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই মানচিত্রের উপাদান টলেমি যে আশ্চর্য্য প্রযত্নের সহিত সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহা রেখায়-রেখায় সত্য না হইলেও, মোটামুটি ভারতবর্ষের স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে অতীব মহার্ঘ; এবং পরবর্তী ভারতের পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ এই মানচিত্র অবলম্বন করিয়া, বহু গবেষণা-মূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

দুঃখের বিষয় এই যে, সাহেবেরা এই মানচিত্র লইয়া যতটা বিতর্ক করিয়াছেন, এদেশের লোকেরা তাহার সিকিও করেন নাই। বিদেশী লেখকেরা ভারতবর্ষের পল্লীর প্রাচীন সমৃদ্ধি সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিবার সুবিধা পান না; তথাপি তাঁহাদের উদ্যম ও প্রযত্নের বিরাম নাই। এবং আমরা তাঁহাদেরই কথা আওড়াইয়া, সময়ে-সময়ে তাঁহাদের লেখার অনুবাদ দিয়া, কৃতবিদ্য ঐতিহাসিকের যশোমাল্য গলায় দোলাইতেছি। এখন আর এ ভণ্ডামি চলিবে না; পরের বাহাদুরী দিয়া নিজেকে বাহাদুর করিবার চেষ্টা এখন উপহাসজনক হইবে; কারণ, আমরা নকলনবিশি না করিয়া, আসল খাঁটি মানুষ হইবার জন্য লালায়িত হইতেছি।

টলেমির মানচিত্রে আমরা কলিকাতার ৮।১০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত "সরসুনো" জায়গার নাম পাই। টলেমি এই স্থানকে "সরসুনো" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ঐ মানচিত্রে বেহালা, বড়ুষে, প্রভৃতি নিকটবর্তী স্থানের উল্লেখ নাই। কেন না ঐ গ্রামগুলি অর্থাৎ বেহালা, বড়ুষে, বাসদেবপুর, সিদ্দিরপুর প্রভৃতি গ্রাম জুড়িয়া, সেই সমস্ত জায়গা জুড়িয়া "সরসুনো" চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সরসুনো গ্রাম যে এক সময়ে অতি সমৃদ্ধ ছিল তাহা গ্রামটি দেখিলেই টের পাওয়া যায়। এখানের প্রাচীন স্থানে যে সকল অট্টালিকা ছিল—তাহা এখন ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হওয়ারই কথা,—প্রায় দুই হাজার বৎসরের কোন চিহ্ন ভূমির উপর থাকার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু গ্রামটি পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে বড় উচু—এবং ইহার ব্যাপক জঙ্গল, দীঘি ও প্রাচীন বড় বড় ভিটিগুলির উপর বহু পুরাতন কালের বিগত-শ্রী যেন একটা স্বপ্নের মহিমা রাখিয়া গিয়াছে।

এ গ্রামে প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্তরায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, ও দীঘি খনন করাইয়াছিলেন কিম্বা সংস্কার করাইয়াছিলেন—কে জানে।

চতুষ্পার্শ্বে এত গ্রাম থাকিতে সরসুনোতে বসন্তরায় গেলেন কেন? বোধ হয় এ গ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির স্মৃতি তখনও উহার উপর দুই একটি অস্থায়ী রশ্মিপাত করিতেছিল। সেই গ্রামের কোন-কোন

বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছি, এই গ্রামের একটা জায়গায় খুব বড় একটা সুড়ঙ্গ গঙ্গা-পর্য্যন্ত ব্যাপক ছিল, সেই সুড়ঙ্গের পথ না কি এখনও দেখা যায়। খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে, এমন কি তাহারও পূর্ব্বে, এইরূপ সুড়ঙ্গ খনিত হইত। মহা চন্দ্রগুপ্ত চন্দ্রকে খুব একটা আঁকালো রকমের সুড়ঙ্গের বিবরণ পাওয়া যায়। এই সরসুনা গ্রামের আশে-পাশে নানারূপ প্রাচীন কালের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বেহালায় যে ধর্ম্ম-পূজা হয়, তাহার ঠাকুর কচ্ছপাকৃতি ধর্ম্ম—প্রস্তরে নির্ম্মিত, তাহা ময়নাগড় প্রভৃতি স্থানের কচ্ছপাকৃতি ধর্ম্মের অনুরূপ, ১০ম কি ১১শ শতাব্দীর নির্ম্মিত। এই মূর্ত্তির সহিত একটি ছোট ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। উহাও প্রস্তর নির্ম্মিত। ইনি বোধিদ্রুমের নিম্নে বজ্রাসনে উপবিষ্ট। তাহার নিকট প্রস্তরের একটি চণ্ডীমূর্ত্তি আছে। ইনি অষ্টভুজা। এই মূর্ত্তি জাভার প্রম্বানান প্রাপ্ত অষ্টভুজামূর্ত্তির অনুরূপ। এগুলি যে বহু প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বেহালা ধর্ম্মতলার ৪০ বিঘা ব্যাপক দীঘি এই ধর্ম্মঠাকুরের অভিষেকের ও পানীয় জল যোগাইত;—দীঘি এখন অনেকটা বুজিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মঠাকুরের এই সম্পত্তি ভাগাভাগি করিয়া শ্রীযুক্ত [illegible]চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং অপরাপর ব্রাহ্মণেরা ভোগ করিতেছেন। বদন লস্কর মহাশয়ের অন্তঃপুরের পুষ্করিণী হইতে যে প্রস্তর-নির্ম্মিত সূর্য্য-দেবতার উদ্ধার হইয়াছিল, তাহা এখন বেহালা বাজারে কালীবাটীতে রক্ষিত আছে; এই মূর্ত্তিও ১০ম কি ১১শ শতাব্দীতে রচিত। বড়িষা হইতে ভগ্নপদ বাসুদেব-মূর্ত্তির উদ্ধার হইয়াছে। রীতিমত অনুসন্ধানের ফলে আরও অনেক পুরাতত্ত্বের আদরণীয় নিদর্শনের উদ্ধার হইতে পারে।

এ সম্বন্ধে আমরা কতকগুলি সামান্য ইঙ্গিত মাত্র দিয়া যাইতেছি। দেশের লোক ইতিহাসের আলোচনা করিতে গিয়া, এই সকল নিকটবর্ত্তী উপকরণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন না।

কালীঘাটের নাম টলেমির মানচিত্রে পাওয়া যায় না;—কিন্তু ঠিক সেই জায়গায় কালীগ্রাম নামক একটা গাঁয়ের নাম আছে।

পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা জেলার সাভার যেখানে সেখানে "সাবারি" গ্রাম আছে। এই সাভার প্রসিদ্ধ রাজা ভীমসেন হইতে আরম্ভ করিয়া হরিশ্চন্দ্র ও মহেন্দ্রের কীর্ত্তি-ভূমি। এই স্থান হইতে বহু প্রাচীন বুদ্ধ-মূর্ত্তি, ভগ্ন বিগ্রহ, গুপ্তদের সময়ের টাকা, প্রাচীন স্তূপ প্রভৃতির উদ্ধার হইয়াছে। টলেমির সাক্ষ্যে প্রতীয়মান হয়, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতেও ইহার অস্তিত্ব ছিল।

বৌদ্ধযুগে "বানিয়া"রা প্রবল ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন "বানিয়াজুড়ি" নামক একটি গ্রাম আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, টলেমির ম্যাপে এই "বানিয়াজুড়ি" পরিদৃষ্ট হয়। ইনি এই গ্রামের নাম দিয়াছেন "বানিয়াজুড়ম"। বলা বাহুল্য, "বানিয়াজুড়ি" এখন যে জায়গায়, "বানিয়াজুড়ম"ও ঠিক সেই স্থানেই। যে সকল গ্রামে বড়-বড় অট্টালিকা ছিল, টলেমি তাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই "বানিয়াজুড়ম" গ্রামে অনেক অট্টালিকা টলেমির ম্যাপে নির্দ্দিষ্ট আছে। আমরা অনুসন্ধানে জানিলাম, "বানিয়াজুড়ি" গ্রামে একটা অতি প্রাচীন মনুমেণ্ট আছে। তাহা কত প্রাচীন, কেহ বলিতে পারেন না। তাহার গাত্রে কোনরূপ শিলালিপি আছে কি না, এবং ঐ গ্রামে অন্য কোন প্রাচীন নিদর্শন আছে কিনা, তাহার খোঁজ আমি লইতে পারি নাই। কিন্তু টলেমি যে স্থান বিবিধ অট্টালিকা-মণ্ডিত বলিয়া দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বাড়ীর পাশে রাখিয়া আমরা এমন চুপ করিয়া বসিয়া আছি—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে।

মাণিকগঞ্জের নিকটে "দাশড়া" গ্রামও টলেমির মানচিত্রে পাওয়া যাইতেছে। এই গ্রাম যে অতি প্রাচীন, তাহা প্রাচীন কুলপঞ্জীগুলিতে দৃষ্ট হয়। কবি কণ্ঠহার (১৬৭৩ খৃঃ) এই গ্রামের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদ্যজাতির ২৭ সমাজের এক সমাজ ছিল দাশড়া। টলেমি এই গ্রামে অট্টালিকামালা সমৃদ্ধ করিয়া আঁকিয়াছেন। এই গ্রামের নিকট হইতে একটা বৃহৎ খাল ধলেশ্বরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। এই খাল কাটাইল কে? দাশড়ার নিকটে শিবালয় গ্রামে ভূমিতে যে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড 'শিব' নামে পূজা পাইতেছেন, তাহা অতি প্রাচীন। ইহা লিঙ্গ নহে,—শিবমূর্ত্তি নহে,—থামের বুকের ন্যায় অমসৃণ একটি দীর্ঘাকৃতি শিলা। এইরূপ শিলা চন্দ্রনাথে আছে। ইহা বহু প্রাচীন পূজার নিদর্শন।

আজ এই পর্য্যন্ত। এই যে আমাদের "শস্য-শ্যামলা" বঙ্গভূমি লইয়া আমরা অবিরত গান বাঁধিতেছি, এবং স্বদেশ-প্রেম দেখাইবার জন্য কবিতা রচনা করিয়া মাসিক পত্রিকাগুলি প্লাবিত করিয়া দিতেছি—সে স্বদেশ-প্রেমকে গৌরবের সহিত প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, আমাদের সমস্ত প্রাচীন ইতিহাস পরের হাতে ছাড়িয়া দিয়া ভিখারীর ন্যায় তাহাদের নিকট হাত পাতিয়া প্রসাদ পাওয়ার বিড়ম্বনা হইতে আত্মরক্ষা করা সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। (ইতিহাস ও আলোচনা)

জাপানের শিক্ষাচর্চ্চা

[শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী]

জাপানীদের মত বুদ্ধিমান্, চতুর জাতি জগতে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কিঞ্চিৎ অধিক অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই ইহারা পাশ্চাত্য জাতির সমস্ত জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া যে ভাবে কাজে লাগাইয়াছে, তাহাতে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত উন্নতি বোধ হয় জগতের আর কোন জাতি করিতে পারে নাই।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যাহারা একরূপ অসভ্য ছিল, তাহারা শিক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা করিয়া—কিরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া—জগতের সুসভ্য জাতিদের সঙ্গে সমান আসনে বসিল, তাহা জানিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল হয়। তাহাদের রাজ্য চালাইবার সুব্যবস্থা, তাহাদের বিরাট নৌবাহিনী, স্থলসেনা-তন্ত্র, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, বিশাল কর্ম্মশালা,

নব্যতন্ত্রের শিক্ষালয়—সর্ববিষয়ে উন্নতির এই যে নিদর্শন, ইহা কিরূপে প্রকটিত হইল, তাহা অনুসন্ধানের বিষয় সন্দেহ নাই।

ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, এই উন্নতির মূলে, জাপানীদের মস্তিষ্ক-শক্তি—জ্ঞানলাভের পিপাসা, উচ্চাকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনা, কার্য্যে অপরিসীম উৎসাহ। তাহাদের মস্তিষ্ক যেমন অপরের জিনিস গ্রহণ করিতে তৎপর, তেমনি নূতন-নূতন বিষয়ের উদ্ভাবনেও দক্ষ। জাপানীরা শুধু জ্ঞান গ্রহণ করিয়াই তৃপ্ত নয়, কার্য্যে তাহা খাটাইয়া নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিতেও উন্মুখ।

জাপানী যুবকেরা নানা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য স্বদেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। সব রকম শিক্ষার ব্যবস্থাই সেখানে আছে। সুতরাং শিক্ষালাভের পর তাহারা রাজনীতিজ্ঞ, আইনজ্ঞ, লেখক, সম্পাদক, ডাক্তার, ভাস্কর, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি কার্য্যের উপযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এই যে বিশ্ব-বিদ্যালয়,—যেখানে তাহারা জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতেছে তাহা তাহাদের ঠিক স্বদেশীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় নহে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণেই তাহাদের এই অপূর্ব্ব জ্ঞান ও কর্ম্মের মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছে। আধুনিক এই সুসভ্য জাপানের অবস্থা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও পঞ্চদশ শতাব্দীর লোকের মতই ছিল।

আমাদের দেশের এবং অন্যান্য অধিকাংশ দেশের বিদ্যালয়েই বাপ পিতামহ যাহা শিখিয়া গিয়াছেন, সন্তানেরাও তাহাই শিখিয়া থাকে। শিক্ষার বিষয় একই, শুধু বইগুলির নাম ও প্রকাশকের নামের রূপান্তর মাত্র পাঠ্য পুঁথিগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক জাপানী বিদ্যালয়গুলিতে জাপানী ছেলেরা এমন সব জিনিস শিখিতে পায়, যাহা কোন দিন, শিখিতে হইবে, এমন কথা তাহাদের বংশের কেহ কখনও হয় তো স্বপ্নেও ভাবে নাই।

পাশ্চাত্যদেশ হইতে শিখিয়া আসিয়া অনেকে জাপানে আধুনিক সাজসরঞ্জাম লইয়া বড় বড় কারখানা খুলিয়া বসিয়াছেন। এ সব জিনিসের সঙ্গে তাহাদের পূর্ব্বে পরিচয় ছিল না। তাই মজুর, মিস্ত্রীর কাজ হইতে সুরু করিয়া সমস্ত কাজই তাহাকে হাতে-কলমে করিয়া লোকজনদের শিখাইয়া লইতে হয়—সমস্ত ব্যাপারই নিজেদের চালাইতে হয়। জাপানের আইনজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ সকলের উপরেই নিজের দেশের লোককে সেই কার্য্যের উপযোগী করিয়া তৈরী করিয়া লইবার ভার রহিয়াছে।

জ্ঞান-অর্জ্জন ও তাহার নিয়োগ করিবার জন্য জাপানের যেন আহার নিদ্রা নাই, এমনি একটা উদ্দীপনার ভাব। উৎসাহের অপব্যবহারও কিছু-কিছু হইতেছে। জাপান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লেখক ষ্টাফোর্ড র‍্যানসম্ বলেন যে, তাঁহার এক জাপানী বন্ধু ইংরেজী শিখিবেন বলিয়া ডাক্তার জনসনের সমগ্র ডিক্সনারিখানি লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। ডিক্সনারি নকল করিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ইঁহার সবে মাত্র ইংরেজী বর্ণমালার সহিত পরিচয় হইতেছিল। অর্থজ্ঞান তখনও আরম্ভ হয় নাই। (শিক্ষক)

কৃষির উন্নতি ও পল্লীস্বাস্থ্য

[শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত

"কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ!"

সকলেই স্বীকার করিবেন, প্রকৃতির উন্মুক্ত জীবন সহরের বন্দিম ও বদ্ধ জীবন অপেক্ষা স্বাস্থ্যের অধিক অনুকূল। বাংলা দেশের পল্লী-স্বাস্থ্যের বর্তমান অবনতির সহিত কৃষির অবনতির একটা নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। অনেক পল্লীগ্রাম ক্রমে ক্রমে [illegible] লোকের দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়াতে উহা ক্রমে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে।

স্বাস্থ্যের অবনতির কারণ

নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণেই প্রধানতঃ পল্লীস্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিতেছে বলিয়া মনে হয়।

(১) গ্রামে জঙ্গল বন ইত্যাদির বৃদ্ধি; ইহাতে জমি সর্ব্বদা সেঁতসেঁতে থাকে; মশা, মাছি, ও অন্যান্য পোকার উৎপাত বৃদ্ধি পায়।

(২) পুকুর, খাল, বিল ইত্যাদিতে পানা, কচুরী, দাম ইত্যাদির বৃদ্ধি;—এগুলির উৎপাতে গ্রামে এখন ভাল পানীয় জল পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে, মাছের উপযুক্ত বৃদ্ধি হইতে পারিতেছে না—নানাপ্রকার পীড়া বৃদ্ধির ত কথাই নাই।

(৩) জল নিকাশের অভাব।—খাল, নালাগুলি পানা, কচুরী, প্রভৃতিতে মজিয়া যাওয়ায়, জলনিকাশের বিশেষ বাধা হইতেছে; তদুপরি সকল প্রকার জলপ্রণালীগুলি ক্রমেই অবহেলায় ক্রমশঃ ভরিয়া আসিতেছে। লোকেল বোর্ড ও রেল রাস্তায়, উপযুক্ত সংখ্যক পোল নাই।

(৪) উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব।—সকল প্রকার খাদ্য-দ্রব্য এখন সহর অপেক্ষা গ্রামেই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। দুধ, মাছ ত মেলাই যায় না; তরিতরকারি ও ফল প্রভৃতিও ক্রমে দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে।

প্রতিকার

(১) গ্রামের বন জঙ্গল কাটিয়া জ্বালাইয়া দিতে হইবে; এবং এই পরিষ্কৃত ভূমিতে শাক, আলু, চিনা বাদাম, কার্পাস, আদা, হলুদ প্রভৃতির আবাদ করিতে হইবে। গাছ এইরূপ ফাঁক ফাঁক করিয়া লাগাইতে হইবে, যেন উহাতে রৌদ্র ও বায়ু চলাচলের ব্যাঘাত না ঘটে। এইরূপ করিলে গ্রাম হইতে মশা, মাছি, সাপের বাসা দূর হইবে এবং অর্থাগমেরও উপায় হইবে।

(২) পুকুর, খাড় ও বিল হইতে পানা, কচুরী, শেওলা তুলিয়া ফেলিতে হইবে। উহা পুড়াইয়া ছাই করিয়া আলু, কপি ও কচু ক্ষেতে দিবে; অথবা কাঁচা অবস্থাতেই জমিতে ছড়াইয়া চষিয়া দিলে উৎকৃষ্ট সার (green manure) হইবে। মজা পুকুরগুলি পরিষ্কার করিবার পর

সেচিয়া ফেলিবে, এবং শোল, বোয়াল প্রভৃতি হিংস্র মাছগুলিকে বিনাশ করিয়া, নূতন বর্ষায় রোহিত, কাতলা প্রভৃতি ভাল-ভাল মাছের বাচ্চা বা ডিম ছাড়িবে। ইহাতে যে কেবল মাছের সংস্থান হইবে তাহা নহে; দেখা গিয়াছে, শতকরা ১০০ টাকা ও অধিক লাভ থাকে।

(৩) গ্রামের ও বাটীর চারিদিকের নালা নর্দ্দামাগুলি পরিষ্কার করাইয়া জল-নিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে; ইহা হয় গ্রাম্য ইউনিয়ন কমিটী দ্বারা নতুবা সমবায় প্রণালীতেও করা যাইতে পারে। গ্রামের বদ্ধ বিলগুলিকে পার্শ্বস্থ খালের সহিত সংযুক্ত করিয়া জল নিঃসারিত করিবে; অথবা সেগুলি পরিষ্কার করাইয়া মাছ পালিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিলগুলি পরিষ্কার থাকিলে উহাতে মশার বাচ্ছা হইতে পারিবে না; কিন্তু মাছ খুব বাড়িবে। তাদের আবাদেও প্রচুর লাভ।

(৪) মাছ, দুধ তরকারী প্রভৃতি খাদ্যের অভাবেও পল্লীবাসিগণের স্বাস্থ্যের কম অবনতি ঘটিতেছে না। উপযুক্ত রূপে কৃষির উন্নতি করিলে পল্লীগ্রামে খাদ্যের অভাব হইবে না। পশুর উন্নতিও সঙ্গে-সঙ্গে হইবে। আজকাল উপযুক্ত গোচারণ-ভূমির অভাব; সুতরাং অল্প স্থান হইতেই কলাই, বরবটী, ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি পশু-খাদ্যের আবাদ করিতে হইবে। উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে বাঙ্গালী আজ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে—পীড়ার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার মত শরীর তাহার নাই। শারীরিক অবনতির সঙ্গে-সঙ্গে বল, বুদ্ধি, ভরসা, প্রতিভা সকলেরই লোপ পাইতে বসিয়াছে।

শিক্ষিতের পল্লী প্রত্যাবর্ত্তন

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এ কাজ কে করিবে? পরিত্যক্ত পল্লীর স্বাস্থ্য ও কৃষির উন্নতি কি অশিক্ষিত, নিরক্ষর কৃষকের দ্বারা সম্ভব? কখনই নহে। এ কাজ শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই হাতে লইতে হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কিয়দংশকে সহরের অস্বাস্থ্যকর কৃত্রিম জীবন পরিত্যাগ করিয়া পল্লীজীবনের উন্নতির জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিতে হইবে। যে সব ভদ্র জমিদার ও তালুকদার গ্রামের পৈত্রিক ভদ্রাসন পরিত্যাগ করিয়া সহরবাসী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও পল্লী-আবাসে ফিরিয়া আসিতে হইবে। বর্ত্তমান কঠোর জীবন-সংগ্রামের দিনে, শিক্ষিত যুবকগণ সহরের নিষ্ফল প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে নিজেদের শরীর ও আয়ু ক্ষয় না করিয়া, পল্লী-আবাসে ফিরিয়া আসুন। সেখানে কৃষি ও গৃহশিল্পের (cottage industry) ব্যবস্থা করিয়া নিজের মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের যোগাড় করুন; এবং সঙ্গে সঙ্গে পল্লীস্বাস্থ্য ও পল্লী-জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন করুন। আবার "বাংলার মাটী, বাংলার জল, বাংলার বায়ু ও বাংলার ফল" পুণ্য ও পূর্ণ হইয়া উঠুক।

(স্বাস্থ্য-সমাচার)

ভারতে বিস্‌মের তুলাদণ্ডের প্রাচীনত্ব

[অধ্যাপক শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্-এ]

অবস্থা ও প্রয়োজন-ভেদে তুলাদণ্ডের গঠন নানা প্রকারের হইতে পারে। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতীয় পেটেণ্ট বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ গ্রেভস্ নানা-প্রকার তুলাদণ্ডের বিভিন্নতা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। (১) যত প্রকার তুলাদণ্ড আছে, তাহাদের মধ্যে একটিতে উক্ত যন্ত্রের আলম্বস্থান পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই প্রকার তুলাদণ্ডকে পাশ্চাত্য ভাষাতে Bisnur আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, এই প্রকার তুলাদণ্ড মানুষের সভ্যতার অতি নিম্ন অবস্থা-সূচক।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়েও এইপ্রকার তুলাদণ্ডের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ কালীকৃষ্ণ ঠাকুর বাহাদুর এইপ্রকার তুলাদণ্ডের বিবরণ প্রকাশ করেন। (২) গত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ডাঃ এনাণ্ডেল লিখিয়াছিলেন যে, এই বিস্‌মের জাতীয় তুলাদণ্ড মাদুরা জেলা, ঢাকা জেলা ও পঞ্জাবে ব্যবহৃত হয়। (৩)

অতঃপর ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ডাঃ চৌধুরী কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে, গাঞ্জাম জেলা, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার নানাস্থানে এই প্রকার তুলাদণ্ডের প্রয়োগ আছে। (৪) ডাঃ এনাণ্ডেল লিখিত বর্ণনা হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, দক্ষিণ শানদেশস্থ ইয়ানঘুই রাজ্যে (৫) ও দার্জ্জিলিং জেলাতে (৬) এই প্রকার তুলা-দণ্ড ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালাদেশ ও ছোটনাগপুরে এই যন্ত্রকে তুলা বলা হইয়া থাকে। এই শব্দ 'তুলাদণ্ড' শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। (৭) দার্জ্জিলিঙ্গে ইহার নাম 'ডাণ্ডি শীর'। এই যন্ত্রের দণ্ড এক অংশে বলিয়া সম্ভবতঃ এই নামকরণ হইয়াছে। দক্ষিণ শান-প্রদেশস্থ তুলাদণ্ডের স্থানীয় নাম পাইকথাগাঙো অর্থাৎ 'ভিসদণ্ড'। (৮) উড়িষ্যাতে এই যন্ত্রকে বিশ বা বিশাকাঠি বা বিশা ডাঙ্গা বলা হইয়া থাকে। গাঞ্জাম জেলাতে এই যন্ত্রের আখ্যা 'কিলা-ডাঙ্গা'।

১। Mem. Asiat. Soc. Beng. Vol.—V. pp. 201—205, 1917.

২। Journ. Asiat. Soc. Beng. Vol—II. p. 615.

৩। Mem. Asiat. Soc. Beng. Vol.—I pp. iv—v. 1907.

৪। Journ. Asiat. Soc. Beng. N. S. Vol. XI pp. 0-16. 1915.

৫। Mem. Asiat. Soc. Beng vol V. pp 198-199, 1917

৬। Journ. Asiat. Soc. Beng. N. S. Vol. XIV pp. 243-244, 1918.

৭। ডাঃ চৌধুরী মনে করেন যে তুলা শব্দ তুল (Scale, beam or measure) হইতে উৎপন্ন। পৃঃ (উঃ প্রঃ ১৩)।

৮। ভস্ ব্রহ্মদেশের ওজন ও ৩.০৬৫ পাউণ্ডের সমান।

এই সমস্ত নামের মধ্যে 'ডাণ্ডি পীর' নামই আমার নিকট সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয় এবং এই প্রবন্ধে পাশ্চাত্য দেশ-প্রচলিত Bismer নামক তুলাদণ্ড ডাণ্ডি-পীর নামে অভিহিত হইবে। আলম্বের প্রকার-ভেদে আমাদের দেশে দুই প্রকার ডাণ্ডি-পীরের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশে প্রচলিত যন্ত্রে আলম্ব-নির্দ্দেশের জন্য দণ্ডে কতিপয় ছিদ্র ও ছিদ্রগুলির ভিতরে সুতা দেওয়া থাকে; কিন্তু অন্যান্য স্থানে প্রচলিত যন্ত্রে তাহা থাকে না। এই সমস্ত যন্ত্রে আলম্ব নির্দ্দেশের জন্য কেবলমাত্র সুতার একটি ফাঁস থাকে; এবং উহাকেই ইচ্ছামত দণ্ডের উপর দিয়া সরাইতে পারা যায়। ডাণ্ডি-পীরের ব্যবহার ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে; ও সাধারণ কার্য্যের জন্য দুই শিকা-বিশিষ্ট তুলাদণ্ড ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু কত প্রাচীন কালে যে প্রথমোক্ত তুলাদণ্ড দ্বারা মাপ কার্য্য সম্পন্ন হইত, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আলোচিত হইল।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী)

জেলখানা

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ সান্যাল]

সেদিন কয়েকজন বন্ধুকে কথায় কথায় বলেছিলুম "জেলখানা রাখবার কোনই দরকার নাই"—তারা হেসে উঠল; বললে "তাহলে বদমাইসদের জ্বালায় বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠবে, সমাজ ভেঙ্গে যাবে।" ভিতর থেকে কোন সাড়াই পেলুম না। সেই থেকে মাঝে-মাঝেই মনে হয়, "জেলখানা তুলে দেওয়া যায় না কি?"

আমাদের দেশের, শুধু আমাদের কেন সকল দেশেরই, জেলখানা মানুষের ভিতরে দেবতার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে একটা তীব্র প্রতিবাদ। যাঁরা জেলখানার সৃজনকর্ত্তা, তাঁরা এইখানেই মানুষকে ছোট করে দেখে মস্ত ভুল করেছিলেন,—স্বার্থান্ধ হৃদয় ক্ষতির ভয়ে শিউরে উঠেছিল; মানুষকে বড় করে ভগবানের অংশ বলে দেখবার ক্ষমতা তাঁদের হোল না।

মানুষের দুটো দিক—পশু ও দেবতার। একদিকে ক্ষুদ্রতা; আর একদিকে তার হৃদয়ের বিশাল বিস্তার,—নিজেকে অন্যের ভিতরে উপলব্ধি করবার তীব্র পবিত্র সাধনা। মনুষ্যত্বকে বিকশিত করে তোলবার ক্ষমতা প্রত্যেক মানুষেরই আছে—তবে সেটা কোথাও সুপ্ত, কোথাও বা জাগ্রত। এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে—অধিকাংশ মানুষই সুপ্ত। এই সুপ্ত শক্তি আমাদের কাছে অপ্রকাশিত; তাই আমরা রিপুর ক্ষণিক চঞ্চলতাকেই বড় বলে ধরে নিই। কিন্তু মানুষকে একদিন জাগতেই হবে,—তাকে বুঝতেই হবে যে, সে অমৃতের পুত্র; অনুভব করতেই হবে তাকে যে, ভগবানের লীলা তার ভিতর দিয়ে প্রতিদিনই নূতন-নূতন ভাবে সুন্দর হয়ে উঠছে। তা না হলে, সৃষ্টির উৎস-মুখ শুকিয়ে উঠত; ভগবানও কাঙ্গাল হয়ে যেতেন। শুধু একটুখানি সুযোগ ও অবসরের অভাব।

মানুষ তখনই রিপুর পায়ে সমস্ত বিলিয়ে দাসখৎ লিখে দেয়, যখন তার হৃদয়ের মণিকোঠার সিংহদ্বারে চাবি পড়ে যায়। রাজা থেকে একেবারে ভিখারী। প্রথম দিনের দীপশিখা উজ্জ্বলতা তেলের অভাবে মলিন হয়ে যায়,—জমাট আঁধার নেমে আসে। মানুষের অনুচিত কোন কাজই তখন তাকে সঙ্কুচিত করে তোলে না, নির্লজ্জতা তার অঙ্গের ভূষণে পরিণত হয়। তবে এ কথাও অস্বীকার করবার উপায় নাই যে, ক্ষণেকের তরে সেই স্তিমিত দীপের ম্লান আলো অসত্যের কালো আঁধারের বুকে বিদ্যুৎ শিখার মতই মাঝে মাঝে খেলে যায়। দেবতাকে অপমান করবার ব্যথা তার জেগে উঠে; কিন্তু সুযোগ ও সহানুভূতির অভাবে তা আবার পূর্ব্বের মতই অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায়। দেবতার ভাব যদি মানুষের ভিতর না থাকত, তা হলে অনুশোচনার এই দহন-জ্বালা তার প্রাণে আসে কোথা থেকে? পৃথিবীতে অনেক ঘৃণ্য পতিত তথাকথিত বদমায়েসদের জীবনে এমন একটা পরিবর্ত্তন এসেছে, যা সকলেরই লক্ষ্য করবার মত। যাঁরা মানুষের প্রাণের দেবতাকে অস্বীকার করেন, তাঁদের আমি জিজ্ঞাসা করি যে, এই কল্পনাতীত ব্যাপার কেমন করে সম্ভবপর হয়, কোন্ পরশ-মাণিক্যের স্পর্শে তাহাদের সমস্ত কালো কলঙ্ক সোনা হয়ে ওঠে?

জ্ঞানের আলোকে যখন আঁধার কেটে যায়, চেতনার মোহন পরশে তার মণিকোঠার রুদ্ধ দুয়ার খুলে যায়, তখন সে আশ্চর্য্য হয়ে যায় তার হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যের বিস্তার দেখে। মর্ম্মে-মর্ম্মে সে উপলব্ধি করতে শেখে,—কি তার কাজ, কি তার জীবনের আদর্শ। তাই ফ্রান্সের কবিসম্রাট ভিক্টর হিউগো বলেছিলেন "He who opens a school closes a prison"—(যিনি একটা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তিনি জেলখানার দরজা বন্ধ করেন)। জেলে দেবার কর্ত্তা যাঁরা, তাঁদের কি সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য নয় মানুষকে মানুষের মত গড়ে তোলা? ক্ষয় রোগ যাকে মরণের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তাকে কি বাহ্যিক প্রলেপ দিয়ে বাঁচিয়ে তোলা যায়? ভ্রান্ত মানবের অপরাধের শাস্তির ব্যবস্থা যাঁরা করেছেন, তাঁরা কি তাঁদের কর্ত্তব্যও সুচারু রূপে সম্পন্ন করতে পেরেছেন? এই কর্ত্তব্য অবহেলার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি তাঁদের করতে হবে না?

আমাদের দেশে একটা লোক অপরাধ করলে তাকে বিচারালয়ের দণ্ডে জেলে পাঠান হল। তার জেলের সেই ছকবাঁধা জীবন—সে যে কি, তা বোধ হয় সকলেই জানেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পশুর মত খাটুনি—নীরস, কঠোর, একঘেয়ে জীবন—শুধু যে তার জীবনের আনন্দকে নষ্ট করে দেয় তা নয়,—তার ভিতরের উচ্চবৃত্তিকে চিরদিনের মত নষ্ট করে দেয়; তাকে পশু করে তোলে। সেখানে তার জীবনকে নানা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে সরস করে তোলবার ব্যবস্থা, কিম্বা তার সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলবার কোনও আয়োজন নাই। জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসেও তার নিস্তার নাই—তার

আপন জন তাকে ঘৃণায় দূরে সরিয়ে দেয়,—সমাজ তাকে আর পূর্ব্বের মত আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরে না। তার উপর পুলিসের সন্দেহ-দৃষ্টি তার নূতন করে সংসার বেঁধে স্ত্রীপুত্র নিয়ে সুখে-শান্তিতে, নিশ্চিন্তে বাস করবার আশাকে চিরদিনের মত বিলুপ্ত করে দেয়। জেলখানার চিহ্ন তাকে এমনি ভাবেই ঘরে-বাইরে প্রতিদিনই অপমানিত করে। সুযোগ ও সহানুভূতির অভাবে তাকে কলঙ্ক পথের পথিকই হতে হয়। এর জন্য দায়ী কে?

আমাদের দেশে আজ পর্য্যন্ত যত চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধ হয়েছে, তার প্রধান কারণ খাদ্যের অভাব। যে দেশের অধিকাংশ লোক খাওয়া কাকে বলে জানে না, অর্দ্ধাশনে-অনশনে যাদের বৎসরের অধিকাংশ দিনই কেটে যায়, স্ত্রী-পুত্রের অনাহারক্লিষ্ট কাতর আর্ত্তনাদ সকল সময়েই যাদের শুনতে হয়,—তাদের পক্ষে পেটের বিনিময়ে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দেওয়া খুব আশ্চর্য্য নয়। এই সব দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত লোকদের অপরাধের জন্য শাস্তি দেবার পূর্ব্বে তাদের অভাব মোচন করবার চেষ্টা করাটাই কি সব চেয়ে বড় কাজ নয়? সকল বাধা দূর করে দিয়ে, মনুষ্যত্বের বিকাশের পথকে সহজ করে তোলাই কি প্রকৃত ধর্ম্ম নয়?

তাই আমার মনে হয় জেলখানা তুলে দেওয়া একটা খুব কঠিন কাজ নয়। দরকার শুধু মানুষকে ভগবানের অংশ বলে সম্মান করা ও তার সম্মুখে অবাধ উন্নতির পথ মুক্ত করে দেওয়া। জ্ঞানের আলো প্রতি ঘরে-ঘরে জ্বেলে দিতে হবে; তা'হ'লে আর কোন ভাবনা থাকবে না। এটা কি এতই কঠিন?

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা)

শ্রাবণ-জ্যোৎস্না

[শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত]

শ্রাবণ রাতে পাগ্‌লা আকাশ
কখন কাঁদে কখন হাসে,
কখন তার অঙ্গ ঢাকা
কখন আসে ছিন্ন বাসে।
খাম্‌খেয়ালী মেঘের দলে
দাঁড়ায় কভু কখন ছুটে,
ক্ষীণ চাঁদে ফাঁকে ফাঁকে
পিছন হ'তে উজলে উঠে!
চাঁদনী আজ অঙ্গ জুড়ে'
মেঘের বসন জড়িয়ে রাখে,
উজল চাঁদ দেহের আভা
ধরার বুকে দাঁড়িয়ে থাকে।
ঝক্‌ঝকানি আঁধার জলে
গাছে পাতায় জল রয়েছে,
লুপ্ত চাঁদের ঝল্‌সা আলো
তাহার পরে চিক্ দিয়েছে।
খড়ের চালে জলের লেপন
তার উপরে আলোর ধোঁয়া,
সিক্ত ধরার মুখখানিতে
ধূসর চুমা রহস্য ছোঁয়া।
ঐ সুদূরে মাঠের পানে
মেঘ কেটেছে একেবারে,—
মুক্ত আলো স্রোতের মত
গড়িয়ে পড়ে দীপ্ত ধারে।
এখানে বা একটু ফাঁকা
একটু হাসি, আবার ঢাকা,
মস্ত কালো মেঘ এল ঐ
বিকট যেন দৈত্য আঁকা!
কোথাও আলো দাঁড়িয়ে যেন
ভোরের বেলা কুয়াস শাদা,
পাংলা মেঘে কোথাও পুন
ফুটতে তারি অঙ্গ বাধা।
বিপুল মেঘের আশে পাশে
আঁকা-বাঁকা চাঁদের রেখা,
কোন্ কুশলী আঁকুছে বসে
কালোর গায়ে শাদার লেখা!

দীনবন্ধু মহামতি শ্রীযুক্ত এনড্রুজ

নিখিল-প্রবাহ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]
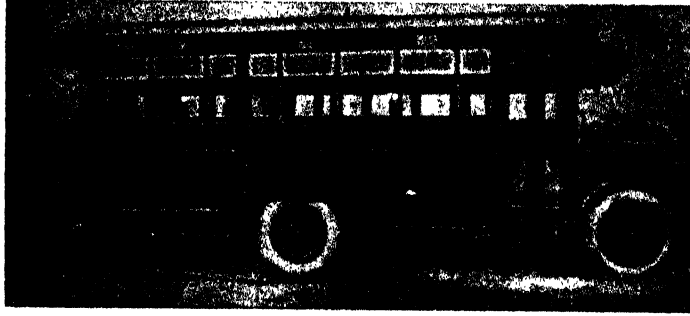
সচল গৃহের বহির্ভাগ
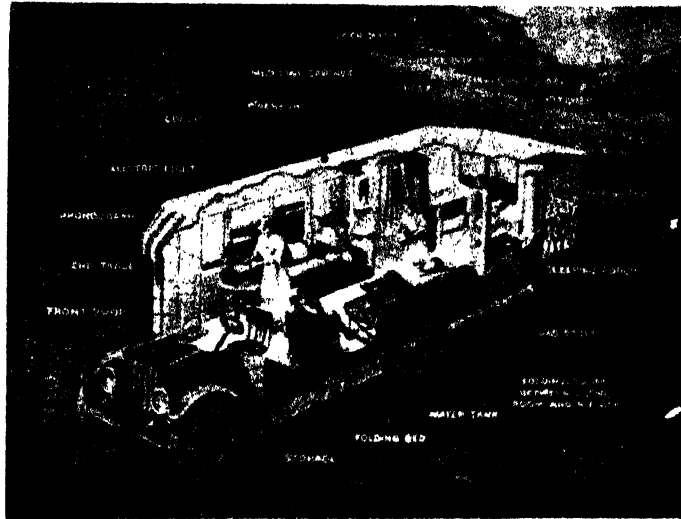
সচল গৃহের অভ্যন্তর

১। সচল গৃহ।

সচল গৃহ শুনিয়া কেহ যেন মনে করিবেন না, যে, ইট-চুণ-সুরকীর তৈয়ারি কোনও একখানি বাড়ী ভৌতিক উপায়ে চলিয়া বেড়াইতেছে! এ সচল গৃহখানি আমেরিকার পূর্ব্বাঞ্চলের এক অবসরপ্রাপ্ত কৃষি-ব্যবসায়ীর সম্পত্তি। প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া, তিনি একখানি প্রকাণ্ড মোটর গাড়ীর মধ্যে এই সচল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গাড়ীখানি অর্থাৎ তাঁহার এই বাড়ীখানি তিরিশ ফিট লম্বা। পিছন দিকে একটি খোলা বারান্দা আছে। ভিতরটি সমস্তই বসবাসের উপযোগী করিয়া তৈয়ারি হইয়াছে। চালকের বসিবার জন্য পৃথক কোনও স্থান না রাখিয়া, ঘরের ভিতরেই একখানি ঘূর্ণী চেয়ারে (Revolving chair) তাহার আড্ডা হইয়াছে। গাড়ী যখন চালাইবার প্রয়োজন থাকে না, তখন সে ঘরে বসিয়া গৃহস্থদের সহিত গল্প করিতে পারে। এই কায়দাটুকু করাতে ভিতরের ঘরখানি আট ফিট চওড়া এবং বিশ ফিট লম্বা জায়গা পাইয়াছে। ঘরের ভিতর একপার্শ্বে ছোট একটি রন্ধনশালা আছে। শুইবার জন্য যোড়া খাট,

সস্তার সচল বাস

[একখানি বড় মোটর-গাড়ীকে পাঁচ ভাগ করিয়া শোবার ঘর, খাবার ঘর, বৈঠকখানা, পায়খানা ও রান্নাঘর করা হইয়াছে। সমস্ত গাড়ীখানির উপর একখানি বিপুল ছাদ দিয়া ঢাকা দেওয়া হইয়াছে। একসঙ্গে দশজন লোক থাকে, অর্থাৎ একটি পরিবার ইহাতে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে পারে।]

ড্রেসিংটেবল, কৌচ, [illegible], ডিনার টেবিল, ছোট ছোট চেয়ার ইত্যাদি সবকিছুর প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সমস্ত সাজানো আছে। [illegible] ঢাকার চেয়েও উঁচু [illegible] করা হইয়াছে, কারণ, ভিতর ভিতর আবার [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] বসিবার জন্য [illegible] করা আছে। পিছনে বারান্দার দিকে স্নানের ঘর, পায়খানা প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। রন্ধনশালায় গ্যাসের ষ্টোভ, কুকার, গরম জলের ট্যাঙ্ক, বরফদান প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। গাড়ীর তলায় রন্ধন করিবার ও তাপ লইবার জন্য গ্যাস-ভরা একটি বড় চোঙা আঁটা আছে। স্নানের ঘরে ঠাণ্ডা জল, গরম জলের কল, ধারাস্নানের ব্যবস্থা এবং হাত মুখ ধুইবার জন্য কাচের গামলা আঁটা আছে। সঙ্গে সঙ্গে বাইশটি বাতি জ্বালিবার মত একটি ছোট তাড়িৎোৎপাদক ইঞ্জিন সংযুক্ত আছে। এই গাড়ী বা সচল বাড়ীখানিতে গাড়ীওয়ালা সপরিবারে আর তাঁর দু'জন অতিথি ভূপর্যটনে বাহির হইয়াছেন। এই ভ্রমণ শেষ হইতে তাঁহাদের প্রায় দুই বৎসর লাগিবে। ইহাদের দেখিয়া আরও অনেকে এই সচল-গৃহ-বাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবে ইহাদের মত এত খরচপত্র করিয়া বিলাস ও আরামের ব্যবস্থা না করিয়া, কোনও রকমে একটু মাথা গুঁজিয়া থাকিবার উপায় করিয়া লইয়াছেন; কারণ, সে দেশে জমি কিনিয়া বাড়ী করা মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে ক্রমেই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে।

(Popular Mechanics)

সচলাবাসে রাত্রিবাস

[একখানি সাধারণ মোটরগাড়ীতেই একটি পরিবার বাস করিতেছে। এই সস্তার সচলাবাস রাত্রে এক স্থানে দাঁড় করাইয়া গাড়ী হইতে সংলগ্ন তাঁবু বিছাইয়া উহার মধ্যে মোড়া খাট পাতিয়া শয়ন করিতে হয়। রন্ধন ও আহারাদিও গাড়ী দাঁড় করাইয়া বাহিরে নামিয়া সারিতে হয়।]

গাড়ী ও বাড়ী (রাত্রে) গাড়ী ও বাড়ী
[তিন ধারের অতিরিক্ত আসনের উপর পর্দ্দা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে।]

প্রায় আঠারো প্রকার বিভিন্ন বর্ণের রেশম সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার বাগানের গুটীপোকাগুলি কেবল যে রঙীন্ রেশম দিয়াই আজ জগৎকে বিস্মিত করিয়াছে তাহা নহে—রেশম উৎপাদনের পরিমাণ হিসাবেও উহারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে পরাস্ত করিয়াছে। এক-একটী গুটীপোকা উর্দ্ধ-সংখ্যা হাজার হইতে বার শত গজ পর্য্যন্ত রেশম উৎপাদন করিতে পারে; কিন্তু ডাক্তার ওসিজিয়ানের বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিপুষ্ট গুটীপোকারা এক-একটি আঠারো শত গজ পর্য্যন্ত রেশম উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ডাক্তার ওসিজিয়ান আর্মেনিয়ার হাপুট সহরের এক রেশম-ব্যবসায়ীর পুত্র। নিউ অর্লিন্সে ইহার প্রকাণ্ড রেশমের কারখানা আছে। কি-কি খাওয়াইলে গুটীপোকারা রঙীন্ রেশম উৎপাদন করিতে পারে, ব্যবসার খাতিরে ডাক্তার ওসিজিয়ান সে সংবাদ গোপন রাখিয়াছেন। আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের বাণিজ্য-বিভাগের কমিশনার স্বয়ং তাঁহার বাগান পরিদর্শনে গিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন যে, বাস্তবিকই তাঁহার চাষের পোকাগুলি আপনারাই নানা রঙীন্ রেশম উৎপাদন করিতেছে। তুষার-শুভ্র হইতে ঘন কৃষ্ণবর্ণ

ডাঃ ভাশিয়ান কে, ওসিজিয়ান

লেবুর বাগান – [নিউ জার্সিতে ডাঃ ওসিজিয়ানের এক লেবু বাগানের বড় বড় লেবু-পাতাই রঙীন রেশম বোনা গুটি পোকাদের প্রধান খাদ্য।]

গুটিপোকার পরীক্ষা

[গুটী-পরিদর্শকেরা রেশম খুলিবার পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন যে, কোন্ কোন্ গুটী ঠিক তৈয়ার হইয়াছে, কোন্‌টী এখনও অসম্পূর্ণ এবং কোন্ কোনগুলিকে শাবক-প্রসবের জন্য পৃথক রক্ষা করা প্রয়োজন।]

গুটিপোকার বিভিন্ন অবস্থা

[১. ডিম। ২. সাধারণ গুটিপোকা। ৩. রেশম বুনিবার পূর্ব্বে। ৪. শ্রেষ্ঠ গুটিপোকা। ৫. সাধারণ গুটির খালি খোল। ৬. ৭. বাচ্চা প্রজাপতি। ৮. ৯. ১০. সাদা, কালো ও কমলা গুটি। ১১. ১২. ১৩. পোকা-খচিত গুটিতে আবদ্ধ হইতেছে। ১৪. ডিমের আকার। ১৫. কালো গুটি থেকে তৈয়ারী রেশমী কাপড়। ১৬. ১৭. গুটি হইতে প্রস্তুত রেশম। ১৮. গুটির খাদ্য বড় লেবুর পাতা।]
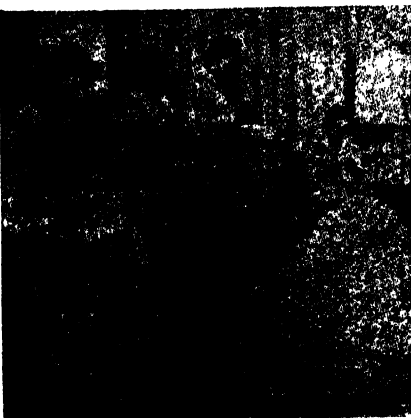
গুটী বাছাই

[আঠারো রকম রংয়ের ভিন্ন-ভিন্ন গুটী আলাদা-আলাদা বাছাই করিয়া তাহা হইতে রেশম খুলিয়া লওয়া হইতেছে।]

গুটিপোকার থাক

[এই চার থাকের মধ্যে প্রথম থাকে গুটিপোকারা খানা খাইতেছে; দ্বিতীয় থাকে তাহাদের রেশম বুনিবার পূর্ব্বাবস্থা। তৃতীয় থাকে, তৈয়ারী গুটী, এবং চতুর্থ থাকে, শাখা-সংলগ্ন গুটিপোকারা রেশম বুনিতেছে।]

কুমারী ফেলাইন ডার্লিং —[ইনি একজন বেলজিয়ান অভিনেত্রী; ছাঁচ তোলাইবার পূর্ব্বে মুখে ভেসেলীন্ মাখিয়া প্রস্তুত হইতেছেন]। ভাস্কর পেয়ারে দি ক্রোয়েৎ।—[ইনি কুমারী ফেলাইন ডার্লিংএর মুখের ছাঁচ লইবার আয়োজন করিতেছেন। ছাঁচ তুলিবার জন্য মুখে প্লাষ্টার চড়াইবার পূর্ব্বে একটি সরু তার মুখের উপর মাঝামাঝি রাখিয়া দিতে হয়। এই তারটি টানিয়া মুখের ছাঁচখানিকে কাঁচা থাকিতে থাকিতে দু'ভাগ করিয়া লওয়া হয়, কারণ তাহা হইলে মুখ হইতে ছাঁচটি শুকাইবার পর খুলিয়া লইবার সুবিধা হয়।] শিল্পের শেষ কাজ।—[ছাঁচটি তোলা হইবার পর উহার যেখানে যা খোঁচ-খাঁচ বা দোষ থাকে, ছুরীর সাহায্যে তাহা শোধরাইয়া লওয়া হয়।] আসল ও নকল।—[জীবন্ত মূর্ত্তি এবং তাহার ছাঁচ হইতে নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি পাশাপাশি দেখান হইয়াছে]।

হাতের ছাঁচ লওয়া। ছাঁচ হইতে হাত গড়া। ছাঁচ হইতে মুখ গড়া। মোম গলাইয়া ছাঁচে ঢালা। মোমের মূর্ত্তি ছাঁচ হইতে বাহির করিয়া জলে ধুইয়া লইতে হয়।

[illegible] মোমের হাত রং করা। মোমের পুতুলের প্রাণ প্রতিষ্ঠা।—[সুনিপুণ চিত্র-শিল্পীরা রঙীন্ তুলি বুলাইয়া প্রাণহীন মোমের পুতুলের মুখে সজীব ভাব ফুটাইয়া তোলেন।] কেশ সন্নিবেশ।—[মূর্ত্তির রং ও প্রতিকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যথাযোগ্য কেশ সন্নিবেশ করা হইতেছে।] বেশ ভূষায় সুসজ্জিত সম্পূর্ণ মোমের প্রতিমূর্ত্তি।]

স্নায়বিক শক্তির পরীক্ষা। আলোক ও ছায়ার প্রভাব। ভার কেন্দ্রের পরিবর্ত্তনে স্নায়বিক উত্তেজনার পরিমাণ। দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা।
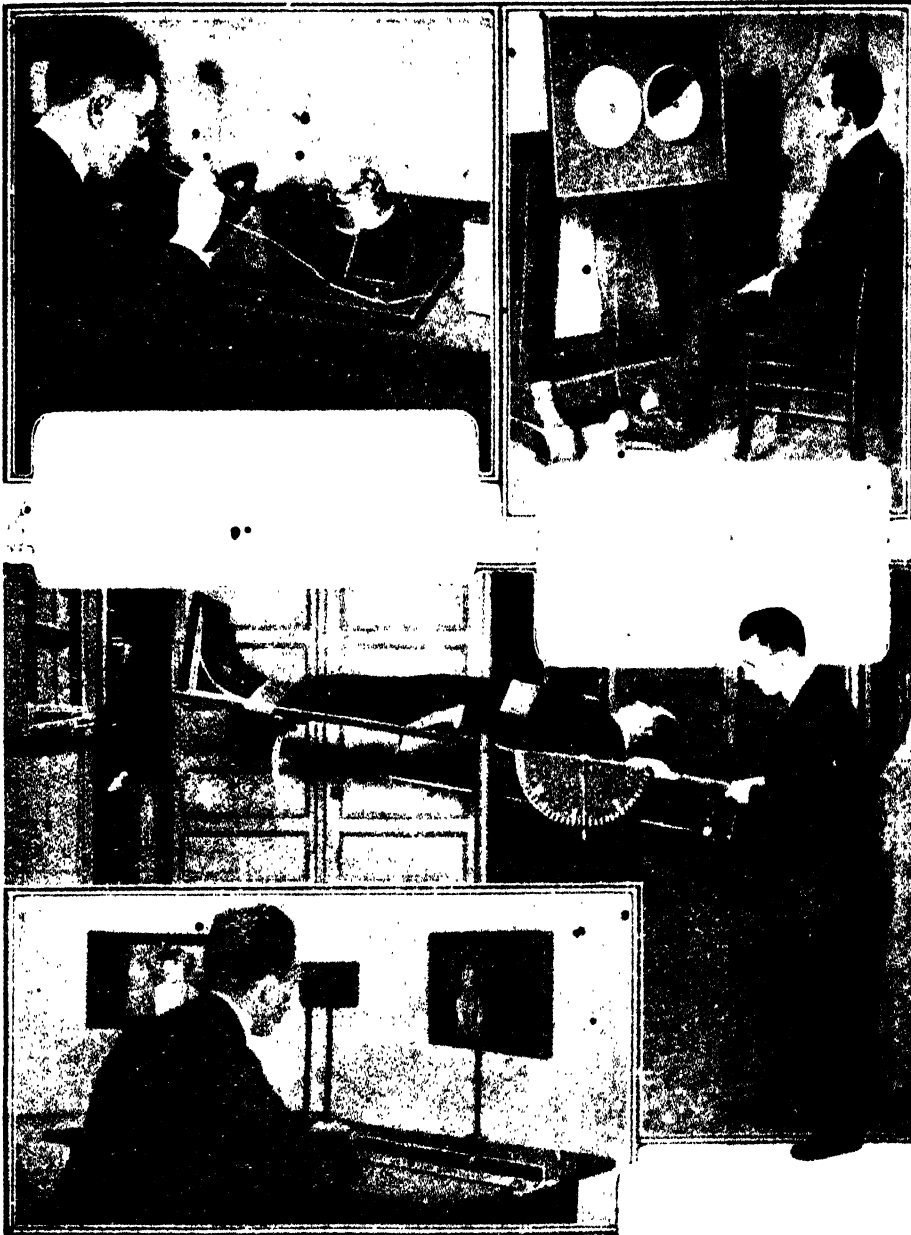
এবং গাঢ় উজ্জ্বল সোণালী রং প্রভৃতি আঠারো প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের রেশম স্বাভাবিক উপায়েই প্রস্তুত হইতেছে— কোনও রূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা নাই, কেবল মাত্র গুটীর আহার্য্য বস্তুর উৎকর্ষ ও পরিমাণের তারতম্য ব্যতীত তিনি অন্য কোনও গুপ্ত কারণের সন্ধান করিতে পারেন নাই। Popular Mechanics.

৩। জীবজন্তুর মূর্ত্তির ছাঁচ।

চীনে মাটির, মোমের, বা [illegible] মূর্ত্তি গঠন করিতে হইলে, কোনও [illegible] প্রথমে একটি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া লইবার প্রয়োজন হইত। পরে সেই সুন্দর প্রতিমূর্ত্তির একটি ছাঁচ তুলিয়া লইয়া,

ভার অনুমান

দৃষ্টির প্রসার ও বর্ণক্ষেত্রে দর্শনেন্দ্রিয়ের সীমা নিরূপণ।

টেলিগ্রাফ্ লিপিবদ্ধ করিবার দক্ষতা। সুর জ্ঞানের পরীক্ষা। মাপের সূক্ষ্ম তারতম্য বুঝিবার ক্ষমতা।
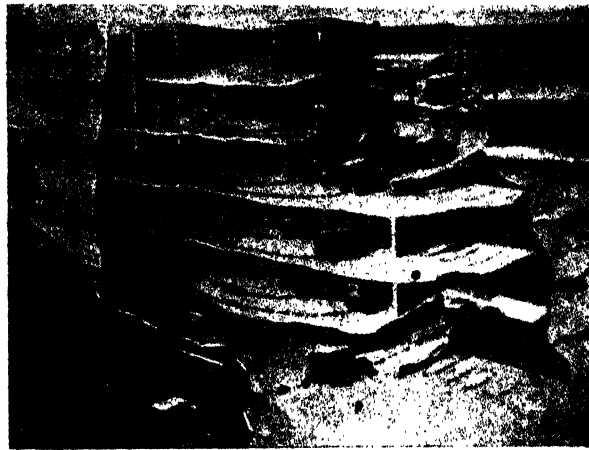
মোটরশালা

ঘোড়ার হোটেল

সেই ছাঁচের সাহায্যে একাধিক মূর্ত্তি গঠিত হইত ; কিন্তু এখন আর ছাঁচ তুলিবার জন্য মর্ম্মর-প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া লইবার প্রয়োজন হইতেছে না। জীবন্ত মূর্ত্তি হইতেই একেবারে ছাঁচ তুলিয়া লওয়া হইতেছে।—সুগঠিত-দেহ, সুঠাম, সুপুরুষ বা সুন্দরীদের বাছিয়া লইয়া ছাঁচ তোলা হয়। একেবারে সর্ব্বাঙ্গের ছাঁচ এক সঙ্গে লওয়া হয় না,—এক-একটি অঙ্গের পৃথক্-পৃথক্ ছাঁচ তোলা হয়। যে দিন যে অঙ্গের ছাঁচ লওয়া হয়, সে দিন ছাঁচ লইবার পূর্ব্বে সেই অঙ্গে প্রথমে উত্তমরূপে ভেসলীন মাখাইয়া লইতে হয়, নতুবা ছাঁচ গায়ের সঙ্গে একেবারে আঁটিয়া বসিয়া যায় ; কারণ প্লাষ্টার জমাইবার জন্য অন্ততঃ আধ মিনিট কাল উহা শরীরের উপর লাগাইয়া রাখা প্রয়োজন। মুখের ছাঁচ তোলাইবার সময় চোখ বুজিয়া থাকিতে হয় ; এই জন্য মুখের ছাঁচটুকু ঠিক সজীব হয় না। ছাঁচ হইতে মূর্ত্তি গড়িয়া, পরে উহাকে রং চং করিয়া, কেশ সন্নিবেশ ও বেশভূষা পরাইলে, তবে সজীবের মত দেখায়।

(Popular Science and Mechanics.)
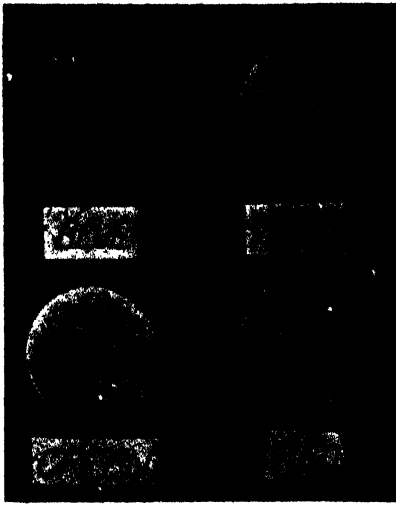
বীজের উপর রঙীন কাচের প্রভাব
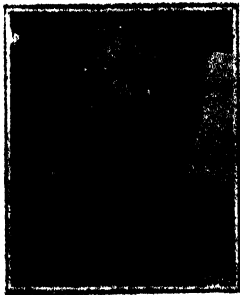
নূতন ঘোড়ার খুরের নাল

কাঠের আড়াল উঁচু করা থাকে, যাহাতে সে বাটখারাগুলি দেখিতে না পায়। ঐ কাঠের আড়ালের তলায় হাত গলাইবার মত একটি ছিদ্র আছে। তাহারই ভিতর দিয়া হাত বাড়াইয়া, ঘূর্ণায়মান টেবিলের উপর হইতে বাটখারা তুলিয়া, চট্‌পট্‌ ছাত্রকে তাহার ওজন অনুমান করিয়া বলিতে হয়। দৃষ্টির প্রসার এবং বর্ণ-ক্ষেত্রে দর্শনেন্দ্রিয়ের সীমা নিরূপণ করিবার জন্য, পরীক্ষকেরা 'পেরীমেটার' ব্যবহার করেন। ছাত্রকে সম্মুখ দিকে দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া স্থির ভাবে বসিয়া থাকিতে হয়, যাহাতে মাথাটি একটুও না নড়ে। অর্দ্ধ-বৃত্তাকার একটি মাপ-যন্ত্রে উক্ত পরীক্ষার ফলাফল স্বতঃই নির্দ্দেশিত হয়। কে কত শীঘ্র টেলিগ্রাফ লিপিবদ্ধ করিতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য, পরীক্ষক ও ছাত্র একটি লম্বা টেবিলের দুই বিপরীত প্রান্তে মুখোমুখি হইয়া বসে। এই টেবিলের উপর টেলিগ্রাফের যন্ত্র আঁটা থাকে, এবং সময় নিরূপণের জন্য একটি বৈদ্যুতিক ঘড়িও সংলগ্ন থাকে। ছাত্রের স্বর-জ্ঞানের পরীক্ষা লইবার জন্য এক অদ্ভুত যন্ত্রের সাহায্য লওয়া হয়। যন্ত্র সংলগ্ন ঘণ্টাগুলি নানা স্বরে বাজিবার সময়, উহারই সংশ্লিষ্ট একটী বায়ুকোষ হইতে স্বরের উদ্দীপনার জন্য সজোরে খানিকটা বাতাস ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহাতে পরীক্ষার্থীর স্বর জ্ঞান, এবং তাহার মনের উপর স্বরের প্রভাব কতখানি এই উভয়বিধ পরিচয়ই পাওয়া যায়। মাপের সূক্ষ্ম তারতম্য দেখিবামাত্র বুঝিতে পারে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য, ছাত্রকে একটি টেবিলে বসাইয়া তাহার সম্মুখে পরীক্ষক একটি যন্ত্রের সাহায্যে সূক্ষ্ম মাপের অতি ঈষৎ প্রভেদ প্রদর্শন করেন। যে ছাত্র তৎক্ষণাৎ সে তফাৎটুকু বুঝিতে পারে, সে যশের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

(Popular Science)

'মোটর-ত্রাণ' সংযুক্ত গাড়ী 'মোটর-ত্রাণে' জীবন-রক্ষা
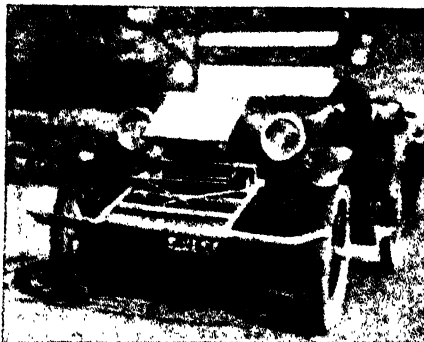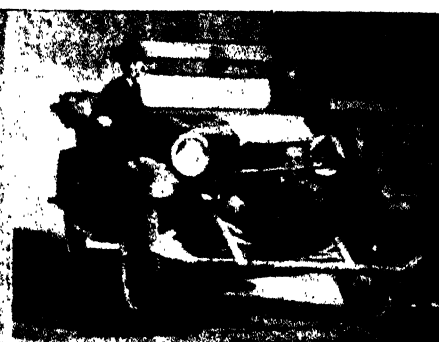
৫। মোটরশালা।

নিউইয়র্ক সহরে স্থানাভাব বশতঃ এবং জমীর মূল্য আতার কারণ মোটর গাড়ী রাখিবার জায়গা পাওয়া দুর্লভ। অধিকাংশ অবস্থাপন্ন লোকও সেখানে হোটেলে থাকে,—মধ্যবিত্ত লোকেরা ঘর ভাড়া করিয়া কোনও রকমে মাথা গুঁজিয়া আছে। সেখানে প্রত্যেকের নিজস্ব মোটর-আস্তাবল রাখা অসম্ভব; এই জন্য ফার্ণাণ্ডু ই ডি'হাসী নামে একজন আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার বুদ্ধি করিয়া একটি ছয়তলা প্রকাণ্ড বাড়ীতে সাধারণের জন্য এক মোটরশালা খুলিয়াছেন। বাড়ীখানি এরূপ কৌশলে নির্ম্মাণ করাইয়াছেন যে, ছয়তলার উপর একখানি মোটর গাড়ী তুলিতে বা সেখান হইতে নামাইতে একটুও বেগ পাইতে হয় না। দার্জ্জিলিং পাহাড়ের উপর যেমন ঘুরিয়া-ঘুরিয়া রেলগাড়ী উঠিয়া যায়, অনেকটা সেই ভাবে এই বাড়ীর ছয়তলার উপর মোটর গাড়ী অতি সহজে ওঠা-নামা করিতে পারে। এই বৃহৎ বাটীর চারি পাশ দিয়া একটি গড়ানে রাস্তা ঘুরিয়া-ঘুরিয়া প্রত্যেক তলাকে বেষ্টন করিয়া উপরে উঠিয়াছে। প্রত্যেক তলায় প্রবেশ ও নির্গমের পৃথক-পৃথক দ্বার আছে; এবং পথটি এরূপ প্রশস্ত যে, দুইখানি গাড়ী অনায়াসে পাশাপাশি যাওয়া-আসা করিতে পারে। এইজন্য গাড়ীতে-গাড়ীতে সংঘর্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই। বাড়ীখানির প্রত্যেক তলায় এক-একখানি গাড়ীর জন্য পৃথক-পৃথক খোপ করা আছে। এই উপায়ে উক্ত বাড়ীখানিতে অসংখ্য গাড়ী রাখিবার স্থান করা হইয়াছে।

(Popular Science)

৬। ঘোড়ার হোটেল।

অধিকাংশ সহরে মানুষের থাকিবার যেমন হোটেল আছে, বার্লিন সহরে সেইরূপ ঘোড়া থাকিবারও একটি হোটেল আছে। হোটেলটি একটী প্রকাণ্ড চারতলা বাড়ীতে অবস্থিত। প্রত্যেক তলায় এক-একটি ঘোড়া থাকিবার জন্য অসংখ্য ঘর আছে। সিঁড়ির পরিবর্ত্তে একটী ক্রমোন্নত গড়ানে পথ চারতলা পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই পথ দিয়া ঘোড়া অনায়াসে উপর-নীচে যাওয়া-আসা করিতে পারে। প্রত্যেক ঘরে ক্রমাদিক্রমে নম্বর দেওয়া আছে। এই জন্য ঘোড়া খুঁজিয়া বাহির করিতে একটুও অসুবিধা হয় না। যাঁহারা মফঃস্বলে থাকেন, তাঁহাদের অনেককেই ঘোড়া রাখিতে হয়। সহরে আসিবার সময়, যেখানে ঘোড়া রাখিবার কোনও ব্যবস্থা নাই সেখানে তাঁহারা ঘোড়া লইয়া যাইতে পারেন না। কিন্তু বার্লিনে যাইবার সময় তাঁহারা নির্ভাবনায় তাঁহাদের চড়িবার প্রিয় ঘোড়াটিকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারেন; কারণ, সেখানে তাঁহাদের ঘোড়ারও থাকিবার হোটেল রহিয়াছে।

(Popular Science)

৭। নির্ধূম বারুদ।

কামান ছুঁড়িবার সময় যাহাতে ধোঁয়া না দেখিতে পাওয়া যায়, এই উদ্দেশ্যে নির্ধূম বারুদের সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ ধোঁয়া দেখিয়া অনেক সময় শত্রুপক্ষ কামানের অবস্থান কোথায় জানিতে পারে, এবং কামানটি নষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করে। এই বারুদ সাধারণ বারুদের মত চূর্ণ পদার্থ নহে,—লম্বা-লম্বা, গোল মোমবাতির আকারে প্রস্তুত। বাতিগুলি এক ইঞ্চি পুরু ও তিন ফিট লম্বা। রংটা পাটকিলে, মজবুত অথচ নমনীয়, এবং শজেলেসের মত স্বচ্ছ। একটা দেয়াশালাই কাঠিতে এই বারুদের বাতি জ্বালানো যায়। জ্বালাইলে হরিদাবর্ণের আলো নির্গত হয় এবং সেলুলয়েড প্রভৃতি সহজ দাহ্য পদার্থের ন্যায় ধীরে সত্বর পুড়িয়া যায়; হাওয়া লাগিলে সহজে নিভিয়া যায় না। কামানে ব্যবহার করিবার সময় এই বাতিগুলি ঠিক মাপে টুকরা করিয়া লওয়া হয়। সৈনিকেরা অনেকে এই বাতি সাধারণ চুরুটে ধরাইয়া লয়। কামানের বিভিন্ন পরিমাপ অনুসারে এই বাতির নলাগুলিও ভিন্ন-ভিন্ন মাপে ও পৃথক আকারে প্রস্তুত হয়। ইহার সহিত কিছু সাধারণ বারুদও ব্যবহার করিতে হয়। সাধারণ বারুদ সোরা, গন্ধক ও কাঠকয়লায় প্রস্তুত। কথিত আছে যে, চীনেরাই নাকি সর্ব্বপ্রথম বারুদের সৃষ্টি করে।

(Scientific American)

৮। পকেট-করাত।

কোন-কোনও বন্দী জার্ম্মাণ সৈনিকের পকেট হইতে এক প্রকার অদ্ভুত করাত পাওয়া গিয়াছে। ইহা ক্ষুরধার ইস্পাতে প্রস্তুত,—প্রায় এক গজ লম্বা; অথচ স্প্রীংয়ের মত ইহা গুটাইয়া পকেটে রাখা যায়। ইহার দ্বারা শত্রু-শিবিরের চারি পাশের তারের অবরোধ অতি সত্বর কাটিয়া ফেলা যায়। বড়-বড় গাছের গুঁড়ি কয়েক মিনিটের মধ্যে চিরিয়া ফেলা

যায়। সাধারণ করাতের ন্যায় ইহাতেও অসংখ্য শাণিত দন্ত সংযুক্ত আছে। বিগত মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণীর উদ্ভাবিত একাধিক নূতন অস্ত্রের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে,—তন্মধ্যে এই অদ্ভুত পকেট-করাতটিও উল্লেখযোগ্য।

(Scientific American)

৯। রেলে তোয়ালে সাবান।

বিলেতের রেলগাড়ীতে এক-একটি কল বসান আছে। তাতে একটি 'আনি' ফেলে দিলেই একখানি তোয়ালে পাওয়া যায়। তোয়ালেখানি যদিও কাগজের, কিন্তু হাত মুখ মোছার কাজ বেশ চলে। ষ্টেশনে একরকম পকেট-বই পাওয়া যায়; তার পাতাগুলি সাবানের তৈরি। একখানি পাতা ছিঁড়ে নিয়ে জলে ভিজিয়ে হাতে-মুখে ঘসলে, বেশ সাফ হ'য়ে যায়। রেলে বেড়াবার সময় মেয়েরা এই সাবান পাতা খুব ব্যবহার করে। পকেট-বইয়ের মত বলে এই সাবান সঙ্গে নিয়ে যাবার কোনও অসুবিধা হয় না।

(Scientific American)

১০। কলের শাবল।

টেলিগ্রাফের বা ট্রামের তারের বড়-বড় থাম কিম্বা গ্যাসের পোষ্ট পুঁতিবার সময়, মাটিতে বড় বড় গর্ত্ত খুঁড়িবার প্রয়োজন হয়। তিন চারজন লোক শাবল লইয়া সমস্ত দিন পরিশ্রম করিলে, তবে হয় ত একটি গর্ত্ত সম্পন্ন করিতে পারে। কিন্তু মাটি শক্ত থাকিলে, বা পাথুরে জমিতে গর্ত্ত কাটিতে হইলে, আরও অধিক সময় লাগিয়া যায়। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য, পী জোন্‌সমবাক নামে একজন আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার নূতন ধরণের কলের শাবল উদ্ভাবন করিয়াছেন। কাঠে বড়-বড় ছিদ্র করিবার জন্য যেমন এক প্রকার বিলাতি তুরপুন দেখা যায়, এই কলের শাবলটিও অনেকটা সেই ধরণের,—কেবল আকারে বৃহৎ এবং বড় চার-কোণা একটি ফ্রেমের মধ্যে আঁটা; আর মুখের সেই ধারালো পুলী-প্যাঁচও প্রকাণ্ড। ছোট একটি তেলের ইঞ্জিনের সাহায্যে এই বিরাট তুরপুনটি ঘুরিতে-ঘুরিতে সবেগে মাটীর মধ্যে ইট-পাথর কাটিয়া প্রবেশ করে; এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রয়োজনমত প্রকাণ্ড গর্ত্ত খুঁড়িয়া দেয়। ইঞ্জিন খারাপ হইয়া গেলে, কলটি হাতে ঘুরাইবার ব্যবস্থা আছে; এবং ইহার চারিটি পায়া জমির ঢাল অনুসারে ইচ্ছামত ছোট বড় করিয়া বসানো যায়। গর্ত্ত খোঁড় সঙ্গে সঙ্গে প্যাঁচের উপর দিয়া কাটা মাটি আপনিই উ দিকে বাহির হইয়া আসে।

(Scientific American

১১। বীজ ও রং।

রঙীন কাচের আবরণের মধ্যে বীজের অঙ্কুরোদ্গ পরীক্ষা করিয়া অদ্ভুত ফল পাওয়া গিয়াছে। এই পরী দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, যে, নীল-রংয়ের আবরণের ম বীজ সত্বর অঙ্কুরিত হয়; এবং চারা শীঘ্র পরিপুষ্ট হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাড়িয়া উঠে। হরিদ্রা, লাল ও সবু আবরণের মধ্যে, হরিদ্রা-বর্ণে যতটা সুফল পাওয়া গিয়াছে অপর দুই বর্ণে সেরূপ হয় নাই। নীল-রংএর পরই বীজে উপর হরিদ্রা বর্ণের প্রভাব বেশী। বীজ-বপন করি অঙ্কুরোদ্গম কাল পর্য্যন্ত, এবং নব পল্লবোৎপন্ন হইবার প কিছুদিন অবধি, উহার উপর রঙীন কাচ ঢাকা দিয়া রাখিলে বাগানের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। রঙীন কাচের অভাবে সাদা কাচের উপর রং মাখাইয়া লইয়া ব্যবহার করা চলে ইহাতেও সমান সুফল পাওয়া যায়। গামলায়, টবের উপর এবং জমীতে হইলে, চার পাশে ইট সাজাইয়া তাহার উপর একখানি রঙীন কাচ ফেলিয়া রাখিলেই যথেষ্ট কাজ হইবে বিশেষ কোনও হাঙ্গামা করিতে হইবে না।

(Scientific American

১২। নূতন ঘোড়ার খুরের নাল।

ঘোড়ার পায়ে নাল লাগাইবার জন্য খুরের উপর বড় বড় পেরেক আটিয়া দিতে হয়। এই পেরেক মারিবা দোষে অনেক সময় ঘোড়ার পা জখম হইয়া যায়। না বাঁধার দোষে অনেক সময় ঘোড়া ল্যাঙ্ড়া দেয়। তার প নাল খুলিয়া গেলে যতক্ষণ না নাল-বাঁধাই লোকটিকে পাওয়া যায়, ঘোড়া নিকামায় বসিয়া যায়। এই সক অসুবিধা দূর করিবার জন্য, উইলিয়াম ওয়াট্‌সন্ না জনৈক নিউজার্সির অধিবাসী এক-প্রকার নূতন ধরণে ঘোড়ার নাল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহা লাগাইবার জ পেরেক মারিবার প্রয়োজন নাই। এবং নাল-বাঁধা লোকের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। যে কোন সহিস, যখন ইচ্ছা, এই নাল ঘোড়ার খুরে জুতাক

জ্বালাইয়া দিতে পারে, এবং ইহা এরূপ কৌশলে প্রস্তুত যে, ঘোড়ার পায়ের মাপ অনুসারে ইচ্ছামত নালটিকে ছোট বড় করিয়া লওয়া যায়; এবং খুব দ্রুতগামী ঘোড়ার পা হইতেও ইহা সহজে খুলিয়া পড়ে না। (Scientific American)

১৬। মোটর-ত্রাণ।

দ্রুতগামী মোটর গাড়ীর সম্মুখে লোক আসিয়া পড়িলে, লোকটি যাহাতে চাপা না পড়িয়া রক্ষা পায়, সম্প্রতি সে উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। ট্রাম ও রেলগাড়ী প্রভৃতির সম্মুখে যেমন cow-catcher সংলগ্ন থাকে, এ যন্ত্রটিও অনেকটা সেই প্রকারের, কেবল একটু উন্নত ধরণের। এইমাত্র [illegible] পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল বেগে [illegible] মোটর গাড়ীর সম্মুখে পড়িয়াও একটি লোক এই মোটর-ত্রাণের [illegible] পাইয়াছে। [illegible] মোটর গাড়ীর [illegible] সংলগ্ন করিয়া [illegible] [illegible] ইহা অনায়াসে [illegible] [illegible] [illegible] আপনা হইতেই [illegible] অঙ্কে তুলিয়া লয়। (Popular Mechanics)

পুস্তক-পরিচয়

বরমাল্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, মূল্য দেড়টাকা।

'পারিজাত'-প্রণেতা, প্রবীণ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি মাসিক-পত্রে মধ্যে-মধ্যে যে সকল মনোহর ছোট গল্প লিখিয়াছেন, তাহারই কয়েকটী সংগ্রহ করিয়া এই 'বরমাল্য' গ্রথিত করিয়াছেন। গল্পগুলি যখন প্রকাশিত হইত, তখন পাঠকগণ প্রবীণ লেখকের ভাব-চাতুর্য্য, ঘটনা-বিন্যাস ও চরিত্র-চিত্রণের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। এখন সেইগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া তিনি বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিয়াছেন। আমরা অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতে পারি, বাঙ্গালা গল্প সাহিত্য-ভাণ্ডারে এ মালা অমলিন ভাবে বিরাজ করিবে, এবং ইহার সুষমায় সকলেই মুগ্ধ হইবেন।

ওপারের আলো

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত, মূল্য আড়াই টাকা।

বাঙ্গালা দেশে ও বাঙ্গালা-সাহিত্যে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নাম সর্ব্ব-পরিচিত। তিনি 'বাঙ্গালা সাহিত্যে'র ইতিহাস লিখিয়া যে যশঃ লাভ করিয়াছেন, এখন উপন্যাস লিখিয়া তাহার বৃদ্ধি-সাধন করিতে চান; বোধ হয়, সেই জন্যই তিনি রোগ-শয্যায় পড়িয়া তিন সপ্তাহের মধ্যে 'ওপারের-আলো' লিখিয়া ফেলিয়াছেন; আবার সেই শয্যাগত থাকিতে-থাকিতেই আর তিন সপ্তাহের মধ্যে এতবড় বইখানি ছাপাইয়া ফেলিয়াছেন। এত তাড়াতাড়িতে যাহা হয়, তাহাই হইয়াছে,—পাকা ওস্তাদেরও সুরগাজিতে এক-এক স্থানে গোল হইয়াছে, মুদ্রাকর-প্রমাদও ঘটিয়াছে; কিন্তু তাহা হইলেও, বইখানির ভিতর দিয়া ওপারের আলো দেখিতে পাওয়া যায়, যদি পাঠকের তেমন দৃষ্টি শক্তি থাকে। শ্রীযুক্ত দীনেশবাবু এই বৃহৎ উপন্যাসখানির মধ্যে ভাল মন্দ নানা চিত্র ও চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন; ইহার কোন কোন চরিত্র-চিত্রন সম্বন্ধে পাঠকগণের মধ্যে মতভেদ হইতে পারে। কিন্তু সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, দীনেশবাবু বাবাজীর চরিত্র যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়—অতি সুন্দর। শ্রীযুক্ত দীনেশবাবু যদি তাঁহার পুস্তকের প্রথম ৯ পরিচ্ছেদ লিখিয়াই পুস্তকখানি শেষ করিতেন, তাহা হইলেও আমরা তাঁহার ঐ বাবাজীর মধ্য দিয়া ওপারের আলোর রশ্মি দেখিতে পাইতাম,—কিশোর রায় বা কাদম্বিনীর কোন অভাবই আমরা অনুভব করিতাম না। লেখক মহাশয়ের মনে কি ছিল জানি না; কিন্তু আমরা তাঁহার উদ্দেশ্য যতটা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, শেষের পরিচ্ছেদ কয়টী না থাকিলেও লেখকের উদ্দেশ্য সফল হইত এবং বোধ হয় তাহাতে বইখানি আরও ভাল হইত।

রসসাগর কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী

কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি-এ,

সংগৃহীত ও সম্পাদিত, মূল্য ২৲ টাকা

সে-দিন আর নাই, যখন আমাদের এই বাঙ্গালা দেশ সত্য-সত্যই 'সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা' ছিল;—যখন গ্রামে-গ্রামে টোল, চতুষ্পাঠী ছিল; ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের শাস্ত্রালোচনা ছিল; বাড়ী-বাড়ী চণ্ডীমণ্ডপে অপরাহ্ণ হইতে রাত্রি প্রহরেক পর্য্যন্ত মজলিস বসিত; গান বাজনা, শাস্ত্রালোচনা, আমোদ-আনন্দ, হাস্য-পরিহাসে গ্রাম মুখর হইত। এখন চারিদিকে

হাহাকার ;—রোগের আর্তনাদে, অভাবের তাড়নায় এখন বাঙ্গালীকে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাই, এখন যদি সেকালের আনন্দের কোন কাহিনী আমরা শুনি, আমাদের হৃদয়ে অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। আমাদের সুধী, মনস্বী, সুপণ্ডিত বন্ধু শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে মহাশয় রসসাগর ভাদুড়ী মহাশয়ের জীবন কথা ও তাঁহার সমস্যা-পূরণের বিবরণ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের সেই সেকালের প্রাণ ভরা হাসির, গালভরা রঙ্গের রাজ্যের সুন্দর দৃশ্য দেখাইয়াছেন ; এজন্য তিনি বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী মেহেরপুর সাবডিবিসনের অন্তর্গত 'বাড়েকা' গ্রামে ১৭০১ খৃষ্টাব্দে রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী মহাশয় বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণনগর তাঁহার লীলাভূমি ছিল। মহারাজ গিরীশচন্দ্রের সভা-পণ্ডিত হইয়াই তিনি স্বীয় অলৌকিক প্রতিভার সমুজ্জ্বল নিদর্শন দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রসসাগর প্রকৃতই রসসাগর ছিলেন ; তাঁহার কবিতা-রচনা শক্তি অসাধারণ ছিল ; আর ছিল তাঁহার পাদ পূরণের ক্ষমতা। এই ক্ষমতার জন্যই তিনি রসসাগর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। রস সাগরের এই সকল রসপূর্ণ কবিতা বলিতে গেলে লোপ পাইতে বসিয়াছিল ; সেকেলে প্রাচীন জনের মুখে দুই চারিটি কবিতা শুনিতে পাওয়া যাইত। আমাদের বন্ধুবর পূর্ণবাবু আজীবন উদ্ভট সংগ্রহ করিয়া আসিতেছেন। রস-সাগরের কবিতা তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাই বহুদিন হইতে তিনি রস সাগরের কবিতা ও তাঁহার জীবন কথা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। ইহার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে ; সেই আয়াসের ফল এই সংগ্রহ-পুস্তক। তিনি রস-সাগরের জীবন কথা, নানা গল্প এবং কবিতা, যতদূর পাওয়া যায়, সংগ্রহ করিয়াছেন ; এবং কি উপলক্ষে কবিতাগুলি রচিত হইয়াছিল, কবিতার তাৎপর্য্য সহ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে পূর্ণবাবু যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা নিম্নে রস সাগরের দুই-একটা কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

একদিন কৃষ্ণনগরের রাজ সভায় রসরাজকে সমস্যা পূরণ করিতে দেওয়া হইল—'বড় দুঃখে সুখ।' রসসাগর তৎক্ষণাৎ এই ভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন

'চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্জরে
নিশায় নিষাদ আনি রেখে দিল ঘরে।
কা কর চকী প্রিয়ে! এ বড় কৌতুক,
বিধি হতে ব্যাধ ভাল, বড় দুঃখে সুখ।

আর একদিন মহারাজ গিরীশচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, 'অমাবস্যা গেল, আবার পূর্ণিমা আসিল'। রস সাগর তখনি পূর্ণ করিলেন—

"ওরে নিদারুণ বিধি, কত খেলা খেল,
সংসার যন্ত্রণা যত হাবাতের ঘাড়ে ফেল।
বেতো রোগী কেঁদে বলে কোন দিন বা ভাল,
অমাবস্যা গেল, আবার পূর্ণিমা আসিল।"

এই প্রকার কত রত্ন যে পূর্ণবাবু সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পুস্তকখানি পাঠ করিলেই, পাঠক দেখিতে পাইবেন। বাঙ্গালা সাহি[ত্যের] ভাণ্ডারে এই 'রস-সাগর' যে অতি সম্মানের আসন গ্রহণ করিবে, এ [কথা] আমরা একবাক্যে বলিতে পারি। পুস্তকখানি সাহিত্যের প[রম] উৎসাহদাতা সুপণ্ডিত, লালগোলার রাজা-বাহাদুরের নামে উৎসর্গ ক[রিয়া] পূর্ণবাবু যথার্থ গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

শ্রীঅনাথনাথ বসু প্রণীত, মূল্য ২॥০ টাকা।

মহাত্মা শিশিরকুমার বাঙ্গালীর গৌরবস্থল ; আমাদের স্পর্দ্ধার সামগ্রী। শিশিরকুমারের স্বদেশহিতৈষণা, পরদুঃখকাতরতা, নির্ভীকতা, সত[্য]বাদিতা, এবং পরিণত বয়সে তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা, তাঁহার ভ[ক্তি] প্রেমতন্ময়তা আদর্শ স্থানীয়। সেই মহাত্মা শিশিরকুমারের জীবন-ক[থা] অনেকে এখানে একটু, সেখানে একটু, এই প্রকার অসম্বদ্ধ ভা[বে] শুনিয়া আসিতেছিলেন। আমরা অবশ্য তাঁহার কর্ম্ম ও ধর্ম্মজীবনে[র] অনেক কথাই জানিতাম, কিন্তু জন-সাধারণ সকল কথা জানিতেন না। তাঁহারা জানিতেন, শিশিরকুমার আর অমৃতবাজার অভিন্ন ;—তাঁহা[রা] জানিতেন, অমিয় নিমাই চরিত আর শিশিরকুমার। কিন্তু বাঙ্গা[লা] দেশে, বিশেষতঃ নদীয়া, যশোহরের নীল-বিদ্রোহের সময় শিশিরকুমা[র] কি তেজ, কি নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, অমৃতবাজার পত্রি[কা] লইয়া তাঁহাকে কেমন ভাবে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাহার প[র] শ্রীঅমিয় নিমাই চরিতে তিনি কি প্রেমের বন্যা দেশে প্রবাহিত করিয়া[]ছিলেন, ইহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ অনেকেই জানিতেন না। সুলেখ[ক] শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু মহাশয় এই অভাব পূরণ করিয়া আমাদে[র] কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার লিখিত এই জীবন-চরিতখা[নি] অতি সুন্দর হইয়াছে। বাঙ্গালা-সাহিত্যে ইহা স্থায়ী হইবে। এ[ই] প্রকার জীবন-চরিত যত অধিক প্রকাশিত হয়, ততই ভাল।

চির-অপরাধী

শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীমান্ মাণিকের এই উপন্যাসখানি যখন 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইত, আমরা তখনই ইহা পাঠ করিয়াছি এখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পর আবার পড়িলাম। মাণি[ক] বাবুর একটা প্রধান গুণ এই যে, তিনি অকারণ বাগাড়ম্বর করেন না যেখানে যতটুকু বলা প্রয়োজন, তাহার অধিক তিনি বলেন না—এব[ং] সেটুকুও বেশ সোজা করিয়া বলেন। এই জন্যই তাঁহার ছোট গল্পগুলি ও উপন্যাস পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। তাঁহার এই 'চির অপরাধী' তাঁহার পূর্ব্ব যশঃ অক্ষুণ্ণ রাখিবে ; বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাগণ তাঁহার এই উপন্যাসখানি সাদরে গ্রহণ করিবেন।

ধান-দূর্ব্বা

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১।০

সাহিত্য-মন্দিরের ভক্ত সাধক সুকবি করুণানিধান, বঙ্গ বাণীর সাধনার আশীর্ব্বাদ, বাঙ্গলার প্রধান সম্পত্তি, "ধান-দূর্ব্বা" ছন্দঃ-সূত্রে গাঁথিয়া তাঁহার দেশবাসীকে যে উপহার দিয়াছেন, আমাদের মনে হয়, এই সাধনায় তিনি সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ইহাই সাধক কবির প্রথম উদ্যম নহে,—বাণীপূজার নির্ম্মাল্য তাঁহার "ঝরা ফুল"—নৈবেদ্য তাঁহার "প্রসাদী",—মঙ্গলঘটে তাঁহার "শান্তিজল"।

এই কাব্য-গ্রন্থের প্রথমেই বিবাহের মঙ্গলগীতি। বর স্বয়ং জয়দেব, কনে হইয়াছেন—

"বরনারী পদ্মাবতী ধরাতলে অমরা স্বপন।"

এই জয়দেবই বঙ্গ-কবিতা জননী-জন্মের পূর্ব্ব শুভ মুহূর্ত্তে মধুর বীণা-ঝঙ্কার তুলিয়াছিলেন। কবি বুঝি এই কথারই ইঙ্গিতে গাহিয়াছেন,—

"ভুবন পাবন বীণা সদা তার সুধা কণ্ঠে বাজে।"

কবি প্রথমেই আমাদিগকে শান্তিরসে আত্মহারা করিয়া তুলিয়াছেন। অকূল সমুদ্র-তটে জয়দেব দাঁড়াইয়া। কবি, তখন তাঁহার মানসিক অবস্থার সহিত বহিঃ-প্রকৃতির এক অপূর্ব্ব মিলন ঘটাইয়া তুলিয়াছেন,—

* * * *

দাঁড়াইয়া ব্রহ্মচারী, অনন্ত সে অচল বেলায়
অম্বর-সমুদ্র-মধ্যে—মিশে গেল জলধি-মন্থন—
ডাকিয়া এনেছে তারে কে অজানা আপনার জন।"

জগন্নাথদেবের বিরাট মন্দির-চূড়া,—সিংহদ্বার-তলে ধ্যান মগ্ন যোগী লুটাইয়া পড়িয়াছেন। বাহিরের রূপ হইতে নেত্রকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া, ভক্ত কবি মহাযোগীর সহিত দেখিতেছেন,

"ব্রহ্ম তাঁর বহির্নেত্র, মৃত্যু-মুক্ত অনন্ত-জীবন
হেরিল বেদীর পরে অন্তরঙ্গ পূর্ণ সনাতন,
নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বরূপোত্তম
নীল মাধবের কান্তি, উজলিছে স্থাবর-জঙ্গম।"

"মঙ্গলগীতি" কবিতায় ভক্ত কবি ব্রহ্মময় জগৎ দেখিয়াছেন,—

"শাশ্বত যাঁর করুণা উৎসে রচিত বিশ্বব্যোম।"

এই একটী পংক্তিতে তাহার সম্পূর্ণ সার্থকতা করিয়াও কবি তাঁহার প্রাণের তৃষ্ণা মিটাইতে পারেন নাই। তিনি বিশ্বের প্রতি বিন্দুতে-বিন্দুতে পরব্রহ্মের আস্বাদ পাইয়াছেন,—

"ঘোষণা করিছে যাঁহার মহিমা মরুতের কানে-কানে,
ঝঙ্কার উঠে নীল জলধিতে উত্তরোল কলতানে।
যিনি বরেণ্য, বরদ পূর্ণ রুদ্র মঙ্গল-দাতা,
লীলা যাঁর এই দ্যুলোক, ভূলোক, যিনি পিতা, যিনি মাতা,
জ্যোতিরূপ যাঁর মণি-কাঞ্চনে, রসরূপ তরু ভূণে,
জীবনে যাঁহার আনন্দরূপ, মনঃবুদ্ধি ও জ্ঞানে। ইত্যাদি।

"কুণাল কাঞ্চন" কবিতা মহারাজ অশোকের বেদনার একটী করুণ কাহিনী। কি পুরুষ, কি নারী, যখন প্রবৃত্তির তাড়নায় অধীর হয়, তখন জগতের এমন কোন নারকীয় কর্ম্ম নাই, যাহা তাহাদের নিকট ন্যায় বিগর্হিত বলিয়া মনে হয়। সপত্নী-পুত্রের উপেক্ষায় তিষ্যরক্ষিতার অবস্থা—

"যৌবনে উঠিছে কি মদ-মদিরা, নাগিনে মদ্যাহতা;
চীৎকারি ওঠে ক্ষিপ্ত বাতাসে প্রতিশোধ-মাদকতা।
পাগল করেছে যে নয়ন-মণি;
হরিব গো তার আলোর অবনী
জ্বলে চক্ষে, কপোলে, বক্ষে উন্মাদ চপলতা।"

আর অপত্য-স্নেহ মানুষের সমস্ত অভিমান ভাসাইয়া দেয়, সেই অপত্য-স্নেহের প্রবাহ-মুখে স্বপ্ন-শয্যায় প্রভাতের প্রথম আলোকে নিদ্রোত্থিত অন্ধ পুত্রকে দেখিয়া—

একি অক্ষিহীন! নৃপতি অশোক লুটায় ধরার পরে!—

এই করুণ কাহিনী চিত্রে, আমরা মনে করি, কবি সম্পূর্ণ কৃতার্থ হইয়াছেন।
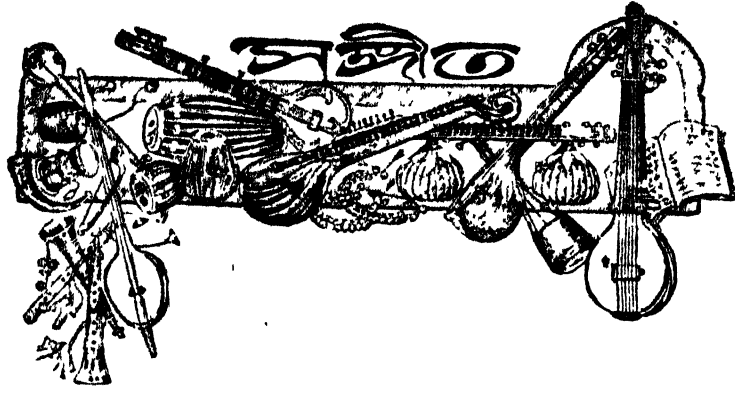
স্বরলিপি—প্রোফেসর প্রমথনাথ রায়। (Banjoist).

মসিদ্‌খানি গৎ

রাগিণী—ইমন্—তাল—ঢিমে কাওয়ালি।

(ম)

আস্থায়ী।

	১	২	৩	০
গ গ	ঋ নি নি স ঋ	গ গ গ ঋ ঋ	গ ধধ প প	ম গ ঋ
* ডে ড়ে	ডা ডে ড়ে ডা ড়া	ডা ড়া ডা ডেড়ে	ডা ডেড়ে ডা ড়া	ডা ড়া ডা
তা	তেটে ধিন্ তেটে ধিন্	ধা ধিন্ ধিন্ ধা	ধিন্ ধাগে তেরে কেটে	না তিন তিন্ Repeat

১	২	৩	০
ঋ স স নি স	ধ্ নি ধ্ নি ঋ	স ঋ গ ম	নিধ পম গঋস
ডা ডে ড়ে ডা ড়া	ডা ডে ড়ে ডা ড়া	ডা ড়া ডা ড়া	ডেড়ে ডেড়ে ডিড়ি ডিড়ি *
তেটে ধিন্ তেটে ধিন্	ধা ধিন্ ধিন্ ধা	ধিন্ ধাগে তেরে কেটে	না তিন্ তিন্ Repeat

অন্তরা।

১	২	৩	০
ম প প ধ নি	স নি ঋ স	নি ঋ ঋ গ ঋ	স স স স স
ডা ডেড়ে ডা ড়া	ডা ড়া ড়া ড়া	ডা ডে ড়ে ডা ড়া	ডে ড়ে ডা ড়া ডা
তেটে ধিন্ তেটে ধিন্	ধা ধিন্ ধিন্ ধা	ধিন্ ধাগে তেরে কেটে	না তিন্ তিন্ তা

১	২	৩	০
স নি নি ঋ স	নি ধ প ম গ	গ নি নি ধ ধ	পম গঋ স
ডা ডে ড়ে ডা ড়া	ডা ড়া ডেড়ে ডা	ডা ডেড়ে ডা ড়া	ডেড়ে ডেড়ে ডা *
তেটে ধিন্ তেটে ধিন্	ধা ধিন্ ধিন্ ধা	ধিন্ ধাগে তেরে কেটে	না তিন্ তিন্ Repeat

বিশ্ব-ভারতী

[শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র, এম-এ, বি-এল্]

কথা সাহিত্যিকের ব্যবসা-বুদ্ধি

নিউইয়র্ক-টাইমস্ পত্রে স্পেন দেশের সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক Visente Blasco Ibanez তিনজন কথা-সাহিত্যিকের ব্যবসা বুদ্ধির বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্মাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

য়ুরোপে – শুধু য়ুরোপ কেন সকল দেশেই সাহিত্যিকের দুঃস্থ। সর্ব্বত্রই বাণীর চরণ-কমল-সেবীরা দরিদ্র। আবার ব্যবসায়ী লোকেরা সৌন্দর্য্যজ্ঞানশূন্য। কলা ও ব্যবসায়িকা বুদ্ধির একত্র সমাবেশ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। আমার মনে হয় বালজাকের মত ব্যবসা বুদ্ধি আর কোন সাহিত্যিকেরই ছিল না। তাঁহার মত ভাবপ্রবণই বা কয়জনকে দেখিতে পাওয়া যায়, মানব-জীবনের সকল অবস্থার সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন। টাকাকড়ির হিসাব তিনি বেশ বুঝিতেন। আর আমার বোধ হয়, তিনিই সর্ব্বপ্রথমে অর্থকে নায়করূপে কথা সাহিত্যে চিত্রিত করিয়াছেন। কোন ব্যবসায়ী লোক যদি বালজাকের লেখার সহিত পরিচিত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাঁহার প্রখর ব্যবসা বুদ্ধি ছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবন-বৃত্ত লেখকেরাও অনেকেই এ কথার যাথার্থ্য স্বীকার করেন না। তাঁহার মুদ্রা-বিষয়ক পরিকল্পনাগুলির উল্লেখ করিয়া তাঁহারা হাস্য করিয়া থাকেন। এই সব পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া তিনি অনেক টাকা লোকসান দিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্যন্ত যে ঋণভারে তিনি প্রপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহা ব্যবসায়ের জন্য— তাঁহার নিজের অপরিমিত-ব্যয়িতার জন্য নয়।

— তাঁহার কল্পনাগুলি যে সুন্দর ছিল, এ কথা সকল ধনীকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। সে সময়কার কোন ধনীই তাঁহার ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদর্শী ছিলেন না। তাঁহার অকৃতকার্য্যতার প্রধান কারণ, তিনি দূর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া থাকিতেন; বর্ত্তমানের দিকে তাঁহার লক্ষ্য আদৌ ছিল না। তাঁহার পরিকল্পনাগুলিও সময়ের উপযোগী ছিল না। তাঁহার চিন্তাধারা বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। সার্দ্দিনিয়ার তাম্র খনিগুলির চারিদিকের বাঁধগুলি ভাঙ্গিয়া কার্য্য করিবার পরিকল্পনাও তাঁহার মাথায় আসিয়াছিল। আবার এক সময়ে ইতালীর দ্বীপাবলীতে ভ্রমণকালে তিনি অনেকগুলি ধাতব-পদার্থ মিশ্রিত অবস্থায় বহু শতাব্দী ধরিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, এগুলি হইতে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে ধাতুগুলি বাহির করিতে পারিলে, বেশ লাভবান হইতে পারা যায়। প্যারীর ব্যবসায়ী লোকেরা এই উদ্ভট পরিকল্পনা শুনিয়া সে সময় প্রাণ ভরিয়া হাসিয়াছিলেন; কিন্তু সুখের বিষয় ইহার অল্প দিন পরেই জনৈক ইংরাজ ব্যবসাদার তাঁহার উদ্ভাবিত পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া প্রভূত পরিমাণে লাভবান হইয়াছেন।

সম-সাময়িক লোকেরা সুপ্রসিদ্ধ লামার্টিনকে 'রাজহংস' আখ্যা দিয়াছিলেন। বাস্তবিকই তাঁহার প্রকৃতি রাজহংসের প্রকৃতির মত বড়ই মধুর ছিল—ধীরভাবে কার্য্য করিবার শক্তি তাঁহার মত কম লোকেরই দেখা যায়। পার্লামেণ্ট মহাসভায় আয়ব্যয়ের হিসাবের আলোচনার সময় তাঁহার তীক্ষ্ণ ধীশক্তির পরিচয় তিনি বহুবার দিয়াছেন। কৃষিবিদ্যা-বিষয়ক কোন কথায়, বা তাহার হিসাব সংক্রান্ত কোন কথা উঠিলে, তাঁহার মতের উপর অনেকেই আস্থা স্থাপন করিতেন। উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত দ্রাক্ষালতার ক্ষেত হইতে তাঁহার নব-উদ্ভাবিত উপায়ে তিনি বিস্তর ফললাভ করিয়াছিলেন। আশেপাশের দ্রাক্ষালতার চাষকারী ব্যবসাদার লোকেরা কোন প্রকারেই সে রকম ফসল উৎপাদন করিতে পারিত না। কবি যখন পবিত্র জেরুজেলামে তীর্থ করিবার মানসে গমন করেন, তখন তাঁহার মনে হয়, এখানে একটী ফরাসী উপনিবেশ স্থাপন করিয়া, তাহাতে দ্রাক্ষালতার চাষ ও সিরিয়া প্রদেশে রেশমের আবাদ করিলে খুব লাভবান হইতে পারা যায়। কবির মনে পরি-

কল্পনার উদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হইল। জমি খরিদ হইল। কিছুদিন কার্য্যও বেশ চলিল; কিন্তু যেরূপ অনন্যমনা হইয়া কার্য্য করিলে কার্য্যকে সফলতা দান করিতে পারা যায়, কবির তাহা ছিল না,—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁহার উপাসকের মন নানাদিক হইতে আকৃষ্ট করিতে লাগিল। কাজে শিথিলতা আসিল,—ক্রমে ব্যবসায়ে ক্ষতি হইতে লাগিল। যে টাকা মূলধন ফেলিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা অনেক কম টাকায় ব্যবসা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ইংরাজ বণিক উহা গ্রহণ করিয়া বেশ লাভবান হইয়াছেন।

ভিক্টর হিউগো জীবনের অধিকাংশ সময় কেবল মাত্র জীবন-ধারণোপযোগী অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেন। এখনকার মত তখন নাটক ও উপন্যাস বিক্রয় করিয়া অর্থলাভ হইত না। হিউগোর পরিবারবর্গও বেশী ছিল। তাহাদের অন্নসংস্থান করিতে তিনি পারিতেন না। রিপাবলিকের তিরোধান ও তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নির্ব্বাসিত হন। পরিবারবর্গের জন্য সমস্ত রাখিয়া, হিউগো সামান্য কয়েক টাকা লইয়া, বেলজিয়াম ও ইংলণ্ডে গমন করেন। জার্ম্মাণীতে অবস্থান কালে তাহার বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছিল; সঙ্গে-সঙ্গে অর্থেরও সমাগম হইয়াছিল। 'লে মিজারেবল' লিখিয়া পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক ও অন্যান্য পুস্তক লিখিয়া ঐরূপ আরও পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

লে মিজারেবেলের প্রকাশক La Croix যখন চুক্তিপত্র লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, তখন তিনি তাহা পাঠ করিতে কিছুতেই স্বীকৃত হন না। সমস্ত রাত পরিশ্রম করিয়া তিনি স্বয়ং এক চুক্তিপত্র প্রস্তুত করেন। প্রকাশক, সাহিত্যিকের ব্যবসায়-বুদ্ধি দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার 'স্মৃতিকথায়' এ সম্বন্ধে ক্রয় লিখিয়া গিয়াছেন, 'য়ুরোপে সমস্ত আইনব্যবসায়ীরা একত্র হইলেও, হিউগোর লিখিত চুক্তিপত্র অপেক্ষা বিশদ-ভাবে সুন্দর করিয়া লিখিতে পারিতেন না।' হিউগো প্যারীতে আসিয়া তাঁহার সমুদায় অর্থ পতিত জমী খরিদ করিতে নিয়োজিত করিলেন; ও উহার উপরে অনেকগুলি সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারীরা সেগুলি বিক্রয় করিয়া দেন। যদি হিউগোর ন্যায় তাঁহাদের ব্যবসা-বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে আজ তাঁহারা ধনকুবের হইতে পারিতেন।

আর্ট ও শরীরতত্ত্ব (Anatomy)

পুরাতনের দোহাই দিয়া চিত্রে একটা নূতনত্বের সৃষ্টি হইতেছে। এদেশে এরূপ চিত্রের নামকরণ হইয়াছে 'ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি'। এ সকল চিত্র শরীরতত্ত্বের নিয়মানুসারে অঙ্কিত হয় না। ইহাদের প্রধান লক্ষ্য ভাব পরিস্ফুটন। এ সম্বন্ধে আমরা জনৈক পাশ্চাত্য মনীষীর লেখনী হইতে দু'একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতে চাই:

'পুরাতন কলাবিদের চিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব হইতেছে—তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্রগুলি শরীরতত্ত্বের নিয়মানুসারে অঙ্কিত।

'পুরাতন চিত্রকরেরা মনস্তত্ত্বের অনুশীলন করিয়া যে পেশী যে ভাবের উদ্দীপক করে, তাহাই চিত্রে অঙ্কিত করিতেন। ফটোগ্রাফের সাহায্যে মানুষের মূর্ত্তি তুলিতে পারা যায়; কিন্তু চিত্রকর তুলিকার সাহায্যে ভাবের চিত্র করিয়া অঙ্কিত মূর্ত্তিকে সজীব করিয়া দেন। 'বোদের চিত্রগুলির মধ্যে বিভিন্ন ভাবের যে চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অন্যত্র সুদুর্লভ। প্রসিদ্ধ লেওনার্দো দা ভিঞ্চির 'মোনালিসার' ওষ্ঠপ্রান্তের কুঞ্চন যে ভাব অভিব্যক্ত করে, তাহা শারীরবিদ্যার পরিপন্থী।

সিনেমার চিত্রকরেরা মুখমণ্ডলের পেশীসমূহের পরিবর্ত্তনের সহিত যে ক্রমধারায় ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা শারীরবিদ্যার আইনকানুন মানিয়াই চলিয়া থাকে।

লেখক মহাশয় চার্লি চেপলেনের ভাবের অভিব্যক্তির দু'একটা উদাহরণ দিয়া কথাটা বিশদ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদিগের বিশ্বাস, চার্লি চেপলেনের নিকট অতদূর যাইতে হইবে না। বাঙ্গালার কলাকুশলী ধীরেন্দ্রনাথের ভাবের অভিব্যক্তির চিত্রগুলি দেখিলেও এ কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। আসল কথাটা হইতেছে, ভাবস্ফুরণ ও মাংসপেশীর সম্প্রসারণ ও কুঞ্চন এক সঙ্গে সম্পাদিত হইয়া থাকে। মনোবৃত্তির অভিব্যক্তি আমরা শরীরের পেশী সকলের কার্য্য দেখিয়া পাঠ করিয়া থাকি। তাই বলিতেছি, মনোবৃত্তির স্ফুরণ চিত্রিত করিতে হইলে শারীর-বিদ্যার সাহায্য লইতেই হইবে।

আনাতোল ফ্রান্স

'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্ত হইয়া যাহারা বিশ্ব-সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাঁহাদের নামের তালিকায় আনাতোল ফ্রান্সের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ্ব-সাহিত্যের সমালোচকগণ কিন্তু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, জীবিত সাহিত্যিকগণের মধ্যে আনাতোল ফ্রান্সের স্থান বহু উর্দ্ধে। সেদিন New York World পত্রে Joseph F. Gould মহোদয় তাঁহার সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এখানে উদ্ধার করিয়া দিলাম।

'এরূপ অনেক পুস্তক লিখিত হইয়াছে, যাহার পাঠক-সংখ্যা খুব কম। প্রকাশকদিগের কৃপায় দু'একখানি করিয়া তাহাদের কাটতি হয়। সুমেরুর (North Pole) নিকট ভাসমান সুবৃহৎ বরফখণ্ড (Iceberg) যেমন মানুষের কোন কাজে লাগে না, কিন্তু কোন গতিকে যদি উহাকে নিউ ইয়র্কের পথদিকে আনিতে পারা যায় তাহা হইলে উহা শত শত ব্যক্তির আরামের কারণ হইয়া থাকে, সেইরূপ আনাতোল ফ্রান্সের আদর্শ যদি পৃথিবীর মানবের সমক্ষে ধরা যায় তাহা হইলে মানব উপকার লাভ করিয়া চরিতার্থ হইবে। অবশ্য ফ্রান্স দেশের তিনি একজন ভবিষ্যদ্বক্তা; তাঁহার বাণী এ্যাংলো স্যাক্সন্ জাতির জন্য লিখিত, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা দেশ কাল পাত্রের অতীত।

এডওয়ার্ড গারনেটের মতে ফ্রান্স এ্যাংলো স্যাক্সন জাতিকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, জীবনের একটা হাল্কা দিকও আছে। সকল সময় গম্ভীর হইয়া থাকিলে চলিবে না। আর এ শিক্ষা ডিকেন্সের পর, আর আমরা বড় একটা পাই নাই।

রস রচনায় আনাতোল ফ্রান্স সিদ্ধহস্ত। W. Courtney সাহেব তাঁহাকে ইংরাজী লেখক Lawrence Sterneএর সহিত এক পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। গম্ভীর ও তরল সকল বিষয়েই তিনি সহানুভূতির সহিত লিখিয়া গিয়াছেন। ছোটবড় সমস্ত ঘটনাকে যিনি লেখনী-গুণে বড় করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন—যাহার নিকট জীবন সুখ-দুঃখময়—যিনি সামান্য একটা ঘটনাকে বিয়োগান্ত করিয়া লোককে কাঁদাইতে পারেন—তাঁহার শক্তি বাস্তবিকই অসাধারণ।

কোন এক সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক এক সময়ে বলিয়াছিলেন। Thackeryকে বিশ্ব-নিন্দুকের (Cynic) পর্য্যায়ে ফেলা যায় না; কারণ, তিনি নির্ব্বোধ লোকদিগকে ভালবাসিতেন। ফ্রান্স সম্বন্ধে এ কথা প্রয়োজ্য নয়। সংযম তাঁহার লেখনীর ভূষণ। ক্ষমা তাঁহার চরিত্রের মহত্ব। মানবের দুর্ব্বলতার প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নির্ব্বোধ ও অসৎ প্রকৃতির লোকদিগের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্রূপাত্মক বাণী আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গমের ন্যায় নিয়তই নিঃসৃত হইয়া থাকে। তাঁহার শ্লেষগুলি বিষাক্ত তীরের ন্যায় মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করে। অত্যাচারী তাহার বিদ্রূপে উত্ত্যক্ত হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না।

কিন্তু এই শ্লেষ-বিদ্রূপের ভিতর কোনরূপ ব্যক্তিগত ঈর্ষা নাই। মশকের ন্যায় ইহা ক্ষত স্থানেই দংশন করে। সুইফ্‌টের বিদ্রূপের তিক্ততা ইহাতে নাই—পোপের ব্যক্তিগত ঈর্ষার ভাবও ইহাতে নাই - ইহাতে আছে সরলতা—ইহাতে আছে সেই শক্তি, যাহা অন্যায়কে দূর করিয়া শান্তির রাজ্য স্থাপন করিতে পারে।

এ শক্তির মূল বুঝিতে হইলে, মানুষটাকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। কলা ও দর্শনের অপূর্ব্ব সম্মিলনে আনাতোল ফ্রান্সের জন্ম। কথাটা একটু বিশদ করিয়া বলা উচিত। প্রকৃত মানুষের মধ্যে দুইটী বিরোধীয় শক্তিকে কার্য্য করিতে দেখিতে পাওয়া যায়—সৌন্দর্য্যজ্ঞান বা কলা ও দার্শনিকতা। দার্শনিকতা মানবকে আদর্শভ্রষ্ট হইতে দেখিলে তাহার প্রতি বিরূপ হয়। ধর্ম্মভীরু দার্শনিক অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিতে পারে না। সত্য ও ন্যায়ের রাজত্ব প্রতিষ্ঠাই তাহার কার্য্য; কিন্তু দার্শনিক একটা কথা ভুলিয়া যান যে, মানব সহজ-দুর্ব্বল। আর এই কথাটা বুঝিয়াছিলেন বলিয়া, দার্শনিক ফ্রান্স কোমল-প্রকৃতির ছিলেন; তাই আমরা তাঁহাকে মানবতার উপাসক রূপেই দেখিতে পাই—তাঁহার প্রাণের কামনা, আদর্শ মানব প্রস্তুত করা। আবার অন্য দিকে তিনি কলাবিৎ। কলার ধর্ম্মই হইতেছে নিয়মানুসরণ করা। নিয়ম অতিক্রম করিয়া চলিলে, কলাবিৎ তাহা সহ্য করিতে পারেন না। তাই কলাবিৎ প্রায়ই কঠোর-প্রকৃতি-সম্পন্ন হইয়া থাকেন। এই কোমলে-কঠোরে, উজ্জ্বলে-মধুরে মিলাইয়া আনাতোল

ফ্রান্স যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বড় মধুর—বড় সুন্দর!

ভবিষ্যৎ মানব

প্রসিদ্ধ জাতিতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক কিথ সাহেব লণ্ডনের রয়েল ইনষ্টিটিউটের সেদিনকার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, প্রসিদ্ধ ক্রমবিকাশবাদী H. G. Wells এর মতে ভবিষ্যৎ মানব কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী হইবে; কিন্তু এ কথাটা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। অভিব্যক্তিবাদে মানব যতই উন্নত হউক না কেন, ভবিষ্যতেও সে দোষে-গুণে জড়িত মানবই থাকিবে; পূর্ণত্ব সে লাভ করিতে পারে না—কেবল শুদ্ধ বুদ্ধি লইয়া কখনই সে জন্মগ্রহণ করিবে না—ভাবপ্রবণতা তাহার থাকিবেই থাকিবে—প্রেম ও ভালবাসার হাত হইতে তাহার কোনকালেই নিষ্কৃতি নাই।

মস্তিষ্কের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, মানবের বৃহৎ মস্তিষ্ক (Cerebrum) ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের উপর (Cerebellum) আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। বৃহৎ মস্তিষ্ক চিন্তা ও কার্য্যকরী শক্তির, আর, ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক বেদনা (emotion) সহজ সংস্কার (Instinct) ও কুসংস্কারের (Prejudice) জনক। এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের কার্য্যকলাপ মানব বনজঙ্গলের পশুদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। বৃহৎ মস্তিষ্কের কার্য্যাবলী মানব উত্তরাধিকারী-সূত্রে প্রাপ্ত।

আমাদের সহজ-সংস্কার (Instincts) যেমন কমিতে থাকে, বেদনা-অনুভূতি (Emotions) ও ভাব তেমনি বাড়িতে থাকে। পথের একতারা-বাদক ভিখারী ও মোটা-মাহিনার থিয়েটারের বাদকের মধ্যে যে প্রভেদ, বনমানুষ ও মানুষের অনুভূতির মধ্যেও পার্থক্য ততটুকু। এ কথাটা ভুলিলে চলিবে না।

অনেকেরই ধারণা, ভবিষ্যৎ মানব কেবল চিন্তা ও ইচ্ছা-শক্তির কেন্দ্র বৃহৎ মস্তিষ্ক লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, আর বেদনা, অনুভূতি, সহজ-সংস্কার তাহার থাকিবে না। এক কথায় বলিতে গেলে ভবিষ্যৎ মানব বৃহৎ মস্তিষ্ক ও ক্ষুদ্র দেহ বিশিষ্ট জীব হইবে।

ইনষ্টিন্-নিউটন, আলেকজেন্দার-নেপোলিয়ন, আরিস্ততল-কান্ট, তোমরা সেক্সপিয়রের এরূপ চিত্র একবার কল্পনা করুন। এরূপ চিত্র দেখিলে কি আপনারা সুখী হইবেন?

বাস্তবিকই বেদনা ও অনুভূতিকে কোন প্রকারে দূর করিয়া দিতে পারিলে—পশুভাবকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিলে—শুদ্ধ বোধশক্তি মানব পাওয়া যাইবে, অনেকের এরূপ একটা ধারণা আছে। মালীরা যেমন পরিশ্রম ও বুদ্ধিবলে ফলমূল-গুলি হইতে ঐ পদার্থসমূহ নির্বাচিত করিয়া মানবের উপভোগযোগ্য করিয়া থাকে, সেইরূপ মানবের ভিতর হইতে পশুভাবগুলিকে নির্বাচিত করিয়া শুদ্ধ মানব পাওয়া যাইতে পারিবে।

কিন্তু মনে রাখা উচিত, এ কল্পনা আকাশকুসুম। ভাবের জন্যই মানুষ সবকে আপন করিতে পারে—সহকর্মী হইতে পারে। জগতে যাহা কিছু বড় কাজ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। ভাব-প্রবণ না হইয়া কেহ কি কাজ করিতে পারে?

তাই বলিতেছিলাম, ভাব ও ইচ্ছাশক্তি লইয়া এখনকার মানব যেরূপ আছে, ভবিষ্যৎ মানবও সেইরূপ থাকিবে।

সারা বার্ণহার্ট

সকলেই জানেন সারার বয়স এখন ৭৭ বৎসর। তাঁহার শরীরে কোনও জরা ও বার্দ্ধক্যের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন, তিনি মিতাচারপরায়ণা বলিয়া এরূপ হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, Thyroid gland চিকিৎসার জন্য তাঁহার শরীরের বাঁধন এখনও এরূপ শক্ত রহিয়াছে। কিন্তু সারার নিজের মতে কার্য্যে অনলসতা, কার্য্য-কুশলতা ও কার্য্য করিবার শক্তিই তাঁহার স্বাস্থ্যকে অটুট রাখিয়াছে। প্রায় ষাট বৎসর কাল অভিনয় কলার উন্নতির জন্য যে চেষ্টা ও সাধনা করিয়া আসিতেছেন, সেই চেষ্টাই তাঁহার নিকট হইতে সাংসারিক দুশ্চিন্তাগুলিকে দূরে রাখিয়াছে।

জীবনের প্রারম্ভ হইতে সারা সকল কাজ নিয়মের অধীন থাকিয়া এরূপ স্বাস্থ্য-সম্পদ লাভ করিয়াছেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে ৮টার সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতরাশ সম্পন্ন করেন। তৎপরে চিঠিপত্রাদি লিখিয়া থাকেন ও দৈনিক সংবাদগুলি পাঠকের নিকট হইতে শুনিয়া

থাকেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পূর্ব্বে দু'একজন আগন্তুকের সহিত কথাবার্ত্তা কন; তার পর ভ্রমণ করিতে যান। ফিরিয়া আসিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজন সম্পন্ন করেন; এবং যে দিন থিয়েটারে ম্যাটিনী থাকে, সে দিন অভিনয় করিতে যান; এবং না থাকিলে, আবার গাড়ীতে করিয়া বেড়াইতে যান; এবং সায়াহ্নের অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হন। তার পর রাত্রিতে ভোজন করিয়া বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত আলাপ করিয়া থাকেন। অভিনয় কলার উন্নতির জন্য রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত পাঠ ও উপদেশাদি দিয়া থাকেন। তৎপরে নিদ্রা যান। এসব কাজ তিনি ঘড়ির কাঁটার মত করিয়া থাকেন।

তাঁহাকে একজন মনীষী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বলিতে পারেন আপনি কি করিয়া অটুট স্বাস্থ্য ও যৌবনকে চিরসঙ্গী করিয়া রাখিয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি বৃদ্ধ হইতে চাই না, তাই আমি চির-যৌবনা। বৃদ্ধা হইবার অবসর আমার নাই—আমার অনেক কাজ। যৌবন সুলভ কার্য্য করিবার শক্তিই আমাকে বৃদ্ধায় পরিণত করে নাই। আর এক কথা, আমি জীবনে করসেট ব্যবহার করি নাই। প্রকৃত কলাবিদের নিকট কাল আপনার রেখাচিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে না। যাহারা পর-চিন্তা ও দুশ্চিন্তা বুকে পোষণ করে, কাল তাহাদেরই উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে।

জাপানে মার্কিণ মহিলা-কবি

প্রতি বৎসর জাপানের সম্রাট মিকাডো দশজন প্রধান কবিকে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন। এ বৎসর এই দশজনের অন্যতম কবি হইতেছেন চার্লস বারনেট-পত্নী। বারনেট সাহেব টোকিয়োস্থিত মার্কিণ মিলিটারি এটাচির পত্নী। কবিতার বিষয় ছিল, 'প্রাতঃকালে আইসি মন্দির দ্বারে।' ১৭০০০ হাজার কবিতা আসিয়াছিল। কবিতাগুলি জাপানী ভাষায় লিখিত। বিদেশীর ভাগ্যে এই পুরস্কার লাভ এই প্রথম। আর এটা বড় কম সৌভাগ্যের কথা নয় যে, একজন বিদেশিনী দুরূহ জাপানী ভাষা আয়ত্ত করিয়া, সেই ভাষায় মনোমদ কবিতা লিখিয়াছেন। ইনি আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ মহিলা কবি।

ইঙ্গিত

[শ্রীবিশ্বকর্ম্মা]

আজ একটু তামাক চর্চ্চা করিব। অন্ন-পানের ন্যায় ধূমপানও আজকাল প্রায় সর্ব্বসাধারণের নিত্য নিয়মিত কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সুতরাং তামাকের কথার আলোচনাটা বেশ সহজ, এবং বোধ হয়, মুখরোচকও হইবে। যাঁহারা চুরুট খান, আগে তাঁহাদিগকে লইয়াই পড়া যাক। এক কাজ করুন। চুরুটের ছাইগুলি একটা টীনের সিগারেটের কিম্বা বাঁশির কৌটায় জমা করুন। যিনি রোজ যে কয়টা চুরুট খান, তার ছাইগুলি যেখানে-সেখানে ফেলিয়া না দিয়া, য়্যাস-ট্রে কিম্বা টীনের কৌটায় জমা করুন। দুই-চার দিন জমা করিলেই, এক কৌটা ছাই জমা হইবে। সেই ছাইয়ের কতকগুলি একটা চীনা-মাটির ডিসে রাখিয়া, তাহার উপর দুই চারি ফোঁটা সজল নাইট্রিক বা সালফিউরিক এসিড ঢালিয়া দিন। কি দেখিতেছেন? খুব ফেণা উঠিতেছে না? ইহাতে কি বুঝিলেন? চুরুটের ছাইয়ে যে তীব্র ক্ষার-পদার্থ আছে, সেই ক্ষার এসিডের সঙ্গে মিলিয়া 'লবণে' (আমরা যে লবণ খাই, সে লবণ নয়—রসায়ন-শাস্ত্রে এক-জাতীয় পদার্থের সাধারণ নামই লবণ) পরিণত হইতেছে। জানিয়া রাখুন, এই চুরুটের ছাই জমির খুব উৎকৃষ্ট সার। আর এই চুরুটের ছাই দাঁতের মাজন-রূপে ব্যবহার করিলে দাঁত খুব পরিষ্কার হয়। তবে যাঁহারা ধূম-পান করেন না, তাঁহাদের হয় ত এই ছাই ব্যবহার করা সুবিধাজনক হইবে না; কারণ, ছাইয়েরও কিঞ্চিৎ মাদকতা-

শক্ত আছে ; এবং সেই জন্য কিছু বিবাদ লাগিতে পারে — মনোদ্রেকও হইতে পারে।

এই ছাই হইতে যে ক্ষার বাহির হইতে পারে, তাহা বাহির করিবার প্রণালী স্বতন্ত্র এবং একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনার যোগ্য। সেই জন্য আজ সে কথা আর পাড়িব না, আর একদিন সে কথা হইবে। এখন চুরুট লইয়া আরও একটু আলোচনা করিতে হইবে।

চুরুটসেবীরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, চুরুটের যে দিকটা তাঁহাদের মুখের ভিতর থাকে, সে দিকটা ক্রমে ভিজিয়া একপ্রকার ঘোলাটে মলিন হরিদ্রা বর্ণের মত পদার্থ বাহির হয়। তামাকের পাতা ঠাণ্ডা জলে ভিজাইলে, বা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লইলেও এই পদার্থ বাহির হয়। এই জিনিসটি হইতে কয়েকটি ঔষধ প্রস্তুত হয়। তন্মধ্যে একটা একশিরার ঔষধ। এই ঔষধ জল টানিয়া শুষিয়া লওয়ায় অতি অল্প দিনের মধ্যে একশিরা রোগ ভাল হয়। একশিরার মত পেটেন্ট ঔষধ আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশের প্রধান উপাদান এই পদার্থ ; অপর উপাদান হিসাবেও। তামাকের পাতার নির্যাস হইতে অনেক ডাক্তারী ঔষধ তৈয়ার হয়। ডাক্তারী ঔষধ প্রস্তুত করিবার পুস্তকে (Pharmacopoeia) মতে এই নির্যাস বাহির করিবার প্রণালী একটু বিশেষ রকমের। আমি মোটামুটি একটা প্রণালী দিতেছি, তাহাতে খুব নিখুঁত ভাবে না হউক, অনেকটা কাছাকাছি ভাবে কতকটা বিশুদ্ধ নির্যাস পাওয়া যাইতে পারে।

একটা পাত্রে জল গরম করিতে দিন। পাত্রটি এমন হইবে যে, জল গরম হইয়া বাষ্প হইলে, সেই বাষ্প একটু সরু গোছের নলের মত পথ দিয়া বাহির হইতে পারে। ষ্টীমারে ডেকের নীচের খোলের ভিতর হাওয়া চালাইবার জন্য যে ফানেল থাকে, তাহার আকৃতি যেমন, এই নলটির আকৃতি সেইরূপ হইলেই চলিবে। সেই নলের মুখ-বরাবর মুখের ঠিক সামনে পাতাগুলিকে দড়ি দিয়া ঝুলাইয়া এমন ভাবে রাখিয়া দিন, যেন, গরম জলের বাষ্প পাতাগুলিতে লাগিতে পারে। সেই বাষ্পের তাপে ও আর্দ্রতায় তামাকের নির্য্যাস বাহির হইতে থাকিবে ; এবং নিম্নস্থিত একটা পাত্রে টস্‌টস্ করিয়া পড়িবে। কিছু রস সংগৃহীত হইলে দেখা যাইবে, সেটা অনেকটা গুড়ের মত। যদি বড় পাতলা হয়, তবে তাহা vapour bathএ ঘন করিয়া লইতে হইবে।

জিনিসটি মাত্র গুড় বা মধু [illegible] অবস্থায় আনা চাই। [illegible] মত।

[illegible] অবস্থায় [illegible] হইতে [illegible] ঠিক [illegible] হয় না। [illegible] তামাকের পাতা [illegible] লইয়া, [illegible] কয়েকটি [illegible] হয়। ঐ সকল [illegible] তামাকের [illegible] কাজেই [illegible] আসে। [illegible] অবস্থায় তামাকের [illegible] চুরুট [illegible] পাকাইয়া [illegible] আমাদের [illegible] প্রভৃতি [illegible] দামী চুরুট [illegible] পাকাইয়া [illegible] আমোদিত হইয়া [illegible] চুরুটের উপযোগী তামাকের [illegible] অনেকটা হওয়া চাই।

[illegible] অথবা চুরুট-সিগারেটের [illegible] তামাকের [illegible] cure করিয়া না লইলে [illegible] ব্যবহারোপযোগী হয় না। এদেশে যাহা তামাক, অর্থাৎ যাহা কলিকায় সাজিয়া হুঁকায় খাইতে হয়, সেই তামাক কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা অনেকেই হয় ত জানেন। তামাকের পাতাগুলি দা-য়ের (কাটারির) সাহায্যে কাটিয়া লইয়া 'দা-কাটা' তামাক প্রস্তুত হয়। অপর এক প্রকার তামাক ঢেঁকিতে কুটিয়া লওয়া হয়। দেশী তামাক-

ওয়ালারা কম দামের তামাকের পাতা হইতে ডাঁটাগুলি বাদ দেয় না; কারণ, তাহাতে মাল কমিয়া যায়। কিন্তু ডাঁটাশুদ্ধ তামাকের স্বাদ ভাল হয় না। সেইজন্য বেশী দামের তামাক প্রস্তুত করিবার সময় ডাঁটা বাদ দেওয়া হয়।

তামাক পাতা কোটা হইবার পর তাহার সহিত চিটাগুড় (তামাক-মাখা মাত গুড় বা molass) মিশাইতে হয়। ভাল তামাকের সঙ্গে, শুনিতে পাই, কাঁঠালের ভূতি, পাকা কলার খোসা প্রভৃতি মিশানো হয়। সেই মিশ্রিত তামাক "মাখা তামাক" নামে অভিহিত হয়। মাখা তামাক একটা মৃৎপাত্রে রাখিয়া, তাহা আবৃত করিয়া, মাটীর নীচে গর্ত্ত করিয়া, পাত্রটি একমাস কাল সেই গর্ত্তের ভিতর রাখিয়া দিতে হয়। এই সময়ের মধ্যে উহার কিছু রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে। সেই ক্রিয়াকে রসায়নের ভাষায় পচন-ক্রিয়া এবং ব্যবসায়ীদের ভাষায় cure করা বা tone আনা বলা যাইতে পারে। একমাস পরে পাত্রটি মাটীর ভিতর হইতে তুলিয়া লইয়া, তাহার ভিতর হইতে তামাক বাহির করিয়া লইয়া, আবার একবার ঢেঁকিতে কুটিয়া লইতে হয়। তখন মিশ্রণটি সম্পূর্ণ হয়। তৎপরে কাঁঠালের খাম্বিরা, এবং অন্যান্য গন্ধদ্রব্য মিশাইতে হয়। বেশী গন্ধদ্রব্য মিশাইলে তামাকের স্বাদ বিকৃত হয়।

চুরুট ও সিগারেট প্রস্তুত তৈয়ার করিবার সময় চুরুটের প্রকৃতি ভেদে বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়; এবং তাহাদের cure করিবার প্রক্রিয়াও স্বতন্ত্র। এই cure করিবার মসলার মধ্যে কয়েকটির নাম বলিতেছি; যথা, common salt, বা আমরা যে লবণ খাই সেই লবণ, nitre বা সোরা, শতকরা ৯৫ অংশ সুরাসার যাহাতে আছে এমন alcohol, tartaric acid, oxalic acid, চিনি, nitrate of ammonium, প্রভৃতি। এইগুলি জলে দ্রব করিয়া সেই জলে তামাকের পাতা ভিজাইয়া কিছুদিন রাখিলে cure অর্থাৎ mature করা হয়। এই cure করার গুণেই চুরুট-সিগারেটের বিশেষ একটা স্বাদ জন্মে। Cure করিবার মসলা সুনির্ব্বাচিত করিয়া লইতে পারিলে, অতি উৎকৃষ্ট চুরুট প্রস্তুত হইতে পারে, যাহার ধূম পান করিলে চুরুটসেবীর মন মোহিত হইয়া যায়।

কেবল cure বা mature করিলেই যথেষ্ট হয় না; উহার সঙ্গে কিছু গন্ধদ্রব্য মিশাইতে হয়। কিন্তু সে গন্ধদ্রব্য আতর গোলাপ অথবা এসেন্স নহে।

আমেরিকায় চুরুটে সুগন্ধ দিবার জন্য সাধারণতঃ নিম্নলিখিত জিনিসগুলি ব্যবহৃত হয়, যথা, orris, vanilla tonka, cascarilla, valerian, elecampane প্রভৃতি ইহা ছাড়া আরও অনেক আছে। দেশালায়ের কারখানার ন্যায় প্রত্যেক সিগার-সিগারেটের কারখানারও একটী করিয়া নিজস্ব recipe আছে। তবে এখানে যাহাদের নাম করা হইল, এগুলি খুব সাধারণ। এ সমস্তই উদ্ভিজ্জ পদার্থ। ইহাদের fluid extract or tincture ব্যবহৃত হয়। এই পদার্থগুলি জলে সিদ্ধ করিয়া বা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইলে fluid extract হয়; এবং alcohol-এ ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইলে tincture প্রস্তুত হয়। কোন-কোন স্থলে জল ও spirit দুইই একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। ঐ সকল উদ্ভিজ্জ পদার্থের একটা, দুইটা, বা ততোধিক এক-এক প্রকার চুরুট প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। ফ্রান্সে fluid extract of valerian, tincture of tonka ben ও alcohol অথবা tincture of valerian, butyric aldehyde, tincture of vanilla, ethyl nitrite ও alcohol এবং উপযুক্ত পরিমাণ জল ব্যবহৃত হয়।

পাঠকেরা বুঝিতে পারিতেছেন, এই সকল উদ্ভিজ্জ আমাদের দেশে জন্মে না। ঐগুলি এদেশে সংগ্রহ করা কঠিন। আর, সংগ্রহ করা গেলেও, তাহাদের মূল্য খুব বেশী পড়িবে। অথচ, আমাদের দেশে এমন যথেষ্ট গাছ জন্মে, যাহাদের গন্ধ অতি মনোহর। আমরা অনেক মসলা ব্যবহার করি, যাহাদের অতি মিষ্ট গন্ধ আছে। একবার আমরা সিগারের সঙ্গে oil of cinnamon ব্যবহার করিয়াছিলাম। তাহা খাইতে অতি মিষ্ট হইয়াছিল। তবে oil of cinnamon ব্যবহারে দাঁতের বিশেষ অনিষ্ট হয়। স্বদেশীর সময়ে যখন ভদ্র-শ্রেণীর লোকেরা বিদেশী cigarette এর পরিবর্ত্তে দেশী বিড়ী ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, তখন মৌরী-গন্ধ, চন্দন-গন্ধ, দারুচিনি-গন্ধ প্রভৃতি কত রকমের সুগন্ধি বিড়ী বাহির হইয়াছিল। সেগুলি লোকের খুব পছন্দও হইত। কিন্তু আজকাল আর সে সব দেখিতে পাই না।

আমাদের দেশে এখন অনেকে চুরুট খাইতে শিখিয়াছেন;

কিছু-কিছু চুরুট প্রস্তুতও হইতেছে। কিন্তু এদেশবাসী চুরুট সেবীরা এখনও চুরুট-সেবনে রীতিমত অভ্যস্ত হন নাই; অনেকেই চুরুটের ভাল-মন্দ বুঝিতে পারেন না। দেশী চুরুট যা তৈয়ার হইতেছে, তাহাও ভাল হইতেছে না। কারণ, চুরুট যাহারা তৈয়ার করে, তাহারা প্রায়ই অশিক্ষিত; উত্তম চুরুট কেমন করিয়া তৈয়ার করিতে হয়, তাহা তাহারা এখনও ভাল করিয়া শিখিতে পারে নাই। সেইজন্য গুণজ্ঞ চুরুটসেবীরা দেশী চুরুট প্রায় খান না। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা ধনী, তাহারা খান হাভানা, ম্যানিলা প্রভৃতি দামী চুরুট; আর যাহারা মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র, তাঁহারা খান অপেক্ষাকৃত কম দামের বর্ম্মা চুরুট। আর যাঁহারা চুরুটের গুণাগুণ কিছুই ভাল বুঝেন না, তাঁহারা দেশী চুরুট বর্ম্মা বলিয়া খান। এবং দেশী চুরুট প্রায় বর্ম্মা নামে বিক্রীত হয়। আপনি কোন চুরুটের দোকানে গিয়া বর্ম্মা চুরুট চাহিলে, দোকানে যদি আসল বর্ম্মা চুরুট নাও থাকে, তবু দোকানদার বর্ম্মা বলিয়া আপনাকে দেশী চুরুট দিবে। এরূপ করিবার তিনটি কারণ অনুমান করিতে পারা যায়। দেশী চুরুট বর্ম্মার অনুকরণে প্রস্তুত বলিয়া, প্রকৃতি সাদৃশ্যে উহা বর্ম্মা নামে অভিহিত হয়; অথবা দেশী চুরুটওয়ালারা নিজেরাই চুরুট চিনিতে না পারিয়া তাহাকে বর্ম্মা চুরুট বলিয়া বিশ্বাস করে। অথবা ইহাও হইতে পারে যে, বর্ম্মা চুরুটের নাম-ডাক খুব, খরিদ্দারও তাহা বেশী পছন্দ করে; তাই দেশী চুরুট বর্ম্মা নামে চালাইবার চেষ্টা করা হয়।

দেশী চুরুট ভাল হইলে তাহারও নাম দাঁড়াইয়া যাইতে পারে, তখন আর বর্ম্মার ছদ্মনামে তাহাকে বিক্রীত হইতে হয় না।

চুরুট প্রস্তুতের ব্যবসায়ে আমাদের দেশের এখন শৈশব অবস্থা। গোড়া হইতেই দেশী চুরুটের দুর্নাম হওয়া, ইহার প্রতি খরিদ্দারের মনে অশ্রদ্ধার ভাবের সঞ্চার হওয়া ভাল নয়। বিশেষতঃ চুরুটের ব্যবসায়—শুধু চুরুট কেন, তামাক-পাতা সংক্রান্ত সকল ব্যবসায়ই—খুব বড় ব্যবসা; এবং ইহার ভবিষ্যৎও খুব উজ্জ্বল। সুতরাং আমার মনে হয়, শিক্ষিত যুবকেরা স্বচ্ছন্দে এই ব্যবসায়ে হাত দিতে পারেন; তাহা কিছুমাত্র অন্যায় হইবে না; এবং ব্যবসায়ের হিসাবে উহাতে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। এ দেশে এই ব্যবসায়টি এখনও পরীক্ষাধীন। যাঁহারা এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা নিজেরা চুরুটসেবী হইলে, শীঘ্রই ইহাকে দাঁড় করাইতে পারিবেন। কেন না, প্রত্যেক প্রকারের মসলা দিয়া চুরুট তৈয়ারী করিয়া, নিজেরা তাহা সেবন করিয়া, তাহার দোষ গুণের বিচার করিতে পারিবেন। ইহা প্রায় সকলেই জানেন যে, যেই রাঁধুনী খুব পাকা রাঁধুনী তিনি রাঁধিতে রাঁধিতে নিজের রান্না তরকারী প্রভৃতি চাখিয়া দেখিয়া থাকেন। চায়ের ব্যবসায়েও তাই — ভাল মন্দ চায়ের দোষ গুণ নিজেরা চাখিয়া দেখিয়া ঠিক করিতে হয়।

তবে চুরুটের ব্যবসায়ে হাত দিতে গেলে, কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এদেশে চুরুট প্রস্তুত করিবার উপযোগী অনেক রকম তামাকের গাছের চাষ হয়। তন্মধ্যে মতিহারী, ত্রিহুতী, মজঃফরপুর, রঙ্গপুর প্রভৃতি নামে পরিচিত কয়েক প্রকার তামাকপাতা প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট পাতা "পোলো লীফ" (polo leaf) নামে পরিচিত। আমাদের দেশের তামাক পাতার জাহাজ বোঝাই হইয়া রেঙ্গুনে গিয়া, বর্ম্মা চুরুটের আকার ধরিয়া, আবার এখানে ফিরিয়া আসে। এদেশে নানা প্রকার পাতা পরীক্ষা করিয়া চুরুটের উপযোগী পাতা বাছিয়া লইতে হইবে। পরে প্রত্যেক মসলাগুলির একটি একটি বা একাধিক মসলার সাহায্যে তামাক-পাতা cure করিতে হইবে। তৎপূর্বে অবশ্য খানিকটা extract বাহির করিয়া লইতে হইবে। এই extract কম বেশী বাহির করার উপর চুরুটের কড়া বা নরম হওয়া নির্ভর করিবে। দেশী চুরুট তৈয়ার করিবার সময় সবটা extract নিংড়াইয়া লওয়া হয় বলিয়া, উহা অত্যন্ত নরম হইয়া যায়। চুরুট সেবীদের উহা খাইতে ভাল লাগে না — সময়ে সময়ে ঘাসের মত লাগে। অতটা করিবার দরকার নাই। কিছু বাহির করিয়া লইতে হইবে, কিছু রাখিতে হইবে। তার পর মসলার tincture প্রস্তুত করিয়া, তামাক-পাতাগুলির উপর হয় পিচকারী করিয়া ছিটাইয়া দিতে হইবে, না হয় tincture এ তামাক পাতাগুলি ভিজাইয়া লইতে হইবে। অতঃপর মোড়ার পালা। এটী শক্ত কাজ। মোড়ার গুণে চুরুট ভাল হয়, মোড়ার দোষে চুরুট খারাপ হয়। পাতাগুলি ভিজা থাকিতে-থাকিতে এমন ভাবে মুড়িতে হইবে, যেন শুকাইবার পর নিতান্ত আলগা কিম্বা নিতান্ত নিরেট না হয়। বেশী ফাঁপা হইলে যেমন অসুবিধা, নিরেট হইলে, ততোধিক। চুরুটের ভিতর দিয়া বায়ু

আসিবার অবকাশ এমন ভাবে থাকা চাই, যেন বায়ু uniformly আসিতে পারে। নহিলে ঠিক গোল হইয়া পুড়িবে না- এক দিক লম্বালম্বি ভাবে পুড়িয়া যাইবে, আর একদিক কাচা থাকিবে। ইহা খাইতেও অসুবিধা এবং ইহাতে অনেক চুরুট নষ্ট হয়—খরিদ্দারের লোকসান হয়। এরূপ চুরুট খরিদ্দার কিছুতেই পছন্দ করিতে পারে না। চুরুটের জন্য তামাক পাতার ডাঁটা বা শিরাগুলি বাদ দিতে হইবে। প্রধান ডাঁটা না বাদ দিলে মোটেই চুরুট হইবে না। অন্যান্য মোটা মোটা শিরাগুলি যথাসম্ভব বাদ দিয়া লইলেই ভাল হয়। কারণ, ডাঁটাশুদ্ধ চরুট যেমন যেমন পুড়িতে থাকিবে, অমনি ডাঁটাগুলি ফুলিয়া উঠিয়া হাওয়া যাইবার পথ বন্ধ করিয়া দিবে; খাইতেও ভাল লাগিবে না। এই চুরুট মোড়াতে হাতের কৌশল চাই, এবং তাহা অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস সাপেক্ষ। তার পর সমান মাপের কাটিয়া, অল্প শুকাইয়া, card board বা পাতলা কাঠের বাক্সে ১০০টি বা ৫০টি কিম্বা ২৫টি হিসাবে বন্ধ করিতে হইবে। তার পর লেবেল আঁটিয়া দিলেই হইল; card board হইলে, তাহা ছাপিয়া লইয়া, পরিশ্রম ও ব্যয় সংক্ষেপ করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তামাক-পাতা সংক্রান্ত সমস্ত জিনিসই একটা বড় ব্যবসায় বা বড় ব্যাপার। আজ যাহা বলিলাম, তাহা অতি সামান্য। কিন্তু ইহাতেই প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং আর অগ্রসর হইতে সাহস হইতেছে না। কারণ মাননীয় সম্পাদক মহাশয় ইহার অধিক স্থান এবার আমাকে কিছুতেই দিবেন না বলিয়া বেশ বুঝিতে পারিতেছি। অতএব এবারকার মত এইখানেই বিশ্বকর্ম্মার দ্রুতধাবনশীল লেখনীর অতিরিক্ত আগ্রহ-উৎসাহ দমন করিতে হইল। এখনও নানা কথা বলিতে বাকী; যথা, সিগারেটের পাতি, জরদা, নস্য, এবং মহিলাগণের পানের সঙ্গে খাইবার দোক্তার কথা। যদি সম্পাদক মহাশয় অভয় দেন, এবং আবার অবসর ঘটে, তবে বারান্তরে সে সকল কথা হইবে।

মোটকথা, চুরুটের ব্যবসায় আরম্ভ করিতে সিগারেটের মত অত কলকব্জার দরকার নাই বলিয়া, বোধ হয় অল্প মূলধনে ইহা আরম্ভ করা যাইতে পারে। ইতি।

বিধবা

(আলোচনা)

'বিষবৃক্ষ'—(১)

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ]

গত চৈত্রের 'বিধবা'-প্রবন্ধে বলিয়াছি যে বিপথগামিনী যুবতী বিধবার প্রতি করুণা ও সমবেদনার সৃষ্টি করিতে হইলে যথেষ্ট কাব্যকলার প্রয়োজন হয়। এক্ষণে দেখা যাউক, বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষে' কি পরিমাণ কাব্যকলা প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই কাব্যকলার এক দিক্ পরিস্ফুট করিব।

'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিমচন্দ্র বিধবার আদর্শচ্যুতির একাধিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; এগুলির মধ্যে নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর প্রণয়-ব্যাপার প্রধান; ইহা আরম্ভে চিত্তাকর্ষক ও শেষে মর্ম্মভেদী। অবৈধ হইলেও এই ব্যাপারের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার জন্য আখ্যায়িকাকার ইহার পার্শ্বে ইহার সহিত যোগসূত্রে গ্রথিত আরও কয়েকটি সমশ্রেণীর ব্যাপার উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইহার ফলে, আখ্যানবস্তু অবৈধ প্রণয়ের নিম্নতম স্তর হইতে ক্রমে ক্রমে উচ্চতম স্তরে উঠিয়াছে।

প্রথমে নিম্নতম স্তরের দৃষ্টান্ত দিই। তারাচরণের মাতা (কুন্দনন্দিনীর হবু-শাশুড়ী) 'শ্রীমতী বিশেষ রূপবতী ছিল, সুতরাং অচিরাৎ বিপদে পতিত হইল। গ্রামস্থ একজন

দুশ্চরিত্র ধনী ব্যক্তির চক্ষে পড়িয়া সে গৃহত্যাগ করিয়া গেল। কোথায় গেল, তাহা কেহ বিশেষ জানিতে পারিল না। কিন্তু শ্রীমতী আর ফিরিয়া আসিল না। শ্রীমতীর একটি শিশুসন্তান ছিল, তাহারই নাম তারাচরণ। শ্রীমতী তারাচরণকে ফেলিয়া গিয়াছিল।' (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।) সূর্য্যমুখী যখন তারাচরণের সহিত বিবাহ দিবার জন্য নগেন্দ্রনাথের নিকট কুন্দকে চাহিলেন, আখ্যায়িকা-কার তখন শ্রীমতীর এইটুকু পরিচয় দিয়াছেন, কদর্য্য কথার আর বেশী কলাও বর্ণনা করেন নাই, এই ঘটনার যতটুকু প্রয়োজন, তাহার অধিক উল্লেখ করেন নাই। পরে দেবেন্দ্র দত্ত যখন হরিদাসী বৈষ্ণবী সাজিয়া বিধবা কুন্দকে ছলে গৃহের বাহির করিবার কু-অভিসন্ধি করিয়াছেন, তখন প্রয়োজন বোধে আখ্যায়িকা-কার আর একবার এই কুৎসিত প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন, 'কুন্দ শুনিয়াছিল যে, তাহার শাশুড়ী ভ্রষ্টা হইয়া দেশত্যাগিনী হইয়াছিল।' (৯ম পরিচ্ছেদ।) রূপবতী যুবতী বিধবার পুত্রবতী হইয়া শিশুপুত্র ফেলিয়া সন্তানের মায়া ভুলিয়া প্রলোভনে পড়িয়া কুলত্যাগিনী হওয়ার কুৎসিত বাস্তব (realistic) বর্ণনা, বঙ্কিমচন্দ্র যথাসম্ভব অল্পে সারিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই (realism) এর সহিত তুলনায় (contrast বিরোধিতা বশতঃ) কুন্দ-জীবনের রোমান্স্ উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিবে, ইহাই শ্রীমতীর বৃত্তান্তের উল্লেখের (artistic purpose) কলাসঙ্গত প্রয়োজনীয়তা।

দ্বিতীয়টি ইহারই সগোত্র, হয়ত ইহা অপেক্ষা একটু ভাল। তাহার 'গঙ্গাজল'—মালতী গোয়ালিনী সম্ভবতঃ নিঃসন্তানা বালবিধবা, শ্রীমতীর মত পুত্রবতী নহে,—সুতরাং শ্রীমতীর তুলনায় তাহার প্রতি অপেক্ষাকৃত কম ঘৃণা হয়, তবে তাহার ব্যবসাটা জঘন্য। তাহার কথা, আর বেশী করিয়া বলিতে চাহি না। (পাঠক মহাশয় ১৯শ, ২২শ ও ৩১শ পরিচ্ছেদ পাঠ করিয়া দেখিবেন।) সে দেবেন্দ্র বাবুর দূতী, হীরার নিকট দুইবার দূতিয়ালি করিয়াছে (একবার কুন্দর জন্য, একবার খোদ হীরার জন্য)। এইরূপে কুন্দর আখ্যানের সহিত পরোক্ষভাবে তাহার যোগসূত্র আছে। এই realism এর সহিত তুলনায় ও (contrast বিরোধিতা-বশতঃ) কুন্দ-জীবনের রোমান্স্ উজ্জ্বলবর্ণে ফুটিবে, ইহাই মালতী গোয়ালিনীর অবতারণার অন্যতম প্রয়োজনীয়তা। এই দুইটি ব্যাপার নিতান্ত অপ্রধান, সুতরাং সামান্যমাত্র উল্লেখেই আখ্যায়িকা-কার ক্ষান্ত হইয়াছেন। এ সব স্ত্রীলোক আর শেষ পর্য্যন্ত কি হইল তাহার বিবরণ দিয়া পাপের শাস্তি-বিধান (Poetic justice) করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

তৃতীয় ও চতুর্থ দেবেন্দ্র-কুন্দর ও দেবেন্দ্র-হীরার ব্যাপার। এই উভয় ব্যাপারের সহিত তুলনায় নগেন্দ্র-কুন্দর ব্যাপারের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেই হইবে। এই তুলনার, বিরোধিতার সাহায্য লইবার জন্যই আখ্যায়িকা-কার এইগুলি অবৈধপ্রণয়ের ব্যাপার মূল আখ্যানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। অবশ্য দেবেন্দ্র-কুন্দর ব্যাপার একতরফা। কুন্দ স্বামীর বন্ধুকে স্বামীর অনুরোধে যখন দর্শন দিয়াছিল তখন 'দেবেন্দ্র তাহার নবযৌবনসম্পদের অপ্রমেয় শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। সে শোভা আর ভুলিলেন না।' কিন্তু কুন্দ 'অনেকক্ষণ ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাঁদিয়া পলাইয়া গেল।' (৮ম পরিচ্ছেদ।) বলা বাহুল্য, কুন্দর মনে একটু আঁচড়ও লাগিল না। লাগিবার কথাও নহে, কেননা তাহার হৃদয় পূর্ব্ব হইতেই নগেন্দ্রের প্রতি নীরব প্রণয়ে পূর্ণ।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। আখ্যায়িকা-কার 'সুশীল চরিত্র' নগেন্দ্রনাথের সধবা অবস্থায় কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্তির উল্লেখমাত্র করেন নাই, চরিত্রহীন দেবেন্দ্রের বেলায় তাহা করিয়াছেন। নগেন্দ্রের তুলনায় দেবেন্দ্রের আচরণ অধিকতর নিন্দনীয়। তবে দেবেন্দ্রের পক্ষে শুধু এইটুকু বলিবার আছে যে বিরূপা, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী পত্নী হৈমবতী হইতে তাহার প্রণয় তৃষ্ণা মেটে নাই বলিয়াই সে বিপথগামী হইয়াছে, চরিত্র নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

নগেন্দ্রনাথ যেমন অন্তরঙ্গ বন্ধু (Confidante) হরদেব ঘোষালের নিকট মনের কথা প্রকাশ করিয়াছেন, দেবেন্দ্রও সেইরূপ ('সমদুঃখ' 'মাতৃলপুত্র') অন্তরঙ্গ বন্ধু সুরেন্দ্রের নিকট মনের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কথোপকথন হইতে আমরা জানিতে পারি, কুন্দর প্রতি দেবেন্দ্রের আসক্তি কত প্রবল। 'তারা মাষ্টারের বিয়ে হয়েছিল এক দেবকন্যার সঙ্গে।......আমার চিত্ত আমার বশ নহে। আমি সকল ত্যাগ করিতে পারি, এই স্ত্রীলোকের আশা ত্যাগ করিতে পারি না। যেদিন প্রথম তাহাকে তারাচরণের গৃহে দেখিয়াছি, সেই দিন অবধি আমি তাহার সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইয়া আছি। আমার চক্ষে এত সৌন্দর্য্য

আর কোথাও নাই। জ্বরে যেমন তৃষ্ণা রোগীকে দগ্ধ করে, সেই অবধি উহার জন্য লালসা আমাকে সেইরূপ দগ্ধ করিতেছে। সেই অবধি আমি উহাকে দেখিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি, তাহা বলিতে পারি না।····· কেবল তাহাকে দেখিবার জন্য। তাহাকে দেখিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া তাহাকে গান শুনাইয়া আমার যে কি পর্য্যন্ত তৃপ্তি হয়, তাহা বলিতে পারি না। তুমি আমার একমাত্র সুহৃদ্।····· কিন্তু তোমাকে যদি ছাড়িতে হয়, সেও স্বীকার, তবু আমি কুন্দনন্দিনীকে দেখিবার আশা ছাড়িতে পারিব না।' (১৭শ পরিচ্ছেদ।)

ইহাও নগেন্দ্রনাথের মত রূপজ মোহ। দেবেন্দ্র যদি কুন্দকে 'দেখিয়া, তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া, তাহাকে গান শুনাইয়াই' তৃপ্ত থাকিতেন, তাহা হইলে ততটা দণ্ডনীয় হইত না। কিন্তু কুন্দকে পাইবার জন্য দেবেন্দ্র যে সমস্ত 'কৌশল' অবলম্বন করিয়াছেন, সে গুলি অত্যন্ত অসৎ। প্রথমতঃ তিনি হরিদাসী বৈষ্ণবী সাজিয়া দত্তবাড়ীর অন্দরে প্রবেশ করিয়া কুন্দকে তাহার শাশুড়ী-সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ দিয়া তাহাকে ঘরের বাহির করিতে চেষ্টা করিলেন। (৯ম পরিচ্ছেদ।) অবশ্য তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলেন। কুন্দ 'অত্যন্ত সাধ্বী।' তাহার পরও দেবেন্দ্র আর একবার বৈষ্ণবীর ছদ্মবেশে দত্তবাড়ীর অন্তঃপুরে কুন্দর 'শ্রীমুখ-পঙ্কজ' দেখিতে গেলেন। (১৫শ পরিচ্ছেদ।) (নির্দোষ কুন্দর পক্ষে এই সাক্ষাতের ফল অতি বিষময় হইল।) এ পথে কিছু হইবে না বুঝিয়া দূতী মালতী গোয়ালিনীকে দিয়া হীরাকে ডাকাইয়া দেবেন্দ্র 'হীরাকে বহুল অর্থের লোভ প্রদর্শন করিয়া, কুন্দকে বিক্রয় করিতে বলিলেন।' (১৯শ পরিচ্ছেদ।) হীরা ঘৃণার সহিত এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। তাহার পর, কুন্দ হীরার গৃহে আশ্রয় লইয়াছে দূতীর মুখে এই সংবাদ পাইয়া (২২শ পরিচ্ছেদ) দেবেন্দ্র হীরার বাড়ী আসিলেন, কিন্তু তখন 'পাখী পলাইয়াছে।' (২৪শ পরিচ্ছেদ।) আবার কুন্দ দত্তবাড়ী ফিরিলে দেবেন্দ্র কুন্দর লোভে অন্তঃপুরসন্নিহিত উদ্যানে গোপনে প্রবেশ করিয়া হীরাকে দেখিতে পাইয়া তাহাদ্বারা কার্য্য উদ্ধারের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণা হীরার কারসাজিতে দরওয়ানদিগের হাতে প্রহার পাইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। (৩৩শ পরিচ্ছেদ।) শেষে হীরার উপর ভীষণ প্রতিশোধ তুলিয়া (৩৬শ পরিচ্ছেদ) 'পাপিষ্ঠ' আর একবার হীরার সাহায্যে কুন্দকে পাইবার চেষ্টা করিল—'যদি কুন্দের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করাতে পার, তবেই তোমার সঙ্গে আমার আলাপ থাকিবে—নচেৎ এই পর্য্যন্ত।' (৪০শ পরিচ্ছেদ।) দেবেন্দ্র-কুন্দর ব্যাপারও এই পর্য্যন্ত। দেবেন্দ্র হীরার ব্যাপার পরে বিবৃত করিব।

কুন্দঘটিত ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র দেবেন্দ্রের চরিত্র ও আচরণ সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করিয়া ধর্ম্মের, সন্নীতির ও সুরুচির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। যথা—'মহাপাপে নিমগ্ন যাহাদিগের চরিত্র, তাহাদিগের সকল কথা স্পষ্ট করিয়া লেখা বড় কষ্টকর।'—১৯শ পরিচ্ছেদ। দেবেন্দ্র-হীরার ব্যাপারে গ্রন্থকার ইহা অপেক্ষা তীব্রভাষায় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সে কথা যথাস্থানে বলিব। কয়েকটি স্থলে বঙ্কিমচন্দ্র দেবেন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু সুহৃদ্‌ভাবে সুরেন্দ্রের মুখ দিয়া তাঁহার চরিত্রের সমালোচনা করাইয়াছেন। (১০ম ও ১৭শ পরিচ্ছেদ।) লোকটি যেন গ্রীক্ নাটকের কোরাস্। দেবেন্দ্র যেমন ধাপের পর ধাপ অধঃপাতে যাইতে লাগিলেন, সুরেন্দ্রের মুখ-নিঃসৃত তিরস্কার বাক্যও তেমনিই তীব্র হইতে তীব্রতর হইল; যেদিন দেবেন্দ্র বলিলেন, 'তোমাকে যদি ছাড়িতে হয়, সেও স্বীকার, তবু আমি কুন্দনন্দিনীকে দেখিবার আশা ছাড়িতে পারিব না' সেদিন সুরেন্দ্রও তাহার অধঃপতন নিবারণ করিবার আর আশা নাই বুঝিয়া বলিলেন, 'তবে তাহাই হউক। তোমার সঙ্গে আমার এই পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ।' (১৭শ পরিচ্ছেদ।) ইহার পর আর সুরেন্দ্রের বার্ত্তা পাওয়া যায় না। সুরেন্দ্রের এই সম্পূর্ণ তিরোভাব দেবেন্দ্রের চরিত্রে পাপের পূর্ণ গ্রাস ঘটিয়াছে তাহারই (index) সূচক।

দেবেন্দ্র-কুন্দর ব্যাপারের ন্যায় দেবেন্দ্র-হীরার ব্যাপারও একতরফা। প্রভেদ এই যে, প্রথমটিতে নারী প্রেমে পড়ে নাই, পুরুষ প্রেমে পড়িয়াছে, দ্বিতীয়টিতে নারীই প্রেমে পড়িয়াছে, পুরুষ প্রেমে পড়ে নাই, তবে প্রতিশোধ তুলিবার জন্য শেষদিকে প্রেমের ভাণ করিয়াছে। এই দুইটি ব্যাপারের পরস্পরের সহিতও নগেন্দ্র-কুন্দর ব্যাপারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। শেষোক্ত ব্যাপারই অবৈধ প্রণয়ের প্রধান আখ্যান। আর এই দুইটি অপ্রধান আখ্যানের প্রথমটির নায়ক প্রধান আখ্যানের নায়কের প্রতিনায়ক, আবার দ্বিতীয়টির নায়িকা প্রথমটির নায়িকার প্রতিনায়িকা।

নায়িকা। প্লটের এই জটিলতা আখ্যায়িকা-কারের কাব্য-কলার আর একটি নিদর্শন। এগুলির কলাসঙ্গত প্রয়োজনীয়তা (artistic purpose) পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি।

—

হীরার আসক্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে আখ্যায়িকা-কার তাহার প্রকৃতির এইরূপ আভাস দিয়াছেন। 'এক্ষণে হীরার বয়স বিংশতি বৎসর। তাহার বুদ্ধির প্রভাবে এবং চরিত্র-গুণে সে দাসমধ্যে শ্রেষ্ঠা বলিয়া গণিত হইয়াছিল।...হীরা বালবিধবা বলিয়া গোবিন্দপুরে পরিচিত। কেহ কখন তাহার স্বামীর কোন প্রসঙ্গ শুনে নাই। কিন্তু হীরার চরিত্রেও কেহ কোনও কলঙ্ক শুনে নাই। তবে হীরা অত্যন্ত মুখরা, সধবার ন্যায় বেশ-বিন্যাস করিত, এবং বেশ-বিন্যাসে বিশেষ প্রীতা ছিল। হীরা আবার সুন্দরী—উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী পদ্মপলাশলোচনা।...হীরা আড়ালে বসে গান করে,...ছেলেদের বিবাহের আবদার করিতে শিখাইয়া দেয়;...হীরার অনেক দোষ।...হীরা আতর গোলাপ দেখিলেই চুরি করে।' (১৫শ পরিচ্ছেদ।) এই যুবতী বিধবা তখন পর্য্যন্ত সচ্চরিত্রা বলিয়া আখ্যায়িকা-কার সার্টিফিকেট্ দিতেছেন, তবে সধবার ন্যায় বেশবিন্যাস করা, বেশবিন্যাসে বিশেষ প্রীতা হওয়া, আতর গোলাপ চুরি করা, ইত্যাদি সামান্য সামান্য কথায় আখ্যায়িকা-কার বুঝাইতে চাহেন যে, সে বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের বাহ্য অনুষ্ঠান করে না, ভিতরে ভিতরে তাহার প্রাণে সখ আছে। এই বিলাস-স্পৃহা সংযমের পথে একটি বাধা। 'হীরার অনেক দোষ। তাহা ক্রমে জানা যাইবে।' একথাও আখ্যায়িকা-কার গাঁথিয়া রাখিতেছেন। আমরা যথাকালে সেগুলির ক্রম-বিকাশ দেখিব। সূর্য্যমুখী ও কমলমণি (এই পরিচ্ছেদে) যখন তাহাকে হরিদাসী বৈষ্ণবীর রহস্যভেদে নিযুক্ত করিলেন, তখন সে পুরস্কার-স্বরূপ হাসিতে হাসিতে যমকে বর চাহিল; ইহাতে বুঝা যায় যে তাহার মনে সুখ নাই, হৃদয়ে অতৃপ্তি, তাই সে মরণকে বরণ করিতে চাহে। তবে এখনও অভাব আকাঙ্ক্ষা তীব্রভাবে অনুভব করিতেছে না, মরণেচ্ছাও সেজন্য তীব্র নহে। জমি প্রস্তুত আছে, তেমন অবস্থা হইলে কুন্দ-রোহিণীর মত সে আত্মহত্যার চেষ্টা করিবে কি? ভবিষ্যতে এই প্রশ্নের উত্তর মিলিবে।

তাহার পর হরিদাসী বৈষ্ণবীর সন্ধানে গিয়া সে দেবেন্দ্রের শ্রীচরণের দর্শন পাইল। সে দেবেন্দ্রের কাছে ধরা না দিয়া অনায়াসে পলাইতে পারিত, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক পলাইল না, কি অন্ধকারে ফুলবাগানের মধ্যে পথ হারাইল তাহা বলা যায় না।' আখ্যায়িকা-কার এই পরিচ্ছেদে একটু সন্দেহ রাখিয়া দিয়াছেন, পরে হীরার স্বগতোক্তি হইতে (২০শ পরিচ্ছেদ) বোধ হয়, প্রথম অনুমানই ঠিক। দেবেন্দ্রের সহিত তাহার পরিচয়ের সূত্রপাত হইল। 'সে রাত্রে হীরা আর দত্তবাড়ীতে গেল না, আপন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়া রহিল।' (১৮শ পরিচ্ছেদ।) কেন? তাহার হৃদয়ে একটা অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল, সে রহস্য আমরা পরে (২০শ পরিচ্ছেদে) তাহার স্বগতোক্তি হইতে জানিতে পারিব। পরদিন প্রাতে সে সূর্য্যমুখীকে দেবেন্দ্রের সংবাদ জানাইল, (১৯শ পরিচ্ছেদ) 'কুন্দ যে নির্দ্দোষী' তাহা কিছু বলিল না। 'হীরার অনেক দোষ' আখ্যায়িকা-কার পূর্ব্বে আভাস দিয়াছেন, আপাততঃ একটি দোষ, কুটিলতা দেখা গেল। পরে বুঝা যাইবে, কুন্দর অনিষ্ট করিবার প্রবৃত্তি হীরার ঈর্ষা সঞ্জাত; তাহার হৃদয়ে দেবেন্দ্রের প্রতি আসক্তির সঙ্গে সঙ্গে দেবেন্দ্রের প্রেমপাত্রীর প্রতি ঈর্ষারও সঞ্চার হইয়াছে। পর পরিচ্ছেদে পাঠকেরা দেখিবেন কুন্দ হীরার দ্বারে আশ্রয় লইলে হীরা কুন্দকে নিভৃতে লুকাইয়া রাখিল—দেবেন্দ্রের উপকারের জন্য নহে, স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে; কুন্দকে সে দেবেন্দ্রনাথের নিকট দিবে, তাহাতে মনিবের মনোরঞ্জন হইবে, তাহার নিজের অর্থলাভ হইবে, তাহা ছাড়া দেবেন্দ্র সে বাড়ীতে 'দখল' করিতে পারিবেন না। এখন সে হীরা দেবেন্দ্রের প্রেমে কুন্দর প্রতিযোগিনী। (২০শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

দেবেন্দ্র মালতী গোয়ালিনীকে দিয়া হীরাকে ডাকিয়া পাঠাইলে, হীরা বড় আশা করিয়া গেল। কিন্তু দেবেন্দ্র হীরার আদর না করিয়া 'হীরাকে বহুল অর্থের লোভ প্রদর্শন করিয়া, কুন্দকে বিক্রয় করিতে বলিলেন;' শুনিয়া 'ক্রোধে' হীরা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। (২১শ পরিচ্ছেদ।) কিন্তু ক্রোধটা ধর্ম্মজ্ঞানের বা প্রভুভক্তির ফল নহে, ঈর্ষাপ্রসূত।

২০শ পরিচ্ছেদে হীরার স্বগতোক্তি হইতে দেবেন্দ্রের প্রতি হীরার আসক্তির গুপ্ত কথা জানা যায়। 'ভালবাসার

কথা শুনিলে হাসিতাম। বলিতাম, ওসব সুখের কথা, লোকে একটা প্রবাদ আছে মাত্র। এখন ত' আর হাসিব না। মনে করিয়াছিলাম, যে ভালবাসে, সে বাসুক, আমি ত কখনও কাহাকে ভালবাসিব না। ঠাকুর বল্লে, রহ, তোরে মজা দেখাচ্চি। শেষে বেণারের দোকানে গঙ্গাস্নান। পরের চোর ধরতে গিয়ে আপনার প্রাণটা চুরি গেল! কি মুখখানি! কি গড়ন! কি গলা!' দেখা গেল, হীরা মজিয়াছে। এই সব স্বগতোক্তি হইতে ইহাও জানা যায় যে তাহার হৃদয়ে সমাত কুমতির দ্বন্দ্ব চলিতেছে। তাহার হৃদয়ের কুটিলতা, স্বার্থপরতা, দ্বেষ প্রভৃতি 'অনেক দাগ' এই স্বগতোক্তিতে ধরা পড়ে। সূর্য্যমুখীর সুখে পর্য্যন্ত তাহার দ্বেষ! (এই স্বগতোক্তির দ্বারা কতকটা থ্যাকারের 'ভ্যানিটি ফেয়ারে' কি শার্পের মত।) স্বার্থসিদ্ধির মতলব আঁটিয়া 'পাপিষ্ঠা' হীরা তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরদিন সে, সূর্য্যমুখীর তিরস্কার কুন্দর গৃহত্যাগের কারণ, নগেন্দ্রনাথকে কৌশলে এই কথা জানাইয়া স্বামিস্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটাইয়া দিল। (২১শ পরিচ্ছেদ।) অবশ্য, ইহার সহিত হীরার প্রণয়লীলার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই।

দেবেন্দ্র, হীরার গৃহে কুন্দ আছে, দূতী মালতী গোয়ালিনীর মুখে এই সংবাদ পাইয়া হীরার বাড়ী আসিলেন, কিন্তু পাখী তখন পলাইয়াছে। 'হীরা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল।' কিন্তু এই হাসিতেই তাহার 'যত হাসি তত কান্নার' বীজ উপ্ত হইল। 'অধঃপাতের সোপানে আর এক পদ নামিতে হয়' এই আশঙ্কায় হীরা দেবেন্দ্রকে 'বসিতে বলিতে পারিল না', কিন্তু 'তাহাও তাহার কপালে ছিল।' দেবেন্দ্র বসিলেন, হীরা তাঁহার যত্ন করিল, দেবেন্দ্র হীরার চক্ষুর প্রশংসা করিলেন, 'হীরা মৃদু হাসিল।' তাহার পর—দেবেন্দ্র যখন 'মধুর স্বরে মধুর ভাবযুক্ত মধুর পদ মধুর ভাবে গায়িলেন'... 'ক্ষণকাল জন্য হীরার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি হইল। সে যে হীরা, এই যে দেবেন্দ্র, তাহা ভুলিয়া গেল। মনে করিতেছিল, ইনি স্বামী—আমি পত্নী। মনে করিতেছিল, বিধাতা দুই জনকে পরস্পরের জন্য সন্ধান করিয়া, বহুকাল হইতে মিলিত করিয়াছেন, বহুকাল হইতে যেন উভয়ের প্রণয়-সুখে উভয়ে সুখী। এই মোহে অভিভূত হীরার মনের কথা মুখে ব্যক্ত হইল। দেবেন্দ্র হীরার মুখে অর্দ্ধ-ব্যক্ত স্বরে শুনিলেন যে, হীরা দেবেন্দ্রকে মনে মনে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে।'*

'কথা ব্যক্ত হইবার পর হীরার চৈতন্য হইল,' সে তখন দৃঢ়স্বরে দেবেন্দ্রকে চলিয়া যাইতে বলিল, 'আমার সর্ব্বনাশ করিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছ বলিয়া কর্কশভাবে তিরস্কার করিল; কিন্তু পরক্ষণেই আবার 'উন্নমিতাননে দেবেন্দ্রের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া কোমলতর স্বরে কহিতে লাগিল, "প্রভু, আমি আপনার রূপ গুণ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। কিন্তু আমাকে কুলটা বিবেচনা করিবেন না। আমি আপনাকে দেখিলেই সুখী হই।" ইত্যাদি। 'হীরা তখন উন্মাদিনীর ন্যায় বিবশা।' সে আবার বলিল, ..."আমার ধর্ম্মজ্ঞান নাই, ধর্ম্মে ভক্তি নাই,—আমি আপনার ভালবাসার তুলনায় কলঙ্ককে তৃণজ্ঞান করি। কিন্তু আপনি ভালবাসেন না—সেখানে কি সুখের জন্য কলঙ্ক কিনিব?...কিন্তু যেদিন আপনি আমাকে ভালবাসিবেন, সেই দিন আপনার দাসী হইয়া চরণসেবা করিব।" এই 'তিন প্রকার কথা' হইতে আমরা বুঝিতে পারি কত প্রবলভাবে হীরার হৃদয়ে দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এখনও সংযমের বাঁধন একেবারে ছেঁড়ে নাই, কিন্তু সে 'অধঃপাতের সোপানে আর একপদ নামিয়াছে।' (তাই এই ২৪শ পরিচ্ছেদের নাম অবতরণ।) দেখা গেল, হীরাও 'বিষবৃক্ষে'র আর একটি বিষফল, তবে নীচু ডালের। দেবেন্দ্রের হৃদয়ে অবশ্য প্রণয়ের অণুমাত্র উন্মেষ হয় নাই, তিনি শুধু হীরার 'চিত্তের অবস্থা' বুঝিলেন এবং 'কলে নাচা'ইয়া তাহাদ্বারা ভবিষ্যতে 'কার্য্যোদ্ধার' করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

'ক্রমে হীরার আসক্তি প্রবল হইতে প্রবলতর হইল।' 'কাপাস মধ্যস্থ তপ্ত অঙ্গারের ন্যায়, দেবেন্দ্রের নিরুপম মূর্ত্তি হীরার অন্তঃকরণকে স্তরে স্তরে দগ্ধ করিতেছিল। অনেকবার হীরার ধর্ম্মভীতি এবং লোকলজ্জা, প্রণয়বেগে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল; কিন্তু দেবেন্দ্রের স্নেহহীন ইন্দ্রিয়পর চরিত্র মনে পড়াতে আবার তাহা বদ্ধমূল হইল। হীরা চিত্ত-সংযমে বিলক্ষণ ক্ষমতাশালিনী এবং সেই ক্ষমতা ছিল বলিয়াই সে বিশেষ ধর্ম্মভীতা না হইয়াও এ পর্য্যন্ত সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিল। সেই ক্ষমতাপ্রভাবেই, সে দেবেন্দ্রের প্রতি

---

* 'So Love was crowned, but Music won the cause.

—Dryden : Alexander's Feast.

প্রবলানুরাগ অপাত্রন্যস্ত জানিয়া সহজেই শমিত করিয়া রাখিতে পারিল।' (৩৩শ পরিচ্ছেদ।) দেখা গেল মানস ব্যভিচার ঘটিলেও হীরার হৃদয়ে (কুন্দ-রোহিণীর মত) দ্বন্দ্ব চলিতেছে, এখনও পর্য্যন্ত সে সংযমের বন্ধনে নিজেকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই সময়ে সে নূতন করিয়া আবার দত্তবাড়ীতে চাকরী লইল দুইটি কারণে, (১) 'চিত্তসংযমের সদুপায়স্বরূপ।' 'পরগৃহের গৃহকর্ম্মাদিতে অনুদিন নিরত থাকিলে, সে অন্য মনে এই বিফলানুরাগের বৃশ্চিকদংশনস্বরূপ জ্বালা ভুলিতে পারিবে।' দ্বিতীয় কারণটি, প্রতিদ্বন্দ্বিনী বোধে দেবেন্দ্রের প্রণয়পাত্রী কুন্দর প্রতি দ্বেষ। 'হীরা, আপনার নিষ্ফল প্রণয়-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু কুন্দনন্দিনীর প্রতি দেবেন্দ্রের অনুরাগ সহ্য করিতে পারিল না।' হীরা কুন্দনন্দিনীর মঙ্গল কামনা করিয়া এরূপ অভিসন্ধি করে নাই। হীরা ঈর্ষ্যাবশতঃ কুন্দের উপরে এত জাতক্রোধ হইয়াছিল যে, তাহার মঙ্গল চিন্তা দূরে থাকুক, কুন্দের নিপাত দৃষ্টি করিলে পরমাহ্লাদিত হইত। পাছে কুন্দের সঙ্গে দেবেন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়, এইরূপ ঈর্ষ্যাজাত ভয়েই হীরা নগেন্দ্রের পত্নীকে প্রহরাতে রাখিল।'

এক সময়ে সে, কুন্দ নগেন্দ্রের প্রণয়িনী হইলে কুন্দের উপর আধিপত্য করিয়া বহু অর্থ হস্তগত করিবে এই অভিসন্ধি করিয়াছিল, কিন্তু এখন 'হীরার অর্থে আর মন ছিল না, মন থাকিলেও কুন্দ হইতে লব্ধ অর্থ বিষতুল্য বোধ হইত।' এখন কুন্দর প্রতি দ্বেষ-বশতঃ হীরা কুন্দকে সর্ব্বদা 'তিরস্কৃত ও অপমানিত' করিত।

তাহার পর, হীরা যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল তাহাই ঘটিল। একদিন দেবেন্দ্র সশরীরে (ছদ্মবেশে নহে। 'নিজবেশেই') 'অন্তঃপুর-সন্নিহিত পুষ্পোদ্যানে' প্রবেশ করিলেন। যদিও হীরা বিলক্ষণ বুঝিল, দেবেন্দ্র দত্ত কি আশায় আসিয়াছেন, তথাপি দেবেন্দ্রের প্রতি তাহার আসক্তি এমন যে 'দেবেন্দ্র হীরার পার্শ্বে বসিলে হীরা চরিতার্থ হইল।' দেবেন্দ্র প্রথমে তাহাকে একটু তোয়াজ করিয়া আসল কথা পাড়িলেন, বলিলেন, হীরা 'কৃপা করিলে' কুন্দর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। হীরা দারুণ ঈর্ষ্যায় দগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কপট সম্মতি দেখাইয়া 'কিয়দ্দূর আসিলে তাহার কণ্ঠসংরুদ্ধ নয়নবারি দরবিগলিত হইয়া কৌশলে বহিতে লাগিল।' তাহার পর তাহার কুটিল কৌশলে দেবেন্দ্র হীরার 'ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ' দরোয়ানদিগের দ্বারা প্রহৃত, অপমানিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন।

২৫শ পরিচ্ছেদ হইতে হীরার প্রণয়, কুন্দর প্রতি দ্বেষ, ও তাহার কপটতা-কুটিলতার পরিচয় পাওয়া গেল। দেবেন্দ্র 'আর দত্তবাড়ী যাইবেন না' স্থির সঙ্কল্প করিলেন, এ বিষয়ে হীরার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল; কিন্তু তিনি 'হীরাকে ইহার প্রতিফল দিবেন' ইহাও স্থির সঙ্কল্প করিলেন। (৩৩শ পরিচ্ছেদ।) হীরা এবার কপটতায় জিতিল, কিন্তু ভবিষ্যতে দেবেন্দ্রের কপটতায় তাহার কি সুদারুণ মনস্তাপ হইল, তাহা এইবার বলিতেছি।

হীরা দারুণ ঈর্ষ্যাবশতঃ দেবেন্দ্রকে অপমানিত করিয়াছিল, 'তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া হীরা মনে মনে বড় হাসিয়াছিল।' কিন্তু তাহার পরে তাহাকে অনেক পশ্চাত্তাপ করিতে হইল। হীরা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "ভাল করি নাই। একে ত আমি তাহার মনের মধ্যে স্থান পাই নাই, এখন আমার সকল ভরসা দূর হইল।" (৩৯শ পরিচ্ছেদ।) তাহার প্রণয় ঈর্ষ্যার উপর জয়লাভ করিল।

তাহার পর দেবেন্দ্র কিরূপ কৌশল ও কপটতার আশ্রয় লইয়া হীরার উপর সেদিনের অপমানের প্রতিশোধ লইল, আখ্যায়িক তাহার বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। 'উর্ণনাভ যেমন মক্ষিকার জন্য জাল পাতে, হীরার জন্য তেমনি দেবেন্দ্র জাল পাতিতে লাগিলেন। ক্ষুধিতা হীরা মক্ষিকা সহজেই সেই জালে পড়িল।' সে দেবেন্দ্রের মধুরালাপে মুগ্ধ, এবং তাঁহার কৈতববাদে প্রতারিত হইল। মনে করিল, ইহাই প্রণয়; দেবেন্দ্র তাহার প্রণয়ী। হীরা চতুরা, কিন্তু এখানে তাহার বুদ্ধি অলোপপ্রায়িনী হইল না। প্রাচীন কবিগণ যে শক্তিকে জিতেন্দ্রিয় মৃত্যুঞ্জয়ের সমাধিভঙ্গে ক্ষমতাশালিনী বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছেন, সেই শক্তির প্রভাবে হীরার বুদ্ধিলোপ হইল। দেবেন্দ্রের গেয় সঙ্গীতে 'এখন তাহার হৃদয় চঞ্চল, মন দেবেন্দ্রপ্রণয়প্রার্থিত হইল। তখন তাহার চক্ষে দেবেন্দ্র সকল সাধুগুণের আধার, রমণীর সর্ব্বাদরণীয় বলিয়া বোধ হইল। হীরার চক্ষে প্রেমবিমুক্ত অশ্রুধারা বহিল।' *

* সঙ্গীতের এই মোহিনী শক্তি (৩৯শ পরিচ্ছেদের মধ্য।) ড্রাইডেন্ প্রভৃতি ইংরেজ কবিদিগের কবিতা স্মরণ করাইয়া দেয় বটে, কিন্তু বিশেষভাবে ভারতচন্দ্রের নিম্নোক্ত কবিতাংশ স্মরণীয়, কেননা এখানে ভারতচন্দ্রের উপযোগিতাই বেশী।

'বীণা বাজাইয়া রায় আরম্ভিলা গান;
সুন্দরের গান শুনি সুন্দরী মোহিলা।
বিনায়ে বীণার স্বরে গাহিতে লাগিলা।'

যাক্, এই বিশদ বর্ণনা আর উদ্ধৃত করিব না। বঙ্কিমচন্দ্র এই বর্ণনার মধ্যেও উদ্দাম ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দোষ-ঘোষণা (condemnation) করিয়া ধর্ম্মের, সম্নীতির, সুরুচির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। তিনি বুঝাইয়াছেন, হীরা ইহাকে 'স্বর্গসুখ' মনে করিলেও, ইহা 'নরক।' আরও বলিয়াছেন—তখন সেই পাপমণ্ডপে বসিয়া পাপান্তঃকরণ দুইজনে পাপাভিলাষে বশীভূত হইয়া চিরপাপরূপ চিরপ্রেম পরস্পরের নিকট প্রতিশ্রুত হইল। হীরা চিত্তসংযম করিতে জানিত, কিন্তু তাহাতে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়া, সহজে পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখে প্রবেশ করিল। ...যখন তাহার বিবেচনা হইল যে দেবেন্দ্র প্রণয়শালী, তখন আর তাহার চিত্তদমনে প্রবৃত্তি রহিল না। এই অপ্রবৃত্তিহেতু বিষবৃক্ষে তাহার ভোগ্য ফল ফলিল।' 'হীরার বিষবৃক্ষ মুকুলিত।' হীরার পূর্ণ অধঃপতন হইল। এই অসংযমের বিষম শাস্তি পরে বর্ণিত হইবে।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদে মন্তব্য করিয়াছেন,—'প্রেম কাহাকে বলে, দেবেন্দ্র তাহা কিছুই হৃদয়ঙ্গম করেন নাই—বরং হীরা জানিয়াছিল।' ইহাতে দেবেন্দ্র অপেক্ষা হীরার শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধ হইবে। আর এক কথা। এই মন্তব্য বিশেষভাবে দেবেন্দ্র-হীরা সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলেও এবং ইহা সামান্যভাবে সকল নায়ক-নায়িকা সম্বন্ধে প্রযুক্ত না হইলেও পুরুষ ও নারীর প্রকৃতির এই প্রভেদটুকু অনেক স্থলে সত্য। টেনিসনের 'Locksley Hall'এর ভগ্নহৃদয় প্রেমিক প্রণয়িনীর অব্যবস্থিতচিত্ততার উপর অভিমান করিয়া পুরুষজগতের যদিও বলিয়াছেন,—

'Woman is the lesser man, and all thy passions, match'd with mine,

Are as moonlight unto sunlight, and as water unto wine.'

—তথাপি প্রেমের জহুরী বায়রনের সুভাষিতটিই শিরোধার্য্য—

'Man's love is of man's life a thing apart,

'Tis woman's whole existence.'—*Don Juan.*

এইবার 'হীরার বিষবৃক্ষের ফল' ফলিল। 'হীরা মহারত্ন কপর্দ্দকের বিনিময়ে বিক্রয় করিল। ধর্ম্ম চিরকষ্টে রক্ষিত হয়, কিন্তু একদিনের অসাবধানতায় বিনষ্ট হয়। হীরার তাহাই হইল। যে ধনের লোভে হীরা এই মহারত্ন বিক্রয় করিল সে এককড়া কাণাকড়ি। কেননা দেবেন্দ্রের প্রেম বন্যার জলের মত। যেমন পঙ্কিল, তেমনি ক্ষণিক। তিন দিনে বন্যার জল সরিয়া গেল, হীরাকে কাদায় বসাইয়া রাখিয়া গেল। হীরা দেবেন্দ্রকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, প্রথমে হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইল। কিন্তু কেবল পরিত্যক্ত নহে—সে দেবেন্দ্র-দ্বারা...অপমানিত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিল।...যখন হীরা দেবেন্দ্রের চরণাবলুণ্ঠিত হইয়া বলিয়াছিল যে, "দাসীরে পরিত্যাগ করিও না," তখন দেবেন্দ্র তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, "তুমি যেমন গর্ব্বিতা, তেমনি আমি তোমার প্রতিফল দিলাম; এখন তুমি এই কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া গৃহে যাও।" হীরা শতমুখে দেবেন্দ্রকে তিরস্কার করিল!... তাহাতে দেবেন্দ্রের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি হীরাকে পদাঘাত করিয়া প্রমোদোদ্যান হইতে বিদায় করিলেন। হীরা পাপিষ্ঠা—দেবেন্দ্র পাপিষ্ঠ এবং পশু। এইরূপ উভয়ের চির প্রেমের প্রতিশ্রুতি সফল হইয়া পরিণত হইল।' (৪০শ পরিচ্ছেদ।) এখানেও দেখা যাইতেছে আখ্যায়িকাকার দূষিত প্রণয়ের পরিণাম-বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ইহার দোষ-ঘোষণা (Condemnation) করিতেছেন।

হীরা এত মর্ম্মান্তিক যাতনায়ও কুন্দ-রোহিণীর মত আত্মহত্যার চেষ্টা করিল না। ক্ষণেকের জন্য সে ইচ্ছা মনে উদয় হইলে তাহা দমন করিয়া তীব্র প্রতিহিংসা-বিষে হৃদয় আচ্ছন্ন করিল, চণ্ডালের নিকট বিষ কিনিয়া মনে মনে কহিল, "আমি কি দোষে বিষ খাইয়া মরিব? যে আমার এদশা করিয়াছে, হয় সেই ইহা খাইবে, নহিলে তাহার প্রেয়সী কুন্দনন্দিনী ইহা ভক্ষণ করিবে। ইহাদের একজনকে মারিয়া, পরে মরিতে হয় মরিব।" (৪০শ পরিচ্ছেদ।)

তাহার পর, যখন নগেন্দ্রনাথ গৃহে ফিরিয়া কুন্দের সহিত সাক্ষাৎ না করাতে কুন্দ 'মর্ম্মান্তিক পীড়িত হইয়া রোদন' করিতেছিল, তখন 'কুন্দের ক্লেশ দেখিয়া আনন্দে হীরার হৃদয় ভাসিয়া গেল।' সে প্রশ্ন করিয়া করিয়া কুন্দের যন্ত্রণার কারণ জানিয়া লইল, কুন্দ যতই ব্যথা পাইতে লাগিল সে ততই প্রীতা হইতে লাগিল। শেষে প্রণয়ীর নাম গোপন করিয়া সে কুন্দকে নিজের ইতিহাস বলিল, আত্মহত্যার আভাস দিল ও শয়তানি করিয়া বিষের মোড়ক কুন্দের কাছে রাখিয়া

অন্তত্র গেল। 'সর্পীর' কৌশলে 'সরলা' কুন্দনন্দিনী বিষপান করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইল, নির্দ্দোষ প্রতিদ্বন্দ্বিনীর উপর হীরা ভীষণ প্রতিশোধ তুলিল। (৪৭শ পরিচ্ছেদ।) হীরার পাপের ভরা পূর্ণ হইল। প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিনীর প্রতি একটু ঈর্ষা কুন্দ-রোহিণীর মনের এক কোণে ছিল; সূর্য্যমুখী-ভ্রমর প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিনীর প্রতি কর্কশব্যবহার করিয়াছিলেন; কিন্তু হীরার দ্বেষ অতি তীব্র। শ্রীহিংসাও স্বামী পাইবার জন্য কপালকুণ্ডলার প্রাণহানি করিতে কাপালিকের প্ররোচনায়ও সম্মত হয় নাই। নয়ান বৌ বা ('রজনী'র) চাঁপাও প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে এমন স্বহস্তে বিষ দিতে পারিত না। দরিয়া দেওয়ানা হইয়া প্রণয়ভাজনকে (প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে নহে) খুন করিয়াছে বটে, কিন্তু সে ও ঝোঁকের মাথায়, হীরার মত শত্রুতা কুটিলতা তাহারও নাই। ইহা হইতে বুঝা যায়, হীরা দাসী ইহাদিগের অপেক্ষা প্রকৃতিতে কত নিকৃষ্ট।

এই নিষ্ঠুর কার্য্যের পূর্ব্ব হইতেই হীরার পাপের শাস্তি আরম্ভ হইয়াছিল। আখ্যায়িকা-কার পূর্ব্বে (৩৬শ পরিচ্ছেদের শেষে) আভাস দিয়াছেন, 'লোকে বলে, ইহলোকে পাপের দণ্ড দেখা যায় না। ইহা সত্য হউক বা না হউক তুমি দেখিবে না যে, চিত্তসংযমে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তি ইহলোকে বিষবৃক্ষের ফলভোগ করিল না।' দেবেন্দ্রের হস্তে নিগ্রহের পরে হীরা উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইল। (৪১শ পরিচ্ছেদ।) 'রোগ কখন আসে, কখন যায়। কুন্দের মৃত্যু দেখিয়া অবধি আবার রোগ বাড়িল।' আখ্যায়িকার শেষ (৫০শ) পরিচ্ছেদে হীরার চরম দুর্দ্দশার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। আখ্যায়িকা-কার পূর্ব্বে (৩৩শ পরিচ্ছেদের শেষে) আভাস দিয়াছেন, 'হীরার লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইল। হীরা এমন গুরুতর শাস্তি পাইল যে তাহা দেখিয়া শেষে দেবেন্দ্রেরও পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল।' এক্ষণে সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিতেছি। 'তখন দেবেন্দ্রের রোপিত বিষবৃক্ষের ফল ফলিয়াছিল। সে অতি কদর্য্য রোগগ্রস্ত হইয়াছিল।...কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর পর বৎসরেকের মধ্যে দেবেন্দ্রেরও মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল।' সেই সন্ধিক্ষণে উন্মাদিনী হীরা দেবেন্দ্রকে দেখা দিল। দেবেন্দ্র 'তাহার উন্মাদের লক্ষণ বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিল না,—কিন্তু অতি দীন ভিখারিণী বলিয়া বোধ করিল। তাহার বয়স অল্প এবং পূর্ব্বলাবণ্যের চিহ্নসকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে তাহার অত্যন্ত দুর্দ্দশা।' দেবেন্দ্র প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিল না, পরে চিনিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার এমন দশা কে করিল?" 'হীরা রোষপ্রদীপ্তকটাক্ষে অধর দংশিত করিয়া দেবেন্দ্রকে মারিতে আসিল। পরে স্থির হইয়া কহিল, "আমার এ দশা তুমিই করিয়াছ।" তাহার পর সে নিজের উন্মাদ রোগের কথা, কুন্দকে বিষ খাওয়াইবার কথা প্রভৃতি বলিয়া শেষে বলিল, "এখন তোমার মরণ নিকট শুনিয়া একবার আহ্লাদ করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি নরকেও যেন তোমার স্থান না হয়।" 'সেই অবধি দেবেন্দ্রের মৃত্যুশয্যা কণ্টকময় হইল। মৃত্যুর অল্প পূর্ব্বেই জ্বরবিকারের প্রলাপে দেবেন্দ্র কেবল বলিয়াছিল, "পদপল্লবমুদারং" "পদপল্লবমুদারং"। দেবেন্দ্রের মৃত্যুর পর কতদিন তাহার উদ্যানমধ্যে নিশীথ সময়ে রক্ষকে ভীতচিত্তে শুনিয়াছে যে, স্ত্রীলোকে গায়িতেছে "স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারং।"'

উভয়েরই কি শোচনীয় পরিণাম আখ্যায়িকা-কার ঘোর মসীবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন! ইহার উপর টীকা টিপ্পনী অনাবশ্যক। কেবল এইটুকু বলিতে চাই যে দেবেন্দ্র হীরা নগেন্দ্র কুন্দ অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর চরিত্র। সুতরাং তাহাদের পাপও গুরুতর, শাস্তিও গুরুতর। পক্ষান্তরে, নগেন্দ্র নিজ অসংযমের দোষে কিয়ৎকালের জন্য কেন্দ্রচ্যুত হইলেও শেষে কঠোর 'প্রায়শ্চিত্ত' করিয়া চিত্তশুদ্ধিলাভ করিলেন। অভাগিনী কুন্দ আত্মহত্যায় নিজ অসংযমের ফলভোগ করিয়া পাপ প্রলোভনময় সংসার হইতে অপসৃত হইল। তাহাদিগের পাপ দেবেন্দ্র হীরার তুলনায় লঘু, এই প্রভেদ মনে রাখিতে হইবে। যাহা হউক, তাহাদিগের অবৈধ প্রণয়ের আলোচনা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে করিব।

আর একটি কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। এই আখ্যায়িকা ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র পাত্রীগণের নামের সার্থকতা প্রণিধান-যোগ্য। তারাচরণের মাতা 'শ্রীমতী' অর্থাৎ 'রূপবতী,' এই রূপই তাহার কাল হইল। ('শ্রীমতী বিশেষ রূপবতী ছিল, সুতরাং অচিরাৎ বিপদে পতিত হইল।') দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী'তে 'মালতী মালতী মালতী ফুল' ইত্যাদি ছড়ায় 'মালতী' গোয়ালিনীর নামের ও কদর্য্য-কার্য্যের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়, আর

খোলসা করিয়া বলিতে চাহি না। 'হীরা' 'কথায় হীরার ধার'—ভারতচন্দ্রের নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের ঋণ সুস্পষ্ট। দেবেন্দ্র দত্তর 'মালিনী মাসি' সম্বোধনের উল্লেখ বাহুল্য-মাত্র।) আর দেবেন্দ্র দত্তর পত্নী 'হৈমবতী' 'অনন্তরত্ন-প্রভব' হিমবানের কন্যার ন্যায় ধনিকন্যা। (যদিও ভিখারী হরের গৃহিণীর সহিত তাহার চরিত্রগত মিল নাই।) 'কুন্দ' (কুঁদ) ক্ষুদ্র পুষ্প—'সেই ক্ষুদ্র হৃদয়খানির মধ্যে অপরিমিত প্রেম।' (ক্ষুদ্র 'কুন্দ কুসুমটি'—২৮শ পরিচ্ছেদ। 'অপরিস্ফুট কুন্দ-কুসুম'—৪৯শ পরিচ্ছেদ।) (রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্ন-হৃদয়ে' —৩৪শ সর্গে—'ক্ষুদ্র যূঁই' তুলনীয়।) পতিপ্রাণা 'সূর্য্যমুখী' সূর্য্যমুখী-ফুলের মতই 'থাকে প্রিয়মুখ চেয়ে।' আর 'কমল-মণি'—অনেক দিন আগেই বলিয়াছি, 'স্বামি-প্রীতি, পুত্র-বাৎসল্য, মাতৃভাব, ভ্রাতৃস্নেহ, ভাজের প্রতি ভালবাসা, সখিত্ব, কমল-হৃদয়ের সব পাপড়িগুলিই ফুটিয়াছে। তাই সে প্রস্ফুটিত শতদল কমল', 'সোণার কমল।' 'কোথা হেন শতদল, হৃদে পূরি পরিমল ?' 'রোহিণী' নবমবর্ষে বিবাহিতা হইয়া ('নবমবর্ষা রোহিণী') বিধবা হইয়াছিল কিনা জানি না; তবে তাহার নামের প্রকৃত তাৎপর্য্য (১ম খণ্ডের ২৮শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এই যে রোহিণী, রোহিণী তারার ন্যায় 'তীব্র জ্যোতির্ম্ময়ী, অনন্ত প্রভাশালিনী, রূপতরঙ্গিণী।' 'ভ্রমর' 'ভোমরা কালো' 'সার্থকতা বশতঃ সেই নামই প্রচলিত হইয়াছিল।' ইহা বুঝাইতে আর মল্লিনাথের প্রয়োজন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমর-প্রণয়-সুধার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয়—'ভ্রমর'ও সুখের দিনে গোবিন্দ-প্রণয়-সুধাপানে বিভোর। 'যামিনী' ভ্রমরের দুঃখ-যামিনীর সহচরী। দেখা গেল, নাম-নির্ব্বাচনেও বঙ্কিমচন্দ্রের কলাকৌশল সামান্য নহে।

দেনা-পাওনা

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(১০)

বসু সাহেব যখন শ্বশুরবাটীতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহারই জন্য বাড়ীময় একটা উৎকণ্ঠার সাড়া পড়িয়া গেছে। ঘরে এবং বাহিরে যেখানে যত অস্ত্র এবং ভাঙ্গা লাণ্ঠন ছিল সংগ্রহ হইয়াছে, এবং এই দুর্যোগের রাত্রে এগুলিকে কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টায় বাড়ীসুদ্ধ সকলে গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। চাকর-বাকর ও আত্মীয়-অনুগত লইয়া একটা অভিযানের দল তৈরি হইয়াছে এবং রায় মহাশয় নিজে সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতেছেন। কাহারা কোন্ দিকে যাইবে, কোন্ পথ, কোন্ মাঠ, কোন্ বন-জঙ্গল অনুসন্ধান করিবে, বারম্বার উপদেশ দিতেছেন, তাঁহার আচরণে ও কণ্ঠস্বরে কেবল উদ্বেগ নয়, আতঙ্ক প্রকাশ পাইয়াছে। এখনও প্রকাশ করিয়া কিছু বলেন নাই সত্য, কিন্তু যে ভয়টা তাঁহার মনের মধ্যে উঁকি মারিতেছে তাহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। তিনি জানিতেন যোড়শীর কয়েকজন একান্ত অনুগত ভূমিজ ও বাগ্দী প্রজা আছে। তাহারা যেমন উদ্ধত তেমনি নিষ্ঠুর। ডাকাতি করে বলিয়া পুলিশের খাতায় নাম ধাম পর্য্যন্ত লেখা আছে,—ইহারা এই অন্ধকার রাত্রে কোথাও একাকী পাইয়া যদি তাহাদের ভৈরবী-মায়ের প্রতি অবিচার স্মরণ করিয়া সহসা প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়া উঠে ত সেখানেও বিচারের আশা করা বৃথা। হৈম একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিতেছিল, পিতার আশঙ্কাও তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই কিন্তু, তখন পর্য্যন্ত সে ভিতরের আসল কথাটা জানিতনা। এইটাই আত্মপ্রকাশ করিল তাহার জননীর কথায়। তিনি হঠাৎ বাহিরে আসিয়া স্বামীকে কঠোর অনুযোগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, সে জামাই মানুষ, তাকে কেন তোমাদের ঝগড়ায় মধ্যস্থ মানা ? যার পিছনে ডাকাতের দল রয়েছে তাকে করবে তোমরা জব্দ ? যেখানে পাও আমার নির্ম্মলকে খুঁজে এনে দাও, নইলে যেখানে দুচক্ষু যায় এই অন্ধকারে আমি বেরিয়ে যাবো। এই বলিয়া তিনি কাঁদ কাঁদ হইয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন, এবং কিছুক্ষণের জন্য কন্যা ও পিতা উভয়েই নির্ব্বাক বিবর্ণ মুখে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

জনার্দ্দন রায় আত্মসম্বরণ করিয়া সান্ত্বনা ও সাহসসূচক

ক একটা কথা হৈমকে বলিতে যাইতেছিলেন, ঠিক এমনি সময়ে জামাতা প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া জল ঝরিতেছে, জামা-কাপড়-জুতা কাদামাখা ;— শ্বশুরের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল,— কিন্তু পরক্ষণেই যে সাহেব-জামাইকে তিনি যথেষ্ট খাতির এবং ভয় করিতেন তাহাকেই আনন্দের উৎকট প্রাবল্যে যা মুখে আসিল তাই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

সাহেব নিঃশব্দে উঠিয়া আসিয়া হাতের ভাঙ্গা ছড়িটা রাখিয়া দিলেন, এবং পায়ের জুতা হাত দিয়া টানিয়া ফেলিয়া গায়ের ভিজা জামাটা খুলিয়া ফেলার মধ্যে ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ আত্মীয়-পর একযোগে ও নির্বিশেষে প্রশ্ন করিতে লাগিল কি করিয়া এ দুরবস্থা ঘটিল এবং কোথায় ঘটিল ?

রায় মহাশয় প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, আচ্ছা, সে সব পরে হবে, তুমি বাড়ীর ভেতরে যাও। মা হৈম, আর দাঁড়িয়ে থেকোনা একটা শুক্‌নো কাপড় চোপড় দাওগে।

বাটীর মধ্যে শ্বশুর শাশুড়ী ও সমবেত কুটুম্বিনীগণের প্রশ্নের উত্তরে নির্ম্মল জানাইল, সে ওপারে ফকির সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল, কিন্তু সাক্ষাৎ হয় নাই, তিনি আশ্রমে নাই।

ওপারের নামে একপ্রকার আতঙ্কসূচক অস্ফুট ধ্বনি উঠিল ; রায় মহাশয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া ! আমাকে বল্‌লেত তাকে ডেকে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু এই অন্ধকারে পথ চিন্‌লে কি করে ?

নির্ম্মল কহিল, পথ চেনবার আমার দরকার হয়নি, হলে পারতাম না।

কিন্তু এলে কি করে ?

একজন আমাকে হাত ধরে এনে বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে গেছেন।

চতুর্দ্দিকে প্রশ্ন উঠিল, কে ? কে ? কি নাম তার ? নির্ম্মল একটুখানি স্থির থাকিয়া কহিল, কি জানি, নামটা জানাতে হয়ত তাঁর আপত্তি আছে।

রায় মহাশয় প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, আপত্তি ? কখ্খনো না, আমাদের দেশের লোককে তুমি চেনোনা। কিন্তু যেই হোক্ তাকে খুসি করে দেওয়া চাই ত ? এই বলিয়া চাকরটাকে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া হুকুম করিয়া দিলেন, অধর, চাটুর্য্যে যদি বাইরে থাকে, এখনি বলে দে কাল সকালেই খবর নিয়ে যেন বক্‌শিস দেওয়া হয়। পুরো টাকাই যেন তার হাতে পড়ে,—কেটে যেন কিছু না রাখে। চাটুর্য্যেটা আবার যে কৃপণ ! এই বলিয়া তিনি উদারতার আবেগে প্রথমে গৃহিণী ও পরে কন্যা-জামাতার মুখের প্রতি সদম্ভ দৃষ্টিপাত করিলেন।

রাত্রে আহারাদির পরে নিরালা ঘরের মধ্যে স্বামীকে একাকী পাইয়া হৈম কহিল, বাবা ত পুরস্কার ঘোষণা করে দিলেন, পরে টাকাটা দেবার চেষ্টাও হয়ত কিছু হবে, কিন্তু ফল হবেনা।

নির্ম্মল কহিল, না, আসামী পাওয়া যাবেনা।

হৈম একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তুমি সেই দয়ালু লোকটিকে কি পুরস্কার দিলে ?

নির্ম্মল কহিল, দেওয়া জিনিসটা কি তুমি এতই সহজ মনে কর ? ও কি কেবলমাত্র দাতার মর্জ্জির উপরেই নির্ভর করে ?

তা'হলে দিতে পারোনি ?

না, দেবার চেষ্টাও করিনি।

হৈম স্বামীর মুখের প্রতি একমুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু আমার উচিত। বাবা তাঁকে বার করতে পারবেননা, কিন্তু আমি পারব।

নির্ম্মল সন্দেহ প্রকাশ করিয়া কহিল, আমার মনে হয় তোমার বাবার মত তুমিও তাঁকে খুঁজে পাবেনা।

হৈম বলিল, যদি পাই ত আমাকেও কিছু পুরস্কার দিয়ো। কিন্তু আমি তাঁকে চিনেচি। কারণ তোমার মত অন্ধ মানুষকেও যে এই ভয়ানক অন্ধকারে নির্বিঘ্নে নদী পার করে ঘরের সামনে রেখে যেতে পারে, অথচ আত্মপ্রকাশ করেনা, তাকে চিন্‌তে পারা শক্ত নয়। তা'ছাড়া সন্ধ্যার আঁধারে গা ঢেকে আমিও একবার তাঁকে দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি ঘর-দোর খোলা ; তিনি নেই বটে, কিন্তু তারাদাস ঠাকুর সমস্ত দখল করে বসে আছেন। লুকিয়ে পালিয়ে এলাম। পথে একজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হল, সে বলে দিলে ষোড়শীকে সে সোজা নদীর পথে যেতে দেখেচে। এখন বুঝ্‌লে, যে দয়ালু লোকটি তোমাকে দিয়ে গেছেন তাঁকে আমি চিনি। কিন্তু সত্যিসত্যিই কি একেবারে হাত ধরে রেখে গেছেন ?

নির্ম্মল ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, সত্যই তাই। যে মুহূর্ত্তে তিনি নিশ্চয় বুঝ্‌লেন আমি অন্ধের

সমান, সেই মুহূর্ত্তেই নিঃসঙ্কোচে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্লেন, আমার হাত ধরে আসুন। কিন্তু, পরের জন্যে এ কাজ তুমি পারতেনা।

হৈম অত্যন্ত সহজে স্বীকার করিয়া কহিল, না।

তাহার স্বামী কহিল, তা জানি। ইহার পরে কি করিয়া কি হইল সমস্ত ঘটনা একে একে বিবৃত করিয়া কহিল, অথচ, এ ছাড়া আমার পক্ষে যে কি উপায় ছিল, আমি জানিনে। আবার ওদিকে তাঁর বিপদের গুরুত্বটা একবার ভেবে দেখ। আমাকে তিনি সামান্যই জান্‌তেন এবং তাও বোধ হয় ভাল বলে জানতেন না। তবুও আমাকেই এই যে নির্জ্জন অন্ধকার পথ দিয়ে নিয়ে এলেন, এর দায়িত্বটা কত বিশ্রী, কত ভয়ঙ্কর! বস্তুতঃ, পথে চল্‌তে চল্‌তে আমার অনেক বার ভয় হয়েছে যদি কারও সুমুখে পড়ি, তার চোখে এটা কি রকম দেখাবে? দেখ, হৈম, তোমাদের দেবীর এই ভৈরবীটিকে আমি চিন্‌তে পারিনি সত্যি, কিন্তু এটুকু আজ নিশ্চয় বুঝেছি এঁর সম্বন্ধে বিচার করায় ঠিক সাধারণ নিয়ম খাটে না। হয়, সতীত্ব জিনিসটা এঁর কাছে নিতান্তই একটা বাহুল্য বস্তু,—তোমাদের মত তার যথার্থ রূপটা ইনি চেনেননা, না হয় এর সুনাম দুর্নাম এঁকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করতে পারে না।

হৈম ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তুমি কি জমিদারের ঘটনা মনে করেই এ সব বল্‌চ?

নির্ম্মল বলিল, আশ্চর্য্য নয়। এই স্ত্রীলোকটি ভাল কি মন্দ আমি জানিনে, কিন্তু এ কথা হলফ করে বল্‌তে পারি ইনি যেমন গভীর, তেম্‌নি শিক্ষিত, তেম্‌নি নিঃশঙ্ক। শাস্ত্রে বলে সাত পা একসঙ্গে চল্‌লে বন্ধুত্ব হয়। এতবড় পথটায় এই দুর্ভেদ্য আঁধারে নিতান্ত তাঁকেই নির্ভর করে অনেক পা আমরা একসঙ্গে চলে এসেছি, একটি একটি করে অনেক প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেচি, কিন্তু কালও তিনি যেমন রহস্যে ঢাকা ছিলেন, আজও তেম্‌নি রয়ে গেলেন।

হৈম কহিল, বন্ধুত্বও হোলো না?

নির্ম্মল কহিল, না।

হৈম এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, একটুও না? তোমার দিক থেকেও না?

নির্ম্মল কহিল, এত বড় কথাটা কেবল ফাঁকি দিয়ে বার করে নিতে চাও? কিন্তু, নিজেকে জান্‌তেও যে দেরি লাগে হৈম। কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সে থমকিয়া গেল। চাহিয়া দেখিল হৈমও তাহার প্রতি দুই চক্ষের স্থির দৃষ্টি পাতিয়া আছে। তাহার মুখে কি ভাব প্রকাশ পাইল, প্রদীপের স্বল্প আলোকে ঠিক বুঝা গেল না, এবং সে নিজেও যে নিজের পূর্ব্ব কথার যোগ রাখিয়া হঠাৎ কি বলিবে, ভাবিতে হৈম ধীরে ধীরে কহিল, সে ঠিক। তবু, পুরুষ মানুষদের বুঝ্‌তে হয়ত একটু দেরিই হয়, কিন্তু মেয়েমানুষের এম্‌নি অভিশাপ যে আমরণ নিজের অদৃষ্টকে বুঝ্‌তেই তার কেটে যায়। আচ্ছা, তুমি ঘুমোও, আমি এখনি আস্‌চি, এই বলিয়া সে আর কোন কথার পূর্ব্বেই উঠিয়া সাবধানে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

কিন্তু যাইবার সময় নির্ম্মল তাহার হাতটা পর্য্যন্ত ধরিয়া ফেলিতে পারে নাই, কিন্তু, কিছুক্ষণে এই তাহার অবাক্ ভাবটা যখন কাটিয়া গেল, তখন নিষ্ফল অভিমান ও অবিচারের বেদনা একই সঙ্গে আলোড়িত হইয়া তাহাকে অকস্মাৎ চঞ্চল করিয়া তুলিল। এদিকে হৈমর এখনি আসার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সুমুখের বড় ঘড়িটায় অত্যন্ত ক্লেশকর মিনিটের কাঁটাটা নড়িতে নড়িতে নিচে ঝুলিয়া পড়িল, কিন্তু তখন পর্য্যন্তও যখন সে ফিরিয়া আসিল না, তখন আর সে একাকী শয্যায় থাকিতে না পারিয়া ধীরে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, অন্ধকার বারান্দায় একটা থামের পাশে হৈম চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কাছে আসিয়া মাথায় গায়ে হাত দিয়া দেখিল, বৃষ্টির ছাঁটে সমস্ত ভিজিয়া গেছে। হাত ধরিয়া সযত্নে তুলিয়া ধরিয়া কহিল, তুমি কি পাগল হয়েছ হৈম?

ইহার অধিক আর তাহার মুখেও আসিল না, আসার প্রয়োজনও বোধ করিল না। ধীরে ধীরে ঘরে আনিয়া প্রদীপের আলোকে মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল অশ্রুর আভাস চোখের কোণ হইতে তখন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

মহাকবি কালিদাসের নব-পরিচয়*

[শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশে আছে, রাম ও সীতা 'পুষ্পক-রথারোহণে বিমান-পথে গমন করিতেছেন, শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে নৈসর্গিক শোভা দেখাইতেছেন। রামচন্দ্র ত্রয়োদশসর্গের অষ্টাদশ শ্লোকে সীতাকে বলিতেছেন, "সমুদ্র দূরে যাইতেছে ও তীরস্থ কাননে উহার পরস্পর অংশগুলি অদৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে, মনে হইতেছে যেন ভূমিই কাননসহ জলগর্ভ হইতে উত্থিত হইতেছে।"

এই অষ্টাদশ 'শ্লোকটি গতি-বিজ্ঞানে'র আপেক্ষিক গতির একটী প্রয়োগ-বিশেষ। বিভিন্ন সমতল-পৃষ্ঠে রথ, কানন ও সমুদ্র বর্ত্তমান। শ্লোকে বর্ণিত আছে, সমুদ্র দূরে যাইতেছে ও তীরস্থ কাননে উহার পরস্পর অংশগুলি অদৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে। সমুদ্র ও কানন যথাস্থানেই রহিয়াছে, রথে বসিয়া শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন, "তীরস্থ কাননে সমুদ্রের অংশগুলি অদৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে যেন ভূমিই কাননসহ জলগর্ভ হইতে উত্থিত হইতেছে।" এই যে জ্ঞান, ইহা কালিদাসের অভিজ্ঞতালব্ধ নহে, কারণ পৃথিবীতে ইহা অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। গতি-বিজ্ঞানের আপেক্ষিক গতির প্রকৃত মর্ম্ম না জানিলে ইহা নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। এই বিংশ শতাব্দীতে গতি-বিজ্ঞান জানা সহজ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু কালিদাস খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন (রায় মহাশয়ের শকুন্তলা দ্রষ্টব্য)। গতি-বিজ্ঞানের এই প্রয়োগকে স্ফুটতর রূপে উপস্থিত করা বর্ত্তমান সময়ের কোনও জ্যামিতিতে সুদক্ষ ব্যক্তির পক্ষেও সহজ নহে। মহাকবি ভাসের গ্রন্থে ও অন্যান্য স্থানেও আপেক্ষিক গতির উল্লেখ আছে বটে; সেরূপ উল্লেখ অভিজ্ঞতা দ্বারা সহজেই অনুমেয়, কিন্তু মহাকবি কালিদাসের বর্ণনা অভিজ্ঞতা দ্বারা লাভ করা যায় না।

ত্রয়োদশসর্গের ২১শ শ্লোকে আছে, "রথ যখন মেঘ পথ দিয়া যাইতে লাগিল, হে চণ্ডি, তুমি কুতূহলে জানালা দিয়া হাত ঝুলাইয়া দিয়া মেঘকে স্পর্শ করিলে, আর উহা তোমার হাতে বিদ্যুৎ জড়াইয়া দিল, মনে হইল যেন মেঘ স্নেহে তোমাকে আর একটি বালা পরাইয়া দিল।"

মেঘের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি আছে, শক্তি স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে, তার স্থানান্তরিত করিতে হইলে স্পর্শ করা আবশ্যক, ইহা কবি জানিতেন। এখানেও তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল না। Leyden Jars তাঁহার সময়ে অজ্ঞাত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের আবিষ্কারের পূর্ব্বে এবং খৃষ্ট জন্মিবারও পূর্ব্বে তিনি এই তত্ত্ব অবগত ছিলেন। একাধারে এরূপ অসাধারণ কবিত্ব, গণিতজ্ঞতা ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য কোনও ভারতীয়ের ছিল, ইহা ভারতের বড়ই গৌরবের বিষয়।

---

* রঘুবংশের ব্যাখ্যায় সম্প্রতি বিদ্যাসাগর কলেজের সুযোগ্য ও সুপণ্ডিত প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায়, এম, এ মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, গতি-বিজ্ঞান (Dynamics) ও তড়িৎ-বিজ্ঞান (Electricity) সম্বন্ধে কালিদাস সুপণ্ডিত ছিলেন। এই গবেষণার জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। এ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহারই মর্ম্মানুবাদ দিলাম।

সাময়িকী

আসামের যে সমস্ত কুলী চাঁদপুরে আটক হইয়াছিল, তাহারা সকলেই যার-যার দেশে চলিয়া গিয়াছে; এখনও যে দু দশ জন বাগান ছাড়িয়া আসিতেছে, দেশের লোকে তাহাদেরও ঘরে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছে। মধ্যে শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল যে, ইহারা দেশে যাইয়া তেমন সমাদর অভ্যর্থনা লাভ করে নাই; এখন শুনিতেছি, সে কথা সত্য নহে, তাহারা বিশেষ আদরের সহিতই অভ্যর্থিত হইয়াছে। তাহা যেন হইল, কিন্তু এখনও আমরা একটা কথা বুঝিতে পারিতেছি না। এই যে কুলীরা আসামে বা অন্য স্থানে চা-বাগানে গিয়াছিল, সে কি বড়-মানুষ হইবার জন্য, না ক্ষুধার তাড়নায়। আমাদের যতদূর জানা আছে, তাহাতে বলিতে পারি, এই যে দলে দলে কুলী বাগানে যাইত এবং কিছুদিন পূর্ব্বেও গিয়াছে, তাহারা দেশে থাকিয়া ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিতে পারিত না, তাই তাহারা একমুষ্টি অন্ন ও একখানি বস্ত্রের কাঙ্গাল হইয়া চা বাগানে বা নানা স্থানের খনিতে কাজ করিতে যায়। তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে, এই যে সব কুলী দেশে ফিরিয়া গেল, তাহাদের পেট চলিবে কি করিয়া? দেশে যদি তাহাদের জমি জমা থাকিত, দুইটা অন্নের সংস্থান থাকিত, তাহা হইলে তাহারা দেশের মায়া কাটাইয়া আসামের জঙ্গলে যাইত না। এখন

তাহারা যে কারণেই হোক দেশে ফিরিয়া গেল; কিন্তু তাহার পর? তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কি হইবে? দেশের মাটী কামড়াইয়া থাকিলে ত ক্ষুধা দূর হইবে না,—দেশে যাহারা আছে, তাহারাই যে দুবেলা খাইতে পায় না। সুতরাং বাগান-প্রত্যাগত কুলীদিগকে দেশে পৌছাইয়া দিলেই নেতৃবর্গের কর্ত্তব্য শেষ হইল না, তাহাদের ভবিষ্যতের ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

চাঁদপুরের কুলীদিগের কথা বলিতে গেলেই এক মহাপ্রাণ যুবকের কথা মনে হয়। ইনি পরলোকগত গৌরীশঙ্কর মার্ত্তিয়া। চাঁদপুরের সুরজমল নাগরমল নামক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর কর্ম্মচারী এই গৌরীশঙ্কর তেইশ বৎসর বয়সের যুবক। যখন চাঁদপুরের কুলীদিগের মধ্যে ওলাউঠার প্রকোপ বৃদ্ধি হইল, তখন এই যুবক কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া রোগীর শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করিলেন; দিনরাত অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকগণের সহিত রোগীর সেবা করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন অবিশ্রান্ত সেবার পর গৌরীশঙ্কর ঐ রোগে আক্রান্ত হইলেন; মৃত্যু-শয্যায়ও তাঁহার মনে নিজের রোগের কথা উঠে নাই; আমরা শুনিয়াছি, একদিকে তিনি রোগের জ্বালায় ছটফট্ করিতেছেন, আর একদিকে খোঁজ করিতেছেন, রোগগ্রস্ত কুলীদিগের কি হইল, তাহাদের শুশ্রূষার কি ব্যবস্থা হইল। অনেক চেষ্টা করিয়াও গৌরীশঙ্করকে কেহ বাচাইতে পারিল না;—অন্ধ পিতামাতা, যুবতী পত্নী ও দুইটী শিশু সন্তান রাখিয়া গৌরীশঙ্কর সাধনোচিত ধামে চলিয়া গেলেন। ভগবানের এ বিধান কেমন করিয়া বুঝিব?

ভারতীয় গুপ্ত পাণ্ডুলিপির পুনরুদ্ধার-কল্পে দেশের নানা স্থানে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, ইহা বড়ই আশার কথা। সম্প্রতি আমরা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট হইতে যে পত্র পাইয়াছি, তাহা নিম্নে তুলিয়া দিলাম। তিনি লিখিয়াছেন, উপাদানের অভাব বশতঃ ভারত ইতিহাসের পাঠকবর্গ স্বতঃই হতাশ হইয়া আসিতেছেন। ফলতঃ ভাবের প্রসারতা এবং চরিত্রের নিষ্কর্ষতা সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হইতে পারে, এরূপ জাতীয় উপকরণের বিপুল আয়োজন তাহাদের নাই। তাহাদের সম্বল যে একেবারে ক্ষুদ্র, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পাণ্ডুলিপি ত দূরের কথা, মুদ্রিত কোন গ্রন্থ সংগ্রহও নিতান্ত কষ্টসাধ্য। সুতরাং ভারত ইতিহাসের উন্নতি-কল্পে উপকরণ সংগ্রহের বড়ই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতার ইম্পিরিয়াল এবং বাঁকীপুরের খোদাবক্স লাইব্রেরী এই উদ্দেশ্যে ইতিপূর্ব্বেই কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারা যে সুযোগটুকু সম্মুখে ধরিতেছেন, গবেষণাকারিগণ সেই সুবিধার সম্যক্ সদ্ব্যবহারের ত্রুটী করিতেছেন না। আধুনিক যে সকল অমূল্য গ্রন্থরাজি লিখিত হইতেছে, তাহাদের প্রায় অধিকাংশই এই সকল লাইব্রেরী এবং কতিপয় বে-সরকারী লাইব্রেরীর শুভ-অনুষ্ঠানের ফল-প্রসূত। আমি ভরসা করি, যিনি এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বে-সরকারী লাইব্রেরীর তিমির গর্ভ হইতে লুপ্ত রত্নরাজি সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠতর পুরস্কারের প্রকৃত অধিকারী হইবেন। যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং বিহারের প্রায় অধিকাংশ জেলাই উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর আদিস্থান। আমাদের সহিত এখনও এরূপ অনেক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার হয়, যাহাদের নিকট এইরূপ পাণ্ডুলিপি এবং মুদ্রিত গ্রন্থরাজি পাওয়া যাইতেছে। বড়ই সমস্যার বিষয় এই যে, এই লাইব্রেরীগুলি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত এবং এই সকলের স্বত্বাধিকারীর সাহায্য ব্যতিরেকে প্রকৃত প্রমাণ সংগ্রহ করা সুদূরপরাহত। যদি আপনার কোন পাঠক ভারত ইতিহাসের যে কোন অধ্যায়ের হিন্দুস্থানী, হিন্দী, পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী, ইংরেজী অথবা পারস্য ভাষায় লিখিত কোন পুরাতন পাণ্ডুলিপির স্বত্বাধিকারী হন, অথবা এরূপ স্বত্বাধিকারীর সহিত পরিচিত থাকেন, তাহা হইলে আমাকে পত্র লিখিয়া জানাইলে অত্যন্ত বাধিত হইব। আমরা সেই মুদ্রিত পুস্তক অথবা পাণ্ডুলিপির জন্য উপযুক্ত মূল্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইতেছি। যদি তাঁহারা উহা হস্তান্তর করিতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে সেই পাণ্ডুলিপির অনুলিপি প্রস্তুত করিবার অনুমতির জন্য তাঁহাকে উপযুক্ত ভাতা প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। দয়া করিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় চিঠি পত্রাদি প্রেরণ করিবেন। ডক্টর এস, এ, খাঁ, এম, এ, ইউনিভারসিটির ইতিহাসের অধ্যাপক, এলাহাবাদ, ইউ, পি।

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা অর্থাৎ ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় যাহারা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা প্রায় সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে, অনুত্তীর্ণের সংখ্যা খুব কম।

তাই, একজন সংবাদপত্র-সম্পাদক রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এবারের পরীক্ষায় নাকি শতকরা একশত পনর জন পাশ হইয়াছে। পাশ বেশী হইয়াছে, বেশ কথা;—ছেলেরা খুব লায়েক হইয়াছে, সে কথাও না হয় মানিয়া লইলাম। কিন্তু, তার পর? এই বার তের হাজার ছেলে এখন যায় কোথায়? দলে দলে ছেলে যে এই কলিকাতা সহরের কলেজগুলির দ্বারে-দ্বারে ঘুরিতেছে-ফিরিতেছে, নিরাশ হইয়া ছল-ছল নেত্রে রাস্তার ফুটপাথে আসিয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাদের উপায় কি হইবে? তবুও ত হরতালের কল্যাণে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে অনেক ছাত্র কলিকাতায় আসিতে পারে নাই। কলিকাতা এবং মফঃস্বলের সমস্ত কলেজে যত ছাত্র ধরিতে পারে, তাহার অনেক অধিক ছাত্র—প্রায় তিন গুণ ছাত্র এবার পাশ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি হয় ত ইচ্ছা করিয়াই পড়া-শুনা ছাড়িয়া দিবে; আর যাহারা কলেজে পড়িতে চায়, ঘটী বাটী বাঁধা দিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের দামোদর পূর্ণ করিতে প্রয়াসী, তাহাদেরও অনেককে যে ফিরিতে হইবে। তাহাদের ব্যবস্থা কি হইবে? প্রতি বৎসরই এই সময়ে কলেজ-প্রবেশে অকৃতকার্য্য নবীন যুবকগণের মলিন মুখ দেখিয়া আমাদের ব্যথিত হইতে হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কিছুদিন পূর্ব্বে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি পরিষদ্-মন্দিরে স্থাপিত করিবার প্রস্তাব করেন। সে সময় সকলেই এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেন, এবং সেজন্য সোৎসাহে চাঁদা সংগ্রহ আরম্ভ হয়। কিছু টাকা সংগৃহীত হইবার পর এই কার্য্যের অগ্রণীবৃন্দের মনে আশার সঞ্চার হয়, যে, খরচার সমস্ত টাকাই অনতিবিলম্বে সংগৃহীত হইবে। তাঁহারা আশ্বস্ত হৃদয়ে মূর্ত্তি নির্ম্মাণের অর্ডার দেন। মূর্ত্তি প্রস্তুত শেষ হইয়াছে; ভাস্কর মহাশয় কিছু টাকাও পাইয়াছেন; এখন অবশিষ্ট টাকা আদায় না দিলে মূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে না। এই এগার শত টাকা উঠিতেছে না কেন, আমরা বলিতে পারি না। বিলম্বও যথেষ্ট হইয়া গিয়াছে! আমাদের ভয় হইতেছে, কোন্ দিন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিব যে, এগার শত টাকার জন্য বাঙ্গালার সাহিত্য-সম্রাট্, 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্ত্তি নীলামে উঠিতেছে। এমন লজ্জা, এমন অপমানের দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য বাঙ্গালী কি চেষ্টা করিবেন না? দেশের যথেষ্ট অভাব তাহা জানি কিন্তু, এই এগার শত টাকা চাঁদা সংগ্রহ হইতে পারে না, এমন দুর্দ্দিন, টাকার এমন দুর্ভিক্ষ বোধ হয় বাঙ্গালা দেশে এখনও উপস্থিত হয় নাই।

আলোচনা

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

নানা স্থানে চরকা ও তাঁতের খোঁজ-খবর লইয়া বেড়াইতেছি; এবং যতই দেখিতেছি, ততই হতাশ হইয়া পড়িতেছি। চরকা অনেকে তৈয়ার করিয়াছেন ও করিতেছেন; মাঝে-মাঝে দুই-একটী নূতন ধরণের এবং বেশ ব্যবহারযোগ্য চরকাও তৈয়ার হইতেছে,—তাহাদিগকে সেকেলে চরকার কিছু উন্নত সংস্করণ বলিলেও অন্যায় হয় না। চরকার বিক্রয়ও খুব—প্রায় ঘরে-ঘরেই দুই-একটী করিয়া চরকা দেখা যাইতেছে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। এ যেন দায়ে পড়ে দারগ্রহ। চরকা কিনিয়াছেন অনেকেই—কিন্তু ব্যবহার করিবার জন্য নহে—কেবল ঘর সাজাইবার জন্য; অন্যান্য আসবাবের ন্যায় চরকাও ভদ্র গৃহস্থের বৈঠকখানার একটী আসবাব,—অভ্যাগতগণ আসিয়া দেখুন, আমার ঘরে চরকা আছে। এ চরকা কেনায় কি ফল? একে ত কলের চরকার প্রবল প্রতাপে হাত-চরকার সাফল্য লাভের আশা খুবই কম; তাহার উপর, চরকা যদি কেবল ঘর সাজাইবার উপকরণ মাত্রে পরিণত হয়, তাহা হইলে চরকা চালাইয়া আমাদের লাভের আশা কোথায়?

বড় দুঃখেই এ সকল কথা বলিতে হইতেছে। আমাদের একটা প্রধান দোষ—আমাদের organization মোটেই নাই;—ছোট-বড় যে-কোন একটা কাজে হাত দিতে গেলেই, সেজন্য যেরূপ বন্দোবস্ত করা দরকার, আমরা প্রায়ই তাহা করিয়া উঠিতে পারি না; আমাদের সকল

সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার সাধনের জন্য অনেকেরই মনে একটা প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সহজে কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যাইতেছে না, এই যা দুঃখের কথা। "হিন্দুস্থান" সম্পাদক ঠিকই বলিয়াছেন—

"অত্যন্ত সাধারণ রকমের আটপৌরে শিক্ষা সার্ব্বজনীন ভাবে দেশে প্রচলিত হউক, ইহাই আমরা চাই। যে শিক্ষার সাহায্যে চাষার ছেলের নিরক্ষরতা ঘুচিবে, টাকা-আনা-পয়সা ঠিকমত বুঝিয়া লইয়া নিজের ব্যবসা বাণিজ্য চালাইতে পারিবে, তেমন শিক্ষার প্রচলন করিতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করা উচিত নয়। বড়-বড় শিক্ষাপদ্ধতি কল্পনা জল্পনা হইতেছে, কিন্তু আসল কাজ কিছুই হইতেছে না। এজন্য কেবল গবর্ণমেণ্টকে দোষ দিলে চলিবে না; দোষের ভাগ আমাদিগকেও বহন করিতে হইবে।

স্যার রাসবিহারী ঘোষ মৃত্যুকালে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ ও সেয়ার জাতীয় বিদ্যালয়ে দান করিয়া গিয়াছেন। জাতীয় বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সে টাকায় শুনিতে পাইতেছি এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবেন। তাঁহারা সেই টাকায় অন্ততঃ এই চেষ্টা করুন না যাহাতে প্রেসিডেন্সী বিভাগের দশ বার বছরের কোনও বালকই নিরক্ষর না থাকে।" হিন্দুস্থান ২৩শে আষাঢ়।

বস্তুতঃ, সকল বিষয়েই গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে আসল কাজ কিছুমাত্র অগ্রসর হইবে না। কোন কাজ করা দরকার হইলে, আমরা যদি সে বিষয়ে চেষ্টা করি, এবং সেই কার্য্য সাধনে আগ্রহের সহিত প্রবৃত্ত হই, এবং কাজটা যদি ভাল হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে কোন উপরোধ অনুরোধ করিতে হইবে না, গবর্ণমেণ্টের কাছে কোনরূপ প্রার্থনা করিতে হইবে না, গবর্ণমেণ্ট স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া সাহায্য করিবেন। কলিকাতার অন্ধ-বিদ্যালয়, মূক-বধির বিদ্যালয় কি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইতেছে না? কিন্তু তাহার গোড়া-পত্তন দেশের লোকের দ্বারাই হইয়াছে। আগে অভাব বোধ, তারপর তাহা নিবারণের চেষ্টা। সেই চেষ্টা হইতেই ক্রমে মহৎ কার্য্য সাধিত হয়।

বর্দ্ধমানে একটি সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম,—

বর্দ্ধমানে মেডিকেল স্কুল।—বর্দ্ধমানে এক মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে; ইহার নাম হইয়াছে রোনাল্ডশে মেডিকেল স্কুল। আগামী ১লা জুলাই হইতে ঐ স্কুলে ছাত্র ভর্ত্তি করা হইবে। এ বৎসর ৫০ জন ছাত্রের বেশী ভর্ত্তি করা হইবে না।

২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ, ১৪ই আষাঢ়।

দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ, এবং সুচিকিৎসকের সংখ্যা যেরূপ কম, তাহাতে, দেশের নানাস্থানে এইরূপ অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটী উল্লেখযোগ্য আনন্দের সংবাদ আছে।

"পল্লীগ্রাম সমূহের স্বাস্থ্যোন্নতি কল্পে কি কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে তদ্বিষয় পরামর্শ করিবার জন্য বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ আগামী ১৬ই জুলাই কলিকাতা নগরীতে মাননীয় সার সুরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক একটা বৈঠকে নিমন্ত্রিত হইবেন। বৈঠকের প্রধান উদ্দেশ্য সাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যনীতি প্রচার।

দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য একটা কিছু করা যে দরকার হইয়াছে, এবং সে পক্ষে যে একটু-আধটু চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, ইহা যেমন আনন্দের সংবাদ, সেইরূপ, বাঙ্গলা সংবাদপত্র সম্পাদকগণের মতের মূল্য যে স্বীকৃত হইতেছে, ইহা দ্বিতীয় আনন্দের সংবাদ। বাঙ্গলা সংবাদপত্রসকল এতদিনে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা কার্য্য-ক্ষেত্রে দেখাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা লোক মত গঠন করিতে পারেন. জনসাধারণ তাঁহাদের কথা শুনে, এবং তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে কাজ করে, অন্ততঃ করিবার চেষ্টা করে। তাই আজকাল দেখিতেছি, এ্যাঙ্গলো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি নিজেদের মনের মতন কথা পাইলে, বাঙ্গলা সংবাদপত্রের দোহাই দিতেও কুণ্ঠিত নহেন; এবং অদ্ধ গবর্ণমেণ্ট—দেশীয় মন্ত্রীরা ক্ষেত্রবিশেষে বাঙ্গলা সংবাদপত্রের মতামত লইয়া কাজ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গলা দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে লোকমত গঠন করিতে হইবে, লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ পক্ষে বাঙ্গলা সংবাদপত্রসমূহ যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে পরামর্শের জন্য আহ্বান করা খুব সমীচী হইয়াছে।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রণীত নূতন গল্প পুস্তক "মায়ের নাম" প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৷৹।

আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার ৬৩ সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম-এ প্রণীত "লেডী ডাক্তার" প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত নূতন উপন্যাস "মঙ্গল মঠ" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য তিন টাকা।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মিনার্ভায় অভিনীত নূতন প্রহসন 'কেলোর কীর্ত্তি' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য আট আনা।

শ্রীমতী বিহঙ্গবালা দাসী প্রণীত "মানসী"তে প্রকাশিত অপূর্ব্ব সামাজিক উপন্যাস "সুলক্ষণা" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত 'দেবতার দান' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৷৹।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

অবতরণ

Emerald Ptg. Works. Blocks By—BHARATVARSHA HALFTONE WORKS.

ভাদ্র, ১৩২৮

প্রথম খণ্ড] নবম বর্ষ [তৃতীয় সংখ্যা

কারণ-তত্ত্ব

[শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, ডি-এস্‌সি, এম-বি]

সাধারণ কথা আছে, সকল বিষয়েরই একটা-না একটা 'কারণ' আছে। কথাটা কতদূর ঠিক, তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাক। গাছ হইতে আপেল পড়িল, নিউটন তাহার 'কারণ' খুঁজিতে গিয়া, একটা প্রকাণ্ড আবিষ্কারই করিয়া বসিলেন। পণ্ডিতেরা উহার একটা নাম দিলেন—মাধ্যাকর্ষণ। গাছের পাতা নড়িল, তাহার কারণ হইল হাওয়া। সূর্য্য উঠিল, চাঁদও অস্ত গেল, তার কারণ সাধারণ লোক বলিল চাঁদ-সূর্য্য ঘুরিতেছে, বৈজ্ঞানিক বলিলেন, পৃথিবী ঘুরিতেছে; যাহা হউক, দেখা গেল যে, সব লোকেই একটা-না-একটা কারণ চায়।

এই পৃথিবীতে জড় জগতে সব কাজেরই কারণ আছে, এ কথা বলিলে কাহারও মনে খট্‌কা লাগিবে না; কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে, ব্যাপারটা আর অত সোজা মনে হইবে না। পাখী ডাকিতেছে, তাহার কারণ আছে। আমি লিখিতেছি, তার কারণ আমার ইচ্ছা; আমার ইচ্ছা হইয়াছে ইহার কারণ কি? আমি বলিব, জলধর দাদা আমায় লেখাইতেছেন। তাঁরই বা এ কুমতি হইল কেন? এ প্রকারে, তার পর, তার পর, তার পর,—কারণ খুঁজিতে-খুঁজিতে একেবারে হয়রাণ। ছেলে বলিল, "বাবা, আম পড়ে কেন?" বাবা বলিলেন, "মাধ্যাকর্ষণ।"

ছেলে কথাটা বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "বাবা, মাধ্যাকর্ষণ কেন হয়?" বাবা বলিলেন, "চুপ কর ব্যাটা,—অমন হয়।" ছেলে বুঝিল। কিন্তু থাবড়া দিয়া সব ছেলেকে বুঝান যায় না। এই কারণ-ধারার বাস্তবিকই কি অন্ত নাই? বৌদ্ধেরা বলিলেন, ইহা অনন্ত। ভক্ত বলিলেন, ভগবানই ইহার মূল। নাস্তিক বলিলেন, "সব জিনিসের কারণ খুঁজে, ভগবানে এসে চুপ করলে কেন?" ভক্ত বলিলেন, "ও-সব সম্বন্ধে বোঝা যায় না; সাধন-ভজন চাই। ভগবৎ প্রেম জাগলে সব বুঝতে পারবে।" সাধারণ লোকে ঘর-করণা চালাইবার জন্য এসব জটিল প্রশ্নের প্রয়োজনই দেখিল না। তাহারা এ দিকে মোটেই ঘেঁসিল না। কিন্তু দার্শনিক চুপ করিবার লোক নহেন; ঐ সব 'কেন' লইয়া বাদ-বিতণ্ডাই যে তাঁহার জ্ঞানের খোরাক;—তাঁর বিদ্যার জিমনাষ্টিকই ঐ সব তর্ক!

এক দল দার্শনিক স্থির করিলেন, কারণ-ধারা অনন্ত; আর একদল বলিলেন "তাহা ভগবানেই শেষ।" তাঁহারা এ সম্বন্ধে বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার অবতারণা করিলেন। আমি সে সব গভীর তত্ত্ব জানিও না, আর তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া ঘুরিয়া মরিতেও রাজী নই। আমি সহজ ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিব। এই দুই মতের কোনটাই যুক্তি-তর্কের উপর নির্ভর করে না—নির্ভর করে মানুষের মনের উপর। বৈঠকখানায় বসিয়া যুক্তি-তর্কের সাহায্যে ভূতের অস্তিত্ব হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম বটে, ভূত কিন্তু ওদিকে মনের স্কন্ধ হইতে যুক্তি-তর্কের ভয়ে নামিল না। রাত্রি দ্বিপ্রহরে নির্জ্জন তেঁতুল-তলা দিয়া যাইবার সময় শরীর ছমছম করিয়া উঠিল; অমনি রাম নাম মুখে আসিল। তখন মনের সঙ্গে একটু লুকোচুরি করিলাম; যুক্তির দ্বারা মনকে বুঝাইতে গেলাম, ভূত ত আমি মানি না,—রাম নাম করিলে এমন দোষটাই বা কি! অতএব তেঁতুল-তলায় অন্ধকার নির্জ্জন রাত্রিতে রাম নামই না হয় করিলাম। কোন কিছু বিশ্বাস করিবার, বা কোন কাজ করিবার ইচ্ছা হইলে, অনুকূল যুক্তি-তর্কের অভাব হয় না। সোজা কথায় বলিতে গেলে, বিশ্বাস আগে, যুক্তি পরে। যুক্তি ও বিশ্বাসের কোন্‌টা কতখানি বলবৎ, বারান্তরে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

জড়-জগতের সকল কাজেরই কারণ আছে, এ কথা মানিতে কাহারও আপত্তি হইল না দেখিলাম। তবে, মানসিক বৈচিত্র্য-ভেদে কেহ বলিলেন, কারণের শেষ আছে; কেহ বলিলেন, নাই। সকলেই কিছুদূর পর্য্যন্ত কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রস্তুত। কিন্তু জড়-জগৎ হইতে মানসিক জগতে আসিলে, গোলমাল আর একটু পাকাইয়া উঠে। সকল মানসিক অবস্থারই কি কারণ আছে? আমাদের মনের সকল ইচ্ছাই কি কারণের অধীন? স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া কি কিছুই নাই?

গীতা বলিলেন 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।' মুখে কথাটার আবৃত্তি করিলাম বটে, কিন্তু 'আমিত্ব' কি সহজে যায়? ইচ্ছা করিলেই হাত উঠাইতেছি; 'ক' না লিখিয়া 'খ' লিখিতেছি; ইচ্ছামত উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্ব যে দিকে খুসি যাইতে পারি। ইহার ভিতর পরাধীনতা কোথায়? ভগবান সকল কর্ম্মেই হয় ত আমাকে নিযুক্ত করিতেছেন; কিন্তু আপাততঃ তাহার ত কোন লক্ষণই বুঝিতে পারিতেছি না! জড়-জগতে বরং ইট-পাথর বাহিরের শক্তি ভিন্ন নড়ে না; আপেল মাধ্যাকর্ষণ ভিন্ন পড়ে না। কিন্তু আমি ইচ্ছা করিলেই যাহা-তাহা করিতে পারি, আমার ইচ্ছা যে একেবারেই স্বাধীন।

তবে কি মনোজগতে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নাই? দার্শনিকেরা আবার গবেষণায় বসিলেন। কেহ বলিলেন, মনোজগতও জড়-জগতের ন্যায় সম্পূর্ণ নিয়মাধীন। তবে আমাদের জ্ঞান পরিপক্ক হয় নাই; তাই কোন্ অবস্থায় কাহার মনে কি চিন্তার উদয় হয় বলিতে পারি না। জড়-জগতেও ত এখন আমরা সকল জিনিসের ভবিষ্যৎ নিরূপণ করিতে পারি না। যে দিন জ্ঞান পরিপূর্ণ হইবে, সে দিন কি জড়-জগৎ, কি মনোজগৎ, সকল বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী করিতে পারিব।

একটা সামান্য পরীক্ষা করা যাক। অপর পৃষ্ঠায় ছোট অক্ষরে কি লিখিলাম, তাহা পাঠক এখন দেখিবেন না। জানি, নিষেধ করিতেছি বলিয়াই দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হইবে। আপাততঃ ইচ্ছাটা একটু সংবরণ করিয়া, কাগজ দিয়া লেখাটা ঢাকিয়া রাখুন। তাহা না হইলে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও চক্ষু ঐ দিকেই যাইবে। আপনি কিছু না ভাবিয়া, যত শীঘ্র পারেন, এক হইতে পাঁচের ভিতর একটি সংখ্যা মনে করুন। সংখ্যাটা মনে রাখিবেন, গোল করিবেন

না। পুনরায় এক হইতে দশের ভিতর একটা সংখ্যা মনে করুন। এইবারে চাপা কাগজটী তুলিয়া পড়িয়া দেখুন ;—

আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, অধিকাংশ পাঠকই 'তিন' ও 'সাত' মনে করিয়াছেন। অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই আমার ভবিষ্যৎবাণী সফল হইবে না। 'ভারতবর্ষের' পাঠক-পাঠিকাগণ দয়া করিয়া বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ইহা পরীক্ষা করিয়া শতকরা কতজনের সম্বন্ধে আমার ভবিষ্যৎবাণী মিলিয়া গেল, জানাইলে বাধিত হইব। লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষায় পার্থক্য আছে। আমি নিজে এক হইতে পাঁচের মধ্যে 'তিন' মনে-করা পরীক্ষায় শতকরা নব্বই জনের সম্বন্ধে সফল হইয়াছি এবং দেখিয়াছি ভাবিবার সময় না দিলে শতকরা পঞ্চাশ জনের উপর এক হইতে দশের মধ্যে 'সাত' মনে করে। কেন এরূপ হয়, তাহা পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

যে সকল পাঠকের সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছে, তাঁহাদের স্বাধীন-চিন্তা কোথায় ছিল? কলিকাতার রাস্তায় গণৎকারেরা লোকের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য দর্শকদের মনে-মনে এক হাতে রাম ও এক হাতে লক্ষ্মণকে রাখিতে বলেন। শতকরা নিরানব্বই জন ডান হাতে রামকে স্থান দেন। গণৎকারের পক্ষে ঠিক ধরিয়া দেওয়া দুরূহ নহে। বাজীকরেরা নিজ ইচ্ছামত অনেক সময়ে দর্শকের অজ্ঞাতে তাঁহাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে এইরূপে চালিত করিতে পারেন।

'হিপ্‌নটিজ্‌মের' কথা বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন। কোন লোককে হিপ্‌নটাইজ করিয়া যদি তাহাকে বলা যায় যে, তুমি অমুক সময়ে উঠিয়া অমুক কাজ করিবে; তবে দেখা যায় যে, সেই লোক সেই সময়ে উঠিয়া নির্দ্দিষ্ট কাজ করিয়া থাকে। কেন সে কাজ করিল, জিজ্ঞাসা করিলে, একটা মন গড়া যুক্তি দেখায়। তাহার ধারণা থাকে যে, সে নিজের ইচ্ছাতেই স্বাধীনভাবে সে-কাজ করিয়াছে; কাহারও আদেশমত চলিতেছে, এ ধারণা তাহার থাকে না।

এই সকল পরীক্ষা হইতে বুঝা যায় যে, আমরা স্বাধীন ভাবে কাজ করিতেছি, এ ধারণা মনে থাকিলেও আমাদের ইচ্ছা সব সময়ে বাস্তবিক পক্ষে স্বাধীন নহে। কোন-কোন দার্শনিকের মতে, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা একেবারেই নাই। আমরা কেবল জ্ঞানের অভাবেই ইচ্ছার কারণ ঠিক করিতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যের ইচ্ছা একেবারেই পারি-পার্শ্বিক ঘটনার দাস।

অপর পক্ষে, কোন কোন দার্শনিকের মতে, জড়ের সহিত মানুষের মনের প্রভেদই এই যে, জড় বাহিরের শক্তির দ্বারা চালিত হয়; কিন্তু মানুষ নিজে যা-ইচ্ছা করিতে পারে। চৈতন্যের ক্রিয়াই এই যে, নিত্য নূতন সৃজন করা। ইঁহারা বলেন যে, দুই-একটা ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছা অবস্থার দ্বারা নিয়মিত হইলেও, বাস্তবিক-পক্ষে তাহা স্বাধীন; এবং এই স্বাধীন ইচ্ছার মূলে কোনই 'কারণ' নাই। তাঁহারা মনো-জগতে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ মানিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন, এ কি কথা যে, সকল জিনিসেরই একটা নির্দ্দিষ্ট কারণ মানিতে হইবেই? সকল জিনিসই যে নিয়মের বশে চলে, তাহার প্রমাণ নাই। জড় পদার্থ নিয়মাধীন হইলেও মানুষের মন স্বাধীন।

এই দুই বিরুদ্ধ মতের কখনও সমন্বয় হইবে কি না, জানি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকল প্রকার মতই—এমন কি দার্শনিক মতও, যুক্তির উপর নির্ভর করে না। আমরা নিজ নিজ স্বভাবমত কোন একটা বিশেষ মত অবলম্বন করি।

পাঠক হয় ত বলিয়া বসিবেন, তবে কি 'সত্য' বলিয়া কোন জিনিস নাই? আমার মত যাহা-ইচ্ছা থাকিতে পারে, কিন্তু সত্য এক বই দুই নয়। কাজেই, মনোজগতে হয় কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে, অথবা নাই; দুই-ই কখন সত্য হইতে পারে না। তবে দার্শনিকেরা এত বুদ্ধিমান্ হইয়াও কেন একমত হইতে পারেন না?

এইখানে একটু অবান্তর প্রসঙ্গ তুলিব। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে, আগে সত্য কি বস্তু, তাহা না বুঝাইয়া অগ্রসর হইবার উপায় নাই। কাজেই, সত্য কি, সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

পারমার্থিক সত্য (absolute truth) এক হইলেও, ব্যবহারিক সত্য এক নহে—বহু; আবার শুনিতে অসম্ভব বোধ হইলেও, এই সত্য পরিবর্ত্তনশীল। আজ যাহা সত্য, কাল তাহা সত্য নহে; এক দেশে যাহা সত্য, অন্য দেশে তাহা সত্য নহে। একের পক্ষে যাহা সত্য, অন্যের পক্ষে তাহা সত্য না-ও হইতে পারে। এতদিন আমরা নিউটনের 'থিওরী' সত্য বলিয়া জানিতাম, আজ আইনষ্টাইন্ তাহা উল্টাইয়া দিলেন। বিজ্ঞানে দেখা যায়, থিওরী ক্রমশঃই পরিবর্ত্তিত হইতেছে; যখন যে থিওরীর প্রচলন থাকে, তখন তাহাই সত্য বলিয়া গৃহীত

হয়। নূতন কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে, থিওরীর পরিবর্ত্তন হয়। আমার কাছে ভূত আছে, এ কথা সত্য; অন্যের কাছে তাহা নহে। আমার নিকটে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে স্বর্গলাভ নিশ্চয়, অন্যের কাছে তাহা অন্ধ-বিশ্বাস মাত্র। দুই আর দুয়ে চার হয়, ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত নহে; পাগলে হয় ত বলিবে, দুই আর দুয়ে পাঁচ হয়। এইরূপ ১০ জন পাগলের মধ্যে একজন সুস্থ মস্তিষ্কের লোকও পাগল বলিয়া পরিচিত হইবে, এবং তাহার সত্য ধারণাগুলি মিথ্যা বলিয়া বিবেচিত হইবে। পারমার্থিক সত্য বা absolute truth এক হইলেও, তাহার নির্ণয়ের কোন উপায়ই আমরা জানি না। কাজেই, যে ধারণায় আমার মন পরিতৃপ্ত থাকে, তাহাই আমার পক্ষে সত্য। ব্যবহারিক হিসাবে এই সত্য প্রত্যেকের পক্ষেই পৃথক্ এবং পরিবর্ত্তনশীল। আজ যে ধারণায় আমার মন পরিতৃপ্ত আছে, কাল আর হয় ত আমি তাহাতে সন্তুষ্ট নহি। সূর্য্য ঘুরিতেছে, এই ধারণাতেই আমরা এতদিন সন্তুষ্ট ছিলাম; বৈজ্ঞানিকেরা এমন কতকগুলি ঘটনার আবিষ্কার করিলেন, যাহাতে আর ঐ ধারণায় সন্তুষ্ট থাকা চলিল না। কাজেই, আমরা এখন বিশ্বাস করি, সূর্য্য ঘুরিতেছে না, পৃথিবী ঘুরিতেছে। গল্প আছে, পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রদের পড়াইতেছিলেন যে, সূর্য্য ঘোরে। একজন ছাত্র বলিল যে, তাহার পুস্তকে লেখা আছে, সূর্য্য ঘোরে না, পৃথিবী ঘোরে। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "আমার ১৫ টাকা বেতন পাইলেই হইল, তা সূর্য্যই ঘুরুক, আর পৃথিবীই ঘুরুক।" বাস্তবিকপক্ষে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকটে সূর্য্য ঘোরা বা পৃথিবী ঘোরা উভয়ই সমান সত্য বা সমান মিথ্যা। যাহা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কাজে আসে না, তাহার সত্য-মিথ্যা আমরা কেবল পরের কথাতেই মানিয়া লই। কিন্তু সাংসারিক কার্য্যে সব সময়ে এরূপ পরের কথায় বিশ্বাস করা চলে না। কাজেই দেখিতে পাই, যে বিশ্বাস-বলে চলিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, তাহাই আমরা সত্য বলিয়া জানি। দুই আর দুয়ে পাঁচ বলিয়া দোকানীর নিকট পাঁচটা জিনিস পাই না; কাজেই দুই আর দুয়ে চার বলিয়াই মানিয়া থাকি। এইরূপ, যে ধারণা যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনকে তৃপ্ত রাখিতে পারে, ততক্ষণ তাহা আমাদের নিকট সত্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা ও কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা মানুষের একই প্রবৃত্তি হইতে জন্মিয়া থাকে। মন সন্তুষ্ট থাকিলে যেমন সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা হয় না, সেইরূপ কারণ অনুসন্ধানেরও চেষ্টা হয় না। পণ্ডিত মহাশয় ১৫ টাকা পাইয়াই সন্তুষ্ট; কাজেই তাঁহার সূর্য্য উঠার কারণ আবিষ্কারের দরকার বোধ হয় নাই। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে হয় ত বলিতেন—ইহার একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমরা আর একটু নিম্ন-স্তরে গেলে দেখিতে পাই যে, এই কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা একেবারেই নাই। অশিক্ষিত চাষাকে, আপেল কেন পড়ে জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিবে, "ও পড়েই, উহার আবার কারণ কি?" এইরূপ অনেক ঘটনারই কারণ জানিবার তাহার আবশ্যকও নাই, ইচ্ছাও নাই। এই জন্য, এই সকল ঘটনার যে কারণ আছে, সে তাহা জানে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জড়-জগতের সমস্ত ঘটনারই কারণ আছে, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। এখানে কিন্তু দেখিতেছি যে, তাহা ঠিক নহে। অশিক্ষিত সন্তুষ্টচিত্ত লোকের কাছে জড়জগতের অনেক ঘটনারই কারণ নাই। এক শ্রেণীর দার্শনিকের মতে যেমন মনোজগতে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ সকল সময়ে নাই, এই শ্রেণীর অশিক্ষিত লোকেও সেইরূপ বলিতে পারে যে, জড়জগতেও সকল কার্য্যের কারণ নাই। অতএব সকল জিনিসেরই কারণ আছে, এ কথা বলা ঠিক হইল না।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, কোন বিষয়ের কারণ থাকা না থাকা বাস্তবিকপক্ষে বিষয়ীর মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। মন যখন নিশ্চিন্ত হয় না, তখনই আমরা কারণের সন্ধান করি। আর মন যখন পরিতৃপ্ত থাকে, তখন কোন কারণেরই আবশ্যকতা থাকে না এবং কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ মানিবারও প্রয়োজন হয় না। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, একই বিষয় সম্বন্ধে কোন দার্শনিক কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত, এবং কেহ বা কারণ নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত। এই কারণ অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসে, আর সময়-সময় কেনই বা তাহা নিবৃত্ত হয়, তাহা ভাবিবার বিষয়। ভক্তের পক্ষে ভগবানের কাছে আসিয়াই এই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়। এই সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

আমরা দেখিতেছি যে, কোন বিষয়ের বাস্তবিকপক্ষে কারণ থাকা বা না থাকায় আমাদের কিছুই যায় আসে না।

এই যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ, যাহাকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া মনে করি, তাহা মনেরই অবস্থা-ভেদে জন্মিয়া থাকে। কারণ কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী; কারণ না হইলে কার্য্য হইবে না, ইহাই কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে মূল স্বীকার্য্য। একটা উদাহরণ লওয়া যাক্।—দেখিলাম, রাম শ্যামকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। এখানে শ্যামের পতন ও রামের ধাক্কা দেওয়া—দুই-ই আমি দেখিতে পাইতেছি; এবং শ্যামের পতনের কারণ যে রামের ধাক্কা, তাহাও মানিতে কোন দ্বিধা নাই। গাছের পাতা নড়িল,—বলিলাম, ইহার কারণ হাওয়া। হাওয়া দেখিতে পাইলাম না বটে, তবে স্পর্শ করিতে পারিলাম। যদি হাওয়া একবার আসিয়াই থামিয়া গিয়া থাকে, তবে হাওয়ার কোন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রমাণই পাইলাম না; তবুও বলিলাম, পাতা হাওয়াতেই নড়িয়াছে। পূর্ব্বের উদাহরণ আর এই উদাহরণে একটু পার্থক্য আছে। এ ক্ষেত্রে কারণ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য না হইলেও, তাহার অস্তিত্ব মানিয়া লইলাম; এবং তাহা যে হাওয়া, তাহা অনুমান করিলাম। এইরূপেই 'থিওরী'র উৎপত্তি হয়। এখানে হাওয়ায় যে পাতা নড়িয়াছে, তাহা থিওরী মাত্র। এই থিওরী অনুভব-গ্রাহ্য নহে, কিন্তু অনুমান-সাপেক্ষ। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চয় হইবার কোনই উপায় নাই। অপর কেহ বলিতে পারেন, পাতা হাওয়ায় নড়ে নাই, পোকায় নড়াইয়াছে। একই ঘটনার কারণ হিসাবে অনেকগুলি 'থিওরী' দেওয়া যাইতে পারে। যে থিওরী সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভবপর ও সরল, এবং যাহার দ্বারা ঘটনাটি সুচারুভাবে পরিস্ফুট হইবে, তাহাই সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে। ঘটনার মধ্যে যদি এমন কিছু থাকে, যাহা থিওরী দ্বারা বুঝান অসম্ভব, অথবা ঘটনা-সম্পর্কিত নূতন এমন কিছু পাওয়া যায়, যাহা থিওরীতে কুলায় না, তবে থিওরীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এই কারণেই আজ নিউটনের থিওরীর বদলে আইনষ্টাইনের থিওরীর উদ্ভব। যাহারা বৈজ্ঞানিক থিওরীকে পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া বিদ্রূপ করেন, তাঁহাদের এই কথাটি সর্ব্বদাই মনে রাখা কর্ত্তব্য।

আমরা দেখিলাম, কারণ অনুসন্ধানের প্রবৃত্তিই থিওরীর উদ্ভবের মূল। থিওরী যখনই অনুভব-গ্রাহ্য হইবে, তখনই তাহা আর থিওরী থাকিবে না। আমি যদি দেখি, পোকায় পাতা নড়াইতেছে, তবে তাহা পাতা নড়িবার অনুভব-গ্রাহ্য কারণ হইল। আমরা সাধারণতঃ দুই প্রকার কারণ দেখিতে পাই; একটি অনুভব-গ্রাহ্য, অপরটি অনুমান-সাপেক্ষ। অনুভব-গ্রাহ্য কারণ মানিতে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু অনুমান-সাপেক্ষ কারণ লইয়াই যত গোল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মন সন্তুষ্ট থাকিলে এইরূপ কারণ মানিবার কোন প্রয়োজন হয় না। এইরূপ কারণের অস্তিত্বই যখন নিশ্চিত নিরূপিত হয় না, তখন 'নাই' বলিলে আর কেহ তাহা 'আছে' বলিয়া সপ্রমাণ করিতে পারেন না। এইরূপ ক্ষেত্রে কারণ থাকা না থাকা আমার মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। আমার যদি কোন ঘটনার কারণ-অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি একেবারেই না জন্মে, তবে আমি তাহার কারণ আছে বলিয়া মানিব না। এই জন্যই কোন কোন দার্শনিক মানসিক-ক্রিয়ার কারণ মানেন না, এবং ইচ্ছাকে স্বাধীন ভাবেন।

কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আলোচনা করিতে গেলে, কারণের স্বভাব কিরূপ, তাহা নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। প্রবন্ধের প্রথমেই বলিয়াছি, সাধারণ কথা আছে যে, সব বিষয়েরই একটা না একটা কারণ আছে। এখানে কথাটা আর একটু ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। 'বিষয়' বলিলে সাধারণতঃ আমরা ঘটনা বা বস্তু উভয়ই বুঝিয়া থাকি। বস্তুগুলি ভাষায় বিশেষ্যপদ বলিয়া ধরা হয়; এবং ঘটনা ক্রিয়া-সাপেক্ষ। একটু ভাবিলেই দেখা যাইবে যে, বিশেষ্য পদগুলির কারণ অনুসন্ধানের কোনই প্রবৃত্তি নাই। বস্তুর কারণ আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। সকল কারণই ক্রিয়ার সহিত জড়িত। সাধারণতঃ আমরা বস্তু ও ক্রিয়ার বিশেষ পার্থক্য স্বীকার না করিলেও, এ স্থলে আমাদের এই দুইটির বিশেষ করিয়া প্রভেদ রাখিতে হইবে। পৃথিবীর কোন কারণ আছে, এ কথা ভাবাই অসম্ভব; কিন্তু পৃথিবীর সৃষ্টি, লয় বা পরিবর্ত্তন—এই সকলের কারণ আছে, ইহা অনায়াসেই মানিতে পারি। বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, যেখানেই কারণ মানি, সেইখানেই তাহা ক্রিয়া-সাপেক্ষ এবং ক্রিয়া মানে কোন বিশেষ অবস্থার পরিবর্ত্তন। অতএব, বলা যাইতে পারে যে, অবস্থার কারণ নাই; কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তনের কারণ আছে। সাধারণতঃ আমরা অবস্থা বলিলেই, তাহার সঙ্গে অবস্থার পরিবর্ত্তনও মনে-মনে ধরিয়া লই। এই জন্যই অবস্থার কারণ আছে মনে করিয়া থাকি। কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে পরিবর্ত্তন ব্যতীত কারণের কল্পনাই

করা যায় না। একটু ভাবিয়া দেখিলে এ কথাটা বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইবে। কেন এমন হয়, তাহা আমি পরে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

যখনই কোন অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, তখনই আমরা, একটা শক্তির দ্বারা তাহা ঘটিয়াছে, এইরূপ অনুমান করিয়া লই। এই শক্তি অনুভব-গ্রাহ্য না হইলেও ইহার অস্তিত্ব মানিতে আমাদের কোনই দ্বিধা হয় না। এই মানার মূলে কারণ অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি না থাকিলে, এইরূপ কোন শক্তির অস্তিত্ব মানিতাম না। উদাহরণ দিলে কথাটা আরও একটু পরিষ্কার হইবে। আমরা বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, টেলিগ্রাফ্, ইলেক্‌ট্রীক্ লাইট্, ইত্যাদির কারণ হিসাবে বৈদ্যুতিক শক্তি মানিয়া থাকি। এই বৈদ্যুতিক শক্তির স্বরূপ কি, আমরা কেহই তাহা জানি না। কেবল এই শক্তির দ্বারা কি-কি কার্য্য হয়, তাহাই বুঝিতে পারি। কার্য্য দেখিয়াই শক্তির অনুমান করিয়াছি। যদিও এই শক্তির মূলে অনুমান, তথাপি ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া, ইহাকে 'ইলেক্‌ট্রিসিটি' সংজ্ঞার দ্বারা অভিহিত করিয়াছি। এইরূপ সংজ্ঞা-নিরূপণে যেমন কতকগুলি লাভ আছে, তেমনি ইহার আনুষঙ্গিক কতকগুলি অসুবিধাও আছে। শক্তির নামকরণ হইলেই আমাদের অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি কমিয়া যায়। Vital force নাম দিয়া এক অজ্ঞাত শক্তি মানিয়া লওয়ায়, Physiologyর অনেক সমস্যা-সমাধানের অন্তরায় হইয়াছে। কাচের ভিতর দিয়া দেখিতে পাই কেন, জিজ্ঞাসা করিলে, শতকরা নিরেনব্বই জন বলেন —কাচ transparent বা স্বচ্ছ। স্বচ্ছ মানেই যাহার ভিতর দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। সোজা করিয়া বলিতে গেলে উত্তরটা দাঁড়াইল এই যে, কাঁচের ভিতর দিয়া দেখিতে পাই, কারণ কাচের ভিতর দিয়া দেখা যায়। স্বচ্ছতা কথাটাই আমাদের অনুসন্ধিৎসার ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে এবং আমরা বাস্তবিক যে প্রশ্নের উত্তর জানি না, তাহা বুঝিতে দেয় নাই। ঠিক উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয়, ইহার কারণ আমরা জানি না। নামকরণ আমাদের অজ্ঞতা ঢাকিবার একটি প্রধান উপায়। সাধারণতঃ, কোন ঘটনা বুঝিতে না পারিলে আমরা তাহার কারণের একটা নাম করিয়া নিশ্চিন্ত হই; ফলে এই নামকরণের জন্যই কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা আরও বন্ধ থাকে।

স্বচ্ছ কথাটার মত electricity কথাটাও আমাদের অনুসন্ধান-স্পৃহা অনেক যায়গায় ব্যাহত করিয়াছে; ইহা শুনিতে কঠোর হইলেও ভগবানের দোহাই দিয়া অনেক অনুসন্ধিৎসা যে বন্ধ আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অবশ্য আমি এ কথা বলি না যে; সকল লোকই নামের মহিমায় ভুলিয়া যান। কিন্তু সাধারণের সম্বন্ধে যে এ কথা খাটে, ইহা নিশ্চিত। তাহা হইলে দেখিতেছি যে, কারণের স্বরূপই শক্তি এবং ইহা অনুমান-সাপেক্ষ। কারণ অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি আমাদিগকে এই অনুমানের পথে লইয়া যায়। একই শক্তি যে সকল প্রকার কার্য্য করিতে পারে, তাহা হঠাৎ মানিতে পারি না। এই জন্যই heat, electricity, magnetism, mechanical force ইত্যাদি কার্য্যভেদে নানা প্রকার শক্তি কল্পনা করা হইয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সকল প্রকার জড়শক্তিকেই মূলে এক বলিয়া মনে করিতেছেন। কারণ, সকল প্রকার ক্রিয়ারই রূপান্তর ঘটিয়া একই পরিণতি হইতে পারে। Heat, electricity, magnetism ইত্যাদি সকল প্রকার শক্তিই mechanical motionএ পরিবর্ত্তনীয়। সব বিজ্ঞানেরই পরিণতি Physicsএ।

কিন্তু পৃথিবীতে জড় শক্তিই একমাত্র শক্তি নহে। মনোজগৎ ও জড়জগতে আমরা পার্থক্য করিয়া থাকি। মনোজগতের বিষয় ও জড়জগতের বিষয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। জড়জগতে আলোক etherএর vibration; কিন্তু মনোজগতে আলোক বিশিষ্ট অনুভূতিমাত্র। পদার্থ-বিজ্ঞানে অন্ধকার বলিয়া কিছুই নাই; আলোকের অভাবই অন্ধকার। কিন্তু মনোজগতে অন্ধকার একটি বিশিষ্ট অনুভূতি। জড়জগতে পদার্থের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ইত্যাদি গুণ আছে। মনোজগতে শোক দুঃখ হর্ষ ইচ্ছা ইত্যাদির সেরূপ কোনই গুণ নাই। মনোজগতের ও জড়জগতের বিভিন্নতা এতই বেশি যে, এই দুই জগৎ একই শক্তির দ্বারা চালিত, এ কথা আমরা মনে করিতে পারি না। এই কারণে অনেক বৈজ্ঞানিকই এই দুই জগৎ যে বিভিন্ন শক্তির দ্বারা চালিত, তাহা মানিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইঁহাদের মতে জড়জগতে পরিবর্ত্তনের কারণ জড়শক্তি, মানসিক জগতে পরিবর্ত্তনের কারণ মানসিক শক্তি। জড়শক্তি যেমন মানসিক পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, তেমনি মানসিক শক্তিও কোন জড়পদার্থে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারে না।

জড়শক্তি ও মানসিক শক্তি এক মানিবার পক্ষে অনেকগুলি অন্তরায় আছে। জড়জগতের ও মানসিক জগতের ক্রিয়া যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের, সে কথা আগেই বলিয়াছি। মানসিক শক্তির কোন বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ পায় না। আমরা নিজের মধ্যেই তাহা অনুভব করি। আমার রাগ, আমার দুঃখ অন্যের পক্ষে অনুভব করা অসম্ভব। অবশ্য তাহারা আমার শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারে। আমি চিনি খাইয়া মিষ্ট স্বাদ অনুভব করিলাম; অন্যে তাহা অনুমান করিলেও, কখনও নিজস্বভাবে অনুভব করিতে পারিবে না। আমার মানসিক শক্তি আমার মনের পরিবর্তন আনয়ন করে, কিন্তু তাহার সহিত বাহিরের পদার্থের কোনই সম্পর্ক নাই। মানসিক শক্তি দ্বারা জড়জগতের পরিবর্তন সম্ভব নহে; অপর পক্ষে জড়শক্তিও মানসিক পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। পাঠক বলিবেন, আমি একজনকে চড় মারিলাম, সে বেদনা অনুভব করিল; চড় মারায় জড়ের পরিবর্তনই সম্ভব; ইহাতে মানসিক বেদনা কিরূপে উৎপন্ন হইবে? এইরূপ অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়, যেখানে জড় মনের উপর এবং মন জড়ের উপর ক্রিয়া করিয়াছে। মদ জড়-পদার্থ বটে, কিন্তু মদ্যপানে মানসিক পরিবর্তন হয়। আমার ইচ্ছা মানসিক শক্তি; ইহার দ্বারা আমি আমার জড় শরীর চালনা করিতে পারি। সাধারণ কথাতেই আছে, শরীরের সহিত মনের ও মনের সহিত শরীরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান। অথচ পূর্বেই বলিয়াছি জড়শক্তি ও মানসিক শক্তির আদান-প্রদান আমরা কল্পনা করিতে পারি না। এ সমস্যার সমাধান কি? একদিকে স্পষ্ট দেখিতেছি, মানসিক ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা হাত নাড়িতেছি, এবং জড়পদার্থ মদ খাইয়া মনে পরিবর্তন আসিতেছে; অথচ জড় ও মন একেবারেই বিভিন্ন।

জড় ও মনের সম্বন্ধ কি, সে সম্বন্ধে আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ একমত হইতে পারেন নাই। কাহারও কাহারও মতে জড়শক্তি ও মানসিক শক্তি অভিন্ন; সুতরাং জড় মনে ও মন জড়ে পরিবর্তন আনয়ন করিতে পারে। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, জড় ও মনের মধ্যে ব্যবধান এতই অধিক যে, একই শক্তি যে উভয়কে চালনা করিতে পারে, এরূপ কল্পনা করাই দুরূহ। জড়-জগতে আমরা conservation of energy; শক্তির অক্ষরবাদ মানিয়া থাকি,—অর্থাৎ আমরা বিশ্বাস করি যে, জড়-জগতে নূতন শক্তির সৃষ্টিও হয় না এবং লয়ও হয় না,—শক্তির কেবল প্রকারভেদ হইয়া থাকে। মানসিক শক্তি জড়ের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে, এ কথা মানিলে হয় আমাদের conservation of energy অস্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ বলিতে হইবে যে মানসিক-শক্তি জড়-শক্তিরই প্রকারভেদ। কিন্তু ইহার কোনই সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। এই সকল কারণে অধিকাংশ পণ্ডিতই মানসিক ও জড়-শক্তিকে বিভিন্ন বলিয়াই স্বীকার করেন এবং তাঁহারা পূর্বোক্ত সমস্যার সমাধানের জন্য psycho-physical parallelism মানিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, আমার ইচ্ছা-শক্তির জন্যই যে হাত উঠিল এরূপ নহে; হাত উঠাইবার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের ভিতর কতকগুলি পরিবর্তন ঘটিল; এই পরিবর্তন জড়ের পরিবর্তন এবং ইহা হইতেই হাত উঠাইবার শক্তি উৎপন্ন হইল। ইচ্ছার ফলে কতকগুলি মানসিক পরিবর্তন ঘটিল মাত্র। অতএব হাত নাড়ার কারণ বাস্তবিকপক্ষে ইচ্ছা নহে; মস্তিষ্কের মধ্য হইতে উৎপন্ন জড় শক্তিই হাত নাড়াইয়াছে। আমরা যে বলি, যে ইচ্ছাতেই হাত নড়িয়াছে তাহা অজ্ঞান-জনিত ভ্রম মাত্র। আমাদের মধ্যে মানসিক-শক্তির ও জড়-শক্তির দুইটি ধারা বিদ্যমান আছে; ইহার একটি অন্যটির কারণ নহে। মানসিক-শক্তির দ্বারাই মনের পরিবর্তন হইতেছে এবং জড়শক্তির দ্বারাই শরীরে পরিবর্তন ঘটিতেছে। এই দুইটি স্রোত পাশাপাশি চলিয়াছে মাত্র, তাহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ বা অপর কোনই সম্পর্ক নাই। ইহাই psycho-physical parallelismএর মূল উক্তি। সাধারণের পক্ষে এই তত্ত্ব বোধগম্য করা একটু দুরূহ। আমার দুঃখ হইল কাঁদিলাম; এই কাঁদার জন্য আমার শরীরে কতকগুলি পরিবর্তন ঘটিল। Psycho-physical parallelism মানিলে আমরা বলিব যে, দুঃখ মানসিক ব্যাপার এবং তাহার ফলে জড়ের পরিবর্তন সম্ভব নহে; শরীর জড় ভিন্ন আর কি! দুঃখের জন্য মনের পরিবর্তন সম্ভব, কিন্তু ক্রন্দনের কারণ মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত কতকগুলি cellsএর chemical ও physical বিকার। সূর্য্য উঠে বলাও যেরূপ ঠিক নহে, সেইরূপ ক্রন্দনের কারণ দুঃখ বলাও ঠিক নহে।

পণ্ডিতদের psycho-physical parallelismএর মত জটিল থিওরীর মধ্যে যাইবার কোনই আবশ্যকতা থাকিত না, যদি তাঁহারা মনের বিকার ও জড়ের বিকার একই প্রকারের বলিয়া মনে করিতে পারিতেন। জড়-জগতে heat, light, প্রভৃতি সকল প্রকার শক্তির মধ্যে একটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মানসিক পরিবর্ত্তনকে জড়ের পরিবর্ত্তনের সহিত এক ধারায় ফেলা যায় না। সেই জন্যই এত গোলমাল।

এত জটিল থিওরী খাড়া করিয়াও নিস্তার নাই। আমি মদ খাইলাম, মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটিল। মদ না খাইলে এই মানসিক বিকার হইত না, ইহা নিশ্চয়। তবে কেমন করিয়া বলি যে, জড়-পদার্থ মদের সহিত আমার মনের কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নাই। মদ খাইয়া আমার মনের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; মদ যদি তাহার কারণ না হয়, তবে তাহার প্রকৃত কারণ কি? স্বীকার করিলাম, এই পরিবর্ত্তন মানসিক। কিন্তু কি শক্তিপ্রভাবে ইহা উৎপন্ন হইল?

কোনও কোনও মনস্তত্ত্ববিদ্ বলিবেন যে মানসিক ধারার মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ মানিবার আবশ্যকতাই নাই, কেবল শরীরের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধেই কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। মদ জড়-পদার্থ, এবং তাহা জড়-শরীরের মধ্যে বিকার ঘটাইয়া আমাকে মাতাল করে। আমার মনের যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা ইহার আনুষঙ্গিক হইলেও তাহার কোনও কারণ মানিবার আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা psycho physical parallelism মানিয়া মানসিক জগতে কার্য্য-কারণ সম্পর্ক মানিলেন না, তাঁহাদের কোন গোলমালই রহিল না।

সকলের মন কিন্তু ইহাতে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। মানসিক জগতেও কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ খুঁজিতে কেহ-কেহ ব্যগ্র হইবেন। আমার মনে হয়, মদ যে মনের পরিবর্ত্তন আনয়ন করে, তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইলে মদের মানসিক পরিবর্ত্তনের শক্তি আছে, মানিতে হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মানসিক শক্তি ভিন্ন মানসিক পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নহে। অতএব মদের মধ্যে মানসিক শক্তি বা চৈতন্য-শক্তির ন্যায় কোন শক্তি আছে, তাহা মানিতে হয়। ইহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আমার মতে মদে জড়-শক্তির সহিত অব্যক্তভাবে মানসিক বা চৈতন্য শক্তিও নিহিত আছে। জড়-শক্তি শরীরের পরিবর্ত্তনের কারণ, এবং এই অব্যক্ত মানসিক শক্তি আমাদের মানসিক পরিবর্ত্তনের কারণ। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, এই অব্যক্ত মানসিক শক্তি কেহ কখন চাক্ষুষ করে নাই। ইহা থিওরী মাত্র। আমাদের কারণ-অনুসন্ধান প্রবৃত্তি এই থিওরী মানিতে বাধ্য করিয়াছে। কিন্তু এখনও নিস্তার নাই। জড়-জগতের প্রত্যেক পদার্থই রূপ-রস-গন্ধ-ইত্যাদির দ্বারা আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। এই রূপ-রস-গন্ধের অনুভূতি প্রত্যেকটাই মানসিক বিকার। অতএব, আমাদের প্রত্যেক জড় পদার্থে অব্যক্ত মানসিক শক্তি নিহিত আছে, মানিতে হইল।

উদাহরণের সাহায্যে কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আমাদের শরীর cell বা জীবকোষের সমষ্টিমাত্র, এবং এই সমস্ত cell বা কোষের প্রাণ আছে; জীবিত শরীরের প্রত্যেক অংশেরই প্রাণ আছে বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হইবে না। আমরা দেখিতে পাই, শিশু আহারের দ্বারা ক্রমশঃ শরীর গঠন করে ও আকারে বৃদ্ধি পায়। আকার-বৃদ্ধির সহিত শরীরে অনেক নূতন জীবকোষের সৃষ্টি হয়; আহার্য্যসামগ্রী হইতেই ইহাদের উপাদান আসে। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ খাদ্য-দ্রব্যই প্রাণহীন জড়-পদার্থ মাত্র; আমরা অনেক সময় উদ্ভিদ বা মাংসাদি খাইয়া থাকি বটে, কিন্তু রন্ধনের জন্য এ সকলেরও প্রাণ নষ্ট হইয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রাণহীন জড়-পদার্থ খাদ্যরূপে শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণময় জীবকোষে পরিণত হইতেছে। প্রাণের সংস্পর্শে নূতন প্রাণ সৃষ্ট হইতেছে। প্রাণহীন জড়পদার্থ উপযুক্ত অবস্থায় প্রাণময় হইতে পারে এ কথা মানিতে হইল; অতএব এরূপ জড়-পদার্থে প্রাণ অব্যক্তরূপে আছে বলিলে বিশেষ অন্যায় হয় না। এখন যদি বলি যে, জড়ের অব্যক্ত প্রাণ যেরূপ জীবনী শক্তি সংস্পর্শে ব্যক্ত হয়, সেইরূপ জড়ের অব্যক্ত চৈতন্য মনের সংস্পর্শে প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে কথাটা আর তত অসম্ভব বোধ হইবে না। আমাদের শরীর carbon, shydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, sulphur ইত্যাদি কতকগুলি জড়ের সমষ্টিমাত্র; এই শরীরে যদি চৈতন্যের অধিষ্ঠান হইতে পারে, তবে অন্য জড়েও যে চৈতন্য শক্তি অব্যক্তভাবে

থাকিবে, বিচিত্র কি! অবশ্য প্রাণহীন জড় ও প্রাণময় শরীরে প্রভেদ আছে, এ কথা সত্য; কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জড়েও অব্যক্ত প্রাণ মানিতে হানি নাই। আচার্য্য বসু পরীক্ষার দ্বারা প্রাণময় শরীর ও প্রাণহীন জড়ে যে অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান নাই, তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

আমরা দেখিলাম যে, কারণ অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি জড়েও অব্যক্ত চৈতন্যের অস্তিত্ব মানিতে বাধ্য করাইল। এই প্রবৃত্তি অনেক সময়ে আমাদিগকে নানাপ্রকার ভ্রমের মধ্যে লইয়া যায়। একই ঘটনা অনেক সময় নানাপ্রকার কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে; এরূপ স্থলে প্রায়ই দেখা যায় যে, কারণ অনুমান-সাপেক্ষ হইলে, যে কারণটা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্ভবপর, তাহাই প্রকৃত বলিয়া মনে হয়। ইহাতে কখন কখনও ভুল হইয়া থাকে। আর, এইরূপ কারণ যে অনুমান-সাপেক্ষ, তাহা ভুলিয়া গিয়া আমরা তাহাকে অনুভব-গ্রাহ্য বলিয়া মনে করি। ইহাতেই মিথ্যা অনুভূতি উৎপন্ন হয়। মনে করুন আমি পুস্তক পড়িতেছি, এমন সময় আমার পায়ে একটা মশক দংশন করিল। আমি মশকটাকে দেখিলাম এবং মারিবার জন্য পায়ে চড় মারিলাম। আমার এক বন্ধু পাশে বসিয়া আছেন; তিনি চড় মারিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম মশক বসিয়াছে। এস্থলে মশক-দংশনের বেদনা ও মশক-দর্শন উভয়ই অনুভবগ্রাহ্য। পাঠে মন নিবিষ্ট থাকায় পায়ে আবার মশক-দংশন-যন্ত্রণার অনুরূপ অনুভূতি হওয়ায় চড় মারিলাম এবং একটি মশককে উড়িয়া যাইতে দেখিলাম। মশককে দংশন করিতে না দেখিলেও এ স্থলে বন্ধু কারণ জিজ্ঞাসা করিলে এবারও বলিলাম যে মশক দংশন করিয়াছে। পুনরায় পাঠে মনোনিবেশ করিলাম। এইবার আমার অগোচরে বন্ধু পায়ে একটি আল্‌পিন ফুটাইয়া দিলেন; পুনরায় চড় মারিলাম এবং বন্ধু কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম মশক দংশন করিয়াছে। এই যে ভ্রম হইল, ইহার কারণ কি? মশক-দংশনের অনুভূতির অনুরূপ যন্ত্রণা বোধ করিয়াই তাহাকে মশকের দংশন সাব্যস্ত করিয়াছি; কারণ মশক-দংশনের দিকেই আমার মন পড়িয়া আছে! এইরূপে মন যদি কোন বিশিষ্ট চিন্তায় বা বিশিষ্ট কার্য্যের দিকে নিয়োজিত থাকে, তবে তৎসংক্রান্ত বিষয়ে ভ্রান্ত অনুভূতির সম্ভাবনা অধিক। পাঠক সহজেই এটী পরীক্ষা করিতে পারেন। কাহাকেও বলুন "এক দুই তিন" বলিলেই সে যেন তৎক্ষণাৎ হাত তোলে। এখন "এক দুই তিন" না বলিয়া এক দুই "দিন" বলিলে দেখিবেন, "দিন"কে "তিন" শুনিয়া সে ঠিক হাত তুলিয়াছে। অন্য অবস্থায় হয় ত তাহার এ ভুল হইত না। কিন্তু তাহার মন হাত তোলার জন্য ব্যগ্র থাকায় এই ভুল হইল। এই ব্যগ্রতা যত অধিক হইবে, ভুলের সম্ভাবনা ততই অধিক। হয় ত "দিন" না বলিয়া "দিম" বলিলে এই ভুল হইত না, কেননা "তিনের" সহিত "দিমের" উচ্চারণে অধিকতর পার্থক্য আছে। কার্য্যের ব্যগ্রতা বাড়াইতে পারিলে শব্দের অধিকতর পার্থক্য সত্ত্বেও ভুল হইবে। কয়েকটী বালককে সারি-সারি দাঁড় করাইয়া যদি বলা যায় যে, "এক দুই তিন" বলিলেই যে ছুটিয়া সর্ব্বাগ্রে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারিবে, তাহার বরাতে পাঁচ টাকা পুরস্কার, তাহা হইলে দেখা যাইবে "তিনের" বদলে "দিম" কেন, "ধিৎ" বলিলেও অনেকে "তিনই" শুনিবে। কারণ, এ স্থলে লোভের জন্য ব্যগ্রতা অধিক সুতরাং ভুলের সম্ভাবনা অধিক। লোভী ব্যক্তিরাই পিতলের বালাকে সোণার বালা বলিয়া জুয়াচোরের নিকট অল্পমূল্যে কিনিয়া ঠকিয়া থাকেন। "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন!" এই প্রবচন পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা বলিতে পারি "লোভে ভ্রম, ভ্রমে দুঃখ।" আমার একজন ফুটবল-উৎসাহী বন্ধু বলেন যে, ম্যাচের সময় সকল প্রকার চীৎকারই "গোল, গোল" বলিয়া মনে হয়। যাঁহার ভূত বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি অধিক বা ভয় অধিক, তিনি অন্ধকারে গাছকে ভূত বলিয়া ভয় খান। গোরারা হরিণ শীকারে বাহির হইলে "নেটিব"কে হরিণ মনে করিয়া প্রায়ই গুলি করিয়া থাকে।

আমাদের মনে অনেক সময় নানা ইচ্ছার উদয় হয়; কিন্তু যে সকল ইচ্ছা সামাজিক হিসাবে দূষণীয় তাহা মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিতে হয়। এই সকল রুদ্ধপ্রবৃত্তি নষ্ট হয় না; সুবিধা পাইলেই আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে তদনুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। এই রুদ্ধ প্রবৃত্তির বশে আমরা যে সব কার্য্য করি, তাহার সঠিক কারণ সকল সময় বুঝিতে না পারিয়া একটা মনগড়া কারণ খাড়া করি। ইহার ফলে সংসারে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়া থাকে। কাহারও উপরে রাগ থাকিলে সামান্য কারণেই তাহার দোষ দেখিয়া থাকি। "যাকে দেখ্‌তে

নারি, তার চলন বাঁকা।" বাঁকা চলন বাস্তবিক না থাকিলেও এরূপ ক্ষেত্রে আমরা চলনের দোষ দেখিতে পাই। স্ত্রৈণ ব্যক্তিরা নিজের স্ত্রীর অপরাধ দেখিতে পায় না।' ভালবাসিলে দোষ দেখিবার ইচ্ছা থাকে না। এজন্য নিজের ছেলের দোষ দেখা যায় না। শ্বাশুড়ী ও পুত্রবধূর মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই কলহ দেখা যায়; কিন্তু প্রত্যেক শ্বাশুড়ী ও প্রত্যেক পুত্রবধূ এই কলহের পৃথক্ পৃথক্ কারণ নির্দেশ করেন। বাস্তবিক পক্ষে ইহার কোনটাই ঠিক নহে। পুত্রবধূ ও শ্বাশুড়ীর সম্পর্ক স্বভাবতঃই ভালবাসার নহে, এইজন্যই উভয়ের মধ্যে কলহের পরিমাণ এত অধিক। গৃহবিবাদ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

কার্য্যের প্রবৃত্তি যে ভ্রান্ত অনুভূতির মূল, তাহা আমরা এখন কতকটা বুঝিতে পারিলাম। স্বপ্নরাজ্যে অনেক সময়েই আমাদের সমস্ত অনুভূতিই ভ্রান্ত। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর প্রকৃত পক্ষে কোন অস্তিত্ব নাই। স্বপ্নে মানসিক বিকারের ফলে এক অবাস্তব জড়-জগতের সৃষ্টি হয়। ইহার কারণ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে নানা মতভেদ আছে। আধুনিক একদল মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মতে মনের রুদ্ধ-বৃত্তিসমূহই আমাদিগকে স্বপ্নদর্শনে প্রবৃত্ত করে। আগেই বলিয়াছি, ভূত মানিতে প্রবৃত্তি থাকিলে অন্ধকারে গাছকে ভূত বলিয়া ভ্রম হয়। এই প্রবৃত্তি অত্যধিক হইলে গাছেরও আবশ্যকতা থাকে না; সামান্য ছায়াকেও ভূত বলিয়া মনে হয়। জাগ্রত অবস্থায় রুদ্ধপ্রবৃত্তিগুলি বাহিরে আসিতে পারে না; ফলে মনোমধ্যে তাহাদের শক্তি সঞ্চিত হইতে থাকে। এইজন্য নিদ্রাকালে শারীরিক সামান্য অনুভূতিসকল বিকৃত হইয়া অবাস্তব জগৎ সৃজন করে। রুদ্ধপ্রবৃত্তির বশে স্বপ্নে বাস্তব-ভ্রম উৎপন্ন করে। যাহার কোন রুদ্ধপ্রবৃত্তি নাই, তাঁহার কোন স্বপ্নদর্শন সম্ভব নহে। মনুষ্যের অসৎ প্রবৃত্তিগুলি, সমস্তই মনোমধ্যে রুদ্ধাবস্থায় বর্ত্তমান আছে এবং এই সকল প্রবৃত্তি স্বপ্নদর্শনের মূল কারণ।

স্বপ্নে যেরূপ মনের অনুভূতি বাহিরের বস্তুতে পরিণত হইল, জাগ্রত অবস্থায় সেরূপ হওয়া কি সম্ভব? আমি বলিয়াছি যে, জাগ্রত অবস্থার অনেক ভ্রমপ্রমাদই এইরূপে উৎপন্ন হয়। বৈদান্তিকেরা বলেন যে, বাহ্যজগতের কোনই অস্তিত্ব নাই; মায়াই এই জগৎ উৎপন্ন করে। তাঁহারা আরও বলেন যে, মুক্ত পুরুষ ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন; মুক্ত পুরুষের লক্ষণই এই, তিনি কামনা-শূন্য। পুরাণকারেরাও বলিয়া থাকেন কামনা হইতে জগতের উৎপত্তি। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে আমরা বলিতে পারি, স্বপ্নে যেরূপ রুদ্ধ-প্রবৃত্তি হইতে অবাস্তব জগৎ উৎপন্ন হয়, জাগ্রত অবস্থাতেও সেইরূপ ইচ্ছা বা কামনা হইতেই "বাস্তব" জগৎ উপলব্ধি হয়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে কারণ অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি সম্বন্ধে আমরা অনেক কথাই বলিয়াছি। এখন, এই প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসে, তাহার আলোচনা করিব। আমি পূর্ব্বে বস্তু ও ঘটনার পার্থক্য বুঝাইয়াছি; বস্তুগুলি ভাষায় বিশেষ্যপদ ও ঘটনা ক্রিয়াসাপেক্ষ। আমি বলিয়াছি, বস্তুর কারণ নাই, কিন্তু ঘটনার কারণ আছে। একটু চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে, ঘটনা ব্যতীত বস্তুর কল্পনাই হইতে পারে না। বস্তু বলিলেই বুঝি, তাহার সহিত কোন ক্রিয়ার সম্পর্ক আছে। কলমের প্রতীতির সহিত লিখনক্রিয়া জড়িত। সকল বস্তুরই কোন না কোন গুণ আছে এবং গুণ মানেই ক্রিয়ার শক্তি। সংসারের সকল দ্রব্যই আমাদিগকে কোন না কোন প্রকারে বিচলিত (affect) করে এবং আমরাও সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য পারিপার্শ্বিক দ্রব্যাদির অবস্থা-পরিবর্ত্তনে সচেষ্ট হই। প্রাণীমাত্রেই স্বীয় পরিবেষ্টনীর দ্বারা বিচলিত হয় ও তাহাকে বিচলিত করে। এই ঘাত-প্রতিঘাতই জীবনের লক্ষণ। যখনই বাঘ দেখি, তখনই বাঘ আমার কি করিতে পারে ও আমি বাঘের কি করিতে পারি, এই দুই ধারণা অজ্ঞাতসারে আমার মনোমধ্যে জাগে; আর তাহারই বশে আমি ব্যাঘ্রকে মারিতে যাই বা পলাইবার চেষ্টা করি। এই দুই প্রকার ধারণাই ব্যাঘ্রের অনুভূতির সহিত জড়িত। এই ধারণা দুইটী বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন। ব্যাঘ্র কি করিতে পারে বুঝিতে হইলে, আমাকে মনে মনে নিজেকে ব্যাঘ্রের অবস্থায় স্থাপিত করিতে হয়। আমার ও ব্যাঘ্রের সম্পর্ক বুঝিতে হইলে আমাকে উভয়ের অবস্থাই হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। সেইরূপ, চিনি খাইবার ইচ্ছা হইলে চিনির কিরূপ স্বাদ ইত্যাদি আমার মনে আসে, অর্থাৎ আমি নিজেকে চিনির সহিত অনন্য মনে করি। এই অনন্য-ভাব ব্যতীত চিনির গুণ আমি বুঝিতে পারি না। এইরূপ সকল ক্ষেত্রেই বিষয়ী বিষয়ের সহিত একীভূত না হইলে বিষয়ের উপলব্ধি হয় না। বিষয়ী ও বিষয়ের সম্পর্ক একেবারে বিপরীত। বিষয়ী মারেন, বিষয় মার খান। বিষয়ী খান,

বিষয় খাদিত হয় ইত্যাদি। সকল ক্ষেত্রে বিষয়ী ও বিষয়ের এই বিরুদ্ধ সম্পর্ক সহজে বোধগম্য হয় না। অকর্মক ক্রিয়া স্থলে বিষয়ের সম্পর্ক প্রথম-দৃষ্টিতে নাই বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু মানসিক বিশ্লেষণে এই সকল ক্ষেত্রেও বিষয় বিষয়ীর সম্পর্ক আছে বুঝিতে পারা যাইবে। বারান্তরে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। সকল অকর্মক ক্রিয়াতেই একটী অবস্থা-পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা প্রচ্ছন্ন আছে। এই পরিবর্ত্তিত অবস্থাই বিষয়। বিষয়ীর সহিত বিষয়ের অভেদ কল্পনা নাট্যগ্রন্থাদিতে অতি পরিষ্কার ভাবে দেখা যায়। নাট্যকার যখন নায়ক ও নায়িকা ইত্যাদির চরিত্র অঙ্কন করেন, তখন তিনি নিজেকে তদনুরূপ অবস্থায় ফেলিয়া থাকেন। মনে মনে স্বয়ং নায়িকা না হইলে নায়িকার মনোভাব ব্যক্ত করা যায় না। যিনি যত বড় শিল্পী, তাঁর এই অভেদ কল্পনার ক্ষমতা তত অধিক। এই কারণে উচ্চ-দরের শিল্পীর পাত্র-পাত্রী সকল সজীব বলিয়া বোধ হয়। সংস্কৃত ও বৈষ্ণব কাব্য গ্রন্থে দেখা যায় যে, নায়িকা নায়ককে চিন্তা করিতে করিতে ভাবাবেশে নায়কের অনুরূপ আচরণ করিতেছেন। এই সকল ক্ষেত্রে বিষয়ী বিষয়ের স্থান অধিকার করিয়াছেন। সাধারণতঃ দেখা যায়, বিষয়-অনুভূতি হইলে আমাদের বিষয়ের সহিত অভেদ কল্পনা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি না। বিশেষ-বিশেষ ঘটনার স্থলে এই অভেদাত্মক অনুভূতি পরিস্ফুট হয়, নচেৎ সাধারণতঃ তাহা অব্যক্ত থাকিয়া যায়।

প্রত্যেক বিষয়ের অনুভূতির সময়েই আমাদের মন বিষয় ও বিষয়ীর ভাব অবলম্বন করিয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়। এই দুই ভাব বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন। তাই একই সময়ে দুইটী ভাবই মনোমধ্যে পরিস্ফুট হয় না,—একটী অব্যক্ত থাকিয়া যায়। এই জন্যই সময়ে-সময়ে বিষয়ী নিজেকে বিষয় বলিয়া ভ্রম করিলেও একই সময়ে আমি বিষয়ী ও বিষয়, দুই-ই অনুভূত হয় না। বৈদান্তিকেরা বলেন যে, মুক্ত পুরুষের নিকট বিষয়ী ও বিষয়ের বিভিন্ন জ্ঞান থাকে না।

বিষয়ীর বিষয়ের সহিত অভেদ কল্পনাকে আমরা একটী বিশিষ্ট কামনা বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি। অতএব বলা যাইতে পারে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যখনই আমাদের মনে কোন বিষয়ের উপলব্ধি হয়, তখনই আমাদের মনে দুইটী বিরুদ্ধ ইচ্ছা বা কামনার উৎপত্তি হইয়া থাকে;—একটী বিষয়ী হইয়া বিষয়ের উপভোগ করা ও অপরটী বিষয় হইয়া বিষয়ীর দ্বারা উপভুক্ত হওয়া। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় ইচ্ছাটি সাধারণতঃ অব্যক্ত থাকে। আমার মতে এই অব্যক্ত ইচ্ছাই কারণ-অনুসন্ধান প্রবৃত্তির মূল। ইচ্ছা পূর্ণ হইলে, বা সম্পূর্ণ-রূপে রুদ্ধ হইলে, কারণ-অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি থাকে না। যখন আমরা কোন বিষয় উপলব্ধি করি, তখন এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়; এই জন্যই বিষয়ের কোন কারণ অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি হয় না। ঘটনার অর্থ বিষয়ের পরিবর্ত্তন; এই পরিবর্ত্তনের সহিত দুই প্রকার অনুভূতি জড়িত; একটি (change) বিকার, অপরটি (continuity) অনবচ্ছিন্নতা। আমার হাত হইতে চশ্‌মা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল; একটা পরিবর্ত্তন ঘটিল অনুভব করিলাম; কিন্তু ভাঙ্গা কাঁচ-গুলিই যে চশ্‌মার কাঁচ, সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল না। অতএব পরিবর্ত্তনের সহিত একটা (continuity) অনবচ্ছিন্নতার ধারণা রহিল। চশ্‌মার অনুভূতি সম্পর্কে দুইটি বিরুদ্ধ ইচ্ছা আছে বলিয়াছি; ইহার একটির সাহায্যে আমি বিষয়ীরূপে চশ্‌মা দেখিলাম, ও অপর বিরুদ্ধ ইচ্ছার সাহায্যে আমার চশ্‌মারূপ বিষয়ের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিলাম। সেইরূপ চশ্‌মা ভাঙ্গাতে যে অবস্থা পরিবর্ত্তনরূপ অনুভূতি হইল, তাহাও দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। একটি হইতে বিষয়ীর অবস্থা-পরিবর্ত্তনের জ্ঞান জন্মিল এবং অপর অব্যক্ত ইচ্ছা হইতে এই পরিবর্ত্তনের অনুযায়ী বিষয় অনুসন্ধানের চেষ্টা হইল। নিরবচ্ছিন্নতা-সংক্রান্ত দ্বিতীয় অব্যক্ত ইচ্ছাও এইরূপ বিষয়-অনুসন্ধানে নিয়োজিত হইল। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই অনুভব-গ্রাহ্য বিষয় না থাকায় আমরা বিষয়ের কাল্পনিক অস্তিত্ব মানিতে বাধ্য হইলাম। ইহা হইতেই কারণ-অনুসন্ধানের প্রবৃত্তির উৎপত্তি।

আমরা দেখিতে পাই যে, বিষয়-উপলব্ধির সময় আমাদের বিষয় ও বিষয়ীর অনুরূপ দুইটি বিরুদ্ধ ইচ্ছাই পূর্ণ হয় এবং প্রথমটা হইতে বহির্জগৎ ও দ্বিতীয়টা হইতে অন্তর্জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। সাধারণতঃ, আমরা এই দুই জগৎকে সমান সত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি। যখন বিষয়ের পরিবর্ত্তন হয়, তখন তদনুযায়ী অনুভূতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। একটা পরিবর্ত্তনের অস্তিত্ব বাহ্য-জগতের, আর একটা অন্তর্জগতের। এই উভয় জগতেই আমরা পরিবর্ত্তনের দুইটী দিক অনুভব করি; একটা বিকার,

আর একটা অনবচ্ছিন্নতা, এই দুই প্রকার অনুভূতিতেই কারণ অনুসন্ধানের প্রবৃত্তিরূপে অব্যক্ত বিরুদ্ধ ইচ্ছার ক্রিয়া দেখা যায়। আমাদের অনেক রুদ্ধ ইচ্ছা সাধারণভাবে চরিতার্থ না হইলে নিদ্রাকালে স্বপ্নে কাল্পনিক অবাস্তব জগৎ সৃষ্টি করে। সেইরূপ বিকার-সংক্রান্ত অব্যক্ত বিরুদ্ধ ইচ্ছা কল্পিত 'শক্তি' মানিতে বাধ্য করায়; এই জন্যই মনোজগতে বিকারের বা পরিবর্ত্তনের কারণ হিসাবে মানসিক শক্তি ও জড়ের পরিবর্ত্তনের কারণ হিসাবে জড়শক্তি মানিয়া থাকি। এই প্রকারেই জড়ের নিরবচ্ছিন্নতা হইতে conservation of matter বা conservation of energy-জড় ও শক্তির অক্ষরবাদের উৎপত্তি। যদিও কোন কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা conservation of matter ও energy সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি আমার মতে ইহার সত্যতা প্রমাণের উপর নির্ভর করে না। ইহা আমরা না মানিয়া থাকিতে পারি না।

অন্তর্জগতে একদিকে যেরূপ বিকার বা পরিবর্ত্তনের অনুভূতি হইতে মানসিক শক্তির অস্তিত্ব কল্পিত হয়, অনবচ্ছিন্নতা হইতে সেইরূপ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। আমাদের সকল প্রকার মানসিক পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে একটা নিরবচ্ছিন্নতা বর্ত্তমান আছে। মনস্তত্ত্ব হিসাবে এই নিরবচ্ছিন্নতার অনুভূতি-সংক্রান্ত বিরুদ্ধ অব্যক্ত ইচ্ছাই আত্মা বা 'আমি' বলিয়া প্রাণ-দেহ-মনাতিরিক্ত স্বতন্ত্র কিছুর অস্তিত্ব মানিতে বাধ্য করায়।

হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা চারি প্রকার কারণের বর্ণনা করিয়াছেন। মৃত্তিকা যখন কুম্ভকারের দ্বারা ঘটে পরিণত হয়, তখন মৃত্তিকাই ঘটের সমবায়ী উপাদান বা পরিণামী কারণ। যে শক্তির দ্বারা মৃত্তিকা ঘটের আকার প্রাপ্ত হয়, তাহা অসমবায়ী কারণ; এবং যে সকল উপকরণের দ্বারা এই শক্তি নিয়োজিত হয়, তাহাই নিমিত্ত কারণ। কুম্ভকার ও তাহার দণ্ড চক্র সলিল ইত্যাদি ঘটের নিমিত্ত কারণ; এতদ্ব্যতীত বৈদান্তিকগণ আরও একটা কারণ স্বীকার করেন; ইহার নাম বিবর্ত্ত-উপাদান। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে রজ্জুই মিথ্যা সর্পজ্ঞানের বিবর্ত্ত-উপাদান কারণ। এ ক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্ত উপাদান বা পরিণামী কারণের ন্যায় রজ্জু সর্পে পরিণত হইতেছে না; কিন্তু উহারই আশ্রয়ে সর্পভ্রম হইতেছে। একটু ভাবিলেই দেখা যাইবে যে পরিণামী কারণ নিরবচ্ছিন্নতা সম্পর্কিত এবং অসমবায়ী কারণ বিকার বা পরিবর্ত্তন-সম্পর্কিত; নিমিত্ত কারণ বাস্তবিকপক্ষে অসমবায়ীর অন্তর্গত বলা যাইতে পারে কারণ যে শক্তি মৃত্তিকাকে ঘটে পরিণত করিয়াছে, কুম্ভকার ইত্যাদি তাহারাই নিমিত্ত মাত্র। বিবর্ত্ত-উপাদান কারণ বুঝিতে হইলে, আমি পূর্ব্বে স্বপ্নে অবাস্তব জগৎ-সৃজন বা রুদ্ধ প্রবৃত্তির বশে ভ্রান্ত-অনুভূতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, মনে রাখা কর্ত্তব্য। আমরা যখন রজ্জু দেখি, তখন আমাদের মধ্যে বিষয়ীর বিষয়ে রূপান্তরিত হইবার যে অব্যক্ত বিরুদ্ধ প্রবৃত্তি আছে, তাহাই চরিতার্থ হয়। সর্প-ভ্রমকালে এই প্রবৃত্তির সহিত সর্পসংক্রান্ত প্রবৃত্তি জড়িত হইয়া ভ্রম উৎপন্ন করে। যাহাদের মনে সর্প-সম্বন্ধীয় কোনরূপ প্রবৃত্তি রুদ্ধাবস্থায় নাই, তাঁহাদের এ প্রকার ভ্রম হইবে না। স্বপ্ন দর্শন সম্বন্ধেও আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রুদ্ধ প্রবৃত্তি ভিন্ন স্বপ্ন দর্শন হয় না।

মোটামুটি বলিতে গেলে বিষয়ীর বিষয়ে পরিণত হইবার যে ইচ্ছা, তাহা হইতেই বিষয়ের উপলব্ধি হয়। এই ইচ্ছাই কারণ বা সত্যানুসন্ধান প্রবৃত্তিরও মূল; এবং ইহা সম্পূর্ণ-রূপে রুদ্ধ হইলে কারণ-অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি থাকে না বা আমরা কাল্পনিক একটা শেষ কারণ স্থির করিয়া লই।

মেঘনাদ

[শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল]

(২:)

যে দিন মনোরমার মোকদ্দমা হাইকোর্টে উঠিল, সে দিন মেঘনাদ আদালতে তাহা শুনিতে গেল। মনোরমার পক্ষে একজন মস্ত বড় উকিলকে মেঘনাদ নিযুক্ত করিয়াছিল। তিনি সওয়াল জবাবে বলিলেন, "এ মোকদ্দমায় যা কিছু প্রমাণ সরকার পক্ষ দিয়াছেন, তা' সমস্ত বিশ্বাস করিলেও তাতে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না যে, মৃত ব্যক্তির স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নাই। সরকার পক্ষের সমস্ত সাক্ষ্যে আমরা পাই শুধু এই কথা, মৃত ব্যক্তি মনোরমার ঘরে রাত্রে আসিয়াছিল; সে অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া আসিয়াছিল; লোকটি বিছানায় শুইয়াছিল; মনোরমা তা'র নাকের কাছে একটা কি ধরিয়াছিল। তার পরে তাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় সতীশের চাকর লইয়া যায়; এবং মৃত ব্যক্তির নিজের ঘরের ভিতর গিয়া সতীশ তাহার গলায় ক্ষুর বসাইয়া দেয়। ডাক্তারের রিপোর্টে প্রকাশ যে, এই ক্ষুরের আঘাতে মৃত্যু হয় নাই। ডাক্তারেরা জবানবন্দীতে বিপরীত কথা বলিয়াছেন বটে; কিন্তু সে কথা খুব বিচারসহ নহে; এবং সে কথা অবিশ্বাস করিয়াই জুরীরা সতীশকে মুক্তি দিয়াছেন। এই সকল বলিয়া তিনি, ডাক্তারের জবানবন্দী যে ভুল, তাহার প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। তার পর বলিলেন, "সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ক্ষুরের আঘাতের সময় এ ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছিল। কোনও বিষ প্রয়োগে ইহার মৃত্যু হয় নাই। তবে কথা উঠে, মৃত্যু কখন হইয়াছিল। মনোরমার ঘরে লোকটা আসিয়াছিল। সেখানে আসিয়াই সে বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছিল; এবং আমি বলি, সে সেই অবস্থায় হঠাৎ কোন কারণে মরিয়া গিয়াছিল। সে কারণ ডাক্তারী পরীক্ষায় ধরা পড়ে নাই। তাহাকে হত্যা করিবার মনোরমার কোনও হেতু ছিল না, এ কথা স্পষ্ট বুঝা যায়। সে সতীশের সহযোগে কেবল এই মৃত্যু ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার হত্যা করিবার ইচ্ছা ছিল, ধরিয়া লইলেও, সে নির্দ্দোষ। কেন না, এ কথা সত্য হইলে, তাহাদের কোনও চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই লোকটা মরিয়া গিয়াছিল। সমস্ত প্রমাণ এই থিওরীর সঙ্গে খাপ খায়। অন্য কোনও থিওরী খুব সুসঙ্গত বলা যায় না।"

জজ সাহেবদের মধ্যে একজন বলিলেন, "কিন্তু এ কথা আপনার মক্কেলের পক্ষ থেকে কখনও উত্থাপন করা হয় নাই। এই কথাই যদি সত্য, তবে আপনার মক্কেল সেই কথা বলিল না কেন? কোনও সাক্ষীর জেরায় এ থিওরী উপস্থিত করা হয় নাই।"

মেঘনাদের মাথার ভিতর সমস্ত শিরাগুলি দপ দপ করিতে লাগিল। প্রহ্লাদ বাবুর ভুল! মনোরমা তো আগাগোড়া

এই কথা বলিয়া আসিয়াছে। প্রহ্লাদ বাবু কিছুতেই কথাটাকে আমল দেন নাই। তাতে যে কি ঘোর অনিষ্ট ঘটিয়াছে, মনোরমার সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে, তাহার নিজের কি বিপদ ঘটিয়াছে, তাহা বিদ্যুদ্বেগে সে চিন্তা করিয়া ফেলিল।

উকিল বাবু জজের কথার জবাব দিলেন। কিছুক্ষণ সাক্ষী-প্রমাণ সম্বন্ধে তাঁহাদের বাদানুবাদ চলিল। দ্বিতীয় জজটি এতক্ষণ তাঁহার লম্বা চেয়ারে ঠেস দিয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া ছিলেন। কিছুক্ষণ বাদে তিনি উঠিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, "আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, এটা জুরীর বিচারের আপীল,—আমরা সাক্ষ্য-প্রমাণ আলোচনা ক'রতে পারি না। জজের রায়ে আইনের দোষ কি আছে, দেখাতে পারেন?"

উকিল বাবু পাঁচ-সাতটা আইনের সূক্ষ্ম কথা উঠাইলেন। জজেরা সবটাতেই ঘাড় নাড়িলেন। শেষে উকীল বাবু বলিলেন, "জজ আমার মক্কেলের প্রতি অন্যায় করিয়াছেন। মনোরমার এ ব্যাপারে স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব ছিল না;—প্রধান অপরাধী সতীশ,—মনোরমা তাহার হুকুমে কিছু সহায়তা করিয়া থাকিতে পারে, ইহাই তাঁহার মত। তিনি যদি এই স্থির করিয়া থাকেন, তবে হত্যাপরাধে মনোরমার শাস্তি হইতেই পারে না। জুরীর সহিত যখন সত্য-সত্য তিনি একমত হইতে পারেন নাই, তখন এমন গোঁজামিল দিয়া সম্মতি না দিয়া, তাঁহার এ মোকদ্দমা হাইকোর্টে পাঠান উচিত ছিল।"

জজ। এটা আইনের দোষ নয়। জজের এ সম্বন্ধে discretion ব্যবহার করিবার অধিকার আছে।

উকিল। কিন্তু তিনি যা' লিখিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, তিনি জুরীর সঙ্গে একমত হইতে পারেন নাই। এই কথা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। জুরীরা মনোরমাকে ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। জজের মতে আসামী সে ধারায় দোষী নয়,—হত্যাকাণ্ডে সহায়তা করার অপরাধে অপরাধী। সুতরাং বাস্তবিক যখন জজ ও জুরী একমত নয়, তখন এ শাস্তি টিঁকিতে পারে না।

দ্বিতীয় জজ বলিলেন, "সহায়তা করা সাব্যস্ত করিলেও তো জজ এই শাস্তিই দিতে পারিতেন। তা ছাড়া সহায়তা না ধরিয়া এটাকে যদি ষড়যন্ত্র ধরিয়া লওয়া যায়—"

উকিল। তাহা হইলেও এটা স্বতন্ত্র অপরাধ,—স্বতন্ত্র চার্জ্জের বিষয়। যে ৩০২ ধারায় জুরী দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন, সে ধারার অপরাধ নয়।

প্রথম জজ বলিলেন, "আপনার তর্কটা বড় চুল-চেরা।"

উকিল। সে কথা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু আপনারা যদি প্রমাণাদি আলোচনা করিয়া দেখেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, বাস্তবিক মনোরমার অপরাধ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় নাই। আপনারা যদি আমার আইনের তর্ক সঙ্গত মনে করেন, তবে আপনারা জজের রায় উল্টাইবেন কি না, সে জন্য প্রমাণাদি দেখিতে পারেন; এবং প্রমাণের উপর যদি আমার মোকদ্দমার জোর থাকে, তবে আপনারা, আমার বর্ত্তমান তর্ক চুল-চেরা হইলেও, তাহার সুযোগ লইয়া আসামীকে মুক্তি দিতে পারেন।

তখন আবার প্রমাণাদি সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা হইল। উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শেষ হইলে, জজেরা রায় মুলতবী রাখিলেন। মনোরমার উকিল মেঘনাদকে বলিলেন, "কি ক'রবে বুঝতে পারছি না। খালাস দিতেও পারে। কিন্তু আমি যে থিওরী বল্লাম, এ সম্বন্ধে যদি নীচের কোর্টে কোনও suggestion থাকতো, তবে নিশ্চয় একে খালাস ক'রতে পারতাম।"

মেঘনাদ মনে-মনে প্রহ্লাদ বাবুর মাথাটা চিবাইয়া খাইতে লাগিল। হতভাগা মূর্খ! নিজের পাণ্ডিত্যের উপর তার এত বিশ্বাস যে, সে তারই ভরসায় কেবল মিথ্যার উপর মিথ্যা চাপাইয়া এতবড় কেলেঙ্কারীটা করিয়া বসিয়াছে!

সে কেবল নিজের মনে-মনেই গজরাইতে লাগিল। এ সম্বন্ধে কাহারও সঙ্গে আলোচনা করিয়া মন পাতলা করিবার তার উপায় ছিল না। সুনীতির কাছে সে এ কথার বিন্দু-বিসর্গও উত্থাপন করিতে পারে না। সে দিন যখন সে বাড়ী ফিরিল, তখন তার মুখ কাজেই খুব অন্ধকার হইয়া রহিল।

সুনীতি যতীনের কাছে শুনিয়াছিল যে, মনোরমার মোকদ্দমা শুনিতে মেঘনাদ হাইকোর্টে গিয়াছিল। সেও কাজেই একটু গম্ভীর হইয়াই ছিল।

মেঘনাদকে জল খাওয়াইয়া সুস্থ করিয়া সুনীতি বলিল, "বাবা, আমার কথাটা কি মিথ্যা যাবে?"

"কোন্ কথা?"

"বৌমার কথা?"

মেঘনাদ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "এত ব্যস্ত কেন? দেখা যাবে।"

"আমার তো আর ত্বর সইছে না বাবা। এ সোণার

সংসার কার? আমি তো এখানে অনধিকার প্রবেশ করে ব'সে রয়েছি। যার সংসার, সে এলে আমি একটু স্বস্তি পাব। সে যদি আমাকে মা বলে' আদর করে' রাখে, তবেই বুঝবো আমার এখানে সত্য-সত্য অধিকার আছে। তা নইলে আমার কেবলি মনে হ'চ্ছে, আমি এখানে থেকে আমার অপরাধ বাড়াচ্ছি!"

মেঘনাদ একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুনীতির দিকে চাহিল—একটা বিষাদের শান্ত ছায়ায় তার মুখ আচ্ছন্ন দেখিল। সে বড় ব্যথা পাইল; বলিল, "আচ্ছা মা, তবে তুমিই দেখে-শুনে, তোমার পছন্দ-মত একটি বউ নিয়ে এস।"

সুনীতি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "আমার কি সে উপায় আছে? সংসারে আমার যে তুমি ছাড়া আর কারো সঙ্গে সম্বন্ধ নাই বাবা!"

কথাটায় মেঘনাদের বুকে বড় ব্যথা লাগিল। সবাই তাহার সম্বন্ধে কি ভাবে, সে কথা যে সুনীতি জানে, এবং তাহাতে তাহার হৃদয়ে যে কত বড় বেদনা জমিয়া রহিয়াছে, তাহা মেঘনাদ আজ সম্পূর্ণরূপ অনুভব করিল। সে পণ করিল, তার সে কলঙ্কের প্রলেপ দূর করিতে হইবে—সে অবিলম্বে বিবাহ করিবে।

যোগেন্দ্র বাবু গুপ্ত-পুলিসের (C. I. D.) ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহার বাসায় ময়মনসিংহের উকিল জগদীশ বাবু অতিথি। সন্ধ্যা বেলায় দুইজনে মিলিয়া যুক্তি করিতেছিলেন।

যো। হাইকোর্টে আজ সবাই বলছিল, মনোরমার না কি খালাস পাবার সম্ভাবনা আছে।

জ। তবে তো বিপদের উপর বিপদ। একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব তার মিতে। আর কাল-বিলম্বে দরকার নাই, ছোঁড়াটাকে রক্ষা ক'রতে না পার্‌লে, আমাদের ধর্ম্মহানি হ'বে।

যো। দেখুন জগদীশ বাবু আমার এক-একবার বড় ভয় হ'চ্ছে,—একটা নিরপরাধ মেয়ের অদৃষ্ট নিয়ে খেলা,—যদি শেষ পর্য্যন্ত ভালো না উৎরায়, তবে চিরজন্ম অনুতাপ করতে হ'বে। সুনীতি তো ওকে মরিয়া হ'য়ে আঁকড়ে ধ'রবে;—যদি শেষ পর্য্যন্ত তাকে ছাড়াতে না পারে, তবে তো মেয়েটার সর্ব্বনাশ!'

জ। আমি সে জন্য এক ফোঁটা চিন্তা করি না। সরিৎ যা মেয়ে, তা'কে দেখ্‌লে মেঘনাদের মাথা ঘুরে যাবে। গান শুনলে সে মূর্চ্ছা যাবে। আর যদি দু' ঘণ্টা তার সঙ্গে আলাপ করে, তবে ও পায়ের তলায় মরে পড়ে থাকবে।

যোগেন্দ্র বাবু একটু খুঁৎখুঁৎ করিতে লাগিলেন; বলিলেন, "আমার বিবেচনায়, মেয়েটাকে একবার বলা দরকার।"

জ। হ'য়েছে! আগে থেকে যদি তার মন বিগড়ে দেন, তবেই তো চিত্তির। আমার কথা শুনুন—দুটো হাত যুড়ে, মন্ত্র-ক'টা একবার পড়া হ'য়ে যাক। তার পর সরিতের বাড়ী কতদূর, আর মেঘনাদের বা বাড়ী কতদূর, দেখা যাবে।

যোগেন্দ্র বাবু কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "যা থাকে বরাতে,—দেখা যা'ক একবার। মেঘনাদ যদি রাজী হয়, তখন ভাবা যাবে।"

দুইজনে বাহির হইলেন। পথে যাইতে যাইতে দুজনে যুক্তি করিলেন যে, তাঁদের দুজনকে একসঙ্গে দেখিলে, মেঘনাদ এটাকে যোগসাজাগ ব্যাপার ভাবিতে পারে; সুতরাং জগদীশ বাবু আগে গিয়া কথাটা পাড়িবেন; যোগেন্দ্র বাবু পরে যেন, কিছু জানেন না, এই ভাবে গিয়া উঠিবেন।

মেঘনাদ সন্ধ্যাবেলায় বটব্যাল কোম্পানীর আফিসে ফিরিয়া আসিল। তার মনটা আজ নানা কারণে খুব খারাপ বোধ হইতেছিল। জামা ছাড়িয়া বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া, সে একখানা ইজি-চেয়ারের উপর শুইয়া ভাবিতে লাগিল। মনোরমা কি মুক্তি পাইবে? মুক্তি পাইলে সে কি করিবে? মেঘনাদ তাহাকে লইয়া কি করিবে? মেঘনাদ যদি তার সন্ধান না লয়, তবে সে যাইবে কোথায়? তার পর ভাবিল বিবাহের কথা। বিয়ে সে করিবে,—কিন্তু কাহাকে? কোথায় কোন্ নিভৃত গৃহের অন্তরাল হইতে একটি অপরিণত-বুদ্ধি বালিকাকে ধরিয়া আনিয়া সে তাহার এই জটিল, পঙ্কিল জীবনের সাথী করিবে! তার তো সাধ্য নাই যে, নির্ম্মল, কলঙ্কশূন্য হৃদয় দিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিবে! সে বালিকা হয় তো তার ফুলের মত পবিত্র হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা লইয়া তার কাছে উপস্থিত হইবে।—বাঙ্গালীর ঘরে এইটাই স্বাভাবিক! তার প্রতিদান কি সে দিতে পারিবে? ভালবাসিতে কি পারিবে? পবিত্র হৃদয়ের যে অনাবিল প্রীতি, তাহা দিয়া সে তো তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে পারিবে না। আবার মনোরমা এ কথার মধ্যে আসিয়া

পড়িল। মনোরমার অঙ্গের সেই অগ্নিময় স্পর্শের স্মৃতি তাহার শরীর কণ্টকিত করিয়া তুলিল।

তাহার মনে হইল যে, যখন সে প্রথম শুনিল মনোরমাকে সবাই একটা উদ্ধারাশ্রমে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছে, তখন সে কি ভাবিয়াছিল। সে সংকল্প করিয়াছিল, মনোরমাকে জীবনের সাথী করিয়া, সমস্ত জীবনের অক্লান্ত অধ্যবসায় ও সেবা দিয়া, তাহাকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবে। সে তাহার কিছুই করে নাই; বরং মনোরমাকে আরও কলঙ্কিত করিয়াছে,—নিজে কলুষিত হইয়াছে। তার এই কর্ত্তব্য-ভ্রংশের কথা মনে হওয়ায় সে নিজেকে তিরস্কার করিতে লাগিল; এবং ভাবিতে লাগিল যে, যদি মনোরমা উদ্ধার পায়, তবে তাহাকে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে সে এখনো পারে কি না? বিবাহ—? সে অসম্ভব! মনোরমাকে আনিলে সুনীতিকে তাড়াইতে হইবে;—সে কল্পনাও সে মনে স্থান দিতে পারিল না। তবে সে মনোরমার কি উপায় করিতে পারে? স্রোতের মুখে কুটার মত সে কি ভাসিয়াই যাইবে—মেঘনাদ কি তার কিছুই করিতে পারিবে না?

জগদীশ বাবু ডাকিলেন, "মেঘনাদ আছ?" মেঘনাদ উঠিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আনিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, কবে এলে? কি মনে করে?"

জগ। আরে ভাই, সে এক মহা বিভ্রাট। আমি এসেছিলাম আমার এক মাসতুতো বোনের বিয়েতে। এসে এক মহা বিপদে পড়ে গিয়েছি। এখন তুমি রক্ষে না ক'রলে তো আর উদ্ধারের উপায় দেখি না।

"কি রকম? কি বিপদ?"

"বিপদ বিষম। আমার মেসোম'শায় গরীব মানুষ, এক রকম ভিক্ষে-সিক্ষে করে' মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন। ছেলেটা ভাল, এম-এ পড়ে। সে নিজেই একরকম দেখে-শুনে বিয়ে ঠিক ক'রেছিল। এখন তার দেশ থেকে এক মামা এসে মহা গোলযোগ বাধিয়েছে। অনেক ঝগড়াঝাঁটির পর সে বলে যে মাতুল-প্রণামী আর এটা-সেটা দিয়ে আর এক হাজার টাকা না হ'লে এ বিয়ে হ'বে না। মেসোম'শায় হাজার টাকা কোথা পাবেন? অনেক হাতে-পায় ধরে কান্না-কাটি ক'রলেন। সে চশমখোর কিছুতে ছাড়ে না। সে ছেলেও কিছু বলে না। আমি তো দেখে খুব চটে গিয়ে, তাদের ন ভূত ন ভবিষ্যতি ক'রে গা'ল দিয়ে বিদায় করে দিয়েছি। তারা ছেলে নিয়ে আজ বিকেল বেলায় দেশে চলে গেছে। আমি রাগের মাথায় বলেছিলাম যে, এমন চশমখোরের হাতে মেয়ে দেয়? আর সরিতের মত মেয়ে—তার পাত্রের কি বড় অভাব পড়েছে,—আমি কালই সরিতের বর এনে বিয়ে দেব। বলে' এখন দায়ে ঠেকেছি—তুমি ছাড়া তো আর বর দেখি না ভাই। এখন তুমি ভদ্রলোকের জাত রাখতে চাও, আর বন্ধুর মুখ রাখতে চাও, তবেই সব দিক রক্ষা হয়।"

মেঘনাদ মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে বলিল, "ভাই, আজ সকালে যদি এর বদলে তুমি এসে হাজার টাকা আমার কাছে চাইতে, তবেই কোনও গোল হ'ত না। কিন্তু বিয়ে করা—একটা অজানা অচেনা মেয়েকে—"

"না, তা' কেন ক'রতে যাবে? তুমি এখনি চল, তাকে দেখে এস,—পছন্দ না হয় তবে বিয়ে করো না।"

"চোখে দেখে কি পছন্দ ক'রবো ভাই,—এ তো আর ছবি না?"

"তবে আমার কথায় বিশ্বাস কর। সে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ,—গায় বাজায় চমৎকার,—আর পাকা গিন্নী। আর কেউ কোনও দিন তার মুখে মিষ্টি কথা বই শোনে নি।"

এমন সময় যোগেন্দ্র বাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। জগদীশ তাঁহার কাছে তার সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। যোগেন্দ্র বাবু বলিলেন, "এতে আর কথা কি? মেঘনাদ বাবু, আপনার বিয়ের বয়স বোধ হয় এতদিনে হ'য়ে থাকবে।"

মেঘনাদ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমার সব-চেয়ে বড় কথা হ'চ্ছে যে, যাকে আমি বিয়ে ক'রবো, সে আমার মাকে মা বলে ভালবাসতে পারবে কি না, সেইটা যাচাই করে নিতে চাই।"

"আপনার মা!" বলিয়া যোগেন্দ্রবাবু জগদীশের মুখের দিকে চাহিলেন। জগদীশ যোগেন্দ্র বাবুর দিকে চাহিলেন।

"হাঁ, আমার ধর্ম্ম-মা, সতীশ বাবুর স্ত্রী। তিনি আমার কাছে আছেন,—তিনি চিরদিনই আমার বাড়ীতে মায়ের গৌরবে থাকবেন। যে মেয়ে তাঁকে মা বলে দেখতে না পারবে, তাকে আমি বিয়ে ক'রতে চাই না।"

জগদীশ ও যোগেন্দ্র বাবু পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন।

"তোমার বোন তা' পারবে ?" বলিয়া মেঘনাদ জগদীশের মুখের দিকে চাহিল। জগদীশের সব চিন্তা এলোমেলো হইয়া গিয়াছিল। সে মনে-মনে ফন্দী আঁটিতেছিল যে সরিৎ আসিয়া সুনীতিকে সদলবলে ঝাঁটাইয়া তাড়াইবে ;—কিন্তু এ যে নূতন কথা!—মা ? সত্য-সত্যই কি তাই ? না, মেঘনাদ এক নম্বরের পাযণ্ড ? সে ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিল, "সে কথা সেই মেয়েকেই জিজ্ঞাসা করো না ?"

মেঘ। সেই ভাল। চল, তোমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাই। তিনিও আমার বিয়ের জন্য ভারি ক্ষেপে উঠেছেন। তিনি নিজেই গিয়ে মেয়ে দেখে আসুন ; তবেই বুঝতে পারা যাবে, তোমায় বোন তাঁকে মায়ের মত দেখতে পারবে কি না।

সুনীতি কিছুতেই মেয়ে দেখিতে রাজি হইল না, মেঘনাদকে বলিয়া-কহিয়া পাঠাইয়া দিল।

সরিৎকে দেখিয়া মেঘনাদের রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। নিপুণ ভাস্করের খোদাই-করা একটা সজীব মূর্ত্তি বটে! কথা নয় তো, যেন অমৃত-লহরী। সে সেতার বাজাইল। সঙ্গীতানভিজ্ঞ মেঘনাদ দেখিল, তার চাঁপার কলির মত আঙ্গুলগুলির দ্রুত লীলাগতি। গানে তাহার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিল।

যে কথাটা জিজ্ঞাসা করিবে বলিয়া সে ঠিক করিয়াছিল, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করা হইল না। মেঘনাদ বিবাহে সম্মত হইল।

জগদীশ মহা ফাঁপরে পড়িয়া গেল। সে তার দূর-সম্পর্কীয় মেসোমশায়ের কল্পিত দুর্দ্দশার কথার সৃষ্টি করিয়া, মেঘনাদকে ফাঁদে ফেলিয়া, এখন ভাবিতে লাগিল, কাজটা ভাল হইল কি না। সুনীতির সঙ্গে মেঘনাদের সম্বন্ধটা কি, সেই কথা লইয়া সে আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। সে সোজাসুজি মনে করিয়াছিল যে, মেঘনাদ সুনীতির জার ;—কাজে-কাজেই মেঘনাদ সরিৎকে লইয়া সংসারী হইয়া বসিয়া পড়িলে, সুনীতিকে মেঘনাদের স্কন্ধ ছাড়িতে হইবে। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, মেঘনাদ বাস্তবিক যাহাই হউক, সে নিজেকে সুনীতির ধর্ম্মপুত্র বলিয়া পরিচয় দেয়। এই সম্পর্কের জোরে সুনীতি মেঘনাদের সংসারে বসিয়া কর্ত্তৃত্ব করিতেছে, এবং করিতে থাকিবে ;—এমন সংসার কি সরিতের পক্ষে সুখের হইবে ? সে ভাবিয়া কূল কিনারা পাইল না।

বিবাহের দিন তিনটার সময় যোগেন্দ্র বাবু আফিস হইতে ফিরিলেন। অত্যন্ত ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে জগদীশ বাবুর কাছে আসিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়েটা কি একেবারে ঠিক ?"

জগদীশ উদাস ভাবে বলিল, "হাঁ।"

"আজই হবে ?"

"হাঁ।"

"তারিখটা ফেরান যায় না ?"

জগদীশ ঘাড় নাড়িল।

যোগেন্দ্র বাবু গম্ভীর ভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

মুদ্রা ও পণ্য-দ্রব্যের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ কি ?

[শ্রীদ্বারকানাথ দত্ত এম-এ, বি-এল্]

বিনিময়ের প্রয়োজনে দেশে যে সকল মুদ্রা প্রবর্ত্তন করা হয়, তাহাদের পরিমাণ ও পণ্যদ্রব্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে। এই সকল মুদ্রার মূল্য কোন ব্যক্তি-বিশেষ দ্বারা অবধারিত হয় না। পণ্য-সামগ্রীর বাজার-দরের ন্যায় উহার মূল্যও একটা সামাজিক ব্যাপার। পরিমাণবাদ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্ব্বে, কি করিয়া যে মুদ্রার সহিত পণ্যের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠাপিত হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া, দরের হারের প্রতি দৃষ্টি

করিয়া সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে। মুদ্রার ক্রয়-শক্তি যে একটা সামাজিক ব্যাপার,—তাহার যোগ্যতার হ্রাস-নিয়মের প্রতিও যে বিশেষ লক্ষ্য করা হইয়াছে, এইরূপ অনুমিত হয় না। ফলতঃ, দেশের সমগ্র পণ্য ও প্রচলিত সমস্ত মুদ্রার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে কখনও সামাজিক অভিমত পরিব্যক্ত হয়, এরূপও কল্পনা করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। বহু অবস্থা ও কারণের সমবেত কার্য্যফল স্বরূপে মুদ্রার ক্রয়-শক্তির অভ্যুদয় হয়; সুতরাং ঐ সকল কারণ ও অবস্থার বিস্তৃত বিশ্লেষণ না হইলে, পণ্যের সহিত মুদ্রার প্রকৃত সম্বন্ধ কি, তাহা সাব্যস্ত হইবে না। এই সকল বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে যে, মুদ্রার পরিমাণের সহিত তাহার মূল্যের কোন প্রকার সাক্ষাৎ বিরুদ্ধানুপাত সম্বন্ধ নাই; বরং পরোক্ষ-ভাবে তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি করিলে, যথাকালে তাহার মূল্যের উত্থান-পতন হইতে পারে। Prof. Kinley নিম্নলিখিত মতে সেই তত্ত্ব সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বিষয়ের জটিলতা।

এই বিজ্ঞান-বিদ্যার সর্ব্বপ্রকার তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের মধ্যে মুদ্রার ক্রয়-শক্তি (purchasing power) বা মূল্য-তত্ত্ব (theory of value) সর্ব্বাপেক্ষা জটিল ও দুরূহ। বহু অবস্থার বিশ্লেষণ করিয়া কোন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, উহা স্বভাবতঃই জটিল হইয়া পড়ে। কোন দেশে একমাত্র আদর্শ-মুদ্রাই প্রচলিত থাকার কল্পনা করিলেও, তাহার ক্রয়-শক্তি ধার্য্য করিতে হইলে, সেই মুদ্রা-মূল্য ও তাহার মধ্যগত ধাতব বস্তুর বাজার-মূল্যের সমতা সম্পাদন করা আবশ্যক; কেন না, আদর্শ ঠিক রাখিতে হইলে, তাহার এই দুই মূল্যের সমতা থাকা প্রয়োজন। যদি মুদ্রা দিয়া বাজার হইতে তাহার মধ্যগত ধাতু অপেক্ষা কম কিম্বা বেশী সোণা ক্রয় করিয়া আনা যাইতে পারে, তবে সেই সমতা ভঙ্গ হইয়া যায়। এই সমতা রক্ষা করিয়াই তবে পণ্য-দ্রব্যের মূল্যের সহিত তাহার সমতা সম্পাদন করিতে হয়। তৎপর ডেবিট বা ধারের প্রক্রিয়ার প্রভাবে সেই সমতার কোন ইতর-বিশেষ হয় কি না, তাহার বিচার-বিবেচনা হওয়া কর্ত্তব্য। এই সকল সমতা ধার্য্য হইয়া পণ্য-দ্রব্যের সহিত তাহার যে সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হইবে, তাহাই তাহার প্রকৃত মূল্য-তত্ত্ব। সুতরাং এই সকল জটিল সম্বন্ধের সমবেত ক্রিয়া-ফল বাহির করিতে হইলে, তাহাদের প্রত্যেক অঙ্গের ক্রিয়া-শক্তি পৃথক্ করিয়া বাহির করা আবশ্যক; তৎপরে সমবেত ক্রিয়া-ফল লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে।

কোন বস্তুর মূল্য ধার্য্য করিতে হইলে, তাহার দুইটা অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। একদিকে তাহার ব্যবহারোপযোগিতা, ও অপর দিকে, আয়োজন ব্যয় কি, তাহার আলোচনা করিতে হয়। মুদ্রার ব্যবহারিক-শক্তি দুইটী; এক তাহার বিনিময়ের মধ্যবর্ত্তিতা করা, অপর তাহার ধাতব বস্তুর শিল্প-ব্যবহার। মুদ্রা এমন এক যন্ত্র যে, তাহার আয়োজন করিতে, সমাজকে বহু মূলধন স্থায়িভাবে নিক্ষেপ (invest) করিয়া রাখিতে হয়। তাহার ক্রয়-শক্তির উপর তাহার এই আয়োজন-ব্যয়ের কোন প্রভাব আছে কি না, তাহা বিশেষ চিন্তনীয়। আর খনি কাটিয়া সোণার আয়োজন করিতে যে ব্যয় পড়ে, তদ্দারা তাহার বাজার দর ধার্য্য হয় কি না তাহাও বিশেষ বিবেচ্য বিষয়।

কল্পনা

এই সকল বহু জটিল বিষয়ের সমাধান ও সামঞ্জস্য করিবার জন্য আমরা কতকগুলি কল্পিতাবস্থার সম্বন্ধে আলোচনা করিব। প্রথমতঃ, আমরা দেশের কোন মর্শুমের সময়ে যত প্রকার পণ্য-সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় হয়, তাহাকেই দেশের সমগ্র পণ্য বলিয়া কল্পনা করিব। দ্বিতীয়তঃ, দেশে কোন প্রকার ধারের বা সাক্ষাৎ বিনিময়ের প্রচলন না থাকা, এবং নগদ মুদ্রার ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার ক্রয়-বিক্রয় কার্য্য সম্পন্ন হওয়া, কল্পিত হইবে। তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক সমবায়ী ব্যষ্টি মাত্রা পণ্যের জন্য এক-একটী করিয়া মুদ্রা দেওয়া হয়; কোন মুদ্রাই একবারের বেশী ব্যবহার করা হয় না এবং এরূপ নূতন-নূতন মুদ্রা ব্যবহারের কোন অনটন নাই। চতুর্থতঃ, বিনিময়ের মধ্যবর্ত্তিতা করা ভিন্ন মুদ্রার কিম্বা মুদ্রাগত সোণার আর কোন ব্যবহার নাই। পঞ্চমতঃ, আদর্শ সুবর্ণ মুদ্রাই একমাত্র প্রচলিত মুদ্রা। এই সকল কল্পিতাবস্থায় মুদ্রার ক্রয়-শক্তি কি হইবে? প্রসঙ্গক্রমে এ কথা বলা আবশ্যক যে, এই একপ্রস্থ সামগ্রী এক সময়ে বা দীর্ঘ সময়ে ক্রয়-বিক্রয় হউক, তাহাতে কিছু

াসিবে যাইবে না; কারণ মুদ্রা দ্বারা কত সামগ্রী ক্রয় রা যাইবে, তাহাই আমাদের আলোচ্য। ইহা পণ্য-দ্রব্যের র্ঘ সময়ের স্বাভাবিক দর (normal price) নহে।

মুদ্রার উৎপাদিকা শক্তি।

শ্রম-বিভাগে কার্য্য করিয়া প্রাকৃতিক উপাদান-সকলকে য ভাবে ব্যবহারযোগ্য করিয়া দেওয়া হয়, বিনিময়ে তাহারই াহায়তা ও সাহচর্য্য করিয়া তাহার ব্যবহারিক শক্তিকে আরও কার্য্যকরী করিয়া তোলে। বিনিময়-ব্যাপার উৎপাদনেরই প্রকার-ভেদ মাত্র। মুদ্রা এই উৎপাদন-কার্য্য সাধনেরই যন্ত্র-স্বরূপ। সুতরাং এই যন্ত্রের আয়োজন করিবার জন্য প্রভূত মূলধন স্থায়িভাবে নিয়োজিত করা হইয়া থাকে। এই ব্যয়ভারের মূল্য তাহার কার্য্যোৎপাদিকা-শক্তি দ্বারা নিরূপিত করিতে হয়। বিনিময়ের প্রক্রিয়া-প্রভাবে ধাতুর যতটা ব্যবহারিক শক্তি সম্পাদিত হয়, তাহাই তাহার মূল্য বা ব্যবহার-যোগ্যতা (value in use or utility)। তাহার পরিমাণ কত ?

দৃষ্টান্ত-স্বরূপে কল্পনা করা যাউক, একদল লোক সমাজ গড়িয়া বাস করে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার বিনিময়-প্রথা প্রচলিত নাই। যে যাহা উৎপন্ন করে, সে তাহাই ভোগ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। যদি প্রাকৃতিক নানা সুযোগ ও সুবিধা থাকায়, তাহাদের মধ্যে দশলক্ষ মাত্রা সমবায়ী-পণ্য (composit units of goods) উৎপন্ন হয়; আর কোন প্রকার বিনিময়-প্রথা প্রচলিত না থাকায়, পাঁচলক্ষ মাত্রা মাত্র তাহাদের ব্যবহারে আসে, তবে অপর পাঁচলক্ষ মাত্রা অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া থাকিবে। তখন ঐ পাঁচলক্ষ মাত্রার ব্যবহারেই তাহাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। এমনই সময়ে যদি সাক্ষাৎ-বিনিময়-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া আরও একলক্ষ মাত্রা ব্যবহারে আসিতে পারে, তবে এই একলক্ষ মাত্রার ব্যবহারোপযোগিতা এই বিনিময়ের মোট মূল্য হইবে; কেন না, তাহারই কর্ম্ম-শক্তি-প্রভাবে এই উপযোগিতা লাভ হইল। তখন সমাজ অনায়াসে আরও একলক্ষ মাত্রা ভোগ বা ক্ষয় ও ব্যয় করিয়া এই বিনিময়-কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। তাহাতে সমাজ উপকৃত হইবে; অন্যথায় এই লক্ষ মাত্রার ব্যবহার হইতে বঞ্চিত হইবে। উপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধা করিয়া উঠিতে না পারিলে, অবশিষ্ট চারিলক্ষ মাত্রা এই বিনিময়ে আসিবে না। সুতরাং তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু এমনই সময়ে যদি এমন কোন সামগ্রীর অভ্যুদয় হয় যে, তাহার জন্য লোকের একটা-সাধারণ চাহিদা (demand) জন্মিয়া যায়, প্রত্যেকেই বিনা বিচারে ও বিনা আপত্তিতে তাহার বিনিময়ে, তাহার উদ্বৃত্ত সামগ্রী দিতে প্রস্তুত হয় এবং সেই সামগ্রীর মধ্যবর্ত্তিতায় অপর চারিলক্ষ মাত্রাও ব্যবহারে আসে, তবে এই চারিলক্ষ মাত্রা সামগ্রীর ব্যবহারিক শক্তি বা উপযোগিতাই এই বিনিময়ের মোট মূল্য হইবে। সুতরাং, সমাজ অনায়াসে এই চারিলক্ষ মাত্রার পরিমাণ সামগ্রীর ব্যবহারিক শক্তি ব্যয় করিয়া এই মধ্যবর্ত্তী সামগ্রীর আয়োজন করিতে পারে। তাহাতে সমাজ উপকৃত হইবে। এই মধ্যবর্ত্তী সামগ্রীই মুদ্রা। সাক্ষাৎ বিনিময়ে যে পরিমাণ ব্যয় কল্পিত হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ব্যয় করিয়া মুদ্রার আয়োজন করা যায়।

এই কল্পিতাবস্থা ছাড়িয়া দিয়া, আমাদের সমাজের প্রতি লক্ষ্য করিলেও, এই বাক্যের সত্যতার উপলব্ধি হইবে। বর্ত্তমানে দেশ-বিদেশের যন্ত্রপাতির ব্যবহার করিয়া কৃষি-শিল্পজাত সামগ্রীর উৎপাদন ও উপযোগিতা সম্পাদন করা হইতেছে। বিনিময় প্রথা উঠাইয়া দিলে, সেই সমস্ত শ্রম ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সুতরাং বিনিময়ের কার্য্য-প্রভাবেই কেবল উহারা সমাজের ব্যবহারে আসে বলিয়া, তাহাদের সেই ব্যবহারিক যোগ্যতাই বিনিময়ের মোট মূল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই মোট ধরিয়া ব্যষ্টি-মাত্রায় মূল্য বাহির করা যায়।

বিনিময়ের জন্য কত মুদ্রা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে ?

মুদ্রা-প্রবর্ত্তন করিতে হইলে, তাহার ব্যয়ের প্রতি বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করিয়াই তাহার প্রবর্ত্তন করা স্বাভাবিক। সমাজকে স্থায়িভাবে কোন মূলধন নিয়োগ করিতে হইলে, তাহারা লভ্য হইবে, তাহা দেখিতেই হয়। মুদ্রার সরবরাহ করিতে যে ব্যয় পড়ে, তাহার যোগে বিনিময় করার ফল-স্বরূপ বস্তুর যে উপযোগিতা লাভ হয়, তদ্দ্বারা তাহার স্থায়িত্বকাল মধ্যে প্রচলিত হারে লভ্য বা সুদ সহ যদি সেই ব্যয় উঠিয়া যায়, তবে সমাজ অনায়াসে সেই ব্যয় করিয়া মুদ্রার আয়োজন করিতে পারে। তখন মুদ্রার ক্রয়-শক্তির উপরে এই যোগান ব্যয়ের কোন প্রভাব থাকিবে

না। এই পরিমাণ ব্যয় করিয়া যে মুদ্রার প্রবর্ত্তন করা হইবে, তাহাই তাহার উৰ্দ্ধ সীমা। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ যদি কল্পনা করা যায় যে, দেশের সমগ্র পণ্যের একবার সাক্ষাৎভাবে বিনিময় করিতে "ব" পরিমাণ উপযোগিতা ক্ষয় বা ব্যয় করিতে হয়, তবে এই "ব" পরিমাণ উপযোগিতা ব্যয় ও ভোগ করিয়া মুদ্রার আয়োজন করা যায়। কিন্তু যদি "ক" পরিমাণ উপযোগিতার ব্যয়ে "ম" পরিমাণ মুদ্রার প্রবর্ত্তন করা যায়, তবে একবার বিনিময়ের "—ক" পরিমাণ উপযোগিতা লভ্য হইবে। আর এই মুদ্রার ব্যবহারেই যদি সেই পরিমাণ কার্য্য দুইবার করা যায়, তবে "ব—$\frac{ক}{২}$" লভ্য হইবে। তিনবার করিতে পারিলে "ব—$\frac{ক}{৩}$" লভ্য হইবে। স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রার ন্যায় যদি অপরিমিত কাল পর্য্যন্ত উহা ব্যবহার করা যায়, তবে এই ভগ্নাংশ $\frac{ক}{অ}$ শূন্যের কাছাকাছি আসিয়া কার্য্যতঃ শূন্য বলিয়া গণ্য করিতে পারা যাইবে। আর সেই মুদ্রা দ্বারা একবার বিনিময় করিলেই যদি লভ্য সহ সেই ব্যয় উঠিয়া যায়, তবে অনায়াসে তাহার আয়োজন জন্য "ব" পরিমাণ ব্যয় করা যাইতে পারিবে। এই কথা ধাতব-মুদ্রা ও পত্র-মুদ্রা, উভয় মুদ্রা সম্বন্ধেই সমভাবে প্রযুক্ত হইবে। কিন্তু সেই মুদ্রা যদি পত্র-মুদ্রা হয়, তবে দুই-একবার ব্যবহারের পরেই নষ্ট হইয়া যাইবে। তখন "ক" পরিমাণ ও তাহার যোগে বিনিময় করার পরিমাণও কমিয়া আসিবে। তাহার ফলে ঐ ভগ্নাংশ $\frac{ক}{অ}$ শূন্যের কাছাকাছি হইবে; তথাপি ব্যবহারিক জীবনে ইহাকেও শূন্য বলিয়া কল্পনা করা যায়। সুতরাং এই সীমানার মধ্যে মুদ্রার সরবরাহ করিলে তাহার ব্যয় প্রচলিত হারে লভ্য সহ উঠিয়া যাইবে; এবং মুদ্রার মূল্যের উপরে তাহার কোন প্রভাব থাকিবে না। তবে এ কথাও বলা আবশ্যক যে, মুদ্রার ব্যবহারে যতটা উপকার লাভ হইতে পারে, সেই উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাই মুদ্রার উৰ্দ্ধ সীমা।

তাহার একটা নিম্ন সীমাও আছে। কেহ-কেহ মনে করেন যে, যে-কোন পরিমাণ মুদ্রা হইলেই সমাজের কার্য্য চলিয়া যাইতে পারে। মুদ্রা যদি কোন মানস-কল্পিত বস্তু হইত, তবে এ বাক্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারিত। তখন মানস-কল্পনায়ই না হয় পণ্যের মূল্য জ্ঞাপন করা যাইত। কিন্তু মুদ্রা যে জড় বস্তু। পণ্যের সহিত তাহার একট সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতে হইলে উহাকে যথাসম্ভব বিভক্ত করিয়া সমাজে বিস্তৃত করা আবশ্যক। একটা পরিমিত পরিমাণ না হইলে উহার যথাসম্ভব বিস্তৃতি ঘটিতে পারে না। কার্য্য-সাধন-যোগ্য একটা পরিমাণ প্রবর্ত্তিত না হইলে, সাক্ষাৎ বিনিময়ে যে সকল অসুবিধা আছে, মুদ্রা লাভ করিবার জন্য নূতন করিয়া সেই অসুবিধার অভ্যুদয় হইবে। এই নিম্ন সীমায় মুদ্রা প্রবর্ত্তিত হইলে, যে-যে-ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ বিনিময়ে বিশেষ ব্যয়-বাহুল্য হয়, সেই সেই-ক্ষেত্রেই কেবল উহার ব্যবহার হইতে পারিবে। তবে এই চলনসই নিম্ন-পরিমাণ যে কি হওয়া আবশ্যক, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। এই দুই সীমার মধ্যে মুদ্রার পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। এই ভাবে মুদ্রার পরিমাণ ও মোট মূল্য স্থির করিয়া, প্রবর্ত্তিত ব্যষ্টি-মাত্রায় মূল্য স্থির করা যায়।

মুদ্রার প্রকৃত পরিমাণ কি ?

আমাদের এই সিদ্ধান্তকে বাস্তব জীবনের সহিত ঐক্য ও সামঞ্জস্য করিতে হইলে, প্রতিমাত্রা পণ্যের বিনিময়ে নূতন-নূতন মুদ্রা ব্যবহারের কল্পনা পরিত্যাগ এবং সাক্ষাৎ বিনিময় সহ মুদ্রার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়। কোন দেশে কোন সমাজেই এই উৰ্দ্ধ সীমায় যাইয়া মুদ্রার প্রবর্ত্তন করিতে হয় না। একই মুদ্রার পুনঃ পুনঃ ব্যবহার হইয়া দেশের সমগ্র পণ্যের বিনিময়-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। আর দেশে যদি ক্রেডিট বা ধারের কার্য্যের কোন অভ্যাস বা প্রচলন না থাকে, তবে সাক্ষাৎ বিনিময় একান্ত বিরল হইয়া পড়া সম্ভব নহে। সাক্ষাৎ এবং পরোক্ষ বিনিময়ের গতিক্রমের কিছু বৈষম্য আছে। সাক্ষাৎ বিনিময় অতি সঙ্কীর্ণ সীমা হইতে ক্রমে প্রসারিত হয়; এবং মুদ্রার ব্যবহার আরম্ভ হইলে, তাহার ব্যবহার বৃহৎ কাজের ক্ষেত্র হইতে ক্রমে সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একটি কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে বিস্তৃত হয়। পরোক্ষ-পন্থা পরিধি হইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিতে চেষ্টা করে। সাক্ষাৎ বিনিময়ে ক্ষেত্র বৃদ্ধি হইতে-হইতে তাহার ব্যয়বৃদ্ধির সহিত উপযোগিতা ক্রমে হ্রাস হইয়া আসে;

এবং মুদ্রার যোগে বিনিময়ের গতি প্রবর্দ্ধিত হইতে-হইতে, সাক্ষাৎ বিনিময়ের উপরে তাহার যে উপযোগিতা আছে, তাহা খর্ব্ব ও সঙ্কুচিত হইয়া ক্রমে তাহার উপযোগিতা হ্রাস হইয়া আসে। যথনই তাহাদের ব্যবহারিক শক্তি বা উপযোগিতা সমান-সমান হয়, তখনই মুদ্রার পরিমাণ-বৃদ্ধি নিবারণ করিতে হয়; কেন না, সাক্ষাৎ বিনিময়ের উপরে তাহার যে, উপযোগিতা, তাহা আর থাকে না। তাহাদের এই সমতা ঘটার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে, তাহার উপযোগিতা ক্রমে কম হইয়া আসিবে সত্য; কিন্তু তথাপি সাক্ষাৎ-বিনিময়ের উপর তাহার যে উপযোগিতা আছে, তদপেক্ষা কম পরিমাণে হ্রাস হইবে। কিন্তু এই সমতা স্থাপিত হওয়ার পর তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে, তদ্দারা আর কোন উপযোগিতা লক্ষ্য হইবে না; বরং বিনিময়ে উপযোগিতার নিম্নে যাইয়া ক্ষতি হইতে থাকিবে। এই সীমানা পর্য্যন্ত মুদ্রার প্রচলনে বা ব্যবহারে যে মোট উপযোগিতা লাভ হয়, তাহাই তাহার প্রবর্ত্তনের শেষ সীমা। এই সীমার পর মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে, তাহার মূল্যের সহিত তাহার একটা বিরুদ্ধানুপাত সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। বিনিময়ে মধ্যবর্ত্তিতা করা ভিন্ন মুদ্রার অন্য কোন ব্যবহার না থাকিলে, তাহার ও দায়শূন্য পত্র-মুদ্রার (Inconvertible paper money-র) সহিত তাহার মূল্যের বিরুদ্ধানুপাত সম্বন্ধ (Inverse ratio) থাকা, সাব্যস্ত হইয়া পরিমাণবাদ সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়।

এই সীমার বাহিরে মুদ্রার প্রবর্ত্তন হইয়া পড়িলে, সমাজের কর্ত্তব্য কি, তাহা বিশেষ চিন্তনীয়। লোকে একবার মুদ্রার ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে, তাহার পরিমাণ সঙ্কোচ করিয়া পুনরায় সাক্ষাৎ বিনিময় প্রথা গ্রহণ করা স্বাভাবিক নহে। মুদ্রা এমনই বস্তু যে, একবার উহার ব্যবহারের ফলে সাক্ষাৎ বিনিময়-প্রথা উঠিয়া গেল, পুনরায় সেই প্রথার প্রবর্ত্তন করা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং আমরা যে মুদ্রার সহিত তাহার সমতার কথা বলিলাম, সেই সমতা অতিক্রান্ত হইয়া পড়া একান্ত অস্বাভাবিক নহে। যদি এমন অবস্থা হয়, তবে সমাজের ক্ষতি হইতে পারে। তবে দৈবাৎ সেইরূপ হইয়া পড়িলে, সমাজের পক্ষে সেই ক্ষতি বহন করা বরং শ্রেয়ঃ, তথাপি মুদ্রা উঠাইয়া দিতে যে ক্ষতি, তাহা বহন করা সঙ্গত নহে। এই ক্ষতি দুই ভাবে উঠিয়া যাইতে পারে। ধারের বিনিময়-ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দিয়া এই বর্দ্ধিত মুদ্রার শেষোপযোগিতার (marginal utility-র) সহিত সমীকরণ করিয়া লইলে, সেই ক্ষতি নিবারিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ার ফলে পণ্য-দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে, উৎপত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার সহায়তা করিয়া সে ক্ষতি নিবারিত হইয়া আসিবে। তবে এ কথাও বলা আবশ্যক, কোন অবস্থাতেই অকারণ মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য নহে। কৃত্রিম বৃদ্ধিতে সমাজের প্রভূত অকল্যাণ ঘটে। সে কথা পরে হইবে।

পণ্য-দ্রব্যের সহিত মুদ্রার সম্বন্ধ।

এই পর্য্যন্ত আমরা যে সকল কল্পিতাবস্থা ধরিয়া আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, পণ্য-সামগ্রীর মোট উপযোগিতাই প্রচলিত মুদ্রার মোট মূল্য। পণ্য-সামগ্রীর উপযোগিতা তাহাদের পরিমাণ-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে আসিয়া থাকে। কিন্তু সেই কমির সহিত তাহাদের অন্তিম বা শেষোপযোগিতার (marginal utility-র) কোন নির্দ্দিষ্ট অনুপাত নাই। তাহাদের উপযোগিতা কোন স্থির অনুপাতে হ্রাস হইয়া আসে না। কোন দ্রব্যের পরিমাণ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিলে, তাহার পূর্ব্ব পরিমাণের অন্তিম যোগ্যতা যে এক্ষণে অর্দ্ধেক কমিয়া আসিবে, এইরূপ কল্পনা করিবার কোন কারণ নাই। তাহাদের মধ্যে এইরূপ কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই; কেবল কমিয়া আসিবে এই মাত্র বলা যায়। পণ্যের পরিমাণ সমান থাকিলে, তাহার মোট উপযোগিতার কথনই ইতর-বিশেষ হয় না। তখন মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ করিলে, তাহার ব্যষ্টি মাত্রার উপযোগিতা অর্দ্ধেক কমিয়া আসিবে; কেন না, আমাদের কল্পিতাবস্থায় মুদ্রার আর কোন ব্যবহারিক শক্তি নাই। এই অবস্থায় তাহার পরিমাণ সহ মূল্যের বিরুদ্ধানুপাত সম্বন্ধ ধার্য্য হয়। কিন্তু মুদ্রার পরিমাণ স্থির রাখিয়া পণ্যের পরিমাণ দ্বিগুণ করিলে, সে সম্বন্ধ রক্ষিত হওয়ার কোন হেতু দেখা যায় না। সে কথা পরে হইবে। মুদ্রার অন্য কোন ব্যবহার না থাকিলে, একমাত্র পণ্য-দ্রব্য স্থির থাকিলে এই সম্বন্ধ স্থাপিত হয়; সুতরাং দায়শূন্য পত্র-মুদ্রা সম্বন্ধে এই কথা খাটিতে পারে। কিন্তু তাহাও সর্ব্বাবস্থায় হয় না। এই সকল কথা পরে আরও পরিস্ফুট হইবে।

পথহারা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পাড়ার ও স্কুলের একটী ছেলের সহিত মারামারি করিয়া, শারীর বলের অভাবে মারার চাইতে অন্ততঃ তিনগুণ মার খাইয়া, রক্তমাখা কাপড়ে বিমল বাড়ী আসিয়া দিদিমার কাছে আছড়াইয়া পড়িতেই, তিনি সর্পদষ্টের মত আঁৎকাইয়া উঠিলেন, "ওমা, আমি কোথায় যাবো মা,—আমার ছেলের এ দশা কে কর্‌লে গা?"

বিমল রুদ্যমান কণ্ঠে সকল কথা জানাইলে, তিনি তখন তারস্বরে গর্জ্জিয়া উঠিয়া ঘোষণা করিলেন, "বল্ তো,—সে হতভাগার মুখে নুড়ো জ্বেলে দিয়ে চিতেয় শুইয়ে আসি।" এবং যেন 'রণং দেহি, রণং দেহি' বলিতে-বলিতেই ঊর্দ্ধশ্বাসে আততায়ীর উদ্দেশে ছুটিলেন। বিমল পরাজয়ের লজ্জা মাথায় লইয়া, কোন মতেই আর বিজয়ী অশ্বিনীর সম্মুখীন হইতে রাজী হইল না। অগত্যা, একাই তিনি অশ্বিনী ও সেই অকাল-কুষ্মাণ্ডকে যে গর্ভে ধরিয়াছিল, সেই সুপুত্রবতী তাহার জননী—এই দুজনকারই আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া রণজয়ী হইয়াই বিলম্বে বাড়ী ফিরিলেন। এ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য তাঁহার অপেক্ষা এতদঞ্চলে অপর কাহারই বা আছে যে, তাঁহাকে জিনিবে? তিনি, ডাল ভাঙ্গিতে হইলে, উহার গায়ে তো কোপ বসান না, একেবারে মূল ধরিয়া কর্ত্তন করেন।

অমৃত আসিয়া ইন্দ্রাণীকে বলিল, "মুখ শুকিয়ে বসে থাক্‌লে আর কি হবে দিদি? আমার পিসিমাটি দেখছি তোমার ছেলেটীর পরকাল একেবারে ঝরঝরে করে দিচ্চেন। এখনও তুমি ওকে রক্ষার উপায় করো!"

এই স্বল্প-পরিচিতের প্রতি ইন্দ্রাণীর অসহায় চিত্ত ক্রমশঃই যেন কৃতজ্ঞ শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিতেছিল। আজ যখন নিজের ব্যর্থ কর্ত্তব্যের গুরুভারে তাহার হৃদয়ে পাষাণ-ভার চাপিয়া উঠিয়াছিল,—স্বর্গীয় স্বামীর ভবিষ্যদ্‌বাণী দুই কর্ণ-পটহ বিদীর্ণপ্রায় করিয়া দিয়া, করুণ তানে বাজিয়া চলিয়াছিল,—'ওকে ওর শনিছাড়া করো ইন্দু,—না হলে, এর পরে বড় পস্তাতে হবে।' —হায়, ইন্দ্রাণী তখন নিজের সুনামটাকেই যে সবচেয়ে বড় মনে করিয়াছিল! আর আজ! সেই সুনামটাই তাহার কোথায় থাকিতেছে? কেন সে তখন নিজের দুর্ব্বলতাকে জোর করিয়া তাড়াইয়া, তাহার সবল-চিত্ত স্বামীর হস্তেই এর সম্পূর্ণ প্রতীকার-ভার ফেলিয়া দেয় নাই? নিরুপায় ভাবে বলিল "আমি ত কোন উপায়ই দেখি নে দাদা!"

অমৃত এই বিশ্বস্ত সম্বোধনে প্রীত হইয়া বলিল, "উপায় বার করো। বুদ্ধিমতী তুমি, অমন করে হাল ছেড়ে দিলে হবে কেন? ওকে শনি-ছাড়া করতে হবে—সে তুমি বুঝতে পারছো না কি?"

ইন্দ্রাণী বেত্রাহতার ন্যায় সর্ব্বশরীরে চম্‌কাইয়া উঠিয়া ব্যাকুল, আর্ত্ত চোখে চাহিল,—"কর্‌বার পথ দেখিয়ে দিন, কর্‌বো;—তাই কর্‌বো এবার। সেবার আমিই পারিনি,—আমারই পাপে ও আজ নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।"

অমৃত পথ দেখাইয়া দিল। সে অনেক উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিল যে, ওই উচ্ছৃঙ্খল প্রশ্রয়দাত্রীর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া, কিছুদিন কোন হিতৈষী ব্যক্তির সাহচর্য্যে রাখিয়া দিলে, এখনও বয়সে বালক বিমলেন্দুর এই দুর্দান্ত ভাবটা দূর হইয়া, পড়াশুনায় যত্ন আসিতে পারে। কিন্তু ইহার নিকটে থাকিলে, এই মাইনর স্কুলের চৌকাঠ পার হওয়াই তাহার পক্ষে কঠিন।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়, কার কাছে ওকে রাখা যায়, বলুন তো?"

অমৃত কহিল, "তোমার চেয়ে হিতৈষী ওর আর তো কারুকেই আমি দেখি নে। তুমি যদি ওকে নিয়ে তোমার বাপের বাড়ী চলে যাও, তা'হলে তো—"

ইন্দ্রাণী কহিল, "তা'হলেও তো ওর পড়া হবে না। সেখানেও এই মিড্‌ল প্রাইমারী ছাড়া অন্য স্কুল তো নেই। তা' ছাড়া—"

অমৃত চিন্তিত মুখে বাধা দিল "হ্যাঁ, তা' জানি। 'তা' ছাড়া' —এটা করা একটু বেশী শক্ত, এই না? তবে এক কাজ

করো দিদি! তোমার তো তেমন অবস্থা খারাপ নয়; ওর জন্য একজন গার্জেন-টিউটার নিযুক্ত করে, ওকে কল্‌কাতায় একটা বাসা করে রেখে দাও। এখানে এইবার যদি ক্লাসে উঠতে পারে, আর তো পড়া হবেই না। কেমন? এ হলে সুবিধা হয় না? আর পিসিমাকেও সহজে রাজী করা যায়।"

ইন্দ্রাণীর চিন্তাম্লান মুখ একটুখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কৃতজ্ঞ নেত্রে চাহিয়া সে ত্বরিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "এ খুব ভাল হবে!" তারপর আবার একটুখানি ভাবিতে লাগিল, "কিন্তু তেমন উপযুক্ত লোক পাওয়া যাবে কোথায়?"

অমৃত হাসিয়া কহিল, "ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব দিদি? লোক যথেষ্ট পাওয়া যাবে। এখন তোমরা প্রস্তুত হও।"

ইন্দ্রাণী আবার দ্বিধায় পড়িল, "মার মত যে কি করে পাওয়া যাবে! উনিও হয় ত যেতে চাইবেন; আর ওঁকে ফেলেই বা আমি কেমন করে—"

অমৃত অসহিষ্ণু হাস্যের সহিত কহিল, "ঐ দেখ! তোমার ঐ যে ভালমানুষী, ঐতেই তুমি মাটি হতে, আর মাটি করতে বসেছ। আমার পিসিমার মত করানোর ভার আমার রৈলো,—তুমি ছোট পিসেমশাইকে আসতে চিঠি লেখো। তাঁর পরামর্শ তো আগে চাই। যদি ছেলেটাকে বাঁচাতে চাও, তা'হলে আর ইতস্ততঃ করে সময় নষ্ট করো না।"

রামদয়ালের অসম্মতির কোন কারণই ছিল না। তিনি আসয়া সানন্দেই স্বীকৃতি দান করিলেন। যেটা সবচেয়ে কঠিন ছিল, সেই কাজটা, মঙ্গলাদেবীর সম্মতি আদায়ের ভারটা অমৃত নিজের ঘাড়ে না লইলে, অবশ্য অপর কাহারও ঘাড়ে দুইটা মাথা ছিল না যে, এমন কথাটা তাঁহার কর্ণগোচরও করিতে সাহসী হয়।

মঙ্গলা এই দুঃসংবাদ পাইয়াই, প্রথমতঃ খুব এক-চোট চীৎকার শব্দে কাঁদিলেন। তারপর ক্রোধ-অভিমানে অধীরা হইয়া, ভাইপোকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এ যে দেখ্‌ছি, আমি খাল কেটে কুমীর ডেকে আনলুম! অ্যাঁ! তুই-ও শেষে ঐ চাঁদমুখ দেখে গড়িয়ে পড়ে, ওই পায়েরই চুটকি হয়ে বাজতে লাগলি অমত্ত? এটাই কি তোর ধর্ম্ম হলো, হাঁ রে?"

অমৃত দুই কাণে আঙ্গুল গুঁজিয়া, জিভ কাটিয়া বলিল, "রামচন্দ্র! তুমি কি যে বলো পিসিমা,—তোমার মুখের যদি এতটুকু আটক আছে! আচ্ছা, এই কথা যে তুমি বল্‌চো,—তা, এখানে ঐ বাজে ইস্কুলে ফেলে ওর আখেরটা তুমি মাটী করচো, এইটেই বা তোমার কি ভালবাসা, তাই বলো তো একটা মাষ্টার পর্য্যন্ত ছেলের জন্য রাখা হয় নি। সঙ্গী জুটেছে একটা পুঁটকে মেয়ে,—সেইটে নিয়ে তো উন্মত্ত, পড়ে কখন? সে সব কিছু দেখ?"

মঙ্গলার মনটা অনেকখানি নরম হইয়া আসিল; এবং এই প্রিয় প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায়, অতিশয় হৃষ্টচিত্তে ঝঙ্কার করিয়া উঠিলেন "দেখ্, তোরাই দেখ্, দশে-ধম্মে দেখ! আমি কি আর সাধ করেই রেগে মরি? না ওই মিট্‌মিটে ডাইনীর, আর সেই বুড়ো ঘুঘুর বাপের শ্রাদ্ধ শুধুশুধুই করতে ইচ্ছে হয়? যাতে ছেলেটা মানুষ না হয়ে অমানুষ হয়ে থাকে, ওরা তাই তো চায় রে! তা না হলে বলে কি না, 'মাষ্টার রেখে কি হবে,—ওর ওই সামান্য পড়া, ও আমার ইন্দু পড়াবে।' মেয়েমানুষ যে আবার ইস্কুলের পড়া পড়াতে জানে, এ তো বাপু আমার বাপের জন্মে কোথাও দেখিনি।"

অমৃত মৃদু হাসিয়া সংক্ষেপে বলিল, "ও সব চাল্!"

মঙ্গলা কহিলেন, "আহা, তাই বল্, তাই বল্ বাবা! হাজার হোক, তোর তো একটা রক্তের টান আছে। তুই যেমন ওর ভাল খুঁজবি, সে কি আর ওরা পারবে। তা, যাতে ওর ভাল হয়, তাই কর না গোপাল আমার! চল্, তোতে-আমাতে ওকে নিয়ে কল্‌কাতা যাই।"

অমৃত কহিল, "তাই বলো পিসিমা। তবে একটা কথা,—এখানের সংসারটাকেও তুমি যদি হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে চলে যাও, তা'হলে এটাও সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে;—ফিরে এসে আর এর মধ্যে তখন ঢোকাই তোমার পক্ষে শক্ত হবে। আপাততঃ ওই থাক্,—তুমি কায়েমী ভাবে এটার কিছু ব্যবস্থা করে তখন ওখানে যাবে, কি বলো?"

মঙ্গলার এ প্রস্তাবটা খুব মনঃপূত না হইলেও, অর্দ্ধ-সম্মতি প্রদান করিয়া বলিলেন, "দেখি।" অমৃত ইন্দ্রাণীকে গিয়া বলিল, "আর তা হলে দেরি না। এইবার চট্‌পট্ বেরিয়ে পড়ো দিদি,—কখন আবার কি হয়। তবে গার্জ্জেন-টিউটার এক্ষণি পাওয়া—তা সে কল্‌কাতায় গেলেই পাওয়া যাবে।"

বাধা দিয়া ইন্দ্রাণী কহিল, "তার তো কিছু দরকার নাই। আমি বাবাকেও বলেছি—তাঁরও মত আছে,—আপনিই ওর গার্জ্জেন-টিউটার হবেন।"

অমৃত সাশ্চর্য্যে চক্ষু বিস্তৃত করিয়া চাহিল। তার পর দ্রুত মাথা নাড়িয়া, আপত্তি প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ও দিদি! না—না, সে কোনমতে হবে না। আমি তোমাদের অন্য লোক জোগাড় করে দোব। আমার চাইতে দুহাজার গুণে যোগ্য লোক তোমরা পেতে পারবে।"

ইন্দ্রাণী উহার মুখে সেই অনিচ্ছুক ভীতি-লেখা পাঠ করিয়া, প্রীতি-মুগ্ধ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "আমরা আপনার চাইতে অত ভালকে চাইনে—আপনাকেই চাই। আপনি এ ভার না নিলে হবে না দাদা,—আপনাকে আমার এ অনুরোধটি রাখতেই হবে। 'না' বল্লেও আমি ছাড়চি নে। আর 'না' বল্‌বেনই বা আপনি কি বলে? আমাদের আর আছে কে?"

নিতান্তই বিপন্ন ভাবে বিষণ্ণ মুখে অমৃত ঘন-ঘন নিজের গুম্ফ মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল, "তাই তো, তাই তো বোন,—এ যে তুমি আমায় বিষম মুস্কিলে ফেল্লে। আমি কি এ দায়িত্ব বইবার উপযুক্ত? আমি কি ঠিক করে পারবো? দেখ, এ বড় কঠিন কাজ! ছেলেখেলার ব্যাপার নয়। যদি আমার হাতে ওর ভাল না হয়ে, কোন রকমে মন্দ হয়ে যায়,—তখন কি তুমি আমায় অল্প-বুদ্ধি বলে ক্ষমা করতে পারবে, না আমি নিজেই নিজেকে মাপ করতে পারবো দিদি? কাজ কি? বিশেষ সংসারে যখন যোগ্য লোকের অভাব নেই।"

এই ছেলেটীর ব্যবহারে, ইহার নির্লোভ প্রকৃতিতে, ইন্দ্রাণী উত্তরোত্তরই মোহিত হইতেছিল। সে মুক্তকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, "তোমার চেয়ে যোগ্য কারুকে আমি তো কখন দেখি নি দাদা!"

অমৃত তৎক্ষণাৎ নত হইয়া দুই হাতে ইন্দ্রাণীর দুই পা চাপিয়া ধরিয়া, তাহার উপর মাথা রাখিল; ভক্তি-গদ্‌গদ্‌ স্বরে সে কহিতে লাগিল, "ইন্দু দিদি! এই জন্যই আমাদের পক্ষে তোমাদের এতখানি দরকার! এই যে তুমি আজ আমার উপর এত বড় বিশ্বাস দেখালে, এইতেই যে কাঠ-খড়ের মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। এর প্রভাব কি কম! নাঃ, আমিই এ ভার নেবো,—আর তোমার এই পায়ের ধূলোর সাহায্যে সে ভার বইবার সম্পূর্ণ যোগ্য হবো।" এই বলিয়াই সেই নবীন ভক্ত, অপরিসীম ভক্তির উচ্ছ্বাসে সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া, পুনঃপুনই ইন্দ্রাণীর পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

আকস্মিক এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়া, ইন্দ্রাণী প্রথমটায় উহার কার্য্যে বাধা দিতে পারে নাই। যখন বিস্ময়াবেগ প্রশমিত হইয়া আসিল,—ত্রস্তে সরিয়া বসিয়া, সে দুই হাতে উহার প্রসারিত হাত ধরিয়া বাধা দিল, "করেন কি! আপনি আমার সম্মানিত ব্যক্তি, এমন ক'রে—" বলিতে-বলিতেই, কিসের একটু শব্দে মুখ তুলিতেই, দেখিতে পাইল, যে, কালো অন্ধকার মুখে মঙ্গলাদেবী দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন—সরিয়া যাইতেছেন। অমৃত পিছন ফিরিয়াছিল, তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিমলেন্দুকে লইয়া অমৃত কলিকাতায় চলিয়া গেল। সমস্ত উদ্যোগ হইয়াও শেষ মুহূর্ত্তে ইন্দ্রাণীর যাওয়া হইল না। রামদয়াল উপস্থিত ছিলেন,—বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি! কেন মা?"

ইন্দ্রাণী জবাব দিল, "ইচ্ছে হচ্চে না বাবা।"

অমৃত খবর পাইয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল, "বিলক্ষণ! যাবে না কি? তুমি না গেলে, কার ভরসায় আমি তোমার ছেলে নিয়ে যাবো, বলো তো? নাও, ওঠো—ওঠো,—সে হবে না। তোমারই জন্যে আমি এই কঠিন কার্য্যে সম্মত হয়েছি। আর এখন তুমি আমায় অগাধজলে ঠেলে দিয়ে নিজে বুঝি সরে পালাচ্চো! কি স্নেহময়ী দিদিটি গো আমার!"

ইন্দ্রাণীর দুই ইন্দীবর নেত্র করুণার বাষ্প-জলে টলটল করিয়া উঠিল। কোন মতে সে নিজের পতনোন্মুখ অশ্রু সম্বরণ করিয়া রাখিয়া, সলিলার্দ্র হাসি হাসিয়া, স্নেহ-স্বরে উহাকে সান্ত্বনা দিবার ইচ্ছায় বলিল,—"সেই থেকে এ বাড়ীর বাইরে যাইনি, আর বুঝি কখন পার্ব্বোও না। আমার এই সুখটুকু থাকতে দিন না দাদা! না হয় ছোট বোনের জন্য এই কষ্ট স্বীকার আপনিই সবটুকু করলেন। পার্ব্বেন না?"

সেই হাসি ও সেই মিনতি 'না' বলিবার পথ রাখে না। একান্ত ক্ষুণ্ণ ও নিরুদ্যম চিত্তে অগত্যা অমৃত একা বিমলের সঙ্গী হইতে সম্মত হইল। তবে এই আশাটুকু প্রদর্শন করিয়া গেল, যে ভবিষ্যতে একদিন ইন্দ্রাণীকে তাহাদের শ্রীহীন সংসারের বিশৃঙ্খলা ঘুচাইতে যাইতেই হইবে। সে না গিয়া কোনমতেই স্থির থাকিতে পারিবেন না, যখন দেখিবে যে সমুচিত খাওয়ার অভাবে তাহার ছেলের ও এই অসহায় ভাইটির গলার হাড় বাহির হইয়াছে। ইন্দ্রাণীও ঈষৎ হাসিয়া

তাহার কথায় অর্দ্ধ-সম্মতির ভাবে, "সে তখন দেখা যাবে,— আমার ভাইটি অমন অক্ষমই বা হবেন কেন?" এই বলিয়া কাটাইয়া দিল। কলিকাতা গমনোপলক্ষে বিমলেন্দুর আনন্দ এবং উৎসাহের অন্ত ছিল না; কিন্তু, যখন হইতে সে শুনিয়াছে যে, তারার যাওয়া হইবে না, তখন হইতেই তাহার অর্দ্ধেকটা আনন্দ ফুরাইয়া গিয়াছে। তারাকে গিয়া বলিল, "দেখ্ বোনটি! তুই খুব কাঁদ, তাহলে মা তোকে আমার সঙ্গে যেতে দেবে।"

তারা ইতিপূর্ব্বেই কাঁদিতেছিল, এই কথায় কান্না তাহার বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সে রুদ্ধমান কণ্ঠে কহিল, "কাঁদলেও মা যাবেন না।" বলিয়া অধিকতর আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিমলের নিজেরও কান্না পাইতেছিল। কিন্তু ক্রোধ আসিয়া তাহাকে পরাস্ত করিয়া ফেলিল। সে বিরক্ত হইয়া বলিল, "আ মলো! খুকির মত প্যানপ্যান করিস কেন? চল্ না, মাকে গিয়ে খুব-মতে জ্বালাতন করচি।"

তারা চোখ মুছিতে-মুছিতে মাথা নাড়িয়া বলিল, "মার মনে দুঃখ হবে যে ভাই!"

বিমল দুই চোখ পাকাইয়া বলিল, "হলো তো বড় বয়েই গেল। মা কি তোর দুঃখ, আমার দুঃখ দেখচে যে, আমরাও দেখবো? না যাস থাক গে যা। যেতে পাবি না তুই ই। আমার কি?"

তারা আবার কাঁদিয়া ফেলিল; কহিল, "মাকে আমি বলেছিলুম। মা বল্লেন, তাঁর যাবার উপায় নেই। আবার কি করে বলব আমি?"

বিমল নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অভিমানে কহিল, "তা হলে তোর আমার সঙ্গে যাবার ইচ্ছেই নেই,—সেইটেই হচ্ছে আসল কথা! বেশ, তবে থাক্।"

কিন্তু এ অভিমান সে বেশীক্ষণ রাখিতে পারিল না। আবার ক্ষণেক পরে ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন সেইখানে উঁকি মারিতে গিয়া নজর পড়িল যে, যেমন ছিল ঠিক তেমনি ভাবে বসিয়াই তখন পর্য্যন্ত তারা নিঃশব্দে কাঁদিতেছে, অমনি তাহার অপরিমেয় স্নেহের উৎস প্রবল বেগে উৎসারিত হইয়া উঠিল। ছুটিয়া আসিয়া ইন্দ্রাণীর পিঠে পড়িয়া ডাকিল "মা!"

ইন্দ্রাণীর চোখে হুস্ করিয়া খানিকটা গরম জল উথ্-লাইয়া উঠিতে গেল; কষ্টে আত্মদমন করিয়া ইন্দ্রাণী উত্তর দিল, "বিনু!"

বিমল কহিল, "মা, তুমি কেন যাবে না? বোনটি না গেলে কে আমায় খাবার দেবে? কে আমার বিছানা করবে? কে আমার সঙ্গে খেলা করবে? কাকে আমি পড়াবো?"

ইন্দ্রাণী আঁচলে চোখ মুছিয়া অপরাধ-কুণ্ঠিত স্বরে কষ্টে কহিল, "ও এর পরে যাবে বিনু,—এ বারটি তুমি তোমার মামার সঙ্গে যাও।"

বিমল কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিতে লাগিল, "বোনটিকে না নিয়ে গেলে, আমি যে গিয়ে থাকতেই পারবো না। আমার যে কিছু ভালই লাগবে না। কেন ও যাবে না বলো তো? হাঁ, নিশ্চয় যাবে। আমি নিয়ে যাবো।" বলিতে-বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

ইন্দ্রাণী আবার চোখ মুছিল। তারা কেন যাইবে না? সে কেন যাইবে না? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তো তাহার সাধ্যায়ত্ত নহে, তাই দিতে পারিল না। কেন যাইবে না? এ যে বড় বিস্ময়েরই কথা! এই সেদিন পর্য্যন্ত যে মাতুল-সম্পর্কীয় ব্যক্তি এ পরিবারের নিকট সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয়ের ন্যায় অপরিচিতই ছিল, আজ সম্পূর্ণরূপে তাহারই হস্তে এই মাতৃপিতৃহীন অসহায় বালককে সঁপিয়া দিয়া, এই যে নিজকে নিরপেক্ষ রাখিল, এই ভিটা আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিল, স্বামীর প্রতি এই কি প্রকৃত শ্রদ্ধা! স্বামীর পুত্রাপেক্ষা তাহার ভুমি কি তৌলদণ্ডের উপর দিকে উঠিয়া পড়িল না কি? এরই নাম কি কর্ত্তব্য পালন!

ইন্দ্রাণী এ কার্য্য যে কত বড় মর্ম্মান্তিক আঘাতে আহত হইয়াই অনুমোদন করিয়াছে, সে শুধু জানেন তাহার অন্তর্যামী! পিতৃহীন বিমলের প্রতি কর্ত্তব্যে সে তাহার বৃদ্ধ পিতার সেবার ভার লয় নাই; সেই বিমলকে এমন করিয়া অনিশ্চিতের স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া, সে যে এই সুখহীন—শুধু তাই নয়, দুঃখের নিলয়ভূমি এই গৃহে বাস করিয়া রহিল, এতে কি বুক তাহার ফাটে-ফাটে হয় নাই! কিন্তু, হইলেই বা উপায় কি! অকাল-বৈধব্যের সহিত অসামান্য রূপ যৌবন যে তাহার পায়ের বেড়ি হইয়া তাহার দুই পা'কে জড়াইয়া ধরিয়া আঁটিয়া আছে! এই তাহার পক্ষে একান্ত অনাবশ্যক শুধু দুঃখেরই বোঝা বহিয়া, তাহার যে এই ঘর ব্যতীত আর কোথাও বাহির হইয়া পড়ার উপায় নাই, উপায় নাই! এদের লইয়া করে কি সে!

তাড়াইলে ইহারা যায় না। ভিতরের অহর্নিশি অগ্নিদাহে ভস্ম না হইয়া, পোড়-খাওয়া পাকা সোণার মতই দিনে-দিনে যেন সমুজ্জল হইয়া উঠিয়া, এই শুভ্র-বেশা, নিরাভরণা, সৌম্যমূর্ত্তি বিধবার চারি পার্শ্বে একটা জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত করিয়া তুলিতেছে। ইহাকে পরাভবের চেষ্টায় যতই না ইন্দ্রাণী নিজের শরীরকে কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত-উপবাসাদিতে পীড়িত করিতে চাহে,—অটুট ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালনের নিয়ম-সংযমে ততই তাহার সুপ্রচুর স্বাস্থ্যসম্পদে ভরা নীরোগ শরীর মানসিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ করিয়া দিয়াই, অনৈসর্গিক রূপ-প্রভা ধারণ করিতে থাকে। এ সমস্যার সমাধান ছিল তখনই,—যখন বিধবার সকল ঐশ্বর্য্যই তাহার সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় স্বামীর চিতায় পুড়িয়া ছাই হইত!

সেদিনকার সেই ঘটনার অনতিবিলম্বে অমৃত ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেই, ঝড়ের মত বেগে গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক, মঙ্গলা-ঠাকুরাণী এক ঝলক অগ্নি-বৃষ্টির মতই উদ্গিরণ করিলেন, "বলি হ্যাঁ গা, গায়ে খানিকটা হলদে রং আছে বলে কি, এমনি করেই চিরদিন পুরুষগুলোকে নাকে দড়ি দিয়েই টান্‌বে? জামাইকে আমার তো পায়ের তলার ছুঁচো করে রেখেই, কচ-মচিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেল্লে। আবার অনেক ভেবে-চিন্তে, কত করে, ভাইপোটা আনালুম, যে, বলি, শত্তুর-পুরীতে তো আমার দুখের মুখ চাইতে কেউ নেই,—ও যদি রক্তের টানে একটু চায়, তাই না হয় দেখি। তা বাছা, ওটাকেও যে আবার তেমনি করেই হাতে ধরে, পায়ে ধরিয়ে, নানান্ রকমে হাবভাব প্রকাশ করে, মেণি বেরালটি করে তুল্‌লে—এটা কি তোমার ধর্ম্ম হলো? এই যে তুমি সোমর্থ মাগী, একটা সোমর্থ ছোঁড়া নিয়ে না জানি কোন্ অকুলেই ভাস্‌তে চল্লে,—এর কেলেঙ্কারীতে কি আর দেশে মুখ দেখাবার পথ খুঁজে পাবো আমরা? ছি-ছি-ছি, বৌ! শুনতে পাই নাকি বেটা-ছেলের মতন লেখাপড়া শিখেছ—তাতেই কি ধর্ম্মজ্ঞানটা এমনি তোমার টন্‌টনে হয়ে উঠেছে যে, একটু হায়া-লজ্জারও ধার ধারো না?"

এই ভর্ৎসনার উত্তরে ইন্দ্রাণী একটুখানি প্রতিবাদ পর্য্যন্ত না করিয়াই, কাঠের মত কঠিন হইয়া বসিয়া থাকিল। ইহার পর হইতেই এতদিনের সমুদায় সঙ্কল্পই তাহার পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিল,—বিমলের প্রতি কর্ত্তব্যকে নিজের নারী-মর্য্যাদার চেয়ে সে নীচেই নামাইয়া দিল। নারীর আর সবই সহে,—শুধু তার নারীত্বের এতটুকু অবমাননা কোনমতেই সহ্য হয় না।

অমৃত ইন্দ্রাণীর এই মানস-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। কারণ না পাইয়া সে অকারণে তাহার প্রতি ইন্দ্রাণীর এই বিরাগকে, তাহার সেই আকস্মিক হৃদয়োচ্ছ্বাসের ফল মনে করিয়া, এবং তাহাকে ভুল করিয়া, বুদ্ধিমতী ইন্দ্রাণীর এত বড় অবিচার করার ফলে, মনে সে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ, এমন কি, একটু ক্রুদ্ধও হইল। মনে-মনে সে বলিল, হরি হে! যার জন্য চুরি করি, সেই বলে চোর! আমার তাই হলো না কি? না, এর মধ্যে আমার পিসিমার কোন কীর্ত্তি আছে?

যাই হোক, এমনি করিয়া বিমল অনন্য-সহায় হইয়া, এক-মাত্র অমৃতকে অবলম্বন করিয়া, কলিকাতায় নির্ব্বাসিত হইলে, মঙ্গলা-ঠাকুরাণীর উচ্চ ক্রন্দনে কিছুদিন পর্য্যন্ত প্রতিবেশী-বর্গ সন্ত্রস্ত হইয়া রহিল। তাড়নায়, ঝঙ্কারে ইন্দ্রাণীর অবিচলিত চিত্তকে বড় বেশি টলাইতে না পারিয়া ও ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ-দুঃখাভিভূতা ক্ষুদ্র তারা একেবারেই অস্থির হইয়া উঠিল। সে যখন বিমলের চিঠির জবাব লিখিল, তাহার মধ্যে লিখিয়া দিল, "দিদিমা আমায় সর্ব্বদাই বকেন, যেন আমার জন্যেই তুমি কল্‌কাতা গিয়েছ। তুমি নেই বলে, আমার বকুনি খেলে আরও বেশি করে কান্না পায়।"

ইহার পরেই গুড্ ফ্রাইডের ছুটি ছিল। অমৃত গৃহ-বিচ্ছেদ-ব্যাকুল-চিত্ত বিমলকে সঙ্গে লইয়া ছুটির কয় দিন যাপন করিবার জন্য ফিরিয়া আসিল। মাস-দুই কলিকাতায় থাকিয়াই বিমলের পাড়াগাঁর রোদ-পোড়া রং অনেক সাফ হইয়াছে। তাহার ঘাড়ের চুল সম্পূর্ণরূপে চাঁচা। সাম্‌নে বুলবুল্ পাখীর ঝোঁটনের মত খানিকটা চুলে সুচারুরূপে টেরি-কাটা। গায়ে তাহার এই স্বল্প শীতে আদ্দির চুড়িদার ও পরণে ম্যাঞ্চেষ্টারে তৈরি চক্‌চকে কালাপেড়ে মিহি ধুতি। ছেলে এবং তাহার বেশভূষা দেখিয়া মঙ্গলা খুসী হইয়া, অমৃতকে শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আশীর্ব্বাদ করিয়া, প্রচার করিতে লাগিলেন যে, যথার্থ রক্তের টান—সে জিনিসই স্বতন্ত্র। ঢং দেখান যায়; কিন্তু তাহাতে কাজ হয় না। তারা তাহার দাদাকে একটু 'সমীহ' করিতে লাগিল। কিন্তু, দাদার এই পল্লীগ্রাম-বহির্ভূত সাজ-গোছ, আকার-প্রকার দেখিয়া সেও বিস্ময়ের সঙ্গে প্রীতও যে না হইয়াছিল তা নয়। বিশেষ যখন সম্পূর্ণরূপেই তাহার কল্পনাতীত কতকগুলি সুন্দর-

সুন্দর উপহার-বস্তু সে তাহার নিকট হইতে পাইল। শুধু একা ইন্দ্রাণীই একটা তপ্ত এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন পূর্ব্বক মৌনী হইয়া রহিল। ইহার মধ্যেই এতটা পরিবর্ত্তন তাহার চক্ষে ভাল লাগে নাই।

গোপনে-গোপনে কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লিখিয়া বেনামীতে মাসিক পত্রে প্রকাশ করা ইন্দ্রাণীর একটা প্রবল সখ ছিল। পিতা ভিন্ন এ সংবাদ অপর কেহই এত দিন জানিত না। অমৃত সেটা হঠাৎ কি করিয়া আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়া, সেই মাসের সদ্য-প্রকাশিত একখানা 'তরণী' হাতে করিয়া, আসিয়া হাসি-হাসি মুখে ডাকিল, "অশ্রুদি!"

ইন্দ্রাণী নিজের ঘরের খাটে শুইয়া কি একখানা বই পড়িতেছিল,—ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া,বিস্রস্ত বেশ-বাস সম্বরণ করিয়া লইয়া, তার পর মৃদু তিরস্কারপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া, সহাস্য অনুযোগে কহিল, "এ নিষ্ফল ডিটেক্টিভী করে কি হলো আপনার?"

তাহার চক্ষের সেই বিব্রত অসন্তোষ এবং অধরের ক্ষুব্ধ বেদনা অনুভব করিয়া, অমৃতের হাসি মুখ সহসাই গম্ভীর হইয়া আসিল। কেনই যে এত সহজে এই তরুণী ব্যথিত হইয়া পড়ে, বিরক্ত হইয়া উঠে, ইহার যেন কোন হেতুই সে খুঁজিয়া পায় না। সে তো ইহাকে খুসী করিতেই চায়। ইহাকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া, ইহার হস্ত হইতেই এক দিন নিজের বিজয়-লব্ধ পুরস্কার গ্রহণ করিবে, এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাতেই সে যে ইহারই করুণা ভিক্ষা করিতে দাঁড়াইয়াছিল! হঠাৎ আজ তাহার কেমন করিয়া মনে হইয়া গেল, যে, সে যেন তাহার একান্তই দুরাশা! এই স্বল্প-ভাষিনী, অনবনত গর্ব্বের মহোচ্চ শিখরাসীনা নারীর চিত্তে বাস্তবিক তাহার প্রতি অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিবার মতও যৎসামান্য এতটুকু সহানুভূতি পর্য্যন্ত স্থান পায় নাই! সে যাহা শ্রদ্ধা-ভরে পূজার ভাবে করিতে যায়, এ তাহাকে উড়িয়া-আসা তৃণ-খণ্ডের ন্যায় অনায়াসে ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া সিংহাসনে সমাসীনা রাজ্ঞীর মতই নিজের অটুট মর্য্যাদার উচ্চাসনে অটল হইয়া থাকে। অমৃত ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, "কেন, কিছু দোষ করেছি কি?"

ইন্দ্রাণী এ কথার জবাব পর্য্যন্ত দিল না দেখিয়া, পত্রিকাখানা রাখিয়া ধীরে-ধীরে সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। বাহির হইতে গিয়া সম্মুখেই দেখিল তাহার পিসিমা; পিসিমা মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেলেন। ইন্দ্রাণীও দ্বারপথে তাঁহাকে তেমন মুখ করিয়া যাইতে দেখিল।

এক সময়ে ইন্দ্রাণীকে ডাকিয়া মঙ্গলা একটুখানি নরম সুরে বলিলেন, "দেখ বৌ, তুমি আমায় পর ভাবলেও, আমি তো আর তোমায় ঠিক তা ভাবতে পারি নে। তোমাদের ভাল-মন্দ আমাকে তুমি না বল্লেও তা দেখতে হয়। তা, আমি বলি কি যে, অমৃতর সঙ্গে তারার বিয়ে তুমি এই বোশেখ মাসেই দিয়ে ফেলো। লোকেও তা হলে আর কোন কথাই কইতে ভরসা করবে না। আর ছোঁড়াটাও যাহোক করে কূলে ফিরতে পারবে। বুঝতে পারচো তো, বেশি দিন তো কোন কথাই চাপা থাকে না, বাছা।"

ইন্দ্রাণী সহসা অগ্নিশিখার মত দীপ্ত হইয়া উঠিয়া, উর্দ্ধস্বরে ডাকিল "মা!" তার পর আকস্মিক বিস্ময়াবেগে বিমূঢ়াবৎ-স্থিত মঙ্গলার মুখের উপর উজ্জ্বল ও অকম্পিত শিখার ন্যায় দুই নেত্র তুলিয়া ধরিয়া, শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে কহিল, "অমৃতকে আমি নিজের ছোট ভাই-এর মতই বিশ্বাস করেছিলুম, ভালও বাসছিলুম। তা না হলে বিনুর সকল ভার ওর হাতে আমি কিছুতেই দিতুম না। হয় ত একদিন তারাকেও ওর হাতে দিলেও দিতে পারতুম। হয় ত ওদের বয়সের বড় বেশি তফাৎ বলে যে মন আমার কোন মতেই এতে ইচ্ছাসত্বেও সায় দিতে চাইছে না, সে মতটা বদলেও যেত। কিন্তু এই যে কথা আর এক দিনও তুমি বলেছিলে, তার চেয়েও বেশি করে আজ আবার বল্লে;—এর পর অমৃতর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই রৈলো না। এর পর আমার তারা তো নয়ই, বিনুকে পর্য্যন্ত আর আমি ওর হাতে রাখতে পারি নে। আর তুমিই বা রাখতে দেবে কি করে, যাকে অত ছোট, অতই নীচ বলে মনে করচো?"

উত্তরের অপেক্ষা মাত্র না করিয়াই ইন্দ্রাণী চলিয়া গেল। নিজের ঘরে ঢুকিয়া দ্বারে খিল লাগাইয়া দিল। তার পর স্বামীর তৈলচিত্রের সামনে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কখন যা করে নাই—তেমন করিয়া আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মনে-মনে সেই পরলোক-নিবাসীর নিকট এই আবেদনই সে করিয়া কাতর প্রাণে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, 'আমায় কি তোমার কাছে তুমি মনে করলে নিয়ে যেতে পারো না?'

(ক্রমশঃ)

বিবিধ-প্রসঙ্গ

লৌহ-খনি

[শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

"লৌহ-কাহিনী" (১) প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম "বর্ম্মে-বর্ম্মে কোলাকুলি" ও "খড়্গে-খড়্গে ভীম পরিচয়" "শত্রুর নিমন্ত্রণ" ভারতের যুদ্ধক্ষেত্রে যে কত শত-সহস্রবার হইয়া গিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই; এবং সে সকল বর্ম্ম, খড়্গ, শাণিতাস্ত্র যে ভারতের লৌহে ভারতেই প্রস্তুত হইত, ইহাও নিঃসন্দেহ।

বাস্তবিক লৌহের ন্যায় প্রয়োজনীয় ধাতব পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই। ভূধর-সলিলে-গহনে সর্ব্বত্র ইহার প্রভাব; রাজা-প্রজা, যোদ্ধা বোদ্ধা সকলের নিকটই ইহার আদর; ধনী-দরিদ্র, সন্ন্যাসী-গৃহস্থ সকলের সহিত ইহার পরিচয়। ইংরাজ কবি বলিয়াছেন—

"Gold is for the mistress—silver for the maid,
Copper for the craftsman, cunning at his trade,
"Good". Said the Baron, sitting in his hall
"But iron—cold iron—is master of them all". (২)

লৌহপ্রস্তর বা খনিজ লৌহ (Iron ore)—

প্রথমেই লৌহকে তাহার স্বরূপে পাওয়া যায় না। নানা প্রকারে রূপান্তরিত হইয়া ক্রমশঃ ইহা নিজ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। শৈশবাবস্থায় ইহার বাস নানা ভাবে ধরিত্রীগর্ভে বা পাহাড়-গাত্রে। তখন তাহার Stone age—পাষাণ-যুগ। আকৃতিতেও তখন উহা কেবলমাত্র প্রস্তর। ঐ প্রস্তরের নাম লৌহ-প্রস্তর বা Iron ore। ভূতত্ত্ববিৎ সন্ধান করিয়া তাহাকে টানিয়া বাহির করেন এবং তাহার মাতৃগর্ভ-সংলগ্ন অর্থাৎ খনি-সংলগ্ন কারখানাতে বড়-বড় পাথরগুলিকে ভাঙ্গিয়া অপেক্ষাকৃত ছোট করিয়া গাড়ী বোঝাই দিয়া লৌহ-কারখানায় পাঠান। তখন তাহার middle age বা মধ্যযুগ। পরে অন্যান্য দ্রব্যাদির সঙ্গে মিশিয়া ঐ সব পাথর Blast Furnaceএ লৌহাবস্থা প্রাপ্ত হয় ও Steel Furnaceএ ইস্পাতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং তখন তাহার পূর্ণ লৌহ-যুগ; অর্থাৎ—Iron age।

যে কোন প্রস্তর হইতে কিছু আর লৌহ-নিষ্কাশন সম্ভবপর নহে। এজন্য চাই লৌহ-প্রস্তর, অর্থাৎ যে সব প্রস্তরে লৌহের ভাগ যথেষ্ট। সাধারণতঃ লৌহ-প্রস্তর যেখানে পাওয়া যায়, সেখানে প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়। এইরূপ সমষ্টির নাম খনি। এখন কিরূপ প্রস্তরকে আমরা লৌহ-প্রস্তর বলিব? লৌহ যাহার মধ্যে আছে তাহাই লৌহ-প্রস্তর—এরূপ উত্তর ঠিক নহে; কারণ লৌহের ভাগ সামান্য হইলে নিষ্কাশনাদির জন্য কারখানা ইত্যাদি সাজ-সরঞ্জামের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নহে। অবশ্য এমন অনেক প্রস্তর আছে, যাহার লৌহভাগের অল্পতা হেতু, তাহাকে এখনই লৌহ-প্রস্তর নামে অভিহিত করিতে পারি না; কিন্তু দূর ভবিষ্যতে হয় ত তাহাই লৌহ-প্রস্তরের স্থান অধিকার করিবে। সুতরাং মোটামুটী দাঁড়াইতেছে এই যে, যে সকল প্রস্তর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যথেষ্ট পরিমাণে লৌহ নিষ্কাশনের উপযোগী, তাহাকেই সাধারণতঃ লৌহ প্রস্তর বলা যায়। কোন একটী খনির প্রস্তরে লৌহের ভাগ হয় ত অত্যন্ত অল্প; এবং সেই প্রস্তর হইতে কারখানাতে লৌহ নিষ্কাশনের পর দেখা গেল যে, যে পরিমাণে লৌহ প্রস্তুত হইল, তাহার বাজার-দর অপেক্ষা নিষ্কাশনের ব্যয় অনেক অধিক। ব্যবসায়ের দিক দিয়া দেখিলে এইরূপ প্রস্তরকে লৌহ-প্রস্তর বলা যাইতে পারে না।

যদি কোন প্রস্তরে ২% সোণা পাওয়া যায়, তাহা হইলে উহা অতি উৎকৃষ্ট স্বর্ণ-প্রস্তর বলিয়া পরিগণিত হইবে। কোন প্রস্তরে ঐ পরিমাণ তাম্র থাকিলে, তাহা কার্য্য ও ব্যবসায়োপযোগী বলিয়া গৃহীত হইবে। কিন্তু লৌহের ঐরূপ পরিমাণ-বিশিষ্ট প্রস্তর কার্য্য ও ব্যবসায়োপযোগী নহে; কারণ ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণ-বিশিষ্ট লৌহ-প্রস্তর উপস্থিত যথেষ্ট পাওয়া যায়; এবং সে ক্ষেত্রে এই অল্প পরিমাণ লৌহ-বিশিষ্ট প্রস্তর হইতে লৌহ-নিষ্কাশন করিতে হইলে, উহার নিষ্কাশন-ব্যয় এত অধিক হইবে যে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে না। কিন্তু অধিক পরিমাণ লৌহ-বিশিষ্ট সমস্ত প্রস্তররাশি নিঃশেষিত হইয়া গেলে ঐগুলিই তখন কার্য্যোপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

লৌহ-প্রস্তরের অপর নাম খনিজ লৌহ। কার্য্যোপযোগী লৌহ-প্রস্তরে সাধারণতঃ অন্যূন ২৫% লৌহ দেখিতে পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট খনিজ লৌহ বিশ্লেষণ করিলে, শতকরা ৬০|৬৫ ভাগ বা কখন-কখন আরও অধিক পরিমাণে লৌহ পাওয়া যায়। (৩)

Ore কাহাকে বলে—এসম্বন্ধে মার্কিন লৌহবিদ্ পণ্ডিত Edwin (Eckel)এর (৪) অভিমতও অনেকাংশে উক্ত রূপ। তিনি তাঁহার Iron ores নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এইরূপ—"An ore is a mineral; or association of minerals from which a metal can be profitably extracted under existing technical conditions.

(Chap. IV).

---

(১) ভারতবর্ষ—কার্ত্তিক—১৩২৬।

(২) Rewards and Fairies.

(৩) Encyclopædia Britannica.

(৪) Iron ores—By Edwin C. Eckel, Assoc: Am. Soc: C. E., Fellow Geol: Soc: Am: 1st Ed.

এই সকল প্রস্তরে (ore) এক বা একাধিক খনিজ পদার্থ বিদ্যমান থাকিতে পারে। লৌহ-খনিতে সাধারণতঃ প্রধান খনিজদ্রব্য লৌহ। এই সকল প্রস্তরে ধাতুর সমাবেশ এরূপ হইবে যাহাতে তাহার ব্যবসায়োযোগী নিষ্কাশন সহজসাধ্য হয়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলিতেছেন ১০% Iron oxide মিশ্রিত খানিকটা কাদা মাটী উৎকৃষ্ট Iron ore বলিয়া সহজেই পরিগণিত হইবে ; কিন্তু ২০% কিম্বা ৩০% Iron silicate-বিশিষ্ট প্রস্তররাশি, নিষ্কাশন বিষয়ে সকল প্রকার সুবিধা অসুবিধার বিষয় পর্য্যালোচনার পর, ব্যবসায়ের পক্ষে ore বলিয়া মোটেই গৃহীত হইবে না। তবে অনুমান, খনিবিদ্যার অধিকতর প্রসারণ ও জ্ঞান বৃদ্ধি, নিষ্কাশন প্রণালীর উন্নতি, অধিক পরিমাণ লৌহ-বিশিষ্ট oreএর হ্রাস এবং লৌহের প্রয়োজন ও ব্যবহারের অতিরিক্ত বৃদ্ধি হেতু, কালে ore শব্দের ব্যবহার-ক্ষেত্রও যথেষ্ট প্রসারিত হইবে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাঁহার মতে—It will be convenient and sufficiently accurate to define an ore deposit as a mass of ore, or ore bearing material large enough to be considered commercially workable, and whose grade, either without or after concentration, will repay handling. (Chap IV).

খনিজ লৌহ বা লৌহ-প্রস্তরে কেবল যে লৌহই বর্ত্তমান তাহা নহে ; ইহাতে নানা প্রকার ভেজালও যথেষ্ট আছে ; এবং কার্য্যক্ষেত্রে সেগুলি অনেক সময় বিবেচনার বিষয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সর্ব্বদাই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় ; এবং কতকগুলি স্থানবিশেষে পাওয়া যায় বা যায় না ; অথবা খুব অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। যে পরিমাণেই হউক ইহাদের অবস্থান মাত্রই বিবেচনার বিষয়। প্রস্তরে লৌহের ভাগ অধিক থাকিলেও তাহাতে যদি Sulphur এবং Titanium অল্লাধিক পরিমাণেও থাকে, তাহা হইলে লৌহ নিষ্কাশন সুকঠিন হইয়া উঠে। ভেজালের উদাহরণ স্বরূপ আমরা যে কোন প্রকার খনিজ লৌহ লইতে পারি। উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট যে প্রকারই হউক না কেন, সাধারণতঃ ইহাতে moisture, silica এবং aluminaর অস্তিত্ব যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কোন-কোন প্রকার খনিজ লৌহে combined water carbon dioxide, organic matter or lime প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ; এবং সকল প্রকার oreএই অল্লাধিক পরিমাণে Sulphur, Phosphorus, manganese, titanium, magnesia, potash ও soda বর্ত্তমান থাকে। কোন-কোন oreএ copper, chromium and nickelও পাওয়া যায়। এই সব ভেজালগুলি তাহাদের জাতি হিসাবে বিভক্ত করিলে, আমরা এইরূপ একটী তালিকা পাইতে পারি। তালিকাটী সঠিক না হইলেও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উপযোগী ; যথা—

Metallic—Manganese, Titanium, Chromium, Nickel, Copper.

Alkaline—Lime, Magnesia, Potash, Soda.

Acid—Silica, Alumina.

Volatile—Water, Carbon dioxide, organic matter.

Special—Phosphorus, Sulphur.

লৌহের প্রচার

কবে কোথায় কি ভাবে কাহার দ্বারা লৌহের প্রথম প্রচলন আরম্ভ হয়, তাহা আলোচনার বিষয়। বিষয়টী জটিল এবং মতভেদও অনেক। সুলেখক Lovat Fraser তাঁহার Iron & Steel in India (৫) নামক পুস্তকে বলিতেছেন যে, প্রাচ্যেই প্রথম লৌহের প্রচলন আরম্ভ। এবং তিনি চীনকে এ বিষয়ে অগ্রণী স্থির করিতেছেন। তাঁহার মতে চীন হইতে ক্রমে উহা ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করে। তবে তিনি এ কথাও স্বীকার করেন,—লৌহবিদ্ অপরাপর অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন—যে ভারতবর্ষ এক সময়ে এ বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

দিল্লীর কুতব-মিনারের নিকটস্থ লৌহ-স্তম্ভ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, আজ পর্য্যন্ত লৌহবিদ্‌গণ স্থির করিতে পারেন নাই যে, কিরূপে এরূপ প্রকাণ্ড স্তম্ভ প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে প্রস্তুত হইয়াছিল। আজ লৌহ প্রস্তুত হইলে কাল বা দুদিন পরে তাহাতে মরিচা লাগে ; এবং দীর্ঘকাল শীত, আতপ, বর্ষায় ফেলিয়া রাখিলে, তাহা একেবারে অব্যবহার্য্য হইয়া যায়। কিন্তু দিল্লীর এই লৌহ-স্তম্ভ যুগ-যুগ ধরিয়া সহস্র-সহস্র শীত, আতপ, বর্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ; কিন্তু কোথাও এতটুকু মরিচা ধরে নাই। তিনি বাস্তবিকই বলিয়াছেন যে ইহার নির্ম্মাণ-প্রণালী মিশরের পিরামিড্ অপেক্ষাও বিস্ময়কর।

অনেকে বলেন, কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে ভারতবাসীদের সেরূপ আগ্রহ ছিল না, এবং এই কারণেই লৌহের ব্যবহার জানা থাকিলেও,সে বিষয়ে তাহারা বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। রক্ষণশীল ভারতবাসী কোনও পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী নহে। পুরাতন প্রথার পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন প্রথায় হাত দিতে তাহারা নারাজ। মহাবীর সেকেন্দরের ভারত আক্রমণ-কালে, তাহারা যে প্রণালীতে লৌহ প্রস্তুত করিত, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের যুগেও তাহারা তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটায় নাই।

শিখদের অবনতির সঙ্গে-সঙ্গে ভারতে লৌহ-বিদ্যার অবনতি আরম্ভ হয়। কিন্তু কল-কারখানা ব্যতিরেকেও যোদ্ধ্‌গণের বিশাল বর্ম্ম যে তাহারা কিরূপ সহজে নির্ম্মাণ করিত, তাহা অনেকেই জানেন। Damascus bladeএর জন্য মাল-মসলা যে এইখানেই সংগৃহীত হইত, তাহা পরলোকগত সৈয়দ আলী বিলগ্রামী প্রমুখ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন।

ইহার পর আবু পাহাড় ও ধর নামক স্থানের লৌহ-স্তম্ভ দুইটী বিস্ময়ের সামগ্রী। কোনারকের বালুকাগর্ভে প্রাপ্ত বৃহৎ-বৃহৎ কড়িগুলি

(৫) Iron & Steel in India by Lovat Fraser—Foreward.

বিস্ময়ের মাত্রা বাড়াইয়া দেয়। রামায়ণ মহাভারতে লৌহ-কথা বহু স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে লৌহ ভীম লৌহ-শিল্পের এক অপরূপ কীর্ত্তি। বৈদিক যুগে যে ভারতে লৌহের সহিত লোক বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিল, অধ্যাপক নিয়োগী মহাশয় তাহা যথেষ্ট পারদর্শিতা সহকারে আলোচনা করিয়াছেন (৬)। পরে এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত

[অধ্যাপক শ্রীহেমচন্দ্র রায় এম-এ]

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত একখানি প্রাচীন মহাকাব্য। দুঃখের বিষয়, এ দেশের পণ্ডিত-সমাজে এই গ্রন্থের পঠন-পাঠন প্রচলিত নাই। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, এই গ্রন্থের অখণ্ডিত বিশুদ্ধ আদর্শ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। ই, বি, কাউএল্‌ সাহেবের সম্পাদিত সংস্করণই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। ঐ পুস্তক নেপালের আদর্শ অবলম্বনে মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের প্রথম সর্গের প্রথমাংশ অন্যের রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করার বিশিষ্ট হেতু আছে। চতুর্দ্দশ সর্গের শেষ-ভাগ হইতে সপ্তদশ সর্গ পর্য্যন্ত অমৃতানন্দ নামক লেখক-বিশেষের সংযোজনা ; এ সম্বন্ধে গ্রন্থশেষে উক্ত লেখকেরই স্বীকারোক্তি আছে। পরন্ত, ঐ অংশ অতি জঘন্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত। ছন্দোদোষ ও ব্যাকরণদোষ ঐ অংশে খুব বেশী পরিমাণে লক্ষিত হয়। এইরূপে আদ্যন্ত খণ্ডিত মূল গ্রন্থের রচনা হৃদয়গ্রাহিণী হইলেও, উহার অনেক স্থল অস্পষ্ট এবং প্রকৃত পাঠের বিকৃত অবস্থার পরিচায়ক। সম্পাদক যত্নের ত্রুটি না করিলেও, অনেক স্থলেই যে মূল গ্রন্থের পাঠ উদ্ধার করিতে পারেন নাই, তাহাতে কোন সংশয় নাই। এইরূপে যথা-লব্ধ গ্রন্থের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলেও, নানা কারণে এই প্রাচীন গ্রন্থখানি সুধিগণের আলোচ্য। ভগবান্ বুদ্ধের জীবন অবলম্বনে এই প্রাচীন সংস্কৃত মহাকাব্য রচিত। ভাবে এবং ভাষায় মহাকবি বাল্মীকির ও কালিদাসের কাব্যের ছায়া এই কাব্যের অনেক স্থলেই লক্ষিত হয়। এই কাব্যে অঙ্গীশান্তরস, অঙ্গভাবে অন্যান্য রসের অবতারণাও আছে। কাব্যামোদী, ঐতিহাসিক, দার্শনিক সকলেই এই কাব্যের আলোচনায় আনন্দ লাভ করিতে পারেন।

মহাকবি অশ্বঘোষ কনিষ্কের সমসাময়িক ; অতএব খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর কবি বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাকবি কালিদাসের কালনির্ণয় করিতে যাইয়া অনেক শিক্ষিত সুপণ্ডিত, স্থানে-স্থানে অশ্বঘোষের কাব্যের সহিত কালিদাসের কাব্যের তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। কেহ বা কালিদাসকে অশ্বঘোষের পূর্ব্ববর্ত্তী কেহ বা পরবর্ত্তী বলেন। উভয়ের রচনার আলোচনায় নিঃসংশয় প্রতীতি হয় যে, তাঁহাদের একজন অবশ্যই অন্যের অনুকরণ করিয়াছেন। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মধ্যে কালিদাসের সময় কেহ-বা খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দী, কেহ-বা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী, কেহ-বা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী বলিয়া থাকেন। সকলেই অনুকূল যুক্তি দ্বারা নিজ-নিজ মতের সমর্থনে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন। ইহার ফলে, ভারতের অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের কাল এখনও সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হয় নাই। যাঁহারা কালিদাসকে খৃষ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী বলেন, বলা বাহুল্য, তাঁহাদের মতে অশ্বঘোষই কালিদাসের অনুকরণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, যাঁহারা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে কালিদাসের কাল-নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের মতে কালিদাসই অশ্বঘোষের অনুবর্ত্তী। কাউএল্‌ সাহেব তাঁহার সম্পাদিত বুদ্ধ-চরিতের ভূমিকায় অশ্বঘোষ ও কালিদাসের ভাবের সমতা অনেক স্থলে দেখাইয়া দিয়াছেন। অশ্বঘোষ সম্বন্ধে তিনি বলেন,—He was the Buddhist Ennius who gave the first inspiration to the Hindu Virgil অর্থাৎ তাঁহার মতে অশ্বঘোষই কালিদাসের কবিত্ব-প্রতিভার প্রবর্ত্তক। কুমার দর্শনে পুরনারীগণের ব্যাকুলতার বর্ণনা বুদ্ধ-চরিতের তৃতীয় সর্গে ১৩-২৩ শ্লোকে যে ভাবে আছে, উহার সহিত রঘুবংশের সপ্তম সর্গের ৫-১২ শ্লোক ও কুমারের সপ্তম সর্গের অনুরূপ শ্লোক অনেকেই তুলনা করিয়া থাকেন। ঐ অংশে একজন যে অন্যের অনুগামী, তাহা সকলেরই বোধগম্য হয়। কে কাহার অনুসরণ করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে মত-ভেদের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

অশ্বঘোষের ভাষা কালিদাসের ভাষার ন্যায় মধুর ও সুমার্জ্জিত নহে ; তথাপি উহা সরল ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে ভূষিত। কালিদাসের কাব্যের মত বুদ্ধ-চরিত কাব্য প্রায়শঃই অলঙ্কারচ্ছটায় মণ্ডিত নহে। কেবল ভাষার দিকে লক্ষ্য করিলে বুদ্ধচরিতের ভাষাই বেশী প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ভাষা ও ভাব অনেক স্থলেই রামায়ণের ন্যায় প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। যথা :—

> নাবজানামি বিষয়ান্ জানে লোকং তদাত্মকম্।
> অনিত্যং তু জগন্মত্বা নাত্র মে রমতে মনঃ॥
> জরা ব্যাধিশ্চ মৃত্যুশ্চ যদি ন স্যাদিদং ত্রয়ম্।
> মমাপি হি মনোজ্ঞেষু বিষয়েষু রতির্ভবেৎ॥ ৪র্থ সর্গ, ৮৫, ৮৬।
> অশুচিবিকৃতশ্চ জীবলোকে বণিতানাময়মীদৃশঃ স্বভাবঃ।
> বসনাভরণৈস্তু বঞ্চ্যমানঃ পুরুষঃ স্ত্রীবিষয়েষু রাগমেতি॥ ৫ম সর্গ, ৬৪।
> কো জনস্য ফলস্থস্য ন স্যাদভিমুখো জনঃ।
> জনীভবতি ভূয়িষ্ঠং স্বজনোঽপি বিপর্য্যয়ে॥
> কুলার্থং ধার্য্যতে পুত্রঃ পোষার্থং সেব্যতে পিতা।
> আশয়াচ্ছ্লিষ্যতি জগন্নাস্তি নিষ্কারণা স্বতা॥ ৬ষ্ঠ সর্গ, ৯, ১০।
> ত্যজ নরবর শোকমেহি ধৈর্য্যং কুধৃতিরিবার্হসি ধীর নাশ্রু মোক্তুম্।
> স্রজমিব মৃদিতমপাস্য লক্ষ্মীং ভুবি বহবো হি নৃপা বনান্যভীয়ুঃ॥
> ৮ম সর্গ, ৮৩।

---

(৬) অধ্যাপক ডাক্তার পঞ্চানন নিয়োগী M. A., P. R. S., Ph. D., F. C. S.—Iron in ancient India.

সমুদ্রবস্ত্রামপি গামবাপ্য পারং জিগীষন্তি মহার্ণবস্য।
লোকস্য কামৈর্নবিতৃপ্তিরস্তি পতদ্ভিরম্ভোভিরিবার্ণবস্য॥

১১শ সর্গ, ১২।

এইরূপ অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। করুণরসের অবতারণাতেও অশ্বঘোষ সিদ্ধহস্ত। বুদ্ধ-চরিতের অষ্টম সর্গে এই শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কুমারকে বনে রাখিয়া সাশ্রুনেত্রে ছন্দক প্রত্যাবৃত্ত হইলে, তাহার প্রতি যশোধরার করুণগর্ভ কটূক্তি বড়ই স্বাভাবিক। যথা—

অনার্য্যমস্নিগ্ধমমিত্রকর্ম্ম মে নৃশংস কৃত্বা কিমিহাদ্য রোদিষি।
নিযচ্ছ বাষ্পং তব তুষ্টমানসো ন সংবদত্যশ্রু চ তচ্চ কর্ম্ম তে॥
বরং মনুষ্যস্য বিচক্ষণো রিপুর্ন মিত্রমপ্রাজ্ঞমযোগপেশলম্।
সুহৃদ্ব্রুবেণ হ্যবিপশ্চিতা ত্বয়া কৃতঃ কুলস্যাস্য মহাননুগ্রহঃ॥

যশোধরার বিলাপও বড়ই হৃদয়স্পর্শী, যথা—

অভাগিনী যন্নহমায়তেক্ষণং শুচিস্মিতং ভর্ত্তুরুদীক্ষিতুং মুখম্।
ন মন্দভাগ্যোঽর্হতি রাহুলোঽপ্যয়ং কদাচিদঙ্কে পরিবর্ত্তিতুং পিতুঃ॥

যে কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত হইল, উহাতেই অশ্বঘোষের রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। ফলতঃ, বুদ্ধ-চরিতে কাব্য-সৌন্দর্য্যের অসদ্ভাব নাই। কাব্যের দ্বাদশ সর্গ দার্শনিক আলোচনায় কিছু জটিল; অন্যান্য অংশে দর্শনও যথাসম্ভব প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে।

কবিত্ব ও রচনা-শক্তিতে মহাকবি কালিদাস অশ্বঘোষ অপেক্ষা দ্বিগুণে গরীয়ান্। কেবল ভাষার তুলনার দ্বারা কবিদের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয়ও নিঃসন্দেহ হয় না। অতএব, অন্য বলবৎ প্রমাণ পাইলে, অশ্বঘোষের কাব্যকে কালিদাসের কাব্যের অনুকরণ মনে করা যাইতে পারে। সুপণ্ডিত সারদারঞ্জন রায় মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত শকুন্তলার ভূমিকায় অশ্বঘোষকে কালিদাসের পরবর্ত্তী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বুদ্ধ-চরিতের প্রথম সর্গের প্রথমাংশ হইতে

"ভূভৃৎ পরার্দ্ধোঽপি সপক্ষ এব প্রবৃত্তদানোঽপি মদানুপেতঃ"

এই অংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, ঐরূপ শ্লেষ-গর্ভ রচনা উত্তরকালে প্রচলিত হইয়াছে, কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে ঐরূপ রচনা সম্ভাবিত হয় না। আমরাও এ ক্ষেত্রে ঐরূপ মনে করি। কিন্তু বুদ্ধ-চরিতের ঐ অংশ অশ্বঘোষের রচিত নহে। কাউএল্ সাহেব স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, প্রথম সর্গের প্রথম ২৪ শ্লোকের অনুরূপ কিছুই তিব্বতীয় প্রাচীন ভাষার অনুবাদে দেখা যায় না। ঐ অংশে বুদ্ধ-চরিতের মূল অংশের ন্যায় ভাষার স্বচ্ছন্দ গতিও দেখিতে পাই না। আধুনিক কবির কবিত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা ঐ অংশে বিলক্ষণ ফুটীকৃত হইয়াছে। সুতরাং ঐ অংশ দশকুমার-চরিতের পূর্ব্বপীঠিকার ন্যায় অন্যের সংযোজিত বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। প্রথম সর্গের প্রথম শ্লোকে যে মিল দেখা যায়, তাহাও পরবর্ত্তী কালের যোজনার ফলে ঘটিয়াছে। ঐ অংশের দ্বারা অশ্বঘোষের আপেক্ষিক অর্ব্বাচীনত্ব প্রতিপন্ন হয় না।

কালিদাস কখন-কখনও আমন্ত ভাগের সহিত আম চকার প্রভৃতি অনুপ্রয়োগের ব্যবধান রাখিয়া ক্রিয়াপদ প্রয়োগ করেন। যথা—'তং পাতয়াম্প্রথম মাস পপাত পশ্চাৎ' 'প্রভ্রংশয়াং যো নহুষঞ্চকার' 'সংযোজয়াং বিধিবদাস সমেত বন্ধুঃ' অশ্বঘোষও ঐরূপ 'সংবর্দ্ধয়ামাত্মজবদ্বভূব' লিখিয়াছেন। ইন্দ্রধ্বজের সঙ্গে উপমা উভয়ের কাব্যেই আছে। কে কাহার অনুকরণ করিয়াছেন বলা যায় না। অনুকরণের প্রবৃত্তি উভয়েরই আছে,—প্রাচীন কবি বাল্মীকি ব্যাস ও ভাসের নিকট উভয়েই ঋণী। অশ্বঘোষের একটি শ্লোক "কাষ্ঠং হি মথ্নন্ লভতে হুতাশং ভূমিং খনন্ বিন্দতি চাপি তোয়ম্। নির্বন্ধিনঃ কিঞ্চন নাস্ত্যসাধ্যং ন্যায়েন যুক্তঞ্চ কৃতঞ্চ সর্ব্বম্॥" ১৩।৬০। ভাস কবির প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণের "কাষ্ঠাদগ্নির্জায়তে মথ্যমানাদ্ ভূমিস্তোয়ং খন্যমানা দদাতি। সোৎসাহানং নাস্ত্যসাধ্যং নরাণাং মার্গারব্ধাঃ সর্ব্বযত্নাঃ ফলন্তি॥"। এই শ্লোকের স্পষ্ট অনুকৃতি। এখানে বলা আবশ্যক, কালিদাস কেবল পূর্ব্ব কবির ছায়া লইয়াই লিখেন, এমন স্পষ্ট অনুকরণ করেন না। এ সম্বন্ধে কাব্য-মীমাংসায় রাজশেখর লিখিয়াছেন,—

"নাস্ত্যচৌরঃ কবিজনো নাস্ত্যচৌরো বণিগ্জনঃ।
স নন্দতি বিনা বাচ্যং যো জানাতি নিগূহিতুম্॥"

এইবার আমরা বুদ্ধ-চরিতের মার-বিজয়ের দুইটি স্থলের আলোচনা করিব। ত্রয়োদশ সর্গের ষোড়শ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে অশ্বঘোষ লিখিয়াছেন "শৈলেন্দ্রপুত্রীং প্রতি যেনবিদ্ধো দেবোঽপি শম্ভুশ্চলিতো বভূব"। এই অংশ দেখিয়া মনে হয়, অশ্বঘোষ অবশ্যই কালিদাসের কুমারসম্ভব দেখিয়া থাকিবেন। পার্ব্বতীর উদ্দেশ্যে মহাদেবকে মদনের বাণবিদ্ধ করার কোন স্পষ্ট উল্লেখ রামায়ণ বা মহাভারতে দেখি নাই। রামায়ণের একস্থলে মদন মহাদেবের চিত্তবিকৃতি সংঘটন করায় মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া হুঙ্কারে তাহাকে ভস্মসাৎ করেন, এই যে সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান আছে, তাহাকেই পল্লবিত করিয়া কালিদাস কুমারসম্ভবে অপূর্ব্ব মদন দাহের অবতারণা করিয়াছেন। শিবপুরাণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ। উহা কুমারসম্ভবের মূল বলিয়া গ্রহণ করা যায় না—এইরূপ সিদ্ধান্ত সুধী-সমাজে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। যদিও ঐ সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদি-সম্মত নহে, তথাপি শিবপুরাণ কুমারসম্ভবের মূল হইলে কুমারে কালিদাসের নিজস্ব অতি অল্পই থাকে; পরন্তু তিনি অনেক শ্লোক পর্য্যন্ত পুরাণ হইতে অপহরণ করিয়াছেন, এইরূপ অযশোভাগী হইয়া পড়েন। পুরাণের প্রতি অত্যধিক ভক্তি না থাকিলে ঐ ভাবে কেহ কালিদাসের কৃতিত্বের অপলাপ করিতে পারেন না। বুদ্ধ-চরিতের আর একটি স্থল—

"কশ্চিত্ততো রৌদ্রবিবৃত্তদৃষ্টিস্তস্মৈ গদামুদ্যময়াঞ্চকার।
স্তম্ভস্ত বাহুঃ সগদস্ততোঽস্য পুরন্দরস্যেব পুরা সবজ্রঃ॥ ১৩।৩৭

এই শ্লোকের চতুর্থ পাদ দেখিয়া মনে হয় কবি অবশ্যই রঘুবংশের দ্বিতীয় সর্গের 'জড়ীকৃতস্ত্র্যম্বকবীক্ষণেন বজ্রং মুমুক্ষন্নিব বজ্রপাণিঃ' এই অংশ দেখিয়া ঐ উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন। মহাভারতীয় দ্রোণ পর্ব্বের যে সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান অবলম্বনে ঐ উপমা বুঝিতে হইবে, কালিদাসই প্রথমে 'ত্র্যম্বকবীক্ষণেন' এই পদের দ্বারা তাহাতে

আলোক-সম্পাত করিয়াছেন। অশ্বঘোষের 'পুরন্দরস্যেব পুরা সবজ্রঃ' এইটুকু পড়িয়া মহাভারতের সেই অপ্রসিদ্ধ উপাখ্যান সাধারণ 'পাঠকের মনে' পড়িতে পারে না। আমাদের মনে হয়, কালিদাস প্রথমে ঐ উপাখ্যানকে উপমার দ্বারা সুপরিচিত করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই, অশ্বঘোষ স্বকাব্যে ঐরূপ সংক্ষিপ্ত নির্দেশ পর্য্যাপ্ত মনে করিয়া থাকিবেন। আশা করি, অতঃপর সুধীসমাজ অশ্বঘোষ ও কালিদাসের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয়ে আমাদের এই কথাগুলিও বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

জীবিকার্জ্জনোপযোগী শিক্ষা

[অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-টি]

কোন দেশে নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইলে, তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য—সেই দেশের প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থা, সভ্যতা ও রীতি-নীতি; সেই দেশের আধুনিক সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা; এবং বিভিন্ন সভ্য দেশের প্রচলিত বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা। আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা যে ফলোপধায়ক হয় নাই, বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি যে দেশের কাহারও আস্থা বা বিশ্বাস নাই, তাহার কারণ, আমরা উক্ত তিনটী বিষয়ই বরাবর অবহেলা করিয়া আসিতেছি। আত্মত্যাগ ও আত্মসংযম যে দেশের প্রাচীন শিক্ষার মূল ভিত্তি ছিল, ভোগ-স্পৃহা ও স্বার্থ-সিদ্ধি সেই দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। ভারতের ধর্ম্মগত ও নীতিমূলক শিক্ষার আদর্শ বিস্মৃত হইয়া আমরা শুধু কেরাণী-প্রস্তুতকারী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়াছি। সমাজের আর্থিক অবস্থার দিকেও আমরা লক্ষ্য রাখি নাই। যে দেশের অধিকাংশ লোক অর্থাভাবে অর্দ্ধাহারে দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক ও ক্ষীণদেহ হইয়া পড়িতেছে, সেই দেশে অর্থাগমের উপযোগী শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা না করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার বোঝা চাপাইয়া আমরা লোকদিগকে দিন-দিন অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিতেছি। তার পর বিভিন্ন সভ্য দেশের শিক্ষার ইতিহাসও আমরা ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখি নাই। পাশ্চাত্যদেশের অনুকরণে আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা গঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহারা নিত্য নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে কিরূপ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে, সে বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করি নাই। ষাট বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা যাহা ছিল, এখনও প্রায় তাহাই রহিয়া গিয়াছে। আর জাপান এই ষাট বৎসরের মধ্যে তাহার ক্রমোন্নতিশীল শিক্ষা-গুণে জগতের অন্যান্য সভ্যজাতির সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। ইয়োরোপীয় অন্যান্য জাতির এবং আমেরিকার ত কথাই নাই। সময়ের ও সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষারও যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহা আমাদের যেন ধারণারই অতীত। তাই যে সকল শিক্ষা-প্রণালী ঐ সকল দেশে অনেক দিন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাদের নাম পর্য্যন্ত হয় ত এখনও আমরা শুনি নাই। অবশ্য, এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, অনেক বিদেশীয় পণ্ডিত তাঁহাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রবর্ত্তনের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের বিদ্যাবত্তার ও সদভিপ্রায়ের প্রশংসা করিলেও, তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীর প্রশংসা করা যায় না। এ দেশের সামাজিক অবস্থা ও প্রাচীন রীতি-নীতির সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকায়, তাঁহারা অনেক সময়ে অনেক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অনেক সময় তাঁহারা তাহাদের দেশের শিক্ষা-প্রণালী এ দেশে অবিকল নকল করিতে যাইয়া, উদ্দেশ্য-সাধনে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। বিদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা এ দেশের উপযোগী করিয়া গ্রহণ করিতে না পারিলে, তাহা হইতে সুফলের আশা করা যায় না। সুতরাং এ বিষয়ে সন্তোষকর কার্য্য ও অভীপ্সিত ফল শুধু তাঁহাদের নিকট হইতেই আশা করা যায়, যাঁহারা দেশের প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষা ও দেশের আধুনিক সর্ব্ব প্রকার অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ, এবং বিদেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন।

জাপানের শিক্ষোন্নতির মূলে এই সত্যটি নিহিত আছে। তাহাদের শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অনেক বিষয়ে তাহারা আমেরিকার অনুকরণ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা সর্ব্বদা সেগুলি নিজের দেশের রীতি-নীতি ও অবস্থার অনুকূল ও উপযোগী করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। সেগুলি অবিকল নকল করিতে যাইয়া তাহারা ভ্রমে পতিত হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, সে দেশের শিক্ষা-নিয়ামক সেই দেশেরই লোক। আমেরিকার কোনও শিক্ষা-ব্যবস্থা তাহাদের দেশে প্রবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে তাহারা, সেই দেশে যাইয়া সেই দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছে। পরে তাহাদের নিজ দেশের অবস্থা ও লোকের স্বভাব প্রকৃতির বিষয় ধীর-স্থির ভাবে আলোচনা করিয়া, এবং প্রয়োজনানুসারে সেই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সাধন করিয়া, তাহারা নিজ দেশের উপযোগী করিয়া উহা গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা-বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারিগণ অধিকাংশই বিদেশীয় বলিয়া, তাঁহাদের সদভিপ্রায় ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও, তাঁহারা এ দেশের প্রকৃত অবস্থা এবং এ দেশের প্রাচীন রীতি-নীতি সুন্দর ভাবে অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পান নাই। তাই তাঁহারা এ দেশের প্রকৃত অভাব বুঝিয়া, এ দেশের লোকের রুচি ও প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে অনেক সময়ে সমর্থ হন নাই।

আমরা তাঁহাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করিতে পারি; কিন্তু শিক্ষা-সংস্কার বিষয়ে দেশবাসীর উদাসীনতা অমার্জ্জনীয়। রাজা রামমোহন রায় বিদ্যাসাগর ও ভূদেব-প্রমুখ মনীষিগণ শিক্ষা ক্ষেত্রে যেরূপ প্রাণপাত চেষ্টা করিয়া সময় ও অবস্থার উপযোগী শিক্ষা দেশ-মধ্যে প্রবর্ত্তন করিতে সহায়তা করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জি ভিন্ন শিক্ষা-ক্ষেত্রে আর কেহ তদ্রূপ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন কি? আমাদের দেশের অনেকেই ইয়োরোপ বা আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন; কিন্তু দেশের শিক্ষা-সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহারা স্বাধীন ভাবে

বড় কিছু ভাবেন নাই। যদি তাঁহারা স্বাধীন ভাবে শিক্ষা-বিভাগের কার্য্যের সমালোচনা করিতেন, যদি তাঁহারা শিক্ষা-সমস্যার মীমাংসা-সাধনে আগ্রহ-ভরে অগ্রসর হইতেন, তবে অনেক পূর্ব্বেই এ দেশের শিক্ষাস্রোত পরিবর্ত্তিত হইত। আর যাঁহারা কখনও বিদেশে যান নাই, ইচ্ছা করিলে তাঁহারাও যে শিক্ষা-ক্ষেত্রে অপূর্ব্ব গঠন-শক্তির পরিচয় দিতে পারেন, তাহার নিদর্শন স্যার আশুতোষ। প্রকৃতপক্ষে, চাই সাধনা, চাই একাগ্রতা।

এখন আর আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদের দেশের উপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদিগকেই বাহির করিতে হইবে। বিদেশীয় শিক্ষাভিজ্ঞ লোকের দিকে তাকাইয়া থাকিলে চলিবে না। তাঁহারা আমাদের সহায়তা করিতে পারেন; কিন্তু কিরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের দেশের সম্পূর্ণ উপযোগী, তাহা আমরা দেখাইয়া না দিলে, তাঁহারা ঠিক ধরিতে পারিবেন না। অতএব, শিক্ষা-ক্ষেত্রে বর্ত্তমান সময়ে দেশীয় ও বিদেশীয় মনীষিগণের সমবেত চেষ্টার ও কার্য্যের যেরূপ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, এরূপ আর কখনও হয় নাই। সুখের বিষয়, ভারত-শাসন সংস্কার আইন অনুসারে শিক্ষা-বিভাগ দেশীয় মন্ত্রীর হস্তে অর্পিত হইয়াছে এবং তাঁহাকে পরামর্শ প্রদানের জন্য ব্যবস্থা পরিষদের চারিজন বে-সরকারী সভ্য লইয়া একটী স্থায়ী কমিটিও গঠিত হইয়াছে। এখন দেশীয় বিদেশীয় সকলেরই প্রধান কর্ত্তব্য যে নানা ভাবে দেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার অভাব-অভিযোগ তাঁহাদের গোচর করা,...বিদেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার আলোচনা করিয়া, তাহা দেশের পক্ষে কতটা উপযোগী, সে বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করা। এইরূপে তাঁহাদিগকে সহায়তা করিতে অগ্রসর না হইলে, তাঁহাদের পক্ষে প্রকৃত পথ খুঁজিয়া বাহির করা অতি কষ্টকর হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতের মধ্যবিত্ত লোকের অন্ন-সমস্যা এত জটিল হইয়া পড়িয়াছে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীর মূল্য এত নামিয়া পড়িয়াছে যে, তাঁহারা সকলেই ব্যবসায়-গত শিক্ষার জন্য লালায়িত। অপর দিকে, দেশের দরিদ্র কৃষককুলের, শিল্পীর এবং শ্রমজীবীর অবস্থা দিন-দিনই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। তাহাদিগের মধ্যে কৃষি-শিল্প-বিষয়ক বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন না করিলে, শিল্প ও কৃষি-কার্য্যে নূতন-নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির প্রচলন না করিলে, তাহাদিগকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। আর দেশের মেরুদণ্ড যাহারা, তাহারা যদি অন্নকষ্টে ক্রমশঃ ক্ষীণ ও হীনবল হইয়া পড়ে, তবে আর দেশের মঙ্গল কোথায়? সুতরাং শীঘ্রই ব্যবসায়গত শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া, এই সকল নিরন্ন লোকের অন্নের সংস্থান করিতে হইবে। এখন দেশহিতৈষী মাত্রেই ধীর ভাবে বিবেচনা করিবেন যে, কিরূপ ব্যবসায়-গত শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের দেশের উপযোগী। এই কার্য্যে যৎসামান্য সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে আমি আজ আমেরিকা ও জাপানের ব্যবসায়-গত শিক্ষা-ব্যবস্থার একটু আভাস প্রদান করিতে অগ্রসর হইলাম।

আমেরিকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাকাল আট বৎসর। এই অষ্টবর্ষব্যাপী অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক। কাজেই, আট বৎসরের পাঠ সমাপন না করিয়া কেহই ব্যবসায়-গত বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। জাপানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল যদিও আট বৎসর, তথাপি শুধু প্রথম চারি বৎসরের পাঠ বাধ্যতা-মূলক। কাজেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম চারি বৎসরের পাঠ সমাপন করিয়াই অনেকে ব্যবসায়-গত বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে চায়; সুতরাং তাহাদের জন্য জাপানে "খ" মিতির শিল্পবিদ্যালয় (Technical School of class B) বলিয়া এক প্রকার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। উভয় দেশেই শিক্ষার্থী সাধারণতঃ ৬ষ্ঠ বর্ষের প্রারম্ভে শিক্ষা আরম্ভ করে। সুতরাং সে যখন আমেরিকায় নিম্নস্তরের ব্যবসায়-গত বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পায়, তখন তাহার বয়স চৌদ্দ বৎসর; আর জাপানে সে যখন "খ" মিতির প্রাথমিক শিল্প-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, তখন তাহার বয়স দশ বৎসর। এখন প্রশ্ন এই যে, ব্যবসায়-গত বিদ্যালয়ে প্রবেশের বয়স কত হওয়া উচিত, এবং ব্যবসায়-গত শিক্ষায় সুনিপুণতা ও অধিকার লাভ করিতে হইলে, সাধারণ শিক্ষায় কতদূর অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন? এ বিষয়ে কোন্ দেশের প্রথা অনুসরণীয় ও অবলম্বনীয়—জাপানের, না আমেরিকার?

এ কথা ঠিক যে, সাধারণ শিক্ষার ভিত্তিমূল একটু সুদৃঢ় ও সুগভীর না হইলে, ব্যবসায়-গত শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি লাভের সম্ভাবনা খুব কম। বিশেষতঃ এরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক দ্বারা সমাজের মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলের আশঙ্কাই অধিক। তাই জাপানেও বাধ্যতামূলক শিক্ষার কাল বাড়াইয়া অন্ততঃপক্ষে ছয় বৎসর করিবার চেষ্টা হইতেছে। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়। দেশের জন-সাধারণ অন্যান্য দেশের তুলনায় অতীব দরিদ্র; অথচ বিনা বেতনে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই। কাজেই, আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকের সংখ্যা যত বেশী, এরূপ আর কোনও সভ্য দেশে নাই। ইহা হইবারই কথা। দরিদ্রতা নিবন্ধন এ দেশবাসী তাহার সন্তানের শিক্ষাব্যয় সঙ্কুলন করিতে অসমর্থ। সে চায় যে, তাহার সন্তান যত শীঘ্র পারে, তাহাকে অর্থ-উপার্জ্জনে সহায়তা করুক। তাই সন্তানের বয়স দশ বৎসর হইতে না হইতেই, কৃষক তাহাকে মাঠে লইয়া যায়,—কৃষি-কার্য্যে তাহার সাহায্য না পাইলে তাহার চলে না। অন্যান্য শিল্পী ও শ্রমজীবিগণও এইরূপে তাহাদের সন্তান-দিগকে অল্প বয়সে শিল্প ও অন্যান্য শ্রমজনক কার্য্যে নিয়োগ করিয়া দেয়। তাহারা যৎকিঞ্চিৎ যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাতেই দরিদ্র শিল্পি-কুলের ও শ্রমজীবীদের সংসার পরিচালনে যথেষ্ট সাহায্য হয়। তাই সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষালাভের জন্য বেশী দিন রাখিতে ইচ্ছা থাকিলেও, আমাদের দেশের জন-সাধারণ তাহা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। আমেরিকা অতিশয় সমৃদ্ধিশালী দেশ। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। আর ভারতবর্ষ নিতান্ত দরিদ্র দেশ, তাহার উপর এখানে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যয়-সাপেক্ষ। সুতরাং

আমেরিকায় যদি আট বৎসর প্রাথমিক শিক্ষার পর, ব্যবসায়-গত শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হইয়া থাকে, তবে এ দেশে তৎপুর্ব্বেই ব্যবসায়-গত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

এখন আমেরিকার কথা ছাড়িয়া, একবার জাপানের ব্যবসায়-গত বিদ্যালয়ে প্রবেশের বয়স সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। জাপান ও ভারতবর্ষ উভয়ই এক মহাদেশের অন্তঃপাতী। জাপানের শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার সম্পর্ক যত ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত, আমেরিকার সঙ্গে তত নয়। বিশেষতঃ, জাপানের আধুনিক শিক্ষা, অনেকটা পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষার অনুকরণে, দেশের উপযোগী করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। এখন যদি আমরা জাপানের শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের দেশের উপযোগী করিয়া গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি, তবে আমাদের কাজ অনেকটা সহজ হইয়া আসিবে। জাপান গত ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে শিক্ষাগুণে আশাতীত উন্নতি লাভ করিয়াছে। কাজেই, তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থাকে অবহেলা করা যায় না। জাপানের সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারি বৎসরের পাঠ সমাপন করিয়াই বালক এক প্রকার ব্যবহারিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু যাহাকে প্রকৃত পক্ষে ব্যবহারিক বিদ্যালয় (Technical School of class 'A') বলা যায়, তাহাতে প্রবেশ করিতে হইলে শিক্ষার্থীকে সাধারণতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬ বৎসরের পাঠ সমাপন করিতে হয়। জাপানের জন-সাধারণ আমাদের দেশ হইতে অনেক উন্নত ও সমৃদ্ধ। বিশেষতঃ অনেক দিন যাবৎ তথায় প্রাথমিক ৪ বৎসরের পাঠ বাধ্যতা-মূলক ও অবৈতনিক। সুতরাং জাপানে যদি ৬ বৎসর বয়সে প্রাথমিক ব্যবহারিক শিক্ষার বন্দোবস্ত হইয়া থাকে, তবে আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ বৎসরের পাঠান্তর ব্যবহারিক শিক্ষা লাভের বন্দোবস্ত হওয়া উচিত।

ব্যবসায়-গত শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের সময় আমাদিগকে বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, এ দেশের শতকরা নব্বই জন লোক কৃষিজীবী, শ্রমজীবী বা হস্ত-শিল্পী। তাহাদের অবস্থা অতি হীন; প্রতিদিন দুই সন্ধ্যা আহারও জোটে না। তাহাদের পক্ষে সন্তানদিগকে নিজ ব্যয়ে অধিক দিন সাধারণ বিদ্যালয়ে রাখা সম্ভবপর নয়। যে পর্য্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা-মূলক ও অবৈতনিক না হইবে, সে পর্য্যন্ত সাধারণ বিদ্যালয়েও ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে কি না সন্দেহ। কিন্তু পাঁচ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে যদি তাহারা তাহাদের সম্মুখে জীবিকার্জ্জনের পথ উন্মুক্ত দেখিতে পায়, তবে তাহাতে তাহারা আকৃষ্ট হইতে পারে। তাই পাঁচ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষার অন্তেই ব্যবহারিক শিক্ষার বন্দোবস্ত হওয়া উচিত।

নিম্ন শ্রেণীর পল্লীবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশই কৃষি ও অন্যান্য শ্রমজনক কার্য্য করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। কেহ-কেহ বা কুটীর-শিল্প অবলম্বন করিয়া অন্নসংস্থান করে। আর কেহ-কেহ বা ক্ষুদ্র ব্যবসায় অর্থাৎ দোকানদারী করিয়া নিজ পরিবারের ভরণ-পোষণ করে। কৃষকগণ এখনও ভাল বীজ সংগ্রহের উপকারিতা বোঝে না; ক্ষেত্রে সার প্রদানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এখনও তাহাদের কোন জ্ঞান নাই; এখনও তাহারা বৈজ্ঞানিক কৃষি-যন্ত্রাদির ব্যবহারের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারে না। গো-জাতির রক্ষা ও উন্নতি সাধন এবং সুস্থ, সবলকায় বৎস উৎপাদন যে তাহাদের পক্ষে কত প্রয়োজনীয়, তাহারা তাহা এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। যৌথ ঋণদান-মণ্ডলী গঠন করিয়া, প্রত্যেকে প্রত্যেকের কার্য্যের দায়িত্ব লইয়া, তাহারা যে মহাজনের অতিরিক্ত সুদের হাত হইতে নিস্তার পাইতে পারে, এখনও তাহারা তাহা ঠিক ভাবে ধরিতে পারে নাই। এখনও কৃষকগণ ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে দালাল ও পাইকারগণের নিকট শস্যাদি বিক্রয় করিতে যাইয়া, আপনাদের ন্যায্য প্রাপ্তি হইতে প্রায়ই বঞ্চিত হয়। তাহারা জানে না যে, সমবায়-সমিতি গঠন করিয়া এক সঙ্গে শস্যাদি বিক্রয় করিবার, অথবা এক সঙ্গে তাহাদের প্রয়োজনীয় বীজাদি ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করিলে, তাহারা কত লাভবান্ হইতে পারে। সুতরাং, ঐ সকল বিষয়ে জ্ঞানদানের ব্যবস্থা শীঘ্রই প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে বঙ্গের কৃষককুল দিন-দিন হীনবল ও নিঃস্ব হইয়া পড়িবে। তার পর গ্রামের শিল্পিগণ এখনও তাহাদের মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতিই ব্যবহার করিতেছে। তাহারা আজও জানে না যে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির ব্যবহার করিয়া অপেক্ষাকৃত কত অল্প সময়ে ও কত অল্প পরিশ্রমে তাহারা অধিকতর দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে। তাহারা জানে না যে, সমবেত ভাবে তাহাদের শিল্পজাত দ্রব্যের উপকরণ কত সহজে ও কত অল্প-মূল্যে সংগ্রহ করিতে পারে। সুতরাং নূতন প্রণালীতে তাহাদিগকে শিল্প-শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্বন্ধেও সেই একই কথা। ব্যবসায়-বাণিজ্য-ক্ষেত্রেও লোকগণ যাহাতে দিন-দিন উন্নততর প্রণালী অবলম্বন করিয়া উন্নতি-মার্গে অগ্রসর হইতে পারে, এবং দেশের ধনবৃদ্ধির সহায়তা করিতে পারে, তাহারও বিধান করিতে হইবে। তাই জাপানের ন্যায় তিন প্রকারের 'ব্যবহারিক বিদ্যালয়' দেশের মধ্যে স্থাপন করিবার প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানের উপযোগিতা অনুসারে কোথাও বা কৃষি-বিদ্যালয়, কোথাও বা শিল্প-বিদ্যালয়, কোথাও বা বাণিজ্য-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। এখন আর সময় নষ্ট করা বিবেচনা-সিদ্ধ নয়। সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থারও একটু পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে। 'নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে' পাঁচ বৎসরের পাঠ সমাপন করিয়া বালক 'উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে' প্রবেশ করিবে। বর্ত্তমান সময়ে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত যেরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হয়, এই প্রস্তাবিত উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা তদনুরূপ হইবে। এখানে বালক তিন বৎসর অধ্যয়ন করিবে; সুতরাং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীকে সর্ব্বসমেত ৮ বৎসর অধ্যয়ন করিতে হইবে। এই আট বৎসরের শিক্ষার অন্তে আবার এক প্রকারের ব্যবহারিক বিদ্যালয় থাকিবে। তাহাদিগকে 'মধ্য ব্যবহারিক বিদ্যালয়' বলা

যাইতে পারে। এখানে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য এই তিন বিষয়েই শিক্ষা প্রদত্ত হইবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া বালক 'মধ্য বিদ্যালয়ে' প্রবেশ করিবে। এই প্রস্তাবিত মধ্য বিদ্যালয়গুলি বর্ত্তমান উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের উপরের দুইটি ক্লাশ ও বর্ত্তমান কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ ক্লাশ লইয়া গঠিত হইবে। এখানে ৪ বৎসর অধ্যয়ন করিতে হইবে। "মধ্য বিদ্যালয়ে'র অধ্যয়ন সমাপনান্তে, ইচ্ছা করিলে, শিক্ষার্থী যেন ব্যবহারিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে "উচ্চ ব্যবহারিক বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেখানেও কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হইবে। তার পর বিশ্ববিদ্যালয় বা সাধারণ কলেজের সংশ্রবে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। এইরূপে সাধারণ-শিক্ষার প্রতি স্তরের সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষার স্তর সমান্তরাল ভাবে যোজিত থাকিবে। শিক্ষার্থী তাহার আর্থিক অবস্থা ও রুচি অনুসারে সাধারণ বিদ্যালয়ে বা ব্যবহারিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে। ব্যবসায়-গত শিক্ষার এইরূপ কোনও বিধি-ব্যবস্থা না হইলে দেশের দারিদ্র্য ও অশান্তি ঘুচিবে না। জাপানেও এই নীতি অনুসৃত হইয়াছে। সেখানে সাধারণ শিক্ষাকে যেরূপ আদ্য, মধ্য, উচ্চ ও কলেজ বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, ব্যবহারিক শিক্ষাকেও তদ্রূপ আদ্য, মধ্য, উচ্চ ও কলেজ বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সাধারণ বিভাগের প্রত্যেক স্তরের শিক্ষার অন্তে শিক্ষার্থী ব্যবহারিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ পাইতেছে। এইরূপ ব্যবস্থা আমাদের দেশের পক্ষে কতটা উপযোগী, তাহা প্রণিধান-যোগ্য।

শ্রেষ্ঠ সাধু

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

বিশ্বেশ্বর-মন্দির মাঝে পড়িয়াছে কলরব,
অদ্ভুত এ কি ঘটিল আজিকে বিস্মিত করি সব!
কোথা হতে এক স্বর্ণের থালা শূন্য পবনে ভাসি—
আলোকিত করি মন্দিরখানি পড়িল সেথায় আসি।
উজল আখরে লিপি মনোহর লেখা আছে মাঝে তার,
'শ্রেষ্ঠ সাধুর শ্রীকরকমলে দিবে ইহা উপহার।'
সকলের আগে পূজারী আসিয়া পরশন করে তায়,
নিমেষের মাঝে স্বর্ণের থালা শিশা হয়ে গেল হায়!
সাধু-সজ্জন যে ছিল সেথায় পরশিল এসে তারে,
কিছু নাহি হল পরিবর্ত্তন, বিস্ময় শুধু বাড়ে।
পথে শুয়ে এক কুষ্ঠের রোগী কহিছে কাতর ভাষে,
'নিয়ে যাও মোরে করুণা করিয়া বিশ্বেশ্বরের পাশে।'
শুনি সেই স্বর জন-কয় তারে নিল মন্দিরতলে,
ভক্তির ধারা নিত্য যেথায় শিশিরের মত গলে।
কি জানি কি ভাবি পূজারী আসিয়া অদ্ভুত থালাখানি—
সকলের হেয় কুষ্ঠরোগীর করে তুলে দিল আনি।
অমনি সে থালা সোণা হয়ে পুনঃ উজ্জ্বল রূপ ধরে,
পুলকে সবার অন্তর তার চরণেতে লুটে পড়ে।
কণ্টকে ঢেকে রেখেছিলে ফুল সুন্দর শোভাময়,
আজিকে তাহার হল অভিষেক,—জয় জয় প্রভু জয়!

মেয়েদের প্রতিষ্ঠা

[শ্রীসত্যবালা দেবী]

যাহা চাহিতেছি, প্রকৃতির মধ্যে তাহার নিজস্ব ধারা নিরীক্ষণ করিয়াই চাহিতেছি। এই প্রতিষ্ঠার মধ্যে মেয়েদের একটা স্ব আছে; সে অহমিকার স্ব নহে—স্বরূপের স্ব। স্বাতন্ত্র্যের ক্ষুধায় যদি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে জীবাণু-সঞ্চার দেখ, চমকিয়ো না। সকল স্বাতন্ত্র্যই সংঘর্ষের উদ্দেশ্য বুকে লইয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠে না। এমন কি, বলা চলে, কোনও স্বাতন্ত্র্যেরই প্রথম বিকাশের মূলে সংঘর্ষের ভাব নাই। বলা চলে কেন, ঠিক ভাবে দেখিতে গেলে বলিতে হয়, সংঘর্ষ সত্যই নাই। মেয়েদের স্বাতন্ত্র্য বলিতে প্রকৃতি যে পদার্থের অভ্যুদয়ের আভাষবৎ আমার দূরদশনের বীক্ষণপটে আদরা টানিয়াছে, সে একটা সম্মিলনরূপী পরিণামের মধ্যেই নর ও নারী উভয় জাতিকে সত্যকার আপনার করিবার নিমিত্ত নবারুণোদয়-রঞ্জিত-রাগে মানবস্বভাবে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের অভ্যুদয়।

স্বাতন্ত্র্য! সত্যই কথাটাকে অকপটে লইবার উদ্যোগ করিলে, সুপ্ত সংস্কার একবার অন্ততঃ জাগিয়া উঠিয়া, চিত্তটাকে সংশয়-দোলায় আন্দোলিত করিবেই; কেন না, আজন্ম শুনিয়া আসিতেছি, 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি।' আজন্মই দেখিয়া আসিতেছি মেয়েদের পরবশ-ভাব। ইহাদের স্বাতন্ত্র্য? জিনিসটা কি? প্রত্যক্ষের উপর যতটা তত্ত্ব আছে, তাহাকে উল্‌টিয়া-পাল্টিয়া নাড়াচাড়া করিলেও বুদ্ধি একটা অশ্বডিম্ব ভিন্ন আর কিছুই বাহির করিতে পারে না। তবে জিনিসটা কি? অনুমান না কল্পনা? সত্যই শক্ত কথা। বিশেষ এখন বিজ্ঞানের যুগ। ভাবের কুহেলীর ওড়না উড়াইয়া দিয়া খানিকটা emotionএর রসোদ্রেকে বাগ্‌বৈখরী সঞ্চার করিয়া ক্ষণিক একটু প্রভাব বিস্তার করিতে পারে—একটা সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় শ্রোতৃজন-চিত্ত যেমন সহসা আবিষ্ট হইয়া উঠে! কিন্তু এ ত সে নয়। এখানে যে আমি সত্যকে পাইয়াছি। তাহাকেই দিতে চাই। এখানে তা তো চলিবে না! উত্তম! দেখা যাক্, বৈজ্ঞানিক যুক্তির অনুকরণেই কত দূর কি করা চলে!

ধরিয়া লও, তোমার বাহিরে বহির্জগতে মেয়েদের মন বলিয়া একটা ব্যাপার আছে। ধরিয়া লও, সেটা প্রাণী-রাজ্যেরই একটা Species। সে ত তাহা হইলে সাধারণ জীব দেহের মতই বাহ্য-জগতের আক্রমণে সাড়া দিবে, নড়িবে, কাঁদিবে, চঞ্চল হইবে; সঙ্গে-সঙ্গে আপনাকে সেই আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে। সকল জীবদেহের মত বাহ্য-জগতের পারিপার্শ্বিক শক্তির আঘাত ও আক্রমণ হইতে পরিত্রাণোপযোগী করিয়া আপনাকে গড়িবার স্বাভাবিক প্রেরণা তাহাতেও থাকাই চাই। তবে ধরিয়া লও, তাহারও আছে; প্রয়োজন-মত আপনাকে পরিণত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে সেও পারে। এখানে ক্রমাভিব্যক্তির কোঠা হইতে তাহাকে বাদ দিতে পার না। তাহার প্রাকৃতিক

নির্ব্বাচনের অধিকার অস্বীকার করিতে পার না। এইবার স্বাতন্ত্র্যের কথা বলিব। স্বাতন্ত্র্য যদি বলি আর কিছুই নহে—সে এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই—আর কিছুই নহে। যদি মেয়েদের জীবন-বিশিষ্ট কিছুর শ্রেণীতে গ্রহণ কর, তবে জীবন-রক্ষার অনুকূল সাড়া দিবার ক্ষমতা তাহাদের স্পষ্ট হইয়া উঠিতে দাও। নচেৎ, আমার আর কিছু বলিবার নাই। ঘরে বসিয়া সর্ব্বাগ্রে ভাবিয়ো যে, জীবে ও জড়ে অস্তিত্ব ধর্ম্মের পার্থক্য আছে। সে পার্থক্যটা কি তাহাও বুঝিয়ো। তার পর সভাস্থলে—যদি লাজ-লজ্জার মাথা খাইয়া সম্ভব হয়, চীৎকার করিয়ো—হে ভগিনিগণ, তোমরা আর পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইয়া থাকিয়ো না। মেয়েদের স্বাতন্ত্র্য বলিতে যে জিনিসটা নির্দ্দেশ করিতেছি, ভরসা করি তাহা পরিষ্কার হইল। আপন জীবনের অবদান দেশকে দিতে হইলে, জীবনটার আগে বিকশিত হইয়া উঠা প্রয়োজন। অঙ্কুরের মধ্যেই বসিয়া থাকিয়া কি গাছ ফল প্রসব করিতে পারে? সেই বিকাশের জন্যই মেয়েদের আপনার দায়িত্বে আপন স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান।

মেয়েদের মনটার কাছ হইতে যদি কিছু সৃজন, বা গঠন অথবা জীবিতের উপযুক্ত কোনও কিছুর প্রত্যাশা কর, সেটাকে জীবন-ধর্ম্মাক্রান্ত করিয়া তোল। যে কাজ জীবিতে সম্ভবে, জড় অবস্থাগত কেহই তাহা পারিবে না। জীবিতের কার্য্যভার বহন করিতে হইলে জীবন্ত হইয়া ওঠাই চাই। তাই বলি, জীবনের কাজ চাহিলে মেয়েদের মনকে জীবন্ত করিয়া তোল; জীবনের যাহা স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম—হেয়ের বর্জ্জন ও শ্রেয়ের গ্রহণ—তাহা অবলম্বন করিতে দাও। তোমার শাস্ত্র-বিহিত গৃহ-ধর্ম্মের খোঁটায় বাঁধিয়া, তোমার পরিবেশিত কর্ত্তব্যের ঘাস-জল ভক্ষণ হইতে তাহাদের অব্যাহতি দাও। ভ্রম, প্রমাদ, স্খলন, পতন প্রভৃতি লইয়া তোমার মাথাব্যথা স্থগিত রাখ। এ সকল তাহাদেরই বিধি-বিচারের এলেকাভুক্ত করিয়া দাও। তোমাদের সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে এমনটা ঘটা প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত—একেবারে অসম্ভব, সম্পূর্ণ miracle যদি স্থির হয়, তবে আমি বলি, তোমরা আর মেয়েদের উন্নত করিবার—মনুষ্যত্ব-সম্পন্ন করিবার—স্বপ্ন দেখিয়ো না। তাহাদের সুখ-দুঃখ, অজ্ঞতা-অধীনতা লইয়া এতদিন অবধি যেমন তোমাদের প্রভাবের তলায় কাঁথাচাপা পড়িয়া তাহারা ঘুমাইতেছে, তেমনি ঘুমাক—নিশ্চিন্ত নির্ভরে ঘুমাক। এই স্তম্ভিত-হৃদয়-বৃত্তি জাতির নিথর সন্তোষ (Placid content) ভাঙ্গিয়ো না। যে কাজ তাহাদের জাগরণের মুখাপেক্ষায় বিলম্বিত হইতেছে, তোমরাই না হয় প্রতিনিধি স্বরূপ করিয়া চলিলে! অথবা না হয় কয়েকটা মেয়ে তোমাদেরই কর-ধৃত অস্ত্র রূপে এই নূতন সখের রঙ্গস্থলে দিন-কতক বন্-বন্ করিয়া ঘুরিয়া লইল। তামাসা মন্দ হইবে না।

জানি, এমন দল আছেন, যাঁহারা আমার এই শেষোক্ত কথাটাকেই স্পষ্ট করিয়া বুঝিবেন; এটা তাঁহাদের যুক্তির কাছেও গ্রাহ্য হইবে। জীবিতের মত কাজ করিবার জন্য মেয়েদের মনকে জীবন্ত হইয়া উঠিতে হইবে—এত বড় নূতন কথাটা বুঝাই তাঁহাদের পক্ষে Miracle। তাঁহাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিও আমি জানি। উদাহরণ যে পড়িয়া রহিয়াছে। সদম্ভে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ সহকারে তাঁহারা দেখাইবেন—আর্য্যজাতি। দেখাইবেন—প্রাচীন ভারত। হয় ত একবার বুকটাও ঠুকিয়া লইবেন।

কিন্তু হায় রে মরীচিকাময়ী আশা! ইতিহাস আজকাল তত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত হইতে চলিয়াছে;—সেও এখন কূট প্রশ্ন, গবেষণা, বিচার, বিতর্ক, প্রমাণের মধ্য দিয়াই সত্যের স্তরে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। আর্য্যজাতির নামে খামখেয়ালীপনা আর কতদিন চলিবে,—ভরসা দিয়া কেহই বলিতে পারে না। হয় ত সে দিন ফুরাইয়া আসিল।

তাঁহারা যদি বলিতে চাহেন, পুরুষের স্ববশে রাখিয়া, তাঁহাদের যুক্তি, অনুভব ও প্রয়োজন অনুসারে মেয়েদের দ্বারা সংসারে মানবোচিত কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ স্বাভাবিক,—তবে তর্কের পরিবর্ত্তে অতৃপ্ত কৌতূহল ও অপরিসীম বিস্ময় সহকারে তাঁহাদের কথা শুনিয়া যাওয়াই আমি শ্রেয়ঃ বোধ করি। আমি যে প্রকৃতির অন্তর্লোক হইতেই নিগূঢ় রহস্যের সন্ধান পাইয়া অনিবার্য্য ভবিষ্যতের ঈষণা প্রকাশ করিতেছি। জগতে প্রচলিত মদগৃহীত কোনও একটা অভিমতের প্রতিষ্ঠা আমার লক্ষ্য নহে। আমার বিশ্বাসকে আমি আস্থা করি না, আমি লড়াইও করি না,—কেবল দিয়া যাই আমার দর্শন;—আর বসিয়া-বসিয়া দেখি,—দেখি, অহঙ্কারের অতীত দেশের শুদ্ধা প্রকৃতি অহঙ্কারকে স্থানচ্যুত করিয়া ধীরে-ধীরে ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে কিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। আমি মেয়েদের মধ্যে দেখিয়াছি শক্তিময়ী প্রকৃতি—বৈজ্ঞানিক নেত্রে জন্মাবধি মিলাইয়া-মিলাইয়া আবিষ্কার করিতেছি তাহার নিয়ম-পরম্পরা। কতকটা আয়ত্তেও আসিয়াছে।

বিজ্ঞ সামাজিক কি বলিতে চান? বলিতে চান কি যে, মেয়েদের মনটা জড়ধর্ম্মী বলিয়াই—তাঁহাদের বুদ্ধিশক্তি অদ্ভুত ইঞ্জিনীয়ারি দেখাইয়া কষ্টগম্য সংসার-শকটকে অক্লেশে চালাইয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে? অর্থাৎ প্রকৃতিকে জড়ত্বের মধ্যে পরাজয়-শৃঙ্খলে বাঁধিয়াই মানব-সভ্যতার বিজয়-বৈজয়ন্তীতলে এ ব্যাপারেও তাঁহারা জিতিতেছেন। জলে তরণী ভাসাইয়া, অনুকূল তরঙ্গের ভরসায় বায়ুতে পাল উড়াইয়া কয়জন মানব পার হইত? এখন বিদ্যা-বলে জল বাষ্পরূপে ধরা পড়িয়াছে; বিদ্যুৎ বাতাসের আজ্ঞাবহ। শুধু মানব নহে—মানবের এক-একটা জাতির অবধি সমস্ত ব্যবহারের, জীবন-যাত্রার উপকরণ পর্য্যন্ত বড়-বড় মহাসাগর পারাপার করিতেছে। যেমন করিয়া বাষ্পবেগ বিদ্যুৎ-বুদ্ধি-কৌশল-বিনির্ম্মিত যন্ত্র-তন্ত্রের কর্ম্মশালায় দাস্য করিতেছে, সংসারে নারী-প্রকৃতির শক্তিও তেমনি চিরদিন বোঝা বহিবে—আমাদের নিয়ন্ত্রিত আচারের লৌহ-বর্ম্মের উপর দিয়া ষ্টিম-এঞ্জিনের মত সংসার-শকটকে টানিয়া চলিবে। অবিশ্বাস কর, চাহিয়া দেখ আর্য্যজীবন। সেই সুখের পারিবারিক আদর্শে নারীর ব্যক্তিত্ব ছিল না। আমরাই হাতের ছাঁচে যেন পুতুল গড়িয়া তাহাতে এমন বৈশিষ্ট্য সন্নিবেশ করিয়াছিলাম যে, ঘরকে স্বর্গ করিতে তাহাদের আর যোড়া পৃথিবীতে মিলিল না। তোমরা চাহ নারীর রূপান্তর! সর্ব্বনাশ! আমাদের সেই পুতুল-গড়া ছাঁচখানি আছাড় মারিয়া ভাঙ্গা! হে নির্ব্বোধ, পাশ্চাত্যের মন্ত্রশিষ্য! আর কি তাহা হইলে সেই গৃহ-সুখ, সেই ঘরে-ঘরে স্বর্গের দৃশ্য—সে সকলের সম্ভাবনা থাকিবে?

ইহার অধিক আর তাঁহারা বলিতে পারেন না। কিন্তু এ কোন্ যুগ? সত্যই না কি তবে সীতা-সাবিত্রী প্রভৃতির মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও আপন দায়িত্ব আপনার ইচ্ছা-নির্দ্দেশে নিজ হস্তে লইবার ক্ষমতা ছিল না! তাঁহারা যেমন-যেমন গুরুজনের আদেশ পাইতেন, করিতেন মাত্র—অভিভাবক-নির্দ্দিষ্ট পথ ছাড়া আর তাঁহাদের পথ ছিল না! তাঁহাদের মন আজ-কালিকার মেয়েদের মতই কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অভ্যাস ও বৃত্তির বাহিরে পদ-প্রক্ষেপ করিত না! সেই ছাঁচের মহিমার জোরেই বিবাহের সপ্তপদীতে বিষ্ণু প্রথম পাদ হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে অর্থ, ধন কর্ম্মযজ্ঞ সৌম্য পশু ঋত্বিক ঘটাইয়া, একে-একে দাম্পত্য জীবনের সপ্তম পাদ সমাপ্তিতে গার্হস্থ্য সুখ পরিপূর্ণ করিয়া দিতেন। আজকালকার ব্রাহ্মণ-বালকের গুরুগৃহে আপঞ্চবিংশতি বর্ষাবধি অবস্থান স্থলে উপনয়ন অন্তে তিনপদ গমন ও তিন দিন অন্ধকার কক্ষে অবরোধের ন্যায়, যাহা এখনমাত্র সপ্তপদ গমনে প্রতীকে পরিণত হইয়াছে। স্বামী যে তখন বধূর সমগ্র হৃদয়-মনটীকে অন্নদানরূপ মণিতুল্য পাশে প্রাণরূপ রত্নসূত্রে ও সত্যস্বরূপ গ্রন্থি দ্বারা বন্ধন করিতেন, তিনি যে অগ্নি-সাক্ষী করিয়া সংস্কার কালে সাবেগে উচ্চারণ করিতেন—

"যদেতদ্ধৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব ॥"

"—হে দেবি, আজি হইতে তোমার ঐ হৃদয় আমার হউক, আমার এই যে হৃদয় ইহা তোমার হউক।" এ সব কি বাহ্য আড়ম্বরমাত্র ছিল? বলিতে পার, হাঁ ছিল, আজও যেমন রহিয়াছে;—কিন্তু আমার কথা, চলিল কেমন করিয়া? বন হইতে একটা মনস্তত্ত্বহীন পশুকে ধরিয়া আনিয়া, মানুষ ত একেবারে তাহাকে নাকে দড়ি দিয়া সায়েস্তা করিতে আরম্ভ করে। তাহার পক্ষে সর্ব্ব পবিত্র, সর্ব্বতোমান্য; তাঁহারই নামে জ্ঞাতি-বন্ধু-প্রতিবেশীবর্গ সমক্ষে কই মানুষ ত এমন করিয়া ভড়ং করিতে বসে না। তার পর স্ত্রী সহধর্ম্মিণী! যে মনের অপরিণতি নিবন্ধন ধর্ম্ম বুঝিতে অসমর্থা; অজ্ঞানে ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে শোচনীয় রূপে অনভিজ্ঞা; মাত্র যাহার আছে নির্জ্জীব মন, আর মাত্র শরীর, তাহাকে সঙ্গে লইয়া—অথবা সহায় করিয়া, কোন্ ধর্ম্ম-সাধন চলিতে পারে? ধর্ম্মবস্তু যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা আমার উত্তর দিন। আর সেই উত্তর শুনিয়া ধীমানে বিচার করুন, প্রাচীন ভারতে নারীর মনের স্বাতন্ত্র্য ছিল না—এ কথা সম্ভব কি অসম্ভব?

এত বিতর্কের পরও যদি আমার কথা প্রতিষ্ঠিত না হয় —ওই জেরই চলে যে, না, সে যুগে, তুমি যে ভাবে বলিতেছ, সে ভাবের স্বাতন্ত্র্য মেয়েদের মনের ছিল না; তবে কতকটা ছিল সত্য;—এঞ্জিনে গাড়ী টানা নয়, গরুতে, ঘোড়াতে গাড়ীটানা-গোছ নারী-প্রকৃতির শক্তি আমাদের সংসার-শকট সচল রাখিত। মেয়েদের মনে একটুখানি স্বাতন্ত্র্যের পক্ষী-নীড় আমরা বাঁধিয়া ছিলাম। সেখানে কাকে যেমন কোকিলের ডিমে তা দেয়, তেমন করিয়া মেয়েরা আমাদেরই সঞ্চারিত কতকগুলি ভাবকে পরিস্ফুট করিত—স্বতন্ত্র কোনও ভাবের

জন্ম দান করিতে তাহারা পারিত না। ওই যে বেদমন্ত্র রচয়িত্রীদের কথা শুনিয়াছ—ওই যে মৈত্রেয়ীর কথা শুনিয়া থাক,—ওই যে কোন্ জনক রাজার সভায় বিচার হইয়াছিল—সে এই রকমেরই স্বাতন্ত্র্য; নূতন বা অপরূপ কিছু নয়। এই রকমের স্বাতন্ত্র্যটুকুকেই অমনি সব ছন্দোবন্দে সম্মান দিয়া আমরা নিজেদের ভাব-সাধনা করিতাম,—কথনও কাহারও তুষ্টি-বিধান' করি নাই। নারীর আমরা ভর্ত্তা ছিলাম, পতি ছিলাম। কোথাও পাইয়াছ কি—ধর্ম্মশাস্ত্রে এমন কোনও শব্দ, যাহা দ্যোতনা করে তাহাদের সমকক্ষতা নিরূপক কোনও অর্থের ?" নারীর মন আমাদের চোখে জড় নহে; তবে তাহার চেতনা জাগ্রত স্তরের চেতনা নহে। আমাদের পুরুষদের অপেক্ষা নিম্নস্তরের চেতনা।

এমনি তকরারে আমার প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া যায়। আমাকে চুপ করিতে হইবে, সন্দেহ কি। কিন্তু আমি পরিতুষ্ট হইব না। তেমনি করিয়াই না হয় তোমরা তোমাদের আর্য্য গৌরব, আর্য্য প্রভাবে নারীশক্তির উদ্বোধন ঘটাইয়া, মাতৃ-পিতৃ উভয় বরই লাভ করিয়াছিলে। না হয় সে দিন উৎরিয়াই গিয়াছিলে। কিন্তু চিরদিন তেমনি দিন রহিল কি? তখন জীবন-সূত্র জটিল হয় নাই। তোমরা আর তোমাদের ঘর—এ ছাড়া জাতির সমক্ষে আর কোন সমস্যাই ছিল না। হয় ত বা তোমাদের জীবন-ধারার সহিত প্রকৃতির নিয়মের আপনা-আপনি সামঞ্জস্য হইয়া গিয়াছিল। আর্য্য ও আর্য্যাঙ্গনা ভিন্ন ভারতে তখন আর ছিল কে? অন্তর্মুখী নারীত্ব আপনার সমস্ত প্রকাশস্পর্দ্ধা ডুবাইয়া দিয়া তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীহীন স্বতঃ-স্ফূরিত জীবনের মধ্য হইতে আহার্য্য আহরণ করিতে পাইত, সে বিচিত্র নহে।

তার পর যখন সম্মুখে দ্রাবিড় আর পশ্চাতে এক-এক করিয়া ক্রমাগত প্লবমান শক হুণ দরদ পহ্লব খশ যবন তুরক প্রভৃতির সংঘর্ষে আর্য্যের সংহতি রাজনৈতিক হিসাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল,—সম্পত্তি, জীবন রক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর সূক্ষ্মতর, সভ্যতর সমস্যা-সকলের আবির্ভাব হইতে লাগিল, বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতে আর্য্যজাতি ডিগ্‌বাজির পর ডিগ্‌বাজি খাইতে লাগিল, তখন আর নারীকে রক্ষা করে কে? বিবিধ প্রকার কৃত্রিম অন্তরাল সৃজন চলিতে লাগিল। কিন্তু মানুষকে রক্ষা করিবার শ্রেষ্ঠ উপকরণ মানুষেরই বাহু;—এ ধনজাত নহে যে, মৃত্তিকা-প্রোথিত করিয়া লুক্কায়িত করিলেই বিপদ কাটিয়া গেল। নারীকে যদি আর্য্যেরা সম্পূর্ণ মানুষ বলিয়া দেখিতেন,—যদি তাহাদের হৃদয়ে সে ভরসা থাকিত যে, ইহাদের স্বাধীন জীবন্ত মন জাতির এই সমস্যায় পুরুষেরই মত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; আর ইহারাও বলে বুদ্ধিতে, উৎসাহ-অনুপ্রাণনায়, কর্ত্তব্য-বোধে পুরুষেরই মত আত্মরক্ষা ও সম্মানরক্ষার্থ প্রাণ বিসর্জ্জনে সমর্থা, তবে কি ঘটিত, জানি না; কারণ, ভারতে তাহা ঘটে নাই;—তবে পৃথিবীর অপরাপর অংশে ইহারই ফলে কি ঘটিয়াছে জানি।

আমেরিকার যে স্থান এখন মার্কিণজাতি-অধ্যুসিত যুক্ত-রাজ্যসমূহ, সেখানেও একদিন আর্য্যদিগের সর্ব্ব প্রথম দ্রাবিড় সংঘর্ষের মত শ্বেত-কৃষ্ণের ঠিক একই কারণে বৈরিতা লইয়া জীবন-মরণ রণ বাধিয়া গিয়াছিল। পরস্পর ঠিক একই ওজনে নির্ম্মমতা চলিয়াছিল। সেখানে পিতৃ অভাবে মেয়েদের রক্ষার ভাবনা ভাবিয়া সাত তাড়াতাড়ি শ্বশুরকুল জুটাইতে হয় নাই;—মেয়েদের অন্তরালে লুকাইবার তাড়ায় বহির্জগতের সকল অভিজ্ঞতার পথ রোধ করিতে হয় নাই। তাহাদের অন্তর অন্তঃপুরে পোষ মানাইতে জ্ঞান-চর্চ্চা বন্ধ করিয়া তাহাদের শূদ্র সাজাইতে হয় নাই। মেয়েরাও নিজহস্তে ট্রেঞ্চ টার্গেট গাড়িয়া বসিয়াছে; বারুদ কুটিয়াছে; টোটা পাকাইয়াছে;—তাহাদেরও কোমল কর মাস্কেট চাঙ্গাড় দিয়া অব্যর্থ লক্ষ্যে শত্রু সংহার করিয়াছে। জিনিসটা ভাল দেখাইয়াছে কি মন্দ দেখাইয়াছে, সে সব কথা শুনিতে চাহি না; তারা স্বর্গে গিয়াছে কি নরকে গিয়াছে, তার সন্ধানের জন্যও আমার মাথা-ব্যথা নাই; আমি একটা জাতির জাগ্রতা জননী রূপে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছি। আমি আর্য্যগৌরবের নিদানভূতা জননীগণ অপেক্ষা তাঁহাদিগকে কম সম্মান দিতে পারিব না। তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে আমেরিকার সেই ভূভাগনিবাসী জাতি আজ দিনে-দিনে পরিবর্দ্ধমান হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের দেশ-আক্রমণ আশাকে স্বপ্নেও কেহ মনে স্থান দিতে পারে না। বিদেশীর প্লাবন তাহাদেরও দেশে আসে; কিন্তু সে সমস্যায় আজিও তাহাদের ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে হয় নাই। যে আসিতেছে, সে দাস রূপেই আসিতেছে; বিজেতৃত্ব কখনও তাহাদের দ্বারা সম্ভব হইবার নহে।

কথা উঠিতে পারে বটে যে, কেন? আমাদের রাজপুত

মারাঠা প্রভৃতি জাতির ঘরে কি এরূপ হয় নাই ? তাহারা ত আমেরিকার মেয়েদের মত স্বাধীনা নহে। তাহারাও ত হিন্দুর আচার-ব্যবহার মানিয়া চলিতেছে। ইহার উত্তর আছে। রাজপুত বা মারাঠা রমণী অথবা শিখ রমণীর মধ্যে যে বীরভাব দেখ, সে ভারতীয় দেশাচারের কারখানায় তৈরী নহে—তাহাদের আদিম শোণিত রক্ত সেই রণদুর্ম্মদ অবস্থার লুপ্তাবশেষই ঐ রূপ দু' একটা স্ফুলিঙ্গের সঞ্চার হেতু। ভারতীয় আচারে তাহারা ত দিনে-দিনে নিস্তেজ হইয়াই আসিতেছে। ভারতের ধর্ম্ম যে বিশ্বব্যাপী সত্য সাধনা করিতেছে—ওগো! আচার নিত্যই তাহার প্রতিবন্ধক!

বিরুদ্ধবাদী এখানেও হটিবেন না জানি; তাঁহার তূণীরে এখনও অস্ত্র আছে। এখনও তকরার উঠিতে পারে। এইবার নির্লিপ্তবৎ অবজ্ঞার হাসি সহকারে তিনি বলিতে পারেন—তুমি ভাবুক। আমিও অতৃপ্ত কৌতূহলে ও অপরিসীম বিস্ময়ে তোমার এত বাজে কথা যোগায় কোথা হইতে, তাই ভাবিতেছি। তোমার ও ঘোড়ার ডিম মেয়েদের মানসিক স্বাতন্ত্র্যের বীজ কোথায়? বৈজ্ঞানিক সকলই করিতে পারেন—সে ত ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যেই! সৃষ্টির অধিকারী কে? একটী নিউক্লিয়াস্ বা এক ফোঁটা প্রোটোপ্লাজম্ তিনি কি এখনও প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন? ওই যে স্বাতন্ত্র্যের কথা বলিতেছ,—থিয়োরি ছাড়িয়া স্থূল জগতের পানে চর্ম্মচক্ষে চাহিয়া, বর্ত্তমান স্ত্রীজাতির মনোমধ্যে উহার একটী অন্ততঃ নিউক্লিয়াস বাহির কর দেখি। মেয়েদের সবটাই ত পুরুষের মুখাপেক্ষী—যেন মূর্ত্তিমান। তুমি তাঁহাদের মানসিক স্বাতন্ত্র্য, পরিপূর্ণ অবয়বে—সে অনেক দূরের কথা—একটা ক্ষুদ্র বীজাকারেই দেখাও দেখি। ওগো! স্বতন্ত্র হইয়া চাড়া দিবার অবস্থা আসিলে, সে কর্ম্ম আমরা কেহই রোধ করিতে পারিব না। মেয়েরা যদি বস্তুতঃ তাহাই হইত, বৃথা পায়ের তলায় পড়িয়া থাকিত না।

এই নির্ম্মম যুক্তির বস্তু-তন্ত্র নির্লজ্জতা। পরিতাপ এই যে, নির্লজ্জের সংখ্যাই বেশী। কিংবা, এ কথা বলিতে পারি, মেয়েদের অবস্থা সম্বন্ধে আমার বিবেচনা সমস্ত দুনীয়া হইতে খাপ-ছাড়া। দুনীয়া দেখিতে পারে আমার পাগলামি; আবার আমিও দেখিতে পারি, যেন দুনীয়াটাই পাগল হইয়া রহিয়াছে। মোট, আমার দর্শন বলে, তোমরা যাহারা উপরিউক্ত যুক্তি দর্শাইয়া মেয়েদের হীন করিতে চাও, তাহারা নিজেরাই স্বরূপতঃ হীন। মানুষের সত্য স্বভাবটার অপলাপ করিয়া বুদ্ধির জোরে প্রকৃতির চোখে ধূলা নিক্ষেপ করিয়া উৎরাইতে চাও; কিন্তু তাহা অসম্ভব জানিও। স্বাতন্ত্র্যের একটি বীজ কেন,—মেয়েদের মনে আমি স্বাতন্ত্র্যের প্রচুর সন্ধান পাইয়াছি। সে একেবারে অগাধ অতল—সুপ্ত সমুদ্রবৎ নিথর নিস্পন্দ! নির্ম্মমতার তুষার-প্রপাত শৈত্যে জমিয়া একেবারে পাথর।

সেই জন্যই সে স্বাতন্ত্র্য active নহে, তাহা passive। অতএব আপন সহিষ্ণুতার জন্যই যাহা স্তিমিতবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, তাহাকে নিষ্ক্রিয় জ্ঞান করিয়া অপেক্ষা করিয়ো না। তোমাদের বড়-বড় মনস্তত্ত্ববিদেরা ত স্বীকারই করেন যে, স্ত্রী-চরিত্র দুর্জ্ঞেয়। এই কথাটার উপরই আমি আমার উক্তি সপ্রমাণ করিব। পুরুষ মনস্তত্ত্ববিৎ যাঁহারা ঐ সিদ্ধান্ত দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মনই ত ছিল সকল বস্তু অবধারণের উপায়-স্বরূপ? দেখ তবে—যে সূচ্যগ্রতীক্ষ্ণ বুদ্ধিশীর্ষ বিশ্ব-রহস্যের কত দুর্গম দুশ্ছেদ্য অংশ অবাধে ভেদ করিয়া গিয়াছে, —যে সকল সৃষ্টির মূল উপাদান পঞ্চভূতের উৎপত্তি, বিকৃতি, পরিণতির একটা ধারাবাহিক বর্ণনাশৃঙ্খল সাজাইয়া দিতে পারিয়াছে,—সেও মৌন মূক হইয়া আপনার অক্ষমতা পর্য্যন্ত স্পষ্টতঃ স্বীকার পাইল। আর অল্প চেষ্টায়ও হাল ছাড়ে নাই। নারীতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে গিয়া, এই জাতিকে উপলক্ষ করিয়া—তাঁহারা দুষ্কৃতির কতখানি পঙ্ক-কর্দ্দম গায়ে মাখিতে পারেন,—জীবাত্মার অবনতিকর কোন-কোন স্থান অবধি অবাধে আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন—কখনও দুঃখে, কখনও লজ্জায়, কখনও—আক্রোশ কি অনুশোচনা ঠিক বুঝিতে পারি না; কিন্তু একেবারে তাহাতে জর্জ্জরিত হইয়াই—শত মুখে এই জাতির গ্লানির স্তূপ দাঁড় করাইতে চাহিলেও, মুখ্যতঃ, আপনাদেরই গ্লানি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আপনার মনের দিক দিয়া, অর্থাৎ আপনার মনটাকেই অবধারণার উপায় করিয়া, তাঁহারা ত—যাহাকে বলে কচ্লাইয়া লেবু তেতো করা—যুগান্ত ধরিয়া তাহা করিলেন; তথাপি—আবার দেখ, অবশেষে সেই বলিলেন যে, নারী-চরিত্র পরম-তত্ত্বজ্ঞেরও দুর্জ্ঞেয়! কেন এমন হয়? যে গায়ের জোরে অস্বীকার করিবে, করুক; কিন্তু যে বুঝিতে পারে, সে নিশ্চয় বলিবে যে, এই উভয় জাতির মানসিক স্বাতন্ত্র্য সত্য। স্পষ্ট দিবালোকের মতই এ কথা প্রত্যক্ষ যে, পুরুষ ও

নারীর মনের গঠন বিভিন্ন। আর নারী-মনের নিগূঢ় তত্ত্ব, তাহার প্রকৃতির নিয়ম-প্রণালী-ধারা—সে মেয়েলী চেতনাই বুঝিতে পারে। পুরুষ-ভাবের তাহা অনধিগম্য বস্তু।

তাই ত গোড়ার গলদ ভাঙ্গিবার জন্য আমার এই প্রদীপের মত আলস তেয়াগি স্থির থাকা—জাগিয়া থাকা। তাহাদের স্বাতন্ত্র্য সত্যকার বস্তু। প্রভুত্বের দুর্মদ স্পর্দ্ধা মারিয়া সেটাকে চাপিয়া ত্রিবিক্রমের পদভরে জাতির মনটা দাঁড়াইয়া আছে। আপনার আত্মা মেয়েরা কেমন করিয়া খুঁজিয়া পাইবে? ভাব-প্রবাহের গহ্বর-মুখ যে পাথর চাপাইয়া অবরুদ্ধ রাখিয়াছ! এই প্রভাবের, ভয়ের, অসংযমের শাসন চূর্ণ কর,—তাহাদের মনটাকে তাদের আপন করে ফিরাইয়া দাও,—দেখ, নারী-শক্তি জাগে কি না!

বাঙ্গালী মেয়ে

[শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

পণ-প্রথার বিষময় ফল এ যুগে আরও ভাল করিয়াই ফলিয়াছে। কৌলীন্যের ফাঁসিকাষ্ঠে বাঙ্গালীর অনেক স্নেহলতাই প্রাণ দিয়াছে। স্নেহলতার আত্মহত্যার পর দুর্ভাগ্য বাঙ্গালীর ভবিষ্য জননী আরও অনেকে এই কুপ্রথার অনুসরণ করিয়াছে। কুলীন, অকুলীন, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সকল ঘরেই মাঝে-মাঝে কেরোসিন তেলের আগুন এমনই জ্বলিয়া ওঠে। এমন আত্মহত্যা যে আর কখনও হয় নাই, এমন নহে। হিন্দুর মেয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সামাজিক অত্যাচারে নানা উপায়ে নীরবে মরিতেছে। বালবিধবার হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে সমগ্র ভারতের সমাজ-সংস্কারক ব্যথিত ও চিন্তিত হইয়াছেন। সহমরণ-প্রথা লোপ পাইয়াছে,—নানা কারণে ব্রহ্মচর্য্যের অধিকার বিলোপ হইতে বসিয়াছে,—অথচ বালবৈধব্য এখনও বাড়িতেছে। নৈতিক সবলতায় হয় ত বহু-বিবাহ লোপ পায় নাই,—সম্ভবতঃ নিদারুণ অভাবেই বহু-বিবাহ এক প্রকার লোপ পাইয়াছে। কন্যাপণ, বরপণ, কৌলীন্য-প্রথা, মেলবন্ধন, বালবৈধব্য, বহু-বিবাহ ইত্যাদি সব শত্রুই কিছু-না-কিছু, কোথাও-না-কোথাও বর্ত্তমান! নারী-শিক্ষার আন্দোলন বহুদিনের,—কিন্তু তাহার বিস্তৃতি ও পরিণতি আজও আশাপ্রদ নহে। আজও বিবাহ না হইলে, ও বিধবা হইলে, বাঙ্গালীর মেয়ে অনেক স্থলেই সমাজের ও পরিবারের গলগ্রহ। কত শত প্রকার সামাজিক অত্যাচারের মধ্যে যে শত-শত সীতার অগ্নি-পরীক্ষা হয়, তাহা আমরা সকলেই জানি। বাঙ্গালী মেয়ে শুধু পণপ্রথায় মরে না,—মরিবার তার অনেক কারণ বর্ত্তমান। বাঙ্গালী মেয়ে চিরকুমারী রহিয়াছেন, চিরবৈধব্য ব্রত পালন করিয়াছেন, নৈতিক চরিত্রের অসামান্য প্রভাবে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। আবার এই বাঙ্গালীর মেয়েই জলে ডুবিয়াছে, আফিং খাইয়াছে, গলায় দড়ি দিয়াছে, কখনও বা আপনাকে চির-কলঙ্কিনী করিয়াছে; কিন্তু কেরোসিনে পুড়িয়া বাঙ্গালী মেয়ে যে তিরস্কার-পুরস্কার পাইয়াছে, আর কখনও ত এমন হয় নাই!

বড় ঘরের মেয়ে কেরোসিনের আগুনে একটিও হয় ত আজও পুড়িয়া মরে নাই। অথচ সেকালে ও একালে বড় ঘরের মেয়েও যে আত্মহত্যা করে নাই, এমন কথা কেহ বলিতে পারেন না। শুনি, বাঙ্গালীর মেয়েরা নাটক, নভেল, গল্প পড়িয়া, বিশ্রী ছবি দেখিয়া উচ্ছ্বাসের উত্তেজনায় বেশী মরিতেছে। সাধারণ ঘরের মেয়ে রোহিণী আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল ও কুন্দ আত্মহত্যা করিয়াছিল। উপন্যাসের জীবন তাদের ছিল, এখনও অনেকের আছে। এখন নাটক, নভেলের উত্তেজনাও আছে, অশিক্ষাও আছে, কুশিক্ষাও আছে; সর্ব্বোপরি অমানুষিক অত্যাচারও আছে। আশ্চর্য্য এই,—বাঙ্গালী খৃষ্টানের মেয়েও আছে, বাঙ্গালী ব্রাহ্ম-বালিকাও আছে, বাঙ্গালী মুসলমান-কন্যাও আছে, সম্পন্ন ঘরের বাঙ্গালী মেয়েও আছে; শিক্ষার

বিস্তারও তাদের মধ্যেই বেশী হইয়াছে; অথচ কই, কথায়-কথায় তারা ত এমন আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না, আফিং খায় না, গলায় দড়ি দেয় না! কুন্দ পেটের ভাতের অভাবে মরে নাই, কুন্দ সূর্য্যমুখীর অত্যাচারেও মরে নাই,—মরিয়াছে নগেন্দ্রকে পাইবে না বলিয়া; এখন কিন্তু অনেক কারণে হিন্দুর মেয়েরা মরিতেছে। "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নাটক হইতে "বলিদান" পর্য্যন্ত, 'সরলা' হইতে 'বঙ্গনারী' পর্য্যন্ত নাটক কত সামাজিক অত্যাচারের কথা প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে পুনঃপুনঃ অভিনয় করিয়াছে! স্নেহলতার আত্মহত্যার কাহিনীর চেয়ে ইহা ভীষণতম। কেরোসিন তেলে আর ক'জন মরিয়াছে! বহু শতাব্দী ধরিয়া কত লক্ষ বাঙ্গালীর মেয়ে এই সামাজিক অত্যাচারে মরিয়াছে,—বাঙ্গালী তাহার ইতিহাস যদি কতকটাও লিখিতে পারে, এবং তাহা প্রত্যেক সামাজিক সম্মেলনে প্রচার করিতে পারে, এবং প্রতিকার প্রার্থনা করিতে পারে, ত এই শোচনীয় কলঙ্ক দূর হইলেও হইতে পারে। বিবাহ-সভায় সামাজিক প্রশ্নের আলোচনা হওয়া এখন বড়ই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

জীবনের মায়া কার না বেশী? অথচ সেই জীবন ইহাদের কাছে এত তুচ্ছ হইয়া পড়িল কেন? হয় ইহা মানসিক ব্যাধি; ইহা অনেক দুশ্চিন্তা, উৎপাত অত্যাচার ও উপদ্রবের ফল; আর না হয় ত অনন্যোপায় বাঙ্গালীর মেয়ে এই নিশ্চিত পথে যাইয়া শুধু সমাজের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতেছে। ইহা ব্যাধি হইলেও, মুক্তির চেষ্টা মাত্র।

ভারতের মধ্যে বাঙ্গালীর মেয়ের জীবন-সমস্যাই সমগ্র দেশে এমন কঠোর দুর্দ্দৈবের মত হইয়া পড়িয়াছে কেন, তাহার মীমাংসা হওয়া উচিত। একান্নবর্ত্তী পরিবার, বাল্য-বিবাহ, চিরবৈধব্য ভারতের বিরাট হিন্দু-সমাজে ত অন্যত্রও আছে। অন্যত্র অবশ্য একান্নবর্ত্তী পরিবারের ব্যবস্থা আছে, দায়ভাগের ব্যবস্থা নাই। বাঙ্গালী মেয়ের এত দুর্দ্দশা ব্রাহ্ম-সমাজে নাই। অথচ সেখানেও অনেকের মতে বহু দোষ বর্ত্তমান। সেখানেও দরিদ্র পিতার অর্থ না থাকিলে বা সুন্দরী মেয়ে না হইলে সমস্যায় পড়িতে হয় বটে; কিন্তু তাঁহারা, হিন্দু ঘরের মত সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া মেয়ের বিবাহ না দিয়াও যত দিন ইচ্ছা কুমারী কন্যাকে ঘরে রাখিতে পারেন। সে সমাজে মেয়েরা আধুনিক শিক্ষা লাভ করেন। প্রয়োজন হইলে মেয়েরা অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন, অবিবাহিতা থাকিতে পারেন; স্বাধীন জীবনের কতকগুলি সুবিধাও ভোগ করিতে পারেন। কিন্তু যতটা শিক্ষা পাইলে ঘরে বসিয়া অন্যের গলগ্রহ না হইয়া পয়সা উপার্জ্জন করা যায়, নিজের ঘরের শান্তি অব্যাহত রাখা যায়। নিজের ছেলে-মেয়েকে যথার্থ মানুষ করিয়া তোলা যায়; নিজের স্বামী, ভাশুর, দেবর, যা, শাশুড়ী, ননদের সহিত সদ্ভাবে বাস করা যায়, বা যতটা নৈতিক বা পারিবারিক, আর্থিক বা সামাজিক শিক্ষায় আত্মরক্ষা করা যায়, নিজের স্বাস্থ্য, নিজের ভবিষ্যৎ, নিজের নৈতিক চরিত্র মোটামুটি বুঝিতে পারা যায়, ততটুকু শিক্ষা, ততটুকু স্বাধীনতা, ততটুকু অধিকার না দিলে, তেমন অবস্থায় আমাদের ঘরের মেয়েদের না তুলিয়া ধরিতে পারিলে, তাদের শুধু নিন্দা করিয়া কি লাভ?

এই সব কথা বলিতে গেলেই বাঙ্গালীর বালবিধবা ও কুমারী মেয়ের কথা যুগপৎ মনে আসে। অনেকে বলেন, স্নেহলতার এ কুদৃষ্টান্তে বাঙ্গালী মেয়ে মরিবে কেন? বাঙ্গালীর ঘরে-ঘরে বালবিধবা নৈতিক চরিত্র লইয়া, সংযম লইয়া কি বাঁচিয়া নাই? আমরা তাহা অস্বীকার করি না। আবার মনের অগোচরও পাপ নাই,—স্বীকার করিয়াও খুসী হইয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। নৈতিক চরিত্রের আব-হাওয়ার অবস্থা যে এখন ভাল নয়, সহরে-সহরে সে দৃষ্টান্ত ক্রমশঃ বড়ই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। আর শুধু কামের ব্যভিচার লইয়াই নৈতিক চরিত্রের বিচার হয় না, ইহা আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিলে, এত স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, এত বিভিন্ন প্রকারের স্ত্রীরোগ অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পাইত না। মেয়ে-ডাক্তার গ্রামে-গ্রামে, সহরে-সহরে মেয়েদের সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিলে, অনেক মেয়ের কথা জানিতে পারিবেন। ছাত্রদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার কিছু-কিছু সংবাদ আমরা জানিতেছি; মেয়েদেরও এখন জানা চাই। এই হিসাবে বাঙ্গালী ছেলেমেয়েকে এখন বিচার করিলে, নৈতিক চরিত্র রক্ষার সম্বন্ধে প্রচুর শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন। প্রচুর আহার, আলো-হাওয়া-পূর্ণ বাসস্থান, পরিশ্রম, বিশ্রাম ও যথেষ্ট

সামাজিক স্বাধীনতার প্রয়োজন ; ইহা ছাড়া বিশেষ বলসম্পন্ন স্ত্রী-পুরুষ সমাজে তত বেশী পাওয়া অসম্ভব। হিন্দু সমাজে ব্যভিচার কম, অনেকে এ কথা বলিয়াছেন। হিন্দুর মেয়ের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা কম, ইহাও অনেকে বলিয়াছেন। হিন্দুর সাধারণ ঘরের মেয়ে যতটা লজ্জাবতী ও বিনয়ী, অনেক দেশের অনেক বড় ঘরের মেয়ের সঙ্গে তার তুলনা করা যায়, ইহাও আমরা শুনিয়াছি। ইহার মধ্যে যতটা সত্য, ততটা আমাদের গৌরবের ; কিন্তু যেখানে আমাদের অগৌরব, আমাদের সমাজের সেই কথাই আমাদের আলোচ্য।

কুমারী কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও যখন অর্থাভাবে পাত্রস্থ করিতে পারি না, যখন বাল-বিধবাকে ধর্ম্মশিক্ষা বা ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিতে পারি না, তখনই তাহাদের নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষার জন্য আমরা চিন্তিত হইয়া পড়ি। আজীবন কুমারী কন্যার ভরণপোষণ করিবে, তবু অযোগ্য বরে বিবাহ দিবে না—ঋষি মনুর এই বিধি কোনও দেশের নিম্নশ্রেণীর বা সাধারণ শিক্ষিত জনসাধারণের জন্য খাটে না। তাই পাশ্চাত্য দেশেও অসম্পন্ন অশিক্ষিত পরিবারে বাল্য-বিবাহ একেবারে উঠিয়া যায় নাই। অনেকে বলেন, বাল-বিধবাও যেমন বাপের ঘরে থাকে, কুমারীও তেমন থাকিবে। বালবিধবা অনন্যোপায় না হইলে এখন বাপের বাড়ী আশ্রয় পায় না। কারণ, এখন বাপ-মা মরিলে ভ্রাতৃবধূর সংসারে থাকিতে হয়, ভাইএর সংসারে নয়। যদিও বিধবা এখন অনেক অসমর্থ পরিবারেই সমাজের গলগ্রহ, তবুও সমর্থ পরিবারে তাহার একটু দাঁড়াইবার স্থান আছে। অর্থ আছে, সামর্থ্য আছে, প্রশ্ন শুধু নৈতিক চরিত্র লইয়া। অসম্পন্ন পরিবারে বিধবা হইলে ভাশুর, দেবরের সংসারে অনেক সময়ই থাকিতে গিয়া নানা কারণে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। একের অভাবে আরও নানারূপ অভাব বাড়িয়া যায়। এক-বেলার অন্ন ও একখানা থান কাপড় জোটানোও শক্ত হয়। তার উপরে মতের বিরোধ, মনোমালিন্যের মাত্রা বড় বাড়িয়া যায়। যার স্বামী-পুত্র আছে, তারই জিত হয় ; তারই জিদ্, তারই প্রভুত্ব বজায় থাকে। বাপের বাড়ী ভ্রাতৃবধূ, আর স্বামীর বাড়ী যা,—এই দুটী প্রাণীর সঙ্গে ভাব রাখিতে পারিলে, অসম্পন্ন পরিবারেও বিধবার পেটের ভাত এখনও জুটিলে জুটিতে পারে। যেখানে আদর আছে, সে স্বর্গে দেবীও বাস করেন। কিন্তু কুমারীর বাপ-ভাই ছাড়া কেহ নাই। মামার বাড়ীর আব্দার এখন আর চলে না। খুড়ো, জ্যাঠা একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে দূর-সম্পর্কীয় হইতেছেন। কিন্তু যে কুমারীর বাপ-ভাই খাইতে দিতে পারে না, বিবাহ দিতে পারে না, তার অবস্থা সমাজে বড় ভীষণ। অনেক সময় মনে হয়, এই সব মেয়ে যদি আসামের মত, ব্রহ্মদেশের মত, নেপালের মত কাপড় বুনিতে পারিত, আর পাঁচরকম অর্থকরী শিল্প শিক্ষিত, তবে ভাইও ত দূর-দূর করিতে পারিত না। অনেক সময় মনে হয়, আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যদি অর্থকরী শিল্প ছেলেদেরও শেখানো হয়, তাহা হইলে বিবাহের বাজারে যে মূল্য তারা পায়, বাজে খরচ না করিয়া, তাহা দিয়াও তাহারা ছোটখাটো ব্যবসায়ের সূত্রপাত করিতে পারে। যৌতুকের অর্থও বোধ হয় তাই। শয্যা, দানসামগ্রী, গৃহশয্যা ও গৃহস্থালীর আসবাব ও নগদ টাকাটা সংসারের কাজ চালাইবারই মূলধন। গরীবের ঘরে এ ব্যবস্থা বোধ হয় মন্দ হয় না। কারণ গরীবের ঘরে কন্যার বাপ খাইতে দিতে পারে না, বাল বিধবাকে ফেলিয়া দিতে পারে না, কুমারীকে সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াও বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা না করিয়া পারে না। এক দিকে নিজের অভাব, অপর দিকে পরের নিন্দা। এই পর কিন্তু আপনার সমাজ। ভয় আছে বলিয়াই সমাজের নিন্দা। গরীবের ঘরে পর্দ্দা কিন্তু অল্প-বিস্তর সকল দেশেই আলগা। স্বাধীন দেশেও বড়ঘরের মেয়ে যেখানে একাকিনী একবার যায় না, গরীবের মেয়ে সেখানে একশ-বার যায়। খাটিয়া খাইতে হইলে যে অন্তঃপুরের বাহিরেও স্ত্রীলোককে আসিতে হয়, এদেশেও সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বাহিরেই আবার নৈতিক চরিত্রের পতনের ভয় বেশী। বাঙ্গালা দেশের যাহারা দরিদ্র, অথচ চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত, অভাব এখন সকল প্রকারেই তাহাদের মেয়েদেরই বেশী। কারণ অতি দরিদ্র সাধারণ ঘরে পর্দ্দার তেমন পাহারা নাই বলিয়াই ঘরে-বাহিরে তাদের কাজের অভাব মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মেয়েদের চেয়ে বেশী নাই। একে অন্নের অভাব, তার উপর কেহ বালবিধবা, কেহ বয়স্থা কুমারী,— ঘরে-বাহিরে তাহাদের অত্যাচার উপদ্রব, অশান্তি ও অনটন ;—সহ্য করিবার সীমাও যখন দুর্ব্বল শরীর-মন অতিক্রম করে, তখনই তাহারা অনন্যোপায় হইয়া মৃত্যুর

দ্বারে মুক্তির পথ খুঁজিয়া বেড়ায়। আধুনিক আত্মহত্যার উপায় মধ্যবিত্তের ঘরের মেয়েরা বরণ করিয়া লইয়া যে কলঙ্ক কিনিয়াছে, সে কলঙ্কে বাঙ্গালীর সমাজ আরও ডুবিবে। যে পাপ এখন শুধু হাভাতের ঘরে, সে পাপ শেষে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে। এই হিসাবে ইহা সংক্রামক ব্যাধি। এখানে বাঙ্গালীর মেয়ে সমাজের অত্যাচারের কাছে মুক্তি পাইবে; আবার সমাজ কিন্তু ঐ মুক্তি-প্রয়াসিনীর কলঙ্কে ভরিয়া যাইবে। যে মরিবে, সে জাতীয় কলঙ্ক-কাহিনী শুনিতে আর আসিবে না; যারা থাকিবে, বংশ-পরম্পরায় তারাই শুধু এ কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া বহিবে।

প্রতিকার পূর্ব্বেই বলিয়াছি—শিক্ষায় ও অর্থকরী শিল্প-বিদ্যায়। সে যুগে নারী-শিক্ষার বিদ্যালয় কোনও দিনই পল্লীতে-পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আজ কিন্তু বঙ্গদেশেও মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সূচনা হইয়াছে। শুধু ইংরাজ-রাজত্বেই ভারতে মহিলা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর বাল্য-বিবাহই যে শুধু এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা অসম্পূর্ণ করিয়াছে, তা নয়; স্ত্রী-শিক্ষা এখনও দেশে উপেক্ষিতই রহিয়াছে। যত কারণই থাক, আমরা তাহা দূর করিতে পারি। আমরা অন্তঃপুরেও তাহাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষায়, অর্থে ও সামর্থ্যে শ্রেষ্ঠ করিয়া গড়িয়া, দেশের এই অপমৃত্যু দূর করিতে পারি। ঘরেও স্বেচ্ছাচারিতা আছে, বাহিরেও স্বাধীনতা আছে। আবার অন্তঃপুরেও যথার্থ শিক্ষা হয়, বাহিরেও শিক্ষার ব্যভিচার হইতে পারে।

নারীজাতিকে রক্ষা করিতেই হইবে। নারী জননী, ভগিনী, কন্যা ও স্ত্রী। নারী বিরাট সমাজের অর্দ্ধশক্তি। সে নারীর আকস্মিক অকাল-মৃত্যু জাতীয় অপমৃত্যু। অত্যাচার, অবিচার, অশ্রদ্ধায় সে নারীকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অজ্ঞানতায় আমরা পথভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছি,—তাই এ-পথে সে-পথে তাহারা মুক্তি খুঁজিয়া বেড়াইতে গিয়া যদি সামাজিক ব্যাধি বাড়াইয়া দেয়, সে রোগে শুধু নারী ভুগিবে না। আজ যাহা বাঙ্গালার নারী-সমাজের ব্যাধি, তাহা অনেক অংশে সমগ্র ভারতের হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য দুর্দ্দশাগ্রস্ত নারী-জাতির ব্যাধি। তাঁহাদের মৃত্যু, তাঁহাদের ধ্বংস, তাঁহাদের অধঃপতন আমাদেরই জাতীয় অধঃপতনের কারণ।

নারীর লাঞ্ছনা

[শ্রীঅনন্তকুমার সান্যাল বি-এ]

একটা কথা উঠিয়াছে যে, বেদ, পুরাণ, মহাভারত, মনুসংহিতা হইতে আরম্ভ করিয়া, হনুমান-চরিত আদি যত অসংখ্য শাস্ত্র হিন্দুদের আছে, তাহাদের কোথাও-কোথাও না কি শাস্ত্র-কারেরা নারীদিগের কথা বলিতে গিয়া, কেবল পুরুষের স্বার্থ ও সুবিধা-সুযোগের দিকটা ষোল-আনা বজায় রাখিয়া, পদে-পদে নারীর আত্ম-মর্য্যাদায় আঘাত করিয়াছেন। কেবল কি তাহাই? আধুনিক বিশ্ব-বিশ্রুত-কীর্ত্তি মহাপুরুষেরা, এমন কি, পঞ্জিকাকার পণ্ডিতেরাও না কি দল বাঁধিয়া, এই সংকীর্ণ-চিত্ততার পরিচয় দিবার নিমিত্ত সহস্র কণ্ঠ হইয়াছেন। কথাটা ভাবিয়া দেখিবার, সন্দেহ নাই। লোক-হিতৈষণা ও সমাজ-কল্যাণই ছিল যাঁহাদের অভিপ্রেত উদ্দেশ্য; আর, কি পুরুষ, কি নারী উভয়েই সমাজ-দেহের দুইটি সবল অঙ্গ, ইহাও যাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না,—সত্য-সত্যই তাঁহারা যদি এমন করিয়া নারীত্বকে খর্ব্ব করিবার জন্য, নারীর মহিমা কীর্ত্তন দূরে থাকুক, তাহার লাঞ্ছনার জন্য শত-সহস্র বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তবে ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। দেখাই যাউক না, আমরা কতদূর পরিতাপ করিতে পারি!

যে সকল সংস্কৃত শ্লোক সুষ্ঠু ছাপার সাজ পরিয়া
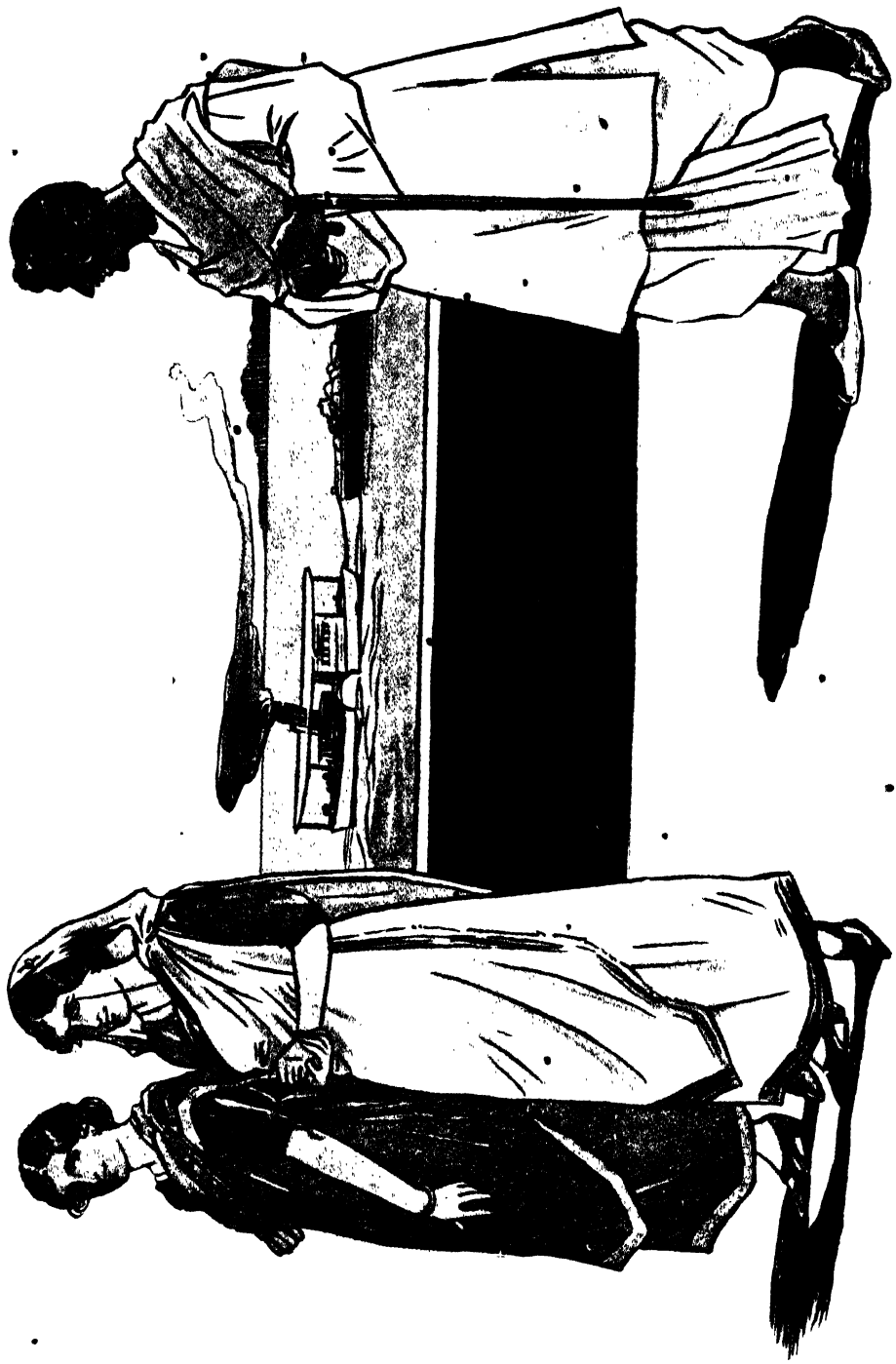
ষ্টীমার ও গাধাবোট

শিল্পী—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন

Emerald Ptg. Works

[Blocks by—BHARATVARSHA HALFTONE WORKS.

আজকাল অনায়াসে সমাজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, সমাজকে ছুটাইয়া লইয়া চলিবার জন্য আবশ্যক ও অনাবশ্যক কশাঘাত করিতেছে, তাহার সমস্ত অংশই শাস্ত্রকারদিগের মস্তিষ্ক-প্রসূত -- এমন কথা এখন ভারতেও অবিশ্বাসের সামগ্রী হইয়াছে। বিনা যুক্তি-তর্কে, মুখ বুজিয়া যাহারা যা'-তা' হজম করিবার জন্য প্রস্তুত, তেমন ভারতবাসীও বুঝিয়াছে বা বিশ্বাস করে যে, শাস্ত্রেও যথেষ্ট প্রক্ষিপ্ত আছে। আর কালের কোন্ অজ্ঞাত, গোপন-পুর হইতে যে বহিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহার গর্ভে যে দুই পাড়ের আবর্জ্জনারাশিরও স্থান নাই, তাহা কে বিশ্বাস করিবে? এখন এই প্রক্ষিপ্তাংশ স্বীকার করিয়া লইয়াও, যদি দেখিতে পাই, শাস্ত্র নিতান্তই একচোখো হইয়া, পুরুষেরই মাত্র কাজ হাসিল করিবার জন্য নারীকে অষ্টে-পৃষ্ঠে সহস্র নাগপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইলে বলিব, সেই প্রাচীন আর্য্যগণ,---মহামান্য মনীষিগণ আর যাহাই হউন, উদার-চেতা ঋষি ছিলেন না। স্নেহের অনন্ত প্রস্রবণরূপ যে মাতৃত্ব, সেবা-ত্যাগের ত্রিবেণী সমান যে পত্নীত্ব, দুহিতৃত্ব, তাহার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া, যাহারা দেখিয়াছেন কেবল মাত্র পুরুষের স্বার্থ—তাঁহারা, কি বলিয়া বলিব, ঋষি ছিলেন? কিন্তু সত্য-সত্যই কি এমন কথা মনে স্থান দিব যে "ত্যাগেনৈকেন" যাহারা অমৃতত্বের সন্ধানের কথা বলিয়া দিয়াছেন,---ঐহিক সুখ, ঐশ্বর্য্য, ভোগ-বিলাসকেই যাহারা জীবনের পরম বাঞ্ছনীয়, পরম চরিতার্থতার সামগ্রী মনে করেন নাই,--ত্যাগই ছিল যাহাদের মূলমন্ত্র, সাধনার মার্গ;—স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য দূরে থাকুক, আপনাকে বিশ্বহিত-চেষ্টায় বিলাইয়া দিয়া যাহারা ধন্য মনে করিতেন, কেবল সমাজ-দেহের একটি অঙ্গকে সুস্থ ও সবল রাখিবার নিমিত্ত যে তাঁহারা অপর অঙ্গটির একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া যাইবেন, এ কথা মনে করিতেও যে চিত্ত সঙ্কুচিত হইয়া আসে। তবে আজ এমন বেসুরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল কেন?

উঠিল এই জন্য—যে সময়ের আদর্শে ও অবস্থায় এই সকল শাস্ত্রের জন্ম, সে-যুগে ও এ-যুগে প্রভেদ আসমান্-জমীন। তখনকার অবস্থা, তখনকার সমাজ, তখনকার লোকচরিত্র বর্ত্তমান কালের সহিত এক নহে; সুতরাং সাত্ত্বিকভাব-প্রধান সেই যুগের আদর্শ তামসিকভাব-প্রধান এই যুগের আদর্শ হইতেও যথেষ্ট পৃথক। যে অনুকূল অবস্থায় আবির্ভূত হইয়া শাস্ত্র স্বচ্ছন্দে বহিয়া আসিয়াছে, দুই দিকে সার্ব্বজনীন কল্যাণ বিধান করিয়া আজ সেই শাস্ত্রকে বহিতে হইতেছে উজান,--আর তার গুণ ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, বিক্রমপুর। সে দিনে শিক্ষা যেমন মানসিক বৃত্তিগুলিকে উদ্বুদ্ধ ও বিকশিত করিয়া তুলিত, তেমন চিত্তকে, হৃদয়কেও সমৃদ্ধ করিত। সমস্যার সমাধান কেবল বিচার-সাপেক্ষই ছিল না, সম্যক্ অনুভূতিরও পদার্থ ছিল। মস্তকই কেবল হৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া বেড়াইত না। এখন আমরা যে "স্বাতন্ত্র্যম্"-এর অভাবে চমকিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছি, সেই "স্বাতন্ত্র্য-হীনা"দিগের পূজার স্থান, সম্মানের স্থানকেই দেবতার সম্মানের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। যাহা এখন অবমাননার, লাঞ্ছনার কাঁটা হইয়া আমাদের বুকে বিঁধিতেছে, আর আমাদের পাশ্চাত্যশিক্ষা-প্রদত্ত নকল অভিমানে আঘাত করিয়া মর্ম্মন্তুদ পীড়া দিতেছে, সেই আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, সেই নিয়মানুবর্ত্তিতাই তখন ছিল নারীর বরণীয়, শ্লাঘ্য ভূষণ। অধ্যাত্ম-সম্পদই ছিল যাহাদের পরম সম্পদ্,—কি পুরুষ, কি নারী, যাহাদের একমাত্র সাধনোদ্দেশ্য ছিল অমৃতের আস্বাদন, পরমার্থ-অর্জ্জন ছিল যাহাদের জীবনের লক্ষ্য—সে পুরুষ-নারীর, সে দম্পতির আবার বিভিন্ন পন্থানুসরণের অবসর কোথায়? নারী, শান্ত অনাবিল নারী-নির্ঝরিণী-পূত উচ্ছল পুরুষ-নির্ঝরের সহিত মিলিত হইয়া বহিয়া-বহিয়া অমৃতের সাগরের পানে ছুটিত। যে জ্ঞান-বর্ত্তিকা লইয়া পুরুষ গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, তাহারই প্রদর্শিত মার্গে নারীও উল্লাসে চলিতে থাকিত। জ্ঞানালোকে আলোকিত যে পন্থা, তাহাই ছিল উভয়ের একমাত্র অধিগম্য অমৃতত্বের পন্থা। তাই নারীকে বলা হইয়াছে, "ন স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"; ইহাতে লেশমাত্রও অবমাননার, অমর্য্যাদার গন্ধ নাই। বরং বলা হইয়াছে, নারীকেও তুল্যরূপে পুরুষের মত যত্নপূর্ব্বক শিক্ষাদান করিতে হইবে।

"বার্ণার্ড শ,' 'ইবসেন'-এ মুগ্ধ হইয়া আমাদের মায়েরা, ভগ্নীরা আজ যে অমর্য্যাদার কথা ভাবিতে শিখিয়াছেন, এবং সমগ্র নারী-জাতিই সেই আত্মাভিমানে কেন না অনুপ্রাণিত হইতেছেন বলিয়া স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য সমাজের উপর বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিতেছেন,—আমাদেরই দেশোচিত আর্য্য-শিক্ষা, আর্য্যসভ্যতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে, আজ তাঁহাদের সুর কোন্ দিকে ধাবিত হইত, বলা শক্ত নহে। মিল,

স্পেন্সার, কাণ্টের যুক্তি-তর্ক, কথার মারপ্যাচের বুলি সকলেই আওড়াইতে পারিতেছি না বলিয়া যত না দুঃখ ও ক্ষোভে আজ প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার অপেক্ষা শত গুণে দুঃখের, মর্ম্মপীড়ার বিষয় এই যে, পুরুষেরা আজ যে 'স্বাধিকার' 'স্বরাজ', 'স্বপ্রতিষ্ঠা'এর কথা বলিয়া আমাদের প্রাচীন আদর্শের ইঙ্গিত করিতেছেন, এতদিন কেন আমরা আমাদের সেই আর্য্য-বৈশিষ্ট্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কুশিক্ষায় মুগ্ধ হইয়া; আর 'আমাদের শক্তিরূপিণী জগদ্ধাত্রীরূপিণী নারীরাই বা কেন মৈত্রেয়ীর ন্যায় আজ বলিতেছেন না— 'যেনাহং নামৃতস্যাং কিমহং তেনকুর্য্যাম্।' হায়, যে দেশের পুরুষেরাই পাশ্চাত্যের মোহ কাটাইয়া সত্যের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না, সেই দেশের নারীও যদি স্বেচ্ছায় সেই কুজ্ঝটিকায় নয়ন অন্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন, তবে বুঝিতে হইবে, এখনও ভীষণ দুর্দ্দিন আমাদের সম্মুখে। আমাদের মর্ম্মাহত হইবার কারণ এই নয় যে, আমাদের সমাজের নারীও কেন না পুরুষেরই মত তাহাদের সঙ্গে-সঙ্গে সদর্পে পা ফেলিয়া শ্রুতিমধুর 'স্বাধীনতা' 'স্বাধিকার' প্রভৃতি পাশ্চাত্য বুলি বলিতে পারিতেছেন না। আমাদের যাহা ক্ষোভের বিষয়, যাহার জন্য আমাদের প্রাণপণ উদ্যম ও প্রয়াসের দরকার, সে হইল আমাদের যাহা স্বীয়, যাহা নিতান্ত আপনার সামগ্রী—সেই আর্য্য-সভ্যতায় ও আর্য্য-শিক্ষায় পুরুষ-নারী-নির্ব্বিশেষে সকলকেই দীক্ষিত করা। আমরা চাই না উপাধি, চাই না শিক্ষার নিশান; চাই শিক্ষা, চাই পুরুষ, চাই চরিত্র। পুরুষ বলিবে, আমি বশিষ্ঠের শিক্ষা চাই; নারী বলিবে, আমি মৈত্রেয়ীর, গার্গীর, লীলার শিক্ষা চাই।

আর আজ এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, জন-সমষ্টির কল্যাণকর যে সকল বিধি-নিষেধ, স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে তাহার পালনই স্বাধীনতা। মনে পড়ে অনেক দিন পূর্ব্বে মহামতি কার্লাইলও ঠিক এমন ধরণেরই একটি কথা বলিয়া গিয়াছেন যে, নিয়মানুবর্ত্তিতাও স্বাধীনতারই একটি অঙ্গ মাত্র।

সাগর-পারের সামাজিক বিপ্লব-পন্থীরা যাহাই বলুন, পুরুষের ও সমাজের চক্ষে আঙ্গুল দিয়া শিক্ষা দিবার নিমিত্ত যতই 'পুতুলের ঘর' (Doll's House) তৈয়ার করুন, আত্মাকে গঠন করিয়া সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া লইতে না পারিলে, সমস্তই ব্যর্থ হইবে; এবং হইতেছেও তাহাই। আজ যে পুরুষ নারীকে অবহেলা করিয়া আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, ইহার প্রতিকার-কল্পে কি নারীকেও তেমনই স্বেচ্ছা-বিহারিণী, স্বৈরিণী হইবার উপদেশ দিতে হইবে? না উভয়কেই উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে তাহাদের আপন চিত্ত-বিশুদ্ধির পথে? সমাজকে চালিত করিতে হইবে সৃজনের দিকে, গঠনের দিকে,—সমাজেরই নিয়ম মানিয়া তাহার সংস্কারের দিকে। বিনাশের দিকে লইয়া গেলে হিন্দু-সমাজও বিশৃঙ্খলতা ও ধ্বংসের দিকেই চলিতে বসিবে। কাজেই, এখন গোড়ার কথা হইতেছে, স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার ও স্ত্রী-স্বাধীনতা নয়;—কথা হইতেছে, শিক্ষা ও স্বাধীনতা পদার্থ যে কি, তাহাই উপলব্ধি করা। আশার কথা,—দেশের চক্ষু খুলিতে বসিয়াছে।

অসীম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

ত্রিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

চারিদণ্ড কাল শিবিরের চারিদিকে ঘুরিয়া সরস্বতী হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। শিবির হইতে অল্প দূরে দুইটা বৃহদাকার তিন্তিড়ী-বৃক্ষতলে একটা পুরাতন কূপ ছিল; ক্লান্ত হইয়া সরস্বতী বৃক্ষচ্ছায়ায় সেই কূপের পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই চারিদণ্ডের মধ্যে হরিনারায়ণ বা অসীম কেহই তাম্বুর বাহিরে আসেন নাই। তাঁহারা যে তাম্বুতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সরস্বতী বরাবর তাহার দুয়ারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিল। সে শিবিরের চারিদিকে ঘুরিয়া সন্ধান জিজ্ঞাসা

দিবার লোক পাইল না। তাহার প্রধান ভয় ছিল যে, সে কথা কহিলেই ধরা পড়িয়া যাইবে!

শিবিরে আসিয়া হরিনারায়ণ ভূপেন্দ্রকে ডাকাইলেন; এবং তাহাকে তাম্বুর দুয়ারে পাহারায় রাখিয়া তিনি অসীমের সহিত স্বাবাসে প্রবেশ করিলেন। হরিনারায়ণ উপবেশন করিলে, অসীম জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন কি বিশেষ প্রয়োজন পড়িয়াছে?"

হরিনারায়ণ কহিলেন, "দেখ অসীম, আমি মোহের বশে একটা মহাপাতক করিয়া বসিয়াছি,—তোমার সহায়তা ব্যতীত তাহার প্রায়শ্চিত্ত অসম্ভব। তোমাকে কি এখন বাদশাহের নিকট যাইতে হইবে?" "এখন নহে, তবে শীঘ্রই যাইতে হইবে।" "কখন?" "তৃতীয় প্রহরে।" "যথেষ্ট সময় আছে,—আমার বক্তব্য অতি সামান্য।" "আপনি যাহা বলিবেন, তাহা আপনার বাড়ীতে বলিলেই হইত। এতদূর কষ্ট করিয়া আসিবার আবশ্যক কি ছিল?" "আমার বাড়ীতে তখন একজন গুপ্তচর বসিয়া ছিল বলিয়া, এতদূর আসিতে হইল; এবং তাহারই ভয়ে ভূপেনকে পাহারায় রাখিতে হইয়াছে। তাহার কথা পরে বলিব,—প্রথমে আমার নিজের কথাটা বলি। অসীম, রুকনপুর পরগণায় তোমার ও ভূপেনের যে অংশ আছে, তাহা কি হরনারায়ণকে লিখিয়া দিয়াছ?"

অসীম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দিন পরে এ কথা তুলিতেছেন কেন?" "মহাপাতক করিয়াছি বলিয়া। সমস্ত কথা তোমাকে খুলিয়া বলিবার জন্যই আজি এখানে আসিয়াছি। তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।" "রুকনপুর পরগণার অংশ দাদাকে প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়া দিয়াছি। তিনি বলিলেন—" "তিনি তোমাকে যাহা-যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি জানি। তুমি জান যে, তোমার অথবা ভূপেনের পৈত্রিক সম্পত্তিতে দান বা বিক্রয়ের অধিকার ছিল না?" "এ কথা ত কখনও শুনি নাই?" "শুন নাই বলিয়াই ত বলিতেছি। দেখ অসীম, তোমার সাহায্য ব্যতীত আমার মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত অসম্ভব।" "কি মহাপাতক?" "বিশ্বাসঘাতকতা। তোমার পিতা আমাকে যতদূর বিশ্বাস করিতেন, ততদূর বিশ্বাস মনুষ্যকে মানুষ করে না। কিন্তু অসীম, আমি কৃতঘ্ন, আমি নরাধম। আমি তাঁহার অশেষ অনুগ্রহ বিস্মৃত হইয়াছিলাম। বিশ্বস্ত বন্ধু ও ভৃত্য বলিয়া তিনি মৃত্যুকালে যে কার্য্যের ভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন, আমি মোহের বশে তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। অসীম, তোমার পিতার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি হিন্দুস্থানে আর কেহ ছিল কি না সন্দেহ। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে চিনিতেন; এবং চিনিতেন বলিয়াই তোমাদের বিষয়-রক্ষার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। অসীম, আমি মোহের বশে, বন্ধুত্বের ছলনায় মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার আদেশ ও নিজের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছিলাম। এই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত না করিতে পারিলে আমাকে নরকস্থ হইতে হইবে।"

"আমি আপনার কথা এখনও বুঝিতে পারি নাই।"

"বুঝিবে কেমন করিয়া,—এখনও ত সমস্ত কথা শোন নাই! মৃত্যুকালে তোমার পিতা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিভাগ করিয়া এক দানপত্র লিখিয়া গিয়াছিলেন। তদনুসারে তোমার বা ভূপেন্দ্রের সম্পত্তি দান-বিক্রয়ের অধিকার নাই। সেই দান-পত্র নষ্ট হইবার আশঙ্কায় তিনি আমার নিকট রাখিয়া গিয়াছেন। আমি হরনারায়ণের মিষ্ট কথার মোহে এবং বন্ধুত্বের ছলনায় তাহার অস্তিত্বও বিস্মৃত হইয়াছিলাম। দেখ অসীম, রুকনপুর পরগণায় তোমার ও ভূপেন্দ্রের যে অংশ ছিল, তাহা এখনও আছে;—হরনারায়ণ তোমাদের নিকট হইতে যে দানপত্র লিখাইয়া লইয়াছে, তাহা মূল্যহীন বাজে কাগজ মাত্র।"

হরিনারায়ণ এই কথা বলিয়া, পুঁথি খুলিয়া বসিলেন; এবং রাশি-রাশি তালপত্রের মধ্য হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিলেন। অসীম তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানা কি?" হরিনারায়ণ কহিলেন, "সেই দান-পত্র।" ঈষৎ হাসিয়া অসীম জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আর ইহা বাহির করিয়া কি ফল হইবে?" হরিনারায়ণ কহিলেন, "ফলাফল ভগবানের উপর নির্ভর করে! চেষ্টা করিতে দোষ কি? দেখ অসীম, তোমার পিতার অন্নে এ দেহ পুষ্ট। মোহমুগ্ধ হইয়া যে মহাপাতক করিয়াছি, হয় ত এখনও তাহার প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব; সুতরাং চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি?" "সুবাদার স্বয়ং দাদার হস্তগত। তাঁহার লোকবল ও ধনবলের অভাব নাই। আমরা কি বিবাদ করিয়া অথবা ফরিয়াদ করিয়া তাঁহার সহিত পারিয়া উঠিব?" "পারিব কি না পারিব, সে কথা কে বলিতে পারে; কিন্তু চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি? সুবাদার তোমার দাদার হস্তগত হইতে পারে, কিন্তু

সুবাদারের মনিব যে তোমার হস্তগত। স্বয়ং বাদ্‌শাহ যদি তোমার পক্ষাবলম্বন করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সুবিচার হইবে।” “বাদ্‌শাহ আমার পক্ষ অবলম্বন করিবেন কি না, সে কথা কেমন করিয়া বলিব বিদ্যালঙ্কার মহাশয়?” “নিশ্চয় করিবেন। তুমি কি বাদ্‌শাহকে কখনও অনুরোধ করিয়াছ?” “বাদ্‌শাহকে যে অনুরোধ করিতে হইবে, আপনার সহিত আজি সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে সে কথা আমার মনে কখনও উদয় হয় নাই।”

“তবে আজই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ।” “দেখিব; কিন্তু বিদ্যালঙ্কার মহাশয়, বাদ্‌শাহীর ত এই অবস্থা,—এক বাদ্‌শাহ দিল্লীর তখ্‌তে; আর এক বাদ্‌শাহ পাটনার আফ্‌জল খাঁর বাগানে। আপনার কি মনে হয় যে, সিংহাসনের অধিকার ছাড়িয়া, মুরশিদ্ কুলী খাঁ এই ভিখারী বাদ্‌শাহের হুকুমে আমাকে পৈত্রিক সম্পত্তি ছাড়িয়া দিবে?” “কি করিবে তাহা বলা যায় না; তবে চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি?” “আর একটা কথা আছে। যে দিন শাহজাদা আজীম্ উশ্-শানের মৃত্যুর সংবাদ আসিয়াছিল, সে দিন আমিই ফররুখ্‌সিয়রকে সিংহাসনের জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তখন তাঁহার অর্থবল ছিল না, লোকবল ছিল না; কিন্তু আজি বাদ্‌শাহ ফররুখ্‌সিয়রের লোকের অভাব নাই বলিয়াই, আমি স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিব না।” “না, তোমাকে নূতন বাদ্‌শাহের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে না। যাহা কিছু করিতে হইবে, আমিই করিব;—তবে আমি যাহা করিব, তাহাতে তুমি আপত্তি করিতে পাইবে না। যে শঠ, তাহার সহিত অসদাচরণে পাপ নাই।” “আপনি যাহা করিবেন, তাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই। বিশেষতঃ, এই দলিল-অনুসারে পৈত্রিক সম্পত্তি দান অথবা বিক্রয়ের অধিকার যখন আমার নাই, তখন আর আমি কি বলিব?” “সুদর্শনকে কি তোমার আবশ্যক আছে?” “আমার আবশ্যক না থাকিলেও, বাদ্‌শাহ তাহাকে ছাড়িবেন বলিয়া বোধ হয় না।” “স্ত্রীলোকগুলিকে লইয়া বড়ই বিপদ হইল। যখন ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া আসি, তখন মনে করিয়াছিলাম যে, দুই-এক দিন পরে হরনারায়ণ স্বয়ং আসিয়া আমাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে। কারণ মানুষ এত সহজে অত দিনের প্রেম, জীবন-ব্যাপী বন্ধুত্ব বিস্মৃত হইতে পারে না। ভুল অসীম, বড় ভুল,—কামিনী-কাঞ্চনের জন্য মানুষ পারে না এমন কার্য্য নাই। স্ত্রীলোকগুলিকে লইয়া বড় বিপদ হইল; সংসারে পুরুষ মাত্র আমরা দুইজন;—একজন যদি বাদ্‌শাহের সহিত দিল্লী যায়, আর অপর যদি মুরশিদাবাদ যায়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকগুলা কোথায় যায়?” “যাইবে আর কোথায়,—আপনি সঙ্গে লইয়া যান।” “তাহারা আমার সহিত গেলে সুদর্শনের কষ্ট হইবে না?” “কিসের কষ্ট? আর সে সন্ধ্যাত্রী—স্ত্রীলোক লইয়া যাত্রা তাহার অসম্ভব। আপনি দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন; সুতরাং আপনার সহিত তাহাদের যাওয়াই সঙ্গিনক্ত।”

পরিবারস্থিত স্ত্রীলোকগণের প্রসঙ্গ কালে হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কারের চক্ষুর কোণে বিষণ্ণতা দেখা দিয়াছিল; কিন্তু অসীমের কথা শুনিয়া, তাঁহার মুখ আবার প্রসন্ন হইল। তিনি কহিলেন, “তবে তাহাই হউক; তুমি কিন্তু আমার সহিত পরামর্শ না করিয়া, বিষয় সম্বন্ধে কাহাকেও কোনও কথা দিও না, অথবা কোন কাগজপত্র সহি করিও না।” “আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই হইবে। আপনি কি এখন মুরশিদাবাদে যাইবেন?” “উপস্থিত দুই-চারি দিন নহে।” “আমাদের বোধ হয় শীঘ্রই দিল্লী যাত্রা করিতে হইবে।” “তবে আমি এখন আসি। তোমরা দুইজন খুব সাবধানে থাকিও; কাহারও নিকট কোন কথা প্রকাশ করিও না। জানিয়া রাখিও, হরনারায়ণের গুপ্তচর তোমাদের সঙ্গে-সঙ্গে ফিরিতেছে।” “চরটা কে বিদ্যালঙ্কার মহাশয়?” “সরস্বতী বৈষ্ণবী ত একজন; তাহার সহিত আর কয়জন আছে, তাহা বলিতে পারি না।”

হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার বিদায় হইলেন; সঙ্গে-সঙ্গে সরস্বতী বৈষ্ণবীও তাঁহার অনুসরণ করিল।

চতুঃপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

“কৈ ঠাকুর, কড়ি কৈ?” “তাই ত বাবা, কড়ি ত নাই।” “ওসব ন্যাকপনা রাখ ঠাকুর, ভেবেছ যে, পায়ের ধূলা দিয়া হীরাপাটনীর কাছে পার পাইবে! এমন জিনিসটি হবার জো নাই। দেখ ঠাকুর, যদি ভাল চাও, তবে কড়ি রাখিয়া নৌকা হইতে নাম।” “বড় বিপদে ফেলিলে বাপু! আসিবার সময় খেয়ার কড়ি ভাঙ্গাইতে ভুল হইয়া গিয়াছে।” “তাহার জন্য চিন্তা নাই। টাকা বাহির কর,

আমিই ভাঙ্গাইয়া দিতেছি।" "টাকা নহে বাপু, আমার নিকট মোহর আছে।" "আঃ, ঠাকুর হীরাপাটনী কি তাহাতে ডরায়? ভাল, মোহরই বাহির কর।" ব্রাহ্মণ কোঁচার খোঁট হইতে নস্যের আধার, এবং তাহার মধ্য হইতে একটি নস্যরঞ্জিত স্বর্ণ-মুদ্রা বাহির করিল; এবং তাহা পাটনীর হস্তে দিয়া, পরীক্ষা করিয়া লইতে বলিল। পাটনী তাহা জলে ধুইয়া লইল, এবং আর একজন যাত্রীকে দিয়া কহিল, "দেখ ত ভাই, মোহরটা আসল কি না?" সে ব্যক্তি অতি বিচক্ষণ লোক। সে কাছার খোঁট হইতে একটি থলিয়া বাহির করিল। সেই থলিয়ার ভিতর হইতে একখানি কষ্টি, এক শিশি তৈল, আর দুই টুকরা সোণা বাহির হইল। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল, "বাপু, তুমি কি সেকরা?" সে ব্যক্তি কহিল, "আজ্ঞা না, আমরা নর-সুন্দর।" "নাম?" "নবীন দাস।" "নিবাস?" "পূর্ব্বে ছিল রুকনপুর, উপস্থিত ডাহাপাড়া।" "কোন্ ডাহাপাড়া?" "সহরের পশ্চিম পার?" "ঢাকার পশ্চিম পারে ত কোন ডাহাপাড়া নাই?" "ঢাকা কেন ঠাকুর, সহর বলিলে কি ঢাকা বুঝায়? সহর ত সহর মুরশিদাবাদ।" তাহার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ হাসিল। নবীন মোহর পরীক্ষা করিল; এবং তাহা পাটনীর হস্তে দিয়া মাথা নাড়িল। পাটনী বারটি টাকা ও একখণ্ড কম এক কাহন কড়ি ব্রাহ্মণকে দিল। নৌকা তীরে লাগিল। যাত্রিগণ নামিল, ব্রাহ্মণও তাহাদিগের সহিত নামিল। নবীন দাস ব্রাহ্মণের সঙ্গ লইল।

কিয়ৎক্ষণ চলিতে-চলিতে ব্রাহ্মণ পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল; এবং দেখিল যে, দূরে থাকিয়া নবীন দাস তাহার অনুসরণ করিতেছে। ব্রাহ্মণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। সেইস্থানে পথটি অত্যন্ত বক্র বলিয়া নবীন তাহা দেখিতে পাইল না। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বৃক্ষতলে অন্ধকার ঘন; সুতরাং যে বৃক্ষতলে ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়াছিল, নবীন দাস যখন তাহার নিকটে আসিল, তখন আর তাহাকে দেখিতে পাইল না। দেখিতে না পাইয়াও নবীন দাঁড়াইল না,—ধীরে-ধীরে চলিতে লাগিল।

অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হইয়া আসিল; এবং সঙ্গে-সঙ্গে বনমধ্যে পথের রেখা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গেল। কিয়দ্দূর গিয়া নবীন দাঁড়াইতে বাধ্য হইল; কারণ সেই স্থানে পথের উপরে একটা প্রকাণ্ড বাঁশ পড়িয়াছিল; এবং তাহা সরাইতে নবীনের সাহসে কুলাইল না। একে বাঁশকাল, তাহার উপর জনশূন্য অরণ্য; কোন দিকে মানুষের আবাসের চিহ্ন-মাত্র নাই। নবীন এদিক-ওদিক চাহিয়া ব্রাহ্মণকেও দেখিতে পাইল না। তখন সে বিষম ফাঁপরে পড়িল। কিয়ৎক্ষণ বিবেচনা করিয়া সে স্থির করিল যে, গঙ্গাতীরে ফিরিয়া যাইবে। সে কেবল একপদ অগ্রসর হইয়াছে মাত্র, সম্মুখে একটা দীর্ঘ নরকঙ্কাল দেখিতে পাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

তাহার পতনের সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কালটিও পড়িয়া গেল; এবং বৃক্ষ হইতে এক মনুষ্য-মূর্ত্তি নামিয়া আসিয়া কঙ্কালটা উঠাইয়া লইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে ফিরিয়া আসিয়া, নবীনের হস্তপদ দৃঢ়রূপে রজ্জু দিয়া বন্ধন করিল; এবং অনায়াসে তাহাকে স্কন্ধে উঠাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে তাহার সহিত আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হইল। আগন্তুক তাঁহাকে দেখিয়া নবীন দাসের দেহ নামাইয়া রাখিল; এবং প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গুরুদেব, ইহাকে কি আপনি আনিয়াছেন?" ব্রাহ্মণ হাসিয়া কহিলেন, "আমি আনি নাই বটে, তবে এ ব্যক্তি আমার জন্যই বনে আসিয়াছে।" "সে কি, এ কি তবে দাক্ষিত?" "উহার নাম নবীন দাস, জাতিতে নাপিত। খেয়ার কড়ি লইয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম; সেইজন্য একটা মোহর বাহির করিতে হইয়াছিল। সেই মোহর দেখিয়া নবীনচন্দ্র আমার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ বনে আসিয়াছে।" "জগদম্বার ইচ্ছা প্রভু, মার বুঝি এত দিনে তৃষ্ণা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে?" "কেন কালীপ্রসাদ, এত পশুতেও কি মা তৃপ্তা নহেন?" "গুরুদেব, আপনি আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ইহা বড়ই আশ্চর্য্য।" "আশ্চর্য্য নহে কালীপ্রসাদ,—আমি কোন দিনই নরবলির পক্ষপাতী নহি।" "এমন আজ্ঞা করিবেন না প্রভু! অমানিশার মহানিশায় মা মহামায়া নরবলি ভিন্ন মহাতৃপ্তি লাভ করেন না।" "ইহাকে কি বলি দিবে না কি?" "চারি মাস যাবৎ একটিও ফাঁদে পড়ে নাই প্রভু; সুতরাং বলি না দিয়া আর উপায় কি?"

নবীন দাসের তৎক্ষণে জ্ঞানোদ্রেক হইয়াছিল। কিন্তু প্রভু-শিষ্যের কথোপকথন শুনিয়া তাহার অঙ্গ হিম হইয়া গিয়াছিল। সে বদ্ধাবস্থাতেই গড়াইয়া আসিয়া ব্রাহ্মণের পদযুগল ধারণ

করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার আর্ত্তনাদ থামিয়া গেল; কারণ, কালীপ্রসাদ তাহার গণ্ডে এমন এক চপেটাঘাত করিল যে, সে দ্বিতীয়বার মূর্চ্ছিত হইল। তখন গুরু শিষ্যকে কহিলেন, "দেখ কালীপ্রসাদ, অমাবস্যার বিলম্ব আছে; সুতরাং ইহাকে তোমার অনেক দিন ধরিয়া রাখিতে হইবে।" শিষ্য কহিল, "প্রভু, অনুমতি করিলে শুক্লপক্ষেই ইহার সদ্‌গতি করিয়া দিই।" "তাহাতে আর প্রয়োজন নাই। আমি বলি কি, ইহাকে ছাড়িয়া দাও।" কালীপ্রসাদ চমকিত হইয়া উঠিল; এবং কহিল, "প্রভু, বলেন কি! এমন কাজ করিলে কি মহামায়া আর রক্ষা রাখিবেন? চারিমাস মহাবলি না পাইয়া মহামায়ার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া আছে। সেইজন্য মা নিজের বলি স্বয়ং সংগ্রহ করিয়াছেন।" "কালীপ্রসাদ!" অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া কালীপ্রসাদ কহিল, "আজ্ঞা?" "তুমি জান, আমি কে?" বেত্রাহত কুক্কুরের ন্যায় অবনত মস্তকে শিষ্য কহিল, "জানি প্রভু!" "ইহাকে লইয়া গিয়া, মহামায়ার মন্দিরে বজ্রকুটিমে রাখিয়া আইস।"

নবীন যখন পুনর্ব্বার চেতনা লাভ করিল, তখন সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না যে, সে কোথায় আসিয়াছে। সে যে-স্থানে পতিত ছিল, তাহার অদূরে একটা পুরাতন মন্দিরমধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছিল। তাহার আলোকে দেখিতে পাইল যে, সে একটা ক্ষুদ্র কক্ষে পতিত আছে। কক্ষের চারিদিকে চাহিয়া নবীন দাস তৃতীয়বার মূর্চ্ছিত হইল। সে দেখিয়াছিল যে, কক্ষের দুইটি দ্বারে দুইটা দীর্ঘ নরকঙ্কাল ত্রিশূল হস্তে দাঁড়াইয়া আছে; এবং তৃতীয় দ্বারে একটা বৃহৎ বিষধর সর্প তাহাকে দংশন করিবার জন্য মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। শীতল কর-স্পর্শে তাহার জ্ঞান পুনরায় ফিরিয়া আসিল। সে চক্ষু মেলিয়া দেখিল, সেই ব্রাহ্মণ তাহার শিয়রে বসিয়া মুখে জল সেচন করিতেছেন এবং কঙ্কালদ্বয় ও সর্প অন্তর্হিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাপু, কেমন আছ?" প্রত্যুত্তরে নবীন আর কোন কথা কহিল না; কিন্তু তাহার চক্ষুর কোণ দিয়া একবিন্দু জল গড়াইল। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণের মন একটু নরম হইল। তিনি মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই, তুমি উঠিয়া আইস।" নবীন উঠিল এবং ঘরের চারি দিকে চাহিয়া যখন ত্রিশূলধারী কঙ্কাল বা বিষধর সর্প দেখিতে পাইল না, তখন সে ধীরে-ধীরে গৃহের বাহির হইল। বাহিরে আসিয়া নবীন দেখিল যে, একটা বহু পুরাতন ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দিরের সম্মুখে কতকটা পরিষ্কৃত স্থান। মন্দিরমধ্যে বৃহৎ কুণ্ডে অগ্নি জ্বলিতেছে,—পূজক কালীপ্রসাদ। তাহার পশ্চাতে একটা মৃতদেহ, দুই-তিনটা সর্প ও কতকগুলা শৃগাল বসিয়া আছে। মন্দিরের অঙ্গনে, তিন দিকে তিনটা জীর্ণ পুরাতন গৃহ এবং তাহারই একটার মধ্যে সে আবদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণ মন্দিরাঙ্গন পার হইয়া অপর পার্শ্বের গৃহে প্রবেশ করিলেন,—নবীন দাসও তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে চলিল। শিবা ও সর্পগুলি তাহাদিগকে দেখিলও না।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু আহার করিবে কি?" নাপিত-পুত্র মাথা নাড়িল। "তৃষ্ণা পাইয়াছে কি?" নবীন দাস কহিল, "হাঁ।" ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত মৃৎপাত্রে জল পান করিয়া নবীন দাস গৃহের এক কোণে উপবেশন করিল। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ বাপু, তুমি বোধ হয় বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে, এখানে আমার সাহায্য ব্যতীত তোমার আর রক্ষা নাই?" প্রত্যুত্তরে নবীন দাস সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিল। ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি, আমার পাছু লইয়াছিলে কেন?" নবীন কহিল "চোর-ডাকাইতের হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য।" "ভাল কথা,—আমার সঙ্গে আসিলে না কেন?" "পাছে আপনি সন্দেহ করেন। প্রভু, আমি কোন মন্দ অভিসন্ধিতে আপনার পাছু লই নাই। আপনার আশীর্ব্বাদে আমার মোহরের অভাব নাই।" নবীন এই বলিয়া কোঁচার খুঁট হইতে দশ থান মোহর খুলিয়া ব্রাহ্মণকে দেখাইল। ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "ভাল কথা। তোমাকে প্রভাতে বাদ্‌শাহী সড়কে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিব।" নবীন ব্যগ্র হইয়া কহিল, "প্রভু, সকাল হইলে কাল ঠাকুরটি যদি না ছাড়েন?" "তুমি চিন্তা করিও না। আমি এখানে থাকিতে আর কেহ তোমাকে স্পর্শ করিতে ভরসা করিবে না। এখনও প্রায় এক প্রহর রাত্রি অবশিষ্ট আছে,—তুমি কি বিশ্রাম করিতে চাহ?" বিশ্রামের নামে নবীন শিহরিয়া উঠিল; এবং কহিল, "প্রভু, বিশ্রাম করিব কি—এখানে পা ফেলিতে অন্তরাত্মা শুকাইয়া আসিতেছে। মনে হইতেছে, এখনই সাপে খাইবে,—না হয় ত উপদেবতার হস্তে প্রাণটা যাইবে।" "তবে জাগিয়াই থাক; কিন্তু ভয় পাইও না।"

হেরফের

[শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল]

১

একটা ঈজি চেয়ারের উপর শুইয়া পড়িয়া সতীশ সমস্ত দিন চুপটি করিয়া কি ভাবিতেছে,—ছুপুর বেলা কাজে পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। অমলা ছুই-একবার তাহার সহিত গল্প করিবার চেষ্টা করিয়াছে, পারে নাই। গল্পের খেই হারাইয়া গিয়া, ছুজনেই চুপ্ করিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যা-মুখে অমলা তাহার নিকটে আসিয়া বসিল; কহিল, সমস্ত দিনটা তুমি এমনধারা বিমর্ষ হয়ে রয়েছে কেন, বুঝতে পারছিনে।

সতীশ হাই তুলিতে-তুলিতে কহিল, সে অনেক কথা, নাই বা শুনলে অমলা!

অমলা কহিল, ভাবনার যদি কোনও কারণ হ'য়ে থাকে, ত সেটা ছুজনের মধ্যে ভাগ করে নিলে, অনেকটা হাল্কা হয়ে যাবে।

সতীশ খানিকটা চুপ্ করিয়া থাকিল; তাহার পর কহিল, ঐ ব্যবসা!

ব্যবসায়ে দিনকতক হইতে অসুবিধা যাইতেছিল, অমলা তাহা জানিত; কহিল, মানুষের সবদিন সমান যায় না। আজ সুবিধে হ'চ্ছে না, কাল্ হবে, তার জন্যে ভেবে কি হবে!

সতীশ কহিল, অমলা তুমি জান না অবস্থা কিসে দাঁড়িয়েছে। তোমাকে এতদিন কোন কথাই বলিনি।

অমলা তাহার দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

সতীশ বলিল, এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, কালই যদি হাজার পাঁচেক টাকা না পাই, ত আর কিছুতেই সামলাতে পারবোনা। বাজারে এই হাজার পাঁচেক টাকা বার ক'রতে পারলে, ফেলতে পারলে, হয় ত বা এ-যাত্রা সামলে যেতে পারি; কিন্তু ওটা কাল-পরশুর মধ্যে চাই, নইলে সব যাবে। আমার ওপর ব্যবসার বিশ্বাস বজায় রাখতে হোলে ওটা অবিলম্বে চাই; বিশ্বাস বজায় না রাখতে পারলে, ব্যবসাদারের ভবিষ্যৎ তাসের ঘরের মত এক মুহূর্ত্তে ফেঁসে যায়!

অমলা হাসিবার মত মুখ করিয়া কহিল, পাঁচ হাজার টাকা! সে ত আমার গহনাগুলো বিক্রী করলেই হয়!

সতীশ খানিকটা চুপ্ করিয়া রহিল; তাহার পর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, অমলা, তাও বাকি নেই। ওই লোহার সিন্দুক খুলে দেখ, একটি গহনাও আর নেই। এই ৫।৭ দিনের মধ্যে সব শেষ করেছি। ভেবেছিলাম তোমাকে জানাব না; ইতিমধ্যে সামলে নিয়ে ওগুলোকে উদ্ধার করব। তাই জন্যে চোরের মত স্ত্রীর গহনাগুলোও নিঃশেষ করতে হয়েছে!

অমলার মুখ হইতে সমস্ত রক্ত যেন মুহূর্ত্তে সরিয়া গিয়া সাদা হইয়া গেল,—নিঃশব্দে তাহার স্বামী কি ছুর্দ্দিনের মধ্য দিয়াই নিঃসহায় চলিয়াছে, সেই কথা মনে করিয়া। জবাব কি দিবে ঠাহর হইল না। বলিল, তা বেশ ক'রেছ,—আমার গহনা যে অভাবের সময় তুমি নিয়েছ, সে ত ভালই করেছ! ওতে আবার চোর আর সাধু কি!

উত্তরে সতীশ অমলার কপালের একগোছা চুল লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে লাগিল; বোধ করি সেই অবসরে সে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগকে শান্ত করিতেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারেও চোখ ছুটা অশ্রুজলে চক্‌চক্ করিতে লাগিল। তাহার পর ছুই-একবার চেষ্টা করিয়া কহিল, অমলা, তা আমি জানতাম, এবং বোধ করি বা সেই সাহসেই আমি তোমাকে না বলেই ওগুলো নিতে পেরেছি। কিন্তু ওতেও হোল না। আরও পাঁচহাজার অন্ততঃ চাই।

অমলা কহিল, তোমার এত বন্ধু-বান্ধব—পাঁচটা হাজার টাকা কেউ দেয় না!

সতীশ কহিল, এ পড়তি কপাল প্রায় মাস-ছুয়েক ধরে চলছে। গোড়ায়-গোড়ায় এক-আধজন কিছু-কিছু দিয়েছিলেন; কিন্তু এখন সবাই স'রে দাঁড়িয়েছে। তাদের দোষ দেওয়াও চলেনা;— এই ছুনিয়া অমলা!

অমলা কহিল, পাঁচটা হাজার টাকা কোথাও পাওয়া যায় না! আমার মনে হ'চ্ছে, এর জন্যে তোমার আট্‌কাবে না,—এর যোগাড় হবেই!

সতীশ অমলার কপোল চুম্বন করিয়া কহিল, একবার শেষ চেষ্টা করতে এখুনি বেরোবো,—অমলা, তোমার এই আশার কথাটি মনে ক'রে নিয়ে যাব,—দেখি তোমার ইচ্ছার গুণে যদি সফল হই।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সতীশ বাহির হইয়া গেল।

২

সন্ধ্যা যে হইয়া গিয়াছে, এবং আলো জ্বালার দরকার, সে কথা অমলার মনেই ছিলনা। চাকর-বাকররা নীচে আলো দেয়; কিন্তু উপরের এই শুইবার ঘরে আলো দেওয়ার কাজটি অমলা নিজের জন্যই বরাবর রাখিয়াছে,—এখানে চাকরের প্রবেশ নিষেধ। সতীশ যখন চলিয়া গেল, তখন যেমন ছিল, তেমনিই অমলা মেজের উপর চুপচাপ করিয়া বসিয়া রহিল।

আলো জ্বালিবার কথা মনে হইল তখন, যখন পাশের বাড়ীর বিশ্বেশ্বরী আসিয়া দোর-গোড়ায় ডাক দিয়া কহিলেন, অমল-বৌমা, কোথায় মা, এখনও আলো জ্বালনি যে!

এই বিশ্বেশ্বরী বর্ষীয়সী বিধবা,—বেশী ভাগ কাশীতেই বাস করেন। স্বামীর অল্প জমিদারী আছে। তাহা হইতে যে আয় হয়, তাহাতে দান-ধ্যান করিয়া, এবং স্বামীর প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণার সেবা করিয়া, যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহাতে বিশ্বেশ্বরীর কাশীবাস চলে। মধ্যে-মধ্যে কাশী হইতে কলিকাতায় আসেন। বেশী দিন না থাকিতে পারিলেও, যে কটা দিন থাকেন, প্রতিবেশীদের কাছে সেই কটা দিনই উৎসবের মত বলিয়া বোধ হয়। সে ক-দিন ছোটর বড়র স্নেহ ও করুণার ধারা উৎসের মত ছুটিয়া চলে। আজ সকালে ইনি কাশী হইতে আসিয়াছেন, অমলা সে খবর পাইয়াছিল; এবং একবার তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইবে, ইহাও স্থির করিয়াছিল। কিন্তু সন্ধ্যার দিকটায় আর মনে ছিলনা।

বিশ্বেশ্বরী যখন নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন অমলা বড় লজ্জা পাইল। তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া, গড় করিয়া প্রণাম করিয়া, বসিবার আসন দিয়া কহিল, জেঠাই মা, আসুন। কবে এলেন, আজ সকালে বুঝি? -আমি যাব-যাব মনে করছিলাম—

বিশ্বেশ্বরী বাধা দিয়া কহিলেন, মা, তোমার চেহারা ত ভাল দেখছিনে,—এত শুক্‌নো-শুক্‌নো কেন? চোখ ছুটো লাল,—কাঁদছিলি না কি মা!—এই অন্ধকারে একলাটি বসে কি হচ্ছিল।

অমলা হাসিবার চেষ্টা করিল, মা, ও কিছু নয়। আমরা একরকম ভালই আছি।

বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, অমলা, পঞ্চাশ বছরের ওপর বয়স হয়েছে—আমাকে কি ফাঁকি দিতে পারিস মা! তোরা সব ভাল আছিস্, তাই দেখবার জন্যে কাশী থেকে ছুটে-ছুটে আসি,—তোদের দুঃখ কি আমার কাছে লুকোতে পারিস্? সতীশ কোথায়? তুমিই বা একলাটি ব'সে ছিলে কেন? কান্না কেন মা?

বলিয়া এমন স্নেহের সহিত অমলাকে আপনার কোলের দিকে টানিয়া আনিলেন, যে, অমলা এই স্নেহের স্পর্শে কিছুতেই নিজেকে সংযত রাখিতে পারিল না। যে মনের বেদনা সন্ধ্যা হইতে বুকের ভিতর জমাট বাঁধিতেছিল, তাহা অশ্রুরূপে টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল।

বিশ্বেশ্বরী তাহাকে বুকের ভিতর টানিয়া আনিয়া কহিলেন, বল ত মা কি দুঃখ।

অমলা খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, ব্যবসায় কি সব গোলমাল হয়েছে।

বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, তাই বুঝি সতীশ বাড়ীতে নেই। তার পর নিজে নিজেই বলিতে লাগিলেন, মার মতন মেয়ের চোখ দিয়ে যখন জল বেরিয়েছে, তখন সহজ নয়। কি হয়েছে মা?

অমলা এই প্রসঙ্গ চাপিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে কহিল, সব কথা জানিনে,—তবে শুনলাম, কাল-পরশুর মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা চাই!

বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, টাকার যোগাড় কি হয়েছে? অমলা কহিল, না, কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সেই সন্ধানেই বেরিয়েছেন। ও টাকাটা না হ'লে না কি বড় মুস্কিল।

বিশ্বেশ্বরী খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, টাকা নিয়েই যত ঝঞ্ঝাট। যখন দরকার পড়ে, তখন চারিদিকেই

যেন ওর অভাব—এটা আমি বরাবরই দেখে আসছি। তা যাক্, তোমরা সবাই ভাল আছ ত মা?

অমলা কহিল, হাঁ, একরকম ভালই। আপনি এবার কতদিন থাকবেন জেঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, তার কি ঠিক আছে মা? এই তোমাদের দেখা-শুনা করে আবার ফিরবো। বোধ করি বড় বেশী দিন নয়।

তাহার পর কহিলেন, যাই মা, রাত হ'য়ে গেল।

৩

খানিক পরে সতীশ ফিরিয়া আসিয়া চুপচাপ করিয়া বসিয়া পড়িল। অমলার বুঝিতে বাকী রহিল না, ব্যাপার কি। কহিল, সুবিধে হ'লনা বুঝি?

সতীশ কহিল, না—।

অমলা কথাটা ঘুরাইয়া লইবার জন্য কহিল, ও-বাড়ীর জেঠাইমা এসেছেন,—তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি বুঝি?

সতীশ অন্যমনস্ক ভাবে কহিল, না।

অমলা কহিল, সন্ধ্যার পর এসেছিলেন যে আমার সঙ্গে দেখা করতে!

সতীশ কহিল, হুঁ।

এমন সময়ে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। বিশ্বেশ্বরী আসিয়া ঘরে ঢুকিতে-ঢুকিতে কহিলেন, এই যে সতীশ এসেছ, —ভাল আছ বাবা?

সতীশ প্রণাম করিয়া কহিল, হাঁ জেঠাইমা।

বিশ্বেশ্বরী হাসিয়া কহিলেন, আমি বাবা তোমাদের দেখতে কাশী থেকে আসি,—আর তোমাদের এই জেঠাইমার কথা মনেই পড়েনা।

সতীশ কহিল, হাঁ জেঠাইমা, সত্যিই আমার দোষ হ'য়েছে। আজ-কাল মনও ভাল নেই। আর সময়ে-সময়ে নানারকম কাজের ফাঁসাদে বেরিয়ে যেতে হয়। এই দেখুন না, এই সন্ধ্যার সময় আজ বেরিয়ে যেতে হয়েছিল।

বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, হাঁ, আমি শুনেছি। টাকার যোগাড় কি হোল বাবা?

সতীশ একটু বিস্মিত হইয়া একবার বিশ্বেশ্বরীর মুখের দিকে, একবার অমলার পানে চাহিল। তাহার পর কহিল, না—; ওই টাকাটা—

বিশ্বেশ্বরী আঁচল হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া দিতে-দিতে কহিলেন, আমি সব শুনেছি বাবা। ও-টাকাটার জন্যে তোমার আর কষ্ট করতে হবেনা, আমার কাছে যখন আছে—

সম্মুখে বজ্রপাত হইলেও বোধ হয় মানুষে এত স্তম্ভিত হয়না। সতীশ কি বলিবে বুঝিতে পারিলনা; কহিল, জেঠাইমা!

বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, ও টাকাটা আমার যখন আছে, তখন ও তোমারই কাজে লাগুক। ওটা পড়ে ছিল বই ত' নয়।

সতীশ চুপ করিয়া রহিল। সমস্ত বুকের ভিতরটা জুড়িয়া তাহার এমন একটা আরাম বোধ হইতে লাগিল, যে, তাহার আতিশয্যে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল,—কোন কথাই মুখ হইতে বাহির হইল না।

বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, তোমার গোলমাল কেটে যাক্—তুমি চিরসুখী হও, এই আশীর্ব্বাদ করি বাবা।

হঠাৎ দুই চোখের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সতীশ বিশ্বেশ্বরীর পায়ের ধূলা লইয়া কহিল, জেঠাইমা, এই আশীর্ব্বাদ যেন সফল হয়—তা নইলে—

বিশ্বেশ্বরী সতীশের শিরশ্চুম্বন করিয়া কহিলেন, হবে বৈ কি বাবা, সার্থক হবে। আমার মন বলছে। তুমি কিছু ভেবোনা। মা অন্নপূর্ণা যে কেমন করে মুহূর্ত্তে খালি পাত্র ভরিয়ে দেন তা তিনিই জানেন।

৪

বিশ্বেশ্বরীর আশীর্ব্বাদ সফল হইয়াছিল। এই টাকাটার জোরে সতীশের ব্যবসায়ের টালটা সামলাইয়া গেল। আজ সে দুই বৎসরের কথা। এই দুই বৎসরে সতীশের ব্যবসায়ের বহু উন্নতি হইয়াছে। চঞ্চলা লক্ষ্মী-দেবীর কৃপা সতীশের সম্বন্ধে এই দুই বৎসর অচঞ্চল বলিয়াই বোধ হইয়াছে।

বাড়ীর শোভা আরও ফিরিয়াছে। এ তল্লাটে মুখুয্যে কোম্পানীর নাম জানেনা, এমন কেহই নাই।

বিশ্বেশ্বরীর সে টাকাটা সতীশ একবার ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তিনি লন নাই,—বলিয়াছিলেন

তোমারই কাছে থাক বাবা ; আমার ত' এখন দরকার নেই ;—যখন দরকার হবে দিয়ো।

টাকা হিসাবে ওটা বড় বেশী নয়, সতীশ এখন উহা বহুগুণে ফিরাইয়া দিতে পারে। কিন্তু উহা যে হৃদয়ের পরিচয় লইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে সতীশ অত্যন্ত সম্মান করে। আবার টাকাটা ফিরাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়া সে মহত্বকে অপমান করিতে তাহার সাহস হইল না।

সংসার চলিতে লাগিল। বিশ্বেশ্বরী ইদানীং আর কাশী ছাড়িয়া আসেন না ; বলেন, শেষ-কালে কি সংসারের টানে মৃত্যুটাও কাশীর বাইরে হবে !

৫

হঠাৎ কিন্তু শোনা গেল, বিশ্বেশ্বরী ফিরিয়া আসিয়াছেন। এ সংবাদ তিনি কাহাকেও দেন নাই, এবং এ আসাটা তাঁহার একান্তই সহসা হইয়াছিল।

সমস্ত দিন সহাস্য, প্রসন্ন মুখে পাড়ার যত ভাই, ভাই-পো, বোন, বোন-পোদের সঙ্গে আলাপ করিয়া, গল্প করিয়া, কাহাকেও বা বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ, কাহাকেও বা কাশীর খেলনা দিয়া তুষ্ট করিয়া, সন্ধ্যার পর বিশ্বেশ্বরী পূজায় বসিলেন।

পূজা সারিয়া বাহিরে আসিতেই, অমলা প্রণাম করিল। এই মেয়েটিকে দেখিলে বিশ্বেশ্বরীর অন্তর প্রসন্ন হইয়া উঠিত। ইহার রূপে এবং গুণে এমন একটা কোমলতা ছিল, যে, তাহাকে তাঁহার নিতান্ত আপনার বলিয়াই মনে হইত। অমলার হাত ধরিয়া তিনি আপনার বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন।

অমলা কহিল, জেঠাইমা, আপনার আসা এতই কম হয়ে গেছে যে, এই হঠাৎ আসাটা আমাদের একটা বড়-রকমের সৌভাগ্য বলেই বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এই ক'টা দিন এখানেই ঘর-বাড়ী করি।

বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, তোমরা আমাকে সত্যিই ওইরকমই ভালবাসো। কিন্তু মা, বোধ হয় আমার এখানে আসা ফুরিয়ে গেল !

অমলা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, সে কি কথা জেঠাইমা !

বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, এ কথাটা আর বাইরের কেউ জানেনা—কাউকে বলিও নি। মা, শুনলাম যে, আমার এই সামান্য সম্পত্তিটুকু না কি বিক্রী হ'য়ে যাবে। আমার গোমস্তা সেই কথা লিখে, আমাকে আসবার জন্যে তাগিদ দিয়েছিলেন। আমি ভাবলাম, এই উপলক্ষ ক'রে একবার তোমাদের সঙ্গে দেখাও ত হবে।

অমলা কহিল, বিক্রী হ'য়ে যাবে কেন ?

বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, শুনলাম, ডিক্রী হ'য়েছে হাজার চল্লিশ টাকার ; এ ডিক্রীর কথাও আবার জানতাম না।

অমলা উত্তেজিত হইয়া কহিল, জানতেন না অথচ ডিক্রী হ'য়ে গেল ! শুনেছি, সে ডিক্রী না কি রদ করা যায়। চেষ্টা করেন নি কেন ?

বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, মা, খবর পেলাম যে, ডিক্রী মিথ্যা নয়। আমার স্বামী না কি বিশহাজার টাকা ধার নিয়াছিলেন ; সেইটে সুদে-আসলে চল্লিশহাজারে দাঁড়িয়েছে। মা, ঋণ যেখানে সত্যি, সেখানে আমার ত' বলবার কিছু নেই ;—বিশেষ তাঁর ঋণ।

অমলা কহিল, শুনেছি না কি, আপনার সম্পত্তি দেবোত্তর,—অন্নপূর্ণাকে দেওয়া। তা হ'লে ত' বিক্রী হয় না।

বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, না, দেবোত্তর নয়। আর দেবোত্তর হ'লেও কি আমি ঐ কথা ব'লে তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করতুম ? না মা, ধর্ম্ম সবচেয়ে বড়। ফাঁকি দিয়ে খানিকটা সম্পত্তি বাঁচিয়ে যেতে হয় ত পারতাম ; কিন্তু তাঁর ঐ ঋণের বোঝাটা যে ইহকালে-পরকালে, তাঁকে-আমাকে নিয়তই নরকের দিকে টানত,—তার কি উপায় করতুম ? না মা, এ ভালই হ'য়েছে যে, যার পাওনা সে নিজেই চেষ্টা ক'রে তার উদ্ধারের উপায় করেছে। বলিয়া বিশ্বেশ্বরী হাসিলেন।

অমলা কহিল, না হয় হাজারচল্লিশ টাকা দিয়ে সম্পত্তিটা রক্ষা করুন না ?

বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, মা, ভুলে গিয়েছিস এরি মধ্যে ! পাঁচহাজার টাকার জন্য সতীশের মত ছেলেকে কত কষ্টই সহ্য করতে হয়েছিল ? আমি বিধবা,—কে দেবে মা আমাকে চল্লিশহাজার টাকা ? কার কাছে হাত পাততে যাব মা ?

অমলা কহিল, কেন, আপনার কাছে কি কিছুই নেই ? আমাদের কাছে সেই পাঁচহাজার টাকা,—আরও কোনও রকম ক'রে—

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, আমার কাছে হয়-ত যৎ-সামান্য

আছে; আর সেই পাঁচহাজার টাকা! সে-টা ত আর চল্লিশ-হাজার নয় মা! ও টাকায় উপস্থিত কোন লাভ হবে না। ওটা বরং তোমাদের কাছেই থাক্; —এর চেয়ে যদি দুর্দ্দিন আসে, ত তখন সেটা দিও।

অমলা কহিল, জেঠাইমা, কি জানি কেমন আপনার মন! জেঠা-মহাশয়ের এই সম্পত্তিটা বিক্রী হ'য়ে যাচ্ছে শুনে, আমার যে কি কষ্ট হ'চ্ছে, তা কি বলব!

বিশ্বেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, কষ্ট যে আমারও হয়নি, তা বলতে পারিনা। কিন্তু তাঁর ঋণকে বজায় রেখে, তাঁর সম্পত্তি ভোগ করা—এ যে আমার একদিনও রুচবে না মা! শুনছি, পরশু দিন না কি ওটা বিক্রী হবে। একটু কষ্টও হচ্ছে; কিন্তু পরলোকগত তাঁর যে এই ধারটা শোধ হ'য়ে যাবে, এই কথা ভেবে মন যেন অনেকটা খোলসা হচ্ছে।

অমলা কহিল, তার পর আপনি কি করবেন?

বিশ্বেশ্বরী আবার হাসিলেন, বলিলেন, যা করছিলাম তাই! পরশু দিন কাশী ফিরে যাব। আর বাকী এই কটা দিন শুদ্ধ-মাত্র আমার অন্নপূর্ণার কাছে কাটিয়ে দেবো। আর দেখ্ মা, এইটেই যেন আমার বেশী সত্যি বলে মনে হ'চ্ছে। যে মনে বিধবা, তার বাইরের এই বিলাসের সরঞ্জামটা ত' এক দিনের জন্যেও মানাত না! সেটা খসে যাওয়াই বোধ হয় ঠিক হোল। আমার কি ভাবনা? তোরা রয়েছিস্, মা অন্নপূর্ণা র'য়েছেন;—তাঁকে ত কেউ বিক্রী করতে পারবেনা! বলিয়া একমুখ হাসিলেন। তাহার পর বলিলেন, মা, রাত হ'য়ে গেল,—যাও, শোওগে। এ দুদিন ত' দেখা হবে।

৬

আজ বিক্রীর দিন। সকাল হইতে আজ আর বিশ্বেশ্বরীর অবসর নাই। কাল কাশী যাইতে হইবে,—ভোর বেলা হইতে বাঁধা-ছাঁদা আরম্ভ হইয়াছে। এবার একটু বিশেষত্ব আছে; কারণ, অধিকাংশ জিনিসই যাইবে। স্বামীর ব্যবহারের খড়ম্‌টুকু হইতে বিছানা পর্য্যন্ত কিছুই থাকিবেনা। এই সর্ব্বরিক্তা নারীর মায়া সব জিনিসকে কাটাইয়া, অবশেষে এই সামান্য পদার্থগুলিতে কি করিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, কে জানে!

গোমস্তা সকাল হইতে কাঁদিয়া অস্থির; কিন্তু বিশ্বেশ্বরীর মন ও-দিকেও পরিপূর্ণ ছিল; কেন না, নূতন মালিক বলিয়াছেন যে, গোমস্তাকে পূর্ব্ববৎ তিনি চাকুরীতে রাখিবেন।

প্রিয়জনের মৃত্যুর সময় সন্ন্যাসীর শ্মশানে যে মনের ভাব হয়, বিশ্বেশ্বরীর বোধ করি কতকটা সেইরূপ হইতেছিল। পুরাতন কাহিনীর এই স্মৃতিটুকু মুছিয়া গিয়া, নূতন সব্ব-রিক্ত জীবন আরম্ভ হইবার সন্ধি-সময়ে, মন ক্ষণে-ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতেছিল।

গোমস্তা যখন কাছারী চলিয়া গেল, তখন বিশ্বেশ্বরী পূজার ঘরে প্রবেশ করিলেন। দুঃখেরই হোক সুখেরই হোক—এ দুর্লভ সময় তিনি আর কোথাও যাপন করিতে পারেন না।

দেবতার কাছে মাথা নত করিয়া কহিলেন, মা, এই যদি ভাল হয় ত, মনকে শান্ত কর, স্তব্ধ কর। তুমি যা করেছো, যা করবে,—তাই সবচেয়ে মঙ্গল,—সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে এই কথাটাকে সত্য ক'রে তোলবার শক্তি আমাকে দেও।

* * * * * *

বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে। ইতিমধ্যে অমলা কয়েকবার আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে,—বিশ্বেশ্বরীর ধ্যান ভাঙ্গাইতে সাহস করে নাই। এবার সে দুয়ারের নিকটে আসিয়া ডাকিল, জেঠাইমা!

বিশ্বেশ্বরী দুয়ার খুলিয়া বাহির হইলেন। শিশির-ধোয়া পদ্মের মত তাঁহার মুখ-শ্রী অপূর্ব্ব দিব্য শোভা ধারণ করিয়াছিল। অমলাকে দেখিয়া কহিলেন, মা যে!

অমলা কহিল, জেঠাইমা, কতবার এসে ফিরে গেলাম, একটা কথা বলবার জন্যে;—তা' আপনার পূজো আর শেষ হয় না।

বিশ্বেশ্বরী হাসিয়া কহিলেন, কি কথা মা?

অমলা কহিল, কথা এই যে, আপনার কাল কাশী যাওয়া হয়না,—আমি স্বপন দেখেছি!

বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, শোন কথা! কাল যে আমাকে যেতেই হবে; সব স্বপন কি সত্যি হয় মা!

অমলা কহিল, কি জানি। আমার মনে হচ্ছে যে, এ স্বপন নিশ্চয়ই সত্যি হবে।

বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, কপাল আমার! তোরা আমাকে এত ভালবাসিস্—

এমন সময় অদূরে জুতার প্রবল আওয়াজ এবং ভাঙ্গা গলায় মা—মা শব্দে, বিশ্বেশ্বরী ত্রস্ত হইয়া চাহিতেই, জুতা চাদর এবং জামা সমেত গোমস্তা তাঁহার পায়ের নিকট সটান দণ্ডবৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, "মা, উদ্ধার হ'য়েছে - সব উদ্ধার হোল।"

বিস্মিত বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, কি, কি হোল, বুঝতে পারছিনে!

গোমস্তা প্রায় অদ্ধেক কাঁদিতে-কাঁদিতে কহিল, বিক্রী হোল না মা,—বেঁচে গেল।

বিশ্বেশ্বরী আরও বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কি ক'রে, কি ক'রে বাচলো!

গোমস্তা উঠিয়া বসিয়া সামলাইয়া কহিল, মা, সতীশ বাবু দিয়াছেন,—সব টাকা,—চল্লিশ—হাজার টাকা গুণে!

বিশ্বেশ্বরী ধীরে-ধীরে সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। জলভরা মেঘের মত তাঁহার সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার পর দুই শান্ত, কমনীয় চোখ হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। অনেকক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া, গোমস্তাকে যাইতে বলিলেন। তাহার পর ধীরে-ধীরে অমলাকে আপনার বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া, বারবার চুম্বন করিয়া কহিলেন, মা, অল্প বয়সে লোকে কত স্বপন দেখে, যা মিথ্যে হয়। কিন্তু আজ আমি সত্যিকার আশীর্ব্বাদ করছি, যেন তোমার প্রত্যেক সোণার স্বপন আজকার মত সত্যি হয়ে ওঠে!

এমন সময়ে সতীশের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল; সে চাকরদের তাগিদ করিয়া বলিতেছে,—খোল্ ব্যাটারা, বিছানা-প্যাটরা খোল্! না, জেঠাইমার এখন কাশী যাওয়া হবে না।

আপনার মনে মনে বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, না, বাবার এ আনন্দের তুলনা কোথাও নেই। তাহার পর ডাকিলেন, সতীশ!

সতীশ আসিয়া দাঁড়াইল। আনন্দে তাহার মুখ লাল হইয়া গিয়াছিল।

বিশ্বেশ্বরী হাসিয়া কহিলেন, ধার শোধ করলে বাবা?

সতীশ কহিল, এমন অসচ্চেষ্টা আমার কোনও দিনই নেই জেঠাইমা! সে পাঁচহাজার টাকা যে কত সহস্র গুণ হ'য়ে আমার বুকের ভিতর বসে গিয়েছে, তার ঠিকানা নেই। তাকে শোধ করতে চেষ্টা করলে, হয় ত বা সমস্ত অন্তরটাই ছিঁড়ে বার করতে হয়।

বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, তবে অতগুলো টাকা জলেই ফেলে দিলে?

সতীশ কহিল, তাও নয় জেঠাইমা! হয়ত' বা আপনার কাছে হ'তে পারে, কিন্তু এই সম্পত্তিটুকু বাঁচান যে আমাদেরই কর্ত্তব্য, আমাদেরই লাভ! ও-টুকু না থাকলে, আর আপনি এখানে না থাকলে, সে-দিনকার আমার মত শত শত দুভাগাদের শূন্য ভিক্ষা পাত্র কে ভরে দিতে পারবে জেঠাই মা? ওই লক্ষ-লোকের চিহ্ন-জোড়া ছোট সম্পত্তিটুকু, আর আমাদের দুনিয়ার এই জেঠাই মা, এদের ত' আমরা ছাড়তে পারিনে।

বিশ্বেশ্বরী চোখের জল মুছিতে মুছিতে কহিলেন, না সতীশ, তোর সঙ্গে কথায় আমি পারবনা। তারপর বারংবার শিরশ্চুম্বন করিয়া কহিলেন, বাবা, বোধ করি আমার মনে এখন এতটুকু মিথ্যার জায়গা নেই, আমি আমার এই মনের সমস্তটা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি এমনি ক'রে চিরসুখী হও, চিরজীবি হও।"

চোখের জল ঢাকিতে ঢাকিতে সতীশ কহিল, তা হ'লে কাশী যাওয়াটা—

বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, হাঁ বাবা, সে এখন আপাততঃ স্থগিত রৈল, কেননা আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার দেখা এইখানেই আজ পেলাম, বলিয়া অমলাকে আর একবার চুম্বন করিলেন।

নিতায়ের দন্ত-শূল

[অভিনেতা—শ্রীতারকনাথ বাগচী]

১। প্রথম দৃশ্য

দাদা। ও কি নিতাই—মাথায় ফেট্টি বাঁধা যে ?

নিতাই। আর না—ঠাকুর,—গেলাম ;—দন্তশূল।

দাদা। ওঃ দন্তশূল ? ঐ দন্তশূলেই আমার শ্বশুর—বুঝলে কি না—

নিতাই। তা বুঝেছি—

দাদা। আচ্ছা, চল আমার সঙ্গে ডাক্তারের কাছে—মস্ত বড় ডাক্তার—এনার ছি পি মার শেষ (L. R. C. P., M. R. C. S.)

২। দ্বিতীয় দৃশ্য

ডাক্তার। কি হয়েছে তোমার ?

নিতাই। দন্তশূল ;

ডাক্তার। দাঁত তোলাতে এসেছ ?

নিতাই। আজ্ঞে হাঁ, ডাক্তার বাবু!

৩। তৃতীয় দৃশ্য

ডাক্তার নড়া-দাঁত না তুলিয়া ভুলক্রমে কাঁচা দাঁত তুলিয়া দিল।

৪। চতুর্থ দৃশ্য

নিতাই যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মনে মনে ডাক্তারের মুণ্ডপাত করিতেছে।

বৃন্দাবন-কথা

[শ্রীহরেন্দ্রকুমার সাহা]

তীর্থদর্শন হিন্দুজীবনের চিরকাম্য। কিন্তু তীর্থ-দর্শনোপযোগী করিয়া মনকে গঠিত করিতে না পারিলে, সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত তীর্থদর্শন তো হয়ই না, হয় কেবল স্থান-দর্শন; হয় কেবল বৃহৎ বৃহৎ মন্দির ও স্থানীয় কীর্ত্তি দর্শন। আমি বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সত্য; কিন্তু আমার হৃদয়ে বৈষ্ণবের চিরবাঞ্ছিত ভক্তি জিনিসটির বড়ই অভাব।

বড়দিনের ছুটী উপলক্ষে ৺কাশীধাম হইতে শ্রীশ্রীবৃন্দাবন

১। প্রেম মহাবিদ্যালয়—অভ্যন্তর দৃশ্য

ধাম দর্শন করিতে যাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার হৃদয় ভক্তিহীন,—আমার প্রাণ শুষ্ক মরু-সদৃশ; সুতরাং শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধামের সৌন্দর্য্য দেখিবার মত মন ও চক্ষু আমার নাই। এখানেও আমি ইট-পাথরের বাড়ী, বৃক্ষ-লতা, ও রাস্তা-ঘাট, যেরূপ অন্যত্র দেখিয়া থাকি, সেইরূপই দেখিতেছি। এই ধামের বিশেষত্ব আমার মত ভক্তিহীন প্রাণে উপলব্ধি করিবার বিষয়ীভূত নহে। যে বৃন্দাবন-রজে গড়াগড়ি দিয়া বৈষ্ণবগণ নিজকে কৃতার্থ মনে করেন,—যে রজ সম্বন্ধে ব্রজবাসিগণ বলেন,

"ধূলা নয় ধূলি নয়, গোপীর পদের রেণু,
সেই ধূলা মাখে চাখে, নন্দের বেটা কানু।"

আমার চক্ষে সেই রজ কেবল মাত্র ধূলিরাশি! যে কালিন্দী যমুনা দর্শনে বৈষ্ণবগণ প্রেমানন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠেন, আমার চক্ষে তাহা কেবল মাত্র একটি নদী। যে যমুনা-পুলিন দর্শনে প্রেমিক ভক্তগণ "শ্রীভগবান এই স্থানে শরচ্চন্দ্রোৎফুল্ল রজনীতে গোপীগণ-সহ রাস-নৃত্যাদি কত কি মধুর লীলা করিয়াছেন" মনে করিয়া আনন্দে দিশাহারা হন, এবং অবিরত প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে থাকেন, আমার চক্ষে তাহা নদী-সৈকত মাত্র। আমাদের বাসাবাটীর পার্শ্বেই "বংশীবট" বৃক্ষ। এই বৃক্ষ-মূলে দাঁড়াইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনিতে ব্রজ-গোপীদিগকে একত্র করিয়া রাসলীলার

সূচনা করিয়াছেন। সেই বংশীবট দেখিয়া আমার মনে কোন ভাবের উদয় হয় না,—এমনই পাষণ্ড মন আমার। এই স্থানে প্রত্যহ বেলা নয়টা হইতে এগারটা পর্য্যন্ত একটি "কৃষ্ণ" এবং কয়েকটী 'গোপী' সাজাইয়া রাসনৃত্য এবং গীত হইয়া থাকে। ইহাদের নৃত্য-ভঙ্গি এবং গান বড়ই মধুর। যাহারা এই নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে, তাহাদিগকে 'রাসধারী' বলা হইয়া থাকে। এই স্থানের পশ্চিমে 'ধীর সমীর'। এখানে শ্রীভগবান গোপীগণ সহ যমুনার সুশীতল বায়ু সেবন

২। প্রেম মহাবিদ্যালয়—অধ্যাপকবৃন্দ

৩। চন্দ্র-সরোবর—গোবর্দ্ধন
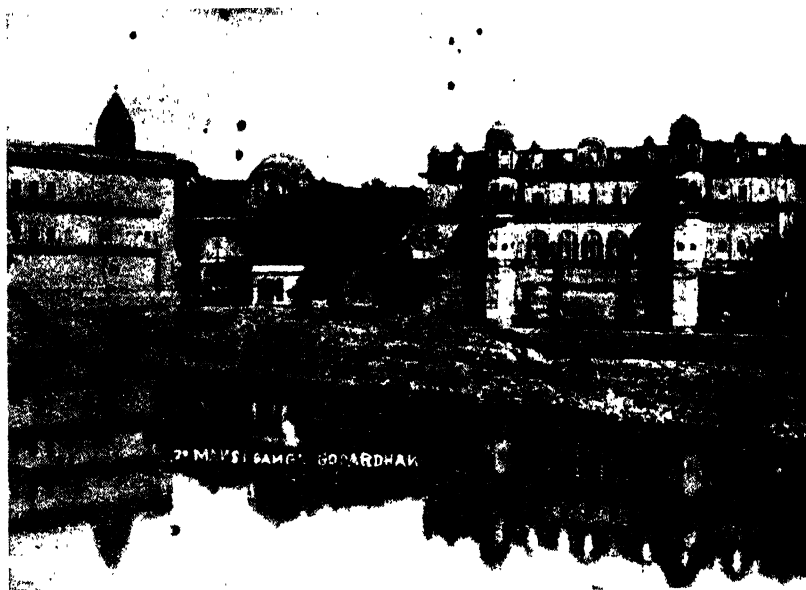
৪। মানসী গঙ্গা—গোবর্দ্ধন

৫। শেঠদিগের মন্দির—বৃন্দাবন

করিতেন। ভগবানের পদরেণু অঙ্গে লেপন মানসে প্রেমিক ভক্তগণ এইস্থানে পরম ভক্তিভরে গড়াগড়ি দেন। এই সমুদায় দেখিয়াও আমাদের মত ভক্তিহীন প্রাণে নানা তর্কের উদয় হয়। মনে হয়, ভগবানের লীলা—সে তো সহস্র-সহস্র বৎসরের কথা। কালক্রমে হয় তো উচ্চ ভূমি নিম্ন হইয়াছে, এবং নিম্ন ভূমি উচ্চ হইয়াছে; সুতরাং গোপীগণের এবং শ্রীভগবানের পদরেণু এ স্থানে এখন থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? অতএব দেখা যাইতেছে, মন গঠিত না হইলে শ্রীবৃন্দাবনে আসাতে কোন লাভ হয় না। যাহা হউক, যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বিবৃত করিবার প্রয়াস পাইব।

অনেকেই ব্যয় করিতে পারেন; কিন্তু ভাগ্যে না থাকিলে যথার্থ বৃন্দাবন দর্শন হয় না। তবে কি এ ভাগ্যহীনের যথার্থ ই বৃন্দাবন-দর্শন হইল না?

ব্রজভূমি ৮৪ ক্রোশ ব্যাপী; লীলাস্থলও বহু। বোধ হয় ক্রমাগত তিনমাস কাল পর্য্যটন ও ভ্রমণ করিলে, প্রধান-প্রধান স্থানগুলি দর্শন করা যায়। এখান হইতে তিনটি দর্শনীয় স্থানে রেলে যাতায়াত করা যায়; যথা, মথুরা, বর্ষাণ (বৃষভানু মহারাজার বাড়ী), নন্দগ্রাম (নন্দ মহারাজার বাড়ী)। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানে পাল্কী, ডুলি অথবা পদব্রজে যাতায়াত করিতে হয়।

৬। রাধাকুণ্ড—শ্যামকুণ্ড

এখানকার ব্রজবাসী বালকগণ দুই একটি পয়সার জন্য যাত্রিগণের সঙ্গে-সঙ্গে

"শ্যাম কুণ্ড রাধা কুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন,
মধুর মধুর বংশী বাজে এই সে বৃন্দাবন।"

বলিতে-বলিতে যায়। তাহাদের চেহারা সুন্দর এবং কণ্ঠস্বর অতি মধুর। ইহারা যেন উপরিউক্ত কবিতাটি বলিয়া ভক্তিহীন বিস্মৃত জীবকে মনে করাইয়া দেয় যে, তোমরা সেই বৃন্দাবনে আসিয়াছ, যে বৃন্দাবনে জীব বহু ভাগ্যোদয় না হইলে আসিতে পারে না। রেলের মাশুলের টাকা কয়টা

বৃন্দাবন সহরে পূর্ব্বে সাড়ে-পাঁচহাজার ঠাকুর-বাড়ী ছিল বলিয়া শুনা যায়। এক্ষণে সেই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যে সকল বিগ্রহ দর্শন করা একরূপ অসম্ভব। বলিতে গেলে, বৃন্দাবন-ধামে প্রায় সকল বাড়ীতেই বিগ্রহ আছেন।

বৃন্দাবন-ধামের প্রধান-প্রধান মন্দিরগুলির সম্যক্ তথা লেখা আমার ক্ষমতার বহির্ভূত। হিন্দুস্থানের প্রধান-প্রধান রাজা-মহারাজাদের মধ্যে প্রায় সকলেই শ্রীধামে দেবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহাদিগের ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় প্রদান

করিয়াছেন। এ স্থানে এত অধিক সংখ্যক দেবালয় আছে বলিয়াই, এই স্থানকে ইংরেজী ভাষায় city of temples বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। মন্দিরগুলির মধ্যে

৭। প্রেম মহাবিদ্যালয়—বহির্দৃশ্য

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জিউ, শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউ, শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন জিউ, শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর জিউ, শ্রীশ্রীরাধাদামোদর জিউ, শ্রীশ্রীরাধারমণ জিউ, এবং শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ জিউ,—এই সাতটী মন্দির বৈষ্ণব মহাত্মগণ কর্ত্তৃক প্রধান দেবালয় মধ্যে গণ্য। তাহার কারণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ এবং পরিকরগণ কর্ত্তৃক এই সকল সেবা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীবৃন্দাবনের রাধাগোবিন্দ জিউর স্থাবর সম্পত্তির আয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; বলিতে গেলে, বৃন্দাবন সহরটিই এই সম্পত্তির অন্তর্গত। জয়পুরের মহারাজা মুসলমান বাদশাহদিগের
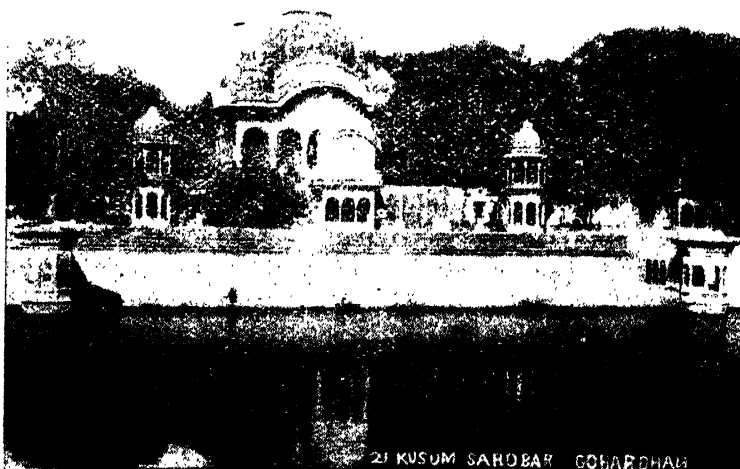
৮। কুসুম সরোবর—গোবর্দ্ধন

অত্যাচার-ভয়ে ভীত হইয়া, গোবিন্দজিউ, গোপীনাথজিউ ও মদনমোহনজিউকে জয়পুরে লইয়া গিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু সম্পত্তি পূর্ব্ববৎ এখানকার মন্দিরের অধীনই ছিল এবং এখনও আছে। বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, স্থাবর সম্পত্তির এত আয়; তদুপরি ভেটের প্রচুর আয় থাকা সত্বেও, শ্রীরাধাগোবিন্দজিউর সেবার কোন পারিপাট্য নাই। সম্ভবতঃ সেবাইত গোস্বামীদিগের অনবধানতার ফলেই এরূপ হইতেছে। শুনিতে পাইলাম, পূর্ব্বে বৃন্দাবনে মুসলমানের

। আচার্য্যকুল—ছাত্রবৃন্দ

১০। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—বৃন্দাবন

বাস ছিল না। কিন্তু রাধাগোবিন্দজিউর সেবাইত গোস্বামীগণ অর্থলোভের বশবর্ত্তী হইয়া, কতকগুলি মুসলমান প্রজা মন্দিরের অদূরেই বসাইয়াছেন, এবং অল্পদিন হইল তথায় একটী মসজিদও নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

কেহ রাধাগোবিন্দজিউর প্রসাদ পাইতে ইচ্ছা করিলে, তাহাকে এক টাকা এক আনা দিতে হয়, কিন্তু এখানকার অনেক ঠাকুর-বাড়ীতে তিন আনা মূল্যেও ঐরূপ প্রসাদ পাওয়া যায়। উপরিউক্ত এক টাকা এক আনা মূল্যের প্রসাদে একজনের উদর পূর্ণ হয়; কিন্তু অপর দেবালয়ের তিন আনা মূল্যের প্রসাদে দুইজনের বেশ হয়। বাঙ্গালী যাত্রী গেলেই ভেটের জন্য বিশেষ পীড়া-পীড়ি হইয়া থাকে; এবং সাধারণতঃ প্রত্যেক যাত্রীকে পাঁচ টাকা হইতে চারি আনা ভেট দিতে হয়। গোবিন্দজিউকে যে ভেট করা হইবে, গোপীনাথজিউ ও মদনমোহনজিউকেও সেই ভেট করিতে হইবে। এইরূপই নিয়ম। শ্যামসুন্দরজিউ এবং রাধাদামোদর জিউকে এক আনা করিয়া ভেট করিতে হয়। রাধারমণ জিউ এবং রাধাবিনোদ জিউর কোনরূপ ভেটের দাবী নাই; অর্থাৎ ভেট করা বা না করা যাত্রিগণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যে দুইটী দেবালয়ে ভেট নাই, তন্মধ্যে রাধারমণ জিউর সেবার পারিপাট্য অতি সুন্দর। এরূপ একটি সেবা আর কোথাও আছে কি না জানি না। গোস্বামী মহাশয়েরা নিজ-হস্তে ভোগ রন্ধন, পূজা এবং শৃঙ্গারাদি অর্থাৎ বেশভূষাদি করিয়া থাকেন। অন্যান্য অধিকাংশ দেবালয়ে এই সকল কার্য্য বেতনভোগী পূজারী ব্রাহ্মণ দ্বারা হইয়া থাকে। রাধারমণ জিউর দেবালয়ের সংশ্লিষ্ট রান্নাঘরে অপর কোন ব্রাহ্মণ, এমন কি গোস্বামী মহাশয়দের নিজ-বাটীর স্ত্রীলোকগণকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। শ্রীশ্রীরাধারমণ জিউর প্রতি গোস্বামী মহাশয়দের ভক্তির তুলনা নাই। এই সেবা শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীপাদ স্থাপন করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার পরিবারবর্গ সেবা চালাইতেছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে বর্ত্তমান কালে শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামীপাদ এবং শ্রীযুক্ত দামোদরলাল গোস্বামীপাদ ভক্তিশাস্ত্রের এবং ষড়্-দর্শনের অদ্বিতীয় পণ্ডিত। যে মহাপ্রাণ ভক্তগণ বৃন্দাবন-দর্শনে আসিবেন—আমার অনুরোধ তাঁহারা যেন এই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হ'ন। এমন নৃত্যশীল, মধুর, ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি জীবনে আর দেখিব না। প্রবাদ আছে, এই ঠাকুর পূর্ব্বে শালগ্রাম-মূর্ত্তিতে বিরাজমান ছিলেন। মহাত্মা গোপাল ভট্ট গোস্বামী আপন অভীষ্ট দেবতাকে উত্তম-উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিতে না পারায়, সর্ব্বদা অতি মনঃকষ্টে কালাতিপাত করিতেন। ভক্তপ্রাণ ভগবান ভক্তের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, একদা শালগ্রাম মূর্ত্তি হইতে দ্বিভুজ, মুরলীধর, ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়া, ভক্তের মনের বাসনা পূর্ণ করেন; এবং তদবধি সেই মূর্ত্তিতেই বিরাজ করিতেছেন।

এখানে আর একটি প্রাচীন বিগ্রহ আছেন। বাঙ্গালীরা ইঁহাকে "বঙ্কুবিহারী" বলিয়া থাকেন। ব্রজবাসী ও হিন্দুস্থানিরা বলেন, বাঁকেবিহারী এবং "বিহারীজি"। ইঁহার মূর্ত্তি অতি চমৎকার! এমন উজ্জ্বল কালোবর্ণের প্রস্তরময় মূর্ত্তি আমি কুত্রাপি দেখি নাই। মূর্ত্তিটি এত কাল এবং এত উজ্জ্বল যে, কিছুক্ষণ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া থাকিলে চক্ষু ঝলসাইয়া যায়। বিশেষ-বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে, বিশেষতঃ "হোরী"র দিন, ইঁহাকে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করা হয়। তখন ইঁহার দর্শন অপরূপ হইয়া থাকে। বঙ্কুবিহারীর দর্শনের একটু বৈচিত্র্য আছে। দিবা-রাত্রিতে মাত্র দুইবার দর্শন পাওয়া যায়। দিবাভাগে বেলা এগারটা হইতে সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত, এবং রাত্রি আটটা হইতে সাড়ে আটটা অবধি দর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু এই অর্দ্ধ ঘণ্টা কালও অবিচ্ছেদে দর্শন পাওয়া যায় না। এক কি দুই মিনিট কাল মূর্ত্তি দর্শন করিতে দেয়; এবং তৎপরে অর্দ্ধ কিম্বা এক মিনিটের জন্য পরদা টানিয়া আড়াল করিয়া দেয়। এই ভাবে বঙ্কুবিহারীজিউর দর্শন পাওয়া যায়। লোকে বলে, অনিমেষ-নয়নে বেশীক্ষণ দর্শন করিলে, চক্ষুর জ্যোতিঃ নষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কায় এইরূপ দর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে। মূর্ত্তির জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া এ প্রবাদ সত্য বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জিউর পুরাতন মন্দির একটি অদ্ভুত কীর্ত্তি ছিল, সন্দেহ নাই। এই মন্দির সপ্ততল এবং নয়টি চূড়া-বিশিষ্ট ছিল। মধ্যস্থলের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় সওয়া মণ ঘৃতের একটি প্রদীপ প্রতি রাত্রিতে প্রজ্বালিত হইত। প্রবাদ আছে যে, আরঙ্গজেব বাদশাহ আগরার প্রাসাদ

হইতে উপরিউক্ত উজ্জ্বল আলো দেখিতে পাইয়া, অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, উহা বৃন্দাবনের গোবিন্দ জিউর মন্দিরের চূড়ার আলো। তিনি তদ্দণ্ডেই ঐ মন্দির ভাঙ্গিয়া দেওয়ার আদেশ করিলেন। ঐ আদেশ জয়পুরের মহারাজা জানিতে পারিয়া, গোবিন্দ জিউ, গোপীনাথ জিউ ও মদনমোহন জিউকে জয়পুর লইয়া যান। এ দিকে বাদশাহের ফৌজ কামান লইয়া আসিয়া, মন্দিরের উপরকার পাঁচতলা ভাঙ্গিয়া দিয়া যায়। তাহারা যে দয়া করিয়া নীচের অংশটা রাখিয়াছিল, ইহা হিন্দুদিগের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। আজ যদি ঐ মন্দির অক্ষত অবস্থায় থাকিত, তাহা হইলে উহা ভারতের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ মন্দির বলিয়া কীর্ত্তিত হইত; এবং কারুকার্য্য হিসাবে বোধ হয় আগরার তাজমহলের নীচেই স্থান পাইত। মন্দিরের যে অংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা দেখিলেই চমৎকৃত হইতে হয়। এরূপ একটি বিরাট মন্দিরগাত্রে কি অদ্ভুত কারুকার্য্যই খচিত হইয়াছিল। মন্দিরটি লাল পাথরে প্রস্তুত। উচ্চতায় তাজমহল অপেক্ষাও অধিক ছিল। যে অংশ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা বহু পুরাতন হইলেও, এখনও নূতন বলিয়া বোধ হয়। কত অর্থই যে এই মন্দির-নির্ম্মাণে ব্যয় হইয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৃন্দাবন প্রত্যাগত কাহারও মুখে এই মন্দিরের বিষয় শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। অথচ বৃন্দাবনে স্থাপত্য-বিদ্যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইতেছে গোবিন্দ জিউর এই পুরাতন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। জয়পুরের মহারাজা মানসিংহ এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মন্দিরটি নির্ম্মাণের বিশেষত্ব এই যে, চতুর্দ্দিক হইতেই মন্দিরাভ্যন্তরে আলো এবং বায়ু প্রবেশের সুন্দর বন্দোবস্ত রহিয়াছে।

মথুরানিবাসী যশস্বী লছমীপতি শেঠের মন্দির, যাহা শ্রীরঙ্গ জিউর মন্দির নামে খ্যাত, ৫৬ ছাপান্ন লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের বহিপ্রাচীরের পরিধি এক মাইলের অধিক। অভ্যন্তরের মূল মন্দিরটি তিনটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রাচীরগুলি সমস্তই প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং অতিশয় উচ্চ। কলিকাতায় এইরূপ উচ্চ প্রাচীর নাই। উচ্চতার তুলনা আলীপুর জেলের প্রাচীরের সহিত দেওয়া যায়; কিন্তু সৌন্দর্য্যের তুলনা কাহার সহিত দিব? এই মন্দিরের "সোণার তালগাছের" কথা বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছিলাম। তখন মনে হইত, তীর্থস্থানে বিশেষতঃ দেবমন্দিরে, ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য "সোণার তালগাছ" প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্য অথবা আবশ্যকতা কি? এতদিনে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন হইল। দেখিয়া বুঝিলাম, উহা "তালগাছ" অথবা তদাকার-বিশিষ্টও নহে। উহা একটি স্বর্ণ-মণ্ডিত স্তম্ভবিশেষ—"অরুণ-স্তম্ভ" নামে খ্যাত। প্রবাদ, স্তম্ভটি সাড়ে বার মণ স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত। ইহারই সন্নিকটে আরও একটি ছোট স্তম্ভ আছে; উহা সওয়া মণ স্বর্ণের দ্বারা মণ্ডিত। বড় স্তম্ভটিকে যাত্রীরা "তালগাছ" কেন বলেন, জানি না; অথবা তাঁহারা যে উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনে আসেন, তাহাই করিয়া থাকেন,—এই সমুদয় খুঁটিনাটি লইয়া থাকেন না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার চক্ষে ইট-পাথরের বাড়ী-ঘর, গাছ পালা ইত্যাদিই পড়িতেছে,—তাহাই দেখিতেছি; সুতরাং "তালগাছ" কি অরুণ-স্তম্ভ ইহা লইয়াই আমি ব্যস্ত বেশী। মূল মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে বহুসংখ্যক বিগ্রহ আছেন; আমি তাহার সংখ্যা করিতে পারি নাই। এই মন্দিরে এখন দৈনিক ২০০৲ দুইশত টাকার ভোগ হইয়া থাকে। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে মিউনিসিপালিটির রাস্তার পূর্ব্বে শেঠজীর বাগান 'রাধাবাগ।' ইহা একটি অপূর্ব্ব বাগান। ইহার সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। বাগানের বাহিরের এবং অভ্যন্তরের তাপের (Temperature) সর্ব্বদাই বোধ হয় ৪।৫ মান (Degree) তারতম্য থাকে। রৌদ্রে ভ্রমণ করিয়া ক্লান্ত-দেহে এই বাগানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলে, অতি শীঘ্রই ক্লান্তি দূর হইয়া যায়। কলিকাতার ইডেন্ (Eden) উদ্যানের সহিত তুলনায় এই বাগানই রমণীয়তায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। উদ্যানের মধ্যেও সুবৃহৎ ঠাকুর-বাড়ী আছে। বিশেষ-বিশেষ উৎসবে শ্রীরঙ্গজী এই উদ্যান-স্থিত মন্দিরে আসিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকেন। উদ্যানের ভিতরে মন্দিরের দুই পার্শ্বে দুইটি প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা আছে; উহাকে পুষ্করিণীও বলা যাইতে পারে। "হোরী"র পর মেলার সময়ে ইন্দারা হইতে জল তুলিয়া ঐ চৌবাচ্চা দুইটি ভরিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে বোধ হয় বহু অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে; কারণ, উহার এক-একটি ছোট-খাটো ডকের ন্যায়।

শ্রীরঙ্গ জিউর মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে একটি গলি; তাহার পরই ভক্তচূড়ামণি প্রসিদ্ধ লালাবাবুর মন্দির। এই মন্দিরও অতি বৃহৎ; এবং দুর্গ-প্রাচীরের ন্যায় সুউচ্চ প্রস্তর-

প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এই মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জিউ স্থাপিত আছেন। সেবার জন্য বার্ষিক চল্লিশ হাজার টাকা আয়ের দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। তাহার আয় দ্বারা দৈনিক ১০০৲ টাকা সেবা কার্য্যে ব্যয় হইতেছে। প্রত্যহ ৩০০ শত হইতে ৩৫০ শত সাধু-বৈষ্ণব প্রসাদ পাইয়া থাকেন। এই মন্দিরের শ্রীরাধার মূর্ত্তিটি যেরূপ ভাব-পূর্ণ, বোধ হয় বৃন্দাবনে এরূপ ভাবপূর্ণ মূর্ত্তি আর নাই। লালাবাবু (রাজা কৃষ্ণচন্দ্র) ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই মন্দির নিম্মাণ করাইয়াছিলেন। শেঠের এবং লালাবাবুর মন্দিরের মধ্যস্থলে যে গলির কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার স্বত্ব লইয়া লালাবাবুর সহিত লছমীপ্রতি শেঠের বিবাদ উপস্থিত হয়, এবং মকদ্দমা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গড়াইয়া উভয় পক্ষের বিস্তর অর্থ ব্যয় হয়। লালাবাবুর গুরুদেব এই মকদ্দমার বিষয় জানিতে পারিয়া, লালাবাবুকে বলেন, "তুমি বৈষ্ণবের সহিত বিবাদ করিয়া অতি অন্যায় কার্য্য করিতেছ। শেঠের বাড়ীতে যাইয়া 'মাধুকরী' না করিলে, তোমার এই অপরাধ-মোচন হইবে না।" লালাবাবু বলিলেন, "আজই আমি হাইকোর্টের মকদ্দমা উঠাইয়া লইবার জন্য লোক পাঠাইতেছি; এবং গলিটি শেঠজীকে ছাড়িয়া দিতেছি।" তাহাতে গুরুদেব সম্মত না হওয়াতে, লালাবাবু মথুরায় শেঠজীর গৃহে যাইয়া অতি দীন ভাবে 'মাধুকরী' প্রার্থনা করিলেন। শেঠজী একখানা স্বর্ণ-থালায় বিবিধ প্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্য-সামগ্রী সজ্জিত করিয়া নিজ-হস্তে লালাবাবুকে দিতে যান। লালাবাবু অতি দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আমি স্বর্ণ-থালায় এই সকল উৎকৃষ্ট খাদ্য-সামগ্রীর জন্য আপনার গৃহে আজ আসি নাই। আপনি দয়া করিয়া একখানি রুটি আমার হাতে তুলিয়া দিন, তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইব।" এই কথা শুনিয়া শেঠজী লালাবাবুকে আলিঙ্গন করিলেন। লালাবাবু বলিলেন, "হাইকোর্টের মকদ্দমা তুলিয়া আনার জন্য লোক পাঠাইয়াছি। গলির স্বত্ব আমি ত্যাগ করিলাম,—উহা আজ হইতে আপনার সম্পত্তি হইল। গুরুদেবের কৃপায় আজ হইতে আপনার সহিত আমার আর কোন বিবাদ থাকিল না।" এই কথা শুনিয়া শেঠজী বলিলেন, "আজ হইতে ঐ গলি সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি হইল,—সর্ব্বসাধারণ ঐ রাস্তায় যাতায়াত করিবে।" এখন দেখুন, বৈষ্ণবের হৃদয় কিরূপ উদারতাপূর্ণ।

লালাবাবুর মন্দিরের প্রায় এক শত গজ দূরে 'ব্রহ্মচারীর মন্দির।' গোয়ালিয়রের মহারাজা এই বিশালকায় মন্দির নিম্মাণ করাইয়া তদীয় গুরুদেব ব্রহ্মচারীকে দান করিয়াছিলেন। তদবধি এই মন্দির "ব্রহ্মচারীর মন্দির" নামে খ্যাত। এই মন্দিরে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। মহারাজা মন্দির নিম্মাণ এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। সেবার জন্য বার্ষিক ১২০০০৲ বার হাজার টাকা দিয়া থাকেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর রাসনৃত্য ও গীত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মচারীর মন্দিরের কিয়দ্দূরে "সাহজীর মন্দির।" লক্ষ্ণৌনিবাসী সাহ বিহারীলাল বহু অর্থ-ব্যয় করিয়া শ্বেত মর্ম্মর-প্রস্তর দ্বারা এই মন্দির নিম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাজমহল ব্যতিরেকে মর্ম্মর-প্রস্তরের এরূপ সুবৃহৎ মন্দির কুত্রাপি দেখি নাই। তাজমহলে অবশ্য এমন অনেক জিনিস আছে, যাহা এই মন্দিরে নাই; কিন্তু এই মন্দিরে এমন দুই-একটি জিনিস আছে, যাহা তাজমহলেও নাই; যেমন মর্ম্মর-প্রস্তরের রজ্জুর ন্যায় পাক-বিশিষ্ট থাম। ইহার এক-একটি থাম যে কত অর্থ-ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। দেওয়াল-গাত্রে নানাবিধ পাথর বসাইয়া (Inlaid) যে কয়েকটি বৃহৎ মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে, যাহা অতি অদ্ভুত এবং শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মন্দিরের দরদালানের এক পার্শ্বে সাদা এবং কাল মর্ম্মর-প্রস্তর দ্বারা মেঝের উপর সাহ বিহারীলাল, তস্য ভ্রাতা, পত্নী, পুত্রবধূ প্রভৃতির মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে—উদ্দেশ্য 'বৈষ্ণবের পাদস্পর্শে পবিত্র হওয়া।' কি অদ্ভুত দৈন্য! ইহা কেবল বৈষ্ণবেই শোভা পায়। প্রবাদ আছে; মন্দির নিম্মাণকালে সাহ বিহারীলালের দেওয়ান বলিয়াছিলেন, "শ্বেত মর্ম্মর-প্রস্তরের দেব মন্দির কুত্রাপি নাই; সুতরাং অল্প ব্যয়ে লাল প্রস্তরের একটি মন্দির নির্ম্মাণ করুন।" এই কথা শুনিয়া সাহজী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহাদের মূর্ত্তির অনতিদূরে উক্ত দেওয়ানের একপদবিশিষ্ট, হস্তহীন এবং চক্ষুবিহীন এক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করান; উদ্দেশ্য—'কেহ যেন কাহারও সদুদ্দেশ্যে বাধা না দেন।' সাহজী প্রভৃতির মূর্ত্তির উপর পাছে কেহ পদক্ষেপ না করেন, এই ভয়ে, ঐ দর-দালানের মেঝেটি এরূপ ভাবে শ্বেত এবং কৃষ্ণ বর্ণের মর্ম্মর দ্বারা মণ্ডিত যে, স্থূল দৃষ্টিতে, উহার ভিতর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে বলিয়া বুঝা যায় না। এই মন্দিরের

সম্মুখে এক প্রকাণ্ড পুষ্পোদ্যান। পুরোভাগে একটা বৃহৎ সিংহ-দরজা,—তাহার উপর কয়েকটি প্রস্তরের মূর্ত্তি আছে। ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কার্জ্জন পূর্ব্বোল্লিখিত মন্দির দেখিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মাংশ এই ;—সাহজীর মন্দির দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন "ইহা সম্রাটের উপযোগী উদ্যান-বাটিকা।" ব্রহ্মচারী মন্দির দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহা একটি বিরাট রেলওয়ে ষ্টেসন।" শেঠের মন্দির দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহা একটি সুরক্ষিত দুর্গ।" এবং 'লালাবাবুর' মন্দির দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহা প্রকৃত দেব-মন্দির বটে।"

বিচারক

[শ্রীআশুতোষ সান্যাল]

সরকারি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর, পেনসনের সঙ্গে-সঙ্গে কতকগুলি অযাচিত ব্যাধি লইয়া যখন মুঙ্গেরের কেল্লায় আশ্রয় লইলাম, এবং শেষের দিন কয়টা ভগবানের নাম লইয়া কাটাইতে লাগিলাম, তখন রসময় বাবুও আমার পথের পথিক হইয়া মুঙ্গেরে বাস করিতে আসিয়াছিলেন। বিদেশে মনের মত সঙ্গী খুঁজিয়া লইতে সকলকেই বেশ একটু বেগ পাইতে হয় ;—কিন্তু রসময় বাবু আমাকে সে কাজটায় অনেকটা নিষ্কৃতি দিয়া, নিজেই আসিয়া ধরা দিলেন। মনের মতন লোক পাইলে প্রাণের কথার অভাব হয় না ; তাই দুই বন্ধু সকাল-সন্ধ্যায় ভাগীরথীর তীরে কষ্টহারিণীর ঘাটে বসিয়া, আপনাপন অতীত জীবনের সুখ-দুঃখের কথা, সাংসারিক সচ্ছলতার বিষয়, পুত্র-কন্যাদের ভবিষ্যৎ জীবন ইত্যাদি নানা বিষয়ের জল্পনা-কল্পনায় দিনগুলি বেশ নির্ব্বিবাদে কাটাইতাম। উপরন্তু, আমার আরও একটা বিশেষ লাভ ও সৌভাগ্য হইয়াছিল। রসময় বাবু তাঁহার গৃহিণীর রন্ধন-কার্য্যের সমালোচক রূপে আমাকেই নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন ; কাজেই মাঝে-মাঝে আমার রসনার কার্য্যও বেশ সুচারু রূপেই চলিত। গৃহিণীর অন্তর্ধানের পরে এরূপ রসনা-তৃপ্তিকর আহার্য্যের আস্বাদন আমার আদৌ হইত কি না সন্দেহ ; কারণ, সংসারের মধ্যে তিনটী শিশু সন্তানকে বুকে করিয়াই জীবনের প্রায় অর্দ্ধেক দিন কাটাইতে হইয়াছিল। গৃহিণীর ও নিজের কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া আর নিজের সুখের অবসর পাইতাম না। কাজেই, রসনার লোভ আমার যথেষ্টই ছিল এবং সেই কারণে রসময় বাবুর সহিত ঘনিষ্ঠতাটা খুব শীঘ্রই পাকিয়া উঠিয়াছিল।

রসময় বাবু ছিলেন অবসর-প্রাপ্ত সেসন জজ ; আর আমি ছিলাম সরকারি খাজাঞ্চিখানার একজন সামান্য হিসাবনবিশ। সুতরাং দুজনে এক ছাঁচে ঢালা হইলেও, ধাতুর পার্থক্য ছিল অনেক। কিন্তু রসময় বাবু ও তাঁহার গৃহিণীর উদার অন্তঃকরণের পরিচয় পাইয়া বুঝিয়াছিলাম, যে, তাঁহাদের প্রকৃতি আধুনিক বড়মানুষের মত নয়। রসময় বাবু যথার্থই একজন জজের মতন জজ ছিলেন ; তাই তাঁহার গুণে লোক এত শীঘ্র তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। আমিও আজ তাঁহারই একটা কথা পাঠকগণকে বলিতে বসিয়াছি।

রসময় বাবুর সহিত পরিচিত হইবার কয়েক দিন পরেই, প্রথম যে দিন তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইলাম, সে দিন আকাশে খুব দুর্য্যোগ। পশ্চিমে মেঘ দেখিলেই আমাদের বাঙ্গলা মুলুকের লোকের পিলে চমকে ওঠে ;—আর এতো একেবারে খাস পশ্চিমের ঝড়-জল। কাজেই ব্যাপারটা খুব সঙ্গীন মনে হইতেছিল। কিন্তু উদর ও রসনার আব্দারে সেই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়াও আমাকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হইল। অর্দ্ধসিক্ত অবস্থায় যখন তাঁহার বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি আমার সেই অবস্থা দেখিয়া হাসিয়াই আকুল হইলেন ; শেষে বলিলেন, "আমাদের প্রথম দিনের আত্মীয়তাটা খুব ঘনঘটা করেই হ'ল।" আমিও হাসিতে হাসিতে ছাতিটা মুড়িয়া, গায়ের ভিজা জামা-কাপড়গুলো সামলাইবার চেষ্টা করিতে যাইব, ঠিক সেই সময় একটি ৭।৮ বৎসরের মেয়ে শুক্‌না কাপড়, তোয়ালে প্রভৃতি আনিয়া বলিল, "দিদিমা কাপড় পাঠিয়ে দিলেন ;—আপনি কাপড় ছাড়ুন।" বালিকার হাত হইতে কাপড় লইয়া কাপড়

ছাড়িলাম এবং গা-মাথা মুছিয়া ফরাসের উপর গিয়া আসর জমকাইয়া বসিলাম। অন্তঃপুরোদ্দেশে সহস্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া, রসময় বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "যে মেয়েটি কাপড় দিয়া গেল, উটি কে?" রসময় বাবু একটু মৃদুহাস্যের সহিত বলিলেন; "উটি হচ্ছে আমার নাতনী।" "আপনার ছেলের মেয়ে?" "না—আমার মেয়ের মেয়ে।" "আপনার কন্যাও কি এখানে আছেন?" এবার তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "না, সে এমুল্লুক ছেড়ে ওপারের মল্লুকে চলে গিয়েছে।" উত্তর শুনিয়া আমি বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। কোথায় একটু আমোদ-আহ্লাদ করিব, না, মৃতা কন্যার কথা তুলিয়া বৃদ্ধের মনে ব্যথা দিলাম। মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহা জীবনে কখনও ভুলিব না। সে মুখ পূর্ব্বেরই মতন উদার, সৌম্য। সুখ-দুঃখের বোঝা ঘাড় থেকে নামিয়ে দিয়ে তিনি যেন সদানন্দ,—সদা-প্রফুল্ল। সে মুখে দুঃখের রেখার চিহ্ন মাত্রও নাই। রসময় বাবু আমার অপ্রস্তুত ভাব লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "দুঃখিত হবার মত এমন কিছু তুমি বল নাই, যার জন্য তোমায় অপ্রস্তুত হতে হবে। পৃথিবীর নিয়মই এই। আর, মৃত্যুর জন্য মানুষের দুঃখ করবারও কিছু নেই। গোণা দিন ফুরিয়ে এলে সকলকেই যেতে হবে। তবে ঐ মেয়েটির জীবনের তার আমার অতীত জীবনের তারের সঙ্গে এমন একটি করুণ সুরে বাঁধা আছে, যার ব্যথিত ঝঙ্কার আমি জীবনের পরপারে গিয়েও ভুলতে পারবো কি না সন্দেহ। আমার নিজের পুত্র-কন্যাকে দূরে রেখেও নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাচ্ছি,—কিন্তু ওকে একদণ্ডও কাছ-ছাড়া করতে পারি না। আমাকে ও এমনি আঁকড়ে ধরেছে।" রসময় বাবুর সেই গম্ভীর অথচ সরল প্রাণস্পর্শী কথা শুনিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম। ব্যাপারটা যে কি, শুনিবার জন্য আমার মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। তাই নিজের মনকে দমন করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি কি সে অতীত কাহিনী শুনতে পারি?"

"অবশ্য পার। সেটা বললেই বরং আমার মনটা হাল্কা হয়। নিজের ভুলচুক্ ও দুঃখের কথা যত বলা যায়, ততই মানুষের প্রাণের ব্যথাটা কমে; আর দুঃখের দুর্জ্জয় বোঝাটা লঘু হয়ে যায়। আজ সে কথা থাক্—কাল সন্ধ্যাবেলায় এস,—বলবো। আজ রাতও অনেক হয়েছে;—আর এখন গল্প জুড়্‌লে, গিন্নীর খাবারও জুড়িয়ে যাবে—রাগও করবেন নিশ্চয়ই।" আমি আর পিড়াপিড়ী না করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলাম। তাহার পর রসময় বাবুর গৃহিণীর স্বহস্তে প্রস্তুত নানাবিধ আহার্য্যের সদ্ব্যবহার করিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

পরদিন সন্ধ্যার আগেই ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখিবার জন্য, সন্ধ্যাহ্নিকাদি তাড়াতাড়ি সমাপন করিয়া, রসময় বাবুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম। পূর্ব্বরাত্রের সেই মেয়েটির কথা শুনিবার জন্য যথার্থই আমার মন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল; বিশেষতঃ রসময় বাবুর মত একজন ধর্ম্মভীরু সদাশয় লোক এমন কি ভুলচুক্ বা পাপ-কাজ করিয়াছেন, যাহাতে ঐ মেয়েটার কাহিনী তাঁর সারা জীবনে দুঃখের রেখা টানিয়া দিয়া, তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। আবার এদিকে বলিলেন যে, মেয়েটী তাঁর নাতনী;—সুতরাং কি এমন গূঢ় রহস্য ইহার চারিদিকে লুক্কায়িত রহিয়াছে—তাহা জানিবার জন্য ঔৎসুক্যও নেহাৎ কম ছিল না।

রসময় বাবুর বাড়ী যখন পৌঁছিলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। দেখিলাম, তিনিও আমারই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। আমাকে আসিতে দেখিয়া খুব আপ্যায়িত করিয়া বসিতে বলিলেন। আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বসিলে, তিনি বলিলেন, "ওহে, গিন্নী আজ তোফা ডালপুরী তৈরী করেছেন,—দু'একখানা খেয়ে দেখ না।" পেটুক মানুষের সময়-অসময় নেই। বিশেষ, রসময় বাবুর গৃহিণীর প্রস্তুত, সুতরাং অমৃত সমান। কাজেই কিছুমাত্র লৌকিকতা করিবার আগেই, এক গাল হাসিয়া বলিলাম, "তাতে আর কি—আমিও সদাই প্রস্তুত।" কথা ফুরাইতে না ফুরাইতেই দেখি, রসময় বাবুর নাতনী একখানি থালা ভরিয়া ডালপুরী ইত্যাদি নানা রকম মুখরোচক খাদ্য-সম্ভার লইয়া হাজির। দৃষ্টিমাত্রেই হাত ও মুখের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইয়া গেল। আমি রসময় বাবুকে পূর্ব্ব দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিলাম। তিনি মৃদুহাস্যে বলিলেন, "বেশ ত, হাতে-মুখে হ'ক না;—আমিও বলি—তুমিও চালাও।" "যে আজ্ঞা" বলিয়া আরম্ভ করিলাম। রসময় বাবু একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আমি যেবার পাটনায় বদলি হয়ে গেলাম, সেবার সেখানে খুব প্লেগের হিড়িক,—মানুষ মরে। মরে মহল্লা একেবারে ওজাড় হয়ে

গেছে। সেই সময় সরকারের হুকুম এল ; অনিচ্ছা সত্ত্বেও, আমায় সে হুকুম তামিল কর্ত্তে সেখানে যেতে হ'ল। দাসত্ব এমনি যে, আমি নিজে হাকিম হলেও, আমাকেও হুকুম মানতে হয়েছিল। গিন্নী কিছুতেই ছাড়লেন না,—পাছে আমি সেখানে গিয়ে, তাকে সংসারে একলা ফেলে রেখে, পালিয়ে যাই, এই ভয়। কাজেই পুত্র-কন্যাদের কলিকাতার বাড়ীতে রেখে, আমরা পাটনা গেলাম। আমরা যে জায়গাটায় থাকতাম, সেখানটায় তত ভয়ের কারণ না থাকলেও, রাস্তা-ঘাটের অবস্থা দেখে, আর মানুষ মরবার খবর শুনে-শুনে, প্রাণটা মাঝে-মাঝে সত্যই আড়ষ্ট হয়ে উঠতো। কিন্তু উপায় ত নেই। বাঘের খাঁচায় ঢুকে তার থাবলের ভয় করলে চলবে কেন! কাজেই, আনন্দময়ীর উপর সব ভাবনা-চিন্তা চাপিয়ে দিয়ে, দিনগুলো কাটিয়ে দিতে লাগলাম। পাটনায় গিয়ে ঝি চাকরের অভাবে প্রথমটা ভারী কষ্টে পড়তে হয়েছিল ; কারণ প্লেগের ভয়ে সবাই পালিয়ে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে আমার আরদালি একটা ঝি সংগ্রহ করে এনে দিলে। সঙ্গে তার এক নেজুড়—১০।১১ বছরের মেয়ে। প্লেগে মেয়েটার বাপকে গ্রাস ক'রে মা ও মেয়েকে একেবারে নিঃসহায় করে দিয়েছিল। ঝিটা খুব বিশ্বাসী শুনে, গৃহিণী তাকেই বাহাল করলেন। মেয়েটা তার ভারি চট্‌পটে আর বুদ্ধিমতী ছিল,—কাজেই গৃহিণীকে বশ করে নিতে তার বেশী সময় লাগল না। ঝিয়ের বাড়ী ছিল দেহাদে,—তাই মাঝে-মাঝে তাকে বাড়ী যেতে হত। মেয়েই মায়ের অনুপস্থিতিতে সব কাজকর্ম্ম করতো। মাস-তিন-চার পরে একদিন ঝি হু'দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ী গেল ; কিন্তু হু'দিনের যায়গায় ছ'দিন হয়ে গেল, তবু সে ফিরল না, বা কোন খবরও দিল না, দেখে তার খোঁজ নেবার জন্যে আরদালিকে তার বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম। আরদালি দেহাদ থেকে ফিরে এসে বললে যে, ঝি প্লেগে মারা গিয়েছে। গৃহিণী ঝিয়ের মৃত্যু সংবাদে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন : আর মেয়েটাও খুব কাঁদা-কাটা করতে লাগল। পরের দিন গৃহিণী মেয়েটার হাতে ২০৲ টাকা দিয়ে তার বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন ; আর বলে দিলেন, যেন শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে গেলে আবার সে ফিরে আসে। মেয়েটা চলে গেলে গৃহিণীর মনটা দিন-কতক খুবই ভার-ভার দেখা গেল ; তিনি মেয়েটার কথা প্রায়ই বলতেন। আরদালি আর একটা ঝি খুঁজে এনে ভর্ত্তি করে দিলে। মাসখানেক পরে মেয়েটা হঠাৎ একদিন এসে হাজির হ'ল। গৃহিণীর ভারী আহ্লাদ—মেয়েটাকে বুকে ধরে, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হিন্দীতে কত কথা বললেন। মেয়েটা আমার বাড়ীতেই থেকে গেল। মা মরার পর থেকে মেয়েটা গিন্নীর আরও আদুরে হয়ে পড়েছিল। তাঁর নিজের মেয়ে কি ঝিয়ের মেয়ে—হিন্দুস্থানী না হ'লে, তা বোঝবারই উপায় ছিল না। গিন্নী আদর করে তার নাম দিয়েছিল কুড়ুনি মেয়ে। তার পর বছর-দুই পাটনায় কেটে গেল। মেয়েটা দু'বছরের মধ্যে মস্ত বড় হয়ে উঠ্‌লো। এতদিন পরে গিন্নীর আবার একটা ভাবনা জুটলো—কুড়ুনির বিয়ে। অত বড় একটা মেয়ে ঘরে আইবুড়ো করে রাখা হিন্দুর ঘরে ত চলে না,—তাই গিন্নীর তাগাদায় আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। তিনি ভাবনার বোঝাটা আমার স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে, দিব্বি হেসে-খেলে বেড়াতে লাগলেন। কাজে-কাজেই বাধ্য হয়ে, আমাকেই তার মুস্কিল আসানের ভার নিতে হ'ল। কুড়ুনির গ্রামে আরদালিকে পাঠিয়ে তার আত্মীয়দের খবর দিলাম। দিন দুই পরে তার কাকা কাকী প্রভৃতি এসে হাজির। তাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কুড়ুনির বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করতে বললাম। তারা ভারি খুসি হয়ে বললে, অনেক টাকার দরকার, তাই তারা এতদিন এ সম্বন্ধে উদাসীন ছিল ; নইলে ঘরের মেয়ে—ফেলবার ত উপায় নেই, ইত্যাদি। তার দিন-কতক পরে তারা বিয়ের সব স্থির করে এসে হাজির হ'ল। গিন্নী নগদে ও গহনায় প্রায় শ' তিনেক টাকা কুড়ুনির হাতে দিয়ে, চোখের জল ফেলতে-ফেলতে তার কাকার সঙ্গে তাকে বিদায় দিলেন—যেন নিজের মেয়েই শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে। হায় রে মায়া! একবার মানুষকে পেয়ে ব'সলে, এমনিই আঁকড়ে ধরে, যে শেষে তাকে ছাড়ান দায় হয়ে ওঠে। তাই গিন্নীর চোখের জল দেখে, আমারও চোখের পাতা দুটো যে ভিজে ওঠে নি তা নয়। তবে নিজের মেয়েকেই মানুষ বড় ধরে রাখতে পারে—তা পরের মেয়ে! কাজেই ব্যথাটা আমার প্রাণে তেমন বাজেনি, যতটা গিন্নীর প্রাণে লেগেছিল ; কারণ তার চলে যাবার পরে দিন-কতক তাঁর রান্না খেয়ে সেটা বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। সে আজ প্রায় নয় বছর হ'ল, পাটনা থেকে বদলি হয়ে ভাগলপুরে আসি। তার পর বদলি হয়ে এই মুঙ্গেরে এসেছিলাম—এবং এইখান থেকেই আমায় পেন্‌সন্‌ নিতে হয়েছিল। যার

জন্য আমার সামর্থ্য থাকতেও পেন্‌সন্ নিয়ে ঘরে বসতে হ'ল, সেই কথাই বলছি। এই মুঙ্গেরে একটা দায়রার কেস্ আসে,—কেস্‌টা একটা খুনি কেস্। একটা দেহাদি লোক, জমি নিয়ে তকরার করতে গিয়ে, রাগের মাথায় একটা লোককে দায়ের কোপ মেরে খুন করে ফেলে। নিম্ন আদালতে লোকটা দোষী সাব্যস্ত হয়; তবে ব্যাপারটা প্রমাণ হ'লেও, জটিল বলে, দায়রায় চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য আসে। সেই মকর্দ্দমার বিচার-ভার পড়ে আমার উপর। একে খুনি মকর্দ্দমা, তার উপর চূড়ান্ত বিচার; কাজেই আমার তথনকার মনের অবস্থা, বুঝতেই পারছ, কি রকম হয়েছিল। একটা লোকের জীবন-মরণের ভার ভগবান আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে, ওপর থেকে দিব্য মজা দেখছিলেন। আসলে কিন্তু বিচার তিনিই করান,—তবে নিমিত্তের ভাগী হয় বিচারক। বিচারক তার দায়িত্ব, এবং নিজের জীবনের কার্য্যাবলীর বিচার যখন করতে বসে, তখন তার কর্ম্মের বোঝা তার মনের উপর এত ভারী হ'য়ে চেপে বসে যে, তার ভারে তাকে নুয়ে পড়তে হবেই হবে। সকাল-সকাল আহারাদি সেরে, দুর্গানাম স্মরণ করতে-করতে আদালতে বেরিয়ে পড়লাম। দু'দিন ধরে উকিলে-উকিলে, সাক্ষীতে-উকিলে, জেরা, তর্কে, প্রমাণ-প্রয়োগে আসামীকে ভগবান এমনিই কঠিন বাঁধনে জড়িয়ে দিলেন যে, তার পরেও দু'দিন আমি আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে, সমস্ত কাগজপত্র বারবার দেখেও সে বাঁধনের আর থেই খুঁজে পেলাম না। নীচের আদালতে, প্রমাণে, জুরিদের মতে, সকল তাতেই একই মত—আসামী দোষী। আমার যে তখন মনের অবস্থা কি, তা আর তোমায় কি বলব। খুন ত সে করেছে তা সত্য;—সাক্ষী-সাবুদে তা ভাল-রকম প্রমাণও হয়েছে; আর সরকারি আইন মতে তার শাস্তিও একেবারে চরম। কিন্তু তার দোষের সাজা দিতে গিয়ে, আমাকেও যে একটা খুন করতে হয়! বল ত বাপু, তখন আমি করি কি! সেদিনকার মত মকর্দ্দমার রায় মুলতুবি রেখে, বাড়ী ফিরে এলাম। কিন্তু বাড়ী এসেও শান্তি পেলাম না। সেই আসামী ব্যাচারীর ছল্-ছল্ চোখ দুটো আমার মনের ভেতর বারবার এসে হাজির হতে লাগল। তার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের, তার পিতা-মাতার সজল চোখ, বুকফাটা হা-হুতাশ, তাদের সেই জলন্ত দীর্ঘশ্বাস যেন আমার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়ে দিতে লাগল। চারিদিক থেকে যেন একটা হাহাকার এসে আমায় জড়িয়ে ধরতে লাগল। উঃ! সে যে কি ভয়ানক অবস্থা আমার সে দিন হয়েছিল! সে যে কি ভয়ানক অব্যক্ত বেদনা, তা বলবার আমার ক্ষমতা নেই। অনেক কষ্টে মনটাকে একটু সামলে নিয়ে, ভাগবৎ খুলে বসলাম। ভগবানের চরণে আত্ম-সমর্পণ করে, মনকে সত্যের পথেই চালিয়ে দিলাম—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন,
যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।"

পরের দিন আদালত খুলবার সঙ্গে-সঙ্গে আদালত-গৃহ লোকে ভরে গেল। একটা লোক মরতে চলেছে—আর তাই দেখবার জন্যে সহস্র চোখ উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে। এটা যেন একটা আনন্দের বিষয়! একটা মজার কথা! হায় মানুষ, যদি আজ তোমার এ অবস্থা হ'ত, তা হ'লে হয় ত মৃত্যুর কথা মনে করেই, শিউরে তুমি মূর্চ্ছা যেতে। আর এটা পরের প্রাণ কি না, তাই একটুও মায়া নেই, একটুও দরদ নেই। তোমার কাছে যেন ওর প্রাণটা মাটীর ঢেলার মত। আদালতে প্রবেশ করে, একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম,—সব যেন নিস্তব্ধ, স্থির। আমি ঢুকতেই, হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড ঝড়ের পূর্ব্ব-লক্ষণের মত, সবাই যেন শঙ্কিত হয়ে উঠল। বিচারকের শেষ কর্ত্তব্য যেটুকু, সেটুকু আমাকেই সম্পন্ন করতে হবে মনে হতেই, আমার প্রাণটার ভেতরও কে যেন সজোরে নাড়া দিয়ে উঠলো। সমস্ত কাগজপত্র পুনরায় দেখে, জুরিদের আর একবার বিবেচনা করতে অনুরোধ করলাম। জুরিরা অর্দ্ধ ঘণ্টা তর্ক-বিতর্কের পর স্থির করলেন, আসামী দোষী। আমার মাথার ভেতরটা সেই কথা শুনে যেন ওলট-পালট হয়ে গেল, হাতের কলমটা হাত থেকে পড়ে গেল। সমস্ত আদালত-গৃহ যেন একটা বিরাট আর্ত্তনাদে হাহাকার করে উঠ্‌ল। আমার তখন সোজা হয়ে বসা ভার হয়ে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি কলমটা তুলে নিলাম। তখন আমার বিবেচনা করার আর ক্ষমতা ছিল না। মাথার উপর কে যেন সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করছিল। বিচারকের যা শেষ কর্ত্তব্য, তা করবার জন্য কলম তুলে নিয়ে হুকুম লিখিলাম, "আসামী দোষী; শাস্তি—ফাঁসি—"

রায় প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে আসামী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। তার গলা দিয়ে একটা শব্দও বের হ'ল না। মনে

হ'ল, তখনই যেন কে তার গলায় ফাঁসির দড়িটা টেনে দিল। সমস্ত আদালত-গৃহ একটা মৃদু আর্ত্তনাদে কেঁপে উঠলো। আমি আর এজলাসে বসে থাকতে পারলাম না,—সমস্ত আদালতটা যেন আমার চারিদিকে নাগরদোলার মত ঘুরতে লাগল। তাড়াতাড়ি এজলাস থেকে নেমে এসে গাড়ী ডাকতে বললাম। গাড়ী এসে দাঁড়াতেই, আমি আদালতের বাহিরে বেরিয়ে এসে গাড়ীতে উঠতে যাব,—ঠিক সেই সময় ঘোমটা ঢাকা একটা স্ত্রীলোক ৩।৪ মাসের একটি শিশুকে আমার পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে, মাটির উপর আছড়ে পড়লো। উঃ! কি সে দৃশ্য! হতভাগিনীর সমস্ত সুখ-স্বচ্ছন্দতা আজ আমিই ভেঙ্গে দিইচি। আরদালিকে ইঙ্গিত করে সরিয়ে দিতে বললাম। আরদালি এসে কাছে দাঁড়াইতেই, সে আমার সুমুখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "বাবু, আপনিই আমার স্বামী দিইছিলি,—আপনিই আমার সুখের ঘর বেঁধে দিইছিলি,—আর আজ আপনিই আবার আমার সব সুখ ভেঙ্গে দিয়ে, আমায় পথের ভিখারিণী করে দিলি। উঃ মাগো!"—তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল, সে অচেতন হয়ে আবার পড়ে গেল। হঠাৎ তার মুখ দেখে, আর কথা শুনে, বহুদিনের একটা কথা মনে হ'ল। এ কে! এ যে সেই গৃহিণীর "কুড়ানি-মেয়ে!" আঁ! তবে সত্যই! আমি আর ভাবতে পারলাম না। তার সেই বিষাদমাখা মূর্ত্তি আর দেখতেও পারলাম না। আরদালিকে তাদের আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে বলে, আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে গেলাম।

বাড়ীতে যখন ঢুকলাম, তখন গৃহিণী বসে খাবার তৈরি করছিলেন! আমার সাড়া পেয়ে, আমার কাছে এসে, মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, "তোমার এ কি মূর্ত্তি হয়েছে,—কাউকে খুন করে এসেছ না কি?" "হাঁ—তোমার সেই কুড়ুনি মেয়ের আজ সর্ব্বনাশ করে এলাম,—তার স্বামীর ফাঁসীর হুকুম"——আর কিছু বলতে পারলাম না—সমস্ত পৃথিবী ঘুরতে লাগল,—আমি অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলাম। সেই দিন থেকে কুড়ুনি তার শিশু কন্যাকে নিয়ে আমার বাড়ীতে আশ্রয় নিলে। কিন্তু হতভাগিনী স্বামীর শোক বেশী দিন সহ্য করতে পারে নি,—মাস দুই বাদেই ঐ মেয়েটীকে আমার পূর্ব্ব-স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিবার জন্য রেখে, সে জন্মের মত তার স্বামীর কাছে চলে গেল। আর গৃহিণী স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে ঐ ছোট মেয়েটীকে বুকে টেনে নিলেন।

রসময় বাবুর কথা শুনতে-শুনতে আমি এতই বিভোর হয়ে গিয়াছিলাম যে, আমার থালার খাবার যেমন তেমনিই পড়ে ছিল। আমি অবাক্ হয়ে শুধু দেখছিলাম যে, মানুষের ভিতর এতবড় হৃদয়, এতখানি করুণা থাকতেও, মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে কেন? আমি খাবার ফেলে রেখে, তাঁর পায়ের তলায় মাথাটা নুইয়ে দিলাম।

অনুসন্ধান

[শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক এম-এ]

(১)

সারা দিন-রাত খুঁজে সারা হ'য়ে—
কোথাও হোলো না সন্ধান যার;
যুগ-যুগান্তর পুরাণ-দর্শন,—
কহিল না কোনো বারতা তার।

(২)

কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে,—ধর্ম্ম আরাধনা
দেখালো না কোনো গোপন পথ;
দূর-দূরান্তর অমরা হইতে—
আসিল না কোনো পুষ্পক-রথ।

(৩)

আকাশ-পাতাল খুঁজে ফিরে দেখে',
বসিল পথিক একদা আসি।
তারি সাথে ছিল,—কে-যেন তখন
"কোথা গিয়েছিলে?" বলিল হাসি!

ঔরাংজেবের কলঙ্ক-মোচন

[শ্রীঅরুণ দত্ত]

ঔরাংজেব সুন্নী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন; সুতরাং সম্রাট্ হইয়া মুসলমান-ধর্ম্মের বহুল-প্রচারে মনোযোগী হইলেন; এইজন্য তিনি অ-মুসলমানদের উপর জেজিয়া কর বসাইলেন এবং বারাণসীর পবিত্র মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া তৎস্থলে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিলেন;—ইহাই প্রচলিত প্রবাদ।

কিন্তু জেনারেল কানিঙ্‌হামের মত এই যে, কাশীর বিখ্যাত বিশ্বেশ্বর মন্দির ঔরাংজেব ভাঙ্গেন নাই। ভাঙ্গিয়াছিলেন তাঁর পিতামহ জহাঙ্গীর বাদ্‌শাহ্। এই মন্দির রাজা মানসিংহ ৩৬ লাখ টাকায় নির্ম্মাণ করেন; কিন্তু তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া জহাঙ্গীর তাহার উপর জামা-মস্‌জিদ স্থাপিত করিয়াছিলেন।

মন্দির-ধ্বংস ইত্যাদি ব্যাপারে ঔরাংজেব যে লিপ্ত ছিলেন না, তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ—ঔরাংজেবেরই একখানা ফর্ম্মান। এই ফর্ম্মান পাইয়াছেন কাশীর পুলিস ইনস্পেক্টর খাঁ বাহাদুর শেখ মহম্মদ তায়াব মহাশয়। বারাণসীর মঙ্গলা গৌরী মহল্লায় গোপী উপাধ্যায় নামের এক ব্রাহ্মণ থাকিতেন। ইঁহার দৌহিত্রের নাম মঙ্গল পাঁড়ে। এই মঙ্গল পাঁড়ের সংক্রান্ত কোন মাম্‌লার খোঁজ করিতে যাইয়া, তার নিকট হইতে অন্যান্য দলিলপত্রের মধ্যে তায়াব মহাশয় ঔরাংজেবের এই ফর্ম্মান পাইয়াছেন (এপ্রিল, ১৯০৫)।

চট্টগ্রামের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজ্ঞ রজনীরঞ্জন সেন মহাশয় ঔরাংজেবের এই আদেশপত্রের একখানা ফটো পাইয়াছেন। ইহা আবুল হোসেন নামের কোনো ব্যক্তিকে লিখিত ও তাঁহার নিকট সম্রাট্‌পুত্র সুল্‌তান মুহম্মদ বাহাদুরের দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল। সেন মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটী অফ্ বেঙ্গলের এক অধিবেশনে (১ মার্চ ১৯১১) তাহার বিষয় যাহা বলেন, তাহা হইতে জানা যায়—

এই ফর্ম্মান একখণ্ড পুরাতন হল্‌দে রঙের কাগজে লিখিত। পিছন দিকে এক খণ্ড ন্যাক্‌ড়া আঠা দিয়া লাগানো—কিন্তু পিছনের ৪×৪½ ইঞ্চি পরিমাণের জায়গা ফাঁক আছে, তাহার উপর সুল্‌তান মুহম্মদের শীলমোহর মারা। এই দলিল বেশ সুরক্ষিত আছে। লেখাটি বেশ স্পষ্ট, অক্ষরগুলিও বড়-বড়। ফর্ম্মান ঘন কালো কালিতে লেখা—তবে উপর দিকে ৩×২½ ইঞ্চি মাপের খানিকটা অংশ লাল কালিতে অলঙ্কার-যুক্ত ভাষায় লিখিত। পিছনদিকে সুল্‌তান মুহম্মদের ছাপ মারা, তাঁর নামের পর কতকগুলি সংখ্যা দেওয়া আছে, বোধ হয় তারিখ, কিন্তু তাহা পড়িতে পারা যায় না। সমুদয় কাগজখানি লম্বায় দুই ফিট সাড়ে দশ ইঞ্চি ও চওড়ায় এক ফুট সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি।

আদেশপত্রখানির সারমর্ম্ম এইরূপ:—

"যেহেতু স্বাভাবিক দয়া ও ঔদার্য্যগুণ বশতঃ আমরা উচ্চনীচ সকল স্তরের লোকের কল্যাণের জন্য ও উন্নতির জন্য আমাদের অপরিসীম শক্তি ও ধর্ম্মানুগত ইচ্ছাবৃত্তি নিয়োজিত করিয়াছি, সেই হেতু আমাদের দয়া ও অনুগ্রহভাজন আবুল হাসান্ জানিবেন যে, আমাদের পবিত্র নীতি অনুসারে ইহা স্থির করিয়াছি যে, পুরাতন কোন মন্দির বিধ্বস্ত করা হইবে না, তবে যেন কোন নূতন মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করিতে না দেওয়া হয়। আমাদের পবিত্র ও গৌরবময় রাজসভায় সংবাদ পৌঁছিয়াছে

যে কোন কোন (মুসলমান) ব্যক্তি বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া বারাণসী নগর ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের হিন্দু অধিবাসীদের ও মন্দির রক্ষক ব্রাহ্মণদের উৎপীড়ন করিতেছে।...অতএব রাজকীয় এই আদেশ জ্ঞাপন করা হইতেছে যে, আমাদের এই মহামান্য আদেশপত্র পাইবামাত্র জারী করিতে হইবে যে, অতঃপর আর কোন (মুসলমান) লোক হিন্দু বা ব্রাহ্মণ অধিবাসীদের উপর অত্যাচার করিবে না। ঐ সকল হিন্দু আপনাদের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ভগবান্-প্রদত্ত আমাদের এই সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য প্রার্থনা করিতে পারিবে। এই আদেশ জরুরী বলিয়া জানিবেন। ১৫ জমাদিয়স্‌সানি, হিঃ ১০৭৪।"

ইতিহাসে লিখিত ঔরংজেব সম্বন্ধে ভ্রান্ত উক্তি নূতন সত্যের উজ্জ্বল আলোর কাছে নিভিয়া যাক। নূতন তথ্য ইতিহাসে স্থানলাভ করুক।

(প্রবাসী)

স্বদেশী প্রচেষ্টার ইতিহাস

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

প্রথম ইংরেজী শিক্ষার মত্ততায় বাঙ্গালী ছাত্রদের মনে স্বদেশী-বিদ্বেষের উৎপত্তি হইয়াছিল। তখন শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী দেশের শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিজেদের দৈন্য কল্পনা করিয়া লজ্জা বোধ করিতেছিল; এবং সকল বিষয়েই পাশ্চাত্য অনুকরণই উন্নত Culture বলিয়া স্থির করিয়াছিল।

প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অবজ্ঞা প্রযুক্ত অনেকে নাস্তিক ও অনেকে খৃষ্টান-ঘেঁষা হইয়া পড়িতেছিলেন।

সেই সময়ে রামমোহন রায়ের শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মব্যাকুলতা অনুভব করিয়া প্রাচীন শাস্ত্র অন্বেষণে প্রবৃত্ত হ'ন। যদিচ প্রচলিত ধর্ম্মসংস্কার তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি স্বদেশের শাস্ত্রকেই ধর্ম্মোন্নতির ভিত্তি রূপে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনিই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বেদ-উপনিষদের আলোচনা ও বিলাতী বিজ্ঞান-তত্ত্ব প্রভৃতির প্রচার বাংলাভাষায় প্রবর্ত্তন করেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ বিদেশী ধর্ম্ম হইতে স্বধর্ম্মে ও বিদেশী ভাষা হইতে মাতৃভাষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করেন।

কেশব বাবুরা যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত হিন্দুসমাজের বিচ্ছেদ-সাধনের উপক্রম করিলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুসমাজকে ত্যাগ করিলেন না; ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুসমাজের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। আধুনিক শিক্ষিত চিত্তকে স্বদেশের অভিমুখী করিবার এই প্রয়াস।

দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে আধুনিক শিক্ষার সহিত স্বদেশী ভাবের সমন্বয়-চেষ্টা বরাবর কাজ করিতে লাগিল। হিন্দুমেলা এই স্বদেশী ভাবের আর একটি অভ্যুত্থান। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথ নবগোপাল মিত্রের সাহায্য করিয়া এই মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে স্বদেশী শিল্পের স্বদেশী মল্লবিদ্যার, স্বদেশী Gamesএর প্রদর্শনী হইত—স্বদেশী-গান গীত স্বদেশী কবিতা আবৃত্ত হইত।

তার পর বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন বাংলা সাহিত্যকে আধুনিক ভাবে পরিপুষ্ট করিয়া দেশের শিক্ষিতগণকে মাতৃভাষায় জাতীয় সাহিত্য-রচনায় উৎসাহিত করিয়া তুলিল। ইহার কিছুকাল পরে শশধরের প্রাদুর্ভাব উল্লেখযোগ্য।

ইতিমধ্যে রাজনারায়ণ বসুকে লইয়া আমাদের পরিবারে সাধারণের অগোচরে স্বদেশী ভাবের বিশেষরূপ চর্চ্চা হইতেছিল। গোপনে স্বদেশী দেশালাই ও উৎকর্ষ-প্রাপ্ত তাঁত প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য চেষ্টা চলিতেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই স্বদেশী ভাবের উত্তেজনাতেই খুলনা হইতে বরিশালে ষ্টীমার চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়া, ইংরাজ কোম্পানীর সহিত দারুণ প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে বরিশালে স্বদেশীর দল তাঁহার সাহায্যের জন্য যেরূপ প্রচণ্ড উৎসাহে যাত্রী-সংগ্রহ ও যাত্রী-ভাঙ্গানর কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এরূপ Fullerএর আমলে হইলে কি বিপদ্ হইত অনুমান করিবেন।

কন্‌গ্রেস গবর্ণমেণ্টের আবেদনের দিকেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চেষ্টাকে প্রবৃত্ত করাইল।

সাধনা পত্রে ও তাহার পরে অন্যত্র আবেদন-নীতি ত্যাগ করিয়া আত্মশক্তি-চালনের দিকে মন দিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; এবং বলেন্দ্রনাথ এবং আমাদের পরিবারের অনেকে যোগ দিয়া স্বদেশী-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

এই স্বদেশী-ভাণ্ডারের ভগ্নাবশেষের উপরে Indian Storesএর অভ্যুদয়।

ইহার অনতিকাল পরেই Provincial Conferenceএ যাহাতে বাংলাভাষায় আপামর সাধারণের নিকট স্বদেশের অভাব আলোচনা করা যায়, যাহাতে ইংরেজী ভাষায় কেবল রাজার নিকট আবেদনেই আমাদের কর্ত্তব্য নিঃশেষিত না হয়,—রাজসাহী কন্‌ফারেন্সে সত্যেন্দ্রনাথের নায়কতায় প্রথম সেই চেষ্টা করা হইয়াছিল;—পরবৎসর ঢাকাতেও সেই চেষ্টা করা যায়।

স্বদেশী Movementএর সঙ্গে এই সকল চেষ্টার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেমন আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রাচীন শাস্ত্রের দিকে মন টানিয়াছিল—Politics সম্বন্ধেও সেইরূপ কিছুদিন হইতে দেশের লোককে দেশের দিকেই টানিবার চেষ্টা চলিতেছিল। তৎকালে শিক্ষিত লোকেরা যেমন সহজে শাস্ত্রের দিকে, স্বদেশী ধর্ম্ম ও স্ব-সমাজের দিকে ফিরিতে চাহেন নাই, এখনকার দিনেও সেইরূপ শিক্ষিত agitation-ওয়ালা সহজে আবেদনের পালা বন্ধ করিয়া স্বদেশের জনসাধারণের সম্মুখে দাঁড়াইতে প্রস্তুত হন নাই।

নূতন পর্য্যায় বঙ্গদর্শনে এই আত্মশক্তি-চর্চ্চা ও স্বদেশী ভাবের দিকে দেশের চিত্ত আকর্ষণের জন্য উপদেশের প্রবর্ত্তন করা হয়; এবং বোলপুরের

বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষার ভার নিজের হাতে লওয়া ও স্বদেশী ভাবের প্রবর্ত্তনের চেষ্টা। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় অগ্রণী। তিনি ইংরেজী ধরণের বিদ্যালয় দেশীয় লোকের দ্বারা চালাইতে সুরু করেন। আমার চেষ্টা—যাহাতে বিদ্যাশিক্ষার আদর্শ যথাসম্ভব স্বদেশী রকম হয়।

এইরূপ আন্দোলন যখন দেশে ভিতরে-ভিতরে চলিতেছিল, তখন যোগেশ চৌধুরী কলিকাতায় কন্‌গ্রেসে শিল্প-প্রদর্শনী খুলিয়া কন্‌গ্রেসের আবেদন-প্রধান ভাবকে স্বদেশী ভাবে দীক্ষিত করিবার প্রথম চেষ্টা করেন। তার পর হইতে এই প্রদর্শনী বৎসরে-বৎসরে চলিতেছে।

ইতিমধ্যে আশু চৌধুরী বর্ত্তমান কন্‌ফারেন্সে পোলিটিকাল ভিক্ষা-বৃত্তির বিরুদ্ধে তর্ক উত্থাপন করিয়া গালি খান। কিন্তু দেশ অন্তরে-অন্তরে স্বদেশী ভাবে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। এমন সময়ে পার্টিশন ব্যাপার একটা উপলক্ষ মাত্র হইয়া, এই স্বদেশী আন্দোলনকে স্পষ্টরূপে বিকশিত করিয়া তুলিল। বস্তুতঃ বয়কট করার ছেলেমানুষী ইহার প্রাণ নহে।

(১৩১২ সনের ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট লিখিত পত্র হইতে গৃহীত। এই খসড়া হইতে বড় করিয়া একটা প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনের জন্য লিখিবার ভার দীনেশ বাবুর উপর ছিল।)

(ইতিহাস ও আলোচনা)

শিক্ষক

[শ্রীঅশোককুমার সেন, এম্‌-এ, বি-টি]

শিক্ষকের কর্ত্তব্য, শিক্ষার্থিগণের শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধন করা। যিনি শুধু শিক্ষার্থীর মনের ভাব ও জ্ঞানের খোরাক ক্রমাগত সঞ্চিত করিয়া তোলেন, তাহা জীর্ণ হইল কি না, পুষ্টির কারণ হইল কি না, ভাবিয়া দেখেন না, তিনি শিক্ষক নহেন—উপদেষ্টা মাত্র।

শিশু যাহাতে মানুষ হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়, শিক্ষককে তাহাই দেখিতে হইবে। উপদেষ্টা উপদেশ দিয়াই পালাস। সে উপদেশ শ্রোতার কর্ণে প্রবেশ করিল কি না, দেখিবার অবকাশ তাঁহার নাই। কিন্তু শিক্ষকের কার্য্য অন্যরূপ। তিনি দেখিবেন, শিক্ষণীয় বিষয়ে ছাত্রের রুচি জন্মিল কি না, জানিবার জন্য তাহার কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল কি না? সাক্ষাৎ ভাবে শিক্ষককে কিছুই শিখাইতে হইবে না।

যিনি শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে ব্রতী হইতে চান, তাঁহাকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইবে। (১) তিনি শিশুদের ভালবাসেন কিনা? (২) শিশুদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি আছে কি না? (৩) শিশুদের মঙ্গল-সাধনে তাঁহার আনন্দ হয় কি না? (৪) তিনি শিশুদের জন্য আনন্দে সময় কাটাইতে পারেন কি না? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে যদি তিনি 'হাঁ' বলিতে পারেন, তবেই যেন তিনি এই কার্য্যে অগ্রসর হ'ন, নতুবা নহে।

শিশুরাই শিক্ষকের উপযুক্ত সমালোচক। তাহারা অনেক সময় যেরূপ নিরপেক্ষ ভাবে তাঁহার সমালোচনা করিয়া থাকে, এরূপ আর কেহই পারে না। নূতন শিক্ষক বালকদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেই, তাহারা তাঁহার সম্বন্ধে মত গঠন করিয়া বসে। তাহাদের এই প্রাথমিক ধারণা অনেক স্থলেই অভ্রান্ত হইয়া থাকে। এই ধারণা যদি শিক্ষকের পক্ষে অনুকূল না হয়, তাহা হইলে তিনি নিজের দোষ-ত্রুটির অনুসন্ধান করিয়া, তাহার প্রতিকার করিবেন। যাহাতে তাহাদের মনে ধারণা বদ্ধমূল হইতে না পারে, তজ্জন্য অবিলম্বে তাঁহাকে অবহিত হইতে হইবে।

শিক্ষকের আচার ব্যবহার (manners)

শিক্ষকের আচার-ব্যবহারের প্রতি শিশুরা বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখে। তাঁহার খুঁটিনাটি বিষয়েও তাহাদের সজাগ দৃষ্টি থাকে। তাহারা এই সব বিষয়ের তীব্র সমালোচনা করে, এবং শিক্ষকের সম্বন্ধে মতামত স্থির করিয়া বসে। তাহাদের চক্ষু দূরদর্শী না হইলেও সূক্ষ্মদর্শী। শিশুদের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি হইতে দোষ গোপন করা অসম্ভব। এজন্য কোনো দোষ বা দুর্ব্বলতা থাকিলে শিক্ষককে তাহা সযত্নপ্রযত্নে পরিহার করিতে হইবে।

শিক্ষক মহাশয়কে দয়াশীল, শিষ্টাচারী, ধৈর্য্যশীল, কর্ম্মঠ, উদ্যোগী ও উন্নতমনা হইতে হইবে। তাঁহার চিত্তের ভাব কোমল অথচ দৃঢ় হইবে। এই কোমলতার সহিত দৃঢ়তার মিশ্রণ, সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়—নূতন শিক্ষকের পক্ষে তো নয়ই। যে সকল শিক্ষক এই ভাবের ভাবুক, ছাত্রেরা আনন্দের সঙ্গে তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকে।

যে সকল শিশু চঞ্চল ও কর্ম্মপ্রিয়, তাহাদের নিকট কর্ম্মঠ ও কর্ম্মপরায়ণ শিক্ষকের আদর অবশ্যম্ভাবী। কোনরূপে সময় কাটান যে শিক্ষকের ব্যবসায়, ঘণ্টার অবসানের সঙ্গে-সঙ্গেই যাঁহার নিষ্কৃতি, ছাত্রেরা তাঁহাকে শীঘ্রই চিনিয়া ফেলে, এবং ঘৃণা ও উপহাসের পাত্র বলিয়া মনে করে। ছাত্রেরাও সময় সময় কার্য্যে শিথিলতা প্রদর্শন করে সত্য, কিন্তু যিনি তাহাদিগকে খাটাইয়া লইতে পারেন, তিনি তাহাদের বিরক্তিভাজন না হইয়া সম্মানভাজনই হইয়া থাকেন। শিক্ষকের উৎসাহে উদ্দীপনায় ছাত্রেরা মাতিয়া উঠিবে। যাহারা অলস, কর্ম্মবিমুখ, তাহারাও তন্দ্রাতুর হইয়া থাকিবার সুযোগ পাইবে না। অনেক সময় শিশুরা শিক্ষণীয় বিষয় বুঝিতে না পারিয়া তাহাতে বিমুখ হইয়া থাকে; শিক্ষক যদি ইঙ্গিতে ইসারায় তাহাদিগকে বুঝিবার পথ দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে তাহারা সহজেই তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। ইহার জন্য ধৈর্য্যের আবশ্যক, আর আবশ্যক শিশুচিত্তের তত্ত্বানুসন্ধানের উপযোগী

সুক্ষ্ম-দৃষ্টি। এই দুইটি প্রধান গুণের অভাবেই অনেক সময় শিক্ষক ছাত্রের নিকট বিভীষিকার কারণ হইয়া থাকেন।

শিক্ষকের ভাষা

শিক্ষকের ভাষা সরল, সুস্পষ্ট ও ব্যাকরণ-সঙ্গত হওয়া আবশ্যক। যেরূপ ভাষায় কথা বলিলে শিশুরা অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারে, ভাষার প্রকৃতি সেইরূপ হইবে। শিশুদের ভাষা শিশুদেরই ভাব-প্রকাশের অনুরূপ। সেই ভাষার সঙ্গে শিক্ষককে বিশেষভাবে পরিচিত হইতে হইবে। সাহিত্যকে ভাষার মুকুর বলা যাইতে পারে। ভাষার উন্নতি-সাধনের জন্য শিক্ষক মহাশয়কে সাহিত্যের সঙ্গে সংস্রব রাখিতে হইবে। তিনি সর্ব্ববিষয়েই শিশুর আদর্শ। ছাত্রেরা যেমন তাঁহার আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করে, তেমনি তাঁহার ভাষারও অনুকরণ করে। যদি তিনি ক্লাসে দুষ্ট গ্রাম্য কথার প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে শিশুরা বাড়ীতে আসিয়াও ঐরূপ কথার পুনরাবৃত্তি করিবে। শিক্ষকের ভাষা শিশুর পিতা-মাতারও অজ্ঞাত থাকিবে না। এইজন্য শিক্ষকের ভাষাও আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত। শিশুদের সকলের শিক্ষাদীক্ষা ও সঙ্গ সমান নহে,—তাহাদের কাহারো-কাহারো মুখ হইতে দুষ্ট গ্রাম্য কথা উচ্চারিত হইতে পারে। হইলে, তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইবে। এরূপ স্থলেও উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তই সমধিক সুফলপ্রদ।

শিক্ষকের কণ্ঠস্বর

শিক্ষকের কণ্ঠস্বর মধুর, সুস্পষ্ট ও সংযত হওয়া আবশ্যক। এরূপ স্বরে শিশুগণের মন সহজে আকৃষ্ট হয়; এবং শিক্ষক যাহা বলেন, শিশুগণ তাহা বুঝিতে ও তদনুরূপ কার্য্য করিতে পারে। স্বরের মধুরতায় ছাত্রগণের মন আকর্ষণের অসুবিধা হয় না। কণ্ঠস্বরেই শ্রোতৃবর্গ বুঝিতে পারে, বক্তা যাহা বলিতেছেন, তাহাই তাঁহার আন্তরিক ভাব কি না। সহানুভূতিব্যঞ্জক স্বর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সদ্ভাব-স্থাপনের প্রধান উপায়। কর্কশ স্বরে কাহারও মন মুগ্ধ হয় না, এবং কেহই মিত্রভাবাপন্ন হইতে পারে না।

শিক্ষকের কণ্ঠস্বর ও দৃষ্টি কেবল যে সুশাসনের সহায় তাহা নহে, শিশুগণের বাক্‌শক্তি – পঠন ও আবৃত্তিরও সহায়।

শিক্ষাদান কালে অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে বা অতীব মৃদুস্বরে কথা কহা উচিত নহে। কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক হওয়া উচিত। সচরাচর কথোপকথনে কণ্ঠস্বর যেরূপ হয়, সেইরূপ হইবে। শিক্ষকের তর্জ্জনগর্জ্জন বা চীৎকার করা উচিত নহে। তাহাতে শিশুগণ ভীত, ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হয়; এবং শিক্ষকের প্রতি সহানুভূতিশূন্য হইয়া পড়ে।

সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, ব্যক্তিমাত্রেরই কণ্ঠস্বরের একটা স্বাভাবিক ওজন আছে। উহার বিকৃতি করিলে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং শিক্ষকতা-কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। আবার ইহাও মনে রাখা উচিত যে, নিবিষ্ট মনে উপদেশ শ্রবণ করাই শিশুগণের কর্ত্তব্য; শিশুগণকে জোর করিয়া শুনানো শিক্ষকের কর্ত্তব্য নহে। তবে বক্তা ও শ্রোতা উভয় পক্ষেরই আগ্রহ থাকা আবশ্যক।

শিক্ষকের জ্ঞান

জ্ঞানই শক্তি। শিক্ষাদান-বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান থাকিলে, শিক্ষক তৎসম্বন্ধে শিক্ষার্থীর চিত্ত সহজেই আকৃষ্ট করিতে পারেন; এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাদের মনোযোগ অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হ'ন। কিন্তু সকল শিক্ষক সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে পারেন না। এই জন্য, যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহার সেই বিষয়েই শিক্ষাদান করা উচিত। কোন বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকা যেরূপ দোষের, কোন বিষয় না জানিয়া জানার ভান করাও তেমনি গর্হিত। জানা না থাকিলে, জানিয়া বলিবেন,—এইরূপ বলাই ন্যায়সঙ্গত।

কর্ত্তব্য কার্য্য ভাল করিয়া নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করা উচিত। এজন্য ছাত্রদের যে বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে শিক্ষকের উত্তমরূপে প্রস্তুত হওয়া দরকার। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জ্ঞান থাকিলেই শিক্ষক নিজের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারিবেন এবং ছাত্রদিগকেও নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হইবেন। তিনি শুধু জ্ঞান দান করিয়া যাইবেন, নিজে জ্ঞানার্জ্জন করিবেন না,—ইহা সুশিক্ষকের কার্য্য নহে। শিক্ষায় সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য শিক্ষক ও ছাত্র উভয়কেই শিক্ষার্থী হইতে হইবে।

শিক্ষকের সাধারণ জ্ঞান

শিক্ষকের সাধারণ জ্ঞান অতীব তীক্ষ্ণ হওয়া আবশ্যক। শিক্ষার্থী যেমন দেখিবামাত্র শিক্ষকের সম্বন্ধে মত স্থির করিয়া বসে, শিক্ষকেরও শিক্ষার্থীর সম্বন্ধে সেইরূপ মত স্থির করিবার ক্ষমতা থাকা উচিত। কি দেখা উচিত, কি দেখা উচিত নহে, কি করা উচিত, কি করা উচিত নহে, কি করিতে দেওয়া উচিত, কি করিতে দেওয়া উচিত নহে, কোন্ সময়ে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, অর্থাৎ কোন্ সময়ে ক্ষমা ও কোন্ সময়ে তেজ প্রদর্শন করা উচিত, প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান থাকা শিক্ষকের বিশিষ্ট গুণ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। আদর্শ শিক্ষকের পাণ্ডিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞতা বা বিচক্ষণতা থাকা সমধিক বাঞ্ছনীয়। পুস্তকলব্ধ জ্ঞানে ভূষিত হওয়া অপেক্ষা মনুষ্যত্বে অর্থাৎ দয়া-দাক্ষিণ্য, বুদ্ধি-বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণে বিভূষিত হওয়া ভাল।

শিক্ষকের চক্ষু

শিক্ষকের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক হইবে। শ্রেণীর প্রতি একবার দৃষ্টিক্ষেপণ করিলেই অসংখ্য কথা নীরবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দৃষ্টির সম্মিলনে অনেক ভাব বা কথার বিনিময় হইয়া থাকে। মনের গবাক্ষ-স্বরূপ চক্ষুতেই শিক্ষার্থী শিক্ষকের সহানু-

ভূতি, স্নেহ, আন্তরিক আগ্রহ ও দৃঢ়তা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিফলিত দেখিতে পায়।

শিক্ষকের তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি থাকিলে তাঁহার শ্রেণীতে বিশৃঙ্খলা হইতে পারে না, সুশাসন অব্যাহত থাকে। সুদক্ষ শিক্ষক তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রভাবে সকল ব্যাপার দেখিতে পাইবেন বটে, কিন্তু সহসা তৎসম্বন্ধে কিছুই বলিবেন না, বা করিবেন না,—বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই ধীরভাবে কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন।

শিক্ষকের কর্ণ

শৃঙ্খলা ও সুশাসন রক্ষা করিবার জন্য শিক্ষকের শ্রবণ-শক্তিও প্রখর থাকা উচিত। সামান্য শব্দ বা কথা শ্রবণ, নানারূপ শব্দের পার্থক্য নিরূপণ, শব্দের স্থান-নির্দ্ধারণ, প্রভৃতি কার্য্যে প্রবল শ্রবণশক্তি আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া সামান্য উচ্চ শব্দেই বিরক্তি বোধ করিলে চলিবে না। তাঁহাকে নিবিষ্ট মনে শিক্ষার্থীর বক্তব্য শ্রবণ করিতে হইবে। সে যখন বলিতে থাকিবে, তখন তাহাকে বাধা দেওয়া উচিত হইবে না; দিলে তাহার উৎসাহ ভঙ্গ ও মন বিভ্রান্ত হইবে।

শিক্ষকের প্রভাব

ইহা অলক্ষিতে বিদ্যালয়ের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বিদ্যালয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্রই শিক্ষক কিরূপ বুঝিতে পারা যায়। শাসন, শৃঙ্খলা, ব্যবস্থা, উন্নতি প্রভৃতিই তাঁহার প্রভাবের পরিচায়ক।

শিক্ষক যে সকল শিশুকে শিক্ষা দেন, তাহারাই উত্তরকালে সমাজের এবং জগতের স্তম্ভ বা মেরুদণ্ড স্বরূপ হইবে। সুতরাং শিক্ষকের প্রভাব যে কতদূর বিস্তৃত, তাহা সহজেই অনুমেয়।

(শিক্ষক)

কর্ম্মত্যাগ

[শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি]

(১)

ভোরের বেলা যখন যুধিষ্ঠির একটা লোকের কাঁধে পুঁটুলি চাপাইয়া, বরাবর একেবারে জমীদার-বাবুর বাড়ীর ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল, তখন রত্নেশ্বর বাবুর দেহে প্রাণ আসিল। তথাপি তিনি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হ্যাঁরে যুধিষ্ঠির, সব পেয়েছিস্ তো?"

একটু যেন অস্বাভাবিক কণ্ঠে যুধিষ্ঠির 'আজ্ঞে হাঁ' বলিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

রত্নেশ্বর বাবুর তখন সে সব লক্ষ্য করিবার অবসর ছিল না। তিনি পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—এক ঘণ্টার মধ্যে তৈরী হয়ে, লোকজন নিয়ে জেলায় রওনা হওগে। যেন দেরী না হয়।

পুত্র 'যে আজ্ঞা' বলিয়া, পুঁটুলিটা সাবধানে উঠাইয়া লইয়া গেল।

"তোর কল্যাণে বাঁচলাম, বাপ! এখন ভালোয়-ভালোয় টাকাটা জেলায় পৌঁছে গেলে বাঁচি। কি দুর্ভাবনাই যে হয়েছিল!" বলিয়া রত্নেশ্বর বাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

ঘটনাটা অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসরেরও বেশী পূর্ব্বেকার। হাঁটা-পথ বা নৌকাপথ তখন যাতায়াতের প্রধান পথ ছিল। অথচ এ দুটা পথই তখন অত্যন্ত বিপদ-সঙ্কুল—বিশেষ রাত্রি-বেলা।

একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় রত্নেশ্বর বাবুর সদরে আজই দাখিল করিবার হাজার পাঁচেক টাকার হঠাৎ অকুলান পড়িয়া যায়। মাঝে-মাঝে হঠাৎ এরূপ অভাব হইলে, যেখান হইতে টাকার যোগাড় হইত, সেই ধনকুবের লোকটির বাড়ী ১৫ ক্রোশ দূরে। প্রভুকে চিন্তান্বিত দেখিয়া, যুধিষ্ঠির পূর্ব্ব দিন অপরাহ্নে প্রভুর পত্র ও একগাছা বাঁশের পাকা লাঠি মাত্র সম্বল করিয়া যাত্রা করিয়াছিল। সেখানে পৌঁছিয়াই চিঠি দেখাইয়া টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল এবং একটি লোকের মাথায়

তাহা চাপাইয়া দিয়া, প্রহরী স্বরূপ লাঠিগাছা কাঁধে ফেলিয়া, তাহার সঙ্গে-সঙ্গে এইমাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

কেমন করিয়া যে যুধিষ্ঠির এই গুরু ভারটি এত সহজে সুসম্পন্ন করিতে পারিল, তাহারও একটা কারণ আছে। যুধিষ্ঠিরের পিতামাতা তাহার নাম যুধিষ্ঠির রাখিলেও, সে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের ন্যায় ধর্ম্মরাজ তো ছিলই না—বরং ঘটনাচক্রে ১৮ বৎসর বয়সে একটা ডাকাতের দলে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল এবং ৩০ বৎসর বয়সে সেই দলেরই সুবিখ্যাত সর্দ্দার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

যখন তাহার বয়স ৩৬ কি ৩৭ বৎসর, তখন একদিন একটা বড়-রকমের ডাকাতি শেষ করিয়া বাড়ী আসিয়া দেখিল, তাহার বছর-আষ্টেকের বড় ছেলেটি বিসূচিকার অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে,—আর তাহার স্ত্রী, কিসে পুত্রের যন্ত্রণার উপশম করিবে, তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া, বিহ্বল হইয়া পুত্রকে বুকে করিয়া বসিয়া আছে। পাশে তাহাদের দুই বছরের ছোট ছেলেটি ঘুমাইতেছে।

ছেলেটি কাল রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইল না। মা গো, বাবা গো, বলিয়া বাপ-মাকে জড়াইয়া ধরিয়াও, এক ঘণ্টার মধ্যে অন্যত্র চলিয়া গেল। স্ত্রীর বুক হইতে পুত্রকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া, যুধিষ্ঠির ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে তাহাকে দাহ করিয়া ফিরিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, স্ত্রীকেও ঐ রোগে ধরিয়াছে। সেও থাকিল না—সেই দিনই চলিয়া গেল। মরণের পূর্ব্বে পুত্রশোকাতুরা নারী কাঁদিতে-কাঁদিতে স্বামীকে বলিয়া গেল, সে যেন লোকের বাড়ী খাটিয়া খায়, যেন ভিক্ষা করিয়া খায়, তবু যেন ও-পাপ কাজ আর না করে। করিলে তাহাদের জলপিণ্ড লোপ পাইবে, ছোট ছেলেটিও আর বাঁচিবে না।

স্ত্রীর দাহ সমাধা করিয়া দুই বছরের ছেলেটিকে বুকে করিয়া, আজ ১০ বৎসর হইল যুধিষ্ঠির তাহাদের গ্রামের জমীদার রত্নেশ্বর বাবুর কাছে তাহার সমস্ত পাপ ও পাপের প্রতিফলের বিবরণ বলিয়া, একটা কার্য্য প্রার্থনা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রত্নেশ্বর বাবু তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া তৎক্ষণাৎ একটি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুধু একটিবার হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "কিন্তু, বাবা, আমার এখানে বরাবর বিশ্বাসী হয়ে থাকতে হবে।"

আজ পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠির সে বিশ্বাস অটুট রাখিয়াছে।

(২)

পুত্রকে লোকজন ও টাকা লইয়া নৌকাযোগে সদরে রওনা হইতে দেখিয়া, রত্নেশ্বর এবার একটু তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন, এমন সময় যুধিষ্ঠির তাঁহার সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

রত্নেশ্বর বাবু প্রসন্ন দৃষ্টিতে যুধিষ্ঠিরের পানে চাহিয়া বলিলেন—"আবার এখনি ফিরে এলে কেন বাবা? কাল তুমি বড়ই খেটেছ! আজ তোমার ছুটি। খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করগে।"

তবু যুধিষ্ঠির সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"বাবু, আমার একটা কথা আছে।"

রত্নেশ্বর বাবু হাসিয়া বলিলেন—"সেই বক্‌শিসের কথা তো? সে আমার খুব মনে আছে। তুমি আমার মান রক্ষা করেছ। এবার তোমার বক্‌শিষ সব চেয়ে বেশী হবে।"

যুধিষ্ঠির ধীরে ধীরে বলিল—"না বাবু, বক্‌শিষের কথা নয়। আমি আর কাজ করতে পারব না, তাই বল্‌তে এইছি।"

রত্নেশ্বর বাবু যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। "বলিস্ কিরে যুধিষ্ঠির! তুই কাজ করতে পারবি নি, সে কি রকম। তোকে কি কেউ কোন শক্ত কথা বলেছে? কে কি বলেছে বল্‌ত বাবা। আমি এখনি তাকে ডেকে বকে দিচ্ছি।" বলিয়া, স্নেহশীল পিতা যেমন সান্ত্বনার চক্ষে অভিমানী পুত্রের পানে চাহেন, তেমনি করিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরের পানে চাহিলেন।

যুধিষ্ঠিরের বড়-বড় চোখ দুটো ছল-ছল করিয়া আসিল। সে বলিল—"না বাবু, আমায় কেউ কিছু বলে নি। বল্লেও, আপনি আমায় যে দয়া করেন, তাতে আমি সে-সব মনেই করতুম না। কিন্তু আর আমার এখানে থাক্‌বার উপায় নেই।"

অতি কোমল কণ্ঠে রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন,—"কেন, বাবা, কি তোর বাধা ঘট্‌ল?"

উত্তরে যুধিষ্ঠির যাহা বলিল, তাহা আমি নিজের ভাষায় বলিতেছি।

(৩)

যুধিষ্ঠির প্রভুকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও চিন্তান্বিত দেখিয়া, তাঁহাকে ভরসা দিয়া গিয়াছিল যে, যেমন করিয়া হউক সে

সকালের মধ্যে টাকা লইয়া ফিরিয়া আসিবে। তাই অপরাহ্নে বাহির হইয়া, লাঠির সাহায্যে মাঠের পর মাঠ বেগে পার হইয়া, সে ঘণ্টা-চারেকের মধ্যে সেখানে পৌছিয়াছিল। তার পর আধ-ঘণ্টার মধ্যে টাকা লইয়া, সেখানকারই একটা লোকের কাঁধে সেই টাকা চাপাইয়া, সে তাহার সহিত প্রহরী স্বরূপ যাত্রা করিয়াছিল।

রাত্রি যখন ১০টা, তখন হইতেই গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা আরম্ভ হইয়াছিল—কে যায়। মাঠের মাঝে রাত্রিতে এরূপ প্রশ্ন কাহারা করে এবং কেন করিয়া থাকে, সে সব কথা সকল পথিকই বিশেষরূপে জানিত। অর্থবাহকের ভীতি-জড়িত কণ্ঠে কোন কথা ফুটিবার আগেই, সে ধীরে-ধীরে শুধু বলিয়াছিল,—আমি যুধিষ্ঠির। উত্তর শুনিবামাত্র প্রশ্নকর্ত্তারা অন্তর্হিত হইয়াছিল। কারণ, ডাকাতি ছাড়িয়া দিলেও, তাহার এক-সময়কার সাহস ও বীরত্বের খ্যাতি কোন দস্যুরই জানিতে বা শুনিতে বাকি ছিল না।

এইরূপে তাহারা যখন ক্রোশ-আষ্টেক পার হইয়া আসিয়াছে, হঠাৎ টাকার একটা টুং টুং শব্দ তাহার কাণে পৌছিল। পুঁটুলির একটা ধার একটু আলগা হইয়া পড়িয়াছিল; সেজন্য টাকায় টাকায় লাগিয়া ঐরূপ শব্দ হইতেছিল।

উঃ! টাকার শব্দ কি ভয়ানক! শব্দটা খানিকটা অন্তর-অন্তর হইতেছিল। দুই-চারিবার শব্দ শোনার পর, যুধিষ্ঠির এই দীর্ঘ দশ বৎসর যে চিন্তা, যে কার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই চিন্তা, সেই কার্য্য শতগুণ মনোহারিত্ব লইয়া তাহার মন অধিকার করিয়া বসিল।

চারিদিকে মাঠ—কোন দিকে একটা মানুষের চেহারা তো দূরে থাক্, শব্দ পর্য্যন্ত নাই! মধ্যরাত্রি অতীতপ্রায়। আর সঙ্গে পাঁচ হাজার টাকা লইয়া একটা তাহার চেয়ে শতগুণে দুর্ব্বল লোক চলিতেছে। কে যেন মনের মধ্যে চুপি-চুপি বলিয়া দিল—"এ পাঁচ হাজার টাকা তো তোরই,—নিয়ে নে না বোকা!"

স্ত্রী ও পুত্রের শোকে যে রাক্ষসীকে সে একেবারে মারিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিল, আজ দেখিল, সে বুকের মধ্যে খাদ্যের অভাবে সাপের মত অজ্ঞান হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া ছিল মাত্র। গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি, নির্জ্জন স্থান, মাঠের বাতাস ও সর্ব্বোপরি টাকার মিষ্ট শব্দের ঔষধ ও পথ্যে সে আজ চক্ষু মেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল; আর রাজ্ঞীর মত যুধিষ্ঠিরকে আদেশ করিল—'নিয়ে নে না বোকা!'

তখনি যুধিষ্ঠির সব ভুলিয়া গেল। পুত্রের মৃত্যুশয্যা, স্ত্রীর মৃত্যুমলিন মুখ, তাহার সেই সকাতর শেষ অনুরোধ, জলপিণ্ডের আশা, কনিষ্ঠ পুত্রের শুভাশুভ—মুহূর্ত্তমধ্যে সকলই তাহার মন হইতে মুছিয়া গেল।

এমন সময় আবার টাকা বাজিয়া উঠিল—টুং! টুং!

বজ্রকঠোর স্বরে যুধিষ্ঠির হাঁকিল—"এই! দাঁড়া চুপ করে।"

লোকটা ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া, তৎক্ষণাৎ টাকার পুঁটুলিটা যুধিষ্ঠিরের কম্পিত প্রসারিত হাতের উপর তুলিয়া দিল। যুধিষ্ঠির দেবতার নামে দিব্য লইয়া বলিতে পারিত যে, সেই সময় লোকটা যদি টাকা দিতে একটু দেরী বা একটু ইতস্ততঃ করিত, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ লাঠির এক আঘাতেই তাহাকে শেষ করিয়া ফেলিত। কিন্তু, ভগবান্ না কি তাহাকে ও লোকটাকে রক্ষা করিবেন, তাই লোকটা তৎক্ষণাৎ টাকাগুলা দিয়া দিল। নহিলে কি সর্ব্বনাশই না হইয়া যাইত!

টাকাগুলা হাতে আসিতে, যুধিষ্ঠিরের অন্তররুদ্ধা সদ্যোত্থিতা ক্ষুধাতুরা রাক্ষসী যেন ক্ষুধার অন্ন পাইল। তাহার প্রসারিত কণ্টকিত হস্ত, লেলিহান জিহ্বা, তাহার শব্দায়িত বিশাল বক্ষ—তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সে রাক্ষসী যেন টাকাগুলিকে গোগ্রাসে ভক্ষণ করিতে লাগিল।

রাক্ষসী যখন এমনি করিয়া তাহার ক্ষুধা মিটাইতেছিল, যুধিষ্ঠির তখন টাকার পুঁটুলি বুকে করিয়া ক্রোশখানেক পথ চলিয়া আসিয়াছে। সঙ্গের লোকটাও ভয়ে-ভয়ে নিঃশব্দে পিছনে আসিয়াছে। এতক্ষণ পরে হঠাৎ যুধিষ্ঠিরের মনে পড়িয়া গেল, জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পত্নীর মৃত্যুকাতর মুখ। পত্নীর অন্তিম মিনতি মনে পড়িল—ও-পাপ-কাজ আর করিও না—জলপিণ্ড লোপ পাইবে—খোকাও আর বাঁচিবে না!

রাক্ষসীর ক্ষুধা তখন অনেকটা মিটিয়া আসিয়াছে। তাই সে তখন যুধিষ্ঠিরের দিকে তেমন করিয়া আর চাহিতেছিল না। তাই স্ত্রীর কথা তাহার কাণে গেল। চুপি-চুপি তাহার স্ত্রী যেন বলিয়া গেল—"হ্যাঁ গো, খোকাটাকেও বাঁচতে দিলে না।"

যুধিষ্ঠির চমকিয়া উঠিল! সে যে একেবারে তাহার সর্ব্বনাশ

করিতে বসিয়াছিল! কাহার পেট ভরাইতে সে এ টাকা লইবে। এতখানি বিষ সে কাহাকে পান করাইবে! এই টাকা লইয়া বাড়ী গিয়া, সে যদি এবারও দেখে যে, কানাই বিসুচিকার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে! ঠোঁট দুখানি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—জল—জল করিয়া ঘটি ঘটি জল পান করিয়াও তৃষ্ণা মিটিতেছে না! তখন?

আতঙ্কে শিহরিয়া যুধিষ্ঠির, টাকাগুলাতে যাহাতে আর শব্দ না হয়, এই ভাবে বেশ করিয়া বাঁধিয়া, সবেগে লোকটার কাঁধে চাপাইয়া দিয়া আগে আগে ছুটিল। টাকার আগুনে যুধিষ্ঠিরের বুকের খানিকটা ও হাত দুটা যেন পুড়িয়া গিয়াছিল।

লোকটা যে অতর্কিত ভারের বেগে পড়িতে-পড়িতে রহিয়া গিয়াছিল, তাহা সে লোকটার পায়ের শব্দে বুঝিয়াছিল।

ক্ষুধা মিটিলেও রাক্ষসী আর একবার অর্দ্ধ-ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়াছিল। কিন্তু যুধিষ্ঠির তখনি আবার তাহার কণ্ঠ রোধ করিয়া ফেলিল। কিন্তু রাক্ষসী তো মরে নাই;—আবার ঔষধ পথ্য পাইয়া কখন যে উঠিয়া বসিবে, তাহার স্থিরতা নাই।

রাত্রির সমস্ত কথা কহিয়া যুধিষ্ঠির ভূমিষ্ঠ হইয়া রত্নেশ্বর বাবুকে প্রণাম করিয়া বলিল—"বাবু, আবার যদি সেই পাপ করে বসি,—তাই আমি চল্লাম। আমার সব অপরাধ মাপ করবেন। আর কানাইকে আপনার চরণে ঠাঁই দেবেন।"

রত্নেশ্বর বাবু যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিতে-শুনিতে এমনই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, খানিকক্ষণ তিনি বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন; নিষেধের একটা কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

একটু পরেই চাহিয়া দেখিলেন যুধিষ্ঠির চলিয়া গিয়াছে। তিনি যুধিষ্ঠিরকে ভাল রকমই জানিতেন। সে যে আর শত চেষ্টাতেও ফিরিবে না, তাহা তিনি খুব বুঝিয়াছিলেন।

'হরি, দয়াময়!' বলিয়া রত্নেশ্বর বাবু একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলিলেন। সেই বলিষ্ঠ, নির্ভীক, কর্ম্মকুশল ও প্রভুভক্ত ভৃত্যের জন্য তাঁহার প্রশান্ত দুটি চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

বরষা

[শ্রীবীরকুমার-বধ রচয়িত্রী]

(১)

আজি এই ম্লান বসুমতী
কার এত আঁখি-জল-মাখা?
ভিজা ফুল ভিজা পাতা, তারি মাঝে আছে গাথা,
কার মরমের ব্যথা
রক্ত দিয়ে আঁকা।

২

আজি কার সিক্ত বন পথে,
অব্যক্ত কি বেদনার গীতি,
নীরবে মূরছি আছে, কেহ হেন নাহি কাছে,
একটু সান্ত্বনা দিবে
এক ফোঁটা প্রীতি।

৩

অবিরত ঝরে কাদম্বিনী
ভিজাইয়া ভাসাইয়া ধরা,
কে গো তুমি দেব-কন্যে! এ অশ্রু কিসের জন্যে,
কেন মা, প্লাবিয়া দিলে
বিশ্ব বসুন্ধরা?

৪

কি বেদনা ব্যথিত মরমে
তাও কি শুনিতে নাই কেহ?—
না জানি কি যাতনায়, এ সমুদ্র বহি যায়,
কে কবে মুছায়ে দিবে
দিয়ে যোগ্য স্নেহ?

সম্পাদকের বৈঠক

[১]

শাস্ত্রীয় প্রশ্ন

১। স্বাধীন বঙ্গে বঙ্গবাসীর ও রাজাদের জাতীয় পরিচ্ছদ কি ছিল? সপ্রমাণ উত্তর দিবেন।

২। শারদীয় শ্রীশ্রীদুর্গা পূজায় "বোধন" প্রথা আছে। বোধন শব্দের প্রকৃতার্থ কি? চির-জাগ্রত—নির্নিমেষ দেবগণের আবার "বোধন" কি? শরৎকালে অন্য দেব-দেবীরও অর্চনা করা হয়; তাঁহাদেরই বা বোধন-বিধান নাই কেন?

শ্রীঅশ্বিনীকুমার কাব্যতীর্থ বিদ্যাভূষণ, কাব্য-বিশারদ সরস্বতী শাস্ত্রী।
হেড্ পণ্ডিত বারদী, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়।
বারদী, ঢাকা।

[২]

তাঁতের কথা

আমার তৈয়ারি তাঁতে ১৬ নং হইতে ৭০।৮০ নং পর্য্যন্ত সূতার কাপড় বয়ন হইয়া থাকে। কাপড়ের বহর তাঁতবিশেষে—অর্থাৎ ৩॥০ গজ হইতে ১০ গজ পর্য্যন্ত ধুতি ৪৪ ইঞ্চি বহরের কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ৬৩,৬৪ ইঞ্চি বহরের চাদর ও শীত বস্ত্র প্রস্তুত হয়। তাঁতের মূল্য—যে তাঁতে ৪৪ ইঞ্চি বহরের কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহার মূল্য ২৫০ আড়াই শত টাকা। ঐ তাঁতের আনুষঙ্গিক যন্ত্র আমার নিকট পাওয়া যাইবে। তাহার মূল্য পৃথক্ জানিবেন।

শ্রীগোষ্ঠবিহারি দাঁ।
পোঃ শ্রীগ্রাম, ভায়া কান্দর।
গ্রাম ইছাপুর, জেলা বর্দ্ধমান।

[৩]

১। শিক্ষক চাই

গ্রামে গ্রামে ও সহজ উপায়ে উন্নত ধরণের তাঁত প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না; উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে লোকে ভাল কাপড় প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা পাইতেছে না। ভাল শিক্ষকের নামের তালিকা সংগ্রহ করিয়া দিবেন।

২। কাপড় ও সূতার খরিদ্দার নাই

দেশী সূতা যাহা প্রস্তুত হইতেছে, বিক্রী হইতেছে না ও খরিদদার না থাকায় বিদেশে চালান হয় না। আমার নিকট অর্ডার দিলে ২০, ৩০, ৪০ নং দেশী চরকায় কাটা সূতা এবং তাঁতের ও জোলার প্রস্তুতী ধুতি ৮ হাত ৩৷০, ৯ হাত ৪৲ ও ১০ হাত ৪৷০—৫৸০ আনায়, এবং বেশী টাকার কাপড় কিনিলে ধুতি, লুঙ্গি, জাম, কাল, নীল ও ডুরীদার শাড়ী পাইকারী দরে পাইতে পারেন।

৩। প্রশ্ন

সূতা রং করিবার পাকা রংয়ের কোন বহি প্রচলন হইয়া থাকিলে কোথায় পাওয়া যায়?

৪। কার্পাস ও কার্পাস বীজ

কার্পাস বীজ, বীজ সহ ও বীজ ছাড়ান উভয় প্রকার কাপাস এখানে সংগৃহীত হইবে। কারণ পার্ব্বত্য ত্রিপুরার নিকটে আমার কারবার; উহা সহজেই সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে পারিব।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস।
পোঃ মুন্সীর হাট, গ্রাম ফতেপুর, জিঃ নোয়াখালী, ভায়া ফেণী
এ, বি, আর রেলওয়ে

[৪]

পাট ও চট

১। কলে কি প্রণালীতে চটের সূতা এবং চট প্রস্তুত হয়?

২। পাট দ্বারা চট প্রস্তুত করিবার হস্ত-চালিত কোনও যন্ত্র আছে কি না?

৩। তাঁত দ্বারা যেরূপ বস্ত্র প্রস্তুত হয়, চট প্রস্তুত করিবার সেরূপ কোনও যন্ত্র প্রস্তুত করা সম্ভবপর হয় কি না; অথবা যদি সেরূপ যন্ত্র কোথাও থাকে, জানাইলে অনুগৃহীত হইব।

৪। চট প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে চটের সূত্রের প্রয়োজন। উক্ত সূত্র প্রস্তুতের জন্যও যন্ত্র আবশ্যক। এ নিমিত্ত হস্ত-চালিত কোনও যন্ত্র কোথাও পাওয়া যায় কি না; অথবা চরকার মত কোন যন্ত্র উক্ত কার্য্যের জন্য সম্ভবপর হয় কি না? এ বিষয় একটু বিশদ্ আলোচনা হইলে পাট-চাষীদের কিছু উপকার হইতে পারে। ইতি।

শ্রীমনীন্দ্রভূষণ দত্ত, ধড্ডা, ত্রিপুরা।

[৫]

মোজা-বোনা কল

আষাঢ় মাসের "ভারতবর্ষে" সম্পাদকের বৈঠকে প্রকাশিত দুইটী প্রশ্নের উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) গেঞ্জির কল

(*a*) Messrs. Symington Cox & Co Ltd.
11, Dacre's Lane, Calcutta.

ইহাদের নিকট ভাল কল আছে। কিছু দিন পূর্ব্বে খুব বিজ্ঞাপন দিতেছিলেন।

(*b*) Shome's Knitting Mills.
24, Jhamapuker Lane, Calcutta.

(c) Messrs. W. H. Brady & Co.

40, Strand Road, Calcutta.

এই দুই ঠিকানায়ও অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। (৩) Fibre Extracting Machine.

(a) কলা গাছ হইতে fibre বাহির করিবার কল নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।—

Mr. A. G. Ganapathy Jyee,
Mechanical Engineer.
C/o. Sri Ganpath Iron Works.
Tinnevelley Town. S. J.

(b) এই সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্য নিম্নোক্ত ব্যক্তির নিকটও পাওয়া যাইতে পারে।

Mr. J. K. Sarkar. F. R. H. S.
Plantain Fibre Expert.
C/o Indian Fibres Co. Ltd.
Camp. The Chowk.
Muttra City. U. P.

(c) নিম্নলিখিত পুরাতন পুস্তিকাখানিতেও কলের ছবি ও তাহা নির্ম্মাণ করিবার সহজ উপায় বিবৃত আছে। উহা কলিকাতা Imperial Libraryতে দেখা যাইতে পারে। ইতি

Notes on simple Machines for extracting plantain fibres by R. L. Froudlock.

শ্রীজীবনতারা হালদার, এম-এসসি।
২২।১ জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট, সিমলা, কলিকাতা।

[৬]

PLANTAIN FIBRE EXTRACTING MACHINES can be avilable at the following places,

(1) Tanjore Agricultural and Industrial Association.—Tanjore.

Price Rs. 2/2/ per machine.

(2) Central Jail, Cananpore.

Rs. 17-8- for each Machine.

[৭]

সূতা প্রস্তুত করার সহজ যন্ত্র।

গত কয়েক মাস যাবৎ চরকা সম্বন্ধে দেশে নানারূপ আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু সাধারণ প্রচলিত চরকার দ্বারা সূতা প্রস্তুত করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, এবং যে পরিমাণ পরিশ্রমে যতটুক সূতা প্রস্তুত হয়, তাহাতে দীর্ঘকাল লোকের উৎসাহ থাকা কঠিন। আমার বিবেচনায় নিম্নলিখিত যন্ত্র দুইটি হইতে সূতা প্রস্তুত বিষয়ে অনেক সাহায্য পাওয়া যাইতে পারিবে।

পূর্ব্বে ইংল্যাণ্ডে ও স্কটল্যাণ্ডে যেরূপ চরকার ব্যবহার ছিল, তাহা এতদ্দেশে প্রচলিত চরকা হইতে অনেক উন্নত বলিয়া মনে হয়। চেম্বারস্ এন্সাইক্লোপিডিয়া (Chamber's Encyclopaedia) নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে ঐরূপ চরকার ছবি ও বিবরণ আছে। এই চরকার চাকাটি পায়ের জোরে চলে। এবং দুই হাতে সূতা কাটা যাইতে পারে। সূতা জড়াইবার পক্ষেও বেশ সুবিধাজনক ব্যবস্থা আছে। ইং ১৭৬৪ সালে জেমস্ হারগ্রিভস্ তাঁহার স্পিনিং জেনি (অর্থাৎ, সূতা তৈয়ারী করিবার যন্ত্র) উদ্ভাবন করেন। এই জেনির সাহায্যে একবারে আশীটি পর্য্যন্ত সূত্র প্রস্তুত হইতে পারে। উক্ত এন্সাইক্লোপিডিয়াতে হারগ্রিভস্ জেনির ছবি ও বিবরণ আছে। এই জেনি হাতে ঘুরাইতে হয়। ইহার প্রস্তুত-প্রণালীও বিশেষ কঠিন নয়; এবং বেশী ব্যয়সাধ্য বলিয়াও বোধ হয় না। কিন্তু কলিকাতা ভিন্ন ইহা মফঃস্বলে প্রস্তুত হওয়া কঠিন। কলিকাতাতে যেরূপ সুদক্ষ কারিকর ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি (Expert) আছেন, মফঃস্বলে তাহা দুর্ল্লভ। ঐরূপ কয়েকটি চরকা (two handed spinning wheels) এবং জেনি (Jenny) প্রথমে কলিকাতায় প্রস্তুত হইলে, তাহা দৃষ্টে পরে মফঃস্বলেও সহজে প্রস্তুত হইতে পারিবে। Chamber's Encyclopaedia বলেন—About 1764 James Hargreaves invented his spinning Jenny, an apparatus by which eight threads could be spun at once, and this was soon improved upon, until eighty could be produced as easily.

অবিলম্বে উক্তরূপ দ্বিহস্ত চরকা (Two-handed spinning wheel) ও জেনি প্রস্তুত করা আবশ্যক এবং তাহা দ্বারা কিরূপ কাজ হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া ফলাফল প্রচার করা কর্ত্তব্য। আশা করি, কলিকাতাবাসী কোন স্বদেশ-ভক্ত মহাত্মা এই দুইটি যন্ত্র প্রস্তুত ও পরীক্ষা করিয়া তাহার ফলাফল দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রাদিতে প্রচার করিয়া স্বদেশবাসী সর্ব্বসাধারণের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

Chamber's Encyclopaedia গ্রন্থের Spinning নামক প্রস্তাবটী পাঠ করিলেই সমস্ত জানা যাইবে। New Encyclopaedia নামক পুস্তকেও এই দুইটী যন্ত্রের ছবি ও বিবরণ আছে। তাহাতে Hargreaves জেনির প্রস্তুত-প্রণালীর বিবরণ আরো বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য Encyclopaedia গ্রন্থেও ইহার বিবরণ থাকা সম্ভব।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, গৌহাটী

[৮]

প্রশ্নের উত্তর

শ্রীযুক্ত সত্যজ্যোতিঃ গুপ্ত মহাশয়ের ১৬ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর—

তামাকুর গুল একদিন জলে ভিজাইয়া রাখিলে সেই জল অতি উৎকৃষ্ট কীট-নাশক রূপে গাছ-পালায় প্রয়োগ করা যায়। ইহার ফল সন্তোষজনক।

শ্রীমণিমালা দেবী, পোঃ অঃ জয়দেবপুর, জেলা ঢাকা।

[৯]

চকমকি, শোলা, পাথর

বিশ্বকর্ম্মা শীর্ষক প্রবন্ধের কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর লিখিতেছি।

১। তামাকু খাইয়া যে গুল ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা এবং তৎসহ কিছু গন্ধক নিভাঁজ গুঁড়া করিয়া একটী পাথরের বাটীতে কিঞ্চিৎ নারিকেল তৈল দিয়া মাড়িলে মলম তৈয়ার হইবে। প্রত্যহ রৌদ্রে গরম করিয়া খোস পাচড়ায় লাগাইলে ক্ষত দুই দিনে আরোগ্য হয়। পরীক্ষিত।

২। চকমকি পাথর। দুই তিন বা চারি পয়সার ইস্পাত দোকান হইতে কিনিয়া চকমকি প্রস্তুতের জন্য কর্ম্মকারের নিকট দিলে তাহারা পিটাইয়া চারি হইতে পাঁচ ইঞ্চ্ লম্বা এবং দুই ইঞ্চ্ চওড়া আকারে প্রস্তুত করিবে; উহার সহিত আরও দুইটী জিনিস আবশ্যক হয়। প্রথমটী পাথর (fire stone)। এই পাথর সহরে যে কোন পসারি দোকানে বা মুদীখানায় পাওয়া যায়। এক বা দুই পয়সা দিলে একখণ্ড ছোট পাথর দেয়। এই পাথর খড়িমাটীর সঙ্গে জন্মে। দ্বিতীয় জিনিসটী একখণ্ড সোলা। এই সোলার এক মুখ আগুনে পোড়াইয়া মাটীতে আস্তে-চাপিয়া নিভাইয়া রাখিতে হইবে। বাম হস্তের উপরে ঐ পাথর এবং নীচে সোলার দগ্ধ মুখ কৌশলে ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে উপরিউক্ত ইস্পাত বা চকমকির ঠোকা দিলে ঐ পাথর হইতে অজস্র অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া সোলার দগ্ধ মুখ ধরিয়া আগুন হইবে। চকমকি ও পাথরে বহুকাল চলে; কেবল সোলা মাসে ২।৪ খানি লাগে।

শ্রীকালীচরণ মুখোপাধ্যায়
জয়দেবপুর, ঢাকা।

[১০]

চকমকি

চকমকি এক প্রকার পাথর। কলিকাতার পথে-ঘাটে অনেক সময়ে রাস্তা বাঁধাইবার পাথরের সঙ্গে এই পাথর দেখা যায়। ইহা একবার দেখিলে সহজেই অন্য পাথরের ভিতর হইতে ইহাকে চিনিয়া বাহির করিয়া লওয়া যায়। যে কোন রকমের একখানা পাতলা ইস্পাত দিয়া ইহার উপর ঠুকিলেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হয়। আমাদের দেশে চকমকির পাথরে ঠুকিবার ইস্পাত কতকটা জাঁতির আকারে প্রস্তুত হইত। পাথরটির নীচে একখণ্ড সোলা ধরিলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সেই সোলায় পড়িয়া তাহাতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। পরে ফুঁ দিয়া আগুনটিকে বাড়াইয়া লইয়া টিকা প্রভৃতি ধরাইয়া লইয়া তামাক খাওয়া হয়। পাটের কাটি (পাঁকাটি) বা অড়হর গাছের কাটির এক দিক বা দুই দিক দ্রবীভূত গন্ধকের মধ্যে ডুবাইলে একটু করিয়া গন্ধক ঐ কাটির মুখে—লাগিয়া তখনই শক্ত হইয়া যায়। ঐ গন্ধক-মাখানো মুখটি সোলার আগুনে ঠেকাইলেই গন্ধক জ্বলিয়া ক্রমে কাটিটিতে শিখা উৎপন্ন হয়। সেই শিখায় প্রদীপ জ্বালা হয়।

শ্রীবিশ্বকর্ম্মা

[১১]

প্রশ্ন

শ্রীবিশ্বকর্ম্মা মহাশয় সমীপেষু

কার্পাসের সূতার কি উপায়ে স্থায়ী কাল ও লাল রং প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে বা ভারতবর্ষে প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব। ইতি

শ্রীনরেন্দ্রনাথ হাজরা এম-বি,
সম্পাদক, নোনা নৈশ বিদ্যালয়, বয়ন বিভাগ
পোঃ উলুবেড়িয়া, জেলা হাবড়া

[১২]

চিনির কল

শ্রীবিশ্বকর্ম্মা মহাশয়!

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি আপনার বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় ছাপা হইলে সুখী হইব।

১। সাফ চিনির কল কোথায় পাওয়া যায়? ঐ কলের মূল্য কত? একটী কল চালাইতে কত জন লোকের দরকার। সকল প্রকার গুড় হইতেই কি সাফ চিনি প্রস্তুত হইতে পারে?

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
পোঃ ধলা, জেলা ময়মনসিংহ

[১৩]

শটীর পালো

মাননীয় শ্রীযুক্ত বিশ্বকর্ম্মা মহাশয় সমীপে

মহাশয়! ভারতবর্ষ পত্রিকায় আমার নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

১। শটীর পালোর ব্যবসায় কেমন লাভজনক?

২। পালো প্রস্তুতের সহজ কোন বৈজ্ঞানিক প্রণালী থাকিলে তাহা কিরূপ?

৩। শটীর কাঁচা মূল চূর্ণ (পেষণ) করিবার কোন কল আছে কি না? থাকিলে তাহার মূল্য কত এবং কোথায় পাওয়া যায়?

নিঃ শ্রীকামিনী কুমার চট্টোপাধ্যায়
পোঃ হাজিগঞ্জ, আলিগঞ্জ কাছারী, জিঃ ত্রিপুরা

[১৪]

উই, মশা, মাছি

আমাদের দেশে উইয়ের চমূ সকল রকম কাঠের জিনিস ত দূরের কথা, ঘরের খড়ের চাল ও বাঁশের 'বাতা' পর্য্যন্ত কাটিয়া ছারখার করিয়া আমাকে অপ্রতীকরণীয় ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে এবং এই সহরতলী বেলেঘাটায় অগণ্য মাছির নিরবচ্ছিন্ন উৎপাতে আমরা নিজেরা ত জ্বালাতন হইতেছি—পরন্তু ক্রমাগত গৃহের আসবাব পত্র ও খাদ্য দ্রব্যের উপর তাহাদের মূত্র বিষ্ঠা পড়িয়া আমাদিগের সুরুচি, স্বাস্থ্য ও নিষ্ঠাকে

অনবদ্য রাখার পথে যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটিতেছে। তাহার উপর, মশাও দুই স্থানেই সুলভ ও সাধারণ (common)। যদি অনুগ্রহ প্রকাশে আপনি কিম্বা 'ইঙ্গিতের' বিশ্বকর্ম্মা মহোদয় কিম্বা 'ভারতবর্ষের' কোন সমব্যথী পাঠক-পাঠিকা উপরিউক্ত দুইটি নর-শত্রুর মৃত্যু-বাণ নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তাহা হইলে উপকৃত ও বাধিত হইব।

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু, কল্যাণকুঞ্জ,
১০২।এ, বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা।

[১৫]

বয়ন শিক্ষা

৩৫ নং এজরা ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত শশীকুমার মজুমদার ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই বইখানির রচনা করিয়াছেন। ভারতে বয়ন-শিল্পের সম্যক বিস্তার ও পরিচালন প্রণালী শিক্ষা, চরকা ও তাঁতের আদর্শ গঠন এবং বহুল প্রচারকল্পে এদেশীয়গণের উপযোগী সহজ ও অল্পায়াস সাধ্য কতিপয় উপায় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক প্রথম শিক্ষার্থিগণের সুবিধার্থ "বয়নশিক্ষা" নামক পুস্তক প্রণীত হইয়াছে। ইহাতে তুলা উৎপাদন, তাহার প্রকার-ভেদ, ভিন্ন-ভিন্ন দেশজাত তুলার বিবরণ, পুষ্ট ও অপুষ্ট তুলার বীজ নির্ণয়, কীটদষ্ট বীজ কিরূপে ভাল বীজ হইতে পৃথক করিতে হয়, কিরূপ তুলায় কিরূপ কাপড় ভাল প্রস্তুত হয় ইত্যাদি অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। বইখানির দাম বারো আনা।

[১৬]

রাসায়নিক কলকব্জা
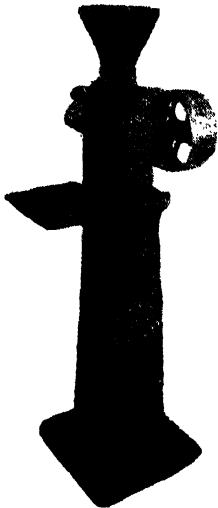
Fig. I. Drug mill.

Fig. I. Drug mill—ইহা দ্বারা শিকড়, ছাল, লতা-পাতা ইত্যাদি অতি সুন্দররূপে চূর্ণ করা যায়। ইহাতে আটাযুক্ত পদার্থও চূর্ণ হইয়া থাকে। ঔষধ প্রস্তুতের জন্য এরূপ একটি কল অতি আবশ্যক। ইহাতে প্রতি মিনিটে এক পোয়া ময়দার ন্যায় গুঁড়া প্রস্তুত হইতে পারে। সাধারণতঃ ইঞ্জিন-চালিত হইলেও ইহা হস্ত-চালিত করা যায়।
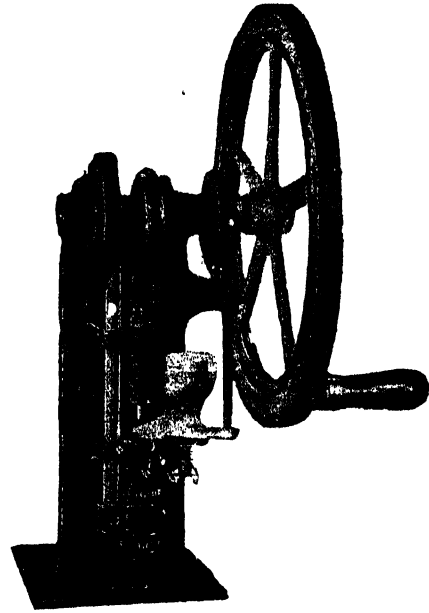
Fig. II. Tablet Machine.

Fig II. Tablet Machine :—ট্যাবলেট্ বা চাকা বড়ি তৈয়ারী করিবার কল। ইহা আমেরিকায় F.D. Stokes Machine Co. উদ্ভাবিত কল। ইহাতে প্রতি মিনিটে ১০০টী পর্য্যন্ত বড়ি অতি সহজে প্রস্তুত হইতে পারে। এই কলে কালির ও কুইনাইনের বড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

Fig III. Sugar coating Machine :—অনেক সময় কুইনাইন ইত্যাদি তিক্ত বড়ি চিনির রসে ফেলিয়া কোটিং দেওয়া হয়। উক্ত কার্য্যের জন্য এই কলটী বিশেষ আবশ্যক।
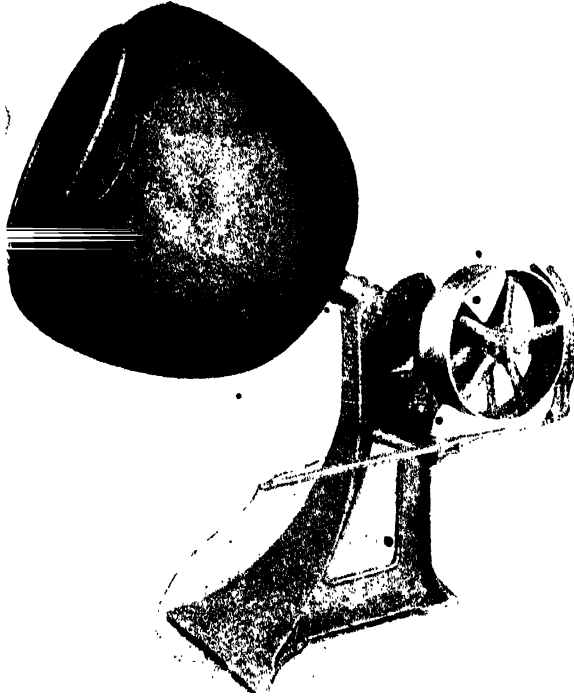
Fig. III. Sugar coating Machine.

Fig. IV. Pill or Tablet Polishing Machine

Fig. IV. Pill or Tablet Polishing Machine অর্থাৎ ট্যাবলেট পালিশের কল ক্যানভাস্ কাপড়ে মোড়া। উহা খুব জোরে ঘুরাইলে চিনির রসে আবৃত বড়িগুলি পালিস হইয়া যায়।

২০।১ লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—ঠিকানায় মেসার্স সি, এন, কুণ্ডুর দোকানে এই কল পাওয়া যায়।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম সি-ই, (জাপান),
এম্-আর-এ-এস (লণ্ডন), যশোহর।

[১৭]

লোহার পালিস

মাননীয় শ্রীযুক্ত "বিশ্বকর্ম্মা" মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

এখানে নিবারণচন্দ্র কর্ম্মকার উত্তম "ক্ষুর" "কাঁচি" ও "ছুরি" প্রস্তুত করিতেছেন। ইঁহার ব্যবসা সোনার গহনা প্রস্তুত করণ; কিন্তু কৌতূহল বশতঃ ক্ষুর প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দেখিলেন যে, বেশ ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে। কিন্তু ঐ ক্ষুর প্রভৃতি অল্পদিনের মধ্যেই জং ধরে (মরিচা পড়ে)। তৈলের ভিতর রাখিলে মরিচা পড়ে না বটে, কিন্তু তৈল হইতে উঠাইলেই আবার মরিচা পড়ে। যদি কোন উপায়ে উহাকে কলাই করা যায়, তাহা হইলে সত্বর জং ধরে না। কি উপায়ে পাড়াগাঁয়ে ক্ষুর প্রভৃতি কলাই করা যায়, অথচ ধার ঠিক থাকিবে? লোহার জিনিস রূপালী করিলে বিক্রয়ের সুবিধা হয়; কারণ, বিলাতি ছুরি কাঁচির রং সাদা। একখানি পুস্তকে পড়িয়াছিলাম, "মেরিণ অ্যাসিডে" একটু কাঁচা "পারা" মিশ্রিত করিয়া পরিস্কৃত লোহার দ্রব্য ডুবাইলে বা উহা মাখাইলে লোহার জিনিস রূপার মত হয়" কিন্তু "মেরিণ অ্যাসিডে" বলিয়া কোন অ্যাসিড আছে বলিয়া আমার জানা নাই। কি উপায়ে লোহার অস্ত্র সাদা করা যায়, আপনার জানা থাকিলে জানাইবেন। উক্ত কর্ম্মকারের সোণার গহনা পালিস করিবার একটা প্রকাণ্ড চাকা আছে—তাহা হাতে ঘুরাইতে হয়। ঐ চাকার সহিত "শাণ" পাথর লাগাইয়া অস্ত্রগুলি ঠিক রূপার মত করা যায়; কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেই জং ধরে। এই কর্ম্মকার ⅜ ইঞ্চি পুরু চৌকা "পোলাদ" দ্বারা ক্ষুর প্রভৃতি প্রস্তুত করে। দরকার হইলে ইহার প্রস্তুত ক্ষুর, কাঁচি, ছুরির নমুনা আপনার নিকট পাঠাইতে পারি। নিবেদন ইতি। বিঃ নিঃ—

শ্রীজগদ্বন্ধু মুখোপাধ্যায়,
লোহাগড়া গ্রাম, পোষ্ট অফিস যশোহর, জেলা যশোহর।

তাপ-বিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ]

মনে কর, এই ১৯২১ সালে সবচেয়ে বেশী গরম, বেশী উত্তপ্ততা কত, আমরা জানিতে চাই। কি করিব ? একটা তাপমান যন্ত্র লইয়া, তাহার নিকটে একটা টুলের উপর বসিয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, তাপমান যন্ত্রের ঐ পারার দিকে তাকাইয়া থাকিব, এবং লক্ষ্য করিব --পারাটা সবচেয়ে বেশী কখন উঠে ? না, এতটা করিতে হইবে না. বিজ্ঞান ইহার একটা সহজ উপায় বাহির করিয়া দিয়াছে। তাপমান-যন্ত্র তৈয়ারি করিবার সময়, নলের মধ্যে একটা খুব সরু ডম্বেলের মত আকারের একটা লোহা প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল,—পারার ঠিক সাম্‌নেই এই লোহা অবস্থিত। এখন, পদ্ম-পত্রে জল থাকিলে জল যেমন পদ্ম-পত্রকে ভিজায় না, পারাও সেইরূপ লোহাকে ভিজায় না। গরমে পারা যখন বাড়িবে, তখন পারা লোহাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইবে ; কিন্তু ঠাণ্ডায় যখন পারা সঙ্কুচিত হইবে, তখন পারা লোহাকে সঙ্গে-সঙ্গে টানিয়া আনিতে পারিবে না—লোহার ও পারার মধ্যে কোন আসক্তি নাই। ফলে, সেখানকার লোহা সেইখানেই পড়িয়া থাকিবে,—পারাটা শুধু ফিরিয়া আসিবে। ১৯২১ সালে ১লা জানুয়ারি এইরূপ একটি তাপমান-যন্ত্র—একটা maximum thermometer শোয়াইয়া রাখ বাস্, সমস্ত বৎসরের মধ্যে আর কিছুই করিতে হইবে না,—উহার দিকে আর ফিরিয়া তাকাইতে হইবে না। এইবার ১৯২২ সালের ১লা জানুয়ারী একবার দেখ, লোহা কোন্ দাগটায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এইটাই হইবে সবচেয়ে বেশী উত্তপ্ততা ; পারা ইহার বেশী নিচেয় আসে নাই ; আসিলে, ইহা লোহাকে আরও বেশী ঠেলিয়া লইয়া যাইত ; কারণ, পারা যে লোহাকে সাম্‌নে ঠেলে, পিছনে টানিতে না পারুক। সুতরাং এইরূপ একটা তাপমান-যন্ত্র দ্বারা বৎসরের মধ্যে বা মাসের মধ্যে, বা দিনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উত্তপ্ততা কত হইয়াছিল, বেশ জানা যায়। এইবার ধর আর একটা তাপমান-যন্ত্র ;

ভিতরে পারার বদলে আছে জল বা স্পিরিট ; এবং এই জল বা স্পিরিটের ভিতরে আছে ঐ ডম্বেলের চেহারার একখণ্ড কাচ। এই তাপমান-যন্ত্র যদি শোয়াইয়া রাখা যায়, তো ঠাণ্ডায় জল যখন হটিয়া আসিবে, তখন ঐ কাচটাকেও সঙ্গে-সঙ্গে টানিয়া আনিবে ; কারণ, জলের উপরিভাগের কাচের উপর একটা টান আছে। কিন্তু তাপে যখন জল বাড়িবে, তখন যেখানকার কাচ সেখানেই পড়িয়া থাকিবে, —জল কাচের দু'পাশ দিয়া অগ্রসর হইবে। সুতরাং এইরূপ একটা তাপমান-যন্ত্রে - একটা minimum thermometerএ কাচের স্থান দেখিয়া বেশ বলা চলে—বৎসরের মধ্যে, বা মাসের মধ্যে, বা দিনের মধ্যে সবচেয়ে কম ঠাণ্ডা —কম উত্তপ্ততা কত হইয়াছিল। আচ্ছা, আর একটা কথা। কোন পদার্থের উত্তপ্ততা যদি মাপিতে হয় — তো সেই পদার্থের মধ্যে তাপমান যন্ত্র রাখিয়া সেই অবস্থাতেই তাপমান যন্ত্রটা পড়িতে হয়। তাপমান-যন্ত্র যদি সেখান হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়া পড়া যায়, তো যেখানে উহা পড়া হইতেছে, সেইখানকার উত্তপ্ততাই পাওয়া যাইবে, —আগে যেখানে রাখা হইয়াছিল, সেখানকার উত্তপ্ততা পাওয়া যাইবে না। সেই কারণে নিয়ম এই যে, তাপমান যন্ত্রটা কখন সরাইয়া লইয়া পড়িবে না। কিন্তু সব সময়ে আমরা কি তাহা করিয়া থাকি ? ধর, শরীরের উত্তাপ যখন দেখি, তখন তাপমান-যন্ত্রটা কি শরীরের মধ্যে রাখিয়াই পড়ি ? তাহা তো করি না ; তাপমান-যন্ত্রটা তো দিব্য বগল হইতে খুলিয়া লইয়া, বাহিরে আনিয়া, জানলার ধারে আলোর কাছে লইয়া গিয়া পড়ি। তবে কি ইহাতে শরীরের উত্তপ্ততা না পাইয়া বাহিরের বাতাসের উত্তপ্ততা পাই ? কিন্তু তুমি আমি রাম শ্যাম হরি—আমাদের ডাক্তারেরা অবধি সকলেই—এ কাজ করিয়া থাকি। তাহা হইলে সকলেই কি বরাবর একটা ভুল করিয়া আসিতেছি ? কিন্তু সবুর।—শরীরের উত্তাপ মাপিবার জন্য যে তাপমান-যন্ত্র ব্যবহার করি, তাহা সাধারণ তাপমান-যন্ত্র নয়,—উহা এক প্রকারের maximum thermometer ; তবে আগে যে maximum thermometerএর কথা বলা হইয়াছে, এটা ঠিক সে রকমের নয়। কিন্তু আগেকার maximum thermometerএর ন্যায় ইহার পারা গরমে যতদূর উঠিবার উঠে, ঠাণ্ডায় আর নামে না। সুতরাং এই তাপমান-যন্ত্র যখন গরম দেহ হইতে বাহিরে আনা যায়, তখন উহার ভিতরকার পারা সঙ্গে-সঙ্গে হটিয়া আসে না। সেই কারণে উহা বাহিরে আসিয়া পড়িলে কোন ক্ষতি হয় না। এই রূপ তাপমান-যন্ত্রের পরিবর্তে সাধারণ তাপমান-যন্ত্র ব্যবহার করিলে, উহাকে দেহের মধ্যে রাখিয়াই পড়িতে হইবে—বাহিরে আনিয়া পড়িলে ভুল হইবে। দেহের উত্তাপ মাপিবার এই বিশিষ্ট রকমের তাপমান-যন্ত্রের গঠন এইরূপ। ইহাতে তলার খোলটা শেষ হইবার পর নলের গোড়ার দিকে এক জায়গায় নলটা অত্যন্ত সরু হইয়া গিয়াছে ;—এই স্থান দিয়া পারার যাতায়াত বড়ই কষ্টকর। খোলের ঐ বিপুল পারা যখন গরম হইল, তখন উহা জোরে ঐ সরু জায়গাটির ভিতর দিয়া গেল ; কিন্তু ঠাণ্ডা হইবার সময় বিপত্তি ঘটিল। তরল পদার্থের ক্ষুদ্র ছোট ছোট অংশের মধ্যে এতটা টান নাই যে, খোলস্থিত পারা সঙ্কুচিত হইবার সময় ও-ধারের পারাকে ঐ দুর্গম পথের মধ্য দিয়া এ-ধারে টানিয়া আনে। ফলে হইল এই এ-ধারের পারা এ ধারে ছোট হইল ; আর ও ধারের পারা ও ধারে ছোট হইল, এ-ধারে আসিল না—মাঝের একটু স্থান পারা শূন্য হইল। কিন্তু ও ধারের পারা কতটুক ? ঐ সরু নলের মধ্যে আর কতটুকুই বা থাকিতে পারে,—যাহা কিছু সে তো এ-ধারেই আছে ; সুতরাং ওদিকে যতটুকু ছোট হইল, তাহা ধর্তব্যের মধ্যে না আনিলেও চলে। ফল কথা, গরমে পারা ও-ধারে যতটুকু গিয়াছিল, ততটুকুই প্রায় রহিয়া গেল—বাহিরে ঠাণ্ডায় আনার জন্য পিছু হটিল না। অতএব যন্ত্রটা বাহিরে আসিয়া পড়ায় কিছু গোল হইল না। আবার ব্যবহার করিবার সময়ে, জোর করিয়া ঝাঁকী দিয়া ও ধারের পারাকে ঐ সরু জায়গা দিয়া চালনা করিতে হইবে।

এইবার দেখা যাউক, তাপমান-যন্ত্রে সাধারণতঃ পারা ব্যবহৃত হয় কেন ? তরল পদার্থ ব্যবহারে সুবিধা আছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু সে তরল পদার্থ জল হইলে আপত্তি কি ? জল পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়, আর বিনা-খরচায় পাওয়া যায় ;—সেই জল ব্যবহার করিলেই তো চলিত ! আচ্ছা, ধর, তাপমান-যন্ত্রমধ্যে পারার বদলে জলই দিলাম। দিলাম না হয় ; কিন্তু ০ এর নীচে জল আর জল থাকে না ; শক্ত বরফ হয়,—১০০ ডিগ্রীর উপর জল ষ্টীমে পরিণত হয়। সুতরাং ০ এর নীচু বা ১০০ উপর উত্তপ্ততা

জলভরা তাপমান-যন্ত্র দিয়া মাপা যাইবে না। পারার এতটা বালাই নাই। ০ এর নীচে ৪০ ডিগ্রী হইবে। এদিকে ৩৫০ ডিগ্রী অবধি পারা তরল অবস্থায় থাকে। সুতরাং ইহার মধ্যের যে কোন উত্তপ্ততা এই পারায়-ভরা তাপমান-যন্ত্র দিয়া মাপা যাইতে পারে। কিন্তু এ ছাড়া আরও সুবিধা আছে। পারা কাচকে ভিজায় না,—সুতরাং নলের মধ্যে যখন যাতায়াত করে, তখন একটুকু পারাও কাচের গায়ে লাগে না। তাহার পর, পারা অস্বচ্ছ —সহজেই পড়া যায়। তাহার পর, ইহা খুব শীঘ্রই বাহিরের উত্তাপ গ্রহণ করিয়া উত্তপ্ত হয়; এবং উত্তপ্ত হইবার জন্য বাহির হইতে খুব অল্প তাপই লয়। এই সব নানান্ কারণে তাপমান-যন্ত্রে পারাই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যেখানে খুব বেশী নীচু—৪০ ডিগ্রীরও কম যাইতে হইবে, সেখানে পারা চলিবে না। সেখানে এল্‌কোহল্ ব্যবহৃত হয়; কারণ, এলকোহল জমিয়া নিরেট হয়—১৩০ ডিগ্রীতে। কিন্তু ইহারও নীচে বা ৩৫০ ডিগ্রীর উপরের উত্তপ্ততা মাপিতে হইলে, কি করিতে হইবে? সে আলোচনা আজ থাক।

জাতি-বিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ]

Dr. Eugene Duboisর আদিম মানবের অস্তিত্বসূচক নিদর্শন আবিষ্কারের কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইহাই নর ও বানরের মধ্যবর্তী স্তররূপে প্রমাণিত হইয়াছে। কোন পণ্ডিতই ইহা অস্বীকার করেন না। এ সম্বন্ধে আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিব। আপাততঃ নর ও বানর একজাতি কি না, তাহাই আলোচিত হইবে। পারী মিউজিয়মের জাতিতত্ত্বের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক M. de Quatrefages ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জাতিতত্ত্বের একটা বিবরণী প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি মানুষ বানরজাতি হইতে উৎপন্ন হইতে পারে কি না, তৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন। প্রধানতঃ তাঁহার সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের সাহায্যে আমরা বর্ত্তমান বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইব। বানর ও বনমানুষের দৈহিক গঠন ও আকারে মানুষের সাদৃশ্য কিছু থাকিলেও উভয়ের মধ্যে যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। Vicq-d'Azyr, Lawrence ও Serres তাহা বেশ যুক্তি দিয়া সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। Duvernoy গোরিলার পরীক্ষায় এবং Gratiolet ও Alix শিম্পাঞ্জির পরীক্ষায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বানরজাতীয় জীব ও মানুষ দুইটা সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতি। ইহাদের অঙ্গসংস্থান ও শারীরিক বিশেষত্ব পরীক্ষা করিলে, ইহারা যে স্বতন্ত্র জাতি, তাহা Pruner-Bey সুন্দররূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, উৎপত্তি ও সঞ্চরণ ক্রমে উভয়ের দৈহিক (vegetative) যন্ত্র একেবারে বিপরীত ভাবে পুষ্টিলাভ করিয়াছে। বানরের কয়েকটা দন্তের পরিণতি-পদ্ধতি মানবের সম্পূর্ণ বিপরীত। Welker দেখাইয়াছেন যে, শিরোস্থিমূলের (base of the skull) পরিবর্ত্তন নর ও বানরে বিরুদ্ধভাবাপন্ন। Sphenoid অস্থিকোণ মানুষের জন্ম হইতে ক্রমশঃ কমিতে থাকে, কিন্তু বানর-জাতিতে ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, তাহা বাড়িতে বাড়িতে একেবারে অস্থি-কোণের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াও থাকে। Bert বলেন, ক্রমোন্নতির ফলে বানরজাতিতে যেমন মানুষের অনুরূপ হইবার লক্ষণ দেখা যায় না, সেইরূপ ক্রমাবনতির ফলে মানুষে বানরের অনুরূপ কোন লক্ষণ দেখা যায় না। Gratioletএর মতে মানুষের মস্তলিঙ্গে (brain) এমন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা হইতে ধরিয়া লইতে পারা যায় যে, বানর মানবে পরিণত হইয়াছে।

জাতিগত পার্থক্য শরীরগত পার্থক্য হইতে নিরূপিত হইতে পারে। মানুষ দুই হাত দুই পদ বিশিষ্ট প্রাণী, বানর-জাতীয়েরা চারি হস্তবিশিষ্ট প্রাণী। কথা কহিবার শক্তি বানরজাতীয় প্রাণীর নাই, মানুষের তাহা সম্পূর্ণরূপ আছে। খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে জীব জগতে মানুষই কেবল পারে। বানর চেষ্টা করিলে কিয়ৎকালের জন্য মানুষের মত কতকটা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু মানুষের মত একেবারে খাড়া হইবার শক্তি তাহার নাই। কতকটা যাহাও বা দাঁড়ায়, কিন্তু তাহা বেশীক্ষণ পারে না। মানুষের হামা দিয়া চলিতে কষ্ট বোধ হয়, দ্রুত চলিতে হইলে, তাহাকে

দুই পায়ের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে হয়। দুই পদে ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ান ও সেই ভাবে সহজে দ্রুত ধাবমান হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। বানরের তাহা নহে। কেহ কেহ অনুমান করেন, মানুষ ঐ ভাবে অভ্যস্ত হইয়াছে, বানর সে ভাবে অভ্যস্ত হয় নাই; অভ্যাসেই সব হয়। কিন্তু যদি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায়, মানুষ কিরূপে অভ্যস্ত হইল, বানর ঐরূপ অভ্যাস করিল না কেন? তাহা হইলে তাঁহারা কোন উত্তর দিতে পারেন না। মানবজাতি কি সখ করিয়া অভ্যাস করিল? বানরের সখ হইল না বলিয়া বানর অভ্যাস করিল না। সখ করিবার কথা ইহাতে কিছুই নাই। ইহাতে বাধা হইবার কথা আছে। মানুষের শারীরিক গঠন তাহাকে খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে বাধ্য করে। বানরের শারীরিক গঠন তাহাকে বানরের মত চলাফেরা করিতে বাধ্য করে। যে যেরূপ বিহিত হইয়াছে, সে সেইরূপ থাকিতে বাধ্য হয়।

গো ও মহিষকে আমরা একজাতীয় বলি না। অথচ গো এবং মহিষের আকারগত সাদৃশ্য যথেষ্টই আছে। তাহাদের আচরণও প্রায় একরূপ। সূক্ষ্মভাবে দেখিলে সে বিষয়ে বানর ও মানুষে আকাশ ও পাতাল তফাত। গরুর শিঙ্ আছে, মহিষেরও শিঙ্ আছে; যুদ্ধের সময় গরু শিঙ্ ব্যবহার করে, মহিষও তদনুরূপ করিয়া থাকে। গরুর চারি পায়ে বিভক্ত খুর, মহিষেরও তাহাই। গরুর খাদ্য ও মহিষের খাদ্য একই রূপ। গরু ও মহিষ আকারেও প্রায় এক; আরও অনেক বিষয়ে গরু ও মহিষের সাদৃশ্য দেখা যায়; কিন্তু পরীক্ষায় দেখা যায় গরু ও মহিষ এক শ্রেণীভুক্ত নয়। ঐরূপ বানর ও মানুষের বিষয় আলোচনা করিলে তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বাহির হইয়া পড়িবে। মানুষের ভাষা তাহাকে সকল জীব হইতে পৃথক্ করিয়া দিতেছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, বানরেরও ভাষা আছে, সে ভাষা আমরা বুঝিতে পারি না; বন্য অবস্থায় বানরেরা যখন সমাজবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহারা পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারে। এ হিসাবে প্রায় সকল জীবেরই ভাষা আছে। বিধাতা যে সকল প্রাণীকে সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহাদের সকলের মধ্যে ঐরূপ এক ভাষারও সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাকে যদি ভাষা বলা যায়, তাহা হইলে সে ভাষা বানরের একচেটিয়া নয়। যথার্থ ভাষা বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা মানুষেরই কেবল আছে। এখন ভাষা বলিতে কি বুঝি, দেখা যাউক। সমাজবদ্ধ জীব-সকলের কণ্ঠমধ্যে এক প্রকার যন্ত্র আছে। তাহাদের মধ্যে যে সকল ভাবের উদয় হয়, সেই সকল ভাব শব্দরূপে সেই যন্ত্র দিয়া বহির্গত হয়। সমশ্রেণীর প্রাণীরা পরস্পরের সেই সকল শব্দের অর্থ সামাজিক অবস্থায় বুঝিয়া থাকে। ইহা মঙ্গলময়ের বিধান, তিনি এইরূপ বিধান না করিলে সেই সকল জীবের বড়ই অসুবিধা হইত। ইহাকে যদি আমরা ভাষা বলি, তাহা হইলে প্রায় সকল জীবেরই ভাষা আছে। এখন যে জীবের মনে যত প্রকার ভাবের উদয় হয়, সেই জীব তত প্রকার শব্দ করিতে পারে; সুতরাং কোন্ জীবের মানসিক উন্নতি কত দূর হইয়াছে, তাহা সেই জীবের ভাষা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারি। আমরা কোন জীবের কারু-কৌশল দেখিয়া সেই বিষয় ঠিক বুঝিতে পারি না; তাহার ভাষা পরীক্ষা করিলে তাহার মনোরাজ্যের গুহ্য ব্যাপার ধরা পড়িয়া যায়। বাবুই পাখী সুন্দর নীড় নির্ম্মাণ করিতে পারে; তাহার বাসার কারুকার্য্য এমন সুন্দর ও সূক্ষ্ম যে, তাহার নিকট মানুষ এঞ্জিনিয়ারের কারুকৌশল হার মানিয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা বলিতে পারি না যে, মানসিক উন্নতিতে বাবুই পাখী মানুষের প্রায় সমকক্ষ। অনেক জীব কারুকার্য্যে বাবুইএর নিকট পরাভূত হয়; কিন্তু তাহাদের মানসিক উন্নতি বাবুই পাখী অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে। যাহার মনে যত ভাব আছে, তাহার মানসিক উন্নতি তত হইয়াছে বুঝিতে হয়। আবার কাহার মনে কত ভাব আছে, তাহা তাহার ভাষায় ধরা পড়িয়া যায়। কোন জাতির মানসিক ভাব সেই জাতির ভাষাদ্বারা পরিমাণ করিতে হয়। পৃথিবীতে মানুষের ভাষার যতটা প্রসার, ততটা প্রসার আর কোন জীবের ভাষায় নাই। অপরাপর জীবের ভাষা প্রধানতঃ স্বর-বৈচিত্র্যের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ, মানুষের ভাষা সেরূপ নহে। সেরূপ হইলে তাহার ভাষার এতটা প্রসার হইত না। মানুষের মনে এত ভাব যে, তাহা মাত্র স্বর-বৈচিত্র্যের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। সে সীমা অতিক্রম না করিলে তাহার ভাবের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না। মানুষকে (অনেক সময়ে) তাহার ভাষা তৈয়ারি করিয়া লইতে হয়; তাহা না হইলে তাহার কাজ চলে না। সকল প্রাণীর সহজাত সংস্কার (natural

instinct) আছে, মানুষেরও যে তাহা নাই, এমন নয়; কিন্তু মানুষ কেবল তাহার উপর ভরসা করিয়া চলিতে পারে না। কাজেই যেখানে তাহাতে কুলায় না, সেখানে তাহাকে বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে হয়। সেই কারণে মানুষ বুদ্ধিজীবী হইয়া পড়িয়াছে; Instinctএর প্রয়োগ প্রায় করে না। সুতরাং মানুষের ভাষা ও অপর প্রাণীর ভাষা এক জিনিস বলিতে পারা যায় না। আমরা ভাষা বলিতে মানুষের ভাষাই বুঝি। অন্য প্রাণীর ভাষা স্বর-সঙ্কেতাদি মাত্র। অতএব যদি বলা যায় যে, ভাষার ব্যবহার পৃথিবীতে কেবল মানুষই করিয়া থাকে, তাহাতে কোন দোষ হয় না। পৃথিবীস্থ জীব-সকলের মধ্যে মানুষের এক বিশেষত্ব—তাহার ভাষায়। এই ভাষা অপর কোন জীবের নাই। বানরজাতির স্বর-সঙ্কেতকে যদি ভাষা বলা যাইত,—তাহা হইলে এত দিনে মানুষের ভাষার ন্যায় তাহাদের ভাষার উন্নতি হইত। শুধু বানরের ভাষায় কেন, যে সমস্ত জীব সমাজ-বদ্ধ হইয়া বনমধ্যে বাস করে, তাহাদের সকলেরই ভাষার তদ্রূপ উন্নতি হইত। মানুষ ও বানর যে, একজাতীয় নহে, এইটী তাহার একটী কারণ। বানর-জাতীয় জীব বহু-প্রকারের আছে, এত প্রকারের আছে যে সংখ্যা হয় না; ইহারা নানাপ্রকার natural environmentsও পাইয়া থাকে। বানর ও মানুষ যদি এক শ্রেণীর হইত, অথবা একই মূল species হইতে যদি উভয়ের উদ্ভব হইত, তাহা হইলে কোন এক জাতীয় বানরের ভাষা কেন মানুষের ভাষার মত প্রসার প্রাপ্ত হইল না? হইতে পারে না। ভাষার জনক মন। বানরের মানুষের মত মন নাই। মানুষের মন তাহাকে সকল জীব হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। কাহারও কাহারও মত, মন পারিপার্শ্বিক অবস্থার (environments) অধীন। যে environments জুটিয়া থাকে, মনের বিকাশ তদনুরূপ হয়। আমরা environmentsএর কার্য্যক্ষেত্রে আছি, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার কার্য্যক্ষেত্র অসীম নয়। Environments সকল কার্য্য সাধন করিতে পারে না; অভ্যন্তরে যাহা আছে, Environments তাহাই বিকসিত করিতে সমর্থ। যাহা নাই, Environments তাহা আনিতে পারে না। যদি তাহা পারিত, তাহা হইলে অনেক শ্রেণীর বানর এত দিনে সুসভ্য মানুষের মত হইত। মানুষ মানুষ হইল কেন?—না, তাহার ভিতর মানুষ ছিল। বানর মানুষ হইল না কেন, যেহেতু তাহার ভিতর মানুষ ছিল না। আমরা গীতাকারের ভাষায় বলিতে পারি—'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ'। কাঁঠালের বীচিকে যে Environments-এই নিক্ষেপ করা যাক্ না কেন, তাহা হইতে কখনই আম্রবৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে না। বিভিন্ন Environments কোন জাতিকে বিভিন্ন আকার প্রকার দিতে পারে, কিন্তু কখনই সে জাতিকে, অপর জাতিতে পরিণত করিতে পারে না।

বানরকে আমরা শাখামৃগ বলিয়া থাকি। ইহাকে শাখামৃগ বলিবার সার্থকতাও আছে। ইহাদের পদদ্বয় (ইহাকে পশ্চাতের 'হস্তদ্বয়'ও বলা হইয়া থাকে) হস্তের ন্যায় অঙ্গুলি-বিশিষ্ট; সুতরাং তাহা তাহাদের বৃক্ষশাখায় বাসের বিশেষ উপযোগী। ভগবান্ যে বৃক্ষশাখাই তাহাদের বিহার-ক্ষেত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, ইহাতে তাহা বেশ বোঝা যায়। আদিকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত বৃক্ষশাখাই তাহাদের প্রিয় বিহারক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে। মানুষও এক সময়ে বৃক্ষ শাখায় বাস করিয়াছে; কিন্তু বৃক্ষশাখায় বাসের উপযোগী বলিয়া মানুষ সৃষ্ট হয় নাই; সেই জন্য মানুষের বেশী দিন বৃক্ষশাখা ভাল লাগিল না। মানুষ এক বিশেষ উপাদানে সৃষ্ট, সে উপাদানে আর কোন জীব সৃষ্ট হয় নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অপরাপর জীব instinctএর উপর নির্ভর করিয়া কালাতিপাত করে; সুতরাং প্রথম হইতে তাহাদের বিহারক্ষেত্র, বাসস্থান ও খাদ্যাখাদ্য একই রূপ রহিয়াছে। এ সকল বিষয়ে কখনই তাহাদের কোনরূপ গোলে পড়িতে হয় নাই। তাহাদের বাসস্থান ও খাদ্যাখাদ্যের কখনও কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিতে হয় নাই। মানুষ সে সৌভাগ্যে চিরকালই বঞ্চিত। মানুষকে সকল বিষয় পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। সে বৃক্ষশাখায় বাস করিয়া দেখিল, বৃক্ষ-কোটরে বাস করিয়াও দেখিল, গুহামধ্যেও মানুষ অনেক অবস্থায় অনেক কাল বাস করিয়াছে। মানুষকে অনেক দেখিতে হইয়াছে, অনেক বুদ্ধি খাটাইতে হইয়াছে, তবে মানুষ এমনটী হইয়াছে। খাদ্য-বিষয়েও মানুষকে যে কত গোলে পড়িতে হইয়াছে, তাহা মানুষই জানে। সে আম-মাংস ভক্ষণ করিয়া দেখিয়াছে, বৃক্ষপত্র চর্ব্বণ করিয়া দেখিয়াছে, ফল খাইয়া দেখিয়াছে, দুধ খাইয়া দেখিয়াছে। মানুষকে অনেক খাদ্য,

অনেক অখাদ্য খাইয়া, দেখিয়া শুনিয়া, পরীক্ষা করিয়া, তবে তাহার খাদ্য নিরূপণ করিতে হইয়াছে। মানুষ কত কি খাইয়াছে;—এত রকম খাইয়াছে যে, অপর কোন জীব তত রকম খায় নাই। অধিক কি মানুষ, অনেক অখাদ্যকে বুদ্ধি-কৌশলে খাদ্যে পরিণত করিয়া লইতেও বাধ্য হইয়াছে। এখন অনেক চিকিৎসক অনুসন্ধান করেন, মানুষের প্রকৃত খাদ্য কি। কিন্তু কেহই কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারেন না। মানুষ কৃত্রিম খাদ্য, অকৃত্রিম খাদ্য উভয়ই ব্যবহার করে। মানুষের খাদ্য আবিষ্কার করিবার সকল প্রয়াসই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মানুষকে এক বিশেষ জীব বলিয়াই মনে হয়। মানুষ এক বিশেষ উপাদানে সৃষ্ট। পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা উত্থাপিত হইলে বলিতে পারা যায় যে, বিশেষ-বিশেষ অবস্থা বিশেষ-বিশেষ জীবের উপযোগী, কিন্তু মানুষ সকল অবস্থাকেই নিজের উপযোগী করিয়া লয়। দুই পদে ভর দিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়ানই মানুষের স্বভাব। মানুষ সুদৃঢ় মেরুদণ্ড (spinal chord) পাইয়াছে। এরূপ সুদৃঢ় মেরুদণ্ড পৃথিবীস্থ আর কোন জীবের নাই।

দেখা গিয়াছে, বলিষ্ঠ মানব খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার স্কন্ধের উপর এত ভার গ্রহণ করিতে পারে যে, সে ভার কোন ওয়েলার ঘোড়ার পৃষ্ঠের উপর দিলে, তাহার পৃষ্ঠাস্থি ভঙ্গ হইয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন, চতুষ্পদ প্রাণী দ্বিপদ অপেক্ষা বেগবান্, কিন্তু বস্তুতঃ বেগগামিতায় কোন চতুষ্পদ জন্তুই মানুষকে পরাভূত করিতে পারে না। হটেনটট্ প্রভৃতি অসভ্য জাতির বেগগামিতার কথা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। চর্চ্চা করিলে শারীরিক বলও মানুষের এত অধিক হইতে দেখা যায় যে, সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতির বল তাহার নিকট তুচ্ছ হইয়া পড়ে। কিন্তু মানুষের বুদ্ধির নিকট শারীরিক বল অতি তুচ্ছ। বুদ্ধি-শক্তির কোথায় সীমা, তাহা কেহই বলিতে পারে না। মানুষ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারে, "দাঁড়াইবার স্থান পাইলে, আমি পৃথিবীকে কক্ষচ্যুত করিতে পারি!" মানুষের পক্ষে মানুষের লীলাক্ষেত্ররূপ এই ভূপৃষ্ঠ অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। সে গগন-মার্গে উড্ডীন হইয়া বিচরণ করিবার প্রয়াস পায়। কোন পক্ষী যত উর্দ্ধে উঠিতে সমর্থ না হয়, সে গগনের ততটা উর্দ্ধে উঠিয়া বিচরণ করিয়া আসে। প্রকাণ্ড তিমি, হাঙ্গর, কুম্ভীর প্রভৃতি ভয়াবহ ও হিংস্র জলজন্তু-সমাকীর্ণ অর্ণব-বক্ষ উদ্বেলিত করিয়া সদর্পে ও স্পর্দ্ধাভরে সে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করিতে প্রয়াস পায়। তাহার সবমেরিণ বিভীষণ ও হিংস্র জলজন্তু-সকলের মনে ত্রাস উৎপাদন করিয়া অতলস্পর্শ সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া অবলীলাক্রমে বিচরণ করিয়া আসে। এবংবিধ মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বানর-জাতীয় জীব, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

মানুষের আর এক বিশেষত্ব তাহার আধ্যাত্মিক জ্ঞানে। বানর ও বনমানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের মনোরাজ্যের কোন অংশেই ইহার বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। অথচ যত কালই আমরা মানুষের অস্তিত্ব পাই, তত কালই তাহার অন্তরে কোন না কোন ভাবে আত্মা, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞানের পরিচয় পাই। ধর্ম্ম ও মনুষ্য যেন হাত-ধরাধরি করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে; কর্ত্তব্য জ্ঞান, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের উপাসনা-প্রবৃত্তি কোন না কোন আকারে কোন্ কালে মানুষের ছিল না? কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারেন না যে, এই কালে মানুষের এ সকল ছিল না। ইহারা মানবজাতির চিরসঙ্গী। মানুষ ছাড়া আরও অনেক জীব সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে; কই—তাহাদের এরূপ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি দেখা যায় না কেন? দেখা যায় বটে, তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে, পরস্পর পরস্পরের জন্য সমবেদনা-পরায়ণ হয়, কিন্তু মানুষের ঠিক যেরূপ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি, অর্থাৎ ঠিক ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি যাহাকে বলা যায়, তাহা তাহাদের নাই।

মানুষ অপরাপর অনেক জীবকে শিক্ষিত করিয়া অল্প-বিস্তর আপনার কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতে পারে এবং করিয়াও লয়। এমন কি, কৌতুক দেখিবার জন্যও অনেক প্রাণীকে যথোপযোগী শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে। মানুষ বহু কালের অভিজ্ঞতায় এখন বুঝিয়াছে, কোন্ প্রাণী কিরূপ শিক্ষার উপযোগী, অর্থাৎ কোন্ প্রাণীকে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

গো, অশ্ব, মহিষ, হস্তী, উষ্ট্র প্রভৃতিকে মানুষ তাহার ভৃত্যরূপে নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিয়াছে, এবং তাহাদিগকে তাহাদিগের স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্তও রাখিয়াছে। কতকগুলি পাখীকে মানুষের ভাষায় কথা

কহান যায়, মানুষ তাহার অভিজ্ঞতার ফলে তাহাও জানিয়াছে। সে তাহাদিগকে পুষিয়া, কথা কহিতে শিখাইয়া কৌতুক উপভোগ করে। মানুষ সময়ে সময়ে বানরকেও তদ্রূপ পোস মানাইয়া অনেক কৌতুক উপভোগ করিয়া থাকে। বানরের গুণের মধ্যে এই যে, বানর অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয়। মানুষের অনেক অনুকরণ করিয়া, মানুষকে আমোদ দিতে পারে। মানুষ সেই কারণে বানর পুষিয়া আমোদ উপভোগ করে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত মানুষ বানরকে তাহার প্রয়োজনীয় কাজে লাগাইতে পারিল না। মানুষ ও বানর যদি এক শ্রেণীর জীব হইত, তাহা হইলে এরূপ হইত না। বানরকে মানুষ কখনই আপনার ভাষা শিখাইতে পারিল না, তাহাকে অপরিহার্য্যরূপে তাহার কোন কার্য্যে নিযুক্তও করিতে পারিল না। আজ যদি গরু ও অশ্বের অভাব হয়, মনুষ্যসমাজে হাহাকার পড়িয়া যাইবে। বানরের অভাবে মনুষ্যের কিছুই ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে হয় না। বানর ও মনুষ্য যদি এক শ্রেণীর প্রাণী হইত, তাহা হইলে অন্য সকল প্রাণী অপেক্ষা বানর মানুষের বেশী কাজে আসিত। বানর মানুষের কাছে পোস মানে অথচ মানুষের কাজে আসে না; ইহাতেই বেশ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বানর ও মানুষ এক জাতীয় নহে। এক সময়ে যখন দাস ব্যবসায় ছিল, তখন সভ্য জাতীয়েরা আফ্রিকার নিগ্রোদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্য করিত না। কিন্তু সভ্যজাতীয়েরা তাহাদিগের দ্বারা এত কাজ পাইত যে, তাহাদিগকে যথেষ্ট মূল্য দিয়া ক্রয় করিবার জন্য লালায়িত হইত। তাহাদিগের আকার প্রকার ও সভ্যজাতীয়দিগের আকার প্রকারে অনেক প্রভেদ। তাহাদিগের ভাষা ও সভ্য জাতীয়দিগের ভাষায় কিছুমাত্র মিল নাই। কিন্তু ইয়ুরোপীয়গণ নিগ্রোদিগের ভাষা অল্প দিনে বুঝিতে পারিত, নিগ্রোদিগকেও ইয়ুরোপীয়দিগের ভাষা অল্প দিনে শিখাইতে পারা যাইত। আর তাহাদিগের দ্বারা ইয়ুরোপীয়গণ যে কাজ পাইত, পৃথিবীর অপর কোন জাতীয় জীবের দ্বারা সে কাজ পাওয়া একেবারে অসম্ভব।

মানুষ মানুষের কাছে যতটা আশা করে ও পায়, এতটা সে অপর কোন জীবের কাছে আশা করিতে ও পাইতে পারে না।

খুব জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বানর ও মানুষ একজাতীয় জীব নহে। বানর ও মানুষে আকাশ পাতাল তফাত। কতকটা হাব-ভাব ও আকারগত সাদৃশ্য দেখিয়া ভুলিলে চলিবে না। উপর উপর দেখিয়া কোন তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় না। তত্ত্বনিরূপণ পক্ষে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও পর্য্যবেক্ষণ প্রয়োজন। তিন লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের নরকঙ্কাল ভূগর্ভ হইতে পাওয়া গিয়াছে, তখনকার বনমানুষেরও কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। আজ মানুষ ও বনমানুষের কঙ্কালে যে প্রভেদ, তখনও সেই প্রভেদ ছিল। প্রভেদ মাথার খুলি ও পৃষ্ঠাস্থিতে বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং সামান্য একটু বহিঃসাদৃশ্য দৃষ্টে তাহাদিগকে সমশ্রেণী-ভুক্ত করা যাইতে পারে না। মানুষকে বানরজাতীয় বলিলে মানব-জাতিতত্ত্বের মূলে একটা মস্ত ভুল থাকিয়া যায়; আমরা দেখিলাম, বানর ও মানব জাতির আকার ও গঠনগত সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয় মাত্র। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, তাহাতে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। যেটুকু সাদৃশ্য দেখি, সেটুকু কি? দুইটী বস্তু খুব দূর হইতে দেখিলে যেরূপ অনুমান হয় সেরূপ। আকাশের দুইটা নক্ষত্রকে আমরা একই রূপ দেখি, কিন্তু জ্যোতির্বিদ তাহাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখেন। বানর, বনমানুষ ও মানুষের গঠনগত তারতম্য বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে তাহাদিগের শরীরের গঠন ও অঙ্গ-সংস্থান পরীক্ষা করিতে হইবে। তাহা হইলে উভয়বিধ প্রাণীর গঠনে বিশেষ প্রভেদ দেখা যায়। মানুষের মাথার খুলি, পৃষ্ঠাস্থি ও বস্তিপ্রদেশ, বানর-জাতির মাথার খুলি, পৃষ্ঠাস্থি ও বস্তিপ্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মানুষের nervous system যেরূপ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, বানর জাতির সেরূপ হয় নাই। যেরূপ সূক্ষ্মস্নায়ুর আঘাতে মানুষ সাড়া দেয়, বানর সেরূপ সাড়া দিতে পারে না। মানুষের কণ্ঠযন্ত্রের (vocal organ) যেরূপ সম্পূর্ণতা সম্পাদিত হইয়াছে, বানরজাতির কণ্ঠযন্ত্রের সেরূপ সম্পূর্ণতা সম্পাদিত হয় নাই। শুধু তাহাই হইলে মনে করা যাইতে পারে যে, বানরের কণ্ঠযন্ত্র কালে সেইরূপ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু বানরের কণ্ঠযন্ত্রের সেইরূপ সম্পূর্ণতা লাভের আশা ও সম্ভাবনা নাই. পরীক্ষাদ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। মানুষের পদদ্বয় ও বানরের পদদ্বয় একরূপ নহে। বানরকে বরং চতুর্হস্ত (Quadrumana) বলা যাইতে পারে। বানর কিছুতেই

মানুষের মত খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারে না ও কখনও পারিবে না ; কারণ, তাহার পৃষ্ঠাস্থি, জানুদ্বয় ও বস্তিপ্রদেশের গঠন তাহার পক্ষে সোজা হইয়া দাঁড়াইবার উপযোগী নহে। তাহার গাত্রলোম ও মানুষের গাত্রলোমে অনেক পার্থক্য। বানরের শরীরস্থ অস্থি-সমাবেশ ও মানুষের শরীরস্থ অস্থি-সমাবেশ একরূপ নহে। হস্তের অস্থিভাগ বানরের ও মানুষের একরূপ নহে। বানর ও মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের স্নায়ু-সংস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। উভয়ের স্কন্ধদেশের স্নায়ুও ভিন্ন ভাবে অবস্থিত। করোটীর বৃত্তখণ্ড মানুষে এক রূপ, বানরে অন্য রূপ। সুতরাং বানর ও মানুষের গঠনগত তারতম্য অনেক। প্রকৃতিগত তারতম্য আরও অনেক বেশী।

ফ্রান্সের মোসাফির

[অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্‌-এ]

[২৬ অক্টোবর—৪ নবেম্বর ১৯২০]

অথাতঃ ফরাসী-বিবরণম্।

আবার ঝাঁপ দিলাম ঘূর্ণিপাকে। দেখা যাক্ এ-যাত্রায় কোথায় গিয়া ঠেকি! সম্প্রতি মোসাফির ত ফ্রান্সের। চার বৎসর কাটিল আমেরিকায়।

ফরাসী জাহাজ। সহযাত্রী মার্কিন, ফরাসী, ইতালিয়ান্‌, বেলজিয়ান, মেক্সিকান, ইংরেজ ইত্যাদি। ভাষা চলিতেছে ফরাসী ও ইংরেজী।

অক্টোবর মাসের শেষ। অথচ পাঁচ-ছয় দিন আট্‌লান্টিকে ঝড়-বৃষ্টি নাই। সৌভাগ্য বটে,—যদিও জাহাজটা নিতান্তই চোথা ও পুরানা। শস্তার দশাবস্থা—তবুও নিউ ইয়র্ক হইতে প্যারি পর্য্যন্ত পৌঁছিতে খরচ হইতেছে দুইশত ডলার। লড়াইয়ের পূর্ব্বে ইহার আধা খরচায়ই কাজ চলিত।

কম মাশুলের জাহাজ। নাচ-গান, আমোদ-কৌতুকের কোন সরঞ্জাম নাই। মোসাফিরগুলা হয় ডেক-চেয়ারে শুইয়া আছে, না হয় পাইচারি করিতেছে। অবশ্য মদের দোকান সর্ব্বদাই খোলা। মার্কিন মুল্লুকে আজকাল আইনের জোরে মদ উঠিয়া গিয়াছে,—কাজেই এক ইয়াঙ্কি ছোক্‌রা ছুট পাইয়া জাহাজে নেশায় চুর হইয়া আছে। মোটের উপর, মাতলামি বা হৈ-চৈ'র কোন লক্ষণ দেখিতেছি না।

ব্রেজিলিয়ান মহাশয় সপত্নীক। হাত-পা নাড়িয়া ইহাদের সঙ্গে আধা-ফরাসীতে কথা বলিতেছি। ইঁহারা রিওর সমান একটা সহর উত্তর আমেরিকায় পাইলেন না। ব্রেজিল ইঁহাদের চিন্তায় সকল দেশের সেরা। তিন মাস যুক্তরাষ্ট্রে কাটাইয়া ইয়োরোপে সফর করিতে চলিতেছেন। পাঁচ মাসের ভিতর দেশে ফিরিবেন। কাফি, চকলেট, ডালচিনি, এলাচি ইত্যাদি মালের কারবার করিয়া থাকেন।

উইস্কন্সিনের এক যুবক ফরাসী শিখিবার জন্য ইয়োরোপে যাইতেছে। যুদ্ধের সময়ে রুশিয়ার আর্কেঞ্জেল বন্দরে এই ব্যক্তি মার্কিন ফৌজের এক কেরাণী ছিল। বষ্টনের দুই মহিলা ভগিনী বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। নিউজার্সি প্রদেশের এক শিক্ষয়িত্রী উচ্চ শিক্ষার জন্য ফ্রান্সে যাইতেছেন। সেখানে গ্রেনোব (Grenoble) বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবেন। এক জার্ম্মাণ নারীর দুরবস্থা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতে হয়। ইহার বাস ষ্ট্রাসবুর্গ সহরে; আল্‌সাস প্রদেশের অন্তর্গত। এই মুল্লুক এতদিন জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের সামিল ছিল। সন্ধির ফলে ফ্রান্স এই অঞ্চলে একতিয়ার কায়েম করিয়াছে। কাজেই এই জার্ম্মাণ রমণী এক্ষণে ফরাসী প্রজা। দুঃখের কথা, একটা ফরাসী শব্দও ইঁহার জানা নাই। জাহাজে জার্ম্মাণ-জানা অনেক পুরুষ-নারীই যাত্রী, বুঝিতেছি। কিন্তু কোন লোকই এই জার্ম্মাণের সঙ্গে জার্ম্মাণ ভাষায় কথা কহিতে সাহস করিতেছে না। ফরাসী জাহাজে জার্ম্মাণ ভাষা? অতএব বোবার মতন একলা

না,—আছে বলিলেও ঠিক বলা হইবে না। অর্থাৎ আছেও, আবার নাইও। কাজেই যে ইংরেজ কখনও ফরাসী পড়ে নাই, সে কোন মতেই এইটা বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না।

তার পর উচ্চারণের মার-প্যাচ ত আছেই। ধরা যাউক, ভারতবর্ষের ইয়োরোপীয় নাম। ইংরেজ যাহাকে "ইণ্ডিয়া" বলে, ফরাসীর মুখে সেই দেশের নাম "অ্যাঁদ"। ঠিক অ্যাঁদও নয়; কারণ, ফরাসীরা দেশের নামের আগায় "দি" শব্দের ফরাসী প্রতিশব্দ La লা (স্ত্রীলিঙ্গে) অথবা Le ল (পুংলিঙ্গে) ব্যবহার করিয়া থাকে। ইংরেজ যাহাকে ফ্রান্স বলে, সেই দেশের ফরাসী নাম La France। এই ধরণে আমাদের দেশের ফরাসী নাম L' Inde।

সোজাসোজি আমরা হয় ত উচ্চারণ করিব, "লিন্দ" কিম্বা লিন্দে। ফরাসী উচ্চারণ "ল্যাঁদ"। এই নিয়ম-মাফিক "হিন্দু" শব্দের ফরাসী উচ্চারণ অ্যাঁদু। হ উচ্চারিত হয় না। হ'র আওয়াজ অ্যা। ন = চন্দ্রবিন্দু। বোধ হয় ফরাসীর উচ্চারণ নকল করিয়াই আমরা বলিতাম "মুই অ্যাঁদু"।

(৪)

জাহাজের বৈঠকখানার টেবিলে-টেবিলে ভিন্ন-ভিন্ন মাসিক বা অন্যবিধ কাগজ ছড়ানো দেখিতেছি। কোন-কোন টেবিলে একতাড়া বিজ্ঞাপন-পত্রের মতন ইস্তাহার নজরে পড়িল। এই গুলায় ফ্রান্সের (যুদ্ধে) কত ক্ষতি হইয়াছে, সেই গুলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আছে। মোটের উপর দশ "ডিপার্ট-মেন্ট" বা জেলা বিধ্বস্ত বা কোন না কোন উপায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। এই সকল জেলায় পুনর্গঠন কাজের জন্য এক কমিটি স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের দেশে "সমিতি" শব্দ যেরূপ প্রচ-লিত, ফরাসী রাষ্ট্রীয় পারিভাষিকে কমিটি শব্দ সেইরূপ আট-পৌরে। বর্ত্তমান কমিটির নাম Le Committee des regious devastees, কোন-কোন তথ্য বাঙ্গালীর মাথায় নয়া খেয়াল চালিতে পারে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ফ্রান্সের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় তিন কোটী আটাত্তর লক্ষ (৩, ৭৭, ৯৭, ০০০)। বাংলা দেশের লোক-সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার কোটি। বাঙ্গালী জাতের উন্নতি-অবনতি বুঝিবার জন্য গোটা ভারতের তথ্য তালিকা আওড়ানো অনুচিত। একটা ছোট ইয়োরোপীয় দেশের তুলনায় আমরা কোথায়, তাহাই জানিতে চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাজ। সাড়ে চার কোটি নরনারীর দেশ স্বয়ংই একটা বিরাট রাষ্ট্রের মশলা জোগাইবে না কেন?

তিন কোটি আটাত্তর লক্ষ ফরাসী স্ত্রী-পুরুষের ভিতর লড়াইয়ের জন্য তৈয়ার ছিল যুবায়-বুড়ায় চুরানব্বই লক্ষ বিশ হাজার (৯৪, ২০, ০০০)। ইহাদের বয়স ছিল ১৯ হইতে ৫০ বৎসর। অর্থাৎ মোট জন সংখ্যার প্রায় চার ভাগের এক ভাগ লোক প্রয়োজন হইলে লড়াইয়ের মাঠে দাঁড়াইতে পারে। ফরাসীরা প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়াছিল ৮৪ লক্ষ ১০ হাজার। যুদ্ধে বেশী লোক মরে নাই। ফ্রান্সে মরিয়াছিল মাত্র ১৩ লক্ষ ৬৪ হাজার। অর্থাৎ গোটা পল্টনের ভিতর শতকরা ১৬জন মাত্র ফৌজের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। মৃত ১৩, ৬৪, ০০০ সৈনিকের মধ্যে যুবাদের সংখ্যা বুড়াদের প্রায় সমান। সাড়ে চার বৎসরের যুদ্ধে ফরাসী যুবা মরিয়াছে প্রায় সাত লক্ষ। এই সাত লক্ষ যুবার কাহারও বয়স ৩২ বৎসরের বেশী ছিল না।

যে যে অঞ্চল যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়, সেই-সেই অঞ্চলের অতি ছোকরা, অতি বুড়া এবং স্ত্রীলোকেরা ঘরবাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া থাকে। ফরাসীরাও পলাইয়াছিল। দশ জেলা হইতে মোটের উপর পলাইয়াছিল ২৭ লক্ষ ২৮ হাজার নর-নারী। এবার এই স্থানেই ইতি; বারান্তরে অবশিষ্ট কথা বলিব।

—— ——

নিখিল-প্রবাহ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

ব্যাঙ্ক লুঠ

[বেলজিয়মের এণ্টওয়ার্প সহরে একটী দ্বিতল বাটীর নিম্নতলে একটা ব্যাঙ্ক ভাড়া ছিল। কিছুদিন পরে ঐ বাটীর দ্বিতলে দুই জন চোর ভাড়াটে আসে। তাহারা একদিন রাত্রে ঘরের মেঝের সিঁদ কাটিয়া দড়ি ঝুলাইয়া দিয়া ব্যাঙ্কের ভিতর নামে এবং 'অক্সি-এসিটিলিন' শিখার সাহায্যে ব্যাঙ্কের লোহার সিন্দুকের চাবি-কল গলাইয়া ফেলিয়া সিন্দুকের ভিতর হইতে ধনসর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া পলাইয়া যায়।]

অক্সি-এসিটিলিন যন্ত্র

[এই যন্ত্র নিঃসৃত অগ্নিশিখার উত্তাপে লৌহ-নির্ম্মিত পদার্থও অতি সত্বর পুড়িয়া দ্রবীভূত হইয়া যায়। চোরেরা পালাইবার সময় তাড়াতাড়িতে ব্যাঙ্ক-বাটীর দ্বিতলের কক্ষে এই যন্ত্রটা ফেলিয়া গিয়াছিল।]
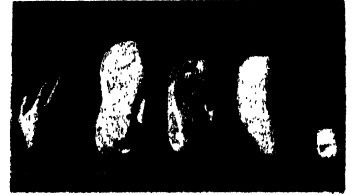
আসামী সন্ধানের সূত্র

[১ম। জনৈক অপরাধীর হাতের ছাঁচ। ২য়। আসামীর জুতার দাগ। ৩য়। ঐ পদচিহ্ন। ৪র্থ। ঐ হাঁটুর দাগ। এই হাঁটুর দাগ দেখিয়া গোয়েন্দা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, আসামীর পরিধানে ডুরিদার ছিটের পায়জামা ছিল এবং উহা ম্যাঞ্চেষ্টারের তৈরী। ৫ম। আসামীর ভুক্তাবশিষ্ট পনির। এই পনিরের টুক্‌রাটী পাইয়া গোয়েন্দা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, আসামীর পাশের একটা দাঁত নাই। কারণ এই টুক্‌রাটিতে একটা কামড় মারিয়া ভাল না লাগায় আসামী উহা ফেলিয়া দিয়াছিল। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে এই তুচ্ছ অযত্নে নিক্ষিপ্ত পনিরের ছোট টুক্‌রাটুকুই তাহাকে সনাক্ত করিয়া শীঘ্র ধরাইয়া দেয়।]

১। অপরাধী-নির্ণয়।

ঔপন্যাসিক কোনান্ ডয়েলের কাল্পনিক গোয়েন্দা শার্লক্ হামস্ যখন একগাছা লাঠি দেখিয়াই স্থির করিয়া ফেলেন যে, অপরাধী দীর্ঘকায় কি খর্ব্ব, যুবক না বৃদ্ধ, তাহার চ'খে চশমা আছে কি না, হাতে আংটি আছে কি না,—তখন পাঠকের একবারও মনে হয় না যে, উহা গ্রন্থকারের কল্পনা

ভূগর্ভ সন্ধানী-যন্ত্র

পকেট তাঁবু। (গুটানো) পকেট তাঁবু। (খাটানো)
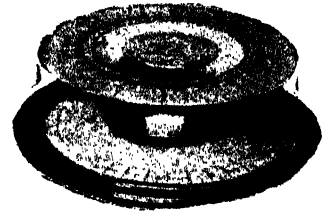
যন্ত্রস্থ কাঁচ পাত্র

নৌকা সাজানো হইতেছে

হাত-নৌকার বাক্স

নৌকা চালানো

বাক্স হইতে নৌকা বাহির করা হইতেছে

পা-পাখা

পুরাকালের প্রাচীন প্রতিমূর্ত্তি

কাঠের পা কুকুর

সর্ব্বাপেক্ষা লঘুভার ধাতু
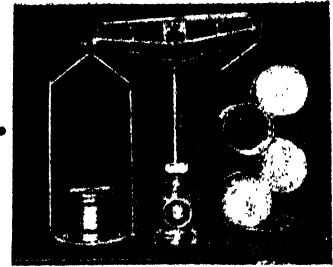
[অ্যালুমিনিয়মের একটি কৌটা ম্যাগনেশিয়মের চারিটি কৌটার অপেক্ষাও ওজনে ভারি দেখা যাইতেছে।]

মাত্র কারণ, যদিও লেখকের কল্পনা শার্লক হোমের অদ্ভুত শক্তিকে অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে, তথাপি অপরাধী নির্ণয়ের বিজ্ঞান-সম্মত ধারাটুকু তিনি আগাগোড়া ঠিক বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। বাস্তব-জগতে যে সকল গোয়েন্দাকে অজ্ঞাত আসামীর সন্ধান করিতে হয়, তাহাদিগকেও ঠিক ঐ শার্লক হোমের অনুসৃত পথেরই অনুবর্ত্তী হইতে হয়।

আমেরিকায় অপরাধী-নির্ণয়ের জন্য কোনও বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। সেখানে গোয়েন্দারা অপরাধ তত্ত্বের রীতিমত বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবার সুযোগ পায় না। ইয়োরোপ কিন্তু এ বিষয়ে আমেরিকার অপেক্ষা অনেক বেশি অগ্রসর হইয়াছে। ইয়োরোপের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্ততঃ চারিটীতে অপরাধ-তত্ত্ব-বিশারদ অধ্যাপক নিয়োগ করিয়া, উক্ত বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় অপরাধ-

দুগ্ধশোধন যন্ত্র

তত্ত্ব শিক্ষা-বিভাগেরও নিজস্ব পৃথক্ পরীক্ষাগার আছে। এই বিভাগের ছাত্রগণকে যেমন অপরাধীর চরিত্র ও মনস্তত্ত্ব বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিতে হয়,—সেই সঙ্গে অপরাধীর দেহ-তত্ত্ব, ঘটনাস্থলের সূক্ষ্ম পরিদর্শন, বিভিন্ন অস্ত্রাঘাত-চিহ্ন, সকল প্রকার বিষের প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করিতে হয়। এই জন্য পরীক্ষাগারে সকল প্রকার অস্ত্র-শস্ত্র, সর্ব্ববিধ বিষ, মোমের বা প্লাষ্টারের দ্বারা নির্ম্মিত এবং চিত্রাঙ্কিত হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি বিবিধ অপরাধের অসংখ্য নমুনা, ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের অপরাধিগণের নকল প্রতিমূর্ত্তি, বিভিন্ন বয়সের নরনারীর অস্থি, কঙ্কাল, করোটী প্রভৃতি, এবং নানা প্রকার পোষাক-পরিচ্ছদ সংগৃহীত থাকে। পরীক্ষার সময় ছাত্রগণকে ঘটনা-স্থলের নক্সা দেখিয়া হত ব্যক্তির নকল প্রতিরূপ পরীক্ষা করিয়া এবং পরীক্ষকের প্রদত্ত অপরাধের বিবরণ যাহা তিনি ভিন্ন ভিন্ন লোকের কল্পিত জবানবন্দীর ভিতর কৌশলে নিহিত রাখেন, তাহার সতর্ক আলোচনা ও বিশ্লেষণ দ্বারা হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য নির্ণয় ও হত্যাকারীর যথাসম্ভব উদ্দেশ করিতে হয়।

একবার কোনও একটি ছাত্রের বাড়ীর পাশে একটা খুন হইয়াছিল। হত্যাকারী কেবলমাত্র একটি টুপি ফেলিয়া গিয়াছিল। ছাত্রটি ঘটনাস্থল পরীক্ষা করিয়া, এবং টুপিটি বিশেষ ভাবে দেখিয়া-শুনিয়া বলিয়া দিয়াছিল যে, হত ব্যক্তির কোনও আত্মীয় তাহাকে খুন করিয়াছে। উহার বয়স পঁয়তাল্লিশ হইতে পঞ্চাশের মধ্যে; মাথাটি বড়—মাথায় কাঁচা-পাকা চুল আছে ও টাক পড়িতে সুরু হইয়াছে। লোকটির আর্থিক অবস্থা খারাপ, এবং তাহার স্বভাব বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়। এই সন্ধান পাইয়া পুলিস অপরাধীকে সত্বর ধরিতে পারিয়াছিল। বুদ্ধিমান্ পাঠকমাত্রেই একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, কেবলমাত্র একটা টুপি হইতে এত খবর পাওয়া যায় কি না। প্রথমতঃ, ঘটনাস্থলে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, হত ব্যক্তির কিছুই

চুলের চাষ   চুল রোপণ করিবার যন্ত্র

চল্লিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বের মানুষ
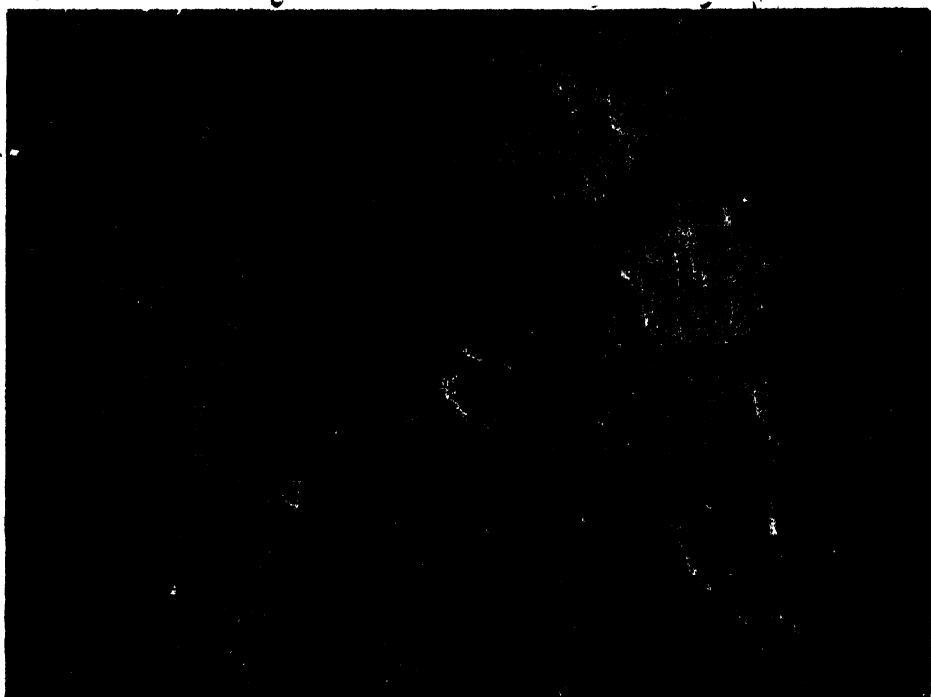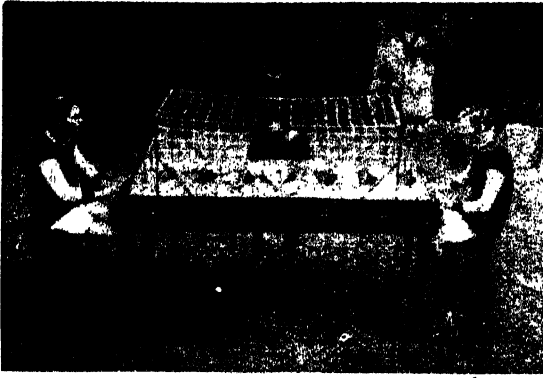
হাতে ফুটবল খেলা

ঘাসের জামা

দেড়গজি বয়বটী মূর্তী
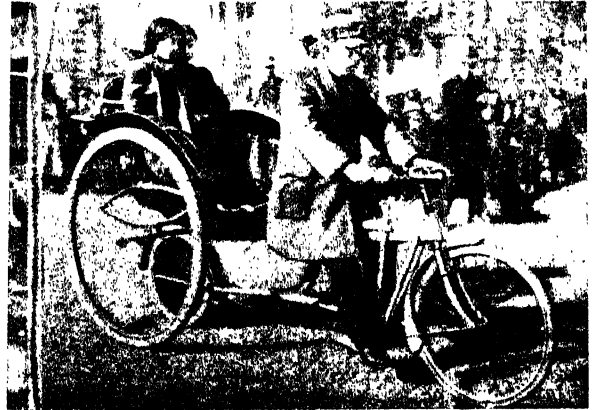
মোটর রিক্‌শ

চুরি যায় নাই। জেরা ও জবানবন্দীর দ্বারা প্রকাশ পাইল যে, হত ব্যক্তির কয়েকজন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ভিন্ন অন্য কোনও আপনার লোক নাই; এবং তিনি সম্প্রতি উইল করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। উইল করিবার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইলে, বিষয়-সম্পত্তি কোনও আত্মীয়ের পাইবার সম্ভাবনা। টুপিটি পরীক্ষা করিয়া তাহার ভিতর হইতে দুই-গাছি কাঁচা-পাকা চুল পাওয়া গিয়াছে। টুপির ভিতর দিকটা ঘামে ভিজিয়াছিল। টুপিটি পুরাতন,—দুই এক জায়গায় ছেঁড়া এবং ধূলি-মলিন। টুপির আভ্যন্তরীণ ফাঁদটি খুব বড়। সুতরাং ছাত্রটি সহজেই অপরাধীর আকৃতি ও অবস্থা অনুমান করিতে পারিয়াছিল।

অষ্ট্রীয়ার 'গ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের' অপরাধ-তত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক গ্রোস্ (Prof. Gross, criminologist) অপরাধীর পদচিহ্ন দেখিয়া বলিয়া দিতে পারেন যে, সে ছুটিয়া গিয়াছে, কি গোপনে পা-টিপিয়া-টিপিয়া গিয়াছে, যাইবার সময় তাহার হাতে কিছু ছিল কি না—এবং তাহার কোনও ব্যাধি আছে কি না। ফরাসী পুলিশের প্রধান গোয়েন্দা বার্টিলন সাহেব জুতার দাগ দেখিয়া বলিয়া দিতে

প্রেসিডেন্ট হার্ডিং ওয়াশিংটন হইতে টেলিফোঁ শুনিতেছেন

[প্রেসিডেন্টের সহিত আমেরিকার কয়েকজন উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারীও ছয় হাজার মাইল দূরে অবস্থিত দুইটি দেশের টেলিফোঁর সাহায্যে পরস্পরের সহিত কথা কওয়া শুনিতেছেন।]

কিউবার অধিনায়ক প্রেসিডেন্ট মেনোকাল

[ক্যাটালিনা ও কিউবা এই দুই দ্বীপের মধ্যে ছয় হাজার মাইল ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও যে তাহারা পরস্পরের সহিত ইচ্ছামত কথা কহিতে পারিতেছে, ইহা স্বকর্ণে শুনিয়া প্রেসিডেন্ট মেনোকাল প্রেসিডেন্ট হার্ডিংকে টেলিফোঁর সাহায্যে আপনার আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছেন।]

সেদিনের সেই অসাধ্য-সাধন ব্যাপারের অন্যান্য শ্রোতাগণ
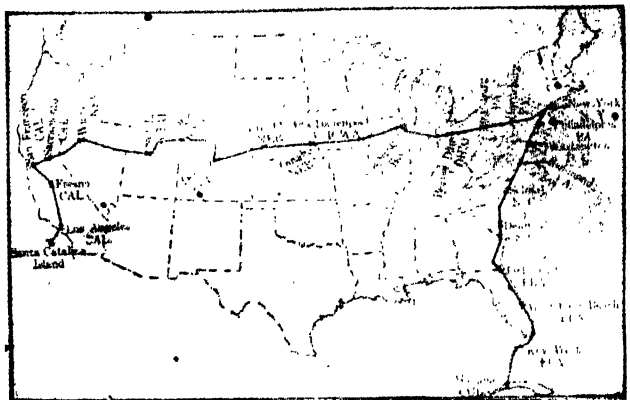
ক্যাটালীনা ও কিউবার টেলিফোঁ লাইনের মানচিত্র

(১) অন্ধের যষ্ঠী (২) বিজ্ঞাপন প্রচারক (৩) রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা (৪) গাড়োয়ানের সঙ্গী
(৫) জাহাজের ঘণ্টাদার (৬) ভিক্ষুকের অবলম্বন (৭) মোটর চালক

পারিতেন যে, তাহার পায়ে কি জুতা ছিল, এবং সে জুতা কোথাকার তৈয়ারী। দীর্ঘকাল ধরিয়া বিভিন্ন জুতা লইয়া পরীক্ষা ও গবেষণা দ্বারা তিনি এই ক্ষমতা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন।

একবার একটি বৃদ্ধকে মৃত অবস্থায় কড়িকাঠ হইতে ঝুলিতে দেখিয়া পুলিশ উহা আত্মহত্যা বলিয়া স্থির করে। কিন্তু অধ্যাপক গ্রোস্ ঘটনাস্থল পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, মৃত ব্যক্তির পায়ের নীচেয় যখন কোনও চেয়ার, বা টুল পড়িয়া নাই, তখন ইহাকে আত্মহত্যা বলা যায় না। তার পর অধ্যাপক গ্রোস্ ডাক্তারের দ্বারা মৃত-দেহ পরীক্ষা করাইয়া, এবং আরও নানা অনুসন্ধান করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, উক্ত বৃদ্ধের রাত্রিকালে নিদ্রিত অবস্থায় স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হইয়াছিল; সকালে তাহার ভৃত্যেরা মনিবের এই আকস্মিক মৃত্যুতে পাছে খুনের দায়ে পড়ে, এই ভয় পাইয়া তাঁহার মৃতদেহ কড়িকাঠে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তাহারাই যে মৃত-দেহটি ঝুলাইয়া রাখিয়াছে, ইহা গোপন করিবার জন্য কার্য্য শেষে টুল বা চেয়ারখানি আবার যথাস্থানে সরাইয়া রাখিয়াছে! (Popular Science)

২। পকেট-তাঁবু

ছবিতে মেয়েটির হাতে যে ছড়িটি রয়েছে, ঐটী তাঁবুর খুঁটি। এই খুঁটিটি ইচ্ছামত উঁচু-নীচু করবার দরকার হ'লে, সেই মাপে কমান-বাড়ানো যায়। বাঁ হাতে যে কাপড়ের বাণ্ডিলটি রয়েছে, ঐটী তাঁবুর খোল। পাটপিট করে এটিকে পকেটে ক'রে নিয়ে যাওয়া যায়। হঠাৎ একদিনের জন্যে বাইরে কোথাও বেড়াতে যাবার দরকার হ'লে, এই তাঁবুটি সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলে, অনেক সময়ে কাজে লেগে যায়। যে সব দালালদের ক্যানভাসিং কাযে মফঃস্বলে ঘুরে বেড়াতে হয়, তাদের পক্ষে কোথাও থাকবার স্থান না জুটলে, এই তাঁবুটি হোটেলের কাজ দেয়। পরের ছবিখানিতে মেয়েটি পকেট তাঁবুটা এক জায়গায় খাটিয়েছে। এর ভিতর স্বচ্ছন্দে রাত্রিবাস করা চলে। তাঁবুর খুঁটিটি বেতের তৈরি বলে, খুব হাল্কা,—ছড়ির মত হাতে ক'রে নিয়ে যাওয়া চলে। তাঁবুর কাপড় এত পাতলা যে, মুড়ে-ঝুড়ে পকেটে পূরে নেওয়া যায়; অথচ খুব মজবুত,—বর্ষাতি কাপড়ের মত জল, ঝড়, হিম, রৌদ্র সব আট্‌কাতে পারে।

(Popular Science)

৩। ভূগর্ভ-সন্ধানী যন্ত্র

মাটির নীচেয় কি আছে, ওপর থেকে বলে দিতে পারে, এমন লোকের পরিচয় আমরা এতদিন গল্পেই শুনে এসেছি। কিন্তু সম্প্রতি একজন জার্ম্মাণ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ বি, জাইরট্‌কা একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন, যার সাহায্যে তিনি বলে দিতে পারেন যে, কোন্‌খানে মাটির নীচেয় জল আছে, আর কোথায় ধাতু-পদার্থ পাওয়া যেতে পারে। যন্ত্রটা বিশেষ কিছুই নয়—একটি কাঁচের পাত্র, তাতে খানিকটা সুরাসার বা ভিনিগার ইত্যাদি কোনও উগ্র তরল পদার্থ ঢালা আছে। একটা কাঁচের কিম্বা কাঠের ছুঁচোলো শলা সেই তরল পদার্থের উপর ভাসে। ঐ শলার একদিক একটা কাঁসা পেতলের ডাণ্ডার সঙ্গে যোগ করা থাকে। ঐ ডাণ্ডাটি আবার সেই পাত্রের কাঁচের ঢাক্‌নার সঙ্গে আঁটা থাকে। ঢাক্‌নাটি চাপা দিলেই কাঁচের পাত্রটি একেবারে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যায়। ঐ ঢাক্‌নার চারধারে গোল কানা বার করা আছে। কানার গায়ে দাগ-কাটা মাপ আঁকা আছে। মাটির নীচেয় যদি ধাতু-পদার্থ থাকে, তাহ'লে ঐ পাত্রের ভিতর ভাসমান শলাটি—বিপরীত দিকে প্রতিক্ষিপ্ত হয়। এই প্রতিক্ষেপের গতির পরিমাণ দেখে, কি জাতীয় ধাতু ঐ মাটার নীচেয় পাওয়া যেতে পারে, তাও জানা যায়। মাটির ভিতর যদি জল কিম্বা কাদামাটি অথবা লবণক্ষার থাকে, তাহ'লে শলাটিকে সোজাসুজি আকর্ষণ করে। আর সেই আকর্ষণের তারতম্য অনুসারে ভূগর্ভে কি আছে, তাহার সঠিক সন্ধান পাওয়া যায়।

(Popular Science)

৪। হাত-বাক্সে নৌকা

একটি 'সুটকেস' কিম্বা বড় ব্যাগের মত বাক্সের মধ্যে এই নৌকাখানি পূরিয়া এক হাতে ঝুলাইয়া লইয়া যাওয়া যায়। হাল্কা কাঠের ফ্রেম খণ্ড-খণ্ডে ভাগ করা থাকে। ব্যবহার করিবার সময় টুক্‌রাগুলি জুড়িয়া প্যাঁচ আঁটিয়া লইলেই কাজ চলে। ফ্রেমের দুই পাশে লম্বা দুইটি রবারের থলের মধ্যে হাওয়া পুরিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। জল-ভ্রমণের পর আবার ফ্রেমটি খুলিয়া, রবারের ব্যাগ হইতে হাওয়া বাহির করিয়া দিয়া বাক্সের মধ্যে ভরিয়া, হাতে ঝুলাইয়া লইয়া আসা যায়।

(Popular Science)

৫। পা-পাখা

আমরা হাত-পাখায় বাতাস খাই; কিন্তু ইয়োরোপ পা-পাখায় বাতাস খাইবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। দোলা-চেয়ারের সঙ্গে একটি হাতোল আঁটিয়া, তাহাতে একখানি ছোট টিনের পাখা লাগাইয়া দিয়াছে। হাতোলের মাথায় একটি চাকা আছে। ঐ চাকার সঙ্গে পাখার যোগ রাখিয়া, একগাছি সরু তার বা চামড়ার দড়ি দোলা-চেয়ারের পাদানীতে বাধা থাকে। চেয়ারে বসিয়া দোল খাইবার সঙ্গে-সঙ্গে দড়িতে টান পড়িয়া, চাকাটি ঘুরিতে থাকে; এবং চাকা ঘোরার সঙ্গে-সঙ্গে টীনের পাখাটিও ফর্‌ফর্ করিয়া বাতাস করিতে সুরু করে। (Popular Science)

৬। পুরাকালের প্রাচীন প্রতিমূর্ত্তি

মিশরে একটা দারু-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, উহা প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি বহু প্রাচীন প্রতিমূর্ত্তি। কায়রো সহরের যাদুঘরে উহা সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। মূর্ত্তিটি কোনও পুরাকালীন গ্রাম-প্রধানের প্রতিরূপ; এবং সম্ভবতঃ উহাই এতাবৎ আবিষ্কৃত পুরাতন-মূর্ত্তির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, বিশেষজ্ঞেরা এইরূপ অনুমান করেন। যাহা হউক, মূর্ত্তিটি দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে মানুষের যেরূপ আকৃতি ছিল, এতদিনেও তাহার বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই; কেবল মাত্র পোষাক-পরিচ্ছদেরই আড়ম্বর বাড়িয়াছে মাত্র। (Popular Science)

৭। কাঠের-পা কুকুর

পা-কাটা মানুষের কাঠের পা অনেকেই দেখিয়াছেন। কিন্তু পা-কাটা কুকুরেও যে কাঠের পা ব্যবহার করিতে পারে—ইহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। একজন ডাক্তারের একটা ভাল কুকুরের একবার মটোর গাড়ী চাপা পড়িয়া পিছনের একটা পা নষ্ট হইয়া যায়। ডাক্তার কুকুরটাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি একটা কাঠের পা তৈয়ার করাইয়া তিন-ঠ্যাং কুকুরটাকে আবার চতুষ্পদ করিয়াছেন। কুকুরের রংটা পাট্‌কিলে; কিন্তু উহার কাঠের পা-খানি সাদা পশমের কাপড়ে সর্ব্বদা মোড়া থাকে বলিয়া, সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। (Popular Mechanics)

৮। সর্ব্বাপেক্ষা লঘুভার ধাতু

এ্যালুমিনিয়মই এতকাল সর্ব্বাপেক্ষা হাল্কা ধাতুর স্থান অধিকার করিয়া, লঘুভার ধাতু-দ্রব্যের মধ্যে একাধিপত্য করিতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি ধাতুবিদেরা ম্যাগ্‌নেশিয়মকে আনিয়া এ্যালুমিনিয়মের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিয়াছেন। ম্যাগ্‌নেশিয়মের লঘুত্ব পরিমাণে এ্যালুমিনিয়ম অপেক্ষা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বেশি। ম্যাগ্‌নেশিয়ম ও এ্যালুমিনিয়ম দুইই একজাতীয় ধাতু; কিন্তু অধিক লঘুত্বের জন্য ম্যাগ্‌নেশিয়মকে এতদিন ব্যবহারোপযোগী তৈজস-পত্র নির্ম্মাণ করিতে পারা যায় নাই। এক্ষণে উহার সহিত শতকরা দশ ভাগ খাদ মিশ্রিত করাতে, উহার দ্বারা চমৎকার তৈজসপত্র প্রস্তুত হইতেছে। এ্যালুমিনিয়ম অপেক্ষা হাল্কা, অথচ মজবুত ও টেঁকসই ম্যাগ্‌নেশিয়মের তৈয়ারী জিনিস লোকে বেশি পছন্দ করিতেছে। ইহা দীর্ঘকাল ব্যবহারেও শীঘ্র নষ্ট হয় না।

(Popular Science)

৯। দুগ্ধ-শোধন যন্ত্র

দুগ্ধের মধ্যে টাইফয়েড্ ও ক্ষয়রোগের বীজাণু প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, বিলাতের 'ডায়েরী-ফার্ম'-ওয়ালারা খরিদ্দারগণকে দুগ্ধ সরবরাহ করিবার পূর্ব্বে উহা শোধন করিয়া পাঠান। পূর্ব্বে ময়লা জল যে উপায়ে শোধন করা হইত, সেই ভাবেই দুগ্ধ শোধন করিয়া দেওয়া হইত; কিন্তু সে উপায়ে বীজাণু ধ্বংস হয় না দেখিয়া, বৈজ্ঞানিকেরা দুগ্ধ শোধনের নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, বৈদ্যুতিক প্রবাহের সংস্পর্শে দুগ্ধস্থ বীজাণুসকল অবিলম্বে নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য নূতন ধরণের বৈদ্যুতিক দুগ্ধ-শোধন-যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। একটা পাত্রে প্রথমতঃ টাট্‌কা দুগ্ধ রাখা হয়। ঐ পাত্রটীর সহিত নলের দ্বারা আর একটী সদা-সমতল (Constant-level) পাত্রের সংযোগ আছে। উহা সর্ব্বদা নলের ভিতর দুগ্ধের সমপরিমাণ তোড় বজায় রাখিয়া দেয় (maintains uniform pressure)। ঐ সদা-সমতল পাত্র হইতে দুগ্ধ আবার একটি সংহার-নালিকার (Lethal Tube) মধ্যে চালিত হয়। সংহার-নালিকার কিয়দংশ কাচ-নির্ম্মিত। উহার মধ্যে-মধ্যে আবার তাড়িত-প্রকোষ্ঠ সন্নিবিষ্ট আছে। সংহার-নালিকা বাহিয়া দুগ্ধ বাহির হইয়া আসিবার সময়, তৎসংলগ্ন একটী তাপমান

যন্ত্রে উহার উত্তাপ নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। সেখান হইতে বাহির হইয়া দুগ্ধ প্রথমে পরস্পর অনুকূল দুইটী পাত্র (Auxiliary Tanks) আসিয়া জড় হয়। তার পর মাঝের একটী আবদ্ধ গর্ভনালীতে (Covered channel) সংগৃহীত হইয়া, পরে নিম্নস্থ শোধিত দুগ্ধের পাত্রে আসিয়া পড়ে। এই পাত্রের গায়ে একটী জলের কলের মত মুখনল সংলগ্ন আছে। এই মুখনল হইতে শোধন করা দুগ্ধ বোতলে ভরিয়া লওয়া হয়।

(Popular Science)

১০। চুলের চাষ

তৃণবিহীন ভূমিকে তৃণাচ্ছাদিত করিবার জন্য যেমন অপর কোনও স্থান হইতে তৃণগুচ্ছ আনিয়া সেখানে বসাইতে হয়, এবং রীতিমত জল-সেচনের দ্বারা উহার চাষ করিতে হয়,—কেশ-বিরল মস্তক কেশাচ্ছাদিত করিবার জন্য ইদানীং সেই উপায় অবলম্বিত হইতেছে। একটী যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, যদ্দ্বারা টাকের উপর চুলের মত সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া, সঙ্গে-সঙ্গে উহাতে চুল বসাইয়া দেওয়া চলে। এই যন্ত্রের সাহায্যে এক্ষণে বহু টাকগ্রস্ত ব্যক্তি আবার কেশলব্ধ হইয়া আপন-আপন শ্রীহীনতার দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা পাইতেছেন।

(Popular Science)

১১। চল্লিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বের মানুষ

আমেরিকার যাদুঘরের অধ্যক্ষ মিঃ চার্লস্ নাইট বলেন যে, অনেক লোকের ধারণা, আগেকার মানুষ দেখ্‌তে খুব লম্বা-চওড়া সুশ্রী সুপুরুষ ছিল। কিন্তু তাদের সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি, জার্ম্মাণীর নিয়াণ্ডারথাল প্রদেশ হইতে চল্লিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বের যে নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহার হুবহু বর্ণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জীবিত অবস্থায় এই মানুষটির কিরূপ আকৃতি ছিল। ক্ষুদ্র ললাট, কোটরগত চক্ষু এবং তাহার চারিপার্শ্বের অস্থি বৃহৎ ও উচ্চ। করোটি দীর্ঘাকৃতি ও চ্যাপ্টা। থুঁৎনী যেন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—এত ছোট। কিন্তু তাহারা দুর্ব্বল ছিল না—অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সাহসী ছিল। গুরু-গম্ভীর মুখের চোয়াল গরিলাদের মত; মনের দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভাব চখের দৃষ্টিতে পরিস্ফুট। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যেন তাহারা সব করিতে প্রস্তুত। প্রকাণ্ড মোটা নাক,—ঠোঁট দুখানি বেজায় পুরু। দেহে অসীম শক্তি; তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি না থাকিলেও, কার্য্যতৎপরতায় সে আজকালের মানুষের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। দুর্জ্জয় সাহস ও শীকার-পটুতায় অদ্বিতীয় এই আদিম মানুষের একমাত্র অভাব ছিল সুরূপ! দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফিট দু'ইঞ্চির বেশি নয়। বৃষস্কন্ধ কেশাবৃত; আজানুলম্বিত বাহু ঘন-রোমাচ্ছাদিত। পদদ্বয় সুদৃঢ় কিন্তু খর্ব্বাকৃতি। অস্ত্রের মধ্যে ইহারা ভল্ল, কুঠার ও কীরিচ ব্যবহার করিত; এবং বসবাস ছিল পর্ব্বত-গুহায়।

(Popular Science)

১২। হাতে ফুটবল খেলা

এ ফুটবল খেলার গ্রাউণ্ড বা ময়দান হচ্ছে, একখানি টেবিল। ওপরটি জাল দিয়ে ঢাকা। টেবিলের ওপর চড়ে দু'দলের এগারজন করে খেলোয়াড় বল নিয়ে ছুটো-ছুটি করে না। প্রত্যেক টিমের একজন ক'রে খেলোয়াড়, টেবিলের যে দিকে গোল-পোষ্ট আছে, সেই ধারে টুলের ওপর ব'সে, পিয়ানো বাজাবার মত হাত দিয়ে চাবি টিপে খেলে। টেবিলের ওপরটার সমস্ত অর্দ্ধচন্দ্রের মত স্প্রীংয়ের চাকতি আঁটা আছে। চাবি টেপার সঙ্গে সঙ্গে চাকতি-গুলো উঠে-পড়ে বলটাকে ঠেলে দেয়। যে খেলোয়াড় খুব ওস্তাদ—চট্‌পট্ ঠিক-ঠিক হাত চালিয়ে, চাবি টিপে যেতে পারে—সেই এ খেলায় জিততে পারে। বিলেতে এখন এই টেবিলে ফুটবল খেলার ফ্যাশানে খুব জোর চলেছে।

(Popular Science)

১৩। ঘাসের জামা

উলুখড় আমেরিকার হাতে পড়ে ভারি জব্দ হয়েছে। নিউইয়র্কের মেয়েরা উলুখড় দিয়ে বুনে চমৎকার গেঞ্জী, মোজা, জামা তৈয়ারি করছে। পশমের চেয়ে অনেক সস্তা, অথচ দেখতে নেহাৎ মন্দ নয় ব'লে, সে দেশের মেয়েরা অনেকেই এখন এই ঘাসের-বোনা পোষাক পরে বেড়াচ্ছে। চীন মুল্লুকে এই জাতের ঘাস সবচেয়ে ভাল; তাই চীন থেকে এখন প্রতি-বছরে জাহাজ বোঝাই হয়ে এই জাতের ঘাস মার্কিণে চালান হচ্ছে! আর দিনকতক পরে হয় ত দেখা যাবে, বিলেত বল্কল পরতে সুরু করেছে!

(Popular Science)

১৪। দেড়গজি বরবটী-সুঁটি

ছবিতে মেয়েটি হাসতে-হাসতে গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছে, মনে করবেন না। ওদের বাগানের বরবটী-ক্ষেত্রের একটা সুঁটি কেমন খেয়ালের ওপর এক বিঘত না হ'য়ে একেবারে দেড়গজ লম্বা হয়ে বেড়ে উঠেছিল। এই আশ্চর্য্য লম্বা বরবটী-সুঁটী যে দেখে, সেই কিনতে চায়। মেয়েটি বলে দাঁড়ান, যদি আরও বড় হয়, তাহ'লে আমি তখন গজে মেপে আপনাদের সুঁটা বেচবো!

(Popular Science)

১৫। মোটর রিক্‌শ

জাপানে আর টিংটিং করে ঘণ্টা বাজিয়ে মানুষে রিক্‌শ টেনে বেড়াচ্ছে না,—এখন ভোঁ-ভোঁ ক'রতে-ক'রতে হর্ণ বাজিয়ে মোটর রিকশ ছুট্‌ছে! ইচ্ছে করলে জাপান এর চেয়ে কম খরচে ইয়োরোপের মত মটর বাইসিকেলের সঙ্গে 'সাইড্‌কার' জুড়ে, ভাড়া খাটাতে পারতো। কিন্তু জাপান তার দেশের বিশেষত্ব ঐ রিক্‌শটিকে বোধ হয় বজায় রাখতে চায়; তাই মোটরের সাহায্যে পরিচালিত হওয়া সত্বেও, গাড়ীর রিকশত্বটুকু যতদূর সম্ভব রাখবার চেষ্টা করেছে।

(Popular Science)

১৬। দেশদেশান্তরে কথা

কাটালীনা ও কিউবা দ্বীপের পরস্পরের মধ্যে দূরত্বের পরিমাণ পাঁচহাজার ছয়শত তিন মাইল। যে দিন এই কাটালীনা হইতে কিউবার লোকের সহিত টেলিফোঁতে প্রথম কথাবার্ত্তা চলিতে আরম্ভ হইল, সেই দিনটিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য আমেরিকার অধিনায়ক প্রেসিডেন্ট হার্ডিং ও কিউবার অধিনায়ক প্রেসিডেন্ট মেনোবাল বহু গণ্য-মান্য সভাসদের সহিত পরস্পরের রাজধানীতে বসিয়া টেলিফোঁয় কাণ পাতিয়া সেই কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলেন। এবং প্রায় সেই ছয়হাজার মাইল দূরে অবস্থিত দুই দ্বীপের লোকের বিজ্ঞান-বলে যে আজ পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা কওয়া সম্ভব ও সাধ্যায়ত্ত হইল, ইহা স্বকর্ণে শুনিয়া উভয় অধিনায়ক পরস্পরকে আপন-আপন আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ছয়হাজার মাইল দূরের লোকের সহিতও যে কথাবার্ত্তা চলিল কেবলমাত্র ইহাই তাহার বিশেষত্ব নহে, আরও বিশেষত্ব এই যে, দুইটি দেশই সাগর-পরিবৃত দ্বীপ! মানচিত্র হইতে পাঠকগণ এই দুই দ্বীপের অবস্থান বুঝিতে পারিবেন। এই কথাবার্ত্তার আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার কতক অংশ টেলিফোঁর তার বহন করিয়াছে,—কতক অংশ বেতার বার্ত্তাবহ পৌঁছাইয়া দিয়াছে, এবং কতক অংশ সমুদ্র-গর্ভস্থ পোতবার্ত্তাবহ তারের (cables) সাহায্যে চলিয়াছে অতঃপর কলিকাতায় বসিয়া লণ্ডনে অবস্থিত কোনও আত্মীয়ের সহিত কথা কওয়ার সম্ভাবনা অদূরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়।

(Literary Digest)

১৭। কুকুরের কাজ

সার্কাসে অনেকেই দেখিয়াছেন যে, কুকুরে কতরকম খেলা দেখাইতে পারে। কিন্তু সার্কাসের বাহিরেও কুকুর তাহার মনিবের অনেক কাজ করিয়া দেয়। একজন সৈনিক যুদ্ধে অন্ধ হইয়া যাইবার পর হইতে, তাহার পোষা কুকুরটি তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবার কাজ করিতেছে। আর একজন দুরবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের কুকুর বিজ্ঞাপন-লেখা ছাতা মুখে করিয়া সমস্ত দিন সহরের পথে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া মনিবকে বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়া আনিয়া দেয়। চশে-চশমা-দেওয়া কুকুরটি মোটর চালকের কাজ করিতেছে। একজন দরিদ্র গাড়োয়ানের ঘোড়া মরিয়া যাওয়ায়, সে আর ঘোড়া কিনিতে পারে নাই,—নিজেই গাড়ীটি টানিয়া বেড়ায় দেখিয়া, তাহার কুকুরটীও মনিবকে সাহায্য করিবার জন্য গাড়ী টানিতে সুরু করিয়াছে। জনৈকা অভিনেত্রীর একটী কুকুর রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ে যোগদান করিয়া প্রতি সপ্তাহে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে। জাহাজের নাবিকদের একটি কুকুর যথাসময়ে ঘণ্টা বাজাইয়া ঘড়ীর সময় নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। একজন ভিক্ষুক পথে-পথে গান-বাজনা শুনাইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। তাহার একখানি ছোট বাজনা-বাক্সের গাড়ী (organ Box) তাহার পোষা কুকুরটাই টানিয়া লইয়া যায়।

(Popular Science)

ছাত্র

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

ধীর প্রথমাশ্রমী, ভারতীর পুত্র,
সত্যের উপাসক, সমাজের সূত্র।
সুদূরের অভিলাষী, অতীতের শিষ্য,
ভাণ্ডার খুলে দেয় তব তরে বিশ্ব।
সংযমী সুন্দর, যোগী যোগ মগ্ন,
ত্রিদিবের স্তন্য যে অধরেতে লগ্ন।
সৌম্য বশংবদ, হে আরুণি নব্য,
তুমি চির-তন্ময়, তুমি একলব্য।

২

হে সাধক, হে তাপস, করি তপ ভঙ্গ
তোমরা কি ছুটে যাবে দেখিবারে রঙ্গ ?
হিমগিরি টলমল, গর্জ্জাক্ সিন্ধু,
খসে যাক্ গ্রহ-তারা ভাস্কর ইন্দু,
তুমি থাক মহিমার অমিয়ায় সিক্ত,
দূরে র'ক ধরণীর কোলাহল্ রিক্ত।
হে সবল, হে মরাল, হে মানস-যাত্রী,
চঞ্চল হেরি কেন কুয়াসার রাত্রি ?

৩

নিরঞ্জন সাধনার গুহা মাঝে বৎস,
আনিবে কি ডাকি সবে, নৃত্য বীভৎস।
মৌনী সাধুরা কেন অকারণ ক্রুদ্ধ ?
মহা-উষা কেটে যায়, করি বাক্ যুদ্ধ।
চল চল ভগীরথ-চিহ্নিত বর্ত্মে
সাধনায় গঙ্গায় এনেছে যে মর্ত্তে।
স্থিরতায় ধীরতায় এনে দেয় মোক্ষ ;
চপলতা সফলতা বিনাশেই দক্ষ।

মোটরে রাঁচী

[শ্রীবিনয়কুমার দাস]

দেখ্‌তে-দেখ্‌তে আমাদের যাবার দিন সাম্‌নে এল। কয়েক দিন থেকে খুব যোগাড়-যন্ত্র হচ্ছে। সকলেই উৎসাহিত করছেন। ফোর্ড গাড়ীতেই যাওয়া ঠিক হল।

গাড়ীখানির এঞ্জিন ও অন্যান্য সব কল-কব্জা, ভাল রকম করে মেরামত ও পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া হল ; কারণ, গাড়ীখানি ইতিমধ্যে কয়েক হাজার মাইল চলেছে—নানান্ ড্রাইভারের হাতে। এ গাড়ী যে এত-দূর যেতে পারবে, এ ভরসা অনেকেরই ছিল না; কিন্তু আমরা বদ্ধপরিকর।

১০ই জুন শুক্রবার—ভোর ৪টায় যাত্রার সময় ঠিক হল। বৃহস্পতিবার রাত্রে হাওড়া ছেড়ে কল্‌কাতায় এসে রইলাম। যাবার আনন্দময় উৎকণ্ঠায় রাত্রে মোটে ঘুম এল না। যা' হ'ক, কোন মতে এপাশ-ওপাশ করে ৩টার সময় তৈরী হয়ে নেওয়া গেল।

শ্রীমান্—দত্ত, সোফার সেলামত ও আমি ভোর ৪টা ৫ মিনিটে কল্‌কাতা থেকে রওনা দিলাম। সঙ্গে সোফার থাকা সত্বেও, steering ধরবার লোভ সাম্‌লাতে পার্‌লাম না। শ্রীসত্ ঘোষ, হাওড়া ষ্টেসনের সুমুখের রাস্তায় আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। মোট হলাম আমরা চারজন।

ভোরের তারাগুলি তখনও অন্ধকারের ভিতর দিয়ে মিট্‌মিট্ করছে,—এমন সময়, নির্জ্জন পথের দু'পাশের ঘুমন্ত বাড়ীগুলিকে পেছনে ফেল্‌তে-ফেল্‌তে আমরা অচেনা পথের সন্ধানে ছুটেছি। পথ বহু দূর ! জানি না, পৌঁছিতে পারব কি না ! তবু চল্‌লাম, তাঁর নাম স্মরণ করে ; নিশ্চয় জানি, তিনি সহায় হবেন।

ফরসা না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ঘণ্টায় ৭।৮ মাইল হিসাবে

চল্‌লাম। একটু আলো পেতেই, গাড়ীর বেগ আরও বাড়ান গেল।

গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে গাড়ী চল্‌ছে। ২১৪ খানা গরুর গাড়ী ছাড়া, শ্রীরামপুরের এদিকে কারও সঙ্গে প্রায় দেখা হল না। গাড়োয়ানগুলি তোফা ঘুমুতে-ঘুমুতে চলেছে। অনেক হর্ণ দিয়েও তাদের ঘুম ভাঙ্গান দায় হয়ে উঠ্‌ছিল।

এই রকম ভাবে ছুটতে-ছুটতে প্রায় ৬।৩৮ মিনিটের সময় আমরা চন্দননগরে (২১ মাইল) পৌঁছিলাম। এইখানে রাস্তাটা একটু গোলমাল হবার উপক্রম হয়েছিল—সা'হক তখনই আবার ঠিক রাস্তায় এলাম।

তার পর চুঁচড়ার জুবিলি পুল ডান দিকে রেখে, রেলের পুলের নীচে দিয়ে আমরা চল্‌লাম। এখান থেকে গঙ্গার সঙ্গে লুকোচুরী আপাততঃ শেষ হ'ল। তার পর থেকেই সুন্দর বনপথের ভিতর দিয়ে গাড়ী চল্‌ল। এখানটায় রাস্তার অবস্থা কয়েক মাইল খুব ভাল। বসতি কম বলে রাস্তাটাও বেশ নিরিবিলি। প্রভাতের বুনো ঠাণ্ডা হাওয়া তখন শরীর-মন স্নিগ্ধ করে তুল্‌ছিল।

ক্রমে বড়-বড় মাঠের মাঝখান দিয়ে আমরা চলেছি। এখানকার রাস্তা মাঝারী রকমের। ৫২ মাইল-স্তম্ভের কাছে প্রথম গাড়ী থামান হ'ল। এখানে আমাদের জল-যোগের সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ীর Radiatorকেও একটু জল-যোগ করিয়ে দেওয়া গেল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে আবার গাড়ী চল্‌ল্।

মাইল ৫ আস্‌বার পর মেমারী (৫৭ মাইল) ষ্টেসনের Level Crossing পার হয়ে, বাজারের পাশে, পিছনের ডানদিকের পুরাতন টিউবটা হঠাৎ ফুটো হয়ে গেল। মিনিট ২৭র মধ্যে stepney পরিয়ে নিলাম। গাড়ী ছাড়্‌ল। কিন্তু ৬৪ মাইলের কাছাকাছি সেটাও একটা মাঠের মাঝখানে জবাব দিয়ে বস্‌ল। বন্ধুরা সকলে মিলে, জামার হাতা গুটিয়ে, মেরামতের কাজে লাগ্‌লেন। চিন্তিত হওয়া দূরে থাকুক—মনে হ'ল, তাঁরা যেন এই চান। ড্রাইভার সেলামতও আমাদের মনের মত। খুব উৎসাহী। প্রায় ৪২ মিনিটের মধ্যে—২টা চাকাতে নূতন টিউব পরিয়ে, ও সরবৎ তৈরী করে খেয়ে নিয়ে—আমরা সে জায়গা ছাড়্‌লাম।

রাঁচির পথে মোটর-সংস্কার

এবার নিরুপদ্রবে গাড়ী ছুট্‌ল, ও ৯।৪৫ মিনিটে আমরা বর্দ্ধমান (৭২ মাইল) পৌঁছিলাম। সহপাঠী বন্ধু—এখান-কার উকিল। বাড়ী খুঁজে নিতে দেরী হল না। বন্ধু বাড়ী ছিলেন না। বৈঠকখানায় গিয়ে দেখি, আমাদের প্রেরিত চিঠি সবেমাত্র এসে মালিকের অপেক্ষায় পড়ে আছে। ব্যাপার গুরুতর দেখে, আমরাই চিঠি খুলে বাড়ীর ভিতর পাঠিয়ে দিলাম—এবং বন্ধুর গৃহিণীকে বলে পাঠালাম, যে, খাওয়ার ধুমটা ফের্‌বার মুখে হবে; উপস্থিত কমের ওপর দিয়ে সেরে,

আবার ২টার মধ্যে যাতে রওনা হতে পারি, তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তার পর ডাকঘরের দিকে গেলাম—বাড়ীতে তার্ পাঠাবার জন্য। সে সময় রাজবাড়ীর এদিক ওদিক, আর বাজারটা ঘোরা হ'ল।

বন্ধু এলেন। স্নানের ব্যবস্থা নিজেরা পুকুরেই ঠিক করে রেখেছিলাম। বর্দ্ধমান বড় পুষ্করিণীর জন্য বিখ্যাত; কিন্তু তার সুনামটা ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে বিলুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছে।

শ্রীমান্—দত্ত খাস কল্‌কাতাই,—পুকুরকে বড় ভয়। ম্যালেরিয়া তো আছেই—তার ওপর সাঁতার না জানাও একটি মস্ত-বড় লুকান প্রতিবন্ধক! তাঁর স্নানের ব্যবস্থা ঘরেই হ'ল। আমরা সহপাঠীর সঙ্গে "রাণী-সায়রে" স্নান করতে গেলাম। দেখ্‌লাম, জলের অবস্থা তত সুবিধার নয়; কিন্তু আয়তন দেখে, সে অভক্তিটুক্ আপনা-হতেই লোপ পেল।

বন্ধুর সঙ্গে কতদিনের পর দেখা। খেতে বসে কত পুরাতন কথা হ'ল। বাল্যের মধুর স্মৃতিতে মনটা ভরে উঠ্‌ল!

একটু বিশ্রামের পর, বিকাল ৩।১৫ মিনিটে রাণীগঞ্জের দিকে রওনা হওয়া গেল। শ্রীমান্—দত্ত Steering-এ। পেট্রল-ট্যাঙ্ক কল্‌কাতা থেকে ভরে নেওয়া হয়েছিল—এখান থেকে আরও ২টীন নেওয়া হ'ল। দাম পড়ল কল্‌কাতার চেয়ে ৷৵০ টীন-পিছু বেশী।

মাইল ২৪ যাবার পর, পশ্চিম দিকটা ভয়ানক মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এল। দেখ্‌তে-দেখ্‌তে অন্ধকার যেন জমাট বাধ্‌ল। খুব মস্ত একটা মাঠের মাঝখান দিয়ে আমরা তখন সেই মেঘের দিকেই ছুটেছি। ঘণ্টায় ২২।২৩ মাইল হিসাবে গাড়ী ছোটান হল,—সেই পশ্চিম দিকেই;—আশা, বৃষ্টি আস্‌বার আগে যদি কোন গ্রামে পৌছিতে পারি। আমাদের অবস্থা তখন পতঙ্গের মত—আগুনের দিকেই ছুটেছি।

আর ছুটতে হ'ল না। ৯৬ মাইলের কাছে, বিষম ঝড় উঠ্‌ল। এ-রকম মাঠের মাঝে ঝড় যাঁরা খেয়েছেন, তাঁরাই বুঝতে পার্‌বেন—আমাদের তখনকার অবস্থা কি রকম। হুড্‌টা উড়ে যাবার যোগাড় হ'ল। গতিক খারাপ দেখে—ঝড়ের দিকে গাড়ীর মুখ রেখে, গাড়ী থামান হ'ল। আমরা নেমে দাঁড়ালাম।

বেলা তখন প্রায় ৪।৩৫। মুসলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল—সঙ্গে বজ্রপাত। কি বড়-বড় ফোঁটা! আমরা ৩ জনে গাড়ীর সব পর্দ্দা ফেলে, ভিতরে আশ্রয় নিলাম শ্রীযুত্—ঘোষ পাশের কুটীরের ছাঁচে গিয়ে দাঁড়ালেন।

প্রায় ২৫ মিনিট অপেক্ষা করেও যখন বৃষ্টি থাম্‌ল না, তখন শ্রীযুত্—ঘোষ এখান থেকে আস্তে-আস্তে চালাতে সুরু করলেন। বেলা ৫টা। সামনে লম্বা রাস্তা। আরও প্রায় ৩৫ মাইল যেতে হবে। সুতরাং একটু পরে, জোরে গাড়ী ছাড়া হল। কয়েক মাইল পরেই এক বনের মাঝ দিয়ে চল্‌লাম।

বাদ্‌লার ঠাণ্ডা বাতাস বনগাছের পাতাগুলি কাঁপিয়ে তুল্‌ছিল। তখন আমরা ক্রমে-ক্রমে রাণীগঞ্জের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছি। পশ্চিমদিকের ভীষণ কাল মেঘখানার যায়গায়, সাঁজের আগের সোণালী রঙ্গ আকাশটাতে ছড়িয়ে পড়েছে। পথ ভোলা দুই-একটা কাল মেঘের টুক্‌রো, এই রঙ্গের ভেতর এসে, নিজের রঙ্গটা হারিয়ে ফেলে—যেন বেগুনে হয়ে যাচ্ছে। সিক্ত, ক্লান্ত, সহরের লোক আমরা, কাছে একটা সহরের ঘর বাড়ী দেখে অনেকটা আশ্বস্ত হলাম। রাণীগঞ্জে (১২৮ মাইল) যখন পৌঁছিলাম, তখন সন্ধ্যা ৭টা।

শ্রীযুত্—ঘোষের এখানে এক বিশেষ আত্মীয়ের বাড়ী। এইখানেই রাত্রি-যাপন করা হবে। আদর-অভ্যর্থনা যথেষ্টই হ'ল। খাওয়ার আগে রেলওয়ে ষ্টেসনটায় বেড়াতে যাবার পথে দেখ্‌লাম, একটি বাড়ীতে ঝড়-জলের সময় বজ্রপাত হয়েছে। দুটা লোকের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু—তিনটার অবস্থাও শোচনীয়। তাদের হাসপাতালে পাঠান হয়েছে। নিয়তির এ কি খেলা!

রাত্রিটা কোন্‌খান দিয়ে গেল, জানি না;—শ্রীযুত্—ঘোষের ডাকে যখন ঘুম ভাঙ্গল, ভোর তখন প্রায় ৪টা।

শনিবার ১১ই জুন। ——— ভোর ৪৷৷টার সময়,—ঘোষের সারথ্যে, আবার রওনা হওয়া গেল। সকলেরই মন আনন্দে বিভোর, উৎসাহে পূর্ণ। কত নূতন ছবি চোখের সামনে ভাস্‌তে লাগ্‌ল। ছবির সে কি সৌন্দর্য্য! আলো-আঁধারের ভিতর কি তার স্নিগ্ধতা! দূরের ছোট-বড় পাহাড়গুলি স্পষ্ট হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। রাস্তা ইতিমধ্যে চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে। গাড়ী চালাতে বড় ভাল লাগে। বর্দ্ধমানের ওদিকে ও-এদিকে, মাঠের সিধে লম্বা রাস্তাতে, যেন ধৈর্য্য-চ্যুতি হয়। তবে বরাবর রাস্তা সরেশ-মাঝারী গোছের।

দেখ্‌তে-দেখ্‌তে কয়লার খনি দেখা দিল। মাঝে মাঝে Pit Head Gear, বয়লারের কাল ধোঁয়া, এঞ্জিন ও

পম্পের ফোঁস্-ফোঁসানি, সরু-সরু লাইনগুলির উপর কাল Tipping wagonগুলির শোভা যাত্রা, বেশ বিচিত্র লাগ্‌ছিল। আরও মিষ্টি লাগ্‌ছিল, এদেশীয় কুলী-রমণীদের মিহি গলার ঐকতান-সঙ্গীত।

বাঙ্গালা দেশে শ্রমজীবী বাঙ্গালী মেয়েদের রাস্তাঘাটে গান খুব অল্পই শোনা যায়। এক-আধ্ দিন যাও বা শোনা যায়, তা হিন্দুস্থানী মেয়েদের দলবাঁধা বেসুর;—কাঁদ্‌ছে কি গান গাচ্ছে বোঝা ভার!

এখানে দেখলাম, এরা সদাই আনন্দময়ী। কয়লার খাদে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে যাচ্ছে,—তবু সকলে মিলে গলা-ধরাধরি করে—কত হাসি—কত গান। কাজের ভিতর এরকম আনন্দ আমরা কবে পাব? কবে আমরা কবির সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে পার্‌ব—

"—জাগ প্রাতে আনন্দে, কর কর্ম্ম আনন্দে
সন্ধ্যায় গৃহে চল হে আনন্দ গানে।—"

যাক্, গানের কথা বেশী বল্‌ব না। সে শিক্ষা আমাদের কই? গান গাওয়াটা আমাদের বড়ই দোষের। তবে, এ দিন বরাবর থাক্‌বে না।

দেখ্‌তে-দেখ্‌তে আসানসোল পার হয়ে, বরাকরে এসে হাজির হলাম। পেট্রল নেবার ইচ্ছা ছিল আসানসোলে; কিন্তু তখনও সব দোকান বন্ধ। Verdon সাহেবের দোকান খোলা ছিল, কিন্তু পেট্রল ছিল না।

বরাকর (১৪৮ মাইল) থেকে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ছেড়ে বাঁয়ে দক্ষিণ দিকে মোড় নিতে হল। ৪ মাইল যাবার পর দেলারগড়ে দামোদর নদ পার হতে হবে। Automobile Association of Bengalএর ছাপান Hand Book and Motor Guideএ আগে জেনেছিলাম যে, এখানে নদীর উপর পুল নাই; কিন্তু এটা পুরুলিয়া যাবার খুব সোজা রাস্তা। ধানবাদ দিয়েও যাওয়া যায়,—তবে কতকটা ঘোর হয়।

যা'হক, প্রায় ৬টার সময় আমরা নদীর ধারে (১৫২ মাইল) এসে উপস্থিত হলাম। এতক্ষণে একটা মস্ত ভুভাবনা শেষ হল। দেখ্‌লাম এখানে কলিয়ারীর সাহেবরা, মোটর, নদী পার কর্‌বার জন্য, একটি ছেলে-খেলার মত পুল তৈরী করেছেন। কতকগুলা পাথর, গাছের ডাল ও বালী দিয়ে পুলটী তৈরী। বেশ সহজে নদী পার হওয়া গেল। "একা নদী বিশ ক্রোশে"র ভয় এবার কাটল।

সকালের জলযোগটা এখানেই শেষ করা হল। আমাদের সঙ্গে কি সব ব্যবস্থা ছিল, এখানে একটু বলে রাখি।

বাম-দিকের ফুটবোর্ডে একটি বাক্স। তাতে পোষাক, খাবার-দাবার, ঔষধপত্র, ও নবীন পরিব্রাজকদের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র। ডানদিকের ফুটবোর্ডে, ৫টা পেট্রল টীন, ১টা এঞ্জিন তেলের টীন, ও পিতলের কক্‌লাগান একটি পানীয় জলের ক্যান,—নারিকেল দড়ী দিয়ে বোনা—জালে মোড়াই করা।

সঙ্গে Stepney ছাড়া আরও দুটী নূতন টায়ার, ৫টী নূতন টিউব, ৩টী Sparking plug., ১টী Commutator ইত্যাদি, ও ছোট-খাট একটি কারখানার যন্ত্রপাতি। তা ছাড়া, বাল্‌তী, মগ, হারিকেন লণ্ঠন, দড়ী, কাটারী ইত্যাদি সময়ে-অসময়ে যা-যা দরকারে লাগ্‌তে পারে, তা প্রায় সবই অল্প-স্বল্পের ওপর সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। ত্রুটী কিছুই নাই,—তবে বেশী ভারি হলে টায়ার ফাট্‌বার সম্ভাবনা,—তাই ফর্দ্দ অনেক কমাতে হয়েছিল।

৬৷২৫ মিনিটে পুরুলিয়ার দিকে যাত্রা করা গেল। এখানকার দৃশ্য নূতন ভাবে আরম্ভ হচ্ছে। ছোট ছোট সাদা বালিয়াড়ীর ওপর, মাঝে-মাঝে সবুজে গাছের ঘন ঝোপ্‌গুলি,—বেশ দেখাচ্ছে। রাস্তা এবার সরেশ হতে আরম্ভ হ'ল। আকাশটাও মেঘ্‌লা—সুতরাং বেশ ঠাণ্ডা। গাড়ী হাওয়ার মত ছুট্‌ল।

১৭২ মাইলে রঘুনাথপুর পৌছিলাম। তখন সকাল ৭৷২০। একটু জলযোগ হল। ট্রেনের চেয়ে মোটরে আরও বেশী ক্ষুধা পায়। সঙ্গে খাবারও যথেষ্ট ছিল—তাই এত ঘন-ঘন ক্ষুধা। এখান থেকে পুরুলিয়ার মধ্যে ধানবাদ, আদরা ইত্যাদির রাস্তা পাওয়া যায়। শ্রীমান্—দত্ত এখান থেকে ২০ মাইল পুরুলিয়া পর্য্যন্ত চালালেন।

সকাল ৮৷৷৹টার সময় আমরা পুরুলিয়া সহরের বাইরে এক তে-মাথায় গিয়ে দাঁড়ালাম (১৯৪ মাইল)। এখান থেকে রাঁচীর দিকে এক শিধা রাস্তা চলে গিয়েছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে এঞ্জিনে তেল ঢেলে, Grease Cupএর ঢাক্‌না-গুলি কসে, টায়ার ও অন্যান্য কল-কব্জাগুলি পরীক্ষা করে—আর সহরে না ঢুকে—রাঁচীর রাস্তা ধর্‌লাম।

আমাদের প্রোগ্রামে পুরুলিয়ায় আহারাদি ও দুপুর কাটাবার কথা ছিল; কিন্তু সকাল-সকাল পৌঁছান গেল দেখে, আমরা ঝালদায় গিয়ে বিশ্রাম করব ঠিক করলাম। ঠিক ৯টার সময় এ যায়গা ছাড়া হল। আমি এখান থেকে রাঁচি (৭২ মাইল) পর্য্যন্ত চালাবার আব্দার মঞ্জুর করিয়ে নিয়ে, Steering ধরলাম।

৩০ মাইল পরে ঝালদা (২২২ মাইল)। রাস্তাটি বেশ সাদা পাথুরে; সরল—কিন্তু একটু উঁচু নীচু। প্রায় পাশ দিয়ে বি, এন, রেলওয়ের পুরুলিয়া-রাঁচি Narrow gauze লাইন; কখনও বা অদৃশ্য হয়ে দূরে চলে যায়, কখনও বা রাস্তার ধারে এসে পড়ে। এখানটা মানভূম জিলা। মাঝে ২।৪টা ছোট-বড় গ্রাম পাওয়া গেল। ভাষা মিশ্র-বাঙ্গলা।

একটানা ৩০ মাইল ছুটে, বেলা ১০৷৷০ টার সময় ঝালদা পৌঁছান গেল। তখন মেঘলার পর প্রখর রোদ দেখা দিয়েছে। এ যায়গা চাচ গালা, লোহা ও ইস্পাতের জিনিসপত্র এবং ছড়ী ও লাঠির জন্য বিখ্যাত। আমরা রেল ষ্টেসনের সামনে, গোড়া-বাধান একটি ছোট অশথ্ গাছের তলায় ডেরা নিলাম।

ষ্টেসনের বড় কর্ম্মচারী শুনলাম বাঙ্গালী। খুব আশ্বস্ত হলাম। ভাবলাম, এই মনুষ্য-বিরল পাহাড়ী দেশে তবু একজন বাঙ্গালী ভাইয়ের সঙ্গ লাভ হবে। আমরা তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য তাড়াতাড়ি তাঁর অফিসে গেলাম। পরিচয়ের গৌরচন্দ্রিকাতেই তিনি গম্ভীর ভাবে একটু হেসে, নিজের কাজে মন দিলেন। আর ঘাড় তুললেন না।

আমাদের অভাব কিছুই ছিল না—খালি প্রয়োজন ছিল বিশ্রামের জন্য একটু শীতল আশ্রয়। কিন্তু ভায়া বোধ হয় ভেবেছিলেন—আরও বেশী কিছু!

ষ্টেসনের পেছনে, কিছু দূরে, পাহাড়ের কোলে, অগণিত পদ্ম-ফোটা একটি মস্ত পুকুরের ঠাণ্ডা জলে সাঁতার ও স্নান শেষ করে—আমাদের সেই অশথ্ গাছের তলায় বন-ভোজনে বসা গেল। খেতে বসে হঠাৎ মনে পড়ল, সেদিন জামাই-ষষ্ঠী। মনের ক্ষোভে ভোজনের মাত্রাটা দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

তার পর বিশেষ-বিশেষ যায়গায় ২।৪খানি চিঠি লিখে, গাড়ীর ভিতরেই বিশ্রাম করা হচ্ছে,—এমন সময় দেখা গেল, পশ্চিম আকাশ আগের দিনের মত আবার ঘনঘটা করে আসছে। তাই দেখে আমরা তখনই বেরিয়ে পড়া স্থির করলাম। গাড়ী সেই দিকেই ছুটান গেল। ৩।৪ মাইল উর্দ্ধশ্বাসে আসবার পর দেখলাম, লাল ধূলায় দেহখানা রঙ্গিয়ে, ঝড় প্রচণ্ড বেগে আমাদের দিকে ছুটে আসছে।

অবস্থা দেখে, এক উঁচু পাহাড়ের ধারে গাড়ী দাঁড় করিয়ে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া গেল। আগে থেকে পর্দ্দা ফেলে, সঙ্গের সতরঞ্চি দিয়ে Bonnet থেকে হুড্ পর্য্যন্ত ঢেকে, গাড়ী দুর্গের ভিতর থেকে উঁকি মেরে, যেন যুদ্ধের অপেক্ষায় রইলাম।

সেলামত বলছিল গাছতলায় ঝড়ের সময় দাঁড়ান বড় বিপজ্জনক। আগের দিনের ঝড়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের বড়ই শোচনীয় অবস্থা দেখেছিলাম। আন্দাজ ৮০।৯০ বৎসরের গাছ পর্য্যন্ত গোড়া ছিঁড়ে "পপাত ধরণীতলে"। তাই তার যুক্তি খুব সঙ্গত বলে মেনে নিয়ে একটা ফাঁকা যায়গা দেখে দাঁড়িয়েছি।

অল্পক্ষণের মধ্যে ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। এত এঁটে সেঁটেও বৃষ্টির হাত থেকে ত্রাণ পাওয়া গেল না। কি ঝড়! মনে হ'ল, পাশের পাহাড়ের চূড়াটা ভেঙ্গে ঘাড়ে পড়ে' আমাদের টিকটুকু বুঝি এবার বিলুপ্ত করে দেয়।

বিদ্যুতের তীব্র আলো এক-একবার চোখগুলোকে যেন ঝলসে দিচ্ছে। বজ্রের গগনভেদী হুঙ্কার সুপ্ত গিরিপুঞ্জকে যেন নির্ম্মম ভাবে জাগিয়ে তুলছিল। তার প্রতিধ্বনি ঘুরে-ফিরে, কোথায় লুকোবে—ঠিক করে উঠতে পারছিল না।

আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি পড়ছে। এখনও প্রায় ৬০ মাইল এই নীরব, নির্জ্জন, পাহাড়ের জঙ্গলে রাস্তা ভেঙ্গে যেতে হবে। সুমুখে অন্ধকার রাত। বাঘের ভয়ও খুব আছে এই জঙ্গলে। ক্রমে দূরের পাহাড়গুলো যেন অস্পষ্ট হয়ে পড়তে লাগল,—বৃষ্টিতে সাদা চারিদিক খালি সাদা।

এদিকে ঝড় আমাদের গাড়ীর সঙ্গে লড়াই সুরু করলে। মনে হ'ল, যেন বলছে—"এ সুন্দর রাজ্যে তোমাদের আর এগুতে দেব না"। বিজলী যেন তার কথায় সায় দিচ্ছে—তীব্র হাস্যে। স্বভাবের এই বিচিত্রতা কি কঠোর মধুর লাগছিল তখন।

দেরী করে সুবিধা নেই দেখে, সেই পিছল রাস্তা দিয়েই খুব সাবধানে আস্তে-আস্তে গাড়ী ছাড়া হ'ল। এবার আঁকা-বাঁকা রাস্তা আরম্ভ হয়েছে—পাহাড়ের গা দিয়ে।

১০।১৫ মাইল এই রকম ভাবে চলতে চলতে, একটি

ছোট-খাট হাটের মধ্যে আমাদের গাড়ী এসে পড়্‌ল। হঠাৎ বৃষ্টিতে হাট ভেঙ্গে গিয়েছে। পুরুষ, স্ত্রীলোক, ছেলে, মেয়ে, যে যেখানে পেরেছে, কোনমতে মাথাটুকু বাঁচিয়ে, সেই বৃষ্টিতে অসহায় অবস্থায় ভিজ্‌ছে। হাটের পাশে কয়েকটা মাত্র খোলার চালের ঘর ;—তারই ছাঁচে ঘেঁসাঘেঁসি করে এক'শ দেড়'শ জন। তাদের অবস্থা দেখে মনটা যেন ভিজে গেল। আমাদের সেখান দিয়ে সেই বাদ্‌লার সময় যেতে দেখে, একটু নূতনত্ব অনুভব করে, চাপাসুর তাদের অনেকে আনন্দধ্বনি করে উঠ্‌ল।

ক্রমে উপরের পাহাড়ের জল, রাস্তা ভাসিয়ে দিলে। রাস্তা ও তার পাশের গভীর খাদ চিনে ওঠা ভার হ'ল। সব লাল জলে ভরা; নদীর স্রোতের মত হু হু শব্দে গড়িয়ে চলেছে। আরও সাবধানে, ভগবানের নাম করতে-করতে এগুতে লাগলাম।

এবার একটা পুল সামনে; দুটী খুব উঁচু পাহাড়কে সংযুক্ত করেছে। শুনেছিলাম, বৃষ্টির সময় পাহাড়ের এই পুলগুলির অবস্থা বড় বিপজ্জনক হয়।

যাহ'ক, সামনে যতটা পারা যায় দেখে নিয়ে, অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে, পুলের উপর উঠে পড়্‌লাম। কিন্তু—এ কি! পুলটী কম খরচায় খুব হাল্‌কা রকমের তৈরী। নীচে আন্দাজ ১" পুরু কাঠের তক্তা বিছান; চাকা চল্‌বার পথে, বরাবর প্রায় ৮" চওড়া লোহার প্লেট মারা। পাশের রেলিংএর উচ্চতা মোটরের Mudguardএর সমান হবে কি না সন্দেহ—তাও সরু খুঁটির উপর। যদি বৃষ্টির জলে চাকা Slip করে একটু পাশের দিকে যায়, তখন তাকে আটকাবার শক্তি সে বেড়ার নাই।

গাড়ী থেকে নীচে চেয়ে দেখ্‌লাম,—প্রায় কয়েক'শ ফিট নীচে দিয়ে সুবর্ণরেখার লাল জল ভীষণ বেগে ছুটেছে। গা শিউরে উঠ্‌ল! ঝড়-বৃষ্টির সময় মোটর যাতায়াতের পক্ষে পুলটী খুবই অনুপযুক্ত বলে মনে হয়। যা' হক, অতি সাবধানে, ধীরে-ধীরে পুলটী পার হয়ে, ওপারে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে আবার চল্‌লাম।

এবার খুব শক্ত-শক্ত বাঁক আরম্ভ হ'ল। এই দুর্গম রাস্তাতেও স্বভাবের নব-নব সৌন্দর্য্য আমাদের মনকে যেন কোথায় ডুবিয়ে দিচ্ছিল।

পাহাড়ী দেশের ঠাণ্ডা পাগ্‌লা হাওয়া, আমাদের সিক্ত বসনগুলিকে উড়িয়ে, শ্রান্ত দেহগুলিকে কাঁপিয়ে, বন হতে বনান্তরে ছুটে যাচ্ছিল। সঙ্গে একটু-আধটু বনফুলের সৌরভ—আর ২।৪ ফোঁটা বৃষ্টির কণা—উড়িয়ে এনে দিচ্ছিল আমাদের কাছে। বাদ্‌লার দিনে নীরব অরণ্যের সে মাধুরী বুঝি কখনও ভুলতে পারব না।

এখন বৃষ্টি ধরে এসেছে। আমরা ক্রমে ক্রমে 'খুলীন', 'কিটা' পার হয়ে 'জোনায়' এসে পৌঁছিলাম। কল্‌কাতা থেকে 'জোনা' (২৪৬½ মাইল)। সমুদ্র থেকে প্রায় ১৫০০ ফিটের উপর উঁচুতে আমরা উঠেছি। আরও ৫০০ ফিট উঁচু হচ্ছে রাঁচি।

এতক্ষণ রেল-লাইন প্রায় কাছাকাছি যাচ্ছিল; 'জোনার' পর থেকে অনেক দূর পর্য্যন্ত আর দেখ্‌তে পাওয়া গেল না। ক্রমে রাস্তা বেশ সহজ ও সুন্দর হতে আরম্ভ হ'ল। দুধারে সারি-সারি গাছ,—মাঝ দিয়ে সিধে সাদা রাস্তা।

'আনগারা' এল (২৫৪¾ মাইল)। এখানে হুনড্রু জল-প্রপাতে যাবার রাস্তা পাওয়া যায়। প্রায় ১৭½ মাইল এখান হতে। ক্রমে ২৬৫½ মাইলের কাছে আবার সুবর্ণ-রেখা পার হতে হ'ল। এটী পাকা খিলানকরা পুল। 'টাটিশিলায়' আবার রেললাইনের সঙ্গে দেখা হ'ল।

সন্ধ্যা ৫টা। এবার রাঁচির ঘরবাড়ীগুলি, রঙ্গমঞ্চের পটে আঁকা—মনোরম দৃশ্যের মত দেখাচ্ছে। আর মেঘ্‌লা সন্ধ্যা-আকাশের সুদূর প্রান্তে ঘন গাছের সবজে রেখার মাঝে বাড়ীগুলি যেন ২।৪টী লাল সাদা রংএর তুলির ছোব।

আজ ভোরে রাণীগঞ্জ, আসানসোল ইত্যাদি ছাড়বার পর অনবরত মাঠ, বন, জঙ্গল, পাহাড়ের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছে যে, তাদের ছেড়ে সহরে ঢুকতে প্রাণ চাইছে না।

এতক্ষণ বেশ এক নেশায় ডুবে ছিলাম—ক্রমে যেন নেশা ছুটে এল। তবু এ যায়গার সঙ্গে আমাদের ওদিককার অনেক তফাৎ। সহরটী বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন,—ধূলা নেই বল্‌লেই হয়। রাস্তাঘাটগুলি মনের মত—গোলমাল ঢের কম—হাওয়াটীও একটু নূতন রকমের মিষ্টি!

আষাঢ় মাস। সেখানে এখনও কোকিলের ডাক প্রেমিকদের প্রাণে নব-নব ভাব জাগিয়ে তুলছে—

বিরহিণীদের অকূল পাথারে ভাসিয়ে ব্যাকুল করছে—নূতন কবিদের কবিত্বের খোরাক যোগাচ্ছে।

ষ্টেসনের একটু দূর দিয়ে, ক্লাবের ডানপাশের মোড ঘুরে, শীর্ণ দোরণ্ডা নদীর কাঠের পুল পার হয়ে—আমরা প্রথমেই রাঁচি সেক্রেটারিয়েট, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিসে গিয়ে—৩জনের বাড়ীতে ৩খানি জরুরী তার পাঠালাম। না জানি, তাঁরা আমাদের এই অজানা ভয়াবহ পথে ছেড়ে দিয়ে কতই চিন্তিত রয়েছেন—এ দু'দিন। তার পর, ৫॥০টার সময় আমরা যাঁদের বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম, তাঁরা আমাদের মধ্যে একজনের আত্মীয়—শুধু আত্মীয় বলি কেন—পরমাত্মীয়।

মোটের ওপর এই ২৭০ মাইল আমরা প্রায় ১৭ ঘণ্টায় এসেছি। বর্দ্ধমানে ও ঝালদায় বিশ্রাম, ও রাণীগঞ্জে রাত্রি-যাপন নিয়ে—আমাদের মোট প্রায় ৩৭ ঘণ্টা লেগেছে।

এবার এইস্থানেই বিশ্রাম; বারান্তরে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা বল্‌বার ইচ্ছা রহিল—যদি—

ইঙ্গিত

[শ্রীবিশ্বকর্ম্মা]

কয়েক দিন হইল, আমি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ * মহাশয়ের বেঙ্গল স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কোম্পানীর কারখানা দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, আজ তাহার একটুখানি পরিচয় দিব। ঘোষ মহাশয় নানা রকম বোতাম প্রস্তুত করিবার কল তৈয়ার করিয়াছেন। এই কল তাঁহার কারখানায় তৈয়ার হইতেছে, এবং অনেক যায়গায় ব্যবহৃতও হইতেছে। এই কলের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আজ আমি ইঙ্গিতের পাঠকগণের গোচর করিতেছি, এবং কলগুলির কয়েকখানি ছবিও ছাপিতেছি। কলের বিবরণ আপনারা উপেনবাবুর নিজের মুখেই শ্রবণ করুন।

"আমাদের এক সেট মেসিনে দৈনিক ২৫ গ্রোস বোতাম তৈয়ার হইতে পারে। কলের মূল্য প্রতিসেট—১৪৮০৲। প্রত্যেক সেট মেসিনের বিশেষ বিবরণ ও চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(I)	সইং এণ্ড স্ক্রাচিং মেসিন (করাত এবং শিং পরিষ্কারক যন্ত্র)	„	৪৫০৲
(II)	পিয়ারসিং বা কাটিং আউট মেসিন	মূল্য	২৮০৲
(III)	সেপিং মেসিন	„	৩০০৲
(IV)	ড্রিলিং মেসিন	„	২৫০৲
(V)	পলিশিং ড্রাম্ (বোতাম পালিশ করিবার কাঠের বাক্স)	„	১০০৲
(VI)	পলিশিং মেসিন বা বোতাম পালিশ করিবার কল, (বড় সাইজ)	„	৬৫৲
	পলিশিং মেসিন বা বোতাম পালিশ করিবার কল, (ছোট সাইজ)	„	৩৫৲
		মোট	১৪৮০৲

* প্রসঙ্গক্রমে এইখানে একটু অবান্তর কথা বলিয়া লইতে চাই। প্রথম স্বদেশীর সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার পালিত মহাশয়ের টাকায় যে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট স্থাপিত হইয়াছিল, উপেনবাবু সেই বিদ্যালয়ের ছাত্র। তখন স্বদেশীর পূর্ণ প্রভাব—লোকের উৎসাহের সীমা নাই,—বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থাও বেশ সচ্ছল। এই সময়ে এই বিদ্যালয়ে যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করেন, উপেনবাবু তাঁহাদের অন্যতম। ইঁহারা ইন্‌ষ্টিটিউটে যেরূপ ফল পাইয়াছেন, তাহা ভালই বলিতে হইবে। আজ আমি উপেনবাবুর একটুখানি কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছি; অদূর-ভবিষ্যতে বেঙ্গল-টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের আরও দুই একজন কৃতী ছাত্রের পরিচয় দিবার আশা রাখি। ইন্‌ষ্টিটিউটের এখনকার অবস্থা কিরূপ তাহা আমি ঠিক জানি না। তবে এক সময়ে যে এখানে ভাল কাজ হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই। ইন্‌ষ্টিটিউটের ঐ সময়কার পাশ করা ছাত্রদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান লইলে পাঠকেরা তাহা জানিতে পারিবেন। বহু অর্থব্যয় করিয়া যাঁহারা বিদেশ হইতে নানা বিদ্যা শিখিয়া আসিতেছেন, বেঙ্গল টেকনিক্যাল্ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রগণের শিক্ষা তদপেক্ষা বড়-বেশী কম হয় নাই, ইহাই আমার ধারণা।

(I) সইং এণ্ড স্ক্র্যাচিং মেসিন (করাত এবং শিং পরিষ্কার যন্ত্র)

(II) পিয়ারসিং বা কাটিং আউট মেসিন

(III) সেপিং মেসিন
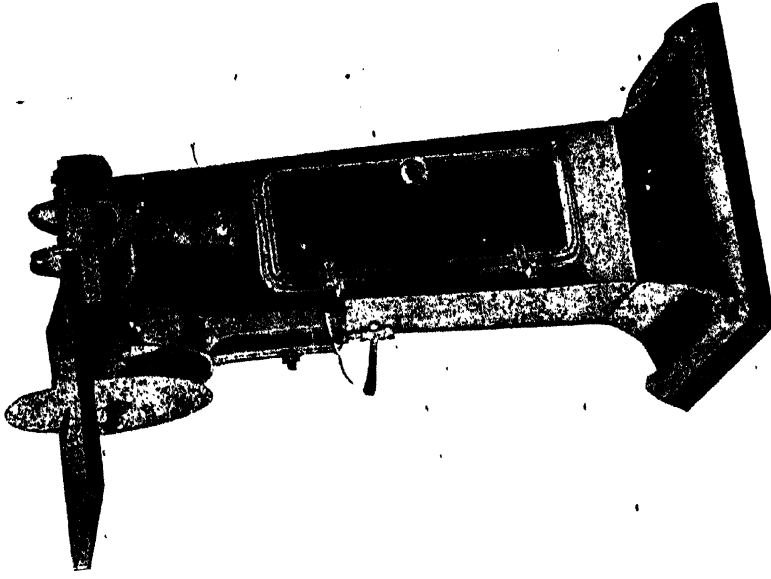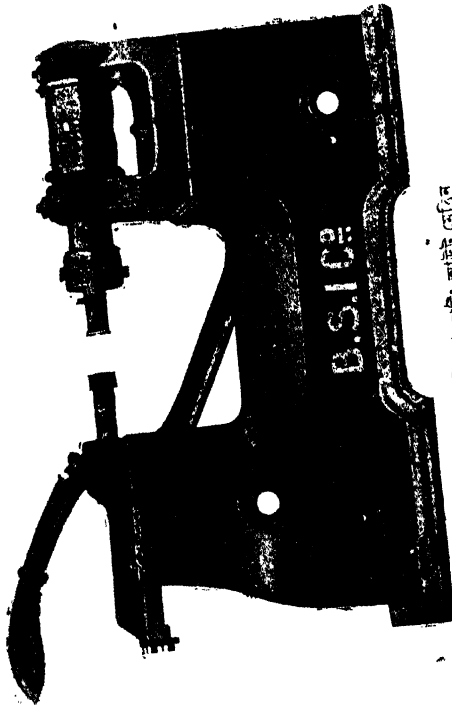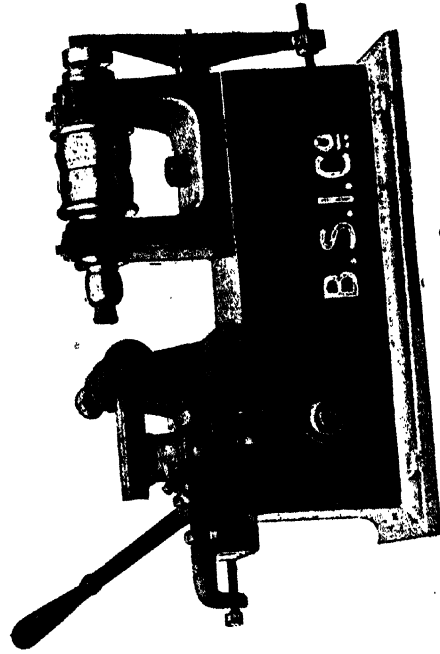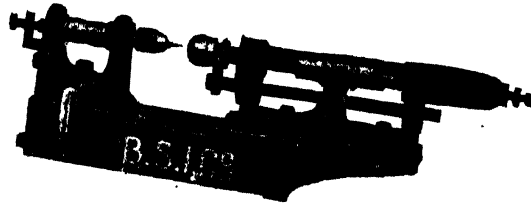
(IV) ড্রিলিং মেসিন
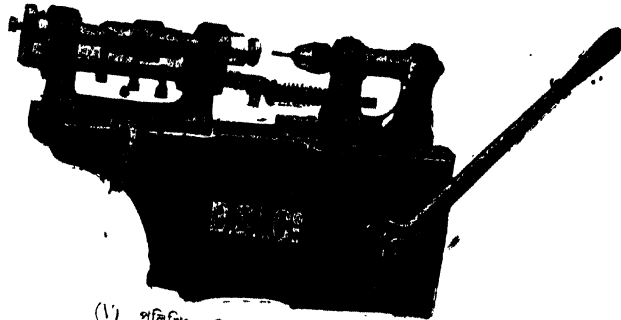
(V) পলিশিং মেসিন (বোতাম পালিশ করিবার কল)
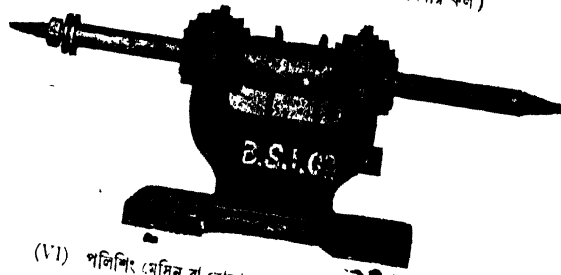
(VI) পলিশিং মেসিন বা বোতাম পালিশ করিবার কল (ছোট সাইজ)

শিংএর বোতাম প্রস্তুত করিবার প্রণালী—

মহিষের শিং বা গরুর শিং ৫।৭ দিন জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে শিংএর অগ্রভাগ অর্থাৎ নিরেট অংশ করাত-মেশনে কাটিতে হইবে। তৎপরে ফাঁপা অংশে যে অসমান ভাব থাকিবে, তাহা স্ক্র্যাচিং কলে সমান করিয়া লইতে হইবে। ঐ ফাঁপা অংশটী ৩।৪টী চাকা করিয়া কাটিয়া লইয়া প্রত্যেকটী একপার্শ্বে চিরিয়া, কাঠ-কয়লার আগুন করিয়া তাহার উপর একটু তেল মাখাইয়া, সেঁকিয়া লইলে অনেকটা রবারের মত হইবে। তাহার পর চেরা মুখের দুই পাশে দুইটী সাঁড়াশী দিয়া ধরিয়া চাড় দিলে লম্বা ছোট তক্তার মত হইবে। উহা প্রেস মেসিনে চাপ দিয়া রাখিয়া একটু ঠাণ্ডা হইলে বাহির করিলে, সেইরূপ আকারই থাকিবে। ইহাকে শিংএর সিট্ বলা যায়। ঐ প্রকার শিংএর সিট্ বোতাম তৈয়ারি করিবার পূর্ব্বে গ্রীষ্মকালে ৫।৭ দিবস এবং শীতকালে ১৪।১৫ দিন জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। ঐ ভিজান শিং পুনরায় স্ক্র্যাচিং বা চাঁচিবার মেসিনে চাঁচিয়া মোটামুটি সমান করিয়া লইতে হইবে। পরে পিয়ার্সিং বা কাটিং আউট মেসিনে ঐ শিংএর সিট কাটিয়া লইলে, বোতামের তলভাগ পরিষ্কৃত হইয়া গোল চাক্তি বাহির হইবে। ঐ চাক্তি সেপিং মেসিনের হোল্ডারে আবদ্ধ করিয়া বোতামের সম্মুখ ভাগের যে প্রকার আকৃতি হইবে, তদনুযায়ী ছুরির দ্বারা কাটিয়া লইতে হইবে। পরে ড্রিলিং মেসিনে ছিদ্র করিতে হইবে। এই প্রণালীতে ৩০।৪০ গ্রোস বোতাম তৈয়ারি হইলে, ড্রামের ভিতর করাতের গুঁড়া সহ বোতাম-গুলি পুরিয়া প্রায় ১৫ দিনকাল কলে ঘুরাইতে হইবে।

তাহার পর ঐ বোতামগুলি ড্রাম হইতে বাহির করিয়া ধুইয়া এবং প্রয়োজন হইলে রং করিয়া, পুনরায় আর একটী Finishing Drumএ বোতামের পালিশের মসলা সহ কাঠের গুঁড়া দিয়া ৪।৫ দিন ঘুরাইয়া তাহা বাহির করিলে, বাজার চলন বোতাম বাহির হইবে। যদি বেশী চকচকে দরকার হয়, তবে, Polishing Latheএ কাপড়ের বফে পালিশ মসলা দ্বারা পালিশ করিতে হইবে।

যদি খুব বড় কারখানা করা যায়, এবং বেশী পরিমাণে বোতাম প্রস্তুত করিতে হয়, তবে নিম্নলিখিত উপায়ে শিংএর সিট প্রস্তুত করিলে সস্তায় এবং সহজে হইবে। এ ক্ষেত্রে ষ্টিমের দরকার।

প্রথমতঃ শিংগুলিকে জলে না ভিজাইয়া, ষ্টিম দ্বারা ১৫।২০ মিনিট সিদ্ধ করিয়া, উপরিউক্ত প্রণালীতে চাঁচিয়া ডগা কাটিয়া ফাঁপা অংশ চাকা করিয়া কাটিয়া, ও আধা-আধি চিরিয়া পুনরায় ষ্টিমে সেই টুক্‌রাগুলি অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিলে, প্রায় নরম রবারের মত হইবে। তৎপর কয়েকখানা ১২"×১" লোহার প্লেট গরম করিয়া তাহার উপর চাপাইবে। এই প্রকারে ৩।৪ থাক সাজাইয়া, খুব বড় প্রেস মেসিনে চাপিলে, শিংএর টুক্‌রাগুলি সব সমান পুরু হইয়া সহজে বাড়িয়া যাইবে। এই সিট Piercing or Cutting out Machineএ কাটিবার পূর্ব্বে, চাঁচিবার দরকার হইবে না; তবে একটু Steamএ সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। ইহাতে কার্য্যের সুবিধা হইবে।

এই বোতাম তৈয়ারী কার্য্যে কি প্রকার লাভ হইবার সম্ভাবনা নিম্নে দেওয়া গেল।—

১/ এক মণ শিংএর মূল্য ১০৲ হইতে ১২৲; এবং প্রতিমণে ৩০ লাইন বোতাম ৩০ গ্রোস হইতে পারে।

উপরিউক্ত প্রণালীতে শিংকে সিট করিতে প্রতি মণে ৬৲ হইতে ৮৲ টাকা পর্য্যন্ত মজুরী লাগে।

প্রতি গ্রোস ৩০ লাইন বোতামে ॥৵১০ করিয়া (সিট করা পর্য্যন্ত) লাগে। তাহার পর—Punching Machineএ প্রত্যেক দিনে ২৫ গ্রোস বোতাম punch হইবে। লোকের মাহিনা ॥৵০ হইতে ৸০ রোজ। Shaping মেসিন-এ প্রত্যহ ২৫ গ্রোস বোতাম Shape হইবে। লোকের মাহিনা ॥৵০ হইতে ৸০ রোজ। Drilling Machineএ প্রতিদিন ২৫ গ্রোস বোতাম ছিদ্র হইবে। লোকের মজুরী (ছোকরা) ।৵০ রোজ। একজন মিস্ত্রী কারখানা দেখিবার জন্য ১৲ রোজ। মালপত্র জোগাইবার জন্য ২।৩টী ছোকরার দরকার; প্রত্যেক ছোকরার ।৵০ রোজ। পালিশ করিবার মসলা ২৫ গ্রোস বোতামে ১৲ লাগিবে। যদি বফে পালিশ করা দরকার হয়, তবে (২টী পালিশ-মেসিনে) ৪জন ছোকরার দরকার। রোজ প্রত্যেক ছোকরা ।৵০ হিঃ। কার্ডে গাঁথাই মজুরী প্রতি গ্রোসে ৵১০। কার্ডের এবং বাক্সের দাম প্রতি গ্রোসে ⁄১০।

দৈনিক মোট খরচের তালিকা।—

২৫ গ্রোস সিট করা পর্য্যন্ত খরচা

প্রতি গ্রোস ॥৵১০ হিঃ	১৬৸১০
Punching মেসিনের লোকের রোজ	৸০
Shaping " " "	৸০
Drilling " " "	।৵০
Mistry " " "	১৲
Polishing ছোকরা ৪ জন ।৵০ হিঃ	১।০
যোগান দিবার ছোকরা ৩ জন ।৵০ হিঃ	১৵০
কার্ডের গাঁথাই খরচ	৸১০
বাক্স এবং কার্ডের দাম	২।⁄১০
পালিশ মসলা	১৲
Power খরচ প্রত্যহ	২৲
Establishment খরচ ইত্যাদি	২॥০
মোট খরচ	৩০॥১০

২৫ গ্রোস বোতামের দাম প্রতি গ্রোস ২।০ হিঃ ৫৬।০

বাদ খরচ	৩০॥০
মোটামুটি লাভ	২৫৸০ অর্থাৎ

শতকরা ৮৭॥০।

প্রতি দিন ২৫ গ্রোস বোতাম তৈয়ারী করিতে হইলে এক

সেট বোতাম কল লাগিবে মূল্য	১৪৮০৲
মুফঃস্বলে কল চালাইলে একটি Oil Engine লাগিবে	৮০০৲
কারখানা ফিট করিবার খরচা	৪০০৲
Working Capital (বোতাম ২ মাস মধ্যে বিক্রয় হইলে)	২০০০৲
	৪৬৮০৲

৫০০০৲ টাকা মূলধন হইলে বেশ কাজ চলিতে পারে।

"নাটে"র বোতাম।

বাজারে ইটালি হইতে যত বোতাম আনীত হয়, উহা—ব্রাজিলে এক প্রকার সুপারি জাতীয় ফল হয়,—তাহা হইতে প্রস্তুত হয়। ঐ ফলের মূল্য প্রতি পাউণ্ড ॥০৴ হইতে ॥৵০ পড়ে (আমরা একবার আনাইয়া দেখিয়াছি); এবং এক পাউণ্ডে এক গ্রোসের বেশী ভাল বোতাম তৈয়ারী হয় না। উক্ত প্রকার নাটের মত কোন দ্রব্য আমাদের দেশে আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য বহুদিন বিশেষ চেষ্টা ও পরীক্ষা করিয়া, আমরা জানিয়াছি, আমাদের দেশে তাল আঁটীর সাদা নারিকেলের মত অংশ হইতে নাট অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট বোতাম হইবে না; এবং তাহার মূল্য প্রতি পাউণ্ড ৴১০ দুই পয়সা হইতে অধিক নহে; এবং তাহা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। এত দিন উহা আমাদের দেশে জ্বালানী ছাড়া কোন প্রকার দরকারে লাগে নাই। আমাদের বিশ্বাস, উহা হইতে বোতাম তৈয়ারী করিলে, পৃথিবীর কোন দেশ আমাদের সহিত বোতামের দাম এবং গুণের অনুপাতে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে না। তাল আঁটীর সময় মাত্র ২।৩ মাস। সেই সময়ে ঐ গুলি যোগাড় করিয়া কি প্রকারে রাখিতে হয়, আমাদের নিকট লিখিলে আমরা জানাইব।

এই বোতাম শিংএর বোতাম তৈয়ারীর প্রণালী অনুযায়ী প্রস্তুত হয়। কেবল Scratching কলের দরকার হয় না।

২৫ গ্রোস বোতামের উপযোগী আঁটি	১।৵০
মজুরী (শিংএর বোতামের অনুপাতে)	১৪৵০
	১৫।৶০

প্রতি গ্রোস ন্যূন পক্ষে ১৲ করিয়া বিক্রয় করিলে ২৫৲। বর্ত্তমান ইটালির বোতামের দাম প্রতি গ্রোস ১৷০ হইতে ৩৲ পর্য্যন্ত।

ঝিনুকের বোতাম।

ঝিনুকের বোতামও এই মেসিনে তৈয়ারি হইবে; কিন্তু খরচ ঢাকার তৈয়ারী বোতাম অপেক্ষা একটু বেশী পড়িবে। তবে বোতামের Finish ভাল হইবে।

নারিকেল মালার, হাতীর দাঁতের, হরিণের শিংয়ের, এবং হাড়ের বোতামও এই মেসিনে তৈয়ারী হইতে পারে। চেষ্টা এবং অনুসন্ধান করিলে, এমন আরও অনেক জিনিস বাহির হইতে পারে, যাহা এখন শুধুই নষ্ট হইয়া যাইতেছে;—সে-গুলিকে যদি বোতাম তৈয়ারীর উপযোগী করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে—মন্দ কি?

পায়ে চালান বোতাম তৈয়ারী করিবার মেসিনের বিবরণ, দরকার হইলে, আমরা পরে দিব।"

ইঙ্গিতের যে সকল পাঠক আমার সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই কারবারে ৫০০০ টাকা মূলধন বিনিয়োগ করিবার সামর্থ্য আছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ-কেহ এই ব্যবসায়টি পছন্দ করিতে পারেন। যদি কাহারও ইচ্ছা হয়, অথচ সামর্থ্যে না কুলায়, তবে দুই-তিন জন বন্ধু মিলিয়াও করিতে পারেন। যাঁহারা বোতামের কারখানা স্থাপন করিতে চান, তাঁহাদের অন্য যাহা কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিবে, তাহা তাঁহারা ৯১ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, দর্জিপাড়া, কলিকাতা, এই ঠিকানায় উপেনবাবুকে পত্র লিখিয়া বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে পারিবেন।

বোতামের যে কয়টি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা ছাড়া, এখনও আরও অনেক কারখানা স্থাপিত হইলে তবে দেশের বোতামের অভাব দূর হইতে পারিবে। সুতরাং এই ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল।

গত আষাঢ় মাসে লিথার্জ্জ ও মেটে সিঁদুর প্রস্তুত করিবার ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। Analytical and Technological Chemist, Chemist-in-charge and Manager, The Punjab Chemical Works, Shahdara, Lahore,—Mr. A. T. Dutta B. Sc., মহাশয় লিথার্জ্জ ও মেটে সিঁদুর প্রস্তুত করিবার আর একটী সহজ প্রণালী আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। সেটিও পাঠকেরা জানিয়া রাখুন।

১ম। Massicot—বা Lead monoxide Pb-O ইহার বর্ণ পীত।

২য়। Litharge বা Lead monoxide বা সীসকাম্ল PbO। ইহা massicot এর রূপান্তর মাত্র। Massicotকে প্রচুর তাপে উত্তপ্ত করিলে লিথার্জ্জ প্রস্তুত হয়। ইহার বর্ণ অনেকটা কমলালেবুর ন্যায়।

৩য়। Red Lead বা Minim বা মেটে সিন্দুর Pb_3O_4। লিথার্জ্জকে সতর্কতার সহিত সেণ্টিগ্রেডের

৪৫০ হইতে ৪৮০ ডিগ্রী তাপে বায়ু সংযোগে প্রায় ৪৮ ঘণ্টাকাল উত্তপ্ত করিলে মেটে সিন্দুর প্রস্তুত হয়। ইহার বর্ণ উজ্জ্বল লোহিত।

৪র্থ। Lead Suboxide বা দ্বিসীসকাম্ল (Pb_2O); ইহার বর্ণ কাল।

৫ম। Lead dioxide; Brown lead oxide বা সীসকদ্বাম্ল PbO_2। মেটে সিন্দুরের সহিত সোরা বা যবক্ষার-দ্রাবক মিশাইলে এই অক্সাইড পাওয়া যায়। ইহার বর্ণ বাদামী।

প্রায় দুই বৎসরাবধি আমি লিথার্জ্জ ও মেটে সিন্দুর প্রস্তুত করিতেছি। বিবিধ পন্থা অবলম্বন করিয়া আমি যে প্রণালীতে অতি সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে লিথার্জ্জ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। আশা করি কেহ, এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন। কাহারও প্রয়োজন হইলে আমি লিথার্জ্জ ও মেটে সিন্দুরের নমুনা পাঠাইতে পারি।

"লিথার্জ্জ বা সীসকাম্ল।"

একটা বেশ মজবুত লোহার কড়ায় (মোটা চাদরের পেটা কড়া হইলে ভাল হয়) সীসা রাখিয়া ঐ সীসা সমেত কড়াখানি বেশ গন্‌গনে আগুনের উপর চাপাইয়া দিন। কড়া বেশ উত্তপ্ত হইলে, সীসা গলিতে থাকিবে। যখন সমস্ত সীসা গলিয়া তরল হইবে, তখন উহাতে অল্প-অল্প করিয়া বেশ শুষ্ক বিলাতি (Sodium Nitrate বা Chille Saltpetre) অথবা দেশী (Potassium Nitrate বা কলমী) সোরা ছড়াইয়া দিন; এবং সঙ্গে-সঙ্গে খুন্তি দিয়া উত্তম রূপে নাড়াচাড়া করুন। এই প্রকারে সোরা হইতে কিয়দংশ অম্লজান সীসার সহিত মিশিয়া, ডিম্বের কুসুমের ন্যায় বর্ণের সীসকাম্লে পরিণত হইয়া, গলিত সীসার উপর ভাসিতে থাকিবে। যখন সমস্ত সীসা অম্লজানযুক্ত হইবে (সমস্ত সীসা অম্লজানযুক্ত হয় না; কিয়দংশ অবিকৃত থাকে) তখন উহা কড়ায় জমাট বাঁধিবে। এই অবস্থায় কড়াখানি নামাইয়া রাখুন। পরে ঠাণ্ডা হইলে উহাতে পরিষ্কার জল ঢালিয়া দিয়া কয়েক ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখুন। এখন ঐ জলে সমস্ত চাপটা গুলিয়া ফেলুন ও Elutriation Process দ্বারা উহা হইতে অক্সাইড অব লেড পৃথক্ করুন। Elutriation Processটা কি, একটু বুঝিয়ে বলতে হবে। একটা ৪০ গ্যালন লোহার টবের উপর হ'তে তিন ইঞ্চি নীচে একটা এক ইঞ্চি ছিদ্র করুন, এবং সেই ছিদ্রপথে একটা (Bend pipe) বাঁকা নল জুড়িয়া দিন, যেন নলের মুখ বাহিরে নীচের দিকে থাকে। এখন এই নলের মুখের নীচে আর একটা বালতী রাখুন। সীসার অক্সাইড সমেত জলটি প্রথমোক্ত টবে ঢালিয়া দিন ও টবটী জলে পূর্ণ করুন। পরে একটা যষ্টি দ্বারা টবের জল খুব আলোড়িত করুন এবং উপর হইতে আরও জল ঢালিয়া দিন। এইরূপ করিলে লেড অক্সাইড জলে ভাসিবে ও পাইপের মধ্য দিয়া দ্বিতীয় টবে গিয়া পড়িবে। আর যে সীসা অক্সাইডে পরিবর্ত্তিত হয় নাই, তাহা প্রথম টবের নীচে পড়িয়া থাকিবে। যখন প্রায় সমুদায় অক্সাইড দ্বিতীয় টবে আসিয়া পড়িবে, তখন দ্বিতীয় টবের জল যেন আর নাড়াচাড়া করা না হয়। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সমস্ত অক্সাইড অব লেড দ্বিতীয় টবের তলায় থিতাইয়া পড়িবে। এখন জলটা উপর হইতে আস্তে-আস্তে ঢালিয়া পৃথক্ পাত্রে রাখুন। এ জলটা আমরা ফেলিব না। ইহা হইতে আর একটা বেশ দামী জিনিস পাওয়া যাইবে। এক্ষণে বালতীর তলায় লেড অক্সাইডটি কোনও মোটা কাপড়ের উপর রাখিয়া জল ঝরাইয়া লউন এবং আরও ২।১ বার পরিষ্কার জল দিয়া ধুইয়া ফেলুন। এখন উহা শুকাইতে হইবে। শুকাইয়া গেলে পুনরায় একটা পরিষ্কার লোহার কড়ায় রাখিয়া খুব গরম করিতে হইবে। গরম করিতে-করিতে উহার রং কমলালেবুর ন্যায় হইবে। এই অবস্থায় কড়াখানি নামাইতে হইবে। এখন লিথার্জ্জ প্রস্তুত হইল। ইহাকে মেটে সিন্দুরে পরিবর্ত্তিত করিতে গেলে, একটী লোহার কড়ায় করিয়া অতি সাবধানে সেন্টিগ্রেডের ৪৫০ হইতে ৪৮০ ডিগ্রী তাপে প্রায় ৪০ হইতে ৪৮ ঘণ্টা কাল গরম করিতে হইবে। তাপের কম-বেশীতে মেটে সিন্দুরের বর্ণের প্রভেদ দেখা যায়।

এখন দেখা যাক্, লেড-অক্সাইড-ধোয়া জলটা কি কাজে লাগে। ঐ জলটা জ্বাল দিয়া খুব গাঢ় করিয়া, কোনও পাত্রে রাখিলে বেশ সরু-সরু দানা জমে। এ দানাগুলি হচ্ছে নাইট্রাইট (Nitrite)। যদি বিলাতি সোরা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে আমরা Sodium Nitrite পাইব; আর

যদি কলমী সোরা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে Potassium Nitrite পাইব। এই দুইটী জিনিসেরই দর খুব বেশী। প্রথমটীর দর প্রায় ২।০-৩৲ টাকা পাউণ্ড; আর দ্বিতীয়টীর প্রায় ৩।৪ টাকা পাউণ্ড; অর্থাৎ সোরার দরের প্রায় দশ গুণ দরে বিক্রয় হয়। কিন্তু জিনিসটী বিশুদ্ধ না হইলে (chemically pure) অত দর পাওয়া যায় না। সুতরাং ঐ দানাগুলি পরিস্রুত জলে গলাইয়া কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া পুনরায় দানা জমাইতে হইবে। এইরূপে ২।৩ বার গলাইয়া দানা জমাইলে (chemically pure) বিশুদ্ধ Soda বা Potash Nitrite পাওয়া যাইবে। তুলা ও রেশমাদি রং করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এক সের সীসাকে অক্সাইডে পরিণত করিতে, প্রায় দেড় পাউণ্ড সোরা লাগে। এই দেড় পাউণ্ড সোরা হইতে এক পাউণ্ডের কিছু বেশী নাইট্রাইট পাওয়া যায়। সুতরাং, যদি Sodium অথবা Potassium Nitrite প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা যায়, তাহা হইলে Litharge টা এক প্রকার বিনা খরচায় পাওয়া যায়।

চন্দননগর সাধারণ পুস্তকালয়

শোক-সংবাদ

৺প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যাঁহারা কলিকাতার খেলা-ধূলার (sports) সমাচার রাখেন, তাঁহাদের নিকট প্রতুলচন্দ্র অপরিচিত ছিলেন না। গত ১৮ই মে বুধবার ফুটবল খেলিতে খেলিতে ইঁহার নাভিদেশে আঘাত লাগে,—ফলে পরদিবস তাঁহার মৃত্যু ঘটে। আমরা এই বাঙ্গালী যুবকের মৃত্যুতে ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। পঠদ্দশায় প্রতুলচন্দ্র হিন্দু স্কুলের ছাত্র ছিলেন। স্কুলে খেলা-ধূলায় তাঁহার বিশেষ আসক্তি ও কৃতিত্ব ছিল। পরে তিনি Y. M. C. A. এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে "স্পোর্টিং ইউনিয়ন্

৺প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্লাবে" খেলিতে আরম্ভ করেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত উক্ত ক্লাবের পক্ষেই খেলিয়াছিলেন।

ফুটবল, হকি, ক্রিকেট্—তিনটী খেলাতেই প্রতুলচন্দ্রের সমান দক্ষতা ছিল।

ফুটবলে তিনি "ব্যাক্" খেলিতেন এবং তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতিও ছিল। ক্রিকেট্ খেলায়ও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। এই খেলায় তিনি wicket-keeper হইতেন এবং অনেকের বিশ্বাস যে, তাঁহার মত সুকৌশলী wicket-keeper বাঙ্গালীর মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকই ছিল। পুণা, বোম্বাই প্রভৃতি সহরে খেলিতে গিয়া তিনি যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত ইংরাজ ক্রিকেট বীর F Torrant তাঁহার ক্রীড়া-নৈপুণ্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন।

ইতিপূর্ব্বে যখন কলিকাতার ফুটবল ক্রীড়া ক্ষেত্রে জনৈক ইংরেজ এইরূপ এক দৈব দুর্ঘটনায় মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েন, তখন I. F. A. স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একটী Charity Matchএর লভ্যাংশ তাঁহার বিধবাকে দান করিয়াছিলেন। কিন্তু, এক্ষেত্রে অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইয়াছে যে, গত ২৮শে জুলাই তারিখের সিল্ড সেমিফাইনেল ম্যাচের লভ্যাংশের অর্দ্ধাংশ ২৪০০৲ টাকা ৺প্রতুলচন্দ্রের বিধবা পত্নীকে দেওয়া হইবে।

৺রায়সাহেব জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম-এ

রায়সাহেব জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের একজন উচ্চ শ্রেণীর কর্ম্মচারী ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। তাঁহার প্রণীত 'সাবিত্রী'

৺রায়সাহেব জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম-এ

যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি শাস্ত্রালোচনা ও সাহিত্য-সেবাতেই নিবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকটী প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। শেষ বয়সে দুইটী উপযুক্ত পুত্রের অকাল-মৃত্যুতে তিনি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেই শোক আর তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার ন্যায় প্রবীণ সাহিত্যসেবীর পরলোক গমনে আমরা শোক প্রকাশ করিতেছি।

৺তারাপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ

ময়মনসিংহ কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক, মনস্বী, সুলেখক তারাপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আর ইহজগতে নাই। বিগত আষাঢ় মাসে তিনি অকালে আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবগণকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি আমাদের 'ভারতবর্ষে'র একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন; বেদ-সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধাবলি পাঠকগণ বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। তাঁহার ন্যায় একজন পরম বন্ধু ও কৃতী, পণ্ডিত লেখককে হারাইয়া আমরা বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি। ভগবান্ তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবার ও আত্মীয়স্বজনগণের হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

ডাক্তার অক্ষয়কুমার দত্ত

ডাক্তার অক্ষয়কুমার দত্ত

ডাক্তার অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় কলিকাতার একজন খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যের প্রশংসা সকলেই করিয়া থাকিতেন। অক্ষয়বাবু প্রায় এক বৎসর নানা রোগে কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। মধ্য বয়সেই তিনি সকলকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

বিশ্ব-ভারতী

[শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল্]

কবি জর্জ্জ রাসেল

নূতন ভাবের ও বাণীর প্রচার করিয়া যাঁহারা জাতীয় জীবন-গঠনে সহায়তা করিয়াছেন, আয়র্লণ্ডের কবি জর্জ্জ রাসেল তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। এ, ই (A, E) এই ছদ্ম-নামে তিনি সাধারণের নিকটে পরিচিত। ঋষি টলষ্টয় যেমন মহা প্রতাপশালী রুসিয়ার জারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পনের বৎসর যাবৎ নির্ভীক ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, জাতীয় চেতনার উদ্বোধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইনিও সেই-রূপ ভাবে কার্য্য করিয়া কতকটা সফলতা লাভ করিয়াছেন। কেহ-কেহ ইঁহাকে চরমপন্থী (Extremist) দলের লোক বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন; কিন্তু ইঁহার রচনাবলী ধীর ভাবে পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, ইনি কোন দলের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ন'ন। ইঁহার প্রাণ মুক্ত আকাশের মত উদার—অনন্তের মত মহান্। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি,—এক বিষয়ে ইনি চরমে গিয়াছেন—সেটা তাঁহার অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ। টলষ্টয়ের ন্যায় ইনিও আয়ার্লাণ্ড-বাসীর অতীব প্রিয়।

কবিরা, কল্পনা ও ভাবের অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বাস করিয়া থাকেন;—অনেক সময়ে তাঁহারা মরজগতের বড়-একটা সংবাদ রাখেন না। তাঁহারা আদর্শের সন্ধানে ছুটিয়া থাকেন। কবির কল্পনা অভিনব সৃষ্টির দ্যোতনা করিয়া দেয়; কিন্তু কবির জীবনী-শক্তি যে দশের ও দেশের জন্য কার্য্য করিতে পারে, সে ধারণা অনেকেই করিতে পারেন না। সে দিন লণ্ডনের King's Collegeএ সেক্সপীয়ারের কথা বিবৃত করিতে গিয়া সুপণ্ডিত জন মেসফিল্ড বলেন, মানবের মনে একটী কার্য্যকরী শক্তি ও অপর একটী নিবিড় আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ, এই দুইটী শক্তির কার্য্য সমান ভাবে চলিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কর্ম্মী অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া সফলতাকে করতলগত করেন; ঘড়ির কাঁটার ন্যায় তিনি অনবরত কার্য্য করিতেই থাকেন; কিন্তু নির্ম্মল আনন্দ—শুদ্ধ অকৃত্রিম আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি তাঁহার বড় থাকে না। অবশ্য সফলতার যে একটা আনন্দ আছে, কর্ম্মী তাহা পাইয়া থাকেন; কিন্তু সে আনন্দ নিছক আনন্দ নহে,—তাহা কতকটা আত্ম-প্রীতি—অহঙ্কারের (Consciousness) আত্মতৃপ্তিমাত্র। আমাদিগের আলোচ্য কবি এই দুই বিভিন্নধর্ম্মী শক্তির সমন্বয়ে বলীয়ান্। প্রথম, কার্য্যকরী শক্তির বলে তিনি স্বদেশকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন; দ্বিতীয়, শক্তির বলে স্বয়ং নির্ম্মল আনন্দ লাভের অধিকারী হইয়াছেন। বাস্তবিক, কথাটার মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা আমাদিগের পুরাকালের ঋষিরা বুঝিয়াছিলেন। জগৎ-স্রষ্টা ভগবান্‌কে তাঁহারা সচ্চিদানন্দময় বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। মানব-মনেরও এই তিনটী ক্রিয়াই আছে। কিন্তু আনন্দের কার্য্য আমরা

আর বড়-একটা দেখিতে পাই না। এই ভীষণ জীবন-সংগ্রামের দিনে আমরা আর আনন্দকে উপলব্ধি করিতে পারি না। তাই আজ আনন্দের বাণী কবির মুখে শুনিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। কবি তাঁহার Imagination and Reveries পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 'শুধু কাব্য-রচনা বা কলানুশীলন আমাকে আনন্দ দান করিতে পারে না—আমার বিবেক আমাকে শান্তি দিতে পারে না। আমি তখনই শান্তি পাই, আনন্দ পাই,—যখনই আমি আমার সহকর্ম্মী স্বদেশবাসীর সহিত একপ্রাণে আয়ার্ল্যাণ্ডের নবজীবন গঠনের জন্য কার্য্য করি। আয়ার্ল্যাণ্ডে জন্মিয়াছি বলিয়া তাহার জন্য আমার প্রীতি আছে সত্য—অহৈতুকি ভালবাসা আছে বটে; কিন্তু তা' বলিয়া কখনও ভুলিব না যে, সমগ্র মানব-জাতি সর্ব্বপ্রধান নৃপতির (Great King) প্রজা—তাঁহারই সন্তান। এই চিরন্তন সার্ব্বজনীন রাজনীতি (Politics of Eternity) আমাকে প্রকৃত আনন্দ দান করে।' বাস্তবিকই যদি শাশ্বত আনন্দের অধিকারী হইতে চাও, তবে মানবকে ভালবাসিতে শিখ—তাহার সুখ-দুঃখকে আপনার করিয়া লও। আভিজাত্যের বা ধনের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া সমগ্র মানব-মণ্ডলীকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে পারিলেই, প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায়।

আর একটা বড় কথা তিনি য়ুরোপকে শিখাইয়াছেন,—ত্যাগেই আনন্দ। এ কথা আমাদিগের কাছে নূতন নহে—আমরা বহুবার ঋষিমুখে এ কথা শুনিয়াছি। কে বলিতে পারে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাব-বিনিময় অসম্ভব! অন্যত্র কবি লিখিয়াছেন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ জীবনের চরম লক্ষ্য নহে—দেবত্বই মানবের লক্ষ্য। পশুভাবাপন্ন মানবকে দেবভাবাপন্ন হইতেই হইবে।

অধুনাতন চিত্র

Bernadette Murphy 'New Witness'-নামক পত্রে অধুনাতন আর্ট সম্বন্ধে একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বিপ্লববাদীরা বল-প্রয়োগ দ্বারা স্থায়ী রাষ্ট্রের ধ্বংস-সাধন করিয়া নূতন রাষ্ট্র স্থাপনের চেষ্টা করিয়া থাকে। শান্তিস্থাপন করাই তাহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য; কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক স্থানেই শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তির প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ভাঙ্গাটা যত সোজা, গড়াটা ততটা নয়। ফরাসী-বিপ্লব সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার জনক; কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আজিও ফরাসী দেশে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার প্রকৃত স্থান কোথায়? আমেরিকার যুক্তরাজ্যে কি প্রকৃত স্বাধীনতা আছে? সেখানেও অর্থের আধিপত্য ও প্রাধান্য। রুসিয়ার অবস্থাও তদ্রূপ। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার।

আর্ট সম্বন্ধেও কথাটা খুবই প্রযুজ্য। এ ক্ষেত্রেও কয়েক-জন বিপ্লববাদী আইন-কানুন মানিয়া চলিতে চান না—তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চান। চিন্তার ধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হউক, ইহা অনেকেই চান। ইহা জীবনী-শক্তির লক্ষণ বটে; কিন্তু তাই বলিয়া, নূতনের মাদকতায় পুরাতনের আইন-কানুনের গণ্ডী ছাড়িয়া, নূতন গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়াটাই স্বাধীনতার লক্ষণ নয়।

প্যারীর চিত্রশালায় ও চিত্র-বিক্রেতার দোকানে প্রবেশ করিলেই, আজকালকার চিত্রের নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল স্থানে তরুণ শিল্পীর উচ্ছৃঙ্খলতার নিদর্শন দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতে হয়। পুরাতনের ধারাটাকে—জাতীয় বিশেষত্বকে—চিরাচরিত পদ্ধতিকে যে বজায় রাখা উচিত, তাহা তাহারা ভুলিয়া যায়। তাহারা ভুলিয়া যায়—অবহিত চিত্তে, ধীর ভাবে কার্য্য করিতে। পুরাতনের শিক্ষার সুফল-গুলিকে ত্যাগ করিলে ত চলিবে না। তাহার দোষগুলি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। তরুণ শিল্পীদের উদ্ভাবনী-শক্তি যে নাই, তাহা নহে; তবে কেন তাহাদের অঙ্কিত চিত্র শোভন হয় না—নয়নাভিরাম হয় না? আমাদিগের বিশ্বাস, নূতন পদ্ধতির দোষে এইরূপ অস্বাভাবিক চিত্র (forced production) বাহির হয়। এ সকল চিত্রে শিল্পীর শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বটে; কিন্তু তাঁহারা বিপথগামী হইয়াছেন বলিয়া দুঃখ হয়। সময়োপযোগী হইবার মোহে তাঁহারা উদ্ভট পরিকল্পনা করিয়া থাকেন;—যথেচ্ছ বর্ণবিন্যাস করেন;—শারীর-বিদ্যার দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখেন না;—মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলির সহিত কোন মতেই পরিচিত হইতে চান না। এই মোহটা তরুণ শিল্পীরা যদি কোনরূপে কাটাইতে পারেন, তাহা হইলে আবার তাঁহারা স্বাধীনতা পাইবেন। একবার তাঁহারা জগতের দিকে চাহিয়া দেখুন,—রঙ্গময়ী প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির সহিত পরিচিত হউন—মানবের আকৃতির দিকে—তাহার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের দিকে লক্ষ্য করুন—তাহার

দেহের গঠনের যে একটা ছন্দ আছে, ললিত ভাব আছে, তাহার দিকে চাহিয়া দেখুন—ভাবের স্ফুরণ দেহের যে-যে অংশের সুবিন্যাসের দ্বারা সূচিত হয়, তাহার বিচার করুন—পরিকল্পনার বিষয়ে অবহিত হউন—বর্ণ-বিন্যাসের সামঞ্জস্য করুন—তাহা হইলে আবার পূর্ব্বের সুদিন আসিবে। আবার যে চিত্র অঙ্কিত হইবে, তাহা জগৎবাসীর নয়নাভিরাম হইবে। তরুণ শিল্পীকে পুরাতনের নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হইবে আন্তরিকতা, বিচারপ্রবণতা ও সমদর্শিতা। তাহা হইলে আর আমাদিগকে চিত্র বা রেথাঙ্কন অসমঞ্জস হইল বলিয়া দুঃখ করিতে হইবে না। একাগ্র মনে সাধনা না করিলে সিদ্ধি লাভ করা যায় না। নিয়মানুবর্ত্তনের স্থলে নিয়ম লঙ্ঘন করিলে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শিল্পী আপনার ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারেন।

সিনেমা-চিত্র

১৯২০ সালে জগদ্বিখ্যাত মরিস মেটারলিঙ্ক আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। একশত ফিলম দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ৪।৫ খানি ভাল, ৪।৫ খানির দৃশ্য সহনীয়; বাকীগুলি দেখিলে মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। সেগুলি প্রদর্শনের কোন কারণই দেখা যায় না। তাঁহার মতে, আমেরিকায় সিনেমা-চিত্রের ব্যবসায় ভাল রূপে চলিতেছে না;—আর এরূপ কুৎসিত দৃশ্য দেখাইলে, কখনই চলিতে পারিবে না।

মানুষ চায় এমন চিত্র দেখিতে, যাহাতে পুণ্যের, আদর্শের, ন্যায়পরায়ণতার ও নৈতিক বলের প্রাধান্য আছে;—এমন চিত্র দেখিতে চায়, যাহাতে ভগবানের সত্বা দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ চিত্র দেখিতে দেখিতে মানুষ দেবত্বে উন্নীত হয়, বর্ত্তমানে আনন্দ পায়, ও ভবিষ্যতে আশান্বিত হয়। যতদিন না সিনেমা-ব্যবসায়ীরা কলানুমোদিত পদ্ধতি-ক্রমে পূর্ব্বোক্ত রূপ চিত্র দেখাইয়া বিকৃত রুচির পরিবর্ত্তন ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের সুষ্ঠু পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন, ততদিন মানবের নৈতিক স্বাস্থ্যের অবনতি হইবেই হইবে। ব্যবসায়ীদের এরূপ চিত্র প্রদর্শন না করিবার কারণ, তাঁহার মতে,—আর্টের দিক ইঁহারা দেখেন না। ইঁহারা দেখেন, কিসে বেশী পয়সা আসে। ইঁহারা অসৎ প্রবৃত্তির মূলে ইন্ধন জোগাইয়া, দেশের যে কি ভয়ানক অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছেন না।

মেটারলিঙ্কের মর্ম্মস্পর্শী বাণী কয়েকজন ব্যবসায়ীর প্রাণে লাগিয়াছে। তাঁহারা ভালরূপ চিত্র প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। শুধু তাঁহাদের চেষ্টা যে কার্য্যকরী হইবে, তাহা মনে হয় না। সাধারণের সহায়তা ব্যতীত এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। শিল্পীর সুন্দর ভাবে চিত্র অঙ্কন করা আবশ্যক;—দর্শকেরও উচিত, যে চিত্র সুন্দর নহে—যাহা মনকে বিমল আনন্দ দান করে না, তাহা না দেখা। মেটারলিঙ্কের মতে, আদর্শ ফিলমাগার স্থাপিত হওয়া উচিত; এবং মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তব্য, ভাল ফিলমগুলি এক স্থানে সংগ্রহ করিয়া রাখা, ও দর্শকদিগকে ঐগুলি দেখান। ইহাকে একপ্রকার মিউজিয়ম বলা যাইতে পারে।

একখানি প্রাচীন পুঁথি

আমেরিকার বুধমণ্ডলী একখানি প্রাচীন পুঁথির পাঠ-উদ্ধারে এখন ব্যস্ত। এখানি সাতশত বৎসর পূর্ব্বেকার লেখা; সম্ভবতঃ দার্শনিক বেকনের লেখনী-প্রসূত। য়ুরোপের পণ্ডিতমণ্ডলী ইহার পাঠ-উদ্ধার করিতে পারেন নাই। পেনসিল্‌ভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার উইলিয়াম রোমানি নিউবোল্ড দুই বৎসর পূর্ব্বে এখানির পাঠোদ্ধারের উপায় একরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু শতকরা পঁচিশ ভাগের এক ভাগ অনুবাদ করিতে পারিয়াছেন; এবং যাহা পারিয়াছেন, তাহা হইতে বিশ্বাস করেন, বিজ্ঞান-রাজ্যে বেকনের স্থান আরিস্ততলের নিম্নে নহে।

পুঁথিখানি Dr. Wilfred M. Voynichএর। তাঁহার মতে ত্রয়োদশ শতকে বেকন বিজ্ঞান-রাজ্যে যতদুর অগ্রসর হইয়াছিলেন, একবিংশ শতকেও বোধ হয় বিজ্ঞানবিদেরা ততদুর অগ্রসর হইতে পারিবেন না। বেকনই অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের আবিষ্কারক;—জীবাণু-তত্ত্ব তাঁহারই মস্তিষ্ক প্রসূত। তিনিই লিষ্টার ও পাস্তরের আবিষ্কারের অগ্রদূত। দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের আবিষ্কারের সার্দ্ধ তিন শতক পূর্ব্বে তিনি স্বহস্তে দূরবীক্ষণ-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া, গ্রহাদির গতি ও সূর্য্য-গ্রহণ দেখিয়াছিলেন, এবং গ্রহ-উপগ্রহাদির সংস্থান ও গতি সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা আধুনিক গণিত-জ্যোতির্বীদিগের মতানুসারী।

এই পুঁথিখানিতে জীব-বিদ্যা (Biology), গণিত-জ্যোতিষ (Astronomy), উদ্ভিদ-বিদ্যা (Botany), ভেষজ-বিদ্যা (Medicine), মনোবিজ্ঞান (Psychology)

প্রভৃতি বিজ্ঞানের নানা বিভাগের অনেক তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, এখানি বিজ্ঞানের বৃহৎ কোষ-গ্রন্থ (Encyclopædic work on science)। মধ্য-যুগের (mediaevalist) লেখার সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদের অনেকেরই মতে, এখানি হয় এলবার্টস ম্যাগনাস, না হয় রোজার বেকনের লেখা।

এখানি সাঙ্কেতিক চিহ্নে লিখিত বলিয়া, আমার বিশ্বাস, ইহা ম্যাগনাসের লেখা নহে। তিনি ডোমিনিয়ন অর্ডারের প্রধান ছিলেন; এবং সম্রাট্ যাঁহার নিকটে আত্মদোষ বিবৃত করিতেন, তাঁহার পক্ষে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিবার কোন কারণই ছিল না। অপর দিকে নিগৃহীত, জেলের আসামী বেকন,—যাঁহার প্রতি আদেশ হইয়াছিল, কুড়ি বৎসর ধরিয়া তিনি কিছু লিখিতে পারিবেন না,—ইহা তাঁহার লেখনী-প্রসূত বলিয়াই মনে হয়। এরূপ মনে হইবার আরও একটা কারণ আছে। তাঁহার লিখিত পুস্তকের অনেক স্থলেই তিনি সাঙ্কেতিক চিহ্নে লিখিত পুঁথির উল্লেখ বহুবার করিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার নিউবোল্ড বলিয়াছেন, আমার ধ্রুব বিশ্বাস, এ অপূর্ব্ব পুঁথি—পাণ্ডিত্যের ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব তাজমহল, বেকনের রচিত। পুঁথিখানি এরূপ ক্ষুদ্র চিহ্ন দ্বারা লিখিত যে, ম্যাগনিফায়িং গ্লাস ব্যতীত পাঠ করা যায় না। ৩০০ পৃষ্ঠায় ৮ লক্ষ শব্দ আছে। ইহা মুদ্রিত করিলে সুবৃহৎ দশ খণ্ড পুস্তক অনায়াসে হইতে পারে। আমার বোধ হয়, রেখাঙ্কন-বিদ্যারও (short-hand) তিনিই উদ্ভাবয়িতা।

ভাষার দিক্ হইতে বিচার করিয়া দেখিলেও বেশ বুঝিতে পারা যায়, ইহাতে ত্রয়োদশ শতকের ল্যাটিন ও ইংরেজীর অপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়াছে। নানা দিক হইতে দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, জীবন-ভয়-ভীত, জ্ঞান-সমুদ্র-মন্থনকারী বেকন যে রত্নের সন্ধান পাইয়াছিলেন, ভাষায় তাহার বর্ণনা করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না; তাই তিনি গোপনে ইঙ্গিতে সে সত্যের কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। জীব-বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান ও আত্মা সম্বন্ধে তিনি চিরাচরিত সিদ্ধান্তগুলির খণ্ডন করিয়া যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ডাক্তার ভয়নিচ ফিলাডেলফিয়ার বিদ্বজ্জন-সমাজে এ সম্বন্ধে শীঘ্রই প্রবন্ধ পাঠ করিবেন বলিয়া বেশী কিছু আর বলেন নাই। কোথা হইতে, বা কাহার নিকট হইতে, কিরূপ ভাবে তিনি এ পুঁথিখানি পাইয়াছেন, সে সম্বন্ধেও আপাততঃ তিনি কিছুই বলেন নাই।

বিধবা

(আলোচনা)

'বিষবৃক্ষ'—(২)

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ]

গত চৈত্রের 'বিধবা'-প্রবন্ধে বলিয়াছি যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বিধবাবিবাহ-সংক্রান্ত আন্দোলনের প্রভাব তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আখ্যায়িকা-কার বঙ্কিমচন্দ্রও অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তাহার ফলে তিনি 'বিষবৃক্ষে' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' যুবতী বিধবার প্রেমতৃষ্ণার বা ইন্দ্রিয়-লালসার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

'বিষবৃক্ষে'র পূর্ব্বে রচিত 'মৃণালিনী'তেও অপ্রধান আখ্যানে পশুপতি-মনোরমার ব্যাপার আপাত-দৃষ্টিতে এই শ্রেণীভুক্ত বলিয়া মনে হয়। এই আখ্যায়িকায় অবশ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোনও প্রসঙ্গ নাই, থাকিতেও পারে না, কেননা আখ্যায়িকার কল্পিত ঘটনাবলি ইংরেজ আমলের বহুপূর্ব্বের—মুসলমান রাজত্বের আরম্ভ-সময়ের। পশুপতি দুইবার বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গ তুলিয়াছে।—'এখন বিধবাবিবাহ করিলে জনসমাজে পরিত্যক্ত হইব। কিন্তু যখন আমি স্বয়ং রাজা হইব, তখন কে আমায় ত্যাগ করিবে? আমি...বিধবা-পরিণয়ের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিব!' (২য় খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ।) 'রাজ্যলাভ করিব ও তোমাকে বিবাহ করিব। ইহাতে তুমি বিধবা

বলিয়া যে বিঘ্ন, শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা আমি তাহার খণ্ডন করিতে পারিব।' (৪র্থ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ)। পশুপতি শুধু যে নগেন্দ্রনাথ দত্তের মত রূপমোহে অন্ধ তাহা নহে, সে রাজ্যলোভে দেশদ্রোহী। যাহা হউক প্রকৃতপক্ষে ইহা বিধবাবিবাহের ব্যাপার নহে; মনোরমা প্রকৃতপক্ষে বিধবা নহে, সে পশুপতিরই নিরুদ্দিষ্টা পত্নী। পশুপতি ইহা জানিত না, (পাঠকও ইহা ৪র্থ খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদের পূর্ব্বে জানিতে পারেন না) কিন্তু মনোরমা ইহা জানিত। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র, পাঠকের মনে মনোরমা লালসাময়ী বিধবা এই বিশ্বাস থাকাতে, হেমচন্দ্রের মারফত মনোরমাকে পাপের পথ হইতে নিবৃত্ত হইবার সদুপদেশ দিয়া ধর্ম্মনীতি ও সুরুচির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।—'সাবধান, মনোরমা! বাসনা হইতে ভ্রান্তি জন্মে; ভ্রান্তি হইতে অধর্ম্ম জন্মে। তোমার ভ্রান্তি পর্য্যন্ত হইয়াছে। তুমি বিবেচনা করিয়া বল দেখি, তুমি যদি ধর্ম্মে একের পত্নী, মনে অন্যের পত্নী হইলে, তবে তুমি দ্বিচারিণী হইলে কিনা?......ধর্ম্মের জন্য প্রেমকে সংহার করিবে।' (৩য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।) বঙ্কিমচন্দ্র রূপমোহান্ধ দেশদ্রোহী পশুপতির মহাপাপের ভীষণ প্রতিফল দিয়াছেন, ইহাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

এক্ষণে সাধারণভাবে 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলি।

প্রথমতঃ লক্ষ্য করিতে হইবে, উভয়ত্র বঙ্কিমচন্দ্র যুবতী বিধবাকে আখ্যায়িকার নায়িকা বা প্রধানা পাত্রী করেন নাই, প্রতিনায়িকা বা অপ্রধানা পাত্রী করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ দত্তের ধর্ম্মপত্নী সূর্য্যমুখী ও গোবিন্দলাল রায়ের ধর্ম্মপত্নী ভ্রমর আখ্যায়িকা-দ্বয়ের নায়িকা, কুন্দনন্দিনী ও রোহিণী প্রতি-নায়িকা। অবৈধ প্রণয় আখ্যায়িকার অন্তর্নিবিষ্ট একটি করুণ episode ফাঁকড়া মাত্র, মূল আখ্যান (main plot) নহে। কুন্দ-রোহিণীর প্রণয়ব্যাপার ও নিদারুণ পরিণাম পাঠকহৃদয়ে গভীর করুণা ও সমবেদনা সঞ্চারিত করে (এরূপ না হইলে কাব্যকলার ত্রুটি হইত, আর্টের দোষ হইত), কিন্তু সূর্য্যমুখী-ভ্রমরের যন্ত্রণার ইতিহাস তদপেক্ষাও গভীরতর করুণা ও সমবেদনা সঞ্চারিত করে। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে দাম্পত্যপ্রণয়ের জয়গানই আখ্যায়িকা-কারের প্রকৃত হৃদ্গত ভাব, পরকীয়া—প্রেম নায়ক-দ্বয়ের জীবনে একটা দুর্ব্বহ কিয়ৎকালের জন্য তাঁহাদিগকে বিড়ম্বিত করিয়াছে, কাল পূর্ণ হইলে গ্রহদোষ কাটিয়াছে, উপসর্গের উপশম হইয়াছে, ছায়া সরিয়া গিয়াছে। নগেন্দ্রনাথের মোহের অবস্থায়ও সূর্য্যমুখী অন্তরে, কুন্দনন্দিনী বাহিরে; গোবিন্দ-লালের মোহের অবস্থায়ও 'ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে।' পরকীয়া-প্রীতিকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাধান্য ও স্থায়িত্ব দিবেন না বলিয়াই তিনি বিবাহিত পুরুষকে এই প্রেমের মহাজন করিয়াছেন, নতুবা আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, অমরনাথের মত অকৃতদার ব্যক্তিকে বা শচীন্দ্রনাথের মত বিপত্নীক ব্যক্তিকে বিধবার প্রেমিক ও পাণিপ্রার্থী করিলেই অধিকতর শোভন ও সঙ্গত হইত। ('মৃণালিনী'তে পশুপতি ত অজ্ঞাতসারে 'in love with his own wife'!) অন্যান্য লেখকদিগের বহু আখ্যানে অবিবাহিত পুরুষকে যুবতী বিধবার প্রেমিক করা হইয়াছে, প্রেমময়ী যুবতী বিধবাকে গল্পের নায়িকা করা হইয়াছে, এইগুলির সহিত প্রভেদ-দৃষ্টে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্টতা উপলব্ধ হয়। তাঁহার ঝোঁক (bias) বিধবার প্রণয়লীলার অনুকূলে কি প্রতিকূলে, তাহাও ধরিতে পারা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, শুধু পরোক্ষভাবে নিজের ঝোঁকের আভাস দিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষান্ত হন নাই, বহুস্থলে বহুভাবে, কোথাও কোথাও স্পষ্টবাক্যে, এই অবৈধ প্রণয়ের, এই পরকীয়া-প্রীতির, এই অসংযমের প্রতিকূলে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যথাস্থানে সে সকলের উল্লেখ করিয়াছি ও করিব। 'বিষবৃক্ষ'-নামকরণেই ত এই (condemnation) দোষপ্রদর্শনের, নিন্দার ভাব স্ফুটীকৃত। তিনি কুন্দর প্রতি নগেন্দ্রনাথের আকর্ষণকে, তথা রোহিণীর প্রতি গোবিন্দ-লালের আকর্ষণকে 'রূপজ মোহ', 'চোখের ভালবাসা' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, (শেক্‌স্‌পীয়ারের Fancy engendered in the eyes); প্রগাঢ় প্রণয় নহে। ('বিষবৃক্ষে'র ৩২শ পরিচ্ছেদে হরদেব ঘোষালের সহিত পত্র-ব্যবহার দ্রষ্টব্য।) 'বিষবৃক্ষে' একাধিক স্থলে, কখনও কখনও সমগ্র একটি পরিচ্ছেদে (যথা ২৯শ), তিনি এই অসংযমের, প্রবৃত্তি-প্রবণতার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, পরবর্ত্তী অনেক লেখকের এই শ্রেণীর আখ্যায়িকায় লেখকের পূর্ণ সমবেদনা ও ঝোঁক বিধবার প্রণয়লীলার দিকে, ইহা বেশ বুঝা যায়।

তৃতীয়তঃ, নগেন্দ্রনাথ-কুন্দনন্দিনীর, গোবিন্দলাল-রোহিণীর হৃদয়ে প্রণয়সঞ্চার হইবামাত্র তাঁহারা স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন, 'পবিত্র প্রেমে'র আবির্ভাবে কৃতার্থম্মন্য হইলেন, এবং

যদি কলমী সোরা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে Potassium Nitrite পাইব। এই দুইটী জিনিসেরই দর খুব বেশী। প্রথমটীর দর প্রায় ২॥০-৩৲ টাকা পাউণ্ড; আর দ্বিতীয়টীর প্রায় ৩।৪ টাকা পাউণ্ড; অর্থাৎ সোরার দরের প্রায় দশ গুণ দরে বিক্রয় হয়। কিন্তু জিনিসটী বিশুদ্ধ না হইলে (chemically pure) অত দর পাওয়া যায় না। সুতরাং ঐ দানাগুলি পরিস্রুত জলে গলাইয়া কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া পুনরায় দানা জমাইতে হইবে। এইরূপে ২।৩ বার গলাইয়া দানা জমাইলে (chemically pure) বিশুদ্ধ Soda বা Potash Nitrite পাওয়া যাইবে। তুলা ও রেশমাদি রং করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এক সের সীসাকে অক্সাইডে পরিণত করিতে, প্রায় দেড় পাউণ্ড সোরা লাগে। এই দেড় পাউণ্ড সোরা হইতে এক পাউণ্ডের কিছু বেশী নাইট্রাইট পাওয়া যায়। সুতরাং, যদি Sodium অথবা Potassium Nitrite প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা যায়, তাহা হইলে Lithargeটা এক প্রকার বিনা খরচায় পাওয়া যায়।

চন্দননগর সাধারণ পুস্তকালয়

শোক-সংবাদ

৺প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যাঁহারা কলিকাতার খেলা-ধূলার (sports) সমাচার রাখেন, তাঁহাদের নিকট প্রতুলচন্দ্র অপরিচিত ছিলেন না। গত ১৮ই মে বুধবার ফুটবল খেলিতে খেলিতে ইঁহার নাভিদেশে আঘাত লাগে,—ফলে পরদিবস তাঁহার মৃত্যু ঘটে। আমরা এই বাঙ্গালী যুবকের মৃত্যুতে ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। পঠদ্দশায় প্রতুলচন্দ্র হিন্দু স্কুলের ছাত্র ছিলেন। স্কুলে খেলা-ধূলায় তাঁহার বিশেষ আসক্তি ও কৃতিত্ব ছিল। পরে তিনি Y. M. C. A. এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে "স্পোর্টিং ইউনিয়ন্ ক্লবে" খেলিতে আরম্ভ করেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত উক্ত ক্লবের পক্ষেই খেলিয়াছিলেন।

৺প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ফুটবল, হকি, ক্রিকেট্—তিনটী খেলাতেই প্রতুলচন্দ্রের সমান দক্ষতা ছিল।

ফুটবলে তিনি "ব্যাক্" খেলিতেন এবং তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতিও ছিল। ক্রিকেট্ খেলায়ও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। এই খেলায় তিনি wicket-keeper হইতেন এবং অনেকের বিশ্বাস যে, তাঁহার মত সুকৌশলী wicket-keeper বাঙ্গালীর মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকই ছিল। পুণা, বোম্বাই প্রভৃতি সহরে খেলিতে গিয়া তিনি যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত ইংরাজ ক্রিকেট বীর F Torrant তাঁহার ক্রীড়া-নৈপুণ্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন।

ইতিপূর্ব্বে যখন কলিকাতার ফুটবল ক্রীড়া-ক্ষেত্রে জনৈক ইংরেজ এইরূপ এক দৈব দুর্ঘটনায় মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েন, তখন I. F. A. স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একটী Charity Matchএর লভ্যাংশ তাঁহার বিধবাকে দান করিয়াছিলেন। কিন্তু, এক্ষেত্রে অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইয়াছে যে, গত ২৮শে জুলাই তারিখের সিল্ড সেমিফাইনেল ম্যাচের লভ্যাংশের অর্দ্ধাংশ ২৪০০৲ টাকা ৺প্রতুলচন্দ্রের বিধবা পত্নীকে দেওয়া হইবে

৺রায়সাহেব জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম-এ

রায়সাহেব জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের একজন উচ্চ শ্রেণীর কর্ম্মচারী ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। তাঁহার প্রণীত 'সাবিত্রী'

৺রায়সাহেব জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম-এ

যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি শাস্ত্রালোচনা ও সাহিত্য-সেবাতেই নিবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকটী প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। শেষ বয়সে দুইটী উপযুক্ত পুত্রের অকাল-মৃত্যুতে তিনি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেই শোক আর তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার ন্যায় প্রবীণ সাহিত্যসেবীর পরলোক গমনে আমরা শোক প্রকাশ করিতেছি।

৺তারাপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ

ময়মনসিংহ কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক, মনস্বী, সুলেখক তারাপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আর ইহজগতে নাই। বিগত আষাঢ় মাসে তিনি অকালে আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবগণকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি আমাদের 'ভারতবর্ষে'র একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন; বেদ-সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধাবলি পাঠকগণ বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। তাঁহার ন্যায় একজন পরম বন্ধু ও কৃতী, পণ্ডিত লেখককে হারাইয়া আমরা বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি। ভগবান্ তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবার ও আত্মীয়স্বজনগণের হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

ডাক্তার অক্ষয়কুমার দত্ত

ডাক্তার অক্ষয়কুমার দত্ত

ডাক্তার অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় কলিকাতার একজন খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যের প্রশংসা সকলেই করিয়া থাকিতেন। অক্ষয়বাবু প্রায় এক বৎসর নানা রোগে কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। মধ্য বয়সেই তিনি সকলকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

দেহের গঠনের যে একটা ছন্দ আছে, ললিত ভাব আছে, তাহার দিকে চাহিয়া দেখুন—ভাবের স্ফুরণ দেহের যে-যে অংশের সুবিন্যাসের দ্বারা সূচিত হয়, তাহার বিচার করুন—পরিকল্পনার বিষয়ে অবহিত হউন—বর্ণ-বিন্যাসের সামঞ্জস্য করুন—তাহা হইলে আবার পূর্ব্বের সুদিন আসিবে। আবার যে চিত্র অঙ্কিত হইবে; তাহা জগৎবাসীর নয়নাভিরাম হইবে। তরুণ শিল্পীকে পুরাতনের নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হইবে আন্তরিকতা, বিচারপ্রবণতা ও সমদর্শিতা। তাহা হইলে আর আমাদিগকে চিত্র বা রেখাঙ্কন অসমঞ্জস হইল বলিয়া দুঃখ করিতে হইবে না। একাগ্র মনে সাধনা না করিলে সিদ্ধি লাভ করা যায় না। নিয়মানুবর্ত্তনের স্থলে নিয়ম লঙ্ঘন করিলে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শিল্পী আপনার ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারেন।

সিনেমা-চিত্র

১৯২০ সালে জগদ্বিখ্যাত মরিস মেটারলিঙ্ক আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। একশত ফিলম দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ৪।৫ খানি ভাল, ৪।৫ খানির দৃশ্য সহনীয়; বাকীগুলি দেখিলে মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। সেগুলি প্রদর্শনের কোন কারণই দেখা যায় না। তাঁহার মতে, আমেরিকায় সিনেমা-চিত্রের ব্যবসায় ভাল রূপে চলিতেছে না;—আর এরূপ কুৎসিত দৃশ্য দেখাইলে, কখনই চলিতে পারিবে না।

মানুষ চায় এমন চিত্র দেখিতে, যাহাতে পুণ্যের, আদর্শের, ন্যায়পরায়ণতার ও নৈতিক বলের প্রাধান্য আছে;—এমন চিত্র দেখিতে চায়, যাহাতে ভগবানের সত্ত্বা দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ চিত্র দেখিতে দেখিতে মানুষ দেবত্বে উন্নীত হয়, বর্ত্তমানে আনন্দ পায়, ও ভবিষ্যতে আশান্বিত হয়। যতদিন না সিনেমা-ব্যবসায়ীরা কলানুমোদিত পদ্ধতি-ক্রমে পূর্ব্বোক্ত রূপ চিত্র দেখাইয়া বিকৃত রুচির পরিবর্ত্তন ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের সুষ্ঠু পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন, ততদিন মানবের নৈতিক স্বাস্থ্যের অবনতি হইবেই হইবে। ব্যবসায়ীদের এরূপ চিত্র প্রদর্শন না করিবার কারণ, তাঁহার মতে,—আর্টের দিক ইঁহারা দেখেন না। ইঁহারা দেখেন, কিসে বেশী পয়সা আসে। ইঁহারা অসৎ প্রবৃত্তির মূলে ইন্ধন জোগাইয়া, দেশের যে কি ভয়ানক অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছেন না।

মেটারলিঙ্কের মর্ম্মস্পর্শী বাণী কয়েকজন ব্যবসায়ীর প্রাণে লাগিয়াছে। তাঁহারা ভালরূপ চিত্র প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। শুধু তাঁহাদের চেষ্টা যে কার্য্যকরী হইবে, তাহা মনে হয় না। সাধারণের সহায়তা ব্যতীত এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। শিল্পীর সুন্দর ভাবে চিত্র অঙ্কন করা আবশ্যক;—দর্শকেরও উচিত, যে চিত্র সুন্দর নহে—যাহা মনকে বিমল আনন্দ দান করে না, তাহা না দেখা। মেটারলিঙ্কের মতে, আদর্শ ফিলমাগার স্থাপিত হওয়া উচিত; এবং মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তব্য, ভাল ফিলমগুলি এক স্থানে সংগ্রহ করিয়া রাখা, ও দর্শকদিগকে ঐগুলি দেখান। ইহাকে একপ্রকার মিউজিয়ম বলা যাইতে পারে।

একখানি প্রাচীন পুঁথি

আমেরিকার বুধমণ্ডলী একখানি প্রাচীন পুঁথির পাঠ-উদ্ধারে এখন ব্যস্ত। এখানি সাতশত বৎসর পূর্ব্বেকার লেখা; সম্ভবতঃ দার্শনিক বেকনের লেখনী-প্রসূত। য়ুরোপের পণ্ডিতমণ্ডলী ইহার পাঠ-উদ্ধার করিতে পারেন নাই। পেনসিল্‌ভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার উইলিয়াম রোমানি নিউবোল্ড দুই বৎসর পূর্ব্বে এখানির পাঠোদ্ধারের উপায় একরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু শতকরা পঁচিশ ভাগের এক ভাগ অনুবাদ করিতে পারিয়াছেন; এবং যাহা পারিয়াছেন, তাহা হইতে বিশ্বাস করেন, বিজ্ঞান-রাজ্যে বেকনের স্থান আরিস্ততলের নিম্নে নহে।

পুঁথিখানি Dr. Wilfred M. Voynichএর। তাঁহার মতে ত্রয়োদশ শতকে বেকন বিজ্ঞান-রাজ্যে যতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, একবিংশ শতকেও বোধ হয় বিজ্ঞানবিদেরা ততদূর অগ্রসর হইতে পারিবেন না। বেকনই অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের আবিষ্কারক;—জীবাণু-তত্ত্ব তাঁহারই মস্তিষ্ক প্রসূত। তিনিই লিষ্টার ও পাস্তুরের আবিষ্কারের অগ্রদূত। দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের আবিষ্কারের সার্দ্ধ তিন শতক পূর্ব্বে তিনি স্বহস্তে দূরবীক্ষণ-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া, গ্রহাদির গতি ও সূর্য্য-গ্রহণ দেখিয়াছিলেন, এবং গ্রহ-উপগ্রহাদির সংস্থান ও গতি সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা আধুনিক গণিত-জ্যোতিষীদিগের মতানুসারী।

এই পুঁথিখানিতে জীব-বিদ্যা (Biology), গণিত-জ্যোতিষ (Astronomy), উদ্ভিদ-বিদ্যা (Botany), ভেষজ-বিদ্যা (Medicine), মনোবিজ্ঞান (Psychology)

প্রভৃতি বিজ্ঞানের নানা বিভাগের অনেক তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, এখানি বিজ্ঞানের বৃহৎ কোষ-গ্রন্থ (Encyclopædic work on science)। মধ্য-যুগের (mediaevalist) লেখার সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদের অনেকেরই মতে, এখানি হয় এলবার্টাস ম্যাগনাস, না হয় রোজার বেকনের লেখা।

এখানি সাঙ্কেতিক চিহ্নে লিখিত বলিয়া, আমার বিশ্বাস, ইহা ম্যাগনাসের লেখা নহে। তিনি ডোমিনিকন্ অর্ডারের প্রধান ছিলেন; এবং সম্রাট্ যাঁহার নিকটে আত্মদোষ বিবৃত করিতেন, তাঁহার পক্ষে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিবার কোন কারণই ছিল না। অপর দিকে নিগৃহীত, জেলের আসামী বেকন,—যাঁহার প্রতি আদেশ হইয়াছিল, কুড়ি বৎসর ধরিয়া তিনি কিছু লিখিতে পারিবেন না,—ইহা তাঁহার লেখনী-প্রসূত বলিয়াই মনে হয়। এরূপ মনে হইবার আরও একটা কারণ আছে। তাঁহার লিখিত পুস্তকের অনেক স্থলেই তিনি সাঙ্কেতিক চিহ্নে লিখিত পুঁথির উল্লেখ বহুবার করিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার নিউবোল্ড বলিয়াছেন, আমার ধ্রুব বিশ্বাস, এ অপূর্ব্ব পুঁথি—পাণ্ডিত্যের ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব তাজমহল, বেকনের রচিত। পুঁথিখানি এরূপ ক্ষুদ্র চিহ্ন দ্বারা লিখিত যে, ম্যাগনিফায়িং গ্লাস ব্যতীত পাঠ করা যায় না। ৩০০ পৃষ্ঠায় ৮ লক্ষ শব্দ আছে। ইহা মুদ্রিত করিলে সুবৃহৎ দশ খণ্ড পুস্তক অনায়াসে হইতে পারে। আমার বোধ হয়, রেখাঙ্কন-বিদ্যারও (short-hand) তিনিই উদ্ভাবয়িতা।

ভাষার দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলেও বেশ বুঝিতে পারা যায়, ইহাতে ত্রয়োদশ শতকের ল্যাটিন ও ইংরেজীর অপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়াছে। নানা দিক হইতে দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, জীবন-ভয়-ভীত, জ্ঞান-সমুদ্র-মন্থনকারী বেকন যে রত্নের সন্ধান পাইয়াছিলেন, ভাষায় তাহার বর্ণনা করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না; তাই তিনি গোপনে ইঙ্গিতে সে সত্যের কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। জীব-বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান ও আত্মা সম্বন্ধে তিনি চিরাচরিত সিদ্ধান্তগুলির খণ্ডন করিয়া যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ডাক্তার ভয়নিচ ফিলাডেলফিয়ার বিদ্বজ্জন-সমাজে এ সম্বন্ধে শীঘ্রই প্রবন্ধ পাঠ করিবেন বলিয়া বেশী কিছু আর বলেন নাই। কোথা হইতে, বা কাহার নিকট হইতে, কিরূপ ভাবে তিনি এ পুঁথিখানি পাইয়াছেন, সে সম্বন্ধেও আপাততঃ তিনি কিছুই বলেন নাই।

বিধবা

(আলোচনা)

'বিষবৃক্ষ'—(২)

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ]

গত চৈত্রের 'বিধবা'-প্রবন্ধে বলিয়াছি যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বিধবাবিবাহ-সংক্রান্ত আন্দোলনের প্রভাব তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আখ্যায়িকা-কার বঙ্কিমচন্দ্রও অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তাহার ফলে তিনি 'বিষবৃক্ষে' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' যুবতী বিধবার প্রেমতৃষ্ণার বা ইন্দ্রিয়-লালসার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

'বিষবৃক্ষে'র পূর্ব্বে রচিত 'মৃণালিনী'তেও অপ্রধান আখ্যানে পশুপতি-মনোরমার ব্যাপার আপাত-দৃষ্টিতে এই শ্রেণীভুক্ত বলিয়া মনে হয়। এই আখ্যায়িকায় অবশ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোনও প্রসঙ্গ নাই, থাকিতেও পারে না, কেননা আখ্যায়িকার কল্পিত ঘটনাবলি ইংরেজ আমলের বহুপূর্ব্বের—মুসলমান রাজত্বের আরম্ভ-সময়ের। পশুপতি দুইবার বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গ তুলিয়াছে।—'এখন বিধবাবিবাহ করিলে জনসমাজে পরিত্যক্ত হইব। কিন্তু যখন আমি স্বয়ং রাজা হইব, তখন কে আমায় ত্যাগ করিবে? আমি...বিধবা-পরিণয়ের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিব।' (২য় খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ।) 'রাজ্যলাভ করিব ও তোমাকে বিবাহ করিব। ইহাতে তুমি বিধবা

বলিয়া যে বিঘ্ন, শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা আমি তাহার খণ্ডন করিতে পারিব।' (৪র্থ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ)। পশুপতি শুধু যে নগেন্দ্রনাথ দত্তের মত রূপমোহে অন্ধ তাহা নহে, সে রাজ্যলোভে দেশদ্রোহী। যাহা হউক প্রকৃতপক্ষে ইহা বিধবাবিবাহের ব্যাপার নহে; মনোরমা প্রকৃতপক্ষে বিধবা নহে, সে পশুপতিরই নিরুদ্দিষ্টা পত্নী। পশুপতি ইহা জানিত না, (পাঠকও ইহা ৪র্থ খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদের পূর্ব্বে জানিতে পারেন না) কিন্তু মনোরমা ইহা জানিত। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র, পাঠকের মনে মনোরমা লালসাময়ী বিধবা এই বিশ্বাস থাকাতে, হেমচন্দ্রের মারফত মনোরমাকে পাপের পথ হইতে নিবৃত্ত হইবার সদুপদেশ দিয়া ধর্ম্মনীতি ও সুরুচির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।—'সাবধান, মনোরমা! বাসনা হইতে ভ্রান্তি জন্মে; ভ্রান্তি হইতে অধর্ম্ম জন্মে। তোমার ভ্রান্তি পর্য্যন্ত হইয়াছে। তুমি বিবেচনা করিয়া বল দেখি, তুমি যদি ধর্ম্মে একের পত্নী, মনে অন্যের পত্নী হইলে, তবে তুমি দ্বিচারিণী হইলে কিনা?......ধর্ম্মের জন্য প্রেমকে সংহার করিবে।' (৩য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।) বঙ্কিমচন্দ্র রূপমোহান্ধ দেশদ্রোহী পশুপতির মহাপাপের ভীষণ প্রতিফল দিয়াছেন, ইহাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

এক্ষণে সাধারণভাবে 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলি।

প্রথমতঃ লক্ষ্য করিতে হইবে, উভয়ত্র বঙ্কিমচন্দ্র যুবতী বিধবাকে আখ্যায়িকার নায়িকা বা প্রধানা পাত্রী করেন নাই, প্রতিনায়িকা বা অপ্রধানা পাত্রী করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ দত্তের ধর্ম্মপত্নী সূর্য্যমুখী ও গোবিন্দলাল রায়ের ধর্ম্মপত্নী ভ্রমর আখ্যায়িকা-দ্বয়ের নায়িকা, কুন্দনন্দিনী ও রোহিণী প্রতি-নায়িকা। অবৈধ প্রণয় আখ্যায়িকার অন্তর্নিবিষ্ট একটি করুণ episode ক্যাংড়া মাত্র, মূল আখ্যান (main plot) নহে। কুন্দ-রোহিণীর প্রণয়ব্যাপার ও নিদারুণ পরিণাম পাঠকহৃদয়ে গভীর করুণা ও সমবেদনা সঞ্চারিত করে (এরূপ না হইলে কাব্যকলার ত্রুটি হইত, আর্টের দোষ হইত), কিন্তু সূর্য্যমুখী-ভ্রমরের যন্ত্রণার ইতিহাস তদপেক্ষাও গভীরতর করুণা ও সমবেদনা সঞ্চারিত করে। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে দাম্পত্যপ্রণয়ের জয়গানই আখ্যায়িকা-কারের প্রকৃত হৃদ্গত ভাব, পরকীয়া—প্রেম নায়ক-দ্বয়ের জীবনে একটা দুর্ব্বহ কিয়ৎকালের জন্য তাঁহাদিগকে বিড়ম্বিত করিয়াছে, কাল পূর্ণ হইলে গ্রহদোষ কাটিয়াছে, উপসর্গের উপশম হইয়াছে, ছায়া সরিয়া গিয়াছে। নগেন্দ্রনাথের মোহের অবস্থায়ও সূর্য্যমুখী অন্তরে, কুন্দনন্দিনী বাহিরে; গোবিন্দ-লালের মোহের অবস্থায়ও 'ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে।' পরকীয়া-প্রীতিকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাধান্য ও স্থায়িত্ব দিবেন না বলিয়াই তিনি বিবাহিত পুরুষকে এই প্রেমের ম্লাজন করিয়াছেন, নতুবা আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, অমরনাথের মত অকৃতদার ব্যক্তিকে বা শচীন্দ্রনাথের মত বিপত্নীক ব্যক্তিকে বিধবার প্রেমিক ও পাণিপ্রার্থী করিলেই অধিকতর শোভন ও সঙ্গত হইত। ('মৃণালিনী'তে পশুপতি ত অজ্ঞাতসারে 'in love with his own wife'!) অন্যান্য লেখকদিগের বহু আখ্যানে অবিবাহিত পুরুষকে যুবতী বিধবার প্রেমিক করা হইয়াছে, প্রেমময়ী যুবতী বিধবাকে গল্পের নায়িকা করা হইয়াছে, এইগুলির সহিত প্রভেদ-দৃষ্টে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্টতা উপলব্ধ হয়। তাঁহার ঝোঁক (bias) বিধবার প্রণয়লীলার অনুকূলে কি প্রতিকূলে, তাহাও ধরিতে পারা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, শুধু পরোক্ষভাবে নিজের ঝোঁকের আভাস দিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষান্ত হন নাই, বহুস্থলে বহুভাবে, কোথাও কোথাও স্পষ্টবাক্যে, এই অবৈধ প্রণয়ের, এই পরকীয়া-প্রীতির, এই অসংযমের প্রতিকূলে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যথাস্থানে সে সকলের উল্লেখ করিয়াছি ও করিব। 'বিষবৃক্ষ'-নামকরণেই ত এই (condemnation) দোষপ্রদর্শনের, নিন্দার ভাব স্ফুটীকৃত। তিনি কুন্দর প্রতি নগেন্দ্রনাথের আকর্ষণকে, তথা রোহিণীর প্রতি গোবিন্দ-লালের আকর্ষণকে 'রূপজ মোহ', 'চোখের ভালবাসা' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, (শেক্‌স্‌পীয়ারের Fancy engendered in the eyes); প্রগাঢ় প্রণয় নহে। ('বিষবৃক্ষে'র ৩২শ পরিচ্ছেদে হরদেব ঘোষালের সহিত পত্র-ব্যবহার দ্রষ্টব্য।) 'বিষবৃক্ষে' একাধিক স্থলে, কখনও কখনও সমগ্র একটি পরিচ্ছেদে (যথা ২৯শ), তিনি এই অসংযমের, প্রবৃত্তি-প্রবণতার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, পরবর্ত্তী অনেক লেখকের এই শ্রেণীর আখ্যায়িকায় লেখকের পূর্ণ সমবেদনা ও ঝোঁক বিধবার প্রণয়লীলার দিকে, ইহা বেশ বুঝা যায়।

তৃতীয়তঃ, নগেন্দ্রনাথ-কুন্দনন্দিনীর, গোবিন্দলাল-রোহিণীর হৃদয়ে প্রণয়সঞ্চার হইবামাত্র তাঁহারা স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন, 'পবিত্র প্রেমে'র আবির্ভাবে কৃতার্থম্মন্য হইলেন, এবং

ইঁহাকে স্বর্গের দেবতা বলিয়া সাগ্রহে বরণ করিয়া লইলেন, বঙ্কিমচন্দ্র এভাবে তাঁহাদিগের চরিত্র অঙ্কন করেন নাই; প্রত্যুত, তাঁহারা এই আসক্তির সহিত প্রাণপণে যুঝিয়াছেন, হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, শেষে তাঁহারা প্রবৃত্তির নিকট পরাজিত হইয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন। যথাস্থানে ইহার বিবরণ দিব। ইহা হইতেও বঙ্কিমচন্দ্রের ঝোঁক ও তাঁহার কাব্যকলার উৎকর্ষ বুঝা যায়।

চতুর্থতঃ, এই অবৈধ প্রণয়ের বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট reticenceএর পরিচয় দিয়াছেন, সর্ব্বত্র ইঙ্গিতে সারিয়াছেন, কোথাও বর্ণনার আতিশয্য নাই, পাপের আভাসমাত্র দিয়া যবনিকাক্ষেপণ করিয়াছেন। ইহারও উদাহরণ যথাস্থানে দিব। হালের কতকগুলি অবৈধপ্রণয়ের বর্ণনাত্মক আখ্যানে যেরূপ চুম্বন-আলিঙ্গনের বাড়াবাড়ি দেখা যায়, তাহার সহিত তুলনা করিলে বুঝা যায়, এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের রুচি কত শুচি ছিল, কত সংযত ও শিষ্টাচার-সম্মত ছিল।

পঞ্চমতঃ, যে আখ্যায়িকাদ্বয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বিধবার অসংযমের, আদর্শচ্যুতির, অবৈধ প্রণয়ের, পরপুরুষে প্রসক্তির বর্ণনা করিয়াছেন, সে দুইখানিতেই তিনি বিপথগামিনী বিধবার প্রণয়লীলার শোচনীয় পরিণাম, পাপের প্রায়শ্চিত্ত বা প্রতিফল, মর্ম্মভেদী ভাবে ঘটাইয়াছেন। করুণায়, সমবেদনায়, তাঁহার হৃদয় (পাঠকের মতই) কাঁদিয়াছে, কিন্তু তিনি ধর্ম্মের ও নীতির তুলাদণ্ড দৃঢ়হস্তে ধরিয়া অসংযমের কঠোর শাস্তিবিধান করিয়াছেন। কুন্দর আত্মহত্যা ও রোহিণীর গোবিন্দলালের হস্তে মৃত্যু স্মরণীয়। ইহাই আধুনিক প্রতীচ্য অলঙ্কারশাস্ত্রের poetic justice; ইহাই প্রাচীন প্রতীচ্য অলঙ্কার-শাস্ত্রের Catharsis ('to purge the mind with pity and terror ..Aristotle); ইহাই কাব্যের সংশিক্ষা।

আমার এই সকল মন্তব্য বিচারসহ কিনা, তাহা আখ্যায়িকাদ্বয়ের আনুপূর্ব্বিক (detailed) আলোচনা করিয়া বুঝাইতেছি।

প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা-বিবাহ-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতাবলম্বী ছিলেন কি না, ইহা তাঁহার আখ্যায়িকাবলিতে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত বহু বাক্য হইতে অনুমান করা যায়। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ও অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহের অনুকূলে তুমুল আন্দোলন করিলেন, সংস্কৃতকলেজের ছাত্র ও জজ্-পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রথম বিধবাবিবাহ করিলেন, উভয়েই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত; আর ইংরেজী-নবিশ বঙ্কিমবাবু ইহার প্রতিকূল মত পোষণ করিতেন ইহা অদ্ভুত শুনায় বটে, কিন্তু ইহা stubborn fact অবিসংবাদী সত্য।

অবশ্য সূর্য্যমুখীর পত্রে যে কথাগুলি আছে—'আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে নাকি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?' 'বিষবৃক্ষ', ১১শ পরিচ্ছেদ।—ইহাতে যে ঝাঁজ ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি যে অশ্রদ্ধার ভাব আছে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজেরই মনোগত ভাব, এরূপ ভাবিলে গ্রন্থকারের প্রতি অবিচার করা হইবে, কেননা সূর্য্যমুখী পতিব্রতা সাধ্বী হিন্দুনারীর মতই কথা বলিয়াছেন* এবং তাঁহার নিজের স্বার্থহানি হইবার আশঙ্কায় তিনি এক্ষেত্রে উদ্‌বেজিত-চিত্ত। এ কথাগুলি তাঁহার মুখে যেমন খাপ খাইয়াছে, যেমন dramatic propriety হইয়াছে, তেমনই নগেন্দ্রনাথ যখন কুন্দকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মুখেও নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি খাপ খাইয়াছে।—'যদি কেহ বলে যে, বিধবা-বিবাহ হিন্দুধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িতে দিই। যেখানে তাদৃশ শাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় বলেন যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত, তখন কে ইহা অশাস্ত্র বলিবে?' ('বিষবৃক্ষ,' ২৫শ পরিচ্ছেদ।) সূর্য্যমুখী গরজে পড়িয়া এবং নিজের জ্ঞান-বিশ্বাস ও সংস্কার-মত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে 'মূর্খ' বলিয়াছেন, পক্ষান্তরে নগেন্দ্রনাথ গরজে পড়িয়া এবং নিজের জ্ঞান-বিশ্বাস ও শিক্ষামত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে 'শাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায়' বলিয়াছেন। আবার পতিপ্রাণা সূর্য্যমুখী যখন স্বামীর সুখের জন্য নিজের স্বার্থ বলি দিয়া কুন্দের সহিত স্বামীর বিবাহ দিতে উদ্‌যোগী হইলেন, তখন তিনিই উল্টা কথা বলিয়াছেন, 'বিধবাবিবাহ শাস্ত্রে আছে—তবে দোষ কি?' ('বিষবৃক্ষ,' ২৫শ পরিচ্ছেদ।) নগেন্দ্রের

---

* ইন্দিরার উক্তি তুলনীয়—'যাহারা বলে বিধবার বিবাহ দাও... তাহারা পতিভক্তিতত্ত্ব বুঝিবে কি?' (ইন্দিরা ১৬শ পরিচ্ছেদ।)

প্রতি গোপনে অনুরাগবতী কুন্দ 'বিধবার বিবাহ কি অশাস্ত্র ?' নগেন্দ্রের এই প্রশ্নে 'না' বলিয়াছে, ('বিষবৃক্ষ,' ১৬শ পরিচ্ছেদ), ইহাও তাহার মতি-গতির উপযুক্ত। যাহাহউক, নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখী-কুন্দর মতা-মত তাঁহাদেরই চরিত্রানুযায়ী, ইহা হইতে গ্রন্থকারের মতের আভাস পাওয়া যায় না।

কিন্তু তিনি যে রূপমোহে অন্ধ দেশদ্রোহী পশুপতি, রূপমোহে অন্ধ পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট নগেন্দ্রনাথ ও পিতৃদ্রোহী ধাপ্পাবাজ জালিয়াত হরলাল, * এই ত্রিমূর্ত্তিকে বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী করিয়া কল্পনা করিয়াছেন, ইহা হইতে পরোক্ষভাবে বেশ একটু আভাস পাওয়া যায় যে বিধবাবিবাহের প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা। 'রজনী'তে অমরনাথের মন বেশ সুস্থ নহে, সুতরাং 'বিধবার বিবাহ দাও' ('রজনী', ২য় খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ) প্রভৃতি অমরনাথের বাক্যে সমাজ-সংস্কারের প্রতি যে কটাক্ষ আছে, তাহা যে বঙ্কিমচন্দ্রেরই নিজের মত, ইহা না হয় নাই মানিলাম। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষে' অপদার্থ তারাচরণ ও ভ্রষ্টচরিত্র দেবেন্দ্রদত্ত-সম্বন্ধে নিজের জোবানী যে সব টিপ্পনী কাটিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার অভিমতের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। তারাচরণ বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিত ও মুখে বলিত 'খুড়ী জেঠাইয়ের বিবাহ দাও।' (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। আর দেবেন্দ্রবাবু 'দুই চারিটা কাওরা ও তিওরের বিধবা মেয়ের বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু সে বরকন্যার গুণে।' (১০ম পরিচ্ছেদ)। তারাচরণ ও দেবেন্দ্রবাবুকে (তথা 'রজনী'তে হীরালালকে) 'রিফর্ম্মার' সাজানতে বেশ বুঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র 'রিফর্ম্মার'-দিগকে কি চক্ষে দেখিতেন। যাক্ এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ ছাড়িয়া এক্ষণে প্রকৃত অনুসরণ করি।

উল্লিখিত আখ্যায়িকাদ্বয়ের মধ্যে 'বিষবৃক্ষ' অপরখানির পূর্ব্ববর্ত্তী এবং ইহাতে বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, অতএব এইখানির আলোচনাই অগ্রে কর্ত্তব্য।

প্রথমেই লক্ষ্য করিতে হইবে, বঙ্কিমচন্দ্র একেবারে যুবতী বিধবার অবৈধ প্রেমলীলা লইয়া আসরে নামেন নাই। নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দর হৃদয়ে যখন প্রথম প্রণয়-সঞ্চার হইয়াছে, তখন কুন্দ কুমারী, ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া বালিকা। নগেন্দ্রনাথ ঘটনাচক্রে যখন মুমূর্ষু পিতার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা 'অনিন্দিত-গৌরকান্তি স্নিগ্ধজ্যোতির্ম্ময়রূপিণী বালিকা' 'লোক-মনোমোহিনী বালিকা' কুন্দনন্দিনীকে দেখিলেন, তখনই তাঁহার হৃদয়ে প্রথমদর্শনে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হইল (২য় পরিচ্ছেদ)। কথাটা সেই মৃত্যুদৃশ্য-বর্ণনার সমকালে প্রকাশ করা অসমীচীন বলিয়া আখ্যায়িকাকার এই পরিচ্ছেদে ইহার উল্লেখ করেন নাই। (চতুর্থ পরিচ্ছেদে) বিপন্নার প্রতি করুণা ('Pity melts the mind to love'—'একই সূত্রে প্রেম করুণা গাথা') এই পূর্ব্বরাগকে আরও ঘোরালো করিয়াছে। তাহার পর, বিপন্নাকে আশ্রয় দিয়া নগেন্দ্রনাথ যখন বিশ্বাসপাত্র (confidante) বন্ধুবর হরদেব ঘোষালকে পত্র লিখিবার অবসর পাইলেন, তখন তিনি কুন্দ-সম্বন্ধে যে কথাগুলি লিখিলেন, একটু তলাইয়া দেখিলে সেই কথাগুলিতেই তাঁহার পূর্ব্বরাগের আভাস পাওয়া যায়। "বল দেখি, কোন্ বয়সে স্ত্রীলোক সুন্দরী ?...... কুন্দ নামে যে কন্যার পরিচয় দিলাম—তাহার বয়স তের বৎসর। তাহাকে দেখিয়া বোধ হয় যে, এই সৌন্দর্য্যের সময়। প্রথম যৌবনসঞ্চারের অব্যবহিত পূর্ব্বেই যেরূপ মাধুর্য্য এবং সরলতা থাকে, পরে তত থাকে না।... আমি সে চক্ষু দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হই।" ইত্যাদি। পত্রের শেষভাগে কুন্দর রূপবর্ণনায় নগেন্দ্রনাথ মস্‌গুল। (৫ম পরিচ্ছেদ)। 'প্রেমের কথা' পুস্তকে (৪১-৪২ পৃঃ) বুঝাইয়াছি, রূপমোহ পূর্ব্বরাগের প্রধান উপকরণ। এক্ষেত্রে নগেন্দ্রনাথ কুন্দর রূপবর্ণনায় যেরূপ মস্‌গুল তাহাতেই রোগটি ধরিতে পারা যায়। এই 'তের বৎসর বয়স' মহাজন-পদাবলীতে বর্ণিত 'বয়ঃসন্ধিকাল', 'শৈশব যৌবন দুহুঁ মিলি গেল'; এই বয়সকে প্রণয় inspire করার কাল ধার্য্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থাঃ' এই নীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন! নগেন্দ্রনাথ তখনও নিজের মনোভাব ঠিক বুঝিতে পারেন নাই, এ যে প্রণয়-অরুণোদয়ের উষা তাহা ঠিক প্রণিধান করিতে পারেন নাই, তাই সূর্য্যমুখীর ঠাট্টায় আখ্যায়িকা-কার সুকৌশলে ইহার ইঙ্গিত করিয়াছেন।—'একটি বালিকা কুড়াইয়া পাইয়া কি আমাকে ভুলিলে ? অনেক জিনিষের কাঁচারই আদর।...আর যদি কুন্দকে স্বয়ং বিবাহ করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাক, তবে বল, আমি বরণডালা সাজাইতে

* (কৃষ্ণকান্তের উইল, ১ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ)। হরলালের যেরূপ চরিত্র, তাহাতে সে প্রকৃতই বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী বলা চলে না, তাহার উদ্দেশ্য পিতাকে ও রোহিণীকে ধাপ্পা দেওয়া।

বসি।' (৫ম পরিচ্ছেদ)। ইহার Irony সফোক্লীস্-শেক্স্পীয়ারের অযোগ্য নহে।

এক্ষেত্রে দেখা গেল, পূর্ব্বরাগ যুবতী বিধবার সহিত নহে, কুমারীর সহিত; ইহাতে ভবিষ্যতে বিধবার সহিত অবৈধ প্রণয়ের অর্দ্ধেক দোষ কাটিয়া গেল।* অবশ্য আধুনিক রুচিতে বিবাহিত পুরুষের আবার প্রেমে পড়া নিন্দনীয় বটে, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে (ও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে) ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে (কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ধনপতি সদাগরের কথা স্মর্ত্তব্য), বঙ্কিমচন্দ্র এক্ষেত্রে স্বজাতির সাহিত্যের এই মামুলি প্রথারই অনুসরণ করিয়াছেন। ইংরেজের সামাজিক প্রথায় ইহা নিন্দনীয় ও বে-আইনী। কিন্তু আমাদের সামাজিক প্রথায় ইহা ততটা নিন্দনীয় নহে।

এই ত গেল নায়কের পূর্ব্বরাগ-সঞ্চারের বৃত্তান্ত। কিন্তু অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধান, 'আদৌ বাচ্যঃ স্ত্রিয়া রাগঃ'। বঙ্কিমচন্দ্র ইহার ব্যবস্থা করেন নাই কি? অবশ্য, আখ্যায়িকা-কার কুন্দর ধীর, শান্ত, সংযত চরিত্রের অনুযায়ী নীরব প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া যথেষ্ট চাপিয়া গিয়াছেন বটে, নায়কের হৃদয়ে পূর্ব্বরাগ-সঞ্চারের উপরই বেশী ঝোঁক দিয়াছেন। কিন্তু এই কুমারী-অবস্থায় পূর্ব্বরাগ-সঞ্চারের কথা একেবারে বাদ দেন নাই। 'প্রেমের কথা' পুস্তকে বলিয়াছি (২৬ পৃঃ), "কুন্দ স্বপ্নে মাতৃনির্দ্দিষ্ট পুরুষকে দেখিল, এই স্বপ্নে দর্শন পূর্ব্বরাগের সূত্রপাত নহে ত?" অবশ্য এরূপ পূর্ব্বরাগ সঞ্চার কুন্দর স্বপ্নদৃষ্টা মাতার অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত, কিন্তু প্রাচীন কবি বলিয়াছেন—'কো নাম পাকাভিমুখস্য জন্তু র্দ্বারাণি দৈবস্য পিধাতুমীষ্টে।' ইহাই যে তাহার অদৃষ্টের পরিণতি। মাতার নিষেধ সত্বেও সে 'ইহার দেবকান্ত রূপ দেখিয়া ভুলি'ল। (৩য় পরিচ্ছেদ।) তাই সে চাঁপাকে বলিল, 'সেই পুরুষের মত সুন্দর পুরুষ যেন কোথাও নাই। এমন রূপ কখনও দেখি নাই।' (৪র্থ পরিচ্ছেদ।) 'প্রেমের কথা' পুস্তকে বলিয়াছি (৪১-৪২ পৃঃ), পূর্ব্বরাগ রূপ-মোহেরই নামান্তর। ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত। ৪র্থ পরিচ্ছেদের নাম 'এই সেই' যেন কৃষ্ণলীলার কথা, শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের কথাই নূতন করিয়া স্মরণ করাইয়া দেয়।——'যে দেখেছি যমুনার তটে সেই দেখি এই চিত্রপটে।' নগেন্দ্রের প্রথম দর্শনে কুন্দ 'বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে বিমূঢ়ার ন্যায় নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল' (৪র্থ পরিচ্ছেদ), নগেন্দ্রের পত্রে 'সেই দুইটি চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে, কিছু বলে না' (৫ম পরিচ্ছেদ),—এ শুধু বিস্ময় নহে, রূপমোহ। ইহা 'স্বর্ণলতা'য় 'স্বর্ণর চক্ষু পুস্তকে নাই। তিনি একদৃষ্টে গোপালের মুখপানে চাহিয়া আছেন।' (৩২শ পরিচ্ছেদ) ইত্যাদির সহিত তুলনীয়। এই ভাবে বুঝিলে ৫ম পরিচ্ছেদের শেষ বাক্যের—গ্রন্থকারের উক্তির—'কেহ কেহ এমন পতঙ্গবৃত্ত যে জলন্ত বহ্নিরাশি দেখিয়াও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।'—পূর্ণ তাৎপর্য্য (full significance) ধরা যায়।

অনেকে হয় ত আমার এই মন্তব্য কষ্টকল্পনা, সমালোচকের উর্ব্বর-মস্তিষ্ক-প্রসূত, বলিয়া বসিবেন। কিন্তু আখ্যায়িকার পরবর্ত্তী অংশের দুইটি স্থল পাঠ করিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে আমার অনুমান ভিত্তিহীন নহে। 'বিবাহের অগ্রে, বাল্যকালাবধি কুন্দ নগেন্দ্রকে ভাল বাসিয়াছিল—কাহাকে বলে নাই, কেহ জানিতে পারে নাই।' (৪২ পরিচ্ছেদ)। 'যদি কেহ কাহাকে বাল্যকালে অকপটে আত্মসমর্পণ করিয়া, যেখানে অমূল্য হৃদয় দিয়াছিল,' ইত্যাদি। (৪৭শ পরিচ্ছেদ)। অতএব দেখা গেল, বঙ্কিমচন্দ্র এক্ষেত্রে যুবতী বিধবার হৃদয়ে প্রথম প্রণয়-সঞ্চারের কল্পনা করেন নাই, কুমারী-অবস্থায়ই কুন্দনন্দিনীর এই ভাবান্তর কল্পনা করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথের পূর্ব্বরাগ-সঞ্চারের প্রসঙ্গেও এ কথা বুঝাইয়াছি।

তাহার পর, কুন্দর বিবাহিত জীবনে আখ্যায়িকা-কার প্রেমিক-প্রেমিকাকে পরস্পরের সম্মুখীন করেন নাই, তাহাদের অন্যোন্যানুরাগের প্রসঙ্গ তোলেন নাই। ইহাও তাঁহার প্রকৃষ্ট রুচি ও আর্টের নিদর্শন।

কুন্দ বিধবা হইয়া নগেন্দ্রনাথের অন্তঃপুরচারিণী হইল। তখন সে ষোড়শী যুবতী, রূপ উছলাইয়া পড়িতেছে। 'এত দূরে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইল।' (৮ম পরিচ্ছেদ)।

* হালের অনেক আখ্যায়িকা-কার বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, অর্থাৎ যুবতী বিধবার কুমারী অবস্থা হইতেই নায়কের সহিত পূর্ব্বরাগের ও (বিবাহ-প্রস্তাবের) ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। যথা, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত', 'পল্লী-সমাজ', 'চন্দ্রনাথ'; শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'তপস্যার ফল' শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দোটানা' ইত্যাদি। হেমবাবুর 'হতাশের আক্ষেপ' স্মর্ত্তব্য।

সেই রূপদর্শনে নগেন্দ্রনাথের হৃদয়-নিহিত পূর্ব্বরাগ নূতন করিয়া জ্বালান হইল। ইহা যে রূপজ মোহ, পরে হরদেব ঘোষালের সহিত নগেন্দ্রনাথের পত্র-ব্যবহারে আখ্যায়িকা-কার তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়াছেন। আবার এখানেও 'Pity melts the mind to love', 'একই সূত্রে প্রেম করুণা গাঁথা।' পতিহীনার প্রতি করুণা এই ভালবাসার একটি উপাদান। 'তাহার বাল্য-বৈধব্য, অনাথিনীত্ব এই সকল লইয়া তাহার জন্য দুঃখ করিতেছিল।...তাঁহার চক্ষু জলে পূরিয়া গেল—তিনি সহসা দ্রুতবেগে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।' (১১শ পরিচ্ছেদ)। শুধু এই করুণাটুকুর প্রসঙ্গে বাল-বিধবার দুঃখমোচন-প্রয়াসী বিধবাবিবাহ-সংক্রান্ত আন্দোলনের প্রবর্ত্তক দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা মনে পড়ে। (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের দু'একটি ঘটনার কথা চৈত্রের প্রবন্ধে বলিয়াছি।—ভারতবর্ষ ১৩২৭ চৈত্র, ৪০৬ পৃঃ)। বিধবা-বিবাহের পক্ষে তর্ক করাতে ন্যায়-কচকচি ঠাকুরকে পুরস্কার দেওয়াতেও কুন্দর প্রতি নগেন্দ্রনাথের সমবেদনা পরিস্ফুট।

একাদশ পরিচ্ছেদে * নগেন্দ্রনাথের যুবতী বিধবা কুন্দর প্রতি রূপমোহের ইতিহাস আরম্ভ। ইহা অবৈধ প্রণয়, নিন্দনীয়, তজ্জন্য এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র কতটা সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা লক্ষণীয়।

প্রথমেই আখ্যায়িকা-কার নগেন্দ্রনাথ বা কুন্দনন্দিনীকে আসরে নামান নাই, অর্থাৎ প্রেমিক-প্রেমিকাকে prominence দেন নাই, সূর্য্যমুখীর পত্রের মারফত অবস্থাটা বর্ণনা করিয়াছেন। এই অবৈধ প্রণয়ে নায়কের ধর্ম্মপত্নী সূর্য্যমুখীরই সর্ব্বনাশ, ('সেই সৌন্দর্য্যই আমার কাল হইয়াছে', 'স্বামীর স্নেহে কুন্দনন্দিনী আমাকে বঞ্চিত করিতেছে'), তাই প্রথমেই আখ্যায়িকা-কার সূর্য্যমুখীর মারফত প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, সূর্য্যমুখীর দিকে পাঠকের সমবেদনার উদ্রেক করিয়াছেন, এই অবৈধ প্রণয়ের অনিষ্টকারিতার আভাস দিয়াছেন। পক্ষান্তরে, হালের বিধবা-সংক্রান্ত অনেক আখ্যায়িকায় প্রেমিক-প্রেমিকাকেই পূর্ণ prominence দেওয়া হয়, তাহাদিগের দিকে সমবেদনা-সঞ্চারের প্রবল প্রয়াস করা হয়। অতএব এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বিশিষ্টতা পরিদৃষ্ট হয়।

আবার এই পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি বিশিষ্টতা পরিদৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তী লেখকদিগের এই শ্রেণীর অনেক চিত্রে দেখা যাইবে, নায়ক-নায়িকা কোনও পক্ষেরই প্রবৃত্তির সহিত দ্বন্দ্বের, চিত্তজয়ের চেষ্টামাত্র নাই। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে নগেন্দ্রনাথ প্রথম হইতেই স্রোতে গা ঢালিয়া দেন নাই, এই রূপমোহের সহিত প্রাণপণে যুঝিতেছেন। সূর্য্যমুখীর পত্রে রূপ-মোহের কথা ও এই যুঝাযুঝির কথার ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ আছে। যথা, রূপ-মোহের কথা।—"কখন কখন অন্য মনে তাঁহার চক্ষু এদিক্ ওদিক্ চাহে কাহার সন্ধানে তাহা আমি কি বুঝিতে পারি না?...কাহার কণ্ঠের শব্দ শুনিবার জন্য, আহারের সময়, গ্রাস হাতে করিয়াও কাণ তুলিয়া থাকেন, তাহা কি বুঝিতে পারি না?...আবার কুন্দের স্বর কাণে গেলে তখনই বড় জোরে হাপুস হাপুস করিয়া ভাত খাইতে আরম্ভ করেন কেন, * তা কি বুঝিতে পারি না? আমার প্রাণাধিক সর্ব্বদা প্রসন্নবদন—এখন এত অন্যমনা কেন? এখন একজন নূতন দাসী রাখিয়াছি তাহার নাম কুমুদ। বাবু তাহাকে...কখন কখন কুমুদ বলিয়া ডাকিতে কুন্দ বলিয়া ফেলেন। আর কত অপ্রতিভ হন। অপ্রতিভ কেন?" (ইহারই আলঙ্কারিক নাম 'গোত্র স্খলন'।)

প্রবৃত্তির সহিত দ্বন্দ্বের কথা।—"তিনি ধর্ম্মাত্মা, শত্রুতেও তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক এখনও করিতে পারে না। আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই, তিনি প্রাণপণে আপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন। যেদিকে কুন্দনন্দিনী থাকে, সাধ্যানুসারে কখন সে দিকে নয়ন ফিরান না। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তাহার নাম মুখে আনেন না।" আবার (১৬শ পরিচ্ছেদে) নগেন্দ্রনাথের মুখের কথায়ও এই দ্বন্দ্বের ইতিহাস পাওয়া যায়।—"কি কষ্টে যে বাঁচিয়া আছি, তাহা বলিতে পারি না। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি। ইতর হইয়াছি। মদ খাই।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে খোদ আখ্যায়িকা-কার এই রূপ-মোহের ইতিহাস যোগাইয়াছেন। পরিচ্ছেদের নাম 'অঙ্কুর'—কেন

* বিধবার একাদশীর যন্ত্রণার কথা ভাবিয়াই কি গ্রন্থকার একাদশ পরিচ্ছেদে এই ইতিহাস আরম্ভ করিয়াছেন?

* মর্ম্মান্তিক কষ্টের ভিতরও এই চাপা বিদ্রূপের সুর উপভোগ্য, ইহা মেয়েলী বর্ণনায় স্বরূপটুকুর নিখুঁত চিত্র।

না এইখানে বিষবৃক্ষের অঙ্কুর। 'ক্রমে ক্রমে নগেন্দ্রের সকল চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। নির্ম্মল আকাশে মেঘ দেখা দিল; অকস্মাৎ সে চরিত্র মেঘাবৃত হইতে লাগিল।' শরীরভঙ্গ, 'নগেন্দ্র অত্যন্ত শীতল-স্বভাব ছিলেন। এখন কথায় কথায় রাগ।' সম্পত্তিরক্ষায় অমনোযোগ, (সীতারামের সহিত তুলনীয়) প্রজাপীড়ন, কুন্দকে ভুলিবার চেষ্টায় মদ্যপান, এই সমস্ত ব্যাপারে চরিত্র-পরিবর্ত্তনের পরিমাণ ও প্রকৃতি বুঝা যায়। তিনি অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ্ হরদেব ঘোষালকেও পূর্ব্বের মত পত্র লিখিয়া মনের কথা জানাইলেন না। (জানাইলেও বন্ধুর উপদেশ দেবেন্দ্র দত্তের প্রতি সুরেন্দ্রের উপদেশের মতই নিষ্ফল হইত।) হরদেব উপযাচক হইয়া পত্র লিখিলে তিনি নিজের উপর রাগ করিয়া উত্তর দিলেন, 'আমি অধঃপাতে যাইতেছি।'

১১শ ও ১২শ পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রনাথের প্রবৃত্তির সহিত দ্বন্দ্বের ইতিহাস পাওয়া যায়। এখনও রূপ-মোহ (infatuation) পূরাপূরি হয় নাই, সবে 'অঙ্কুর।'

এই পর্য্যন্ত গেল নায়কের মনের অবস্থার বিবরণ। ১৪শ পরিচ্ছেদে কমলমণির চেষ্টায় কুন্দর মনের অবস্থা জানা যাইবে। বঙ্কিমচন্দ্র এক্ষেত্রে 'আদৌ বাচ্যঃ স্ত্রিয়া রাগঃ' আলঙ্কারিকের এই নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিয়া সুবিবেচনার কার্য্যই করিয়াছেন। কেননা এই অবৈধ প্রণয়-ব্যাপারে কুন্দ অপেক্ষা নগেন্দ্রনাথের অপরাধ অনেক বেশী। কুন্দ স্থির ধীর, passive, নীরবে ভালবাসিয়াছিল, 'কাহাকে বলে নাই, কেহ জানিতে পারে নাই' (৪২শ পরিচ্ছেদ), নিজে উপযাচিকা হইয়া প্রেম-নিবেদন জানায় নাই। (হালের আখ্যায়িকা-কারদিগের রচনায় কোন কোন ক্ষেত্রে নায়িকাই বেশী 'Forward'!) সুতরাং এ ক্ষেত্রে নায়কের মোহের ইতিহাসের পূর্ব্বে কুন্দর হৃদয়ের পরিচয় দিলে কুন্দর শান্ত সংযত চরিত্রের সহিত অসঙ্গতি হইত, এবং আর্টের দোষ ঘটিত।

কমলমণি যখন সূর্য্যমুখীর 'কণ্টকোদ্ধারের জন্য কুন্দকে সঙ্গে লইতে চাহিলেন, তখন কুন্দ 'ঘাড় নাড়িল'—"যাব না।" তাহার এই অসম্মতিতেই তাহার হৃদয়ের অনুরাগ 'ধরা পড়িল।' (তাই পরিচ্ছেদের নাম—'ধরা পড়িল।') সে যাইতে চাহে না, নগেন্দ্রকে পাইবার আশা করে না, কিন্তু দর্শনসুখে বঞ্চিত হইতে চাহে না। কমলমণির সস্নেহ প্রশ্নে—'তুই দাদা বাবুকে বড় ভালবাসিস্—না?' 'কুন্দ উত্তর দিল না। কমলমণির হৃদয়-মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।' কুন্দর প্রণয় নীরব। আর সে শান্ত, সংযত-প্রকৃতি, (তাহার হিষ্টিরিয়ার ধাত নহে।) কিন্তু যখন কমলমণি তাহাকে বুঝাইলেন, সে থাকাতে 'সোণার সংসার ছারখার গেল', তখন সে 'অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিল—বালিকার ন্যায় বিবশা হইয়া কাঁদিল।' কিন্তু অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "যাব।" ইহাতে বুঝা গেল এই নীরব প্রেম কত গভীর, অথচ গ্রন্থকারের ভাষায়, 'কুন্দনন্দিনী পরের মঙ্গল-মন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলি দিল।...নগেন্দ্রকে ভুলিতে স্বীকৃত হইল।...আপনার মঙ্গল?...কুন্দনন্দিনী আপনার মঙ্গল বুঝিতে পারে না।' এই আত্মসুখবলিদানের সঙ্কল্প, এই চিত্তজয়ের চেষ্টা, কুন্দর চরিত্রে একটা মাধুর্য্যের, একটা ঔদার্য্যের বিকাশ করে। 'মানস ব্যভিচার' বলিয়া ধর্ম্মনীতিজ্ঞ নিন্দা করিলেও, কুন্দচরিত্রে একটা মাধুর্য্যের ও ঔদার্য্যের আভাস আছে, ইহা অস্বীকার করা চলে না—বিশেষতঃ পরবর্ত্তী আখ্যায়িকা-কারদিগের সৃষ্ট এই শ্রেণীর অনেক চরিত্রের তুলনায়।

পাষাণী

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

সেদিন লিখিতে গেনু শ্লেটেতে তোমার
আমার নামের যবে দুইটি অক্ষর,
'ন'—'না'—বলি রক্ত চক্ষে করি তিরস্কার
চাপিয়া ধরিলে মোর উর্দ্ধোত্থিত কর;
সে কি মূর্ত্তি। সে কি স্বর! সে কি ক্রুদ্ধ ভাষা
সে কি ভঙ্গী সুকঠোর, সে কি তীব্র বাণী!

সে কি তিক্ত হলাহল, মিটাতে পিপাসা,
ভরিয়া অধরে, মোর ওষ্ঠে দিল আনি!
যে ক'রেছে নিবেদন বিনা পরিচয়ে
সরবস্ব, চারি চক্ষু মিলিবার আগে,
তারে ব্যথা দিয়া সুখ পাও কি হৃদয়ে?
'দাও তবে, দিব বুক পাতি' অনুরাগে।

গানের ঝরণা

কথা—শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীইন্দিরা দেবী।

(১)

আজি, আমার প্রাণের গানের ঝরণা—
হের, ফুলে ফুলে ফুলে ফুটিয়া
যেন, তারার মতন ছুটিয়া
দূরে, আকাশে বাতাসে উঠিয়া
মরি, দিগ্‌দিগন্তে লুটিয়া
কিবা সুরভি সুষমা ছড়ায়ে
পড়ে, হাসিতে আলোতে গড়ায়ে
সুরে তানে লয়ে যেন ইন্দ্রজাল বরণা।

(২)

আজি, আমার ভারতী ছন্দে
নন্দন নন্দিতা নন্দে
নাচে প্রভাতে সাঁঝে নিশীথে
গ্রীষ্ম বসন্ত বরসা শীতে
বীণা বাঁশরী সেতারা ধ্বনিতে
প্রেম সোহাগ আদর বাণীতে
সুরে তানে মীড়ে মধু ঝঙ্কৃত চরণা।

(৩)

আমার, ভাব-বিহ্বলা কল্পনা
আজি, আপন সৌরভে মাতিয়া,
কত, আলোকে পুলকে ভাতিয়া,
যত, সুখ বেদনায় সরমে,
মরি, খুলিয়া ফুল্ল মরমে,
চলে, আকুল আবেগে উথলি
প্রাণে, চমকে বাসনা বিজুলি
সুরে তানে লয়ে মূর্চ্ছনা ভরণা।

(৪)

আমার ভাব-বিহ্বলা কল্পনা
কিবা, জাগরণে কিবা স্বপনে,
নিতি, চন্দ্র তারকা তপনে
বনে, কাননে তুষারে সলিলে
যত, মানব দানব নিখিলে,
ধীরে, ফুটায়ে প্রীতি করুণা
নব, যৌবন রাগ অরুণা—
সুরে তানে গানে দুঃখ তাপ-হরণা।

মা পা II ধা র্সা ণা | ধা পা মা I গা রা রা | রমা -পমা পা I পধা -া -া |
আ জি আ মা র প্রা ণে র গা নে র ঝ ০ র ণা ০ ০

-া II মা পা I ধা র্সা র্সা | ণা ধা পা I মা গা রা | -া সা সা I সরা রা -া |
০ হে র ফু লে ফু লে ফু লে ফু টি য়া ০ যে ন তা রার্ ০

সা সা -া I ণ্া ণ্া ধ্া | -া ধা ধ্া I র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা I র্সা না র্সা |
ম তন ০ ছু টি য়া ০ দূ রে আ কা শে বা তা সে উ ঠি য়া

-া র্সা ণা I র্সা র্রা র্রা | র্সা ণা র্সা I ণা ণা ধা | -া ধা ধা I র্রা গা মা |
০ ম রি দি গ্ দি গ ০ ন্তে লু টি য়া ০ কি বা সু র ভি

পা ধা ধা I ধা ধা ধা | -া ধা ধা I ধা ণা ধা | পা পা পা I মা মা-গা I
সু ষ মা ছ ড়া য়ে ০ প ড়ে হা সি তে০ আ লো তে গ ড়া য়ে

-া গা গা I সা সা সা | সা সা সা I রা গা মা I পা মা পা I পধা -া -া | -া মা পা II
সু রে তা নে ল য়ে যে ন ই ন্দ্র জা ল ব র ণা ০ ০ ০ "আজি"

মা মা I মা মা মা | মা মা পা I পা ধা ধা | -া মা পা I ধা র্সা র্সা |
আ জি আ মা র ভা র তী ছ ০ ন্দে ০ ন ০ ন্দ ন ন

-মা মা পা I পা ধা ধা | -া ধা ধা I ধা র্রা র্রা | র্রা -র্জ্ঞা র্রা I র্সা র্না র্সা |
০ ন্দি তা ন ০ ন্দে ০ না চে প্র ভা তে সাঁ ০ ঝে নি শী থে

ণা ধা ধা I ধা ণা -া | ণা ণা ণা I ধা পা ধা | -া ধা ধা I ধা ণা ধা |
গ্রী ০ ষ্ম ব স ০ ন্ত ব র্ ষা শী তে ০ বী ণা বাঁ শ রী

পা পা পা I পা পা পা | -মা মা মা I গা গা গা | গা গা-গা I গা গা গা |
সে তা রা ধ্ব নি তে ০ প্রে ম সো হা গ আ দ র বা ণী তে

-সা সা সা I সা সা সা | সা সা সা I রা রা মা | পা মা পা I পা -ধা -া II
০ সু রে তা নে মী ড়ে ম ধু ঝ ০ ঙ্কৃ ত চ র ণা ০ ০

-া সা সা I সা -া সা | ন্সা -রগা -া I রা সা -া | সন্া -সা ন্া I ধ্া -া -া |
০ আ মার ভা ০ ব বি ০ ০ হ্বা লা ০ ক ০ ল্প না ০ ০

-া ধ্া ধ্া I ধ্া রা রা | রা রা রা I রা রা রা | -া রা রা I
০ আ জি আ প ন সৌ র ভে মা তি য়া ০ ক ত

রা গা মা | রা গা মগা I রা সন্া সা | -া সা সা I সা সা সা |
আ লো কে পু ল কে ভা ত্তি য়া ০ য ত সু খ বে

সা সা -া I সা ন্া ৰসা | -া ণ্া ণ্া I ণ্া ণ্া ণ্া | ণ্া -া ণ্া I ধ্া প্া ধ্া |
দ নায় ৪ স র মে ০ ম রি খু লি য়া ফু ০ ল্ল ম র নে

-া ধ্া ধ্া I ধ্া মা গা | গা গা গা I গা গা গা | -া গা গা I গা মা পা |
০ চ লে আ কু ল আ বে গে উ থ লি ০ প্রা ণে চ ম কে

গা মপা মগা I ৰগা গা রা | -া রা রা I রা -গা মা | গা রা -া I
বা স না বি জু লি ০ সু রে তা ০ নে ল য়ে ০

রা -গা মা | গা মা পা I পা -ধা -া | -া সা সা I সা -া সা |
মূ ০ র্চ্ছ না ভ র ণা ০ ০ ০ আ মার ভা ০ ব

ন্সা -রগা -া I রা সা -া | সণ্া -সা ণ্া I ধ্া -া -া | -া মা মা I সমা মা মা |
বি ০ ০ হ্ব লা ০ ক ০ ল্ল না ০ ০ ০ কি বা জা গ র

মা মা পা I পা ধা ধা | -া মা পা I ধা -র্সা র্সা | মা পা ধা I
ণে কি বা স্ব প নে ০ নি তি চ ০ ন্দ্র তা র কা

ধর্সা ণা ধা | -া ধা ধা I ধা র্রা র্রা | র্রা র্জ্জা র্রা I র্সা না র্সা | -া ণা ধা I
ত প নে ০ ব নে কা ন নে তু ষা রে স লি লে ০ য ত

ধা ণা ণা | ণা ণা ণা I ধা পা ধা | -া ধা ধা I ধা ণা ধা | পা -া পা I
মা ন ব দা ন ব নি খি লে ০ ধী রে ফু টা য়ে প্রী ০ তি

পা পা পা | -মা মা মা I গা -া গা | গা গা গা I গা গা গা | -সা সা সা I
ক রু ণা ০ ন ব যৌ ০ ব ন রা গ অ রু ণা ০ সু রে

সা -া সা | সা -া সা I রা গা মা | পা মা পা I পা -ধা -া | -া সা রা II
তা ০ নে গা ০ নে হু খ তা প হ র ণা ০ ০ ০ "আজি"

শ্রীকান্তর ভ্রমণ-কাহিনী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(৭)

আপনাকে আপনি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, যে কয়টি নারী-চরিত্র আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছে, তাহার একটি সেই কুশারী মহাশয়ের বিদ্রোহী ভ্রাতৃ-জায়া। এই সুদীর্ঘ জীবনে সুনন্দাকে আমি আজও ভুলি নাই। মানুষকে এত শীঘ্র এবং এত সহজে রাজলক্ষ্মী আপনার করিয়া লইতে পারে, যে, সুনন্দা যে একদিন আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিয়াছিল তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। না হইলে এই আশ্চর্য্য মেয়েটিকে জানিবার সুযোগ আমার কখনও ঘটিতনা। অধ্যাপক যদু তর্কালঙ্কারের ভাঙা-চোরা দু তিন খানি ঘর আমাদের বাড়ীর পশ্চিমে মাঠের একপ্রান্তে চাহিলেই সোজা চোখে পড়ে, এখানে আসিয়া পর্য্যন্তই পড়িয়াছে, কেবল এক বিদ্রোহিনী যে ওইখানে তার স্বামি-পুত্র লইয়া বাসা বাঁধিয়াছে ইহাই জানিতামনা। বাঁশের পুল পার হইয়া একটা কঠিন অনুর্ব্বর মাঠের উপর দিয়া মিনিট দশেকের পথ ; মাঝখানে গাছপালা প্রায় কিছুই নাই, অনেক দূর পর্য্যন্ত বেশ স্পষ্টই দেখা যায়। আজ সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া জানালার মধ্যে দিয়া যখন ওই জীর্ণ শ্রীহীন ঘরগুলি চোখে পড়িল, তখন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব ব্যথা ও আগ্রহের সহিত চাহিয়া রহিলাম। এবং যে বস্তু অনেকদিন অনেক উপলক্ষ্যে দেখিয়াও বার বার ভুলিয়াছি, সেই কথাই মনে পড়িল যে, সংসারে কোন-কিছুরই কেবল-মাত্র বাহিরটা দেখিয়া কিছুই বলিবার যো নাই। কে বলিবে ওই পোড়ো বাড়ীটা শিয়াল কুকুরের আশ্রয়স্থল নহে ? কে অনুমান করিবে, ওই কয়খানা ভাঙা ঘরের মধ্যে কুমার-রঘু-শকুন্তলা-মেঘদূতের অধ্যাপনা চলে, হয়ত স্মৃতি ও ন্যায়ের মীমাংসা ও বিচার লইয়া ছাত্র পরিবৃত এক নবীন অধ্যাপক মগ্ন হইয়া থাকেন! কে জানিবে উহারই মধ্যে এই বাঙ্‌লা দেশের এক তরুণী নারী ধর্ম্ম ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রাখিতে স্বেচ্ছায় অশেষ দুঃখ বহন করিতেছে! দক্ষিণের জানালা দিয়া বাটীর মধ্যে দৃষ্টি পড়ায় মনে হইল উঠানের উপর কি যেন একটা হইতেছে,—রতন আপত্তি করিতেছে এবং রাজলক্ষ্মী তাহা খণ্ডন করিতেছে। সুতরাং কণ্ঠস্বরটা তাহারই কিছু প্রবল। আমি উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে কিছু অপ্রতিভ হইয়া গেল। কহিল, ঘুম ভেঙে গেল বুঝি? যাবেই ত। রতন, তুই গলাটা একটু খাটো কর্ বাবা, নইলে আমিও আর পারিনে।

এই প্রকার অনুযোগ এবং অভিযোগে কেবল রতনই একা নয়, বাড়ীশুদ্ধ সকলেই আমরা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম, অতএব, সেও যেমন চুপ করিয়া রহিল, আমিও তেম্‌নি কথা কহিলামনা। দেখিলাম একটা বড় চাঙারীতে চাল-ডাল-ঘি-তেল প্রভৃতি, এবং আর একটা ছোট পাত্রে এতজ্জাতীয় নানাবিধ ভোজ্যবস্তু সজ্জিত হইয়াছে ; মনে হইল এইগুলির পরিমাণ ও তাহাদিগকে বহন করিবার শক্তি-সামর্থ্য প্রসঙ্গেই রতন প্রতিবাদ করিতেছিল। ঠিক তাই। রাজলক্ষ্মী আমাকে মধ্যস্থ মানিয়া বলিল, শোন এর কথা। এই ক'টা চাল-ডাল আর বয়ে নিয়ে যেতে পারবেনা! এ যে আমি নিয়ে যেতে পারি রতন! এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া স্বচ্ছন্দে বড় ঝুড়িটা তুলিয়া ধরিল।

বাস্তবিক, ভার হিসাবে মানুষের পক্ষে, এমন কি রতনের পক্ষেও এগুলি বহিয়া লইয়া যাওয়া কঠিন ছিলনা, কিন্তু কঠিন ছিল আর একটা কাজ। ইহাতে তাহার মর্য্যাদা হানি হইবে, কিন্তু মনিবের কাছে লজ্জায় এই কথাটাই সে স্বীকার করিতে পারিতেছিলনা ; আমি তাহার মুখের পানে চাহিয়া অত্যন্ত সহজেই এ কথাটা বুঝিতে পারিলাম। হাসিয়া কহিলাম, তোমার যথেষ্ট লোকজন আছে, প্রজারও অভাব নেই,—তাদের কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও, রতন না হয় খালি হাতে সঙ্গে যাক্।

রতন অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল, রাজলক্ষ্মী একবার আমার ও একবার তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিজেও হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, হতভাগা আধঘণ্টা ধরে ঝগড়া

করলে, তবু বল্‌লেনা যে মা, ও সব ছোট কাজ রতন-বাবুর নয়। যা' কাউকে ডেকে আন্‌গে।

সে চলিয়া গেলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সকালে উঠেই এ সব যে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, মানুষের খাবার জিনিস সকালেই পাঠাতে হয়।

কিন্তু কোথায় পাঠানো হচ্চে? এবং তার হেতু?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হেতু মানুষে খাবে। এবং, যাচ্চে বামুন বাড়ীতে।

কহিলাম, বামুনটি কে?

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, বোধ হয় ভাবিল নামটা বলিবে কি না। কিন্তু পরক্ষণেই কহিল, দিয়ে বল্‌তে নেই, পুণ্যি কমে যায়। যাও, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে এস,—তোমার চা তৈরি হয়ে গেছে।

আমি আর কোন প্রশ্ন না করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম।

বেলা বোধ হয় তখন দশটা, বাহিরের ঘরে তক্তপোষের উপর বসিয়া কাজের অভাবে একখানা পুরানো সাপ্তাহিক কাগজের বিজ্ঞাপন পড়িতেছিলাম, একটা অচেনা কণ্ঠস্বরের সম্ভাষণে মুখ তুলিয়া দেখিলাম, আগন্তুক অপরিচিতই বটে। কহিলেন, নমস্কার বাবু মশায়।

আমিও হাত তুলিয়া প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলাম, বসুন।

ব্রাহ্মণের অতিশয় দীন বেশ, পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই, শুধু একখানি মলিন উত্তরীয়। পরিধানের বস্ত্রখানিও তেমনি মলিন, উপরন্তু দু'তিন স্থান গ্রন্থি বাঁধা। পল্লীগ্রামে ভদ্র ব্যক্তির আচ্ছাদনের দীনতা বিস্ময়ের বস্তুও নয়, কেবল মাত্র ইহার উপরেই তাঁহার সাংসারিক অবস্থা অনুমান করাও চলেনা। তিনি সম্মুখের বাঁশের মোড়াটার উপর উপবেশন করিয়া কহিলেন, আমি আপনার একজন দরিদ্র প্রজা,—ইতিপূর্ব্বেই আমার আসা কর্ত্তব্য ছিল,—ভারি ত্রুটি হয়ে গেছে।

আমাকে জমিদার মনে করিয়া কেহ আলাপ করিতে আসিলে আমি মনেমনে যেমন লজ্জিত হইতাম, তেমনি বিরক্ত হইতাম; বিশেষতঃ, ইহারা যে সকল নিবেদন ও আবেদন লইয়া উপস্থিত হইত, এবং যে সকল বদ্ধমূল উৎপাত ও অত্যাচারের প্রতিবিধান প্রার্থনা করিত তাহাতে আমার কোন হাতই ছিলনা। ইঁহার প্রতিও প্রসন্ন হইতে পারিলাম-না, কহিলাম, বিলম্বে আসার জন্যে আপনি দুঃখিত হবেননা, কারণ, কোনদিন না এলেও আমি ত্রুটি নিতামনা,—ও-রকম আমার স্বভাব নয়। কিন্তু আপনার প্রয়োজন?

ব্রাহ্মণ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, অসময়ে এসে আপনার কাজে হয়ত ব্যাঘাত করলাম, আমি আর একদিন আস্‌ব, এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আমি বিরক্ত হইয়া কহিলাম, আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন বলুন?

আমার বিরক্তিটা তিনি অনায়াসেই লক্ষ্য করিলেন। একটু মৌন থাকিয়া শান্ত ভাবে বলিলেন, আমি সামান্য ব্যক্তি, প্রয়োজনও যৎসামান্য। মা ঠাকরুণ আমাকে স্মরণ করেছেন, হয়ত তাঁর আবশ্যক থাক্‌তে পারে—আমার কিছু নেই।

জবাবটা কঠোর কিন্তু সত্য। এবং আমার প্রশ্নের তুলনায় অসঙ্গতও নয়; কিন্তু এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত নাকি এরূপ জবাব শুনাইবার কেহ লোক ছিলনা, তাই ব্রাহ্মণের প্রত্যুত্তরে কেবল বিস্ময়াপন্ন নয়, সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম। অথচ, মেজাজ আমার স্বভাবতঃ রুক্ষও নয়, অন্যত্র কোথাও এ কথায় কিছু মনেও হইতনা। কিন্তু ঐশ্বর্য্যের ক্ষমতা জিনিসটা এতই বিশ্রী যে সেটা পরের ধার করা হইলেও তাহার অপব্যবহারের প্রলোভন মানুষে সহজে কাটাইয়া উঠিতে পারেনা। অতএব, অপেক্ষাকৃত ঢের বেশি রূঢ় উত্তরই হঠাৎ মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ঝাঁজটা তার উৎক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বেই দেখিলাম পাশের দরজাটা খুলিয়া গেল, এবং রাজলক্ষ্মী তাহার পূজার আসন হইতে অসমাপ্ত আহ্নিক ফেলিয়া রাখিয়াই উঠিয়া আসিল। দূর হইতে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া কহিল, এরই মধ্যে উঠ্‌বেননা, আপনি বসুন। আপনার কাছে আমার অনেক কথা আছে।

ব্রাহ্মণ পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, মা, আপনি ত আমার সংসারের অনেক দিনের দুশ্চিন্তা দূর করে দিলেন,—এতে প্রায় আমাদের পোনর দিনের খাওয়া চলে যাবে। কিন্তু সম্প্রতি ত অকাল চল্‌চে, ব্রত-নিয়ম কিছুরই দিন নেই। ব্রাহ্মণী আশ্চর্য্য হয়ে তাই জিজ্ঞাসা করছিলেন—

রাজলক্ষ্মী সহাস্যে কহিল, আপনার ব্রাহ্মণী কেবল বার-ব্রতর দিনক্ষণগুলোই শিখে রেখেছেন, কিন্তু প্রতিবেশীর

তত্ত্ব নেবার কালাকাল বিচারটা আমার কাছে শিখে যেতে বলে দেবেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, এতবড় সিধেটা কি তাহলে মা—

প্রশ্নটা তিনি শেষ করিতে পারিলেননা, অথবা ইচ্ছা করিয়াই করিলেননা, কিন্তু আমি এই দাম্ভিক ব্রাহ্মণের অনুক্ত বাক্যের মর্ম্মটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিলাম। কিন্তু ভয় হইল আমারই মত না বুঝিয়া রাজলক্ষ্মীও হয়ত একটা শক্ত কথা শুনিবে। লোকটির একদিকের পরিচয় এখনও অজ্ঞাত থাকিলে আর একদিকের পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম, সুতরাং এমন ইচ্ছা হইলনা যে আমারই সম্মুখে আবার তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটে। শুধু একটা সাহস এই ছিল যে কেহ কোনদিন মুখোমুখি রাজলক্ষ্মীকে নিরুত্তর করিয়া দিতে পারিতনা। ঠিক তাহাই হইল। এই বিশ্রী প্রশ্নটাকে সে অত্যন্ত সহজে পাশ কাটাইয়া গিয়া হাসিয়া বলিল, তর্কালঙ্কার মশাই, শুনেচি আপনার ব্রাহ্মণী ভারি রাগী মানুষ,—বিনা নিমন্ত্রণে গিয়ে পড়লে হয়ত চটে যাবেন, না হলে এ কথার জবাব তাঁকেই দিয়ে আসতাম।

এতক্ষণে বুঝিলাম ইনিই যদুনাথ কুশারী। অধ্যাপক মানুষ, প্রিয়তমার মেজাজের উল্লেখে নিজের মেজাজ হারাইয়া ফেলিলেন; হাঃ হাঃ করিয়া উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়া প্রসন্ন চিত্তে বলিলেন, না মা, রাগী হবে কেন, নিতান্তই সোজা মানুষ। আমরা দরিদ্র, আপনি গেলে ত তার উপযুক্ত সম্মান করতে পারবনা, তিনিই আস্‌বেন। একটু সময় পেলে আমিই তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব।

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, তর্কালঙ্কার মশাই, আপনার ছাত্র ক'টি?

কুশারী বলিলেন, পাঁচটি। এ দেশে বেশি ছাত্র ত পাবার যো নেই,—অধ্যাপনা কেবল নাম মাত্র।

সব ক'টিকেই খেতে পরতে দিতে হয়?

না। বিজয় ত দাদার ওখানেই থাকে, একটির বাড়ী গ্রামের মধ্যেই; কেবল তিনটি ছাত্র আমার কাছে থাকে। রাজলক্ষ্মী একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া, অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, এই দুঃসময়ে এ তো সহজ নয় তর্কালঙ্কার মশাই! ঠিক এই কণ্ঠস্বরেরই প্রয়োজন ছিল। না হইলে অভিমানী অধ্যাপকের উত্তপ্ত হইয়া উঠার কিছুমাত্র বাধা ছিলনা। অথচ, এবার তাঁহার মনটা একেবারে ও-দিক দিয়াই গেলনা। অতি সহজেই গৃহের দুঃখ দৈন্য স্বীকার করিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, কি করে যে চলে সে কেবল আমরা দুটি প্রাণীই জানি। কিন্তু তবু ত ভগবানের উদয়াস্ত আটকে থাকেনা মা! তাছাড়া উপায়ই বা কি? অধ্যয়ন অধ্যাপনা ত ব্রাহ্মণেরই কাজ। আচার্য্য দেবের কাছে যা' পেয়েছি, সে ত কেবল ন্যস্তধন,—আর একদিন সে ত ফিরিয়ে দিতেই হবে মা। একটু স্থির থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, একদিন এই ভার ছিল দেশের ভূস্বামীর উপর, কিন্তু এখন দিন কাল সমস্তই বদ্‌লে গেছে। সে অধিকারও তাঁদের নেই, সে দায়িত্বও গেছে। প্রজার রক্ত শোষণ করা ছাড়া আর তাঁদের কোন করণীয় নেই। তাঁদের ভূস্বামী বলে মনে করতেই এখন ঘৃণা বোধ হয়।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, কিন্তু এদের মধ্যে কেউ যদি কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়, তাতে যেন আবার বাধা দেবেননা!

কুশারী লজ্জা পাইয়া নিজেও হাসিলেন, কহিলেন, বিমনা হয়ে আপনার কথাটা আমি মনেই করিনি। কিন্তু বাধা দেব কেন? সত্যই ত এ আপনাদেরই কর্ত্তব্য।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমরা পূজা-আচ্ছা করি, কিন্তু একটা মন্তরও হয়ত শুদ্ধ আবৃত্তি করতে পারিনে,—এও কিন্তু আপনার কর্ত্তব্য, তা স্মরণ করিয়ে দিচ্চি।

কুশারী হাসিয়া বলিলেন, তাই হবে মা। এই বলিয়া তিনি বেলার দিকে চাহিয়া উঠিয়া পড়িলেন। রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল, যাইবার সময় আমিও কোন মতে একটা নমস্কার সারিয়া লইলাম।

তিনি চলিয়া গেলে রাজলক্ষ্মী কহিল, আজ তোমাকে একটু সকাল সকাল নাওয়া খাওয়া সেরে নিতে হবে।

কেন বল ত?

দুপুর বেলা একবার সুনন্দার বাড়ীতে যেতে হবে।

একটু বিস্মিত হইয়া কহিলাম, কিন্তু আমাকে কেন? তোমার বাহন রতন আছে ত?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া বলিল, ও বাহনে আর কুলোবে না। তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে আর কোথাও আমি এক পাও নড়চিনে।

বলিলাম, আচ্ছা, তাই হবে।

মধুসূদনের কবিতায় দেশীয় ভাব

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম]

মধুসূদনের কবিতা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথার অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। মধুসূদনের কবিতা-রচনার প্রারম্ভ সময় হইতে এ যাবৎ তাঁহার কবিতা সম্বন্ধে বহু সমালোচকের নানা মতামত প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক পণ্ডিতের মতে, তাঁহারা কবিতায় বিজাতীয় ভাবের আধিক্য, এবং স্বদেশী ভাবের অল্পতা পরিলক্ষিত হয়। অনেকের মতে, তিনি বিজাতীয় ভাবকে স্বদেশীয় পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছেন। অনেক প্রবীণ সমালোচক, যাঁহারা পূর্ব্বে মধুসূদনের কবিতায় স্বদেশী ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার পরবর্ত্তী কালে তাঁহার কবিতায় বিজাতীয় ভাব উপলব্ধি করেন। আবার অনেকে পূর্ব্বে বিদেশী ভাব লক্ষ্য করিয়া, শেষে স্বদেশী ভাব দেখিয়া চমৎকৃত হন। প্রকৃত প্রস্তাবে একবার মাত্র পাঠ করিয়া, মধুসূদনের কবিতা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বিষম সমস্যা; কারণ, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, নানা দেশীয় মহাকবিদিগের কাব্যোদ্যান হইতে নানা উৎকৃষ্ট পুষ্পের মধু আহরণ করিয়া, তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন;—এবং সেই সকল কবির ভাব ও চিন্তা যে কোন-না-কোন আকারে তাঁহার কাব্য মধ্যে পরিলক্ষিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৈশোরে তিনি ইংরেজী ও পারসী,—প্রথম-যৌবনে গ্রীক, লাটিন, হিব্রু, এবং মান্দ্রাজে অবস্থান কালে তেলেগু ও তামিল ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি যখন ইংরেজি কবিতা ও ইংরেজী নাট্য-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কবিতায় হাফেজ, হোমর এবং ভার্জিল প্রভৃতির প্রভাব বিশেষ রূপে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। মান্দ্রাজে রচিত তাঁহার কতকগুলি ইংরেজী কবিতায় তেলেগু ও তামিল কবিতার ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় এ ভাব কেহ সহসা ধরিতে পারেন নাই; কারণ, বাঙ্গালার মধ্যে তেলেগু ও তামিল ভাষা অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি পরিজ্ঞাত আছেন। আমিও এ কথা জানিতাম না; সম্প্রতি বিশাখা-পত্তনে অবস্থান-কালে, জনৈক শিক্ষিত তেলেগু সম্পাদকের সহিত মধুসূদনের বিষয় আলোচিত হওয়ায়, এ বিষয়টি অবগত হইয়াছি। মধুসূদন যে আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, সে কথা আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। আরবী ভাষায় কোরাণে যে স্বর্গের বর্ণনা আছে, মধুসূদনের কাব্যে তাহার ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে। সে কথা ডাক্তার সিদ্দিকী মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞতা বশতঃ কোন বঙ্গীয় সমালোচকই এ কথা ধরিতে পারেন নাই। অথচ, উক্ত স্বর্গের বর্ণনায় যে কি ভাবের আধিক্য আছে, তাহা না জানিয়া, উহার সম্বন্ধে বহু মতামত অভিব্যক্ত হইয়াছে। মধুসূদনের নরক-বর্ণনা সম্বন্ধেও বহু মতদ্বৈধ লক্ষিত হইয়া থাকে। একবার হাইকোর্টের কোন প্রসিদ্ধ উকীল মধুসূদনকে জিজ্ঞাসা করেন যে,—'এই বর্ণনাটি আপনি মিল্টন হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, এ কথাটি ঠিক কি না?' মধুসূদন হাসিয়া বলেন, "ঐ বর্ণনাটি মিল্টন যে স্থান হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, আমিও সেই স্থান হইতে গ্রহণ করিয়াছি। এই দেখুন,—" বলিয়া তিনি দান্তের কবিতার কতকাংশের আবৃত্তি করিয়া বুঝাইয়া দিলে, উকীল মহাশয় চমৎকৃত হ'ন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, এই বিজাতীয় ভাবের নরক-বর্ণনা দেশীয় ভাবের আধিক্যে পরিপূর্ণ। বস্তুতঃ, এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, মধুসূদনের কবিতা পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথাও বলা যায় না যে, তাঁহার কবিতা সম্পূর্ণরূপে বিদেশী ভাবানুপ্রাণিত। প্রকৃতই যদি তাঁহার কবিতা বিদেশীয় ভাবে পূর্ণ হইত, তাহা হইলে উহা কখনই বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী আসন প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইত না। জাতীয় কবিতাই জাতীয় সাহিত্যে স্থায়ী হইয়া থাকে। জাতীয়তার অভাব থাকিলে, যতই উৎকৃষ্ট কবিতা হউক না কেন, কালে ধীরে-ধীরে তাহা লোপ পাইয়া থাকে। প্রকৃত কবিত্ব থাকিলেও, সে কবিতায় যদি জাতীয়তার চিহ্নসমূহের অভাব থাকে, সময় তাহাকে অপসারিত করিয়া দিবেই; ইহাতে কোন সংশয়ই নাই। মধুসূদন তাঁহার কবিতায় জাতীয় ভাব ত প্রদান করিয়াছেনই; পরন্তু, তাঁহার কবিতায় মৌলিকতা পূর্ণ

প্রকটিত। শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের সমালোচনা কালে লিখিয়াছিলেন যে,—whatever passes through the crucible of the author's mind, receives an original shape." স্বর্গীয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ওই মতের পূর্ণ সমর্থন করিয়াছিলেন। মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা-কালে রাজনারায়ণবাবু লিখিয়াছিলেন, "তাঁহার কাব্যে ইয়োরোপ ও আসিয়ার মহাকবিদিগের অনুকরণের প্রাচুর্য্য দেখা যায় সত্য বটে, কিন্তু তিনি যাহার অনুকরণ করিয়াছেন, তাহাকে নূতন বেশে সুশোভিত করিয়াছেন; এ প্রকার অনুকরণ দূষণীয় হইলে মিল্টনের ন্যায় কবিও বহু নিন্দার্হ হয়েন। দত্তজ মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছেন, কেবল ইহা দ্বারাই তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই কাব্যের প্রধান গৌরব এই যে, ইহার হিন্দু আকার প্রায় সকল স্থানে রক্ষিত হইয়াছে, অথচ সকল স্থানে ইয়োরোপীয় বিশুদ্ধ রুচি প্রদর্শিত হইয়াছে।" মৌলিকত্বে ও দেশীয় ভাবের প্রাধান্যে মধুসূদনের কবিতা বাঙ্গলা ভাষায় অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র মেঘনাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন;—"Mr. Dutta owes a great deal more to Valmiki than the mere story. But, nevertheless, the poem is his own work from beginning to end."

মধুসূদনের রচনার সম্বন্ধেও বিস্তর মতভেদ ও মত-পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। যিনি আজ তাঁহার রচনাকে শ্রুতি-কঠোর বলিতেছেন, তিনিই আবার কাল তাহাকে প্রাঞ্জল ও শ্রুতি-মধুর বলিতেছেন। রাজনারায়ণ বসু ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকারই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। মধুসূদনের গ্রন্থ ও রচনা সম্বন্ধে ইঁহারা পূর্ব্বে যে মত পরিব্যক্ত করেন, পরবর্ত্তী সময়ে আবার সে মতের প্রত্যাহার বা পরিবর্ত্তন করেন। ইহাতেই সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণ হইতেছে যে, কবির গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা বা আলোচনা না করিয়া, হঠাৎ কোন মতামত প্রদান করা সমীচীন নহে। উহা বিশেষ রূপে অধ্যয়ন এবং আলোচনা করিয়া করাই কর্ত্তব্য। তাঁহার কাব্যের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া, আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, জাতীয়তা-রক্ষা ও মৌলিকতা তাঁহার রচনার বিশেষ ও প্রধান গুণ। ঐ দুইটি গুণের সমবায়ে তাঁহার কবিত্বপূর্ণ সৌন্দর্য্যময়ী ও ওজোগুণ সম্পন্ন কবিতা বাঙ্গালী পাঠকের নিকটে এতাদৃশ চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

মধুসূদনের বীরাঙ্গনা ও ব্রজাঙ্গনা কাব্যে জাতীয় ভাব কতদূর পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা পাঠক মাত্রেই অবগত হইয়াছেন। মধুসূদনের চরিত লেখক মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে ঐ দুইখানি অতুল্য কাব্যের সবিশেষ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মধুসূদনের বীরাঙ্গনার রুক্মিণীর পত্রিকা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "রুক্মিণী পত্রিকায় ভাগবত-বর্ণিত সে সকল ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে, কবি তাহার এরূপ হৃদয়গ্রাহী ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, পাঠ করিলে মনে হয়, যেন কোন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ভক্তেরই রচনা পাঠ করিতেছি। তবেই দেখুন, জাতীয় ভাবের অবতার মধুসূদনকে বিজাতীয় ভাবের নিয়ামক বিবেচনা করা যে কতদূর অসঙ্গত ও ভ্রমাত্মক, তাহা বলা যায় না।

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে মধুসূদনের জাতীয় ভাব পূর্ণ প্রকটিত। এই কবিতাবলী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, স্বদেশী কবিতার ভাবে তিনি কতদূর পর্য্যন্ত অনুপ্রাণিত ও নিমগ্ন ছিলেন। এই গ্রন্থে 'বঙ্গভাষা' 'কমলে-কামিনী' 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' 'বউ কথা কও' 'দোদোল' 'শ্রীপঞ্চমী' 'আশ্বিন মাস' 'বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির' 'বটবৃক্ষ' 'সীতাদেবী' 'মহাভারত' 'সরস্বতী' 'কপোতাক্ষ নদ' 'ঈশ্বরীপাটনী' 'বিজয়া দশমী' 'কোজাগর লক্ষ্মী পূজা' প্রভৃতি শীর্ষক কবিতা-সমূহ পাঠ করিলে, কে বলিবেন যে, পাশ্চাত্যভাবানুপ্রাণিত খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী মাইকেলের দ্বারা এই সব রচিত হইয়াছিল! আর লিখিত হইয়াছিল কোথায়? সেই প্রাচ্যভাব-বিমণ্ডিত সভ্যতার উজ্জ্বল-আড়ম্বর পূর্ণ ইয়োরোপে—ফ্রান্স দেশে! দেশের নিমিত্ত প্রগাঢ় অনুরাগ হৃদয়ে নিহিত না থাকিলে, ঐরূপ স্থানে উপরিউক্ত বিষয় সম্বন্ধে কবিতা রচনা করা প্রকৃত পক্ষে আদৌ সম্ভবপর নহে। এ সম্বন্ধে 'সাহিত্য'-সম্পাদক যথার্থই লিখিয়াছিলেন;—"পরধর্ম্মাশ্রিত, স্ব-সমাজচ্যুত, পরসমাজভুক্ত মাইকেল, সর্ব্ব প্রকারে বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবন-পরিধির বহির্ভূত হইয়াও, কোন্ গুণে,

—কোন্ অধিকারে, কিসের প্রভাবে বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে লাভ আছে। ব্যথিত পিতার মত যে হিন্দুসমাজ ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে উরগক্ষত অঙ্গুলীর ন্যায় স্বধর্ম্মত্যাগী মধুসূদনকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, মাইকেল মধুসূদন কোন্ শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই ক্রুদ্ধ সমাজের রুদ্ধ দ্বার ভাঙ্গিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া গড়ুরের মত সমগ্র জাতির প্রেমামৃত হরণ করিয়াছিলেন ?” যে শক্তির দ্বারা মধুসূদন অসাধ্য সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে শক্তি তাঁহার হৃদয়ের বিশ্বব্যাপিনী সহানুভূতি ও স্বদেশানুরাগ।

আর একটি কথা। মধুসূদনের বাহ্যিক আচার-ব্যবহারে পূর্ণ পাশ্চাত্য ভাব পরিলক্ষিত হইলেও তিনি জাতীয় ভাবের পূর্ণ অনুকূলতা প্রদর্শন করিতেন। তিনি জাতীয় আহার্য্যের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন; এবং স্বদেশের প্রত্যেক বস্তুর মুক্তকণ্ঠে গুণ কীর্ত্তন করিতেন। কোন নগরে তাঁহার অভিনন্দন-সভায় তত্রত্য অধিবাসীরা তাঁহার বৈদেশিক পরিচ্ছদের সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, “বন্ধুগণ! আমার বৈদেশিক পরিচ্ছদের জন্য, আপনাদিগকে দুঃখিত হইতে হইবে না; আমার কোট বুট যদি, কোনদিন, সাহেব হইয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়, তবে একবার একখানি দর্পণের দিকে চাহিলেই আমার সে ভ্রম দূর হইবে, আমার বর্ণই আমার জাতি স্মরণ করাইয়া দিবে।” যোগীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, “আহার-ব্যবহারে সাহেবী রীতির অনুকরণ করিলেও, মধুসূদন সাহেব-উপাসক ছিলেন না। একবার তিনি ব্যারিষ্টারী উপলক্ষে এক সবর্ডিনেট জজের আদালতে উপস্থিত হইয়াছিলেন; দেশীয় জজের নিকট উকীল মহাশয়েরা অত্যন্ত অশিষ্ট ব্যবহার করিতেছিলেন; কিন্তু জজ-সাহেবকে দেখিবামাত্র একেবারে সঙ্কুচিত ও তটস্থ প্রায় হইলেন। মধুসূদন ঠিক ইহার বিপরীত ব্যবহার করিলেন; জজ-সাহেবের অপেক্ষা তিনি সবর্ডিনেট জজকে অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং অশিষ্ট উকীল মহাশয়দিগকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন,—“ইনি দেশীয় জজ, ইঁহার সম্মানেই আমাদের সম্মান; ইঁহারই প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন আপনাদিগের কর্ত্তব্য।” স্বদেশের ও স্বজাতির সম্বন্ধে মধুসূদনের মনের ভাব কিরূপ ছিল, তাঁহার এইরূপ ব্যবহার হইতেই তাহা প্রতীয়মান হইবে।

পুস্তক-পরিচয়

রাজা-বাদ্‌শা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য বার আনা

প্রতিষ্ঠাভাজন ঐতিহাসিক শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের পাঠক-পাঠিকাগণের সুপরিচিত। তাঁহার লেখনী-প্রসূত বহু ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়া পাঠক-পাঠিকাগণের চিত্ত-বিনোদন করিয়াছে। তাঁহার সরল, সুন্দর, পুষ্পিত ভাষা ঐতিহাসিক প্রবন্ধে উপন্যাসের মাধুর্য্য ঢালিয়া দিয়া ইতিহাসের নীরস ভাষার প্রতি পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে। ব্রজেন্দ্রনাথের এই শক্তি ‘রাজা-বাদ্‌শা’র রচনায় ষোল আনা বিকাশলাভ করিয়াছে। ‘রাজা বাদ্‌শা’ গল্পের বহি। ব্রজেন্দ্রনাথ আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের জন্য এই গল্পগুলি লিখিয়াছেন; ভারতবর্ষের মোগল-যুগের ইতিহাস হইতে এই গল্পগুলির উপাদান সংগৃহীত। ছেলে-মেয়েদের আমোদিত করিবার জন্য ‘একাধিক সহস্র রজনী’ হইতে কাল্পনিক রাজা-বাদ্‌শার কাহিনী আহরণ না করিয়া তিনি যে আমাদের দেশের ইতিহাস হইতে সত্যকার রাজা-বাদ্‌শার কর্ম্ম-জীবনের কাহিনী আহরণ করিয়া ছেলেমেয়েদের মনের মতন করিয়া লিখিয়াছেন, এজন্য তিনি তাহাদের অভিভাবকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইহা পাঠে তাহারা রস পাইবে, আমোদ পাইবে, ইতিহাসের অনেক কথা জানিতে পারিবে; এবং আশা করি ইতিহাসের প্রতি তরুণ চিত্ত আকৃষ্ট হইবে। এক সঙ্গে আমোদ ও শিক্ষাদানের উপযোগী এমন বই আমাদের অফুরন্ত গল্পের ভাণ্ডারেও বড়ই দুর্লভ মনে হয়। ‘রাজা-বাদ্‌শা’তে মুসলমান আমোলের সাতটি গল্প আছে। প্রত্যেক গল্পই সচিত্র; ছবিগুলি সুন্দর, মনোমুগ্ধকর। সাতটি গল্পই বেশ আমোদজনক হইয়াছে; বাছা-বাছা গল্প, কোনটিরই নিন্দা করিবার যো নাই, তবে ‘ভিস্তি-বাদ্‌শা’ ও ‘সেয়ানে-সেয়ানে’ সবচেয়ে আমাদের ভাল লাগিল। ব্রজেন্দ্রনাথের আর একটু বাহাদুরী, তিনি রাজা-বাদ্‌শাদের মুখের কথার ভিতর দিয়া তাঁহাদের চরিত্র চমৎকার ফুটাইয়াছেন; রাণী দুর্গাবতী, শিবাজী, আওরংজীব্ প্রভৃতিকে ঠিক চিনিতে পারা যায়। কেতাবকে বাঘের মতন ভয় করে, এমন ছেলেও ‘রাজা-বাদ্‌শা’ পাইয়া বহিখানি শেষ না করিয়া খেলা করিতে যায় নাই, ইহা নিজের চোখে দেখিয়াছি। আর, ইহাই পুস্তকখানির সবচেয়ে বড় ‘সার্টিফিকেট’ নহে কি?

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

গৃহ-কল্যাণী

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল বি-এ প্রণীত, মূল্য আট আনা

এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌সের আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার একষষ্টিতম গ্রন্থ। লেখক গল্প-সাহিত্যক্ষেত্রে নবীন নহেন; তাঁহার অনেকগুলি গল্প ইতোপূর্ব্বে নানা মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই 'গৃহ-কল্যাণী' ছোট উপন্যাস হইলেও ইহাতে গার্হস্থ্য চিত্র অতি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। দয়াল, ও শরৎ, এই দুইটী চিত্র বেশ ফুটিয়াছে; কিরণ চরিত্রের মাধুর্য্য বড়ই উপভোগ্য। প্রফুল্ল বাবুর এই বইখানি পাঠকগণের নিকট যথেষ্ট আদর লাভ করিবে।

সুরের হাওয়া

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু বি-এস-সি প্রণীত, মূল্য আট আনা

'সুরের হাওয়া' উপরিউক্ত সংস্করণের দ্বাষষ্টিতম গ্রন্থ। আমরা এই নবীন লেখকের বিশেষ পক্ষপাতী; ইঁহার কয়েকটী গল্প 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছে এবং সেগুলি যথেষ্ট প্রশংসাও লাভ করিয়াছে। প্রফুল্ল বাবুর একটী প্রধান গুণ এই যে, তিনি কবির লেখনী লইয়া গল্প লেখেন; যে কথাটী যেমন করিয়া বলিলে হৃদয় স্পর্শ করে, তাঁহার লেখনী মুখে ঠিক সেই কথাটাই আসিয়া পড়ে; তাঁহার লেখায় কোন প্রকার কৃত্রিমতা, কোনপ্রকার কষ্ট-কল্পনা নাই; একজন নবীন লেখকের পক্ষে ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে; 'সুরের হাওয়া'তেও তাহার প্রমাণ বিদ্যমান। আমরা সকলকেই এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি; আমাদের বিশ্বাস, প্রফুল্লবাবুর অঙ্কিত 'অরুণিমা' চরিত্র সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

প্রতিভা

বরদাকান্ত সেন-গুপ্ত প্রণীত, মূল্য আট আনা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌সের আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার ত্রিষষ্টিতম গ্রন্থ এই 'প্রতিভা'। এই উপন্যাসখানি অতি ক্ষুদ্র হইলেও, লেখক তাঁহার বক্তব্য বেশ গোছাইয়া বলিয়াছেন, কোন প্রকার আড়ম্বর করেন নাই। এই উপন্যাসের নায়িকা প্রতিভার চরিত্র বেশ অঙ্কিত হইয়াছে; গুণেন্দ্রকেও আমাদের ভাল লাগিল। লেখকের কল্পনা-কৌশলের প্রশংসা করিতে হয়। গল্পের ভাষা বেশ ঝরঝরে।

আত্রেয়ী

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত বি-এল্ প্রণীত, মূল্য আট আনা

এখানি আট-আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার চতুঃষষ্টি গ্রন্থ। গ্রন্থকার এই গল্পটী আগাগোড়া একটী অতি উচ্চ সুরে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, তাই ইহার কোন স্থানে আড়ষ্ট ভাব লক্ষিত হয় না। কি নবীন মজুমদার, কি এই উপন্যাসের প্রাণ 'আত্রেয়ী' কোন চরিত্রই নরম হইতে পায় নাই; বক্তব্য বিষয় এমন সোজা করিয়া, এমন প্রাণ খুলিয়া বলা বিশেষ যোগ্যতার পরিচায়ক। আমরা এই গল্পটী পড়িয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিয়াছি, পাঠকগণও করিবেন।

জাতক

রায় সাহেব শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ এম-এ কর্ত্তৃক অনূদিত,
মূল্য পাঁচ টাকা

প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে পরম শ্রদ্ধাস্পদ ঈশান বাবুর 'জাতকের' প্রথম খণ্ডের পরিচয় প্রদানের সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল; আমরা সেই সময় হইতেই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম; এতদিনে আমাদের সে আশা পূর্ণ হইল। এই দ্বিতীয় খণ্ড পড়িয়া দেখিলাম, ইহা প্রথম খণ্ড হইতেও মনোরম। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই সম্পৎ বৃদ্ধি করিয়া ঈশান বাবু বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। জাতকগুলি যে কতদূর শিক্ষাপ্রদ, তাহা আর বলিতে হইবে না। ঈশান বাবু এই দ্বিতীয় খণ্ডের যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এই ভূমিকা পাঠ করিয়া বৌদ্ধ-দর্শন সম্বন্ধে অনেক শিক্ষা লাভ করিলাম। তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত, সুলেখক সাহিত্য-রথীর অনুবাদের আর কি পরিচয় প্রদান করিব? এই জাতকখানির বাঙ্গালী পাঠকসমাজে বিশেষ আদর লাভ করা বাঞ্ছনীয়। পুস্তকখানির মূল্য পাঁচ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে; এত বড় পুস্তক, এমন ভাল কাগজে ছাপা, এমন সুন্দর বাঁধাই আজকালকার দিনে পাঁচ টাকাতেও দেওয়া যায় না। ঈশান বাবু জাতকের তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ করিয়াছেন, এ শুভ সংবাদও আমরা বঙ্গীয় পাঠকগণকে প্রদান করিলাম।

ষ্টেফানস্ নির্ম্মলেন্দু ঘোষ

লক্ষ্মীপ্রসাদ চৌধুরী সঙ্কলিত, মূল্য লেখা নাই

যাহার জীবন-কথা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সে বালক ছিল; যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই ভগবানের বিধানে সে এ পারের খেলা শেষ করিয়া পরপারে চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু এই অল্প কয়েক দিনের জন্যই সংসারোদ্যানে ফুটিয়া নির্ম্মলেন্দু যে সৌরভ বিতরণ করিয়া গিয়াছে, ছাত্র-জীবনের যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছে, তাহা আমাদের ছাত্রগণের অনুকরণীয়। নির্ম্মলেন্দু খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল; কিন্তু এই অল্প বয়সেই তাহার ধর্ম্মানুরাগ সাম্প্রদায়িক গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছিল। এমন নির্ম্মল-চরিত্র বালকের জীবন-কথা ছাত্রগণের অবশ্য পাঠ্য। আমরা এই জীবন-কথা পাঠ করিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম, বালকের নির্ম্মলেন্দু নাম সত্যসত্যই সার্থক হইয়াছিল।

বঙ্গ গৌরব—সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশরৎকুমার রায় প্রণীত, মূল্য আট আনা

বঙ্গ গৌরব সার গুরুদাসের পবিত্র জীবন-কথা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শরৎবাবু এই মহৎ জীবনের ঘটনাবলি এমন সরল ও সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, পড়িলে আশ্চর্য্য বোধ হয়; এমন অল্লায়তন পুস্তকের মধ্যে সার গুরুদাসের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের সমস্ত ঘটনাবলির বর্ণনা বিশেষ ক্ষমতার পরিচায়ক। শরৎবাবু সমস্ত কথাই বেশ গোছাইয়া বলিয়াছেন। ক্ষুদ্র হইলেও পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ।

সূচনা

শ্রীমনোরঞ্জন দাস গুপ্ত প্রণীত, মূল্য আট আনা

এখানি কবিতা পুস্তক। নানা বিষয়িণী অনেকগুলি ছোট ছোট কবিতা এই পুস্তকে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। কবিতাগুলি বেশ সরস ও সুন্দর; লেখকের শব্দ-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে হয়; বিষয়-নির্ব্বাচনও সুন্দর হইয়াছে। তিনি বইখানির নাম 'সূচনা' দিয়াছেন; তাঁহার এই সূচনা দেখিয়াই আমরা বুঝিয়াছি, তিনি সর্ব্বথা কবি নামের যোগ্য।

পাঞ্জাব-কাহিনী

শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু প্রণীত, মূল্য ছয় আনা

কিছুদিন পূর্ব্বে পঞ্জাবে যে অভিনয় হইয়া গেল, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অল্প দিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ ফুরাইয়া গিয়াছে, এখানি দ্বিতীয় সংস্করণ; সুতরাং ইহা যে পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা আর বলিতে হইবে না।

কানের দুল

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা।

এখানি কয়েকটী ছোট গল্পের মালা। গল্প কয়েকটীর লেখক বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত, সুধী, মনস্বী শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র। ইহাতে সাতটী ছোট গল্প আছে; সবগুলিই 'ভারতবর্ষ' ও 'মানসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পগুলির পরিচয় দিবার কি কোন প্রয়োজন আছে? শ্রীমান্ খগেন্দ্রের নামেই গল্পের পরিচয়। তাঁহার 'নীলাম্বরী'র 'বাঁশী চোর' গল্প যে এখনও আমাদের কণ্ঠস্থ রহিয়াছে; সেই কৃতী লেখক এতদিন পরে এই 'কানের দুল' লইয়া সাহিত্য-সমাজে উপস্থিত হইয়াছেন। অলঙ্কার হিসাবে 'দুল' অতি ছোট অলঙ্কার, ইহা অলঙ্কার-শাস্ত্রে প্রবীণা মহিলাগণ অবশ্যই বলিবেন; কিন্তু যত বহুমূল্য অলঙ্কারেই সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত হউক না কেন, কানে কিছু না থাকিলে সবই বেমানান হয়; তাই অলঙ্কার-শিল্পী এই 'কানের দুল' লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন; এবং আমাদের বিশ্বাস এ দুল ছোট অলঙ্কার হইলেও ইহার মধ্য হইতে বহুমূল্য হীরা জহরতের যে জলুস বাহির হইয়াছে, তাহাতে অনেক অলঙ্কার ছাড়াইয়া ইহারই দিকে অলঙ্কার-প্রিয়া মহিলাগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

সমর্পণ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত, মূল্য দুই টাকা।

সুলেখক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ অতি অল্প দিনের মধ্যেই যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন; তাঁহার 'স্মৃতি-মন্দির' তাঁহার 'বৈজ্ঞানিকের বিকৃত বুদ্ধি' যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে; বর্ত্তমান উপন্যাসখানিও তাঁহার যশঃ অক্ষুণ্ণ রাখিবে। সুরেন্দ্রবাবু এই উপন্যাসে যে কয়েকটী চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন, সে সবগুলিই বেশ ফুটিয়াছে; অনিল ও ধনঞ্জয় বাবুর চরিত্র চিত্রণ অতি সুন্দর হইয়াছে। সুরেন্দ্র বাবুর ভাষা ও রচনা-কৌশল উপন্যাসের সম্পূর্ণ উপযোগী; তিনি কোন কারণেই গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধি করিবার জন্য ভাষাকে ফেনাইয়া তোলেন না। আমরা এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি; উপন্যাসের আখ্যান-ভাগের পরিকল্পনাও সুন্দর হইয়াছে।

রেখাঙ্কন

শ্রীননীগোপাল গোস্বামী চিত্রকলা-বিনোদ প্রণীত, মূল্য আট আনা

এখানি অঙ্কন-তত্ত্ব বিষয়ক ক্ষুদ্র পুস্তিকা। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে অঙ্কন বিদ্যা সম্বন্ধে প্রথম শিক্ষার্থীর জ্ঞাতব্য সমস্ত কথাই ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। লেখক একজন বিখ্যাত চিত্রকর; তিনি হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার উপদেশ যে বিশেষ ফলপ্রদ হইবে, তাহা না বলিলেও চলে। এক্ষণে চিত্রাঙ্কন-বিদ্যার দিকে অনেক শিক্ষার্থীর মন আকৃষ্ট হইয়াছে; এই বইখানি তাঁহাদের বিশেষ উপকারে লাগিবে।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ প্রণীত ॥• সংস্করণের ৬৪ সংখ্যক গ্রন্থ 'পাখীর কথা' প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'গহনার বাক্স' প্রকাশিত হইল। মূল্য সাত সিকা।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা'র সচিত্র রাজসংস্করণ প্রকাশিত হইল। মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্ত প্রণীত 'স্বর মূর্চ্ছনা' প্রকাশিত হইল। মূল্য নয় সিকা।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত 'কেদার বদরীর পথে প্রকাশিত' হইল। মূল্য দেড় টাকা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ প্রণীত 'পাগলা-ঝোড়া'র পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দুইটী নূতন প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য দুই টাকা।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্য লহরী সিরিজের 'বেদের ভেলকী' ও 'ফিরিঙ্গীর প্রতিহিংসা' প্রকাশিত হইল। মূল্য প্রত্যেকখানি বারো আনা।

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু প্রণীত 'মহাত্মা গান্ধীর চরিত্র মহিমা' প্রকাশিত হইল। মূল্য চারি আনা।

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু বি-এ বার-এট-ল প্রণীত নূতন সচিত্র নাটক 'পুণ্ডরীক' প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works.

শ্মশান—দাহ-অন্তে

শিল্পী—শ্রীবিপিনচন্দ্র দে

Emerald Ptg. Works. [Blocks by • BHARATVARSHA HALFTONE WORKS.

আশ্বিন, ১৩২৮

প্রথম খণ্ড] নবম বর্ষ [চতুর্থ সংখ্যা

গীতায় পুরুষোত্তম-তত্ত্ব

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ]

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,

> দ্বাবিমৌপুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
> ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
> উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
> যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥

এখানে ভগবান ত্রিবিধ পুরুষের উল্লেখ করিলেন, (১) ক্ষর, (২) অক্ষর ও (৩) উত্তম। এই ক্ষর, অক্ষর এবং উত্তম পুরুষ কি? শঙ্করাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ক্ষর শব্দের অর্থ "সমস্তং বিকারজাতং"; অক্ষর শব্দের অর্থ "ভগবতো মায়াশক্তিঃ" এবং উত্তম পুরুষ শব্দের অর্থ ঈশ্বর। অর্থাৎ ব্রহ্মই উত্তম পুরুষ; ব্রহ্মের শক্তি বা মায়া অক্ষর, এবং মায়া-রচিত যাবতীয় জড়-পদার্থ সমষ্টি ক্ষর। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধে আপত্তি এই যে, গীতার শ্লোকে ক্ষর এবং অক্ষর উভয়কে "পুরুষ" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা অনুসারে তাহারা পুরুষ-শব্দ-বাচ্য হইতে পারে না। পুরুষ ও প্রকৃতি কাহাকে বলে, তাহা গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,

> "কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
> পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥

১৩ অধ্যায় ২০ শ্লোক।

জগতে যে প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন হইতেছে, কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহার হেতু প্রকৃতি; যাহা সুখ-

দুঃখের ভোক্তা তাহা পুরুষ (পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুংক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ১৩।২১)। ক্ষর শব্দের অর্থ যদি "সমস্ত বিকারজাত" হয়, তাহা হইলে তাহাকে পুরুষ বলা যায় না ; কারণ, "বিকারজাত"—যথা মানবের দেহ, বৃক্ষলতাদির দেহ, মৃত্তিকা, প্রস্তর—ইহারা জড় পদার্থ, ইহাদের চৈতন্য নাই,—সুখ-দুঃখ কিরূপে ভোগ করিবে? মায়াশক্তি যদি অচেতন হয়, তাহা হইলে তাহাকেও পুরুষ বলা যায় না; এ কারণে, শঙ্করাচার্য্য যে অক্ষর পুরুষ অর্থে ভগবানের মায়াশক্তি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যায় উক্তরূপ আপত্তি উঠিতে পারে—বোধ হয় ইহাই আশঙ্কা করিয়া, মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন, যে, বিকারজাত এবং মায়াশক্তি—ইহারা পুরুষের উপাধি হয়েন বলিয়া পুরুষ-শব্দবাচ্য হইয়াছেন। অর্থাৎ ক্ষর এবং অক্ষর ইঁহারা পুরুষ নহেন, পুরুষের উপাধি। কিন্তু এ ব্যাখ্যাও সন্তোষজনক বোধ হয় না ; কারণ ভগবান গীতায় স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন যে, ইঁহারা পুরুষ। ভগবান ইহা বলেন নাই যে, ইঁহারা পুরুষ নহেন, পুরুষের উপাধি—এজন্য পুরুষ বলিয়া ভ্রম হয়। পরন্তু ক্ষর এবং অক্ষর যদি পুরুষ না হন, তাহা হইলে ভগবানের পুরুষোত্তম সংজ্ঞা অযৌক্তিক হয়। বহু পুরুষের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁহারই পুরুষোত্তম সংজ্ঞা যুক্তিযুক্ত। পুরুষ যদি এক হন, তাহা হইলে তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলা সার্থক হয় না। (১)

শ্রীধর স্বামী অদ্বৈত-মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, ক্ষর শব্দের অর্থ জড়পদার্থ সমষ্টি ; কিন্তু অক্ষর শব্দের অর্থ জীবাত্মা। অক্ষর শব্দের তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাকে পুরুষ বলা যায় বটে, কিন্তু ক্ষর শব্দের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাকে পুরুষ বলা যায় না। সুতরাং শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বলা যায় যে, যদি ক্ষর শব্দের ব্যাখ্যা পুরুষ-সংজ্ঞানুযায়ী না হয়, তাহা হইলে অক্ষর শব্দের ব্যাখ্যাও পুরুষ-সংজ্ঞানুযায়ী না হইলে ক্ষতি কি? অতএব, শঙ্করাচার্য্য এবং শ্রীধর স্বামী ক্ষর এবং অক্ষরের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—তাঁহাদের কাহারও ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হয় নাই। না হইবারই কথা ; কারণ, গীতা এ স্থানে তিন প্রকার পুরুষের উল্লেখ করিয়াছেন, (ক্ষর, অক্ষর এবং উত্তম) ; কিন্তু অদ্বৈত মতে পুরুষ এক (যেহেতু, এই মতে ব্রহ্মই চেতন পদার্থ, অপর সকল পদার্থ অচেতন), এবং বিশিষ্টাদ্বৈত মতে পুরুষ দুই প্রকার (জীবাত্মা ও পরমাত্মা)। সুতরাং, এতদুভয় মতের সহিত গীতার পুরুষত্রয়বাদের সামঞ্জস্য করা কঠিন।

আমাদের মনে হয়, ক্ষর পুরুষের অর্থ জীবাত্মাসমূহ। গীতার শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, "ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি"। এখানে ভূত শব্দের অর্থ, যাবতীয় সচেতন প্রাণিসমূহ ; কারণ, চেতন পদার্থ না হইলে তাহাকে পুরুষ বলা যায় না। ভূত শব্দ প্রাণী অর্থে সচরাচর ব্যবহৃত হয়, যথা "সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান।" গীতাতেও এই অর্থে নানা স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন, "অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ।" ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "অধিভূতং প্রাণিজাতং অধিকৃত্য ভবতি।" অতএব, এখানে শঙ্করাচার্য্য ভূত শব্দের অর্থ প্রাণী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আপত্তি হইতে পারে যে, ক্ষর শব্দের অর্থ বিনাশশীল, "ক্ষরতীতি ক্ষরঃ" ; জড় পদার্থসমূহ বিনাশশীল ; এ জন্য তাহাদিগকে ক্ষর বলা যুক্তিসঙ্গত ; কিন্তু সুখদুঃখের ভোক্তা সচেতন প্রাণী বা জীবাত্মাকে কি করিয়া ক্ষর বা বিনাশশীল বলা যায়? অষ্টম অধ্যায়ের ঊনবিংশ শ্লোকে এই সমস্যার মীমাংসা পাওয়া যায়—

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥

"একই ভূতসমষ্টি বারবার উৎপন্ন হইয়া (ব্রহ্মার) রাত্রি হইলে অবশ হইয়া (ব্রহ্মাতে) বিলীন হইয়া যায় ; পুনরায় (ব্রহ্মার) দিবাগমে উৎপন্ন হয়।" এই শ্লোকে জড় পদার্থ-সমূহকে লক্ষ্য করিয়া ভূত শব্দের ব্যবহার হয় নাই ; সচেতন প্রাণীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ; কারণ, অচেতন পদার্থ সম্বন্ধে অবশ শব্দের প্রয়োগ সার্থক হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ক্ষর পুরুষ হইতেছে নিখিল প্রাণিসমূহ বা জীবাত্মাসমূহ। ইহারা সুখদুঃখের ভোক্তা সচেতন পদার্থ। প্রলয়ের সময় ইহাদের ধ্বংস হয় এবং সৃষ্টির সময় উৎপত্তি হয় ; এ জন্য এই পুরুষ-সমষ্টিকে ক্ষর বা বিনাশশীল পুরুষ বলা

---

(১) গীতার মতে পুরুষ বহু ; কারণ, গীতা বলিয়াছেন,
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুংক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্ যোনিজন্মসু ॥ ১৩।২১
সুতরাং বিভিন্ন যোনিতে বিভিন্ন পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে জ্যৈষ্ঠের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত "গীতার অদ্বৈতবাদ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে। অতঃপর দেখা যাউক, অক্ষর পুরুষ শব্দে গীতা কাহাকে নির্দ্দেশ করিতেছেন। অক্ষরের ব্যাখ্যা করিবার সময় গীতা বলিয়াছেন "কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে",—কূটস্থকে অক্ষর বলা হয়। কূটস্থ শব্দের দুই রকম ব্যাখ্যা করা হয়। কূট অর্থাৎ পর্ব্বত-শৃঙ্গের ন্যায় নির্ব্বিকার ভাবে যাহা অবস্থান করে, তাহাকে কূটস্থ বলা যায়; অথবা, কূট অর্থাৎ মায়া বা বঞ্চনা,—যাহা বঞ্চনাপূর্ব্বক অবস্থান করে তাহা কূটস্থ। এখানে কূটস্থ শব্দের প্রথম অর্থটি গ্রহণীয় বলিয়া বোধ হয়; কারণ, অক্ষর শব্দের অর্থের সহিত "শৈল-শৃঙ্গের ন্যায় নির্ব্বিকার" এই অর্থের সমধিক সামঞ্জস্য আছে। অক্ষর এবং কূটস্থ—অবিনাশী এবং নির্ব্বিকার,—বলিয়া ভগবান কোন্ পুরুষকে নির্দ্দেশ করিতেছেন? অষ্টম অধ্যায়ে অর্জ্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "ব্রহ্ম কাহাকে বলে?", তাহার উত্তরে ভগবান বলিয়াছেন, "অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং"—অক্ষরকে (পরম) ব্রহ্ম বলা হয়। আমাদের মনে হয়, গীতাতে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মকেই অক্ষর শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং ভগবানের স্বরূপকে ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং চরম তত্ত্ব বলিয়া পুরুষোত্তম নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যে সকল স্থানে ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, (২) সেই সকল স্থানের অর্থ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, চরমতত্ত্ব বা ভগবান অর্থে গীতায় ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ নাই (৩)। বরং কয়েক স্থানে স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত আছে যে, ভগবান ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ২৬ ও ২৭ শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন,

> মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
> স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
> ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
> শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥

"যিনি নিরন্তর আমাকেই ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করেন, তিনি ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা; অমৃত, অব্যয়, সনাতন ধর্ম্ম এবং ঐকান্তিক সুখ,—আমি সকলেরই প্রতিষ্ঠা।" এখানে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ যে পিতামহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা নহেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কারণ, এখানে গুণাতীত অবস্থার কথা হইতেছে; চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা গুণাতীত নহেন, তিনি সগুণ। শঙ্করাচার্য্যও ব্রহ্ম শব্দের এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন; "ব্রহ্মভূয়ায়" শব্দের অর্থ তিনি করিয়াছেন, "ব্রহ্মভবনায়, মোক্ষায়"; এবং "ব্রহ্মণঃ" শব্দের অর্থ তিনি করিয়াছেন "পরমাত্মনঃ।" অতএব উপরিউক্ত শ্লোকদ্বয়ে স্পষ্ট ভাবে উক্ত হইল যে, ভগবান ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন,—ব্রহ্ম ভগবানে প্রতিষ্ঠিত।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলিতেছেন,

> অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং।
> বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ৫৩
> ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
> সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥ ৫৪
> ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
> ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং॥ ৫৫

"অহংকার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মম ও শান্ত হইয়া (উক্ত ব্যক্তি) ব্রহ্মের সহিত একতা প্রাপ্ত হয়েন। ব্রহ্মভূত হইবার পর তিনি প্রসন্ন হয়েন, তাঁহার শোক বা আকাঙ্ক্ষা থাকে না, সর্ব্বভূতে তাঁহার সমজ্ঞান হয়, এবং তিনি আমাতে উৎকৃষ্ট ভক্তি লাভ করেন। ভক্তির দ্বারা তিনি জানিতে পারেন আমি কি প্রকার, তদনন্তর আমাকে যথার্থ রূপে জানিবার পর আমাতে প্রবিষ্ট হন।" এখানেও বলা হইল, ব্রহ্মলাভ করিবার পর ভগবানকে লাভ করিতে হয়। অতএব, ভগবান ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু।

ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এই যে চরমবস্তু, ইহাকে গীতায় পরমাত্মা, পুরুষোত্তম, পরমেশ্বর বলিয়া অভিহিত করা

---

(২) গীতা নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে "ব্রহ্ম" শব্দের প্রয়োগ আছে;—২।৭২; ৩।১৫; ৪।২৪, ২৫, ৩১; ৫।১০, ১৯, ২০, ২১, ২৪, ২৫, ২৬; ৬।২৭, ২৮, ৪৪; ৭।২৯; ৮।১, ৩, ১৩, ১৬, ১৭, ২৪; ১০।১২; ১২।৩, ৪; ১৩।১২-১৭, ৩১; ১৪।৩, ৪, ২৬, ২৭; ১৭।২৩, ২৪; ১৮।৫০, ৫৩, ৫৪।

(৩) ১০ অধ্যায় ১২ শ্লোকে অর্জ্জুন ভগবানকে বলিতেছেন "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।" কিন্তু অর্জ্জুনের উক্তি হইতে ভগবানের স্বরূপ নিশ্চয় করা উচিত নহে। কারণ, অর্জ্জুন যে ভগবানের স্বরূপ অবগত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

হইয়াছে (৪)। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অহং বলিয়া যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও এই চরমতত্ত্ব। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, পরমাত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে প্রভেদ কি? চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন,

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩ শ্লোক।

শঙ্করাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, এই শ্লোকে ভগবান তাঁহার মায়া শক্তিকে যোনি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; এবং এই মায়া শক্তি বিকারজাত সকল বস্তু অপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া, এবং তাহাদিগকে ভরণ করে বলিয়া, ইহার ব্রহ্ম আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, ব্রহ্ম শব্দ গীতায় অন্যত্র যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এখানেও সেই অর্থে গ্রহণ করিতে কোন বাধা নাই। তাহা হইলে, বুঝিতে হইবে, ভগবান ব্রহ্মের মধ্য দিয়া জীব ও জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টির অব্যবহিত কারণ ব্রহ্ম; কিন্তু মূল ও আদি কারণ ভগবান। সৃষ্টির সময় জীব জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, প্রলয়ের সময় ব্রহ্মে বিলীন হয়। ব্রহ্ম সূত্রের প্রারম্ভে মহর্ষি বাদরায়ণ ব্রহ্মের যে বেদান্ত সম্মত লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" "যাঁহা হইতে নিখিল জগৎ উৎপন্ন হয়, যাহাতে ইহা অবস্থান করে এবং যাহাতে বিলীন হয়" তাহার সহিত গীতার এই ভাবে মিল পাওয়া যায়। অষ্টম অধ্যায়ে সৃষ্টি ও প্রলয়ের বর্ণনা করা হইয়াছে।

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে ॥ ১৮
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে
রাত্র্যাগমেঽবশ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎসনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্ত স্তমাহুঃপরমাং গতিং।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১

শঙ্করাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, এ স্থানে দুইটি অব্যক্তের উল্লেখ আছে; প্রথম অব্যক্ত মায়া বা অবিদ্যা, দ্বিতীয় অব্যক্ত ব্রহ্ম। আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যাখ্যা অনুসারে প্রথম অব্যক্ত ব্রহ্ম, দ্বিতীয় অব্যক্ত ভগবান। কিন্তু উপরি-উদ্ধৃত ২০ শ্লোকের পাঠ নির্ভুল কি না, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। প্রচলিত পাঠ হইতেছে "তস্মাৎ অব্যক্তাৎ তু পরঃ অন্যঃ সনাতনঃ অব্যক্তঃ ভাবঃ"। আমাদের বোধ হয়, পাঠটি এইরূপ হইলে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হয়, "তস্মাৎ ব্যক্তাৎ তু পরঃ অন্যঃ সনাতনঃ অব্যক্তঃ ভাবঃ"। আমাদের প্রস্তাবিত পাঠ গ্রহণ করিলে, মাত্র একটি লুপ্ত অকার উঠাইয়া দিতে হয়।

প্রচলিত পাঠ—পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।

প্রস্তাবিত পাঠ—পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোব্যক্তাৎ সনাতনঃ।

সুতরাং উভয় পাঠের মধ্যে উচ্চারণগত কোন পার্থক্য নাই। প্রচলিত পাঠটি অশুদ্ধ মনে করিবার প্রধান কারণ এই যে, প্রচলিত পাঠ অনুসারে শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে পূর্ব্বোক্ত অব্যক্ত হইতে উৎকৃষ্ট অপর অব্যক্তের উল্লেখ আছে (পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ) এবং শেষার্দ্ধে এই উৎকৃষ্টতর অব্যক্তের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি)। এ ক্ষেত্রে যে লক্ষণ দ্বারা উৎকৃষ্টতর অব্যক্তকে নিকৃষ্টতর অব্যক্ত হইতে প্রভেদ করা যায়, এরূপ লক্ষণের নির্দ্দেশ করাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইল, তাহা উভয়বিধ অব্যক্তের সাধারণ লক্ষণ; কারণ, সর্ব্বভূতের বিনাশ হইলে, উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট কোন অব্যক্তেরই বিনাশ ঘটে না। এতদ্ব্যতীত "তস্মাৎ অব্যক্তাৎ" অপেক্ষা "তস্মাৎ ব্যক্তাৎ" এই পাঠটি যুক্ততর যে হেতু অব্যবহিত পূর্ব্ব শ্লোকে অব্যক্তের কোন উল্লেখ নাই, ব্যক্তেরই উল্লেখ আছে। তস্মাৎ অব্যক্তাৎ এই পাঠটি সিদ্ধ করিতে হইলে, এই অব্যবহিত-পূর্ব্ব শ্লোকটি ছাড়িয়া, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকটি গ্রহণ করিতে হয়। অধিকন্তু, বিংশ শ্লোকে যে একটিমাত্র অব্যক্তেরই উল্লেখ আছে তাহা একবিংশ শ্লোক হইতেও

(৪) গীতায় নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে এই চরমতত্ত্ব বা পরমেশ্বরের উল্লেখ আছে;—৪।৫, ৬-৯; ৫।১৪, ১৫, ২৯; ৬।৭, ১৪, ২৯-৩১; ৭।৪, ৫, ৬, ৭-১১; ৮।৪, ৫, ৭-১০, ১৩, ১৪-১৬; ৯।৩, ৪-১১, ১৬-১৯, ২২-২৪, ২৬, ২৯, ৩২, ৩৪; ১০।১-৪২; ১১।১৮, ২০, ৩২, ৩৩, ৩৭-৩৮, ৪০, ৪৩, ৫৫-৫৬; ১২।১-৮, ১৩।৩, ২৩, ২৮, ২৯, ৩২, ৩৩; ১৪।৩, ৪, ১৯, ২৬, ২৭; ১৫।৬, ১০-১৫, ১৬-২০; ১৭।২৩; ১৮।৪৬, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৬১, ৬২।

প্রতীতি হয়। একবিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে, "অব্যক্তকে অক্ষর বলা হয়; ইহাই পরমা গতি,—যে গতি পাইয়া পুনরায় সংসারে ফিরিতে হয় না। ইহাই আমার পরম ধাম।" ২০ শ্লোকে যদি দুই প্রকার অব্যক্তের উল্লেখ থাকিত, তাহা হইলে ২১ শ্লোকে কোন্ প্রকার অব্যক্তের প্রসঙ্গ হইতেছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত ছিল। কিন্তু ২১ শ্লোকে এরূপ কথা বলা হইল, যেন পূর্ব্বে এক প্রকার অব্যক্তেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। ২১ শ্লোকে অব্যক্তকে অক্ষর বলা হইয়াছে। ৮ম অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকে বলা হইয়াছে, "অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং"। ১৫ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে, পুরুষ তিন প্রকার, ক্ষর, অক্ষর ও উত্তম। অতএব বোধ হয়, এই অব্যক্ত, ব্রহ্ম, অক্ষর পুরুষ, এই সকল একই বস্তুর সংজ্ঞা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ১২ হইতে ১৭ শ্লোকে ব্রহ্মের বর্ণনা আছে। ব্রহ্ম ও ভগবানের প্রভেদ স্মরণ করিয়া আমরা এই বর্ণনা পাঠ করিতে পারি।

> জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
> অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥
> সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
> সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
> সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জিতং।
> অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥
> বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
> সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥
> অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং।
> ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥
> জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি স্তমসঃ পরমুচ্যতে।
> জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্যবিষ্ঠিতং॥

শঙ্করাচার্য্য অবশ্য বলিয়াছেন যে, ইহা চরম তত্ত্ব বা ভগবানেরই বর্ণনা। কিন্তু ১২ শ্লোকে বলা হইয়াছে, "অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম", ইহার স্বাভাবিক অর্থ এই যে ব্রহ্ম অনাদি ও মৎপর (যদপেক্ষা আমি অর্থাৎ ভগবান উৎকৃষ্ট, অহং পর উৎকৃষ্টতরঃ যস্মাৎ)। ব্রহ্ম ও ভগবানের আমরা যে প্রভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তদনুসারে এই স্বাভাবিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্ম ও ভগবান অভিন্ন; এজন্য তিনি এই স্বাভাবিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। তিনি "অনাদিমৎ" এক পদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; এবং "পরং" একটি বিভিন্ন পদ বলিয়াছেন। অনাদিমৎ পদটি তিনি এই ভাবে সিদ্ধ করিয়াছেন,—"আদিরস্য অস্তি ইতি আদিমৎ। ন আদিমৎ অনাদিমৎ"। এই ভাবে যে পদ সিদ্ধ হইল তাহার অর্থ যাহা, অনাদি শব্দের অর্থও তাহা। অনাদি বলিলেই যদি চলিত, তাহা হইলে অনাদিমৎ এই বিরল-প্রয়োগ শব্দটি ব্যবহার করা নিরর্থক হয়। শঙ্করাচার্য্যও এই আপত্তি লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, অনাদি ও মৎপর এই ভাবে পদচ্ছেদ করিলে, অর্থ-সঙ্গতি হয় না; এ জন্য "মৎ" শব্দটি অনাবশ্যক হইলেও শ্লোক পূরণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাতে অনাদিও মৎপর এই ভাবে পদচ্ছেদ করিলে অর্থের অসঙ্গতি হয় না।

উপরে ব্রহ্মের যে বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে, "মৎপরং" ব্যতীত তাহার সব কথাই ভগবান সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায়। সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি, নির্গুণ, ভূতভর্ত্তৃ, গ্রসিষ্ণু, প্রভবিষ্ণু, জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ, তমসঃ পরং, জ্ঞানং জ্ঞেয়ং, হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতং,—এই সকল কথা সাধারণতঃ ভগবান সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয়। অতএব ব্রহ্ম ও ভগবান উভয়েরই এই সব লক্ষণ সাধারণ; এবং এই সকল লক্ষণ ব্রহ্ম ও ভগবানকে জগতের অন্য সকল বস্তু হইতে পৃথক্ করে। তাহা হইলে ব্রহ্ম ও ভগবান উভয়ের প্রভেদ করিবার কোন লক্ষণ আছে কি? একটি লক্ষণ আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

> সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
> তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥

নিখিল জগতের বীজ হইতেছেন ভগবান, ব্রহ্ম হইতেছেন উৎপত্তি-স্থান। অন্য স্থানে ভগবান ব্রহ্মকে তাঁহার ধাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,

> অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিং।
> যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ৮।২১
> ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্ক ন পাবকঃ।
> যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ১৫।৬

উভয় শ্লোকেই ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ব্রহ্ম ও ভগবানের ভেদসূচক আর একটি লক্ষণ হইতেছে ঈশ্বরত্ব। ব্রহ্ম নিখিল জগৎ প্রসব করিয়া থাকেন, ভরণও করিয়া থাকেন ("ভূতভর্ত্তৃ"); কিন্তু কোথাও ব্রহ্মকে প্রভু ঈশ্বর

বা অন্তর্যামী (যিনি অন্তরে বা হৃদয়ে থাকিয়া যমন বা শাসন করেন) বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। ভগবানকে এই ভাবে নানা স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৫।১৭

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ং॥ ৯।১৮

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ১৮।৬১

গীতার অষ্টম অধ্যায়ের নাম "অক্ষর ব্রহ্মযোগ"। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অক্ষর ও ব্রহ্ম এক বস্তু এবং ভগবান বা পুরুষোত্তম তাহা হইতে ভিন্ন বস্তু। ভগবান যে ব্রহ্ম অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট, এই তত্ত্ব পঞ্চদশ অধ্যায়ে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। এই অধ্যায়ের নাম "পুরুষোত্তম যোগ"। এই পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্ বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎকৃতকৃত্যশ্চভারত॥

ভগবান যে ব্রহ্ম অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট, এই তত্ত্ব সাধারণতঃ বিদিত নহে; এবং অত্যন্ত নিগূঢ় বলিয়াই কি ভগবান ইহাকে "গুহ্যতম" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন? অষ্টম অধ্যায়ে বা "অক্ষর ব্রহ্মযোগে" ভগবান বলিতেছেন

যদক্ষরং বেদবিদোবদন্তি
বিশন্তি যদ্‌যতয়োবীতরাগাঃ॥
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যংচরন্তি
তত্তেপদংসংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥ ১১ শ্লোক

এই শ্লোক শুনিয়া মনে হয়, অক্ষর বা ব্রহ্ম কি বস্তু, তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যাইবে। কিন্তু পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে,—মৃত্যুকালে কিরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কঠোপনিষদে এই ধরণের একটী শ্লোক আছে।

সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ
ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ (২য় বল্লী, ১৫ শ্লোক)

এখানে শ্রুতি যে তত্ত্ব প্রকাশ করিবেন বলিয়া প্রস্তাব করিলেন, শ্লোকের শেষে ওঁ শব্দ দ্বারা তাহা নির্দ্দেশ করিয়া, পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে তাহার বিস্তার করিলেন। যথা—

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরং পরং।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥
এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং এতদালম্বনং পরং।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

কিন্তু গীতায় ভগবান প্রস্তাবিত বিষয়ের এইরূপ কোন নির্দ্দেশ না করিয়া সহসা (abruptly) কেন প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইলেন? এখানে কি কয়েকটি শ্লোক হারাইয়া গিয়াছে?

ব্রহ্ম অপেক্ষাও ভগবান উৎকৃষ্ট তত্ত্ব। কিন্তু ব্রহ্ম ভগবানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বস্তু। ব্রহ্ম ও ভগবান উভয়েই মায়াতীত বস্তু। এজন্য ভগবান ব্রহ্মকে নিজধাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং বলিয়াছেন, ব্রহ্মকে লাভ করিলে, আর দুঃখবহুল সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না—

যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে॥

পুনশ্চ: "জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে" অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিলে অমৃত লাভ করা যায়।

বাস্তবিক ব্রহ্ম লাভ হইলে ভগবান লাভে আর বিলম্ব থাকে না। এই কথাই ভগবান দ্বাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন,

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবং॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয় গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ॥

এখানে ব্রহ্মোপাসনার কথা হইতেছে; কারণ অক্ষর, কূটস্থ—এই সকল শব্দ অন্যত্র ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রয়োগ হইয়াছে। বাস্তবিক, এই শ্লোকের প্রারম্ভে অর্জ্জুন যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা এই যে ভগবানের উপাসনা শ্রেষ্ঠ, না ব্রহ্মের উপাসনা শ্রেষ্ঠ?

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥

"যাহারা তোমাকে উপাসনা করে, এবং যাহারা অক্ষর (ব্রহ্ম) উপাসনা করে, তাহাদের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ?" উত্তরে ভগবান মীমাংসা করিয়াছিলেন, যাহারা ভগবানের উপাসনা করে তাহারাই শ্রেষ্ঠ; যাহারা ব্রহ্মোপাসনা করে, তাহারা যদিও শেষে ভগবানকেই পায় (কি ভাবে পায় তাহা ১৮ অধ্যায়ে ৫০ হইতে ৫৫ শ্লোকে সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে), তথাপি এই ব্রহ্মোপাসনার পথ অধিকতর কষ্টকর।

ব্রহ্ম নির্গুণ, তাঁহার সত্ত্বগুণোপহিত সগুণ ভাবকে বিষ্ণু,

ভগবান বা পরমাত্মা বলা হয়। এই ভাবে গীতার পুরুষোত্তম-তত্ত্বের সমাধান হয় না। কারণ, প্রথমতঃ, পুরুষোত্তম বা পরমাত্মা সগুণ নহেন, তিনিও ব্রহ্মের ন্যায় নির্গুণ ; যথা—

অনাদিত্বা নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ। ১৩। ৩১

দ্বিতীয়তঃ, বেদান্ত মতে ব্রহ্মই চরমতত্ত্ব ; বিষ্ণু অপেক্ষা ব্রহ্ম উৎকৃষ্ট ; বিষ্ণু ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু গীতার মতে পরমাত্মাই চরমতত্ত্ব ; ব্রহ্ম অপেক্ষা পরমাত্মা উৎকৃষ্ট ; ব্রহ্ম পরমাত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মই চরমবস্তু—এই তত্ত্ব এতদূর প্রসিদ্ধ এবং দার্শনিকদের মধ্যে সর্ব্ববাদিসম্মত যে, ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট একটী স্বতন্ত্র বস্তু আছে, ইহা গ্রহণ করিতে যথেষ্ট আশঙ্কা হয়। কিন্তু ভগবদ্গীতা যতই আলোচনা করা যায়, ততই স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে ইহাই গীতার মত।

এই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব আমরা মুণ্ডকোপনিষদেও দেখিতে পাই। মুণ্ডকোপনিষদেও অক্ষর ও ব্রহ্ম সমানার্থবাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে ; এবং অক্ষর-ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষের উল্লেখ আছে।

দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥ ২। ১। ২
যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য এষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২। ২। ৭
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং।
তদা বিদ্বান্ পুণ্য পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং
সাম্যমুপৈতি ॥ ৩। ১। ৩

উদ্ধৃত প্রথম শ্লোকে অক্ষর (ব্রহ্ম) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষের উল্লেখ আছে ; দ্বিতীয় শ্লোকে ব্রহ্মকে পরমাত্মার "পুর" বা বাসস্থান বলা হইয়াছে (গীতার "তদ্ধাম পরমং মম" বাক্য ইহার সহিত তুলনীয়) ; তৃতীয় শ্লোকে পরমাত্মাকে ব্রহ্মের উৎপত্তি স্থান বলা হইয়াছে (কিংবা ব্রহ্মকে পরমাত্মার যোনি বলা হইয়াছে,—যথা গীতায় "মমযোনি মহদ্‌ব্রহ্ম")।

"অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" এই কথাগুলির বিস্তারিত আলোচনা ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ "অদৃশ্যত্বাদি" অধিকরণের (২১ হইতে ২৩ সূত্রের) শঙ্কর-ভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে। শঙ্করাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, এখানে অক্ষর অর্থে ব্রহ্মের অবিদ্যা শক্তি,—ব্রহ্ম তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট, ইহাই এখানে বলা হইয়াছে। মুণ্ডকোপনিষদেই অক্ষর শব্দ পূর্ব্বে কয়েক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে,—সর্ব্বত্রই অক্ষর শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। উদ্ধৃত শ্লোকের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকেও অক্ষর শব্দ ব্রহ্ম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে অক্ষর শব্দ হঠাৎ নূতন অর্থে প্রযুক্ত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। অক্ষর ব্রহ্ম হইতে উৎকৃষ্ট তত্ত্বান্তর স্বীকার করিবার বিরুদ্ধে শঙ্করাচার্য্য আপত্তি করিয়াছেন যে, মুণ্ডকোপনিষদের প্রারম্ভে দুইটি বিদ্যার উল্লেখ আছে, (১) অপরা বিদ্যা (অর্থাৎ ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ) এবং (২) পরা বিদ্যা (যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে—যাহার দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে পাওয়া যায়)। এ ক্ষেত্রে যদি অক্ষর ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব (পুরুষোত্তম-তত্ত্ব) গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে অপরা ও পরা বিদ্যা ব্যতীত অপর একটি বিদ্যা স্বীকার করিতে হয়, যে বিদ্যা দ্বারা এই পুরুষোত্তমকে লাভ করা যায়। তাহাতে বিদ্যা তিন প্রকার হইয়া যায় ; কিন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন বিদ্যা দুই প্রকার। (৫) এই আপত্তি সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে, তৃতীয় বিদ্যার কল্পনা নিষ্প্রয়োজন ; কারণ, পুরুষোত্তম তত্ত্ব সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার অতীত। বিদ্যা দ্বারা জগৎ এবং ব্রহ্মকে লাভ করা যায় ; কিন্তু পুরুষোত্তমকে বিদ্যা দ্বারা লাভ করা যায় না। ইহা যে আমাদের অনুমান মাত্র নহে, তাহা মুণ্ডকোপনিষদের নিম্ন-লিখিত শ্লোক হইতে প্রতীতি হইবে—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে
তনুং স্বাং ॥ ৩। ২। ৩

এই আত্মা (পরমাত্মা বা পুরুষোত্তম) উৎকৃষ্ট বচন দ্বারা লাভ করা যায় না, মেধা বা পাণ্ডিত্য দ্বারা লাভ করা যায় না। সেই পরমাত্মা যাহাকে বরণ করেন (অনুগ্রহ করেন), সেই তাহাকে লাভ করিতে পারে, তাহার নিকট ইনি নিজ রূপ প্রকাশ করেন। এখানে স্পষ্ট ভাবে বলা হইল যে, পরমাত্মা বিদ্যার বিষয় নহে, ইহা পরমাত্মারই অনুগ্রহের বিষয়।

এই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব অন্য উপনিষদ-বাক্য দ্বারাও সমর্থন

---

(৫) যদি পুনঃ পরমেশ্বরাদন্যদদৃশ্যত্বাদিগুণকমক্ষরং পরিকল্প্যেত, নেয়ং পরা বিদ্যা স্যাৎ * * ত্রিস্রশ্চ বিদ্যা প্রতিজ্ঞায়েরন্ ত্বৎপক্ষে। অক্ষরস্য ভূতযোনেঃ পরস্য পরমাত্মনঃ প্রতিপাদ্যমানত্বাৎ। দ্বে এব তু বিদ্যে বেদিতব্যে ইহ নির্দিষ্টে।

ব্রহ্মসূত্র ১। ২। ২১ শঙ্করভাষ্য

করা যায়। কঠোপনিষদের কয়েকটি শ্লোকের আলোচনা করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎপুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্নপরং কিঞ্চিৎ সাকাষ্ঠা সা পরাগতিঃ॥

১ অধ্যায় ৩ বল্লী ১০। ১১

ইন্দ্রিয় হইতে বিষয় শ্রেষ্ঠ, বিষয় অপেক্ষা মন, মন অপেক্ষা বুদ্ধি, বুদ্ধি অপেক্ষা "মহান্ আত্মা", তাহা অপেক্ষা অব্যক্ত, অব্যক্ত অপেক্ষা পুরুষ, পুরুষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু নাই, ইহাই শ্রেষ্ঠ গতি। ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন, বুদ্ধি এই সকল শব্দের অর্থবোধে কোন গোলযোগ নাই। "মহান্ আত্মা", অব্যক্ত ও পুরুষ এই তিনটি বস্তু কি? শঙ্করাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মহান্ আত্মা=হিরণ্যগর্ভ, অব্যক্ত=ব্রহ্মের শক্তি, পুরুষ=ব্রহ্ম। আমাদের মনে হয় মহান্ আত্মা=জীবাত্মা, (৬) অব্যক্ত=অক্ষর ব্রহ্ম, পুরুষ=পুরুষোত্তম বা পরমেশ্বর—এই ব্যাখ্যা সন্তোষজনক।

(৬) জীবাত্মাকে মহান্ বলা হইয়াছে; কারণ পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বগুলি (ইন্দ্রিয় হইতে বুদ্ধি পর্য্যন্ত) অচেতন; জীবাত্মা সচেতন পদার্থ এজন্য এই সকল অচেতন তত্ত্ব অপেক্ষা মহৎ বা শ্রেষ্ঠ।

সজ্জন-সঙ্গতি

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

সঙ্গী যারা ক্ষণেক ছিল সঙ্গেতে,
আচম্‌কা যার পরশ পেলাম অঙ্গেতে,
যাদের কাছে ধুনীর আঁচে জগৎযোগে,
আলোক পেলাম হারিয়ে শশী সূর্য্যকে,
যাদের সাথে পারের ঘাটে দূরদেশে,
ডাক দিয়েছি সুদূর নেয়ের উদ্দেশে,
আজকে পরাণ ব্যাকুল তাদের তল্লাসে,
আজকে চোখে তাদের লেগে জল আসে।

২

ডাকলে তারা, আয় রে মোদের সঙ্গ নে,
নাম গেয়ে তাঁর নাচ্‌লে বুকের অঙ্গনে;
পায় নি সাড়া, পায় নি আমার দোর খোলা,
টহল গেয়ে জাগিয়ে গেল ভোর বেলা,
তন্দ্রা এসে ঢাকলে নিশির শেষটুক্,
স্মরছি কেঁদে সেই যে সুরের রেশ্‌টুক্,
আজকে পরাণ ব্যাকুল তাদের তল্লাসে,
আজকে চোখে তাদের লেগে জল আসে।

৩

যে সব কপোত বনের ঝাড় ও ঝোপ ভুলি,
ক্ষণিক মুখর করলে বুকের খোপগুলি,
পাখায় মেখে পদ্ম পরাগ, সঞ্চরি'
মনের বনে উড়লো যে সব চঞ্চরী;
গভীর স্নেহের নঙ্গর ফেলে সৈকতে
যে সব তরী আস্‌লো গেল এই পথে,
আজকে পরাণ ব্যাকুল তাদের তল্লাসে,
আজকে চোখে তাদের লেগে জল আসে।

মেঘনাদ

[শ্রীনরেশচন্দ্র সেন, এম-এ, ডি-এল]

(২৪)

মেঘনাদের বিবাহ হইয়া গেল। মেয়ের মা-বাপ জামাই দেখিয়া যেমন মুগ্ধ হইলেন, তেমনি আবার তার ঘরে ধর্ম্ম-মায়ের অধিষ্ঠানে অপ্রসন্ন হইলেন। তাঁদের মেয়ে-জামাইয়ের ঘাড়ের উপর বসিয়া যে কোথাকার একটা কে প্রভুত্ব করিবে, আর তাহাদের অন্নধ্বংস করিবে, এ কথা ভাবিতে তাঁহাদের ভাল লাগিত না। কিন্তু সব দিক কাহারও জুড়িয়া আসে না, এই ভাবিয়া তাঁহারা নিজেদের আশ্বস্ত করিলেন, এবং কায়মনোবাক্যে আশা করিতে লাগিলেন যে, কোনও একটা কিছু হইয়া, এ পাপ অচিরেই নিপাত যাইবে।

অষ্টমঙ্গলার পর সরিৎ যখন বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মা তাহাকে বেড়িয়া ধরিলেন। সরিৎ পঞ্চ-মুখে সুনীতির সুখ্যাতি করিতে লাগিল। সুনীতি প্রভুত্ব করা দূরে থাকুক, ইহারই মধ্যে সরিৎকে সব বিষয়ে প্রভু করিয়া দিবার জন্য অস্থির। তার কাছে টাকা পয়সা যাহা কিছু আছে, সব সে সরিৎকে গছাইয়া দিতে চাহিয়াছিল,— সরিৎ কিছুতেই নেয় নাই। তার পর সে সরিতের নামে একখানা সেভিংস-ব্যাঙ্কের বই করিয়া, তাহাতে হাজার টাকা রাখিয়া দিয়াছে; এবং বইখানা সরিতের বাক্সে দিয়া দিয়াছে। সুনীতি নিজেকে দাসী করিয়া, সরিৎকে গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী করিবার জন্যই বরং ব্যস্ত। শুনিয়া মা অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।

এদিকে মনোরমার মোকদ্দমার রায় প্রকাশ হইল। জজ-সাহেবেরা আপীল মঞ্জুর করিয়া মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচারের জন্য আদেশ পাঠাইলেন। মনোরমার উকীল মেঘনাদকে মোকদ্দমা চালান সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ দিলেন।

মেঘনাদ একদিন ময়মনসিংহে যাইয়া জগদীশকে মোকদ্দমা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া আসিল। মোকদ্দমার কথা বলিয়া কহিয়া মেঘনাদ বলিল, "না-হ'ক কতকগুলো মিথ্যা কথা সাজিয়ে প্রহ্লাদ বাবু এই কাণ্ডটা ক'রলে। সোজা-সুজি সবই যদি সত্য কথা বলে যেত, তবে কোনও লেঠা হত না।"

জগদীশ বলিল, "হাঁ, হাঁ! আপীলে মোকদ্দমা গেলে অমন কথা বলা সোজা। তা' হ'লে যে জুরী কি ভাবতো তার ঠিকানা আছে? দেখই না, এবারে কি করে জুরী!"

মেঘনাদ বলিল, "চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা। তুমি শালা ওকালতি কর নির্জ্জলা মিথ্যার জোরে। আর তাই করে এমন অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে যে, নেহাৎ দরকারে পড়ে যদি কালে-ভদ্রে কোথাও একটা সত্য কথা ব'লতে হয়, তবে একেবারে কাহিল হয়ে পড়। যথা—তোমার বোনকে

আমার ঘাড়ে গছাবে, তাও সোজাসুজি বললে না—এক বিরাট অনাবশ্যক উপন্যাস রচনা করে গিয়ে উপস্থিত হ'লে।"

জগদীশ হাসিয়া বলিল, "কে তোমায় বল্লে যে, সে সব মিথ্যে?"

"তোমার বোন। সে তো আর ভাইয়ের মত ওকালতি করে না!"

"বটে, ছুঁড়ী এমন অকৃতজ্ঞ! দুদিনের আলাপ—এরই মধ্যে তোমার কাছে আমার নামে লাগাতে আরম্ভ করেছে!"

"দুদিনের আলাপ নয় রে শালা—জন্ম জন্মান্তরের!"

"ইস্, তাই না কি? এতদূর দাঁড়িয়েছে? তা' ভাই, এ জন্ম-জন্মান্তরের আলাপটা থাকতো কোথায়, আমি যদি ওই উপন্যাসটা না রচনা করতাম? তুমি আরও খাঁটী দশ বছর তো নিরুপদ্রবে আইবড় হয়ে থাকতে।"

"এইখানেই তো তোমার ভুল। তুমি যখন গিয়েছিলে আমার কাছে, তখন আমি বিয়ের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হ'য়েই ব'সে ছিলাম। ঠিক তখনি আমি ব'সে এই ভাবছিলাম যে, কোথায় আমার জন্য আমার হৃদয়রাণী 'কমলাসন পাতি' ব'সে রয়েছেন।"

"তাই না কি? আশ্চর্য্য coincidence! এ কি 'উইল-পাওয়ার' না কি?"

"সন্দেহ কি! তখন আমার সেই জন্ম-জন্মান্তরের সখীটি astral plainএ আমাকে টানছিলেন ব'লেই আমার তেমনি মনে হচ্ছিল।"

এবার আর মেঘনাদ মনোরমার সঙ্গে দেখা করিল না। সে ভার দিয়া আসিল জগদীশের উপর। সে যে মনোরমার সঙ্গে দেখা না করিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছে, আর দেখা করিবার জন্য যে তার ইচ্ছাই হয় নাই, এই কথা মনে করিয়া সে অত্যন্ত আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। তাই কলিকাতায় আসিয়াই সে বিজয়ী বীরের মত সোজা শ্বশুর-বাড়ী গিয়া উঠিল।

শাশুড়ী অল্পক্ষণ তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া তাহাকে সরিতের ঘরে পাঠাইয়া দিলেন। সরিৎ তখন বসিয়া কলেজের পড়া তৈয়ার করিতেছিল। মেঘনাদ আসিতেই উঠিয়া স্মিত-লজ্জিত মুখে তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া বসাইল। মেঘনাদ সরিতের ছোট দেহখানি তাহার বলিষ্ঠ বাহুতে বেষ্টন করিয়া, তাহার লজ্জারক্ত গণ্ডে ও ওষ্ঠাধরে চুম্বন করিল। সরিৎ লজ্জিত, সঙ্কুচিত হইয়া তাহার বুকের সঙ্গে মিলাইয়া রহিল।

একটা ভীষণ জ্বালাময় স্মৃতি মেঘনাদের বুকের মধ্যে ধাঁ করিয়া আগুন জ্বালিয়া দিল। এমনি করিয়া সে সেদিনও মনোরমাকে চুম্বন করিয়াছিল। এ কথা ভাবিতে তার হাত-পা অসাড় হইয়া উঠিল। সে সরিৎকে ছাড়িয়া দিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

সরিৎ কিছুই বুঝিতে পারিল না। স্বামীর রকম-সকম দেখিয়া ব্যথিত হইল; কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। সেও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মেঘনাদ ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিল সরিৎকে সে বঞ্চনা করিবে না, সব কথা তাহাকে খুলিয়া বলিবে। এই ভাবিয়া সে, সরিৎকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া, কি করিয়া খুব মোলায়েম ভাবে, সরিতের মনে অনাবশ্যক ঘা' না দিয়া, কথাটা বলা যায়, তাহাই ভাবিতে লাগিল; কিন্তু কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না।

শেষে মেঘনাদ সরিতের মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "সরিৎ, তুমি আমায় ভালবাস?"

সরিৎ লজ্জিত মুখখানা মেঘনাদের বুকের ভিতর লুকাইল। মেঘনাদ পীড়াপীড়ি করিতে, সে একটু হাসিয়া বলিল, "কি জানি? বোধ হয় বাসি না।"

মেঘনাদও হাসিল; সরিতের গাল টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "মিথ্যাবাদী! সত্য বল, ভালবাস কি না?"

সরিৎ বলিল, "ভাল মজা, জোর করে ধরে আমাকে বলাবে, আর তাই সত্য হ'বে! উঃ লাগে যে!"

মেঘনাদ গাল ছাড়িয়া দিল। "ভালবাসি"—সরিতের মুখ হইতে এই কথাটা শুনিবার জন্য যেন সে ক্ষেপিয়া উঠিল। পীড়াপীড়ির চোটে দায় পড়া গোছ করিয়া সরিৎ এই আনন্দময় সত্যটাকে স্বীকার করিল।

মেঘনাদ আনন্দে যেন নাচিয়া উঠিল,—যেন এমন আশ্চর্য্য কথা কেউ কখনও শোনে নাই, আর এত বড় সৌভাগ্য যেন কাহারও কখনও হয় নাই। সে সরিৎকে বুকের কাছে সাপটিয়া ধরিয়া, তাহার গালে একটা ঠোনা মারিয়া বলিল, "দুষ্টুমীর এই শাস্তি!"

কথায়-কথায় আনন্দের একটা লুকান ফোয়ারা ছুটিয়া

গেল,—ছুইজনে সেই চিরন্তন প্রথা অনুসারে, সেই সনাতন মদিরায় বিভোর হইয়া গেল। এই নেশার ঘোরে তাহারা যে-সব কথা-বার্ত্তা কহিল, সেগুলি সমস্তই অতি সেকেলে, অতি পুরাতন বাজে কথা; কিন্তু মেঘনাদ ও সরিতের কাছে সেগুলি যেন বিশ্বকর্ম্মার কারখানায় সদ্য তৈয়ারী নূতন মাল, এ বিশ্বের সকল সম্পদের চেয়ে দামী ও সার্থক ও অপূর্ব্ব বলিয়া মনে হইল। সে সব দামী বাজে কথা কে না জানে,—যার অক্ষরে-অক্ষরে মধু ঝরে,—যাতে হৃদয় কাণায়-কাণায় আনন্দে ভরিয়া উঠে, সেই সব অর্থপূর্ণ গভীর বাজে কথা সবারই জীবনের একটা আনন্দময় অংশ ভরিয়া রাখে। এই আনন্দের রেডিয়াম-কণাগুলি মেঘনাদ তাহার হৃদয়ের ভিতর ঠাসিয়া জমা করিতে লাগিল—তা'র লোভের শান্তি হইল না।

এতটা আনন্দ একেবারে কঠিন আঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিবার সাহস তাহার হইল না। তার মনের গোপন কথা আপাততঃ মুলতবী রহিয়া গেল; সবচেয়ে দরকারী কথাটা বলা হইল না।

সরিতের বাপের বাড়ীতে বেশী দিন থাকা হইল না। তাহাকে আনিয়া নিজের বাড়ীতে অধিষ্ঠিত না করিয়া, মেঘনাদের মন কিছুতেই ঠাণ্ডা হইল না। সরিৎ কলেজে পড়িতে লাগিল, কিন্তু পড়াশুনায় বড় ব্যাঘাত হইতে লাগিল! মেঘনাদের দিন-রাত একটা আনন্দের নেশার ভিতর দিয়া কাটিয়া যাইতে লাগিল।

বলা বাহুল্য, মেঘনাদ এখন এই বাড়ীতেই স্থায়ী ভাবে উঠিয়া আসিয়াছে। বটব্যাল কোম্পানীর আফিসে যে ঘরে সে থাকিত, সেখানে আর একজন কেমিষ্ট আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে।

(২৫)

সুনীতির সাধ পূর্ণ হইয়াছে। বউ আসিয়াছে, চাঁদের মত বউ। স্নেহে ভরা কচি হৃদয় তার সে সুনীতির কাছে খুলিয়া দিয়াছে, তাহাকে মায়ের মত ভালবাসিয়াছে। কিন্তু সুনীতির মন তো আনন্দে ভরিয়া উঠে না! মেঘনাদ যে সরিৎকে লইয়া এতটা মাতামাতি করিতেছে, দু'জনে যে পরস্পরের প্রেমে বিভোর হইয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া তো তার প্রাণ নাচিয়া উঠে না! যখন তাদের সখের ঝগড়া লইয়া দু'জনে মাকে মধ্যস্থ করে, এবং এ ওর নামে নালিস জুড়িয়া দেয়, তখন তো তাহার প্রাণ প্রীতিতে আপ্লুত হইয়া উঠে না! একটা অহেতুক বিষাদ সুনীতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; থাকিয়া-থাকিয়া কেন যে তার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, তাহা সে বুঝিতে পারে না।

সুনীতি নিজের মনের সঙ্গে পারিয়া উঠিল না। যাতে তার হাসিবার কথা, তাতে তার মন কাঁদিয়া উঠে,—বুঝাইলে বুঝ মানে না, এ যে বড় বিষম দায়!

রাত্রে সুনীতির ঘুম হয় না। পাশের ঘরে এই নবীন প্রেমিক-যুগল অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত যে হাসি-খেলার কলরোল তুলিয়া দেয়, তাহাতে সুনীতির হৃদয় মথিত করিয়া দেয়। তাহাদের অফুরন্ত প্রেমলীলার যে আভাস থাকিয়া থাকিয়া সুনীতির কাণে আসিয়া প্রবেশ করে, তাতে তার চোখে জল আসে। সে নিজের উপর বিরক্ত হইয়া ঠোঁট কামড়াইয়া ধরে—নিজেকে তিরস্কার করে। কিন্তু করুণ অশ্রুধারা তাহার সমস্ত মুখ ভাসাইয়া দেয়,—সে থামাইতে পারে না। তখন সে শুইয়া-শুইয়া, বালিসে মুখ গুঁজিয়া, কেবলি কাঁদিতে থাকে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুঃখের রজনী প্রভাত করে।

কিসের এ দুঃখ? কেন তার প্রাণের এ করুণ আর্ত্তনাদ? এ যে তার ব্যর্থ জীবনের নিদারুণ হাহাকার! সার্থক নারী-জীবনের এই উজ্জ্বল জীবন্ত মূর্ত্তির পাশে তাহার অন্ধকার জীবনের ছবি ধরিয়া, সুনীতি আজ মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিল যে, তার জীবনটা সম্পূর্ণ অসার, অর্থশূন্য এবং আলোক-শূন্য। সত্য, সার্থক জীবনে সে বঞ্চিত হইয়াছে। তার জীবনের ইক্ষু-দণ্ডের রসটুকু তার নিষ্ঠুর ভাগ্যদেবতা নিঃশেষে নিংড়াইয়া রাখিয়া, শুধু তার ছিবড়েটুকু দিয়া তাহাকে এ জগতে পাঠাইয়াছিলেন, কেবলমাত্র জগৎ-জোড়া বিশাল বেদনার যজ্ঞে ইন্ধন জোগাইবার জন্য,—এই কথা ভাবিতে তাহার সমস্ত হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিত।

কিন্তু শুধু কি তাই? সুনীতি লজ্জায় মরিয়া, ঘৃণায় ভরিয়া অনুভব করিল যে, শুধু এই দুঃখই তার দুঃখ নয়। অনেক দিন তার মনের আনাচে-কানাচে একটা কথা মধ্যে-মধ্যে উঁকি মারিয়াছে,—এতদিন সে তাহাকে টিপিয়া মারিয়াছে। সে অনেক দিন মনকে ঠকাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই কয় দিন দীনতার সহিত সে সেই সত্য অনুভব করিল। তাহা লোকের কাছে বলিবার নয়;—আপনার

কাছেও তাহা স্বীকার করিতে সুনীতি কুণ্ঠিত, লজ্জিত হইয়া উঠিল। সুনীতির নিজেকে কুচা-কুচা করিয়া কাটিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইল,—তার অন্তরের উপর দারুণ ক্রোধ হইল! কি ঘৃণিত, কি নীচ, কি সর্ব্বনেশে, কি অবিশ্বাসী তার মন! এতদিন কি মেঘনাদ দুধ দিয়া ঘরে এমন একটা কালসাপ পুষিয়া আসিয়াছে? তার আগে সুনীতি মরিল না কেন?

সুনীতির হৃদয় মথিত করিয়া দুঃখ-সিন্ধু গর্জ্জিয়া উঠিল,—চোখের জলে তার বিছানা ভাসিয়া গেল। সমস্ত হৃদয়ের গ্রন্থি তার ছিন্ন-ভিন্ন, দলিত, নিষ্পেষিত হইয়া গেল তার এই আত্ম-তিরস্কারে। সে মর্ম্মের ভিতর অনুভব করিল যে, সে মেঘনাদের দয়ার, আতিথ্যের অযোগ্য হইয়াছে,—মনের তলায় সে মেঘনাদের 'মা' ডাকের অপমান করিয়াছে।

এমন পাপ বুকের ভিতর লুকাইয়া আর তো সে এখানে থাকিতে পারে না। কিন্তু যাইবে কোথায়? তাও কি ভাবিতে হইবে? মরণের তো বাধা নাই; মরণের ভয়ে সে স্বামীকে ছাড়িয়া, দুটি শিশু-পুত্র ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছে; স্বামী তার পবিত্রতায় কলঙ্ক দিয়াছিলেন বলিয়া, রাগের মাথায় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। নিজেকে সেই অপমানের যোগ্য জানিয়া, আজ তার মনে হইল যে, সেই লাঞ্ছিত স্বামীর কাছেই শাস্তি লইতে তাহাকে যাইতে হইবে। সে মরিবে; কিন্তু শুধু মরিলে তার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। স্বামীর হাতে শাস্তি না পাইলে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।

একদিন সকালে উঠিয়া সুনীতি সরিৎকে বলিল, "বউমা, আমি আজ আমার মায়ের কাছে যাব মনে করছি,—তুমি সংসার-টংসার বুঝে নাও মা!"

সরিৎ বলিল, "সে কি মা, তা' হ'লে চ'লবে কেমন ক'রে? সংসারের হাঙ্গামাই যদি ক'রবো, তবে পড়বো কখন? আমার পরীক্ষা যে এসে পড়লো! আপনি আমার পরীক্ষার পরে যাবেন।"

সুনীতি একটু হাসিয়া বলিল, "শোন পাগল মেয়ের কথা! তোমার পরীক্ষা হ'তে এখনো ছ' মাস বাকী। আমি এ ছ' মাস বসে থাকবো? না মা, আমি একবার মাকে দেখে আসি। বুড়ো মানুষ,—কবে আছেন কবে নেই,—অমার মনটা বড় ছট্‌-ফট্‌ করছে।"

সরিৎ মুখ ভার করিয়া বলিল, "আমি সে সব কিছু জানি না মা, আপনার ছেলেকে বলুন গে।"

যখন সরিৎ কিছুতেই বাগ মানিল না, তখন বাধ্য হইয়া সুনীতি মেঘনাদের কাছে গেল। আজ তার যাইতে সঙ্কোচ বোধ হইল। যে সহজ সম্বন্ধ তাদের ভিতর এতদিন ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, আজ তার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ফাঁক পড়িয়া গিয়াছে। আজ আর সুনীতি মেঘনাদকে তেমন সরল ভাবে সম্ভাষণ করিতে পারিল না। একটু সঙ্কুচিত ও লজ্জিত ভাবে সে মেঘনাদকে তাহার প্রস্তাব জানাইল। মেঘনাদ প্রবল বেগে ঘোর আপত্তি জানাইল, এবং সুনীতির সব যুক্তি ও আপত্তি জোরে জোরে কথা বলিয়া ভাসাইয়া দিল।

শেষে না পারিয়া সুনীতি কাঁদিয়া ফেলিল। তখন মেঘনাদকে বাধ্য হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইল। কিন্তু একমাসের মধ্যে ফিরিতে হইবে, এ কথা বারবার করিয়া বলিয়া দিল।

যতীনকে সঙ্গে করিয়া সুনীতি চলিল। তার ছেলে তিনটিকে অনেক বলিয়া-কহিয়া সরিতের হাতে-হাতে দিয়া গেল। যাইবার সময় সে কাঁদিয়া-কাটিয়া একটা মহা গণ্ডগোল বাধাইল।

মেঘনাদ বলিল, "এক মাসের জন্য যেতে তোমার এতই যদি দুঃখ হয় মা, তবে যাচ্ছ কেন? যতীনকে পাঠিয়ে তোমার মাকেই কেন এখানে আনিয়ে নাও না।"

সুনীতি চক্ষু মুছিতে-মুছিতে বলিল, "দুঃখ কিসের বাবা? মেয়েছেলের কান্না, এর কি কোনও মানে আছে? আমরা কিসে কাঁদি, আর কিসে না কাঁদি?"

বলা বাহুল্য, সুনীতি ঢাকায় গেল না,—সে গেল টাঙ্গাইল।

যতীন বলিল, "টাঙ্গাইল যদি যাবে, তবে মেঘনাদ বাবুকে বল্লে কেন ঢাকায় যাবে?"

সুনীতি বলিল, "তা নৈলে কি সে ছাড়তো?"

য। আমি কিন্তু সতীশ বাবুর বাড়ী যাচ্ছিনে বাপু, সে আগে থেকে ব'লে রাখছি!

সু। না তোমায় যেতে হ'বে না।

বর্ষাকাল, সমস্ত দেশটা জলে থৈথৈ করিতেছে। কেবল মাঝে-মাঝে এক-একটা গ্রাম মাথা তুলিয়া আছে। আকাশের পূর্ণিমার চাঁদ সেই জলের উপর জ্যোৎস্না ঢালিয়া দিয়াছে। ছোট-ছোট ঢেউগুলির উপর দিয়া তাহা নাচিয়া, গড়াইয়া

যাইতেছে। স্তব্ধ রাত্রি, জনমানবশূন্য! দূরে কদাচিৎ একটা মাঝির গান বা দাঁড়ের শব্দ শুনা যাইতেছে। এমনি নিস্তব্ধ রাত্রির ভিতর দিয়া একখানা ছোট ডিঙ্গিতে সুনীতি ও যতীন টাঙ্গাইলের পথে অগ্রসর হইল। টাঙ্গাইলের ঘাটে দূর হইতে নৌকার আলোর ভিড় দেখিয়া সুনীতি চিনিতে পারিল সেই পরিচিত, প্রিয়, সুন্দর ভূমি! তাহার সকল দুঃখের লীলাভূমি, তাহার চিরন্তন আশ্রয়! এই দেশ দেখিয়া সুখে-দুঃখে তাহার প্রাণ ভরিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইল।

ঘাটে নৌকা লাগিতে, যতীন বলিল, "দিদি, আমি নৌকাতেই থাকি—তুমি মাঝিকে নিয়ে যাও।"

সুনীতি একটু ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, তাই ভালো।"

মাঝির সঙ্গে সুনীতি সুপ্তা নগরীর ভিতর দিয়া ঘোমটা টানিয়া চলিল। তাহার বুক একটু কাঁপিয়া উঠিল। সে যে মৃত্যুর মুখে যাইতেছে, তাহা অনুভব করিয়া তার ভয় হইল না,—হৃদয় গভীর ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল। চন্দ্রালোকিত আকাশের দিকে চাহিয়া সে ভাবিল, সে ঐ দেশে শীঘ্রই যাইবে। তার মনের সমস্ত ময়লা ধুইয়া, সে শান্ত, নির্ব্বিকার চিত্তে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে চলিল।

বাড়ীর উঠানের কাছে আসিয়া তার চক্ষে জল আসিল। সমস্ত অতীত তার চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠিল। তার দুঃখ-ভরা অতীত জীবনের স্মৃতিতেও সে আজ কাঁদিল। সে যে তার পুণ্য-পবিত্র জীবনের কাহিনী,—সে যে সন্তানের মধুর স্পর্শে ভরা আনন্দের জীবন,—সে যে অপরাধে ভরা স্নেহ-রসে পূরিত জীবন! তার পা উঠিল না। বাহিরের উঠানে আসিয়া সে থামিয়া গেল। এখন সে কি করিবে?

ঘরের ভিতর হইতে সতীশ বলিল "কে?"

সুনীতির সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল,—সে উত্তর দিল না।

লণ্ঠন লইয়া সতীশ বাহির হইয়া আসিল। সুনীতি তাহার সঙ্গী মাঝিকে তাড়া-তাড়ি বিদায় দিল; নিজে সে মাথা নীচু করিয়া কম্পিত কলেবরে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সতীশ আসিয়া লণ্ঠন তুলিয়া দেখিল। সে সাত হাত পিছাইয়া গিয়া বলিল, "তুমি! আবার তুমি এসেছ কি ক'রতে?"

সুনীতি কথা কহিল না।

সতীশ বলিল, "এত বড় বেহায়া তুমি, যে, এত বড় অন্যায় ক'রে আবার আমার বাড়ীতে পা দিতে এসেছ কি সাহসে? বেরোও তুমি,—তোমার স্থান এখানে নয়,—ঐ রাস্তায়।"

সুনীতি নিশ্চল, নির্ব্বাক্!

সতীশ বলিল, "ভাল আপদ! বেরোও তুমি। কি ক'রতে ম'রতে এসেছ এখানে?"

সুনীতি মৃদু কণ্ঠে বলিল, "আমি মরতেই এসেছি।"

সতীশ চমকিয়া উঠিল। একটু বাদে সে বলিল, "মরতে এসেছ! তা' এখানে কেন? নদীতে যাও, গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মর গে। এখান থেকে বেরোও।"

সুনীতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল; স্বামীর আদেশ পাইয়া সে মুখ ফিরাইয়া বাহির হইতে গেল। আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আমার একটা শেষ কথা রাখবে কি? আমার বাছাদের একবার দেখে যাব।"

"না, সে সব হ'বে না। তারা ঘুমুচ্ছে, বাড়ীর সবাই ঘুমুচ্ছে,—কেউ জাগবার আগে, জানবার আগে, তুমি বেরিয়ে পড়, শীগ্‌গির বেরোও।"

"একবার,—শুধু একবার দেখে যাব! তা'দের ঘুমন্ত মুখ দেখে যাব,—জন্মের মত দেখে যাব" বলিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে সুনীতি সতীশের পায়ে লুটিয়া পড়িল।

সতীশ জোর করিয়া পা ছাড়াইয়া লইল। তাহাতে সুনীতির মাথায় সতীশের খড়মের ঘা লাগিয়া গেল; কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। হাত দিয়া কপাল চাপিয়া ধরিয়া সুনীতি উঠিয়া গেল। সতীশ তাড়াতাড়ি দুয়ারে খিল দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

রাস্তায় আসিয়া সুনীতি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাবিল। ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে নৌকায় ফিরিয়া গেল।

যতীন সুনীতিকে বলিল, "এ তো জানা কথা। কেন তুমি এলে?"

সুনীতি বলিল, "আমার বরাত!"

যতীন। এখন কোথায় যাবে?

সুনীতি। চল, ঢাকায় যাওয়া যা'ক। তুমি শোও, আমি মেঘনাদকে একখানা চিঠি লিখে নি।

সে একখানা চিঠি লিখিল সতীশকে, আর একখানা লিখিল মেঘনাদকে। শেষে বলিল, "না, আমার মনের পাপ

আর তা'কে জানিয়ে কি হ'বে।' বলিয়া মেঘনাদের চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিল ; সতীশের চিঠিখানা মুড়িয়া সে বাক্সের উপর চাপা দিয়া রাখিল।

তখন শেষ রাত্রি। সুনীতি চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ জাগিয়া নাই। সে নীরবে নৌকার শিল্‌খানি উঠাইয়া লইয়া ধীরে-ধীরে জলে নামিল। অনেক জলে গিয়া শিলখানি গলায় বাঁধিয়া ডুবিল, আর উঠিল না।

পরের দিন সকাল-বেলায় যতীন চিঠিখানা লইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে সতীশের বাড়ী গেল। সতীশ তখন সবে মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়াছে। যতীনকে দেখিয়া সে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু যতীন যখন কাঁদিয়া বলিল, "দিদি নেই!" তখন সে সর্পাহতের মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাড়াতাড়ি সে যতীনের হাত হইতে চিঠিখানা কাড়িয়া লইয়া পড়িল। সুনীতি লিখিয়াছে—

"তোমার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলিলাম। আমি তোমার কাছে শাস্তি লইতে আসিয়াছিলাম, শাস্তি পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। আমার আর কোনও দুঃখ নাই,—কেবল যাইবার আগে আমার বাছাদের একবার দেখিতে পাইলাম না, এই আমার দুঃখ!

"আমি তোমার শয্যা কলঙ্কিত করি নাই। কিন্তু মনে-মনে আমি ভীষণ পাপ করিয়াছি। আশীর্ব্বাদ কর, আমার এই প্রায়শ্চিত্তে যেন আমার পাপ ধুইয়া যায়।

"তোমার কাছে আমার এই শেষ অনুরোধ,—অভাগিনীর গর্ভে জন্মিয়াছে বলিয়া ছেলেদের গঞ্জনা দিও না,—তাদের মা-বাপ হইয়া তুমি তাহাদের দেখিও।

অপরাধিনী

সুনীতি।"

পুনঃ—"মেঘনাদ দেবতা, তার উপর তুমি অন্যায় সন্দেহ করিলে, ধর্ম্মের কাছে দোষী হইবে। সে আমাকে মা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, মায়ের সম্মান দিয়া ঘরে রাখিয়াছিল। আমি পোড়ারমুখী তার সে 'মা' ডাকের সম্মান রাখিতে না পারিয়া, তাহাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি।"

সতীশ স্তম্ভিত হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। যখন সে কতকটা আত্মস্থ হইল, তখন সে যতীনকে লইয়া ছুটিয়া গেল প্রহ্লাদ বাবুর বাসায়। তখনি থানায় খবর দিয়া প্রহ্লাদ বাবু এ চিঠি দাখিল করিয়া দিলেন। সুনীতির শবদেহ ছাঁকিয়া তোলা হইল। রীতিমত তদন্ত হইয়া তাহার আত্মহত্যা সাব্যস্ত হইলে, প্রহ্লাদ বাবু নিশ্চিন্ত হইলেন।

(২৭)

পুনর্ব্বিচারে মনোরমা মুক্তি পাইল। মেঘনাদ একদিন আসিয়া সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছিল। এবার সে সরিৎকে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিল। মনোরমার সঙ্গে সে দেখা করে নাই।

জগদীশ প্রথমে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল। মুক্তি পাইয়া মনোরমা মেঘনাদের কাছে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। শেষে সাত-পাঁচ ভাবিয়া জগদীশ তাহার মুহুরী রামগোপালের সঙ্গে তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিল এবং মেঘনাদকে একখানা দীর্ঘ টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দিল।

এদিকে মেঘনাদ অনেকদিন সুনীতির কোনও সংবাদ না পাইয়া, তার মায়ের কাছে টেলিগ্রাফ করিয়া জানিল যে, সুনীতি বা যতীন ঢাকায় যায় নাই। সে মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। চারিদিকে খোঁজ-তল্লাস করিতে লাগিল। কেবল, সুনীতি যে টাঙ্গাইল যাইতে পারে, এ কথা তাহার এক দিনও মনে হইল না।

হঠাৎ একদিন সকাল-বেলায় সতীশ তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার কাছে মেঘনাদ নিদারুণ সংবাদ শুনিল। সতীশ সেই দিনই ছেলেদের লইয়া চলিয়া গেল। ছেলেরা মহা কান্নাকাটি জুড়িয়া দিল। ছটুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া সরিৎ কাঁদিয়া আকুল হইল।

পরের দিন মেঘনাদ সকালে উঠিয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া Indian Medical Journal পড়িতেছিল। নূতন জ্বরের সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ দেখিয়া ঔৎসুক্যের সহিত পড়িতে লাগিল। পড়িতে-পড়িতে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। আর একজন তাহারই মত পরীক্ষা করিয়া এই জ্বরের বীজ ও তাহার প্রতিষেধক আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে দেখিয়া সে চমকিত হইল। তাড়াতাড়ি সে প্রবন্ধের শেষে লেখকের নাম খুঁজিল—দেখিল—'যতীশ ঘোষ'। রাগে তাহার ব্রহ্মতালু জ্বলিয়া উঠিল। পাপিষ্ঠ, অবিশ্বাসী বন্ধুর অপকার্য্যে সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। মেঘনাদ নিজের আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে আর কাহাকেও কিছু বলে নাই—কেবল বলিয়াছিল যতীশ ঘোষকে। এতদিন মেঘনাদ নানা ঝঞ্ঝাটে

পড়িয়া তাহার প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করিয়া পাঠাইতে পারে নাই; আর এই বিশ্বাসঘাতক অনায়াসে মেঘনাদের প্রাপ্য যশঃ চুরি করিয়া লইল! রাগে গরগর করিতে-করিতে সে প্রবন্ধটি আবার পড়িতে লাগিল। যতীশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আবিষ্কারের প্রক্রিয়া বর্ণনা করিয়াছে—জীবাণুদিগের আকৃতি-প্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছে; এবং প্রতিষেধকের ফলাফল এবং প্রয়োগের নিয়ম ব্যাখ্যা করিয়াছে। প্রবন্ধের শেষে সে মেঘনাদের নাম করিয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিয়াছে। মেঘনাদ তাহার নির্দ্দেশ অনুসারে অনেকগুলি পরীক্ষা সম্পন্ন করিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে এই আবিষ্কারে অনেকটা সহায়তা করিয়াছে—এইরূপ যতীশ লিখিয়াছে।

কাগজখানা ফেলিয়া দিয়া মেঘনাদ মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। এই চোর, পরস্বাপহারককে পণ্ডিত-সমাজে অপদস্থ করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। যতই ভাবিল, ততই দেখিতে পাইল যে, তাহার পক্ষে এ বিষয়ে কর্তৃত্ব প্রমাণ করিবার কোনই উপায় নাই। তাহার সহায়তা স্বীকার করিয়া যতীশ তাহার প্রমাণ-প্রয়োগের পথ প্রায় বন্ধ করিয়াছে। অনেকক্ষণ ভাবিয়া-ভাবিয়া তার মাথাটা গরম হইয়া উঠিল। সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল সুনীতির শোকে তাহার মন একেই অন্ধকার হইয়া ছিল,—তার পর এই আলোচনা আর তার ভাল লাগিল না।

সে উঠিয়া দাঁড়াইতেই, টেলিগ্রাফের পিয়ন আসিয়া ঘরে ঢুকিল, এবং জগদীশের টেলিগ্রামখানা তাহাকে দিল। রসিদ সই করিয়া দিয়া ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে টেলিগ্রাম খুলিয়া সে পড়িল,

"মনোরমা মুক্তি পাইয়াছে"—কথাটায় তার প্রাণ এখন কাঁপিয়া উঠিল। তার পর আরও গুরুতর কথা! "সে তোমার কাছে যাইতে চায়। তাহাকে আমার মুহুরীর সঙ্গে পাঠাইলাম,—তুমি প্রস্তুত হও, সাবধান!"

মেঘনাদের মাথা ঘুরিয়া উঠিল। যতীশ ঘোষের অপরাধের কথা সে ভুলিয়া গেল। সে ভাবিল, তার অতীত তাহাকে অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। এ পাপ হইতে এখন সে কেমন করিয়া মুক্ত হইবে? মনোরমাকে লইয়া সে এখন কি করিবে? সেই সব পুরাতন অসমাহিত প্রশ্ন আবার নূতন করিয়া তাহার মাথার ভিতর তোলপাড় করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

বিরামহীন

[শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম-এ, বি-এল]

বৃষ্টি আজ কোন মতে থামে না থামে না,
মেঘেরা দিয়েছে ঢেলে অলস শরীর
আকাশের গায়। বুঝি ধরার কামনা
ধরেছে জলদ-রূপ? চির অতৃপ্তির
অসীমে পড়েছে ছায়া বুঝি? আজি হেথা
বনে বনে উঠে বেজে বিরহের বাণী;
প্রাণে গুমরিয়া উঠে অপরূপ ব্যথা।
ফুল' ফুলে' উঠে ওরে কোন অভিমানী!

পশ্চিমের বুকে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের রাশ
পুঞ্জীভূত—অতরল। ক্ষণে ক্ষণে হয়
চকিত উজ্জ্বল নীল বিদ্যুৎ বিকাশ
—বেদনার নিমেষের ব্যাকুল বিস্ময়।
তবু সে আকাশ হতে মেঘেরা নাবে না
বৃষ্টি আজ কোন মতে থামে না থামে না।

পথহারা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ব্যাপার বেশ একটু ঘোরালো হইয়া উঠিল। ইন্দ্রাণী সে দিনের পর হইতে অমৃতকে একেবারেই এড়াইয়া চলিতে লাগিল। এদিকে মঙ্গলাঠাকুরাণী ইন্দ্রাণীর এই অনভ্যস্ত উত্তেজিত ব্যবহারে ভয় পাইয়া গিয়া মনে করিলেন, হয় ত এইবার রাগ করিয়া ইন্দ্রাণী অমৃতকে তাড়াইয়া দিবে। এক দিকে ভাইপোর মায়া, অপর পক্ষে, তাঁহার 'দুখে' যে আবার আসিয়া সেই সৎমায়েরই পায়ের তলায় আসন পাতিয়া বসিবে, এই অসহ্য ঈর্ষার জ্বালা, এতদুভয়কে সাম্‌লাইয়া চলিতে গিয়া তিনি একান্ত বিপন্ন বোধ করিতেই, মাথার মধ্যে একটা যুক্তি আসিয়া ঘা মারিল। চুপি-চুপি অমৃতকে ডাকিয়া আনিয়া, ফিস্‌ফিস্ করিয়া তাহাকে শুনাইয়া বলিলেন, "আর শুনেছিস্ পেসাদে, আমাদের রাজরাণী তোর ওপোর যে বড় রেগেছেন!"

অমৃতের মনটা অত্যন্তই বিগড়াইয়া গিয়াছিল,—সমস্তই তাহার যেন তিক্ত-বিরক্ত ধরিয়া যাইতেছে,—কিছুই ভাল লাগিতেছিল না;—তথাপি, এই কথাটায় সে যেন বেত খাইয়া চম্‌কাইয়া উঠিল; এবং ব্যগ্র ভাবে অথচ ম্লান হাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "আমার অপরাধ?"

মঙ্গলা মুখখানা বিজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ মহামন্ত্রীর মত গম্ভীর করিয়া, তেমনি স্বরেই জবাব দিলেন, "কেমন করে জান্‌বো বাছা! তবে ও-বাড়ীর বেয়ানের সঙ্গে বলাবলি হচ্ছিল,—কাণে ঢুকলো,—তাই শুন্‌তে পেলুম যে, আমাদের গিন্নি ঠাকরুণ খুব রুখে-রুখে বল্‌ছেন, 'ওকে আমি দূর করে তবে ছাড়বো; যখন-তখন ছুটে-ছুটে আমার ঘরে এসে ঢোকেন,—পায়ে ধরে আমায় অপমানের কথা বল্‌তে পর্য্যন্ত বাদ দেন নি,—ওঁর হাতে আমি ছেলে রাখ্‌বো! ছোট লোক ছোঁড়া!' তাই বলি কি বাবা, কাজ কি তোর অত ঝঞ্ঝাটে,—না হয় চিরদুখী দুখের আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হোক্,—তুই নিজের ঘরে ফিরে যা; কোন্ দিন হুট্ করে তোর নামে কি একটা অপবাদই বা দিয়ে বস্‌বে। আমার ও-সবে বড় ভয়, ওসব কথা আমার বাপের রক্তে উঠ্‌লে আমি মাথা কুটে মরে যাব।"

একেই মন ভাল ছিল না,—ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত আগুনের মত একমুহূর্ত্তে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া, অমৃত কম্পিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "বটে! এত ছোট মন ওঁর! উনি না এ-দিকে শিক্ষিতা? আচ্ছা, থাকুন উনি; দেখি, কেমন করে আমায় দূর করেন। বিমল!—বি-ম-ল!"

বিমল ছুটিয়া আসিলে, ক্রোধক্ষিপ্ত অমৃত জ্ঞানশূন্য ভাবে তাহাকে হুকুম করিল, "আজই আমরা কলকাতায় ফিরবো, শিগ্‌গির তৈরি হয়ে নাও গে।"

বাড়ী আসিয়া, বোনটিকে পাইয়া, বিমলের আদৌ আর কলিকাতায় ফিরিবার ইচ্ছাই ছিল না। তার উপর এইরূপ অতর্কিত অন্যায় আদেশে সে ঘোর অসন্তোষের সহিত ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল; বলিল, "কালও তো আমাদের ছুটী আছে,—আজ কেন যাবো? আজ আমি যাবো না।"

অমৃত ক্রোধে তখনও কাঁপিতেছিল। রুখিয়া উঠিল, "আজ তোমায় যেতেই হবে। আমার হুকুম বলে যাবে।"

বিমলেন্দুকে আজ পর্য্যন্ত কেহ কোন দিন 'হুকুম' চালায় নাই,—এ শব্দটা তাহার সম্পূর্ণই অশ্রুত। সেও ঠিক সেই এক রকমই রোখের সহিত জবাব গাহিল, "আমি কারু হুকুমের চাকর নই।"

তখন অমৃত আসিয়া বিমলের কাণ ধরিতেই, একদিক হইতে মঙ্গলা হাঁউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; অন্য দিক হইতে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া তারা ছুটিয়া আসিয়া তাহার দাদাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল। কেশর-ফুলানো সিংহ-শিশুর মত ফুলিতে-ফুলিতে বিমল অমৃতের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল। যে সব লোক ভয়ত্রস্ত দৃষ্টি লইয়া, এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনের জন্য সমবেত হইয়াছিল, তাহাদেরই মধ্যস্থ একজন ভৃত্যকে একখানা গাড়ি ডাকিয়া আনিতে আদেশ দিয়া, অমৃত বিমলের কাণ ছাড়িয়া হাত ধরিল। এই

সময়ে তাহার চোখ পড়িয়া গেল সেই মুহূর্ত্তে উপস্থিত ইন্দ্রাণীর মুখের উপর। অমৃত তাড়াতাড়ি তাহার মুখ হইতে নিজের দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া, জোর করিয়া উহাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে চাহিয়া, বিমলকে আদেশের স্বরে কহিল, "এসো!"

বিমল পূর্ব্বের মতই তাহার বজ্রমুষ্টি হইতে নিজের হস্ত মুক্ত করিতে চাহিয়া, টানাটানি বাধাইয়া, তর্জ্জন করিয়া বলিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাবো না,—তুমি ছেড়ে দাও আমায় শিগ্‌গির বল্‌চি।"

ইন্দ্রাণী অমৃতের সম্মুখীন হইয়া, তাহার স্বভাবসিদ্ধ নম্র অথচ দৃঢ় স্বরে কহিল, "কেন ওকে পীড়ন করচেন? ও আর কল্‌কাতায় এক্ষণ যাবে না। আপনি ওকে ছেড়ে দিন।"

অমৃত ইন্দ্রাণীর এই আদেশ গ্রাহ্য মাত্র করিল না; বরং হিংস্র পশুর হস্তধৃত শিকারের মত বিমলের ধৃত হস্ত অধিকতর বলের সহিত চাপিয়া ধরিয়া, আগুনের জ্বালাভরা দুই চক্ষু ইন্দ্রাণীর মুখে সংস্থাপনান্তর কুটিল স্বরে কহিল, "আমি ওর গার্জ্জেন, ওর ভাল-মন্দ তোমার চেয়ে ঢের বেশি আমি বুঝি। আমার কাজে কেউ যে কথা কইতে আসে, সে আমার পছন্দ নয়।"

শুনিয়া ইন্দ্রাণীর সমস্ত মুখই টকটকে লাল হইয়া উঠিল; কিন্তু সম্পূর্ণ সংযত কণ্ঠেই সে কহিল, "আপনি তো ওর গার্জ্জেন নন,—আমিই সে ভার পেয়েছি। আমি বল্‌চি, আপনি আর ওকে নিয়ে গিয়ে কষ্ট পাবেন না,—আমার হাতেই ওকে ছেড়ে দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন।"

ভৃত্য আসিয়া খবর দিল, গাড়ী আসিয়াছে। অমৃত তাহাকে নিজেদের অল্পসল্প জিনিষপত্র তুলিয়া দিতে হুকুম দিয়া, বিদ্রূপ-হাস্যে রঞ্জিত মুখখানা ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে ফিরাইয়া, ব্যঙ্গের ভাবে হাসিয়া কহিল, "আজ্ঞে না দিদি ঠাক্‌রুণ! মাপ কর্ব্বেন, বিমলের গার্জ্জেন এখন আর আপনি বা আপনার বাবা নেই,—এখন থেকে আমিই ওর সম্পূর্ণ অভিভাবকত্ব নিজের হাতেই নিলুম। ইচ্ছা হয় নালিস করে দেখতে পারেন। তবে জেনে রাখবেন, সেখানে ওর এই তের বৎসর বয়সে মিড্‌ল-প্রাইমার পরীক্ষাতেও ফেল করাই আমার সপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। তা ছাড়া, আপনি পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোক, আর আপনার বাবা অক্ষম বৃদ্ধ। আর আমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার আপনাদের যদি কোন স্বকপোলকল্পিত অপরাধ তৈরি করেও থাকেন, তো, সে কথা আদালতে দাঁড়িয়ে মুখ দিয়ে বার করতে পারবেন কি?—প্রণাম ভাল লাগে নি, তাই এবার নমস্কার করে গেলুম। বারান্তরে হয় ত তারও দরকার হবে না।"

এই বলিয়া নত মস্তকে যোড় হাত ঠেকাইয়া, নিজের পিসির দিকে একবার না তাকাইয়াই, অমৃত বিমলকে জোর করিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

একটা প্রকাণ্ড ঝটিকা বহিয়া গেলে, বৃক্ষসঙ্কুল বনস্থলীর যেমন অবস্থা হয়,—কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত ঠিক সেই রকমই, ঝড়ে-ভাঙ্গা গাছগুলার মতই, এই বাড়ীর সল্প কয়েকজন লোক যেন মুহ্যমান ও বিমূঢ় হইয়া রহিল। তার পর সর্ব্ব প্রথম সেই স্তম্ভিত নীরবতা ভঙ্গ করিয়া, মঙ্গলাঠাক্‌রাণীর শঙ্খধ্বনিবৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠ সপ্তমে বাজিয়া উঠিল—"ওরে, আমি এ যে খাল কেটে কুমীর এনে জিওলুম রে; ওরে এক শত্তুরের হাত এড়াতে গিয়ে এ যে মস্ত শত্তুরের হাতে আমার দুধের বাছাকে সঁপে দিয়েছি রে। ওলো তারা! বাছা যে আমার অনেকক্ষণ কিছু খায় নি লো; ওলো, ছুটে গিয়ে দেখ্‌গে যা, গাড়ী দেখা যাচ্চে কি না। ত্‌'হলে ঐ গাড়ীর চাকায় আজ আমি প্রাণ দোব লো।" বলিতে-বলিতে উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া একেবারে সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। সৌভাগ্যের বিষয় তাঁহার প্রাণ হরণের জন্য একখানা গাড়ির চাকাও সুদূর পর্য্যন্ত সমস্ত পথটার উপর দেখা গেল না। উহাদের গাড়ি ততক্ষণে দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে।

হ্যারিসন রোডের একটা ত্রিতল বাড়ীর দুইটা ঘর লইয়া অমৃত-বিমলে সংসার পাতিয়া বসিয়াছিল। এর মধ্যে একখানা ঘর রাজপুত্রের বাসযোগ্য করিয়া সাজাইয়া, সে তাহাতেই বিমলকে রাখিল। সে ঘরে বড়লোকের ছেলের উপযুক্ত কিছুরই অপ্রতুল ছিল না। স্প্রিংএর-গদি-আঁটা ভাল খাট, নেটের মশারি, মেহগিনির রাইটিং টেব্‌ল। শ্বেত-পাথর-আঁটা বৃহৎ আয়না, হালফ্যাসানের একটা কাপড় রাখা আলমারি। তা ভিন্ন, সোনার ঘড়ি, চেন, বোতাম,—রূপার ছড়ি, রেশমী ছাতা, আর যা কিছু সে সকলি। এই সমস্ত দিয়াই যে সে গৃহহারা আত্মীয়-বান্ধব-বিচ্যুত বালকের বিমুখ চিত্তকে জয় করিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিয়াছে,—

এ সবকে অপ্রয়োজনীয় বলা চলে কোন্ হিসাবে? এ না হইলে, কিসের জোরে সে এই অশাস্য দুর্দ্দান্ত ছেলেকে বশে রাখিত? এই কয় বৎসরে অমৃত-মামার সাহায্যে বিমলেন্দুর এই নূতন সুখ বিলাসের মধ্যে জীবন-যাপনটা এতই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, এসব ছাড়িয়া, পূজার ছুটীর ক'টা দিনও সে আর নিজেদের পল্লীগ্রামের ভাঙ্গা বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া, চিরাভ্যস্ত জীবন যাত্রার মধ্যে নিজের সেই পুরাতন স্থানটা খুঁজিয়া পায় না। গ্রীষ্মের ছুটীতে কোনবারই বাড়ী যাওয়া ঘটে না। ঐ সময় দারজিলিং, কারসিয়ং, সিমলা পাহাড়, পুরী, ওয়াল্‌টেয়ার প্রভৃতি স্থানে হাওয়া খাওয়াই তাহার ওয়ার্ডের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযুক্ত বোধ করিয়া, বিমলেন্দুর অভিভাবক তাহাকে বাড়ী যাইতে দেয় না। বিমলেরও প্রথম যাত্রার পূর্ব্বাবধিই যা কিছু আপত্তি ছিল;—এখন আর তাহা নাই। বরং এই অবসরের প্রতীক্ষায় সে উদ্‌গ্রীব হইয়াই থাকে। পূজার ছুটীতে প্রথমবার দিন দশেকের জন্য, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারে বৈদ্যনাথ-মধুপুরের ফেরৎ মাত্র দিন-পাঁচেকের মত সে বাড়ী থাকিতে পাইয়াছিল। শেষ বৎসরে তাও পাইল না। তা তখন আর পাওয়ার প্রয়োজনও বড় ছিল না। বিমল নিজেই বলিল যে, "এবার আর শুধু-শুধু দেশে যাওয়া কেন? চলুন, এবার আমরা পূজার ছুটীতে সিঙ্গাপুরে বেড়িয়ে আসি।"

অমৃত দ্বিধা-সম্পূর্ণ একটা তীব্র দুঃখ অনুভব করিয়া কহিল, "তাই যাওয়া যাক্।"

ইন্দ্রাণীর উদ্দেশে মনে-মনে সে বলিল, "যেমন কর্ম্ম তোমার! আমায় তুমি নিকৃষ্ট কীটের মত পায়ের তলায় পিশিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে চাহিয়াছিলে না? আজ কে কাহাকে দূর করিল, তাই দেখ! আমায় আদর করিয়া কাছে টানিলে, মেয়ে দিলে, তোমারও ভাল হইত, আর আমাকেও তোমাদের বঞ্চিত করিয়া ঐ অর্দ্ধেক অংশ লাভ করার চেষ্টা করিতে হইত না, আপনিই আসিত। তার সঙ্গে অমন রূপসী। মেয়েটী ছোট ছিল বটে, কিন্তু এতদিনে সেও ত বার বছরের হইয়া উঠিল। এখন দাও, কোথা হইতে কত বড় সুপাত্র আনিয়া মেয়ের বিবাহ দেবে, দাও। আমি ত বড় মন্দ, যেহেতু তোমার পায়ের ধূলা মাথায় দিয়াছিলাম। এখন এই তো তোমার মাথায় পা তুলিয়া দিলাম, কি করিতে পারিলে?"

রামদয়াল এই বিবাদ-ভঞ্জনের চেষ্টায় নিজের অক্ষম শরীর-মন লইয়া বারংবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমন কি, নিজে গিয়া অমৃতের হাতে ধরিয়া তিনি বিমলকে পুরা ছুটিটার জন্যও, অন্ততঃ তার স্বজনের মধ্যে ফিরিয়া চাহিয়াছিলেন,—অমৃত সম্মত হয় নাই। সে যে যুক্তি দেখাইল, বাহিরের দিক হইতে তাহাকে নেহাৎ মূল্যহীন বলা যায় না। সে বলে, নানা কারণে সে নিজে আর বিমলের সহিত বিমলের বাড়ীতে যাইতে পারে না; অতএব দীর্ঘ দিন বিমলের পড়া-শুনা বন্ধ করিয়া, অনর্থক অস্বাস্থ্যকর পল্লীগৃহে বিমলকে রাখা তাহার উচিত বোধ হয় না। বিশেষতঃ, দিদিমার উদ্দাম আদরে এই ছেলেটীর স্বভাব কতদূর উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিল, সে কথা তো তাঁহার অজ্ঞাত নয়। এখন আবার তাহার মধ্যে একবার গিয়া পড়িলে, আর কি সে তাহাকে বশে রাখিতে পারিবে? অনেক কষ্টে, বিস্তর পরিশ্রমে যেটুকু হইয়াছে—সে সমস্তই মাটি করিতে চাহেন না কি?—

রামদয়াল নির্ব্বোধ না হইলেও সরল ও ধার্ম্মিক লোক। সাংসারিক কূটকচালে বুদ্ধি তাঁহার ছিল না। তিনি এই যুক্তিটার যাথার্থ্য অনুভব করিয়া, আর দ্বিরুক্তি পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না। যথার্থই দেখা গেল যে, অমৃতের তত্ত্বাবধানে অত্যল্প কালের মধ্যেই বিমলের সেই উদ্দাম পল্লী জীবনের আশ্চর্য্য রূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; এবং সে পরিবর্ত্তন মন্দের দিকে নয়। বিমল পড়া-শোনায় অনেক উন্নতি করিয়াছে। তাহার একটা যেন ভব্যতা-বোধ জন্মিতেছে। ছেলের ভালই তো তাঁহাদের দেখিতে হইবে।

এই ঘটনার প্রায় পাঁচ ছয় মাস পরেই রামদয়াল কঠিন পীড়ায় শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। সংবাদ পাইয়া ইন্দ্রাণী পিতার সেবা করিতে বারীৎপুরে চলিয়া গেল। ইহার পর রামদয়াল আরোগ্য লাভানন্তর শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেও, বৃদ্ধ-কালের কঠিন পীড়া এমন অবস্থা তাঁহাকে আর প্রত্যর্পণ করিল না, যাহাতে পূর্ব্বের মত বিষয়-কার্য্য করা চলে। এদিকে বিমলেন্দুর তরফ হইতে তাহার মাসিক বৃত্তি প্রথমে পঞ্চাশ টাকা, ও শিক্ষকের হিসাবে অমৃতের আশী দ্বিতীয় মাস হইতেই বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে। এক্ষণে মাসিক শত মুদ্রা এবং মাষ্টারের একশত দিয়াও, সমস্ত মাস ধরিয়াই কোন না কোন উপ্‌রি খরচের জন্য বিমলের তাগিদ-পত্র আসিতে

থাকে। সে পত্রে শুধুই বালকোচিত আবদার নয়, বিষয়াধিকারীর গভীর আদেশের সুরও সর্ব্বদা ধ্বনিত হইতে শুনা যায়।

অমৃত পত্র লিখিল, "আপনি অক্ষম, তত্ত্বাবধানের অভাবে বিষয় নষ্ট হইতে বসিয়াছে। বিমলের ইচ্ছা, আমার ঘাড়েই সবটি ফেলে। তবে তার কথার এখনও মূল্য হয় নাই; যেহেতু এখনও সে নাবালক। আমায় দিয়া কাজ নাই,—আমার সময়ই বা কোথা? তবে উপযুক্ত রূপ বন্দোবস্ত করা বিশেষ প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

এই সঙ্গে বিমল নিজেও অমৃতকে বিষয়-কার্য্যের তদারক-ভার দিতে অনুরোধ করিয়া স্বতন্ত্র পত্র দিয়াছিল।

দ্বিতীয় পত্রে বিমল আরও অনেক কথার সহিত এই কথাগুলি লিখিল—"আমি নাবালক বলে আপনারা আমার কথা গ্রাহ্য করেন না; কিন্তু আমি যখন আপনাদের চেয়ে যোগ্যতর অভিভাবক পাচ্ছি, তখন কেনই বা আপনাদের অনুগ্রহজীবী হয়ে থাকবো? ওঁর হাতে আমার গার্জ্জেনশিপ যদি না আপনারা সহজে দেন, তা হলে অগত্যাই আমায় জজের কাছে দরখাস্ত দিয়ে সেটা আদায় করতে হয়। কিন্তু এখনও আমি সেটা করতে ইচ্ছা করছি না। তবে যদি তাই করতেই আমায় বাধ্য করা হয়, তো সেজন্য আপনারা সম্পূর্ণ দায়ী। অমৃত মামা আমার নিকট আত্মীয় এবং প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী।"

ইহার পর রামদয়াল ও ইন্দ্রাণী নাবালকের সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া, নিজেদের সমস্ত দায়িত্বই অমৃতের হস্তে তুলিয়া দিল। শুধু তাই নয়,—ইন্দ্রাণীকে তাহার স্বামী যে তাঁহার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ দান করিয়া গিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত তাঁহার সেই উইলের প্রোবেট পর্য্যন্ত লওয়া হয় নাই,—সমস্ত সম্পত্তিই এক রহিয়াছে। এই সঙ্গে ইন্দ্রাণীও তাই তাহার নাবালক সপত্নী-পুত্রের আত্মীয় এবং অভিভাবক অমৃতের অনুগ্রহের উপরই পড়িল।

প্রথম বৎসরে অমৃত হিসাব মত টাকা মাস-কাবারে মাস-কাবারেই পাঠাইয়া দিল। দ্বিতীয় বৎসর হইতে বিমলের খরচ বৃদ্ধির অজুহাতে মা-দিদিমার খরচের টাকায় টান পড়িল। ইন্দ্রাণী ভাল-মন্দ কোন কথাই কহিল না। মঙ্গলা ঠাকুরাণী ছন্দে-বন্দে ভ্রাতুষ্পুত্রের অতি দর্পের অবশ্যম্ভাবী ফলে নিশ্চিত সর্ব্বনাশের ভবিষ্যৎ-বাণী-গাহিতে গাহিতে, পাড়া-পড়সীকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়া, ক্রন্দনের সহিত এত কাল পরে প্রতি মাসেই একবার করিয়া স্বীকার করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার নিজের গায়ের রক্ত ওই কৃতঘ্ন ভাইপোকে আনিয়া নিজের নাসিকা স্বহস্তে ছেদন না করিলে, শত্তুর সম্পর্ক যারা তাদের হাতেও যে তিনি এর চেয়ে ঢের বেশী সুখে ছিলেন। হায়, হায়! এমন কুমতি তাঁহার কেন হইয়াছিল!

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

আকাশ দেখিতে-দেখিতে ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রাজধানীর ধূম-ধূসর ঊর্দ্ধাকাশে আসন্ন-বর্ষণ ভয়-ভীত বিহঙ্গের দল সেই মেঘ-চন্দ্রাতপের নীচে আরও একখানা বিচিত্র চাঁদোয়ার মত বিস্তৃত হইয়া গিয়া, মেঘমলিন দিবসান্তের মলিন মূর্ত্তিকে ম্লানতর করিয়া তুলিল; পথে পথবাহী পথিকবৃন্দ ত্রস্তে গতি চঞ্চল করিয়া দিল। গাড়ীগুলা একটু ছুটিয়া চলিল। আকাশে চাহিয়া মেঘের ঘটাখানা নিরীক্ষণ করিতে-করিতে, কলেজ ষ্ট্রীটের ফুটপাথের উপরকার খুচরা পুস্তক-বিক্রেতা, মণিহারীর দোকানদার, ফলওয়ালারা নিজের ঝাঁকা-পেতে পাততাড়ী ক্ষিপ্রহস্তে গুটাইয়া লইতে লাগিল।

এমন সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের দ্বিতলের সিঁড়ি দিয়া একটী ছেলে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে নামিয়া আসিতেছিল। কলেজের ছুটী অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে; সকল ছেলেই প্রায় বিদায় লইয়া গিয়াছে। কেবল এই প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রটী একা এতক্ষণ ধরিয়া উপরে বসিয়া কি করিতেছিল, সেই জানে। তবে এমন করিয়া যে উঠি-পড়ি করিয়া ছুটিয়া নামিয়া আসিতেছে, ইহার কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। সে ঐ যে কারণে শূন্য পথে কাক-চিল ছুটাছুটি করিতেছে, পথের উপর পথিক ও গাড়ি মোটর ট্রাম ছুটিতেছে—সেই একই কারণ-প্রসূত। হয় ত কি কার্য্যে ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত, সূর্য্যাস্ত-সমুজ্জ্বল দিগন্তের মসীপুঞ্জ রেখা যে দেখিতে না দেখিতে মেঘারণ্যে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সে খবর সে জানিতে পারে নাই। যখন তাহার ঘন কালো নবীন

জটাজুট পৃথিবীর ভয়ার্ত্ত মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, আকস্মিক মহাভয়ের সন্তাড়নে তাহার শ্বাস রুদ্ধ করিবার উপক্রম করিয়া তুলিয়াছে, সেই সময় এই ছেলেটার হঠাৎ ধ্যান ভঙ্গ হয়, এবং তৎক্ষণাৎ সে বাড়ী ফিরিবার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া নামিতে থাকে।

সিঁড়ির সর্ব্বের শেষ ধাপ হইতে যেমন মাটিতে পা পড়িয়াছে, অমনি তাহারই সমান বেগশালী অপর এক ব্যক্তির সহিত তাহার সংঘর্ষ হইয়া গেল। মালে ও মেলে নয়,—দুখানা পূর্ণতেজে চালানো মেল গাড়ীতে ধাক্কা লাগিলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি।

সিঁড়ি দিয়া যে ছেলেটা এঞ্জিনের বেগে নামিয়া আসিতেছিল, ধাক্কা লাগানোর দোষ সুক্ষ্ম বিচারে তারই একটু কম। বোধ করি সেই হেতু ধরিয়াই, সে সমধিক ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রূ বাকাইয়া চাহিতেই, সংঘর্ষিতের বেদনা-ক্লিষ্ট মুখখানা দেখিয়া, ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে সহসা বলিয়া ফেলিল, "ওঃ আপনি! মাপ কর্ব্বেন!"

অপর ছেলেটা, যেটি সদ্য লাইব্রেরী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল, সে ব্যক্তি এতক্ষণে নিজের ললাটে প্রাপ্ত ভীষণ আঘাত-ব্যথা কতকটা সামলাইয়া লইতে পারিয়াছে। মৃদু হাস্যের সহিত ডান হাতখানা বাড়াইয়া দিল, "বিলক্ষণ! দোষ কল্লাম আমি, প্রায়শ্চিত্ত করচেন আপনি? নাঃ, বিমলেন্দু বাবু! কাজটা ভারি অন্যায় হয়ে গ্যাছে মশাই! সমস্তক্ষণ বইটা নিয়ে বেহুঁষ হয়ে থেকে, শেষে যখন বইএর অক্ষর হঠাৎ অন্ধকারে ডুব মার্‌লে, তখন মরিয়া হয়ে মারি কি মরি করে বার হয়ে পড়া গেছলো আর কি!"—বলিয়া ছেলেটা অপরাধ ক্ষালনের মিষ্ট হাসি একটুখানি হাসিল। সে হাসিটুকু বড়ই মিঠে,—বড়ই সরেষ তার ঝঙ্কারটি।

বিমলেন্দুও ঈষৎ সলজ্জ হাস্যে স্বীকার করিল যে, তাহার ব্যাপারটাও ঠিক উহারই সহিত এক সমান।

"ঐ যাঃ! বড়-বড় ফোঁটা দিয়ে বৃষ্টি নেমে এলো! নাঃ, আজ নাকাল করাবে দেখতে পাচ্চি!"

"চলুন, চলুন,—চট্ করে বেরিয়ে পড়া যাক্।" পুনশ্চ এই কথা বলিয়াই, ছেলেটা বিমলেন্দুর হাত ধরিয়া টানিতে-টানিতে, নিজে দ্রুত অগ্রসর হইয়া সাম্‌নের পৈঠা কয়টা অতিক্রম করিল।

ফটকের সাম্‌নে একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল। সহিস ও কোচম্যানের মুখ ভিতরের দিকে ফিরানো। তাহাদের চক্ষের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি একবার কালো অন্ধকার আকাশে, একবার প্রকাণ্ড বাড়ীখানার ইতস্ততঃ ফিরিয়া-ফিরিয়া অসহিষ্ণুর বিরক্তি-বজ্র হানিতেছিল। বহুক্ষণ বোঝা-ঘাড়ে দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া ঘোড়াটাও যে বেশ সন্তুষ্ট নাই, তাহার সাম্‌নের পা দিয়া পুনঃ-পুনঃ মাটিতে ক্ষুর-ক্ষেপণেই উহা প্রকটিত। ছেলে-দুটি একসঙ্গে বাহিরে আসিতেই, সহিসটা গাড়ির দরজা খুলিয়া দিল,—কোচম্যান ঘোড়ার লাগাম ঠিক করিয়া ধরিল। ছেলেটা গাড়ির পা-দানীতে একটা পা রাখিয়া, এদিক-ওদিক চাহিয়াই, বিমলের ধৃত-হস্ত আকর্ষণ করিয়া বলিয়া ফেলিল,—"ট্রাম একখানাও নেই,—কোথায় এখন ভিজ্‌তে যাবেন। চলুন আমার সঙ্গে।"

এই বলিয়াই, উহাকে ভালরূপে ভাবিতে পর্য্যন্ত না দিয়া, গাড়ির মধ্যে একরকম টানিয়া তুলিয়া লইল। দরজা সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল, ঘোড়া ছুটিল। মেঘও গর্জ্জিয়া উঠিল; এবং হুহুশব্দে ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল। বেলগেছিয়ার কাছাকাছি একটা স্থানে, একটা বাগানবাড়ীর মধ্যের গাড়ীবারান্দায় শ্রান্ত এবং শীতার্ত্ত ঘোড়াটা গাড়িখানাকে পৌছাইয়া দিয়া থামিল। সহিসটা সপ্‌সপে হইয়া ভিজিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে দরজা খুলিয়া দিলে, যাহার গাড়ী সেই আগে নামিয়া, বিমলেন্দুকে নামাইয়া লইতেছে, এমন সময় মাথার উপরের ঢাকা বারান্দা হইতে ব্যগ্রকণ্ঠের আহ্বান আসিল, "কেরে, মঞ্জু এলি?"

ছেলেটা বিমলের হাত ধরিয়াই, অকাল-সন্ধ্যার স্বল্পালোকে পথ দেখিয়া, সাম্‌নের চওড়া বারান্দার দক্ষিণ প্রান্তে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইয়া, স্বর কিছু উচ্চ করিয়াই জবাব দিল, "হাঁ মা, আমরা এসেছি। তুমি শিগ্‌গির দু'কাপ চা, আর যদি কিছু খাবার থাকে তো আমাদের দুজনের জন্যে পাঠিয়ে দাওগে। ভারি ক্ষিদে পেয়েছে।"

সিঁড়ির ঠিক সাম্‌নেই উপরের বারান্দায় বৈদ্যুতিক আলোর সুইচ্ খট করিয়া উঠিয়া অন্ধকার সিঁড়িশুদ্ধ আলোকিত হইয়া উঠিল। মা কহিলেন, "হ্যাঁ রে মঞ্জু, ভিজিস নি তো রে একটুও? দেখ বাছা, ভিজে কাপড়ে যেন থেকো না। দরকার হয় তো বলো, কাপড় আর তোয়ালে পাঠিয়ে দিই। ক'জনের জন্য পাঠাবো?"

মঞ্জু বা অসমঞ্জ হাসিয়া কহিল, "না গো মা, না,—একটুও

ভিজি নি। সে ফোঁটাকত জল যা পড়েছিল, এতখানি পথ আসতে শুকিয়ে গেছে। তুমি খাবার ব্যবস্থা কর মা, পেটের নাড়িগুলো শুদ্ধু প্রায় হজম হ'বার যোগাড় হয়ে এসেছে। দুজনের মত দিও।"

"এই যে, সবই ঠিক আছে,—আমি এক্ষণি গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

সাম্‌নেই একটা বড় হল। ঘরটা কল্‌কোতার বড়-লোকী কেতায় হালফ্যাসানে সাজান। ঘরের দেওয়ালে অনেকগুলা বিদ্যুতালোকের মধ্যে একটা মাত্র জ্বলিতেছে। সেই ঘর দিয়া তাহার পাশেই আর একটা ঘরে অসমঞ্জ বিমলকে লইয়া প্রবেশ করিল; এবং ঘরের আলোকে জাগাইয়া তুলিয়া, দুখানা চেয়ার দুজনের জন্য টানিয়া আনিয়া, দুজনেই বসিয়া পড়িলে পর, বিমলের পিঠ চাপড়াইয়া সহাস্যে কহিল, "বিমলবাবুর বোধ করি এতটা উপদ্রব সহ্য হচ্চে না, না?"

বিমল নিজের বিজড়িত বিব্রত ভাবটা গোপন করিতে চাহিয়া, চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিয়া কহিয়া উঠিল, "সে কি? না, না,—কেন?"

অসমঞ্জ পুনশ্চ হাসিয়া কহিল, "না হলে এতটা চুপচাপ্‌ কেন? মনে করেচেন, হঠাৎ এ লোকটা মাথা ভাঙতেই বা এলো কেন, আবার চিলের মত ছোঁ মেরে উড়িয়ে নিয়ে এসেই বা তালগাছে তুল্লে কেন? মনে নিশ্চয় কোন কু-মতলব আছে।" বলিয়া শিশুর মত মুক্ত কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

উহার কথার ভঙ্গি ও হাসির সুরে কি ছিল,—বিমলের অনভ্যস্ত, লজ্জিত ভাবটা যেন ইহাতেই একসঙ্গে দূরে সরিয়া গেল; এবং কোয়াসা-কাটা রৌদ্রের মত তাহার সমস্ত চিত্ত ভরিয়া যেন একটা আনন্দ ও গৌরব ঝলমল করিয়া উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গেই সে তাহার ঠিক সম্মুখস্থিত মুখখানার উপর পূর্ণচক্ষে চাহিতেই, তাহার সর্ব্বশরীর-মন যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মেঘের অন্ধকারে যে চোখের সার্চ্চলাইটের মত দৃষ্টি এতক্ষণ লুকান ছিল, আলোর আভায় তাহা বিদ্যুতোজ্জ্বল হইয়া প্রকটিত হইয়াছে। সে চোখের দিকে এক নিমেষের চেয়ে বেশিক্ষণ চাহিয়া থাকা অসম্ভব। বিমল কি বলিতে গিয়া, সেই চোখের দিকে চাহিয়াই, নিজের চোখের দৃষ্টি নত করিয়া লইল। তার পর ঈষৎ হাস্যের সহিত উত্তর করিল, "বিলক্ষণ! এই বৃষ্টিতে কোথায় ভিজে মরতুম, সঙ্গে করে এনে—" এই সময় একজন ভৃত্য একখানা চিত্র-বিচিত্র-করা মুরাদাবাদী বড় খুঞ্চেতে করিয়া দুই পেয়ালা চা এবং দুখানা রেকাবে নানাবিধ খাদ্য প্রভৃতি লইয়া ঘরে ঢুকিল। বিমল সেই দিকে চাহিয়াই কথাটা শেষ করিল, "আশ্রয় এবং আহার দুই-ই যোগাচ্চেন,—আবার উল্টে বল্‌চেন কি না, আমিই অত্যাচারিত হচ্চি? তা, এ বড় মন্দ নয়!"

অসমঞ্জ সাম্‌নে রাখা চায়ের পেয়ালা বিমলের দিকে আগাইয়া দিতে-দিতে, হাসিয়া মুখ তুলিতেই, আবার তাহার সেই হীরকের মত সমুজ্জ্বল, অন্তর্ভেদী দুই চোখের দৃষ্টির সহিত বিমলের সসংস্ত্রম্ভ দৃষ্টি সম্মিলিত হইয়া গেল। তাহার সমস্ত দেহে আবার যেন কাঁটা দিয়া উঠিল; অথচ সে অন্তরের মধ্য হইতে যেন এই নব পরিচিতের প্রতি একটা প্রবলতম আকর্ষণ অনুভব না করিয়াও থাকিতে পারিতেছিল না। নিঃশব্দ-কৌতুকে গরম চায়ের বাটী তুলিয়া লইয়া, সে যথা-কার্য্যে মনোনিবেশ করিল,—অনুরোধের অপেক্ষা রাখিল না। তাহার যেন মনে হইল, ইহার মুখ হইতে উপরোধের ভাষা—সে যে বাহির করাইতে চায়, তাহার নিজেরই দীনতা। এ যেন স্বভাবতই রাজা,—স্বতঃই উচ্চ।

কক্ষ-বহির্ভাগে খটখট করিয়া খুব ভারি জুতা পায়ে দিয়া, সদর্প চলনে কেহ চলিয়া আসিতেছে জানা গেল। অসমঞ্জ সে সময় কি কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া ডাকিল, "মিঃ পল্‌!"

"উঁ!" বলিয়া জবাব দিয়া যে ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিল, তাহার দিকে চাহিতে গিয়াই বিমলেন্দুর চক্ষুস্থির হইয়া গেল। অসমঞ্জর ওই দুই আশ্চর্য্য রহস্যময়, জ্যোতিঃ-বিস্ফারিত আয়ত লোচনের অপেক্ষাও এ যেন সমধিক বিস্ময়কর! যে আসিল, সে অসঙ্কোচে সোজা অসমঞ্জের পার্শ্বে আসিয়া, একখানা আসন টানিয়া লইয়া, নিতান্তই সহজ ভাবে বসিয়া পড়িল। সে ঘরে যে কোন একজন অপরিচিত তৃতীয় ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেছে, এমন এতটুকু সঙ্কোচ পর্য্যন্ত না দেখাইয়াই, অসমঞ্জকে জিজ্ঞাসা করিল, "………ফুটবল ম্যাচ আজ তা হলে হলো না বোধ হয়?"

অসমঞ্জ উত্তর করিল "খুবই সম্ভব বটে। আর এখানে কি হয়েছিল তা জানিস্‌ নে বুঝি? এই ঝড়ের মুখেই যে দুখানা প্যাসেঞ্জারে মস্ত বড় একটা কলিসন হয়ে গেছে।"

বলিয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ সেই প্রকার শিশু-সুলভ উচ্চহাস্যে কক্ষ মুখরিত করিয়া তুলিল।

অসমঞ্জ যাহাকে 'পল্' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল, সে মানুষটিকে দেখিয়া তাহাকে মেয়ে বলিবে কি ছেলে বলিবে,—বেচারা বিমলেন্দু ইহার যেন কোনই কূলকিনারাই পাইতেছিল না। সেই অদ্ভুত জীবটার পরনে খাটো-করিয়া-পরা সরু কালাপেড়ে ধুতী, গায়ে তাহার পুরুষালি ঢংএর উল্টা কলার ও চওড়া কফের প্রান্তে বোতাম-আঁটা পিরাণরূপী জ্যাকেট। পায়ে ফুল মোজা এবং ভারি-ওজনের একযোড়া বেটাছেলে-জুতা। খাটো-খাটো মাথার চুলগুলি ইহার কাঁধের চাইতে একটুখানি নীচে নামিয়াছে। সামনে ইহার ডানদিকে সিঁথে কাটা। অর্থাৎ এক কথায়, মেয়েলী চেহারাকে যতদূর পর্য্যন্ত পুরুষোচিত করা যায়, এই অপূর্ব্ব-দর্শনা মেয়েটী তাহার জন্য কিছুমাত্র ত্রুটি দেখায় নাই। এই মেয়েটাকে দেখিলে—সে কেমন দেখিতে? সুন্দরী কি কুৎসিতা? বয়স তাহার কত? এই সকল প্রশ্ন কোনমতেই দর্শকের মনকে কুতূহলী করিতেই পারে না। সবশুদ্ধ এই একটা কথাই মনে হয় যে, অদ্ভুত!

পল অসমঞ্জের কথায় তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার অলস হাস্যে দুই বাঁকা ভুরু গুণ-চড়ানো ধনুকের মত ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত করিয়া, কঠোর কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "সেই খবর নিয়ে এসে তুমি মজা করে চা, সন্দেশ পেটে দিচ্চো? জানো, আজ কত হাজার জ্যান্ত লোক মড়া সেজে মালগাড়ী ভর্ত্তি হয়ে, নদীগর্ভে স্থানলাভ করে ভ্রান্ত পরিচালকদের ভ্রান্তি-নিরসন করতে বাধ্য হবে?"

বিমলের মাথার প্রত্যেক চুলের গোড়া, শরীরের প্রত্যেকটি রোমকূপ, সেই বজ্রকঠিন কণ্ঠস্বরের সেই অমানুষিক চিত্রাঙ্কনে খাড়া হইয়া উঠিল। সে দেখিল, ইহার চোখেও সেই বিদ্যুদগ্নির ঝলক। তবে অসমঞ্জের চোখের মত সে চোখ তেমন আশ্চর্য্য ও অভিনব নয়। উহা শুধুই আগুনে ভরা। অসমঞ্জের চোখে যেন অনল এবং অমৃত দুই-ই পাশাপাশি, মেশামিশি করিয়া আছে।

অসমঞ্জ নিজের কৌতুক-হাস্য রুদ্ধ না করিয়াই, বিমলের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া দিয়া বলিতে লাগিল,—"ওই দেখ পল! ওই দেখ, কলিসনে'র হত এবং আহত ওই একটীমাত্র ব্যক্তিকে ওয়াগন ভর্ত্তি করে স্রোতের মুখে ফেলবার জন্যে নিয়ে এসেছি। কর্ত্তব্যে অবহেলাও হয় নি। এখন স্থির্ ভবঃ। বিমলেন্দুর নাম তুমি নিশ্চয়ই রাধিকা, অপরেশ, এদের কাছে নাহোক হাজারবারও শুনে থাকবে। বিমল! তুমি অবশ্য আমার এই বোনটী সম্বন্ধে আশা করি একেবারেই অজ্ঞ, এটির নাম উৎপলা। কিন্তু আমরা একে ছোট থেকেই "সেণ্টপল" নাম দিয়েছি, আর তাই বলেই ওকে ডাকি।"

বিমলের মনের মধ্যে এতক্ষণ এই চিত্রাঙ্গদা-রূপিণী অর্দ্ধ-নারী কোন লজ্জার আভাস জাগাইয়া তুলে নাই। এইরূপ সম্পূর্ণ অপরিচিতা কিশোরীর সান্নিধ্য অপর কোথায়ও, অপর কাহারও সহিত হইলে, এতক্ষণ লজ্জার উত্তাপে তাহার আললাট আরক্ত হইয়া উঠিয়া, তাহার মাথা-মুখ বুঝি মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে চাহিত; কিন্তু ইহার নারীত্ব এতই প্রচ্ছন্ন যে, ইহার সম্বন্ধে লজ্জা করিবার কথা মনে করাইতে যেন লজ্জার উদয় হয়। তথাপি ওই 'উৎপলা' নামটাতেই যেন বিমলকে ঈষৎ একটুখানি রাঙাইয়া তুলিল। বিশেষতঃ, এ অবস্থায় কি রকম ব্যবহারটা করিতে হইবে, সে কথাও তো তাহার জানা ছিল না।

উৎপলা নিজের চৌকী ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া, অত্যন্ত সহজ ভাবেই নিজের হাতখানা বিমলের দিকে বাড়াইয়া দিয়া, সহজ-গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল, "ভারি সুখী হলেম। আপনার কথা আমরা রাধিকাদের কাছে অনেকবার শুনেছি।"

তার পর উৎপলা নিজের ভাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "ওঃ বুঝেছি! তোমাদের দুজনে বুঝি ধাক্কাধুক্কি হয়ে গেছলো? আচ্ছা মজার লোক তো তুমি! উঃ, কি ভয়ঙ্কর ভাবনাই যে আমায় ধরিয়ে দিয়েছিলে! এই ঝড়জলে বাড়ীর বার হতে দিতে মা সাতশো আপত্তি করতো, অথচ সব দলবল জুটিয়ে যেতেও হতো। তা এঁকে আমাদের সভার কথাটা বলা হয়েচে?"

অসমঞ্জ কথার জবাব না দিয়া, বোনের চোখের উপর চোখ রাখিয়া কি ইঙ্গিত করিল। বিমল তাহা বুঝিল না। সে কেবল বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, যেন দুখানা তড়িতের একত্র সমাবেশ হইয়াছে,—এখনি উহা হইতে হয় ত কি একটা স্ফুরিত, সৃজিত অথবা ধ্বংস হইয়া উঠিবে। অজ্ঞাতে তাহার বুকটা একটুখানি কাঁপিয়া উঠিল।

গভীর রাত্রে বৃষ্টি থামিলে বিমলেন্দু যখন এই নবপরিচিত-গণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, গাড়ী চাপিয়া নিজের বন্ধ

সঙ্গী সত্বেও নিঃসঙ্গ মেসের ঘরখানার উদ্দেশে বাহির হইল, তখন সেই সুপ্তিময় নিশীথের অন্ধকারে মধ্যযামিনীর নীরব মৌনতার মধ্যে অনন্তকোটী গ্রহ-তারকার দীপ্ত নেত্রের ভাষাহীন জলন্ত সাক্ষ্যে, সে নিজের উচ্চকিত, সম্মোহিত চিত্তের কাছেই মনে-মনে স্বীকার করিয়া লইল যে, এমন দুটি প্রাণী ইহার পূর্ব্বে সে আর কখনও কল্পনাতেও দেখিতে পায় নাই; এবং সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়াই ইহাদের সঙ্গ ও সখ্য সে তাহার নিজের জীবনের পক্ষে একান্ত স্পৃহণীয় ও বরণীয় বলিয়াই অনুভব করিয়া গেল!

অভ্যাগত

[শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর, বি-এ]

(Parody)

কেন বঞ্চিত হবো ভোজনে,
মোরা—কত আশা করে, নিজ বাসা ছেড়ে,
খেতে—এসেছি এখানে ক'জনে।

ওগো—তাই যদি নাহি হবে গো,
এত কি গরজ বাড়ীতে তোমার
ছুটিয়া এসেছি কবে গো?
হয়ে—ক্ষুধার জ্বালায় অন্ধ,
এসে—দেখিব কি খাওয়া বন্ধ?

তবে—তাড়াতাড়ি পাত কর বলে' ডাক'
তব আত্মীয়-স্বজনে।
মোরা—শুনেছি তোমার বাড়ী
চাহে যদি কেহ এক হাতা কিছু
এনে দেয় হাঁড়ি-হাঁড়ি।
তুমি—পাবনা হইতে এনেছ আচার,
মালদহ হ'তে খাজা ভারে-ভার,
এ কি—সবি মিছে কথা? দিও না ক ব্যথা,
মোরা—খাব না ক বেশী ওজনে।

অসীম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

পঞ্চপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

পূজা সাঙ্গ হইলে কালীপ্রসাদ গৃহের দুয়ারে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "গুরুদেব, মহাপ্রসাদ?" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "বাপু হে, অদ্য আমার উপবাসের দিন; তুমি আহার করিয়া বিশ্রাম কর।" শিষ্য চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ একটা বৃহৎ তাম্রকুণ্ডে জল ভরিয়া কক্ষের মধ্যস্থলে রাখিলেন, এবং দীপ নির্ব্বাপিত করিলেন। নবীন ভয়ে তটস্থ হইয়া ব্রাহ্মণের দিকে ঘেঁসিয়া বসিল। ব্রাহ্মণ স্থির, নিশ্চল। কিয়ৎক্ষণ পরে নবীনের মনে হইল যে, তাম্রকুণ্ডের জলে চন্দ্রালোকে আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু সে গৃহের দ্বার ও বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখিল, কোন দিক হইতেই কক্ষ-মধ্যে চন্দ্রালোক আসিতেছে না। তখন সে অত্যন্ত ভীত হইল বটে, কিন্তু জ্ঞানহারা হইল না।

দেখিতে দেখিতে তাম্রকুণ্ডের জলে অগ্নিশিখা খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রাণভয়ে নবীনদাস ডাকিল, "প্রভু, ঠাকুর!" কেহ উত্তর দিল না। তখন নবীনদাস ভয়ে ঘরের চারিদিক হাতড়াইয়া বেড়াইল; কিন্তু কাহাকেও খুঁজিয়া পাইল না। সে ভয়ে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু প্রতি দুয়ার হইতে এক-একটি সর্প তাহাকে

ফিরিয়া আসিতে বাধা করিল। তাম্রকুণ্ডের জল আগুন লাগিয়া দপ্‌দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল,—ধূমে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া নবীন এক কোণে বসিয়া কাঁপিতে লাগিল। দেখিতে-দেখিতে সে বসিয়া বসিয়াই জ্ঞান হারাইল।

তখন অন্ধকার হইতে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "নবীন, তুমি কি জাগিয়া আছ?" উত্তর হইল, "না।" "তবে উত্তর দিতেছ কেমন করিয়া?" "আপনার আদেশে।" "উত্তম, তাম্রকুণ্ডের দিকে চাহিয়া দেখ।" "দেখিতেছি।" "কি দেখিতেছ?" "জল জ্বলিতেছে।" "আর কি?" "ধূম। ধূমের মধ্যে একটা মানুষ। স্ত্রীলোক, বয়স অল্প; তেমন সুন্দরী নহে, সন্ন্যাসিনীর বেশ। কোন এক সম্পন্ন গৃহস্থের বাটীর অঙ্গনে দাঁড়াইয়া আছে। কি বলিতেছে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। শুনিয়াছি, সে বলিতেছে, "যদি আমি সতী হই, তাহা হইলে আমার মনের বলে আমার স্বামী আবার ফিরিয়া আসিবে, আবার আমাকে গ্রহণ করিবে,—তোরা দেখিবি, দেখিবি, দেখিবি। আর একদল রমণী তাহাকে পরিহাস করিতেছে।" অন্ধকার হইতে ব্রাহ্মণ কহিলেন, "বৈশ্বানর, বর্ত্তমান হইতে অতীতে যাও। নবীন কি দেখিতেছ?" "রাত্রি শেষ। সেই গৃহের চারিদিকে অনেকগুলা কুকুর কলরব করিতেছে। অঙ্গনে অনেক কলার পাতা পড়িয়া আছে,—বোধ হয় রাত্রিতে বৃহৎ ভোজ ছিল। চেলীর কাপড় পরিয়া বর ও বধূ সেই অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল। আর কেহ তাহাদিগের সহিত আসিল না। বাড়ীর সকলে ঘুমাইতেছে। বর বধূকে কি বলিল, বধূ কাঁদিতেছে। বর তাহাকে পদাঘাত করিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু তাহার চেলীর উত্তরীয় বধূর সাটীর সহিত বাঁধা রহিল। বধূ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। প্রভাত হইয়াছে, চারিদিক হইতে বহু স্ত্রী-পুরুষ মূর্চ্ছিতা বধূকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেহ তাহাকে গালি দিতেছে, কেহ দুঃখ করিতেছে, কেহ বা তাহার মুখে জল ছিটাইতেছে। বধূ উঠিল; কিন্তু সে কাহারও তিরস্কার মানিল না, সান্ত্বনা লইল না। স্বামীর পরিত্যক্ত উত্তরীয় অঙ্গে জড়াইয়া কহিল, সে সতী,—তাহার স্বামী যেখানেই থাকুক, তাহার সতীত্বের বলে আবার ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে গ্রহণ করিবে।" অন্ধকার হইতে পুনরায় কে কহিল, "আরও দূরে যাও।" নবীন আবার বলিতে আরম্ভ করিল "প্রশস্ত নদীতীরে দীর্ঘ অট্টালিকা। তাহার দুয়ারে দুইটা হাতী দাঁড়াইয়া আছে। আটজন গোলাম একখানা রূপার তাঞ্জাম বহিয়া আনিল। অট্টালিকার মধ্য হইতে দুইজন গোলাম আসিয়া একখানা প্রকাণ্ড গালিচা বিছাইয়া দিল। গোলামেরা গালিচার উপর তাঞ্জাম রাখিল। একজন সন্ন্যাসী আসিয়া গালিচার উপর দাঁড়াইল,—গোলামেরা তাহাকে অপমান করিয়া নামাইয়া দিল। সন্ন্যাসী তাঞ্জামের আরোহীকে কি বলিল। আরোহী তাহার উত্তর দিল না। সন্ন্যাসী বলিতেছে, 'তোর দর্প চূর্ণ হইবে; তোর এই অতুল ঐশ্বর্য্য, অপরিসীম ক্ষমতা অতি শীঘ্র ভস্ম হইয়া যাইবে। ইহার কণামাত্র থাকিবে না। তুই পথে পথে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবি; লোকালয় ছাড়িয়া শ্মশানে আশ্রয় লইবি; তবে তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। যাহার রূপের মোহে দেবগুরু বিস্মৃত হইয়াছিস্, সে বিষধরী হইয়া তোকে দংশন করিবে। তাহার বিষের যন্ত্রণায় ঐশ্বর্য্য, পদ, সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া দেশের গ্রামে গ্রামে, নগরে-নগরে ছুটিয়া বেড়াইবি।" নবীন থামিল। গৃহমধ্যে আবার কে কহিল, "বৈশ্বানর, স্থির হও,—ভবিষ্যতে যাও।" নবীন পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল, "আর একটা নদীতীর, সম্মুখে প্রকাণ্ড অট্টালিকা, তাহার সম্মুখে হাজার সওয়ার তলওয়ার খুলিয়া পাহারা দিতেছে। এ অট্টালিকা আমি চিনি, ইহা মুরশিদাবাদের সুবাদার জাফর কুলীখাঁর দেউড়ী। তাঞ্জামে চড়িয়া একজন আমীর আসিল,—সে হিন্দু, বাঙ্গালী। সে দেখিতে অনেকটা আজিকার ব্রাহ্মণের মত। আরজবেগী স্বয়ং আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেল।" অন্ধকার হইতে পুনরায় শব্দ হইল, "আরও দূরে যাও।" নবীন পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল। "গঙ্গাবক্ষে একখানা প্রকাণ্ড ছিপ্ নক্ষত্রবেগে ছুটিয়াছে। তাহা দেখিতে-দেখিতে পদ্মার মোহানায় পৌঁছিল। একজন ছিপ্ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, একখানা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই গ্রামের পথে একটি যুবতী স্ত্রীলোক বসিয়া ছিল। সে বোধ হয় পাগলী; কারণ, তাহার পরণে লাল কস্তাপেড়ে সাড়ী, কপালভরা সিন্দূর, অঞ্চলে একখানা জীর্ণ পুরাতন চেলীর উত্তরীয় বাঁধা। নৌকার আরোহীকে দেখিয়া সেই পাগলী উঠিয়া দাঁড়াইল। আরোহী অগ্রসর হইয়া তাহার হস্তধারণ করিল। প্রকাশ্যে গ্রামের মধ্য দিয়া

সেই পাগলী তাহার হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছে। গ্রামের অনেক লোক তাহাদিগের সঙ্গে চলিয়াছে। মেয়ে পুরুষ সকলেই বলিতেছে, যে, এতদিনে পাগলী পিতার জাতি নষ্ট করিল। পাগলী তাহা শুনিল। সে হাসিতেছে, এবং এক-রাশি রুক্ষ জটার উপরে কাপড় টানিয়া দিয়াছে। সকলে একটা পুরাতন বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল। একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অঙ্গনে নামিয়া আসিল। নৌকার আরোহী ও পাগলী তাহাকে প্রণাম করিল। অঙ্গনটা আমার পরিচিত। এইখানে বিবাহের রাত্রিতে বর বধূকে পদাঘাত করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।" অন্ধকার হইতে শব্দ হইল, "স্থির হও। বৈশ্বানর প্রত্যাবর্ত্তন কর। এই ব্যক্তি কোথায় যাইবে?" নবীন বলিতে আরম্ভ করিল, "একটা প্রশস্ত নদীতীরে এক প্রৌঢ়া বৈষ্ণবী বসিয়া আছে,—আমি তাহাকে চিনি। সে ডাহাপাড়ার সরস্বতী বৈষ্ণবী। আমার পরামর্শানুসারে কাননগোই হরনারায়ণ রায় তাহাকে গোয়েন্দা করিয়া পাটনায় পাঠাইয়াছিলেন। প্রকাণ্ড সহর,—বোধ হয় পাটনা। এ সহর আমি কখনও দেখি নাই। সরস্বতীর পার্শ্বে একটি পরমা সুন্দরী যুবতী বসিয়া আছে। তাহার রূপ এত যে, বস্ত্র-অলঙ্কারের অভাবে গৈরিক বসনে তাহাকে অধিকতর সুন্দরী দেখাইতেছে।

"নদীতীরে একখানা নৌকা লাগিল। সেখানা গহনার নৌকা। কারণ, অনেক লোক মালপত্র লইয়া নামিল। আমিও তাহার মধ্যে ছিলাম। সরস্বতী আমাকে দেখিয়া উঠিয়া আসিল; কিন্তু আমি তাহার সহিত কথা কহিব কি,—মেয়েটির রূপ দেখিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি তাহাদের সহিত সহরে চলিলাম। প্রকাণ্ড চৌক,—অনেক দোকান-পসার। একটা বেণিয়ার দোকানের সম্মুখে একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বসিয়া আছেন। আমি তাঁহাকে চিনি। তিনি ডাহা-পাড়ার হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার। এই লোকটাকে সরাইতে পারিলে একশ' থান মোহর বকশিশ পাইব। আর যদি কাবার করিতে পারি—" কক্ষ মধ্যে শব্দ হইল, "অগ্নি যথাস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন কর।" সহসা কক্ষের ধূম দূর হইয়া গেল,—তাম্র-কুণ্ডের অগ্নি নিবিয়া গেল। দ্বিতীয়বার শব্দ হইল, "নবীন, তুমি ঘুমাও।" নবীন দাস যেখানে বসিয়া ছিল, সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িল।

সে যখন জাগিয়া উঠিল, তখন মুক্ত বাতায়ন-পথে সূর্য্যরশ্মি আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে। চারিদিক অনুসন্ধান করিয়া সে ত্রিশূলধারী নরকঙ্কাল, বিষধর সর্প অথবা তাম্রকুণ্ড কিছুই দেখিতে পাইল না। নবীন দাস উর্দ্ধশ্বাসে কক্ষত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

ভস্মরাশি যেমন প্রজ্বলিত হুতাশনকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না, মলিন বসনও তেমনই রূপসীর রূপ লুকাইতে পারে না। রমণী-রূপ বহুবিধ। কবিকুল তাহার মধ্যে স্নিগ্ধ ও তীব্র রূপের বর্ণনাই করিয়া থাকেন। মণিয়ার রূপ তীব্র। যে মানুষের মনে বল নাই, তাহার চক্ষু এ রূপে ঝলসিয়া যায়। বিদ্যালঙ্কার-গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে, আচার ব্যবহার ও রীতি-নীতির পরিবর্ত্তনে সে রূপ যেন তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছিল। সামান্য গৈরিক বসনের এমন কি শক্তি আছে যে, সে জ্বলন্ত রূপ-শিখা আচ্ছন্ন করিয়া রাখে! মণিয়া যখন পথে চলিত, তখন পথের লোক আশ্চর্য্য হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত। তাহার মাতা দুঃখ করিত যে, কন্যা এমন রূপের মর্য্যাদা বুঝিল না,—সময় থাকিতে কিছু উপার্জ্জন করিয়া লইল না। তাহার ভক্তবৃন্দ তাহার এই পরিবর্ত্তনে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। মণিয়া যখন মজুরা করিতে যাইত, তখন সে রীতিমত পেশোয়াজ ও ওড়না চড়াইয়া যাইত; কিন্তু অপর সময়ে সে হিন্দু-সন্ন্যাসিনী সাজিয়া থাকিত। ইদানীং সে প্রায় সমস্ত দিনই সরস্বতীর সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরিত। তাহার এক ভয় ছিল, পাছে মজুরা করিতে যাইবার সময় সরস্বতীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়।

একদিন অপরাহ্নে সে সরস্বতীর সহিত চৌক দিয়া যাইতেছিল। একটা দোকানের সম্মুখে একজন লোককে দেখিয়া সরস্বতী দূরে দাঁড়াইয়া গেল; এবং মণিয়াকে কহিল, "বহিন, তুমি ঘরে যাও; আমি এখন যাইতে পারিব না।" মণিয়া আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া চলিয়া গেল। সরস্বতী সেই দোকানের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অসীম ও হরি-নারায়ণ দোকান হইতে বাহির হইলেন। তখন সরস্বতী অন্তরাল হইতে আসিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ দোকানটা কাহার?" সে ব্যক্তি কহিল, "মনোহর সাহা বণিয়ার। সাহাজী সহরে খুব মশহুর লোক,—তুমি কি নূতন

আসিয়াছ ?" সরস্বতী তাহার কথার স্পষ্ট উত্তর না দিয়া, পাশ কাটাইয়া সরিয়া গেল ; এবং দূরে থাকিয়া অসীমের অনুসরণ করিল। কিন্তু অসীম ও হরিনারায়ণকে ছাউনীর পথে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সে ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিতে-আসিতে পথে তাহার সহিত এক মুসলমানের সাক্ষাৎ হইল। মুসলমান তাহার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দেখিয়া, সরস্বতী দাঁড়াইয়া গেল। তাহার মুখখানা পরিচিত বোধ হইলেও, সরস্বতী কিছুতেই তাহাকে চিনিতে পারিল না। তাহার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাব দেখিয়া মুসলমান হাসিয়া কহিল, "বিবি, স্যালাম, মুই বাঙ্গলা ত্থাশ হইতে আয়েলাম, এ ত্থাশের কথা ত বুঝ্‌তে পারি নে ?" তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সরস্বতী হাসিয়া কহিল, "ওমা, নবীন দাদা বুঝি ! এ আবার কি ঢং ?" মুসলমান হাসিয়া উঠিল ; এবং কহিল, "তবে প্রথমটা চিনিতে পার নাই ! সরস্বতী দিদি ! এবারে একেবারে একশ' থান মোহর বকশিশ ! তোমার সঙ্গে রাধেকৃষ্ণ সম্পর্ক অর্থাৎ নিযকী কৃষ্ণ বলরাম আর বলিব না। কোন গতিকে বুড়াকে কাশী কি বৃন্দাবন পার করিতে পারিলেই হয়।" সরস্বতী তাহার উৎসাহে উৎসাহিত না হইয়া কহিল, "মামলাটা যত সোজা মনে করিয়াছ নবীন দাদা, ততটা সোজা নহে। ছোটরায় আর বামুনঠাকুর কয়দিন ধরিয়া কি কানাঘুষা করিতেছে, আমি কিছুই সমঝাইতে পারিতেছি না। তুমি আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। কিন্তু তুমি থাকিবে কোথায় ? যে পোষাকে আসিয়াছ,—আমাদের আখড়ায় ত জায়গা পাইবে না।" "তাহার জন্য চিন্তা করিও না। তুলসীর কণ্ঠী, জপের মালা, এবং নামাবলী সঙ্গেই আছে ; সুতরাং খাঁ সাহেবের প্রেমানন্দ বাবাজী সাজিতে বিলম্ব হইবে না।" এই সময়ে সরস্বতীকে পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, "কি বহিন, এখনও এইখানেই আছ ?" সরস্বতী বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিল যে, তাহার পশ্চাতেই মণিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক বিস্ময় নবীনচন্দ্রকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে মণিয়ার দিকে চাহিয়া ছিল। সরস্বতী তাহার অবস্থা দেখিয়া ক্রুদ্ধা হইল, এবং অস্ফুট স্বরে কহিল, "আ মর মিনসে, মেয়েটাকে যেন হাঁ করিয়া গিলিতেছে, —একটু লজ্জাও করে না ?" নবীন বহু কষ্টে আত্ম-সম্বরণ করিল। মণিয়া তাহার রকম দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "বহিন, খাঁসাহেব বুঝি তোমার দেশের লোক ?" সরস্বতী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিল, "বহিন, ও আমাদের দেশের বহুরূপী,—দু'পয়সা রোজগারের চেষ্টায় পাটনায় আসিয়াছে। ও মুসলমান নয় হিন্দু, উহার নাম নবীন।" নবীন নিজের নাম শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া মণিয়াও ঈষৎ হাসিল সুতরাং নবীন কৃতকৃতার্থ হইয়া গেল। নিজের রূপ-পরিবর্ত্তনে কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য নবীন ভাঙ্গা হিন্দিতে বলিল, "বিবি, আমি এই এক লহমা ঐ গাছটার আড়াল হইতে আসিতেছি,—তোমরা এইখানেই দাঁড়াও।" সরস্বতী ও মণিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নবীন একটা বৃহদাকার তিন্তিড়ী-গাছের অন্তরালে গিয়া, মুহূর্ত্তমধ্যে বাঙ্গালী বৈষ্ণব সাজিয়া আসিল। সে ফিরিয়া আসিলে সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "নবীন দাদা, পরচুলা আর কাপড়গুলা কি করিলে ?" নবীন একটা গৈরিক-রঞ্জিত বস্ত্রের ঝুলি দেখাইয়া কহিল, "এই যে, ইহার মধ্যে।" এই বলিয়া সে একবার প্রশংসা অকর্ষণ করিবার জন্য মণিয়ার দিকে চাহিল। মণিয়া তাহা বুঝিতে পারিল ; এবং একমুখ হাসিয়া কহিল, "বাঃ ! তোফা !" নবীন ভাবিল, বিষ্ণুদূত আসিয়া গড়ুর-পৃষ্ঠে তাহাকে সশরীরে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল।

সরস্বতী ও মণিয়ার সহিত নবীন আখড়ায় চলিল। পথে যাইতে-যাইতে নবীন মণিয়ার প্রতি যেরূপ লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিল, তাহা হইতে বুদ্ধিমতী মণিয়ার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ইহারই মধ্যে নবীন দাস তাহার অনুগত দাসানুদাস হইয়া পড়িয়াছে। যাইতে-যাইতে মণিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বহুরূপী-সাহেব, তুমি কাল কি সাজিবে ?" প্রশ্ন শুনিয়া নবীন বিষম সমস্যায় পড়িল। সরস্বতী তাহাকে বাঁচাইবার জন্য বহুরূপী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল মাত্র ; কিন্তু সে ত সত্য-সত্যই বহুরূপী নহে ; সুতরাং রূপ-পরিবর্ত্তনে তাহার অভ্যাস নাই। প্রায় অর্দ্ধদণ্ড পরে নবীন একটা উত্তর খুঁজিয়া পাইল। সে কহিল, "বিবি সাহেব যাহা বলিবেন, তাহাই সাজিব।" মণিয়া কহিল, "কাল বাঙ্গালী রাজা সাজিও।" নবীন চরিতার্থ হইয়া বলিল, "যো হুকুম।" আখড়ার দরজায় আসিয়া মণিয়া, সরস্বতী ও নবীনের নিকট বিদায় লইল। তখন সরস্বতী তাহার হাত ছাড়াইতে পারিলে বাঁচে ; এবং সেও সরস্বতীর নিকট হইতে দূরে যাইতে চাহে ;

কারণ, সরস্বতী অন্তরালে নবীনের নিকট সংবাদ জানিতে ইচ্ছুক, এবং মণিয়ারও একটা বড় মজলিসে মজুরা ছিল।

আখড়া ছাড়িয়া মণিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। পথে যাইতে-যাইতে তাহার অদৃষ্টক্রমে একখানা এক্কা মিলিয়া গেল। সে এক্কায় চড়িয়া বসিল, এবং চালককে দ্রুতবেগে চালাইতে আদেশ করিল। এক্কা যখন তাহার গৃহের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তখন সে দেখিতে পাইল, হরিনারায়ণ পদব্রজে গৃহে ফিরিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মণিয়া এক্কা থামাইয়া নামিল। হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ, মা?"

মণিয়া কহিল, "বাপজান, সংবাদ আছে; তবে জরুরী কি না তাহা বলিতে পারি না। সরস্বতীর দেশের এক দোস্ত আসিয়াছে, তাহার নাম নবীন,—সে বহুরূপী।" "নবীন, বহুরূপী! লোকটা দেখিতে কেমন?" মণিয়া যতদূর পারিল নবীনের রূপ বর্ণনা করিল। তাহা শুনিয়া হরিনারায়ণ কহিলেন, "লোকটাকে একবার দেখাইতে পার?" "তাহার জন্য চিন্তা কি। বোধ হয় আমি যাহা বলিব সে তাহাই করিবে।" হরিনারায়ণ উত্তর শুনিয়া হাসিলেন; এবং কহিলেন, "প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আমাকে মনোহর সাহার দোকানে পাইবে।"

ভারতীয় পরিব্রাজক

[শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল, এফ্-আর হিস্ট্-এস্]

ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারগণ হিন্দুজীবনকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ও পরিব্রজ্যা এই চতুর্ব্বিধ আশ্রমের ভিতর দিয়া হিন্দুজীবন পরিপুষ্টতা লাভ করিয়া থাকে। (১) প্রথম জীবনে শিক্ষা, দ্বিতীয়ে সংযম, তৃতীয়ে যজ্ঞবিধি সমাপন করিয়া জীবনের শেষভাগে মোক্ষার্থ বিচরণ করাই পরিব্রজ্যা। (২) সংসারে বৈরাগ্য হইলে ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য অথবা বানপ্রস্থ যে কোনও আশ্রম হইতে পরিব্রজ্যা গ্রহণ করা যাইতে পারে। (৩) কিন্তু একবার গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার অন্য আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করা নিষিদ্ধ। ক্রমাগত রোগ, দুঃখ, শোক ভোগ করিয়া মানব যখন সংসারে অনাসক্ত হইয়া পড়ে, তখন সে যে কোনও আশ্রম হইতে পরিব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারে। বৈরাগ্য জন্মিলে আর অন্য কোনও আশ্রমের প্রয়োজন নাই। (৪) কাহারও কাহারও মতে ব্রাহ্মণেরই সন্ন্যাস গ্রহণে অধিকার আছে। (৫) আবার কাহারও কাহারও মতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়েরই সন্ন্যাসাধিকার আছে। (৬) শূদ্রের জন্য কেবল গার্হস্থ্য আশ্রম; সেই আশ্রমে থাকিয়া পঞ্চ যজ্ঞ বিধান পালন ভিন্ন অন্য কিছুরই নির্দ্দেশ দেখা যায় না। (৭) তৃতীয় আশ্রমের কার্য্য সমাপন করিয়া পিতৃগণ, দেবগণ, স্বপিতৃগণ, ঋষিগণ, মানবগণ ও নিজের শ্রাদ্ধ করিয়া প্রাজাপত্য অথবা আগ্নেয় যজ্ঞ সম্পাদন করেন। এই সকল যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা রূপে দান করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করাই শাস্ত্রের বিধান। (৮) বৈরাগ্যের তারতম্যানুসারে পরিব্রাজক বা সন্ন্যাসীর মধ্যেও চতুর্ব্বিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। চতুর্ব্বিধ পরিব্রাজকেরই আচারাদি বিভিন্ন। বেশ, আচরণ প্রভৃতির দ্বারা কে কোন্ শ্রেণীর পরিব্রাজক তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। এই চারি প্রকার যতির নাম কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস। কুটীচক সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য অপেক্ষা বহূদক সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য অধিক। তদপেক্ষা হংসের বৈরাগ্য প্রবল, পরমহংসের বৈরাগ্য ততোধিক। (৯) কুটীচক পরিব্রাজক পুত্রাদির দ্বারা কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া কাম ক্রোধাদি শূন্য হইয়া যথাবিধি

(১) মহাভারত শান্তিপর্ব্ব।

(২) মনু ষষ্ঠ অধ্যায়; যাজ্ঞবল্ক্য ৩য় অধ্যায়।

(৩) জাবালোপনিষদ্ ৪র্থ অধ্যায় নৃসিংহপুরাণ।

(৪) দক্ষ ৭ম অধ্যায়।

(৫) মহাভারত শান্তিপর্ব্ব।

(৬) মনু ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

(৭) বামনপুরাণ ১৪শ অধ্যায়।

(৮) নৃসিংহপুরাণ ৬০শ অধ্যায়।

(৯) হারীত ১৯ অধ্যায়, নৃসিংহপুরাণ ৬০ অধ্যায়।

সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। তিনি যথাবিধি ত্রিদণ্ড, জল, পবিত্র ও কাষায় বস্ত্র ধারণ করিবেন। স্নান, শৌচ, আচমন, জপ, স্বাধ্যায়, ব্রহ্মচর্য্য ও ধ্যানরত হইয়া পুত্রাদির গৃহ হইতেই মাত্র প্রাণধারণোপযোগী অন্ন ভিক্ষা করিয়া ভোজন করিবেন। তিনি কুটীরে বাস করিয়াই মোক্ষ লাভের উপায় চিন্তা করিবেন। স্বগৃহে থাকিয়া সাগ্নিকের গৃহ হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া পবিত্রভাবে এই শ্রেণীর সন্ন্যাসী জীবন যাপন করিতে পারেন। বন্ধুর গৃহে ভিক্ষা অথবা শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। (১০) বহূদক সন্ন্যাসী বন্ধু ও পুত্রাদির গৃহে ভিক্ষা করিতে পারিবে না, মাতৃগৃহে লব্ধ ভিক্ষা দ্বারাই তাহাকে জীবন ধারণ করিতে হইবে। এক-জনের প্রদত্ত অন্ন আহার তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। গোলোম-রজ্জু-সংবদ্ধ ত্রিদণ্ড, শিকা-কমণ্ডলু, পবিত্র, খনিত্র, ক্ষুদ্র কৃপাণ, শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণে তাঁহার নিষেধ নাই। তিনি কাষায় বস্ত্র ধারণ করিবেন। সতত বেদান্ত আলোচনায় রত থাকিবেন। সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষাচরণ দ্বারাই তাঁহাকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। মোক্ষ লাভই তাঁহার জীবনের চরম উদ্দেশ্য এবং সঙ্গবিবর্জ্জিত হইয়া সাধনে তৎপর হইবেন। তিনি নিজের গৃহে বাস করিতে পারিবেন না। কুটীর, জল, বস্ত্র প্রভৃতিতে তাঁহার আসক্তি থাকিবে না। দণ্ড আসন, অন্ন প্রভৃতির উপর তাঁহার অনুরাগ থাকিবে না। (১১) হংস পরিব্রাজক কমণ্ডলু, শিক্য, ভিক্ষাপাত্র, কন্থা, কৌপীন এবং একমাত্র দণ্ডধারণ করিবেন। দেবতাদিগের মধ্যে তাঁহার কাছে কোনও ভেদ থাকিবে না। যজ্ঞোপবীত ধারণ তাঁহার নিষিদ্ধ নহে। তিনি নিত্য ক্রিয়া স্নান করিবেন, সদা আর্দ্রবাসেই থাকিবেন। চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। বৃক্ষমূলে, পর্ব্বতগুহায় অথবা নদীতীরে বাস করিবেন। তিনি গ্রামে ও তীর্থে একরাত্রি বাস করিতে পারেন। তিন রাত্র, ষট্‌রাত্র, পক্ষ ও মাস উপবাস করিয়া কৃচ্ছ্রব্রত পালন করাই তাঁহার কর্ত্তব্য, আর এইরূপ করিলে তাঁহার শরীরও কৃশ হইবে। (১২) পরমহংস পরিব্রাজক কৌপীন, আচ্ছাদন বস্ত্র ও শীত নিবারণী কন্থা ধারণ করিতে পারিবেন। জপমালা ও বেণু দণ্ড গ্রহণ করা তাঁহার কর্ত্তব্য। তিনি মধুকর অথবা একান্ন ভোজন করিবেন। পরমহংস ত্রিদণ্ড, রজ্জু, শিখা, যজ্ঞোপবীত ও নিত্য-কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিবেন। কেহ কেহ পরমহংসের যজ্ঞোপবীতাদি ধারণ নিষিদ্ধ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সংবর্ত্তক, অরুণি, শ্বেতকেতু, দুর্ব্বাসা, নিদাঘ, জড়ভরত, দত্তাত্রেয়, বৈরতক, প্রভৃতি পরম-হংসগণ কোনওরূপ চিহ্ন ধারণ করেন নাই। তাঁহাদের কোনও বিশিষ্ট আচার ছিল না। তাঁহারা জ্ঞানী হইয়াও উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিতেন। তাঁহারা দণ্ড, কমণ্ডলু, শিক্য পাত্র, জল, পবিত্র, শিখা ও যজ্ঞোপবীত এই সকল "ভূঃ স্বাহা" বলিয়া জলে বিসর্জ্জন দিয়া আত্মজ্ঞান-পরায়ণ হইয়া থাকেন। পরমহংস যখন যেরূপ পোষাক পান, তখন সেইরূপ পোষাকই পরিধান করিয়া থাকেন। তিনি নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া ব্রহ্মমার্গে বিচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার মন পবিত্র থাকিবে। প্রাণ-ধারণের জন্য তিনি ভিক্ষা করিতে পারেন। ভিক্ষা লাভে সন্তুষ্ট অথবা অলাভে অসন্তুষ্ট হওয়া তাঁহার পক্ষে অনুচিত। শূন্যগৃহ, দেব-গৃহ, তৃণকুটীর, বলীক বা বৃক্ষমূলে কুম্ভকার গৃহে, অগ্নিহোত্রি গৃহে, নদীতীরে, পর্ব্বতগুহায়, নির্ঝরের পার্শ্বে অথবা বেদীর উপর বাস করিতে পারেন। মমতা-বিহীন হইয়া ব্রহ্মধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করা তাঁহার কর্ত্তব্য। আত্মাই তাঁহার যজ্ঞোপবীত; অতএব পৃথক্ যজ্ঞোপবীত ধারণের তাঁহার প্রয়োজন নাই। সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেবল কৌপীন আচ্ছাদন ও দণ্ড ধারণই তাঁহার পক্ষে সমীচীন। বিদ্যাই তাঁহার শিখা এবং বাক্য মন ও শরীর দণ্ডই তাঁহার ত্রিদণ্ড। কাজেই এগুলি ধারণের তাঁহার নিকট কোনও আবশ্যকতা নাই। তিনি নিয়ত পরিভ্রমণ করিবেন। কেবল বর্ষাকালে স্থির হইয়া এক স্থানে বাস করিবেন। কুটীচক ও বহূদক সন্ন্যাসীর ত্রিদণ্ড ধারণের বিধান আছে। কিন্তু হংসের এক দণ্ড ও পরমহংসের কেবল শরীর রক্ষা এবং পরোপকারের জন্য একমাত্র দণ্ড গ্রহণের বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। (১৩) পরিব্রাজক প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া যথাবিধি শৌচ কর্ম্ম সমাপন করিবেন। তৎপরে দণ্ডধারণ ও আচমন করিয়া স্নান করিবেন। তদনন্তর বিধিবৎ সন্ধ্যোপাসনা করিবেন। পরিব্রাজক একাকী বিচরণ করিবেন। দুই বা তিন জন একত্র বিচরণ করিলে অনুরাগ অথবা বিদ্বেষ জন্মিতে পারে। এইজন্য সঙ্গমাত্র নিষিদ্ধ। সামর্থ্য না থাকিলে কোনও

(১০) স্কন্দপুরাণ ৪১ অধ্যায়।

(১১) বৃদ্ধপরাশর, পিতামহ, স্কন্দপুরাণ।

(১২) স্কন্দপুরাণ ৪১ অ।

শক্তিশালী পরিব্রাজকের সহিত তিনি বিচরণ করিতে পারেন। পরিব্রাজক সর্ব্বভূতের মঙ্গলাচরণ করিবেন। প্রাণি-হিংসা তাঁহার পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ। অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, চিত্তশুদ্ধি, হরিভক্তি, সন্তোষ, শৌচ, সরলতা, আস্তিক্য, ব্রহ্ম সংস্পর্শ, স্বাধ্যায়, সমদর্শন, অনৌদ্ধত্য, অদীনতা, প্রসন্নতা, স্থৈর্য্য, মৃদুত্ব, স্নেহ, গুরুশুশ্রূষা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, দম, শম, উপেক্ষা, ধৈর্য্য, মাধুর্য্য, তিতিক্ষা, দয়া, লাজ, তপস্যা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, যোগ, অল্পাহার, স্নান, দেবতারাধনা, ধ্যান, প্রাণায়াম, বলি, স্তুতি, ভিক্ষাটন, জপ, সন্ধ্যা, কর্ম্মফলত্যাগ এই সকল পালন করা যতির ধর্ম্ম। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত গুরুগৃহে বাস করিয়া জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহাকে পরিভ্রমণ করিবার জন্য বাহির হইতে হইবে। পরিব্রাজক গ্রামে একরাত্রি ও নগরে পাঁচ রাত্র বাস করিবেন। বর্ষাকালে একত্র চারিমাস অবস্থিতি করিতে পারিবেন। যতি, স্থাবর, জঙ্গম, বীজ, তৈজস, বিষ ও অস্ত্র এই ছয়টি সর্ব্বদা পুরীষবৎ ত্যাগ করিবেন। রাসায়নিক বিদ্যা, জ্যোতিষ, ক্রয়-বিক্রয়, শিল্প, পরদার, অভিনয় দর্শন, পাশাখেলা, স্ত্রীলোক, বন্ধু ও ভক্ষ্য সর্ব্বদা তিনি পরিহার করিবেন। কখনও তাঁবুতে খলের সহিত বণিক্ দলের সহিত নগরে গ্রামে ও বাসগৃহে যতি কখনও বাস করিবেন না। যতির পক্ষে রাগ, দ্বেষ, মদ, মায়া, দম্ভ এবং মোহবশে কার্য্য করা অন্যায়। মঞ্চ, শুক্ল বস্ত্র, নটীর বিষয় আলোচনা, চাঞ্চল্য, দিবাস্বপ্ন, ও যান এগুলি যতির পতনের কারণ। একত্র অন্যথাস্থানে পাত্রালাপ, সঞ্চয়, শিষ্য সংগ্রহ এবং বৃথা কথা বলা যতির বিদ্যাভ্যাসে প্রমাদ বন্ধন করে। যে যতির কোনও রূপ ভোজন-অনুরাগ নাই এবং যিনি হিত-পরায়ণ ও পরিমিত-ভাষী এবং সত্য-বাদী তিনিই সহজে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। যে যতি সদ্যোজাতা, এবং ষোড়শবর্ষীয়া নারীকে এক ভাবেই দর্শন করিতে পারেন, মোক্ষ লাভ তাঁহার পক্ষে অনায়াস-সাধ্য। যিনি ভিক্ষা ও পুরীষাদি ত্যাগের জন্যই যোজন পথের বেশী গমন করেন না তিনিই মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। কোনও সময়ে যাঁহার দৃষ্টি-শক্তি দূরে গমন করে না, যিনি হিতাহিত, মনোরম ও শোকাবহ বাক্য শুনিয়াও শুনেন না, তিনি মোক্ষ লাভের অধিকারী। বিকারের হেতু নিকটে থাকিলেও যাঁহার বিকার হয় না, তিনিই মোক্ষ লাভ করিবার উপযুক্ত পাত্র। এই সকল যতিকে যথাক্রমে অজিহ্ব, ষণ্ডক, পঙ্গু, অন্ধ বধির ও মুগ্ধ পরিব্রাজক বলে। ইহারাই মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হন। পরিব্রাজক একবার ভিক্ষার জন্য বহির্গত হইবেন। যখন গৃহস্থের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে, ভোজনাদি শেষ হইয়া যাইবে সেই সময়েই ভিক্ষার জন্য বিচরণ করিবেন। ভিক্ষালাভে তিনি হৃষ্ট হইবেন না, অথবা অলাভে বিষণ্ণ হইবেন না। প্রাণ-যাত্রার উপযুক্ত ভিক্ষা পাত্রে গ্রহণ করিবেন। যতি গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিবেন। কেবল এক গৃহ হইতে ভিক্ষা করিয়া তাহা ভোজন করিবেন না। মাধুকর ভৈক্ষ্যাই যতির পক্ষে প্রশস্ত। জানুর উপর নাভির নিম্নদেশ পর্য্যন্ত বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া তাহার নিম্নে কৌপীন পরিধান যতির কর্ত্তব্য। তিনি বাম হস্তে পাত্র ও দক্ষিণ হস্তে দণ্ড ধারণ করিবেন। সংযতবাক্ হইয়া সূর্য্যো-পাসনা করিবেন। তদনন্তর হৃদয়স্থিত চিত্তাখ্য আদিত্য পুরুষকে ধ্যান করিয়া ভিক্ষার্থ বহির্গত হইবেন। তারপর "আপনি ভিক্ষা দিন" বলিয়া গোদোহ মাত্রকাল বাক্‌যত হইয়া অধোমুখে থাকিবেন। যতি দাতার হস্তস্থিত ভিক্ষা দেখিয়া বাহুদ্বারা ত্রিদণ্ড দক্ষিণ অঙ্গে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া ভিক্ষাপাত্র বাম হস্তে রাখিবেন। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাম-পাত্রস্থিত অন্ন আচ্ছাদন করিবেন। স্পৃহা-বিহীন হইয়া প্রাণযাত্রিক মাত্র অন্ন ভিক্ষা করিবেন। ভিক্ষাও পাঁচ প্রকার—মাধুকর, অসংক্লৃপ্ত, প্রাক্‌প্রণীত, অযাচিত ও তাৎকালি কোপপন্ন। পূর্ব্ব হইতে সংকল্প না করিয়া পাচ অথবা সাত গৃহ হইতে, মধুকর যেরূপ মধু সংগ্রহ করে, সেরূপ ভিক্ষা সংগ্রহ করাকে মাধুকর ভিক্ষা বলে। মাধুকর ভিক্ষাই যতির পক্ষে প্রশস্ত। ভিক্ষায় বহির্গত হইবার পূর্ব্বে কেহ নিমন্ত্রণ করিলে তাহাকে "অযাচিত" এবং নিদ্রোত্থিত হইবার পূর্ব্বে ভক্তি সহকারে ভক্ত যে ভিক্ষা দিয়া যায়, তাহাকে প্রাক্‌প্রণীত ভিক্ষা বলে। উপাসনাকালে ব্রাহ্মণ যে ভিক্ষার জন্য অনুরোধ করে, তাহাকে তৎকালিক এবং ভক্তমধ্যে যে সিদ্ধ অন্ন লইয়া আসে, তাহাকে "উপপন্ন" ভৈক্ষ্য বলে। শুদ্ধচরিত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অন্ন আহরণ করিবেন। ব্রাহ্মণের অন্ন পাইলে তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন। এই তিন বর্ণের ভিক্ষা না পাইলে দুই দিন অপেক্ষা করিয়া তৃতীয় দিন শূদ্রের

অন্ন ভিক্ষা করিয়াও জীবনধারণ করা কর্ত্তব্য। উল্কাপাতাদি উৎপাতের হস্ত হইতে রক্ষার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া অথবা নক্ষত্র-বিদ্যায় পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া কখনও ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না। যে পরিমিত অন্ন সহজে জীর্ণ হয় ও শরীর রক্ষা করে, সেই পরিমিত অন্ন ভোজনই যতির কর্ত্তব্য। যে অন্ন ভোজন দ্বারা শরীর অসুস্থ হয়, তাহা গ্রহণ করা একেবারে নিষিদ্ধ। রজস্বলা প্রদত্ত অন্ন, যজ্ঞান্ন, শূদ্রান্ন, লৌহ-ভাণ্ডস্থ অন্ন যতিদিগের সর্ব্বদা বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। পিতৃপুরুষের অন্ন বা দেবাদির অথবা অপরের কল্পিত অন্ন সর্ব্বথা ত্যাজ্য। যে গৃহে অনেক তাপস মিলিত হইয়াছে, যেখানে অনেক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত, যেখানে কুকুর ও কাক অনেক আসিয়া জুটিয়াছে, সেই গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ। যে গৃহের লোক মূর্খতা বশতঃ ৫।৭ দিন ভিক্ষা দেয় না, সেই গৃহে ভিক্ষা লওয়া নিষিদ্ধ। সাধু-চরিত্র অপতিত বিপ্রের গৃহ কদাচ ত্যাগ করিবেন না। যে গৃহস্থ নিজে আহারের কষ্ট পাইয়াও ভিক্ষা দিয়া থাকে, তাহার গৃহে ভিক্ষা অনুচিত। যতির ভিক্ষাপাত্র ধাতুনির্ম্মিত করিবে না। তাহাতে ছিদ্রাদি থাকিবে না। জলধৌত করিলেই যতির পাত্র শুদ্ধ হইবে। অলাবু, কাষ্ঠময়, মৃন্ময় ও বৈদল পাত্রই যতির ব্যবহারের পক্ষে প্রশস্ত। আহৃত পত্রে অথবা বৃক্ষ হইতে পতিত পত্রে যতি ভোজন করিতে পারেন। বট অশ্বত্থ বা করঞ্জক ভক্ষণ করা উচিত নয়। কুম্ভ, তিন্দুক, কোবিদার এবং অর্ক পত্রেও ভোজন নিষিদ্ধ। যতি ভিক্ষাটন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া হস্ত-পদাদি প্রক্ষালন করিয়া আচমন পূর্ব্বক সূর্য্যকে নিবেদন করিয়া জপ করিবেন; তৎপরে ভোজনে নিযুক্ত হইবেন। ভোজনকালে কথা বলিবেন না। পর্ণ-পুটকে অথবা পাত্রে ভোজন করা বিধেয়। ভোজনান্তর যতি মন্ত্র দ্বারা পাত্র ধৌত করিবেন। তদনন্তর আচমন করিয়া প্রাণ নিরোধ পূর্ব্বক সূর্য্যকে উপাসনা করিবেন। তারপর সন্ধ্যা সমাপন করিয়া রাত্রি দেব-গৃহাদিতে যাপন করিবেন। হৃৎপদ্মে আত্মাকে ধ্যান করিয়া যতি পরম স্থান লাভ করেন। স্বধর্ম্মানুবর্ত্তী বৃদ্ধ যতিকে অভ্যুত্থান ও প্রিয়ালাপ দ্বারা যতি সম্মান প্রদর্শন করিবেন। কেশ নখাদি কর্ত্তন করিবেন। ভিক্ষাপাত্র বৃক্ষমূল, কুবস্ত্র, ও অসহায়তা এগুলি মুক্ত পুরুষের লক্ষণ। মরণ বা জীবন কাহারও অভিনন্দন করিবেন না। ভৃত্য যেরূপ প্রভুর আদেশ পালন করে, সেরূপ কালের জন্য অপেক্ষা করিবেন। দৃষ্টি দ্বারা পবিত্র স্থান দেখিয়া পদবিন্যাস, বস্ত্র দ্বারা পবিত্র করিয়া জলপান, সত্য বাক্য মনে যাহা পবিত্র বলিয়া বোধ হয় তাহার আচরণ যতির ধর্ম্ম। যতির পক্ষে পরনিন্দা অকর্ত্তব্য; তিনি কাহাকেও অবমাননা করিবেন না; কাহারও সহিত শত্রুতা করিবেন না। ক্রোধীর প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিবেন না। অপরে তিরস্কার করিলে তাহার কুশল প্রার্থনা করিবেন। আত্মজ্ঞানপরায়ণ, নিরপেক্ষ, নিরামিষাশী হইয়া একাকী বিচরণ করিবেন। অল্প অন্ন আহার ও নির্জ্জন স্থানে বাস করিয়া বিষয়-দৃষ্টি ইন্দ্রিয়-গ্রামকে সংযত করিবেন। ভোজনের সময় ভিন্ন অন্য কিছু আহার করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। তবে আবশ্যক হইলে ঔষধ সেবন করিতে পারেন। বিপন্ন না হইলে যতি পাথেয় গ্রহণ করিতে পারিবেন না। আপৎকালে এক দিনের জন্য পক্কান্ন গ্রহণ করিতে পারেন। নিত্যই তীর্থ বাস করিবেন না। যতির পক্ষে উপবাস প্রশস্ত নহে। অধ্যয়নশীল ও ব্যাখ্যান ব্রত হইয়াও থাকা যতির অনুচিত। তবে উপনিষদের আলোচনা করা যতির সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। কুটীর, জল, বস্ত্র, আসন, অন্ন প্রভৃতি কোনও দ্রব্যেই তাঁহার আসক্তি থাকিবে না। কাহারও সহিত ইন্দ্রিয়-সংসর্গ করিবেন না। মাৎসর্য্যাদি ত্যাগ সকল আশ্রমেই কর্ত্তব্য। পরিব্রাজকের ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, সত্য ও মিথ্যা কোনও ভেদ নাই। তাঁহারা সকল সহ্য করিবেন। সকলকে সমান ভাবে দেখিবেন। লোষ্ট্র ও কাঞ্চন তুল্য জ্ঞান করিবেন। কোনও রূপ সঞ্চয় করা যতির পক্ষে নিষিদ্ধ। আশীর্ব্বাদ করাও বিধেয় নহে। বাক্য, চক্ষু ও কর্ণের সংযম করা আবশ্যক। ঊর্দ্ধে অথবা বৃক্ষের শাখাদি ভাঙ্গিবেন না। লোকের আধিব্যাধি জরা মরণ প্রভৃতি দেখিয়া নিজে জ্ঞানলাভ করিবেন। নিজের পক্ষে যাহা অপথ্য, তাহা পরের প্রতি আচরণ করিবেন না। সত্য, ক্রোধহীনতা, হ্রী, ধৃতি, দম, সংযতেন্দ্রিয়তা ও বিদ্যা এ গুলিই পরিব্রাজকের ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি পরিব্রজ্যা সংগ্রহ করিয়া স্বধর্ম্মে অবস্থান করেন না, রাজা তাহার অঙ্গে কুকুরের পদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া তাহাকে নির্ব্বাসিত করিবেন। ভিক্ষুর কেবল চারিটি কাম আছে —ধ্যান, শৌচ, ভিক্ষা এবং একান্তে অবস্থান। তপস্যার দ্বারা কৃশ শরীর, রোগগ্রস্ত, বৃদ্ধি, গ্রহপীড়িত ও বিকলেন্দ্রিয় ভিক্ষু গৃহবাস করিতে

পারেন। আর কেহই গৃহে বাস করিতে পারেন না। যতির কাছে শত্রুমিত্র ও উদাসীনের কোনও ভেদ থাকিবে না। তিনি সকলকে সমান ভাবে দেখিবেন। বাক্য মন ও কর্ম্মদ্বারা তিনি কাহারও দ্রোহ করিবেন না। তিনি কখনও কাহারও নিন্দা করিবেন না। ভিক্ষু কখনও ভিক্ষুর নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না। নিন্দাকারীকে সতত ক্ষমা করিবেন। কাহারও সহিত শত্রুতা করিবেন না। ক্রোধকারীর প্রতি ক্রোধ করিবেন না। তাহার কুশল কামনা করিবেন। দিনে ও রাত্রিতে অজ্ঞানতঃ যে প্রাণিহিংসা হয়, সেই পাপ-শুদ্ধির নিমিত্ত প্রাণায়াম করিবেন। সম্মান যোগীর কাছে বিষতুল্য ও অসম্মান অমৃততুল্য। আতিথ্য, যজ্ঞ, দেবযাত্রোৎসব প্রভৃতিতে তিনি যোগ দিবেন না। যবাগূ তক্র পয়ঃ যাবক (যবের খিচুড়ি) ফল, মূল, প্রিয়ঙ্গু, ছাতু এইগুলিই যতির আহারোপযোগী। তিনি এই সকল ভিক্ষা করিতে পারেন।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

পাটলিপুত্র এবং জগৎশেঠ বংশ

[শ্রীরামলাল সিংহ, বি-এল্।]

জগৎশেঠ ফতেচাঁদ

আমি পূর্ব্ব-প্রবন্ধে (১) শেঠ মাণিকচাঁদের কথা বলিয়াছি। আজি আমরা তাঁহার দত্তক-পুত্র জগৎশেঠ ফতেচাঁদের সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলিব।

ঈশ্বর বুঝি মানুষকে একাধারে সকল সুখের অধিকারী করেন না। তাই ধন জনে পূর্ণ পরিবার এ সংসারে অতি বিরল। মাণিকচাঁদ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও অপুত্রক ছিলেন। নিজ ঔরসজাত পুত্র না থাকাতে তিনি তাঁহার ভাগিনেয় ফতেচাঁদকে দত্তক-পুত্র গ্রহণ করেন। মাণিকচাঁদের ভগিনী ধনবাইএর গর্ভে ও ধনন্দ-রাজবংশীয় বারাণসীর প্রধান শেঠ রায় উদয়চাঁদের ঔরসে ফতেচাঁদের জন্ম হয়। (২)

মাণিকচাঁদের জীবদ্দশায় ফতেচাঁদ মুর্শিদাবাদে থাকিয়া কুঠির কার্য্যে সম্যক্ দক্ষতা লাভ করেন। মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর ফতেচাঁদ ভারতের নানা স্থানে মহাজনী কুঠী স্থাপন করেন।

১৭২৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ্ সাহের সহিত ফতেচাঁদ সাক্ষাৎ করায়, সম্রাট তাঁহাকে "জগৎশেঠ" উপাধি প্রদান করেন; এবং উপাধির ফর্ম্মাণের সহিত ফতেচাঁদকে মতির গোশওয়ারা (কাণবালা) ও হস্তী খিলৎ প্রদান করেন। আর সেই সঙ্গে ফতেচাঁদের পুত্র আনন্দচাঁদও "শেঠ" উপাধি ও মতির কাণবালা প্রাপ্ত হন। (৩)

জগৎশেঠের 'ফর্ম্মাণ' হইতে আমরা নিম্নলিখিত অনুলিপি উদ্ধৃত করিলাম :—

(বাদশাহ মহম্মদ শার মোহর)

এই শুভকর আনন্দবর্দ্ধক সময়ে আমাদের চিরস্থায়ী সাম্রাজ্যের দিবাকরের কিরণজাল এই জগন্মাননীয় এবং সর্ব্বলোক বশীভূতকারী আদেশ দ্বারা বিশ্বস্ত ভাব এবং গৌরবের নিদর্শন স্বরূপে ফতেচাঁদ "জগৎশেঠ" উপাধি এবং মতির গোশোয়ারা (কাণবালা) ও হস্তী (খলাৎ) এবং তাঁহার পুত্র আনন্দচাঁদ "শেঠ" উপাধি ও মতির কাণবালা প্রাপ্ত হইলেন। সাম্রাজ্যের সমস্ত বর্ত্তমান ও ভাবী হাকিম, আমলা, মুৎসদ্দী প্রভৃতির উচিত যে তাঁহারা উক্ত ফতেচাঁদকে "জগৎশেঠ" এবং তাঁহার পুত্রকে শেঠ আনন্দচাঁদ লেখেন। এ বিষয়ে যত্ন ও মনোযোগ রাখেন। ৪ জুলুস-১২ রজব..." (৪)

আজি কোথায় গেল সে "চিরস্থায়ী" সাম্রাজ্য, আর কোথায় বা সেই "জগন্মাননীয় এবং সর্ব্বলোক বশীভূতকারী" আদেশ! কালের কি বিচিত্র গতি!

কথিত আছে, এক সময়ে সম্রাট্ মহম্মদ্ শাহ মুর্শিদকুলীখাঁর প্রতি বিরক্ত হইয়া ফতেচাঁদকে বঙ্গের নবাবী-পদে অভিষিক্ত করিতে চাহেন। ফতেচাঁদ উপকারী বন্ধুর পদ লইতে অস্বীকার করেন। সম্রাট্ ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সকল রাজকার্য্যে শেঠদিগের পরামর্শ লইবার আদেশ প্রদান করেন। (৫) এবং জগৎশেঠ নাম-খোদিত একটি বহুমূল্য সমুজ্জ্বল মরকত মণিও ফতেচাঁদকে প্রদান করেন।

১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলীখাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার জামাতা সুজা-

(১) ভারতবর্ষ, বৈশাখ, ১৩২৭; পৃঃ ৬৩৩।

(২) মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পৃঃ ৫৪।

(৩) ঐ পৃ ৫৫।

(৪) কালীপ্রসন্নের বাঃ ইঃ পৃ ৫৪৬।

(৫) মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পৃঃ ৫৫।

উদ্দীন খাঁ বঙ্গের সুবাদারী পদ প্রাপ্ত হন। (৬) জগৎশেঠ ফতেচাঁদ সুজাউদ্দীনের একজন প্রধান পরামর্শদাতা হইলেন। ধর্ম্ম-চিন্তা-নিরত সুজাউদ্দীন বার্দ্ধক্যে রাজ-কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ মানসে, ঢাকা হইতে নিজ পুত্র সরফরাজ খাঁকে মুর্শিদাবাদে আনয়ন করিয়া, তাঁহার হস্তে রাজ্য ভার কতক পরিমাণে প্রদান করেন; এবং যাহাতে রাজ-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়, সেই মানসে দেওয়ান রায় রায়ণ আলমচাঁদ, প্রধান শ্রেষ্ঠী ফতেচাঁদ, সেনাপতি হাজি অহম্মদ্ এবং মিরজা আলি (ভবিষ্যৎ আলিবর্দ্দী খাঁ), এই চারিজনকে লইয়া এক মন্ত্রী-সভা গঠন করিলেন। জগৎশেঠ ফতেচাঁদের প্রভাব দিন-দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার কর্ম্মচারীরা বঙ্গ, বিহার ও অন্যান্য স্থান হইতে ১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা রাজস্ব বাৎসরিক আদায় করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সুজাউদ্দীন সেই টাকা জগৎশেঠ ফতেচাঁদের কুঠির মারফৎ দিল্লীর সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। (৭)

মোগল-রাজ্যের পূর্ব্বে বঙ্গ-বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব বঙ্গ-বিহার ও উড়িষ্যাতে ব্যয়িত হইত। সম্রাট্ আকবরের সময় হইতে বৎসর-বৎসর দেড় কোটি টাকা মোগল বাদশাহগণের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের জন্য দিল্লীতে প্রেরিত হইতে লাগিল। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা দিন-দিন দরিদ্র হইতে লাগিল। প্রজা-হিতকর কার্য্য সকল স্থগিত হইল। সুশাসন-নীতির পরিবর্ত্তে কেবল শোষণ-নীতি প্রবর্ত্তিত হইল।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সুজাউদ্দীনের মৃত্যু হইলে, সরফরাজ খাঁ মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবেশন করিলেন। (৮) সুজাউদ্দীন মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্র সরফরাজ খাঁকে এই উপদেশ দিয়া যান যে, যাবতীয় রাজ কার্য্য জগৎশেঠ ফতেচাঁদ ও দেওয়ান রায় রায়ণ আলমচাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া পরিচালন করিবে।

অস্থির-চিত্ত, বিলাস ও আড়ম্বর-প্রিয় সরফরাজ রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া, জগৎশেঠ ফতেচাঁদ বা রায় রায়ণ আলমচাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। জগৎশেঠের সহিত সরফরাজের অচিরে মনোবিবাদ উপস্থিত হইল। জগৎশেঠ ফতেচাঁদ, রায় রায়ণ আলমচাঁদ এবং হাজী আহমদ্ অবমানিত হইয়া সরফরাজের পরিবর্ত্তে আজিমাবাদের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দী খাঁকে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন; এবং আলিবর্দ্দী খাঁকে বিহার হইতে বঙ্গ-দেশে আহ্বান করিলেন। (৯) আলিবর্দ্দী খাঁ সসৈন্যে বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঘেরিয়া বা গিরিয়ায় আলিবর্দ্দীর সহিত সরফরাজ খাঁর ঘোর যুদ্ধ হইল। সরফরাজ খাঁ পরাজিত হইয়া নিহত হইলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করিলেন।

আলিবর্দ্দী খাঁ জগৎশেঠ ফতেচাঁদকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া সকল কার্য্যেই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। জগৎশেঠ ধনে ও মানে ভারতের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন।

সুদূর মহারাষ্ট্র প্রদেশে মোগল-শক্তি-বিধ্বংসী যে শক্তি সঞ্চিত হইতেছিল, উড়িষ্যার মুসলমান্ দেওয়ান মীর হবীব সেই মহারাষ্ট্রীয় শক্তিকে বঙ্গে আহ্বান করেন। বঙ্গে বর্গীগণ দেখা দিল; অশান্তির স্রোত প্রবাহিত হইল। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় বর্গীগণ মীর হবীবের অধীন থাকিয়া, জগৎশেঠ ফতেচাঁদের মুর্শিদাবাদের কুঠি লুণ্ঠন করিয়া,দুই কোটি আর্কট মুদ্রা এবং বহুমূল্য দ্রব্যাদি হস্তগত করেন। (১০) কিন্তু তাহাতে জগৎশেঠ ফতেচাঁদের কিছুমাত্র ধনক্ষয় হইল না। এই লুণ্ঠনের পরেও তিনি প্রতিবৎসর ১ কোটি টাকা দর্শনী স্বরূপ মোগল সরকারে পূর্ব্বের ন্যায় প্রেরণ করিতে লাগিলেন। (১১)

১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। (১২) কিন্তু শেঠ বংশের গরিমা অক্ষুণ্ণ রহিল।

পাটলিপুত্রে স্মৃতিচিহ্ন

পাটলিপুত্রে জগৎশেঠ ফতেচাঁদের কোন বিশেষ কীর্ত্তি চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।

জগৎচাঁদ ফতেচাঁদের সমসাময়িক ঘটনাবলী

১৭২২ খৃষ্টাব্দে—শেঠ মাণিকচাঁদের মৃত্যু।

১৭২৩ খৃষ্টাব্দে অস্টেণ্ড কোম্পানী নামধেয় জর্ম্মাণ-বণিক-সম্প্রদায়ের বঙ্গে আগমন। জর্ম্মাণ্ সম্রাটের অধীন বেলিজিয়মের কতিপয় বণিক্ এই অস্টেণ্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী ছিলেন। তাঁহারা জর্ম্মাণ্ সম্রাটের সনন্দ-পত্র লইয়া বঙ্গে আগমন করেন। (১৩) তাঁহারা কলিকাতার ১৫ মাইল উত্তরে, হুগলীর নিকটে, বাঁকেবাজার নামক স্থানে নিজেদের একটি কুঠী স্থাপন করেন; এবং বহুবিধ দ্রব্যাদি স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে থাকেন। এবং অবিলম্বে তাঁহাদের ব্যবসায় প্রসার লাভ করিল। (১৪)

১৭২৪ খৃষ্টাব্দে ফতেচাঁদের "জগৎশেঠ" উপাধি প্রাপ্তি। (১৫)

১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলীখাঁর মৃত্যু হয় এবং তাঁহার জামাতা সুজা-উদ্দীনের মুর্শিদাবাদে নবাবী পদ প্রাপ্তি। (১৬) বিহার প্রদেশকে বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নসরৎ-ইয়ার খাঁকে বিহারের সুবাদারী পদ প্রদান। (১৭)

---

(৬) ষ্টুয়ার্টের বাঃ, ই পৃ ৪৬৮।
(৭) ষ্টুয়ার্টের বাঃ ই পৃ ৪৭৫-৭৬।
(৮) ষ্টুঃ বাঃ ই পৃ ৪৯৩।
(৯) মুঃ কাঃ পৃ ৫৮-৫৯।
(১০) ষ্টুঃ বাঃ ই পৃ ৫১৯।
(১১) মুঃ কাঃ পৃঃ ৬১।
(১২) ঐ পৃঃ ৬২।
(১৩) মুর্শিদাবাদ কাহিনী পৃঃ ৫৩।
(১৪) কালীপ্রসন্নের বাঃ ই পৃ ১০৫, ষ্টুঃ বাঃ ই পৃ ৪৮০।
(১৫) মুঃ কাঃ পৃ ৫৪।
(১৬) ষ্টুঃ বাঃ ই পৃ ৪৬৮।
(১৭) ঐ পৃ ৪৬৫।

১৭২৮ খৃষ্টাব্দ রাজস্ব বিভাগের পোদ্দার জগৎশেঠ ফতেচাঁদের কর্ম্মচারীরা ১ কোটী ৮৮ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করেন। (১৮)

১৭২৯-৩০ খৃঃ বঙ্গের সহিত বিহারের পুনঃ সম্মিলন : (১৯) ফরিদ্ উদ্দৌলার বিহারের সুবাদারী পদ হইতে নিষ্কাসন এবং আলিবর্দ্দী খাঁর পাটনার সুবেদারী পদ প্রাপ্তি। সিরাজউদ্দৌলার জন্ম এবং মাতামহ আলিবর্দ্দী খাঁর সহিত পাটনায় আগমন। (২০)

১৭৩০ খৃঃ ইংরাজ এবং অসটেণ্ড কোম্পানী নামধেয় বেলজিয়ান বণিক্ সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য। গঙ্গাবক্ষে জলযুদ্ধ এবং অসটেণ্ড কোম্পানির পরাজয়। (২১)

১৭৩১ খৃঃ আলিবর্দ্দী খাঁর দিল্লীর দরবার হইতে মহব্বৎ জঙ্গ উপাধি প্রাপ্তি। (২২)

১৭৩৩ খৃঃ ইংরাজ এবং ওলন্দাজদিগের প্ররোচনায় বাঁকেবাজারের জর্ম্মাণ কুঠী মুর্শিদাবাদের নবাব সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং বিধ্বস্ত। (২৩)

১১ অক্টোবর ১৭৩৭ খৃঃ গঙ্গাসাগরে প্রবল ঝটিকা ও ভূমিকম্প। কলিকাতায় দুই শত ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ ভূমিসাৎ। উত্তর দিকে প্রায় একশত ক্রোশ ব্যাপিয়া ঝড়ের প্রকোপ এবং প্রায় তিন লক্ষ লোকের প্রাণনাশ। (২৪)

মার্চ্চ ১৭৩৯ খৃঃ—নাদীর সাহের ভারত আক্রমণ। (২৫) সুজাউদ্দীনের মৃত্যু এবং তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁর মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবেশন। (২৬)

১৭৪০ খৃঃ জগৎশেঠ ফতেচাঁদ, রায় রায়ণ আলমচাঁদ এবং হাজি আহমদের সুজাউদ্দীনের বিপক্ষে চক্রান্ত। আলিবর্দ্দীকে পাটনা হইতে বঙ্গে আহ্বান। আলিবর্দ্দীর পাটনা ত্যাগ, (২৭) ও নিজ জামাতা জৈনউদ্দীনকে নায়েব নাজিম্ নিযুক্ত করেন। (২৮) গৌরিয়ার যুদ্ধে আলিবর্দ্দী কর্ত্তৃক সরফরাজ পরাজিত এবং নিহত। (২৯)

(১৮) ষ্টু: ইঃ তিঃ পৃ ৪৭৫ ৭৬।
(১৯) ঐ পৃঃ ৪৭৭।
(২০) কালীপ্রসন্নের বাঃ ই পৃ ৯৮।
(২১) ষ্টু বাঃ ই পৃ ৪৮১।
(২২) কাঃ প্রঃ কাঃ ই পৃ ৯০।
(২৩) ষ্টু: বাঃ ই পৃঃ ৪৮২।
(২৪) কাঃ প্রঃ বাঃ ই ১৩৭।
(২৫) ষ্টু: বা ইঃ ৪৯৪।
(২৬) ষ্টু: পৃঃ ৪৯৩।
(২৭) মুঃ কাঃ পৃ ৫৮-৫৯।
(২৮) কাঃ প্রঃ বা ই পৃ ১৩৯॥
(২৯) মুঃ কাঃ পৃ ৫৯।

১৭৪১ খৃঃ আলিবর্দ্দী খাঁর ৬৫ বৎসর বয়সে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে আরোহণ। (৩০)

১৭৪২ খৃঃ মীর হবীবের অধীন মহারাষ্ট্রীয় বর্গীগণ কর্ত্তৃক জগৎশেঠ ফতেচাঁদের মুর্শিদাবাদ কুঠী লুণ্ঠন। (৩১)

১৭৪৪ খৃঃ জগৎশেঠ ফতেচাঁদের মৃত্যু। (৩২)

বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা

[শ্রীপঞ্চানন দাস এম্ এস্‌সি]

আজকাল অর্থকরী শিক্ষার জন্য খুব একটা ধুয়া উঠিয়াছে। ইহা অবশ্যই মঙ্গলের লক্ষণ সন্দেহ নাই, কিন্তু ভাল বা মন্দ যে কোন একটা তুমুল আন্দোলনের ঝড় আসিলেই সেই সঙ্গে অনেক শুভ প্রতিষ্ঠানেরও ধূলিসাৎ হইবার সম্ভাবনা থাকে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সেইরূপ কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা আছে; অন্ততঃ উহার বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া সঞ্জাত হইবার আশঙ্কা আছে। মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রত্যক্ষ ফল প্রায়ই দেখা যায় না, অথচ উহার পরীক্ষাগার প্রভৃতি করিতে ও চালাইতে বহু লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়। এইরূপ ষাঁড়ের গোবর কি কাজে লাগিবে, এই বলিয়া একটা অনর্থ ঘটিতে পারে। সে জন্য পাশ্চাত্য জাতিরা বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে কি চক্ষে দেখেন, তাহা একবার দেখিয়া লওয়া ঠিক এই সন্ধিমুহূর্ত্তে ততটা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বোধ হয়।

ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য দুইটি; প্রথমতঃ শিক্ষাদান, দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি। জার্ম্মেণীতে মৌলিক অনুসন্ধানকারী ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইবার অধিকার নাই। অধ্যাপক যত সামান্য বা যত বেশী ইচ্ছা, বক্তৃতা দিতে পারেন; ইচ্ছা করিলে মোটেই বক্তৃতা না দিয়া একমাত্র মৌলিক গবেষণায় নিবিষ্ট হইতে পারেন; কেহ তাহাতে বাধা দিবার নাই। অর্থের ভাবনা তাঁহাকে ভাবিতে হয় না। তাঁহার পুত্র পরিবারের অভাব-প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয় দেখে। অধ্যাপক নিশ্চিন্তমনে সমুদয় মানসিক শক্তি বিজ্ঞানের গবেষণায় কেন্দ্রীভূত করেন।

বিদ্বজ্জনের সম্মান ফ্রান্সের ন্যায় কোন দেশেই বোধ হয় নাই। ফরাসীদের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাকাঙ্ক্ষা হইতেছে Institut de Franceএর সভ্য হওয়ার সম্মান লাভ। এই Institut প্রতি বৎসর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পুরস্কার-স্বরূপ বহু অর্থ ব্যয় করেন। মৌলিক চিন্তাশক্তিশালী ব্যক্তি ফ্রান্সের অতি গৌরবের সামগ্রী। চিন্তাশীলের মৃত্যুতে মৃতসৎকারের যে ঘটা ও আয়োজন হয়, তাহা ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্টের ভাগ্যেও, বোধ হয় জোটে না।

(৩০) ষ্টু: বাঃ ই পৃ।
(৩১) ষ্টু: পৃ ৫০০।
(৩২) মুঃ কাঃ পৃ ৬২।

ফ্রান্স ও জার্ম্মেণীতে "ভাল ছেলের" আদরও কম নয়। ইঁহারা বোঝেন, যে মেধাবী বুদ্ধিমান্ বালকই একদিন মানুষ হইয়া উঠিবে, এবং ইহারাই দেশের প্রচ্ছন্ন শক্তি। পিতামাতার দারিদ্র্যে বুদ্ধিমান্ বালকের শিক্ষার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না। ফ্রান্সে অনেক বিদ্যালয়ে (Lycee) শতকরা পঁচাত্তর জন ছাত্র বৃত্তিপ্রাপ্ত। যে সকল ছাত্র অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন, তাহাদের জন্য Government-এর স্বতন্ত্র বিদ্যালয় আছে। সেখানে শিক্ষাপ্রণালী অপেক্ষাকৃত বহু উন্নত ও অগ্রগামী।

ইংরাজ নিজের দেশে এতদিন বিজ্ঞান-শিক্ষা ও গবেষণা দুইই অবহেলা করিয়া আসিয়াছেন। বিগত যুদ্ধে তাহার পরিণামও হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছেন। সম্প্রতি ইংরাজ জাগিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বিশেষতঃ ফলিত বিজ্ঞান ও শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা লইয়া খুব একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

অপর পক্ষে, জার্ম্মেণী তাহার রাসায়নিক পরীক্ষা ও গবেষণাকারীর বিশাল সেনার দৌলতে এই পাঁচ বৎসর যুদ্ধ করিয়া টিকিয়া ছিল। যুদ্ধের সময় Lever Kusenএ Bayer কোম্পানীর কারখানায় অনূ্যন ৫০০ রসায়নবিৎ গবেষণায় নিযুক্ত ছিল; এখন বোধ হয়, আরও কয়েক শত যোগ হইয়াছে। জমীর সার ও বারুদ তৈয়ারীর জন্য nitrates অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। জার্ম্মেণী এই nitrateএর জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল ছিল। এখন Badische Annilin und Soda Fabrik বায়ু হইতে nitrate প্রস্তুত করিতেছে। বিখ্যাত Haber processএর উৎকর্ষ সাধন করিয়া উহারা প্রত্যহ প্রায় আড়াই বর্গ মাইল বায়ু হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে।

একটু ভাবিলেই দেখা যায়, বর্ত্তমান সভ্যতার মূলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা। রেলের গাড়ী, টেলিগ্রাফ, কলকারখানা, ঔষধাদি, মানুষের জীবনসংগ্রামের ও আরামের জন্য যে সমস্ত আয়োজনের সৃষ্টি হইয়াছে, এ সবই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসুর কাজ। অবশ্য বিজ্ঞানের অপব্যবহারও হইয়াছে—মানুষ মারিবার কল দিন দিন বাড়িতেছে। কিন্তু তাহার জন্য দায়ী কে,—বিজ্ঞান, না মানুষের সংহারবৃত্তি? পাশ্চাত্য সভ্যতা বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিজ্ঞানের এই সংহারশক্তির কারণে, বিজ্ঞান-বিদ্বেষের একটা ঢেউ উঠিতেছে। ইহার পরিণাম অমঙ্গলকর, নিঃসন্দেহ। অগ্নিতে রন্ধনও হয়, আবার গৃহদাহও হইতে পারে। এই গৃহদাহন ক্ষমতার জন্য কি অগ্নি বর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মচারী ও ফলমূলজীবী হইতে হইবে? কথাটা কতক অবান্তর, সুতরাং উহা ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। বিজ্ঞানের ওকালতি করা এই জন্য, যে যদি জগতের সঙ্গে সমান পাড়ি দিয়া চলিতে হয়, ত আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়াও পরীক্ষাগার প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে ও চালাইতে হইবে; ইহা অর্থের বা মস্তিষ্কের অপব্যয় নয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে জার্ম্মাণীর কেবল একটা কারখানায় ৫০০ গবেষণাকারী আছে। বিগত ৫০ বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়ন-বিদ্যার ৫০০ M.A. বাহির হইয়াছে কি? কিন্তু রহস্য এই যে যাহারা বাহির হইয়াছে, তাহাদেরই অন্নসংস্থান হয় না। তাহার কারণ অতি জাজ্বল্যমান—দেশে রাসায়নিক শিল্প নাই বলিলেই হয়। কিন্তু আগে শিল্প সৃষ্টি করিয়া পরে গবেষণার প্রস্তাব আগে সাঁতার শিখিয়া পরে জলে নামার সমান।

বিজ্ঞানের পক্ষ হইতে আর আর একটা বলা যায়, সাহিত্যের ন্যায় বিজ্ঞানের ভিতর দিয়াও জাতীয় ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে। বহুর মধ্যে একের অনুভূতি এই ভারতেই হইয়াছে। আবার এই ভারতবাসীই বৈজ্ঞানিক জগতেও সেই সত্যের আবিষ্কার করিলেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সচলাচল নির্ব্বিশেষে সকল পদার্থেই চেতনা বা সাড়ার আবিষ্কার, আমাদের সেই বেদোপনিষদ-কার ঋষিদের চিন্তারই বর্ত্তমান ধারা মনে করা যায়।

ভোগ

[কস্যচিৎ বৃদ্ধস্য]

ভোক্তা কে?—জীব।

জীব কাহাকে বলে?—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি সম্পন্ন চিদাভাস।

সে আবার কি? উঁহা কি 'আমি' নহে? না, 'আমি' পূর্ণচৈতন্য আত্মা; জীবত্ব আমার কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহস্থিত চৈতন্য মাত্র (Reflection of the soul in the three bodies.)

জীব কেমন করে ভোগ করে?—ইন্দ্রিয় দ্বারা।

ভোগ্য বস্তু কি? বিষয় ও বিষয় সংস্কার।

জীব জড় না চৈতন্য?—জীব জড় হইলেও উহাতে চৈতন্যাভাস ন্যস্ত থাকায়, চৈতন্যময় প্রতীতি হয়।

বিষয় ও সংস্কার, উহারা কি জড় নহে?—হাঁ, উহারাও জড়।

জীব জড় হইয়া কিরূপে বিষয় ও সংস্কার ভোগ করিতে পারে?—চৈতন্যাভাস উহাতে থাকায়, সে ভোগ করে; 'আমি' বা 'আত্মা' ভোক্তা নহেন; তিনি কেবল সাক্ষী-স্বরূপ 'জীবে'র ভোগ দেখেন; কিন্তু উহাতে কোনও রূপে লিপ্ত হয়েন না।

আচ্ছা, তবে যেখানে 'আমি' বা 'আত্মা', কারণ 'সূক্ষ্ম' ও 'স্থূল' দেহ ধারণ করিয়াছেন, সেখানে, তখন জীবের (অর্থাৎ আত্মার জীবত্বের), বিষয় ভোগে দোষ কি?—দোষ কিছুই নাই; উহার ঐ ত স্বভাব। জীবত্ব ধারণ যদি 'আত্মা'র লীলা হয়, তাহার বিষয় ভোগ না ঘটিলে লীলায় ব্যাঘাত ঘটিবে।

তবে—ত্যাগের মাহাত্ম্য—'কামিনী কাঞ্চন' ত্যাগের উপদেশের কথা—কেন এত শোনা যায়?

ত্যাগের উদ্দেশ্য, ভোগ-পথের বিঘ্ন সকল সরান মাত্র। 'ত্যাগ অর্থে 'ভোগ ত্যাগ'—নহে—আসক্তি ত্যাগ মাত্র।

গীতায় ত ভগবান্ ত্যাগ-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন?—হাঁ, তিনি

ত্যাগ অর্থে, কর্ম্মারম্ভে আসক্তি ত্যাগ ও কর্ম্ম করিবার সময় এবং কর্ম্মান্তে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগের কথা বলিয়াছেন।

আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, কি রূপে ভোগ করিতে হয়, বুঝাইয়া দিউন। ভোক্তা—মন, ভোগ্য—বিষয়, 'আমি' কেবল দ্রষ্টা মাত্র—ইহা যদি ভোগের সময় স্মরণ থাকে, তাহা হইলেই ঠিক-ঠিক ভোগ হইয়া যায়। স্মরণ না থাকিলে, মন ভোগ্য বিষয় দ্বারা অভিভূত হয় এবং তদাকারে আকারিত হইয়া যায়। ফলে দাঁড়ায়—জীবের চৈতন্যাংশ (চিদাভাষ) প্রায় সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া, সে পূর্ণ জড়ত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। জন্মান্তর-বাদীগণের মতে, তাহার মনুষ্যত্ব ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। পরে সে পশুত্বে বা প্রস্তরত্বে পর্য্যন্ত পর্য্যবসিত হইতে পারে। অর্থাৎ যে Pendulum (পেণ্ডুলাম) এত দূর অগ্রসর হইয়া মনুষ্য রূপে পরিণত হইয়াছিল, বিবেক-শূন্য ভোগ দ্বারা উহা পশ্চাদ্‌গামী হইয়া, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গে বা প্রস্তরে অধোগতি পাইবার আশঙ্কা থাকে।

সেই জন্যই "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিতা" এই বাক্য দ্বারা উপনিষদ্‌ বুঝাইয়াছেন, 'আমি' আমার স্বরূপত্ব কি তাহা ভুলিয়া যখন জীব রূপে ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হই, তখনই ভোগ নিন্দনীয়; নতুবা বুদ্ধি সহকারে আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া ভোগ করিলে, প্রকৃতপক্ষে চিত্তশুদ্ধি হইয়া ভগবদ্-প্রাপ্তির সহায়তা হয়।

ভোগ কতদিন করিতে পারা যায়?—যত দিন জীব দেহ ধারণ করিয়া থাকে।

মৃত্যু অর্থাৎ স্থূল-দেহ ত্যাগের পর ভোগ থাকে কি?—হাঁ, জীব সূক্ষ্ম দেহেও ভোগ করিয়া থাকে। জীবিত অবস্থায় অর্থাৎ স্থূলদেহ রক্ষা করিয়াও সে স্বপ্নে সূক্ষ্ম দেহে বিষয়-সংস্কার ভোগ করিয়া থাকে।

ভোগের শেষ কবে হয়?—জীব যখন স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহ-মুক্ত, বা বিদেহী হইয়া, ব্রাহ্মীস্থিতি অর্থাৎ নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করে।

সে অবস্থা কিরূপ?—তাহা অনির্ব্বচনীয়। তবে সিদ্ধ মহাত্মারা ঐ অবস্থার অল্প স্বল্প আভাস মাত্র প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সে সময় জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান সব একত্রীভূত হইয়া, এক অব্যয় জ্ঞান মাত্র অবশিষ্ট থাকে। নির্ব্বিকল্প সমাধিরূপ সাধনা দ্বারা তাঁহারা ঐ অবস্থা, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, কেহ-কেহ আর মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আইসেন না, আবার কেহ-কেহ অবশিষ্ট প্রাক্তন কর্ম্মের ভোগ জন্য এবং জগতের হিতার্থ দেহে ফিরিয়া আসিয়া থাকেন। তাঁহারা তখন যে সকল কর্ম্ম দ্বারা ভোগ করিয়া থাকেন, উহা, দগ্ধ-বীজ শস্যের ন্যায়, তাঁহাদিগকে নূতন বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে না। এবং তাঁহারা ভোগান্তে স্বরূপ বিশ্রান্তি বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন। অর্থাৎ তাঁহাদের তখন লীলার সমাপ্তি হইয়া যায়, লীলার প্রারম্ভে যাহা ছিলেন আবার তাহাই হয়েন।

ভোগ করা তাহা হইলে 'চিনি খাওয়া'?—হাঁ, তাহাই বটে।

মুক্ত হইয়া ভোগান্তে 'হওয়া তাহা হইলে 'চিনি হওয়া?' এখানে উপমা ঠিক হইল কি না বিচার-সাপেক্ষ; কারণ, 'চিনি হওয়া' ত জড়ত্ব প্রাপ্তি মাত্র। ব্রহ্মনির্ব্বাণে যদি পূর্ণ চৈতন্যত্বে পরিণতি হয়, তাহার সহিত জড়ত্বের সম্বন্ধ কিরূপে থাকিতে পারে? সে অবস্থায় জ্ঞান ও আনন্দ অফুরন্ত;—মুক্ত পুরুষগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তবে 'চিনি হওয়ার' সহিত, তাহার কেমন করিয়া সাদৃশ্য থাকিতে পারে?

রপ্তানী-বাণিজ্য

[শ্রীসতীশচন্দ্র দে এম-এ, বি-এল্]

ভারতবর্ষের রপ্তানী কারবার ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইবে, ইহা আশা করা স্বাভাবিক। এই দেশে যত রকমের কাঁচা মাল আছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও তাহা নাই। বিদেশী বণিকগণ, তাহাদের দেশের জন্য যে-যে জিনিষের আবশ্যক হইবে বা যাহা দ্বারা কোন মূল্যবান্ জিনিষ প্রস্তুত করিয়া লাভবান্ হইবে বলিয়া আশা করে, তাহা এখান হইতে সর্ব্বদা লইতে সচেষ্ট আছে।

কাঁচামাল ব্যতীত ভারতের প্রস্তুত দ্রব্যাদিরও রপ্তানী ক্রমে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাও আশা করা যায়। যে সকল জিনিষের মূল্যের প্রধান অংশ কাঁচামালের মূল্য মাত্র, তাহার রপ্তানী বৃদ্ধি না হইলে মনে করিতে হইবে যে, এমন কতকগুলি কারণ রহিয়াছে, যাহা দূর করিতে ব্যবসায়ী লোকের চেষ্টা করা আবশ্যক। কাষ্টম হাউসের প্রকাশিত রপ্তানী মালের তালিকাতে দেখা যায়, কাঁচামালের রপ্তানী যত বেশী হয়, ভারতে প্রস্তুত জিনিষের রপ্তানী তত হয় না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে রপ্তানী-কারকের কি-কি বিষয় জানা আবশ্যক, এবং কিরূপে তাহা জানা যাইবে, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করা হইবে। রপ্তানী কারবারের লাভ প্রধানতঃ বিদেশী ব্যবসায়িগণই প্রাপ্ত হয়। দেশী ব্যবসায়িগণ প্রায়ই তাহাদের সাহায্যে রপ্তানীর কাজ চালাইয়া থাকে। ঐ ব্যবসা যাহাতে আমাদের দেশের লোকের হাতে আসে, তাহার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

১। জিনিষ প্রস্তুত-কারককে অথবা রপ্তানী-কারককে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, সে যে সব জিনিষ তৈয়ার করে বা রপ্তানী করিতে চাহে, তাহার জন্য বিদেশে চাহিদা আছে কি না, বা হইতে পারে কি না; থাকিলে, জিনিষ পাঠাইয়া যে দাম পাওয়া যাইবে, তাহাতে তাহার লাভ হইবে কি না?

২। বিদেশের ক্রেতাগণের দৃষ্টি কি ভাবে আকৃষ্ট করা যাইতে পারে। তাহাদের নিকট হইতে অর্ডার পাইবার উপায় কি?

৩। প্রেরিত জিনিষের মূল্য কি ভাবে, কত দিন পরে, কাহার নিকট হইতে পাওয়া যাইবে। ক্রেতাগণের বিশ্বস্ততা ও অবস্থা, জাহাজে কি ভাবে মাল পাঠাইতে হইবে, ইন্‌সিউর কি ভাবে করিতে হয়, কাষ্টমহাউসের নিয়ম কি, ইত্যাদি বিষয় জানিতে হইবে। এই সব নিয়মাদি ভিন্ন-ভিন্ন দেশে ভিন্ন-ভিন্ন রকমের।

প্রথমোক্ত বিষয় অর্থাৎ বিদেশে আপনার মালের চাহিদা আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

(ক) Director of Commercial Intelligenceকে লিখিলে তিনি এ সম্বন্ধে অনেক খবর দিতে পারিবেন। Germany, America প্রভৃতি দেশে এইরূপ Department of Government আছে, যাহারা সর্ব্বদাই লোককে এই সব বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে।

(খ) বর্ত্তমানে যাঁহারা রপ্তানী কারবারে লিপ্ত আছেন, তাঁহাদিগকে লিখিলে, তাঁহারাও অনেক খবর দিতে পারিবেন। রপ্তানী ব্যবসায়িগণের নামের তালিকা Thacker's Indian Directoryতে পাইবেন।

(গ) ভারতের প্রতি বন্দরের কাষ্টম হাউস হইতে প্রকাশিত রপ্তানির তালিকা দেখিলে জানিতে পারিবেন, কোন্ জিনিস কোন্ বন্দরে রপ্তানী হয়। বন্দরের Custom Collectorকে লিখিলে এই তালিকা পাইবেন।

(ঘ) Exchange Bankএ লিখিবেন। বৈদেশিক বাণিজ্যের অনেক খবর তাহাদের নিজ স্বার্থের জন্যই রাখিতে হয়। আপনার সংবাদটী তাঁহাদের জানা না থাকিলেও, আপনার পত্র পাইলে তাঁহারা তাঁহাদের বিদেশস্থ প্রতিনিধি বা কর্ম্মচারী দ্বারা সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আপনাকে জানাইবেন।

(ঙ) London, New York প্রভৃতি বিদেশের Directoryতে অনেক খবর পাওয়া যাইবে।

(চ) প্রতি বন্দরেই Commission Agents আছেন। তাঁহাদিগকে লিখিতে পারেন; কিন্তু আপনাকে সাহায্য করা তাঁহাদের স্বার্থের বিরুদ্ধ বলিয়া, তাঁহাদের দ্বারা কাজ না করাইলে, তাঁহারা আপনাকে সংবাদ জানাইয়া সাহায্য করিবেন না।

(ছ) যে দেশে জিনিষ পাঠাইতে চান, সেই দেশের লোকের রীতি-নীতি জানিতে হইবে। এইজন্য ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ইত্যাদি পাঠ করিতে হইবে; এবং উক্ত দেশীয় লোক পাইলেই তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিবেন।

দ্বিতীয় বিষয়ে সফলতা লাভের জন্য, অর্থাৎ বিদেশীয় ক্রেতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগের অর্ডার পাওয়ার জন্য, নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে।

(ক) উপযুক্ত বিক্রেতা বা canvasser বিদেশে পাঠাইতে পারিলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। তাহার খরচ পোষাইবে কি না বিবেচনা করিতে হইবে। যাহাকে পাঠাইবেন, তাহার বিদেশীয় ভাষা জানা চাই, এবং আপনার জিনিষের ব্যবহার ও উপকারিতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হওয়া চাই।

মেসের পত্র

[শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ]

বন্ধু,

বেশী দেরী নাই সন্ন্যাসী হয়ে
পড়ি বুঝি কবে ভেসে।
ব্রহ্মচর্য্য চলিতেছে রীতিমত
কেন না রয়েছি মেসে।
ধোবার অভাবে কাপড় হয়েছে
গেরুয়া,
শয্যা কেবল সার হইয়াছে
খেরুয়া,
চোরে নিয়ে গেছে সবই, কেবল
ফেরুয়া
সম্বল আছে শেষে।
বেড়ে গেছে দাড়ী, সময় পাইনি ব'লে
হয়নি নাপিত ডাকা
তেলের বোতল পাইনা খুঁজিয়া, তাই
হয়না ক তেল মাখা;
খড়ি উঠে গায় তৈলবিন্দু
বিহনে,
কটা হলো চুল, দেরী নাই জটা
বয়নে,
কুলায় বাঁধিবে অচিরে কেশর
গহনে,
দেশের পাখীরা এসে।
ম্যানেজার বাবু সন্ন্যাসে মতি হেরি
কুশাসন দেন পেতে,
মৎস্য-মাংস বন্ধ করিয়া দিয়া
কাঁচকলা দেন খেতে।
পরণের ধুতি এখনো এতেও
ছাড়িনি,
গাঁজার কল্‌কে এখনো ধরিতে
পারিনি,
এদুটা হলেই বলে "তারা দীন-
তারিণী"
ছুটিব সাধুর বেশে।
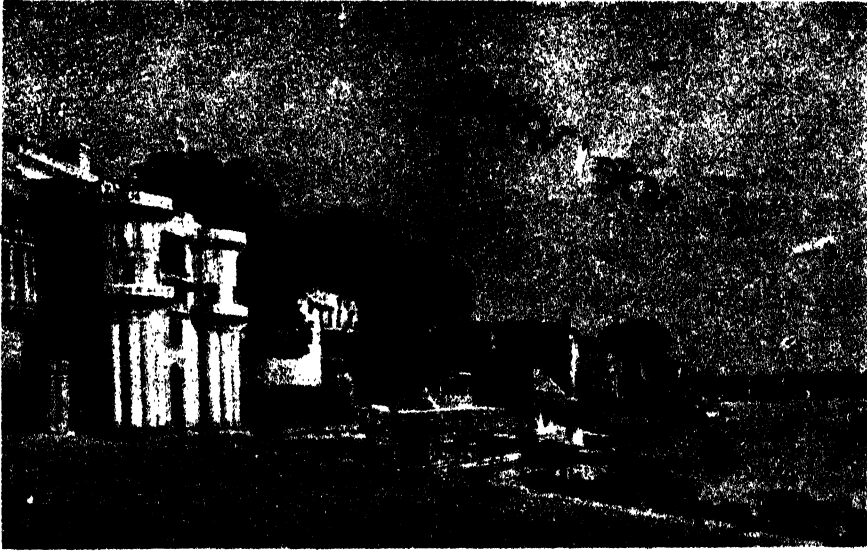
অসি ঘাট

[শ্রীগৌরাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

"সারা বৎসরের মধ্যে কেবল একবার—একটিবারের জন্য কাজ-কর্ম্মের বোঝা যথাসম্ভব মস্তক হইতে নামাইয়া, একসঙ্গে কয়েক দিনের অবকাশের ব্যবস্থা করিতে পারি;—সে আমাদের সর্ব্বপ্রধান পর্ব্ব দুর্গোৎসবের সময়। সে সময় যাঁহারা দীর্ঘ অবকাশ পান, তাঁহারা দিল্লী, লাহোর, বোম্বাই, সিংহলে যান; আর যাঁহারা অল্প কয়েক দিনের ছুটী পান, তাঁহারা হাতের কাছে পুরী, বৈদ্যনাথ, মধুপুর, বা দার্জ্জিলিংয়ে—বড় জোর কাশীধাম পর্য্যন্ত 'ধাওয়া' করেন। যাঁহাদের এখনও পল্লীবাস আছে, এখনও যাঁহাদের পল্লী-নিকেতনে দিনান্তে ক্ষুদ্র প্রদীপটি জ্বলে, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই—বোধ হয় হাজারে দশ জন—পূজার সময় দেশে যান কি না সন্দেহ। যাঁহাদের আয় সঙ্কীর্ণ, তাঁহারা সংসার প্রতিপালনের জন্যই এই দুর্ম্মূল্যের দিনে ঋণগ্রস্ত; তাঁহাদের মনে ইচ্ছা থাকিলেও প্রবাস-বাস ঘোচে না—দরিদ্রের মনোরথ হৃদয়েই বিলীন হয়; দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তাঁহারা প্রবাসেই অবকাশ যাপন করিতে বাধ্য হন। বলা বাহুল্য আমিও এই দলেরই একজন।"*

তবুও সেবার পূজার সময় যখন বন্ধুগণের মধ্যে নানা-জনের নানা স্থানে যাইবার সুদীর্ঘ 'প্রোগ্রাম' হইতে লাগিল, তখন আমি আর একবার বারাণসী দর্শনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। সওদাগরী আপিসের কাজ—সুতরাং চারদিন মাত্র ছুটী। বড়বাবু মহাশয়ের কাছে ২।১ দিনের বেশী ছুটির নাম করিবারও দুঃসাহস কাহারও নাই। তাঁহার গুম্ফ-রেখা যখন সবে দেখা দিয়াছে, এমন এক দিনে নিরীহ ভালমানুষ ছোকরা বাবু মহাশয়, ভিজে বিড়ালটীর মত এই আপিসে প্রবেশ করিয়া, শত্রুর মুখে ছাই দিয়া আজ ৪২ বৎসর গোলামি করিতেছেন। কত 'বড় সাহেব' তাঁহার হাতে মানুষ হইয়াছেন।—আর ছোট সাহেবদের তো কথাই নাই,—তাঁহারা বড়বাবুর ঘরের লোক বলিলেই হয়। এই সুদীর্ঘ ৪২ বৎসরের মধ্যে তিনি একসঙ্গে কখন বিয়াল্লিশ দিন ছুটী লন নাই। অন্যান্য বাবুরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিত যে, তিনি ছুটি জমাইয়া রাখিতেছেন; সব ছুটি 'একেবারে' লইবেন বলিয়া। সুতরাং কেহ ছুটি লইতে গেলে, তিনি নিজেকে নজীর দেখাইয়া, তাহাকে ভাগাইয়া দিতেন। দেশ-ভূঁই ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন ছাড়া এই যে সব প্রবাসী বাবু,—ইঁহাদের যে ছুটীর আবশ্যক হইতে

---

* হিমাচল পথে—শ্রীযুক্ত জলধর সেন।

পারে, বড়বাবু এ কথা ভাবিতেই পারিতেন না। তর্কে জিতিতে না পারিলে, তিনি সাফ জবাব দিতেন, "বাপু হে, অত ছুটির দরকার থাকিলে, তোমার এখানে না আসাই ভাল ছিল। তা বেশ, তবে যাও—তোমার পূরা ছুটির বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি।" আসল কথা, সব বিষয়েই বড়বাবুর দাপটে সবাই ভয়ে তটস্থ।

আমার সঙ্গে বড়বাবুর সম্পর্কটা বড় মধুর ছিল না। আপিসের বাবুদের মধ্যে তাঁহার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী অনেক। তাঁহারা ছাড়া আর সকলেই আমাদের এই সম্পর্কটা বেশ উপভোগ করিতেন। বড়বাবু কোন রকমেই এই "আপিস-জ্বালানো ফোচকে ছোঁড়াটাকে" আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাহার কারণ, আমার যত-কিছু কাজ কর্ম্ম,—তাহা এক সাহেবের সঙ্গে, আর সে সাহেবটি এ-ক্ষেত্রে বেশ ভাল লোক,—নেটীভ বড়বাবুর এতখানি প্রতিপত্তির পোষকতা করাটা যুক্তিসঙ্গত বোধ করিতেন না। বড়বাবু আমার প্রতি বিশেষ নারাজ, কারণ আমি এই সাহেবের বাবু।

সাহেবকে বুঝাইয়া বলিলাম, যে যদি মাঝে এক-এক দিন করিয়া তিন দিন ছুটি পাই, তাহা হইলে দুর্গা ও লক্ষ্মী পূজা একত্র করিয়া আমার দশদিন ছুটি হয় ও আমি একটু দূর হইতে ঘুরিয়া আসিতে পারি। তিনি আপত্তির সুর তুলিলেন যে, বড়সাহেব জানিতে পারিলে অসন্তুষ্ট হইবেন। আমি ইহার প্রতিষেধক বিশেষ রূপেই অবগত ছিলাম; সুতরাং বলিলাম যে বড়বাবুর কাছে এ বিষয় লইয়া আমি যাই নাই; কারণ, ইহা নিশ্চিত যে, তিনি অনুকূল মত না আনিয়া প্রতিকূল মতই আনিবেন। বাস্, তাঁহার নিজের দায়িত্বে তৎক্ষণাৎ আমার ছুটী মঞ্জুর হইল; এবং তিনি নিজেও আমার ন্যায় তিনদিন ছুটী লইয়া দশ দিনের জন্য ওয়ালটেয়ারে যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

আমার জন্য কোন গাড়ী রিজার্ভ হইবার নহে; এমন কি, একটা সেকেণ্ডক্লাস বার্থও নহে; সুতরাং এ সম্বন্ধে লিখিবার কিছুই নাই। হুকুম হইবামাত্র ফেয়ারলি প্লেস্ রেল আপিস হইতে একখানি মধ্য শ্রেণীর পূজা কনসেসন টিকিট লইয়া আসিলাম এবং অনেককেই তাহা দেখাইয়া দিলাম। কথাটা অবশ্য বড়বাবুর কাণে উঠিতে একটুও দেরী হইল না। তিনি কিছুক্ষণ পরে একবার আমাদের ঘরে ঢুকিয়া, তাঁহার এক আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের গোলমাল হে?" একজন আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া টিকিটখানি তাঁহাকে দেখাইয়া দিল; এবং আমি, যেন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে কি হইয়াছে এইভাবে, তাহা এরূপ ভাবে দেখিতে লাগিলাম যে, আর সকলেই আমার দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

এইবার পথের কথা বলিব। পাঞ্জাব মেলে যাইবার ইচ্ছায় যথেষ্ট সময় থাকিতে হাওড়া ষ্টেসনে আসিয়া দেখি, সে প্লাটফরমে প্রবেশ করা একরূপ অসাধ্য;—সে যেন স্বর্গদ্বার। বিশেষ পুণ্য না থাকিলে প্রহরীরা কাহাকেও ভিতরে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। আমার সঙ্গে জিনিসপত্রের মধ্যে মাত্র এক ব্যাগ। একটু চেষ্টার পরই প্রবেশলাভে সমর্থ হইলাম। কিন্তু যে কামরাতেই উঠিতে যাই সেখানেই হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ, না না না না রব। কেহ বা দরজায় পিঠ দিয়া দাঁড়াইলেন, আবার কেহ বা চাবিও লাগাইলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীদিগের ভৃত্যবর্গের জন্য নির্দ্দিষ্ট কামরাগুলিও দেখিলাম বাবুতে বোঝাই। অনেক চেষ্টার পর তাহারই একটি কামরায় প্রবেশ করিলাম, এবং দেখিলাম দাঁড়াইয়া যাওয়া যাইতে পারে। দুএকজন আরোহী আমার এতখানি সুবিধা ভোগ করাটা সুনজরে দেখিতে পারিলেন না। তাঁহারা আমার হিতৈষী হইয়া উঠিলেন, এবং শুনাইয়া দিলেন, গতকল্য ডুপ্লিকেট পাঞ্জাব ও বম্বে মেল চলিয়াছিল, আজও চলিবে, আমার তাহাতেই যাওয়া সুবিধা। বর্ত্তমান অবস্থায় যাওয়া আমার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইবে। তাহার পর এক্সপ্রেসও আছে, তাহাতে মোটেই ভিড় হয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিছুক্ষণ এই ভাবে বিনামূল্যে উপদেশ লাভে অতিষ্ঠ হইয়া, তথা হইতে নামিয়া পড়িলাম। পাশেই বোম্বাই মেল দাঁড়াইয়া; কিন্তু আগ্রাতে একবার নামিবার ইচ্ছা থাকায়, আর তথায় চেষ্টা করিলাম না। অনুসন্ধানে জানিলাম, ডুপ্লিকেট মেল চলিবার কোন ব্যবস্থা নাই। ওদিকে যাইবার জন্য দিল্লী এক্সপ্রেসই শেষ দ্রুত গাড়ী। তাহাতে যাইবার জন্য দশ নম্বর প্লাটফরমে উপস্থিত হইয়া দেখি, তথায়ও প্রবেশলাভ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। কোন রকমে প্রবেশ করিয়া দেখি—অন্যত্র যাহা এখানেও তাই, সকলেই হাঁ হাঁ করিয়া বলেন, "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট এ গাড়ী, আমাদেরই মালপত্রে গিয়াছে ভরি।"

একটি কামরায় বেশ বায়গা আছে দেখিয়া, প্রবেশলাভের

চেষ্টা করিলাম; কিন্তু দেখিলাম, তাহার দরজায় পিঠ দিয়া একজন ভদ্রবেশধারী দণ্ডায়মান। উপবিষ্ট অন্যান্য অনেকেই তাঁহাকে বলিতেছেন, দেখিবেন মশায়, কেহ যেন না আসিতে পারে। তাঁহাকে সরিতে অনুরোধ করায়, তিনি উত্তর দিলেন, চাবি বন্ধ—অন্যত্র চেষ্টা দেখুন। আমি বলিলাম, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া একটু সরিলে, আমি জানালা দিয়া ভিতরে আসিতে পারি।" অমনি সকলে না না করিয়া উঠিলেন।

ভাবিলাম ফিরিয়া যাই, পরদিন আবার দেখা যাইবে। কিন্তু তখনি আবার মনে হইল, পর দিবসেও তো এইরূপ হইতে পারে। লোকে গাড়ী গাড়ী জিনিসপত্র লইয়া যাইতেছে, আর আমি একটিমাত্র ব্যাগ লইয়া স্থান করিয়া লইতে পারিতেছি না,—বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার! গাড়ী প্লাটফরমে আসিবার পূর্ব্বে আসিয়াই বা লাভ কি? রেল কর্তৃপক্ষ তো আর সাধারণের সুবিধার জন্য তাহার পূর্ব্বে প্লাটফরমের প্রবেশ-পথ খুলিয়া দিবেন না! লোকের পর লোকের ঠাসাঠাসিতে সকলে ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়িলেও, সে স্বর্গদ্বার খুলিবার নয়। কর্তৃপক্ষ যদি পথগুলি খুলিয়া রাখেন, তাহা হইলে শতভাগ যাত্রীদের কিঞ্চিৎ সুবিধা হয়; কিন্তু সে কথা শুনে কে।

আমি দাঁড়াইয়া এই সব ভাবিতেছি, এমন-সময়ে গাড়ীর মধ্য হইতে একজন বলিলেন, "মশায়, জায়গা দিতে পারি; কিন্তু গান গাইতে হবে।" আমি ভাবিলাম হয় ত অপর কাহারও উদ্দেশে বলিতেছেন; সুতরাং চুপ করিয়াই রহিলাম। তিনি পুনরায় বলিলেন, "কি? চুপ ক'রে রইলেন যে, গাইবেন না? যান তবে।" আমি দেখিলাম, কথাটা আমাকেই উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন। এ সুযোগ ছাড়িয়া দেওয়া নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। বলিলাম, "তার আর কি—দেখা যাবে।" ঠিক বুঝতে পারিলাম না যে, ভদ্রলোকের মতলব গান শোনা, না আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া লওয়া।

কিন্তু দরজায় দেখি, বাস্তবিকই চাবিবন্ধ। জানালা দিয়া প্রবেশের অনুমতি পাইলাম। একজন ব্যাগটা তুলিয়া লইলেন। আমিও ভিতরে গিয়া বসিয়া স্বস্তি বোধ করিলাম। ক্ষণপরেই গানের ফরমায়েসে সকলে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিল। এখনি অক্ষমতা জানানটা কাজের কথা নহে বুঝিয়া, তাঁহাদের আশ্বাস দিয়া বলিলাম, কিছু পরে দেখা যাইবে।

কিছুক্ষণ পরে টিকিট পরীক্ষা করিবার জন্য একজন বাবু গাড়ীর দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন; এবং সেই অবসরে আরও ২।৪ জন যাত্রী তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ঢুকিয়া পড়িয়া স্থানে-স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যাঁহারা আগে আসিয়া গাড়ী দখল করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার নিকট নবাগতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। চেকার বাবু সবে তখন ২।১ জনের টিকিট দেখিয়াছেন। অভিযোগের উত্তরে বলিলেন, "তাই তো মশায়, কি করি। সকলেই ত যাইতে চান। দেখি, যদি আর কোথাও জায়গা করে দিতে পারি।" কিন্তু নবাগত ব্যক্তিগণ বলিলেন যে, তাঁহারা দেখিয়া আসিয়াছেন, আর কোথাও স্থান নাই। তাঁহারা বরং এ কামরায় দাঁড়াইয়াই যাইবেন। চেকার বাবু বলিলেন, "তাহা হইবার নহে। আপনারা হয় ত মনে ভাবছেন, কিছুক্ষণ পরেই অনেকে নেমে যাবেন; তখন আপনাদের আর কোন অসুবিধা থাকিবে না। কিন্তু এ অনেক দূরের গাড়ী, কাছে কেউই নামবেন না। সারা পথই আপনাদের এই ভাবে যেতে হবে। আর তাতে হয় ত আপনাদের কেউ faint হবেন। তখন দোষ যত আমাদের ঘাড়েই পড়বে, কাল এই রকম হয়েছিল। আপনারা বরং আমার সঙ্গে আসুন; আমি অন্য জায়গায় চেষ্টা দেখি।" অগত্যা তাঁহারা সকলে নামিয়া গেলেন। একজন, চেকার বাবুকে চাবিটা পুনরায় বন্ধ করিতে অনুরোধ করিলেন, তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। দেখিলাম, চেকার বাবুটীর কথায়-বার্ত্তায় বা ব্যবহারে বেশ ভদ্র ভাব।

গাড়ী ছাড়িবার আর বেশী বিলম্ব নাই। একজন বৃদ্ধ, দাড়ী গোঁপ কামান, সৌম্যমূর্ত্তি, গায়ে একখানি উড়ানী, গলায় মোটা রুদ্রাক্ষ মালা, একটী যুবককে সঙ্গে লইয়া, কোথাও যদি উঠিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে-করিতে আমাদের কামরার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এক-আধ-জনকে স্থান দেওয়া অনায়াসেই যাইতে পারিত। কিন্তু অধিকাংশ যাত্রীই তাহাতেও রাজী নহেন। কাজেই বৃদ্ধের আবেদনের কোন ফল ফলিল না। বৃদ্ধ শুধু হাত তুলিয়া, "আচ্ছা বাবা, বেশ, তোমরাই যাও, আমি না হয় যাব না।" বলিয়া, একটু হাসিয়া, আস্তে-আস্তে চলিয়া গেলেন।

আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাহাকে ডাকিয়া আমার জায়গায় বসাইয়া, আমি নিজে দাঁড়াইয়া থাকি। কিন্তু সাহসে কুলাইল না; হয় ত সে ক্ষেত্রে আমাকেও নামিয়া যাইতে হইত।

গাড়ী ছাড়িবার আর দুই মিনিট আছে, এমন সময়ে দেখি, ৫।৬ জন গাড়ী হইতে নামিয়া যাইতেছেন। আমি একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায়, একজন তাঁহার দন্তপংক্তি বিকশিত করিয়া বলিলেন—"নইলে কি আর মহাশয়কে জায়গা দেওয়া যেতো।" ইহাদিগকে ট্রাম ভাড়া দিয়া ও প্লাটফরম টিকিট কিনিয়া দিয়া, জায়গা দখল রাখিবার জন্য আনা হইয়াছিল। ট্রেণ ছাড়ে-ছাড়ে এমন সময় একটি বাবু ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীর দুয়ার খুলিবার চেষ্টা করিল। সহযাত্রীরা আপত্তি করিলেন—উঠিতে দিবেন না। কিন্তু বাবু অনুনয় করিয়া বলিল—"আমাকে কোন রকমে যেতেই হবে। কাল আমার কাজে জয়েনিং ডেট; না গেলে চাকুরি থাকিবে না।" সহযাত্রীরা দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইলেন।

তাহার পর কিছুক্ষণ নানা রকম গল্পগুজব, জার্ম্মাণ যুদ্ধ, সমাজ-নীতি, রাজ-নীতি, ইত্যাদির আলোচনার মধ্যে গাড়ী বর্দ্ধমানে আসিয়া থামিল। এখানে একজন ভদ্রলোক উঠিবার চেষ্টা করিবামাত্র, সহযাত্রীরা বলিলেন, এখানে স্থান নাই। তিনি বলিলেন—আচ্ছা, খুলুন তো; জায়গা হয় কি না দেখা যাবে।

চাবি বন্ধ—আচ্ছা, চাবি আমার কাছে আছে—বলিয়া তিনি খুলিতে উদ্যত হইলেন। ইহাতে একজন দরজায় পিঠ দিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক বল-প্রয়োগে দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার গায়ে সাদা পাঞ্জাবী, চোখে চশমা, দেহখানি বেশ দৃঢ়, সুপুরুষ। গম্ভীর ভাবে বলিলেন, এই তো যথেষ্ট জায়গা আছে,—কেন অনর্থক মারামারি বাধাচ্ছিলেন। আপনাদের যেমন যাওয়ার দরকার, অপরেরও তেমনি। আপনারা সেটা মোটেই ভেবে দেখেন না। আগে উঠে বসতে পারলেই ভাবেন যে, গাড়ীটা আপনাদেরই সম্পত্তি, পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ-দখল করবেন। কিন্তু নামবার সময় যে উইল করে যেতে ভুলে যান, এইটে যা দুঃখ। কোথায় যাবেন আপনারা? একজন উত্তর করিলেন—দেওঘরে। আপনি? মধুপুর।

আমি বসিয়া দেখিতেছিলাম, পথে এইরূপ মিলিটারী হইতে না পারিলে আর সুবিধা নাই।

সহযাত্রীরা অনেকেই শুইয়া পড়িলেন; আমি বসিয়া ঝিমাইতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে দেখি, সকলেই ব্যস্ত-সমস্ত। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাঁহারা জেসিডিতে নামিয়া যাইতেছেন। গাড়ী প্রায় খালি হইয়া গেল। একটী বাঙ্কে উঠিয়া নিদ্রা দিতে লাগিলাম।

ভোরে উঠিয়া দেখি, গাড়ী মোকামা-ঘাট আসিয়াছে। যাত্রী তখন তিন বা চারিজন মাত্র। যাহার চাকরি যাইবার ভয় ছিল, তিনি একজন। এমন সময় ওপার হইতে ষ্টীমার আসিল ও অনেক যাত্রী আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। একটী মুসলমান যুবক আমার নিকটে আসিয়া বসিলেন। তিনি আলিগড় কলেজের ছাত্র। অনেকক্ষণ তাঁহার সহিত আলাপ হইল। কোন কোন ষ্টেসনে চক্ষুর তৃপ্তিকর নানা প্রকার জলখাবার বিক্রয় হইতেছিল,—দানাপুরে তাহার কিছু সদ্ব্যবহার করা গেল। বেলা ১০টার সময় আরায় নামিয়া, সিভিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় গিয়া উঠিলাম। এখানে আরা হাউস প্রসিদ্ধ। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এখানকার মুষ্টিমেয় ইংরাজ অধিবাসিগণ এই গৃহে বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। এখানে বিদ্রোহীদের নায়ক ছিলেন, জগদীশপুরের জমিদার কুমার সিং। আরার হাসপাতাল ছিল তাঁহার হস্তী ও অশ্বশালা; আর জেলখানা তাঁহার নাচ-ঘর। দানাপুর হইতে ফৌজ আসিয়া আরা হাউসে অবরুদ্ধ ইংরাজগণের উদ্ধার সাধন করে। গৃহটী সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। তাহার স্থানে-স্থানে গোলার দাগ এখনও বর্ত্তমান।

অরণ্য কালী বা আরা দেবীর নাম হইতে না কি আরা সহরের নাম। দেবালয়টী অন্ধকারময়, সহরের বাহিরে এক স্থানে অবস্থিত। বেহারী পাণ্ডা ঠাকুরগণ কপালে সিন্দুর মাখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; যেমন জোয়ান, তেমনি ভীষণ-দর্শন। ছাগ-বলির এখানে যথেষ্ট আয়োজন। একজন পাণ্ডা বলিলেন, একচক্রা নগরী ইহার অনতিদূরেই ছিল; এবং আরা নামের সহিত তাহার যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। আর একজন বলিলেন, কর্ণ তাঁহার পুত্রকে—এই দেবালয় যেখানে অবস্থিত, সেখানে আড়া-আড়ি ভাবে চিরিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম 'আরা'; আর দাতা-কর্ণের এই বিস্ময়কর দানের

স্মরণার্থ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। এখানে জৈনদের কয়েকটী দেবালয় আছে। একটী দেবালয়ের পুষ্করিণীর মধ্যে একটী মন্দির আছে; তীর হইতে সেতুর সাহায্যে তথায় যাইতে হয়। এক স্থানে একটী কৃত্রিম পরেশনাথ পাহাড় আছে। উপরিতলে স্থানে স্থানে ইহাদের তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি ও পাঠাগার। এখানে জৈন ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও বহু পুরাতন হস্তলিখিত কীটদষ্ট পুঁথি আছে; এবং নানা ভাষায় ইহাদের মুদ্রিত অষ্টাদশ স্বপ্ন তালিকা রক্ষিত আছে।

কাশী-নরেশ

পরদিন প্রত্যুষে পাঞ্জাব মেলের একটী কামরায় উঠিয়া কাশী-যাত্রা!

মোগলসরাইয়ে গাড়ী বদল করিলাম। একটু পরেই গাড়ী গঙ্গার পুলের উপর দিয়া কাশী (রাজঘাট) ষ্টেসনে পৌঁছিল। পুলের ওধার হইতে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গার ধারে-ধারে যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর কোথাও সারি-সারি অসংখ্য সোপান-শ্রেণী, অগণিত দেবালয়-চূড়া ও দ্বিতল, ত্রিতল, চৌতল ভবন রহিয়াছে। এই মনোমোহন দৃশ্য অতৃপ্ত-নয়নে দেখিলাম।

পূজার তিনদিন বেশ আনন্দে কাটিল। কর্ম্মক্লান্ত দেহে এবং হাড়ে যেন একটু বাতাস লাগিল। বিজয়া দশমীর দিন বিকালে বিসর্জ্জনের জন্য প্রায় সমস্ত প্রতিমা দশাশ্বমেধ-ঘাটে আনীত হয়। তথাকার দৃশ্য অপূর্ব্ব,—একবার দেখিলে সারা জীবনে ভুলিতে পারা যায় না। শত-শত বালক, বৃদ্ধ, যুবা, দশাশ্বমেধ ঘাট ও তৎসংলগ্ন ঘাটগুলিতে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া আছে; সমস্ত সহর উজাড় হইয়া একত্র সমবেত হইয়াছে। শিশুগণের লোভনীয় নানাবিধ বিক্রেয় বস্তুর মেলা বসিয়াছে। অনেকে 'ভাসান' দেখিবার জন্য নৌকারও আশ্রয় লইয়াছেন। আর গঙ্গাতীরবর্ত্তী অট্টালিকাসমূহের ছাদ ও বাতায়নে অসংখ্য বালক বালিকা, বৃদ্ধা, যুবতীর সমাবেশ। কালিদাসের 'কুবলয়িত গবাক্ষাং "লোচনৈরঙ্গনানাম" বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য সপ্রমাণ করিতেছে। সকলেরই মনে সেই সন্ধিক্ষণে উল্লাস ও বিষাদের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। ভোগের পর ত্যাগ, জীবনের অন্তে
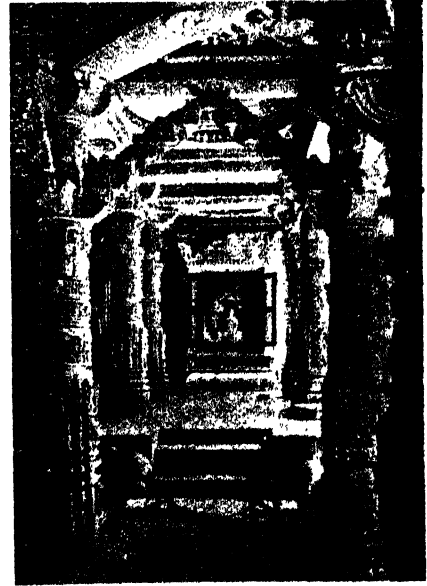
বৌদ্ধ-মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ—সারনাথ

মরণ, প্রবৃত্তির অবসানে নিবৃত্তি,—বিজয়া ব্যাপার যেন এই মহাসত্য শিক্ষা দিতেছে। মাটীর দেহের ন্যায় মৃন্ময়ী প্রতিমার বিসর্জ্জন হইতেছে,—সকলেই দৃশ্য দর্শনে ও গঙ্গা-স্পর্শনে উৎসুক। দূরে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা, শিব ও শক্তি

বিরাজমান। আর অদূরে জীবনের পরিণতি জ্ঞাপক মণি-কর্ণিকার শ্মশানঘাট।

আমরাও একখানি নৌকা লইয়াছিলাম। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে নৌকা হইতে কাশীর দৃশ্য অতুলনীয়। ঘাটের গঙ্গাগর্ভ হইতে উত্থিত হইতেছে এরূপ সুরম্য অত্যুচ্চ অট্টালিকাসমূহ, অসংখ্য পাষাণ-সোপান-শ্রেণী, আর পুরীর পাশ দিয়া বাঁকিয়া ভাগীরথী কুল-কুল রবে বহিতেছেন। এ সমস্তই কাশীর দৃশ্যকে লোভনীয় করিয়া

স্বর্ণ-মন্দির—কাশী

দুর্গা বাড়ী

তুলিয়াছে। কিন্তু এই মনোলোভা পুরী-শোভা দেখিয়াই ত মনে এমন সুখের ফোয়ারা খেলার কথা নহে; আরও ত অনেক দেশে অনেক সুন্দর সহর, সুরম্য হর্ম্ম্য, 'পুণ্য-বতী স্রোতস্বতী' রহিয়াছে; কৈ—আর কোথাও ত মনে এরূপ ভাবের উদয় হয় না।

বিশ্বনাথের মন্দির

কুলে-কুলে জল। সেই জলে অর্দ্ধ প্রোথিত প্রস্তর-মন্দিরের চাতাল হইতেও এই রমণীয় দৃশ্য প্রাণ ভরিয়া দেখিয়াছি। জ্যোৎস্না-রাত্রে গঙ্গাবক্ষে বিচরণশীল নৌকা হইতেও এই দৃশ্য নয়নগোচর হইয়াছে। কাশী প্রবেশ-কালে এই দৃশ্য প্রাণ-মন অধিকার করে, এবং ইহারই প্রভাবেই সমস্ত মধুময় হইয়া উঠে; অগণিত মন্দির-চূড়া, পাথরের 'দ্বিতল, ত্রিতল, চৌতল ভবন', ভিত্তি-গাত্রে বিচিত্র চিত্রাবলী, গোটা-পাথর মোড়া গলি রাস্তা, কোথাও উচ্চ, কোথাও নিম্ন; গঙ্গাতটে যেন

"তাই মনে হয়, বৈদিক পুরাণ-বর্ণিত রাজা প্রভৃতি প্রাচীন কালের মহাপুরুষগণ হইতে আরম্ভ করিয়া এই ঘোর কলিকালে ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ স্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণ পর্য্যন্ত যে সকল সিদ্ধপুরুষ এই

পবিত্র পুরীতে বিচরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের চরণ-রজঃ বারাণসীর প্রত্যেক ধূলিকণায় অণুতে-অণুতে মিশ্রিত রহিয়াছে; সেই চরণ-রেণুর স্পর্শে আমাদের হৃদয় মন বিমল শান্তিতে ভরিয়া যায়, প্রাণে কেমন একটা বৈরাগ্যের ভাব আসে, পুণ্য-ভূমি ছাড়িতে চোখে জল আসে, প্রাণে বেদনা

সারনাথের ধ্বংসাবশেষ

বোধ হয়, হৃদয়ে শূন্যতার অনুভব হয়। আমরা স্থূল দৃষ্টিতে বুঝিয়া উঠিতে পারি না, কেন এমন হয়।"

ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন—

"What Rome is to the Roman-Catholic or Mecca is to the Mohammadans, that or more is Benares to the Hindus. It is the most Sacred City of Hinduism the stronghold of Brahmanism, the seat of Sanskrit learning and the home of Indian Philosophy."

পেশোয়ার হউক। তাঁহার নিকট মিরাটের দুর্গোৎসবের গল্প শুনিলাম। যথেষ্ট ধূমধাম। ষ্টেসনে বাঙ্গালী ভলেণ্টিয়ার ছিল, বাঙ্গালী যাত্রী দেখিলেই তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া সম্ভবপর হইলে যত্ন করিয়া নামাইয়া লইয়া যাইবার জন্য। ইহা সত্য কি না জানি না, তবে কাশীতে বসিয়া মিরাটের পূজার জিলিপী খাইয়া আসিয়াছি, তাহা বেশ মনে আছে!

গ্রাণ্ডকর্ড লাইনে মোগল সরাইয়ের পরই উল্লেখযোগ্য স্থান,—পাঠান সম্রাট্ শেরশার সমাধি বা শেষ আরাম—"সাসারাম" ট্রেণ হইতে উহা বেশ সুন্দর দেখায়। তার পর প্রায় আড়াই মাইল ব্যাপী শোণ ব্রীজ; —এত দিন ইহারই ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ সেতু বলিয়া খ্যাতি ছিল। এখন দীর্ঘতম "সারা ব্রীজ" ইহাকে পরাস্ত করিয়াছে। কলিকাতার বাবুরা অনেকেই

চেৎ সিংহের প্রাসাদ—কাশী

এইবার ফিরিবার পালা। মোগলসরাইতে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক সাগ্রহে বসিবার স্থান এবং রাত্রিতে নিদ্রারও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ইনিও কলিকাতা হইতে বাহির হইয়াছেন পূজার ছুটীতে, এবং গিয়াছিলেন দিল্লী পর্য্যন্ত। প্রবাসে ইনি অনেক কাল কাটাইয়াছেন। স্বদেশী বাঙ্গালী ও প্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে পার্থক্য অনেক। যেখানে বাঙ্গালী সেই-খানেই দুর্গোৎসব,—তা মেসোপটেমিয়াই হউক বা পারস্য

তীর্থদর্শন—ফোয়ারা।

বোতল বা সোরাইতে শোণের জল পুরিয়া লইলেন। একজন বেহারী ভদ্রলোকের সহিত জনৈক বাঙ্গালী যুবক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে ঘোর তর্ক করিয়াছিলেন। বেহারী ভদ্রলোকটী স্বপক্ষে, ও বাঙ্গালী বাবু বিপক্ষে যুক্তি-তর্ক দেখাইতে লাগিলেন। প্রথমটী উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট; এবং বলিলেন যে, তিনি proud of being a student of that University। প্রতিবাদীও নিজেকে তথাকার গ্রাজুয়েট বলিয়া পরিচয় দিলেন; কিন্তু তাঁহার

হিন্দুকলেজের একাংশ

স্বামী ভাস্করানন্দের সমাধি ভবন

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ
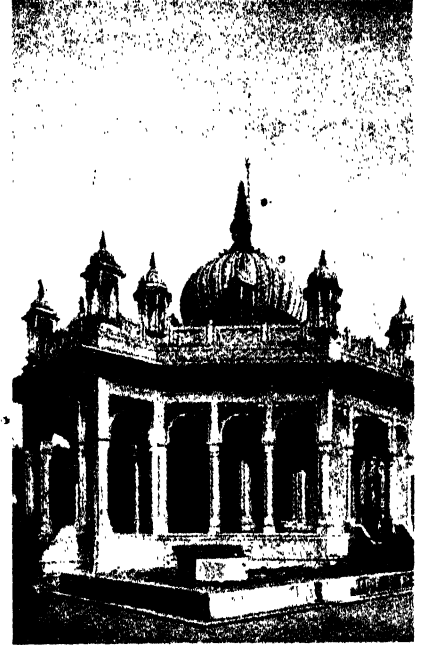
কুইন্‌স্ কলেজ

শেষোক্ত মত মোটেই সমর্থন করিতে রাজী নহেন,—বরং নিজেকে unfortunate বলিতে ইচ্ছুক। কোন্ পক্ষের জিৎ হইল জানি না; তবে সেই বাঙ্গালী ভদ্রলোকটীকে কিছু দিন পরে ক্লাইব ষ্ট্রীটের সওদাগর আফিসগুলিতে চাকুরীর উমেদারী করিতে দেখিয়াছি।

শোণ-ইষ্টব্যাঙ্ক ষ্টেসন হইতে কয়েকজন ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠিলেন। উঠিয়াই তাঁহাদের মধ্যে একজন হারমোনিয়ম্ সহযোগে গাইতে আরম্ভ করিলেন, "জীবনে মরণে জনমে জনমে তোমারে কেন গো পাই না।" গাড়ী ছাড়িয়া দিল; কিন্তু গানটী অনেকক্ষণ চলিল এবং জ্যোৎস্না রাত্রিতে চলন্ত গাড়ীতে তাহা বেশ মিঠা লাগিতেছিল। যদিও গানটী অনেকবার শুনিয়াছি, তথাপি যেন তাহা এখনও কাণের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গয়াতে তাঁহারা দলবল সহ নামিয়া যাইবার সময়, এরূপ

ঠেলাঠেলি মারামারির অভিনয় করিয়া গেলেন যে, গানের মধুরতা ও কোমলতার পর কঠোরতাটুকু একটু যেন কেমনভাবে ফুটিয়া উঠিল,—যেন তাঁহারা কত ব্যস্ত, কত অত্যাবশ্যক জরুরী কাজে তাঁহাদের পথ আটকাইয়া রহিয়াছে। অসহিষ্ণু গেটক রাজ তাঁহাদের অপেক্ষা করিতেছিল কি না জানি না। তবে শুনিলাম, তাঁহারা, অন্ততঃ গায়ক ভদ্রলোকটী এখানকার কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আত্মীয়।

এই প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ তীর্থ এবং অন্তঃসলিলা পবিত্রা ফল্গু নদীর পর একে একে তিনটা টানেল অতিক্রম করিয়া, গাড়ী রাত্রিতে গোমোয় পৌঁছিল। এখান হইতে পরেশনাথ পাহাড়ের দৃশ্য মনোহর। পরেশনাথ জৈনদের অন্যতম প্রধান তীর্থ। পাহাড়টীর উচ্চতা যথেষ্ট; প্রায় ৪৪৭৯ ফীট; এবং এই শৈলশৃঙ্গে প্রায় ২৪টা জৈনমন্দির বিভিন্ন তীর্থঙ্করগণের নির্ব্বাণ উপলক্ষ করিয়া বিদ্যমান।

তার পর নিশিশেষে বর্দ্ধমান। শুষ্ক ঝরাফলের ডালির মত বাসি মিহিদানা লইবার বিশেষ আগ্রহ হইল না। যথা সময়ে হাওড়ায় আগমন। —তারপর সেই খাড়া বড়ি থোড়, আর থোড় বড়ি খাড়া!

সোণার কাঠি

[শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু বি-এস্ সি

(১)

বি এ পরীক্ষার পর, নূতন ফাগুনে, হঠাৎ একদিন আকাশ ছাওয়া জোছনার পানে তাকাইয়া, তরুণ তার অন্তরের মাঝে একটা নূতনতর আবেশের সাড়া পাইল। যে অন্তরটা এতদিন পুঁথির কারা-প্রাচীরে বন্দী থাকিয়া, প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য হইতে বঞ্চিত ছিল, তাহা সহসা কারামুক্ত কয়েদীর মত উপরের উদার আকাশ, ও নবপুষ্প মুকুলিত শ্যামবিটপীর রূপের পানে চাহিয়া, বিস্ময়ে পুলকিত হইয়া উঠিল। ঘনপল্লবের ফাঁকে পাগল বাতাসের আনাগোনার শব্দ ও পাখীর অস্ফুট কলতান তার মর্ম্মের মাঝে যেন কত যুগান্তের হারানো কথা বহিয়া আনিল।.....

সামনে কর্ম্মহীন, দীর্ঘ অলস দিন;—মুক্তির আরামে প্রাণ এমনি আবেশ-বিভোর; তায় সহসা চাঁদের সহিত প্রকৃতির সহিত নবীন ভাবে পরিচিত হওয়ায়, তার চারিপাশে যেন ভাবের মন্থন লাগিয়া গেল। সমস্ত প্রকৃতিটাকে সে নিবিড় ভাবে বুকের কাছে টানিতে চাহিল।......

কাব্য যে সে ভালবাসিত না, তা নয়; কিন্তু পরীক্ষা পাশের ধাঁধাঁয় পড়িয়া, কাব্যের আদত প্রাণটির সন্ধান সে পায় নাই। আজ অবাধ, মুক্ত অন্তরটি লইয়া বাতাসের মাতামাতি, পাখীর কাকলী ও আলোকের স্নেহালিঙ্গনের মাঝে দাঁড়াইয়া সে জীবনে প্রথম অনুভব করিল, কাব্যের প্রাণ কোথায় লুকান।......দেখিয়া তাহার সারা অন্তর শিশুর মত উদ্দাম আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তরুণ বুঝিল, প্রকৃতির নবশ্যাম রূপ কবি-কল্পনার জীবন্ত মূর্ত্তি; এবং ইহারই অভিনন্দনে কবির মূক অন্তরটি মুখর করিয়া তোলে, —নির্ব্বাচিত শব্দ সম্পদে সীমাহারাকে সীমার গণ্ডীতে টানিয়া আনে।......

দীর্ঘ অলস দিনগুলি কাব্যালোচনা ও প্রকৃতি-বন্দনায় কাটাইয়া, অল্প সময়ের ভিতর তরুণ কবি-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল; এবং অচিরে কল্পনার নীল-সায়রে সাঁতার দিয়া ছায়ালোকময় ভাবের বাস্তা আহরণ করিয়া খাতার পাতা ভরিয়া তুলিল। যথাসময়ে তাহার দু'একটি মাসিক পত্রে ছাপাইয়া, নিজেকে তরুণ কবিজ্ঞানে সে মনে মনে যথেষ্ট উৎফুল্ল হইয়া উঠিল;—অবশ্য বৌদি লতিকাই ছিল তাহার প্রধান উৎসাহদাত্রী।

এমনি সময়ে বৌদির সহিত তার পিত্রালয় পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামটিতে দিনকয়েকের জন্য বেড়াইবার প্রস্তাবটা তরুণের মন্দ লাগিল না; কারণ শ্যামতটশালিনী তটিনী-বেষ্টিতা পাড়াগাঁটি আর যাই হউক, তাদের টালীগঞ্জের বাড়ীটির চেয়ে ঢের বেশী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-সম্পন্না।

যথাসময়ে কবির অত্যাবশ্যক সরঞ্জামে সজ্জিত হইয়া,

তরুণ সেই অচিন্ কল্পলোকের পানে চলিল। তাহার অসম্ভব উচ্ছ্বাস দেখিয়া লতিকা হাসিয়া বলিল, "দেখো ভাই, প্রাণটি আমাদের এঁদো পুকুরপারের গাব গাছটায় রেখে এসো না।"

উৎফুল্ল তরুণ বলিল, "কেন, এঁদো পুকুর, আর গাব গাছ ছাড়া কিছু কি নেই তোমাদের দেশে ?"

লতিকা বলিল, "আছে সবই ; তবে শেওলা-পড়া, পদ্ম-ফোটা এঁদো পুকুর, গুপ্ত তার হুতুম পেচার শব্দমুখর গাব গাছ যদি-বা কবি দেওরটির প্রাণের পর্দা নেড়ে দেয়। কবির ইন্দ্রিয়গুলো ত স্বতন্ত্র ধরণের।"......

কবি অভিনন্দনটি তরুণের বড় ভাল লাগিল। সে খুসী হইয়া বলিল, "সত্যি বৌদি, কবিরা অদ্ভুত ধাঁচের। নিবিড় বন কান্তারের ভাষাহীন আলাপনের ভেতরই যেন তারা প্রকৃত প্রাণের খোঁজ পায়। আচ্ছা, তোমাদের দেশটি প্রকৃতির লীলাকুঞ্জ নয় ? ভোরে চক্রবালরেখায় সূর্য্য উঠে, সোণার ধারায় নদীর জল, শ্যামল বনানী ভাসিয়ে দেয়,—পাপিয়া, দয়েল, ভৃঙ্গ বনে-বনে গেয়ে ওঠে,—গন্ধ-বিধুর বাতাসের মৃদু নিশ্বাসে ধানের ওপর ঢেউ খেলে যায়,—আর প্রাণের তন্ত্রীতে একটা অনাহত সুর জেগে ওঠে,—নিশ্চয়ই এই রকম।"

লতিকা মৃদু হাসিয়া বলিল, "অত শত বুঝ্বার, দেখ্বার ক্ষমতা থাকলে, কবে তোমার মত কবি হ'য়ে উঠ্তাম। শুধু এটুকু বুঝি,—হাঁ, এখানে দালানের ঘেঁসাঘেঁসি, গাড়ী মোটরের হুড়োহুড়ি, আর মানুষের ঠেসাঠেসিতে প্রাণ যেমন হাঁপিয়ে উঠে, ওখানে তেমন নয়। ওখানকার চারধারের আকাশ বনানী, নদী-প্রান্তরের চিরনবীন দৃশ্যে প্রাণে একটা ভরাট করা পুলক জাগে।......তোমার বেশ ভাল লাগ্বার কথা।"

তরুণ চক্ষু বুজিয়া অচিন্ দেশটি সম্বন্ধে কত কি কল্পনা করিয়া লইল।......ষ্টীমারে সেকেণ্ড ক্লাশ ক্যাবিনের খোলা জানালার ধারে বসিয়া, বিস্তৃত-সলিলা পদ্মার তরুঘেরা তীরের শোভা দেখিয়া, আত্মহারা তরুণ লতিকাকে অজস্র প্রশ্নবৃষ্টিতে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সসীম জ্ঞান লইয়া তরুণের বিপুল আগ্রহ দমনে অপারগ লতিকার অক্ষমতার ভিতরও হাসি পাইল—দেবরটির শিশুর মত অর্থহীন প্রশ্নবৃষ্টিতে। বাস্তবিক, সহুরে লোকগুলি চিরদিন নিজেদের সহরের গণ্ডীর ভিতর বন্দী রাখিয়া জ্ঞানের সীমারেখাও কেমন টানিয়া রাখে ; তাই ধান গাছে জন্মে না লতায় ধরে—বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চউপাধি লাভের পরও তাদের তাহা বলিয়া দিতে হয় !

ওপারের ঐ গাছটার কি নাম, লতা না ফুলের, কখন তাতে কুঁড়ি ধরে, ফুল ফোটে,—ঐ পাখীটা 'চোক গেল' না 'বৌ কথা কও', কোথায় থাকে, কখন আসে,—রাখাল বালকের ঐ মেঠো সুর গোষ্ঠ না ভাটিয়াল, কোন্ পল্লী-কবির রচনা, পারের ঐ ভগ্ন দেবালয় কোন্ যুগে কার প্রতিষ্ঠিত, ইত্যাদি বহু প্রশ্নের সাধ্যমত সমাধানে ক্লান্ত লতিকা যখন তন্দ্রাবিষ্ট হইল, তরুণ তখন চারিপাশের সৌন্দর্য্যমেখলার চিত্রাঙ্কনে নিবিষ্ট হইল। সৌভাগ্যক্রমে ক্যাবিনে তৃতীয় আরোহী কেউ ছিল না,—তাই তরুণ কবিটি আশা মিটাইয়া তার সীমাহারা কল্পনা রঙ্গের ছোপে ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল।

লতিকা জাগিয়া দেখিল, ইতিমধ্যে তরুণ নূতন খাতাটি ভরিয়া তুলিয়াছে ! অবাক্ হইয়া বলিল, "সেই অবধি ক্রমাগত লিখ্চ ! অদ্ভুত নেশা ত। চারপাশের থৈ থৈ জল, রোদে-পোড়া মাঠ, আর গাছের সারের ভেতর কি যে তোমরা দেখ ঠাকুরপো, খুঁজে পাই না। ওতে কি পেটও ভরে ? আমায় ডাকনি কেন ?"

তরুণ তখন নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল ; গদগদস্বরে বলিল, "অন্তর যেখানে আহার পায় বৌদি, বাইরের ক্ষুধা সেখানে মাথা উঠাতে পারে না। কবিরা বায়ুভুক।"

"সে বুঝা যেত সঙ্গে খাবার না থাক্‌লে," বলিয়া লতিকা আহার্য্যের আয়োজনে উঠিয়া পড়িল।

তরুণ বলিল, "আহার ত চিরদিনই আছে বৌদি ; কিন্তু এমন দৃশ্য ত চিরদিন মিলে না। শোন একবার বর্ণনাটা।"

ব্রাকেটে ঝুলান ছোট ঘড়িটায় চোখ বুলাইয়া লতিকা বলিল, "বরং আমার কাছে সঙ্গের খাবারের বিস্তারিত বর্ণনা শুনে তুমি হৃষ্টমনে স্নানে যাও। বেলা দেড়টায় তেমন রসজ্ঞ ব্যক্তিও কাব্যের রসগ্রহণে অক্ষম।" বলিয়া বাক্স খুলিয়া সাবান, তৈল, তোয়ালে বাহির করিয়া দিল।

হতাশ ভাবে লতিকার পানে তাকাইয়া, স্নানের ঘরে যাইতে-যাইতে তরুণ বলিল, "অরসিকেষু রস কথনং শিরসি মা লিখ।"

নাস্‌পাতির খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে লতিকা মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, "গন্তব্য স্থানে পৌছে রসজ্ঞ লোকের সন্ধান

দোব'খন। এখুনি এতগুলো দীর্ঘশ্বাসের বাজে-খরচ কর্ব্বার প্রয়োজন নেই।"

(২)

তরুণ মুগ্ধ হইল। গ্রামটি বেষ্টন করিয়া ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীটি সর্পশিশুর মতই আঁকিয়া-বাঁকিয়া স্বচ্ছন্দ-প্রবাহে চলিয়াছে। তীরে আম্রবন, ছায়াবহুল বট ও অশ্বত্থের সারি। কোথাও বেতের ঝাড়, বাঁশের ঝোপ, ঘেঁটুফুল, কালকাসন্দার বন, কোথাও শিউলি বকুল গাছ ভরিয়া, কোথাও মাধবীলতা সহকার তরুটিকে জড়াইয়া। কৃষ্ণচূড়ায় স্তবকে স্তবকে লাল, বেগুনি, হলদে রংএর ফুল, ভোমরার দল গুন্‌গুন্ করিয়া এ ফুলে ও-ফুলে মধুপান-মত্ত,—জামরুল, আতা, গোলাপজাম গাছে পাখীর মহোৎসব; ঝিঁঝির ঐকতান বাদন, ঘুঘুর উদাস কণ্ঠ।

এ সব দেখিতে এবং এ সবের সহিত পরিচিত হইতে যাইয়া, পল্লীবাসীদের সঙ্গে পরিচয় করিবার কথা তরুণ ভুলিয়াই গেল।...সহুরে মানুষ, বনাকীর্ণ পাড়াগাঁয়ে আসিয়া হয় ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে, এবং পল্লী জীবনের অসংস্কৃত, অপরিচ্ছন্ন রুচি সম্বন্ধে বিশ্রী ধারণা লইয়া ফিরিবে, —এ ভয় যে লতিকার ছিল না তাহা নয়; কিন্তু দরিদ্র গৃহস্থের দীন আয়োজনের ভিতর দেবরটির অপরিসীম আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি দেখিয়া সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল; বলিল, "কবি তুমি ঠাকুরপো, তাই কৃত্রিমতার ভেতর দিয়ে তোমার অভ্যর্থনার আয়োজন হয় নি। পল্লীবাসীর স্বাভাবিক যা তাই তুমি পাচ্ছ,—অসুবিধা হয় ত' বলো।"

তরুণ হাসিয়া বলিল, "এর বেশী অভ্যর্থনা হলে মরে যাব বৌদি। এমন বুকভরা যত্ন কখনো পাই নি,—তোমরা আমার অনুভব কর্ব্বার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে সচেতন করে তুলেছ। এখানকার আকাশ-বাতাসও আমায় কি ভাবে আবাহন কচ্ছে, আমি বোঝাবার ভাষা পাই না।"

লতিকা তৃপ্ত হইয়া বলিল, "প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্য, বাইরের সমস্ত দীনতার কালিমা ছাপিয়ে, তোমার কাছে রঙ্গিন্ হয়ে উঠ্‌বে জেনেই, সাহস করে তোমায় এখানে এনেছি ঠাকুরপো,—নৈলে আমাদের সাধ্য কি যে—"

বাধা দিয়া তরুণ বলিল, "আমি কি পর বৌদি, যে, শিষ্টাচারটাই বড় করে দাঁড় করাবে! ভগবান্ পল্লীবাসীদের যে ঐশ্বর্য্য দুহাতে বিলিয়ে দিয়েছেন, তার তুলনায় সহুরেরা যে নিতান্তই কাঙ্গাল। বুকভরা প্রীতি, ফুলভরা মধু, গাছভরা ফল, ক্ষেতভরা ফসল—কোথায় এমনটি আছে?" বলিয়া কবির সেই গানটির আবৃত্তি করিল।

লতিকা সাহ্লাদে বলিল, "এত ভাল লেগেছে তোমার?"

তরুণ গদ্গদস্বরে বলিল, "আমার ইচ্ছা হচ্ছে, এ অনন্ত সৌন্দর্য্যের মাঝে চিরদিনের জন্য ডুবে যেতে।......তোমায় হিংসা হচ্ছে বৌদি, কি সুন্দর তোমাদের দেশ!"

কল্পনার এইরূপ মালা গাথার ভিতর প্রবাসের দিনগুলি তরুণের বড়ই উপভোগ্য হইয়াছিল।......

কবি-যশঃ-প্রয়াসী দেবরটির দুর্ব্বলতা লতিকার কাছে গোপন ছিল না; তাই তাহার প্রবাসের দিনগুলি অধিকতর রঙ্গিন্ করিবার জন্য সে নিজেকে তরুণের অন্ধ উপাসকের পদে বৃত করিল; এবং সেই পদমর্য্যাদা অটুট রাখিবার জন্য, দিনের অনেকটা সময় তাহাকে তরুণের নবরচিত কবিতার সমালোচনা করিতে হইত, যাহা স্তুতিবাদেরই রূপান্তর। তরুণ কিন্তু এইরূপ সমালোচনা হৃষ্টমনে গ্রহণ করিত।.....

সেদিন ক্ষুদ্র এক পস্‌লা বৃষ্টির পর বৈকালিক কিরণের গোটাকতক রশ্মি মেঘের ক্ষুদ্র কণায় প্রতিফলিত হইয়া সুনীল আকাশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সপ্তবর্ণ রঞ্জিত সুবঙ্কিম ইন্দ্রধনুটি ফুটাইয়া তুলিলে তরুণ সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য কবিতায় ফুটাইয়া লতিকাকে শুনাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

লতিকা তখন কক্ষান্তরে পাড়ার সমবয়সী কণিকা, সন্ধ্যা, বিন্দু প্রভৃতির কাছে তাহার স্বামিপ্রেমের গোপন কাহিনীটুকু কহিতেছিল, এবং তরুণীরাও তাহা রসের ছোপে ছোপাইয়া তুলিতেছিল। কণিকা ও সন্ধ্যা অবিবাহিতা, বাদলের বন্যায় এই নিছক প্রেমকাহিনীটুকু তাহারা কি ভাবে গ্রহণ করিতেছিল তাহা বলা যায় না, কিন্তু নবোঢ়া তরুণীর দল বেশ একটু সরস বোধ করিতেছিল। স্কুলের অবাধ মুক্ত জীবন হইতে বঞ্চিত হইয়াও স্বামীর নৈশ-বিদ্যালয়ে তাহার ক্ষতির চেয়ে লাভের মাত্রাই বেশী হইয়াছে, এই কথাটি লতিকা যখন ঈষৎ গর্ব্বের সহিত জানাইল, তখন কণিকা হাসিয়া মাটিতে গড়াইয়া উঠিল। মুক্তপাখী এমন স্বচ্ছন্দ মনে পিঞ্জর—হউক তা সোণার, বরণ করিয়া লইতে পারে, ইহা কণিকার কাছে যেমন অদ্ভুত তেমনি হাস্যকর বোধ হইল। লতিকার

বিবহের পর এই প্রথম সাক্ষাৎ, সে ভাবিয়াছিল স্বাধীন পাঠ্যজীবন হইতে বঞ্চিত হইয়া লতিকা মর্ম্মমরা হইয়া গিয়াছে। নিজের স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়াও জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বনটির কাছে নারীর সমস্ত ক্ষতিপূরণ হইতে পারে, কণিকা কিছুতেই তাহা ধারণা করিতে পারিতে ছিল না।

সারাটি গ্রামে তাহার মত দুর্দ্দান্ত মেয়ে দ্বিতীয় ছিল না। ভগবান্ যেন তাহাকে ছেলে গড়িতে-গড়িতে ভুলিয়া মেয়ে গড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। ছেলে-বয়স হইতেই পাড়ার দুষ্ট ছেলেদের সহিত টক্কর দিয়া, তাহাদের অনুকরণে কাপড় পড়িয়া গোল্লাছুট, হা ডু ডু, ডাংগুটি খেলিয়া, পাখীর ছানা সংগ্রহ ও পড়শীদের ফলমূল আহরণ করিয়াই সে বড় হইয়াছে, এবং বাপ মায়ের সমস্ত শাসন ব্যর্থ করিয়া মানসিক বৃত্তি গুলিও সে রমণীর অনুপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমী অনেকটা দূর হইলেও, মেয়েদের স্বাভাবিক কোমলতা ও ব্রীড়ার অভাব তাহাকে ব্যাপিয়া রহিল। পুরুষ কোনও অংশে নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এবং এক দিন তাহাকেই উপাস্যরূপে বরণ করিতে হইবে, ইহা সে কিছুতেই মানিতে চাহিত না। ইহা লইয়া সঙ্গিনীদের সহিত মাঝে মাঝে তর্কও হইত তুমুল; কিন্তু সে বরাবর বড় গলায় জানাইয়া দিত তাহাদের মত সে কখনো একান্ত আশ্রয় রূপে পুরুষকে অবলম্বন করিবে না,—কিছুতেই না।

হাসি একটু থামিলে কণিকা বলিল, "নিত্য তুই স্বামীর পা টিপে দিস্, আর তৃপ্তিতে তোর বুক ভরে ওঠে,—তুই অবাক্ কর্লি লতি! আরামে তার চোখ বুজে আসাটা বিচিত্র নয়; কিন্তু আমি ভেবে পাই না, ঐ অচেনা পুরুষটার পা টিপে তোর তৃপ্তি হেঃ!"

লতিকা আরক্ত মুখে বলিল, "বিয়ে হলে তুইও বুঝ্বি, কি যে তৃপ্তি। সন্দেশ যে খায় নি, তাকে কেমন করে বুঝান যায়, সন্দেশের কি স্বাদ!"

কণিকা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিল, "আহা-হা কি উপমা! যেন কালিদাস! সন্দেশ খাওয়া আর পা টেপা যদি সমান আরাম হয়, তবে এমন বিনি পয়সার আরাম থেকে এখানেও বঞ্চিত থাকিস কেন,—নে টেপ্, ঐ চামাড়ে পায়ের চেয়ে এই রাঙ্গা পা ঢের ঢের নরম।" বলিয়া নরম পা ছুটি একেবারে লতিকার কোলের উপর তুলিয়া দিল।

লতিকা তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "আহা, রকম দেখে আর বাঁচি নে। তোর পা টিপ্তে গেলাম আর কি।"

কণিকা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "না হয় উপযুক্ত বখশিসও দোবো—ঢের নরম, ঢের মিষ্টি"—বলিয়া বাহু বাড়াইয়া উদ্যত ওষ্ঠে তাহার দিকে আগু হইল।

তরুণীরা রঙ্গ দেখিয়া হাসিয়া গড়াইল। লতিকা ভ্রুকুটি করিয়া কহিল, "তেমনি ছেলেমানুষ আছিস্! বোর্ডিংএ কি করিস্? সেখানে ত যেদো কেলো নেই, ডাংগুটি, পাখীর ছানা পাড়া চলে কি করে?"

কণিকা অবলীলাক্রমে বলিল, "খুব চলে, বেশ চলে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যেদিন না থাকে, সে দিন গাছে উঠি, ডালে দোল খাই, লাফাই, ঝাঁপাই। আর তোরা—বাস্ রে! কেন, ছেলেদের বেলা দোষ নেই যত আমাদের বেলা!" বলিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিল। লতিকা বলিল, "বিয়ে হলে কি কর্বি?"

কণিকা চোখমুখ ঘুরাইয়া বলিল, "আহা রে, বে' করে গেলাম আর কি! পুরুষের বাঁদীগিরি আমার কুষ্টিতে নেই। বাপ্ রে! বাপ্! যে বিবরণ শুনি তোদের মুখে!—পা টেপ, হাওয়া কর, মন যুগিয়ে চল। আবার কথায়-কথায় ফোঁস। না বাপু, আমার ধাতে ওসব সয় না। কিসে ওদের চেয়ে কম শুনি? বিদ্যায়, না বুদ্ধিতে? বেশ আছি, খাই দাই বেড়াই,—আবার হাস্য পেলে হাস্য করি, নৃত্য পেলে নাচি।" বলিয়া নৃত্যের ভঙ্গিমা করিল। সন্ধ্যা এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল; এইবার বলিল, "ওকে আর ঘাঁটাস না লতি,—ও কি বলে, তার না আছে মাথা, না আছে মুণ্ডু। ও একটা সাফ্রেজিষ্ট,—ওর বিলেতে জন্মান উচিত ছিল।"

তাহাদের এইরূপ তর্কের মাঝে সহসা "বৌদি, বৌদি" করিয়া তরুণের আবির্ভাব হইল। কোনও দিকে দৃক্পাত না করিয়া তরুণ একেবারে ইহাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু সহসা নিজেকে তরুণ পল্টনের মাঝে দেখিতে পাইয়া অপ্রতিভ তরুণ পলায়নের খোঁজে বলিয়া ফেলিল, "খাতাটা বৌদি, খাতাটা?"

দুষ্টু কণিকা লতিকাকে টিপিয়া বলিল, "তোর দেওর একেবারে গাভীহারা বৎস যে রে!" তাহাকে ছোট্ট একটি চিমটি কাটিয়া লতিকা বলিল, "বিশ্বের সন্ধানে গিয়ে নিজেকে

হারিয়ে ফেলা কবিদের এক মস্ত রোগ, ঠাকুরপো! বাঁ হাতখানার খানাতল্লাস করেছ ত?"

তরুণ অধিকতর রাঙ্গা হইয়া বলিল, "এখনো নয়,—আর —আর একটা—ঐ যে গো!" সঙ্গে-সঙ্গে অদৃশ্য হইল। তরুণী-মহলে একটা চাপা হাস্যরোল শোনা গেল।

"আবার কবি! ওর বড়টিও কি তোর এমন ন্যাওটা লতি?" বলিয়া দুষ্টু কণিকা হাসিয়া উঠিল। আবার হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। লতিকা তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "ভারি বয়াটে তুই।"

এখনি যাইয়া দেওরটিকে শান্ত না করিলে মানাভিমানের পালা কতদূর গড়াইবে, লতিকার অবিদিত ছিল না। খাতা খোঁজের ছুতায় সে উঠিয়া পড়িল।

(৩)

তরুণের ঘরে যাইয়া লতিকা তাহার তিক্ততার ঝাঁঝ দস্তুর মত অনুভব করিল;—বোঝা গেল, তরুণীদের চপল পরিহাস তাহার শ্রবণ এড়ায় নাই। কিন্তু লতিকা ওষুধ জানিত ভাল; নিরীহ মানুষটির মত তাহার কাছে যাইয়া, কণ্ঠে স্নেহ গলাইয়া কহিল, "বাদলের যে রূপ আছে, এখানে বেশ বোঝা যায়,—নয় ঠাকুরপো? গাছের মাথায় ঝড়ের মাতামাতি, মেঘের আড়ালে বিদ্যুতের লুকোচুরি, বজ্রের ডমুরু নাদ, ইন্দ্রধনুর রূপবিকাশ, আর চারপাশের ভীত পুলকিত ভাবটুকু পরম উপভোগ্য। আজকের ছবিটি তোমার নিপুণ তুলিতে নিশ্চয় ফুটেছে চমৎকার! পড় না ঠাকুরপো!"

তরুণের তিক্ততা পুলকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে হৃষ্টমনে অনেকগুলি কবিতা শুনাইয়া দিল; এবং লতিকা গম্ভীর ভাবে তাহার অজস্র প্রশংসা করিল। কিন্তু দেয়ালের অপর পার্শ্ব হইতে তখন যে রসচুরি আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা টের পাইয়া লতিকার গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা দায় হইল।

সাহিত্য-পথে নবীন পথিক এই তরুণ তখনও বিশ্বের সামনে তার খাতাটি মেলিয়া ধরিবার মত বলীয়ান্ হয় নাই। তা ছাড়া সৃষ্টিছাড়া লজ্জায় এই গুণগ্রাহী বৌদিটি ছাড়া আর সকলের কাছে সে তার কবিতা-শিশুগুলিকে গোপন রাখিতেই চাহিত। ঐ অপরিচিতা তরুণীর দল তার গোপন রসের খানিকটা লুণ্ঠন করিতেছে জানিয়া দেওরটি কিরূপ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িবে, কল্পনায় তাহা ভাবিয়া লইয়া, একটা চাপা হাসি লতিকার কণ্ঠ ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিল; কিন্তু আত্মহারা তরুণের তখন বৌদিটির বৈলক্ষণ্য নজর করিবার মত অবস্থা ছিল না।

বাহিরের গোপন রসচুরি তরুণের গোচরীভূত হইল তখন, যখন কণিকার প্রবল ধাক্কায় বেচারা সন্ধ্যা হুড়মুড় করিয়া প্রায় তরুণের ঘাড়ের উপর উল্টিয়া পড়িল। নিজেকে সাম্‌লাইতে যাইয়া প্রথমটা সন্ধ্যা তরুণের ঘাড় অবলম্বন করিল; এবং পরমুহূর্ত্তে লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে বাহিরে ছুটিয়া পলাইল। বাহিরে উচ্চ হাস্যরোলের ভিতর কণিকার কণ্ঠ শোনা গেল, "খাতা খুঁজতে এসে, কাব্যির গন্ধ পেয়ে আমাদের ভুলে যাওয়া! পেলি না সন্ধ্যা খাতাটা?" সন্ধ্যা কিন্তু সে তল্লাট ছাড়িয়া পেছনের আমবনে লুকাইয়া মনে-মনে গর্জ্জিতেছিল। তরুণ একটু দম লইয়া, ব্যাপারটা আগাগোড়া বুঝিয়া, যথেষ্ট চটিয়াছিল; কিন্তু এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে ত রাগারাগি চলে না! অগত্যা আরক্ত মুখে ঘামিতে লাগিল।

লতিকাও প্রহসনটা বেশ উপভোগ করিতেছিল; কিন্তু ন্যায়তঃ ইহার একটা আশু মীমাংসা করিবার জন্য, কণিকাকে ধরিয়া আনিয়া বলিল, "এ রকম দুষ্টুমী না করে, ঠাকুরপোর সঙ্গে আলাপ কর্ না; দিব্বি রোজ রোজ গল্প-গুজবে ছুটিটা কাট্‌বে ভাল।......এ আমার খুড়তুতো বোন্ ঠাকুরপো, এবার ম্যাট্রিকুলেশন দেবে,—এর সঙ্গে আলাপ পরিচয় কর।"

কিন্তু তরুণ ঘাড়ও তুলিল না, কথাও কহিল না। কণিকার সঙ্কোচের লেশও দেখা গেল না। হাসিয়া বলিল, "উনি বুঝি খালি গাছপালার সঙ্গে কথা কইতেই ভালবাসেন? গাঁয়ে এত বাক্যবীর থাকতে রাজ্যের নির্ব্বাক্ গাছপালা উনি বেছে নিলেন কেন, আমি ভেবে পাই না লতি! ফলে কিন্তু মানুষটি গাছ এবং গাছগুলো মানুষ হয়ে উঠবে বলে দিচ্ছি। কাল সমস্ত গাছগুলো কেটে ফেল্‌তে হবে।" এমন অদ্ভুত কথার পর মৌনী পুরুষেরও যোগভঙ্গ হয়, কিন্তু তরুণের কথা ফুটিল না,—ঘাড়ও সোজা হইল না। কণিকা ভারি কৌতুক বোধ করিল। পুরুষের এই শ্রেণীর লজ্জা তাহার চোখে নূতন। পুরুষকে সে আদৌ লজ্জা করিত না। ট্রেন ও স্কুলের গাড়ীর খোলা জানালায় বসিয়া-বসিয়া মেয়ে-গাড়ীগুলো কেন্দ্রীভূত করিয়া তরলমতি যুবকদের আনাগোনা সে দেখিত। দেখিয়া-দেখিয়া সহিয়া-সহিয়া বিশ্বের

পুরুষজাতটার সম্বন্ধে সে বিশ্রী রকম ধারণা করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাহার সেই অভিজ্ঞতার চিরন্তন ব্যতিক্রম দেখিয়া, বিস্ময়ের সহিত তাহার কৌতুক বোধ হইল যথেষ্ট।

আলাপ করিবার জন্য তাহার জিহ্বায় কণ্ডূয়ন আরম্ভ হইয়াছিল। সে লতিকাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "দিব্বি মানুষের সঙ্গে আলাপ কচ্চে এনেছিস যা হোক। তোর দেওর কবিতায় কথা বলে বুঝি রে? মিল পাচ্ছে না বোধ হয়।"

তরুণ মুহূর্তের জন্য চোখ তুলিয়াই আবার নত করিল। তরুণীর হাস্যোজ্জ্বল মুখে সঙ্কুচিত হইবার মত শিল-মোহর আঁটা ছিল না। তথাপি, অকারণ লজ্জাটা ঠেলিয়া দেওয়াও তাহার দুঃসাধ্য হইল। তখন কণিকা গায়ে পড়িয়া আলাপ সুরু করিয়া দিল,

"কণিকা আমার নাম, বিক্রমপুরেতে ধাম,
বিক্রমেতে সবে কম্পমান;
একটু ডরি না নরে, নরেরা আমায় ডরে, —
মহাশয় তাহার প্রমাণ।"

লতিকা হাসিয়া উঠিল। কণিকা উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিল,

"অর্দ্ধঘণ্টা হয় গত, কবি করি মাথা নত
খুঁজি মরে চরণের মিল,
অকবি হাতের কাছে, যত গদ্য পড়ি আছে
তুলি মারে কবি মাথে ঢিল।"

লতিকা মেঝেয় গড়াইয়া পড়িল। অদ্ভুত রহস্যময়ী তরুণীটির রসের স্রোতে তরুণের লজ্জার বাঁধও যেন ভাঙ্গিয়া গেল। সে নিজের অজ্ঞাতসারেই বলিয়া ফেলিল, "চমৎকার শক্তি ত! মুখে-মুখে তৈরী কল্লেন?"

ঘাড়টি দুলাইয়া কণিকা বলিল, "কাগজ-কলমের বংশ আমার কাছে নেই—চস্‌মার ভেতর দিয়েও কি দেখ্‌ছেন না মশাই? কবিতা আপনার একচেটিয়া নয়। আমরাও লিখ্‌তে জানি; কিন্তু আপনার মত মুখচোরা, কোণ-ঠেসা নই,—আমরা লিখি, আবার অপরকে ডেকে শোনাই। ঝড়ের আগে সমস্ত পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে থাকে। তেমনি মানুষের এই যে মৌন ভাব, এও একটা বিষম ব্যাধির পূর্ব্বলক্ষণ। সে রোগ বিনি-পয়সায় সারালেম তরুণ বাবু,—অন্ততঃ একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।"

তরুণ হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "হাঁ, আমি কৃতজ্ঞ।"

ঘাড়টি একবার এ-পাশে, আবার ও-পাশে দুলাইয়া কণিকা বলিল, "অমন ফাঁকা কৃতজ্ঞতায় কি চলে? অন্ততঃ তা একটা সনেট বা লঘুত্রিপদীতে মূর্ত্ত করুন।...কবিতা ক'টা শোনান না তরুণ বাবু! দূর থেকে কিছুই শুন্‌তে পাই নি।"

তরুণ ঈষৎ রাঙ্গা হইয়া বলিল, "না,—না, কি শুন্‌বেন। ও শোন্‌বার মত নয়। যাচ্ছে-তাই, না,—না" বলিয়া খাতাখানি লুকাইতে চেষ্টা করিল।

কণিকা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "মাসিকে ছাপা হলে হাজার লোকে দেখে, আর আমি মিনতি কচ্ছি কি না। মুখচোরা অসরল মানুষের এই এক রকম।" সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার রাগের রকম দেখিয়া, অমন শক্ত কথার পরও তরুণ রাগিতে পারিল না,—তাহার ভারি আমোদ বোধ হইল। এক-আধটা আলাপের পর মানুষ কি বন্ধুত্বের দাবীতে এমন মান-অভিমান করিতে পারে!

অগত্যা তরুণকে খাতা খুলিয়া বসিতেই হইল; এবং কবিতার ভিতর দিয়া ধীরে-ধীরে তাহার সঙ্কোচের মেঘ কাটিয়া আসিল।..কণিকা তাহার নিত্য-সাথী হইয়া উঠিল।

(৪)

কণিকার সহিত সহজ ভাবে মেলা-মেশা করিয়া তরুণ যেন ধীরে-ধীরে প্রাণের ভিতর একটা নূতন কাব্যের সাড়া পাইল। প্রকৃতির রূপে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া উপভোগ করার চেয়ে, যে জীবন্ত রূপ আশ-পাশে চলা-ফেরা করিয়া অনুক্ষণ প্রতি অঙ্গ হইতে অফুরন্ত ছন্দ বিকীর্ণ করে, তাহা অনুভব করিবার আগ্রহটা তাহার অজ্ঞাতেই সহসা প্রবল হইয়া উঠিল। রক্ত-সন্ধ্যার অস্পষ্ট ছায়ালোকে ও স্নিগ্ধ-সমীর-সেবিত জ্যোৎস্না-প্লাবনের মাঝে তাহার কাব্যমুগ্ধা সঙ্গিনীর যৌবনশ্রী-মণ্ডিত লালিমা কখন যে তাহার অন্তরের তারটি নূতন সুরে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিল, তরুণ তাহা জানিতেও পারিল না।

কবিতার ভিতর দিয়া সেই নব ভাব-তরঙ্গের মৃদু আঘাত

কণিকার রুদ্ধ দুয়ারেও বুঝি ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিল। কাব্যমুগ্ধা কণিকা এ সবের সন্ধান রাখিবার চেষ্টা করে নাই; একচোখো হরিণীর মত সে শুধু ডাঙ্গার শত্রুর দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছিল। ঐ নিরীহ মুখচোরা কবিটিকে সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর অযোগ্য বিবেচনা করিয়াই নিজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অরক্ষিতা হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু কবির পুষ্পশরগুলি যে সুরক্ষিত দুর্গটিও অনায়াসে জয় করিতে পারে, তাহা তাহার জানা ছিল না।

তরুণের কবিতাগুলি ক্রমেই করুণ-রসে স্নিগ্ধ হইয়া উঠিতেছিল; এবং কণিকার কঠিন অন্তর তাহার সেচনে ধীরে-ধীরে আর্দ্র হইয়া উঠিতে লাগিল।... কিন্তু যেদিন তাহার মাতা ও লতিকা তরুণের সহিত তাহার বিবাহের কথার আলোচনা করিতেছিলেন, কণিকা সে দিন সহসা নিজের অন্তরের প্রতি চাহিয়াই রুখিয়া দাঁড়াইল। অমন করিয়া নিজের গর্ব ক্ষুণ্ণ করিয়া সে সঙ্গিনীদের কাছে হাস্যাস্পদ হইতে পারে না—কিছুতেই না; তাহাতে ফল যাহাই হউক।

বিবাহের নামে কণিকাকে এমন করিয়া আর কখনও রাগিতে দেখা যায় নাই।—দাসীবৃত্তি সে করিবে না।—পুরুষের ভিতর তাহার চেয়ে এমন শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, যাহার কাছে সে মাথা নোয়াইতে পারে। এই রকম কথা কহিয়াই সে পাত্রটির সম্বন্ধে টিকাটিপ্পনি করিয়া, তাহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া দিত। কিন্তু তরুণ সম্বন্ধে ঐরূপ টিপ্পনি না করিয়া, সে শুধু ফাঁকা গর্জ্জনে তাহার অমত জানাইয়া দিল। মাতা কিন্তু ইহাতে অনেকটা আশান্বিতা হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "রূপে, গুণে, বংশে, বিদ্যায় এমনটি আর কোথায় পাওয়া যাবে বল ত? শান্ত মিষ্ট স্বভাব, মুখে উঁচু কথাটি নেই। ওর গুণে বাঘ বশ হয়,—আর তুই এমনি সৃষ্টিছাড়া।"

কণিকা মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "হাঁ, আমি অমনি! যাও, আমি পার্ব্ব না।" বলিয়া দুপ্ দাপ্ করিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় পেছনের বাগানটিতে তরুণের সঙ্গে চোখো-চোখি হইতেই সে বলিল, "ভারি বিশ্রী ওরা, তরুণ বাবু, ভারি বিশ্রী!"

অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিগুলি কণিকার সুগৌর মুখখানির উপর পড়িয়াছিল; মেঘের মত এলোচুলের রাশি লতাইয়া পিঠের উপর নামিয়াছে। তরুণ চকিতে তাহার মুগ্ধ দৃষ্টি বুলাইয়া বলিল, "কি বিশ্রী, কণা?"

"দেখুন না, মা আর লতি বলে কি না, আমার সঙ্গে আপনার—ধোৎ! কি বিশ্রী!" দূরে আম্র-পল্লবের মাঝে আত্ম-গোপন করিয়া একটা কোকিল মুহুর্মুহু ডাকিতেছিল। সেই স্বরটুকু তরুণের অন্তরের মাঝে একটা স্বপ্নময় আবেশ ছড়াইয়া দিতেছিল। সে সহসা বলিয়া ফেলিল, "তোমার আমার কি কণা? বিবাহ!" বলিয়াই সে রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

ব্রীড়া-সঙ্কোচহীনা কণিকাও যেন জীবনে এই প্রথম শিহরিয়া উঠিল। এক ঝলক রক্ত কোথা হইতে তাহার পরিপুষ্ট গণ্ড দুটিতে আবির্ভূত হইল। সামনের গোলাপ গাছ হইতে একটা গোলাপ ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে অন্য দিকে চাহিয়া কণিকা বলিল, "কি বিশ্রী—ধোৎ!"

কোকিলটা উঠিয়া আসিয়া নিকটের গাছ হইতে ডাকিতে সুরু করিল। তরুণ সহসা সংযমের বাঁধ হারাইয়া, কণিকার ফুলের চেয়ে নরম হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "কি এমন বিশ্রী, কণা! এ কি অসম্ভব? তুমি বিবাহ কর্ত্তে চাও না, পুরুষের দাসীত্ব কর্ত্তে হবে বলে। কিন্তু কণা, সে যে দাসীত্ব নয়, সে রাণীত্ব,—একটা হৃদয়ের উপর স্নেহের, সেবার, কোমলতার সাম্রাজ্য স্থাপন করা। প্রেমের রাজ্যে, স্নেহের রাজ্যে ত রাজা-প্রজা নেই,—সেখানে সুখ খালি আত্মদানে। বাইরের চোখে তাকে দাসত্ব বলে মনে হতে পারে; কিন্তু সেই প্রেমের দাসত্ব কর্ত্তে কেউ অনুশোচনা করে না, সর্ব্বস্ব দিয়ে প্রাণ আপ্‌নি লুটিয়ে পড়তে চায়।"

কণিকা ধীরে-ধীরে হাতখানি টানিয়া বলিল, "তবে এই যে চোখ-রাঙ্গানি, শাসন, হাত-পা টিপে দেওয়া"—বলিয়াই সে যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। অতি কোমল কণ্ঠে তরুণ বলিল, "বাপ-মা শাসন করেন সেটা কি তাঁদের শুভেচ্ছার পরিচায়ক নয়? তেমনি স্বামীর। তার পর সেবার কথা যদি বল, সেটা কেউ ত দাবী করে না; বরং কি করে সেটা উপভোগ কর্ত্তে হয়, তোমরাই তা শিখিয়ে দাও।..আমি হয় ত কালই ফিরে যাব। যাবার আগে জান্‌তে চাই, সত্যি আমি অতটুকু আশা কর্ত্তে পারি কি না। আর যদি নিরাশ হই—" তরুণের কণ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল। তাহার আকুল দৃষ্টির তলে কণিকার কঠোরতাও যেন কোমল

হইয়া উঠিল। সে নতমুখে বলিল, "আপনি বন্ধু—তার পর কি না! আর সকলে কি ভাববে? না—না, তা হয় না, তরুণ বাবু।"

একটা প্রজাপতি উড়িয়া আসিয়া কণিকার কাঁধের উপর বসিল। উদ্বেলিত হৃদয়ে তরুণ বলিল, "আমাদের বন্ধুত্ব অটুট বন্ধনে দৃঢ় কর্‌বার এই ত উপায়।···আর সবাই কি বলবে?—তাদের বলো, সোণার কাঠির স্পর্শে রূপকথার রাজকন্যা তার অফুরন্ত ঘুম থেকে জেগে উঠেছে,—নিজের বিশৃঙ্খল রাজ্যটি এবার সে সাজিয়ে-গুছিয়ে নেবে। যে নূতন রাজা সে বরণ করে নিয়েছে, সেখানে সে দাসী নয়;—স্নেহে, কোমলতায়, সেবায় সেখানে সে রাজরাজেশ্বরী।··· ঐ দেখ, গাছের পাতার ফাঁকে চন্দ্রকিরণ এসে আমাদের পূত প্রেমের ধারায় স্নান করিয়ে দিচ্ছে,—স্বয়ং প্রজাপতি তাঁর দূত পাঠিয়ে তাঁরই আদেশ জানিয়ে দিয়েছেন,—পাখীর কণ্ঠে মিলনের গীত জেগে উঠ্‌ছে।"···

ঐ সান্ধ্য-গরিমার মাঝে তরুণ পুনরায় কণিকার হাত চাপিয়া ধরিল,—চঞ্চলা কণিকা অচঞ্চল দেহে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল,—তাহার মুখর কণ্ঠ যেন মূক হইয়া গিয়াছিল। সমস্ত প্রকৃতি বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল সোণার কাঠির স্পর্শে কেমন করিয়া ঘুমন্ত প্রাণ জাগিয়া ওঠে।

পাগল বাদল

[শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত]

ঝলকে ঝলকে ছুটে আয়
ভাসিত হৃদয় আঙিনায়
উছল উতল বরিষায়।

শাঙন গহন কালো মেঘ
আকাশে নিবিড় উদ্‌বেগ,
পাগল চপল জল-বেগ।

থমকি' ঠমকি' মেঘ যায়
আকুলি' বিজুলি ঠারে চায়,
অঝোর বিভোর বারি ধায়।

কাননে বাগানে ঘন রব
শ্রবণ-মোহন উৎসব
পাগল-বাদল-কলরব।

ঝরিয়া মরিয়া অবসান
সজল চপল মেঘখান,
পথের দুধারে জলতান।

ছিঁড়েছে মেঘের জোড়া বুক
ফাঁকেতে নীলের হাসি-মুখ,
কোথারে আজিকে কোথা দুখ?

গ্রামের আধেকে রোদ ভায়
আধেকে আঁধার মাখা ছায়,—
ঘরণী রূপসী দিশি চায়।

লুকান গোপন যেন রূপ
ফাটিয়া পড়িছে অপরূপ,—
ধরায় বিরাজে যেন ভূপ।

পথের উপরে যত জল
রূপের আলোকে জলজল,
সিকত পাতা সে ঝলমল।

দেয়ালে পুকুরে পড়ে রোদ
আঁকড়ি চুমিয়া লহে শোধ,
তরল তপত সুখ-বোধ।

রোদের তুলনা আজি নাই,
কাঁদন-সিকত হাসি পাই,
গলিত রূপায় অবগাই।

আবার আসিল মেঘ ওই
চাঁদোয়া খাটাল, রবি কই?—
বাদল-সলিল থইথই।

আঁধার-জড়িমা-ঘেরা দেশ
ঘুমের কুহক-ভরা বেশ
বাদল-খেয়াল নাহি শেষ।

নারীর দেবীত্ব

[শ্রীরমলা বসু]

দেবীত্বের নামে নারীর প্রতি আবহমান কাল হতে যে রকম ব্যবহার চলে আসছে, তা ভেবে দেখলে অবাক্ লাগে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, এ ধারণা তার নিজের মনেই এ-রকম বড় করে ও উঁচু করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, প্রথমতঃ সে নিজেই এ কথা মানতে চাইবে না; এবং মানতে চাওয়াও তার পক্ষে কষ্টদায়ক হয়ে উঠবে। সে যখন সেবাদাসী, সে যখন পুরুষের সোহাগের ক্রীড়নক মাত্র, সে অবস্থা যে তার পক্ষে সব সময় সুখকর ও গৌরবজনক নয়, সে তা অনেক সময় বুঝতে পারবে; কিন্তু দেবীর উচ্চ আসনে বসিয়ে রাখা যে কোন রকমে তার পক্ষে ক্ষতিকর ও হেয়কর, তাতে যে তার মনের ও আত্মার বিস্তারের পক্ষে কত অন্তরায়, তার জীবনের প্রসারতা কতটুকু তাতে খর্ব্ব হয়ে আসে,—এতদিনের বদ্ধমূল ধারণার কাছে এ কথাটা বোধগম্য হওয়া সত্যি তার নিজের কাছেও কঠিন হয়ে ওঠে।

দেবীত্বের গণ্ডি এঁকে, তাকে ক্ষুদ্র পরিমিত স্থানে বদ্ধ রেখে, ত্যাগের ও স্বার্থশূন্যতার একটা উজ্জ্বল কৃত্রিম ছবি এঁকে এমন করে পুরুষ তার নিজের স্বার্থের ও সুবিধার জন্যে নারীর ও সমাজের মনে প্রবিষ্ট করে রেখে এসেছে যে, এটা যে পুরুষের পক্ষে শুধু একটা স্বার্থসিদ্ধির অন্যতম গভীর কৌশল, তা কেউ স্বীকার করতে চাইবে না। পুরুষ ত এ কথা শুনে নিজেকে অন্যায় রকমে অবজ্ঞা মনে করবে।

নারীকে যখন সে খোলাখুলি ভাবে সেবাদাসী ও ক্রীড়নকের মত ব্যবহার করে, তখন হয় তো বাধ্য হয়ে তাকে অনেক সময় মানতে হবে - এ তার স্বার্থের সুবিধার জন্য। যেটা মানুষ চোখের সামনে সোজাসুজি ভাবে দেখতে পায়, যে অবস্থাটা বুঝতে কষ্ট হয় না—তার সঙ্গে যুঝে ওঠা মানুষের পক্ষে সহজ হয়; কিন্তু যে অন্যায় ন্যায়ের সূক্ষ্ম আকার ধরে, তার আপাতঃ-গরিমা ও মহত্ত্ব নিয়ে মানুষের সামনে এসে দাঁড়ায়,—তার বিরুদ্ধে নিজেকে দাঁড় করান, বড়ই কঠিন। কারণ, সেখানে মানুষ যে নিজেই জানে না—কত বড় অন্যায় ও অত্যাচারের হতভাগ্য পাত্র সে। সেখানে নিজেই যে সে মিত্র ভেবে অজানা মঙ্গল-রূপ-ধারী শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাইবে না। অলক্ষ্য ভাবে গুপ্তশত্রু যে তার জীবনের কত ক্ষতি করছে, তার ধারণাই তার মনে আসবে না।

ইয়োরোপে নর-নারীর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য ভাবে কিছু দিন থেকে চলে আসছে, তার কারণ, সেখানে প্রত্যক্ষ ভাবেই নারীর প্রতি অবিচার চলে এসেছে;—সেখানে সে হয়

ভোগের বিলাস সামগ্রী, নয় নিপীড়িতা সেবাদাসী, নয় পুরুষের কর্মক্ষেত্রে অত্যাচারিতা, দুর্ব্বল প্রতিদ্বন্দ্বিনী, তাই ক্রমশঃ নারীর মন আঘাত পেয়ে, ও সংসার-ক্ষেত্রে উভয়ের অবস্থার এতটা তারতম্য দেখে, শিক্ষা ও মনের বিচার-বুদ্ধির প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে সবলের অত্যাচারে দুর্ব্বলের সাময়িক পরাভব স্বীকারেরও অবশ্যম্ভাবী বিদ্রোহানল চারিদিকে জ্বালিয়ে তুলেছে; তাই এ দ্বন্দ্ব আকার নিয়ে সেখানে প্রকাশ পেয়ে, সমগ্র ইয়োরোপে একটা বিপুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল; এবং যার একটা কিছু স্থায়ী সমাধান না হলে অবার জ্বলে উঠবে। নারী সেখানে জানছে, কোন দিক হতে তার জীবনের পূর্ণতা লাভের পক্ষে "ক্ষতিকর" ব্যাপারটা তাকে আক্রমণ করছে। তাই মন তার সজাগ হয়ে উঠেছে।

মানুষের জীবনের প্রধান অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম ও বৃত্তিই হচ্ছে স্বার্থ (ego self)—তা কেহ স্বীকার করুক বা না করুক, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মানুষের মনের সেই সর্ব্বপ্রধান বৃত্তি দ্বারাই সে সবচেয়ে বেশী চালিত হয়। তাই যেখানে তার স্বার্থে আঘাত লাগে, সেখানেই আঘাতকারীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব আসবেই। দেশে দেশে, জাতিতে-জাতিতে যে দ্বন্দ্ব মাঝে-মাঝে উপস্থিত হয়, তার মূল কারণই হচ্ছে এই। প্রবল দুর্ব্বলকে করায়ত্ত করবার চেষ্টা করবেই; আর দুর্ব্বল সেখানে শক্তির অভাবে, সাময়িক ভাবে আপনাকে নত করবে—মনে তার নত হবার ইচ্ছা না থাকলেও; কিন্তু অন্তরে-অন্তরে সে বিদ্রোহ জ্বেলে রাখবেই। সময় ও সুবিধা পেলেই, এবং শক্তি সঞ্চয় করতে পারলেই, তা বাইরে এক-দিন ফুটে উঠবেই উঠবে। বাহিরের আধিপত্য সেজন্য কোন কাজেরই নয়।

জগতের ইতিহাসে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, সামাজিক জীবনে—সব স্থানেই তার ভূরি-ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়। ফরাসী বিপ্লবের একমাত্র কারণই এই। আভিজাত্যদিগের বহুদিনের দম্ভ-মিশ্রিত অত্যাচার সহ্য করে আসলেও, যেদিন জনসাধারণের মন আবার সজাগ হয়ে উঠল, সেদিন তারা মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করল যে, তাদের জন্ম শুধু নীরবে মাথা নত করে আভিজাত্য বংশীয়দের সেবা ও দাসত্ব করবার জন্যেই হয় নি। যেদিন তাদের ভিতরের সুপ্ত, অন্তর্নিহিত শক্তি-সমুদায় প্লাবনের জলধারার ন্যায় উদ্দাম গতিতে সব বাধা ভেঙ্গে, বিপুল গর্জ্জনে বাহির হয়ে এল, সেদিন তার সামনে অভিজাতদের এতদিনের প্রভুত্ব করবার শক্তি কোথায় নিমেষে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তারা জলন্ত বিদ্রোহে সারাদেশ জ্বালিয়ে ছার-খার করে দিলে, যত দিন না দেশ থেকে অন্যায় অত্যাচার ও অসামঞ্জস্য দূর হয়ে গেল। আজকালকার "বলসেবিক" দলের উৎপত্তিও এই একই কারণে।

কিন্তু দেশে দেশে, জাতিতে-জাতিতে যে দ্বন্দ্ব চলে এসেছে, তার চেয়ে ঢের বেশী গভীর ভাবে ও সমস্যাপূর্ণ হয়ে বহুদিন হতে নর-নারীর অধিকার নিয়ে চিরন্তন দ্বন্দ্ব চলে আসছে।

পুরুষ এতদিন তার শারীরিক শক্তির প্রাধান্যে প্রবল পক্ষ হয়ে উঠেছিল; এবং তারই সাহায্যে সে নারীকে নিজের ভোগের ও সেবার সুবিধা অনুযায়ী গড়ে তুলবার জন্যে, নারীকে তাহার মানসিক শিক্ষা ও তাহার ফলে শক্তি ও অন্যান্য বহির্জগতের ক্ষেত্র থেকেও বাদ দিয়ে, সেখানকার আধিপত্যও লাভ করে আসছিল। এ শুধু আমাদের অন্তঃপুরাবদ্ধ নারীবহুল দেশে নয়; যেখানে তার বাহিরের চলাফেরার স্বাধীনতা অন্ততঃ প্রচুর ভাবে আছে, সে দেশেও।

কাজেই এ পর্য্যন্ত শারীরিক ও মানসিক দুই ক্ষেত্রের প্রাধান্যে জগতের তরীর হাল পুরুষ নিজের হাতে ধরে, নিজের সুবিধা মত চালনা করে আসছিল। ক্ষমতার অস্ত্র যখন সব দিক দিয়ে তারই হাতে এসে পড়ল, তখন সে তাহা নিজের স্বার্থ ও সুবিধার জন্যেই প্রয়োগ করতে লাগল। মানব-জাতি যত তার শিশুকাল ছাড়িয়ে নানা বিষয়ে ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হতে লাগল, তত পাশবিক বলের আধিপত্য কমে গিয়ে, মানসিক বৃত্তির ঔৎকর্ষ্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তার শ্রেষ্ঠত্ব লাভের উপায় হয়ে উঠল। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কৌশলে অন্য নিম্নস্তরের জীব হতে আরম্ভ করে, প্রকৃতিকেও তারা বশে এনে, তার লুকানো ভাণ্ডার থেকে জীবন-যাত্রার কত সুবিধাজনক ও উপযোগী জিনিস আবিষ্কার করে, নিজে-দের সেবায় নিযুক্ত করল। এই জ্ঞান-শিক্ষা ও বুদ্ধির ফলে এক উৎকৃষ্ট অথচ সংখ্যায় কম জাতি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট অথচ বলবান্ ও সংখ্যায় বেশী জাতির উপর আপনার অধিকার বিস্তৃতির উপর বার করল। এখন সে অধিকার

বজায় রাখবার মূলে তাদের জ্ঞান ও শিক্ষা; সুতরাং স্বভাবতঃই তারা পরাজিত জাতিকে সে জ্ঞানের আলো ও শিক্ষা-রূপ বড় হবার অস্ত্র-সকল হতে বঞ্চিত রাখবার প্রয়াস পেল। তার উদাহরণ রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে ভূরি-ভূরি পাওয়া যায়।

নর-নারীর সম্বন্ধেও চিরদিন এই ঘটে এসেছে। শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে, বাহিরের বিস্তৃত গতিশীল জগতের সঙ্গে সমান ভাবে পা ফেলে চলবার অভিজ্ঞতায় নারীকে এমন করে বেঁধে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে, যাতে সে চিরদিন দুর্ব্বল, অসহায়, অনভিজ্ঞ থেকে গিয়ে, কোন দিন যাতে পুরুষের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিনী না হয়ে উঠতে পারে। যাতে সহজেই তার বশ ও তার দ্বারা চালিত হয়। তাই পুরুষ জাতির মনে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ভাবে এই চেষ্টা ও ইচ্ছা সর্ব্বদাই কাজ করছে যে, নারীর পক্ষে সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত নয়। কিন্তু চিরদিন কি নারী তা মেনে চলবে? একদিন না একদিন সে পুরুষকে জবাব করতে বাধ্য করবেই করবে;—তাকে জগতের বিপুল কর্ম্ম-ক্ষেত্র ও উন্নতির পথ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে, একদিন সে সমান ভাবে সর্ব্বত্র তার ন্যায্য পাওনা ও অধিকার দাবী করে বসবে,—যেমন ইয়োরোপে এখন সে করতে শিখ্‌ছে। সেখানে তার চোখ ফুটেছে অপেক্ষাকৃত সহজে; কারণ, সেখানে পুরুষের স্বার্থ-সিদ্ধির অভিপ্রায় নারী-পূজার আকার ধরে, গুহ্য ভাবে নারীকে আক্রমণ করে, তাকে তার অধিকার হতে সব সময়ে বঞ্চিত করে নি। কিন্তু আমাদের দেশের পণ্ডিতদের মনস্তত্ত্বের অভিজ্ঞতা ও বিচার-বুদ্ধি চিরদিনই অতি সূক্ষ্ম ও সুদূর-গোচর। মানুষের মনকে কি ভাবে সবচেয়ে বশে আনা যেতে পারে ও তাতে যখন মানুষের নিজের মন সায় দেয় ও অধীনতা স্বীকার করে, তখনই বাইরের সব আধিপত্য সহজ হয়ে উঠে,—এ কথা তাঁদের খুব ভাল করে জানা ছিল।

তাই তাঁরা নারীর জন্যে সৃষ্টি করলেন এক উঁচু সিংহাসন;—সেই আসনে পরম সমারোহে দেবী করে তাকে বসিয়ে দিলেন। তার চারি পাশে ত্যাগ ও স্বার্থশূন্যতার গণ্ডি এঁকে এমন ভাবে তাকে আবদ্ধ করলেন যে, আড়ষ্ট ভাবে তার মধ্যে থেকে, সেই আসনের গণ্ডি পার হয়ে একটু এধার-ওধার নড়বার অধিকার ও শক্তি তার রইল না। পুরুষ ও সমাজের আরোপিত কৃত্রিম মহিমা ও গৌরবে আনন্দিত হয়ে সত্যিকারের দেবীত্ব তো তার লাভ হোলই না, নারীত্বও হারিয়ে সে ক্রমশঃ কীটত্বের দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

ত্যাগ ও ভোগের সম্বন্ধে আমাদের মনে এক অদ্ভুত ধারণা ও সংস্কার আছে। ত্যাগ জিনিসটাকে আমরা সর্ব্বদাই খুব উঁচু স্তরে স্থান দিলেও, ভোগকে মানুষের নিম্ন প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত মনে করি। তার মানে, স্বার্থ বা অহং জিনিসটা যে মানুষের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ও স্বাভাবিক কার্য্য-কারক ধর্ম্ম, তা' আমরা মানতে চাই না, কিম্বা মেনেও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হই; কিন্তু প্রথমতঃ যে জিনিস মানুষের মধ্যে এত স্বভাবজ, তার জন্যে কুণ্ঠিত হওয়ারই প্রয়োজন নাই। ভোগ বা ভোগের স্পৃহা - সেটা স্বার্থ বা অহং-সংস্পৃষ্ট বলেই আমরা তাকে এত নীচু স্থান দি।

এখন ভোগটা কি? না, মানুষের মনের অহং-এর সংস্পৃষ্ট আনন্দ ও সুখ পাবার ইচ্ছা। সেটা আমরা জীবনে আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি দিয়ে নানারকমে ভোগ বা সম্ভোগ করি। এই যে ভোগ বা সম্ভোগ সেটা, তাহলে মানুষের মনের অত্যন্ত স্বাভাবিক আনন্দ লাভ করবার ইচ্ছা। আর সেটা জীবনে স্বাভাবিক,—সেটা নিতান্ত অপেচ্ছ ভাবে ব্যবহৃত না হলে—মানুষেরও মনের বিকাশের সহায়তাই করে,—তা দিয়ে তার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা কমই। তার পর ত্যাগ জিনিসটা কি;—যদি একবার আমরা তা বড় করে ও ভাল করে তলিয়ে দেখতে যাই,—তবে দেখতে পাব, শুধু ত্যাগ বলে কোন জিনিস পৃথিবীতে নেই। মানুষের স্বভাবে তা সম্ভবই হয় না। কোন না কোন দিক থেকে, ত্যাগের মধ্যে ভোগের স্পৃহা, অর্থাৎ আনন্দ পাবার ইচ্ছা আছে বলেই মানুষ ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। আর যে ভোগ করেছে, সেই ত্যাগ করতে পারে; আর তখনই ত্যাগের কিছু মর্ম্ম থাকে। তখন সে ত্যাগ মহিমান্বিত হয়ে ওঠে,—মানুষকে বড় করে তোলে। কিন্তু যে ভোগের কিছু জানলে না, ভাবটাকেই যে ত্যাগ ভেবে রাখলে,—আর একজন যে ত্যাগের মন্ত্র জোর করে তার ওপর আরোপ করে রেখেছে, বাধ্য হয়ে তাকে গ্রহণ করল,—তখন সে ত্যাগের মহিমা কোথায়? সে ত্যাগের সার্থকতা কোথায়? সে ত্যাগের গৌরব কোথায়? সে তো মানুষকে বড় করে তুলতে পারে না। সে তো ত্যাগ নয়, সে তো অভাব,—সে তো বঞ্চিত হওয়া ও বঞ্চিত ভাবে

থাকা। সে অভাব, সে বঞ্চিত হওয়া মানুষকে খর্ব্ব করে; সব রকমে ছোট করে ফেলে। তার মধ্যে তার মনুষ্যত্ব প্রকাশের, মনের প্রসারতার কোন সম্পর্ক থাকে না।

তাই, নারীকে যে দেবীর আসনে বসিয়ে রাখা হয়েছে, যেখান থেকে শুধু সে নিঃস্বার্থ ভাবে ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি হয়ে, মানুষের স্বভাবজ সব সাধ আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, কামনা, স্বার্থ —সবার উপরে অস্বাভাবিক ভাবে উঠে, নিজেকে যত পারে অলক্ষ্যে রেখে ছোট করে হেয় করে, সংসারের মধ্যে যতখানি কম স্থান অধিকার করতে পারে, করে;—কিছুরই দাবী না করে শুধু অকাতরে দান করে যাবে আপনাকে। কিন্তু সেই গণ্ডিবদ্ধ গতি-রহিত জীবনে, এমন কি সে নিজে লাভ করতে পারবে, যাতে তার সেই "আপনাকে" দান করবার ভিতর সংসারকে দেবার মত কিছু দান করে যাবার থাকবে? সব দিক থেকে যদি সে বঞ্চিত ও আবদ্ধ থাকে, তার জীবন কিছুতেই পরিপুষ্টতা লাভ করতে পারে না, কোন দিক থেকে তার পূর্ণ সার্থকতা লাভ হতে পারে না। আর নিজে যে জীবনে পূর্ণ বিকাশ ও সার্থকতা লাভ করে নি—সে অপরকে দেবে কি? সে দেবে কি, কোন দিন যে তার মনের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির বিকাশের ক্ষেত্র না পায়, যদি সে তার স্বভাবজ আনন্দ ও ভোগের বাসনার কথঞ্চিৎও পরিতৃপ্তি না পায় জীবনে?

ছোট করে কোন জিনিসকে দেখলে ও ভাবলে তা সত্যি-করে শেষে ছোটই থেকে যায় ও হয়ে যায়। ত্যাগের মধ্যে দিয়েই হোক, কি বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা দিয়েই হোক—মানুষ যখনই দীনতার মোহে মুগ্ধ হয়ে নিজেকে অতি ছোট দীনহীন ভাবে দেখতে ও দেখাতে শেখে, তখন ক্রমশঃ সত্যিই তার অন্তর ও স্বভাব দীনতায় ভরে যায়। তাই নারী, বিশেষতঃ ভারত-নারীর যা প্রধান গৌরব—ত্যাগশীলতা, দীনতা, অস্বাভাবিক লজ্জা অর্থাৎ জড়তা, নিজেকে সবার পিছনে দীনহীন ছোট ভাবে রাখা, নিজের সৎপ্রবৃত্তিগুলির খর্ব্ব করা, এমন কি শরীররক্ষার উপযোগী খাওয়া-পরার মধ্যেও অস্বাভাবিক লজ্জা ও দীনতা,—নিজেকে সব ভাবেই এমন করে পশ্চাতে ফেলে রাখার ইচ্ছা—এতে সত্যি করেই সে নিজেকে ছোট ও খর্ব্ব করে ফেলেছে সব দিক দিয়ে।

তার পর এ দীনতা ও স্বার্থত্যাগের এমন উজ্জ্বল মহিমান্বিত ছবি আঁকা রয়েছে তাদের মনে যে, এ ভাবে থেকে সে নিজের মনের ও শক্তির কত ক্ষতি করছে, তা তার স্বপ্নেও মনে হবে না। এমনি করে সূক্ষ্মদর্শী ভারতের শাস্ত্রকারেরা নারীর মনে দেবীত্বের উজ্জ্বল চিত্র এঁকে দিয়ে চিরদিনের জন্যে, তার সত্যিকার উন্নতির অন্তরায় করে তার নিজের মনকেই তৈয়ের করে রেখে এসেছেন। এ গণ্ডি কাটিয়ে যেখানে তার আসল জীবন, আসল নারীত্বের বিকাশ, যেখানে এ ধূলামাটীমাখা সংসারের পথে তার বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র পড়ে রয়েছে, যেখানে সব দিক থেকে ন্যায্য পাওনা দাবী করবার অধিকার তার আছে, যেখানে সেও ধূলোর মানুষ,—সাধারণ ধূলোর মানুষই শুধু—সাধারণ ধূলোর মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, দুর্ব্বলতা, স্বার্থ থাকা তার মধ্যে অস্বাভাবিক ও লজ্জার কিছু না। পথ চলতে চলতে যদি তার গায়ে ধূলো কাদা লাগে কখন, তবে চিরদিনের জন্যে গণ্ডিচ্যুতা হবার কথা নয় তার;—আবার ধূলো ঝেড়ে পথ অতিক্রম করে গন্তব্য পথে চলবার অধিকার থাকবে তার—যেখানে দেবীর আসন থেকে একটু ভ্রষ্ট হলেই জগতের লোকের সমালোচনা-পূর্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চিরদিনের জন্য তাকে আহত করে রাখবে না—যেখানে সেও ঠেকবে, শিখবে, চলবে, কাজ করবে,—আর সবারই সাথে যাবে। যবে নারী এই বঝবে, এই চাইবে—যবে সে দেবীর সংকীর্ণ আসন থেকে স্বেচ্ছায় নেমে আসবে বিস্তৃত জগতের রাজপথের ধূলো কাদায় তার জীবনের উদ্দেশ্য চিনে নিতে; তবে জানব এতো দিন পরে নারীর মহিমময় নারীত্বের—দেবীত্বের নয়—আসন ফিরে পাবার জন্য ভারত-নারীর প্রাণ ফের জেগে উঠেছে। কৃত্রিম আদর্শ আর তাকে ভুলিয়া রাখতে পারবে না। সে জানবে, সে কি, সে কি চায়, কিসে তার চিরন্তন অধিকার, কে সে অধিকার থেকে তাকে চ্যুত করে আসছে, কোন্ পথে গেলে যে সে লুপ্ত অধিকার ফিরে পাবে।

সে দেবীও হতে চায় না, সে খেলনারও জিনিস নয়। কবির চিত্রাঙ্গদার সহিত এক সাথে সুর মিলিয়ে মন তার বলে উঠবে—

> "দেবী নহি, নহি আমি সামান্য রমণী।
> পূজা করি, রাখিবে মাথায়, সেও আমি
> নই, অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে
> পিছে; সেও আমি নহি।"

নারী-সমস্যা

[শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী]

আজকাল পাশ্চাত্য বিবাহ-সমস্যা নিয়ে অনেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। পাশ্চাত্য জগতে বিবাহচ্ছেদ প্রথা থাকাতে, আর নারী ও পুরুষের প্রায় সমান অধিকার থাকায়, বিবাহটা স্থলে-স্থলে সাময়িক হয়ে পড়েছে। এক কথায়, তাকে বিবাহ না বলে স্বৈরাচার বলা চলে। কাজেই সন্তানদের কাছে পিতৃ-মাতৃ-পরিচয় অনেক স্থলেই গর্ব্বের বিষয় না হয়ে, লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। জগতের অনেক মনীষী সমাজের এই অনাচারে শিউরে উঠেছেন।

যদি ভাবি, ওখানে যা-খুসী হ'ক না, আমাদের তাতে কি ক্ষতিবৃদ্ধি?—কিন্তু সেটা খাটছে না; কেন না, আমাদের সমাজ ও মনের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব কিছু কম আধিপত্য বিস্তার করে নি। সেইজন্য আমাদের সমাজ আর মন দুই-ই ও-বিষয়ে অনুকূল-প্রতিকূল দু'রকম মতই দিতে আরম্ভ করেছে।

বিবাহ সম্পর্কটা দৈহিক সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'লেও, মাত্র ঐটাই ওর মূল আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দেশ্য নয়। তার অনেকটাই মানসিক মিলনের উপর নির্ভর করে। কাজেই ও-সমাজে নর-নারীর অবাধ-সম্মিলন আর পূর্ণ অধিকার থাকার ফলে, যাঁরা সমাজের ধর্ম্ম আর ভিত্তিস্বরূপ, সেই নারীরা অনেকেই পুরুষদের মতন চঞ্চলমতি হয়ে, নিজেদের নির্ব্বাচন বা মিলন একবারে স্থির করে নিতে পারেন না। সমাজ তাঁদের অনুকূল হওয়াতে, তাঁরা মনের সাময়িক মোহের প্রভাবকে দমন না করে, অনুসরণ করে চলেন।

এখন পুরুষেরা যতদিন স্বেচ্ছাচার বা স্বৈরাচার করে এসেছেন, তাতে সমাজের কিছু ক্ষতি হয় নি; মানে, পুরুষের অসুবিধা ঘটে নি; তার শাসন-বিচার মেনে চলবার লোক ছিল,—তার প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল নারীর কাছে। তার মূল কারণ, নারীরা 'মা'। সন্তান জন্মানর পর তাঁরা নিজের অধিকার—স্বার্থ বা সুখ-দুঃখ নিয়ে বেশী ব্যস্ত হ'ন না;—তাঁদের সুখ, আনন্দ, স্বার্থ সবই তাঁদের সন্তান। সেক্ষেত্রে তাঁদের ধর্ম্ম শেখানো বা ভয় দেখানো সমাজের পক্ষে সহজ হতো। সমাজের সুবিধা ছিল এই যে, স্বাভাবিক মায়া-প্রবণতার জন্য মার পক্ষে সন্তানকে ত্যাগ করা এক প্রকার অসাধ্য; কেন না, তিনি নিজের মধ্যে তাকে বহুদিন বহন করেন; সেই সময় থেকেই তার মনে স্বতঃই একটা মায়া জন্মায়। তার পরে সন্তানকে কোলে পাওয়ার পর মাকে দিয়ে যে-কোন স্বার্থ, যে-কোন অধিকার ত্যাগ করানো যায়,—তাঁর মনে মার মমতা, স্নেহ প্রবল হয় অন্য সব জিনিসের চেয়ে। কিন্তু পুরুষের তা হয় না; তার কারণ, মা সন্তানকে না দেখে, অনুভবেই তার প্রতি মায়াপরবশ হ'ন; আর সেই অনুভবের কালটাও কিছু কম নয়। পিতার কাছে সেরকম স্নেহ আশা করা যায় না। তিনি তাকে দেখে ভালবাসতে পারেন,—অনুভবে স্নেহ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। আবার, জননীর পক্ষে শিশুর লালন পালন, আর সংসার প্রতিপালন, একলা করা কঠিন। কাজেই সন্তানের জন্যই নারী পুরুষের আশ্রয়ে বা অধীনে থাকতে বাধ্য বটে। সোজা কথায়, সন্তান যখন দুজনের, তখন পরস্পরের সাহচর্য্য পরস্পরের দরকার। নারী আর পুরুষ দু'জনে মিলে সমাজ সৃষ্টি করেছেন। একদিকে পুরুষ প্রবল, একদিকে নারী প্রবল। অধিকার নারীর যে কম, তা সব সময়ে নয়। কিন্তু মায়াপ্রবণতার জন্য নারীরা পুরুষের নিষ্ঠুর প্রবৃত্তির কাছে দুর্ব্বল; তাই যেখানে পুরুষ অমানুষ, সেখানে নারীত্বের অপমান হয়েছে—নারী উৎপীড়িতা।

পাতিব্রত্য গুণ, আর স্ত্রৈণতা মহৎ দোষ—এটা সব সমাজেই চলে; অথচ দুটাই কি এক জিনিস নয়? কাজেই, স্বামী ব্যভিচারী, আর স্ত্রী সব সময়ে সুশীলা থাকবেন,—স্বামীর স্বৈরাচারের প্রতিবাদ করবেন না, শুধু—চোখের জলে দিন-রাত কাটাবেন,—কখনও উপায় খুঁজবেন না—এটা সব শাস্ত্রে আর সমাজে খুব মহৎ আদর্শ আর ভালো জিনিস হ'লেও, মানুষের মনকে বিদ্রোহী করে তোলে (অবশ্য নারীরা যদি মানুষ নামে অভিহিত হ'ন)। মানুষ অত্যাচার বুঝতে পারলে, ন্যায়-অন্যায় নির্ব্বিচারে, নিজের ক্ষতি করেও অনেক সময়ে প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে থাকে—এটাতে তার ধর্ম্ম-অধর্ম্ম দেখবার, বা নিন্দা-প্রশংসা কিছু করবার

নেই। এতে শুধু দেখতে পাওয়া যায় উৎপীড়িত মানবাত্মার ক্ষুব্ধ বিদ্রোহে আত্মহত্যা। এ আত্মহত্যা দেহের নয় মনের। কিন্তু এই যে বিদ্রোহ, এই যে প্রতিশোধ-স্পৃহা, এটাতে কি বিশেষ ভয়ের কারণ আছে? এ কি মানুষের—নারীর মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম—প্রেম, স্নেহ, মমতার চেয়ে বড়?—এ কি মানুষের মহৎ বৃত্তিগুলিকে একেবারে নষ্ট করতে পারে? যাতে সমাজে স্বৈরাচার, পশ্বাচার ছাড়া কিছু থাকে না?

আমার মনে হয়—তা হয় না। তাই যদি হ'ত, তা'হলে ঐ সমাজেই এত কুমারী নারী, মাতৃত্বের ভাবে উদ্বোধিত হয়ে, শিশু-পালন, শিশু শিক্ষা, শিশু সেবার জন্য নূতন, স্বাভাবিক, সৎপন্থা অন্বেষণ করে বেড়াতেন না। বিবাহিতা বা সন্তানবতী মহিলাদের কথা ছেড়ে দিলাম; কেন না, তাঁদের পক্ষে এটা স্বাভাবিক। এত চিন্তাশীল, সমাজতত্ত্বজ্ঞ, ধার্ম্মিক, মহৎ লোক জন্মাতেন না, যারা সমাজের হিত-চিন্তায় দিনের পর দিন কাটাচ্ছেন।

আমার মনে হয়, বহুদিনব্যাপী পুরুষের অসংযম, উচ্ছৃঙ্খলতা নারীত্বকে বিদ্রোহী করে তুলেছে। কিন্তু তা ক্ষণিক হবে, স্থায়ী হবে না। এই বিদ্রোহ-হলাহলের পর যে অমৃত উঠে আসবে, তা হচ্ছে পুরুষের সংযম, একনিষ্ঠ প্রেম, মহত্ত্ব,—নারীর তেজস্বী স্বাবলম্বনশীল সতীত্ব, মধুর মাতৃত্ব। এ থেকে সত্যকে, ধর্ম্মকে পূর্ণ রূপে দেখা যাবে;—আড়াল করে রেখে, সমাজের পেষণে রেখে পুরুষের রক্ষার নাম দিয়ে উৎপীড়িত করে, সেই অন্ধ-মৃত ধর্ম্ম—নারীত্বকে আদর্শ, সত্য বলে প্রচার করা চলবে না। পুরুষ আর নারী দুটী জাত পৃথিবীতে আছে—তাদের উভয়কেই ধর্ম্ম সমান ভাবে পালন করতে হবে।

ও-সমাজের পদস্খলন, পাপ দেখ্‌লে চম্‌কাবার দরকার নেই; কেন না, আমাদের সমাজে ও-জিনিসটা যথেষ্ট পরিমাণে আছে, নানা আকারে, সকলেই তা জানেন। যদি সমাজে যথেচ্ছাচারের স্রোত বয়,—সেটা শিক্ষার, পারিপার্শ্বিক অবস্থার, আর মা-বাপের চরিত্র সুগঠিত না করতে পারার দোষ। ওটা মুখ্য ভাবে ব্যক্তিগত দোষ বলে মনে হয়। কিন্তু গৌণ ভাবে দেখলে বেশ বোঝা যায়, ঐসব কারণ ওর মূল।

সেই চোখ বুজে ধর্ম্মপালন করাকে আমি ধর্ম্ম বল্‌তে প্রস্তুত নই—যার মধ্যে প্রেমের, ভালবাসার প্রেরণা নেই।

আমাদের উচিত, মুক্তির ভিতর থেকে সত্য বস্তু খুঁজে বার করা;—তাই হচ্ছে ধর্ম্ম। তাতে যদি ভুল থাকে, যদি খাঁটি জিনিস সবটা না পাই, যদি আদর্শচ্যুতি দেখি, তবু বন্ধন করে রেখে অভ্যাসগত ভালো চাই না।—তাই নেব, আদর্শকে বড় আসন দেব কিন্তু সত্যের চেয়ে নয়।—আদর্শচ্যুতিই সব চেয়ে বড় অপরাধ নয়—যদি মনুষ্যত্ব থাকে।

আমরা শিক্ষা দেব এমন করে, যাতে সত্য বা ধর্ম্ম অভ্যাসগত না হয়—বন্ধনমাত্র না হয়—মানুষ মুক্ত থাকে। তার পরে যদি আদর্শচ্যুতি ঘটে, তাকে ধর্ম্মভ্রষ্টতা বলা চলবে না; সে মানুষ আবার নিজেকে মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে,—এই রকম হওয়া দরকার।

যারা মনে করেন, এরকম বিধানে সমাজে যথেচ্ছাচারিতা কদর্য্য ভাবে দেখা দেবে, তাঁরা ভুল করেন; কারণ, মানুষমাত্রেই অমানুষ নয়; তাদের মনের গতি যতটা প্রেমের দিকে—লালসার দিকে তার শতাংশের একাংশও নাই। আমাদের সমাজে ত বিবাহ সম্বন্ধে নারীদের বিধি-ব্যবস্থা কম কঠোর নয়। কোন সত্যনিষ্ঠ সমাজতত্ত্বজ্ঞ এ কথা বল্‌তে পারেন কি যে, আমাদের হতভাগ্য সমাজে নারীত্বহীন স্ত্রীলোকের সংখ্যা পাশ্চাত্য সমাজের চেয়ে কিছু বিশেষ কম। কঠোর ব্যবস্থা, সুকঠোর আদর্শ, অসূর্য্যম্পশ্য অবরোধ সত্ত্বেও যদি এমন ঘটনা দেখা যায়, তা'হলে কোন সমাজের নিয়মের উপরই আস্থা রাখা চলে না। সমাজের কঠোর পেষণ বা বন্ধন মানুষকে আদর্শ-চরিত্র করতে পারে না,—ওটা নির্ভর করে বেশী চরিত্র-গঠনের উপর।

এ থেকে মনে হয়, মানুষের চরিত্র গড়বার জন্য, বা মানুষকে বাঁধবার জন্য, অন্ধ নিয়ম-সংযম তত দরকার নয়, যত বেশী দরকার সৎশিক্ষা, পারিপার্শ্বিক সৎ আদর্শ, চরিত্রবান্ স্নেহশীল পরিজনের মমতা ভালোবাসা। কিন্তু তাও কি মানুষের মনকে সব সময়ে বাঁধতে পারে?

সব জিনিসেরই ভাল-মন্দ ব্যতিক্রম আছে। তখন দোষীকে ক্ষমা করা হয় ভালো; না হয়, বিচার করুক সমাজ। কিন্তু এক জনের জন্য সকলের শাসন বা বিচার করাকে ধর্ম্ম বা সুবিচার বলা চলবে না,—তাকে পীড়ন বলতে হবে।

এ যুগে অবরোধহীন সমাজে যদি কোনখানে নারীত্বের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়, বুঝতে হ'বে, ওটা বন্ধনে থাকলেও সম্ভব

হতো। অবরোধ বা শাসন দ্বারা পৃথিবীর কোনো স্ত্রী বিক্ষিপ্ত-চরিত্র হবে না, এটা আশা করা মূঢ়তা।

স্বেচ্ছাচারী ও মহৎ-চরিত্র নরনারী পৃথিবীতে সব যুগে সব সমাজে চিরন্তন হয়ে ছিল, আর থাকবে—এইটাই স্বাভাবিক, আর সত্য। কোন সমাজ আদর্শ গড়ে তার নরনারীকে আদর্শ মানুষ করতে পারবে না।

শুধু নারীদের সম্বন্ধে আমার বলার কারণ, ঐ চপল-প্রকৃতি হতভাগিনীরা যাঁরা ভুল করেন, অপরাধ করেন, তাহা অ-দৃষ্ট থাকে না, দেখা যায়; পুরুষের পাপ গোপন থাকে। তাই পুরুষ নির্মমভাবে তাঁদের সমাজ-বহির্ভূত করে নিজে সাধু হয়ে, সমাজপতি হয়ে আবার সেই নারীজাতির কাছেই স্বাচ্ছন্দ্য আর আনন্দ ভোগ করেন। আর নিজেদের চরিত্রবল না থাকার জন্য সমগ্র নারীজাতির উপর সন্দেহ করেন, অবিচার করেন; স্থলে স্থলে অতি ইতরোচিত ব্যবহার করতেও দেখা যায়।

'নারীর কথা'য় নরের জবাব

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ জ্যোতিরত্ন]

'আষাঢ়' মাসের 'ভারতবর্ষে' শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী 'নারীর কথা' শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই প্রবন্ধের সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। পাগলী মা আমার সাধুদিগের উপর, শাস্ত্রের উপর, নারদের উপর রেগে গেছেন। এটা পাগলীদের স্বভাব। ঐ দেখ না এক পাগলী উলঙ্গ হয়ে, খাঁড়া ধরে, নিজের ছেলেদের মাথা কাটচেন; তাতে কত হাসি।

ভগবান্ যে সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে আমাদের চক্ষে কতকটা দোষ, আর কতকটা গুণ আছে। এ রকম সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি যে কেন হয়েছে, তা কাহারও বোঝবার উপায় নেই। সুতরাং তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বে ৪০ অধ্যায়ে লেখা আছে, "মানবগণের মোহ উৎপাদনের নিমিত্ত সর্ব্বজন-মোহিনী স্ত্রীজাতির সৃষ্টি।" এতে পুরুষের কোন দোষ নাই; দোষ যদি কারো থাকে, তবে সেটা ভগবানের। ঐ দোষ-গুণের সাম্য হচ্ছে সৃষ্টি-রক্ষার উপায়। যেগুলাকে আমরা অনিষ্টকর মনে করি, সেগুলাকে যদি সংযত ভাবে রেখে কাজ নিই, তবে প্রভূত মঙ্গল হয়। এই যে আগুন, এটাকে ভগবান্ পোড়াবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ঐ আগুনকে সংযত ভাবে চালালে, ডানহাতের ব্যাপারে কেমন সুবিধা হয়; আবার রেলগাড়ী চড়ে কেমন যাওয়া যায়।

মা আমার এক যায়গায় বলচেন, "মহিলা-শিক্ষার কথা উঠলেই পুরুষেরা ভয় পেয়ে যান, যথেচ্ছাচার সহ্য না করেন।" বলি, যথেচ্ছাচার কি কেউ সহ্য করতে পারে? যদি তোমারই মেয়ে-ছেলে যথেচ্ছাচার করে, তা কি তুমি সহ্য কর? আর পুরুষ স্ত্রী-শিক্ষার কথায় ভয় পান না। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীজাতিকে কিরূপ শিক্ষা দিতে হবে, তা এখনও পুরুষেরা ঠিক করে উঠতে পারেন নি। স্ত্রীজাতি শিক্ষিতা হলে, তারাই ত সাবিত্রী, দময়ন্তী, পতিব্রতা হবেন—তবে ভয়ের কারণ কি? সংসারটা ত শান্তির স্রোতে ভাসবে,—এতে ভয় পাবে কেন? তারা ভয় পাচ্ছে,—কি করে পাশ্চাত্য স্রোতের মধ্য দিয়ে নারীজাতিকে শিক্ষা দেওয়া যায়। তাতে যদি কুফল হয়, তবে সেটা পুরুষ জাতিরই ক্ষোভের বিষয়। এ দায়িত্বের ভয় অবশ্য তাদের আছে।

যাঁরা মোক্ষমার্গের সাধক, তাঁরাই নারীজাতির কতকগুলি অপগুণের উল্লেখ করেছেন। সেটা 'দেখে ও ঠেকে' শিখেছেন। মোক্ষমার্গের মূল ভিত্তিই বাসনা-ত্যাগ। কামিনী ও কাঞ্চনে সকলেই আকৃষ্ট; এমন কি, জ্যোতিষ শাস্ত্রেও ধনস্থান ও জায়াস্থানকে মারক স্থান বলেছেন—এ কথা অস্বীকার করা চলে না। মহাযোগী মহেশ্বর মোহিনী মূর্ত্তি দেখে ছুটে-ছিলেন। ব্রহ্মাও রেহাই পান নি। দেবর্ষি নারদও তাই। আমরা কোন্ ছার। যখন কোন যোগী সাধনে বসেছেন, তখনই কামিনী তাহা ব্যর্থ করতে গেলেন। তাঁর সাধনা

বিশ্বাও জলে ফেলে দিলেন। সে কাজগুলো অবশ্য অপ্সরীদের দ্বারা অর্থাৎ নারী-জাতির অপগুণ-সাহায্যে। ঐ অপগুণের সমতা হচ্ছে মাতৃত্বে। যে মহাপুরুষগণ নারীর অপগুণের উল্লেখ করেছেন, তাঁরাও আবার স্ত্রীজাতিকে মা বলে ডেকেছেন—স্ত্রীজাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শে হৃদয় পূর্ণ করে রেখেছিলেন। তাঁদের কাছে জননী, ভগিনী, দুহিতা—যাবতীয় নারীই মা হয়ে গেছেন। এমন উদারতা ও সমন্বয় সাধক জীবনেই হয়। তাই তাঁরা নারীজাতির অপগুণের উল্লেখ করে, যাহাতে মাতৃত্ব স্থাপন করতে পারা যায়, তারই সম্বন্ধে সাবধান করেছেন।

"সমাজের অনুশাসনে অবিবাহিতা কন্যা আত্মহত্যার আশ্রয় লয়।" এটা যে কতটা হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য, তা বলা যায় না। এটা নারীতেই সম্ভব। শাস্ত্রের আইনেও আত্মহত্যাকারী দণ্ডনীয়; রাজার আইনেও তাই। বর্ত্তমান সময়ে ঐ আত্মহত্যার সমর্থনকারীও অনেকে আছেন। হয় ত যিনি প্রথমে কেরোসিনে ভেজান কাপড়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন, তাঁর চিতাভস্মের উপর স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করে লেখা থাকবে, "যেমন কলম্বস হঠাৎ আমেরিকা আবিষ্কার করে যশস্বী হয়েছেন, তেমনি এই বালিকাও হঠাৎ আত্মহত্যার একটা নূতন রাস্তা দেখিয়ে যশস্বিনী হইলেন।" হায় রে, আমাদের বাহাদুরীর তারিফ্!!

বেচারা পঞ্জিকাকারদের দোষ কি? তাঁরা শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই কথা লিখেছেন। তবে 'সম্ভোগ' কথাটা লেখেন। বর্ত্তমান সময়ে তাই দাঁড়িয়েছে। নারীজাতি পুরুষাপেক্ষা বিলাসিনী কতকটা ছিলেন; এবং এখন অধিক মাত্রায় হচ্ছেন। সীতাদেবী দণ্ডকারণ্যে ফুলের গয়না পরতেন। রামায়ণে দেখা যায় রাবণ যখন তাঁকে হরণ করেন, তখন তিনি সেই গয়নাগুলি এক-একখানি করে খুলে ফেলেছিলেন। এখনও ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে সাঁওতাল রমণীগণ অৰ্দ্ধনগ্নাবস্থায় থেকে মাথায় বনফুল গুঁজে যায়। বাড়ীর কর্ত্তা বঙ্গলক্ষ্মীর মোটা কাপড় পরেন; কিন্তু সীমন্তিনীরা 'ও চট কি পরা যায়' বলেন।

পাগলী মা আমার বল্‌ছেন, "মাঝে মাঝে দেখি, নারীত্বের মহিমা এমনি ঠুন্‌কো জিনিস যে, বাল্যে পিতার অধীনে, যৌবনে স্বামীর অধীনে, বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীনে, নারীর থাকিতে হইবে; কদাচ স্বাতন্ত্র্য দেওয়া উচিত নয়। কি দুর্ণাই! এমন ঠুন্‌কো ধর্ম্ম নাই থাক্‌ল।" এই ঠুন্‌কো জিনিস অবলম্বন করেই সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, গান্ধারী, রুক্মিণী, পতিব্রতা আমাদের হিন্দুর মুখোজ্জ্বল করে বসে আছেন;—তাঁরা কখনই হৃদয়ের অসীম বল থাকা সত্ত্বেও স্বাতন্ত্র্য গ্রহণ করেন নাই। সাবিত্রী যেন ইঙ্গিতেই বল্‌ছেন, "প্রাণ দেব বলে সাধ করেছি,—বাদ সেধো না।" তা না হলে নারদ-মুখে ভাবী পতির এক বৎসর মধ্যেই মৃত্যু জানিয়াও, সাধের ফাঁস গলায় দিয়ে অধীন হয়েই ছিলেন! দময়ন্তী স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে পিতার গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর অসীম তেজে ব্যাধ ভস্ম হয়েছিল; তবে তিনি স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিলেন না কেন? পতিব্রতা ত লক্ষহীরার রূপে মুগ্ধ স্বামীকে Divorce করে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারতেন। যাঁর সতীত্ব-তেজে সূর্য্যোদয় বন্ধ হয়েছিল, তিনি ঐ আইন মেনে চলেছিলেন। এই ঠুন্‌কো জিনিসই আবহমান কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত পাষাণ-কঠিন হয়ে বসে আছে। "এমন ঠুন্‌কো ধর্ম্ম নাই থাকল।" বেশ কথা,—না থাক্‌ল, ক্ষতি কি। তবে থাক্‌বে কি? উচ্ছৃঙ্খলতা? আমরা যেটাকে সাধারণ কথায় স্বাধীনতা বলি, সেটা হচ্ছে স্বেচ্ছাচারিতা। মা তুমি যতই স্বাধীন হব-হব ভাববে, ততই তুমি জানবে পরাধীন; ঐ গোঁয়ের তুমি অধীন—স্বাধীন নও। প্রকৃত স্বাধীনতা মনের;—বাইরের বাঁধন নয়। ঐ ঠুন্‌কো জিনিসটা পাশ্চাত্য জগতে বিরল। তার ফল কি দাঁড়িয়েছে, বিলাতে সফ্রিগেট; আমেরিকায় বিয়েটা একটা চুক্তি মাত্র (contract)। এই জিনিসের অভাবে হাজার-হাজার বিবাহ-বিচ্ছেদ (Divorce and judicial separation) মামলা। গত ইয়োরোপীয় যুদ্ধে যাঁহাদের স্বামী যুদ্ধে গিয়া দু তিন বৎসর কাটিয়েছেন, তাঁদের কতকগুলির পত্নী, পুনরায় বিবাহ করে ফেলেছেন।

"অবশ্য জায়গায় জায়গায় সতী-মাহাত্ম্য দেখা গেছে; কিন্তু সে কি শুধু নরপূজার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন নয়। শুধু পতি-দেবতার সন্তুষ্টি নয়?" কথাটা এক রকম সত্য। আচ্ছা যদি ভগবান্‌ই শুধু থাক্‌তেন, আর ভক্ত না থাক্‌তেন,—তা হলে ভগবান্ বিফল নয় কি! আর শুধু ভক্ত থাকতে পারে না; কারণ, সে কাহার ভক্ত? এখানে ভগবান্ ও ভক্ত উভয়েই মহৎ। নরপূজা করে ও পতি-

রাধারাণী ও দেবেন্দ্রনারায়ণ

শিল্পী—শ্রীভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় রাধারাণী—বঙ্কিমচন্দ্র

Emerald Ptg. Works. [Blocks by—BHARATVARSHA HALFTONE WORKS.

দেবতার সন্তুষ্টি সাধন করেই না আজ তোমরা জননী! গান্ধারী, স্বামী অন্ধ বলে, নিজের চোখ বেঁধে জীবনটা কাটিয়ে দিলেন,—এ ত্যাগ ও নরপূজা মাতৃজাতিরই ভিতর ছিল ও আছে। নরপূজা ও পতি-দেবতার সন্তুষ্টি সাধন করেই সতীরা সতী, মহিমময়ী, পূজ্যা ও নমস্যা। যিনি যাকেই পূজা করুন না, তিনি উপাসক, উপাস্য নন। নর সতী-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করতে কখনই বিমুখ হন নাই; সাধক নারীজাতিকে মাতৃত্বে বরণ করতে কখনই কৃপণতা করেন নি। পুরুষ এমন কোন জায়গায় লেখেন নি যে, আমি স্বামী, আমার পূজা সন্তুষ্টি সাধন করে আমার পত্নী সাধ্বী নাম পেয়েছেন। সদ্‌গুণ, ত্যাগ, সেবা, করুণা, গাম্ভীর্য্য দেখে নর সর্ব্বদাই নারী জাতিকে বলিতে প্রস্তুত "তোমারি তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে।"

আমার শেষ কথা, আপনার লেখায় একদেশদর্শিতা (Pessimistic view) পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। গানটা শেষ করে গাওয়া হয়েছিল বলেই আপনার মনটা একবগ্‌গা মেরেছিল। তা না হলে আমার মার এ ভুল হয় না। নারীজাতি কখনই হিন্দুর চক্ষে সম্পূর্ণ দোষের আধার বলেন না। তাঁরা দোষগুণ দুই-ই দেখিয়েছেন। পুরুষেও কি তাই নয়? বিষে মৃত্যু হয়, আবার বিষই মৃতের জীবনদান করে; ঘি খেয়ে শরীরের পুষ্টি হয় আবার অসুখও হয়। পুরুষ বা স্ত্রীজাতি ঠিক তাই। অসংযতচিত্ত নরের পক্ষে বিষ, আর সংযত নরের পক্ষে অমৃত। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সাধনার সাহায্যকারীই হয়েছিলেন নারী; তিনি প্রথমে স্ত্রীদেবতার সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সাধক, সিদ্ধপুরুষ, ঋষিদের, স্ত্রীজাতির নিন্দা করে কি লাভবান হবার বাসনা ছিল? তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই, জগতের হিতসাধনই স্বার্থ ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বর্ত্তমান ভারতে বলেছেন "হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা সাবিত্রী, দময়ন্তী;—ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়-সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে।" মা এখন বিদায়; হয় ত আবার দেখা হবে।—

অনাদৃতা

[শ্রীঅমিয়া চৌধুরী]

মালতীর পাল্কী যখন প্রকাণ্ড লাল বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া থামিল, তখন হেমন্তের বেলা অবসান-প্রায়।

"পাল্কী করে এলে না কি?" বলিতে-বলিতে গৃহিণী উমা প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন। মালতী পাল্কী হইতে বাহির হইয়া বড় যা'কে প্রণাম করিল। পাল্কীর খোলা দরজায় একখানি বালক-মুখ দেখা গেল। মালতী সেদিকে হাত বাড়াইয়া কহিল, "আয়, নেমে আয়।"

উমা অপ্রসন্ন স্বরে কহিলেন, "কে গা?"

"আমার ভাই, বড়দি।"

"ভাইটিকে সঙ্গে করে এনেছ বুঝি? বাপ্ রে—সৎভাইএর অত দরদ?" অতি ক্রোধে উমা আর বেশী কথা কহিতে পারিলেন না: দ্রুতপদে স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে মেজবধূ আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছিল। বড় যা চলিয়া যাইতেই, সে ছেলেটিকে কাছে টানিয়া লইল; কহিল, "মুখখানি তোর মতই ছোট বৌ, তবে কালো দেখ্‌ছি। তোর সৎমা কালো ছিলেন বুঝি?"

"হ্যাঁ; আচ্ছা, কি করি বল ত মেজদি।"

"কিসের কি? ও, বড়দির এক কথা! চল্, ঘরে চল্।"

মালতী বিষণ্ণচিত্তে দ্বিতলে নিজের শয়ন-কক্ষে গিয়া

উপস্থিত হইল। মেজবৌ তাহাকে বসিতে দিল না; কহিল, "সন্ধ্যে হয়ে গেছে, শীগগীর মুখ হাত ধুয়ে আয়। তুই আসতে অত দেরী করলি কেন? শ্যামবাজার তো দশদিনের পথ নয়; উনি মারা যেতেই এলে পারতিস।"

"রইলাম দুটো দিন। বাপের বাড়ী যাওয়া তো এই শেষ হ'ল। এতদিন বাপ ছিলেন না,—তাও ছোটমা মার মতই ভালবাসতেন; জুড়োবার স্থান একটা ছিল।"

"সে তো সত্যি কথাই; কিন্তু এদিকে ঠাকুরপো তো রেগে বসে আছে।"

"কেন, রাগ কিসের?"

"এতদিন গিয়ে বসে রইলি;—যাক্ গে, তোর ভাইটির নাম কি?"

"বিজয়কুমার।"

"এসো বিজয়, আমার সঙ্গে এসো।" বলিয়া মেজবধূ বালককে টানিয়া লইল।

মালতীর দুই ভাশুর; দুই জনেই উকীল। মালতীর স্বামী সত্যেন্দ্র মেডিকেল কলেজে পড়িতেছে। তাহারা ধনী বটে, কিন্তু বাড়ীতে লোকের সংখ্যা অল্প; কারণ, গৃহিণী উমা নিরাশ্রয় আত্মীয়বর্গদ্বারা গৃহ পূর্ণ করার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিলেন। সুতরাং অনাথ বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে সঙ্গে আনিয়া মালতী যে অপরাধ করিল, তাহা উমার কাছে একান্ত অমার্জনীয় বলিয়া বোধ হইল।

সেদিন রাত্রে সত্যেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়াই কহিল, "আবার এ আপদ জুটিয়ে আনলে কেন?" প্রায় পনরো দিন পরে স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ! এমন নীরস সম্ভাষণের জন্য মালতী একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। সে নীরবে নত-মুখে বসিয়া রহিল। সত্যেন্দ্র টেবিলের উপরে ছড়ানো জিনিসপত্রগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া কহিতে লাগিল, "নিজে তো এক পয়সা আজও উপার্জ্জন করতে পারি নি; এর মধ্যে তোমাকে বিবাহ করেছি, এই ত' বিষম সমস্যা। তার উপরে শালার অন্ন-বস্ত্রের ভারটাও যদি দাদার উপরে চাপাতে হয়, তবে আর লজ্জার সীমা থাকে না। ওকে এনে কিন্তু ভাল করলে না।"

"কোথায় রেখে আসতাম ওকে?"

"কেন, তোমার কাকারা আছেন ত'।"

"তাঁরা রাখতে চাইলেন না যে।"

"আমরাই বুঝি রাখ্‌তে বাধ্য? কোন্ আইনে শুনি?"

মালতী চুপ করিয়া রহিল।

সত্যেন্দ্র কহিল "কি?"

"কি আর? নিরাশ্রয়কে একটু আশ্রয় দিতে আমরা পারব না? আমরা তো অক্ষম নই।"

"ভয়ানক দয়াবতী হয়ে উঠেছ যে! পরের ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে সবাই দয়ার প্রচার করতে পারে। কিন্তু এ যে কত বড় অন্যায়;—যাক্ গে, কোথায় সে বিজয়কুমার?"

"সে পিসিমার ঘরে কম্বলে শুয়েছে।"

সত্যেন্দ্র শয্যায় শুইয়া পড়িয়া গায়ের কাপড়টা টানিয়া লইতে-লইতে অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, "দরিদ্রের ঘরে বিয়ে করা এক মহাপাপ।"

অন্ধকারে মালতী হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিল,—কোন কথা কহিল না।

পরদিন সকালে মালতী ভাঁড়ার-ঘরে তরকারী কুটিতেছিল; সদ্যস্নাতা বড়বধূ পিঠের উপর দীর্ঘ সিক্ত কেশগুলি ছড়াইয়া দ্বারের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মালতী চোখ তুলিতেই তিনি কহিলেন, "কি গো, ভাইকে তো আদর করে নিয়ে এলে; মায়ের শ্রাদ্ধ-পিণ্ডির খরচটা কে দেবে শুনি?" মালতী নিরুত্তর। উমা তীব্র হাস্যপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "ঠাকুরপো চার বছর ধরেই ফেল্ হচ্চে; তা না হ'লে হয় তো সংশাশুড়ীর শ্রাদ্ধের খরচটা দিত। কিন্তু টাকাটা দিতে যে কাকে হ'বে, সে আমি জানি; রোজগার করা এমনি পাপ বটে।"

মালতী নত-মস্তকে আপনার কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। মেজ বধূ চায়ের পেয়ালা ও জলখাবারের থালা আনিয়া বড়বার সম্মুখে নামাইয়া রাখিল। উমা সেদিকে চাহিয়া কহিলেন, "আধঘণ্টা হোল প্রায় স্নান করেছি,—এত তাড়াতাড়ি চা'টা করে নিয়ে এলে মেজবৌ?" মেজ বধূর নাম লক্ষ্মী। সে স্বভাবেও লক্ষ্মী বটে; তবু উমার কাছে তাহাকে কম লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত না। কিন্তু লক্ষ্মী বড়-লোকের কন্যা, মা-বাপের বড় আদরের। সে অনেক সময় বাপের বাড়ীতে থাকিত বলিয়া, উমা তাহার উপরে ইচ্ছামত অধিকার খাটাইতে পারিতেন না। অধিকন্তু, তাঁহার মেজ দেবর শচীন্দ্রের সহিত তাঁহার একেবারেই বনিবনাও হইত না। সেই ভয়েই তিনি লক্ষ্মীকে একটু এড়াইয়া চলিতেন। দরিদ্র-কন্যা মৌন-স্বভাবা মালতী তাঁহার সমস্ত ক্রোধের উপ-

লক্ষ হইয়া বিরাজ করিত। সত্যেন্দ্র মালতীর লাঞ্ছনা চোখে দেখিয়াও কোন প্রতিকার করিবার চেষ্টা মাত্র করিত না। এইজন্য সত্যেন্দ্রের উপরে উমার এক ধরণের স্নেহ ছিল; সে অবশ্য স্বার্থপরের স্নেহ।

চা আনিতে দেরী হওয়াতে উমা যখন বিদ্রূপ করিলেন, লক্ষ্মী কোন উত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়া চুপ করিয়া রহিল। উমা তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "শ্রাদ্ধের খরচটা কে দেবে, তাই জানতে এসেছিলুম।"

লক্ষ্মী কহিল, "সংসার থেকে—"

"সংসারের টাকাটা আসে কোত্থেকে শুনি!" এমন সময় শচীন্দ্রের পদশব্দ শোনা গেল। লক্ষ্মী ঘোমটা টানিয়া দিল; এবং মালতী মোটা থামের আড়ালে সরিয়া পড়িল। শচীন্দ্র আসিয়া কহিলেন, "সংসারের টাকাটা আসে ব্যাঙ্ক থেকে। টাকা তুলে আনতে হয় তো বলো, এনে দেব। কার শ্রাদ্ধ?"

উমা মুখ কালো করিয়া কহিলেন, "তোমার দাদার টাকাটা আর সংসার খরচে দেওয়া হয় না বুঝি!"

"হ্যাঁ, ডাক্তারের লম্বা-লম্বা বিল, সাহেব-বাড়ীর কাপড়ের ফর্দ্দ, আর রতন স্যাকরার খাঁই মিটিয়ে যা বাকী থেকে যায়, তার থেকে কিছু কেড়ে-কুড়ে দাদা সংসারে দেন, তা জানি। কিন্তু বাজে-খরচ দিতে তাঁকে তো কেউ বলছে না। শ্রাদ্ধে যা খরচ হ'বে, তা আমি ব্যাঙ্ক থেকে এনে দেব এখন।" বলিয়া শচীন্দ্র বাহিরে চলিয়া গেলেন। উমা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। উমার বাক্য-স্রোতের জ্বালায় সেদিন সকলের মন তিক্ত হইয়া উঠিল। যদিও সেদিন রবিবার ছিল, গৃহকর্ত্তা উপেন্দ্র অন্তঃপুরে বড় দর্শন দিলেন না। বড়-বধূর রুগ্ন ছেলে-মেয়েগুলিই মায়ের হাতে কয়েকবার প্রহার লাভ করিল।

শ্রাদ্ধ শেষ হইতে অনেক দেরী হইয়া গিয়াছিল। উমা মালতীকে ডাকিয়া কহিলেন, "বাড়ীশুদ্ধ লোকের খাওয়া শেষ হোল; বামুনদিদি এখন তোমার জন্য হাঁড়ী কোলে করে বসে থাকবে না কি? এক বাড়ীতে অমন রকম-রকম মেজাজ নিয়ে চলবে না।"

মালতী তাড়াতাড়ি কহিল, "কাজ তো হয়ে গেছে বড়দি। বিজুকে খাইয়েই আসচি। বামুনদিদি আমার ভাত একপাশে ঢাকা দিয়ে হেঁসেল তুলুক না।" বলিয়াই সে বিজয়ের আহারের আয়োজন করিতে চলিয়া গেল। উমা আপন মনে বকিয়া যাইতে লাগিলেন।

মালতী বিজয়কে খাওয়াইয়া নীচের কলঘরে হাতপা পরিষ্কার করিতেছিল, এমন সময় উপর হইতে বড় বধূর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ডাকিয়া উঠিল "ছোট বৌ!" মালতী প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিয়া উপরের দিকে চাহিল। উমা রেলিংএর কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন; কহিলেন, "ছোট-ঠাকুরপোর জলখাবারটা পিসিমার ঘরে আছে, বোন উপরে নিয়ে এসো শিগ্গীর।" মালতী তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া ফেলিল। পরণের কাপড়-খানা প্রায় ভিজিয়া গিয়াছে। নীচেই তাহার একখানা শাড়ী রৌদ্রে শুকাইতেছিল; সে কাপড়খানা ছাড়িয়া ফেলিয়া পিসিমার ঘরে আসিয়া জলখাবার গোছাইতে বসিল। এই সমস্ত কার্য্য শেষ করিতে মিনিট পনরো সময় লাগিয়াছিল; খাবারের থালাখানা হাতে লইয়া উপরের সিঁড়িতে অর্দ্ধেক উঠিয়াই সে স্বামীর উগ্র কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। মালতী থামিয়া পড়িল; শুনিল, সত্যেন্দ্র কহিতেছে, "কেন, কিসের কাজ?"

উমা উত্তর দিলেন, "কাজ তো কত! সেই থেকে ভাইকে খাওয়ানো নিয়ে সাধ্যসাধনা চলছে।"

"তবে থাক্, আমার দরকার নেই।" বলিয়া সত্যেন্দ্র বাহিরে আসিল, এবং সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল। মালতী দুইচক্ষুর ব্যাকুল অনুনয়পূর্ণ দৃষ্টি দিয়া স্বামীর চোখের দিকে চাহিল; সত্যেন্দ্র তাহার কোন মর্য্যাদা রক্ষা করিল না। বড় বধূ কক্ষমধ্য হইতেই ডাকিতে লাগিলেন, "ঠাকুরপো, অ ঠাকুরপো, খেয়ে গেলে না? আহা, খেয়েই যাও না। রাগ করে একদিন না খেয়ে কি হবে বল ত?"

সেদিন আর মালতীর খাওয়া হইল না। তাহার ত্রুটি-বশতঃ স্বামীর আহার হয় নাই, এই আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হইয়া সে আর আহারে বসিতে পারিল না। লক্ষ্মী একবার অনুরোধ করিতে আসিয়াছিল। মালতী কহিল, "না, মেজদি, আমার পেটব্যথা করছে।" উমা শুনিতে পাইয়া কহিলেন, "হ্যাঃ, পেটব্যথা বৈকি! ওগো, সব বুঝি! গেরস্তের ঘরে অত রাজকন্যার মত অভিমানী হলে চলে না!"

এই ঘটনার তিন চারিদিন পরে একদিন সকালবেলা মালতী বিষণ্ণমুখে উমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। উমা

তাহাকে দেখিয়াও কোন কথা কহিলেন না; অগত্যা মালতী মৃদুস্বরে ডাকিল, "বড়দি।"

উমা কহিলেন, "কেন ?"

"কাল রাত্রে বিজুর বড় জ্বর হয়েছে। সারারাত ঘুমোতে পারে নি। পিসিমা বল্‌ছিলেন—"

"তা আমি কি করব ?"

"একজন ডাক্তার ডাকলে হয় না ?"

"ভাল জ্বালা হ'ল দেখছি। বাড়ীর সবাই মিলে যত হাড়হাবাতে জুটিয়ে আনুক, আর আমি মরি জ্বালাতন হয়ে! আমি এমন হলে পারব না বল্‌ছি।" মালতী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। উমা অসহিষ্ণু ভাবে কহিলেন, "যাও না, একটা বন্দোবস্ত যা হয় কর গে; সবাই আমার ঘাড়ে চাপালে তো ভারি বিপদ দেখছি। কেন, ছোটঠাকুরপো কৈ ? সে পারবে না কুটুম্বকে একটু অষুদ দিতে ? তবে ডাক্তারী বিদ্যে শেখা কি করতে ?"

মালতী স্বামীর কক্ষে আসিয়া দেখিল, সত্যেন্দ্র স্নানান্তে পরিপাটী বেশ পরিয়া আয়নার সম্মুখে চুল আঁচড়াইতেছে। স্ত্রীকে দেখিয়া সে ফিরিয়া চাহিল।

মালতী আস্তে আস্তে কহিল, "একটা কথা শোন।" সত্যেন্দ্র চিরুণীখানা রাখিয়া ভিজা তোয়ালে লইয়া হাত দুখানি মুছিতে মুছিতে কহিল, "কি কথা ?"

"বিজুর বড় জ্বর হয়েছে, কাল রাত্রে।"

"তারপর ?"

"তুমি একবার দেখবে চল।"

সত্যেন্দ্র বিব্রত হইয়া পড়িল। চোখে চশমা পরিতে পরিতে কহিল, "আমি ? আমি তো এখন কলেজে যাচ্চি। দশটা বাজে প্রায়, আমার আর সময় নেই। হারাণবাবুকে ডাকাও না।"

হারাণ বাবু ইহাদের পারিবারিক চিকিৎসক। মালতী কহিল, "ডাকানো ত আমার ইচ্ছায় হ'বে না।"

"তাহ'লে আমি আর কি করব ?"

"তুমি কাউকে বল না ডেকে আনতে।"

"তা কি করে হয় ? বাড়ীর সবাই ভাব্‌বে যে বিজয়ের জন্য আমার আর ভাবনার অন্ত নেই। আমি অত আহ্লাদপনা দেখাতে পারব না। বড়-বৌই বা কি ভাববেন ?"

"কি উপায় করব তবে ?"

"বড় বৌকে বলগে।" বলিয়া সত্যেন্দ্র দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

লক্ষ্মী আসিয়া কহিল, "ছোট বৌ, আজ আর স্নান করবি না না কি! কত বেলা হয়েছে দেখ্ দেখি।" মালতী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "এই যাই; বিজুকে নিয়ে যে বড় ভাবনায় পড়লাম, মেজদি।" লক্ষ্মী কহিল, "ভাবনা কিসের ? তোর ভাশুরকে বলেছি; হারাণ বাবুকে ডাকতে লোক পাঠিয়েছেন।"

মালতী ছলছল কৃতজ্ঞতা-ভরা দুই নেত্রে লক্ষ্মীর মুখপানে চাহিয়া কহিল, "আমি তো মেজদি, তোমাকে কোন কথা বলিনি।" লক্ষ্মীর সুন্দর মুখখানি স্নিগ্ধ হাস্যে ভরিয়া গেল; সে কহিল, "ভগবান্ দুটো চোখ দিয়েছেন যে ভাই, না বল্লেও সব আপনিই দেখতে পাই।"

একদাগ ঔষধ পেটে পড়িতেই বিজয়ের জ্বর সারিয়া গেল; দ্বিপ্রহরে সে শান্ত হইয়া ঘুমাইতে লাগিল। মালতী লক্ষ্মীর কাছে গিয়া কহিল, "ভাগ্যে মেজদি, এখানে ছিলে।" লক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, "থাকছি না আর বেশী দিন।"

মালতী শঙ্কিত হইয়া কহিল, "কেন ভাই ?"

"মা পত্র দিয়েছেন, দাদা নিতে আসবেন আমাকে।"

"মাগো, আমি একা কি করে থাকব মেজদি।" মালতীর ব্যাকুলতাকে লক্ষ্মী হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল না। এই বাড়ীতে সে ছাড়া মালতী যে কত অসহায় কত বিপন্ন, সে তাহা জানিত। যদিও সে বড় বধূর বাক্যবাণ হইতে মালতীকে বাচাইতে পারিত না, তথাপি সেই মালতীর একমাত্র সান্ত্বনা-স্থল। স্বামীর কাছে তো সে বালিকা বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা লাভ করিত না। তাই লক্ষ্মী ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, "অঘ্রাণের তো শেষ এসে পড়ল। এই পৌষ মাসটা শুধু থাকব। বেশী দিন নয়।" মালতী ব্যগ্র হইয়া কহিল, "দেরী কোরো না ভাই, মাঘ মাস পড়তেই চলে এসো নিশ্চয়। আমি থাকতে পারব না।"

"শীগ্‌গীরই আসব। এই কয়টা দিন থাকিস্ সয়ে-রয়ে। তবু তো বিজু এবার একটি সঙ্গী আছে।"

মালতী ম্লানমুখে কহিল, "ওকে এনে তো আমি বড়দির চক্ষুশূল হয়েছি।" লক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, "কবেই বা তুমি বড়দির চোখের মণি ছিলে।" মালতীও হাসিল; কহিল,

"না ভাই, তামাসা নয়; সত্যি বল না, বিজুকে নিয়ে কি করব? এমন জান্‌লে"—অর্দ্ধ-সমাপ্ত কথা মুখে লইয়া মালতী থামিয়া গেল। বড়বধূ ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়া কহিলেন, "হাঁ গা, ভিজিটের টাকাটা কে দিলে শুনি?" মালতী বা লক্ষ্মী কেহই উত্তর দিল না। গৃহিণী সকল সন্ধান না লইয়া আসেন নাই। দুজনেই চুপ করিয়া আছে দেখিয়া, তাঁহার কাংস্য-কণ্ঠ সজোরে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, "তাহ'লে মেজ-ঠাকুরপো আজকাল টাকা-পয়সা ঘরে আনছে বুঝি? আমি সে খবর পাব কি করে? তাকে বলো মেজবৌ, দুটো-একটা টাকা পায় তো যেন ভূতের কাজে না দিয়ে সংসারেই দেয়। এতবড় সংসারটা অমনি চলে না। বাপের বাড়ী যাচ্চ, পরামর্শটা দিয়ে যেয়ো। আজকালের ছেলেরা বাপের কথা না শুনুক, বৌ-এর কথা শোনে।"

উমার উচ্চ কণ্ঠের কথা পার্শ্বস্থ কক্ষে উপবিষ্ট শচীন্দ্রের কর্ণে স্পষ্টই প্রবেশ করিল। তিনি বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "ভিজিটের টাকা নিয়ে যা বলবার তা আমাকেই বল না, ওদের কেন বৃথা কথা শোনাচ্চ?"

উমা অপ্রসন্ন মুখে কহিলেন, "তোমাকে তো আমি কিছু বলছি না।"

"এই যে একরাশ কথা বল্লে, সে কাকে? বাবা ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমিয়ে রেখেছেন বলেই তো আর ভিজিটের টাকা দুটোও সেখান থেকে তুলে আনতে পারি না। আর তোমার কাছে চাইতে যাওয়া মানে আবার একরাশ কথা শোনা। তার চেয়ে নিজেই দিলাম, আপদ চুকে গেল।"

"তা দাও গে না; তোমার টাকা যেমন ইচ্ছে খরচ করবে, আমার তাতে কি? কিন্তু বলি ঠাকুরপো, তুমি কি সর্ব্বক্ষণই আমার সঙ্গে ঝগড়া করবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে থাক না কি?"

"যদি থাকি ত তোমার স্বভাবের গুণেই।" বলিয়া শচীন্দ্র আপনার কক্ষে ফিরিয়া গেলেন।

ইহার কয়েক দিন পরে লক্ষ্মী বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। উমার সকল বিরক্তি ও ক্রোধের বর্ষণস্থল হইয়া, মালতী ভয়ে-ভয়ে দিন কাটাইতে লাগিল। সমস্ত দিন সে কাজকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকিত। নিজেকে কোন কথা ভাবিবার অবসর দিত না। তবুও কোন-কোন দিন তাহার মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিত; সংসারের তুচ্ছ খুঁটী-নাটী ব্যাপারে মন কিছুতেই বাঁধা পড়িতে চাহিত না। তাহার বাল্যের সুখ কল্পনাগুলি পুরাতন সঙ্গীর মত যেন প্রাণের ভিতরে ফিরিয়া আসিত; তাহাদের ব্যাকুল বাসনাকে মালতী কোন মতেই থামাইয়া দিতে পারিত না। একদিন বিকাল বেলা, সমস্ত কাজের শেষে, কাপড়খানি কাচিয়া, চুল বাঁধিয়া, মালতী দ্বিতলের শয়ন-কক্ষের বাতায়নে দাঁড়াইয়া ছিল। পৌষের অপরাহ্ণ তখন জ্যোতিঃহারা সূর্য্যের রক্ত আভায় অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখে একটুখানি খোলা জমি; সেই স্থানে কয়েকটা নারিকেল ও খেজুর-বৃক্ষ গৃহ-স্বামীর যত্নে বাড়িয়া ক্রমে আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। শীতের বাতাসে বৃক্ষ-গুলির সুচিক্কণ পত্ররাশি কম্পিত হইতেছিল। সেইখানে দাঁড়াইয়া মালতী আপনার জীবনের ব্যর্থতার বিষয় ভাবিতেছিল। তাহার জীবনের সার্থকতা কোথায়? বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ চারি বৎসর কেবল বড়বধূর বাক্য-জ্বালা সহিয়াই কাটিল; সংসারের কোন বিষয়ে তাহার তিলমাত্র অধিকার জন্মে নাই; কিন্তু গৃহের দাসীত্ব করিতে তাহাকেই প্রয়োজন। স্বামী-প্রেম বলিয়া সে যাহাকে জানে, তাহাও আজ পর্য্যন্ত একদিনের জন্য তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই; কখনও ঘটিবার সম্ভাবনাও নাই। সেই তো তাহার সকল ব্যথার মূল। সেই একটি স্থানে যদি স্নেহ ও সান্ত্বনার প্রাচুর্য্য থাকিত, তবে বড়বধূর সমস্ত অত্যাচার মালতী সহাস্য মুখে সহিতে পারিত। কিন্তু তাহারই বিশেষ অভাব ছিল। মালতী আপন চিন্তায় ডুবিয়া আছে, এমন সময়ে তাহার কর্ণে তীক্ষ্ণ আহ্বান আসিয়া বাজিল, "ছোটবৌ।"

"যাচ্চি, বড়দি।" বলিয়া মালতী ত্রস্ত ভাবে বাহির হইয়া আসিল। দেখিল বড় যা দাঁড়াইয়া আছেন,—তাঁহার হাতে একটা শালপাতার ঠোঙ্গা; আর সম্মুখে অপরাধীর মত নত-মস্তকে দণ্ডায়মান বিজয়কুমার। মালতীকে দেখিয়া বড়বধূ কহিলেন, "হ্যাঁ গা, এ কি ছোটলোকের কাণ্ড বল দেখি? চারটে পয়সা চুরি করে খেলে?"

"কি হয়েছে বড়দি?"

"কখনো কিছু কাজ করতে বলি না। চারবেলা তো গোগ্রাসে ভাতের পিণ্ডি গিলছে। আজ কি কুবুদ্ধি হোল আমার,—তোমার গুণধর ভাইকে চার আনার রসগোল্লা আনতে দিয়েছিলাম; তার থেকে ছোঁড়া চার পয়সা চুরী করেছে।"

"কে, বিজু ?"

"সে নয় তো আর কে ? যেমন শিক্ষে ! ওলি আর মানি বড় কাঁদছিল ; তাই ভাবলাম এখুনি আনিয়ে দিই ; তা, খুব শাস্তি হ'ল আমার।"

"হয় তো ঠকে এসেছে বড়দি !"

"মিছে কথা বোলো না ছোট বৌ,—ঠক্‌বার ছেলে তোমার ভাইটি নয়। বাজার করবার অভ্যেসটা তো আর নতুন নয়। নবাবের ছেলে ত নয়, যে, জন্মে দোকান-বাজার চোখে দেখেনি।" উমা নীচে গিয়া একজন ভৃত্যকে দোকানে পাঠাইয়া দিলেন। সে জানিয়া আসিয়া কহিল, দোকানী চার আনার খাবারই দিয়াছে। বিজয়কুমার যে চুরী করিয়া খাইয়াছে, আজ তাহা প্রমাণ হইয়া গেল। মালতী বিজয়কে আপনার ঘরে টানিয়া লইয়া, তাহার গালে একটা চড় বসাইয়া দিয়া কহিল, "কেন চুরি করে খেলি হতভাগা ?"

বিজয় চোখ মুছিতে লাগিল।

মালতী কাঁদিয়া ফেলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া চাপা কণ্ঠে কহিল, "আমার ভাই হয়ে চুরি করে খেলি ? রসগোল্লা খাবার জন্য প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল,—আমাকে বলিস্‌নি কেন ? আজ রাত্রে আর খেতে পাবি না ; যা, আমার কাছ থেকে সরে যা।" বলিয়া তাহাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া দিল।

বিজয় বাহির হইয়া গেল। মালতী দুঃখে কাঁদিতেই লাগিল। পিতৃমাতৃহীন অনাথ ভাইটিকে সে বড় ভালবাসিত ; তাই তাহাকে প্রহার করিয়া, সে নিজেই অশান্তি ভোগ করিতে লাগিল। সত্যেন্দ্র আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। মালতী মুখ ফিরাইয়া লইল বটে, কিন্তু সত্যেন্দ্র তাহার অশ্রুচিহ্নিত মুখ দেখিতে পাইল। সে বুঝিল, একটা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পাছে স্ত্রীর বেদনায় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, বড়বধূ বা বাড়ীর অন্য লোকের কাছে উপহাসাস্পদ হইতে হয়, সেই ভয়ে সে মালতীকে কোন প্রশ্নই করিতে পারিল না। নীরবে জামা কাপড় ছাড়িয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সে দিন রাত্রে বিজয়কুমার না খাইয়াই শুইয়া রহিল ; গৃহিণী দেখিয়াও কথা কহিলেন না। কিন্তু মালতীও যখন খাইবে না বলিল, তখন তিনি রাগিয়া উঠিলেন ; কহিলেন, "ভাই বোনে শক্তি করে উপোসী রইলে না কি ? এ সেই চুরির শোধ হচ্ছে বুঝি ? তা মন্দ নয়। কিন্তু বলি ছোটবৌ, অত রাগই বা কিসের ? রাত পোহালেই যখন সেই পিণ্ডি গিল্‌তে হ'বে, তখন আবার মান-অভিমান কেন ?"

মালতী কোন উত্তর না দিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। সত্যেন্দ্র টেবিলের নিকটে বসিয়া সিগারেট টানিতেছিল। স্ত্রীকে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া কহিল, "খেয়েছ ?"

"না।"

"যাও না, খেয়ে এসো ; রাত হয়েছে ত।"

"আজ খাব না।"

সত্যেন্দ্র অনুমান করিল, সেই বিকালের অশ্রুবর্ষণের সহিত এই উপবাসের কোন সম্বন্ধ আছে। সে নিরুত্তরে ধূমপান করিতে লাগিল। মালতী টেবিলের অপর প্রান্তে একখানা চেয়ারে গিয়া বসিল। তাহার অশ্রুক্লান মুখের দিকে চাহিয়া, সত্যেন্দ্রের মায়া হইতে লাগিল ; মৃদু স্বরে কহিল, "খাবে না কেন ?"

"ক্ষিদে নেই" বলিয়া মালতী মুখ ফিরাইল।

আবার অশ্রুবর্ষণের উপক্রম দেখিয়া, সত্যেন্দ্র আসন্ন আরাম-ভঙ্গের আশঙ্কায় বিব্রত হইয়া পড়িল ; তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া কহিল, "আজ সারাদিন খেটেছি বড়, ঘুম পেয়েছে —শুইগে। তুমি শোবে না ?"

"যাচ্ছি।"

সত্যেন্দ্র শয্যায় প্রবেশ করিয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে সুখনিদ্রায় অভিভূত হইয়া গেল। মালতী আলো নিবাইয়া অন্ধকারে বসিয়া রহিল ; মনের বেদনা স্বামীর কাছেও প্রকাশ করিতে পারিল না।

দিন পাঁচ-ছয় পরে উমার লক্ষ্মীপূজা ছিল। পূজার আয়োজন করিতে-করিতে তিনি একবার ঘর ছাড়িয়া গিয়াছিলেন ; সহসা ফিরিয়া আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষুস্থির হইয়া গেল। দেখিলেন, বিজয়কুমার পূজার ঘর হইতে পশ্চাতের দ্বারপথে পলায়ন করিতেছে। উমা করস্থিত ফুলের সাজি সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া, ভীষণ কণ্ঠে ডাকিলেন, "বিজয় !" কেহ উত্তর দিল না। আজ দুই দিন হইল মালতীর জ্বর হইয়াছে, সে ঘরে শুইয়াছিল। উমা দ্রুত চরণে মালতীর কক্ষ দ্বারে আসিয়া কহিলেন, "ওগো, শুন্‌চো ?"

মালতী ক্লান্ত স্বরে কহিল, "কি হয়েছে ?"

"হয়েছে আমার মাথা। পূজোর সাজানো নৈবেদ্য হ'তে কি যেন চুরি করে নিয়ে পালালো।"

মালতী ভীত হইয়া কহিল, "কে ?"

"তোমার বাপের গুণবান্ বংশধর, আবার কে ? মুখ পোড়া বাঁদরের ঠাকুরের ভোগে দৃষ্টি পড়েছে, এবার আর রক্ষে নেই। যেমন মা-বাপের ছেলে গা। এই বয়সেই চুরি বিদ্যেয় পাকা হয়ে উঠছে।"

"মা-বাপের কথা কি বলচ বড়দি !"

"বলছি, ভাল বাপ-মায়ের ছেলে চোর হয় না।"

মালতী বিবর্ণ মুখে উমার দিকে চাহিয়া রহিল।

"তোমার বাপ তো মিছে কথা বলতে, আর ঠকাতে কম করেন নি,—তাঁর ছেলেই তো বিজয়কুমার। সে আর ভাল হ'বে কি করে ?"

"ছেলেমানুষ, জন্মে শিক্ষা পায় নি, তাই একটা অন্যায় করে ফেলেছে। তাই বলে একেবারে আমার বাপকে গাল দিচ্ছ কেন বড়দি ?"

"ওমা গো, মুখ তো খুব বেড়েছে ছোট বৌ ! চোরের হয়ে আবার আমার সঙ্গে ঝগড়া কত্তে এলে ? একই শিকে কি না ! আচ্ছা, আজ আমিও দেখছি।"

অল্পক্ষণ পরেই গৃহিণীর আশ্রিত সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র হরিদাস বেত্রহস্তে বিজয়কে শাসন করিতে আসিল। বিজয় আর্তনাদ করিয়া উঠিল ; এবং মালতী আপন কক্ষে শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। সেইক্ষণেই গৃহ-প্রত্যাগত সত্যেন্দ্র অসুস্থ পত্নীকে এমন ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "অমন করে বসে আছ যে ?"

মালতী ব্যগ্রস্বরে কহিল, "তুমি একবার বাইরে গিয়ে দেখ। বড়দিদি তাঁর ভাইপোকে দিয়ে বিজুকে মার খাওয়াচ্ছেন, তুমি বাধা দাও গে যাও, তোমার পায়ে পড়ি।"

"আমি—?"

"পারবে না ? এতটা অন্যায় সহ্য হ'বে তোমার ? হরিকে দিয়ে বিজুকে মার খাওয়ানো,—সে তো শুধু আমাকে নয়,—আমার মা-বাপকে শুদ্ধ অপমান করা হ'বে। এ অপমান থেকে তুমি আমাদের বাঁচাও।"

সত্যেন্দ্র তাহার চিরমৌনী পত্নীকে এত কথা কহিতে শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। কহিল, "বিজু কি অন্যায় করেছে, সে অনুসন্ধান না নিয়ে—"

মালতী ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। হরিদাস বেত উঠাইয়া মারিবার উপক্রম করিয়াছে, এমন সময়ে মালতী আসিয়া দুই-হাতে ভ্রাতাকে সরাইয়া দিল। ক্রোধে, বিস্ময়ে আত্মহারা উমা কঠোর কণ্ঠে কহিলেন, "ছোটবৌ, ও কি হচ্চে ?"

"নিয়ে যাচ্চি একে। যথেষ্ট কথা শুনিয়েও তৃপ্তি হোল না বড়দি, তাই যাকে-তাকে নিয়ে এসে মার খাওয়াতে ?"

মালতীর মুখে এই কথা ? উমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তীক্ষ্ণ, কটু কণ্ঠে সমস্ত গায়ের জ্বালা ঢালিয়া দিয়া কহিলেন, "আমার ভাইপো বুঝি মানুষ নয়, ছোটবৌ ?"

"মানুষ হ'লেও, বিজুকে মারবার তার কি অধিকার ?" বলিয়া মালতী ভাইকে লইয়া চলিয়া গেল। উমা সমস্ত মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিলেন। সেদিন আহার-কালে উপেন্দ্র অন্তঃপুরে আসিলে, উমা সকালের ঘটনা তাঁহার নিকটে বিবৃত করিয়া কহিলেন, "এত অপমান আমি সইব না। আমাকে বাপের-বাড়ী পাঠিয়ে দাও।"

উপেন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, "তা তুই জা'এ যখন একসঙ্গে ঘর করতে পারচ না, তখন কাজে-কাজেই তোমাকে বাপের বাড়ী যেতে হয় ;—বৌমার তো একটা বাপের বাড়ীও নেই যে, সেখানে ছুটে গিয়ে রাগ দেখাবেন।"

আবার দিন কাটিতে লাগিল ; মালতী এখনও অসুস্থ। একদিন সে লক্ষ্মীর একখানি বিস্তারিত পত্র পাইল ; পত্রের প্রথমাংশ এইরূপ :—

"স্নেহের মালতি, তোমার শ্বশুরের পত্রে তোমার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া বড় চিন্তিত হইলাম। তিনি আমাকে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিতে লিখিয়াছেন, অথচ কেন, তাহা খুলিয়া লিখেন নাই। তোমার জ্বর ছাড়াও আর কিছু কাণ্ড ঘটিয়াছে নিশ্চয়। কি হইয়াছে ? দুটো দিন সহিয়া থাক বোন, পৌষ মাসটা শেষ হইলেই আমি আসিব। আমাদের দেশের বৌগুলির কি দশা, ভাবিয়া আকুল হইতে হয়। আমার মাসতুত ভাই অমলকে জান ত ? অমল গতবার বি-এ ফেল করিয়াছিল ; এবার তো পরীক্ষাই দিল না। নন্-কো-অপারেশন্ করিতেছে। কিন্তু তাহার চোট্‌টা ইংরাজকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই ;—অন্য দিকে সর্ব্বতোভাবে নিরপরাধ বধূ ও তাহার পিতৃ-পরিবারের যন্ত্রণার বিষয় হইয়াছে। অমল পরীক্ষা দেয় নাই, রোজগার

করে না, এ সকলই বধূর দোষ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। আমার মাসীমারা ছেলের রূপগুণ ও বংশ-মর্য্যাদার জোরে শিক্ষিতা মেয়ে ঘরে আনিয়াছিলেন। সে শিক্ষার মর্য্যাদাটা তাঁহারা খুব দিতেছেন। উপযুক্ত শিক্ষা যে মানুষের মনে অধিকতর আত্মবোধ ও সম্মান-জ্ঞান জাগাইয়া দেয়, এই সহজ কথাটা যাহারা না বুঝে, তাহাদের লইয়া বড় বিপদ। মাসীমার বাড়ী আমাদের বাড়ীর পাশেই। দিবারাত্রি তাঁহাদের ঘরে অশান্তি ও কলহ লাগিয়াই আছে। সমস্ত বিষয়েই বাক্যহীন বৌটাকে উপলক্ষ দাড় করানো হয়। অমল 'নন্-কো-অপারেশন' করিতেছে; কিন্তু সে খুব 'সুবোধ' ছেলে, পিতৃ-মাতৃভক্ত; বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নীকে অন্যায় অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার মত পৌরুষ তাহার একবিন্দু নাই। দেখিয়া-শুনিয়া দুঃখও হয়, আবার হাসিও পায়। যে ছেলে আপনার সহধর্ম্মিণীকে অযথা অপমানের হাত হইতে বাঁচাইতে পারে না, সে আবার একটা বিশাল দেশকে উদ্ধার করিবার কল্পনা স্বপ্নেও করিয়া থাকে! আমাদের দেশের ছেলেরা বিবাহ করে কেন বল দেখি? ঝি বা রাঁধুনী তো টাকা দিলেই পাওয়া যায়। তাহাই সংগ্রহ করিবার জন্য আমাদের দেশের কলেজে পাশকরা ছেলেগুলো পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে কেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।"

এই রকম তীব্র বিদ্বেষে চিঠিখানি আগাগোড়া পূর্ণ। মালতী মনে মনে কহিল, "দেবতার মত স্বামী পেয়েছ—মেজদি, তাই অত কথা বলতে পেরেছ; আমি আজ-কালের ছেলেদের দোষ দিই কি করে? আমার স্বামীও তো এ সম্প্রদায়ের বাহিরে নন্।" মালতীর জ্বর সারিয়াও সারিতেছিল না। কিন্তু মাঘমাসটা পড়িতেই লক্ষ্মীর আসা সম্বন্ধে তাহার মনে যে একটু আশা জাগিল, সেই আশার জোরে সে একটু সুস্থ সবল হইয়া উঠিল। সেদিন সকাল-বেলা মালতী রোগশয্যা ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া বসিয়া ছিল। তাহার শরীর-মন এখনও বড় দুর্ব্বল। থামের গায়ে অলস দেহভার স্থাপন করিয়া সে শীত-প্রভাতের উষ্ণ-মধুর রৌদ্রটুকু উপভোগ করিতেছিল। এমন সময় নীচে প্রাঙ্গণে বিজয়কুমারের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে রেলিংএর ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, বিজয় উমার কনিষ্ঠ-পুত্র রণুকে ক্রোড়ে লইয়া বাজার করিয়া ফিরিতেছে। তাহার দুই হাত নানা আকারের কাগজের ও শালপাতার মোড়কে পরিপূর্ণ মালতীর অজ্ঞাতে বিজয়কে আজকাল এই সব কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে বুঝিয়া, নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে মালতী বিচলিতা হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে সে দেখিল, বিজয় প্রাঙ্গণের কলতলায় বাসন পরিষ্কার করিতে-করিতে বামুনদিদির সঙ্গে কথাবার্ত্তায় মগ্ন হইয়া গিয়াছে। মালতীর মাথাটা ঘুরিতে লাগিল; সে উঠিয়া গিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। সেদিন দুপুরবেলা সে দাসীকে দিয়া বিজয়কে আপনার কক্ষে ডাকিয়া পাঠাইল। দাসী আসিয়া কহিল, "বিজয়ের ভারি জ্বর হয়েছে যে! সে মাথা তুলতেই পারচে না।" মালতী কহিল, "কোথায় সে?" দাসী কক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া চলিয়া গেল। মালতী ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল; কম্পিত পদে বারান্দা অতিক্রম করিয়া, একপ্রান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র, অন্ধকার, অপরিষ্কৃত কক্ষদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই সময়েই পাশের ঘর হইতে বড় মা'র কর্কশ কণ্ঠস্বর তাহার কানে ভাসিয়া আসিল। উমা নবাগতা ভ্রাতৃজায়াকে উদ্দেশ করিয়া কহিতেছিলেন, "জ্বালিয়ে খাচ্ছে আমাকে। আবার না কি জ্বর হয়েছে শুনছি।"

"কে ছেলেটা?"

কে-জানে কোথাকার কে? পথ থেকে ধরে এনে ঘরে ঢুকানো—তোমার নন্দাই খুব পারেন। কিন্তু তার যত তাল তো সামলাতে হয় এই আমাকেই, কি বল ভাই?"

"সত্যি তো। মা-বাপ নেই ছেলেটার?"

"হরি বল! মা-বাপেরই যদি ঠিক থাকবে, তবে আর পরের ঘরে পড়ে আছে? ওদের কি আবার 'ঘর' 'পর' আছে?"

মালতীর দুই কর্ণে কে যেন আগুন ঢালিয়া দিল। সে আর ভ্রাতার কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিল না; কাঁদিতে-কাঁদিতে আপনার ঘরে গিয়া শুইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সত্যেন্দ্র আসিয়া পত্নীকে এই অবস্থায় দেখিল। বিস্মিত হইয়া কহিল, "কাঁদচ যে অত?"

মালতী শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। দুই হাত জোড় করিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে কহিল, "কখনো কিছু চাইনি,—আজ জোড়-হাত করে বলছি তোমায়, এর একটা প্রতিকার কর তুমি। আমি আমার পিতৃ-অপমান আর সইতে পারি না যে! আমি তোমাদের বৌ, এই অধিকারে আমার বাপকে শুদ্ধু গিন্নির গাল খেতে হচ্চে। কিন্তু বৌএর কোন্ অধিকার

তোমরা আমায় দিয়েছ বল দেখি? তিলে-তিলে শুধু আমার বুক ভেঙ্গে দিচ্চ না?"

সত্যেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া কহিল—"কি করচ? কেউ শোনে যদি"—

"এখনো সেই ভয় তোমার? কেউ শোনে যদি, তোমার একটু নিন্দে হ'বে—এই ত? সেইটুকু সইবার মত তেজ তোমার নেই? তোমার সম্ভ্রম বজায় রাখতে আমার সকল দুঃখে পাথর চাপা দিয়ে রাখব, আর তুমি আমার দিকে ফিরেও চাইবে না,—এমন পাষাণ তুমি, মা গো!"

"কেন ঠাকুরপোকে অত কথা শোনাচ্চ ছোটবৌ? তোমার মরা বাপের বড় ভাগ্যি যে আমার বাড়ীতে তোমায় ঠাই দিয়াছি। কিসের জোরে অত কথা শোনাও। আজ বাড়ী ছেড়ে যাও না,—আজই নতুন বৌ বরণ করে আনি।" উমা যেন দ্বারের সন্নিকট হইতে অশনি সম্পাত করিয়া চলিয়া গেলেন। মালতী দুই চক্ষুর জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল, "আরো সহ্য করতে বল আমায়? আমাকে কি তোমরা মানুষ মনে কর না? আমি"—বলিতে-বলিতে তাহার রোগশীর্ণ, পাণ্ডুর কপোল বহিয়া তরল অগ্নি-স্রোতের মত অজস্র অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

সত্যেন্দ্র বিব্রত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল,—এমন কাণ্ড সে কল্পনাও করে নাই। মালতী অসহিষ্ণু কণ্ঠে কহিল, "তুমি যাও, তুমি আমার সামনে থেকে যাও। দেবতার আসনে যাকে বসিয়েছিলুম, তাকে এত ভীরু, কাপুরুষ দেখলে সহ্য হয় না,—তুমি যাও।" সত্যেন্দ্র বিনা প্রতিবাদে নত মস্তকে বাহির হইয়া গেল। মালতী উপাধানে মুখ চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল।

গভীর রাত্রে অবসন্ন নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া মালতী দেখিল, লক্ষ্মী তাহার শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতেছে। মালতী সেই হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল, "ফিরে এলে ভাই! আর যেয়ো না মেজদি।" লক্ষ্মী স্নিগ্ধ স্বরে প্রাণের মায়া ঢালিয়া দিয়া কহিল, "না ভাই, আমি আর তোমাকে ফেলে যাব না।" মালতী একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "বিজু কেমন আছে মেজদি, জান?"

"তার জ্বর কমেছে; তার জন্যে এখন ভেবো না,—তুমি ঘুমাও।" মালতী চোখ বুজিয়া আবার ঘুমাইতে চাহিল। কিন্তু একটু পরেই চমকিয়া চোখ খুলিল। লক্ষ্মী তাহাকে চাহিতে দেখিয়া কহিল, "কি ছোট-বৌ? কষ্ট হচ্চে?" "না।" বলিয়া মালতী আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। মিনিট দশ পরে সে সহসা ভয়ানক চমকাইয়া শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। লক্ষ্মী বাহু দ্বারা তাহার কম্পিত দেহ বেষ্টন করিয়া কহিল, "ও কি, কোথা যাও বোন? ঠাকুরপোকে ডাকব কি?" "না,—না" বলিতে-বলিতে মালতী সবেগে বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

"ছোট-বৌ।"

"মেজদি!"

"কেন অমন করচিস্ ভাই?"

"আমি এখানে থাকতে পারচি না; চারদিকে যেন আগুন লেগে গেছে।" বলিয়া মালতী নিঝুম হইয়া পড়িল। লক্ষ্মী পাখার বাতাস করিতে-করিতে তাহাকে ধরিয়া রাখিল।

সাত দিন পরে মালতীর জ্বর ছাড়িয়া গেল। লক্ষ্মীর একান্ত স্নেহ যত্নে একটু একটু করিয়া সে সুস্থতা লাভ করিতে লাগিল। একদিন বিকালবেলা বারান্দায় বসিয়া কোলের উপর কাগজ রাখিয়া সে কি লিখিতেছিল; এমন সময় লক্ষ্মী ওদিকে তাহার ঘর হইতে ডাকিল, "ছোট-বৌ।"

"কেন মেজদি?"

"আর হিমে বাইরে বসে থেকো না,—ঘরে যাও।"

"এইটুকু লিখে যাচ্চি"—

"অত আজ আর নাই লিখলে বোন, মাথা ধরবে যে।"

"না, কিছু হ'বে না।" বলিয়া মালতী দিনান্তের শেষ আভার ন্যায় একটু ম্লান হাসি হাসিল।

সেদিন রাত্রে সত্যেন্দ্র যখন শয়ন-গৃহে আসিল, মালতী উঠিয়া গিয়া তাহার পায়ের উপর মাথা নত করিয়া পড়িল। তাহার রুক্ষ কেশভার স্বামীর পদতল প্লাবিত করিয়া ছড়াইয়া রহিল। সত্যেন্দ্র তীব্র জ্বালা-মিশ্রিত সুরে কহিল, "আজ আবার ভক্তি উছলে উঠল যে?" মালতী কোন উত্তর দিল না। সত্যেন্দ্র কহিল, "সেদিন তো ভীরু কাপুরুষ বলে খুব একচোট বকে নিয়েছ,—আজ আবার কাপুরুষের পায়ের উপরে এসে পড়লে? দরকার নেই,—দরকার নেই, আমাকে আবার অত ভক্তি দেখানো কেন?"

মালতী উত্তর না দিয়া পা ছাড়িয়া দিল। সত্যেন্দ্র শয্যায় দেহ প্রসারিত করিয়া লেপটা টানিয়া লইল; এবং তাহার ঘুম আসিতেও দেরী হইল না। মালতী ঠাণ্ডা মেঝের উপরে

অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। ঘর অন্ধকার,—সেই অন্ধকারে বসিয়া সে চোখের জল ফেলিতে লাগিল। তার পর সে উঠিল; আস্তে-আস্তে পালঙ্কের কাছে গিয়া দাঁড়াইল; মুক্ত বাতায়ন-পথে শীত-রজনীর কুয়াসাচ্ছন্ন জ্যোৎস্না সতীন্দ্রের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। মালতী দৃষ্টি নত করিয়া সেই সুপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কত রাত্রি সে বিনিদ্র অবস্থায় এই মুখের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া তৃপ্তি পায় নাই! কত দিন এই সুপ্ত সৌন্দর্য্য তাহার তরুণ মনে আশার প্রদীপ জ্বালাইয়া দিয়াছে। বিবাহিত জীবনে যখন দুঃখ প্রবেশ করে নাই, তখন তাহার সমস্ত কল্পনা, সমস্ত আনন্দ, সমস্ত আশা, এই একটি ব্যক্তিকে ঘিরিয়া অবিরাম উচ্ছ্বসিত হইত। আজ সে দিন কোথায় গেল? মালতীর মনে হইল, তাহার চঞ্চল বক্ষ যেন কেহ কঠিন লৌহদণ্ডে দলিত, পেষিত করিয়া দিতেছে। সে আর চাহিয়া থাকিতে পারিল না। একবার হাত দিয়া নিদ্রিত স্বামীকে স্পর্শ করিল; তার পর ছুটিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল।

তখনও প্রভাতের রৌদ্র উজ্জ্বল হয় নাই—সতীন্দ্র লক্ষ্মীর শয়ন-কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া ব্যাকুল স্বরে ডাকিল, "মেজ বৌ!" "ঠাকুরপো না কি?" মেজ বৌ ব্যস্ত হইয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল।

"দরজাটা খোল শীগ্‌গীর—"

লক্ষ্মী দ্বার মোচন করিয়া বাহিরে আসিতেই, সতীন্দ্র ভীতি-বিবর্ণ মুখে কহিল, "সর্ব্বনাশ হয়েছে মেজবৌ,—তোমাদের ছোট বৌকে ঘরে খুঁজে পাচ্ছি না, বাড়ীতে কোথাও সে নেই।" লক্ষ্মী রেলিংটা চাপিয়া ধরিয়া, পাংশুমুখে চাহিয়া রহিল। শচীন্দ্র বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "তোমরা সব পাগল হয়েছ না কি? স্নানের ঘরে টরে"—

সতীন্দ্র মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, কোথাও নেই; সব জায়গা খোঁজ করেছি। দেউড়ীর দরজা খোলা ছিল,—ভগবান সিং নিজে বল্লে—"

লক্ষ্মী কোন মতে কহিল, "শ্যামবাজারে চলে যায় নি ত?"

শচীন্দ্র কহিলেন, "এ রকম ভাবে চলে যাওয়ার অর্থ কি? আচ্ছা দেখ্‌ছি"—বলিয়া তিনি দ্রুত-পদে নীচে নামিয়া গেলেন। যদি মালতী ঘরেই বসিয়া থাকে, এই আশায় মুগ্ধ হইয়া সতীন্দ্র আবার তাহার শূন্য শয়ন-কক্ষের দিকে ফিরিয়া গেল। প্রবেশ করিয়াই দেখিল, বিছানায় পায়ের দিকে একখানা পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। সতীন্দ্র তাড়া-তাড়ি পত্রখানা তুলিয়া লইল। খামের উপরে মালতীর সুন্দর হস্তাক্ষরে সতীন্দ্রনাথ নাম লেখা আছে। সতীন্দ্র কম্পিত হস্তে খাম ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিয়া ফেলিল; এবং বিছানার উপরে বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল;—

"শ্রীচরণেষু,—আমি তোমাদের কাহাকেও না জানাইয়া আজ রাত্রিতে গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিলাম। তোমরা আমার সন্ধান করিলেও আমাকে পাইবে না। যদি পার তবে বিন্তুকে একটু আশ্রয় দিও। অথবা তাহাকে পথের কুকুরের মত রাস্তায় তাড়াইয়া দিলেও কোন ক্ষতি নাই; কারণ, আমি যে দেশে চলিলাম সেখানে কোন দুঃখই আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। সে দেশ বহু দূরে।

"ভাবিয়াছিলাম, চুপ করিয়া সহিয়া থাকিব। কিন্তু কিছুতেই সহিতে পারিলাম না। তাই অনেক ভাবিয়া দেখিলাম। কেরাসিন মারিয়া আত্মহত্যা করা অপেক্ষা আমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছি, তাহাই আমার কাছে ভাল মনে হইল। আমি সেই পথেই যাত্রা করিলাম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাকে ঠিক স্থানে পৌঁছাইয়া দেন।

"তুমি এমেও ভাবিও না যে, বড়দিদির লাঞ্ছনা অসহ্য হওয়াতেই আমি এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বড়দিদির অপরিসীম অত্যাচারও আমি সহাস্যমুখে সহ্য করিতে পারিতাম, যদি তুমি আমার মান-অপমান, সুখ-দুঃখের প্রকৃত সাথী হইতে। তুমি তো এক দিনের জন্য তাহা হও নাই, এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার দুঃখ বোঝ নাই। তুমি সর্ব্বদাই সকলের কাছে আপনার মর্য্যাদা বজায় রাখিতে ব্যস্ত থাকিতে; কিন্তু এ কথা কখনও ভাবিয়াছ কি যে, আমারও আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান আছে; এবং আমি আকাশ হইতে মাটিতে খসিয়া পড়ি নাই; মা বাপের কোলেই আমি জন্মিয়াছিলাম, এবং তাঁহাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি তোমার পিতৃ-মাতৃ ভক্তি অপেক্ষা এক তিল কম নহে? যাহাদের কন্যাকে পত্নী-পদ দিয়াছ, সেই আমার স্বর্গস্থ পিতামাতার অপমান যখন তোমার পুরুষের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারিল না, তখন আমিই বা তোমার পরিবারের কথা ভাবিব কেন? আমার গৃহত্যাগে তোমাদের পারিবারিক সম্মানে আঘাত লাগিবে,

এই কথা ভাবিতে আজ আমার ক্রূর আনন্দ হইতেছে। নিজের জীবন বলি দিয়া আমি সকল অপমান, অবহেলার চূড়ান্ত করিয়া যাইব। আমার দিক হইতে তোমাদের সমস্ত সুখ, সম্মান, সুবিধা অক্ষুণ্ণ রাখা চাই, অথচ আমার দিকটা তোমরা একেবারেই ভাবিবে না,—এ কথাটা আমি সহ্য করিতে পারি না। মানুষ মাটী বা পাথর নয়, যে, প্রয়োজন মত তোমরা তাহা হইতে কিছু কাটিয়া লইবে, কিন্তু তাহাকে কিছুই ফিরাইয়া দিবে না। নারী দেহেও যে প্রাণ আছে, তাহা তোমরা ভুলিয়াছ ; নিজে নারী হইয়া আমি তো তাহা ভুলিতে পারি না।

"তিন বৎসর সুখ কুটিয়া কখনও আমাকে ভালবাসা জানাও নাই। স্বামী যদি নিজের সহৃদয়তা দ্বারা স্ত্রীর ভালবাসা না বুঝেন, তবে তার সাধ্য নাই—সে অবিরাম চেষ্টায় তাহাকে জোর করিয়া জাগাইয়া দিবে। আমি তোমাকে ভালবাসিয়াছি। এখনও যে সে ভালবাসার একবিন্দু হ্রাস হইয়াছে এমন নহে ; তবু আজ শেষ বিদায়ক্ষণে "বাসি" বলিয়া কোন লাভ নাই,—তাই বলিতেছি, "বাসিতাম।" প্রতিদানহীন প্রচণ্ড প্রেম দিবারাত্রি আগুনের মত আমার মনের মধ্যে জ্বলিত ; সে অগ্নিদহনে আমার ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, কর্ত্তব্য সমস্ত পুড়িয়া গিয়াছে ; আজ আমি আপনার বশে নাই। এক দিন ছিল, যখন দেবতার আসনে তোমাকে বসাইয়াও আমার তৃপ্তি হইত না ; আজ দেখিলাম তুমি সংসারের আর সাধারণ দশজনের মতই ;—সমস্ত মলিনতা, পঙ্কিলতার বীজ তোমার মধ্যে সুপ্ত আছে, তাহা আমি বুঝিয়াছি। আমার দেবতার এই মলিন মূর্ত্তি চোখে দেখিয়া, আমার আর সংসার-বাসের প্রবৃত্তি নাই। তোমাকে শ্রদ্ধা করিতে পারিব না,—তোমার সঙ্গে মিলিয়া তোমার সংসার করিব কি করিয়া ? তোমার সহিত পাছে কপটতা করিতে হয়, সেই ভয়ে তোমার জীবনের পথ হইতে সরিয়া যাইতেছি। তুমি আবার বিবাহ করিবে নিশ্চয়। কিন্তু চিরবিদায়ের দিনে তোমাকে অনুরোধ করিতেছি,—আর কাহাকেও এমন দুঃখ দিও না। আর, উপার্জ্জনক্ষম হইয়া বিবাহ করিও ; তাহা হইলে, বড়দিদির বাক্যবাণ সহিতে হইবে না। আমাকে বিবাহ করিয়া অনেক সময় বড়দিদির নিকটে অন্যায় কথা শুনিয়াছ,—সে সকল হইতে তোমাকে মুক্তি দিয়া গেলাম। তুমি না কি দেশোদ্ধারের সংকল্প করিয়া কলেজ ত্যাগ করিয়াছ ; এখন তুমি কি করিবে, সে কথায় আমার আর প্রয়োজন নাই। তবে সংসারে আমার ন্যায় হতভাগিনীর সংখ্যা বিরল নহে ; তাহাদের জন্যই বলিতেছি,—অত বড় দেশোদ্ধারের কথা না ভাবিয়া, সেই অভাগিনীদের তাহাদের অন্ধকার জীবন হইতে উদ্ধার করিতে পারিলে দেশের মঙ্গল হয়। যদি নিজের হৃদয় দিয়া কখনও নারীর হৃদয় বুঝিবার চেষ্টা কর, তবে দেখিবে, এই চিরলাঞ্ছিত জাতি মনের মধ্যে কত গভীর গোপন দুঃখ বহন করিয়া হাসিমুখে সর্ব্বাবস্থায় তোমাদের সংসার পরিচালনা করে। ঈশ্বর চরণে আমার প্রার্থনা—তিনি যেন একদিন তোমার অন্ধ চক্ষু খুলিয়া দেন।

"এখন তবে বিদায়। বৃথা আমার অনুসন্ধান করিও না। আমি বহু বহু দূর তীর্থে যাত্রা করিলাম। ইতি

মালতী।"

বিস্ময়বিমূঢ় সত্যেন্দ্রের হাত হইতে পত্রখানা কাড়িয়া লইয়া, মেজ-বৌ একনিশ্বাসে তাহা পাঠ করিয়া ফেলিয়া, মেঝেতে লুটাইয়া পড়িল। তাহার বক্ষঃস্থল মথিত করিয়া, একটী রুদ্ধ আহ্বান কম্পিত অধরে ফুটিয়া বাহির হইল, "ছোট বৌ!"

* * * *

শচীন্দ্র বিশ্বেশ্বরবাবুকে একটা অনাথ আশ্রমে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

গৃহত্যাগিনী মালতীর নাম সে গৃহে আর উচ্চারিত হইল না। উমা তাঁহার অবিবাহিতা, বয়স্থা পিতৃব্য-কন্যার সহিত সত্যেন্দ্রের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন।

পর বৎসর বর্ষা শচীন্দ্রের সহিত নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ব্যর্থ হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিল। সে এক বিপুল আশা বক্ষে লইয়া অসংখ্য তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়াছিল ; কিন্তু কাহারও সন্ধান মিলে নাই। অগত্যা কল্পনাতীত, মর্ম্মান্তিক কথাই তাহাকে বিশ্বাস করিয়া লইতে হইল। মালতীর নাম সে আর মুখে লইল না ;—শুধু একখানি পবিত্র সুন্দর মুখ চিরদিনের মত তাহার হৃদয়ে আঁকা হইয়া রহিল।

রাঁচীর পথে মোটর

[শ্রীবিনয়কুমার দাস]

প্রত্যাবর্ত্তন

১২ই জুন রবিবার—প্রাতে রাঁচী সহর ভ্রমণ করে, মোরাবাদী পাহাড়ে ওঠা গেল। এখান থেকে রাঁচী ও দোরণ্ডার কতকটা বেশ দেখা যায়। দূরের ও কাছের ছোট বড় পাহাড়, নদী, মাঠ ও তার উপর দিয়ে লাল সাদা, আঁকা-বাঁকা ও সিধা রাস্তাগুলি চমৎকার দেখায়। চূড়ায় ঈশ্বরোপাসনার জন্য একটি পাথরের খোলা মন্দির আছে। একটু নীচে পাশের দিকে একটি গুহা। তার এপাশে বাসভবন।

নামবার পথে ভক্তিভাজন জ্যোতিঃ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। নানা প্রসঙ্গের পর তিনি দুই বন্ধুর পেন্সিলে ছবি এঁকে নিলেন। আধঘণ্টার মধ্যে ছবি দু'খানি শেষ হ'ল। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর ধীর হস্তের ক্ষিপ্রতা খুব আশ্চর্য্যের। এখানে তাঁর আঁকা, অনেক বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় ও পরিচিতদের ছবি তাঁর খাতায় দেখ্‌লাম। ২০।২৫ বৎসর আগেকার আঁকা ছবিও খাতায় রয়েছে।

বিকালে জগন্নাথপুর পাহাড় ঘুরে কাঁকের দিকে যাওয়া হ'ল। কাঁকেতে সাহেবদের পাগ্‌লা গারদ ও গভর্ণমেণ্টের একটি কৃষিক্ষেত্র আছে। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল; তাই সব ঘুরে দেখ্‌বার তেমন সুযোগ পেলাম না। সন্ধ্যার অন্ধকার ভেদ করে দশ মাইল এসে, আমরা যখন আত্মীয়ের বাড়ী পৌঁছিলাম—তখন রাত্রি প্রায় ১০টা।

১৩ই জুন সোমবার—রাঁচী হ্রদ, রাঁচী পাহাড় ইত্যাদি স্থানে বেড়ান হল। রাঁচী পাহাড়ের উপর একটা পুরাতন মন্দির আছে। কত দেশ-বিদেশের যাত্রীর কত কাল থেকে এখানে যাওয়া-আসা। তাদের লিখিত সহস্র-সহস্র নামে মন্দির-গাত্র পরিপূর্ণ। ২।১টা মজার কবিতাও দেখ্‌লাম। এমন যায়গায় এসে নীরস প্রাণেও কবিত্ব-রসের সঞ্চার হয়—কবিদের কথা ছেড়েই দি'ই।

আজ হুন্‌ড্রু জলপ্রপাত দেখ্‌তে যাবার ইচ্ছা ছিল;—কিন্তু স্থানীয় বন্ধুদের মুখে শুন্‌লাম, বর্ষার আগে তাতে না কি জল খুব কম থাকে—সুতরাং মজুরী পোষাবে না। যাওয়াটা এবার স্থগিত রাখতে হল বলে, মনে হচ্ছে যেন একটা মস্ত খুঁত থেকে গেল। কয়েক বৎসর আগে একবার হুন্‌ড্রু দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সারারাত পুস্‌পুস্‌ করে

গিয়েছিলাম—কিন্তু সে যেন কত ভাল লেগেছিল। সেই জ্যোৎস্নামাখা, নিঝুম রাত দুপুরে, কুলীদের সঙ্গে মিলে পাহাড়ের জঙ্গলী রাস্তায় গাড়ীটানা,—জলপ্রপাতে স্নান,—তারই পাশে রাঁধা খাওয়া—সব যেন মনের ভৈতর আঁকা আছে। জলের সেই একটানা উদাস সুর এখনও যেন কাণে বাজছে। সে মহান্‌, গম্ভীর দৃশ্য জীবনে বুঝি কখনও ভুলতে পারব না।

১৪ই জুন মঙ্গলবার—ভোর ৪।৪৫ মিনিটের সময় আত্মীয়দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, আমরা হাজারীবাগের দিকে রওনা হলাম। যদিও প্রায় ৩০ মাইল ঘুরে যেতে হবে, কিন্তু এ পথের দৃশ্য পুরুলিয়ার রাস্তার চেয়ে না কি আরও রমণীয়; তাই একটু কষ্ট স্বীকার করেও, এদিক দিয়ে ঘুরে যাওয়াই স্থির হ'ল।

রাত্রে পেট্রল, এঞ্জিন-তেল, জল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সব বোঝাই ক'রে, ও গাড়ীটীকে ভাল রকম করে পরীক্ষা করে রেখে দেওয়া হয়েছিল। ঠিক নির্দ্ধারিত সময়ে আমরা দোরণ্ডা (রাঁচি) ছাড়লাম। ভোরের আলো ভাল করে ফুটে ওঠবার আগেই, আমরা সহরের বাইরে, দূরে—বহুদূরে গিয়ে পড়লাম।

কয়েক মাইল উঁচু-নীচু মেঠো রাস্তা দিয়ে যাবার পর, ওরমানঝির (রাঁচি থেকে সাড়ে তের মাইল) কাছ থেকে পাহাড়ের চড়াই ও জঙ্গল আরম্ভ হ'ল। দুধারে কেবল শালবন; মাঝখান দিয়ে হাজারীবাগের নির্জ্জন রাস্তা।

রাঁচি থেকে হাজারীবাগে যাবার মোটর-সার্ভিস ছাড়া, গরুর গাড়ীতেও যাত্রীরা যাতায়াত করেন। মোটরের সঙ্গে প্রায় দেখা-শুনা হয় বলে, এ রাস্তায় গরুগুলা মোটর দেখে তত ভয় পায় না। ওদিকে মোটরের শব্দে গরুগুলি ভয়ে গাড়ী ও গাড়োয়ান সমেত, হয় মাঠে না হয় পাশের খানায় নেমে যায়। বেচারীদের এই অকারণ আতঙ্ক দেখে মনটা বড়ই ক্ষুণ্ণ হয়।

এখন দেখতে-দেখতে আমরা ক্রমাগত উঁচুতে উঠ্‌তে লাগলাম। পাহাড়ের গা দিয়ে রাস্তা ঘুরে-ঘুরে গিয়েছে। অনেকটা দার্জ্জিলিংএর Cart Roadএর মত। প্রত্যেক বাঁকে নূতন ছবি। মাঝে-মাঝে রাস্তা গভীর খাদের ঠিক পাশ দিয়ে গিয়েছে। হাজার দেড় হাজার ফিট নীচে অগম্য জঙ্গল। আকাশটা আজ সকাল থেকেই মেঘলা করে আছে; সুতরাং বেশ আরামে যাওয়া যাচ্ছে। যদিও চড়ায়ে ওঠা খুবই পরিশ্রমের, কিন্তু আমাদের নিরীহ এঞ্জিনটী নিজের মনে, প্রাণপণে আপনার কাজ করে যাচ্ছে।

শুনেছিলাম, এ রাস্তায় না কি কখন কখন দিনের বেলায়ও বাঘ দেখতে পাওয়া যায়। আমরা সকলেই প্রত্যেক মুহূর্ত্তে এরকম একটা মাহেন্দ্র সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম; কিন্তু কত বন, জঙ্গল, পাহাড়, উপত্যকার ভিতর দিয়ে এলাম, তবু আমাদের দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি না—হাজার বাঘের ভেতর একটারও সঙ্গে দেখা হ'ল না। দেখা হলে আমাদের ভ্রমণ-কাহিনীটা তবু অনেকটা বীর কিম্বা করুণ রসের খোরাক পেত। কিন্তু তা' থেকে বঞ্চিত হতে হ'ল। অবশ্য এখনও পথ অনেক বাকী আছে। এই সবে ছোটাপাল্ (১৯॥০ মাইল)। যা'হক উপস্থিত এরকম একটা ঘটনার কোনই সম্ভাবনা নেই দেখে, বন্ধুরা স্বভাবের সৌন্দর্য্য সম্ভোগের দিকে বেশী মন দিলেন। সকলেই নীরব—তন্ময়!

সুন্দর জায়গা দেখে, মাঝে-মাঝে গাড়ী থামিয়ে, কিছুক্ষণ ধরে সেখানটা দেখে নেওয়া গেল। মাঝে নামতে হয়েছিল; কিন্তু এখন আমরা প্রায় ২০০০ ফিটের ওপর উঠে পড়েছি। নীচের পাহাড়গুলি মাটীর ঢিপির মত ও রাঁচী প্লেটো একটি চোস্ত সবজে মাঠের মত দেখাচ্ছে। মাঠ ও বন চেনা ভার। তখন খালি মনে হচ্ছিল——

"—আজিকে এই আকাশ-তলে
জলে স্থলে ফুলে ফলে
কেমন করে মন হরণ
ছড়ালে মোর মন—"

নীরস, শুষ্ক প্রাণের নির্জীব তন্ত্রীগুলি সজীব হ'য়ে, যেন আপনা হ'তে ঝঙ্কার দিয়ে উঠছিল। ভাবছিলাম—যাঁর সৃষ্টি এত সুন্দর, না জানি তিনি কেমন।

অনেক উৎরাইএর পর ৬।১৫ মিনিটে আমরা রামগড় (২৮ মাইল) পৌঁছিলাম। এখানে দামোদর পার হতে হ'ল। ভাল পুল আছে। গ্রীষ্মের সময় দামোদর ক্ষীণাঙ্গ—কিন্তু বর্ষার সময় তার চেহারা একেবারে অন্য রকম। কার্য্যও সাংঘাতিক। হঠাৎ বন্যা এসে গ্রামবাসীদের উদ্বাস্তু করে ফেলে বলে, সরকার থেকে টেলিগ্রাফ করবার জন্য লোকের বন্দোবস্ত আছে। ১৫ ফিটের বেশী জল হলেই, তৎক্ষণাৎ

তারে খবর দিয়ে সকলকে সাবধান করে দেওয়া হয়। কখন-কখনও অল্প বৃষ্টির পরই জল এসে ৩০ ফিট উপরে উঠে পড়ে। দামোদরের হঠাৎ বন্যা বাঙ্গালাদেশের সকলের ভাল রকমই জানা আছে।

পুলের উপর উঠে, মাঝখানটাতে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে আবার যাত্রা সুরু করা গেল। শ্রীযুক্ত ঘোষ এমন রাস্তায় মোটর চালাবার ইচ্ছাটা আর দমন করতে না পেরে, আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও Steering ধরলেন ও বাকী ২০ মাইল তিনিই চালালেন। Steeringএ বসবার ব্যস্ততা আমাদের তিন-জনেরই খুব প্রবল। সেলামতকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে বল্ল, "আপলোক আবি চালাইয়ে—ঠগ জানেসে হামকো চালানে দেনেই পড়েগা।"

এবার উঁচু-নীচু অপেক্ষাকৃত কম। দুধারে জঙ্গল, মাঝে ২।১ খানা গ্রাম—অনেক ছাড়াছাড়িতে। হিন্দুস্থানীর বাস তাতে দেখলাম বেশী। হলুদ-ছোপান কাপড় পরে গ্রাম্য বধূরা কপাটের আড়াল থেকে উঁকি মারছে। বয়স্থারা ইঁদারা থেকে জল ভরে কলসী কাঁকে করে ঘরে ফিরছে। গ্রামের ছোট ছেলে মেয়েরা মোটরের শব্দে যে যেখানে ছিল—ছুটে রাস্তায় এসে হাজির। অনেক সময় আড়াল থেকে বেরিয়ে লাফাতে-লাফাতে একেবারে গাড়ীর সাম্‌নে। তাদের চেয়ে বেশী উৎসাহ তাদের কঙ্কালসার কুকুরগুলার। গাড়ী দেখলে অন্ততঃ আধমাইলটাক ঘেউ ঘেউ করে পাশে পাশে ছুটবেই। শেষে আমাদের সেলামত মিঞা, তার পিতল দিয়ে মাথা-বাধান বেতের লাঠিটা দেখিয়ে শাসালে তবে তারা নিরস্ত হয়।

তখন গ্রামের মাঝে বুড়ো মুদী, বোধ হয় তার ঠাকুর-দাদার আমলের ছোট দোকানখানি সবে মাত্র খুলে বসেছে। বুড়ী এখনও ঝাঁট দিচ্ছে। ছোট নাতী-নাত্‌নীরা, পাশের মউয়া গাছের নীচে পাতা খাটীয়ার আশে-পাশে খেলায় ব্যস্ত। তারই পেছনে তাদের বাপ, এই মাত্র প্রথম ছিলিমটী হুঁকায় চড়িয়ে মউতাত্‌ সুরু করেছে;—গরু-লাঙ্গল পাশেই—এখনই চাষে যাবে।

তার পর আর একটা বড় জঙ্গল পার হয়ে, আমরা হাজারীবাগের কাছাকাছি এসে পড়্‌লাম। দূর থেকে সহরের ঘরবাড়ী, গির্জার চূড়া ক্রমে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল।

ভোর থেকে ৫৭ মাইল Motoring করা হয়েছে এখনও কিছু খাওয়া হয় নি—সুতরাং শ্রীমান্ দত্তের গাড়ী দাঁড় করাবার অনুরোধটা আমরা খুব আগ্রহের সহিত রাখলাম। তখন বেলা ৭৷৷০টা। সহরের ভেতর থামলে দর্শকের ভীড় বড্ড হয়—এবং তাদের একঘেয়ে হাজার প্রশ্নের জবাব দেবার ধৈর্য্য তখন আমাদের মোটে ছিল না। তা ছাড়া, আমাদের ভোজনের বহরটাতে একটু ব্যাঘাত ঘট্‌বার সম্ভাবনা; তাই সহরের বাইরে মাঠের ধারে গাড়ী রেখে আমরা খাবারের বাক্স খুল্‌লাম।

রাঁচির প্রিয়জনদের আদরের দান—সকলের কাছে অতিরিক্ত মাত্রায় আদর পেলে। আমরা পাছে আগে সুরু করি, ভয়ে শ্রীযুত—ঘোষ, গাড়ীর ভেতর থেকে নীচে লাফ্‌ দেবার সময়, তাঁর খাকির হাফ্‌ প্যান্ট্‌টা এ রকম ভাবে ছিঁড়্‌লেন যে, সূচ সূতা সঙ্গে না থাক্‌লে সহরে ঢোকা আমাদের ভার হত। কিন্তু সেদিকে তাঁর তখন লক্ষ্য ছিল না;—তাঁর নজর ছিল তখন রাঁচির "রামধারী" ময়রার ক্ষীরমোহনের দিকে! তবে, এত ক্ষতি করেও আমাদের হাত থেকে তিনি পেলেন খুব কমই!

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে (৮৷৷০টার সময়) আমরা St. Columbus College ডাইনে ফেলে, বায়ের রাস্তা দিয়ে সহরে ঢুক্‌লাম। এক ঘণ্টার মধ্যে সহরটা দেখে, স্থানীয় আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে, বাগোড়রের ডাক-বাংলোয় গিয়ে আহারাদি ও বিশ্রাম করা হবে—এরকম প্রোগ্রাম ছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ তা ঘটে উঠল না। ছোট্ট ছেলেটি থেকে বাড়ীর গৃহিণী ঠাকুরাণী পর্য্যন্ত, অন্ততঃ দুপুরটা আমাদের সেখানে থাক্‌বার জন্য অনুরোধ কর্‌লেন। তাঁদের সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করে থাক্‌তে পার্‌লাম না; সুতরাং সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁদের আতিথ্য স্বীকার করা গেল। এক ঘণ্টার মধ্যে সব তৈরি হয়ে যাবে আশ্বাস পেলাম! দিদি অনেক কাজের ক্ষতি করেও, আমাদের সঙ্গে গেলেন—সহর দেখাতে। গৃহস্বামী অফিস থেকে তখনও ফেরেন নাই—সুতরাং দিদি এই কষ্ট-স্বীকারটুকু না কর্‌লে, আমাদের বেশী কিছুই দেখা হত না।

প্রথমে আমরা "হাজারীবাগ রিফরমেটরি স্কুল" দেখ্‌তে গেলাম। দিদির তৎপরতায় শীঘ্রই ভিতরে যাবার অনুমতি পাওয়া গেল। বড় সাহেব এসে জানালেন,—তিনি বড় ব্যস্ত;

সে জন্যে সঙ্গে যেতে পারছেন না; তাই সঙ্গে একটি বাঙ্গালী বাবুকে দিলেন—দেখাবার জন্য। দুষ্ট ছেলে সংশোধন করবার জন্য গভর্ণমেণ্টের এই রিফরমেটরি স্কুল। আগে সব ক্লাসগুলি দেখা হ'ল। ইংরাজী, বাঙ্গলা, উর্দ্দু, ফার্সী ইত্যাদি ভাষা শিক্ষার জন্য আলাদা-আলাদা শ্রেণী ও তার জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষক আছেন। সব ঘরেই নৈতিক শিক্ষার জন্য নানা ভাষায় Motto টাঙ্গান আছে।

তার পর কারখানা। বাঁশ ও বেতের কাজ, লোহার চাদর ও টীনের কাজ; কামার, ছুতার ইত্যাদির কাজ; কাপড়, ঝাড়ন, তোয়ালে, বিছানার চাদর ইত্যাদি তাঁতের কাজ ও অন্যান্য অনেক রকম কারিকুরি এখানে শেখানো হয়। তা ছাড়া, কৃষিকার্য্যও তারা যথেষ্ট শেখে। সেই ক্ষেত্রের কুমড়া এত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে হয় যে, সেগুলি রাখবার জন্য সাম্নের হলে, দড়ীর সিকার আয়োজন দেখলেই বেশ বুঝ্তে পারা যায়। তাদের বোনা বড় তোয়ালে আমরা সকলে একখানা করে কিন্লাম। একটি কয়েদী ছেলে তোয়ালে ক'খানি আমাদের গাড়ীতে পৌঁছে দিলে—তার নাম সন্তোষ। জিজ্ঞাসা করে জান্লাম কল্-কাতার কলেজ স্কোয়ারের কাছে তার বাড়ী। তিন বৎসরের শাস্তিতে এখানে এসেছে। ঘরে বিধবা মা ও ছোট দুটী ভাই-বোন আছে। আমরা, তাঁদের কাছে কিছু খবর দিতে পারি কি না জান্তে চাইলুম। বেচারী ছলছল্ নেত্রে খালি মাটির দিকে চেয়ে রইল। দেখে প্রাণে বড় কষ্ট হল।

ছেলেবেলায় সঙ্গদোষে পড়ে, না জানি হয় ত এক মুহূর্ত্তের জন্য পথভ্রষ্ট হয়ে পড়াতে তাদের এই শাস্তি। এখানে কড়া শাসনের ভয়ে, এবং বাঁধা নিয়মে থেকে, এদের স্বভাব এত শান্ত হয়েছে যে, কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে থাক্লে, বেশ বুঝ্তে পারা যায়। এরা ভবিষ্যৎ জীবনে সুপথে থেকে যাতে কাজ করে জীবিকা উপার্জ্জন করতে পারে, সরকার তার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও ব্যয় করছেন। শিক্ষা-প্রণালী দেখ্বার উপযুক্ত।

রাঁচির পথে বিশ্রাম
(আরোহী—শ্রীযুক্ত ঘোষ, শ্রীযুক্ত দত্ত, শ্রীযুক্ত লেখক ও সোফার সেলামত মিঞা)

পরে তাদের Fly-proof রান্নাঘরের পাশ দিয়ে গেলাম। ওদেরই মধ্যে কয়েকজন রাঁধে। এর ভিতরেও না কি জাত-বিচারের ব্যবস্থা পুরা রকমের।

এ সব দেখে "ব্যাণ্ড" ক্লাশে এলাম। এত ছোট ছেলেদের ব্যাণ্ড বাজান এই প্রথম দেখ্লাম। কুড়ি পঁচিশটি ১০ থেকে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের ছেলেরা সে দলে রয়েছে। Band-Master টী খুব ভদ্র লোক। আলাপ পরিচয় হ'ল। যত্ন করে কয়েকটা গৎ শোনালেন। তার মধ্যে Soldiers' March টী এখনও কাণে বাজছে। শুন্লাম এদের Drill ও একটি দেখবার জিনিস।

বড় সাহেব, সঙ্গের বাবু ও অন্যান্য সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে,

আমরা সেখান থেকে বেরুলাম। এদের শিক্ষার ব্যবস্থা ও সুবন্দোবস্ত দেখে এত আনন্দিত হয়েছিলাম যে, Visitors' Bookএ লেখবার সময়, বেশী লিখলে পাছে কিছু বাদ পড়ে যায়, তাই,—এক লাইনে লিখে এলাম—It is simply splendid.

বাইরে এসে দেখি, আমাদের মোটরের চারিদিক ঘিরে কয়েকজন সাহেব। গাড়ীর হুডের পেছনে—বড়-বড় অক্ষরে কাগজে Ranchi—Calcutta লেখা ও অন্যান্য সরঞ্জাম তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আগেই ভিতরের জিনিষগুলি তন্নতন্ন করে দেখা হয়েছে;—এবার জিজ্ঞাসা-পড়া।

ক'বে বেরিয়েছি—কোন্ রাস্তা দিয়ে এলাম—রাস্তার অবস্থা কেমন—Motor Guideএর বর্ণনা, রাস্তাঘাটের মানচিত্র ও নির্দ্দেশ ঠিক মিলেছে কি না—এই সব নানা কৌতূহলসূচক প্রশ্ন করলেন। শুনলাম, তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন সেখানকার Executive Engineer—Mr. Gubbey,—আমাদের সঙ্গে যে Motor Guide ছিল তারই Editor। আমরা যতটুক যা দেখেছি, ব'লে তাঁদের খুসী করে—কাছের "জিবরাল্টর" পাহাড় দেখবার জন্য গেলাম।

পাহাড়টা প্রদক্ষিণ করে, কিছুক্ষণের মধ্যে, আবার সহরে এসে পড়া গেল। ফেরবার পথে বাঁয়ে সীতাগড় পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। শুনলাম, ওখানে একটি বড় পিঁজরাপোল আছে।

১১টার মধ্যে আবার যখন ফিরলাম—তখন গৃহস্বামী বাড়ী ফিরেছেন। স্নানাদির পর আহারে ডাক পড়ল। কিন্তু এ কি ব্যাপার! এত অল্পক্ষণের মধ্যে এমন বিপুল আয়োজন কি ক'রে সম্ভব হল, আমরা তাই ভাব্তে-ভাব্তে আর সুসময় নষ্ট না করে, বিশেষ উৎসাহের সহিত কাজে মন দিলাম। আর ওদিকে পরিবারের সকলেই তাঁহাদের সহজ, সরল আদর-যত্নে আমাদের লজ্জিত করে ফেল্‌ছিলেন। এঁদের অতিথি-সৎকারের ব্যবস্থা ও সুমিষ্ট ব্যবহার বহুদিন মনে থাক্‌বে। সহরে, আমাদের অধিকাংশ গৃহস্থদের এই সদ্‌গুণটীর যে বিশেষ অভাব দেখা যায়, তা বোধ হয় সহরের আমরা মনে-মনে কেহ অস্বীকার করতে পার্‌ব না।

একটু বিশ্রাম ও গল্পসল্পের পর, আমরা হাজারীবাগ ছেড়ে, বাগোদরে যাবার রাস্তায় এসে পড়লাম। এবার দত্ত ও ঘোষকে বঞ্চিত করে আমি Steeringএ বসেছি। লম্বা সিধে পথ—মাঝে-মাঝে অল্প চড়াই-উৎরাই ও বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলেছি। সারাদিন মেঘলার পর, এখন একটু রোদ দেখা দিয়েছে। রাস্তাটী খুব নির্জ্জন লাগ্‌ছিল। দু'একটি গ্রাম, ৩।৪ টি পুল, ও কয়েকটী মন্দির ছাড়া, উল্লেখ-যোগ্য তেমন কিছু দেখা গেল না।

একটানে ৩২ মাইল আস্‌বার পর, বাগোদরে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে আবার এসে পড়্‌লাম। এখানেও বাঘের ভয় একটু-আধটু আছে। শুন্‌লাম, ভোরের বেলায় ডাক-বাংলোর খানসামাকে কিছু দিন আগে না কি নিয়ে গিয়েছে।

১৮ মাইল পরে ৫।৪০ মিনিটে ইস্রি ষ্টেসনের কাছে এলাম। এটী ই-আই-আর গ্রাণ্ড-কর্ডের একটী ছোট-খাট ষ্টেসন। সাম্‌নে পরেশনাথ পাহাড়; প্রায় ৪৫০০ ফিট উঁচুতে একটি মন্দিরের মুকুট পরে, স্থির, গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আশে-পাশে ছোট-মাঝারী কতকগুলি পাহাড়। ইস্রি ষ্টেসন থেকে শাল-কাঠের খুব চালান হয় দেখলাম। একটা ধর্ম্মশালা আছে। ষ্টেসন-মাষ্টারটী বাঙ্গালী; আলাপ হল।

শেষে নিমিয়াঘাটের নির্জ্জন Inspection Bunglow-টীতে এসে যখন পৌছিলাম—তখন সন্ধ্যা ৬৷৷০। এটী পরেশনাথের নীচে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর। নিষ্কর্ম্মা চৌকিদার, মোটরের শব্দে চোখ মুছ্‌তে-মুছ্‌তে ছুটে এসে বাংলোর ঘরগুলি খুলে দিলে। আস্তাবলে গাড়ী রেখে, সেদিনকার মত এঞ্জিন বেচারীকে নিস্তার দিলাম—সেও বাঁচ্‌ল—ঠাণ্ডা হয়ে।

এবার আহারের চিন্তা। এ বাংলোতে খানসামা নেই; সুতরাং নিজেদের ব্যবস্থা করে নিতে হবে। চৌকিদারকে এক মাইল দূরে দোকানে পাঠান হ'ল। সে বোধ হয় এই সুযোগে, বাংলো আগ্‌লাবার ভার আমাদের উপর ন্যস্ত করে, গ্রামান্তরে গিয়ে তার ছেলেপুলেগুলিকে দেখে, রাত্রি ৯৷৷০ টার সময় ফির্‌ল। যা পাওয়া গেল, তাতে খিচুড়ী ছাড়া অন্য কিছু হল না। কিন্তু তাই খুব তৃপ্তির সহিত খেয়ে নিয়ে, শুয়ে পড়া গেল। আমাদের মধ্যে একজন—প্রত্যেক-বার তাঁর নাম করলে তিনি হয় ত চটে যাবেন—বাঘের ভয়ে, শোবার আগে, অনেক আপত্তি সত্ত্বেও, বেশ ক'রে সব জানালা

দরজাগুলি বন্ধ করে দিলেন;—এমন কি খড়খড়িগুলি পর্য্যন্ত,—পাছে বাঘ এসে পাখীর ভিতর দিয়ে লেজ গলিয়ে দেয়।

১৫ই জুন বুধবার—ঘুম ভাঙ্গল ভোর ৫টায়। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে, জলযোগ করে, পরেশনাথ পাহাড়ে ওঠবার জন্য ৬টার সময় রওনা হলাম। সোফারকে গাড়ীর তত্ত্বাবধানে রেখে, আমরা তিনজনে বেরুলাম। সঙ্গে গেল, স্থানীয় Guide "দয়াল"—বনভোজনের উপযোগী সব বোঝা নিয়ে; কারণ, উপরে কিছু পাওয়া যায় না।

মাইল খানেক বনের ভিতর অসমতল রাস্তা দিয়ে যাবার পর, চড়াই আরম্ভ হ'ল। সঙ্গের মোটা ছড়িগুলি চড়াই ওঠ্‌বার বিশেষ সাহায্য করছে না দেখে, শ্রীমান্—দত্ত বাঁশের একটি লম্বা লাঠি কাঠুরিয়াদের কাছ থেকে যোগাড় করে নিলেন—আমরাও পরে ঐ'টি পেয়েছিলাম। অবশেষে ছড়িগুলি দয়াল বেচারীর কাঁধে চড়্‌ল। ক্রমে-ক্রমে আমাদের হ্যাটগুলিও তার "বোঝার ওপর শাকের আঁটী" হ'ল।

এ পাহাড়ে ওঠবার দুটী রাস্তা আছে। একটি মধুবন দিয়ে উঠেছে, আর একটা নিমিয়াঘাট দিয়ে। গিরিডি ও ওদিককার যাত্রীরা সচরাচর মধুবনের রাস্তা দিয়ে ওঠে। শুন্‌লাম, ও-রাস্তায় না কি চড়াই বড় বেশী; কিন্তু পথ অপেক্ষাকৃত কম।

এখন আমাদের ৬ মাইল অনবরত চড়াই উঠ্‌তে হচ্ছে। চূড়ার মন্দিরটা যেন ছেলেখেলার ছোট মাটীর রথের মত দেখাচ্ছে; রাস্তার বাঁকের সঙ্গে সঙ্গে আবার কখনও বা বনের ভিতর লুকিয়ে পড়্‌ছে। আমাদের গন্তব্যস্থান ঐ চূড়ায়।

মাইল-দুই ক্রমাগত ওঠ্‌বার পর, তৃষ্ণা পেতে লাগ্‌ল। দয়াল রাস্তায় জল পাওয়া যায় বলে আশ্বাস দিয়েছিল; কিন্তু আরও এক মাইল পরে ঝরণা পাওয়া যাবে বলাতে, দয়ালের ওপর ভারি রাগ হ'ল। জল নীচে থেকে সঙ্গে নেবার বন্দোবস্ত করেছিলাম; কিন্তু দয়াল তার বোঝা কমাবার জন্য, আমাদের ওপর এই নির্দ্দয় ব্যবহার করলে। কিন্তু যখন এক মাইল আস্‌বার পরও কোন ঝরণার শব্দ পেলাম না, তখন তার কাঁধের লাঠি তারই পিঠে বসাব বলে শাসাতে, বেচারী বাল্‌তী ও গ্লাস নিয়ে হাস্‌তে-হাস্‌তে বনের ভিতর অদৃশ্য হ'য়ে পড়্‌ল। আমরা মনের মত এক-একটি পাথর দেখে বসে পড়্‌লাম।

কিছুক্ষণ পরে দয়াল ঠিক সেই রকম ভাবে হাস্‌তে-হাস্‌তে সামনে এসে দাঁড়াল—তবে বাল্‌তীর পরিবর্ত্তে হাতে বাঁশীটা হ'লে ঠিক মানাত। তার চেহারাখানিও কতকটা সেই রকমই—মুখখানি বেশ সরল—অমিয়মাখা—বয়স ১৮।১৯ হবে।

প্রচুর পরিমাণে বিস্কুট ও Bengal Canning-এর Guava জেলির শ্রাদ্ধ ও ঠাণ্ডা জলটুকু নিঃশেষ করা গেল। ননীচোরারও বিস্কুটে অরুচি নেই দেখে, সকলে ভারি খুসী হলাম।

ক্রমে-ক্রমে গভীর জঙ্গলে এসে পড়েছি। খুব বড়-বড় পলাশ, অশ্বত্থ-বট, শাল-সেগুন, আম-জাম ইত্যাদি গাছে বন পূর্ণ। মাঝে-মাঝে কলা গাছও দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। শুন্‌লাম, বড় বড় কাঁদিও হয়; কিন্তু ভোগে আসে—রাম-অনুচরদের। তা'ছাড়া, একরকম ডুমুর গাছ রাস্তার আশে-পাশে অনেক র'য়েছে। দয়াল যেতে যেতে পাকা ফলগুলি, হাত বাড়িয়ে পেড়ে খেতে লাগল। আমরাও কয়েকটা খেয়ে দেখ্‌লাম—বেশ মিষ্ট—রসাল; তবে ছোট ছোট বীজে পূর্ণ।

এইরকমভাবে চড়াইএর পর চড়াই ক্রমাগত উঠ্‌তে-উঠ্‌তে শরীর পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। যা'হ'ক, মাঝে মাঝে বিশ্রাম ও চলার পর, বেলা প্রায় ১০৷০টার সময় আমরা পরেশনাথ ডাক-বাংলোয় গিয়ে হাজির হলাম। বাংলোয় থাক্‌তে হ'লে, আগে থেকে ওপরওয়ালাদের হুকুম আন্‌তে হয়।

চূড়ার মন্দির আরও এক মাইল উপরে। তা'ছাড়া, আরও ২৫টী ছোট-ছোট মন্দির আছে পাহাড়ের চারিদিকে। সব ভাল করে দেখ্‌তে গেলে ৩।৪ দিনের কম হয় না। চূড়ার মন্দিরের কাছে জল পাওয়া যাবে না শুনে, তখন আর উপরে না উঠে—একটু নীচে পাশের দিকের পাহাড়ের এক মন্দিরে এলাম। সেটার নাম জল-মন্দির। এখানে ঠাকুরের মূর্ত্তি আছে। চূড়ার মন্দিরে খালি চরণ। ঠিক কর্‌লাম—আহারাদির পর উপরে ওঠা যাবে। প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা জলমন্দিরে এলাম। এখানটা প্রায় ৪০০০ ফিট উঁচু। কারসিয়ংএর উচ্চতার কাছাকাছি। খুব ঠাণ্ডা—শীত পেতে লাগ্‌ল। সাদা-সাদা মেঘগুলি, দূর থেকে ভেসে এসে, আমাদের ঢেকে ফেল্‌ছে।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর, মন্দিরের ভিতরে গেলাম।

বুদ্ধদেবের ৮।১০ মূর্ত্তি আছে। ধূনা-গুগ্‌গুলের পবিত্র সুগন্ধে মন্দিরটা আমোদিত। যায়গাটা মন্দিরের ঠিক উপযুক্ত—নির্জ্জন—নিস্তব্ধ—শান্তিময়। যেন সংসার ও স্বর্গের মাঝামাঝি একটি স্থান!

একটি ১৬।১৭ বৎসর বয়সের ছেলে সেখানকার পূজারী। ইতোমধ্যে তার সঙ্গে খুব জমিয়ে নেওয়া গিয়েছিল। ছেলেটী বেশ বিনয়ী। কিছুর আশা দিয়ে, আমাদের আহারাদির বন্দোবস্তটা তার কাছেই করা হয়েছিল। শীঘ্রই আহার প্রস্তুত হ'ল। তার চেয়ে আরও শীঘ্র—আমরা, পূজারীর পেতলের কানা-উঁচু থালে, মোটা লাল কাঁকুরে ভাতে কাল কলাইয়ের দাল মেখে—তৈলহীন বনগাদালী শাকভাজা সংযোগে—অতি কৃতজ্ঞতার সহিত সদ্ব্যবহার করে—পূজারী ঠাকুরের খাটিয়াখানিতে ক্লান্ত শরীরগুলি ঢেলে দিলাম। সঙ্গের খাবার আপাততঃ আর দরকারে লাগ্‌ল না।

ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের পর পূজারীকে সন্তুষ্ট করে—আমরা বেরিয়ে পড়্‌লাম। মাইলখানেক উপরে উঠে, চূড়ার মন্দিরে আসা গেল। ছেলেবেলায় একবার গিরিডী গিয়েছিলাম। সেখান থেকে এই মন্দিরটা একখানা মস্ত কাল মেঘের উপর একটি ছোট শ্বেত বিন্দুর মত দেখাত;—আজ কতদিন পরে—জীবনের কত পরিবর্ত্তনের পর—সেই মন্দিরের দ্বারে এসে উপস্থিত। বহুদিনের আশা আজ পূর্ণ!

উপর থেকে চারিদিকের দৃশ্য বর্ণনাতীত। প্রাণভরে উপভোগ করতে করতে বিশ্বপতির শ্রীচরণে মাথা আপনা হতে নত হয়ে এল। মনে হ'ল—কি যেন এক স্বপ্নরাজ্য—এখানের সবই মনোরম। সময় অল্প বলে, মনে বড় ক্ষোভ থেকে গেল।

বেলা ৩টা—নামতে সুরু করেছি। সংসারের জীব, আবার সংসারে ফিরে চল্‌লাম। এত শান্তি ধাতে সইবে কেন?

উৎরাইএর সঙ্গে গলাধাক্কা আরম্ভ হ'ল। মনে হচ্ছে—যেন এ পবিত্র রাজ্যে, পাপীদের অনধিকার প্রবেশের জন্য—শাস্তি!

দয়ালের সঙ্গে তার অনেক সুখ দুঃখের গল্প করতে-করতে ৪।৷০ ঘণ্টার যায়গায়—প্রায় ৩ ঘণ্টার মধ্যে—একটি সিধা, কিন্তু ভয়ানক ঢালু রাস্তা দিয়ে—আমরা নেমে এলাম। এ রাস্তাটী দিয়ে পাহাড়ীরা উঠে-নামে—আল্‌গা ছোট-বড় পাথরের। একটু অসাবধান হলেই, ২।৪ শত ফিট্ নীচে গড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা।

প্রায় সমস্ত দিন ধরে এই ১৬ মাইল ওঠা-নামায় শরীর অতিশয় অবসন্ন হয়ে পড়েছে। পা আর চল্‌ছে না। কোন মতে বাংলো পর্য্যন্ত টল্‌তে-টল্‌তে এসে, আমরা মোটরে বসে পড়্‌লাম।

আজ সেলামত প্রস্তুত ছিল—তার কথাই ফল্‌ল। ইঙ্গিত মাত্রেই, সে একটু মুচকে হেসে, গাড়ী ছেড়ে দিলে। পিছনে ফিরে দেখি—দয়াল বেচারী তখনও এক-দৃষ্টে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে—শুধু এক দিনের পরিচয়! চূড়ার বড় মন্দিরটী ভোরে যে রকমটা দেখেছিলাম—আবার সেই রকম ছোট্ট দেখাচ্ছে। দয়াল ও পরেশনাথ—দুজনের কাছ থেকে বিদায় নিলাম—জানি না এই বিদায় চির-বিদায় কি না!

সকলেই ক্লান্ত। কুশনটা ঠেস দিয়ে গাড়ীর কোণে-কোণে তিনজন নীরবে অর্দ্ধশায়িত। "বাবুলোক আজ ঠগ্ গিয়া"—সেলামতের মুখ আজ বিজয়-গর্ব্বে প্রসন্ন—অথচ গম্ভীর। সে নিজের মনে মনের সাধে হাকিয়ে চলেছে—ভুভু শব্দে। ছোট ২।১ পসলা বৃষ্টি হয়ে গেল। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। একটু সুস্থ হয়ে হঠাৎ শ্রীযুত— ঘোষ হাত বদল কর্‌লেন। সেলামত অগত্যা সরে বস্‌ল।

রাত্রি ৮টার সময়—যখন ভালরকম চমক ভাঙ্গল—দেখি, বরাবর Inspection-বাংলোর সুমুখে আমাদের গাড়ী এসে গিয়েছে। নিমিয়াঘাট থেকে প্রায় ৫০ মাইল এসেছি। জ্যোৎস্না রাত্রি। সুমুখে বরাকর নদী। বাঁয়ে—দূরে পঞ্চ-কোট পাহাড়। রাত্রের আহার ও নিদ্রা এখানেই হল।

১৬ই জুন বৃহস্পতিবার—মধ্যাহ্ন-ভোজনটা এখানে শেষ করে, বেলা ১৷৷০টার সময়—নদী, উপরের পুল, ও পাশের বহু পুরাতন মন্দিরগুলি পেছনে ফেলে—আমরা বরাকর ছাড়্‌লাম। শ্রীযুক্ত—ঘোষ Steeringএ। সকালটা বিশ্রাম নিয়ে ভালই হয়েছে। আমরা এখন বেশ তাজা।

এবার সেই জানা রাস্তায় এসে মিল্‌লাম। যাবার সময় এখান থেকে দক্ষিণ মুখে পুরুলিয়ার রাস্তা ধরেছিলাম। মার্টিন কোম্পানীর কুলটীর লোহার কারখানা বাঁয়ে রেখে—আসানসোল সহরের মাঝ দিয়ে—রাণীগঞ্জের সেই তেমাথা রাস্তা ছাড়িয়ে—আমরা চল্‌লাম। ক্রমে ক্রমে রাস্তা সমতল

হয়ে এল, পাহাড় অদৃশ্য হল। বড়-বড় অনেকগুলি মাঠ পার হয়ে, সন্ধ্যা ৬।২৫ মিনিটে আমরা বরাকর থেকে ৭৬ মাইল এসে—বর্দ্ধমানের কমলসায়রের পাশে দাঁড়ালাম। এখান থেকে মহারাজের চিড়িয়াখানার বাঘের গর্জ্জন শোনা যাচ্ছিল। একটু জলযোগ করে—বন্ধুর বাড়ী ও সহরটা ঘুরে—ডাক-বাংলোয় ফিরে এলাম। অনেক রাত্রে খাওয়া শেষ হল। তার পরই অগাধ ঘুম। এক ঘুমেই রাত্রি পোহাল।

১৬ই জুন শুক্রবার—৬ দিন পরে, কত দেশ ঘুরে, আজ বাড়ী ফেরা হবে। সকলেরই মুখে আনন্দের একটা আভাস দেখা যাচ্ছে;—বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত—ঘোষের। এখান থেকেই তিনি কতকটা পাঁইতারা করে নিচ্ছিলেন। কোন মতে সামনের এই ৭২টা মাইল যেতে পারলেই—ব্যস্।

সকাল ৬টায় তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিয়ে, Engine Start করা গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে সহর ছাড়িয়ে মাঠের রাস্তায় এসে পড়্লাম। এবার শেষ রক্ষার ভার পড়্ল আমার ওপর। যাবার সময় এই রাস্তাতে আমার হাতেই ২টা টিউব Puncture হয়েছিল; সুতরাং আবার বদনামের আশঙ্কায় খুব সাবধানে চালাচ্ছি। বর্দ্ধমানের ৬।১০ মিনিটের প্যাসেঞ্জার ট্রেণখানার সঙ্গে দেখা হ'ল। প্রায় ৫০ মাইল তার সঙ্গে আগু-পিছু করে আসা হচ্ছিল—শেষে ৫।৬টা Level Crossingএ দাঁড় করিয়ে আমাদের পেছিয়ে দিলে।

এ রাস্তায় নূতন তেমন কিছু দেখ্লাম না। সবই একটু পরিচিত লাগ্ছিল। মাঝে-মাঝে কয়েকটা গরু মাঠ থেকে ছুটে এসে আমাদের তাড়া করলে। তাদের ব্যাপার দেখে হাসি থামান ভার হ'ল।

ক্রমে মেমারী, বেণ্ডেল, চন্দননগর পার হয়ে, শ্রীরামপুরের Level Crossingএ এসে, গাড়ী আবার আট্কাল। ট্রেণের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নেই;—আধঘণ্টা আগে থেকে—রেল কটকের বড় জমাদার—না—না, জমিদার—"কে ওয়াড়ী বন্ধ" করে খোস্ মেজাজে পায়চারী করচেন। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। কাজে-কাজেই বেশী সময় নষ্ট না করে—আধ মাইলটাক্ ঘুরে ষ্টেশনের পাশের Tunnel দিয়ে আমরা লাইন পার হয়ে, বড় রাস্তায় এসে পড়্লাম। তখনও পাড়েজী গম্ভীর ভাবে—তার পিতল-বাঁধান খড়ম জোড়া পায়ে দিয়ে, খড়-বোঝাই গরুগাড়ীর বাঙ্গালী গাড়োয়ানটাকে আট্কে রেখে, সুর করে তুলসীদাসের দোহা শুনিয়ে, ফাঁকি দিয়ে তার পরপারে যাবার ফন্দিটা বাতলে দিচ্ছিল; এবং সঙ্গে-সঙ্গে সম্ভবতঃ নিজের ইহকালেরও কিছু ব্যবস্থায় ছিল। তার ব্যবহার দেখে শ্রীমান্ দত্ত মহাগর্জ্জন করে উঠলেন; কিন্তু বর্ষণ করবার বহুপূর্ব্বে আমরা মাহেশের রথতলার কাছাকাছি এসে পড়্লাম।

তার পর রিসড়ার ভিতর দিয়ে, চট্কলের বেপরোয়া লোকের ভীড় ঠেলে, এগুতে লাগলাম। শেষে উত্তরপাড়া, বেলুড়, লিলুয়া ও হাওড়ার পুল পার হয়ে, আমরা বেলা ১০টায় নিরাপদে কল্কাতায় ফিরলাম।

তখন আমাদের গাড়ীর লাল-ধুলা-মাখা চেহারাখানা, অদ্ভুত; বাক্স, টায়ারের গাদা ও সারি-সারি পেট্রল টানের বহর—আমাদের সবেমাত্র শেষ-করা লম্বা পাড়াটার বেশ ভাল রকম আভাস দিচ্ছিল।

বঙ্গে সুলতানী আমল *

[অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ]

প্রথম প্রস্তাব

বাঙ্গালার ইতিহাস কয়েকখানি লিখিত হইয়াছে,—শীঘ্রই আরও দুই-একখানি হয় ত হইবে। কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস আলোচনা করিতে বসিলে মনে হয় না যে, বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিবার সময় এখনও আসিয়াছে, বা দু'দশ বছরের মধ্যে আসিবে। বাঙ্গালার ইতিহাসের জনসাধারণের দিকটার তো অতি সামান্য অংশই এ যাবৎ জানা গিয়াছে;—রাজা-রাজড়ার দিকটায়ও এত বড়-বড় ফাঁক রহিয়া গিয়াছে যে,

* মদীয় Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal (Calcutta Universityর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের অন্যতম Griffith Memorial Prize প্রাপ্ত) অবলম্বনে লিখিত।

ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস বছর পঁচিশেকের জন্য স্থগিত থাকাই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। প্রাক্-মৌর্য্য আমলে বাঙ্গালার অবস্থা কি ছিল, তাহা আমরা জানি না। মৌর্য্যদের সময়কার পূর্ব্ব-ভারতের অবস্থা সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান বড় বেশী নহে। গুপ্ত-রাজারা বাঙ্গালা দেশটার বেশ বিলি বন্দোবস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন; তাহার কতক-কতক প্রমাণ মাত্র গত ১০-১১ বৎসরের মধ্যে বাহির হইয়াছে। গুপ্তদের পতন-কালের কথা, রাজা শশাঙ্কের কথা, আদিত্য সেনের বংশের কথা আমরা সামান্য মাত্র জানি। তার পরে আবার শতাব্দীব্যাপী অন্ধকার। গৌড়ের প্রজারা গোপালকে রাজা নির্ব্বাচিত করিল, পাল-বংশের উত্থান হইল। পাল-বংশের রাজত্বের কঙ্কালটা ছাড়া বড় বেশী কিছু আমাদের জানা নাই। পালদের শেষ দশায় চন্দ্র, বর্ম্ম, সেন-বংশ কি করিয়া বাঙ্গালায় উঠিল, পড়িল,—তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তার পরে মুসলমান আসিয়া বাঙ্গালায় আসন পাড়িয়া বসিলে পর, যতদিন দিল্লীর সম্রাটের কর্ত্তৃত্ব বাঙ্গালা দেশের উপর ছিল, ততদিনকার বাঙ্গালা দেশের কথা সামান্য কিছু কিছু জানা যায়। হিজরি প্রায় ৭৪০ অব্দে (১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে) বাঙ্গালা দেশ সুলতানদের নায়কতায় দিল্লীর অধীনতা হইতে মুক্ত হয়। এই সময় হইতে প্রায় ১৬১২ খৃঃ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত, বাঙ্গালার ইতিহাস বলিয়া যাহা পরিচিত আছে, তাহার অনেকখানিই ফেলিয়া দিয়া, নূতন করিয়া বাঙ্গলার ইতিহাস লিখিতে হইবে। এই সময়ের জন্য আমাদের প্রধান অবলম্বন—১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত গোলাম হোসেন-প্রণীত রিয়াজ-উস্-সালাতিন্। বাঙ্গালা দেশের জল বায়ুর গুণে, কাগজের লেখা পুঁথিকে এখানে বিশেষ যত্ন ভিন্ন দুই-তিন শত বৎসরের বেশী টিঁকাইয়া রাখা কঠিন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে গোলাম হোসেন যখন তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন, তখন বিশ্বাসযোগ্য সমসাময়িক গ্রন্থকারের লেখা ইতিহাস বিশেষ পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ বর্ত্তমান কালের গবেষণায় পদে-পদে গোলাম হোসেনের সন-তারিখে ভুল বাহির হইতেছে।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ষ্টুয়ার্ট সাহেব, প্রধানতঃ রিয়াজ অবলম্বনে, তদীয় বিখ্যাত বাঙ্গালার ইতিহাস প্রণয়ন করেন। বহু দিন পর্য্যন্ত তাহাই বাঙ্গালার মুসলমান আমলের প্রামাণ্য ইতিহাস বলিয়া আদৃত ছিল;—এখনও ষ্টুয়ার্ট সাহেবের গ্রন্থের আদর কম নহে। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এক দৈব ঘটনায় বাঙ্গালায় ইতিহাস-আলোচনার পথ প্রশস্ত হইয়া যায়। এই বৎসর আগষ্ট মাসের শেষ ভাগে, কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত দিনহাটা নামক স্থানের তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে-কুণ্টেশ্বরী দেবীর মন্দিরের নিকটে, ধুর্ল্লা নদীর তীরে বঙ্গের ৬৯৩ হিঃ হইতে ৮০০ হিঃ (খৃঃ—১২৯৩—১৩৯৭) পর্য্যন্ত সময়ের বঙ্গের সুলতানগণের ১৩৫০০ রৌপ্য-মুদ্রা পাওয়া যায়। জলের স্রোতের বেগে নদীর পাড় ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তাহাতেই, পিত্তলের ঘটিগুলিতে এই মুদ্রাসমূহ রক্ষিত ছিল, তাহা লোক-লোচনের গোচরে আসে। কোচবিহার রাজ এই মুদ্রাগুলি দিয়া রাজস্ব প্রদান করেন; এবং এইরূপে এই মুদ্রা-গুলি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হয়। পণ্ডিতগণের দৃষ্টি এই প্রাচীন মুদ্রাগুলির প্রতি আকৃষ্ট হইলে, সরকার বাহাদুর এই মুদ্রাগুলি হইতে ঐতিহাসিক হিসাবে মূল্যবান্ দুই প্রস্থ মুদ্রা কলিকাতা টাঁকশালের জন্য এবং এসিয়াটিক সোসাইটির চিত্রশালার জন্য বাছিবার ভার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উপর অর্পণ করেন। রাজেন্দ্রলাল এই বাছাই কার্য্য সুসম্পন্ন করেন; এবং ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (৪৮০ পৃঃ) এই মুদ্রাগুলির এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত করেন। টাঁকশাল ও এসিয়াটিক সোসাইটির জন্য মুদ্রা-নির্ব্বাচন শেষ করিয়া, কর্ণেল গুথ্রি নামক এক ভদ্রলোকের জন্য পুনরায় অবশিষ্ট মুদ্রাগুলি পরীক্ষা করিয়া রাজা রাজেন্দ্র-লাল আরও প্রায় এক হাজার মুদ্রা বাছাই করেন। কর্ণেল গুথ্রি এই মুদ্রাগুলি কিনিয়া লয়েন।

কর্ণেল গুথ্রির এই মুদ্রা-সংগ্রহ অবলম্বন করিয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত মুদ্রা-তত্ত্ববিৎ এডোয়ার্ড টমাস্ তাঁহার Initial Coinage of Bengal নামক পুস্তক রচনা করেন। মুদ্রা-তত্ত্বের দিক হইতে বাঙ্গালার মুসলমান-যুগের ধারাবাহিক ইতিহাস-রচনার এই প্রথম উদ্যম। টমাস সাহেব বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। এক হিসাবে তাঁহাকেই Father of Bengal Numismatics বা বঙ্গীয় মুদ্রা-তত্ত্বের জন্মদাতা বলা যায়। তাঁহার রচিত Chronicles of the Pathan Sultans of Delhi অতি প্রামাণিক ও মূল্যবান্ গ্রন্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যই অতিমাত্রায় আত্মপ্রত্যয় জন্মাইয়া একটু দোষের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। মুদ্রা-তত্ত্বের আলোচনা করিতে গেলে, অত্যন্ত অবিশ্বাসী

হুঁসিয়ার মন এবং সদা-জাগ্রৎ চক্ষু দরকার। মুসলমান-যুগের মুদ্রাগুলি ঐতিহাসিক হিসাবে মূল্যবান্ শুধু এই জন্যই যে, তাহাদের কিনারায় ঘুরাইয়া টাঁকশালের নাম এবং তারিখ লেখা থাকে। এক রাজার সম্পূর্ণ এক প্রস্থ মুদ্রা পাইলে, তিনি কোন্ বৎসর হইতে কোন্ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন, তাহা অতি সহজেই ঠিক করা যায়। কিন্তু মুদ্রার কিনারাগুলি পড়া এক বিষম আয়াসসাধ্য ব্যাপার। শিল্পীর অসাবধানতায় প্রায়ই এই কিনারার লেখাগুলি কাটিয়া যাইত। হয় ত ছাঁচটি যত বড়, রূপার পাতখানা তাহা হইতে ছোট লওয়া হইত; কাজেই কিনারার লেখাগুলি মুদ্রায় উঠিতই না, বা মাত্র অর্দ্ধেকখানি উঠিত। অথবা, ছাঁচের উপর হাতুড়ীর
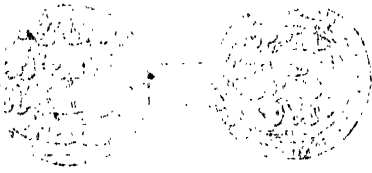
আলি শাহের মুদ্রা

ঘা মারিবার সময়, ছাঁচ একদিকে একটু সরিয়া গেল;—কিনারার লেখার একধার পূরাই উঠিল, আর একধার মোটেই উঠিল না। কারিগরের অক্ষমতায় অথবা কেরদানিতে অনেক সময় লেখাগুলি এমন জটিলতর হইয়াছে যে, তাহা সঠিক পড়িতে গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হয়। এই সকল গোঁদের উপর আবার এক বিষম বিস্ফোটক জুটিয়াছিল। টাকা তো প্রচার করিতেন রাজা; কিন্তু তাহা ভাঙ্গাইয়া লইতে হইত পোদ্দারের নিকট হইতে। পোদ্দার টাকা ভাঙ্গাইয়া এক ঝুড়ি কড়ি দিত;—জীবন-যাত্রার সাধারণ খরিদ-বিক্রি ঐ কড়ি দিয়াই হইত। ইলিয়াস শাহের আমল হইতে (৭৪৪ হিঃ=খৃঃ ১৩৪৩) পোদ্দারগণ ছেনি দিয়া না কাটিয়া কোন মুদ্রাই ভাঙ্গাইয়া দিত না। কাটিয়া পরীক্ষা করিয়া যখন দেখিত যে রূপা খাঁটিই, তখন ভাঙ্গাইয়া কড়ি দিত। বহুবার কাটিয়া-কাটিয়া কোন-কোন মুদ্রার এমন অবস্থা হইয়াছে যে, কিনারার লেখা দূরে থাক্, মাঝের লেখাগুলিও পড়িয়া উঠা কঠিন; এবং কোন্ রাজার মুদ্রা তাহাই ঠিক করিতে প্রাণান্ত হয়!

এইখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, এই মুদ্রা কাটিয়া পরীক্ষা করার প্রথা বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা দেশেরই প্রথা। অন্য কোন দেশের পোদ্দার এইরূপ বর্ব্বরের মত মুদ্রা কাটিয়া-কাটিয়া মুদ্রাগুলির মুদ্রাত্ব লোপ করিয়া দিত না। ইলিয়াস শাহের আমলী হইতেই এই প্রথা কি করিয়া বাঙ্গালা দেশে উদ্ভূত হইল, তাহার কারণ এতদিন রহস্যাবৃত ছিল। ইলিয়াস শাহের উপরেই পোদ্দারগণের যেন বিশেষ রাগ দেখা যায়। তাঁহার মুদ্রাগুলিকে এমন নির্দ্দয় ভাবে কাটা হইয়াছে যে, দেখিলে দুঃখ হয়। সহসা সেদিন পোদ্দারগণের এই বর্ব্বরতার কারণ আবিষ্কার করিয়াছি। কিছুদিন হইল, মুদ্রা তত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত এইচ্, ই, ষ্টেপলটন্ সাহেব (H. E. Stapleton) ইলিয়াস শাহের ফিরোজাবাদে মুদ্রিত একটি অক্ষত মুদ্রা পরিষ্কৃত করিবার জন্য আমার নিকট দেন। মুদ্রাটির গায়ে কতকগুলি সবুজ বর্ণ ঝঙ্কার ও ময়লা লাগিয়া ছিল। রাসায়নিক উপায় অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে, সামান্য আঘাতে ময়লাগুলি ছাড়ান যায় কি না সেই উদ্দেশ্যে, বাঁধা মেঝেতে বার-কয়েক ঠুকিতেই মুদ্রাটি কাটিয়া গেল; এবং তাহার মধ্য হইতে কাল বর্ণের এক রকম গুঁড়া বাহির হইয়া পড়িল। একটু চাপিতেই, মুদ্রাটি কাটলের রেখায় ফাঁক হইয়া গেল; এবং দেখিলাম যে, মুদ্রাটির মধ্যভাগ কাল বর্ণের কি এক পদার্থে পরিপূর্ণ। মুদ্রাটি এমন সুকৌশলে নির্ম্মিত যে, উপরে পাতলা রূপার পাত দেওয়া এবং মধ্যে ঐরূপ কাল বর্ণের পদার্থ! যেন কোন আধুনিক কারিগর সুকৌশলে কোন হীনতর ধাতুর উপর গিল্টি করিয়া মুদ্রাটি তৈয়ার করিয়াছে। ঢাকা কলেজের রসায়নের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম এ মহাশয় পরীক্ষা করিয়া বলিয়া দিলেন যে, ভিতরের কাল পদার্থটি তামা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইলিয়াস শাহের মুদ্রার উপর পোদ্দারগণ এত সন্দিগ্ধ কেন ছিল,—এই মুদ্রাটির আবিষ্কারে এতদিনে সেই রহস্য ভেদ পাওয়া গিয়াছে। হয় স্বয়ং ইলিয়াস শাহ অথবা তাঁহার আমলে কোন কৌশলী জালিয়াৎ এইরূপ কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিল। সেই হইতে পোদ্দারগণ সন্দিহান হইয়া, মুদ্রা কাটিয়া তাহার অভ্যন্তর পরীক্ষা না করিয়া, আর কোন মুদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিত না।

পোদ্দারগণের এই ব্যবহারে, এবং পূর্ব্বোল্লিখিত কারণ-

সমূহে, এই আমলের মুদ্রাগুলির কিনারার লেখা পাঠ করা এক বিষম ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, মুদ্রার পাঠোদ্ধার করিতে আরবী ভাষায় বিশেষ বিদ্যার আবশ্যক করে না। রাজার নামগুলি ভিন্ন, মুদ্রাগুলির পাঠের লিপির বয়েদ সমুদায়ই প্রায় অভিন্ন। আরবী ভাষায় অক্ষর-পরিচয় থাকিলেই, এবং একটি মুদ্রার বয়েদ ভাল করিয়া আয়ত্ত করিয়া লইতে পারিলেই, প্রায় সমস্ত মুদ্রাই অভ্রান্ত রূপে পাঠ করা যায়। এই অবস্থায়, মুদ্রা পাঠ ব্যাপারে, দিগ্‌গজ আরবী পণ্ডিত, এবং বর্ণপরিচয়-সম্বল অনুসন্ধিৎসুর অবস্থা প্রায় একই রকমের। চাই কেবল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি; এবং সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইবার পূর্ব্বে, কোন পাঠকে প্রকৃত পাঠ বলিয়া স্বীকার না করা। টমাস সাহেব অগাধ পাণ্ডিত্য-লব্ধ আত্ম-প্রত্যয়ের বলে অনেক সময়ে প্রথম দৃষ্টিতে যে পাঠ করিয়াছিলেন, অনেক স্থলে সেই পাঠই প্রকৃত বলিয়া ধরিয়া লইয়া ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। ফলে তাঁহার মূল্যবান্ রচনা Initial Coinage of Bengal গ্রন্থে অনেক ভ্রম প্রমাদ ঢুকিয়া পড়িয়াছে এবং পরবর্ত্তী কর্ম্মিগণ সেই সকল ভ্রম-প্রমাদ অম্লান বদনে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া, এই যুগের ইতিহাসে বিষম গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

টমাসের পরে এই ক্ষেত্রে যাহারা কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্লকম্যান্ সাহেব প্রধান। তিনি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৩য় সংখ্যা বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় Contributions towards the History and Geography of Bengal নামক মূল্যবান্ ও সুদীর্ঘ প্রবন্ধে এই যুগের ইতিহাস পুনর্ব্বার আলোচনা করেন; এবং ইতিহাসে অনেক নূতন তথ্য সংস্থাপিত করিয়া যান। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৩য় সংখ্যা পত্রিকায়, তিনি আর এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রস্তাব, এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় সংখ্যায় এই সম্বন্ধে তৃতীয় প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করেন। এই তিনটি প্রবন্ধ ব্লকম্যান সাহেবের অমর কীর্ত্তি। তিনি প্রচলিত পারস্য ভাষায় লিখিত ইতিহাস, মসজিদ ও অন্যান্য পুরাতন ইমারতের শিলালিপি, ও প্রাচীন মুদ্রা মিলাইয়া তাঁহার নিবন্ধগুলি রচনা করিয়াছিলেন। প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী অতীত হইতে চলিল; কিন্তু ব্লকম্যান সাহেব বাঙ্গালার মুসলমান আমলের ইতিহাসের আলোচনাকে যেখানে রাখিয়া গিয়াছেন, আজও তাহা প্রায় সেখানেই আছে। এই ক্ষেত্রে আর কোন শক্তিমান্ কর্ম্মীর আবির্ভাব হয় নাই। নূতন শিলালিপির ও মুদ্রার আবিষ্কারও আর বড় বেশী হয় নাই। এই বিদ্যার চর্চ্চাতেই যেন ভাটা পড়িয়া গিয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই আমলের একশত মুদ্রা খুলনা জেলায় পাওয়া যায়। এই মুদ্রাগুলির আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শ্রীযুক্ত নেভিল সাহেব ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার শেষ সংখ্যায় প্রকাশিত করেন। ময়মনসিংহ জেলায় ইনায়েতপুর নামক স্থানে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে, ঢাকা জেলায় পুরিন্দা নামক স্থানে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে, আসাম নাওগাঙ্গ জেলার রূপাইবাড়ী নামক স্থানে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এবং ১৯১৩, ১৯১৬ ও ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট জেলায় কান্তবির মহল্লা, কাঙ্করিবাগ ও বাশাইল নামক স্থানত্রয়ে এই যুগের বহু পুরাতন মুদ্রা পাওয়া যায়। এই সকল মুদ্রা শিলংএর মুদ্রা-পেটিকায় (Coin Cabinet) রক্ষিত হইয়াছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত এ, ডবলিউ, বোথাম ও আর, ফ্রিয়েল্ সাহেবদ্বয়ের সম্পাদকতায় শিলং মুদ্রা-পেটিকার এক বর্ণনা-মূলক তালিকা বাহির হইয়াছে (Supplement to the Catalogue of the Provincial Cabinet of Coins, Assam)। তাহাতে এই মুদ্রাগুলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, মুদ্রা-পেটিকার বিবরণমূলক তালিকা (Coin Catalogue) যে রূপ সতর্কতা ও নিপুণতা সহকারে সম্পাদিত হওয়া উচিত, এই তালিকা তেমন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের মুদ্রা-পেটিকায় এই যুগের অনেক মুদ্রা রক্ষিত হইয়াছে; এবং মুদ্রা-পেটিকার বিবরণমূলক তালিকার ২য় ভাগে (১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত), ১২৯ হইতে ১৮২ পৃষ্ঠায়, বাঙ্গালা দেশের মুদ্রাগুলির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। মূল পুস্তকখানির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নেল্‌সন রাইট সাহেব। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের মুদ্রার অধ্যায়টি সার জেমস্ বৌর্ডিলন কে-সি-এস্-আই মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত। এই অধ্যায়ে স্থানে-স্থানে এত ভ্রম-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে যে, এই অধ্যায়টি আবার লিখিত হইলে ভাল হয়।

প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে এই যুগের ৩৪৬টি মুদ্রা ঢাকা জেলার কোন এক গ্রামে আবিষ্কৃত হয়; এবং নির্দ্দেশী-করণ

ও বর্ণনার জন্য আমার নিকট প্রেরিত হয়। প্রায় ছয় মাসের কঠোর পরিশ্রমে সমস্ত মুদ্রার যথা-শক্তি পাঠ উদ্ধার করিয়া উঠিয়া দেখিলাম যে, প্রথম যুগের স্বাধীন সুলতানগণের ইতিহাস উদ্ধারের অতি মূল্যবান্ উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ৩৪৬টি মুদ্রার মধ্যে কোন্ রাজার কতটি, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১।	গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহ	১
২।	ফকরুদ্দিন মবারক শাহ	১
৩।	শামসুদ্দিন ইলিয়াস্ শাহ	৩৩
৪।	ইলিয়াস্-পুত্র সেকেন্দর শাহ	৬০
৫।	সেকেন্দর-পুত্র গিয়াসুদ্দিন আজাম শাহ	৭২
৬।	আজাম-পুত্র সইফউদ্দিন হাম্জা শাহ	১৪
৭।	শিহাবুদ্দিন বায়াজিদ শাহ	৩৪
৮।	বায়জিদ-পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ	৫
৯।	দনুজমর্দ্দন দেব	৩
১০।	মহেন্দ্র দেব	১
১১।	জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ	১২২
	মোট	৩৪৬

এই যুগের মুদ্রা লইয়া যাঁহারা নাড়া-চাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা এই তালিকা দেখিলেই বুঝিবেন যে, ঐতিহাসিক হিসাবে এই মুদ্রাগুলির গুরুত্ব কিরূপ। হামজা ও বায়জিদ শাহের মুদ্রা তো এ পর্য্যন্ত অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ছিলই; অন্যান্য রাজারও এত মুদ্রা একসঙ্গে সেই কোচবিহারের ১৩৫০০এর পরে আর বড় পাওয়া যায় নাই। বায়জিদ শাহের অস্তিত্ব লইয়া এ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক মহলে নানা বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। তিনি সত্যই ছিলেন, না, রাজা গণেশই এই নাম ধরিয়া মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন,—এই তর্কের শেষ এখনও হয় নাই। বায়াজিদ শাহের পুত্র ফিরোজ শাহের মুদ্রার আবিষ্কারে আশা করি এই তর্কের নিরসন হইবে। এইখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, বায়াজিদ-পুত্র ফিরোজ শাহের নাম এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ইতিহাসে তাঁহার নামের একেবারেই উল্লেখ নাই। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার কোন মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয় নাই।

দনুজমর্দ্দন দেবের তিনটি ও মহেন্দ্র দেবের একটি মুদ্রা এই আবিষ্কারের মধ্যে থাকায়, এই রহস্যময় রাজা দুইজনের বিষয় পুনরায় আলোচিত হইতে পারিবে। ১৩২৫ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে আমি দনুজমর্দ্দন দেব ও মহেন্দ্র দেব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু তখনও, এই রাজাদ্বয় প্রকৃত পক্ষে কে, তাহার আভাস পাই নাই। কিছু পরেই পাইলাম। এখন আশা করি নিঃসন্দিগ্ধরূপে দেখাইয়া দিতে পারিব যে, রাজা গণেশই দনুজমর্দ্দন নাম ধারণ করিয়া বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন; এবং তৎপুত্র যদুই মহেন্দ্র দেব নাম ধারণ করিয়া পিতৃ-সিংহাসনে উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। পরে তিনি মুসলমান হইয়া জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ নাম ধারণ করেন। মালদহে পরলোকগত রাধেশচন্দ্র শেঠ কর্ত্তৃক দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্র দেবের মুদ্রার আবিষ্কারের, ও তাহাদের ভ্রমসঙ্কুল পাঠ প্রকাশের অব্যবহিত পরে, যে সকল মহাত্মা দেববংশ নামক প্রাচীন পুঁথির আবিষ্কার করিয়া—মহেন্দ্র দেব দনুজ-মর্দ্দনের পিতা এবং তাঁহারা কায়স্থবংশীয় বলিয়া স্থির করিয়া-ছিলেন,—যাঁহারা কুলগ্রন্থ হইতে দিনাজপুর রাজ্যের সহিত রাজা গণেশের সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিলেন,—

গাজী শাহের মুদ্রা

তাঁহারা এইবার কি বলেন, দেশবাসিগণ তাহারও বিচার করিতে পারিবেন।

এই ৩৪৬টি মুদ্রার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক মুদ্রাটি জালা-লুদ্দিনের রাজত্বের শেষ বৎসরের, অর্থাৎ ৮৩৫ হিঃ = ১৪৩১ খৃষ্টাব্দের। এই বৎসরই বোধ হয় মুদ্রাগুলি মাটির নীচে পোতা হইয়াছিল। অধিকাংশ মুদ্রাই খুব ভাল অবস্থায় আছে। অল্প কয়েকটি রাসায়নিক উপায়ে পরিষ্কার করিতে হইয়াছিল। এইখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, শ্রীযুক্ত এইচ্, ই, ষ্টেপলটন সাহেব এই আমলের অনেক-গুলি মুদ্রা ঢাকায় বসিয়া ধীরে-ধীরে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার নিকট দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্র দেবের অনেকগুলি মুদ্রা আছে। তিনি এই মুদ্রাগুলি অবলম্বনে

প্রবন্ধ লিখিতে ব্যাপৃত আছেন। প্রবন্ধের প্রথম অংশ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ছাপিতে গিয়াছে। দ্বিতীয় অংশ লিখিত হইতেছে। ষ্টেপলটন্ সাহেবের সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি বাহির হইলে এই যুগ সম্বন্ধে আরও অনেক নূতন সংবাদ পাওয়া যাইবে।

৭৪২ হিঃ = ১৩৪১ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালার ইতিহাসের যবনিকা উত্তোলিত হইলে দেখা যায়, ফখরুদ্দিন মবারক শাহ সোনারগাঁয়ে সুলতান হইয়া, এবং আলাউদ্দিন আলি শাহ ফিরোজাবাদ বা পাণ্ডুয়ায় সুলতান হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন। পাগ্‌লা রাজা মুহম্মদ তুঘ্‌লক্ তখন দিল্লীর সম্রাট। বাঙ্গালা দেশটা তখন দুই বিভাগে বিভক্ত ছিল। পূর্ব্ব বিভাগের রাজধানী তখন সোনারগাঁ এবং পশ্চিম-বিভাগের রাজধানী ছিল গৌড় বা লক্ষ্ণাবতী। আলি শাহ রাজধানী গৌড় হইতে ফিরোজাবাদ বা পাণ্ডুয়ায় স্থানান্তরিত করেন। এই সময়ের ইতিহাস অত্যন্ত গোলমেলে। সমস্ত বিবরণের বিশদ ভাবে আলোচনা করার আবশ্যকতা নাই। মোট কথাটা এই। বহরাম খাঁ ছিলেন সোনারগাঁয়ে রাজ-প্রতিনিধি। তাঁহার শিল্লাদার বা বর্ম্মবাহক ও দেহরক্ষক ফখরুদ্দিন ৭৩৯ বা ৭৪০ হিজরায় তাঁহাকে হত্যা করিয়া, বা তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যুর সুযোগ অবলম্বন করিয়া, ফখরুদ্দিন মবারক শাহ নাম ধারণ করিয়া, সোনারগাঁয়ের সিংহাসনে উপবেশন করেন, এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কদর খাঁ তখন লক্ষ্ণাবতীতে রাজ-প্রতিনিধি। তিনি তাঁহার সেনাপতি আলি মবারকের সহায়তায় সোনারগাঁয়ে বিদ্রোহ দমন করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ফখরুদ্দিন কৌশলে কদর খাঁ ও আলির মধ্যে ভেদ জন্মাইয়া দিলেন। আলি ও ফখরুদ্দিনের ষড়যন্ত্রে কদর খাঁ গুপ্ত-ঘাতকের হস্তে হত হন। এই ঘটনা ৭৪০—৭৪১ হিঃ মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল। কদর খাঁ হত হইলে, আলি আলাউদ্দিন আলি শাহ নাম ধারণ করিয়া, ৭৪২ হিজরায় পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গের আধিপত্য লাভ করেন; এবং রাজধানী লক্ষ্ণাবতী হইতে পাণ্ডুয়ায় স্থানান্তরিত করেন। এইরূপে ৭৪২ হিজরায় আমরা আলি শাহকে ফিরোজাবাদে এবং ফখরুদ্দিনকে সোনারগাঁয়ে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। মুহম্মদ তুঘ্‌লকের পাগলামীতে তখন দিল্লীর সিংহাসন টলটলায়মান! কাজেই, বঙ্গের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার মত অবস্থা দিল্লীর সম্রাটের ছিল না। আলি শাহ বঙ্গের পশ্চিমার্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, ফখরুদ্দিনের সহিত তাঁহার অনবরত সজ্ঘর্ষ চলিয়াছিল।

ফখরুদ্দিন মবারক শাহ

মুদ্রাসমূহের সাক্ষ্য অনুসারে ফখরুদ্দিন ৭৪০ হিঃ হইতে ৭৫০ হিঃ পর্য্যন্ত সোনারগাঁয়ে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ফখরুদ্দিনের মুদ্রাসমূহ এমন সুগঠিত, তাহাদের উপরে উৎকীর্ণ অক্ষরগুলি এমন সুন্দর ও সুস্পষ্ট যে, দেখিয়া মনে আনন্দের উদয় হয়; এবং সোনারগাঁয়ের যে শিল্পিশ্রেষ্ঠ এই মুদ্রাগুলির কারিগর, তাঁহার উদ্দেশে শত ধন্যবাদ দিতে হয়। তাঁহার মুদ্রাগুলি পড়িতে বিন্দুমাত্রও কষ্ট বা সংশয় হয় না। মুদ্রা-নির্ম্মাণ-শিল্প ফখরুদ্দিনের আমলে যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, বাঙ্গালায় মুসলমান আমলে আর কখনও তেমনটি হয় নাই।

বর্ত্তমান আবিষ্কারে ফখরুদ্দিনের একটি মাত্র মুদ্রা আছে; এবং সৌভাগ্যক্রমে সেটি বেশ অক্ষত অবস্থায় আছে। মুদ্রাটি ৭৪১ হিজরির। ঢাকা মিউজিয়মের মুদ্রা-পেটিকায় ফখরুদ্দিনের ৭৪৩, ৭৪৫, ৭৪৬, ৭৪৭, ৭৪৮ ও ৭৪৯ হিজরির মুদ্রা আছে। এই সমস্ত মুদ্রাই আসাম গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উপহৃত; এবং পূর্ব্বে উল্লিখিত শ্রীহট্টের কান্তবির মহল্লায় ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত। কলিকাতা যাদুঘরের মুদ্রা-পেটিকায় ফখরুদ্দিনের ৭৪৫, ৭৪৭, ৭৪৮ এবং ৭৪৯ হিজরির মুদ্রা আছে। শিলং মুদ্রা-পেটিকায় ফখরুদ্দিনের ৭৪০ হিঃ হইতে ৭৫০ হিঃ পর্য্যন্ত সমস্ত বৎসরের মুদ্রাই আছে।

ফখরুদ্দিনের এ যাবৎ আবিষ্কৃত মুদ্রাগুলিকে ক, খ, গ, ঘ—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। বর্ত্তমান আবিষ্কারের ৭৪১ হিজরির মুদ্রাটি 'ক' শ্রেণীর। উহার বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

১। 'ক' শ্রেণী। ফখরুদ্দিন মবারক শাহের রৌপ্য-মুদ্রা।

তারিখ ৭৪১ হিঃ। ওজন ১৬০.৫ গ্রেণ। বেধ .৯৯ ইঞ্চি।

ভাওপীঠ। বৃত্তাভ্যন্তরে; কিন্তু বৃত্তের সম্পূর্ণাঙ্গ খুব কম মুদ্রায়ই আছে। অধিকাংশ মুদ্রায় আদৌ বৃত্তের চিহ্ন দেখা যায় না।

লিপিঃ—আস্ সুলতান্ আল্ আজম্
ফখর উদ্দুনিয়া ও উদ্দিন
আবু আল-মুজফর মবারক্ শাহ
আস্-সুলতান।

উল্টাপীঠ—বৃত্তাভ্যন্তরে লিপি।
লিপি—ইমিন্ খলিফত্
আল্লাহ্ নাছর্ আমির
আল্-মুমনিন্।

কিনারায় লিপি ঃ—জরব্ হজত্ আসসিক্কত্ বেহজরত্ জলাল্ সোণারগাঁও সনত্ আহাদি ও আরবায়িন্ ও সবামাইয়াত্। (এই সিক্কাটি রাজধানী সোণারগাঁওতে এক ও চল্লিশ ও সাতশত সনে মুদ্রিত)।

'ক' ও 'খ' শ্রেণী মুদ্রার মধ্যে বিশেষ কিছুই বিভিন্নতা নাই। কেবল উল্টাপীঠের লিপিতে 'ক' শ্রেণীতে আছে "ইমিন্ খলিফত্ আল্লাহ্" আর 'খ' শ্রেণীতে আছে, "ইমিন্ আল্ খলিফত্…"

২। ঢাকা মিউজিয়মের মুদ্রা পেটিকার ৭৪৯ হিজরির মুদ্রা। এইটি 'খ' শ্রেণীর মুদ্রা।

৩। শিলং পেটিকায় ৭৫০ হিজরির মুদ্রা। এটিও 'খ' শ্রেণীর।

এই ক ও খ শ্রেণী ছাড়া ফখরুদ্দিনের আর এক শ্রেণীর মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। এই মুদ্রা সংখ্যায় খুব অল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে;—তিন চারিটির বেশী নহে। শিলং পেটিকায় দুইটি এই শ্রেণীর মুদ্রা আছে। টমাস (Initial Coinage P. 57) এই শ্রেণীর একটি মুদ্রার বর্ণনা দিয়াছেন। উহার তারিখ তিনি ৭৩৭ হিঃ পড়িয়াছিলেন; ব্লকম্যান সাহেব শুদ্ধ করিয়া ৭৩৯ হিঃ পড়িতে চাহেন। (I. A. S. B. 1873. P. 252)। এককের অঙ্কটি বোধ হয় 'সবা'=৭ না পড়িয়া 'তসা'=৯-ই পড়িতে হইবে। এই মুদ্রাটিকে 'গ' শ্রেণীর মুদ্রা বলিয়া বর্ণনা করা যায়। ভাওপীঠের লিপি চতুষ্কোণের অভ্যন্তরে; কিন্তু উল্টাপীঠ 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর মুদ্রার মত বৃত্তের অভ্যন্তরেই। উল্টাপীঠের কিনারার লিপিটির যে শব্দ ফখরুদ্দিনের মুদ্রাতে সাধারণতঃ যে স্থানে থাকে, এই মুদ্রাতে সেই শব্দ সেই স্থানে নাই। শিলং-পেটিকার মুদ্রা দুইটিকে 'ঘ' শ্রেণীর মুদ্রা বলিয়া বর্ণনা করা যায়। এই মুদ্রা দুইটিতে উভয় পীঠের লিপিই চতুষ্কোণের অভ্যন্তরে। চতুষ্কোণগুলি আবার বৃত্তাভ্যন্তরে অবস্থিত; এবং ছোট-ছোট সরল রেখা চতুষ্কোণের বাহুর মধ্যভাগ হইতে বৃত্তের ব্যাস পর্যান্ত গিয়াছে। এই ক্ষুদ্র রেখাগুলিকে সূচিকা (pellets) বলা যায়। উল্টাপীঠের কিনারার লিপি মাত্র একটি মুদ্রায় রক্ষা পাইয়াছে (Shillong Supplementary Catalogue N. O.—$\frac{3}{5a}$)। এই লিপির শব্দসংস্থান 'গ' শ্রেণীর মুদ্রার অনুরূপ। এই লিপিটির পাঠোদ্ধার হয় নাই। সম্পূর্ণাঙ্গ এই শ্রেণীর আর একটি মুদ্রা পাওয়া না গেলে নিঃসন্দিগ্ধ পাঠ উদ্ধৃত হইবেও না। তারিখটি যাহাই হউক, উহার দশকের ঘরে যে 'আরবাইন'=৪০ নাই, তাহা একরূপ নিশ্চিত। হইতে পারে, এটিও ৭৩৯ হিজরির মুদ্রা। না-ও হইতে পারে। ফখরুদ্দিনের মুদ্রার প্রশংসা পূর্ব্বেই করিয়াছি। ফখরুদ্দিনের মুদ্রার মত সুন্দর মুদ্রা দুর্লভ।

ফখরুদ্দিনের মুদ্রা
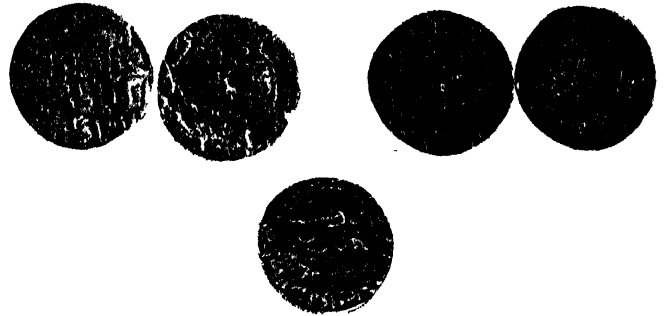
কিন্তু গ ও ঘ শ্রেণীর এই মুদ্রা তিনটির প্রশংসা করা কঠিন। এগুলি নেহাৎ আনাড়ির হাতের তৈয়ারী বলিয়া মনে হয়। অক্ষরগুলি অপরিষ্কার ও মোছা-মোছা। এগুলি ফখরুদ্দিনের রাজত্বের প্রারম্ভে অপটু শিল্পী দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়। এই জাতীয় কোন মুদ্রায় যদি ৭৩৯ হিজরার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন তারিখ পাওয়া যায়, তবে ধরিতে হইবে যে, ৭৩০ হিজরার পরবর্ত্তী কোন সময়ে ফখরুদ্দিন বিদ্রোহী হইয়া সোণারগাঁয়ের সিংহাসন দখল করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু বিশেষ সফল-কাম হন নাই। এই মুদ্রাগুলির দুষ্প্রাপ্যতা ও নিকৃষ্ট গড়নই তাহার প্রমাণ। বর্ত্তমানে ইহাই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত যে, ৭৩৯ হিজরায় বহরাম

খাঁর মৃত্যু হইলে, ফখরুদ্দিন সোনার-গাঁয়ের সিংহাসন অধিকার করেন; এবং ৭৪০ হইতে ৭৫০ হিজরা পর্য্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিয়া, পরলোকগত হ'ন।

ফখরুদ্দিন মবারক শাহের রাজত্বকালে, টেন্‌জিয়ার্স্‌বাসী বিখ্যাত ভ্রমণকারী ইব্‌ন্ বতুতা, মুহম্মদ তুগ্‌লকের দূত রূপে, চীনদেশে যাইবার পথে বাঙ্গলাদেশে আগমন করেন। তিনি বাঙ্গালা দেশের তৎসাময়িক রাজ-নৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। রাখালবাবুর বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগে তাহার কতক-কতক বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

আলাউদ্দিন আলি শাহ

এ পর্য্যন্ত আলি শাহের খুব অল্প সংখ্যক মুদ্রাই পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের 'পাওয়া'-সমূহে তাঁহার একটি মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয় নাই। আলি শাহের রাজত্বের জন্য তাঁহার টমাস-বর্ণিত মুদ্রা কয়টি, এবং কলিকাতা যাদুঘরের দুইটি মুদ্রাই আমাদের সম্বল।

টমাস আলি শাহের ফিরোজাবাদে মুদ্রিত ৭৪২, ৭৪৪, ৭৪৫ ও ৭৪৬ হিজরার মুদ্রা দেখিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন; এবং ৭৪২ হিজরার মুদ্রাটির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চিত্র দেখিয়া কিন্তু মনে হয়, তারিখের এককের ঘরটি তিনি ঠিক পড়িতে পারেন নাই। ইহা দুই না পড়িয়া তিন (তুলাহ্) পড়া উচিত। আরবী বর্ণমালা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বিচার করিতে পারিবেন।

কলিকাতা যাদুঘরের মুদ্রা-পেটিকার দুইটি মুদ্রার তারিখ ৭৪৩ ও ৭৪৪ হিঃ পড়া হইয়াছে (I.M.C. Page. 150)। প্রথমটির তারিখ খুব সম্ভবতঃ ঠিকই পড়া হইয়াছে; কিন্তু দ্বিতীয়টির তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। আমি নিজে এই মুদ্রাটি পরীক্ষা করিয়াছি। এই মুদ্রার তারিখে ও টমাসের মুদ্রার তারিখে কোন বিভিন্নতা নাই, একই রকমে লিখিত। তুলাহ্—৩ শব্দটির আদ্যাংশ 'তুল্' বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। কেবল আদিতে সামান্য একটু খাড়া টান বেশী আছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহাকে আর্‌বা—৪ কিছুতেই পড়া চলে না। অন্য কোন অঙ্কও পড়া যায় না। কাজেই ইহাকে তুলাহ্—৩-ই পড়িতে হইবে। তিনের প্রতিশব্দটি আরবীতে তুল্হ্ অথবা তুলাহ্ উভয় রূপেই দেখা যায়। কলিকাতা যাদুঘরের প্রথম মুদ্রাটিতে তিন যেন তুল্হ্-রূপে লিখিত। দ্বিতীয়টি ও টমাসের মুদ্রটিতে তুলাহ্ রূপে লিখিত। কাজে দেখা যাইতেছে যে, আলিশাহের যতগুলি মুদ্রা আম[illegible] পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইতেছি, তাহাদের স[illegible] গুলিরই তারিখ সম্ভবতঃ ৭৪৩ হিঃ। টমাসের মুদ্রার (১নং ও কলিকাতা যাদুঘরের প্রথম মুদ্রাটির (২নং) চিত্র দেও[illegible] গেল।

ইতিহাস বলে, আলি শাহ মাত্র এক বৎসর পাঁচ মা[illegible] রাজত্ব করিয়াছিলেন। মুদ্রার প্রমাণও তাহারই সমর্থ[illegible] করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। ৭৪২ হিজরাতে কদর খাঁ[illegible] মৃত্যুর পর, আলি শাহ ফিরোজাবাদের সিংহাসন অধিকা[illegible] করেন; এবং ৭৪৩ হিজরাতেই তাঁহার রাজত্ব শেষ হইয়া যা[illegible] বলিয়া বোধ হইতেছে।

টমাসের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া, ব্লক্‌ম্যান সাহে[illegible] ধরিয়াছিলেন যে, ৭৪৬ হিজরাতে আলি শাহ পরবর্ত্তী রাজ[illegible] ইলিয়াস শাহ কর্ত্তৃক হত হন। কিন্তু টমাসের চিত্রিত মুদ্রাটি হইতে দেখা যায় যে, তিনি তিনকে ভুল দুই পড়িয়াছিলেন। এমন অবস্থায়, তাঁহার কথিত বাকী মুদ্রা-গুলিতে তিনি প্রকৃতই ৭৪৪, ৭৪৫ ও ৭৪৬ হিজরা তারিখ পাইয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে স্বতঃই সন্দেহ হয়। কাজেই, নিঃসন্দিগ্ধ ঐ-ঐ সনের মুদ্রা ফিরিয়া না পাওয়া পর্য্যন্ত আলি শাহের রাজত্ব ৭৪৩ হিজরাতেই শেষ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া ধরিতে হইবে। আলি শাহের পতনের কারণ ইলিয়াস শাহের অভ্যুত্থান। ইলিয়াস শাহের প্রসঙ্গে এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।

ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন গাজী শাহ

ফখরুদ্দিন মবারক শাহের মৃত্যুর পর আমরা ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন গাজী শাহকে সোণারগাঁয়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই। ফখরুদ্দিনের মৃত্যু সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ যা' তা' লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গোলাম হোসেন বলেন, আলি শাহের সহিত ফখরুদ্দিনের সর্ব্বদাই সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইত। অবশেষে আলি শাহ ফখরুদ্দিনকে ধৃত ও নিহত করেন। বাদাওনি বলেন, সম্রাট মুহম্মদ তুঘ্‌লক্ ৭৪১ হিঃতে সোণার-গাঁয়ে গিয়া, ফখ্‌রুদ্দিনকে ধৃত করিয়া, দিল্লীতে লইয়া যান, এবং তথায় নিহত করেন। শামসি সিরাজ আফিফ্ (তারিখি

ফিরোজশাহীর গ্রন্থকার)এর মতে, ৭৫৫ হিঃতে ইলিয়াস শাহের হস্তে ফখ্‌রুদ্দিন নিহত হন। এই যুগের প্রধান তিন ঐতিহাসিক এইরূপে ফখরুদ্দিনের মৃত্যু সম্বন্ধে তিন রকম বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন! কিন্তু মুদ্রাতত্ত্বের প্রমাণ অভ্রান্ত রূপে নির্দ্দেশ করিতেছে যে, ফখরুদ্দিন ৭৫০ হিঃ পর্য্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাবে সোণারগাঁয়ে রাজত্ব করেন, এবং এই বৎসরেই সোনারগাঁর সিংহাসনে গাজী শাহ তাঁহার উত্তরাধিকার লাভ করেন।

একমাত্র মুদ্রাই গাজী শাহের অস্তিত্বের প্রমাণ। ইতিহাসে তাঁহার নামেরও উল্লেখ নাই! টমাস্ গাজী শাহের একটি মুদ্রার বর্ণনা করিয়াছেন, ও তাহার ছবি দিয়াছেন। টমাসের মতে এই মুদ্রার তারিখ ৭৫১ হিঃ। ব্লক্‌ম্যান সাহেব এই পাঠটি সংশোধন করিয়া এই মুদ্রাটির তারিখ ৭৫৩ হিঃ বলিয়া ধরিয়াছেন। ছবি দেখিলে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকে না যে, মুদ্রাটি ৭৫৩ হিজরারই। ইহার এককের শব্দ তুলাহ্--৩—আলি শাহের মুদ্রার এককের অঙ্কের অনুরূপ। কলিকাতা যাদুঘরে গাজী শাহের একটিমাত্র মুদ্রা আছে; এবং তাহার তারিখ নিঃসন্দেহ ৭৫১ হিজরা। শিলং পেটিকায়ও গাজী শাহের একটি মাত্র মুদ্রা আছে; এবং ইহার তারিখ নিঃসন্দেহ ৭৫০ হিজরা! টমাসের ও শিলং-পেটিকার মুদ্রা দুইটির চিত্র প্রদত্ত হইল।

এই তিন মুদ্রার প্রমাণে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ৭৫০ হিজরাতে, ফখরুদ্দিনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, গাজী শাহ সোণারগাঁয়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৭৫৩ হিজরা পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করেন। ৭৫৩ হিজরা হইতে সোণারগাঁয়ের টাঁকশালে মুদ্রিত, এবং ফখরুদ্দিন ও ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিনের মুদ্রার অবিকল অনুরূপ ইলিয়াস শাহের মুদ্রা সহসা দেখা দেয়। ইলিয়াস শাহের প্রসঙ্গে এই মুদ্রার বিশদ বিবরণ দেওয়া যাইবে। ৭৫৩ হিজরার পরবর্ত্তী ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিনের একটিও মুদ্রা এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য যে, ৭৫৩ হিজরাতে ইলিয়াস শাহ কর্ত্তৃক সোণারগাঁ অধিকৃত, এবং ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন হত হইয়াছিলেন।

ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিনের সহিত ফখরুদ্দিনের কি সম্পর্ক ছিল, তাহা জানা যায় না। তবে তাঁহার মুদ্রার ভাওপীঠের লিপির শেষাংশে "সুলতানের পুত্র সুলতান" এতদর্থক বাক্য দেখিয়া, প্রায় নিঃসন্দেহ ধরিয়া লওয়া যায় যে, ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন ফখরুদ্দিনের পুত্রই ছিলেন।

সোণারগাঁ জয় করিয়া ইলিয়াস শাহ বঙ্গের একচ্ছত্র রাজা হইয়া বসেন। সম্রাট মুহম্মদ তুঘ্‌লকের মৃত্যুর পর ফিরোজশাহ ৭৫২ হিজরাতে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই স্থিরধী সম্রাট্ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই দিল্লীর সম্রাটের হস্তচ্যুত বাঙ্গালা দেশ অধিকার করিবার জন্য সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ৭৫৪ হিঃ তে বাঙ্গালা দেশে অভিযান করেন। ইলিয়াস শাহের নেতৃত্বে কিরূপে বঙ্গের সম্মিলিত হিন্দু-মুসলমান শক্তি তাঁহাকে প্রতিহত করিয়াছিল, পরবর্ত্তী প্রস্তাবে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

ফ্রান্সের মোসাফির

(১৬ অক্টোবর—৪ নবেম্বর, ১৯২০)

[অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার, এম-এ]

(১)

বাংলাদেশের কোন জেলায় বোধ হয় ৪।৫টার অধিক মিউনিসিপ্যালিটি নাই। ফ্রান্স দেশের দশ জেলার মিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যা কত, ঠিক জানি না। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল ৪,০৬৮ মিউনিসিপ্যালিটি। এই দশ জেলায় ইস্কুল ছিল, গুণতিতে ৬,৪৪৫। বাঙ্গালীকে যদি কোন দিন ফরাসীর সঙ্গে টক্কর দিতে হয়, তাহা হইলে সবেধন নীলমণি জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র, কিম্বা তাঁহাদের সমকক্ষ আর দু'এক-জন বাঙ্গালীর, অথবা ইহাঁদের দুই-চারজন সাঙ্গোপাঙ্গের তালিকা বাহির করিলে চলিবে না। তিন কোটি আটাত্তর লক্ষ নর-নারীর দশটা মাত্র জেলায় যদি অন্ততঃ ৪,০৬৮টা মিউনিসিপ্যালিটি এবং ৬,৪৪৫টা ইস্কুল থাকিতে পারে, তাহা হইলে,—সাড়ে চার কোটি হিন্দু-মুসলমানের দশ জেলায়

কতগুলা মিউনিসিপ্যালিটি আর কতগুলা ইস্কুল থাকা চাই? কড়ায়-ক্রান্তিতে এই অনুপাত বজায় রাখিয়া চলিতে পারিলে, তবে বাঙ্গালী জাতি দুনিয়ায় দাগ রাখিতে পারিবে। মান্দ্রাজ হইতে অথবা বোম্বাই হইতে দু'চার জন পণ্ডিতকে কুড়াইয়া আনিয়া কলিকাতার এক বাথানে' মজুদ করিলে, অথবা মারাঠাদের মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ধ শুঁকিয়া গৌরবান্বিত বোধ করিলে, বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব প্রচারিত হইবে না। বঙ্গভাষা-ভাষী সাড়ে চার কোটি স্ত্রী-পুরুষ সকল অঙ্গে পূর্ণতা লাভ করিবে কত দিনে, এবং কি উপায়ে, এই চিন্তা ছাড়া, যুবক বাঙ্গালীর আর কোন চিন্তাই শ্রেয়ঃ নয়।

এই ত গেল স্বাস্থ্য ও শিক্ষার হিসাব। ফরাসী সম্পদের একটা খতিয়ান করা যাউক। যুদ্ধক্ষেত্রের দশ জেলার রেলপথ নষ্টই হইয়াছিল, ২,৮৮০ মাইল। গোটা বাংলার রেলপথের মাইল সংখ্যা কত? খাল নষ্ট হইয়াছিল, ৯৯২ মাইল। রাস্তা নষ্ট হইয়াছিল—১১,৫০০। কারখানা-গুলা নেহাৎ ছোটও নয়। কারণ, এই সমুদায়ের মধ্যে ৩,৫০০ কারখানায় মোটের উপর ৬৭৯,০০০ মজুর খাটিত। অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেকটায় প্রায় ২০০ লোক মজুরি করিত। আমাদের মৈমনসিংহ বা দিনাজপুর জেলার কয়টা ফ্যাক্টরিতে অন্ততঃ ২০০ কারিগরের অন্ন-সংস্থান হইয়া থাকে?

(২)

সহযাত্রীদের মধ্যে একজন চিত্রশিল্পী। ইনি চুঁড়িয়া-চুঁড়িয়া এক ফরাসী সুন্দরীকে আবিষ্কার করিয়াছেন। এই রমণীকে তৃতীয় শ্রেণীর ডেক হইতে উপরে আনাইয়া, চিত্রকর মহাশয় স্কেচ্ করিতেছেন। জাহাজে বসিয়া পরপরেজ মাছের মিছিল দেখিতেছি। এইগুলা জাহাজের সঙ্গে টক্কর দিবার জন্য জাহাজের সঙ্গে ছুটিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে জোট বাঁধিয়া হাওয়ায় লাফাইতেছেও মন্দ নয়। যেন কতকগুলা টরপেডো বোটের সারি দেখিতেছি আর কি!

যুক্তরাষ্ট্রে সভাপতি নির্ব্বাচনের দিন জাহাজের ইয়াঙ্কি ছোকরারাও একটা বাছাইয়ের বাবস্থা করিল। কাগজ ছাপাইয়া ভোট দিবার আয়োজন হইল। মোটের উপর হার্ডিংয়েরই জয় দেখা গেল। আর এক দফা ভোটের বিষয় ছিল "লীগ্-অব্-নেশন্স" সম্বন্ধে। আরোহীদের অধিকাংশই এই লীগের স্বপক্ষে দেখিতেছি।

এক মার্কিন বলিতেছেন—"মহাশয়, পৃথিবীতে যুদ্ধ থামাইবার কোন কল আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। লীগ্-অব্-নেশন্স এই কল কি না, জানি না। হয় ত বা নয়। কিন্তু যদি কোন যন্ত্র-বিশেষের দ্বারা কখনো যুদ্ধ উঠাইয়া দেওয়া সম্ভব হয়, তবে সেই যন্ত্র লীগের ভিতরই আছে।" এক শ্রোতা জবাব দিলেন, "পরাধীন জাতিগুলাকে স্বাধীন করিয়া দিবার কোন ব্যবস্থা এই লীগ করিতেছেন বা করিবেন কি?" দলের ভিতর হইতে একজনের মুখে শুনিলাম—"রাধামাধব! পরাধীন জাতিগুলাকে চিরকালের জন্য পরাধীন রাখাই এই লীগের উদ্দেশ্য। কারণ, লীগের নিয়মানুসারে কোন স্বাধীন জাতি কোন পরাধীন জাতিকে অস্ত্র-শস্ত্র বা যুদ্ধের সরঞ্জাম বেচিতে পারিবে না। সুতরাং পরাধীন জাতিগুলা তাহাদের স্বাধীনতা লাভ করিবে কি উপায়ে? কাজেই বলিতে হয়, যে জাতি এই লীগের অন্তর্ভুক্ত, সেই জাতি পরাধীন জাতিগুলার চিরশত্রু।"

এই সকল আলোচনার সুযোগে এক ব্যক্তি তাঁহার হাতের নিউইয়র্ক হইতে সম্পাদিত "নেশ্যন" কাগজখানা (১৩ অক্টোবর ১৯২০) সকলের সম্মুখে ধরিলেন। এই কাগজের আন্তর্জাতিক বিভাগে পরাধীন জাতিগুলার স্বাধীনতা লাভ সম্বন্ধে এক নয়া-ধরণের মোসাবিদা বাহির হইয়াছে।

বিগত জুলাই মাসে রুশিয়ার মস্কো-নগরে এক বিরাট বিশ্ব-মজুর-সঙ্ঘের কংগ্রেস বসিয়াছিল। এই বৈঠকে লেনিন ও বোলশেভিকি প্রবর্ত্তিত কমিউনিষ্ট মতের খসড়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই খসড়ার অষ্টম ধারায় প্রকাশ, যে সকল স্বাধীন দেশের অধীনে "উপনিবেশ" এবং বিজিত অধীন জাতি শাসিত ও শোষিত হইতেছে, সেই সকল দেশের মজুর-সঙ্ঘ, এবং মজুর-নায়কেরা স্বজাতির নর-নারীর বিভিন্ন দলের ভিতর পরাধীন দেশসমূহের স্বপক্ষে আন্দোলন সৃষ্টি করিতে বিশেষ মনোযোগী হইবেন। যদি কোন মজুরদল পরাধীন জাতিদের স্বাধীনতার জন্য এইরূপ আন্দোলন উপস্থিত না করেন, তাহা হইলে, সেই দলকে বিশ্ব-মজুর-সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না। বিজিত দেশসমূহে স্বদেশীয় বণিক, শাসনকর্ত্তা, মহাজন এবং কর্ম্মচারীদের অত্যাচার এবং দুর্নীতি যেন-তেন প্রকারেণ জন-সাধারণের গোচর করা মজুর-সঙ্ঘের বিশেষ কর্ত্তব্য বিবেচিত হইবে। যদি কোন সঙ্ঘ এই কার্য্য না করে, তাহা হইলে তাহাকে বিশ্ব-মজুর-

সঙ্ঘ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে। বিজিত দেশ বা উপনিবেশসমূহে স্বাধীনতার জন্য যত বিপ্লব ও বিদ্রোহ ঘটিবে, সেই সকল বিদ্রোহ ও বিপ্লবে "কায়েন মনসা বাচা" একমাত্র মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশের দ্বারা নয়া সাহায্য করিতে মজুর-সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবে না। স্বদেশীয় সৈনিক-বৃন্দকে মজুর-সঙ্ঘ নানা উপায়ে বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন যে, বিজিত দেশসমূহে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, তাহারা যেন জনগণের স্বাধীনতা-চেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াই না করে। যখন-তখন, যেখানে সেখানে মজুর-সঙ্ঘ পরাধীন জাতিগুলাকে স্বাধীন করিয়া দিবার জন্য স্বদেশীয় গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন। অনুরোধে সুফল না ফলিলে, শাসন-কর্ত্তাদের উপর চোখ রাঙাইতে হইবে। তাহাতেও কোন কাজ না হইলে, স্বদেশীয় গভর্ণমেণ্টকে নানা উপায়ে বিব্রত করিয়া তুলিতে হইবে। এইজন্য আইনসঙ্গত, অথবা, এমন কি, বে-আইনী এবং গুপ্তকার্য্য-প্রণালী প্রয়োগ করাও কর্ত্তব্য বিবেচিত হইবে। অধিকন্তু, স্বদেশীয় সকল শ্রেণীর চাষীকে বক্তৃতালয়ে, কার্য্যক্ষেত্রে এবং পাঠশালায় শিখাইতে চেষ্টা করিতে হইবে যে, উপনিবেশসমূহের এবং পরাধীন জাতির অন্তর্গত কৃষক ও শ্রমজীবীর দল তাহাদেরই ভাই-বোন। এই বিদেশীয় ভাই-বোনদের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক স্বাধীনতা লাভের সাহায্য করা প্রত্যেক শ্রমজীবীরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ নানা উপায়ে যদি কোন মজুর-সঙ্ঘ পরাধীন দেশের স্বাধীনতা ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে তাহাকে বিশ্ব-মজুর-সঙ্ঘ নিজ বৈঠকে স্থান দিবেন না।

বিলাতী র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডের মতন সোশ্যালিষ্টরা বিশ্ব-মজুর-সঙ্ঘের বৈঠকে আর কল্কে পাইতেছেন না। এই ধরণের "মডারেট" মজুর-নায়ককে লেনিনের দল বয়কট করিয়াছে।

কোথায় উইলসনের "লীগ অব্ নেশ্যন্‌স্", আর কোথায় বল্‌শেভিকীদের "কমিউনিষ্ট অঁ্যাতার্ন্যশুন্যাল"!

(৩)

জাহাজের লোকগুলা বড় বেশী মেশামিশি করিল না। যে যে-দলে আসিয়াছিল, সে সেই-দলেই যেন দশটা দিন কাটাইয়া দিল। ফরাসীরা কোন বিদেশীর সঙ্গে কথা বলিল না। আমেরিকানরাও পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হইল না। নিজ দল বা সমাজের বাহিরে আসিয়া অন্য দল বা সমাজের সঙ্গে আত্মীয়তা করা নিতান্তই কঠিন। অন্যান্যবারও জাহাজে এইরূপ জাতি-স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাইয়াছি। ইংরাজেরা ফরাসীর সঙ্গে মিশে নাই; জাপানীরা মার্কিনদের সঙ্গে জটলা করে নাই। অবশ্য, প্রত্যেক জাহাজে দুই-চারজন কাণকাটা সিপাই সর্ব্বঘটে বিরাজ করে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেটা কোন সম্প্রদায় বা জাতি-বিশেষের স্বভাব নয়। উহা ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্র মাত্র।

একদিন বিকালে আভর (Havre) পৌঁছিলাম। ফরাসীতে আভর শব্দের অর্থ "বন্দর"। বন্দর বা জাহাজখানা বলিয়া কোন নগরের নাম বিলাতে যদি "হার্বার" রাখা হয়, তাহা হইলে ফ্রান্সের হাভর নগরের অনুরূপ নাম-করণ করা হইবে। ছোট পাহাড়ের গায়ে ও পায়ে সহরটা অবস্থিত। নিউইয়র্কের আকাশস্পর্শী বাড়ীঘর এখানে নাই। মন্দির, গির্জ্জা বা সরকারী আফিস-জাতীয় অট্টালিকার উঁচুচূড়া দু-একটা মাত্র দেখা গেল। ঘর-বাড়ীগুলা দূর হইতে পীতাভ সাদা দেখায়, সেইন-নদীর মুখে প্রবেশ করিলাম। অনেকগুলা বড়-বড় জাহাজের পিয়ার দেখিতেছি। বড়-বড় জাহাজও কয়েকটা ঘাটে বাঁধা আছে। খালাসীদের স্ত্রী-পুত্র কন্যারা নদীর কিনারায় আসিয়াছে। সেখান হইতে জাহাজের কর্ম্মী আত্মীয়-কুটুম্বকে দেখিয়া নাচানাচি করিতেছে। কাঠের জুতাগুলার আওয়াজ শুনিয়া মনে পড়িল, অল্প দিন হইল লড়াই থামিয়াছে। যুদ্ধের জের এখনও চলিতেছে। ডাঙায় নামা গেল। কাষ্টম-হাউসের কড়াকড়ি যথেষ্ট আশা করা গিয়াছিল। বিশেষ কিছুই দেখিলাম না। এখন শুনিতেছি না কি, ফ্রান্স হইতে বিদেশে বাহির হইয়া যাইবার সময় মোসাফিরদিগকে নাকাল হইতে হয়। যাহা হউক, সে সম্প্রতি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা।

জাহাজ কোম্পানীর এক স্পেশ্যাল ট্রেণ আছে। এইটা প্যারিস পর্য্যন্ত আসে। রাত্রি সাড়ে দশটার সময় ফরাসী জাতির জীবন-কেন্দ্রে পৌঁছিলাম। রেলে নৈশ ভোজনের জন্য খরচ পড়িল ১৪ ফ্রাঁ (franc)। আজ-কালকার বিনিময়ের হারে ইহার দাম প্রায় তিন টাকা। পেট ভরিল বটে, তবে এমন হাতী-ঘোড়া কিছু খাইলাম না। একটা নূতন শাক খাওয়া গেল, নাম আঁদীভ্ (endive)। শীত

পড়িয়াছে। গাড়ীর জানালা-দরজা পরদায় ঢাকা। ভিতর গরম রাখিবার জন্য তড়িৎ বা গ্যাসের পাইপ ব্যবহার করা হইতেছে না। কয়লার খাঁক্তি হয় ত মাঘের বাঘা শীতের সময় কয়লা খরচ করা হইবে। পথে পড়িল একটা বড় সহর রু আঁ (Rouen)। সেইন (Seine) নদীর ধারে-ধারে রেল চলিতেছে। কিন্তু অন্ধকার রাত্রি,—তাহার উপর পর্দ্দা। কাজেই, পাঁচ ঘণ্টা সহযাত্রীদের সঙ্গে মুখামুখি বসিয়া কাটাইতে হইল—দেশটার কিছু দেখা গেল না।

ভাঙা-ফরাসী, বা না-ফরাসী ফরাসীতে বিদেশী ভাষায় কথা বলিবার ক্ষমতা জাহির করিতে সচেষ্ট হইলাম। দেখিতেছি, সম্মুখের দুই ভগ্নী ইংরেজী জানে। ইহারা সুইস। নিউইয়র্ক হইতে আসিতেছে একই জাহাজে,—যাইতেছে সুইটসারল্যাণ্ডের লোজান (Lausaunee) নগরে। লোজান ইহাদের জন্মভূমি। জাহাজে শুনিয়াছিলাম, লোজানের ফরাসী উচ্চারণ প্যারিসবাসীদের উচ্চারণ হইতেও খাঁটি। কথাটা সত্য কি মিথ্যা, জানি না। আমরা যেমন ছেলেবেলায় নবদ্বীপের বাংলা উচ্চারণের তারিফ করিতাম, বোধ হয় এই গুজবটা ফরাসী মহলে সেই ধরণেরই হইবে। যাহা হউক,—খানিক সুললিত লোজানি উচ্চারণের আওতায় কাণ শুধরাইয়া লইলাম।

বিধবা

(আলোচনা)

বিষবৃক্ষ—(২)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম-এ]

অবশ্য 'নগেন্দ্রকে ভুলিতে স্বীকৃত' হওয়া যত সহজ, প্রকৃত পক্ষে ভোলা তত সহজ নহে। কবি বলিয়াছেন "ভোলা যায় কি কথার কথা। প্রাণ যার প্রাণে গাঁথা।" ইত্যাদি। পর-পরিচ্ছেদে দেখা যায়, এই আত্ম-সুখ-বলিদানের দৃঢ়সঙ্কল্প করিতে যাওয়ায় কুন্দ কতটা বিকলচিত্ত হইয়াছে, তাহার মনে কতটা ধাক্কা লাগিয়াছে। 'হরিদাসী'র কুৎসিত গান শুনিয়া সকলে চলিয়া গেল, কিন্তু 'কুন্দনন্দিনী রহিল…… অন্যমনে ছিল, এইজন্য যেখানকার সেখানে রহিল।…… চরণে তাহার গতি-শক্তি ছিল কি না সন্দেহ।' 'হরিদাসী' তাহাকে বিরলে পাইয়া যে সব কথা বলিল, কুন্দ তাহার 'কতক বা শুনিল, কতক বা শুনিল না।' এই সব লক্ষণ হইতে বুঝা যায়, কেন সে অন্যমনাঃ, কেন সে গতি-শক্তিহীন; ভিতরে ভিতরে দ্বন্দ্ব তখনও চলিতেছে।

তাহার প্রমাণ, ১৬শ পরিচ্ছেদে। 'সেইদিন প্রদোষকালে' বাপীতটে অন্ধকারে নিরালায় একাকিনী কুন্দনন্দিনী নিজের হতভাগ্য জীবনের কথা মনের দুঃখে ভাবিতেছে আর কাঁদিতেছে। এই নানা ভাবনার মধ্যে নগেন্দ্রনাথের ভাবনাই সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। 'একবার মুখে আনিব? কেহ নাই—মনের সাধে নাম করি। ন—নগ—নগেন্দ্র।··· আমার নগেন্দ্র!···আমার নগেন্দ্র? আমি কে? সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্র। কতই নাম করিতেছি—হলেম কি? আচ্ছা, সূর্য্যমুখীর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি আমার সঙ্গে হতো!' ……'একবার আকাঙ্ক্ষা ভরিয়া মনে করি—তিনি আমায় ভালবাসেন।……কমল কি কথাটি বল্‌তে বল্‌তে বলিল না?……আমি পোড়ারমুখী জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। ……মিছে কথা! তা মিছে কথাই ভাবি। মিছে কথাকে সত্য করিয়া ভাবিব।' (ভাল কথার ঝুঁটোও ভাল।) বুঝা গেল, কতখানি গভীর প্রেম, কতখানি আকুল আকাঙ্ক্ষা, এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভিতর চাপা ছিল। কমলমণির কথায় প্রবল ধাক্কা খাইয়া সে আজ মনের রাশ ছাড়িয়া দিয়াছে।

তাহার হৃদয়ের ভিতর তখনও সংগ্রাম চলিতেছিল। কমলের কাছে কলিকাতা যাইতে স্বীকৃতা হইয়াও সে এখনও মন স্থির করিতে পারিতেছে না। 'কলিকাতায় যেতে হবে যে, তা-ত যেতে পারিব না; দেখিতে পাব না

যে। আমি যেতে পারব না—পারব না—পারব না। তা না গিয়াই বা কি করি? যদি কমলের কথা সত্য হয়, তবে ত যারা আমার জন্য এত করেছে, তাদের ত সর্ব্বনাশ করিতেছি।……আমায় যেতে হবে। তা পারিব না।' দেখা গেল, নূতন করিয়া প্রবলবেগে তীব্রভাবে দ্বন্দ্ব চলিতেছে, কখনও 'সুমতির', কখনও 'কুমতি'র জয় হইতেছে। শেষে সে রণে ভঙ্গ দিয়া আত্মহত্যা করিয়া সকল দ্বন্দ্বের শেষ করিতে সঙ্কল্প করিল। 'তাই ডুবে মরি। মরিবই মরিব।' ডুবেই মরি।……ডুবে মরা হবে না—ফুলে পড়িয়া থাকিব—দেখিতে রাক্ষসীর মত হব।* যদি তিনি দেখেন? বিষ খেয়ে ত মরিতে পারি।……বিষ কোথা পাব……'মরিতে পারিব কি? পারি—কিন্তু আজি না—একবার আকাঙ্ক্ষা ভরিয়া মনে করি।' 'মরা হবে না ঐ কথা ভাবি।' ইহার পরে নগেন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবে না বলিয়া ও স্বপ্ন-বৃত্তান্ত মনে করিয়া কুন্দ ডুবিয়া মরিতেই স্থির সঙ্কল্প করিল, কিন্তু নগেন্দ্রনাথ সেই সন্ধিক্ষণে (psychological moment এ) আসিয়া গোল বাধাইলেন। 'কুন্দের সে দিন আর মরা হলো না।' 'কুন্দনন্দিনী মরিতে চাহে না।' 'কুন্দ ডুবিয়া মরিল না কেন?' প্রেমের কথা শুনিবার বা শুনাইবার আকাঙ্ক্ষা নহে, নগেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিবার, তাঁহাকে আপনার করিবার আকাঙ্ক্ষা নহে—নগেন্দ্রনাথকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা, শুধু দেখিবার আকাঙ্ক্ষা কুন্দর মেটে নাই।

* Hawthorne এর 'Blithedale Romance' তুলনীয়। 'A reflection occurs to me that will show ludicrously, I doubt not, on my page, but must come in, for its sterling truth. Being the woman that she was, could Zenobia have foreseen all these ugly circumstances of death—how ill it would become her, the altogether unseemly aspect she must put on………She would no more have committed the dreadful act than have exhibited herself to a public assembly in a badly fitting garment,—Ch 27.

এ ক্ষেত্রে নায়িকা সত্যসত্যই জলে ডুবিয়া আত্ম-ঘাতিনী হইয়াছে। মার্কিন আখ্যায়িকাকার যে চিন্তার ধারা একজন তৃতীয় পক্ষের মনে প্রবাহিত করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মহত্যা-প্রয়াসিনী প্রেমিকার মনেই সেই চিন্তার ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। প্রেমিকার মনের কথা—'প্রিয়েষু সৌভাগ্য ফলা হি চারুতা।

সে আকাঙ্ক্ষা কুন্দ ত্যাগ করিতে পারে না, হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত করিবার মত তাহার হৃদয়ে বল নাই। এই ত 'বিষবৃক্ষে'র মূল।

এই পরিচ্ছেদের আর একটি বিশিষ্টতা আছে। নগেন্দ্রনাথ রূপমোহে অন্ধ হইলেও এতদিন কুন্দকে দূরে রাখিয়া আসিতেছিলেন (১১শ পরিচ্ছেদের উদ্ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য)। কুন্দও দূর হইতে নীরবে হৃদয়ের নিভৃতমন্দিরে নগেন্দ্রনাথের পূজা করিতেছিল, কোনও পক্ষই অপরের সহিত বিশ্রব্ধালাপের প্রণয়-সম্ভাষণের চেষ্টা করেন নাই; কিন্তু কুন্দ কলিকাতায় যাইবে এই সংবাদে নগেন্দ্রনাথেরও ধৈর্য্যের বাঁধন একেবারে ছিঁড়িল, তিনি বাপীতটে সন্ধ্যার অন্ধকারে নিভৃতে কুন্দনন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই নিভৃত আলাপই প্রণয়ি-যুগলের প্রথম আলাপ। পরবর্ত্তী আখ্যায়িকা-কারদিগের আখ্যায়িকায় প্রেমিক-প্রেমিকার ঘন ঘন নির্জ্জনে দেখা-শুনা, এমন কি প্রেমিকা প্রেমিককে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এইরূপ সব ঘটনাও আছে; ইহার সহিত তুলনায় নগেন্দ্রনাথের সংযম তথা বঙ্কিমচন্দ্রের সাবধানতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আবার হালের কোন কোন আখ্যায়িকায় পরস্ত্রীকে চুম্বন-আলিঙ্গনের যে চিত্র দেখা যায়, তাহার সহিত তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের রুচি কত মার্জ্জিত! কুন্দ যখন জলে ডুবিয়া মরিবার 'অস্খলিত সঙ্কল্পে ধীরে ধীরে সোপান অবতরণ করিতেছিল, তখন পশ্চাৎ হইতে' নগেন্দ্রনাথ 'অতি ধীরে ধীরে তাহার পৃষ্ঠে অঙ্গুলি-স্পর্শ করিলেন'। পরস্ত্রীর অঙ্গ-স্পর্শ গর্হিত কার্য্য বটে। কিন্তু অঙ্গ-স্পর্শ মাত্রই—চুম্বন-আলিঙ্গন নহে। আর এটুকুর জন্যও বঙ্কিমচন্দ্র উভয় পক্ষকেই ধিক্কার দিয়া ধর্ম্মনীতি ও রুচির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। 'নগেন্দ্র! এই কি তোমার এত কালের সুচরিত্র? এই কি তোমার এত কালের শিক্ষা?… ছি ছি! দেখ তুমি চোর! চোরের অপেক্ষাও হীন!…… তুমি চোরের অধিক চুরি করিতে আসিয়াছ! নগেন্দ্র, তুমি মরিলেই ভাল হয়। যদি সাহস থাকে, তবে তুমি গিয়া ডুবিয়া মর।' 'আর ছি ছি! কুন্দনন্দিনি। তুমি চোরের স্পর্শে কাঁপিলে কেন?……চোরের কথা শুনিয়া তোমার গায়ে কাঁটা দিল কেন?……ডুবিবে? ডুবিয়া মর না?'

নগেন্দ্রনাথ প্রবৃত্তির সহিত যুঝিয়া আজ পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। 'শুন কুন্দ! আমি বহু কষ্টে এতদিন সহ্য

করিয়াছিলাম, আর পারিলাম না।......আর পারি না। তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না।' মোহের প্রথম অবস্থায় নগেন্দ্র অনাথিনী কুন্দনন্দিনীর বৈধব্যদুর্দ্দশা দেখিয়া চোখের জল ফেলিয়াছিলেন, বিধবা-বিবাহের পক্ষে তর্ক করাতে 'ন্যায় কচকচি ঠাকুর'কে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন ('ভাদ্রের প্রবন্ধে ১১শ পরিচ্ছেদের উদ্ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য) এই পর্য্যন্ত; এখন মোহের চরম অবস্থায় তিনি স্বয়ং কুন্দকে বিধবাবিবাহ করিতে প্রস্তুত, কুন্দের নিকট সেই প্রস্তাব করিলেন, পরে ভগিনীপতি শ্রীশচন্দ্রের সহিত পত্র ব্যবহারে স্বয়ং কোমর বাঁধিয়া বিধবা-বিবাহের পক্ষে তর্ক করিলেন (২৫শ পরিচ্ছেদ)।

এদিকে অল্পভাষিণী কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে 'না' বলিল, বিধবার বিবাহ অশাস্ত্র নহে ইহা স্বীকার করিয়াও প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল, নগেন্দ্রনাথ যখন 'সহস্রমুখে, অপরিমিত প্রেমপরিপূর্ণ মর্ম্মভেদী কত কথা' বলিলেন, তখন মনে-মনে কৃতার্থা হইলেও, দৃঢ়স্বরে 'না' বলিল, মনে-মনে ভালবাসিলেও নগেন্দ্রনাথের 'আমায় ভালবাসিবে কি না?' এই আকুল প্রশ্নেও 'না' বলিল। কেন? সে নিজের সুখের জন্য অপরের সুখের হন্তারক হইতে চাহে না। পরের মঙ্গলের জন্য আত্মবলিদান তাহার অভিপ্রায়। অথচ নগেন্দ্রনাথের প্রতি ভালবাসা হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিবার মত হৃদয়বল তাহার নাই, নগেন্দ্রনাথকে দূর হইতে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার মেটে নাই, তাই কুন্দ-নন্দিনী মরিতে চাহে না।'

কুন্দ শেষ পর্য্যন্ত কমলমণির প্রস্তাব-অনুযায়ী কার্য্য করিতে অথবা আত্মহত্যার সঙ্কল্প অস্খলিত রাখিতে পারিত কি না সন্দেহ। কিন্তু হরিদাসী বৈষ্ণবী-ঘটিত ব্যাপারে সূর্য্যমুখীর তিরস্কারে ঘটনাবলি অন্য পথে চলিল। ঘৃণায়, লজ্জায়, অভিমানে, অনাথিনী কুন্দনন্দিনী একাকিনী গৃহ-ত্যাগিনী হইল। প্লটের সঙ্কল্পিত পরিণতি ঘটাইবার জন্যই এইরূপ নূতন ঘটনার সৃষ্টি। কুন্দনন্দিনীর চরিত্র-বিকাশেও ইহা সহায়তা করে। এই গৃহত্যাগ-ব্যাপারের ভিতর দিয়াও আবার আমরা কুন্দর হৃদয়-নিহিত গভীর প্রেমের নূতন করিয়া পরিচয় পাই। তখনও সেই নগেন্দ্রনাথকে দূর হইতে গোপনে একটি বার দেখিবার আকুল আকাঙ্ক্ষা, নগেন্দ্র-স্মৃতিতে হৃদয় ভরপূর, আর নিজের মঙ্গল বিসর্জ্জন দিয়া নগেন্দ্রের মঙ্গলের জন্য ঐকান্তিক কামনা। (১৮শ পরিচ্ছেদ।)

প্রথমে তাহার আকাঙ্ক্ষা এইটুকুমাত্র—'মানস, একবার নগেন্দ্রনাথের শয়নকক্ষে বাতায়ন-পথের আলো দেখিয়া যায়। একবার সেই আলো দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে।' ···'সে আলো ছাড়িয়া যাইতে পারিল না।'

গ্রন্থকার এইখানে পতঙ্গজাতির উল্লেখ করিয়া একটু সুন্দর সঙ্কেত (Symbolism) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন—'পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ।' (এই পরিচ্ছেদে আরও কয়েকটি সুন্দর Symbolism ও দুর্লক্ষণ Omen আছে।) আলো দেখিয়াই সে তৃপ্ত, নগেন্দ্রনাথকে তাহার অন্ধকারময় জীবনের আলোককে দেখিবার সাহস, অতটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা, যেন তাহার নাই।) এই সমগ্র পরিচ্ছেদের রচনাভঙ্গী হইতে বলা যায় যে, কবির হৃদয় অভাগিনী কুন্দ-নন্দিনীর প্রতি তীব্র সমবেদনায় ও গভীর করুণায় কানায় কানায় পূর্ণ।) তাহার পর, কবি আর একগ্রাম উচ্চে উঠিয়াছেন।—'এক মনুষ্যমূর্ত্তি আলোকপটে চিত্রিত হইল। হরি! হরি! সে নগেন্দ্রের মূর্ত্তি। তুমি আবার এখনই সরিয়া অদৃশ্য হইবে, এই ভয়ে তাহার দেখার সুখ হইতেছে না। তুমি দাঁড়াও, সরিও না—কুন্দ বড় দুঃখিনী। দাঁড়াও, তাহা হইলে, সেই পুষ্করিণীর স্বচ্ছ শীতলবারি—তাহার আর মনে পড়িবে না।' (অর্থাৎ তাহার আর মরিতে ইচ্ছা হইবে না।) 'নগেন্দ্র সার্সি বন্ধ করিয়া সরিয়া গেলেন। নির্দ্দয়! ইহাতে কি ক্ষতি! না, তোমার রাত্রি জাগিয়া কাজ নাই—নিদ্রা যাও-শরীর অসুস্থ হইবে। কুন্দনন্দিনী মরে মরুক। তোমার মাথা না ধরে, কুন্দনন্দিনীর কামনা এই।' প্রিয়ের মঙ্গলেই তাহার মঙ্গল। আখ্যায়িকাকার পূর্ব্বেই বলিয়াছেন (১৪শ পরিচ্ছেদ), 'আপনার মঙ্গল? কুন্দ-নন্দিনী আপনার মঙ্গল বুঝিতে পারে না।' 'এখন আলোক-ময় গবাক্ষ যেন অন্ধকার হইল। চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া, চক্ষের জল মুছিয়া, কুন্দনন্দিনী উঠিল। তবু কুন্দনন্দিনী—নির্ব্বোধ কুন্দনন্দিনী ফিরিয়া ফিরিয়া সেই দিকে চাহিতে লাগিল।' সেইখানেই যে তাহার জীবনের ধ্রুবতারা অন্তর্হিত হইয়াছে। অসামান্য-সরলা কুন্দনন্দিনী একদিন অন্ধকারে ব্যজনহস্তে মৃত পিতার গাত্রে বায়ুসঞ্চালন করিয়া-ছিল (৩য় পরিচ্ছেদ), আর আজ অসামান্য-সরলা কুন্দ-নন্দিনী, নগেন্দ্র সার্সি বন্ধ করিয়া সরিয়া গেলেও 'ফিরিয়া ফিরিয়া সেই দিকে চাহিতে লাগিল।'

সূর্য্যমুখীর তিরস্কারে কুন্দ পলাইয়া আসিয়া হীরার বাটীতে আশ্রয় পাইল। কিন্তু তাহার শান্তি কোথায়? রাত্রে 'কুন্দ আপনার মনের দুঃখে জাগিয়া রহিল!' (২০শ পরিচ্ছেদ।) ক্রমে নগেন্দ্রকে ছাড়িয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল। ২৩শ পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার কুন্দর হৃদয়ের দ্বন্দ্বের ইতিহাস দিয়াছেন—'কুন্দ এখন পিঞ্জরের পাখী—"সতত চঞ্চল।" এদিকে মহালজ্জা—অপমান—তিরস্কার—মুখ দেখাইবার উপায় নাই—সূর্য্যমুখী ত বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেই লজ্জাস্রোতের উপরে প্রণয়-স্রোত আসিয়া পড়িল। পরস্পর প্রতিঘাতে প্রণয়প্রবাহই বাড়িয়া উঠিল। বড় নদীতে ছোট নদী ডুবিয়া গেল। সূর্য্যমুখীকৃত অপমান ক্রমে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। সূর্য্যমুখী আর মনে স্থান পাইলেন না—নগেন্দ্রই সর্ব্বত্র। ক্রমে কুন্দ ভাবিতে লাগিল, "আমি কেন সে গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলাম। দুটো কথায় আমার কি ক্ষতি হইয়াছিল? আমি ত নগেন্দ্রকে দেখিতাম। এখন যে একবারও দেখিতে পাই না।" দিবানিশি মনোমধ্যে এই চিন্তা করিত। দত্তগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর্ত্তব্য কি না, এ বিচার আর বড় করিত না—সেটা দুই চারি দিনে স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, যাওয়াই কর্ত্তব্য—নহিলে প্রাণ যায়; তবে গেলে সূর্য্যমুখী পুনশ্চ দূরীকৃত করিবে কি না ইহাই বিবেচ্য হইল। শেষে কুন্দের এমন দুর্দ্দশা হইল যে, সে সিদ্ধান্ত করিল, সূর্য্যমুখী দূরীকৃতই করুক আর যাই করুক, যাওয়াই স্থির। হৃদয়ও আর প্রাণাধিকের অদর্শন সহ্য করিতে পারে না। শেষে কুন্দ একদিন দুই চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে শয্যাত্যাগ করিয়া, উঠিয়া 'পথ অনুমান করিয়া দত্তগৃহাভিমুখে সন্দেহমন্দপদে চলিল। যাইবার আর কিছুই অভিপ্রায় নহে—যদি কোন সুযোগে একবার নগেন্দ্রকে দেখিতে পায়। দত্তগৃহে ফিরিয়া যাওয়া ত ঘটিতেছে না—যবে ঘটিবে, তবে ঘটিবে-ইতিমধ্যে এক দিন লুকাইয়া দেখিয়া আসিলে ক্ষতি কি? কোন সুযোগে নগেন্দ্রকে বাতায়নে, কি প্রাসাদে, কি উদ্যানে, কি পথে দেখিতে পাইব। দেখিয়াই অমনি কুন্দ ফিরিয়া আসিবে।' অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া 'প্রত্যাবর্ত্তনার্থ কুন্দ গাত্রোত্থান করিল। এক আশা মনে প্রবলা হইল। অন্তঃপুরসংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে' যদি তাঁহাকে দেখিতে পায়। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া উদ্যান-মধ্যে কেহ শুইয়া রহিয়াছে, সে নগেন্দ্র মনে করিয়া কুন্দ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। শেষে সে সূর্য্যমুখীর হাতে ধরা পড়িল। সূর্য্যমুখী তাহাকে আদর করিয়া লইয়া গেলেন। ফলকথা, নগেন্দ্রের অদর্শনে কুন্দর হৃদয়ের দ্বন্দ্ব তীব্রতর হইল, শেষে প্রবৃত্তির জয় হইল, পরের মঙ্গলের জন্য নিজ-স্বার্থ বলি দেওয়ার সঙ্কল্প-রক্ষায় অসমর্থ হইয়া সে নগেন্দ্রের দর্শনলাভের জন্য আবার গৃহে ফিরিয়া গেল।

এই ত গেল কুন্দর অবস্থা। এদিকে কুন্দর গৃহত্যাগের সংবাদ শুনিয়া 'নগেন্দ্র ভাবিলেন, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়া, কুন্দ আমার গৃহে আর থাকা অনুচিত বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। যদি তাই, তবে কমলের সঙ্গে গেল না কেন? নগেন্দ্রের মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিল।......সূর্য্যমুখীর কি দোষ তাহা কিছু জানিলেন না, কিন্তু সূর্য্যমুখীর সঙ্গে আলাপ বন্ধ করিলেন। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় কুন্দ-নন্দিনীর সন্ধানার্থ স্ত্রীলোক চর পাঠাইলেন।' (২০শ পরিচ্ছেদ।) তাহার পর হীরার কাছে সূর্য্যমুখীর তিরস্কার কুন্দর গৃহত্যাগের কারণ এই কথা জানিয়া তিনি সূর্য্যমুখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সূর্য্যমুখীও অকপটে সকল কথা বলিলেন, নিজের মনোগত সন্দেহের কথাও স্বীকার করিলেন। ইহার ফল এই হইল যে সূর্য্যমুখীর কাছে নগেন্দ্রের চক্ষুলজ্জার আড় ভাঙ্গিল, তিনিও মনের কথা মুক্ত-কণ্ঠে সূর্য্যমুখীকে বলিলেন। এখানেও আমরা তাঁহার হৃদয়ের দ্বন্দ্বের স্বীকারোক্তি পাই। 'আমি যে যন্ত্রণা পাইয়াছি, যে যন্ত্রণা পাইতেছি, তাহা তোমাকে কি বলিব? তুমি মনে করিয়াছ আমি চিত্তদমনের চেষ্টা করি নাই; এমত ভাবিও না। আমি যত আমাকে তিরস্কার করিয়াছি, তুমি কখনও তত তিরস্কার করিবে না। আমি পাপাত্মা—আমার চিত্ত বশ হইল না।' এতদিনে সংযমের শেষ বাঁধন কাটিল। কুন্দর জন্য 'আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। তোমাতে আমার আর সুখ নাই—কুন্দনন্দিনীকে সন্ধান করিয়া আমি দেশদেশান্তরে ফিরিব। যদি কুন্দনন্দিনীকে ভুলিতে পারি, তবে আবার আসিব।' (২১শ পরিচ্ছেদ।) তিনি স্পষ্টবাক্যে এই সব কথা বলিলেন। (শেষে সূর্য্য-মুখীর অনুরোধে তিনি কুন্দর আসার আশায় একমাস কাল গৃহে থাকিতে রাজী হইলেন।) নগেন্দ্রের হৃদয়েও প্রবৃত্তির জয় হইল। এইখানে 'বিষবৃক্ষের মুকুল।' এ-ক্ষেত্রেও

গ্রন্থকার দৃঢ়স্বরে নায়কের আচরণের (condemnation) দোষ-ঘোষণা করিয়াছেন। ('তোমার মরাই ভাল ছিল।')

হীরা ঠিকই বলিয়াছিল, 'প্রেমের পাক বিচ্ছেদে। বিচ্ছেদে বাবুর ভালবাসাটা পেকে আস্‌বে।' (২০শ পরিচ্ছেদ।) কুন্দর কয়েকদিন বিচ্ছেদে নগেন্দ্রনাথের প্রবৃত্তি উদ্দাম হইয়া উঠিল। কুন্দ ফিরিলে তিনি এইবার বিধবাবিবাহে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। নব অনুরাগের সময় (১১শ পরিচ্ছেদ) নগেন্দ্রনাথ বিধবাবিবাহের পক্ষে তর্ককারী 'ন্যায়কচকচি ঠাকুরকে' পুরস্কার দিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, এক্ষণে প্রবৃত্তির প্রাবল্যে তিনি নিজেই বিধবাবিবাহ তথা বহুবিবাহের পক্ষে কোমর বাঁধিয়া কূটতর্ক করিতেছেন (শ্রীশচন্দ্রকে প্রেরিত পত্রে ২৫ শ পরিচ্ছেদ)। তিনি এখন একাধারে বিধবাবিবাহ-সমর্থক বিদ্যাসাগর, আবার বহুবিবাহ-সমর্থক-রূপে বিদ্যাসাগরের প্রতিপক্ষ। সূর্য্যমুখীর কথাও যে তিনি না ভাবিতেছেন তাহা নহে,—'সূর্য্যমুখী এ বিবাহে দুঃখিতা নহেন। তিনিই বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন—তিনিই ইহাতে আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছেন—তিনিই ইহাতে উদ্যোগী।' (সূর্য্যমুখীও কমলমণিকে লিখিয়াছেন, 'এ বিবাহে আমিই ঘটক।') কেন যে সূর্য্যমুখী এ বিবাহে স্বয়ং উদ্‌যোগী, কেন তিনি আপনার মৃত্যুর উদ্‌যোগ আপনি করিলেন, নগেন্দ্রনাথ মনের তখনকার অবস্থায় তাহা বুঝিলেন না, বা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। শ্রীশচন্দ্র তাঁহাকে ঘৃণা করিবেন, তাহাতেও তিনি লজ্জিত বা কুণ্ঠিত নহেন। 'আমি এ বিবাহ করিব। যদি পৃথিবীর সকলে আমাকে ত্যাগ করে, তথাপি আমি বিবাহ করিব। নচেৎ আমি উন্মাদগ্রস্ত হইব—তাহার বড় বাকীও নাই।' (শ্রীশচন্দ্রকে প্রেরিত পত্র, ২৫শ পরিচ্ছেদ।) এই উন্মাদের অসংযমের প্রকৃতি ও নিদান বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ কি ?' শীর্ষক ২৯শ পরিচ্ছেদে সবিস্তারে বুঝাইয়াছেন। পাঠকবর্গকে সমগ্র পরিচ্ছেদটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিবেন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রবৃত্তিদমনে অসমর্থতার বিষময় ফল দৃষ্টান্তদ্বারা পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যেই এই অবৈধ প্রণয়ের কাহিনী রচনা করিয়াছেন, মনোরম ঘটনাবলি দ্বারা পাঠকের হৃদয়ে আনন্দময় উত্তেজনা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে নহে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দ্বারা জীবনকে সার্থক করিবার জন্য উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে নহে।

এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা-বিবাহের পর নগেন্দ্র-কুন্দর সুখের পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কিত করেন নাই। শুধু এক নিমেষের জন্য নগেন্দ্রনাথের সুখের বিদ্যুদ্‌বিকাশ আমাদের চোখ ঝলসাইয়া (?) দেয়! 'তখন নগেন্দ্র বৈঠকখানায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন ? ভাবিতেছিলেন, "কুন্দনন্দিনী! কুন্দ আমার! কুন্দ আমার স্ত্রী! কুন্দ! কুন্দ! সে আমার!" কাছে শ্রীশচন্দ্র আসিয়া বসিয়াছিলেন—ভাল করিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেছিলেন না।' (২৬শ পরিচ্ছেদ) আর সূর্য্যমুখীর মুখের কথায় নগেন্দ্রের এই সুখের কথা জানা যায়—"একবার তোমার ভাইকে দেখিয়া আইস—সে মুখভরা আহ্লাদ দেখিয়া আইস; তখন জানিবে, তিনি আজ কত সুখে সুখী।" (২৭শ পরিচ্ছেদ।) আবার সূর্য্যমুখীর পত্রে আছে—'আমার যিনি প্রাণাধিক তিনি সুখী হইয়াছেন ইহা দেখিয়াছি।' (২৮শ পরিচ্ছেদ।) এই তিন কথায় নগেন্দ্রনাথের সুখের কাহিনী সমাপ্ত। এই গেল নগেন্দ্রনাথের সুখের কাহিনী।

আর অভাগিনী কুন্দর সুখের কথা এইটুকু মাত্র আছে। 'কুন্দনন্দিনী যে সুখের আশা করিতে কখন ভরসা করেন নাই, তাঁহার সে সুখ হইয়াছিল। তিনি নগেন্দ্রের স্ত্রী হইয়াছিলেন। যে দিন বিবাহ হইল, কুন্দনন্দিনী মনে করিলেন, এ সুখের সীমা নাই, পরিমাণ নাই।' (৩১শ পরিচ্ছেদ।)

বাস্‌, ইহার পরেই উভয় পক্ষের অতৃপ্তি, অশান্তি, অনুতাপ, অনুশোচনার কথা। দেখা গেল নগেন্দ্র-কুন্দর মোহ এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে এই মোহের প্রভাবে সংযমের বাঁধন টুটিয়াছিল, আখ্যায়িকাকার তাহার বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে ক্ষণেকের জন্য তাঁহাদিগের সুখের, আনন্দের, কৃতার্থতার চিত্র আমাদের নয়ন-গোচর করিয়াই যবনিকাপাত করিয়াছেন। (পক্ষান্তরে, ৺রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসারে' ও 'সমাজে' বিধবা-বিবাহের পর শরৎ-সুধার সুখের চিত্র পূর্ণ-পরিসর।) ইহা হইতে বেশ বুঝা গেল, অসংযমের পরিণাম প্রদর্শন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। (সমগ্র ২৯শ পরিচ্ছেদে এই তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে।) পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি, নগেন্দ্রনাথ-সূর্য্যমুখীর দাম্পত্য-প্রেমের বৃত্তান্তই প্রধান ব্যাপার, তাহাই আখ্যায়িকার centre of interest ; নগেন্দ্র-কুন্দর মোহ এই দাম্পত্য-

সুখ-রূপ সূর্য্যালোকের উপর 'দুই দিনের জন্য' ছায়াপাত করিয়াছিল। দাম্পত্য প্রণয় আখ্যায়িকার মুখ্য বিষয় হওয়াতে আখ্যানের এই অংশে সূর্য্যমুখীর হৃদয়ের জ্বালা, মর্ম্মান্তিক বেদনার উপরে কবি বেশী জোর (stress) দিয়াছেন (২৫শ, ২৬শ, ২৭শ, ২৮শ পরিচ্ছেদ) এবং সূর্য্যমুখীর জন্য আমাদের যে পরিমাণে সমবেদনা জাগাইয়াছেন, অভাগিনী কুন্দর জন্য সে পরিমাণে নহে। কুন্দর প্রতি কমলমণির ব্যবহারেও (৩১শ পরিচ্ছেদের শেষ অংশে) যেন ইহার ইঙ্গিত রহিয়াছে।

অবশ্য, বিধবা-বিবাহের পরই সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া না গেলে হয় ত প্রেমিক-প্রেমিকা আরও অধিক দিন সুখভোগ করিতেন, বিবাহ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেন, কিন্তু কবির সে উদ্দেশ্য নহে বলিয়াই তিনি এইরূপ ঘটনা-সংস্থান করিয়াছেন। সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের পর নগেন্দ্রনাথ যেরূপ উদ্যম ও একাগ্রতার সহিত তাঁহার সন্ধান আরম্ভ করিলেন, কুন্দর গৃহত্যাগের পর সেরূপ করেন নাই (২০শ ও ৩০শ পরিচ্ছেদ তুলনীয়)। ইহা হইতেই সূর্য্যমুখীর প্রতি তাঁহার প্রণয়ের প্রগাঢ়তার পরিমাণ বুঝা যায়। কুন্দর গৃহত্যাগের পর তাঁহার মনে যে নির্ব্বেদের উদয় হইয়াছিল, সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের পর তদপেক্ষা পূর্ণতর নির্ব্বেদ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল (২১শ ও ৩২শ পরিচ্ছেদ তুলনীয়)। কেন-না এক্ষেত্রে নিজকৃত দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুতাপ প্রবল। তাই আখ্যায়িকাকার বলিয়াছেন ('বিষবৃক্ষ কি?' ২৯শ পরিচ্ছেদের শেষে)—'তাঁহার দোষ গুরুতর; প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর আরম্ভ হইল।' আবার কুন্দর হৃদয়ও এজন্য অনুতাপে ভরা। 'তখন মনে পরিতাপ হইল—মনে করিলেন সূর্য্যমুখী আমাকে অসময়ে রক্ষা করিয়াছিল—নহিলে আমি কোথায় যাইতাম—কিন্তু আজি সে আমার জন্য গৃহত্যাগী হইল। আমি সুখী না হইয়া মরিলে ভাল ছিল।' শুধু মনে মনে ভাবিলেন তাহা নহে, অল্পভাষিণী কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রনাথকে মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিলেন, 'কি করিলে যেমন ছিল, তেমনি হয়।' (৩১শ পরিচ্ছেদ।)

এই পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রনাথ-কুন্দনন্দিনীর কথোপকথন হইতে বুঝা যায়, তাঁহাদের সুখের দিনের প্রভাত হইতে না হইতেই অবসান হইয়াছে। নগেন্দ্রনাথের বিরক্তি, তিরস্কার, অন্তর্দাহ, কুন্দর হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিল। কুন্দ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলেন, 'সুখের সীমা আছে।' তাহার পর লাঞ্ছিতা মর্ম্মপীড়িতা অভাগিনী কুন্দনন্দিনী সহৃদয়া স্নেহময়ী কমলমণির কাছে কাঁদিতে গেলেন, কমল আমল দিলেন না। ভগ্নহৃদয়া 'কুন্দনন্দিনী দেখিলেন, সকল সুখেরই সীমা আছে।' এইরূপে করুণার তুলিকায় আখ্যায়িকাকার কুন্দর চিত্র আঁকিয়া পাঠকের হৃদয়ে সমবেদনার উদ্রেক করিয়াছেন। কুন্দরও গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

ইহার পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে (৩২শ) বিশ্বাস-পাত্র (confidante) অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ হরদেব ঘোষালের সহিত পত্র-ব্যবহারে নগেন্দ্রনাথের তীব্র অনুতাপের ও প্রবল নির্ব্বেদের ইতিহাস জানা যায়, এবং সূর্য্যমুখীর প্রীতি প্রগাঢ় প্রণয়ের সহিত কুন্দর প্রতি 'চোখের ভালবাসা'র প্রভেদ বিশদরূপে বুঝা যায়। উভয় প্রকার ভালবাসার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ উদ্ধৃত করিয়া আর পুঁথি বাড়াইব না। সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের পূর্ব্বে যখন কুন্দকে বিবাহ করিয়া নগেন্দ্রনাথের হৃদয়ভরা সুখ, তখন 'এক একবার মনে পড়িতেছিল, সূর্য্যমুখী উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দিয়াছে—তবে আমার এ সুখে আর কাহার আপত্তি?" (২৬শ পরিচ্ছেদ।) নূতন পত্নীলাভে এমন পরিপূর্ণ সুখের সময়েও সূর্য্যমুখীর কথা মনে পড়ায় বুঝা যায় সূর্য্যমুখী তখনও নগেন্দ্রনাথের হৃদয়ের কতখানি অধিকার করিয়া আছেন। সুতরাং গৃহত্যাগের পর সূর্য্যমুখীই যে তাঁহার সমগ্র হৃদয় অধিকার করিলেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। যদিও তখনও তিনি কুন্দকে ভালবাসেন, তথাপি সূর্য্যমুখী বিহনে কুন্দ এখন তাঁহার 'চক্ষুঃশূল হইয়াছে', 'তাহার দোষ নাই—দোষ আমারই—কিন্তু আমি তাহার মুখদর্শন আর সহ্য করিতে পারি না।...নিত্য ভর্ৎসনা করি—সে কাঁদে।' রূপমোহের এই পরিণাম। তাই আখ্যায়িকাকার বলিয়াছেন, 'কুন্দনন্দিনী ভগ্ন পুতুলের ন্যায় নগেন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একাকিনী অযত্নে পড়িয়া রহিলেন।'

'এক মাস হইল আমার সূর্য্যমুখী আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।...আমিও গৃহত্যাগ করিব। দেশে দেশে তাঁহার সন্ধান করিয়া বেড়াইব। তাঁহাকে পাই, লইয়া গৃহে আসিব; নচেৎ আর আসিব না।' (৩২শ পরিচ্ছেদ।) এই সঙ্কল্প করিয়া নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীর চিন্তায় তন্ময় হইয়া তাঁহার সন্ধানে গৃহত্যাগ করিলেন। পর-পরিচ্ছেদে সূর্য্য-মুখীর বৃত্তান্ত ও নগেন্দ্রনাথের অনুতাপ ও যন্ত্রণার ইতিহাস

লিপিবদ্ধ। নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীর (অলীক) মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া শোকে মুহ্যমান হইলেন, বিষয়-আশয়ের বন্দোবস্ত করিয়া পুনর্ব্বার দেশ-পর্য্যটন করিবেন স্থির করিয়া শ্রীশচন্দ্রের নিকট হইয়া স্বগ্রামে ফিরিলেন। ইহার ভিতর কুন্দর কথা শুধু এইটুকু আছে যে চিরকালের মত দেশত্যাগের পূর্ব্বে তাহাকে কমলমণির নিকটে পাঠাইবেন (৩৮শ পরিচ্ছেদ)। সুতরাং পরিচ্ছেদগুলি এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। শুধু এইটুকুর জন্য সেগুলির উল্লেখ করিলাম যে ইহা হইতেও সপ্রমাণ হয় নগেন্দ্রনাথ যে, সূর্য্যমুখীর দাম্পত্য-প্রণয়ই আখ্যায়িকার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়, নগেন্দ্র-কুন্দর অবৈধ-প্রণয় অপ্রধান ব্যাপার।

এতদিন ধরিয়া হীরা কুন্দকে কিরূপে নির্য্যাতিতা করিতেছিল তাহার বিবরণ একটি পরিচ্ছেদে আছে, কিন্তু এ ব্যাপার দেবেন্দ্র-কুন্দ-হীরা-সংক্রান্ত অপর একটি অপ্রধান ব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং বর্ত্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য নহে। কুন্দ অন্ধকার পুরীতে অন্ধকার জীবন (৪২শ পরিচ্ছেদ) যাপন করিতেছিল। (এই পরিচ্ছেদে অন্ধকার পুরীর বর্ণনা অন্ধকার জীবনের সহিত কি সুন্দর খাপ খায়! কবির কাব্যকলা এখানে লক্ষণীয়।) তাহার একমাত্র সম্বল ও সান্ত্বনা 'নগেন্দ্রনাথ দেওয়ানজিকে যে পত্রগুলি লিখিতেন', 'সেইগুলি পাঠ তাহার সন্ধ্যা-গায়ত্রী হইয়াছিল।' এই পরিচ্ছেদের শেষভাগে আখ্যায়িকাকার কুন্দর যন্ত্রণার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। 'বাস্তবিক সূর্য্যমুখী স্বামীকে ভালবাসিতেন, কুন্দ কি বাসে না? সেই ক্ষুদ্র হৃদয়খানির মধ্যে অপরিমিত প্রেম! প্রকাশের শক্তি নাই বলিয়া, তাহা বিরুদ্ধ বায়ুর ন্যায় সতত কুন্দের সে হৃদয়ে আঘাত করিত।... এখন কি দোষে তাকে নগেন্দ্র পায়ে ঠেলিয়াছেন? কুন্দ এই কথা রাত্রিদিন ভাবে, রাত্রি দিন কাঁদে। ভাল, নগেন্দ্র নাই ভালবাসুন—তাকে ভালবাসিবেন, কুন্দের এমন কি ভাগ্য—একবার কুন্দ তাঁকে দেখিতে পায় না কেন?' 'আবার ভাবিত, সূর্য্যমুখী আমাকে রক্ষা করিয়াছিল—আমাকে ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিত—তাহাকে পথের কাঙ্গালী করিলাম; আমার মত অভাগিনী কি আর আছে? আমি মরিলাম না কেন? এখন মরি না কেন?' আবার ভাবিত, "এখন মরিব না। তিনি আসুন—তাঁকে আর একবার দেখি—যদি সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসে, তবে মরিব। আর তার সুখের পথে কাঁটা হব না।'

অভাগিনী কুন্দনন্দিনীর এই যন্ত্রণা-দর্শনে করুণা-পরবশ হইয়া আখ্যায়িকাকার কমলমণিকে এবার সমবেদনাময়ী সখীর ভূমিকা লওয়াইয়াছেন। 'এবার আসিয়া কুন্দনন্দিনীর শুষ্ক মূর্ত্তি দেখিয়া কমলমণির রাগ দূর হইল—দুঃখ হইল। তিনি কুন্দনন্দিনীকে প্রফুল্লিত করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন, নগেন্দ্র আসিতেছেন, সংবাদ দিয়া কুন্দের মুখে হাসি দেখিলেন। সূর্য্যমুখীর মৃত্যু-সংবাদ···শুনিয়া কুন্দ কাঁদিল।···কমলমণি কুন্দকে শান্ত করিলেন।' (৪৩শ পরিচ্ছেদ।)

নগেন্দ্র আসিলেন, কিন্তু আসিয়া আবার নূতন করিয়া কুন্দকে 'মনঃপীড়া দিলেন। চিরদুঃখিনী কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না।' (৪৩ পরিচ্ছেদ।) (ইহার পর তিনটি পরিচ্ছেদে আবার সূর্য্যমুখী centre of interest; তবে কুন্দর কথা শুধু এইটুকু আছে যে নগেন্দ্রনাথ শয্যাগৃহের অন্ধকারে প্রত্যাবৃত্তা সূর্য্যমুখীকে কুন্দনন্দিনী ভাবিলেন আর বলিলেন, 'কুন্দ তুমি কখন্ আসিলে? আমি আজি সমস্ত রাত্রি সূর্য্যমুখীকে স্বপ্ন দেখিয়াছি। তুমি যদি সূর্য্যমুখী হইতে পারিতে তবে কি সুখ হইত!'—৪৫শ পরিচ্ছেদ। নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে ভুলেন নাই কুন্দর এইটুকু লাভ, কিন্তু সূর্য্যমুখীর প্রতি পক্ষপাত সুপরিস্ফুট।) 'বাটী আসিয়া নগেন্দ্র কুন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না। কুন্দ আপন শয়নাগারে, উপাধানে মুখ ন্যস্ত করিয়া সমস্ত রাত্রি রোদন করিল। কেবল বালিকা সুলভ রোদন নহে—মর্ম্মান্তিক পীড়িত হইয়া রোদন করিল। তখন কুন্দ পরিতাপ করিতে লাগিল যে, "কেন আমি স্বামি-দর্শন-লালসায় প্রাণ রাখিয়াছিলাম।" আরও ভাবিল যে, "এখন আর কোন্ সুখের আশায় প্রাণ রাখি?" তাহার পর মাতা তাহাকে ডাকিয়া লইতেছেন সে পুনরায় এইরূপ স্বপ্ন দেখিল। অসহ্য যন্ত্রণা, স্বপ্নের প্রভাব, ও হীরার প্ররোচনা, এই ত্রিবিধ উপসর্গে কুন্দর বিষপানের সঙ্কল্প দৃঢ় করিল, হীরার শয়তানিতে বিষও হস্তগত হইল (৪৭শ পরিচ্ছেদ), কুন্দ বিষপান করিল। সূর্য্যমুখী (আজ কুন্দর মরণের দিনে) তাহার প্রতি রাগ অভিমান ভুলিলেন, 'কনিষ্ঠা ভগিনী'কে দেখিতে আসিলেন। ('রত্নাবলী' প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকে পাটরাণীর আচরণ, তুলনীয়)। কুন্দর মরণকালে আখ্যায়িকাকার এত সমবেদনাময় যে সপত্নীর

হৃদয়েও সমবেদনার সৃষ্টি করিয়াছেন। (৪৮শ পরিচ্ছেদ।)

তাহার পর কুন্দর মরণকালীন মর্ম্মান্তিক উক্তি। 'কুন্দ কখন স্বামীর কথার উত্তর করিত না—আজি সে অন্তিম কালে মুক্ত-কণ্ঠে স্বামীর সঙ্গে কথা কহিল, বলিল, *··· "কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে···তবে আমি মরিতাম না। আমি অল্প দিন মাত্র তোমাকে পাইয়াছি—তোমাকে দেখিয়া আমার আজও তৃপ্তি হয় নাই। আমি মরিতাম না।"...কুন্দ আজি বড় মুখরা, সে আর ত স্বামীর সঙ্গে কথা কহিবার দিন পাইবে না— "যাহা বলিলাম, তাহা কেবল মনের আবেগে বলিয়াছি। তোমার আসিবার আগেই আমি মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, তোমাকে দেখিয়া মরিব। দিদির কাছে তোমাকে রাখিয়া আমি মরিব—আর তাঁহার সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না। আমি মরিব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম—তবে তোমাকে দেখিলে আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।...আমার কথা কহিবার তৃষ্ণা নিবারণ হইল না। - আমি তোমাকে দেবতা বলিয়াই জানিতাম—সাহস করিয়া কখন মুখ ফুটিয়া কথা কহি নাই। আমার সাধ মিটিল না।" (৪৯শ পরিচ্ছেদ।) আর এই মর্ম্মভেদী দৃশ্য উদ্ঘাটন করিব না। বুঝা গেল, মরণ-কালেও কুন্দর আকাঙ্ক্ষা ও অতৃপ্তি অটুট রহিয়াছে।

ইন্দ্রিয়-দমনে, চিত্তসংযমে অসমর্থতার কি নিদারুণ পরিণাম আখ্যায়িকাকার গাঢ়বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। শ্রাবণের প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, অপর দুইটি অপ্রধান আখ্যানে—দেবেন্দ্র-কুন্দ ও দেবেন্দ্র-হীরার ব্যাপারে—আখ্যায়িকাকার ইহা অপেক্ষাও গাঢ়তর বর্ণে অসংযমের বিষময় পরিণাম চিত্রিত করিয়াছেন। গোবিন্দলাল ও রোহিণীর কথা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আলোচনা করিব। আপাততঃ যে আখ্যায়িকা আনুপূর্ব্বিক আলোচনা সমাপ্ত করিলাম, ইহা হইতে কি সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হয় না যে, তরলমতি পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে অবৈধ প্রণয়ের তীব্র উত্তেজনা উন্মাদনার উদ্রেক করা বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য নহে, অসংযমের বিষময় পরিণাম প্রদর্শন করিয়া মোহের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য? (ইহা বিশেষ করিয়া তিনি 'বিষবৃক্ষ কি?' শীর্ষক ২৯শ পরিচ্ছেদে প্রকটিত করিয়াছেন এবং আরও অনেক স্থানে ইহার আভাস দিয়াছেন।) এই কাহিনী পাঠ করিয়া, হৃদয়ঙ্গম করিয়া, ব্যভিচারের স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইবে না, নিবৃত্তি হইবে। It will serve as a warning and not as an example.

অথচ এমন পাঠক ও সমালোচকও আছেন, যাঁহারা 'উল্টা' বলেন। তাঁহারা এমন পর্য্যন্ত বলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র কুন্দনন্দিনীর সৃষ্টি করিয়া শেষ-জীবনে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, এই সংবাদ তাঁহারা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন! কিন্তু এই সকল সুবিখ্যাত ব্যক্তিকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, বঙ্কিমচন্দ্র 'ইন্দিরা' ও 'রাজসিংহ' ঢালিয়া সাজিয়াছিলেন, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র উপসংহার পরে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, 'সাম্য' তাঁহার পরিণত বয়সের মতের সহিত মেলে নাই বলিয়া তিনি উহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি যদি 'বিষবৃক্ষ' সমাজের অনিষ্টকর বলিয়া পরে বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহার প্রচার বন্ধ করিলেন না কেন? গ্রন্থবিক্রয়ে লাভের অঙ্কই ত তাঁহার পরম কাম্য ছিল না, 'What is writ is writ,—Would it were worthier' বলিয়া বায়রণের মত হাল ছাড়িয়া দিবার পাত্রও তিনি ছিলেন না। তাই বড় দুঃখেই এই শ্রেণীর পাঠক ও সমালোচককে বিখ্যাত বিলাতী সমালোচক Sir Walter Raleighর কথায় বলিতে ইচ্ছা হয়—"Books are written to be read by those who can understand them; their possible effect on those who cannot, is a matter of medical rather than of literary interest."

ভাঙ্গাবৃন্তে করি রয়েছে জীবন ধরি
জীবনে উদাস।

* * * * *

একটি কহেনি কথা অনেক সহেছে
মরমে মরমে কীট অনেক রয়েছে
আজ মরিবার কালে শুধাইছ কেন?

—ভগ্নহৃদয়, ৩০শ সর্গ।

ত্রয়ী

শিল্পী—শ্রীবসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

"গরজি গরজি শঙ্খ তোমার
বাজিয়া বাজিয়া উঠুক এবার,
গর্ব্ব টুটিয়া নিদ্রা ছুটিয়া
জাগুক্ তীব্র চেতনা।"

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিখিল-প্রবাহ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

মেসোপোটেমিয়ার কৃষক-পরিবার

১। মেসোপোটেমিয়ার কথা

প্রাচীন জগতের ইতিহাসে মেসোপোটেমিয়া যে বিপুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে, আর কোনও দেশের সহিতই তাহার তুলনা হয় না;—এমন কি, মিশরেরও নহে। মেসোপোটেমিয়ার নাম মানব-ইতিহাসের কত বিলুপ্ত অতীতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ঐতিহাসিকেরা অনেকেই ইহাকে আদি মানবের

জন্মস্থান ও সভ্যতার সূতিকাগার বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বিগত মহাযুদ্ধের পর, এসিয়ার এই অতি-প্রাচীন দেশটি ইংরাজের তত্ত্বাবধানে আসিয়াছে—সাধারণ লোকে বোধ হয় এ সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছুই জানেন না; কিন্তু যাঁহারা ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ্, তাঁহাদের নিকট এ দেশের কাহিনী অতীব হৃদয়গ্রাহী। কালদীয়া, বাবিলন, আসুরিয়া প্রভৃতি একাধিক সাম্রাজ্য এখানে

গ্রীষ্মকালে নগর-প্রান্তে মরু-বিহারীদের আস্তানা

উপর্য্যুপরি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে—আবার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বহু বিরাট যুদ্ধ এখানেই ঘটিয়াছিল; এবং তাহার ফলাফলে কত সাম্রাজ্যের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। য়িহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান—সকলের নিকটেই ইহা পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত।

মেসোপোটেমিয়াকে মোটা-

য়িহুদী ধর্ম্মাচার্য্য এজ্‌রার সমাধি-মন্দির।

দুটি ছুটি ভাগ করা যাইতে পারে। বোগদাদের উপরের অংশটুকু উত্তরার্দ্ধ ও তাহার নিম্নাংশ পারস্যোপসাগর পর্য্যন্ত দক্ষিণার্দ্ধ। এই উত্তর ও দক্ষিণার্দ্ধের মধ্যে কয়েকটি মূল-প্রকৃতিগত প্রধান পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এক দিকে পর্ব্বত ও অরণ্য-সমাকুল অসমতল প্রদেশ; অন্য দিকে—নদ-নদী-প্রবাহিত সমতল ভূমি। বোগদাদের নিম্ন হইতে পারস্যোপ সাগর পর্য্যন্ত ভূখণ্ড যাহা প্রাচীন যুগে বাবিরুশ-রাজ্য বলিয়া আখ্যাত ছিল, এবং উপস্থিত ইরাক প্রদেশ নামে পরিচিত—উহার দুইপাশ দিয়া—য়ুফ্রেটিশ্ ও টাইগ্রীস্ নদী প্রবহমান। সমুদ্র হইতে একশত মাইল উপরে এই দুই নদী পরস্পর যুক্ত হইয়া একটী স্রোতে সাগরে গিয়া মিশিয়াছে। এই দুই নদীর সংযোগ স্থলকে 'শটেল আরাব' বলে। উক্ত সমগ্র ভূখণ্ড বালুকা-মিশ্রিত মৃত্তিকাবৃত বলিয়া অত্যন্ত উর্ব্বর এবং কৃষি-কার্য্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। প্রাচীন জগতের মধ্যে সর্ব্বোত্তম সমৃদ্ধ এই প্রদেশ পৃথিবীর শস্য-ভাণ্ডার স্বরূপ ছিল। সভ্যতার সেই প্রথম উষাকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত কত সাম্রাজ্যের অগণ্য অধিবাসীর সেবা করিয়াও, এ দেশের ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি এখনও অক্ষয় ও অপরিমেয়।

বাবিলন হইতে নাইনেভে পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর ভূখণ্ডব্যাপী ধ্বংসাবশেষ এখনও বহু লুপ্ত সাম্রাজ্যের অতীত গৌরব ও সমৃদ্ধির সাক্ষ্য দিতেছে। দক্ষিণ সমতল খণ্ডেও কত যে বিভিন্ন শিক্ষা ও সভ্যতার জন্ম, উন্নতি, পরিণতি ও বিস্মৃতি ঘটিয়া গিয়াছে, পুরাতত্ত্ব তাহা প্রমাণ করিয়াছে। মেসোপোটেমিয়া প্রধানতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। ডিসেম্বর হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত উত্তরার্দ্ধে প্রচুর বৃষ্টি হয়। দক্ষিণার্দ্ধে অতি সামান্য বৃষ্টি হয় বলিয়া, খাল খননাদি পূর্ত্ত-কার্য্যের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে কৃষিক্ষেত্রে জল সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সুদূর অতীতের সে কোন্ অজ্ঞাতনামা ইঞ্জীনিয়ারের দল সেখানে পূর্ত্তকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও জানা নাই বটে, কিন্তু বর্ত্তমানের বহু বিশেষজ্ঞ উহা দেখিয়া, বিস্ময়বিমূঢ় চিত্তে প্রশংসা করিতে থাকেন। শীত সেখানে অতি অল্প দিনের জন্য আসে;—বৎসরের সেই সময়টুকু

টাইগ্রীস্ নদীর ধারে বেদুইনের দল

(তীরে তাহাদের অস্থায়ী আবাস ও জলে তাহাদের পালিত মহিষের দল)

গোলাকার আরব নৌকা

(আরবেরা এখনও তাহাদের সেই প্রাচীন গোলাকার নৌকায় চড়িয়া নদী পারাপার হয়)

অত্যন্ত উপভোগ্য বলিয়া মনে হয়। মেসোপোটেমিয়ার বর্ত্তমান অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই আরব। উহারা আরবের মরুভূমি ছাড়িয়া আসিয়া ক্রমশঃ এই স্থানের বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু এখনও তাহাদের আদিম বর্ব্বরতা ঘুচে নাই। উহাদের মধ্যে অসংখ্য দল আছে। প্রত্যেক দল এক-একজন সর্দ্দারের অধীন থাকে। কোনও দলেরই পরস্পরের সহিত সদ্ভাব নাই; প্রায়ই তাহারা মারামারি, কাটাকাটি করিয়া মরে। তাহারা বেশীর ভাগই ঘর-বাড়ীর

আলোক-রশ্মি প্রভাবে পীনস্ রোগের চিকিৎসা
(স্ফটিকমণি-নির্ম্মিত বৈদ্যুতিক দীপশলাকার সাহায্যে নাসিকার অভ্যন্তরে চিকিৎসক গাঢ় নীল রশ্মি প্রয়োগ করিতেছেন)

ধার ধারে না;—আরবের মরুবিহারী বেদুইন পশুপাল সঙ্গে লইয়া স্থানে-স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়—তাঁবু গাড়িয়া রাত্রিবাস করে। কেবল গরমের সময় অসহ্য উত্তাপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সহরের প্রান্তে আসিয়া আশ্রয় লয়। কেবলমাত্র অল্পসংখ্যক কয়েকজন নদীর ধারে-ধারে হোগলার ঘর করিয়া বসবাস করে। উহারা নৌকা চালায়, গো-মহিষাদি পালন করে এবং চাষ-বাস করিয়া প্রচুর শস্য উৎপাদন করে। কিন্তু বর্ষাশেষে তাহারাও অনেকে ঘর ছাড়িয়া পালিত পশুগুলিকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়ে।

টন্‌সিলাইটিসের চিকিৎসা

দূরে দূরে যেখানে একটু তৃণাচ্ছাদিত ভূমি দেখিতে পায় —সেইখানেই তাহাদের পশুগুলিকে চরাইতে লইয়া যায়। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি যখন ঘাস মরিয়া যায়, ও নদীনালা

বাত-ব্যাধির প্রতীকার

শুকাইয়া উঠে, তখন আবার তাহারা নদীতীরের আশ্রয়-গুলিতে ফিরিয়া আসে। সেই সময় যাযাবরদের মধ্যে অনেকেও আসিয়া তাহাদের গৃহে অতিথি হয়। উহাদের

মেঝের উপর স্থাপিত ইলেক্‌ট্রিক ভাইব্রেটার

চোরের সরঞ্জাম
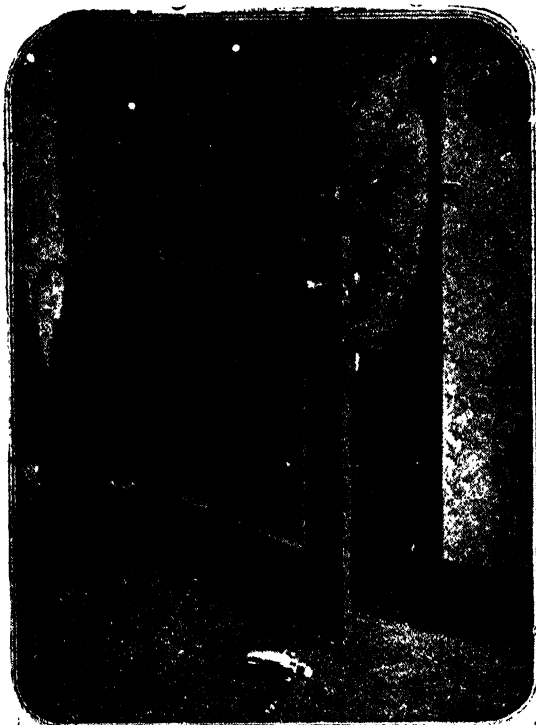
ওজোন উৎপাদক যন্ত্র

চোর ঠকাইবার কৃত্রিম মানুষ

কপাটের পার্শ্বে দেয়ালের ধারে মোটর-হর্ণ বসাইয়া রাখা

দরজার হাতোলে তাড়িত-প্রবাহ সংযোগ করা

একপায়ে কতক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, ঘড়ী ধরিয়া তাহার পরীক্ষা হইতেছে

সঙ্গীত বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থী ছাত্রের পরীক্ষা

কন্সার্টের দলে কর্ম্ম প্রার্থীর পরীক্ষা

কাজের লোকের পরীক্ষা

কাজের লোকের দক্ষতা ও নৈপুণ্যের পরীক্ষা

মধ্যে বেদুইন ও মাদেন এই দুই দলই সর্ব্বপ্রধান। বেদুইনরা আভিজাত্য গৌরবে মাদেনদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এইজন্য উহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনও সামাজিক আদান-প্রদান হয় না। সহরের বাসিন্দাদের মধ্যে অধিকাংশই জমিদার, ব্যবসাদার, দোকানী, পসারী ইত্যাদি। আরবদের পোষাক এক দীর্ঘ 'আঙ্‌রাখা'; কটিদেশে কোমরবন্ধ আঁটা; এবং মাথার উপর একখানি বৃহৎ রুমাল ভাঁজ করিয়া চাপা দেওয়া ও তদুপরি একটি উষ্ট্রলোম বা পশম-নিৰ্ম্মিত বিড়ে আঁটা থাকে। যাহারা ধনী, তাহারা এতদতিরিক্ত এক একটী সৌখীন কোর্ত্তা ব্যবহার করে; এবং তাহার উপর আবার রেশমের এক-একটি 'আবা' পরিধান করে। এই 'আবা'র বহর দেখিয়া তাহাদের অনেকেরই পদমর্য্যাদা বুঝিতে পারা যায়। তাহাদের ভাষাও প্রধানতঃ আরবী; তবে ফার্শীও অনেকে জানে; কারণ, বাসিন্দাদের মধ্যে অনেক পারস্য-বাসীও আছেন। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা থলের মত ঢিলে ইজের এবং লম্বা-লম্বা মোটা কাপড়ের তৈয়ারী টুপি ব্যবহার করে। কিন্তু কোমরে কটিবন্ধ সকলেরই থাকে।

নূতন পদ্ধতিতে নির্ম্মিত বাটীর বহির্দৃশ্য

(সম্মুখে গাড়ীবারান্দা ও ছাদের উপর খেলাধুলা করিবার সরু হলটি দেখা যাইতেছে)

উহারা সকলে ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী বটে; কিন্তু সেই দুই সনাতন শিয়া ও সুন্নী শ্রেণী বিভাগ এখানেও প্রবল ভাবে বিদ্যমান। তবে ধর্ম্মের জন্য এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে এখানে কোনও বিদ্বেষ বা রেষারিষি দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি, বড়-বড় সহরে মুসলমান, খৃষ্টান, য়িহুদী, আর্ম্মেনিয়ান—সকলেই বেশ সদ্ভাবের সহিত বসবাস করিতেছে, দেখা যায়। তুর্কীরা যে সকল য়িহুদী ও আর্ম্মেনিয়ান মেয়েদের ধরিয়া আনিয়া সহরের বাজারে বিক্রয় করে, ক্রেতা আরব অধিবাসীরা তাহাদের লইয়া গিয়া বেশ আদর-যত্নেই রাখে; কারণ, অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইয়োরোপীয় ও মার্কিন মিশনারী সাহায্য-সমিতিগুলির আশ্রয় দান তাহারা স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করে; এবং তাহাদের নিকট হইতে কোনও প্রকার সাহায্য লইতে স্বীকৃত হয় না।

গাড়ীবারান্দার ভিতর দিক বা দরদালানের দৃশ্য

(এই দরদালানের পার্শ্বের দক্ষিণ দিকের থামগুলির পরেই প্রকাণ্ড বৈঠকখানা)

মেসোপোটেমিয়ার প্রায় অধিকাংশ বড়-বড় সহরই পূর্ব্বোক্ত বড়-বড় দুইটি নদীর ধারে অবস্থিত; বিশেষতঃ টাইগ্রীসের ধারে। উত্তরার্দ্ধে প্রাচীন আসুরীয়ার ঠিক মধ্যস্থলে 'মসুল' একটী প্রধান সহর। উপস্থিত ইহা

অভাবের দারুণ নিষ্পেষণে দারিদ্র্য ও ক্ষয়ের পথে অগ্রসর হইয়াছে বটে; কিন্তু এককালে উহার মত সমৃদ্ধিশালী নগর এসিয়ার ভিতর আর দ্বিতীয় ছিল না। এই মণ্ডুলেই সর্ব্বপ্রথম জগদ্বিখ্যাত মস্‌লিনের উৎপত্তি হইয়াছিল।
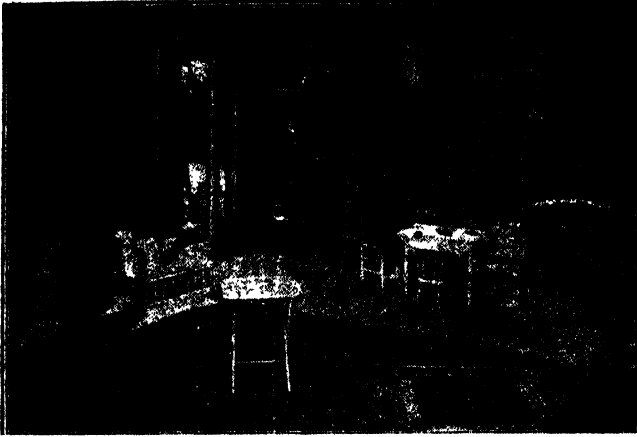
ছাদের উপরে ছেলেদের খেলাঘর

প্রত্নতত্ত্ব মণ্ডুলকে জগতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। টাইগ্রীস্ নদীর বাম কূলে নাইনেভের ধ্বংসাবশেষ দৈর্ঘ্যে প্রায় আঠার মাইল এবং প্রস্থে বারো মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই বিরাট্ ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাচীন সভ্যতার অসংখ্য নিদর্শন সংগৃহীত হইয়া, আজ পৃথিবীর প্রত্যেক প্রধান-প্রধান যাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। পুরাতত্ত্ব-বিদেরা বলেন, নাইনেভের সভ্যতা মেসোপোটেমিয়ার প্রাচীনত্বের তুলনায় বড় বেশী দিনের নহে। ইহারও বহুকাল পূর্ব্বে যে এ দেশ সভ্যতার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

বোগদাদ হইতে পারস্যোপসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে খর্জ্জুর-বৃক্ষের অতি-প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। দিগন্তব্যাপী তরুপাদপ-হীন প্রান্তরের মধ্যে এই একমাত্র খর্জ্জুর-বৃক্ষগুলিই সে দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। ইহারা কেবলমাত্র নয়নানন্দকর নহে—দেশবাসীর ক্ষুন্নিবৃত্তিও করে; কারণ, খেজুর আরবদের একটী প্রধান খাদ্য। মণ্ডুল হইতে প্রায় দুইশত মাইল পশ্চাতে বিশ্ববিশ্রুত বোগদাদ সহর। প্রায় পাঁচশত বৎসরেরও অধিক কাল এই বোগদাদ সহর মুসলমান সাম্রাজ্যের রাজধানী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। বিদ্যায়, বৈভবে, বিলাসে ও বাণিজ্যে বোগদাদ একদিন জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। উপস্থিত ইহার লোকসংখ্যা দেড়লক্ষের অধিক নহে। তাহাদের মধ্যে আবার বহু ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে। নানা শ্রেণীর মুসলমান, য়িহুদী, নেস্তারী, কাল্‌দীয়ান, খৃষ্টান, আর্ম্মেনিয়ান, সিরীয়ান্ প্রভৃতির বসবাস। যুদ্ধের সময় হইতে ফরাসী ও ইংরাজেরও আমদানী হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে কেবলমাত্র ইয়োরোপীয় মিশনারীদের যাতায়াত ছিল। কালদীয়ানই নিম্ন মেসো-পোটেমিয়ার আদিম অধিবাসীদের বংশধর। খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম অভ্যুদয়ে তাহারা ঐ নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, এবং মুসলমান-বিজয়ের সময় সহস্র প্রলোভন ও অত্যাচারের মধ্যেও তাহারা আপনাদের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে নাই। ইহারা গৌরবর্ণ, দেখিতে সুশ্রী, ঢিলে পায়জামা পরিধান করে, কোমরে কটীবন্ধ ব্যবহার করে এবং মস্তকে

শোবার ঘরের ভিতরের দৃশ্য

রুমাল জড়াইয়া বাঁধে। আর্মেনিয়ানরাও অনেকে রোমান-ক্যাথলিক খৃষ্টান; তবে বেশীর ভাগ তাহারা গ্রেগরীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত। বোগদাদে য়িহুদীর সংখ্যা প্রায় চল্লিশ সহস্র। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা

না কি কোন স্মরণাতীতকালে বাবিরূশের হস্তে বন্দী হইয়া মেসোপোটেমিয়ায় আনীত হইয়াছিল। য়িহুদীদের ধর্ম্ম-নায়ক মহাত্মা এজরার সমাধি-মন্দিরটি বোগদাদ হইতে কিছু দূরে, নদীর দক্ষিণ কূলে প্রতিষ্ঠিত। য়িহুদীরা অতি যত্নের সহিত এই মন্দির রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এই মন্দিরের শীর্ষদেশ মসলমানী ধরণের গম্বুজাকারে নির্ম্মিত। আশে পাশে নারিকেল-কুঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়। সে দেশের য়িহুদীদের মধ্যে এই প্রবাদ প্রচলিত যে, ঐ নারিকেলের ভিতর যে জল থাকে, উহা তাহাদেরই সেই পরাজিত, বন্দী পূর্ব্বপুরুষগণের কাতর অশ্রুজল।

আস্‌বাব, তৈজস্ প্রভৃতি ধ্বংসোদ্ধৃত অতীতের স্মৃতি-চিহ্ন গুলি হইতে পর্য্যায়ক্রমে আসুরীয়, নব-বাবিরূশ, পারস্য ও গ্রীক, পার্থিয়ান যুগের প্রাচীন সভ্যতা, রীতি-নীতি ও আধিপত্যের পরিচয় জানিতে পারা গিয়াছে। খৃঃ-পূর্ব্ব ছয় শতাব্দীতে নৃপতি নেবুকাদ্‌নেজার বাবিরূশে যে নূতন সহরটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, পৃথিবীর আর কোথাও সেরূপ সুন্দর ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহর এ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হয় নাই। মনোহর হর্ম্ম্যরাজি, অপূর্ব্ব পুষ্পোদ্যান, চমৎকার প্রমোদাগার প্রভৃতি পরিশোভিত, ইন্দ্রের অমরাবতীর তুল্য সেই যে অনুপম শিল্প-শোভায় সুসম্পদ্‌শালী সমৃদ্ধ নগর,—যাহার ভুবন-বিদিত

খাবার ঘর

স্নানের ঘর
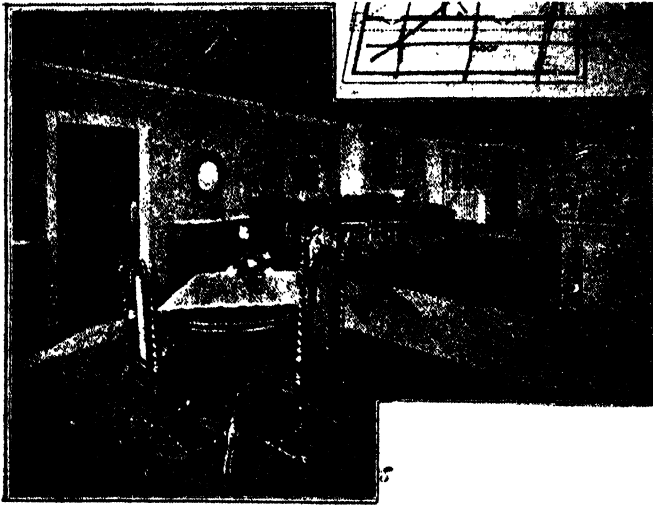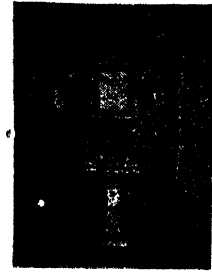
বোগদাদ হইতে প্রায় এক শত মাইল দক্ষিণে য়ুফ্রেটীশ্ নদীর বাম কূলে ধূ ধূ করিতেছে বাবিরূশের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ—! কালের করাল কবলে সে বিপুল ধ্বংসের চিহ্নও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। জার্ম্মাণ প্রত্ন-তত্ত্বানুসন্ধীগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ইতিহাসের বহু মূল্যবান তথ্য এই মৃত দেশের মৃত্তিকা-গহ্বর হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। খৃঃ-পূর্ব্ব ৬০০ শতাব্দীতে বাবিরূশ-অধিপতি নেবুকাদ্‌নেজারের রাজত্ব কালীন একটি সহরের অনেকটা অংশ মাটির ভিতরে খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত খৃঃ-পূর্ব্ব আড়াই হাজার বৎসর আগের পর্য্যন্ত বাবিরূশ নৃপতিগণের স্থাপিত নগরাদির বহু নিদর্শন ঐ ধ্বংসের ভিতর হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজপথ, অট্টালিকা,

দোদুল্যমান কানন, আজিও বিশ্বের বিস্ময়ের সামগ্রী হইয়া আছে, ঐতিহাসিকের বর্ণনা, কবির কল্পনা তাহার অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম।

সমুদ্র হইতে ৬৭ মাইল দূরে শাটেল্-আরবের দক্ষিণ কূলে বর্ত্তমান 'বস্‌রা' সহর অবস্থিত। সেকালে ইহার নাম ছিল 'বাল্‌সোরা'। আরব্য উপন্যাসের সেই পরিচিত নাবিক সিন্ধাবাদ উটের পিঠে চড়িয়া বোগদাদ হইতে এই বাল্‌সোরার বিখ্যাত বন্দরে আসিত; এবং এই বন্দর হইতেই জাহাজে আরোহণ করিয়া সিন্ধাবাদ যাইত বাণিজ্য করিতে পারস্যোপ-সাগরের তদানীন্তন অনাবিষ্কৃত দ্বীপপুঞ্জে। সেই সিন্ধাবাদের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত উক্ত প্রাচীন বাল্‌সোরা বা বর্ত্তমান বস্‌রা সহর জগতের একটি বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্র হইয়া

আছে; কারণ, এসিয়ার একটি সর্ব্বপ্রধান বন্দর হইবার উপযোগী ইহার অনেকগুলি সুবিধা আছে। ইহার লোক-সংখ্যা উপস্থিত ষাট হাজার মাত্র।

মেসোপোটেমিয়ায় আর একটী সম্প্রদায় আছে, যাহাদের উল্লেখ না করিলে, মেসোপোটেমিয়ার বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এই সম্প্রদায়ের নাম 'শেবীয়ান'; ইহারা নক্ষত্রোপাসক। খৃষ্টান, য়িহুদী ও ইসলাম ধর্ম্মের কতক অংশ প্রাচীন বাবিরুশের পৌত্তলিকতার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ইহাদের মধ্যে এক অদ্ভুত ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। স্রোতস্বিনী নদীর জল ইহাদের উপাসনার প্রধান উপকরণ। এই জন্য বিখ্যাত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ইহাদের মধ্যে যাহারা তুর্ক সেনাদলভুক্ত হইয়াছিল,—সতত স্রোতস্বিনী নদীর সন্নিকটে অবস্থান যুদ্ধের সময় সম্ভবপর নহে দেখিয়া, তাহারা ধর্ম্মের খাতিরে, সত্বর সৈনিক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। নৌ-শিল্প, সোণা-রূপার কাজ ও কর্ম্মকার-বৃত্তি প্রভৃতি ইহাদের উপজীবিকা। এই সকল কাজে ইহারা এমন নিপুণ ও সুদক্ষ যে, দুর্দ্দান্ত আরবেরাও ইহাদের কদর বুঝিয়া আদর করিয়া থাকে। ইহারা কেহই মাথার চুল বা গোঁফ-দাড়ী কখনও কামানো দূরে থাক, ছাঁটে না পর্য্যন্ত। ইহাদের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সুন্দরী ও রূপবান্। দুই শতাব্দী পূর্ব্বেও ইহাদের সংখ্যা প্রায় বিশ হাজারের উপর ছিল; কিন্তু এত দ্রুত ইহারা লোপ পাইয়া যাইতেছে যে, আগামী শতাব্দীতে বোধ হয় ইহাদের আর অস্তিত্ব থাকিবে না; কারণ, উপস্থিত ইহাদের সংখ্যা মাত্র তিন হাজার প্রাণী!

মেসোপোটেমিয়ার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীসমূহের সাহায্য পাইলে, এবং রেলপথ প্রভৃতি বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে এ দেশ অচিরে আবার তাহার পূর্ব্ব গৌরবে ফিরিয়া আসিতে পারে, আশা করা যায়।

(Current History.)

২। আলোক-রশ্মির প্রভাবে রোগের প্রতিকার

অগ্নিশিখা ও আলোক-রশ্মির প্রয়োগ দ্বারা রোগের চিকিৎসা পুরাকালেও প্রচলিত ছিল। মিশর ও রোমের ঐতিহাসিক কাহিনীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সূর্য্য-কিরণে রৌদ্র-স্নান করা সেকালের ব্যাধিগ্রস্তদের আরোগ্যলাভ করিবার একটী প্রধান ব্যবস্থা ছিল। এখনও অনেক দেশের রোগীরা এই উপায় অবলম্বন করে বটে, কিন্তু তাহারা হয় ত জানে না যে, সূর্য্য-কিরণের উত্তাপেই তাহারা আরোগ্যলাভ করে না—রবি-রশ্মির অভ্যন্তর-নিহিত রাসায়নিক শক্তির প্রভাবেই তাহারা নিরাময় হইয়া উঠে। শ্বেতবর্ণের আলোক নানাবর্ণের আলোকের সংমিশ্রিত রূপ। একটি ত্রিকোণ কাচের ভিতর দিয়া সূর্য্য রশ্মি দেখিলে, তরল রক্তাভা হইতে পীতাভা ও নীলাভা প্রভৃতি সূর্য্য-কিরণের ভিন্ন-ভিন্ন বর্ণ পৃথক্ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। তরল রক্তাভ রশ্মিগুলিই উত্তাপবাহী। উহার মধ্যে
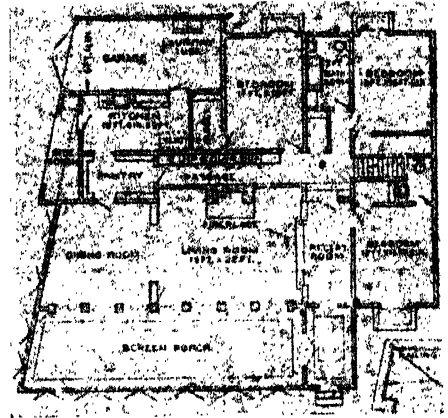
বাড়ীর নক্সা

রাসায়নিক গুণ অতি অল্পই থাকে। নীল-বর্ণ রশ্মিতেই রাসায়নিক প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই জন্য কেবলমাত্র নীল রশ্মির প্রয়োগে রোগ শীঘ্র দূর হইতে পারে। এই নীল রশ্মি যত গাঢ়তর হইবে, অর্থাৎ উহার মধ্যে রাসায়নিক গুণ যত বেশী থাকিবে, রোগীর পক্ষে উহা ততই অধিক ফলপ্রদ। এখানে গাঢ় নীলরশ্মি (Ultra Violet Rays) বলিলে কেহ যেন গভীর নীল রং মনে করিবেন না; কারণ এ রশ্মির রেখাই খালি-চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না;—বর্ণ তো দূরের কথা। সুতরাং এখানে গাঢ় নীল রশ্মি অর্থে গভীর রাসায়নিক প্রভাববিশিষ্ট আলোক-শিখা বুঝিতে হইবে। সূর্য্য-কিরণের মধ্যে যে গাঢ় নীল রশ্মিটুকু আছে, দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ করিয়া, বিবিধবাষ্পীয় স্তর ভেদ পূর্ব্বক, উহাকে পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছিতে হয় বলিয়া, উহার

অভ্যন্তরস্থ রাসায়নিক শক্তি বহু পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়। এই কারণে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার জন্য কৃত্রিম আলোকের সাহায্য লওয়ার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। প্রথমে বৈদ্যুতিক আর্ক-ল্যাম্পের (অঙ্গার-দীপাগ্রে ঘনীভূত প্রবল

শ্রীমতী ইলীন শোপার

বৈদ্যুতিক শক্তি-সঞ্জাত তীব্র নীলাভ আলোক) সাহায্যে রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছিল। কারণ সূর্য্য-কিরণের অপেক্ষা উক্ত আলোক-রশ্মির মধ্যে আরোগ্যকর রাসায়নিক শক্তির প্রভাব অনেক গুণ অধিক-মাত্রায় বিদ্যমান। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, আর্ক-ল্যাম্পের শিখা রোগ নিবারণের পক্ষে উপযোগী হইলেও, উহার উত্তাপ দেহ চর্ম্মের পক্ষে বিশেষ হানিকর, তখন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলোক-চিকিৎসক শ্রীযুক্ত নায়েল্স্ ফিন্সেনের উদ্ভাবিত উপায়ে উত্তাপবাহী আলোক-রশ্মিটুকু বাদ দিয়া, উহার প্রয়োগ প্রচলিত হয়। পরে আর্ক-ল্যাম্পের ব্যবহারও উঠিয়া গিয়া, তৎপরিবর্ত্তে স্ফাটিক দীপাধার প্রচলিত হইয়াছে। পারদ-বাষ্পের ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালিত হইলে, গাঢ় নীল রশ্মি উৎপাদিত হয় বলিয়া, স্ফাটিক দীপাধারে তাড়িত-শক্তি সঞ্চারিত করিবার পূর্ব্বে, উহা প্রথমে পারদ-বাষ্পের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করা হইতেছে। কাচের তুলনায় স্ফাটিক দীপাধার অধিক স্বচ্ছ হওয়ায়, গাঢ় নীল রশ্মি সহজেই উহা ভেদ করিয়া আসিতে পারে; এবং উহার উত্তাপ-সংহারক গুণ থাকায়, উহাতে প্রবলতর আলোক-শিখা প্রজ্বালিত করা চলে। স্ফটিক-মণি দীপের আর একটী প্রধান গুণ এই যে, উহার সাহায্যে আলোক-রশ্মি শরীর ভেদ করিয়া, দেহের অভ্যন্তর-ভাগেও প্রবেশ করাইতে পারা যায়। এই আলোক-রশ্মির চিকিৎসা বিন্দুমাত্রও যন্ত্রণাদায়ক নহে; বরং ঈষৎ আরাম-প্রদ, এবং আশু ফলদায়ী। সকল প্রকার বাত,বেদনা, যন্ত্রণা, ফোড়া, ঘা,, সর্দ্দি-কাশী, হাঁপানী, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, নিমোনিয়া, টিউবারকিউলোসিস্, টন্‌সিলাইটিজ, লাম্বেগো, নিউর‍্যাল্‌জিয়া মাথা-ভার, গা-ম্যাজ-ম্যাজ, জ্বরভাব, মন্দাগ্নি, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি মনুষ্য-দেহের সহস্র প্রকার ব্যাধি এই গাঢ়নীল আলোক-রশ্মির চিকিৎসায় সত্বর আরোগ্য হইয়া যায়। ডাঃ জর্জ ক্রাইল বলেন, এই রশ্মির প্রভাবে কেবলমাত্র ব্যাধির

খুকী ও নেংটে!
(ইলীনের তের বৎসর বয়সে আঁকা ছবি)

বীজাণুই নষ্ট হয় না—সঙ্গে-সঙ্গে স্বাস্থ্যের বীজাণুগুলিকেও সরল, সতেজ ও শক্তিশালী করিয়া তুলে।

(Popular Science)

৩। চোর তাড়াইবার কৌশল

বাড়ীর ভিতর, প্রবেশ-পথের সন্নিকটে, একটি কৃত্রিম মানবমূর্ত্তি দাঁড় করাইয়া রাখিলে, অল্পবুদ্ধি চোরকে অনায়াসে ঠকাইতে পারা যায়। অন্ধকারে কোনও উপায়ে বাড়ীর ভিতরে

ঢুকিয়া, সে যেমন পথ নিরূপণের জন্য তাহার বৈদ্যুতিক হাত-প্রদীপটি (Electric torch lamp) ক্ষণেকের জন্য টিপিয়া ধরে, অমনি তৎপ্রতিফলিত আলোকে সহসা সম্মুখে সেই কৃত্রিম মূর্ত্তিটি দেখিতে পাইয়া, লোক রহিয়াছে মনে করিয়া, চোরটি পলাইয়া যায়। অন্ধকার ঘরের ভিতর হঠাৎ
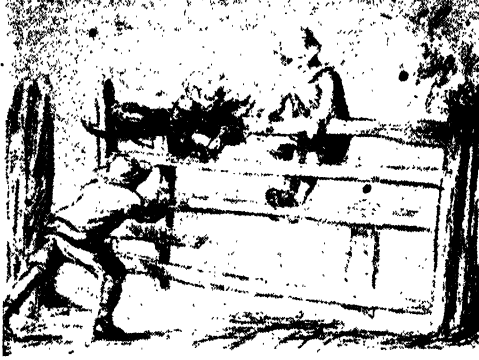
বেড়া নয় গাড়ী !
(রয়েল এ্যাকাডেমীর প্রদর্শনীতে গৃহীত ইলীনের আঁকা প্রথম চিত্র)

আলো জ্বলিয়া উঠিলেও, অনেক দুর্দ্দান্ত চোর ভয়ে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে। এই জন্য ঘরের ভিতর দিকে দরজার সম্মুখ-বরাবর কেহ যদি একটি 'ওজোন জেনারেটার' বা ঘনীভূত অম্লজান-উৎপাদক যন্ত্র ঝুলাইয়া রাখেন, তাহা হইলে, বহুক্ষণ নিঃশব্দে
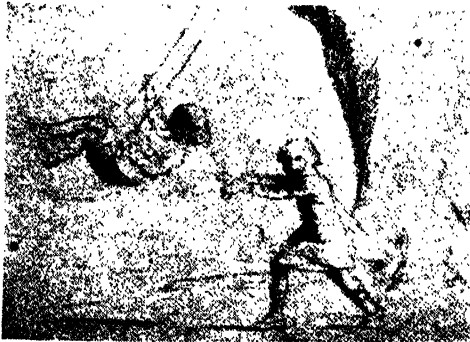
দোলনা
(রয়েল এ্যাকাডেমীর প্রদর্শনীতে গৃহীত ইলীনের আঁকা দ্বিতীয় চিত্র)

ও অতি সন্তর্পণে চেষ্টা করিয়া, চোর যেমন ঘরের দরজাটি একটু খুলিয়া ধরিবে, অমনি তৎক্ষণাৎ বাহিরের বায়ুর সংস্পর্শে ওজোন-জেনারেটার হইতে আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া, চোরের সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড করিয়া দিবে। দরজার

হাতোলে যাঁহারা বুদ্ধি করিয়া রাত্রিকালে বৈদ্যুতিক বাতি বা পাখার লাইন হইতে তার-যোগে তাড়িত শক্তি—সঞ্চালিত করিয়া রাখেন, তাঁহাদের বাটীতে চোর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিবামাত্র, হাতে শক্ লাগিয়া হতাশ হইবে। নিঃসাড়ে চুপি-চুপি চোর ঘরে ঢুকিবামাত্র, অর্দ্ধরাত্রে নিস্তব্ধ কক্ষের ভিতর সহসা যদি বিকট শব্দ হইয়া উঠে, তাহা হইলে বহু দুঃসাহসী চোরকেও পিছু হটিতে হয়। এই জন্য ঘরের মেঝেয়, দরজার কাছাকাছি, অনেকে এক-একটি 'ইলেক্‌ট্রিক্ ভাইব্রেটার' ফেলিয়া রাখে। কেহ-কেহ আবার দরজার পার্শ্বেই, দেয়ালের গায়ে একটী 'মোটর হর্ণ' খাটাইয়া রাখে। দরজার

সর্দ্দার খানসামা
(রয়েল এ্যাকাডেমীর প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার-প্রাপ্ত মিঃ অর্পেনের আঁকা প্যারিসের চ্যাথাম হোটেলের পরিচারক যুজীন গ্রোসরীদারের প্রতিকৃতি)

কব্জার সহিত হর্ণের বাদ্যোৎপাদক স্থলটি তার দিয়া এমন ভাবে যোগ করা থাকে যে, চোর যত সন্তর্পণেই দরজাটি খুলিয়া ভিতরে আসিবার চেষ্টা করুক না কেন, কব্জা নড়িলেই, সঙ্গে-সঙ্গে হর্ণের ভেঁপু বাজিয়া উঠিয়া, চোর ও গৃহস্থ উভয়কেই সাবধান করিয়া দিবে।

(Popular Science.)

৪। কাজের লোকের পরীক্ষা

মই-সিঁড়িতে চড়িয়া, অথবা ভারার উপর দাঁড়াইয়া, যাহাদের কাজ করিতে হইবে, তাহাদের একপায়ে দাঁড়ানো অভ্যাস করিতে হয়। অধিকক্ষণ একপায়ে দাঁড়াইয়া থাকা বড় সহজ নহে। অনভ্যস্ত লোকেরা প্রায়ই এই পরীক্ষাটীতে

নীল মুগী সাদা হইতে সুরু করিয়াছে
(ডিসেম্বর ১৯১৭)

উত্তীর্ণ হইতে পারে না। সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ছাত্রকে পরীক্ষা দিতে হয় যে, তাহার সুরজ্ঞান আছে কি না। মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন, আশিটি লক্ষণ আছে, যাহা দেখিয়া সঙ্গীতজ্ঞকে চিনিতে পারা যায়; কিন্তু সঙ্গীত বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েদের বিশেষ করিয়া পাঁচ ছয়টি লক্ষণেরই পরিচয় লওয়া হয়; যেমন তাল, মান, কাল, লয়, সুর, স্বর, ইত্যাদি। কনসার্ট পার্টিতে বা ব্যাণ্ডের দলে ঢুকিতে গেলেও, এইরূপ পরীক্ষা দিতে হয়। একটি 'মেট্রোনোমের' সাহায্যে এই পরীক্ষা গৃহীত হয়। কেহ ঠিক কাজের লোক কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য, কর্ম্মপ্রার্থীর হাতে একটি পেন্সিল দিয়া, তাহাকে, দেয়ালের গায়ে বোর্ডের উপর অঙ্কিত একটি চক্র দেখাইয়া, বলা হয়, তুমি, ঐ চক্রের ঠিক মধ্যস্থলে যে বিন্দুটি আছে, পেন্সিলের অগ্রভাগ দ্বারা দূর হইতে উহা স্পর্শ কর। যে তাহা একবারেই ঠিক ছুঁইতে পারে, তাহাকে আর অকেজো মনে করিবার কারণ নাই। তবে তাহার কার্য্য-তৎপরতা, দক্ষতা, চারিদিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিবার ক্ষমতা, ভ্রম-প্রমাদ ধরিয়া ফেলিবার নৈপুণ্য, ইত্যাদি কাজের লোকের বিশেষ-বিশেষ গুণগুলি আছে কি না জানিতে হইলে, আর একটি পরীক্ষার প্রয়োজন হয়;—তাহার হাতে একখানি চিত্রাঙ্কিত পত্র দিয়া, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহার দোষগুণ বাহির করিতে বলা হয়। যিনি এই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, তিনি ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, গোয়েন্দা ও গার্ডের কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

(Popular Science.)

৫। বাড়ী নির্ম্মাণের নূতন পদ্ধতি

কাজের সুবিধা করিবার জন্য আমেরিকানরা আজকাল নূতন ধরণের বাড়ী নির্ম্মাণ করিতেছে। সম্প্রতি ইলিনয়ের জনৈক মহিলা দাস-দাসী না রাখিয়া নিজেরই অল্প সময়ের মধ্যে বাড়ীর সব কাজ করিবার সুবিধা হইবে বিবেচনা করিয়া, সেই ভাবে তাঁহার নূতন গৃহখানি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন; বাড়ীর আসবাবপত্রও সেই হিসাবে তৈয়ার করাইয়া লইয়া-

নীল মুর্গী প্রায় সাদা হইয়াছে
(আগষ্ট ১৯১৮)

ছেন। তাঁহার বাড়ীখানি চূণ-সুরকী-ইট-বালির তৈয়ারী একটি পাকা দ্বিতল বাংলা। পরিমাণ,—দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ৫৮ ফিট। চতুষ্কোণ আকার,—চারিদিকে চার ফিট চওড়া দেয়াল। সবগুলি ঘরই একতালায় এক মেঝের উপর পাশাপাশি এক সঙ্গে তৈয়ার করা আছে। ভিত্তি-মূলে একটি আট ফিট লম্বা

ও পাঁচফিট চওড়া গহ্বর নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহার ভিতর স্বয়ং চালিত একটী গ্যাসের বয়লার বসান হইয়াছে। ইহার দ্বারা কয়লা, ছাই এবং রাঁধুনীর হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া গিয়াছে। শোবার ঘর, খাবার ঘর, বৈঠকখানা, বারান্দা প্রভৃতিকে প্রকৃত পক্ষে একখানিই ৪২ × ৩৪ ফিট মাপের বড় ঘর বলা যাইতে পারে কেবল মাঝের হল্ ঘরের মেঝেটিই যা অন্য গুলির চেয়ে দু'ধাপ উঁচু! দুইটি বইয়ের আলমারী বৈঠকখানা ও খাবার ঘরের মাঝে ব্যবধান স্বরূপ দাঁড়াইয়া, তাহাদের পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। একধারে সারি-সারি আটটি থাম বৈঠকখানা ও গাড়ী-বারান্দার বিভিন্ন ব্যবহার স্মরণ করাইয়া দেয়। বৈঠকখানার পরেই অভিনন্দন-কক্ষ এবং তাহার পাশেই শয়ন-কক্ষ। মেঝেটি আগাগোড়া ইটালিয়ান টালি মোড়া; সুতরাং অতি অল্প আয়াসেই পরিষ্কার করা যায়। ঘরের ভিতর দিকে দেয়ালের গায়ে বালি না ধরাইয়া, ফুলকাটা কার্ডবোর্ড আঁটা আছে। বাড়ীর পিছন দিকে মোটর গাড়ী রাখিবার আস্তাবল ও বৈদ্যুতিক উপায়ে কাপড় কাচিবার ধোবাখানা তৈয়ার করা আছে। রান্না-বান্না সমস্তই গ্যাস বয়লারের সাহায্যে চলে। বাসন-মাজিবার জন্য রান্নাঘরের ভিতরই একটি বৈদ্যুতিক বাসন ধোয়া কল বসানো আছে। শোবার ঘরের একদিকে স্নানের ঘর সংলগ্ন আছে। ছাদের উপর খেলা-ধূলা করিবার একটী নীচু লম্বা ঘর করা আছে। বাড়ীতে কোনও অতিথি সমাগম হইলে, এই-খানেই তাহার শোবার ব্যবস্থাও করিয়া দেওয়া হয়।

(Popular Mechanics.)

৬। কিশোরী চিত্রশিল্পী

কুমারী ইলীন শোপার ১৩ বৎসর বয়সে ছবি আঁকা সুরু করিয়াছিল। সম্প্রতি লণ্ডনের রাজকীয় চিত্রশালায় (Royal Academy of Arts.) যে বাসন্তী চিত্র-প্রদর্শনী হইয়াছিল, কুমারী ইলীন তাহাতে নিজের আঁকা দু'খানি ছবি পাঠাইয়াছিল। ইলীনের বয়স এখন ১৫ বৎসর মাত্র। কেহ আশা করে নাই যে, ১২০০০ হাজার নিপুণ চিত্রকর যেখানে প্রতিযোগিতার জন্য চিত্র পাঠাইয়াছেন, এই মেয়েটির ছবি সেখানে স্থান পাইবে। কিন্তু বিচারকেরা যখন ইলীনের দু'খানি ছবিই প্রদর্শন-যোগ্য ও পুরস্কার পাইবার উপযোগী বলিয়া রায় দিলেন, মিস্ ইলীনের আত্মীয়, বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তিরা সেদিন বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া গেলেন। মিস্ ইলীনও সেদিন হইতে যশস্বী শিল্পী বলিয়া জগতে পরিচিতা হইল। এত অল্প বয়সে এরূপ সুম্মান আর কোনও চিত্রকরের অদৃষ্টে ঘটে নাই। ইলীন কোনও আর্টস্কুলে কখনও পড়ে নাই। তাহার পিতার নিকট হইতেই সে চিত্রাঙ্কন-বিদ্যা শিখিয়াছিল। তাহার পিতা জজ শোপার আর্, ই, একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকর। এই বাসন্তী-প্রদর্শনীতে এবার প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন, সুবিখ্যাত চিত্রকর মিঃ অর্পেণ্। ইনি শান্তি-সভার (Peace Conference) অধিবেশনে উপস্থিত

নীল মুর্গী একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে
(সেপ্টেম্বর ১৯১৮)

দেশ-বিদেশের মহারথিগণের চিত্রাঙ্কনের জন্য ফ্রান্সে গিয়াছিলেন। প্যারিতে অবস্থান-কালে তাঁহার হোটেলের এক পরিচারকের চেহারা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; এবং তিনি খেয়ালের বশে সেই হোটেলের পরিচারকের একখানি প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। সেই ছবিখানি কিন্তু এত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তাহাই প্রদর্শনীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

(Literary Digest)

৭। কুক্কুটীর রূপান্তর।

ওয়াশিংটন সহরের একটি কুক্কুটী এক বৎসরের মধ্যে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে শুনিয়া কেহ যেন মনে করিবেন না যে সে কুক্কুটীরূপ ছাড়িয়া হংস বা বকের রূপ ধারণ করিয়াছে। কুক্কুটী রং বদলাইয়াছে মাত্র। তাহার জাত-বর্ণ ছিল নীল রং। কুক্কুট বংশীয়দের একটি বিশেষ জাতীয় বর্ণ স্বভাবতঃই নীল হয়; তবে কখনও কখনও উহাদের কালো বাচ্ছাও হইতে দেখা গিয়াছে; কিন্তু এই নীল মুর্গীটি পরিণত বয়সে হঠাৎ এক বৎসরের মধ্যে সাদা হইয়া যাওয়ায় জীবতত্ত্ববিদেরা ইহার কোনও যুক্তি-যুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাইতেছেন না; বিশেষ আবার সাদা হইয়া যাইবার পরও ইহার যে বাচ্ছা হইয়াছে তাহারা নীল হওয়ায় গোলযোগ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। (Literary Digest)

বিদায় বেলায়

[হাবিলদার কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম]

আজ অমন ক'রে গো বারেবারে জল-ছলছল চোখে চেয়ো না,
জল-ছলছল চোখে চেয়ো না।
ঐ কাতর-কণ্ঠে থেকে থেকে শুধু বিদায়ের গান গেয়ো না,
শুধু বিদায়ের গান গেয়ো না।
হাসি দিয়ে যদি লুকালে তোমার সারা জীবনের বেদনা
আজো তবে শুধু হেসে যাও, আজ বিদায়ের দিনে কেঁদো না!
ঐ ব্যথাতুর আঁখি কাঁদো-কাঁদো মুখ
দেখি, আর শুধু হুহু ক'রে বুক!
চলার তোমার বাকী পথটুক্—
পথিক! ওগো সুদূর পথের পথিক!—
হায় অমন ক'রে ও অকরুণ গীতে, আঁখির সলিলে ছেয়ো না,
ওগো আঁখির সলিলে ছেয়ো না!
দূরের পথিক! তুমি ভাব, বুঝি তব ব্যথা কেউ বোঝে না,
তোমার ব্যথার তুমিই দরদী একাকী,
পথে ফেরে যারা পথ-হারা, কোন গৃহবাসী তারে খোঁজে না,—
ক্ষত হ'য়ে জাগে আজো সেই ব্যথা লেখা কি?
বাউলের গানে ব্যথা হানে বুঝি শুধু ধূধূ মাঠে পথিকে?—
এ যে মিছে অভিমান, পরবাসী, দেখে ঘর-বাসীদের ক্ষতিকে!
তবে জান কি তোমার বিদায়-কথায়
কত বুক-ভাঙ্গা গোপন ব্যথায়
আজ কতগুলি প্রাণ কাঁদিছে কোথায়
পথিক! ওগো অভিমানী দূর পথিক!
কেহ ভালো বাসিল না ভেবে যেন আজো মিছে ব্যথা পেয়ে যেয়ো না,
ওগো যাবে যাও, তুমি বুকে ব্যথা নিয়ে যেয়ো না।

তাপ-বিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ]

একটা গরম জিনিস একটা ঠাণ্ডা জিনিসের কাছে রাখা হইল; দেখা গেল, গরম জিনিস খানিক তাপ হারাইয়াছে; আর ঠাণ্ডা জিনিস খানিক তাপ পাইয়াছে। এই যে তাপ, যাহা একটা জিনিস ছাড়িল, এবং আর একটা জিনিসে আসিয়া আশ্রয় লইল, সে তাপের প্রকৃতি কিরূপ? ইহা কি পদার্থ শ্রেণী-ভুক্ত? পদার্থের প্রধান গুণ হইল এই যে ইহার ওজন আছে;—কম হউক, বেশী হউক, ইহার ভার একেবারে শূন্য নয়। আচ্ছা, ঐ গরম জিনিষটা গরম থাকিতে-থাকিতে একবার ওজন কর; আর, ঠাণ্ডা হইলে আর একবার ওজন কর;—খুব সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে ওজন কর—দেখিবে, ওজনে একচুলও তফাৎ হয় নাই—উহার এতটুকুও লোকসান হয় নাই। তাপের যখন কোন ওজন নাই, তখন উহাকে পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তবে ইহা কি? এই তাপ যদি কোন ইঞ্জিনে দাও, দেখিবে, ইঞ্জিনের চাকা ঘুরিতেছে; এবং কোথাও যাত্রী-পূর্ণ গাড়ী ছুটিতেছে, কোথাও খনি হইতে কয়লা উঠিতেছে, কোথাও সুরকি ভাঙ্গা হইতেছে। এই শক্তির বিকাশ কোথা হইতে হইল? এই বিশ্বে শক্তির সৃষ্টিও নাই, বিনাশও নাই,—ইহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই ব্রহ্মাণ্ডে যতটুকু শক্তি ছিল, আজও ঠিক ততটুকুই আছে;—এতটুকু বাড়ে নাই, এতটুকু কমে নাই; এবং আবার দুই হাজার বৎসর পরে উহা ঠিক ততটুকুই থাকিবে। নিত্য প্রকৃতির যে পরিবর্ত্তন দেখিতেছি, তাহাতে শক্তির রূপান্তর দেখিতেছি মাত্র;—কোন নূতন শক্তির আবির্ভাব দেখিতেছি না, কোন পুরাতন শক্তির তিরোভাবও দেখিতেছি না। ইঞ্জিনের চাকায় যে গতি-শক্তি দেখিতেছি, তাহা আসিতেছে নিশ্চয় আর কোন শক্তি হইতে; এবং তাপই হইল সেই অপর শক্তি। আবার, চকমকি ঠুকিয়া যখন আগুন বাহির করিতেছি, তখন গতি-শক্তি তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে। তাপ হইল শক্তির একটা রূপ। কিন্তু এই তাপের পরিমাণের একটা মাপ আমরা

করিয়া থাকি; বলি, এই বস্তু এতটা তাপ পাইল; এ বস্তু অতটা তাপ হারাইল। কিন্তু তাপের কথা সংখ্যায় প্রকাশ করিতে হইলে, একটা একক (unit) চাই—যাহার তুলনায় এই মাপটা বলা চলে। যখন বলি, ছড়ি-গাছটা লম্বায় তিন ফিট, তখন ফুট বলিয়া খানিক নির্দ্দিষ্ট লম্বা একটা মাপ কাঠি ধরিয়া লই—যাহার তুলনায় ছড়ি-গাছটি তিন গুণ। একটা পাথরের ওজন যখন বলি দশ সের, তখন সের বলিয়া একটা একক ধরিয়া লই—যাহার তুলনায় পাথরটা দশগুণ ভারি। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা দরকার। বিজ্ঞানে মাপ জোকের কথা বলিতে গেলে, ঐ ইঞ্চি, ফুট, গজ বা হাতএর কথা ভুলিয়া যাইতে হইবে। বিজ্ঞানে কোন জিনিসের ওজন সের বা পাউণ্ডের তুলনায় প্রকাশিত হয় না। বিজ্ঞানে মাপের একক হইল সেণ্টিমিটার; ওজনের একক হইল গ্রাম। আবার সেণ্টিমিটার ও গ্রামের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে;—এক ঘন সেণ্টিমিটার জলের ওজন হইল এক গ্রাম। যাক্, এখন কথা হইতেছিল তাপের একক কি? তাপের এককের নাম দেওয়া হয় ক্যালরি (calorie)। এক গ্রাম জলকে সেণ্টিগ্রেডের এক ডিগ্রী তুলিতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন, তাহাই হইল তাপের একক—তাহারই নাম ক্যালরি।

পদার্থের উত্তপ্ততার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এখন তাপের পরিমাণের কথা বলা হইল। উত্তপ্ততা ও তাপ কি একই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে? না, তাহা নয়। বিষয়টা পরিষ্কার হওয়া দরকার। আমার পাঁচ বৎসরের শিশু পুত্রকে পাঁচটা রসগোল্লা খাইতে দিলে, তাহার পেট টন্-টন করিতে থাকিবে; কিন্তু ঐ পাঁচটা রসগোল্লা তাহার ব্রাহ্মণ পিতার পেটের এক কোণে পড়িয়া থাকিবে। আহার্য্যের যে পরিমাণ একজনের পেট ভরিয়া দিল, সেই পরিমাণে আর একজনের ক্ষুধার সিকির সিকিও নিবৃত্ত হইল না। আধ সের জল একটা গেলাসে ঢাল,—গেলাসে জল হয় ত ৬ ইঞ্চি উঠিয়া যাইবে; কিন্তু একটী থালায় যদি সেই আধ সের জল ঢাল, তো দেখিবে, হয় ত উহা এক ইঞ্চির উপর উঠিবে না। আগুনের উপর একটা লোহার তার মিনিট খানেক রাখ,—দেখিবে, তারটা লাল হইয়া উঠিয়াছে; তারটায় হাত দাও, হাতে ফোস্কা পড়িয়া যাইবে; একটী তাপমান যন্ত্র দিয়া দেখ,—দেখিবে, উহার উত্তপ্ততা অনেক বেশী। ঐ আগুনের উপর এক বালতি জল ঐ এক মিনিটের জন্য রাখ; দেখিবে,—তাপমান-যন্ত্র দিলে দেখিতে পাইবে—পারা অল্পই উঠিল;—হাত দিয়া ছুঁইলে তো ধরাই সুকঠিন—উহা আদৌ গরম হইয়াছে কি না। ধরা যাইতে পারে,লোহার তার-আগুন হইতে যতটা পরিমাণ তাপ পাইয়াছে,—ঐ বালতির জলও ঠিক ততটা পরিমাণ তাপ পাইয়াছে; কিন্তু ঐ একই পরিমাণ তাপে একটার উত্তপ্ততা হইল খুব বেশী, আর একটার উত্তপ্ততা খুবই কম। সুতরাং কোন পদার্থের উত্তপ্ততা জানিয়া ফস্ করিয়া বলা চলে না—তাহাতে কতটা তাপ আছে। ঠিক যেমন কোন ব্যক্তির পেট ভরিয়াছে এই সংবাদে, সেই ব্যক্তির উদর গহ্বরে কতটা পরিমাণে আহার্য্য আছে সে খবর রাখা যায় না; আরও যেমন কোন পাত্রের জলের উচ্চতা মাত্র জানিয়া কেহ হিসাব করিতে পারে না, সেই পাত্রে জলের পরিমাণ কত আছে। পাত্রস্থিত জলের পরিমাণের সহিত জলের উচ্চতার যে সম্বন্ধ, কোন পদার্থের অন্তর্নিহিত তাপের সঙ্গে তাহার উত্তপ্ততার সেই সম্বন্ধ। জলের উচ্চতা হইল তাহার এক অবস্থা; সেই অবস্থা জানায় যে অন্য জল-পূর্ণ পাত্রের সহিত সংযোগ করিলে জল এ-পাত্র হইতে ও-পাত্রে চলিয়া যাইবে, বা ও-পাত্র হইতে এ-পাত্রে গড়াইয়া আসিবে। উত্তপ্ততা হইল সেইরূপ এক অবস্থা; এই অবস্থা বলিয়া দেয় যে, অন্য পদার্থের সহিত সংযোগ করিলে তাপ এখান হইতে ওখানে চলিয়া যাইবে, বা ওখান হইতে এখানে চলিয়া আসিবে। ছাতের জলের ট্যাঙ্ক একটা নল দিয়া যদি গোলদীঘির সহিত জুড়িয়া দাও, তো জল ট্যাঙ্ক হইতে গোলদীঘিতে চলিয়া যাইবে—যদিও গোলদীঘির জল ট্যাঙ্কের জলের লক্ষগুণ বেশী। জল সব সময় উঁচু হইতে নীচুতে চলিয়া যায়—তা জলের পরিমাণ যেথায় যেরূপ থাকুক না কেন। সেইরূপ, তাপ সব সময় বেশী উত্তপ্ত স্থান হইতে কম উত্তপ্ত স্থানে চলিয়া যায়—তাপের পরিমাণ যেথায় যেরূপ থাকুক না কেন। ঐ তপ্ত লোহার তার যদি ঐ ঈষদুষ্ণ বালতির জলে ডোবাও,—দেখিবে, তাপ ছোট্ট তার হইতে ঐ বিপুল জলেই চলিয়া গেল। একটা পাত্রে ঠিক কতটা জল আছে জানিতে গেলে, জলের উচ্চতার সঙ্গে-সঙ্গে আর একটা জিনিষ জানা দরকার,—সেই পাত্রের খোলটা কিরূপ। সেইরূপ, তাপ আসিয়া যখন কোন পদার্থের উত্তপ্ততা বাড়াইয়া দেয়, তখন, কতটা তাপ আসিল ঠিক

করিতে হইলে, ঐ পদার্থের তাপ-গ্রহণের ক্ষমতার পরিচয় জানা চাই। আর এই ক্ষমতা নির্ভর করে সেই পদার্থের ওজন ও তাহার আপেক্ষিক উত্তাপের উপর। এই আপেক্ষিক উত্তাপটা কি? কোন নির্দ্দিষ্ট ওজনের জলকে কোন নির্দ্দিষ্ট ডিগ্রী তুলিতে যতটা পরিমাণ তাপের প্রয়োজন, সেই ওজনের আর একটা পদার্থকে সেই ততটা ডিগ্রী তুলিতে আগেকার পরিমাণের তাপের প্রয়োজন নাই—ইহার একটা ভগ্নাংশ মাত্র হইলেই চলিবে। এই ভগ্নাংশ ভিন্ন-ভিন্ন পদার্থের ভিন্ন-ভিন্ন; এবং এই ভগ্নাংশই পদার্থের আপেক্ষিক উত্তাপ সূচিত করে। একটা হিসাব ধরিলেই বিষয়টা আরও পরিষ্কার হইবে। এক গ্রাম জলকে এক ডিগ্রী তুলিতে এক ক্যালরি তাপ লাগে (ক্যালরির সংজ্ঞাই তাই); সুতরাং দশ গ্রাম জলকে কুড়ি ডিগ্রী তুলিতে ২০০ ক্যালরির প্রয়োজন। দেখা গেল, দশ গ্রাম তামাকে কুড়ি ডিগ্রী তুলিতে ২০০ ক্যালরি লাগিল না—মাত্র লাগিল ২০ ক্যালরি। অর্থাৎ সম পরিমাণ জলকে সম ডিগ্রী তুলিতে যাহা লাগিয়াছিল, তাহার দশ ভাগের এক ভাগ। এই যদি পরীক্ষায় দেখা যায়, তো তামার আপেক্ষিক তাপ হইবে $\frac{১}{১০}$।

এইবার মনে কর, এক গ্রাম জল লওয়া হইল—খুব ঠাণ্ডা—উত্তপ্ততা সেন্টিগ্রেডের ০। উহাতে যদি এক ক্যালরি তাপ দেওয়া যায়, তো উহার উত্তপ্ততা হইবে ১ ডিগ্রী। এইবার যদি আর এক ক্যালরি দাও, তো উহার উত্তপ্ততা হইবে ২ ডিগ্রী। আর এক ক্যালরিতে উত্তপ্ততা ৩। এইরূপে উত্তপ্ততা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে। বাড়িতে-বাড়িতে ধর ৯৯ ডিগ্রীতে পৌঁছিল। আর এক ক্যালরি দাও—১০০ ডিগ্রী। উত্তপ্ততা যখন ১০০ ডিগ্রীতে পৌঁছিল, তখন আর এক ক্যালরি দাও, দেখিবে, উহা ১০১ ডিগ্রীতে উঠিল না—সেই ১০০ তেই রহিল। ২, ৩, ১০, ২০, ১০০, ২০০, ৫০০ ক্যালরি দাও,—উত্তপ্ততা সেই ১০০ ডিগ্রী রহিল—এতটুকুও বেশী হইল না। ৫৩৬ ক্যালরি তাপ যখন দেওয়া হইল, তখনও সেই ১০০ ডিগ্রী। কিন্তু এবার জল আর জল নাই—সমস্ত বাষ্পে পরিণত হইয়াছে। এইবার, যদি তাপ দাও, তো এই বাষ্পের উত্তপ্ততা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিবে—১০১, ১০২ এইরূপ। জল যখন তরল অবস্থায় ছিল, তখন তাপ দিলেই উত্তপ্ততা বাড়িয়াছে। জল যখন বায়বীয় আকারে ছিল, তখনও তাপে বাষ্পের উত্তপ্ততা বাড়িয়াছে। কিন্তু এই সন্ধিস্থলে—জল হইতে বাষ্পে পরিণত হইবার সময় —জলের উত্তপ্ততা যখন ক্রমশঃ ক্রমশঃ উঠিয়া ১০০ ডিগ্রীতে পৌঁছিল, তখন ঐ জল ৫৩৬ ক্যালরি অবধি তাপ পাইয়াছে—কিন্তু উহার উত্তপ্ততা এতটুকুও বাড়ে নাই। এতটা তাপ তবে করিল কি? এই যে তাপ রূপে শক্তি প্রয়োগ করিলাম, সে তাপ গেল কোথায়? সে উত্তপ্ততা বাড়াইল না বটে, কিন্তু আর এক কাজ করিল—পদার্থের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইল,—তরল হইতে বায়বীয় অবস্থায় লইয়া গেল; এবং এই অবস্থা-পরিবর্ত্তনের জন্য খানিকটা শক্তির প্রয়োজন। কেন, বলিতেছি। প্রত্যেক পদার্থ কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশ,—কতকগুলি অণুর সমষ্টি—এইরূপ কল্পিত হয়। কঠিন অবস্থায় এই অণুগুলির মধ্যে একটা আকর্ষণ—একটা টান থাকে; বায়বীয় অবস্থায় এই টানটা বিরাগে পরিণত হয়,—অণুগুলি খুব কাছাকাছি থাকা দূরে থাকুক, পরস্পর পৃথক্ হইবার জন্য বিপুল চেষ্টা করে। আর তরল অবস্থায় যেন 'থাক লক্ষ্মী, যাও বালাই'—অনুরাগও নাই, বিরাগও নাই। কঠিন অবস্থায় উহারা বন্ধু, তরল অবস্থায় উদাসীন, এবং বায়বীয় অবস্থায় শত্রু। বন্ধুকে উদাসীন করিতে খানিকটা বাহিরের শক্তি চাই। উদাসীনকে শত্রু করিতে হইলে বাহিরের উত্তেজনার প্রয়োজন। তাই বাহির হইতে তাপ-রূপ শক্তি আসিয়া অণুগুলির মধ্যে যেখানে বিরাগ ছিল না, সেখানে বিরাগ আনিল,—তরল জিনিষকে বায়বীয় আকারে পরিণত করিল। ১০০ ডিগ্রীর এক গ্রাম জলের জন্য তাপের প্রয়োজন হইল ৫৩৬ ক্যালরি। এ তাপ উত্তপ্ততা বাড়াইল না—শুধু অবস্থার পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিল। সেইরূপ ০ ডিগ্রীর এক গ্রাম বরফকে জলে পরিণত করিতে হইলে ৮০ ক্যালরি তাপ চাই। ০ ডিগ্রীতে এক গ্রাম বরফ লও,—তাহাতে এক ক্যালরি তাপ দাও,—দেখিবে,—তাপমান-যন্ত্র দিলে দেখিতে পাইবে, উহার উত্তপ্ততা এতটুকুও বাড়ে নাই। ২, ১০, ৫০, ৬০ ক্যালরি,—উত্তপ্ততা সেই শূন্য—এতটুকুও বাড়ে নাই। যখন ৮০ ক্যালরি দেওয়া হইল, তখনও উত্তপ্ততা শূন্য। তখন কিন্তু বরফ আর বরফ নাই,—উহা জলে পরিণত হইয়াছে। এই ৮০ ক্যালরি তাপ এক গ্রাম জলের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিল মাত্র,—উহার উত্তপ্ততা বাড়াইল

না। উত্তপ্ততা না বাড়াইয়া, শুধু পদার্থের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে এই যে তাপ লাগে, তার নাম প্রচ্ছন্ন তাপ।

জলের এতটা প্রচ্ছন্ন তাপ আছে- তাই শীত-প্রধান দেশে—যেখানে রাত্রে বরফ পড়ে— সেখানে সূর্য্যোদয়ে তাপ পাইবামাত্রই সমস্ত বরফটা একেবারে হঠাৎ গলিয়া দেশে বন্যার সৃষ্টি করে না,—বরফ গলাইতে প্রচুর তাপ লাগে বলিয়া বরফ খুব ধীরে-ধীরে গলিতে থাকে।

জাতি-বিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ]

মানব ও মানবভাবাপন্ন বানর (anthropoid ape) যে এক জাতি নয়, তাহা আমরা পূর্ব্বে সাধারণের উপযোগী করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহারা এক জাতি না হইলেও, ইহাদের মধ্যবর্ত্তী যে একটা সূত্র আছে, তাহা অস্বীকার করা চলে না। তবে এ কথা ঠিক যে, বানর ও মনুষ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে; আর বানর মনুষ্যের জ্ঞাতি বা পূর্ব্বপুরুষও নয়। মনুষ্য বানর-জাতির বংশধর,—ডারউইন এরূপ মত কোন দিন প্রচার করেন নাই। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, অন্যান্য জীবের ন্যায় মানুষও অন্য কোন নিম্নতর জীবের পরিণতি মাত্র। তাহার মতের প্রধান কথা এই যে, নৈসর্গিক নির্ব্বাচন-নিয়মে জাতির উৎপত্তি। তিনি বলেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিপাকে পড়িয়া, এক জাতি অপর জাতিতে পরিণত হইয়া থাকে। এই সমস্ত উক্তির মূলে রহিয়াছে অভিব্যক্তিবাদ। আর এই অভিব্যক্তিবাদ সকলকেই মানিয়া লইতে হয়। অভিব্যক্তি না মানিলে, এমন সব গুরুতর সমস্যার কথা আসিয়া পড়ে, যাহার সমাধান করা সম্ভবপর নয়। মনুষ্যকে নিম্নতর জীব হইতে উৎপন্ন না বলিলে, স্বীকার করিয়াই লইতে হয় যে, মনুষ্য স্বতন্ত্র সৃষ্টি। আবার এ দিকে তাহাকে স্বতন্ত্র সৃষ্টি বলিয়া স্বীকার করিলে, অভিব্যক্তিবাদ অসিদ্ধ হইয়া পড়ে।

ডারউইনের "জাত্যন্তরোৎপত্তি" (Origin of Species) নামক গ্রন্থ বাহির হইবার পূর্ব্বে, প্রতীচ্যদেশে অনেকের সংস্কার ছিল যে, নদীগর্ভে যেমন নানা রকমের উপল-খণ্ড ইতস্ততঃ অসম্বদ্ধ ভাবে পড়িয়া থাকে, সেইরূপ এই পৃথিবীতে এত বিভিন্ন রকমের জীব-জন্তু স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ভাবে সৃষ্ট হইয়া বাস করিতেছে। ইহাদের কাহারও সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধ নাই। (Erasmus Darwin) ইরাসমাস্ ডারউইন (১৭৩১-১৮০২) প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন যে, ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের অসংখ্য জীবজন্তু, একমাত্র আদিম জীবনধাতুময় মোনেরা হইতে উৎপন্ন হইয়া, ক্রমবিকাশন্যায়ে এত ভিন্ন-ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। ইংলণ্ডে ডারউইন এবং ফ্রান্সে (Lamarck) লামার্ক (১৭৪৪-১৮২৯) প্রায় একই সময়ে একই প্রকারের মতবাদ প্রচার করেন। বাফন্ (Buffon), ইরাসমাস্ ডারউইন (Erasmus Darwin) লামার্ক (Lamarck) ট্রেভিরেনস (Treviranus), হিলেয়ার (Etienne Geoffroy St Hilaire), গেটে (Goethe) প্রভৃতি পণ্ডিত প্রথমে প্রতিপাদন করেন যে, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীবদেহ এক আদিম জীবের সন্ততিগণের দেহের বিশেষ-বিশেষ অবস্থাগত ক্রমপরিণাম। তারপর চার্লস্ ডারউইন (Charles Darwin), ওয়ালেস (Alfred Russel Wallace), স্পেনসার (Herbert Spencer) ও হেকেলের (Heakel) যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় ইহা পরিমার্জ্জিত হইয়া ও পূর্ণতা লাভ করিয়া, প্রকৃষ্ট মতবাদ বলিয়া পণ্ডিত-সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়। ইহাদের মতে, কোন অজ্ঞেয় নিয়মে জড়শক্তি হইতে সপ্রাণ পদার্থের উদ্ভব হয়। পরে তাহারা জীবন-সংগ্রামে নিজ-নিজ সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এবং নিজ-নিজ বংশ-বিস্তার করিবার জন্য, অনবরত চেষ্টা করিতে থাকে; তাহারই ফলে পৃথিবীতে নানা জীবের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রত্নযুগোদ্ভূত আদিম জীবের বংশবিস্তার এত অধিক হইয়াছিল যে, বংশরক্ষার উপযুক্ত আহার ও বাসভূমি স্থির করিয়া লওয়া, তাহার পক্ষে বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং অনতিকাল মধ্যেই আপনাপন অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম বাধিয়া গেল। ফলে বলবানেরই জয় হইল,—আর যাহারা দুর্ব্বল, তাহারা মরিল। জীবরাজ্যে

জীবন ধারণ করিবার কোন গুণ বা সুবিধা যাহাদের আছে, তাহারাই ভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া যায়। এইরূপে অগাবান জীবগণ যে শুধু বাচিয়া যায়, তাহা নয়—তাহাদের জীবন-সংগ্রাম ত চলিতে থাকেই; আর যে গুণে বা বিশেষত্বে প্রকৃতি তাহাদিগকে বিজয়-মাল্যে বিভূষিত করিয়াছেন, সেই গুণ বা বিশেষত্ব তাহাদের জ্যামিতিক অনুপাতে, বংশবিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে বংশপরম্পরায় বাড়িতে থাকে। ক্রমপরিণামিনী প্রকৃতিদেবী এইরূপে দুর্ব্বলকে নিগৃহীত করিয়া, সবলের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক, নিজ অঙ্কে আশ্রয় দিয়া থাকেন। কঠোর জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতমের পরিত্রাণ, বা উত্তরজীবন লাভকে স্পেন্সার "Survival of the fittest" নামে অভিহিত করিয়াছেন। আর ডারউইন এই বিশেষত্ব বিশিষ্ট জীবের প্রতি প্রকৃতির এইরূপ নিগ্রহানুগ্রহের নাম দিয়াছেন —"নৈসর্গিক নির্ব্বাচন" বা Natural selection। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ডারউইনের "নৈসর্গিক নির্ব্বাচনকেই" স্পেন্সার "জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কেহ-কেহ এই দুইটীকে স্বতন্ত্র ভাবিয়া থাকেন। তাহা ঠিক নয়—দুইটাই এক। ডারউইন নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন; এবং স্পেন্সারও বলিয়াছেন, জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতম হইবার জন্য যে চেষ্টা, তাহাই জাত্যন্তর প্রাপ্তির একমাত্র কারণ। এই চেষ্টার মধ্যে দুইটী জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়—একটা সন্ততিপ্রবণতা (principle of heredity), অপরটা বংশানুক্রমপ্রবণতা বা principle of adaptation। ডারউইন ও স্পেন্সারের মতে, বংশানুক্রমপ্রবণতার সাহায্যে পিতার উপার্জ্জিত গুণ সন্তানে বর্ত্তাইয়া থাকে; কিন্তু ভাইজমান Weiseman তাহা স্বীকার করেন না। ডারউইন বলেন, জীবরাজ্যে ক্রমবিকাশ ধীরে-ধীরেই হইয়া থাকে—তাহাতে জীবসমূহ অতি ক্ষুদ্র অবস্থা হইতে শ্রেষ্ঠ অবস্থা লাভ করে। পূর্ব্বে কেহ এ বিষয়ে সন্দেহ করিতেন না, কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে Deoriez নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, ধীরে-ধীরে ক্রমবিকাশে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে, এতদিনে পৃথিবীর পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হওয়া অসম্ভব হইত। তিনি দেখাইয়াছেন যে, প্রাণি-জগতে মধ্যে-মধ্যে জড়-জগতের ভূকম্পের ন্যায় আকস্মিক ঘটনায় পৃথিবীর এইরূপ পরিণতি হইয়াছে। তাঁহার মতে দেখা যাইতেছে যে, পরিবর্ত্তন ধীরে-ধীরে হয় না,—সহসাই হইয়া থাকে। Bergson বলেন, সৃষ্টিতে নূতন গুণ ও ধর্ম্ম ক্রমাগত সংযুক্ত হইয়াই চলিয়াছে। এই জন্যই জীবাদির আকার, গুণ ও ধর্ম্মে এত পার্থক্য।

প্রথমে প্রাণিমাত্রশূন্য ছিল,—তাহা হইতে জীবের উৎপত্তি কিরূপে হইল, ইহা এক সমস্যা। প্রতীচ্য জগতে, দুইশত বৎসরের অধিক হইল, এই ব্যাপার লইয়া তর্ক চলিয়াছে। জড় হইতে জীবের উৎপত্তি হইতে পারে কি না, তাহা লইয়া প্রধানতঃ দুইটা মতের সৃষ্টি হইয়াছে। একদল পণ্ডিতের মত, জড় হইতে জীবের উৎপত্তি হইতে পারে না;—জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি হইয়াছে। আর একদল বলেন, জড় হইতে জীবের আবির্ভাব হইয়াছে। জীবের অবিদ্যমানেও নূতন জীব আপনাআপনি উদ্ভূত হইতে পারে। ডারউইন অনুমান করেন, জড় হইতে জীবের, অর্থাৎ প্রাণপঙ্ক (protoplasm) রূপ সপ্রাণ পদার্থের জন্ম হইয়াছে। বিগত ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে বাষ্টিয়ান (Bastian) বলিয়াছেন যে, কর্ম্ম-নিরপেক্ষ জড় পরমাণু সকলের কোন রাসায়নিক সংযোগ-সন্নিবেশ হইতে এই প্রাণপঙ্ক উৎপন্ন হইয়াছে। জড়জগৎ জড় পরমাণুর সমষ্টি। পরমাণুপুঞ্জ শক্তিজাত। যে শক্তিতে জড় পরমাণু সকল সৃষ্ট হয়, সেই শক্তিকে জড়শক্তি (Physical force) বলা যাইতে পারে। পরমাণুপুঞ্জের মূলে শক্তি বুঝিতে হয়। বিশ্বব্যাপী শক্তির কতকটা শক্তি পরমাণুতে পরিণত হইলে, তাহারা পরস্পর আকর্ষণ-বিকর্ষণের ধর্ম্মাবলম্বী হয়। আকর্ষণ-বিকর্ষণ ক্রিয়া হইতে পরস্পরের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হইতে থাকে। ফলে, পরমাণুপুঞ্জ ক্রমাগত পরিণাম প্রাপ্ত হইতে থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ জড়-জগতের সৃষ্টি হয়—ক্রমশঃ জীবনী-শক্তির আবির্ভাব হয়। জীবনী-শক্তি জড়-শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। জীবনী-শক্তি জড়-পরমাণুপুঞ্জকে আপন কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া, তাহাদের উপর আর এক প্রকার পরিণাম ঘটায়। ইহাতে সজীবতার কেন্দ্র স্বরূপ প্রাণপঙ্ক বা কোষাণুর (protoplasmic cell) সৃষ্টি হয়। ইহারা জড়জগৎ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্ট হয়, ও বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে। এই প্রাণপঙ্ক বা কোষাণু হইতে জীবনের প্রথম সূচনা হইয়া থাকে। জীবমাত্রেরই জীবন প্রথমে একটী মাত্র প্রাণপঙ্ক বা কোষাণু হইতে সূচিত হইয়া থাকে। এই প্রাণপঙ্ক বীজাঙ্কুরের আশ্রয়ীভূত, এবং নিরন্তর আকুঞ্চন-প্রসারণশীল পঙ্কি-

ডিম্বান্তর্গত একপ্রকার অদ্ভুত তলতলে পদার্থের আধার। মাত্র একটুকরা কোষাণুই নিম্নতম জাতীয় প্রাণীর জীবাণু। অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ প্রাণীর জীবাণু এইরূপ কয়েকটী কোষাণুর সমষ্টি। জীব ক্রমশঃ বড় হইলে, তাহাতে দেহ-গহ্বর জন্মিতে দেখা যায়। এইরূপে উন্নত হইতে-হইতে শেষে পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর এইরূপ ক্রমবিকাশের নিয়মে ব্যক্তিগত দেহ গঠিত হয়। সাধারণতঃ জীবসমূহের দুইটী শ্রেণী,—Protozoa বা আদি জীব এবং Metazoa বা মিশ্রজীব। আদিজীব নিম্নতম জীব,—কেবল একটী মাত্র কোষাণু দ্বারা ইহার দেহ গঠিত। সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর জীবের দেহে একটীমাত্র কোষাণু থাকে, কিন্তু পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ কোষাণুর সমবায়ে একটী পূর্ণাবয়ব জীব বা মানবদেহ গঠিত।

শ্রীকান্তর ভ্রমণ-কাহিনী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(৮)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একদিন সুনন্দা আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিয়াছিল, তাহাকে পরমাত্মীয়ের মত কাছে পাইয়াছিলাম। ইহার সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিয়া না বলিলেও কথাটাকে প্রত্যয় না করিবার বিশেষ কোন হেতু নাই। কিন্তু আমাদের প্রথম পরিচয়ের ইতিহাসটা বিশ্বাস করানো শক্ত হইবে হয়ত। অনেকেই মনে করিবেন ইহা অদ্ভুত; হয়ত, অনেকেই মাথা নাড়িয়া কহিবেন, এ সকল কেবল গল্পেই চলে। তাঁহারা বলিবেন, আমরাও বাঙালি, বাঙ্‌লা দেশেরই মানুষ, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ ঘরে এমন হয় তাহা ত কথনো দেখি নাই! তা বটে। কিন্তু প্রত্যুত্তরে শুধু ইহাই বলিতে পারি, আমিও এ দেশেরই মানুষ, এবং একটির অধিক সুনন্দা এ দেশে আমারও চোখে পড়ে নাই। তত্রাচ ইহা সত্য।

রাজলক্ষ্মী ভিতরে প্রবেশ করিল, আমি তাহাদের ভাঙ্গা প্রাচীরের ধারে দাঁড়াইয়া কোথায় একটু ছায়া আছে খোঁজ করিতেছি, একটি সতেরো আঠারো বছরের ছোক্‌রা আসিয়া কহিল, আসুন, ভেতরে আসুন?

তর্কালঙ্কার মশাই কোথায়? বিশ্রাম করছেন বোধ হয়?

আজ্ঞে, না, তিনি হাটে গেছেন। মা আছেন, আসুন। বলিয়া সে অগ্রবর্ত্তী হইল, এবং যথেষ্ট দ্বিধাভরেই আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। একদা কোন কালে হয়ত এ বাটীর সদর দরজা কোথাও ছিল, কিন্তু সম্প্রতি তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত। অতএব, ভুত-পূর্ব্ব একটা ঢেঁকি-শালার পথে অন্তঃপুরে প্রবেশ করায় নিশ্চয়ই ইহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করি নাই। প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া সুনন্দাকে দেখিলাম। উনিশ-কুড়ি বছরের শ্যামবর্ণ একটি মেয়ে এই বাড়ীটির মতই একেবারে আভরণ-বর্জ্জিত। সম্মুখের অপরিসর বারন্দার একধারে মুড়ি ভাজিতেছিল, বোধ হয় রাজলক্ষ্মীর আগমনের সঙ্গেসঙ্গেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—আমাকে দীর্ণ একখানি কম্বলের আসন পাতিয়া দিয়া নমস্কার করিল। কহিল, বসুন। ছেলেটিকে বলিল, অজয়, উনুনে আগুন আছে, একটু তামাক সেজে দাও বাবা। রাজলক্ষ্মী বিনা আসনে পূর্ব্বেই উপবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার প্রতি চাহিয়া ঈষৎ সলজ্জ হাস্যে কহিল, আপনাকে কিন্তু পান দিতে পারবনা। পান আমাদের বাড়ীতে নেই।

আমরা কে, অজয় বোধ হয় তাহা জানিতে পারিয়াছিল। সে তাহার গুরু-পত্নীর কথায় সহসা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, নেই? তা'হলে পান বুঝি আজ হঠাৎ ফুরিয়ে গেছে মা?

সুনন্দা তাহার মুখের দিকে এক মুহূর্ত্ত মুখ টিপিয়া চাহিয়া থাকিয়া কহিল, ওটা হঠাৎ আজ ফুরিয়ে গেছে, না, কেবল হঠাৎ একদিনই ছিল অজয়? এই বলিয়া সহসা খিল্‌-খিল্‌ করিয়া হাসিয়া রাজলক্ষ্মীকে বলিল, ও-রবিবারে ছোট মহন্ত ঠাকুরের আস্‌বার কথায় এক পয়সার পান কেনা হয়েছিল,—সে প্রায় দিন দশেকের কথা। এই! এতেই আমার অজয় একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেছে, পান হঠাৎ ফুরোলো কি করে? এই বলিয়া সে আবার হাসিয়া ফেলিল। অজয়

মহা অপ্রতিভ হইয়া বলিতে লাগিল, বাঃ—এই বুঝি! তা' বেশ ত হোলোই বা,—ফুরোলোই বা—

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে সদয় কণ্ঠে কহিল, তা সত্যিই ত ভাই, ও পুরুষ মানুষ, ও কি করে জানবে কি তোমার সংসারে ফুরিয়েছে!

অজয় একজনকেও তাহার অনুকূলে পাইয়া কহিতে লাগিল, দেখুন ত! দেখুন ত! অথচ মা ভাবেন—

সুনন্দা তেমনি সহাস্যে বলিল, হাঁ, মা ভাবেন বই কি! না দিদি, আমার অজয়ই হল বাড়ীর গিন্নী;—ও সব জানে। কেবল এখানে যে কোন কষ্ট আছে, মায় বাবুগিরী পর্য্যন্ত;—এইটেই ও স্বীকার করতে পারেনা।

কেন পারবনা! বাঃ—বাবুগিরী কি ভাল! ও ত আমাদের—এই বলিতে বলিতে কথাটা আর শেষ না করিয়াই সে বোধ করি আমার জন্য তামাক সাজিতেই বাহিরে প্রস্থান করিল। সুনন্দা কহিল, বামুন-পণ্ডিতের ঘরে হর্ত্তুকিই যথেষ্ট, খুঁজলে এক-আধটা সুপুরিও হয়ত পাওয়া যেতে পারে,—আচ্ছা, আমি দেখ্‌চি—এই বলিয়া সেও যাইবার উদ্যোগ করিতেই রাজলক্ষ্মী সহসা তাহার আঁচল ধরিয়া কহিল, হর্ত্তুকি আমার সইবেনা ভাই, সুপুরিতেও কাজ নেই। তুমি একটুখানি আমার কাছে স্থির হয়ে বোসো, দুটো কথা কই। এই বলিয়া সে একপ্রকার জোর করিয়াই তাহাকে পার্শ্বে বসাইল।

আতিথ্যের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত উভয়েই নীরব রহিল। এই অবকাশে আমি আর একবার নূতন করিয়া সুনন্দাকে দেখিয়া লইলাম। প্রথমেই মনে হইল, বস্তুতঃ, এই দারিদ্র্য জিনিষটা সংসারে কতই না অর্থহীন একজন যদি তাহাকে স্বীকার না করে! এই যে আমাদের সাধারণ বাঙালী ঘরের সামান্য একটি মেয়ে বাহিরে হইতে যাহার কোন বিশেষত্ব নাই; না আছে রূপ না আছে বস্ত্র-অলঙ্কার; এই ভগ্ন গৃহের যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, কেবল অভাব অনাটনের ছায়া,—কিন্তু, তবুও সে যে ওই ছায়া মাত্রই, তার বেশি কিছু নয়, সে কথাও যেন সঙ্গেসঙ্গেই চোখে পড়িতে বাকি থাকেনা। অভাবের দুঃখটাকে এই মেয়েটি কেবল মাত্র যেন চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া দূরে রাখিয়াছে,—জোর করিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করে, এত বড় সাহস তাহার নাই। অথচ মাস কয়েক পূর্ব্বেও ইহার সমস্তই ছিল,—ঘর-বাড়ী, লোক-জন, আত্মীয়-বন্ধু—স্বচ্ছল সংসার, কোন বস্তুরই অভাব ছিলনা,—শুধু একটা কঠোর অন্যায়ের ততোধিক কঠোর প্রতিবাদ করিতে সমস্ত ছাড়িয়া আসিয়াছে, একখণ্ড জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করার মত, মনস্থির করিতে একটা বেলাও লাগে নাই। অথচ, কোথাও কোন অঙ্গে ইহার কঠোরতার কোন চিহ্ন নাই!

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, আমি ভেবেছিলুম সুনন্দার বুঝি বয়স হয়েছে। ও হরি! একেবারে ছেলে মানুষ!

অজয় বোধ হয় তাহার গুরুদেবের হুঁকাতেই তামাক সাজিয়া আনিতেছিল; সুনন্দা তাহাকে দেখাইয়া বলিল, ছেলেমানুষ কি রকম! ওই অত বড় বড় ছেলে যার তার বয়স বুঝি কম? এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। চমৎকার সচ্ছন্দ সরল হাসি। অজয় নিজে উনুন হইতে আগুন লইবে কি না জিজ্ঞাসা করায় পরিহাস করিয়া কহিল, কি জানি কি জাতের ছেলে বাবা তুমি, কাজ নেই তোমার উনুন ছুঁয়ে। আসল কথা, জ্বলন্ত অঙ্গার চুল্লী হইতে উঠানো শক্ত বলিয়া সে আপনি গিয়া আগুন তুলিয়া কলিকাটার উপরে রাখিয়া দিয়া অজয়ের হাতে দিল, এবং হাসিমুখে ফিরিয়া আসিয়া স্বস্থানে উপবেশন করিল। সাধারণ পল্লী-রমণী-সুলভ হাসি তামাসা হইতে আরম্ভ করিয়া কথায় বার্ত্তায় আচরণে কোনখানে কোন বিশেষত্ব ধরিবার যো নাই, অথচ, ইতিমধ্যে যে সামান্য পরিচয়টুকু তাহার পাইয়াছি তাহা কতই না অসামান্য। এই অসাধারণতার হেতুটা পরক্ষণেই আমাদের দুজনের কাছেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। অজয় আমার হাতে হুকাটা দিয়া বলিল, মা, ওটা তা'হলে তুলে রেখে দি?

সুনন্দা ইঙ্গিতে সায় দেওয়ায় তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলাম আমারই অদূরে একখণ্ড কাঠের পীঁড়ার উপর মস্ত মোটা একটা পুথি এলো-মেলো ভাবে খোলা পড়িয়া আছে। এতক্ষণ কেহই উহা দেখি নাই; অজয় তাহার পাতাগুলি গুছাইয়া তুলিতে তুলিতে ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিল, মা, 'উৎপত্তি প্রকরণটা' ত আজো শেষ হলনা, কবে আর হবে! ও আর হবেই না।

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, ওটা কিসের পথি অজয়?

যোগবাশিষ্ঠঃ।

তোমার মা মুড়ি ভাজছিলেন আর তুমি শোনাচ্ছিলে?

না, আমি মা'র কাছে পড়ি।

অজয়ের এই সরল ও সংক্ষিপ্ত উত্তরে সুনন্দা হঠাৎ যেন লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল, তাড়া-তাড়ি কহিল, পড়াবার মত বিদ্যে ত ওর মায়ের ছাই আছে। না দিদি, দুপুরবেলা একলা সংসারের কাজ করি, উনি প্রায়ই থাকতে পারেন না, ছেলেরা বই নিয়ে কে যে কখন কি বকে যায় তার বারো আনা আমি শুনতেই পাইনে। ওর কি, যাহোক্ একটা বলে দিলে।

অজয় তাহার যোগবাশিষ্ঠঃ লইয়া প্রস্থান করিল, রাজলক্ষ্মী গম্ভীর মুখে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। মুহূর্ত্ত কয়েক পরে সহসা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বাড়ীটা আমার কাছাকাছি হলে আমিও তোমার চেলা হয়ে যেতুম ভাই। একে ত জানিনে কিছুই, তাতে আহ্নিক-পূজোর কথাগুলোও যদি ঠিক মত বলতে পারতুম।

মন্ত্রোচ্চারণ সম্বন্ধে তাহার সন্দিগ্ধ আক্ষেপ আমি অনেক শুনিয়াছি, ওটা আমার অভ্যাস ছিল, কিন্তু সুনন্দা এই প্রথম শুনিয়াও কোন কথা কহিল না, কেবল মুচকিয়া একটু হাসিল মাত্র। কি জানি সে কি মনে করিল। হয়ত ভাবিল, যে তাৎপর্য্য বুঝেনা, প্রয়োগ জানেনা, শুধু অর্থহীন আবৃত্তির পরিশুদ্ধতায় এত দৃষ্টি কেন? হয়ত বা ইহা তাহার কাছেও নূতন নয়,—আমাদের সাধারণ বাঙালী ঘরের মেয়েদের মুখে এম্নি সকরুণ লোভ ও মোহের কথা সে অনেক শুনিয়াছে, ইহার উত্তর দেওয়া বা প্রতিবাদ করাও আর প্রয়োজন মনে করে না। অথবা এ সকল কিছু নাও হইতে পারে, কেবল স্বাভাবিক বিনয় বশেই মৌন হইয়া রহিল। তবুও এ কথাটা ত মনে না করিয়া পারিলাম না, সে যদি আজ তাহার এই অপরিচিত অতিথিটিকে নিতান্তই সাধারণ মেয়েদের সমান করিয়া, ছোট করিয়া দেখিয়া থাকে ত আবার একদিন তাহার অতিশয় অনুতাপের সহিত মত বদ্‌লাইবার প্রয়োজন হইবে।

রাজলক্ষ্মী চোখের পলকে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইল। আমি জানি কেহ হা করিলে সে তাহার মনের কথা বুঝিতে পারে, আর সে মন্ত্র-তন্ত্রের ধার দিয়াও গেল না। এবং একটু পরেই নিছক ঘর-কন্না ও গৃহস্থালীর কথা আরম্ভ করিয়া দিল। তাহাদের মৃদু কণ্ঠের সমস্ত আলোচনা আমার কানেও গেলনা, কান দিবার চেষ্টাও করিলাম না। বরঞ্চ, তর্কালঙ্কারের থেলো হুঁকায় অজয় দত্ত শুষ্ক সুকঠোর তামাকু প্রাণ-পণ করিয়া নিঃশেষ করিতে নিযুক্ত হইলাম।

এই দুটি রমণী অস্পষ্ট মৃদুভাবে সংসার-যাত্রা সম্বন্ধে কোন্ জটিল তত্ত্বের সমাধান করিতে লাগিল সে তাহারাই জানে; কিন্তু, তাহাদেরই অদূরে হুঁকা হাতে নীরবে বসিয়া আমার মনে হইতে লাগিল আজ সহসা একটা কঠিন প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছি। ' আমাদের বিরুদ্ধে একটা বিশ্রী অভিযোগ আছে, মেয়েদের আমরা হীন করিয়া রাখিয়াছি। এই শক্ত কাজটা যে কেমন করিয়া করিয়াছি, এবং কোথায় উহার প্রতিকার, এ কথা অনেকবার অনেক দিক দিয়া আমি ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু আজ সুনন্দাকে ঠিক এমন করিয়া নিজের চোখে না দেখিলে বোধ করি সংশয় চিরদিন রহিয়াই যাইত। দেশে ও বিদেশে রকমারি স্ত্রী-স্বাধীনতা কতই না দেখিয়াছি। ইহার যে নমুনা বর্ম্মা-মুলুকে পা দিয়াই চোখে পড়িয়াছিল তাহা ভুলিবার যো কি! জন তিনেক ব্রহ্ম-সুন্দরী প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়াইয়া একটা যণ্ডামার্ক পুরুষকে আক-পেটা করিতেছেন দেখিয়া পুলকে রোমাঞ্চিত ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া উঠিয়াছিলাম। অভয়া মুগ্ধচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছিল, 'শ্রীকান্তবাবু, আমাদের বাঙালী মেয়েরা যদি এম্নি।—' আমার খুড়ামশাই একবার জনদুই মাড়োয়ারী রমণীর নামে নালিশ করিতে গিয়াছিলেন, তাহারা রেলগাড়ীতে নাকি খুড়ার নাক ও কান প্রবল পরাক্রমে মলিয়া দিয়াছিল। শুনিয়া খুড়িমা আমার দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, আচ্ছা, আমাদের বাঙালীর ঘরে ঘরে যদি ওর চলন থাকত! থাকিলে আমার খুড়ামশাই নিশ্চয়ই ঘোরতর আপত্তি করিতেন; কিন্তু, ইহাতেই যে নারীজাতির হীন অবস্থার প্রতিবিধান হইত, তাহাও ত অসংশয়ে বলা যায়না। ইহাই যে কোথায় এবং কিরূপে হয়, সুনন্দার ভগ্ন-গৃহের ছিন্ন আসনখানিতে বসিয়া আজ নিঃশব্দে এবং নিঃসন্দেহে অনুভব করিতেছিলাম। কেবল একটা 'আসুন' বলিয়া অভ্যর্থনা করা ছাড়া সে আমার সহিত দ্বিতীয় বাক্যালাপ করে নাই, রাজলক্ষ্মীর সঙ্গেও যে কোন বড় কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাও নয়; কিন্তু সেই যে অজয়ের মিথ্যা আড়ম্বরের প্রত্যুত্তরে হাসিমুখে জানাইয়াছিল, এ বাড়ীতে পান নাই, কিনিবার মত সামর্থ্য নাই,—

এখানে উহা দুর্লভ বস্তু! তাহার সকল কথার মাঝে এই কথাটা যেন আমার কাণে বাজিতেই ছিল। তাহার সঙ্কোচ-লেশহীন এইটুকু পরিহাসে দারিদ্র্যের সমস্ত লজ্জা কোথায় যে লজ্জায় মুখ লুকাইল, সারাক্ষণের মধ্যে আর তাহার দেখাই মিলিল না। এক মুহূর্ত্তেই জানা গেল এই ভাঙা বাড়ী, এই জীর্ণ গৃহসজ্জা, এই দুঃখ দৈন্য অনাটন, এই নিরাভরণ মেয়েটি তাহাদের অনেক উপরে। অধ্যাপক পিতা দিবার মধ্যে, কন্যাকে তাঁহার অশেষ যত্নে ধর্ম্ম ও বিদ্যাদান করিয়া শ্বশুরকুলে পাঠাইয়াছিলেন; তৎপরে সে জুতা-মোজা পরিবে কি ঘোমটা খুলিয়া পথে বেড়াইবে, কিম্বা, অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে স্বামি-পুত্র লইয়া ভাঙা বাড়ীতে বাস করিবে, তথায় মুড়ি ভাজিবে, কি যোগবাশিষ্ঠঃ পড়াইবে, সে চিন্তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। মেয়েদের আমরা হীন করিয়াছি কিনা, এ তর্ক নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু এই দিক দিয়া যদি তাহাদের বঞ্চিত করিয়া থাকি ত সে কর্ম্মের ফলভোগ অনিবার্য্য! অজয়ের 'উৎপত্তি প্রকরণ' উঠিয়া না পড়িলে সুনন্দার লেখা-পড়ার কথা আমরা জানিতেও পারিতাম না। তাহার মুড়ি ভাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সরল ও সামান্য হাসি-তামাসার মধ্যে দিয়া যোগবাশিষ্ঠের ঝাঁঝ কোথাও উঁকি মারে নাই; অথচ, স্বামীর অবর্ত্তমানে অপরিচিত অতিথির অভ্যর্থনা করিতেও তাহার কোনখানে বাধিল না। নির্জ্জন গৃহের মধ্যে একটা সতেরো-আঠারো বছরের ছেলের সে এতই সহজে ও অবলীলাক্রমে মা হইয়া গেছে, যে শাসন ও সংশয়ের দড়ি-দড়া দিয়া তাহাকে বাঁধিবার কল্পনাও বোধ করি কোন দিন তাহার স্বামীর মনে উঠে নাই। অথচ, ইহারই প্রহরা দিতে ঘরে ঘরে কত প্রহরীরই না সৃষ্টি হইয়া গেছে!

তর্কালঙ্কার মহাশয় ছেলেটিকে সঙ্গে করিয়া হাটে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এদিকে বেলা পড়িয়া আসিতেছিল। এই দরিদ্র গৃহলক্ষ্মীর কত কাজই না পড়িয়া আছে মনে করিয়া রাজলক্ষ্মী উঠিয়া পড়িল, এবং বিদায় লইয়া কহিল, আজ চল্লুম, যদি বিরক্ত না হও ত আবার আস্‌বো।

আমিও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, আমারও কথা কইবার লোক কেউ নেই, যদি অভয় দেন ত মাঝে মাঝে আস্‌ব।

সুনন্দা মুখে কিছু কহিল না, কিন্তু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। পথে আসিতে আসিতে রাজলক্ষ্মী কহিল, মেয়েটি চমৎকার। যেমন স্বামী তেম্‌নি স্ত্রী। ভগবান এদের বেশ মিলিয়েছেন।

আমি কহিলাম, হাঁ।

রাজলক্ষ্মী কহিল, এদের ও-বাড়ীর কথাটা আজ আর তুললুম না। কুশারী মহাশয়কে আজও ভাল চিন্‌তে পারিনি, কিন্তু এরা দুটি যা'ই বড় চমৎকার মানুষ।

বলিলাম, খুব সম্ভব তাই। কিন্তু তোমার ত মানুষ বশ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা, দেখনা চেষ্টা করে যদি এঁদের আবার মিল করে দিতে পারো।

রাজলক্ষ্মী মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া বলিল, ক্ষমতা থাক্‌তে পারে, কিন্তু তোমাকে বশ করাটা তার প্রমাণ নয়। চেষ্টা করলে ওটা অনেকেই পারত।

বলিলাম, হতেও পারে। তবে, চেষ্টার যখন সুযোগ ঘটেনি, তখন, তর্ক করায় ফল হবেনা।

রাজলক্ষ্মী তেমনি হাসিয়া কহিল, আচ্ছা গো, আচ্ছা। দিন এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেছে ভেবে রেখোনা।

আজ সারাদিনটাই কেমন একটা মেঘলাটে গোছের করিয়াছিল। অপরাহ্ণ-সূর্য্য অসময়েই একখণ্ড কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ায় আমাদের সাম্‌নের আকাশটা রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই গোলাপী ছায়া সম্মুখের কঠিন ধূসর মাঠে ও ইহারই একান্তবর্ত্তী এক ঝাড় বাঁশ ও গোটা দুই তেঁতুলগাছে যেন সোনা মাখাইয়া দিয়াছিল। রাজলক্ষ্মীর শেষ অনুযোগের জবাব দিলাম না, কিন্তু ভিতরের মনটা যেন বাহিরের দশদিকের মতই রাঙিয়া উঠিল। অলক্ষ্যে একবার তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম। ওষ্ঠাধরে হাসি তখনও সম্পূর্ণ মিলায় নাই, বিগলিত স্বর্ণপ্রভায় এই একান্ত পরিচিত হাসিমুখখানি একেবারে যেন অপূর্ব্ব মনে হইল। হয়ত, এ কেবল আকাশের রঙই নয়; হয়ত, যে আলো আর একটি নারীর কাছে হইতে এইমাত্র আমি আহরণ করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহারই অপরূপ দীপ্তি ইহারও অন্তরে খেলিয়া বেড়াইতেছিল। পথে আমরা ছাড়া আর কেহ ছিলনা। সে সুমুখে আঙুল বাড়াইয়া কহিল, তোমার ছায়া পড়েনি কেন বল ত? চাহিয়া দেখিলাম অদূরে ডান-দিকে আমাদের অস্পষ্ট ছায়া এক হইয়া মিলিয়াছে, কহিলাম, বস্তু থাক্‌লে ছায়া পড়ে,—বোধ হয় ওটা আর নেই।

আগে ছিল?

লক্ষ্য করে দেখিনি, ঠিক মনে পড়চে না।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, আমার পড়্‌চে,—ছিল না। এতটুকু বয়স থেকে ওটা দেখ্‌তে শিখেছিলাম। এই বলিয়া সে একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আজকের দিনটা আমার বড় ভাল লেগেচে। মনে হচ্চে এতদিন পরে একটি সঙ্গী পেলাম। এই বলিয়া সে আমার প্রতি চাহিল। আমি কিছু কহিলাম না, কিন্তু মনে মনে নিশ্চয় বুঝিলাম, সে ঠিক সত্য কথাটাই কহিয়াছে।

বাটী আসিয়া পৌঁছিলাম। কিন্তু ধুলা-পা ধুইবার অবকাশ, মিলিল না, শান্তি ও তৃপ্তি দুই-ই একই সঙ্গে অন্তর্হিত হইল। দেখি বাহিরের উঠান ভরিয়া জন দশ পনর লোক বসিয়া আছে; আমাদের দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। রতন বোধ হয় এতক্ষণ বক্তৃতা করিতেছিল, তাহার মুখ উত্তেজনা ও নিগূঢ় আনন্দে চক্‌চক্ করিতেছে; কাছে আসিয়া কহিল, মা, বারবার যা বলেছি ঠিক তাই হয়েচে।

রাজলক্ষ্মী অধীরভাবে কহিল, কি বলেছিলি আমার মনে নেই, আর একবার বল্।

রতন কহিল, নব্‌নেকে পুলিশের লোক হাত-কড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে গেচে।

বেঁধে নিয়ে গেচে! কখন্? কি করেছিল সে?

মালতীকে সে একেবারে খুন করে ফেলেচে!

বলিস্ কি রে! তাহার মুখ একেবারে শাদা হইয়া গেল।

কিন্তু কথা শেষ না হইতেই অনেকে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, না না, মা-ঠাকরুণ, একেবারে খুন করেনি। খুব মেরেচে বটে, কিন্তু মেরে ফেলেনি।

রতন চোখ রাঙাইয়া কহিল, তোরা কি জানিস্? তাকে হাঁসপাতালে পাঠাতে হবে, কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। গেল কোথা? তোদের শুদ্ধু হাতে দড়ি পড়্‌তে পারে জানিস্? শুনিয়া সকলের মুখ শুকাইল। কেহ কেহ সরিবার চেষ্টাও করিল। রাজলক্ষ্মী রতনের প্রতি কঠিন দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, তুই ও-ধারে দাঁড়াগে যা। যখন জিজ্ঞাসা কোরব বলিস্। ভিড়ের মধ্যে মালতীর বুড়া বাপ পাংশুমুখে দাঁড়াইয়া ছিল; আমরা সবাই তাহাকে চিনিতাম, ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল, কি হয়েচে সত্যি বলত বিশ্বনাথ। লুকালে কিম্বা মিছে কথা কইলে বিপদে পড়বে পার।

বিশ্বনাথ যাহা কহিল তাহা সংক্ষেপে এইরূপ। কাল রাত্রি হইতে মালতী তাহার পিতার বাটীতে ছিল। আজ দুপুরবেলা সে পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল। তাহার স্বামী নবীন কোথায় লুকাইয়া ছিল, একাকী পাইয়া বিষম প্রহার করিয়াছে—এমন কি মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে। মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে প্রথমে এখানে আসে, কিন্তু আমাদের দেখা না পাইয়া কুশারী মহাশয়ের সন্ধানে কাছারী-বাটীতে যায়, সেখানে তাঁহারও সাক্ষাৎ না পাইয়া সোজা থানায় গিয়া সমস্ত মার-ধরের চিহ্ন দেখাইয়া পুলিশ সঙ্গে করিয়া আনিয়া নবীনকে ধরাইয়া দেয়। সে তখন ঘরেই ছিল, নিজের হাতে দুটো চাল সিদ্ধ করিয়া খাইতে বসিতেছিল; সুতরাং পলাইবার সুযোগ পায় নাই। দারোগাবাবু লাথি মারিয়া ভাত ফেলিয়া দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া গেছেন।

ব্যাপার শুনিয়া রাজলক্ষ্মী অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিল। সে মালতীকেও যেমন দেখিতে পারিত না, নবীনের প্রতিও তেম্‌নি প্রসন্ন ছিল না। কিন্তু তাহার সমস্ত রাগ পড়িল গিয়া আমার উপরে। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, তোমাকে একশ বার বলেচি ছোট লোকদের এসব নোংরা কাণ্ডের মধ্যে তুমি যেয়ো না। যাও এখন সাম্‌লাও গে,—আমি কিচ্ছু জানিনে। এই বলিয়া সে আর কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া দ্রুতপদে বাটীর ভিতর চলিয়া গেল। বলিতে বলিতে গেল, নব্‌নের ফাঁসি হওয়াই উচিত। আর ও হারামজাদী যদি মরে থাকে ত আপদ গেছে!

কিছুক্ষণের নিমিত্ত আমরা সবাই যেন আড়ষ্ট হইয়া গেলাম। বকুনি খাইয়া মনে হইতে লাগিল কাল এম্‌নি সময়ে মধ্যস্থ হইয়া ইহাদের যে মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলাম তাহা ভাল হয় নাই। না করিলে এ দুর্ঘটনা হয়ত আজ ঘটিত না। কিন্তু আমার মৎলব ভাল ছিল। ভাবিয়াছিলাম প্রেম-লীলার যে অদৃশ্য চাপা স্রোতটা অন্তরালে বহিয়া সমস্ত পাড়াটাকে নিরন্তর ঘুলাইয়া তুলিতেছে, তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলে হয়ত ভাল হইবে। দেখিতেছি ভুল করিয়াছি। কিন্তু তার পূর্ব্বে সমস্ত ব্যাপারটা একটু বিস্তৃত করিয়া বলা প্রয়োজন। মালতী নবীন ডোমের স্ত্রী বটে, কিন্তু এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত দেখিতেছি সমস্ত ডোম-পাড়ার মধ্যে সে একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিশেষ। কখন্ কোন্ পরিবারের মাঝে সে যে অগ্নিকাণ্ড বাধাইয়া দিবে,

এ লইয়া কোন মেয়ের মনেই শান্তি নাই। এই যুবতী মেয়েটা যেমন সুশ্রী তেম্নি চপল। সে কাঁচপোকার টিপ পরে, নেবুর তেল মাখিয়া চুল বাঁধে, পরণে তাহার মিলের চওড়া কালাপেড়ে শাড়ী, তাহার মাথার ঘোমটা পথে-ঘাটে ঘাড়ে নামিয়া পড়িবার কোন বাধা নাই। এই মুখরা মেয়েটাকে মুখের সাম্‌নে বলিবার কাহারো সাহস নাই, কিন্তু অগোচরে তাহার নামের সঙ্গে যে বিশেষণ পাড়ার মেয়েরা যোগ করিয়া দেয়, তাহা লেখা চলে না। প্রথমে নাকি মালতী নবীনের ঘর করিতে চাহে নাই, বাপের বাড়ীতেই থাকিত। বলিত, ও আমাকে খাওয়াইবে কি? এবং এই ধিক্কারেই নাকি নবীন দেশত্যাগী হইয়া কোথায় কোন্ সহরে গিয়া পিয়াদাগিরী চাকুরি করিয়া বছর খানেক হইল গ্রামে ফিরিয়াছে। আসিবার সময় মালতীর জন্য রূপার পৈঁচা, মিহি সূতার শাড়ী, রেশমের ফিতা, এক বোতল গোলাপ-জল এবং একটা টিনের তোরঙ্গ সঙ্গে আনিয়াছে, এবং এইগুলির পরিবর্ত্তে স্ত্রীকে শুধু ঘরে আনা নয়, তাহার হৃদয় পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু এ সকল আমার শোনা কথা। আবার কবে হইতে যে স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ জাগিল, ঘাটে যাবার পথে আড়ি পাতিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল, এবং অতঃপর যাহা হয় সুরু হইয়া গেল, আমি ঠিক জানি না। আমরা ত আসিয়া অবধি দেখিতেছি ইহাদের বাক্ ও হাত-যুদ্ধ কোন দিন কামাই যায় না। মাথা-ফাটা-ফাটি কেবল আজ নয়, আরও দিন দুই হইয়া গেছে;—বোধ করি এই জন্যই আজ নবীন মোড়ল স্ত্রীর মাথা ভাঙিয়া আসিয়াও নিশ্চিন্ত চিত্তে আহারে বসিতেছিল, কল্পনাও করে নাই পুলিশ ডাকিয়া মালতী তাহাকে বাঁধিয়া চালান দিবে! কাল সকালেই প্রভাতী রাগিণীর ন্যায় মালতীর তীক্ষ্ণ-কণ্ঠ যখন গগনভেদ করিয়া উঠিল, রাজলক্ষ্মী ঘরের কাজ ফেলিয়া কাছে আসিয়া কহিল, বাড়ীর পাশে রোজ এ হাঙ্গামা সহ্য হয় না,—না হয় কিছু টাকা-কড়ি দিয়ে হতভাগীকে তুমি দূর করে দাও।

বলিলাম, নবীনটাও কম পাজি নয়। কাজ-কর্ম্ম করবে না, কেবল টেরি কেটে আর মাছ ধরে বেড়াবে, আর হাতে পয়সা পেলেই তাড়ি খেয়ে মারপিট সুরু করবে। বলা বাহুল্য এ সকল সে সহরে শিখিয়া আসিয়াছিল।

দুই-ই সমান! বলিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল। বলিতে বলিতে গেল, কাজ-কর্ম্ম করবেই বা কখন্? হারামজাদী তার সময় দিলে ত!

বস্তুতঃ, অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের গালি-গালাজ ও মারা-মারির মকদ্দমা আরও বার দুই করিয়াছি,—কোন ফল হয় নাই; আজ ভাবিলাম খাওয়া-দাওয়ার পরে ডাকাইয়া আনিয়া এইবার শেষ মীমাংসা করিয়া দিব। কিন্তু ডাকাইতে হইল না, দুপুর-বেলা পাড়ার মেয়ে পুরুষে বাড়ী ভরিয়া গেল। নবীন কহিল, বাবু মশায়, ওকে আর আমি চাইনে,—ও নষ্ট মেয়ে-মানুষ। ও আমার ঘর থেকে দূর হয়ে যাক।

মুখরা মালতী ঘোমটার ভিতর হইতে কহিল, ও আমার শাঁখা-নোয়া খুলে দিক্।

নবীন বলিল, তুই আমার রূপোর পৈঁচে ফিরিয়ে দে।

মালতী তৎক্ষণাৎ হাত হইতে সে দুই-গাছা টানিয়া খুলিয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিল।

নবীন কুড়াইয়া লইয়া কহিল, আমার টিনের তোরঙ্গ তুই নিতে পাবিনে।

মালতী কহিল, আমি চাইনে। এই বলিয়া সে আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া তাহার পায়ের কাছে ছুড়িয়া দিল।

নবীন তখন বীরদর্পে অগ্রসর হইয়া মালতীর শাঁখা পট্ পট্ করিয়া ভাঙিয়া দিল এবং নোয়াগাছটা টানিয়া খুলিয়া প্রাচীর ডিঙাইয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিল। কহিল, যা, তোকে বিধবা করে দিলাম।

আমি ত অবাক্ হইয়া গেলাম। একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি তখন বুঝাইয়া বলিল যে, এরূপ না হইলে মালতীর নিকা করা আর হইত না,—সমস্তই ঠিক-ঠাক্ আছে।

কথায় কথায় ব্যাপারটা আরও বিশদ হইল। বিশ্বেশ্বরের বড় জামাইয়ের ভাই আজ ছয় মাস ধরিয়া হাঁটা-হাঁটি করিতেছে। তাহার অবস্থা ভাল, বিশুকে সে কুড়ি টাকা নগদ দিবে, এবং মালতীকে পায়ে মল, হাতে রূপার চুড়ি এবং নাকে সোনার নথ দিবে বলিয়াছে, এমন কি এগুলি সে বিশুর কাছে জমা রাখিয়া পর্য্যন্ত দিয়াছে।

শুনিয়া সমস্ত জিনিসটাই অত্যন্ত বিশ্রী ঠেকিল। কিছু দিন হইতে যে একটা কদর্য্য ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, তাহা

নিঃসন্দেহ, এবং না জানিয়া হয়ত আমি তাহার সাহায্যই করিলাম। নবীন কহিল, আমি ত এই চাই। সহরে গিয়ে এবার মজা করে চাকরি কোরব,—তোর মত অমন দশ গণ্ডা বিয়ে কোরব। রাঙামাটির হরি মোড়ল ত তার মেয়ের জন্যে সাধাসাধি করচে,—তার পায়ের নোখেও তুই লাগিস্‌নে। এই বলিয়া সে তাহার রূপার পৈঁচা ও তোরঙ্গর চাবি ট্যাঁকে গুজিয়া চলিয়া গেল। এই আস্ফালন সত্ত্বেও কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল না যে তাহার সহরের চাকরি, কিম্বা হরি মোড়লের মেয়ে কোনটার আশাই তার ভবিষ্যৎকে বেশ উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছে।

রতন আসিয়া কহিল, বাবু, মা বল্‌চেন এসব নোংরা কাণ্ড বাড়ী থেকে বিদেয় করুন।

আমাকে করিতে কিছু হইল না, বিশ্বেশ্বর মোড়ল তাহার মেয়েকে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু পাছে আমার পায়ের ধূলা লইতে আসে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি গিয়া ঘরে ঢুকিলাম। ভাবিবার চেষ্টা করিলাম, যাক্‌, যা হইল তা ভালই হইল। মন যখন ভাঙিয়াছে এবং উপায় যখন আছে, তখন ব্যর্থ আক্রোশে নিত্য-নিয়ত মারামারি কাটা-কাটি করিয়া ঘর করার চেয়ে এ ভাল।

কিন্তু আজ সুনন্দার বাটী হইতে ফিরিয়া শুনিলাম, গত কল্যর নিষ্পত্তি অমন নিছক ভালই হয় নাই। সদ্য-বিধবা মালতীর উপর নবীন স্বামিত্বের দাবী-দাওয়া সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিলেও মারপিটের অধিকার ছাড়ে নাই। সে এ-পাড়া হইতে ও-পাড়ায় গিয়া হয়ত সমস্ত সকালটা লুকাইয়া অপেক্ষা করিয়াছে এবং এক সময়ে একাকী পাইয়া বিষম কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মেয়েটাই বা গেল কোথায়?

সূর্য্য অস্ত গেল। পশ্চিমের জানালা দিয়া মাঠের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম, খুব সম্ভব মালতী পুলিশের ভয়েই কোথাও লুকাইয়া আছে,—কিন্তু নবীনকে সে যে ধরাইয়া দিয়াছে ভালই করিয়াছে! হতভাগার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে,—মেয়েটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে।

রাজলক্ষ্মী সন্ধ্যার প্রদীপ হাতে ঘরে ঢুকিয়া ক্ষণকাল থমকিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কোন কথা কহিল না। নীরবে বাহির হইয়া পাশের ঘরের চৌকাটে পা দিয়াই কিন্তু কি একটা ভারি জিনিস পড়ার শব্দের সঙ্গে-সঙ্গেই অস্ফুটে চীৎকার করিয়া উঠিল। ছুটিয়া গিয়া দেখি মস্ত একটা কাপড়ের পুঁটুলি দুই হাত বাড়াইয়া তাহার পা ধরিয়া তাহারি উপর মাথা খুঁড়িতেছে। রাজলক্ষ্মীর হাতের প্রদীপটা পড়িয়া গেলেও জ্বলিতেছিল, তুলিয়া ধরিতেই সেই মিহি সূতার চওড়া কালাপেড়ে শাড়ী চোখে পড়িল।

বলিলাম, এ মালতী।

রাজলক্ষ্মী কহিল, হতভাগী, সন্ধ্যাবেলায় আমায় ছুঁলি? ইস্‌! এ কি বল্‌ ত?

প্রদীপের আলোকে ঠাহর করিয়া দেখিলাম তাহার মাথার ক্ষত হইতে পুনরায় রক্ত ঝরিয়া অপরের পা দুখানি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই হতভাগিনীর কান্না যেন শতধারে ফাটিয়া পড়িল; কহিল, মা আমাকে বাঁচাও—

রাজলক্ষ্মী কটু কণ্ঠে কহিল, কেন, তোর আবার হ'ল কি?

সে কাঁদিয়া কহিল, দারোগা বল্‌চে কাল সকালেই তাকে চালান দেবে,—দিলেই পাঁচ বচ্ছরের জেল হয়ে যাবে।

আমি কহিলাম, যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি শাস্তি হওয়া ত চাই।

রাজলক্ষ্মী কহিল, হোলই বা জেল, তাতে তোর কি?

মেয়েটার কান্না যেন দমকা ঝড়ের মত তাহার বুক ফাটিয়া উঠিল; বলিল, বাবু বলেন বলুন, মা, ও কথা তুমি বোলো না—তার মুখের ভাত আমি খেতে দিই নি। বলিতে বলিতে সে আবার মাথা কুটিতে লাগিল,—কহিল, মা, আমাদের তুমি এই বারটি বাঁচিয়ে দাও, আমরা বিদেশে কোথাও চলে গিয়ে ভিক্ষে করে খাবো। নইলে তোমারি পুকুরে গিয়ে ডুব দিয়ে মরব।

হঠাৎ রাজলক্ষ্মীর দুই চোখ দিয়া বড় বড় জলের ফোঁটা গড়াইয়া পড়িল; ধীরে ধীরে তাহার একরাশ এলো চুলের উপর হাত রাখিয়া রুদ্ধ-স্বরে কহিল, আচ্ছা, আচ্ছা, তুই চুপ কর,—আমি দেখ্‌চি।

দেখিতেও হইল। রাজলক্ষ্মীর বাক্স হইতে শ'দুই টাকা সেই রাত্রেই কোথায় গিয়া অন্তর্হিত হইল, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু, নবীন মোড়ল কিম্বা মালতী কাহাকেও সকাল হইতে আর রাঙ্গামাটিতে দেখিতে পাওয়া গেল না।

বিশ্ব-ভারতী

[শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল্]

রবীন্দ্রনাথের বাণী

সাময়িক পত্রিকার পাঠকেরা পাশ্চাত্য জগতে রবীন্দ্রনাথের সংবর্দ্ধনার কথা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সম্মানে বাঙ্গালী জাতিই সম্মানিত। তিনি যে-সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, তাহার একটা ফিরিস্তিও পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু যে বাণী শুনাইয়া তিনি বিদ্বন্মণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে বাণী আমরা এখনও সম্পূর্ণভাবে শুনিতে পাই নাই। 'মডার্ণ-রিভিউ' পত্রিকার মার্চ্ মাসের সংখ্যায় আমরা তাহার কতকটা পরিচয় পাইয়াছি। 'প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলন' সম্বন্ধে তিনি প্রায় সকল দেশেই বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এখানে আসিয়াও তিনি সে কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। তিনি যে কথা শুনাইয়াছেন, তাহার পুনরুক্তি করিতে চাহি না। তবে ঐ কথা বলিতে চাই,—বাঙ্গালী একবার চিন্তা কর—কথাটার ভিতর কতখানি সত্য আছে। জ্ঞান কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে। সত্যান্বেষণ কোন দেশবাসীর একচেটিয়া হইতে পারে না। কোন দেশের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর জ্ঞানকে আবদ্ধ রাখিতে পারা যায় না। জ্ঞান আহরণ করিতে হইলে, প্রতীচ্যের দেশে-দেশে ঘুরিতেই হইবে; কারণ, ঐ সকল দেশবাসীরা বহু কাল হইতে প্রকৃতির অন্তস্তল বিশ্লেষণ করিয়া, নানারূপ যন্ত্র-সাহায্যে যে দৃশ্য দেখিয়াছেন,—যে-সকল মহাসত্যে উপনীত হইয়াছেন,—সেগুলিকে আমাদের গ্রহণ করিতেই হইবে। সে সকল পরীক্ষিত সত্যগুলিকে দূর করিলে ত চলিবে না। সেগুলিকে গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। সেই সকল সত্যকে ভিত্তি করিয়া জ্ঞানের অট্টালিকা তুলিতে হইবে। সেই অট্টালিকার ভিতর প্রাচ্যের ভাবরাশি রক্ষা করিতে হইবে। আদান-প্রদান জগতের নিয়ম। প্রাচ্যের যাহা ভাল তাহা আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে—বিনিময়ে আমাদিগকেও তাহাদিগকে কিছু দিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য জগৎকে দিতে চাহিয়াছেন আমাদিগের সনাতন ভাব-ধারা—আমাদিগের ধর্ম্মনিষ্ঠা, একাগ্রতা ও সাধনা; গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন—তাঁহারা যে সমস্ত প্রাকৃতিক সত্যে উপনীত হইয়াছেন। পাশ্চাত্য জগৎ রবীন্দ্রনাথকে নবযুগের অগ্রদূত বলিয়া একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহার বাণী শুনিয়া, জগৎ ও জীবনকে নূতন করিয়া দেখিতে শিখিতেছেন। 'তপোবনের বাণী'তে তিনি প্রাচীন ভারতের ঋষি-যতিদিগের শান্তরসাস্পদ আশ্রমের চিত্র দেখাইয়াছেন;—শুনাইয়াছেন,—আনন্দের—অমৃতের অধিকারী হইতে হইলে, ধ্যান-ধারণা করিতে হইবে—আকাঙ্ক্ষার হ্রাস করিতে হইবে। কর্ম্মফলে অধিকার-শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। জগতে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপিত করিতে হইবে। 'ভারতের সাধারণ লোকধর্ম্ম' (Public Life in India) সম্বন্ধে ফ্রান্স দেশে বক্তৃতার একস্থলে

তিনি বলিয়াছিলেন, 'সমগ্র আসিয়া মহাদেশে মানবত্বের পরিস্ফুট হইবার সুযোগ নাই। এখানে মানবত্বকে চাপিয়া রাখা হইয়াছে। এরূপ অবস্থায়, আমার বিশ্বাস, শীঘ্রই মানবত্ব দাসত্বের চাপ দূর করিয়া ফেলিয়া, সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইবে। যে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে—ঘাতের প্রতিঘাত আছে,—সেই নিয়মবশে রুদ্ধ মানবত্ব বিজাতীয় চাপ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবে।'

রবীন্দ্রনাথ ফরাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, " 'জাতি-সংঘ' (League of Nations) কি মানব-সংহতি (League of peoples) হইয়াছে? আসিয়া মহাদেশে জাতি-সংঘ অপেক্ষা মানব-সংহতির আবশ্যকতা খুব বেশী। জাপানকে ছাড়িয়া দিলে, আসিয়ায় কোথাও ব্যক্তি ছাড়া শক্তির অস্তিত্ব নাই। জাতি-সংঘ গঠন করিয়া শক্তি-প্রতিষ্ঠার কল্পনা করা আসিয়া মহাদেশে সুদূরপরাহত; কারণ, জাতি-সংঘে আসিয়ার ব্যক্তিত্বের স্থান নাই। বৃহৎ মহাদেশের মানব-সংহতির সহিত যাঁহাদেরই পরিচয় আছে, তাঁহারাই আমার কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন।" বাস্তবিকই ভারতবর্ষে ব্যক্তি ছাড়া শক্তি কোনও দিন ছিল না। সে ব্যক্তি কখনও বা সম্মিলিত 'জন' বা 'গণ' রূপে, কখনও বা রাজাধিরাজ রূপে দণ্ড ধারণ করিয়াছে।

অন্যত্র তিনি 'ভারতের ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'বিশ্ব প্রেমই' ভারতের শাশ্বত ধর্ম্ম—মানবকে ভ্রাতৃভাবে, সৌহার্দ্দের বন্ধনে আবদ্ধ রাখাই ভারতের ধর্ম্ম—শুধু মানব নয়, সমগ্র প্রাণি-প্রীতিই ভারতের ধর্ম্ম। শাক্যসিংহ 'অহিংসা' এই মহামন্ত্র জগতে বিলাইয়া গিয়াছেন। মহাযানপন্থীদিগের 'মহাকায়' ও 'বোধি-হৃদয়' হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, প্রীতি—প্রেমই জগতের ধর্ম্ম। বৈষ্ণব কবিরা এই প্রেমরসেই মশ্‌গুল ছিলেন; তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, প্রেমময়ের অসীম প্রেম মানব-হৃদয়ে সীমাবদ্ধ হইয়াছে মাত্র।

ভারত-ধর্ম্মের বিশেষত্ব এই,—ভারত বুঝিয়াছিল, ভগবানের অসীম প্রেম মানব-হৃদয়ে সীমাবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবাসী বুঝিয়াছিল, ভগবানের প্রেমের আবশ্যকতাই থাকে না, যদি না মানবের, প্রেমের সহিত তাহার যোগ থাকে। কথাটা বাস্তবিকই সত্য; আর তাই ভারতবাসী ভগবান্‌কে কখনও মাতৃ-রূপে, কখনও পিতৃ-রূপে, কখনও পুত্র-রূপে, কখনও স্বামি-রূপে দেখিয়া, পূজা করিয়াছে, ভালবাসিয়াছে, আদর-যত্ন করিয়াছে—সর্ব্বস্ব দান করিয়াছে। ভারতের অতীত সাহিত্যে এই সত্যের নিদর্শন পদে-পদে দেখিতে পাওয়া যায়।

'বাঙ্গালার বাউল' সম্বন্ধে বক্তৃতা কালে, রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, এই প্রাচীন সম্প্রদায় সত্যান্বেষী। এখনও ইহারা গান গাহিয়া ধর্ম্মালোচনা করিয়া থাকে। ইহাদের ধর্ম্মের ভিত্তি কোনরূপ দার্শনিক বাদের উপর স্থাপিত নয়। ইহাদের কোনরূপ দর্শন বা তত্ত্ববিদ্যা নাই। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে, ইহারাই ভারতে সার্ব্বজনীন চেতনা (democratic consciousness) প্রথমে আনিয়াছে; এবং ইহারাই জগতে এই নূতন ভাবধারা প্রবাহিত করাইয়া বরেণ্য হইয়াছে।

বার্লিনে তিনি 'বাঙ্ময় ব্রহ্ম' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সনাতন ঋষিদিগের 'শব্দ-ব্রহ্ম'—এই সিদ্ধান্ত তিনি জার্ম্মাণদিগকে বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন।

সুইডেনে তিনি নোবেল প্রাইজের সর্ত্তানুসারে যে দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহার একটির নাম 'ভগবৎ-প্রীতি।' তাঁহার মতে আসিয়া মহাদেশ ভগবৎ-প্রীতির জন্য প্রসিদ্ধ। ভগবান্‌কে ভালবাসিলে, মানব মানবকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। যদি জগতে প্রকৃত শান্তি স্থাপন করিতে চাও, তাহা হইলে মানবকে ভালবাস। জাতি-সংঘ স্থাপিত করিলেই, জগতে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না;—মানবকে ভাল না বাসিলে—তাহাকে আলিঙ্গন না করিলে—তাহার ভিতর একই ভগবানের সত্তা না দেখিতে পাইলে, জগতে শান্তি-রাজ্য স্থাপিত হইবে না। এই স্থলে আমরা ভাদ্র মাসের 'ভারতী' পত্রিকা হইতে রবীন্দ্রনাথের পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না:—

"এই পশ্চিম দেশে আমার সম্মানের জন্য যেরূপ উল্লাস দেখিতেছি, তাহাতে অবাক্ হইয়া ভাবি, ইহার অর্থ কি? শুনিয়াছি, আমি না কি মানব-জাতির বন্ধু বলিয়া আমার এই সম্মান। আশা করি, তাই যেন সত্য হয়, যে, আমার লেখার মধ্যে সর্ব্বত্র মানব-প্রেম ফুটিয়া উঠিয়াছে,—এবং তাহা সকল গণ্ডী ছাড়াইয়া, সকল জাতির হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। যদি তাই সত্য হয়, তবে আমার

লেখার মধ্যে এই যে সবচেয়ে বড় সুরটি—ইহাই যেন আমার জীবনেরও মূলমন্ত্র হয়। সেদিন হামবার্গের হোটেলে, আমার ঘরে একাকী বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময়ে দুইটি ব্রীড়াময়ী, মধুর-হাসিনী জার্মাণ-বালিকা আমার জন্য একটী গোলাপগুচ্ছ উপহার লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাদের মধ্যে একটী মেয়ে ভাঙ্গা ইংরাজীতে বলিল, "ভারতকে আমি ভালবাসি।" আমি বলিলাম, "কেন তুমি ভারতকে ভালবাস?" বালিকা উত্তর করিল, "আপনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন বলিয়া।" এত বড় প্রশংসা গ্রহণ করিবার মত আত্ম-প্রসাদ আমার নাই। তবে আমার বিশ্বাস, ইহার অর্থ এই যে, আমার কাছে ঐরূপ তাহারা আশা করে; এবং এজন্য ইহা প্রশংসা না হইয়া, আমার পক্ষে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ হইল। অথবা, হয় ত তাহারা এই বলিতে চাহিয়াছিল যে, আমার দেশ ভগবান্‌কে ভালবাসে; সেই জন্য তাহারা আমার দেশকে ভালবাসে। এরূপ প্রত্যাশার অর্থ বেশ বুঝা যায়। সকল জাতি আপন-আপন দেশকে ভালবাসে,—কাজেই পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইতেছে। জগৎ এখন এমন দেশ চায়, যেখানে লোকে ভগবান্‌কেই ভালবাসে, নিজের দেশকে নয়; সেই দেশই সকল দেশের, সকল মানবের ভক্তি অর্জ্জন করিবে। নিজের প্রতি বা স্বজাতির প্রতি ভালবাসার একমাত্র ফল স্বার্থের সংঘর্ষ; ভগবানে প্রীতিই আমাদের জীবনের চরম সার্থকতা। সকল সমস্যার মীমাংসা ইহার মধ্যে আছে।" রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে মনীষী রামমোহন রায় ইয়ুরোপকে বুঝাইয়াছিলেন, ভারতবাসী পুত্তলিকা-পূজক নহে;—তাহারা একেশ্বরবাদী, আর ভারতের ভগবৎ-প্রেম উপনিষদের 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' হইতে উৎপন্ন। তাই ভারত সর্ব্বজীবের ভিতর ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি করে; সর্ব্বজীবে অহিংসা না করিয়া থাকিতে পারে না। আর এই কথাই স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় প্রচার করিয়া, তাহাদিগের ভিতর উপনিষৎ-প্রীতি বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন। বিলাতেও তিনি এই কথা শুনাইয়াছিলেন। এ সকল বাণী ভারতের নিজস্ব বাণী। শব্দ ব্রহ্ম, বাণী সনাতন সত্য; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নূতন ভাবে পাশ্চাত্য জগতের নিকট এ কথা প্রচার করিয়া স্বয়ং ধন্য হইয়াছেন; কারণ, তিনি মানবমনকে ভগবদ্-মুখী করিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছেন; কৃতকার্য্য যে একেবারেই হ'ন নাই, তাহাও বলিতে পারি না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার প্রবন্ধ-নিচয় এখনও পাঠ করিবার সুবিধা আমাদের হয় নাই। তবে একটী প্রবন্ধ, যাহা আমেরিকার নিউইয়র্কের Mentor পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং যাহা Indian Daily News পত্রিকা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, তাহা আমরাও পাঠ করিয়াছি। এ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া জগৎ বুঝিয়াছে, আমরা রমণীকে কি চক্ষে দেখিয়া থাকি। আমরা নারীর সম্মান করিতে জানি না বলিয়া, পাশ্চাত্য জগৎ আমাদিগকে ঘৃণা করিত। আমাদের অবরোধ-প্রথা নারীত্বের বিকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী না হইতে পারে; কিন্তু ভারতে নারীর স্বাধীনতা নাই, বা ভারতবাসী নারীর সম্মান করিতে জানে না, একথা ভারতবাসী কখনই স্বীকার করিবে না। নারীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাহার গৃহে। আমাদেরই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন যেথানে নারীর পূজা হইয়া থাকে, সেইথানেই দেবতারা রমণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সারাংশের ভাবানুবাদ করিয়া দিতেছি:—অনুভূতি উৎপাদিকা শক্তির জনয়িত্রী। নারী স্বভাবতঃ অনুভূতি-বলে গরীয়সী। সহনশীলতা তাহার জীবনকে কাব্যময় করিয়া রাখিয়াছে। এই আদর্শ, পুরুষের অলক্ষ্যে তাহার নিরন্তর ব্যগ্র কার্য্যকরী শক্তিকে সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে ও ধর্ম্মে নূতন সৃষ্টি করিবার জন্য অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এই জন্যই ভারতে রমণীকে সৃষ্টিরূপিণী মহাশক্তির অংশ বলা হইয়া থাকে।

প্রাণিবিজ্ঞানের (Biology) মতে নারীর কার্য্য পুরুষের কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র সত্য; কিন্তু মনোবিজ্ঞানের মতে উভয়ের কার্য্যাবলীই অভিন্ন। যদি কোন গতিকে সমস্ত জগৎ পুরুষভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচয় পদে পদে পাওয়া যাইবে; কারণ একরূপ ভাব হইতে জীবনে সত্য ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যায় না; বিভিন্ন ভাবের সমন্বয়েই সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে—সত্য প্রকাশমান হয়।

পুরুষ ও রমণী যদি অভিন্ন ভাবাত্মক না হইত, তাহা হইলে রমণীর প্রয়োজনীয়তাই থাকিত না। ধরাধামে নূতন অমরাবতী-সৃষ্টির কল্পনা সহজ জ্ঞানবশে প্রথম রমণী ইভের মস্তিষ্কে আসিয়াছিল বলিয়াই সে স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইবার উপায়কে বরণ করিয়া লইয়াছিল। স্বর্গে তাহার কোনরূপ

অভাবই ছিল না; কিন্তু সুধু সৃষ্টি করিবার প্রলোভনে সে মর্ত্ত্যে আসে এবং সঙ্গীর আদর্শকে পূর্ণতা দান করিবার চেষ্টা করে।

পাশ্চাত্য জগতে অধিকাংশ রমণীই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, পুরুষদিগের সহিত তাঁহাদের কোনরূপ পার্থক্যই নাই।

ভালবাসা যে কোন মূর্ত্তিতেই দেখা দিক, কর্ত্তব্য তাহার অনুগামী। পুত্রকন্যাদিগের সহিত জননীর অচ্ছেদ্য বন্ধন ভালবাসা-প্রসূত; আর, এই ভালবাসা তাহার গৃহকে, অটুট রাখে। পুরুষ ও রমণীর প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে সত্য; আবার, সেই পার্থক্য সামাজিক ও অন্যান্য অবস্থাবশে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে; এবং ইহার জন্য মনে যে অবসাদ আসে, তাহাকে দূর করিবার জন্য পুরুষ রমণীকে গৃহকর্ত্রী করিয়া রাখিয়াছে। আর, এই কর্ত্তৃত্ব হ্রাস হইলে রমণীর জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে।

পুরুষের প্রাধান্য ক্রম-বর্দ্ধিত হইয়া এরূপ অবস্থায় দাঁড়ায় যে, সে লিঙ্গ সংবিৎকে (Ser-consciousness) ভুলিয়া যায়। যে যুগে পুরুষ ধর্ম্ম-বিষয়ে আপনাকে উন্নত মনে করিয়া, স্ত্রীলোকদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত, সে যুগে কামিনী-ত্যাগের ব্যবস্থা ছিল। তখন তাহারা ভাবিত, কামিনী কামের পথে—ভোগের পথে তাহাদিগকে লইয়া যায়। তাই সমাজে তাহার উপর অত্যাচার হইত—রমণীর অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ হইত না। অনবরত শক্তি রোধ করিয়া রাখিলে বা চাপিতে চেষ্টা করিলে, সে শক্তি অন্য দিক্ দিয়া আপনই প্রকাশ হইয়া পড়ে—ইহা স্বভাবের নিয়ম। এই নিয়মবশে রমণীর সুপ্ত-শক্তি পুরুষের দুর্ব্বলতাকে আক্রমণ করিয়া, তাহাকে অধিকতর দুর্ব্বল করিয়া ফেলিত। স্বাধীনতাকে চাপিয়া রাখিয়া, পুরুষ ও রমণীর বন্ধন অটুট থাকিতে পারে না। সে বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়ে; এবং পরিশেষে অত্যাচারের ভারে ছিঁড়িয়া যায়।

যাহা হউক, পুরুষ ও রমণীর শক্তির সমন্বয় গৃহের আকর্ষণী শক্তি থাকিলেই হইতে পারে। পুরুষের যদি গৃহের দিকে টান থাকে, গৃহের প্রতি যদি কর্ত্তব্যবোধ থাকে, মমত্ব-বোধ থাকে, তাহা হইলেই গৃহে শান্তি বিরাজমান থাকিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পুরুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাহাকে এরূপ অবস্থায় লইয়া গিয়াছে যে, গৃহের ভার-কেন্দ্র আর যথাস্থানে নাই; এবং সেও ক্রমশঃ ইহার প্রভাব হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে।

আমাদিগের সমাজে কিন্তু এরূপ হইবার সম্ভাবনা কম; কারণ, আমাদিগের রমণীরা প্রথম হইতেই এরূপ শিক্ষা পায়, যাহাতে সে গৃহের শান্তি রক্ষা করিতে পারে—বৈষম্যের ভিতর সাম্য আনিতে পারে। সহজ জ্ঞানে তাহারা প্রাণের টানে এরূপভাবে কার্য্য করিয়া থাকে যে, তাহাকে দাসীপণা বলিতে পারা যায় না। সামাজিক জীবন-গঠনে রমণী শিল্পীর কার্য্য করিয়া আসিয়াছে—সামান্য মুটে-মজুরের কার্য্য করে না। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি তাহারই কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু যদি নারী এই সৃষ্টি-কার্য্যে সৌন্দর্য্য-জ্ঞানরহিত, কলাবিদ্যায়-আস্থাহীন পুরুষের কর্তৃত্বাধীন থাকে, তাহা হইলে তাহার সৌন্দর্য্যের সকল অনুভূতিই নষ্ট হইয়া যায়। আর যেখানে রমণীকে পুরুষের জন্য তাহার সৌন্দর্য্য-জ্ঞানবিরহিত ইচ্ছার অনুরূপ হইয়া চলিতে হয়, বা তাহার কামানলে ইন্ধন যোগাইতে হয়, সেইখানেই ধ্বংস অনিবার্য্য;—সেইখানেই মর্ম্মবিদারক দৃশ্যের অভিনয় হইয়া থাকে। সমাজে এরূপ বিয়োগান্ত দৃশ্য অনেকই দেখিতে পাওয়া যায়। স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ এখনও সেই অতীত কালের বর্ব্বরতা-মূলক অধিকারের উপর স্থাপিত। স্ত্রীর শরীর ও মনের উপর স্বামীর সম্পূর্ণ অধিকার। নারীর শারীরিক দুর্ব্বলতা ও জীবন-ধারণোপযোগী অর্থ উপার্জ্জনের অক্ষমতাই কি বাস্তবিক তাহাকে পুরুষ অপেক্ষা হীন করিয়াছে? সামান্য অর্থ উপায় করিতে পারে বলিয়াই কি পুরুষ রমণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? এ কথা মূর্খতার পরিচায়ক ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

সবল মাংসপেশী ও অর্থ-বল পুরুষদিগের অনেক অভাব-অভিযোগ দূর করিতে পারে সত্য, কিন্তু আদর্শ-সৃষ্টিকারী নারীর সহনশীলতা অসীম। দ্রব্য-বিক্রেতা বা চুক্তিমত কার্য্যকারী পুরুষ যদি বিনিময়ে মূল্য না পায়, বা চুক্তি-ভঙ্গকারী অপর পক্ষ তাহার প্রাপ্য না দেয়, তাহা হইলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু সম্মুখে যিনি আদর্শ স্থাপিত করেন, তিনি বিনিময়ে কিছু চান না—যাহা পান, তাহার মূল্য বড় কম নয়। ভারতের রমণী এই আদর্শকে করায়ত্ত করিয়াছে। তাহাদের সরল বিশ্বাস ও অকৃত্রিম পবিত্র প্রেম তাহাদিগকে প্রকৃত ভক্ত, প্রকৃত অনুরাগী করিয়াছে। ভারতে পূত প্রেমই নারীর

বিশেষত্ব। এই প্রেমকে আমরা প্রশংসা করি না—পূজা করি; এবং যে নারী দিব্য প্রেমে অনুরাগিণী তাহাকে আমরা 'দেবী' বলিয়া থাকি; কারণ, তাহাতে মহাশক্তির বিকাশ দেখিতে পাই। ইহা সামান্য উপমা নহে। ইহার সত্যতা আমরা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াছি; কারণ, ভারতবাসী ভগবানের শাশ্বত স্ত্রী-শক্তির বিকাশ অনুভব করিয়াছে। প্রতীচ্য রমণী তাহার আদর্শ—তাহার পবিত্র অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম জানে বলিয়া সর্ব্বদাই পুরুষদিগের অনুকরণীয়। তাহাদিগের নিকট হইতে পুরুষের শিখিবার অনেক জিনিস আছে। যে সকল পুরুষ আদর্শ নীতি হইতে দূরে চলিয়া যায়, তাহারা এ কথার যাথার্থ্য স্বীকার না করিতে পারে; কিন্তু তাহাতে আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয় না; রমণীর কৃতিত্বও যায় না।

সহ্য করিবার জন্য রমণীর সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকা উচিত। তাহার ভাব ও অনুভূতিকে কোন ক্রমেই নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়। পুরুষের আঘাত ও অত্যাচার হইতে ঐ-গুলিকে রক্ষা করা চাই। অন্যান্য দেশের রমণীর ন্যায় ভারত-রমণীরও দুঃখ-দুর্দ্দশা আছে।

সূর্য্যের কিরণ যেমন সূর্য্য হইতে বিচ্যুত হইয়া, জগতের বস্তুসমূহের সৃষ্টির মূল কারণ হয়, সেইরূপ আদর্শের ভিতর দিয়া ভারত-রমণীর দুঃখ-দুর্দ্দশাগুলি আসে বলিয়া, ঐগুলি আনন্দের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের পৌরাণিক সাবিত্রীর আখ্যায়িকা কণ্ঠস্থ। তাহারা জানে, সতী-শিরোমণি সাবিত্রী আপনার প্রেমের বলে মৃত স্বামীকে যমরাজের কবল হইতে ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছিলেন। তাহারা জানে, নিষ্কলঙ্ক সীতাদেবীর ত্যাগের পুরস্কার দুঃখ। আর এই দুঃখকে তিনি দেবতার নির্ম্মাল্য স্বরূপ পবিত্র জ্ঞানে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। আমাদের দেশের রমণীরা জানে, এই দেহকে শাশ্বত দেহের প্রতিচ্ছবি করিতে হইবে, তাহারা জানে, এই দেহ ও মনকে এমন ভাবে গড়িতে হইবে, যাহাতে ভবিষ্যতে বা পরজন্মে তাহারা অমৃতের অধিকারী হইতে পারে। তাহারা জানে, প্রেমের দিব্য ক্ষমতা আছে। তাহারা জানে, প্রেমেই তাহাদিগকে অমৃতের সন্ধান দিতে পারে; এবং এই জন্যই কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাহারা প্রেমের উপাসনা করিয়া, সকলকে ভালবাসিয়া, আপনার করিয়া লইয়া, জীবন যাপন করিতে থাকে। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের কার্য্যকরী শক্তি অর্থোপার্জ্জনে, কিংবা প্রকৃতির রহস্যোদ্ঘাটনে, অথবা কোন একটা বড় প্রতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠানের পরিচালনায় নিয়োজিত হয় না সত্য, কিন্তু সে শক্তি মানবের নৈতিক সম্বন্ধ অটুট রাখিবার জন্য সদাই উন্মুখ। আর এই জ্ঞান-বলে বলীয়ান্ বলিয়া, ভারত-রমণীরা সুবিধাকে তুচ্ছ করে এবং দুঃখ-দৈন্যকে বরণ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকে।

গৃহের স্থায়ী প্রভাব কেবলমাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে না; শাশ্বত নৈতিক আদর্শের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভর করে। মানবের সম্বন্ধ যে মিথ্যা নহে এ জ্ঞান থাকা চাই; আর চাই প্রকৃত মানুষের (Personality of man) প্রতি ভালবাসা—মানুষের ভিতরে যে ঐশী শক্তি আছে, তাহার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ। ছোট-বড় দেখিলে চলিবে না। প্রকৃত মনুষ্যত্ব দেখিতে পাইলেই, মস্তক নত করিতে হইবে। তবে গৃহ ও সমাজ-বন্ধন অটুট থাকিবে।

কৃষি-কার্য্যের বিস্তৃতি ও উন্নতির সহিত, আমাদের দেশের লোকদিগের যাযাবর বৃত্তি হ্রাস হইয়া, গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিবার ইচ্ছা বর্দ্ধিত হয়। আর এই কার্য্য করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের যে অবসর থাকিত, সেই সময়ে তাঁহারা মানুষের সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেন। ভারতবর্ষ ও চীন দেশের প্রাচীন সভ্যতার ধারা বুঝিতে হইলে, এদিকে একটু লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সেই সভ্যতার মূলে সহযোগিতাই দেখিতে পাওয়া যায়;—প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেখানে নাই। গৃহকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সমবেত চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়;—দেখিতে পাওয়া যায় গৃহের জন্য নিজ-নিজ স্বার্থের বলিদান।

অপর দিকে আবার দেখিতে পাওয়া যায়, যাযাবর বৃত্তি যাহারা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহারাও একটা সভ্যতার ধারা প্রচলন করিয়াছিল। ইহারা শক্তিশালী ও গর্ব্বিত। ইহারা কেবল সুবিধা খুঁজিত, কি করিয়া পরস্বাপহরণ করিবে; কি করিয়া আপনার স্বার্থ বজায় রাখিবে; কি করিয়া অধিকতর ক্ষমতাশালী হইবে। ইহারা মানবের কোনরূপ বন্ধনই মানিত না। ধর্ম্মের ধারও ধারিত না। আপনার প্রভাব কম শক্তিশালী লোকের উপর চালাইতে চেষ্টা করিত। গৃহের প্রভাব ইহারা স্বীকার করে না। মহিলা-দিগকে ইহারা অর্থোপার্জ্জনের যন্ত্র করিতে চায়—পুরুষের

ন্যায় সমান ভাবে কার্য্য করাইতে চায়। রমণীকে পবিত্র গৃহের গণ্ডীর বাহিরে আনিয়া, পুরুষজনোচিত পরুষ কার্য্য সর্ব্বদা করাইয়াও, ইহারা রমণীকে পুরুষ করিতে পারে নাই। অপর দিকে, এই সকল জাতির রমণীরা একদিন বুঝিবেন, আমাদের আদর্শ কতটা উচ্চ; এবং একদিন তাঁহারা তাঁহাদের ন্যায় দাবী গ্রহণ করিবেন; এবং তাঁহারা যে মানবের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রী—তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী শক্তি (Guardian Spirit) তাহা বুঝিবেন। আর বুঝিবেন, তাঁহারাই গৃহের শান্তিদাত্রী। দিনের শেষে কর্ম্মক্লিষ্ট, অবসাদগ্রস্ত পুরুষ, যখন গৃহে প্রবেশ করে, তখন নারীই তাহার কর্ম্মপটু হস্তের সেবার দ্বারা, মধুময় প্রেমের বাণীর দ্বারা, সকল দুঃখ, সকল যাতনা দূর করিয়া দিতে পারে।

দুঃখের বিষয়, কর্ম্মশীল পুরুষ কলকব্জার উন্নতির সহিত তাহার ভোগের যন্ত্র উদ্ভাবনে ব্যস্ত। গৃহের সুখ-শান্তিকে সে দূর করিয়া দেয়—ভালবাসাকে পরিহার করিয়া স্বাচ্ছন্দ্যকে বরণ করিয়া লয়। ইহার যে কুফল হইয়াছে, তাহার আর উল্লেখ করিব না। বর্ত্তমান যুগে একটা সাড়া পড়িয়াছে—এই দুর্দ্দিনের হাত হইতে সুদিন ফিরিয়া আনিতে এক রমণীই পারেন। মানবের নৈতিক প্রাধান্য স্থাপন করিতে একমাত্র রমণীই পারদর্শিনী। তিনিই আবার গৃহে শান্তি আনিতে পারেন। রমণীকে কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, তিনি পুরুষের ক্রীড়নক ন'ন—তিনি গৃহের শোভাবর্দ্ধনশীল আসবাবপত্রের অন্যতম ন'ন—তিনি গৃহ ও সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্য স্বরূপ। তিনি প্রেম দিয়া স্বামীকে আপনার করুন;—মঙ্গল হস্ত দ্বারা অমঙ্গলকে দূর করুন। নৈতিক স্বাস্থ্য ও আনন্দ আবার ফিরিয়া আসিবে।"

রমণীর এই আদর্শ—সনাতন আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ জগতের সমক্ষে এই হিমালয়ের ন্যায় উচ্চ আদর্শ উপস্থিত করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। পাশ্চাত্য রমণীরা যদি হৃদয়ের পরতে-পরতে এই আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন,—এই আদর্শের অনুধাবন করেন—যদি এই আদর্শ অনুসারে কার্য্য করেন, তাহা হইলে 'সুবিধাবাদের' জন্য যে সকল অসুবিধা তাঁহারা ভোগ করেন, তাহা দূর হইয়া যাইবে—বিবাহ-বন্ধন ছেদন করিবার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না—বিপথগামী স্বামীকে প্রেমের দ্বারা আপনার দিকে টানিয়া আনিতে পারিবেন। রমণীকেও পর-পুরুষের দেহের সৌন্দর্য্যের বা মানসিক গুণের পক্ষপাতিনী হইয়া লালসার দৃষ্টিতে তাহার দিকে ছুটিতে হইবে না;—কারণ, রমণী তখন বুঝিবেন, জগতে স্ত্রীলোক সকলেই—পুরুষ ত কেবল তাহার স্বামী। প্রেম সকল বাধা, সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, গৃহে-গৃহে পুনরায় শান্তি আনিবে। ভগবান্ করুন, জগতে সেই দিন আবার ফিরিয়া আসুক।

সম্পাদকের বৈঠক

[১]

কাপাস-বীজ—সূতা

মহাশয়, আপনাদের গত বৈশাখ মাসের ভারতবর্ষের "সম্পাদকের বৈঠকে" আমি গারো কার্পাসের বীজ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি বলিয়া আমার এক পত্র প্রকাশিত হয়। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থান হইতে তুলার বীজের জন্য এত পত্র পাইতেছি যে, সমুদায়গুলির উত্তর দিতে গেলে, ইহার জন্য আমাকে একটী স্বতন্ত্র আফিস খুলিয়া বসিতে হয়। আমরা এবার পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিলাম না বলিয়া সকলের আদেশ পালন করিতে পারি নাই। আজকাল যাঁহারা বীজের জন্য পত্র লিখিতেছেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত, বীজ বপনের সময় বৈশাখ মাস; অতএব তাহার পূর্ব্বেই বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। মাঘ ফাল্গুন মাসই ইহার উপযুক্ত সময়।

ইহা ছাড়া, চরকার সূতা কোথায় খরিদ করিতে পাওয়া যায়, তাহা অনেক ভদ্রলোকেই পত্রের দ্বারা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তাঁহাদের সকলকেও উত্তর দেওয়া অসম্ভব বলিয়া আপনাদের পত্রিকায় আশ্রয় লইলাম। সূতার সম্বন্ধে বিশেষ কোন সন্ধান রাখি না। এখন হইতে তাহার সন্ধান লইবার চেষ্টা করিব। তবে বিলাতী সুলভ সূতার বহুল প্রচারের দরুণ সর্ব্বত্রই চরকা এক প্রকার বিশ্রাম লইয়াছিল। আসামে যাহারা সূতা কাটে, তাহারা প্রায় নিজেরাই কাপড় প্রস্তুত করে। এড়ি ও মুগার সম্বন্ধেও সেই কথা। তবে চেষ্টা করিলে কিছু পাওয়া যাইতে পারে। যাহাই হউক, কংগ্রেস কমিটীর ব্রাঞ্চ আফিসগুলিতে পত্র লিখিলে, ইহার বিশেষ সন্ধান পাওয়া গেলেও যাইতে পারে।

লক্ষ্মীপুর, গোয়ালপাড়া। শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

[২]

আর্য্যপরিচ্ছদ

১। পূর্ব্বকালের বঙ্গবাসীর ও বঙ্গীয় রাজন্যবর্গের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিশেষ কিছু দৃষ্ট হয় না। আর্য্যের বা আর্য্য রাজন্যবর্গের পরিচ্ছদ-বিধি শাস্ত্রে আছে।

২। বোধন শব্দের অর্থ "বিজ্ঞাপন",—জাগান ইতি ভাষা। নির্নিমেষের নিদ্রা সম্ভব। মৎস্য নির্নিমেষ,—কিন্তু নিদ্রা যায়। দেব-নিদ্রা মানবাদির নিদ্রা হইতে পৃথক্; কারণ, মানবাদির শরীর পার্থিব ও তমঃ-প্রধান। দেব-শরীর তৈজস ও সত্ত্ব-প্রধান। মানবাদির নিদ্রা জড়; দেবনিদ্রা চিৎস্বরূপা; সুতরাং মানবের মত দেবগণ নিদ্রায় আচ্ছন্ন নহেন, উহা তাঁহাদের বিশ্রাম মাত্র। "প্রসুপ্তঞ্চ জনার্দ্দনম্" ইত্যাদি হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, দেবনিদ্রা কল্পিত নহে। শ্রুতি বলেন দক্ষিণায়ন দেবগণের রাত্রি তুল্য। শারদীয়া পূজা দক্ষিণায়নে প্রধানতঃ শত্রুবিনাশ-কামনায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শত্রুবিনাশ দৈহিক শক্তি-সাপেক্ষ। অবতার-তত্ত্বে ইহা পরিস্ফুট। নিদ্রাবসন্ন দেবতার দৈহিক শক্তির উন্মেষের জন্য দেবীর বোধন-ব্যবস্থা। বোধনান্তে "অহং দেবোঽথ নৈবেদ্যম্" ইত্যাদি জ্ঞানে অর্চ্চনা করিলে মানবের পার্থিব দেহের সুপ্ত শক্তিরও বোধন সাধিত হয়। শারদীয়া অন্যান্য পূজা, হয় নিত্য দেব-প্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত, না হয় তান্ত্রিক পূজা—সুতরাং বোধনের ব্যবস্থা নাই।

ভট্টপল্লী। শ্রীকান্তিচন্দ্র কাব্য-স্মৃতিতীর্থ

[৩]

চরকায় কি করিয়া সূতা শক্ত হয়

মাননীয় বিশ্বকর্ম্মা সমীপেষু;—

আমাদের গ্রামে সম্প্রতি ১৫।২০টি চরকা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেহ-কেহ সূক্ষ্ম সূতাও কাটিতে পারেন। কিন্তু চরকা-কাটা সূতা কলের সূতার মত শক্ত হয় না। ঐ সূতা কোনরূপে শক্ত করা যাইতে পারে কিনা, আপনি অথবা "ভারতবর্ষের" পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে কেহ আমাকে জানাইলে অথবা ভারতবর্ষে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

ফরাশগঞ্জ, নোয়াখালী। শ্রীশৈলজাপ্রসন্ন দাস।

[৪]

চিনির কল

৩৯ নং গিরিশ মুখার্জ্জি রোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বকর্ম্মা সমীপেষু,—

মহাশয়, আমি একটী গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার ভাল বিলাতী কল চাই। আপনি দয়া করিয়া পত্রের উত্তর অথবা ভারতবর্ষ কাগজে ছাপাইয়া ইহার অনুসন্ধান বলিতে পারেন। এবং আমি আপনার নিকট জানিতে চাই যে, নদীয়া কিংবা টাকী প্রভৃতি জায়গায় গুড় কিনিয়া চিনি প্রস্তুত করিয়া চালান দিতে পারিলে, লাভ হয় কি না এবং কারবার চলা সম্ভব কি না।

শ্রীজ্ঞানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

[৫]

লবণ

নারিকেল গাছের বেল্লে ও শাখা হইতে লবণ পাওয়া যায়; শাখাতেই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। শাখা জ্বালাইয়া ছাইগুলি জলে ভিজাইয়া, কাপড়ে ছাঁকিয়া, সেই জল একটি পাত্রে ধরিয়া রাখিতে হয়। সেই জল থিতাইলে উপরের জলটুকু অতি সন্তর্পণে মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া, জ্বাল দিয়া মারিলে পাক-পাত্রের চারি দিকে ও তলদেশে লবণ জমিয়া যাইবে।

ক্ষার

কলা গাছের পাতা, কাণ্ড সমস্ত শুকাইয়া পোড়াইয়া ছাইগুলি উপরিউক্ত নিয়মে জলে ভিজাইয়া ছাঁকিয়া সেই জল দ্বারা বস্ত্র সিদ্ধ করিলে অতিশয় পরিষ্কৃত হইবে। শুধু কলাগাছের ক্ষার নহে—যাঁহাদের কাঠের রান্না, তাঁহারা ছাইগুলি ভিজাইয়া দেখিবেন, সেই ছাই-মিশ্রিত জল পিচ্ছিল হয় কি না। যদি জল পিচ্ছিল হয়, তবেই বুঝা যাইবে, উহা ক্ষারের উপযুক্ত। তেঁতুল কাঠ ও জিন্, আম, ইত্যাদির ছাইএ বিস্তর ক্ষার আছে।

শ্রীসুভাষিণী ঘোষজায়া।
কেয়ার অফ শ্রীমৎ বসন্তকুমার ঘোষ, দলিদার উকিল,
পিরোজপুর, বরিশাল।

[৬]

মোজা ও গেঞ্জি

১। বাঙ্গালা দেশে, বর্ত্তমানে কয়টী মোজা এবং গেঞ্জির কল চলিতেছে? কলগুলি যৌথ মূলধনে স্থাপিত কি না?

২। মোজা ও গেঞ্জির হস্ত-চালিত কল ব্যবহারে লাভবান্ হওয়া যায় কি না? এইরূপ কারবারে কত টাকা মূলধন আবশ্যক?

৩। কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় বেঙ্গল হোসিয়ারী নামে একটি লিমিটেড্ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত কোম্পানীর বর্ত্তমান অবস্থা কি এবং তাঁহাদের ঠিকানা কি? কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট W. N. Bose দের পরিচয় কি?

শ্রীভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। শাল্লা গৌরীপুর কাছারী।
পোঃ আজমিরিগঞ্জ, জিলা শ্রীহট্ট।

[৭]

তামাকের গুল

মাননীয় শ্রীযুক্ত বিশ্বকর্ম্মা মহাশয় সমীপে,—

তামাকু খাইয়া যে গুল আমরা ফেলিয়া দি, সেই গুলকে শীতল জলে ধুইয়া শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিয়া, কাপড়ের ছাঁকনিতে ছাঁকিয়া, সামান্য

তৈলে একটুকু কর্পূর মিশাইয়া, কর্পূর চূর্ণ করিয়া তামাকু-গুল-চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিলে, অতি উত্তম দন্ত মঞ্জন তৈয়ারী হয়। খুব সাহস করিয়া বলিতে পারি, এই মাজন ব্যবহারে দাঁতের গোড়া শক্ত হয়, দন্ত-শূল, দাঁতের গোড়া ফোলা আরোগ্য হয়। সহজে দাঁত পরিষ্কার এবং মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। আমি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, অর্থ উপায়ের জন্য ব্যবসায়ের হিসাব করিলে, তামাকু গুল চূর্ণ আধ সের, লাল রঙ্গের পোড়া উনান মাটী চূর্ণ দেড় পুয়া বা ছয় ছটাক, ফুলখড়ি চূর্ণ এক ছটাক, শুঁট চূর্ণ আধ ছটাক এবং সৈন্ধব লবণ চূর্ণ আধ ছটাক সুগন্ধাদির জন্য লবঙ্গ তৈল সহ কর্পূর মিশ্রিত করিয়া সমস্ত চূর্ণের সহিত একত্র মিশাইলে উৎকৃষ্ট সুবাসিত দন্ত মঞ্জন তৈয়ারী হইবে।

২। অসহ্য যাতনাপ্রদ দাঁতের গোড়া ফোলায়, প্রাতে উঠিয়া মুখ না ধুইয়া হুকার জলে কুলি করিয়া তামাকু গুলের মাজনে দন্ত মার্জ্জন করিলে আশু যাতনা নষ্ট হয় এবং রোগও আরোগ্য হয়।

C/o Post Box 18. Rangoon. শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার।

[৮]

সাপের বিষ ও প্রসব-বেদনা নাশের উপায়

শ্রীবিশ্বকর্ম্মা মহাশয় সমীপেষু,—

(১) আমি কয়েকটী লোকের নিকট শুনিয়াছি যে সাপে কামড়াইলে ক্ষত স্থানে কেঁচোর রস (Juice) দিলে এবং রোগীকে ঐ রস বেশী পরিমাণে খাওয়াইলে সাপের বিষের ক্রিয়া (Action) হয় না। আপনার মতে ইহার উপর কতটা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায় ?

(২) প্রসবকালে গর্ভিনীর প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়াও যদি সন্তান প্রসব হইতে বিলম্ব বা কষ্ট হয়, তবে গর্ভিণীর কেশের অগ্রভাগে কাঁটা-নটের শিকড় (root) বাঁধিয়া উহা নাভিদেশে ঝুলাইয়া দিলে শীঘ্রই সন্তান প্রসব হয়। কাঁটা-নটের কি এ ক্ষমতা আছে বলিয়া মনে করেন ?

পোঃ বহিরগাছি, সাধনপাড়া গ্রাম। শ্রীপাঁচুগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়।
জিঃ নদীয়া।

[৯]

তুলার চাষ

ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ প্রশ্ন করিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গের মাটিতে পাটের চাষের পরিবর্ত্তে তুলার চাষ করিলে পাটের মত তুলার কৃষিতেও লাভবান্ হওয়া যায় কি না? "পাটের পরিবর্ত্তে তুলার চাষ" বলিতে কাব্যতীর্থ মহাশয় কি মনে করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রশ্নের ভাষায় সম্যক্ পরিস্ফুট না হইলেও, যদি তিনি মনে করিয়া থাকেন, পাটের চাষ তুলিয়া দিয়া তুলার চাষ করিতে হইবে, তবে তাহা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে, অর্থনীতির দিক হইতেও বিষয়টিকে ভালরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। অবশ্য বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া যাইতেছে যে, যে মাটিতে পাটের চাষ হয়, সেই মাটিতেই তুলার চাষও হইতে পারে। কাব্যতীর্থ মহাশয়ের প্রকৃত মনের ভাব বোধ হয় এই যে, পাটের চাষ কমাইয়া দিয়া আবশ্যক ও সুবিধা মত তুলার চাষ বাড়ান হউক।

ঢাকার বিশ্ববিখ্যাত মসলিন যে সূত্রে নির্ম্মিত হইত, সেই সূত্র প্রস্তুত করিবার তুলা বঙ্গদেশের বাহিরে অন্য কোন স্থান হইতে আসিত না। ঢাকা জেলাতেই মস্‌লিন বয়নোপযোগী "কাপাসের" চাষ হইত। ঢাকা জেলার উত্তরাংশে ঢাকা সদর মহকুমাতে কাপাসিয়া নামক একটি স্থান আছে। পরম্পরাগত প্রবাদ এই যে, এইস্থানেই মসলিন বয়নোপযোগী "কাপাস আবাদ হইত বলিয়া ঐই স্থানের নাম "কাপাসিয়া" হইয়াছে। কাপাসিয়াতে এখনও তুলার চাষ হয়, কিন্তু পাট আসিয়া তুলার অধিকার দখল করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থান যে তুলার চাষের অনুকূল, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে; যদিচ মসলিন বয়নোপযোগী সূক্ষ্মতন্তুবিশিষ্ট তুলার চাষের পদ্ধতি অপ্রতিবিধেয় কারণে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সমতল বঙ্গদেশে তুলার চাষ হইতে পারে কি না, এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া গভর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ হইতে সম্প্রতি যে বুলেটিন (bulletin) বাহির হইয়াছে, তাহার বিবরণ প্রদানেই কাব্যতীর্থ মহাশয়ের প্রশ্নের বিস্তৃত উত্তর দেওয়া হইবে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বঙ্গদেশে আকারানুপাতে নেহাৎ অল্প তুলা উৎপন্ন হয়। ইহাতে মনে হয়, তুলার চাষ বঙ্গদেশে বিশেষ লাভজনক কৃষি নহে। ১৯১৯-২০ সালে বঙ্গদেশে মোট ৬৮,৮৫২একার জমিতে ২৪,৬১২ গাইট তুলা হইয়াছিল। আর এ বৎসর ৭০,১৭২একার ভূমিতে মোট ২০,৮৭০ গাঁইট তুলা জন্মিয়াছে। দুই প্রকারের তুলার চাষ হয়। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের আদিম অধিবাসীরা মান্ধাতার আমলের প্রাচীন পদ্ধতিতে এক প্রকার তুলা উৎপাদন করে। বাজারে ইহার নাম "কুমিল্লা তুলা।" ইহা বৎসরের প্রথম ভাগে উৎপন্ন হয়। এই তুলার তন্তু তেমন উৎকৃষ্ট নহে। অন্য প্রকারের তুলা পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার স্থানে স্থানে উচ্চ ভূমিতে উৎপন্ন হয় এই তুলা "বঙ্গ-সিন্ধু" (Bengal Sind) নামে অভিহিত। ইহা গুণে ভারতজাত অন্যান্য বহু স্থানের তুলার সমকক্ষ।

পুরাতন কাগজপত্রাদি (old records) হইতে দেখা গিয়াছে, যখনই বঙ্গদেশে তন্তু-নির্ম্মিত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই সময়েই তুলার চাষ বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা চলিয়াছে। পরন্তু, গত যুদ্ধের শেষ অবস্থাতেই এই প্রচেষ্টা বিশেষ প্রবল হইয়াছিল। বিগত এক শতাব্দী মধ্যে বঙ্গদেশে তুলার চাষ প্রবর্ত্তনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে; কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইয়াছে। তুলার চাষ প্রবর্ত্তনের চেষ্টাতে অনেক সময় নষ্ট ও বহু অর্থব্যয় হইয়াছে। তালিকা দৃষ্টে বুঝা যায় কেবল ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে নয়, পরন্তু পৃথিবীর যে-যে স্থানে কার্পাসের চাষ হয়, প্রায় সেই সেই স্থান হইতেই বীজ আনাইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল। কিন্তু কৃষকগণ তুলার চাষকে আগ্রহ সহকারে আঁকড়িয়া ধরে নাই; কেন না, ধান্য ও পাটের চাষেই তাহাদের অধিকতর অর্থ উপার্জ্জন হইতেছে।

বঙ্গদেশে তুলার অপ্রচুর চাষের হেতু রূপে উক্ত যুক্তির অবতারণা না করিয়াও, নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এ দেশের অধিকাংশ স্থানের প্রাকৃতিক ও আর্ত্তব অবস্থা তুলার চাষের উপযোগী নহে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান যে সমস্ত স্থানে তুলার আবাদ হয়, সে সকল স্থানে ফসল উৎপাদনের জন্য, এমন কি, শুধু জল-সেচনের উপর নির্ভর করিতে হয়। উদাহরণ-স্বরূপ মিশরের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতের যে সমস্ত স্থানে তুলার আবাদ হয় (যথা, দাক্ষিণাত্য, বেরার, গুজরাত, মধ্য-ভারত ও পঞ্জাব) সে সকল স্থানে বৎসরে ৩৫ ইঞ্চির অধিক বারিপাত হয় না। এই সকল স্থানে পয়ো-নিঃসারণের বেশ সুবন্দোবস্ত আছে। কিন্তু বঙ্গদেশের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে প্রতি বৎসর প্রায় ৮০ ইঞ্চি বারিপাত হয়, এবং বৎসরের অধিকাংশ সময় বেশীর ভাগ ভূমি জলমগ্ন থাকে। সুতরাং বর্ষাকালে তুলার চাষের উদ্যম যে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

এই সকল কারণে মনে হয় বঙ্গদেশের স্থানবিশেষে তুলার চাষের প্রভূত প্রচলন করিতে হইলে, তাহা শীতের ফসল স্বরূপ চাষ করিতে হইবে। ব্যবসায় বা অর্থ-নীতির হিসাবে ইহা লাভজনক হইবে, এমন কথা বলা যায় না। তবে ইহা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। শীতকালে তুলার চাষ করিলে কৃষকেরা তুলার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিতে পারিবে; কেন না, সে সময় তাহারা অত্যাবশ্যক পাট ও ধান লইয়া ব্যস্ত থাকিবে না। প্রাকৃতিক ও আর্ত্তব অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, শীতকালে তুলার চাষ না হইবার বিশেষ কারণ দেখা যায় না। নিম্ন বঙ্গে এত বেশী শীত পড়ে না, যাহাতে তুলার গাছ নষ্ট হইতে পারে। বিশেষতঃ, শীতকালে আকাশ পরিষ্কার থাকে বলিয়া, পোকাতে ফসল নষ্ট হইবার আশঙ্কা কম। শীতকালে যদি উপযুক্ত রূপ বৃষ্টি না হয়, তবে ক্ষেত্রে সামান্য জল-সেচনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। জলসেচন অতিরিক্ত ব্যয় বা কষ্টসাধ্য নহে। কাঁচা কূপ খনন করিলে ১৫।২০ ফিট নিম্নেই জল পাওয়া যায়। অথবা বিল বা পুষ্করিণী হইতেও জল সেচনের ব্যবস্থা হইতে পারে।

হিলি (বগুড়া) শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বি-এল,

[১০]

উত্তর

পেঁয়াজের খোসার রং

শুক্‌না পেঁয়াজের খোসা ঝাঁজরীর মধ্যে রাখিয়া জল ঢালিয়া যে হলুদ রং পাওয়া যায়, আর গরম জলে কিয়ৎক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে যে রং পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে ঔজ্জ্বল্য ও স্থায়িত্ব হিসাবে কোনও পার্থক্য নাই। কিন্তু দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত রং অপেক্ষাকৃত গাঢ় হয়। এই হলুদে রংএর সহিত নীল তুঁতিয়া (copper sulphate) মিশাইলে সবুজ রং ও হীরাকষ (iron sulphate) মিশাইলে সবুজ মিশ্রিত কাল রং (greenish black) পাওয়া যায়। (পেঁয়াজের খোসায় অল্প পরিমাণে Tannic Acid আছে। হীরাকষের লৌহের সহিত মিশিয়া কাল রংএর Taunate of Iron হয়)।

কচু পাতার রং

কচু প্রভৃতি গুল্ম-লতাদির পাতার, (শুধু গুল্ম-লতাদি কেন, প্রায় সকল পাতারই) সবুজ রংটা হচ্ছে (chlorophyll) ক্লোরোফিল। ক্লোরোফিলের রংটা নিতান্ত অস্থায়ী। বায়ুর অম্লজান (oxygen) ও আলোকের সংস্পর্শে ইহার রং বদলাইয়া যায়। প্রথমে হরিদ্রা মিশ্রিত হরিৎবর্ণ ও পরে ফিকে হলুদ বর্ণে পরিবর্ত্তিত হয়। এ রংটা পাকা করার কোনও উপায় অদ্যাপি উদ্ভাবিত হয় নাই। এ রংটা সরবৎ (syrup) ও গন্ধ তৈলাদি রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। গাছের পাতা বা ঘাস হইতে (Ether) ইথর, (Carbon disulphide) কার্ব্বন ডাইসালফাইড, (Alcohol) সুরাসার অথবা (Caustic Potash solution) কষ্টিক পটাসের জল দিয়া এই রংটা বাহির করিতে হয়।

সবুজ সার

পুষ্করিণীজাত সকল প্রকার পানা হইতেই গাছের পুষ্টিকারক সার পাওয়া যায়। ইহার কারণ, ঐ সকল পানাতেই পটাশ (Potassium chloride)এর ভাগ বেশী আছে। পটাশ জিনিসটা সকল গাছেরই পুষ্টিকর খাদ্য। লাউ, কুমড়া, সকল প্রকার শাক সব্জী, আম, কাঁঠাল নারিকেল প্রভৃতি সকল বৃক্ষেই ইহার সার প্রয়োগ করিতে পারা যায় এবং তাহাতে গাছও বেশ সতেজ হয়।

শিরিষ আটা

মাছের আঁইস হইতে শিরিষ আটা (glue) প্রস্তুত হয়। আঁইসগুলি প্রথমে লবণ, দ্রাবক (Hydrochloric acid) মিশ্রিত জলে (এক ভাগ লবণ দ্রাবকের সহিত ১২ ভাগ জল মিশাইয়া সেই জলে) কয়েক ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখিলে, আঁইসের সমস্ত ধাতব পদার্থ (mineral matters) লবণ দ্রাবক খাইয়া ফেলিবে। অতঃপর আঁইসগুলি পরিষ্কার জলে উত্তম রূপে ধুইয়া ফেলিয়া, চূণের জলে ধুইতে হইবে। এই প্রক্রিয়ায় আঁইসস্থ মেদ, মাংস ও তৈলাক্ত পদার্থ চূণের ক্ষারের সহিত মিশিয়া সাবান হইয়া পৃথক হইবে। পুনরায় পরিষ্কার জলে ধুইয়া সামান্য জলে আঁইসগুলি রাখিয়া বাষ্পের সাহায্যে (water bath) গরম করিলে আটা (glue) জলে গুলিয়া যাইবে। এখন ইহাতে সামান্য ফটকিরি (alum) মিশাইয়া উত্তমরূপে নাড়িলে সমস্ত ময়লা গাদ হইয়া ভাসিবে। এই গাদ পৃথক করিয়া আটার জলটা তারের জালতির (100-holes seive) মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লইয়া সেণ্টিগ্রেডের ৬০ ডিগ্রী তাপে শুকাইতে হইবে। যত অল্প তাপে শুকান যাইবে, শিরিষের qualityও তত ভাল হইবে। এজন্য Vacuum Pan ব্যবহার করিতে পারিলে ভাল হয়। একেবারে না শুকাইয়া পাতলা থাকিতে কাঁচের চাদরের উপর (glass plate) পাতলা করিয়া ঢালিয়া দিতে হইবে। ঠাণ্ডা হইলে উহা জমিয়া

যাইবে। ফটো এন্‌গ্রেভিং (Photo engraving) ও কাঠের দ্রব্যাদি জুড়িবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। মাছের কাঁটা হইতেও এই শিরিষ পাওয়া যায়। ইহাকে Fish glue বলে।

কলা গাছের লবণ

কলা গাছে লবণের ভাগ খুব অল্প আছে। পোড়াইয়া ছাই করিয়া সেই ছাই রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নলিখিত জিনিসগুলি পাইয়াছি:—

	১ম	২য়
পটাশ ক্ষার (Potassium Carbonate)	৪৫·৭%	৫৩·২%
পটাশ ক্লোরাইড (Potassium Chloride)	৫·৩%	৫·৯%
পটাশ সাল্‌ফেট (Pottassium Sulphate)	৩·২%	৪·৬%
লবণ (Sodium Chloride)	২·৬%	২·৪%
	৫৬·৮%	৬৬·১%

প্রথমটীতে অদ্রবনীয় অংশ (Insolubic Matters) অধিক ছিল। কারণ সমস্তটা পুড়িয়া ছাই হয় নাই। দ্বিতীয়টী অপেক্ষাকৃত ভাল পুড়িয়াছিল। আর খানিকটা ছাই ভাল করিয়া পোড়াইয়া বিশ্লেষণ করিয়া

পটাশ ক্ষার (Potassium Carbonate)		৬৭৮%
পটাশ সাল্‌ফেট (Potassium Sulphate)		৩·৯%
পটাশ ক্লোরাইড (Potassium Chloride)		৪·৮%
লবণ (Sodium Chloride)		৩·০%
লৌহ, এল্যুমিনিয়ম প্রভৃতি		৪·৭%
অদ্রবনীয় অংশ	Insoluble Matter	১২·৮
বালুকা প্রভৃতি	silica etc.	
জলীয় অংশ	moisture	৩৫
	মোট	১০০·৫

পাইয়াছি। এখন দেখিতেছি যে কলা গাছে লবণের অংশ এত কম যে উহা হইতে লবণ প্রস্তুত করা লাভজনক নহে। কিন্তু ইহাতে পটাশ ক্ষারের ভাগ খুব বেশী আছে। সুতরাং এই ক্ষারটী বাহির করিলে বেশ লাভজনক হইবে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত বিশ্বকর্ম্মা মহাশয় নারিকেল পাতার ছাই হইতে যে প্রকারে পটাশ বাহির করিতে বলিয়াছেন, ঠিক সেই উপায়ে কলা গাছের পাতা (কলা বাসনা) ডাঁটা প্রভৃতি হইতে পটাশ বাহির করা যাইবে। সেই পটাশ পুনরায় (Refine) পরিষ্কার করিলে ভাল Pearl ash হইবে। ১৯১৩ খৃঃ Scientific American পত্রিকায় দেখিয়াছিলাম যে, আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে এক বৎসরে যে কলার কাঁদির ডাঁটা জমিয়াছিল, তাহার ছাই হইতে ৫০০ টণ অর্থাৎ প্রায় ১৩৭০ মণ Pearl Ash প্রস্তুত হইয়াছিল। আমাদের দেশেও কলা গাছের অভাব নাই। কলা কাটিয়া লইয়া গাছটী পচাইয়া নষ্ট না করিয়া, যদি শুকাইয়া পোড়াইয়া ছাই করিয়া, উহা হইতে পটাশ বাহির করা হয়, তবে প্রতি বৎসর কত শত মণ পটাশ আমাদের দেশে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এ বিষয়ে সকল পল্লীবাসীরই চেষ্টা করা উচিত। এ সম্বন্ধে কেহ কিছু জানিতে চাহিলে আমি আনন্দের সহিত জানাইব।

কাপড় পরিষ্কার

গরম জলে কেবল মাত্র তারপীন তেল মিশাইয়া কাপড় কাচিলে কাপড় পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু তেমন ভাল পরিষ্কার হয় না। কিন্তু ঐ তারপীন মিশ্রিত গরম জলে যদি সাবান বা সুরাসার মিশ্রিত পটাশ (alcoholic Potash) মিশাইয়া কাপড় কাচা হয়, তবে বেশ ভাল পরিষ্কার হয়। দুইটী প্রক্রিয়া লিখিয়া দিলাম, ইহার যে কোনটীর সাহায্যে অতি অল্প পরিশ্রমে কাপড় (ফ্লানেল সিল্ক প্রভৃতি সকল প্রকার কাপড়) বেশ পরিষ্কার হইবে।

১ম।—এক বালতী গরম জলে (প্রায় ২ গ্যালন) আধ সের বার সোপ গুলিয়া তাহাতে অর্দ্ধ ছটাক তারপীন তৈল ও দেড় ছটাক এমোনিয়া (Liquor Ammonia Fort) মিশাইতে হইবে। এই জলে কাপড়গুলি ডুবাইয়া পাত্রের মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া রাখিবে (নতুবা এমোনিয়া শীঘ্র উপিয়া যাইবে)। চার ঘণ্টা কাল ভিজাইবার পর কাপড়গুলি পরিষ্কার জলে কাচিলে দুধের ফেনার ন্যায় সাদা হইবে।

২য়। এক বালতী গরম জলে এক পোয়া কাপড় কাচা সাবান গুলিয়া উহাতে অর্দ্ধ ছটাক এমোনিয়া এক কাঁচ্চা সোহাগা (Borax) এক ছটাক তারপীন তেল মিশাইয়া ঐ জলে কাপড়গুলি ২০ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিয়া, পরে পরিষ্কার রূপে কাচিলে অনায়াসেই পরিষ্কার হইবে।

তারপীন, এমোনিয়া, সোহাগা, প্রভৃতি যে কোনটী পৃথক ভাবে সাবানের জলের সহিত মিশাইয়া কাপড় কাচিলেও কাপড় পরিষ্কার হয়। কিন্তু এমোনিয়াটা সবচেয়ে ভাল। তারপীনের আধিক্যে কাপড়ের কোনও ক্ষতি হয় না; কিন্তু গন্ধটা কাপড়ে থেকে যায়।

গাছের পোকা নিবারণ

তামাকে নিকোটিন্ (Nicotine) নামক এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ (Alkaloid) আছে। এ জিনিসটা যদিও পোড়াইলে উপিয়া যায়, তথাপি তামাকের গুলে ইহার কিয়দংশ থাকিয়া যায়। এ ছাড়া গুলে পটাশও থাকে। এই তামাকের গুল একটী বেশ ভাল কাজে লাগান যায়। গুলগুলি বেশ গুঁড়া করিয়া জলে এক দিবস ভিজাইয়া রাখিলে, উহা হইতে হলদে রংয়ের এক নির্য্যাস বাহির হয়। এই নির্য্যাসের সহিত সামান্য পরিমাণে কর্পূর ও সাবানের জল মিশাইয়া, যে সকল গাছে পোকা লাগে, তাহার পাতায় ও ডাঁটায় ছিটাইয়া দিলে, পোকা নষ্ট হইবে। ইহাতে গাছের কোনও ক্ষতি হইবে না। হুঁকার জলও এই প্রকারে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আলুর চাষের জমি ও সার

যে মাটী আল্‌গা ও যাহাতে বালির ভাগ বেশী আছে, (দোআঁশ মাটী?) সেই মাটীই আলুর চাষের পক্ষে প্রশস্ত। এরূপ মাটিতে আলু গাছের শিকড় ইতস্ততঃ প্রসারিত হইতে পারে ও আলুর

বৃদ্ধির পক্ষে বেশ সুবিধাজনক। আলুর চাষের পক্ষে ক্ষারক (Potash) দীপক বা প্রস্ফুরক (Phosphorus) যবক্ষারক (Nitrogenous) সারই প্রশস্ত। কারণ আলুতে এই কয়টী জিনিসেরই আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং আলুর জমিতে নিম্নলিখিত সারের যে কোনটী প্রয়োগ করিলে বেশ ভাল ফসল হইবে।

১।	ক্যালসিয়ম সুপারফস্‌ফেট (Calcium Superphosphate)	১ মণ ১০ সের
	এমোনিয়া সল্‌ফেট (Ammonia Sulphate)	১৪ সের
	কাইনাইট (Kainit)	৩৫ সের
		২॥০ মণ
২।	ক্যালসিয়ম সুপারফসফেট্‌	১ মণ
	কাইনাইট্‌	৩০ সের
	সোডিয়াম নাইট্রেট (বিলাতি সোরা or Chille salt petre)	৩০ সের
		২॥০ মণ
৩।	ক্যালসিয়ম সুপারফস্‌ফেট	১ মণ ১২ সের
	কাইনাইট্‌	১৬ সের
	এমোনিয়া সল্‌ফেট	১৬ সের
	সোডিয়ম নাইট্রেট	১৬ সের
		২॥০ মণ
৪।	সোডিয়ম নাইট্রেট	১৫ সের
	পটাসিয়াম সল্‌ফেট	১০ সের
	ম্যাগ্‌নিসিয়ম ক্লোরাইড (Magnesium Chloride)	৫ সের
	(Bone meal) হাড়ের গুঁড়া	১০ সের
		১ মণ

কিন্তু বেশী পটাশ ব্যবহার করিলে আলুর গাছে এক প্রকার রোগ জন্মে। তাহাতে ফসলের হানি হইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং যদি পটাশের কিয়দংশ হীরাকষ (Iron Sulphate) দ্বারা পূর্ণ করা হয়, তবে উহাতে জমির উৎপাদিকা শক্তিও বাড়ে এবং রোগের বীজ, কীট পতঙ্গাদির বিনাশ সাধন করে। এজন্য নিম্নলিখিত সারটী খুব ভাল।

৫।	কাইনাইট	২০ সের
	সোডিয়াম নাইট্রেট	২০ সের
	হীরাকষ	৮ সের
	ক্যালসিয়ম সুপারফস্‌ফেট	৩২ সের
		২ মণ

উপরিলিখিত সারগুলি প্রতি বিঘায় প্রযোজ্য।

২০শ। ট্যানিক এসিড (Tannic Acid) কালীর একটা প্রধান উপকরণ। চায়ের পাতায় Tannic থাকার জন্যই উহা হইতে কালী প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া হরীতকী হইতে বেশ ভাল কালী প্রস্তুত হয়। আমি বাবলা গাছের ছাল ও আমের কষি (আমের আঁটির মধ্যস্থ শাঁস) হইতে কালী প্রস্তুত করিয়াছি এবং উহা মন্দ হয় নাই। বাবলা গাছের ছাল বা আমের কষি থেঁতো করিয়া (কুটিয়া) সম ওজন জলে এক দিবস ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। পরে ঐ জল ছাঁকিয়া লইয়া পুনরায় উহাতে (ঐ ছিবড়াতে) ঐ পরিমাণ জল দিয়া ভিজাইয়া পর দিবস এ জলও ছাঁকিয়া লইয়া প্রথম জলের সহিত মিশাইতে হইবে। এখন এই নির্য্যাসের সহিত ঐ পরিমাণ (Feric Chloride) ফেরিক ক্লোরাইড দ্রব (১ ভাগ ক্লোরাইডের সহিত হইবে) ১২॥০ ভাল জল মিশাইয়া ফেরিক ক্লোরাইড দ্রব প্রস্তুত করিতে ও উহার দশমাংশ লবণ দ্রাবক (Hyprochloric Acid Sp-gr. 1·16) মিশাইয়া সেণ্টিগ্রেডের ৭৫ হইতে ৮০ ডিগ্রী তাপে ১২ ঘণ্টা কাল গরম করিয়া উহার গরম জল মিশাইয়া (প্রথমে যতটা নির্য্যাস পাওয়া গিয়াছিল তাহার দ্বিগুণ জল দিতে হইবে) পুনরায় সেণ্টিগ্রেডের ৮০ ডিগ্রী তাপে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল গরম করিতে হইবে। এখন ইহা ঠাণ্ডা করিয়া কোনও পাত্রের মধ্যে পুরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। প্রায় ২০।২২ দিন পরে ইহা ছাঁকিয়া লইলে বেশ সুন্দর কাল কালী প্রস্তুত হয়। এখন ইহার সহিত সামান্য পরিমাণে জলে দ্রবণীয় Aniline Blue মিশাইলে উত্তম ব্লু ব্ল্যাক কালী হয়। বাবলার ছাল প্রায় সকল পল্লীগ্রামেই অনায়াসে সংগ্রহ হইতে পারে। আর আমের কষি ত ফেলিয়া দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে উহা কাজে লাগাইলে মন্দ হয় না।

আমের কষি ও বাবলা ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া কাথ বাহির করিলেও উহা হইতে কালী প্রস্তুত করা যাইবে।

শ্রীআশুতোষ দত্ত
কেমিষ্ট ইনচার্জ্জ, ও ম্যানেজার
দি পঞ্জাব কেমিকাল ওয়ার্কস
সাহাদারা, লাহোর।

[১১]

তুলা-পেঁজা কল

মাননীয় শ্রীবিশ্বকর্ম্মা মহাশয় সমীপেষু—

১। চরকার সুতা কাটার জন্য তুলা পেঁজার কোন যন্ত্র আছে কি না? থাকিলে, কোথায় উহা পাওয়া যায় এবং মূল্য কত?

শ্রীবিনয়কুমার সেন,
বাসন্দা.পোঃ, বরিশাল।

[১২]

ম্যালেরিয়া ও প্লেগ

১। দেখিতে পাই, যে দেশে ম্যালেরিয়ার অধিক প্রাদুর্ভাব, তথায় প্লেগ হইতে পারে না; ইহার বৈজ্ঞানিক কোন কারণ আছে কি না, ও থাকিলে তাহা কি?

২। শত-শত দৃষ্টান্তে দেখা যায়, সর্প শিশুদিগকে দংশন করে না—বরং তাহাদের লইয়া নানাপ্রকার খেলা করে—ইহাতে কোন সত্য নিহিত আছে কি ?

৩। অনেকবার প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, কোন সাপ কোন গর্ভবতী নারীর চোখে-চোখে পড়িলে, আর চলাচল করিতে পারে না—একস্থানে স্থিরভাবেই থাকে—যতক্ষণ না গর্ভবতী নারী সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। আর কেহ এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন কি না—ও দেখিয়া থাকিলে, ইহারই বা বিশেষত্ব কি ?

শ্রীসরলকুমার দাস

ভাপটিয়াহি, বি, এন, ডবলিউ, রেলওয়ে

ভাগলপুর, বিহার।

[১৩]

স্তার সংবাদ চাই

১। ভারতবর্ষে কতগুলি স্তার কল ভারতীয় লোকদ্বারা পরিচালিত।

২। ঐ কল সমূহে কত স্তা হয় এবং ঐ সমস্ত স্তা ভারতে থাকিলে ভারতের বস্ত্র-সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে কি না।

৩। ঐ সমস্ত কলে, কত নম্বর হইতে কত নম্বর পর্য্যন্ত স্তা হইয়া থাকে।

৪। ৪০ নম্বরের উপরের দেশী স্তা পাওয়া যায় কি না। পাওয়া গেলে কোথা হইতে আনিতে হইবে।

৫। তোয়ালে, বিছানার চাদর ও সিট প্রভৃতি তৈরী করিবার উপযুক্ত twisted স্তা দেশী পাওয়া যায় কি না। পাওয়া গেলে কোথা হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে।

সাহাজাদপুর। নিঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার

[১৪]

লেবুগাছের পোকা নিবারণ

১। কোনও প্রকার পোকার অত্যাচারে গাছে লেবু রাখা যায় না। ইহার কি কোন প্রতিকার নাই। যদি থাকে, তবে কি ?

বিনীত—

শ্রীঅমূল্যকুমার দত্ত

রাজনগর, শ্রীহট্ট।

[১৫]

চাষ-বাস সংক্রান্ত

শ্রীবিশ্বকর্ম্মা মহাশয় সমীপেষু—

১। জমি সেচনের জন্ত কোনরূপ উন্নত প্রণালীর কল পাওয়া যায় কি না ? পাওয়া গেলে তাহার মূল্য কত ? ও ঠিকানা কি ?

২। গরু বা ঘোড়ার জন্ত খড় কাটিবার কল কোথায় পাওয়া যায় ও তাহার মূল্য কত ?

৭১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীরামানুজাচার্য্য গোস্বামী

[১৬]

শ্রীবিশ্বকর্ম্মা মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আগামী ভাদ্রের সংখ্যায় নিম্নলিখিত প্রশ্নদ্বয়ের অনুগ্রহপূর্ব্বক উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন।

১। যে ভারতীয় তুলা হইতে চরকার দ্বারা সহজে উৎকৃষ্ট স্তা তৈয়ার হয়, তাহার নাম, বীজ পাইবার ঠিকানা ও আবাদের প্রণালী।

২। ঐরূপ তুলা পশ্চিম-বঙ্গের ক্ষেত্রে আবাদের অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে আবাদোপযোগী অথচ উৎকৃষ্ট তুলার নাম বীজ পাইবার ঠিকানা এবং চাষের উপায়। দুই একটী বিভিন্ন জাতীয় উৎকৃষ্ট তুলার আলোচনা থাকিলে বাধিত হইব।

পোঃ অঃ কাশিগোড়ী

(Kasigori) মেদিনীপুর।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

[১৭]

পাকা রং

স্তা পাকা রং করিবার জন্ত বাঙ্গালায় যে একখানি বই সম্প্রতি বাহির হইয়াছে সেই বইখানির কথা অনেকেই লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। বইখানির নাম—"পাকা রং প্রণালী" ডাক্তার টি, এন, চক্রবর্ত্তী এম-পি-এস প্রণীত ; মূল্য দুই আনা। প্রাপ্তিস্থান হোমিও রিসার্চ লেবরেটরী, ব্রাহ্মণ গাঁ, ঢাকা।

আর ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক সূর্য্যনারায়ণ ঘোষ প্রণীত "রামধনু" পুস্তকেও পাকা রং করিবার অনেক প্রণালী বিশদভাবে বিবৃত আছে। তাহার মূল্য দুই টাকা।

[১৮]

প্রশ্নের উত্তর

শ্রাবণের "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত সত্যজ্যোতিঃ গুপ্ত মহাশয় "বিশ্বকর্ম্মা"র প্রতি কয়েকটী প্রশ্ন করেছেন, তার কোন কোন প্রশ্নের উত্তরে আমাদের কিছু বলবার আছে :—

ঝাঁজরীতে গরম জল ঢেলে শুকনো পেঁয়াজের খোসা থেকে রং বের করার চেয়ে গরম জলে খোসা ভিজিয়ে আমরা অপেক্ষাকৃত গাঢ় রং পেয়েছি ; বোধ হয় গরম জলে ভিজিয়ে রাখার প্রক্রিয়াটাই ভাল। কারণ ঝাঁজরীতে জল ঢেলে বের করলে খোসাতে খানিকটা রং থেকে যায়, ভিজিয়ে রাখলে তা হয় না। আর লাল, নীল প্রভৃতি রং সম্বন্ধে তিনি যে প্রশ্ন করেছেন সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনেকদূর এগিয়ে

গেছে। সে সব সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ তিনি অনেক বই থেকে পড়তে পারেন, সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে মোটের ওপর বলতে গেলে লাল, নীল, হলদে প্রভৃতি রং এর অধিকাংশই তৈরী হয়ে থাকে গাছপালা থেকে। আবার মেজেন্টা, সফেদা, হরিতাল প্রভৃতি খনিজ রংও ঢের আছে। আমার দেশে হলুদ, কুঁড়, গাঁদাফুলের পাঁপড়ি থেকে বেশ হলদে রং পাওয়া যায়। কাঁটাল গাছের ভেতরের সার থেকে সিদ্ধ করে অথবা রসে বেশ হলদে রং পাওয়া যায়। শেফালী ফুলের ডাঁটা শুকিয়ে ঠিক পেঁয়াজের খোসার রং বের করবার প্রক্রিয়াতে খুব সুন্দর স্থায়ী হলদে রং পাওয়া যায়। মেহেদী পাতা থেকে সুন্দর জরদ রং অনেকেই তৈরী করে থাকে। নীলের ত কথাই নেই। নীল চাষের ব্যাপার বোধ হয় কারো অজানা নেই। পূর্ব্ববঙ্গের ছিট্‌কী ও বড় তোয়ালের মত একরকমের গাছের ফল খুব শুকিয়ে গরম জল দিয়ে একরকমের নীল রং পাওয়া যেতে পারে। জবা, ঝুমকো ফুল শুকিয়েও পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে এক রকমের ফিকে বেগুনী রং পাওয়া যেতে পারে। Brazil wood বা বকমকাঠ, সুন্দরীকাঠ, চন্দনকাঠ থেকে গরম জল দিয়ে লাল রং তৈরী হয়ে থাকে। গালা পোকা (Lac-worms) থেকেও সুন্দর লাল রং পাওয়া যায়। হরীতকী, মাজুফল, আমলকী, বহেড়া, ভেলা ইত্যাদির কালো রং বোধ হয় সকলেই দেখেছেন। করঞ্জা, লালশাক (চুলো) তেলাকুচা থেকেও একরকম লাল নির্য্যাস বের করে নেওয়া যেতে পারে।

দুর্ব্বাঘাস, কচুপাতা প্রভৃতি সকল রকমের পাতা থেকেই সবুজ রং পাওয়া যেতে পারে। ওই রংটা পাতার chlorophill ছাড়া আর কিছুই নয়। পাতা শুকিয়ে, তাতে গরম জল দিয়ে, সেই রঙ্গীন জলটাকে ফের শুকিয়ে নিলে, খুব অল্প পরিমাণে সবুজ রং তৈরী হতে পারে। আর কাঁচা কচুপাতা কাগজে মেরে দিলে যে সুন্দর সবুজ রংটা হয়, সেটাকে ওই কাগজের ওপরই পাকা করতে হলে, খুব পরিষ্কার গঁদ তুলি দিয়ে এক পোঁচ মাখিয়ে দিলেই রংটা আর নষ্ট হবে না।

পূর্ব্ববঙ্গের কোন-কোন অঞ্চলে সুপারীর ছোবড়া সিদ্ধ করে, খুব পরিষ্কার হলে, তাতে সরু দড়ি করে, শিকা এবং নানারকমের বিনুনী করতে দেখেছি। আস্ত সুপারীর খোলটাকে সিদ্ধ করে ওপরের কালো ছালটা তুলে, উল্টে দিলে বেশ সুন্দর ফুলের মত দেখতে হয়। তাতে রং করে অনেক রকমের খেলানা তৈরী হয়। পূর্ব্ববঙ্গে অনেক অঞ্চলেই সুপারীর ছোবড়া ঘুঁটের মত করে আগুন জ্বালায়। আমার বিশ্বাস, সুপারীর ছোবড়া পরিষ্কার করে ঢেঁকিতে বা উদুখলে কুটে ভাল কাগজ তৈরী হতে পারে।

পানা লাউ, কুমড়ো গাছের পক্ষে বেশ সার। বোধ হয় ওর ক্ষার জাতীয় পদার্থ টাই গাছের পক্ষে পুষ্টিকর। কিন্তু প্রায়ই দেখেছি, পানা পচে একেবারে মাটীর মত না হয়ে গেলে, তাতে লাউ কুমড়ো গাছ লাল হয়ে মরে যায়। তবে কলাগাছ যে কোন অবস্থাতেই সাররূপে ব্যবহার হয়। পানা-পচা মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে জমী তৈরী করলে, তাতে যে কোন রকম শাকসব্জীই ভাল জন্মায়।

অধিকাংশ ঔষধ তৈরী হয়ে থাকে গাছ গাছড়া থেকে;—গুল্ম বিশেষ যে বিষঘ্ন হবে, তাতে কোন আশ্চর্য্যের কারণ নেই। সত্যজ্যোতিঃ বাবুর ওই গুল্মগুলির Botanical name অন্ততঃ দেশীয় নামটা জানানো উচিত ছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে "ভারতবর্ষে" Aristolochia Indica বা ঈশার মূল নামে গুল্মবিশেষের সাপের বিষ নষ্ট করবার অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় আলোচিত হয়েছিল। আমি কোন কোন Agriculture College থেকে জানতে পেরেছি যে, ওই জাতের গাছ নিম্ন বঙ্গের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ও গাছ, বা তার ফলাফল কিছুই প্রত্যক্ষ করতে পারি নি।

পুস্তক-পরিচয়

গহনার বাক্স—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য এক টাকা বার আনা। সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী যখন এই 'বাক্সে'র গহনাগুলি প্রস্তুত করিতেছিলেন, তখন হইতেই আমরা ইহার কারুকার্য্যের প্রশংসা আরম্ভ করিয়াছিলাম; তাহার পর, এক একখানি গহনা যখন সাময়িক পত্রের মারফৎ বাজারে বাহির হইতে লাগিল, তখন আর দশজনের সঙ্গে আমরাও গহনাগুলির তারিফ্ করিয়াছি। এখন শিল্পী প্রভাতবাবু গহনাগুলিকে 'বাক্সে' সাজাইয়া বাহির করিলেন, কাজেই এখন আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণের দরবারে এই বাক্স হাজির হইল;—তাঁহারাই এখন যাচাই করিয়া দেখুন। আমরা এই মাত্র পরিচয় নিঃসন্দেহে দিতে পারি যে, প্রভাতবাবুর মত শিল্পী এ গহনায় সীমাস্ত একটুও খাদ বা পান মিশান নাই,—একেবারে খাঁটি সোনা। এই ঘোর স্বদেশীর দিনে অতিরিক্ত নন-কো-অপারেশন্ ওয়ালাও চোক বুজিয়া এই স্বদেশী 'গহনার বাক্স' এই মহাপূজার সময় সহধর্ম্মিণী, দুহিতা ও ভগিনীদিগের হস্তে প্রদান করিতে পারিবেন। প্রভাতবাবুর 'গহনার বাক্সে' কি কি গহনা আছে, তাহার ফর্দ্দ দেওয়া নিতান্তই অনাবশ্যক, বাক্সে গিল্‌টী কিছুই নাই।

লেডী ডাক্তার—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম-এ প্রণীত; মূল্য আট আনা। এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ প্রকাশিত আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার পঞ্চষষ্টি গ্রন্থ। গ্রন্থকার কালীপ্রসন্নবাবু বঙ্গ-সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি; এই 'লেডী ডাক্তারে' তাঁহার সে প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এখানি ছোট গল্প সংগ্রহ। ইহাতে লেডী ডাক্তার, বি-এ বউ, অকর্ম্মণ্য, সত্য-পালন, মায়ের কোলে ও বিজ্ঞান বিভ্রত, এই চারটী ছোট গল্প আছে; সবগুলিই সরস পরিহাসে উজ্জ্বল, সবগুলিই সুপাঠ্য; তাহার মধ্যেও আমাদের কিন্তু বিজ্ঞানবিভ্রতই খুব ভাল লাগিয়াছে। পাঠক পাঠিকাগণ আট আনা (অবশ্য ডাক খরচা বাদে) ব্যয় করিয়া আমাদের পরিচয়ের সত্যতা পরীক্ষা করিতে বিস্মৃত হইবেন না।

পাখীর কথা।—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, পি-এইচ-ডি প্রণীত; মূল্য আট আনা। আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার ষট্‌ষষ্টিতম গ্রন্থ এই 'পাখীর কথা'। লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন, তিনি বৈজ্ঞানিক নহেন; ভালই হইয়াছে। অবৈজ্ঞানিক সুরেন্দ্রনাথ যে ভাবে পাখীর কথা বলিয়াছেন, তাহা সাধারণ পাঠক যে বেশ বুঝিতে পারিবেন, তাহা আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতেছি; বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিলে সাধারণ পাঠক ভয়ে এই পাখীদিগের সান্নিধ্য পরিহার করিতেন। সুরেন্দ্রনাথ, বই পড়িয়া পাখীর কথা বলেন নাই, নিজে দেখিয়া ও পরীক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন; সেই জন্য বইখানি সুন্দর হইয়াছে।

চতুর্ব্বেদ।—শ্রীভিক্ষু সুদর্শন প্রণীত; মূল্য আট আনা। এই বইখানিতে যে 'দুই একটা কথা' আছে, আমরাই তাহা লিখিয়াছি; তাহাতেই বইখানির পরিচয় দিয়াছি! 'শ্রীভিক্ষু সুদর্শন ছদ্মনাম,... বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত লেখক এই ছদ্মনাম যে কেন গ্রহণ করিলেন, তিনিই বলিতে পারেন; আমরা বাধ্য হইয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয় দিবার প্রলোভন সংবরণ করিলাম। বইখানির সম্বন্ধে 'দুই একটা কথা'র যাহা বলিয়াছি, এখনও তাহাই বলিতেছি;—'গল্প কয়টির একটা বিশেষত্ব আছে; এগুলির সুর অন্য রকমের—উচ্চ স্তরের; উদ্দেশ্য চিত্ত-বিনোদন নহে—তাহা হইতেও মহত্তর।' ইহাই পুস্তকের পরিচয়। ইহা ব্যতীত আরও একটা কথা আছে। সুপ্রসিদ্ধ প্রকাশক মহাশয়গণ এমন ভাল কাগজে ছাপিয়া, দুইখানি ত্রিবর্ণ ও চারিখানি একবর্ণের চিত্র দিয়া যে কেমন করিয়া তাঁহাদের আট আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার পাঠকপাঠিকাগণকে এ বই দিলেন, তাহা ত অব্যবসায়ী আমরা বুঝিয়াই উঠিতে পারিতেছি না;—দুইখানি ত্রিবর্ণ চিত্রেই যে আট আনা খরচ পড়ে; তাহার পর ৪ খানি একবর্ণ চিত্র; ছয়খানি চিত্রই ভাল আর্ট পেপারে ছাপা। পূজার বাজারে আট আনা মূল্যে এমন বই দিয়া প্রকাশক মহাশয়গণ তথা গ্রন্থকার নিশ্চয়ই পুণ্য সঞ্চয় করিবেন।

সেবিকা—শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ প্রণীত, মূল্য এক টাকা। 'সেবিকা' ছোট গল্পের বই। লেখক মহাশয় 'ভারতবর্ষে'র পাঠকপাঠিকাগণের বিশেষ পরিচিত; তাঁহার কয়েকটি ছোট গল্প ও কবিতা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছে। সেই গল্পগুলি এবং 'সবুজপত্রে' যে কয়েকটী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সংগ্রহ করিয়া এই 'সেবিকা' ছাপাইয়াছেন। একবার ছোট গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে এখনকার অনেক গল্প ছোট বটে এবং গল্পও বটে, কিন্তু ছোট-গল্প নহে। শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্রের 'সেবিকা' সম্বন্ধে আমরা অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতে পারি, এগুলি ছোটও বটে, গল্পও বটে—এবং ছোট-গল্পও বটে। যথার্থ শিল্পীর মত গ্রন্থকার এই ছোট গল্প কয়টী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; যেমন ঝরঝরে, কবিত্বপূর্ণ, তেমনই প্রাণস্পর্শী; পড়িলেই বলিতে হইবে "হাঁ, ছোট গল্প বটে!"

তাজ।—শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত; মূল্য দেড় টাকা। কবি প্রমথনাথের বীণা অনেক দিন নীরব ছিল; তিনি মধ্যে মধ্যে নিতান্ত জোর-জুলুমের দায়ে পড়িয়া সাময়িক পত্রে দুই একটা কবিতা লিখিতেন; আমরাই 'ভারতবর্ষে'র জন্য 'তাজ' নামক সুন্দর কবিতা আদায় করিয়াছিলাম; সুতরাং এখন এই যে 'তাজ' প্রকাশিত হইল, তাহার জন্য কবিবর যে প্রশংসা লাভ করিবেন, আমরাও তাহার অংশ দাবী করিতে পারি। অনেকগুলি কবিতাই আমাদের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল; পাঠকগণও একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছিলেন। এখন সেইগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এখন আবার পড়িয়া মনে হইতেছে, এগুলি যেন নূতন! এই পূজার বাজারে কবিবরের 'তাজ' যথেষ্ট আদর লাভ করিবে;—এমন রঙ্গিন এণ্টিক কাগজ, এমন রেশমী কাপড়ে বাঁধাই, এমন সুন্দর ছাপা, তার পর এমন মনোরম কবিতাবলি,—এই ত পূজার চূড়ান্ত উপহার!

পুণ্ডরীক।—শ্রীশ্রীশচন্দ্র বসু বি-এ, বার এট ল প্রণীত; মূল্য এক টাকা। এখানি নাটক; ফরাসীভাষায় লিখিত; ছায়া ফরাসী হইলেও কায়া একেবারে দিশী। আমরা এ প্রকার উপকরণ সংগ্রহের পক্ষপাতী। এই নাটকখানির অভিনয়োপযোগিতা, ভাষা, কথোপকথন, চরিত্র-চিত্রণ, অঙ্ক-গর্ভাঙ্ক-গঠন, ঘটনা সংযোজন প্রভৃতি প্রশংসনীয়। নাট্যকার ইংরাজী ভাষায় 'বুদ্ধ' ও 'নলদময়ন্তী' নামক নাটক লিখিয়া যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহার এই প্রথম লেখা বাঙ্গালা নাটকখানিতে সে প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হয় নাই।

পরলোকগত অমৃতলাল রায়

[অধ্যাপক শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত এম-এ]

১৮৮৬ খৃঃ অব্দে যখন অমৃতলাল রায় আমেরিকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস ভিক্টোরীয় যুগের মাহাত্ম্যে আপনাকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছিল। অশনে, বসনে, ভূষণে, বিদ্যালয়ে, ধর্ম্মবেদীতে, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব উৎকট ভাবে দীপ্যমান হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র প্রাচ্য খৃষ্টের বোধনে পৌরোহিত্য করিবার প্রয়াস পাইয়া, সম্প্রতি বঙ্গ-সমাজের মধ্যগগন হইতে তিরোহিত। ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র প্রমুখ সাহিত্য-রথকে সম্মুখে রাখিয়া "বঙ্গবাসী" উচ্ছৃঙ্খল, পথভ্রষ্ট হিন্দু-সমাজকে পুরাণ-কাহিনী শুনাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন;

শশধর তর্কচূড়ামণি ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনকে সভামধ্যে দাঁড় করাইয়া, জনসাধারণকে হিন্দুধর্ম্ম-মাহাত্ম্য শুনাইবার আয়োজন করিতেছিলেন। শিক্ষিতাভিমানী হিন্দুসমাজ কিন্তু বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছিল। ইংরাজ-বাসুকী বিরাট্ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নিজের মস্তকোপরি ধারণ করিয়া, সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন। মাঝে-মাঝে ঈষৎ চাঞ্চল্যে, স্পন্দনে ভূকম্প হইত; কিন্তু তাহাতে বিপুল বিশ্বসংসারের কাহারও কিছু আসিয়া-যাইত কি? এক দিকে অপচয়, আর এক দিকে উপচীয়মান নবীন সম্পদ্; হয় ত এক দিক্ ধ্বসিয়া গেল,—আর এক দিক্ জাগিয়া উঠিল। বাসুকী মাথা নাড়িলেন; মিসর হইতে আরাবি পাশা বন্দী হইয়া সিংহলে আসিলেন; ব্রিটিশ সেনাপতি গর্ডন খার্টুমে নিহত হইলে, ক্রুদ্ধ বাসুকী ফণা তুলিলেন;—আজও তাহা অবনমিত হয় নাই। বুভুক্ষু রুষ গরুড় পাঞ্জদে পাইলেন; আফগান আমীর আব্দর রহমন ভারত গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; বাসুকীর কিন্তু হৃৎকম্প উপস্থিত;—সে কম্পন আমরা ভারতবাসী শিরায়-শিরায় অনুভব করিয়াছিলাম। আজ সে রুষ নাই; আফ্গানিস্থানের আমীরের অবস্থা ফিরিয়াছে; কিন্তু ব্রিটিশ বাসুকী "অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া।" আর এক কম্পনে ব্রহ্মরাজ্য ধ্বসিয়া গেল। ভারতবাসী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জয়গান করিল। লর্ড্ ডফ্রিণ্ দু'একজন দেশীয় মোড়ল ও বিদেশী ভারত-বন্ধুকে, কংগ্রেসের মত একটা কোনও অনুষ্ঠানকে অবলম্বন করিয়া, রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনার উপকারিতা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। আশা ছিল, কংগ্রেস্ ব্রিটিশ শান্তির স্তবগান করিয়া, ভারতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য পাকা করিয়া রাখিবে। আর দেশীয় সংবাদপত্রগুলিও এ বিষয়ে সাহায্য করিবে।

এমন সময়ে অমৃতলাল আমেরিকা হইতে দেশে ফিরিলেন। যে গৌরিভা গ্রামে তাঁহার জন্মস্থান, সেই গ্রাম ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সিভিলিয়ান বিহারীলাল গুপ্ত, কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্মভূমি। সেজেই অমৃতলালের বিলাত-প্রবাস যে খুব একটা নূতন ব্যাপার হইল, তাহা নহে। কিন্তু তিনি ব্রাহ্ম হইলেন না; Reformed Hindu ও ন'ন্; কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণ্য সমাজ মধ্যে হিন্দু থাকিতে ইচ্ছা করিলেন। কয়েক মাস পরে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত নন্দকুমার রায় তখন জীবিত; ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার রচিত বাঙ্গালা অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের অভিনয়ে বঙ্গ-নাট্যসাহিত্যে নবযুগের উন্মেষ হইয়াছিল। অমৃতলালকে লইয়া বৈদ্যসমাজে একটা ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হইল। এক দল তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজে তুলিলেন। কালক্রমে অপর দল লয় পাইল। কিন্তু কাহারও বিরুদ্ধে কোনও ভাব মনের মধ্যে পোষণ না করিয়া, স্বদেশ-সেবায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করিলেন।

পরলোকগত অমৃতলাল রায়

তিনি দেখিলেন যে, একখানি নূতন সাময়িক পত্রিকার আয়োজন করা আবশ্যক, এবং সে কাগজ ইংরাজিতে সম্পাদিত হওয়া ভাল। কেন ভাল, তাহা আজকালকার পাঠকগণ হয় ত বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না। একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। সমগ্র শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজের উপর ইংরাজি ভাষার ও সাহিত্যের প্রভাব খুব বেশী ছিল। বেশ গমগমে ইংরাজি ভাষায় লিখিতে ও বক্তৃতা করিতে পারিলেই দেশের ও দশের কাছে বাহাদুরি লওয়া যাইত ত বটেই; তা' ছাড়া, ইংরাজিতে ভাল করিয়া গুছাইয়া না বলিলে, কেহ বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া কোনও কথাই শুনিতে চাহিত না। অবশ্যই, তথাকথিত অশিক্ষিত জনসাধারণের

মধ্যে "বঙ্গবাসী"র প্রচার ও প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল;—সমাজের শ্রেণীবিশেষের মধ্যে "সঞ্জীবনী" ও "সময়" বেশ কাজ করিতেছিল। কিন্তু ইস্কুল-কলেজের যুবক-সম্প্রদায় তাহাদের কথা যে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত শুনিত, এমন বলা যায় না। ছেলেরা দো-টানার মধ্যে পড়িয়া বিপন্ন হইয়াছিল। বাঙ্গালীর সম্পাদিত ইংরাজি কাগজ অনেক ছিল; কিন্তু কেহই ভাল করিয়া ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার মর্ম্মকথা, অথবা সমাজের ভিতরকার আসল জোর কোথায়, তাহা সহৃদয়তার সহিত বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন না। অথচ, ছেলেরা যে পল্লীভবন ছাড়িয়া সহরে লেখা-পড়া করিতে আসিল, সেখানে তাহারা আধুনিক ব্রাহ্মণ্য হিন্দু-সমাজের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াছিল। সহরে আসিয়া একেবারে পলিটিক্সএর আবর্ত্তে পড়িয়া গেল। "পত্রিকা" ও "মিরর" নির্ভীক ভাবে গভর্মেণ্টের সমালোচনা করিত; মাঝে মাঝে একটু আধটু বৈষ্ণব তত্ত্বকথা, অথবা থিয়সফির খবর স্থান পাইত। ঐ কাগজ দুটীকে ইংরাজ কিছু ভয় করিত। লর্ড ডফ্‌রিণ "মিরর" সম্পাদককে লাট ভবনে আরো অনেক নিমন্ত্রিত পত্রিকা-সম্পাদকের মাঝখানে তিরস্কার করিলেন; নরেন্দ্রনাথ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—I did not come here to be insulted by your Lordship;—লাট সাহেব তৎক্ষণাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। দেশের লোক বাহবা দিল। সেক্রেটরি যখন লর্ড ডফ্‌রিণের কাছে "রেইস্ এণ্ড্ রায়ৎ"-এর সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখার্জ্জির পরিচয় দিলেন, লাট সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"আপনি রেইস্ এণ্ড্ রায়তের সম্পাদক? আমি কখনও ভাবিতে পারি নাই যে অমন চমৎকার ইংরাজি একজন বাঙ্গালী লিখিতে পারে।" কলিকাতার ছাত্র-সমাজ শম্ভুচন্দ্রকে বাহবা দিল। কিন্তু শম্ভুচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের কোনও ধার ধারিতেন না। বিলাতের Punch পত্রিকা যখন বঙ্কিমচন্দ্রকে Bunkum বলিয়া বিদ্রূপ করিল, শম্ভুচন্দ্র বঙ্কিম বাবুর লেখার এক বর্ণও না পড়িয়া "পঞ্চ"কে গালি দিলেন; পরে সাবিত্রী লাইব্রেরী হইতে একখানি "চন্দ্রশেখর" আনাইয়া, ডফ্‌টন কলেজের একজন বাঙ্গালী অধ্যাপককে পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। খানিক পরে, বঙ্কিমবাবুর mannerism লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন—"আঁ, বঙ্কিম এই রকম লেখে! এমন জানলে আমি Punchএর বিরুদ্ধে লিখ্‌তুম না।' "ইণ্ডিয়ান্ নেশন" সম্পাদক ব্যারিষ্টার ও অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ ঘোষকে তিরস্কার করিয়া শম্ভুচন্দ্র যখন তীব্র কশাঘাত করিতেন, বাঙ্গালী পাঠক বাহবা দিয়া বলিত—"হাঁ, গালি দিতে হয়, এই রকম ভাষায় দাও; কি চোস্ত ইংরাজী দেখেছ!" সুরেন্দ্রনাথের সাপ্তাহিক "বেঙ্গলী" ছেলেরা পড়িত তাঁহার বক্তৃতাগুলির জন্য;—অন্য কোনও কাগজে সেগুলি পূরা মুদ্রিত হইত না। বাঙ্গালীর কাছে কেশবচন্দ্র, লালমোহন, সুরেন্দ্রনাথ ইংরাজীতে বক্তৃতা করিয়া যশস্বী হইলেন। অমৃতলাল রায় দেখিলেন যে, দেশের ও সমাজের কথা ভাল করিয়া দেশের লোককে, বিশেষতঃ, যুবক Hopeful দিগকে শুনাইতে হইলে, ইংরাজীতে কাগজ চালাইতে হইবে। তিনি কাগজের নাম রাখিলেন Hope।

ইংরাজী ভাষায় লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ ছিল। মার্কিণ দেশে দরিদ্র যুবক অমৃতলাল যখন হোটেলের ঘর ঝাঁট দিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া অবসরমত কিছু কিছু লিখিতেন, তখন তাঁহাকে নিউইয়র্কের একখানা বড় কাগজের সম্পাদক একদিন বলিলেন—"ইংরাজ কি রকম ভারতবর্ষ শাসন করিতেছে, সে সম্বন্ধে তুমি একটা প্রবন্ধ লিখে আন।" অমৃতলাল প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইলে, তিনি পড়িয়া বলিলেন—"উহুঁ, হয় নি; তুমি যেন অনেকটা সাবধান হয়ে লিখেছ; সত্য কথা লিখ্‌তে ভয় পেয়ো না। এটি ফিরিয়ে নিয়ে যাও; আবার লিখে আন।" সেবার তিনি যাহা লিখিয়া দিলেন, তাহাতে সুখী হইয়া কাগজওয়ালারা তাঁহাকে কয়েক শত ডলার পারিশ্রমিক দিয়াছিলেন। তিনি ভবিষ্যতে কখনও সত্য কথা লিখিতে ভয় পান নাই।

অন্যান্য কাজের ন্যায় "হোপ" ও রাষ্ট্রনীতি ও কাল-ধর্ম্ম সমস্যার আলোচনা করিত। কিন্তু প্রতি সপ্তাহে দেড় পৃষ্ঠা Society notes থাকিত। তাহার সহকারী সম্পাদকদ্বয়ের মধ্যে প্রবোধপ্রকাশ সেন-গুপ্ত দিন-কতক কলেজে অধ্যাপনা করিয়া শেষ পর্যন্ত "হোপ" কাগজের সেবা করিয়াই মারা গেলেন। প্রবোধপ্রকাশের পিতা ক্ষেত্রমোহন "দৈনিক ও সমাচার-চন্দ্রিকা"র সম্পাদক ছিলেন। ক্ষেত্রমোহনের মত পাকা সম্পাদক বাঙ্গালীর মধ্যে কেহ ছিল না। "হোপ"-এর আর এক জন সহকারী সম্পাদক প্রেমানন্দ ভারতীমহাশয় শেষে মার্কিণ দেশে

গৈরিক পরিহিত সাধু-সন্ন্যাসী হইয়া বহু শিষ্যের মাঝখানে দেহত্যাগ করিয়াছেন; যে নবীন লেখক তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া Society notes লিখিত, সেই কেবল "হোপ"-এর স্মৃতিটুকু শ্রদ্ধার সহিত অন্তরে পোষণ করিয়া জীবিত আছে। ছেলে মহলে, সাধারণতঃ বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে কাগজের প্রসার বৃদ্ধি পাইল। কাগজের সুর কখনও বদলায় নাই। Conservative বলিতে হয় বলুন, কিন্তু reactionary মোটেই ছিল না। কোনও সমাজের প্রতি কিছুমাত্র বিদ্বেষ প্রকাশ পাইত না। চারিদিকে সমাজ-সংস্কারের ধুয়া লইয়া হৈ-চৈ হইত; "হোপ"—'the all-sweeping besom of societarian reform' এর বিরুদ্ধে চার্লস্ ল্যাম্বের ধরণে আপত্তি জানাইলেন গম্‌গমে ইংরাজি ভাষায়, আবার "নবাভারতে" ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি বিষাদময় চিত্র বাহির হইল;—প্রবন্ধের নাম—"আশাশিশু—নিরাশামন্দিরে"; "হোপ"-এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল;—Esperanza, in the cave of Despair। ভারতী মহাশয় বলিলেন,—'এ কি? ব্রাহ্ম কাগজের অনুবাদ করিয়া লীডার লিখিল কে?' সম্পাদক অমৃতলাল হাসিয়া বলিলেন—'বেশ করেছে, ভালই করেছে।' তখনকার পলিটিক্স কেবল হাওয়ার উপরে চলিতেছিল। অনেকে বিশ্বাস করিতেন যে, ইংলণ্ডের লিবারল্ দল ভারতবর্ষের উন্নতি বিধান করিবেন; অন্য কেহও করিবেন না। অমৃতলাল শেষ পর্য্যন্ত কোনও বিশেষ দলের উপর নির্ভর করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বলিতেন, ইংরাজ নেশনকে বুঝাইতে পার,—ভাল; কাহারও নিকট হইতে কিছু প্রত্যাশা করিও না। বড় বড় ব্যাপার লইয়া তিনি দেশের লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, যেখানে ইংরাজের স্বার্থ রহিয়াছে, সেখানে সকল মোড়লেরই এক সুর। লর্ড জর্জ্জ হামিণ্টন, মিঃ ব্রড্রিক, স্যর মাইকেল হিক্‌স্‌বীচ,—সকলেরই মুখে একই কথা। আর বড়-বড় মোড়লদের মুখে ভারতবর্ষের নাম পর্য্যন্ত শুনা যাইত না। তাই কংগ্রেস যখন বছরে বছরে "আবেদন আর নিবেদনের থালা" মাথায় করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইত, অমৃতলালের ঠিক তাহা ভাল লাগিত না। ভিক্টোরীয় যুগের শেষ ভাগে ইংলণ্ডের সব বড় বড় কাগজের একটা স্বাধীন স্বতন্ত্র সংযত সুর ছিল। এ দেশের কাগজগুলাও মোটের উপর বেশ সংযত ছিল। লর্ড ডফ্‌রিণ হয় ত ভাবিয়াছিলেন যতটা সম্ভব পত্রিকা-সম্পাদকগণকে গভর্মেণ্টের বন্ধু করিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু তাঁহার মেজাজ অন্য রকমের ছিল; তাই তিনি এ দেশের লোকের উপর গালি বর্ষণ করিয়া বিদায় হইলেন। যদি তিনি সফলকাম হইতেন তাহা হইলে আজকালকার লয়েড্ জর্জ্জকে তাঁহার অনুকরণকারী বলিতে পারিতাম; কিন্তু তাহা হইল না। লয়েড্ জর্জ্জ যে কৌশলে কাগজ ওয়ালাদের হাত করিয়া নিজে 'সর্ব্বে সর্ব্বা' হইলেন, সেটা সে-যুগে সম্ভবপর ছিল না। কে জানিত যে, একদিন মিঃ হার্মস্‌ওয়ার্থ হইবেন লর্ড নর্থ্‌ক্লিফ্, ভাইকাউণ্ট্! তাঁহার এক সহোদর হইবেন লর্ড রদারমিয়ার, ভাইকাউণ্ট্! আর এক সহোদর স্যর লেষ্টার হার্মস্‌ওয়ার্থ, ব্যারনেট্! টাইম্‌স ও ডেলি মেলের ম্যানেজারদ্বয়কে তিনি নাইট করিয়া দিলেন। ডেলি এক্সপ্রেসের লর্ড বিভারব্রুককে তিনি Peer করিয়া দিলেন। নিউজ অভ্ দি ওয়ার্লড্ পত্রিকার মিঃ রিডেল হইলেন লর্ড রিডেল। ভারতবর্ষের ইংরাজ শাসকগণ প্রথম প্রথম দেশীয় সংবাদপত্রগুলাকে হেয় ও অপদার্থ জ্ঞান করিলেন; পরে আইনের সাহায্যে তাহাদিগকে জব্দ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন। তাহাদের সাহায্য কতটা আবশ্যক তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিলেন না। তাই অমৃতলাল বলিতেন, গভর্মেণ্টের প্রতি তাকাইয়া থাকিও না; আত্মনির্ভর হও। গণতন্ত্র নিউ ইয়র্কের Triumphant Democracy একদিন তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল। কিন্তু কখনও তিনি ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল হইতে কক্ষচ্যুত হইয়া নিরুদ্দেশ ব্যোমপথে ঘুরিয়া বেড়ান নাই। তাঁহার ইচ্ছা হইল, পাশ্চাত্য জগৎকে হিন্দু-সভ্যতার দার্শনিক তত্ত্ব বুঝাইয়া দিতে হইবে; 'হিন্দু ম্যাগাজিন' নাম দিয়া একখানি মাসিক পত্র বাহির করিলেন। কয়েক খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়া উহা বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু ডাক্তার বেন্ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য মনীষী পত্রিকা পাঠ করিয়া অমৃতলালের সহিত পত্রব্যবহার আরম্ভ করিয়া দিলেন।

তা'র পরে একদিন "হোপ" কাগজ বন্ধ হইয়া গেল; কাগজের আয় মন্দ ছিল না, অথচ ঋণের দায়ে সব চাপা পড়িয়া গেল। আয়ের চেয়ে ব্যয় তাঁ'র বেশী হইত, কারণ তিনি কোনও কিছু হিসাব না করিয়া অকাতরে অর্থদান করিতেন। তাঁহার বন্ধ বান্ধবেরা তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন; কিন্তু কোনও ফল হইত না। এমন অসময়ে এক একজন প্রার্থী উপস্থিত হইত যে তাঁহাকে বাড়ীর মধ্য হইতে যাহার কাছে টাকা-পয়সা যা' কিছু আছে সংগ্রহ করিয়া আগন্তুককে বিদায় করিতে হইত। সন্ধ্যার পর একেবারে রিক্তহস্ত হইয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেন; এমন সময়ে একটি দরিদ্র কলেজের ছাত্র আসিয়া তাঁহাকে জানাইল যে পরদিন য়ুনিভার্সিটীর ফী জমা না দিতে পারিলে তাহার পরীক্ষা দেওয়া হইবে না। তিনি বলিলেন, "তাই ত হে, কি করা যায় বল দেখি? আচ্ছা, কাল যা' মণি অর্ডার আস্‌বে, তা' থেকে আগে তোমাকে দিয়ে তবে অন্য কাজ।" যথাসময়ে সে টাকা লইয়া চলিয়া গেল। এ দিকে তাঁর নিজের সংসার কিসে চলে, তা'র ঠিক নাই।

ভগ্ন-স্বাস্থ্য অমৃতলাল বাঙ্গালার বাহিরে চলিয়া গেলেন। বহুদিন "ট্রিবিউন্" পত্রের ও দিন-কতক "পাঞ্জাবী"র সম্পাদক হইয়া লাহোরে কালযাপন করিলেন। গত শ্রাবণ মাসে প্রবাসেই তাঁহার দেহত্যাগ হইল।

শোক-সংবাদ

৺রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়

উত্তরপাড়ার জমিদার বলিয়াই পরিচয় দিই, কারণ এই প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাধারণের নিকট আত্ম-প্রকাশ না করিয়াই অমরধামে চলিয়া গেলেন; কিন্তু যাঁহারা তাঁহার পরিচয় লাভের সৌভাগ্যবান্ হইয়াছিলেন, তাঁহারা একবাক্যে বলিবেন যে, বাঙ্গালীর মধ্যে অমন নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি অতি অল্পই ছিলেন। রাসবিহারীবাবু নীরবে জ্ঞান সাধনা করিয়াই চলিয়া গেলেন; তাঁহার গভীর জ্ঞান, অগাধ পাণ্ডিত্যের ফল কেহই লাভ করিতে পারিলেন না; এত বিনয়ী, এমন পরোপকারী, এরূপ নিরহঙ্কার, এবং এমন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহাত্মার পরলোক গমনে আমরা শোকসন্তপ্ত হইয়াছি; আমরা একজন মানুষের মত মানুষ, একজন সহৃদয় বন্ধু হারাইয়াছি।

৺রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়

৺উপেন্দ্রনাথ সেন

কলুটোলার কবিরাজ পরিবারের উজ্জ্বল রত্ন, কর্ম্মবীর, সাধুচরিত্র, হৃদয়বান্ উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। উপেন্দ্রবাবু আজ এক বৎসর হইল উদরী রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন; মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি কাশীধামে গমন করিয়াছিলেন; সেইখানেই বাবা বিশ্বনাথ তাঁহার কৃতী পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইয়াছেন। 'বেঙ্গলী' পত্র যখন সাপ্তাহিক হইতে দৈনিকে পরিবর্ত্তিত হয়, তখন উপেন্দ্রনাথের আশ্রয় লাভ করিয়াই তাহা পুষ্ট হইয়াছিল; উপেন্দ্রনাথ 'বেঙ্গলী' ও 'হিতবাদী' পরিচালনে অর্থ, সামর্থ্য ব্যয়ে কোন দিন কৃপণতা করেন নাই। তাহার পর স্বদেশী আমলে তিনি যে কত ভাবে, প্রকাশ্যে ও গোপনে দেশের উপকার

৺প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী

৺উপেন্দ্রনাথ সেন

করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না, বঙ্গলক্ষ্মী কলের জন্য তিনি বলিতে গেলে জীবনপাত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পুত্রগণ ও আত্মীয় বান্ধবদিগের গভীর শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

৺প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী

এই সেদিন—এখনও একবৎসর পূর্ণ হয় নাই—সাহিত্য-রথী, অক্লান্তকর্ম্মী সুধী দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় চলিয়া গেলেন, আর আজই তাঁহার একমাত্র পুত্র—উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র—প্রভাতকুসুম অকালে, ৪২ বৎসর বয়সে শুকাইয়া গেলেন। আমরা এই নিদারুণ সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়াছি। প্রভাতকুসুম যে প্রভাতকুসুমের ন্যায়ই সৌগন্ধে চারিদিক্ আমোদিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কি হাইকোর্টের ব্যারিষ্টারীতে, কি দেশের সেবায়, কি পিতার আদর্শ অনুসরণ করিয়া সাহিত্য-সেবায়, প্রভাতকুসুম যে নিজের অতুলনীয় প্রতিভা বিকাশ করিতেছিলেন। কিন্তু আর কিছুই হইল না,—জগৎজননী তাঁহাকে ডাকিয়া লইলেন; বিধবা সহধর্ম্মিণী, শিশু-পুত্রকন্যা ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবকে কাঁদাইয়া প্রভাতকুসুম পিতৃ-সন্নিধানে চলিয়া গেলেন।

৺চন্দ্রশেখর কর

'অনাথ-বালকে'র লেখক চন্দ্রশেখর কর মহাশয় আর ইহজগতে নাই। যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত পরিচিত, তাঁহারাই চন্দ্রশেখরের সরল, অনাড়ম্বর ও মর্ম্মস্পর্শী লেখার কথা জানেন। চন্দ্রশেখরবাবু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন; জ্যেষ্ঠপুত্রের অকাল-বিয়োগে বড়ই মর্ম্মবেদনা পাইয়া তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাহার পর সাহিত্য সেবা ও ধর্ম্মচর্চ্চায় জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু তাঁহার সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল না; একমাত্র পুত্রকে অনাথ করিয়া 'অনাথ বালকে'র লেখক অনাথনাথের চরণতলে চলিয়া গেলেন।

সাহিত্য-সংবাদ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রণীত 'গাছ পালা' নামক উদ্ভিদতত্ত্ব-বিষয়ক বর্ণচিত্রযুক্ত নূতন পুস্তক আশ্বিনের প্রথমেই প্রকাশিত হইবে।

৷৷• সংস্করণের ৬৭ নং গ্রন্থ শ্রীভিক্ষু সুদর্শন প্রণীত সচিত্র 'চতুর্ব্বেদ' প্রকাশিত হইল।

কবিবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত নূতন কাব্য 'তাজ' প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৷৷•

শ্রীযুক্ত কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস 'দেওয়ানা গ্রাম' প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৸৹

শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত বৌরাণী প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৲

শ্রীমতী কিরণলেখা রায় প্রণীত নূতন পাকপ্রণালী "বরেন্দ্ররন্ধন প্রকাশিত হইল, মূল্য ২৲

শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী প্রণীত নূতন কাব্য 'শান্তিলতা' প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৲

শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত নূতন উপন্যাস 'সন্তান' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী প্রণীত 'রহমান খাঁর দুর্গোৎসব" নূতন প্রকাশিত হইল। দাম দেড় টাকা। শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী প্রণীত আর একখানি নূতন উপন্যাস "মানসী" প্রকাশিত হইল। দাম আট আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আগামী ১২ই আশ্বিন কার্ত্তিক-সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হইবে।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

'ঐ বুঝি বাঁশী বাজে'

শিল্পী [illegible]

Emerald Ptg. Works

Blocks by, BHARATVARSHA HALFTONE WORKS.

কার্ত্তিক, ১৩২৮

প্রথম খণ্ড] নবম বর্ষ [পঞ্চম সংখ্যা

বিশ্বরূপ

[মাননীয় মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত সার বিজয়চন্দ্ মহ্‌তাব্ বাহাদুর,

কে-সি-এস-আই, কে-সি-আই-ই, আই ও-এম]

ও রূপ ধরিলে হৃদে,

ঘুচে যাবে সব মল।

উথলি উঠিবে প্রেম,

শুদ্ধ পূত নিরমল ॥

শঙ্কর ভালেতে সাজে,

যোগী আজ্ঞাপুরে রাজে,

পূর্ণ নাদে সদা বাজে,

বিন্দুরূপে ঢল ঢল ॥

মাতৃজাতির সাধনা

[শ্রীসত্যবালা দেবী]

মায়ের দুখানি ছবি আমাদের আছে। স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে, মাতৃজাতিকে দুই আদর্শের একটাকে অবলম্বন কর্ত্তে হবে—দুটা ভাবের একটা ভাব ধর্ত্তে হবে। এক-একটা ভাব এক একখানি ধ্যান। পুরাণকার সেই ধ্যান ধরে তার মূর্ত্তি কুঁদেচেন। সে মূর্ত্তিকে প্রাণময়ী কর্ত্তে তার গাথা রচনা করেচেন। আমাদের অতি পরিচিত করে, আমাদের প্রতিদিনের সুখ দুঃখ, আবেগ-আকাঙ্ক্ষা কিছুই দূরে না রেখে,—আমাদেরই অভ্যস্ত পথটা দিয়ে নিয়ে এসে, সে গাথার উপাখ্যান ঠিক আমাদের জীবনের সুরে সুর মিলিয়ে, তালে তাল দিয়েই, তাঁরা রচনা করেছেন। ধ্যানের দিক দিয়ে আমাদের সঙ্গে মেলে না—প্রাণের দিক দিয়ে মিলে যায়। আমাদের চেয়ে অনেক উঁচু হলেও প্রাণী হিসাবে আমরাও তার চেয়ে নীচু নই।—তাই ত সে মূর্ত্তি আমাদের এত প্রাণে-প্রাণে বসে গেছে,—তাই ত সে আমাদের আদর্শ। সেই ধ্যানের মা,—গাথা, কাহিনী, আদর্শের মা, প্রতিদিনের পূজায়, প্রতি মাসের পর্ব্বে, বর্ষে বর্ষে, যুগান্ত ধরে অবতীর্ণা হয়ে আসচেন। কল্পনা অনুভূতিকে জাগিয়েছে—অনুভূতি রসোদ্রেক করেচে—মন ভাবে মগ্ন হয়ে গেছে। সেই মা জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। আজও যে শারদীয়ার ঝলমল শস্য, শুভ্র-মেঘ স্তূপ, উচ্ছ্বসিত নদীর দুকূল এই বর্ষে-বর্ষে উৎসব-নৃত্যে যেন বেঁচে ওঠে,—সে না এই মায়েরই স্পর্শ! জাতি ধ্যানের মাকে ঘটে, প্রতিমায় আবাহন করে, প্রাণ দিয়ে আসচে।—কেন আসচে?—তাঁর কাছ থেকে,—সে যেমনটা চায়, তেমনটারই পরিপূর্ণ জীবনরূপী মায়ের কাছ থেকে,—সে জীবন মেগে নেবে বলে। যেমন হতে চায় সে—অথচ আপনার পারিপার্শ্বিকের চাপে কুঁকড়ে এখনও হতে পারে নি, তেমনটা হয়ে উঠবে বলে। মা যে প্রসূতি,—মাকেই ত চাইবে! মাকেই জাতি চেয়েচে। এই মায়ের আবাহন ভাব-পরম্পরার ভেতর দিয়ে চলে আসচে। দুখানি ছবি সুচিত্রিত হয়ে উঠেচে। বহু যুগ ধরে হয়ে উঠেচে। এখন যেন জীবিতা, জাগ্রতা মা। একই মা—দুই অবস্থায়। দুটী ধ্যান। দুই অবস্থার ভিতর একই মা।

চিনেছ কি, কোন্ মায়ের কথা বলচি? বলচি, আমার মায়ের কথা—সতী মা, গৌরী মা। কে সতী—সেই, যাঁর নামেরই প্রতিধ্বনি লয়ে, সতী গৌরবে এখনও সীমন্তিনীর সুন্দর ললাট উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে,—সেই—

দক্ষস্য কন্যা ভবপূর্ব্বপত্নী
সতী সতী যোগবিসৃষ্টদেহা *

—সেই মা, যাঁর দশমহাবিদ্যারূপিণী দশ শক্তির ছায়াপাতে মরণজয়ী শ্মশানচারী রুদ্র ভয়ে নেত্র মুদিত করেছিলেন। যাঁর মনস্তাপে দক্ষের ত্রিলোক সমাহৃত যজ্ঞ ধ্বংস-বিধ্বংস হয়ে গেল,—সেই কটাক্ষ-নির্দ্দেশে বিপ্লব-বিধায়িনী—শিব-রাণী। সেই সতী। আর গৌরী মা? কোন্ মা? উন্মত্ত প্রমথনাথকে—সে ভাঙ্গড় ভোলাকে—যিনি গৃহবাসী, কৈলাসের পতি করেছিলেন—সেই—

অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ
ক্রীতস্তপোভিরিতি বাদিনি চন্দ্রমৌলৌ। +

চেনবার কিছুই নেই। অতি-পরিচিত,—জানে না কে আছে? মায়ের কথা সবাই শুনেচে। এই মায়েরই কথা আমাদের সুখ দুঃখের মত করে—আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে—এতদিন হৃদয় গঠন করে এসেচে। তাই ত মাতৃজাতি হৃদয়ের সম্পদে অতুলনীয়া। আজ যদি মাতৃজাতিকে জাগতে হয়, তবে এই মায়ের ভাবে জেগে উঠতে হবে। এই মায়েরই চেতনা আপনার চেতনার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে, চেতনাকে গড়ে তুলতে হবে। এই মায়েরই বল আপনার বল বলে ধরে নিয়ে, শক্তি-সাধনাকে জীবন ধারণের চেয়ে বড় বলে বুঝতে হবে। মায়ে যা আছে, তা যখন অকপটে গ্রহণ করেছ—তারে যখন বড় বলে বুঝেছ—তখন ত আর

---

* অনুবাদ। দক্ষতনয়া সতী মহাদেবের পরম পতিব্রতা পত্নী। (পিতৃকৃত অপমান জন্য রোষে) যিনি যোগবলে তনুত্যাগ করেন।

+ অনুবাদ। হে অবনতাঙ্গি অদ্যাবধি আমি তোমার তপস্যা দ্বারা পরিক্রীত দাস হইলাম। চন্দ্রচূড় দ্বারা এই বলিয়া অভিহিত।

তোমাতে যা আছে, তারে বড় কর্ত্তে পার্ব্বে না। কার সম্ভ্রম বেশী—মায়ের, না তোমার ? তখন সাধনা বড় হবে ;—লজ্জা বড় হবে না, মান বড় হবে না, ভয় বড় হবে না। তোমার রমণী-সুলভ দুর্ব্বলতা—সেও বড় হবে না।

লজ্জা, মান, ভয়—এ সমস্ত কথা আসচে কেন? এত দিন মায়ের পূজা হয়ে এসেচে,—মেয়েরা যা করে এসেচে, সে মাতৃ-পূজা। যদি আজ সাধনা কর্ত্তে হয়—মাতৃজাতির সম্মুখে হয় ত অনেক বাধা বিঘ্ন আসতে পারে,—সাধন-মার্গে না কি এসে থাকে। সেই জন্যই এ কথা বলে রাখলাম। এই মা পরিচিতা। বাঙ্গালীর ঘরের সকল মেয়েই অশ্রু-সিক্ত চক্ষে, আশ্বিনে গৃহদ্বার-সমাগত ভিখারীর মুখে আগমনীর গান শোনে। দরিদ্রের ঘরণী ধনী পিতৃ-গৃহের অনাদরে বারেক বা সেই বহুযুগের অভিমানিনী দাক্ষায়ণীর কথা ভাবে। গৃহস্থালীর কাজে-কর্ম্মে, বৃহৎ সংসারের সেবায়, অতিরিক্ত শ্রমে শ্রান্ত হয়ে, অনেক গৃহিণীই এক-একবার অন্নপূর্ণার স্নিগ্ধোজ্জ্বল, ঢলঢল মুখ-খানি কল্পনা কর্ব্বার চেষ্টা করে। আর এটুকু অস্বাভাবিক নহে। সত্যই সহসা তাদের মধ্যে খানিকটা উত্তাপ আসে,—জীবনের কার্য্যকরী বাষ্প-শক্তির স্তিমিত ভাব একটু যেন কেটে যায়। কিন্তু এই পর্য্যন্ত। এর বেশী তারা পারে না। জানে না,—কখনও শেখেও নি। এ যে তাদেরই বহু দূর হতে প্রতিফলিত একটুখানি আলো—এ যে তার আপনারই আত্মসূর্য্য হতে আসচে, এ পর্য্যন্ত।—আর এগোতে পারে না। জাতি হিসাবেই এখনও সচেতন হয়ে ওঠে নি। অথচ তারা পারে ;—কিন্তু কি পারে—কেই বা বুঝবার মত—কেই বা বোঝাবার মত। মাতৃজাতি মা ঐ পর্য্যন্ত।

"মা" ত সামান্য নয়। আর সকল রহস্য জাতি যে আবিষ্কার করে নি, এমনও ত নয়। তবে মেয়েদের দেয় কি? মাতৃ-আত্মার সূর্য্যজ্যোতিঃতে মনের আঁধার কাটিয়ে অনেক সাধকই পরমার্থ পেয়েচেন। জাতির ভাণ্ডারে শক্তি-সাধনার অমূল্য রত্ন অনেক সাধকেই জমা দিয়েচেন। শক্তি কি? নরাকারে শক্তির স্বরূপ কোনরূপ সবই আবিষ্কৃত। স্ব-কে স্ব-ভাবে স্ব-আধারে জাগাবার চেষ্টা নাই। শক্তিতত্ত্ব এত দূর পর্য্যন্ত জেনেও, বাঙ্গালী তাই শক্তিহীন। না জেনেও নিসর্গের কৃপায় অনেক অজ্ঞান জাতি এই জ্ঞানীদের চেয়েও উঁচু হয়ে রয়েচে। বাঙ্গালী সাধনা জেনেও সাধন-সম্পন্ন নয়। তারা না জেনেও, সাধন-সম্পন্ন। উদাহরণ দিতে হলে ম্লেচ্ছের নাম কর্ত্তেও কুণ্ঠিত নই।

জ্ঞানের দিক দিয়ে যারে বলি ওঁ,—ভাবের দিকে সেই ত মা। নরে জ্ঞান সাধন। আপনার কর্কশত্ব ব্যায়াম-বীর্য্যের ভিতর দিয়ে তারে আনন্দের কোঠায় পৌছতে হয়। তার জীবনটা বাহিরে প্রকাশ দেয় কর্ম্মে। সাধনা জ্ঞান সাধন। এই জ্ঞানই তার আনন্দে পর্য্যবসিত হবে। নারীতে ভাব সাধন। সে আনন্দের কোঠায় পৌছোবে আপনার বিক্রবত্ব, তনুত্ব, মৃদুত্বের ভিতর দিয়ে। জীবনটাও বাহিরে প্রকাশ দেয় শক্তিতে। নারীর সাধনায় ভাবই তার আনন্দে পর্য্য-বসিত হবে। তাই জানার দিক দিয়ে চরমে উঠে, আমরা উচ্চারণ করি ওঁ। পাওয়ার দিক দিয়ে চরমে উঠে বলি মা। দুয়ের মধ্যেই আছে দুটো সমাপ্তি। রহস্যের যেন দুই পূর্ণচ্ছেদ। বিশ্ব-রহস্যের সব দিকটা তখনই পরিষ্কার হয়ে যায়, যখন এটা—এই শৃঙ্খলাটা বেশ স্পষ্ট হয়ে গেছে। সেইখান থেকেই সাধকে দেখেচেন—পুরুষে কচ্চে, জানচে ; আর মেয়েরা পাচ্চে, হচ্চে। একে অন্যকে করায়, জানায়,—আর পাওয়ায়, হওয়ায়। পুরুষ যেমন জানচে, তেমনি কচ্চে ; নারী যেমন পাচ্চে, তেমনি হচ্চে।

সুতরাং ওঁ-এর দিকে পুরুষের একটা স্বাভাবিক ধারা আছে। মা-এর দিকেও নারীর একটা স্বাভাবিক ধারা আছে। যে সব সাধক মাতৃ-সাধনা বা শক্তি-সাধনা করে গেছেন, তাঁরা যে কেবল নারীকে ইষ্ট-দেবী করেচেন, তা নয়,—নারীর প্রাণ, নারীর হৃদয়টাও তাঁদের নিতে হয়েচে। প্রাকৃত জীবনে নর-নারীর প্রভেদের তুচ্ছতা দেখে, এ কথা যতই তাঁরা গোপন করুন,—ধাপ্পা কখনও প্রকৃত বলে চলে যাবার নয়।—এ গোপনতা রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, অথবা হ্লাদিনী শক্তির সাধক বৈষ্ণব মহাপুরুষদিগের জীবনে অনেকবারই চক্ষের সামনে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে গেছে,—সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়েচে। শক্তি-সাধনায় সিদ্ধ মহাপুরুষগণ জীবনে যা দেখিয়ে গেছেন, মেয়েদের প্রত্যেকের জীবনেই তা সুপ্ত হয়ে আছে। ঢেকে রেখেছে আধারের অশুদ্ধতা। এই শুদ্ধি-বিধানের জন্যই সাধনা-তপস্যার প্রয়োজন। মেয়েরা তার পথ-নির্দ্দেশ পায় নি, পায় না।—এখনও সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এ লেন-দেনের

ব্যক্তি ত খুঁজে পাচ্ছি নি। মেয়েরা পেয়েছে শুদ্ধি; কিন্তু সে শুদ্ধির খুবই প্রারম্ভ পদ্ধতি। তাতে সাধনারই উপযুক্ত করে তোলে। সাধনাই শুদ্ধির পথ।

মেয়েরা নিজেদের সাধনার পথে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত, স্ত্রী-চরিত্রের স্বাস্থ্য কিছুতেই সমাজে ফুটে উঠবে না। সমাজ সংস্কার হিসাবে তাদের উন্নতির জন্য আমরা বিগত একশত বৎসর কাল অনেক কিছুই করে আসচি; তবু তাদের নৈতিক অবস্থা দিনে-দিনে বরং হীনই হয়ে পড়্চে। তাদের পর্দ্দায় ঘিরেও বলচি তারা জন্তু; আবার পর্দ্দা ভেঙ্গে বার করে দিয়েও মানুষ করে তুলতে পারচি না। ভাগ্য সম্বন্ধে একটা বন্দোবস্ত কর্ত্তে—বাল্য-বিবাহ, যৌবন বিবাহ, বিধবা-বিবাহ—অনেকেরই ব্যবস্থা কচ্চি; কিন্তু নিষ্পত্তি কিছুই হয়ে উঠচে না। হয় না যে—হবে কেমন করে? বাজে উৎসাহের অপব্যবহার না করে, সমস্ত সমাজ তাদের আপন সাধনায় প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বার পন্থার অনুসন্ধান করুন—সখের women's problem যদি তাঁরা সত্যই solve কর্ত্তে চান।

এখন মেয়েদের এই শিক্ষাই দিতে হবে—শূন্য হৃদয়-মন নিয়ে, লক্ষ্যহীন ভাবে জীবনের দিন না কাটিয়ে, তারা আপনাদের ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। ঐ যে দুটী ভাব—ঐ যে মায়ের দুটী ধ্যান—যা বহুযুগ ধরে, বহু ভাব-পরম্পরার মধ্য দিয়ে জাতিকে জীবন্ত করে তুলেচে, সেই ভাব, সেই ধ্যানকে ধরে জাতি জীবন্ত হয়ে উঠুক। অভিব্যক্তি যেখানে এসে সহসা যেন থমকে গেছে, সেখান হতে আবার গতি-পন্থা অবলম্বন করুক,—পথটুকু শেষ হোক।

মায়ের দুই ধ্যান, দুই মূর্ত্তি—দুই অবস্থার ভিতর একই মা।

প্রথম সতী: সতীই আদিম অবস্থা, সতীই—মূল ভাব। তাই নারীত্বের সবখানিই সতীত্ব। সতীত্ব-বিচ্ছিন্ন নারীত্ব আমরা কল্পনাই কর্ত্তে পারি না। সংসারে কি দেখি? দুর্দ্দম পুরুষের সমস্ত অত্যাচার থেকে—পঙ্কিল পৃথিবীর সমস্ত কদর্য্যতা, বীভৎসতা থেকে—ক্ষীণা, দুর্ব্বলা, মৃদু-স্বভাবা নারী যেন মন্ত্রবলে রক্ষা পেয়ে, আপনার সৌন্দর্য্যে আপনি দিনে-দিনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠচে। তার বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী বলবান ব্যবস্থাগুলো প্রচণ্ড গতিতে ছুটাছুটি কচ্চে—তাদেরই মাঝখানে সে;—তারে রক্ষা করে কার সাধ্য? বিনাশের মধ্যেও বিনা চেষ্টায় আত্মরক্ষা? এই অসম্ভব প্রতিদিনই সম্ভব হচ্চে। কচ্চে কে?—সতীত্ব। এত তেজ তার অভ্যন্তরে। ভাব তবে—কত সে তেজ? কিই বা স্বরূপ তার? এই জন্যই সতীত্ব-বিচ্ছিন্ন নারীত্ব আমরা কল্পনা কর্ত্তে পারি না। ক্ষুধিত জগৎ এত বড় হত্যাশালা—নারী এখানে এত উপাদেয় ভক্ষ্য যে, সতীত্বের মহান্ বল চক্ষের পলক-পাতের অবসরে যদি এতটুকু বিশ্রাম লয়,—নারী তখনই বিমর্দ্দিতা হয়ে যাবে।

এই সতীত্বের আমরা মূর্ত্তি গড়েছি—সতী। কি উপাখ্যান রচনা করেচি?

প্রবল প্রতাপান্বিত ঐশ্বর্য্য-রত্নাকর রাজা দক্ষ,—তিনি পিতা। তাঁর জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুখময় ঘর ছেড়ে, প্রসূতির মত মায়ের কোল ছেড়ে, দেবতাদের অঙ্কলক্ষ্মী পঞ্চদশ সহোদরা ছেড়ে, সকলের আদরিণী সর্ব্বকনিষ্ঠা সতী মহাদেবের ঘরে ঘর কর্ত্তে এলেন। বর গৃহহীন—ভিক্ষান্ন সম্বল। অনুচর—ভূত প্রেত। আচার ববম্ বম গালের বাদ্য—তাথৈঃ থিয়া নৃত্য। তাও আবার উলঙ্গ হয়ে—বাঘছাল পরে—গায়ে ভস্ম মেখে। সতীর মনে বিকার নাই—তিনি সুখে ঘর কচ্চেন। তাও ভাগ্যে সইল না। একদিন তাঁর পিত্রালয়ে যজ্ঞ হল। মহাদেব নিমন্ত্রণে গেলেন। এমনি অসভ্য যে, অত বড় রাজা শ্বশুর,—যাকে দেখে সভাস্থ সকলে উঠে এসে প্রণাম কর্ল্লে—তাঁর সম্মান রেখে গাত্রোত্থানও কর্লেন না। দক্ষ তিরস্কার করে, শাসন কর্ত্তে গেলেন;—বাবাজীর আবার সঙ্গে এক অনুচর ছিল—সে ব্যাটা মুখোমুখি কলহ আরম্ভ কর্লে। বাবাজির উত্তর নাই—আবার মুচ্‌কে হাসি। এ তো প্রকারান্তরে চাকর দিয়ে অপমান করান। শ্বশুর মহাশয় রাগ সামলাতে পার্লেন না—দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিলেন। শ্বশুর-জামাইয়ে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল। একে অত-বড় ধনীর কন্যা হয়ে, ভিখারী, কদাচারী উন্মত্তের গৃহিণীপনা—তার উপর পিত্রালয়ের সকল সম্পর্ক লোপ। শ্বশুর-ঘর এমন অবস্থায় যিনি করেচেন, তিনি বুঝচেন ব্যাপারটা কি? বহুদিন কেটে গেল—পিতা সতী বলে একবার উদ্দেশ নিলেন না। দক্ষের ভয়ে ভদ্র-সমাজের কেউ মহাদেবের সঙ্গে আলাপ করে না। তার ক্ষতি কি,—সে ত নিজেই ভাঙ্গড়, ভোলা—ভদ্রয়ানার ধার দিয়েও চলে না। ঠেকো হয়ে আর ঠেকরে কোথা। দক্ষের আদেশে শিবের যজ্ঞভাগ বন্ধ হয়ে গেছ্‌ল।

লোকের কেমন ধারণা—শিবহীন যজ্ঞ হতে নাই। অর্থাৎ দক্ষ শিবকে কর্ম্মবাড়ী নিমন্ত্রণ বারণ করে দিয়েছিলেন; কিন্তু সে ভাবে কাজ-কর্ম্ম অভদ্রোচিত বুঝে, লোকে ঘটা করে কাজ-কর্ম্ম করা বন্ধ রেখেছিল। এইটুকু বুঝতে পেরে, শ্বশুর মহাশয় একটু ঝাল ঝাড়তে চাইলেন। জামাই, তা আবার নেহাৎ গরিব;—সে দর্প করে জিতে যাবে—এ কি সয়। তিনি নিজে এক প্রকাণ্ড যজ্ঞের আয়োজন কর্লেন—শিবের নিমন্ত্রণ হল না। আর সতী সামলাতে পার্লেন না। বাবাও ত জামাইকে যথেষ্ট শাসন করেচেন। বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েচেন—এত দিন উদ্দেশ নেন নি। এ কি কম? এমন করে লোক হাসিয়ে যেন শোধ তুলতে চাওয়াটা কি তাঁর সাজে? তিনিই না গুরুজন! লক্ষী মেয়ে হলেও আর সামলাতে পার্লেন না। ঠিক কর্লেন ভেবে-চিন্তে, যে বাবার কাছে গিয়ে পড়ি,—আমার সুখ দেখে কেমন করে তিনি এমনটা করেন, দেখব। শিবের বারণ না শুনেই সতী গেলেন। গিয়ে দেখলেন, তাঁরে দেখে মায়ের কেমন ভয়-ভয় ভাব। বোনেরা যেন অপ্রস্তুত। বাপ্ ত একেবারে মারমুখী—যা তাই বলতে লাগলেন। অবশেষে, শিব সতীকে ভালবাসে—সেটা স্মরণ করে, শিবকে জব্দ কর্ব্বার ঝোঁকে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে, সতী যে নিজেরই কন্যা, সে আর তাঁর মনে রইল না। বললেন, ডাক সতীকে। একেবারে যজ্ঞস্থলে, দেশ শুদ্ধ লোকের সামনে, তাঁকে হাঁক-ডাক করে আনালেন। মুখে যা এলো, তাই বলতে লাগলেন। শিবকেও গাল দিতে লাগলেন—সতীকেও গাল দিতে লাগিলেন। সতী মরমে মরে গেলেন। বড়মানুষীর অহঙ্কার এত অধঃপাতে দেয়। ঘৃণায় সর্ব্বাঙ্গ শিউরে-শিউরে উঠতে লাগল যে, তিনি এই বড়মানুষের ঘরে জন্মেছিলেন। তার ওপর, শিব যখন তাঁকে এখানে আসতে বারণ করেছিলেন, তখন তিনি ভারি রেগেছিলেন—তাঁকে যা তাই বলেছিলেন—যা তাই করেছিলেন। বুঝলেন, শিব এই সব বুঝেই বারণ করেছিলেন। ভারি আত্মগ্লানিও এলো। মাথা ঘুরে সতী বসে পড়লেন। দম বন্ধ হয়ে গেল। আর উঠলেন না। সর্ব্বনেশে মেয়ে এমন মরণও মর্ত্তে পেরেছিল।

উপাখ্যান হিসাবে একটী গল্পের ভিতর এমন সকল রসের সমাবেশ—সমাজের এমন নিখুঁত ছবি—আর মেলে না। কাব্যাংশে, উপদেশাংশে—সকল দিকেই, এ কাহিনীর তুলনা নেই।—কিন্তু জ্ঞানের অংশটাও দেখতে হবে ত! এর ভিতরের ভাব কি,—এর তাৎপর্য্য কি?

এইবার তাই দেখা যাক।

ব্রহ্মা-পুত্র মনু,—মনু-পুত্র দক্ষ। ধাতুগত অর্থ নিষ্পত্তির পর বোধ হয় দাঁড়াবে। আর প্রকৃতও তাই। ব্রহ্মা—সৃষ্টিকর্ত্তা। মনু সৃষ্ট মানবের মনন-শক্তি। দক্ষ—নিপুণতা।

এই দক্ষের যোলটী কন্যা।

মহাদেব তখনও দেবাদিদেব। দক্ষের যত সম্মান—সে এই কন্যাগুলিকে সৎপাত্রে পাত্রস্থ করে। ঐশ্বর্য্য দক্ষতার জন্য। কন্যা-দানের পূর্ব্বে দক্ষ উঁচু ছিলেন না। শিবই ছিলেন।

ধর্ম্মই সমস্ত জগতকে ধারণ করে আছে। সে বড় কম ক্ষমতার কথা নয়—আর কম প্রভাবের কথা নয়। দক্ষ তাঁকে একেবারে ত্রয়োদশটী কন্যা দান করলেন। প্রত্যেক কন্যারই এক একটা সন্তান—তের জনের তেরটী। নিম্নে সন্তান সমেত মায়েদের নাম দেওয়া গেল।

(১) শ্রদ্ধা | সত্য (২) মৈত্রী | প্রসাদ (৩) দয়া | অভয় (৪) শান্তি | শম (৫) তুষ্টি | হর্ষ (৬) পুষ্টি | গর্ব্ব (৭) ক্রিয়া | যোগ (৮) উন্নতি | দর্প (৯) বুদ্ধি | অর্থ (১০) মেধা | স্মৃতি (১১) তিতিক্ষা | ক্ষেম (১২) লজ্জা | বিনয় (১৩) মূর্ত্তি | নরনারায়ণ

কন্যার জন্ম ও কন্যা-দানের অভিব্যক্তি সম্মত অর্থ হইতে পারে যে, মনন-শক্তি দ্বারা মানব যখন দক্ষ হয়ে উঠল, তখন তার শ্রদ্ধা মৈত্রী দয়া শান্তি প্রভৃতি গুণের সঞ্চার হওয়ায়, সে সেইগুলি দিয়ে ধর্ম্ম স্থাপনা কর্লে! ধর্ম্মে অব্যাহত থাকার ফলেই মানবের মধ্যে সত্য, প্রসাদ, অভয় প্রভৃতির আবির্ভাব হল।

চতুর্দ্দশ কন্যাটীকে অগ্নিকে সমর্পণ করা হয়েচে—অগ্নি হতে বিবিধ দিকে বংশ-বিস্তার। পঞ্চদশটী সন্দয় পিতৃগণকে,—সেও তাই। অর্থাৎ নিপুণতার অপর দুই কন্যা বা নিপুণতা জাত অপর দুই গুণ হতে মানবের সভ্যতা স্থাপন।

যোড়শ কন্যা সতী। তাকে ব্রহ্মা শিবের হাতে দেওয়ালেন। তার মানেই, সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছায় নিপুণতা দ্বারাই মানব-মন অবশেষে শিব বা পরম মঙ্গলকে লাভ কর্ত্তে পারে, এমন কোনও গুণ আয়ত্ত কর্ত্তে পারে। হতে পারে এই গুণই বিদ্যা।

এইবার দক্ষ-যজ্ঞের কথা ধরা যাক্।

অন্ধঃ তমঃ প্রবিশন্তি যো উ বিদ্যাম্ উপাসতে। দক্ষতার দ্বারা মানব শিব-সঙ্গম্নী বিদ্যাকে আবিষ্কার কর্লে। কিন্তু শিব তার আয়ত্ত হলো না। উপনিষদের মতে, সে অন্ধ তমের মধ্যে প্রবেশ কর্লে। তাহার নিপুণতার দ্বারাই সে বিদ্যাকে পেয়েছে—শিবার্থে তারে নিয়োজিত করেছে—অথচ সভ্যতার যজ্ঞশালায় সে দেখে, শিব তার আজ্ঞাধীন নয়। তখন সে শুদ্ধম্ জ্ঞানম্ অপাপবিদ্ধমকে impractical বলে ঘোষণা কর্ল। শিবকে পরিত্যাগ কর্ল। শ্বশুর মশাই রেগে জামাতাকে যজ্ঞশালা থেকে তাড়িয়ে দিলেন। এই সময় নন্দী বানরটা ঝগড়া বাধিয়েছিল—সকলকে গালি দিয়েছিল,—উপাখ্যানেই আছে। কিন্তু তার গালাগালি অভিশাপের কথাগুলো বানরের মত নয়—বেশ মানুষেরই মত। শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে এ সব আছে। বচনের একটু নমুনা উদ্ধৃত কচ্ছি। শিব দক্ষকে নমস্কার না করায়, শিবকে তাড়িয়ে দেওয়ার অর্থাৎ দক্ষতার দ্বারা বিদ্যা প্রয়োগে আয়ত্ত হবার নয় দেখে মঙ্গল পথ পরিত্যাগ করার যারা সমর্থক,—নন্দীকেশ্বর তাদের অভিশাপ কচ্ছেন। গ্রাম্য সুখের অভিলাষে কূটধর্ম্মসক্ত প্রবঞ্চনাদি বহন গৃহাশ্রমে আসক্ত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড বিস্তার করুক। এ ত ক্ষুদ্র কথা নয়। এই পুরাণ কথায় রূপকচ্ছলে ভারতবর্ষের সভ্য জাতীয় ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। তার পর পাল্টা জবাব ব্রাহ্মণরা দিয়েছিলেন। এ সব বাদানুবাদ ঠিক যেন হিন্দু ও বৌদ্ধের ধর্ম্ম-কলহ।

তার পর শিববিহীন যজ্ঞ—সে যেন একটা প্রকাণ্ড বিপ্লবের কারণরূপী নির্ম্মম অত্যাচার ব্যবস্থা। সতী পিত্রালয়ে যাবার জন্য শিবের অনুমতি চাইচেন—শিব তাঁকে বোঝাচ্চেন। শ্রীমদ্ভাগবত থেকেই আর একটু উদ্ধৃত করি—"নিরহঙ্কার ব্যক্তিগণের সমৃদ্ধি দেখিলে দক্ষের অন্তঃকরণ অতিশয় সন্তপ্ত হয়। দক্ষ পুণ্যকীর্ত্তি দ্বারা কখনই ঐ সরল, নিরহঙ্কার ব্যক্তিদিগের ঐশ্বর্য্য এবং সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হন না।" এ কি প্রকৃতই রাজা শ্বশুরের সহিত ভিখারী জামাতার ঝগড়া, না, এই শ্বশুর জামাই রূপকে আবরণে, মানব-প্রকৃতির দুই সনাতন বৃত্তি—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সঙ্ঘর্ষ? তাই, যাঁর মতে সত্য, তাঁর ধারণায় তবে সতী কে? কোন্ বস্তু প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া সতত নিবৃত্তির অনুগামী—নিবৃত্তি হইতে প্রবৃত্তির মধ্যে ফিরিয়া আসিলে আপনিই বিনষ্ট হয়? তিনিই ঠিক বুঝিবেন, সতীভাব বস্তুটি কি। মানব-মনের সর্ব্বাবশেষ, সর্ব্বোত্তম প্রসবই সতীত্ব। আর এই সতীত্ব নারীত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে যাহা থাকে, সে আর নারীত্ব নহে;—স্থূল, ভোগায়তন হিংস্র জগতেরই খানিকটা জড়ত্ব, স্থূলত্ব—খানিকটা বস্তু-সমবায়মাত্র। এই সতীত্বের বিশুদ্ধ ভাব ঘরের মেয়েদের ধরাইতে হইলে, তাদের কেমনটা গড়ে তুলতে হবে, পার তোমরা ভেবে উঠতে?

বাকি রইল, শিবহীন যজ্ঞে শিব-নিন্দায় সতীর দেহত্যাগ। সতী শিবার্থেই যজ্ঞে গিয়াছেন। গিয়াছেন তার কারণ, জগতে শিবহীন কিছু থাকতে পারে—তাঁর বিশ্বাস নয়। যখন সেটা স্পষ্ট হল দেখলেন—সত্যই যজ্ঞ শিবহীন,—যাজ্ঞিকেরা শিবহীন,—এ যজ্ঞের মূল-মন্ত্র শিবনিন্দা—তখন আপনার যতখানি অস্তিত্ব—এই শিবহীন কাণ্ড যেখানে অনুষ্ঠিত হতে পারে তার সংস্পর্শে ছিল, সমস্তই বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। দক্ষতায় এতটুকু পেয়েই যে মানব উন্মত্ত হয়ে উঠেছে,—শিবের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের কথা মুক্ত-কণ্ঠে তাদের শোনালেন। নিরহঙ্কার ব্যক্তিগণের ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধি—অহঙ্কারী পুণ্যকীর্ত্তি দ্বারা প্রজাপতি লোকপাল হয়েও প্রাপ্ত হতে সক্ষম নয়—যারে তারে বর্ণনা করে গেলেন—"আমরা অণিমাদি যে সমস্ত ঐশ্বর্য্য আয়ত্ত করিয়াছি, তোমরা কখনও তাহা চক্ষেও দেখ নাই। তোমাদের ঐশ্বর্য্য কেবল যজ্ঞশালাতেই থাকে। যজ্ঞান্ন-পরিতৃপ্ত মানবগণ তাহার প্রশংসা করে; এবং কর্ম্মকাণ্ড-সমাশ্রিত পুরুষেরাই তাহা ভক্ষণ করে। আমাদের ঐশ্বর্য্য সেরূপ নহে। তাহা ইচ্ছা মাত্রই উৎপন্ন হয়—তাহার হেতু অব্যক্ত।" এখানেও পুনরায় ভাবা যেতে পারে সতী কে—মানবের মনের কোন্ বস্তু শিবের সঙ্গে একত্র শিবের ঐশ্বর্য্য ভোগ করে? অহঙ্কারে শিব পথ পরিত্যাগ করার পরও, তখনও আমাদিগকে মঙ্গলের নির্দ্দেশ দিতে থাকে?

বিদ্যা, অবিদ্যা—দুইই আমাদের মনোজাত বস্তু। অবিদ্যাই শিবত্বের প্রতিবন্ধক। বিদ্যাই শিবভাবের সন্ধান করে—বিদ্যাই অবিদ্যা-জনিত অন্ধকারের মোহ টুটিয়ে দিতে চেষ্টা করে। তবে সতী কি বিদ্যারূপিণী? বিদ্যা-শক্তিই সতীত্ব?

জ্ঞানের তর্ক থাক। মায়েদের মন ওর প্রভাবে আচ্ছন্ন হয় না। তোমার জানার-বোঝার বাদ-বিতর্ক তাঁদের আপনার

স্থান হতে এতটুকুও টলায় না। কর্মের ঐশ্বর্য্য তাঁদের মধ্যে কোনও প্রভাব বিস্তারে সমর্থ নয়। শিব-বিভবেই যে সতীর ঐশ্বর্য্য। "সে যে ইচ্ছামাত্রই উৎপন্ন—তাহার হেতু অব্যক্ত।" ওই উপাখ্যানের মধ্য হতে—ওই জ্ঞানতত্ত্ব হতে সেটুকু গুটিয়ে নিতে পার, যদি চেষ্টা কর। সতী-কাহিনীর যতখানি ব্যক্ত হবার, সে ব্যক্ত হয়েচে—অব্যক্ত ব্যক্ত হবার নয়। একটা অব্যক্ত শক্তিই তারে গুটিয়ে নিতে পার্কে। যে বল মায়েদের প্রকৃত বল,—সতীবল যার ভিত্তি—সে শিবের ভাণ্ডারের ধন। শক্তি-সাধকেই তারে বুঝবে—মায়ের হৃদয়েই তারে বিকাশ করা যেতে পারে!

নিজের কাজ বুঝে নে মা তোরা,—কবে যদি বেলা সহসা বয়ে যায়। এ দীপযুগলগ্ন শীর্ণ সুমঙ্গল শিখাটুকু—হোম বেদী তার নাই, যদি জেলে তুলতে পারি,—যদি মা বেলা বয়ে যায়! উত্তর-সাধকের জীবনপ্রাত ব্যর্থ করে দিস নে। বুঝে নে মা তোরা! বুঝে নে! মাতৃ-জাতির সাধনায় পথ চিনে নিয়ে "মা" মন্ত্র সফল কর। এত দিনের এই ভাব-পরম্পরার ভেতর দিয়ে টেনে আনা কথাটাকে জীবন্ত করে একবার শুধু দেখ কি হয়! একবার না হয় দেখা না, তোরা কে?—না হয় জাতির পক্ষ হইতে কোনও ভিক্ষাই বয়ে আনলুম না!

শারদ-বীণা

[শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম-এ, বি-এল্]

এস মা, অমল-হাস্য-প্লাবিত শারদ সুপ্রভাতে,
এস মা, মধুর স্বপ্ন-জড়িত নিথর নিশীথ রাতে,
করিয়া পূর্ণ সকল রিক্ত,
শুষ্ক স্নেহের সুধায় সিক্ত,
আঁধারে আলোক-মাধুরী-দীপ্ত,
সুখ সহস্র সাথে,
মছায়ে অশ্রু অজস্রভরার ভাণ্ড করিয়া হাতে!

ঊর্দ্ধে অরূপ নীলের লীলায় আকাশ আত্মহারা,
দিবসে উদাস বিরাগী, রাত্রে খচিত লক্ষ তারা।
জড়িত পৃথ্বী হরিৎ-হিরণে
হসিত তপন-চন্দ্র-কিরণে
ঘোষিছে গানে ও গন্ধে, বরণে
কিসের বার্ত্তা কারা!
এস মা, বহিয়া সে রহস্যের কল-স্রোতের ধারা!

ওই দিগন্তে কাঁপে কি তোমার তরীর শুভ্র পাল?
হোথা কি তোরণে উড়িছে পতাকা, যেথায় চক্রবাল?
হেথায় শুভ্র পুষ্প-পুঞ্জে
ছেয়েছে শষ্প সলিল-কুঞ্জে,
মুখর ধরণী কূজন-গুঞ্জে,
এ কি এ ইন্দ্রজাল!
হিরণ্ময়ী ও অরুণা ঘুচালো সকল অন্তরাল।

সঙ্গে তোমার শারদলক্ষ্মী বক্ষে করুণা-ভরা,
মধুর দৃষ্টি পড়েছে যেথায় পূর্ণ সেথায় ধরা।
সলিলে কমল, ক্ষেত্রে শস্য,
আলোকে কাব্য, পবনে স্পর্শ,
ধান্য-শীর্ষে শিহরে হর্ষ
সকল দুঃখহরা।
পথে প্রান্তরে লুটায়ে পড়িছে জ্যোৎস্না অমিয়-ঝরা।

সরস্বতীর বীণায় বাজিছে একটি শান্ত সুর,
—সুদূর আসিল নিকট হইয়া, নিকট হইল দূর।
অভেদ এদিনে স্বর্গ মর্ত্ত্য,
মিলিল হেথায় সকল বর্ত্ম;
নিখিল সম্ভাবনার অর্থ
মিটিল জিজ্ঞাসুর।
শারদ-বীণার একখানি সুরে ভরিল ভুবনপুর।
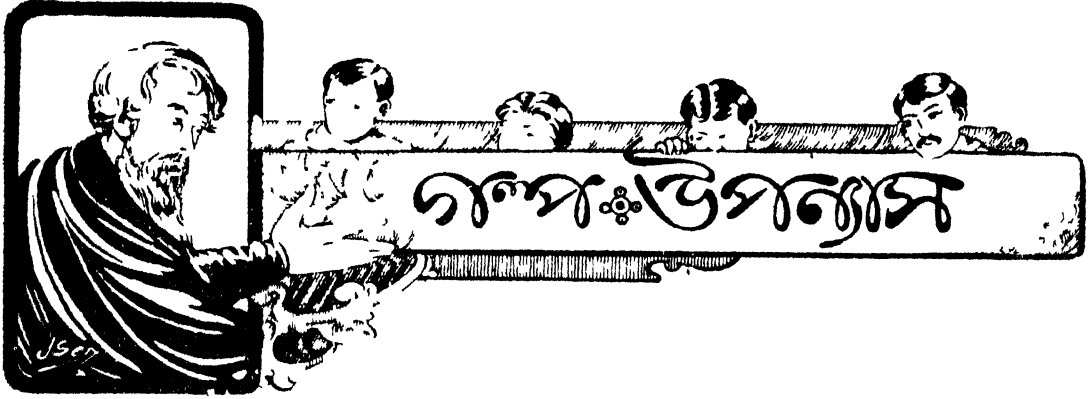
মেঘনাদ

[শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল্]

(২৬)

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া মেঘনাদ স্থির করিল যে, মনোরমা আসিবার পূর্ব্বেই সরিৎকে সব কথা খুলিয়া বলিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা স্থির করিয়া সে আর কালবিলম্ব করিতে পারিল না, তখনি বাড়ীর ভিতর গেল।

সরিৎ তখন রান্নাঘরে। সুনীতি যাইবার পর মেঘনাদ একজন বামণী নিযুক্ত করিয়াছিল। ব্রাহ্মণীর পতির সংখ্যা কত ছিল, তাহার ঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না; কিন্তু রন্ধনে যে তিনি দ্রৌপদীর সমকক্ষ, এ কথা কেহ কোনও দিন বলে নাই। কিন্তু রন্ধনে পটুতার বিষয়ে তাঁর মনে একটা প্রকাণ্ড অহঙ্কার ছিল। বিশেষতঃ, এই এক-ফোঁটা মেয়ে সরিৎ যে তাঁহাকে রান্না করিতে শিখাইবে, সেটা তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। কিন্তু সরিৎ পাকা রাঁধুনী, সেও বামণীকে নানা রকম উপদেশ না দিয়া পারিত না। এ সব উপদেশ ব্রাহ্মণী পারৎপক্ষে গায়ে মাখিতেন না। একটা দারুণ অবজ্ঞা দিয়া তাহাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা নিতান্তই নিষ্ফল হইলে, তিনি সরিতের প্রস্তাবিত তরকারী রাঁধিতে গিয়া এমন একটা কেরামতি করিয়া বসিতেন যে, রান্নাটা ::: সাধারণ রান্নার চেয়েও অনেকটা উৎকর্ষ লাভ করিত। সরিৎ তাহাতে দোষ ধরিতে গেলে, সে অম্লান বদনে সমস্ত দোষটা সরিতের ঘাড়ে চাপাইয়া দিত।

আজ সরিৎ রাঁধুনীকে ইলিস মাছের 'পাতুরী' রাঁধিতে শিখাইতেছিল। মাছগুলি মাখিয়া সে কড়াইয়ে ছাড়িয়া দিল। সরিষা ও লঙ্কা-বাটা একটা বাসনে গুলিয়া রাখিয়া-ছিল,—বামণ দিদিকে একটু পরে তাহা কড়াইয়ে ঢালিয়া দিতে বলিল।

বামুণ দিদি গালে হাত দিয়া বলিল, "এখুনি ঝোল দেবে কি গো,—মাছ যে এখনো সাঁতলান হ'ল না।"

"আর সাঁতলাতে হ'বে না—তুমি ঝোল দাও।"

"সে কি গো! কাঁচা মাছ খাবে কে গো?"

সরিৎ তাড়াতাড়ি নিজেই ঝোলটা ঢালিয়া দিয়া বলিল, "অতখানি জলে সেদ্ধ হ'বে, তবু মাছ কাঁচাই থাকবে?"

"আহা! তবু তো সাঁতলান হ'ল না! না সাঁতলালে কি মাছের আঁসটে গন্ধ যায়?"

"যায় কি না দেখো" বলিয়া সরিৎ হাত ধুইতে লাগিল।

বামুণ দিদি তখন আস্তে-আস্তে জলের ঘটিটা লইয়া, কড়াইয়ে আরও খানিকটা জল ঢালিবার উদ্যোগ করিল। সরিৎ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ও কি কর?"

বামুণ দিদি বলিল, "আরও জল লাগবে,—ঐটুকুতে মাছ সেদ্ধ হ'বে না।"

"হ'বে গো, হ'বে। তুমি এখন পার তো, কড়া'য়ের উপর ঐ থালাটা চাপা দাও।" বামনী বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া তাই করিল।

এমন সময় মেঘনাদ গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিল, "সরিৎ!"

ভারী আওয়াজ শুনিয়া সরিৎ চমকিত হইল। সে বামুণ-দিদিকে তাড়াতাড়ি বলিল, "ঝোলটা ঐকটু এঁটে এলে, সামান্য একটু কাঁচা তেল দিয়ে নামিয়ে রেখ।" বলিয়া সে ছুটিয়া স্বামীর কাছে গেল।

মেঘনাদের মুখ দেখিয়া তা'র প্রাণ শুকাইয়া গেল। মেঘনাদ তাহাকে লইয়া উপরে গেল। একটা তক্তপোষের উপর সরিৎকে বসাইয়া সে বলিল, "আমাদের একটা ভীষণ পরীক্ষা এসে প'ড়েছে সরিৎ!"

সরিৎ কথা কহিল না। কেবল তার বড়-বড় চক্ষু দুটি কাতর দৃষ্টিতে মেঘনাদের মুখের উপর নিবদ্ধ করিল। মেঘনাদ সে চোখের দিকে চাহিতে পারিল না; মাটীর দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ দাঁতে নখ খুঁটিয়া বলিল, "তুমি আমাকে ভালবাস,—আমিও প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভাল বাসি,—এ কথা আমি বুকে হাত দিয়ে ব'লতে পারি। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। আমি তোমার সে বিশ্বাসের যোগ্য চিরদিন থাকবো, এটা আশা করি। কিন্তু তুমি হয় তো মনে কর যে, আমি দেবতা! তা আমি নই সরিৎ! সেই কথাই আজ আমার তোমাকে খুলে ব'লতে হ'চ্ছে।

"আমার অতীত জীবনে একটা পাপ আছে, যেটা আমি তোমাকে অনেক দিন ব'লবো মনে করেছি; কিন্তু ব'লতে সাহস করি নি। ভেবেছিলাম, হয় তো বা কোনও দিন ব'লতে হ'বেও না। কিন্তু সে পাপ আমার পিছু নিয়েছে। এখন তা'র সঙ্গে আমাকে তোমার হাত ধ'রে লড়'তে হ'বে,—তাই তোমাকে সে কথা না বল্লে আর চলছে না।"

তার পর মনোরমার সঙ্গে তার যে সম্পর্ক, তা'র সঙ্গে তা'র যখন যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে, সে তাকে যখন যে সম্ভাষণ করিয়াছে—সব কথা মেঘনাদ অকপটে সরিতের কাছে বলিয়া গেল। মনোরমার প্রতি তা'র মনের ভাব কখন কেমন হইয়াছে, তাহাও সে বলিল।

সরিৎ যে অকপট বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাকে আশ্রয় করিয়া, তা'র প্রেমের জীবন আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা মেঘনাদের কথায় একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। মেঘনাদ যতটা বলিল, সরিৎ তা'র চেয়ে অনেকটা বেশী তার সম্বন্ধে বিশ্বাস করিল। তার যেন মনে হইতে লাগিল যে, পৃথিবী তা'র পায়ের তলা হইতে সরিয়া গেল। তার জীবনের একমাত্র আশ্রয় যেন সে হারাইল।

সে কোনও কথা কহিল না,—কাঁদিল না। মুখখানা তার সাদা হইয়া গেল। সে তক্তপোষ চাপিয়া ধরিয়া, মাটীর দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল।

মেঘনাদ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "মনোরমা কাল এখানে আসছে। ভীষণ পরীক্ষা এখন আমার সম্মুখে। আমি এখন কি ক'রবো, মনোরমার কি ব্যবস্থা ক'রবো—কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। এখন তুমি আমার সহায়! তুমি আমার হাতে ধ'রে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও মনো——এই—সরিৎ!"

শেষে তার নাম করিতে মেঘনাদ যে ভুলটা করিল, এই ব্যাপারটা সরিতের বুকের ভিতর ছুরির মত বিঁধিল। এক মুহূর্ত্তের জন্য যেন তার হৃৎপিণ্ড হইতে সবটুকু রক্ত সরিয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ তাড়িতালোকে চোখের সামনে বিভীষিকা দেখিলে, যেমন লোকে বিমূঢ় হইয়া যায়, তেমনি বিমূঢ় হইল সরিৎ। তেমনি তা'র চক্ষের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিল মেঘনাদের মনটা। সে মনে মনে স্থির করিল সরিৎকে মেঘনাদ যতই শ্রদ্ধা বা আদর করুক না কেন,—তার অন্তরটা, তা'র রক্ত-মাংস, ছাইয়া আছে মনোরমা।

সে কোনও কথা কহিল না।

মেঘনাদও ভুলটা করিয়াই চমকিয়া উঠিল! এমন ভুলও মানুষে করে? না জানি সরিৎ কি ভাবিল! এই কথা ভাবিতে তার মনটা একদম এলো-মেলো হইয়া গেল,—তার ভাবনা-চিন্তা ঠিক শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে চলিতে একেবারে অস্বীকার করিল।

অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া সে বলিল, "এখন কি ক'রবো? আমাকে তুমি ব'লে দাও। তোমার হাতেই আমি আমার জীবনের সমস্ত ভার বুঝিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চাই।"

সরিৎ এতক্ষণে অনেকটা সামলাইয়া উঠিয়াছিল। সে

শুষ্ক কণ্ঠে, গলাটা একটু ঝাড়িয়া বলিল, "তা'র জন্য এই ঘরে একটা বিছানার বন্দোবস্ত ক'রে দি।"

মেঘনাদ অবাক হইয়া একবার তাহার মুখের দিকে চাহিল। সরিৎ মুখ নীচু করিয়াই ছিল,—মেঘনাদ কিছু বুঝিল না।

সে বলিল, "কি বলছো সরিৎ? সে এখানে থাকতেই পারে না। তার জন্য কোনও একটা উদ্ধারাশ্রমে, কি কোনও মিশনে বন্দোবস্ত ক'রতে হবে।"

সরিৎ উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "সেইটা কি তোমার ধর্ম্ম হ'বে?"

"তা ছাড়া আমি কি ক'রতে পারি?"

সরিৎ স্থির ভাবে বলিল, "তুমি তাকে বিয়ে ক'রবে!"

মেঘনাদ লাফাইয়া উঠিল,—খুব জোর করিয়া বলিল, "তুমি কি পাগল, সরিৎ? তা'কে যে আমি বিয়ে ক'রবো,—তোমাকে কি ক'রবো?"

"ওঃ, আমার জন্যে চিন্তা নেই" বলিয়া সরিৎ দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

মেঘনাদ তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "যেয়ো না, ব'সো। কথাটা অত সোজা নয়। তোমার জন্য চিন্তা নেই ঠিক,—কেন না, বিয়ে আমি তা'কে কিছুতেই ক'রছি নে। আর, তোমাকে বিয়ে না ক'রলেও, আমি তা'কে বিয়ে ক'রতাম না। তুমি জান না সে কি ভয়ানক মেয়ে-মানুষ। সে ভয়ানক দুশ্চরিত্রা - আর সম্ভবতঃ সে খুনী!"

সরিৎ একটু হাসিয়া বলিল, "কিন্তু তা' জেনে-শুনেই তো তুমি তা'কে বিয়ে ক'রতে চেয়েছিলে। বিয়ে ক'রবে বলেই তুমি তা'কে চুমো খেয়েছিলে;— এখন সে কথা তোলা মিথ্যা। ধর্ম্মের চক্ষে সে তোমার স্ত্রী,—তা'কে ত্যাগ ক'রলে তোমার অধর্ম্ম হ'বে।"

মেঘনাদ তাহার হাত ছাড়িয়া, দুই হাতে মাথা গুঁজিয়া তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িল। মেঘনাদ নিজের অন্তরাত্মার কাছে ঠিক এই কথা কতবার শুনিয়াছে! তার বিবেক যেন সরিতের মূর্ত্তি ধরিয়া, তাহাকে এই কথা বলিয়া চাবুক মারিয়া গেল।

সরিৎ ফাঁক পাইয়া, ঘর হইতে বাহির হইয়া, সটান রান্নাঘরে গিয়া হাজির হইল। তখন তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে, দাঁতে-দাঁতে লাগিয়া আসিতেছে,—সে যেন আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। তার প্রাণের ভিতর কি ভীষণ অন্ধকার! কি একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্ত তাহার চিন্তাকে অস্থির ও শূন্য করিয়া ফেলিতেছে,—তার অন্তরাত্মাকে যেন শিকড় উপড়াইয়া টানিয়া ফেলিতেছে, —তাহাকে মুচড়াইয়া ভাঙ্গিতেছে। এই সব চাপিয়া-ঢাকিয়া, শান্ত মুখে স্বামীর সঙ্গে তত্ত্ব-কথা বলিতে যে দারুণ চেষ্টা করিতে হইয়াছে, তাহার অবসাদে তাহার সমস্ত শরীর-মন একেবারে গলিয়া পড়িতে চাহিল। সে রান্নাঘরে একটি পিঁড়ি টানিয়া, দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িল।

বামুণদিদি বলিল, "রান্না হ'য়ে গেছে।" সরিৎ মেঘনাদকে খবর দিতে বলিল। মেঘনাদ অনেকক্ষণ পরে স্নান করিতে নামিল। সরিৎ রান্নাঘরে চাপিয়া বসিয়া রহিল। মেঘনাদ সে-দিকে আসিতেছে শুনিয়া, তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি এটা-ওটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

সে দেখিতে পাইল যে, বামুণ দিদি পাতুড়ী শুকাইয়া একেবারে চচ্চড়ি করিয়া ফেলিয়াছে। উপরন্তু একটু পোড়াইয়াছে। হঠাৎ সে ভয়ানক চটিয়া উঠিল। তাহার চিত্তের সমুদায় ক্ষোভ সে বামুণ দিদির উপর তিরস্কারে ঢালিয়া দিল। মেঘনাদ এখন কি দিয়া খাইবে তাই ভাবিয়া, সে তাড়া-তাড়ি দুইটা ডিম ভাঙ্গিয়া অমলেট ভাজিতে বসিল। ভাজা হইলে, বামুণ দিদিকে হেঁসেল হইতে একেবারে সরাইয়া দিয়া, সে নিজ হাতে মেঘনাদের ভাতের থালা সাজাইয়া নিয়া, তাহাকে খাইতে দিল।

তখন আর তাহাদের মধ্যে কোনও কথা হইল না। দুজনেই এখন কোনও কথা পাড়িতে ভয়ানক সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল। কেমন একটা লজ্জা আসিয়া যেন দুজনেরই মুখ বন্ধ করিয়া দিল।

মেঘনাদ খাইয়া বটব্যাল কোম্পানীর আফিসে চলিয়া গেল; সরিৎও কলেজে চলিয়া গেল।

(২৭)

বিকালে ফিরিয়া মেঘনাদ দেখিল, সরিৎ তখনো কলেজ হইতে ফেরে নাই। ফিরিবার সময় অতীত হইয়া গেল। বেথুন কলেজের bus সে-পাড়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহা মেঘনাদ দেখিয়াছে,—কাজেই সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে

ভয়ানক ছট্‌-ফট্‌ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ বাড়ীতে ও পথে পায়চারী করিয়া, সে বেথুন কলেজের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। কলেজে গিয়া শুনিল, মেয়েরা সব বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। ভয়ানক আশঙ্কায় তার মন পীড়িত হইল। সে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বাড়ী ফিরিল। ঝি আসিয়া তাহার হাতে একখানা চিঠি দিয়া বলিল, মেঘনাদের শ্বশুরবাড়ীর একজন চাকর চিঠিখানা দিয়া গিয়াছে। লেখা সরিতের— দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া, মেঘনাদ চিঠি খুলিয়া পড়িল। পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িল।

সরিৎ লিখিয়াছে,—

"অনেক ভাবিয়া দেখিলাম,—বুঝিলাম, তোমার সঙ্গে আমার কোনও ধর্ম্ম-সম্বন্ধ নাই, হইতে পারে না। মনোরমা তোমার ধর্ম্ম-পত্নী; তুমি তাহার প্রতি তোমার কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিলে, আমায় শ্রদ্ধা করিতে পারিবে। না হইলে আমি তোমাকে ঘৃণা করিব।

"আমার জন্য কোনও চিন্তা করিও না। আমার জীবনের এ ক'টা দিন বড় বেশী নয়,—ইহা বোধ হয় ভুলিতে পারিব। জীবনে ভালবাসাবাসি ছাড়াও অনেক কাজের ক্ষেত্র আছে; আমি একটা কার্য্য-ক্ষেত্র বাছিয়া লইব। ভগবান্‌ আমার সহায় হউন।

"তোমায়-আমায় এ বিচ্ছেদ চিরদিনের। ইহা রাগ বা অভিমানের কথা নয়,—খুব বিবেচনা করিয়া আমি ইহা স্থির করিয়াছি। এ সিদ্ধান্ত বদলাইবার নয়। বদলাইতে তুমি কোনও চেষ্টা করিও না। এ-সব কথা আমি কাহাকেও জানাই নাই,—আর কেহ জানিবেও না। তুমি দয়া করিয়া আমার এ লজ্জার কথাটা প্রচার করিও না। তুমি যদি এ বাড়ীতে আসিয়া আমাকে ফিরাইবার চেষ্টা কর, তবে কথাটা জানাজানি হইবে। সেটা আমি ইচ্ছা করি না; তুমিও বোধ হয় ইচ্ছা করিবে না।

"আর একটা কথা বলিয়া রাখি। তুমি আমার সঙ্গে দেখা করিতে চেষ্টা করিও না। যতই চেষ্টা কর না কেন, আমি বাঁচিয়া থাকিতে তুমি আর আমাকে দেখিতে পাইবে না। তোমার কাছে আমি মৃত; তুমি যদি এ কথা মানিয়া না লও, তবে কাজে-কাজেই মরিয়া এ কথা সত্য করিতে হইবে।

"এ চিঠির উত্তর দিতে হইবে না। উত্তর দিলেও আমি পড়িব না। তোমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখিলে, আমি সতীত্ব-ধর্ম্মে পতিত হইব। মনে রাখিও, আমি সাধ্বী,—আমি মনোরমা নই। অজ্ঞাতসারে যে পাপ করিয়াছি, তা'র প্রায়শ্চিত্ত জীবন ভরিয়া করিতে হইবে।"

পত্রখানা মেঘনাদ বার-বার পড়িল। পড়িয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল; তার পর দুই চক্ষু হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া, ভাবিতে চেষ্টা করিল। কোনও কথাই ঠিক করিয়া ভাবিতে পারিল না। এই আঘাতের তীব্রতায় তার মনটা একেবারে অসাড় হইয়া গিয়াছিল,—সে কোনও কিছুই ভাবিতে পারিতেছিল না।

তখন রাত্রি হইয়াছে। মেঘনাদ একবার উঠিয়া কাপড়-চোপড় পরিয়া বাহির হইল। ট্রামের লাইনের কাছে আসিয়া ট্রামে উঠিল। কিন্তু সরিতের বাপের বাড়ীর কাছে আসিয়া ভাবিল, "না, এখন যাওয়াটা ভাল হ'বে না।" সে ট্রাম হইতে নামিল না, বরাবর গড়ের মাঠে চলিয়া গেল। সেখানে লক্ষ্যশূন্য ভাবে ঘণ্টাখানেক পায়চারী করিয়া, বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

বাড়ীতে আসিয়া, টেবিলের কাছে অন্যমনস্ক ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। জগদীশের টেলিগ্রামখানা টেবিলের উপর পড়িয়া ছিল। অনেকক্ষণ তাহার উপর চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া রহিল; কিন্তু তখন তার মন অনেক দূরে ছিল— সে কিছু দেখিতে পাইল না। সে ভাবিতেছিল, সে এই রাত্রে শ্বশুরবাড়ী না গিয়া ভালই করিয়াছে। এখন গেলেই একটা জানাজানি হইয়া যাইত। পরে গেলেই চলিবে। সরিৎ যে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এই সর্ব্বনাশের কথাটা লোকে জানিবে—ভাবিতে, তার একটা দারুণ লজ্জা ও ভয় হইতে লাগিল। তাই সেই জানা-জানিটাকে যতদূর সম্ভব দূরে ঠেলিয়া রাখিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

অনেকক্ষণ পরে টেলিগ্রামখানা সে দেখিতে পাইল। তখন তা'র মনে হইল যে, কাল সকালে মনোরমা আসিয়া পৌঁছিবে।

এই কথাটায় তার সম্বিৎ যেন ফিরিয়া আসিল,—সে সমস্ত কথাটা পরিষ্কার করিয়া ভাবিতে পারিল। এখন ভাবিতে গিয়া, তাহার রাগ হইল সরিতের উপর। সরিৎ যে তার নিজের দুঃখে অধীর হইয়া, মেঘনাদের কথা একবারও ভাবিল না;— মেঘনাদের কঠোর পরীক্ষায় ন্যায় সহধর্ম্মিণীর মত পাশে

দাঁড়াইয়া, তাহার সহায়তা করিতে আসিল না,—খুব সাধারণ তুচ্ছ স্ত্রীলোকের মত রাগ ও অভিমানের অভিনয় করিতে বসিল,—ইহাতে সে মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেল। সরিৎ শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী,—তার কাছে মেঘনাদ এ রকমটা আশা করে নাই। সে ভাবিতেছিল যে, তা'র ভাবনা-চিন্তার বোঝা সরিতের কাছে নামাইয়া দিলে, সে-ই ইহার একটা সহজ সদুপায় দেখাইয়া দিতে পারিবে। তাহা তো হইলই না,—লাভের মধ্যে হইল, কেবল দারুণ লজ্জা ও অপমান। ইহার মধ্যে সরিতের যে অন্যায়টা, তাহাই তাহার বেশী করিয়া মনে হইতে লাগিল।

সরিৎ তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে—তাহার প্রতি ঘোর অবিচার করিয়াছে। তাহার মনের কথা সে যদি মুখ ফুটিয়া বলিত, তবে মেঘনাদ তার মনের মেঘ কাটাইয়া দিতে পারিত। সংশোধনের সে সুযোগ পর্য্যন্ত না দিয়া সরিৎ তাহাদের সম্বন্ধটা একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে চাহিয়াছে। এটা কেবল অবিবেচনার কথা নয়, স্পর্দ্ধার কথা। কেন, এতটা স্পর্দ্ধা কিসের? সরিৎ ভাবিতেছে, সে না হইলে মেঘনাদের চলিবে না? এতদিন চলিয়াছে, আর আজ চলিবে না? আচ্ছা, সেই ভাল। মেঘনাদ তার মনুষ্যত্ব খর্ব্ব করিয়া, পায়ে ধরিয়া সরিৎকে সাধিতে যাইবে না। তার দরকার থাকে, সে-ই আসিয়া সাধিবে।—বাস্।

এই কথা ভাবিতে সে একটা আশ্চর্য্য রকম স্বস্তি ও শক্তি অনুভব করিল। সে যেন দেখিতে পাইল, একটা বোঝা হইতে সে মুক্তি পাইয়াছে। এখন মনোরমার সম্বন্ধে তার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সে অনেকটা নিরুদ্বেগে স্থির করিতে বসিয়া গেল।

মনোরমা যে কাল আসিতেছে—এখন সে কি করিবে? তাহাকে সে বাড়ীতে আনিতে বাধ্য,—সে সম্বন্ধে তাহার আর এখন কোনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রহিল না। তার পর? তার পর মনোরমার সঙ্গে পূর্ব্ব সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা, বা তাহাকে বিবাহ করা—সেও অসম্ভব। বিশেষ, সরিৎ সেই কথা বলিয়াছে বলিয়াই, তাহা আরও অসম্ভব! কিন্তু মনোরমাকে লইয়া সে করিবে কি? মনোরমার যে সমস্ত জীবনটা পড়িয়া রহিয়াছে—তাহার সে কি উপায় করিবে?

সে নানা কল্পনা করিতে লাগিল। ভাবিতে-ভাবিতে তার মনের তলায় একটা কথা ধ্বনিত হইতে লাগিল—এই মনোরমাকে লইয়া প্রথমে সে সত্যের পথ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল,—তার সেই সত্য পথ পরিত্যাগ করাই তার জীবনের সকল দুর্গতির সূত্রপাত! তার মনে হইল, তা'র প্রায়শ্চিত্তের এই সুযোগ! সরিৎ তাহাকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে,—সুনীতি মরিয়াছে। এখন সাহস করিয়া, সে সমস্ত জগতের সম্মুখে মনোরমাকে স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারিলেই, তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে তাহার জীবনে অবজ্ঞাত সত্যের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা হইবে—তাহার জীবনের যে জটিলতা মিথ্যার আশ্রয়ে পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা মিলাইয়া গিয়া, সে সরল সত্যের পথে জোর করিয়া চলিতে পারিবে!

এই কথাটা ক্রমে তাহাকে একেবারে পাইয়া বসিল। তাহার মনে হইল, ইহা যেন বিধাতার ইঙ্গিত! এমনি করিয়া তাহার সকল বাধা সরাইয়া, ভগবান্ তাহাকে মনোরমার সম্মুখীন করিয়া দিতেছেন—তার একটা শেষ পরীক্ষার জন্য। আর কোনও কথা তার মনে হইল না। হিতাহিত, সুবিধা-অসুবিধার কথা সে চেষ্টা করিয়াও ভাবিতে পারিল না;—এই কল্পনার প্রবল স্রোতে তার সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ন্যায়ান্যায়, সুবিধা-অসুবিধার সকল বিচার ভাসিয়া গেল;—সে প্রবল বন্যার স্রোতে একটা কুটার মত ভাসিয়া চলিল,—তার নিজের ভাবনা-চিন্তার উপর যেন আর তার কোনও হাত রহিল না।

তার মনের ভিতর সে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা অনুভব করিল। যুদ্ধের প্রাক্কালে বীরের হৃদয় যেমন উৎসাহে ভরিয়া উঠে, তেমনি তাহার হৃদয় উৎসাহিত হইয়া উঠিল। আবার তেমনি একটা বিদ্রোহী আশঙ্কায় থাকিয়া-থাকিয়া সে পীড়িত হইতে লাগিল। এ কথা তার এক-একবার মনে হইতে লাগিল যে, এ পথ তার সর্ব্বনাশের পথ। জীবনে যা' কিছু শ্রেয়ঃ ও প্রেয় বলিয়া সে আশ্রয় করিয়াছে, সব বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে সে এ পথে পা দিয়া। কিন্তু তবু যেন তার মনে হইতে লাগিল, এ পথে না গিয়া তাহার উপায় নাই। একবার তার নষ্ট জীবনের জন্য সে বেদনায় কাতর হইল,—আর একবার তার কর্ত্তব্যের গৌরবে তার রক্ত তাতিয়া উঠিল। এমনি উত্তেজনা ও বেদনার ভিতর দিয়া সে রাত্রিটা কাটাইয়া দিল।

সকাল-বেলায় উঠিয়া সে ষ্টেসনে গেল,—মনোরমাকে আনিবার জন্য। গত রাত্রে তার মনের ভিতর ভাবের যে

তাণ্ডব নৃত্য হইয়াছিল, তাহাতে তাহার চিত্ত একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এখন সে ক্লান্ত, শীর্ণ ও কতক ভীত চিত্তে, তার জীবনের প্রধান সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিল। এখন তার আর নিজেকে যুদ্ধোন্মুখ বীরের মত মনে হইল না, বরং বলির পশুর মত মনে হইল। কিন্তু তার যে ফিরিবার উপায় আছে, তাহা তাহার মনে হইল না। যাহা আসিতেছে, তাহা যে একটা আপদ, তাহা সে স্পষ্ট বুঝিল। কিন্তু তার এমন একটা মোহ আছে যে, তাহা কেবল যে তাহাকে ঘাড় পাতিয়া লইতে হইবে, তাহা নহে,—তাহাকে আগ-বাড়িয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইতে হইবে।

ষ্টেসনে আসিয়া তাহাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। ট্রেণ প্রায় এক ঘণ্টা দেরীতে আসিল। ততক্ষণ সে শুষ্ক মুখে নিস্পন্দ জড় দেহের মত একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া রহিল। যখন ট্রেণ আসিয়া পৌঁছিল, তখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল,—তার বুকের ভিতর ধড়াস্-ধড়াস্ করিতে লাগিল,—কাণ দুইটা গরম হইয়া উঠিল,—সে অতি কষ্টে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর সে প্রত্যেক গাড়ীর কাছে গিয়া, ব্যস্ত ভাবে খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল।

সমস্ত ট্রেণের ইণ্টারমিডিয়েট ও থার্ড ক্লাশ সে তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিল—মনোরমার চিহ্নও দেখিতে পাইল না। সে আসে নাই।

একটা স্বস্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া সে থামিল। কপালের ঘাম মুছিয়া সে আস্তে-আস্তে ষ্টেসনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সকাল-বেলার আলোটা এখন তাহার চক্ষে একটু বেশী উজ্জ্বল বলিয়া মনে হইল। লোক-জনের চলা-ফেরার মধ্যে সে যেন একটা আনন্দের সাড়া অনুভব করিল। তা'র প্রাণটা অসম্ভব রকম হাল্কা হইয়া উঠিল।

মনোরমা এ ট্রেণে আসিতে পারে নাই, পরেও আসিতে পারে। কাজেই সে যে একেবারে মুক্তি পাইল, এ কথা মনে করিবার তার কোনও হেতু ছিল না। কিন্তু এখনকার মত যে সে পরীক্ষাটা হইতে মুক্তি পাইল, তাহাতেই যেন সে অসম্ভব স্বস্তি বোধ করিল; এমন কি, তার মনে হইল যে, সরিৎকেও এ খবরটা তার দিয়া যাওয়া উচিত।

ষ্টেসনের বাহিরে একখানা গাড়ীতে মাল উঠাইতেছিল। ভিতরে বোরখা-পরা একটি স্ত্রীলোক বসিয়া ছিল। বাহিরে দাঁড়াইয়া একটি ভদ্র মুসলমান মালের তদ্বির করিতেছিলেন। মেঘনাদকে দেখিয়া ভদ্রলোক সেলাম করিলেন,—মেঘনাদ চিনিল, সে মণি মিঞা!

"এই যে ডাক্তার বাবু, কি মনে করে?" বলিয়া মণি মিঞা একটু হাসিল। মেঘনাদের মনে হইল, যেন বোরখা-পরা স্ত্রীলোকটী তাহার দিকে চাহিল।

মেঘনাদ বলিল, "এসেছিলাম,—আমার একটি লোক আসবার কথা ছিল।"

মণি মিঞা বলিল, "কোথা থেকে?"

"ময়মনসিং থেকে।" কথাটায় মেঘনাদ একটু বিরক্ত হইল। সে তাড়াতাড়ি বিদায় হইয়া গেল। মণি মিঞা গাড়ীতে উঠিয়া স্ত্রীলোকটির পাশে বসিল। গাড়ী যখন মেঘনাদের পাশ দিয়া যায়, তখন মেঘনাদ দেখিতে পাইল, তাহারা দুজনেই মেঘনাদের দিকে চাহিয়া কি কথা বলিতেছে, এবং সে শুনিতে পাইল, স্ত্রীলোকটী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সে হাসির শব্দ শুনিয়া মেঘনাদ চমকিয়া উঠিল। একবার মনে হইল, ছুটিয়া গিয়া মণি মিঞাকে জিজ্ঞাসা করে;—কিন্তু পরক্ষণে সে নিজেকে সংযত করিল। আপদ যদি আপনি বিদায় হইয়া যায়, তবে, তাহাকে টানিয়া ঘাড়ে আনিবার কি প্রয়োজন! কিন্তু তাহার সন্দেহ রহিল না যে, বোরখার ভিতর যে ছিল, সে মুসলমানী নয়,—সে মনোরমা!

সংশয় মিটাইবার জন্য সে জগদীশের কাছে টেলিগ্রাম করিল। উত্তরে সে জানিল যে, মনোরমা জগদীশের মুহুরীর সঙ্গেই কলিকাতা রওনা হইয়াছিল। পথে জগন্নাথগঞ্জে তাহার মণি মিঞার সঙ্গে দেখা হয়। সে মণি মিঞার সঙ্গেই কলিকাতায় যাইবে বলিয়া, জগদীশের মুহুরীকে বিদায় দিয়াছে। তার পর তাহারা কোথায় গিয়াছে, তাহা জগদীশ জানে না।

মেঘনাদের ঘাড় হইতে একটা প্রকাণ্ড বোঝা নামিয়া গেল। সে কতকটা সহজ ভাবে নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিল। এতদিন ধরিয়া তাহার সমস্ত জীবন যে একটা পাপের বোঝায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহা নামিয়া গিয়া, যেন

তাহাকে একেবারে মুক্ত করিয়া দিয়া গেল,—তার প্রাণটা অসম্ভব রকম হাল্কা বোধ হইল।

কিন্তু সরিৎ! সে তো এখনও কোনও খবরই পাঠাইল না! তাহাকে ফিরাইবার কি উপায়? একবার মেঘনাদ ভাবিল, সে নিজে গিয়া তা'র সঙ্গে দেখা করিয়া, সব কথা বলিলেই বোধ হয় সব মিটিয়া যাইবে। কিন্তু সে সাহস তাহার হইল না। চিঠিতে সরিৎ যে রকম শাসাইয়াছে, তাহাতে ও-বাড়ীতে মেঘনাদ গেলে, তা'র পক্ষে ভয়ানক একটা কিছু করিয়া ফেলা অসম্ভব নয়। তাহাকে চিঠি লিখিলেও সে তাহা পড়িবে কি না সন্দেহ। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে জগদীশের টেলিগ্রামখানা ডাকে সরিতের কাছে পাঠাইয়া দিল। খবরটা পাইলে হয় তো সরিৎ আপনি ফিরিয়া আসিবে, তাহার এইরূপ আশা হইল।

(ক্রমশঃ)

রক্ত বনাম জল

[শ্রীভিক্ষু সুদর্শন]

(১)

"আগামী রবিবার, সেণ্ট জোসেফ কলেজের রেভারেণ্ড মঙ্গল কচ্ছপ বি এ টোডাদের মধ্যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে ছয় ঘটিকার সময় বক্তৃতা করিবেন। সকলের উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয়।" সীতাগড়ের দেশীয়-গণের জন্য নির্ম্মিত গির্জ্জার বহির্দ্দেশস্থ বোর্ডের এই বিজ্ঞাপনটী তিনজনে পড়িতেছিলেন। একজন বৃদ্ধ, একজন বৃদ্ধা (বৃদ্ধের স্ত্রী), এবং তৃতীয়া যুবতী কুমারী—বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার দূর-সম্পর্কীয়া ভ্রাতুষ্পুত্রী। ভ্রাতুষ্পুত্রীটীর সংসারে কেহই না থাকায়, তিনি বৃদ্ধের পরিবারভুক্তা হইয়াছিলেন। বৃদ্ধের সন্তানাদি ছিল না;—তাই, দূর-সম্পর্কিতা হইলেও, যুবতী বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার সন্তানেরই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনজনই দেশীয় খৃষ্টান।

বিজ্ঞাপনটী যুবতী বার-বার পড়িতে লাগিলেন। অন্যের পক্ষে বিজ্ঞাপনে কিছুই বিশেষত্ব ছিল না। কিন্তু, যুবতী মনে করিতেন যে, অশিক্ষিত অখৃষ্টীয়ানদের মধ্যে ধর্ম্ম-প্রচারের ন্যায় সাধু কার্য্য আর জগতে হইতে পারে না। তাই তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত বিজ্ঞাপনটী পাঠ করিতে-করিতে, তাঁহার খুড়িমাকে বলিলেন, "খুড়িমা! শুনিয়াছ! এই বক্তা নিজে একজন টোডা। বাল্যকালে ইঁহাকে ইঁহার মাতা অপরের নিকট বিক্রী করেন। একজন ইংরাজ মিশনারী ইঁহাকে উদ্ধার করিয়া শিক্ষা দেন। ক্রমে ইনি সম্মানের সহিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এখন মিশনারী হইয়াছেন। এক্ষণে নিজ জাতিকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে যাইবেন। শুনিলাম, আমাদের ইংরাজ ধর্ম্ম-প্রচারকের সহিত কিছুদিন এখানেই বাস করিবেন।"

বৃদ্ধ এই কথা শুনিয়া শ্লেষ-সহকারে বলিলেন, "আমার উপদেশ যদি এই রেভারেণ্ড মঙ্গল কচ্ছপ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, আমি তাঁহাকে এই পরামর্শ দিই যে তিনি যেন কদাচ টোডাদের মধ্যে না যান। আমি কিছুদিন ঐ সকল জনপদে কার্য্য করিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বরং কচ্ছপ মহাশয় সভ্য দেশে সম্মানিত হইবেন; কিন্তু অসভ্য দেশে তাঁহাকে কেহ সম্মান ত করিবেই না, অধিকন্তু তিনি এ দেশে থাকিয়া যে সভ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাকে তাহা বিসর্জ্জন দিয়া পুনর্ব্বার অসভ্য হইতে হইবে।"

বৃদ্ধা এ মন্তব্যে দুঃখিতা হইয়া স্বামীকে বলিলেন, "এ রকম অখৃষ্টীয়ের ন্যায় কথা তুমি কি করিয়া বলিলে, বুঝিতে পারিলাম না। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে কি একই রক্ত প্রবাহিত হইতেছে না?" স্বামী উত্তর করিলেন, "দেখ, আমি প্রকৃত খৃষ্টানেরই ন্যায় আচরণ করিয়া থাকি। কিন্তু, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা খুব সত্য কথা। অসভ্য কালো কখনও সাদা হয় না; রক্ত জলের অপেক্ষা বরাবরই গাঢ়। কচ্ছপ মহাশয় বি-এ পাশই করুন, আর যাহাই করুন, উনি চিরকাল অসভ্যই থাকিবেন।"

নির্দ্ধারিত দিবসে রেভারেণ্ড মঙ্গল কচ্ছপ বি-এ সীতাগড়ে উপনীত হইয়া, ইংরাজ পাদরীর গৃহে অতিথি হইলেন। বি-এ পাশ টোডা পাদরীকে দেখিবার জন্য সীতাগড়ের আবাল-বৃদ্ধ সকলেই অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। সীতাগড় দেশীয় খৃষ্টানগণের উপনিবেশ হইলেও, ইতঃপূর্ব্বে তথায় অসভ্য জাতিভুক্ত বি এ পাশ পাদরী কেহ উপস্থিত হন নাই। তাই এই অভূতপূর্ব্ব মানুষটী দেখিবার জন্য সকলেরই আগ্রহান্বিত হইবার কথা।

পরদিবস আরও একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। এ যাবৎ, ইংরাজ মিশনারী মহাশয় বড়দিন ব্যতীত অন্য কোন সময়ে কোন দেশীয় খৃষ্টানকে কোন ব্যাপারেই নিমন্ত্রণ করা সঙ্গত মনে করেন নাই। কিন্তু, এবার তাঁহার "টেনিস্ পার্টিতে" কমলার নিমন্ত্রণ হইল। নিমন্ত্রণ হইবার একটী বিশেষ কারণ ছিল। ইংরাজ পাদরী মহাশয় এবং টোডা জাতিকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল সেই সমিতির সভাপতি মহাশয়, স্থির করিয়াছিলেন যে, টোডা জাতীয় কচ্ছপ মহাশয়ের সহিত সুসভ্য বাঙ্গালী যুবতীর উদ্বাহ ব্যাপার সমাধা হইলে কচ্ছপ মহাশয়ের মান বৃদ্ধি হইবে। কমলা খুব সম্ভবতঃ এইরূপ মহৎ কার্য্যে ব্রতী টোডা মঙ্গল কচ্ছপকে বিবাহ করিতে অসম্মত নাও হইতে পারেন। এই সদুদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশ্যেই আজ ইংরাজ মিশনারী মহাশয় কমলাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

টেনিস্-ক্ষেত্রে রেভারেণ্ড মঙ্গল কচ্ছপ ও কমলার দেখা হইল। কমলা দেখিলেন যে, কচ্ছপ মহাশয় টোডা হইলেও, দেখিতে মন্দ নহেন। টেনিসে তিনি বিশেষ পারদর্শী; কথোপকথনে তিনি চিত্তাকর্ষণে সুদক্ষ; ব্যবহারে বিশেষ ভদ্র। দিশী বিলাতী অনেক গ্রন্থকারের সহিতই তিনি সুপরিচিত। ফলে কচ্ছপ মহাশয় টোডা হইলেও কমলা তৎপ্রতি অল্প-বিস্তর আকৃষ্টা হইল। অধিকন্তু, কমলার সহিত যখন তাহার, টোডাদের খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সম্বন্ধে কথোপকথন হইতে লাগিল, তখন কমলার বোধ হইতে লাগিল, যে, এরূপ ব্যক্তির পক্ষেই ওরূপ কার্য্যের ভার গ্রহণ করা, এবং তাহা সুসম্পন্ন করা, সম্ভবপর। গৃহে প্রত্যাগমন কালে কমলার মনে হইতে লাগিল যে তিনি সত্যই একটী কর্ম্মবীরের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন। অবশ্য, মঙ্গল কচ্ছপের সম্বন্ধে কমলার এই যে সমানুভূতির ভাব, ইহাকে প্রেম বা অনুরাগ বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হয়; কারণ, উভয়ের রক্তে কত প্রভেদ। তথাপি, কমলার মনে হইতে লাগিল যে, তিনি মানুষের মত একটী মানুষের দেখা পাইয়াছেন।

রেভারেণ্ড মঙ্গল কচ্ছপের হৃদয়ে অবশ্য প্রথম দর্শনেই ভালবাসার সূত্রপাত হইয়াছিল। উচ্চশিক্ষিত এবং খ্রীষ্টীয়ান হইলেও, তাঁহাকে যে কোন সাহেবের কন্যা বরমালা প্রদান করিবে, তাহা তিনি কখনও মনে স্থান দেন নাই। তবে উচ্চশিক্ষিতা সদ্বংশজাতা কমলা যে তাঁহার প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানে সহানুভূতি দেখাইয়া, অনেকক্ষণ তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি কৃতার্থ হইয়াছিলেন; এবং সঙ্গে-সঙ্গে কমলার মনোরঞ্জক কথোপকথন, এবং তদুপরি সুন্দর মুখ দেখিয়া, তিনি তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন।

রবিবার ৬ ঘটিকার সময় যখন রেভারেণ্ড মঙ্গল কচ্ছপ এক-ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতায় অসভ্য, বর্ব্বর টোডাদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের আবশ্যকতা এবং সঙ্গে-সঙ্গে সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিলেন, তখন আর কাহারও চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটুক, কমলা ও তাঁহার খুড়িমা যে অভিভূতা হইয়া পড়িলেন, তাহা সভাস্থ সকলের নিকটই প্রতীয়মান হইল। ইহার ফলে কমলা ও খুড়িমা রেভারেণ্ড মঙ্গল কচ্ছপের টোডাত্ব ভুলিয়া গেলেন; এবং তাঁহাকে সাদরে স্বগৃহে কিছুদিন বাস করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। কচ্ছপ মহাশয় এই সাদর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিলেন না।

দেখিতে-দেখিতে সুদীর্ঘ দুই মাস কাটিয়া গেল। রেভারেণ্ড কচ্ছপ সীতাগড়ের লোক সকলের সহানুভূতি আকর্ষণার্থ একটি বক্তৃতা দিতে তথায় আসিলেন; কিন্তু ঘটনাচক্রে তিনি দুই মাস তথায় বাস করিলেন। এই দুই মাস অতীত হইবার পূর্ব্বে, একদিন নদী-তীরে কমলার সহিত ভ্রমণকালে, কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "দেখুন, টোডাদের মধ্যে খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করিয়াছি; কিন্তু সুশিক্ষিত সমাজে দীর্ঘকাল বাস করিবার পর জীবনের অবশিষ্টাংশ (যদিও আমি নিজে টোডা) তাহাদের মধ্যে একাকী বাস করা সুকঠিন। বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইবে, অথচ, হয় ত আমি একজন সভ্য খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীর দেখা পাইব না। একজন স্বধর্ম্মী সঙ্গী পাইলে. আমার নানা রকমেই সুবিধা

হয়।” কমলা উত্তর করিলেন, “অবশ্য, ওরূপ স্থানে আপনাকে সত্যই বড় নির্জ্জন জীবন যাপন করিতে হইবে। আমারও মনে হয় যে, আপনার একজন সঙ্গী থাকা আবশ্যক।”

“সত্যই কি আপনি তাহাই মনে করেন? মানুষের একাকী বাস নির্জ্জন কারাবাসের ন্যায়। আমি কি কোন দিন আপনাকে সঙ্গিনীরূপে পাইতে পারি?” কচ্ছপের এ কথায় কমলা চমকিয়া উঠিলেন। কচ্ছপ মহাশয় পণ্ডিত, ভদ্র,—সবই ভাল; কিন্তু তথাপি কমলা এরূপ প্রশ্নের প্রত্যাশা করেন নাই। তাই তিনি কেবল উত্তর করিলেন “আপনি কি করিয়া এরূপ প্রশ্ন করিলেন?”

কচ্ছপ মহাশয় কমলাকে তাঁহার প্রশ্নে বিচলিতা হইতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। একজন টোডার পক্ষে এরূপ প্রশ্ন করা যে সুসঙ্গত হয় নাই, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। তাই তিনি কমলার বেদনা দূর করিবার জন্য বলিলেন, “আপনিও কি আমাকে ঘৃণা করেন? যদি আমাকে ঘৃণাই করেন, তবে আমার প্রশ্নের উত্তর কোন দিনই প্রত্যাশা করি না। আর যদি ঘৃণা না করেন, তবে আপনাকে এই প্রস্তাবটীর সম্বন্ধে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। প্রশ্নের উত্তর আমি আজই চাহিতেছি না। আপনার যখন সুবিধা হইবে, আপনার মতামত আমাকে জানাইতে পারেন। আমি আপনাকে অপমান করিবার উদ্দেশ্যে ওরূপ প্রশ্ন করি নাই। কারণ আপনাতে ও আমাতে কত প্রভেদ, তাহা আমি খুব ভালরূপেই বুঝি। তবে আমি আপনাকে ভাল বাসি; এবং ইহা বেশ বুঝিতেছি যে, আপনাকে সঙ্গিনীরূপে পাইলে, শুধু যে আমার জীবন সার্থক হইবে, তাহা নহে; যে উদ্দেশ্যে আমি জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, সে উদ্দেশ্যও সাধিত হইবে। আমি বেশ বুঝি যে, একজন টোডাকে স্বামি-রূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা আপনার হইতেই পারে না। তবে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, টোডাকে গ্রহণের কথা মনে না করিয়া, যদি আমাকে কেবল সমধর্ম্মী বলিয়াই বিবাহ করেন, তবে আমি যে আপনাকে চির জীবন প্রগাঢ় ভাল বাসিব, সে প্রতিজ্ঞা করিতে পারি। আপনার নিকট আমি আজই উত্তর চাহিতেছি না। আপনি এক পক্ষ চিন্তা করুন। যদি তাহার পরে আপনি আমাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না হন, তবে আমি বলিতেছি যে, আর আমি আপনাকে এ সম্বন্ধে বিরক্ত করিব না।”

কমলা বুঝিলেন যে, রেভারেণ্ড মঙ্গল কচ্ছপ কথাগুলি অন্তরের সহিতই বলিলেন।

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, কমলা তাঁহার খুড়িমার নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। খুড়িমা ইতঃপূর্ব্বেই কচ্ছপ মহাশয়ের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সরল সদ্ব্যবহার, ভদ্রোচিত কথোপকথন, বিদ্যা,—সর্ব্বোপরি খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে তীব্র আকাঙ্ক্ষা,—এই সমস্ত কথা বিবেচনা করিয়া এই যুবকের সহিত কমলার বিবাহ তিনি কিছুতেই অযোগ্য সম্মিলন মনে করিতে পারিতেছিলেন না। তাই তিনি শুধু সম্মতি দিয়া ক্ষান্ত হইলেন না; যাহাতে কমলা অসম্মতি প্রকাশ না করে, তজ্জন্য তিনি তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

খুল্লতাত মহাশয় কিন্তু এ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিলেন। “সর্ব্বনাশ! একজন সুশিক্ষিতা উচ্চবংশজাতা বাঙ্গালী যুবতী একজন টোডাকে বিবাহ করিবেন! হোক না সে টোডা ভদ্রলোক, হোক না সে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী, হোক না সে পাদরী;—এরূপ বিবাহ কদাপি হইতে পারে না। এরূপ কথা শুনিয়াই আমার রক্ত গরম হইয়া উঠিয়াছে।”

কিন্তু খুড়িমা বুঝাইতে লাগিলেন, যে, ইহা কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্য ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। রেভারেণ্ড মঙ্গল কচ্ছপ অসভ্য, বর্ব্বর, অখ্রীষ্টীয়ান জাতিকে খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। কমলাও এইরূপে জীবন উৎসর্গ করুক। তাহার জীবন ধন্য হইবে। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রস্তাব আর হইতে পারে না। ফলে, কমলার আর কিছু বলিবার থাকিল না। কচ্ছপের প্রতি তিনি ইতঃপূর্ব্বেই আকৃষ্টা হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি মনে করিলেন যে, ধর্ম্মের জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিবেন। ক্ষণভঙ্গুর জীবনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা মহত্তর কার্য্য আর কিছুই হইতে পারে না।

পক্ষান্তে কচ্ছপ মহাশয় তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে পাইলেন শুধু ক্ষুদ্র একটী “হাঁ”। শুনিয়া তিনি সম্ভ্রম সহকারে কমলার দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া ২।৩ টী অঙ্গুলি চুম্বন করিলেন। কমলা এ চুম্বনে আবার চমকিয়া উঠিলেন। এবারও ইহা কচ্ছপের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কচ্ছপ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, টোডা হইলেও তিনি কমলাকে এরূপ ভালবাসিবেন যে, কমলা ভুলিয়া যাইবেন যে তিনি টোডা।

শুভবিবাহ হইয়া গেল—কচ্ছপ এবং কমলা সীতাগড় ত্যাগ করিয়া টোডাদের দেশে চলিলেন।

(২)

সেভাবেও মঙ্গল কচ্ছপ এবং কমলা টোডাদের দেশে—মঙ্গল কচ্ছপের স্বদেশে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তাঁহাদের জন্য একখানি ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। একজন অল্প-শিক্ষিত খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী টোডা ও তাহার পত্নী তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কমলা নূতন দেশে যাইয়া, নূতন কার্য্যক্ষেত্রে স্বামীর আদরে সময় কাটাইতে লাগিলেন। কমলা প্রায়ই তাঁহার খুড়িমাকে পত্র দিতেন। পত্র স্বামীর গুণগানে পূর্ণ। মঙ্গল কচ্ছপও প্রাণ ভরিয়া কমলাকে ভালবাসিতে লাগিলেন। কমলার গুণেও তিনি মোহিত হইয়াছিলেন। সভ্যদেশ ছাড়িয়া, প্রাণপ্রিয় খুল্লতাত ও ততোধিক প্রিয়তমা খুল্লতাত-পত্নীকে ছাড়িয়া আসিয়া, নানারূপ ক্লেশ হইলেও, কমলা সে সকল গ্রাহ্য করিতেন না। প্রাণপণে স্বামীকে ভালবাসিতেন, স্বামীর সেবা করিতেন। তাই উভয়েরই দিন ভাল ভাবেই কাটিতেছিল।

পৌছিবার তিন-চারি মাস পরে কচ্ছপ মহাশয় একদিবস স্বদেশে একটী কদাকার টোডা স্ত্রীলোককে অৰ্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় দেখিয়া চমকিত হইলেন। কমলা তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন; স্বামীকে এরূপ ভাবে চমকিত হইতে দেখিয়া কমলা কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কচ্ছপ স্ত্রীকে এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু কমলা তথাপি কারণ জানিবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন, "উনি কি তোমার কোন আত্মীয়া?" "আমার মনে হইতেছে, উঁহাকে আমি যেন চিনি। হাঁ, আমার মনে পড়িয়াছে, উনি আমার মাসীমা। খুব বাল্যকালে উঁহাকে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু, ও সম্বন্ধে আমাকে আর প্রশ্ন করিও না।" কমলা স্বামীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে আর তাঁহাকে বিরক্ত করিলেন না; কিন্তু, সেই অসভ্য, কদাকার স্ত্রীলোককে আরও কিছুক্ষণ পরে আবার তথায় দেখিতে পাইয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। কমলা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন যে, স্বামী টোডাদের সম্বন্ধে এক্ষণে ভিন্ন মত প্রকাশ করিতেছেন। প্রথমে কচ্ছপ টোডাদের পৌত্তলিকতা ও বর্ব্বরতার জন্য আক্ষেপ করিতেন; এক্ষণে তিনি আর সেরূপ আক্ষেপ করেন না। তিনি মনে করেন যে, উহাদের ঐরূপ ব্যবহার স্বাভাবিক। একদিন তিনি স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া কমলার নিকট নিজের পিতার কথা বলিতে লাগিলেন—ইতঃপূর্ব্বে তিনি আর কোনও দিন এ কথার উল্লেখ করেন নাই—"তাঁহার কথা আমার বেশ মনে পড়ে। তিনি এক জন বড় যোদ্ধা ছিলেন; তাঁহার বহু পত্নী ছিল। তিনি যুদ্ধে পরাভূত হইলে আমি বিক্রীত হই। তাঁহার বড় প্রাসাদ ছিল, অনেক দাসদাসী ছিল।" কমলার মনে হইতে লাগিল, কচ্ছপ বিশেষ গর্ব্ব ও আহ্লাদের সহিত তাঁহার পিতার ক্ষমতার কথার আলোচনা করিতেছেন। তাঁহার মনে কি এক রকম ভয় হইল। রক্তের টান, খুড়া মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, সত্যই কি বেশী? সত্যই কি স্বামীর ধমনীস্থ টোডা-রক্ত সভ্যতার উপর, শিক্ষার উপর, ধীরে ধীরে, অলক্ষ্যে প্রাধান্য লাভ করিতেছে?

একদিন সন্ধ্যাকালে কচ্ছপ ও কমলা তাঁহাদের গৃহের বহির্দ্দেশে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে অদূরে ঢাকের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। শস্য-সংগ্রহের অব্যবহিত পরেই টোডাগণ অত্যধিক আমোদ-প্রমোদ করিত। ঢাকের সঙ্গে-সঙ্গে অমানুষিক চীৎকার ও গীতধ্বনি শ্রুত হইল। কমলা এই সকল শব্দে ভীত হইলেন। কিন্তু, কচ্ছপ প্রশান্ত চিত্তে পত্নীকে বলিলেন, "উহাতে ভয় করিবার কিছুই নাই। প্রচুর শস্য গৃহে আসিয়াছে, তাই উহারা আহ্লাদে নৃত্যগীত করিতেছে।" কমলা শুনিয়া বলিলেন, "কিন্তু কি সর্ব্বনেশে বাদ্য ও চীৎকার!" কচ্ছপ আশ্বাসের ভাষায় পত্নীকে বলিলেন, "উহারা ত কাহারও ক্ষতি করিতেছে না; উহারা আনন্দ প্রকাশ করিতেছে।" এই বলিয়া তিনি ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে-সঙ্গে তাল দিতে লাগিলেন।

গীত-বাদ্যধ্বনি নিকটতর হইতে লাগিল। কচ্ছপ কমলাকে বলিলেন, "শুনিতে পাইতেছ না? কি সুন্দর! কি মধুর! ইহা তোমাদের বাঙ্গালা গীতাপেক্ষা মিষ্ট! ইংরাজী বাদ্যাপেক্ষা হৃদয়োন্মাদকর।" এই বলিয়া, পাদরীর পোষাক পরিহিত হইলেও, তিনি গৃহমধ্যে, বহির্দ্দেশস্থ বাদ্যধ্বনির সহিত তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

কমলা চীৎকার করিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিতে লাগিলেন। যদি অন্য কেহ তাঁহাকে ঐ ভাবে দেখিয়া ফেলে!

কি সর্ব্বনাশ! কিন্তু কচ্ছপ তখন আর তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতেছিলেন না। তিনি স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ! এ নাচটা ঠিক এই রকম। এই রকম করিয়া পা ফেলিতে হয়। এই ভাবে বন্দুক ধরিতে হয়—এই ভাবে তরবারি গ্রহণ করিতে হয়। বস্! শত্রুকে কাটিয়া ফেল—তৎপরে তাহার মাথাটা লইয়া এই ভাবে ফুটবল খেল! কি সুন্দর! কি চিত্তাকর্ষক।" কথা কহিতে-কহিতে তাঁহার চক্ষে অমানুষিক দীপ্তি খেলিতে লাগিল।

কমলা মর্ম্মান্তিক আহত হইলেন। স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সর্ব্বনাশ! তুমি কি করিতেছ? কি বলিতেছ? এরূপ পাশবিক আচরণ করিতেছ কেন? এরূপ করিলে আর ত আমি তোমাকে কোন দিন ভালবাসিতে পারিব না।"

মুহূর্ত্তমধ্যে কচ্ছপের চক্ষের সে অমানুষিক ভাব দূর হইল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, কমলা তাঁহাকে তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা আঘাত করিয়াছেন। তিনি শান্ত হইয়া বলিলেন, "কমলা! আমি কি করিয়াছি! তুমি নিশ্চিন্ত থাক; আর কদাপি এরূপ করিব না। এবার আমায় ক্ষমা কর।" কমলা কাঁপিতে-কাঁপিতে স্বীয় হস্তে কচ্ছপের হস্ত গ্রহণ করিলেন। কচ্ছপ কমলার হস্তদ্বয়মধ্যে নিজ মুখ রাখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

কমলা ও কচ্ছপের বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ এক বৎসর অতিবাহিত হইল। কচ্ছপ মহাশয় এই সময়ে অনেককে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন; পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। কমলা বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

এক বৎসর যে দিন পূর্ণ হইল, সেই দিন বালিকা-বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কমলা দেখিলেন, স্বামী গৃহে নাই। সে দিন তাঁহার জ্বর বোধ হইতেছিল। কুইনাইনের শিশি অনুসন্ধান করিতে-করিতে তিনি ভাণ্ডার-গৃহে আসিয়া, দেখিলেন, মনুয়া মদের বোতল রহিয়াছে—বোতলটী একেবারে খালি। এক অব্যক্ত ভয়ে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কাঁপিতে-কাঁপিতে শয্যাকক্ষে যাইয়া তিনি দেখিলেন, শয্যোপরি রেভারেণ্ড কচ্ছপ মহাশয়ের বসন ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। তিনি এবার বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, রক্ত প্রকৃতই জলের অপেক্ষা গাঢ়। তাঁহার স্বামী ইংরাজী সভ্যতার বক্ষে পদাঘাত করিয়া পুনর্ব্বার টৌডাত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কক্ষের, তথা হইতে গৃহের, এবং ক্রমে প্রাচীরের বহির্ভাগে আসিলেন। দূরে ঢাকের বাদ্য ও সঙ্গে-সঙ্গে বিকট চীৎকার এবং হাস্যধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। কি এক অজ্ঞাত শক্তি তাঁহাকে দূরে—যে স্থান হইতে বাদ্যধ্বনি আসিতেছিল, সেই দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, অনেকগুলি টোডা স্ত্রী-পুরুষ একত্র মিলিত হইয়া মহানন্দে নৃত্যগীত করিতেছে; আর তাহাদেরই মধ্যস্থানে টোডার বেশে তাঁহারই স্বামী—রেভারেণ্ড মঙ্গল কচ্ছপ বি-এ টোডাদের ন্যায় বিকট নৃত্য করিতেছেন।

সত্যই, রক্ত জলের অপেক্ষা গাঢ়। টোডার রক্ত সভ্যতার উপরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কমলা ভীতি-বিহ্বল চিত্তে, উন্মাদ নেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কচ্ছপও স্ত্রীকে দেখিলেন। দেখিবামাত্র বিকট চীৎকার করিয়া তিনি আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন; এবং কমলার দিকে দৌড়াইয়া আসিলেন। নিকটে আসিয়া দেখিলেন, কমলা যেন বাহ্যজ্ঞানবিরহিতা। তাই তিনি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া আবাসে আসিলেন। সে সময়ে তিনি আর টোডা মঙ্গল কচ্ছপ নহেন;—তিনি রেভারেণ্ড মঙ্গল কচ্ছপ বি-এ, টোডাদের খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে ব্রতী—বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী সুসভ্য ব্যক্তি। ধীরে-ধীরে তিনি কমলাকে গৃহে আনিলেন;—দেখিলেন, কমলার ভয়ানক জ্বর হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্ত অল্প-শিক্ষিত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী টোডার স্ত্রীকে ডাকিয়া আনিয়া, তাহারই হাতে কমলাকে দিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

(৩)

টোডাদের জনপদ হইতে মিশনারীদের অন্য গির্জ্জা প্রায় পঞ্চবিংশতি মাইল দূর। এই পঁচিশ মাইল পথ টোডাদের বেশ-পরিহিত একজন টোডা উলঙ্গ, পাদুকাবিহীন অবস্থায় প্রাণপণে দৌড়াইতেছিল। যখন সে গির্জ্জার নিকটস্থ মিশনারীদের আবাসে পৌঁছিল, তখন যেন সে একপ্রকার সংজ্ঞাহীন। কিন্তু তাহাতে তাহার দৃক্‌পাত নাই। সে তত্রস্থ মিশনারী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া বলিল যে, রেভারেণ্ড মঙ্গল কচ্ছপ একপ্রস্থ পোষাকের জন্য তাঁহাকে মিশনারী মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছেন। মিশনারী টোডাকে জিজ্ঞাসা

করিলেন যে, কচ্ছপ মহাশয় কোন পত্র দিয়াছেন কি না? টোডাটী ছোট একখানি পত্র দিল। তাহাতে কচ্ছপ মহাশয় লিখিয়াছেন যে, টোডাগণ তাঁহার গৃহে যাইয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে; এক্ষণে তিনি উপযুক্ত বস্ত্রাভাবে গৃহের বহির্ভাগে যাইতে পারিতেছেন না। মিশনারী মহাশয় কচ্ছপ মহাশয়ের পত্রানুযায়ী টোডাকে এক প্রস্থ পরিধেয় প্রদান করিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, পত্রবাহককে যেন তিনি কোথাও দেখিয়াছেন; কিন্তু তিনি স্থির নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। বস্তুতঃ ঐ টোডা আর কেহই নহে—রেভারেণ্ড মঙ্গল কচ্ছপ বি-এ স্বয়ং। কিন্তু, এই টোডা-বেশধারী, উলঙ্গ, পাদুকাবিহীন ব্যক্তিই যে মঙ্গল কচ্ছপ, তাহা কল্পনা করা মিশনারী মহাশয়ের পক্ষে প্রকৃতই স্বপ্নাতীত ব্যাপার ছিল।

কচ্ছপ আবার দৌড়াইতে লাগিলেন; আবার পঞ্চবিংশ মাইল অতিবাহিত হইল। স্বীয় গ্রামের বহির্ভাগে উপনীত হইয়া তিনি যত্নসহকারে মিশনারী-দত্ত পরিধেয় পরিধান করিলেন; এবং গ্রামাভ্যন্তরে পুনঃ প্রবেশ করিয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন।

কমলা অজ্ঞানাবস্থায় বিছানার উপর পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দেহের তাপ অত্যন্ত অধিক—মুখের সে সৌন্দর্য্য কে যেন হরণ করিয়াছে। দেখিলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। কচ্ছপ অনাহারে অনিদ্রায় বিছানার পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিলেন। কয়েক ঘণ্টা পরে তিনি কমলাকে চক্ষু মেলিতে দেখিলেন। মিশনারীর পোষাক পরিহিত স্বামীকে দেখিয়া, কমলা বিস্ময়ে ক্ষুদ্র একটী চীৎকার করিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিল, "তুমি এ পোষাক কোথায় পাইয়াছ?" কচ্ছপ ধীরে-ধীরে উত্তর করিলেন, "কোন্ পোষাক? আমি যাহা পরিয়া রহিয়াছি? কেন? এ ত আমার পুরাতন পোষাক—যাহা এত দিন পরিতেছি।" কমলা এবার আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওঃ, তাহা হইলে আমার বড় ভুল হইয়াছে। আমি কি তবে স্বপ্ন দেখিতেছিলাম?"

কচ্ছপ ধীরে-ধীরে কমলার মাথায় হাত দিতে লাগিলেন। "প্রিয়তমে! তুমি ঘুমাও। তোমার বড় জ্বর হইয়াছে;—তুমি যে কি বলিতেছ, বুঝিতেছি না।" "তাহা হইলে তুমি তোমার মিশনারীর পোষাক ছিঁড়িয়া টোডাদের সহিত নৃত্য কর নাই?" "না—না, কমলা! জ্বরের বিকারে তোমার এরূপ মনে হইয়াছিল।" "যাক্! তাহা হইলে আর আমার ক্ষোভের কারণ নাই! আমি এক্ষণে আহ্লাদে মরিতে পারিব।" এই বলিয়া কমলা আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

পাঁচদিন, পাঁচরাত্রি কমলা মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কোন সময় এক মিনিট, কোন সময় বা দুই মিনিটের জন্য তাঁহার জ্ঞান হইতে লাগিল। কচ্ছপকে তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট উপবিষ্ট থাকিতে দেখিলেন; কিন্তু সেই ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহাকে আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। অনিদ্রায়, উপবাসে কচ্ছপ যখন কমলার শুশ্রূষা করিতে-ছিলেন, তখন তিনি মনে-মনে বহুবার প্রতিজ্ঞা করিতেছিলেন যে, যদি এ যাত্রা কমলা বাঁচেন, তবে তিনি আর টোডাদের দেশে—স্বীয় জন্মভূমিতে থাকিবেন না; তিনি সীতাগড়ে সভ্যসমাজে প্রত্যাগমন করিবেন; কারণ, তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন যে রক্ত সর্ব্বদাই জলের অপেক্ষা গাঢ়।

পাঁচদিন পাঁচরাত্রি অবসান হইলে, কমলা পুনর্ব্বার চক্ষু মেলিলেন। স্বামীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য বল! আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা বিকারের প্রকোপ মাত্র?" কচ্ছপ উত্তর করিলেন, "প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, উহা বিকারের ঘোর মাত্র।" মনে-মনে বলিলেন, একবার কেন, কমলার আত্মাকে শান্তি দিবার জন্য, প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য, সহস্র সহস্রবার এরূপ মিথ্যা কথা বলিতে তাঁহার আপত্তি নাই। স্বামীর উত্তরে কমলার মুখে হাসি দেখা দিল। ইহাই তাঁহার শেষ হাসি।

পরদিন মঙ্গল কচ্ছপ স্বহস্তে কমলার জন্য মাটী খুঁড়িয়া, অতি যত্নে তাঁহাকে সমাহিত করিলেন। তিনি এ কার্য্যে অন্য কাহারও সাহায্য লইলেন না—কমলা যে তাঁহার বড় প্রিয় ছিলেন,—বড় পবিত্র ছিলেন। পরে তিনি তাঁহার পারলৌকিক মঙ্গল কামনায় অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রার্থনা করিয়া, মিশনারীর পোষাকটী ছিন্নভিন্ন করিলেন। তার পর মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "সভ্যতার সহিত আর আমি কোন সম্পর্ক রাখিব না। আর আমি ইংরাজী বা বাঙ্গালায় একটী কথাও উচ্চারণ করিব না। আমি যে টোডা, সেই টোডাই হইলাম।"

কেহ যদি এক্ষণে সেই স্থানে যাইয়া রেভারেণ্ড মঙ্গল কচ্ছপ বি-এ মহাশয়ের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে টোডারা তাহাদেরই একজনকে—তাহাদেরই ন্যায় উলঙ্গ, পাদুকাবিহীন একজনকে দেখাইয়া দেয়। রক্ত জল অপেক্ষা প্রকৃতই গাঢ়। *

* ইংরাজী গল্পের ছায়াবলম্বনে।

পথহারা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রমহলে একটা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। 'পোলিটিক্যাল ইকোনমি'র একজন প্রোফেসর, তাঁহার পড়ানোর ঘণ্টায়, কোন একজন ছেলেকে কি একটা তুচ্ছ বিষয়ের জন্য, কি না কি একটা মস্ত বড় শক্ত কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাই লইয়া গুরু-শিষ্য দলে চটাচটি হয়; এবং তাঁহাকে তাঁহার ছাত্রের কাছে 'এপোলজী' (ক্ষমা প্রার্থনা) করিতে হুকুমজারি করা হইলে, যথন তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না, তখন তাহারা নিজেদের 'গুরুমারা' বিদ্যা জাহির করিয়া তুলিল, এবং দল বাঁধিয়া কলেজ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। 'গুরুমারা' ছাত্রদলের পাণ্ডা ছাত্রটার নাম অসমঞ্জ রায়।

বিমল কলেজ হইতে অস্বস্থ চিত্তে মেসে ফিরিয়াই পুনশ্চ বাহির হইতেছিল,---অমৃত আসিয়া পথ আগুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খেলে না, কিছু না,—ব্যস্ত হয়ে কোথা চলেছ?"

বিমল বাধা পাইয়া, বিরক্ত চিত্তে উত্তর করিল, "সবদিনই কি খাই? দিন, যেতে দিন,—বিশেষ একটা দরকারে যাচ্চি।"

অমৃত দরজা ছাড়িল না; বরং হাত দিয়া সঙ্কীর্ণ পথটুকুও চাপিয়া রাখিয়া কহিল, "সেইজন্যেই তো আরও জান্‌তে চাই যে, রোজ-রোজ কোথা থেকে খেয়ে আসো? কার গাড়ীতে চেপে অত রাত্রে মেসে ফেরা হয়? কোথায় যাও?"

বিমলের স্বভাবে কোনদিনই তাহার কার্য্যের প্রতিরোধ সহ্য করা লেখা নাই। সে অত্যন্ত অসহিষ্ণু ও ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহার অভিভাবকের মুখের উপরেই বলিয়া বসিল, "যেখানেই যাই না কেন,—সে খোঁজে আপনার কিসের দরকার? দোর ছাড়ুন আপনি,—আমার নষ্ট করবার মত সময় নেই,—বেশ দেখতে পাচ্চেন।"

অমৃত অ-নড় হইয়া থাকিয়া, প্রশান্ত স্বরে কহিল, "এ তো আর সৎমা পাও নি, যে চোখ-রাঙানীতে ভয় পাওয়াবে। আমি আইন মতন তোমার গতিবিধির উপর নজর রাখতে বাধ্য যে,—সে তো আর তোমার রাগের ভয় করে ভুলে যেতে পারি নে। আমার অনুমতি না নিয়ে, অথবা আমার সঙ্গে ভিন্ন, তুমি কোথাও যেতে পাবে না,—সে আমিও বাপু তোমায় স্পষ্ট করে বলে দিচ্চি।"

বিমল মনে-মনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেও, এই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় অমৃতকে চিনিয়া লইতে তাহারও বাকি ছিল না। কাজেই নম্র মূর্ত্তি ধরিয়া, বিনয়ের সহিত কহিল, "সেদিন তো বলেছি আপনাকে, তাঁরা খুব ভদ্রলোক। সেখানে গেলে আমার পক্ষে ভাল ভিন্ন কোনমতেই মন্দ হতে পারবে না। একদিন আমি আপনাকে নিয়ে গিয়ে, তাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো,—তখন বুঝতে পারবেন, যা বলচি সত্যি কি না।"

অমৃত বলিল, "বেশ, তা যদি হয়, আমার কোনই আপত্তি নেই। আচ্ছা, তুমি এই চেকখানায় একটা সই দিয়ে দাও দেখি। চৌরঙ্গীর বাড়ী মেরামতের জন্য অনেকগুলো টাকার দরকার পড়েছে। ব্যাঙ্ক থেকে বার করতে হবে।"

বিমল অত্যন্ত ব্যস্ত,—সে তখন ইহার কবল হইতে উদ্ধার হইতে পারিলে বাঁচে। পকেট হইতে ষ্টাইলো পেনটা বাহির করিয়া, দ্রুতহস্তে সই করিয়া দিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "আজকাল আমার সই সবেতেই নেন যে? তার মানে কি?"

অমৃত মৃদু হাসিয়া কহিল, "কি জানো বাবা, এখন তুমি বড় হয়েছ,—আমার সই থাকলেও, তোমার একটা সই থাকাও আমি উচিত বোধ করি। কাজ যা করবে, একেবারে পাকা করে করাই ভাল। ভবিষ্যতে তাতে ঠক্‌তে হবে না।"

দোর খোলা পাইয়াই বিমলেন্দু ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। কাঁচা-পাকার উপদেশের আধখানার বেশি তাহার কাণের মধ্যে ঢোকেও নাই;—আর যাও বা ঢুকিয়াছিল, সেও যে একান্তই নিষ্ফল ভাবে, তা তাহার মনের এই একটুখানি চিন্তাতেই প্রকাশ পাইল,—সিঁড়ি দিয়া নামিতে-নামিতে সে এইটুকু মনে-মনে বলিতে-বলিতে নামিল যে, একবার সাবালক হইতে পারিলে বোঝা যায়! তোমার ঘাড়টা

তাহ'লে ভাল করিয়া ভাঙিয়া, আমার ঘাড় ভাঙ্গার শোধটা নিই!"

বিমলেন্দু বেলগাছিয়ার সেই বাড়ীতে পৌছিয়া, সোজা উপরে উঠিয়া গেল। ইতঃপূর্ব্বে আরও বারকয়েক আসিয়া, সে এ গৃহের এই খোলা অভ্যর্থনা লাভ করিয়া গিয়াছে। অসমঞ্জ ও উৎপলা তাহাকে পুনঃ-পুনঃই বলিয়া দিয়াছে, যে, যখনি ইচ্ছা আসিয়া, সে অনায়াসেই উপরে উঠিয়া যাইবার অধিকার পাইল। এরূপ না করিয়া পরের মতন যদি বাহিরে অপেক্ষা করে, তাহাতে উহারা নিজেদের অবমানিত বোধ করিবে। এই বিদেশী চালটাকে অন্তরের সহিতই তাহারা ঘৃণা করিয়া থাকে। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে-উঠিতেই অসমঞ্জর সেই ঝরণা-ঝরা স্রোতের মত অপরূপ হাস্যধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। সে হাসি যেন বিমলের দুশ্চিন্তা-নিপীড়িত বিষণ্ণ অন্তরের সমুদায় ম্লানিমা বিদূরিত করিয়া দিয়া, একটা আনন্দ-প্লাবনের মতই, তাহার সর্ব্ব-দেহ-মনের ভিতর দিয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া গেল। তাহার সঙ্কোচে মৃদু, শঙ্কিত পদক্ষেপ উৎসাহে চঞ্চল হইয়া তাহাকে যেন দ্রুত গন্তব্যস্থলে পৌছাইয়া দিল।

ঘরের মধ্যে শুধু ভাই-বোনেই নয়,—তা ভিন্ন আরও জন-দশেক ছেলে থানদশেক চৌকি জুড়িয়া বসিয়া গিয়াছে। উহাদের মাঝখানে সেই সাদা পাথরের টেবিলটা,—সেইটের উপর জনপিছু একটা করিয়া চায়ের পেয়ালা, এবং মধ্যস্থলে একখানা প্রকাণ্ড বাগথালা ভর্ত্তি করিয়া কচুরি সন্দেশ ইত্যাদি গৃহপ্রস্তুত সুখাদ্যের রাশি। বিমলেন্দু চিনিল,—ছেলেগুলি সকলেই আজিকার সাহেব-মারা কাণ্ডের অভিনেতৃবৃন্দ,—অসমঞ্জের এখানে ইহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই গতিবিধি আছে। ইহাদের মধ্যে রাধিকা এবং অপরেশ এই দুইজন বিমলেন্দুর পরিচিত, এবং বন্ধুও বটে।

বিমল ঘরে ঢুকিতেই, আবার একটা আনন্দধ্বনি উঠিল; এবং স্বল্পক্ষণ পরে সেটা থামিয়া আসিলে, অসমঞ্জর ঠিক পাশে নিজের চৌকির কোনমতে স্থান সঙ্কুলান করিয়া লইয়া, বিমল বিস্মিত কণ্ঠে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তাহ'লে কি সে সব মিটমাট হয়ে গেছে না কি?"

অসমঞ্জও ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি সব?"

বিমল কহিল "আজ যা' তোমরা কাণ্ড করেছ,—কি করে মিট্‌লো?"

অসমঞ্জ মুক্ত কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। আবার সেই সানন্দ, সরল, মধুময় হাস্যতরঙ্গে ঘরদ্বার তরঙ্গিত হইয়া গিয়া, বিমলের প্রাণের পর্দ্দায়-পর্দ্দায় সে সঙ্গীতময় হাস্যলহরী বিস্ময়ানন্দে বাজিয়া বাজিয়া উঠিতে লাগিল। সে বিকসিত নেত্রে চাহিয়া, সাগ্রহে কহিয়া উঠিল, "কি, বলো তো? অত হাস্‌চো কেন? যা'হোক অম্‌নি-অম্‌নি যে সব এত শীঘ্র মিটে গেল—"

বাধা দিয়া সহাস্যে অসমঞ্জ কহিল, "পাগল! কে'বল্লে তোমায়, মিটে গেল? এত সহজই কি ব্যাপারটা, যে, এমনই চুপি-চুপি অকস্মাৎ মিটে যাবে? কারুর ফাইন হবে না,—কেউ রাষ্টিকেট হবে না,- দুটো-চারটে গাল খাবে না—তা' না ঘরের, না পরের? এ'ও কি হয়ে থাকে?" বলিয়া আবার সে হাসিতে লাগিল।

বিমলেন্দু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "তাতেই তোমার এত হাসি পাচ্চে? কি কাণ্ড করলে বলো দেখি? নিশ্চয় ওরা তোমাকে রাষ্টিকেট করবে! কত দিনের মত, তাই বা কে জানে। উঃ, কি ক্ষতিটাই হলো! এই তো ক'টা মাস পরেই একজামিনেসন্ আস্‌চে। দু-দুবার কাট হয়েছ তুমি—এবারও হয় ত হ'তে। এতেও আবার হাসি পাচ্চে তোমার?"

অসমঞ্জ ইহার কথায় জবাব না দিয়া, তেম্‌নি হাসিমুখে নিজের সঙ্গীত-মধুর উচ্চ কণ্ঠে আবৃত্তি করিয়া গেল,—

"বন্ধু!

"রিক্ত যারা সর্ব্বহারা সর্ব্বজয়ী বিশ্বে তারা,—
সর্ব্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয় কো তারা ক্রীতদাস;
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে কর্‌বো মোরা পরিহাস।"

বিমল হার মানিবার ভাবে বিষাদে কহিল, "আশ্চর্য্য!"

বিমলের সর্ব্বান্তঃকরণের বেসুরা, বিকল যন্ত্র সেই বিপুল-গভীর মন্দ্রে যেন সঘনে বাজিয়া উঠিল। সে, বিস্মিত এবং মুগ্ধ হইয়া, নত দেহে অসমঞ্জের পদধূলি তুলিয়া লইয়া, মাথায় দিল, - ইতিপূর্ব্বে এ শ্রদ্ধা সে আর কাহাকেও কখনও দেখায় নাই,—গদ্‌-গদ্ স্বরে কহিয়া উঠিল, "ভাই, আমায়ও তুমি তোমার মতন মানুষ করে নাও।" বিমলেন্দুর হাত ধরিয়া অসমঞ্জ স্থির কণ্ঠে কহিল "সাক্ষী?"

সম্মোহিতের মত বিমলেন্দু জবাব দিল "বল?"

অসমঞ্জ তাহার হাত তেমনি করিয়া নিজের হাতে ধরিয়া

থাকিয়া, তেমনি চোখে-চোখে মিলাইয়া কহিল, "নিজের অন্তর-পুরুষ।"

বিমল কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, "সে তো চিনি নে।" স্নিগ্ধ, শান্ত হাস্যে সমস্ত মুখ প্রভাময় করিয়া তুলিয়া অসমঞ্জ কহিল, "চিনবে পরে।"

সম্মোহিতবং বিমলেন্দু উত্তর করিল, "তবে, সাক্ষী রইলেন আমার অন্তর-পুরুষ।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

একান্ত অধৈর্য্যে সারাদিনটা কোনমতে কাটাইয়া, বেলা তিনটা বাজিতে না বাজিতেই, সেইটাকেই অপরাহ্নকাল ধরিয়া লইয়া, দিগ্বিদিক-জ্ঞান-শূন্যের মত বিমলেন্দু একখানা ভাড়াটে মোটরে চড়িয়া, অসমঞ্জদের বাড়ী আসিয়া পৌছিল। এরচেয়ে আরও বেশী বিলম্ব সে ভদ্রতার কোন খাতিরেই সহ্য করিতে পারিয়া উঠিল না।

ঘরে সেদিন কেহ ছিল না। পথেও কোন চাকর-বাকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে নাই। সামনের ফটক হইতে আরম্ভ করিয়া, দ্বিতলের এই ঘরগুলা পর্য্যন্ত, সমস্তই খোলা। বিমল কিছু বিস্ময় বোধ করিতে যাইতেই, এ বাড়ীর আরও অনেক জিনিষের কথাই তাহার স্মরণ হইল, যাহার কাছে এইসব খুঁটি-নাটির বিস্ময়জনক ব্যাপার একান্তই তুচ্ছ।

ঘরের মধ্যে একটা ঘড়ি ছিল,—সেটার দিকে নজর পড়িলে দেখা গেল, তখন ঠিক তিনটে। চারিদিক প্রায় স্তব্ধ। শরতের পীতাভ উজ্জ্বল রৌদ্র চারিদিক যেন আচ্ছন্ন করিয়া জ্বলিতেছে। ঘরের একটা জানালার ঠিক পার্শ্বেই নীচের বাগান হইতে একটা পুষ্পিত শেফালিগাছ খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ডালে-ডালে অসংখ্য সাদা কুঁড়ি ও ফুল তপ্ত হাওয়ায় ঝিল্‌মিল্‌ করিয়া নাচিয়া উঠিতেছে। সেই গাছের উপরেই দুইটা চড়ুই পাখী কিচির-মিচির শব্দে কি জানি কিসের গান গাহিতেছিল। বিমলেন্দু একবার মনে করিল ফিরিয়া যায়,—এখনও তো এ বাড়ীর কেহ তাহার আগমন জানিতে পারে নাই;—ফিরিয়া গেলেই বা কে জানিবে? কিন্তু মন আবার অনিচ্ছুক হইয়া ফিরিয়া আসিল। যে টেবিলটায় প্রতিদিন তাহাদের জন্য খাবার দেওয়া হয়, আজ সেখানে শুধু একখানা লাল, বাঁধান বই পড়িয়া আছে। একখানা চৌকি টানিয়া বসিয়া পড়িয়া, বইখানা হাতে করিয়া তুলিতেই, আবার একটা নূতন বিস্ময়ে বুকটা তাহার ধক্ করিয়া উঠিল; কোন বিদেশী প্রসিদ্ধ পুস্তকের ইংরেজী তরজমা। রিভল-বারের গুলির চেয়েও না কি তার মধ্যে ধ্বংস-শক্তি অধিকতর পরিমাণে সঞ্চিত আছে—এম্‌নি একটা আশঙ্কা কর্তৃপক্ষ করিয়া থাকেন। বিমল বইখানা তুলিয়া লইল; এবং অজ্ঞ বালক যেমন বিষ ও অমৃতে বিন্দুমাত্র পৃথক বোধ না করিয়াই, পরম পরিতোষের সহিত তাহা নিজের মুখে তুলিয়া ধরে, তেম্‌নি করিয়াই আগ্রহ-ভরে সেখানা পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল।

সন্ধ্যার ছায়া গাঢ়তর হইয়া আলোর আভাসটুকু পর্য্যন্ত আড়াল করিয়া দাঁড়াইলে, বইখানার সাড়ে তিন ভাগ যখন শেষ হইয়া আসিয়াছে, তেমন সময় বিমলেন্দু পুস্তক হইতে চোখ তুলিয়া চাহিতেই, সে যেন এক নূতন বিস্ময়ে চমকাইয়া উঠিল। দ্বৈপ্রহরিক সেই খর-রৌদ্র-জাল, ধূর্জ্জটীর সেই দীপ্ত নেত্রানল, সরমরাগ-মধুর, নববধূ পর্ব্বতরাজ-তনয়ার সপ্রেম, সলজ্জ শঙ্কিত চাহনিটীর সহিত মিলিয়াই কি অমন স্নিগ্ধ শশিকলারূপে পরিণত হইয়া জুড়াইয়া গিয়াছে? শরতের প্রসন্ন নীলাকাশে তারার লহর স্তবকে-স্তবকে সাজান, কিন্তু তাহার মধ্যেও কি শুধু আগুন, শুধুই জ্বালা? আর কি কিছুই উহাতে ছিল না? না—না, কোথা দাহ? কোথায় জ্বালা? মানুষ অত্যাচারীও নহে, অত্যাচারিতও নহে। প্রকৃতির মধ্যে দাহও আছে, শান্তিও আছে; তেমনি মানুষেরও মধ্যে বিদ্রোহ-সন্ধির, ভালর-মন্দর তরঙ্গ চির-তরঙ্গায়িত, নিছক মন্দ কেমন করিয়া তাহাকে বলা যায়? উঃ কি উত্তপ্ত, কি উন্মাদনাময় সাহচর্য্যেই এই ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহার কাটিয়াছে। আর একটু হইলেই বিমলের সমস্ত জীবনটাতেই যেন ওই তপ্তস্পর্শ, ওই অগ্নিশিখা আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল আর কি!—

সম্মুখে আগুনের একটা ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গের মতই বিমল উৎপলাকে দেখিতে পাইল। দুজনের চোখে-চোখে মিলিল, —বিমলের বোধ হইল, দীপশলাকা দিয়া যে একটুখানি আগুন জ্বলে, প্রদীপের পলিতার মুখকে একমুহূর্ত্তেই যেমন তাহা উজ্জ্বল করিয়া তোলে, তেমনি সেই দুটী দীপ্ত চক্ষু হইতে অগ্নির কণা দুটি ঠিকরাইয়া আসিয়া তাহাকে

যেন আবার জ্বালাইয়া দিল। কোথায় শান্ত-মধুর সন্ধ্যা, কোথায় বা হরশির-স্থিত কনককিরণবর্ষী সুবিমল চন্দ্রলেখা! বইখানা হাত হইতে পড়িয়া গেল, সে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। সেই আলোতে বইখানার দিকে বারেক চাহিয়াই উৎপলা জিজ্ঞাসা করিল "পড়া হয়ে গেছে?"

বিমল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল "না।"

"শেষ হয়ে এসেছে বোধ হয়? বসুন না, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আমি তিনবার এসে ফিরে-ফিরে গেছি। খুব নিবিষ্ট হয়ে পড়ছিলেন তো!"

বিমলেন্দু আসন গ্রহণ করিয়া একটু বিজড়িত ভাবে কহিল, "মাপ কর্ব্বেন, জানতে পারি নি আমি।"

উৎপলা স্থির চক্ষু বিমলের মুখে নিবদ্ধ করিয়া কহিল "আপনাকে যদি ওই বইটা হাতে করে এদিক-ওদিক তাকাতে দেখতাম, তা'হলেই হয় ত আমি আপনাকে মাপ করতে পারতাম না।"

মেয়েদের মুখে এরকম কথা শোনায় বিস্ময় যথেষ্ট আছে, সে মিথ্যা নহে। কিন্তু এই মেয়ের মুখ দিয়া তো এ ভিন্ন আর কিছু বাহির হওয়াও আশা করা যায় না; কাজেই আশ্চর্য্য হইয়াও বিমল আশ্চর্য্য হইল না। তা ভিন্ন অভ্যাসে সকলই মানুষকে সহিয়া যায়। এমন দিন ছিল, যে দিনে হিন্দুঘরের এত বড় মেয়ে আইবড় রাখিলেই দশের মুখে অন্ন রুচিত না। আজ তাও তো রুচিতেছে, আবার এ সবও হয় ত একদিন সহিবে। বিমলেরও এই অর্দ্ধনারীশ্বর গোছ মেয়েটাকে কতকটা সহিয়া গিয়াছে। আরও একটা কথা আছে। বিমল কোনদিনই মেয়েদের কর্ত্তব্য ও রীতি-নীতি সম্বন্ধে খুব বেশী অভিজ্ঞও নয়। তাহার জ্ঞানে সে নিজের দিদিমা মঙ্গলাদেবীকে, বিমাতা ইন্দ্রাণীকে, ও ভাল করিয়া জানিয়াছে, তাহার আদরের বোনটী তারাকে। তাও আজ পাঁচ ছয় বৎসর হইল সে ইহাদেরও সঙ্গচ্যুত। একমাত্র স্বল্পভাষী, রুক্ষভাষী অভিভাবক অমৃতকে লইয়াই তাহার চপল বাল্য-জীবন কৈশোরত্বের সীমা ছাড়াইতেছিল। এর মাঝখানে কোন কল্যাণময়ী নারীর মঙ্গল হস্ত এই নবজীবনের গঠন কার্য্যে সহায়তা মাত্র করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহার মধ্যে শুধু এতটুকু একটুখানি ক্ষুদ্র, অথচ তারার মতই দীপ্ত আলো সে জীবনটাকে নিকষ কালো অমাবস্যার অন্ধকার হইতে রক্ষা করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল, সে দূরাবস্থিতা তারার মুখ! কিন্তু সে তারা সুদূর গগনোদ্যানেরই মত বহু দূরেই ফুটিয়া রহিল। তাই সে আলোটুকু শুধুই তাহার পথের আলো হইয়া রহিল, প্রাণের অমৃত-নিষেক হইয়া উঠিতে পারিল না। তার পর এই কলিকাতা সহরে পথে, যানে, এবং সভা-সমিতির মধ্যে যে সকল নারীমূর্ত্তি বিমলের চোখে পড়িয়াছে, তাহাদের সঙ্গে উৎপলার কতটুকু প্রভেদ, তাহার পরিমাণ বিমলের জানা নাই। বাহিরের বেশ-ভূষা ছাড়িয়া, ভিতরের কোন মাল-মসলার পার্থক্য আছে কি না, বিমল সে কথা বুঝিবে কেমন করিয়া? সে তো কাহারও নৈকট্য লাভ করিতে পারে নাই। এর উপর পুরাণ-ইতিহাসে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য সাহিত্যে, যে সকল নারী-চরিত্রের সহিত তাহার বিশেষ রূপ ঘনিষ্ঠতা আছে, তাহাদের সঙ্গে এই নব-পরিচিতার তো বড় বেশি ভেদ দেখা যায় না। যে ভদ্রা অর্জ্জুনের রথে সারথ্যকারিণী, যে চিত্রাঙ্গদা পিতৃরাজ্যের প্রজা-পালয়িত্রী, যে প্রমীলা নারী-সেনা সঙ্গে অর্জ্জুনের সহিত সমর-ঘোষণাকারিণী,—আবার পদ্মিনী যশোবন্ত-মহিষী, কূট রাজনীতিবিদ্ অকুতোভয় রাজপুত মহিলাদ্বয়,—কর্ম্মদেবী লক্ষ্মীবাই,—তবে উৎপলা এতই কি বিস্ময়কর? বিশেষ মেয়ে-পুরুষের সমান অধিকারের জন্য সমগ্র পাশ্চাত্য-জগৎ-নিবাসিনীগণ যখন আগ্রহে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন।

তথাপি একটুখানি বিস্ময়ের সুরেই বলিয়া ফেলিল "আপনি এ বই পড়েছেন না কি?" "অনেকবার।" বলিয়া উৎপলা ঈষৎ হাসিল,—"কেন, আপনার মতে কি এ সব বই আমাদের পড়বার যোগ্যই নয়?"

বিমল ঈষৎ সপ্রতিভ ভাবে, নিজের আশ্চর্য্য ভাবটা সম্বরণ করিয়া ফেলিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উত্তর করিল, "না, তা নয়। তবে এতে অনেক ভয়ঙ্কর-ভয়ঙ্কর কথা বলেছে। পড়তে-পড়তে এক-একটা জায়গায় বুকের রক্ত যেন থমকে থাকে।"

উৎপলা তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে কহিল, "আপনার খুব ভয় করছিল না কি? আচ্ছা, তার পরও আপনি কি সাহসে এখানে বসে রইলেন?"

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বিমলেন্দু কহিল "সে কি? কেন?"

উৎপলা তেমনি স্বরেই কহিল, "যারা এই-সব সাংঘাতিক বই পড়ে, তাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসতে আপনার ভয় করে না? জানেন, এই বইটা সরকার থেকে ফরফিট করা হয়েছে···এটা এখন বোমার সরঞ্জাম, রিভলভার, কার্টিজ প্রভৃতিরই সামিল। ঐ বই নিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়লে কি হয় জানেন? ইনটারণ্ অথবা জেল। আচ্ছা, যদি এই মুহূর্ত্তে সি, আই, ডির পাঁচটা লোক সিঁড়ি দিয়ে টপ-টপ করে উঠে এসে, ওই দোরের সামনে দাঁড়ায়,—আপনি কি মনে করেন যে তারা কোনমতেই বিশ্বাস করবে যে, ওই বইখানা হাতে নিয়েও আপনি ওদের হাতে পড়বার উপযুক্ত শীকার ন'ন? ···ও কি! অমন করে চমকে উঠে দোরের দিকে চাইচেন যে? না—না, এখনও আসে নি কেউ,—হয় ত কোন দিনই আসবেও না। আবার ধরুন, যদি এক্ষণি এসেই দাঁড়ায়,···সবটাই তো ভেবে দেখতে হয়। ধরুন, যদিই পুলিশ এসে, ওই বই যারা রাখে, যারা পড়ে, তাদের মধ্যে থাকতে দেখলে, আপনাকেও ধরে নিয়ে যায়, দুঃখ দেয়, নির্ব্বাসিত করে—"

বিমল সহসা কি যেন একটা গুপ্ত বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিল। তাহার নির্ব্বাক্, শুষ্কপ্রায় অধর-ওষ্ঠ যেন কোন গোপন সরসতার রসে সিক্ত হইয়া আসিল। সে ঈষৎ জোরের সঙ্গে বলিয়া উঠিল,—

"সে যদি আপনারা সইতে পারেন,—আমিও পারবো,—তাতে নিজকে দুর্ভাগ্য বোধ করবো না।"

"পারবেন কি সত্য-সত্যই? পুলিশের হাতের নির্য্যাতনের খবর জানেন কিছু? সে সইবে আপনার?"

"ততটুকু শক্তি আমার মধ্যে নেই বলে আমার মনে হয় না। যদি অবিচারের দণ্ড মাথায় পড়ে, সে আমি মাথা পেতে নিয়ে বইতেও পেরে উঠ্‌বো। কিন্তু ওসব কাল্পনিক চিন্তায় কাজ কি? আমরা বাস্তবিকই তো আর অপরাধী নই! পুলিশই বা হঠাৎ আমাদের পিছনে লাগবে কেন? একটুখানি দোষ না পেলে ওরাও একেবারেই নির্দ্দোষকে পীড়ন করে না,—অন্ততঃ আমার তো এমনি বিশ্বাস।"

উৎপলা মৃদু হাসিল। সে হাসিতে ও তাহার কণ্ঠস্বরে করুণা ধ্বনিত হইল। সে কহিল, "আপনি এখনও নেহাৎ ছেলে-মানুষ! অপরাধের গন্ধ আপনি কা'কে বলেন? কলেজে দলবদ্ধ হয়ে সাহেব মারা, নিষিদ্ধ পুস্তক ঘরে রাখা,—আর এর চেয়ে বেশি কোন্ অপরাধে, লোকে দণ্ডনীয় হয়ে থাকে?"

বিমলের মুখ আবার একবার যেন একটুখানি শুকাইয়া আসিল। নিজের অজ্ঞাতেই একবারের জন্য তাহার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দরজার দিকে ঘুরিয়া আসিল। ক্ষণকাল সে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিল না,···গঠিত মূর্ত্তির মতই স্তব্ধ অনড় হইয়া বসিয়া রহিল।

"বিমল বাবু!—"

বিমলেন্দু নীরবে বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল। তাহার বিবর্ণ মুখে ঘন-ঘন গাঢ় তপ্ত শোণিতের গতায়াতে মানসিক সংগ্রাম সুস্পষ্ট প্রকটিত হইতেছিল।

প্রশান্ত স্বরে উৎপলা কহিল, "বিমল বাবু! কাল আপনি ছোড়দা'র কাছে যে আত্মদান করে বসেছিলেন, সে একটা স্নায়বিক উত্তেজনা মাত্র। তা নইলে যাদের ভাল করে চেনেন না, যাদের জীবন কি, তার কি উদ্দেশ্য,—কোন কিছুর সঙ্গেই পরিচয় নেই, সেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাতকে যে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করতে এলেন, সেটা কি স্বাভাবিক? ছোড়দা'ও এটা ঠিক বুঝতে পেরেছিল। তাই আমাদের যে নিয়ম আছে যে, যে আমাদের দলভুক্ত হয়, তাকে প্রথমেই এই খাতায় আমাদের নিয়মাবলী পাঠ করে, সেই সব দায়িত্বের বশ্যতা অঙ্গীকার পূর্ব্বক নিজের নাম সই করে দিতে হয়। কাল আপনাকে সেই সাময়িক একটা মত্ততার মুহূর্ত্তেই সে সে সম্বন্ধে বাধ্য করে নাই। আজ সে দরকারী কাজে দূরে গেছে,—কিন্তু আমার উপর আদেশ আছে, যদি আপনি নিজের সেই ক্ষণিক উচ্ছ্বাস ফিরিয়ে নিয়ে দূরে সরে যেতে চান, যদি······"

বাধা দিয়া বিমল উঠিয়া দাঁড়াইল। দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দৃঢ় স্বরে কহিল, "কই খাতা?"

উৎপলা কি বলিতে যাইতেছিল,—ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া অসহিষ্ণু ভাবে পুনশ্চ সে কহিয়া উঠিল "আমার সঙ্কল্প স্থির,—দিন, কোথায় কি লিখ্‌তে হবে।"

উৎপলা নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গেল; এবং মুহূর্ত্ত পরেই একখানা মার্ব্বেল-কাগজে বাঁধান মোটা খাতা লইয়া ফিরিল। সেখানায় 'মৃত-সঞ্জীবনী' সভার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে অনেক

খবরই ছিল। কয়েকটি কঠিনতর নিয়মাবলীর পরিশেষে এই কয়টি কথা লিখিত আছে :—এই সভা-সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি এই নিয়ম কয়টীর মধ্যে যে কোন একটী নিয়মভঙ্গ পাপে পাপী হইলে, তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে হইবে। বিশ্বাস-ভঙ্গের অথবা শপথ-ভঙ্গের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু।

এই পর্য্যন্ত পড়া হইতেই, বিমলের হাত একটুখানি কাঁপিল,—তাহার কণ্ঠ ভেদ করিয়া দীর্ঘশ্বাস বহিয়া গেল। উৎপলা মৃদু হাস্যের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এ ভারি কঠিন বিমলেন্দু বাবু! আপনার সাহস হবে না। তার চেয়ে আপনি বরং এখনও সরে যান।"

খাতাটার যেখানে আরও কয়েকটা নামের স্বাক্ষর ছিল, তাহার সবশেষে নূতন আর একটা নামের যোগ হইল—শ্রীবিমলেন্দুপ্রকাশ সেনগুপ্ত।

আলোক-মণ্ডলে

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

১

কোমলতা নেই ক হেথা প্রাসাদ গাঁথা মর্ম্মরে
ঝলসে আঁখি তীব্র আলোর দীপ্তিতে,
কৃত্রিমতার গুমটানিতে ছুটায় দেহে ঘর্ম্ম রে
কি এক গোপন বেদন-মাখা তৃপ্তিতে।

২

হেথায় শোভা নয়নলোভা, নয় ক কিছু তার বেশী,
সকল কথা ফুরিয়ে বলে একবারে,
হেথায় যেন সবাই প্রবীণ নেই ক নবীন পরদেশী,
বয় না জীবন বিচিত্রতার বেগ-ভরে।

৩

নাই ক রূপের অপূর্ব্বতা, রূপ যে বাঁধা বাঁধ দিয়ে,
হেথায় আশা দেয়নি বাসা শঙ্কারে,
নাই ক ব্যাকুল কোলাকুলি নিত্য প্রণয় সন্দেহে
মধুর তৃষা নাই ক অলির ঝঙ্কারে।

৪

নাই ক সে ভাব নিত্য নূতন, ভাব রয়েছে ঘর পেতে,
নাই সে অনির্ব্বচনীয়ের আবছায়া,
নাই ক ধ্বনির প্রতিধ্বনি উজ্জ্বলতার গর্ব্বেতে,
দীপটী যেন দেয় না তাহার দীপ-ছায়া।

৫

হেথায় তরী কাষ্ঠ-তরী নয় ক হরি কাণ্ডারী
অফুরন্ত প্রেমের যমুনোত্রী নেই,
রাজস্বয়ের ভাণ্ডারও নয়, কর্ণও নয় ভাণ্ডারী,
নেই ক প্রাণের নিমন্ত্রণের পত্রী নেই।

৬

নাই ক হেথায় শিখীর পাখায় সেই মাধুরী ঢলঢলে
মর্ম্মে পশা'র শক্তি নাহি সঙ্গীতে,
দৃষ্টিতে নাই মিষ্টতা সেই রত্ন-মণির ঝলমলে
আর ত কথা কয় না সে কই ইঙ্গিতে।

৭

আমরা বঁধুর মধুর প্রেমের মাধুকরী মাগতে চাই,
শ্যামের তনুর সুবাস খুঁজি চন্দনে,
বংশীবটের কুঞ্জ হতে কে মথুরায় আনলে ভাই,
ফন্দী করে বন্দী করে বন্ধনে।

অসীম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

সপ্তপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

নবীন দাস নিশ্চিন্ত মনে শীতল প্রভাত-সমীরণের সহিত তামাক্-সেবন করিতেছিল। সেই সময়ে আখড়ার সম্মুখ দিয়া একজন পুরুষ চলিয়া যাইতেছিল। লোকটাকে দেখিয়া নবীনের মনে হইল যে, সে বাঙ্গালী। নবীন প্রথমে মনে করিল যে, বাঙ্গালীই হউক, আর বিহারীই হউক, সে কথায় তাহার প্রয়োজন কি? তাহার পরে আবার কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বলি ওহে, তুমি কি বাঙ্গালী না কি?" সে ব্যক্তি বাঙ্গালী; সুতরাং প্রশ্ন শুনিয়া ফিরিল, এবং আখড়ার দাওয়ায় উঠিয়া, নবীনকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কতদিন এখানে আসিয়াছেন?" নবীন তাহাকে বসিতে বলিয়া কহিল, "কাল সন্ধ্যাবেলায়। তোমরা—আপনারা?" "আমরা নাপিত, নিবাস গৌড়। একজন আমীরের সহিত চাকরী লইয়া এদেশে আসিয়াছিলাম।" "বটে—বটে, আমরাও পরামাণিক, তামাক ইচ্ছা হইবে কি?"

আগন্তুক হুঁকা লইয়া দাওয়ায় বসিয়া গেল। এ-কথা সে-কথার পর নবীন জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার কাছে চাকরী কর বন্ধু?" আগন্তুক দুঃখিত হইয়া কহিল, "চাকরী আর করি কই বন্ধু! উপস্থিত সেটি গিয়াছে।" "কোথায় চাকরী করিতে?" "একজন কায়স্থ রাজা,—নূতন বাদশাহের দোস্ত,—বড় আমীর লোক। আমার বরাতের দোষেই চাকরীটা গেল।"

নবীন দাস বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। চাকরী যে কেন গেল, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া, সে আগন্তুকের আত্মাভিমানে আঘাত করিল না; বরঞ্চ কথাটা ফিরাইবার জন্য সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমীরের নামটা কি?" আগন্তুক কহিল, "রাজা অসীম রায়।" কিছুমাত্র ঔৎসুক্য প্রকাশ না করিয়া, নবীন জিজ্ঞাসা করিল, "পূর্ব্বদেশের লোক বুঝি?" আগন্তুক কহিল, "না দাদা, নূতন মুরশিদাবাদ সহরের লোক। বয়স কম, সংসারও দরদ নাই। দিব্য আরামে ছিলাম, —বিলক্ষণ দু'টাকা উপরি পাওনা ছিল। অদৃষ্টদোষে সব গেল দাদা, সব গেল!"

নবীন কিছু কহিল না, শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। আগন্তুক বলিতে লাগিল, "মনিবের আমার দিল্‌খানা ছিল যেন দরিয়া;—বরাত দাদা, বরাত! মেয়েমানুষের জন্য দুনিয়াটা ছারেখারে গেল।" নবীনচন্দ্র দ্বিতীয়বার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, হুঁকাটা আগন্তুকের হস্তে প্রদান করিল। কলিকার তামাকু শেষ হইয়া আসিয়াছিল; সুতরাং আগন্তুক একটা টান দিয়াই কাসিয়া উঠিল। নবীন সেই অবসরে হুঁকাটা আত্মসাৎ করিয়া, নিজে টানিতে আরম্ভ করিয়া দিল। কাসি সামলাইয়া আগন্তুক বলিতে লাগিল, "দাদা রে, বামন হইয়া চাঁদে হাত দিতে গেলেই, এইরূপ হইয়া থাকে। এই সহরে একটা খুবসুরৎ বাঈজী আছে,—তাহার নাম মণিয়া। এই উঠ্‌তি বয়স,—চেহারাখানাও জম্‌কালো,—গলাটা বুল্‌বুলের মত,—হাসিটা এস্রাজের আওয়াজের মত। আমি দাদা গরীবের ছেলে,—বড়লোকের জুতা বহিতে আসিয়া, দু'দিন সোণার মুখনলে অম্বরী তামাক টানিয়া, মনিব বাহির হইয়া গেলে মখমলের মস্‌নদে বসিয়া, মাথাটা ঘুরিয়া গিয়াছিল। মেয়েমানুষটার সহিত মনিবের গলায়-গলায় ভাব!"

এতক্ষণে নবীন দাস বিচলিত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "বটে! মেয়েমানুষটার বুঝি তখন তোমার উপর টান?"

"আরে রামচন্দ্র! সে তেমন চিড়িয়াই না। বন্ধু, পাটনা সহরের মণিয়া বাঈ যেন লোটন পায়রা,—যতটা দম পায়, ততটা ঘুরপাক খায়। পয়সা ভিন্ন সে ভাল করিয়া কথাই কয় না!"

"তবে কি হইল?"

"বেকুবের যাহা হইয়া থাকে! একদিন মনিবের শাল-দোশালা চড়াইয়া, নকল রাজা সাজিয়া বাজারটা যাচাই করিতে গেলাম; কিন্তু সে বাজারে মেকী চলা ভার! কত

আসল রাজা সে নিত্য কিনিয়া বেচিতেছে,—নকল রাজা চিনিতে তাহার বাজাইতেও হইল না। বরাত, বন্ধু, বরাত। নেশাটা ভালরকম জমিয়া গিয়াছিল ; সুতরাং মনিব আসিয়া যখন ধরিয়া ফেলিল, তখন পলাইবার উপায় পর্য্যন্ত রহিল না। ফলে চাকরীটি পর্য্যন্ত গেল।"

নবীন দাস একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিল ; এবং কলিকার ভস্ম ঢালিয়া ফেলিয়া, পুনরায় তামাকু সাজিতে উদ্যত হইল। তাহা দেখিয়া আগন্তুক ব্যস্ত হইয়া কলিকাটা লইয়া তামাকু সাজিতে আরম্ভ করিল। নবীন প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নামটি কি দাদা ?"

আগন্তুক কহিল, "নবকৃষ্ণ।"

"বাঈজীটির নাম কি বলিলে ভাই ?"

"মণিয়া বাঈ।"

"সে এ সহরে কোথায় থাকে ?"

"সহরের মধ্যেই।"

এই সময়ে নবকৃষ্ণের তামাকু সাজা শেষ হইল ; কিন্তু সে পূর্ব্বেই নবীনের তামাকু-সেবন-পদ্ধতি জানিতে পারিয়াছিল ; সুতরাং সে কলিকাটি নবীনের হস্তে না দিয়া, নিশ্চিন্ত মনে ধূমপান করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া নবীন মনে-মনে অল্প-বিস্তর বিরক্ত হইল ; কিন্তু নবকৃষ্ণকে চটাইবার ভয়ে কিছু বলিতে ভরসা করিল না। কলিকার তামাকু যখন প্রায় শেষ হয়-হয় হইয়াছে, তখন নবকৃষ্ণ কলিকাটি নবীনের হস্তে সমর্পণ করিয়া উঠিল। নবীন জিজ্ঞাসা করিল, "এখন চলিলে কোথায় ?"

"চাকরীর চেষ্টায়।"

নবীন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; এবং জিজ্ঞাসা করিল, "বন্ধু, ওবেলায় দর্শনটা পাওয়া যাইবে ত ?"

নবকৃষ্ণ কহিল,—"যাইবে, অবশ্য যাইবে ! আমি নিজেই আসিব।" নবকৃষ্ণ চলিয়া গেলে, নবীন সরস্বতীর সন্ধানে আখড়ার দিকে গেল ; এবং তাহাকে গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা দেখিয়া, পুনরায় দাওয়ায় আসিয়া, তামাকু সাজিতে বসিল। এই সময়ে মণিয়া আসিয়া আখড়ার দুয়ারে দাঁড়াইল ; এবং নবীনকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "কি ভাই সাহেব, সহরে বাহির হও নাই ?" হাসি দেখিয়া নবীনের হৃদয় যে দীর্ঘ লম্ফ দিয়াছিল, সম্বোধন শুনিয়া অর্দ্ধপথে তাহা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। নবীন দীর্ঘকাল প্রেমের ব্যবসা করিয়া আসিয়াছে ; সুতরাং একেবারে আশা ত্যাগ করিল না। সে অম্লানবদনে ভ্রাতৃ-সম্বোধন হজম করিয়া কহিল, "বিবিসাহেব, আমাদের মুরশিদাবাদ সহরে বহুরূপীরা সন্ধ্যার সময়ে বাহির হয়। তোমাদের পাটনা সহরের নিয়ম কি ?"

মণিয়া কহিল, "ভাই সাহেব, বহুরূপীদের নিয়ম কি তাহা ত বলিতে পারি না ; তাহারা যখন বহুরূপী সাজিয়া আসে, তখনই দেখিতে পাই। ঘরে ত কাহাকেও দেখি নাই। কোন-কোন দিন মেলাতেও যেন সকালেও বহুরূপী দেখিয়াছি।"

"ভাল কথা, আজ বিকালে সাজিয়া বাহির হইব। বিবিসাহেব, কোথায়-কোথায় যাইব, আমি ত সহরের পথ চিনি না ! তোমার যদি অবসর থাকে, তাহা হইলে আমাকে পথ চিনাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে ত ?"

মণিয়া হাসিয়া বলিল, "কেন পারিব না !" মণিয়ার সঙ্গলাভের সম্মতি পাইয়া, নরসুন্দর-কুলশেখর নবীন তৎক্ষণাৎ সশরীরে বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল ; তাহার দেহখানা মাত্র পাটনা সহরের আখড়ায় পড়িয়া রহিল।

বহুক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "বিবি, কোথায়-কোথায় যাইব বলিলে না ?"

মণিয়া কহিল, "সহরের আমীর-ওমরাহ—কাহারও নাম শুনিয়াছ কি ? পথে-পথে ঘুরিলে উপার্জ্জন অধিক হয় না ; দুই দণ্ড পথে না ঘুরিয়া, যদি একদণ্ড আমীরদের ঘরে-ঘরে ফির, তাহা হইলে রোজগার দ্বিগুণ হইবে।"

নবীন কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, "আমীর ওমরাহ ত কাহাকেও চিনি না। তবে শুনিয়াছি যে, এই সহরে এক বিখ্যাত বাঈজী আছে,—সকল আমীর-ওমরাহ না কি তাহার জুতা বহিয়া চলে।" "বটে ! এমন বাঈজী কে ?" "মণিয়া বাঈ।" মণিয়া গম্ভীর হইয়া গেল ; এবং কিছুক্ষণ পরে কহিল, "নাম শুনিয়াছি বটে, তবে দেখি নাই।" নবীন উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাহার ঠিকানা জান ?" "ঠিকানা জানিতে কতক্ষণ লাগিবে ? আমি এখনই জানিয়া আসিতেছি।" "বিবিসাহেব, তবে চল আজ সন্ধ্যাবেলায় মণিয়া বাঈয়ের ঘরে যাওয়া যাক। যদি অদৃষ্টে রোজগার থাকে, তাহা সেইখানেই দুই-চারিটা আমীর মিলিয়া যাইবে।" মণিয়া বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া, আখড়ার দুয়ার হইতে চলিয়া গেল ; সরস্বতীর সহিত আর সাক্ষাৎ করিল না।

নবীনও বিনা চেষ্টায় কার্য্যসম্পন্ন করিয়াছে মনে করিয়া, আত্মপ্রসাদ লাভ করিল।

অষ্টপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

"তবে সেই ভাল, আমাদের বোধ হয় দুই-এক দিনের মধ্যেই ছাউনী উঠাইয়া এলাহাবাদে যাইতে হইবে। লোক-জন ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ হইয়াছে;—অভাব কেবল অর্থের। এই পত্রখানা বাদশাহ স্বয়ং লিখিয়া দিয়াছেন। তবে তাঁহার পিতার সহিত দেওয়ানের যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে পত্রে কোন কার্য্য হইবে বলিয়া বোধ হয় না। আহমদবেগ আর একখানা পত্র দিয়াছেন; সম্ভবতঃ এই পত্রে কিছু কার্য্য হইলে হইতে পারে। দেওয়ানের দরবারে আরজী পেশ করিতে হইলে, বহু অর্থের প্রয়োজন; কিন্তু অর্থের বড়ই অনাটন।" "আমি কি তোমার নিকট অর্থ চাহিয়াছি বাপু! জাফরকুলীখাঁর নিকট দরবার করিতে হইলে যত অর্থের প্রয়োজন হইবে, তাহা আমি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। যদি তোমার সম্পত্তি তোমাকে কখনও ফিরাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে ঋণ পরিশোধ করিবার বহু অবসর পাইবে। ভাল কথা! মণিয়ার সহিত কি তোমার সম্প্রতি সাক্ষাৎ হইয়াছে?" "না।" "নবীন নাপিত পাটনায় আসিয়া পৌছিয়াছে। কেন আসিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। তাহার উপস্থিতি আমাদিগের পক্ষে শুভ নহে।" "এই বাদশাহী ছাউনীর মধ্যে নবীন আর আমার কি করিবে? আপনারা ত চলিয়া যাইতেছেন; সুতরাং ভয়ের কোন কারণই নাই।" "দেখ বাপু, নবীনচন্দ্র পরামাণিক কি জন্য পাটনায় আসিয়াছে, তাহা যতক্ষণ জানিতে না পারা যাইতেছে, ততক্ষণ হরিনারায়ণ শর্ম্মা পাটনা সহরের বাহিরে পদার্পণ করিতেছেন না। একটা কথা বলিয়া যাই। আজি হইতে সুদর্শন যাহা পরীক্ষা না করিবে, তাহা তোমরা দুই ভাই মুখে দিও না।" "কেন, দাদা কি আমাদের বিষ খাওয়াইবেন?" "কিছুই বিচিত্র নহে। বিষয়ের লোভে মানুষ সমস্তই করিতে পারে।" "আপনি যখন আদেশ করিতেছেন, তখন সে আদেশ অবশ্যই পালন করিব; কিন্তু যদি কেহ খাদ্যে বিষ দেয়, সে খাদ্য যে সুদর্শনের উদরস্থ হইবে?" "সে ভার আমার। সুদর্শন ত আমার একমাত্র পুত্র;—তাহার রক্ষার ব্যবস্থা আমি করিয়া যাইতেছি।"

হরিনারায়ণ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অসীম তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ভূপেন্দ্র তাম্বুর দুয়ারে দাঁড়াইয়া ছিল; সে-ও আসিয়া প্রণাম করিল। হরিনারায়ণ বস্ত্রাবাস পরিত্যাগ করিলেন। সেদিন নগরোপকণ্ঠে ভীষণ জনতা;—দলে দলে নর-নারী পথ ধরিয়া চলিয়াছে। হরিনারায়ণ ধীরে ধীরে চৌকের দিকে চলিলেন। পথে যাইতে-যাইতে তাঁহার মনে হইল, কে যেন তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া অতি ধীরে আকর্ষণ করিতেছে। তিনি পশ্চাতে না চাহিয়া, পথের এক পার্শ্বে সরিয়া গেলেন, এবং দেখিলেন, গৈরিক-বসন-মণ্ডিতা এক রমণী তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে। অবসর বুঝিয়া রমণী অস্ফুটস্বরে কহিল, "বাপজান, ঐ কূয়ার ধারে চলুন।" পথি-পার্শ্বে এক কৃষক কূপ হইতে জল উঠাইয়া ক্ষেত্রে সেচন করিতেছিল। হরিনারায়ণ কূপের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিতে আরম্ভ করিলেন। রমণীও তদ্রূপ করিল। এই অবসরে রমণী কহিল, "আমি মণিয়া। আজ সন্ধ্যাকালে নবীন বহুরূপী সাজিয়া আমার গৃহে আসিবে, সুতরাং দুই-একদিন পাটনা সহরে একটা জাল মণিয়া বাঈ খাড়া করিতে হইবে। আপনারা কেহ আশ্চর্য্য হইবেন না। এই সঙ্গে আমারও বেশ-পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, কারণ, নবীন ও সরস্বতী আমাকে এই বেশে দেখিয়াছে। যখন অন্যত্র যাইতে হইবে, তখন কাফ্রী সাজিতে হইবে।" হরিনারায়ণ মণিয়ার কথার উত্তর না দিয়া, পথে ফিরিয়া আসিলেন। মণিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া হরিনারায়ণ দেখিলেন যে, সুদর্শন অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া, তিনটা তম্বুরা, একটী সুরবাহার ও দুইটা পাখোয়াজ একত্র বন্ধন করিতেছেন। এত বাদ্য-যন্ত্রের একত্র সমাবেশ দেখিয়া হরিনারায়ণ বিস্মিত হইলেন; এবং পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, এতগুলা তম্বুরা আর পাখোয়াজ কি হইবে?" সুদর্শন বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "কেন, দিল্লী লইয়া যাইব?" "এ যে এক গাড়ীর বোঝা! বাদশাহ যাইতেছেন যুদ্ধ করিতে,—তাহার মধ্যে এত বাদ্য-যন্ত্র কেমন করিয়া লইয়া যাইবি?" প্রশ্ন শুনিয়া সুদর্শন মস্তক-কণ্ডুয়ন করিতে বসিলেন। এতগুলা বাদ্য-যন্ত্র লইয়া যাইতে কি পরিমাণ আয়োজন আবশ্যক, তাহা পূর্ব্বে স্মরণ হয় নাই। পুত্রকে অবনত দেখিয়া

হরিনারায়ণ কহিলেন, "তুমি, নিজে যাহা বহিয়া লইয়া যাইতে পারিবে, তাহাই লও,—অবশিষ্ট বিদায় করিয়া দাও। উপস্থিত এগুলা ছাড়িয়া পূজার ঘরে আইস।" সুদর্শন উঠিয়া পিতার অনুসরণ করিলেন। পিতা-পুত্রে পূজার ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। হরিনারায়ণ কহিলেন, "দেখ বাপু, আজি হইতে আমার একটা নূতন আদেশ মানিয়া চলিতে হইবে।" পুত্র কহিল, "যে আজ্ঞা।" "আরে বাপু, আগে আদেশটাই শুন!" "আপনি যখন আদেশ করিতেছেন, তখন অবশ্য পালনীয়; সুতরাং শুনিবার আবশ্যকতা নাই।" "দেখ বাপু, মূর্খ দ্বিবিধ,—সাধারণ মূর্খ এবং পণ্ডিত মূর্খ। তুমি শাস্ত্রদর্শী হইয়াও অত্যন্ত নির্ব্বোধ।" "যে আজ্ঞা।" "যে আজ্ঞা কি রে বাপু!" "আপনি যখন আদেশ করিতেছেন, তখন অবশ্যই স্বীকার্য্য।" "ফক্কিকা ছাড়িয়া কথাটা শুন।" "আজ্ঞা করুন।" "আজি হইতে ছায়ার ন্যায় অসীম ও ভূপেন্দ্রের অনুসরণ করিবে।" "যে আজ্ঞা।" "অসীমের সমস্ত খাদ্য, পাচক ও তুমি আস্বাদন করিবার পর, অসীমের পাত্রে দিবে।" সুদর্শন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল, "অবশ্য - অবশ্য; তবে অসীমের সংসারের ব্যয় বাড়িয়া যাইবে।" "আজি হইতে বাদশাহের আদেশ ব্যতীত সঙ্গীত-চর্চ্চা করিবে না।" সুদর্শনের আনন্দ সহসা বিষাদে পরিণত হইল। সে অতি বড় দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "যে আজ্ঞা।" হরিনারায়ণ দুয়ার খুলিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। সুদর্শন রন্ধনশালায় গিয়া কাঁদিতে বসিলেন। বধূ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদ কেন?" প্রশ্ন শুনিয়া সুদর্শনের শোকের আবেগ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে?" ভগ্ন কণ্ঠে সুদর্শন কহিলেন, "আরও কঠিন ব্রাহ্মণী,— আরও কঠিন! কর্ত্তা তম্বুরাগুলি বিদায় করিতে আদেশ করিয়াছেন।" স্বামীর শোকের কারণ শুনিয়া ব্রাহ্মণী আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার হাসি দেখিয়া সুদর্শন অত্যন্ত চটিলেন,—তাঁহার চোখের জল শুকাইয়া গেল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি, বেয়াদবী! আমি কাঁদিতেছি, আর তোমার হাসি আসিতেছে? যতবড় মুখ না, ততবড় কথা?" ব্রাহ্মণী হাসিয়া কহিলেন, "কই মহারাজ, কথা ত কহি নাই।" সুদর্শন পরাজয় মানিয়া কহিল, "তাও ত বটে। কিন্তু বড় বৌ, তোমার হাসিটা বেয়াদবীর লক্ষণ।" পত্নী কহিলেন, "তোমার কাণ্ড দেখিলে আমি ত আমি,— পাথরেরও হাসি পায়।" "বড় বৌ, বড়ই বিপদে পড়িয়াছি, বড় জোর একটা তম্বুরা আর একটা পাখোয়াজ ঘাড়ে করিয়া চলিতে পারি। বাকীগুলা কি করিব?" "তোমার কোন বন্ধুকে দিয়া যাও না কেন?" "কোন্ বন্ধুকে?" "কেন, আড়াল হইতে যাহার গান শুনিতে গিয়া, পথ ছাড়িয়া গাছে উঠিয়াছিলে?" "ঠিক কথা বলিয়াছ। বড়বৌ, তুমি একজন গুণী লোক। আমার কসরৎ কেবল তিনজন বুঝিয়াছে— তুমি, নূতন বাদশাহ, আর মণিয়া বাঈ।" "আমার গলায় দড়ি।" "সে যাহাই বল,— উপস্থিত মণিয়ার বাড়ী চলিলাম।"

"এই দুপ্রহর বেলায়, এতখানি রৌদ্র মাথায় করিয়া, অনাহারে কোথায় যাইবে?" "তম্বুরা আর পাখোয়াজগুলির ব্যবস্থা না করিয়া, আমি পেট ভরিয়া খাইতে পারিব না বড়বৌ।"

সুদর্শন দুইটি তম্বুরা ও একটি পাখোয়াজ লইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বেলা বাড়িয়া চলিল,—তথাপি পিতা বা পুত্র কেহই ফিরিলেন না। উষ্ণ অন্ন শীতল হইয়া গেল,—তথাপি সুদর্শন বা হরিনারায়ণের দর্শন মিলিল না। সমস্ত দিন অভুক্ত থাকিয়া, বধূ ও ননন্দা অসীমকে সংবাদ দিয়া পাঠাইলেন।

প্যারিসে প্রথম সপ্তাহ

[অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ]

(১)

সুইস্ ভগ্নীরা বলিলেন, প্যারিস ইঁহাদের পরিচিত নগর। শস্তা হোটেলের সন্ধান ইঁহাদের আছে। কাজেই ইঁহাদের পিছু-পিছু ছুটিলাম। ষ্টেশনের নিকটেই এক বড় হোটেলে কুলীরা আমাদের মাল ঘাড়ে করিয়া উপস্থিত হইল। হোটেলে প্রবেশ করিয়া শুনি, দৈনিক ঘর-ভাড়া ৯০।১০০ ফ্রাঁ। ত্রাহি মধুসূদন! তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। রাত্রি প্রায় ১২টা বাজিতে চলিল,—এখন যাওয়া যায় কোথায়? কুলীরা এদিক-ওদিক যাওয়া-আসা করিয়া, ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—ফোন করিয়া ঠিক করিয়াছি, ৩৫ ফ্রাঁর এক হোটেল আছে। কিন্তু সেটা সহরের উত্তর দিকে, না দক্ষিণ দিকে, তাহা তাহাদের জানা নাই। তথাপি, ইহারা হিড়হিড় করিয়া আমাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ভাবিলাম এই রে! এতদিনে যে স্ত্রী-নায়কের পাল্লায় পড়িয়া, প্যারিসের গুণ্ডার হাতে বা প্রাণ যায়।

কুলীরা সোজা পথ ছাড়িয়া, বাঁকা পথ ধরিল। ক্রমশঃ অন্ধকার বাড়িতেছে। কোথায় নিউইয়র্কের রাস্তায় দিনের মতন আলো, আর কোথায় প্যারিসের আঁধার গলি-ঘোঁচ। অথচ সহরের নেহাৎ মধ্যস্থলেই গার্ সাঁ-লাজার (Gare St. Lazare) (ষ্টেশন) অবস্থিত। কুলীরা আবার ফোন করিতে গেল। রাস্তায় দু'চারজনকে জিজ্ঞাসা করিল। অন্ততঃ আধ মাইল হাঁটাহাঁটি করিবার পর, এক নির্জ্জন রাস্তার মোড়ে আসিয়া মাল নামাইয়া বলিল—"সবুর কর,—অদূরের পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।" খবর পাওয়া গেল,—যে হোটেলে যাইতেছি, সেখানে পৌঁছিতে হইলে, গোটা রাত হাঁটিতে হইবে। ট্যাক্সি ভাড়া করিতে সাহস হইতেছে না—খরচ মারাত্মক বলিয়া! কিন্তু পাহারাওয়ালা খবর দিল—"আরে বেকুব যে পথে হাঁটিয়া আসিয়াছ, সেই পথের একটুকু বাঁকের মুখেই ত একটা শস্তা হোটেল আছে।" সেইখানে উপস্থিত হইলাম। সুইস্-নারী বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল, হোটেল-ওয়ালী বসিয়া আছে। তাহার সঙ্গে ফিশফিশ কথা বলিয়া, বাহিরে আসিয়া ইংরাজিতে আমাদিগকে জানাইল—কুচ পরোয়া নাই। অতি সস্তায় ঘর ঠিক করিয়াছি। কুলীরা যেন জানিতে না পারে। কুলীদের বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। খরচ লাগিল ২০ ফ্রাঁ। এতখানি পথ মাল ঘাড়ে চাপাইয়া আনিবার জন্য ১০০ ডলার দিলেও আমেরিকায় লোক পাওয়া যাইত না। ফরাসী কুলীদের কাণ্ড দেখিয়া বুঝিলাম—ইয়োরোপে পদার্পণ করিয়াছি। যন্ত্রের কাজ, গাড়ীর কাজ, বিদ্যুতের কাজ এখানে এখনও মানুষই করে; অর্থাৎ, হাজার হইলেও ইয়োরোপ এসিয়ারই ঘেঁষা।

হোটেলওয়ালী আমাকে দেখিবামাত্রই "অবান্ধকারং গিরিগহ্বরাণাং দংষ্ট্রাময়ূখৈঃ শকলানি কুর্ব্বন্" হাসিয়া ফেলিল। তাহার ঝীও আরও আহ্লাদে আটখানা। হোটেলওয়ালীর স্বামী ইংরেজিতে কথা বলিতে পারেন—ঠিক আমি যতটা পারি ফরাসীতে! নানাপ্রকার গল্প চলিতে লাগিল। আমি দেখিতে থাকিলাম—কি অদ্ভুত উপায়ে বাড়ীওয়ালীর খোপার চুল, মাথা হইতে কম্-সে-কম্ ছয় ইঞ্চি খাড়া উঠিয়াছে!

প্যারিসে দরদস্তর করিতে হয়। গাড়ী, কুলী, বাড়ী, জিনিষপত্র—যা হ'ক কিছু এক দামে পাইতে আশা করা অসম্ভব! বোধ হয় লড়াইয়ের দুর্য্যোগে ফরাসী-চরিত্রে এরূপ ঘটিয়া থাকিবে। অথবা হয় ত বিদেশী মোসাফির দেখিলে মানুষ, মাত্রেরই অপরকে ঠকাইবার এবং বাগে ফেলিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। বাঁধা দাম অবশ্য আছেই;—কিন্তু বড়-বড় হোটেলেও যার কাছে যেমন পাওয়া যায়, তেমন আদায় করিবার চেষ্টা খুব প্রবল শুনিতেছি। তা ছাড়া, লোকের ভিড় এত বেশী যে, হোটেলে ঠাঁই পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। ফরাসী কুলী-মজুরেরা বক্শিষ ও দস্তুরি সম্বন্ধে দুনিয়ার যে কোন কুলীকে ফিকির শিখাইতে পারে। পশ্চিমারা কথায় কথায় বলিয়া থাকে—চীনা কুলীদের সন্তুষ্ট করা বড়ই কঠিন। এখন দেখিতেছি—চীনারা

ফরাসীর নিকট হার মানিয়াছে। আমাদের হোটেলওয়ালারা বলিলেন—এই কুলীরা আপনাদের যে হোটেলে লইয়া যাইতেছিল, সেই হোটেলে আপনারা যত দিতেন, তাহার অন্ততঃ অর্দ্ধেক ইহাদের দস্তুরি। তার পর, সেই বাড়ীতে বসবাস করা ভদ্রলোকের পক্ষে অসম্ভব! ইত্যাদি।

সকালে উঠিয়া দেখি—পাড়াটা নেহাৎ খেলো নয়। চকচকে বাঁধানো পথ। রাস্তার দুধারের ঘর-বাড়ীগুলা বেশ কিছু জাঁকালোও বটে। রাত্রিকালের কথঞ্চিৎ মিটিমিটি আলোকে যে জায়গাটা ভয়াবহ বোধ হইতেছিল, সেইটা দিনের বেলায় দেখিতেছি—লোকবহুল ব্যাঙ্ক-পাড়ার এক অংশ। অদূরে ৪।৫ মিনিটের হাঁটা পথের ভিতরই সঙ্গীত-ভবন "ওপেরা"। ইংরেজ, মার্কিন, ইতালীয়, জাপানী ও অন্যান্য ব্যবসায়-সঙ্ঘের সৌধগুলা এই পাড়ারই ধনগৌরব বুঝাইতেছে। আশে-পাশে দারিদ্র্যের বা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-জীবনের কোনো চিহ্ন নাই। যেন লণ্ডনেরই কোনো অতি-প্রসিদ্ধ মহাল্লায় বাস করিতেছি।

কলিকাতার লেড ল ইত্যাদি বড়-বড় ইংরেজ দোকানে যেমন ছুঁচ হ'তে শাল পর্য্যন্ত সব জিনিষই পাওয়া যায়—প্যারিসের অনেক দোকান সেইরূপ। মার্কিন ভাষায় এই-গুলাকে "ডিপার্টমেণ্ট ষ্টোর" বলে। নিউইয়র্কের "মেসী," "গিম্বেল" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। প্যারিসের লাফায়েৎ গ্যালারি, "প্রাঁতাঁ" (Printemps) ইত্যাদি ম্যাগাজাঁ (magasin) এই জাতীয় দোকান। জিনিষ-পত্রের দাম দেখিতেছি অবিকল আমেরিকান দামের সমান। অর্থাৎ ফ্রান্সে আজকাল বাজার-দর যার-পর-নাই চড়া। যুদ্ধের পূর্ব্বে সাধারণতঃ ফরাসী জিনিষের দাম মার্কিণ জিনিষের প্রায় আধা বা শতকরা ৭৫ ভাগ বলিয়া ধরা হইত। যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর সকল দেশেই দাম চড়িয়াছে। কিন্তু অনুপাতে দেখিতেছি, ফ্রান্সের দর-বৃদ্ধি আমেরিকার দর-বৃদ্ধি হইতে অনেক বেশী। সমান অনুপাতে দর বাড়িলে, ফ্রান্সে আজও জিনিষ-পত্রের দাম, মার্কিণ দেশীয় দামের আধা না হউক, শতকরা ৭৫ থাকিত। বস্তুতঃ এইরূপ আশা করিয়াই নিউইয়র্ক ছাড়িয়াছিলাম। প্যারিসে আগা-গোড়া নিউইয়র্কের খরচই লাগিবে, এরূপ স্বপ্নেও ভাবি নাই। রেলের নৈশ-ভোজনে ১৪।১৫ ফ্রাঁ মার্কিন মাপে অত্যধিক মনে হয় নাই। কিন্তু সহরের এক রেষ্টরাঁতে মধ্যাহ্ন-ভোজনে লাগিল ৩০ ফ্রাঁ। ব্যাপার কি? এক বেলার খাওয়াতেই যে দুই বেলার পেট ভরিতেছে, এরূপ বিশ্বাস করিবার লক্ষণও জঠরানলে পাইতেছি না।

(২)

আমেরিকার লোকেরা দেখিতে লম্বা-চৌড়া। ফরাসীরা প্রায় সকলেই বেঁটে। অধিকন্তু দেখিতেছি ইহারা সকলেই কুঁজো—অর্থাৎ সম্মুখে ঘাড় হেঁট করিয়া হাঁটে। আমরা যে সকল মূর্ত্তিকে দরবারী ভাষায় হোদলকুৎকুৎ বলিয়া থাকি, সেই ধরণের চেহারা ইয়াঙ্কিস্থানে নজরে পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্যারিসে এই মূর্ত্তি বিরল নয়।

টেলিফোন আমেরিকায় বাড়ীমাত্রেরই একটা মামুলী আসবাব স্বরূপ বিবেচিত হয়। প্যারিসে টেলিফোনের রেওয়াজ তত বেশী দেখিতেছি না। ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখে না, এমন গৃহস্থ বা দোকানদার আমেরিকায় একজনও আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু "গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোম্পানী" এবং "আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানী"র আফিসে খবর পাইলাম, —প্যারিসে ব্যাঙ্ক চেকের চলন অতি কম। নগদ টাকার ব্যবহারই ফরাসী জাতের দস্তুর। খুব বড়-বড় হোটেল ছাড়া, চেকে লেন-দেন এক প্রকার অসাধ্য। অর্থাৎ ফ্রান্স আজও ইয়োরেশিয়ারই এক অংশ। আর আমেরিকা আটলাণ্টিকের অপর পারে।

খাওয়া-পরা, রাস্তা-ঘাট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, আসবাব-পত্র ইত্যাদি বৈষয়িক জীবনের সকল বিভাগেই মার্কিণ জাতিকে দুনিয়ার মাথায় না বসাইয়া উপায় নাই। আমেরিকার হিসাবে গোটা ইয়োরোপ ও এশিয়া মধ্যযুগের আওতায় রহিয়াছে। এইজন্য একবার মার্কিন মুল্লুকের জল পেটে পড়িলেই, সকল লোকেরই স্বদেশে ফিরিবার সাধ কমিতে থাকে। দুনিয়ার লোক চায়—সুখ, সাংসারিক সুখ, জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য। সমস্ত পৃথিবীকেই অন্ততঃ সাংসারিকতার হিসাবে আমেরিকার আদর্শে গড়িয়া তোলা বর্ত্তমান মানবের এক প্রধান ধর্ম্ম সন্দেহ নাই।

মিশরের কায়রো সহরে দেখিয়াছিলাম—হোটেলের বারন্দার নীচে, রাস্তার উপরে বা ধারে, টেবিল-চেয়ার সাজানো। এইখানে যখন-তখন লোকেরা বসিয়া আড্ডা

মারে। ইচ্ছা-মত কাফি, চা, মদ ইত্যাদি পান করে। প্যারিসে আসিয়া বুঝিতেছি—এই কায়দার জন্মদাতা ফরাসী জাত। যেখানে-সেখানে, রাস্তার পাশে, গলি-ঘোঁচের মোড়ে রেষ্টর‍্যাণ্টগুলার এই ধরণের আয়োজন চোখে পড়িতেছে। বিলাতী ও ইয়াঙ্কি সমাজে এই প্রথা নাই।

বস্তুতঃ ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার রাস্তায় পায়চারি করিতে-করিতে, কোন জায়গায় বসিতে ইচ্ছা করিলে, বা খানিকটা সময় কাটাইতে চাহিলে, ঠাঁই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্যারিসে আড্ডা মারিবার জায়গা বিস্তর। এখনও বসিয়া দেখি নাই—কিছু না খাইয়া বসিয়া থাকিলেও পয়সা দিতে হয় কি না।

হোটেল-রেষ্টরাণ্টে অন্ততঃ ত দস্তর দেখিতেছি—মধ্যাহ্ন ভোজন বা নৈশ-ভোজনের জন্য কোন টেবিল গ্রহণ করিবা-মাত্রই ২।৩ কুভেয়ার-(couvert) দিতে হয়। কুভেয়ার এক প্রকার সেলামি বিশেষ। খাওয়ার দামের অতিরিক্ত এই খরচা। তাহার উপর বক্‌শিষ ত আছেই। খাওয়ার খরচ যদি ১৪ ফ্রাঁ লাগে, তাহার সঙ্গে ২ ফ্রাঁ সেলামি হোটেলের মালিক পায়। আর অন্ততঃ দশমাংশ অর্থাৎ ১৷৷০ ফ্রাঁ বাবুর্চির একপ্রকার বাঁধা "টিপ।" মোটের উপর এক খানার খরচ ১৭৷৷০ ফ্রাঁ।

ফরাসীরা রাঁধে ভাল। এই বিষয়ে মার্কিণরা হয় ত হার মানিবে। বিশেষতঃ সন্দেশ, মিঠাই, কেক্, পেষ্ট্রি ইত্যাদি দ্রব্যে ফরাসীরা নামজাদা। শুনিতেছি, জার্ম্মাণদের রন্ধন-বিদ্যালয়ে ফরাসী কায়দার রান্না-বাড়ি বিশেষ ভাবে শিখান হইয়া থাকে। ফরাসী পিঠা-পুলি তৈয়ারি করিতে শিখাও জার্ম্মাণ বালিকাদের অত্যাবশ্যক বিবেচিত হয়।

গলিঘোঁচ ছাড়িয়া প্যারিসের "বুল্‌ভার" (boulevard) গুলিতে আসিয়া দাঁড়াইলে ফরাসী জাতির গৌরব-গর্ব্ব সহজেই বুঝিতে পারা যায়। প্রশস্ত রাস্তাগুলি দেখিবামাত্র বুক চওড়া হইবারই কথা। মেপ্‌ল্ তরুর সারিওয়ালা সুবিস্তৃত সুদীর্ঘ রাজ-পথের দুই ধারে ঐশ্বর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি এবং বাস্তু-শিল্পের উৎকৃষ্ট নমুনা অসংখ্য। এই সকল বিষয়ে ফরাসীরা অন্য কোনো জাতির নিকটে সহজে হার মানিবে কি করিয়া ?

মাটির নীচের রেলপথে যাওয়া-আসা করিতেছি। বিলাতের ও আমেরিকার "আন্তর্ভৌম" রেলওয়ের ব্যবস্থা বোধ হয় যেন বেশী আরামদায়ক। প্যারিসেও অন্যান্য সহরের মতনই ট্রামওয়ে এবং অম্নিবাস ত অবশ্য আছেই; কিন্তু নিউইয়র্কের রাস্তায় ঊর্দ্ধে মঞ্চ তুলিয়া যেমন রেলপথ তৈয়ারী করা হইয়াছে, সেই ধরণের এলিভেটেড গাড়ীর রাস্তা প্যারিসে নাই। রবিবারে খৃষ্টান জগতের সর্ব্বত্রই গতিবিধি কিছু কম। কিন্তু প্যারিসে দেখিতেছি, গলিতে-গলিতে ঠেলা-গাড়ীর উপর নানান্ সওদা বিক্রী হইতেছে।

(৩)

এক চিত্র-শিল্পী বন্ধুর বাড়ীতে চা-পানের সময় কয়েক ঘণ্টা কাটানো গেল। স্বামী-স্ত্রী দুই জনেই চিত্রকর ও লেখক। ইহাদের ছবি সাধারণ দৃষ্টিতে কিম্ভুত-কিমাকার। স্ত্রীর কল্পনা তবুও খানিকটা বোধগম্য; কিন্তু স্বামী মহাশয় কিউবিজ্‌ম্-পন্থার চরম সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও, ইঁহার রচনায় বিভিন্ন বর্ণ-সমাবেশের চাতুর্য্য, এবং রূপ-সামঞ্জস্য উপভোগ করা অসম্ভব নয়। সেজান্‌কে (Cezanne) এই ধরণের নব্য শিল্পীরা গুরু বিবেচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু কোথায় সেজানের সরল, স্বাভাবিক প্রকৃতিনিষ্ঠা,—আর কোথায় ইঁহাদের কষ্ট-কল্পনা-প্রসূত একটা নতুন কিছু খাড়া করা।

শিল্পীর নাম অ্যালবেয়ার গ্লেজ (Albert Gleeges) ইঁহার প্রথম পুস্তক ফরাসী হইতে অনূদিত হইয়াছে ইংরেজিতে "Cubism" নামে। দ্বিতীয় পুস্তক কয়েক দিন হইল ফরাসীতে বাহির হইয়াছে। চিত্র-শিল্পের নব্যতন্ত্র বুঝাইতে ইনি চেষ্টা করিতেছেন। দুঃখের কথা, নব্য শিল্পীরা কেতাবে ও বক্তৃতায় যে সকল মোসাবিদা প্রচার করিয়া থাকেন, ইঁহাদের অনেকেরই আঁকা চিত্রে তাহা ঢুঁড়িয়া পাই না।

স্ত্রীর নাম জুলিয়েত (Juliat)। ইনি একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন—অনেক টাকা খরচ করিয়া, খুব ভাল কাগজে ও খুবসুরত ছাপায়। কেতাবটা পদ্য না গদ্য, বুঝিবার জো নাই। এমন কি, এটা চিত্রশিল্প, না সাহিত্য, তাহাও জনসাধারণের মাথায় প্রবেশ করিতে অনেক সময় লাগিবে। কোনো-কোনো পাতা এমন ভাবে ছাপানো হইয়াছে, যেন দেখিবামাত্র একটা বিচিত্র সিঁড়ি, অথবা নানা জ্যামিতিক আকৃতির সমাবেশ, অথবা অন্য কোন মূর্ত্তি

চোখে পড়ে। এই ধরণের কৃতিত্ব ইয়োরোমেরিকায় আজকাল মাঝে-মাঝে প্রায়ই দেখিতে পাই। শিল্প-বিপ্লবের, অন্ততঃ জীবন-স্পন্দনের, অথবা ব্যক্তিত্ব প্রকাশের এইগুলা কতক-কতক নমুনা বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। স্ত্রী-শিল্পীটির রূপ প্রায় পুরুষের ধরণেই ছাঁটা।

কিউবিষ্ট চিত্রকর গ্লেজ্

জুলিয়েতের পিতা জুল রোশ (Jules Roche) উপস্থিত ছিলেন। ইঁহার বয়স প্রায় আশী বৎসর। এই বৃদ্ধ বহুকাল ধরিয়া ফরাসী পার্লামেন্টের "শাঁবর দে দেপুতে"র (Chambre des deputes) অর্থাৎ কমন্স হাউসের মেম্বার ছিলেন।

১৮৭০ সালে যখন তৃতীয়বার ফ্রান্সে গণ-তন্ত্র বা রিপাব্লিক স্থাপিত হয়, তখন তিনি উদীয়মান যুবক। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে হাতেখড়ি হইয়াছিল ১৬ বৎসর বয়স হইতে। হইবারই কথা। ৫০।৭৫ বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্সে নিত্যই একটা বিপ্লব ঘটিত। ফ্রান্স ছিল তখনকার দিনে ইয়োরোপের "বোল্‌শেভিকী" অর্থাৎ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ। এই ঝটিকা-কেন্দ্রের আওতায় রোশের যৌবন কাটিয়াছে; এবং বর্ত্তমান ফরাসী রিপাব্লিকের প্রতিষ্ঠাতা গাঁবেতা (Gambetta) ইঁহার পরম বন্ধু ছিলেন।

তাহা সত্বেও, আজ ইনি মান্ধাতার আমলের ডেমোক্রেসী ও প্রজাতন্ত্রের বোল্‌চাল ছাড়া, আর কিছু হজম করিতে অপারগ। ইনি খানিক কথা-বার্ত্তার পর চলিয়া গেলে, জুলিয়েত বলিলেন—"আমার পিতা কি রকম ডেমোক্রেসী চান, শুনিবেন? ঠিক অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইয়োরোপীয়ানরা রিপাব্লিক শব্দে যাহা বুঝিত, ১৯২০ সালেও ইনি তাহাই প্রচার করিতেছেন। অর্থাৎ ইনি চান সেই পেরিক্লীসের দাস সেবিত ধনী শাসিত এথিনীয় গণ-তন্ত্র।"

রোশ একখানা দৈনিক কাগজের সম্পাদক। নাম "রেপিব্লিক ফ্রাঁসেজ" (La republique francaise) ইনি বলিলেন—"কয়েক মাস পূর্ব্বে ভারতীয় ডেলিগেশন

স্থাপত্যে নৃত্যকলা (ওপেরার সম্মুখে)

যখন প্যারিসে আসিয়াছিল, তখন আমি আমার কাগজে ভারতের স্বপক্ষে মত প্রচার করিয়াছিলাম।" জুলিয়েতের মুখে শুনিলাম—"আমার পিতার কাগজ কোনো লোক পড়ে না। রাস্তায় বা দোকানে ইহা কিনিতে পাওয়া যায় না। মাত্র বিশ হাজার ছাপা হয়। রাষ্ট্র, সমাজ ও

আর্থিক সমস্যার আলোচনায় যে সকল বুড়া বা যুবা এখনো গাবেত্তার নামে মুগ্ধ, তাহারা কাগজটা ডাকে পায়।" কাজেই, এই কাগজে ভারতবাসীর স্বপক্ষে উইচারিটা সম্পাদকীয় মন্তব্য বাহির হইয়া থাকিলেও, ইহার ফলে ফরাসী দেশে কোনো ভারতীয় দাগ পড়ে নাই—সহজে অনুমান করা চলে। তবে বুড়ায় বুড়ায় বনে ভাল। আর ফ্রান্সের

ম্যাদলেইন বুলভার

মাথায় আজকাল বড়াদেরই জয়জয়কার চলিতেছে। কাজেই রোশ কোন কিছুর মুরুব্বি দাঁড়াইলে, অন্ততঃ সামাজিকতার দিক হইতে কথঞ্চিৎ লাভবান্ হওয়ার সম্ভাবনা।

গ্রেজের ইুডিওতে একজন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন। নাম গুস্তাভ জেলে (Geley)। ইনি প্রেততত্ত্ব-তত্ত্বের ব্যাপারী। ভুতুড়ে কাণ্ড আলোচনা করিবার জন্য এক ল্যাবরেটরি কায়েম করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠানের নামটা খুব লম্বা—"আঁস্তিতিউ (Institut) মেতাপ্সিকিক (metapsychique) আঁতারনাশিওনাল।" ভূত বশীকরণ বিদ্যায় ইনি না কি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। ইহার সাঙ্গোপাঙ্গও শুনিতেছি অনেক।

এক ব্যবসায়ী পরিবারে নিমন্ত্রণ ছিল ম্যাজেষ্টিক হোটেলে। এই হোটেল লণ্ডনের "রিট্জ" বা "কার্লটন" এবং নিউইয়র্কের "ওয়াল্ডর্ফ আষ্টরিয়া" ইত্যাদি হোটেলের সমকক্ষ। এই সকল হোটেলে বিভিন্ন ডিপ্লোম্যাটিক আফিসের বড়-বড় প্রতিনিধিরা, অথবা সামাজিক লেনদেনে ঐ শ্রেণীর সামিল লোক বসবাস করিয়া থাকে। নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন আমেরিকা-ফেরৎ ফরাসী মহিলা। ইনি বিধবা। অন্যান্য সকলে ইহার ভাই এবং ভাইয়ের পরিবার ও পুত্র-কন্যা। এঁদের কারবার পশমী কাপড়ের। বিলাতের সঙ্গে এবং দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনার সঙ্গে ইঁহাদের আমদানি-রপ্তানি চলিয়া থাকে। ইঁহারা বলিতেছেন—"আমেরিকায় টাকা থাকিলেই লোকে মানুষ বলিয়া গণ্য হয়। ফ্রান্সে সেটি হবার জো নাই। এখানে চিত্তের উৎকর্ষ, বিদ্যার দৌড় এবং সভ্যতার পরিচয় না দিলে, কোনো লোক সমাজে খ্যাতিলাভ করিতে পারে না। ফরাসী রাজ্যের ভিতর ডলার-পূজা পাইবেন না।"
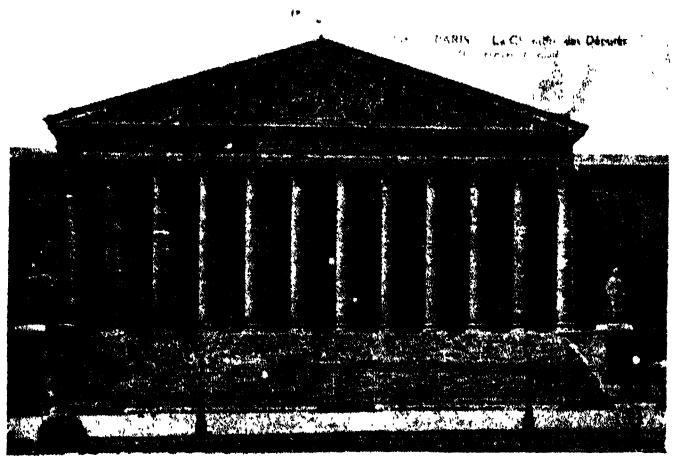
ডলার-পূজার নিন্দা করাটা দেখিতেছি সকল জাতেরই এক ফাসন। অথচ ডলার-পূজা করে না, এমন লোক একজনও নজরে আসিতেছে না। বোধ হয় বা ডলার-পূজা শব্দটা ভিন্ন-ভিন্ন লোক ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকে।

শাঁবার দে দেপুতে

(৪)

প্যারিসে ঠগের দৌরাত্ম্য খুব বেশী। রেষ্টরাণ্টের এক খানসামা এক দিন কুভের্য়ারের বাঁধা দাম আদায় করিয়া, তাহার উপর দুই ফ্রাঁ নিজ মজুরি দাবি করিয়া বসিল। বচসার পর বুঝাইয়া দিল যে, এইটা তাহার সার্ভিসের কিম্মৎ। অবশ্য ইহার অতিরিক্ত আবার বক্‌শিস বা টিপ ত আছেই।

অজ্ঞাত কুলশীল সিপাহীর কবর
(প্যারিসের প্রসিদ্ধ বিজয় খিলানের আওতায়)

আমি বুঝিলাম, জুচ্চুরি চলিতেছে। যাহা হউক, লোকটা বিল যেরূপ লিখিয়া আমার সম্মুখে ধরিল, ঠিক সেইরূপই টাকা দেওয়া গেল। দেখি, দৌড় কতদূর। ঘটনা-চক্রে কিছু রেজকি ফিরাইয়া পাইবার কথা। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পরও যখন ফেরৎ পাইলাম না, তখন খানসামাদের সর্দ্দারকে ডাকিয়া হুকুম করিলাম। সর্দ্দারের কাছে নালিশ করিবামাত্র লোকটা কেউ-মেউ করিতে লাগিল। অনেকগুলা সহভোজীর সম্মুখে সর্দ্দারের গালাগালি খাইয়া লোকটা যার পর-নাই নাকাল হইল। দুই ফ্রাঁ আমার ট্যাঁকে আসিলে—কড়ায়-ক্রান্তিতে রেজকিও হস্তগত হইল। প্যারিসে গাঁটকাটার হাত এড়াইতে হইলে চব্বিশ ঘণ্টা সাবধান থাকা আবশ্যক।

এক দিন রাত্রে এক যুবার সঙ্গে রেষ্টরাণ্টের আব্-হাওয়া বুঝিতে বাহির হইলাম। এক প্রকাণ্ড "ক্যাফে" তে প্রবেশ করা গেল। প্রায় দেড়হাজার লোক এখানে এক-সঙ্গে বসিতে পারে। কেহ সরাব পান করিতেছে—কেহ খানা খাইতেছে—কেহ কাফি ইচ্ছা করিতেছে ইত্যাদি। গান ও বাজনা চলিতেছে,—সমাগত স্ত্রী-পুরুষেরা দলে দলে নাচানাচিও করিতেছে। একটা টেবিলে বসিবামাত্রই এক খান্‌সামা আসিয়া হাজির। হয় কমসে কম কিছু অর্ডার দিতে হইবে—না হয় পত্র-পাঠ বিদায়। আরে ম'ল যা! এক পেয়ালা চকলেট ফরাসিতে "শোকোলা", আর এক পেয়ালা কাফি অর্ডার দেওয়া গেল। আমি কিছুই গ্রহণ করিলাম না,—যুবা পান করিল কাফি।

কিছুক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর যুবা বলিল—এইখানে দেখিতেছি আমার পরিচিত অনেক লোক। কয়েক মিনিটের ভিতরই এক রমণী আসিয়া তাহার পাশে বসিল;—আমি অপরিচিত লোক থাকা সত্ত্বেও সে যুবার সঙ্গে কথোপকথনে ভিড়িয়া গেল। কোন মতেই উঠে না। যুবা তাহার জন্য এক গ্লাস মদের অর্ডার দিল। স্ত্রীলোকটা
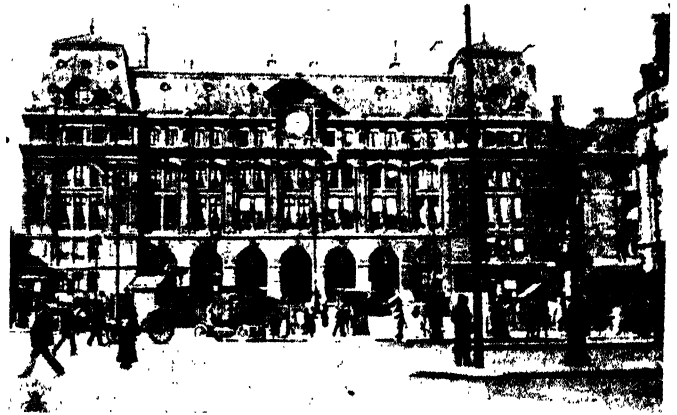
গার (ষ্টেসন) সাঁ-লাজার

খানিক পরে উঠিয়া যাইবার পর যুবা বলিল—"রেষ্টরাণ্টে বসিলেই এই ধরণের রমণী আসিয়া গল্প জুড়িয়া দেয়—তোমার সঙ্গে চেনা থাক্ বা নাই থাক্। এক্ষেত্রে অবশ্য এই রমণী আমার পুরান বন্ধু।"

আমি ভাবিলাম—পশ্চিমারা মিশরে যাইয়া কায়রোর কাফে হোটেলে মুসলমান নারীদের বেহায়া ব্যবহার দেখিয়া

নাক শিট্‌কায় কেন? যাহা হউক,—আমাদের গল্প চলিতে থাকিল;—প্রায় আড়াই ঘণ্টা হইতে চলিল—খানসামা ঘুরিয়া-ফিরিয়া বারে বারে আমাদের টেবিলের কাছে আসিতেছে। যুবা বলিল—"আর একটা অর্ডার না দিলে আর চলে না দেখিতেছি।" কিছু কেক্‌ ও শোকোলা আনানো গেল।

রাস্তার লোকজন

মোটের উপর খরচ পড়িল ১৫ ফ্রাঁ। সুতরাং অন্যান্য সহরের মতন প্যারিসেও আড্ডা মারিতে পয়সা লাগে; বিনা পয়সায় বসিবার জায়গা কোথাও নাই।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, স্ত্রীলোকের পোষাক-পরিচ্ছদের ফ্যাসন ঠিক করা হয় প্যারিসের মহিলা-মহলে। ফরাসী কায়দা অনুসারে পরে ইয়োরোপ এমেরিকার সর্ব্বত্র ষ্টাইল জারি হয়। এক ফরাসী মহিলা বলিতেছেন, "মহাশয়, নিউ ইয়র্কের সমাজে অর্থাৎ নৈশ মজলিশে স্ত্রীলোকেরা যে ধরণের রঙিন পোষাক ব্যবহার করিয়া থাকে, ফ্রান্সে তাহা অত্যন্ত অসংযত ও অশ্লীল বিবেচিত হয়।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সে কি? প্যারিসেই না আমেরিকার পোষাক তৈয়ারি হয়?" জবাব—"প্যারিসেই তৈয়ারি হয় বটে—কিন্তু সেগুলা প্যারিসে ব্যবহার হয় না। মার্কিণ বাজারের জন্য ফরাসীরা নানা ধরণের ষ্টাইল গড়িয়া থাকে। সেগুলা ফরাসী-সমাজে কোন মতেই চলিবে না।" ভাবিতেছি—কোন্ দিকেই বা তাকাই? সকল জাতিই নিজকে সংযম, শ্রীলতা, ও সুনীতির শিরোমণি সমঝিয়া থাকে।

ফরাসী ভাষার জাত মারিতেছি। অর্থাৎ বচন, লিঙ্গ, পুরুষের শ্রাদ্ধ করিয়া, কর্ত্তার ক্রিয়ার সম্বন্ধ উল্টাইয়া, আর উচ্চারণের মাথা খাইয়া দুরদম্ ফরাসী চালাইতেছি। কোন কোন জায়গায় ইতিমধ্যে দেড় ঘণ্টা দুই ঘণ্টা ধরিয়া কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত সামলাইতে হইয়াছে। এমন কি, কোন লোকের সঙ্গে তাহার বাড়ীতে দেখা করিতে যাইয়া ঘরে না পাইলে ঝী চাকরকে পর্য্যন্ত বুঝাইয়া দিতেছি—"বাবু বাড়ী আসিলে আমার কথা বো'ল—অথবা বাবুর সঙ্গে আমার অমুক স্থানে অমুক সময়ে মোলাকাতের ব্যবস্থা থাক্।" ইত্যাদি। আরও কঠিন ব্যাপার টেলিফোনে কথা বলা। পাঁচ সাত দিন প্যারিসে থাকিতে থাকিতেই তাহাও দেখিতেছি পারিলাম। একলা রেলওয়ে

জাঁ দার্ক-মূর্ত্তি (রাস্তার মোড়ে)

ষ্টেশন হইতে মাল পর্য্যন্ত খালাশ করিয়া মুটের ঘাড়ে চড়াইয়া ঘর পর্য্যন্ত পৌছিয়াছি। একটাও ইংরেজী শব্দের সাহায্য না লইয়াই এই সব গুছানো যাইতেছে।

প্যারিসে প্রায় ৬০।৭০ জন ভারত-সন্তানের বসতি। ১০ই নবেম্বর রাত্রে এখানকার এক মাঝারি গোছের ক্যাফেতে (ক্যাফে কার্ডিন্যাল) দেওয়ালি উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। কোথা হইতে একটা উড়ো খবর পাইয়া নিমন্ত্রিত না হইয়াও তীর্থের কাকের মত যথাস্থানে যাইয়া হাজির।

দেখি প্রকাণ্ড ঘর গুল্‌জার। একটা হারমোনিয়াম টেবিলের উপর বসানো। দশ বার জন পার্শী-পোষাকে হিন্দু মহিলা। লোকজনের আওয়াজে বুঝিলাম—মারাঠা, মান্দ্রাজী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, মায় বাঙ্গালীও "বৃহত্তর ভারতের" ফরাসী উপনিবেশে উপস্থিত। শুনিতেছি—৫।৭ জন ছাত্র ছাড়া এখানকার ভারতসন্তান সকলেই ব্যবসাদার। ব্যবসাও ইহাদের সকলেরই এক প্রকার,—ইহারা মুক্তার ব্যাপারী।

বুল্‌ভার দে-ইতালিয়াঁ

নিঃ-মথের ব্যবস্থা ছিল; হিন্দী, বাংলা গান হইল। এক পাঞ্জাবী মহাশয় ফরাসী জাতীয় সঙ্গীতে মার্সেইয়ের (Marseillaies) হিন্দী তর্জ্জমা গাহিলেন। তর্জ্জমা করিয়াছেন নিজে,—সুরও ঠিক করিয়াছেন নিজে। বিশ বৎসর ইনি প্যারিসের অধিবাসী।

১১ই নবেম্বর প্যারিসে মহা ধূম। প্রথম দফা আর্মিষ্টিসের পর আজ তৃতীয় বৎসর সুরু হইল। দ্বিতীয় দফা,—আজ ১৯২০ সালে তৃতীয় ফরাসী রিপাব্লিকের ৫০ বৎসর পূর্ণ হইল। কাজেই একটা বড় গোছের জুবিলীর অনুষ্ঠান হইয়াছে। ফরাসী নাম সাঁ্যকঁতেনেয়রে (sinqu-anteraire) বিদ্যুতের গাড়ী বহিবার জন্য প্রায় ৬,০০০ লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। আলোকবাহীদের মিছিলগুলা যারপরনাই চিত্তাকর্ষক। বোধ হয় এইটাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য বস্তু। আলো সাজাইয়া বসন্ত, শীত, শস্য-কাটা ইত্যাদি বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

আর দুইটা বস্তু চিত্তাকর্ষক কি না জানি না—তবে বাজার হিসাবে উল্লেখযোগ্য বটে। প্রথম নম্বর—গাঁবেতার হৃৎপিণ্ডটা মফস্বল হইতে মহা সমারোহে প্যারিসে আনা হইয়াছে। বুদ্ধদেবের দাঁতের ইজ্জদ যাহারা বুঝে, তাহারা এই হৃৎপিণ্ডের পূজাটা হজম করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় নম্বর,—লড়াইয়ে যত লোক মারা পড়িয়াছিল, তাহাদের অনেকের নাম-ধাম জানিতে পারা যায় নাই। এই ধরণের অসংখ্য লাস্ "যথা নাম গোত্রাঃ" রূপে কবর দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদের শ্রাদ্ধের সময়েও অবশ্য এই ধরণেই "যথা নামগোত্রাঃ" ইত্যাদি মন্ত্র আওড়ান হইয়াছিল। আজ সাঁ্যকঁতেনেয়ারের মেলায় দেখিতেছি—এই ধরণের একটা লাস লড়াইয়ের মাঠের কবর হইতে তুলিয়া আনা হইয়াছে। প্যারিসের প্রসিদ্ধ "বিজয়-খিলানে" এইটা গাড়া হইবে। এই

বুল্‌ভার দে কাপুসিন

লাসের জন্য মিছিল বাহির হইল। যেমন-তেমন মিছিল নয়। তৃতীয় ফরাসী রিপাব্লিকের জন্মদাতা গাঁবেতার হৃৎপিণ্ডকে যতখানি পূজা করা হইতেছে, এই অজ্ঞাতকুলশীল রামা-শ্যামার লাস-পচা মাটির চাপকেও ঠিক ততখানি পূজা করা হইতেছে।

এই দ্বিতীয় নম্বরের মিছিল অনুষ্ঠান করিয়া ফরাসী গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তারা ভাবিয়াছেন যে, এই উপায়ে তাঁহারা ফরাসী জনসাধারণকে হাত করিতে পারিবেন; অর্থাৎ ফ্রান্সের যে কোন লোকেই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফরাসী বীরেরও সমান—এই তত্ত্বটা যেন দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বুঝিতে

প্লাস দ'ল কঁকদ

পারে—এই উদ্দেশে এই কিম্ভূত-কিমাকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। কল্পনাটা মৌলিক বটে! তবে যদি এত সহজে একটা মরা মানুষের পচা হাড়মাংস লইয়া নাচানাচি করিলে—গরীব আধ-মরা বা মৃত-প্রায় মজুর চাষীকে ভুলান যাইত, তাহা হইলে সমাজ-সংস্কার বা রাষ্ট্র-সংস্কারের জন্য মাথা ঘামাইবার দরকার থাকিত না।

গ্রাঁ ওতেল

রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করিয়া জনসাধারণের মেজাজে বিশেষ কোন প্রকার উল্লাস, উচ্ছ্বাস বা অত্যধিক জীবনবত্তার চিহ্ন দেখিলাম না। বস্তুতঃ যুদ্ধে জয়লাভের পর ফরাসী নর-নারী কোন বিষয়ে লাভবান্ হইতেছে কি না, তাহা হয় ত পণ্ডিতেরা ষ্টাটিসটিক্‌সের ঝুলি খুঁজিয়া বলিলেও বলিতে পারেন। সহজ চোখে সকলেই বুঝিতেছে—প্যারিসের মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজকাল একবেলার বেশী দুই বেলা পূরা পেট খায় না। সকালে এবং রাত্রে একখানা রুটির সঙ্গে এক পেয়ালা চা, কাফি বা শোকোঁলা পান অসংখ্য পরিবারেরই বরাদ্দ। তারপর মফঃস্বলের কথা ত আরও শোচনীয়। এই শীতের দুর্য্যোগে সকলে হাহাকার করিতেছে।

কাগজে একটা সংবাদ পড়িলাম, ইংরেজরা ফরাসীর উপরও এই বিষয়ে এক টেক্কা মারিয়াছে। উহারা একটা "অজ্ঞাত-কুলশীল" মরা ইংরেজ সিপাহীর পচা লাস ফ্রান্স হইতে লইয়া গিয়া একদম ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার অ্যাবিতে পুঁতিয়াছে। এই অ্যাবি বিলাতী গোরস্থানের সেরা। কেবল তাহাই নয়—ফ্রান্স হইতে বিশেষ এক থাবা ফরাসী মাটিও ইংরাজেরা এই লাসের সঙ্গে লইয়া গিয়াছে।
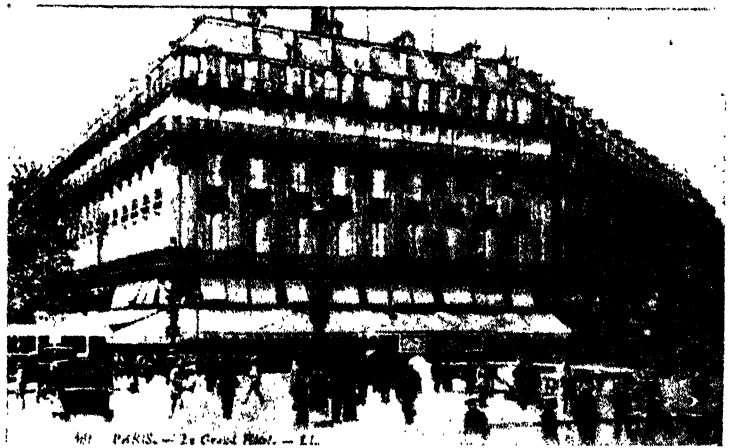
ইহাতে ইংরেজ জাত এক ঢিলে দুই পাখী মারিল ভাবিতেছে। প্রথমতঃ একটা রামা-শ্যামাকে ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টারে গাড়িয়া ডেমোক্রেসির পরাকাষ্ঠা ত দেখাইলই; অধিকন্তু ফরাসী জাতটাকেও ইংরেজ জাতের চিরমিত্র জ্ঞানে সম্মান করা হইল।

অবশ্য যাঁহারা রাষ্ট্র-নীতির মার-প্যাঁচ বুঝেন, তাঁহারা সহজে আন্দাজ করিয়া লইবেন যে,—এক থাবা মাটির

মাথায়ও ইংরেজ অনেক চাল চালিয়াছে—এবং পরেও চালিবে নিশ্চয়। আন্তর্জাতিক আনাগোনার কতখানি ইংরাজ কাগজে ছাপা হয়? গুপ্ত সন্ধির যুগ আজও দুনিয়া হইতে উঠিয়া যায় নাই।
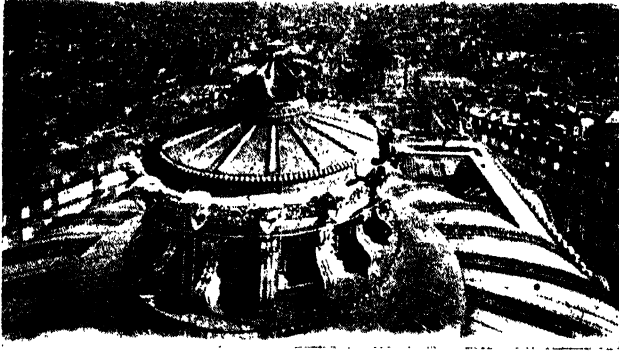
ওপেরা-ভবনের চূড়া

গাঁবেত্তা

ফরাসী দাড়ির কথা কথা ত জন্মাবধিই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু বাজারে হাটে রাস্তায় হোটেলে ত বেশী চোখে পড়িতেছে না। লোকের সখ ফ্রান্সে আছে বটে।

কয়েকজন মার্কিণ, স্পেনিস ও ইতালীয় লোকের আড্ডায় উপস্থিত ছিলাম। তাহারা বলাবলি করিতেছে:—ফ্রান্স দেশটা যত ভাল লাগে, ফরাসী জাতটা তত ভাল নয়।"

ভৈরব

[মহারাজকুমার শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়]

কত কল্প পর আজ, উদ্দাম দুরন্ত পান্থ—
অন্ধকার পথে।
প্রদীপ্ত পতাকা তুলি বিদ্যুৎ বিচ্ছুরি এলে,
আষাঢ়ের রথে॥

নীরদ-নির্ঘোষে ওই— মহা-শূন্য কেঁপে উঠে
সূর্য্য, চন্দ্র, তারা।
আতঙ্কের অঙ্ক পরে, আঁখি মেলি চেয়ে থাকে
নিখিলের ধারা॥

ধ্বংসের বিরাট গাথা, প্রভঞ্জন-পক্ষ-পরে
দিকে দিকে ছুটে।
বসুধার বুকে তাই শ্যামল অঞ্চলখানি
দুলে দুলে উঠে॥

বিজয়ী কেতনে তব, লেখা আছে সৃজনের
সর্ব্বশেষ গান।
রুদ্ধ গৃহে তাই আজি শিহরিছে থাকি থাকি
ক্ষুদ্র ক্ষুব্ধ প্রাণ॥

প্রলয়ের মহামন্ত্র মন্দ্রিত করিল আজ
তব জয় ভেরী।
মহাকাল বক্ষ পরে রুদ্রাণী রুধির স্নাতা
পরা নাহি হেরি॥

অম্বর আবরি তব ঘন ঘোর জটা জুট
আঁধারিছে দিশা।
অনিমেষ চেয়ে আছে সেই অন্ধকার পানে,
অন্ধময়ী নিশা॥

হে প্রচণ্ড! এই তব দলন-দহন-লীলা
সেই বুঝে ভাল
যাহার বৈরাগ্য হিয়া উপেক্ষিয়া সব সোণা
বরিয়াছে কাল॥

অসহায় ধরা শিশু কম্পিত, শিথিল তনু
ভয়ে আত্মহারা।
দেবতারে স্মরি শুধু তোমার প্লাবন-সাথে
মিশাইছে ধারা॥

ত্রাসিয়া উঠিছে চিত্ত, অমঙ্গল শঙ্কা করি
চাহে পাণ্ডু মুখে।
দেখিছে না বক্ষানলে প্রোথিত ত্রিশূল তব
অশিবের বুকে॥

হে বিপুল! হে বিরাট! উদ্যত করকা-কর
হে রুদ্র ভৈরব!
নিখিল নয়ন জলে অবগাহি এলে আজ
প্রমত্ত গৌরব॥

জ্বলন্ত-জীমূত-স্বরে ফুকারিলে, নব তান
নব জীবনের।
আমরা বুঝিতে নারি উদার আহ্বান তব
মহা-বিষাণের॥

আমরা বুঝিতে নারি কোন্ অপরাধে এই
নির্য্যাতন পালা।
কি সুখে দোলাও গলে মানবের শেষ অর্ঘ্য
কঙ্কালের মালা॥

আমরা বুঝিতে নারি কি লাগি তোমার চোখে
গৃধিনীর ক্ষুধা।
বিশ্বেরে নিঃশেষি পুনঃ, কোন্ মন্ত্র-সঞ্জীবনে
সঞ্চারিবে সুধা॥

নাহি বুঝি ক্ষতি নাই, তবু আঁখি মুদিব না
হে দহন-রাজ!
বিশ্ব-ধ্বংসকারী-যজ্ঞে মোরাও ইন্ধন দিব
শঙ্কা-ভয়-লাজ॥

তারপরে যবে পুন, পাইব তোমার দেখা—
অপূর্ব্ব পুলকে।
এমনি এক আষাঢ়ে পড়িব শান্তির পাঠ
নক্ষত্র-আলোকে॥

সেদিন বুঝিব কেন আঁধারের রূপ ধরে,
এসেছিলে তুমি।
পৃথিবীর বুক হ'তে উঠিবে কমল তব
চরণেরে চুমি॥

পথের সন্ধান

[শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু]

১

অখিল চৌধুরী পূর্ব্ববঙ্গের একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার—বাৎসরিক প্রায় লক্ষ টাকা আয়। পুত্র অনিল এম্-এ দিবার অছিলায় কলিকাতায় হৈ হৈ করিয়া বেড়াইতেছে। দেশের হিতের জন্য দৈনিকে, মাসিকে প্রবন্ধ লিখিয়াছে। গোলামখানার সামনে সটান্ হইয়া শুইয়াছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়-প্রদত্ত উপাধির অসারতা সপ্রমাণ করিয়াছে; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্বর তুলিয়াছে, গভর্ণমেণ্টের দেওয়া উপাধির বিরুদ্ধে। এমন সময়, অদৃষ্টের বিদ্রূপ; সে বৎসর ঝড়ে নিপীড়িত পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণকে মুক্তহস্তে সাহায্য করিবার জন্য সরকার বাহাদুর তাহার পিতাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দিয়া সম্মানিত করিলেন!

সে কি হে অনিল! তোমার বাপ?

বক্তার উপর বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অনিল বলিল, হাঁ, আমার বাপ! তাতে হয়েছে কি?

হবে আবার কি? বাবাকে ত বরখাস্ত করতে পারবে না, বন্ধু! যেহেতুক তিনি তোমার অন্নদাস নন। আর তুমিও কিছু রিজাইন্ করতে পারবে না, যেহেতুক তোমার দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে তাঁর মর্জ্জির উপর!

এই দ্বিতীয় বক্তাটী অনিলের আর একটী সহপাঠী এবং অদ্ভুত প্রকৃতির। ইহার আগ্রহ নিগ্রহ দু'ই দুর্ব্বোধ। গোলামখানার সম্মুখে যেমন অধ্যবসায়ের সহিত সে অনিলের পার্শ্বদেশ অধিকার করিয়াছিল, তেমনি উৎসাহে অজস্র শ্লেষও বর্ষিয়াছিল! ফুটপাথের উপর কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিবার পর বিনু ফোঁপাইতে আরম্ভ করিল। ইহার হাসি-কান্না সহজে বুঝা যায় না। অনিল ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিল, কাঁদ্‌ছিস নাকি? হাঁ। কেন রে? বিরহে—বন্ধু-বিরহে! অক্রূরের রথের পথ আগ্‌লে গোপিনীরা একদিন এমনি করেই পড়েছিল।

অনিল খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, ছিল—ছিল। তা আমায় কুতুকাতু দিচ্ছিস কেন? নইলে হাস কৈ, বন্ধু? কিছুক্ষণ পরে পরীক্ষার্থী কোন ছাত্রকে অদূরে দ্বিধাগ্রস্তভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া বিনু বুক পাতিয়া কীর্ত্তনের সুরে গাহিল—'দেহি পদপল্লবমুদারম্!' পরীক্ষার্থী ফিরতি ট্রামে উঠিয়া পড়িল!

এ সকল পূর্ব্ব কথা। আজ চায়ের আসরে বিনুর মন্তব্য শুনিয়া অনিল বিস্ময় ও বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখ চাহিয়া প্রশ্ন করিল, ডিস্‌মিস্, রিজাইন্ ছাড়া তৃতীয় পন্থা কিছু দেখ্‌ছ না?

হাঁ—'মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ।'

অনিল নীরবে নির্জ্জনে গিয়া একখানি চিঠি লিখিল। আমরা তাহার অবিকল নকল দিতেছি।

স্নেহের রেণু—

তুমি কি নীরবে সহ্য কর্ব্বে এই অপমান? গভর্ণমেণ্ট আর লোক পেলেন না? উপাধি দিলেন, আমার বাবাকে? ধিক! তাঁর পক্ষে উপাধি—আমার সমাধি! কিন্তু ছেড়ে দিলে হবে না হাল। বাবাকে সম্মত করাতে হবে এ সম্মান (?) ছেড়ে দিতে। রীতিমত লড়াই কর্ত্তে হবে তাঁর সঙ্গে, তোমাকে আমাকে। প্রয়োগ কর্ত্তে হবে আমাদের যত কিছু অস্ত্র—আমার তর্ক-যুক্তি, তোমার অশ্রুজল। বাল্য সঙ্গিনীটি আমার! তুমি তাঁকে বিধিমতে প্রস্তুত করে রেখ। রবীন্দ্রনাথের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের কথা বোলো, সুব্রহ্মণ্যের বিরাট্ ত্যাগের কথা তুলো। আমি কিছুতেই মনে কর্ত্তে পারিনি—ত্যাগের আদর্শে কারু চেয়ে ছোট—আমার বাপ। আমি বাড়ী যাব শীঘ্রই, কেবল অপেক্ষা তোমার প্রত্যুত্তরের। বুঝ্‌ব তুমি যথার্থই তাঁর বন্ধু-কন্যা—প্রকৃত হিতৈষিণী তুমি তাঁর,—এ উপাধি-ব্যাধির চিকিৎসা করে তাঁকে আরোগ্য কর্ত্তে পার যদি। নইলে জেনো, এ উপাধি সত্যই আমার সমাধি। আর মুখ দেখাব না তোমাদের। ইতি

তোমার মুখাপেক্ষী

অনিল

পত্রখানি লিখিয়া অনিলের উগ্র ঝাঁজ অনেকটা প্রশমিত হইল। পত্রের প্রত্যুত্তর আসিল, সুন্দর নারীহস্তে লিখিত দুটী কথা—

বাড়ী এস। ইতি—,

স্বরেণু।

২

আপনি আমায় চান্, কি খেতাব চান্?

উত্তেজনায় অনিলের স্বর ও শরীর কাঁপিতেছিল। অখিলবাবু পুত্রকে কোনদিন প্রশ্রয় দেন নাই সত্য, কিন্তু যথাসম্ভব তাহার স্বাধীনতা চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। আজ হঠাৎ তাহার স্পর্দ্ধিত প্রশ্নে যুগপৎ তাঁহার মনে বিস্ময়, বিরক্তি ও অসহ্য ক্রোধের উদয় হইল। কিন্তু আত্ম-সংযমে চিরাভ্যস্ত বৃদ্ধ বাহিক অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া প্রতিপ্রশ্ন করিলেন, তার আগে তুমি একটা কথার জবাব দাও। তুমি আমাকে চাও কি আপনার পথে চল্‌তে চাও?

তাঁহার স্বরে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য। কথাগুলা যেন অনিলের কানে ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিয়া উঠিল! ঠিক এই প্রশ্নের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, আপনি ত বরাবর আমাকে স্বাধীনভাবে চল্‌তে উপদেশ দিয়েছেন—

সত্য! কিন্তু কখন তোমার যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিয়েছি কি?

অনিল উত্তর করিল না দেখিয়া অখিল জিজ্ঞাসিলেন, পড়াশুনা করছ, না কেবল হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছ?

অনিল দৃঢ়স্বরে বলিল, এম্-এ পড়্‌ব না।

একেবারে স্থির করে ফেলেছ? কেন?

ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ হচ্ছে।

খুব সত্য! ইংরাজী শিক্ষার ফল তোমাতে প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি। এ বিজাতীয় শিক্ষা এখনি বন্ধ করা উচিত। কিন্তু আমাকে আগে জানাওনি কেন? মাস মাস কলেজের মাইনে নিচ্ছ, বাসাখরচ দিচ্ছি কি অপব্যয় করবার জন্য? যে উদ্দেশ্যে আমি টাকা দিচ্ছি, তা না করে টাকা আত্মসাৎ করাকে ঠকানো বলে, তা জান?

যেন চাবুকের আঘাতে অনিলের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল! কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, সে টাকা আমি আপনাকে ফিরে দেব। কিন্তু আপনি খেতাব ফিরে দিন।

টাকা ফিরে দিলেই দোষ কাটে না। তারপর, আমি কি করব না করব সে বিবেচনা আমার কাছে।

ইহার প্রত্যুত্তরে অনিল কি বলিতে যাইতেছিল, ঠিক সেই সময় গৃহকর্ত্রী বলিলেন, ছি বাবা, ওঁর মুখের ওপর কি কথা কইতে আছে?

জানি। আজ যদি আমার মা থাক্‌তেন—

অনিলের চোখ দিয়া অভিমান উথলিয়া উঠিল। অশ্রুসিক্ত স্বরে বলিতে লাগিল, আজ যদি আমার আপনার মা থাক্‌তেন, তিনি তোমার মত চুপ করে আমার অপমান দেখ্‌তে পারতেন না। তুমি সৎমা—

সহসা শরবিদ্ধ হইয়া বিহঙ্গিনী যেমন লুটাইয়া পড়ে, অনিলের বিমাতা একখানি আসনের উপর তেমনি ঢলিয়া পড়িলেন। তাঁহার বিবর্ণ মুখে রেখায় রেখায় অপরিসীম বেদনা ফুটিয়া উঠিল। যেদিন নববধূরূপে এই সংসারে আসিয়া শৈলজা একবৎসরের মাতৃহীন অনিলকে অঙ্কে তুলিয়া লইয়াছিলেন, সেদিন হইতে তাঁহার মাতৃত্ব সিন্ধুগামিনী তরঙ্গিণীর ন্যায় নিয়ত আয়তকায় হইয়া শতমুখে শতধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। পাছে অনিলের উপর তাঁহার একাগ্র বাৎসল্য অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়, এজন্য তিনি কখন নিজের সন্তান কামনা করেন নাই। বিশবৎসর পরে আজ সেই অনিল বলিতেছে, তুমি সৎমা! নির্ঘাত আঘাত। অনিল অশ্রুর অন্তরাল হইতে একবার মায়ের মুখপানে চাহিল। তাহার মন সেই ছোট শিশুটীর মত তাহাকে মায়ের কোলপানে ঠেলিতে লাগিল। কিন্তু আর কেন? এখনই ত তাহাকে সকল বন্ধন ছেদন করিয়া অকূল সমুদ্রে ভাসিতে হইবে! আর কেন? কঠোর কর্ত্তব্য সম্মুখে! অনিল নতমুখে ধীরে ধীরে শূন্য বক্ষ লইয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। শৈলজার মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হইল না। কেবল একবারমাত্র একখানি কর অনিলের দিকে প্রসারিত হইয়া শূন্য আলিঙ্গন করিল।

হায়, আজ কোথায় সে অনিল! পিতার স্নেহের ধন, মাতার অঞ্চলের নিধি! যাহাকে আশ্রয় করিয়া কত আশা, কত কল্পনা, কত স্বপ্ন শতদল পদ্মের মত বিকশিত হইয়াছে —কোথায় সে! এ ত সে নয়! অখিলের নৈরাশ্য-কাতর অন্তর বারবার এই কথাই বলিতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে কাতরস্বরে শৈলজা বলিলেন, ডাকো।

কাকে?

অনিকে।

আর ডাকাডাকি কেন? ওকে মন থেকে মুছে ফেলে দাও। নইলে কষ্ট পাবে।

এ কি জলের আঁক যে মুছে ফেলে দেব? তুমিই কি পেরেছ?

পারিনি, কিন্তু পারব।

ও পাগল হয়েছে বলে তুমিও কি পাগল হলে? ওকে ত্যাজ্যপুত্র করবে?

ত্যাজ্যপুত্র কে করবে, শৈল! সেদিন আর নেই! এখন ছেলেরাই বাপমাকে ত্যাগ করছে।

তা হ'ক! আমি যে ওকে এতটুকু থেকে এত বড় করেছি। এই সেদিন পর্য্যন্ত খাইয়ে দিতে হয়েছে। আমার কোলের কাছে না হলে ঘুমুতে পারত না!

সে দিন আর নাই শৈল! সে দিন গিয়েছে! তুমি ওকে এতটুকু থেকে এত বড় করেছ। মা'র কথাই জানো। কিন্তু বাপ যে ধ্যানে গড়ে, তার প্রতি নিঃশ্বাস পড়ে ছেলের জন্য, তা বাপ না হলে বুঝ্তে পারে না।

একটা উত্তপ্ত শ্বাস বাহির হইবার জন্য অখিলের হৃৎপিণ্ডটাকে মোচড় দিতে লাগিল। কিন্তু অনিলের অকল্যাণ আশঙ্কায় তিনি তাহা প্রাণপণে চাপিতে চাপিতে বলিলেন, আশায় মানুষ অন্ধ হয়; ভাবে, ছেলে চিরকালই ছেলে থাক্‌বে। কিন্তু একদিন হঠাৎ চমক ভেঙ্গে দেখে বাপ যা চায়, ছেলে তা চায় না। কত যত্নে যে-সব বুলি শিখিয়েছিল, শিক্‌লী-কাটা পাখী আর সে সব বুলি বলে না। মনে হয়, কে একজন অজানা অচেনা ছেলের রূপ ধরে এসেছে—তার আশা, ভাষা, ভালবাসা, সবই দুর্ব্বোধ! কি বিড়ম্বনা।

পেটে ধরিনি বলে আমি সৎমা! শৈলজা ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

ও এখন আপনার মা পেয়েছে—

শৈলজা ত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, কাকে মা বলেছে? কোন্ সর্ব্বনাশী আমার কোলের বাছাকে কেড়ে নিয়েছে? সে কি মানুষ নয়? পাথরে গড়া?

সে মাটীর মা! ছেলে তার শরীরে আপনার প্রাণ-সঞ্চার করে, তাকে জীয়ন্ত করে। বুঝতে পারছ না? ইনি দেশমাতা জন্মভূমি।

সর্ব্বরক্ষে! তোমার কথা শুনে আমার বুকের ভেতর ঠাঁই ঠাঁই করে কাঁপছিল! বেশ্ ত! অনি আমার অজর অমর হয়ে দেশের সেবা করুক, কিন্তু আমায় মা বলবে না কেন?

তুমি মনের মত মা নও।

একটী কথা বল্‌ব?

কি?

ও যা বল্‌ছে, তাই কেন কর না? এতদিন পরে রায় বাহাদুর হয়ে—

চতুর্ভুজ হব না, জানি! বরং দশজনে ধন্য ধন্য করবে, সকলের মাথার মণি হব। তার কাছে 'রাজা' 'রায় বাহাদুর' খেতাব নগণ্য। কেনা মান আর শ্রদ্ধার সম্মান কি এক! কিন্তু—

কিন্তু কি? চুপ করলে কেন?

কিন্তু কি জান? সেই ধন্য ধন্য করাটাকেই আমি সকলের চেয়ে বেশী ভয় করি।

সবাই কি নাম খোঁজে!

প্রথমে না খুঁজতে পারে, কিন্তু প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তির লোভ যে কোথা দিয়ে কখন এসে জোঁকের মত ছেঁকে ধরে, তা বুঝ্‌তেই পারা যায় না। কিন্তু একবার যখন ধরে তখন তাদের ঠেকান শক্ত।

তা হ'ক। দশমুখে ধর্ম্ম। দশজনে যা ভাল বলে, তাই করাই ভাল।

দশজন যখন এক কথা বলে, তখন সেটা ভাল বলে মানি। কিন্তু দশ জনের দশ কথা খেয়াল বৈ আর কি! নইলে এত দল-ভাঙ্গাভাঙ্গি হয় কেন? সত্যের দলাদলি নাই। আজ যিনি এ-দলে ছিলেন, সামান্য একটু মতের গরমিল হল, অমনি কাল ও-দলে গেলেন; নয়ত একটা নূতন দল করলেন। বারো রাজপুত তের হাঁড়ি শুনেছ? এ দুর্ভাগা দেশে চিরকালই তাই হয়ে আসছে। রোজ কাগজ পড়, দেখছ ত। কেউ বল্‌ছেন, বিদেশীদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা হবে না। কিন্তু আজকাল পৃথিবী শুদ্ধ লোক যাঁকে সম্মান করছে, তিনি পাশ্চাত্য দেশ সব ঘুরে এসে বল্‌ছেন, না, ওদের সঙ্গে এখন সব সম্পর্ক উঠিয়ে

দিলে আমাদের মানসিক উন্নতির পথ বন্ধ হবে। মনের দ্বারে আগড় দেওয়া ভাল নয়, তাতে সত্যের প্রবেশ-পথ রুদ্ধ হয়।

দেশের কি মাথা কেউ নেই!

থাকবে না কেন? মাথা আছে, ছাতা নেই। শৈল, তুমি আপনার কথা ভাব্‌চ, কিন্তু আর একজনের যে কি সর্ব্বনাশ হচ্চে, সে দিকে চেয়ে দেখছ না!

কে? কার?

রেণুর। তোমার আমার যন্ত্রণা বটে, কিন্তু সে আর ক'দিন। আমাদের ত শেষ হয়ে এসেছে। যেটুকু বাকী ছিল, এইবার হল! কিন্তু রেণুর যে সারা জীবন সামনে পড়ে রয়েছে। আমি রাধারমণের কাছে কি জবাব দেব?

রাধারমণ কি আমাদের মন দেখ্‌তে পাচ্ছেন না? তিনি ত অন্তর্যামী!

আমি রেণুর বাপের কথা বল্‌ছি। তার কাছে যখন যাব, তখন কি বলব!

আমাদের অপরাধ কি যে জবাবদিহি করতে হবে?

অপরাধ একটু আছে বৈ কি। নেই কি? ভেবে দেখ দিকি! কত সম্বন্ধ এসেছে, কান দিয়েছি! ছেলেবেলা দুজনের মান-অভিমান, আদর উৎপাত দেখে মনে হত, অনির চেয়ে রেণুর আর ভাল পাত্তর পাব না। লোকে নিন্দে করেছে, ওর বাপ যে কোলিয়ারিটুকু রেখে গেছে, আমি সেইটী টেঁকে বসে আছি! আমি কিন্তু সত্যই আপনার ছেলের চেয়ে আর ভাল পত্তির দেখতে পাইনি। অনির মনের মতন ক'রে ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে গড়ে তুলেছি।

তুমি অত ভাবছ কেন? অনি কি রেণুকে ত্যাগ ক'রতে পারবে?

ও না-ই করলে! কিন্তু শৈল, আমি ঐ বাউণ্ডুলের হাতে আমার সোনার প্রতিমাকে দেব কেমন ক'রে!

কিন্তু অনিকে কেউ যদি এখনও জব্দয় রাখতে পারে ত সে রেণু। রেণুর আবদার ও কিছুতে এড়াতে পারে না।

তা হ'তে পারে! কিন্তু রেণু ত আর আবদার করবে না যে আমায় বে কর।

৩

এ তোমার ভারি অন্যায় রেণু! সবেতেই জোর জুলুম! আমি খাব না। এখানকার কে আমি! কি অধিকারে খাব?

উদ্‌গত হাসিকে অধরের অন্তরালে লুকাইয়া রেণু বলিল, সে কথা তা হলে তোমার চিঠিতে লেখা উচিত ছিল।

আমার কি জানা ছিল যে, বাবা এই রকম করবেন!

আমারই কি জানা ছিল যে, তুমি একেবারে Ultimatum দিতে এসেছ! তা হলে হাত পুড়িয়ে রেঁধে মরতেম না।

অনেকদিন আগেকার কথা অনিলের মনে পড়িল। তখন রেণুর বয়স সাত, অনিলের বারো। কাঁচা চালের ভাত, আমরুলের অম্বল, তেঁতুল পাতার চড়চড়ি, সুল্‌পো শাক সড়সড়ি খাওয়াইবার জন্য সে কি জেদ! অনিলকে চিরদিনই এই তেজস্বিনী বালিকার ধনুকভাঙ্গা পণের কাছে হার মানিতে হইয়াছে। পিতা মাতার কাছে অভিযোগ করিয়াও কোন ফল হয় নাই। তাঁহারা এই বালিকাকেই প্রশ্রয় দিয়াছেন। সে আজ নয় বৎসরের কথা। বালিকা এখন যুবতী। শীতান্তে বসন্তের আবির্ভাব হইয়াছে। রেণুকে দেখিতে দেখিতে অতীত হইতে বর্ত্তমানে আসিবামাত্র অনিলের বুকের ভিতরং যেন খালি হইয়া গেল! হায়, পিতৃগৃহের সঙ্গে সঙ্গে ইহার সহিতও চিরবিচ্ছেদ ত অবশ্যম্ভাবী! তাহার বাল্যের ভালবাসা, চিরদিনের আশা রেণু! ত্যাগ, ত্যাগ! ত্যাগই জীবনের মহত্ত্ব! মনুষ্যত্বের আদর্শ! ত্যাগই আনন্দ! দুঃখিনী জন্মভূমির জন্য পিতা মাতা-প্রণয়িনী সবই ত্যাগ করিতে হইবে। অভাগিনী জন্মভূমি! অভাগিনী রেণু! অনিল স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, তোমার হাত-পোড়ান ত আজ নূতন নয়, রেণু! সে রান্না কি ভোল্‌বার! কিন্তু আমি এলে মা-ই ত রাঁধেন।

অনিলের স্বরে অভিমব সুর শুনিয়া রেণু চকিত হইল। কিন্তু আঘাত করিতে ছাড়িল না, বলিল, তাঁর গরজ! সতীন-পোর জন্য ভারি ত মাথাব্যথা!

লজ্জায় অধোবদন হইয়া অনিল অন্ন-ব্যঞ্জনের প্রতি চাহিয়া রহিল।

বাপকে অপমান করলে বুঝি দেবত্ব প্রাপ্তি হয়?

তার মানে?

তাই ত দেখ্‌ছি, দেবতাদেরই দৃষ্টিতে পেটভরে।

অনিল কোলের কাছে থালাটা টানিয়া লইয়া বলিল, অপমান আমি করেছি?

না। লাট সাহেব।

সে কথা সত্য, রেণু! গভর্ণমেন্টের দেওয়া টাইটল্ সম্মান নয়। ইচ্ছা করলে কি 'রায়-বাহাদুর' খেতাব ছাড়া যায় না?

কেমন করে জান্‌ব? তুমি তবে লোকের কাছে 'বাহাদুর' হবার জন্য এত লালায়িত কেন?

তার মানে?

বাবার সঙ্গে আজ যা করলে, তাতে নিশ্চয় লোকে ধন্য ধন্য করবে, তোমাকে বাহাদুর বল্‌বে। ও কি! ও কি! বাঃ! মাছ-মাংস খাওনা, ঝালের ঝোল একটু মুখে দাও!

পূর্ব্ববঙ্গের অভ্যাসানুসারে অনিলের পিতা একটু বেশী ঝাল খাইতেন। কিন্তু কলিকাতা-প্রবাসী পুত্রের রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অনিল প্রথম গ্রাস মুখে তুলিয়াই বলিল, উঃ বেজায় ঝাল দিয়েছ যে।

রেণু একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, সত্যি? তা হতে পারে; আমার ভাবা উচিত ছিল যে, ঝাল খাওয়াটা তুমি এখন পরের মুখেই অভ্যাস করছ।

তুমি দেখছি, আমাকে পাগল করে তুলবে।

রেণু সলজ্জ হাসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, ঝাল খাইয়ে নয় কি? কিন্তু দুধে ত ঝাল দিই নি, ওটা খাও!

অনিল আহারে বসিবার পর শৈলজা দুধ লইয়া আসিতেন এবং পুত্রের আহারে অমনোযোগ দেখিলে স্বহস্তে অন্ন-ব্যঞ্জন মাখিয়া তাহার মুখে তুলিয়া দিতেন। আজও সেই দুধের বাটী আসিয়াছে, কিন্তু মা কোথা? প্রশ্নটা অনিলের ঠোঁটের আগায় আসিলেও মুখ দিয়া বাহির হইল না। কেবল বিষণ্ণ চক্ষে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। রেণু তাহা বুঝিল, কিন্তু নির্যাতন করিতেও ছাড়িল না, বলিল, এদিক-ওদিক কি দেখ্‌ছ। দুধ তোমার সামনে!

বেশ! আমি বুঝি দেখতে পাচ্ছিনি!

তবে খুঁজ্‌ছ কি? দেখছিলে কেউ আড়াল থেকে তোমার খাওয়া দেখছে কিনা?

অনিলের চোখ দুটীতে অশ্রুর আভাস দেখা দিল, কথা কহিতে পারিল না। কেবল ঘাড় নাড়িল। কিন্তু অশ্রুর সে আভাসটুকু রেণুর চক্ষু এড়াইল না। অনিলকে সামলাইবার অবসর দিবার নিমিত্ত সে পরিহাসচ্ছলে কহিল, তবে? আমাকে লজ্জা করছে? বেশ ত! এই আমি চোখ বুজছি, তুমি খাও! বলিয়া রেণু দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

অনিল তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া দুধের বাটি মুখে তুলিল, কিন্তু পান করিতে পারিল না। পরিপূর্ণ পাত্র প্রত্যাখ্যান করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

রেণু স্থির জানিত যে, এই প্রত্যাখ্যানের প্রকৃত কারণ অনিল নিজমুখে স্বীকার করিলে মাতা-পুত্রের মাঝখানে যে বাষ্প ঘনাইয়া উঠিতেছে, তাহা অনায়াসেই কাটিয়া যায়। অনিল আঁচাইয়া আসিতেই সে প্রশ্ন করিল, দুধ খেলে না কেন?

অনিল কিন্তু রেণুর ঈপ্সিত উত্তর প্রদান করিল না। কিছুক্ষণ তাহার মুখ চাহিয়া কহিল, তুমি যে কেমন করে খেতে বলছ, রেণু, আমি তাতেই অবাক্ হচ্ছি!

কেন?

কেন? দেশের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ না। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, স্বাস্থ্য নেই, চারিদিকে হাহাকার! সে হাহাকার শুনতে শুনতে কি ঘন দুধের বাটিতে চুমুক দেওয়া যায়। এ ত দুধ নয়? এ যে দরিদ্রের দেহের রক্ত! কিন্তু, যারা অকাতরে সেই রক্ত ঢেলে আমাদের বিলাস-ভোগের যোগাড় করে দিচ্ছে, তারা দুবেলা দু'মুঠো খেতে পায় না। যাদের অর্থে আমাদের এই ইন্দ্রভবন হয়েছে, তাদের মাথায় ছাত ত দূরের কথা, একটা ছাতাও নেই!

তুমি কেমন করে জান্‌লে যে নেই? গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে ঘুরে দেখেছ কি? বাবার জমিদারী তুমি তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান কর, খাওয়া পরার দরুণ কষ্ট পাচ্ছে এমন এক ঘর প্রজা দেখাতে পারবে না।

পারব না?

রেণু দৃঢ়স্বরে বলিল, না।

বেশ! তোমার কথা মেনে নিলেম। কিন্তু সারা বাঙ্গলা ত আর বাবার জমিদারী নয়।

তা-ই বা কেমন করে জান্‌লে?

বাঃ! এ কি আবার জানতে বাকি থাকে! সবই যে চোখে দেখতে হয়, এমন কি কথা! কলকেতায় আমার যিনি প্রাইভেট্ টিউটর ছিলেন, তাঁর কথা যদি তুমি শুনতে তা হলে একটাও অবিশ্বাস করতে পারতে না। তোমার চোখে আঙুল দিয়ে সব দেখিয়ে দিতেন। তোমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যেত।

রেণু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, সে ত ঠিক কথা।

চোখে আঙুল দিলে ত জল বেরুবেই। ভাল, চোখ দিয়ে না হয় সত্যি সত্যিই জল বেরুল। কিন্তু সে কান্নায় ফল কি, যদি না প্রতিকার হয়?

প্রতিকার? প্রতিকার আমাদেরই হাতে! দেশে টাকার অভাব নেই। কিন্তু সে টাকা হচ্ছে কি? মাম্‌লা মোকদ্দমায়, খেতাব-খাতে লক্ষ লক্ষ টাকা উড়ছে। ম্যাঞ্চেষ্টার কোটি কোটি টাকা লুটছে, আর গাঁজা আপিং মদের দোকান দিন দিন বাড়ছে!

না বাড়বে কেন! দেশের শতকরা নব্বুই জন নিরক্ষর, উচ্চ আমোদের স্বাদ জানে না। তাদের বিশ্বাস তারা বেশ আছে, তবে যা দুঃখ অন্ন-বস্ত্রের।

যাকে ভূতে পায়, সে জানে না তার কি দুর্গতি হয়েছে। বিকারের রোগী ভাবে বেশ সুস্থ আছে। কিন্তু এদিকে যে ধাত ছাড়-ছাড় তা বোঝে না।

তুমি বোঝাবে কি করে? এ দেশের লোক শতশত বৎসর দুঃখ ভোগ করে জেনেছে যে দুঃখের প্রতিকার নেই। এ সাগরে কূল নেই। তাই আগে-আগে তীরে ওঠ্‌বার জন্যে যে একটু হাত-পা ছুঁড়ত, এখন আর তাও করে না। কাপুরুষের মত অদৃষ্ট-অদৃষ্ট বলে জলের তলে নিশ্চিন্তে মরণ-শয্যা পেতেছে। এরা মরবে। তুমি তার কি উপায় করবে?

আমি কি করব? গ্রামে-গ্রামে পল্লীতে-পল্লীতে যাব। সবাইকে মিনতি করে বল্‌ব, অন্ন-বস্ত্রের জন্য পরমুখাপেক্ষী হয়ে থেক না। ভাই ভাই মামলা করে উচ্ছন্ন যেয়ো না, আর দোহাই তোমাদের স্ত্রী-পুত্রের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে শুঁড়ির পেট ভরিয়ো না।

বললে শুনবে কেন? তারা বারবার দেখেছে যে যিনি দুঃখ দূর করব বলে আসেন, তাঁরই ধন্য ধন্য হয়, তাদের দুঃখের এক কণাও কমে না। তারা তোমার কথা নেবে কেন? যিনি আচার্য্য হবেন, যে আদর্শ লোক-চক্ষুর সামনে ধরবেন, তাঁর নিজ জীবনে সেটা প্রতিষ্ঠা করা চাই। এরই অভাবে অত বড় ঋষি টলষ্টয়ের কথা পাশ্চাত্য জগৎ নেয়নি। তিনি বিষয় ত্যাগ করলেন, স্ত্রীকে দান করে! তাতে হয় না। 'আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখায়।' যিনি মাতাল, তিনি যদি বলেন, মদ খেয়োনা, তাঁর কথা শুন্‌বে কেন? যিনি স্বদেশ-বাসীকে ঠকিয়ে পয়সা উপার্জ্জন করেন, তিনি বিদেশীদের বলেন—চোর। ছিঃ! মাম্‌লা মোকদ্দমা উঠিয়ে দাও, মদের দোকান তুলে দাও, এ সব কথা একদিন অভিনেতার মুখে রঙ্গ-মঞ্চ থেকেও প্রচার হয়েছে। লেক্‌চার দিলেই হয় না। যার বুকে আগুন আছে, তার মুখের বাণী আগুনের ফিন্‌কীর মতন ছোটে; যার কানে সেঁধয়, তার প্রাণে আগুন ধরে ওঠে। সে আগুন কি তোমার বুকে আছে? দীন-দরিদ্রের দুঃখে যথার্থই কি তোমার প্রাণ কেঁদেছে? দু'হাজার বৎসর পূর্ব্বে কাল্‌ভারির মাঠে যে হৃদয়ভেদী দৃশ্যের অভিনয় হয়েছিল—দেবত্বের অপমান, নরত্বের নির্যাতন, প্রেম, করুণা সরল বিশ্বাসের হত্যা; এই সুসভ্য সমাজে যে সে দৃশ্যের পুনরভিনয় হচ্ছে—নিরপরাধ নিরীহ নর-নারায়ণের রক্ত মোক্ষণ, তা দেখে কি তুমি আত্মহারা, জ্ঞান-শূন্য হয়েছ? যদি তা হয়ে থাক, তুমি অসাধ্য সাধন করবে। আর যদি কেবল ধার-করা কথা বেচে বেড়াও, তা হলে জেনো, সে ব্যবসায়ে দেউলে হবে—তুমি-ই।

৪

পিতা-পুত্রের অভাবনীয় মনোভঙ্গে চৌধুরীদিগের চির-প্রফুল্ল ভবন আজ সারাদিন যেন শ্রাবণের দিনের মত মুখ-ভার করিয়া রহিয়াছে। দাস-দাসীদিগের চুপিচুপি কানা-কানি, চাপা-হাসি, মাঝে মাঝে চোখের ইঙ্গিত দেখিয়া অনিল ভাবিতে লাগিল, গৃহে আজ তাহারই সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন আলোচনা চলিতেছে। ছি-ছি, কি লজ্জা! একান্ত অতিষ্ঠ হইয়া সে রাত্রি নয়টার ট্রেনের অপেক্ষা করিয়া রহিল।

কিন্তু তাহার মন যতই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, যাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, সেই বাড়ীখানা যেন সজীব হইয়া শত বাহু বিস্তার করিয়া শতপাকে তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিতেছে! এ বন্ধন ছেদন করিতে তাহার বুকের শিরা-উপশিরায় টান ধরে কেন? বৃক্ষ হইতে ফুল ঝরিয়া যায়, ফল খসিয়া পড়ে, ইহাই ত স্বভাবের বিধি। তবে কেন তাহার হৃদয় এমন অব্যক্ত বেদনায় টন্‌টন্ করিতেছে? এই গৃহ, যেখানে সে জীবনের প্রথম আলোক দেখিয়াছে, প্রাণ-বায়ুর প্রথম শ্বাস গ্রহণ করিয়াছে,—তাহার আজন্ম স্নেহের-নীড়, বাল্যের ক্রীড়াভূমি, কৈশোরের বিলাস, যৌবনের সুখ, জীবনের আনন্দ—ইহা ত কেবল ইট-কাঠের গঠন নয়! ইহা তাহার

স্মৃতির সুবর্ণ দেউল, পূর্ব্ব পুরুষগণের পদাঙ্ক-পূত পবিত্র মঠ! ইহাই যে জন্মভূমির মর্ম্মস্থল! স্বদেশানুরাগের অমৃত নির্ঝর! জনকের বাৎসল্য, জননীর স্নেহ, সহোদর-সহোদরার প্রীতি, পত্নীর প্রেম, পুত্র-কন্যার মমতা, সংসারে যাহা কিছু পবিত্র, মধুর, সুন্দর, গৃহ সকলের আকর। কিন্তু জাতীয় ইতিহাসে ইহার স্থান কোথায়? না থাক; কিন্তু অনিলের অন্তরে? রেণুর হস্ত-চিহ্নিত দেওয়ালের গায় ঐ দাগটুকু পর্য্যন্ত যে কত মূল্যবান্, আজ সে অস্থি-মজ্জায় অনুভব করিতে লাগিল। হায়, হাসিমুখে স্বেচ্ছায় কে এ স্বর্গ ত্যাগ করিতে পারে? অনিল স্নেহহীন পিতার নির্ম্মম কটু বাক্য, অপমান স্মরণ করিয়া মন বাঁধিতে লাগিল। কিন্তু মা! তিনিও পিতার পক্ষ অবলম্বন করেছেন। সারাদিন আমার কাছে এলেন না। আমিও এঁদের মুখ দেখাব না। কিন্তু রেণুর কাছে বিদায় নিতে হবে— চির-বিদায়!

অনিল চোখ ফিরাইতে দেখিল, অদূরে রেণু হস্তে বস্ত্র, পিরান ও উত্তরীয় লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখ স্থির, গম্ভীর, প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়। অনিল নিশ্চিত করিয়াছিল, পিতার কিছুই সে লইবে না, এক-বস্ত্রে গৃহত্যাগ করিবে। মনে মনে ঈষৎ শঙ্কিত হইল। এ মুখের কোন আদেশ লঙ্ঘন করা তাহার অসাধ্য।

রেণু পাশের ঘরে বস্ত্র প্রভৃতি রাখিয়া আসিয়া কহিল, কাপড় ছাড়।

কেন? এখানকার কিছুই আমি নিয়ে যাব না।

তার মানে, বাবার জিনিস কিছু নেবে না। কিন্তু এ-সব বাবার দেওয়া নয়। তুমি নিতে চাইলেও তিনি দেবেন মনে করেছ, বুঝি? এ সব তাঁর নয়। আমি নিজে সুতা কেটে বাঁশিরামকে দিয়ে ঐ ধুতি-চাদর আর জামার-কাপড় বুনিয়েছি। জামা আমার নিজের হাতের সেলাই, অবশ্য, বিদেশী সুতায়। আমার এ কাপড়ও অমনি করে বুনিয়েছি।

এতক্ষণ পরে রেণুর সাজের উপর অনিলের চক্ষু পড়িল— কি চমৎকার! একখানি কোরা লাল কস্তাপেড়ে সাড়ী তাহার সরল, সুঠাম দেহকে ভাঁজে ভাঁজে পাকে পাকে জড়াইয়া যেন তরঙ্গিত জাহ্নবীর পবিত্রতায় শোভা পাইতেছে! তাহার হাতে দুইগাছি সাদা-সিধে জোড়েন-পাকের বালা, গলায় সামান্য একগাছি দড়ি-হার, কানে দুইটী সোণার মটর ছাড়া অলঙ্কারের লেশ মাত্র নাই। কিন্তু এই যৎসামান্য আভরণে তাহার শোভা ও সৌষ্ঠব যেন শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে! অনিলের মুগ্ধ-দৃষ্টির সম্মুখে রেণুর মুখখানি লজ্জায় আকণ্ঠ রঞ্জিত হইয়া উঠিল এবং চক্ষুদ্বয় আপনা হইতে নত হইয়া পড়িল। সেই লজ্জা-জড়িত ভাব ঢাকিবার জন্য সে তাড়া-তাড়ি বলিল, বেশ ত! তুমি ইতস্ততঃ করছ কেন? এখন ত পর; এরপর না হয় নিজে উপায় করে দাম ধরে দিয়ো।

অনিল আর কোন কথা না কহিয়া কাপড় ছাড়িয়া আসিল। রেণু অগ্রগামিনী হইয়া বলিল, এস!

কোথা?

রেণু কোন উত্তর না দিয়া চলিল। অনিলও দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া সঙ্গ নিল। অনিল ভাবিতেছিল, রেণু তাহাকে মাতৃ-সন্নিধানে লইয়া যাইতেছে। মায়ের জন্য সারাদিন তাহার মন কাঁদিয়াছে। হায়, রেণুর এ বুদ্ধি, এ জেদ, এতক্ষণ ছিল কোথা? কিন্তু অনিলের সকল অনুমান ব্যর্থ করিয়া রেণু তাহাকে লইয়া উপস্থিত হইল, রাধারমণের গৃহে। অনিলের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

রেণু সলজ্জ মৃদু হাস্যে গণ্ড ও অধরযুগলে গোলাপ বিকশিত করিয়া কহিল, এস, দুজনে প্রণাম করি।

উভয়ে নতজানু হইয়া প্রণত হইল।

দুজনে উঠিয়া দাঁড়াইলে সিংহাসনের সম্মুখে রক্ষিত কদলী-পত্রের উপর হইতে দুইগাছি গোড়ে তুলিয়া লইয়া অনিলকে পরাইয়া দিয়া বলিল, তোমার গলা থেকে একগাছা আমায় পরিয়ে দাও।

মন্ত্র-চালিতবৎ অনিল আদেশ পালন করিল। তাহার হাতে একটী সিঁদূর কৌটা দিয়া রেণু বলিল, আমার সিঁতের ওপর ঢেলে দাও।

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া অনিল বলিল, সে কি!

আজ আমার বিয়ে।

কার সঙ্গে?

রেণু এ কথার উত্তর না দিয়া মাথা পাতিল। অনিল সিঁদূর পরাইয়া দিল। রেণু রাধারমণের বিগ্রহ-মূর্ত্তি দেখাইয়া কহিল, শোন, ইনি সাক্ষাৎ ভগবান্, সর্ব্বদর্শী। আজ আমি হিন্দুর প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে স্বয়ম্বরা হয়ে এই সর্ব্ব-সাক্ষী ভগবানের সামনে তোমার গলায় মালা দিলেম। আজ হতে

তুমি আমার স্বামী। বলিয়া গলায় আঁচল দিয়া অনিলের পদ-ধূলি মাথায় তুলিয়া লইল।

অনিল হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, স্বামী! আমি? কিন্তু এখন ত আমি এ বে মান্‌তে পারব না। আমি যে জন্মভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করব।

রেণু উত্তেজিত স্বরে কহিল, তোমায় মান্‌তে কে বল্‌ছে। যার যে ধর্ম্ম, তার নিজের কাছে। চল, বাবা-মার কাছে যাই।

বাবার কাছে? কেন? আমার ওপর যদি তাঁর এতটুকু টান থাক্‌ত, তা-হলে আজ আমায় এমন করে নিরাশ্রয় হতে হত না; মা'ও তাঁর দিকে, আজ সারাদিন একবার—

অনিলের বুকের ভিতর ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রোদন-কম্পিত স্বরে কহিল, আমার কেউ নেই, কেউ নেই! রেণু, পথের ভিখারীকে কেন তুমি—

আমি ত তোমাকে বলেছি, আমার জন্য তোমার কোন দায়িত্ব নেই। কিন্তু তোমার নিজের কর্ত্তব্য কর। তুমি উচ্চ কার্য্য করবে, বাপ মা'র আশীর্ব্বাদ নিয়ে যাও।

আশীর্ব্বাদ নয়, অভিশাপ!

বাপ-মায়ের শাপও বর। তুমি চল।

রাধারমণকে প্রণাম করিয়া, অশ্রু-চিহ্ন মুছিয়া অনিল রেণুর অনুগামী হইল। কিন্তু উভয়েই দূর হইতে শুনিতে পাইল, অখিল শৈলজাকে তিরস্কার করিতেছেন, সারাদিন উপবাস করে মরছ কেন? যে তোমার মুখ চাইলে না, তার জন্য এত কেন?

অনিল থমকিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু রেণু তাহাকে অব্যাহতি দিল না। কক্ষে উপস্থিত হইতেই প্রবীণ দম্পতী কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্‌-বিস্ময়ে নবীন বর-বধূকে দেখিতে লাগিলেন। যে উৎকট সাহসকে অবলম্বন করিয়া, রেণু নারী-সুলভ সরম ও শান্ততাকে দূরে রাখিয়াছিল, এতক্ষণ পরে তাহাদের দুঃসহ আবেগ তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। পিতৃস্থানীয় অখিলের পদধূলি গ্রহণ করিয়া কোন রূপে সে আপনার দেহখানাকে টানিয়া লইয়া শৈলজার পায় ফেলিয়া দিল। শৈলজা তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ চুম্বন করিলেন এবং তাহার কম্পিত কর হইতে লোহা-গাছটী গ্রহণ করিয়া সযত্নে পরাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়িল না, একটা শাঁক পর্য্যন্ত বাজিল না। কেবল গৃহদেবতাকে সাক্ষী করিয়া অভিমান, অশ্রু ও আসন্ন বিচ্ছেদ মাথায় ধরিয়া নব-দম্পতী অনিশ্চিত বন্দরের উদ্দেশে সংসার-সাগরে আপন আপন জীবন-তরী ভাসাইয়া দিল।

পিতার পদধূলি গ্রহণ করিয়া নতমুখে অনিল কহিল, আমি চলে যাচ্ছি।

একটা তীব্র বেদনার আঘাতে অখিলের হৃৎপিণ্ড যেন কুঞ্চিত হইয়া গেল। বৃদ্ধ বসিয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ ধরিয়া পুত্রের দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক মুখ দেখিতে দেখিতে বলিলেন, বেশ! বুঝলেম, তুমি আপনার পথ বেছে নিয়েছ। কিন্তু যে পথেই যাও, আমার একটা কথা মনে রেখ, সঙ্কীর্ণতা দেখ্‌লেই তা ত্যাগ করবে। সত্যের প্রশস্ত পথ। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার জীবন সফল হোক!

অনিল প্রণাম করিল এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া শৈলজাকে প্রণাম করিয়া ডাকিল, মা—

বাবা—

অশ্রুর প্রবল উচ্ছ্বাসে অনিলের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। শৈলজা তাহাকে বক্ষে ধারণ করিবার নিমিত্ত বাহুদ্বয় বিস্তার করিতে না করিতে সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল!

গৃহের বাহির হইয়া অনিল একবার পথের পানে চাহিল, যেন অবিকল তাহার হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি—কেবল শূন্য ও অন্ধকার! কে জানে এ পথের কোথায় শেষ! এ দীর্ঘ পথ সে একা কেমন করিয়া চলিবে; এ বিরাট শূন্যতা সে কি দিয়া পূর্ণ করিবে, এ দুর্ভেদ্য অন্ধকারে কোথায় একটু আলোক পাইবে;—অনিশ্চিত, অনিশ্চিত, সকলি অনিশ্চিত!

৫

এ কি ভাল হল, মা?

এই আকস্মিক প্রশ্নে রেণু চকিতে একবার অখিলের মুখ চাহিল। একটু নীরব থাকিয়া বলিল, আর ভাল-মন্দ বিচারে ফল কি, বাবা?

আছে বৈ কি, মা! কাজের সঙ্গে সঙ্গে ত সব চুকে যায় না। শাস্ত্রের বিধি, দেশাচার, এ সব না মান্‌লে যে লোকে নিন্দে করবে!

যাঁরা প্যাটেল-বিলের পক্ষপাতী তাঁরাও কি নিন্দে রবেন, বাবা ?

অখিল মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তা না করুন, কিন্তু তাঁরাও তাঁদের ব্যবস্থাকে যথেচ্ছাচারিতার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য আইনের শরণাপন্ন হতে যাচ্ছিলেন। তোমার বিবাহ না হল ধর্ম্ম, না আইন-সঙ্গত।

রেণুর মুখ সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল। বলিল, বাবা, আপনিই ত শিক্ষা দিয়েছেন, হৃদয়ের সত্য-ধর্ম্মের চেয়ে আর বড় ধর্ম্ম নেই।

জানি, মা! কিন্তু লোক-ধর্ম্মও ফেলে দেবার জিনিস নয়। সত্য বটে, তোমার বাপ-মা নেই, তবু একজন দান না করলে যে গ্রহণ অসিদ্ধ হয়। তাও আবার দেবতা-ব্রাহ্মণ সাক্ষী রেখে করা চাই।

যিনি দেবতা ব্রাহ্মণের সৃষ্টিকর্ত্তা, সত্যের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি, সকল ধর্ম্ম যাঁ থেকে উদ্ভব হয়েছে, আমার হৃদয়ের ভিতর বসে তিনি আমায় দান করেছেন, এ আমি স্পষ্টাক্ষরে জানি, বাবা! নইলে এ কাজ কখন করতে পারতেম না।

কিন্তু বিবাহ যে সামাজিক বন্ধন, মা! সমাজ সে বন্ধন স্বীকার না করলে তোমার সন্তানদের বিবাহে গোল উঠতে পারে। আইন তাদের হয় ত তোমার উত্তরাধিকারী বলেই স্বীকার করবে না।

এত কথা ত ভাবিনি, বাবা! আমি নিজের মনের কথা ভেবেছি যে, এ আশ্রয় ছেড়ে আমি অন্য কোথাও যেতে পারব না; আর ভেবেছি, ছেলের জন্য নিদারুণ মর্ম্মব্যথা ভুলে আমার জন্য আপনার দুর্ভাবনা।

অখিল বিস্মিত-নেত্রে রেণুর মুখ চাহিয়া বলিলেন, সে কি! আমার দুর্ভাবনা—কে বল্‌লে!

যে ক'রে বারে বারে আমার মুখপানে চেয়ে আপনি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলেছেন তা যে অন্ধেও জান্‌তে পারে! আর ত আমি কিছু ভাবিনি, ভাববার সময়ও পাই নি।

কিন্তু, মা, সমাজ যদি তোমায় ত্যাগ করে?

রেণু ভীত-নেত্রে অখিলের মুখপানে চাহিয়া উৎকণ্ঠার স্বরে জিজ্ঞাসিল, আপনিও কি তা হলে আমায় ত্যাগ করবেন, বাবা?

না, মা! কিন্তু সে যদি তোমাকে না নেয়?

তাঁর কথা তিনি জানেন। আপনার দুধ খাবার সময় হল, বাবা, আমি গরম করে আনিগে।

অনিল কলিকাতায় ফিরিবামাত্র বিনু তাহার চিবুক ধরিয়া গাহিল, "তুই ফিরে এলি কি রে রামধন!"

অনিল কেবল স্থির-নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

বুঝেছি, বন্ধু! মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ। বেড়ে! তা'হলে বাসা উত্তোলন; চা ও প্রাতরাশের আসর ভঞ্জন? বেশ বন্ধু, বেশ! আজ হতে ল্যাণ্ড্-লর্ড-লীলা শেষ। ভরসা আমাদের মেস্! চল, আমারই রুমের একটা সীট্ আজ তিন দিন হ'ল খালি হয়েছে। আমার রুম-মেট্ গিয়েছেন কাঁচাড়ে—স্বদেশী প্রচারে। এইখান থেকে প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক সুরু। ছাত্রাবাস, বিনয়চাঁদের খাস্ কাম্‌রা। দুই পার্শ্বে দু'খানি ভাঙা তক্তাপোষ, তদুপরি ছিন্ন কন্থা—ছারপোকা কিল্‌বিল্! মাঝখানে একখানি তেঠেঙে টেবিল, তার উভয় পার্শ্বে হাত-ভাঙা কেদারা, তাতে দেদার মৎকুণ। সহসা অনিলকুমারের প্রবেশ।

অনিল প্রশ্ন করিল, নাটকখানা ট্রাজিডি হবে কি কমেডি?

ফার্স্, বন্ধু, ফার্স্।

নাম কি হবে? ছিন্ন-কন্থা?

না, মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ।

কিন্তু, বন্ধু! তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করলে বটে, হোঁচট্ খেয়ো না যেন!

দূর আহাম্মক! এতদিন চল্‌ছি, পথ যে মুখস্থ হয়ে গেছে। হোঁচট্ খাব কেন?

ওরে মূর্খ! চলা পথেই হোঁচট্ খায়! তার জন্য পথ ভাড়া করে আন্‌তে হয় না। যাক্! কিন্তু তোমার বাসার সব জিনিস যদি তুলে আনা হয়, তাহলে ত বন্ধু মেস্ নিশ্বেস ফেল্‌তে পারবে না।

অনিল রুক্ষ-স্বরে বলিল, সব কি? তার একটা জিনিসও আসবে না।

তোমার একটু বাড়াবাড়ি, বন্ধু! বাপের সঙ্গেই ছাড়াছাড়ি, তাঁর প্রদত্ত দ্রব্যাদির সঙ্গে আড়া-আড়ি কেন?

আমি ভুলে যেতে চাই, আমি সেখানকার কেউ।

তা হ'লে, বন্ধু, পিতৃ-দত্ত, পিতৃ-অন্নপুষ্ট শরীরটাও ত ত্যাগ করতে হয়! সোণারচাঁদ রে!

অনিল বিন্দুর মেসে আশ্রয় লইয়া প্রথম খবরের কাগজ বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর দুই তিনটী ছাত্র পড়াইয়া আপনার খরচ চালাইতে লাগিল। রেণুকে পত্র লিখিল, আমি উঠিয়া আসিয়াছি মেসে। বাসার জিনিস কি হবে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করে পত্র লিখবে কি আমাকে?

ইহার উত্তর আসিল, সমস্ত বিক্রি করে টাকা কোন চ্যারিটীতে দান কোর, শ্রীযুক্ত পিতাঠাকুরের আদেশ।

তাহাই হইল।

একদিন প্রভাতে উঠিয়া বিন্দু কিছুক্ষণ একদৃষ্টে অনিলকে দেখিয়া কহিল, বাঃ! ছ'মাসে যে চেহারা বা'র করেছ, বন্ধু, যদি জমীদারের ছেলে বলে তোমাকে কেউ চিন্‌তে পারে, তাকে দু'শ ছেলাম গুণে দেব! নাটকখানা তা হলে ট্রাজিডিই হল, দেখছি।

এই সময় সংবাদ-পত্রে প্রকাশ হইল, পূর্ব্ববঙ্গে একজন বিশিষ্ট রাজ-পুরুষের শুভাগমন উপলক্ষে তথাকার জমীদার ও স্থানীয় লোকগণ শ্রীযুক্ত অখিলকুমার চৌধুরীর নেতৃত্বে উক্ত রাজপুরুষের অভ্যর্থনার জন্য বিরাট সভা করিতেছেন। বিন্দু শুইয়া ছিল, উৎসাহে উঠিয়া বসিয়া বলিল, এটা ত পণ্ড করতে হচ্ছে, বন্ধু!

কোন্‌টা?

বিন্দু সংবাদের পাশে লাল পেন্‌সিলের দাগ দিয়া কাগজখানা অনিলের হাতে দিল। কিন্তু তাহার মুখে একটুও উৎসাহের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। এই সময় কয়েকজন যুবক হঠাৎ কক্ষ মধ্যে দমকা হাওয়ার মত আসিয়া বলিল, এখনও বসে যে! অনিল, ওঠ! আর এক মিনিট্ দেরী নয়। পয়লা ট্রেণে যাব। এবার কিন্তু তোমাদের বাড়ীতে থেকে ক্যাম্পেন্ চালাব।

আমার যাওয়া হবে না।

হবে না! কেন?

হবে না—হবে না। বস্! তার আবার কেন; কি বৃত্তান্ত—ওঁর কাছে বসে বসে আমি এখন কৈফিয়ৎ কাটি!

একজন বলিল, ওঃ! বোঝা গেছে! অখিলবাবু এই অভ্যর্থনা-সমিতির নেতা কিনা! কাউয়ার্ড!

অনিলের চোখ দুটা ঝক্‌ঝক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে সেই হল কাপুরুষ!

বিন্দু দেখিল, ব্যাপারটা অনিলের পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। বন্ধুকে বাঁচাইবার জন্য সে বলিয়া উঠিল

Buck up my brave bucks,
My dainty ducks, cheer-i-o
Onward, onward, Eastward Ho!
চল ভাই, রণে যাই দিয়ে তাই সকলে,
গুড্‌বাই, কাজ নাই অনিলে কি অনলে।

টাণ্ডেল্ ছিচ্ (Stand Still) ঘিনি ঘেনাম্ কমিসন (begin again motion)।

বিন্দুর পরিহাস যে কেবল কথায়, কাজে নহে, সকলে জানিত। তাহাকে নেতা করিয়া করতালি দিতে দিতে সকলে বাহির হইয়া গেল।

৬

অভ্যর্থনার উদ্যোগ যথাসাধ্য ভণ্ডুল করিয়া চারিজন সঙ্গী লইয়া বিন্দু অনিলের পিতার কাছে উপস্থিত হইল। সঙ্গিগণকে বলিল, জাতীয়-ভাণ্ডারের জন্য বুড়ার কাছ থেকে কিছু চাঁদা আদায় করতে হবে। কিন্তু মনের আসল কথা, পিতা-পুত্রে মিটমাটের একটা সুযোগ খোঁজা—পিতার আদরে অনিল যাহাতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

বিন্দু বৃদ্ধকে প্রণাম করিল। অখিল সকলকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বসাইলেন। একজন বসিয়াই প্রশ্ন করিল, আপনি কেন এ অভ্যর্থনার নেতা হলেন?

আমি স্বেচ্ছায় হই নি, আমাকে করেছে।

যিনি অনিলকে কাপুরুষ বলেছিলেন, তিনি উচ্চস্বরে বলিলেন, আপনার উদ্দেশ্যটা কি, মশায়? দেশের মঙ্গল হয়, এটা বুঝি আপনার অভিপ্রায় নয়?

কেন এ কথা বল্‌ছেন?

তা হলে শয়তানীর প্রশ্রয় আপনি দিতেন না। যাতে দেশের কল্যাণ হয় সে চেষ্টা করতেন। আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন।

আপনারা যা করছেন তাইতেই যে দেশের কল্যাণ হবে, কেমন করে জানব? বন্দরে জাহাজ বাঁধা আছে, হঠাৎ তার বাঁধন খুলে পাল তুলে, অকূলে ভেসে পড়্‌লেই যে চেষ্টা করা হল, আর তাতেই বাঞ্ছিত স্থানে পৌঁছবেন, এমন কি লেখাপড়া আছে? কোথায় কোন্ চোরা-

পাহাড়ে জাহাজের তলা ফুটো করে দেবে, ঘূর্ণিপাকে টেনে নেবে, এ সবও ত ভাবা দরকার ?

আরে মশাই, ভাব্‌তে ভাব্‌তে জীবনটাই গেল। অত ভাবলে কি কলম্বাস্‌ আমেরিকা discover করতে পারতেন ? আমরা বলি, চালাও পান্‌সী—

হাঁ, যাঁর যেমন fancy ! আমার বিশ্বাস, স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচারিতায় একটু তফাৎ আছে।

তা বলে চেষ্টা করতে হবে না ?

বৃদ্ধ স্থির, গম্ভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলিলেন, অবশ্য হবে! কিন্তু যে চেষ্টা বিদ্বেষ-বুদ্ধি থেকে উৎপন্ন, তাতে আপাততঃ আশানুরূপ ফল কিছু হতে পারে, কিন্তু স্থায়ী কল্যাণ সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস নেই ;—আর আমায় মাপ করবেন—আমি কারুর ওপর বিদ্বেষ-বুদ্ধি পোষণ করতে ইচ্ছাও করি না। এটা আমার সম্পূর্ণ নিজের মত, এ নিয়ে তর্ক করায় কোন ফল দেখিনা।

তাহলে আপনার মত, "সর্ব্বভূতহিতে রতঃ" হয়ে চুপ করে বসে থাকা। কোন চেষ্টার দরকার নাই ?

কেন ? যাতে আপনার উন্নতি হয়, কল্যাণ হয়, সে চেষ্টায় কে বাধা দিতে পারে ? সে চেষ্টা করুন।

কি করে ? অরণ্যে রোদন করে ?

না, চরিত্র গঠন করে। আমাদেরই দেশে কোন মহাপুরুষ বলেছেন, চরিত্রই বিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পারে। আগে সংযমী হও, তারপর উন্নতি। উন্নতি অর্থে হৃদয়ের বিস্তার, আর হৃদয়ের বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সে প্রেম আস্‌বে কোথা থেকে ? আগে সংযমী, সহানুভূতিসম্পন্ন হও ! দেশের দুঃখ বোঝ ! দরিদ্র, অজ্ঞ, অত্যাচার-নিপীড়িতদের জন্য তোমার প্রাণ কাঁদুক ; কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে শ্বাস রুদ্ধ হক, মস্তিষ্ক ঘুরে যাক, পাগল হয়ে যাও ! কৌশলে কোন মহৎ কাজ হয়না। প্রেম, সত্যানুরাগ, মহাবীর্য্য সকল মহাকার্য্যের সহায়। যাদের ভাল খোঁজ, তাদের আগে ভালবাস ! তাদের সঙ্গে এক হয়ে মেশ ! দেখ আগে তাদের কোথায় ঘা, তবে ত ওষুধ দেবে। তখন সে ওষুধ পড়্‌বে, তাতে প্রকৃতই ঘা সারবে। ওপরে ওপরে শুকিয়ে ভিতরে ভিতরে শোষ হবেনা।

বিনু এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, এইবার সুযোগ বুঝিয়া বলিল, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি কেউ উপদিষ্ট হয়ে আমাদের এই পথ অবলম্বন করে, সে কি অন্যায় করছে, আপনার মনে হয় ? আমি অনিলের সহপাঠী।

একবার চকিত দৃষ্টিতে বৃদ্ধ বিনুর মুখ চাহিলেন। তারপর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, গুরুর উপদেশ পালন অন্যায় বল্‌ব কেমন করে ? তবে উপদেশ ঠিক ঠিক বোঝা চাই।

বিনু মনে মনে ভাবিতে লাগিল, বাবা বুড়োটা কে গো ! ছেলে কেমন আছে একবার জিজ্ঞাসাও করলে না ! দুজনেই সমান একগুঁয়ে ! বাঙালে গোঁ ! এদিকে ছেলেকে দেখ্‌বার জন্যে মরে যাচ্ছেন ! নাম করতেই যে করে আমার দিকে চাইলে—যেন গিল্‌বে ! বুড় ভাঙ্‌বে তবু মচ্‌কাবে না। ও মরবে—নিশ্চয় মরবে—নইলে অমন চেহারা হয় !

একজন বলিল, মশায়, বোঝার ভার আমাদের নয় ! ছেলেবেলা বাপ-মা যা বুঝিয়েছেন, তাই বুঝেছি। এখন আমাদের জন্য যাঁরা ভাব্‌ছেন, তাঁদের কথাই বুঝ্‌ছি।

ঠিক্‌ বুঝ্‌ছেন কই ? আমি শুনেছি, যিনি সর্ব্বত্যাগী হয়ে এই মহাব্রত নিয়েছেন, তিনি বলেন, প্রেম, সত্যনিষ্ঠা, সংযম আগে প্রয়োজন। তিনি বলেন উত্তেজনাহীন হয়ে কার্য্য সাধন করতে হবে ! কে তাঁর কথা শুন্‌ছে ? এত অসহিষ্ণু যে, মতের সঙ্গে না মিল্‌লেই খড়্গহস্ত ! যাক্‌ অনেক বেলা হল, আহারাদি আজ এইখানে হোক না ?

সে কি মশায় ? আমাদের আপনি খাওয়াবেন ? ভয় করবে না ?

অখিল বক্তার প্রতি বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, সে কি ! আমি অতিথি-সৎকার করব, অভ্যাগতের সম্মান কর্‌ব, তাতে কি ভয় ? কিসের ভয় ? কারে ভয় ?

উত্তরে জনৈক যুবক বলিল, বেশ ! অতিথির যথেষ্ট সম্মান করা হবে, আমাদের কিছু অর্থ দিন।

মনঃপীড়িত বৃদ্ধ বারবার আঘাতে উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিতে-ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, কি ? ভিক্ষা ?

যেন দাহ্যস্তূপে আগুনের ফিন্‌কী পড়িল ! যুবকগণের মধ্যে জনৈক চসমাধারী বলিয়া উঠিলেন, ভিক্ষা ! সারা বাঙ্‌লা জুড়ে দুর্ভিক্ষ, আর আপনার টাকায় ছাতা ধরছে—তাতেও বলেন, ভিক্ষা ! আপনার এত টাকা থাক্‌তে দেশশুদ্ধ লোকে

বঞ্চিত হবে কেন? কি অধিকারে আপনি এত টাকার মালিক! যারা ক্ষীরের বাটি মুখে করে বড়লোকের ঘরে জন্মেছেন বলে, মনে করেন, টাকায় তাঁদের জন্মগত অধিকার, তাঁদের ভুল। তাঁরা দিনরাত গদির ওপর বসে নিত্য দুধ-ভাত খাবেন, আর যারা খেটে মরবে তাদের একবেলা ফেন-ভাত জুটবে না, এ কোন্ দেশী বিচার? ভগবান্ সবাইকে সমান সৃষ্টি করেছেন, সবাইকে সমান অধিকার দিয়েছেন—বেঁচে থাক্‌বার। আপনারা তাদের পিষে মারতে চান! টাকা দেশের, সকলের তাতে সমান অধিকার। আমরা ভিক্ষা করতে আসিনি, ন্যায্য প্রাপ্য নিতে এসেছি।

অখিল প্রথম স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তারপর গম্ভীর হইয়া বলিলেন, আমার আয় কত মনে করেন?

শুনেছি, লক্ষ টাকা!

বিষয়ের মূল্য কত?

বিশগুণ ধরুন—বিশ লক্ষ টাকা।

বাংলার লোকসংখ্যা কত?

ধরুন—পাঁচ কোটী।

তাহলে আপনাদের পাঁচজনের ভাগে পড়ে চার আনা করে। এই নিন, বলিয়া বৃদ্ধ বক্তার সম্মুখে একটী সিকি রাখিয়া নমস্কার করিলেন।

সকলেই হতভম্বের মত পরস্পর মুখ-চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। তাহাদের জ্বলন্ত উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতার যে এইরূপ উদ্ভট পরিণতি হইবে, কেহই ভাবে নাই। বিনু সিকিটী কুড়াইয়া লইয়া অখিলকে প্রণাম করিল।

ট্রেণে উঠিয়া বিনু বলিল, এটাকে charm করে ঘড়ির চেনে ঝুলিয়ে রাখ্‌ব। Three cheers for the peerless peers of Bengal—Hip Hip Hurrah! Hip Hip Hurrah! Hip Hip Hurrah!

৭

অখিলের সম্বন্ধে বিনুর অনুমান সত্য হইল। অনিলের গৃহত্যাগের কয়েকমাস পরে বৃদ্ধ শেষ শয্যা পাতিলেন। শৈলজা শিয়রে বসিয়া পাখা করিতেছিলেন—বিষম গাত্রদাহ। রেণু পায় হাত বুলাইতেছিল। আজ তাহার সহাস তরুণ মুখচ্ছবি অতি করুণ—যেন জলে ভেজা চাঁদের আলো, শিশির-ধোয়া ফুল! একবার উৎকণ্ঠিত চক্ষে মুমূর্ষুর মুখপা[নে] চাহিয়া রেণু মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসিল, কল্‌কেতায় কি টেলিগ্রা[ম] করে দেব, বাবা?

বৃদ্ধ চকিত হইয়া একবার ঘরের চারদিকে চাহিলেন তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ক্রমে রেণুর উপর নিবদ্ধ হইল—কল্‌কেতায় কেন মা?

তাঁর জানাও ত উচিত।

মুমূর্ষুর হৃদয়ভেদী শ্বাসে মনে হইল বুঝি সেই সঙ্গেই সব শেষ হইয়া যায়! একটু সামলাইয়া, শুষ্কফুলের মত একটু হাসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, তার দরকার নাই, মা!

শৈলজা অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, এ কি দণ্ড তুমি তারে দিচ্ছ! একবার দেখ্‌বেও না, দেখ্‌তেও দেবে না? সে যে চিরদিন আমাদেরই দুষ্‌বে।

তবে আমায় কেন জিজ্ঞাসা করছ?

এই সময় একজন দাসী আসিয়া জানাইল, দাওয়ান সাক্ষাৎপ্রার্থী।

শৈলজা উঠিলেন না, বসিয়া রহিলেন। যাঁহার সহিত চিরবিচ্ছেদ আসন্ন, তাঁহার সহিত তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদও এখন তাঁহার পক্ষে দুঃসহ। দাওয়ান কক্ষে আসিয়া বলিলেন, কল্‌কেতা থেকে পত্র এসেছে।

আগ্রহে, উত্তেজনায়, চাঞ্চল্যে মুমূর্ষুর স্বর আরও অস্পষ্ট হইল—কার?

দাওয়ান একটু ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিলেন, ছোট বাবুর।

বক্ষের দ্রুত স্পন্দনে বৃদ্ধ কথা কহিতে পারিলেন না, ইঙ্গিত করিলেন—পড়।

দাওয়ান পড়িলেন, কলিকাতায় দুটী ধনী পরিবারের মধ্যে একটা ভয়ানক মোকদ্দমা বেধেছে, একটা ভাঙ্গা পাঁচিল উপলক্ষ করে। এই মোকদ্দমা সালিসে মেটাবার জন্যে আমি এক পক্ষকে অনুরোধ করি। তাঁহাকে অনেক বুঝিয়ে রাজি করেছি। কিন্তু একটী সর্ত্ত আছে। তাঁর এক কন্যাকে আমাকে বিবাহ করতে হবে। স্বদেশের এই হিতকর কার্য্য করবার জন্য আমার সব বন্ধুরা উৎসাহ দিচ্ছেন আমাকে, কেবল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিনু ছাড়া। এখন আপনার অভিপ্রায় জান্‌বার প্রার্থনা। রেণুর সঙ্গে আমার বিবাহ কি সিদ্ধ? আপনি ও মা আমার প্রণাম জানবেন।

মুমূর্ষু বৃদ্ধ কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। তার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, আমার জবানী তুমি লিখে দাও—তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার। সে সম্বন্ধে আমার কোন মতামত নাই। যে বিবাহের সাক্ষী রাধারমণ, তাহা সম্পূর্ণ সিদ্ধ। রেণু ধর্ম্মতঃ তোমার সহধর্ম্মিণী! কেবল লোকাচার-সঙ্গত কার্য্য বাকী। কিন্তু হিন্দু-সমাজে বহু-বিবাহে বাধা নাই। দেশ-হিতে তুমি আত্ম-বলি দিতে পার এবং দেওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু যাহাকে বিবাহ করিবে, তাহাকে ভরণ-পোষণ করাও তোমার কর্ত্তব্য। এইজন্য একটা কথা তোমাকে জানান আবশ্যক মনে করি। তুমি এখান হইতে যাইবার পরই আমি রেণুর নামে আমার সমস্ত বিষয় উইল করিয়াছি।

বৃদ্ধ এত দিন ধরিয়া কেন যে এত যত্নে রেণুকে বিষয়-কর্ম্ম শিখাইতেছিলেন, সে এখন তাহা বুঝিল; মৃদুস্বরে বলিল, বাবা!

বুঝেছি, মা! তারই কল্যাণের জন্য তোমার হাতে বিষয় দিয়েছি। মা, আজ তোমাকে একটা কথা বলি। দেবতার কাছে কখন কিছু চেয়ো না। এক সাধু আমায় বলেছিলেন—ভগবান্ যাকে দণ্ড দেবার ইচ্ছা করেন, তারই প্রার্থনা পূর্ণ হয়। এ কথা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। চাইতে হবে কেন, মা? তোমার যা প্রয়োজন, তোমার পক্ষে হিতকর, তা তিনি জান্‌ছেন, দেখছেন, আপনা হতে দিচ্ছেন। রাধারমণ! কর্ম্মক্ষেত্রে কত বার আস্‌তে-যেতে হবে, জানি নি; কিন্তু কোন জন্মে যেন না ভুলি যে, তুমি মঙ্গলময়! একটা গল্প শোন, মা! ছেলে হ'ল না—এত বড় সম্পত্তি ভোগ করবে কে? রাধারমণের কাছে বড়ই কাতর হয়ে প্রার্থনা করেছিলেম। প্রার্থনা পূর্ণ করলেন—ভক্তবৎসল কি না!

মুমূর্ষুর নিস্তেজ চক্ষু দিয়া ভক্তি-অশ্রু ঝরিল। যুক্ত করে প্রণাম করিয়া ভক্তি-গদ্‌গদ-স্বরে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু ছেলে হয়ে সূতিকায় প্রসূতি মারা গেল। সেই এক বৎসরের শিশু নিয়ে কি বিভ্রাট! দিনরাত তাকে বুকে করে রাখি! তার পর শৈল এলেন, আমার বুকের ধনকে বুকে তুলে নিলেন। শৈল, মনে আছে, অনি ছাত্রবৃত্তিতে যখন মেডেল পেলে? তোমায় আমায় সে কি জেদাজিদি? ও বলে, মেডেল ও রাখবে, আমি বলি, আমি রাখব। তখন সংমা বলে বুঝতে পারেনি, অনি ওর হাতেই মেডেল দিলে। তুমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে আমায় বললে, কেমন! মা, একটু জল দিতে পারিস্?

রেণু মুখে বেদানার রস দিতে দিতে বলিল, ভাল হয়ে বল্‌বেন, বাবা! সে সব কথায় এখন দরকার কি?

কিছু নাঃ, কিছু নাঃ! কোন দরকার নেই। ভাল হয়ে বলব, কেমন মা? সেই ভাল! তার পর চুপিচুপি সেই মেডেল শৈল আমার হাতে এনে দিলে—

বৃদ্ধ বালিসের নীচে কি যেন হাতড়াইতে লাগিলেন। সেই আসন্ন মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন মুখে যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তির দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। শৈলজা নিঃশব্দে চোখে আঁচল দিলেন। রেণু অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

বৃদ্ধ ভগ্ন, কম্পিত স্বরে আবার বলিতে লাগিলেন, তার পর জান, মা! শৈলর তখন হিষ্টিরিয়া ছিল। অনি যেদিন প্রথম দেখলে, সেদিন ছেলের কি কান্না! বলে, মা মরে গেল! তখন ত সংমা বলে জানে না! তার পর ছেলের টাইফয়েড হল! শৈল, মনে আছে? সে সব কি দিনই গিয়েছে! কত রাত বাতি জেলে মুখ চেয়ে বসে—শৈল এক পাশে, আমি এক পাশে! যমের সঙ্গে সে কি লাঠালাঠি! সে সব দিনও কেটেছে! এখন আবার সেই ছেলে নিয়ে কি বিভ্রাট! কি মনস্তাপ! মা, আর একটু জল!

রেণুর হাতে গরম দুগ্ধ পান করিয়া অখিল তন্দ্রাচ্ছন্ন হইলেন।

৮

দেওয়ানের পত্র পাইবার পর অভিমানে অনিলের হৃদয় ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। পূর্ব্বে যত পত্র সে বাড়ী হইতে পাইয়াছে, সবই পিতার স্বহস্তের লেখা। বিষয়চ্যুত করায় তাহার মনে যত কষ্ট না হইয়াছিল, পিতার হস্তাক্ষরটুকু পাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহার চিত্ত চতুর্গুণ ব্যথিত হইল। তার উপর কি মর্ম্মঘাতী পত্র? সে যে প্রণাম দিল, তাহার পরিবর্ত্তে একটা আশীর্ব্বাদ ত দূরের কথা, একটা কুশল প্রশ্ন নাই। 'তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার'। ভাল, তাই হবে! আমি এখনি গিয়ে বিয়ের সম্মতি দিয়ে আসি। ভাবিয়া অনিল দড়ির আন্‌লা হইতে একখানা

ময়লা চাদর টানিয়া লইল। কিন্তু পা উঠিল না। ঠিক মনে হইল, রেণু দ্বারের অন্তরাল হইতে মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে। তাহার জীবনের কামনা—রেণু! কতদিন হইল অনিল তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, সেও কোন উদ্দেশ করে নাই। চাদরখানা হাতে করিয়াই অনিল তন্ময় হইয়া রেণুর কথাই ভাবিতে লাগিল। অন্তর্দ্দৃষ্টিকে আপনার অন্তরের অন্তরে প্রেরণ করিয়া দেখিল, সেখানে দেশ নাই, দিক নাই, কাল নাই, আছে কেবল রেণু, রেণু, রেণু! তাহার বাল্য-প্রণয়িনীই সমস্ত বুকটা জুড়িয়া বসিয়া আছে! কোথায় দেশ? এই ত দেশের মাটী স্পর্শ করছি, বায়ুর শ্বাস নিচ্ছি, তবে রেণুর মত তাহাকে অন্তরে অন্তরে অনুভব করি না কেন?

কখন যে বিনু ঘরে আসিয়াছে, টেবিলের উপর খোলা চিঠিখানা পড়িয়াছে, অনিল তাহা জানিতেও পারিল না। হঠাৎ বিনুর স্বরে চমকিয়া উঠিয়া কহিল, তুই কখন ফিরে এলি?

আমার ফেরবার কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু তুমি কতক্ষণ চাদর নিয়ে বৃন্দাবনের বাঁদরের মত ভাজা ছোলার পথ চেয়ে রয়েছ, বন্ধু?

তোর সকল কথাতেই ঠাট্টা? সকল সময়েই হাসি। মুখ ত কখন বিষণ্ণ দেখলেম না।

কে জানে, বন্ধু, এ পোড়ার মুখখানা বিধাতা কি করেই গড়েছিলেন! দাঁত বের করেই রয়েছে! তোর মুখ চেয়ে তোর বাপের সামনে যা খানিকক্ষণ বদনখানাকে বিগড়ে রেখেছিলুম। কিন্তু তোমার মুখখানা ত সে রকম নয়, বন্ধু, ওতে যে ছ'টা ঋতুরই সমান আধিপত্য! আপাততঃ প্রাবৃট্-সমাগমে ঘন-মেঘ-সমাবৃত—ভাষার তোড় দেখছিস? তবু সংস্কৃতের জীরো? বাংলার হীরো কি না? কিন্তু তুমি আজ কি ভাবে ভাবিত? বলে—(সুর করিয়া) কে ভাবিনী ভাব ধরালে, ডোর-কৌপিন্ তোমায় পরালে—'কশ্চিৎ কান্তা বিরহগুরুণা?' কিন্তু এখন কোন্ কান্তার বিরহ তোমার জেগেছে? তোমার গলায় বরমালা দিয়ে যিনি দুর্গম কান্তারে পথ হারিয়েছেন, না, যিনি হারাব-হারাব করছেন?

তুই কেমন করে জান্‌লি?

ঠিক প্রেমে-পাওয়ার মত তোমায় চেহারা হয়েছে, বন্ধু! প্রণয় কি ভূত?

বেশক্, বন্ধু, বেশক্! প্রেম আর প্রেত একই পদার্থ। ছম্‌ছমে ভাব, থেকে থেকে চম্‌কে ওঠা—যেন কে আসছে, যেন কে কি বল্‌ছে, আকাশমুখী লঙ্কার মত চক্ষু দুটো, তারও পর আবল-তাবল বকা—এ সব লক্ষণ দুয়েতেই আছে। এখন তুমি কাকে ভাবছিলে, বন্ধু?

লক্ষ্মী-সরস্বতী দুজনকেই; সে কথা এখন থাক্। চিঠিখানা পড়্‌লি?

ও রোগ যে আমার মা'র পেট থেকে পড়ে এস্তক আছে, বন্ধু! পরের চিঠি পেলেই পড়ি, জানিস্ নি? চুরি করে বেন্দার পরিবারের চিঠি পড়েছিলুম বলে, জন্মের মত বন্ধুবিচ্ছেদ হয়ে গেল।

দেখলি, বাবা নিজের হাতে লেখেন নি।

বোধ হয় লিখতে পারেন নি।

এ কথা অনিল মনে করে নাই। এমন কি হতে পারে? পঞ্চাশ বৎসর বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু প্রচুর স্বাস্থ্য, পরিপূর্ণ কর্ম্ম-শক্তি, এই ক'মাসে সব শেষ হয়ে গেল! ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, আমার মনে হয়, লেখেন নি। একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাসে অনিলের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল।

তুই একবার রেণুকে লিখে জান্ না?

রেণুকে? এই ক'মাস আমি তাকে কোন চিঠি লিখি নি, সেও আমার উদ্দেশ করে নি। এখন লিখলে মনে করবে, বিষয় পেয়েছে বলে খোসামোদ করছি। ছি ছি, কি লজ্জা। তাতে কাজ নেই। ওদিককার সম্পর্ক সব মুছে ফেলে দিয়ে এই মেয়েটাকে বে করে নূতন জীবন আরম্ভ করি।

তাই কর, বন্ধু! চল, মুকুন্দ বাবুকে বলে আসি যে, তিনি সালিসি-নামায় সই করুন, তুমি তাঁর মেয়ে বিয়ে করবে।

তা চল, বলিয়া অনিল উঠিল এবং পরক্ষণেই কিন্তু বসিয়া পড়িল।

আবার কিন্তু কি, বন্ধু? পারবে না? আচ্ছা, এক কাজ কর। চিরকালটা আমি কলেজ পালিয়েছি, আর তুমি Proxy দিয়ে এসেছ। এইবার আমায় সে ঋণ শোধ করবার একটা সুযোগ দাও, বন্ধু! আমি Proxy হয়ে তোমার প্রতিনিধি বর হই। এ নূতন কাণ্ড হবে না।

নজির আছে। ইতিহাস পড়েছ,—বন্ধু? নেপোলিয়নের কথা মনে কর। তবে তিনি অষ্ট্রীয়-দুহিতাকে গ্রহণ করেছিলেন। তুমি না হয় পরার্থে পত্নীত্যাগ করবে।

তা কি হয়? লোকে বলবে, দেশের কল্যাণ কেবল এদের মুখে। কাজের বেলা পেছিয়ে পড়ে।

লোকের নিন্দা-সুখ্যাতের মুখ চেয়ে দেশের কাজ হয় না, বন্ধু! লোকে ভাল বল্‌বে বলে যে ভাল কাজ করে, সে দোকানদার। আর এ তুচ্ছ ব্যাপারটাকে ফাঁপিয়ে তুমি এত বড় করে তুলছ কেন? মেয়ে বে না করলে যে মোকদ্দমা মেটাবে না, সে মামলা করে উচ্ছন্ন যাক্‌। এই কুরুটে, ক্যাডাভ্যারাস্ ক্যাডের জন্যে তুমি রেণুকে ভাসিয়ে দেবে?

অনিল অভিমানের সুরে কহিল, আমি ভাসিয়ে দেব কি? বাবা ত তাকেই বজায় করেছেন!

বিষয় দিয়ে? স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতালের রাজত্ব তার কাছে তোমার একটা কড়ে আঙ্গুলের তুল্য নয়, বন্ধু? কিসের জন্যে তার সারা জীবন ব্যর্থ করে দিচ্ছিস, পাগল!

দেশের জন্যে—আত্ম-বলি।

দেশের জন্যে! বুকে হাত দিয়ে দেখ্ দিকি তার নাম করতে তোর প্রাণ কি রকম চঞ্চল হয়ে নেচে উঠছে! তোর দেশ তোর রেণুর আঁচলে বাঁধা। কিন্তু আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ্, আমার দেশ আমার এই বুকের ভিতর। দেশের জন্যে সখের ব্যথা নয়, সত্যি ভালবাসা।

সে ভালবাসা তোর আছে?

কি বল্‌ব! সহসা যেন বিনুর মুখে কি-এক অপূর্ব্ব বিভা ফুটিয়া উঠিল। দুই চক্ষু যেন প্রখর মধ্যাহ্ন-কিরণে জ্বলিতে লাগিল। বিনু বলিল, কি বল্‌ব! আমার বাপ-মা, ভাই, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, সবই আমার দেশ! তোর মত ছায়া নয়, কল্পনা নয়, দেশ আমার কাছে প্রত্যক্ষ—তোর রেণু যেমন তোর কাছে প্রত্যক্ষ! দেশ আমার অন্নদানে জননী, ভালবাসায় প্রণয়িনী। দেশ আমার সাধনা, দেশের জন্য আমি সন্ন্যাসী। কিন্তু এ পথ সকলের নয়। তোমার মত যার পেছটান্ আছে, সে এ ব্রতের অধিকারী নয়, বন্ধু!

এই সময়ে তার আসিল, যদি বাবাকে শেষ দেখা দেখ্‌তে চাও, শীঘ্র এস।

কিন্তু যথাসম্ভব সত্বর আসিয়াও অনিল পিতাকে জীবিত দেখিতে পাইল না। শৈলজা অশ্রুশূন্য চক্ষে কিছুক্ষণ অনিলের শীর্ণ মুখের পানে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। তারপর তাহার সম্মুখে আছাড়িয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আর কি দেখ্‌তে এলি বাপ! সব ফুরিয়ে গেছে!

কিন্তু অনিলের চক্ষে জল ছিলনা। নীরস নয়নে পিতার মৃতদেহ আপাদ-মস্তক দেখিতে-দেখিতে দেখিল, তাঁহার পদদ্বয় আশ্রয় করিয়া একজন নিথর, নিস্পন্দভাবে পড়িয়া আছে—সে রেণু!

অনিল আবার দেখিতে লাগিল। সে-যে পিতার স্নেহময় হৃদয় পুনরধিকার করিতে আসিয়াছে! কিন্তু তিনি তাহাকে চির-বঞ্চিত করিয়া লোকান্তরে চলিয়া গেলেন। হয় ত মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার তাহার কথা তাঁহার মনেও হয় নাই। সেই সময় হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল, পিতার করধৃত একখানি স্বর্ণ-পদকের উপর—তাহারই ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পুরস্কার! তরু-কোটর-গত বহ্নির ন্যায় পিতা এই স্নেহ অন্তরের অন্তরে লুকাইয়া কেবল দগ্ধ হইয়াছেন! অনিলের শরীর টলিতে লাগিল। কিন্তু ভূপতিত হইবার পূর্ব্বেই দেওয়ান তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, বাবা, এসেছ!

হাঁ, কাকা! বাবার মুখে আগুন দিতে হবে যে! আমার কর্ত্তব্য কিনা! বলিয়াই বৃদ্ধ দেওয়ানের বুকের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

৯

অনি, আমায় বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দে! এ বাড়ীতে আমি আর তিষ্ঠুতে পারছিনি।

মা, তোমায় একদিন একটা কথা বলে ফেলে তোমার স্নেহের অধিকার আমি হারিয়েছি। তুমি কি সে কথাটা কিছুতেই ভুল্‌তে পারছ না?

কি কথা, বাবা?

সেই যে, সেই-যে, সে কথা আর আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না, মা! কিন্তু জীবনের সেই একটা অপরাধ তুমি কি মাপ করবে না?

পাগল! মায়ের কাছে কি সন্তানের অপরাধ আছে রে? তুই যে আমার পেটের ছেলের চেয়ে বেশী।

আর আমায় কথায় ভোলালে হবে না। বেশ!

আমাদের ভাবনা না ভাব, তোমার রাধারমণকে কারে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে?

এখনও যাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছি, তখনও তাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌ব,—রেণুকে।

রেণু ত নিজের অনাথ-ভাণ্ডার, আতুরাশ্রম, চিকিৎসালয় নিয়ে ব্যস্ত, তার ওপর লোকের বাড়ী-বাড়ী বেড়ান আছে। তোমার রাধারমণকে দেখবে কখন?

ওকথা বোল না! মা-যে আমার দশহাতে দশদিক রক্ষা করে! তুই আর আমায় আট্‌কাস্‌ নি। একদিন যা ফেলে আমি স্বর্গেও যেতে চাইতাম না—আজ তাই আমার জেলখানা হ'য়েছে।

চোখে অঞ্চল দিয়া শৈলজা চলিয়া গেলেন এবং অল্পদিন পরে আর্ত্তের পরম-তীর্থ শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

দিনের অধিকাংশ সময়ই রেণুর সঙ্গ পাওয়া যায় না। কেবল আহার করাইবার সময় আসিয়া উপস্থিত হয়। গৃহে থাকা ক্রমে অনিলের পক্ষেও একান্ত ক্লেশকর হইয়া উঠিল। একদিন আহারের পর রেণু প্রস্থানের উপক্রম করিতেই অনিল অভিমানের সুরে বলিল, আবার কোথা যাচ্ছ? চল, তোমার সঙ্গে আমি যাব।

রেণু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, আমাকে একলা ছেড়ে দিতে ভয় করে বুঝি?

অনিল অপ্রতিভ হইয়া বলিল, দূর! তা কেন? তা বৈ কি! আমি কি তাই বল্‌ছি?

তবে কি বল্‌ছ?

বল্‌ছি, বল্‌ছি—

আচ্ছা, তুমি ততক্ষণ ভেবে রাখ; আমি পরে এসে শুনব। আমি সেই অবসরে ছিরু ঘরামীর ছেলেকে একবার দেখে আসি। তার ভারি জ্বর—কেবলই মা—মা করছে।

তুমি তাই তার মা হতে চলেছ? এত যদি মা হবার সাধ ত একটা সৎপাত্র দেখে বে' করনা কেন?

বাঃ! মেয়ে-মানুষের কবার বে হয়?

সেই বে'র কথা বল্‌ছ? সে ত বে' নয়, একটা পরদা দিয়ে আপনাকে এমন করে ঘিরে রেখেছ যে, ছোঁবার অধিকার কারুর নেই।

ছোঁবার অধিকার কারুকে দেব না বলেই তেমন করে পরদা দিয়েছি। কেন? তোমরা কি মনে কর, ঘর-সংসার করা, ছেলেপুলের মা হওয়া ছাড়া স্ত্রীলোকের আর কোন উচ্চ কার্য্যে অধিকার নেই? তোমরা মেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছ, কিন্তু দেশের কাজে তাদের অধিকার দিয়েছ কি? অন্তঃপুর সংসারের আধখানা জুড়ে রয়েছে। মানুষের ভাল-মন্দ সকল কাজেরই প্রেরণা যেখান থেকে আসে, সেই অন্তঃপুরকে তোমরা কেবল সূতিকাগার করে রেখেছ!

অনিল অভিভূতের ন্যায় রেণুর-মুখ চাহিয়া রহিল। রেণু বলিতে লাগিল, দেশের কাজে এখন ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারিণী, দুই-ই দরকার। কিন্তু সকলকে একপথে গেলে চল্‌বে না। যক্ষ্মায়, ম্যালেরিয়ায় নগর গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে। অর্থের অভাবে, চিকিৎসকের অভাবে সুচিকিৎসা হয় না, শুশ্রূষা হয় না। এই কল্যাণ-ব্রতে ব্রতী হবার জন্য স্বার্থত্যাগী ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারিণীর প্রয়োজন। এমন কত কাজ রয়েছে, কত বল্‌ব? সবাই সব-কাজ পারে না! কিন্তু রুচি-অনুসারে দেশের এতটুকু কাজ না করতে পারে, এমন অধম, অকৃতি কে আছে? এতে বিদ্যা-বুদ্ধির দরকার নেই। চাই কেবল স্বদেশ-বাসীর দুঃখে সমবেদনা, জন্মভূমির জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন, আর চাই পথের বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করবার দুর্দ্দমনীয় সাহস।

কিন্তু আমি যে পথ হারিয়ে ফেলেছি।

আপনার বুকের ভিতর খুঁজে দেখ—সত্যের প্রশস্ত পথ।

বাবা বরাবরই আমাকে সে কথা বলেছেন, কিন্তু সে কথা ত আমি মানিনি। আমি আপনাকে না বুঝে, না চিনে দেশের সেবা করতে ছুটে গিয়েছিলেম—একনিষ্ঠ সেবা! তখন বুঝ্‌তে পারিনি যে, দেশ দেশ করছি কেবল মুখে—আমার মন জুড়ে ছিলে তুমি। এখনও তাই। আমার জীবন ব্যর্থ।

ব্যর্থ কেন বলছ? তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি। আর কি চাই? ভোগ? ভোগের সময় কৈ? একবার চোখ চেয়ে দেখ, কান পেতে শোন! কি দুঃখ, কি বেদনা, কি বুকফাটা কান্না। তা শুনে যদি তুমি স্থির থাক্‌তে পার, তোমার ভোগের ইচ্ছা থাকে, তোমায় বাহাদুর বল্‌ব! তুমি তা পারবে না, তোমার দেহে ত্যাগীর রক্ত রয়েছে! তুমি যাঁর সন্তান, আমি তাঁর শিক্ষিতা শিষ্যা। এস, এক মহাব্রতে আমরা এক হ'য়ে আত্ম-বিসর্জ্জন করি। মনে কর, ইহলোকে এই আমাদের বিবাহ। ছেলেবেলা তোমার নর্ম্ম-সঙ্গিনী ছিলেম, এখন থেকে তোমার কর্ম্ম-সঙ্গিনী, ধর্ম্ম-সঙ্গিনী হব।

পাগল! তুমি ব্রহ্মচারিণী হলে তোমার এ বিপুল সম্পত্তি ভোগ করবে কে?

আমার দেশশুদ্ধ ছেলে-মেয়ে থাক্‌তে সম্পত্তি ভোগ করবার ভাবনা? তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে আমার সহায় হও! আমি অবলা—আমার বল, বুদ্ধি, ভরসা, সাহস, সব তুমি। যদি আমরা ঠিক পথে চল্‌তে পারি, তাহ'লে দেশের চিহ্নিত সেবক হয়ে জন্ম-জন্ম জন্মভূমি সেবার অধিকার পাব। এর চেয়ে বড় ধর্ম্ম আর নেই।

মার্কিণ মুলুক

[শ্রীইন্দুভূষণ দে মজুমদার এম-এস্‌সি, এফ-আর-এস্-এ.]

ইয়েল্ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম কয়দিন (১৯০৫)

নিউ হেভেন্ (New Haven) কনেক্টিকাট্ প্রদেশের প্রধান নগর। এখানে ইয়েল্ বিশ্ববিদ্যালয় ও কনেক্টিকাটের কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্র অবস্থিত। নিউ হেভেনে পৌঁছনের কিছুদিন পরেই একজন পরিচিত ছাত্রবন্ধুর প্রকোষ্ঠে গমন করিলাম। সপ্তাহখানেক পরেই তাহার ইয়েল্ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ্-ডি পরীক্ষা দিবার কথা। লৌকিকতা অনুসারে সে পাত্রে সুরা ঢালিয়া আমাকে পান করিতে দিল। কিন্তু ঐ রসে বঞ্চিত ছিলাম বলিয়া, ধন্যবাদের সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে হইল। সে যখন আমার নিকট শুনিতে পাইল যে, ভারতবর্ষের ছাত্রসমাজে সুরার প্রচলন একেবারে নাই বলিলেই হয়, তখন বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে বলিল, "ভারতবর্ষের মত গরম দেশে তোমরা কি করিয়া সুরাপান না করিয়া থাকিতে পার? এই দেশে আমরা গ্রীষ্মকালে সুরাপান করিয়া ঠাণ্ডা হই, আর শীতকালে সুরাপান করিয়া গরম হই।" উপায়ান্তর না দেখিয়া সে নিজেই আমার স্বাস্থ্য পান করিয়া ক্ষান্ত হইল, আমাকে আর পান করিতে অনুরোধ করিল না। কিন্তু তাহার মনে এই বিশ্বাসটা বদ্ধমূল হইল যে, ভারতবর্ষ একটা আজগবি দেশ,--সেখানকার সমস্তই অদ্ভুত।
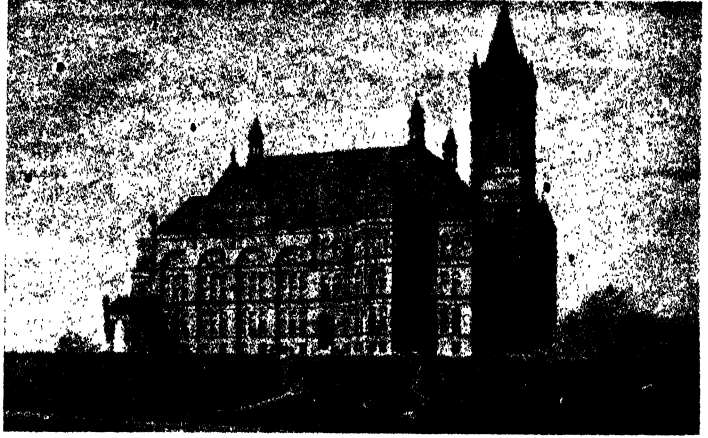
কলা-শিক্ষাগার, সিরাকিউস্ বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ ইয়র্ক

ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্রবৃন্দের শোভাযাত্রা, কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়

ইয়েল্ গ্র্যাজুয়েট্ ক্লাবে আর একদিন অধিকতর বিপদে পড়িয়াছিলাম। ঐ ক্লাবের সভ্যগণ সকলেই গ্র্যাজুয়েট্,—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, এবং উপাধিধারী বর্তমান ও ভূতপূর্ব্ব ছাত্র লইয়া ঐ ক্লাব গঠিত। কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্রের অধ্যক্ষ ডাক্তার জেঙ্কিন্‌স্ (Dr. Jenkins) একদিন আমাকে সন্ধ্যার সময় ঐ ক্লাবে তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত পরিচিত করাইয়া দিলেন। তাঁহাদের সহিত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা

বিষয়ের আলাপ হইতে লাগিল। ডাক্তার জেঙ্কিন্স্ আমার জন্য কোন্ পানীয়ের আদেশ দিবেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তখন বিষম সমস্যায় পতিত হইলাম। মাদক দ্রব্য ছাড়া লেমনেড্ প্রভৃতি অন্য কোন পানীয় সেখানে ছিল কি না, তাহা জানিতাম না। কিছু পান করিব না বলিলেও
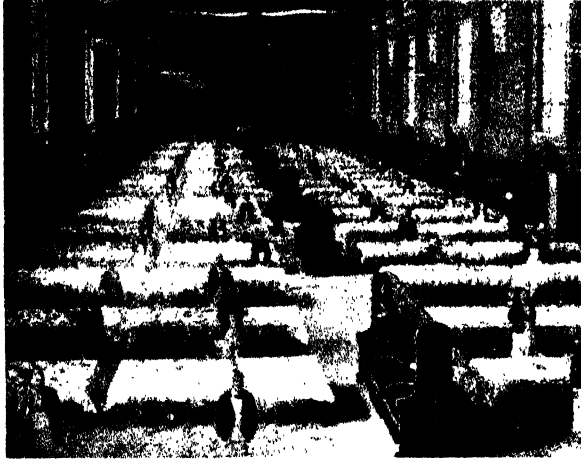
ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোজনাগার

অভদ্রতা হয়। সুতরাং আমি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। আমার দ্বিধা দেখিয়া, ডাক্তার জেঙ্কিন্স্ আমার অবগতির জন্য কতকগুলি পানীয় দ্রব্যের নাম করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে মনে হইল যেন জিঞ্জারেড্ কথাটাও শুনিতে পাইলাম। জিঞ্জারেডের নাম শুনিয়া আমি অকূলে কূল পাইলাম। নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন হাতের কাছে যাহা পায়, তাহাই আঁকড়াইয়া ধরে, আমিও তেমন জিঞ্জারেডের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িলাম। কিন্তু অদৃষ্ট তবুও সুপ্রসন্ন হইল না। যখন বোতলটা খালি হইল, তখন লেবেলে দেখিলাম যে, বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—"জিঞ্জারেল"। আমি জানিতাম যে, "এইল্" (Ale) একপ্রকার মদ্য; কাজেই সিদ্ধান্ত করিলাম জিঞ্জারেলও নিশ্চয়ই নির্দ্দোষ পানীয় নহে। আমি উহা স্পর্শও করিলাম না। ডাক্তার জেঙ্কিন্স্ আমাকে দুই-একবার পান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; কিন্তু আমি তৎসম্বন্ধে কোন ইচ্ছা না দেখাইয়া, কথাবার্ত্তাতেই মগ্ন রহিলাম। আমেরিকায় কিছুদিন থাকিয়াই, পরে জানিতে পারিলাম যে, যদিও এইল্ ও বিয়ার্ মদ্যবিশেষ, তথাপি জিঞ্জারেল ও জিঞ্জার বিয়ারে কোনপ্রকার মাদক দ্রব্য নাই। এই সকল পানীয় পরে বহুবার উদরস্থ হইয়াছে; কিন্তু ইয়েল্ গ্র্যাজুয়েট্ ক্লাবে তখন কি আহাম্মকিটাই না করিয়াছিলাম! ঐ কথা স্মরণ হইলে, আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারি না।

ঐ ক্লাবে একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করিলাম যে, আমেরিকা-বাসীরা অন্যান্য বিষয়ে যেমন উদার-প্রকৃতির, পানীয় সম্বন্ধেও তাহাদের উদারতা কম নহে। দেশী বিদেশী মাদক কিম্বা নির্দ্দোষ পানীয়গুলি কিছুই তাহারা বর্জ্জন করে না। ক্লাবে দেখিলাম সকল প্রকার মদ্যেরই প্রচলন আছে। একজন অর্ডার করিলেন কক্‌টেইল (Cocktail); একজন হাইবল্ (Highball); তৃতীয় ব্যক্তি অর্ডার করিলেন বিয়ার্। এইরূপে প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদরের পানীয়গুলি নিঃশেষ করিতে লাগিলেন। মার্কিণদিগের মধ্যে ইয়োরোপের বিভিন্ন জাতির রক্ত যে মিশ্রিত আছে, তাহাদিগের সুরাপান সম্বন্ধে সার্ব্বভৌমিকত্ব দেখিয়াই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেশের লোকেরা কোন্-কোন্ সুরায় অনুরক্ত,—তৎসম্বন্ধে একটী ছড়া আমেরিকায় প্রচলিত আছে :—

উড্‌ব্রিজ হল, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়

"ফরাসী, সে ভালবাসে সুরার গেলাস ;
জর্ম্মাণ পাগল হয় বিয়ারের তরে।
আধাআধি মিশ্রপানে ইংরাজের সাধ,—
ইহাই পলকে তার দেল্‌খোস্‌ করে।
আইরিস্‌ উৎসুক সদা হুইস্কির লাগি,—
হুইস্কি মাতায় তারে পুলক আবেশে ;
মার্কিণের রুচি কিসে বলা বড় দায়—
অকাতরে পান করে যা পায় নিঃশেষে।" *

যে দুই-চারিটী দেখিয়াছি, তাহারা হয় ত নিগ্রো, নয় ত অতি নিম্নশ্রেণীর শ্বেতাঙ্গ। লোকে শেষোক্ত ব্যক্তিদিগকে ঘৃণা করিয়া White Trash (শ্বেতাঙ্গদিগের আবর্জ্জনা) নামে অভিহিত করিয়া থাকে। আমেরিকার আব্‌হাওয়ায় স্বাস্থ্যের জন্যই কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুরাপান আবশ্যক। শীতকালে ঐ দেশে বড়ই ঠাণ্ডা পড়ে,—আবার গ্রীষ্মকালে বেশ গরম পড়িয়া থাকে। এই প্রকার অতি-শীতোষ্ণ দেশে, আমার দার্শনিক বন্ধুটীর মতে, সুরাপান করিলে, গ্রীষ্মকালে বৈদ্যুতিক পাখার, আর শীতকালে বহ্নিসেবনের কাজ হইয়া থাকে।

কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃশ্য—(উত্তরাংশ)

ইয়েল্‌ গ্র্যাজুয়েট্‌ ক্লাবের প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্ব্বে, যে কয়টী সভ্যের সহিত আলাপ হইল, তাঁহাদের অগাধ জ্ঞানের বিষয়ে কিছু না বলা সঙ্গত হইবে না। তাঁহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাকে যে সকল বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। আমাদের দেশ সম্বন্ধে তাঁহারা যে কত খবর রাখেন, তাহা দেখিয়াও আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ভারতবর্ষের অধিবাসী হইয়া আমি দেশের যে সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাঁহারা বিদেশী হইয়াও সে সকল বিষয়ের খবর রাখেন দেখিয়া, আমার আশ্চর্য্য হইবারই কথা। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা, ধর্ম্মতত্ত্ব, জাতিভেদ, ভাষা, কৃষি, শিল্প, খনি, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে অনেক

কিন্তু আজকাল এই মহাসমরের অবসানে, আমেরিকায় না কি সুরাপান-প্রথা রহিত হইয়াছে। ইহা যুক্তরাজ্যের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

ইয়েলের একজন উপদেষ্টা ডাক্তার উইন্‌টন্‌ (Dr. Winton) যখন দেখিলেন যে, আমার কোন প্রকারের সুরাপানের অভ্যাস নাই, তখন একটু লজ্জিত ভাবে বলিলেন, "আমাদের দেশে লোকে অল্পমাত্রায় সুরাপান করে বটে, কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া কখনও মাতাল হয় না। এদেশে মাতালকে সকলে বড়ই ঘৃণা করে।" আমেরিকায় অবস্থিতি-কালে তাঁহার উক্তির যথার্থতা নিজেও উপলব্ধি করিয়াছি। ইংলণ্ডের ন্যায় আমেরিকায় মাতাল বড় চোখে পড়ে নাই ;

শীতকালে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ-পথ

* শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা এম-এ কর্ত্তৃক অনূদিত।

তত্ত্বই, আমার মনে হইল, যেন তাঁহাদিগের নখদর্পণে। তাঁহারা এক-একটা বিষয় সম্বন্ধে আমাকে নানা দিক্ দিয়া এমন সকল প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, যাহা পূর্ব্বে আমার মনে কখনও উদয় হয় নাই।

যিনি উদ্ভিদতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ, দেখিলাম, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান কেবল গাছ-পালাতেই সীমাবদ্ধ নহে; ভারতবর্ষে বৎসর-বৎসর কত লোক সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেই সংখ্যাও তাঁহার অজ্ঞাত নহে। যিনি রসায়নশাস্ত্রে পণ্ডিত, দেখিলাম, ভাষা-তত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁহার চর্চ্চা আছে। তিনি আমাকে "হিন্দুস্থান" শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন; এবং নিজেই বলিতে লাগিলেন, "স্থান" শব্দটার সংস্কৃত ধাতু লাটিন "ষ্টো" (Sto, to Stand অর্থাৎ দণ্ডায়মান হওয়া) ধাতুর অনুরূপ। দেখিলাম, প্রত্যেকেই যেন জ্ঞানের এক-একটা ভাণ্ডারবিশেষ। তখন স্বতঃই আমার মনে উদয় হইল, ইঁহারা বিদেশ—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যদি এত খবর রাখেন, তবে নিজ দেশ সম্বন্ধে ইঁহাদের জ্ঞান নিশ্চয়ই অপরিসীম। ভবিষ্যতে আবার যখন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রশ্ন চলিতে থাকিবে, তখন যাহাতে অপ্রস্তুত না হই, তজ্জন্য আমি পরদিন প্রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে মহাকোষ ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পুস্তক হইতে স্বদেশের অনেক জ্ঞাতব্য তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া লইলাম।
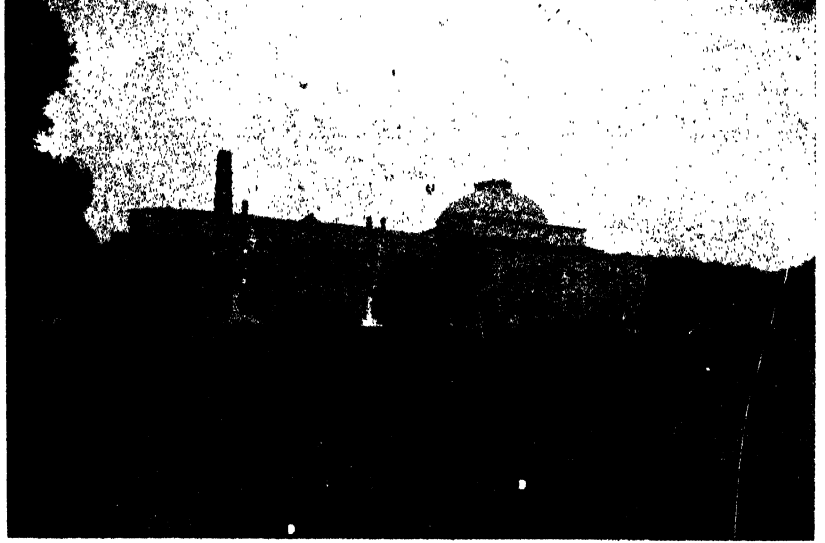
কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যায়ামগৃহ

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে সকল বিষয়ে কথোপকথন হইল, তন্মধ্যে একটা কথা সকলের মুখেই শুনিতে পাইলাম। মনে হইল যেন, ঐ বিষয়ে তাঁহারা সকলেই গৌরব অনুভব করিলেন। উহা বড়লাট-পত্নী লেডি কার্জনের কথা। লর্ড কার্জন তখন ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা,—ত্রিংশৎ কোটি মানবের ভাগ্য-নিয়ন্তা। প্রথমে যে ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইল, তাঁহাকে ডাক্তার 'ক' বলিয়াই উল্লেখ করিব। হস্তমর্দ্দন করিয়াই আমরা পরস্পরকে মার্কিণ কায়দায় বলিলাম, "আপনার সাক্ষাৎ লাভে সুখী হইলাম।" অতঃপর ডাক্তার ক কহিলেন "মিঃ দে, লর্ড কার্জনকে ভারতবর্ষের লোকে কেমন পছন্দ করে?" রাজনৈতিক বিষয়ে আলাপের সূত্রপাত করিতে আমার তেমন প্রবৃত্তি ছিল না। দুই-এক কথায় উত্তর দেওয়া শেষ হইলেই, তিনি খুব আগ্রহের সহিত

জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর লেডি কার্জন সম্বন্ধে ভারতবাসী-দিগের কিরূপ মত, তাহাও আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি।" আমি জানিতাম যে, লেডি কার্জন সম্বন্ধে মার্কিণরা বিশেষ গৌরবান্বিত। সেই কক্ষের অন্যান্য লোকেরা আমার উত্তর শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিল। আমি বলিলাম, "লেডি কার্জন ত খুবই লোকপ্রিয়। তিনি অপরূপ সুন্দরী বলিয়া পরিচিতা। তাঁহার মধুর ব্যবহারে তিনি ভারতবাসীদিগের হৃদয় জয় করিয়াছেন। তাহারা লেডি কার্জনকে লাটপত্নীরূপে পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত।"

বাবি হ্রদ ও জলপ্রপাত

ডাক্তার ক বলিয়া উঠিলেন, "মিঃ দে, আপনি অবশ্যই জানেন যে, লেডি কার্জন একজন মার্কিণ মহিলা।"

ইহার পরে আর একজন ভদ্রলোক আসিলেন। তাঁহাকে ডাক্তার খ বলিয়া উল্লেখ করিব। তিনি হস্তমর্দ্দনাদির পর বলিলেন, "ভারতবর্ষের দিল্লী-দরবার সম্বন্ধে কিছু বলিয়া আমাদের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন। আমাদের দেশেরও কেহ কেহ ঐ দরবারে উপস্থিত ছিলেন।" তিনি কোন্ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন, তাহা আমি তখনই অনুমান করিলাম। ডাক্তার খ বলিতে লগিলেন, "তাঁহারা লেডি কার্জনের অতিথিরূপে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। লেডি কার্জন আমাদের দেশেরই মেয়ে কিনা! আচ্ছা মিঃ দে, লেডি কার্জনকে ভারতের লোকেরা খুব পছন্দ করে ত?"

ইহার পরে তৃতীয় যে ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইলাম, তাঁহার নাম দিব ডাক্তার গ। যাহার সহিত পরিচিত

কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী

হইতেছি, তাঁহাকেই ডাক্তার উপাধিধারী দেখিয়া, মনে হইল যে, ইয়েল্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলেই বুঝি পি-এইচ্-ডি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভারতবর্ষে কি আমেরিকার অনেক লোক আছে?" এই কথার পরই তিনি পুনরায়

শীতঋতুতে বরফাবৃত সেণ্ট্রাল এভিনিউ

বলিয়া উঠিলেন, "কেন? আমার ভুল হইয়াছিল—ভারত-বর্ষের বড়লাট-পত্নীই ত আমাদের দেশের ক্রোরপতি মিঃ লিটারের (Leiter) কন্যা। খবরের কাগজে অনেক সময় লেডি কার্জনের কথা পাঠ করিয়া থাকি। সেই বৃহৎ

দরবারের সময় একবার ভারতবর্ষে যাইতে পারিলে বেশ ভাল হইত। আচ্ছা, মিঃ দে, লেডি কার্জন দিল্লী দরবারে খুব যশ অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন ত ?'

অতঃপর আর একজন ভদ্রলোক আসিলেন। তাঁহার মুখেও ঐ কথা। নানাবিধ বিষয়ে আলাপের পর, যখন আমি রাত্রিবেলা সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া উঠিলাম,
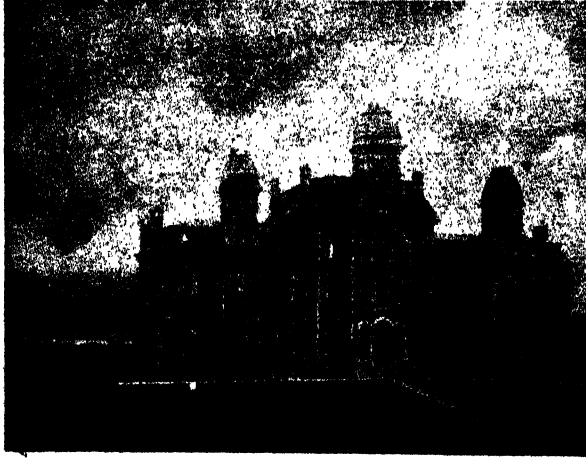
ভাষা-শিক্ষাগার, সিরাকিউস্ বিশ্ববিদ্যালয়

তখনও আমি শুনিতে পাইলাম যে, কয়েক জনের মধ্যে মিস্ লিটারের সহিত জর্জ ন্যাথেনিয়েল্ কার্জনের বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

নিউহেভেনের ইয়াঙ্কিরা (Yankee) আমাকে পারস্য কবি ওমর খৈয়ম্ ও ইংরেজ কবি রাড্‌য়ার্ড কিপ্লিং (Rudyard Kipling) সম্বন্ধেও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিত। আমি ইঁহাদিগকে ইয়াঙ্কি আখ্যায় অভিহিত করিলাম; কারণ, কনেক্‌টিকাট্ প্রদেশের অধিবাসীরাই ঐ নামে পরিচিত। ডাক্তার উইন্‌টনের নিকট শুনিলাম যে, যদিও বিদেশীরা সমগ্র যুক্ত-রাজ্যের লোকদিগকেই ইয়াঙ্কি নামে অভিহিত করিয়া থাকে, যুক্তরাজ্যের লোকেরা কিন্তু কেবল নিউ ইংল্যাণ্ড (New England), অর্থাৎ ম্যাছেচুছেট্‌স্ (Massachusetts), রোড্ আইল্যাণ্ড (Rhode Island), কনেক্‌টিকাট্ প্রভৃতি কয়টী প্রদেশের অধিবাসীদিগের সম্বন্ধেই ঐ নামটী প্রয়োগ করিয়া থাকে। আবার কনেক্‌টিকাটের লোকের উপরই নিউ ইংল্যাণ্ডের লোকেরা ঐ নামটী চাপাইয়াছে। ইয়াঙ্কি শব্দের উৎপত্তি-সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। তবে উহা "ইংলিশ" শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াই মনে হয়। শ্বেতাঙ্গেরা যখন আমেরিকায় প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন আদিম অধিবাসী ইণ্ডিয়ানেরা তাহাদিগকে ইয়াঙ্কি নামে অভিহিত করিত। মেক্সিকো হইতে প্রত্যাগত একজন আমেরিকা-বাসীর নিকট শুনিলাম যে, মেক্সিকান্‌রা ইংরেজী অক্ষর 'y' উচ্চারণ করিতে পারে না বলিয়া, যুক্তরাজ্যের লোকদিগকে ইয়াঙ্কি না বলিয়া "গিঙ্গো" বলিয়া থাকে।

ওমর্ খৈয়ম্ ও কিপ্লিংয়ের কথা বলিতেছিলাম। পারস্য কবি ওমর্ খৈয়ম্ তখনও ভারতবর্ষে তত সুপরিচিত হন নাই। পারস্য কবি বলিতে আমাদের তখন সাদি ও ফার্দ্দুসির নামই মনে হইত। আমেরিকায় দেখিলাম, ওমর্ খৈয়মের ইংরেজী অনুবাদের সহিত অনেকেই পরিচিত। ভারতবর্ষ ও পারস্য দুইটাই প্রাচ্য দেশ,—উভয়ের মধ্যে দূরত্বও বেশী নহে; এইজন্যই আমেরিকার ছাত্রেরা আমার নিকট ওমর্ খৈয়মের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গীতাঞ্জলি তখনও বাহির হয় নাই, তখন তিনি আমেরিকায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু কিপ্লিংয়ের নাম সকলের মুখেই শুনিতে পাইতাম। ছাত্র, অধ্যাপক সকলেই কিপ্লিং পড়িয়াছে; এবং কিপ্লিং পাঠে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহাদের নানারূপ ধারণা জন্মিয়াছে। আমি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোজন-কক্ষে
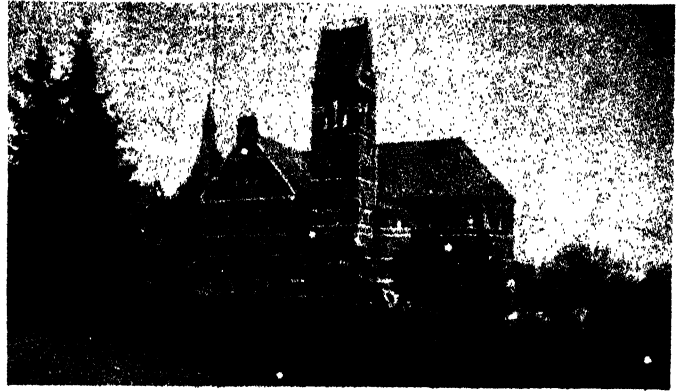
বার্ণস্‌হল, কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়

আহার করিতাম। ঐ কক্ষে একেবারে প্রায় ১১০০ ছাত্র ভোজন করিতে পারিত। আমেরিকায় আর কোন বিদ্যালয়ে অত বড় ভোজন-কক্ষ ছিল না। আমি গ্রাজুয়েটদিগের একটা টেবিলে স্থান পাইয়াছিলাম। প্রথম যে ছাত্রটার সহিত আমার পরিচয় হইল, সে একজন দার্শনিক। সে এইরূপে আলাপ আরম্ভ করিল, "আমার অনেক সময় মনে হইয়াছে যে, একবার ভারতবর্ষে যাইয়া সাধু-সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় অশ্বত্থ-বৃক্ষের তলায় বসিয়া ভগবচ্চিন্তা করিব। মিঃ দে, তোমার কি মনে হয় কিপ্লিংয়ের এই উক্তিটী ঠিক?" তার পর সে বলিল, "আমি সম্প্রতি কিপ্লিংয়ের 'নৌলকা' (Naulahka) নামক উপন্যাস পাঠ করিতেছি। আচ্ছা, ভারতবর্ষের লোক কি খুব অহিফেনসেবী?" সে পুনরায় বলিতে লাগিল, "আমার সর্ব্বদাই এই ধারণা ছিল যে, ভারতের মহিলারা অন্তঃপুরে খুব কড়া পাহারায় থাকে,—বাহিরের লোকদিগের সহিত তাহাদিগের কথা বলিবার কোন সুযোগ ঘটে না। আচ্ছা, রাণী সীতাবাইয়ের চিত্রটা কি তোমার অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয় না?" তাহার প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দিয়া, আমি আহারে পুনরায় মনোনিবেশ করিতেছি, তখন আর একজন ছাত্র আমার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। অন্য ছাত্রদের অপেক্ষা তাহাকে অধিক স্ফূর্ত্তিবাজ বলিয়াই মনে হইল। সে বলিল, "আমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পুস্তক পাইলেই পড়ি। কিপ্লিংয়ের আমি একজন

কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের কিয়দংশ

আমেরিকায় আমরা কিপ্লিং পড়িয়াই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি! তুমি কি কিপ্লিংয়ের 'কিম্' (Kim) নামক পুস্তক পাঠ করিয়াছ? সেই লামার গল্পটা কি করুণরসাত্মক! লামা তাহার ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণিত একটা নদীর অন্বেষণ করিতেছিল,—সেই নদীতে অবগাহন মাত্র সমস্ত পাপ ধৌত হইয়া যায়; এবং মুক্তি লাভের আর কোন সংশয় থাকে না। তোমার কি মনে হয়, মিঃ দে, গল্পটা অস্বাভাবিক?"
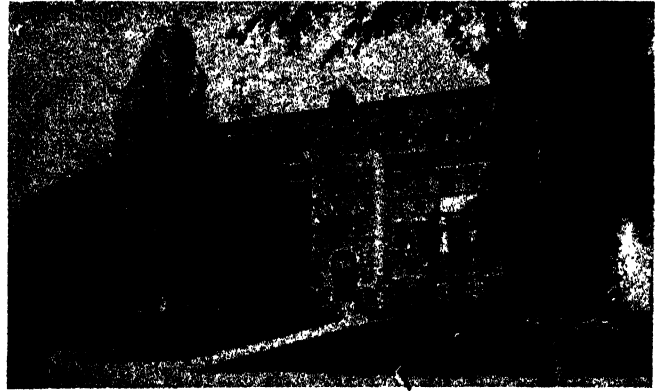
ফ্রাঙ্কলিন হল, কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়

দ্বিতীয় একজন ছাত্র প্রাথমিক পরিচয়াদির পর বলিল, "কিপ্লিং তাঁহার 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের গাথা'য় (Ballad of East and West) লিখিয়াছেন,—

'পশ্চিম পশ্চিমে রবে—পূরবে পূরব,
এ দু'য়ের সম্মিলন চির-অসম্ভব।
স্বর্গ মর্ত্ত্য বিভুপদে যেদিন জুটিবে,
সেই দিন উভয়ের বিভেদ টুটিবে।'*

ভক্ত। তাঁহার 'সৈন্যনিবাসের গাথা'গুলি (Barrack-Room Ballads) আমার খুব ভাল লাগে। ঐ সঙ্গীতগুলি আমি অনেক সময় আপন মনে গাহিয়া থাকি।" এই বলিয়া সে "ম্যাণ্ডেলে" নামক কবিতার কতক-কতক অংশ আবৃত্তি করিতে লাগিল।

"দেখিনু তরুণী চারু চুরুটের ধোঁয়া করিতেছে পান।
খৃষ্টানী চুমা পুতুলের পায়ে বৃথা করিতেছে দান।"

ঐ অংশ আবৃত্তি করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের

* শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা এম্ এ কর্ত্তৃক অনূদিত। পরবর্ত্তী কবিতাগুলির অনুবাদের জন্যও লেখক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

দেশের মেয়েরা কি ধূমপান করে? তুমি কোন দিন ব্রহ্ম দেশে গিয়াছ কি? ঐ দেশের মেয়েরা কি দেখিতে খুব সুশ্রী?" আমার উত্তর শুনিয়া সে আবার আবৃত্তি করিতে লাগিল।

"তার বাহু মোর কাঁধের উপর, গালে গালে প্রায় লাগে।
দুজনে মিলিয়া দেখিনু জাহাজ
দেখিনু হাতীতে করিতেছে কাজ,
সেগুন কাঠের তাল সাজাইয়া— দেখিনু নয়ন-আগে!"

কেয়ুগা হ্রদে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের নৌ প্রতিযোগিতা

এইবার সে জিজ্ঞাসা করিল "ভারতবর্ষে কি হাতী দিয়া কাঠ টানা হয়?" আমার সম্মতি-সূচক উত্তর পাইয়া সে পুনরায় আবৃত্তি করিল!

"কিছুতেই রবে নাক' মন তব আর
ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে হবে বারবার,
মসলা-মেশান রসুনের বাস জিনিষ সে রসনার;
নারিকেল বন, প্রশান্ত কিরণ,
মন্দিরে রিণিঠিণি অনুখণ,
স্মৃতিরাই মনে আসিবে ভাসিয়া মধুর
স্মিরিতি তার।"

এইবার প্রশ্ন হইল "ভারতবর্ষের লোক কি খুব রসুনের ভক্ত?" আবার তাহার কবিতা-স্রোত চলিতে লাগিল—

"টেমসের তীরে ভ্রমি যদি আমি শত রমণীর সনে,
শত কথা যদি কহে পীরিতের, তুচ্ছ সে গণি মনে!
কি বুঝিবে তারা পরাণের কথা, কি বলিব অকারণে?
মোটা মোটা হাত, কুৎসিত মুখ,
তা দেখিয়া হায় ভরে কি এ বুক?
প্রাণে সদা আসে ভেসে
ফুটফুটে বন-ফুল-কলি এক, ফিটফাট এক দেশে,
অমল মধুর রূপসী বালিকা নীল-নির্ম্মল বেশে।"

এইবার প্রশ্ন হইল "তোমার প্রাণ কি দেশের কোন বালিকার জন্য কাঁদে? কিপ্লিংয়ের বর্ণনাতে কি কোন প্রকার অত্যুক্তি আছে?"

তিন জনকে একই প্রশ্নের তিনবার উত্তর দিয়াও আমার নিষ্কৃতি ঘটিল না; চতুর্থ ছাত্র একজন আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, এও কি কিপ্লিংয়েরই অবতারণা করিবে, না অন্য বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিবে। যাহা ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই হইল। সে বলিল যে, কিপ্লিংয়ের ভারত সম্বন্ধে গল্পগুলি সে আগ্রহের সহিত পাঠ করে। সম্প্রতি সে তাহার Jungle Book ও Plain Tales from the Hills নামক পুস্তকদ্বয় পাঠ করিতেছে।
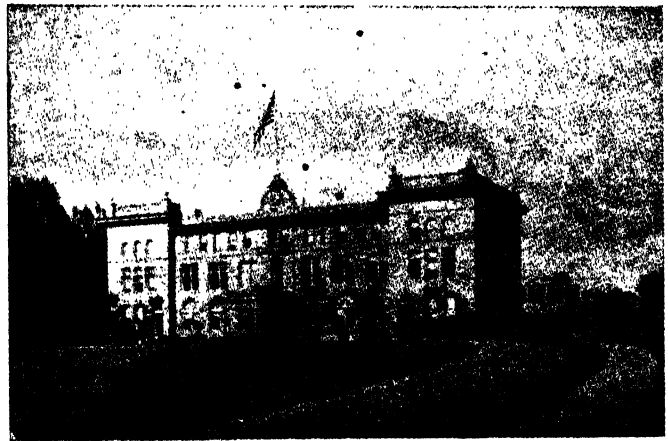
পশু চিকিৎসার কলেজ, কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়

তাহার বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমার আহার শেষ হইল; এবং কিপ্লিংয়ের চিত্রগুলি অতিরঞ্জিত কি না, সে জিজ্ঞাসা করিতে না করিতেই, আমি সকলকে গুড্‌বাই বলিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলাম। পরদিন

বিশ্বরূপ

মাননীয় শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে মুদ্রিত

Emerald Ptg. Works.

দেখিলাম যে, "নিউ-হেভেন্ রেজিষ্টার" নামক দৈনিক সংবাদ-পত্রে আমার সম্বন্ধে বেশ একটু হাস্যকর 'বর্ণনা বাহির হইয়াছে। কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ঃ—

"ভারতবর্ষের মিঃ দে এখানে শিক্ষালাভ করিতে আসিয়াছেন।

"প্রথমে পাগড়ীর দরুণ তাঁহার জীবনটা বেশ একটু বিপদপূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু এখন তাহার সহিয়া গিয়াছে।

'তাঁহার নিকট কিপ্লিংয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিও না।

'পৃথিবীর চতুর্দ্দিক হইতে আগত সভ্য লইয়া নিউ হেভেনের যে বিশ্বপ্রেমিক ছাত্রমণ্ডলী গঠিত, ভারতবর্ষের মিঃ আর, বি, দের আগমনে তাহাতে একটা ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। ইহা নিশ্চয়ই একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। * * * নিউ হেভেনের জীবন এখন মিঃ দের ভাল লাগিতেছে, কিন্তু প্রথম প্রথম মার্কিণদের আচার-ব্যবহারের উপর তিনি বিরূপ ছিলেন। নিউ হেভেনে আসিয়া কয়দিন মিঃ দে একটা পাগড়ী পরিয়া সাধারণের চমক লাগাইয়া দিয়াছিলেন। সেই পীতবর্ণের জমকালো 'পাগড়ীতে তাঁহাকে 'পল্লীবালা' (Country girl) নাটকের "রংয়ের বাজার" মত দেখাইত। মিঃ দের বন্ধু সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে বটে, কিন্তু তাহার অশান্তির এখনও শেষ হয় নাই। যে কোন ছাত্রের সহিতই তাহার পরিচয় হইয়াছে, সকলেই এই বলিয়া আলাপ আরম্ভ করিয়াছে, 'বল দেখি, মিঃ দে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিপ্লিং যে সকল পুস্তক লিখিয়াছেন, সেগুলি কি অত্যুক্তিপূর্ণ?' ইহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, কিপ্লিংয়ের নাম শুনিবামাত্র, মিঃ দে উর্দ্ধশ্বাসে চম্পট দিয়া থাকেন।'

বিরহী

[শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি টি]

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং

কলিকাতা

৪ঠা শ্রাবণ, ১৩২৮।

শ্রীচরণেষু—

আমার সর্ব্বস্ব—কাল সন্ধ্যাকালে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আসিবার সময় আকাশের চোখেও যত জল, আমার চোখেও তত। আমি আসিতে চাহি নাই,—কেন তুমি আমাকে জোর করিয়া পাঠাইয়া দিলে? আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করিয়াছিলাম? কখনও কি তোমার এতটুকু শান্তি-ভঙ্গ করিয়াছি? কখনও কি তোমার পড়ার ব্যাঘাত করিয়াছি? তোমার কবিতা, তোমার গানের একছত্রও কি আমার জন্য নষ্ট হইয়াছে? তোমার লিখিবার ঘর যে আমি চিরকাল পূজার ঘরের মত মানিয়া আসিয়াছি, তাহা তো জান। অপবিত্র বস্ত্রে কখনও সে ঘরে প্রবেশ করি নাই, তা কি তুমি জান না? মাঝে-মাঝে তোমার মন্দিরে যাইতাম বলিয়া কি রাগ করিতে? কি করিব, তোমার সেই ধ্যানমগ্ন শান্তমূর্ত্তি যে আমার বড় ভাল লাগিত। ২।৪ বার উঁকি দিয়া তাহা দেখিবার লোভ যে আমি কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিতাম না। তুমি যখন খোলা জানালার ধারটিতে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া যাইতে, তখন তোমার মুখে যে স্বর্গের আভা ফুটিয়া উঠিত, তাহার যে তুলনা নাই—তাহা না দেখিয়া কি মেয়েমানুষে থাকিতে পারে? লিখিতে লিখিতে যখন তোমার চোখে মুখে নানা ভাবের ছবি ফুটিয়া উঠিত, তাহা না দেখিলে যে আমার দিনই বৃথা যাইত। তাই কি তুমি রাগ করিয়া আমাকে দণ্ড দিলে? কিন্তু এ নির্ব্বাসন-দণ্ড দিলে কেন? এর চেয়ে প্রাণদণ্ডও যে ছিল ভাল। তুমি যে ইহাতে রাগ কর, আগে কেন আমাকে বলিলে না। তাহা হইলে তো আমি তোমার কবিতার ঘরে যাইতাম না।

তুমি বলিবে, আমার শরীরের জন্য, আমার স্বাস্থ্যের জন্য, আমার সুপ্রসবের জন্য এখানে পাঠাইয়াছ। তাই

স্বাস্থ্য, ছাই শরীর, ছাই সুপ্রসব। তোমাকেই যদি দেখিতে না পাইলাম, এসব লইয়া আমি কি করিব?

তোমার ছেলের কথা না লিখিলে, তুমি ভাবিবে,—তাই লিখিতেছি—সে ভাল আছে। তোমার কথা তার খুবই মনে আছে ও থাকিবে। সে যে এই বুকে—যেখানে দিন-রাত তোমার চিন্তা, তোমার ছবি জাগিয়া আছে,—সেখানে মানুষ হইয়াছে;—তোমাকে ভুলিবে সে কি করিয়া? আজ সকালে উঠিয়াই সে তোমাকে ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল। উঃ, সে কি ডাক! যেন সে উত্তর না লইয়া ছাড়িবে না! তাহার সেই প্রাণপূর্ণ কণ্ঠ, সেই গভীর বিশ্বাস যে, তুমি নিশ্চয়ই উত্তর দিবে,—আসিবে,—আসিয়া তাহাকে কোলে করিবে;—শুনিয়া ও দেখিয়া আমার বুকখানা ফাটিয়া যাইতে লাগিল। চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতেছিল। দাদা আসিয়া পড়িলেন, তাঁহার সামনেও নিজেকে সম্বরণ করিতে না পারিয়া অন্যত্র উঠিয়া গেলাম।

দাদার কথা কাণে গেল—'ওরে—তোর বাবা এখান থেকে শুনতে পাবে না রে।'

হ্যাগা, এ আকুল ডাক কি মাত্র ৫০০ মাইল দূর থেকেও শোনা যায় না? আমার তো মনে হয়—এ এক ভুবন থেকে আর এক ভুবনে শোনা যায়।

আমার প্রণাম জানিও।

তোমারি—বাণবিদ্ধা হরিণী।

(২)

শ্রীশিবঃ

এলাহাবাদ

৬ই শ্রাবণ, ১৩২৮।

আমার রাণি!

এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম। আমি ঠিক ভাবছিলাম, এইবার তোমার পত্র আসবে। তোমার হৃদয়ে যখনি যে ভাব উঠছে, তখনি তার ঢেউ এসে আমার হৃদয়ে পৌঁছুচ্ছে—কিছুই আমার অজানা রইছে না। তোমার চিঠিখানি যখন আসছিল, আমার মনে হচ্ছিল, ঠিক যেন তোমার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। সে তো আর কিছু নয়,—তোমারি বাক্যগুলি মূর্ত্তি ধরে এসেছে।

আমার হরিণী! তুমি তো বনের হরিণী নও যে, কারও কঠিন বাণ তোমায় বিধ্‌বে। তুমি আমার মনের হরিণী। তুমি বাণবিদ্ধা তো নও,—তুমি অপাপবিদ্ধা! আমার অন্তরই তোমার লীলাভূমি। পাছে তোমার এতটুকু বাজে, তাই সেখানে কোন কঠিনতা, কোন শুষ্কতা রাখি নি।

কত অভিমানেই চিঠিখানি লিখেছ। কিন্তু কি মিষ্ট অভিমানই তুমি করতে শিখেছিলে! এ তো কাঁটার মত তীক্ষ্ণ নয়,—এ যে পুষ্পের মত কোমল। এর স্পর্শে আমার সমস্ত মন যে বারবার শিউরে উঠছে! আর এখানি পড়তে-পড়তে স্পষ্ট বুঝতে পারছি, এরই ফলে কাল আবার একখানি চিঠি এসে পৌঁছুবে—তাতে লেখা থাক্‌বে—'আমি রাগ করে কত মন্দ কথা লিখেছি—কিন্তু সে আমি মনে করি নি। আমায় ক্ষমা কোরো।'

কিন্তু এ তো রাগ নয়,—এ যে নিবিড় অনুরাগ—এর সঙ্গে-সঙ্গে আমার একখানি চিঠি এসে পৌঁছুল বলে, তাই এ চিঠিখানি আমার আরও ভাল লাগছে। তোমার মন যে আমার কাছে দর্পণের চেয়েও স্বচ্ছ। তোমায় এতটুকু বুঝতেও যে আমার বাকি নেই। তোমার একটী নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত কি ছন্দে বইছে, তাও যে আমার অবিদিত নেই।

তোমার কেবল একটা কথার উত্তর দেব। আমার কবিতার ঘরে তোমার উপদ্রব! কথাটা সুধু অদ্ভুত নয়, অতি অদ্ভুত। তুমিই যে আমার মূর্ত্তিমতী কবিতা। তোমাকেই ঘিরিয়া যে আমার যত ছন্দ, যত গান—তা কি তুমি জান না? বসন্তস্পর্শে ফুলের মত তোমারি আবির্ভাবে—আমার যত ভাব, যা কিছু কল্পনা—সে সমস্ত যে বিকশিত হয়ে উঠে! তুমি যখন আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াও, মনে হয়,—আমার কবিতা-লক্ষ্মী মূর্ত্তি ধরে আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে!

তোমাকে কেন পাঠালাম—এতবার শুনেও কি তা বোঝ নি? সেবার খোকা হবার সময় কি উৎকণ্ঠাই ভোগ করেছিলাম। তোমাকে হারানোর ভয় যে আমার বড় ভয়। তোমাকে হারালে আমি কি নিয়ে থাক্‌ব বল! সেখানে তোমার দাদা ডাক্তার,—সবাই তোমার পরিচর্য্যা করবে,—এ কটা মাস অন্ততঃ যত্নে থাক্‌বে। পরিশ্রম থেকে একটু পরিত্রাণ পাবে। আর এখানে সে-সবের কোন সুবিধে নেই—তার উপর পরিশ্রম ছিল ষোল-আনা।

এই অবস্থায় আমার পরিচর্য্যার জন্য তুমি সব সময়ে অস্থির থাক্‌তে—এটা যে আমার বড় বাজ্‌তো। আমার সব কাজই তোমার নিজের না কর্‌লে তৃপ্তি হবে না—সেই যে ছিল আরও বিপদ। তাই পাঠাতে হ'ল।

আমারও বিশ্বাস তাই—ডাক্তার মত ডাক্‌তে পার্‌লে এক ভুবনের ডাঁক সমস্ত ভুবনে শোনা যায়। খোকার আকুল চীৎকারের ডাক, তোমার নীরব ব্যাকুল সকাতর আহ্বান, সবই আমার মনের মধ্যে তরঙ্গের 'পর তরঙ্গ তুলে জমা হচ্চে। এ কি তরঙ্গ! আমার বুকটা একেবারে তোলপাড় করে তুলছে রাণি! একটু থাম, একটু স্থির হও। আমায় নিঃশ্বাস নিতে দাও!

তোমাকে ছেড়ে যতদূর ভাল থাকা সম্ভব তা আছি। তোমাদের কুশল লিখো।

তোমার অভিন্ন

প্রশান্ত।

(৩)

শ্রীশ্রীদুর্গা

কলিকাতা

৫ই শ্রাবণ, ১৩২৮।

সপ্রণাম নিবেদন,—

প্রিয়তম, অভিমানে, দুঃখে কাল তোমাকে বড় কঠিন চিঠি লিখিয়া ফেলিয়াছি। আহা, একে একা সেখানে কত কষ্ট পাইতেছ; তার পর আমি হতভাগী তোমাকে যন্ত্রণা দিলাম। সে পত্র তো আর ফেরান যায় না! নহিলে টাকাকড়ি যাহা লাগে, তাহাই দিয়া চিঠিখানা ফেরৎ আনিতাম। আমার ইচ্ছা করিতেছে যে, পোড়া চিঠিখানা পৌঁছিবার আগেই ছুটিয়া তোমার কাছে যাই,—আর সে চিঠিখানা আসিতেই, তাহা টুকুরা-টুকুরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলি। দোহাই তোমার, সেখানা পড়িয়া কিছু মনে করিও না। সেখানা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ফেরৎ লইতেছি। তোমার পায়ে পড়ি, আমার উপর তুমি রাগ করিও না।

তুমি তো জান, তোমার কাছ-ছাড়া হ'লে, আমার বড় দুঃখ, বড় রাগ হয়। তোমার বেড়াইয়া ফিরিতে দেরী হইলে, আমি অস্থির হইয়া উঠিতাম। কতবার যে দরজা আর ঘর করিতাম, তাহার হিসাব তো তুমি রাখ না। পোড়ারমুখী দাইটা তাহা দেখিত, আর মুখ টিপিয়া হাসিত। এমন রাগ হইত তাহার উপর। মনে হইত, দিই তাহাকে দুই চড় বসাইয়া। পরের মন কি পরে বোঝে! সে আর হাসিবে না কেন? যখন দেখিতাম তুমি ফিরিতেছ, অম্‌নি চট্‌ করিয়া ঘরের ভিতর কোন একটা কাজ লইয়া বসিয়া পড়িতাম। তুমি বুঝিতেও পারিতে না—ঝাউ-গাছ-ঘেরা পথের মধ্যে যেমন তোমার মুখচন্দ্রের উদয় হইত, আমি সেখান হইতেই দৃষ্টি দিয়া তাহার সুধা পান করিয়া, তবে কাজের মধ্যে গম্ভীর হইয়া বসিয়াছি। তুমি আমাকে গম্ভীর দেখিয়া বুঝিতে, আমি রাগ করিয়াছি; এবং আমার ক্রোধ-শান্তির জন্য যে মধুর ব্যবস্থা করিতে, তাহাতে ক্রোধ শীঘ্র ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিত না। কিন্তু তোমার কি অসীম ক্ষমতা! তোমার উপর যে রাগ করিবারও যো নাই।

তোমার বন্ধু-বান্ধবেরা যখন তোমার কাছে বেড়াইতে, গল্প করিতে আসিতেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতারই উদয় হইত। বুঝিতাম, তোমার এখন বাহিরে যাইবার আশঙ্কা নাই। তাঁহারা তোমার গান, কবিতা শুনিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিতেন—আমার একটুও রাগ হইত না;—কারণ, আমিও তো বঞ্চিত হইতাম না। হাতে কাজ করিতে-করিতে, দুয়ারের আড়াল হইতে তোমার মধুর কণ্ঠ শুনিতাম,—আর কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ চা পান ইত্যাদি তাঁহাদের সরবরাহ করিতাম। কিন্তু তোমার যে বন্ধুরা আসিয়া তোমাকে ডাকিয়া বাহিরে লইয়া যাইতেন, তাহাদের মুখে যে জিনিসের ব্যবস্থা করিতাম, তাহা আর তোমাকে বলিব না।

এত সব বলিলাম এই জন্য যে, তুমি বুঝিতে পারিবে যে, যে তোমাকে সর্ব্বক্ষণ দেখিবার জন্য লোলুপ থাকিতাম, সেই তোমাকে এ তিন মাসের জন্য ছাড়িয়া আসিয়া—কি অবস্থাই আমার হইয়াছে। তাই রাগের বশে তোমাকে অমন নিষ্ঠুর চিঠি লিখিয়া ফেলিয়াছি।

এখন কতকগুলি কাজের কথা বলি। এগুলি বেশ করিয়া মনে রাখিয়া—মনে না থাকে লিখিয়া রাখিয়া—সেই অনুসারে কাজ করিবে।

১। চা তিন পেয়ালার বেশী কিছুতেই খাইবে না। দুই পেয়ালাই বলিতাম; কিন্তু বেড়াইতে গিয়া যে কোথাও

এক পেয়ালা খাও, তাহা হইতে তোমাকে আর বঞ্চিত করিলাম না। এই তো গেল চা'য়ের সম্বন্ধে।

২। দুধ জলখাবার সম্বন্ধে আমি যে ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসিয়াছি, সেই মত চলিতেই হইবে। পয়সার কথা ভাবিয়া কমাইতে পারিবে না।

৩। নিজে হাত পুড়াইয়া রাঁধিতে পাইবে না। পাচক ব্রাহ্মণ একজন অবশ্য-অবশ্য রাখিবে। তুমি স্বপাক খাইতেছ শুনিলে, আমার এমন হাসি পায় যে তাহা আর কি বলিব। আগুনটা হাঁড়ির নীচে দিতে হইবে, কি উপরে দিতে হইবে, সে খেয়ালই তোমার সব সময়ে থাকিবে কি না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সে বাহাদুরি করিতে যাইও না। শেষটা কোন্ দিন লঙ্কাকাণ্ড করিয়া বসিবে, ইহা ভাবিয়া আমি ঘুমাইতে পারিব না।

৪। বেড়াইয়া একটু সকাল রাতেই ফিরিও। আর ফিরিবার সময় অন্ধকারে যেন কিছুতেই আসা না হয়। অবশ্য অবশ্য আলো লইয়া আসিবে।

৫। যদি আমায় একটু ভালবাস, আমার উপরিউক্ত চারিটী কথা রাখিবে। যদি না রাখ, আমার মরা মুখ দেখিবে।

৬। বাড়ীতে টাকা পাঠাইতে হইবে বলিয়া খাওয়া কম করিতে পাইবে না। তুমি আমাকে টাকা পাঠাইও না। হাত-খরচ লইয়া আমি কি করিব? পূজার সময়ও আমার জন্য ভাল কাপড় তোমার কিনিতে হইবে না। আশীর্ব্বাদ করিও লালপাড় মোটা সাড়ী পরিয়া যেন তোমার চরণে স্থান পাই।—এ টাকাগুলা তোমার নিজের জন্য খরচ করিলে, আমি বাঁচিয়া যাইব—তোমার কেনা হইয়া থাকিব।

ইতি—

তোমার শ্রীচরণের-দাসী।

(৪)

শ্রীশিবঃ

এলাহাবাদ

৭ই শ্রাবণ, ১৩২৮, রাত্রি ১টা।

আমার হৃদয়রাণী—

তোমার প্রথম পত্রের কৈফিয়ৎ স্বরূপ দ্বিতীয় পত্রখানি আজ বিকালে পেলাম। ওগো, আগের পত্রখানি একটু রাগ করে লিখেছিলে!

এখন গভীর রাত্রি। কোন দিকে কোন শব্দ নেই। সমস্ত দিন অসুরের মত খেটে, সারা সহরটা এখন এমন ঘুমিয়ে পড়েছে যে, বর্শা দিয়ে বিঁধলেও, এর ঘুম এখন ভাঙ্গবে না। ঘরের দুয়ার-জানালাগুলো সব খুলে দিয়ে, আমি বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার বৃথা চেষ্টা করছিলাম। আলো নিবানো ছিল, তাই চারিদিক্ দিয়ে জ্যোৎস্না এসে ঘরের মেঝে, বিছানা একেবারে প্লাবিত করে দিয়েছিল। আজ আবার শুনছি পূর্ণিমা। এমন দিনেও কি পূর্ণিমাকে আসতে হয়!

আমার মনে পড়্ছে সুধু আগের পূর্ণিমার রাত্রি। ঠিক এই জানালার পাশটীতে তুমি শুয়ে ছিলে। ফুলের শোভার মত জ্যোৎস্নারাশি তোমার সর্ব্বাঙ্গে পড়েছিল। আমি তোমার পাশে বসে মুগ্ধ হয়ে তাই দেখ্ছিলাম; আর ভাবছিলাম, এ জ্যোৎস্না যে তোমার অঙ্গের বিমল জ্যোতিঃ। আমি বসে-বসে তোমাকে সুধু দেখছিলাম। স্পর্শ পর্য্যন্ত করি নি। প্রাণের মধ্যে একটা আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। তুমি আমার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বল্লে—একটা গান গাও।

আমার আবার গান। কিন্তু তুমি ভালবাস, গাইতেই হ'ল।

মাত্র কটা ছত্র গুণ-গুণ করে গেয়েছিলাম :—

এর পরে কত দিন কত সন্ধ্যা-বেলা
কাটিবে একেলা।
কেমনে ছাড়িয়া রব কঠিন হইয়া
পরাণ ধরিয়া।
করিয়াছি কোন্ দিন কোন্ রূঢ় কথা
সব পড়ে মনে।
সে সব ভুলিয়া যাও, দুখ যেন নাহি পাও
সে কথা স্মরণে।

গাহিতে-গাহিতে একবার চেয়ে দেখি, তোমার চোখ-দুটী জলে ভরা—মেঘ-বর্ষণ-সিক্ত দুটী নীল-পদ্ম! সুর তো কণ্ঠেই মিলিয়ে গেল। যেমন তোমার সজল চোখ-দুটী মুছিয়ে দিতে গেছি—কি সে তোমার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন! কত করে তোমাকে যে শান্ত করতে হয়েছিল, তা আমিই জানি।

আজ সেদিনকার সেই কিন্তু উচ্ছ্বাসটী ঘরময় কেঁদে ফিরছে। আজ অশ্রু-বিসর্জ্জনের পালা আমার।

শয্যা আর সইতে পারলাম না। তাই উঠে তোমাকে পত্র লিখতে বসেছি।

অদর্শনের এত রূপ বুঝি আর কখন দেখি নি। তোমায় এমন করে প্রতীক্ষও বুঝি আর কখন করি নি!

আজ মনে পড়ছে, খুব ভোরে উঠে দেখতাম, তুমি তখনও ঘুমিয়ে। তোমার গায়ের কাপড়টী যদি কোথাও একটু শ্লথ হয়ে যেত, তা ঠিক করে দিয়ে, মাথার দিকটার জানালাটা বন্ধ করে, খোকাকে একটু চাপড়ে তার ঘুমটাকে একটু গাঢ় করে দিয়ে, আমি উঠে পড়তাম। একটুখানি বেড়িয়ে এসে, প্রাতঃকৃত্য সেরে যখন নিজের ঘরটিতে এসে বসতাম, তুমি ঠিক ঘড়ির কাঁটার মত চায়ের পেয়ালাটী নিয়ে সম্মুখে আসতে। এই আমার চেয়ে আধঘণ্টা দেরীতে উঠার জন্য তোমার লজ্জার অন্ত ছিল না। তখন তোমাকে দেখে যে পৌরাণিক চিত্রটী আমার মনে পড়ত, তা তো তোমাকে অনেকবার বলেছি। ঠিক যেন মোহিনী-রূপ ধরে তুমি সুধা-পাত্র হস্তে আসছ। এখানে একজন কেবল হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকত, তাই রক্ষে! নইলে?

তখনও তোমার সুনীল চোখে স্বপ্ন-রাজ্যের রং একটু লেগে থাকতো,—গাল ছুটাতে লজ্জার একটু আভা দেখা যেত,—কাজের জন্য একটা ব্যস্ততা তাও তোমার দৃঢ়-বদ্ধ ওষ্ঠাধরে ফুটে উঠত। সে কিন্তু এক অভিনব মূর্ত্তি।

সকালে উঠেই সেই মূর্ত্তি মনে পড়ে, আর এমন যে পেয়ালা-ভরা চা, তাও বিস্বাদ, বিবর্ণ বলে মনে হয়। আবার মনে হয়, আর একবার ডেকে বলেছি—ওগো, আর এক পেয়ালা চা দাও না। অমনি শাসনের সুরে বলেছ—'না, এখন নটা বেজে গেছে, এখন আর চা খায় না। রান্না হয়েছে, উঠে নেয়ে-খেয়ে নাও।' তার পর কোন দিন বা আমার জয়, কোন দিন বা তোমার জয় হোত।

খাবার সময়টীতে মনে পড়ে, তোমার সেই কি আগ্রহ! সব কাজ ছেড়ে সে সময় তোমার আমার কাছটীতে বসা চাই-ই। তখনি পড়ি ভারি মুস্কিলে। তোমার সঙ্গে কথা কই, না আহারে মন দিই। ফলে দেরী হ'ত; কিন্তু না খেয়ে ওঠবার যো ছিল না।

ঐখানটীতে বসে তুমি পা ছুখানি ছড়িয়ে দিয়ে পান সাজতে। সে জায়গাটায় গিয়ে এক-একবার বসি। পানের বাটাটায় এক-একবার হাত দিই, যদি তোমার স্পর্শ একটু মিলে। সবই কি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয়!

রাত্রে বেড়িয়ে ফেরবার সময় মনে পড়ে—রান্না-বান্না করে, একখানি পরিষ্কার শুভ্র সাড়ী পরে, দুয়ারটীর পাশে তুমি দাঁড়িয়ে। চক্ষে তোমার কৌতুকের হাসি, চক্ষে তোমার অফুরন্ত প্রেম! এখন বাড়ীর ভেতর ঢুকতে মনে হয়, কি ভয়ানক নিস্তব্ধ। ছ্যাঁৎ করে মনে হয়, হয় ত দেরী হয়েছে বলে ঘরে গিয়ে রাগ করে বসেছ। তখনি সে ভুল ভেঙ্গে যায়। বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিই—আর চোখ বুজে তোমাকে ভাবি।

আর খাওয়া-দাওয়া। তখন কি আর কিছু ভাল লাগে। কিন্তু তোমার দিব্যি দেওয়া! কি করব—আবার উঠে খাবার যোগাড় করতে হয়।

আচ্ছা, এমন কি হয় না, যে, বসে লিখছি,—আর তুমি যেমন আসতে—আস্তে-আস্তে এসে, চেয়ারটীতে ভর দিয়ে একটীবার দাঁড়াতে পার না? একটীবার তোমার মুখখানি দেখে নিই।

আমি সুস্থ আছি; ভেবো না। 'বাবাজী' রাখা হবে না—রাগ কোরো না। তাতে বড্ড খরচ। আর পাওয়াও তো যায় না তেমন। সে অনুরোধটা আর কোরো না—দিব্যিটা ফেরৎ নিও। আর সব কাজ তোমার উপদেশ-মত হচ্ছে—এমন কি আলো নিয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত।

রাত দুটো বেজে গিয়েছে। এবার শুই। তুমিও ঘুমোও। পত্র দিতে দেরী কোরো না।

তোমারই প্রশান্ত।

(৫)

শ্রীশ্রীদুর্গা
সহায়

কলিকাতা

১৫ই শ্রাবণ, ১৩২৮।

ভাই সই,

এসে পর্য্যন্ত নানা ঝঞ্ঝাটে তোমাকে পত্র দিতে পারি নাই। তুমি ভাই যেন তার আবার শোধ নিও না। কি আনন্দেই যে ছিলাম তোমাদের কাছে, তা আর ভুলতে পাচ্ছি নে। বাংলার শ্রেষ্ঠ সহরে এসেছি,—বাবা, মা, ভাই সবাই যত্ন করেন—ভালবাসেন—তবু যেন মনে হয়, আমায় উনি বনবাসে

পাঠিয়ে দিয়েছেন। কেমন করে যে ভগবান মনের মধ্যে এমন পরিবর্ত্তন সাধিত করেন, তা তো কিছুই বুঝতে পারি না। যেখানে জন্মিয়াছি, বড় হইয়াছি, স্নেহ পাইয়াছি ও এখনও পাইতেছি—সেখানে থাকিয়াও আর একজনের অদর্শনে কেন এমন কাঁদিয়া মরি। ব্রাহ্মণ যেমন উপবীত ধারণের পর, দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে, আমরাও যেন সেই রকম আর এক নব জন্ম পাই। এ কি রহস্য ভাই!

দেখ দিকি ভাই কি অন্যায়! এখন বড় হইয়াছি, ছেলে পুলের মা হইয়াছি,—এখন কি দুই-এক দিনের বেশী কাছ-ছাড়া হইয়া থাকা ভাল লাগে? উনি তো বুঝিবেন না। আছেন তো বেশ আছেন,—যা বল তাই করিতেছেন। কিন্তু একবার একটা গোঁ ধরিলেন, তো আর রক্ষা নাই। সেই যে ধরিয়া বসিলেন,—এখানে তোমার কষ্ট হইবে,—যত্ন হইবে না —সেখানে তোমার দাদা ডাক্তার,—কত বড়-বড় ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ। অন্ততঃ এবারটা সেখানে যাও। আর কাহার সাধ্য তাহার নড়চড় করে। মাটীর মানুষ বটে, কিন্তু মাটীর মধ্যে কতখানি শক্ত পাথর আছে, তা আমি একেবারে হাড়ে-হাড়ে বুঝিতেছি। কেন ভাই, কোন্ মেয়েমানুষে প্রসব না করিতেছে; আর সেটা এমন শক্তই বা কি? আর কটা লোকের দাদা ডাক্তার থাকে বল ত? আর সকলেই বুঝি সুপ্রসব হবার জন্য কলিকাতায় আসে? সত্যি ভাই গা যেন জ্বালা করে।

তখন যদি রাগ করিয়া বলিতাম,—না, আমি যাইব না— কেমন ইচ্ছামত পাঠাইতে পারিতেন, দেখিতাম। কিন্তু কি করিব,—তিনি যে অসাধারণ শক্তিমান্। এমন মিষ্ট কথায়, এত অনুনয় করিয়া আমাকে বলিলেন যে, চোখে জল আসিলেও, আমি 'না' বলিতে পারিলাম না।

কেমন সবাই মিলিয়া ছিলাম ভাই! সন্ধ্যার পর যেদিন তোমাদের ওখানে বেড়াইতে যাইতাম, বা তুমি বেড়াইতে আসিতে—সে কতই আনন্দ, ভাব দেখি! দুজনে মিলিয়া তোমাদের বাসায়, ওঁদের আড্ডার পাশে লুকাইয়া, কেমন গান শুনিতাম,—কত কথাবার্ত্তা চুরি করিতাম। তুমি গানের সমজ্দার; যখন বলিতে—কি সুন্দর গলা ভাই, আমি আনন্দে আত্মহারা হইতাম।

তুমি আবার যখন তাহার পর দিন সন্ধ্যার পর আমাদের বাসায় আসিয়া সেই গানটী গাইতে, আমি অবাক্ হইয়া থাকিতাম;—কেমন করিয়া তুমি শিখিলে ভাবিয়া।—আর এতও তোমার মনে থাকে ভাই!

যাক্, এসব ত গেল ভাই দুঃখের কথা। এখন গোটাকতক কাজের কথা লিখি।

দেখ ভাই, তুমি ঠাট্টা করিও না। ওঁকে একা রাখিয়া, আমি মনে এতটুকু সোয়াস্তি পাইতেছি না। হয় ত ক্ষুধার সময় খাইতে পাইতেছেন না,—সময়-মত জল পাইতেছেন না, —না খাইয়াই হয় ত কাজে যাইতেছেন—এসব ভাবিয়া আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। কোন্ জিনিষ কোথায় রাখিয়া, হয় ত দরকারের সময় তাহা খুঁজিয়া মিলিতেছে না। একবার একটা কামিজ কাঁধে ফেলিয়া, সারা বাড়ীটা কামিজ-কামিজ করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিলেন। সেই তো মানুষ! দিনের মধ্যে কম করিয়া অন্ততঃ দশবার তাঁহার কলম, কাগজ, খাতা, আপিসের বাক্সের চাবি ইত্যাদির খোঁজ দিতে হইত। উনি 'বাবাজী' রাখিতে রাজী নহেন। তুমি ভাই যেমন করিয়া হউক, কমল বাবুকে দিয়া একটা বাবাজী রাখিয়া দিবে; নইলে কোন্ দিন হাত পুড়াইয়া বসিয়া থাকিবেন। কমল বাবুকেই তখন তো ঔষধ ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি লইয়া বিব্রত হইতে হইবে। হয় ত বা এক-আধ দিন রাত্রিতে কাছে শুইতেও হইবে। তখন মজাটা টের পাইবে। তাই বলিতেছি, নিজের প্রাণের দায়ে একটা 'বাবাজী' যোগাড় করিয়া দিও। আর একটা কাজ তোমাকে করিতেই হইবে ভাই। সন্ধ্যা হলেই তো তোমাদের ওখানে যাইবেন। সেই অবসরে তুমি আমাদের বাসায় যাইয়া, ঘর-করণা গুছাইয়া দিয়া যাইও। যে অগোছাল মানুষ! চাকরটাকেও রোজ একটু লক্ষ্য রেখো। ওরাও তো ভাল-মানুষের কাছে ফাঁকির সুবিধা পায়। আর ঐ সময় কবিতার খাতাখানি হইতে, তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা চুরি করিয়া লিখিয়া লইতে হইবে। আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে বুঝিতে—উনি এখন কি-ছাই-পাঁশ ভাবিতেছেন।

পারিবে তো ভাই? তুমি আবার ভাই পারিবে না! তুমি ডাক্তারের কাণ দুবেলা কাট; ইচ্ছা করিলে সাহেবের পর্য্যন্ত কাণ কাটিতে পার,—আমার স্বামীর কবিতার খাতাখানা কি আট্কাইবে? রাগ করিও না ভাই।

ছেলেমেয়েরা আর তাদের বাবারা সব কেমন আছে

লিখিও। তাঁদের আমার আশীর্ব্বাদ দিও। তুমি আমার ভালবাসা জানিও।

ইতি—

তোমার সই।

(৬)

শ্রীহরি

সহায়। এলাহাবাদ

১৭ই শ্রাবণ, ১৩২৮।

সই ভাই—

তবু মনে হয়েছে এই ভাগ্যি! মিথ্যা কথাটা আর কেন? মনে-মনে তো সবারই জানা আছে ভাই। কাজের ঝঞ্ঝাট আর বুঝি না বল্লে হোত না? কলকাতায় বুঝি আজকাল ঘরে-ঘরে ঢেঁকি পাতা হ'য়েছে,—আর ধোপারা বুঝি একদম দেশ ছেড়ে চলে গেছে,—তাই ধান-সিদ্ধ করতে, আর কাপড় কাচ্‌তে গিয়ে সময় পাও নি? এ দিকে 'শান্ত-শিষ্ট'র চিঠিগুলি তো বেশ নিয়মমত আস্‌ছে। আচ্ছা, বড় জোর মাস তিন-চার—তার পর একবার তোমাকে দেখে নেব।

সত্যি সই, তুমি গিয়ে পর্য্যন্ত আমার মন বড় খারাপ। নারায়ণ করুন, সুভালাভালি ছেলে কোলে করে আবার ফিরে এস। আবার হেসে, কথা কয়ে বাঁচি! তুমি গিয়ে অবধি ভাই, আমার বেড়ান একরকম বন্ধই হয়ে গিয়েছে।

তাও বলি ভাই, তোদের দুজনের আবার বাড়াবাড়ি। রবি বাবুর 'গোড়ায় গলদে'র চিকিৎসা তোদের দরকার। রোজ বিকেলে দুজনে খানিকটা করে বাইকারবনেট্ অব-সোডা খাস্ দিকি—রোগ কম্‌বে। দাদা ডাক্তার,—ডিস্‌পেন্‌সারী থেকে একটু আনিয়ে নিস্। আর পারিস তো এ-পক্ষের জন্য একটু পাঠিয়ে দিস্। বড় একটুতে হ'বে না। এ পক্ষের রোগ আরও কঠিন। না হয় লিখিস্, কলম্ বাবুকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব এখন। স্বামীর নাম বল্‌তে বা শিরোনামা ছাড়া লিখতে দোষ—এই তো তোর কথা। তা আমাদের ঠাকুরমাদের আমলেও যখন শ্যামকে ফাম্ আর কালীকে কালি বল্লে দোষ হ'ত না, তখন আমরা কমলকে কলম বল্লেই বা দোষ হ'বে কেন? কি বলিস্?

মশায় সুপারিশ করবার আগেই মশায়ের কর্ত্তাবাবুকে যথেষ্ট অনুরোধ-উপরোধ করা হয়েছিল—যাতে এ গরীবের বাসাটায় বিরহের মাস ক'টা কাটান। তা তাঁর মত হ'ল না; বল্লেন—না, তাতে আমার মন আরও খারাপ হ'বে। এত দিন ছিলাম ও-বাড়ীতে। তবু সময়ে সময়ে মনে হ'বে যেন সে ও-বাড়ীতেই আছে। শুন্‌লি তো? আরও কিছু শুন্‌তে চাস?

হাঁ করে রইচিস্,—তবে শোন্ ভাই! এখন আর তোমার 'উনি' বড়-একটা ঘর ছেড়ে বার হ'ন না। শুনেছি, বাইরের ঘর ছেড়ে, তোমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন। সন্ধ্যা-বেলা আসেন একবার;—তাও আবার প্রায়ই ডেকে আন্‌তে হয়—'শান্ত-শিষ্ট' না হলে আবার আড্ডা তো জমে না!

কিন্তু বর্ষায় যেমন কোকিলের গলা বন্ধ হয়ে যায়—বিরহে তেমনি কবির কণ্ঠ এখানে একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছে। তাঁদের সবারই হাসি, কথা তো আমরা ভাই চিনে ফেলেছিলাম। সেই ছেলেমানুষের মত হাসি আর একে-বারেই শোনা যায় না। তা নিয়ে এঁরা সব কত ঠাট্টা করেন; কিন্তু 'শান্ত-শিষ্টর' কিছুতেই সাড়া নেই। দেবেন বাবু একদিন বল্লেন—একটা গান গাইতে হবে ভাই; গাও। শান্তবাবু মিনতি করে বল্‌লেন—থাক্ না ভাই; বেশ তো তোমাদের কথাবার্ত্তা চল্‌ছে। দেবেন বাবুও না-ছোড়বান্দা। বল্লেন—বাসায় দিন-রাত গুন্-গুন্ করে বেড়ান; আর এখানে এলেই উঠে বসার ক্ষমতা থাকে না। আমাদেরও স্ত্রী বাপের বাড়ী যায় হে। তোমার একা যায় নি। শেষটা গান গাইতে হ'ল তাঁকে। গাইলেন কোন্ গানটা জানিস্? সেই—

'এস এস, ফিরে এস—

আমার ক্ষুধিত-তৃষিত-তাপিত চিত বঁধু হে ফিরে এস।'

উঃ! কি গান গাওয়া ভাই! কি বল্‌ব তোকে—যেন ঠিক কাঁদ্‌তে-কাঁদ্‌তে ডাকৃতে লাগলেন।

যখন গাইছিলেন—

ওগো নিঠুর ফিরে এস;

আমার করুণ কোমল এস;

আমার সব সুখ-দুখ-মন্থন ধন অন্তরে ফিরে এস।

তখন মনে হচ্ছিল, তাঁর অন্তরের ধন অভিমান করে চলে গেছে—আর কেঁদে-কেঁদে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আর সে কি বুক-ফাটা কান্না! কেউ সেদিন সেখানে

এমন পাষাণ ছিল না, যে না কেঁদেছে। মাসীমা তো কেঁদে আকুল। ছোট-বউ আমাকে জড়িয়ে ধরে বল্লে, 'ও দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, কাউকে দিয়ে তুমি চুপ করতে বলে পাঠাও —আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।' আমি যে এমন ডাকসাইটে পাষাণ, কান্না চাপতে না পেরে, অন্য একটা ঘরে পালিয়ে গিয়ে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগলাম। উঃ! অমন লোককে গান গাইতে বল্‌তে আছে! তুই ফিরে না এলে, আমি তো ভেতর থেকে কখ্‌খন গানের ফরমাস পাঠাব না! ওঁকেও বারণ করে দেব, যেন গান গাইতে না বলেন।

সত্যি ভাই, রাগ করিস্‌নে—তোর উপর একটুখানি সেদিন হিংসে হয়েছিল! উঃ, কি ভালই বাসেন তোকে! নইলে কি গানের মধ্যে অমন বুক-ফাটা কান্না ফুটিয়ে তুল্‌তে পারেন? গান তো থেমে গেল। তোমার 'উনি' তখনি উন্মনা হয়ে চলে গেলেন। যে যার বাসায় চলে গেলেন। চোখের জলের বান সেদিন বাইরেও বয়েছিল—তা পরে শুন্‌লাম। আমি সে-দিন রাতে কেবল ভেবেছি, এ সময় এই ডাক শুনে তুই এখন কি কচ্ছিস্‌। ডাক্ তুই নিশ্চয়ই শুন্‌তে পেয়েছিলি —এ আমি দিব্যি করে বল্‌তে পারি। সে সময়ে তোর দশাটা কি হয়েছিল, আমাকে লিখিস্‌ ভাই। গান হয়েছিল পরশু রাত্তির ৮টার সময়। সেদিন বেস্পতিবার।

তোমার একটা কাজ করেছি ভাই—পাকে-চক্রে একটা 'বাবাজী' রাখিয়ে দিয়েছি। তবে একটু মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কি করব, গরজ বড় বালাই, নইলে যে হয় না।

কমল বাবুকে দিয়ে খবর দিলাম—একটী ছেলে তাঁর বাসায় আশ্রয় চায়—তার কেউ নেই ইত্যাদি। তার বয়স ১৬ বছর আন্দাজ,—বামুনের ছেলে—রাঁধতেও জানে এক রকম। আমার শিক্ষামত সে ধরে বসল—আমিও আপনার রেঁধে দেব। এখন সেই রাঁধচে। তোমার 'ওঁর' হাত আর পোড়বার ভয় নেই। হাতখানা বুকের উপর রেখে যেমন তৃপ্তি পেতে, এখনও তেমনি পাবে।

এবার তো মনের মতন ২।১টা খবর দিলাম। আর বাকি খবর ২।৪ দিন মধ্যে পাবে। সব হুকুমই তামিল করব। তবে বাই, একটু ধৈর্য্য ধরতে হবে।

বড় ফাজিল হয়েছিস্‌, নয় না? আমার সঙ্গে আসিস্ লাগ্‌তে? আমার মুখ বুঝি ভুলে গিয়েছিস্‌ এই ক'দিনে? দূর থেকে তাই ঠাট্টা ছুড়ে মারা হয়েচে। আবার লেখা হয়েচে, ছেলের 'বাবারা' সব কেমন আছেন। এ-গুণটা বুঝি কলকাতা গিয়ে বাড়ছে? আচ্ছা, এস একবার তুমি কাছে। তখন একবার তোমায় দেখে নেব।

এখন উঠি ভাই। কমল বাবুর পানগুলি এখনি সাজতে হবে। যে পান-খোর মানুষ—একটী পান কম হ'লে আর রক্ষে থাকবে না।

তোমার সই।

(৭)

শ্রীদুর্গা

কলিকাতা

২০শে শ্রাবণ, ১৩২৮।

ভাই সই,

তুমি আমায় বাঁচালে ভাই। তাঁর যে 'বাবাজী' রাখিয়ে দিয়েছ, আর যে সব খবর দিয়েছ, এ জন্য আর তোমাকে বেশী কি বলব। তুমি বয়সে আমার বড়, তোমার পায়ে মাথা রাখিয়া আমি বারবার প্রণাম করিতেছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে সর্ব্বসুখে সুখিনী করেন।

তোমার এ বারকার পত্র পড়িয়াছি,—আর ভাই চোখের জল ফেলিয়াছি। কি গুণে যে তিনি আমাকে অত ভাল-বাসেন তাই আমি ভাবি। চেহারা তো দেখিয়াছ—আর গুণও তো জান—তবু ওঁর ভালবাসার অন্ত নাই। প্রাপ্যের ঢের বেশী পাইতেছি, তাই ভাই ভয় হয়—যদি হঠাৎ একদিন বেশী পাওনা বন্ধ হইয়া যায়। তখন তো মনে করিতে পারিব না, যাহা আমার ন্যায্য পাওনা তাহাই পাইয়াছি। সে মরিয়া গেলেও ভাবিতে পারিব না—তার চেয়ে মরিব, সেও ভাল। তাই এক-একবার ভাবি, ওঁর ওই ভালবাসা পাইয়া ভালয়-ভালয় যেন যাইতে পারি। অমনি মনটা ছঁ্যাৎ করিয়া ওঠে,—উঃ, ওঁকে রাখিয়া কোথায় যাইব। ওঁকে ফেলিয়া বৈকুণ্ঠে গিয়াও তো শান্তি পাইব না।

গেল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে আমার যে কি দশা হইয়াছিল, তা আর তোমাকে কি বলিব। বুকটা তখন যেন একেবারে ফাটিয়া যাইতেছিল। প্রাণটা সত্যকার পাখী হইয়া উড়িয়া যাইতে চাহিতেছিল। আর বাহির হইতে না পারিয়া, পিঞ্জরের মধ্যে ছট্‌ফট্ করিয়া, ডানা আছড়াইয়া মরিতেছিল। সে-দিন বড় লোক হাসাইয়াছিলাম। মা

পর্যান্ত জানিতে পারিয়াছিলেন। কোন রকমেই আপনাকে সুস্থির করিতে না পারিয়া, আমার ঘরের মধ্যে আসিয়া, দুয়ার বন্ধ করিয়া লুটাইয়া-লুটাইয়া কাঁদিতেছিলাম। বৌ-দিদি টের পাইয়া বাহির হইতে ডাকিলেন। দুয়ার খুলিয়া দিলাম। কিন্তু বৌ-দিদির মুখে দুটা সান্ত্বনার কথা শুনিয়া মনের বাঁধ আরও ভাঙ্গিয়া গেল। তখন মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিষ্ট অনুযোগ করিয়া বলিলেন—ছি-মা, আজ বাদে কাল খালাস হবে, এখন কি অমন করে ফুলে-ফুলে কাঁদে—আর ওতে যে জামাইয়ের আমার অকল্যাণ হবে। কত কষ্টে চুপ করি তখন। শেষটা আর লজ্জায় মার সুমুখে বেরুতে পারি না। ছি! মা কি ভাবিলেন! বৌ-দিদি সকাল-বেলা শোধ নিলেন—আমরা যখন এতই তোর পর, তখন কেন আর আসা ভাই। তার চেয়ে ছেলে হ'লে, আমরাই না হয় দেখে আস্‌তাম একদিন!

আর একটা কথা মনে উঠ্‌ছে ভাই। তোমাকে বলে ফেলি। কিছু মনে কোরো না।

ইংরাজি মাসের শেষ হয়ে আস্‌চে। এ সময়ে তাঁর হাত প্রায় খালি হ'য়ে আসে। তার উপর যদি মাসের মাঝামাঝি বাড়ী থেকে কোন দরকার বলিয়া চিঠি-পত্র গিয়া থাকে, তাহা হইলে আর দেখিতে হইবে না,—যাহা তাঁহারা চাহিয়াছেন, পত্র-পাঠ তাহা পাঠাইয়া দিয়া বসিয়া আছেন। শেষে নিজের বেলায় অষ্টরম্ভা। অমন আল্‌গা মানুষ যদি আর একটা থাকে। আর তাঁরাও তো ভাবিবেন না যে, লোকটার কি করিয়া চলিবে—তাঁহাদের টাকা পাইলেই হইল। আমি থাকিতে এদিক-ওদিক হইতে টানিয়া কিছু হাতে রাখিতাম। এক রকম চলিয়া যাইত। এখন সে সব আর কে দেখিবে? আমি আর ভাই ভাবিয়া-ভাবিয়া পারি না। এখানে রাখিয়া গিয়া এমন মুস্কিলেই তিনি আমাকে ফেলিয়াছেন। দুধ-জলখাবার ভাল করিয়া খাইবার জন্য তো দিব্য দিয়া লিখিয়াছি। পারত-পক্ষে তাহা তুচ্ছ করিবেন না। কিন্তু হাত যদি শূন্য থাকে, কি করিবেন? কমল বাবুকে দিয়া সে খবরটা লইতে হইবে। ওঁর তো কিছুই লুকান স্বভাব নাই। জিজ্ঞাসা করিলেই সত্য বলিবেন।

মাপ কোরো ভাই, তোমার মুখ আবার মনে নাই! বাবা কথাটা ওখানে বাবা শব্দের বহুবচন নয় ভাই, ওর মানে বাবা ইত্যাদি অর্থাৎ বাবা কাকা এই সব। বুঝলে কি না? সব খবর লিখবে।

তোমার সই।

(০৮)

শ্রীশ্রীহরি

সহায় এলাহাবাদ

২৮শে শ্রাবণ, ১৩২৮।

সই ভাই,

তোমার চিঠি কদিন হ'ল পেয়েছি। একটু দেরী হয়ে গেল কাজের গোলমালে। যেন আবার ঠোঁট্ ফুলিও না। সে দিন যে তোমার দুর্দ্দশা হবে, তা আমি জান্‌তাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ভাই!

তা'বলে, চিঠিতে অত কাঁদুনি গাইতে পাবে না, বলে রাখ্‌চি। তা'হলে কিন্তু আমি কিছু খবর দেব না ভাই।

এখন মথুরার খবর কিছু বলি শোন। তোমার ঘরে মাঝে-মাঝে সন্ধ্যার পর একবার অভিসারে যাই। সত্যি, একেবারে অগোছালো মানুষ—অতখানি আবার ভাল নয়। প্রথম দিন তোমার ঘর সাফ্ করতে আমার ঝাড়া একটা ঘণ্টা লেগেছিল। টেবিলটাতে তো রাজ্যের জিনিষ জমা হয়েছে। জলের কুঁজোটা পর্য্যন্ত সেখানে ঠাঁই পেয়েছে। সেটা আবার তোমার গুণধর চাকরের কাজ। সব ঠিক করে রেখে এসেছি; আর চাকরটাকে বলে এসেছি, যদি এসে অপরিষ্কার দেখি তো টের পাবি।

খাবার-দাবার তোমার মনের মত করে তৈরী করে দিয়ে আসি। একদিনকার সন্দেশ অন্ততঃ তিন দিন হয়। তবে বারণ করে দিয়ে এসেছি, কেউ যেন আমার নাম না করে।

খাতা তো বিরহের কবিতা ও গানে বোঝাই হয়ে গিয়েছে,—কত লিখ্‌ব। এসে দেখো। সবগুলিতেই ভাই তোমার কথা ভরা। এগুলো আবার ছাপান হবে,—সবাই পড়বে। আমি হ'লে তো ঝগড়া করতাম—'কেন তুমি আমার কথা দেশশুদ্ধ লোককে বলে বেড়াবে'—বলে। আর তুই তো এতে একেবারে সোহাগে ঢলে পড়িস। ধন্যি মেয়ে বটে! তবে তুই নেহাৎ একেবারে হাপিত্যেশে পড়ে আছিস—কিছু না নিয়ে উঠ্‌বি নি। তাই একটা কিছু বলি শোন্:—

আমার জীবন-রাণী তুমি যে আমার হৃদয়-রাণী।
সুধার ধারা পশে যে শ্রবণে তব কণ্ঠের বাণী।'
মধুর তোমার অধর মাঝেতে
কুন্দ কলিকা ফুটে
বিকশিত তব হৃদয়-পদ্মে
চিত্ত ভ্রমর লুটে ;
তুমি যে আমার ব্যর্থ জীবনে
সার্থক শুভক্ষণ।
তুমি যে আমার অন্তর মাঝে
অন্তরতম ধন।
তুমি যে আমার নিরাশার মেঘে অরুণ কিরণখানি।
দুখ-দুর্দ্দিনে ভরসা আমার তোমারি কমল পাণি!
এখন হ'ল ত প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা। আর কিন্তু ভাই এমন করে চুরি করে পদ্য-টদ্য পাঁটবো না। হাজার হোক মেয়ে-মানুষ তো - বুকটা গুরগুর করে একটু।

হাঁ, অভিসার কথাটা যে বলেছিলাম, তার সঙ্গে একটা মজা আছে। কথাটা আমার নয় - কলম বাবুর। একদিন সন্ধ্যার পর কি একটা ছল করে তিনি বাড়ীর মধ্যে এসে বল্লেন - যাও, তোমার আবার অভিসারের সময় হয়ে এল। এই বেলা ঘুরে এস ;—আবার ফিরে এসে এ গরীবকেও তো একটু দেখ্‌তে হবে। তবে অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখ মধুর নূপুর — যেন ভুলো না।

কথার ছিরি একবার দেখেছিস্। সত্যি ভাই, বয়স যাড়ছে, আর রঙ্গরসটা যেন দিন দিন বাড়ছে। অমন কথার বাঁধুনি আর ঠাট্টা আর কোথাও শুনেছিস্। কিন্তু সত্যি বলছি ভাই—বড্ড মিষ্টি লাগে। ওই হাসি, ওই মিষ্টি কথা, শুনতে-শুনতে যেন চোখ বুজ্‌তে পারি।

তার পর তো উনি চলে গেলেন। আমি চাকরটাকে সঙ্গে করে তোমাদের ওখানে গেলাম। বড় জোর আধ ঘণ্টা হয়েছে। গোটাকতক জিনিষ একটু গুছিয়ে রেখেছি — এমন সময় দুয়ারে শব্দ হ'ল – চেয়ে দেখি, তোমার 'শান্ত-শিষ্ট' বাবু—পেছনে কলম বাবু। আমার যে কি অবস্থা হ'ল —তা আর কি বলব। ভাগ্যে তোর তিনি কবি মানুষ—তাই রক্ষে। পাশের দিকে একটীবারও না তাকিয়ে, বরাবর বিছানার দিকে এগিয়ে গেলেন। আমার উনি আমার দিকে তাকিয়ে, একটু মুচ্‌কি হেসে নিলেন। উঃ কি দুষ্টু! আমি তো পড়ি তো আর উঠিনে,—সেই ভাবে ঘর থেকে বার হয়ে ছোঁড়াটাকে সঙ্গে নিয়ে দে ছুট্।

কি দুষ্ট বুদ্ধি ভাই! এর শোধ আমি নেব—দেখিস্ তুই ফিরে এলে!

আজকাল আর বেশী যাইনে। তবে ইন্‌স্পেকসন করতে মাঝে-মাঝে যাই—বেশীক্ষণ থাকি না। কলম বাবু কথা দিয়েছেন, অমনটী আর কখ্‌খনো কোর্‌বেন না। তবে যে ফন্দীবাজ লোক—বিশ্বাস হয় না চট্ ক'রে। হয় ত আর একরকম ফন্দী বার করে বস্‌বেন ;—আর কিছু বল্লে বলবেন, —দেখ আগেকার মত তো করি নি!

আর একদিনের একটা কথা বলে, আজকের চিঠি শেষ করি।

কলম বাবু, টাকাকড়ি যদি কিছু দরকার হয় বলে, বার-বার করে নিতে বলে দিয়েছেন। কিছুতে নেন্ নি। গত রবিবার দুপুরে দুজনে ঘরে বিছানায় বসে কি একটা পড়ছি, এমন সময় তোমার 'উনি' ডাক্‌লেন—'কমল আছ?'

আমি ত তখনি দে ছুট্ পাশের ঘরে। উঠে কলম বাবু দুয়ার খুলে দিতে উনি ঘরে এলেন।

এসে একটু ইতস্ততঃ করে বল্‌লেন—দেখ কমল, আমায় গোটা পাঁচেক টাকা দাও তো ভাই। কথাটা এমন কাতর হয়ে বল্লেন যে, আমার স্বামীর সদাহাসি মুখ ম্লান হয়ে গেল। তিনিও কাতর হয়ে বল্লেন—আচ্ছা প্রশান্ত, তুমি আমাকে এতই পর ভাব যে, সামান্য ৫টা টাকা আমার কাছে চাইতে তোমার এত কুণ্ঠা, এত দ্বিধা? দুয়ারের আড়াল থেকে দেখ্‌লাম—কলম বাবুর চোখ ছলছল্ করছে।

শান্ত-শিষ্ট তখন লজ্জিত হয়ে বল্লেন—"না ভাই, আমার হাতে টাকা ছিল, সেজন্যে বলেছিলাম দরকার নেই। হঠাৎ দিন তিনেক হ'ল বাড়ী থেকে চিঠি পেলাম, গোটা ৪০ টাকার বিশেষ দরকার ;—তাই পাঠিয়ে দিয়েছি। এদিকে আর যে টাকা ছিল না, তা মনে নেই। এতেই চলে যেত। কিন্তু রাণীর কঠিন দিব্যি যদি ঘি ইত্যাদি না খাই। কি করি, কিনতেই হবে। সামনে থাকলে এ সব গ্রাহ্য না করেই পারতাম—কিন্তু অসাক্ষাতে তো আর উপায় নেই।" বলে, একটা বড় গোছের নিঃশ্বাস ফেলে, এঁর পাশে বসে পড়্‌লেন। মনে হ'ল, মনটা তাঁর আজ বড়ই বেশী খারাপ।

রাগ কিম্বা হিংসা করিস্‌নে ভাই। তোমার ওঁর সেদিনের

কথা শুনে, বড় মায়া হ'তে লাগিল। দুয়ারের ফাঁক দিয়ে দেখ্‌লাম, চেহারাটা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছে—দেখ্‌লে মনে হয় বড়ই মুষড়ে গেছেন। বাংলা মেঘদূতে পড়েছি যে, বিরহী যক্ষের শরীর বিরহে এত কৃশ হয়ে গিয়েছিল যে, তার হাত থেকে কনক-বলয় খসে পড়েছিল। কিন্তু এ বিরহীর মূর্ত্তি যা দেখ্‌লাম, সে কেতাবের বিরহীর চেয়ে ঢের করুণ। রোগা তো হয়ে গেছেনই—মুখখানা যেন মনে হ'ল রক্তহীন; আর তার উপরে এমন একটা অসহায় ভাব ফুটে রয়েছে যে, দেখ্‌লে মনে হয়, আহা! এমন লোককেও একা ফেলে যায়!

আমার উনি তক্ষণি দশটা টাকা বার করে দিলেন। দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—যদি এমনি কষ্ট হবে, গিন্নীকে পাঠাতে কে বলেছিল ভাই।

এই কথাতেই এদ্দিনকার লজ্জার বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তোমার গল্প সুরু হ'ল। সে গল্প আর থামে না। বল্‌তে-বল্‌তে কবির এক-এক সময় গলা ধরে আস্‌তে লাগ্‌ল। তার বলার ভঙ্গী, গলার স্বর, চেহারার চাহনি দেখে, আমার বুকটার ভেতর যেন কেমন করতে লাগ্‌ল। প্রসবের পর দুই মাসের বেশী কিছুতে দেরী করো না ভাই। সত্যি বল্‌ছি, যে তোমা-অন্ত প্রাণ, এমন মানুষকে ছেড়ে থাক্‌তে নেই—সে বল্‌লেও নয়। ওঁকে এগিয়ে দিয়ে 'উনি' যখন ফিরে এলেন, তখন বল্‌লাম—হ্যাঁগা, ওঁকে একটু ভাল ওষুধ-বিষুদ দাও। 'বাবাজী' বল্লে, কিছু খান্‌ না; আর এই চেহারা সুধুসুধু ডাক্তারের কথাতে তো রোগ যাবে না।

ইনি বল্‌লেন—কি করব বল! প্রশান্তর অসুখ তো শরীরে নয়—মনে। ওর অসুখ তো ফার্ম্মাকোপিয়াতে পাওয়া যাবে না। তোমার সইকে আনাতে পার এখুনি, তো দেখ, অসুখ দেশ ছেড়ে রাতারাতি পালায়। আর পার তো সইয়ের বদলে নিজে একটু চেষ্টা করে দেখ। আমি তো হার মেনেছি।

শুন্‌লি একবার কথা ভাই। শুনিয়েও দিয়েছি তেমনি। বল্লাম, কথাটা বুকে হাত দিয়ে বোলো একটু। এত তো বন্ধুত্ব,—একবার যদি ভাল করে চোখ চেয়ে, মিষ্টি করে তাকাই ওঁর দিকে—তো কোথায় সব ভেসে যায়!

মিছে কি ভাই! উনি বল্‌লেন, মেয়েমানুষের মন বড় সন্দিগ্ধ। আর নিজেরা যে সন্দেহের কাজ করেন, তা বল্‌বেন না। তাঁরা বেশী দূর না যান নজরটা তো চালান? আমরা যদি ও-রকম করি, তো সন্দেহ হয় কি না একবার দেখি।

আর কত দেরী? সময় তো হয়েছে।

তোমার স্বামীর ভালবাসার সঙ্গে, বোঝার উপর শাকের আঁটির মত, আমার ভালবাসাও একটুখানি জেনো।

আর কেউ নই—তোমার সই।

(৯)

শ্রীশ্রীহরি

সহায় এলাহাবাদ

৩রা আশ্বিন, ১৩২৮।

প্রিয়তমেষু—

রাণী, নির্ব্বিঘ্নে তোমার একটী মেয়ে হয়েছে শুনে, কত আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হ'লাম তা আর কি বলব! কি ভাবনা আমার যে হয়েছিল, আর কত কথা যে এ দুটো মাস ভেবেছি, তা যেদিন আবার দেখা হবে, বলব। তোমার স্বাস্থ্যের চিন্তা দাঁতের মধ্যেকার একটী ছোট কাঁটার মত আমাকে সব সময়ে অশান্ত করে রেখে দিত। আজ বাঁচলাম।

সামনের নদী জলে ভরে ফুলে উঠেছে। এখান থেকে তার কল্লোল শুন্‌তে পাচ্ছি। ঐ নদীর মত আমার মনটা আজ কাণায়-কাণায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে; বুঝি ছাপিয়ে পড়বে সেই দিন, যেদিন তুমি এসে, মেয়েটি কোলে করে, খোকার হাত ধরে, হাস্যোজ্জ্বল মুখে আমার সামনে এসে দাঁড়াবে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কমল বাবুর বাড়ী থেকে শাঁখ বেজে-বেজে নীরব হয়েছে। রোজ শাঁখের শব্দ শুন্‌লেই, আমার মনটা করুণ মেঘে ছেয়ে আসে। আবার কবে আমার এই নিরানন্দ ভবনটীতে তোমার ওষ্ঠাধর-স্পর্শে শঙ্খ শিউরে বেজে উঠ্‌বে! এখানকার সব যেন শীতে শুষ্ক শীর্ণ হয়ে গিয়েছে; তুমি বসন্ত-রাণীর মত সেই আস্‌বে, আর তোমার মোহন স্পর্শে সব আবার সজীব হয়ে উঠ্‌বে, চারিদিকে আবার সবুজের ছবি ফুটে উঠ্‌বে।

আমার জন্য তুমি কিছু ভেবো না। একটা মাস আমি এমনি করে চালিয়ে দেব। সামনেই পিপাসার জল—এ নিশ্চিত জান্‌তে পারলে কি পথিকের এক-আধ ক্রোশ পথ যেতে তত কষ্ট হয়। জলের শীতল হাওয়া ওই যে আস্‌ছে।

তার কল্লোলও বুঝি শোনা যাচ্ছে। আর তো ভাবনা নেই। প্রায় দুটো মাস কাটিয়ে দিয়েছি। আর কোন গতিকে দুইটা মাস — তা তুমি আস্‌ছে-আস্‌ছে করে কেটে যাবে। তুমি ব্যস্ত হয়ো না। এখন— আঁতুড়ের ১ মাস। তার পর একটা মাস বিশ্রাম। তার পর আমি গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসব। নইলে তোমার শরীর ভাল থাক্‌বে না।

এখানে তোমার ইচ্ছা মতই সব হ'চ্চে। ভেবো না। চাকরটা বেশ খাবার কচ্চে আজকাল; সন্দেশ পর্য্যন্ত তৈরি করতে শিখে গেছে। তবে তুমি থাক্‌তে যে তৃপ্তি, তা আর কোথায় পাব? দেবেন বাবু, ধীরেন বাবু, কমল এরা ত দিন-রাতই খবর নিচ্ছেন। এত করেন সবাই আমার জন্য যে, আমার নিজের অযোগ্যতায় আমার মাথা নীচু হয়ে যায়। কিসে ওঁরা আমাকে এত ভালবাসেন, বলতে পারি নে।

দিনে প্রায়ই ধীরেন বাবু খাবার পাঠিয়ে দেন। কমল তো এক-একদিন রান্না তরকারী নিয়ে খালি পায়ে এসে হাজির হন। পাওনা চারিদিক থেকে যে পর্ব্বত-প্রমাণ হয়ে উঠল রাণী—দেবার যে কোন উপায় নেই। এ জন্মটা কি এই স্নেহ, এই ভালবাসার ঋণ এমনি করেই বেড়ে যেতে থাক্‌বে?

আঁতুড়ে বসে এ মাসটা তুমি চিঠিপত্র লিখো না। লিখ্‌তেও একটু পরিশ্রম ও উদ্বেগ হয়। সেটা ভাল নয়। আমি নন্দ'দার কাছ থেকে তোমার খবর নেব। আর তোমাকে ঠিক একদিন অন্তর পত্র দেব।

মেয়ের নাম থাক—প্রতিমা। কি বল?

তোমারই—প্রশান্ত।

(১০)

শ্রীদুর্গা

সহায়— এলাহাবাদ

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩২৮।

ভাই বৌদি—

সকাল বেলাই আসিয়া পৌছিয়াছি। তুমি এখন হয় ত মনে। শ্রীমের—নাগো একি বেহায়া মেয়েমানুষ—ষষ্ঠী-পূজার বিছানার দিকে এগিয়ে গেলেন তাকিয়ে, একটু মুচ্‌কি হেসে নিলে করে দিন-রাত মনে-মনে পারে? ভগবান্‌ পর্য্যন্ত শুনেছি পারেন না। আসিয়া যাহা দেখিলাম, সবই তোমাকে বলিতেছি বৌদিদি,—শুনিয়া তুমি বিচার করিও। তোমার পায়ে পড়ি বৌদি, অবিচার করিয়া সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিও না।

জানই তো, আসিবার কোনই খবর দিই নাই। দিলে কি আসিতে দিতেন এখন। বলিয়া বসিতেন, এখনও অন্ততঃ ২ মাস বিশ্রাম একান্ত দরকার। সকালে যখন পৌছিলাম, তখন বেলা সাতটা। সইকে আগে থেকে খবর দেওয়া ছিল। রাত্রে আসিয়া চাকর-বাকরকে বলিয়া সই ঠিক করিয়া গিয়াছিল—কেবল ওঁকেই কিছুই জানান হয় নাই। তাহাদের বিশেষ করিয়া নিষেধ পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছিল। গাড়ী যখন ঝাউ-গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে আসিতে লাগিল—এক-এক করিয়া পরিচিত বাড়ীগুলি চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল—আবেগে সমস্ত বুকটা তখন দুরুদুরু করিয়া কাঁপিতেছিল। শচীন জিজ্ঞাসা করিল—মাসিমা, আর কত দেরী? অতি কষ্টে তাহাকে উত্তর দিলাম 'এই এল।' খোকা জিজ্ঞাসা করিল—'মা, বাবার কাছে যাচ্ছি?' এই-বার লইয়া এই একই কথা খোকা অন্ততঃ ২০ বার জিজ্ঞাসা করিল। তাহাকে ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিয়া শান্ত করিলাম। তখন কি আমার মুখে কথা আসিতেছে? মনে হইতেছিল—যেন কত কাল পরে তাঁহার কাছে যাইতেছি। হঠাৎ আমাকে দেখিয়া কি বলিবেন, কি ভাবিবেন? রাগ করিবেন কি? হাঁ, উনি আবার আমাকে পাইয়া রাগ করিবেন! করিলেও, এমন উপায় জানি, সব রাগ জল করিয়া দিব। বড় জোর না হয় বলিবেন—এই শরীর নিয়ে এত শীগ্‌গির আসা উচিত হয় নি। তা বলুন। তখন বলিব—মানুষের শরীরটাই বুঝি সব—মনটা বুঝি কিছুই নয়। এই সব ভাবিয়া তখন আমি আত্মহারা!

গাড়ী বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া থামিতে তবে চমক ভাঙ্গিল। চাকরটা বাহিরেই ছিল, দাইও তৈরি ছিল। জিনিষপত্র ধীরে-ধীরে নামাইয়া লইতে লাগিল। আমি শচীকে, ভাড়া মিটাইয়া দিয়া, বাহিরের ঘরে বিশ্রাম করিতে বলিলাম; আর ঐ ঘরের ভিতর দিয়া, দাইয়ের কোলে খুকীকে দিয়া, খোকার হাত ধরিয়া তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলাম।

তিনি যে এ সময় লিখিবেন, তাহা আমার জানা ছিল। দুয়ারের দিকে পিছন ফিরিয়া, চেয়ারে বসিয়া তিনি লিখিতে-

ছিলেন। কোঁচার খুঁটটা কেবল গায়ে দেওয়া। আমার বুকের ভিতর তখন যেন একটা ঢাক বাজিতেছিল। মনে হইতেছিল, উনি বুঝি এই বুকের শব্দে ফিরিয়া চাহিবেন। একটু পাশে গিয়া তাঁহাকে একটু ভাল করিয়া দেখিলাম। উঃ, কি রোগাই হইয়া গিয়াছেন! যেন চেনা যায় না। আর কি বিষণ্ণ মুখখানি যে তাঁর দেখিয়াছিলাম, তাহা কখন ভুলিব না। আর কখন উঁহার কাছ ছাড়িয়া যাইব না—কিছুতেই নয়।

খোকাকে বলিয়া দিয়াছিলাম—যেন ডাকিস্ না আগে। খানিকক্ষণ সে লুকোচুরি খেলা ভাবিয়া নিষেধ মানিয়াছিল। আমি যখন এক পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া আছি, এমন সময় খোকা 'বাবা' বলিয়া ডাকিয়া, খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তিনি চমকিত হইয়া চাহিলেন; বিস্ময়ে-আনন্দে এক প্রকার টলিতে-টলিতে আসিয়া খোকাকে বুকে তুলিয়া লইলেন। আর আমার পানে হাসি মুখে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন—'হাঁ তুমি এয়েছ, তুমি এয়েছ!' আর মুখে হাসি থাকিলেও চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

আমি আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিলাম না। চক্ষের জলে ভাসিতে-ভাসিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া, আমার অশ্রু-প্লাবিত মুখখানা তাঁহার পায়ের উপর চাপিয়া ধরিলাম।

বৌদি ভাই, রাগ করিও না। আশীর্ব্বাদ করিও, এই পা দুখানির উপর এমনি করিয়া পড়িয়াই যেন একদিন চোক দুটা বুজিতে পারি।

তোমার

মহারাণী।

সতীন

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

হইনি আমি খুব তো ডাগর, বুদ্ধি আমার কতই বা আর,
কেমন ক'রে পার্ব্বো আমি সকল কথা বুঝতে সবার?
সবাই বলে তুমি আমায় সতীন বল কেন, জানে—
আমি ভাবি অবাক্ হ'য়ে, ও কথাটার কি-ই বা মানে।

দাদামণির পাশে আমায় দেখ্‌লে বল কেন লোকে
কাণাকাণি হয় গো সুরু, চাওয়া-চাওয়ি চোখে চোখে,
ছাড়্‌বো না আজ দিদিমণি, দিতেই তোমায় হবে ব'লে
দাদামণি কে হন্ আমার, তুমি আমার সতীন হ'লে।

ভাল তাঁরে বাসি কিনা? তা তো বাসিই, বড্ড বাসি;
অপরাধ কি ভালবাসা? হাস' যে সব ঘৃণার হাসি
মান্‌ছি আমি না দেখে তাঁয় পারিনে থাক্‌তে মোটে,
এত কি সে দোষের, তাতে এতই কেন কথা ওঠে?

ব'ল্‌বে না ভাই দিদিমণি? আচ্ছা, আমায় ব'ল্‌বে নাক'?
দাদামণির সোহাগী, তাই ঐ নামে কি আমায় ডাক'?
তা' যদি হয়, তা'হ'লে ভাই ব'ল্‌ছি ক'রে সত্যি এ তিন্
ঠিকই আমি সতীন তোমার, ঠিকই সতীন, ঠিকই সতীন।

কোষ্ঠীর ফল

[শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্]

১

আমার কোষ্ঠীতে ছিল, "মৃত্তিকাপ্রোথিত গুপ্তধন লাভ"; অথচ যখন ওকালতী পাশ করিয়া মানভূমের খুব একটা ছোট-খাটো যায়গায় ওকালতি আরম্ভ করিয়া দিলাম, তখন এটা অন্ততঃ ঠিক যে, ঐ কোষ্ঠীর বচনের দিকে নজর রাখিয়া এ কাজ করি নাই।

কোষ্ঠীকে কোনও দিনই বেশ ভাল মত বিশ্বাস না করিতে পারিলেও, আমার দিকের এই অভাবটা পুরাপুরি পূর্ণ করিয়াছিল আমার স্ত্রী কমলা। কমলা ছিল এক পরম হিন্দু-কন্যা; তাহাতে মোটের উপর সুবিধাই দাঁড়াইয়াছিল। কারণ, যদিও সে সহসা গুপ্তধন পাইবার প্রত্যাশায় আমার এই বাসাটির সম্ভব-অসম্ভব নানারকম স্থান খুঁড়াইয়া ফেলিয়াছিল, তথাপি তাহাকে লইয়া অসুবিধা ছিল না। সেই খোঁড়া যায়গা ভরাট করিয়া সে লাউ-কুমড়া, তরি-তরকারি দিত; এবং তাহাতে অর্থলাভ না হউক, তরকারির দুঃখ ছিল না। সে যে যুগ-যুগান্তরের বিনা পয়সার দাসী—এ কথাটা তাহার কাছে এখনও ধরা পড়িয়া যায় নাই; সুতরাং সে বরং প্রসন্ন মুখেই দুইবেলার রান্না রাঁধিয়া, পতি-পুত্রকে খাওয়াইয়া, গুপ্ত-ধনের ভরসায় থাকিত।

সমাজের যে সকল দুর্দ্দান্ত-সমস্যা, তাহার ঢেউ এখনও এই ছোট জায়গাটিতে পৌছায় নাই; সুতরাং সকলেরই দিন বিনা সমস্যায় সনাতন প্রথায় কাটিয়া যায়। ম্যালেরিয়া এখনও আসে নাই; সুতরাং প্লীহাটি হইতে মানুষ পর্য্যন্ত সবাই নধর-চিক্কণ। এত যেখানে সুবিধা, সেখানে ওকালতি করিয়া দিন চলিয়া গেলেই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিয়া, আমরাও একান্ত অসন্তুষ্ট ছিলাম না।

হঠাৎ সেবার দুর্ভিক্ষ হইয়া এই সহজ ভাবের পরিবর্ত্তন বোধ হইল। রায়তরা জমিদারের খাজনা দিতে পারিল না, —কাঙ্গালের দল বাড়িয়া গেল, এবং তাহাদের খাওয়াইবার মত অবস্থার লোকও কমিয়া গেল।

একদিন সকালে বাহিরে বসিয়া আছি, এমন সময় মঙ্গল মাঝি আসিয়া উপস্থিত। এই মঙ্গল-মাঝি সাঁওতাল; অদূরে একটা গ্রামে তার বাড়ী। সে আমার বিশ্বাসী মক্কেল, এবং তাহার গ্রামের যত মামলা-মোকদ্দমা সে আমারই কাছে লইয়া আসিত।

তাহাকে দেখিয়া কহিলাম, মঙ্গল, খবর কি?

মঙ্গল কহিল, বাবু, খবর ত তেমন ভাল নয়। সবই আক্রা। জমিদারের তাড়া। চাষবাস যে কেমন করে হয়, জানি নে। কিছু টাকা না দিলে ত চলে না বাবু।

মনের ভিতর বেশ খুসী বোধ করিলাম না। কারণ, টাকার প্রাচুর্য্য আমার ছিল না। কিন্তু এত বড় প্রয়োজনীয় লোকটাকে ত হাতছাড়া করাও চলে না। কিছু টাকার জন্য যদি আজ হাতছাড়া করি, ত' কাল একজন তাহাকে পরম আদরে লুফিয়া লইবেন; এবং টাকা ত' দিবেনই, পরন্তু তাহার উপর হয় ত দুইবেলা নিমন্ত্রণ খাওয়াইবেন; এবং তাহার ফলে গাঁ-শুদ্ধ মক্কেলকে আমি চিরদিনের জন্য হারাইব। ওকালতি করিতে গেলে এ সব বিষয়ে অবহেলা করা চলে না; সুতরাং সম্ভবমত হইলে দিবই স্থির করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, কত টাকা?

মঙ্গল কহিল, দু'কুড়ি দশ হলেই হবে।

মুখের ভাব যথাসম্ভব মোলায়েম করিবার চেষ্টা করিয়া কহিলাম, তা বেশ, দেবো।

মঙ্গল কহিল, তবে ইষ্ট্যাম্প নিয়ে আসি?

আমি কহিলাম, মঙ্গল, তুমি টাকাটা অমনিই নিয়ো—ষ্ট্যাম্প আর আনতে হবে না।

মঙ্গল একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার বিস্তৃত মুখের এক-মুখ হাসিয়া কহিল, যদি ফেরৎ না দিই বাবু?

আমি কহিলাম, মঙ্গল বেঁচে থাকতে আমার সে ভয় নেই।

এই কথায় তাহার সেই বাঁকা-চোরা পোড়-খাওয়া মুখখানা হঠাৎ অসম্ভব গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে খানিকটা চুপ করিয়া রহিল। বুঝিলাম, এই সামান্য বিশ্বাসের কথাটা তাহার বুকের ভিতর কতখানি দাগিয়া বসিয়া গেছে!

এমন সময় আমার ছোট ছেলে আসিয়া ডাকিল, মঙ্গল বাড়ীতে এস। মঙ্গল হাসিতে-হাসিতে তাহার পিছনে চলিল; কহিল, মাচাটা বুঝি পড়ে গেছে খোকা বাবু। আমার বাড়ীর ভিতরেও মঙ্গলের গতি প্রায় অবাধ ছিল। তরকারীর হেফাজৎ করা, মাচা বাঁধা—এ সকল ত' ছিলই; তাহার উপর, সে নানা-রকম সাঁওতালী ভূত-পেত্নী, ডাইনের গল্প বলিত, মন্ত্র পড়িত, এবং কোন্ পাখী কখন উড়িয়া গেলে কি ফল হয়, আকাশের চেহারা অনুসারে মানুষের কি লাভালাভ হয়,—সাঁওতালী শাস্ত্রে এ সব বিষয়ে কি বলে, তাহারও ব্যাখ্যা করিত।

২

মাস-দুই পরে মঙ্গল আসিয়া কহিল, বাবু আমাদের মৌজো শালখোটা বিকিয়ে যাচ্ছে। তোমাদের এই আদালতেই ত' বিকুবে। ওটা কেন না। ওটা ভারি আয়-পয়ের মৌজা বাবু!

আমি কহিলাম, আমার মৌজা নিয়ে কি হবে,—এই বিদেশে বিভুঁয়ে? তা ছাড়া, আর—আয়ই যদি হবে, ত' ওটা বিকুচ্ছে কেন?

মঙ্গল কহিল, যাঁর ছিল তিনি ত' ইচ্ছে ক'রেই বিকিয়ে দিচ্ছেন,—অনেক দূরে থাকেন। তুমি ত কাছেই আছো,—আমরা তোমার 'পরজা' (প্রজা) হবো,—এ বেশ হবে বাবু।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কতয় বিকুবে আন্দাজ?

মঙ্গল কহিল,—এই আড়াই হাজার—তিন হাজারের মধ্যে হবে।

আমি বলিলাম, এত টাকা আমি দিতে ত পারবো না; আর ও কিনেই বা কি হবে?

মঙ্গল কহিল, কিন্তু বাবু, ভারি পয়মন্ত!

আমি কহিলাম, রেখে দে তোর পয়মন্ত!

কতকটা নিরাশ হইয়া সে বাড়ীর ভিতরে গেল; এবং সেখানেও শুনিতে পাইলাম, সাড়ম্বরে এবং উচ্চ স্বরে সে এই পয়মন্ত মৌজা বিক্রয়ের গল্প করিতেছে; এবং তাহার পর তালু ও জিহ্বার একপ্রকার শব্দ করিয়া, দুঃখ জানাইয়া কহিল, বাবু কিছুতে নিতে রাজী হলেন না।

তাহার পর যে সকল কথাবার্ত্তা হইল, তাহা মন দিয়া না শুনিলেও, বুঝিতে পারিলাম যে, দুঃখটা শুধু একপক্ষের নহে,—দুইপক্ষেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সেই রাত্রে কমলা কহিল, ওই মঙ্গল যে বলছিল সেই মৌজাটা নিলে না কেন?

আমি হাসিয়া কহিলাম, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাকী সব মৌজা-গুলোই নেওয়া হয়েছে কি না, শুধু—ওইটেই বাকী,—তাই ভাবছি।

কমলা অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, না, তা নয়। ও বলছিল, ওটা ভারি পয়মন্ত।

আমি কহিলাম, কি রকম?

কমলা উৎসাহিত হইয়া কহিল, ও বলছিল যে, এমন সব লক্ষণ আর চিহ্ন ও দেখেছে, যাতে ঠিক বোঝা যায় যে, যে ওটা নেবে, সে ভারী সুখী হবে।

শুনিয়া আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

কমলা একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, কিসে কি হয় বলা যায় না ত! তা ছাড়া, ওরা সাঁওতাল,—ওরা এমন সব বুঝতে পারে—

আমি হাসিয়া কহিলাম, গুপ্তধনের কথাও বলেছে না কি? কমলা কহিল, তোমার সব তাতেই হাসি আর ঠাট্টা!

* * * *

আদালতে লোকারণ্য—আজ নিলামের দিন। একের পর এক নিলাম হইতেছিল,—এমন সময় শালখো মৌজা ডাকে উঠিল। এই মৌজাটি খরিদ করিবার জন্য ভিতরে-বাইরে কিরূপ অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম, এই কথা মনে উদয় হইবা-মাত্র দেখিলাম, মঙ্গল ঠেলাঠেলি করিয়া আমার নিকট উপস্থিত; কহিল, ডাকো বাবু—

আমি কহিলাম, ডাকব কি'রে? টাকা কৈ?

মঙ্গল একটা টাকার পুঁটুলি দেখাইয়া কহিল, টাকা আছে বাবু,—ডাকো না!

আমি কহিলাম, আশ্চর্য্য করলি যে রে! ব্যাপার কি?

মঙ্গল কহিল, সব এখন বলতে পারি নে। ডাক হচ্ছে শুনতে পাচ্ছো না। আমিই তবে ডাকলাম। এই বলিয়া সে চীৎকার করিয়া ডাক আরম্ভ করিয়া দিল। একহাজার হইতে সুরু করিয়া ২৫০০৲ টাকা ডাক শেষ করিয়া খরিদ করিয়া লইল। তাহার পর খরিদ্দারের নাম লিখাইবার সময় লিখাইয়া দিল আমার নাম।

রাগ আমার সহজে হয় না; কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সে সময় রাগে প্রায় জ্ঞান হারাইয়াছিলাম। চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, মঙ্গল, এ সব করছিস কি?

মঙ্গল আমার কাছে আসিয়া, তাহার সাঁওতালী দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া কহিল, বাবু রাগ করো না। মঙ্গল তোমার অনিষ্ট করবে না। টাকা তোমাকে দিতে হবে না, ওই মৌজা থেকে তিন-বছরে তুলে নেব। আমরা তোমার পরজা হব বাবু।

ব্যাপারটা আমার কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য রহিয়া গেল। দেখিলাম সে-দিনকার দেয় টাকা জমা হইয়া গেল; এবং বাকী টাকাও যথাসময়ে জমা হইয়া গেল। অথচ কিসে কি হইল আমি তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিলাম না!

হতভাগার দেখাও আর পাওয়া যায় না। সেই যে পলাইয়াছে, আর আসে না। মৌজার মালিক হইয়াছি বটে, কিন্তু কি করিয়া যে হইলাম, তাহাও জানি না; এবং তাহার জন্য শ্রীঘরই বা যাইতে হইবে কি না, তাহারই বা স্থিরতা কি?

পূজার কয়েকদিন মাত্র বাকী আছে; বাড়ী যাইব কি যাইব না চিন্তা করিতে-করিতে, বাড়ী যাওয়াই স্থির করিয়াছি; কিন্তু মনে বেশ শান্তি নাই। মঙ্গলকে কয়েকবার ডাকানর পর, সে আজ আসিবে বলিয়াছে।

মঙ্গলের সেদিনকার চেহারা দেখিয়া আমার মনে একটুও আনন্দ হইল না। মনে হইল, এই সাঁওতাল তাহার তন্ত্র-মন্ত্র এবং দুষ্টবুদ্ধি লইয়া ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় আমাকে এমনি একটা ফাঁদে ফেলিয়াছে, যাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া কঠিন। ক্রুদ্ধ স্বরে তাহাকে কহিলাম, তোকে ডেকে পাওয়া যায় না—তুই হয়েছিস কি?

সে কহিল, ভয়ে আসতে পারি নি বাবু।

আমি বলিলাম, তুই আমার নামেই বা ও মৌজা কিনলি কেন, আর টাকা কোথায় পেলি? তুই আমাকে কি বিপদে ফেলবি হতভাগা?

মঙ্গল কহিল, আমরা সব গাঁয়ের লোক তোমার প্রজা হ'য়ে থাকতে চাই বাবু,—তাই সবাই চাঁদা ক'রে টাকা দিয়েছি। তুমিই রাজা হলে বাবু। ও টাকা আমি ওই গাঁ থেকে তুলে শোধ ক'রে দেবো,—তুমি রাগ ক'রো না বাবু।

আমার মন অনেকটা প্রসন্ন হইল; কহিলাম, তা' এত কাণ্ড করতে গেলি কেন? না হয় অন্য কেউ কিনতো?

সে হাত যোড় করিয়া কহিল, সে বড় দুঃখু হ'তো বাবু। তুমি রাজার মত রাজা। তাই সবাই মিলে আমরা ক'রেছি। আবদার রাজার কাছে করবো না ত কার কাছে করবো?

মনের ভিতর কিন্তু খটকা থাকিয়া গেল,—এই দরিদ্র নিরন্ন সাঁওতাল,—ইহারা কি করিয়া অতগুলা টাকা তুলিল? যা হোক, রাজা ত হইয়াছি, যতদিন রাজ্যভোগ করা যায়। তাহার পর প্রয়োজন হইলে রাজত্ব বেচিলেও ত' চলিবে।

৩

পূজার সময় সমস্ত বাঙ্গলা দেশ শিশিরে-সৌন্দর্য্যে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। সকালবেলা শিউলিফুলের গন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া, রাত্রি পর্য্যন্ত একটা পবিত্রতায় যেন দিনগুলি পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। যে রোগী, সেও উঠিয়া বসিয়াছে; যে দুঃখী, সেও আজ আগমনীর দিনে তাহার দুঃখ ভুলিয়া, মায়ের পানে চাহিয়া আছে!

সপ্তমীর বাঁশী যখন অদূরে বাজিয়া উঠিল, তখন কমলা কহিল, একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।

কমলা মনে করে, পূজার এই প্রথম দিনটি নারীর পক্ষে মহৎ দিন। বোধ হয় সেই জন্যই প্রতি বৎসর এই দিনে সে সর্ব্ব-আভরণে এবং সুন্দর বেশে, সজ্জিত হইয়া আমাকে প্রণাম করে। এই সুন্দর আত্ম-নতির মধ্যে যে পবিত্রতা আছে, যে মহত্ত্ব আছে, তাহা চিরদিনই আমাকে মুগ্ধ করে।

এবার যখন আমাকে প্রণাম করিয়া উঠিল, তখন দেখিলাম, কমলার চুড়ি ও বালা ভিন্ন অন্য গহনা নাই।

আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, এবার গহনা সব পরো নি?

কমলা চুপ করিয়া রহিল।

আমি কহিলাম, কেন?

কমলা আস্তে আস্তে কহিল, নেই।

বিস্মিত হইয়া কহিলাম, নেই কি রকম?

কমলা কহিল, ওই মৌজা কেনার জন্যে—

মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত মুখচোখ কঠিন হইয়া উঠিল।

তাহা দেখিয়া; কমলা আমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া কহিল, আজ পূজোর দিন, আজ কঠিন কথা ব'লো না! আজ যা বলবে, তাই সত্যি হ'য়ে যাবে। এই কটা দিন মাপ ক'রো। আমি অপরাধ ক'রেছি, তোমার ভালোর জন্যই করেছি। তুমি আশীর্ব্বাদ করুলে, আমার কোন দুঃখ থাকবে না,—আসছে বছর ওর দশগুণ হবে। সামান্য গহনা বৈ ত নয়। বলিয়া সে আমার পায়ে হাত দিল।

সমস্ত গাঁয়ের সাঁওতালের কাছে ঋণী হওয়ার চেয়ে যে কমলার গহনায় ঐ টাকা সংগ্রহ হইয়াছে, ইহাতে মন যেন কতকটা শান্তি পাইল। ওটা তা হ'লে সত্যই আমাদের। যা হোক, টাকাটা একেবারে নষ্ট হয় নাই,—এই ঢের। কমলাকে দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া, বিশেষ আজ এই বিশেষ দিনটিতে, মন অনেকটা নরম হইল। তাহাকে হাতে ধরিয়া উঠাইয়া কহিলাম,—আজকের দিন আর তোমাকে কিছু বল্লাম না; সত্যিই আশীর্ব্বাদ করছি, যা মনে ভেবে ঐ কাজ করেছো, তা সার্থক হোক। কিন্তু ঐ মৌজাটার ওপর তোমাদের সকলকার, বিশেষ ক'রে—"

কমলা কহিল, পরে বলবো।

৪

পূজা-শেষে কর্ম্মস্থানে সেইদিন মাত্র ফিরিয়াছি। সকাল হইতে সমস্ত দিনটাই প্রায় গোছ-গাছ ও দেখা-সাক্ষাৎ করিতেই কাটিয়াছে। বিকালে বাহিরের বারান্দায় বসিয়া ছিলাম। এমন সময় মঙ্গল আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

আমি কহিলাম, মঙ্গল, তুই ত' আচ্ছা দাগাবাজ! বাড়ীতে মেয়েদের ভুলিয়ে, গহনা ভেঙ্গে, টাকা যোগাড় ক'রে মৌজা কেনবার তোর কি দরকার হ'য়েছিল? আবার মিথ্যে কথা—যে, টাকা তোরা দিয়েছিস্। তুই খুব মোড়ল সাঁওতাল হয়েছিস ত'!

মঙ্গল কহিল, বাবু, সব বুঝতে পারবে এখনই। ওই মৌজাটায় খুব ভাল কয়লা আছে। একটা সাহেবের লোক যাওয়া-আসা কচ্ছিল; তার কাছ থেকে জানতে পারি। সে কি আমাকে ঠকাতে পারে বাবু,—তিনকুড়ি বছরের মঙ্গল সাঁওতালকে! সব সে সেরা কয়লা আছে। আর রাজার কাছ থেকে নিম্ন-স্বত্বটা নিয়ে নিও। তা হ'লে ত' লাখ টাকা ছোট কথা! বাবু, একটা সাহেব তোমার সঙ্গে কথা কইবার জন্যে ছুটিতেও এসেছিল—আজ আসচে আবার। কমে যেয়ো না বাবু।

আমি বলিলাম, এ সব কথা স্পষ্ট ক'রে আগে বলিস নি কেন?

মঙ্গল কহিল, কথা দু'কাণ হ'লে কি রক্ষে আছে বাবু? তা হ'লে ওর দাম সে দিন দশ-বিশ হাজার উঠে যেত। এক মঙ্গল জানত, আর কেউ নয়। ওই মৌজাটার দামই চার পাঁচহাজার টাকা বাবু, একটুও যদি কয়লা না বেরোয়, তবু বেচে দিলে লাভ থাকবে। মঙ্গল দাগাবাজ নয় বাবু।

এমন সময় ঘোড়ায় চড়িয়া এক সাহেব আসিয়া উপস্থিত। খুব বড় একটা কয়লা-কোম্পানীর সহকারী ম্যানেজার বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া, বসিয়া কহিলেন, শালখো মৌজা আপনার?

আমি কহিলাম, হাঁ।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, নিম্ন-স্বত্ব?

একবার একটু মিথ্যে কহিতে হইল। বলিলাম, এখনও নয়,—তবে কথাবার্ত্তা চলছে; ৫।৭ দিনের ভেতর বন্দোবস্ত হ'য়ে যাবে।

সাহেব কহিল, বেশ। আমাদের কোম্পানী কয়লা তোলবার জন্যে ওটা বন্দোবস্ত নিতে চান। আমি আপাততঃ 'বোরিং' (খনন) ক'রে দেখতে চাই, কেমন কয়লা পাওয়া যাবে; তার পর এসে কথাবার্ত্তা শেষ করবো। গুড্ ইভনিং। আমাদের কোম্পানীর নাম সবাই জানে; সুতরাং ভরসা করি, আর কারও সঙ্গে কথা কবেন না।

আমি বলিলাম, না, একমাস আপনার জন্যে অপেক্ষা করব। ইতিমধ্যে বোরিং করুন।

নিম্ন-স্বত্বের বন্দোবস্ত লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না।

মাসখানেক পরে সাহেব আসিয়া কহিল, বাবু, সোজা কথা বলা ভাল—ফাষ্ট-ক্লাস কয়লা বেরিয়েছে। আমার কোম্পানী আপনার সঙ্গে শেষ কথাবার্ত্তা কইতে বলেছেন। সুতরাং কথাবার্ত্তা শেষ ক'রে দু'চার দিনের মধ্যে দলিল রেজেষ্টি করে দেবেন।

কথাবার্ত্তা শেষ হইয়া, প্রথম সেলামী স্বরূপ প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা পাওয়া গেল। যাঁহারা কয়লার ব্যাপার জানেন,

তাঁহারা বুঝিবেন, ভবিষ্যৎ লাভের হিসাবে প্রথম সেলামী বিশেষ কিছুই নয়।

এই কয়লার খেলাটা পাশা খেলার মত,—একদিনে মানুষকে ইহা লক্ষপতি করে,—একদিনে আবার পথে বসায়। কপালক্রমে পাশার এই দাঁভের দিক্‌টাই আমার ভাগ্যে উঠিয়াছিল।

৫

পর বৎসর কমলার অনুরোধে মা'র প্রতিমা বাড়ীতে গড়াইয়া মা'কে আনিলাম।

এবার সপ্তমী পূজার সকালে কমলা নানা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া আমাকে প্রণাম করিল। ফহিল, এবার আশীর্ব্বাদ মন খুলে করবে ত?

আমি কহিলাম, কেন, গেল বার কি করি নি?

কমলা বলিল, একশোবার। তাই ত' আজ মা স্বয়ং এসেছেন। দেখলে, কোষ্ঠী সত্যি নয়?

আমি কহিলাম, কি জানি! কেন না, যে রকম মিথ্যা আর চাতুরীর ভেতর দিয়ে ওকে কতকটা সত্যি দাঁড় করান হয়েছে, তাতে ওর ওপর গভীর বিশ্বাস হবার কথা নয়। কিন্তু এতে আর সন্দেহ নেই যে, সালঙ্কারা সভূষণা কমলা সত্যি,—বলিয়া তাহার কপোল চুম্বন করিলাম।

আহুতি

[শ্রীরমলা বসু]

তোমরা বলিবে, চক্ষুই বাহিক জগতের সহিত মানুষের প্রধান যোগ। চক্ষুই মানুষকে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে দেয়; চক্ষুই হৃদয়ের আদান-প্রদানের একমাত্র উপায়। তোমাদের চোখ আছে, তাই তোমরা আকাশের অনন্ত নীলিমা, সাগরের চঞ্চল উচ্ছ্বাস, গিরি-শিখরের মহতী শোভা, শারদ-প্রাতের স্নিগ্ধ মাধুরিমা, গোধূলির বিচিত্র শোভা সম্ভোগ করিতে পার। চক্ষুহীন সে শোভার, সে সম্ভোগের কি বা জানিবে? কিন্তু চোখে দেখিতে পাও বলিয়াই, বোধ হয়, তোমরা নিস্তব্ধ আকাশের তলে দাঁড়াইয়া, তাহার সেই নীরব গীতধ্বনি, সাগরের গম্ভীর তান, কুসুমের বিচিত্র গন্ধ, বিহঙ্গমের মধুর গীত ঠিক তেমনি ভাবে, চক্ষু-হীনের মত উপভোগ করিতে পার না। তোমাদের চোখ যে তাহার চঞ্চল দৃষ্টি দিয়া তোমাদের মনকেও চঞ্চল করিয়া তোলে। তোমরা উপভোগ কর বটে, কিন্তু আমাদের মত মন-প্রাণ দিয়া একটা জিনিষ একমনে সম্ভোগ করিতে পার না। বাহিরের সঙ্গে কারবার আমাদের কম খুব; তাই যা কিছু ধন বাহির হইতে লাভ করি, সেগুলি ভোগ করি আমরা অন্তরে লইয়া গিয়া। তোমাদের ভালবাসাও সেই রকম, অনেকটা চোখের উপর নির্ভর করে বলিয়া, যতক্ষণ চোখের সামনে থাকে, যতক্ষণ সে প্রেয় জিনিষ দৃষ্টি-প্রিয় হয়, ততক্ষণই তাহার আদর বেশী থাকে। তাহা চক্ষের আড়াল হইয়া গেলে, তাহার সৌন্দর্য্য চোখের সামনে না দেখিলে, তাহার আকর্ষণও ক্রমশঃ কমিয়া আসে। আর আমরা, এই অতল, সীমাহীন অন্ধকারে,—যেখানে নানা দৃশ্য আমাদের মনকে ক্ষণে-ক্ষণে নানা ভাবে বিচলিত করিয়া তুলিতে পারে না,—সেখানে চির-অন্ধকারের মধ্যে দয়িতের যে ছবি আঁকি, তাহা সেই গাঢ় অচঞ্চল অন্ধকারের মতই চির-স্থির, চির-অচঞ্চল।

তাহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কলিকাতার এক ভাড়াটিয়া বাসায়,—তাহার দুইখানি স্নিগ্ধ-কর-পল্লবের স্পর্শে। আমি কোন দিন জানি নাই—সেই দুইখানি হাত, ভাস্কর-গঠিত-মূর্ত্তি-নিন্দিত অপূর্ব্ব গঠনের, কিম্বা তোমরা যে চম্পক-বর্ণের প্রশংসা কর, সেই কাঞ্চন-কষিত গৌর-বর্ণের। সে দুখানি কুশ্রী কি সুশ্রী, কিছুই আমি জানিতাম না। জানিতাম, শুধু তাহার নবনীত-কোমল, মমতাময়, সকরুণ স্পর্শ,—যাহার প্রত্যেক চালনায় করুণা ঝরিয়া পড়িত। তার পর শুনিলাম, তাহার সুধা-কণ্ঠের স্নিগ্ধ বাণী;—আমার কাছে তাহা অপূর্ব্ব সঙ্গীতের মত মনে হইত। আর পরিচয় পাইলাম তাহার অমূল্য, স্নেহপূর্ণ হৃদয়খানির; মনে হইত, ইহার কাছে চক্ষু দিয়া সৌন্দর্য্য-ভোগ কি ছার! অবশ্য, জন্মান্ধের কাছে তার কোন ধারণাই নাই; তবু মনে হয়, চোখ দিয়া দেখ বলিয়া, তোমরা উপরের তথ্যের

বিষয়ই বেশী খবর পাও,—ভিতরে তলাইয়া দেখিবার অবসর তোমাদের কম।

আমার এক পিসতুত ভাই আমাদের সহিত এক বাসায় থাকিয়া আফিস করিতেন। কিছুদিন হইতে আমি তাঁহারই নিকট ছিলাম। আমাদের বাসায় এক ঝি ও রাঁধুনী বামুণ ভিন্ন আর কেহই ছিল না। আমি জন্মান্ধ, তাই বুঝি স্পর্শ-শক্তির বিকাশ আমার খুব ভাল করিয়া হইয়াছিল। কিছু-দিন থাকিতে-থাকিতে সমস্ত বাড়ীটা আমার নিকট সুপরিচিত হইয়া গেল; দেওয়াল স্পর্শ করিয়া আমি সর্ব্বত্রই অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারিতাম। আমাদের গলিটার ভিতরেও মাঝে-মাঝে একটু বেড়াইয়া বেড়াইতাম; কিন্তু বড় রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়ার প্রাদুর্ভাব বলিয়া, সেখানে দাদা আমাকে যাইতে বারণ করিয়া দিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ীর নীচের তলায় অন্য একজন ভাড়াটীয়া থাকিত। দাদা প্রত্যহ অতি প্রত্যূষেই বাটী হইতে বাহির হইয়া যাইতেন,—রাত্রিতে ফিরিতেও তাঁহার খুব দেরী হইত।

আমি সারাদিন একলাই কাটাইতাম; কিন্তু তাহাতে আমার বড় বেশী কষ্ট হইত না; কারণ, একলা থাকিতে আমি চিরদিনই অভ্যস্ত। চিন্তা ভিন্ন আর কয়জন সঙ্গীই বা অন্ধের জোটে? তবে আমি ভাল বেহালা বাজাইতে পারিতাম,—আমার প্রিয় বেহালাটীকে লইয়া আমার দিন বেশ কাটিয়া যাইত। মাঝে-মাঝে ঝি ও বামুণের সঙ্গে তাহাদের দেশের গল্পও জুড়িয়া দিতাম। তাহাদের পদশব্দে কে কোন্ জন বেশ বুঝিতে পারিতাম; কিন্তু মাঝে-মাঝে যখন তন্ময় হইয়া বেহালা বাজাইতাম, তখন কোন-কোন দিন হঠাৎ আর একটী অতি মৃদু পদশব্দ ও কাপড়ের খস্-খসানী শুনিতে পাইতাম; এবং একটী মৃদু-মধুর সৌরভ আসিয়া আমার নাকে লাগিত,—বুঝিতে পারিতাম না কার।

কথায়-কথায় ঝি একদিন বলিল, "নীচের তলার রাম বাবুর বৌ গান বড় ভালবাসে;—তাই সে মাঝে মাঝে ওপর তলায় এসে, চুপচাপ বাজনা শুনে যায়। আহা! বৌটার বড্ড দুর্দ্দশা,—স্বামীটা বেহদ্দো মাতাল,—দিনরাত প্রায় বাড়ী থাকে না। তবে যখন আসে, বৌটাকে মেরে-ধরে একেবারে একেকার করে।" কিন্তু এ গল্প ঝিয়ের মুখে শুনেছিলাম মাত্র,—মনের পাতে তাহার কোন দিন ছায়া পড়ে নি; কিম্বা সবিশেষ প্রশ্ন করিবার মত কৌতূহলও কোন দিন হয় নাই। রকম বাঙ্গালী সমাজে, কত কুলাঙ্গার রামবাবু-শ্যামবাবু, কত বাবু আছে, যাহারা নিরপরাধা স্ত্রীদের উপর এমনি অত্যাচারই করিয়া আসিতেছে,—কে তাহার খোঁজ রাখিতে যায়?

একদিন বাজাইতে-বাজাইতে, হঠাৎ [illegible] চুড়ীর একটু টুং শব্দ হওয়াতে, আমি "কে" বলার পর, আর কোন দিনও আমার ঘরে সে মৃদু পদশব্দ, কিম্বা নিস্তব্ধ সত্তা অনুভব করি নাই। সেই দিন ধরা পড়িবার পর, আর বোধ হয় সে উপরে আসিত না।

সেবার কলিকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর ভীষণ প্রকোপ। জর্ম্মণ-যুদ্ধে যত না লোক ক্ষয় হইয়াছিল, তাহার শতগুণ এই করাল-বদনা ব্যাধি রাক্ষসীর প্রকোপে পড়িয়া প্রাণ হারাইতেছিল। আমিও এই জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়ি।

সেবা করিবার কেহই ছিল না; চাকুরী যাইবার ভয়ে দাদা আফিস কামাই করিতে পারিতেন না; অজ্ঞ ঝি বামুণের উপর ভার দিয়া চলিয়া যাইতে হইত। আমি অসহ্য যন্ত্রণায় সারাদিন অজ্ঞানের মত বিছানায় পড়িয়া থাকিতাম। একদিন একটু জ্ঞানের মত হইয়াছে,—দেখি, কাহার দুখানি শীতল কোমল হস্ত আমার মাথার ভিতর আস্তে-আস্তে অঙ্গুলি-চালনা করিতেছে। আমি তখনি বুঝিলাম, এ ঝিয়ের হাত নয়! আমাকে নড়িতে দেখিয়াই, কে যেন সুধা-স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি একটু ভাল বোধ হচ্ছে? এই ঘোলটুকু একটু খেয়ে ফেলবেন কি?" সরবতের আস্বাদেই বুঝিলাম, এ ঝি-চাকরের অযত্ন-প্রস্তুত নয়।

সেইদিন হইতে রোগের যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া মনে হইত না; দুইখানি সেবা-নিপুণ হস্তের যত্নে আমার সকল কষ্টের লাঘব হইত। সন্ধ্যাবেলায় দক্ষিণের উন্মুক্ত জানালা দিয়া, আস্তে-আস্তে যখন বাতাস আসিয়া, আমার রোগদগ্ধ দেহ চুম্বন করিত, আর তাহার হস্তের স্নিগ্ধ স্পর্শ আমার জ্বরতপ্ত কপোলের উপর আস্তে-আস্তে বুলাইয়া যাইত,—তখন মনে হইত, এ রোগ-শয্যা হইতে যেন কখন আর না উঠিতে হয়,—চিরদিনই যেন এই ভাবে তাহার সেবা পাই আমি।

সে সেবা, সে যত্ন আমার নিকট এমনি লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহারই অকৃত্রিম শুশ্রূষায় আমি আস্তে-আস্তে সারিয়া উঠিলাম। এখনও সে অবসর পাইলেই আমার নিকট আসিয়া বসিত; বেহালা বাজাইবার জন্য নানা ফরমাইস করিত; তাহার ছেলেবেলাকার, দেশের, মা-বাপের অনেক গল্পই করিত। আমার চাইতে সে অল্প দিনেরই ছোট হইলেও, আমাকে সে "দাদা" সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

করুণাময়ী নারীর দয়ার্দ্র হৃদয় রোগকাতর ব্যক্তির আর্ত্তনাদে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সে এইরূপ অনাহূত ভাবে, অকাতরে লজ্জা-ভয় ত্যাগ করিয়া, একজন অনাত্মীয় পুরুষের সেবা করিতে পারিয়াছিল। আর, সেই রোগ-যন্ত্রণার উপশমের সঙ্গে-সঙ্গে, বোধ হয় সে তাহার পূর্ব্ব অন্তরালের মধ্যে আবার আশ্রয় গ্রহণ করিত,—যদি না আমি অন্ধ হইতাম। আমার এই দৃষ্টি-হীনতা আমাদের সে ব্যবধান হইতে বাঁচাইয়া দিল; আমার দৃষ্টি-হীনতাই তাহার অবগুণ্ঠন হইল। চাক্ষুষ হিসাবে সে তো আমার কাছে অন্তরালবর্ত্তিনীই—সেই জন্যই বোধ হয় অন্য কোন পরপুরুষের মত সে আমাকে লজ্জা করিতে শিখিল না। পরম আত্মীয়ের মতই আমার সহিত ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। আর আমি? আমি ধীরে-ধীরে পলকে-পলকে তাহার সেই স্নিগ্ধ-মধুর, করুণ স্বভাবের যতই পরিচয় পাইতে লাগিলাম, ততই মুগ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিলাম। রোগ অবসানের পর তাহার সেবাস্পর্শ অনুভব করিতাম না বটে, কিন্তু সমস্ত শ্রবণ-শক্তি তাহার পদশব্দ, তাহার কণ্ঠস্বরের জন্য উন্মুখ করিয়া রাখিতাম। অতি অজানিত ভাবেও সে আমার সান্নিধ্যে আসিলে, তাহার মৃদু সৌরভ আমি অনুভব করিয়া বুঝিতে পারিতাম,—নিকটেই কোথাও সে আছে।

ধীরে-ধীরে আমার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত জীবন, কখন যে তাহার প্রভাব আসিয়া অধিকার করিয়া বসিল, জানিতেও পারিলাম না।

সকাল ও সন্ধ্যাবেলা প্রায় সে আমার নিকট আসিত না; আপনার গৃহ-কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত; আর আমি বিভোর হইয়া তাহার ধ্যানে রত থাকিতাম। একদিন হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া গেল,—এ কি? আমি এ কি করিতেছি! সে যে বিবাহিতা,—সে যে পরস্ত্রী! সে যে কখন আমার কেহ হইতে পারে না! হউক না তাহার স্বামী নামে স্বামী, মাতাল, দুরাচার, অত্যাচারী;—তবু সে যে তাহার স্ত্রী! আর আমি যে অন্যের স্ত্রীর প্রতি এই রকম মনের ভাব পোষণ করি, তাহাতে তাহার প্রতি অবমাননা করা হয়; সে যে আমার নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র, নির্ম্মল, সুন্দর! সে যে আমার মত হতভাগ্য একটা জীবের জন্য এত দয়া অনুভব করে,—এত যত্ন-সেবা করে,—তাহার প্রতিদান কি আমি এই রকমেই দিব?—না—না—কখনই না। আজ হইতে সে আমার সুখ-স্বপ্নের চিন্তা নয় শুধু,—সে আমার আরাধ্যা, পূজনীয়া।

জানিতাম, কোন দিন আমা দ্বারা তাহার কোন অপকার হইবে না;—কোন দিন ইঙ্গিতেও সে আমার মনের কথা জানিতে পারিবে না। আমি তাহাকে যথার্থ ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলাম, শ্রদ্ধামিশ্রিত পবিত্র ভালবাসা। ভালবাসা নিঃস্বার্থ, ভালবাসা পবিত্র হইলে, সে কখন কামনার জিনিষ হয় না,—সে কখনও তাহার প্রিয়জনের অনিষ্ট করিতে পারে না। তবে বলিতে পার, পৃথিবীর হিসাবে যে ভালবাসার মূল্য নাই,—যাহা কখনও সফল হইতে পারে না,—যাহা চিন্তার মধ্যেও আনা পাপ,—সেই ভালবাসা স্বীকার করিয়া আবার এত বক্তৃতার ঘটা কেন? তখনও এত গভীর পবিত্র ভাবে ভালোবাসিয়াও মনকে চিরদিনের সংস্কার-মুক্ত করিতে পারি নাই,—এখনও পারিয়াছি কি না কে জানে? তাই মনে হইল, নদীর উদ্দাম গতি যখন তার স্বচ্ছ, পবিত্র জলধারার উচ্ছ্বাস লইয়া, পর্ব্বত ছাড়িয়া বাহির হয়, তখন গমা-অগম্য যে-কোন পথে যাইলেও, তাহার সে বিপুল জলধারার নির্ম্মলতা কখন অপবিত্র হয় না; তেমনি আমার হৃদয়ের গতির ধারাও যখন সত্য জলধারা রূপে সংসারের বাঁধা পথের বাহিরেই জীবনে প্রথম ধাবিত হইল, তখন নিজেকে অপরাধী ভাবিয়াই কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম। এমন পবিত্র, নিঃস্বার্থ ভাবে কোন দিন ভালবাসি নাই,—তবু মনে হইল এ কি করিতেছি!

স্থির করিলাম, মনে মনেও আমার দেবীর আসন প্রেম দিয়া হেয় করিব না; সে আসন চির-শুভ্র, চির পবিত্র রাখিব, শুধু ভক্তি চন্দন ধূপে মনে মনে তাহার পূজা করিব। সেখানে কোন স্বার্থ থাকিবে না, কোন কামনা থাকিবে না।

হৃদয়ে পবিত্র হোমের আগুন জ্বালিয়া, সে দেবীর প্রতিষ্ঠা করিব।

সেই দিন হইতে মনকে অনেক বুঝাইলাম। সে নিকটে আসিলে মনে-মনে তাহাকে নমস্কার করিতাম। সে আমার জীবনের ইষ্ট-দেবতা হইয়া পড়িল। সে কিন্তু আমার নীরব পূজার কিছুই জানিত না। ছোট ভগিনীর মত আমার কাছে স্নেহের ও আব্দারের ডালি লইয়া উপস্থিত হইত; অনর্গল কত বকিয়া যাইত। কোন কিছু পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে আমার পদধূলি লইয়া প্রণাম করিলে, মনে-মনে আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতাম। মনে-মনে বলিতাম, "এ কি উপহাস দেবী? তোমার দীন ভক্তের সহিত এ কি বিদ্রূপ?" এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

কলিকাতার এক জন-বহুল ধূলি-গন্ধময় গলির মধ্যে, কোথাকার দুইটী অপরিচিত প্রাণী আমরা,—এ কি বিচিত্র সম্বন্ধ নিজেদের মধ্যে গড়িয়া তুলিলাম! আমি হতভাগ্য, বন্ধু-বান্ধবহীন, চির-অন্ধ জীব; আর সে মাতাল, দুশ্চরিত্র, দরিদ্র স্বামীর নিপীড়িতা স্ত্রী। একটা বিপুল মাদকতার নেশায় দিন যেন কাটিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু তাহার মধ্যে অপবিত্রতার লেশ মাত্র ছিল না,—একটা অনাবিল স্নেহের ডোরে দুজনাই বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। বুভুক্ষু হৃদয়খানি যেন সত্য-সত্যই আমাকে ভগিনীর স্নেহে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার স্বভাবটী যেমন স্নেহ-মধুর, তেমনই স্বচ্ছ-সরল ছিল। তাহার ঘর-সংসারের,—তাহার গত জীবনের,—তাহার আশা-ইচ্ছা-উদ্যমের সব কথাই সে আমার কাছে অবাধে বলিয়া যাইত। কিন্তু তাহার স্বামীর অত্যাচারের সম্বন্ধে একটী অনুযোগও আমি তাহার মুখে কখনও শুনি নাই।

সে সকল সংবাদ আমি ঝিয়ের কাছেই সংগ্রহ করিতাম। এক-একদিন নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া মাতালের অজস্র কটুবাক্য ও গালিবর্ষণে বুঝিতে পারিতাম, অত্যাচারের মাত্রা কতখানি চলিতেছে; এবং তাহারই সঙ্গে মাঝে-মাঝে ও কিসের শব্দ শুনিতে পাইতাম! তখন নিজেকে প্রকৃতিস্থ রাখা যেন সাধ্যের অতীত হইয়া উঠিত। হায় বিধাতা! একে আমি তাহাকে তাহার স্বামীর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার কেহ নই,—তাহাতে অন্ধ, দুর্ব্বল, অপারগ; তাহাই বলিয়া কি আমার দেবীকে,—যাহার সম্মুখে হৃদয়-মন শ্রদ্ধা-ভক্তিতে আপনি নত হইয়া আসে,—তাহারই উপর অশ্রাব্য কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে শুনিব; পারিলে যাহার কেশাগ্রের ক্ষতি হইতে দিতে চাহি না, তাহারই কুসুম-পেলব দেহে দুরাচারের অত্যাচারের আঘাত অনুভব করিতে হইবে? কত দিন আর ইহা সহ্য করিয়া চলিব? দিনে-দিনে অত্যাচারের মাত্রা আরো অধিক হইয়া উঠিতেছিল। দুই দিন সে উপরে আসিল না। ঝিয়ের মুখে শুনিলাম, তাহার জ্বর হইয়াছে,—তাই সে উঠিতে পারে নাই। দুই দিন ধরিয়া তাহার স্বামীরও দেখা নাই। আমি তখন ঝিকে দিয়া ডাক্তার ডাকাইয়া দেখাইতে বলিলাম। ডাক্তার আসিয়া বলিল, মাথায় আঘাত লাগিয়া যে ক্ষত হইয়াছে, তাহারই দরুণ এ জ্বর। দুই দিন পূর্ব্বে তাহার স্বামীরই এই কীর্ত্তি!

তখন বর্ষার শেষাশেষি,—কয়দিন থেকে ভাল করিয়া বৃষ্টি হইতেছিল না,—অথচ প্রকৃতির মন খোলসাও হইয়া যায় নাই,—নিরুদ্ধ অশ্রুজমাট এক স্তব্ধ আঁধার মূর্ত্তি লইয়া যেন সে বসিয়াছিল। চারিদিকের রুদ্ধ ভাব, মেঘাবদ্ধ আকাশে ও বদ্ধগতি বাতাসে, গলির ভিতরের ঘরটীতে বসিয়া যেন প্রাণের ভিতর হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। সে জ্বর-শয্যায় নীচের তলায় শুইয়া। কি একটা ছুটিতে দুই দিনের জন্য দাদাও শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলেন। বেহালাটাও তার ছিঁড়িয়া এক পাশে পড়িয়াছিল। আমার নিকট সমস্ত জীবনটাই যেন বেসুরা ঠেকিতেছিল।

সন্ধ্যাবেলা একা বসিয়া-বসিয়া মনটা দারুণ তিক্ততা ও অবসাদে ভরিয়া গেল। কেবলি বসিয়া-বসিয়া, তাহার নির্য্যাতন ও জ্বরের কথা মনে করিয়া, মনটা যেন সকল সংসারের উপর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ইহার কি কোন প্রতীকার নাই? নিরীহ অবলার প্রতি এ কি অত্যাচার! ভাবিতে ভাবিতে কি জানি কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি,—হঠাৎ মনে হইল, বাতাসের রুদ্ধতা যেন আরো বাড়িয়া গিয়াছে,—কি একটা দুঃস্বপ্নের ভারে তখনও বুকের মধ্যে যেন একটা পাথর চাপিয়া ধরার ন্যায় বোধ হইতেছে,—সমস্ত শরীর দারুণ গ্রীষ্মে, ঘর্ম্মে ভিজিয়া গিয়াছে। হাত-পাখাটা হাতড়াইতে-হাতড়াইতে, বিছানার পার্শ্বে খুঁজিবার চেষ্টা করিতেছি,—এমন সময় কিসের শব্দে যেন সমস্ত মন সজাগ হইয়া উঠিল। বিছানায় উঠিয়া বসিয়া, যেন নীচের ঘর হইতে কাহার অস্পষ্ট কাতরোক্তি শুনিতে পাইলাম। তাহার পরই ঝিয়ের গলার আওয়াজ

শুনিলাম। সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মেরে ফেল্লে রে, মেরে ফেল্লে।" আর যেন আমার দ্বিরুক্তির অবসর সহ্য হইল না,—সমস্ত শরীর যেন কিসের উত্তেজনায় কাঁপিয়া উঠিল। নাই বা হইলাম আমি তাহার রক্ষা করিবার কেহ,—হইলামই বা অন্ধ, দৃষ্টিহীন,—আমি কি পুরুষ নই? আমি কি মানুষ নই? একজন নিরপরাধা রুগ্না নারীকে এই পাষণ্ডের—হইলই বা সে স্বামী—হস্ত হইতে রক্ষা করিবার ক্ষমতা কি আমার নাই?

উত্তেজনার বশে টলিতে-টলিতে একতলার সিঁড়ী বাহিয়া, তখনি নীচে নামিয়া গেলাম। গিয়া যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার দুই কর্ণ আরক্ত হইয়া উঠিল। আমারই বিষয় লইয়া, মিথ্যা অপবাদ দিয়া পাষণ্ড তাহাকে নির্য্যাতন করিতেছে। সে বেচারী অন্ধকারে আমাকে দেখিতে পায় নাই। মাতালের কণ্ঠস্বর ও অশ্রাব্য ভাষা যতই উচ্চ হইতে উচ্চ সুরে উঠিতে লাগিল, ততই সে প্রাণপণে তাহাকে থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

লজ্জা-কুণ্ঠা-মিশ্রিত যেন তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম —"ছিঃ—ছিঃ, ও কি বলছ! তিনি যে আমার দাদা হন! ছিঃ—ছিঃ, যদি শুনতে পান! তোমার দুটী পায়ে পড়ি, একটু আস্তে কথা কও।" তাহার উত্তরে এক জঘন্য তীব্র সম্ভাষণ শুনিলাম ও প্রচণ্ড এক আঘাতের শব্দ পাইলাম। তাহারই সঙ্গে-সঙ্গে অতিকাতর "মাগো" শব্দের সঙ্গে, মনে হইল, যেন সে পড়িয়া গেল!

এক মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত শরীর যেন তাড়িৎ-স্পর্শের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল; বিজাতীয় ঘৃণায় আমার সমস্ত মনটা ভরিয়া গেল; আর সহ্য হইল না। হাতড়াইতে-হাতড়াইতে মনে হইল, একটা টিপয়ের মত পাইলাম। সেইটা তুলিয়া লইয়া সজোরে মাতালের দিকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িলাম। তার পর একসঙ্গে আমার মাথার ভিতরের সমস্ত আগুন নিভিয়া গিয়া, তুষার-শীতল হইয়া আসিল। তার পর আর আমি কিছুই জানি না। যখন জ্ঞান হইল, যেন শুনিতে পাইলাম, অনেক লোকের চলাচল ও আগমন। কে যেন অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "খুন"। আবার কে যেন বলিল "পুলিশ" "হাজত"। কে যেন বলিল "স্বেচ্ছাকৃত খুন—বিচার—ফাঁসী"। সবই যেন কত দূর থেকে আমার কর্ণে ভাসিয়া আসিতে লাগিল,—এমনই অস্পষ্ট কথাবার্ত্তা ও চলাচল তাহাদের। নিজে আড়ষ্ট ভাবে পড়িয়া আছি,—হাত-পাগুলি পাথরের মত ভারী হইয়া গিয়াছে, বুকের উপরেও যেন একটা বিষম ভার চাপান রহিয়াছে;—যেন তাহাতে দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। তবু শক্তি নাই একতিল উঠিবার, কি তাহা সরাইয়া ফেলিয়া দিবার, কিম্বা মুখ ফুটিয়া কাহাকেও ডাকিবার।

মনে হইতে লাগিল,—যাহা ছুড়িয়া মারিয়াছিলাম, জানি না তাহা কোথায় তাহার লাগিয়াছে,—তবু তাহাতেই তাহার অপদার্থ জীবনের শেষ হইয়াছে! এই রকম কষ্টকর ভাবে নিশ্চল হইয়া পড়িয়া থাকিলেও, মন যেন আমার এক অদ্ভুত তৃপ্তিতে ভরিয়া গিয়াছে। মনে হইল, সকলে ভাবিতেছে, এ ইচ্ছাকৃত খুন। আমি খুনী; আমি অপরাধী; আমার ফাঁসী হইবে। জানিতাম, ইচ্ছা করিয়া খুন করি নাই; কিন্তু লোকে যদি তাই ভাবে, ভাবুক। তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র লজ্জা নাই। ফাঁসী হইবে, হউক,—তাহাতে যেন আমার বিন্দুমাত্র ভয় নাই। আমার দেবীর প্রাণ-রক্ষার্থ, মান-রক্ষার্থ যদি এই অপদার্থ জীবনটা আহুতি দান করিতে পারি, তবে তো আমি ধন্য, আমি কৃতার্থ।

যেন জীবনের পরম সফলতা লাভ করিবার একটা আনন্দের উচ্ছ্বাসে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, যদি মনে-মনে ভালবাসিয়াও তাহার কাছে অপরাধী হইয়া থাকি, তা'হলে আজকার এ জীবন-আহুতিতে তাহার সব দোষ স্ফালন হইয়া যাইবে।

আবার শুনিলাম, "পুলিশ, পুলিশ, ডাক্তার"। মনে হইল, কে যেন সহস্র তুষার-শীতল বাহু বাহির করিয়া, আলিঙ্গন করিয়া, আমাকে গ্রাস করিতেছে। নানাবিধ উত্তেজনায়, দুর্ব্বল মস্তিষ্কে আবার গভীর অন্ধকারে তলাইয়া গেলাম।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, মনে হইল, বিছানা থেকে নামিয়া চৌকাঠের উপর মাথা দিয়া পড়িয়া আছি,—চারিদিকে শোঁ-শোঁ করিয়া বাতাস বহিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিতেছে—সারা-রাতের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া। বারান্দা দিয়া খোলা দরজার পথে জলের ঝাপটা আসিয়া, আমাকে প্রায় ভিজাইয়া দিবার উপক্রম করিতেছে। ভোরের ট্রেনে ফিরিয়া আসিয়া দাদা, শুনিলাম, আমাকে ডাকাডাকি করিতেছেন, "কি রে, ঠাণ্ডায় ভিজে, ও-ভাবে চৌকাঠের ওপর মাথা রেখে পড়ে আছিস কেন? ওঠ, ওঠ,—অসুখ করবে।"

কাঁপিতে-কাঁপিতে উঠিয়া বসিলাম। গতরাত্রের স্বপ্নের

ঘোর তখনও আমাকে ঘিরিয়া আছে। যত না বৃষ্টির ঝাপটায় —তাহার বেশী উত্তেজনার স্বেদে, তখনও আমার সমস্ত দেহ ভিজিয়া গিয়া কাঁপিতেছে।

কাল রাত্রের ঘটনা সবই স্বপ্নের মধ্যে ঘটিয়াছে জানিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেও, যতই স্বপ্নের কথা মনে পড়িয়া যাইতে লাগিল, ততই এক অদ্ভুত অবসাদ ও অতৃপ্তিতে আমার মন সারাদিন ভরিয়া রহিল। সারা-দিন একা-একা এই ব্যাপার লইয়া অনেক ভাবিলাম। তার পর রাত্রে দাদা বাসায় ফিরিলে পর, তাঁহার নিকট আস্তে আস্তে গিয়া বলিলাম, "কিছুদিনের জন্যে আমায় দেশে পাঠিয়ে দিন।"

দাদা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর সস্নেহে আমার পিঠের উপর হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন, "কেন রে, তোর বুঝি এখানে একা-একা আর ভাল লাগছে না? আমিও তাই ভাবছিলুম, তোকে এনে এখানে একেবারে খাঁচায় বন্দী করেছি। এ পরের চাকরীর ঝঞ্ঝাটে তোকে তো আমি দেখ্‌তে-শুনতেও পারি না। তা'ছাড়া, শুধু চাকরীর দোহাই দিলে চলবে কেন,—আফিসের পর সন্ধ্যেবেলা এ বদ্ধ ঘরে আমারও মন টিঁকে না—তাই এক পাশার অড্ডা জুটিয়েছি। তার এম্নি নেশা হয়েছে যে, রোজ না গেলেই নয়—তোর কথা তাই একটুও মনে থাকে না। সেই সকালে তো বার হই; আর কত রাত করে ফিরি—তোর একা-একা লাগা আর আশ্চর্য্য কি। আর ভগবান্‌ও তোকে এমনি মেরে রেখেছেন যে, একটু এধার-ওধার যাবি, বেড়াবি, বন্ধু-বান্ধব জোটাবি, তারও তো যো নেই। তাই ভেবেছিলুম, তোর দেশেও যা, এখানেও তা। সেখানেও তা তোর কেউ সাথী তেমন ছিল না। এদিকে বাড়ীতে বুড়ো মামি-মা একা কন্নবান্ন-খাটবার লোক—বুড়ো মানুষ তোকে নিয়ে ঝঞ্ঝাটে পড়ে সামলাতে চাইতেন না; গজ-গজ করতেন। তাই তো তোকে এখানে আনাই। এবার ঠিক করেছি, তোর বৌদিদিকে দেশের বাড়ীতে রাখব। তা'হলে তুই অনায়াসে গিয়ে থাকতে পারিস। হীরু-মিণুও এখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে—তারাও তোর সঙ্গী হবে বেশ। তা'হলে দেখি,—এবার যেদিন শুনব, কেউ জানা লোক গাঁয়ে যাচ্ছে, তোকে তা হলে না হয় কদ্দিনের জন্যে পাঠিয়েই দেবখন"।—বলিয়া দাদা এক-মনে সিগারেট ফুঁকিতে লাগিলেন!

আর, আমার সমস্ত অন্তঃকরণ মথিত করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল, দুই অন্ধ চক্ষু জালা করিয়া যেন জল ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল। হায় দাদা! তুমি কি বুঝিবে এ কিসের উত্তেজনায়, প্রাণের গভীরতম নাড়ীর বন্ধন ছেদন করিয়া কেন আমি চলিয়া যাইতে চাহিতেছি। সে যে আমি নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না।

—

দার্জ্জিলিংএ

[শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু]

১

দার্জ্জিলিং ষ্টেসন। মেল আসিবার সময় হইয়া গিয়াছে। আসিতে কত দেরী হইবে ভাবিয়া, চঞ্চল হইয়া, সকলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নানা রংএর বেশ-পরিহিত কয়েকটি মেম তাহাদের বন্ধুদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য আসিয়াছে। তাহারা অনেকক্ষণ প্লাটফর্মে ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বেঞ্চে বসিতে আসিয়া দেখিল, প্রত্যেকটিতেই দুই-একজন করিয়া বাঙ্গালী বসিয়া আছে। বসিতে ইচ্ছা থাকিলেও বসিল না। কেবল একটি বেঞ্চে এক সাহেবী-পোষাক-পরা বাঙ্গালী যুবকের পাশে দুইটি মেম বসিয়া পড়িল।

যুবকটিকে একবার দেখিলেই চোখে লাগিয়া থাকে। হঠাৎ দার্জ্জিলিংএর ঘন কুয়াসায় দেখিলে, সাহেব বলিয়া ভ্রম হয়। দীর্ঘকায় না হইলেও শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট। খাঁড়ার মত উঁচু নাক প্রথমেই চোখে পড়ে। সেই উন্নত নাসিকার দুই ধারে সুতীব্র উজ্জ্বল দুটী ছোট চোখ,—তাহা দিয়া বুদ্ধির

জ্যোতিঃ করিয়া পড়িতেছে। মুখখানি ছোট হইলেও কপাল ও চোয়াল প্রশস্ত। দাড়ি-গোঁফ-কামানো মুখের প্রতি চাহিলেই মনে হয়, যুবকটি যেমন কাজের লোক, তেমি ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ও বুদ্ধিমান্। গায়ে খয়ের-রংএর গরম সুট,—মাথায় সুটের রংএর ফেল্ট হ্যাট; আকাশের নীল রংএর সার্টের ওপর রগরগে লাল টাই যেন উষা-সূর্যের আলোকধারা। যুবকটী অত্যন্ত অধীর হইয়া পেটেন্ট চামড়ার জুতার ওপর লাঠি দিয়া মৃদু আঘাত করিতেছিল। বাড়ীতে যেন কত কাজ পড়িয়া রহিয়াছে, ট্রেণটা আসিলে সে বাঁচে। কলিকাতা হইতে তাহার এক বন্ধু আসিবে—তাহাকেই লইয়া যাইতে আসিয়াছে; ভাবিয়াছিল, একজন চাকর পাঠাইয়া দিবে; কিন্তু প্রভাত তাহার ছেলেবেলার বন্ধু,—দুই তিনখানি চিঠি লিখিয়া তাহাকে আনাইতেছে;—তার পর বাড়ীতে বসিয়া থাকিলে প্রভাত তাহাকে হয় ত এমন ঠাট্টা করিবে যে সে সহিতে পারিবে না।

অস্থির চিত্তে রণেন চারিদিকের লোকজনের প্রতি চাহিয়া দেখিতে লাগিল। প্রতি মেমের সাজ অন্য মেমদের হইতে তফাৎ; এক রংএর গাউন পরা, এক রকমের পেটি-কোট পরা দুইটি মেম খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। যিনি যত কুরূপা, তাঁর সজ্জায় তত রংএর ছড়াছড়ি। এক বাঙ্গালী যুবক লপেটা পায়ে দিয়া, আদ্দির পাঞ্জাবী পরিয়া, ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—অবশ্য ভেতরে গরম গেঞ্জি আছে। এক বৃদ্ধ স্বাস্থ্যকামী, গলাবন্ধ, র‍্যাপার, মোটা মোজা, ওভারকোট, শাল ইত্যাদি জড়াইয়া ভালুক সাজিয়া ঘুরিতেছেন। আর এক বাঙ্গালীর কাপড়ের ওপর হ্যাট মাথায়;—তবে গায়ে তাঁহার ওয়াটারপ্রুফ কোট আছে। কয়েকটি বাঙ্গালী ছোকরা খাকী সার্ট, খাকী হাপ-প্যাণ্ট পরিয়া, পায়ে মোটা বুটের ওপর পটি জড়াইয়া, ছোট বেতের ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, বাঙ্গালী যুবক কিরূপ স্মার্ট হইতে পারে, তাহার পরিচয় দিতেছে। এক কোণে সাহেবদের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েগুলি দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিতেছিল: তাহাদের হাসি-ভরা মুখ-গুলির দিকে চাহিয়া রণেন বসিয়া রহিল।

ছেলেদের সরল আনন্দময় হাসি ছাপাইয়া দার্জ্জিলিংএর ছোট রেলের ঝক্‌ঝক্ শব্দ কাণে আসিয়া বাজিল। সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কুলী-রমণীদের থ্যাবড়া মুখ যেন আশায় ভরিয়া উঠিল; ছোট-ছোট চোখ জ্বল-জ্বল করিতে লাগিল। রণেন হ্যাটটা ঠিক করিয়া লইয়া, প্যাণ্টের পকেট হইতে গোলাপী সিল্কের রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিয়া, লাঠি দিয়া ষ্টেসনের মেজে দুইবার ঠুকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ট্রেণ আসিয়া প্লাটফর্মে ঢুকিল;—হুড়াহুড়ি, চেঁচামেচি, জড়াজড়ি পড়িয়া গেল। সাহেব, মেম, বাঙ্গালী সাহেব, বাঙ্গালী বাবু, বাঙ্গালী মেয়ে, ভুটিয়া কুলী, বয়, খানসামা, সকলের ভিড় হইতে কিছু দূরে পিছনে দাঁড়াইয়া, তীক্ষ্ণ চোখ দিয়া ট্রেণের প্রতি গাড়ীর দিকে চাহিয়া, রণেন তাহার বন্ধুর সন্ধান করিতে লাগিল। কিছু আগে এক সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্ট-মেণ্টে এক প্রশান্ত উজ্জ্বল স্নিগ্ধ মুখ দেখিয়া কয়েকটি সাহেব ও কুলী রমণী ভিড় ঠেলিয়া সেই দিকে ছুটিল।

ট্রেণ থামিল। এক সুপুরুষ যুবক স্নিগ্ধ হাসিয়া, গাড়ী হইতে বাহির হইয়া, রণেনের হাত জড়াইয়া ধরিল। যুবকটি রণেনের চেয়ে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বড়; মাথার মাঝখানে টেরী কাটা; দুই পাশে কালো কোঁকড়ানো চুল ঝুলিয়া পড়িয়াছে। মুখখানি ভরা, গোলগাল, অতি স্নিগ্ধ। নাক রণেনের মত সরু ও উঁচু না হইলেও, বেশ সুন্দর। দীর্ঘপল্লবঘন দুই চক্ষু অতি মিষ্টি চাহিয়া আছে। গায়ে দুধের মত সাদা ফ্লানেলের পাঞ্জাবী; দেশী ধুতির ওপর গেরুয়া রংএর লাল শাল জড়ানো; মোজাহীন পায়ে কালো পম্প-সু।

রণেনের চাকর গাড়ী হইতে হাতব্যাগ, ছড়ি, ছাতা, বর্ষাতি সব বাহির করিয়া, লগেজের রিসিটের জন্য দাঁড়াইয়া রহিল।

রণেন বলিল, 'তা হলে সত্যি এলে দেখছি। তিনখানা চিঠি লিখতে তবে আসা হোল। কৈ, ওভার-কোটটা গায়েও দাও নি!'

'কৈ, পথে শীত ত কিছুই করে নি। ঘুমের কাছে আসতে একটু হী-হী করেছিল। তখন শালটা জড়ালুম।'

'নঃ, শীত কৈ! তবে ৫৭ ডিগ্রি টেম্পারেচার। দাও, তোমার লগেজের রিসিটটা।'

'হাঁ, এই নাও রিসিট—ও, কার্সিয়াংএ খুব ব্রেকফাষ্ট খাওয়া গেছে। তা তোমার চাকর ঠিক নিয়ে যেতে পারবে ত? বড় দরকারী লগেজগুলো আছে।' 'আচ্ছা, আসছ ত একজন —ক'দিনের জন্য; দশটাকা কি বলে লগেজ চার্জ্জ হয়?' 'ভাই, একগাদা বই আছে,—আর সেই বড় ক্যামেরাটা—

তুমি বল্বে, লাইব্রেরী ঘাড়ে করে আন্‌ছি ; ভাই, কল্‌কাতায় যা গরম, কিছু লেখাপড়া কর্‌বার জো নেই—তাই বইগুলো নিয়ে এলুম।'

'ও, এই জন্যে বুঝি আসা হোল'।'

'না ভাই,—তুমি এত করে লিখলে, আর আস্‌বো না! তোমায় কত দিন দেখি নি বল তো। তবে জান তো—আমার সে থিসিস্‌টা এ বছরের মধ্যেই শেষ করতে হবে।'

রণেন লগেজের রিসিট চাকর বাহাদুরের হাতে দিয়া, অতি সাবধানে যেন সব জিনিষ লইয়া যায় বলিয়া, তাহার বন্ধুকে লইয়া ষ্টেসন হইতে বাহির হইল। Prestage রোড দিয়া দুইজনে উঠিতে লাগিল।

প্রভাত বলিল, 'তোমাদের বাড়ী ত অনেক দূর, ঠিক মনে পড়ছে না,—কত বছর আগে এসেছিলুম।'

'হাঁ, কিছু দূর বটে। এ রাস্তাটা একটু উঁচু। দেখ্‌ছো, কেমন পরিষ্কার ছিলো, তুমি এলে, আর চারিদিক ফগে ভরে আস্‌ছে—ঠিক বিষ্টি হবে। কাঁদাবে আর কি।'

'ভালই ত হে।'

'ফগই ত ভাল। তা তুমি এবার এম-এ দিচ্ছো? গেল বছরই ত লেকচার কম্‌প্লিট্ হয়ে গেছলো,—এবার দিলেই পার। একা ত আছ—পড়া শুনা কিছু হচ্ছে?'

'তোমার কি বল না—ফাষ্টক্লাস এম-এসসি হয়ে বসে আছ—সবাইকে advice gratis দিচ্ছো। ইংরাজীতে এম-এ পড়া কি বাবুগিরি জানো না ত।'

প্রভাত একটু অপ্রতিভ হইয়া, কথাটা ঘুরাইয়া লইবার জন্য বলিল, 'তোমাদের বাড়ীতে একটা বড় hot-house ছিলো না—আছে?'

'হাঁ আছে। তবে সেটাকে যে যত রকমের গাছ, পাথর, পাতা, শেকড়, মাটি এনে ভরিয়ে তোমার মিউজিয়াম করবে, তা হবে না।'

'কিন্তু ভাই, ওই জন্যে আমায় একটা ঘর ছেড়ে দিতে হবে। তোমাদের বাড়ী ত মস্ত ; আর যখন বল্‌ছো, আর কেউ নেই।'

'একদিকে একজনেরা ভাড়ায় আছে—সুন্দর family।' কথাটা বলিতে, রণেনের মুখ চাপা হাসিতে, আনন্দে ভরিয়া গেল!

'আর একদিকে তুমি একা?'

'তবে সে দিকটায় সব সময়ে বড় থাকি না।' বলিয়া আবার মৃদু হাসিল, রুমাল দিয়া মুখ মুছিয়া লইল। প্রভাত অত লক্ষ্যই করিল না। রণেন চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না,—মৃদু হাসিয়া বলিল, 'আমাদের বাড়ীতে যাঁরা আছেন, বুঝলে, খুব interesting পরিবার।'

'কোন মেয়ে আছেন বুঝি, গায়িকা—সুন্দরী কি বলো'?

'বা—তুমি যে সেই—তোমায় চোখে দেখার আগে তোমার স্বপন চোখে লাগে—এখন বেদন না জাগলেই বাঁচি' —এক মিষ্টি গলার মিষ্টি সুর রণেনের কাণে বাজিতে লাগিল।

'কিন্তু ভাই, আমার থিসিসের খানিকটা লিখ্‌তেই হবে—অন্ততঃ আউট্‌লাইনটা। এখন গিয়েই সবাইয়ের সঙ্গে ভাব কর্‌তে পার্‌ছি না'।

'বইগুলো মিছেই বয়ে নিয়ে এলে। আমায় লিখে জানালে, আমি সদুপদেশ দিতুম। ও বাক্স-বন্দীই থাক্‌বে, বলে রাখছি'।

'না ভাই, তা হলে মোটেই চল্‌বে না। এ কাজটা না সেরে ফেল্লে, সাগর-পাড়ি দেবার কোন চেষ্টা কর্‌তে পার্‌ছি না'।—

'কিন্তু, তুমি ওই মাটি আর পাথরের মধ্যে কি রস পাও জানি না। আমায় ত হাজার টাকা দিলেও ওই পাথরগুলোর নাম মুখস্থ করতে পার্‌তুম না'।

'সে যা'হোক—আপাততঃ আমি তোমার তরুণী বন্ধুদের সঙ্গে ভাব করতে পার্‌ছি না। তুমি একাই জমিয়ে রেখেছো, বুঝ্‌ছি। আমায় এখন গোড়ায় কিছুদিন ছুটি দাও। কল্‌কাতায় গরমে ত লিখ্‌তে-পড়্‌তে পার্‌তুম না—চুপচাপ শুয়ে ভেবেছি। সেই আইডিয়াগুলো, যত শীগ্‌গীর পারি, লিখে ফেল্‌তে হবে।'

'আচ্ছা দেখা যাবে কত আইডিয়ার ঠিক থাকে'—

'আর কতদূর হে—এ ত West Pointএর কাছাকাছি এলুম।'

'আর মিনিট তিন।'

২

কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুই বন্ধু বাড়ীর গেটে আসিয়া পৌঁছিল। অক্‌ল্যাণ্ড রোডের ওপর বেশ বড় একখানি

বাড়ী—টিন, কাট আর কাচের তৈরী। বাড়ীতে ঢুকিবার আঁকাবাঁকা পথের দুইধারে পাইন গাছের সারি,—নিস্তব্ধ প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া;—একটু বাতাস বহিতেই সন্‌সন্‌ শব্দে ধ্বনি করিয়া উঠিল। পাইন-গাছের তলায়-তলায় ফুলের ঝাড়,—তারার মালার মত ফুলগুলি দুলিয়া-দুলিয়া উঠিল। বাড়ীর ঠিক সম্মুখের জায়গায় যেখানে কসমস, মারগারেট, ডেসি, আইভি—নানা ফুল রংএর হোলি-খেলা খেলিতেছে,—প্রভাত অবাক হইয়া সেখানে দাঁড়াইতেই, একটা গান কাণে আসিয়া বাজিল,

"কবে তুমি আসবে বলে আমি রইবো না বসে ;
আমি চল্‌বো বাহিরে, শুকনো ফুলের পাতাগুলি
পড়্‌তেছে খসে।"

বাড়ীখানি দুইটি পরিবারের থাকিবার মত দুইভাগে ভাগ করা,—চারিদিক ঘিরিয়া কাচে-ঘেরা বারান্দা। ঢুকিবার দুইটি পাশাপাশি দরজা। দক্ষিণের অংশটায় এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া আছেন। বামের দিকটায় রণেন আছে। প্রবেশের দুই দরজার মাঝখানে একটা বড় গোলাপ ফুলের গাছ, আগুনের শিখার মত রাঙা ফুলে-ভরা গাছের ঝাড়—দরজা দুইটির উপর নিকুঞ্জ রচনা করিয়া, টিনের চালে উঠিয়া গিয়াছে। গাছের তলা একদল স্নোপ্ল্যাণ্ট দিয়া ঘিরিয়া সাজানো। দুই দরজার দুইদিকে দুইটি ডালিয়ার গাছ।

রণেন ধীরে ডানদিকের দরজার দিকে একটু অগ্রসর হইয়া থামিল। প্রভাত, নিবিষ্ট মনে গান শুনিতে-শুনিতে রণেনকে ছাড়াইয়া একেবারে দরজার গোড়ায় আসিয়া পড়িল : দেখিল, সম্মুখের বারান্দায় এক কোণে বসিয়া একটি মেয়ে গান গাহিতেছে। প্রভাত অতি লজ্জিত হইয়া, পাশের দরজার দিকে দৌড় দিল। রণেন যে এ কাণ্ডটা ইচ্ছা করিয়া ঘটাইয়াছে, তাহা ভাবিয়া ভারী রাগিয়া উঠিল। হঠাৎ গান থামিয়া গেল। এক সরল, মিষ্ট হাসির শব্দ তাহার কাণে আসাতে, সে রাগ কোথায় চলিয়া গেল। হাসি তাহাকেই লইয়া। রণেন নির্দ্দোষ ভালমানুষের মত তাহার পেছনে ঘরে ঢুকিতেই, সে কি ধমক দিবে ভাবিতেছিল,—আবার সেই হাসি ও কথা কাণে আসাতে, সব গুলাইয়া গেল। রণেন মৃদু হাসিয়া, তাহার দিকে চাহিয়া, ভিতরের ঘরে ঢুকিয়া গেল। পাশের বাড়ী হইতে কতকগুলি কথা বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া প্রভাতের কাণে মধুর সুরে বাজিতে লাগিল।

'ছি শুকু, অমন করে হাস্‌তে হয়।' 'বা, হাস্‌বো না বুঝি! তবে কাঁদি,—কাঁদ্‌বো? কাঁদি মা?' 'চুপ কর একটু, শুকু একটু ঘুমোগে যা না—পাড়া একটু জুড়োক্‌—আর বাজনা নিয়ে প্যান-প্যান করিস্‌ নে।' 'বাজনা তোমার ভালো লাগে না বুঝি—বা! বাজনা ভালোবাস্‌তেই হবে,—আমি বাজাবো,—বাজাবো;—যতক্ষণ না বল্‌বে বাজনা ভালবাসি, ততক্ষণ বাজাবো—ছাড়্‌বো না'। 'আচ্ছা বাপু, বাজনা আমার খুবই ভাল লাগে।' এখন একটু বন্ধ কর,—'আমাদের প্রাণটা যে যাচ্ছে।'—'এই বন্ধ কর্‌লুম—হা—হা। আচ্ছা, কলেজের মেয়েগুলো কি ছোটলোক, বাবা! রোজ চিঠির জন্যে প্রতীক্ষা করছি—আর একদিন একজনও চিঠি দিলে না! আস্‌বার সময় কত ঢং,—এ বলে চিঠি দেবো, ও বলে চিঠি লিখো। আমি কিন্তু স্পষ্ট বলে এলুম, আমি ভাই কাউকে চিঠি দিতে পার্‌বো না,—ও-সব ভাই আমার আসে না। তবে তোমরা যদি চিঠি কেউ না দাও, ভারি রাগ কর্‌বো। আচ্ছা, রণেন বাবু বন্ধুটিকে নিয়ে কেমন আমাদের বাড়ী তুলছিলেন দেখ্‌ছিলে।—আচ্ছা মা, বড় টেবিলটা পরিষ্কার কর্‌বো, তা'তে বক্‌বে না ত—বেশ, দিদি এত নোংরা 'কর্‌তে পারে—

'এত্তা বড় টেবিল মে এত্তা জঞ্জাল
হরদম্‌ লাগাতে ঝাড়ন্‌ তব্‌বি এসা হাল।'

কিছুক্ষণ পরে যখন দুই বন্ধুতে চায়ের টেবিলে বসিল, রণেন আড়-চোখে প্রভাতের গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। প্রভাত ঠিক করিয়াছিল, পাশের বাড়ীর পরিবারের কোন কথা কহিবে না, বা তুলিতে দিবে না। কোন্‌ ঘরটায় শুইবে, কোন্‌ ঘরটায় পড়িবে, কোন্‌টায় লাইব্রেরী করিবে, মনে-মনে তাহারই মতলব আঁটিতেছিল। দ্বিতীয় বার চা ঢালিতে, আবার কোন হাসির ধ্বনিতে অভিভূত হইয়া পড়িল। চায়ে চিনি না দিয়াই খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

রণেন বলিল, 'ওহে, অত তাড়াতাড়ি কেন,—ও কেকটা খাও;—দেখো, মেয়েটি বেশ—এত সরল।'

'আচ্ছা, তোমায় আমি কিছু জিজ্ঞেস করেছি?'

'মুখেই না হয় করছো না—কিন্তু মনে-মনে? সত্যি বলো। আর, ওঁর বাবা এত ভদ্রলোক—perfect

gentleman—পরিবারের সবাই এত আমুদে।' 'তুমি সারাদিন ওই বাড়ীতেই থাকো, বুঝতে পারছি।'

'তা, তুমি কি বল্‌তে চাও, ওঁরা কত হাসি-গল্প করবেন, আর আমি এখানে নির্জ্জন কারাবাসে interned হয়ে থাক্‌বো? তুমি হয় ত তাই থাক্‌তে চাও।'

'আমায় তাই থাকতেই হবে'।

'আচ্ছা, তোমার বইয়ের শক্সটা কলকাতায় ফেরৎ পাঠিয়ে দিচ্ছি'।

'তুমি তা বলে, কি বলে আমায় ওঁদের বাড়ী ঢোকাচ্ছিলে?'

'নিজেই গানে মুগ্ধ হয়ে ঢুকছিলে—আবার আমায় দোষ। কাউকে ঠিক দেখতে পেলে? শুধু একটা লাল জ্যাকেট'।

'কি যা-তা বলিস—চুপ্', কিছুক্ষণ থামিয়া, শূন্য চায়ের কাপে চামচ নাড়িতে-নাড়িতে প্রভাত আবার বলিল, 'কলেজে পড়েন বোধ হয়'?

'হাঁ, চুপ—থার্ড-ইয়ারে পড়েন—কৈ আর কিছু প্রশ্ন করছো না—চুপ্'।

'কজন আছেন ওঁরা'?

'কজন? মিষ্টার রায়, তাঁর স্ত্রী, দুই মেয়ে, একছেলে; আর মিষ্টার রায়ের এক শালা। জলটা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আর এক কাপ যদি ঢালতে চাও, ঢেলে নাও।'

'ছোটটিই বুঝি গান গাইছিলেন?'

'বা—ঠিক ধরেছো। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ও, কত চিনি ঢাল্‌ছো? দ্বিতীয় কাপে চিনি দাও নি—তাই বুঝি পুষিয়ে নিচ্ছো? ওই তোমার সব লগেজ এসে পড়েছে। তোমার তা-হলে ওদিকের সব-শেষের ঘরটা চাই—যেন একটুও হাসি গান না পৌছতে পারে—আচ্ছা।'

'তোমার বোধ হয় ও-বাড়ীতে এখন একটু যেতে হবে'?

'আচ্ছা গো, আচ্ছা'।

রণেন উঠিয়া প্রভাতের জন্য ঘর ঠিক করিয়া দিতে গেল। প্রভাত সেই ঠাণ্ডা চা আর অর্দ্ধভুক্ত কেকের সম্মুখে বসিয়া, মিষ্টি হাসি ও গলার সুর শুনিতে লাগিল।

চোখের চাউনির যেমন এক যাদু-শক্তি আছে, গলার স্বরের তেমি এক মন্ত্রশক্তি আছে। মানুষের স্বভাব, তার আত্মার পরিচয়—তাহার গলার সুরে বোঝা যায়। এ যেন তার অন্তরের সঙ্গীত। যদি সে মন বেসুরে বাধা থাকে, তাল কাটিয়া যাইবে, ঝঙ্কার কিছুতেই উঠিবে না।

প্রভাত এ মেয়েটিকে দেখে নাই,—কেবল তাহার হাসি, তাহার গলার সুর, কথার আওয়াজ শুনিয়াই যেন তাহার সহিত নিবিড় ভাবে পরিচিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার মনের অবস্থাটা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।...এই সব ভাবনা হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য, সে কিছু না খাইয়া, লগেজ খুলিবার জন্য উঠিয়া চলিয়া গেল।

৩

প্রভাত যখন লগেজ খুলিয়া জামা, কাপড়, বই গুছাইতে বসিল, রণেন তখন রায়েদের বাড়ীতে। সে দরজা খুলিয়া ঢুকিতেই, মিষ্টার রায়ের ছোট মেয়ে শকুন্তলা সরল হাসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, 'কৈ, আপনার বন্ধুটি?'

'সে এখন বই গোছাতে বসেছে।'

'বই চাপা পড়ে যেন মারা না যান— বেশ ত আমাদের বাড়ী আস্‌ছিলেন।'

মিসেস্ রায় কালো 'র‍্যাগে' অর্দ্ধদেহ ঢাকিয়া, সোফায় হেলান দিয়া বসিয়া, টুর্গেনিভের একখানা নভেল পড়িতে-ছিলেন,—রাগান্বিত স্বরে বলিলেন, 'শুকু!'

মিষ্টার রায় কালো ওভারকোট মুড়ি দিয়া, সেদিনকার খবরের কাগজ দেখিতেছিলেন; হাসিয়া বলিলেন, 'এস রণেন! তোমার বন্ধুটি বুঝি বিশ্রাম করছেন?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

শকুন্তলা চায়ের টেবিল সাজাইতেছিল। পাশে বয় দাঁড়াইয়া ছিল। নিজেই সে সব পেয়ালা প্লেট রাখিতেছিল। টেবিলের মাঝখানে এক বড় ক্যাক্টাস ঘিরিয়া, জিরেনিয়াম, আইভি, ফার্ণ জড়াইয়া এক সুন্দর ফুলের তোড়া। রোজ রণেন নিজে আপনার হাতে ফুল তুলিয়া, তোড়া বাধিয়া মালিকে দিয়া পাঠাইয়া দেয়। আজ তাড়াতাড়িতে ভুল হইয়া গিয়াছে। শকুন্তলা সরল চোখ দিয়া একবার ফুলের তোড়ার দিকে চাহিল। রণেন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতেই বলিল, 'চাটা খেয়ে যান।'

'আমি এই যে খেয়ে এলুম।'

'বা! তা কি জানি,—রোজ আমাদের সঙ্গে খান,—আজও খেতে হবে।'

মিষ্টার রায় বলিলেন, 'ও কি শুকু, উনি এই যে খেয়ে আস্‌ছেন।'

যতীনমামা পাশের ঘরে লেপ-মুড়ি দিয়া পড়িয়া ছিলেন। চায়ের গন্ধে উঠিয়া আসিয়া, দুষ্টামি-ভরা চোখে রণেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'তা রণেনবাবু আর এক কাপ পারবেন,—খুব পারবেন।'

মিসেস্ রায় বলিলেন, 'কেন জোর করে খাওয়ানো!'

যতীনবাবু বলিলেন, 'জোর কে কর্‌ছে,—উনি নিজেই বল্‌লেন,—চা না-খেয়ে উঠছেন না।'

'যতীন মামার সব সময়েই ফাজ্‌লামি!' বলিয়া শকুন্তলা তার দিদির পরে দিদি ও ছোট ভাই লাবুকে বেশ জ্বালাতন করিয়া তুলিতে গেল।

যতীনবাবু সহাস্য মুখে বসিয়া, নিজের কাপে চা ঢালিয়া, রণেনের সম্মুখের কাপে একটু চা ঢালিয়া, যেন শিহরিয়া উঠিলেন। বড় কেট্‌লি টেবিলের মাঝখানে রাখিয়া, অভিনয়ের স্বরে বলিলেন, 'ও খুড়ি—খুড়ি,—বড় ভুল হয়ে গেছে,—ক্ষমা করবেন। অ শুকু, চা দিয়ে যা না?'

মিষ্টার রায়, একটু হাসিলেন। মিসেস্ রায়ও লুকাইয়া হাসিলেন। দিদি দরজার আড়াল হইতে উচ্চ স্বরে হাসিয়া উঠিলেন। আর শকুন্তলা মুখ রাঙা করিয়া, ধীরে তাহার বাবার কাপে চা ঢালিতে আরম্ভ করিল।

'দাও মা, রণেনের কাপেও চা ঢেলে দাও। তোমার বন্ধু কি করেন, রণেন?'

'এম্-এস্‌সি পাশ করে বসে আছেন।'

'কি বিষয়?'

'জিয়লজি। তবে বোটানিও খুব ভালো জানেন।'

শকুন্তলা রণেনের কাপে তাড়াতাড়ি চা ঢালিয়া, একটু চিনি দুধ দিয়া কোনমতে চা করিয়া দিয়া, নিজে চা ঢালিয়া খাইতে বসিয়া গেল।

যতীনবাবু গম্ভীর ভাবে আড়-চোখে রণেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'দেখুন ত, আপনার চিনি কম হয়েছে কি না—লাবু চিনিটা এগিয়ে দে ত।' তার পর শকুন্তলার দিকে হাসিয়া চাহিলেন। সে চাউনির মানে এই যে, শকুন্তলার হাতের চায়ে কি রণেনের চিনি কম লাগিতে পারে!

রণেন কিন্তু দুষ্টামি করিয়া বলিল, 'একটু কম হয়েছে।'

যতীনবাবু যেন অতি দুঃখের স্বরে, অভিনয়ের স্বরে বলিলেন, 'ও আমি যে চা-টুকু ঢেলেছিলুম, সেটুকু বুঝি আর কিছুতেই মিষ্টি হচ্ছে না' বলিয়া যেন অতি আবেগের সহিত চিনির পাত্র রণেনের দিকে আগাইয়া দিলেন। শকুন্তলা মনে-মনে চটিয়া, এর প্রতিশোধ কিরূপে লওয়া যাইবে, তাহাই ঠিক করিতে লাগিল।

অর্দ্ধেক চা খাইয়া শকুন্তলা বড় প্লাম-কেক কাটিতে বসিল। বাবা, মা, দিদি, যতীনমামাকে দিয়া, রণেনের দিকে চাহিল।

রণেন বলিল, 'না, আমার আর দরকার হবে না।'

যতীনমামা বলিলেন, 'দাও—দাও, খুব ধর্‌বে,—শাকের উপর বোঝার আঁটি।'

শকুন্তলা রণেন ও লাবুকে দুইটি ছোট অংশ দিয়া, নিজের জন্য প্রায় কিছুই না রাখিয়া, একখানি বড় খণ্ড আবার যতীনবাবুকে দিল।

'আ, আমার কি সৌভাগ্য, এম্নি রাগ করে,—রোজ দু'খানা করে দিও।'

'দেখো না মা—যতীনমামা কি করছে?'

'আ যতীন,—শুকু একটু শান্ত হ!'

'আচ্ছা, আমি কতক্ষণ চুপ করে আছি, বল তো,—কতক্ষণ দুষ্টামি করি নি—দেখ লাবু, কি সুন্দর ওখানটায় ফগ কেটে যাচ্ছে—কি সুন্দর নীলপাখী!'

লাবু বাহিরের দরজার দিকে কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া তাকাইয়া, নীলপাখীর কোন সন্ধান না পাইয়া, যখন প্লেটের দিকে চাহিল, দেখিল, তাহার দু'খানি ক্রীম-রোল কোথায় অন্তর্দ্ধান করিয়াছে।

'মা—ছোটদি—' বলিয়া সে গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

'আ—শুকু'—

শকুন্তলা তখন এক গানের পদ গাহিতেছিল,—

'গরম গরম চা, তাতে প্লামকেক, তাতেও নাইক অরুচি'—

'কি মা—বা! আমি কি জানি? সে ত নীলপাখী পেছন দিয়ে নিয়ে গেল!'

ছোটদিদির গান শুনিয়া, লাবুও চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না,—ক্রীমরোলের শোক ভুলিয়া সে গাহিয়া উঠিল,—

'গরম গরম চা, তাতে ক্রীমরোল তাতেও নাইক অরুচি—মাংসের রোষ্ট, জেলি আর টোষ্ট, পোলাও কালিয়া খাবো জি'—

মা, একদিন পোলোয়া খাবো?'

'চুপ্—লাবু, একেবারে চুপ্।'

'বা—আমার ক্রীমরোল্?'

'শুকু দাও, ওর কেক দাও—'

'বা, আমি কি জানি না? ও কেন আমার বই লুকিয়েছে?'

'আমি লুকিয়েছি বুঝি?'

'ছি, লাবু, মিথ্যে কথা বল্‌বে না,—মিথ্যে কথা বল্‌তে নেই। বলো, আমি লুকিয়েছি, দোবো না। লুকোইনি বোলো না।'

'সে বুঝি আমি লুকিয়েছি! ছোটদি, যতীন-মামা ত আমায় লুকুতে বল্লে!'

অতি নিরীহ ভালোমানুষের মত চাহিয়া, আশ্চর্য্য হইয়া, যতীনবাবু বলিলেন, 'আমি?' তিনি যেন কিছুই জানেন না।

শকুন্তলা ইসারা করিয়া বলিল, 'লাবু, যতীন মামার ঐ পকেটে।' লাবু লাফাইয়া উঠিয়া, যতীনমামার পকেটে হাত দিতেই, সত্যই—দুইটি নয়, চারিটি—ক্রীমরোল বাহির হইয়া পড়িল। কিরূপে যে এতগুলি আসিল, তাহা যতীনমামা নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

মিসেস্ রায় বেশ আমোদ উপভোগ করিয়া বলিলেন, 'হাঁ যতীন, কেক চুরি?' মিষ্টার রায় বলিলেন, 'শালা চোর'। যতীনবাবু সত্যই ধৃত-চোরের মত মুখ করিয়া, লজ্জায় অধোবদন হইয়া, অভিনয়ের চূড়ান্ত করিলেন।

চা খাওয়া শেষ হইলে, রণেন তাড়াতাড়ি উঠিয়া, বাগানে গিয়া একটি তোড়া অতি সুন্দর করিয়া বাঁধিয়া, শকুন্তলাকে দিয়া বন্ধুর সন্ধানে চলিল।

বাড়ী ঢুকিয়া রণেন দেখিল, প্রভাত সত্যই একটি লাইব্রেরী সঙ্গে আনিয়াছে। তাহার বইয়ের বড় আলমারি ভরিয়া গিয়াছে। বই সাজাইয়া, ঘরের জিনিষ-পত্র সাজাইয়া, প্রভাত বিছানায় মুখ বুজিয়া শুইয়া ছিল। শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া, রণেন তাহাকে ডাকিল না। তাহার দিকে চাহিয়া, মৃদু হাসিয়া, আপন ঘরে ঢুকিল। জুতা বদলাইয়া, একটা ভেলভেটের চটিজুতা পরিল। আয়নায় চুলটা ঠিক করিয়া নিল। তার পর দরজার সম্মুখে আসিয়া, গোলাপপুষ্প পর্য্যবেক্ষণে মন দিল।

যতীনবাবু তাহাকে অমন আনমনা ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ডাকিলেন, 'আসুন রণেন বাবু, এক দান তাস খেলা যাক্।'

বস্তুতঃ, রণেন এই ডাকটিরই প্রতীক্ষা করিতেছিল। তবে এইমাত্র আসিয়া, আবার রায়েদের বাড়ী যাইতে একটু সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। দ্বিতীয়বার ডাকিতে, সে পাশের দরজা দিয়া তাহাদের ঘরে ঢুকিল।

তাসখেলার পাণ্ডা ও ওস্তাদ যতীনমামা। বৃষ্টি-মুখর, কুয়াসাচ্ছন্ন, কর্ম্মহীন দিনগুলি কাটাইবার বেশ আমোদজনক উপায় বলিয়া, মিষ্টার রায়ও ইহাতে মজিয়াছেন। মিসেস্ রায় বড় খেলেন না। তবে দিদিমণি তাস পাইলে আর কিছু চান না। শকুন্তলার খেলাটা বড় ভালো লাগে না,—সে ভালো জানেও না। তবে খেলার দোষ ধরিয়া দিতে সে অদ্বিতীয়। খেলোয়াড় হওয়ার চেয়ে, সমালোচক হওয়ায় সুযোগ-সুবিধা বেশী বলিয়া সে সেইটি পছন্দ করে।

রণেন এক চেয়ারে বসিল। যতীন-মামা ডাকিলেন, 'শুকু, তাসটা কোথায়, দিয়ে যা।' পাশের ঘর হইতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উত্তর আসিল, 'আমি এখন কপি কুট্‌ছি—যেতে পারবো না। ওঁদের তাস কোথায়, জামা কোথায়, জুতো কোথায়, রুমাল কোথায়—সব শুকু জানে—কেন?'

তার পর রণেনের গলা শুনিয়া, হাসিতে-হাসিতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা, আপনি রাতে ভাত খাবেন, না লুচি? আমি তাসটাস কিছু জানি না বাপু। খেল্‌বেন ওঁরা,—আমি কখনও খেলেছি?'

রণেন নির্নিমেষ নয়নে শকুন্তলার হাস্য-রহস্যদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, 'আজ একটু খেল্‌বেন আসুন না?'

'না—দেখুন, আজ আমার এখন একটুও সময় নেই। মাছের তরকারি চড়িয়ে আসছি। কাল দুপুরে খেল্‌বো—আপনার বন্ধুকে নিয়ে আস্‌বেন।'

যতীনবাবু বলিলেন, 'হাঁ, তুমি আবার খেল্‌বে—ছাই!'

'আচ্ছা দেখো, কাল যদি না তোমাদের হারিয়ে দি—'

মিসেস্ রায় বলিলেন, 'বোস্ না শুকু একটু খেল্‌তে—আমি না হয় তরকারিটা দেখ্‌ছি গে—'

'না মা—তুমি বেশ আরামে পড়্‌ছো - কেন সুখে থাক্‌তে ভুতে কিলোয়। লাবু, আয় ত ভাই, আমায় একটু help কর্‌বি—না দিদি, তোমার মোটেই উঠ্‌তে হবে না—

হা—হা—বাবা দেখ্‌ছেন, বলি কালে-কালে কতই হোল্‌, পুলিপিঠের লেজ বেরোল!'

সরল মধুর হাসির তরঙ্গ সমস্ত ঘরে ছড়াইয়া দিয়া লালুকে টানিয়া লইয়া শকুন্তলা রান্নাঘরে চলিয়া গেল। রণেনের মন খেলায় তেমন বসিল না বটে, তবু সে মুখে হাসি লইয়া খেলায় বসিয়া গেল।

রণেনের মন যখন সাহেব, বিবি, গোলাম, টেক্কার লাল ও কালো রং ও রাজ্যে উড়িয়া গিয়া, পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল, প্রভাত তখন সোফায় চুপ করিয়া শুইয়া, তাহার বৈজ্ঞানিক থিওরির কথা ভাবিতেছিল। তাহার মন কত কোটি-কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর তরুণ বয়সের যুগে চলিয়া গিয়াছিল। তখন পৃথিবীতে কোন জীবের জন্ম হয় নাই। তখন এই গিরি-মণ্ডিতা, নদী-মেখলা শস্যশ্যামলা, জীবধাত্রী সমুদ্র স্তনিতা পৃথিবী এক অগ্নিপিণ্ড ছিল। কত লক্ষ-লক্ষ যুগ অহর্নিশি শূন্যপথে ঘুরিয়া, দেহের সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল; কিন্তু এখনও তাহার বক্ষে সে অগ্নি ধক-ধক জ্বলিতেছে। তার পর অগ্নি, জল, বাতাস,—জলেস্থলে কি ঘাতাঘাত সংগ্রাম! ভূমির বিভাগ হইল। পর্ব্বত-পুত্রদের একে-একে জন্ম হইল;—এই পাহাড়দের জন্মকথা, ধাতু দ্রব্যের সৃষ্টি কি রহস্যময়। ধীরে ধীরে জল ও ভূমির মিলন-তটে জীব-প্রাণের জন্ম হইল। সেই প্রাণ কত যুগ ধরিয়া, কত বৃক্ষ, লতা, পাতা—কত মৎস্য, পক্ষী, পশুর জন্ম দিয়া, কত অদ্ভুত, কত বীভৎস, কত ভীষণ, কত বিচিত্র রূপে আপনাকে বিবর্ত্তিত করিয়া, মানব-রূপে প্রকাশিত হইল। তার পর এই মানব-পৃথিবীর ইতিহাসই বা কি আশ্চর্য্যকর।

কত লাল, নীল, কালো, হল্‌দে পাথর-মাটির মধ্যে তাহার মন হারাইয়া গিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, কাল হইতেই সে কাজ আরম্ভ করিয়া দিবে। রণেনের ও-বাড়ী রহিয়াছে,—সে তাহাকে বেশী বিরক্ত করিবে না, সময় নষ্ট করিবে না। কিন্তু সকল চিন্তার মধ্যে একটা হাসি যেন তাহাকে বিব্রত করিতেছিল, হঠাৎ তাহার নানারংএর পাথরের সারির মধ্যে একখানি নিমেষে-দেখা মুখ ভাসিয়া উঠিতেছিল। সেই হাস্যদীপ্ত মুখের ওপর উনানের আগুনের লাল আভা পড়িয়া, লাল জ্যাকেটের সঙ্গে এক রংএ ছোপাইয়া দিয়াছে,—উজ্জ্বল চোখ দুইটি কড়ার উপর তরকারির রং দেখিতেছে।

সহসা প্রভাতের মনে হইল, অরণ্যে প্রথম মানবের জন্ম হইতে মানুষ কেবল দুইটি জিনিষ চাহিয়াছে,—তাহার জীবনে দুইটি কাজ—খাবার খোঁজা, আর প্রেম খোঁজা; দুইটি ক্ষুধা—অন্নের জন্য ও অন্তরের জন্য। আহার, আশ্রয়, ও নারী—এই কি জীবনের চরম সার্থকতা? কিছুক্ষণ পরে তাহার মনে হইল, না,—আর একটি ক্ষুধা আছে,—তাহা জ্ঞানের জন্য—জানিবার পিপাসা।

৪

পরদিন প্রভাতে প্রভাত যখন জাগিল, তখন বেলা হইয়া গিয়াছে,—পাশের শোবার ঘর হইতে রণেন উঠিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিতেই, একটা গানের সুর কাণে আসিয়া বাজিল। কথাগুলি ঠিক ধরা যাইতেছিল না,—শুধু রাত্রি-শেষে জাগরণের আনন্দের সুর—প্রভাতের আলোয় উড়িয়া যাইতে অধীর পাখীর গানের সুর। তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া, বারান্দায় আসিয়া, কাচের দরজা খুলিয়া দেখিল, পাশের বাড়ীর মেয়েটি গোলাপকুঞ্জে দাঁড়াইয়া গাহিতেছে—

'নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে, তার মধু কেন মন-মধুপে খাওয়ান।'

অদূরে সব সাদা। আকাশ, আলো, মাটি যেন কোন শুভ্র যবনিকায় ঢাকা পড়িয়াছে। প্রভাতের নির্ম্মল আলো শিশির-ভেজা ঘাসে ঝাউগাছগুলির পাতায় ঝিকিমিকি করিতেছে। সোপ্ল্যাণ্টগুলিতে জলবিন্দু হীরা মণির মত ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। হেলিয়ট্রোপ রংএর একখানি সাড়ি পরিয়া মেয়েটি গাহিতেছিল। প্রভাতে সদ্য-জাগা, স্নিগ্ধ মুখের উপর সূর্য্যের আলো আসিয়া, কালো চুলে লুকোচুরি খেলিতেছে।

প্রভাতের মুখচোখ যেন চিকিমিকি করিয়া উঠিল। দরজা খোলার শব্দে শকুন্তলা গান থামাইয়া চাহিল; মাথা নত করিয়া ধীরে পাশের দরজা দিয়া চলিয়া গেল। তাহার মুখের উপর দিয়া যে মৃদু-মধুর হাসি তাহার অজ্ঞাতে খেলিয়া গিয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারিল না। নিমেষের মধ্যে সে শুধু দেখিয়াছিল,—একগাদা কালো কোঁকড়ানো চুল,—আর দুইটি নির্ম্মল স্নিগ্ধ আনন্দিত চোখের চাউনি। আর প্রভাতও শকুন্তলার মুখ ভালো করিয়া দেখে নাই। মুখের এক ছবি তাহার মনে পড়িয়া গেল,—সে গীত-সায়রে সুরের হাওয়ায় টলমল মুখ-পদ্মের স্বপ্নছবি,—যেমন নির্ম্মল, তেমনি উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ।

তাহার মনে হইল, আজ যেন সে কি অসাধ্য সাধন করিতে পারে,—খুব একটা বড় কাজ করিয়া ফেলিতে পারে,—দেশের বা মানবের কল্যাণের জন্য এক নিমেষে জীবনদান করিতে পারে। সে মুখ সে আর দেখিতে চায় না,—সে গান সে আর শুনিতে চায় না,—এক নিমেষে সে যাহা পাইয়াছে, তাহাই তাহার যাত্রাপথের অক্ষয়, আনন্দময় পাথেয়।

চা খাইয়াই সে পড়িবার ঘরে গিয়া ঢুকিল। ঘরখানি বাড়ীর শেষ-সীমান্তে। পেছনে পাইন গাছ আর বাঁশবনে ভরা পাহাড় নামিয়া কার্ট রোডে গিয়া পড়িয়াছে। সেই ঝাউ-পাতার সন্‌সন্‌, বেণুবনের মরমর, ছোট ঝরণার ঝরঝর শব্দ-মুখরিত ঘরে গিয়া, সে কয়েক মিনিট স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। আজ কাজ করিবার কি অফুরন্ত শক্তি সে পাইয়াছে,—তবু কাজে লাগিতে মন সরিতেছিল না। ইচ্ছা হইতেছিল, এই আলো, ছায়াঘন ঝাউবনের স্নিগ্ধ-শীতল অন্ধকারের দিকে চাহিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া মেঘের খেলা দেখে!

চারিদিক নিবিড় মেঘে ঘিরিয়া আসিল। প্রভাত নিবিষ্ট মনে কয়েকখানি বই লইয়া পড়িতে ও নোট লইতে আরম্ভ করিয়া দিল। আজ তাহার মনে কত নূতন-নূতন চিন্তা, ভাব আসিয়া ভিড় করিল,—তাহার থিসিসের থিওরিটা এত স্পষ্ট হইয়া ধরা দিল যে, সে নিজেই অবাক্ হইল।

দুপুরে খাওয়ার পর রণেন হাসিয়া বলিল, 'বন্ধু, চলো, তাস খেলে আসা যাক্।' সকালের ঘটনাটা তাহার চোখ এড়ায় নি। প্রভাত বলিল, 'না সখা, আমায় একখানা বই আজ শেষ করতেই হবে!' অগত্যা রণেন একাই রায়েদের বাড়ী চলিল।

তাস খেলিবার কথা ছিল বটে, কিন্তু মিষ্টার রায়ের কয়েকখানা জরুরী চিঠি লিখিতে হইবে,—যতীনমামার দুপুরে একটু ঘুম না হইলে নয়। সুতরাং রণেন বন্ধুকে লইয়া যাইতে না পারায় একটু অপ্রস্তুতে পড়িল। শকুন্তলা দুষ্টামির হাসি হাসিয়া, পিতার দিকে চাহিয়া বলিল, 'চলুন ত, হারমোনিয়ামটা নিয়ে একটু প্যাঁ পোঁ করা যাক।' সেটা যে প্রভাতের পড়াশুনায় ব্যাঘাত করিবারই আয়োজন, তাহা রণেনও বুঝিল না। গান গাওয়া হইবে জানিয়া, সে তখন তাস খেলার দুঃখটা ভুলিতেছিল।

মিষ্টার রায় বলিলেন, 'কিন্তু শুকু, বেশী চেঁচিও না,—আমায় চিঠিগুলো লিখতে হচ্ছে।'

পিতার নিকট অনুমতি পাইয়া, রণেনকে লইয়া, সে চঞ্চল-পদে পাশের ঘরে গিয়া ঢুকিল। কিন্তু হারমোনিয়াম্ খুলিয়া বসিলে, তাহার আর কোন গানের উৎসাহ রহিল না। রণেনের দিকে হারমোনিয়াম এগাইয়া দিয়া বলিল, 'আপনি একটা গান।'

'তা হলে একটা সুর বাজাই।'

উদাস দৃষ্টিতে সে বলিল, 'সে ভালো,—বেশ একটা হিন্দুস্থানী সুর। আপনার কাছ থেকে অনেকগুলো ভালো সুর শিখলুম; কখনো ভুলবো না।'

রণেনের গণ্ড দুইটি লাল হইয়া উঠিল। সে মীরাবাইয়ের এক গানের সুর বাজাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। হঠাৎ বাজানোর মধ্যে শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, আপনার বন্ধু গান জানেন?'

'তেমন ভালো জানে না। তবে ভালো বাঁশী বাজাতে জানে।'

'আমাদের একদিন শোনাবেন না?'

'বোলবো।'

হঠাৎ পাশের ঘর হইতে যতীনমামা গাহিয়া উঠিলেন, 'শুকু ঘুমোল, পাড়া জুড়োল, রণেন এলো দেশে।' যতীন বাবুর ঘুমের বিশেষ ব্যাঘাত হইতেছিল। তিনি জানিতেন, এ গান গাহিলে, হারমোনিয়াম একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু আজ ফল আশানুরূপ হইল না।

শকুন্তলা হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা, মজা দেখাচ্ছি। ধরুন ত একটা খুব চেঁচামেচির গান।'

'কিন্তু আপনার বাবা যে চিঠি লিখ্‌ছেন'।

'তাই ত! বাবা, আপনার চিঠি লেখা হয়েছে? আমরা চেঁচিয়ে গাইতে পারি?'

মিষ্টার রায় চিঠি লেখা মোটে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি মেয়েটিকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন,—আর যতীন শালা একটু জব্দ হয়, তাহাও ইচ্ছা ছিল। তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমরা চেঁচিয়ে গাইতে পারো।'

তখন শকুন্তলা গলা ছাড়িয়া গান ধরিল, 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে'। যতীন মামাকে দিবা-নিদ্রার আশা ত্যাগ করিতে হইল। লাবু বিছানা হইতে হাসিয়া গাহিয়া

উঠিল, 'যখন গরম বিছানা হইতে উঠিলে কাঁদিয়া, যতীন মামা।'

এক অস্ত্র ব্যর্থ হইল; তবু যতীনবাবু নিরাশ হইলেন না। ভালো করিয়া রগ মুড়ি দিয়া গাহিয়া উঠিলেন,

'শুকু আছে বলে রে ভাই আমরা বেঁচে আছি;
কিন্তু আর একজনে যে হায় মরার কাছাকাছি—
(শুকুর তরে) মরার কাছাকাছি।'

রণেনের চোখ মুখ লাল হইয়া, আগুন বাহির হইতে লাগিল,—হারমোনিয়াম বাজাইতে হাত কাঁপিতে লাগিল। শকুন্তলা কিন্তু হার মানিল না,—সে কাঠের দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া, এত উচ্চ স্বরে গাহিতে লাগিল যে যতীন মামা গলার সহিত পাল্লা দিতে না পারিয়া চুপ করিলেন।

গান চলিতে লাগিল। প্রভাত যেখানে পাথর, মাটি, ধাতুদের জগতে নিমগ্ন ছিল, সেখানে গানের সব কথা পৌঁছাইতে ছিল না বটে, কিন্তু একটি মধুর সুর তাহাকে আকুল করিয়া দিতেছিল। সেই সুরে সে উদ্দীপ্ত হইয়া প্রাণের আনন্দে লিখিয়া যাইতেছিল। শুধু মাঝে-মাঝে যেন চোখ পড়িতে চাহিতেছিল না, কলম নড়িতে চাহিতেছিল না,—মন কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য উদাস হইয়া উঠিতেছিল।

রণেন একটা গজল ধরিল,—তাহার মন-মাতানো সুরে সবাই মুগ্ধ হইয়া উঠিল।

মিষ্টার রায় বলিলেন, 'শুকু, ওটা শিখে নাও।'

গান শেখানো চলিতে লাগিল। এই গান শিখাইতে রণেন ভারি আনন্দ পাইত। কখনও সহসা এক সুরের মুখে শকুন্তলার সরল স্নিগ্ধ চোখ দুইটি তাহার চোখের ওপর আসিয়া পড়ে,—কখনও এক পদ ভুল গাহিয়া তাহার গাল গোলাপ ফুলের মত রাঙা হইয়া ফুলিয়া ওঠে,—গাহিতে-গাহিতে দুইজনের গলা এক সুরে মিশিয়া যায়, কখন সুরের ছায়ায় তাহার মুখ ঢাকা পড়িয়া যায়, যেন কি অজানা ব্যথায় চোখ কালো হইয়া আসে, কখনও সুরের আলোয় মুখে কি দিব্য শ্রী উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে,—কখনও এক লাইন ইচ্ছা করিয়া ভুল গাহিয়া মধুর হাসিয়া ওঠে।

এই গান গাওয়া, গান শোনার মধ্য দিয়াই তাহাদের দুইজনের জানা-শোনা হইয়াছে,—এমনি কথা-বার্ত্তা তাহারা খুব কম বলিয়াছে। এই জানা-শোনা একদিকে যেমন অস্পষ্ট, অপর দিকে তেমনি নিবিড়, গভীর। তাহারা দুই-জনে এক গানের নদীর দুই ধারে দাঁড়াইয়া আছে,—সুরের তরী দিয়া আনাগোনা, পারাপার হইতেছে। কিন্তু এ মিলন কি রহস্যময়!' দক্ষিণ বাতাস যেমন ফুলের পাতাদের স্পর্শ করিয়া চলিয়া যায়,—চাঁদের আলো যেমন ঝর্ণার জলকে ছুঁইয়া যায়,—তেমনি একজনের মন সুরের লোকে আর একজনকে স্পর্শ করে। এ মিলন-জাল এত সূক্ষ্ম,—ইহাকে ধরিতে গেলে ছিঁড়িয়া যায়,—দেখিতে গেলে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অথচ ইহাকে মহা সত্য বলিয়া অন্তরে-অন্তরে স্বীকার করিতেই হইবে।

গজল শিখিয়া শকুন্তলা বলিল, 'ও, তিনটে বেজে গেলো,—চায়ের সব ঠিক করতে হবে,—আপনি ত আমাদের এখানে খাচ্ছেন না?'

একটু ব্যথিত হইয়া হাসিয়া রণেন বলিল, 'না, দেখি, বন্ধুটি আমার কি করছেন।'

৫

এমনি করিয়া কয়েকদিন কাটিয়া গেল। হাস্যে, গল্পে, গানে, খেলায় রণেনের দিন অতি মধুর, সুখকর ভাবে কাটিতেছিল। প্রভাতের দিনও কম আনন্দকর ছিল না। সে যেন এক অপূর্ব্ব জগতে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার মনের অবস্থাটা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। প্রতিদিন সকালে উঠিয়া নিমেষের মধ্যে সে একবার শকুন্তলার দেখা পায়,—একটি প্রভাতী গান শোনে। সেই সুর সকল কাজে, চিন্তায় তাহার মনে গুঞ্জরণ করে। এই দেখাটুকু, শোনাটুকু তাহার সমস্ত দিনের আনন্দের পাথেয়। কি তীব্র সুখের সহিত সে লেখা-পড়া করে;—মাথা এত পরিষ্কার, চিন্তা এত গভীর, বেগবান্ থাকে। সে থিসিসে তন্ময় হইয়া যায়। তবে মাঝে-মাঝে হঠাৎ সে কেন আনমনা হইয়া ওঠে,—কেন খাতা মুড়িয়া ভাবিতে বসে—সে মেয়েটি এখন কি করিতেছে,—বাবার টেবিল গোছাইতেছে,—সবাইয়ের কাপড় আলনায় সাজাইতেছে, কুটনো কুটিয়া বয়কে কি হুকুম করিল,—প্লেট অপরিষ্কার, ভালো মাজা হয় নাই—বলিয়া চাকরকে বকিয়া, নিজেই ধুইতে আরম্ভ করিয়াছে। লাবুর সহিত কোন খুনসুটি, যতীন-মামার সঙ্গে কোন পরিহাস। সে কেবল সরল হাসির সুধায় এ সংসার সিঞ্চিত করিয়া সকলকে স্নিগ্ধ করিয়া রাখে নাই,—সদা মঙ্গল-কর্ম্ম-রত

হস্তে অন্তরের সেবা দিয়া সকলের সকল অভাব দূর করিতেছে ; —বিছানা, কাপড়, জামা, রুমাল হইতে স্নানের জল, খাবার— কে কি পরিয়া বেড়াইতে যাইবে,—কে কি খাইবে—সকলের প্রতি সজাগ সপ্রেম দৃষ্টি আছে ;—শকুন্তলার হাসি কেবল পাহাড়ের ঝর্ণাধারার মত কলকল করিয়া বহিয়া যায় না,—এ যেন গভীর নদী-জলের ওপর ঢেউয়ের মাতামাতি কলধ্বনি— সে নদী কেবল গান গাহিয়া যায় না, দুই তীর নিৰ্ম্মল করিয়া, ফুল ফোটাইয়া সোনার ফসল ফলাইয়া বহিয়া যায়। প্রভাত তাহার থিসিসে মন দেয়,—বারবার সে মন কোন্ হাসির জগতে ভাসিয়া আসিতে চায়।

৬

সকালে সুন্দর সূর্য্যের আলো দেখিয়া, প্রভাত বাহাদুরকে বলিল, 'আজ hot-houseএ সে লেখা-পড়া করিবে। তাহাকে দিয়া কয়েকখানা বই, খাতা ও একখানা চেয়ার পাঠাইয়া দিল। বাড়ীর ঠিক পেছনে রণেনের অতি আদরের, গর্ব্বের হট-হাউস।'

আজ সকালে এক গানের সুর তাহার কাণে বাজিতেছিল,—

'তুমি যে এসেছো মোর ভবনে, তাই রব উঠেছে ভুবনে।' প্রভাত মৃদুস্বরে গাহিতে গাহিতে চলিল,—নইলে ফুলে কিসের রং লেগেছে। হট্-হাউসের দরজায় আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—একখানি নীল সাড়ীর আঁচল দেখা যাইতেছে। ঢুকিবে কি না ভাবিতেছে ;—এক শিশুর মিষ্টি হাসির শব্দ কাণে আসাতে, মন্ত্র-চালিতের মত ঢুকিয়া পড়িল।

সমস্ত ঘর ফুলের রংএ রঙীন,—সব টব ফুলে ছাওয়া। ঘরের মাঝখানে শকুন্তলা একটি ছোট মেয়েকে লইয়া ফুল দেখাইতেছে ও আদর করিতেছে। প্রভাতকে দেখিয়া সে মৃদু হাসিয়া অভ্যর্থনা করিল,—যেন তাহারা কতদিনের পুরাতন পরিচিত। কাহারও একটু সঙ্কোচ বোধ হইল না।

স্নিগ্ধ স্বরে প্রভাত বলিল, 'বেবীটিকে কোথা থেকে পেলেন ?'

প্রভাতের নির্ম্মল উজ্জ্বল চোখের দিকে চাহিয়া শকুন্তলা বলিল, 'ওই পাশের বাড়ীর মেমদের আয়াটার কাছ থেকে কেড়ে আনলুম।'

বেবীর মত নরম গাল টিপিয়া আদর করিয়া প্রভাত বলিল, 'ভারী সুন্দর ত ! বাস্তবিক, বাড়ীতে ছোট ছেলে-মেয়ে না থাকলে, আমার ত ভারী ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে।'

'আমি বেবী ভারি ভালবাসি জানেন ?'

প্রভাত কয়েকটি জিরেনিয়াম ছিঁড়িয়া বেবীর হাতে দিল।

'ফুল ছিঁড়ছেন—রণেনবাবু কিন্তু বকবেন।'

'তা না হয় একটু বন্ধুর বকুনি খাবো।'

'আপনি ত এখানে এখন পড়াশুনা করছেন—আর বিরক্ত করবো না—আমি ভারি গোলমাল করি—আপনার ভারি অসুবিধে হয়।'

'মোটেই নয়—আমার ভারি ভালো লাগে' বলিয়া প্রভাতের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। বেবী কাঁদিয়া ওঠায়, শকুন্তলা তাহাকে ভুলাইতে লাগিল। বেবী কিছুতেই থামিতেছে না দেখিয়া, বুকের সোণার সেফটি-পিন্ খুলিয়া তাহার হাতে দিল।

প্রভাত শকুন্তলার দিকে চাহিয়া দেখিল। প্রতি প্রভাতে যে গায়িকার সুর-দীপ্ত মুখ দেখিয়াছে, তাহা হইতে এ মুখ অনেক তফাৎ। তবে এত মধুর হাসিতে মুখখানি বাস্তবিকই মধুময়। তবু চোখ দুইটির কোণে একটু কালি রহিয়াছে। উজ্জ্বল দুই তারা হইতে সরলতা ও প্রতিভার জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছে। এই আনন্দময় আলো যে দিকে পড়িবে, সে স্থান নিৰ্ম্মল উজ্জ্বল করিবে। এ আলো দীপ্ত করিবে—দাহ করিবে না, দ্বিপ্রহরের খর-রবিকরের মত নয়, জ্যোৎস্নার আলোর মত স্নিগ্ধ,—প্রভাতের আলোর মত পবিত্র। প্রভাতের আরও যেন মনে হইল, এ আলো সন্ধ্যার গোধূলি আলোর মত করুণ, উদাস। এ এত হাসে, এত গায়, তবু কোথায় যেন একটা গোপন ব্যথা লুকানো আছে। এ যেন জীবনে একটা গভীর আঘাত পাইয়াছে বা পাইবে।

বেবী সেফ্টি-পিনটা সিমেণ্টের মেজেয় ফেলিয়া দিল। প্রভাত ধীরে তাহা তুলিয়া শকুন্তলার হাতে দিল। বেবী বারবার অতি ছট্‌ফট্ করিতেছিল বলিয়া, প্রভাত বলিল, 'চলুন, ওই গাছটার তলায় যাওয়া যাক,—অতগুলো ফুল দেখলে, ও কিছু ভুলবে।'

হট-হাউসের দরজায় ছুটিয়া আয়ার মুখ দেখা গেল। 'দিন, আমি দিয়ে আসছি ;—আপনি ওই চেয়ারটায় বসুন'। বলিয়া, প্রভাত বেবীকে শকুন্তলার কোল হইতে লইয়া, আয়ার কাছে দিয়া আসিল।

'বসুন না চেয়ারটায়'।

'না, বেশ আছি।' বলিয়া শকুন্তলা ফিউমিয়া ফুলের ঝাড়ের তলার এক টবে ঠেসান দিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। ম্যাগ্নোলিয়া ফুলের মত রাঙ্গা মুখ ঘেরিয়া কালো কেশের রাশি; তাহার ওপর ফিউমিয়া ফুলগুলি নত হইয়া পড়িয়াছে। গায়ে পিটুনিয়া ফুলের রং-এর এক জামার উপর এষ্টার ফুলের রং-এর একখানি সাড়ি। মোজা-বিহীন পায়ে ক্যাক্টাসের মত লাল ভেল-ভেটের চটিজুতো। উপর হইতে সূর্য্যের আলো ভাঙ্গা কাচের মধ্য দিয়া ঝরিয়া পড়িয়া, সমস্ত দেহ দ্যুতি-মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

কোন্ মন্ত্র-বলে দুইজনের মনের দরজা খুলিয়া গেল;—অতি-পুরাতন বন্ধুর মত নিঃসঙ্কোচে তাহারা গল্প জুড়িয়া দিল—যেন তাহারা কত জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া কত গল্প করিয়া আসিয়াছে।

কত তুচ্ছ, সরল কথা, কত সামান্য দৈনন্দিন ঘটনা—প্রতিদিনের জীবনের গল্প—কত অপরূপ, কত রহস্যময় হইয়া, লোমহর্ষণ নভেলের চেয়েও ভালো বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তার পর নিজেদের জীবনের কথা আসিল। প্রভাত তাহার থিসিসের কথা,—জীবনের উচ্চ আদর্শের কথা,—ভারতে কোথায় কি ধাতু লুকানো থাকিতে পারে, সে কোন্ দেশে কোন্ ধাতুর সন্ধান করিবে—ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া যাইতে লাগিল, শকুন্তলাও তার কলেজের গল্প, পড়াশুনার কথা—কত কথা বলিতে লাগিল। তাহারা মন খুলিয়া গল্প করিতেছিল; কিন্তু শকুন্তলা প্রায়ই গম্ভীর হইতেছিল,—মাঝে-মাঝে অতি মৃদু হাসিতেছিল। তাহার উচ্চহাস্যের মত তাহার গাম্ভীর্য্যও স্বাভাবিক, সুন্দর।

সে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, আপনার এই পাথর আর মাটির নাম মুখস্থ করতে ভালো লাগে? আমি হলে ত মোটেই পারতুম না'।

'জানেন, আমরাই, পৃথিবী-মায়ের বুকে কোথায় কি রত্ন লুকানো আছে, তার সন্ধান দিতে পারি। এই দেখুন, ছোট-নাগপুরে কত ধাতু খুঁজলে পাওয়া যাবে।'

'আহা, প্রজাপতিটা কি ছট্‌ফট্ করছে দেখুন।

সম্মুখে একটা মাকড়সার জালে এক প্রজাপতি পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিল। প্রভাত ধীরে, কোমল হস্তে তাহাকে জাল হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া বলিল, 'ভারী সুন্দর দেখ্‌তে, দেখেছেন। ওপরের দু-খানি ডানা ঠিক যেন আকাশের নীলিমা। তার ওপর তারার মত সাদা ফুটকি। আর নীচের ডানাদুটি কি সবুজ! তার ওপর লাল আভা—আর তলাট কালো হয়ে এসেছে;—যেন ভোর-বেলার আলো।'

প্রভাত শকুন্তলার মুখের দিকে চাহিল। ব্যথিত, করুণ দৃষ্টি দিয়া সে চাহিয়া আছে। সযত্নে সে প্রজাপতিটিকে ছাড়িয়া দিল। উড়িয়া সে এক আইভির উপর গিয়া বসিল।

'অনেকক্ষণ গল্প করছি,—আপনার কত লেখা হোত,—আপনার সময় নষ্ট করলুম—ও, দেখুন মাংসটা চড়িয়ে এসেছি,—পুড়ে না গেলে হয়। কতক্ষণ এসেছি বলুন ত।'

'কি জানি, খুব বেশীক্ষণ নয়।' ঘড়িতে সময় হিসাব করিলে, খুব জোর তিন কোয়ার্টার হইত; কিন্তু প্রভাতের মনের ঘড়িতে এ সময় অপরিমেয়,—এ হিসাবের বাহিরে।

'আচ্ছা আজ আসি। মা রান্না-ঘরে একা আছেন।' বলিয়া শকুন্তলা মাথা একটু নত করিয়া নমস্কার করিল।

প্রভাতও প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিল, 'আসুন।'

শকুন্তলা চলিয়া গেল। প্রভাত অনেকক্ষণ ধরিয়া হট-হাউসে এ-ফুল ও-ফুল দেখিয়া ঘুরিল,—বই-খাতা সব পড়িয়া রহিল;—কোন বে-হিসাবী আনন্দ আজ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে।

হট-হাউস হইতে বাহির হইয়া দেখিল, সামনে লাবু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাকে ডাকিয়া, মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাব করিয়া, তাহাকে ধরিয়া বেড়াইতে লইয়া গেল। বাড়ীর পেছনে পাইন, মেপেল, বাঁশ-বনের মধ্যে, নানা বাজে গল্প করিতে-করিতে, দুইজনে ঝাউপাতার ছাওয়া সরু-পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রভাত বাঁশ কাটিয়া লাবুকে এক বাঁশের বন্দুক তৈরী করিয়া দিল। দুইজনে কড়াইসুঁটি ক্ষেতে নামিয়া, কিছুক্ষণ কড়াইসুঁটি ছিঁড়িয়া খাইল। আজ প্রভাতের অন্তর যেন উপছাইয়া পড়িতেছে,—কি করিবে, ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না। লাবুকে বিদায় করিয়া সে ফগে-ঢাকা বেণু-বনে বসিয়া গাহিতে লাগিল, 'তুমি যে এসেছো মোর ভবনে, তাই রব উঠেছে ভুবনে।'

৭

খাবারের টেবিলে বসিয়াই প্রভাত ধরা পড়িল। তাহার মুখের, চোখের অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য, চাঞ্চল্য দেখিয়াই রণেন বুঝিল, একটা কিছু ঘটিয়াছে।

'কি সখা, কি হোল ?'

প্রভাত ভাবিল, সব খুলিয়া বলে ;—কেমন বাধিয়া গেল। এ যেন কোন পবিত্র মন্দিরের নির্ম্মল রহস্যের কথা,—ইহাকে বাহিরে আনিবার অধিকার নাই,—জানাইলে পাপ হইবে। সে হাসিয়া বলিল, 'ভাই, ভারী ক্ষিদে পেয়েছে,—এই বাহাদুর, ছিটো, ছিটো।' কিন্তু সে না হাসিয়াই গাহিয়া ফেলিল, 'তুমি যে এসেছো মোর ভবনে।' রণেন হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিল, 'বা,-বা, এ যে প্রাণ চায়—চক্ষু না চায়। চলো, আজ খেয়ে গিয়ে মিষ্টার রায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি—তিনি তোমার কথা বল্‌ছিলেন।'

'না ভাই—আচ্ছা, দুপুরে নয় বিকেলে।'

আলাপের সময়টী কিছু পেছাইয়া দিতে পারিলে সে যেন বাঁচিয়া যায়। দুপুরে আর লেখাপড়া হইল না,—চুপ করিয়া কোচে অর্দ্ধশয়ান ভাবে শুইয়া, যেন দিবাস্বপ্ন দেখিতে-দেখিতে, সে তাহার এক বন্ধুকে চিঠি লিখিল—

বন্ধু,

তুমি যদি এখানে আস্‌তে, তবে মেঘের খেলা দেখতে-দেখতে পাহাড়গুলো গুণ্‌তে-গুণ্‌তে, ঝর্ণার গান শুন্‌তে-শুন্‌তে, গল্পের জাল বুন্‌তে-বুন্‌তে, আঁকা-বাঁকা পথের পরে পাহাড়-বন ঘুরে-ঘুরে, ফার্ণ কুড়াতাম ; ষ্ট্রবেরী খেতাম, ফগ খেতাম, মলে যেতাম, দেখতাম বসে কত না সং, প্রতি মেমের নতুন ঢং ; হেলাফেলা সারাবেলা, হট-হাউসে ফুল তোলা, জিরোনিয়াম, ফিউসিয়া, পিটোনিয়া বিগোনিয়া ; হল্লা হোত, হোত হাসি, বৃষ্টি ভিজে সর্দ্দি কাশি, বাড়ী এসে চা খেতাম, রাগ্-মুড়ি দিয়ে গান ধরতাম।

চুপটি করে আছি শুয়ে, পাইন গাছের মাথায় চেয়ে। পাশের বাড়ীর অচিন মেয়ে, মাঝে-মাঝে উঠ্‌ছে গেয়ে। প্রভাত-পাখীর গানের মত, ঝর্ণা ধারার তানের মত—তাহার কথা, তাহার হাসি, যেন পদ্ম হতে পাপড়ি রাশি পড়্‌ছে ঝরে, শুন্‌ছি শুয়ে একলা ঘরে। মাঝে কাচের কাটের আড়াল, বাহিরে হাওয়া যেন মাতাল। জড়াজড়ি পাতায়-পাতায়, মাতা-মাতি শাখায়-শাখায়, ঘাসে-ঘাসে কাণাকাণি, গাছে-গাছে জানাজানি। ফুলে-ফুলে হাসাহাসি, ভালবাসি-ভালবাসি। আমার শুধু হচ্ছে মনে, আকাশ আলোয় মাটির সনে, কাহার কথার মিষ্টি সুরের রংএ গেছে সব ভরে। চুপ্‌টি করে শুন্‌ছি শুয়ে, পাইন গাছের মাথায় চেয়ে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

সুরা

[শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর, বি-এ]

অয়ি—জীবনধনহারিণী !
অয়ি—নির্ঝ্জলা, সূর্য্য-করোজ্জ্বল-বরণী
গণিকা-তারিণী—তারিণী।

নীল বোতল-তল-বাসিনী টল-মল,
ফেনিল বিকম্পিত মাতাল সম্বল,
শুক্তিতে চুম্বিয়া কর তুমি চঞ্চল,
শুভ্রে ধূসর-কারিণী।

প্রথম অলক্ষ্মী-আগম তব সেবনে,
প্রথম সোমরসে আস তপোবনে,
চরম সর্ব্বনাশ তুমি জন-ভবনে
জ্ঞান-ধর্ম্ম শত পুণ্য-নাশিনী।

চির অকল্যাণ-মন্ত্রী—বলি গণ্য
দেশ-বিদেশে লুটিতেছ অন্ন
ভৈরবী যোগিনী—সমাদৃতা ভগিনী
তন্ত্র কলুষ-মন্ত্র-বাহিনী।

জয়-পরাজয়

[শ্রীজলধর সেন]

(১)

ভবেশ চৌধুরী এম-এ পাশ করিয়া বি-এল পড়িতেছিলেন; —পড়া আর হইল না; পিতা মহেশ চৌধুরী মারা গেলেন; ভবেশবাবুকে জমীদারীর ভার গ্রহণ করিতে হইল। জমিদারীও ছোট নহে, তিনি হরিপুরের ছোট তরফ হইলেও তাহার আয় প্রায় তিন লক্ষ টাকা। তাহার পর উত্তরাধিকার-সূত্রে যেমন জমিদারী পাইলেন, তেমনই বড় তরফের সহিত শত্রুতাও পাইলেন। আর সে বড় তরফও যেমন-তেমন নয়,—শ্রীযুক্তা ভবসুন্দরী চৌধুরাণীর নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়; চৌধুরাণী নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামায় হুকুম দেন। এ অবস্থায় ভবেশবাবু ম্যানেজারের উপর জমিদারীর ভার দিয়া পড়াশুনায় নিযুক্ত থাকা সঙ্গত মনে করিলেন না;—কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বাড়ীতে আসিয়া বসিতে হইল। সকলেই বলিতে লাগিল, জমিদারী কার্য্যে অনভিজ্ঞ ভবেশবাবুকে বড় তরফের চৌধুরাণীর প্রতাপে অস্থির হইতে হইবে; এত বড় দুর্দ্দান্ত পুরুষ মহেশ বাবুকেই ভবসুন্দরী চৌধুরাণী গ্রাহ্য করেন নাই—ভবেশ বাবু ত নাবালক বলিলেই হয়; শীঘ্রই একটা বড় রকমের দাঙ্গা বাধিয়া উঠিবেই।

তাহাই হইল। মহেশ চৌধুরীর মৃত্যুর পর পাঁচ মাসও গেল না। আশ্বিন মাসে পূজার সময় ঠিক সপ্তমী-পূজার দিন বেলা দশটার সময় সদরের পেস্কার মহাশয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বাবুর কাছে এতালা করিলেন, বড় তরফের লাঠিয়াল পাইকে সেইদিন প্রাতঃকালে মকিমপুরের চর দখল করিয়াছে; প্রজাদের ঘর-দুয়ার ভাঙ্গিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছে, প্রজারা নিরুপায় হইয়া হুজুরে হাজির হইয়াছে।

তখন পুরোহিত মহাশয় সবে পূজায় বসিবেন, সেই সময় এই সংবাদ পাইয়া ভবেশবাবু অধীর হইয়া পড়িলেন; রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। কি, এত বড় কথা! পিতার মৃত্যুর পর পাঁচ মাসও যায় নাই, ইহারই মধ্যে অত বড় একটা চর যে দখল হইয়া গেল!

ভবেশবাবু হুকুম দিলেন, 'যত টাকা লাগে দেব, যত লোক দরকার হয় এখনই সংগ্রহ কর; আজই সন্ধ্যার মধ্যে মকিমপুরের চর দখলে আনা চাই। কেমন ভবসুন্দরী চৌধুরাণী, আমি দেখ্‌তে চাই।'

হুকুম পাইয়া তখনই চারিদিকে লোক ছুটিল। পাশের বাড়ীই বড় তরফের; সেখানেও পূজা হইতেছে; গোয়েন্দার মারফৎ সেখানেও এ সংবাদ পৌঁছিল। বড় তরফের চৌধুরাণীও হুকুম দিলেন "চরের দখল ঠিক রাখ্‌তে হবে; যত টাকা লাগে, কুছ পরোয়া নেই।" দুই বাড়ীরই পূজা-মণ্ডপে আসনের উপর বসিয়া মা-দুর্গা কি ভাবিলেন, তিনিই বলিতে পারেন; পুরোহিত মন্ত্র পড়িতেছেন 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা'—এদিকে কিন্তু অশান্তির তাণ্ডব-লীলার জন্য যজমান দ্বয় উন্মত্ত!

সন্ধ্যার পরই সংবাদ আসিল, ছোট তরফের জিৎ হইয়াছে—চর দখলে আসিয়াছে; ছোট তরফের দেড়-শ লাঠিয়ালের লাঠির চোটে বড় তরফের লাঠিয়ালেরা ঊর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া পলায়ন করিয়াছে; খুন হয় নাই—দুই পক্ষের বিশ-পঁচিশ-জন আহত হইয়াছে; তবে ছোট তরফের প্রধান সর্দ্দার হারাণ ভূঁইমালীকে বড় তরফের লোকেরা বিশেষ কৌশলে বন্দী করিয়া কোথায় লইয়া গিয়াছে—প্রাণে মারিয়াছে কি-না কেহ বলিতে পারিল না। একজন শুধু এইমাত্র খবর দিতে পারিল যে, হারাণ সর্দ্দার জখম ত হয়-ই নাই, তাহার শরীরে কেহ এক ঘা লাঠিও বসাইতে পারে নাই। নিতান্ত গ্রহের ফের বলিয়াই যুদ্ধে জয়ী হইয়াও হারাণ সর্দ্দার বন্দী হইয়াছিল। সন্ধ্যার আঁধারে তাহার আর খোঁজ পাওয়া গেল না।

(২)

পরদিন, আগামী পূজার দিন প্রাতঃকালেই চারিদিকে রাষ্ট্র হইল, বড় তরফের চৌধুরাণী হুকুম দিয়াছেন যে, পূজার এ-দুই-দিন আর কোন হাঙ্গামা করিয়া কাজ নাই; বিজয়া

দশমীর দিন, হয় মকিমপুরের চর দখল করা চাই, নয় ভবেশ চৌধুরীর মাথা চাই—বক্‌শিস্ দশ-হাজার টাকা!

ভবেশ বাবুও কথাটা শুনিলেন; তিনি হাসিয়া বলিলেন 'আমার এইটুকু মাথাটার দাম দশ-হাজার টাকা! তবে ত আমি যে-সে লোক নই—একেবারে দশ-হাজার!", ভবেশ বাবু ম্যানেজার বাবুর বাড়ীতে লোক পাঠাইবার আদেশ দিলেন—বাড়ীতে পূজার জন্য তিনি ছুটী লইয়া বাড়ী গিয়াছেন।

অষ্টমীর দিন বেলা তখন এগারটা; অষ্টমী-পূজা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; দুই-বাড়ীতেই ঢাক বাজিতেছে; দুই বাড়ীতেই সমান কোলাহল। ভবেশবাবু এখনও পূজা-মণ্ডপে আসেন নাই, তাঁহার অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; তিনি না আসিলে আরতি আরম্ভ হইবে না।

অনেকক্ষণ পরে শুভ্র গরদের বস্ত্র পরিধান করিয়া, গরদের উত্তরীয় ধারণ করিয়া ভবেশবাবু নগ্ন-পদে পূজা-মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন; তাঁহাকে দেখিয়া জনতা পথ ছাড়িয়া দিল। তিনি ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইয়া মণ্ডপের সিঁড়ি দিয়া দালানে উঠিতে লাগিলেন। দুই-তিনটী সিঁড়ি যখন উঠিয়াছেন, তখন মলিন, ছিন্ন-বস্ত্র পরিহিত একটী নয় বৎসরের বালক তাড়া-তাড়ি সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ভবেশবাবুর গতিরোধ করিয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ মলিন, সে বোধ হয় অনেক দূর হইতে আসিয়াছে। একটা ভিক্ষুক বাবুর সম্মুখে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে দেখিয়া ভৃত্যেরা হাঁ-হাঁ করিয়া অগ্রসর হইল। ভবেশবাবু তাহাদিগকে নিরস্ত হইতে বলিয়া অতি কোমল স্বরে বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে ছোকরা, তোমার কি চাই?"

বালক এক-দৃষ্টিতে বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর-ভাবে বলিল "বাবুজি, আমার বাবা।"

ভবেশবাবু বলিলেন, "কে তোমার বাবা?"

"আমার বাবাকে জান না? আমার বাবা হারাণ সর্দ্দার। বাবুজি, আমার বাবাকে এনে দাও। মা যে কাল থেকে কিছু খায়নি, ঘুমায়নি।"

"তুমি কার সঙ্গে এলে?"

"কেন, মার সঙ্গে ঐ যে মা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। মা বলে দিয়েছিল, মা-দুর্গার কাছে বাবাকে চাইতে,—আমি তোমার কাছেই চাইলাম। দাও আমার বাবাকে এনে।"

শেষের কথাটা, 'দাও আমার বাবাকে এনে'—এমন দৃঢ়তার সহিত এবং এমন উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হইল, যেন মণ্ডপ প্রতিধ্বনিত হইল; সমাগত লোকজন স্তম্ভিত হইয়া গেল। ভবেশবাবু একটী কথাও না বলিয়া ব্যগ্রভাবে বালকের হাত চাপিয়া ধরিলেন; তাঁহার তখন কথা বলিবার শক্তি ছিল না।

তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বালক আরও উত্তেজিত হইয়া বলিল, "কথা বল না যে? বাবাকে এনে দাও, নইলে ঐ মা দুর্গার কাছে নালিস করব,—মা ত তাই-ই বলে দিয়েছেন।"

এইবার ভবেশবাবুর কথা ফুটিল; তিনি ধীরভাবে বলিলেন, "মা দুর্গার কাছে নালিস করতে হবে না, আমিই তোমার বাবাকে এনে দিচ্ছি। এস আমার সঙ্গে।" এই বলিয়া তিনি বালকের হাত ধরিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিলেন। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, ছোট তরফের জমিদার ভবেশবাবু একটী দরিদ্র বালকের হাত ধরিয়া নগ্নপদে বড় তরফের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এমন দৃশ্য দেখিবার সৌভাগ্য কাহারও হয় নাই।

(৩)

ভবেশবাবু বড় তরফের দেউড়ীর নিকট উপস্থিত হইলে, দ্বারবান্‌গণ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইল এবং সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তিনি কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বালকটীর হাত ধরিয়া একেবারে পূজা-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। তখন পূজা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া পুরোহিত পূজা বন্ধ করিয়া আসনে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; যে যেখানে ছিল সে সেখানে দাঁড়াইয়া ভবেশবাবুকে অভিবাদন করিল। তিনি পূজামণ্ডপের দুই তিনটা সিঁড়ি উঠিয়াই উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "খুড়ী-মা?"

চৌধুরাণী তখন মণ্ডপে প্রতিমার পার্শ্বে বসিয়া পূজা দর্শন করিতেছিলেন। এই আকস্মিক অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া এবং এই সম্বোধন শুনিয়া তিনি বিচলিত হইলেন; কোনও উত্তর দিবারই তাঁহার সামর্থ্য রহিল না।

ভবেশবাবু আজ বালকের হাত ছাড়িয়া দিয়া মণ্ডপের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভবসুন্দরী চৌধুরাণীকে প্রণাম করিলেন —দেবী প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেলেন। তাহার পর উচ্চৈঃস্বরে প্রাণের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া করযোড়ে বলিলেন, "খুড়ীমা, মকিমপুরের চর আজ তোমাকে দিতে এসেছি। আর এই নাও ভবেশ চৌধুরীর মাথা, দশ হাজার টাকা দিতে হবে না, রক্তপাত করতে হবে না, শুধু দিতে হবে ঐ বালকের পিতা হারাণ সর্দ্দারকে। ছোট তরফের জমিদার, তোমাদের তিন পুরুষের আজন্ম শত্রু, আজ করযোড়ে হারাণ সর্দ্দারকে ভিক্ষা করছে। এই মহাষ্টমীর দিন তোমার হতভাগ্য সন্তানের এই আবদার রক্ষা করিতেই হইবে।"

ভবসুন্দরী চৌধুরাণী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; কোথায় চলিয়া গেল তাঁহার ঘোর অভিমান—কোথায় ভাসিয়া গেল তিন পুরুষের শত্রুতা—ভুলিয়া গেলেন তিনি মকিমপুরের চর—ভুলিয়া গেলেন তিনি ভবেশ চৌধুরীর মাথার কথা—ভুলিয়া গেলেন তিনি বাহিরের জনসঙ্ঘ। দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া তিনি ভবেশবাবুকে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "চাই না আমি মকিমপুরের চর—চাই না বড় তরফের জমিদারী—আজ তুই আমাকে যে নতুন সম্পদ্ দিলি—ভবেশ তার কাছে স্বর্গ আমার তুচ্ছ। বড় তরফ আজ এই মহাষ্টমীর দিন তোর মঙ্গলের জন্য তোর কাছে পরাজয় স্বীকার করল;—ঐ মা দুর্গা সাক্ষী, আজ হইতে আমি সব শত্রুতা বিসর্জ্জন দিলাম। কে আছিস্ রে, ছোট তরফের হারাণ সর্দ্দার কোথায়, এখনই নিয়ে আয়।"

তখনই লোক ছুটিল। দুই তিন মিনিটের মধ্যেই হারাণ সর্দ্দারকে সেখানে লইয়া আসিল। ভবেশবাবু চৌধুরাণীর বাহুপাশ মুক্ত হইয়া বলিলেন, "একটু দাঁড়াও খুড়ী-মা, আগে বালকের পিতাকে ফিরাইয়া দিয়া আসি। তিনি তখন নীচে নামিয়া গিয়া হারাণ সর্দ্দারের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া তাহাকে বালকের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "এই নাও খোকা তোমার বাবা।" তাহার পর তিনি পুনরায় মণ্ডপে উঠিয়া গেলে চৌধুরাণী আরও একটু অগ্রসর হইয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "ভবেশ, আজ তোমার জয়, কিন্তু তুমি যেতে পারছ না। আজ তোমার কাকীমার হাতে মহামায়ার প্রসাদ এখানেই পেতে হবে। বোসো বাবা।"

ভবেশ চৌধুরী ভবসুন্দরী চৌধুরাণীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া সেইখানেই মৃত্তিকাসনে বসিয়া পড়িলেন;—বাহিরে ঢাকঢোল বাজিয়া উঠিল; সানাই সানন্দে গান ধরিল—

"আজ নাচ্ মা আনন্দময়ী!"

ব্যাকুল বেদনা

[শ্রীযামিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত]

এখনো অর্ঘ্য পারিনি সঁপিতে হে মোর হৃদয়স্বামী!
তোমারে ভাবিতে আন্ মনে পরে কেবল দিবসযামী।
চন্দ্রে তোমার না হেরি নিছনি, ছুটে সে কামনা-বান,
মলয়া তোমার সাধন-কুঞ্জে না বহে কোকিলতান।
তোমার পুষ্পে তোমারে সাজাতে না ভরি বরণডালা,
দাঁড়ায়ে সমুখে কোন্ সে দেবতা যোগাই তাহার মালা।
যা দিয়েছ তুমি মুছে ফেল সব ধোয়ায়ে নয়নজলে,
ভিখারীর মত আশীষ মাগিতে দাঁড়াব চরণতলে।
বিরাট্ বিশ্বে তোমার দৃশ্যে ভরিয়া উঠুক প্রাণ,
করুণা তোমার পীযূষের ধারা রসনা করুক পান।
বন্দনা তব প্রকৃতিকণ্ঠে শুনিয়া জুড়াক্ কাণ,
পুষ্প তোমার বহুক গন্ধ, তৃপ্ত হউক ঘ্রাণ।
পবনে তোমার মধুর পরশ লভুক দগ্ধ-দেহ
দীনের চিত্তে দাও হে বিত্ত তোমার অতুল-স্নেহ।

দুরাকাঙ্ক্ষা

[লেখক ও শিল্পী—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন]

১ম পর্ব্ব—

বর্ষাকাল; সন্ধ্যে হয় হয়। সে দিন আড্ডা প্রায় ফাঁকা; আমরা মাত্র তিনজন;—শচীন হাঁটু দুলিয়ে, হাতের তুড়ীতে তাল রেখে, খুব গলা খেলিয়ে অথচ গুণ-গুণ করে গাইচে,—

"আয়ে ঘনপতি, আয়ে মল্লারো
দুনিয়া বাহারো।"

কুমুদ সরকার খবরের কাগজ পড়চে, আর মাঝে মাঝে শচীনকে জিজ্ঞাসা করচে,—"ওহে 'সুরটা' কাওয়ালী, না চিমে তেতালা?" আমি ফরাসে সটান্ চিৎ হয়ে শুয়ে কড়ি-বরগা গুণচি, আর শচীনকে গানের বাকী লাইনগুলো মনে করিয়ে দিচ্চি; এমন সময় বন্ধু জীবনকৃষ্ণ ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে জিজ্ঞাসা কল্লে—"ওহে, মণিরায় আছে?" আমি তার ভাবগতিক দেখে তড়াক্ করে উঠে বসে জিজ্ঞাসা কল্লুম—"কেন হে, ব্যাপার কি?"

জীবনকৃষ্ণের মুখে সেই এক কথা,—"মণিরায় কোথায়, শিগ্‌গির বল, এর পরে সব বলব।"

অনেক জেরা করেও যখন দেখলুম, 'মণিরায় কোথায়?' ছাড়া আর কোন কথাই তার কাছ থেকে বার করা গেলনা, তখন বল্লুম —"হয় বাড়ীতে, নয় কারখানায়।"

জীবনকৃষ্ণ—না, বাড়ীতে খুঁজেচি, সে নেই, আর কোথাও গেছে জান কি?" আমি—"তা বলতে পারিনে।" এই কথা শুনে জীবনকৃষ্ণ আর তিলমাত্রও দাঁড়াল না; বোধ হল সে মণিরায়ের কারখানার দিকেই যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়ল। ঠিক সেই সময়েই জোরে বৃষ্টি এল। তার সঙ্গে ছাতা নেই দেখে বল্লুম—"বন্ধু, বৃষ্টিতে ভিজে যেয়ো না, আমার ছাতাটা নিয়ে যাও।"

ছাতা নিয়ে যাবার কথা বলাতে, জীবনকৃষ্ণ ত চটেই লাল, মুখ ভেঙ্গিয়ে বল্লে—"যাবার সময় পেছু ডাকলে, আর সময় পেলে না ডাকবার। এখন এক কোশ পথ হেঁটে গিয়ে মণিরায়ের দেখা পেলে হয়।" তারপর তক্ত-পোষের ওপর মিনিট-দুই চুপ করে বসল, অর্থাৎ পেছন ডাকার দোষটা কাটিয়ে নিয়ে হঠাৎ উঠেই কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেল।

"মুখ ভেঙ্গিয়ে বল্লে——"

শচীনের গান বন্ধ হয়ে গেছল। আমি, কুমুদ ও শচীন বলাবলি করতে লাগলুম, মণিরায়ের সঙ্গে এর এমন কি দরকার থাকতে পারে? মণিরায়, Automobile Engineer; জীবনকৃষ্ণের মোটর গাড়ীর ওপর কোন দিন পথে

নেই। মোটর কেনবার ইচ্ছেও কখনও দেখা যায় নি। তার কথার ভাবে বোধ হ'ল, মোটর-সংক্রান্ত কোনও গোপনীয় ব্যাপারে সে মণিরায়ের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

যাহোক, মণিরায়ের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত যখন কিছুই বোঝা যাবে না, তখন আর কল্পনা-জল্পনা করাই মিথ্যে।

মণির একটু পরিচয় এখানে দেওয়া দরকার। সে বিলেত থেকে Motor Engineering শিখে এসে এখানে কারখানা খুলেচে। বিলেতে অনেক দিন থাকলেও সে সাহেব হয়ে যায়নি। এখানে এসে পাঞ্জাবী পরে, ধুতিও পরে, ডাল-ভাতও খায়। তবে কতকগুলো বিলিতি অভ্যেস তার থেকে গেছে, যেমন—কোনও কিছুতে আশ্চর্য্য হলে শিশ দেয়, কথায় কথায় Gosh, Rats, Blinking idiot ইত্যাদি বলে ওঠে; কোনও কথা জোর করে বলতে হলে, তক্তপোষ, টেবিল বা নিজের হাতের চেটোর ওপর জোরে ঘুষি মারে। এ-ছাড়া আর কোন রকম প্রকাণ্ড বিলিতি অভ্যেস তার বড় একটা দেখা যায় না।

২য় পর্ব্ব—

জীবনকৃষ্ণ কারখানায় পৌঁছে শুনলে মণিরায় বাড়ী চলে গেছে। এতে প্রথমে একটু নিরাশ হল, তারপর পুনরুদ্যমে মণির বাড়ীর দিকে দৌড়ল। সে যখন মণির বাড়ীতে এসে হাজির, মণি তখন একটা বেতের চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর পা তুলে সিগরেট্ ফুঁকচে, আর মোটর গাড়ীর এঞ্জিনের Spark Plug তৈরী করবার মতলব ভাঁওরাচ্চে।

জীবনকৃষ্ণ ঘরের মধ্যে ঢুকেই এক-নিঃশ্বাসে বলে গেল—"ভাই মণি, বড্ড দরকারে তোমার কাছে এসেচি; তোমার কারখানায় গিয়ে শুনলুম, তুমি বাড়ী চলে গেছ, তাই সেখান থেকে আবার তোমার বাড়ীতে এলুম, তুমি ছাড়া আমার আর গতি নেই। উঃ! কি বিষ্টিটাই মাথার উপর দিয়ে গেছে।"

তার জলে-ভেজা খোড়ো-কাকের মত চেহারা দেখে মণি খাপ্পিয়ে উঠে বল্লে,—"Your দরকার be hanged, আগে ভিজে কাপড়-জামা ছাড়, তারপর সব কথা হবে।"

জীবনকৃষ্ণ—আর কাপড়-জামা ছাড়া! তোমার কাছে Car-owners' list আছে?

মণি—Rot! Don't be a silly ass, কাপড়-জামা ছাড় আগে, একটু চা খাও, তারপর তোমার দরকারের কথা হবে।

জীবন—উঃ না, আর চা খাব না, জলে ভিজে মাথাটা বরং একটু ঠাণ্ডা হয়েচে, চা খেলে আবার এখনি গরম হয়ে উঠবে।

মণি—Queer! you are behaving like a raving maniac! কি হে, তোমার হয়েচে কি?

জীবন—আর হয়েচে কি! যাক্, তুমি যখন ছাড়বে না, তখন দাও না হয় জামা-কাপড়।

জীবনকৃষ্ণ জামা-কাপড় ছেড়ে চেয়ারে বসতে গিয়ে হঠাৎ আর্ত্তনাদ করে উঠল—"আমার ভিজে জামা, ভিজে জামা কই; ওর পকেটে যে আমার অঙ্কের নড়ি আছে। কোথায় গেল জামা, চাকরটা নিয়ে গেচে বোধ হয়? এখনি আনিয়ে দাও।"

চাকরটা জামা নিয়ে এলে জীবন তার বুক-পকেট থেকে রুমালে-বাঁধা এক টুকরো কাগজ খুলে নিয়ে বল্লে—"এর জন্যেই আজ এই জল-বৃষ্টি মাথায় করে তোমার কাছে আসা।"

মণি এতক্ষণ অবাক্ হয়ে তার ভাব-ভঙ্গী দেখছিল; এইবার সেই কাগজের টুকরোটি দেখে বলে উঠল—"Rummy!"

জীবনকৃষ্ণ—রামিই বল আর বামীই বল, এখন দয়া করে আমার একটু উপকার কর।

মণি—এই আধঘণ্টা ধরে কেবল দরকারের কথাই বলচ, এখন খোলসা করে বলে ফেল ত—কি দরকার?

জীবন—এতক্ষণ সবই বলতুম, তুমিই যে কেবল দেরী করিয়ে দিলে।

মণি বেতের চেয়ারটাতে হেলান দিয়ে ডান পা-টা লম্বা করে ছড়িয়ে, চসমাটা নাকের উপর ভাল করে বসিয়ে বল্লে—"Bosh, now out with it man."

জীবন—তোমার কাছে Car-owners' list আছে?

দুরাকাঙ্ক্ষা

শিল্পী—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন
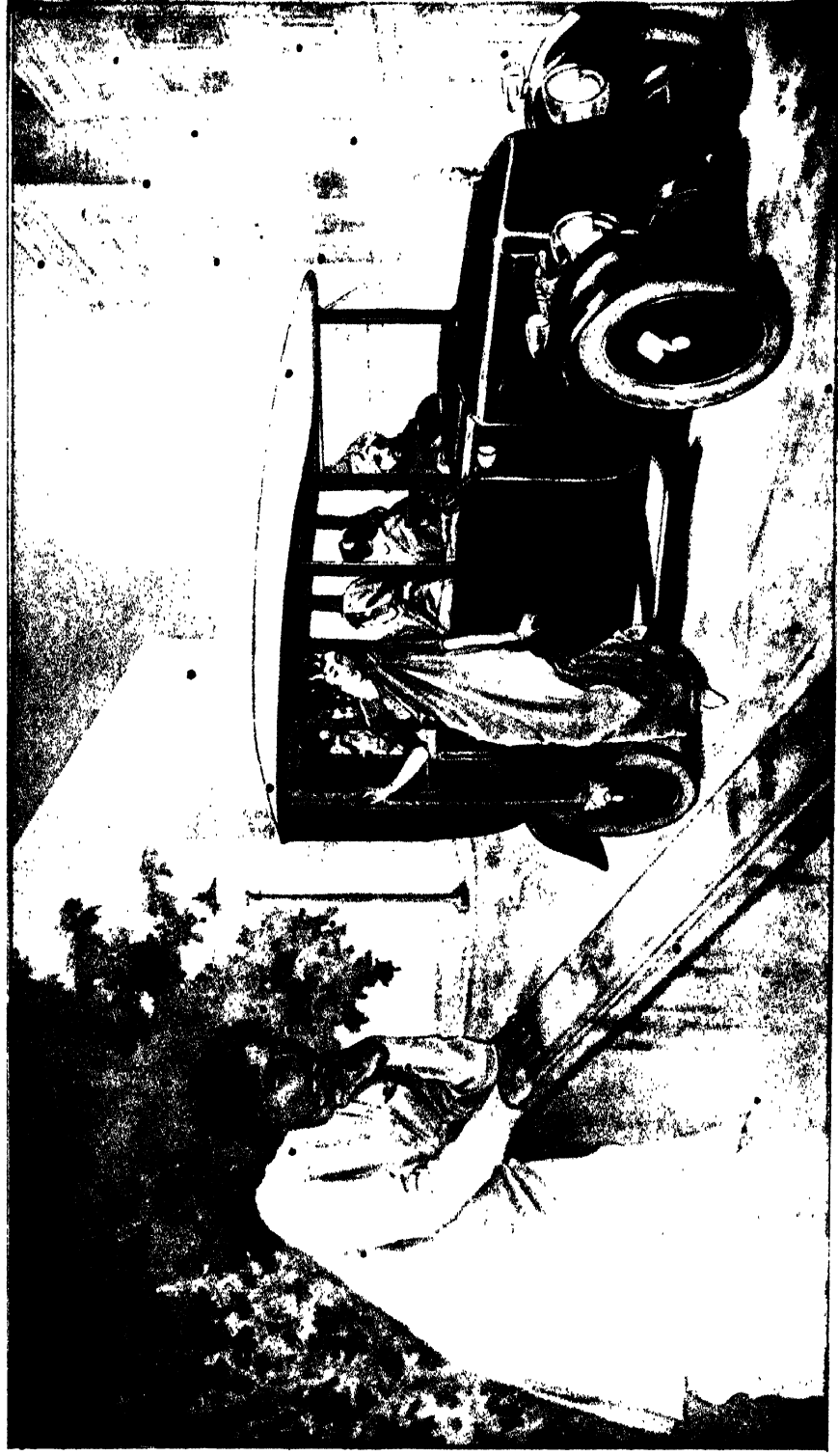
Emerald Ptg. Works.

Blocks by—BHARATVARSHA HALFTONE WORKS.

মণি—আছে, কেন? Harping on the old cord still?

জীবন—আর কর্ড! কর্ড এখন গলায় ফাঁসী হয়ে বসেচে।

মণি সেলফের ওপর থেকে Car-owners' list টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস কল্লে—"কই, দেখি তোমার কাগজ?" জীবনকৃষ্ণ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কাগজখানি একবার ভাল করে দেখে, মণিরায়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে অত্যন্ত মিনতি করে বল্লে—"ভাই, এতে যে গাড়ীর নম্বরটা লেখা আছে, দেখ ত সেই গাড়ীখানা কার?"

মণি—গাড়ীর নম্বর! গাড়ীর নম্বরে কি দরকার? Going to purchase a car? কই, এ কথা ত শুনিনি! তাও মারলে কিসে? তা, অন্য জায়গা থেকে Second-hand car কিনবে কেন? আমার Workshop-এ কখানা ভাল ভাল গাড়ী বিক্রীর জন্যে রয়েচে। এই, একখানা Hudson Super six, run only 2,007 miles, engine in splendid condition, very sparingly used; এ গাড়ী না পছন্দ কর Cole Aero-Eight নাও, luxuriously upholstered, plenty of leg room, car-এর conditionও বেশ ভাল, that's a fine car to buy, তবে এটা latest type নয়, এ car না কিনতে চাও, একখানা Seven passenger বিউইক টুরিং-কার আছে, comfortable, roomy গাড়ী; soundless, tenacious on the road—আর Buick-এর যে এঞ্জিন, that's a piece of Art; দামও বেশী নয়; কিন্তু এ সব হচ্চে American car. আমি ক'দিন হল একটা Wolsely কার-এর শ্যাশে বেশ সুবিধে দরে কিনেচি, যদি বল, তা হলে এই chassis-তে body build করে দি—sedan, cabriolet, limousine বা touring যে রকম বলবে, সেই রকম বডি তৈরী করে দোবো। বিলিতির চেয়ে কোন অংশে খারাপ হবে না, আমার work-shopএ trained মিস্তিরী আছে, দামেও বেশ—

জীবনকৃষ্ণ, মণিরায়ের এই গাড়ীর বর্ণনায় ক্রমেই অধীর হয়ে উঠছিল; শেষে আর থাকতে না পেরে বাধা দিয়ে বলে উঠল—বিলেত থেকে একটি আস্ত গাধা হয়ে এসেচ। কাণ্ডজ্ঞানের একান্ত অভাব দেখচি। আমার হাঁড়ির খবর তুমি জান, আমি মোটর কিনব, এ ধারণা তোমার কিসে হল? আর গাড়ীই যদি কিনব, তবে একখানা গাড়ীর নম্বর নিয়েই বা তোমার কাছে আসব কেন?

মণি—I beg your pardon, তা হলে বোধ হয় car repairএর জন্যে তুমি আমার কাছে এসেচ—engine overhaul? Valve grinding? Magneto repair? দেখ, এই Delco systemটা এখানে মাত্র দু'তিনজন আমরা বুঝি—

জীবন—চুলোয় যাক তোমার 'দেলকো সিসটেম' আর ম্যাগনিটো; আমি এলুম তোমার কাছে—

মণি—With a car-number, ওঃ! আমি এতক্ষণে সব বুঝতে পেরেচি। A case of car smash or run over, ay?

জীবন—'রাণ ওভারই' বটে। গাড়ী চাপা আর কে পড়বে, আমিই পড়েচি, এখন যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

মণি—Dear me! তুমি এ সব কথা আগে আমায় কিছু বলনি ত, badly injured? ফ্র্যাকচার ট্যাকচার কোথাও হয়েচে না কি? তা হলে এখানে বসে না থেকে এখুনি একজন bone-setter'এর কাছে গিয়ে ভাল করে দেখান উচিত। আর, গাড়ীর নম্বর যখন পাওয়া গেছে, তখন ভাবনা কি। পুলিস-কেশ করলেই ওর সঙ্গে একটা damage suit খাড়া করতে হবে; কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—রাস্তার wrong side-এ ছিলে না ত? Was the chap driving rashly?

জীবন—আর ড্রাইভিং! একেবারে মর্ম্মভেদ করে বুকের হাড় ভেঙ্গে গাড়ীর চারখানা চাকাই নিঃশব্দে আমার ওপর দিয়ে চলে গেছে।

মণি—Holy snakes! বুকের হাড় ভাঙ্গা, মর্ম্মভেদ, এ সব কি বলচ? Are you as bad as that? You are joking perhaps. কই, তোমাকে দেখে সে রকম কিছু হয়েচে বলে ত মনে হচ্চে না; তবে এটা বেশ বুঝতে পাচ্চি you are not your old-self, তোমার চেহারাটা যেন কেমন বদলে গেছে। দেখ, I am a repairer of cars, not of human limbs and parts, যদিই কিছু হয়ে থাকে, তোমার এখুনি একজন ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত—look here, if it's a case of accident, তাহলে

ডাক্তারের certificate-এর উপর তোমার damage-এর দাবী নির্ভর করচে। একেবারে হাজার ছয়েক টাকা damage-এর দাবীতে আদায় করে নাও, তারপর if you don't mind, তা হলে আমি বলি, ঐ টাকায় আমার কাছ থেকে একখানা car কিনে চড়ে বেড়াও, বাকীটা না হয় instalment-এ সুবিধে মত দিও।

জীবন—ডাক্তারের কাছে আমার চেয়ে তোমার যাওয়াই বেশী দরকার বলে মনে কচ্চি। না, তোমার কাছে আসাই মিথ্যে হল। ঐ নম্বরের গাড়ীখানা কার, জানবার জন্যে আমি এর আগেও, আরও দু'এক জায়গায় গেছলুম; কিন্তু তারা এমন বিশ্রী সন্দেহ করতে লাগল যে, অগত্যা তোমার কাছে আসতে হল। এখানে আসবার আমার বড় একটা ইচ্ছে ছিল না, কেন না, তোমার পেটে কথা থাকে না, আর এই ব্যাপারটা আমি আড্ডার কাউকে বলতেও চাই না, শুধু প্রাণের দায়েই তোমার কাছে এসেচি। এ কথা দ্বাদশকরের কোন থার্ড পারসনকে জানিও না। যাক, এখন তোমাকে কালীর দিব্বি করতে হচ্চে ভাই।

মণি 'কালীর দিব্বি?' Rubbish!

জীবন—হাঁ, তুমি যাই বল, তোমাকে দিব্বি গালতেই হবে। যদি বিলেত থেকে এসে ও-দিব্বিটা না মান, তবে সেখানকার সায়েবদেরই একটা দিব্বি না হয় গাল। ঐ যে তুমি নিজেই কথায় কথায় Honor bright দিব্বি কর, তাও যদি বলতে না চাও, 'আপন গড্' বল, তা হলেই হবে।

মণি Bally rot! আচ্ছা Honor bright.

জীবন—তা হলে দয়া করে ঐ নম্বরের গাড়ীখানা কা'র, বলে দাও।

মণিরায় car owners' list খুলে ছ' হাজারের কোট থেকে আঙ্গুল নাবিয়ে আনতে আরম্ভ করলে। জীবনকৃষ্ণ সন্দেহ, আশা, ভয়, এই তিনের মেশান ভাবে মুখখানা অদ্ভুত করে উদ্‌গ্রীব হয়ে বই-এর দিকে চেয়ে বসে রইল। মিনিটখানেক পরেই মণি বলে উঠল - "Here you are."

জীবনকৃষ্ণ অত্যন্ত আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে—"আঁা, আঁা, পেয়েচ পেয়েচ, কই দেখি।" মণি, বইখানা জীবনকৃষ্ণের হাতে না দিয়ে মুড়ে রেখে বল্লে—"That's an Armstrong Siddley."

জীবনকৃষ্ণ চেঁচিয়ে বলে উঠল—"গাড়ীর নাম আমি চাই না; গাড়ীখানা কা'র, তার নাম ও ঠিকানা বলে দাও। সে-সব ঐ বইয়েতে নিশ্চয়ই লেখা আছে। নেই কি মণি?"

মণি বল্লে—"আছে বই কি, এই ছাখ।"

জীবনকৃষ্ণ মণির হাত থেকে বইখানা ছিনিয়ে নিয়ে পড়তে লাগল, তারপর সেই নম্বর-লেখা কাগজখানার সঙ্গে বারবার মিলিয়ে সেই পাতাখানা ছিঁড়ে নিতে গেল। মণি বাধা দিয়ে বলে উঠল—"Hold on, don't spoil the book. টেবিলের ওপর কাগজ পেন্‌সিল রয়েচে, যা লিখে নেবার লিখে নাও, বইখানার পাতা ছিঁড় না। আমি আজ তোমার রকম-সকম কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।"

জীবনকৃষ্ণ সে কথা কাণে না তুলে কাগজ-পেন্‌সিল নিয়ে কাঁপা-হাতে, প্রতি কথাটি বারবার বানান করে লিখে, অনেকবার ভাল করে মিলিয়ে দেখে বইখানা রেখে দিয়ে বল্লে—"ঐ যে গাড়ীর নাম করলে, ওর দাম কত?"

মণি -Armstrong Siddley গাড়ী Post-war model, six-cylinder engine, saloon double phaeton body—R. A. C. rating 20.5 horse-power, Treasury tax L 8. 8. 0. আগে ছিল Siddley Deasy Motor Car Co Limited, এখন হয়েচে Armstrong Siddley, এঞ্জিন সম্বন্ধে আমার ভাল জানা—

জীবনকৃষ্ণ অতিষ্ঠ হয়ে বলে উঠল—"আঃ, আবার সেই গাড়ীর বর্ণনা আরম্ভ করলে, এই বুদ্ধি নিয়েই তুমি ব্যবসা করবে?"

মণি Why, what's up now?

জীবন—তোমার ও 'আপ ডাউন' রেখে দিয়ে এখন গাড়ীর দামটা একবার বল, শুনে চলে যাই, আমি আর এখানে বসতে পাচ্ছি না, আমার প্রাণ যেন কি রকম করচে।

মণি—Oh, price? I am afraid it's a high-priced car, চ্যাশের দাম equipped with Lucas engine-starter, 5 lamps, 4 wheels, spare rim, 4 tyres, all wings and dash-board -সাত-শ কুড়ি পাউণ্ড -

জীবন—সাত-শ কুড়ি পাউণ্ড বিলিতি দাম, আঁা!

মণি—ও ত শুধু চ্যাশের দাম, গাড়ী complete with body—ডবল ফেটন্ সেলুন, ১৯২০ সালের দাম হচ্চে

...তে ১,০০০ পাউণ্ড, এখানে আরও বেশী, packing, insurance, freight, dealer's profit, high exchange. এসব নিয়ে ওর দাম এখানে দাঁড়ায় ...কুড়ি বাইশ হাজার টাকা।

জীবনকৃষ্ণ শুনে চমকে উঠল, আর ভয়ানক নিরাশ হয়ে ...বলতে লাগল—"হাজার পাউণ্ড—এক পাউণ্ডে পনেরো টাকা, খুব বড়লোক না হলে, এ গাড়ী কেউ কিনতে

"ওটা চাবুরল্যাট্ নয় —'সেভ্‌রলে'"

...রে না। হায়! ঐ নম্বরের গাড়ীখানা যদি ফোর্ড, বা ওভারল্যাণ্ড ফোর্ড, নিদেন পক্ষে চাবুরল্যাট্ হতো, তা হলেও আশা থাকত। কি সর্ব্বনেশে গাড়ীর নাম বল্লে তুমি ...পরায়—ওঃ!"

মণি, জীবনকৃষ্ণের ঐ কথা শুনে বলে উঠল—"Excuse me, let me correct you, ঐ নামের গাড়ীগুলোর একখানাও ওভারল্যাণ্ড ফোর্ড নয়—ওর নাম উইলিস্ ওভারল্যাণ্ড নম্বর ফোর মডেল, আর ওটা চাবুরল্যাট্ নয়,—'সেভ্‌রলে'। তোমার আজ কি হয়েছে বলতে পার?"

মণিরায়ের কোন কথাই জীবনকৃষ্ণের কাণে গেল বলে মনে হল না; সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর "এক হাজার পাউণ্ড, এক পাউণ্ডে পনেরো টাকা," কেবলি বিড় বিড় করে এই কথা বলতে বলতে মাতালের মত টলতে টলতে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেল। মণির অনেক ডাকাডাকিতেও ফিরে এল না।

মণি হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ তার কথা ভাবলে, তারপর —"I love a lassie, a bonnie bonnie lassie"—শিশ দিতে দিতে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

৩য় পর্ব্ব—

মণির সঙ্গে জীবনকৃষ্ণের দেখা হবার পরে, জীবন প্রায় এক হপ্তা আমাদের আড্ডায় আসেনি। সে নিয়মিত আড্ডাধারী; হঠাৎ এমনভাবে ডুব মারাতে আমরা ক্রমাগত তার খোঁজ নিতে লাগলুম; কিন্তু বাড়ীতে গেলেই শুনতুম সে বাড়ী নেই, কোথায় বেরিয়ে গেছে কেউ বলতে পারে না, শুধু দিনে খাবার সময় থাকে ও রাত্তিরে এসে শোয়। মণি রোজই আড্ডায় আসত, তাকে জীবন-কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করলেই বলত—"জীবনকৃষ্ণের কাছে আমি promise-bound, তার কথা তোমাদের কিছুই বলতে পারব না।" জীবন ও মণির ব্যাপারটা আমাদের কাছে বড়ই অদ্ভুত ঠেকতে লাগল!

কয়েকদিন এমনি ভাবেই গেল। একদিন পুরো দমে আড্ডা চলচে, এমন সময় হঠাৎ জীবনকৃষ্ণ এসে হাজির। আমরা সকলে মিলে তাকে ধরে বসলুম। আমাদের হাত থেকে তার ছাড়ানছোড়ন নেই জেনে, সে সেদিন যা বল্লে তা এই,—

"প্রায় দিন-পনের আগে শ্যামবাজারের এক রাস্তা দিয়ে যাচ্চি, এমন সময় দেখতে পেলুম, একটি মেয়ে দোতলার বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রাস্তায় কি দেখচে। তাকে দেখেই মনে হল---'রূপ লাগ গেই হৃদয় হামারি।'

"সেই রাস্তা দিয়েই বরাবর যাই, কিন্তু মেয়েটিকে ত আর কখন দেখিনি। এ কার মেয়ে? কাপড়-চোপড় হাল-ফ্যাসানের মেয়েদের মত; ভাল করে আবার চেয়ে দেখলুম—তাকে কুমারী বলে মনে হল, আর সেই সঙ্গে মনে হঠাৎ একটা আশা জেগে উঠল। এইখানে আমার আগেকার কথা একটু বলে রাখি,—তোমরা বোধ হয় জান না, এক জায়গায় আমার বিয়ের কথা প্রায় ঠিক হয়ে আছে। মা ও বাবার ইচ্ছে আমি সেইখানেই বিয়ে করি। কিন্তু মা-বাপের কথাতেই মত দিয়ে, না-দেখে-শুনে এ রকম বিয়ে করা আমার মোটেই ইচ্ছে নয়—"

কৃষ্ণশেখর এইখানে বাধা দিয়ে বলে উঠল—"তাতে দোষ কি? রামচন্দ্র পিতৃআজ্ঞা পালনের জন্যে চোদ্দ বচ্ছর বনে ছিলেন।" জীবনকৃষ্ণ এই কথাতে চটে গিয়ে বল্লে—"তেমনি কষ্টও পেয়েছিলেন, সীতাকে রাবণ ধরে নিয়ে গেল, রাক্ষসদের সঙ্গে লড়াই। যাক, এ সব তর্ক আর একদিন হবে।

"দশ বছরের প্যান্‌প্যানে ঘ্যানঘ্যানে নোলক নাকে কচি খুকীকে বিয়ে করে আনা, আর একটা টেয়াপাখী ধরে তাকে পোষ মানিয়ে তার সঙ্গে প্রেম করতে যাওয়া একই কথা। বিয়ের এই সেকেলে প্রথাটা আমাদের দেশ থেকে উঠে

"রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রাস্তায় কি দেখ্‌চে"

যাওয়া উচিত। আগে লাভ্ না হয়ে বিয়ে হওয়া বিয়েই নয়। আমার বিয়েতে রোম্যান্স থাকবে, এই আমি চাই।"

এই কথা শুনে শচীন টিপ্পনী কাটলে—"তুমি গন্ধর্ব্ব বিয়ে না করে ছাড়বে না।" মণিরায় ঠোঁটে সিগারেট চেপে বলে উঠল—"Blinking idiot!" জীবনকৃষ্ণ শুনে বল্লে,—"তা যাই বল, তোমরা আমাকে সব কথা খোলসা করে বলতে বলেচ, তাই বলচি।"

গল্পের প্রথমেই বাধা পড়াতে স্মরগতি চটে গিয়ে বল্লে—

"তোমাদের ও সব কথা এখন থাক, তারপর ব্যাপারটা কতদূর গড়াল শুনি।"

জীবনকৃষ্ণ আবার আরম্ভ করলে—

"যে পাড়ায় মেয়েটিকে দেখলুম, সেখানে আমার জানা কোন লোকই ছিল না। তাকে বারবার দেখবার ইচ্ছে হলেও, ভদ্রতার খাতিরে বেশী বার দেখ্‌তে পারলুম না। প্রাণটাকে সেই বাড়ীর বারান্দায় ফেলে রেখে শুধু দেহটাকে নিয়ে পথ চলতে লাগলুম; ভাবলুম রাত্তিরে ফেরবার সময় বাড়ীটার খোঁজ করে যাবো, কিন্তু মন মানলে না, ফিরতে হল। ফিরে এসে বাড়ীর দরজায় দেখলুম একটি Letter box টাঙ্গান রয়েচে; তাতে লেখা, কি বাঁড়ুয্যে, গোড়ার অক্ষরগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণের বাড়ী দেখে আমার মাথায় যেন বাজ পড়্‌ল— আমরা কায়স্থ, আর সে যে ব্রাহ্মণের মেয়ে। হায়! আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হল। ভয়ানক হতাশ হয়ে আবার পথ চলতে লাগলুম, এমন সময় আমার এক ব্রাদার-অফিসার—দাসুর সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেল। সে আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলে—'কিহে, রাম বাঁড়ুয্যের বাড়ীর দরজায় কি দেখ্‌ছিলে?'

আমি—তুমি কি করে জানলে, এ কা'র বাড়ী?

দাসু—আরে আগে বলই না ছাই কি দেখছিলে, আমার কাজই হল এদিকে, আমি আর জানিনা ও কার বাড়ী?

আমি—না, তা, এ, এমন কিছু নয়, ওঁরা কি ব্রাহ্ম?

দাসু—ব্রাহ্ম কেন হতে যাবে, ব্রাহ্মণ,—কেন হে মতলব কি?

আমি—একটি মেয়ে ছিল জানলায়—

দাসু—জানলায় মেয়ে? ও-বাড়ীতে তিনজন ৪০।৫০ বছরের বুড়ী ছাড়া আর কোনও মেয়েই ত নেই।

আমি—এই যে আমি দেখলুম।

দাসু—কাকে যে কোথায় দেখেচ তা বলতে পারলুম না, কিন্তু ও-বাড়ীতে কম বয়েসের কোন মেয়েই নেই—ওঃ, হয়েচে রামবাবুর এক বন্ধুর বাড়ীর মেয়েরা প্রায়ই ওঁদের বাড়ীতে আসেন, তাঁদেরই কাউকে দেখেচ বোধ হয়।

আমি—তাঁরা কি, বলতে পার? এই, এই কায়স্থ কি?

দাসু—অতশত খোঁজ রাখিনা, সন্ধান করে দেখনা তাঁরা কি—

এই বলে একটু মুচকে হেসে সে চলে গেল। আমি আবার আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে পথ চলতে লাগলুম, আর ভাবতে লাগলুম, কা'র কাছে এঁদের খোঁজ পাওয়া যায়? রাম বাঁড়ুয্যেকেই বা এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি কি করে? এটা বোধ হয় ভদ্রতাসঙ্গত কাজ হবে না। তারপর রোজ সকাল-সন্ধ্যে ঐ রাস্তা দিয়ে আনাগোনা করতে লাগলুম, আশা—যদি সেই মেয়েটিকে আর একবার দেখতে পাই। শেষে আর থাকতে না পেরে,—যা থাকে অদৃষ্টে ভেবে—একটু সেজেগুজে, একদিন দুকুরবেলা রাম বাঁড়ুয্যের বাড়ীর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালুম। কড়া নাড়ব কি কাউকে ডাকব—এই কথা ভাবচি, এমন সময় ঘাড়ে-গর্দ্দানে-এক, ভাঁটার মতন গোল, এক মেদিনীপুরী ঝি, সেই বাড়ীর দরজা খুলে বেরিয়ে এসে, আমাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠল—'ছঁড়া কে গো, চোর হবে বা বটেক, পুলুস ডাকব না কি গো।'

আমি তার সেই কথা শুনে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলুম; সেখান থেকে পালাব, কি থাকব, ঠিক করতে না পেরে, ভাবলুম টাকার লোভ দেখালে বোধ হয় কাজ হতে পারে। বল্লুম,—'ওগো ঝি, আমি চোর-টোর নই, রামবাবুর ছেলের একজন বন্ধু, একটু দরকারে এসেচি, তোমাকে একটা টাকা—'

আমার কথা শেষ হতে পেলে না। ঝি-টি দরজায় দাঁড়িয়ে বারকতক যেন নেচে নিলে, তারপর চেঁচিয়ে বলে উঠল—'কেশবা রাউলের ম্যাইয়াকে টাকা দেখাও বটেক? পনর বছরে রামবাবুর ছেলিয়া দেখলুম নি, আর আজ হল ছেলিয়া! বাবু হয়ে আসচ বটেক, পাক্যা বদমাস। এ দামো! দামো!'

ঝি-এর এই রণচণ্ডী মূর্ত্তি দেখে সেখানে দাঁড়ান আমি মোটেই যুক্তিসঙ্গত মনে করলুম না। দেখলুম সে আমাকে চোর বলে ঠাউরেচে। আর ঐ টাকার কথায় আরও কিছু যে ভেবেচে, এতেও কোনও সন্দেহ নেই। তার চেঁচামেচিতে রাস্তায় দু' একজন লোকও দাঁড়িয়ে গেছে। আমি ভারি বে-গতিক দেখে, ফ্যাসাদে পড়বার ভয়ে, সেখান থেকে সরবার উপক্রম করচি, এমন সময় সেই তেলের কুপোর

"কেশবা রাউলের ম্যাইয়াকে টাকা দেখাও বটেক ?"

মতন দেহ থেকে বিকট চীৎকার উঠল—'আরে এ দামো! দামো! ডাক্‌রা ছঁড়া যে পালাতে নাগল প্রায়, এ পুলুষ, পুলুষ,—'

আমি আর কিছু শোন্‌বার অপেক্ষা না করে একেবারে চোঁচা দৌড় মারলুম।

রামবাবুর বাড়ীর পথ ত বন্ধ হল, এখন কি করি?

অথচ মেয়েটির খোঁজ নেবার কোন বুদ্ধিই আর মাথায় এল না। এমনি করে আরও কয়েক দিন গেল। একদিন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ধরে যাচ্ছি, দেখি প্রায় হাণ্ড্রেড ইয়ার্ডস্ দূরে একখানি প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী যাচ্ছে, তার মধ্যে সেই মেয়েটি বসে—সে যেন আমার চোক ঝলসে দিয়ে চলে গেল। গাড়ীখানা, আর তার সাজসজ্জা দেখে আমার ত

সুরপতি ঠোকর মারলে—"তা ত চিরকালই জানা আছে। তা না হলে যার নামধাম জাত জানা নেই, তাকেই বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়ে উঠে?"

সতীনের কবিতা আওড়ান একটা রোগ। সে এই ফাঁকে একটা গানের কলি, রসান দিয়ে জীবনকৃষ্ণকে শুনিয়ে দিলে,—

"আমি একটা হস্তী-মূর্খ"

একেবারে বুদ্ধিলোপ হল। কিন্তু, আর একটি আশা এল, গাড়ীখানা ঐ মেয়েটির না-ও হতে পারে, এমন কতলোকের গাড়ীতে কত লোক বসে যায়। হায়! হায়! যদি গাড়ীখানার নম্বর দেখে নিতুম, তা হলে সব খোঁজই পেতুম, এ বুদ্ধি তখন আমার ঘটে এল না, মনে মনে ভাবলুম—আমি একটা হস্তীমূর্খ!"

"কি জাতি কি নাম ধরে,
কোথায় বসতি করে,
আমি ত চিনিনে তারে
চেনে মোর দুনয়ন!"

জীবন—মনে কত কথাই আসতে লাগল, মনকে বোঝাবারও চেষ্টা করলুম—দেখলুম মন অবুঝ। সে

কেবলই বলে,—'ও স্বজাত, স্বজাত, ধনীর মেয়ে নয়, ও-গাড়ীও ওর নয়, ওকে পাবে, পাবে!' এই সব নানা রকম কথা ভাবতে ভাবতে চলেচি, এমন সময় কে বলে উঠল—'এ বাবু, তেরে মন্‌মে কিসিকা খ্যাল্ লগা হ্যয়।'

ফিরে দেখি, ফুটপাথের ওপর একজন গণৎকার বসে ঐ কথা বলচে! গণৎকারের কথা শুনে আমি চমকে উঠলুম। ঠিকই ত বলেচে, আমি ঐ মেয়েটির কথাই ত ভাবতে ভাবতে চলেচি। তার ওপর বড়ই ভক্তি হল। কাছে যেতেই সে বল্লে—'দেখে বাবু তেরা হাত?' হোবে বাবু, ঠিক হোবে, দেখে তেরা বায়াঁ হাত?'

আমি বাঁ হাত বাড়িয়ে দিলুম, সে দেখে বলতে লাগল—'কুছ্ অঘ্‌টন্ সে সাদী হোগা, স্ত্রীভাগসে বহুৎ ধন্ মিলেগা, ওয়াহ্ ওয়াহ্ য়্যাসা হাত মে কিসিকা নহি দেখা।'

তারপর সে যে কি বলে গেল, তা আমার কাণেই গেল না, আমি কেবলই ভাবতে লাগলুম—'অঘ্‌টন্ সে সাদী হোগা।'

হাত গোণাবার দিন-কয়েক পরে, আমি মামার বাড়ীতে পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেখলুম সেই গাড়ীখানা

"অঘ্‌টন্ সে সাদী হোগা"

আমি বসে হাতখানা বাড়িয়ে দিলুম। সে অনেকক্ষণ দেখে বল্লে-'তেরা গ্রহ্ অভি প্রসন্ নহি হ্যয়, শান্তি করনে সে ভাগ প্রসন্ হোগা, বাবা বৈজনাথকে পূজা কে লিয়ে বিশ গণ্ডা দে দেও, হাম্ গ্রহ্ শান্তি করেঙ্গে, যিস্ সে তেরা ভাগ্ খুল্ যায়গা। মনোকামনা সিধ্ হোগা।'

আমি তৎক্ষণাৎ তাকে পাঁচ সিকে দিয়ে বল্লুম—'ভাগ্য প্রসন্ন হবে ত?'

গণৎকার—

'হোলী কি রাতকি জাগায় বিত্যা
নয়না যোগিন্, কামচ্ছা দেবী,

আমার কাছ থেকে প্রায় হান্‌ড্রেড্ ইয়ার্ডস্ দূরে এসে থেমেচে, আর তার মধ্যে থেকে সেই মেয়েটি নাবচে। আমি তন্ময় হয়ে মেয়েটিকে দেখতে লাগলুম। মেয়েটি বাড়ীর মধ্যে চলে যেতেই আমার চমক ভাঙ্গল। তারপর দৌড়ে রাস্তায় গিয়ে, কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে, গাড়ীর নম্বরটা নিয়েই আড্ডায় মণিরায়ের সন্ধানে আসি। এখানে না পেয়ে কারখানায় যাই, সেখানে সে নেই দেখে তার বাড়ীতে গিয়ে তার কাছ থেকে গাড়ীখানা কার জানতে পারি। সেই দিনই এক রকম নিরাশ হয়েছিলুম। তবুও শেষ আশায় নির্ভর করে, গাড়ীখানা যার, তার বাড়ীটা অনেক খুঁজে

বার করি। তারা খুব বড়লোক, আমাদের স্বজাতও বটে, কিন্তু আমার মতন অবস্থার লোকের সে বাড়ীর মেয়েকে বিয়ে করবার কল্পনা করাও দুরাশা।" এই বলে জীবনকৃষ্ণ চুপ করলে। তখন রাত্রি ন'টা বেজে গেছে। সবাই উঠে বাড়ী চলে গেল, আমিও উঠে পড়লুম। জীবনকৃষ্ণ তক্তপোষ থেকে নাবতে নাবতে হঠাৎ বসে পড়ে দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে বলে উঠল—'এত দিনে আমার সব আশা নির্ম্মূল হল।'

আমি অনেক সান্ত্বনা দিয়ে তাকে বাড়ী পৌঁছে দিলুম। এই ঘটনাটি ঘটে প্রায় এক বছর আগে। জীবনকৃষ্ণ এখন মোটর গাড়ীর নামে হাড়ে চটা! সে যদিও মুখে বলে—'আমি সব আশা এখন একেবারে ত্যাগ করেচি', কিন্তু আমরা গোপন অনুসন্ধানে জেনেচি প্রকাশ্যভাবে আশা ত্যাগ করলেও, সে মনে মনে একেবারে আশা ছাড়ে নি। সে এখন ভয়ানক 'রেস' খেলতে আরম্ভ করেচে, ইচ্ছেটা এই,—রেসে তার অদৃষ্ট ফিরিয়ে তারপর সেই মেয়েটির দিকে হাত বাড়ানো। হায় দুরাকাঙ্ক্ষা!

"সব আশা নির্ম্মূল হ'ল"

পূজা

[শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু]

অনেক দিন পরে আজ মা আনন্দময়ীর কাছে ধূমধাম করে পূজা দেওয়া হবে। ভোর থেকেই সকলে মা'র পূজার নৈবেদ্য, ফুল, চন্দন, প্রভৃতির যোগাড়ে ব্যস্ত। সকলের মুখে একটা আনন্দের রেখা। ছোট ছেলেরা বলির ছাগলটাকে নিয়ে আনন্দে মত্ত। আমার একটা বিশেষ সু-খবর আসার জন্যেই, আজ আনন্দময়ীর কাছে পূজা দেওয়ার এত আয়োজন। তাই অপর সকলের চেয়ে আমার আনন্দই বেশী।

পূজার গোছগাছ করতেই বেলা আট্‌টা বাজ'ল। প্রায় সমস্তই যোগাড় হ'য়েচে, এমন সময় পুরোহিত মহাশয় তাড়া দিয়ে গেলেন যে,—আর বেশী দেরি করো না; তোমরা একটু পরে সব গুছিয়ে নিয়ে এস, কিছু যেন ভুল না হয়; আমি এগিয়ে মা'র মন্দিরে যাচ্ছি।

যেটুকু আয়োজন বাকি ছিল, পুরোহিত মহাশয়ের তাড়াতে, তা চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল।

মা আনন্দময়ীর মন্দির বেশী দূর নয়। খিড়কী পুকুরের পরেই যে মাঠ আছে, সেই মাঠটা পার হ'লেই, মা'র মন্দিরে পৌঁছান যায়।

ছোট ছেলেরা, পূজার আর বেশী দেরি নাই শুনে, সকলে যাবার আগে, ছাগলটাকে নিয়ে যাবার জন্যে টানাটানি করতে লাগ'ল; কিন্তু ছাগলটা কিছুতেই যাবে না। ছেলেরাও ছাড়বার পাত্র নয়। শেষে তারা একটা কঞ্চি নিয়ে ছাগলটাকে মারতে লাগ'ল; মার খেয়ে সেটা একটা বিকট চীৎকার আরম্ভ করলে। তার চীৎকার শুনে বোধ হ'তে লাগ'ল, সে যেন বুঝতে পেরেছে যে, তাকে বলি দেওয়া হবে।

চীৎকার শুনে মনটা কি রকম হ'ল। কে যেন কাণের কাছে এসে বলতে লাগ'ল,—"মা আনন্দময়ীর পূজায় ছাগ-বলি কেন, একটা প্রাণিবধের কি প্রয়োজন? মা ত ওতে সন্তুষ্ট হবেন না! মা'র পূজায় সন্তানের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত স্বার্থ বলি দিতে হবে; তা হ'লে মা সন্তুষ্ট হবেন।" মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। আস্তে-আস্তে ছেলেদের কাছে গিয়ে, তাদের হাত থেকে ছাগলটাকে নিয়ে, সেটার গলার দড়ি খুলে দিলুম। খোলবামাত্রই ছাগলটা তীর বেগে ছুটে চলে গেল। ছেলেরা এ ব্যাপার কিছুই বুঝতে না পেরে, অবাক্ হ'য়ে রইল।

বাড়ীর মধ্যে এ' খবর পৌঁছুতেই, সকলে তাড়াতাড়ি এসে, কারণ জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে, অতি কষ্টে, ক্ষীণ স্বরে বল্লুম—"মা ত ওতে সন্তুষ্ট হবেন না।" মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুলো না।

ইতিমধ্যে পুরোহিত মহাশয়ের কাছে খবর যাওয়াতে, তিনি দৌড়তে-দৌড়তে এসে, চীৎকার করে বলতে লাগলেন,—"মা'র সঙ্গে চালাকি! মা'র নাম করে সাত-আট দিন থেকে পাটাটা কিনে, পূজোর সময় তাকে ছেড়ে দিলে! পূজো করতে করতে মাথার চুল পেকে গেল,—কখন ত এ রকম ব্যাপার দেখি নি। এরা শীঘ্রই একটা মহা অমঙ্গল ঘটাবে। আমার দ্বারা এ রকম ছেলে খেলা পূজো হবে না,—আমি চল্লুম।" এই সব বলে, পুরোহিত মহাশয় রেগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বাড়ীর মেয়েরা পুরোহিত মহাশয়ের ব্যাপার দেখে-শুনে, ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের ভয়ে কাঁপতে লাগল। আমারও মনে ভাবনা হ'তে লাগল,—"পুরোহিত মহাশয় রেগে চলে গেলেন; নিকটে ত আর কোন পুরোহিত নাই,—কে পূজা করবে? এত আয়োজন কি সমস্তই মাটি হবে!"

আমার কর্ণকুহরে কে যেন বলতে লাগ'ল,—"সন্তান মা'র পূজা করবে, তার আবার পুরোহিতের কি প্রয়োজন?" মনে-মনে ভাবলুম,—"আমি ত মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানি না,—কি করে মা'র পূজা কর'ব—কি করে মাকে সন্তুষ্ট করব?" পরক্ষণেই সেই স্বর আবার বলতে লাগল,—"প্রাণের আবেগে জগজ্জননীকে 'মা' বলে ডাকতে পারলেই, তিনি সন্তুষ্ট হবেন। সন্তান মাকে ডাকবে, তার আবার মন্ত্র-তন্ত্র কি? অত নৈবেদ্য, অত ফুল কি হবে? মা ত ও-সব কিছুই চান না,—মা চান সন্তানের ভক্তি, প্রেম, পবিত্রতা। এ তিনটি না থাকলে, মা রাশি-রাশি নৈবেদ্য, ফুল ও চন্দনে সন্তুষ্ট হবেন না!"

মনে-মনে স্থির করলুম, ও সব ফেলে রেখে, একা আনন্দময়ীর মন্দিরে গিয়ে, প্রাণের আবেগে 'মা' বলে ডাকব'। বাড়ী থেকে বেরিয়ে দু এক পদ অগ্রসর হ'য়েছি, আবার সেই স্বর কর্ণকুহরে বলতে লাগলো,—"আনন্দময়ীর পূজার জন্য মন্দিরে যাবার কি প্রয়োজন? তিনি ত তোমার হৃদয় মন্দিরে সর্ব্বদা বিরাজ করছেন! ভাল করে দেখ,—হৃদয়-মধ্যেই দেখতে পাবে।"

আর এক পদও অগ্রসর হ'তে পারলাম না! পরক্ষণেই হৃদয়-মধ্য থেকে এক অস্ফুট মধুর স্বর উঠল,—"আমি ত সর্ব্বদা তোর সঙ্গে রয়েছি,—তোর শরীরে রয়েছি,—তোর হৃদয়-মধ্যে রয়েছি,—এত দিনেও তা বুঝতে পারলি না?"

এক অব্যক্ত আনন্দে শরীর স্পন্দিত হয়ে উঠল। সে যে কি আনন্দ, তা' ভাষায় প্রকাশ করবার সাধ্য নাই।

কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ ভাবে সেখানে দাঁড়াবার পর, ধীরে ধীরে আপনার ঘরে এসে বসলুম। বসে, মনে মনে বলতে লাগলুম,—"কি আনন্দ! এত আনন্দ ত কখন হয় নি তুমি ত আমার সঙ্গে রয়েছ,—তুমি ত আমার শরীরে রয়েছ,—তুমি ত আমার হৃদয়ে রয়েছ;—কৈ এতদিন ত তোমায় জানতে পারি নি,—এতদিন ত তোমায় বুঝতে পারি নি। তুমি ত সকলের শরীরে রয়েছ,—সকলের হৃদয়ে রয়েছ, কৈ,—সকলে ত তা' বুঝতে পারছে না!—সকলে ত তা জানতে পারছে না! হৃদয়-মধ্যে যে তোমায় পেয়েছি! তোমায় ত ভুলতে পারবো না! তোমার মধুর স্বর যে শুনেছি,—সে স্বর ত আর ভুলতে পারবো না!"

সে দিনের পর কত দিন চলে গেল,—কিন্তু সে অস্ফুট মধুর স্বর আর এক দিনও শুনতে পেলুম না; আর কখনও শুনতে পাব কি না, জানি না। মনে হয়, সন্তানকে মা'র পূজায় প্রবৃত্ত করবার জন্যেই বুঝি তিনি একবার চকিতে প্রকৃত সুখের আস্বাদ বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। সে আস্বাদ ত আর ভোলবার নয়।

আনন্দময়ী জগৎ-জননীর ইচ্ছামত যেন আজীবন সন্তানের ন্যায় তাঁর পূজায় রত থাকি।

কৌতুকাঙ্কন

(Cartoons),

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

মদনোৎসব

জার্ম্মেণী যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রচুর অর্থদণ্ড দিতে স্বীকৃত হওয়ায় মিত্রশক্তিপুঞ্জের আনন্দ-উল্লাস। (Passing Show. London.)

রক্ষা-কবচ

জার্ম্মেণীর জিঘাংসা বৃত্তিকে জব্দ করিয়া রাখিবার একমাত্র উপায় কি, উদ্যত সঙীনটিতে তাহাই প্রকাশ পাইতেছে।

(New york Tribune.)

ভাঁটার টানে

য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু জগৎ পার হইয়া ভাব-রাজ্য প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধ তাহাতে বাধা দিয়াছে। এখন ভাঁটার টানে সভ্যতার তরিখানি ক্রমশঃ পিছাইয়া আসিয়া বস্তু-

নূতন দ্বারপাল

অষ্ট্রীয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ সম্প্রতি সিংহাসন পুনরধিকার করিবার চেষ্টায় গোপনে রাজধানীতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু মিত্রশক্তিপুঞ্জের কড়া নজর এড়াইতে না পারিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। এই চিত্রে তাঁহার সেই চেষ্টাকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে।

জীবন-যুদ্ধ

য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের যবনিকা পড়িয়াছে, শান্তি স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু যবনিকার অন্তরালে য়ুরোপ কিরূপ শান্তি উপভোগ করিতেছে এ চিত্রখানি তাহারই নিদর্শন ! (Hvepsen, Christiania)

অশান্তি

যুদ্ধ থেমে গিয়ে শান্তি স্থাপনা হবার পর ইংরেজ নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাড়ী ফিরে এসে দেখলে কী সর্ব্বনাশ ! আয়ার্লাণ্ড, ঈজীপ্ট, ইণ্ডিয়া সবাই বিগড়েছে যে ! তাই মাথায় হাত দিয়ে বলছে "দূর হক্ ছাই, শান্তির নিকুচি করেছে ! এ অশান্তির চেয়ে যুদ্ধ যে আমার ঢের ভাল ছিল !" (Glasgow Bulletin.)

কাবুলীওয়ালা

যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ জার্ম্মেণীর নিকট হইতে প্রায় পনেরো হাজার কোটী টাকা আদায় করিবার চেষ্টাকে ফরাসী উদার-নৈতিক কাগজওয়ালারা এই ভাবে ব্যঙ্গ করিয়াছেন ।
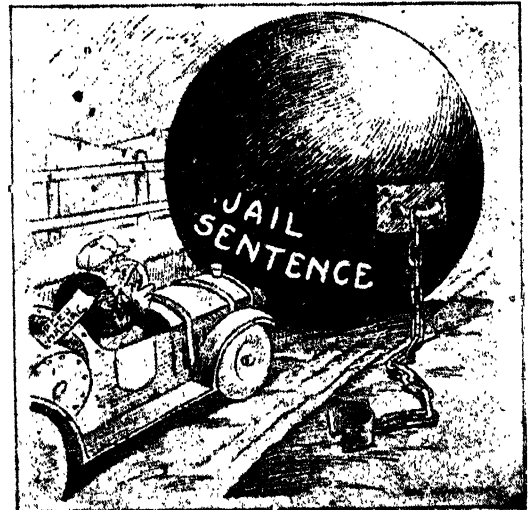
সমস্যার সমাধান

পুলিশ অনেক চেষ্টা করিয়াও মোটর দুর্ঘটনা বন্ধ করিতে পারিতেছে না। দুরন্ত মোটর-চালকদের অসাবধানতার জন্য লোক চাপা পড়ার সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। মোটর দুর্ঘটনা ঘটিলেই চালককে যদি জেলে দেওয়া হয় তবেই বোধ হয় এই আপদ দূর
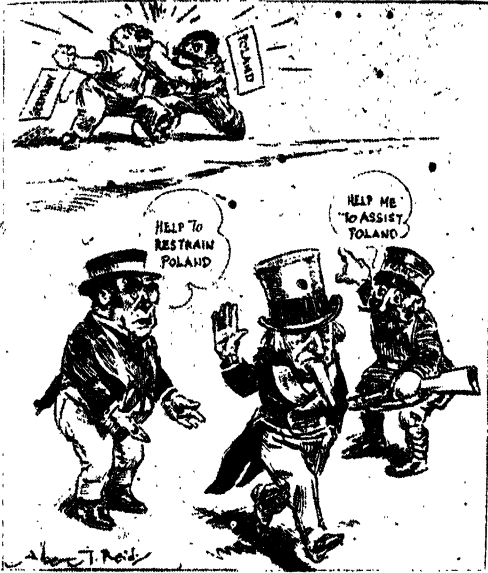
সরে পড়া !

পোলাণ্ড সম্বন্ধে জার্ম্মেণীর অধিকার সাব্যস্ত করা ব্যাপারে ফরাসীর সহিত ইংরাজের মনান্তর ঘটিয়াছিল, তখন উভয়ে আমেরিকাকে মধ্যস্থ মানিতে চায়, কিন্তু নূতন দেশনায়ক হার্ডিংয়ের শাসনাধীনে আসিয়া আমেরিকা নিখিল জাতি-পঞ্চায়েৎ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং য়ুরোপীয় গোলোযোগ হইতে তফাৎ থাকিবার ইচ্ছা জানাইয়া মধ্যস্থ হইতে স্বীকার করে নাই। (New york Evening Mail.)

চাষীর ফসল

কৃষক যেমন শস্যক্ষেত্রে দিনের পর দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ক'রে তবে বছরান্তে তার ক্ষেতের ধান মরাইয়ে নিয়ে এসে তোলে, তেম্‌নি করে দেশের মধ্যবিত্ত লোকেরা বারোমাস তিরিশ দিন হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রে বছরান্তে যদি দু পয়সা জমাবার চেষ্টা করে, তা হ'লেই ইন্‌কম ট্যাক্স আফিস অমনি পেছন থেকে গুড় গুড় করে এসে সেটি গ্রাস করে ফেলে ! (San Francisco Chronicle.)

মালা গাঁথা

ইংরাজের রাজ্য-লিপ্সা যে ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্ত এই চিত্রে দেখানো হইয়াছে যে সে ক্রমাগত একটির পর আর একটি দেশ কেমন কৌশলে তাহার সাম্রাজ্যের মুক্তাহারে গাঁথিয়া লইতেছে। কেবল একটি মুক্তা তাহার মালা হইতে খসিয়া পড়িয়াছে,

মেয়েদের ভোট

বিলাতে রমণী ভোট দিবার ক্ষমতা পাওয়ায় রাষ্ট্র-সভার ছোট বড় সব রকম সভ্যই আজ তাহার খোসামোদ করিতেছে !

যমদূত

যুদ্ধের বিষময় ফলে অষ্ট্রীয়া আজ ধরাশায়ী ও মৃতপ্রায়! সন্ধি সর্ত্ত অনুসারে তাহার রাজস্ব ও শস্য-সমৃদ্ধ প্রদেশগুলি হস্তচ্যুত হইয়াছে। অসংখ্য কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ অবস্থায় অষ্ট্রীয়ার বুকের উপর চড়িয়া যমদূতের মত অত্যাচার করিতেছে যে শার্দ্দূলবর, তার গাত্র-চর্ম্মে বিচিত্র রেখায় লেখা আছে "HORTHY" অষ্ট্রীয়া আজ এই নিষ্ঠুর সেনাপতি হর্থীর কঠোর শাসনাধীনে রহিয়াছে. আর হর্থীকে উৎসাহ দিতেছে "Entente." বা মিত্র-শক্তিপুঞ্জ! (Noten Kraker. Amsterdam)

সভ্যতার [illegible]

মধ্য য়ুরোপকে ধ্বংস করিয়া ইংরাজ ও ফরাসী আজ জগতের সভ্যতাকে রক্ষা করিলাম বলিয়া বাহাস্ফালন করিতেছে, জার্ম্মাণীর ষ্টাটগার্ট সহরে প্রকাশিত একখানি সংবাদপত্রে সেই জন্য তাহাদের

ডিম্ব-সমস্যা

য়ুরোপে যুদ্ধ বাধাইবার ফলে জার্ম্মাণ ঈগল পাখী আজ মিত্র-শক্তির ক্ষতিপূরণের দাবীরূপ যে ডিম্বটি প্রসব করিয়াছে, উহাতে 'তা' দিতে হইবে কি না ইহা লইয়া সে বিষম সমস্যায় পড়িয়াছে।

দেনদার

বিগত মহাযুদ্ধে য়ুরোপ, আমেরিকার নিকট হইতে প্রায় ত্রিংশ হাজার কোটি টাকা ধার লইয়াছে, কিন্তু এযাবৎ এক পয়সাও শোধ করিতে পারি নাই। এই চিত্রে তাই ব্যঙ্গ করিয়া দেখানো হইতেছে— যে মিত্র-শক্তি যখন হোটেলে খাওয়া দাওয়া করিয়া বাড়ী ফিরিতেছেন তখন হোটেলওয়ালা আমেরিকা খোরাকীর খরচা দাখিল করিতেছে, এবং কপর্দ্দকহীন য়ুরোপ পকেট হাতড়াইয়া বলিতেছে "তাই ত হে! কি করি বল ত? একটা কাণা কড়িও নেই যে আমার কাছে?" হোটেল-ওয়ালা বিরক্ত হইয়া বলিতেছে "খাবার আগে লোকের দাম দেবার মুরোদ আছে কি না জেনে আসা উচিত ছিল।"

(New york Tribune.)

হবেই হবে!

যুদ্ধের পর শান্তির আসরে য়ুরোপের সহিত আমেরিকা যোগ দেয় নাই, কিন্তু অস্ত্র সংক্ষেপের জন্য আমেরিকা আজ ওয়াশিংটনে একটি বৈঠক বসাইয়া য়ুরোপকে তাহাতে আহ্বান করিয়াছে; সেই জন্য এই চিত্রে আমেরিকাকে বিদ্রূপ করিয়া দেখানো হইয়াছে যে নন্-কো-অপারেশন করিয়া বসিয়া থাকিলে তোমার চলিবে না তোমাকে য়ুরোপের সঙ্গে মিশিতেই হইবে। ঘটনার অবশ্যম্ভাবী ফল তোমাকে কঠিন করে য়ুরোপের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইবে।

(St. Lovis Star.)

উপায় কি

ইংরাজের প্রধান অমাত্য লয়েড্ জর্জ্জ ও ফরাসী প্রধান-অমাত্য মুশে ব্রায়াও্ জার্ম্মাণীর নিকট যে ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়াছেন তাহা অসম্ভব অতিরিক্ত বিবেচিত হওয়ায় এই চিত্রে বিদ্রূপ করিয়া দেখান হইয়াছে যে বোঝার ভারে গাড়ীখানি পশ্চাতদিকে ঝুঁকিয়া পড়ায় সামনের ঘোড়াটি জমি হইতে শূন্যে উঠিয়া পড়িয়াছে। ফরাসী অমাত্য-প্রধান রাশ টানিয়া চাবুক দেখাইয়াও কিছু করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া লয়েড জর্জ বলিতেছেন "বন্ধু! ঘোড়াটা যাতে মাটিতে দাঁড়াতে পারে আগে তার ব্যবস্থা কর, তবে তো গাড়ী টানবে?

(The Star, London.)

নূতন ব্যসন

আয়র্লাণ্ডকে শান্তি দিবার জন্য ইংরাজের চেষ্টাকে জার্ম্মেণী এই ভাবে ব্যঙ্গ করিয়াছে। (Kladderadatsch, Berlin.)

সাপের খেলা

আইরিশদের ইংরাজ-বিদ্বেষ ও ইংরাজের আয়র্লণ্ডের প্রতি অত্যাচার দুই বিষধর অজগরের মত ফণা বিস্তার করিয়া ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে এবং এই দুই জাতি আজ ক্রোধান্ধ হইয়া আপন আপন বিষধরকে আরও উত্তেজিত করিতেছে।

(G. M. Adam's Service.)

ইটালী

বলসেবীদের প্রভাব রুষিয়া হইতে সর্ব্বপ্রথমে ইটালীতে প্রবেশ করিয়াছিল। সেখানেও মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যে ঘোরতর বিরোধ চলিতে থাকে। এই চিত্রে ইটালীর প্রধান মন্ত্রী জায়োলিতি মধ্যবিত্তদের নিরস্ত্র হইবার জন্ত অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু শ্রীমতী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নিম্ন শ্রেণীর দুর্দ্দান্তকে দেখাইয়া বলিতেছেন "আগে উহাকে নিরস্ত্র করা হোক্, ওই ত প্রথমে দাঙ্গা বাধাইয়াছে!"

(Il. 420, Florence.)

মুস্কিল

কর্ত্তা। (জনবুল) ছেলেটা বড় জ্বালাতন কচ্চে যে! কি চাচ্ছে ওকে দাওনা গা—চুপ করুক্!

গিন্নী। (লয়েড জর্জ) যা চাচ্ছে, তা যে দেবার যো নেই ছাই! সেই ত হয়েছে মুস্কিল! (The Passing Show, London.)

এরা বলে কি ?

আমেরিকার সহিত ইংরাজের মনান্তর লইয়া লোকে যে আসন্ন যুদ্ধের আশঙ্কা করিতেছিল, উহা যে ভিত্তিহীন এই চিত্রে তাহাই দেখানো হইয়াছে। শ্যাম চাচা (আমেরিকার ডাক-নাম uncle sam) জনবুলকে জিজ্ঞাসা করিতেছে 'জন্! এরা বলে কি? তোমাতে আমাতে নাকি শীগগির লড়াই বাধবে?' জনবুল অট্টহাস্য করিয়া সে কথা উড়াইয়া দিতেছে।

(Punch, London.)

পুলিশ

"দেশ মাতাকি জয়, বলে আর চেঁচাবে বাছাধন?
এখন চল পাঠশালার বদলে হাজতে পচবে!"

(Charivari, Paris.)

জন্মদিনে

আমেরিকার উদ্যোগেই নিখিল জাতি-সঙ্ঘের (League of Nations) জন্ম হইয়াছিল, অথচ আমেরিকাই আজ সেই সঙ্ঘে যোগদান করিল না দেখিয়া উপহাসচ্ছলে এই চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে যে নিখিল জাতি-সঙ্ঘের প্রথম বার্ষিক জন্মোৎসবে সকল জাতিই যোগ দিয়াছে, কেবল সেই সঙ্ঘ-শিশুর জনক উপস্থিত নাই, ভিত্তি-গাত্রে তাঁহার একখানি চিত্র ঝুলিতেছে, নিমন্ত্রিত জনবুল সঙ্ঘ-শিশুর ধাত্রী য়ুরোপকে বলিতেছে, "ছেলেটি দিব্যি হয়েছে ; ঠিক ওর বাপের মত !" ধাত্রী য়ুরোপ-চিত্রের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছে—'হ্যাঁ তা বটে, কিন্তু ওর বাপ ওকে ত্যাগ করেছে !'

(De Amsterdammer, Amsterdam.)

কারিকরের কারিকুরি

রুষিয়া তার বলসেবী কারিকরদের বলছে 'আভিজাত্যের অন্যায় অত্যাচার থেকে আজ তোমরা বাহুবলে মুক্ত হয়েছো বটে কিন্তু সুখে-স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকতে চাও যদি, তাহলে সেই বাহুবল তোমরা সবাই আজ কর্ম্মশালার কাজে লাগাও।' (Soviet Russia.)

শ্রীমতীর ত্রাস

সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে জার্ম্মেণীর সেনা-শক্তি হ্রাস করা হইয়াছে, কিন্তু বাভেরিয়া প্রদেশে একদল স্বেচ্ছাসেবক সৈনিক সম্প্রদায় গঠিত হইতেছে দেখিয়া ফ্রান্স ভীত হইয়া উঠিয়াছে এবং উহাকে অঙ্কুরে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। নেংটি ইঁদুরের মত নগণ্য এই সৌখীন সেনাদলের ভয়ে সন্ত্রস্ত ফরাসীকে জার্ম্মাণী এই ব্যঙ্গ-চিত্রের মধ্যে বিদ্রূপ করিয়াছে। (Kladderadatsch, Berlin.)

ছদ্মবেশ

অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের দাবী শুনে জার্ম্মাণী তার আর্থিক দুরবস্থার উল্লেখ করে কতকটা রেহাই পাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ফ্রান্স সেটাকে মিছে কথা বলে অগ্রাহ্য করেছে। মিত্র-শক্তির করুণা উদ্রেকের জন্য জার্ম্মেণী যে দারিদ্র্যের ভাণ করেছিল এই চিত্রে তার সেই ছদ্ম-বেশকে লক্ষ্য করে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। (L'Alsace Francaise.)

মায়ের ভয়

সন্ধি-সর্ত্ত অনুসারে জার্ম্মেণীর অনেকগুলি দুগ্ধবতী গাভীও ফরাসীদের দিতে হবে। সন্ধির এই সর্ত্তটিকে লক্ষ্য করে এই চিত্রে দেখানো হয়েছে যে মা তাঁর সন্তানদের নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছেন, বলছেন "আয় বাছা, আমরা এমন দেশে পালাই যেখানে ফরাসীরা আর আমাদের কিছু নিতে পার্ব্বে না।"

(Simplicissimus, Munich.)

মাণিক-জোড়

বিলেতে জিনিষপত্রের দর চড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোক-জনের মাইনে মজুরীও সব বেড়ে গিয়েছিল, এখন দর কমতে সুরু হওয়ায় মজুরীও কমাবার কথা হচ্ছে; কিন্তু শ্রমজীবীরা তাতে আপত্তি করছে। সেই জন্যে তাদের ব্যঙ্গ করে এই চিত্রে দেখানো হয়েছে যে তারা দিব্যি দুটিতে মাণিক-জোড় বেঁধে আছে, কেন আর তাদের সুখের ব্যাঘাত করা! (Dallas' News.)

শাস্তি দাও

হণ্টার কমিটির রিপোর্ট বাহির হইলেও পাঞ্জাব ও অমৃতসরের কথা ভারত ভুলিতে পারে নাই। সে এখনও ব্রিটানীয়ার কাছে সুবিচার প্রার্থনা করিতেছে, বলিতেছে "শাস্তি দাও! অপরাধীদের শাস্তি দাও!" উত্তরে বিটানীয়া তাহাকে ক্ষমার উপদেশ দিতেছেন।

(New India, Madras.)

বজেট

রাজস্বের টাকা গবর্ণমেণ্ট কি কি কাজে খরচ কর্বেন তার বার্ষিক হিসাবের যে খসড়া পাশ হ'য়েছে সেটা সাধারণের মনোমত না হওয়ায় এই ভোজের চিত্রে আহার্য্যের অসমতুল পরিমাণ দেখাইয়া উহাকে উপহাস করা হইয়াছে। (Washington Labour.)

নূতন কুটুম্ব

বলসেবীর সহিত ইংলণ্ড আজ এক শয্যায় রাত্রি-বাস করিতেছে; এই ব্যঙ্গ-চিত্রের অর্থ এই যে বলসেবীদের সহিত ইংলণ্ড যে নূতন বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে তাহাকেই বিদ্রূপ করা; কারণ যে ইংলণ্ড বলসেবীকে সব চেয়ে বেশী ঘৃণা করিয়াছিল সেই আবার আজ ব্যবসার খাতিরে তাহার সহিত কুটুম্বিতা করিতেছে।

(G. M. Adams Service.)
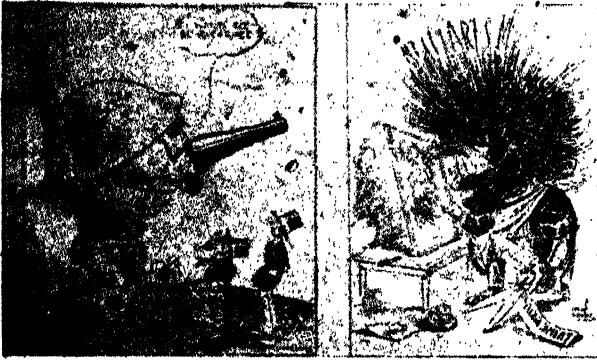
অস্ত্র-সংক্ষেপ

সমর-সজ্জা সংক্ষেপ করা হউক এই লইয়া য়ুরোপের সকল জাতির মধ্যেই একটা তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে, কিন্তু কার্য্যতঃ কেহই সাহস করিয়া তাহার সামরিক শক্তি হ্রাস করিতে পারিতেছে না পাছে অন্য লোক সেই সুযোগে তাহার রাজ্যটি অধিকার করিয়া বসে! প্রতিবেশীদের পরস্পরের প্রতি এমনিই তাহাদের বিশ্বাস! পাশের চিত্রখানি ব্রিটীশ সিংহ তাহার রণসজ্জারূপ কেশর ছাঁটিবার জন্য অস্ত্র সংক্ষেপক কাঁচি লইয়া আয়নার সম্মুখে বসিয়াছে বটে, কিন্তু উপরোক্ত কারণে কাজ আরম্ভ করিতে পারিতেছে না! (St. Louis Times.)

নূতন যাত্রী

যুদ্ধ বিগ্রহ-ব্যাধি ও দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত য়ুরোপ হইতে দলে দলে অসহায় নিরন্ন আশ্রয়হীন লোক আজ আমেরিকায় পলাইয়া আসিতেছে; আমেরিকা তাহাদের অভয় দিতেছে বটে কিন্তু তাহাদের সহযাত্রী তাহাদের ব্যাধি ও মহামারীর বস্তাগুলিকে ঢুকিতে দিতে ইচ্ছুক নহে। (Providence Journel.)

দড়ী টানা

ভারতের গরম দল ও নরম দলের ভিতর জাতীয় আন্দোলন লইয়া যে টানাটানি চলিতেছে, বুরোক্রেসীর পালোয়ান (গভর্মেণ্ট) তাহার মধ্যে অক্ষত দেহে দাঁড়াইয়া মৃদু হাস্য করিতেছে, কারণ সে জানে আমি থাকিতে ইহাদের কখনও মিট-মাট হইবে না। (The Looker-on, Calcutta.)

জ্বালাতন

অনেকগুলি ছোট বড় রাজ্যের সমষ্টি এই ব্রিটীশ সাম্রাজ্য আজ চারিদিকের গোলযোগে উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছে। অনেকগুলি ছেলে মেয়ের মার মত, খোকা খুকীদের উৎপাতে জ্বালাতন হ'য়ে সে যেন বল্‌ছে "কি মুস্কিল? সব কটা একসঙ্গে চেঁচাতে শুরু করেছে যে! আঃ! এখন কোন্‌টাকে রেখে কোন্‌টাকে সাম্‌লাবো বল ত! (Detroit News.)

আবার সেই !

ঢেঁড়াদার বেরিয়েছে, জগতময় ঢেঁড়া পিটে বল্‌ছে "বদলায়নি! বদলায়নি! কিছু বদলায়নি! সব ঠিক তেমনিই আছে। আবার সেই অস্ত্রপূজা, গোলা বারুদের উৎসব, গরীবের রক্ত শুষে ধনীর অর্থ সঞ্চয়, প্রতিবেশীর প্রতি ঘৃণা ও অবিশ্বাস পৃথিবী জুড়ে তেমনিই পুরো মাত্রায় চলেছে !"

(Dayton News.)

চাষার ভাষা

পেট ভরে খেতে চাও তো চাষ কর, চাষ করে কিসে বেশি শস্য উৎপাদন হয় যদি জান্‌তে চাও তাহ'লে বই পড়। লেখা-পড়া না শিখলে যে কিছুই হবে না, এ চিত্রখানিতে অঙ্কিত কেতাব, কাস্তে ও শস্য বলসেবী চাষাদের তাহাই জানাইতেছে।

(Soviet Russia.)

গুরু-শিষ্য

আয়ার্লণ্ডের আল্‌ষ্টার্ নামক স্থানে যে ইংরাজ উপনিবেশটি আছে তাহাদের সর্ব্বপ্রধান নেতা হইতেছেন সার্ এডওয়ার্ড কার্সন্। ১৯১৪ সালে সার্ এডওয়ার্ড কার্সন্ গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য আল্‌ষ্টারকে রণসজ্জায় সজ্জিত করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমানে তিনি গভর্মেণ্টের পক্ষে হইয়াছেন এবং আয়ার্লণ্ড বিদ্রোহী হইয়াছে। বিদ্রোহী আয়ার্লণ্ডকে সার্ এডওয়ার্ড আজ ধমক দিতেছেন, কিন্তু আয়ার্লণ্ড তাহা না মানিয়া বলিতেছে "আপনিই ত গুরুদেব প্রথমে আমাদের এ বিদ্যে শিখিয়েছেন!"

(Westminister Gazette.)

জামাতার বিপদ

স্ত্রীকে নিয়ে এলেই শাশুড়ী ঠাকরুণও যে সঙ্গে সঙ্গে এসে ঘাড়ে চাপবেন, এই হ'য়েছে এখন জামা'য়ের বিপদ! অর্থাৎ জিনিসপত্রের দাম কমিলেই যে সেই সঙ্গে মজুরীর মূল্যটাও কমিয়া যাইবে, ইহাই হইতেছে এখন শ্রমজীবী জামাতাদের দুর্ভাবনা।

(London Opinion)

নন্‌ কো-অপারেশন্‌

এক বিরাট সভায় বক্তা বলিতেছেন "ভাই সব যদি "স্বরাজ" চাও, তবে নিরুপদ্রবে চর্‌কা ঘোরাও।

(Looker On, Calcutta.)

শান্তির অশান্তি

য়ুরোপের কৃত্রিম শান্তি যেন মিথ্যায় সহস্র বন্ধনে কাতর হইয়া নব-বর্ষের নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিতেছে।

(IL. 420, Florence.)

কণ্ঠরোধ

ভুয়ো শান্তি পাছে আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলে, এই ভয়ে ভণ্ড শান্তি-সেবকেরা অসি-অগ্রে তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া রাখিয়াছে।

(Kladderadatsch, Berlin.)
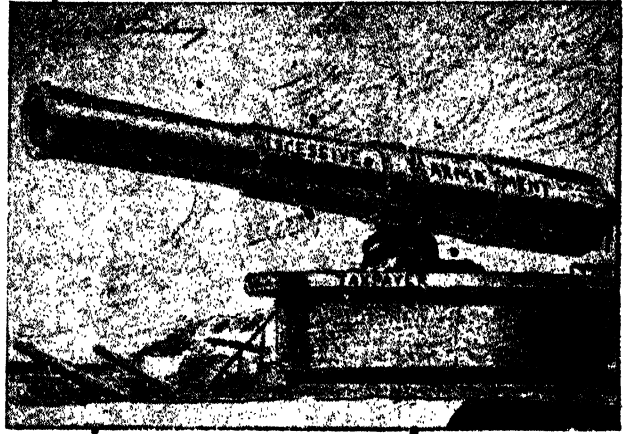
কামানের বোঝা

সামরিক বিভাগের ব্যয় ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, বলিয়া তদনুপাতে আয় বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে দেশবাসীর উপর উত্তরোত্তর উচ্চ হারে কর চাপানো হইতেছে। এইরূপ করভারে পীড়িত হওয়া যে কামানের বোঝা বওয়ারই নামান্তর মাত্র এই চিত্রখানিতে তাহাই দেখানো হইয়াছে। (Brooklyn Eagle.)

রোগ বৃদ্ধি

জন বুল্ (ইংরাজ জাতির ডাক-নাম) প্রধান মন্ত্রী লয়েড্ জর্জকে বলিতেছে "কই হে ? তুমি যে বলেছিলে নিখিল জাতি সঙ্ঘের (League of Nations) তেলটা মালিশ ক'র্লে আমার হাতে-পায়ের এই ফুলো আর ব্যথা (সৈন্য ও নৌ-বহর) অনেক কমে যাবে, কিন্তু এ যে দেখছি আরও বেড়ে উঠছে !"

(London Opinion.)

শান্তির পরিণাম

আয়ার্লণ্ডে, রুষিয়ার, অষ্ট্রীয়ার এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইল্‌সনের পক্ষে শান্তির পরিণাম কি বিষময় হইয়াছে এই চিত্রদ্বয় তাহাই ব্যক্ত করিতেছে।

(Nebeispatter, Zurich.)

কলির কংস

আমেরিকায় একটি ছোট খাটো জাপানী উপনিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আমেরিকা সেটাকে নষ্ট কর্ব্বার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে; তাই এই জাপানী চিত্রে আমেরিকাকে উপহাস করে বলা হচ্ছে "হ্যাগো ! তুমি অত বড় জোয়ান মরদ হয়ে আমার এই এক ফোঁটা কচি ছেলেটাকে দেখে অত ভয় পাচ্ছ কেন !"

(Puck, Osaka.)

শান্তির পরিণাম

আয়ার্লণ্ডে, রুষিয়ার, অষ্ট্রীয়ার এবং আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সনের পক্ষে শান্তির পরিণাম কি বিষময় হইয়াছে—এই চিত্রদ্বয় তাহাই ব্যক্ত করিতেছে।

(Nebelspatter, Zurich.)

চালাও

যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্য জার্ম্মাণীকে পীড়ন করায় অনেকে ফ্রান্সের উপর দোষারোপ করিতেছে বলিয়া ফ্রান্স এই চিত্রের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে যে, যুদ্ধে যাহারা প্রাণ দিয়াছে তাহাদের মৃত কঙ্কাল আজ কবর হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য আদেশ করিতেছে :

(La Victoire, Paris.)

অযোগ্যের পুরস্কার

আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন জগতে শান্তি স্থাপনের জন্য ১৯২০ সালের "নোবেল প্রাইজ" পাইয়াছেন, অথচ সেই আমেরিকাই কেবল এখনও পর্য্যন্ত জার্ম্মেণীর সহিত সন্ধি স্থাপন করে নাই। অন্যান্য যুধ্যমান জাতি সকলেই যুদ্ধের চিরন্তন প্রথানুসারে 'রণ-বিরাম' ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত দস্তুর অনুযায়ী আমেরিকা এখনও তাহা করেন নাই। সেইজন্য আমেরিকাকে উপহাস করিয়া জার্ম্মেণী এই চিত্রে দেখাইতেছে যে, শান্তির দেবতা যেন পুরস্কারবাহী দূতকে আসিয়া বলিতেছেন "দাঁড়াও! কাকে তুমি শান্তির পুরস্কার দিতে এসেছ? ও লোকটা যে এখনও হাতে কুড়ুল নিয়ে বসে আছে!"

(Kladderadatsch. Berlin.)

দেউলিয়ার আত্মকথা

[শ্রীযুগলকিশোর সরকার]

এই নিখিলে সকলেই একটা লাভ-ক্ষতির হিসেব মনে-মনে খুঁজচে। এই কেনা-বেচার জগতে কেমন করে লেনা-দেনা ক'রলে লাভ হবে, সবারই চোখ সেই দিকে। ক্ষতির দিকে কেউ বড় একটা যেতে চায় না। কিন্তু না যেতে চাইলেই বা কি হবে,—দেউলে হওয়া যার প্রাক্তন, তারে যেতেই হবে, —যতই কেন সে চতুর হোক্ না, যতই কেন তার 'বিষয়বুদ্ধি' থাকুক না। লাভবান্ যাঁরা হ'চ্চেন, তাঁরা বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে আছেন।—মনের তৃপ্তি আর হৃদয়ের আনন্দ নিয়ে, তাঁরা দিনের পর দিনগুলি বেশ কাটিয়ে চ'লেছেন,—স্রোতের মুখে ছোট্ট পান্‌সিখানি যেম্‌নি ক'রে যায়, ঠিক্ তেম্‌নি ক'রে। তাঁদের দিক্ থেকে অনুযোগের কথা বড় একটা শুন্‌তে পাওয়া যায় না। কিন্তু আর একদল লোক,—যাঁরা এই সদাগরি ব্যাপারে 'দেউলে' হ'য়েছেন—তাঁদের দিনগুলি ঠিক আগেকার লোকগুলির মত যাচ্চে না। তাঁদের দিক্ থেকে একটা রুদ্ধ যাতনা, একটা সুপ্ত বেদনা, একটা অন্ধ হাহাকার ক্ষ্যাপা হাওয়ার মত মাঝে-মাঝে চারদিকে ছড়িয়ে প'ড়ে,—কিছুকাল হৃদয়বান্ সুধী ব্যক্তিদের হৃদয়ে একটা সমবেদনার ছাপ এঁকে দিয়ে, আর হৃদয়হীন সাধারণ লোকের মনে একটা ব্যঙ্গ ইঙ্গিতের অবসর ক'রে দিয়ে আবার চ'লে যাচ্চে। সুধী যাঁরা, তাঁরা বুঝচেন হৃদয়ের ক্ষত কতখানি। কিন্তু শুধু এই লোকগুলি নিয়েই ত জগৎ নয়। যদি শুধু এঁদের নিয়েই জগৎ হোত, তবে তাঁরা—এই দেউলের দল—অনেকটা শান্তিতে থাক্‌তে পেতেন। কিন্তু হৃদয়হীনদের নিয়েই যে জগতের প্রায় ষোল-আনা। তাই তাঁদের হৃদয়ের ক্ষত ভাল হবার দিক্ দিয়েই ত যাচ্চে না, পরন্তু দুষ্ট ব্রণের মত সমস্ত প্রাণটুকু বিষাক্ত ক'রে তুলচে।

আমি শেষের দলের একজন বণিক্। বহুকাল বণিগ্‌বৃত্তি ক'রে আস্‌ছি। চিরকাল আমি 'দেউলে' ছিলাম না। এক দিন আমার মাথা কত উঁচুতে ছিল;—এত উঁচুতে যে, তোমরা তার নাগাল কখনও নিতে পারতে না। পাশাপাশি সম-ব্যবসায়ী সদাগরের দল আমার ঐশ্বর্য্যের ঈর্ষ্যায় পুড়ে ম'রত; আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে নাগাল নিতে না পেরে, শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রত। কিন্তু ব'লতে আমার ক'লজে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্চে,—আজ আমি একবারে দেউলে,—কেবল সেই দিন একটা ভুল 'সওদা' ক'রে। সদাগর-মহলে, আমার 'বিষয়বুদ্ধি' খুব বেশী আছে, এই রকম একটা খ্যাতি চিরকাল ছিল। 'সওদা' ক'রতে আমার মত আর দুটী নাই, এটা তারা বড় জোর গলা করেই ব'লত। কথাটার ভেতরে সত্য যে একেবারেই ছিল না, এটাই বা আমি বলি কেমন ক'রে? কেন তারা শুধু-শুধু খোসামুদি ক'রে এটা আমার ওপর আরোপ ক'রবে? সত্য বোধ হয়,—বোধ হয় কেন—কিছু ছিল। কিন্তু সেই যে 'বিষয়বুদ্ধি,'—সেটা ছিল কোথা সেই ভুল 'সওদা' করবার সময়? এমন ঠকা ঠক্‌তে হোল যে, একেবারে ফতুর!

সুধী পাঠক! তবে শোন,—শুনলে বোধ হয় তোমার কোন কাজে লাগ্‌তে পারবে; কেন না, তুমিও এই সদাগরি মহলের একজন। তুমি হয় ত জান না যে, তুমি একজন বণিক্; কিন্তু তুমি ঠিক্ তাই। একটা দিনের ভেতর কতগুলো 'লেনা দেনা,' 'কেনা বেচা' ক'রচ বল দেখি? যাক্—সেদিনকার হাটে দেখ্‌লাম, একটা ভারি সুন্দর, চক্‌চ'কে জিনিষ বিক্রির জন্যে এসেছে। জিনিষ দেখেই আমার প্রাণে একবারে লেগে গেল। 'ভাল-মন্দ লাগা' এই কথাটা নিয়ে মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা অনেক মাথা ঘামিয়েছেন, আর অনেক কথাই ব'লেছেন,—বড়-বড় কেতাব ভ'রে গিয়েছে। তাঁরা বলেন, জিনিষ ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর লাগে কেন? 'ভাল-মন্দ লাগা'টা কি জিনিষের ভেতরে, না মনের ভেতরে? শেষে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, 'ভাল-মন্দ' লাগাটা মনের ভেতরে, জিনিষের ভেতরে নয়। যদি তাই হ'ত, তবে একটা জিনিষই একজনের কাছে সুন্দর, আর একজনের কাছে অসুন্দর ঠেক্‌বে কেন? তুমি একটা জিনিষ দেখলে,—তোমার মনের ভেতরও একটা জিনিষ আছে;—যদি তোমার দেখা জিনিষটা তোমার মনের ভেতরের জিনিষের সঙ্গে খাপ খেল, তবেই জান্‌বে, সেই জিনিষটা তোমায় ভাল লাগ্‌বে।

যাক্—কি ব'লতে-ব'লতে কি বলে চলেছি। হ্যাঁ—

সেদিনকার বাজারের সেই জিনিষটা এত সুন্দর, এত রঙ্গিন,—যেন কেউ সোণালি তুলি দিয়ে রাঙ্গিয়ে দিয়েছে,—একেবারে, আগাগোড়া। সুন্দর জিনিসের স্বভাবই এই যে, তারা আশেপাশের জিনিসকেও তাদের নিজের রঙ্গে রঙ্গিন ক'রে ফেলে—সেই আশেপাশের জিনিসগুলো যতই কেন অসুন্দর হোক্ না। যেমন সন্ধ্যার রক্তরাগ, আকাশের নীলিমা, উষার অরুণিমা, জোছনার হাসি যারই উপর পড়ুক্ না—তার উপর নিজের ছাপ এঁকে দেবেই,—তাদের নিজের রঙ্গে রঙ্গিন ক'রবেই। বাজারের সেই জিনিষটা দেখে, আমার এই বেণের মনটাও একবারে গোটাটা রঙ্গিন হ'য়ে গেল। প্রাণে বড় একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা হ'ল, যেমন ক'রে হোক্, এ জিনিষটা নিতেই হবে,—এ 'সওদা' ক'রতেই হবে। এত বড় একটা সুন্দর জিনিষ,—এমন একটা লাভের সওদা হারাব?—না, তা হবে না। সমব্যবসায়ী বণিকের দলও 'রুখে' প'ড়ল। একটা ভয়ানক প্রতিযোগিতা চ'লল। এই সব দেখে-শুনে, আমার ঐ 'সওদা' করবার এত অস্বাভাবিক আগ্রহ দেখে, বোধ হয় কোন অমঙ্গল আশঙ্কা ক'রে, আত্মীয়েরা বললেন, "এ সওদা তোমায় ক'রতে দেওয়া হবে না।" আমি কিন্তু অটল,—জোর গলায় ব'ললাম্ "ক'রবই।" আর তার সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল, এঁরা আমার আত্মীয় নন—এঁরা অনাত্মীয়; না হ'লে এতবড় একটা ভাল জিনিষ,—এমন একটা 'লাভের সওদা' আমায় ক'রতে দিচ্চেন না! ক্রোধে আত্মহারা হয়ে গেলাম। কিন্তু শেষতক্ জিত—ঠিক জিত কি? না—না, এ যে মস্ত হার, এ যে মস্ত ভুল—হ'ল আমারই। এত বড় মনের বল নিয়ে যখন বাজারে ঢুকেছি, তখন আর যায় কোথা? 'সওদা' করলাম্। কি দাম দিয়ে? হৃদয়ের যত-টুকু সুখ, যতটুকু শান্তি, যতটুকু স্বাস্থ্য, যতটুকু প্রাণ ছিল—সব দিয়ে। মনে ক'রলাম, বড় লাভবান্ হ'য়েছি। কিন্তু হদ্দ চার-পাঁচদিন পরেই দেখি, এ কি? জিনিষটা এত দাম দিয়ে কিন্‌লাম, কিন্তু হ'ল কি? 'সওদা' করবার সময় জিনিষটা প্রাণের সঙ্গে এত খাপ খেল,—প্রাণে এমন সুন্দর সুর বাজল, মনটা এত রঙ্গিন হ'ল,—কিন্তু আজ এ কি? আজ এত খাপছাড়া, বেখাপ লাগে কেন? প্রাণে এত বেসুরো ঠেকে কেন? এত অরঙ্গিনই বা দেখায় কেন? তবে কি সওদায় ঠক্‌লাম? ও গো, এ কথাটা যে আমি ভাবতেও পারি না—আমি যে আমার সর্ব্বস্ব দিয়েছি; তা'হ'লে যে আমায় একেবারে দেউলে হ'তে হবে। তীব্র ভ্রূভঙ্গি করে বিবেক তার উত্তর দিলে,—'রঙ্গিন দেখে সওদা ক'রেছিলে, কিন্তু ধোপে টিক্‌বে কি না ভেবেছিলে কি?' বিবেকের কটাক্ষ দেখে, আর উত্তরের ভাব দেখে, আমার মনটা কেমন হ'ল জান? ঘুমোতে-ঘুমোতে তুমি যদি স্বপ্ন দেখ, হঠাৎ ছাদ থেকে প'ড়ে গেলে, তা'হ'লে আতঙ্কে শিউরে ওঠ,—আর ঘুম ভেঙ্গে যায়। এই শিউরে ওঠা আর ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার মাঝামাঝি অবস্থাটা যেম্‌নি হয়, আমার অবস্থাটাও ঠিক সেই রকম হ'য়েছিল। সওদা করবার সময় যে রাঙ্গা কাচের ভেতর দিয়ে আমার অতিবড় বাঞ্ছিত জিনিষটাকে দেখেছিলাম, সে কৃত্রিম আবরণটা খসে গেল;—দেখলাম বড্ড ঠকেছি, মস্ত ভুল করেছি,—ফতুর হ'য়েছি,—একবারে 'দেউলে'। ঠিক কি? আচ্ছা একবার হিসেবটা ভাল ক'রে দেখি। দেখি, কি দাম দিয়েছি, আর কি পেয়েছি! তার পর যোগ-বিয়োগ বুঝতে পারা যাবে। আচ্ছা, আগে কি দাম দিয়েছি দেখা যাক্;—হৃদয়ের যতটুকু সুখ, যতটুকু শান্তি, যতটুকু স্বাস্থ্য, যতটুকু প্রাণ—সব দিয়েছি। উঃ, দামটা বড্ড বেশী দিয়ে ফেলেছি। একটা তরুণ জীবনের সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে—একটা ফুলের কুঁড়ির সমস্ত সুরভির বিনিময়ে—ঐ খাপছাড়া, বেসুরো অরঙ্গিন জিনিষটা; এ যে মস্ত হার, এ যে মস্ত ভুল। ও গো, এ ভুল যে আমি আর কখনও শোধরাতে পারব না। এ যে আমার অস্থিমজ্জাগত। এটার হেস্ত-নেস্ত করতে হলে, আমার জীবনের এই যে প্রথম নবীন সংস্করণ, এটা আগাগোড়া বদ্‌লাতে হবে,—এ কাঠামোয় যে হবে না। তবে কি এ জীবন-ভোরই আমি দেউলে? না—না, এ কথাটা যে আমি ভাবতেও পারছি না;—আচ্ছা, যদি হিসেবে ভুল হয়ে থাকে? তবে আর একবার ভাল করে হিসেব করে দেখি। এত দাম দিয়ে শুধু কি ঐ খাপছাড়া, বেসুরো, অরঙ্গিন জিনিষটাই পেয়েছি? অন্ধ আমি; তার সঙ্গে যে একটা বড় জিনিষ পেয়েছি।

পেয়েছি অভিজ্ঞতা,—রাশি-রাশি,—অফুরন্ত। তাই বলি, ভাই বণিকের দল! আমার দেখে তোমরা সবে শেখ। দেখ একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক একটা বহ্নিমান্ ধূমকেতু তোমাদের এই 'কেনাবেচার আকাশে' কিছু দিনের জন্যে দ্বাদশ সূর্য্যের তেজে উঠেছিল। তার পাশাপাশি আরও

দেশ, শুধু একটা ভুলের জন্যে একেবারে খসে পড়ল। শুধু নিজে পড়ে নি,—আকাশের সমস্ত নীলিমাটুকুকেও ছাই ক'রে দিয়ে গেছে।

আবার বলি, 'সওদা' ক'রবে খুব সাবধানে! ভাল ক'রে যাচাই করে দেখ। দেখবে, আজ যেটা মনের সঙ্গে খাপ খাচ্চে, চোখে রঙ্গিন ঠেক্‌ছে, কাণে সুরে বাজচে—কাল সেটা তেম্‌নি খাপ খায় কি না,—তেম্‌নি রঙ্গিন ঠেকে কি না, তেমনি সুরে বাজে কি না। তা যদি না কর, তবে এই ভবের হাটে 'দেউলে', হ'য়ে, আমার মত চীৎকার ক'রে ব'ল্‌তে হবে,—

"নিয়ে এস! নিয়ে এস! ওগো তব খেয়া-তরীখানি
বারেক এ ঘাটে,
কৃপা করে কর পার, আমি আজি পূর্ণ-রিক্তপাণি,
সর্ব্বস্ব খোয়ায়ে, ভাঙ্গা হাটে।"

রজনীকান্ত ও রবীন্দ্রনাথ

[শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত]

১৩১৬ সালের ২৮শে মাঘ বৃহস্পতিবার (ইং ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১০), কবি রজনীকান্তের গলদেশে অস্ত্রোপচার হয়।

তাঁহার গলদেশে দুরারোগ্য কর্কটিকা রোগ হইয়াছিল। রোগ বৃদ্ধি হইয়া যখন কবির শ্বাস-প্রশ্বাস চলাচলের পথ রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল, তখন তাঁহাকে মেডিকেল কলেজে লইয়া আসা হয়। সেখানে Captain Denham White সাহেব ঐ দিন বেলা ১২টার সময়, কবির কণ্ঠদেশে Tracheotomy Operation দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস চলাচলের জন্য ছিদ্র-করিয়া দিলেন।

সুকণ্ঠ কবির কমনীয় কণ্ঠ চিরদিনের জন্য নীরব হইল; তাঁহার প্রাণোন্মাদনকারী সঙ্গীত—অপূর্ব্ব রসালাপ, সুমধুর বাক্যরাজি সকলি একেবারে থামিয়া গেল। নির্ব্বাক্ কবি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কটেজ-গৃহে আশ্রয় লইলেন। সদানন্দ কবির দুঃখযন্ত্রণাময় জীবন আরম্ভ হইল।

তাঁহার মনের ভাব, এই সময় হইতে লেখনী-সাহায্যে ব্যক্ত করিতে হইত। দারুণ ও অসহনীয় রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে কান্তকবির ঈশ্বরনির্ভরতা, তাঁহার মঙ্গলময়ত্বে একান্ত বিশ্বাস, ভগবদ্ভক্তি ও কাব্য-রচনার অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিয়া, বাঙ্গালার বহু লোক কটেজে গিয়া, কান্তকবির এই অপূর্ব্ব ছবি দেখিয়া আসিলেন। অনেকের লেখনী-মুখে,—বাঙ্গালার সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদিতে কবির কথা বাহির হইল। বাঙ্গালী কবি সাগ্রহে লিখিলেন—

"থামো, থামো—দেখে' নিই পিপাসিত দু'টা আঁখি ভরে',
থামো কবি,—এঁকে নিই হৃদিপটে আরো ভাল ক'রে
ওই সাধনার মূর্ত্তি—নির্ভরের চিত্র মনোহর;
* * * *
'বাণী' যার সহচরী, 'কল্যাণী' সে কল্পদ' তাঁ'র,
উন্মুক্ত যাহার প্রাণে অমরার 'অমৃত' ভাণ্ডার
তৃষ্ণার্ত্ত ভক্তের লাগি'—আজি পড়ি এ রোগ-শয্যায়,
দুঃসহ যন্ত্রণা মাঝে মগ্ন তবু মায়ের সেবায়
নিষ্ঠার অম্লান পুষ্পে! হেরি এই শান্ত সুবিমল
ধ্যানমূর্ত্তি—মনে হয়, নীলকণ্ঠ পিইছে গরল
সমুদ্র-মন্থন দিনে—বাটি লয়ে অমৃতের কণা
কাব্যের অমর লোকে—এ চিত্রের কোথায় তুলনা।"

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

বাঙ্গালার বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ কান্তকবির এই অবস্থার কথা শুনিয়া, এবং তাঁহাকে দেখিতে রজনীকান্তের সাধ হইয়াছে ইহা জানিয়া, একদিন হাসপাতালের কটেজ-গৃহে গমন করেন। কান্তকবিকে দেখিয়া এবং তাঁহার সহিত কথা কহিয়া রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হইয়া গেলেন। রবীন্দ্রনাথের কথার উত্তরে রজনীকান্ত যাহা লিখিয়া ব্যক্ত করেন—তাহা কবির হাসপাতালের খাতা হইতে অবিকল তুলিয়া দিলাম;—

"এই tracheotomy ক'রে বেঁচে আছি। আমাকে এ সময় পায়ের ধূলা দিয়ে যান মহাপুরুষ!

—আমি যখন বুঝলাম যে, এই উৎকট বাথা Penal code নয়; এ কেবল আগুনে ফেলে আমার খাদ উড়িয়ে দিচ্চে, আমাকে কোলে নেবে ব'লে—তখন বুঝিলাম প্রেম। তার পর সব সচ্চি। একবার দেখ্‌তে বড় সাধ ছিল, নইলে হয় তো কৈফিয়ৎ দিতে হতো—সে দেখা আমার হ'ল। এখন বলুন, শিবা মে পন্থানঃ সন্তু!

—আপনি আমাদের সাহিত্যনায়ক, দার্শনিক; চরিত্রে, সহিষ্ণুতায়, প্রতিভায় দেশের আদর্শ। তাই দেখে গেলে একটু পুণ্য হবে ব'লে দেখ্‌তে চেয়েছিলাম। নিজের তো, পায়ের কাছে যাবার শক্তি নাই।

—ছেলেটিকে বোলপুরে* দয়া করে নিতে চেয়েছিলেন, শুনে কত আনন্দ হ'ল। আমি মহারাজকে† কথা দিয়ে বাধ্য হয়ে আছি। নইলে আপনার কাছে থেকে দেবতা হতো, তাও কি পিতার অনিচ্ছা হতে পারে?

—কি শক্তি আপনার নাই? অর্থ-শক্তি? তার যে গৌরব, তা আমি এই যাবার রাস্তায় বেশ বুঝতে পাচ্চি। তার জন্যে মানুষ 'মানুষ' হয় না। এই যে মেডিকেল কলেজের ছেলেরা আমার জন্য দিনরাত্রি দেহপাত কচ্চে, এরা কি আমাকে অর্থ দেয়? ওদের প্রাণটা দেখুন, ওরা কত বড়লোক।

—আর একবার যদি 'দয়াল' কণ্ঠ দিত, তবে আপনার 'রাজা ও রাণী' আপনার কাছে একবার অভিনয় ক'রে দেখাতেম। আমি 'রাজা'র অভিনয় করেছি।

—অমন কাব্য, অমন নাটক কোথায় পাব? রাজার পার্ট আজও অনর্গল মুখস্থ আছে।

'এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়?"
(রাজা ও রাণী, ২য় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য।)

একবার দেবতাকে শোনাতে পারলাম না।

—আর 'কথা' আমার ছেলেরা recitation (আবৃত্তি) করে।

—আর 'কণিকা'র আদর্শে 'অমৃত' লিখেছি। লিখে ধন্য হয়েছি। ঐ আদর্শে লিখে ধন্য হয়েছি।

ইহার কিছুদিন পরে রজনীকান্ত তাঁহার নিম্নলিখিত গানখানি রবীন্দ্রনাথকে পাঠাইয়া দেন;—

দয়ার বিচার

আমায়, সকল রকমে কাঙাল করেছে,
গর্ব্ব করিতে চূর;
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য,
সকলি করেছে দূর।
ঐ-গুলো সব মায়াময় রূপে,
ফেলেছিল মোরে অহমিকা-কূপে,
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল
করেছে দীন-আতুর;
আমায়, সকল রকমে কাঙাল করিয়া,
গর্ব্ব করিছে চূর।
যায় নি এখনো দেহাত্মিকা মতি,
এখনো কি মায়া দেহটার প্রতি,
এই, দেহটা যে আমি, সেই ধারণায়
হয়ে আছি ভরপুর,
তাই, সকল রকমে কাঙাল করিয়া,
গর্ব্ব করিছে চূর।
ভাবিতাম, "আমি লিখি বুঝি বেশ,
আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ,"
তাই, বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে,
বেদনা দিল প্রচুর;
আমায় কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে,
গর্ব্ব করিতে চূর!

রজনীকান্তের গানখানি পাইয়া রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্তকে যে পত্র লেখেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

সেদিন আপনার রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটা জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থি-মাংস স্নায়ু-পেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোন মতে বন্দী করিতে

* রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত "বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে"।
† মহারাজ সার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর।

পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে, সেদিন আপনি আমার "রাজা ও রাণী" নাটক হইতে প্রসঙ্গ-ক্রমে নিম্নলিখিত অংশটী উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

—"এ রাজ্যেতে যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার, যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ়বলে ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয় ?"

ঐ কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল সুখ-দুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারে প্রভুর শক্তির দ্বারাও কি ছোট এই মানুষটীর আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না ? শরীর হার মানিয়াছে কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই—কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই—পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত বেশী করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত-স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে ? মানুষের আত্মার সত্য-প্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থি-মাংস ও ক্ষুধা তৃষ্ণার মধ্যে নয়, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সচ্ছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য্য।

যে দিন আপনার সহিত দেখা হইয়াছে সেই দিনই আমি বোলপুরে চলিয়া আসিয়াছি। ইতিমধ্যে আমার যদি কলিকাতায় যাওয়া ঘটে তবে নিশ্চয় দেখা হইবে।

আপনি যে গানটী পাঠাইয়াছেন তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। সিদ্ধিদাতা আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন—আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্ত তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে—অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ ত একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাহাকে রিক্ত করেন, তাহাকে কেমন গভীর ভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন; আজ আপনার জীবন-সঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা-সঙ্গীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে। ইতি—
১৬ই আষাঢ় ১৩১৭ সাল।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

দেনা-পাওনা

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(১১)

সকালে উঠিয়া হৈম নিজের গত রাত্রির ব্যবহার স্মরণ করিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল। নির্দ্দোষ ও চরিত্রবান্ স্বামীর প্রতি এই অহেতুক অভিমানের উৎপাতটাকে সে ঝড়-জল ও দুর্য্যোগের মধ্যে তাঁহার আকস্মিক নিরুদ্দেশের আতঙ্কটার ঘাড়েই দোষ চাপাইয়া দিয়া মনে মনে হাসিতে চাহিল, কিন্তু, সমস্ত প্রাণটাকে খুলিয়া দিয়া যে হাসি তাহার চিরদিনের অভ্যাস, কিছুতেই আজ তাহার আর নাগাল পাইলনা। চোখের বালি বাহির হইয়া গিয়াছে বুঝিয়াও অবোধ চোখদুটা যেন তাহার কোনমতেও নিঃশঙ্ক হইতে চাহিলনা। শিরোমণি মহাশয় নিজে আসিয়া শুভক্ষণ স্থির করিয়া দিয়াছেন,—সাড়ে দশটা না কিছুতে উত্তীর্ণ হয়। মা ভাঁড়ার ঘরে যাত্রার আয়োজন ও রান্নাঘরে খাবার ব্যবস্থা করিতে অতিশয় ব্যস্ত, তাঁহার মুহূর্ত্তের অবকাশ নাই, এমনি সময়ে সদর হইতে ডাক আসিল, রায় মহাশয় কন্যাকে আহ্বান করিয়াছেন। হৈম বাহিরে আসিয়া দেখিল কিসের যেন একটা উৎসব চলিয়াছে। পিতা ফরাসের উপর বাঁধা-হুঁকা হাতে বার দিয়া বসিয়াছেন, শিরোমণি মহাশয় আছেন, জমিদারের গমস্তা এককড়ি নন্দী আছে, তারাদাস আছে, আরও কয়েকজন গণ্য-মান্য ব্যক্তি আছেন, তাহার স্বামীও একধারে চুপ করিয়া বসিয়া আছে,—সমারোহ চলিতেছে। উৎসাহ ও আনন্দের প্রাবল্যে সবাই একযোগে সংবাদটা হৈমর গোচর করিতে গিয়া প্রথমটা কিছু বুঝাই গেলনা। শিরোমণির দাঁত নাই, কিন্তু, আওয়াজ আছে,—তাহার বিপুল শক্তি মুহূর্ত্তেই আর সমস্ত থামাইয়া দিয়া যাহা প্রকাশ

করিল তাহা এইরূপ ;—কাল ভয়ানক দুর্য্যোগের রাত্রে মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে—নির্ব্বিঘ্নে শক্রপুরী হস্তগত হইয়াছে। ভৈরবী বাড়ী ছিলনা, চরের মুখে খবর পাইয়া তারাদাস সেই মেয়েটাকে লইয়া এই অবকাশে গিয়া সমস্ত দখল করিয়া লইয়াছে। বিবাদ করা দূরে থাক্ ভয়ে সে কথাটি পর্য্যন্ত বলে নাই, সামান্য কিছু কিছু জিনিসপত্র লইয়া রাত্রেই বাহির হইয়া গেছে। প্রাচীরের বাহিরে মন্দির-সংলগ্ন যে চালাটার মধ্যে দূরের যাত্রীরা কেহ কেহ রান্না-বাড়া করিয়া খায়, তাহাতেই আশ্রয় লইয়াছে। এ সমস্তই মা চণ্ডীর কৃপা এবং এই কৃপাটা আর একটুখানি বৃদ্ধি পাইলেই তাহাকে গ্রাম হইতে দূর করিয়া দেওয়াও কঠিন কাজ হইবেনা।

উৎফুল্ল তারাদাস উপরের দিকে একটা কটাক্ষপাত করিয়া সবিনয় হাস্যে কহিল, সমস্তই মায়ের কাজ,—যা' করবার তিনিই করেছেন, নইলে অতবড় রাই-বাঘিনী একেবারে ভেড়া হয়ে গেল! তামাকটি ধরিয়ে সবে ফু দিচ্চি, মেয়েটা পাশে বসে চা-সিদ্ধটুকু ছেঁকে দিচ্চে,—এম্নি সময়ে কোথা থেকে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে এসে হাজির। আমাদের দেখে ভয়ে যেন একেবারে কাঠ হয়ে গেল; খানিকপরে আস্তে-আস্তে বল্‌লে, বাবা, আমি ত কখনো বলিনি তুমি যাও, কিম্বা এখানে থেকোনা। নিজে রাগ করে চলে গিয়ে কত কষ্টই না পেলে!

আমি বল্‌লাম, হঃ—

দোরের উপরে উঠে বল্‌লে, এ ঘরে কি তুমি তালা দিয়েছ বাবা?

বোল্‌লাম, হঃ—দিইচি। কি করবি, কর।

চুপ করে থেকে বল্‌লে, তোমার সঙ্গে আমি কিছুই কোরব না বাবা, তোমরা থাকো। কেবল ঘরটা একবার খুলে দাও, আমার কাপড় দু'খানা নিই।

দিলাম খুলে। মা চণ্ডীর দয়ায় আর কোন দাঙ্গা করলেনা; পরবার থানদুই কাপড়, একটা কম্বল, আর একটা ঘটি নিয়ে অন্ধকারেই ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে দূর হয়ে গেল। মা'কে গড় হয়ে নমস্কার করে বোল্‌লাম, মা, এম্নি দয়া যেন ছেলের ওপর থাকে। তোর নাম না কোরে কখনো জল-গ্রহণ করিনে!

শিরোমণি হাত নাড়িয়া কহিলেন, থাক্‌বে! থাক্‌বে! আমি বল্‌চি তারাদাস, মা মুখ তুলে চাইবেন! নইলে তাঁর জগদম্বা নামই যে বৃথা!

এককড়ি কহিল, কিন্তু ঠাকুর, যাই বল, মায়ের গদী কখনো খালি থাক্‌তে পারবেনা, তোমার মেয়েটিকে নতুন ভৈরবী করতে বিলম্ব করলেও চল্‌বেনা বলে রাখ্‌চি!

রায় মহাশয় পোড়া হুঁকাটা পাশের লোকটির হাতে দিয়া পরম গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন, হবে, হবে, সব হবে, আমি সমস্ত ঠিক করে দেব, তোমরা ব্যস্ত হোয়োনা। জামাতার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, কি বাবা, ছুঁড়ির কাছ থেকে এক ছত্র লিখিয়ে নেওয়া ত চাই? চাই বই কি! তাও হবে,—ডেকে আনিয়ে দুটো ধমক্ দিয়ে এও আমি করিয়ে নেব। কিন্তু, তাও বলে রাখ্‌চি তারাদাস, কদমতলার ওই জমিটে নিয়ে হাঙ্গামা করলে চল্‌বেনা। ধানের আড়ত্‌টা আমার সাম্‌নে সরিয়ে না আনলে চারদিকে আর চোখ্ রাখ্‌তে পারচিনে! মেলার নাম করে ষোড়শীর মত ঝগড়া করলে, কিন্তু—

কথাটা সমাপ্ত করিতেও হইলনা। অনেকেই তারাদাসের হইয়া রাজী হইয়া গেল, এবং সে নিজে জিভ্ কাটিয়া প্রায় গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, অমন কথা মুখেও আন্‌বেন না রায় মশায়, আপনারই ত সব! হাতীর সঙ্গে মশার বিবাদ! কি বল মা? এই বলিয়া সে একটা ভাল কথা কিম্বা একটুখানি ঘাড়-নাড়া কিম্বা এম্‌নি কিছু একটা শুনিবার প্রত্যাশায় হৈমর মুখের প্রতি চাহিল, এবং সেই সঙ্গে অনেকেরই দৃষ্টি তাহার উপরে গিয়া পড়িল। হৈম কিছুই কহিল না; পরন্তু তাহার মুখের চেহারায় ষোড়শীর সেই প্রথম বিচারের দিনটাই সকলের দপ্ করিয়া মনে পড়িয়া অপ্রত্যাশিত একটা নিরুৎসাহের মেঘ যেন কোথা হইতে আসিয়া পলকের নিমিত্ত ঘরের মধ্যে ছায়াপাত করিল, —কিন্তু পলক মাত্রই। রায় মহাশয় সোজা হইয়া বসিয়া তামাকের জন্য একটা উচ্চ হাঁক দিয়া কহিলেন, বাবা নির্ম্মল, যাত্রার সময়টা শিরোমণি মশায় দশটার মধ্যেই দেখে দিয়েছেন;—মেয়েদের কাণ্ড,—একটু সকাল সকাল তৈরি না হতে পারলে বার হওয়াই যাবে না।

নির্ম্মল ঘাড় নাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং আর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই হৈম নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

মুখ হাত ধোয়া হইতে স্নান পর্য্যন্ত সমাধা করিতে

বোস্ সাহেবের বেশি বিলম্ব হইল না। বাটীর মধ্যে পা দিয়াই শাশুড়ীর উচ্চ কণ্ঠ রান্নাঘর হইতে শুনা গেল, তিনি মেয়েকে লইয়া পড়িয়াছেন। সে যে ঘরের মধ্যে কি করিতেছে তাহা ভাবিয়া পাইতেছেন না। ঘরে ঢুকিয়া দেখিতে পাইল হৈম মেজের উপর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে; আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি, তোমার মা যে ভারি বকাবকি করছেন? তা'ছাড়া সময়ও ত বেশি নেই।

হৈম কহিল, ঢের সময় আছে,—আজ ত আমাদের যাওয়া হতে পারে না।

কেন?

হৈম কহিল, কেন কি? ষোড়শীর এতবড় বিপদে তার সঙ্গে একবার দেখা না করেই যাবো?

নির্ম্মল কহিল, বেশ ত, দেখা করেই এসোনা। তারও ত সময় আছে।

হৈম বলিল, আর তুমিই বা একবার দেখা না করে কি কোরে যেতে পারবে?

নির্ম্মল কহিল, চেষ্টা করলে বোধ হয় পারা যাবে। অসম্ভব রকমের শক্ত বলে ঠেকচেনা। তা'ছাড়া, আমি একবার দেখা করে গেলেই যে এ বিপদে তার কি সুবিধে হবে ভেবে পাচ্চিনে।

হৈম প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া শুধু কহিল, না সে কোন মতেই হবেনা।

হবে না কেন? তা'ছাড়া আমার যে সেই সৈদাবাদের চামড়ার মামলা আছে—

থাক্ তোমার চামড়ার মামলা, একটা তার করে দাও। আজ তোমার কিছুতেই যাওয়া হবেনা।

বেশ ত, চলনা না হয় দুজনে একবার দেখা করেই আসি? সে সময় ত আছে।

হৈম মুখ তুলিয়া একটু হাসিয়া বলিল, না, সে তোমার সেখানে হয়, কিন্তু, এখানে হয় না। আর এত লোকের সামনে বাবা-ই বা কি মনে করবেন? রাত্রে আমরা লুকিয়ে যাবো।

নির্ম্মলের যথার্থ ই অত্যন্ত জরুরি মকদ্দমা ছিল, তা'ছাড়া কোন্ ছুতায় যে যাওয়া এমন হঠাৎ স্থগিত করা যাইতে পারে, সে ভাবিয়া পাইল না, বিশেষতঃ, শ্বশুরের সঙ্গে ইহাতে নিদারুণ বিচ্ছেদ ঘটিবার সম্ভাবনা। চিন্তা করিয়া কহিল, সে হয়না হৈম, যেতে আমাদের আজ হবেই। তা'ছাড়া মনে হয় আমরা মাঝে পড়ে বিপদটা তার আরও বাড়িয়ে তুলব। আমার কথা শোন, চল, অযাচিত মধ্যস্থতায় কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি হয়।

হৈম স্বামীর মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল, আমাকে ত তুমি জানো, আজ আমি কিছুতেই যেতে পারবনা। আর, কালকের অপরাধে যদি আমাকে তুমি শাস্তি দিতেই চাও, ত ফেলে রেখে যাও। আমি আর তোমাকে আট্‌কাবোনা।

নির্ম্মল আর কিছু না বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। শরীর ভাল নয়, আজ যাওয়া হইলনা শুনিয়া শাশুড়ী-ঠাকুরাণী আশ্চর্য্য হইলেন, উদ্বিগ্ন হইলেন এবং ততোধিক খুসি হইয়া উঠিলেন, কিন্তু বাহিরের ঘরে বসিয়া শ্বশুর মহাশয় শুধু একটা হুঁ বলিয়াই তামাক টানিতে লাগিলেন। তিনি আশ্চর্য্যও হইলেননা, উদ্বিগ্নও হইলেননা, এবং যাহার কিছুমাত্র কাণ্ড-জ্ঞান আছে, সে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া খুসির কথা মুখেও আনিবে না।

মকদ্দমার ব্যবস্থা করিতে নির্ম্মল তার করিয়া দিল এবং কাজটা যে কেবল নিরর্থক নয় মন্দ, তাহাও সে মনে-মনে বুঝিল, তবুও সেই মনটাই তাহার সারাদিন একান্ত সংগোপনে সেই দিনান্তের জন্যই উন্মুখ হইয়া রহিল। বিগত রাত্রির হৈমর কান্নাটা যে কত হাস্যাস্পদ, কত অসম্ভব অপেক্ষাও অসম্ভব, সমস্ত দিন ধরিয়া এ কথা তাহার বহুবার মনে হইয়াছে, কিন্তু সেই একফোঁটা চোখের জল কেবলি যেন বড় এবং উজ্জ্বল হইয়া এমনই একটা অজ্ঞাত ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব রহস্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা একই কালে তিক্ত ও মধুর, এবং যে অশ্রুকণা তাহার উৎস হইতে প্রতি মুহূর্ত্তেই কোথায় যেন ধীরে-ধীরে সরিয়া যাইতেছে।

রাত্রির অন্ধকারেও পিতার চক্ষুকে ফাঁকি দিবার প্রয়াস নিষ্ফল বুঝিয়া হৈম স্বামী ও তাহার পশ্চিমে চাকরটাকে সঙ্গে করিয়া যখন ষোড়শীর নূতন বাসার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। ষোড়শী একখানি কম্বলের উপর বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে কি একখানা বই পড়িতেছিল, সম্মুখে জুতার শব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আসুন। এস, দিদি এস। এই বলিয়া সে গুটানো কম্বলখানি প্রসারিত করিয়া পাতিয়া দিল।

আসন গ্রহণ করিয়া স্বামি-স্ত্রী উভয়েই নিঃশব্দে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া হৈম কহিল, দিদির এই নতুন ঘরখানির আর যা দোষ থাক্ অপব্যয়ের অপবাদ শিরোমণি মশায় এমন কি আমার বাবা পর্য্যন্ত দিতে পারবেন না। এই আশ্চর্য্য বস্তুটি দেখাবার লোভ দিয়েই আজ এঁকে ধরে রেখেচি, নইলে আমাকে শুদ্ধ নিয়ে দুপুরের গাড়ীতে চলে গিয়েছিলেন আর কি! স্বামীকে কহিল, কেমন, এ না দেখে গেলে অনুতাপ করতে হোতো?

নির্ম্মল কহিল, দেখেও ত কিছু কম করতে হবে মনে হয়না।

হৈম স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, সে ঠিক। হয়ত চোখে না দেখ্‌লেই ছিল ভাল। তাহার পরে ষোড়শীর শান্ত মলিন মুখখানির উপর নিজের স্নিগ্ধ চোখ দুটি রাখিয়া বলিল, আমরা সমস্তই শুনেচি। কিন্তু এ পাগ্‌লামি কেন করতে গেলে দিদি, এ ঘরে তুমি ত থাক্‌তে পারবেনা? আবেগ ও করুণায় শেষ দিকটায় তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল। কিন্তু ষোড়শীর গলায় ইহার প্রতিধ্বনি বাজিলনা। সে অত্যন্ত সহজ ভাবে কহিল, অভ্যাস হয়ে যাবে। এর চেয়েও কত খারাপ ঘরে কত মানুষকে ত থাক্‌তে হয় ভাই। তা'ছাড়া, বাবার বড় কষ্ট হচ্ছিল।

হৈম প্রশ্ন করিল, তা'হলে সমস্তই তুমি ছেড়ে দিলে?

ইহার উত্তর তাহার স্বামীর নিকট হইতে আসিল, সে কহিল, এ ছাড়া আর কি উপায় আছে বল্‌তে পারো? সমস্ত গ্রামের সঙ্গে ত একজন অসহায় স্ত্রীলোক দিবারাত্রি বিবাদ করে টিক্‌তে পারেনা। ষোড়শীকে কহিল, এই ভাল। যদি স্বেচ্ছায় এইখানে থাকাই সঙ্কল্প করে থাকেন, এবং এ কুটীরও অভ্যাস হয়ে যাবে বিশ্বাস করে থাকেন—সংসারে কিছুই ত্যাগ করা আপনার শক্ত হবেনা।

ষোড়শী মৌন হইয়া রহিল, এবং তাহার মুখ দেখিয়াও তাহার মনের কথা কিছুই বুঝা গেলনা। হৈম বলিল, তুমি সন্ন্যাসিনী, বিষয়-আশয় ছাড়া তোমার কঠিন নয়, এ কুঁড়েও তোমার সইবে আমি জানি, কিন্তু এর সঙ্গে যে মিথ্যে দুর্নাম লেগে রইল সেও কি সইবে দিদি?

ষোড়শী হাসিমুখে ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিল, দুর্নাম যদি মিথ্যেই হয় সইবেনা কেন? হৈম, সংসারে মিথ্যে কথার অভাব নেই, কিন্তু তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে যে আবার মিথ্যে কাজের সৃষ্টি হয় তার গুরুভারটাই সওয়া যায়না।

হৈম কহিল, কিন্তু এককড়ি নন্দী যে কথা এবং কাজ দুই-ই মিথ্যে রটিয়ে বেড়াচ্ছে? মেয়ে-মানুষের জীবনে সে যে অসহ্য।

ষোড়শী লেশমাত্র উত্তেজিত হইলনা, আস্তে-আস্তে কহিল, আমি যতদূর শুনেচি, এককড়ি মিথ্যে ত বিশেষ বলেনি। জমিদার বাবু হঠাৎ অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন, ঘরে আর কেউ ছিলনা,—আমি তাঁর সেবা করেচি। এ তো অসত্য নয়।

হৈম উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। আর একজনের ধীরতার তুলনায় তাহার কণ্ঠস্বর কিছু অনাবশ্যক তীক্ষ্ণ শুনাইল, কহিল, কিন্তু সকলেই ত সব কাজ পারেনা দিদি। আর্ত্তের সেবা করারও ত একটা ধারা আছে?

ষোড়শী তেম্‌নি মৃদুকণ্ঠে বলিল, আছে বই কি! কিন্তু, স্থান কাল না বুঝে কেবল বাইরে থেকে এই ধারাটা স্থির করে দেওয়া যায় না হৈম। আপনি কি বলেন? এই বলিয়া সে নির্ম্মলের প্রতি চাহিয়া একটু হাসিল।

নির্ম্মল এ ইঙ্গিত সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া কহিল, অন্ততঃ আমি ত কোনমতেই অস্বীকার করতে পারিনে। তা'ছাড়া কাজের ধারা সকলের একও নয়,—এই যেমন সন্ন্যাসিনীর।

স্বামীর এই উক্তিটাকে হৈম তলাইয়া দেখিল না, কহিল, হোক্ সন্ন্যাসিনী, কিন্তু তাঁর কি ধর্ম্ম নেই? তিনি কি নারী নয়? আপনাকে সে ঘর থেকে ধরিয়ে নিয়ে গেল, অথচ বল্‌লেন নিজে গিয়েছিলেন। এই মিথ্যের কি আবশ্যক ছিল? তার অসুখ ত কেবল নিজের দোষে। তবুও এত বড় ঘোর পাপিষ্ঠকে বাঁচাবার আপনার কি দরকার ছিল? এর পরেও মানুষে যদি সন্দেহ করে সে কি তাদের দোষ?

স্ত্রীর কথা শুনিয়া নির্ম্মল ক্ষুব্ধ এবং লজ্জিত হইয়া উঠিল। সে জানিত অভিযোগ করিতে হৈম ঘর হইতে বাহির হয় নাই,—বাড়ী চড়িয়া অপমান করিবার মত ক্ষুদ্র এবং হীন সে নয়,—বস্তুতঃ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া একটা বড় রকমের ভরসা দিতেই সে উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু কথায় কথায় এ সকল কি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল! কিন্তু পাছে আত্মবিস্মৃত হইয়া আরও বেশি কিছু বলিয়া বসে,

এই ভয়ে সে ব্যস্ত হইয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু আবশ্যক হইল না। ষোড়শী হাসিয়া বলিল, তোমার স্বামী বলছিলেন সন্ন্যাসিনীর ধর্ম্ম অ-সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে নাও মিলতে পারে, এই যেমন এই কুঁড়ের মধ্যে নিরাশ্রয়, ধূলো বালির ওপর একাকী বাস করা। তোমার সহ্য হবে না। এই বলিয়া সে পুনরায় হাসিয়া কহিল, সত্যিই আমাকে ঘর থেকে টেনে-হিঁচড়ে কেউ ধরে নিয়ে যায়নি, আমি রাগের মাথায় আপনিই বেরিয়ে পড়েছিলাম।

নির্ম্মল কহিল, কিন্তু আপনার রাগ আছে বলে ত মনে হয় না?

ষোড়শী হাসি চাপিয়া শুধু বলিল, আছে বই কি। হৈমকে কহিল, কিন্তু সে তর্ক আমি করচিনে, সত্যিই আমি মিথ্যে বলেছিলাম। কিন্তু ঘোর পাপিষ্ঠ বলে কি তাকে বাঁচাবার অধিকারও কারও নেই? তোমার স্বামী উকিল, তাঁকে বরঞ্চ সময় মত কখনো জিজ্ঞেসা করে দেখো।

নির্ম্মল বলিল, সময় মত সাধারণ বুদ্ধিতে একটা জবাব দিতেও পারি, কিন্তু ওকালতি বুদ্ধিতে ত কিছুই খুঁজে পাচ্ছিনে।

ষোড়শী কহিল, তা'ছাড়া এমন ত হতে পারে সজ্ঞানে অনেক কর্ম্মই তিনি করেন না—

হৈম বাধা দিয়া কহিল, তাই বলে কি নিজের বাপের বিরুদ্ধেও যেতে হবে? এও কি সন্ন্যাসিনীর ধর্ম্ম?

ষোড়শী রাগ করিল না, হাসি মুখে কহিল, সন্ন্যাসিনীর হোক্ না হোক্, মেয়েমানুষের অন্ততঃ এমন জিনিস সংসারে থাকতে পারে যা বাপেরও বড়। তাই যদি না হোতো হৈম, এই ভাঙা কুঁড়ের মধ্যে তোমার পায়ের ধূলোই বা পড়ত কি কোরে?

হৈম শশব্যস্তে হেঁট হইয়া তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া কহিল, অমন কথা তুমি মুখেও এনোনা দিদি। আমার শ্বশুরকে কোন্ এক রাজা একখানি তলোয়ার খিলাত দিয়েছিলেন, ছেলেবেলা আমি প্রায় সেখানি খুলে খুলে দেখতাম। খাপখানা তার ধূলো-বালিতে মলিন হয়ে গেছে, কিন্তু আসল জিনিসে কোথাও এতটুকু ময়লা ধরেনি। সে যেমন সোজা, তেম্নি কঠিন, তেম্নি খাঁটি,—তার কথা আমার তোমার পানে চাইলেই মনে পড়ে। মনে হয়, দেশশুদ্ধ লোক সবাই ভুল করচে, কেউ কিছুই জানে না, —তুমি ইচ্ছে করলে চোখের পলকে সেই খাপখানা ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারো। কেন দিচ্চ না দিদি?

ষোড়শী তাহার ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া কহিল, আজ তোমাদের যাবার কথা ছিল, হল না কেন? বোধ হয় কাল যাওয়া হবে?

হৈম তাহার স্বামীকে দেখাইয়া কহিল, কাল রাত্রে কে এঁকে হাত ধরে নদী মাঠ প্রান্তর নির্ব্বিঘ্নে পার করে এনে বাড়ীতে নিয়ে গেছেন, আমার বাবা তাঁকে পুরো এক টাকা বক্‌সিস্ দিতে চেয়েছেন। কিন্তু টাকাটা তাঁর হাতে পড়বে না, কারণ, তিনি তাঁকে খুঁজে পাবেন না; এই অন্ধ মানুষটিকে অমন কোরে দিয়ে না গেলে যে কি হোতো সে কেবল আমিই জানি, আর আমিই কেবল তাঁর নাম জানি। কিন্তু টাকা-কড়ি ত তাঁকে দেবার যো নেই,—তাই কেবল একটু পায়ের ধূলো নিতে—এই বলিয়া সে তাহার হাতখানা টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেই ষোড়শী নিজের মুঠাটা শক্ত করিয়া রাখিয়া কেবল একটু হাসিল।

হৈম বাঁ হাত দিয়া তাহার চোখের কোন্‌টা মুছিয়া লইয়া হাসিয়া কহিল, পায়ের ধূলো দিতে হবেনা, দিদি, মুঠোটা একটু আল্‌গা কর—আমার হাত ভেঙে গেল। শক্ত কেবল মনই নয়, হাতটাও কম নয়। ইস্পাতের তলওয়ারটা কি সাধে মনে পড়ে! কিন্তু এই কথাটি আজ দাও দিদি, আপনার লোকের যদি কখনো দরকার হয় এই প্রবাসী বোন্‌টিকে তখন স্মরণ করবে?

ষোড়শী তাহার হাতের উপর ধীরে-ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল, কিছুই বলিল না।

হৈম কহিল, তা'হলে কথা দিতে চাও না?

ষোড়শী বলিল, আমার জন্যে তোমার বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয় এই কি আমি চাইতে পারি ভাই?

নির্ম্মল কহিল, ঝগড়া না করেও ত অনেক জিনিস করা যায়?

ষোড়শী বলিল, আমি বলি তা-ও আপনাদের চেষ্টা করে কাজ নেই। কিন্তু তাই বলে প্রবাসী বোন্‌টিকেও আমি ভুলে যাবোনা। আমার খবর আপনারা পাবেন।

চাকরটা এতক্ষণ চুপ করিয়া বাহিরে বসিয়া ছিল, সে

কহিল, মা কালকের মত আজও ঝড়-জল হতে পারে,—মেঘ উঠেচে।

হৈম বাহিরে উঁকি মারিয়া দেখিয়া প্রণাম করিয়া এবার পায়ের ধূলা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, নির্ম্মল হাত তুলিয়া একটা নমস্কার করিয়া কহিল, আমি চিরদিন ঋণীই রয়ে গেলাম, শোধ দেবার আর কোন পথ রইলনা। আদালতের মানুষ, বিষয়-সম্পত্তি-ওয়ালা ভৈরবীর কাজে লাগলেও লাগতে পারতাম, কিন্তু, কুঁড়ে ঘরের সন্ন্যাসিনীরা আমাদের হাতের বাইরে। সমস্ত না ছেড়েও উপায় ছিলনা সত্যি, কিন্তু ছেড়েও যে উপায় হবে তা ভরসা হয় না।

ষোড়শী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কে বল্‌লে আমি সমস্ত ছেড়ে দিয়েচি? আমি ত কিছুই ছাড়িনি।

নির্ম্মল ও হৈম উভয়েই অবাক্ হইয়া, একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, ছাড়েননি? কোন সত্বই ত্যাগ করেননি?

ষোড়শী তেম্‌নি শান্ত সহজ কণ্ঠে কহিল, না, কিছুই না। আমি স্ত্রীলোক, আমি নিরুপায়, কিন্তু আমার ভৈরবীর অধিকার একতিল শিথিল হয়নি। তাঁরা পুরুষ মানুষ, তাঁদের জোর আছে,—কিন্তু সেই জোরটা তাঁদের ষোল আনা সপ্রমাণ না কোরে আমার হাত থেকে কিছুই পাবার যো' নেই—মাটির একটা ঢেলা পর্য্যন্ত না। নির্ম্মলবাবু, আমি মেয়ে মানুষ, কিন্তু সংসারে সেইটাই আমার বড় অপরাধ যাঁরা স্থির করে রেখেছেন, তাঁরা ভুল করেছেন। এ ভ্রম তাঁদের সংশোধন করতে হবে।

কথা শুনিয়া দুজনেই স্তব্ধ হইয়া রহিল। ঘরে তখনও আলো জ্বলে নাই,—অন্ধকারে তাহার মুখ, তাহার চোখ, তাহার ক্ষীণ দেহের অস্পষ্ট ঋজুতা ভিন্ন আর কিছুই লক্ষ্য হইলনা,—কিন্তু ওই শান্ত অবিচলিত কণ্ঠস্বরও যে মিথ্যা আস্ফালন উদ্গীর্ণ করে নাই, তাহা মর্ম্মের মাঝখানে গিয়া উভয়েরই সবলে বিদ্ধ করিল।

অনতিদূরে পথের বাঁকটার কাছে একটা গোলমাল শুনা গেল। আগে এবং পিছনে কয়েকটা আলোর সঙ্গে গোটা দুই পাল্‌কি চলিয়াছে।

অন্ধকারে নজর করিয়া দেখিয়া নির্ম্মল কহিল, জমিদার বাবু তা'হলে আজই পদধূলি দিলেন দেখ্‌চি।

ষোড়শী ভিতর হইতে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, জমিদার বাবু? তাঁর কি আস্‌বার কথা ছিল? এই বলিয়া সে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

নির্ম্মল কহিল, হাঁ, তাঁর নদীর ধারের নরক-কুণ্ডর ঝাড়া-মোছা চল্‌ছিল। এককড়ি বল্‌ছিল, শরীর সারবার জন্যে হুজুর আজকালের মধ্যেই স্বরাজ্যে পদার্পণ করবেন। করলেনও বটে।

ষোড়শী নির্ব্বাক হইয়া সেই খানেই দাঁড়াইয়া রহিল। বিদায় লইয়া নির্ম্মল আস্তে আস্তে কহিল,—যত দূরেই থাকি আমরা বেঁচে থাক্‌তে নিজেকে একেবারেই নিরুপায় এবং নিরাশ্রয় ভেবে রাখ্‌বেন না। এই বলিয়া সে হৈমর হাত ধরিয়া অন্ধকারে অগ্রসর হইল। ষোড়শী তেম্‌নি স্থির তেম্‌নি স্তব্ধ হইয়াই রহিল, এ কথারও কোন উত্তর দিল না।

নালন্দ

[শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল]

এ অঞ্চলে দেখিবার মত দুইটি প্রধান জিনিষ আছে,—রাজগৃহ এবং নালন্দ; এবং এই দুইএর মধ্যে, আমার মনে হয়, বিস্ময়কর যদি কিছু থাকে, তবে তাহা নালন্দেই আছে।

কথা ছিল, আমরা তিনজনে মিলিয়া, ট্রলি করিয়া, ভোরে বাহির হইয়া, নালন্দ দেখিয়া, বেলা দশটা-এগারটার মধ্যে ফিরিব। ট্রলি জিনিষটার প্রাপ্তি সম্বন্ধে আমাদের হাত কিছুই না থাকিলেও, ষ্টেশনের বাবুরা সম্পূর্ণ ভরসাই দিয়াছিলেন। কিন্তু যাত্রার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায়, তাঁহারা আর তেমন ভরসা দিতে পারিলেন না; কারণ, পরদিন তাঁহাদের বড় সাহেবের ইনস্‌পেকসন-রূপ আকস্মিক বিপৎপাতে, সবই বে-বন্দোবস্ত হইয়া পড়িয়াছে;—সাহেবের একখানা ট্রলি চাই, এবং আমাদের ভাগ্যে ট্রলি জুটিবে কি না, তাহাতেও গভীর সন্দেহ। তাঁহারা কিন্তু চেষ্টায় ত্রুটি করিবেন না; এবং সংবাদ পাইলে অথবা ট্রলি আসিয়া পৌঁছিলে, আমাদিগকে রাত্রি চারটার মধ্যেই সংবাদ দিবেন, এ আশ্বাস দিলেন।

সে রাত্রি ছিল পূর্ণিমা; এবং স্নিগ্ধ, সুন্দর বাতাস

দিতেছিল। এমন রাত্রেই মানুষের মন চট্ করিয়া একটা চরম সিদ্ধান্তে আসিয়া হাজির হইতে চায়। আমরা একেবারেই সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলাম যে, ট্রলি পাওয়া সম্ভব নহে। অথচ, আমাদের মধ্যে বাকী দুইজনের নালন্দ না দেখিলেও নয়; কেন না, তাঁহারা শীঘ্রই এ অঞ্চল ছাড়িয়া যাইবেন। সুতরাং স্থির হইল যে, একটা টমটম ভাড়া করিয়া ফেলা যাউক। বেহারের টমটম যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের বুঝাইবার প্রয়োজন নাই—ইহা কি; এবং যাঁহারা দেখেন নাই, তাঁহাদিগকেও বুঝাইবার ক্ষমতা আমার নাই যে, ইহা কি! ইহাতে চড়িলে, যুগপৎ নাগরদোলা, ঝাম্পান, শাম্পনি এবং গাড়ী চড়ার কাজ হয়; এবং মাইল ৫।৭ চলিলে, নির্ব্বাণের কাছাকাছি পৌছান যায়। শাস্ত্রে রজোস্নান, ঘর্ম্মস্নান ইত্যাদি যতগুলি স্নানের ব্যবস্থা আছে, তাহারও প্রায় সকলগুলিই হয়;—বাড়তির ভিতর, অশ্রুস্নানও হয়। যেহেতু, কৃচ্ছ্রসাধন না করিলে, কোনও মহৎ কর্ম্মই হয় না; সেই হেতু, আমার বন্ধুদ্বয় এই কৃচ্ছ্রকেই গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়া, সেই রাত্রিতেই টমটম স্থির করিয়া ফেলিলেন; এবং যেহেতু, আমি কৃচ্ছ্র এবং মহৎ কর্ম্ম উভয়কেই সম্মান এবং ভয়ের চক্ষে দেখি, সেই হেতু, বন্ধুদ্বয়ের লোভনীয় সঙ্গ-লাভের সম্ভাবনা সত্ত্বেও, রণে ভঙ্গ দিলাম।

পাঁচটার সময় বাহির হইবার কথা ছিল; সুতরাং চারটায় না উঠিলে চলিবে না। যাঁহাদের যাইবার কথা, তাঁহাদের মধ্যে কেহই প্রাতরুত্থানকারী বলিয়া খ্যাত ছিলেন না; সুতরাং তৃতীয় এক ব্যক্তির উপর ভার দেওয়া হইল যে, সে যথাসময়ে উঠাইয়া দিবে। দুর্ভাগ্যক্রমে, জ্যোৎস্নার জন্য সে দুইটা রাত্রিকেই চারিটা বলিয়া ভুল করিয়া, তাঁহাদের অর্দ্ধ-রাত্রিতেই উঠাইয়া দিয়া প্রমাদ উপস্থিত করিল। আমেরিকা আবিষ্কার করিতে যাইবার পূর্ব্বে বোধ হয় কলম্বসেরও এত উৎসাহ এবং আত্ম-তৃপ্তি হয় নাই, যত হইয়াছিল আমার এই নালন্দ-গামী বন্ধুদ্বয়ের। তাঁহাদের দাপাদাপি এবং গর্ব্বিত পদশব্দে গৃহস্থালী মুখরিত হইয়া উঠিল; এবং আমরা বাকী কয়েকটি প্রাণী নিদ্রার আশা ত্যাগ করিয়া সাগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, কখন এই দুইটি উৎসাহী তাঁহাদের টমটম রথে আরোহণ করেন।

পাঁচটার কিছু পূর্ব্বেই যখন নালন্দ-গামী টমটমের কর্কশ শব্দ মিলাইয়া গেল, তখন আমরা দুই-এর বার হইয়াছি। আর ঘুমানও চলে না,—অথচ, অর্দ্ধ-রাত্রি জাগরণে শরীরও অপটু। সুতরাং আকাশের দিকে চাহিয়া, বিষণ্ণ মনে বিছানায় পড়িয়া রহিলাম।

"বাবুজী—বাবুজী—"

কে আবার এই ভোরে ডাকাডাকি করে! কতকটা রাগতঃ স্বরে কহিলাম, "কোন্ হায় রে?"

"মাষ্টার বাবু কহিল, টালি তৈয়ার হায়—"

রাখে হরি মারে কে! এত অল্প সবুরেই যে এমন মেওয়া কপালে আছে, কে জানিত! আমার নালন্দ দেখা কে ঘোচায়! সাধনা যস্য যাদৃশী সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী! কৌতুকময় আমার এই কৃচ্ছ্র-সাধক বন্ধুদ্বয়কে দুইটায় সময় উঠাইয়া এক মরণ-যোগ্য, ঘোড়ায়-টানা, ন্যুব্জ-দেহ টমটমে সওয়ার করিয়া সাত-মাইলের ধূলা, আরোহণ ও অবরোহণ, এবং ধাক্কাধাক্কির পথে তাড়াতাড়ি রওনা করিয়া দিলেন; এবং তাহার পরই মিনিট দশেকের মধ্যে খবর আসিল, ট্রলি তৈয়ার! আশ্চর্য্য!

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আমি,—এতক্ষণ-নির্ব্বাক কিন্তু নালন্দ-দর্শনাভিলাষী দুইটি বালকবালিকাকে লইয়া, নালন্দের পথে অগ্রসর হইলাম।

কৃচ্ছ্র-সাধনের মতই, অথবা বোধ হয় তাহা অপেক্ষাও, বেশী ভয় করি আমি প্রত্নতত্ত্বকে; সুতরাং ভরসা করি, কোন সুধীই আমার এই লেখাকে, প্রত্নতত্ত্বের গভীর গবেষণা আশা করিয়া, পাঠ করিতে বসিবেন না। তাহাতে আমার অপেক্ষা অল্প নৈরাশ্য তাঁহাদের হইবে না।

নালন্দ পৌছিয়া বন্ধুদ্বয়ের সঙ্গে দেখা হইতে বিলম্ব হইল না।

খনন করিতে-করিতে যে সকল পুরাতন জিনিষ বাহির হইয়াছে, তাহাদের সাজাইয়া একটি মিউজিয়ম করা হইয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিকের হিসাবে এখানে দেখিবার জিনিষ বিস্তর আছে। মিউজিয়মটি বড় নহে,—একটিমাত্র ঘরের ভিতর কুলাইয়া গিয়াছে। এখানে নানাবিধ মৃৎপাত্রই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছোট-বড় নানাবিধ কলসী, ভাঁড় ইত্যাদি, এখনও অবিকৃত রহিয়াছে; এমন কি ভাঙ্গে নাই পর্য্যন্ত। দু' হাজার, আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার এই মৃৎপাত্রগুলি, কেমন করিয়া এই দীর্ঘকালের ঝঞ্ঝা বহন করিয়া, এখনও সম্পূর্ণ অবিকৃত আছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়।

মাটির উপর খোদিত অক্ষর-সমন্বিত, ছোট বড় নানারকম শীলমোহরও দেখিবার জিনিস। সামান্য টাকার পরিমাণ, অথবা তাহা অপেক্ষা কিছু বড় চাকতি—ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অক্ষরে পরিপূর্ণ। দুটা একটা নয়, এমন বিস্তর। বিশেষজ্ঞদিগের অনুমান এইগুলি দ্বারা শীলমোহরের কার্য্য হইত; কিন্তু এগুলি এমনি নূতন ও অবিকৃত আছে যে, এরূপ কার্য্যে লাগান হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। একটি শীল নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের শীল। তাহাতে যে অক্ষর খোদিত আছে, তাহার পাঠ উদ্ধার করিয়া ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। মাটির একটা মুখসের মত প্রকাণ্ড হাসি-হাসি মুখ দেখিলে, মনে হয় না যে, বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে উহা প্রস্তুত হইতে পারিত।

খনন করিয়া যে যুগের কাহিনী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ বৌদ্ধ-যুগ। অতি-বৃহৎ হইতে অতি-ক্ষুদ্র নানাবিধ বুদ্ধমূর্ত্তি প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। এক-আধটা এমন মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে, যাহা বৌদ্ধ নহে। একটা প্রকাণ্ড তাম্র-ফলক পাওয়া গিয়াছে—তাহা এখনও পরিষ্কৃত করা হয় নাই। তাহার মধ্যে-মধ্যে এখনও দগ্ধ-মৃত্তিকাখণ্ড প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে,—বোধ হয় উহা সজোরে ইহাদের উপর পড়িয়া থাকিবে।

ব্রঞ্জের ফাঁপা পায়ের তলার দিক, ছোট এবং বড় আকারের, একজোড়া আছে। অনুমান, কোন প্রকাণ্ড বুদ্ধ-মূর্ত্তির ইহা অংশ। এইরূপ একজোড়া হাতের অগ্রভাগও পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে একটির আঙ্গুলগুলি সাধারণ ভাবে বিন্যস্ত,—অপরটিতে কিছু বিশেষত্ব আছে। একটি আঙ্গুল সম্মুখভাগে দুমড়াইয়া রাখা হইয়াছে; এবং অপর অঙ্গুলিগুলিও সাধারণভাবে রাখা নহে। একটি গদা এবং ত্রিশূলও পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয় এগুলি ব্যায়াম হিসাবে রাখা হইত। এমন কি, সেই যুগের চাউল পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। একপ্রকার কতকটা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে; এবং আর একপ্রকার চমৎকার শ্বেতবর্ণ। বোধ হয় প্রথমোক্ত চাউলগুলি বাহিরে পড়িয়া থাকায়, ঐরূপ আকার ধারণ করিয়াছে।

ছোট এবং বড় নানাবিধ বুদ্ধমূর্ত্তি, প্রস্তরের ও ধাতুর উপর উৎকীর্ণ, পাওয়া গিয়াছে। সকলগুলিতেই বিশেষ কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের ধ্যানীমূর্ত্তি, ও বুদ্ধের জন্ম,—প্রধানতঃ এই দুই প্রকারের মূর্ত্তিই আছে। বুদ্ধের জন্মে, মায়াদেবীর উরু হইতে জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া, নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত সকল দশাই, ১০।১২ অঙ্গুল দীর্ঘ ও ৭।৮ অঙ্গুল প্রস্থ শিলাখণ্ডে খোদিত; এবং প্রত্যেক সূক্ষ্ম কর্ম্ম এরূপ কৌশলের সহিত করা হইয়াছে যে, বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না।

একখণ্ড প্রকাণ্ড কাষ্ঠ রক্ষিত হইয়াছে,—উহা ও মৃত্তিকার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। কালের প্রভাবে উহা প্রায় কয়লার আকার ধারণ করিয়াছে। লোহার জিনিষের মধ্যে ৩।৪টি তালা দেখিবার যোগ্য। তাহার মধ্যে একটি পরিষ্কৃত করা হইয়াছে। কতকগুলি লৌহবলয় লৌহদণ্ডকে বেষ্টন করিয়া আছে; এবং এই লৌহদণ্ডে কড়া লাগান আছে। এই তালা অত্যন্ত মজবুত; এবং ইহা যেখানে লাগান হইত, সেখানে ঐ কড়াগুলি পুঁতিয়া লাগান হইত।

মিউজিয়ম দেখিয়া আমরা, যেখানে খনন কার্য্য হইতেছে, সেখানে গেলাম। খনন করিয়া একটি প্রকাণ্ড বাড়ী উদ্ধার করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ এইটি নালন্দ বিদ্যাপীঠের প্রধান গৃহ ছিল। ইহা দেখিয়া স্তম্ভিত, নির্ব্বাক হইয়া থাকিতে হয়! প্রথম তালা সম্পূর্ণই আছে; যাহা দ্বিতীয় তালা ছিল, তাহার উপরটা নাই। প্রথমেই লক্ষ্য হয় কতকগুলি গৃহ। ইহার প্রত্যেকটিতে দুইটি করিয়া বড়-বড় বাঁধান স্থান। বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন ছাত্রগণের এইখানেই শয্যা-রচনা হইত। তাহার নিকট ছোট-ছোট বাঁধান জায়গা,—অনুমান, ছাত্রদের পুঁথিপত্র এখানে থাকিত। দোতালার উপর সারি-সারি এইরূপ গৃহ অনেকগুলি। সমস্ত বাড়ীটির মধ্যে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার দেখা যায়। একই দেওয়ালের নির্ম্মাণ-কৌশল বিভিন্ন ধরণের। নীচের দিকটার ইষ্টকগুলি হয় ত তেমন সুন্দর নহে; এবং বিশেষ কৌশলের সহিতও তাহাদের বসান হয় নাই; অথচ উপর দিকের ইষ্টকগুলি সুন্দর এবং চমৎকার মানান-সই-করিয়া বসান; দেখিলে মনে হয় না যে, তাহা আধুনিক কাজ নহে। সমস্ত বাড়ীটাতেই অল্প-বিস্তর এইরূপ প্রভেদ দেখা যায়; এবং ইহা বরাবরই দেখা যায় যে, উপরের দিকের নির্ম্মাণ-কৌশলই সুন্দরতর। যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, তাঁহারা বলেন যে, ইহা দুই যুগের শিল্পের পরিচায়ক। তাঁহারা বলেন, যে প্রথম যুগের সমস্তটাই কোনও এক সময়ে মাটির নিম্নে সম্পূর্ণ প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর, দ্বিতীয় যুগে আবার নূতন করিয়া তাহার উপর নির্ম্মাণ-কার্য্য

হইয়াছিল। আমার কিন্তু দেখিয়া তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হইল না। দুই-যুগের হইলে, নিশ্চয়ই মধ্যে মৃত্তিকার স্তর দেখা যাইত; এবং ঠিক একের অব্যবহিত উপরেই অপর স্থাপত্য দৃষ্ট হইত না। অজ্ঞাতে এক স্তরের উপর যদি দ্বিতীয় স্তরের গৃহ নির্ম্মাণ করা হইত, তাহা হইলে, প্রত্যেক গৃহের ঠিক এক দেওয়ালের উপর অপর দেওয়াল হইত না, এবং এক গৃহের উপর অপর গৃহ হইত না। আজ কত দীর্ঘকাল যে বিদ্যাপীঠ দাঁড়াইয়া আছে,—কিছুই আশ্চর্য্য নহে যে, সময়ে-সময়ে তাহাতে সংস্কার ও নূতন নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইত; এবং বিভিন্ন সময়ের সংস্কারে, স্থাপত্যের ভিন্নতা হওয়াই স্বাভাবিক।

দ্বিতলের দেওয়াল অথবা ছাত নাই; শুধু মেঝে আছে। এইগুলি ঘুরিয়া-ঘুরিয়া দেখিতে অল্প সময় লাগে না। কোন জায়গায় একতালার ছাতও নাই,—সেখানে সাবধানে দেওয়ালের উপর দিয়া যাইতে হয়। নীচের তলার ঘরগুলি উচ্চতায় আজকালকার আধুনিক ঘরের চেয়ে কম নহে। উপর তলা হইতে নীচের তলায় নামিবার সেকালের সিঁড়ির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া এমন হইয়া গিয়াছে যে, ব্যবহার চলে না, এবং সম্পূর্ণও নাই। মাত্র নীচের প্রস্তর-নির্ম্মিত দু' তিন ধাপের চিহ্ন পাওয়া যায়। বাংলার গভর্ণর লর্ড রোণালড্‌শে বাহাদুর কিছুদিন পূর্ব্বে নালন্দ দেখিতে যান। তাঁহার জন্য উপর হইতে নীচের তালায় নামিবার একটি সিঁড়ি প্রস্তুত হইয়াছিল। দর্শকগণ এখন তাহাই ব্যবহার করেন।

নীচের তলায় মাঝখানে প্রকাণ্ড উঠান; এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে ঘর। ঘরগুলি প্রশস্ত; কিন্তু একটিতেও জানালা নাই। বোধ হয় তখনও জানালার প্রচলন হয় নাই; হইলে, নিশ্চয়ই এতবড় বিদ্যা-মন্দিরে উহা দেখা যাইত। কোন্ ঘর কি হিসাবে ব্যবহৃত হইত, তা বুঝা কঠিন,—ঘরের মধ্যে কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। তাহার মধ্যে একটি গৃহ সম্ভবতঃ মন্দির হিসাবে ব্যবহার হইত। ইহার মধ্য হইতে অনেকগুলি বুদ্ধ-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে; এবং এখনও আরও পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। এই গৃহে কতকগুলি বেদীর মত আছে;—অনুমান, মূর্ত্তিগুলি ইহারই উপর রক্ষিত হইত।

ঘরগুলির মধ্যে দুইটি ঘর স্থাপত্য-হিসাবে দর্শন-যোগ্য। শুনা যায়, ভারতবর্ষে খিলানের ইতিহাস আধুনিক;—পূর্ব্বে খিলান-নির্ম্মাণ-কৌশল জানা ছিল না। কিন্তু এই দুইটি ঘরেই খিলানের চমৎকার কৌশল দেখা যায়। দরজার উপর খিলান; এবং বরাবর ইঁট বাহির করিয়া, তাহাকে আরও সুন্দর করা হইয়াছে। ভিতরকার ছাদও সম্পূর্ণ খিলানের তৈরী। অবশ্য এ কথা বলা চলে না যে, এগুলি আধুনিক; কারণ, এই ঘর-দুটির উপর দোতলায় পূর্ব্ব-কথিত ছাত্রদের থাকিবার ঘর।

আর একটি দেখিবার জিনিষ—কূপ। এটি পুরাতন কূপ। ইহাকে সংস্কার করিয়া এখন বেশ কাজ চলিতেছে। ইহারই জল এখন সেখানে ব্যবহার চলে।

রন্ধন-শালা কোথায় ছিল, তাহার কোন আভাষ পাওয়া যায় না। কোন ঘরেই উনান দেখিতে পাওয়া যায় না; অথবা কোন ঘরেই ধূম্রের লক্ষণ দেখা যায় না। হয় ত বা রন্ধনশালা পৃথক ছিল, যাহার সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই; অথবা যাহা কালের প্রভাবে লুপ্ত হইয়াছে। এখানে কিন্তু মাটির নিম্নে খানিকটা করিয়া বাঁধান পয়ঃ-প্রণালীর মত মধ্যে-মধ্যে দেখা গেল। যিনি আমাদিগকে দেখাইতেছিলেন, তিনি বলিলেন, এগুলি হোমের জন্য ব্যবহৃত হইত। এগুলি এখন বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে; সুতরাং ভাল করিয়া দেখা গেল না।

বিদ্যামন্দিরের প্রবেশদ্বার কোথায় ছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় নাই। তবে দক্ষিণ দিকে একটা প্রকাণ্ড ফটকের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে চিহ্ন না বলিয়া ফটকই পাওয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। তাহার সম্মুখে "ষ্টেয়ার-কেশের" মত সিঁড়িরও আভাষ আছে। বৎসরের সকল সময়ে খনন কার্য্য হওয়া সম্ভব নহে; অতি গ্রীষ্মে এবং বর্ষায় উহা বন্ধ থাকে। শুধু বন্ধ থাকে না, বর্ষার পূর্ব্বে যে সকল খনন হইয়াছে, তাহাদেরও রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। এবং অনেক ক্ষেত্রেই অর্দ্ধ-খননের পর একবার উহা নূতন করিয়া গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হয়। এই ফটকের দিকটায় এখন এই বন্ধ করিবার কাজ চলিতেছে, সুতরাং আগামী বৎসর এ-দিকে আরও নূতন আবিষ্কারের ভরসা করা যায়।

	র্	র্	মা	|	ম্	পা	পা	I	ণ্	ণা	মা	I	পা	পা	-া	|
(৩)	ব	হ	ত		রা	ভ	রি		থ	রে	থ		০	রে	০	
(৭)	ন	ব	ক		ম্	ল	কু		মু	দ	বা		০	লা	০	
(১১)	য	ত	ভ		ক	ত	আ		ন	ত	শি		০	র	০	

	মা	পা	ণা	|	ণা	পা	পা	I	র্র্া	র্া	র্সা	|	র্সা	-া	র্স র্সা	|
(৩ক)	পূ	জা	উ		প	চা	র		ঘরে	ঘ	০		রে	০	রচ	
(৭ক)	আজি সা	জা			ও	পূ	জা		র০	ডা	০		লা	০	হলি	
(১১ক)	গা	ও	জ		য়	গা	ন		জন	নী	০		র	০	আজি	

	র্া	র্মা	র্মা	|	র্া	র্মা	র্া	I	র্সা	র্া	র্সা	|	ণা	র্সা	ণা	|
(২)	দে	বী	র		তো	র	ণ		সা	জা	তে		য	ত	নে	
(৮)	চন্	দ	ন		ব	ন	সু		ন্	দ	রী		০	আ	নো	
(১২)	নিব্	ঠা	র		শু	ভ	আ		র	তী	আ		লো	কে	০	

	পা	ণা	পা	|	মা	পা	মা	I	পা	-ণা	-পা	|	-মা	-রা	-সা	II
(৪ক)	ম	রা	ল		ব	লা	কা		হা	০	০		০	০	র্	
(৮ক)	শী	ত	ল		গ	ন্	ধ		সা	০	০		০	০	র্	
(১২ক)	খু	চা	ও		অ	ন্	ধ		কা	০	০		০	০	র্	

সাহিত্য-সংবাদ

আচার্য্য সার জগদীশচন্দ্র বসু প্রণীত 'অব্যক্ত' প্রকাশিত হইল ; মূল্য আড়াই টাকা।

'[illegible] পাঞ্জাবী' প্রণেতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত নূতন উপন্যাস "[illegible]" প্রকাশিত হইল, মূল্য ২৲।

শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ বিশ্বাস প্রণীত নূতন সুবৃহৎ উপন্যাস "ঐশ্বর্য্য" প্রকাশিত হইল, মূ।২৲।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন উপন্যাস "স্রোতের গতি" প্রকাশিত হইল, মূল্য ১।০।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্যলহরী সিরিজের "সোনার কৌটা" ও "তস্কর ডাক্তার" প্রকাশিত হইল, মূল্য প্রত্যেকখানি ৷৵০।

শ্রীমতী সুনীতি দেবী প্রণীত "শিবনাথ" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ৷০।

শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত "স্বরদ শিক্ষা" প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল, মূল্য প্রত্যেক ভাগ ১৲।

শ্রীমতী বিভা দেবী প্রণীত নূতন সুবৃহৎ গার্হস্থ্য উপন্যাস "জন্মান্তরে" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য আড়াই টাকা।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু প্রণীত "মেদিনীপুরের ইতিহাস" বহু চিত্রে শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইল ; মূল্য আড়াই টাকা।

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু রায় প্রণীত "স্বায়ত্ত শাসনের ইতিহাস" প্রকাশিত হইল, মূল্য ২৲

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত নূতন উপন্যাস "শ্রী" প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৷০

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CAL[illegible]

নিয়মসেবা

Emerald Ptg. Works.

Blocks by—BHARATVARSHA HALFTONE WORKS.

অগ্রহায়ণ, ১৩২৮

প্রথম খণ্ড] নবম বর্ষ [ষষ্ঠ সংখ্যা

কারখানা ও গৃহশিল্প

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ]

এক সময় ছিল, যখন দেশে অধিক সংখ্যক কলকারখানার প্রতিষ্ঠাই জাতীয় উন্নতির প্রধান উপায় বলিয়া বিবেচিত হইত। আমরা দেখিতাম যে, পাশ্চাত্য জাতি সকল ঐশ্বর্য্যে ও ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ,—তাহাদের দেশের অসংখ্য কলকারখানা তাহাদের ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার কারণ। ইহা দেখিয়া আমরা কলকারখানা সম্বন্ধে অতিশয় উচ্চ ধারণা পোষণ করিতাম। কিন্তু ক্রমশঃ কারখানার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইবার ফলে, ইহার দুই-একটি করিয়া দোষ আমাদের চক্ষে পড়িতে লাগিল। আমাদের দেশের কেহ-কেহ বিদেশে গিয়া দেখিয়া আসিলেন—সেখানকার শ্রমজীবীরা কিরূপ জীবন যাপন করে, তাহাদের মনের ভাব কি, মনের গতি কোন্ দিকে; ডিকেন্স, রস্কিন, টলষ্টয় প্রভৃতি চিন্তাশীল পাশ্চাত্য লেখকগণ কারখানার বিরুদ্ধে যে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। আমাদের দেশেও একটি দুইটি করিয়া কারখানা স্থাপিত হইল—আমরা স্বচক্ষে তাহার ফলাফল দেখিতে পাইলাম। এক্ষণে অনেকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে দেশে বহুসংখ্যক কারখানা স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয় কি না। সন্দেহ হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রশ্নের এখনও মীমাংসা হয় নাই। বোধ করি, পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রাপ্ত অধিকাংশ লোকের এখনও বিশ্বাস যে, মোটের উপর

কলকারখানার কুফল অপেক্ষা সুফল বেশী; এবং তাঁহারা মনে করেন যে, দেশে বহুসংখ্যক কলকারখানা স্থাপিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন, কল-কারখানার সাহায্য ব্যতীত আমাদের জীবন যাপন করাই অসম্ভব। আমরা প্রতিনিয়ত যে-সকল দ্রব্য ব্যবহার করি, তাহার মধ্যে অধিকাংশ দ্রব্য কলে প্রস্তুত হইয়া আসে বলিয়া, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা হইয়া থাকে। আমরা ভুলিয়া যাই যে, আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে নানা অপ্রয়োজনীয় বিলাসের উপকরণ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সেই সকল অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বাদ দিলে, অধিকাংশ প্রয়োজনীয় দ্রব্যই কলের সাহায্য ব্যতীত প্রস্তুত হইতে পারে। ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে বোধ হয় আমাদের দেশে কলে প্রস্তুত কোন দ্রব্যের ব্যবহারই ছিল না। তাহার পূর্ব্বে সহস্র-সহস্র বৎসর আমরা কলের সাহায্য ব্যতীত জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছি; এবং সে জীবন যে হেয় বা নীরস ছিল, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। যখন ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, জয়দেব, চণ্ডীদাস গান গাহিয়াছিলেন, তখনকার জীবন হেয় হইতে পারে না। যখন মহাবীর, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, নানক, চৈতন্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তখনকার জীবন হেয় হইতে পারে না। যখন সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও লীলাবতী রচিত হইয়াছিল, কোনারক ও ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, অজন্তা গুহায় চিত্রাবলি অঙ্কিত হইয়াছিল, তখনকার জীবন হেয় জীবন হইতে পারে না। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতা আবদ্ধ ছিল,—দেশের সাধারণ লোক পশুবৎ জীবন যাপন করিত, ইহা কদাপি বিশ্বাস করা যায় না। তুলসী দাসের দোঁহা ও রামপ্রসাদের গান দেশের সাধারণ লোকেরই সম্পত্তি; চৈতন্যদেব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া দেশের সাধারণ লোকদিগকেই উন্মত্ত করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার মন্দির এবং অজন্তার চিত্রাবলি দেশের সাধারণ শিল্পীদেরই কীর্ত্তি। জন-সাধারণ অসভ্য হইলে, তাহাদের মধ্য হইতে এত সাধু ও ধর্ম্ম-প্রচারক আবির্ভূত হইতে পারিতেন না।

তবে এ কথা অবশ্য বলা যায় যে, এতদিন আমাদের দেশে কল-কারখানা ছিল না বলিয়া, কখনও যে কল-কারখানার প্রচলন করা উচিত নহে, ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। কলকারখানার প্রচলন করিলে যদি সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়, তাহা হইলে তাহা কর্ত্তব্য; আমাদের দেশে কখনও কলকারখানা ছিল না, এ আপত্তি সে ক্ষেত্রে মঞ্জুর হইবে না। পক্ষান্তরে, যদি উহা সমাজের কল্যাণকর না হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশে উহা করা উচিত হইবে না,—সকল সভ্য দেশে উহার প্রচলন থাকা সত্ত্বেও নয়।

কারখানায় অধিকতর দ্রুত ভাবে বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইতে পারে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কারখানার সহিত কতকগুলি অনিষ্ট জড়িত আছে;—তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কারখানায় কাজ করা অপেক্ষা ঘরে কাজ করা নানা রকমে বাঞ্ছনীয়। কারখানায় পরের ভৃত্য হইয়া কাজ করিতে হয়—গৃহে তাহা হয় না। কারখানায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইতে হইবে,—নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত থাকিতে হইবে। হয় ত শ্রমজীবীর শরীর কিছু অসুস্থ আছে; তাহা সত্ত্বেও তাহাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে কারখানায় উপস্থিত হইতে হইবে,—একটু দেরী করিলে চলিবে না। তাহা হইলে, সে যে সারাদিন কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিবে না! হয় ত শ্রমজীবীর গৃহে কাহারও অসুখ হইয়াছে; তাহাকে দেখিবার আর কেহ নাই। এ ক্ষেত্রে, হয় তাহার পীড়িত আত্মীয়কে অসহায় ভাবে গৃহে ফেলিয়া রাখিয়া, তাহাকে কারখানায় যাইতে হইবে; নচেৎ সমস্ত দিবস কিছু উপার্জ্জন না করিয়া, তাহাকে বাড়ীতে থাকিতে হইবে। তাহা হইলে, তাহার চলিবে কি করিয়া? কারখানায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ে কাজ করিতে গেলে, বাড়ীতে ছেলেদের দেখিবার কেহ থাকে না। কারখানায় অবিশ্রাম দীর্ঘকাল ধরিয়া কাজ করিতে হয়; তাহাতে শরীর ও মন উভয়ই অবসন্ন হইয়া যায়। কারখানার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আলো ও বাতাস আসিতে পারে না; সর্ব্বদা প্রবল শব্দ হয়; ধূলা, কয়লার গুঁড়া, তূলার আঁশ প্রভৃতি বায়ুর সহিত ফুসফুসে প্রবেশ করে;—এই সকল কারণে কারখানাতে কাজ করা অস্বাস্থ্যকর। কারখানায় বহুসংখ্যক মজুরকে অপরিসর স্থানের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাজ করিতে হয়। তাহারা বাধ্য হইয়া যে সকল ঘরে থাকে, সেগুলি এত অন্ধকার, সঙ্কীর্ণ, স্যাঁৎ-স্যেঁতে,—তথায় গতিশীল বায়ু এত কম যে, সেখানে কিছুদিন বাস করিলে স্বাস্থ্যহানি হয়;—শিশুদের পক্ষে ইহা বিশেষ ভাবে অনিষ্টকর। অর্থ লোভে অল্পবয়স্ক বালক-

বালিকা এবং আসন্ন-প্রসবা বা সদ্যঃ প্রসূতি স্ত্রীলোক কারখানায় কাজ করিয়া শরীর নষ্ট করে।

পাশ্চাত্যদেশে যখন কারখানার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়, তখন এই সকল অনিষ্ট অতি ভীষণ ভাবে দেখা দিয়াছিল। কয়েকটি পরোপকারী ব্যক্তির অক্লান্ত চেষ্টায় আজকাল অবস্থার কিছু পরিমাণে উন্নতি হইয়াছে। কারখানাগুলি আজকাল এ ভাবে নির্ম্মিত হয়, যাহাতে তাহাদের মধ্যে কিয়ৎ-পরিমাণে আলোক প্রবেশ করিতে, ও বাতাসের চলাচল হইতে পারে। কলের ঘূর্ণায়মান চাকা প্রভৃতিতে মজুরদের গায়েতে আঘাত না লাগে, তাহার বন্দোবস্ত হইয়াছে। আইন করিয়া শিশু এবং আসন্ন-প্রসবা প্রভৃতির কাজ করা বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ অনিষ্ট কমান হইয়াছে মাত্র, একেবারে উঠাইতে পারা যায় নাই। কতকগুলি অনিষ্ট আছে, যাহার কোন প্রতিকার নাই। গৃহে অনুপস্থিত থাকিলে শিশুদের যত্ন হয় না, পীড়িত আত্মীয়ের শুশ্রূষা হয় না—আইন করিয়া এ অনিষ্ট রোধ করা যায় না। বাড়ীতে বসিয়া কাজ করিতে পারিলে কত সুবিধা। ছেলে-মেয়েদিগকে সর্ব্বদা চক্ষের উপর রাখিয়া কাজ করা যায়; পীড়িতকে সময়মত ঔষধ ও পথ্য দেওয়া যায়; ক্লান্ত হইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলে, কেহ তাড়না করিবে বলিয়া ভয় নাই; কিছুক্ষণ অন্য গৃহ-কার্য্য করিয়া, চিত্ত-বিনোদন করিবার উপায় আছে; মনিবের সম্মুখে বসিয়া কাজ করিতে হইতেছে—ইহা মনে করিয়া সর্ব্বদা সশঙ্কিত চিত্তে থাকিতে হয় না।

কারখানায় আর একটি অনিষ্ট সাধিত হয়। কারখানা স্থাপিত হইবার ফলে, প্রথমে মজুরদের মধ্যে, পরে দেশে সাধারণ ভাবে, দুর্নীতির বৃদ্ধি হয়। নানা কারণে কারখানার মজুরদের মধ্যে দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়। প্রধান কারণ এই যে, তাহারা সাধারণতঃ দেশে পরিবারদিগকে রাখিয়া, অপরিচিত স্থানে কাজ করিতে যায়;—নানারূপ প্রলোভনে পড়িয়া তাহাদের চরিত্র নষ্ট হয়। পরিবার সঙ্গে থাকিলে, লোকের চরিত্র নষ্ট হইবার সম্ভাবনা কম থাকে। তাহার উপর, দেশে গুরুজন, আত্মীয়-স্বজনের প্রভাবে এবং সাধারণ সুনামের খাতিরে, অসৎপথে চলিবার প্রবৃত্তি সংযত হইয়া থাকে। মজুরেরা যখন বিদেশে কাজ করিতে যায়, তখন এ সকল উপরওয়ালা থাকে না। তাহারা কাজে অনেক নগদ পয়সা পায়। নগরে প্রলোভনের অভাব থাকে না। সহজেই দুশ্চরিত্র সঙ্গী জুটে। সারাদিন পরিশ্রম করিয়া, যখন সন্ধ্যা-বেলা তাহাদের চিত্ত অবসন্ন হয়, তখন তাহারা উত্তেজক আমোদ-প্রমোদের জন্য লালায়িত হয়। শৌণ্ডিকালয় ও গণিকালয় এইরূপ আমোদ যোগাইয়া থাকে। ইহাতে শুধু যে তাহাদের সর্ব্বনাশ হয়, তাহা নহে;—তাহাদের শরীরে নানা কুৎসিত ব্যাধি আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহা তাহাদের সন্তানের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া পল্লী-জীবন দূষিত করে। যে সকল শ্রমজীবী কর্ম্মস্থলে তাহাদের পরিবার লইয়া যায়, তাহাদের অবস্থাও বিপজ্জনক। তাহারা যেখানে বাস করে, সেখানে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুব কম। সাধারণতঃ একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর পাশাপাশি কামরাতে বিভিন্ন শ্রমজীবী বাস করে। এক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদিগকে দুশ্চরিত্র ব্যক্তির সংসর্গ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া রাখা সম্ভবপর হয় না। মহামতি এণ্ডরুজ সাহেব ফিজি প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় শ্রমজীবীদের অবস্থা উত্তম রূপে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, সে সকল স্থানে ভারতীয় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম বলিয়া, এবং ধর্ম্ম ও সমাজের বন্ধন অতিশয় শিথিল বলিয়া, ভারতীয় স্ত্রীলোকের চরিত্র অনেক সময় বড় খারাপ হইয়া গিয়াছে। স্বদেশে যেখানে স্বামী-স্ত্রী একত্র থাকিতে পায়, এবং সামাজিক বন্ধন মানুষকে অসৎ পথে চলিতে বাধা দেয়, সেখানে যে সকল দরিদ্র ব্যক্তি তাহাদের চরিত্র পবিত্র রাখিয়া জীবন যাপন করিতে পারিত, বিদেশে অস্বাভাবিক প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া, তাহারা অনেকেই দুশ্চরিত্র হইয়া পড়ে। মহামতি এণ্ডরুজ শুদ্ধ বিদেশেই যে এইরূপ চরিত্রের অবনতি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা নহে। ভারতবর্ষেও যেখানে কারখানায় কাজ করিতে বহুসংখ্যক শ্রমজীবী একত্র হইয়াছে, সেখানেও তিনি ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি Young Men of India নামক পত্রে এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহা হইতে কিছু-কিছু তুলিয়া দিতেছি। এণ্ডরুজ সাহেব লিখিয়াছেন,—

It has been my duty in recent years to make a very careful investigation into the new industrial life of India at the different

centres,—both in the great Indian cities and the smaller Indian townships, where growth of population has been rapid. I have also been called upon to investigate conditions of labour, under indenture, among those who were sent abroad from India to Fiji, Ceylon, Malaya, South Africa and other places.

The facts and figures presented by these investigations have been so startling, as a revelation of festering moral evil, that for a long time I hardly dared to credit them or to give them full publicity. But they have now been proved by independent enquiries to be true and the time has come to state them clearly.

The truth is that the old domestic morality of Indian agricultural life is breaking down in every direction, wherever close contact with the larger city life and even with the smaller townships, owing to new industrial conditions have occurred.

ইহা যেন কেহ না মনে করেন যে, ভারতবাসীর প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা হেতু ভারতবর্ষেই এইরূপ হইতেছে। এজন্য মহামতি এণ্ড্রুজ ইহা লেখাও প্রয়োজন মনে করিয়াছেন যে, বিলাতে যখন প্রথম কল-কারখানা স্থাপিত হয়, তখন সেখানকার শ্রমজীবীদের মধ্যে দুর্নীতি খুব বাড়িয়া গিয়াছিল,—এখন পর্য্যন্তও সে দোষ অন্তর্হিত হয় নাই। তিনি লিখিয়াছেন,—

I wish it to be clearly understood that it is a worldwide phenomenon. It is not confined to India only.…Let me give a brief statement by a contemporary writer of the conditions which prevailed a century ago during the industrial revolution in England itself....

"The physical status of the families of the manufacturing classes in England was reduced to the lowest point by the rapid industrial change. The moral conditions were even worse. Children of tender age were reduced to physical wrecks. Young girls were ruined before they reached the age of thirteen or fourteen. Family life became impossible. The barracks in which the labourers lived reeked in immorality."

Here in bare, cold, naked details we have a picture of a sudden moral blight sweeping over England from which she has never really recovered. The figures about venereal disease in England which have recently been published show the truth of this conclusion.

সর্ব্বত্রই প্রথমে কুফল বেশী হয়। পরে যখন প্রতিকারের চেষ্টা হইতে থাকে, তখন কুফল কিছু কমিয়া থাকে; কিন্তু উহার সম্পূর্ণ বিলোপ কখনও হয় না। গৃহ-শিল্প অপেক্ষা কারখানার জীবন নৈতিক অবনতির সহায়ক, ইহা স্থির কথা।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কারখানাতে সুলভে দ্রব্য প্রস্তুত হয় এবং শ্রমজীবীরা অধিক উপার্জ্জন করে, ইহা স্বীকার করিলেও, কারখানার বিরুদ্ধে অনেকগুলি প্রবল আপত্তি আছে। গৃহ-শিল্পে পারিবারিক জীবনের উপযোগী এমন অনেকগুলি সুবিধা আছে, অর্থ দিয়া যাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করা যায় না। শ্রমজীবীরা যে বেশী উপার্জ্জন করে, তাহার অনেকাংশ শৌণ্ডিকালয় এবং গণিকালয়ে অপব্যয়িত হইয়া থাকে;—গৃহে পরিবারবর্গের অবস্থা উপার্জ্জনের আধিক্য অনুযায়ী উন্নত হয় না। আর যদি শ্রমজীবীদের চরিত্রই নষ্ট হইল, তাহা হইলে বেশী অর্থাগম হইয়া কি হইবে? মহামতি এণ্ড্রুজ যথার্থই বলিয়াছেন,—

People talk glibly about the coming industrial expansion in India. Do they realize at what a cost that expansion is already being carried out in many of our great cities? They tell us that by this means India will become prosperous. Have they

never heard the words, ringing in their ears,—

"What shall it profit a man, if he gain the whole world and lose his own soul, or what shall a man give in exchange for his soul?"

কারখানার জীবন এরূপ অস্বাভাবিক ও দুর্নীতি-পরায়ণ, এবং গ্রামের জীবন এত সরল ও পবিত্র যে, কারখানায় গিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করা অপেক্ষা, গ্রামে যদি কোন রূপে গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যায়, তাহাই বাঞ্ছনীয়। গ্রামে থাকিয়া গৃহ-শিল্পের সাহায্যে যে গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যায়, তাহার প্রমাণ,—ভারতে সহস্র-সহস্র বৎসর এইরূপ হইয়া আসিয়াছে।

কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রথমতঃ জীবিকার অভাবে শ্রমজীবীরা অত্যন্ত কষ্ট পায়। কলে সস্তায় দ্রব্য প্রস্তুত হয়; যাহারা পূর্ব্বের ন্যায় ঘরে খাটিয়া ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করে, তাহাদের খরচ বেশী পড়ে; কাজেই তাহাদের দ্রব্য বিক্রীত হয় না। অথচ সকলেই যে কলে কাজ করিবে—প্রথম-প্রথম এত বেশী কল প্রতিষ্ঠিত হয় না; অনেকে ঘর ছাড়িয়া বিদেশে গিয়া কলে কাজ করিতে ইচ্ছুক হয় না। এই ভাবে গৃহ-শিল্প বিনষ্ট হয়; এবং শ্রমজীবীদের কষ্ট হয়। বিলাতে প্রথমে এই লইয়া খুব দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়াছিল। যে সকল শ্রমজীবীর জীবিকা নষ্ট হইত, তাহারা দল বাঁধিয়া কল-কারখানা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিত। বহুসংখ্যক কল স্থাপিত হইবার পর, ক্রমশঃ অধিকাংশ শ্রমজীবী কলে কাজ পায় বটে; (১) কিন্তু এত অধিক পরিমাণে বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয় যে, দেশে তত দ্রব্যের প্রয়োজন হয় না। তখন ঐ সকল দ্রব্য বিদেশে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করা হয়। যে সকল দেশে কল স্থাপিত হয় নাই, সেই সকল দেশে কলজাত দ্রব্য বিক্রয় করা হয়। তখন ঐ দেশের গৃহশিল্প নষ্ট হয়,— শ্রমজীবীরা কাজ পায় না,—দেশ দরিদ্র হইয়া পড়ে। কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইলেই, এই ভাবে দুর্ব্বল জাতির উপর অত্যাচার অপরিহার্য্য। এমন কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না যে, কলকারখানা হইতে উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে বিক্রয় না করিয়া, নিজেদের দেশেই ব্যবহার করিয়া, দেশের উন্নতি হইয়াছে। ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মেণি, যুক্তরাজ্য, জাপান এই ভাবে কলের দ্রব্য বিদেশে বিক্রয় করিয়া বড়লোক হইবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহাতে যে বিদেশের সর্ব্বনাশ হয়, এই চিন্তায় কেহ কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই। অতএব যদি একটি দেশে বহুসংখ্যক কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে সেই দেশ বড়লোক হইতে পারে; কিন্তু অন্য কোন দেশ দরিদ্র হইয়া পড়িবেই। প্রত্যুত, যদি সব দেশে বহুসংখ্যক কল-কারখানা স্থাপিত হয়, তাহা হইলে কেহ বিদেশে দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবেন না; এবং কল-কারখানার মালিকগণ লাভবান্ হইতে পারিবেন না। ইহার ফলে, কলকারখানার সংখ্যা কমিয়া যাইবে, এবং দেশের সকল শ্রমজীবী কাজ পাইবে না। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, দেশের সমস্ত শ্রমজীবী যাহাতে কাজ পায়, এরূপ সামাজিক ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

কারখানার প্রতিষ্ঠা হইবার আর একটা কুফল, দেশ বিলাসী এবং অলস হইয়া পড়ে। মানুষের যাহা প্রকৃত বাহ্য অভাব, তাহা খুব বেশী নহে। ইংরেজ কবি Goldsmith গাহিয়াছেন,

Man wants but little here below
Nor wants that little long.

দেশের সব লোক যথেষ্ট পরিশ্রম করিলে, কলের সাহায্য ব্যতীতও দেশের সকল অভাব মোচন হইতে পারে। দেশে যখন বহুসংখ্যক কল প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং দেশের অধিকাংশ শ্রমজীবী যখন কলে খাটিতে আরম্ভ করে, তখন দেশের প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। অল্প শ্রমে এত বেশী দ্রব্য উৎপন্ন হইবার ফলে, লোক অভাবাতিরিক্ত দ্রব্য ব্যবহার করে;—করিয়া বিলাসী হইয়া পড়ে।

(১) ইংলণ্ডে বহুসংখ্যক কলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বটে, কিন্তু এই উপায়েই যে সমস্ত শ্রমজীবী জীবিকা পাইয়াছে তাহা নহে। বহুসংখ্যক শ্রমজীবী আমেরিকা, West India প্রভৃতি দেশে গিয়া বসবাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহাতে বিলাতের পল্লীগুলি শ্রীহীন হইয়াছিল; Deserted Village এ কবি তজ্জন্য আক্ষেপ করিয়াছিলেন। আমাদের দেশেও গৃহশিল্প নষ্ট হওয়াতে, অনেক দরিদ্র শ্রমজীবীকে বিদেশে যাইতে হইয়াছিল; এবং সেখানে তাহাদের যৎপরোনাস্তি দুর্গতি হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, সকল দেশে সর্ব্বদা এইরূপ বিদেশে গিয়া অর্থ উপার্জ্জন [illegible]

কলকারখানা হইবার পূর্ব্বে বিলাসিতা ছিল বটে, কিন্তু তখন বিলাসিতা অল্প-সংখ্যক ধনী লোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকিত; কারণ বিলাস-দ্রব্য তখন বহুমূল্য ছিল। এক্ষণে বিলাসের দ্রব্য সুলভ হওয়ায়, দেশের বহু লোক বিলাসী হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা সামান্য পরিচ্ছদে দেহ আচ্ছাদন করিত এবং শীত নিবারণ করিত, তাহারা এক্ষণে অধিক পরিমাণে বস্ত্র ব্যবহার করে। কারণ, এখন দেহ আবরণ ও শীত নিবারণ বস্ত্রের গৌণ উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছে;—বিলাস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াছে।(২) বিলাস-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে লোকে বহুসংখ্যক বস্ত্র ব্যবহার করে; বারবার বেশ পরিবর্ত্তন করে। বস্ত্র ব্যতীত অপর সকল বিষয়েও বিলাস প্রবেশ করে। সৌখীন গন্ধ, সাবান, গৃহসজ্জা—এই সকল বিষয়েই বিলাস পরিস্ফুট হয়।

কলকারখানার ফলে আমরা কতক পরিমাণে অলস, ও ইন্দ্রিয় চালনে অপটু হইয়া পড়ি। আমাদের যে বাহ্য অভাবগুলি স্বাভাবিক, সেগুলির মোচন করিতে হইলে, আমাদিগকে কিছু পরিশ্রম করিতে হয়।—তাহা শরীর ও মন উভয়ের পক্ষেই হিতকর। কাঠ কাটা, জল তোলা, জমি খোঁড়া—এ সকল স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। এ সকল অভাব কলের সাহায্যে পূরণ হইলে, আমাদের শরীর অবশ হইয়া পড়ে। শ্রমাভাবে আমাদের শরীর নষ্ট হয়। টেনিস, বিলিয়ার্ড প্রভৃতি বিলাসী খেলার সাহায্যে আমরা অঙ্গ-চালনার চেষ্টা করি। তাহাতে উপযুক্ত ব্যায়াম হয় না; এবং তাহাতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। স্ত্রীলোকেরাও পূর্ব্বে সকল গৃহকার্য্য করিত; এবং অবসরের মধ্যে চরকা কাটিত। এক্ষণে সাজসজ্জায় অনেক সময় অতিবাহিত হয়।

কলকারখানার আর একটি অনিষ্ট এই যে, ইহা জীবনের শান্তি বিনষ্ট করে। সকল দেশেই যে একটা প্রাচীন আদর্শ ছিল, Plain living and high thinking, আজকাল সে সকল আদর্শ ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সামাজিক জীবন দুই বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইতে পারে। একটী ধারা,—আহার বিহার প্রভৃতি বিষয়ে অল্পে সন্তুষ্ট থাকিয়া, জীবনের অধিকাংশ চেষ্টা আধ্যাত্মিক উন্নতিতে প্রয়োগ করা। দ্বিতীয় ধারা,—জীবনের অধিকাংশ চেষ্টা আহার-বিহার ও বিলাস-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য প্রয়োগ করা। গৃহ-শিল্প পূর্ব্বোক্ত জীবনের সহায়ক; কলকারখানা শেষোক্ত জীবনের আনুষঙ্গিক। গৃহশিল্পে নিযুক্ত থাকিলেও, মনকে মুক্ত রাখিতে পারা যায়। চরকা কাটিতে-কাটিতে, ঘরে বসিয়া তাঁত চালাইতে-চালাইতে, ঈশ্বর বিষয়ক গান গাওয়া যায়; ভিখারীর ধর্ম্মসঙ্গীত শোনা যায়;—সাধারণতঃ মনকে উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে সর্ব্বদা তুলিয়া রাখা যায়। কিন্তু কারখানায় সর্ব্বদা প্রবল কর্কশ শব্দ ও ব্যস্ততার মধ্যে, মনকে উচ্চ ধর্ম্মজগতে তুলিয়া নির্লিপ্ত রাখা খুব কঠিন,—প্রায় অসম্ভব। প্রাচীন ভারতে সাধারণ লোকদের মধ্যে ধর্ম্ম-ভাবের সর্ব্বদা যেরূপ চর্চ্চা হইত, দেশের অধিকাংশ শ্রমজীবী যদি কারখানায় কাজ করে, তাহা হইলে সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে।

কারখানা হইতে রাশি-রাশি দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া আসি-তেছে;—সহস্র-সহস্র লোকে মিলিয়া তাহা রেলে, জাহাজে, মোটর-লরিতে তুলিয়া দেশবিদেশে পাঠাইয়া দিতেছে। সওদাগরেরা নানা জটিল হিসাব রাখিতেছে; বাজারে অমুক জিনিষের দর কমিবে না বাড়িবে, এই লইয়া সহস্র লোকে বাজি রাখিতেছে;—এবং চিন্তা ও আশঙ্কায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বাজার-দরের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে;—এইরূপ একটা কৃত্রিম কারণে মনের শান্তি বিনষ্ট হয়। লোকে জীবিকার সন্ধানে, বা বড়লোক হইবার আশায়, গ্রাম ছাড়িয়া নগরে বাস করিতে আরম্ভ করে। সেখানে দিনরাত্রি ব্যস্ততা ও কোলাহল;—অসংখ্য ট্রাম, মোটর-কার, ঘোড়ার গাড়ী অনবরত ছুটিতেছে;—লোকে ছুটাছুটি করিয়া ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণে উঠিতেছে;—আফিসের সময় তাড়াতাড়ি আফিস যাইতেছে। লোকের এক মুহূর্ত্ত অবসর নাই যে, ধর্ম্মচিন্তা করে, বা দুইটা সৎ কথা শোনে। সর্ব্বদা কোলাহল, ব্যস্ততা;—রাজপথ ধূলি-সমাচ্ছন্ন, আকাশ ধূম-মলিন। বর্ত্তমান সভ্যতার এই শান্তিহীনতা লক্ষ্য করিয়া, একজন ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন,—

"I see it not so much as a fascinating kaleidoscope as a great and complicated machine that is grinding, grinding, grinding

(২) তাই যখন দেশ বিলাতী বস্ত্রে ছাইয়া গিয়াছিল, তখন কোন ছিটের জামা করিবে, কোন পাড় পছন্দ করিবে—লোকে ইহাই স্থির করিতে পারিত না।

the bodies and souls of the people who made it and cannot now control it." And as I spoke, I gazed down upon the moving masses of people, the scurring motors, the long lines of trams, the palatial hotels here, the sordid warehouses there. * * I too felt that I was in the grip of some horrible machine that was whirling round and round in a vicious circle, grinding youth and beauty, hope and happiness.

এবং ইহার সহিত সরল গ্রাম্য জীবনের তুলনা করুন। কৃষক চাষ করিতে-করিতে গান গাহিতেছে—

মন তুমি কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জনম রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোণা।

মাঝি সুর ধরিয়াছে,—

মন-মাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারি না।

কলু গান ধরিয়াছে—

মা আমার ঘুরাবি কত
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত।

প্রাচীন গ্রাম্য জীবন যদি সুখের না হইত, তাহা হইলে "বার মাসে তের পার্ব্বণ" হইতে পারিত না,—পার্ব্বণে-পার্ব্বণে আনন্দ সুখের স্রোত বহিত না। এখনও পল্লীতে, এবং যে সকল নগরে 'সভ্যতা'র বিষ প্রবেশ করে নাই, সেই সকল নগরে হরি-সংকীর্ত্তন, চব্বিশ প্রহর কথকতা, বারোয়ারির পূজা হইয়া থাকে। দেশ সম্পূর্ণ সভ্য হইলে সব উঠিয়া যাইবে।

মোট কথা, আমরা কি চাহি, সেটা স্থির করিতে হইবে; এবং সেই মত উদ্যোগ করিতে হইবে। আমরা কি চাহি বিলাস বেশভূষা, গৃহসজ্জা, থিয়েটার, বায়স্কোপ, মোটরকার, নিত্য নূতন বিলাসের উপকরণ? তাহা হইলে অনেক কলকারখানার প্রতিষ্ঠা করিয়া সেইরকম উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে;—শান্তি-সুখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে হইবে; —তাহার জন্য আক্ষেপ করিলে চলিবে না। আর যদি শান্তি ও আধ্যাত্মিকতা জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে মোটা বস্ত্র ও পর্ণ-কুটীরে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে; বিলাস-বৈচিত্র্যহীন পল্লী-জীবনে অভ্যস্ত হইতে হইবে। বিলাসীও হইব, শান্তিপূর্ণ ধর্ম্মময় জীবনও যাপন করিব—দুই রকম এক সঙ্গে সম্ভব হইবে না।

বাস্তবিক, কল-কারখানাগুলি অস্বাভাবিক উপায়ে ধন-বৃদ্ধির উপায় বলিয়া মনে হয়। একখণ্ড বস্ত্র উৎপাদন করিতে যে পরিমাণে পরিশ্রম ও সময় লাগা প্রকৃতির অভিপ্রেত, তদপেক্ষা অল্প সময়ে ও পরিশ্রমে বস্ত্র প্রস্তুত করাই কারখানার উদ্দেশ্য। ফুকা দিয়া দুধ দুহিলে গরু বেশী দুধ দেয় বটে, কিন্তু তাহার শরীর নষ্ট হইয়া যায়। সেইরূপ, কারখানার সাহায্যে বেশী পরিমাণে দ্রব্য উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু ইহাতে সমাজ দূষিত হইয়া পড়ে। কল-কারখানার অংশগুলি একটী বৃহৎ দানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলিয়া বোধ হয়; —কলের শব্দ তাহার কর্কশ স্বর, কলের ধূম তাহার দূষিত নিঃশ্বাস। ইহা আকাশের বায়ু দূষিত করে, সমাজের নীতি দূষিত করে, পল্লীর সৌন্দর্য্য বিনষ্ট করে। শ্রমজীবিগণকে ক্রীতদাস করিয়া ফেলে; কারণ, শ্রমজীবিগণকে বাধ্য হইয়া ইহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হয়।

রেলগাড়ী, মোটর-কার ও ছাপাখানায় সমাজের বেশী হিত সাধন করিয়াছে, না অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। শোনা যায়, রেল গাড়ী ও মোটর-কারে ব্যবধানকে বিনষ্ট করিয়াছে (They have annihilated distance)। কিন্তু যেখানে ভগবান্ স্বয়ং কিছু ব্যবধান রাখিয়া দিয়াছেন, সেখানে সব ব্যবধান বিনাশ করিলে ফল যে শুভ হইবে, তাহা সন্দেহের বিষয়। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, রেলগাড়ী প্রভৃতিতে অভাব-ক্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট সাহায্য যতটুকু পৌঁছিয়াছে, তাহাপেক্ষা বেশী পরিমাণে দুঃখীর শ্রমজাত খাদ্য লইয়া গিয়া, তাহার দুঃখ বাড়াইয়াছে;—অত্যাচারীকে দুর্ব্বলের নিকট যাইবার সুবিধা দিয়াছে;—আত্মীয়-স্বজনের মিলন অপেক্ষা বিচ্ছেদ বেশী করিয়াছে। বিদেশে কলের প্রস্তুত সুলভ দ্রব্য আমাদের শ্রমজীবীর জীবিকার উপায় নষ্ট করিতে পারিত না, যদি রেল সেগুলি শীঘ্র ও সুলভে সর্ব্বত্র বহন করিয়া না আনিত। দেশে বুভুক্ষু লক্ষ-লক্ষ ব্যক্তি থাকিতেও দেশের অন্ন বিদেশে চালান যাইত না, যদি রেলে

তাহা বহিবার সুবিধা করিয়া না দিত। (৩) কলের উন্নতির সহিত চরিত্রের অবনতি কিরূপ পদে-পদে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা একটা দৃষ্টান্ত হইতে বোঝা যাইবে। কল হিসাবে গরুর গাড়ী অপেক্ষা ঘোড়ার গাড়ী উন্নত, ঘোড়ার গাড়ী হইতে মোটরকার উন্নত। আবার গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান অপেক্ষা ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানের চরিত্র নিকৃষ্টতর; আবার ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান অপেক্ষা ট্যাক্সির শফার আরও নিকৃষ্টতর। ছাপাখানাতে গ্রন্থের বহুল প্রচারের সুবিধা হইয়াছে; কিন্তু মোটের উপর সমাজের ইষ্টকর গ্রন্থ অপেক্ষা অনিষ্টকর গ্রন্থের বেশী প্রচার হইয়াছে; কারণ, সাধারণতঃ যে গ্রন্থ বেশী প্রিয় তাহা হিতকর নহে। বায়স্কোপ, উপন্যাস, থিয়েটার প্রভৃতি হইতে ক্রমাগত উত্তেজনাকর উপাদান পাইবার জন্য লোকে সাধারণতঃ উদ্‌গ্রীব হয়। কিন্তু এই ভাবে ক্রমাগত উত্তেজনার ফলে চরিত্রবল কমিয়া যায়।

অনেকে এই কথা বলেন যে, কারখানা হইতে গৃহ-শিল্প ভাল; কিন্তু বৈদ্যুতিক কলের সাহায্যে গৃহ শিল্পকে অধিক কার্য্যকর করিতে হইবে, যাহাতে গৃহ-শিল্প কারখানার প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারে। গৃহ-শিল্পকে কিয়ৎ পরিমাণে অধিকতর কার্য্যকর করিলে ক্ষতি নাই; কিন্তু এটাকে যে কারখানার তুল্য ক্ষিপ্র করিতে হইবে, ইহা মনে করা ভুল। কারণ, আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, কারখানাতে অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতার সহিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়; তাহা সমাজের পক্ষে হিতকর নহে।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে, গৃহশিল্প কলের প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে না পারিলে টিকিবে কি করিয়া? অন্য সকল দেশে কারখানা চলিতেছে,—আমরা মন্থরগামী গৃহশিল্প লইয়া বাঁচিব কি করিয়া? যাঁহারা এ প্রশ্ন করেন, তাঁহারা মানবের শক্তি সম্বন্ধে অতি হেয় ধারণা পোষণ করেন। তাঁহারা মনে করেন যে, যাহা সুলভ, মানুষ তাহা কিনিবেই; কারণ, অল্প খরচ করিতে সকলেরই ভাল লাগে। কিন্তু যাহা ভাল লাগে, তাহা যদি কল্যাণকর না হয়,—যাহা "প্রেয়" তাহা যদি "শ্রেয়" না হয়,—তাহা হইলে প্রেয়কে ত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে বরণ করিবার ক্ষমতা মানবের নিশ্চয় আছে। মদ খাইতে ভাল লাগে,—তথাপি অধিকাংশ লোক মদ খায় না কেন? কারণ, উহা কল্যাণকর নহে। সেই ভাবে, যদি দেশের লোক বুঝিতে পারে যে, কারখানা দেশের কল্যাণকর নহে, তাহা হইলে লোকে কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্য ব্যবহার না করিয়া, গৃহশিল্পজাত দ্রব্য নিশ্চয় ব্যবহার করিবে। সুলভ দ্রব্য ক্রয় করিবার প্রবৃত্তি দমন করা কঠিন। কিন্তু সব ভাল জিনিষই কঠিন। কঠিন বলিয়া পিছাইলে চলিবে না। আমার মনে যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, কল অপেক্ষা গৃহশিল্প সমাজের কল্যাণকর,—আমি বেশী খরচ করিয়াও—বা বেশী কষ্ট করিয়াও—গৃহশিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহার করিব। তুমি এইরূপ বুঝিলে, তুমিও এইরূপ করিবে। একটা জাতি যদি বুঝে—যদি কোন মহাপুরুষ দেশের সব লোককে ঠিক মত বুঝাইতে পারেন—তাহা হইলে সমস্ত জাতি গৃহশিল্প ব্যবহার করিবে।

এইরূপ একটা কাজে সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি সমস্ত জাতিকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, কলে প্রস্তুত বস্ত্র ব্যবহার না করিয়া, চরকার সূতার কাপড় ব্যবহার করা উচিত। ইহাতে বিলাস ছাড়িতে হইবে, কষ্টসহিষ্ণু হইতে হইবে, উদ্যোগী হইতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী বস্ত্রের কথা বলিয়াছেন; কারণ, বস্ত্র এমন একটি কলে-প্রস্তুত দ্রব্য, যাহা সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। এবং একজন লোক যেরূপ বেশ পরিধান করিয়াছে, তাহা হইতে তাহার মনের ভাব বেশ বোঝা যায়;—সে বিলাস ও বাহ্য আড়ম্বর ভাল বাসে কি না, তাহা তাহার বেশ হইতে বেশ বোঝা যায়। মহাত্মা গান্ধী যদি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হন, তাহা হইলে সমস্ত জাতির বিলাসোন্মুখ প্রবৃত্তিকে ফিরাইতে পারিবেন;—দেশের লোককে পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী, সরল ও পরোপকারী করিতে পারিবেন। আর ভারতে কোটি-কোটি দরিদ্র লোক যে জীবিকার অভাবে অনাহারে জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া যাইতেছে, গৃহস্থের অনাথা, বিধবা স্ত্রীলোক যে বাধ্য হইয়া কারখানায় কাজ করিতে গিয়া, চরিত্রের পবিত্রতা হারাইতেছে, তাহার একটা প্রতিকার হয়। আশা করি, জাতি তাহার সমবেত চেষ্টা দ্বারা এই উচ্চ উপদেশ লাভের যোগ্যতা প্রমাণ করিবে।

(৩) আমাদের দেশের শস্য বিদেশে চালান দিবার সুবিধা করিয়া দিয়া রেলগাড়ী যে ক্ষতি করিয়াছে, দুর্ভিক্ষের সময় শস্য বিতরণের সুবিধা করিয়া দিয়া তাহার অল্প অংশই পূরণ করিয়াছে।

মেঘনাদ

[শ্রীনরেশচন্দ্র সেন, এম-এ, ডি-এল]

(২৮)

সাত দিন চলিয়া গেল, সরিতের কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। তখন মেঘনাদ তাহাকে একখানা চিঠি লেখা স্থির করিল। তার মনের সব কথা খোলসা করিয়া একখানা দীর্ঘ পত্র লিখিল।

কোনও উত্তর আসিল না।

কয়েক দিন পরে সরিতের বড় ভাই অজিত আসিয়া ডাকিল "সরিৎ!"

মেঘনাদ চমকিয়া উঠিল। সে ব্যস্ত ভাবে আসিয়া বলিল, "সরিৎ! সে এখানে কোথায়? সে তো তোমাদের বাড়ীতে!"

অজিতের মুখ শুকাইয়া গেল; সে বলিল, "কই, না!"

দু'জনেই দু'জনের মুখ চাহিয়া বিমূঢ় হইয়া রহিল। দু'জনেই থপ্ করিয়া দু'খানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। মেঘনাদ জোরে মাথা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "সে কি কথা! কি হ'য়েছে স্পষ্ট ক'রে বল—সরিৎ ওখানে নেই?"

"না; পরন্তু কলেজ যাবার সময় সে ব'লে গেল যে, সে আর ও বাড়ীতে ফিরবে না, এখানেই আসবে। ফেরেও নি। আমরা জানি, কলেজ থেকে এদিককার busএ উঠে, সে এখানে এসেছে।"

এমন সরিৎ প্রায় করিত। আর এমনি করিয়াই সে সেদিন মেঘনাদের বাড়ী ছাড়িয়া যায়।

অনেকক্ষণ দু'জনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শেষে অজিত লাফাইয়া উঠিল। সে বলিল, "চল আমাদের ওখানে; বাবাকে, মাকে এখনি এ কথা ব'লতে হ'বে।"

মেঘনাদ যন্ত্র-চালিতের মত অজিতের সঙ্গে গেল। তার শ্বশুর-বাড়ীতে ভীষণ কান্নাকাটি লাগিয়া গেল। মেঘনাদ ও অজিত সমস্ত সম্ভব ও অসম্ভব স্থানে গিয়া সন্ধান করিল—সরিতের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না।

সন্ধ্যার সময় নিরাশ হৃদয়ে তাহারা সরিতের পিত্রালয়ে ফিরিল। সরিতের মা তখন বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছেন;—তাহার পিতা বৈঠকখানায় গোঁজ হইয়া বসিয়া আছেন। অজিতেরা যে নিরাশ হইয়া ফিরিয়াছে, এ কথা শুনিয়া সরিতের মা কান্না জুড়িয়া দিলেন;—বাপ কেবল মাত্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

মেঘনাদকে সবাই সে রাত্রে সেখানেই থাকিতে অনুরোধ করিলেন। মেঘনাদ কিছুতেই সরিৎ ছাড়া সে বাড়ীতে থাকিতে সম্মত হইল না। সে যত শীঘ্র পারিল. বিদায় লইয়া, বাহির হইয়া পড়িল।

তার প্রাণে যে দারুণ হাহাকার উঠিয়াছিল, তাহাতে তার কাণে তালা লাগিয়া গিয়াছিল,—চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায়, টলিতে-টলিতে ট্রামে আসিয়া উঠিল; ট্রামে বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল।

সরিতের খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল সুলতা। সে একজন বিলাত-ফেরত ব্রাহ্মের মেয়ে,—সরিতের দীর্ঘকালের সতীর্থ। মেঘনাদ সরিৎকে লইয়া অনেক দিন তাহাদের বাড়ী গিয়াছে; এবং সুলতা ও তাহার পিতা-মাতার সঙ্গে আলাপ করিয়াছে।

চলিতে-চলিতে হঠাৎ মেঘনাদের মনে হইল যে, সরিৎ সেখানে গিয়া থাকিতে পারে। সে তৎক্ষণাৎ ট্রাম হইতে নামিয়া, গাড়ী করিয়া, সুলতার বাড়ী গেল। সুলতার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হইল;—মেঘনাদ সুলতার সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা জানাইল। তাহার ভাই ভিতরে গিয়া খবর আনিল,—সুলতার শরীর বড় খারাপ, সে মেঘনাদের সঙ্গে দেখা করিতে পারিবে না।

মেঘনাদ তাহার প্রয়োজনের কথা জানাইল,—দুই মিনিটের জন্য তা'র সঙ্গে দেখা করিবার প্রার্থনা জানাইল। সুলতা এবার স্পষ্টই দেখা করিতে অস্বীকার করিল। মেঘনাদ ভয়ানক ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আচ্ছা, একটা কথা জানতে পারি কি? তিনি সরিতের কোনও খবর জানেন কি? তা'র কি হ'য়েছে? সে কি বেঁচে আছে?"

খবর আসিল, সরিৎ বাঁচিয়া আছে, ভালই আছে; কিন্তু মেঘনাদ বাবুর এ খবরে কোনও দরকার নাই।

মেঘনাদ আশ্বস্ত হইয়া, আবার তার শ্বশুরবাড়ী ফিরিয়া গেল। সে ভাবিয়াছিল যে, এ সংবাদে সরিতের বাপ-মাও আশ্বস্ত হইবেন। কিন্তু এ কথায় সরিতের মায়ের শোক আরও উথলিয়া উঠিল। মেঘনাদ অজিতকে সুলতার বাড়ীর ঠিকানা দিয়া, বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

পরের দিন অজিত, সুলতার কাছে যাহা শুনিয়াছিল, তাহা মেঘনাদকে বলিয়া গেল। সরিৎ সেদিন কলেজ হইতে সুলতার বাড়ী গিয়াছিল। সেখান হইতে সেই ট্রেণে সে কোথাও একটা চাকরীতে গিয়াছে। সে বেশ ভাল চাকরী পাইয়াছে,—তার কোনও কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু কোথায়, কি চাকরীতে গিয়াছে, তাহা সুলতা কিছুতেই বলিল না। সুলতা তার জন্য কাপড়-চোপড়, জিনিষ-পত্র কিনিয়া গুছাইয়া দিয়াছে; যাহা দিয়াছে, তাহাতে সরিতকে কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। মোট কথা, সরিতের জন্য কোনও চিন্তাই নাই; কিন্তু সে নিজে খবর না দিলে, তার আত্মীয়-স্বজনকে সুলতা কোনও খবরই দিবে না।

অজিত চলিয়া গেলে, মেঘনাদ ভাবিতে বসিল। গভীর বেদনায় তাহার সমস্ত হৃদয় যেন চুরমার হইয়া গেল। তাহার বড় কান্না পাইতে লাগিল। সরিৎ যে এই কয় মাসে তার জীবনের পরতে-পরতে মিশিয়া গিয়াছিল! সে তাহাকে অনায়াসে ছাড়িয়া গেল; কিন্তু মেঘনাদের সমস্ত জীবনের গোড়া ধরিয়া যেন কে উপড়াইয়া লইয়াছে, মনে হইতে লাগিল। জীবনটা তার কাছে একটা বিরাট শূন্য,—কেবল বেদনায় ভরা একটা দুর্ব্বিষহ ভার বলিয়া মনে হইল। সে সত্য-সত্যই কাঁদিল। তাহার সমস্ত জীবনের পুঞ্জীকৃত বেদনায় সে কাঁদিল,—তার জীবনের অসার্থকতায় সে কাঁদিল। সার্থকতার এত কাছাকাছি আসিয়া, তার জীবন এমন শূন্য ও অসার্থক হইয়া গেল বলিয়া সে কাঁদিল। সরিৎ যে তাহাকে জন্মের মত ছাড়িয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ মাত্র রহিল না।

কিন্তু তার সমস্ত বেদনা, সকল হাহাকারের মধ্য দিয়া, ক্রমে একটা অনুভূতি খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিল। এখন সে মুক্ত! সুনীতি যখন তার ঘাড়ে আসিয়া পড়িল, তখন সে জীবন-ব্যাপী বন্ধনের আশঙ্কায় পীড়িত হইয়াছিল। কিন্তু সুনীতি কয়েক মাসের মধ্যেই তাহাকে মুক্তি দিয়া গেল। সুনীতির জন্যই সে বাধ্য হইয়া বিবাহ করিয়াছিল। তাহাতে সে তৃপ্তি পাইয়াছিল; কিন্তু মাঝে-মাঝে সে তবু অনুভব করিত যে, সে সোণার শিকল গলায় পড়িয়াছে;—তা'র স্বাধীনতা সে বিসর্জ্জন দিয়াছে। যখন মনোরমার আসিবার সংবাদ পাইল, তখন এই বন্ধনের বেদনা আরও গভীর ভাবে তাহাকে পীড়িত করিয়াছিল। কিন্তু এখন মনোরমা ও সরিৎ একসঙ্গে তাহাকে ছাড়িয়া গিয়া, তাহাকে একেবারে মুক্ত করিয়া দিল। এখন তার কোনও বন্ধন নাই, বাধা নাই,—সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এখন আবার সে জীবন যেমন করিয়া ইচ্ছা ভাঙ্গিয়া গড়িয়া লইতে পারে।

গভীর বেদনার সঙ্গে সে এই মুক্তির পুলক অনুভব

করিল। সঙ্গে-সঙ্গে তার মন তার তিনটি বন্ধনের ধ্যান করিতে লাগিল। প্রত্যেকের স্মৃতিতে সে বেদনা বোধ করিল। সুনীতি যে কয়েক দিন তার জীবন আনন্দে পরিপূরিত করিয়া দিয়াছিল সে কথা স্মরণ করিয়া সে ক্লিষ্ট হইল। কিন্তু সুনীতি তাহাকে ছাড়িয়া গেল,—সে মেঘনাদকে ভাল না বাসিয়া পারিল না বলিয়া। তাহার প্রেম-বঞ্চিত তৃষিত হৃদয় মেঘনাদকে দেখিয়া কামনায় পীড়িত হইয়াছিল; কিন্তু তার অন্তরের ধর্ম্ম-জ্ঞান তাহাকে ইহার জন্য মৃত্যুদণ্ড দিল। মনোরমাও ঠিক তাহারই মত, মেঘনাদের কমনীয় কান্তিতে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে কামনা করিয়াছিল; কিন্তু অপরাধ-লুব্ধ তাহার হৃদয় সম্মুখে মণি মিত্রকে পাইয়া, দূরগত মেঘনাদকে অনায়াসে বিস্মৃত হইয়া, কামনার অতল সাগরে ডুব দিয়া বসিল। কিন্তু সরিৎ তার অসীম ভালবাসা ব্যর্থ বোধ করিয়া, কামনাকে পিষিয়া মারিয়া, জীবনের সার্থকতার জন্য অন্য পথ খুঁজিয়া লইল। এ কথা স্মরণ করিতে মেঘনাদের হৃদয় সরিতের গর্ব্বে একটু উৎফুল্ল হইল। সরিৎ যে সাধারণ নারীর চেয়ে কত উচ্চে, সে কথা স্মরণ করিয়া সে, প্রাণভরা বেদনার ভিতর দিয়াও, আশ্চর্য্য রকম আনন্দ অনুভব করিল।

সে অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিল, সরিতের মঙ্গল হউক;—তার আত্মা পরিতৃপ্তি লাভ করুক। সে আর মেঘনাদের নয়; কিন্তু সে যেখানেই থাকুক, সেখানেই সে গৌরব লাভ করুক,—সুখী হউক,—এ কথা মেঘনাদ বারবার বলিতে লাগিল।

সরিৎ মুক্তি পাইয়াছে। তাহার বিশাল অন্তর মেঘনাদের ক্লেদযুক্ত প্রেমের বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়াছে। সেও মেঘনাদকে অসত্য হইতে, বন্ধন হইতে, মুক্তি দিয়া গিয়াছে! এখন মেঘনাদ স্বাধীন। তাহার সমস্ত জীবন এখন তার নিজের হাতে। অতীতের সব ভুলচুক মিটিয়া গিয়াছে। সত্যের সঙ্গে,—ধর্ম্মের সঙ্গে দেনা-পাওনা চুকিয়া গিয়াছে। এখন সে কারও অধীন নয়।

সমস্ত চিন্তা, সমস্ত বেদনা আচ্ছন্ন করিয়া, ক্রমে এই অনুভূতি তাহার মনের ভিতর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিল। সে মনে-মনে তা'র ভবিষ্যৎ জীবন গড়িয়া তুলিতে লাগিল।

(২৯)

মেঘনাদ বৈঠকখানায় বসিয়া ছিল। অত্যন্ত সন্তর্পণে তার ঘরে ঢুকিল সেই লোকটি,—অসিতের মৃত্যুশয্যায় যাহাকে মেঘনাদ দেখিয়াছিল, এবং যে তাহাকে একদিন গোলদীঘিতে শাসাইয়াছিল।

মেঘনাদ তাহাকে দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল। তাহার পশ্চাতে আর একজন আসিল;—তাহাকেও মেঘনাদ অসিতের কাছে দেখিয়াছিল। সে ঘরে ঢুকিয়াই দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। মেঘনাদের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল।

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "মেঘনাদ বাবু, আমাদের সঙ্গে আপনাকে আসতে হ'বে।"

মেঘনাদ শুষ্ক মুখে বলিল, "কোথায়?"

"তা' এখনো ব'লতে পারি না! সম্প্রতি ক'লকাতা থেকে বেরিয়ে প'ড়তে হ'বে। তার পর ভেবে-চিন্তে একটা উপায় ঠিক ক'রতে হ'বে।

"কেন? একটু বুঝিয়ে বলুন।"

"পুলিশ আজ আপনাকে ও আমাকে গ্রেপ্তার ক'রতে বেরুবে, সে খবর পেয়েছি। সময় অত্যন্ত অল্প,—এখনো পালান যেতে পারে।"

মেঘনাদ বলিল, "আপনারা পালান,—আমি পালাব না।"

লোকটি হাসিয়া বলিল, "আপনাকে যেতেই হ'বে। আপনি আমাদের অনেক কথা জানেন; আপনাকে পুলিশের হাতে আমরা প'ড়তে দিতে পারি না। তা' ছাড়া, আপনার কাছে আমরা একটু উপকার পেয়েছি;—আপনাকে আমাদের জন্য মিছামিছি বিপন্ন হ'তে দিতে পারি না। পুলিশের হাতে প'ড়লে যে আপনার শাস্তি হ'বেই, সে কথা নিশ্চিত জানবেন।"

মেঘনাদ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আমি যাব না।" লোকটা একটা রিভলভার বাহির করিয়া মেঘনাদের দিকে ঘুরাইয়া ধরিল। তাহার সঙ্গীও তাহাই করিল। তা'র পর সে হাসিয়া বলিল, "হয় যাবেন, না হয় এইখানেই জন্মের মত প'ড়ে থাকবেন। তর্কের সময় নেই, এখনি হয় তো পুলিশ এসে প'ড়বে। আপনি আসুন—আর কথা কইলেই গুলি ক'রবো।"

মেঘনাদ বিমূঢ় চিত্তে অগ্রসর হইল। তখন দুইজন দুই দিক হইতে তাহার হাত ধরিয়া লইয়া বাহির হইল।

বাহিরে মেঘনাদের দরজার পাশে দেওয়াল ঘেঁসিয়া কয়েকটা লোক দাঁড়াইয়া ছিল। মেঘনাদকে লইয়া এই দুই-জন বাহির হইবামাত্রই, বাহিরের লোকগুলি তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মেঘনাদকে তাহারা অনায়াসে গ্রেপ্তার করিল; কিন্তু তাহার সঙ্গী দুইটি ভয়ানক ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল। শেষে একজন বহু কষ্টে তাহার ডান হাত মুক্ত করিয়া ফেলিল; এবং চট্‌পট্ রিভলভার ঘুরাইয়া গুলি করিতে লাগিল। ঠিক সেই সময়ে একখানা মোটর কোথা হইতে আসিয়া সেইখানে দাঁড়াইল; তাহার ভিতর হইতে একজন কি দুইজন লোক রিভলভার চালাইতে লাগিল। পরমুহূর্ত্তে মেঘনাদ দেখিল, তাহার সঙ্গী দুইটি মুক্তি লাভ করিয়া, মোটরে গিয়া উঠিয়া বসিল; চারজন লোক রক্তাক্ত হইয়া সেইখানে রাস্তায় পড়িয়া রহিল।

মেঘনাদও তখন মুক্ত। যাহারা তাহাকে ধরিয়াছিল, তাহারাও আহত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

চক্ষের নিমেষে এই সব কাণ্ড ঘটিয়া গেল। রাস্তার অপর পারের একটা বাড়ী হইতে উর্দ্দিপরা কয়েকজন পুলিস কর্ম্মচারী ছুটিয়া আসিল; কিন্তু তাহারা আসিবার পূর্ব্বেই, মোটর ভোঁ-ভোঁ শব্দে ছুটিয়া, নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। তাহারা আসিয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় মেঘনাদকে শক্ত করিয়া ধরিয়া, দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল।

মেঘনাদ সম্পূর্ণ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। যখন তাহাকে বাঁধা শেষ হইল, তখন তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। তখন পুলিসের কর্ম্মচারীরা একখানা গাড়ী ডাকিয়া, মেঘনাদকে তাহাতে উঠিতে বলিল। তখন মেঘনাদ বলিল, "এ লোক-গুলো এমনি ভাবে পড়ে' থাকবে,— এদের একটু আশু চিকিৎসা ক'রতে দেবেন কি আমায়?"

ইনস্পেক্টার বাবু একবার মেঘনাদের দিকে, একবার আহত লোকদিগের দিকে চাহিলেন। মেঘনাদের হাত-পা ছাড়িয়া দিতে সাহস হইল না; অথচ C. I. Dর ইনস্পেক্টার, সবইনস্পেক্টার ও কয়েকজন কনেষ্টবল আহত হইয়াছে,—তাহাদের আশু চিকিৎসাও দরকার। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া, তিনি মেঘনাদকে উত্তম রূপে তল্লাস করিয়া দেখিয়া, তাহার হাত মুক্ত করিয়া দিলেন; কিন্তু দুই হাতের মধ্যে দুইটা লম্বা দড়ি বাঁধিয়া রাখিলেন। মেঘনাদের নির্দ্দেশ মত, তার স্থির সহায়তায়, পুলিসের লোক বাড়ী হইতে ঔষধ-পত্র, নেকড়া ও তুলা আনিয়া দিল। মেঘনাদ সবারই ব্যবস্থা করিয়া, ধীর ভাবে গিয়া গাড়ীতে উঠিল। তখন তার হাত-পা লৌহ-শৃঙ্খলে বাঁধা হইল।

মেঘনাদ হাসিল; তার এক ফোঁটাও দুঃখ হইল না। তার নৈরাশ্য অত্যন্ত সম্পূর্ণ ও পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছিল। জীবনে আর তার কোনও কিছু কামনা ছিল না। জীবনটাকে তার আগাগোড়া একটা নিষ্ঠুর, অনন্ত পরিহাস বলিয়া মনে হইতেছিল। তাই সে হাসিল।

এই মাত্র সে মনে করিতেছিল যে, সে মুক্ত! তার পর-মুহূর্ত্তেই সে শৃঙ্খলিত হইল। আর সে স্পষ্টই দেখিতে পাইল যে, এই যে শিকল তার হাতে-পায়ে পড়িয়াছে, তাহা কিছুতেই সে ছাড়াইতে পারিবে না। বিচারের আশা সে করিল না। সে নির্দ্দোষ সত্য; কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ যে কত সঙ্গীন, তাহা সে বটব্যাল কোম্পানীর আফিসের খানা-তল্লাসীর সময়েই অনুমান করিয়াছিল। তার পর তাহাকে যে অবস্থায় গ্রেপ্তার করা হইল, এবং গ্রেপ্তার লইয়া যে ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইল, তাহাতে কোনও বিচারকই তাহাকে নির্দ্দোষ ভাবিতে সাহস পাইবেন না—এ কথা সে দিব্য-চক্ষে দেখিতে পাইল। তাহার বিরুদ্ধে সমস্ত পৃথিবী এমন একটা চক্রান্ত করিয়া ঘটনাগুলি গড়িয়া তুলিয়াছে যে, তার লৌহ-কারাগার হইতে মুক্তি পাইবার একটা সূক্ষ্ম রন্ধ্র-পথও তাহার চোখে পড়িল না। সমস্ত জীবনটা তার দীর্ঘ বেদনা-ভোগের ফলে, তার কাছে যথেষ্ট তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এখন তাহা সম্পূর্ণ রূপে বিস্বাদ ও বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। বেদনা-ক্ষোভ তাহাকে পরিত্যাগ করিল। সে শান্ত, স্থির চিত্তে বসিয়া রহিল।

মেঘনাদকে প্রথমে যাইতে হইল গুপ্ত পুলিসের আফিসে। সেখানে প্রথমে কয়েকজন বাঙ্গালী পুলিস কর্ম্মচারী মেঘনাদকে লইয়া পড়িল। অনেক কথা তাহারা জিজ্ঞাসা করিল। তা[illegible] আরও কথাই মেঘনাদ জানিত না। যাহা জানিত, [illegible] মেঘনাদ সম্পূর্ণ সত্য কথা বলিল। অসিতের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ, বটব্যাল কোম্পানীর আফিস হইতে অ্যাসিড চুরি, প্রথমবারে তাহা গোপন করিবার চেষ্টা, অসিতকে দেখিতে বাগানবাড়ীতে যাওয়া প্রভৃতি সমস্ত সে অকপটে স্বীকার করিল। যাহা সত্য নহে বলিয়া সে জানিত, তাহা অস্বীকার করিল।

তাহার সম্বন্ধে সে কিছু জানে না, সে সম্বন্ধে কোনও কথাই সে বলিতে পারে না—তাহাও সে জানাইল। পুলিস কর্ম্মচারীরা তাহাকে নানা প্রকার উপায়ে আরও নানা কথা স্বীকার করাইতে চেষ্টা করিল,—ভয় প্রদর্শন করিল,—ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিল, এপ্রুভার করিবার লোভ দেখাইল,—মেঘনাদ তাহাতে কেবল হাসিল।

ইহার পর গুপ্ত পুলিসের ডেপুটি ইনস্পেক্টার জেনারেল স্বয়ং তাহাকে লইয়া পড়িলেন। মেঘনাদ যে, যে কথা বলিয়াছিল, তাহা হইতে একটিও বেশী কথা তিনি তাহার নিকট হইতে বাহির করিতে পারিলেন না। একটা প্রকাণ্ড নথী লইয়া, তাহা দেখিয়া-দেখিয়া তিনি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। মেঘনাদ আন্দাজে বুঝিল যে, পুলিস তাহার পিছনে গুপ্তচর লাগাইয়াছিল। সেই চরের রিপোর্টের মূলেই তাহাকে প্রশ্ন করা হইতেছে। সে দেখিতে পাইল যে, অসিত যে দিন প্রথমে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসে, সেই দিন হইতে বরাবর এই চরটি তাহার উপর খর দৃষ্টি রাখিয়াছে। তাহার গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে এবং রিপোর্ট করিয়াছে। কিন্তু সত্য কথার সঙ্গে-সঙ্গে সে অনেকটা মিথ্যা, এবং প্রভূত পরিমাণে কল্পনা জুড়িয়া দিয়াছে। মেঘনাদ বুঝিল যে, গুপ্তচর তাহার নামে যে রিপোর্ট করিয়াছে, তাহাতে তাহার পাঁচদিন বাগানে যাওয়ার কথা আছে। অসিতের সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা মেঘনাদ প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিল। কিন্তু সাহেব তাহাদের কথাবার্ত্তার একটা রিপোর্ট পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ রিপোর্ট ঠিক কি না। মেঘনাদ হাসিয়া বলিল, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

সাহেব বলিলেন, "তবে তোমাদের কি কথা হইয়াছিল ?"

মেঘনাদ বলিল, "আমার বন্ধু আমাকে বিশ্বাস করে' যে সব কথা ব'লেছে, সে কথা আমি তার অনুমতি ছাড়া প্রকাশ ক'রতে পারি না।"

সাহেব তাহাকে পীড়াপীড়ি করিলেন, ফুসলাইবার চেষ্টা করিলেন, ভয় দেখাইলেন; কিন্তু মেঘনাদ বজ্রবৎ কঠোর হইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ জেরার পর মেঘনাদকে আলিপুর জেলখানায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সেখানে তাহাকে একটা ছোট শূন্য গৃহে বন্ধ করিয়া রাখিল। মেঘনাদ তাহাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিল না। সে তাহার কঠিন শয্যায় যাইয়া, মাথার তলায় হাত দিয়া শুইয়া পড়িল।

এখন মেঘনাদের চিন্তার মধ্যে ক্ষোভের ছায়ামাত্র ছিল না। সংসারের অক্টোপাসের কঠিন বন্ধনের ভিতর আবদ্ধ হইয়া, তাহার দুঃখ-কষ্ট সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। এখন তাহার মনে হইল যে, সংসার তার সকল বন্ধন লইয়া তাহার পিছনে পড়িয়া আছে। তাঁর সঙ্গে সংসারের সব দেনা-পাওনা চুকিয়া গিয়াছে। এখন তার কামনার বিষয় কিছুই নাই; তাই কিছুতেই তাহার বেদনা-বোধও নাই। সকল কামনা হইতে মুক্ত হইয়া, সে সমস্ত সুখ-দুঃখের অতীত হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের কোনও দুঃখকেই সে আর দুঃখ বলিয়া গ্রাহ্য করিতেছে না;—কেবল মৃত্যুর জন্য সে শান্ত চিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছে।

মনের এই অবস্থায় সে নিজের ভিতর একটা অসাধারণ শক্তির সন্ধান পাইল। সে দেখিতে পাইল যে, এখন কিছুতেই সে বিচলিত হয় না,—কিছুতেই তাহার ভয় নাই। এতগুলি পুলিস কর্ম্মচারী এবং স্বয়ং ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল সাহেবের কাছে সে অগ্নি-পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছে;—এক মুহূর্ত্তের জন্য মুক্তির লোভে আকৃষ্ট হয় নাই,—ভয়ে বিচলিত হয় নাই। কেন না, এ জগতের কোনও বস্তুর উপরই তার আকাঙ্ক্ষা নাই,—কাজেই কিছু হারাইবার ভয়ও নাই। সে অনুভব করিল যে, এই বন্ধনে বদ্ধ হইয়াই সে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিয়াছে। বন্ধনকে সে বন্ধন বলিয়াই গ্রাহ্য করিতেছে না;—মনের ভিতর সে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অনুভব করিতেছে।

তার আজ মনে হইতে লাগিল—কত তুচ্ছ জগতের, জীবনের যত ভয়-ভাবনা। যে সব জিনিষ সে এতদিন প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল, সেগুলি ছোট ছেলেদের খেলার পুতুলেরই মত তুচ্ছ, হেয়! যে সব ভয়ে সে আগে মরিয়া গিয়াছিল, যে সব লোভে সে লুব্ধ হইয়াছিল, সেগুলিও কি তুচ্ছ! বয়স্ক ব্যক্তি শিশুদের পুতুল খেলায় যে অশ্রদ্ধা ও কৌতুক যুগপৎ অনুভব করে, জীবনের সমস্ত ব্যাপার মেঘনাদ আজ তেমনি অশ্রদ্ধা ও কৌতুকের সঙ্গে আলোচনা করিতে লাগিল। এ সব তুচ্ছ জিনিষও যে মনকে বদ্ধ করিতে পারে, সে কেবল একটা বুদ্ধির ভুলে,—একটা মোহের বশে। সেই মোহ ও মায়ার পরপারটা

মেঘনাদের চক্ষের সম্মুখ হইতে হঠাৎ অপসারিত হইয়া গেল। সে সমস্ত জগৎকে তুচ্ছ করিতে শিখিল; এবং জগৎকে তুচ্ছ করিয়াই, সে আপনার প্রাণের ভিতর শক্তিমান্ আত্মার সহজ মুক্তি ও গৌরব অনুভব করিল।

সে মনে-মনে জগদীশ্বরের চরণে অসংখ্য প্রণিপাত করিল। কঠিন আঘাতে তাহার সকল বন্ধন কাটিয়া, ভগবান্ তাহাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। মূঢ় সে,—বন্ধনের ভিতর আপনার আত্মাকে নিবিষ্ট করিয়া দিয়া, বন্ধন-মোচনের ব্যথায় সে কাতর হইয়া কাঁদিতেছে;—ভগবানের অবিচারে তাঁহার উপর অভিমান করিয়াছে। আজ তা'র দিব্য-দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে,—সে মুক্তির আস্বাদে তৃপ্ত হইয়া, ভগবান্কে ধন্যবাদ দিল।

(৩০)

মেঘনাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ কাগজে পড়িয়াই জগদীশ ছুটিয়া কলিকাতায় আসিল। আসিয়াই, একটার পর একটা করিয়া সমস্ত সংবাদ শুনিয়া, সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কত বড় ঝড়টা যে মেঘনাদের মাথার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, তাহা সে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিল। সরিতের সংবাদ লইয়া সে জানিল যে, তার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে;—সে ঢাকা বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী হইয়া সেখানে আছে।

সরিৎ সংবাদ পাইয়া, তখনি পিতার কাছে চিঠি লিখিয়া, মেঘনাদের টাকা-কড়ি কোথায় কি আছে তাহা জানাইয়াছে। তাহার নিজের নামে কিছু কোম্পানীর কাগজ ও টাকা পোষ্টাফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা ছিল। সরিৎ দুইখানা ফরম দস্তখত করিয়া পাঠাইয়া, সেই টাকা উঠাইয়া মেঘনাদের মোকদ্দমার তদ্বির করিতে লিখিয়াছে।

মেঘনাদের শ্বশুর ও অজিত উঠিয়া-পড়িয়া মোকদ্দমার তদ্বির করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। খুব নামজাদা একজন এটর্ণী ও কয়েক জন বড়-বড় ব্যারিষ্টার তাহার পক্ষে নিযুক্ত হইয়াছেন।

জগদীশ যোগেন্দ্র বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল।

যোগেন্দ্র বাবু বলিলেন, "যে দিন মেঘনাদের বিয়ে হয়, সেই দিন প্রথম আমার হাতে এই কেস এসে পড়ে। আমি অনেক চেষ্টা করছিলাম,—কিছুতেই মেঘনাদকে রক্ষা ক'রতে পারলাম না।"

জগদীশ তাঁহার সঙ্গে বসিয়া মোকদ্দমার বিষয়ে পরামর্শ করিল। যোগেন্দ্রবাবু তাহাকে কতকগুলি গোপনীয় কথা বলিয়া ফেলিলেন। শেষে বলিলেন, "এ কেস এখন আমার হাতে নেই। আমি যখন মেঘনাদকে বাঁচাতে পারলাম না, তখন ছেড়ে দিলাম। তাই সব কথা আপনাকে ব'লতে পারছি না। কিন্তু আমার খুব বিশ্বাস যে, ভাল রকম তদ্বির হ'লে মেঘনাদ খালাস হ'বে।"

মেঘনাদের বিচার হইল হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইবিউন্যালে। তিনজন জজ বসিয়া বিচার করিলেন। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ,—রাজ-দ্রোহ, রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা আর পুলিস কর্ম্মচারীকে হত্যা করা ও গুরুতর রূপে আহত করা।

যে সমস্ত পুলিস কর্ম্মচারী মেঘনাদকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়া আহত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে দুই জন সেই আঘাতের ফলে মারা যায়। পুলিস পক্ষ হইতে প্রমাণ দেওয়া হয় যে, মেঘনাদও তাহার সঙ্গীদের সঙ্গে-সঙ্গে গুলি চালাইয়াছিল। কাজেই, এ হত্যাকাণ্ডের জন্য সে তাহাদের সমান দায়ী।

মেঘনাদের পক্ষের জেরায় সাক্ষীগুলি গোলমাল করিয়া ফেলিল। মিথ্যাটা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে প্রমাণ হইয়া গেল। মেঘনাদের হাতে ছিল বলিয়া যে রিভলভারটা হাজির করা হইয়াছিল, তাহাও পুলিসের রিভলভার বলিয়া সন্দেহ উপস্থাপিত হইল। মোটের উপর, গ্রেপ্তারের দিনের অপরাধ সম্বন্ধে মোকদ্দমা মেঘনাদের সম্পূর্ণ অনুকূল বলিয়াই মনে হইল।

সেদিনকার বিচার শেষে জগদীশ ও অজিত মেঘনাদের সঙ্গে দেখা করিবার অনুমতি পাইল। তাহারা ব্যারিষ্টারের নিকট যাহা শুনিয়াছিল, তাহা মেঘনাদকে জানাইয়া তাহাকে আশ্বাস দিল।

মেঘনাদ মুক্তি-লাভের আশায় অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল না। সে বলিল, "ভগবানের যদি তাই ইচ্ছা হয়, তাই হইবে!"

অজিত সঙ্কোচের সহিত বলিল, "সরিতের একখানা চিঠি এয়েছে,—সে ঢাকার স্কুলে টীচার হয়ে গেছে।"

সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাবে মেঘনাদ বলিল, "সে ভাল আছে তো!"

অজিত চিঠিখানা বাহির করিয়া মেঘনাদকে দিল। মেঘনাদ শান্ত চিত্তে তাহা লইয়া পড়িল। পড়িয়া বলিল, "বেশ, বড় খুসী হ'লাম। তাকে লিখো, আমি তাকে আশীর্ব্বাদ ক'রছি। কিন্তু আর যাই কর ভাই, তা'র টাকাটা নিও না। আমার মোকদ্দমার জন্য, আমারি নামে যে টাকা আছে, তাই দিয়ে যতদূর যা হয়, তাই করো। এতটাও করার দরকার বোধ করি না। তবে তোমাদের যদি তা'তে তৃপ্তি হয়, তাই করো। কিন্তু সরিতের সামান্য পুঁজিটা ভেঙ্গো না।"

মেঘনাদের মনের অবস্থা দেখিয়া, তাহারা উদ্বিগ্ন হইয়া ফিরিয়া আসিল।

পরের দিন ষড়যন্ত্রের সম্বন্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ দেওয়া হইল। সে সব সাক্ষীও জেরায় অনেকটা গোলমাল হইয়া গেল; কিন্তু যে কয়টা কথা ছাঁকা সত্য, তাহার কোনও ওলট-পালট হইল না। সেই দিন সাক্ষ্য শেষ হইল; জজেরা রায় মুলতবী রাখিলেন।

সাতদিন পর জজেরা রায় দিলেন। মেঘনাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রমাণিত সাব্যস্ত করিয়া, তাঁহারা মেঘনাদকে সেই অভিযোগে পাঁচ বৎসর কারাবাসের আদেশ দিলেন। অপরাপর অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই বলিয়া, সে বিষয়ে মেঘনাদকে মুক্তি দিলেন।

দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া অজিত ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সে যখন মেঘনাদের সঙ্গে দেখা করিতে গেল, তখনও সে কাঁদিতেছে। মেঘনাদ তাহার চক্ষু মুছাইয়া, শান্ত ভাবে বলিল, "এত দুঃখ কিসের ভাই! পাঁচটা বৎসর এমনি কি বেশী। তা ছাড়া, আমি জেলের বাইরে থেকে এমনি কি সুখ শান্তি পেয়েছি যে, জেলে এলে আমি বেশী একটা দুঃখ পাবো?

"তোমরা ভাই সরিৎকে দেখো। সে হয় তো এ কথা শুনলে ব্যথা পাবে। তাকে তোমরা শান্ত করো। আর তার চাকরীটা ছাড়িয়ে তোমরা নিয়ে এসো। সে এখান থেকে চলে গিয়েছিল আমার ভয়ে। এখন আর সে ভয় নেই। তাকে ফিরে এসে কলেজে প'ড়তে ব'লো। পাঁচ বছরের জন্য তো সে এখন নিশ্চিন্ত! তার পরও আমি তাকে বিরক্ত করবো না, এ কথাও তাকে বলো।"

মেঘনাদ বেশ প্রফুল্ল চিত্তে কারাগারে চলিয়া গেল। সেখানে পরের দিন হইতেই, সে এমন উৎসাহের সহিত ঘানি টানিতে, ও কাঞ্জী খাইতে লাগিয়া গেল, যেন, চিরজীবন সে এই কাজই করিয়া আসিয়াছে। সে তাহা অপেক্ষাও বেশী উৎসাহের সহিত কারাবাসী অপরাধীদের শরীর ও চিত্তের অবস্থার অনুশীলন করিতে লাগিল। সে Criminology শাস্ত্র অনেকটা পড়িয়া ফেলিয়াছিল। এখন তাহার শিক্ষাটা বাস্তব জীবনে, অপরাধীদের জীবনের সহিত মিলাইয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়া, সে আনন্দিত হইল।

মেঘনাদকে ডাক্তার জানিয়া, অনেকে তাহাকে বেশ খাতির করিত। একজন ওয়ার্ডার একটা কুৎসিত রোগে বড় কষ্ট পাইতেছিল। মেঘনাদ তাহাকে একটা প্রেস্ক্রিপসান লিখিয়া দিয়াছিল। সেই ঔষধ খাইয়া ওয়ার্ডার রোগমুক্ত হয়। তাহার পর হইতে সে মেঘনাদকে বিশেষ অনুগ্রহ করিত। জেলে কয়েদীর যতদূর আরামে জীবনে কাটানো সম্ভব, মেঘনাদ নিজের চরিত্র-গুণে সহজেই তাহা পাইল।

কিন্তু মেঘনাদ কেবল নিজের আরামে সন্তুষ্ট হইল না। সে দেখিতে পাইল যে, কয়েদীদের উপর প্রায়ই নিয়ম-বহির্ভূত রকম অত্যাচার হয়। জেলের আইন-কানুন তাহার জানা ছিল। সে দেখিতে পাইল যে, অধিকাংশ স্থলেই অতিরিক্ত পরিশ্রম, অপর্য্যাপ্ত আহার ও অস্বাস্থ্যকর বিধান কয়েদীদের সহ্য করিতে হয়। সে কয়েদীদিগকে শিখাইল যে, তাহারা যেন কিছুতেই আইন-বহির্ভূত কোনও আদেশ মানিয়া না চলে। তাহার শিক্ষায় আশ্চর্য্য ফল হইল। কয়েদীরা দল বাঁধিয়া হুকুম অমান্য করিতে লাগিল; এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ভিজিটার আসিলেই, তাঁহাদের নিকট একযোগে নালিস করিতে লাগিল। ইহাতে জেলার বিচলিত হইয়া উঠিলেন। মেঘনাদের স্বাধীনতা খর্ব্ব করা হইল; এবং ক্রমে তাহার অন্য কয়েদীদের সঙ্গে মেলা-মেশা একেবারে বন্ধ হইল।

এই রকম করিয়া সুখে-দুঃখে মেঘনাদ জেলখানায় জীবন কাটাইতে লাগিল। কিন্তু সকল অবস্থাতেই সে প্রফুল্ল, এবং সুখে-দুঃখে সে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার হইয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

পথহারা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিকালের ডাকে এই পত্রখানি বিমলেন্দুর হস্তগত হইল—

শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন,

"বিমল! পূজনীয় পিতৃদেব মৃত্যুশয্যায়। তোমায় একবার শেষ-দেখা দেখিতে চান। তাঁহার বিশেষ অনুরোধ—অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও তাঁহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিও না। এই পত্র তোমার অমৃত মামাকে দেখাইলে, তিনি তোমার এখানে আসায় আপত্তি করিতে পারিবেন না। আশা করি, তাঁহার এই শেষ ইচ্ছাটি তুমি পূর্ণ করিবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। আশীর্ব্বাদ লইও। তোমার চির-শুভার্থিনী মা

ইন্দ্রাণী।"

এই পত্রের অপর পৃষ্ঠায়, সুচারু ছাঁদে সুন্দর অক্ষরে তারার লিখিত দীর্ঘ পত্র। সে পত্রে রামদয়ালের মুমূর্ষু-প্রায় অবস্থার জন্য বিলাপ, বিমলেন্দুর দীর্ঘকাল উঁহাদের বিস্মৃত থাকার জন্য অভিমান, মৃদু তিরস্কার; এবং একবার মাতামহের মৃত্যু-শয্যায় শেষ সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ—ইহার প্রায় ছত্রে-ছত্রেই প্রেরিত হইয়াছিল। অবশেষে সে লিখিয়াছে—

"তোমার কি মনে পড়ে না দাদা,' দাদু আমাদের কত ভালবেসেছেন? তুমি বোধ হয় বুঝতে পার নি, তিনি তোমার কতবড় শুভাকাঙ্ক্ষী। এই অসহ্য রোগ-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে রয়েছেন,—তবু প্রত্যেক দিনটীতেই ডাক এলে, একবার করে অন্ততঃ খবর নেন, তোমার কোন চিঠি এসেছে কি না? আমার মামাবাবু মারা গেলে, মা যখন শোকে অত্যন্ত কাতর হন, তিনি নিজের সে অসহনীয় শোককেও সম্পূর্ণ রূপে চেপে ফেলে, সর্ব্বপ্রথম তোমায় আনতে গিয়েছিলেন,—সে কথা মনে পড়ে কি? তুমি এলে না। অমৃত মামা আসতে দিলেন না, শুনলুম। তিনি ফিরে এসে মাকে বল্লেন, 'মা, সেবার বিমলকে নিয়েই তুই তোর সবচেয়ে বড় দুঃখকে যে জয় করেছিসি, তাই ভেবেছিলুম, এবারও তাকে আজকের এ দুর্দ্দিনে তোর কোলে এনে দিতে পারলে, তাকে দেখেও তোর বুক একটু ঠাণ্ডা হবে। কিন্তু পারলাম না।' দাদা! কতবড় স্নেহময়, মহৎ-প্রাণ আত্মীয় তুমি যে হারাচ্চো, তা হয় ত বুঝতেও পারচো না। কিন্তু এক দিন হয় ত পারবে। কি জানি কেন, আমার এই কথাই কেবল মনে হচ্চে!—একবার আসবে না কি?—তোমারই 'বোনটী'—তারা।"

বিমলের সর্ব্বদেহে খর রক্ত-স্রোত ছুটিয়া গেল। কি মিষ্ট ভৎর্সনাপূর্ণ ব্যাকুল অনুযোগ! কি বেদনাময় সকরুণ আহ্বান! তারা! তারা! বোনটী আমার! কতদিন যে তোকে দেখি নাই রে! তুই নিজে ডাকিতেছিস, তবু যাইব না? দাদু আজ মৃত্যু-শয্যাতে আহ্বান করিতেছেন,—ওই বৃদ্ধ তাহার কেহ না হইয়াও যে কত স্নেহ—কত আদর তাহাকে করিয়াছেন,—সে-সব কথা অকস্মাৎ আজ যে মনে পড়িয়া যাইতেছে! না গিয়া কি সে থাকিতে পারে?

অমৃত পত্র পড়িয়া একটু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল। তার পর জিজ্ঞাসা করিল,—

"তা'হলে কি করা ঠিক করেছ?"

বিমল জোরের সহিত জবাব দিল, "যাবো,—আজই, এক্ষুণিই যাবো।" বলিতে-বলিতে চিন্তিত হইয়া পড়িল। ইতিপূর্ব্বে একা কোন দিনই সে কলিকাতার বাহিরে পদার্পণ করে নাই। বারীৎপুর কোন্ পথে, কোথা দিয়া যাইতে হয়—সে সকলের কিছুই সে জানে না।

অমৃত কহিল, "যাবে, তা যাও;—তবে কি না, তোমার সৎ-মায়ের এ একটা মস্তবড় চাল,—এটা জেনে যাওয়াই ভাল। রামদয়াল গুপ্ত মরচে, না কচু করচে! মরবার ভান করে, এই সময়ে মেয়ের বিষয়টার বন্দোবস্তটা করে ফেলব বেশ একটা ফন্দি বার করেছে বটে! আচ্ছা পাকা লোক যা' হোক।"

বিমল পথের বিড়ম্বনা ভাবিয়া ঈষৎ নিরুদ্যম বোধ

করিতেছিল ; সে এই মন্তব্যে কিছু আশ্বস্ত হইয়াই বলিয়া উঠিল, "কিন্তু তা যদি না হয় ?"

অমৃত মুচ্‌কিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "বাপু! সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। তুমি একটা কচি ছেলে—তোমায় ঠকানো যেমন সোজা, আমায় ঠকানো তো আর তেমন নয়। ওই চিঠি, তুমি কি মনে করো, সেই এক-ফোঁটা মেয়ে তারার মাথা থেকে বার হয়েছে? তা'হলে সে এতদিন এনি বেসাণ্ট হয়ে বক্তৃতা করে বেড়াত—ঘরের কোণে বসে থাকতো না।

একটু পরেই সাজগোজ করিয়া বিমলেন্দু বাহির হইয়া গেল ; এবং ইদানীং তাহার যেরূপ নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেইরূপ গভীর রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া, নিদ্রিত অমৃতকে জাগাইয়া, অধৈর্য্য-কৌতূহলে প্রশ্ন করিল, "মামা, আচ্ছা বলুন দেখি, আমার বাবার যা বিষয় আছে, সে সমস্তই কি আমার একলার? তাতে আর কারু কোন অংশই তো নেই ?"

অমৃত নিদ্রা-জড়িত, অলস চিত্তে ক্ষণকাল মূঢ়ের মত থাকিয়া, পরে ঈষৎ সজাগ হইয়া উঠিয়া উত্তর করিল, "যা দাঁড়িয়েছে, তাতে সেই রকমই হয়ে পড়েছে বটে। তবে তোমার বাপের উইলে লেখা আছে যা, তাতে তোমার সৎ-মা তাঁর অর্দ্ধেক বিষয়ের অধিকারিণী।"

বিমল সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "তা'হলে তিনি সেটা পেলেন না কেন ?"

অমৃত কহিল "তাঁর বাপ সে সময় আদালত থেকে উইলের প্রোবেট নেওয়া দরকার বোধ করেন নি। গেঁয়ো লোক—আইন, আদালত না জানার দরুণই হোক, অথবা ওঁদের যেমন একটা সঙ্কীর্ণতা সকল কাজেই পা বেঁধে রাখে—তারি জন্যই হোক, ওটা করেন নি। তার পর যখন আমার হাতে সব ভার পড়লো, তখনও ওই আলস্য—বা ওর কিছু বড় নাম দিয়ে তার গৌরববৃদ্ধিই করো—ঐ সঙ্কোচ তাঁকে মেয়ের টাকার দাবী রাখতে দেয় নি। তা আমরা, ওদিকে বছর তিনেক ধরে, যতদিন উনি দৌলতপুরে থেকেচেন, মাসহারা পাঠিয়েছি। যখন থেকে বাপের বাড়ী চলে গেছেন, তখন থেকে আর সেখানে বেচে খরচ পাঠাবার দরকার আছে বলে মনে করি নি।"

বিমলেন্দু ও কথার কাণ না দিয়াই, নিজের চিন্তা-ধারার অনুবর্ত্তন করিয়া কহিল, "তা'হলে এর পরে যদি কখন বউ সেই টাকার দাবী তোলে, তা'হলে তো অর্দ্ধেক বিষয় সে-ই পাবে ?"

অমৃত উত্তর দিল, "উইল যে জাল নয়, এখন সেটা আরও ভাল করে প্রমাণ করতে হবে অবশ্য। করতে পারলে তখন হয় ত পেতে পারে। সে কিন্তু অনেক ফ্যাসাদ সইতে পারলে, তার শেষে।"

বিমল কি ভাবিতেছিল ;—সেইরূপ চিন্তিত চিত্তেই, আত্মগত কহিল, "তা'হলে তারার বিয়ের জন্যে কিছু বেশি করে টাকা দিয়ে দিলেই তিনি হয় ত সব বিষয়টার জন্য ব্যস্ত হবেন না, না ?"

অমৃত সংক্ষেপে কহিল, "সম্ভব বটে!" বলিয়া পরে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "তা, হঠাৎ তোমার এসব কথা জিজ্ঞাসা করবার কারণটা কি ?"

বিমলেন্দু নিজের ঘরে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিয়া উত্তর দিল, "এসব কথার আমি তো কিছুই জানতুম না,—তাই একটু জিজ্ঞেস করছিলুম।"

বিমলেন্দুর আকস্মিক উদ্রিক্ত এই বিষম অনুসন্ধিৎসা, যাহা মানুষের মধ্যরাত্রের সুখ-নিদ্রাকেও খাতির করে না—ইহা অমৃতকে যে খুব সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই, তাহাই সপ্রমাণ করিয়া দিয়া, বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে সে কহিয়া উঠিল, "এ জানবার জন্য সকাল পর্য্যন্ত কি আর অপেক্ষা করা চল্‌তো না বিমু ?"

বিমল ততক্ষণে নিজের ঘরে ঢুকিয়া, বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পর দিন কোথা হইতে কি শুনিয়া আসিয়া, বিমলকে গ্রেফ্‌তার করিয়া, অমৃত তাহার অভিভাবকের পদমর্য্যাদার উপযোগী গম্ভীর ভাবে কথা কহিয়া বলিল, "এ সব কি শুনতে পাচ্চি, বিমল? তুমি না কি কলেজ ছেড়ে দিচ্চ ?"

বিমলও নিজের স্বভাবানুযায়ী গরিমা-দৃপ্ত ভাবে জবাব করিল, "দিব কেন, দিয়েছি।" অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া অমৃত কহিল, "কারণ?"

বিমল কহিল, "কারণ অনেক ; তার মধ্যে একটা—অবিচার।"

"অ-বি-চা-র! কার ওপরে কে অবিচার করলে, শুনি ?" অমৃতের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের সুর সীমাতিক্রম করিতেছিল।

বিমল কহিল, "আপনি কি কোনই খবর রাখেন না?... সাহেবকে মারা নিয়ে যে গোলমাল হলো, তাতে ছেলেদের ওপর কি কঠোর ব্যবহার করা হয়েছে, সেটা দেখতে পান নি?"

অমৃত উত্তেজিত হইয়া উঠিল, "একটা প্রফেসরকে ধরে বেদম মার দিয়ে বসলো,—আর তাদের ফুল-চন্দন দিয়ে পূজা করা হয় নি বলে, তুমি পড়া ছেড়ে দিচ্চো? সেই গোঁয়ার-গোবিন্দ চাষা-ক'টাকে যে শাস্তি দিয়েছে, সে কি তাদের পাপের উপযুক্ত হয়েছে বলে মনে করো তুমি? দু'বছর, চার-বছর কি,—আমি হলে ক্লাশকে ক্লাশ শুদ্ধ বরাবরের জন্য রাষ্টিকেশানের হুকুম দিতুম। এ বুঝি শুধু ঐ গুণ্ডা-দলের সর্দ্দারটাকেই চিরকালের মত করেছে?"

বিমলের শিরায়-শিরায় বিদ্যুদগ্নি ছুটিয়া গেল। অপরাহ্ন বেলার লোহিতাভা-দীপ্ত, সূর্য্যরশ্মির মত আ-ললাট চিবুক লাল করিয়া, সে তাহার আত্মীয় ও অভিভাবকের মুখে নিজের অগ্নিদৃষ্টি সংস্থাপিত করিল। তাহার মুখ হইতে এক-ঝলক আগুনের মত নির্গত হইয়া গেল, "খবরদার! তাঁর সম্বন্ধে সাবধান হ'য়ে সমালোচনা করো।"

অমৃত নিজের অজ্ঞাতসারেই বারেকের জন্য মাথা নত করিয়াই, পরক্ষণে আত্মসম্বৃত হইয়া, জোর করিয়া তাচ্ছল্যের হাসি হাসিয়া, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সুরে কহিল, "কেন বল দেখি? তিনি কি গবর্ণর জেনারেল?"

তীব্র পরিহাসের সঘৃণ হাস্যে বিমলের সমস্ত মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অবজ্ঞার সহিত সে উত্তর করিল, "তিনি গবর্ণর জেনারেল না হতে পারেন; কিন্তু তুমি কে, তার ঠিক রেখেছ কি?"

অপমানের ক্রোধে অমৃতের সুন্দর মুখ কালো হইয়া উঠিল! সক্রোধে সে ডাকিল, "বিমল!"

বিমল তাহার ক্রোধে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া, পুনশ্চ সেই ঘৃণাপূর্ণ হাসি হাসিল, "তুমি একজন বিশ্বাসঘাতক, পরের অন্নদাস;—কেমন করে তাঁর মহিমা তুমি বুঝবে? চাঁদকে কলঙ্কী বল্লে, তার গৌরব লুপ্ত হয় না;—জানো অমৃত মামা—"

বিমল কোন দিনই কাহারো মর্য্যাদা রাখিয়া চলে নাই,—অমৃতেরও না। তবে ইদানীং বড় হইয়া, কলেজে ঢুকিয়া, তাহার গ্রাম্য ভাব অনেকখানি শোধরাইয়াছিল। এমন স্পষ্ট ভাষায় অপমানও সে অমৃতকে অনেক দিনই করে নাই। বিশেষ ঐ "বিশ্বাসঘাতকতার" কথাটা তাহার মর্ম্মসন্ধিতে গিয়া বিঁধিয়াছিল; তাই বিদ্ধ বরাহের হিংস্র গর্জ্জনে ঘর কাঁপাইয়া তুলিয়া, নিজেদের বংশ-শোণিতের সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই, অমৃত কহিল, "এইজন্যই কি এত বৎসর ধরে সব ছেড়ে দিয়ে তোমায় মানুষ করলুম, বিমল? তোমার ভালর জন্য নিজের পিসির মনে মর্ম্মান্তিক দুঃখ দিয়েছি;—নিজে বিবাহ পর্য্যন্ত করি নি যে, তাতে তোমায় এমন করে দেখতে পারবো না। তারই কি এই ফল হলো?"

বিমল উথলিত ক্রোধ দমনে রাখিয়া, বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া, অমৃতকে আর একটু আশ্চর্য্য করিয়া দিয়া, তাহার অভিযোগের এই জবাব দিল, "সে যে তুমি আমায় ভাল-বেসে করো নি, সে কথা যেমন আমিও জানি, তেম্‌নি তুমি নিজেও জানো। যার জন্যে করেছিলে, সে সম্বন্ধে তুমি যে একটুও ঠকোনি, সে কথা আমি জোর করেই বল্‌তে পারি। তা যেমন তোমার সাত্ত্বিক উদ্দেশ্য, ফললাভই কি আর তার চাইতে বেশি শুদ্ধ হবে মনে করেছ মামা? তা'হলে তোমারও হিসাবে ভুল হয়েছে, বল্‌তে হবে।"

বিমল চলিয়া গেলেও, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রোধাতিশয্যে ও বিস্ময়াতিশয্যে অমৃতের মুখ দিয়া কোনই শব্দ বাহির হইল না। যখন হইল, তখন সে গুম্ হইয়া শুধু বলিল "হুঁ"।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বারীৎপুর একখানি গ্রাম হইলেও, নিতান্ত গণ্ডগ্রাম নহে। গঙ্গাতীর হইতে ইহার শোভাটিও নেহাৎ হতশ্রী দেখায় না। গ্রামের মধ্যে দুচার ঘর মধ্যবিত্তের বাস থাকায়, এই গ্রামে একটী স্কুল, একটী ছোট গোছের লাইব্রেরী, ও সম্প্রতি গ্রামের মেয়েদের জন্য একটী বালিকা-বিদ্যালয়ও সংস্থাপিত হইয়াছে। রামদয়াল গুপ্ত পুরুষানুক্রমে এই গ্রামেই বাস করিয়া আসিতেছেন। অবস্থাপন্ন বলিয়া তাঁহাদের একটি খ্যাতিও ছিল। সেটা রটিয়াছিল অনেকটা উহাঁদের দান-শক্তি-প্রভাবে;—ঐশ্বর্য্য-জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইয়া নহে। সাধারণের সকল কার্য্যে,—যেমন, স্কুল-সংস্থাপন ও পরিচালনে, লাইব্রেরী-স্থাপনায়, মিউনিসিপ্যাল যে কোন ব্যাপারে—সকল বিষয়েই রামদয়াল অগ্রণী ছিলেন। এর জন্য পয়সা খরচ তাঁহাকে কম করিতে হয় নাই। তার পুত্র আজ

তুই বৎসরাধিক হইল, তাঁহারি একমাত্র পুত্র, তাঁহারই জামাতা-প্রদর্শিত পথে, এক বিধবা তরুণী বধূ তাঁহার গলায় গাঁথিয়া দিয়া, দীর্ঘ রোগ-ভোগান্তে অনন্তের অজানা পথে যাত্রা করিয়াছে। দুশ্চিকিৎস্য রোগের বহুব্যয়সাধ্য চিকিৎসায় তাঁহার স্বল্প সঞ্চয় নিঃশেষ হইয়াছিল। এমন সময়ে তাঁহার গ্রামের মধ্যে এমন একটি ঘটনা ঘটে, যাহাতে করিয়া তাঁহার অবস্থা রঘু রাজার সঙ্গে সমানে-সমানে দাঁড়াইতে বড় বেশি বাকি থাকিল না। সে কথাটা বলার পূর্ব্বে, আর একটা ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

গ্রামের একজন জমিদার ছিলেন। বহুকাল তিনি অন্যান্য জমিদার-জাতীয় জীবদিগের মতই, অসভ্য পল্লী-জীবনের মায়া কাটাইয়া সহরবাসী। তাঁদের পুরানো ফ্যাসানের বৃহৎ অট্টালিকাটার সদর দেউড়ী খোলা থাকিলেও, ভিতরে একটী দুঃস্থ আত্মীয় ব্যতীত আর বড় কেহ থাকিত না। এই পরিবারটীর দারিদ্র্য-খ্যাতি এ অঞ্চলের মধ্যে সর্ব্বশ্রুত ব্যাপার ; এবং জমিদার-গৃহে বাস করিয়াও, উহারা একাহারী, অনাহারী থাকিয়া দিনপাত করিতেছেন—সে কথা তাঁরাও গোপন করিবার কোন প্রয়োজন বোধ করিতেন না।

একদা বহুকাল-বিস্মৃত পিতৃ-ভূমে এক জমিদার-পুত্রের আবির্ভাব হইল। দেশের লোক কৌতূহলী হইয়া ভিড় করিল ; কিন্তু বিরক্তি ও নৈরাশ্য লইয়া ফিরিয়া গেল। জমিদার-পুত্রের চেহারাটা ছাড়া, আর কোনখানটাতেই তাহার জমিদারত্ব ব্যক্ত হইতেছিল না। ছেলেটার ঘাড় চাঁচিয়া কামানো,—সামনে কোঁকড়া চুলের সুন্দর স্তর ;—উজ্জ্বল চক্ষু সোণার বাঁধনে বাঁধা চশমায় মণ্ডিত ;—গায়ে সাদাসিদা পিরাণ ও ধুতী। সে আসিয়া বড়রকম একটা ভোজ দিল না ;—খাজনা মাপ দিল না। একদিন লাইব্রেরীর বারান্দায় লোক জড়ো করাইয়া, সবার নিকট,—কলিকাতায় যেখানে সে নিজে থাকে, সেইখানেরই কি একটা অজ্ঞাত প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত যে সভা তাহারা করিয়াছে (যাহার সঙ্গে এ গ্রামের কোনই লাভ-ক্ষতির সম্বন্ধ জড়িত নয়), তাহারই জন্য চাঁদার বহি বাহির করিয়া ধরিল। গ্রাম-বৃদ্ধগণ প্রকাশ্যে নিন্দা করিলেন, অপ্রকাশ্যে গালি দিলেন। যুবার দল কেহ বা চাঁদা দিয়া জমিদারের সহিত সখ্য করিল ; কেহ বা জমিদারের সঙ্গে এবং তাঁর সঙ্গীদের সহিত বচসা আরম্ভ করিয়া দিল। জমিদার নিজে আসিয়া বলিলেন, "এ দেশের কাজ,—এতে সকলে যোগ না দিলে পাপ হইবে। অতএব তোমাদের আত্মার কল্যাণের জন্যই তোমাদের ইহাতে যোগ দিতে ডাকিতেছি।"

উহারা বলিল, "দেশের যদি কাজ হইত, তা'হইলে দেশ ইহার ফলভাগী হইত। তোমার কলিকাতার রাস্তায় গিয়া তুমি হাত-পা নাড়িয়া বক্তৃতা করিবে, তাহাতে আমার ঘরে কি অর্থ আসিবে? না, আমার গ্রামের ম্যালেরিয়া দূর হইবে? না, ভাত-কাপড় সস্তা হইবে?" জমিদার ঘৃণার সহিত হাসিয়া বলিলেন, "দেশের আইডিয়াটাই তোমাদের কত ক্ষুদ্র! দেশ বলিতে কি এই গ্রামখানিই বুঝায়? সমস্ত ভারতবর্ষই তো আমার দেশ! ভারত-লক্ষ্মী আমার দেশ-মাতা। শুধু গ্রামের উন্নতি, ঘরের উন্নতি খুঁজলে দেশের কার্য্য করা হয় না। আমাদের এখন স্বরাজ চাই, স্বাধীনতা চাই, নিজেদের সব স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, ঐ বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে।"

অপর পক্ষ চটিয়া বলিল, "রেখে দাও তোমার স্বরাজ! রেখে দাও তোমার স্বাধীনতা! নিজের গাঁয়ের ভিটে মাটি হচ্চে ; গাঁয়ে খাবার জলের অভাবে লোকে পচা জল খাচ্চে ; মড়কে মানুষ মরে গ্রাম শ্মশান হচ্চে ;—একটা ডাক্তারখানা নেই, অতিথিশালা নেই,—এইটুকুই পেরে ওঠেন না—আর ওঁরা সমস্ত ভারতবর্ষকে স্বাধীন কর্ব্বেন। সে অমনি ছেলের হাতের মোয়া কি না।"

জমিদারের দল উত্তেজিত হইয়া জবাব দিল, "ছোট কাজ কর্ব্বার অবসর অনেকেরই হয়। একটা মহত্তর ব্যাপার সংঘটিত করে তোলা মুখের কথা নহে। আগে স্বরাজ আদায় হোক, এসব তখন আপনিই ঘটে যাবে।"

বিপক্ষগণ এ কথা মানিতে চাহিল না। তাহারা সেকালের নিরাড়ম্বর দেশ-প্রীতির দু'একটা উদাহরণ দিতে বসিয়া গেল,—যখন সভা-সমিতির খুব জাঁক ছিল না, কিন্তু কাজ ছিল। ধর্ম্মের নামে জনহিতকর কার্য্য হইত। জমিদারদের বাড়ীতে চিকিৎসালয়, অনাথাশ্রম থাকিত। নিত্য-নিত্য ক্রিয়া-কলাপে গরীব সাধারণ ভালমন্দ খাইতে পাইত। পুণ্যের লোভে লোকে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠায় উত্তম পান-জলের ব্যবস্থা করিত। বৃক্ষ-ছায়ায় পথিকের তাপ দূর করিত। কেহ-কেহ দুর্ভিক্ষে

স্বরূপ এই গ্রামেরই রামদয়াল গুপ্তের নাম করিল; বলিল—"এখনও তো ঐ একটী বৃদ্ধ বেঁচে রয়েছেন। কোন ধূমধাম না করেই সকল ভাল কাজের মধ্যে আছেন। 'স্কুল চাই? আচ্ছা, দুশ নাও। পুকুর মজে উঠেছে? আচ্ছা, কাটিয়ে দিচ্চি। রাস্তা যেমেরামত,—তৈরি হলো।' তা যতটা শক্তি—অর্থ দিয়ে, যতটা শক্তি—সামর্থ্য দিয়ে, আর যতটা পারা যায়, দৃষ্টান্তে ও মিষ্টি কথায় পাঁচজনের মন ভুলিয়ে। একেই বলি দেশের কাজ! প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক পল্লীতে যদি এরই অনুকরণ হয়, তবেই তো দেশে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা আপনি হবে।"

নবীন জমিদার দল-বলকে বলিয়া দিল, "ওহে, রামদয়ালের কাছে গেলে, হয় ত বেশ বড়-রকম একটা চাঁদা আদায় হবে। তা'ছাড়া, ধরে-করে পাঁচজনের কাছ থেকেও"—

বাড়ীতে পা দিয়াই জমিদারের ছেলেটী থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সূর্য্যের প্রথমোদিত রক্ত-রাগের নবীনালোকে যেন তাহার দু' চোখ জুড়াইয়া গেল! এমন দর্শনীয় পদার্থ তাহাদের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যয়নের মধ্যে স্থান-লাভ তো করেই নাই;—বরঞ্চ মায়ার বিকার বোধে বিদূরিতই হইয়া গিয়াছে। তথাপি সেদিন ইহার দিকে চোখ পড়িতেই, তাহার অন্তরের নিগূঢ় আনন্দের তুফান তাহার সারা মনে-প্রাণে যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল;—সমস্ত বিশ্ব-সংসার যেন সেই আনন্দোজ্জ্বল মুখটির আলোয় ঝলক দিয়া উঠিল। কিন্তু সে একটী নিমেষেরই মত। তার পরই সদ্যস্নাতা, রাঙা-চেলী-পরা তারা যেমন, অপরিচিত যুবকের প্রশংসমান নেত্রের সহিত দৃষ্টি মিলিতেই, চকিতা হইয়া চলিয়া গেল, অমনি লজ্জার কালো মেঘে তরুণ সন্ন্যাসীর অন্তরের সমস্ত আলোকোৎসবের মুখ ঢাকিয়া দিল। নিজের এই আত্ম-বিস্মৃতি তাহার নিকট একটা নিরতিশয় বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়া তুলিল! সঙ্গে-সঙ্গে নিজের অন্তরের এই লুব্ধ তন্ময়তা তাহার সারা চিত্তকেই ধিক্কার দিয়া উঠিল। প্রথম প্রলোভনের কাছেই কি সে পরাজিত হইয়া গেল? এই শক্তি লইয়াই কি সে এত বড়—না, এ তাহার পরাজয় নয়। মহাদেব যেদিনে দেব-ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিয়া, ভস্মীভূত কন্দর্পের পার্শ্বোপবিষ্টা নিরুপমা উমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিয়াছিলেন, সেই দিনেই তাঁহার জিতেন্দ্রিয়তা সর্ব্বজনপূজ্য হইয়াছিল। সম্মোহন-শক্তি যতই প্রবল হয়, তাহার মোহ কাটানোর মহিমা ততই না জয়যুক্ত হইয়া উঠে! যেখানে প্রলোভন ক্ষুদ্র, সেখানে তাহার পরাভবের মহত্ত্বও মহত্তর নহে।

বৃদ্ধ জীর্ণ রামদয়ালের সহিত এই নবীন, এবং জীবনের উদ্দাম চাঞ্চল্যে সতেজ, তরুণটির অনেক কথাই হইল। রামদয়াল উহার চাঁদার খাতায় সহি দিলেন না; তবে সঙ্গে-সঙ্গেই পঁচিশটি টাকা নগদ গণিয়া উহার হাতে দিলেন। ছেলেটা খুঁৎ খুঁৎ করিয়া জানাইল, তাঁহার বদান্যতা সম্বন্ধে সে এর চাইতে ঢের বেশী গুজব শুনিয়াছিল। রামদয়াল ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, লোকে সাধারণতঃ একটু বেশি করিয়াই বলিয়া থাকে। আপাততঃ এখানে একটী মেয়ে-স্কুল করিবার কল্পনা আছে; সেজন্যও কিছু টাকা খরচের প্রয়োজন। গ্রামের কাজ ফেলিয়া গ্রামান্তরের কাজে হাত দেওয়া, তাঁহার মতে একটুখানি অসঙ্গত। অবশ্য যদি সেটা বেশী প্রয়োজনীয় না হয়।

ছেলেটী বুঝিল; ইতঃপূর্ব্বে যারা এই গ্রাম্য প্রীতি লইয়া তর্ক করিয়াছিল, তাহারা এই বৃদ্ধ ব্যক্তিটিরই ছাত্র। কিছু বিরক্ত হইয়া কহিল, "দেখুন 'আইডিয়ালটা' (আদর্শ) একটু 'হাই' (উচ্চ) হওয়ায় দোষ কি? এই যে সব সঙ্কীর্ণ মত-গুলা আপনারা প্রচার করে থাকেন, দেশের এই নূতন উদ্যমের দিনে এটা কি ভাল?"

দয়াল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন্‌টা?"

ছেলেটী উত্তর করিল "এই—গ্রামকেই সর্ব্বস্ব মনে করা! এক তো, আমাদের দেশের লোকে এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া যাওয়াকে 'বিদেশ যাত্রা' মনে করে। নিজ শ্রেণীর বাইরেই ব্রাহ্মণে-ব্রাহ্মণে এক পংক্তিতে খায় না,—ব্রাহ্মণ-কায়স্থে তো কথাই নাই। এখনও যদি আপনারা, এই সব জটিল এবং কুটিল শিক্ষার কুহক থেকে দেশকে মুক্তি দেবার চেষ্টা করে, তাকে এক বিশাল ভারতবর্ষ—এক বৃহত্তম ভারতীয় নেশনের সঙ্গে পরিচিত হতে না দিয়ে, শুধু নিজের পরিবারে—স্ব-গ্রামে বদ্ধ রাখতে চান, তা'হলে আমাদের স্ব-রাজ প্রাপ্তির আশা কি শুদ্ধ আকাশ-কুসুমেই পর্য্যবসিত হয় না?"

বৃদ্ধ ব্যক্তিটী কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিয়াছেন, এমন বোধ হইল না। মৃদুহাস্যে তাঁহার শীর্ণ মুখে এক অপূর্ব্ব আলোক-দ্যুতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি তরুণের

আবেগোত্তেজিত, আরক্ত, সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া, স্নেহ-মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "বাবা, তুমি যা বল্‌ছো, সব ঠিক। কিন্তু নিজের পরিবারকে—স্ব-গ্রামকে যদি দুর্দ্দশার মধ্যে ফেলে রাখতে চাও, তা'হলে তোমার স্ব-রাজকে তুমি প্রতিষ্ঠা করবে কোন সহরের কোন্ টাউন হলে? প্রত্যেকে যদি তোমরা তোমাদের দরিদ্র আত্মীয়ের, দরিদ্র মূর্খ প্রতিবেশীর অজ্ঞতা, রোগ, অভাব বিদূরিত কর্ব্বার জন্য বদ্ধ-পরিকর হও,—যদি সহস্র-সহস্র জলাচরণীয় জাতিকে বিদ্যা দান করো, নৈতিক চরিত্রে উন্নতি দানের চেষ্টা করো,—শত-শত অনাচরণীয় জাতিকে মানুষ করে গড়ে নেবার জন্য আত্মোৎসর্গ করো,—যে ম্যালেরিয়া সোণার বাংলাকে যমের দক্ষিণ দুয়ারে পরিণত করে তুল্‌ছে, তার উচ্ছেদকেই জীবনের প্রধান তপস্যা করে তোল,—নিজেদের পাশ্চাত্য শক্তির সঙ্গে প্রাচ্যের ধর্ম্মপ্রাণতায় অলঙ্কৃত করে তোল,—তা'হলে তার চেয়ে বড় স্ব-রাজ আর কে কোথায় পেয়ে থাকে?

ছেলেটী গভীর ভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া আরম্ভ করিল, "কিন্তু এসব পরেও হ'তে পারে। আপাততঃ যারা জোঁকের মত আমাদের সর্ব্বশরীরের রক্ত পান কর্ব্বার জন্য আমাদের গায়ের উপর বসে আছে, তাদের—" বাধা দিয়া রামদয়াল কহিলেন, "তাদের গায়ের উপর দুটো পট্‌কা বাজি ছুঁড়ে দিলেও, তারা তোমাদের গায়ের রক্ত বজায় রেখে পালিয়ে যেতে বেশী ব্যস্ত হবে না। অতএব, সেদিক থেকে মন সরিয়ে নিয়ে, যাতে তোমাদের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করে, এবং রাজা—রাজরাজেশ্বর—যিনি প্রকৃত নেওয়া-দেওয়ার কর্ত্তা—তাঁর কাছ থেকেই স্বতঃসিদ্ধ ভাবে স্বাধিকার পেতে পারো, সেই দিকেই তোমরা মনোযোগী হও। যে চেষ্টাটা ব্যর্থ এবং অনুচিত পথে—"

ছেলেটী সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিয়া উঠিল, "থাক্! আপনার এই টাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ! আমাদের দুজনকার মতের মধ্যে পঞ্চাশ বছরের তফাৎ থাকাই স্বাভাবিক। আর তা' থাক্,—বিদায়!"—ছেলেটী পিছন ফিরিতে গিয়া, পশ্চাৎ হইতে সঙ্গীতময় কণ্ঠে উচ্চারিত হইতে শুনিল, "দাদু! মা জিজ্ঞেস করলেন, খাবার আন্‌বেন কি?"

বারেক সেদিকে ফিরিয়া চাহিতেই, সেই কিশোরী উমার মত তন্বী ও গৌরী মেয়েটীর কৃষ্ণ-পল্লবে অর্দ্ধাবৃত স্নিগ্ধ দুটি চোখের উপর দৃষ্টি পড়িয়া গেল। মেয়েটী ঈষৎ বিব্রত হইয়া একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইল।

ছেলেটীর নির্ভীক দৃঢ়নিষ্ঠ-চিত্ত ঈষৎ চাঞ্চল্যের ভরে বার কয়েক তাহার বুকের মধ্যে দোলা দিয়া গেল। সে চকিতে চোখ ফিরাইয়া লইয়া, বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু বিদ্যুৎ চমকিয়া মেঘের মধ্যে লুকাইলেও, যেমন দ্রষ্টার মনের আকাশে কিছুক্ষণ তাহার খেলা চলিতে থাকে, তেমনি সেই তড়িল্লতাবৎ রূপসী তন্বীটির মূর্ত্তি কয়েকটা দিন ধরিয়াই ইহার মনের মধ্যে মাঝে-মাঝে জাগিয়া উঠিতে ছাড়ে নাই।

ইহার পর আরও দু' একবার আসিয়া সে তাহার প্রতিপক্ষ-মতের বৃদ্ধটির সহিত বিরুদ্ধ যুক্তি-প্রয়োগে তর্ক করিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই মেয়েটীকে সে আর একটী বারও দেখিতে পায় নাই। তবে ইহার পরিচয় সে পাইয়াছিল। সে এই বৃদ্ধেরই দৌহিত্রী। তাঁহার বিধবা কন্যার কুমারী মেয়ে। নাম তাহার তারা।

যে এই মেয়েটীর নামকরণ করিয়াছিল, তাহার সূক্ষ্ম-দর্শিতার উপরে ছেলেটীর কিছু শ্রদ্ধা জন্মিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জমিদার-বাড়ীতে যাঁরা আশ্রিত থাকিয়া, জমিদারের ভিটায় দীপদান করিতেন, জমিদারদের তাঁরা অনেক দূরের আত্মীয়। জমিদার-নন্দন বার-কয়েক দেশে গতায়াত করিলেন, উহার দরুণ ঐ পরিবারের দুঃখ-দারিদ্র্য যে কিছু-মাত্র কম পড়িল, এমন সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই; বরঞ্চ ঐ সৌখীন, বড়লোক আত্মীয়—যাঁর ঘরের আশ্রয়ে মাথা গুঁজিবার ঠাঁই জুটিয়াছে,—তাঁহাকে অতিথি রূপে যতটুকু সম্ভব আপ্যায়ন করিতে, উহাঁদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া যাইবার যোগাড় হইল। শুধু উনিই নহেন,—উহার সহিত আরও দু' তিনটী লোক;—দিন-দুইচার করিয়া ইঁহাদের স্থিতি। ইহারা অনায়াসে আসিয়া ঘরের চৌকাট চাপিয়া বসে। এই আত্মীয় পরিবারটী উহার খুড়া সম্বন্ধীয়। গৃহিণীকে হাসিমুখে ডাকিয়া বলে, "খুড়িমা! তোমার কইমাছের ঝোল, লাউ-ডগার ডাল্‌না সকাল-সকাল চড়িয়ে দাও, বাপু,—ভারি ক্ষিধে পেয়ে গেছে।" সারা গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে তর্ক-যুদ্ধে জয়ী হইয়া আসিয়া, উঁচু গলায় অর্দ্ধেক পথ হইতে ডাক দিতে-দিতে আসে, "খুড়িমা গো! লুচির কত দেরী?

যদি দেরি করো, পেটের জ্বালায় আমি কিন্তু আজ নিশ্চয় তা'হলে মারা যাব।" ধার-করা পয়সায় কই মাছ ও ঘৃত কিনিয়া, গরীব বেচারী খুড়িমা এই স্নেহের দৌরাত্ম্য হাসি মুখেই সহিয়া যাইতেন। দেশ-ভক্তির উচ্ছ্বাসে এ সকল ছোট কথা উদ্যমী ছেলেটীর মনেও পড়িত না; আর অযাচিত ভাবে তাহার কাছে গরম লুচির দাম চাহিতেও ইঁহাদেরও মাথা কাটা যাইত। তাই এই রসনা তৃপ্তিকর ক্ষুধা-নিবৃত্তির উপাদানগুলির যোগান দিতে তাঁহাদের উপর যে কতবড় দুর্দ্দশার চাপ পড়িতেছিল, সে কথাটা ইঁহারা বাহ্য-প্রকটিত কাষ্ঠহাসির অন্তরালে সযত্নেই গোপনে রাখিয়া দিতেন। এমন করিয়াই দিন চলিতেছিল;—এমন সময়ে তাঁহাদের আতিথেয়তার যোগ্য পুরস্কার মিলিয়া গেল। যে ছেলেটি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীতে পচিশ টাকা মাহিনার চাকরী করিত, সে একদিন তাহাদের ধনী ও দেশহিতৈষী বন্ধুর প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া, নিতান্তই বিড়ম্বনাময় দাসত্ব স্বরূপ ছোট চাকরীটাতে রিজাইন দিয়া ঘরে ফিরিল; এবং বন্ধু অসমঞ্জের নিকটেই শেখা কয়েকটা যুক্তি দেখাইয়া, বাড়ীর এবং পাড়ার লোকের সহিত ঐ বিষয়ে কিছু-কিছু তর্ক করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিধবা মা, স্ত্রী, পুত্র, ছোট-ছোট বোনেরা অর্দ্ধাহারী ছিলই;—অনাহারী হইলেও সে গ্রাহ্য করিল না। কেহ এতৎ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে বা তিরস্কার করিতে আসিলে কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া শেষে এই কথা বলিল, "মহৎ দুঃখ ব্যতীত মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হয় না।" কথাটা অসমঞ্জেরই,—তবে প্রয়োগটায় কিছু ভ্রম ঘটিয়াছিল, এই যা। যাই হোক, ছেলেটি নিজের এবং পরের দুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে-বেড়াইতে, যখন গুটিকতক গুণ্ডাগোছের ছেলেকে নিজের দলে টানিয়া, তাদের একটুখানি ভদ্রগোছের করিয়া আনিতেছে,—এমনই সময় ঐ দলবল শুদ্ধ সে একটা ডাকাতি মকর্দ্দমায় জড়াইয়া পড়িল। খুব সম্ভব সে সম্বন্ধে সে দোষীও নয়, এবং পুলিশও সে কথা জানে;—তথাপি, এই নূতন দলটাকে যখন পুষ্ট হইতে দেওয়া চলিবে না, তখন ছলে-বলে-কৌশলে যেমন করিয়া হয়, অঙ্কুরেই ইহাকে নষ্ট করিয়া ফেলা বুদ্ধিমানের—বিশেষতঃ, পুলিশের মত বেশী বুদ্ধিমানের, রাজনীতি।

ছেলের মা সারা পৃথিবী অন্ধকার দেখিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া, রামদয়ালের দুই পা সবলে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যতই রুগ্ন, যতই বৃদ্ধ হৌন, উঁহার দ্বারা সকলের সব কাজই সর্ব্বাবস্থায় ঘটিতে পারে। বিপন্নাকে কোন মতেই শান্ত করিতে না পারিয়া, অগত্যাই রামদয়াল দুঃস্থের সহায়তা করিতে—অসম্ভব জানিয়াও, প্রতিশ্রুত হইলেন; এবং অনেক চেষ্টা-যত্নে, নিজের স্বল্প-সঞ্চিত অবশিষ্ট সমুদায় সম্পত্তির বিনিময়ে, বিধবার ঐ একমাত্র পুত্রটীকে চার বৎসরের নির্ব্বাসনের পরিবর্ত্তে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ হইলেন। এর উপর আবার ঐ পরিবারটীর প্রায় পূরাপুরী সমস্ত ভারই তাঁহার স্কন্ধে পড়িল। পূর্ব্বে কতকটা থাকিলেও সম্পূর্ণ ছিল না। এই ঘরেরই একটী মেয়েকে তিনি ইতঃপূর্ব্বেই নিজের কৃতবিদ্য একমাত্র পুত্রের সহিত বিবাহিত করিয়া, উহার বিবাহ-পণের চিন্তা হইতে নিঃসম্বল বিধবাকে মুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ভাগ্যের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারেন নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। অর্দ্ধাহারে যাহার শৈশব কাটিয়াছে, যৌবনে আজও সে সেই একাহারী ব্রহ্মচারিণী বিধবা।—ইহার পর এ দেশের জমিদার-পুত্র, প্রায় দুই বৎসর হইতে যায়, আর দেশে আসেন নাই।

গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বিমল যে দিন অমৃতের হস্তে বন্দীকৃত হইয়া কলিকাতায় যায়, সেই ঘটনার পর পুরা ছয়টী বৎসর অতীত হইয়া গেল। এই দীর্ঘকালে কত ভাঙ্গা-গড়াই না হইয়া গেল! সমস্ত বিশ্ব-জগতের অঙ্গেই সে তাহার চলিষ্ণুতার তুলিকা প্রতিনিয়ত বুলাইয়া চলিয়াছে। ফলে, অঙ্কুর মহাবৃক্ষে পরিণত, মহাবৃক্ষ মহাঝড়ে সমূলোৎপাটিত হইতেছে। এই দীর্ঘ দিনে সেই ক্ষুদ্র তারা আজ ষোড়শ কলায় পরিপূর্ণ পূর্ণচন্দ্রে পরিবর্ত্তিতা হইয়াছে। কলঙ্কহীন চাঁদের মত তাহার শুভ্র সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া অভাগিনী মায়ের চিত্ত হর্ষ-বিষাদে আবার এক নূতন চিন্তা-সাগরে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। এইবার তারাকে তাহার পতির ঘরে পাঠাইতে হইবে। তারার বয়স প্রায় পঞ্চদশ পূর্ণ হইল।

এদিকে সংসার প্রায় অচল; যে দুই-তিন বৎসর ইন্দ্রাণী যাওয়া আসা করিয়া কাটাইয়াছে, তাহার জন্য মাসিক বৃত্তি অমৃত পাঠাইত। প্রায় তিন বৎসর হইতে যায়, স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে একটী কপর্দ্দকও সে পায় নাই। একবার

বড় টানাটানির সময় ইন্দ্রাণী বাপকে গিয়া বলে, "আমারও একটা ভাগ আছে তো,—সেটা কি আর পাওয়া যায় না? বিমল তো এখন সাবালক হয়েছে।"

রামদয়াল ঈষৎ বিষন্ন হাসি হাসিয়া জবাব দেন, "সাবালক হলেও সে অমৃতের হাতে। ও যে নালিশ মকর্দ্দমা না করলে টাকা দেয়, তেমন তো বোঝায় না। যা'হোক, বলো তো আমি তাকে একখানা চিঠি লিখে দেখতে পারি।"

ইন্দ্রাণীর সমস্ত চিত্ত এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এক মুহূর্ত্তেই যেন বিরাট ঘৃণায় ভরিয়া উঠিয়া বাঁকিয়া দাঁড়াইল। সে গভীর বিতৃষ্ণা-ভরে কহিয়া উঠিল, "কাকে? অমৃতকে? না, বাবা, না, সে আপনি লিখবেন না।"

রামদয়াল মেয়ের আরক্ত মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া, সন্দিগ্ধ ভাবে প্রশ্ন করিলেন, "তবে কি করবে? একেবারেই কি আদালতে যেতে চাইচো?"

একহাত জিব্ কাটিয়া, শিহরিয়া ইন্দ্রাণী কহিল, "বিমুর সঙ্গে বিষয় নিয়ে মামলা! বাবা, আপনি তো জানেন, আমি তাকে তারার চেয়ে কম ভাবি নে।"

হৃষ্ট হইয়া সেই নিঃস্ব-দাতা এবং কপর্দ্দকশূন্য ধনী ব্যক্তিটী আস্তে-আস্তে মাথাটি নাড়িতে-নাড়িতে মেয়ের শশ্মান-সৈকতের মত বৈরাগ্যময় এবং দেবার্চ্চিত গন্ধপুষ্পের মতই নির্ম্মল মুখের দিকে চাহিয়া প্রসন্ন, গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন "এই তো চাই মা! এই তো চাই! কাঁদনের এ পৃথিবী? কতটুকু জিনিষ টাকা? ধর্ম্মপথে থাকলে অর্দ্ধেক রাত্রেও মানুষের অন্ন জোটে—এতে তুমি কোন দিনই সন্দেহ করে ফেলো না। আর তোমার তারার বিয়ে! আমরা হিন্দু,—আমরা জন্মান্তরের কর্ম্ম মানি। অতীত জন্মের সঞ্চিত কার্য্যে সে যদি এ জন্মের মত পতি-লাভ অদৃষ্ট নিয়ে এসে থাকে,—সে তোমার ধন থাকলেও ওকে এসে বিয়ে করবে, না থাক্‌লেও পালাতে পারবে না। আর যদি বিয়ে না-ই হয়, তাতেও বড় বেশী পাপ হবে না মা। বরং তার চেয়ে ঢের বেশী পাপ হবে, ওর বিয়ের উপলক্ষে যদি তোমার মায়ের ধর্ম্মে আঘাত পড়ে।—"এই সময়ে কার্য্য-ব্যপদেশে আগত তারার মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে ডাকিলেন, "তারাদিদি!"

"ডাকচেন দাদু?" বলিয়া তারা আসিয়া মাতামহের পিঠ ঘেঁসিয়া বসিয়া পড়িল; এবং তাঁহার কালকুসুম-বিনিন্দিত মাথাটিতে নিজের চাঁপার কলির মত মোটা-মোটা খাটো আঙ্গুলগুলি সযত্নে প্রবেশ করাইয়া দিয়া, তাহার পরিচর্য্যা আরম্ভ করিয়া দিল। রামদয়াল ক্ষণকাল অত্যন্ত করুণা-পূর্ণ স্নেহে তাহার সেই বালিকা-সুলভ সরল মুখখানির পানে চাহিয়া থাকিয়া, অর্দ্ধ আশ্বাসে, অর্দ্ধ পরিহাসে, ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "আমি বলি কি, তারাদিদি! তুই ভাই উমার মত পতিকাম্য তপস্যায় আত্মসমর্পণ করে দে; একদিন না একদিন 'বৃষরাজকেতন' বর স্বয়ং তোকে ধরা দিয়ে, নিজের মুখেই বলতে বাধ্য হবেন,

"অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ, ক্রীতস্তপোভি—"

কি বলিস ভাই?

তারা যথাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াই, মুখে শুধু ঈষৎ একটু-খানি রাগ দেখাইয়া কহিল, "যান, তা বৈ কি।—" সে তাহার মাতামহের কাছে কালিদাসের 'কুমার সম্ভব' পড়িয়াছিল। তবে বরের কথায় লজ্জায় রাঙ্গা হইবার বয়স হইলেও, স্বভাব-ধর্ম্মে এখনও সে বালিকাই থাকিয়া গিয়াছে। কাব্যার্থ গ্রহণ করিলেও, কাব্যরসোপলব্ধি করিতে পারে নাই।

ইহার পর রামদয়ালের যত্নে ও ইন্দ্রাণীর চেষ্টায় বারীৎ-পুরে একটী ছোট-খাট-গোছ মেয়ে-স্কুল প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্ত হইল। তাহার প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হইল রামদয়াল গুপ্তের বিধবা কন্যা ইন্দ্রাণী। বারীৎপুরের দক্ষিণপাড়া নিবাসী রামদয়ালের জ্ঞাতিভ্রাতা নবদ্বীপচন্দ্র আসিয়া বলিলেন, "ভায়া, তুমিও এ বয়সে ব্রাহ্ম আচারটা নিয়ে বস্‌লে? আমরা বিদ্যমানে, আমাদের ঘরের মেয়ে যে 'গুরুমা' হয়ে মেয়ে পড়ান, এতে গুপ্তবংশের উচুঁ মাথাটা মাটিতে এসে ঠেকে যে!"

রামদয়াল ইঁহার এই গুরু অভিযোগের উত্তরে এই বলিলেন যে, "ইন্দু-মা এই যে কাজ নিয়েচেন,—এ না নিলে আমাদের অন্ন জোটবার পক্ষেও টান পড়ে যাবে। কারণ, আমার সবই প্রায় শেষ করে ফেলেছি। আর উনি তো বরাবরই আমাদের উঠোনে, পাড়ার যতগুলি গরীবের মেয়েকে চেষ্টা করে পেরেছিলেন, নিয়ে এসে, রোজ দু'এক ঘণ্টা করে তাদের হাতের লেখা, একটু পড়া, আর উপদেশ দিয়ে, যথাসাধ্য উন্নত করবার চেষ্টা করছিলেনই। ওদের মধ্যে কারু-কারুকে পৈতে কাটতে, কাঁথা সেলাই করতেও শিখিয়েছেন। তবে এখন সেই শেখানটা

একটুখানি বড় রকম করে করা হবে; আর যাঁরা পারবেন, তাঁদের কাছ থেকে কিছু-কিছু মাইনে নেওয়া হবে, এই যা। অবশ্য কাজটা অনেকটা ছোট, বই কি! তবে কি জান, জাতি ব্যবসাটা তো মেয়ের দ্বারা হবার নয়—কাজটা বড় কঠিন।

নবদ্বীপ ইহার বিরুদ্ধে দু'চারটা কঠিন যুক্তি দেখাইলেন; রামদয়ালের অন্নাভাবের কল্পনাটাকে অবজ্ঞেয় পরিহাসের সহিত কোন্‌দিকে উড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। তার পর ইহাদের কৃতসঙ্কল্প বুঝিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। সম্পর্কে বাধিলেও, রাগের মাথায় এই ধিঙ্গি বিধবার নামে এমনও দু' একটা কটু বাক্য তাঁহার মুখ দিয়া যেখানে-সেখানে বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল যে, যাহারা ইন্দ্রাণীকে পরোক্ষ বা অপরোক্ষ ভাবে জানিত, সকলেই প্রায় কাণে আঙ্গুল দিল। নেহাৎ দু' একজন লঘুচিত্ত পুরুষ, এবং অধিকাংশ নারীই, শুধু মুখ বাঁকাইয়া অর্থপূর্ণ হাসি হাসিল। কোন-কোন মেয়ে বলিল, "একে রূপ, তায় বিদ্যে,—ওলো, ও মেয়ে যে বিবি সেজে সাহেবের সঙ্গে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যায় নি, সেই ওর বাপের ভাগ্যি!" কেহ বা জবাব দিল, "সবুরে মেওয়া ফলে লো দিদি, দু'দিন মুখ বুজে সবুর করে দেখ তো—যায় না যায়! বলি, রূপ কি আর ওর একলারই আছে না কি? আমাদের দেখলেই কি আর লোকে থুথু ফেলে? আর বইও তো দু'পাঁচখানা না পড়েছি, তাও না। তবে অত গুমোর করতে কোন দিনই পারলাম না বাপু! একরকমেই চির-কাল কেটে গেল।

স্কুলে ধনীর চেয়ে দরিদ্রার সংখ্যাই বেশি। কাজেই আয়ের অপেক্ষা ব্যয়ের অঙ্কটাই বড় হয়। তথাপি, যা দশ-পনের টাকা পাওয়া যায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া, পিতার ও মেয়ের সহায়তায়, ইন্দ্রাণী এই স্কুলটিকে নিজের আদর্শ মত গড়িয়া তুলিতে, ইহার উপর যেন নিজের বুকের রক্ত ঢালিতে লাগিল। উত্তম রূপে বাংলা, সামান্য ভাবে সংস্কৃত ও ইংরাজী পাঠ্য রাখিয়া, সে নিজের সমস্ত প্রাণ দিয়া তাহার ছাত্রী-গুলির নৈতিক চরিত্র গঠিত, এবং তাহাদের অবস্থা নির্ব্বিশেষে কার্য্যকরী শিক্ষায় শিক্ষিতা করিতে চেষ্টা করিতেছিল। স্কুলে ব্রাহ্মণ হইতে হাড়ির মেয়ে পর্য্যন্ত তাহার ছাত্রী। দেব-পূজা, রন্ধন, সূচীকার্য্য, কাপড় কাটা, কলের ও হাতের সেলাই, কাঁথা সেলাই, পৈতা তোলা, চরকা কাটা, একটী বৃদ্ধ তাঁতির সাহায্যে বস্ত্র বয়ন অবধি—এবং অন্ত্যজ জাতীয়া মেয়েদের—যাদের পূর্ব্বে ধাত্রীর ব্যবসা ছিল,—উহাদের ঘরের মেয়েদের লিখিত ও মৌখিক ধাত্রী-বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। অবশ্য অর্থাভাব না ঘটিলে ইহার চেয়ে অনেক বেশি কাজই এই শিক্ষায়তনে হইতে পারিত; তবু ঐকান্তিকতার দ্বারা যত হয়, লক্ষ টাকাতেও তার অর্দ্ধেক-টুকুও কাজ হয় না। তারার শিক্ষাও এই উপায়ে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

এমন সময় একদিন রামদয়ালের শোক এবং বার্দ্ধক্য-জীর্ণ শরীরে বহু দিনের সঞ্চিত কঠিন রোগ ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকটিত হইল। ইন্দ্রাণীদের জীবন-যাত্রার পথে আরও একটুখানি জটিলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল।

বিশ্বের দেবতা

[শ্রীরমলা বসু]

হে বিপুল সীমাময় বিশ্বের দেবতা!
পাপ-পুণ্যে বিশ্বলোক করিয়া সৃজন,
তুমি হয়ে আছ তার সীমার অতীত,
আপনার পুণ্য গণ্ডি করিয়া অঙ্কন?
তুমি বসি আপনার রুদ্র-সিংহাসনে
ন্যায়ের তুলার দণ্ডে করিছ বিচার
ন্যায়ান্যায়ে পাপ-পুণ্যে মানবে পতিত
চির বিচারক রূপে প্রতি কার্য্য তার?
কে আঁকিল বিসদৃশ দেবতার ছবি?
কে কহিল সে দেবতা শুধুই কঠিন?
সৃজন করিয়া স্রষ্টা, সে সৃষ্টি হইতে
আপনারে রাখিয়াছে দূরে চির-দিন,
নহে তাহা, পাপ-পুণ্যে হইয়া জড়িত;
বিশ্বের দেবতা নহে—বিশ্বের অতীত।

অসীম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

একোনষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

দিবসের তৃতীয় প্রহর আরম্ভ হইয়াছে। পাটনা দুর্গের নিম্নে গঙ্গাতীরে অসংখ্য নৌকা আবদ্ধ রহিয়াছে। মাঝি-মাল্লারা তীরে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া রন্ধন করিতেছিল। এই সময়ে একজন আসিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "রাজমহলে কাহার নৌকা যাইবে?" একে-একে সকলকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, আগন্তুক পুনরায় নগরে ফিরিয়া যাইতেছিল,—এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিল; এবং জিজ্ঞাসা করিল, "কি বন্ধু, রাজমহল যাইবে এ কথা ত সকালবেলায় বল নাই?" নবকৃষ্ণ ফিরিয়া দেখিল, বক্তা নবীন দাস। সে কহিল, "এই সঙ্গী পাইলেই যাই। অনেক দিন রোজগার-পত্র নাই,—হাতের পয়সা ফুরাইয়া আসিয়াছে,—এই বেলা দেশে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল।" নবীন হাসিয়া কহিল, "তোমার পয়সার অভাব? বল কি বন্ধু? আমি ত দেখিতেছি, তোমার এখন একাদশ বৃহস্পতি। তুমি ইচ্ছা করিলে, এখনই হাজার টাকা রোজগার করিতে পার।" নবকৃষ্ণ সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন করিয়া, কেমন করিয়া?" নবীন কহিল, "রাজমহল যাইবার মৎলব পরিত্যাগ করিয়া, আমার সহিত আইস।"

উভয়ে নদীতীর পরিত্যাগ করিয়া, নগরে প্রবেশ করিল; এবং কিয়দ্দূর চলিতে-চলিতে, পথের ধারে একটা জীর্ণ বনময় সমাধির মধ্যে প্রবেশ করিল। দূর হইতে নবীন দাসকে আসিতে দেখিয়া, আর একজন লোক পথিপার্শ্বে এক বৃহৎ অশ্বত্থের কাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল;—নবীন তাহা দেখিতে পাইল না। সমাধির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, নবীন পাথরের কবরের উপরে বসিল; এবং নবকৃষ্ণকে আপনার পাশে বসাইল। নবকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যে বলিলেন, আমি ইচ্ছা করিলেই হাজার টাকা রোজগার করিতে পারি,—কেমন করিয়া, কেমন করিয়া?" নবীন কহিল, "অতি সামান্য কাজ।" "কি কাজ?" "দেখ, তোমার মনিবের সহিত মুরশিদাবাদ হইতে এক বুড়া বামণ আসিয়াছে,—তাহার নাম হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার:—তাহাকে চিন কি?" "বিলক্ষণ চিনি। বিদ্যালঙ্কার ঠাকুরের ছেলে সুদর্শন ঠাকুর একটি রাক্ষস-অবতার। আহারের পরে অক্লেশে দুই-কুড়ি আম ও একটা খাজা কাঁঠাল জলযোগ করিয়া ফেলে।" "সেই বুড়া বামণের কথাই বলিতেছি। বুড়াকে যদি কোন গতিকে কাশী পার করিতে পার, তাহা হইলে এখনই নগদ হাজার টাকা।" "বুড়া ত মন্দ লোক নহে! তবে তাহাকে পার করিতে চাহ কেন?" "কে ভাল লোক, কে মন্দ লোক,—সে কথা বলা বড় কঠিন। বিশেষতঃ, বড়লোকের সম্পর্কে। বুড়া মন্দ লোক না হইতে পারে; কিন্তু তাহার একটি বিধবা মেয়ে আছে জান; তাহার সহিত, বুঝিলে কি না, তোমার মনিবের—বুঝিতে পারিয়াছ ত? বুড়া সমাজের ভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে; কিন্তু মেয়েটা এখনও তোমার মনিবকে ছাড়িতে চাহে না। তোমার মনিবও যে,—আমার মনিবও সে। আমি তোমার মনিবের বড় ভাইয়ের খাস নফর; এবং তাঁহারই হুকুমে বুড়া বামণকে আর তাহার মেয়েটাকে ছোটকর্ত্তার সঙ্গ ছাড়াইতে আসিয়াছি। দেখ, যদি কোন গতিকে এই লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটাকে, আর বুড়াটাকে কাবু করিতে পার, তাহা হইলে সন্ধ্যাবেলায় নগদ হাজার টাকার একটি তোড়া তোমার দুয়ারে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিব।" "বুড়াকে কেমন করিয়া পার করিব?" "সে কথা তুমি বুঝ। পার করার অনেক উপায় আছে,—ছালায় ভরিয়া খেয়ার নৌকায় গঙ্গার পরপারেও রাখিয়া আসা যায়; আবার এক ঘায়ে বৈতরণীর পরপারেও পৌঁছাইয়া দেওয়া যায়। যখন যেমন সুবিধা হয়, সেইরূপ পথ অবলম্বন করা প্রয়োজন।"

নবকৃষ্ণ বহুক্ষণ অধোবদনে চিন্তা করিল। সেই সময়ে যে ব্যক্তি কবরের বাহিরে দাঁড়াইয়া তাহাদিগের কথাবার্ত্তা

শুনিতেছিল, সে নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে সরিয়া দুয়ারের নিকট আসিল। বহুক্ষণ পরে নবকৃষ্ণ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "টাকাটা কিছু বাড়াইতে পার?" নবীন জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" "বৈতরণী পারের খেয়ার কড়ি।" "মাত্রা বুঝিলে বলিতে পারি।" কবরের বাহিরে আগন্তুক নবীন দাসের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। নবকৃষ্ণ কহিল, "আমি তবে খবর লইয়া আসি। তোমার সহিত দেখা হইবে কোথায়?" "কেন, আখড়ায়।"

এই সময়ে, যে ব্যক্তি কবরের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল, সে ধীরে-ধীরে নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রের মধ্যে লুকাইল। অল্পক্ষণ পরেই নবীন ও নবকৃষ্ণ কবর হইতে বাহির হইয়া, সহরের দিকে গেল। আগন্তুক তখন অড়হর-ক্ষেত্র হইতে নির্গত হইয়া প্রস্থান করিল।

অর্দ্ধদণ্ড পরে আগন্তুক চৌকে মনোহর দাসের দোকানে প্রবেশ করিয়া, এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, "শেঠ কোথায়?" সে ব্যক্তি তাহাকে লইয়া দোকানের পশ্চাতে গেল। মনোহর দাস সেখানে কাঁটায় টাকা ওজন করিতেছিল। সে আগন্তুককে দেখিয়া, উঠিয়া আসিয়া প্রণাম করিয়া, আসন দিল। আগন্তুক কহিল, "শাহাজী, একবার কোন গতিকে রাজা সাহেবের তাম্বুতে একটা লোক পাঠাইতে হইবে; এবং সে লোক যতক্ষণ ফিরিয়া না আসিবে, ততক্ষণ আমাকে লুকাইয়া রাখিতে হইবে।" মনোহর দাস সবিনয়ে কহিল, "ইহা আর অধিক কথা কি মহারাজ! লোক এখনই পাঠাইতেছি। আর আপনাকে লুকাইয়া রাখা? আপনি এইখানে বসিয়া থাকিলেই হয়।"

আগন্তুক একখানা পত্র লিখিয়া দিল। মনোহর দাসের পুত্র তাহা লইয়া গেল; এবং অর্দ্ধদণ্ড মধ্যে অসীমকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। অসীম আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ, বিদ্যালঙ্কার মহাশয়?" হরিনারায়ণ নবীন দাস ও নবকৃষ্ণের পরামর্শের কথা অসীমকে জানাইলেন। অসীম কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আপনি এইখানে অপেক্ষা করুন,—আমি আপনার জন্য জনকয়েক চেলা লইয়া আসিতেছি। আপনি যে কয় দিন এ দেশে থাকিবেন, তাহারা আপনার সঙ্গে-সঙ্গেই থাকিবে।" অসীম চলিয়া গেলেন;—মনোহর দাস তাঁহাকে দোকানের বাহির করিয়া দিয়া আসিল। তখন হরিনারায়ণ তাহাকে কহিলেন, "শাহাজী, তোমার পুত্রটিকে আর একবার ছাড়িতে হইবে।" মনোহর দাস প্রণাম করিয়া কহিল, "আমার যথাসর্ব্বস্ব মহারাজের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছি; সুতরাং পুত্র যে আর একবার যাইবে, ইহা আর অধিক কথা কি?" মনোহর দাসের পুত্র আসিলে, হরিনারায়ণ তাহাকে মণিয়াকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

এক দণ্ড পরে মণিয়া আসিল; এবং হরিনারায়ণের মুখে নবীন দাস ও নবকৃষ্ণের পরামর্শের কথা শুনিয়া, হাসিয়া কহিল, "বাপজান, এই পাটনা সহরে নবীন দাস বা নবকৃষ্ণ খানসামা পয়সা দিয়া যাহা করিতে পারিবে, এই মণিয়ার মুখের কথায় তাহার দশগুণ কাজ হইবে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন,—আমি দুই-চারিজন লোক ডাকিয়া দিই,—তাহারা সদা সর্ব্বদা আপনার সঙ্গে থাকিবে।" মণিয়া এই বলিয়া চলিয়া গেল; এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে চারিজন মুসলমান লইয়া ফিরিয়া আসিল। হরিনারায়ণ যখন মনোহর দাসের দোকান হইতে বাহির হইলেন, তখন মণিয়া কহিল, "বাপজান, সন্ধ্যাবেলায় একবার শেঠজীর নিকট সংবাদ লইবেন। নবকৃষ্ণ কতদূর কি করিয়া আসে, সে সংবাদটা দিয়া যাইব।"

হরিনারায়ণ অবনত মস্তকে চিন্তা করিতে-করিতে চলিলেন; কিন্তু কোন্ দিকে যাইতেছেন, তাহা লক্ষ্য করিলেন না। মণিয়া যে চারিজন মুসলমান আনিয়াছিল, তাহারা দূরে থাকিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। অল্পক্ষণ পরে মনোহর দাসের পুত্র আসিয়া হরিনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরজী, এখন আর কি কিছু কাজ আছে?" এই আকস্মিক প্রশ্নে হরিনারায়ণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; এবং কহিলেন, "না বাপু, কাজকর্ম্ম এখন আর কিছু নাই। বিপদে পড়িয়া তোমাকে দুই-তিনবার পরিশ্রম করাইয়াছি; সেজন্য অপরাধ লইও না।" মনোহর দাসের পুত্র আর কোনও কথা না কহিয়া, প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। হরিনারায়ণ কিন্তু বুঝিতে পারিলেন না যে, সেই সময় হইতে তাঁহার চেলার সংখ্যা বাড়িয়া গেল। তিনি অন্যমনস্ক হইয়া যে পথ ধরিয়া চলিতেছিলেন, সেই পথেই চলিতে লাগিলেন।

ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

মণিয়া যখন আখড়ায় আসিয়া পৌঁছিল, তখন নবীন দাস আহার শেষ করিয়া, দুয়ারে বসিয়া তামাকু সেবন

করিতেছিল। এই দুই দিনে তাহার পরিচ্ছদের বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। এখন আর তাহাকে বাঙ্গালা দেশের একটি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামের ক্ষৌরকার বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। মণিয়া আসিলে, সে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া, ভিতরে লইয়া গেল; এবং একখানা খাটিয়ার উপরে বকপক্ষবৎ শুভ্র শয্যা বিস্তার করিয়া তাহাকে বসাইল; এবং বহুসুগন্ধযুক্ত তাম্বুল রচনা করিয়া দিল। মণিয়া বসিল, এবং ঈষৎ হাসিয়া, প্রৌঢ় নরসুন্দরকে চরিতার্থ করিয়া দিল। নবীন দাস একবার খাটিয়ার উপরে বসিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু অবশেষে তাহার ভরসায় কুলাইয়া উঠিল না। সে তখন স্বতন্ত্র শয্যায় বসিয়া, মণিয়ার সহিত বিশুদ্ধ প্রেমালাপের উপক্রমণিকা আরম্ভ করিল।

নবীন জিজ্ঞাসা করিল, "বিবি সাহেব, তোমার এই বয়স,—তুমি এখন হইতে সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছ কেন?" মণিয়া সুদীর্ঘ কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "তুমি পুরুষ,—তোমাকে সে কথা বলিয়া আর কি হইবে?" "কেন, পুরুষ-জাতির অপরাধ কি বিবি সাহেব?" "পুরুষ জাতি ফেরেপবাজ ও নিমকহারাম। এক ফেরেপবাজের জন্যই আমি যৌবনে যোগিনী সাজিয়াছি।" "একজন ফেরেপবাজী করিয়াছে বলিয়া কি সকলেই দোষী হইবে? বিবি সাহেব, এ বড় অবিচারের কথা!" "একবার যখন বিশ্বাস হারাইয়াছি, তখন কি আর সহজে বিশ্বাস করিতে পারি?" "গোলামকে একবার বিশ্বাস করিয়াই দেখ না! যে কমবখ্‌ৎ তোমার সহিত ফেরেপবাজী করিয়াছিল সে বোধ হয় অন্ধ?" "না, তাহার চক্ষু দুইটি তোমারই মত বাবু সাহেব!" আনন্দে উন্মত্ত হইয়া নবীন দাস বলিয়া উঠিল, "জয় রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ। বল কি বিবি সাহেব! তোমার ঐ কোমল অঙ্গে সন্ন্যাসিনীর সাজ বড়ই কঠিন-বোধ হইতেছে।" অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া মণিয়া কহিল, "বাবু সাহেব, সে দিন গিয়াছে। এমন দিন ছিল, যখন প্রভাতে উঠিয়া, চোখের কোলে সুরমা টানিতে ভুল হইলে, ঘরের বাহির হইতে লজ্জা করিত।" নবীন ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আরে ছি, জয় রাধে কৃষ্ণ, বল কি বিবি সাহেব? তোমার চোখের কোলে সুরমা! সে ত স্বয়ং ভগবান্ টানিয়া দিয়াছেন। তুমি রহস্য করিতেছ বুঝি?" "রহস্য করিব কেন, বাবু সাহেব? আমার যে মাশুক—" "তাহার নাম করিও না;—সে অন্ধ,—তাহার চৌদ্দপুরুষ অন্ধ ছিল। দেখ বিবি সাহেব, এই গেরুয়া কাপড় ছাড়িয়া যদি একবার আগেকার পোষাক ধর, তাহা হইলে—" মণিয়া বস্ত্রাঞ্চলে শুষ্ক নেত্র মুছিয়া কহিল, "কাহার জন্য করিব—বল?" নবীন দাস ফাঁপরে পড়িল। তাহার বড় ইচ্ছা হইল, সে বলে, 'কেন, আমার জন্য'; কিন্তু সে কথা উচ্চারণ করিতে তাহার ভরসা হইল না। মণিয়া কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনের ভাব বুঝিতে পারিল; এবং কহিল, "তখন দিনে পাঁচবার করিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতাম;—এখন যে কেশে জটা পড়িয়া আসিতেছে! তখন রঙ্গিন ফুলের মালায় এই কেশ জড়াইয়া রাখিতাম;—মাশুক তাহা সোহাগ করিয়া খুলিয়া দিত।"

এই সময় নবকৃষ্ণ বেগে প্রবেশ করিয়া, মণিয়াকে দেখিয়াই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। নবীন তাহার ভাবগতিক দেখিয়া, হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বন্ধ, সংবাদ কি? ইনি সন্ন্যাসিনী,—পুরুষের ফেরেপবাজীতে পড়িয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং ইঁহার সাক্ষাতে তুমি একটু সাবধান হইয়া সকল কথাই বলিতে পার।" নবকৃষ্ণ কহিল, "সমস্তই ঠিক। এখন নগদ দুইশত, কাজ হাসিল হইলে আর তিন-শত।" নবীন কহিল, "কি ব্যবস্থা করিলে?" "বুড়া যখন ঘরে ফিরিবে, তখন পথে একেবারে বৈতরণী পার করিয়া দিব।"

মণিয়া অল্প-অল্প বাঙ্গালা বুঝিত। 'বাড়ী ফিরিবার সময়ে পথে' পর্য্যন্ত সে বুঝিল; কিন্তু বৈতরণী পারের কথাটা সে বুঝিতে পারিল না। নবীন দাস উঠিয়া গিয়া, অন্য ঘর হইতে টাকা লইয়া আসিল; এবং নবকৃষ্ণ তাহা লইয়া চলিয়া গেল। অবসর বুঝিয়া মণিয়া কহিল, "বাবু সাহেব, সন্ধ্যা হইয়া আসিল,—আমি তবে এখন আসি। মাশুকের ফেরেপবাজীর কথাটা কাল আসিয়া শুনাইয়া যাইব।" প্রৌঢ় নবীন দাস সে কথা শুনিয়া, যেন বৈকুণ্ঠ হইতে পৃথিবীতে আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহার প্রথমে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না;—সে নির্নিমেষ নয়নে মণিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মণিয়া তাহার অবস্থা দেখিয়া, বহু কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু সাহেব, অমন করিয়া কি দেখিতেছ?" নবীন বহু কষ্টে উত্তর করিল, "হ্যাঁ—তা—না—" মণিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি সুর ভাঁজিতেছ, বাবু সাহেব?" "সাহসে কুল-

করিয়া নবীন এক নিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, "আমাকে মণিয়া বাঈয়ের বাড়ী লইয়া যাইবে না ?" "কেমন করিয়া লইয়া যাইব,—তুমি ত বহুরূপী সাজিলে না!" "এই সাজি, এই সাজি,—তুমি একটু দাঁড়াও। আমি একদণ্ডের মধ্যে—থুড়ি, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে, বিবি সাহেব, দোহাই তোমার—" "তুমি সাজিয়া থাক, আমি ফিরিয়া আসিতেছি।" মেঘান্তরালে বিদ্যুল্লতার ন্যায় তন্বীর গৌর দেহ সহসা অন্তর্হিত হইল। নবীনদাস হতাশ হইয়া ভূতলে বসিয়া পড়িল।

মণিয়া আখড়া হইতে বাহির হইয়া দ্রুতপদে মনোহর দাসের দোকানে গেল; এবং তাহার পুত্রকে দিয়া অসীমকে বলিয়া পাঠাইল যে, অদ্য রাত্রিতে হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার গৃহে ফিরিলে, বিপৎপাতের সম্ভাবনা আছে। সংবাদ পাঠাইয়া সে গৃহে ফিরিয়া গেল; এবং অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে মসীকৃষ্ণ কাফ্রী-বালক সাজিয়া আখড়ায় ফিরিয়া আসিল। নবীন তখন হতাশ মনে তামাকু সাজিতেছিল। সে তাহাকে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কে রে ?" মণিয়া সুদীর্ঘ সেলাম করিয়া কহিল "জনাব, মণিয়া বাঈনে মুঝে ভেজি।" "উচ্ছন্ন যা, কি বলিলি ?" মণিয়া দ্বিতীয় বার সেলাম করিয়া কহিল, "হজরৎ, গোলাম হাজির।" নবীন অধিকতর বিরক্ত হইয়া কহিল, "তাহা ত দেখিতেছি,—এখন কি করিতে হইবে বাপু ?" কাফ্রী কহিল, "মণিয়া বাঈনে মুঝে ভেজি।" "ভাল আপদ! আরে বাপু, সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে যে সে মানুষটা কোথায় গেল ?" কাফ্রী-বালক মাথা নাড়িল। নবীন ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "মাথা নাড়া,—তবে তুই বেটা কি করিতে আসিয়াছিস্ ? আমি তোর চাইতে দশগুণ জোরে মাথা নাড়িতে পারি।" নবীন বেগে মস্তক সঞ্চালন করিল; মণিয়া তাহা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। নবীন অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া কাফ্রী বালককে প্রহার করিতে গেল। বালক পলাইল। তখন হতাশ হইয়া আখড়ায় ফিরিয়া আসিয়া, নবীন পুনরায় তামাকু সাজিতে বসিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বালক পুনর্ব্বার আসিয়া, দূর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "হজরৎ ?" নবীনচন্দ্র কথঞ্চিৎ প্রসন্ন হইয়া কহিল, "বাপধন, নিকটে এস।—একবার তামাকু ইচ্ছা করিবে ? কাফ্রী-বালক শুভ্র দন্ত-পংক্তি বিকশিত করিয়া কহিল, "জী।" নবীন হুঁকা হইতে কলিকাটি নামাইয়া বারান্দায় রাখিল। বালক নিকটে আসিয়া, তাহা উঠাইয়া লইয়া টানিতে আরম্ভ করিল। নবীনদাস তখন প্রশ্ন আরম্ভ করিল, "ওরে, একটা খবর বল না ভাই! ওই যে আউরৎ এখানে এসেছিল, সে কাঁহা গেয়া ? ভারি খুবসুরৎ বুঝলি কি না,—এই চাঁপা ফুলের মত রং বুঝলি কি না,—রম্ভা মেনকা উর্ব্বশীর মত বুঝলি কি না ?" বালক কলিকাটি নামাইয়া রাখিয়া কহিল, "জী।" নবীন সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "এই ত বাপধন, এখন বেশ বুঝিতেছ, সে আউরৎ কোথা গেল ?" বালক হাসিয়া কহিল, "জী।" নবীন ক্রুদ্ধ হইয়া বালককে ধরিতে গেল; কিন্তু সে দ্রুত পদে পলাইল।

এই সময়ে পাটনা সহরের আর এক অংশে একজন সওয়ার আসিয়া, হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কারের হস্তে একখানি পত্র দিল। তিনি তাহা পাঠ করিয়া কহিলেন, "বহুৎ আচ্ছা, লোক কোথায় ?" পথে দুই-চারিজন লোক দাঁড়াইয়া ছিল,—সওয়ার তাহাদিগের একজনকে ডাকিয়া কি বলিয়া দিল। সে হরিনারায়ণের সঙ্গে গঙ্গাতীরে চলিয়া গেল। গঙ্গাতীরে একখানা প্রকাণ্ড ছিপ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি ছিপে উঠিলে, তাহা বিদ্যুৎ-গতিতে পূর্ব্ব দিকে চলিয়া গেল।

কাফ্রী-বালক এবারে আর ফিরিয়া আসিল না। নবীন আখড়ার চারিদিকে মণিয়ার সন্ধান আরম্ভ করিল। চারিদিক ঘুরিয়া নবীন যখন ক্লান্ত হইয়া আখড়ায় ফিরিয়া আসিল, তখন মণিয়া দুয়ারের পার্শ্ব হইতে বাহির হইয়া, সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হজরৎ ?" নবীন কহিল, "বেটা পাজি!" মণিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "জী।" নবীন বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইল। মণিয়া কহিল, "জনাব তসরিফ লে চলিয়ে।" নবীন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ আবার কাহাকে বলে বাপু ?" "বাঈ সাহেব মজুরাপর যায়েঙ্গে।" "মজুরাটি কি, হাতী, ঘোড়া, না পাল্‌কী ?" মণিয়া আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। সে হাসিয়া কহিল, "আপ জলদি চলিয়ে!" নবীন হাসিয়া কহিল, "হাঁ, এ কথাটা বুঝি। কিন্তু বাপধন, সে রম্ভা না আসিলে নবীনদাস চলিতেছেন না।" কাফ্রী-বালক যেন ইঙ্গিতে সে কথা বুঝিল, এবং সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি আসিল; তথাপি নবীনদাসের রন্ধা আসিল না। সে বারবার তামাকু সাজিয়া কলিকা গরম করিয়া ফেলিল। এক প্রহর রাত্রি কাটিয়া গেল,—বাদশাহী নহবৎ বাজিয়া উঠিল,—তথাপি কেহ আসিল না। তখন নবীনদাস মাথায় চাদর বাঁধিয়া রম্ভার সন্ধানে বাহির হইল। আখড়ার বাহিরে তাঁহার সহিত সরস্বতীর সাক্ষাৎ হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি নবীনদাদা, কোথায় চলিয়াছ?" নবীন কহিল, "বড় জরুরী কাজ,—ফিরিতে বোধ হয় রাত্রি হইবে।"

একষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

তম্বুরা ও পাখোয়াজের বোঝা লইয়া সুদর্শন যখন মণিয়ার গৃহে উপস্থিত হইল, তখন মণিয়ার মাতা সম্মার্জ্জনী হস্তে গৃহমার্জ্জনা করিতেছিল। সে সুদর্শনকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই? আমরা নূতন ওস্তাদ রাখি না।" সুদর্শন অভ্যর্থনা শুনিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া গেল; এবং বহুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "মণিয়া বাঈ ঘরে আছে?" বৃদ্ধা মতিয়া দুয়ারে সম্মার্জ্জনী আঘাত করিয়া কহিল, "মুলাকাৎ নেহি হোগা।" সুদর্শন ভীত হইয়া দশ হস্ত পশ্চাতে সরিয়া গেল। মতিয়া তখন গৃহের দুয়ার বন্ধ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। সুদর্শন তখন বাধ্য হইয়া অদূরে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিল। দেখিতে-দেখিতে দুই দণ্ড কাটিয়া গেল; কিন্তু মণিয়া আসিল না। ব্রাহ্মণ ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িল।

বেলা পড়িয়া আসিল। ক্ষুৎ-পিপাসায় অস্থির হইয়া সুদর্শন পুনরায় মণিয়ার দুয়ারের নিকটে গিয়া করাঘাত করিল। ভিতর হইতে কে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কে?" সুদর্শন উত্তর দিলেন, "আমি, সুদর্শন ভট্টাচার্য্য।" কিয়ৎক্ষণ পরে এক বৃদ্ধ মুসলমান আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। সুদর্শন তাহাকে কহিল, "আমি মণিয়া বাঈয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।" বৃদ্ধ কহিল, "বাঈ ঘরে নাই,—কোথায় গিয়াছে বলিতে পারি না।" সুদর্শন হতাশ হইয়া কহিল, "মিঞা সাহেব, প্রায় এক প্রহর বসিয়া আছি,—সমস্ত দিন আহার হয় নাই। মণিয়া বাঈ কখন আসিবেন, বলিতে পার?" বৃদ্ধ দুঃখিত হইয়া কহিল, "মহাশয়, সে কমবখ্‌তী যে কখন্ আসে, আর কখন্ যায়, তাহা আমি বলিতে পারি না। সকলে বলিতেছে, সম্প্রতি তাহাকে জিনে ধরিয়াছে। জিন তাহাকে, বাটীর বাহির হইলেই, আশমানে উড়াইয়া লইয়া যায়। কোথায় যে লইয়া যায়, তাহা মানুষে কেমন করিয়া বলিবে। আপনি ক্ষুধিত হইয়াছেন; সুতরাং আর কতক্ষণ অপেক্ষা করিবেন? সন্ধ্যাবেলায় একবার সংবাদ লইয়া যাইবেন।" বৃদ্ধা মতিয়া বোধ হয় নিদ্রিতা হইয়াছিল; সে এই সময়ে অপরিচিত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনিয়া, গৃহের অভ্যন্তর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ হ্যায় রে?" এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বাহিরে আসিল। সুদর্শনকে দেখিয়াই বৃদ্ধা জ্বলিয়া উঠিল এবং কহিল, "তুই ফের আসিয়াছিস্?" সুদর্শন অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া উত্তর দিতে ভুলিয়া গেল। বৃদ্ধা তখন দ্রুতবেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়া, বাহির হইতে দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল; এবং বাহিরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তাহার ক্রন্দনে পল্লীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; এবং সকলেই একসঙ্গে তাহাকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু কেহই উত্তর দিল না। বৃদ্ধা ক্রন্দনের মধ্যে দুই-একবার জিন-জিন বলিয়া চীৎকার করিতেছিল। তাহা হইতে দুই-একজন বুদ্ধিমান্ প্রাতিবেশী বুঝিল যে, জিন মণিয়া বাঈকে ধরিতে আসিয়াছে। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "জিন কোথায়?" বৃদ্ধা চীৎকার বন্ধ না করিয়াই, গৃহের রুদ্ধ দ্বার দেখাইয়া দিল। দুই-চারিজন সাহসী পুরুষ সাহসে ভর করিয়া দুয়ার খুলিয়া দেখিল, বৃদ্ধ গৃহস্বামী ও একজন অপরিচিত পুরুষ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুদর্শনকে দেখিয়া বৃদ্ধার চীৎকারের মাত্রা বাড়িল; এবং সে বলিল, "ঐ জিন, ঐ জিন।" তখন সকলে মিলিয়া সুদর্শনকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। সুদর্শন এত আশ্চর্য্য হইয়া গেল যে, তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সহৃদয় প্রতিবেশিগণের মধ্যে একজন ওঝা ডাকিতে ছুটিল; একজন কাজী ডাকিতে গেল; এবং দুই-চারিজন দল বাঁধিয়া ফৌজদারকে সংবাদ দিতে গেল। সুদর্শনের তম্বুরা ও পাখোয়াজগুলি বৃক্ষতলে পড়িয়া ছিল,—তাহা যে পাইল সে-ই উঠাইয়া লইয়া গেল।

ওঝা ও কাজী আসিবার পূর্ব্বে ফৌজদার আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিয়াই,

সুদর্শনকে লইয়া কোতোয়ালীতে চলিয়া গেল। মণিয়া যখন বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গৃহে আসিল, তখন মাতাকে দেখিতে না পাইয়া সে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিতা হইল না। কারণ, তাহার মাতা মধ্যে মধ্যে না বলিয়া চলিয়া যাইত। কোমল-হৃদয়া প্রতিবেশিনীদিগের অনুগ্রহে তাহার সংবাদ জানিতে বিলম্ব হইল না। তাহারা আসিয়া বলিয়া গেল যে, জিন তাহার সন্ধানে আসিয়াছিল; এবং তাহাকে না পাইয়া, তাহার মাতাকে ধরিতে গিয়াছিল। পল্লীর সকলে মিলিয়া তাহার মাতাকে বাঁচাইয়াছে; এবং ফৌজদার আসিয়া জিনকে লইয়া গিয়াছে। মণিয়া প্রথমে মনে করিয়াছিল যে, হয় ত অসীম আসিয়াছিলেন; কিন্তু সে যখন শুনিল যে, জিন তালগাছের মত লম্বা এবং মসীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, তখন তাহার চিন্তা দূর হইল। সে প্রতিবেশিনীদিগকে বিদায় করিয়া কাফ্রী বালক সাজিল, এবং বুর্খায় আপাদ-মস্তক মণ্ডিতা হইয়া চলিয়া গেল।

একজন প্রতিবেশী আসিয়া যখন অসীমকে সংবাদ দিল যে, হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার এবং সুদর্শন তখনও গৃহে ফিরিয়া যান নাই, তখন তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত। বাদশাহ আদেশ দিয়াছেন যে, লস্কর প্রভাতে পাটনা ত্যাগ করিয়া কুচ্ করিবে। তিনি ভূপেন্দ্রকে বিদ্যালঙ্কার-গৃহে পাঠাইয়া দিয়া, যাত্রার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল,—শিবিরে অসংখ্য মশাল জ্বলিয়া উঠিল,—রাত্রির প্রথম দণ্ড কাটিয়া গেল; কিন্তু ভূপেন্দ্র তখনও ফিরিল না দেখিয়া, অসীম উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে বিদ্যালঙ্কার-গৃহে যাত্রা করিলেন।

তিনি গিয়া দেখিলেন যে, ভূপেন্দ্রের নিকট হরিনারায়ণের সংবাদ পাইয়া দুর্গাঠাকুরাণী ও বধূ আশ্বস্তা হইয়াছেন বটে, কিন্তু তখনও কেহ আহার করেন নাই। অসীম বড় বধূর নিকট জানিলেন যে, সুদর্শন সম্ভবতঃ তম্বুরা ও পাখোয়াজ স্কন্ধে করিয়া মণিয়ার গৃহে গিয়াছেন; এবং তাহা শুনিয়া ভূপেন্দ্রও সেই দিকে গিয়াছে। তিনি স্ত্রীলোকদিগকে আশ্বাস দিয়া মণিয়ার গৃহাভিমুখে চলিলেন। তিনি দেখিলেন যে, মণিয়ার গৃহের দ্বারে এক কাফ্রী বালক দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু তিনি অন্ধকারে তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। কাফ্রী তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" বালক ইঙ্গিতে জানাইল, সে মূক। মণিয়ার গৃহে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, অসীম প্রতিবেশীদিগের নিকট জানিলেন যে, মণিয়ার পিতা ও মাতা ফৌজদারীতে গিয়াছে! তাহা শুনিয়া তিনি সহর কোতোয়ালীতে চলিলেন।

ফৌজদার তাঁহার পরিচয় পাইয়া সুদর্শনকে ছাড়িয়া দিল। দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে ভূপেন্দ্র ও অসীম সুদর্শনকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে পথে এক ব্যক্তিকে দেখিয়া অসীম দাঁড়াইয়া গেলেন। সুদর্শন জিজ্ঞাসা করিল, "দাঁড়াইলি কেন?" অসীম কহিলেন, "ধীরে, ভাই, ধীরে,—লোকটা পরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে।" ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "বলি, তোর আক্কেলটা কি? এই দুই প্রহর রাত্রিতে তুই কি এখন পরিচয় করিতে বসিবি না কি?" অসীম যাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি বাঙ্গালা কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া অসীম অন্ধকারে লুকাইলেন। সে নিকটে আসিয়া সুদর্শনকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কি বাঙ্গালী?" সুদর্শন উত্তর দিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু ভূপেন্দ্র ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে নিরস্ত করিল। আগন্তুক উত্তর না পাইয়া ধীরে-ধীরে চলিয়া গেল। তখন অসীমের নির্দ্দেশ মত ভূপেন্দ্র সুদর্শনকে লইয়া গৃহে ফিরিল। অসীম আগন্তুকের অনুসরণ করিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া আগন্তুক এক গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার মুখে আলোক পড়িতে, অসীম প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ফিরিবার সময়ে তিনি দূর হইতে শুনিতে পাইলেন, গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, এবং আগন্তুক গৃহে প্রবেশ করিল।

একটী নিবেদন

[শ্রীলাবণ্যবালা ঘোষ]

আজকাল যে স্ত্রী-স্বাধীনতার ধূয়া উঠেছে, তার প্রধান প্রশ্ন-দুটী নিয়ে বেশ আলোচনা চলেছে সমাজে। প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে, স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য আছে কি না; ও দ্বিতীয়টী হচ্ছে, পুরুষ এবং স্ত্রীর মনোবৃত্তির বিকাশ সম ভাবে হয় কি না। এক কথায়, নারী পুরুষের সঙ্গে এক স্তরে দাঁড়াতে পারে কি না,—তার জাতিগত ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। এই যে স্ত্রী-স্বাধীনতার সাড়া পড়ে গেছে বিশ্বময়,—নারী যে আজ সব শৃঙ্খলের বন্ধন খুলে ফেলে, বন্ধনমুক্ত হয়ে খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে—তার কারণ কি? আর ওদিকে যে পুরুষেরা দুই দল বেঁধেছেন,—একদল নারীর পক্ষ সমর্থন করে যাচ্ছেন, আর, আর একদল যে তাই তাদের উপর রোষ-কষায়িত লোচনে তাকিয়ে তিরস্কার বর্ষণ কর্‌ছেন—তাই বা কারণ কি? এই প্রশ্নগুলির সমাধানের ভার সমাজপতিদের উপরই দেওয়া গেল,—তাঁরাই বিচার করে দেখুন। ওগো সমাজপতিরা! নারীর জীয়ন-কাটি ও মরণ-কাটির ভার তোমাদের উপরেই দিয়েছেন স্বয়ং স্বয়ম্ভূ। প্রভুত্ব পেয়ে যখন সেই প্রভুত্বের সীমা অতিক্রম করে গেলে—তারও একটা সুফল বা কুফল, যা বল,—একটা কিছু আছেই। কোন বিষয়ের বাড়াবাড়ি করা ভাল নয়। লেবু বেশী কচ্‌লালেই তিত হয়ে যায়। যতদিন স্ত্রীজাতির উপর আধিপত্য করা খেটেছে, ততদিন তোমরা তা করেছ। তাকে সকল বিষয়ে খর্ব্ব ও হীন করে রেখেছিলে; তাই তার মনো-বৃত্তিগুলি ভাল করে ফুটে উঠতে পারে নি।—কেবল বোধ হয় ভাবের দিকটাই ফুটিয়ে তুলতে পেরেছ তোমরা; অথবা তোমরা তা কর নি,—নারী আপন স্বভাবগুণেই ভাবময়ী ও স্নেহময়ী। স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী বলে তাকে সর্ব্বদাই পায়ের নীচে স্থান দিয়েছ তোমরা;—তারা না কি কিছু বোঝে না,—জানে না,—শক্তি নেই;—তাই, "তোমরা চুপ করে থাক, আমরা যা বলি, তাই কর বিনা বাক্য ব্যয়ে"—এই মন্ত্রেই দীক্ষিত করেছিলে তাদের। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ পর্য্যন্ত না কি তারা তোমাদেরই আজ্ঞা বহন করে এসেছে বিনা বাক্য ব্যয়ে;—তবে আজ কেন তারা মুখ খুলেছে! একদিন যা তারা আনন্দের সহিত করে এসেছে, আজ আর তারা তা পারছে না কেন,—নিশ্চয়ই এর একটা কারণ আছে। কারণ ব্যতীত কার্য্য কখন হয় না। হেয়-জ্ঞান কর নি বলছ? আচ্ছা, তাই মানলাম। কিন্তু সমাজে কোথায় স্থান দিয়ে এসেছ তাদের? তা তোমরাই ভেবে দেখ।

তাদের অন্ধকার ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখে,—বাহিরে বিচিত্র প্রকৃতির ভিতর যে তাল-লয়-শুদ্ধ একই সুর বেজে চলেছে,—সেখানে ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ সব যে এক নিয়মে

বাধা—এ সংবাদ না দিয়ে বলেছ, "এই বদ্ধ ঘরের মতই পৃথিবীটা; সেখানেও অন্ধকার,—আলো নেই; অতএব এইখানেই থাক তোমরা। বাইরে দেখ্‌বার মত, জান্‌বার মত কিছু নেই।" এই যে বন্দীত্ব—এর শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলতে কি কম চেষ্টা ও কষ্ট করতে হয়েছিল ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ৺রামমোহন রায় প্রভৃতিকে? পাশ্চাত্য শিক্ষায় মোহ থাক্‌তে পারে। কিন্তু তারই গুণে আমরা অন্ধকার ঘরের ফাটলের ভিতর দিয়ে যে একটীমাত্র আলোক-রেখা দেখ্‌তে পেয়েছি! এখন ত তোমাদের প্রতারণা ধরা পড়া গেছে। তবে কি করে তোমাদের কথায় বিশ্বাস করে' রুদ্ধ অন্ধকার ঘরে হাঁপিয়ে মরি? শুন্‌লাম, জান্‌লাম, বুঝ্‌লাম, যে, বাহিরে আলো আছে, বাতাস আছে; প্রাণীকে সতেজ রাখ্‌বার কত কি উপাদান আছে। আর কি রুদ্ধ ঘরে থাকা যায়?

এই যে ঘর, এই যে বন্দীত্ব—এ যে চিন্তার অধীনতা! এতদিন তোমাদের চিন্তাই ছিল আমাদের চিন্তা; তোমাদের বুদ্ধিই ছিল আমাদের বুদ্ধি;—আর তাই ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিতে কুণ্ঠিতাও হই নি। সবাই যে মন্ত্রণা করে আমাদের এই ভাবে বন্দী করে রেখেছিলে, তা' ত বুঝি নি! তাই যখন জান্‌লাম জ্ঞানের আলোকে, যে, চিন্তার স্বাধীনতা মানুষ মাত্রেরই আছে; এবং তাতে পাপ নেই—নিষেধও নেই,—তখন হ'তে এই স্বাধীনতা পাবার জন্যেই কাঁদাকাটি, অনুনয়-বিনয়।

যাঁরা স্ত্রী-স্বাধীনতার ফলে নারীকে "স্বেচ্ছা বিহারিণী ও স্বৈরিণী" মনে করেন, তাঁরা যে এখনও স্ত্রী-স্বাধীনতার মর্ম্ম বোঝেন নি। নারী-জাতির অপমান নারীর দ্বারা সম্ভবে না। ওগো ভাইরা! তোমরা কি তাদের একবার জিজ্ঞেস করেছ, "তোমরা কি চাও! তোমাদের স্বাধীনতার মানে কি?" আগে ত বলেছি, তোমরাই তাদের জীয়েন-কাটি ও মরণ-কাটি রেখেছ তোমাদের কাছে। তোমাদের শ্রদ্ধা, তোমাদের সহানুভূতি, তোমাদের সহযোগিতা, তোমাদের উৎসাহই যে তাদের জীয়েন-কাটি। যে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাবিহারিণীর সৃষ্টি করে, নারী সে স্বাধীনতা চায় না। সবাই জানে, বন্ধনেই মুক্তি। সে বাঁধন ছেড়ে কেউ যেতে চায় না। স্বাধীনতা মানে মুক্তি হ'তে পারে; কিন্তু, উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। আমরা চাই চিন্তার স্বাধীনতা। ভগবান্ ভাল-মন্দের জ্ঞান ও তা' বিচার কর্‌বার শক্তি স্ত্রী ও পুরুষ সকলকেই সমান ভাবেই দিয়েছেন। চিন্তা কর্‌বার শক্তি, কার্য্যে ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগ ও সুখ-দুঃখের অনুভূতি সকল মানুষেরই আছে; কিন্তু, নারী এতদিন জান্‌ত না যে, তার অন্তর্জগতে এত ঐশ্বর্য্য ও শক্তি আছে। কেউ ত তাকে জহুরীর কায শেখায় নি। যে নিজেকে জানে না, বোঝে না,—সে অন্যকেও জান্‌তে, বুঝ্‌তে পারে না; এবং নিজেকেও বোঝাতে পারে না ঠিক মত। এই এই জন্যই নারী-চরিত্র তোমাদের কাছে জটিল বোধ হয়েছে বরাবর। তার আত্ম-চিন্তার শক্তি যে ছিল না এতদিন! আজ পাশ্চাত্য জগতের এই আলোটুকু ধার করে নিয়ে তারা জান্‌তে পেরেছে যে, তাদের হৃদয়ের সব রত্নগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ব্যবহার না করে। তাই কি তাদের এত অপরাধ! তোমরা তাদের যা জান্‌তে দিতে চাও নি, তাই তারা জান্‌তে পেরেছে বলে আজ তোমাদের এত রাগ! তারা ত কোন অংশে পুরুষের চেয়ে হীন নয়;—তারা পুরুষের সঙ্গে সমানে সব কাযে চলতে পারে।

নারী যে আজ স্বাধীনতা পাবার জন্য এত ব্যস্ত, সে ত তোমাদেরই উপকারের জন্য। তোমরা বল তারা শক্তি-রূপিণী; কিন্তু, সেই শক্তির ব্যবহার কতখানি হয়েছে, বল দেখি? তারা নিজেরা বল্‌ছে যে, তারা শুধু সহধর্ম্মিণী নয় তোমাদের,—সহকর্ম্মিণীও। তোমাদের কাযে সাহায্য করে তাদের কত আনন্দ! স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে সাহায্য করে, যাতে এই জীবন-পথের ভার, বোঝা কমিয়ে আন্‌তে পারে, তাই তোমাদের কাছে সেই চিন্তার স্বাধীনতা—তোমাদের সঙ্গে কায কর্‌বার স্বাধীনতা, ও নারীত্ব বিকাশের স্বাধীনতা চায় আজ নারী।

তোমরা নারীকে পঙ্গু করে রেখেছিলে,—চল্‌তে শেখাও নি। চীনেদেশের মেয়েদের পা ছোট করে রাখাই সৌন্দর্য্য হতে পারে; কিন্তু আজ যদি য়োরোপের মত চীনের অবস্থা হ'ত যুদ্ধ করে, তা'হলে ইয়োরোপের মেয়েরা যে সব কায চালিয়ে দিয়েছে চীনের রমণীরা কি তাই পারত? সেক্ষেত্রে চীনের পুরুষরা কি অনুতপ্ত হত না—তাদের ঐ ভাবে পঙ্গু করে রেখেছে বলে? কাযের সময় যখন নারীর সাহায্য পাও না,—বাড়ীতে স্ত্রীর কাছে কোন রকম কঠিন সমস্যার সমাধানে এতটুকু পরামর্শ পাও না;—তার পরিবর্ত্তে যখন শোন, "দেখ, তুমি যা ভাল বোঝ, তাই কর"—তখন কি একবারও তোমাদের মন বিরক্তিতে ভরে

উঠে না? একবারও কি মনে হয় না, "নাঃ! তুমি, কোন কাযেরই নও,—যাই অমুক বন্ধুর কাছে, দেখি, সে কি বলে!" এটা কি স্ত্রীর চিন্তার স্বাধীনতা নেই বলে নয়? সব সময় তাকে শিখিয়েছ, তুমি যা করছ তাই ঠিক; আর তাতে প্রতিবাদ করবার স্ত্রীর কোন অধিকার নেই।—কাষেই যখন চাও যে, তারা তোমাদের শক্তিস্বরূপিণী হয়ে পাশে দাঁড়াবে, তখন পাও না। অল্প লেখা পড়া শিখিয়ে, বা আদৌ না শিখিয়ে,—জ্ঞানালোকের অভাবে তাঁদের মনোবৃত্তিগুলিকে ফুটিয়ে তোল্‌বার সুযোগ ও সুবিধা না দিয়ে যে কি সর্ব্বনাশ করে রেখেছ, তা যদি তোমরা বুঝ্‌তে, তা'হলে স্ত্রী-স্বাধীনতার বিপক্ষে আজ তোমরা দাঁড়াতে পার্‌তে না। অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি কিছুরই ভাল নয়। যতটা শিক্ষা ও স্বাধীনতা দিলে নারী অভিভাবক অভাবে সংসারে অবাধে নিজ কর্ত্তব্য-গুলি করে যেতে পারে, অন্ততঃ সেটুকুর অধিকারও কি তারা চাইতে পারে না? গৃহকর্ম্ম সেরে তারা বাকি সময়টুকু দ্বেষ, হিংসা, কলহ, বা নভেল-পড়া ও পরচর্চ্চায় কাটিয়ে দিচ্ছে,—এই যে সময়ের অপব্যবহার, এর জন্য দায়ী কি তোমরা নও? সময় কাটাবার আর যে কিছু নেই তাদের। মনোবৃত্তির ও বুদ্ধির বিকাশ না হলে, কেমন করে তাদের মন উচ্চ চিন্তায় রত থাক্‌বে? তাই ত ছোট কথা, নীচ চিন্তায় তাদের অবসরটুকু কেটে যায়। এখানে হয় ত বল্‌বেন অনেকে—এ কথাটা মিথ্যা। সকলের পক্ষেই অবশ্য খাট্‌বে না কথাটা; কিন্তু আজকাল অধিকাংশ অশিক্ষিতা রমণীর সময় এই ভাবেই কাটে। শিক্ষা মানে যে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, তা বলি না। স্ত্রী-স্বাধীনতা মানে যে বাঁধা-গরু ছাড়া পাওয়ার মত, যেখানে-সেখানে যাওয়া, যা-খুসী করা, তা নয়। গৃহেই তোমরা তোমাদের বোনেদের, স্ত্রীদের শিক্ষা দিতে পার, স্বাধীন চিন্তার উৎস খুলিয়ে দিতে পার। বলে-বীর্য্যেও তারা তোমাদের সমকক্ষ হতে পারে। জীবন-সংগ্রামে ধৈর্য্য তাদেরই বেশী তোমাদের চেয়ে। যখন তাঁকে যে ভাবে দেখ্‌তে চাও, সেই ভাবেই দেখ্‌তে পাবে—যদি তাঁদের তেমনি করে শিক্ষা দাও।

আর্য্যশিক্ষা আমাদের একেবারে আপন নিশ্চয়ই। মুসলমানদের আগমনে ভারতে অবরোধ প্রথার সৃষ্টি হয়। তখন মুসলমানদের ভয়ে অসূর্য্যম্পশ্যা করে রাখা হ'ত নারীদের। সেই সঙ্গে তাদের মনগুলিও সেই ভাবে জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত হ'ল। স্বাধীনতার আস্বাদ ত নারীজাতি একসময় পেয়েছিল। সহসা এই অবরোধ-প্রথার সঙ্গে-সঙ্গে তাদের কেমন একটা ভয় ও আতঙ্ক জন্মে গেল। তাই পুরুষের উপর সকল বিষয়ে নির্ভর করে ফেলেছিল সম্পূর্ণ ভাবে;—এই সুযোগে না তারাও আমাদের হাত করে নিলে! তার আগেকার যুগগুলির কথা আলাদা। তখন ছিল না কি? স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষার জন্য নারীকে অনুনয়-বিনয় করতে হয় নি। কারণ, তখন সবই না চেয়ে পেয়েছিল। তখন তাই স্বেচ্ছায় আনন্দের সহিত নারী পুরুষের পাশাপাশি চলেছিল সতী-সাধ্বী হয়ে। আমার এ কথার অর্থ এই যে, নারী সেকালে স্বাধীনতা পেয়েও উচ্ছৃঙ্খল ভাবে চলতেন না; পতির আজ্ঞা অমান্য না করে, তাঁর ইচ্ছায় নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে ছেড়ে দিয়ে চল্‌তে পেরেছিলেন। কারণ নারী যদি পুরুষের সঙ্গে এক স্তরে এসে দাঁড়াতে পারে, তা'হলে উভয়েই একমত হয়ে চল্‌তে পারে বিবাহিত জীবনে। শিক্ষিতা মেয়েরা স্বামীর কথার যুক্তি ও মূল্য বেশী বোঝে।—তাই নারী যদি পুরুষের সঙ্গে সমানে মনোবৃত্তিগুলিকে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারে, তা'হলে ভুল বোঝাবুঝি হয় না। অনেকে মনে করেন, হিন্দু সমাজের মেয়েদের আজ্ঞানুবর্ত্তিতা বেশী;—হ'তে পারে তা'। কিন্তু স্বামীর আজ্ঞার মূল্য বুঝে আনন্দের সহিত পালন করতে পারে কয়জন? অনেক সময় দেখা যায়—এই বুদ্ধিহীনতার জন্য অনিচ্ছায় অনেকে আজ্ঞা-পালন করে এই বলে, "আমরা আর এ সব কি বুঝি—ওঁরা যা ভাল বোঝেন তাই করুন।" "পতি পরম গুরু" নিশ্চয়ই; —কিন্তু অনেক মাতাল স্বামীকে মদ খাওয়া সম্বন্ধে কোন কথা বলবার অধিকার পর্য্যন্ত হিন্দু-রমণীর থাকে না। আমি অনেকবার এরকম বল্‌তে শুনেছি, "কি করব ভাই—একে বেটা ছেলে, তায় স্বামী—আমি কি কিছু বল্‌তে পারি?" কিছু বল্‌বার সাহস পর্য্যন্ত তাদের রাখ নি। যখন সংসারে স্বামী ও স্ত্রী এক পথের পথিক ও সহযাত্রী, তখন পরস্পরকে যদি পরস্পরের হাত ধরে তোলবার ক্ষমতা ও অধিকার না দেওয়া হয়, তা'হলে জীবনটা কি রকম সমস্যাপূর্ণ হয়ে উঠে, বল দেখি?

সতীদাহ-প্রথা আর্য্যেরাই করেছিলেন; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, অনেকে অনিচ্ছায় সমাজের তাড়নায় সহমরণে যায়,—তখন ৺রাজা রামমোহন রায়ের এই প্রথা তুলে

দেবার চেষ্টাকে কি অন্যায় বলব? যে আজ্ঞানুবর্ত্তিতায় আনন্দ নাই—তার মূল্য কতটুকু? ভয়ে ভজার চেয়ে ভক্তিতে ভজা কি ভাল নয়? সব সমাজেই ভাল ও মন্দ আছে। সমাজে কয়জন স্বাধীনতা পেয়ে স্বেচ্ছাচারিণী ও স্বেচ্ছাবিহারিণী হ'ন, এবং সমাজের পীড়নে ও পেষণে কয়জন স্বাধীনতা না পেয়ে তাই হ'ন তার হিসাব করেছো কি তোমরা? না; সব দোষ তোমাদের নয়। আমরা যা' স্বেচ্ছায়, হেলায় হারিয়েছিলাম, তা' তোমরা দেবে কি করে? আর আমরা এখন সেই হারান-ধনের সন্ধান পেয়েছি,—এখন আমাদের ঠেকায় কে?

অবরোধ-প্রথায় বাহিরে যাওয়া নিষেধ হয়েছিল বটে—তাই বলে চিন্তার স্বাধীনতা হারাতে কে বলেছিল? সেটাও অলসতাই ভয়ে তোমাদের হাতে সঁপে দিয়েছিলাম। সেই স্বাধীনতা ও শিক্ষার একটুখানি আগুন কোথায় কোন কোণে ধিকিধিকি জলছিল, তাই আজ পাশ্চাত্য আবহাওয়ার সংস্পর্শে সে আগুনটা দপ্ করে জ্বলে উঠেছে।

পুরুষ চিরকালই সমাজের মস্তক স্বরূপ ছিল। আচার-বিচার, ব্যবহার, রীতিনীতি—সবই তাদের হাতে ছিল; কিন্তু, সেই আর্য্যযুগেও নারীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। ভিতরে ও বাহিরে সকল কাযের স্বাধীনতা তো তাঁরা পেয়েছিলেন। লীলা, গার্গী, খনা ও মৈত্রীর চিন্তার স্বাধীন স্রোতের কাছে কিছুই ত বাধা মানে নি! সেই চিন্তার আদান প্রদান ত সুধীমণ্ডলীতেই চলত? আমাদের সেই আদর্শ রমণীরা কোন্ অংশে কম স্বাধীন ছিলেন? মুনিকন্যারা মুনিদের অনুপস্থিতিতে অতিথি সেবা করতেন; স্বয়ম্বর-বিবাহও চলিত। পথে অবাধে তাঁহারা যাতায়াত করতেন; নানারকম অস্ত্রবিদ্যায়ও পারদর্শিতা লাভ করতেন। বড় বড় রাজ্যের শাসনকার্য্যও নির্ব্বাহ করতেন; লেখা পড়াও করেছেন তাঁরা। আবার ত্রেতাযুগে প্রমোদোদ্যানে পুরুষ ও স্ত্রীর একত্র বেড়ানর কথাও দেখতে পাই। তখনকার দিনে স্ত্রী যেমন স্বামীর বশ্যতা স্বীকার করত, স্বামীও স্ত্রীর প্রাপ্য সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হতেন না, বা দ্বিধা বোধ করতেন না।

এই যে পুরুষের সহিত সমকক্ষ ভাবে চিন্তা করবার স্বাধীনতা ও যুক্তিতর্কের আদান-প্রদান—এই থেকে একত্র কাজ করবার উৎসাহ জন্মায়। বাহিরে গিয়ে যে পুরুষের সঙ্গে সকল সময় কায করতে হবে এমন নয়; স্ত্রীর উৎসাহ নিয়ে, তার সঙ্গে পরামর্শ করে, একমত হয়েও পুরুষ বাহিরের কায করতে পারে। আরও একটী কথা, কত পুরুষ কত কি কায করে যাচ্ছেন,—কত কি গবেষণা করছেন,—কত কঠিন সমস্যার সমাধান করছেন; কিন্তু নিরক্ষরা স্ত্রীগণ তাদের কাযের কোন মূল্যই বুঝছেন না। এতে বেশী আনন্দ, না ভায়ের কাযের মর্ম্ম বোন, ও স্বামীর কাযের মর্ম্ম স্ত্রী যখন বোঝেন, তখন বেশী আনন্দ?

এখন স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ বুঝতে হ'বে আমাদের। ভাল-মন্দ বিচারের অধিকার তোমাদেরও যেমন, আমাদেরও তেমন। তার পর নানা বিষয়ে চিন্তা করে, মনের উৎকর্ষ সাধনে তোমাদেরও যেমন অধিকার আছে, আমাদেরও তেমনি আছে। শরীরের দিক দিয়ে জীবনী-শক্তি সঞ্চয় করতে হলে, বেঁচে থাকতে গেলে, বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের তোমাদেরও যেমন অধিকার আছে, আমাদেরও তেমনি। লেডিজ পার্কে কয়জন তাদের বাড়ীর মেয়েদের একটু বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের ও পাঁচজন মহিলার সঙ্গে আলাপ করবার অধিকার দিয়েছে? কলিকাতার অন্ধকূপ রান্নাঘর ছেড়ে, অন্ততঃ ঘণ্টা-খানেকের জন্যও মুক্ত আকাশের তলে মেয়েদের আসা দরকার, এটা কি তোমরা অনুভব করেছিলে? তার পর কোন রকম ব্যায়াম করা মেয়েদের পক্ষে অশোভন। বাহিরে না গিয়ে তাতেও স্বাস্থ্যরক্ষা হয় বটে, কিন্তু তাও যে মেয়েদের করতে নেই। ঘরের কাযে যথেষ্ট ব্যায়াম হয় বলবে? না, তাতে শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনা সমান ভাবে হয় না। কত কিছু আছে, যা তোমাদের করতে আছে, কিন্তু আমাদের করতে নেই। লেখাপড়া বেশী করতে নেই মেয়েদের, তাতে তারা অলস হয়, বাবু হয়, ও বসে-বসে নভেল পড়তে শেখে,—এই তোমাদের ধারণা! তারা যতটুকু লেখাপড়া শেখে, তাতে নভেলের ভাষা ছাড়া আর কিছু বোঝবার ক্ষমতা থাকে না। সেই জন্যই এইরকম হয়। শিক্ষিতা মহিলারা শিক্ষার গুণে নিজেদের রুচি আচার খুব মার্জ্জিত করে ফেলতে শেখেন। তার ফলে মন্দকে পরিহার ও উত্তমকে বরণ করে নিয়ে তাঁরা পাথেয় বেশী করে সঞ্চয় করে ফেলেন।

অন্য সমাজের কথা ছেড়ে দিই;—যাঁরা হিন্দুসমাজে শিক্ষার বিস্তার-কল্পে উঠে পড়ে লেগেছেন, তাঁরা যে তা' করে অনুতাপ করছেন, তা ত মনে হয় না। জগদ্ধাত্রীরূপিণী,

শান্তিস্বরূপিণী দেবীর আখ্যামাত্র আমাদের বড় করে ফেল্‌তে পারে না। তোমরা যে আমাদের ঐ আসনে দেখ্‌তে চাও, তাই ত উঠে পড়ে লেগেছি।—সমাজ-গঠনে, জাতি-গঠনে আমাদের যতখানি অধিকার, তা আমরা চাই। আমাদের বাদ দিয়ে দুটীর একটীও হবে না। কবি টেনিসন এ কথা খুব ভাল করেই ত তাঁর Princess এ বুঝিয়েছেন। যেমন রূপ (form) বস্তু (matter) ছাড়া থাক্‌তে পারে না, বস্তুও রূপ ব্যতীত থাক্‌তে পারে না, তেমনি—পুরুষ ও স্ত্রী পরস্পরকে সাহায্য না কর্‌লে, সমাজ ও জাতির গঠন হতে পারে না। তোমরা একা এতদিন ত সমাজ-গঠন করে এসেছ - তাই বলবে? সে সমাজের ভিত্তি ভাল নয় বলেই ত ভেঙ্গে চুরে যাচ্ছে। ইয়োরোপ এত স্বাধীনচেতা হয়েও ত নারীকে সব অধিকার দিতে রাজি ছিল না;—কিন্তু নারী আপনার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে তাই। শুধু অধিকার নয়, কর্ত্তব্য। তোমরা একা যেখানে দাঁড়াতে পার না, সেখানে নারী গিয়ে তোমাদের সাহায্য কর্‌বে;—যেখানে নারী একা কাজ করতে পারে না, সেখানে পুরুষ গিয়ে তাকে তুলে ধর্‌বে—এই ত চাই। ঘরে-বাইরে সব রকম কাযের জন্য আমাদের তৈরী করে নাও। এই ত স্বাধীনতা।

স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষার ফলে যে দু'একটা স্বেচ্ছা-বিহারিণীর দর্শন পাই, সে ঐ দু'টীর ফলে নয়। শিক্ষা ও স্বাধীনতার অপব্যবহারের ফলেই ঐ রকম হয়। স্বাধীনতার অর্থে আমরা চিন্তার স্বাধীনতা, পুরুষের সহিত কায করবার স্বাধীনতা—পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে, এবং তাদের সহকর্ম্মিণী হবার উপযোগী উপায় অবলম্বনের স্বাধীনতা বুঝি। শক্তি যে আমাদের মধ্যে আছে,—আমরা যে সকল কাযে তাদের সাথী হতে পারি, এ স্বাধীনতা আমাদের আছে,—এটা বুঝি কখন? যখন বুঝি যে, জড়তা ও অক্ষমতার লজ্জা-সঙ্কোচের বন্দীত্ব হতে মুক্ত হ'তে পেরেছি। তখনই নিজেকে তাঁহাদের সহকর্ম্মিণী হবার পক্ষে মুক্ত ও স্বাধীন মনে করি। শ্রীরাম-চন্দ্রের পথশ্রমের ও বনবাস-দুঃখের ভার লাঘব করবার জন্য যখন সীতা বনে যেতে চাইলেন, তখন সে স্বাধীনতা পেলেন কেন? শ্রীরামচন্দ্র জান্‌তেন যে, সীতার সে মনের জোর আছে;—নইলে তাঁকে সঙ্গে নিতে পারতেন না। তোমরা যখন দেখ্‌বে, আমাদেরও সে শক্তি আছে, তখন তোমরা আপনারাই আমাদের কাযের স্বাধীনতা দেবে। পণ্ডিতা রমাবাই তাঁর স্বাধীনতা ও শিক্ষার ফলে যে বিরাট ব্যাপার ক'রে তুলেছেন পুণায়, তা কি শক্তির পরিচায়ক নয়? কোন চিকিৎসকের পরিবারে, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর পরিবারের মহিলাগণ ছেলেমেয়েদের সামান্য অসুখ হলে ওষুধের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ নিজেরা করে নিয়ে, ওজন করে সব ওষুধ মিশিয়ে নিয়ে, মিক্‌শ্চার তৈরী করেন। হিন্দুমহিলারা মেডিকেল কলেজে না পড়েও ত বাড়ীতে এই শিক্ষা পেয়েছেন - ইহাও সুখের বিষয়। বাড়ীর পুরুষেরাই ত শিখিয়েছেন তাঁদের। অনেক হিন্দু পরিবার আজকাল মেয়েদের বাড়ীতেই নানা রকমের শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়ে তাঁদের শিক্ষিতা করে তুলছেন। বি এ, এম এ পাশ করাই শিক্ষার চরম নয়। মনোবৃত্তিগুলির উৎকর্ষ-সাধনে, ভাব, চিন্তা ও কার্য্যের এবং ভিতর ও বাহিরের সামঞ্জস্যতেই শিক্ষার পরিণতি। বাড়ীর পুরুষদের উপরেই সব নির্ভর করে। কতকগুলি বিষয়ে আমাদের আত্মনির্ভরশীলতা থাকা চাই। তা নইলে এমনি জড়ভরত হয়ে যাই আমরা যে, বিপদে হাত পা নড়ে না—সব অবশ হয়ে যায়। পুরুষদের সাহায্য করা দূরে থাক্—তাদের কায বাড়িয়ে দিই। এই জড়তা কাটিয়ে উঠতে না পার্‌লেও অনেক সময় অসুবিধা হয়। সব গুছিয়ে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে ষ্টেশনে এসে, একেবারে অনভ্যাস বশতঃ অত লোকের মাঝে পড়ে, পা চল্‌তে চায় না। "ওগো, শীঘ্র এসো", শুনলেও যে লজ্জায় যাওয়া যায় না। ওদিকে হয় ত গাড়ী ছাড়ে-ছাড়ে। অর্দ্ধেক পুঁটুলী পড়ে রইল, ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলে দিতে হ'ল গাড়ীর ভিতর; স্ত্রীকেও পুঁটুলী-বিশেষের মত গাড়ীতে ঠেলে তুলে দিতে হল। এটাও কি বিরক্তিকর নয়? কোন বিপদে পড়্‌লে নিজেকে রক্ষা করবার শক্তি নেই;—শরীরেও বল নেই, বুদ্ধিরও বল নেই—এইজন্যই ব্যায়াম ও বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন। তার পর মনের স্ফূর্ত্তির উপর মানুষের আয়ু নির্ভর করে; পর্দ্দা ও অবরোধ প্রথায় সেই স্ফূর্ত্তির পথ বন্ধ করে রেখেছে। রাত্রি দিন ছোট-ছাট সঙ্কীর্ণ ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকায় স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। এই রকমে পরমায়ুও কমে আস্‌ছে। কত মেয়ে স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় ভোগে, কত মেয়ের নানা প্রকার অত্যাচারে অকাল-মৃত্যু ঘটে। কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের এই বিনীত আবেদন

একশ্রেণীর উদারচেতাদের কাছে গ্রাহ্য হয়েছে। তবু বাধা, বিঘ্ন, বিদ্রূপ সব উপেক্ষা করে, স্বাধীনতা ও শিক্ষার উৎকর্ষের জন্য আমাদের দৃঢ় ভাবে দাঁড়াতে হ'বে।

এই জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যদি নারীকে তোমাদের আদর্শে গড়ে উঠ্‌তে না দেখ, তা'হলে জেনো যে সেটা শিক্ষার ফলে নয়, শিক্ষা দেবার দোষে। আবার শুধু দেবার দোষও নয়—গ্রহণেরও দোষ আছে। শিক্ষা পেলে মনের জোর বাড়ে! তাতে মানুষ ভাবের আবেগে আত্মহত্যা প্রভৃতি যা'তা কায করে ফেলে না। হিন্দু সমাজে আত্মহত্যার উদাহরণ আজকাল বেশী দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে, প্রকৃত শিক্ষার অভাব। সময়ে-সময়ে সমাজ-পীড়নে অনন্যোপায় হয়েও আত্মহত্যা করে থাকে মেয়েরা। যেমন স্নেহলতা যদি জান্‌ত যে, বিবাহ না করে, কুমারী অবস্থায় পিতার গলগ্রহ না হয়ে, ও তার অপমানের কারণ না হয়েও, বেঁচে থাক্‌বার তা'র অধিকার আছে, তা'হলে কখনও সে আত্মহত্যা করত না। লেখাপড়া জানা থাক্‌লে, বা আসামের মেয়েদের মত বস্ত্রবয়ন জান্‌লে, বা অন্য কোন অর্থকর শিল্প শেখা থাক্‌লে, তার উপরই নির্ভর করে সে আজ পণপ্রথাকে হারিয়ে দিয়ে, বেঁচে থাক্‌বার একটা অবলম্বন পেত। এই যে তার মৃত্যু, যা' কতকগুলি আত্মহত্যা ব্যাপারের ভিত্তি স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে সমাজকে কলঙ্কিত কচ্ছে, তার জন্য দায়ী কি সমাজপতিরা নয়? লীলা, গার্গী ও খণা প্রভৃতির আসন আমরা পেতে চাই নিশ্চয়ই। তাঁরা যদি আমাদের আদর্শস্থানীয়া, তা'হলে তাঁদের বিদ্যা, শিক্ষা, স্বাধীনতা সবই' আমাদের চাই। জ্যোতিষ শাস্ত্রে, অঙ্কশাস্ত্রে যে সব ব্যুৎপত্তি দেখিয়ে, পুরুষদের সঙ্গে এক সভায় বসে বাদানুবাদ করবার মত মানসিক শক্তির, এবং চিন্তা ও বুদ্ধির স্বাধীনতার যে পরিচয় দিয়েছেন, সেই—স্বাধীনতার অধিকার, সেই সবই আমরাও পেতে পারি না কি?

বোম্বাই ও মান্দ্রাজের মেয়েরা রাষ্ট্রীয় অধিকার পেয়েছেন; কিন্তু আমরা কোথায় পড়ে আছি? চিন্তার স্বাধীনতা পেলে, আমাদের ভিতরে কতখানি শক্তি সঞ্চিত আছে, তা নিজেরা বুঝতে পারি, তোমাদেরও বোঝাতে পারি। তোমরা আমাদের হীন ভাব্‌ছ, বা অনেক নীচে স্থান দিয়েছ বলে, নাকে-কান্নার এ সময় নয়। তোমরা যা ইচ্ছা ভাব, আমরা ততক্ষণে এগিয়ে যাই। তোমাদেরই কাযের সাথী হয়ে যখন দাঁড়াব, তখন তোমরাই আমাদের কাযের সাথী করে নেবে। যে বেদ মেয়েদের পড়্‌তে নেই, সেই ঋক্‌বেদে ঋষিপত্নীদের রচিত শ্লোক রয়েছে। তাই পড়ে পুরুষ আজ ধন্য হচ্ছে। এই থেকে বোঝা যায়, ঋষিরা স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। আগেই বলেছি যে, আমাদের এই বন্দীত্ব—এ তো মুসলমানেরা আস্‌বার আগে ছিল না। নারীর এই স্থান-নির্ণয় শাস্ত্র করে'নি, সমাজ করেছে। সমাজে নারীর স্থান কোথায় ছিল? আমার মনে হয়, কোথাও না। তাই নারী আজ এত বড় সমাজে একটুখানি স্থান করে নেবার জন্য এত লালায়িত। সে আজ বুঝেছে, তারও অধিকার আছে সমাজের মধ্যে। যে জাতির পুরুষ, নারীকে স্বাধীনতা দিলে ব্যভিচারিণী হয়ে উঠ্‌বে বলে মনে করে, সে জাতির উন্নতি কখন হ'তে পারে না। কারণ, যে রক্ষক, সেই ত এক্ষেত্রে ভক্ষক হয়ে দাঁড়ায়। যে সতীত্ব নারীর নিজস্ব ধন, তাকে আগ্‌লাবার জন্য পুরুষের আশ্রয় নিতে হ'বে কেন?

"শিক্ষার ভিতর দিয়াই চিন্তার উৎকর্ষ লাভ, ও তাহার ভিতর দিয়াই আত্মার উন্নতি বুঝ্‌তে হ'বে। চরিত্রের পূর্ণতা বিধান হয় জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের যোগে; আর তার সঙ্গে সংযম চাই। সেই জ্ঞানকে অবহেলা বা তাচ্ছিল্য কর্‌লে ত হ'বে না। তাই শিক্ষা দিতে যাঁরা বিমুখ, তাঁরা ভাব্‌ছেন যে, নারীকে শিক্ষা দিলে তার ভাল-মন্দ বিচারের শক্তি বাড়্‌বে; তাতে তাঁদের এতদিনের নিয়ম-কানুনের ভুল-ত্রুটী সব ধরা পড়ে গিয়ে, তাঁদের এই যে এতদিনের একচেটে প্রভুত্ব, তা খর্ব্ব হয়ে যাবে। আর, স্বাধীনতা পেলে যে নারীর স্বৈরিণী হ'বার সম্ভাবনা,—যাঁরা এ কথা ভাবেন, তাঁদের নিজেদের চরিত্রের উপর যে কতখানি আস্থা, তা' বেশ বোঝা যায়। কিন্তু আমার মনে হয়, পুরুষ যদি স্বেচ্ছাচারী হয়, তবেই নারী বিপদে পড়্‌তে পারে; কিন্তু শিক্ষার জোরে সে নিজেকে রক্ষা করবার বল ও বুদ্ধি পায়। যে সমাজ সংযতেন্দ্রিয় ও চরিত্রবান্ পুরুষ নিয়ে গঠিত হয়, সে সমাজে নারী সব রকম স্বাধীনতা পেলেও, ব্যভিচারিণী হ'বার ত কোন উপায় থাকে না! তবে যে বলেছি, নারীর মরণ-কাটি ও জীয়ন-কাটি তোমাদের কাছে, তা কি মিথ্যা? প্রকৃত শিক্ষিতা নারী পুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতা আদৌ পছন্দ

করে না। হিন্দু মহিলা যেখানে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়বেন, একজন শিক্ষিতা মহিলা সেখানে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য বুক বেঁধে দাঁড়াতে পারবেন। প্রকৃত শিক্ষার অভাবেই হিন্দু ভগিনীদের এই দুর্দ্দশা।

পুরুষকে বাদ দিয়ে নারী-জাতির চলতে পারে না। পুরুষ নারীকে বাদ দিয়ে চল্‌তে পারে না। পুরুষ এবং স্ত্রীকে সমান স্তরে এসে দাঁড়াতে হ'বে সব বিষয়ে; তাতে কারোই শ্রদ্ধা ও সম্মানের লাঘব হ'বে না। সমাজের নিয়মের মধ্যে থেকেও নারী তাঁর উপযোগী স্বাধীনতা ও শিক্ষার প্রভাবে পুরুষের উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী হতে পারে।

যে মায়ের সুধা পান করে পুরুষ আজ শক্তিশালী, সেই মাতৃশক্তিকে আজ ছোট করে দেখ্‌লে চলবে কেন?

নারীর সম্মান

[অধ্যাপক শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল]

ভারতে নারীর সম্মান চিরপ্রতিষ্ঠ। শুধু মানব-সমাজে নহে, ভারতের দেবদেবীর মধ্যেও নারীর গৌরবের ধারা অক্ষুণ্ণ দেখিতে পাই। ত্রিভুবনের অধিষ্ঠাত্রী ভগবতী আদ্যাশক্তি স্বামীর বুকে পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ভগবানের অবতার বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার চরণ যুগল ধারণ করিয়া মানভঞ্জন করিতেছেন। (১) এমন কি, ইহাঁদের নাম করিতে হইলেও অগ্রে রাধার নাম পশ্চাৎ কৃষ্ণের নাম করিতে হয়। 'লক্ষ্মী-নারায়ণ' বা 'সীতারামে'র বেলায়ও এইরূপ। ('হরগৌরী' বা 'শিবদুর্গা'র বেলায় অন্যরূপ; তাহার কারণ বোধ হয়, পাগল বাবা পাগলী মাকে অত্যধিক আদর দিয়া ফেলিয়াছেন; তাই তাঁহার সপত্নী স্বামীর প্রতি করুণার বশবর্ত্তিনী হইয়া, স্বামীর নামটাকে নিজের নামের পূর্ব্বে বসিতে দিয়াছেন। নতুবা 'Adding Injury to Insult' হইয়া পড়িবে যে!) দ্বন্দ্ব-সমাসে নারীর নাম আগে বসাইবার প্রথাও এই নিমিত্ত কি না, কে জানে।

ভারতে স্মরণাতীত কাল হইতে নারী সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র সম্মানিতা হইয়া আসিতেছেন। সাবিত্রীর সতীত্ব-তেজের নিকট শমনেরও পরাভব, সীতার নির্য্যাতনে রাবণের সবংশে নিধন, ও দ্রৌপদীর অপমানে কুরুবংশ-ধ্বংস, এ সকল ঘটনা সর্ব্বজনবিদিত। 'নলদময়ন্তী' প্রভৃতি পৌরাণিক আখ্যান পাঠ করিলেও দেখিতে পাওয়া যায়, মূর্খ অসভ্য ব্যাধগণও নারীর সতীত্বকে সম্মান করিয়া চলিত। ঐতিহাসিক যুগের রাজপুত নারীর বীরত্বকাহিনী এবং তাঁহাদের স্পর্দ্ধা ও সম্মানের কথা কাহার না বিদিত আছে? বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠ করিলেও দেখিতে পাওয়া যায়, রাণী ভবানী প্রভৃতি নারীগণ তেজোগর্ব্বে সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অধিক কথায় কাজ কি, রমণীমাত্রকেই সর্ব্বসাধারণের 'মাতৃ'-সম্বোধন ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোন দেশে বিহিত আছে কি না, তাহা সন্দেহের স্থল। 'মাতৃবৎ পরদারেষু.........যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ' এই মহাবাক্য অন্য কোন দেশের সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে কি না, বলিতে পারি না।

অবশ্য ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোন দেশে নারীগণ পুরুষগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হয়েন না, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। বরং অনেক ক্ষেত্রে অনেক দেশে নারীজাতির প্রতি প্রদর্শিত সম্মানের আধিক্যই পরিদৃষ্ট হয়। উদাহরণ স্থলে, ইয়োরোপের Age of Chivalryর উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতে আবহমান কাল হইতে প্রচলিত, মানবমাত্রেরই প্রকৃতিগত নারীপূজা, আর বিলাতের রজোগুণসমূদ্ভূত কৃত্রিম বিধিবদ্ধ নারীপূজা, এতদুভয়ের মধ্যে একটু প্রভেদ আছে বলিয়া বোধ হয়। মনে হয়, ভারতের নারীপূজা সাত্ত্বিক ও স্বর্গীয় ভাবাপন্ন; কিন্তু বিলাতের নারী-পূজা রাজসিক ও পার্থিব ভাবাপন্ন। ভারতবাসীর নিকট নারীর অসম্মান দেবতার অসম্মান ও আপ্তবাক্যের অনাদর; কিন্তু ইয়োরোপবাসীর নিকট ইহা শুধু সমাজ-বিধির অসম্মান, ও স্বীয় নৈতিক চরিত্রের অপকর্ষ-দ্যোতক। এক কথায় বলিতে গেলে, ভারতবাসী নারীর অসম্মানকে অধর্ম্ম বলিয়া

(১) আজকাল অনেক আসরেই এইরূপ মানভঞ্জনের পালা গীত হইতেছে।

মনে করে; কিন্তু ইয়োরোপবাসীর চক্ষুতে ইহা শুধু অকর্ম্ম-মাত্র,—ধর্ম্মের সহিত ইহার তেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই।

বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আজকাল ভারতবাসী তাহার এই বিশিষ্টতা হারাইতে বসিয়াছে। যে নারী স্বামীকে তাহার জীবনের একমাত্র আরাধ্য দেবতা বলিয়া জানে, এবং তাঁহার সুখের জন্য হেলায় নিজ জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারে, যে সীমন্তের সিন্দুর-রেখা ও হস্তের লৌহবলয়কেই জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ বলিয়া মনে করে, যাহার জীবনব্যাপিনী কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় গৃহস্থের গৃহে-গৃহে প্রতি সন্ধ্যায় "সাঁঝের বাতি" জ্বলিয়া গৃহমাত্রকেই শান্তি ও মঙ্গলের আলয় করিয়া তুলিতেছে, যাহার অলৌকিক সহিষ্ণুতায় ভারতবাসী এখনও আত্মীয়-স্বজনকে লইয়া নির্ব্বিবাদে একত্র কালযাপন করিতে পারিতেছে, যাহার ভক্তি, শ্রদ্ধা, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও চরিত্র-মাধুর্য্যে হিন্দু-সমাজ বহু বর্ষের বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া এখনও অটুট রহিয়াছে, যাহার স্নেহের পীযূষ-ধারায় ভারত-বাসীর গৃহ-প্রাঙ্গণে নিত্য মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছে, যাহার মোহন-মুখ-ধ্বনিত মঙ্গল-শঙ্খে প্রতি সন্ধ্যায় ভারত-বাসীর নির্জ্জন পল্লী-কুটীর মুখরিত হইতেছে,—এক কথায়, যাহার রমণীয়তায় 'রমণীয় করিবারে রমণী এ ভবে' এই উক্তি সার্থক হইয়াছে,—ভারতবাসী আজ গ্রহ-বৈগুণ্যে সেই মাতৃ-স্বরূপা, দেবী-স্বরূপা নারীজাতির প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে পারিতেছে না।

অনেকে হয় ত বলিবেন, "কেন, আজকাল আমাদের দেশে নারীর সম্মানের অভাব ত দেখিতেছি না; বরং আধিক্যই দেখিতেছি। নারী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছে; স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করিতে পাইতেছে; যেখানে ইচ্ছা যাইতে পাইতেছে; সভা-সমিতিতে যোগদান করিতেছে; ভিন্ন-ভিন্ন বিভাগে বড় বড় পদ পাইতেছে; অবাধে সমাজ-চর্চ্চা ও রাজনীতি-চর্চ্চা করিতে পাইতেছে; অনেক বিষয়ে পুরুষের সহিত সমান অধিকার পাইতেছে; আর কি চাও? আরও কিছুদিন সবুর কর, নারীগণের আরও উন্নতি দেখিতে পাইবে।"

কিন্তু যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহারা জানেন না, অথবা জানিয়াও জানেন না, যে, এই সকল বিষয়ে উন্নতি নারীর চরম উন্নতি নহে;—পুরুষের সহিত সকল বিষয়ে সমান অধি-কার প্রাপ্তি নারীর চরম লক্ষ্য নহে। অবশ্য বিলাতের অনেক মহিলা রাজনীতিক অধিকার পাইবার জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বিবাদ বাধাইতেছেন; এবং তাঁহাদের দেখাদেখি কোন-কোন ভারতবাসিনীও অত্যধিক স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু ভারতের অধিকাংশ রমণীই এখনও আপনাদিগকে এই মত্ততা হইতে দূরে রাখিয়া, গৃহস্থালীতে আপনাদের নিপুণ হস্তের পরিচয় প্রদান করিয়া, সংসারে সুখ ও শান্তি আনয়ন করিতেছে। ইহাকেই ত তাহারা তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া জানে। অন্তঃপুরের কর্ত্রীত্বই তাহাদের নিকট কর্ত্রীত্ব,—সভা-সমিতির বা দরবারের কর্ত্রীত্ব বা নেত্রীত্ব তাহারা চাহে না।

বাস্তবিক, প্রকৃত স্ত্রী-শিক্ষার অর্থ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা নহে; পরন্তু, গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের শিক্ষা,—এ কথা নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। এ কথা বহু বার বহু লোকের মুখে শুনা গিয়াছে। নারীর শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য স্কুল-কলেজে শিক্ষাদান, আদালতে বক্তৃতা, অথবা ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যে হস্তক্ষেপ নহে। তাহার শিক্ষার উদ্দেশ্য গৃহ-স্থালীর কর্ম্ম সুচারু রূপে সম্পন্ন করা; সংসারের শান্তি ও সুব্যবস্থা রক্ষা করা; দেবদেবীর সেবার ব্যবস্থা ও গুরুজনের পরিচর্য্যা করা; পুত্র-কন্যাগণের লালন পালন করা ও তাহাদিগকে সুশিক্ষা (অর্থাৎ সদাচার শিক্ষা) দেওয়া;—এক কথায়, সংসারের সর্ব্ববিধ আভ্যন্তরিক মঙ্গল বিধান। এ দায়িত্ব বড় কম দায়িত্ব নহে। যাঁহার মধ্যে প্রকৃত নারীত্ব বর্ত্তমান, তিনি এই দায়িত্ব লইয়া সন্তুষ্ট থাকেন; ইহার বাহিরে যাওয়া বা যাইবার চেষ্টা করাকে তিনি অনধিকার-চর্চ্চা বলিয়াই মনে করেন।

নারীর প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে যে কথা বলিলাম, তাহা যদি পাঠকবর্গের নিকট প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের অবগতি ও সংশয় নিরাকরণের জন্য দুই-চারিজন মনস্বী লেখকের উক্তি উদ্ধৃত করিতে পারি।

প্রথমতঃ, বঙ্গের গৌরব, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষায় সুশিক্ষিতা, সুলেখিকা শ্রীমতী অনুরূপা দেবী বিগত অগ্রহায়ণ মাসের 'ভারতবর্ষে' 'স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে' যে 'দু'-একটী কথা' বলিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য; এবং উহা সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই মনোযোগ সহকারে পাঠ করা উচিত। উক্ত প্রবন্ধের শেষ প্যারাগ্রাফটি উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না—

"আমি স্কুল-কলেজের বিরোধী নহি। বরং নরনারী-নির্ব্বিশেষে ইতর-ভদ্র সকলেরই জন্য প্রাথমিক শিক্ষা-প্রচলনের একান্ত পক্ষপাতী; এবং ব্যক্তিগত ভাবে উচ্চ অর্থাৎ কালেজিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করি না। কিন্তু উহার বর্ত্তমান ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নহি; এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নারীজন্ম শুধুই বি-এ, এম্-এ পরীক্ষা পাশেই সার্থকতার চরম ফললাভে সমর্থ—এ বিশ্বাস আমার নাই। অতএব আমার বিশ্বাস মতে মেয়েদের জন্য এখন আমাদের অনেক বেশি ভাবিতে হইবে, খাটিতে হইবে,—উহাদের মঙ্গলামঙ্গল ভাল করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। অমঙ্গলের ভ্রান্ত পথে যদি পাঠান হইয়া গিয়া থাকে, ফিরাইয়া আনিয়া সুমঙ্গলের পথে শুভযাত্রা করাইতে হইবে। নিজের মেয়েটিকে বিবাহের বাজারের বাঁধা নিয়মে ক'নে-দেখানর মামুলী শিক্ষা দিলেই চলিবে না,—উহাকে স্বামীর সহধর্ম্মিণী, সামাজিক শ্রেষ্ঠ জীবের অর্দ্ধাঙ্গিনী এবং তদপেক্ষাও উন্নত দৃষ্টিতে জীব-জননী রূপে দেখিতে হইবে। যদি ইহার উপযুক্ত রূপে তাহাকে গড়িয়া দিতে না পারো, তবে 'মেকি টাকা' চালানোর মত 'খেলো' জিনিস দান করার অপরাধে ইহ-পর দুই লোকেরই দরবারে তোমার সাজার ব্যবস্থা হইয়া রহিল, নিশ্চিত জানিও। কারণ, এই যে বিদেশী ঢঙের পুরুষোচিত শিক্ষা মেয়েদের জন্য বিহিত হইয়াছে, ইহা সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত না হইলে আমাদের মেয়েদের গার্হস্থ্য জীবনের ভবিষ্যৎ খুবই সুখোজ্জ্বল বলিয়া আমার ত বিশ্বাস হয় না। অবশ্য যদি না আমি ভ্রমে পড়িয়া থাকি।"
['স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দু-একটী কথা', "ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩২৭।]

তাহার পর, অনেকের ধারণা এই যে, বিলাতের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আপামর-সাধারণ সকলেই সমাজ ও রাজনীতি-ক্ষেত্রে পুরুষের সহিত নারীর সমান অধিকারের পক্ষপাতী। কিন্তু দুই-এক জন খ্যাতনামা বিলাতী লেখকের গ্রন্থ হইতেও উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারি যে, তাঁহাদের এ ধারণা ভ্রান্ত।

উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ কবি টেনিসন মানব-সমাজে নারীর প্রকৃত স্থান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্য আচার-ব্যবহারের পক্ষপাতী ব্যক্তি-গণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল—

—"Let her make herself her own
To give or keep, to live and learn be
All that not harms distinctive womanhood.
For woman is not undevelopt man,
But diverse : *could we make her as the man,*
Sweet love were slain : his dearest bond
is this,
Not like to like, but like in difference."
[The Princess, Book VII.]

নারী যদি মানব-সমাজে তাহার নিজের স্থান ও তৎ-প্রতি তাহার নিজ কর্ত্তব্য ভুলিয়া, স্নেহ-প্রেমের মধুর বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সংসার ও সমাজ হইতে দূরে থাকিয়া, পুরুষের অনুকরণে বাণীর সেবাতেই নিজ প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিতে চায়, তাহা হইলে তাহার চেষ্টা কিরূপ বিফল হয়, ও সেইজন্য তাহাকে কিরূপ উপহাসাস্পদ হইতে হয়, এই বিষয়টি মহাকবি টেনিসন উক্ত Princess নামক কাব্যে সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর আর একজন প্রতিভাশালী ও শক্তি-শালী লেখক Samuel Smiles তাঁহার *Duty* নামক পুস্তকে নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :—

'After all, the best school of discipline is home. Family life is God's own method of training the young. And homes are very much as women make them. "The hope of France," said the late Bishop of Orleans, "is in her mothers." It is the same with England. But alas! we are distracted by the outcries of women who *protest against their woman hood, and wildly strain—to throw off their most lovable characteristics.* They want power—political power, and yet the world is entirely what their home-influence has made it. They believe in the potentiality of votes, and desire to be "enfranchised." But do they really believe that the world would

be better than it is if they had the privilege of giving a vote once in three or five years for a parliamentary representative? St. Paul gave the palm to the women who were stayers and workers at home, for he recognised that home is the crystal of society, and that domestic love and duty are the best security, for all that is most dear to us on earth.' [Duty, Chapter II.]

অন্যে পরে কা কথা, জর্ম্মণী দেশীয় রাজনীতি-তত্ত্ববিৎ Bluntochli তাঁহার '*The Theory of the State*' গ্রন্থে সমাজে নারীর প্রকৃত স্থান ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়—

'Her proper sphere is the life of the family for which she would be unfitted by mixing largely in public duties and political struggles. Womanly virtues would suffer,—woman's love as mother and wife, her housewifely skill, her fine sensibility and sweetness of character,—and there would be no gain in political capacity to make good the loss'.

[*The Theory of the State*, Chapter XX.]

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে, সামাজিক বা রাজনীতিক ব্যাপারে পুরুষের সহিত সমান অধিকার দিলেই নারীর প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করা হইল না; তাহার নারীত্বের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা হইল না। নারীকে তাহার যোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার আদর কর, তবে তাহার প্রকৃত সম্মান করা হইবে। সে যাহা চায়, অথবা যাহাতে তাহার প্রকৃত মঙ্গল হইবে, তাহাই তাহাকে দাও; সে যাহা চায় না, বা যাহাতে তাহার ও সমাজের ঠিক শুভ হইবে না, তাহা দিতে গিয়া বাহাদুরী দেখাইও না। ইহাতে তাহার সম্মান করা হইবে না; বরং তাঁহার নারীত্বের অপমানই করা হইবে।

এখন কথা উঠিতে পারে, ভারতমহিলা কি চায়? সে চায় শ্বশুর-শাশুড়ীর স্নেহ, স্বামীর ভালবাসা, পুত্র-কন্যার শ্রদ্ধা-ভক্তি, অপরাপর পরিজনবর্গের শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার; সে চায় সংসারের কর্ত্রীত্ব, সংসারের কোথায় কি হইতেছে তাহা দেখিয়া, তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করিবার অধিকার; সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সে চায়—মানুষোচিত ব্যবহার। দেখা যাউক, আমরা এখন আমাদের রমণীগণকে তাহাদের এই অবশ্য-প্রাপ্য বস্তুগুলি কিরূপ ভাবে দিতেছি।

বড়ই দুঃখের বিষয়, যাঁহারা আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের ভিতরকার খবর একটু রাখেন, তাঁহারাই জানেন বা বলিয়া থাকেন, আমরা নারীজাতির প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শনে বড়ই উদাসীন, বড়ই কৃপণ। কথাটার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। অথচ আমরাই স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বড়াই করিয়া বেড়াই। কি পল্লীগ্রামে, কি সহরে, আমাদের অন্তঃপুরের দিকে চাহিয়া দেখুন, কি ভীষণ নারীনিগ্রহ সেখানে অবাধে চলিয়া যাইতেছে। প্রায় প্রতিদিনই সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে এক বা ততোঽধিক নারী-নিগ্রহের বিবরণ পাঠ করা যায়। শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদের (বিশেষতঃ শাশুড়ী ও ননদের) কঠোর নির্য্যাতনে ও স্বামীর নিদারুণ অনাদরে কত শত অবলা, সংসার-জ্ঞান-রহিতা বালিকা বধূ দিবারাত্রি অশ্রুপাত করিয়া দিন কাটাইতেছে। আবার অনেকে নিদারুণ প্রহারের ফলে, অথবা অসহ্য বাক্য-যন্ত্রণায় মর্ম্মাহত হইয়া, আত্মহত্যা দ্বারা ইহ-জগতের সকল জ্বালা জুড়াইতেছে। উপায়বিহীনা বালিকা শ্বশুরবাড়ীর ঝি-চাকরের পর্য্যন্ত লাঞ্ছনা-ভর্ৎসনা নিরুত্তরে সহ্য করিতেছে। বধূ বিনা দোষে তিরস্কৃত হইতেছে। আবার শুধু সে নিজে নয়,—তাহার পিতৃকুলের ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত কুৎসিত ভাষায় অপমানিত হইতেছে। বধূর পিতা দরিদ্র হইলে ত কথাই নাই। হয় ত তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, কন্যাটির বিবাহ দিয়া, পরে আর মনের মত তত্ত্ব করিতে পারিলেন না; তাহাতে তাঁহার কন্যার নির্য্যাতনের একশেষ হইবে। (২) কন্যার পিতার নিকট হইতে অত্যাচার-উৎপীড়ন সহকারে বর-পণ আদায়ই ত নারীর নারীত্বের অপমানের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। একটি কোমল-হৃদয়া, সরলা বালিকা, তাহার সমস্ত জীবনটা তোমাদের পায়ে বিকাইয়া দিয়া, তোমাদের দাসী হইতে

(২) যাঁহারা শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'মা' আখ্যায়িকা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ধনেশ্বর মৃত্যুঞ্জয় বসুর গৃহ হইতে বিতাড়িতা তদীয় নিরপরাধা পুত্রবধূ মনোরমার অষ্টাদশবর্ষব্যাপী হৃদয়জ্বালা দুঃখের কাহিনী, পাঠ করিতে-করিতে অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন কি?

আসিতেছে ;—তাহাতেও তোমরা সন্তুষ্ট নও ;—তোমরা চাও আরও টাকা। ইহা অপেক্ষা ঘৃণার বিষয় আর কি হইতে পারে? আবার বধূ যদি ধনি-কন্যা হয়, তাহা হইলেও তাহার নিস্তার নাই ; কেন না, শ্বশ্রূ-প্রদত্ত 'বড়লোকের বেটি', 'রাজার নন্দিনী প্যারী' প্রভৃতি সুমিষ্ট আখ্যায় তাহার কর্ণকুহর অবিরত পরিতৃপ্ত হইতে থাকিবে!

স্ত্রী যদি স্বামীর ভালবাসা ও যত্ন পায়, তাহা হইলে শ্বশুরবাড়ীর অন্যান্য সকল কষ্ট সে হাসিমুখে সহ্য করিতে পারে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সেই আসল জিনিসটারই একান্ত অভাব দেখা যায়। সতী স্ত্রী স্বামী ভিন্ন আর কিছুই জানে না ; কিন্তু পিশাচ স্বামী অহর্নিশ নানাবিধ উপায়ে স্ত্রীর শরীরে ও মনে কষ্ট দিতে পশ্চাৎপদ নহে। প্রায়ই দেখা যায়, সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা স্ত্রীর স্বামী হয় মদ্যপায়ী, নয় দুশ্চরিত্র ; আর না হয় অত্যধিক পরিমাণে নিষ্ঠুর, এবং তিরস্কার ও প্রহারপরায়ণ। স্বামীর একবিন্দু ভালবাসা পাইলেই স্ত্রী নিজ জীবন সার্থক মনে করে ; কিন্তু স্বামী অনেক সময় তাহাও দিতে কুণ্ঠিত। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি যে, একজন স্বামী রাত্রিতে, তাহার স্ত্রী শয়নকক্ষে আসিলেই, মাঝে-মাঝে এই বলিয়া তাহাকে সম্ভাষণ করিত,—"দাঁড়া, পিঠের কাপড় খোল্।" তাহার পর একগাছি কঞ্চির ছড়ি তাহার পিঠে ভাঙ্গা হইত। এরূপ প্রায়ই ঘটিত। আবার সেই 'মাতৃ-ভক্ত' যুবক না কি তাহার পালিকা মাতার (অর্থাৎ মাসীমার) প্ররোচনাতেই এইরূপ করিত। (মাসীমাও এ কার্য্যে বিশেষ পটু ছিলেন।) সুখের বিষয়, সেই বালিকা এখন আর এ জগতে নাই,—জগৎ-পিতার স্নেহমঙ্গ-ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া সকল জ্বালা ভুলিয়াছে।

চরিত্রহীন, পিশাচ-হৃদয় স্বামী কত রকমেই না তাহার নিরপরাধা স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করিতেছে! স্ত্রী ধূলিশয্যায় শয়ন করিয়া, স্বামীর প্রতীক্ষায় অশ্রুপাত করিয়া, সারারাত্রি কাটাইতেছে ; আর গুণধর স্বামী হয় ত বেশ্যালয়ে পরম সুখে রজনী-যাপন করিতেছেন। অভাগিনী বৎসরের মধ্যে এক দিনও হয় ত দেবদুর্লভ স্বামীর শ্রীচরণ-দর্শন পায় না।

আমাদের সমাজে অবাধে প্রচলিত পুরুষের বহুবিবাহ-প্রথা নারী-নিগ্রহের আর একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। মৃতদারের পুনঃ-পত্নী-গ্রহণের কথা ছাড়িয়াই দিউন না ; কেন না, তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে গেলে, বোধ হয় শতকরা নিরনব্বই জন গণ্যমান্য ভদ্রলোক আমাকে 'নাস্তিক' 'বিধর্ম্মী', 'সনাতনধর্ম্মদ্বেষী' 'হিন্দুশাস্ত্রের অমর্য্যাদাকারী' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া, প্রহার করিতে উদ্যত হইবেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে এখন কোন কথা বলিব না। এ স্থলে আমি যুগপৎ বহুপত্নী-পরিগ্রহের কথাই বলিতেছি। কুলীনদের, বিশেষতঃ কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই দোষটা সবচেয়ে বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিতে পাওয়া যায়, অমুক ত সোণারচাঁদ,—সে মোটে পঁচিশটি কি ত্রিশটি বিবাহ করিয়াছে ; তাহার পিতার ৮০টি, এবং পিতামহের ১০৮টি বিবাহ ছিল! বিবাহ যে কুলীনের ব্যবসায়! যে বিশ-পঞ্চাশটা, অন্ততঃ দশ-পনরটা, বিবাহ করিতে না পারিল, সে আবার কুলীন কিসের? আবার সেকালের রাজাদের মধ্যে এ প্রথাটা খুবই চলিত ;—একালের নবাবদের মধ্যে [illegible] আসিয়াছে।

রাজারাজড়া বা কুলীন প্রভুদের কথা ছাড়িয়া দিয়া, সাধারণ গৃহস্থের মধ্যে আসিয়াও দেখিতে পাই, বহুবিবাহ-প্রথা এত অধিক না হইলেও, অল্পবিস্তর প্রচলিত আছে।

কাহারও পুত্র হইল না—সে আবার বিবাহ করিল (আবার যুবক অপেক্ষা বৃদ্ধের বিবাহের নেশাটা বেশী)। কাহারও স্ত্রী রুগ্না, সে হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া আর একটি বধূ ঘরে আনিল। কাহারও বা স্ত্রী সুন্দরী নহে ;—হঠাৎ একটা কালো-কুৎসিত কালপেঁচার সঙ্গে বিবাহটা হইয়া গিয়াছিল ; এখন তাহার জ্ঞান হইয়াছে ;—সে দেখিয়া-শুনিয়া, পছন্দ করিয়া, আবার একটি সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিল ;—কেন না, যাহাকে লইয়া সারাজীবন কাটাইতে হইবে, সে যদি মনের মতন না হইল, তাহা হইলে জীবনে সুখ কি? কেহ বা (নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও) মাতা-পিতার উপরোধে একাধিক বিবাহ করিতেছে। কেহ হয় ত বাপ-মায়ের একমাত্র আদরের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে ;—মাতা-পিতা স্নেহবশতঃ কন্যাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইতে দুই-চারি দিন বিলম্ব করিতেছেন ;—জামাতা মহাশয়ের বা বৈবাহিকা মহোদয়ার আর সহ্য হইল না,—গুণবান্ পুত্রের আর একটি বিবাহের ব্যবস্থা হইল। নিত্য এইরূপ কত ঘটনা ঘটিতেছে, কতগুলির উল্লেখ করিব?

নিম্নে একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিতেছি ;—তাহা

ধরা পড়িয়াছে, সেই গৌরীরই, লোক-মনের উপর প্রভাব বেশী।

ব্রহ্মা করিলেন তপস্যা। তাহার ফলে দেব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, নর, অসুর সমেত বিপুল ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইল। সেই হওয়ারই অগ্রে দেব প্রাধান্য আপনা হইতেই জগতে স্থাপিত হইয়াছিল। যে তপস্যা ব্রহ্মাকে ব্রহ্মা করে, যে তপস্যার বলেই ব্রহ্মাণ্ড, সে তপঃকে উড়াইয়া দিবে কে? ফলতঃ, সেই ত ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিল অসুর। সে উচ্চাকাঙ্ক্ষায় তপঃ-পথ অবলম্বন করিল। ব্রহ্মার তপস্যায় দেবতা বড়; কিন্তু ব্রহ্মার বিধানে তপস্যা বলে অসুর দেবতাকে উঁচাইল। যোগ্যতায় উঁচাইতেই, অসুর-সংঘাতে দেব-প্রাধান্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল।

তারক নামে মহাসুর ব্রহ্মা-লব্ধ বরে অত্যন্ত তেজস্বী ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়া, লোক সকলের উপপ্লবের নিমিত্ত ধূমকেতুবৎ উত্থিত হইল। তপস্যা বলে সে মহাশক্তিকে আশ্রয় করিয়াছে বটে,—কিন্তু অন্তরের অসুর ভাব কোথা যাইবে? সমস্তই তাহার স্বার্থ,—কেবল আত্ম তৃপ্তির চেষ্টা। বিশ্বেরও তাহাকে উপেক্ষা করিবার শক্তি নাই। সকলি শক্তির বশ। গুমরিত হাহাকারে আকাশ-বাতাস উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

তখন তারকের প্রভাবে সূর্য্যের আর প্রখর কিরণ বর্ষণের অধিকার ছিল না। যেটুকু রশ্মি-সাহায্যে অসুরের পুরোত্থান-দীর্ঘিকায় কমল প্রস্ফুটিত হইতে পায়, সেই পর্য্যন্ত। তার পর বাকি সমস্ত তেজঃ, সমস্ত তাপ লুকাইয়া, তারকের ভয়ে তাঁহাকে ম্লান-মুখে অবস্থান করিতে হইত। চন্দ্রের ষোড়শ কলাময়ী পৌর্ণমাসী শোভা জগৎ সমক্ষ হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইত। তাঁহাকে যে অসুর-পুরী সাজাইবার ভার লইতে হইয়াছিল! কেবল যে কলাটী দেবাদিদেব মহাদেবের শিরোভূষণ, অসুর সেইটী গ্রহণ করিতে সাহসী হয় নাই বলিয়াই, তাহা হইয়া উঠে নাই। পবন স্তব্ধ হইয়া তালবৃন্তানিলবৎ এতটুকু ঝিরিঝিরি ধারে তাহারই সেবা করিত; পাছে, এমন কি, উদ্যানের কুসুমটীও বৃন্তচ্যুত হয় এই ভয়ে, তাহার আর অপর কোথাও যাইবার অধিকার ছিল না। ষড়-ঋতুর পর্য্যায়-ক্রমে জগতে উদিত হওয়া বন্ধ হইল;—না হইলে আর পর্য্যায়-ক্রমে অসুরের উদ্যানের পরিচর্য্যা করে কে? সমুদ্র ব্যস্ত হইয়া তাহারই উপহার-যোগ্য রত্নোৎপাদনের প্রতীক্ষা করেন। বাসুকীর মস্তকের মণি তাহারই ভবনে অধিষ্ঠান-দীপের কার্য্য করে। স্বয়ং ইন্দ্রও মুহুর্মুহু কল্প-প্রসূত প্রসূন তাহার সন্তোষার্থ প্রেরণ করেন।

ইত্থমারাধ্যমানোঽপি ক্লিশ্নাতি ভুবনত্রয়ম্।
শাম্যেৎ প্রত্যপকারেণ নোপকারেণ দুর্জ্জনঃ॥ (২)

* * * *

তস্মিন্ বিপ্রকৃতাঃ কালে তারকেন দিবৌকসঃ।
তুরাসাহং পুরোধায় ধাম স্বায়ম্ভুবং যযুঃ॥ (৩)

ব্রহ্মা দেবগণের মুখে সমস্ত শ্রবণ করিলেন। বুঝিলেন, দেব-প্রকৃতির অন্তস্তল আলোড়িত হইয়াছে। তাঁহার সৃষ্ট দেব-চরিত্রে যে অসম্পূর্ণতা ছিল, এইবার তাঁহার বিধানে অমোঘ ভবিতব্য সেটুকু সারিতে পারে। অসুর-প্রাধান্য-উচ্ছেদকামী শরণাগত দেবগণকে বলিলেন

সম্পৎস্যতে বঃ কামোঽয়ং কালঃ কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতাং।
ন ত্বস্য সিদ্ধৌ যাস্যামি সর্গব্যাপারমাত্মনা॥
ইতঃ স দৈত্যঃ প্রাপ্তশ্রীর্নেত এবার্হতি ক্ষয়ম্।
বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্॥ (৪)

ব্রহ্মার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া দেবতারা বুঝিলেন, আবদারে মেওয়া মিলিবার নয়—চাই তপঃ। ব্রহ্মার বর তপের আজ্ঞাকারী। দেবতারা বুঝিলেন, ব্রহ্মা ভক্তবৎসল কর্ত্তা নহেন; তিনি তাঁহার অলঙ্ঘ্য নিয়মের আজ্ঞাধীন। সৃষ্টির সামান্য একটী কীটও সেই শক্তির আশ্রয়ে অসুর-দলন করিতে পারে; তাহার আশ্রয় উপেক্ষা করিয়া দেবের অন্তঃসারশূন্য দেবত্ব কিছুই করিতে পারিবে না। তাঁহারা মহাসমস্যায় পড়িলেন। তপের ফলদাতা দেবতা তাঁহারা;—

(২) অনুবাদ এইরূপে আরাধনা করিলেও সে ত্রিভুবনকে ক্লেশ প্রদান করে। দুর্জ্জনের স্বভাবই এই যে, তাহারা অপকারীর কাছে শান্ত মূর্ত্তি ধরে; উপকারীর কাছে নহে।

(৩) সেই সময়ে তারকের দ্বারা উপদ্রুত হইয়া দেবগণ ইন্দ্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন।

(৪) তোমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে; কিন্তু কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতে হইবে। আমি স্বয়ং এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইব না। সেই অসুর আমার নিকট হইতেই উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহাকে বিনাশ করা আমার উচিত নহে। দেখ, বিষবৃক্ষকেও পালন ও বর্দ্ধন করিয়া নিজ হাতে ছেদন করাটা ভাল দেখায় না।

অতবড় গগনস্পর্শী অভিমান ধূলিসাৎ করিয়া আত্ম-বিস্মৃত হওয়া,—সে কি সহজ কথা গো! আর ছাই দেবত্ব ছাড়া অপর কিছুর অভ্যাসই আছে কি? সেই বা হয় কোথা হইতে? অবশেষে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে তপস্যা করিবার মত আর একটা কিছু দেবাতিরিক্ত সত্তা (superman type) গড়িয়া লইতে হইবে। তাঁহারা ব্রহ্মাকে বলিলেন

তদিচ্ছামো বিভো স্রষ্টুং সেনান্যং তস্য শান্তয়ে।
কর্ম্মবন্ধচ্ছিদং ধর্ম্মং ভবস্যেব মুমুক্ষবঃ॥ (৫)

এবার আব্দার একটু সমঝিয়া হইল। বুঝিতেছি, তোমায় দিয়া কিছু করাইয়া লইতে পারিব না; কিন্তু আমাদের একটা উপায় চাই ত? তবে বলিয়া দাও,—যে লোক করিয়া দিবে, সে লোককে পাই কোথা? ব্রহ্মা তখন পরামর্শ দিতে বসিলেন; বলিলেন "সেই অসুর যেরূপ সমর-কুশল, তাহাতে, সে যখন যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করিবে, তখন তাহার অগ্রবর্ত্তী হইতে কাহারও সামর্থ্য নাই। তবে মহেশ্বরের ঔরস-জাত সন্তান হইলে, যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইতে পারে। সেই পরম প্রভু দেবদেব শঙ্কর তমোগুণের অতীত সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। আমি এবং বিষ্ণু তাঁহার সামর্থ্যের ইয়ত্তা করিতে অক্ষম। মহাদেব এখন তপস্যায় নিরত। তোমরা পার্ব্বতীর সৌন্দর্য্য দ্বারা অয়স্কান্ত মণির লৌহ আকর্ষণের ন্যায় তাঁহার মন আকর্ষণে যত্নবান্ হও।"

এইবার একবার সমস্ত পূর্ব্বের কথাগুলা মনে কর। সেই দক্ষের নিকট শিবের লাঞ্ছনা; সেই কলহ,—সেই সতীর দেহত্যাগ। স্মরণ কর, দেবতারা সকলেই দক্ষ পক্ষের লোক। তাহা হইলেই বুঝিবে, মাকে বুঝাইতে, সতীর আলেখ্য চিত্রিয়া, আবার গৌরী অঙ্কনের হেতু কি? সভ্যতা বিস্তারে মানব ত মঙ্গল পথ ধরিতে পারিল না। মানবের যতটুকু মঙ্গলের সহিত যুক্ত হইয়াছিল, তাহা স্বেচ্ছায় মনুষ্য-লোক পরিত্যাগ করিল। এইবার মানুষের উপায় কি? সুরাসুরের দ্বন্দ্ব আর অসুর-উপদ্রবের মধ্য দিয়া আমরা জানিতেছি, মানুষ এতক্ষণে কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মানুষকে মঙ্গল-পথ কে ধরাইবে? ধরাইবার কর্ত্তা যে সুমতি, সেও এতদিনে একটু নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে। বুঝিয়াছে—বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর। এইবার তাই, যে বিদ্যা-প্রভাবে শিবের সহিত মানুষের সম্বন্ধ হইবে, তাহার energy নূতন স্থান হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এবার তাই অটল, অচল, পৃথিবীর ভার ধারণে সমর্থ গিরিরাজ হিমালয় গৌরীর পিতা। এবার আর knowledge নহে, এবার Faith। গৌরী কে? তিনি ত সেই সতীই। মানুষের অশিব-দাসত্ব দেখিয়া, শিবকে পাইবার পথ হাতে-কলমে দেখাইবার জন্য, দেহান্তর গ্রহণ করিয়াছেন। এ একটা নবযুগের কথা,—পৃথিবীর একটা নূতন ভাঙ্গা-গড়ার কথা। অনেক বিপ্লব, বিবর্ত্তন, ভোগ, ঐশ্বর্য্য, সংহারের পর, মানুষ যখন বিশ্ব-রহস্যের সহিত আপনার প্রকৃত পরিচয় কি, জানিতে পারিয়াছে,—তখন কি ভাবে নিজের বনীয়াদ পত্তন করিতেছে, সেই কথা।

এ দিকে গিরিরাজ ভবনে গৌরী—

দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা।
পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্ জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি॥
তাং নারদঃ কামচরঃ কদাচিৎ কন্যাং কিল প্রেক্ষ্য পিতুঃ সমীপে
সমাদিদেশৈকবধূং ভবিত্রীং প্রেম্ণা শরীরার্দ্ধহরাং হরস্য॥ (৬)

ভস্মের আবরণে অগ্নি যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে না, তেমনি কৈশোর কমনীয়তার আবরণে গৌরীর হৃদয়ের নিগূঢ় প্রচ্ছন্ন শক্তি—হৃদয়ের অব্যক্ত প্রেরণা-পরম্পরা অধিক দিন প্রচ্ছন্ন রহিল না। তার পর নারদ আবার স্বয়ং আসিয়া সকল সন্দেহ ভাঙ্গিয়া দিয়া গেলেন। গিরিরাজ বুঝিলেন, বহ্নি ব্যতিরেকে অন্য কোনও তেজই মন্ত্রপূত ঘৃতাহুতির যোগ্য হইতে পারে না। তনয়ার নব যৌবন উপস্থিত; তিনি তখনও

অনুবাদ। (৫) অতএব হে বিভো! মুক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ যেমন সংসারবন্ধনোচ্ছেদক কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ আমাদিগেরও ইচ্ছা যে, সেই দুরাত্মার বিনাশের নিমিত্ত একজন সেনা-পতির সৃষ্টি করিব।

(৬) শশিকলা যেমন উদয়ের পর ক্রমশঃ দিন-দিন জ্যোৎস্নাপূর্ণ নব-নব কলা সংযোগে সংবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ তিনি অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যের সহিত দিনে-দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। একদিন ইচ্ছাবিহারী নারদ পিতৃ সমীপস্থ সেই কন্যাকে দেখিয়া বলিলেন, ইনি প্রণয় যাত্রা মহাদেবের অর্দ্ধাঙ্গহারিণী একমাত্র পত্নী হইবেন।

নিশ্চেষ্ট—পাত্র অন্বেষণের কোনও চেষ্টাই করিলেন না। মনে দৃঢ় সংস্কার,—যাহার জন্য যে আসিয়াছে, তাহার নিকট সে যাইবেই। ভাগ্যই মিলাইয়া দিবে। সময়, সুযোগ আপনিই উপস্থিত হইবে। এইখানে আমার একটা সন্দেহ আছে;—অষ্টমে গৌরীদান কথাটায় গৌরী শব্দ সংযুক্ত হইল কেন? এ গৌরী ত অষ্টমে অনন্ত পুষ্প মধুমাসে চূত-মুকুল সবিশেষ সঙ্গ দ্বিরেফমালার অনুকারী মাতা-পিতার আঁখি-পল্লবে অতৃপ্ত তৃষ্ণার ঘোর সঞ্চারিত করিয়া সখী-পরিবৃতা কিশোরী ক্রীড়াচ্ছলে মন্দাকিনীর তীরদেশে বালুকার বেদী রচনা করিতেছেন—কন্দুক-পুত্তলিকাদি লইয়া খেলা করিতেছেন। বৃহৎ সমুজ্জ্বল শিখা প্রদীপকে যেমন সুশোভিত করে, মন্দাকিনী যেমন স্বর্গ-পথকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তেমনি, এ গৌরী হিমালয়ের গৃহ পবিত্র ও অলঙ্কৃত করিয়া বিরাজিতা ছিলেন। তার পর সে ক্রীড়া-চাপল্য যখন অন্তর্হিত হইয়াছে, তখনও ত বিবাহের নাম কেহ করে নাই! তাঁহার অনন্যসাধারণ মন নিশ্চিন্ত হইয়া নিরুপদ্রবে তখন নিজেরই যেন এক সুপ্ত শক্তিকে জাগাইতেছে। শারদ সুর-গঙ্গায় মানসের হংসরাজির মত,—নিশীথে ওষধি-লতার স্বভাব-সিদ্ধ আলোক-দীপ্তির মত,—তাঁহার চিত্তপটে ধীরে-ধীরে প্রাক্তন-জন্ম-বিদ্যা প্রাদুর্ভূত হইতেছে। এত শীঘ্র শিক্ষকের বিদ্যা, উপদেশ আয়ত্ত করিতেছেন, যেন সে শিক্ষা নহে,—যেন সে পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত বিদ্যার স্মরণ করাইয়া দিবামাত্রই পুনরাবির্ভাব। গৌরীর বয়স বাড়িতেছে;—গিরিরাজও অপেক্ষা করিতেছেন। সাধু ব্যক্তিগণ ইষ্ট বিষয়েও ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। তিনিও উদাসীন;—মহাদেব ত স্বয়ং প্রার্থনা করেন নাই। শেষ এইমাত্র দেখিতে পাই, অদ্রিরাজ অবশেষে দেবগণের পূজনীয় শঙ্কর—যিনি অনর্ঘ—তাঁহাকে অর্ঘ্য দান করিলেন; আর স্বীয় তনয়াকে সেই যোগরত যোগীশ্বরের শুশ্রূষায় নিরত হইতে বলিলেন। আর মহাদেব? যিনি স্বীয় অষ্ট-মূর্ত্তিরই মূর্ত্তি-বিশেষ অগ্নিকে যজ্ঞ-কাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্বলিত করিয়া, স্বয়ং সমস্ত কামনা-ফলের বিধাতা হইয়াও, কোনও নিগূঢ় কামনায় তপশ্চর্য্যা করিতে-ছিলেন, তিনি—

প্রত্যর্থিভূতামপি তাং সমাধেঃ
শুশ্রূষমাণাং গিরিশোঽনুমেনে।
বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ॥ (৭)

এই পর্য্যন্ত গেল স্বাভাবিকের রাজত্ব। প্রয়োজনের কোনও তাগিদ নাই; সমস্তই আনন্দের স্ফুরণে ধীরে ধীরে স্ফুরিত হইতেছে। অন্তর্জ্জগতে চিনিয়া-চিনিয়াই সকলে আপন পথে অগ্রসর হইতেছে। বহির্জ্জগৎ হইতে কোনও তাড়া নাই। দেবগণের প্রয়োজনই প্রথম এই সম্ভাবনা জাগাইল। সেই অতর্কিত ধাক্কা এই সৌন্দর্য্যের রাজ্যে কি কদর্য্যতা, কি বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছিল,—এইবার সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

ইন্দ্র দেবগণকে লইয়া অলকা-পুরীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, অভিষ্ট সিদ্ধির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রয়োজনের তাড়ায় তিনি দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য। স্থির করিলেন, শিবেরও প্রয়োজন জাগাইয়া, তাঁহাকে দিয়া আত্ম-প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লইবেন। বহির্জ্জগতে সকলেই প্রয়োজনের দাস। বহির্জ্জগৎ হইতেই প্রকাণ্ড একটা তাড়া খাইয়া, এখন তিনি দেব-সমাজ লইয়া উদ্‌ভ্রান্ত। ধাক্কা খাইয়াই দেব-সমাজ জাগিয়াছে। ধাক্কা দিয়াই ইন্দ্র শিবের ধ্যান ভাঙাইতে চান। শিবের বহির্জ্জগতে তদুপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টির উদ্যোগ করিলেন। প্রভুর প্রয়োজনের গুরুত্বের অনুপাতেই অনুজীবী ভৃত্যের গৌরব-গরিমা! ইন্দ্রের কার্য্য-বিশেষ-ব্যপদেশ আজ তাঁহাকে কন্দর্পেরও মুখাপেক্ষী করিয়া দিল। ব্রহ্মা যে বলিয়া দিয়াছেন, পার্ব্বতীর সৌন্দর্য্য দিয়া, অয়স্কান্ত মণির লৌহ আকর্ষণবৎ, শিবের মন আকর্ষণে যত্নবান্ হও। যেমন ইন্দ্র, তেমনি তাঁহার বুদ্ধি; আবার যেমন বুদ্ধি, তদনুরূপ কর্ম্মচেষ্টা। কন্দর্পকেও এ যাবৎ আপনার সীমার বাহিরে যাইতে হয় নাই। হীন-চিত্ত যে তাহার প্রলোভনের পঞ্চ-বাণে এক কথায় বিজিত হইয়া থাকে, সেই চিত্ত জয় করিয়া-করিয়া সে আপনাকে অজেয় বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছে। ইন্দ্র মুখ ফুটিয়া বলিবার পূর্ব্বেই, সে আপনার অহঙ্কারে সাধিয়াই শিব-বিজয়ের ভার গ্রহণ করিল।

(৭) অনুবাদ। তপস্যার পরিপন্থিনী (স্ত্রীজাতি) জানিয়াও, গিরিশ তাহার শুশ্রূষা অনুমোদন করিলেন, যে হেতু, বিকারের কারণ বিদ্যমান থাকিলেও, যাঁহাদিগের মনোবিকার না হয়, তাঁহারাই প্রকৃত ধীর।

এইখানে বুঝিবার সুবিধার জন্য, একটা জিনিষ ধরিয়া লওয়া তত মারাত্মক ভ্রম হইবে না। আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, যে বৃত্তি প্রলোভনে পড়িবার উদ্দীপক, যে বৃত্তি কামনার সাহায্যকারী, তাহাই 'কন্দর্প'। অসুর-বিজয়ার্থ শিবকে গৌরীর সৌন্দর্য্যের দ্বারা আকর্ষণ করিতে, ইন্দ্র কন্দর্পের হস্তে শিব-জয় ভার তুলিয়া দিলেন; কিন্তু কন্দর্প-নিয়োগে শিব যদি গৌরীর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হন, তাহা হইলে ইন্দ্রের মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে;—কিন্তু ব্রহ্মার মনোরথ পূর্ণ হইবে না।

ওদিকে কন্দর্প চলিল। প্রভুর সম্মানে সম্মানিত সে স্পর্দ্ধায় মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছে,—প্রাণ থাকুক আর যাউক, কার্য্য সিদ্ধ করিতেই হইবে। তাহার প্রিয় সহচর বসন্ত এবং প্রিয় বনিতা রতি, নানা অমঙ্গল আশঙ্কা করিতে-করিতে, পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিলেন। কি এক অজানা ভয়ে তাঁহাদের বক্ষ-কবাট দুরু-দুরু কাঁপিতেছে। ক্রমে সকলে হিমবতে মহাদেবের আশ্রমে উপনীত হইলেন সহসা বসন্তের আবির্ভাবে সব যেন এলো-মেলো হইয়া উঠিল। সূর্য্য নির্ব্বিবাদে আপন আহ্নিক-গতি-পথে দক্ষিণের দূরতম প্রান্তে যাইতেছিলেন;—সহসা থমকিয়া উত্তরের দিকে হেলিলেন। পরিত্যক্তা নায়িকার দীর্ঘশ্বাসের মত, দক্ষিণের মলয়ের উচ্ছ্বাস আবার সেই বনস্থলীর উপর দিয়া বহিয়া গেল। আবার অশোক-তরুর ঝরা ফুল যেন স্তবকে-স্তবকে কেমন করিয়া শাখা জুড়িয়া হাসিতে লাগিল। আবার পাটল-কিশলয়-দল-ঘেরা আমের মুঞ্জরী বেড়িয়া-বেড়িয়া মত্ত মধুকর গুঞ্জরিতে লাগিল। বসন্তের নায়িকারূপী বনস্থলী আবার বিলাস-সজ্জা করিতে বসিলেন। নাসিকায় তাঁহার তিল ফুলের তিলক, ভ্রমর-পংক্তি যেন কাজল-রাগ, চূত-প্রবাল-রূপ অধর লালিমায় হাসির ছটা! কোকিল ডাকিল। পিয়াল-রেণু চোখে লাগিয়া দৃষ্টিহারা হরিণের পদশব্দে বনতলের ঝরা পাতা মর্ম্মরিয়া উঠিল।

আবার মনোরাজ্যেও একটা হিল্লোল বহিল বৈ কি! এমন কি, বুড়া-বুড়া ঋষিগুলার শুষ্ক দেহ প্রাণের আবেগে উল্লসিয়া উঠিল। তাঁহারাও কষ্টে-সৃষ্টে মনকে বশে রাখিলেন। প্রীতির একটা যে মরসুম আসিয়া গিয়াছে, দ্রষ্টা ভাবে তাঁহারা তাহা বুঝিতে লাগিলেন। এক পুষ্প-পাত্রে ভ্রমর-দম্পতী মধুর সন্ধানে বসিয়া গিয়াছে। মধু পানে ভ্রমর সেদিন প্রিয়ার অনুগামী। আরও প্রবলতর কোনও ক্ষুধার ঝোঁক বুঝি তাহার মধ্যে ছিল, তাই সে এখানে সবল হইয়াও, পিছাইয়া দাঁড়াইবার মত, হঠাৎ ভদ্র হইয়া পড়িয়াছে। কৃষ্ণসার ফিরিয়া যখন দীর্ঘ শৃঙ্গে মৃগীর গাত্র কণ্ডূয়ন করিয়া দিতেছিল, সেই স্বভাব-চঞ্চলা ভীরু সেদিন আর পলায়ন করে নাই;—স্পর্শ-সুখ-নিমীলিতাক্ষী শান্ত স্থির দাঁড়াইয়া ছিল। করিণী পদ্মরেণু-সুরভিত বারিটুকু গণ্ডুষ-মধ্যস্থ করিয়া, প্রেম-ভরে যূথপতির সন্ধান করিতেছিল। আর চক্রবাক-চক্রবাকবধূ মৃণাল-খণ্ড একত্র ভাগ করিয়া লইতেছিল। যেখানে বল্লরীর গাঢ় আবেষ্টনে বনস্পতির শাখা বাঁধা পড়িয়াছিল, সেখানেও কেমন একটা অকারণ পুলক-চেতনার যেন বৈদ্যুতিক ঝিমিঝিমি! পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকস্তনা স্ফুরৎপ্রবালোষ্ঠ-মনোহরা লতাবালিকায় প্রাণবন্ত আবেগ আসিয়া গিয়াছে! নির্জ্জীব লতা-পাশে স্থাণু বৃক্ষকাণ্ড বিজড়িত হইলে এমনটা ত দেখায় না! সেখানে প্রমোদোন্মত্ত কিন্নর-কিন্নরীর সঙ্গীত-সভা থাকিয়া-থাকিয়া নীরব হইয়া যাইতেছিল।—কেন? কিন্নর-বালার ললাটের পত্রাবলী-রচনা বিন্দু-বিন্দু ঘর্ম্মবারি-স্পর্শে যখন ঈষৎ স্ফীত, যখন পুষ্পাসবের নেশার আমেজে তাহার বিস্ফারিত নয়ন ঘূর্ণিত হইতেছে তখন কিন্নর-নায়কের আবেগের মাত্রা ছাপাইয়া যাইতেছিল;—সে তখন প্রিয়ার মুখে চুম্বন-রেখা মুদ্রিত করিয়া দিতেছিল।

এমনি মাদকতার মধ্যে, এমনি ধৈর্য্যচ্যুতির মধ্যে মহাদেব স্থাণুবৎ অটল, অচল, নির্ব্বিকার।

আত্মেশ্বরাণাং নহি জাতু বিঘ্নাঃ সমাধিভেদপ্রভবো
ভবন্তি। (৮)

তিনি তখন দেবদারু তরুতলে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম-পরিবৃত বেদীর উপর বীরাসনে বসিয়া। পূর্ব্ব দেহ ঋজু, উন্নত; স্কন্ধদ্বয় সন্নত; উত্তান পাণিদ্বয় ক্রোড়দেশ-ন্যস্ত;—যেন সেথা একটী রক্তপদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। মন তখন তাঁর সমাধি-মুখী;—নবদ্বার-পথে কোনও বার্ত্তাই আর হৃদয়ে পৌঁছিবার নহে। ক্ষেত্রজ্ঞ মহর্ষি-গণের নিকট অক্ষর বলিয়া পরিচিত পরমাত্মাকে স্বীয় আত্মার

(৮) অনুবাদ। যাঁহারা আপনাকে জয় করিয়াছেন, তাঁহাদের মনের একাগ্রতা আর কোনও রূপ বিঘ্ন দ্বারা ভগ্ন হইবার নহে।

মধ্যে অবলোকন করিতে-করিতে, তিনি তখন তাঁহাতেই নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন।

মূর্ত্তি দেখিয়া কন্দর্পের প্রাণ উড়িয়া গেল! এমন লোকক্ষেত্রে তাহার ব্যবহারের অস্ত্র দ্বারা,—মন দ্বারাও ধর্ষণের কল্পনা করিতে পারা যায় না! হাত কাঁপিল; বুক শুকাইল। হাতের অস্ত্র হাত হইতে,—কখন, সে জানিল না,—খসিয়া পড়িল। সে আপনার উদ্দেশ্য ভুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দেখিল, ধীরে-ধীরে যোগীশ্বরের ধ্যান ভাঙ্গিতেছে। ক্রমে যোগীশ্বর চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। প্রাণায়াম-বদ্ধ নিঃশ্বাস-পবন পরিত্যাগ করিলেন। বীরাসন-রচনা ভঙ্গ করিলেন। নন্দী সংবাদ দিল, গিরিরাজ-নন্দিনী নিকটে আসিবার অনুমতি চাহিতেছেন। মহেশ্বরের ভ্রূভঙ্গি সম্মতি-সূচক;—ইঙ্গিতজ্ঞ অনুচর চলিয়া গেল।

বসন্তের ভরা বন নিপুণ হস্তে নিঃশেষ করিয়া, সখীগণ রাজকুমারীর ফুলের ডালা ভরিয়া দিয়াছিল। ফুলগুলি মহেশ্বরের পায়ের তলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। আর ফুলের সঙ্গে সৌন্দর্যাস্পর্দ্ধী পার্ব্বতীর মুখখানিও প্রণামচ্ছলে সেখানে অবনত হইল। সুনীল কেশ-কলাপ হইতে কর্ণিকার কুসুম স্থানচ্যুত হইয়া পদতলের কুসুমরাশির দলে গিয়া মিশিল। কন্দর্প নির্নিমেষ নেত্রে দেখিতে লাগিল,—এই পার্ব্বতী!

তন্বী সভয়ে সখীদ্বয় সহ বেদীতটবর্ত্তিনী! রত্নাধিশ্বর-কন্যার দেহে একটীও যে মণিভূষণ নাই, চক্ষে দেখিয়াও তাহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। অশোক ফুল অঙ্গে যেন পদ্মরাগের মত মানাইয়াছে। কর্ণিকার কুসুমে সুবর্ণ-শোভা। সিন্ধুবারা পুষ্প সে অঙ্গে স্থান পাইয়া, শোভায় মুক্তাকে ম্লান করিয়াছে। সেই বনভূমি আপনার গোপন অঙ্গে তাহাকে বুঝি পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে।—প্রভাতারুণবৎ আরক্ত বসনে, স্তনভরে ঈষৎ অবনতা গৌরী যখন আসিতেছিলেন, মনে হইতেছিল, যেন একটী পল্লবিতা পুষ্পাবনতা লতা বায়ু-ভরে ঈষৎ হেলিতেছে, দুলিতেছে! একটা মধুকর তাঁহার সুগন্ধি নিঃশ্বাস-পবনে আকৃষ্ট হইয়া, বিম্বাধর-সন্নিধানে গুণ-গুণ স্বর আরম্ভ করায়, দংশন-ভয়ে চঞ্চল-দৃষ্টি ঈষৎ বেপমানা বালা লীলা-কমল-সঞ্চালনে তাহাকে নিবারণ করিতে গেলে, নিতম্বের বকুল-পুষ্প-রচিত কাঞ্চীদাম খসিয়া পড়িল। অপর হস্তে তাড়াতাড়ি তাহার স্থানচ্যুতি নিবারণ করিতেছেন,—ঠিক সময়ে পুনরায় সাহস সঞ্চয় করিয়া কন্দর্প শরাসন কুড়াইয়া লইল।

পার্ব্বতী প্রণামান্তে মুখ তুলিয়া চাহিলে, মহেশ্বর আশীর্ব্বাদ করিলেন—"অন্য কোনও রমণীকে ভজনা করেন নাই—তুমি এরূপ পতি লাভ কর।" পার্ব্বতী মন্দাকিনী হইতে পদ্মবীজ উত্তোলন পূর্ব্বক, সূর্য্যাতাপে শুষ্ক করিয়া যে জপমালা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাই আপন করে মহেশ্বরকে দিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিলেন। তিনি মালা গ্রহণ করিবার উপক্রম করিতেছেন,—সহসা আপনার মধ্যে চিত্ত-বিকার অনুভব করিলেন। বুঝিলেন, ঈষৎ বিলুপ্ত-ধৈর্য্য হইয়া, তিনি সেই বিম্বফল-তুল্য অধরোষ্ঠ-বিশিষ্টা উমার মুখ পানে সতৃষ্ণ নেত্রে চাহিয়া আছেন। জিতেন্দ্রিয়ত্ব হেতু বলবৎ ইন্দ্রিয়-ক্ষোভ তখনি দাবিয়া, কারণ সন্ধান করিতে মহেশ্বর দেখিলেন—

স দক্ষিণাপাঙ্গনিবিষ্টমুষ্টিং নতং সমাকুঞ্চিতসব্যপাদম্।
দদর্শ চক্রীকৃতচারুচাপং প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্॥ (৯)

তপস্যার প্রতি আক্রমণে বর্দ্ধিত ক্রোধ রুদ্রের কুটিল ভ্রূভঙ্গ ভেদিয়া তৃতীয় নেত্রজ অগ্নি ধ্বক্‌ধ্বক্ জ্বলিয়া উঠিল। মদন ভস্ম হইয়া গেল। ভূতনাথ ভূতসাথ স্ত্রীজাতির সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়া, উভরড়ে হিমালয় হইতে পলায়ন করিলেন।

হায় রে পিতার উচ্চ অভিলাষ! হায় রে আপনার নবীন সৌন্দর্য্য! সখী-সমক্ষে অবমানিতা, লজ্জিতা গৌরী শূন্যমনা হইলেন। ব্যথার ব্যথী হিমালয়ের সুশীতল ক্রোড় না থাকিলে, ধরিত্রি! তুমি বিদীর্ণা হইয়া তাহাকে বক্ষে স্থান দিতে কি?

(৯) অনুবাদ। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, কন্দর্প আপনার বাম পদ আকুঞ্চিত এবং স্কন্ধদ্বয় সন্নত করিয়া গুণাকর্ষণ-মুষ্টি দক্ষিণ চক্ষুর প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত আনয়ন হেতু (আকর্ণ পুরিত সন্ধান হেতু) চক্রীকৃত সুন্দর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক অবস্থিত রহিয়াছেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভগবান্ বুদ্ধদেবের চট্টল পরিভ্রমণ

[লেখক শ্রীরাজচন্দ্র দত্ত]

(১)

কোয়েপাড়া গ্রামনিবাসী কায়স্থ-বংশোদ্ভব ঈশানচন্দ্র দাসের পুত্র কবি নীলকমল দাস তৎরচিত "বুদ্ধওয়াং" বা "বুদ্ধরঞ্জিকা" গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন —

নিজ কায়স্থ বংশোদ্ভব হই দীন হীন।

*　　*　　*

রাজ সিমন্তিনী (১) আজ্ঞা শিরেতে আনিয়া।
বুদ্ধলীলা প্রকাশিব শাস্ত্র বিচারিয়া॥
ফুল নামে লোথক (২) সে মহা শাস্ত্র জ্ঞাতা।
শাস্ত্র দেখি বলিলেন যে সব বারতা॥
সে সব বৃত্তান্ত বঙ্গ ভাষাতে রচন।
করিতে বাসনা নীলকমলের মন॥

এই গ্রন্থ প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। বুদ্ধদেব চট্টগ্রামের কোন্-কোন্ জনপদ দিয়া তাঁহার শিষ্য আনন্দ সমভিব্যাহারে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অনেক তথ্য এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের জীবন কাল সংক্রান্ত ঘটনাবলীর আলোচনায় ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটনে সহায়তা হইতে পারে বলিয়া, এই প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত বিষয়গুলির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

সেই রথে আরোহণ করি ভগবান।
বায়ুভরে শিষ্য সহ চলিলা আর্কান॥

দক্ষিণাভিমুখে রথ যায় সমীরণ।
যেশ্চাপা নদীর তীরে মিলিলা তখন॥
আর্কান রাজ্যের নদী হেরী ভগবান।
রথ নামিবারে আদেশিলা সেই স্থান॥
আজ্ঞা মাত্রে দেব রথ রহিলা তখনে।
সেই স্থানে অবরোহে বুদ্ধ শিষ্য সনে॥

জলনিধির পূর্ব্বাংশেতে আছে এক মেরু।
ছিলা গিরি নামে গিরি সুন্দর সুচারু॥
সে মেরু শিখরে বুদ্ধ করি আরোহণ।
তাহার পশ্চিম দিকে করিলা গমন॥
মরা পপ্পাদা নামে পাথর উপরে।
দাঁড়াইয়ে ভগবান চতুর্দ্দিগে হেরে॥
তদন্তর আমাকে ডাকিয়ে ভগবান।
মনের মানস কিছু বোলেন সে স্থান॥
শুন ওহে ছোট ভ্রাতা আনন্দা সুজন।
পশ্চিম রাজ্যের কথা করহ শ্রবণ॥
ষোল রাজ্যে মধ্যে এই আর্কান সুস্থান।
পানস পঞ্চ নদী মধ্যে এ নদী প্রধান॥
সকল নদীর নীর এ নীরনিধিতে।
আসিয়ে পতন হয়ে নিরন্তর স্রোতে॥
এ নদীর পূর্ব্ব কূলে উনসত সহর।
পশ্চিম দিগেতে আছে সেই সম সর॥
এ সব রাজ্যেতে আমি পারামি কারণ।
কত জন্মে কতরূপ করেছি ধারণ॥
এক্ষে আমি দাঁড়াইয়েছি পর্ব্বত শিখরে।
মালাকর জন্ম ছিল এক জন্মান্তরে॥

(উক্ত গ্রন্থে ২৭৮।২৭৯ পৃষ্ঠায়

রথে চড়িয়া বুদ্ধদেব দক্ষিণ দিকে গমন কালে, সর্ব্বপ্রথম যে পর্ব্বত তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইয়াছিল, তিনি তাহাতে আরোহণ করিয়াছিলেন। সেই পর্ব্বত "জলনিধির" পূর্ব্বাংশে, অর্থাৎ সমুদ্রের পূর্ব্ব উপকূলে অবস্থিত। এই "জলনিধিতে" সমস্ত নদীর জল যাইয়া পতিত হইত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত পর্ব্বত হইতে ধন্যবতী নগর (বর্ত্তমান চাকমা রাজ্য, নয়ন পথে পতিত হইয়া থাকে। তাহা অর্দ্ধ দিবসের পথ মাত্র। কারণ "ধন্যবতীর" রাজা সৈন্য সামন্ত সহ বেলা দ্বিপ্রহরে তাঁহার রাজধানী হইতে রওনা হইয়া, রাত্রি সমাগমেই এই পর্ব্বতে পৌঁছিয়াছিলেন, ইহা এই পুঁথির বর্ণনায় দৃষ্ট হয়। এই পর্ব্বত তখন আরাকান রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই পর্ব্বতই বর্ত্তমান চন্দ্রনাথ শৈল। চন্দ্রনাথ শিব-মন্দিরের উত্তর-পার্শ্বে যে পাষাণময় মন্দিরের উচ্চ ভিটির ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে, উহাই

---

(১) চাকমা রাজমহিষী ৺কালিন্দী রাণী।

(২) রাউজান থানার বোয়াপাড়া গ্রামের কুলচন্দ্র লোথক নামক একজন বৌদ্ধ পুরোহিতের সাহায্যে নীলকমল দাস এই "বৌদ্ধরঞ্জিকা" রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থের বিষয়গুলি বৌদ্ধ-শাস্ত্র হইতে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। চাকমা রাণী কালিন্দীর আদেশে কবি এই গ্রন্থ রচনা করেন।

বুদ্ধদেবের উপবেশন-স্থান বলিয়া অতি প্রাচীন প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান কালে ভূকম্পনের ফলে এই মন্দির পাহাড়ের গহ্বরে পতিত হইয়া থাকিলেও, হিন্দুদের পর্ব্ব উপলক্ষে মেলার সময় এবং বৌদ্ধ পর্ব্বাদিতে পাহাড়িয়া এবং অন্যান্য বৌদ্ধগণ উক্ত ভিটিতে ও তন্নিকটস্থ শিলায় সিন্দূর, প্রদীপ ইত্যাদি দিয়া পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

(২)

অতঃপর বুদ্ধদেব রোসাঙ্গ রাজ্যে গিয়াছিলেন। ইহা পুঁথির বর্ণনায় দৃষ্ট হয়। এই রোসাঙ্গ রাজ্য কর্ণফুলী নদীর পূর্ব্ব উপকূলেই বটে। আমরা কবি আলাওলের গ্রন্থেও দেখিতে পাই,—

"কর্ণফুলী নদী পূর্ব্বে আছে এক পুরী।
রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতারি॥"

এই রোসাঙ্গ নগরের, উক্ত বুদ্ধওয়াং গ্রন্থের ২৮৮ পৃষ্ঠায় বর্ণনা মতে—

তেন মতে দ্বাত্রিংশ রূপ চমৎকার।
রোসাঙ্গ সহরের দেখালেন বারে বার॥
ক্ষেয়ত্ত পর্ব্বতে বুদ্ধ স শিষ্য সহিতে।
লীলা রঙ্গে রসে বাস করে আনন্দেতে॥

উক্ত গ্রন্থের ৩০৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে—

তদন্তর ভগবান কহেন শিষ্যরে।
জম্বুদ্বীপ ধন্য দ্বীপ অবনী ভিতরে॥
পশ্চিমদিগেতে আছে ষোরশ সহর।
গেঁড় ধান্য আদি উৎপন্নিত বহুতর॥
জন্মে জন্মে নানা দ্রব্য করেছি আহার।
সেই ষোল রাজ্য ধন্য প্রশংসা অপার॥
দক্ষিণ রাজ্যেতে এই রোসাঙ্গ প্রধান।
মধু মালতাদি জন্মে নানাবিধ ধান॥
কত মতে কত জন্মে করেছি আহার।
পুণ্য স্থান হইলেক কৃপাতে আমার॥

ইত্যাদি।

ইহার পর বুদ্ধদেব ধন্যবতী নগরে অর্থাৎ বর্ত্তমান রান্দুনীয়াস্থ চাক্‌মা রাজ্যে, যেখানে সাতদিনব্যাপী মহামুনী মেলা হইয়া থাকে, তথায় গমন করিয়াছিলেন,—

এই রাজ্য দুঃখী ব্যক্তি নাই একজন।
ধন্যবতী রাজ্য নাম হয়ে এ কারণ॥

ঐ গ্রন্থ ৩০৫ পৃষ্ঠা।

অতঃপর ভগবান বুদ্ধ দেব ব্রহ্মদেশের দ্বারাবতী প্রভৃতি নগরে বিমান রথে চড়িয়া গমন করিয়াছিলেন।

(৩)

ভগবান বুদ্ধদেবের জীবনের প্রথম ভাগের—

রাজ্য সুখ গত হইলে ত্রিংশত বৎসর।
পঞ্চ বৎসর তপ করিলেন বনান্তর॥

ইহার পর তদীয় জীবনের শেষ পঁয়তাল্লিশ বৎসর নানা স্থানে এক বৎসর দুই বৎসর করিয়া "ওয়া" বা বর্ষা বাস করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে—

আর "এক ওয়া" ছিল প্রভু সিংহল দ্বীপেতে।
তেত্রিশ বরিষ গত হয় সেই স্থানেতে॥

সিংহল হইতে বুদ্ধদেব দ্বারাবতী, অমরাবতী, সেদুক্তেরা ঠাকাছিরি প্রভৃতি নগরে একচল্লিশ বৎসর "ওয়া" বা বর্ষাকাল কাটাইয়া—

রাম্যু রাজ্য এক "ওয়া" রহিলা তদন্তর।
অন্ত হইলেক দ্বয় চল্লিশ বৎসর॥
তেতাল্লিশ বৎসরেতে রাজ্য ধন্যবতী।
সে নগরে একোয়া করেন নিবসতি॥

উক্ত গ্রন্থ ৪৯৩ পৃষ্ঠা।

ইহার পর বুদ্ধদেব মিথিলা নগর হইয়া রাজগড় বা রাজগৃহে গিয়াছিলেন, দৃষ্ট হয়। তদনন্তর আশি বৎসরে, ভগবান বুদ্ধ, নির্ব্বাণ প্রাপ্তির কিঞ্চিদধিক তিন মাস পূর্ব্বে, ব্রহ্মদেশের "বৈশালি" নগরে গমন করেন। (উক্ত গ্রন্থের ৫০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) তথায় বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন,

আর দেখা না হইবে সেই সে নগর।
পঞ্চত্ব হইব আমি ত্রয় মাসান্তর॥
যে দাওয়াং কেয়াং গৃহ দেখিব নয়নে।
মনের মানস পূর্ণ করিব এখনে॥

(উক্ত গ্রন্থের ৫০৪ পৃষ্ঠা)

এত ভাবি চিন্তামণি চিন্তিয়া অন্তর।
দিব্য নেত্রে হেরিলেন ঐশালী নগর॥
ধীরে ধীরে ভগবান করিলা গমন।
পেছক্কা নগরে গিয়া দিয়া দরশন॥
ছংন্দ্যা নামে বণিকের আম্রবাগানেতে।
বিশ্রামার্থে বসিলেন তরুর ছায়াতে॥

(ঐ গ্রন্থ ৬০৮ পৃষ্ঠা)

তথায় ঐ বণিকের গৃহে আতিথ্য গ্রহণের পর তিনি রক্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়েন। তৎপর আনন্দ বলিতেছেন

ঐশালি হইতে প্রভু করিলা গমন।
খুচিনাকং রাজ্যে আসিবেন করি মন॥
জ্বরাতে পীড়িত অঙ্গ কম্পে ঘন ঘন।
চলিতে না পারে প্রভু করিছে গমন॥
ষষ্টি প্রায় আসি সঙ্গেতে তখন।
মম অঙ্গে ভর করি করিলা প্রস্থান॥
ধীরে ধীরে পূর্ব্ব মুখে করেন গমন।
চক্রশালা (৩) রাজ্যে উপনীত ততক্ষণ॥

---

(৩) এই চক্রশালা বা ইদগাঁও গ্রামে প্রতি বৎসর বিষুব সংক্রান্তিতে মেলা হইয়া থাকে এবং তথায় বৌদ্ধগণ বুদ্ধপদে পিণ্ডদান করেন।

মেয়ংথ গ্রামেতে এক তরুর ছায়াতে।
শ্রমযুক্ত বিশ্রামার্থে বসিলা তথাতে ॥
বিসন্ন আনন দেখি হইয়া কাতর।
বিছাইয়া দিনু আমি গায়ের অম্বর ॥
তদুপরি ভগবান করিলা শয়ন।
কাতরে নিশ্বাস বায়ু বহে ঘন ঘন ॥
জলের পিপাসাযুক্ত হইয়া তখন।
আমাকে বলিলা জল আনহ এখন ॥
ছাবিক লইয়া গেনু নদীর তীরেতে।
ঘোলাকার দেখি জল চিন্তিত মনেতে ॥
অধে উর্দ্ধে নদী আমি করি অন্বেষণ।
ভাল জল প্রাপ্ত না হইলাম কখন ॥
প্রভুর সদনে আমি বিরস বদনে।
কর যোড়ে কহিলাম বলি শ্রীচরণে।
অনতি দূরেতে আছে কর্ণফুলী নদী।
সুবাসীত বারি পাব তথা যায় যদি ॥
কামুতা নদী বলে ব্রহ্মার ভাষাতে।
কর্ণফুলী বলি ব্যাখ্যা বাঙ্গলা ভাষাতে ॥

*

সেই নীর ভগবান করিয়া ভক্ষণ।
ধরাম্বর শয্যা গতে করিলা শয়ন ॥
সে সময় আলারা ঋষির জয়মান।
কুস্তাচা নামেতে মান্যা রাজার সন্তান ॥

(উক্ত গ্রন্থ ৫১১-৫১৩ পৃষ্ঠা)

(৪)

কুস্তাচা নামক বণিক পঞ্চাশখানা বাণিজ্য তরী লইয়া সওদাগরী করিতে যাইতেছিলেন। বুদ্ধকে "নীরনিধি" তীরে শয়নে দেখিয়া তথায় তরণী লাগাইলেন এবং বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই স্থলে বজ্র পতন প্রভৃতির শব্দ পর্য্যন্ত ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেব শ্রবণ করিতে পান নাই,—এই কথা গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই চৈত্যশালার অতি নিকটে সওদাগরের "ভিটি" ও "রাজঘাট" ও তাহার অনতি দূরে "ধনঘাট" প্রভৃতি স্থানের নাম হইতে প্রতীয়মান হয় যে, এক সময় বাণিজ্য-তরণী-সমূহ, আর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি দেশ হইতে দিগ-দিগন্তরে যাইতে হইলে, এই স্থান হইয়াই যাইত; এবং পানীয় জল ও নানাবিধ আহারীয় সামগ্রী এই স্থান (ঘাটা) হইতেই পুনঃ সংগৃহীত হইত। অতঃপর ঐ পুঁথির বর্ণনায় (৫১৭ পৃষ্ঠা) উক্ত বাণিজ্য স্থান সম্বন্ধীয় বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে।

তদন্তরে নৃপসুত তরী আরোহিয়া।
বাণিজ্য করিতে যায় জলধি বাহিয়া ॥

ঐ পুঁথির ৫১৮ পৃষ্ঠায় শিষ্য আনন্দ বলিতেছেন—

তথা হইতে ভগবান চলে ধীরে ধীরে।
আমি সহ উপনীত কাইচা (৪) নদীতীরে ॥

আবার ভগবান বুদ্ধদেব—

কাচুকা নদীর নীরে নামিয়া তখন।
অঙ্গ ধৌত করিলেন পতিত পাবন ॥

সম্ভবতঃ কাচুকা নদী কাইচা নদীর বহু উত্তরে কোন পর্ব্বত-বাহিনী মিঠা জল-বিশিষ্ট নদী হইবে। অতঃপর—

ভগবান চলিলেন এই তীর হইতে।
উপনীত হলো এক আম্রবাগানেতে ॥

তথায় বুদ্ধদেবের আমাশয় রোগ আরও বৃদ্ধি পাইল। তাহার পর ৫২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে—

সেই আম্র বাগান হইতে ভগবান্।
পদ ব্রজে উত্তরেতে করিলা প্রস্থান ॥
অজ্ঞিরা যমুনা পার হইয়া তখন।
উত্তরাভিমুখে বুদ্ধ করিয়া গমন ॥
খুচিনারুং নগরের দক্ষিণ দ্বারেতে।
পূর্ব্ব দ্বার হইতে কিছু অনতি দূরেতে ॥

দুইটি অশোক তরুর মূলে অশীতি বর্ষ বয়সে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত বর্ণনা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আরাকান রাজ্যের বৈশালা নগর হইতে ভগবান বুদ্ধ তিন মাস উল্লিখিত স্থানসমূহ পরিভ্রমণ করতঃ খুচিনারু অর্থাৎ কুশী নগরে গিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্ম-দেশস্থ বৈশালী, যেদাওয়াং (zedabin) প্রভৃতি নগর হইতে কুশী নগর মোটামুটী উত্তরাভিমুখে বর্ণিত হওয়ায় দিক্‌-নিরূপণ সম্বন্ধে বিশেষ কোন গোলযোগ হয় নাই।

এই প্রবন্ধের কবিতার বর্ণ বিন্যাস আসল পুঁথিতে যেমন আছে, তদ্রূপই লিখা হইয়াছে, সংশোধন করা হয় নাই।

ব্যাঙ্ক

[শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত এম-এ, এফ-আর-ই-এস,]

টাকা লইয়া ব্যাঙ্কের কারবার। টাকা বলিতে কেবল স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্রের মুদ্রা ও নোট বুঝিলে চলিবে না, যে সকল দলীল টাকার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়, তাহাও বুঝিতে হইবে। যথা, হুণ্ডী, বিল, চেক ইত্যাদি। এক কথায়, যদি কেহ ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলীর বিবরণ জানিতে চান ত বলিব—ব্যাঙ্কের কাজ ধার নেওয়া ও দেওয়া। ব্যাঙ্ক ডান হাতে

---

(৪) কর্ণফুলী নদীর পুরোভাগের যে অংশ পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়াছে, তাহা এখনও কাইচা নদী নামে অভিহিত হয়।

সাধারণের নিকট হইতে টাকা ধার করে, ও বাম হাতে ঐ টাকা সাধারণকেই ধার দেয়। অবশ্য কেহ বিনা স্বার্থে ব্যাঙ্ককে কর্জ্জ দেয় না; তাই ব্যাঙ্ক যে টাকা ধার করে, তাহার উপর সুদ দিতে হয়। ব্যাঙ্কও নিঃস্বার্থভাবে টাকা কর্জ্জ দেয় না; সেও বেশ দু'পয়সা সুদ আদায় করিয়া লয়। ব্যাঙ্ক যে যত সুদে ধার করে, তাহা অপেক্ষা বেশী সুদে কর্জ্জ দেয়; তাহা না হইলে, তাহার লাভ আসিবে কোথা হইতে?

ব্যাঙ্ক অনেক উপায়ে টাকা কর্জ্জ করে।

১। ব্যাঙ্কে এক প্রকার হিসাব রাখা হয়, তাহার নাম "চল্‌তি হিসাব" (Current Accounts)। এই হিসাবে টাকা রাখিলে, যাহাকে খুসি চেক্ (cheque) কাটিয়া টাকা দেওয়া চলে। মনে করুন, চন্দ্রকান্ত দাসের ব্যাঙ্কে একটা চল্‌তি হিসাব আছে; সেখানে তিনি কতক টাকা রাখেন। শ্যামচন্দ্র ঘোষকে তাঁহার ৫০৲ দিতে হইবে। তিনি এক চেক কাটিয়া, তাঁহার ব্যাঙ্ককে লিখিয়া দিলেন, "শ্যামচন্দ্র ঘোষকে ৫০৲ টাকা দেও।" শ্যামচন্দ্র ঘোষ এই চেক্ লইয়া চন্দ্রকান্ত দাসের ব্যাঙ্কে গেলেই, ব্যাঙ্ক তাহার সই লইয়া উক্ত টাকা দিবে। অবশ্য চন্দ্রকান্ত দাসের হিসাবে উপযুক্ত পরিমাণ টাকা জমা থাকা চাই। যথেষ্ট পরিমাণে টাকা না থাকিলেও টাকা দেওয়া হয়, যদি পূর্ব্ব হইতে ব্যাঙ্কের সহিত ধার পাইবার বন্দোবস্ত থাকে।

এই সকল চল্‌তি হিসাবে কতক পরিমাণ টাকা সব সময়ই পড়িয়া থাকে। ব্যাঙ্ক সেই টাকা খাটাইয়া সুদ পায়।

২। ব্যাঙ্কে সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসাব (Savings Bank Account) রাখা হয়। যাহাদের অল্প টাকা বেশী সুদে ব্যাঙ্কে রাখিবার ইচ্ছা, তাহারা এই হিসাবে টাকা রাখিয়া থাকে। সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসাবে চেক্ কাটিয়া অপরের পাওনা শোধ করা চলে না; তবে সপ্তাহে একদিন টাকা তুলিয়া লওয়া যায়। এই হিসাবে জমা রোজই লওয়া হয়; কিন্তু টাকা উঠাইয়া লইতে দেওয়া হয় সপ্তাহে কেবল মাত্র একদিন। এই প্রকার হিসাবে চল্‌তি হিসাব অপেক্ষা নানা অসুবিধা আছে বলিয়াই ব্যাঙ্ক বেশী সুদ দেয়। সাধারণতঃ সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসাবে অনেক টাকা পড়িয়া থাকে; কারণ, নিতান্ত দরকার না হইলে, কেহ স্বীয় উদ্বৃত্ত অর্থ খরচ করিতে চাহে না। সেভিংস ব্যাঙ্কের টাকা খাটাইয়াও ব্যাঙ্ক দু'পয়সা সুদ পায়।

৩। ইহা ছাড়া ব্যাঙ্ক নির্দ্দিষ্ট কয়েক দিনের নোটীশে, বা চাহিবামাত্র শোধ করিবার সর্ত্তে, টাকা ধার করে (money borrowed at call or at short notice)। এই প্রকারের কর্জ্জে ব্যাঙ্ক খুব কমই সুদ দেয়, এবং খুব কম সুদেই এই অর্থ খাটাইয়া থাকে। যে সমস্ত বড়-বড় কোম্পানীর টাকা অব্যবহৃত ভাবে পড়িয়া থাকে, অনিশ্চিত আবশ্যকের জন্য তাহারা ব্যাঙ্ককে এইরূপ সর্ত্তে কিঞ্চিৎ সুদ লইয়া এই টাকা ধার দেয়।

উপরিউক্ত তিন প্রকারে ব্যাঙ্ক যে সমস্ত টাকা ধার করে, তাহাকে অতি সাবধানে সেই টাকা খাটাইতে হয়; কারণ, ইচ্ছা করিলে টাকার মালিক যে কোন সময়ে এই টাকা তুলিয়া লইতে পারে। এই যে চাহিবামাত্র দেওয়ার সর্ত্ত—এই কথা ব্যাঙ্ককে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া, তাহার ব্যবসা চালাইতে হয়। এই সর্ত্ত রক্ষায় অক্ষম হইলেই ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়া যায়,—তাহাকে ব্যবসা বন্ধ করিতে হয়। খুব হিসাব করিয়া স্থির করিতে হয়, কতটা অর্থ প্রকৃত প্রস্তাবে দৈনন্দিন ব্যবহারে দরকার। কোন দেশে শতকরা ২৫ বা ৩০ দরকার হয়; আবার কোথাও কেবল মাত্র ১৫ কিম্বা ২০তেই চলিয়া যায়। এই পরিমাণ অর্থ ও ইহার কিছু বেশী হাতে রাখিলেই চলে; এবং বাকী টাকা উপযুক্ত বন্ধকী দ্রব্য লইয়া ধার দিতে হয়। ব্যাঙ্কারের এমন সকল সম্পত্তি এরূপ সর্ত্তে বন্ধক রাখা দরকার, যাহা সে আবশ্যক হইলে অনতি বিলম্বে বিক্রয় করিয়া, বা অন্যত্র বন্ধক রাখিয়া আপনার দেনা শোধ করিতে পারে। ব্যাঙ্কের লক্ষ্য থাকিবে অল্প অথচ নিশ্চিত লাভের দিকে। বেশী সুদ পাইতে গিয়া আসল মূলধন ডুবাইলে ব্যাঙ্কের কাজ চলে না। আর তাহার মূলধন কোথাও বেশী সুদে আটক (locked up) করিয়া ফেলিলেও দেউলিয়া হইবার সম্ভাবনা।

৪। নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থায়ী ভাবে (Fixed Deposits) সাধারণের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ৩ বা ১২ মাসের জন্য টাকা ধার করা হয়। দুই বা তিন বৎসরের অতিরিক্ত সর্ত্তে ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ কর্জ্জ করিতে চাহে না; কারণ, দুই বা তিন বৎসর পরে টাকার বাজার (money market) কিরূপ হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন। বাজার নামিয়া গেলে, ব্যাঙ্ককে অনর্থক বেশী সুদ দিতে হয়।

নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে এই টাকা শোধ করিতে হয় না বলিয়া, ব্যাঙ্ক এইরূপ জমায় অতিরিক্ত সুদ দেয়। অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া ব্যাঙ্ক এই টাকা বেশী সুদে খাটায়। নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে উত্তমর্ণ জমার টাকা দাবী করিলে, ব্যাঙ্ক উহা শোধ করিতে আইনতঃ বাধ্য নয়। টাকা ফিরাইয়া চাহিলে, সাধারণতঃ ব্যাঙ্ক কিছু মাত্র সুদ না দিয়া টাকা পরিশোধ করে। অধিকাংশ স্থলে ব্যাঙ্ক উত্তমর্ণের নিকট হইতে স্থায়ী জমার রসিদ (Fixed Deposit Receipt) বন্ধক রাখিয়া বেশী সুদে ধার দেয়। যাহার অর্থ তাহাকে ধার দিয়া দু'পয়সা লাভ, ব্যবসা মন্দ নহে। আর টাকা মারা যাইবার ভয় একেবারেই নাই।

উপরিউক্ত চারি উপায়ে সাধারণতঃ ব্যাঙ্ক টাকা ধার করিয়া থাকে—(১) চল্‌তি হিসাব (Current account), (২) সেভিংস হিসাব (Savings Bank Account), (৩) চাহিবামাত্র শোধ করিবার সর্ত্তে জমা গ্রহণ (Money borrowed at call or short notice), এবং (৪) স্থায়ী জমা (Fixed Deposits)।

ব্যাঙ্ক নানা উপায়ে টাকা লগ্নি করিয়া থাকে।

১। জমিদারী, বাড়ীঘর বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক ধার দেয়। কিন্তু এই প্রকারের কর্জ্জ অধিক পরিমাণে দেওয়া ব্যাঙ্কের পক্ষে উচিত নয়; কারণ, এইরূপ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া মূলধনের পুনরুদ্ধার করা অত্যন্ত

সময় সাপেক্ষ ও অসুবিধাজনক; অথচ ব্যাঙ্ক অধিকাংশ অর্থ চাহিবা-মাত্র শোধ করিবার সর্ত্তে জমা লইয়াছে।

২। নানাবিধ সমবায় কোম্পানীর অংশ (Joint Stock Company shares) বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক ধার দেয়। ব্যাঙ্ক অধমর্ণের নিকট হইতে অংশ জমা রাখিয়া এই মর্ম্মে চুক্তি লিখাইয়া লয় যে, আবশ্যক হইলে এই সকল অংশ (shares) বিক্রয় করিয়া টাকা উসুল করিতে পারিবে। এই সকল অংশ জমা রাখিয়া কর্জ্জ দিবার একটী সুবিধা এই যে, যখন ইচ্ছা সেয়ার বাজারে (Share market বা Stock Excharge) ইহা বিক্রয় করিয়া টাকা ফিরাইয়া পাওয়া যায়।

৩। গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী (Govt. Security) বা কোম্পানীর কাগজ (Govt. Promisory notes), ওয়ার বণ্ড (War Bonds) ইত্যাদি বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক ধার দেয়। অবশ্য কর্জ্জ দিবার পূর্ব্বে ব্যাঙ্ক ঐ সকল কাগজ নিজের নামে লিখাইয়া লয়। সেয়ারের ন্যায় এই সমস্ত গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীও যখন তখন সেয়ার বাজারে বিক্রয় করিয়া টাকা উসুল করা চলে।

৪। ব্যাঙ্ক হুণ্ডী বা বিলের ব্যবসা করে। তাহাতেও লাভ হয়। কোন এক ব্যক্তি (বা কোম্পানী) কর্ত্তৃক দ্বিতীয় এক ব্যক্তিকে তৃতীয় আর এক ব্যক্তির নিকট টাকা দিবার আদেশকেই হুণ্ডী বা বিল বলা যায়। কলিকাতার কোন ব্যবসায়ী হয়ত করাচীর এক ব্যবসায়ীর উপর হুণ্ডী কাটিয়াছে। কলিকাতার ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ককে তৃতীয় ব্যক্তি করিয়া, করাচীর দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর হুণ্ডী লিখিয়া দিল। যদি হুণ্ডীর পরিমাণ ৫০০ ্ হয়, তাহা হইলে কলিকাতার ব্যাঙ্ক প্রথম ব্যক্তির নিকট হইতে ৫০০ টাকার কিছু কম দিয়া উহা কিনিয়া লইবে। যতটা কম দেওয়া হইবে, ততটাই ব্যাঙ্কের লাভ। হুণ্ডী কিনিয়া লইয়া কলিকাতার ব্যাঙ্ক তাহার করাচী শাখায়—আর সেখানে শাখা না থাকিলে, এজেণ্টের নিকট—টাকা আদায়ের জন্য পাঠাইয়া দিবে। করাচীতে পুরোপুরি ৫০০ টাকা আদায় করা হইবে। হুণ্ডীর উভয় পক্ষকে খুব ভাল রকম না জানিয়া ব্যাঙ্ক টাকা আগাম (advance) দেয় না।

বিলাতী বিল বা Sterling Bills of Exchangeকে ঠিক হুণ্ডী বলা চলে না; কারণ, Sterling Billএর মুদ্রা আমাদের টাকা নহে; বিলাতী পাউণ্ড। ব্যাঙ্ককে দেশী টাকা দিয়া বিলাতী টাকা কিনিতে হয়। এইরূপ বিলের ব্যবসায়ে ব্যাঙ্কের বেশ লাভ হয়; আর লোকসানের আশঙ্কাও কিঞ্চিৎ কম; কারণ, এই সকল বিলের সহিত জাহাজী মালের রসিদ থাকে। আবশ্যক হইলে ব্যাঙ্ক মাল নিজেই ছাড়াইয়া লইয়া অনেক টাকা উসুল করিতে পারে।

কলিকাতা হইতে ব্যবসায়ীরা বিদেশে মাল চালান করে। জাহাজে মাল তুলিয়া দিলে তাহারা কাপ্তেনের নিকট হইতে রসিদ পায়। ইহার নাম Bills of Lading। এই সমস্ত মাল পাঠাইবার সঙ্গে-সঙ্গেই বীমা কোম্পানীর দ্বারা ইন্সিওর করে। এরূপ না করিলে কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়া মাল নষ্ট হইলে, সমস্ত টাকা মারা যায়। বীমা কোম্পানী মাল ইনসিওর করিয়া একখানা সার্টিফিকেট দেয় (Insurance Certificate)। প্রেরিত মালের একটা তালিকাও প্রস্তুত করিতে হয়,—ইহার নাম Invoice। এই তিনখানা কাগজ (ইহার প্রত্যেকখানিরই দুই বা ততোধিক নকল থাকে; কারণ, সাবধানতার জন্য বিভিন্ন ষ্টীমারে এক সেট করিয়া পাঠাইতে হয়)—মালের রসিদ (Bill of Landing), ইন্‌সিওরেন্স সার্টিফিকেট (Insurance Policy), ও মালের তালিকা (Invoice) একত্র জুড়িয়া, ব্যবসায়ী, যাহার নিকট মাল প্রেরিত হইতেছে, তাহার উপরে একখানি বিল (Bill of Exchange) কাটিয়া ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হয়। ব্যাঙ্ক বিচার করিয়া দেখে যে, যিনি বিল বা হুণ্ডী কাটিতেছেন, ও যাঁহার উপর কাটা হইতেছে, এই দুই পক্ষ (Party) ভাল কি না;—শুধু ব্যবসায়ী হিসাবে, সাধু নহে,—বিলের পরিমিত অর্থের যোগ্য কি না। যাহার নিকট মাল প্রেরিত হইতেছে তাহার, কিম্বা তাহার ব্যাঙ্কের আদেশপত্রও (Letter of Credit) ব্যাঙ্ক দেখিয়া লয়। পাঠাইবার আদেশ না থাকিলে, প্রেরিত মাল বিদেশে গৃহীত নাও হইতে পারে; বিলের টাকা আদায় না হইলে লোকসান হইবারই কথা। ইহা ব্যতীত জাহাজের কাপ্তেনের রসিদের (Bill of Lading) সহিত দ্রব্য তালিকা (Invoice) মোটামুটী ভাবে ব্যাঙ্ক মিলাইয়া দেখে। মনঃপূত হইলে ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ব্যাঙ্ক এই বিল কিনিয়া লয়। ব্যবসায়ী তাহার বিল সংক্রান্ত সকল স্বত্ব ব্যাঙ্ককে লিখিয়া দিয়া মূল্য পায়। যদি বিলের টাকা কোন কারণে আদায় না হয় ও তজ্জন্য ব্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে সে ক্ষতিপূরণ করিবে, এই সর্ত্তও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে লিখাইয়া লয়। অবশ্য বিলের পরিমিত টাকার অপেক্ষা কম টাকা দেওয়া হয়। বিভিন্ন দেশের টাকা বিভিন্ন রকমের। সে খুঁটিনাটির মধ্যে অদ্য যাইব না —বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এইরূপ লাভ ব্যাঙ্কের কেনা-বেচার মার-প্যাঁচের উপরই হইয়া থাকে।

৫। বিদেশ হইতে জাহাজে মাল আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ব্যবসায়ী বিলের টাকা দিয়া মাল ছাড়াইয়া লইতে পারিতেছে না। এরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্ক নিজে টাকা দিয়া মাল খালাস করে ও জিনিষ বন্ধক রাখে। পরে ব্যবসায়ী সুবিধা মত একেবারে বা ক্রমে ক্রমে টাকা পরিশোধ করিয়া, ব্যাঙ্কের নিকট হইতে মাল ছাড়াইয়া লয়। ব্যাঙ্ক ধার দেওয়া টাকার উপর সুদ পায়। এইরূপ কর্জ্জের নাম Loans against Merchandise.

৬। কোম্পানীর কাগজের সুদ (Interest) বা সমবায় কোম্পানীর লভ্যাংশ (Dividend) আদায় করিয়া দিবার জন্য ব্যাঙ্ক তাহার মক্কেলের নিকট হইতে কমিসন লয়।

৭। কোম্পানীর কাগজ বা সমবায় কোম্পানীর অংশ (Shares) ক্রয় বা বিক্রয়ের জন্যও ব্যাঙ্ক কমিসন পাইয়া থাকে।

৮। মূল্যবান দ্রব্য অথবা মূল্যবান দলীলপত্র সাবধানে (Safe custody) রাখিবার জন্যও ব্যাঙ্ক কমিসন পায়।

৯। ড্রাফট্ (Draft) ও টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার (Telegraphic Transfer সংক্ষেপে T. T) বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক দু'পয়সা লাভ করে। দূরবর্তী স্থানে টাকা পাঠাইতে হইলে সাধারণকে এই সকলের আশ্রয় লইতে হয়। যে স্থানে টাকা পাঠাইতে হইবে, সেই স্থানে ব্যাঙ্ক নিজ শাখা বা এজেণ্টের উপর একখানি চেক্ কাটিয়া দেয়—ইহাকেই ড্রাফট্ বলে। এই ড্রাফট্ দেখাইয়া টাকা আদায় করিতে হয়। টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার ও টেলিগ্রাফিক মণিঅর্ডারে কোন প্রভেদ নাই। ড্রাফট্ ও মণিঅর্ডারে প্রভেদ এই যে পিয়াদা বাড়ী গিয়া মণিঅর্ডার বিলি করিয়া আসে; আর ড্রাফট্ লইয়া গিয়া ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে হয়। ড্রাফট্ বা টেলিগ্রামে লিখিত টাকা অপেক্ষা ব্যাঙ্ক কিছু বেশী আদায় করে। এই অতিরিক্ত অংশই ব্যাঙ্কের কমিসন বা পারিশ্রমিক। পোষ্টাফিসের সাহায্যে অধিক পরিমাণে টাকা পাঠান যায় না বলিয়া, এবং ব্যাঙ্কের কমিসন অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া, ব্যবসায়ীগণ ব্যাঙ্কের সাহায্যে দূরবর্ত্তী স্থানে টাকা পাঠাইয়া থাকে।

রাষ্ট্র-বিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এম-এ]

বাইবেল-বর্ণিত ইডেন উদ্যানে আদম ও ইভের বাস ছিল। ইঁহারা কিছুকাল পরম সুখে কাটাইবার পর, শয়তানের কুপরামর্শে পাপে লিপ্ত হ'ন। পরমেশ্বর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে এই নন্দন-কানন হইতে বিতাড়িত করেন। এই অভিশপ্ত দম্পতির সন্তান-সন্ততিরা এক্ষণে এই সুবিশাল পৃথিবীতে বাস করিতেছে। ইহাদিগের আচারগত, ভাষাগত, বর্ণগত পার্থক্য যথেষ্ট। ইহাদিগের ক্রম-বিকাশের ইতিহাসও একরূপ নহে। কিন্তু এই বৈষম্যের মধ্যেও এই বিষয়ে ঐক্য আছে যে, ইহারা সর্ব্বত্রই কোন না কোন প্রকার দল বা সমাজ গঠন করিয়া বাস করিতেছে।

আদিগুরু আরিষ্টটল বলিয়াছেন যে, সমাজ-গঠন করিয়া বাস করাই মানবের স্বভাব। কতকগুলি নরনারী এক স্থানে সম্মিলিত হইয়া বসবাস করে—প্রত্যেকে অপরের সাহায্য পাইবার আশায়; কারণ, অপরের সহায়তা ব্যতীত নিজের সকল অভাব পূরণ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

এই সকল সমাজের প্রধান বিশেষত্ব-পরস্পরের বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক। একজন আদেশ করে, অপরে তাহা পালন করে। এই আদেশ পালন করিবার অভ্যাস যে সমাজে নাই, সে সমাজে শৃঙ্খলা নাই; কারণ এই অভ্যাসই সমাজের মূল ভিত্তি। পূর্ব্বে আমরা আদম-ফল খাইয়াছিলেন। তিনি আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিলেন; সেই জন্য তাঁহাদিগের পতন হইল।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সমাজকে দৃঢ়বদ্ধ রাখিবার একমাত্র শৃঙ্খল,—এই আজ্ঞাকারী ও আজ্ঞাবহের সম্পর্ক। স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়াই মানব অপর লোকের সঙ্গ, সাহচর্য্য কামনা করে। তাহার সকল অভাব নিজের চেষ্টায় সে পূরণ করিতে পারে না—সেই জন্যই সে অপরের সহায়তা প্রার্থনা করে। যখন আর্য্যগণ পঞ্চনদে বসবাস করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের এই নূতন বাসভূমিতে কত নূতন অভাব কত অভিনব বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সকল দূর করিবার মানসে তাঁহারা দলবদ্ধ হইলেন। কেহ খাদ্য সংগ্রহের ভার লইলেন; কেহ বা শত্রু-বিজয়ে ব্যাপৃত রহিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, অপরের সহায়তা ব্যতীত একা কেহ কৃষি-কর্ম্ম বা শত্রু-দমন করিতে পারিবে না। সুতরাং যাঁহারা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিবেন, তাঁহাদিগের ভরণপোষণের ভার অপরে লইবেন। কৃষিজীবিগণ শস্য উৎপাদনের বিনিময়ে পাইবেন—শান্তি।

স্বার্থের সহিত সমাজের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ বলিয়াই, সমাজ-চ্যুতিকে আমরা কঠিনতম দণ্ড বলিয়া মনে করি। সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি সকলের ঘৃণার পাত্র; তাহার গৃহে রজক, ক্ষৌরকার যায় না, দাসদাসী তাহার কর্ম্ম করে না—সে সর্ব্ব বিষয়েই বঞ্চিত।

অতএব "সমাজ" অর্থে আমরা বুঝি, বাধ্যবাধকতা সম্পর্কযুক্ত দলবদ্ধ নরনারী। এই দল গঠন নানা উদ্দেশ্যে হইতে পারে—ধর্ম্ম-সাধন, শান্তি-রক্ষা, আমোদ-প্রমোদ, সাহিত্যচর্চ্চা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে গঠিত সমাজের নিয়ম, গঠন-পদ্ধতি ও আকার বিভিন্ন হইবে—সমাজের আদেশ ও তাহার পালনের ব্যবস্থারও পার্থক্য থাকিবে। ধর্ম্ম-সমাজ উপাসনার পদ্ধতি-নির্দ্দেশ ও উপাসকদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবে। শান্তি ও ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা সমাজের লক্ষ্য। সমাজ শত্রু বহিঃ ও গৃহশত্রু হইতে সমাজকে নিরাপদ রাখিবার ব্যবস্থা, সত্য ও ন্যায় ধর্ম্ম পালন, এবং সর্ব্ববিষয়ে শৃঙ্খলা-বিধান করিবে। রাষ্ট্র-গঠনের প্রণালী নির্দ্দেশ ও নিয়ম প্রণয়ন করিবে।

"সমাজ-বিজ্ঞানের" ব্যাপক অর্থে আমরা বুঝি—সমাজভুক্ত মানবের ক্রিয়া-কলাপের বিশ্লেষণ ও আলোচনা। মানব যে-যে সমাজ গঠন করিয়াছে, সমাজ-বিজ্ঞান তাহার স্বরূপ নির্ণয় করে। ইহার অন্তর্গত ধর্ম্ম-বিজ্ঞান, ধন-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, সমাজ-বদ্ধ মানবের বিভিন্ন প্রচেষ্টার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে।

আদিম কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যত রকম রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছে, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান তাহার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস নহে। বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রের যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহা তাহার মূল কারণ নির্দ্দেশক। রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্য কি, রাষ্ট্রীয় দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কে-কে, তাহাদের পরস্পরের সম্পর্ক কি—রাষ্ট্র-বিজ্ঞান তাহার সমাধান করে।

কালের গতি রাষ্ট্রের আকারের দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। বর্ত্তমান

স্থিতি, কোথাও বা গতি। প্রাচীন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় গ্রীক নগর-রাষ্ট্র, বা হিমালয়ের পাদদেশস্থ ক্ষুদ্র গণরাষ্ট্র বৈশালীর যে চিত্র দেখিতে পাই, তাহার সহিত বর্ত্তমান যুগের অর্দ্ধপৃথিবীব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আয়তনের কি অপরিসীম পার্থক্য। প্রাচীন নগর-রাষ্ট্রের অভাব-অভিযোগ কত সামান্ত—রাষ্ট্র-পতি একাধারে শাসক, সেনানী, পুরোহিত; আর, আধুনিক রাষ্ট্রে কত গুরুসমস্যা, স্বাধিকার রক্ষার কি প্রবল চেষ্টা—রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সংখ্যা কত অধিক। সুতরাং এই ক্রমবিকাশের সহিত রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানের কার্য্যের পরিসরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে যাহা স্বপ্নাতীত ছিল, এমন বহু সমস্যার সমাধান এই বিজ্ঞানকে এখন করিতে হয়। সুতরাং ইহার বিধি, নিয়ম ও সিদ্ধান্তগুলিও ক্রমপরিবর্ত্তনশীল; অভ্রান্ত সত্য রূপে চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত ইহার পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী।

প্রাচীন হিন্দুগণ রাষ্ট্র-বিজ্ঞানকে দণ্ডনীতি বলিতেন। তাঁহারা রাষ্ট্রীয় বিষয়ের আলোচনা নীতির অঙ্গ মনে করিতেন; কারণ, তাঁহাদিগের লক্ষ্য ছিল সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি সাধন। প্রত্যেক রাজার কর্ত্তব্য অন্বীক্ষিকি, বেদত্রয়, বার্ত্তা ও দণ্ড-নীতির অনুশীলন। শুক্রাচার্য্য বলেন যে, দণ্ডনীতির উদ্দেশ্য দণ্ডার্হের দণ্ডবিধান করিয়া রাষ্ট্রীয় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

মহাভারতে নীতিশাস্ত্রের উৎপত্তির আখ্যান আছে—সত্যযুগে যখন মোহের আবির্ভাব বশতঃ পাপের উৎপত্তি হইল, তখন দেবগণ আশু বেদধর্ম্ম লোপের শঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা অবিলম্বে লক্ষ অধ্যায়যুক্ত নীতিশাস্ত্র রচনা করিলেন। এই শাস্ত্র কালক্রমে শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক সহস্র অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হয়।

সংস্কৃত সাহিত্যে দণ্ডনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে কৌটিল্য, শুক্রাচার্য্য, কামন্দক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রধান। ইহাদিগের লক্ষ্য ছিল—শাসন-কার্য্যের সম্পূর্ণতা সাধন। দণ্ডনীতি এই নিমিত্তই এত আদৃত হইত। কৌটিল্য বলেন—দণ্ডনীতি, রাজকার্য্যে কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য—তাহা নিরূপণ করে; এবং শক্তি-বৃদ্ধি ও দুর্ব্বলতা পরিহারের উপায় নির্দ্দেশ করে।

পীর সাহেবের দরগা

[শ্রীঅজয়কুমার সেন]

(১)

দুই বন্ধুতে প্রাচীন সমাধি সকল দেখিয়া যখন ফিরিতেছিল, কমল তখন কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "দেখ অতুল, ঐ যে একটা সমাধি দেখছো -তার বিবরণ শুনলে তুমি মর্ম্মাহত হ'বে।" এই বলিয়া সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অন্যমনস্ক ভাবে চলিতে লাগিল।

তখন সবে মাত্র সন্ধ্যার ঈষৎ আঁধার পৃথিবীর বক্ষের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দুই বন্ধুতে অতি কষ্টে বন্ধুর পথ দিয়া ফিরিতেছিল।

অতুল বলিল, "কি রকম—শুনতে পাই না?"

কমল চিন্তান্বিত ভাবে বলিল, "তুমি কেন,—সকলেরই শোনা উচিত। এমন—" বলিয়া কমল চাপা কণ্ঠে বলিল, "শোকাবহ ঘটনা যে—শুনলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।"

অতুল আবেগ ভরে বলিল, "এখনই বলিতে বলিতে চল না কেন?"

কমল "এখন থাক—বাড়ী গিয়া বলিব" বলিয়া মৌন হইয়া চলিতে লাগিল।

যখন তাহারা সমাধির পাশ দিয়া ফিরিতেছিল,—সেই স্থানের অধিবাসীরা সেই সময় সমাধিতে আলো দিতেছিল, এবং কেহ-কেহ সেখানে বসিয়া গান করিতেছিল।

অনেক ঘুরিয়া-ঘুরিয়া যখন তাহারা বাড়ী ফিরিল, তখন আকাশ তারায় ভরা; এবং গ্রাম-প্রান্তে নৃত্যশীলা গিরি-নদীর উচ্ছ্বাস শোনা যাইতেছিল।

(২)

আহারাদি শেষ হইলে অতুল বলিল, "কমল, তোমার সেই গল্পটা এইবার বল।"

কমল বলিল, "শুনবে তা' হ'লে" এই বলিয়া সে বলিতে আরম্ভ করিল।

যে স্থানে সমাধিমন্দির দেখিলে, উহারই নিকটে পীর সাহেবের ঘর ছিল। পীর সাহেবের এখন কেউ আছে কি না, তাহা আমি জানি না। এখানকার অধিবাসীরা পীর সাহেবকে দেবতার মত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। যদি কেহ বিপদে পড়িত, অমনি তাঁর নিকট আসিত; তিনি আর ব্যবস্থা করে দিতেন। এই রকমে তাঁহার দিন যাইতেছিল।

এই গ্রামে একজন প্রতাপান্বিত জমিদার বাস করিতেন। তাঁহার ক্ষমতা ছিল অসীম। তিনি পীর, পয়গম্বর, সাধু ও ফকির মানিতেন না—এই চরিত্রের লোক।

সেই জমিদারের রূপলাবণ্যবতী এক বয়স্কা কন্যা ছিল। এত বয়স পর্য্যন্ত, উপযুক্ত পাত্রের অভাবে, তিনি কন্যাদান করিতে পারেন নাই। জমিদার কন্যাকে বড় স্নেহ করিতেন।

জমিদার-কন্যা ফতেমা প্রায়ই গ্রামে বাহির হইতেন। সেই সময়ে পীর সাহেবের খুব নাম। ফতেমা একদিন পীর সাহেবকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, পিতা বলিলেন, "না—ও পীর নয়—ভণ্ড। তাহাকে দেখিয়া পুণ্য সঞ্চয় করবার দরকার নাই।"

ফতেমা কিছু না বলিয়া বিষণ্ণ মুখে অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। পীর সাহেবের কথা ফতেমার মনের মধ্যে বারবার উদিত হইতে লাগিল।

(৩)

পীর সাহেবকে দেখিবার বাসনা ফতেমার মনে বলবতী হইল। একদিন সন্ধ্যার সময় ফতেমা পীর সাহেবের দরগায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এই রাত্রে জমিদার-কন্যা ফতেমাকে সঙ্গিবিহীনা অবস্থায় দেখিয়া পীর সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; এবং সস্নেহ কণ্ঠে কহিলেন, "আপনি এই রাত্রে! কিছু কি প্রয়োজন আছে?"

ফতেমা বলিল, "আপনার নাম অনেক দিন থেকে শুনছি। দেখ্‌বো দেখ্‌বো করে আর আসা হয় না। তাই আপনার কাছে এসেছি।"

পীরসাহেব বলিলেন, "আর কেহ সঙ্গে আছে?"

ফতেমা বলিল, "না, আমি একলাই এসেছি। আপনার নিকট আসবার কথা বাবাকে বল্‌তে, তিনি বল্লেন, 'ও ভণ্ড।' বাবার নিষেধ সত্ত্বেও আমি এসেছি।"

পীর সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "পিতার নিষেধ সত্ত্বে আপনি আসিয়া বড়ই অন্যায় করিলেন।"

ফতেমা কাতর কণ্ঠে কহিল, "বাবা আপনাকে দেখিতে পারেন না; কারণ, আপনি পুণ্যাত্মা ও ধার্ম্মিক লোক। তিনি ধর্ম্ম মানেন না, সাধু মানেন না, মসজিদ মানেন না—" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

পীর সাহেব বলিলেন, "পিতার উপর ক্রোধান্ধ হইবেন না—তিনি মহাশয় ব্যক্তি—আশ্রিত-বৎসল।"

এই কথা শুনিয়া ফতেমা বলিল, "তিনি যে সাধু-ফকিরকে অশ্রদ্ধা করেন!" বলিয়া চুপ করিল।

রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া পীর সাহেব বলিলেন, "আপনি এখন ঘরে যান।"

যাইবার সময়, ফতেমা পীর সাহেবের পদধূলি লইয়া "আপনাকে দেখিয়া আমি ধন্য হইলাম" বলিয়া চলিয়া গেল।

(৪)

জমিদার লোক-মুখে শুনিলেন যে, তাঁহার কন্যা পীর সাহেবের কাছে যায়; এবং তাহার নিকটে দীক্ষা লইয়াছে। ইহা শুনিয়া তাঁহার মন জ্বলিয়া উঠিল; এবং তৎক্ষণাৎ তিনি কন্যাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

অসময়ে পিতার আহ্বান শুনিয়া ফতেমা ভাবিল—পিতা কি পীর সাহেবের নিকটে তাহার যাতায়াতের কথা শুনিয়াছেন?

ফতেমাকে দেখিয়া তাহার পিতা বলিয়া উঠিলেন, "তুমি না কি ভণ্ড পীরের নিকট দীক্ষিতা হয়েছো, আর তাহার নিকটে যাও? এখনি ইহার সচ্ উত্তর দাও; নচেৎ বিষম অনর্থ হইবে।"

ফতেমা অবিচলিত কণ্ঠে বলিল, "হাঁ, আমি তাঁর নিকটে যাই, এবং দীক্ষা লইয়াছি। তিনিও আমাকে ধর্ম্মের সঙ্গিনী করেছেন। আমি অন্য কোন দীক্ষা লই নাই; আমি প্রেমের দীক্ষা লইয়াছি। ইহাতে যদি আপনার রোষে পড়িয়া জীবন দিতে হয়, তাহাতে আমি প্রস্তুত।"

কন্যার কথা শুনিয়া জমিদারের চমক ভাঙ্গিল। তিনি রাগে অন্ধ হইয়া বলিলেন, "যে আমার আদেশ অমান্য করে, ভণ্ড পীরের নিকট দীক্ষিত হয়, সে আমার কন্যা নয়। আর তার স্থানও আমার বাড়ীতে নয়।"

পিতার কথা শুনিয়া ফতেমা কিয়ৎকাল তথায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া, অবশেষে অন্তঃপুরে চলিয়া গেল।

(৫)

জমিদার ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার তিরস্কারে কন্যার মন ফিরিয়া যাইবে।

পরদিন ফতেমাকে দেখিতে না পাইয়া, তিনি পীরের

নিকট আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, পীরসাহেব ধ্যানস্থ—ফতেমা পীর সাহেবের সম্মুখে নিবিষ্ট চিত্তে বসিয়া।

কন্যাকে এই ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জমিদার অনুচরদিগকে বলিলেন, "পীরকে বাঁধ—ফতেমাকে চুল ধরিয়া টানিয়া আন।"

এই গোলযোগে পীরসাহেবের ধ্যান ভঙ্গ হইল—তিনি সম্মুখে জমিদারকে দেখিয়া বলিলেন, "আপনি এই দীনের কুটীরে! বসুন। আমার সৌভাগ্য!"

জমিদার তাঁহার কথায় কাণ না দিয়া একজন অনুচরকে বলিলেন—"পীরকে বাঁধ আগে।" যেমন অনুচররা পীরসাহেবকে ধরিতে যাইবে, অমনি ফতেমা কালবিলম্ব না করিয়া, ঘরের কোণ হইতে একটি কুঠার লইয়া, সেই অনুচরের গলায় আঘাত করিল।

ইহা দেখিয়া জমিদার আরও ক্রোধান্বিত হইলেন; বলিলেন, "ফতেমাকে এখনই কাটিয়া ফেল! অসচ্চরিত্রা! দ্বিচারিণী!"

অনুচররা ফতেমাকে যেমন আঘাত করিতে যাইবে, অমনি পীর সাহেব তাহাকে রক্ষা করিতে গিয়া, নিজের ঘাড় বাড়াইয়া দিলেন! ফতেমার উপর উদ্যত আঘাত তাহার স্কন্ধে না পড়িয়া, পীরসাহেবের স্কন্ধের উপর পড়িল।

"পিতা কি করিলেন!" বলিয়া ফতেমা পীরসাহেবের পাদমূলে লুটাইয়া পড়িল।

জমিদার বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ এই অচিন্তিত-পূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। পরিশেষে—"ফতেমা, মা আমার!" বলিয়া পীরের পদতলে বসিয়া পড়িলেন।"

(৬)

কমলের আবেগময়ী ভাষায় এই কাহিনী শুনিতে-শুনিতে অতুল বলিয়া উঠিল, "কি নিষ্ঠুর ঐ বাপ!"

কমল কিছুক্ষণ থামিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল।

"যে সমাধি তুমি দেখিয়া আসিলে, ঐটী পীরের সমাধি। ঐখানে পীর সাহেবকে গোর দেওয়া হয়। গভীর রাত্রে এখনও ঐ স্থান হইতে একটা করুণ গীত-ধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায়। গান শুনিয়া ঐ স্থানের অধিবাসীরা ভাবিত, জমিদার-কন্যা গভীর রাত্রে আসিয়া, মৃতের পাশে বসিয়া, করুণ স্বরে গীত গাহিয়া যায়। আর প্রত্যূষে গিয়া দেখা যাইত, গোরের উপর ইতস্ততঃ ফুল ছড়ান রহিয়াছে। ঐ রকম করুণ গীত প্রায় নিশীথে শোনা যায়।"

কথার মধ্য স্থলে অতুল বলিয়া উঠিল—"ফতেমাকে আর কেউ কখনও দেখে নাই?"

কমল বলিল, "যে দিন পীর সাহেবকে সমাহিত করা হয়, তার পর দিন হইতে ফতেমা নিরুদ্দেশ। আর তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।"

ফতেমাকে খুঁজিয়া আনিবার জন্য জমিদার বিপুল অর্থ-ব্যয় করিলেন; কিন্তু ফতেমাকে আর পাওয়া গেল না। সকলে তাহার আশা ছাড়িয়া দিল।

জমিদার শেষে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া, নিজেকে তিরস্কার করিলেন; এবং পীরসাহেবের সমাধির উপর এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন।

মন্দিরের কাজ যেদিন শেষ হইয়া গেল, সেদিন জমিদার নতজানু হইয়া মন্দিরের নিকট বসিয়া প্রার্থনা করিলেন।

এই তাঁহার জীবনে প্রথম প্রার্থনা।

ইতোমধ্যে ফতেমা পাগলিনীর ন্যায় আসিয়া বলিল, "পিতা, আজ আপনি এসেছেন! আমাকেও ওঁর পাশে স্থান দিন!" বলিয়া ভূতলে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেল।

জমিদার তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখিলেন, ফতেমার মৃত-দেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

সকলে মিলিয়া পীর সাহেবের পার্শ্বেই ফতেমার নশ্বর দেহ সমাহিত করিল।

মার্কিণ মুলুক

[শ্রীইন্দুভূষণ দে মজুমদার এম্-এস্‌সি]

(আমেরিকায় ভারতবাসী)

"মোদের জাগতে হবে, উঠতে হবে, লাগতে হবে কাজে ;
যেতে হবে সাগরের পার,
ছাড়তে হবে জাতের বিচার,
শুনতে হবে বিশ্ব-বীণা কোন সুরেতে বাজে।"

যুক্ত-রাজ্যে ভারতবাসীর সংখ্যা বড়ই কম। ঐ দেশে চীন, জাপান ও ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদিগের সংখ্যা ভারতবাসীদের অপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং আমেরিকাবাসীরা চীনা, জাপানী ও ফিলিপিনোদের সম্বন্ধে যতটা জানে, ভারতবাসীদের সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান যে তদপেক্ষা অনেক কম, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। যে সকল উচ্চশিক্ষিত আমেরিকান্ স্বামী বিবেকানন্দ, ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্যর জগদীশচন্দ্র বসুর ন্যায় ভারতীয় মনীষীদিগের সংস্রবে আসিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্য হিন্দু সভ্যতা সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা ; কিন্তু সাধারণ আমেরিকান্‌দিগের মধ্যে অধিকাংশেরই বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষ করকোষ্ঠী-গণক, বাজিকর ও সাপুড়ের দেশ ; কেন না, প্রদর্শনী ও সার্কাস প্রভৃতিতে ঐ শ্রেণীর ভারতবাসীদের সহিতই তাহাদের সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। পুস্তকাদি পাঠ করিয়া সাধারণ মার্কিণদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে ধারণা, তাহা তাহাদিগের প্রশ্নের ধরণেই উপলব্ধি হয়। ট্রেণে, ষ্টীমারে অনেক আমেরিকান্ ভারতবাসীদের সহিত প্রথম আলাপেই জিজ্ঞাসা করে, "ভারতবর্ষে কি লোকের সংখ্যা অপেক্ষা দেবতার সংখ্যা অধিক ? সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই কি সে বাগ্‌দত্ত হয় ? বিধবাদিগের উপর কি সমাজের এতই অত্যাচার যে, তাহারা বৈধব্য দশা ভোগ করা অপেক্ষা, মৃত পতির চিতা-শয্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ মনে করে ? ভারতবাসীরা কি সর্পজাতির উপাসক ? তাহারা কি জীবন্ত শিশুদিগকে কুম্ভীরের নিকট উৎসর্গ করিয়া থাকে ?" হিন্দুদিগের সম্বন্ধে আমেরিকায় একটী ছড়াও শুনিয়াছি :—

"The poor benighted Hindoo
He does the best he Kindoo ; (১)
He sticks to his caste,
From first to last,
And for pants he makes his Skindoo" (২)

অর্থাৎ—

আঁধারের জীব যত হতভাগা হিন্দু,
আড়ম্বরে ত্রুটি নাই তবু এক বিন্দু ;
আমরণ আছে বসি
ধরিয়া জাতির রশি
এদিকে উলঙ্গ, তাতে লাজ নাই কিন্তু।

ভারতবর্ষ হইতে প্রথমে কে কবে আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন, তাহা অবগত নহি। তবে বঙ্গদেশের অমৃতলাল রায় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এবং মহারাষ্ট্র-রমণী আনন্দী বাঈ যোশী ও ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারক রেভারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় গমন করেন। মিঃ রায় ইংলণ্ডে তিন বৎসর চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে, ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে নিউইয়র্কে পৌছেন ও আমেরিকায় আরও তিন বৎসর অতিবাহিত করেন। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইনি লাহোরে (Hope) পত্র সম্পাদন কালে, উহাতে তাঁহার আমেরিকা-প্রবাসের কাহিনী ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেন। পরে ঐগুলি পুস্তকাকারেও মুদ্রিত হয়। এই সুশিক্ষিত ভারতবাসী ভদ্রলোকটি বিল্ মার্টিন্ (Bill Martin) নামক একজন চতুর্দ্দশ-বর্ষীয় আমেরিকান্ মুচী বালকের নিকট যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, সেই কাহিনী হইতেই মার্কিণ চরিত্রের বিশেষত্ব সম্যক্ পরিস্ফুট হয়। ইনি নিউইয়র্কে কার্য্যান্বেষণে ঘুরিতেছিলেন,—নিজের

(১) Can do. (২) Skin do.

তহবিলও নিঃশেষ হইয়াছিল। বন্ধুহীন, কপর্দ্দক-শূন্য অবস্থায় উপবাস ভিন্ন আর গতি ছিল না। এমন সময় একটী মুচী বালক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি জুতা ব্রাশ করাইবেন কি না। উত্তরে মিঃ রায় পরিহাসচ্ছলে কহিলেন যে, তাঁহার পয়সা নাই;—বালকটী যদি বিনা পয়সায় তাঁহার জুতা ব্রাশ

প্রিন্স্ ভিক্টর নিতে ন্দ্রনারায়ণ—কুচবিহার

করিয়া দেয়, তবে তাঁহার আপত্তি নাই। তখন মুচী বালক বলিল "এ ত সামান্য কথা। আমি নিশ্চয়ই বিনা পয়সায় তোমার জুতা ব্রাশ করিয়া দিব। যদিও তুমি কৃষ্ণাঙ্গ, তবু তোমার ন্যায় একজন দরিদ্র ব্যক্তির যে সামান্য একটু উপকার করিব না, আমার অন্তঃকরণ ততটা নীচ নহে। কিন্তু, দেখ, তোমাকে দেখিয়া ত নিগ্রো বলিয়া মনে হয় না। তুমি কি একজন স্পানিওলা (Spaniola)?" পরিচয় পাইয়া সে বলিল "বটে, তুমি একজন হিন্দু! বার্ণামের (Barnum) সার্কাসে ত আমি

শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে মজুমদার

অনেক হিন্দু দেখিয়াছি; কিন্তু তাহাদের পোষাক ত তোমার মত নয়! ভারতবর্ষ কি রকম দেশ, তাহা আমি জানি। সম্প্রতি আমি তোমাদের দেশ সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ করিতেছি।" আলাপসূত্রে সে যখন জানিতে পারিল যে, মিঃ রায় নিউইয়র্ক সহরে কাজের চেষ্টা করিয়াও বেকার অবস্থায় বসিয়া আছেন, তখন বলিল, "তুমি কি বলিতে চাও যে, তোমার মতন একজন বয়স্ক লোকের নিউইয়র্কে কাজের কোন যোগাড় হইতেছে না! বোধ হয়, কোন

সুখের চাকরী না পাইলে তোমার করিবার ইচ্ছা নাই। তুমি কি তোমার হাত ময়লা করিতে রাজি নও? মনে রাখিও, এদেশে ফুলবাবু ও নিষ্কর্ম্মাদের স্থান নাই।"

বিল্ মার্টিন্ মিঃ রায়কে কোন হোটেল অথবা ভোজনাগারে (Restaurant) খিদমদ্গারের (waiter) কার্য্য করিতে পরামর্শ দিয়া বলিল, "তোমার ভিতরে যদি পদার্থ থাকে, তবে ক্রমে ক্রমে যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্টের পদ লাভ করাও তোমার পক্ষে অসম্ভব নহে।" বিল্ মার্টিন্‌কে যখন জিজ্ঞাসা করা গেল, সে নিজে কখনও প্রেসিডেণ্ট হইবার আশা রাখে কি না, তখন সে বলিল, "উহা আমার ভবিষ্যৎ

নায়াগ্রা-প্রপাতের বন্ধুগণ—

(ক) এইচ, পি, মিত্র; (খ) জে, এন, চক্রবর্ত্তী; (গ) এস, এল, শীল; (ঘ) ডি, দত্ত; (ঙ) এইচ, এল, দত্ত।

আর্থিক অবস্থার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। ঐ পদ আমি নিলে নিতেও পারি, না নিতেও পারি। দুনিয়াতে টাকাই সব। যদি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারি, তবে প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য আমি অর্দ্ধ পয়সা ব্যয়

বিল্ মার্টিনের পরামর্শ মত মিঃ রায় জাত্যভিমান বিসর্জ্জন দিয়া ও কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া একটী লৌহার কারখানাতে কার্য্য গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি নিউইয়র্কে কোন পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের পদও লাভ করিয়াছিলেন। গ্রন্থ প্রণয়ন কালে তিনি লিখিতেছেন "বিল্ মার্টিন্ যদি জীবিত থাকে, তবে সে এখন (১৮৮৯ সালে) একজন বিংশতিবর্ষীয় যুবক। এই কয়েকটী লাইন কি কোন দিন তাহার চোখে পড়িয়া, তাহার ভারতবাসী বন্ধুকে মনে করাইয়া দিবে!"

আনন্দ বাঈ যোশী ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নবম বৎসরে ইঁহার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইনি আমেরিকায় পৌছেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ফিলাডেলফিয়ার রমণী চিকিৎসা বিদ্যালয় (Women's Medical College, Philadelphia) হইতে এম্ ডি উপাধি প্রাপ্ত হন; এবং সেই বৎসরই রুগ্ন শরীরে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পরবর্ত্তী বৎসরে অর্থাৎ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। ইনি লোক-গঞ্জনায় দৃক্পাত না করিয়া, ও অসীম সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করিয়া, স্বীয় বিবেক বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া, স্বামীর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, অষ্টাদশ বৎসর বয়সের সময়, হিন্দু-রমণীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম, কিরূপে কয়েকজন মার্কিণ মহিলার সহিত, প্রবল জ্ঞানলিপ্সা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত যুক্তরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন, এবং কিরূপেই বা হিন্দু রীতিনীতি সম্যক্ রক্ষা করিয়া, অসামান্য প্রতিভা ও চরিত্রবলে সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা মিসেস্ ক্যারোলাইন্ হিলি ডাল্ (Caroline Healy Dall) প্রণীত আনন্দী বাঈ যোশীর জীবনীতে বর্ণিত আছে।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও ইংলণ্ডের পথে আমেরিকায় গমন করেন। তাঁহার "Oriental Christ" অর্থাৎ "প্রাচ্য খৃষ্ট" নামক পুস্তকখানি আমেরিকায় অবস্থান কালেই সমাপ্ত হয়; এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দেই প্রকাশিত হয়। রেভারেণ্ড মজুমদারের ভূ-প্রদক্ষিণের বিবরণ তৎপ্রণীত "Tour Round the World" নামক পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে।

মিসেস্ ড্যাল্ প্রণীত জীবনীতে আনন্দী বাঈর স্বামী গোপাল বিনায়ক যোশী এবং তাঁহার বন্ধু মিঃ সাঠের ১৮৮৪

ও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় অবস্থানের কথা লিখিত আছে। এই জীবনী পাঠে আমরা ইহাও অবগত হই যে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে অষ্টবিংশতি বৎসর বয়সের সময় পণ্ডিতা রমাবাঈ আত্মীয়া আনন্দী বাঈর অনুরোধে আমেরিকায় গমন করেন।

এই কয়জনের পূর্ব্বে কিম্বা ইঁহাদের সময়ে অপর কোন ভারতবাসী অধ্যয়ন কিম্বা অন্য অভিপ্রায়ে আমেরিকায় অবস্থান করিয়াছেন কি না, জানি না। তবে মোটের উপর ইহা স্বীকার্য্য যে, আমাদের দেশের ছাত্রেরা হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিবার জন্যই প্রথম-প্রথম আমেরিকায় গমন করিতে আরম্ভ করেন।

কর্ণেলে ভারতবাসী ছাত্রগণ (১৯০৭ সাল)

১৮৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দে সিকাগোর আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী (Chicago International Exhibition) উপলক্ষে একটি ধর্ম্ম-সভা আহূত হয়। ইহা Parliament of Religions নামে বিখ্যাত। ঐ সম্মিলনীতে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মসমূহের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। ভারতবর্ষ ও সিংহল হইতে কয়েকজন বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, জৈন ও থিয়জফির প্রচারকও ঐ ধর্ম্মসভায় নিমন্ত্রিত হন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিনিধি ছিলেন সিংহলবাসী মিঃ ধর্ম্মপাল। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ছিলেন বোম্বাইবাসী মিঃ নাগরকার ও রেভারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। জৈন ধর্ম্মের ছিলেন মিঃ গান্ধী। আর থিওজফির প্রতিনিধি ছিলেন মিসেস্ আনি বেসান্তের সহিত মিঃ চক্রবর্ত্তী। অন্য প্রতিনিধিদের ন্যায় প্রথমে নিমন্ত্রিত না হইয়াও স্বামী বিবেকানন্দ এই মহাসভায় হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া ভারতবর্ষের যে মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালী পাঠকের অবিদিত নহে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী বাঙ্গালা ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই বাহির হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার আমেরিকা প্রবাসের কাহিনী এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন।

সিকাগো ধর্ম্ম-সভায় বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী প্রচারকেরা যে স্ব স্ব ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, তাহা সভায় রিপোর্টে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে একজন ভারতবাসী প্রতিনিধি (১) প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভেদ বর্ণনা করিয়া একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তাহার কিয়দংশ নিম্নে বিবৃত হইল:—

"প্রতীচ্য জগতে আপনারা সজাগ, সতর্ক, কর্ম্মব্যস্ত ও লাভের প্রত্যাশী; প্রাচ্যজগতে আমরা চিন্তমগ্ন, ধ্যানস্থ ও বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা। প্রতীচ্যে জড়জগতের রহস্যগুলি বিজ্ঞানবলে আপনাদের আয়ত্তাধীন, নিসর্গকে জয় করিয়া আপনারা ধনৈশ্বর্য্যশালী। আপনারা অনেক সময় মনে করেন, প্রকৃতিদেবী আপনাদের দাসীস্থানীয়া;—তাঁহার পবিত্রতা উপলব্ধি করিতে আপনারা অক্ষম। প্রাচ্যে প্রকৃতিই আমাদের সনাতন ধর্ম্মমন্দির, স্রষ্টার পরেই আমরা সৃষ্টির

(১) রেভারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

শাসক। প্রতীচ্যে লোকের চালচলন আইন কানুনের অধীন; এখানে আপনারা নৈতিক বিধিবিধানের ব্যবস্থা করেন ও জনসমাজের মতামত দ্বারা পরিচালিত হন। প্রাচ্যে ভগবানই আমাদের আদর্শ, এবং তাঁহাকেই আদর্শ মনে আমরা সম্পূর্ণ আত্মজয়ের বৃথা প্রয়াস করিয়া থাকি। প্রতীচ্যে আপনারা সর্ব্বদাই কাজে মগ্ন,—এখানে কর্ম্মই আপনাদের ধর্ম্ম। প্রাচ্যে আমরা বহুক্ষণ ধর্ম্মচিন্তায় অতিবাহিত করি,—সেখানে ধর্ম্মই আমাদের কর্ম্ম।"

সিকাগো ধর্ম্ম সভার পর হইতেই আমেরিকার বেদান্ত সমিতি স্থাপিত হয়; ও নিউইয়র্ক, সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো (San Francisco), লস্ এঞ্জেলোস্ (Angeles) প্রভৃতি স্থানে স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকজন বাঙ্গালী সহযোগী ও গুরুভাই তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া মার্কিণদিগকে বেদান্ত শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন।

কপূর্থলার মহারাজাও সিকাগোর আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন। মহারাজা ইয়োরোপে ভ্রমণ কালে অন্য মহিষী বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও স্পেন্ দেশীয় এক ললনার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার জন্যই আমেরিকার কোন সংবাদপত্র মহারাজার আমেরিকা অবস্থান কালে কৌতুক করিয়া লিখিয়াছিল যে, মহারাজার অন্তঃপুরে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ৯৯টী মহিষী আছেন; একটী মার্কিণ মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার মহিষীর সংখ্যা একশতে পরিণত করিবার জন্যই তাঁহার যুক্তরাজ্যে শুভাগমন। মহারাজা তাঁহার মার্কিণ ভ্রমণ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছেন।

বরদার মহারাজাও ১৯০৬ সালে আমেরিকায় উপস্থিত হইয়া হার্ভার্ড প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। আমেরিকার সংবাদপত্রগুলিতে মহারাজার রাজ্য,ধন, ঐশ্বর্য্য, মণিমুক্তা, পোষাক পরিচ্ছদ, চেহারা, ইংরাজী উচ্চারণ প্রভৃতি সম্বন্ধে ——— বিবরণ দেখিতে পাইতাম। মহারাজা রাজকীয় পরিচ্ছদ, জহরত প্রভৃতি পরিধান করিতেন না বলিয়া মার্কিণরা যেন একটু নিরাশ হইয়াছিল। মনে পড়ে, মহারাজার সম্বন্ধে একটা বর্ণনার হেড্‌লাইনে লিখিত ছিল "He is a Dapper Chap. Looks like a rich East Indian Merchant." অর্থাৎ লোকটী বেশ চালাক চতুর, দেখিতে একজন ধনী ভারতবর্ষীয় বণিকের মত। একজন বিশিষ্ট-মহারাজা সম্বন্ধে "Chap" কথাটা প্রয়োগ করা কেবল সাম্যবাদী আমেরিকাতেই সম্ভব। মহারাজার একটা উক্তিতে আমেরিকার সংবাদপত্রগুলিতে হুলস্থূল পড়িয়াছিল। আমেরিকানরা তাহাদের ললনাদিগের সম্বন্ধে বড়ই গৌরবান্বিত; তাই তাহারা মহারাজার কাছে মার্কিণ মহিলার বিশেষ সুখ্যাতি শুনিবারই আশা করিয়াছিল। কিন্তু কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি মার্কিণ রমণীদের সম্বন্ধে মহারাজার মত জিজ্ঞাসা করায়, মহারাজা বলিলেন যে, তিনি মার্কিণ রমণীদের কোন বিশেষত্ব দেখিতে পান নাই। মৌমাছির চাকে যেন লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইল। সংবাদপত্রগুলিতে বড়-বড় হরপে হেড্‌লাইন্ বাহির হইতে লাগিল "Here is an Indian Maharaja who finds nothing extraordinary in American women" অর্থাৎ

আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণ

পি, এস, শিলোত্রি; এইচ, এল, দত্ত; কে, এল, চক্রবর্ত্তী; মাননীয় শ্রীযুক্ত রমানাথন্; এস, এল, শীল; এ, সি ঘোষ; আই, বি, দে মজুমদার।

"ভারতবর্ষের একজন রাজা বলিতেছেন যে, মার্কিণ রমণীদের মধ্যে অসাধারণত্ব কিছুই নাই।"

কলিকাতার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও সিকাগোর আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার ডি, এন, রায়, জে, এন, ঘোষ প্রভৃতি হোমিওপ্যাথগণ ও কলিকাতার মূক-বধির বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বন্দোপাধ্যায় আমেরিকায় বাঙ্গালী শিক্ষার্থীদিগের অগ্রণী। ১৯০৪-৫ সাল হইতে ভারতবর্ষের কত ছাত্র যে আমেরিকায় অধ্যয়নার্থ গমন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা সহজ নহে। তাঁহাদের নামের ধারাবাহিক তালিকা প্রকাশ করাও এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের দেশের অপর আমেরিকা-যাত্রীদিগের মধ্যে ভূ-প্রদক্ষিণ প্রণেতা চন্দ্রশেখর সেন, সংবাদপত্রের লেখক ও গ্রন্থকার সন্ত নিহাল সিং, বক্তা বিপিনচন্দ্র পাল, হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক বাবা ভারতী (৮), বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও কবীন্দ্র সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম করা যাইতে পারে। ধর্ম্ম জগতে যেমন বিবেকানন্দ, সাহিত্য জগতে তেমনি রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান-জগতে জগদীশচন্দ্র ভারতবর্ষকে পাশ্চাত্য জগতে পরিচিত করিয়াছেন। সংবাদপত্রে তাঁহাদের আমেরিকা প্রবাসের কথা অনেকেই পাঠ করিয়া থাকিবেন। সিংহলের সলিসিটর-জেনারেল অনারেবল্ রমানাথন্ কে সি, সি-এম্-জি মহোদয়ও ১৯০৬ সালে হার্ভার্ড, কর্ণেল প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রভেদ (Spirit of the East contrasted with the Spirit of the West) প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া প্রাচ্য জগতের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। সার্ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তও মৎস্যতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট্ কর্ত্তৃক আমেরিকায় প্রেরিত হইয়াছিলেন।

আমেরিকার যুক্তরাজ্য (United States of America) নামক গ্রন্থের প্রণেতা লালা লজপৎ রায় "বর্ত্তমান জগতের" লেখক বিনয়কুমার সরকার, "মার্কিণযাত্রা" ও "America through Hindu Eyes" নামক গ্রন্থদ্বয়-প্রণেতা বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক ও "আমেরিকায় পনের বৎসর" (Fifteen Years in America) নামক গ্রন্থের রচয়িতা ডাক্তার সুধীন্দ্র বসু তাঁহাদের মার্কিণ জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি প্রবন্ধ ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশের অক্ষয়কুমার দত্ত ও ডাক্তার সুধীন্দ্র বসু আমেরিকার নাগরিকত্ব (American Citizenship) গ্রহণ করিয়াছেন। ডাক্তার পি, এন, রায় নামক একজন বাঙ্গালী চিকিৎসকও বহুকাল যাবৎ সপরিবারে বষ্টন নগরে বাস করিতেছেন। তাঁহার পত্নী একজন স্কচ্ মহিলা। বষ্টনে বাস কালে ঐ পরিবারের সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। একদিন

অনারেবল্ রমানাথন্ কে-সি, সি-এম-জি

উঁহাদের বাটীতে আহারের জন্য নিমন্ত্রিতও হইয়াছিলাম। ডাক্তার রায়ের কন্যাদ্বয়ের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রী লাভের সংবাদ কিছুদিন পূর্ব্বে খবরের কাগজে পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম।

অনেক ভারতবর্ষীয় যুবককে ইংরাজ রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে দেখা যায়; কিন্তু ভারতবর্ষীয় যুবকের সহিত মার্কিণ

(৮) প্রেমানন্দ মহাভারতী।

রমণীর বিবাহের সংখ্যা অতি অল্প। যে কয়টী বিবাহ হইয়াছে তাহা অঙ্গুলি দ্বারা গণনা করা যাইতে পারে। আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষই ইহার মূলীভূত কারণ; তবে ইহা ভারতবাসী ছাত্রের পক্ষে শাপে বর বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই বর্ণবিদ্বেষ হেতু আমেরিকায় ভারতবর্ষের ছাত্রেরা অনেক প্রলোভনের হাত হইতে রক্ষা পায়। বিলাতে ঐ সকল প্রলোভন হইতে তাহাদের নিষ্কৃতি পাওয়া সুকঠিন।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে ছাত্রগণ বিদেশে শিক্ষালাভ করিবার জন্য প্রায় বিলাতেই গমন করিত; কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ আমেরিকায় এবং জাপানে ভারতবাসী ছাত্রের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে; ইহা শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। আমেরিকায় পূর্ব্বে আমাদের দেশের দুই চারিটী ছাত্র হোমিওপ্যাথি পড়িত; এখন শতাধিক ছাত্র ইঞ্জিনীয়ারিং, কৃষি-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা পাইতেছে। বোধ হয় আমেরিকার সংস্পর্শে জাপানের এতাদৃশ উন্নতি দেখিয়াই, আমেরিকার দিকে ভারতবাসীর মন আকৃষ্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে কতিপয় ছাত্র গভর্ণমেণ্টের, ও শিল্প-বিজ্ঞান-সমিতির এবং বরদা, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যের বৃত্তি গ্রহণ করিয়া আমেরিকায় শিক্ষালাভ করিয়াছে ও করিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা সুখের বিষয় এই যে, যে সকল ছাত্র নিজের খরচে আমেরিকায় গমন করিয়াছে, তন্মধ্যে কেহ কেহ অবস্থা-বিশেষে আমেরিকান্ ও জাপানী ছাত্রদের উদার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে, অকুণ্ঠিত চিত্তে, সকল প্রকারের কার্য্য করিয়া কলেজের ব্যয়-নির্ব্বাহ করিতেও সমর্থ হইয়াছে। পূর্ব্বাঞ্চল অপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চলেই এই সকল ছাত্রের জীবিকা অর্জ্জনের অধিক সুবিধা। ঐ স্থানের খরচও অপেক্ষাকৃত কম। টেবিলে খানা পরিবেশন করা, বাসন মাজা, মেঝে পরিষ্কার করা প্রভৃতি কার্য্য ছাত্রদের সহজেই জোটে। কেহ কেহ বা অবসর মত সর্টহ্যাণ্ড লিখিয়া টাইপ্ রাইট্ করিয়া, হিসাবপত্র রাখিয়া, লাইব্রেরীতে পুস্তক বিতরণে সাহায্য করিয়া, কেরাণীগিরি বা গৃহশিক্ষকের কার্য্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে; তবে ঐ সকল কার্য্য ততটা সহজ-লভ্য নহে। কোন কোন ছাত্র পুস্তকাদি বিক্রয় করিয়াও কমিশন লাভ করে। অবস্থা-বিশেষে অনেকে সংবাদ-বাহক, ক্ষৌরকার, রজক প্রভৃতির কার্য্যও করিয়া থাকে। গ্রীষ্মাবকাশের তিনমাস কৃষকদিগের অধীনে মাঠে কার্য্য করিয়াও বহু ছাত্র কলেজের বেতনের সংস্থান করে। জাত্যভিমানী ভারতবাসী ছাত্রদিগের পক্ষে অনভ্যাস বশতঃ প্রথম-প্রথম ঐ সকল উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করা বড় সহজ নহে। তাহারা আমেরিকান্ ছাত্রদিগের ন্যায় তেমন সবল ও কষ্ট-সহিষ্ণু নহে। যে সকল ছাত্র কলেজের জীবন হইতেই আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা করে,—তাহার বলেই ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তাহারা জীবন-সংগ্রামে সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। পরে

আমেরিকা-প্রবাসী মহারাষ্ট্র পরিবার

(১) বিশ্বনাথ বনওয়ালীকর; (২) রঘুনাথ বনওয়ালীকর; (৩) মিসেস রমাবাঈ যোশী; (৪) মিঃ এস, এল, যোশী এম-এ; (৫) মিঃ এল, এল, যোশী বি-এস্‌সি, এম-ডি; (৬) মনোরমা বাঈ; (৭) আনন্দী বাঈ; (৮) সুন্দর রাও।

এই সকল ছাত্রের দ্বারাই দেশের মুখ উজ্জল হইতে দেখা যায়।

আমাদের দেশের অভিজাত-বংশীয়দিগের মধ্যেও কেহ-কেহ বিলাতের অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে প্রবিষ্ট না হইয়া, আমেরিকাতেই অধ্যয়ন করিয়াছেন। বরদার দ্বিতীয় মহারাজ-কুমার হার্ভার্ডের এবং কুচবিহারের মহারাজ-কুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ কর্ণেলের ছাত্র।

যে দেশে জর্জ ওয়াশিংটন্ ও আব্রাহাম্ লিঙ্কলনের ন্যায় মহাপুরুষ, রাল্ফ ওয়াল্ডো এমারসন্ ও উইলিয়ম্ জেম্সের ন্যায় দার্শনিক, বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ ও জেম্স্ গার্ফিল্ডের ন্যায় কর্ম্মবীর, বুকার্ ওয়াশিংটনের ন্যায় স্বজাতি-প্রেমিক, এণ্ড্রু কার্ণেগির ন্যায় দাতাকর্ণ, ড্যানিয়েল্ ওয়েব্ষ্টার্ ও উইলিয়ম্ জেনিঙ্গস্ ব্রায়েনের ন্যায় বাগ্মী, টমাস্ জেফারসন্ ও উড্রো উইল্সনের ন্যায় রাজনীতি-বিশারদ, ওয়াশিংটন্ আর্ভিং ও মার্ক টোয়েনের ন্যায় হাস্যরসাত্মক গ্রন্থকার, এবং টমাস্ এডিসন্ ও গ্রাহাম্ বেলের ন্যায় বিজ্ঞানবিৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে দেশের লোক মাত্র চারিশত বৎসরের মধ্যে একটী মহাদেশকে ভীষণ বন্যজন্তুসঙ্কুল অরণ্যানী হইতে শোভাসমৃদ্ধিশালী বিশাল জনপদসমূহে পরিণত করিয়াছেন, যাঁহারা জগতের সর্ব্বকনিষ্ঠ জাতি হইলেও সভ্যতায়, ধন-সম্পদে, জ্ঞান-মাহাত্ম্যে বর্ত্তমানে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন,—ধন্য সেই দেশ, আর ধন্য সেই দেশের লোক। সভ্যতার আলোক প্রথমে প্রাচ্য জগতেই প্রকাশিত হয়; ক্রমে-ক্রমে উহার রশ্মি পাশ্চাত্য গগনে বিকীর্ণ হইয়াছিল। প্রতীচি হইতে প্রতিফলিত হইয়া ঐ রশ্মি আবার পূর্ব্ব-দেশে আগমন করিতেছে। ভারতবর্ষের ছাত্রগণ আমেরিকা হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া নিয়ত স্বদেশের কল্যাণ সাধন করিতে থাকুক, ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

দার্জ্জিলিং-এ

[শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু]

(৮)

বিকেলে রণেন যখন আসিয়া বলিল, "চলো সুধা, ও-বাড়ী যাওয়া যাক", সে যে কেন কোন মতে যাইল না, তাহা ভাবিয়া সে নিজেই অবাক্ হইল। রণেন সত্যই রাগ করিয়া বাহিরে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। প্রভাত যেন এক স্বপ্নের ঘোরে বহুক্ষণ বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া রহিল।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয়। হঠাৎ সব মেঘ কাটিয়া গিয়া সন্ধ্যার রাঙা আলোয় চারিদিক সুন্দর হইয়া উঠিল। প্রভাত কি মনে করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া, রায়দের দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। মিষ্টার রায় সম্মুখে বসিয়া ছিলেন; তিনি অভ্যর্থনা করিয়া ডাকিলেন, "আসুন, প্রভাত বাবু।" প্রভাত ঘরে ঢুকিয়া, মিসেস রায়কে এক নমস্কার করিয়া, সম্মুখের এক চেয়ারে বসিয়া পড়িল। মিষ্টার রায় আপনিই নানা কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিলেন। সে মাঝে মাঝে দুই একটা কথা বলিয়া কথাবার্ত্তায় যোগ দিয়া কোনমতে বাঁচিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে প্রভাত বলিয়া উঠিল, "কৈ, আজ বেড়াতে গেলেন না?"

মিষ্টার রায় বলিলেন, "না, আজ শরীরটা ভালো নেই; আর সন্ধ্যে হয়ে এলো।" ঠিক সেই সময়ে শকুন্তলা ঘরে ঢুকিতে, প্রভাত উঠিয়া দাঁড়াইয়া, তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "চলুন, একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।"

অন্য সময় হইলে শকুন্তলা উত্তর দিত, "কাজ আছে, রান্না করতে হবে"—কিন্তু সে কেমন নীরব হইয়া গেল।

তাহাকে এমন স্তব্ধ দেখিয়া, মিষ্টার রায় মনে-মনে হাসিয়া বলিলেন, "যাও না শুকু, প্রভাত বাবুর সঙ্গে একটু বেড়িয়ে

এসো। তুমি ত দু'দিন বেড়াতে যাও নি।" পাশের ঘর হইতে যতীন মামা ফোড়ং দিলেন, "যাও, যাও শুকু, এমন রঙীন সন্ধ্যাটা মাটি হয়ে যাচ্ছে!"

শকুন্তলা কি উত্তর দিতে যাইতেছিল;—গোল টেবিল ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মাও তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আধ ঘণ্টা বেড়িয়ে এসো,—আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি।"

কি যেন অজানা শক্তি শকুন্তলাকে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল।

দুইজনে যখন বাহিরে আসিল, কাহারও মুখে কোন কথা ফুটিল না। ব্যাপারটা কি ঘটিল, তাহা শকুন্তলা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। আর প্রভাত ভাবিতেছিল, এমনি ভাবে বেড়াইতে টানিয়া আনা কতদূর ভদ্রতার নিয়মোচিত?—হয় ত সে সভ্যতার গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়াছে। শকুন্তলা চারিদিকে লাবুকে খুঁজিতেছিল; কিন্তু কোন দিকে তাহার দেখা মিলিল না।

দুইজনে নীরবে পাইন গাছের তলা দিয়া অক্‌ল্যাণ্ড রোডে উঠিল। গেটে আসিয়া প্রভাত বলিল, "তাই ত, একটা ছাতা আনা হোল না যে।"

"কি দরকার! দেখুন,—না, আপনি আর যাবেন না, বিষ্টি হবে না।" "যদি হয় ত আমিই—" প্রভাত বলিতে যাইতেছিল, আপনার জন্য দায়ী। তাহা আর বলা হইল না। শকুন্তলা বলিল, "না। যদি হয় একটু মজা করে ভেজা যাবে!"

"চলুন, কোন্ দিকে যাওয়া যায়।"

"ঘুমের দিকেই চলুন। দার্জ্জিলিংএর ভিড় আমি মোটে পছন্দ করি না।" এ কথায় নীরবতা ভাঙ্গিয়া যাইতেই, আবার অনর্গল কথার স্রোত বহিতে লাগিল। হট হাউসের অসমাপ্ত কথাবার্ত্তার শেষ সূত্র ধরিয়া আবার গল্প সুরু হইল। আবার নিজেদের জীবনের কথা, ছেলেবেলার কথা, স্কুলের হাসি-কান্না, কলেজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, গত জীবনের কত ছোট-ছোট হাস্যকর ঘটনা—অফুরন্ত হাসির স্রোত বহিতে লাগিল। আর মাঝে-মাঝে চারিদিকের প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে মন্তব্য চলিতে লাগিল।

শকুন্তলা বলিল, "বাঃ! কি সুন্দর ষ্ট্রবেরী! আসুন, কিছু তোলা যাক্।" প্রভাত রাস্তা হইতে পাহাড়ের একটু ওপরে উঠিয়া, ভালো-ভালো ষ্ট্রবেরী তুলিয়া শকুন্তলার আঁচল ভরিতে লাগিল।

"বা! আমায় সব দিচ্ছেন,—আপনি কিছু খাচ্ছেন না! কি সুন্দর খেতে—টক আমার ভারি ভালো লাগে!"

"না না,—আঁচলে বাঁধবেন না; আমি রুমাল দিচ্ছি! কিছু সঙ্গে নেওয়া যাক,—লাবু খুব খুসি হবে।"

"আর যতীন মামাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে খেতে হবে। বা! কি সুন্দর ফার্ণ!"

"বেশ সুন্দর। কিন্তু মেডেন হেয়ার, এস্‌পায়া ফার্ণ আমার ভারি ভালো লাগে।"

"বা, কি সুন্দর ফগ ঘিরে আস্‌ছে,—এই রকম আমার বেশ লাগে"—নানা কথা কহিতে-কহিতে তাহারা কতদূর আসিয়াছিল, তাহা খেয়ালই ছিল না। তাহারা যে দুই যুবক-যুবতী, তাহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহারা যেন দুই বালক-বালিকা,—স্কুল পালাইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। হঠাৎ সুতীক্ষ্ণ, শীতল, ঝোড়ো বাতাস প্রভাতের শাল ও শকুন্তলার আঁচল ওড়াইতে লাগিল।

প্রভাত বলিল, "ও, এ যে একেবারে বাতাসিয়ায় এসে পৌঁছেচি! আর এগোন সুবিধের নয়—চলুন, ফেরা যাক।"

"লুপটা দেখে গেলে হোত না?"

"না, দেখুন, সে আর একদিন হবে,—আপনার ছুটি ত বেশীক্ষণ নয়।"

"তবে ফিরুন।"

ফিরিয়া দেখিল, সম্মুখে কুয়াসা অতি ঘন; দুই ধারের গাছের ছায়ায় পথের ঘন অন্ধকার অতি নিবিড়।

"বড় অন্ধকার হয়ে এলো,—বিষ্টি পড়তে আরম্ভ হয়েছে।"

শকুন্তলা হাসিয়া বলিল, "না, ও গাছের পাতার জল। এ রকম অন্ধকার আমার ভারি ভালো লাগে,—যেন অন্ধকার ধপ্‌ধপ্ করছে।"

প্রভাত শঙ্কিত স্বরে বলিল, "কিন্তু সত্যিই যে বিষ্টি এলো। একটা গরম কাপড়ও আনেন নি;—আমার শালটা নিন।"

"না—না—" বলিয়া শকুন্তলা আপত্তি জানাইল।

"বা—তা হবে না—দেখুন, ভিজে অসুখ করলে—" প্রভাত আর বলিতে পারিল না। শকুন্তলা বুঝিল যে,

বাস্তবিক তাঁহার অসুখ করিলে, প্রভাতকেই দোষী হইতে হইবে। প্রভাত যখন নিজের শালটা শকুন্তলার গায়ে জড়াইয়া দিল, সে আর কোন আপত্তি করিল না।

প্রভাত ধীরে-ধীরে বলিল, "মাথায় তুলে নিন,—মাথাটা কেন মিছেমিছি ভেজাবেন।"

"তা বটে, চুল শুকোতে এক হাঙ্গাম। বা, আমি কি স্বার্থপর! দিব্যি শাল মুড়ি দিয়ে যাচ্ছি,—আর আপনি ভিজে যাচ্ছেন।"

"আপনার জুতোটা মাটি হোল,—ঝরা পাতাগুলো ভিজে পচপচ করছে।"

"আর আপনার জুতোটা বুঝি পাথর হচ্ছে! না, চলুন, ওই ঝোপটায় একটু দাঁড়ানো যাক। আপনি কত ভিজবেন!"

"ওখানে দাঁড়িয়ে বিশেষ কিছু সুবিধে হবে না। কাছাকাছি কোথায় বড় পাথর ছিল—"

"এই যে,—পাথরটার আড়ালে বেশ দাঁড়ানো যাবে—আসুন।"

"ভেজা ত যথেষ্ট হয়েছে—দাঁড়িয়ে কি লাভ!"

"এই রুমালটা দিয়ে মাথাটা মুছে ফেলুন।"

ট্রিফার্ণ ও মসে ছাওয়া এক বড় কালো পাথরের আড়ালে কয়েকটি বড় গাছের তলায় দুইজনে দাঁড়াইল। অতি বেগে বৃষ্টি আসিল,—বাতাস মাতিয়া উঠিল,—তীরের মত তীক্ষ্ণ বারিধারা অবিশ্রাম ঝরিতে লাগিল। দুই পাশের গাছের সারি এই বারিধারা-সিক্ত পুলকিত তরুণ-তরুণী পথিকদ্বয়কে ঘিরিয়া হা-হা করিয়া অট্টহাস্য-ধ্বনি করিতে লাগিল।

দুইজনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া রহিল। বৃষ্টির বেগ যত বাড়িতেছিল, দুইজনের মনের আনন্দ ততই বৃদ্ধি পাইতেছিল। প্রভাতের অন্তরে যেন কি কলরোল পড়িয়া গিয়াছে। সে শুধু মাঝে-মাঝে বলিয়া উঠিতেছিল, "বিষ্টির শব্দ কি সুন্দর শুনতে লাগ্‌ছে।" শকুন্তলাও এই কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন, বৃষ্টি-মুখর, পর্ব্বত-পথে দাঁড়াইয়া অপরিসীম সুখ পাইতেছিল। চেঁচাইয়া সে গাহে নাই বটে, তাহারি মনের তারে কে বাজাইতেছিল,

"মম চিত্ত নিতি নৃত্যে কে যে নাচে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।"

বিষ্টি থামিল। কিন্তু কুয়াসা এত ঘন কালো হইয়া আসিল যে, পথের কিছুই দেখা যাইতেছিল না। সাদা ফগের মধ্যে লাল শাল জড়ানো শকুন্তলার সুন্দর মুখখানি স্বচ্ছ সরোবরে লাল পাপড়িঘেরা পদ্মের মত ফুটিয়া রহিয়াছে। সে মুখও অস্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল।

প্রভাত থামিয়া বলিল, "তাই ত, পথ কিছুই দেখা যাচ্ছে না; আর বাঁ দিক একেবারে খোলা।"

সাহসিকা একটু হাসিয়া বলিল, "পড়লে একেবারে গড়্‌গড়িয়ে কার্ট রোডে—কি বলেন?"

"না, এমনি করে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। আপনি অত ধার দিয়ে যাবেন না,—এই দিকটায় আসুন। আমি আগে পাহাড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাই—আপনি আমার ঠিক পেছনে-পেছনে আসবেন।"

"বা,—যদি পড়ি ত দু'জনে একসঙ্গে পড়্‌বো—তবেই ত মজা!"

প্রভাত বেশ ভয় পাইয়াছিল; সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শকুন্তলা বলিল, "তার চেয়ে পথের ধারে একটু বসা যাক আসুন;—ফগ কেটে গেলে যাওয়া যাবে।"

"না, আপনার বাবা-মা কত ভাব্‌ছেন বোধ হয়। আচ্ছা, একটা শব্দ শুনছেন?"

"ঠিক ঘোড়ার খুরের মত। সত্যি ঘোড়া হলে মুস্কিল—একেবারে ঘাড়ে এসে পড়্‌বে না ত?" এবার সাহসিকা একটু ভয় পাইল।

"না, ও ঘোড়া নয়। এ ফগে কে ঘোড়া চালাতে সাহস করবে? ও ঝর্ণার শব্দ। আসুন, এই রুমালটা ধরুন—ঠিক আমার পেছনে-পেছনে আস্‌বেন।"

ফগে সাদা রুমাল ভালো করিয়া দেখা যাইতেছিল না। প্রভাতের শীতল হাতটা শকুন্তলার তপ্ত হাতের ওপর আসিয়া পড়িল। এক হাতে শকুন্তলাকে ধরিয়া, আর এক হাতে পথ দেখিতে দেখিতে, ধীরপদে সে চলিল।

চারিদিক তখন স্তব্ধ;—নিবিড় ঘন স্নিগ্ধ কুয়াসায় ঢাকা। শুধু বাতাস এই তরুণ পথিকদের সুখকর দুরবস্থা দেখিয়া, ফার্ণ দোলাইয়া, বনবৃক্ষগুলি কাঁপাইয়া হাসিয়া উঠিতেছে। আর ঝর্ণাধারার অবিশ্রাম হাস্যধ্বনি। শুধু কাপড়-জামার খস্‌খস্, পায়ে চলার মস্‌মস্, দুইটি বুকের ধুপ্‌ধাপ্, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। এতক্ষণ বেশ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল; কিন্তু যখন আঙ্গুলের সহিত আঙ্গুল জড়াইয়া গেল, মুখের সব কথা বন্ধ

হইল। শুধু অন্ধকারে অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মত মাঝে-মাঝে দুই একটি কথা জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল—'আস্তে' 'দেখবেন' 'এই নামছি' 'এইখানটা উঁচু' 'ওদিকে পাথর' 'আরও এদিকে' 'আস্তে'—'ঠিক যাচ্ছি' 'ভয় নেই' 'আপনি সাবধান' 'হোঁচোট খাবেন না'—আর মাঝে-মাঝে হাসি। অন্ধকারে যখন মুখ দেখা যায় না, প্রতি কথা অতি স্পষ্ট হইয়া ওঠে,—গলার সুর যেন সমস্ত দেহকে স্পর্শ করে। মুখে কথা নাই,—নদীর ওপরের ঢেউদের মাতামাতি বন্ধ হইল বটে; কিন্তু শান্ত নদীর তলে-তলে কি দুর্নিবার, প্রমত্ত, প্রখর স্রোত বহিতেছে, তাহা কে জানিবে।

এক ঝর্ণার সামনে আসিয়া দুইজনে দাঁড়াইল। প্রভাত বলিল, "দেখি, পকেটে একটা দেশলাই ছিল।"

দেশলাই বাহির হইল বটে, কিন্তু বাতাসে কিছুতেই জ্বালা গেল না। প্রভাত যতই বারবার ব্যর্থ হয়, শকুন্তলা তত উচ্চস্বরে হাসিয়া ওঠে। দশ-এগারোটা কাটি নিষ্ফল হইলে পর, শকুন্তলা প্রভাতের হাত হইতে দেশলাই লইয়া, শালের আড়ালে দেশলাই ধরাইল,—তাহার প্রথম কাটিই জ্বলিয়া উঠিল। সেই দেশলাইয়ের আলোয় প্রভাত দেখিল, কি অপরূপ দ্যুতিময় শকুন্তলার মুখ,—যেন একটা ডালিয়া ফুল! এত রাঙা কিরূপে হইল,—লজ্জায় না আনন্দে? কিছুক্ষণ দুইজনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পায়ের তলায় বারিধারাসঙ্গীত ঝর্ণা এই যাত্রী দুইটীর খেলা দেখিয়া খলখল করিয়া হাসিতে লাগিল। দেশলাই নিবিয়া গেল। শকুন্তলা আর একটি কাটি জ্বালাইলে, প্রভাত কাছের দুই-তিনখানি বড় পাথর জলধারার মাঝখানে ফেলিয়া দিয়া, জুতা বাঁচাইয়া পারাবারের ব্যবস্থা করিল।

শকুন্তলার হাত ধরিয়া বলিল, "আসুন।"

"আচ্ছা, আপনার জুতোটা জলে ডোবাচ্ছেন কিসের জন্য?"

"ও কিছু হবে না। কি সুন্দর ঝর্ণাটা দেখেছেন,—যেন এক বিদ্যুতের শিখা।"

"আপনার শালটা কিন্তু একেবারে মাটি হয়ে গেল।"

"না, পাগর হচ্ছে।"

ঝর্ণার হাসির সঙ্গে তাহাদের সরল মধুর হাসি মিলাইয়া গেল।

আবার দুইজনে হাত-ধরাধরি করিয়া স্তব্ধ হইয়া চলিল। এ স্তব্ধতা প্রশান্ত-সিন্ধুর অতল জলের স্তব্ধতা। বাড়ীর কাছাকাছি আসাতে, কুয়াসা অনেক কমিয়া গেল। পথ দেখা যাইতেছিল, তবু তাহারা হাত-ধরাধরি করিয়া চলিল।

বাড়ীর গেটে আসিয়া হাত-ছাড়াছাড়ি হইল। শকুন্তলা এবার একটু আগে-আগে চলিল। দরজার নিকটে আসিয়া বলিল, "কাল যে পিক্‌নিক্—ভুলেই গেছলুম। আসছেন ত?" প্রভাত নীরবে শকুন্তলার স্নিগ্ধ মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। শকুন্তলা একটু মাথা নত করিয়া, বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া গেল। তাহার গায়ে যে প্রভাতের শাল রহিয়াছে, তাহা ফিরাইয়া দিতে আর মনে হইল না।

ঘরে ঢুকিতেই মিসেস রায় বলিলেন, "একেবারে ভিজে এসিছিস ত! এবার জ্বর হোক্!"

"না মা, দেখো, একটুও চুল ভেজে নি।"

মেয়ের মাথায় হাত দিয়া মা বলিলেন, "সত্যি যে!"

মিষ্টার রায়ের দিকে চাহিয়া শকুন্তলা বলিল, "ওই ত মজা!"

যতীনমামা গাহিয়া উঠিলেন, "মজা করে ভিজে এলুম, গায়ে জল লাগ্‌লো না।" কিন্তু এ সব দিকে মনোযোগ দিবার মত মনের অবস্থা শকুন্তলার তখন ছিল না;—সে আপনার ঘরে গিয়া ঢুকিল।

সে রাতে যখন সবাই ঘুমাইয়াছে,—প্রভাত বারান্দায় একটি জানলা খুলিয়া চুপ করিয়া চাহিয়া ছিল। চাঁদের রূপালী আলো মেঘে ঢাকা পাহাড়ের শিখরে-শিখরে, জলে-ভেজা পাইন-গাছগুলির পাতায়-পাতায়, জলবিন্দুময় স্নোপ্লান্টগুলিতে বাশখাসের রাশিতে ঝিকিমিকি করিয়া এক মোহন লোক সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রভাত ভাবিতেছিল, আজিকার ঘটনাগুলি যেন কে ঘটাইয়া দিয়া গেল;—সে কিছুই করে নাই। তাহার মনের দুয়ারে সে কখনও আগল দেয় নাই;—এ ঘর সবার আনাগোনার পথের মত পড়িয়াই আছে। তাই এখানে যে আসিতে চায়, সে নিমেষের মধ্যেই আসিতে পারে;—পথ খুঁজিয়া মরিতে হয় না। তাহার এই বাইশ বছরের জীবনে এই মুক্তদ্বার, প্রেমালোকিত ঘরের পথ দিয়া, কত বন্ধু আসিয়াছে। ক্ষণিকের জন্য কেহ বসিয়া গল্প করিয়াছে; কেহ পথের পাশে কোন ভুলে ভুলিয়া বসিয়া কত কথা কহিয়াছে,—গান গাহিয়াছে,—বীণা বাজাইয়াছে,—আবার উঠিয়া চলিয়া

গিয়াছে। তাহাদের গলার সুর, গানের ঝঙ্কার, কথার স্মৃতি কত শরৎ প্রভাতে, আষাঢ় সন্ধ্যায়, বসন্ত রাতে, হঠাৎ বাজিয়া উঠিয়া মন উদাস করিয়া তোলে। পাখীর মত কেহ এক ঋতুতে নীড় রচিয়া অপর ঋতুতে কোথায় চলিয়া যায়। ফুলের মত কেহ প্রভাতে ফুটিয়া উঠিয়া, সন্ধ্যায় ঝরিয়া পড়ে। সবাই যে আসে, আর দাঁড়াইয়া চলিয়া যায়,—এই তার বেশ ভালো লাগে। সে কাহাকেও বাঁধিতে চায় না;—জীবনের নদী যে বহিয়া চলিয়াছে। তবু সে ভাবিতেছিল, আজ যে তরুণী তাহার অন্তরের ঘরে চঞ্চল চরণে আসিল, সে যদি হাসিতে-হাসিতে ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া বলে,—এ আমার ঘর, সবার যাতায়াতের অবারিত পথ নয়,—তবে সে তার সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য হইবে? সে যাহাই হউক, সে নিশ্চয় বুঝিল, এই গীত-মুখরা পাখী যদি এখানে নীড় বাঁধিতে চায়, তবে সে সব খড়কুটো আনন্দে জোগাইয়া দিবে।

এসব কথা ভাবিতে ভালো লাগিতেছিল; কি তীব্র আনন্দে তাহার দেহ-মন ভরিয়া গিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, পাশের বাড়ীর কোন্ ঘরে, কোন্ কোমল শয্যায় সেই তরুণী শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! অথবা সেও তাহারি মত বিনিদ্র নয়নে চুপ করিয়া জ্যোৎস্না রাত্রির দিকে চাহিয়া আছে!

পরদিন পিক্‌নিক। সকালে উঠিয়া কথাটা ভাবিতেই, প্রভাতের কেমন ভয় হইল;—এ দিনটা কোনমতে কাটিয়া গেলে যেন সে বাঁচে।

সকালে চা খাইয়া সকলে Picnicএ যাত্রা করিলেন। Tiger Hillএ যাওয়া হইবে ঠিক ছিল। যাবার সমস্ত পথ প্রভাত শকুন্তলার নিকটে ধরা দিল না। সে মিষ্টার রায় ও যতীন বাবুর সহিত নানা গল্প করিতে-করিতে, শকুন্তলা হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়া চলিল। অগত্যা রণেন শকুন্তলার সঙ্গ লইল।

গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া, কিছু চা-বিস্কুট খাইয়া, সকলে চারিদিকে বেড়াইতে বাহির হইল। রণেন বাহাদুরকে লইয়া রান্নার জোগাড়ে চলিল।

প্রভাত আনমনা ঘুরিতেছিল; একটা মিষ্টি হাসি কাণে আসিল। অদূরে এক গাছের তলায় কতকগুলি কাঠ সাজাইয়া বাহাদুর এক উনান করিয়াছে। শকুন্তলা বড়গাছের ডালগুলি ছোট করিয়া ভাঙ্গিয়া রণেনের হাতে দিতেছে। রণেন সে গুলি উনানে পূরিয়া ফুঁ দিতেছে। তাহাদের সাহায্য করিবে ভাবিয়া প্রভাত একটু অগ্রসর হইল। ধোঁয়া কাটিয়া দাউ-দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সেই আগুনের আভা রণেনের সান্‌প্রুফ কাপড়ের রাইডিং সুটে, শকুন্তলার স্যাম্‌পেন রংএর সাড়ির ওপর পড়িয়া ঝলমল করিয়া তুলিল। প্রভাতকে তাহারা কেউ দেখিতে পাইতেছিল না। প্রভাত দেখিতেছিল,—কিসের আলো রণেনের চোখ ভরিয়া নাচিতেছে; কিসের আলো শকুন্তলার চোখ দিয়া ক্ষরিয়া পড়িতেছে। সে প্রেমের নির্ম্মল আলো, সেখানে একটুও ধোঁয়া নাই;—সব মলিনতা কাটিয়া গিয়াছে। প্রভাত আর তাহাদের দিকে অগ্রসর হইল না। সকালে যে ভয় তাহার মনে হইয়াছিল, তাহা কাটিয়া গেল। এক তৃপ্তির, সুখের নিশ্বাস ফেলিয়া সে সম্মুখের ঘন বনে প্রবেশ করিল।

কতক্ষণ সে বনের মধ্যে ঘুরিয়াছিল, তাহা তাহার খেয়াল ছিল না। কখনও মাটি বা পাথর তুলিয়া পরীক্ষা করিতেছিল। কখনও কোন ফার্ণ, লতা ছিঁড়িয়া দেখিতেছিল; কখনও সেই বিজন বন-অন্ধকারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মাথার ওপর গাছে-গাছে, শাখায়-শাখায় জড়াজড়ি। সহসা পেছনে এক পায়ের শব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল—শকুন্তলা।

"তুমি—এসেছ?"

শকুন্তলা কি বলিবে,—সে তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল—"বেশ, একা বন্ধুকে ধোঁয়া খেতে ফেলে রেখে দিয়ে, বনে ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে! চলুন, একটু ধোঁয়া খেয়ে কাঁদবেন—তবে ত রান্নার মজা।"

প্রভাত কোন উত্তর দিল না;—নির্নিমেষ নয়নে শকুন্তলার অস্বাভাবিক উদ্দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শকুন্তলার দীপ্ত চোখ দুইটি যেন তাহার সমস্ত দেহে বিদ্যুৎ ছড়াইয়া দিল। জোর করিয়া সে আপনাকে দাঁড় করাইয়া রাখিল। সে যেন উল্কার মত তাহার দিকে ছুটিয়া যাইবে;—তাড়াতাড়ি এক গাছের ডাল ধরিয়া আপনাকে দমন করিল। শকুন্তলা যেন একটু ভয় পাইল;—কিন্তু প্রভাতের চোখের দিকে চাহিতেই মনে হইল, কি নির্ম্মল চোখ দুটি!

দুইজনে গাছের তলায় বসিয়া পড়িল। প্রভাতের হাতে কয়েকটি লতা ও পাথর ছিল। সে জিওলজির প্রফেসারের মত তাহার ওপর বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিল—এই হিমালয়

কত-শত যুগ আগে সাগরের তলায় ছিল। বিবর্ত্তনের পর্ব্বে-পর্ব্বে পাহাড়দের জন্মকথা বলিয়া যাইতে লাগিল—Archoean Rocks, Primary Rocks, Glacial Period—কত কি। শকুন্তলা মনোযোগী ছাত্রীর মত কথাগুলি শুনিতেছিল বটে,—চেষ্টা করিলে অনেক কথা সে বুঝিতেও পারিত; কিন্তু সে কিছু বুঝিতে চাহিতেছিল না,—শুধু প্রভাতের স্নিগ্ধ-গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনিতেছিল।

সহসা সন্‌সন্‌, মরমর শব্দে গাছগুলি আন্দোলিত হইয়া উঠিল;—ঝম্‌ঝম শব্দে বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টি স্পর্শে যেন তাহারা সহজ মনের অবস্থা ফিরিয়া পাইল। প্রভাত উঠিয়া দাঁড়াইল; শকুন্তলাও তার পাশে দাঁড়াইল; বিদ্যুতের মত চোখে চাইয়া বলিল, "আজও বৃষ্টি—আপনি ভারি বাতুলে—" দুইজনে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রণেনের গলা শোনা গেল, "প্রভাত—প্রভাত!" দুই জনে হাসিয়া সমস্বরে চেঁচাইল, "এই যে আমরা।"

ছাতা লইয়া রণেন ছুটিয়া আসিতেছিল; দুইজনকে এক গাছের গুঁড়িতে ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া রণেন বলিল—"বা, বেশ দেখাচ্ছে। দু'জনেই এক জায়গায়;—আমি ভাবলুম তুমি পাথর শিকারে গেছ;—আর আপনি ফার্ণ শিকারে।"

লজ্জায় রাঙা হইয়া শকুন্তলা হাসিয়া রণেনের দিকে চাহিল।...রণেন তাহার পাশে আসিয়া, ছাতা ধরিয়া দাঁড়াইল। বৃষ্টি খুব বেগে আসিল। ছাতার বেশী ভাগটা শকুন্তলা ও রণেনের মাথায় ছিল;—আর শিক-ঝরা জলটাই প্রভাতের ঘাড়ে পড়িতেছিল।

রণেন বলিল, "আচ্ছা, এতগুলো ছাতা, বর্ষাতি আনা গেল, অথচ বেশ ভিজছেন।" "বা, পিক্‌নিকে এসে যদি না একটু ভিজলুম ত হোল কি! রণেনবাবু, কি সুন্দর বিষ্টি!" কাল প্রভাতের সঙ্গে থাকিয়া গান গাহিবার কথা মনে হইলেও সঙ্কোচ হইয়াছিল। আজ আর শকুন্তলা থাকিতে পারিল না,—গান ধরিল। রণেনও তাহার সহিত যোগ দিল। বৃষ্টির শব্দের সহিত পাল্লা দিয়া তাহারা দীপ্ত কণ্ঠে গাহিতে লাগিল। প্রভাত কিন্তু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; দুই চোখ ভরিয়া সেই জলধারার প্রতি চাহিয়া, সে কত কথা ভাবিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, সেই মেঘদূতের কবি কেন দুষ্মন্ত শকুন্তলার মিলন তপোবনের উপবনে ঘটাইয়াছিলেন; কেন তিনি এমনি মেঘ-অন্ধকার-ঘন, বারিধারা-মুখর পথের বৃক্ষ-আশ্রয়তলে সে মিলন ঘটান নাই! জগতের আদিম দুষ্মন্তের সহিত আদিম শকুন্তলার কোথায় দেখা হইয়াছিল? সে ত কোন উদার আকাশতলে গিরি-শিখরে, কোন হিংস্র-জন্তু-সঙ্কুল বন-পথের তরুতলে, কোন বারিধারা-মুখর স্নিগ্ধ অন্ধকার গহ্বরে! আকাশ, মাটি তাহার সাক্ষী ছিল,—আলো-হাওয়া তাহারা পুরোহিত ছিল;—বর্ষা-বসন্ত তাহার মিলন-গান গাহিয়াছিল;—পুষ্প-লতা তাহার মিলন-শয্যা রচনা করিয়াছিল! জগতের চিরকালের বিরহিণী শকুন্তলার অশ্রুই প্রতি আষাঢ়ে আকাশের কালো নয়নে জমিয়া ঝরিয়া পড়ে।

আরও জোরে বৃষ্টি আসিল,—ছাতার ওপর কে যেন মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিল। গান বন্ধ করিয়া শকুন্তলা চেঁচাইয়া লাফাইয়া উঠিল—"শিল, শিল—"

"বন্ধ, ছাতাটা ধরো,—কিছু শিল কুড়ানো যাক্‌।"

প্রভাত ছাতা ধরিল; কিন্তু যাঁহার মাথায় ধরিল, তিনি সে ছাতা হইতে বাহির হইয়া, শিল কুড়াইতে মত্ত হইয়া উঠিলেন।

রণেন বলিল, "না—না, আপনি ভিজবেন না—আমি কুড়িয়ে দিচ্চি।"

প্রভাত বলিল, "শীগ্‌গীর ছাতায় আসুন—মাথাটা যদি বাঁচাতে চান।"

শকুন্তলা হাসিয়া বলিল, "আর আপনার বন্ধুর মাথাটা বুঝি মাথা নয়!"

এক গাদা শিল কুড়াইয়া আনিয়া, ছাতার তলায় দাঁড়াইয়া, সে ছটফট করিতে লাগিল। "নিন—আপনি খান"—বলিয়া প্রভাতের হাতে কয়েকটা শিল তুলিয়া দিল।

রণেন খুব বড় কয়েকটা শিল কুড়াইয়া আনিয়া শকুন্তলার হাতে দিল।

"বা—আপনি যে সবগুলোই আমায় দিয়ে দিলেন। নিন কয়েকটা—আঃ! কি আরাম টাইগার হিলে বসে শিল খাওয়া!"

প্রথম-প্রথম শিল কুড়াইতে যে উৎসাহ দেখা গিয়াছিল, কয়েকটা শিল মুখে পুরিতেই সে উৎসাহ চলিয়া গেল। কেহ 'উঃ', কেহ 'আঃ' বলিয়া হাতের শিলগুলি ফেলিয়া

দিলেও, মুখের শিলগুলি সবাই আমোদ করিয়া খাইলেন। অবিশ্রাম শিল পড়িতে লাগিল, রণেন গাহিয়া উঠিল,—

"যদি শিলের মত কেক ঝুরে পড়ে এইখানে শত শত,
আমি কুড়ায়ে নিতাম, মুখে পূরিতাম, আর কুড়াতাম রে—"

শকুন্তলা গাহিয়া উঠিল,—

"যদি শিলগুলি হ'ত সন্দেশ ভাই, আর ফার্ণ লুচির মত—
আমি খাওয়াতাম, সবাইকে ডেকে এনে খাওয়াতাম—"

তার পর দুই জনের প্রাণে যেন গানের ফোয়ারা খুলিয়া গেল। কখনও শকুন্তলা গানের প্রথম লাইন গাহিয়া উঠিলে, রণেন পরের লাইন গাহিয়া ওঠে;—কখনও দুইজনে এক সঙ্গে গায়। কোন গান আর সম্পূর্ণ গাওয়া হইল না—এক গানের দুই চার লাইন গাহিয়াই নূতন গান গাহিতে মত্ত হইয়া ওঠে। প্রভাত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল বটে, কিন্তু তাহার দেহের রক্ত প্রতি গানের ছন্দে-তালে বাজিয়া উঠিতেছিল। কত রকমের গান—থিয়াটারের, যাত্রার, ধর্ম্মসঙ্গীত, প্রেম-সঙ্গীত, হাসির গান।

শিল পড়া থামিল,—বৃষ্টি কমিল। রণেন ছাতাটা প্রভাতের হাত হইতে লইয়া বলিল, "চলুন।"

প্রভাত বলিল, "হাঁ, আপনার মা হয় ত ভাবছেন।"

রণেন বলিল, "তুমিও চলো—ভিজে কাঠ ধরাতে অনেক ফুঁ দিতে হইবে।"

শকুন্তলা ও রণেন আগে-আগে চলিল,—প্রভাত ধীরে পেছনে-পেছনে চলিল। আজ তাহার অন্তর কানায়-কানায় ভরিয়া গিয়াছে।

ইহার পর হইতে প্রভাত এত গম্ভীর হইয়া উঠিল যে, খাবারের সময়ও যতীনবাবু তাহাকে কোন প্রকার ঠাট্টা করিতে সাহস করিলেন না। বাস্তবিক প্রভাতের ভয় হইতেছিল;—সে আপনাকে শকুন্তলা হইতে যতদূর সম্ভব দূরে রাখিল। ফিরিবার সময় ফার্ণ কুড়াইবার ছল করিয়া, ধীরে-ধীরে সবার পেছনে-পেছনে আসিল।

যখন বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়াছে,—হঠাৎ সে সবাইকে ছাড়াইয়া রণেন ও শকুন্তলাকে ধরিল। তখন টিপটিপ বৃষ্টি পড়িতেছিল;—রণেন শকুন্তলার মাথায় ছাতা ধরিয়া চলিতেছিল।

তাহাদের পাশে আসিয়া প্রভাত বলিল, "তোমাদের ছাতার একটু জায়গা হবে?"

"খুব হবে—আসুন" বলিয়া শকুন্তলা তাহাকে পাশে ডাকিয়া নিল। "আপনার ফার্ণ কুড়ানো শেষ হোল—ও, এক গাদা নিয়েছেন যে!" শকুন্তলার কুড়ানো ফার্ণগুলি রণেনের হাতে চলিতেছিল। সে সেগুলি প্রভাতের হাতে দিয়া বলিল, "বন্ধু, তা'হলে এগুলোও ধরো—পথ আর বেশী নেই।"

শকুন্তলা হাসিয়া বলিল, "দেখবেন, মিশিয়ে ফেলবেন না।"

"আচ্ছা, আপনি না হয় বেছে নেবেন;—খুব enjoy করা গেলো আজ!"

শকুন্তলা রণেনের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার মালাগুলো কেনা হয়েছে?"

রণেন উত্তর দিল, "সে ত 'কাল বিকেলেই কিনে এনেছি। আপনাদের বার্থ সব রিজার্ভ হয়েছে—জিজ্ঞেস করে এসেছি।"

প্রভাত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কি?"

রণেন অতি মৃদু হাসিয়া বলিল, "কাল মেলে যে ওঁরা যাচ্ছেন।"

"তাই না কি? সত্যি?"

ম্লান হাসি হাসিয়া শকুন্তলা বলিল, "হাঁ, কাল আমরা যাচ্ছি।"

চাপা গলায় "ও" বলিয়া প্রভাত শকুন্তলার দিকে চাহিল। সে চাউনির মানে এই যে, পরশু যদি এ কথা জানতুম, তবে আপনার সঙ্গে এমন করে আলাপ করতুম না। এ বড় অন্যায়।

সকলে বাড়ীর দরজায় আসিয়া পৌঁছিল।

"নিন আপনার ফার্ণ" বলিয়া প্রভাত সব ফার্ণগুলি শকুন্তলার হাতে দিল।

"আপনার চাই না বুঝি?"

"না, আমার দরকার নেই।"

"খুব ভিজেছেন,—শীগ্‌গীর কাপড় জামা ছাড়ুন গে। খুব আমোদে কাটলো—ভারি ভালো লেগেছে—" বলিয়া, মৃদু হাসিয়া, শকুন্তলা নিজেদের বাড়ীতে গিয়া ঢুকিল।

"ভারী ভাল লেগেছে' গানের সুরের মত এই কথাগুলি ঘরের হাওয়ায় ঘুরিয়া-ঘুরিয়া প্রভাতের কাণে বাজিতে লাগিল। কাপড়-জামা বদলাইয়া প্রভাত চুপ করিয়া বারান্দায় আসিয়া বসিল। বাহিরে ঝির-ঝির বৃষ্টি পড়িতেছে।

চারিদিক কুয়াসায় সমাচ্ছন্ন। শুধু সামনের গোলাপের ঝাড়, মারগারেট ফুলগুলি, বাশখাস বাতাসে দুলিতেছে, কাঁপিতেছে। মনে হইতেছে, মেঘের শুভ্র সাগরে ঘেরা, বর্ষা-মুখর এক নির্জ্জন দ্বীপে কয়েকটি ফুল, ঘাস, ঝাউগাছ ও একটি গানের সুর লইয়া সে বাস করিতেছে।

সুতীক্ষ্ণ, শীতল বাতাস বহিতেছে। ধীরে-ধীরে কুয়াসা কাটিয়া বৃষ্টি থামিয়া আসিল। সামনের ছোট পাহাড়ের ওপর পাইনগাছগুলি সাদা সিল্কের ওড়নার মত অতি স্বচ্ছ কুয়াসায় ঢাকা। এই ক্ষান্ত বর্ষণ, নিস্তব্ধ, স্নিগ্ধোজ্জ্বল সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া, মুগ্ধ হইয়া প্রভাত চির-চঞ্চলা প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিল।

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে,—চারিদিক হইতে মেঘের আবরণ উঠিয়া আসিতেছে। প্রকৃতি তাহার মুক্ত কবরী দিয়া সমস্ত ঢাকিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল; ধীরে-ধীরে মুক্ত বেণী বাঁধিতেছে। সম্মুখের ঘন বন-সমাচ্ছন্ন পাহাড়ের বুকে একখানি লঘু মেঘ বনদেবীর নির্ম্মল হাসির মত। দূরের পাহাড়গুলি সবুজ মখমলের অঙ্গবাস পরিয়া, একে অপরের গায়ে উঁকি মারিয়া, যেন সুদূর দিগন্তে ঊর্দ্ধপানে কি দেখিতে চাহিতেছে। আরও দূরে, পাহাড়ের সারির ওপর, মেঘের ফাঁক দিয়া, নির্ম্মল সূর্য্যের আলো-ধারা ঝরিয়া পড়িয়া, নীলকান্তমণির আভা মাখাইয়া দিয়াছে। সেই ঘন নীল পাহাড়ের ওপর স্নিগ্ধ নীল মেঘদল খেলিতেছে। উত্তর দিকের কালো পাহাড়গুলির কালো মেঘের সহিত মিলিয়া রাত্রির অন্ধকারের সৃষ্টি করিতেছে। আর পশ্চিমদিকের পাহাড়গুলির কি অপরূপ কান্তি! ঘনশ্যাম পাহাড়ের গায়ে মেঘ-খিচ্ছুরিত সন্ধ্যার রাঙা আলো। পাহাড়ের মাথায় দীর্ঘ বৃক্ষসারির ওপর একখানি নাতিদীর্ঘ মেঘ লাগিয়া রহিয়াছে। তাহার ওপর সন্ধ্যা-সূর্য্যের রক্তিম ছটা রক্তমেঘের মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এদিকে চক্রবালের মেঘগুলি পিঙ্গল আভার। তাহার তলার স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, নীল মেঘপুঞ্জ নীল পাহাড়গুলির সহিত মিলিয়া গিয়াছে।

তলায় রেল লাইনের লোহা ঝিকমিক করিতেছে। তাহার তলায় আলো-ছায়াময় সাদা কার্টরোড যেন আঁকাবাঁকা এক আলোর রেখা। কয়েকটি ভুটিয়া মেয়ে কুলী গান গাহিতে-গাহিতে যাইতেছে। তাহাদের মুখ দেখা যাইতেছে না,—শুধু লাল নীল হলদে জামার রংগুলি জ্বলিতেছে।

পাহাড়ের গহ্বরের গন্ধময় ভিজে মাটি, ফুল, পাতার সৌরভময় হাওয়া মৃদু বহিতেছে। অতি হাল্কা সাদা ছোট-ছোট মেঘগুলি নীল পাহাড়ের গায়ে উঠিতেছে, পড়িতেছে, দুলিতেছে, খেলিতেছে;—মুক্তার হারের মত কেহ মাথায় কেহ বুকে, কেহ পায়ে জড়াইয়া আছে। যেন হীরা-মণি-মাণিক্যের ভারে বিজড়িত নীলবসনা সুন্দরীরা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, গায়ে মালার পর মালা দুলিতেছে।

মল্লিকাফুলের মত সাদা কয়েকখানা মেঘ মৃদু বাতাসে উড়িয়া যাইতেছে। কেহ যেন এক বলাকা, কেহ শুভ্র তরী, কেহ অবগুণ্ঠিতা নারী। প্রতি মেঘ বহুরূপী—কখনও নানা রংএর মন্দির, কখনও একরাশ তুলা, কখন-কখনও প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনও অদ্ভুত জীব, কখনও অতি সুন্দর হাল্কা বরফের বস্তুপুঞ্জ,—কোন শিল্পী তাহা হইতে অপরূপ মূর্ত্তি গড়িতে পারে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। চা-বাগানের লালবাড়ী আর দেখা যাইতেছে না। উত্তরদিকে মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। মেঘের গম্ভীর গর্জ্জন শান্ত আকাশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। কুলীমেয়েদের গান আর শোনা যাইতেছে না। নিত্য দীপালি-উৎসবময় দার্জ্জিলিংএর বাড়ীগুলি আর দেখা যাইতেছে না। শুধু বনের অন্ধকারের ফাঁকে-ফাঁকে থাকে-থাকে সাজানো প্রদীপের সারি,—যেন কোন সহস্রাক্ষ, অতি বৃহৎ দৈত্য চুপ করিয়া শুইয়া আছে।

দিক্-চক্রবালের মেঘগুলি নামিয়া পাহাড় ছাইয়া ফেলিতেছে। সাদা মেঘগুলি কৃষ্ণাভ হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বের পাহাড়গুলি মেঘের কম্বল মুড়ি দিয়া রাত্রে ঘুমাইবার আয়োজন করিতেছে; পশ্চিমের পাহাড়গুলির সে দ্যুতিময় কান্তি কৈ? রঙের খেলা শেষ করিয়া, রঙের তুলি তুলিয়া সন্ধ্যা কালো-মেঘের আড়ালে লুকাইয়া চলিয়া যাইতেছে;— পাহাড়ের সহিত পাহাড় মিশিয়া এক হইয়া যাইতেছে। তলা দিয়া ছোট রেলগাড়ী ঝক্‌ঝক করিয়া চলিয়া গেল; যেন একটা কালো সাপ মাথায় মণি জ্বালাইয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া পাহাড় দিয়া নামিয়া গেল। তলায় কার্টরোড—কালো পাতার ওপর এক সাদা আঁচড়।

আবার সব সাদায় সাদা হইয়া কুয়াসায় ঘিরিয়া আসিতেছে। সুতীক্ষ্ণ, শীতল, আর্দ্র বাতাস বহিতেছে। চারিদিকে থর-থর, সন-সন, সর-সর শব্দ। দক্ষিণে একটু চাঁদের আলো,

কিন্তু উত্তরে বিদ্যুতের ঝিলিক; বজ্রের গর্জ্জন;—সব যেন এক রহস্যময় মায়া, অবাস্তব ছায়া, আলো-ছায়া-ঘন মাধুর্য্য, আঁধারের খেলা। আবার ঝিরি-ঝিরি বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে।

কোন্ বিশ্ব-দেবতার চরণ বন্দনা করিতে প্রভাতের অন্তর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে ধর্ম্মের কোন ধার ধারে নাই; পূজা-উপাসনার প্রতি তাহার বিশেষ ভক্তি ছিল না; কিন্তু আজ তাহার অন্তরের আনন্দের বান্ কাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িতে চায়। এই সোণালী, রূপালী, সবুজে, সুনীলে বিশ্ব-প্রকৃতির কি মাধুরী উদ্‌ঘাটিত হইল! দীপ্ত কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল,—ভালো লেগেছে,—তোমার আকাশ, আলো, পাহাড়, বন সব ভালো লেগেছে। তোমাকে প্রণাম,—হে সুখকর, তোমাকে প্রণাম;—হে দুঃখকর, তোমাকে প্রণাম;—তুমি, যে আমায় আনন্দ দিয়েছো, তোমাকে প্রণাম।

আরও কত কথা তাহার মনে ভিড় করিয়া জমিয়াছিল;—সে সব সে বুঝিতে পারিতেছিল না;—ব্যক্ত করিতে পারিতে ছিল না। সে বলিতে চাহিতেছিল, হে নির্ম্মল, হে সুন্দর, হে হাস্যময় আনন্দ, তোমাকে নমস্কার। এই হাসি-কথা, গান—গায়িকা, তোমাকে নমস্কার। কথা কহিয়া মন যেন আরও ভরিয়া আসিতেছিল। হঠাৎ একটি গান মনে পড়িল,—

"যে কেহ মোরে বেসেছো ভালো,
জ্বেলেছো ঘরে তাঁহারি আলো
সবারে আমি নমি—"

(১০)

কিন্তু পরের দিন সন্ধ্যায় মন যে এমন উল্টা সুরে গাহিবে, তাহা কে জানিত।

দুপুরের মেলে রায়-পরিবারকে গাড়ীতে চড়াইয়া বিদায় দিয়া, দুই বন্ধু যখন বাড়ী ফিরিল, তখন কাহার অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়, তাহা বলা শক্ত। ষ্টেসন হইতে বাড়ী আসিবার সমস্ত পথ প্রভাত অতি অস্বাভাবিক ভাবে হাসিতে-হাসিতে আসিয়াছে; পথে যেখানে যে-কোন প্রকার হাস্য-উদ্রেকের বস্তু পাইয়াছে, তাহার যথোচিত ব্যবহার হইয়াছে;—কোন মোটা মেম, অতি রংকরা মুখ, কোন বাঙ্গালী-সাহেবের অদ্ভুত সাজ, কোন ছোকরা বাঙ্গালীর ষ্টাইল। কিন্তু বাড়ী পৌঁছিতেই তাহার হাসির ভাণ্ডার যেন ফুরাইয়া গেল,—কোনমতে দুই বন্ধু চা খাইয়া বারান্দায় আসিয়া বসিল।

রণেন হারমোনিয়ম বাজাইতেছিল; প্রভাত একটু রুক্ষ স্বরে বলিল, "আর প্যান-প্যান করিস্ নে ভাই—"

"কেন, হঠাৎ হারমোনিয়মের কি দোষ হোল? ভালো লাগ্‌ছে না? দেখ, কি সুন্দর বাইরেটা হয়েছে!"

"দেখ্‌ছি, দেখিছি—একটু চুপ করো।"

"কি হোল হে?"

"আচ্ছা, তোর গান গাইতে ভালো লাগ্‌ছে?"

বাস্তবিক রণেনের গান গাহিতে মোটেই ভালো লাগিতেছিল না;—সে গানও গাহিতে ছিল না,—মনটা ভোলাইবার জন্য হারমোনিয়ম বাজাইতেছিল। কিছুক্ষণ বাজাইয়া বন্ধুর ওপর দয়া করিয়া বন্ধ করিল। তার পর মালিকে ডাকিল; একটা কোদাল আনাইল;—সামনের জায়গাটায় ফুল গাছ বসাইতে হইবে বলিয়া, মিছামিছি নিজেই খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল।

প্রভাত বসিয়া-বসিয়া এক চাউনির কথা ভাবিতেছিল। গাড়ী যখন হুইসিল দিল, ট্রেণ নড়িল,—প্রভাত রায়-পরিবারের সকলকে নমস্কার করিয়া, একবার শকুন্তলার দিকে চাহিল। শকুন্তলার নির্ম্মল, উজ্জ্বল, হাসিভরা, ব্যথাভরা, কালো চোখ দুইটি নিমেষের জন্য তাহার চোখের ওপর আসিয়া পড়িল। সে নিমেষ তাহার পক্ষে অনন্ত ক্ষণ। সেই বিদায়ের চাউনি তাহাকে কি বলিয়াছিল?

চোখের ভাষা আমি কি করিয়া বুঝাইব;—চাউনির ঠিক মানে আমি বলতে পারি না।

প্রভাত ভাবিতেছিল,—সে চাউনি কি বলিল, ভারি ভালো লেগেছে, এই দার্জ্জিলিংএ দিনগুলি; এই বিষ্টিতে ভেজা, শিল খাওয়া, মেঘে পথ হারানো, ভারি ভালো লেগেছে। আর তাহার চোখদু'টি উত্তর দিল, আমারও খুব ভালো লেগেছে। তোমার হাসি, তোমার থাকা, তোমার গান, তোমার চাউনি, এই পথে চলা, কথা বলা, বসে ভাবা।

সে চাউনি কি বলিল, মনে রেখো, ভুলো না বন্ধু, ভুলো না; আর তাহার চোখ উত্তর দিল, ভুলবো না বন্ধু, তুমিও মনে রেখো।—জীবনে যদি কখনও বন্ধুরা ছেড়ে যায়, কোন বন্ধুর দরকার হয়, এ বন্ধুকে ডাকতে ভুলো না।

সে চাউনি কি বলিল, তবে বিদায় বন্ধু, বিদায়;—আর

তাহার চোখ উত্তর দিল, আমার এ খোলা ঘরটা, হাসি-গানে আকুল করে, ক'দিন তুমি বাসা বেঁধে আজ অশ্রুজলে ভিজিয়ে চলে যাচ্ছো—এর সব দুয়ার সব সময় তোমার জন্য খোলা থাক্‌বে—যে দুয়ার দিয়ে যখন খুসি এসো।

সে চাউনির কৃত মানে ভাবিতে-ভাবিতে সে সন্ধ্যা-স্বপ্ন রচনা করিতে লাগিল। আর রণেনও কোদালে বেশীক্ষণ মন দিতে পারিল না,—সামনের রাস্তায় একা বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল।

রাতে দুই বন্ধু সকাল-সকাল আলো নিবাইয়া বিছানায় শুইল বটে, কিন্তু কাহারও চোখে ঘুম আসিল না। দুই জনেই চুপচাপ,—এ যেন ভাবে ও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া শুইয়া থাকিয়া প্রভাত ডাকিল, "রণেন!"

দ্বিতীয় ডাকে সে সাড়া দিল, "কি?"

প্রভাত কি জিজ্ঞাসা করিবে, তাহা ঠিক খুঁজিয়া পাইতেছিল না;—চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ বলিল, "আচ্ছা, ওঁরা বড় শীগ্‌গির গেলেন।"

"ভালোই হোল ভাই।"

"কেন বল তো?"

"আর কিছুদিন থাক্‌লে একটা কিছু ঘটেও যেতে পার্‌তো, একটা হেস্তনেস্ত—"

"তাই না কি,—আমি অতদূর ভাবি নি।"

এই স্তব্ধ অন্ধকারে পাশাপাশি ঘরের বিছানায় শুয়ে চুপে-চুপে কথা বলার মধ্যে শুধু রহস্য নয়, মাধুর্য্যও আছে;—প্রতি কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া, তীক্ষ্ণ হইয়া বাজে।

রণেনের ব্যথিত কণ্ঠস্বরে প্রভাত বলিল, "আমায় কালও যদি বল্‌তে—"

"হাঁ, তোমায়? আর বোলো না।"

প্রভাত ভাবিল বাস্তবিক, তিন দিন, তিন ঘণ্টা;—কিন্তু এই তার জীবনকে ওলট-পালট করিয়া দিয়াছে। সে ধীরে বলিল, "আমার মনে হয় ভাই, ও সমস্ত জিনিষটা অতি সরল, সহজ ভাবেই নিয়েছে;—যেমন আর দশজনের সঙ্গে মেশে—"

"আমার ত তা মনে হয় না;—এত যত্ন করে খাওয়াত।"

"আমি আমার কথাই বল্‌তে পারি,—তোমার কথা কেমন করে বোল্‌বো। দেখো, অমন সরল ভাবে খেলা, সহজ ভাবে কথা বলা ওর স্বভাব;—তুমি ভুল কোরছো।"

"ভুল কর্‌তেই আমি রাজি আছি।"

"তাই না কি—তা' হলে, বল—"

"ঠিক্ বুঝে উঠতে পারছি না।"

"একটা মোহও ত হতে পারে;—ভেবে দেখো।"

"দেখি ভাই, এখন ঘুমোও।"

দুইজনে চুপ করিল। তাহাদের কথাগুলি অন্ধকারে ঘুরিতে লাগিল; আর তার সঙ্গে এক মিষ্টি হাসির সুর। প্রভাত ধীরে বিছানা হইতে উঠিয়া, বারান্দায় বাহির হইয়া দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে ঝোড়ো হাওয়া হা-হা করিয়া ডাকিতেছে। প্রতিপদের চাঁদ কয়েকটি তারা লইয়া আকাশের এক নীল কোণ উজ্জ্বল করিয়াছে। অপর দিকে কালো মেঘের পুঞ্জে বিদ্যুৎ ঝলসিছে। অন্য সব-দিক সাদা।

(১১)

পরদিন সকালে রণেন তাহার বাগান লইয়া পড়িল; প্রভাত তাহার থিসিস লইয়া বসিল। কিন্তু রণেনের কোন নতুন গাছ পোঁতা হইল না; প্রভাতের কিছু লেখাও হইল না; পাতার সব কালো রেখা—সব যেন ফগের মত সাদা হইয়া যায়। তার পর সে সাদা-পর্দ্দা উঠিয়া গিয়া, গোলাপের মত রাঙা এক সহাস্য মুখ ফুটিয়া ওঠে। ফুল-পাতাগুলি দুলিয়া ওঠে। তাহাদের মধ্য হইতে এক স্নিগ্ধ সরল চোখ চাহিয়া থাকে।

সমস্ত দিন দুইজনেই চুপচাপ। দুপুরে প্রভাত বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিতে-ঘুরিতে পাশের বাড়ীর খালি ঘরগুলির মধ্যে গিয়া পড়িল। শূন্য টেবিল, চেয়ার, তক্তা পড়িয়া রহিয়াছে। কোথাও ছেঁড়া চিঠির কয়েকটি পাতা;—কোন কোণে শুক্‌নো ঝরা ফুলের পাপড়ি,—কোন দিকে কয়েকটা দেশলাইয়ের পোড়া কাটি;—তাহারা সব যেন নড়িয়া এক মধুর হাসির সুরে নাচিয়া উঠিল।

ফিরিয়া গিয়া প্রভাত রণেনকে বলিল, "তুমি কি আমায় একটা ভূতের বাড়ীতে রেখে দিতে চাও?"

"কি হোল বন্ধু?"

"সারাদিন তোমার দেখা নেই—একটা কথা কইতে পাই না।"

"এত-দিন কোন দুপুরে আমার দেখা পাও নি—খোঁজও কর নি।"

"না ভাই, এখানে থাক্‌লে আমার পড়াশুনা হচ্ছে না; কল্‌কাতা যেতে হচ্ছে।"

সেই পাহাড়ের মালা,—সেই মেঘের খেলা,—সেই সন্ধ্যার সাতরংএর আলো। শুধু বৃষ্টি একটু বেগে, রুদ্ধ দুর্নিবার ক্রন্দনের মত ঝরিতেছে;—বাতাস করুণ অস্ফুট আর্ত্তনাদের মত বহিতেছে;—রাত্রির কালো আঁচলের ভিতর সন্ধ্যার রঙীন আলো অতি শীঘ্র মিলাইয়া যাইতেছে।

কি অজানা ব্যথা। প্রভাত কেন কাঁদিতে চায়? তার অন্তর যেন অকারণে অশ্রুতে ভরিয়া গিয়াছে। কয়েক দিন আগে, এক সন্ধ্যায়, আপনার ইচ্ছাশক্তির অজ্ঞাতে, সে যেমন কাহার চরণে আনন্দে লুটাইয়া পড়িতে চাহিয়াছিল,—আজ তেমনি অশ্রুজলে লুটাইয়া পড়িতে চাহিতেছে। ওই ভিজে মাটির ওপর, ঘাসের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে পারিলে, সে যেন বাঁচিয়া যায়।

এ কিসের তৃষ্ণা? কিসের কান্না? এ গোপন-রহস্যময়, অপরিচিত বেদনা যেন অর্দ্ধেক তাহার সুদূর পিয়াসী মনের সৃষ্টি; আর অর্দ্ধেক এই বাহিরের জল-স্থল-আবাসের মায়া। হঠাৎ তাহার মনে হইল, আজ যেন ১লা আষাঢ়। পাঁজিতে আজ যে মাসের যে তারিখই থাক্ না, তাহার মানস-আকাশে আজ ১লা আষাঢ়। এই আষাঢ়ের প্রথম দিবসে-মেঘ, মেদুর অম্বরে, জগতের চিরন্তন যক্ষ তার বিরহিণী প্রিয়ার জন্য ব্যথিত হইয়া, আপন বীণা লইয়া বসিয়াছে। পৃথিবীর সেই চির-কালের যক্ষের অশ্রু তাহার সমস্ত অন্তরীকাশ জুড়িয়া জমিয়াছে। এ ধারা অঝোরে ঝরিয়া পড়িলে সে বাঁচে।

কোথায় সে প্রিয়া? কাহার জন্য এ অশ্রু? এ যেন কোন রক্তমাংসের নারীর জন্য নয়;—এ কোন অজানা, বেণী অলকাবাসিনী অনন্তযৌবনা চিরসৌন্দর্য্যময়ীর জন্য। কোথায় —কোথায় সে অলকা? সে কি তাহার চিত্তের মর্ম্মস্থলে,— সে বিরহিণী কি অন্তর-কমলের স্বর্ণ-পাপড়ির শয্যায় সুপ্ত হইয়া আছে? অথবা সে, সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে আপনাকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া, মিলাইয়া-মিলাইয়া, ছড়াইয়া, লুকাইয়া, জলে-স্থলে-আকাশে আপনাকে মুক্ত, বিকম্পিত, শিহরিত, চঞ্চল করিয়া, ক্ষণে-ক্ষণে কোন্ অজানা মুহূর্ত্তে দেহ-মন স্পর্শে উন্মনা করিয়া যায়;—তৃষিত, ব্যথিত, দীপ্ত, আনন্দিত করে। আজ ওই গোলাপকুঞ্জ, কিউসিয়া, ক্যাকটাস ফুলদল হইতে, এই ভিজে মাটির গন্ধে তাহারি অঙ্গের সৌরভ ভাসিয়া আসিতেছে। স্নিগ্ধ, নীল পাহাড়ের ওপর তাহারি নীলবাস লুটাইয়া পড়িয়াছে। ওই পশ্চিম-দিকের পাহাড়ের মাথায় রঙীন মেঘে তাহারি স্বপ্নময় চাউনি। ওই কালো মেঘের রাশি তাহারি কালো কবরী—সমস্ত অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। শুধু দক্ষিণ কোণের মেঘ সরিয়া, নীল আকাশে তাহারি অঙ্গের লাবণ্য দেখা যাইতেছে। এই পাহাড়ের কোলের মেঘগুলি বুঝি তার অন্তরের লীলা,—তার খুসি,—তার হেলাফেলা। তাহার ক্ষণিক বেদনা, হাস্য, অশ্রুজল এই নব-নব রূপী মেঘের খেলার মূর্ত্তি ধরিতেছে। জিয়লজিতে সে যে পৃথিবীর ইতিহাস জানিয়াছে, তাহা তাহার নিকট ভুল বোধ হইল; এ কেবল অগ্নি, জল, পাথর, মাটির বিবর্ত্তনের ইতিহাস নয়—এ পৃথিবী যেন কোন উর্ব্বশীর নব-নব বিকাশ;—সে অনন্তসৌন্দর্য্যময়ী অনন্ত-যৌবনার যুগে-যুগে ক্ষণে-ক্ষণে নব-নব রূপের ধারা।

রণেনকে জিজ্ঞাসা করিলে সে নিশ্চয় হাসিয়া বলিত, এ ব্যথা হচ্ছে শকুন্তলার জন্য বিরহ-বেদনা। প্রভাত যে এ কথা ভাবে নাই, তাহা নহে; তবু তাহার মনে হইতে লাগিল, এ বেদনার সহিত শকুন্তলার যোগ আছে, অথচ নাই। এ যাহার জন্য, তাহাকে সে জীবনে কত অপরূপ শুভ মুহূর্ত্তে পাইয়াছে, আবার হারাইয়াছে। মানব-মানস-স্বর্গের উর্ব্বশী সে। পথের ফগের অন্ধকারে, শিলাবৃষ্টি-মুখর বনবৃক্ষছায়ায় সে তাহারই স্পর্শ পাইয়া ধন্য হইয়াছে।

কালো মেঘের মধ্যে সন্ধ্যার শেষ স্বর্ণ-রেখা মিলাইয়া গেল; প্রভাত রণেনকে বাগান হইতে ধরিয়া আনিল।

"ভাই একটু গান গাও না,—তোমার একটা বাঁশী ছিল না?" অনেক খুঁজিয়া একটা বাঁশী বাহির হইল।

প্রভাত বাঁশী বাজাইতে লাগিল; আর রণেন গান ধরিল। যে সব গান সে কত যত্নে শকুন্তলাকে শিখাইয়াছে,—কত আনন্দের সহিত শকুন্তলার নিকট হইতে শুনিয়াছে,—একের পর এক করিয়া সে গানগুলি গাহিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সব গানের সুরই কি করুণ;—সে সাহানাই হউক, আর পুরবীই হউক; বেহাগই হউক, আর বাগেশ্রীই হউক— সকল সুরই যেন কান্নাভরা। গানের কথাগুলির কত নতুন-নতুন অর্থ তাহাদের নিকট উদ্ঘাটিত হইল;—কোনটি গজল, কোনটি ভজন, বাউলের সুর, কীর্ত্তন, রামপ্রসাদী, ভাটিয়াল,

চণ্ডীদাস, রবীন্দ্রনাথের কত গান। স্নিগ্ধ জোৎস্না গোলাপ-কুঞ্জে ঝরিয়া পড়িয়াছে। মেঘলোকের দিকে চাহিয়া, প্রভাত সুরে-সুরে বাঁশী ভরিয়া দিল।

সবশেষে গাহিয়া উঠিল, "আমার একটি কথা বাঁশী জানে,—বাঁশীই জানে।"

রণেন হাসিয়া বলিল, "কি কথা বন্ধু?"

"এতক্ষণ ত এত সুরে সেই কথাই বল্লুম।"

"তাই না কি?"

দুইজনে কিছুক্ষণ চুপ করিল।

রণেন জিজ্ঞাসা করিল, "তা হলে তুমি কাল সত্যি যাচ্ছো?"

"আচ্ছা, কালকের দিনটা থেকে না গেলে যাক; তুমি কি ঠিক করলে?"

"বুঝে উঠ্‌তে পারছি না।"

"ঠিক বলো—তা হলে কলকাতায় গিয়ে দেখা করবো। কি, চুপ করে রইলে যে! আমি গেলে ভয় আছে উল্টো ফলও হতে পারে? সত্যি বলো।"

"হাঁ ভাই, সত্যি বল্‌বো,—তোমার ভয়টা নেহাৎ মিথ্যে নয়।"

"আমি ত তাই ভাব্‌ছিলুম; মনে মনে ঠিকই করেছিলুম—গিয়ে দেখা কোর্‌বো না।"

"কিন্তু তুমি।"

"ও, হাসালে। কি জানো Science is my bride, বুঝলে। আর তোমার মিলনের পথে, কোন ভয় নেই ভাই।"

"কি যা-তা বলিস"—রণেন ভাবিল, প্রভাত কি সত্যই শকুন্তলাকে ভালবাসিয়াছে? ভালবাসাই ত তাহার প্রকৃতি, হয় ত তাহার চেয়েও বেশী ভালবাসিয়াছে। হঠাৎ একটা গানের দুই পদ মনে পড়াতে, সে মনে মনে হাসিয়া উঠিল—

> "দেখো সখা ভুল করে ভালোবেসো না,
> আমি ভালোবাসি বলে তুমি বেসো না।"

আর প্রভাত ভাবিতেছিল, রণেন নিশ্চয় তাহার চেয়েও অনেক বেশী শকুন্তলাকে ভালোবাসে, তাহার সহিত মোটে ত ক'দিনের আলাপ।

জ্যোৎস্না-ধোওয়া গোলাপ-ঝাড়ের দিকে চাহিয়া দুইজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বাঁশী ও গান থামিয়া গিয়াছে। তাহার সুর ঘরের হাওয়ায় ঘুরিয়া বহিতে লাগিল,

> "কবে তুমি আস্‌বে বলে আমি রইবো না বসে;
> আমি চল্‌বো বাহিরে।
> শুক্‌নো ফুলের পাতাগুলি পড়্‌তেছে খসে।"

(১২)

দেড় বছর কাটিয়া গিয়াছে। অকল্যাণ্ড রোডের সেই বাড়ীর সেই হটহাউস। ক্রিউসিয়া ঝাড়টি আরও বড় হইয়াছে। তাহার তলায় শকুন্তলা দাঁড়াইয়া। শকুন্তলাকে আগেকার চেয়ে বড় দেখাইতেছে। তাহার দেহে যেন যৌবনের জোয়ার ভরিয়া আসিয়াছে। কোলে একটি ছোট শিশু। সম্মুখে মুখোমুখি প্রভাত দাঁড়াইয়া, এই কল্যাণী মাতৃ-মূর্ত্তির স্থির সৌন্দর্য্য দেখিতেছিল। স্নিগ্ধস্বরে বলিল, "বা শুক, তোমায় ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। প্রথম যেদিন এখানে তোমায় দেখেছিলুম, তার চেয়েও সুন্দর।"

শকুন্তলার সমস্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। চুপ করিয়া, সরল চোখ দিয়া, একবার কোলের শিশুটির দিকে, একবার প্রভাতের দিকে, চাহিল। প্রভাত তাহার কোল হইতে ছোট শিশুটিকে কাড়িয়া লইয়া, চুমায় আদরে ভরিয়া দিল। শিশুটি হাসিল; তার পর কাঁদিয়া উঠিল। প্রভাত তাহার আঙুল হইতে সোনার আংটি তাহার হাতে খেলিতে দিয়া বলিল, "কি নাম রাখ্‌ছো এর?"

"তুমিই বলো না।"

"এর ভালো নাম যা খুসী রাখো; এর একটা ডাক-নাম রাখ্‌বে ডালিয়া।" তাহার মনে পড়িল, এক ফণাচ্ছন্ন অন্ধকার সন্ধ্যায়, এক ঝর্ণার ধারে, দেশলাইয়ের আলোয় কাহার মুখ ডালিয়া ফুলের মত সুন্দর দেখিয়াছিল।

আংটি লইয়া খেলিতে-খেলিতে খুকী সেটা নীচে ফেলিয়া দিল। শকুন্তলা তাহা ধীরে তুলিয়া প্রভাতের হাতে দিতে আসিল।

"ও রকম করে নেবো না,—আঙুলে পরিয়ে দিতে হবে।"

"আচ্ছা এসো" বলিয়া শকুন্তলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হাসিয়া রণেন হট্‌হাউসে ঢুকিল।

"ওহে বন্ধু, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু flirting করছি।

কিছু মনে কোরো না। তুমি এখন এখান থেকে যেতে পারো।"

"তা বেশ—বেশ। ওহে, তোমার ঈমাগ্র ওরা ছাড়্‌বে, খবর দিয়েছে।"

"তাড়িয়ে দিতে পারলে বাঁচো, ময় ?"

"কি জানি, যদি শকুন্তলাকে নিয়ে elope করো ?"

শকুন্তলা স্বামীর মুখের দিকে রাগিয়া চাহিয়া বলিল—"যাও—"

"যাচ্ছি" বলিয়া রণেন কটহাউস হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রভাত দেখিল, শকুন্তলার চোখে একবিন্দু জল টলমল করিতেছে। সে তাড়াতাড়ি খুকীকে শকুন্তলার কোলে দিয়া, আংটিটি শকুন্তলার হাত হইতে খুকীর হাতে দিয়া বলিল, "এটি দিয়ে আমি ওকে দেখলুম, বুঝলে। বাস্তবিক, রণেনটা কি দুষ্ট !"

চোখের জল সামলাইয়া শকুন্তলা বলিল, "তোমার থিসিসটা শেষ হয়েছে ?"

"এক রকম ত শেষ করেছি।"

"একটা D. Sc. না Ph. D.? Next summer এতে ত গেলে পারতে !"

"আবার শুনছি, একটা জার্ম্মাণ না কি আমার থিওরি নিয়ে work করছে ;—বিলেতে গিয়ে ঠিক খবর পাবো ;—তাড়াতাড়ি যাওয়া চাই, বুঝলে।"

রণেন আবার ঢুকিয়া বলিল, "এমন সুন্দর বাইরেটা হয়েছে ! কি সব চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছো ! চল ভাই, একটু বেড়িয়ে আসি।"

প্রভাত খুকীকে কোলে লইল। প্রভাত ও রণেনের মধ্যে শকুন্তলা চলিল। ধীরে তাহারা অকল্যাণ্ড রোডে বেড়াইতে গেল।

কয়েকদিন পরে এক সন্ধ্যায়, যে চেয়ারে বসিয়া প্রভাত বহুদিন আগে শকুন্তলার বিদায়ের চাউনির কথা ভাবিয়াছিল, সেই চেয়ারে আনমনা বসিয়া শকুন্তলা প্রভাতের শেষ বিদায়ের চাউনির কথা ভাবিতেছিল। দুপুরের মেলে প্রভাতকে বিদায় দিয়া আসিয়াছে। সে বিলাত যাইতেছে। ফিরিবে কি ফিরিবে না, কে জানে।

সে নির্ম্মল, স্নিগ্ধ, চোখ দুইটি কি বলিয়াছিল ? সে চাউনি বলিয়াছিল, সুখে থাকো,—তোমরা সুখে থাকো,—তোমাদের ঘর যেন দিন-রাত হাসি-গানে ভরা থাকে।

ধীরে শকুন্তলা খুকীকে বুকে করিয়া চুমা খাইল। দুই বিন্দু অশ্রু খুকীর হাসিভরা মুখে ঝরিয়া পড়িল।

রণেন আসিয়া ধীরে ঢুকিল ; তাহার পাশে দাঁড়াইয়া, মাথার কেশে হাত বুলাইল। একটুখানি হাতের ওপর হাত রাখিল, "এসো, একটু গান গাওয়া যাক। তুমি গাও, আমি বাঁশীটা বাজাই।"

শকুন্তলা খুকীকে রণেনের কোলে দিয়া, ম্লান মৃদু হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, তাহার হাতের সহিত হাত জড়াইয়া বলিল, "না, চলো, ভারি সুন্দর সন্ধ্যেটা হয়েছে ;—বাইরে একটু বেড়িয়ে আসি।"

দার্জ্জিলিং-সন্ধ্যার অপরূপ আলো চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

ভ্রান্ত

[শ্রীরমলা বসু]

বুকে লয়ে ভাঙ্গা বাঁশী একা নিরালায়,
কাটালি সারাটী বেলা, পথের ধূলায় ;
ভ্রান্ত পথিক ! তুই কিসের আশায় ?
বেলা তোর বয়ে গেল হেলায় খেলায়।
ভেবেছিস্ ভাগ্য তোরে আপনি খুঁজিয়া,
হেম-মাল্যখানি তার দিবে পরাইয়া,
সযতনে নিজ হতে, তোর কণ্ঠ বেড়ে ?
পথ হতে উঠাইয়া লবে ধূলি ঝেড়ে ?
তুই রবি তারি আশে ধূলায় পড়িয়া,
যতদিন আদরে সে না লয় যাচিয়া ?
তুই দিবি শুয়ে-শুয়ে অদৃষ্টের দোষ ?
তুই শুধু করে র'বি অভিমান রোষ ?
হায় ভ্রান্ত ! সৌভাগ্য কি নিজে দেয় ধরা ?
সুখ নয়—দুঃখ শুধু হয় স্বয়ম্বরা।

বর্ত্তমান ফ্রান্স

[অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ]

(১)

একজন প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কারের সঙ্গে আলাপ হইল তাঁহার নিজ ভবনে। ভবনটা এক প্রাসাদ-বিশেষ। যেন বা মধ্যযুগের বা নেপোলিয়নী আমলের। প্রকাণ্ড ফটক পার হইয়া বাড়ীতে ঢুকিতে হয়;—ঢুকিবামাত্র ফটক বন্ধ হইয়া যায়। আমীরী চালের আদব-কায়দা দেখা গেল। ব্যাঙ্কার মহাশয়ের নাম রাফায়েল-জর্জ লেভি (Raphael-Georges Levy) ফ্রান্সের লোকেরা ইঁহাকে ধন-কুবের এবং পাকা ব্যবসাদার বলিয়া জানে। ইনি লক্ষপতি কি ক্রোড়পতি, তাহা জরীপ করিয়া দরকার নাই। মামুলি খেয়ালে ত দু-চার-দশ-হাজার টাকার বেশী যার ট্যাঁকে আছে, সেই লক্ষপতি। লাখে আর দুই লাখে তফাৎ করিতে বলা জন-সাধারণের পক্ষে বেকুবি।

লেভি মহাশয় জাতিতে ইহুদি; কিন্তু ফরাসী সমাজে নাম-ডাক খুব। এখানকার 'সেনা'র (Senat; ইংরেজি প্রতিশব্দের উচ্চারণ সেনেট্) অর্থাৎ "লর্ড হাউসে"র একজন সভ্য। তাহা ছাড়া রাষ্ট্র-নৈতিক কার্য্যক্ষেত্রে এবং সাহিত্য-বিভাগেও যশ ইঁহার অনেক। আমেরিকার হার্ভার্ডের অধ্যাপক টাওসিগ্ (Taussig) সরকারী আয় ব্যয় সম্বন্ধে যে দরের লোক, ফ্রান্সে লেভির স্থান সেইরূপ। ফরাসী "সেনায়" ইনি রাজস্ব-বিভাগেরই তদবির করিয়া থাকেন।

নানা কথা-বার্ত্তা হইল। আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিল, ফ্রান্সের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যে লেন-দেন। ইনি বুঝিলেন—ভারত-সন্তানদের সঙ্গে ফরাসী জনসাধারণের আদান প্রদান ঘনিষ্ঠতর করা আবশ্যক। বলিলেন—"অবশ্য, বুঝিতেই পারিতেছ,—আমি যখন ফরাসী, তখন তোমাদের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে আমি কোন পক্ষ গ্রহণ করিতে পারি না।"

মাস দু'এক হইল, লেভির এক কেতাব বাহির হইয়াছে। বইখানা উপহার দিয়া বলিলেন—"ইতি মধ্যে ২০,০০০ কাপি কাটিয়া গিয়াছে। আমার বক্তব্যগুলা ভারতবর্ষে প্রচার করিতে পারিবে?" কেতাবের নাম "লা জুষ্ট পে" (La Juste Paix) বা "ন্যায়সঙ্গত সন্ধি"। গত বৎসর ইংরেজ ধন-বিজ্ঞানবিৎ কেইন্‌স্ (Keynes) তাঁহার Economic Consequences of the Peace" গ্রন্থে ইংরেজি ভাষায় প্রচার করিয়াছেন যে, ১৯১৯ সালে ভার্সাইয়ে (Versailles) যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সর্ত্তগুলা জার্ম্মাণির পক্ষে যারপরনাই কড়া। জার্ম্মাণ সমাজ ইহার ফলে একদম উপিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তাহা জগতের পক্ষে মঙ্গল-জনক নয়। ফরাসী লেভি ইংরেজ পণ্ডিতের মত খণ্ডন করিয়া, দফায়-দফায় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, সন্ধিটা আগাগোড়া সহৃদয়তার সহিতই কায়েম করা হইয়াছে;—বিজেতাদের পক্ষ টানিয়া অন্যায় দাবী করা হয় নাই। বিজিত জার্ম্মাণদেরও কুপো-কষা করিয়া ধনে-প্রাণে মারিবার ফিকির এই সন্ধির সর্ত্তের ভিতর নাই। জার্ম্মাণির নিকট ফ্রান্স যত টাকা বা যত মাল দাবী করিয়াছে, সবই জার্ম্মাণির দিবার ক্ষমতা আছে। জার্ম্মাণির অবস্থা যত শোচনীয় ভাবিতেছ, তত শোচনীয় নয়। ইত্যাদি। এই সকল কথা বুঝাইবার জন্য; লেভি মহাশয়, যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণির আর্থিক অবস্থা এবং টাকার বাজার কিরূপ ছিল, এবং আর্মিষ্টিসের পর হইতেই বা কিরূপ হইয়াছে, তাহার এক বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। মোটের উপর, ইঁহার মত—"জার্ম্মাণদের মায়াকান্নায় তোমরা ভুলিও না, হে বিশ্বজন!"

ফ্রান্সে প্রত্যেক বিদেশীর উপর পুলিশের তীক্ষ্ণ নজর। গোয়েন্দা বিভাগের কথা বলিতেছি না। তা ত সকল দেশেই সমান। যে কোনো বিদেশী লোক—যে পদেরই হউক না কেন—ফ্রান্সে পদার্পণ করা মাত্রই, পুলিশ আফিসে

নাম-ধাম দিয়া আসিতে বাধ্য। আমার হোটেলওয়ালা আমাকে ঘর দিতে না দিতেই, চোদ্দ-পুরুষের কাহিনী একটা ছাপানো কাগজে লিখিয়া লইল।

এইটা লইয়া পরদিন আমি গেলাম আমার পাড়ার পুলিশ আফিসে। সেখানে এই কাগজের উপর এক ছাপ মারা হইল। তার পর তৈয়ারি করিতে হইল ৫টা ফটোগ্রাফ। পাসপোর্টের জন্য এই ধরণেরই কতকগুলা ফটো দরকার হয়। পাড়ার কোতোয়ালী হইতে সহরের সর্ব্ব-প্রধান পুলিশ আফিসে গেলাম এই কাগজ আর ছবিগুলা লইয়া। সদর থানায় বিদেশীদের নজরে রাখিবার জন্য অনেক কর্ম্মচারী কাজ করে দেখিলাম। লোকের ভিড় সেখানে খুব বেশী। আমার কাগজপত্র দেখিয়া সার্টিফিকেট তৈয়ারী করিতে লাগিল আধ ঘণ্টারও অধিক—এত কথা এত জায়গায় লেখা দরকার হয়। একটা রসিদ পাইলাম। ইহাতে লেখা আছে যে, দশ দিন পরে অমুক তারিখে আবার পুলিশ আফিসে আসিতে হইবে। সেই সময়ে, যদি বড় কোতোয়ালের মর্জ্জি হয়, তবে একটা পাকা চিঠি বা কার্ড পাইব। সেই কার্ড যে না পায়, তাহার ফ্রান্সে বসবাস নিষিদ্ধ।

অন্য কোন দেশে এমন ব্যবস্থা কখনো চোখে পড়ে নাই। ফ্রান্সে শুনিতেছি—এই নিয়ম আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। তবে হাঙ্গামা, গলদ্‌ঘর্ম্ম, বা দুশ্চিন্তার বিষয় কিছুই নাই। প্রায় সকলেই ফ্রান্সে বাস করিবার জন্য অনুমতি-পত্র পাইয়া থাকে। দশদিনের জন্য যে রসিদ পাইলাম, তাহার জন্য ট্যাক্স দিতে হইবে ৫ফ্রাঁ। এই ট্যাক্স আমাকে নিজে যাইয়া দিয়া আসিতে হইবে। আমার পাড়ার থানায় নয়, খাজাঞ্চীর আফিসে। কোতোয়ালীতে আর একটা সহি-করা কাগজ পাইলাম। তাহার জন্য দিতে হইয়াছে প্রায় সাত ফ্রাঁ।

শুনিলাম, ছাত্র হইয়া আসিলে, কোনো বিদেশীকে এই কর দিতে হয় না। ব্যবসায়ীদের দিতে হয়। আমি ব্যবসায়ী বটে! কেন না, কোতোয়ালীর কেরাণীরা আমার কাগজে লিখিয়া দিল যে, আমি "ওম্‌ দ' লেত্‌র্‌" (homme de lettres,) বা সাহিত্য-সেবীর ব্যবসায় চালাইবার জন্য ফ্রান্সে পর্য্যটন করিতেছি।

প্যারিস সহরটায় রাত্রিকালে রোশনাইয়ের বড় অভাব। মস্ত-মস্ত বুলভারগুলা আলোর খাঁকতিতে ভয়াবহ বোধ হয়। বড়-বড় সড়কেও দেখিতেছি—দুই-তিনটা থাম বাদ দিয়া বাতী জ্বালা হইয়াছে। এমন কি, স্যাঁ-তেনেয়ারের রাত্রেও প্যারিসের মিউনিসিপ্যালিটি আলোক খরচার বাজেট বাড়ায় নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে শুনিতেছি অবস্থা ঠিক উল্টা ছিল। প্যারিস আলোকমালায় গুলজার থাকিত।

(২)

এক লেখকের বাড়ীতে সান্ধ্য বৈঠকে গিয়াছিলাম। ছোট তিনটা কামরার ভিতর বসা বা খাড়া দেখিলাম—কম-সে-কম ৬০ জন পুরুষ-নারী। লম্বা চুলওয়ালা পুরুষ সেখানে ছিল না;—কিন্তু ছোট-চুলওয়ালা স্ত্রীর সংখ্যা ছিল মন্দ নয়।

কেহ লেখক, কেহ চিত্রকর, কেহ স্থপতি, কেহ সমজদার, কেহ সমালোচক, কেহ কবি, কেহ পত্রিকা-সম্পাদক, কেহ পত্রিকায় প্রবন্ধ সংগ্রহের আড়কাঠি। জাতি হিসাবে কেহ ইহুদি, কেহ মামুলি খৃষ্টান অর্থাৎ ক্যাথলিক, কেহ প্রটেষ্টাণ্ট, কেহ বা নাস্তিক, কেহ পোল, কেহ মেক্সিকান, কেহ চেকো-স্লোভাক, কেহ যুগো-স্লাভ, কেহ মার্কিণ;—অবশ্য কয়েকজন নেটিভ অর্থাৎ ফরাসীও বটে।

ঘরগুলার মেজে হইতে ছাদ পর্য্যন্ত আগাগোড়া দেখিতেছি ছবি, মানচিত্র, প্রত্নতাত্ত্বিকের হাতুড়ি-বাটালি, চিত্রকরের তুলী, রং, সাহিত্যিকের কেতাব, আর জার্ণেলিষ্টের আধা-পড়া প্রুফ। এই ধরণের জীবনকে পশ্চিমা দরবারী ভাষায় বলা হয় "বোহিমিয়ান" (Bohemian)। দিল-দরিয়া মেজাজ,—ব্যবসার মধ্যে ছবি আঁকা, বা কবিতা লেখা, বা ছবি-কবিতার সমালোচনা করা; আর ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে,—এই সকল লক্ষণ থাকিলে ইয়োরা-মেরিকার নব নর-নারীরা বোহিমিয়ান ডিগ্রি পায়।

পোল জিজ্ঞাসা করিল—"ভারতবর্ষের লোকেরা আজ-কালও দুর্ভিক্ষে মরে?" মেক্সিকান বলিল—"আমি মেক্সিকোতে হিন্দু সাহিত্যের গল্প প্রকাশ করিতে চাই।" ফরাসীর প্রশ্ন—"ওহে বাপু, তোমাদের দেশের লোকেরা নতুন ধরণের ছবি কিছু আঁকে-টাঁকে কি?" মার্কিণ বলিল—"আমিও এই কথাই জিজ্ঞাসা করিব ভাবিতেছিলাম।" ইত্যাদি। যে লেখকের ঘরে এই মজলিস বসিয়াছিল,

তাঁহার নাম আলেকজাঁদার ম্যার্সেরো (Alexandre Mercereau); যুবক ফ্রান্সের মহলে-মহলে ইঁহার নাম আছে।

সকাল নয়টার সময় "রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের বেসরকারী কলেজে"র এক ক্লাশে উপস্থিত ছিলাম। ছাত্র ছিল প্রায় দুই শত। ফরাসী যুবারা দেখিতে অন্যান্য দেশীয় কলেজের ছোকরাদের মতনই। যুদ্ধে আহত কাহাকেও বোধ হইল না। একজন মাত্র ছাত্রী। বক্তৃতার বিষয় "বাজেট" বা সরকারী আয়ব্যয়। অধ্যাপক প্রবেশ করিবামাত্র ঘন করতালি। বোধ হয় বৎসরের প্রথম বক্তৃতা বলিয়া। ছাত্রেরা সহজেই নোট লিখিয়া যাইতে লাগিল। আমি এক ঘণ্টা বসিয়া কেবলমাত্র ফরাসী উচ্চারণ শুনিতে থাকিলাম। কয়েকটা শব্দ ছাড়া আর কিছু কাণে প্রবেশ করিল না। ফরাসী রপ্ত করিতে দেখিতেছি অনেক সময় লাগিবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই ফরাসীতে চিঠিপত্র লেখা সুরু করিয়া দিয়াছি।

কলেজটার ফরাসী নাম "একল লিবর দে সিয়াঁস পোলিটিক্" (Ecole libre sciences politiques)। এই পাঠশালা জগদ্‌বিখ্যাত। ফ্রান্সের বড় বড় রাষ্ট্রীয় পদের জন্য এখানকার ছাত্রেরা তৈয়ারি হয়। ইস্কুলটা লিবর (স্বাধীন); অর্থাৎ ইহার উপর গবর্মেণ্টের বা প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন এক্তিয়ার নাই। সহজ বাংলায় ইহার নাম "স্বদেশী" বা "জাতীয়" বিদ্যালয়। বর্ত্তমানে এই কলেজের পরিচালক দেইসঠাল্ (Eugene d'Eichthal)। ইনি ফরাসী পণ্ডিত-সমাজে নামজাদা। কলেজটা স্থাপন করিয়াছিলেন বুৎমি (Emile Boutmy)। ফ্রান্সের বাহিরেও বুৎমির লেখা কোনো-কোনো বই রাষ্ট্রনীতির ছাত্রেরা জানে।

বাজেট সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিবার পর, কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল। জাহাজের সহযাত্রী এক ইয়াঙ্কি যুবাকে দলের ভিতর দেখিলাম। কয়েক বৎসর হইল, সে মার্কিণ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েট হইয়াছে। ইহার মত—আমরা দেশে বাজেট সম্বন্ধে যতটা শিখিয়াছি, তাহা আজকার এই বক্তৃতার তুলনায় নিতান্ত ভাসাভাসা।

(৩)

একটা বড় গোছের সম্মিলন হইয়া গেল। প্রায় তিন শত লোক উপস্থিত। সবাই ইস্কুল মাষ্টার লাইনের। অধ্যাপক, অধ্যাপকের স্ত্রী বা পুত্র কন্যা ইত্যাদি জাতীয় স্ত্রী-পুরুষের মেলমেশ। অনুষ্ঠানের নাম "রাপ্রোশমাঁ ইউনিভার্সিতেয়ার" (Rapprochement Universitaire)। ছুটির পর বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়াছে; তাই সকলের আলাপ পরিচয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিদেশী অধ্যাপকাদি নরনারীর অভ্যর্থনা এই অনুষ্ঠানের এক উদ্দেশ্য বলিয়া নিমন্ত্রণ পত্র ছাপা হইয়াছে। ফরাসী রাষ্ট্রের শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তা অর্থাৎ শিক্ষা-সচিব হাজির ছিলেন। গান-বাজনার পর বক্তৃতা ও জলযোগ। পরে নাচ। ঘণ্টা কাটিল তিন।

এক ধাঁটিতে অনেকের সঙ্গে করমর্দ্দন হইল। কেহ-কেহ ফ্রান্স-বিখ্যাত ত নিশ্চয়ই;—জগৎ-প্রসিদ্ধও বটে। সকলের নাম দিতে গেলে ফরাসী বিদ্বৎ-পরিষদের পঞ্জিকা লেখা হইয়া যাইবে। দেখিলাম আইন, অনুশাসন, কনষ্টিটিউশন্যাল ল ইত্যাদি বিদ্যার প্রতিনিধি লার্নোদ্‌কে (Larnaude)। চিত্র-বিজ্ঞানের এক আধুনিক স্তম্ভ দেলাক্রোআ (Delacroix) এই সম্মিলনের সম্পাদক। সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের অধ্যাপক বাশ (Basch), ভারত-প্রসিদ্ধ সিলভাঁ লিভি (Sylvain Lévi), এবং তুলনা-সিদ্ধ ভাষা-বিজ্ঞানের নূতন পথ-প্রদর্শক মেইএ (Meillet) উপস্থিত ছিলেন। আর ছিল সমবায়-পন্থী ধনবিজ্ঞানের সুলেখক শার্ল জিড্ (Charles Gide);—ভারতীয় এবং আমেরিকান ছাত্র ও মাষ্টার মহলে আটপৌরে লোক। খাঁটি বিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারিং বা চিকিৎসা বিভাগের কোনো ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়াছি, বোধ হইল না।

বিদেশীদের মধ্যে ঘর ভরা দেখিলাম মার্কিণদের দলে। একটা মার্কিণ উপনিবেশই গড়িয়া উঠিয়াছে বলা যাইতে পারে। ধোবা, নাপিত হইতে আরম্ভ করিয়া হোটেল, ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল, লাইব্রেরী পর্য্যন্ত কোন দিকেই ইয়াঙ্কিরা ফ্রান্সে ফাঁক রাখে নাই। পুরানা চেনা আমেরিকান বন্ধুদের মধ্যে হঠাৎ দেখা হইল সস্ত্রীক অধ্যাপক হ্যান্‌কিন্সের সঙ্গে। হ্যান্‌কিন্স্ (Hankins) ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ-বিজ্ঞান পড়াইয়া থাকেন। সাত-সাত বৎসর চাকরির পর আমেরিকার অধ্যাপকরা এক বৎসর রেহাই পাইয়া থাকে।

পুরা বেতনে ছুটি ভোগ করে। ছুটিটা অধ্যাপকরা বিদেশ পর্যটনে কাটায়।

এই ধরণের ছুটি পাইয়াই সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক ক্লার্ক (Clark) এশিয়ায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। তিনি আগামী জানুয়ারি মাসে (১৯২২) ভারতবর্ষে থাকিবেন। হানকিন্স বলিলেন "আমি এখানকার ইস্কুল কলেজে নানা বিভাগে বিদ্যা বাড়াইতেছি।"

আলেকজাঁদার ম্যার্সেরো

আর একজন মাকিণ অধ্যাপকের নাম ভারতীয় ছাত্র-মহলে অজানা নয়। তাঁহার নাম গার্ণার (Garner)। ইনি ফরাসী পণ্ডিত ব্রিসো (Brissaud) প্রণীত গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ History of French Public Law নামে প্রচার করিয়াছেন। গার্ণার বলিলেন—"আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গত গ্রীষ্মে নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম সেখানে বক্তৃতা করিবার জন্য।" ইঁহার আলোচ্য বিষয় রাষ্ট্র-বিজ্ঞান।
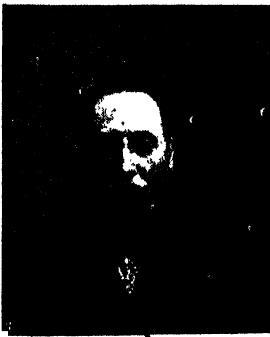
ভাষাতত্ত্ববিৎ মেইএ

এক মার্কিণ ফ্রান্সে গ্রীক শিখাইয়া থাকেন। নাম হ্যারি (Harry)। ইনি জন্‌স্ হপ্‌কিন্সের (Johns Hopkins University) লোক। সেখানকার অধ্যাপক ব্লুমফিল্ডকে (Bloomfield) হ্যারি ঋগ্বেদের সূচী প্রস্তুত করিতে সাহায্য করিয়াছেন। এই গ্রন্থে, একটা শব্দ বা বাক্য বা মন্ত্র কতবার ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তালিকা পাওয়া যায়। গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়াণ্টাল সীরিজে (Harvard Oriental Series)।

এক ফরাসী মহিলা আমেরিকার বিন্ মাওর (Bryn Mawr) কলেজে শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে প্যারিসে Alliance Francaise (এলিয়ান্স ফ্রাঁসেজ) এর পাঠশালায় ফরাসী শিখাইয়া থাকেন। আর একজন ফরাসী আমেরিকান সাহিত্যে পারদর্শী। ইনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। নাম সেস্তর (Cestre)।

চিত্রশিল্পী দেলাক্রোআর কাজ

(লুভ্‌র্ সংগ্রহালয়ে)

বিদেশীদের মধ্যে চীনা যুবক দেখিলাম কয়েকজন। চীনা নারী একজন। ভারতীয় ছাত্র চার-পাঁচজনের মধ্যে একজন প্যাস্টায়র (Pasteur) ইনষ্টিটিউটে ব্যাকটিরিওলজি চর্চ্চা করিতেছেন; দুইজন সংস্কৃত ও ভাষা-তত্ত্বের অনুশীলন করেন; এবং একজন উচ্চ অঙ্গের গণিত সাধিতেছেন।

নরওয়ের এক এঞ্জিনিয়ার ছোকরা হিন্দুদের সঙ্গে খুব মেলামেশা করিতেছে। ডেনমার্কের এক ব্যক্তি বলিলেন —"মহাশয়, আমাদের ছাত্রেরা ফ্রান্সে আসিয়া ভাল সমাজে মিশিতে পায় না। দেশে ফিরিয়া গিয়া ফরাসী সমাজের

জঘন্য দিকটার সাক্ষ্য দেয়। ফ্রান্সে ভেনিশ ছাত্রদের জন্য কোন সুব্যবস্থা করা যায় কি না, তাহার চেষ্টায় আমি এক কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছি।"

(৪)

উইলি ব্লুমেনথাল ফ্রান্সের [illegible] চামড়ার ব্যাপারী। ব্লুমেনথাল কোম্পানির কারবার চলে আমাদের দেশের সঙ্গে। আফিসে কথা-বার্ত্তা হইল। কর্ত্তা বলিলেন "দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনপলি সহরে আমাদের ট্যানিং ফ্যাক্টরি আছে। সেখানকার পরিচালক একজন ভারত-সন্তান। নাম টিপু সাহেব। মান্দ্রাজে আমাদের আফিসের পরিচালক ইংরেজ। এখান হইতে ফ্রান্সে চামড়া রপ্তানি করা হয়। উত্তর-ভারতে লক্ষ্ণৌ সহরে এক এজেন্সী আছে। সেখানকার কর্ত্তা একজন মুসলমান—মালা বক্স। আমাদের কলিকাতার আফিসে চামড়া খরিদ করা হয়। এখানকার কর্ত্তা একজন সুইস।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "ভারতবর্ষের কোন-কোন জায়গায় আপনারা জুতা বা অন্যান্য চামড়ার-জিনিষের ফ্যাক্টরি খুলিতেছেন না কেন? ওখানে কাঁচা চামড়া এবং খানিকটা আধা-ট্যান করা চামড়া ত পাইবেন-ই। সঙ্গে-সঙ্গে সস্তায় মজুরও জুটিবে। এদিকে আমরা আমাদের দেশের ভিতর কতকগুলি নয়া কারখানা পাইয়া অনেক বিষয়ে লাভবান হইব। আপনারা ফ্রান্স হইতে মাত্র দুই-চারিজন কেমিষ্ট ও এঞ্জিনিয়ার পাঠাইলেই বড়-বড় ফ্যাক্টরি চলিতে পারে। সহকারী কেমিষ্ট ও এঞ্জিনিয়ার আজকাল ভারতে সহজেই পাওয়া যাইবে।"

কোম্পানীর কর্ত্তা জবাব দিলেন—"আপনাদের দেশে জুতা পরে কয়জন লোক? ভারতবর্ষে সস্তায় জুতা তৈয়ারী করা সম্ভব বটে, কিন্তু সেই জুতার বাজার ভারতে নাই; জুতা রপ্তানি করিতে হইবে ইয়োরোপ ও আমেরিকায়। ফলে দাঁড়াইবে যে, ফ্রান্সে আমাদের যে সকল কারখানা আছে, আমাদের ভারতীয় কারখানাগুলা সেই সকল কারখানার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিবে। ইহাতে আমাদের লোকসান ছাড়া লাভ নাই। বরং আমরা যদি ভারতীয় কাঁচা বা আধা-টান্ চামড়া আমদানী করিয়া রুশিয়ায় কারখানা খুলি, তাহা হইলে লাভবান্ হইবার আশা আছে। কারণ, রুশিয়ার নরনারী প্রত্যেকেই জুতা পরে। রুশিয়ায় তৈয়ারি জুতা রুশিয়ার বাজারে বিক্রী করিতে পারিব।

লুভর্ মিউজিয়াম

(স্থাপত্য ঘরের এক অংশ)

লড়াই ও বলশেভিকীর গোলযোগে রুশিয়ার সঙ্গে কারবার এখনও খুলিতে পারা যায় নাই। কিন্তু শীঘ্রই খুলিবার কথা আছে।"

কাজের কথা এই যে,—ভারতীয় ধনি-সম্প্রদায় যদি এখন চামড়ার ফ্যাক্টরি খুলিতে এবং বাড়াইতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে ত অতি শীঘ্রই তাঁহারা ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের চামড়ার ব্যাপারীদের সঙ্গে টক্কর দিতে পারিবেন। এই টক্কর একমাত্র ভারতবর্ষেই গণ্ডীবদ্ধ থাকিবে না। গোটা দুনিয়ার বাজার জুড়িয়া সামনাসামনি লড়াই চালাইবার সুযোগ আমাদের হাতে রহিয়াছে।

এত উচ্চ হারে ডিউটি দিয়াও আমরা ফ্রান্স এবং আর্জ্জেন্টিনায় চামড়ার কারখানা খুলিয়া টাকা কামাইতেছি।"

আমি বলিলাম—"ভারতবর্ষের নয়া ট্যানিং ফ্যাক্টরিগুলার খবর বোধ হয় আপনাদের আফিসে নিয়মিত রূপে আসে। এই নূতন স্বদেশী আন্দোলনের থিড়িকে আপনাদের কারবার বাড়িতেছে না কি? বিশেষতঃ, জার্ম্মাণদের গতিবিধি এখন কিছুকাল ধরিয়া ভারতে নিষিদ্ধ। ভারতবর্ষের জার্ম্মাণ কারবারগুলা দখল করিবার জন্য জাপানী, মার্কিণ ও ইংরেজ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ফরাসীরা এ সম্বন্ধে কতটা উদ্যোগী?" জবাব পাইলাম—"মহাশয়, ফরাসী জাত

কারুজেল ময়দানের বিজয়-তোরণ
(লুভ্‌র মিউজিয়ামের ভিতরকার বাগানে)

ব্লুমেনথাল কোম্পানী ভারতবর্ষ হইতে চামড়া আনাইয়া দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা দেশে রপ্তানি করে। সেখানে জুতার কারখানা খুলিয়া লাভবান্ হইতেছে। কোম্পানীর কর্ত্তা বলিলেন,—"ইংরেজ গবর্মেণ্টের আইন অনুসারে ভারতবর্ষ হইতে চামড়ার রপ্তানি করিতে আমাদের প্রচুর ডিউটি (কর) দিতে হয়। ইংরেজের আইন ন্যায়সঙ্গত নয়। কারণ বৃটিশ সাম্রাজ্যের যে কোনো অংশের লোক শতকরা মাত্র ৫৲ টাকা হিসাবে কর দেয়। কিন্তু অন্যান্য বিদেশী বণিকদিগকে কর দিতে হয় শতকরা ১৫৲ টাকা।

বড় ঢিমেতেতালা। ইংরেজ ও মার্কিণদের সমান দ্রুত চলিতে আমরা একদম অসমর্থ। একটা মজার কথা বলিতেছি। কয়েক দিন হইল, আমাদের একজন পুরান জার্ম্মাণ খরিদদার দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ফরাসী ব্যবসায়ীরা এখনও জার্ম্মাণির আড়তের সঙ্গে লেন-দেন সুরু করিতেছে না কেন?" তাঁহাকে আমি বলিয়াছিলাম—"ফরাসী জাত এত শীঘ্র দুস্মনের সঙ্গে মিত্রতা করিতে অপারগ। আমরা হিংসা, দ্বেষ, শত্রুতা বড় বহুকাল হৃদয়ে পুষিয়া থাকি।" জার্ম্মাণ

জবাব দিয়াছিলেন—"অথচ আর্মিষ্টিস্ সহি হইবার দুই দিনের ভিতরই আমাদের পুরান ইংরেজ সহযোগীরা জার্ম্মাণিতে আসিয়া সহরে-সহরে প্রচুর অর্ডার লইয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণি আজকাল ইংল্যাণ্ডের এক প্রধান বাজার।"

(৫)

প্যারিসে "স্বদেশী আন্দোলন" চলিতেছে তুমুল ভাবে। সকল ফরাসীর মুখে একই বাণী,—"পাত্রী'র (patrie) পুনর্গঠন। ইহাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়,—জার্ম্মাণদের নিকট হইতে টাকা আদায় করা। যুদ্ধের খচ্চা (স্বদে-

লুভ্র্ (স্থাপত্য ঘরের এক অংশ)

আসলে), আর পল্লী সহরগুলা নূতন করিয়া গড়িবার জন্য যত টাকা লাগে, এই সমুদায় ফ্রান্স দাবী করিয়াছে। "তাঁ" (Temps), ম্যাতাঁ (Matin) ইত্যাদি দৈনিক কাগজে রোজই পড়িতেছি—জার্ম্মাণি এই সব টাকা এবং মাল-মসলা দিবেন কি না সেই সম্বন্ধে তর্কপ্রশ্ন।

একদিন রাত্রিকালে একটা শিশু-পাঠশালায় সভা হইল। চাঁছা গলায় একব্যক্তি খোলতাই আওয়াজ করিয়া বক্তৃতা করিলেন। শুনিলাম,—"ওহে শিশু ফ্রান্স, তোমাদের উপরই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। সর্ব্বদা মনে রাখিও, বর্ব্বর দুস্‌মনেরা তোমাদের মাতৃ-ভূমিকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ছাড়িয়াছে। এই দুরাত্মা জার্ম্মাণদের অত্যাচারের ফল ফ্রান্সকে অনেক দিন সহিতে হইবে। মানবের সভ্যতাকে এবং ফরাসীজাতিকে পুনর্গঠিত করিবার ভার তোমাদের হাতে।" বক্তা বাগ্মী বটে,—আমেরিকায় এই ধরণের বক্তৃতা কখনো কাণে আসে নাই।

ফ্রান্সের বিধ্বস্ত জেলাগুলার ছবি দেখান হইল। কতকগুলা জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হইল। আরও কয়েকটা বক্তৃতা শুনিলাম। ধুয়া একই। একজন বলিলেন,—"স্বদেশকে নবজীবন দান করিবার জন্য টাকার প্রয়োজন। দুস্‌মনের তহবিল হইতে যত টাকা আসিবে, তাহাতে এই বিরাট রেণেসাঁস্ (renaissance) চালানো যাইবে না। খরচ কুলাইয়া উঠিবার জন্য ফরাসী গবর্মেণ্ট নূতন এক সরকারী ঋণ-ভাণ্ডার খুলিয়াছেন। এই ভাণ্ডারে, তোমরা যে যেখানে আছ, টাকা ধার দাও, এবং ধার দিতে অন্যান্য সকলকে পরামর্শ দাও।" রেনেসাঁস্ শব্দটা আজকাল ফরাসী রাষ্ট্রমণ্ডলে অহরহ ব্যবহৃত হইতেছে।

একব্যক্তি সাইনবোর্ড ইত্যাদিতে ছবি আঁকিয়া থাকেন। ইনি বলিতেছেন—"মহাশয়, আমি কয়েকজন হিন্দুর সঙ্গে
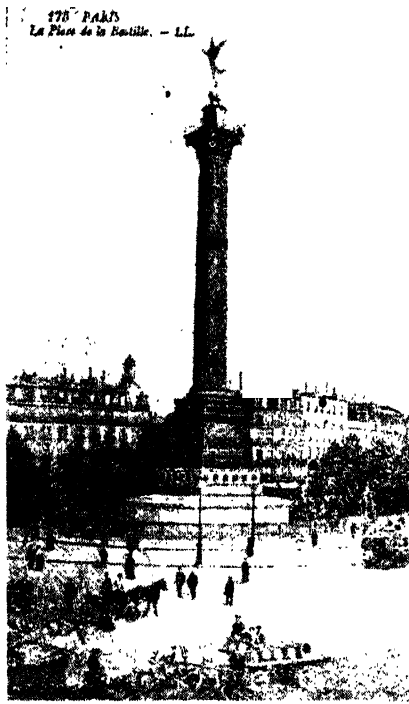
প্লাস দ'লা বাস্তির

বিজয়-দেবতার মূর্ত্তি
(লুভ্‌র সংগ্রহালয়ে)

পরিচিত হইয়াছিলাম, যুদ্ধের সময়। কি আশ্চর্য্য—আপনারা ঠিক ফরাসীদের মতনই ইংরেজ বিদ্বেষী!" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সে কি? ফরাসীরা কি ইংরেজকে ভালবাসে না?" চিত্রশিল্পী বলিলেন "ইংরেজের সমান স্বার্থপর জাত জগতে আর নাই। ইহারা নিজের মতলব হাসিল করিবার জন্য অন্যান্য লোকের সঙ্গে বন্ধুত্বের ভান করে। নিজ স্বার্থ কোন মতেই ভুলিতে পারে না। এমন কি যুদ্ধের সময়েও ইংরেজরা ফরাসীদিগকে আত্মীয় বিবেচনা করিতে পারে নাই। আমাদের ফৌজের সঙ্গে উহাদের ফৌজের লেন-দেন কখনও প্রীতিজনক ছিল না। কিন্তু ফরাসী জাতের চরিত্র বিপরীত। আমাদের মেজাজে পরজাতি বিদ্বেষ একদম নাই। আরব, তাতার, হিন্দু, সেনেগালী—সকল জাতকেই আমরা আদরের সহিত ঘর বাড়ী ছাড়িয়া দিতে পারি। এই যুদ্ধে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।"
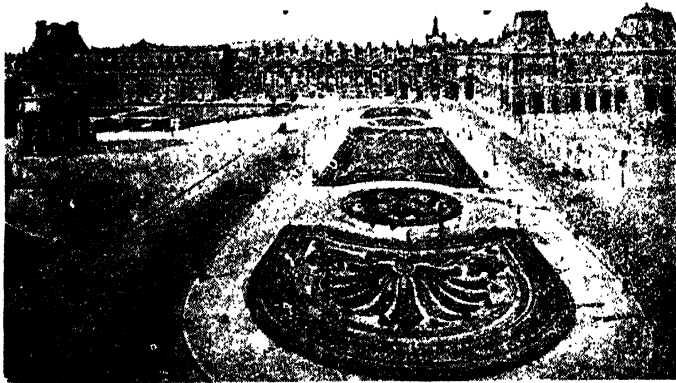
ক রুজল ময়দানের এক অংশ
(লুভ্‌র্ মিউজিয়ামের ভিতর কার বাগান।

একটা মজা দেখিতেছি। আন্তর্জাতিক কারবারে ইংরেজ যে মতে সায় দিতেছেন, ফরাসীরা ঠিক তাহার উল্টা চলিতে চাহেন। রুশিয়ার বোলশেভিকীকে ইংরেজ গবর্মেণ্ট মানিয়া লইতে রাজি—ফরাসীরা এ বিষয়ে খড়্গহস্ত। পোল্যাণ্ডের মিত্র ফ্রান্স—ইংরেজ এ সম্বন্ধে গা করেন না।

গ্রীসের শাসন-প্রণালী লইয়া গণ্ডগোল। গ্রীকদের রাজা এখন নির্ব্বাসনে। ইংরেজ বলিতেছেন—"গ্রীক জনসাধারণ যা ভাল বুঝে করুক, ইহাতে আমরা হস্তক্ষেপ করিব না।" ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-সচিব এবং রাষ্ট্র-নায়ক ও কাগজ-ওয়ালারা একবাক্যে বলিতেছেন—"গ্রীসে রাজতন্ত্রের পুনরায় প্রতিষ্ঠা হওয়া আমাদের একদম বাঞ্ছনীয় নয়।" সুইট্‌জার্ল্যাণ্ডের জেনেভা সহরে বিশ্বরাষ্ট্র-পরিষদের (লীগ অব নেসনস্‌এর) বৈঠক বসিয়াছে। এক ইংরেজ প্রতিনিধি মত প্রচার করিয়াছেন "জার্ম্মাণীকে এই পরিষদের অন্তর্গত রাষ্ট্র বিবেচনা করা হউক।" ফরাসীরা আগাগোড়া এই প্রস্তাবে তেলে-বেগুণে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ফ্রান্সকে ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষেপানো অতি সোজা।

যাহারা একটা ইংরেজি শব্দও জানে না, এমন অনেক ফরাসীর সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেছি। ছাপাখানায়, ডাক-ঘরে, মিউজিয়ামে, লাইব্রেরীতে এবং অন্যান্য দু'একটা আফিসের লোক-জনের ঘাড়ে ফরাসী উচ্চারণ পরীক্ষা করিতেছি। কিন্তু যখনই কলেজে বা আর কোথাও বক্তৃতা শুনিতে হাজির হই, একটা কথাও পাকড়াইতে পারি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ঘরে ভাষা-পরিষদের সভা হইল। বিশ-পাঁচশ জন পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা করিলেন অধ্যাপক মেইএ। ইঁহার সর্ব্বপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম introduction a'l'étude comparative des lang ues indoeuropeennes. বর্ত্তমান আলোচনা শুনিলাম ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগুলার কারকের বিভক্তি সম্বন্ধে।

গাঁ প্যালে (Grand Palais)তে একটা প্রদর্শনী চলিতেছে। ইহাকে বলা হয় স্যালোঁ দোতোন্ (salon d'antomne) বা শারদীয় বাজার। স্যালোঁ বলিলে বৈঠকখানা, বৈঠক, বাজার ইত্যাদি যা হোক কিছু বুঝিতে হইবে। দ্রষ্টব্য বস্তু তিন প্রকার। প্রথমতঃ আসবাবপত্র খাট, গালিচা, চেয়ার ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ, অস্থাপত্য শিল্প।

স্প্যানিষ চিত্রকর মুরিলোর কাজ
(লুভ্‌র্ সংগ্রহালয়ে)

তৃতীয়তঃ, চিত্রশিল্প। এইগুলা সবই নব্য-তন্ত্রের সুকুমার শিল্পের সামিল। পুরান তন্ত্রকে দরবারী ভাষায় বলা হয় "অ্যাকাডেমিক" অর্থাৎ গতানুগতিক বা মামুলি। চিত্রের লাইনে নয়া রীতির এক ষাঁড় আঁরি মাতিস্ (Henri Matisse); ইনি বয়সে প্রবীণ। দু'এক বৎসর হইল মারা গিয়াছেন রেনোআঁ (Renoir)। কিন্তু ইঁহার আঁকা ছবি কতকগুলা এই বাজারে দেখানো হইয়াছে। আজ-কালকার এই ধরণের চিত্রকরদের ভিতর আঁদ্রে দেরাঁ (Andre Derain) বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাঁহার কোন কাজ স্যালোঁতে দেখিলাম না। অ্যালবেয়ার গ্লেজের

দেখিতেছি একটা।, যে কোন দর্শকই ইহার ছবিটাকে নবাতন্ত্রের চরম দৃষ্টান্ত বিবেচনা করিবেন। প্রদর্শনীর এক বিস্তৃত বিবরণ বাহির হইয়াছে এক মাসিক কাগজে। কাগজটার নাম Les Hommes du Jour নবেম্বর ১৯২০)। প্রদর্শনীর কথায়ই সংখ্যাটা ভরা। লেখক ম্যার্সেরো।

বর্ত্তমান জগৎ যে একাকার তাহা বেশ বুঝিতেছি প্যারিসের এক ছোট ছাপাখানায় প্রবেশ করিয়া। গলির ভিতর অথবা রাস্তার পাশে অন্ধকারময় ঘর। দুর্গন্ধের বাথান। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব। নিউ ইয়র্কের আর তোকিওর গরীব-পাড়ার ছাপাখানায়ও এই দৃশ্যই দেখিয়াছি। বলা বাহুল্য, এইজন্যই আজ ছনিয়া ভরিয়া রব উঠিয়াছে—সকল দেশের মজুর চাষীর স্বার্থ এক। জাতি-নির্ব্বিশেষে, ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে, বর্ণ-নির্ব্বিশেষে গরীব লোক মাত্রই ভাই বোন। অতএব, হে মানব-বংশের দরিদ্র সন্তান, হে জগতের নির্ধন নরনারী, উঠো, জাগো, আর কোমর বাঁধিয়া একদল হইয়া দাঁড়াও।"

পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি

[অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, পিএইচ-ডি]

বিচার-পদ্ধতি।

দিব্য

বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই, উভয় পক্ষকেই একখানা রাজিনামা লিখিয়া দিতে হইত যে, তাহারা পঞ্চায়েতের বিচার বিনা ওজরে মানিয়া লইবে। কিন্তু মনের মত রায় না পাইলে, কোন পক্ষেরই ওজর-আপত্তির অসদ্ভাব দেখা যাইত না। পঞ্চায়েতের বিচার না মানিয়া, তখন তাহারা 'দিব্যের' (ইংরেজীতে যাহাকে ordeal বলে) দাবী করিত। আর এই 'দিব্যের' দাবীও দুই-একবারে মিটিত না। পরাজিত পক্ষ যতবার, যত রকমের 'দিব্য' পরীক্ষার দাবী করিত, ততবার দিব্যের ব্যবস্থা করিয়া, তাহার আবদার রক্ষা করিতে হইত। উদ্দেশ্য বোধ হয় এই ছিল যে,—তাহার মনে কোন প্রকার ক্ষোভের কারণ না থাকে। শ্রীযুত ভাস্কর বামন ভট এই দিব্যের বিচার সম্বন্ধীয় কয়েকখানি দলীল, ভারত-ইতিহাস-মণ্ডলের তৃতীয় সম্মেলন বৃত্তে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই একখানা দলীল হইতেই বুঝা যাইবে যে, মামলা হারিয়া মারাঠা বাদী বা বিবাদী কিরূপে বারবার বিভিন্ন প্রকারের দিব্যের দাবী করিতে পারিত। সমগ্র দলীলখানি উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই,—মাত্র একটি অংশ তুলিয়া দিতেছি—"তার পরদিন সোমাজী গোতের বিচারে গররাজী হইয়া বলিল যে, নদী হইতে গ্রামবাসীরা যাহার হাত ধরিয়া তুলিবে, তাহার দাবীই গ্রাহ্য। তখন তুমি বাবাজী এই ব্যবস্থায় সম্মত আছ কি না জিজ্ঞাসা করায়, তুমি তোমার সম্মতি জানাইলে। তার পরদিন সোমাজী এই 'ক্রিয়ায়' গররাজী হইয়া রঞ্জনগাঁওয়ের মসজিদের দিব্যের কথা প্রস্তাব করিল। তৃতীয় দিবস মসজিদের দিব্য না কবুল করিয়া সে আবার প্রস্তাব করিল যে, বাদী-প্রতিবাদী পরস্পরের হাতে জল-ঢালাঢালি করিয়া স্থির করিবে, কাহার দাবী ঠিক। তার পর সোমাজী এই প্রস্তাবেও গররাজি হইয়া 'অগ্নিদিব্য' প্রার্থনা করিল।"

উপরে উল্লিখিত 'দিব্যগুলির' মধ্যে একটিতেও কিন্তু দৈব-বিচারের গন্ধও ছিল না। উভয় পক্ষ কোন পুণ্য-তিথিতে, কোন পবিত্র নদীতটে অথবা কোন পবিত্র স্রোত-সঙ্গমে সমবেত হইত। সেইখানে সমস্ত গ্রামবাসী কোন শুভ মুহূর্ত্তে স্নান করিয়া নদীর তীরে উঠিয়া দাঁড়াইত। বাদী-প্রতিবাদী তখনও নদীগর্ভে দণ্ডায়মান থাকিত। তখন হয় পাটীল অথবা কোন পল্লীবৃদ্ধ সমবেত পল্লীবাসিগণের অনুজ্ঞা অনুসারে বিবাদীয় সম্পত্তির ন্যায্য অধিকারীকে নদী হইতে হাত ধরিয়া তুলিত। নামে দিব্য হইলেও, ইহা কার্য্যতঃ জুরির বিচার বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে।

সেকালে লোকের কুসংস্কার ও ধর্ম্ম-বিশ্বাস যেরূপ প্রবল ছিল, তাহাতে এই প্রথায় অবিচার হইবার আশঙ্কা একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। পুণ্য তিথিতে কৃষ্ণা অথবা গোদাবরীর পবিত্র সলিলে দাড়াইয়া, সমবেত গ্রামবাসীদের সম্মুখে দেব-ব্রাহ্মণ সাক্ষী করিয়া, মিথ্যা আচরণ করিবার সাহস তখনকার দিনে অতি অল্প লোকেই করিতে পারিত। আর তেমন লোকের উপর এমন বিচারের ভার গ্রামবাসিগণ দিবেই বা কেন? যে আবাল্য সকলের বিশ্বাস-ভাজন, সে বার্দ্ধক্যে পরলোকের প্রান্তে দাঁড়াইয়া কেন এমন কাজ করিবে, যাহার ফল ইহকালে লোকনিন্দা ও পরকালে অনন্ত নরক? পুণা পরগণার অন্তর্গত করসঙ্গ গ্রামের পাটীলকী বতনের বিবাদের মামলা এই প্রথায় হইয়াছিল। সমবেত গ্রামবাসী শুচি স্নাত হইয়া, কৃষ্ণার সৈকতে দাড়াইয়া, একনাক নামক এক মহার লক্ষকে 'বতনের' প্রকৃত অধিকারীর হাত ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে আপনার মতিপ্রায় ব্যক্ত করিতে আদেশ করিয়াছিল।

তখনকার মারাঠী রীতিতে নত প্রকারের দিব্য প্রচলিত ছিল। সে সকল আলোচনার সময়ও নাই, স্থানও নাই। কেবল যে দুইটীর উল্লেখ অন্যাপেক্ষা অধিক সংখ্যক দলীলে পাওয়া যায় তাহারই বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া যাইতেছে। ইহার একটির নাম 'রবা'; দ্বিতীয়টির নাম 'অগ্নি দিব্য'। ফুটন্ত তৈলপূর্ণ পাত্রের মধ্য হইতে উত্তপ্ত ধাতুখণ্ড বাহির করিয়া আনিবার নাম 'রবা কাঢ়ণে'। বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের সম্মতি লইয়া এই দিব্যের ব্যবস্থা হইত। দিব্যের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত কোন জাগ্রত দেবতার পবিত্র মন্দিরে। সরকার হইতে পাঁজি পুঁথির সাহায্যে শুভ মুহূর্ত্ত স্থির করিয়া, এই 'দিব্যে'র সময় নির্দ্দেশ করা হইত। আর বাদী প্রতিবাদীর সঙ্গে থাকিত তাহাদের গ্রামবাসিগণ ও একজন সরকারী কর্ম্মচারী। একখানি মারাঠী দলীল হইতে 'রবার' সমসাময়িক বিবরণ তুলিয়া দিতেছি। মামলাটি চলিতেছিল কোন গ্রামের 'পাটীলকী' লইয়া। বাদী ও প্রতিবাদীর নাম দেবজী ও শঙ্করজী ডাঙ্গট। সরকারী রায়ে লেখা আছে "তার পর রাজশ্রী আপাজী হনমন্ত সুভেদার, বালাজী দাদাজী এবং বাঘোজী রাউতের সঙ্গে পালীতে অগ্নি-দিব্যের জন্য তোমাদিগকে পাঠান হইল। সেই গ্রামের গোত তথাকার মন্দিরে সমবেত হইয়া অগ্নি জালিয়া ঘি ও তৈল উত্তপ্ত করিল। তুমি স্নান করিয়া, নিজের দাবী যথারীতি জানাইয়া, সকলের সম্মুখে সেই তপ্ত তৈলের ভিতর হইতে দুইখণ্ড ধাতু বাহির করিলে। তার পর তোমার হাত বাঁধিয়া রাখিয়া তাহার উপর শিলমোহর করা হইল। পরদিন, উপরিউক্ত দুই পক্ষকেই মহলের আমলারা হুজুরে লইয়া আসিল। তৃতীয় দিনে মজলিসের সম্মুখে শিলমোহর ভাঙ্গিয়া হাত খোলা হইল। তোমার হাতে আগেকার দাগ ভিন্ন আর কোন নূতন দাগ দেখা গেল না। তুমি এই দিব্যে জয়ী হইলে।" *

অগ্নি-দিব্যের ব্যবস্থা ইহা হইতে একটু বিভিন্ন। বিচার-প্রার্থীর হাতখানিতে প্রথমে অশ্বত্থ পত্রের আবরণ নূতন সূতায় ভাল করিয়া বাঁধিয়া, সেই পত্রাবৃত হস্তে একটি উত্তপ্ত লৌহ-গোলক দেওয়া হইত। সেই তপ্ত ধাতু গোলক হাতে লইয়া, মৃত্তিকায় অঙ্কিত সাতটি বৃত্তের প্রান্তে উপনীত হইয়া, বিচার প্রার্থী শুকনা তৃণের উপর হাতের গোলা ফেলিয়া দিত। তৃণগুলি জ্বলিয়া উঠিলেই বুঝা যাইত যে, লোহার গোলাটি ভাল করিয়াই গরম করা হইয়াছে, কোন প্রকার প্রতারণা করা হয় নাই। তার পর যথারীতি বিচার প্রার্থীর হাত পরীক্ষা করা হইত। কোন প্রকারের নূতন ক্ষতচিহ্ন না থাকিলেই, দিব্যে তাহার জয় হইত। বলা বাহুল্য, এই সকল দিব্যের বিচার বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। এমন কি, বৃহস্পতির গ্রন্থে অগ্নি-দিব্যের যে ব্যবস্থা আছে, তাহার সহিত মারাঠা দলীলের অগ্নি দিব্যের বিবরণের সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায়। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ ও শুক্র প্রভৃতি প্রাচীন নীতিবিদ্‌গণও এই প্রকার বিচারের অনুমোদন করিয়াছেন। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন্থসঙ্গ ও মুসলমান পণ্ডিত আবু রিহান অল বিরুনির সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, শাস্ত্রকারগণের এই ব্যবস্থা কার্য্যতঃ ভারতবর্ষে বিভিন্ন যুগে প্রতিপালিত হইত। ভিন্সেন্ট স্মিথ বলেন যে, মুঘল সম্রাট আকবরের কালেও দিব্যের বিচার প্রচলিত ছিল। ভিনিসীয় পরিব্রাজক নিকোলা মেনুসী ঔরংজীবের রাজত্ব-সময়ে দক্ষিণ-ভারতে 'দিব্যের' প্রচলন লক্ষ্য করিয়াছেন; এবং ইংরেজ কর্ম্মচারী কর্ণেল ড্রুরী বলেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে এই প্রকারের বিচার প্রচলিত ছিল।

* এই দুইখানি দলীলের ভাবগত অনুবাদ দিয়াছি।

নিকট আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, পীরসাহেব ধ্যানস্থ—ফতেমা পীর সাহেবের সম্মুখে নিবিষ্ট চিত্তে বসিয়া।

কন্যাকে এই ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জমিদার অনুচরদিগকে বলিলেন, "পীরকে বাঁধ—ফতেমাকে চুল ধরিয়া টানিয়া আন।"

এই গোলযোগে পীরসাহেবের ধ্যান ভঙ্গ হইল—তিনি সম্মুখে জমিদারকে দেখিয়া বলিলেন, "আপনি এই দীনের কুটীরে! বসুন। আমার সৌভাগ্য!"

জমিদার তাঁহার কথায় কাণ না দিয়া একজন অনুচরকে বলিলেন—"পীরকে বাধ আগে।" যেমন অনুচরেরা পীরসাহেবকে ধরিতে যাইবে, অমনি ফতেমা কাল-বিলম্ব না করিয়া, ঘরের কোণ হইতে একটি কুঠার লইয়া, সেই অনুচরের গলায় আঘাত করিল।

ইহা দেখিয়া জমিদার আরও ক্রোধান্বিত হইলেন; বলিলেন, "ফতেমাকে এখনই কাটিয়া ফেল্! অসচ্চরিত্রা! দ্বিচারিণী!"

অনুচররা ফতেমাকে যেমন আঘাত করিতে যাইবে, অমনি পীর সাহেব তাহাকে রক্ষা করিতে গিয়া, নিজের ঘাড় বাড়াইয়া দিলেন! ফতেমার উপর উদ্যত আঘাত তাহার স্কন্ধে না পড়িয়া, পীরসাহেবের স্কন্ধের উপর পড়িল।

"পিতা কি করিলেন!" বলিয়া ফতেমা পীরসাহেবের পাদমূলে লুটাইয়া পড়িল।

জমিদার বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ এই অচিন্তিত-পূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। পরিশেষে—"ফতেমা, মা আমার!" বলিয়া পীরের পদতলে বসিয়া পড়িলেন।"

(৬)

কমলের আবেগময়ী ভাষায় এই কাহিনী শুনিতে-শুনিতে অতুল বলিয়া উঠিল, "কি নিষ্ঠুর ঐ বাপ!"

কমল কিছুক্ষণ থামিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল।

"যে সমাধি তুমি দেখিয়া আসিলে, ঐটী পীরের সমাধি। ঐখানে পীর সাহেবকে গোর দেওয়া হয়। গভীর রাত্রে এখনও ঐ স্থান হইতে একটা করুণ গীত-ধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায়। গান শুনিয়া ঐ স্থানের অধিবাসীরা ভাবিত, জমিদার-কন্যা গভীর রাত্রে আসিয়া, মৃতের পাশে বসিয়া, করুণ স্বরে গীত গাহিয়া যায়। আর প্রত্যুষে গিয়া দেখা যাইত, গোরের উপর ইতস্ততঃ ফুল ছড়ানি রহিয়াছে। ঐ রকম করুণ গীত প্রায় নিশীথে শোনা যায়।"

কথার মধ্য স্থলে অতুল বলিয়া উঠিল—"ফতেমাকে আর কেউ কখনও দেখে নাই?"

কমল বলিল, "যে দিন পীর সাহেবকে সমাহিত করা হয়, তার পর দিন হইতে ফতেমা নিরুদ্দেশ। আর তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।"

ফতেমাকে খুঁজিয়া আনিবার জন্য জমিদার বিপুল অর্থ-ব্যয় করিলেন; কিন্তু ফতেমাকে আর পাওয়া গেল না। সকলে তাহার আশা ছাড়িয়া দিল।

জমিদার শেষে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া, নিজেকে তিরস্কার করিলেন; এবং পীরসাহেবের সমাধির উপর এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন।

মন্দিরের কাজ যেদিন শেষ হইয়া গেল, সেদিন জমিদার নতজানু হইয়া মন্দিরের নিকট বসিয়া প্রার্থনা করিলেন।

এই তাঁহার জীবনে প্রথম প্রার্থনা।

ইতোমধ্যে ফতেমা পাগলিনীর ন্যায় আসিয়া বলিল, "পিতা, আজ আপনি এসেছেন। আমাকেও ওঁর পাশে স্থান দিন!" বলিয়া ভূতলে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেল।

জমিদার তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখিলেন, ফতেমার মৃত-দেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

সকলে মিলিয়া পীর সাহেবের পার্শ্বেই ফতেমার নশ্বর দেহ সমাহিত করিল।

মার্কিণ মুলুক

[শ্রীইন্দুভূষণ দে মজুমদার এম্-এস্‌সি]

(আমেরিকায় ভারতবাসী)

"মোদের জাগতে হবে, উঠতে হবে, লাগতে হবে কাজে;
যেতে হবে সাগরের পার,
ছাড়তে হবে জাতের বিচার,
শুনতে হবে বিশ্ব-বীণা কোন্ সুরেতে বাজে।"

যুক্ত-রাজ্যে ভারতবাসীর সংখ্যা বড়ই কম। ঐ দেশে চীন, জাপান ও ফিলিপিন্ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদিগের সংখ্যা ভারতবাসীদের অপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং আমেরিকাবাসীরা চীনা, জাপানী ও ফিলিপিনোদের সম্বন্ধে যতটা জানে, ভারতবাসীদের সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান যে তদপেক্ষা অনেক কম, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। যে সকল উচ্চশিক্ষিত আমেরিকান্ স্বামী বিবেকানন্দ, ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্যর জগদীশচন্দ্র বসুর ন্যায় ভারতীয় মনীষীদিগের সংস্রবে আসিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্য হিন্দু-সভ্যতা সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা; কিন্তু সাধারণ আমেরিকান্‌দিগের মধ্যে অধিকাংশেরই বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষ করকোষ্ঠী-গণক, বাজিকর ও সাপুড়ের দেশ; কেন না, প্রদর্শনী ও সার্কাস প্রভৃতিতে ঐ শ্রেণীর ভারতবাসীদের সহিতই তাহাদের সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। পুস্তকাদি পাঠ করিয়া সাধারণ মার্কিণদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে ধারণা, তাহা তাহাদিগের প্রশ্নের ধরণেই উপলব্ধি হয়। ট্রেণে, ষ্টীমারে অনেক আমেরিকান্ ভারতবাসীদের সহিত প্রথম আলাপেই জিজ্ঞাসা করে, "ভারতবর্ষে কি লোকের সংখ্যা অপেক্ষা দেবতার সংখ্যা অধিক? সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই কি সে বাগ্‌দত্ত হয়? বিধবাদিগের উপর কি সমাজের এতই অত্যাচার যে, তাহারা বৈধব্য দশা ভোগ করা অপেক্ষা, মৃত পতির চিতা-শয্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ মনে করে?, ভারতবাসীরা কি সর্পজাতির উপাসক? তাহারা কি জীবন্ত শিশুদিগকে কুম্ভীরের নিকট উৎসর্গ করিয়া থাকে?" হিন্দুদিগের সম্বন্ধে আমেরিকায় একটী ছড়াও শুনিয়াছি:—

"The poor benighted Hindoo
He does the best he Kindoo; (১)
He sticks to his caste,
From first to last,
And for pants he makes his Skindoo" (২)

অর্থাৎ—

আঁধারের জীব যত হতভাগা হিন্দু,
আড়ম্বরে ত্রুটি নাই তবু এক বিন্দু;
আমরণ আছে বসি
ধরিয়া জাতির রশি
এদিকে উলঙ্গ, তাহে লাজ নাই কিন্তু।

ভারতবর্ষ হইতে প্রথমে কে কবে আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন, তাহা অবগত নহি। তবে বঙ্গদেশের অমৃতলাল রায় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এবং মহারাষ্ট্র রমণী আনন্দী বাঈ যোশী ও ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারক রেভারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় গমন করেন। মিঃ রায় ইংলণ্ডে তিন বৎসর চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে, ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে নিউইয়র্কে পৌছেন ও আমেরিকায় আরও তিন বৎসর অতিবাহিত করেন; আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইনি লাহোরে (Hope) পত্র সম্পাদন কালে, উহাতে তাঁহার আমেরিকা-প্রবাসের কাহিনী ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেন। পরে ঐগুলি পুস্তকাকারেও মুদ্রিত হয়। এই সুশিক্ষিত ভারতবাসী ভদ্রলোকটি বিল্ মার্টিন্ (Bill Martin) নামক একজন চতুর্দ্দশ-বর্ষীয় আমেরিকান্ মুচী বালকের নিকট যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, সেই কাহিনী হইতেই মার্কিণ চরিত্রের বিশেষত্ব সম্যক্ পরিস্ফুট হয়। ইনি নিউইয়র্কে কার্য্যান্বেষণে ঘুরিতেছিলেন,—নিজের

(১) Can do. (২) Skin do.

তহবিলও নিঃশেষ হইয়াছিল। বন্ধুহীন, কপর্দ্দক-শূন্য অবস্থায় উপবাস ভিন্ন আর গতি ছিল না। এমন সময় একটী মুচী বালক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি জুতা ব্রাশ করাইবেন কি না। উত্তরে মিঃ রায় পরিহাসচ্ছলে কহিলেন যে, তাঁহার পয়সা নাই;—বালকটী যদি বিনা পয়সায় তাঁহার জুতা ব্রাশ

প্রিন্স্ ভিক্টর নিতেন্দ্রনারায়ণ—কুচবিহার

করিয়া দেয়, তবে তাঁহার আপত্তি নাই। তখন মুচী বালক বলিল "এ ত সামান্য কথা। আমি নিশ্চয়ই বিনা পয়সায় তোমার জুতা ব্রাশ করিয়া দিব। যদিও তুমি কৃষ্ণাঙ্গ, তবু তোমার ন্যায় একজন দরিদ্র ব্যক্তির যে সামান্য একটু উপকার করিব না, আমার অন্তঃকরণ ততটা নীচ নহে। কিন্তু, দেখ, তোমাকে দেখিয়া ত নিগ্রো বলিয়া মনে হয় না! তুমি কি একজন স্পানিওলা (Spaniola)?" পরিচয় পাইয়া সে বলিল "বটে, তুমি একজন হিন্দু! বার্ণামের (Barnum) সার্কাসে ত আমি

শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে মজুমদার

অনেক হিন্দু দেখিয়াছি; কিন্তু তাহাদের পোষাক ত তোমার মত নয়! ভারতবর্ষ কি রকম দেশ, তাহা আমি জানি। সম্প্রতি আমি তোমাদের দেশ সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ করিতেছি।" আলাপসূত্রে সে যখন জানিতে পারিল যে, মিঃ রায় নিউইয়র্ক সহরে কাজের চেষ্টা করিয়াও বেকার অবস্থায় বসিয়া আছেন, তখন বলিল, "তুমি কি বলিতে চাও যে, তোমার মতন একজন বয়স্ক লোকের নিউইয়র্কে কাজের কোন যোগাড় হইতেছে না! বোধ হয়, কোন

সুখের চাকরী না পাইলে তোমার করিবার ইচ্ছা নাই। তুমি কি তোমার হাত ময়লা করিতে রাজি নও? মনে রাখিও, এদেশে ফুলবাবু ও নিষ্কর্ম্মাদের স্থান নাই।"

বিল্ মার্টিন্ মিঃ রায়কে কোন হোটেল অথবা ভোজনাগারে (Restaurant) খিদ্‌মদ্‌গারের (waiter) কার্য্য করিতে পরামর্শ দিয়া বলিল, "তোমার ভিতরে যদি পদার্থ থাকে, তবে ক্রমে ক্রমে যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্টের পদ লাভ করাও তোমার পক্ষে অসম্ভব নহে।" বিল মার্টিন্‌কে যখন জিজ্ঞাসা করা গেল, সে নিজে কখনও প্রেসিডেণ্ট হইবার আশা রাখে কি না, তখন সে বলিল, "উহা আমার ভবিষ্যৎ

নায়াগ্রা-প্রপাতের বন্ধুগণ—

(ক) এইচ, পি, মিত্র, (খ) জে, এন, চক্রবর্ত্তী (গ) এস, এল, শীল; (ঘ) ডি, দত্ত, (ঙ) এইচ, এল, দত্ত।

আর্থিক অবস্থার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। ঐ পদ আমি নিলে নিতেও পারি, না নিতেও পারি। দুনিয়াতে টাকাই সব। যদি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারি, তবে প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য আমি অর্দ্ধ পয়সা ব্যয় করিতেও প্রস্তুত নহি।"

বিল্ মার্টিনের পরামর্শ মত মিঃ রায় জাত্যভিমান বিসর্জ্জন দিয়া ও কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া একটী লোহার কারখানাতে কার্য্য গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি নিউইয়র্কে কোন পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের পদও লাভ করিয়াছিলেন। গ্রন্থ প্রণয়ন কালে তিনি লিখিতেছেন "বিল্ মার্টিন যদি জীবিত থাকে, তবে সে এখন (১৮৮৯ সালে) একজন বিংশতিবর্ষীয় যুবক। এই কয়টী লাইন কি কোন দিন তাহার চোখে পড়িয়া, তাহার ভারতবাসী বন্ধুকে মনে করাইয়া দিবে!"

আনন্দ বাঈ যোশী ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নবম বৎসরে ইহার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইনি আমেরিকায় পৌছেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ফিলাডেলফিয়ার রমণী চিকিৎসা বিদ্যালয় (Women's Medical College, Philadelphia) হইতে এম ডি উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং সেই বৎসরই রুগ্ন শরীরে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পরবর্ত্তী বৎসরে অর্থাৎ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। ইনি লোক গঞ্জনায় দৃক্‌পাত না করিয়া, ও অসীম সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করিয়া, স্বীয় বিবেক বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া, স্বামীর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, অষ্টাদশ বৎসর বয়সের সময়, হিন্দু রমণীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম, কিরূপে কয়েকজন মার্কিণ মহিলার সহিত, প্রবল জ্ঞানলিপ্সা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত যুক্তরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন, এবং কিরূপেই বা হিন্দু রীতিনীতি সম্যক্ রক্ষা করিয়া, অসামান্য প্রতিভা ও চরিত্রবলে সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা মিসেস্ ক্যারোলাইন্ হিলি ড্যাল্ (Caroline Healy Dall) প্রণীত আনন্দী বাঈ যোশীর জীবনীতে বর্ণিত আছে।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও ইংলণ্ডের পথে আমেরিকায় গমন করেন। তাঁহার 'Oriental Christ" অর্থাৎ "প্রাচ্য খৃষ্ট" নামক পুস্তকখানি আমেরিকায় অবস্থান কালেই সমাপ্ত হয়, এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দেই প্রকাশিত হয়। রেভারেণ্ড মজুমদারের ভূ প্রদক্ষিণের বিবরণ তৎপ্রণীত "Tour Round the World" নামক পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে।

মিসেস্ ড্যাল্ প্রণীত জীবনীতে আনন্দী বাঈর স্বামী গোপাল বিনায়ক যোশী এবং তাঁহার বন্ধু মিঃ সাঠের ১৮৮৪

ও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় অবস্থানের কথা লিখিত আছে। এই জীবনী পাঠে আমরা ইহাও অবগত হই যে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে অষ্টবিংশতি বৎসর বয়সের সময় পণ্ডিতা রমাবাঈ আত্মীয়া আনন্দী বাঈর অনুরোধে আমেরিকায় গমন করেন।

এই কয়জনের পূর্ব্বে কিম্বা ইঁহাদের সময়ে অপর কোন ভারতবাসী অধ্যয়ন কিম্বা অন্য অভিপ্রায়ে আমেরিকায় অবস্থান করিয়াছেন কি না, জানি না। তবে মোটের উপর ইহা স্বীকার্য্য যে, আমাদের দেশের ছাত্রেরা হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিবার জন্যই প্রথম প্রথম আমেরিকায় গমন করিতে আরম্ভ করেন।

কর্ণেলে ভারতবাসী ছাত্রগণ (১৯০৭ সাল)

১৮৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দে সিকাগোর আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী (Chicago International Exhibition) উপলক্ষে একটি ধর্ম্ম-সভা আহূত হয়। উহা Parliament of Religions নামে বিখ্যাত। ঐ সম্মিলনীতে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মসমূহের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। ভারতবর্ষ ও সিংহল হইতে কয়েকজন বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, জৈন ও থিয়জফির প্রচারকও ঐ ধর্ম্মসভায় নিমন্ত্রিত হন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিনিধি ছিলেন সিংহলবাসী মিঃ ধর্ম্মপাল। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ছিলেন বোম্বাইবাসী মিঃ নাগরকার ও রেভারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। জৈন ধর্ম্মের ছিলেন মিঃ গান্ধী। আর থিওজফির প্রতিনিধি ছিলেন মিসেস্ আনি বেসান্তের সহিত মিঃ চক্রবর্ত্তী। অন্য প্রতিনিধিদের ন্যায় প্রথমে নিমন্ত্রিত না হইয়াও স্বামী বিবেকানন্দ এই মহাসভায় হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া ভারতবর্ষের যে মুখোজ্জল করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালী পাঠকের অবিদিত নহে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী বাঙ্গালা ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই বাহির হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার আমেরিকা প্রবাসের কাহিনী এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা নিস্প্রয়োজন।

সিকাগো ধর্ম্ম-সভায় বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী প্রচারকেরা যে স্ব স্ব ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, তাহা সভার রিপোর্টে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে একজন ভারতবাসী প্রতিনিধি (১) প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভেদ বর্ণনা করিয়া একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তাহার কিয়দংশ নিম্নে বিবৃত হইল:—

"প্রতীচ্য জগতে আপনারা সজাগ, সতর্ক, কর্ম্মব্যস্ত ও লাভের প্রত্যাশী; প্রাচ্যজগতে আমরা চিন্তমগ্ন, ধ্যানস্থ ও বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা। প্রতীচ্যে জড়জগতের রহস্যগুলি বিজ্ঞানবলে আপনাদের আয়ত্তাধীন, নিসর্গকে জয় করিয়া আপনারা ধনৈশ্বর্য্যশালী। আপনারা অনেক সময় মনে করেন, প্রকৃতিদেবী আপনাদের দাসীস্থানীয়া;—তাঁহার পবিত্রতা উপলব্ধি করিতে আপনারা অক্ষম। প্রাচ্যে প্রকৃতিই আমাদের সনাতন ধর্ম্মমন্দির, স্রষ্টার পরেই আমরা সৃষ্টির

(১) রেভারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদার.

উপাসক। প্রতীচ্যে লোকের চালচলন আইন কানুনের অধীন; এখানে আপনারা নৈতিক বিধিবিধানের ব্যবস্থা করেন ও জনসমাজের মতামত দ্বারা পরিচালিত হন। প্রাচ্যে ভগবান্‌ই আমাদের আদর্শ, এবং তাঁহাকেই আদর্শ জ্ঞানে আমরা সম্পূর্ণ আত্মজয়ের বৃথা প্রয়াস করিয়া থাকি। প্রতীচ্যে আপনারা সর্ব্বদাই কাজে মগ্ন,—এখানে কর্ম্মই আপনাদের ধর্ম্ম।' প্রাচ্যে আমরা বহুক্ষণ ধর্ম্মচিন্তায় অতিবাহিত করি,—সেখানে ধর্ম্মই আমাদের কর্ম্ম।"

সিকাগো ধর্ম্ম-সভার পর হইতেই আমেরিকার বেদান্ত সমিতি স্থাপিত হয়; ও নিউইয়র্ক, সান্‌ফ্র্যান্সিস্‌কো (San Francisco), লস্ এঞ্জেলোস্ (Angelos) প্রভৃতি স্থানে স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকজন বাঙ্গালী সহযোগী ও গুরুভাই তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া মার্কিণদিগকে বেদান্ত শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন।

কর্পূরতলার মহারাজাও সিকাগোর আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন। মহারাজা ইয়োরোপে ভ্রমণকালে অন্য মহিষী বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও স্পেন্ দেশীয় এক ললনার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার জন্যই আমেরিকার কোন সংবাদপত্র মহারাজার আমেরিকা অবস্থান কালে কৌতুক করিয়া লিখিয়াছিল যে, মহারাজার অন্তঃপুরে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ৯৯টী মহিষী আছেন; একটী মার্কিণ মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার মহিষীর সংখ্যা একশতে পরিণত করিবার জন্যই তাঁহার যুক্তরাজ্যে শুভাগমন। মহারাজা তাঁহার মার্কিণ ভ্রমণ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছেন।

বরদার মহারাজাও ১৯০৬ সালে আমেরিকায় উপস্থিত হইয়া হার্ভার্ড প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। আমেরিকার সংবাদপত্রগুলিতে মহারাজার রাজ্য, ধন, ঐশ্বর্য্য, মণিমুক্তা, পোষাক পরিচ্ছদ, চেহারা, ইংরাজী উচ্চারণ প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক বিবরণ দেখিতে পাইতাম। মহারাজা রাজকীয় পরিচ্ছদ, জহরত প্রভৃতি পরিধান করিতেন না বলিয়া মার্কিণরা যেন একটু নিরাশ হইয়াছিল। মনে পড়ে, মহারাজার সম্বন্ধে একটা বর্ণনার হেড্‌লাইনে লিখিত ছিল "He is a Dapper Chap. Looks like a rich East Indian Merchant." অর্থাৎ লোকটী বেশ চালাক চতুর, দেখিতে একজন ধনী ভারতবর্ষীয় বণিকের মত। একজন বিশিষ্ট মহারাজা সম্বন্ধে "Chap" কথাটী প্রয়োগ করা কেবল সাম্যবাদী আমেরিকাতেই সম্ভব। মহারাজার একটী উক্তিতে আমেরিকার সংবাদপত্রগুলিতে হুলস্থুল পড়িয়াছিল। আমেরিকান্‌রা তাহাদের ললনাদিগের সম্বন্ধে বড়ই

আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণ

পি, এস, শিলোত্রি, এইচ, এল, দত্ত; জে, এন, চক্রবর্ত্তী; মাননীয় শ্রীযুক্ত রমানাথন্; এস, এল, শীল; এ, সি, ঘোষ; আই, বি, দে মজুমদার।

গৌরবান্বিত; তাই তাহারা মহারাজার কাছে মার্কিণ মহিলার বিশেষ সুখ্যাতি শুনিবারই আশা করিয়াছিল। কিন্তু কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি মার্কিণ রমণীদের সম্বন্ধে মহারাজার মত জিজ্ঞাসা করায়, মহারাজা বলিলেন যে, তিনি মার্কিণ রমণীদের কোন বিশেষত্ব দেখিতে পান নাই। মৌমাছির চাকে যেন লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইল। সংবাদপত্রগুলিতে বড়-বড় হরপে হেড্‌লাইন্ বাহির হইতে লাগিল "Here is an Indian Maharaja who finds nothing extraordinary in American women" অর্থাৎ

"ভারতবর্ষের একজন রাজা বলিতেছেন যে, মার্কিণ রমণীদের মধ্যে অসাধারণত্ব কিছুই নাই।"

কলিকাতার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও সিকাগোর আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার ডি, এন, রায়, জে, এন, ঘোষ প্রভৃতি হোমিওপ্যাথগণ ও কলিকাতার মূক-বধির বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বন্দোপাধ্যায় আমেরিকায় বাঙ্গালী শিক্ষার্থীদিগের অগ্রণী। ১৯০৪।৫ সাল হইতে ভারতবর্ষের কত ছাত্র যে আমেরিকায় অধ্যয়নার্থ গমন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা সহজ নহে। তাঁহাদের নামের ধারাবাহিক তালিকা প্রকাশ করাও এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের দেশের অপর আমেরিকা-যাত্রীদিগের মধ্যে ভূ-প্রদক্ষিণ-প্রণেতা চন্দ্রশেখর সেন, সংবাদপত্রের লেখক ও গ্রন্থকার সন্ত নিহাল সিং, বক্তা বিপিনচন্দ্র পাল, হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারক বাবা ভারতী (১) বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও কবীন্দ্র সার্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম করা যাইতে পারে। ধর্ম্ম-জগতে যেমন বিবেকানন্দ, সাহিত্য-জগতে তেমনি রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান-জগতে জগদীশচন্দ্র ভারতবর্ষকে পাশ্চাত্য জগতে পরিচিত করিয়াছেন। সংবাদপত্রে তাঁহাদের আমেরিকা প্রবাসের কথা অনেকেই পাঠ করিয়া থাকিবেন। সিংহলের সলিসিটর-জেনারেল্ অনারেবল্ রমানাথন্ কে-সি, সি-এম্-জি মহোদয়ও ১৯০৬ সালে হার্ভার্ড, কর্ণেল প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রভেদ (Spirit of the East contrasted with the Spirit of the West) প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া প্রাচ্য জগতের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। সার্ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তও মৎস্যতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট্ কর্ত্তৃক আমেরিকায় প্রেরিত হইয়াছিলেন।

আমেরিকার যুক্তরাজ্য (United States of America) নামক গ্রন্থের প্রণেতা লালা লজপৎ রায় "বর্ত্তমান জগতের" লেখক বিনয়কুমার সরকার, "মার্কিণযাত্রা" ও "America through Hindu Eyes" নামক গ্রন্থদ্বয়-প্রণেতা বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক ও "আমেরিকায় পনের বৎসর" (Fifteen Years in America) নামক গ্রন্থের রচয়িতা ডাক্তার সুধীন্দ্র বসু তাঁহাদের মার্কিণ জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি প্রবন্ধ ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশের অক্ষয়কুমার দত্ত ও ডাক্তার সুধীন্দ্র বসু আমেরিকার নাগরিকত্ব (American Citizenship) গ্রহণ করিয়াছেন। ডাক্তার পি, এন, রায় নামক একজন বাঙ্গালী চিকিৎসকও বহুকাল যাবৎ সপরিবারে বষ্টন নগরে বাস করিতেছেন। তাঁহার পত্নী একজন স্কচ্ মহিলা। বষ্টনে বাস কালে ঐ পরিবারের সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। একদিন

অনারেবল্ রমানাথন্ কে-সি, সি-এম্-জি

উঁহাদের বাটীতে আহারের জন্য নিমন্ত্রিতও হইয়াছিলাম। ডাক্তার রায়ের কন্যাদ্বয়ের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রী লাভের সংবাদ কিছুদিন পূর্ব্বে খবরের কাগজে পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম।

অনেক ভারতবর্ষীয় যুবককে ইংরাজ রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে দেখা যায় ; কিন্তু ভারতবর্ষীয় যুবকের সহিত মার্কিণ

(১) প্রেমানন্দ মহাভারতী।

রমণীর বিবাহের সংখ্যা অতি অল্প। যে কয়টী বিবাহ হইয়াছে তাহা অঙ্গুলি দ্বারা গণনা করা যাইতে পারে। আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষই ইহার মূলীভূত কারণ, তবে ইহা ভারতবাসী ছাত্রের পক্ষে শাপে বর বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই বর্ণবিদ্বেষ হেতু আমেরিকায় ভারতবর্ষের ছাত্রেরা অনেক প্রলোভনের হাত হইতে রক্ষা পায়। বিলাতে ঐ সকল প্রলোভন হইতে তাহাদের নিষ্কৃতি পাওয়া সুকঠিন।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে ছাত্রগণ বিদেশে শিক্ষালাভ করিবার জন্য প্রায় বিলাতেই গমন করিত; কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ আমেরিকায় এবং জাপানে ভারতবাসী ছাত্রের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে; ইহা শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। আমেরিকায় পূর্ব্বে আমাদের দেশের দুই চারিটী ছাত্র হোমিওপ্যাথি পড়িত; এখন শতাধিক ছাত্র ইঞ্জিনীয়ারিং, কৃষি-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা পাইতেছে। বোধ হয় আমেরিকার সংস্পর্শে জাপানের এতাদৃশ উন্নতি দেখিয়াই, আমেরিকার দিকে ভারতবাসীর মন আকৃষ্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে কতিপয় ছাত্র গভর্ণমেণ্টের, ও শিল্প-বিজ্ঞান-সমিতির এবং বরদা, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যের বৃত্তি গ্রহণ করিয়া আমেরিকায় শিক্ষালাভ করিয়াছে ও করিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা সুখের বিষয় এই যে, যে সকল ছাত্র নিজের খরচে আমেরিকায় গমন করিয়াছে, তন্মধ্যে কেহ কেহ অবস্থা-বিশেষে আমেরিকান্ ও জাপানী ছাত্রদের উদার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, জাতি-ধর্ম্ম-নির্বিশেষে, অকুণ্ঠিত চিত্তে, সকল প্রকারের কার্য্য করিয়া কলেজের ব্যয়-নির্ব্বাহ করিতেও সমর্থ হইয়াছে। পূর্ব্বাঞ্চল অপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চলেই এই সকল ছাত্রের জীবিকা অর্জ্জনের অধিক সুবিধা। ঐ স্থানের খরচও অপেক্ষাকৃত কম। টেবিলে খানা পরিবেশন করা, বাসন মাজা, মেঝে পরিষ্কার করা প্রভৃতি কার্য্য ছাত্রদের সহজেই জোটে। কেহ-কেহ বা অবসর মত সর্টহ্যাণ্ড লিখিয়া টাইপ্ রাইট্ করিয়া, হিসাবপত্র রাখিয়া, লাইব্রেরীতে পুস্তক বিতরণে সাহায্য করিয়া, কেরাণীগিরি বা গৃহ-শিক্ষকের কার্য্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে; তবে ঐ সকল কার্য্য ততটা সহজ-লভ্য নহে। কোন-কোন ছাত্র পুস্তকাদি বিক্রয় করিয়াও কমিশন লাভ করে। অবস্থা-বিশেষে অনেকে সংবাদ-বাহক, ক্ষৌরকার, রজক প্রভৃতির কার্য্যও করিয়া থাকে। গ্রীষ্মাবকাশের তিনমাস কৃষকদিগের অধীনে মাঠে কার্য্য করিয়াও বহু ছাত্র কলেজের বেতনের সংস্থান করে। জাত্যভিমানী ভারতবাসী ছাত্রদিগের পক্ষে অনভ্যাসবশতঃ প্রথম-প্রথম ঐ সকল উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করা বড় সহজ নহে। তাহারা আমেরিকান্ ছাত্রদিগের ন্যায় তেমন সবল ও কষ্ট-সহিষ্ণু নহে। যে সকল ছাত্র কলেজের জীবন হইতেই আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা করে,—তাহার বলেই ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তাহারা জীবন-সংগ্রামে সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। পরে

আমেরিকা-প্রবাসী মহারাষ্ট্র পরিবার

(১) বিশ্বনাথ বনওয়ালীকর; (২) রঘুনাথ বনওয়ালীকর; (৩) মিসেস রমাবাঈ যোশী; (৪) মিঃ এস, এল, যোশী এম-এ; (৫) মিঃ এল, এল, যোশী বি-এস্‌সি, এম-ডি; (৬) মনোরমা বাঈ; (৭) আনন্দী বাঈ; (৮) সুন্দর রাও।

তিনি অপূর্ব্ব প্রতিভা, ঐকান্তিক চেষ্টা, অসীম অধ্যবসায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়া, ভারতবাসীর নৈতিক, মানসিক, বৈষয়িক ও রাজনৈতিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে যাঁহারা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, সেই পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বার অবরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকে দেশবন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য আমাদের সমাজে যে কোন দোষ প্রবেশ করে নাই, এ কথা আমরা বলি না। কিন্তু সে সকল দোষের জন্য রাজা রামমোহন রায় বা পাশ্চাত্য শিক্ষা দায়ী নহেন। তাহার জন্য আমরাই দায়ী। রামমোহন রায়ের দৃষ্টান্ত ও উপদেশ অনুসারে যদি আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত ধর্ম্ম-শিক্ষা বজায় রাখিতাম, তাহা হইলে আমাদের সমাজে বিশেষ অনিষ্ট ও বিপ্লব ঘটিবার অধিক সম্ভাবনা থাকিত না। ধর্ম্মহীন শিক্ষাই সকল অনিষ্টের মূলে অবস্থিত। আমাদিগের মাতৃভাষা এত অল্প দিনের মধ্যে যে এরূপ আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করিয়াছে, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত সহযোগিতাই তাহার মূল কারণ। রাজা রামমোহন রায় বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরেজের সহযোগিতা ভিন্ন আমরা কোনমতেই শিক্ষা, ব্যবসা, বাণিজ্য, শাসন-নীতি প্রভৃতি কোন বিষয়ে সম্যক্ উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইব না। পাশ্চাত্য সাহিত্য, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য ইতিহাস অধ্যয়ন না করিলে আমাদের ব্যক্তিগত, সমাজগত ও জাতিগত সঙ্কীর্ণতা ঘুচিবে না; পৃথিবীর অপরাপর জাতির সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইব না; এবং আমাদিগের দেশে জ্ঞান ও ধনাগমের পথ সুগম হইবে না। কর্ম্ম-চেষ্টা-বিমুখ ভারতবাসীকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য ইংরেজের সহযোগিতা তিনি একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন; এবং এই উদ্দেশ্যে সম্ভ্রান্ত ধনশালী ইংরেজগণ যাহাতে ভারতের স্থায়ী অধিবাসী হয়েন, তিনি তাহার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন। আজকাল আমরা "জাতীয়তা" (Nationalism) সম্বন্ধে অনেক কথা, অনেক বক্তৃতা শুনিতেছি; কিন্তু এই জাতীয়তা যে ভাবে এবং যে প্রণালীতে প্রচারিত হইতেছে, তাহা বড়ই অনুদার, বড়ই সঙ্কীর্ণ, বড়ই স্বার্থ-প্রণোদিত বলিয়া মনে হয়। রাজা রামমোহন রায় যে "জাতীয় ভাবের" পোষণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না; তাঁহার "জাতীয়তা" প্রেম ও উদারতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার "জাতীয়তার" সহিত সমগ্র মানব-জাতির আদান-প্রদানের সম্বন্ধ ছিল; উহার মধ্যে সঙ্কীর্ণতা বা বিদ্বেষভাব স্থান পাইত না।

শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী বিবেকানন্দ এক স্থানে বলিয়া গিয়াছেন যে, যেথানেই উদারতা, সেইখানেই জীবন; যেথানে সঙ্কীর্ণতা, সেইখানেই মৃত্যু। যাহার প্রসারতা আছে, তাহারই মধ্যে আমরা জীবনের স্পন্দন অনুভব করিয়া থাকি; যাহা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, তাহাই মৃত। যখন ভারতের সহিত বহির্জগতের আদান-প্রদান চলিত, তখন ভারত জীবিত ছিল। বৌদ্ধ-যুগ ভারতের "স্বর্ণযুগ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ কি বৈষয়িক, কি নৈতিক, কি আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তাহার কারণ এই যে, তখন ভারতের সহিত চীন, জাপান, তাতার, তুরস্ক, মিশর, গ্রীস, রোম প্রভৃতি ভারতের বাহিরের দেশের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক জ্ঞানের আদান-প্রদান চলিত। বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ সমুদ্র পার হইয়া দেশ-বিদেশে ভগবান বুদ্ধের উচ্চ নৈতিক ধর্ম্ম, এবং ভারতের সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বসমূহ প্রচার করিতেন। ভারতের নৌ-যান, ভারতের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য দূর-দূরান্তর দেশে বহন করিয়া, তথা হইতে প্রচুর অর্থ ও ব্যবহার্য্য পণ্য সংগ্রহ করিয়া আনিত। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পতনের পর যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনরায় ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিল, তাহার মধ্যে প্রাচীন আর্য্য-ধর্ম্মের উদারতা ও মহাপ্রাণতা ছিল না। সুতরাং তখন ভারতের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, শিক্ষা ও ভাব ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইল; ভারতবর্ষ উদার নীতি পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কীর্ণতাকে দৃঢ় ভাবে আলিঙ্গন করিল। তখন হইতে ভারতবাসীর সমুদ্র বাহিয়া ভারতের বাহিরে গমন করা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বলিয়া নিষিদ্ধ হইল;—বহির্জগতের সহিত ভারতের জ্ঞানের ও কর্ম্মের আদান-প্রদান রহিত হইল। তখন হইতেই ভারত আবার মৃত্যুর কবলে পতিত হইল; কুসংস্কার, অজ্ঞতা, জাতি-বিদ্বেষ আবার প্রবল শক্তি সঞ্চয় করিয়া, ভারতের সর্ব্বত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। ভারতবাসীর চিন্তা-স্রোত, কর্ম্মক্ষেত্র ও কর্ম্মচেষ্টা গণ্ডীর মধ্যে অবরুদ্ধ হইল। সেই সময় হইতেই ভারতে পরাধীনতা ও দাসত্বের সূত্রপাত হইল। বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা

রামমোহন রায় বহুশতাব্দীব্যাপী সেই সঙ্কীর্ণতার শৃঙ্খল কাটিয়া, তাঁহার দেশবাসীর ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও চিন্তায় পুনরায় উদারতার প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মৃতপ্রায় ভারতকে উদারতার সঞ্জীবনী-মন্ত্রে পুনরায় অনুপ্রাণিত ও শক্তিশালী করিতে তাঁহারই প্রথম চেষ্টা। তাই তিনি মহাপুরুষ,—তাই তিনি বরেণ্য,—তাই তিনি পূজ্য,—তাই তিনি ভারতের ও জগতের মহান্ আদর্শ। অদ্য আমরা সেই আদর্শের পূজা করিতে এই সভাগৃহে সমবেত হইয়াছি। ভগবানের নিকট একান্ত মনে প্রার্থনা করিতেছি, যেন তাঁহার মহান্ আদর্শ চিরদিন তাঁহার দেশবাসীকে ধর্ম্মের পথে, সত্যের পথে, কর্ত্তব্যের পথে, অগ্রসর হইতে সহায়তা করে।

শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের যে ধারণা ছিল,—বর্ত্তমান সময়ে যাহারা স্বরাজ-লাভের জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন,—তাহা তাঁহাদের কল্পনার সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ বিষয়ে তাঁহার দূর-দৃষ্টি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ইংরেজ-শাসনের প্রথমাবস্থায়, সেই ঘোর বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থার দিনে, ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ভাগ্য সম্বন্ধে তিনি কিরূপ উজ্জ্বল, আশাপ্রদ ভাব পোষণ করিতেন, তৎসম্বন্ধে স্বর্গগত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার লিখিত রাজার জীবন চরিতে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন :—

"এ দেশ সভ্যতা ও জ্ঞানে উন্নত হইয়া ইংলণ্ডের উপনিবেশসমূহের ন্যায় রাজনৈতিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ইংলণ্ডের উপনিবেশ সকলের যেরূপ রাজনৈতিক অধিকার, তাঁহাদের সহিত ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডীয় গভর্ণমেণ্টের যেরূপ সম্বন্ধ,—রাজা আশা করিতেন যে, ভারতবর্ষ জ্ঞান ও সভ্যতায় উন্নত হইয়া, সেইরূপ রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিবে; এবং ইংলণ্ডের সহিত তাহার সেইরূপ রাজনৈতিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা রাজার একান্ত বাসনা ও আশা ছিল। তিনি কেনেডা দেশের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন যে, কেনেডার সহিত ইংলণ্ডের যেরূপ রাজনৈতিক সম্বন্ধ, ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের সেইরূপ সম্বন্ধ সময়ে নিবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়। যদি কোন কালে (বর্ত্তমান সময়ে চিন্তা বা অনুমানের অতীত) কোন ঘটনার দ্বারা ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও এই ভারত-রাজ্য সমগ্র আসিয়াখণ্ডে জ্ঞান ও সভ্যতা বিস্তারের উপায় স্বরূপ হইবে।"

নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আমরা তাঁহার স্বদেশবাসী হইয়া তাঁহার বিরাট আদর্শ ছোট করিতে সঙ্কোচ বোধ করি না। কিন্তু বিদেশবাসী ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মনীষিগণ রাজা রামমোহন রায়কে কিরূপ শ্রদ্ধা ও অনুরাগের চক্ষে দেখিতেন,—তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে কিরূপ উচ্চভাব পোষণ করিতেন, তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া, এই অভিভাষণের উপসংহার করিব।

খৃষ্টানদিগের মধ্যে কেহ-কেহ ট্রিনিটী (Trinity) মানেন না; তাঁহারা এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন। ইঁহারা ইউনিটেরিয়ান্ খ্রীষ্টান্ (Unitarian Christian) নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মিস মেরী কার্পেণ্টার তাঁহার প্রণীত রাজার জীবন-চরিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, বিলাতে British Christian Unitarian Association নামক এই সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রীষ্টানগণের একটী সমিতি ছিল। যদিও রাজা রামমোহন রায় একেশ্বরবাদী ছিলেন, কিন্তু তিনি খ্রীষ্টান নহেন বলিয়া, এই সমিতির সভ্য রূপে পরিগণিত হইতে তাঁহার আপত্তি ছিল। সমিতির সভ্যগণ তাঁহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে সভ্য রূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা Christian কথাটী উঠাইয়া দিয়া সমিতির নাম British and Foreign Unitarian Associationএ পরিবর্ত্তিত করিয়া, রাজাকে সভ্য রূপে গ্রহণ করেন। এই সমিতি একটী প্রকাশ্য সভায় রাজাকে এক অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। সর্ জন বাউরিং এই অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিবার সময়, রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "প্লেটো বা সক্রেটীশ্, নিউটন্ বা মিল্টন্, অতর্কিত ভাবে এখানে উপস্থিত হইলে মনে যে ভাবের উদয় হইত, প্রিয় ভ্রাতঃ, আমি সেই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, তোমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেছি। আমার নিকট দেশ ও কালের ব্যবধান, দুই স্পর্শ।"—রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম।

"জগদ্বিখ্যাত উইলিয়ম রস্কো তাঁহাকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইয়াছিলেন। অশীতিপর বৃদ্ধ, মহাজ্ঞানী রস্কো রাজাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন—"I bless God

that I have been permitted to live to see this day."—(ঐ)

ইংলণ্ড-প্রবাসী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ মার্কিণ ডাক্তার বুট (Dr. Boot) রাজার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

"To me, he stood alone, in this single majesty of, I had almost said, perfect humanity. No one in the past history or in present time, ever came before my judgment clothed in such wisdom, grace and humanity. I know of no tendency even to error."

পুনশ্চ—

"I have studied them (Raja Ram Mohan Roy's Works) with a subdued feeling since his death and risen from their perusal with more confirmed conviction of his having been unequalled in past and present time."

রেভারেণ্ড ডবলু, জে, ফক্স রাজার মৃত্যুর পর লণ্ডনের ফিন্‌সবেরি উপাসনালয়ে যে বিশেষ ধর্ম্মোপদেশ (Sermon) প্রদান করেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন :—"And being dead, he yet speaketh with a voice to which not only India but Europe and America will listen for generations."—রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম।

জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ম্যাক্সমূলর্ রাজা রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—"The common root of all sections of Theistic church is the work done once for all by Ram Mohon Roy and in one form or another, under one name or another, I feel convinced that work will live." তিনি অন্য স্থানে বলিয়াছেন :—"He was the first to complete a connected life-current between the East and West—the inspired engineer in the world of faith that cut the channel of communication, the Spiritual Suez between sea and sea, landlocked in the rigid sectarianism of exclusive revelation and set their separate surges of National life into one mighty world-current of universal humanity."

সার মণিয়র উইলিয়মস্ রাজার সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন :—"The first correct minded investigator of the Science of Comparative Religion the world has produced."

স্বনামখ্যাত বঙ্গের কৃতী সন্তান মনস্বী স্বর্গগত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ভারতের বর্ত্তমান যুগকে "রামমোহনের যুগ" বলিয়া উল্লেখ করিয়া, রাজা রামমোহন রায়ের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের বিশেষ-বিশেষ কার্য্য সম্বন্ধে আমি কোন আলোচনা করিলাম না। এই সভায় উপস্থিত আমা অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তিগণের হস্তে উক্ত ভার সমর্পিত হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়ের দৃষ্টান্ত, তাঁহার কার্য্য এবং তাঁহার উপদেশের সহিত বর্ত্তমান দেশব্যাপী আন্দোলনের যে সম্বন্ধ রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র ইঙ্গিত করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিলাম।

জীব-বিজ্ঞান

[শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম-বি]

পৃথিবীর যে কোনও জীবের নাম কর না কেন, তাদের সকলেরই উৎপত্তি এই আমীবার মত একটী ছোট্ট সেল (cell) থেকে ;—এই cellই তাহার জীবনের প্রথম অবস্থা। Cell যখন বড় হয়, তখন তার ভেতরে এক বা ততোহধিক

১ম চিত্র।
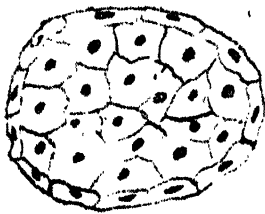
পার্টিসন তৈরী হয়ে, cellটাকে দুই বা ততোহধিক ভাগে ভাগ করে ফেলে। আমীবার মত জীবে এই অংশগুলো আসল গোড়ার সেল থেকে খসে পড়ে ; এবং খসে-পড়া অংশগুলার প্রত্যেকটা এক-একটা পূর্ণ আমীবায় পরিণত হয়। এই কারণে আমীবা চিরকালই ছোট ; এবং এক-সেল মাত্র-সার থেকে যায়। অন্য জাতীয় জীবে ঐ গোড়ার সেলটা আমীবার মত ভাগ হয়ে যায় বটে, কিন্তু অংশগুলা খসে পড়ে না। একটা সেল ভাগ হয়ে দুটা, দুটা থেকে চারটা, এই রকম করে সেলের সংখ্যা বেড়ে থাকে ; এবং সঙ্গে-সঙ্গে ঐ জীব আকারে বিভিন্ন এবং আয়তনে বড় হতে থাকে। শুধু তাই নয়,—এই সমষ্টির প্রত্যেক সেল আর ঠিক আমীবার মত থাকতে পারে না। মনে কর, আদিম cell থেকে ভাগাভাগি করে, ৩১টী সেল হয়েছে ; এবং তারা এক সঙ্গে জড় হয়ে আছে,—যেমন ১ম চিত্রে।

এখানে দেখা যাচ্চে, সেলগুলা আর গোলাকার থাকচে না। পরস্পরের চাপে তাদের আকার নানারকম হয়ে গেছে। কাজও বদলেছে। এই পিণ্ডের প্রত্যেক সেল আর আমীবার মত চলে-ফিরে বেড়াতে পারে না ; তারা আটকা পড়ে গেছে। এই সমষ্টিটা হয় ত চলে বেড়াতে

পারে; এবং ঐ চলার পক্ষে বাইরের সেলরাই কোন উপায়ে সহায়তা করতে পারে;—ভিতরের সেল পারে না। এই বাইরের সেলরাই তখন এই পিণ্ডাকৃতি জীবের পায়ের কাজ করবে। তার পর, জল থেকে খাদ্যাদি সংগ্রহ করা, বাইরের সেলরাই সহজে পারে; ভিতরের গুলা পারে না। এই রকম সেলের সংখ্যা যত বাড়তে থাকে, তাদের মধ্যে গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ জাতিভেদও তত বাড়তে থাকে। শেষে যখন আমরা মানুষের মত উচ্চ জীবে এসে হাজির হই, তখন দেখি, তার প্রতি কাজের জন্য এক-এক দল সেল আলাদা করা আছে; যেমন চলবার জন্য এক জাত, দেখবার জন্য এক জাত। এই রকম প্রতি কাজের জন্য। সেলগুলা সকলে মিলে যেন একটা সমাজ গড়ে তুলেছে।

আমরা শুনেছি, মানুষ আদিম অবস্থায় যখন বুনো ছিল, তখন প্রত্যেক লোকটাকে তার আহার সংগ্রহ করতে হ'ত,—ঘর বাঁধাতে হ'ত, শত্রু থেকে আত্মরক্ষা করতে হ'ত। তার পর সমাজ যত গাঁথতে লাগল, তখন প্রত্যেককে আর সব কাজ করবার দরকার হল না;—এক জাত চাষ করতে লাগল, এক জাত ঘর বাঁধতে লাগল, এক দল শত্রুর হাত থেকে সকলকে রক্ষা করতে লাগল। আরও পাকা সমাজে দেখ, একটা ঘর বাঁধাও একদল লোকের দ্বারা হয় না। এক জাত ইট তৈরী করে; এক জাত তা সাজায়; এক জাত কাট চ্যালা করে; এক জাত দরজা-জানালা বসায়। সেল সমাজেও এই রকম। সমাজ যত বড়, তার ব্যবস্থা তত জটিল;—সেখানে জাতিভেদ তত বেশী।

এই জাতিভেদ আকারগত বলতে পার, বা কর্ম্মগত

২য় চিত্র
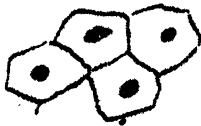
বলতে পার। কারণ, আকার কর্ম্মের অনুরূপ। উপর-কার আবরণ বা ভিতরকার পাতলা lining তৈরী করবার জন্য যে সেল, তারা চেপ্টা-চেপ্টা, টা'ল বা আঁশের মত দেখতে। (২য় চিত্রে) পেশীর সেলগুলা লম্বা ছুঁচাল। এরা আকারেও কাজে অনেকটা জোঁকের মত। এরা জোঁকের মত একবার লম্বা আর সরু হয়,—একবার ছোট ও মোটা হয়। কাজেই, এই রকম সেলের সমষ্টি যে পেশী, সেও সরু ও লম্বা বা মোটা ও ছোট হতে পারে। হাত পাশে ঝুলছিল। হঠাৎ একটা পানতুয়া এসে তাতে ঠেকল। হাতের চেটোর কতকগুলা পেশী অমনি ছোট হয়ে গেল;—আঙুলগুলো আর সোজা থাকতে পারল না;—পানতুয়ার উপর টপ্ করে মুঠো করে ফেললে। সঙ্গে-সঙ্গে হাতের পেশী ছোট হয়ে গেল;—হাত আর ঝুলে থাকতে পারলে না;—আর মুঠোটা এসে মুখে হাজির হল। পেশীর সেল জোঁকের মত না হলে পানতুয়া নিয়ে করতুম কি? (৩য় চিত্র)

৩য় চিত্র

আমরা দুরকম সেলের পরিচয় দিলুম। এই রকম নানা রকম সেল আছে, নানা কাজের জন্য।

আমাদের দেহের ভিতরে এইরূপ অসংখ্য সেল তাদের ঘরকরনা করচে। তারা শুধু নড়ে-চড়ে বেড়াতে পারে না;—আর বাকী সব বিষয়েই জীবন্ত। তারা শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করচে; আহার করে শরীরের পুষ্টি-সাধন করচে; সন্তান উৎপাদন করচে। এই সন্তান আবার বড় হয়ে 'কলিকালের ছেলের' মত বাপ-মায়ের জায়গা জুড়ে বসচে; এবং তাদের বার-বাড়ীতে ঠেলে দিচ্চে। দু'দিন বাদে সেখানেও আর স্থান হয় না। এই রকম তাড়া খেতে-খেতে এক দিন তাঁদের আয়ু শেষ হয়। তখন বাস্তুভিটার উপর থেকে সমস্ত মমত্ব পরিহার করে, তাঁরা একে-একে খসে পড়েন।

প্রতিনিয়ত এমনি কত নতুন সেল শরীরে তৈরী হচ্চে, কত পুরান সেল ঝরে পড়চে,—তার ইয়ত্তা নেই। আমি যখন বলি, 'কাল যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এ সেই হরিদাস'

—তখন ভুল করি। বাস্তবিক, কাল যে হরিদাসকে দেখেছিলুম, সে হরিদাস আর নেই ; তার জায়গা জুড়ে এ একজন নূতন লোক দাঁড়িয়ে। কল থেকে অজস্র জলবিন্দু ঝরচে ;—আমি দেখচি জলধারা। জলধারা ত একটা স্থির জিনিষ নয়। আমি যখন একটা জলবিন্দু-সমষ্টির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলি, এই জলধারা,—সেই মুহূর্ত্তে ত আমার জলধারা অদৃশ্য হয়ে গেছে,—তার জায়গায় এসেছে এক নূতন জলবিন্দু-সমষ্টি। অথচ আমার আঙুল ঐ দিকে বাড়ানই আছে,—বলছি 'এই জলধারা।' আমাদের হরিদাসও সেই রকম,—একটা সেল-প্রবাহ। এই চিরপ্রবহমান বিন্দুধারা হাসচে, খেলচে, টাকা জমাচ্চে ;—মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে বন্ধুত্বের আকাঙ্ক্ষা করচে ;—পরকালে ভাল খাবে-পরবে বলে চিরজীবনটা অনাহারে শুকিয়ে মরচে ;—এবং একটা safety pin (সেফ্‌টি পিন)এর জন্য পৃথিবী তোলপাড় করচে। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং ?

দেহের সেলসমবায় বেঁচে থাকে, জানা গেল। কিন্তু তারা বাঁচে কি করে ? আমরা জানি—বাঁচতে গেলে, প্রত্যেক সেলটীর দরকার জল, অম্লজান, দ্রবীভূত খাদ্য, তাপ ও অপথ্য পরিহার। এ সব আসে কোথা থেকে ? আমরা এক-একটা করে আলোচনা করব।

জল

জল আসে রক্ত থেকে ; আর রক্ত থাকে শিরার মধ্যে। শিরাগুলো ছোট-ছোট শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে, শরীরের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে আছে। এরাই সেলের পাড়ায়-পাড়ায় জল সরবরাহ করে। কিন্তু একটা কথা হচ্চে,—শিরায় ত কোন ছিদ্র নেই, যা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গিয়ে সেলে যাবে। এ রকম ছিদ্র থাকলে ত সমস্ত রক্ত ঐ পথে বেরিয়ে যেত। শিরার ভিতরে রৈল রক্ত। সেলগুলো সে রক্ত থেকে জল পায় কি করে ? তার ব্যবস্থা আছে।

ছেলেদের খেলবার জন্য এক রকম রবারের রঙিন বেলুন পাওয়া যায়, অনেকেই দেখেছেন। ভিতরে এক রকম হাল্কা গ্যাস পোরা থাকে বলে' এ গুলা ওড়ে। উড়ন্ত বেলুন কিনে ঘরে রেখে দিলুম ; দেখা গেল, দু'-একদিন বাদে সে আর উড়তে চায় না। কি হ'ল ? যার জন্য উড়ছিল, সেই গ্যাস বেরিয়ে গেছে। গ্যাস পূরে যে বাঁধন দেওয়া হয়েছিল তা তেমনি আছে। অথচ বেরিয়ে গেছে, রবার ফুঁড়ে ; কিন্তু রবারে কোন ছেঁদা হয় নি। গ্যাস বেরিয়ে গেল, অথচ বেলুন একেবারে চুপ্‌সে যায় নি ত। যে গ্যাস বেরিয়ে গেছে, তার জায়গা বাইরের বাতাস এসে দখল করেছে। এ-ও এসেছে ঐ গোপন পথে। এই রকম রবারের থলির মধ্যে মিশ্রীর সরবৎ পূরে, যদি সেটা জলে ডুবিয়ে রাখা যায়, ত, দেখা যায় যে, কিছুক্ষণ পরে বাইরের জলে মিষ্ট স্বাদ হয়েছে ;—সরবৎ রবার ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। এবং বাইরের জল ঐ রকমে থলির ভিতর ঢুকেছে। সেলগুলার গা ঘেঁসে-ঘেঁসে যে সব শিরা-উপশিরা আছে, তারা খুব পাৎলা, এবং উপরিউক্ত বেলুনের রবারের মত। বেলুনের ভিতর থেকে সরবৎ বা গ্যাস যে উপায়ে বেরিয়ে যায়, এবং বাইরের জল বা বাতাস ভিতরে ঢোকে, অনেকটা সেই উপায়ে উপশিরাদের ভিতর থেকে জল এবং জলে দ্রবীভূত খাদ্য ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্য বেরিয়ে গিয়ে সেলপাড়ায় হাজির হয়, এবং সেলপাড়ার আবর্জ্জনাদি উপশিরায় এসে পৌঁছে।

আমরা দেখচি, সেলরা বাস করচে উপশিরাদের তীর ঘেঁসে। এই উপশিরা থেকে তারা খাদ্য ও জল সংগ্রহ করচে ; এবং এরির জলে তাদের দেশের যত আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করচে। এই রকম করতে-করতে এক সময়ে সমস্ত খাদ্য নিঃশেষ হয়ে যাবে ; এবং পরিত্যক্ত দূষিত পদার্থে চারিদিকের জল বিষাক্ত হয়ে উঠবে। সেলগুলা ছাড়া থাকলে পালিয়ে বাঁচত ; এবং অন্যত্র খাদ্যাদির সন্ধান করত। কিন্তু তাদের নড়বার জো নেই। কাজেই, তাদের যদি বাঁচাতে হয়, ত, চারিপাশের জল এক ভাবে রাখলে চলবে না ;—তাকে মুহুর্মুহুঃ বদলান দরকার। এবং বদলাতে হলে, যেখান থেকে ঐ জল আসচে, শিরার ভিতরকার সেই রক্তে অনর্গল স্রোত বহান চাই। এই স্রোত বহান খুব সহজ হয়ে আসে, যদি শিরাগুলোর গোড়ায়, যেখান থেকে তারা বেরুচ্চে সেইখানে, একটা পাম্প্ (pump) থাকে। শরীরে সত্যসত্যই এমনি একটা পাম্প্ আছে। তার নাম Heart (হৃৎপিণ্ড)।

ডাক্তারেরা এক রকম রবারের পিচকারী ব্যবহার করেন। অনেকে হয় ত তা দেখেছেন। ৪র্থ চিত্রে তার একটা প্রতিকৃতি দেওয়া গেল। যন্ত্রটি হচ্ছে, একটা ফাঁপা বল (ক)। এর থেকে দুটো নল বেরিয়েছে (খ ও গ) বলের

দুই দিকে দুটো ভাল্‌ভ্‌ (valve) আছে (চ ও ছ)। চিত্রে দেখান হয়েছে যে, খ নলের ডগা জলে বোড়ান আছে। চিত্রের জ টী জলপাত্র। (৪র্থ চিত্র)

মনে কর, ক নলকে টিপলুম; তার ভেতরকার হাওয়া বেরিয়ে গেল। এইবার ছেড়ে দিলুম। বলের ভিতরকার শূন্য পূরণ করতে গ নল দিয়ে বাতাস ঢোকবার চেষ্টা করলে; কিন্তু অমনি ছ ভাল্‌ভ্‌ বন্ধ হয়ে গেল। কাজেই খ নল দিয়ে জল গিয়ে বল ভর্ত্তি করলে। খ নল দিয়ে জল যাবার সময়ে চ ভাল্‌ভ্‌ আপনি খুলে গেল। এখন আবার বল টিপলুম। অমনি তার ভিতরকার জল গ নল দিয়ে বেরিয়ে গেল। খানিকটা খ দিয়েও বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু তা করলে চ ভাল্‌ভ্‌ খ নলের পথ বন্ধ করে দেবে। এই রকম টিপে-ধরা আর ছেড়ে-দেওয়া যতক্ষণ করতে পারবো, ততক্ষণ গ নলের মুখ দিয়ে জলের ধারা বইতে থাকবে। চ ও ছ ভাল্‌ভ্‌ এমন ভাবে সাজান আছে যে, জলের স্রোত শুধু এক দিকেই বইবে; গ এর মুখ দিয়ে, দুদিক দিয়ে বইতে পারে না।

৪র্থ চিত্র

পিচকারীর ক বলের মত হার্ট (হৃৎপিণ্ড) একটা ফাঁপা যন্ত্র—পেশী দিয়ে তৈরী। বলকে টিপে ধরতে হয় এবং ছেড়ে দিতে হয়; তবে সে পাম্প্‌ করে। হার্ট কিন্তু কারুর সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না। পেশী সেলের আকুঞ্চন-প্রসারণের ফলে তার ভিতরকার গহ্বর একবার ছোট হয়ে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে,—একবার বড় হচ্চে—আপনা-আপনি। এই রকম করে সে ভিতরকার রক্তকে ঠেলে বার করে দিচ্চে। এই রকম পাম্প্‌ করচে অবিশ্রাম। চ ও ছ এর মত হার্টের ভিতরেও কয়েকটা ভাল্‌ভ্‌ আছে—যাদের সাহায্যে রক্ত-প্রবাহ কেবল এক দিকেই বয়। যে নল দিয়ে রক্ত হার্টে এসে হাজির হয়, সেটা পিচকারীর খ নলের মত। আর যে নল দিয়ে রক্ত হার্ট থেকে বেরিয়ে যায়, সেটা গ নলের কাজ করে। কেবল পিচকারীর দুদিক খোলা; রক্ত-বাহী নলের কোথাও খোলা নেই। হার্ট পাম্প্‌ করচে এবং তার ভিতরকার রক্ত একটা নল দিয়ে বেরিয়ে পড়চে। এই নল নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হতে-হতে, খুব ছোট-ছোট হয়ে সেলপাড়ায় পৌঁছয়। সেখানে এদের ভিতরকার রক্ত ও বাইরের সেল—এদের মধ্যে আদান-প্রদান চলতে থাকে। তার পর এই ছোট ছোট নল দুটো-তিনটে করে মিশে, সংখ্যায় কিছু কম ও আকারে কিছু বড় হয়। এই উপশিরা-গুলো আবার মিশে-মিশে বড়-বড় শিরা তৈরী করে। তাদের থেকে আবার আরও বড় বড় শিরা তৈরী হয়। এই রকম করে দেহের সমস্ত শিরা মিশে, দুটী মাত্র বড় নল হয়ে হার্টে এসে পৌঁছয়।

এখানে রক্তবাহী নলের তিন শ্রেণী দেখা যাচ্ছে। তাদের বোঝাবার জন্য তিনটে নাম দেওয়া দরকার হয়েছে। হার্ট থেকে রক্ত যে নল দিয়ে শরীরের সর্ব্বত্র চালান হয়, তার নাম Artery (ধমনি)। যে নল দিয়ে রক্ত হার্টে ফিরে আসে, তার নাম দেওয়া হয়েছে Vein (শিরা)। আর যে পাতলা ছোট-

ছোট নলের সঙ্গে সেলদের আদান-প্রদান চলে, তাদের বলা হয় Capillary। হার্ট ক্রমাগত পাম্প্ করে' আর্টারির (Artery) ভিতর রক্ত চালিয়ে দিচ্ছে। এই জন্য আর্টারির রক্ত ধক্‌ধক্ করে নাচতে-নাচতে চলে। নাড়ী দেখবার সময় আমরা এই ধক্‌ধকানি টের পাই। পাম্পের ঠেলা সহ্য করতে হয় বলে' আর্টারিগুলোকে শক্ত ও মজবুত হতে হয়। তাদের সহজে টিপে চেপ্‌টে দেওয়া যায় না। ক্যাপিলারিতে (Capillary) আস্‌তে-আস্‌তে পাম্পের বেগ কমে আসে। ভেন (Vein) এ পাম্প করার কোন চিহ্নই নেই। ভেনের রক্ত গড়াতে-গড়াতে হার্টে ফিরে আসে,—নিতান্ত ঢিমা তালে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে:—

(১) আর্টারি ফেটে গেলে, রক্ত জোরে, ফিন্‌কি দিয়ে এবং পাম্পের তালে-তালে নাচতে-নাচতে বেরোয়;—সহজে টিপে বন্ধ করা যায় না।

হার্টের মধ্যে কোন জায়গায় থাকে। ভেনের বেলা ঠিক উল্টো। কারণ, ভেনের স্রোত আসচে বাইরে থেকে হার্টের দিকে। কাজেই যে দিকে হার্ট আছে, তার উল্টো দিকে বাঁধন দিতে হবে। (৫ম চিত্র।)

আর্টারি বা ভেনকে হাড়ের গায়ে ঠেসে ধর্‌তে পারলেই, সহজে রক্ত বন্ধ করা যায়। খুব খানিকটা মাংসের ভিতরে এদের টিপে ধরা ভারি শক্ত। এই কারণে, কাটা জায়গার কাছাকাছি, যেখানে আর্টারি বা ভেনকে হাড়ের গায়ে টিপে ধরতে পার, সেইখানেই বাঁধন দেবে।

ক্যাপিলারি-কাটা রক্ত বন্ধ করতে, যেখান থেকে রক্ত বেরুচ্ছে, সেইখানেই একটা পরিষ্কার জিনিষ দিয়ে বেঁধে দাও।

এমন জায়গা থেকে রক্ত বেরুতে পারে, যেখানে টেপাও যায় না, বাঁধন দেওয়াও যায় না। যেমন বুকের ভেতর থেকে বা পেটের ভেতর থেকে যখন রক্ত বেরোয় কাশীর

(২) ক্যাপিলারি কাটা রক্ত আস্তে-আস্তে, চুইয়ে-চুইয়ে বেরোয়। টিপে ধরলে বন্ধ হয়ে যায়। আঙ্গুল তুলে নাও,—দেখবে, কোন রক্ত নেই। কিন্তু দেখ্‌তে-দেখ্‌তে আবার রক্তে ভরে আস্‌তে থাকে।

(৩) ভেন কেটে গেলে, রক্ত গল্‌গল্ করে বেরুতে থাকে,—ফিন্‌কি দেয় না; এবং চাপ দিয়ে রক্ত সহজে বন্ধ রাখা যায়।

যেখান থেকেই রক্ত বেরুক, পার ত টিপে ধর—বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু কতক্ষণ টিপে রাখা যায়? একটা জোর বাঁধন দিলে, টেপাটা স্থায়ী হ'তে পারে। কোথায় বাঁধন দেবে?

আর্টারির স্রোত আসচে হার্ট থেকে। এই স্রোত বন্ধ করতে হলে, কাটা জায়গার যে দিকে হার্ট আছে, সেই দিকে বাঁধন দাও;—বাঁধনটা যেন কাটা জায়গা আর

সঙ্গে, বা বমির সঙ্গে। এখানে কি করা যায়? আমরা জানি, একটু-আধটু কেটে গেলে, খানিকক্ষণ রক্ত বেরিয়ে, আপনি বন্ধ হয়ে যায়। রক্ত বাইরে থাকলে জমে যায়। এই জমা রক্ত, যেখান দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছিল সেই ছেঁদা বন্ধ করে দেয়। আর্টারি বা ভেন ফেটে যখন গলগল করে রক্ত বেরুতে থাকে, তখন তা জমতে পায় না। যেমন জমতে থাকে, অমনি স্রোতের বেগে তা ধুয়ে যায়। এই জন্য রক্ত-স্রাব বেশী হয়। আমরা যদি খানিকক্ষণ এই স্রোত বন্ধ করতে পারি, তা হলে জমা রক্তের বাঁধ বেশ পাকা হয়ে উঠতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে টিপে রক্ত বন্ধ করি। টিপে ধরাই যদি রক্ত বন্ধ করার একমাত্র উপায় হত, ত, অনন্ত কাল টিপে রাখতে হত।

যে রক্ত বেরিয়েছে, তাকে জমতে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। রক্তস্রোতের জোর কমাতে পারলে, এ উদ্দেশ্য

সিদ্ধ হবে। যদি টিপে ধরতে পারতুম, তা'হলে ত স্রোত বন্ধ হয়েই যেত। যখন তা পারি না, তখন আমাদের একমাত্র উপায় হার্টকে শান্ত করা।

১। আমরা যখন দৌড়ুই, তখন হার্টের অবস্থা কি হয়? বুকের মধ্যে একেবারে তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ করে দেয়। একেবারে মরিয়া হয়ে রক্ত পাম্প করে। যখন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি, তখন এমন করে না। যখন শুয়ে থাকি, তখন আরও আস্তে পাম্প করে। অতএব রোগীকে শুইয়ে ফেল। নড়াচড়া যত কম হয় ততই ভাল।

২। ভয় পেলে আমাদের বুক ধড়ফড় করে। এই জন্য রোগীকে ভয় পেতে, বা অন্য কোন রকমে বিচলিত হতে দিও না। কতখানি রক্ত বেরুল, তাকে দেখতে দিও না,—ভয় পাবে। পাঁচজনে পাশে বসে হা-হুতাশ কোরো না,—ঘাবড়াবে।

৩। খুব ঠাণ্ডা লাগলে রক্ত বন্ধ হতে পারে। তাই রোগীর বুকে বা পেটে আইসব্যাগ (Ice-bag) বসাতে পার। একটু বরফ চুষতে দিয়েও দেখ। (এখানে ঠাণ্ডা লাগান অর্থে—যাতে সর্দ্দি হয়, এমন কাজ করা নয়; যাতে তাপ কমে, তাই করা।)

৪। রোগী যাতে ঘুমোয় তার চেষ্টা কর।

এই রকম করলে রক্তস্রাব বন্ধ হতে পারে। কিন্তু এই সময়ে রোগী যদি লাফালাফি আরম্ভ করেন, ত যে রক্তের চাপড়া তৈরী হয়েছিল, সেটা খসে গিয়ে আবার নতুন করে বেরুতে থাকবে। রক্তের চাপড়াটা যতক্ষণ বেশ শক্ত না হচ্চে, ততক্ষণ নড়াচড়া করতে নেই।

নাক দিয়ে যখন নাসার রক্ত পড়তে থাকে, তখন নাক টিপে ধরে, বা খানিকক্ষণ নাককে বিশ্রাম দিয়ে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিলে রক্ত বন্ধ হয়। এই সময়ে যদি নাক ছাড়া যায়, ত জমা রক্তের বাঁধ ভেঙে গিয়ে আবার রক্ত পড়তে আরম্ভ হয়। এই কারণে নাসা হলে নাক ঝাড়তে নেই।

জল, খাদ্য, অম্লজান ও তাপ সেলরা রক্তের ভিতর দিয়েই পায়। এই কারণে বেশী রক্তস্রাব হলে, সেলগুলা মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। (১) খাদ্যের অভাবে তারা নির্জ্জীব হয়। তখন মগজ ভাল করে কাজ করে না। হার্ট পারিনা-পারিনা করে পাম্প করতে থাকে, এবং পাকাশয় কাজে ইস্তফা দিতে চায়। (২) অম্লজানের অভাবে সেলরা হাহাকার করতে থাকে। আর আমরা হাঁফিয়ে উঠি; এবং লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে অম্লজানের ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করি। (৩) তাপ কমে গিয়ে শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে আসে; এবং (৪) জলের অভাব প্রচণ্ড পিপাসার আকারে আমাদের অতিষ্ঠ করে তোলে। বেশী রক্তস্রাব যে আশু মারাত্মক হয়, সেটা কিন্তু প্রধানতঃ জলের অভাবে। কোন রকম করে এই জলের ক্ষতি পূরণ করতে পারলে, অন্য অভাব পূরণের সময় পাওয়া যায়।

দেহে যখন জলের অভাব হয়,—রক্তস্রাব হয়েই হোক বা দেহ থেকে বেশী জলে বেরিয়ে গিয়েই হোক—যেমন গ্রীষ্মকালে ঘামের সঙ্গে, বা বহুমূত্র রোগে প্রস্রাবের সঙ্গে বা কলেরা রোগে দাস্ত বমির সঙ্গে—তখন আমরা পিপাসায় কাতর হই। পিপাসা হইলেই বুঝতে হবে, শরীরে জলের অভাব হয়েছে। এই অভাব দূর করবার জন্য খানিকটা জল শরীরে ঢোকান দরকার। মুখ দিয়েই হোক, মলদ্বার দিয়েই হোক, বা চামড়ার নীচে বা শিরার ভেতর ফুঁড়ে দিয়েই হোক,—কোন রকম করে রক্তের সঙ্গে খানিকটা জল মেশাতে পারলেই, সেলেরা শান্ত হবে এবং পিপাসা নিবৃত্ত হবে। তৃষ্ণার সময় যে জল গিলেই খেতে হবে, এমন কোন কথা নেই। গিলে যে জল খাই, তা রক্তে পৌঁছুতে একটু দেরী হয়। তড়িঘড়ি যদি জল ঢোকাতে চাই, ত একেবারে শিরার ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়াই ভাল। বেশী রক্তস্রাব হলে, বা যখন কলেরা প্রভৃতি রোগে জল পেটে তলায় না, তখন এই রকম করেই শরীরে জল ঢোকানো হয়—একেবারে শিরার ভেতরে। যখন তড়িঘড়ি না ঢোকালেও চলে, অথচ মুখ দিয়ে দেওয়া যায় না—রোগী হয় ত খায় না, বা খেয়ে রাখতে পারে না—তখন পিচকারীর মুখে একটা নল বা সলা (catheter) লাগিয়ে, মলদ্বার দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। একেবারে বেশী জল ঢোকালে, তখনি দাস্ত হয়ে সব বেরিয়ে যেতে পারে। তাই অল্প-অল্প করে দিতে হয়। একবারে চার-পাঁচ আউন্স দেওয়া যেতে পারে। শুধু জল না দিয়ে জলের প্রতি পাঁইটে এক ড্রাম, বা চা'র চামচের একচামচ নুন দিলে কষ্ট কম হয়। যে জল পিচকারী করা হচ্চে তার তাপ যেন শরীরের তাপের চেয়ে খুব বেশী বা কম না হয়। হলে, কষ্ট হবে।

তাপ-বিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ]

গ্রীষ্মকালে পল্লীগ্রামের ডোবাগুলি একেবারে শুকাইয়া যায়। জলটা যায় কোথায়? গরমে ফুটিয়া কি ষ্টিমে পরিণত হয়? হাত দিলে দেখা যায়, জল গরম বটে, কিন্তু ফুটন্ত জলের মত গরম নয়। তবে কি জল মাটিতে শুষিয়া যায়;—অথবা পল্লীবাসিনীর কলসী চড়িয়া অন্যত্র গমন করে? আচ্ছা, পরীক্ষাটা চোখের উপরই করা যাউক। ঘরের মধ্যে একটা পাত্রে খানিক জল রাখ। বেশ লক্ষ্য রাখিও, সেই জলে কোন জন্তু জানোয়ার, পোকা-মাকড় মুখ না দেয়; কয়েক দিন পরে দেখিবে, সেই পাত্র খালি হইয়া গিয়াছে,—জল নাই। তাপ দেওয়া হয় নাই; সুতরাং জল নিশ্চয় ফোটে নাই। জল তবে গেল কোথায়? জলের বদলে তেল রাখ,—দেখিবে, তেল ঠিক আছে,—কমে নাই। পরীক্ষাটা যদি কোন স্পিরিট বা এসেন্স্ লইয়া কর,—দেখিবে, দিন ঘণ্টা নয়—কয়েক মিনিটের মধ্যে উহা অদৃশ্য হইয়াছে। এই যে এসেন্স্, জল প্রভৃতি দ্রব্য,—কি শীত, কি গ্রীষ্মে—প্রতিনিয়ত দ্রুতবেগে হউক বা খুব ধীরে-ধীরে হউক ক্রমশঃ জলীয় হইতে বায়বীয় অবস্থায় পরিণত হইতেছে,—ইহা জলীয় পদার্থের একটা বিশেষ গুণ, ফোটা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। জলীয় পদার্থ মাত্রেই এই গুণ দৃষ্ট হয় না; পারা তেল প্রভৃতিতে ইহা প্রায় দেখাই যায় না। জল যখন ফোটে, তখন উহা এক নির্দ্দিষ্ট উত্তপ্ততায় ফোটে। সেই উত্তপ্ততার এতটুকু কম হইলে চলিবে না। বাহিরের বাতাসের চাপ যদি স্বাভাবিক থাকে, তো, জল ৯৯½ ডিগ্রীতেও ফুটিবে না। পুরাপুরি ১০০ ডিগ্রী হওয়া চাই; তবে উহা ফুটিতে থাকিবে; আর যখন ফুটিবে, তখন জলের প্রতি কণাটী ফুটিতে থাকিবে। কিন্তু এই যে থালার জল ক্রমশঃ ধীরে-ধীরে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে,—ইহার জন্য কোন বিশিষ্ট উত্তপ্ততার প্রয়োজন নাই। সকল উত্তপ্ততায় এই পরিবর্ত্তন অল্প-বিস্তর সংসাধিত হইতেছে; এবং সমস্ত জল-বিন্দু হইতে ইহা হইতেছে না,—মাত্র উপরের খোলা অংশ হইতে হইতেছে। আবার, জলের উপর যদি তেলের একটা স্তর ভাসিতে থাকে, তাহা হইলে দেখা যায়, জল আর বায়বীয় আকার ধারণ করিতেছে না;—যেমন জল তেমনি আছে।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, এক গ্র্যাম ১০০ ডিগ্রীর উত্তপ্ততার জলকে বাষ্পে পরিণত করিতে হইলে, বাহির হইতে অনেকটা তাপ চাই। বিভিন্ন উত্তপ্ততায় যখন জলের বা কোন জলীয় পদার্থের অদৃশ্য পরিবর্ত্তন ঘটে, তখন সেই পরিবর্ত্তনের জন্য উহা বাহির হইতে অল্প-বিস্তর তাপ গ্রহণ করে। এই পরিবর্ত্তন যত দ্রুত হয়, বাহির হইতে তাপ গ্রহণ তত শীঘ্র শীঘ্র হইতে থাকে। তাই দেখা যায়, হাতটা বেশ ঠাণ্ডা বোধ হয়, যখন হাতের উপর কতকটা এসেন্স ঢালা যায়। ঈথর বলিয়া একটী রাসায়নিক পদার্থ আছে; ডাক্তারেরা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন;—এই তরল ঈথরের বায়বীয় আকারে পরিবর্ত্তন অতি দ্রুত ঘটিয়া থাকে; তজ্জনিত ঠাণ্ডার মাত্রাও খুব বেশী। একটা পাত্‌লা সরু কাচের শিশিতে খানিকটা জল ভরিয়া, একটা বড় পাত্রস্থিত ঈথরের মধ্যে এই শিশিটা রাখিয়া দাও। এইবার যদি এই ঈথরের উপর জোরে বাতাস করিতে থাক, খানিক পরে দেখিবে, শিশির জল জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে। ঈথরের অবস্থান্তর প্রাপ্তির জন্য যে তাপের প্রয়োজন, তাহার অনেকটা ঐ শিশির জল হইতে আসিয়াছে; এবং তাহার ফলে ঐ জল বরফে পরিণত হইয়াছে।

কিন্তু ঈথরের উপর জোরে বাতাস করিবার কথা কেন বলা হইল?

ঈথর, এসেন্স, জল প্রভৃতি পদার্থের তরল হইতে বায়বীয় অবস্থায় পরিবর্ত্তন নানা উপায়ে বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। তাহার মধ্যে একটা বিশিষ্ট উপায় হইল, নূতন বাতাসের আমদানি। কথাটা এই,—ভাঁড়ার নিরাপদ থাকে, যদি আকণ্ঠ ভোজন করাইবার পর কাহাকেও ভাঁড়ারের হেপাজতের ভার দিয়া রাখা যায়। ঈথরের উপরিস্থিত বাতাসের, ঈথর প্রভৃতি হইতে উত্থিত বাষ্প গ্রহণ করিবার

একটা সীমা আছে। সেই সীমায় যখন পৌঁছায়, উপরকার বাতাস যখন বাষ্পে একেবারে আকণ্ঠ ভরপুর হইয়া বলে, না, আর চলে না,—তখন তরল পদার্থের বায়বীয় আকারে পরিবর্ত্তন একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ভাঁড়ার খালি করাই যদি উদ্দেশ্য হয়,—চাও যদি যে ঈথরটা শীঘ্র-শীঘ্র উপিয়া যায়,—তাহা হইলে তাড়াও সেই বাতাস যাহার পেট ভরিয়া গিয়াছে;—নূতন-নূতন অভুক্তের দলকে লইয়া এস;—হাওয়া করিয়া তাজা বাতাস আমদানি কর। তাই দেখা যায়, বর্ষার দিনে বাতাস জলীয় বাষ্পে বোঝাই থাকে, তখন ভিজা কাপড় প্রায় শুকাইতে চায় না। কিন্তু শীতকালে বাতাসে যখন ঐ জলীয় বাষ্পের অত্যন্ত অভাব, তখন কাপড় হুহু করিয়া শুকায়; এবং সোণায় সোহাগা হয়, যদি জোরে বাতাস চলিতে থাকে। এই কারণেই দেখা যায়, বৃষ্টির পর, হাওয়া জোরে চলিলে, রাস্তার কাদা শীঘ্র শুকায়। জলের কুঁজা বেলে মাটির হওয়ায় বাহিরটা ভিজা থাকে; এবং তথা হইতে হাওয়ায় জল শীঘ্র-শীঘ্র বায়বীয় আকার ধারণ করে। ইহার জন্য যে তাপের প্রয়োজন, তাহা ভিতরের জল হইতে আসে; কাজেই জল ঠাণ্ডা হয়।

তরল পদার্থের বায়বীয় আকারে পরিবর্ত্তন যে হেতু কেবল মাত্র উপরের খোলা ভাগ হইতে হইয়া থাকে, সেই কারণে, পাত্র যত প্রশস্ত হয়, এই প্রক্রিয়া ততই দ্রুত হইতে থাকে। তাই দেখি, মায়েরা যখন তাড়াতাড়ি গরম দুধ জুড়াইতে চান, তখন বিজ্ঞান পড়া না থাকিলেও, তাঁহারা দুধ বাটী হইতে একটা থালায় ঢালেন; এবং শুধু তাহাতেই নিশ্চিত থাকেন না,—সেই দুধের উপর হাওয়া করিতে থাকেন।

আরও অনেক প্রকারে তরল পদার্থের বায়বীয় আকারে পরিবর্ত্তনের গতি বর্দ্ধিত করা যায়। তন্মধ্যে একটা হইল, তাপের বৃদ্ধি; আর একটা, উপরকার বাতাসের চাপের হ্রাস। তাপ বাড়িলে বা তাপ কমিলে কেন এই পরিবর্ত্তন দ্রুত হয়, তাহা এই ভাবে বেশ সহজে ধারণায় আনা যায়। পদার্থ মাত্রেই কঠিন, বা তরল, বা বায়বীয় অগণ্য অণুর সমষ্টিমাত্র। এই অণুগুলি চুপ করিয়া নাই,—ছুটাছুটি করিতেছে। বায়বীয় অবস্থায় এই অণুগুলি ভীমবেগে ছুটিতেছে; তরল অবস্থায় এই গতি অনেকটা মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। একটা পাত্রে খানিক জল আছে। জলের উপরকার যে স্তরটা বাতাসের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে, তাহার অণুগুলি বাতাসে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে; সম্পূর্ণ ভাবে কৃতকার্য্য হইতেছে না, কারণ, উপরকার বাতাসের চাপ প্রতিরোধ করিতেছে। এ যেন অভিভাবক বা শিক্ষকের কৃত্রিম চাপ শিশুদিগের চাঞ্চল্যকে কোনরূপে দমিত করিয়াছে। তাপ দিলে অণুগুলির গতি বর্দ্ধিত হয়। ফলে, আরও অধিক সংখ্যক অণু বাতাসে চলিয়া যায়। আর এই প্রতিকূলতার যদি কোনরূপ লাঘব ঘটে,—বাতাসের চাপ যদি কোনরূপে কমানি যায়, তাহা হইলে, অণুগুলি দ্রুতবেগে তাহাদের স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবে।

বাহিরে বাতাসের চাপের পরিবর্ত্তন ঘটিলে, তরল পদার্থ যে উত্তপ্ততায় ফোটে, তাহার পরিবর্ত্তন ঘটে। যেমন ধর জল। জল একশ ডিগ্রীতে ফোটে, যদি বাহিরে বাতাসের চাপ ৭৬ সেন্টিমিটার পারার চাপের সমান হয়। কিন্তু চাপ যদি ৭৬ সেন্টিমিটার না হইয়া কম হয়, তাহা হইলে জল একশ ডিগ্রীরও কমে ফুটিবে। এ সম্বন্ধে এক মজার পরীক্ষা করা যাইতে পারে। একটা কাচের পাত্রে জল ফোটাও। সেই অবস্থায় টপ্ করিয়া তলা হইতে উত্তাপ সরাইয়া, পাত্রের মুখটা ছিপি দিয়া বন্ধ করিয়া দাও। এইবার এই পাত্রের উপর ঠাণ্ডা বরফ-জল ঢাল; দেখিবে, পাত্রের ভিতরকার জল ফুটিতেছে। সে কি কথা! গরম তো করিলাম না,—বরং ঠাণ্ডা জল ঢালিলাম; তাহাতেই জল ফুটিতে লাগিল? ঠিক তাই! ব্যাপারটা হইতেছে এই—জল ফুটিতেছিল; সেই অবস্থায় মুখ বন্ধ করা হইয়াছে; তাহাতে ভিতরকার অনেকটা বাতাস চলিয়া গিয়াছিল। এবং সেই বাতাসের স্থান জলীয় বাষ্পে বোঝাই ছিল। এখন উপরে বরফ জল ঢালায়, ভিতরের জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডায় আবার জলে পরিণত হইয়াছে,—খানিকটা স্থান শূন্য হইয়া গিয়াছে। চাপ খুব কমিয়াছে। কম চাপে খুব অল্প উত্তপ্ততায়ও জল ফোটে; তাই জল ফুটিল। মনে হইল, যেন শৈত্য ভিতরকার জলকে ফুটাইল; কিন্তু আসলে এই সব ব্যাপার ঘটিল।

হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, বাহিরের চাপ যদি মোটামুটি ২.৭ সেন্টিমিটার কম হয়, তো জল এক ডিগ্রী কম উত্তপ্ততায় ফোটে; অর্থাৎ, বাহিরের চাপ যদি ৭৬ সেন্টিমিটার না হইয়া ৭৬ হইতে ২.৭ কম, অর্থাৎ ৭৩.৩ সেন্টিমিটার হয়, তো জল ফুটিবে ১০০ এর এক ডিগ্রী কমে, অর্থাৎ ৯৯ ডিগ্রীতে। এই মোটামুটি এই হিসাবেই চলে। সুতরাং জল কত ডিগ্রীতে ফুটে, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ফস্ করিয়া ১০০ ডিগ্রী উত্তর

দিলে, সেটা ঠিক উত্তর হইবে না; আর একটা সংবাদের প্রয়োজন—বাহিরের চাপ কত? সেই চাপ যদি ৭৬ সেণ্টিমিটার পারার সমান হয়, তাহা হইলে অবশ্য ১০০ ডিগ্রীতে ফুটিবে। কিন্তু তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে আগেকার হিসাব অনুসারে ঠিক করিতে হইবে, কত ডিগ্রীতে ফুটিবে। অভ্যন্তরে, জল কত ডিগ্রীতে ফুটিতেছে দেখিয়া, বাহিরের বাতাসের চাপের পরিমাণ ঠিক করিতে পারা যায়। ধর, কোন পর্ব্বতে উঠিয়া দেখিলাম, সেখানে জল ৯৫ ডিগ্রীতে ফুটিতেছে। ১০০ হইতে ৫ ডিগ্রী কম; অতএব সেখানকার বাতাসের চাপ হইবে ৭৬ সেণ্টিমিটার হইতে (৫×২.৭) ১৩.৫ সেণ্টিমিটার কম অর্থাৎ ৬২.৫ সেণ্টিমিটার। এখন আর একটা হিসাব আছে, যাহাতে জানা যায় যে মাটি হইতে এত ফিট উঠিলে চাপ এত সেণ্টিমিটার কমে। সুতরাং এই চাপের পরিমাণটা হিসাব করিয়া তখনই বলিয়া দিব, সেই স্থানের উচ্চতা কত। অতএব কোন পর্ব্বতের উচ্চতা মাপিতে যাইবার সময়, সঙ্গে দড়িদড়া, মাপিবার যন্ত্রপাতি কিছুই লইতে হইবে না;—শুধু একটা তাপমান যন্ত্র লও, তাহাতেই মোটামুটি কাজ চলিবে

জাতি-বিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ]

৪

ঋগ্বেদের ঋষি একদিন প্রাণমাতান সুরে পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগাইয়া গাইয়াছিলেন—

'অনু প্রত্নস্যৌকসো হুবে তুবি প্রতিং নরং।
যং তে পূর্ব্বং পিতা হুবে।'—১।৩০।৯

মানবের সেই 'প্রত্ন ওকঃ' বা আদিম লীলা-নিকেতনের নিরূপণ সমস্যা লইয়া নৃতত্ত্ববিদ্ ও জাতিতত্ত্বকুশল পণ্ডিত-মণ্ডলী অন্যান্য মনীষীদের ন্যায় গবেষণার চূড়ান্ত করিয়াছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক ও প্রাণিবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণও এ সম্বন্ধে কম আলোচনা করেন নাই। ছয়ট্টি বৎসর পূর্ব্বে নট্ (Nott) ও গ্লিডন্ (Gliddon) নামে দুইজন আমেরিকান পণ্ডিত "The Types of Mankind" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বইখানির তাৎকাল নামে সকলেই আকৃষ্ট হয়। মানব-জাতি মূলে এক না হইয়া যে বহুবিধ, ইহাই প্রমাণ করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকারের দেখান অভিপ্রায় যে, মানুষ প্রথমে বহু প্রকারের ছিল;—এক জাতীয় মানবের বংশধরের সহিত অপর জাতীয় মানবের বংশধরের কোন সম্পর্কই ছিল না। এইটুকুই এই গ্রন্থের প্রধান বক্তব্য। সুতরাং এই গ্রন্থের মতে আদিম মানবের প্রত্নবাস-ভূমির অনেকগুলি কেন্দ্র স্বীকার করিয়া লওয়া হইতেছে। আফ্রিকান প্রভৃতি কয়েকটী জাতির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিয়াই এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছিল। এইজন্য হয় ত বৈজ্ঞানিক জগতে ইহার সমাদর হইত না। কিন্তু এই গ্রন্থে সেই সময়ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডক্টর মর্টন (Dr. S. G. Morton) ও অধ্যাপক লুই আগাসি—(Prof. Louis Agassiz) লিখিত নিবন্ধ সংযোজিত থাকায়, জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ এই গ্রন্থের মত একেবারে উড়াইয়া দিতে সাহসী হন নাই। তবে তাঁহারা তৎকালীন জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণায় আমেরিকার জাতিতত্ত্ববিদ্‌দের আদৌ সম্মান দেন নাই। (অবশ্য বর্ত্তমানকালে ইঁহাদের আসন অতি উচ্চে।) কাস্‌পারির (Caspari) গ্রন্থোক্ত পেশেলের (Oscer Peschel) (১) উক্তি হইতে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সিমোনিন্(২) (Simonin) ও রেভিল্(৩) (A. Réville) আগাসির মতবাদের যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন। জাতির বহুত্ব সূচক মত আজকাল আর কেহই সমর্থন্ করেন না। আলেক্‌জণ্ডার

১। Die Urgeschichte der Menschheit. Second Ed, Leipsic, 1877, Vol I, p 241.

২। L'Homme American. Paris, 1870. p. 12.

৩। Les Religions des Peuples non-civilisés. Paris, 1883-Vol. I. p. 196.

উইন্‌চেল্‌(৪) (Alexander Winchell) স্পষ্টই লিখিয়াছেন —"The plural origin of mankind is a doctrine now almost entirely superseded. All schools admit the probable descent of all races from a common stock." ফরাসী নৃতত্ত্ববিদ্‌ কাতরফাজও(৫) (Quatrefages) আগাসির মতের যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এ দিকে, মানুষ যখন কোন এক বিশেষ স্থান হইতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এই মত স্থির হইল, তখন, সেই প্রত্নভূমি কোথায়, তাহার গবেষণায় পণ্ডিতমণ্ডলী প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ স্থির করিলেন, একদিকে গ্রীনল্যাণ্ড হইতে মধ্য আফ্রিকা, এবং অপর দিকে আমেরিকা হইতে মধ্য-এসিয়া পর্য্যন্ত দশটা স্থানে মানবের আদিম জন্মভূমি ছিল। এই উপলক্ষে কেহ ভারত মহাসাগরের দক্ষিণাংশে অধুনা লুপ্ত 'লেমুরিয়ার' আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। হেকেল, কাস্‌পারি, পেশেল প্রভৃতি পণ্ডিতেরা ইহার পোষকতা করিতে লাগিলেন। কোন পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিলেন, মধ্য-এসিয়ার পামির উপত্যকাই মানবের আদিম লীলাস্থলী। অনেকেই এই মতের সমর্থন করেন। এই মত সমর্থনকারীদিগের মধ্যে লাসেন, (Lassen), বুরনুফ (Burnouf), ইয়াল্‌ড্‌ (Ewald), ওব্রী (Obry), ডেক্‌স্টাইন (D'Eckstein), হোফের (Hofer), সেনার (Senart), মাসপেরো (Maspero), লেনরমাণ্ট (Lenormant) প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষিগণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। বর্ত্তমান কালের প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ্‌ ম্যাথিউ (W. D. Mathew) ও নৃতত্ত্ববিদ্‌ জিউফ্রিদা রুজ্জেরিও (Giufrida Ruggeri) বলেন, মধ্য-এসিয়া হইতে মানব সর্ব্বপ্রথম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করে।

এ ছাড়া আরও অনেক রকম মতের আবির্ভাব হয়। আমরা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সে সমস্ত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। এক্ষণে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, মধ্য-এসিয়া হইতেই মানব নানা দিকে ছড়াইয়া পড়ে। মধ্য-এসিয়া হইতেই মানবের প্রথম প্রব্রজন আরম্ভ হয়।

Indian Geological Survey-র ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ ইণ্ডো-আফ্রিকান মহাদেশের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান ভারত-মহাসাগরের মধ্যে এই মহাদেশের নিদর্শন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকা, মাডাগাস্কার, সেশেল (Seychelles) ও অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জ এবং দাক্ষিণাত্য, এই সমস্ত স্থান মানবের প্রথম প্রব্রজন-(Migration) প্রচেষ্টার সময় বিচ্ছিন্ন ছিল না; ইহাদের মধ্যে জলের কোন ব্যবধান ছিল না। এগুলি তখন পরস্পর সংযুক্তই ছিল। এসিয়াটিক মহাদেশ ও সণ্ডা (Sunda) প্রদেশের (অর্থাৎ বোর্নিও, সুমাত্রা ও যবদ্বীপের) মধ্যবর্ত্তী জলভাগ অতি অগভীর—ইহার কোন অংশ ৫০ ব্যামের অধিক গভীর নয়। সণ্ডা-প্রদেশ অতি সঙ্কীর্ণ প্রণালী দ্বারাই এসিয়া মহাদেশ হইতে বিযুক্ত হইয়াছে। এ দিকে আবার এই প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ নিউগিনী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা আরও পশ্চিমে ইহার প্রসার ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের মধ্যে টোরেস-প্রণালীর ব্যবধান মাত্র আছে। এক্ষণে নিউ জীলণ্ডের আয়তন খুব বড় নয়, পূর্ব্বে ইহার আয়তন আরও বড় ছিল। সম্প্রতি ১৮৯৭ সালে এলিস দ্বীপপুঞ্জের মধ্যবর্ত্তী ফুনাফুটী দ্বীপে বেধনী (Boring) যন্ত্র-সাহায্যে সুগভীর প্রবালস্তর পর্য্যন্ত যে পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহার ফলে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, পলিনেসিয়ার বিশাল কলেবরের অস্তিত্ব অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের। এই ত গেল এক দিকের কথা। অপর দিকে ইয়ুরোপের সঙ্গে আফ্রিকার যে অন্ততঃ তিনটা স্থানে সংযোগ ছিল, তাহা হস্তী, তরক্ষু, করিযাদঃ (hippopotamus) বৃহজ্জাতীয় সিংহ প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চলবাসী আরণ্য পশুশ্রেণীর অস্তিত্ব হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। টিউনিস, পানটেলারিয়া, সিসিলি, মাল্টা ও ইতালীর মধ্যে এবং আরও পূর্ব্বে সিরেনেকা ও গ্রীসের মধ্যে জলের কোন ব্যবধান ছিল না। বর্ত্তমান ব্রিটেন ইউরোপ মহাদেশের কুক্ষিগত ছিল। বেরিং ষ্ট্রেটের মধ্য দিয়া আলাস্কা পর্য্যন্ত দুই দিকের প্রায় বরাবর স্থলভাগ ছিল; আর উত্তর-পশ্চিম ইয়ুরোপ হইতে আরম্ভ করিয়া ফারোদ্বীপ-পুঞ্জ ও আইসলণ্ডের মধ্য দিয়া গ্রীনলণ্ড ও উত্তর আমেরিকা

৪। Preadamites; or a Demonstration of the existence of Men before Adam. Chicago, 1880: p. 297.

৫। The Human Race. New York. 1879, ch. XIV.

পর্য্যন্ত স্থল ছিল। উল্লিখিত ভূমিগুলির পরস্পর সংযোগ থাকায় বহ্বাধুনিক যুগের মানবের পক্ষে তাঁহার প্রথম লীলাভূমি মধ্য এসিয়া হইতে পৃথিবীর বাসোপযোগী সমস্ত স্থানে বিস্তৃত হইবার যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা ছিল। মধ্য এসিয়া হইতেই যে তাঁহার প্রব্রজন আরম্ভ হইয়াছিল, ইহা প্রায় সকল পণ্ডিতই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখিবেন যে, বহ্বাধুনিক ও অন্ত্যাধুনিক যুগে মধ্য এসিয়াই মানব-প্রব্রজনের প্রশস্ত পন্থা ছিল। অন্য পথে প্রব্রজন তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না বলিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী বিজ্ঞান-সম্মত এই মতটী নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইয়াছেন। সম্প্রতি এই কয়েক বৎসরের মধ্যে সকল দেশের বিদ্বৎসমাজ যে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের সাহায্যে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, অন্ত্যাধুনিক যুগের প্রথমাবস্থায় অথবা Tertiary যুগের পরিপক্কাবস্থায় সমস্ত পৃথিবী প্রাথমিক মানব দ্বারা অধ্যুষিত হইয়াছিল। এ সিদ্ধান্ত সত্য হইলে স্বতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বর্ত্তমান সমস্ত মানববংশ অন্ত্যাধুনিক যুগের মানব-সাধারণের prototype বা আদর্শ-সঞ্জাত। এই মানবাস্থির এবং প্রাথমিক শিল্পকলার ধ্বংসাবশেষ সর্ব্বত্র পাওয়া যাইতেছে। ঐ সমস্ত জিনিস যে শুধু তৎকালের অনুরূপ, তাহা নহে, উপাদানের পার্থক্য ছাড়িয়া দিলে স্যর জন ইভান্সের (Sir J. Evans) ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, সেগুলির ঐক্য এত বেশী, যে একই হাতের তৈয়ারি বলিতে পারা যায়। ('So identical that they might have been manufactured by the same hands')। পরবর্ত্তী কালের জাতিগত পার্থক্যের পূর্ব্বে পৃথিবীতে এক আদিম মানব (proto-human form) ছিল। আমরা যে সমস্ত বৈষম্য ও বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই, সেগুলি ক্রমশঃ পরে বিভিন্ন ভৌগোলিক সংস্থানে ভিন্ন ভিন্ন পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও সমঞ্জসী-করণের ফলে সৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, সাধারণতঃ নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের স্বীকৃত ইথিওপিক বা নিগ্রো, মোঙ্গোলিক বা পীত, আমেরিকান বা ঈষৎ তাম্র এবং ককেসিক বা শ্বেত, এই চারিটী প্রাথমিক বিভাগের প্রত্যেকেরই অন্ত্যাধুনিক পূর্ব্বপুরুষ আছে। এই পূর্ব্বপুরুষের কেন্দ্র হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া অথবা প্রায় সমান্তর স্বাধীন ভাবে এই চারিটী বিভাগের উৎপত্তি হইয়াছে। শ্বেত হইতে কৃষ্ণবর্ণ, পীত হইতে শ্বেত বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে একটী হইতে অপরটী উদ্ভূত হইয়াছে, এই প্রকারের কষ্টকল্পনা কোনরূপেই সম্ভব নয়।

যাহা হউক, প্রাথমিক শ্রেণী-প্রতিষ্ঠাপক এই কেন্দ্রাপ-সরণের (divergence) পরে কেন্দ্রসমবায়ের (convergence) সূচনা হয়। কতক পূর্ব্বেই হইয়াছিল, কতক কিছু পরে; কিন্তু ফলে পূর্ব্ববর্ণিত সংমিশ্রণ ঘটে। ইহাতে মূল আদর্শ কোথাও বা পরিবর্ত্তিত এবং কোথাও বা একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। কাজেই যাঁহারা মানবজাতির এত প্রকারের বিভাগের পর্য্যায় নিরূপণ করিতে ব্যস্ত ছিলেন, তাঁহাদের মাথা ঘুরিয়া গেল, তাঁহাদের চেষ্টা বিফল হইতে লাগিল। প্রাচীন প্রস্তরযুগ শেষ হইবার পূর্ব্বে উচ্চ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিভিন্নতার মূল সম্পূর্ণভাবে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। দুএকটা উদাহরণও দেওয়া যাইতে পারে। ১১,০০০ বৎসর পূর্ব্বে যে মিসরে পূর্ণাঙ্গের সমাজ-নীতি ও রাজনীতি ছিল, তাহার নিদর্শন ওপেট (Oppert) দেখাইয়াছেন। ইউরোপীয় আকৃতিবিশিষ্ট মানব মিসরের পঞ্চম বংশীয় Prince Nenkheftkar (৩৭০০ পূঃ খৃঃ ?) স্থাপত্য প্রতিকৃতি অধ্যাপক ফ্লিন্ডার্স পেট্রী ১৮৯৭ সালে বাহির করেন। অক্কডদিগের রাজা Ensagsaganar প্রতিকৃতি ইহা অপেক্ষাও প্রাচীন। ইহার আকৃতির সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, ইহা সেমেটিক বা আর্য্য-ভাবাপন্ন। সুতরাং আমরা এই সমস্ত প্রমাণের বলে বলিতে পারি যে, নবযুগ প্রবর্ত্তনের কয়েক সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ককেসিক type বা আদর্শ যে শুধু সঞ্জাত হইয়াছিল, তাহা নহে, প্রত্যুত ইহা মিসর ও বাবিলনিয়ার বিপুল পরিসরের মধ্যে বিশেষভাবে সঞ্চারিত হইয়াছিল। এই বিবর্ত্তন পূর্ণমাত্রায় সঙ্ঘটিত হইতে যে বহু বর্ষ লাগিয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রাথমিক শ্রেণীগুলি নবপ্রস্তরযুগের প্রাক্কালেই সুবিভক্ত হইয়াছিল।

সন্তরণ প্রতিযোগিতা

গত কয়েক বৎসর হইতে কলিকাতায় বাঙালী বালক ও যুবকগণের মধ্যে সন্তরণ শিক্ষার একটা আগ্রহ দেখা যাইতেছে। গোলদীঘি ও হেদুয়ার পুষ্করিণীতে দুইটি সাঁতার ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাগবাজার ও আহিরীটোলা

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

অঞ্চলেও কয়েকটি "সাঁতার ক্লাব" আছে। এ অঞ্চলের ছেলেরা গঙ্গায় সাঁতার অভ্যাস করে। শরীর ও স্বাস্থ্যের উন্নতির পক্ষে সন্তরণ যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যায়াম, স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদেরা অনেকেই এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সন্তরণ শিক্ষায় সাধারণকে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রতি বৎসর একটি করিয়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়। এ বৎসর পয়লা অক্টোবর গোলদীঘিতে এবং দোস্রা অক্টোবর হেদুয়ার পুষ্করিণীতে এইরূপ দুইটি প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। গোলদীঘিতে এইরূপ প্রতিযোগিতা আজ নয় বৎসর ধরিয়া হইতেছে। এ সম্বন্ধে অনেকেই জানেন; এবং "ভারতবর্ষে"ও পূর্ব্বে তাহার সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এবার আমরা দ্বিতীয় প্রতিযোগিতাটির কিছু পরিচয় দিতেছি। এই প্রতিযোগিতা 'কেন্দ্রীয় সন্তরণ সমিতির' সভ্যগণ কর্ত্তৃক এই বৎসর প্রথম আরম্ভ হইয়াছে। ইহার প্রধান বিশেষত্ব ছিল, কয়েকটি পারিতোষিকের বিলাতী নামের পরিবর্ত্তে খাঁটি স্বদেশী নাম; এবং এক মাইল সন্তরণ-প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান ইতঃপূর্ব্বে এ দেশের কোনও সমিতিতেই হয় নাই; এ বিষয়ে 'কেন্দ্রীয় সন্তরণ সমিতি'ই প্রথম পথ প্রদর্শন করিলেন। এই প্রতিযোগিতায় শ্রীমান প্রফুল্লকুমার ঘোষ নামক একটা কুড়ি বৎসরের যুবক সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। চারিটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার এবং শ্রেষ্ঠ পদকগুলি, এই যুবকটি, তাহার অদ্ভুত সন্তরণ-শক্তি প্রদর্শন করিয়া, জিতিয়া লইয়াছে। প্রত্যেক খেলায় এই যুবক যে সময়ের মধ্যে বাজী জিতিয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়; কারণ, ভারতবর্ষে ইতঃপূর্ব্বে এত অল্প সময়ের মধ্যে আর কেহ উক্ত বাজীগুলি জিতিতে পারে নাই। প্রফুল্ল সাতাশ মিনিট আটায় সেকেণ্ডের মধ্যে এক মাইলের বাজী জিতিয়া 'গুরুদাস চ্যালেঞ্জ কাপ' পাইয়াছে; তের মিনিট একুশ সেকেণ্ডের মধ্যে আধ মাইলের বাজীতে জিতিয়া "অক্ষয় সম্পুট" অর্জ্জন করিয়াছে; ৬মিঃ ২৮½ সেঃ মধ্যে ৪৪০ গজের বাজী জিতিয়া "সরকার চ্যালেঞ্জ কাপ" পাইয়াছে; এবং ৩মিঃ ১সেঃ মধ্যে ২২০ গজের বাজী জিতিয়া 'কার-নোবীশ চ্যালেঞ্জ কাপ" লইয়াছে। ১১০ গজের বাজীতে 'এম, সি সরকার চ্যালেঞ্জ কাপ' পাইয়াছেন শ্রীযুক্ত জে গোস্বামী (সময় ১মিঃ ১৩সেঃ)। ছাত্রগণের মধ্যে ১১০ গজের বাজী জিতিয়া "অমিয় স্মৃতি সম্পুট" পাইয়াছে শ্রীমান

সন্তরণকারীদিগের প্রতিকৃতি
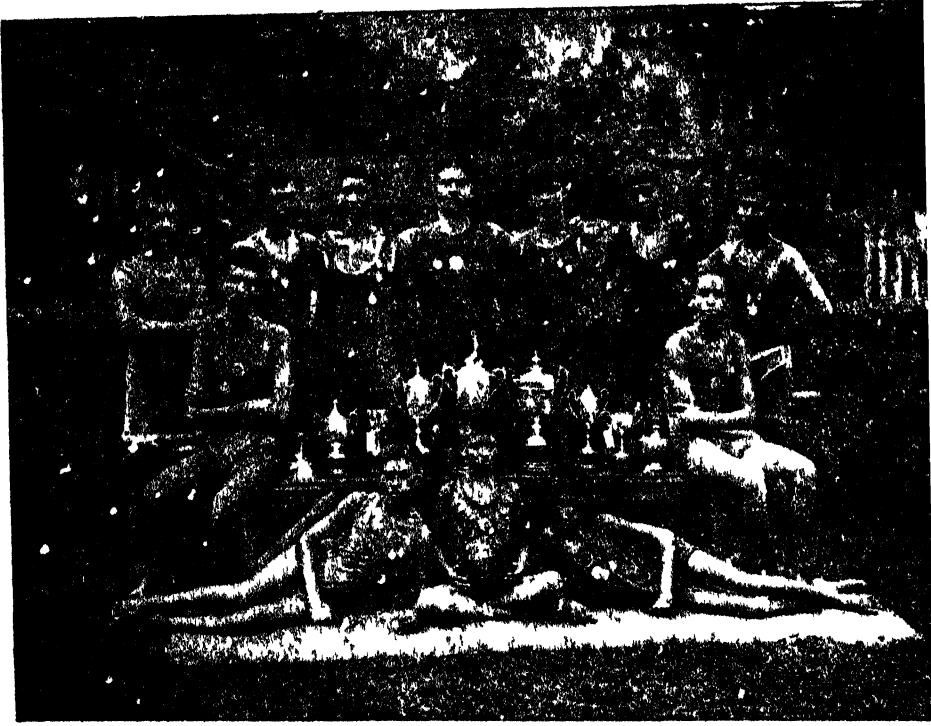
এন্ ঘোষ (সময় .মিঃ -· সে·)। ..১০ গজ চিৎ সাতারে 'কুঠারী চ্যালেঞ্জ্ কাপ্ পাইয়াছেন শ্রীযুক্ত সি বসু (সময় ১ মিঃ ৪৫ সেঃ)। ডুবঝাঁপের বাজীতে (plunge for distance) 'সুশীল সরকার কাপ্' পাইয়াছেন শ্রীযুক্ত —এম, দে (দূরত্ব—৬৫ ফিট্ ৯ ইঞ্চ)। ২২০ গজ 'ভাগে সাঁতার' (Relay Race) বাজীতে 'ধীরেন চ্যালেঞ্জ্ শীল্ড্" পাইয়াছেন শ্রীযুক্ত এস, পালের দল (সময়—২ মি. ২৮২/৫ সেঃ)। মগ্ন ত্রাণ প্রতিযোগিতায় শ্রীযুক্ত আর, রক্ষিত "মৃণাল ঝারী" পুরস্কার পাইয়াছেন। বালকদের ৫৫ গজ বাজীতে শ্রীমান জি, গাঙ্গুলী—প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ভারতী সম্পুট" লাভ করিয়াছেন। বালকদের 'ভাগে সাঁতার' বাজীতে 'কালী মেমোরিয়াল কাপ্' পাইয়াছেন শ্রীযুক্ত বি, পালের দল। সৌখীন সাঁতার খেলায় (Fancy swimming) প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। 'জল পোলো' খেলায় শ্রীযুক্ত এস্ পালের দল জিতিয়াছে, এবং—'আনাড়ীদের সাঁতার খেলায়' (Novices' Race) শ্রীযুক্ত এন সিংহ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। (সময়—১ মি ৪৫২/৫ সে)

পাইকপাড়ার কুমার বাহাদুর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ সভাপতি হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মোরেনো সাহেব (Mr. H. W B Moreno) বিচারক হইয়াছিলেন, এবং শ্রীমতী ডি, এন, মৈত্র মহোদয়া পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন।

নিখিল প্রবাহ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]
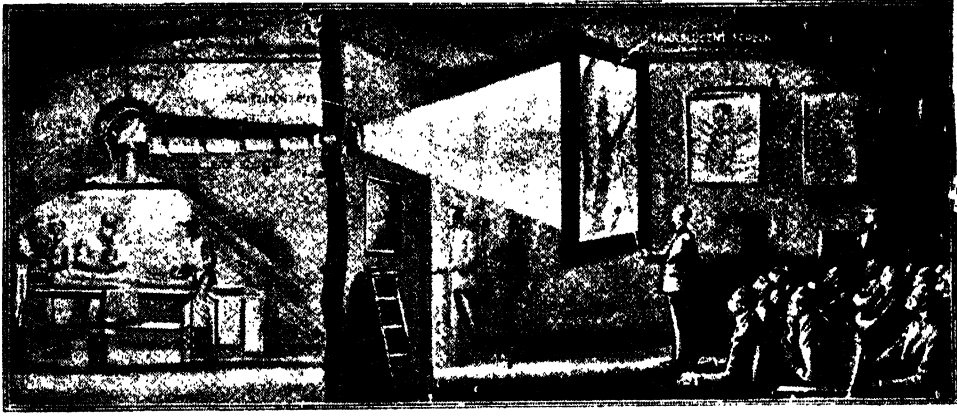
অস্ত্র-চিকিৎসা শিক্ষা

১। অস্ত্র-চিকিৎসা শিক্ষার নূতন উপায়।

হার্ব্বার্ট সিল্‌ভার নামে জনৈক সিন্‌সিনাটির অধিবাসী একটি নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন ; তাহার দ্বারা চিকিৎসা বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ হাসপাতালের বড় বড় কঠিন অস্ত্র-চিকিৎসাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। ইতঃপূর্ব্বে রোগীর দেহে অস্ত্র প্রয়োগের সময় প্রধান

মগ্ন-ত্রাণ-তরী

চিকিৎসক, তাঁহার সহকারী এবং দু'একজন নার্স ব্যতীত অপর কাহারও রোগীর কক্ষে প্রবেশাধিকার না থাকায়, অন্য কেহই তাহা দেখিবার সুযোগ পাইত না। এখনও যদিও সেই নিয়মই বজায় আছে, কিন্তু রোগীর কক্ষের নিকটস্থ অন্য একখানি ঘরে ছাত্রদের বসাইয়া, কোনও শিক্ষক অনায়াসে পূর্ব্বোক্ত কক্ষে অনুষ্ঠিত অস্ত্র-চিকিৎসার প্রত্যেক অঙ্গ কাজটুকু পর্য্যন্ত ছাত্রদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইতে পারিবেন ; এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার বিশদ আলোচনা করিয়া,

শরীরের অবস্থা

তাহাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান দিতে পারিবেন। এই যন্ত্রটি অনেকটা 'সাব্‌মেরীণে' ব্যবহৃত 'পেরিস্কোপ' ধরণের ; তবে ইহার সহিত আলোক-চিত্র প্রতিফলিত হইবার ব্যবস্থা থাকায়, অনেক সুবিধা হইয়াছে। অস্ত্র-চিকিৎসার প্রত্যেক ব্যাপার
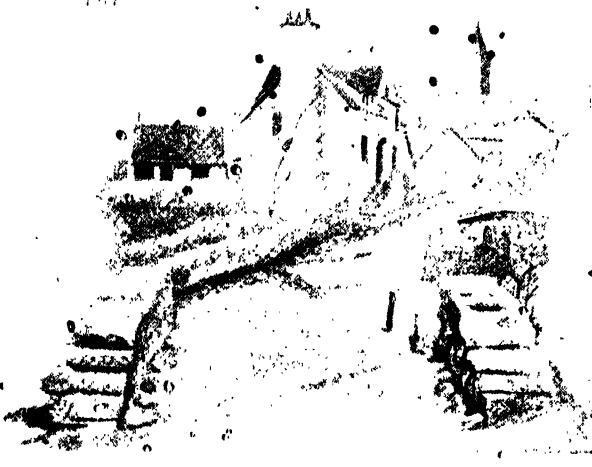
স্কচ্ দেশের একটি নকল গ্রাম

(পথ ঘাট ঘর-বাড়ী, এমন কি শুক্‌নো গাছটি পর্য্যন্ত স্কচ-দেশের একটী গ্রামের হুবহু নকল করিয়া গড়া হইয়াছে। যাহারা স্কচ্-দেশের সহিত পরিচিত, তাঁহারা পর্য্যন্ত এই নকল গ্রামের কৃত্রিমতা ধরিতে পারিবে না)

উক্ত পেরিস্কোপ-সংযুক্ত চিত্রালোকের সাহায্যে পার্শ্বের কক্ষে প্রলম্বিত পর্দ্দার উপর—বায়োস্কোপের ছবির মত বর্দ্ধিত আকারে প্রতিফলিত হয়; এবং শিক্ষক সেই চিত্রের সাহায্যে ছাত্রদের উহা বুঝাইয়া দেন।

অতঃপর এই যন্ত্রের সাহায্যে, কারখানার মালিক তাঁহার আপিস ঘরে বসিয়াই, অন্য কাজ করিতে-করিতে, মিস্ত্রীরা কি করিতেছে না করিতেছে, তাহাও পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(Popular Science)

২। মগ্ন-ত্রাণ তরী।

আমিষ্টাডামের কারিকরেরা এই অভিনব নৌকা নির্ম্মাণ করিয়াছে। ইহা বেতের তৈয়ারী বলিয়া অত্যন্ত হাল্কা; এবং চারিপার্শ্বে সোলার বেষ্টনী থাকায়, ধাক্কা লাগিয়া ভাঙিয়া যাইবার বা উল্টাইয়া পড়িবার আশঙ্কা নাই। এই নৌকার উপর একখানি বারি-বারণ (water-proof) আবরণ আছে বলিয়া, হঠাৎ উল্টাইয়া পড়িলেও, ইহার ভিতর জল ঢুকিতে পারে না। আকারে বৃহৎ বলিয়া ইহাতে অনেকগুলি আরোহীর প্রাণ-রক্ষা হইতে পারে; এবং উপরে আচ্ছাদন থাকায়, শীতে, হিমে, জল-ঝড়েও রাত্রিবাসের বাধা হয় না।

(Popular Science)

৩। শরীরের অবস্থা নির্ণায়ক যন্ত্র।

রোগীর আরোগ্য হইবার স্বাভাবিক শক্তি কি পরিমাণ অবশিষ্ট আছে, এবং উহা বাড়িতেছে কি কমিয়া আসিতেছে, উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে আজ-কাল যে কেহ তাহা অনায়াসে জানিতে পারিবে। প্রত্যেকের শরীরের মধ্যেই সৃষ্টি ও ধ্বংসের অবিরাম দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী জীবাণুগুলি যদি সমান শক্তিতে না যুঝিতে পারে, তবে রোগ অবশ্যম্ভাবী। যেমন, শরীর যে পরিমাণ জল গ্রহণ করিতে পারে, তদনুপাতে যদি বাহির করিয়া না দিতে পারে, তাহা হইলে উদরী রোগের উৎপত্তি হয়। সুতরাং শরীরের অবস্থা সঠিক জানিতে পারিলে, চিকিৎসার বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া, উক্ত যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হইয়াছে। রোগী একটি রবারের নলের ভিতর

বাতিওয়ালাকে সঙ্কেত করিবার চাবি

বৈদ্যুতিক বাতি-ঘর

নকল বাড়ী

বাড়ীর ভিতরের দৃশ্য রঙ্গমঞ্চের উপর তোলা হইতেছে

বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগ

বাক্সবন্দী বন্ধ ক'রে

জ্যোৎস্নালোকিত পূর্ণিমার নকল দৃশ্য
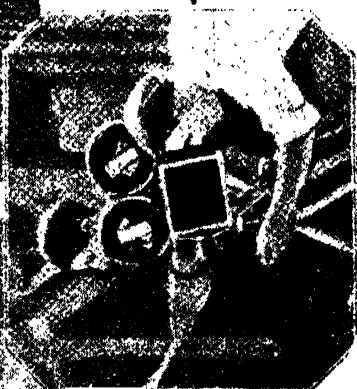
চিকিৎসকেরা রোগীর শরীরের অবস্থা বুঝিতে পারেন; এবং তদনুসারে চিকিৎসা করেন।

(Popular Science)

৪। চিত্রে নকল দৃশ্য।

বায়োস্কোপের ছবিতে মাঝে মাঝে বহু প্রাচীন যুগের সহর ও গ্রামের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ছবিতে সেগুলির কৃত্রিমতা একটুও ধরিতে পারা যায় না। সহরের ঘরবাড়ী ও গ্রামের পথঘাট প্রভৃতি আগাগোড়াই সত্য

ছানা সমেত পাখীর বাসা

(এই দৃশ্যটি তুলিবার জন্য যথার্থই গাছের উপর উঠিয়া সত্যকার পাখীর বাসার ছবি লইতে হইয়াছে)

বলিয়া ভ্রম হয়; অথচ তাহার কোনটাই সত্য নয়। সমস্তই নকল বুঁদির কেল্লার মত কাদামাটি, কাঠখড়ের তৈয়ারী। তাও সম্পূর্ণ নয়,—কেবল সম্মুখ-ভাগটা, অর্থাৎ শুধু যে অংশটুকু গড়া হয়; বাকিটা অসম্পূর্ণই থাকে। বায়োস্কোপ কোম্পানীকে, ছবির প্রয়োজন অনুসারে, পৃথিবীর নানা দেশের নানা সহরের অংশবিশেষের নকল দৃশ্য তৈয়ার করিয়া লইতে হয়; নতুবা দলবল সমেত ছবি তুলিবার জন্য প্রত্যেক-বার যদি সেই সকল দেশে তাহাদের যাইতে হইত, তাহা

গির্জ্জার পশ্চাদ্ভাগ

নকল পার্ব্বত্য ভূমি

নকল-গির্জ্জা

(কাঠের আদরা করিয়া তাহার উপর চূণ-বালি ও সিমেণ্টের প্রলেপ দিয়া সুদক্ষ কারিগরেরা নকল পার্ব্বত্য-ভূমি গড়িয়াছে)

নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। শ্বাসবায়ু নলের ভিতর দিয়া প্রথমে একটি কাচের টিউবের মধ্যে আসে; এবং পরে একটি জারের ভিতর আসিয়া পড়ে। সঙ্গে-সঙ্গে শ্বাসবায়ুর অভ্যন্তরস্থ 'কারবন্-ডাইঅক্সাইডে'র মাত্রার পরিমাণও জানিতে পারা যায়। উহারই পরিমাণের তারতম্য দেখিয়া,

হইলে ছবির খরচ পোষাইত না। জাটলাণ্ডে জার্ম্মেনীর সহিত ইংরেজের যে জলযুদ্ধ হইয়াছিল, কোনও ইংরেজ বায়োস্কোপ কোম্পানী বহু পরিশ্রমে ও বহু অর্থব্যয়ে তাহার একখানি নকল ছবি তৈয়ার করাইয়াছিলেন। ছোট-ছোট

উচ্চ পর্ব্বত-শিখর হইতে যুবকের ঝম্প প্রদান

টিনের জাহাজ টেবিলের উপর সাজাইয়া, প্রকৃত যুদ্ধের বর্ণনার অনুসরণ পূর্ব্বক, তাহার প্রত্যেকটির গতি বড় বড় গণিত শাস্ত্রবিদ্‌গণের দ্বারা নির্দ্ধারিত করাইয়া, এই নকল ছবি তোলা হইয়াছিল। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাসায়নিক বিস্ফোরক জ্বালাইয়া, প্রজ্বলিত রণপোতের অনুকরণ করা হইয়াছিল; এবং একটি সরু নলের মুখে ফুঁ দিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া, কামান ছোড়ার হুবহু নকল করা হইয়াছিল। টেবিলটি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে আট ফিট মাত্র। উপরটি সমুদ্রের জলের মত রং করা। প্রত্যেক টিনের জাহাজখানি টেবিলের মাপের অনুপাতে মাপিয়া তৈয়ার করা হইয়াছিল। ছবি তুলিবার সময়, প্রত্যেক জাহাজের গতি প্রতিবার মাপিয়া, এক ইঞ্চির এক ষোড়শতম অংশমাত্র নড়ানো হইয়াছিল। কেবলমাত্র ইংরেজের রণপোত-বহরেরই একটা চাল দেখাইবার জন্য জাহাজগুলিকে আশিহাজার বার নাড়া-চাড়া করিতে হইয়াছিল। বায়োস্কোপ কোম্পানী বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সমর-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া, 'এয়ারোপ্লেনের' সাহায্যে আকাশ-মার্গ হইতে এই ঐতিহাসিক মহাযুদ্ধের প্রকৃত চিত্রখানি তুলিয়া আনিতে পারিয়াছেন! এই উক্তির সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য ক্যামেরাটিকে একটা উচ্চ মঞ্চের উপর তুলিয়া, ও তাহার মুখ নীচের দিকে করিয়া, এই ছবিখানি তুলিতে হইয়াছিল। ক্যামেরাটিকে নাড়িয়া-চাড়িয়া ও ভিন্ন-ভিন্ন ধাপে উঠাইয়া-নামাইয়া, বায়োস্কোপের ছবিতে অনেক অঘটন ব্যাপারের কৃত্রিম সংঘটন করা যায়। বৈদ্যুতিক আলোক ও তাড়িত শক্তির সাহায্যেও, চিত্রে মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠা, প্রভৃতি অনেক আশ্চর্য্য কৌশলের, ও জ্যোৎস্নালোকিত পূর্ণিমার রাত্রি ইত্যাদি বহু কল্পনাতীত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করা যায়।—একটি ছবিতে বাপ-মাকে লুকাইয়া বর-কনে বিবাহ করিতে যাইতেছে। তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে আসিয়াই দেখে ক'নের বাপ জানিতে পারিয়া তাহাদের ধরিতে

কৃত্রিম মূর্ত্তি উপর হইতে নীচে পড়িতেছে

আসিতেছে,—ভয়ে তৎক্ষণাৎ কনের হাত ধরিয়া বর ষ্টেশনের ধারে একটা মস্তবড় সিন্দুক রহিয়াছে দেখিয়া, তাহারই ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। ইতঃমধ্যে কুলিরা আসিয়া, বাক্সটাতে দড়ি বাঁধিয়া, লেবেল আঁটিয়া, গড়াইতে-গড়াইতে লইয়া গিয়া,

মালগাড়ীতে তুলিয়া দিল। বাক্সটিকে কুলিরা যখন গড়াইয়া লইয়া যাইতেছে, তখন দর্শকেরা দেখিতে পায়, গুড়ি-গুড়ি-মারা বর-ক'নে দু'জনেই বাক্সের মধ্যে লুটো-পুটি খাইতেছে! অথচ প্রকৃত পক্ষে তাহারা কেহই তখন বাক্সের মধ্যে লুটো-পুটি খায় না। ছবি তোলার কৌশলেই

মাথার চুল খাড়া করা

(বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে মাথার উপরদিকের ঐ ধাতুময় পাত-খানিতে তাড়িত-প্রবাহ সঞ্চালিত করা থাকে; অভিনেতা যখনই উহার নীচে গিয়া দাঁড়ান, বৈদ্যুতিক শক্তির আকর্ষণে তাঁহার মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠে)

এ ব্যাপারটি দেখান হয়। বর-ক'নে-সমেত বাক্সটি একটি ঢাকের মত গোল আধারে বসাইয়া দেওয়া হয়; এবং ঐ আধারটি চাকার উপর চড়াইয়া ঘোরানো হয়; কিন্তু ছবিতে ওঠে—যেন বাক্সটিকেই গড়াইয়া লইয়া যাইতেছে! সাততলা বাড়ীর ছাদের উপর হইতে বা পাহাড়ের চূড়া হইতে লাফাইয়া পড়াও ছবি তোলার কৌশল। লাফাইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, এবং মাটিতে বা জলে পড়ার অব্যবহিত পরেই, জীবন্ত নায়ক অভিনয় করেন। কিন্তু যাঁহাকে পড়িতে দেখি, তিনি একটী কৃত্রিম মূর্ত্তি! সাইকেল চড়িয়া শূন্যে উঠিয়া যাওয়া বা মোটরগাড়ী হাঁকাইয়া একেবারে নদীর এ-পার হইতে

দেয়াশলাই জ্বালা

(অভিনেতার দেয়াশলাই জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে আলোকেরও যথোপযোগী পরিবর্ত্তন করা হইতেছে)

ডাইরেক্টার বা আচার্য্য চিত্রাভিনয় পরিচালন করিতেছেন

(ফনোগ্রাফের মত চোঙার ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক শব্দ-নিক্ষেপী যন্ত্রের সাহায্যে তিনি আদেশ জ্ঞাপন করিতেছেন, নতুবা দূরবর্ত্তী অভিনেতারা তাঁহার কথা শুনিতে পাইবে না। চিত্রকর তাঁহারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছবি তুলিতেছেন)

কৃত্রিম জল-যুদ্ধ
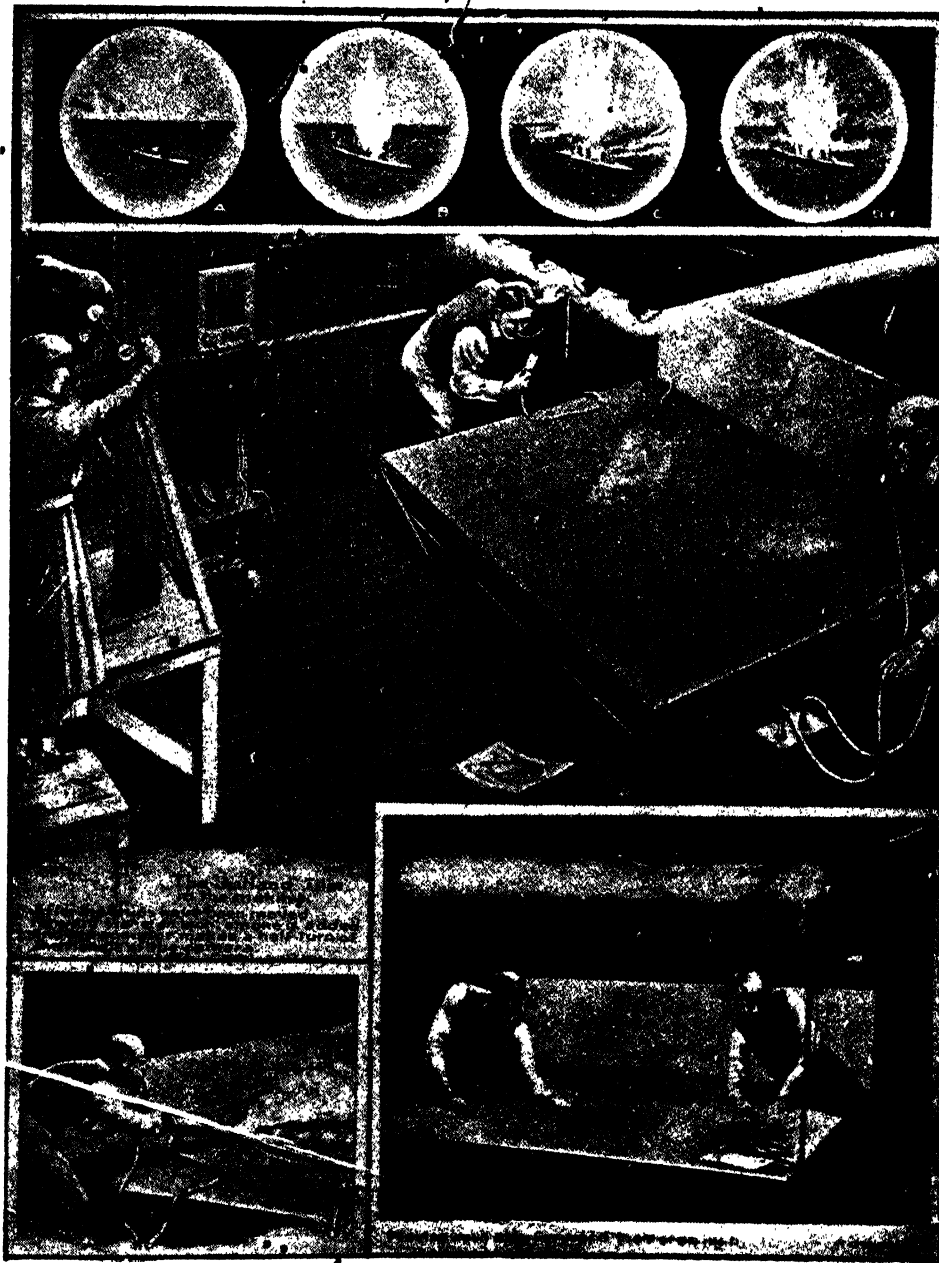
(উচ্চমঞ্চের উপর হইতে ক্যামেরার মুখ নীচের দিকে করিয়া ইহার ছবি লওয়া হইতেছে)

কৃত্রিম কামান-দাগা

জাহাজের গতি

(এক ইঞ্চির এক ষোড়শতম অংশ মাপিয়া প্রত্যেক জাহাজখানি সরানো হইতেছে)
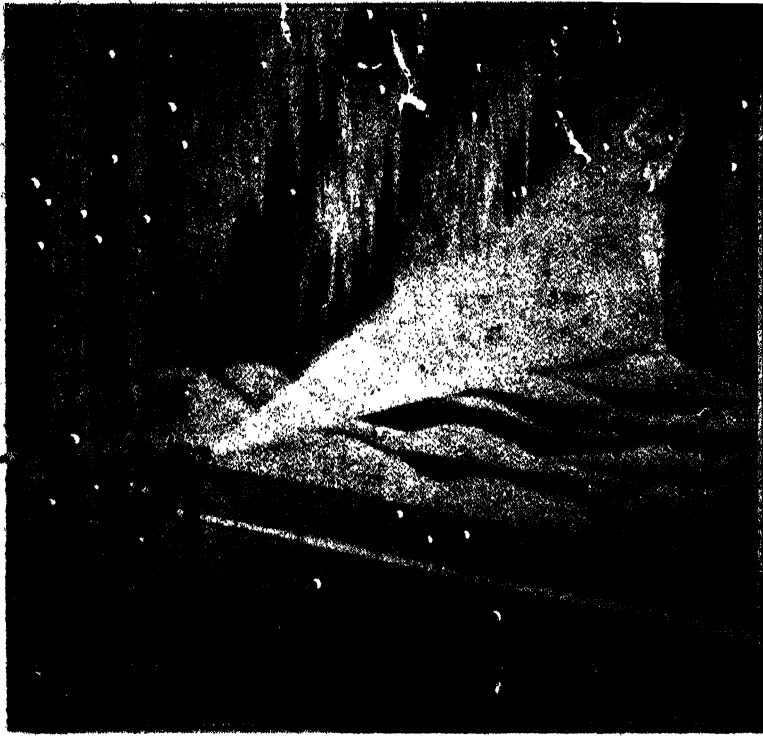
কৃত্রিম বরফের গুহা

চালিয়া যাওয়া, ক্যামেরার কায়দায় সংসাধিত হয়। ভিতরের অধিকাংশ দৃশ্য রঙ্গমঞ্চের সাহায্যেই হয়। জলের ভিতরের অনেক দৃশ্য কাচের মধ্যে সাঁতার কাটিয়া তোলা হয়। কিন্তু মনোহর দৃশ্যের ছবি তুলিবার সময় বিশ্ব-সৃষ্টির সৌন্দর্য্য বাহিরেই ঘুরিতে হয়। অন্ধকার ঘরের ভিতর হাতে ঢুকিবার সময়, বা সুইচ টিপিয়া ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বালিবার সঙ্গে-সঙ্গে, কিম্বা আলো নিভাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িবার সময়, অথবা অন্ধকারে দেশালাই জ্বালাইয়া চুরুট ধরাইবার সময়, ছবিতে আলোর তারতম্য দেখাইবার জন্য, সুদক্ষ লোক মোতায়েন রাখিতে হয়। ডাইরেক্টার বা অধ্যক্ষের আদেশ মত তাহাদের সর্ব্বদা সুইচ-বোর্ডের সম্মুখে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হয়।

(Popular Mechanics)

বিশ্ব-ভারতী

[শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল্]
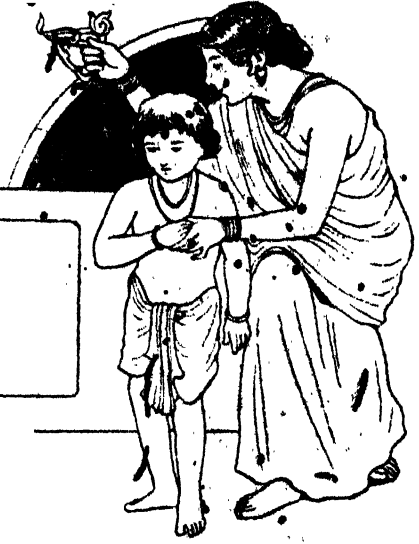
আনাতোল ফ্রান্সের আত্মকাহিনী

বিখ্যাত ফরাসী "La Revue de Paris" পত্রিকার মধ্য-জুন সংখ্যায় আনাতোল ফ্রান্সের আত্মকাহিনীর প্রথম অংশ প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে আমরা অংশবিশেষের অনুবাদ করিয়া দিলাম।

বিদ্যালয়ে অল্প বয়সেই বালক ফ্রান্স কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া স্বয়ং বিজ্ঞান ও প্রাচীন-সাহিত্য (classics) এই উভয়ের মধ্যে প্রাচীন-সাহিত্যকে প্রধান অধীতব্য বিষয় বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, আশ্চর্য্যের বিষয়, এই লইয়া আমার পিতা-মাতার সহিত কোন দিন কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। কেন যে তাঁহারা এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন, তাঁহার কারণ কতকটা অনুভব করিতে পারি। বাবা দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত তাঁহার মনোগত ভাব মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেন না; আর মা আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে ভাবিয়া উদ্বেগের বশে কোনরূপ সঙ্কল্পই স্থির করিতে পারিতেন না। তবে, মার ধারণা ছিল যে যে কোন বিষয়ই আমি নির্দ্ধারণ করিয়া লই না, সেই বিষয়েই কৃতকার্য্য হইব; আর বাবার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কি বিজ্ঞান, কি প্রাচীন-সাহিত্য কোনটাতেই আমি পারদর্শী হইব না।

ফ্রান্সের পরিচারিকার নিকট হইতে আমরা জানিতে পারি, বিজ্ঞানের উপর তাঁহার কোন দিনই আস্থা ছিল না; এমন কি উড়া জাহাজ চড়ার যখন পরীক্ষা চলিতেছিল, তখনও তিনি সেদিকে বড় ঘেঁসিতেন না। সাহিত্যের প্রতি তাঁহার যেমন টান ছিল, জ্যামিতির প্রতি ঠিক তাহার বিপরীত—বিরাগ ছিল। ক্লাশের অধ্যাপনা হইতে তিনি বড় কিছু শিখিতে পারিতেন না। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, যা কিছু আমি শিখিয়াছি, তাহা নিজেই চেষ্টা করিয়া।

অর্দ্ধ-শতাব্দী-ব্যাপী উচ্চশিক্ষার পরিণতির ফল কিছুই হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না—বরং বলা যাইতে পারে, ইহা অনেক অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে। এ শিক্ষা-প্রণালী দোষার্হ। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে সকল বিদ্যালয় আছে, তাহাতে আর সাধারণ লোকের ছেলেদের বড় স্থান নাই, স্থান আছে ধনীর ছেলেদের জন্য। আর সেখানে গরীবের ছেলেরা বড়-একটা কিছু শিক্ষাও পায় না। পাঁচ-বৎসর-ব্যাপী এই ভীষণ যুদ্ধ আমাদের সকল প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া দিয়াছে। এখন সাধারণ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি আবার নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। অসাধারণ সরলতা (magestic simplicity) নূতন গড়নের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে,—গরীব ও বড়লোকের ছেলেরা যাহাতে এক রকম শিক্ষা পায়, তাহাই করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে সকল ছাত্রকেই যাইতে হইবে। তার পর শিক্ষার প্রতি যাহার বেশী অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহাকেই উচ্চশিক্ষা দান করিবার

অধিকার দেওয়া যাইবে। এখানেও ধনী ও গরীবের কোন ভেদ থাকিবে না। আবার সকল শ্রেণীর ছেলেদের ভিতর যাহাদের অধিকতর শিক্ষানুরাগী দেখা যাইবে, বিষয়ভেদে তাহারা বিজ্ঞান বা প্রাচীন-সাহিত্যের জন্য যে বিশেষ বিশেষ বিদ্যালয় থাকিবে, তাহাতে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইবে। এইভাবে শিক্ষার ভিতর সার্ব্বজনীনত্ব স্থান পাইবে (democracy)।

গারেন্‌সীতে হিউগো

একটা প্রচলিত কথা শুনিতে পাওয়া যায়, পনের বৎসর গারেন্‌সীতে বাস করিয়াও ভিক্টর হিউগো কখনই ইংরাজী শিক্ষা করেন নাই। ইংরাজী ভাষার উপর তাঁহার বিদ্বেষের ভাব ছিল। কথাটার মূলে কিন্তু, আদৌ সত্য নাই। সার উইলিয়ম বট্‌লার তখন সেখানে সামান্য পদাতিকের কার্য্য করিতেন। তিনি কবির সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কবি তাঁহাকে এতদূর ভালবাসিতেন যে, মধ্যে মধ্যে 'হট্‌ভিলা হাউসে' তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া একসঙ্গে আহার করিতেন। অবশ্য তিনি ইংরাজীতে বড়-একটা কথাবার্ত্তা কহিতেন না; তবে তিনি ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন, একথা বলা যায় না। এক সময় তিনি বট্‌লারকে বলিয়াছিলেন, ইংরাজী ভাষায় দুইটা শব্দকে আমি আদৌ পছন্দ করি না, একটা হচ্ছে ভদ্র (Respectable), আর একটা হচ্ছে অন্তজ অভদ্র (Ragged)। আচ্ছা ধর 'অন্তজ বিদ্যালয়' (Ragged school) কথাটা। কথাটা শুন্‌লেই শরীরটা কেঁপে ওঠে না।

তাঁহার "La Legende des siecles" প্রকাশিত হইবার কিছুদিন পরে তিনি Octave Lacroin কে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা হইতে এখানে তিনি যে ভাবে জীবন-যাত্রা করিতেন, তাহার বেশ একটা চিত্র পাওয়া যায়। 'আমি 'Hautevilla House'এ বাস করিতেছি। বাড়ীটা ৬০ বৎসর পূর্ব্বে কোন এক ইংরাজ জলদস্যু কর্ত্তৃক সমুদ্রের তীরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাতঃকালে উঠি, সমস্তদিন কার্য্য করি, এবং সকাল-সকালই নিদ্রা যাই। Firmain Bayর নিকট একটী পর্ব্বতশৃঙ্গে একটী স্বাভাবিক আরাম-কেদারা আমি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি। সেখানে বসিয়া আমি লিখিয়া থাকি। আমার প্রকাশকের নিকট শুনিয়াছি, গত তিন বৎসরের ভিতর ৭৪০টী প্রবন্ধে লোকে আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। আমি তাহাদের একটা লেখাও পড়ি নাই। যে সকল কর্ম্মঠ লোকদের মধ্যে আমি বাস করিতেছি, তাহাদিগকে আমি বড়ই ভালবাসি, এবং তাহারাও আমাকে একটু ভালবাসে। আমি চুরুট বা তামাক সেবন করি না। ইংরাজের মত সিদ্ধ মাংস খাই, আর জার্ম্মাণের মত মদ্য পান করি।'

অস্কার ওয়াইল্ডির লুপ্ত হস্তলিখিত পুঁথি

আয়র্লণ্ডের সুবিখ্যাত লেখক ওয়াইল্ডির "The Portrait of Mr. W. H." নামক পুস্তকের হস্তলিপি ২৬ বৎসর পরে আমেরিকায় নিউইয়র্ক সহরে পাওয়া গিয়াছে। পুস্তক-প্রকাশক মিচেল কেনার্লে এখন ইহার স্বত্বাধিকারী। পুঁথিখানি লেখকের স্বহস্ত-লিখিত; পত্র-সংখ্যা ১০৫। ইহাতে তাঁহার স্বাক্ষরও আছে।

পুস্তকখানি যে নকল নয়,—আসল, তাহার অকাট্য প্রমাণ নিউইয়র্কের Morning Post পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

'ডব্লিউ, এচ' কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি। তাঁহারই উদ্দেশে সেক্সপীয়র অনেকগুলি চতুর্দ্দশপদী কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন; তিনিই কবির হৃদয়ে অনেক ভাবের বন্যা ছুটাইয়া দিয়াছেন। আবার তাঁহার জন্য কবি মানসিক যন্ত্রণাও কম ভোগ করেন নাই।

১৮৮৯ সালের জুলাই মাসের Blackwood's Magazine পত্রে 'The Portrait of Mr. W. H.' নামক প্রবন্ধ প্রথমে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ লইয়া সে সময় খুব আলোচনা হয়। ফলে ওয়াইল্ডি বিস্তৃত ভাবে এ বিষয়ের আলোচনা করিবেন বলিয়া সকলকে আশ্বস্ত করেন। ১৮৯৩ সালে পুস্তকখানি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৯৫ সালের ৫ই এপ্রেল তারিখে লেখক ধৃত হইলে, পুস্তক-প্রকাশক পাণ্ডুলিপিখানি আর প্রকাশ করিতে সম্মত হন না; এবং তাঁহারা হস্তলিখিত পুঁথিখানি চেল্‌সার টাইট ষ্ট্রীটের বাড়ীতে ফিরাইয়া পাঠান। সেই অবধি উক্ত পাণ্ডুলিপির আর কোনরূপ সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

প্রকাশক মহাশয় এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, লেখক

মহাশয় পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া মুদ্রিত করিবার জন্য তাঁহার এক আমেরিকার বন্ধুর নিকট পাঠাইয়া দেন। তার পর তিনি ধৃত হন, এবং তাঁহার বন্ধুও ঐখানি তাঁহার ড্রয়ারের ভিতর, যে ভাবে আসিয়াছিল সেই ভাবেই, রাখিয়া দেন। লেখকের বন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁহার জনৈক আত্মীয় ১৯২০ সালের জুলাই মাসে মোড়কটী প্রকাশকের হস্তে প্রদান করেন।

এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে ষ্টুয়ার্ট ম্যাসন-প্রকাশিত অস্কার ওয়াইল্ডির পুস্তকের প্রমাণ-পঞ্জীতে (Bibliography of Oscar Wildie) এইরূপ লিখিত আছে :—

মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েক সহস্র শব্দ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়া পুস্তকাকার ধারণ করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক Elkin Mathens and John Lane ইংরাজী ১৮৯৩ সালের শেষ ভাগে পুস্তকখানি প্রকাশ করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দেন। বিজ্ঞাপনে এইরূপ লিখিত ছিল :—অস্কার ওয়াইল্ডি-লিখিত 'ডবলিউ এচের' ইতিহাস বাস্তবিক অতুলনীয়, অভিনব সামগ্রী। যদি সেক্সপীয়রের চতুর্দ্দশপদী কবিতার প্রকৃত উৎস খুঁজিতে চান, তবে এই পুস্তক পাঠ করুন। পুস্তকের চিত্রের পরিকল্পনা প্রসিদ্ধ শিল্পী চালর্স রিকেটের। পুস্তক-সংখ্যা পাঁচ শত খানি মাত্র হইবে। মূল্য ১০ শিলিং ছয় পেন্স নেট মাত্র। ৫০ খানি ভাল কাগজে প্রকাশিত হইবে। উহার প্রত্যেক-খানির মূল্য ২১ শিলিং মাত্র নির্দ্ধারিত হইল।

দান্তে

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইতালীর দার্শনিক, স্বদেশ-প্রেমিক, মহাকবি দান্তের ছয়শত বার্ষিক শ্রাদ্ধ-বাসরে উৎসব-আয়োজনের কোনরূপ ত্রুটি হয় নাই। তাঁহার মনীষার যথোপযুক্ত সম্মান হইয়াছে ;—শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য জগতের বরেণ্য সাহিত্যিকেরা ফ্লরেন্সে উপস্থিত হন। দান্তের বিশেষত্ব তাঁহার নৈতিক চরিত্রে ও ধর্ম্ম-জীবনে পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি ইতালীবাসীর মনে যে স্বদেশ-প্রেমের বীজ বপন করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই আজ প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার প্রতিভার প্রদীপ্ত শিখায় ইতালী-বাসী যে পথের সন্ধান পাইয়াছিল, সেই পথে চলিয়া আহারা গন্তব্য স্থানে—স্বাধীনতার কেন্দ্রে—উপস্থিত হইতে পারিয়াছিল। আজ আমরা তাঁহার কাব্যের সমালোচনা করিব না ;—রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি যে সত্যের মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার কথাও বলিব না। কাব্যের ভিতর দিয়া তিনি রাজনীতির যে উচ্চ আদর্শ উপস্থাপিত করিয়া, দেশে যে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহারও কথা তুলিব না। বারান্তরে ঐ সকল কথার আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

আজ সমস্ত জগৎ শ্রমজীবীদের চাঞ্চল্যে ব্যতিব্যস্ত। তাহাদের দাবী ন্যায়সঙ্গত কি না, তাহার বিচার করিবার দিন আসিয়াছে। জগতে একটা সাড়া পড়িয়াছে—সোরগোল উঠিয়াছে—ধনশালীরা কতদিন আর তাহাদের ন্যায্য দাবী উপেক্ষা করিবে,—কতদিন তাহাদের কাতর অনুনয়ে কর্ণপাত করিবে না ;—কতদিন তাহাদের মনুষ্যত্বকে দারিদ্র্যের পেষণে চাপিয়া রাখিবে। জগতের মধ্যে বোধ হয় দান্তেই শ্রমজীবীদের উন্নতির প্রথম পথ-প্রদর্শক। শ্রমজীবীদের নেতা-স্বরূপ তিনি যাহা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে দু'একটা কথা আজ বলিব। ফ্লরেন্সের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষা-সচিব (former Minister of Public Instruction) Mr. Francesco Ruffini বক্তৃতা-স্থলে বলিয়াছিলেন, বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমজীবীদের মধ্যে একতাবন্ধন স্থাপন করিবার জন্য তিনি শ্রমজীবী-সমবায়ের (Labour Union) সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই শ্রমজীবী-সমবায় ও জাতিসংহতির (League of Nations) মধ্যস্থলে তিনি সগর্ব্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। বাণিজ্য-শিল্পের প্রজাতন্ত্রের স্রষ্টাই তিনি। তিনিই শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধনীদের হস্তে না রাখিয়া, নব-নির্ম্মিত সমিতি বা সঙ্ঘের (Syndicate-এর) উপর প্রদান করেন। ধনীদের খেয়ালের হাত হইতে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি রক্ষা পাইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল—দুঃস্থ শ্রমজীবীদের আর্থিক অবস্থাও কতকটা সচ্ছল হইয়াছিল।

ফ্লরেন্সের এই বিদ্রোহ—এই শাসন-পরিবর্ত্তন ধনীদের ক্ষমতাকে সংযত করিয়াছিল। যখন শক্তিহীন ধনীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তখন সঙ্ঘ হইতে (Syndicate) তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ ক্ষমতা দিবার ব্যবস্থা হইল। তাঁহারাও সঙ্ঘের সভ্য হইতে পারিতেন ; কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে কোন শ্রেণী-

কার। ব্যবসায়ী-সভার (Professional corporationএর) সভ্য হইতে হইবে। তাহা না হইলে তাহারা সঙ্ঘের সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না। ব্যবসায়ী-সভার মধ্যে উকীল, বস্ত্রব্যবসায়ী, কুঠীয়াল, ডাক্তার, ঔষধ-বিক্রেতা প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। দান্তে ঔষধ-বিক্রেতা বলিয়া নিজের নাম রেজেষ্ট্রী করিয়াছিলেন।

দান্তে এই প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া শ্রমজীবীদের ভিতর যে শক্তির বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আজ ফল-পুষ্পসমন্বিত বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। এই যে জোর করিয়া ব্যবসায় খাতায় নাম রেজেষ্ট্রী করা,—ইহার বিরুদ্ধে তখন তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছিল; কিন্তু আজ সমস্ত সভ্য জগৎ ইহার মহিমা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিতেছে—সঙ্ঘবাদীর (Syndicatists) শক্তি দেখিয়া জগৎ স্তম্ভিত।

এই ঔষধ-বিক্রেতা দান্তে, যাহাকে রুফিণী 'দৈব' (Divine) আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন (Divine apothecary) তিনি সঙ্ঘে বসিয়া বিচার করিবার সময়, প্রজাতন্ত্রের নিয়মবশে সমস্ত কার্য্যই করিতেন; আভ্যন্তরি অভিজাত ধনীদের (magnates) আক্রমণ হইতে শিশু-সঙ্ঘকে রক্ষা করিয়াছিলেন। শুধু এই কার্য্যেই তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয় নাই। নির্ব্বাচিত সভাদিগের জন্যই যে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন, তাহা নহে। তিনি সর্ব্বসাধারণের (mass) উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। সর্ব্বসাধারণ যাহাতে ক্ষমতার অধিকারী হয়, সে বিষয়ে তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। মধ্য শ্রেণীর লোকেরা—যাহারা শ্রমজীবীদের উৎপন্ন দ্রব্য অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া লাভবান্ হয় (profiteering middlemen),—তাহারা দান্তেকে সর্ব্বদাই ঘৃণা ও উপহাস করিত। আবার অভিজাত সম্প্রদায়ও তাঁহাকে ঘৃণা করিত; কারণ, তিনিই তাহাদের শক্তি হ্রাস করিয়া দিয়াছেন। আল্পস্ পর্ব্বতের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া, তিনি এই সমস্ত ব্যক্তির দিকে চাহিয়াও দেখিতেন না। তিনি দেখিতেন, কিসে সাধারণ লোক শক্তি পাইয়া শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে পারে। এক কথায়, সাধারণ লোকদিগকে তিনি প্রকৃত মনুষ্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফ্লরেন্সে ব্যবসায়ী-সঙ্ঘ অধিক দিন নিজেদের হস্তে শক্তি রাখিতে পারে নাই; কারণ, অভিজাত ধনী ও অর্থশালী মধ্য-শ্রেণীর লোকেরা সর্ব্বদাই তাহাদিগের 'কার্য্যের সমালোচনা করিয়া,' তাহাদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করিত। পক্ষান্তরে ব্যবসায়ীরাও 'উহাদিগের শক্তি হ্রাস করিতে পারে নাই। কাজেই, দান্তেকে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল। নির্ব্বাসিত দান্তে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, মহাসমুদ্রের জীবেরা যেরূপ অসীমের মধ্যে বাস করিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ আজ আমার জন্মভূমি ছাড়িয়া সমস্ত জগতের অধিবাসী হইলাম (The world has become my country as the ocean is the country of the deep)।

দান্তে আর একটী মহাসত্য জগৎকে দান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ও নাগরিক শক্তির (Religious and civic power) মধ্যে পার্থক্য চিরদিনই থাকিবে। নাগরিক শক্তি কোনদিনই ধর্ম্মের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিবে না।

ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে দান্তে যে জাতি-সংহতি গঠনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সাম্রাজ্য বিষয়ক পুস্তিকা (Treatise on Monarchy) পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। য়ুরোপের মহাযুদ্ধের অবসানে আমেরিকার সভাপতি উইল্‌সন সাহেবের উদ্ভাবিত League of Nationsএর সৃষ্টির পরিকল্পনার জন্য তিনি যে দান্তের নিকট কতকটা ঋণী, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

ভুল বোঝা

[অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য এম-এ]

(১)

অনেক কষ্টে গ্রামের স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিবার পর, বৈমাত্রেয় বড় ভাই যখন আর কিছুতেই খরচ দিতে রাজি হলেন না, তখন রামলালকে অগত্যা নিঃসম্বলেই কলিকাতায় আসিতে হইল। কলিকাতার কোনও এক বিখ্যাত স্কুলে তাঁহাদের গ্রামের কে একজন মাষ্টারী করিতেন। প্রবাদ, তাঁহার সন্ধানে সব সময়েই প্রাইভেট টিউশানী খালি থাকিত। কিন্তু রামলাল দিনকয়েক তাঁহার কাছে হাঁটাহাঁটি করিবার পর, তিনি তাহাকে বিশদ রূপে বুঝাইয়া দিলেন, আজ-কাল টিউশানী মেলা অত্যন্ত কঠিন। ল-কলেজের ছাত্রদের জন্য কাহারও কিছু পাইবার আশা নাই; এবং ভবিষ্যতেও, ল-কলেজ উঠিয়া না গেলে, টিউশানীর সুবিধা হইবে না।

সাতদিন হোটেলে থাইয়া এবং অনবরত রাস্তায় ঘুরিয়াও কিছু মিলিল না দেখিয়া, রামলাল অবশেষে বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য কল্পনা করিতেছিলেন। এমন সময়ে হোটেলের ম্যানেজার একদিন সন্ধ্যাকালে রামলালকে বলিলেন:— "আপনি বরাহনগরে গিয়ে মাষ্টারী করতে পারবেন?" রামলাল অকূল সমুদ্রে কূল পাইয়া আনন্দে সম্মতি জানাইলেন। ম্যানেজার মহাশয় একখানি ছোট চিঠি লিখিয়া রামলালের হাতে দিয়া বলিলেন—"আপনি ঐই ঠিকানায় কাল সকালে গিয়ে দেখা করবেন।"

পরদিন খুব ভোরে উঠিয়া রামলাল ধূলি-ধূসরিত জুতা জোড়াটী ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া পরিষ্কার করিয়া লইলেন এবং তার পর শতছিন্ন পিরাণটী গায়ে দিয়া যাত্রা করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় উপস্থিত হইয়া রামলাল দরজার কড়া ধরিয়া নাড়িতেই, একটী ছোট ছেলে বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কাকে চান?" চিঠির শিরোনামায় লেখা ছিল—সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়। সুতরাং রামলাল বলিলেন, "আমি একবার সন্তোষ বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।" "আপনি কি তাঁর আফিসে কাজ করেন?" "না।"

"তবে তাঁকে কি করে চিনলেন?" "আমি তাঁকে চিনি না, কখন দেখিও নাই।" "তাহ'লে তাঁর সঙ্গে কি দরকার?" "তুমি তাঁকে গিয়ে বল যে একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।" ছেলেটী উপায়ান্তর না দেখিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। মিনিট কয়েক পরে একজন সৌম্যমূর্ত্তি প্রৌঢ় ব্যক্তি নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কোথা থেকে আসছেন?" "কলকেতা থেকে।" বলিয়া রামলাল তাঁহার হাতে চিঠিখানা দিলেন।

দুই-তিনবার পত্রখানি পড়িয়া ভদ্রলোকটী বলিলেন— "আচ্ছা তা বেশ। আপনি এখানে থাকতে পারেন। একটী ছেলে ও একটী মেয়েকে পড়াতে হবে। থাকবেন, খাবেন, আর পাঁচ টাকা মাইনে পাবেন। কেমন, রাজি আছেন ত?" রামলাল স্বীকৃত হইলেন। ভদ্রলোকটী বলিতে লাগিলেন "আর আজকাল যে দিনকাল পড়েছে মশাই। আফিসে চাকরী করি, মাত্র দুটী-শ' টাকা মাইনে পাই। বাসা-খরচই তাতে চলে না। কুড়ি বছর আগে আমিই দেখেছি, ৫০ টাকা হলে একটা পরিবারের এখানে বেশ চলে যেত। দিন দিন আরো কত কি দেখতে হবে। রেণু, ওরে তোর জেঠাই মাকে বল্, মাষ্টার মশায় এ-বেলা থেকে এখানে খাবেন।" "আজ্ঞে, বিকেল বেলাই একেবারে জিনিষ-পত্র সব নিয়ে এখানে আসব।" বলিয়া রামলাল তখনকার মত বিদায় লইলেন।

বিকেল বেলায় একজন কুলীর মাথায় একটা ছোট ট্রাঙ্ক ও একটা সামান্য বেডিং চাপাইয়া মাষ্টার মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রেণু উপরের জানালা হইতে দেখিয়াই বলিল—"ননী, মাষ্টার মশায় এসেছেন।" ননী ছুটিয়া বাহিরে আসিয়াই মাষ্টার মহাশয়ের আসবাব-পত্রের প্রতি একটু সকৌতুক দৃষ্টিপাত করিল। তার পর বলিল, "চলুন, আপনার ঘর দেখিয়ে দিই।" পাশেরই একটা ঘরের দুয়ারে গিয়া বলিল, "এই ঘরেই আপনি থাকবেন; আর ঐ [illegible]

আমরা পড়ব।" মাষ্টার একে-একে জিনিষগুলি নামাইতে লাগিলেন। "আপনার সঙ্গে আর কিছু নাই?" "না।" "মাত্র এই?" "হুঁ।" বলিয়া মাষ্টার সেই সামান্য কয়টী জিনিষই যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিলেন।

পরদিন সকালে মাষ্টার ননীকে পড়াইতেছিলেন। রেণু এককাপ চা আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। "আমি ত চা খাই না।" ননী বলিল—"কেন মাষ্টার মশাই, আপনাদের দেশে কি চা পাওয়া যায় না?" মাষ্টার হাসিয়া বলিলেন—"না—না, তা কেন,—চা পাওয়া যায় বৈ কি।" "তবে আপনাদের বাড়ীতে কেনা হয় না?" "না। আমাদের কারো চা খাওয়া অভ্যাস নাই।" রেণু বলিল "আচ্ছা, তা না থাক,—দু'দিন খেলেই অভ্যেস হয়ে যাবে।" রামলাল আর আপত্তি না করিয়া, চায়ের পিয়ালাটী নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন।

রেণু টেবিলখানি মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া পড়িতে বসিল।

একটী দুই-তিন বছরের ছোট ছেলে একখানি বিস্কুটের অর্দ্ধখণ্ড মুখের ভিতর করিয়া চুষিতে-চুষিতে দরজার সামনে আসিয়া থামিল। রেণু দেখিতে পাইয়া বলিল—"জুনু এস, এখার থেকে আর কাঁদতে পারবে না কিন্তু;—মাষ্টার মশায়ের কাছে পড়তে হবে।" জুনু নিঃসঙ্কোচে আসিয়া দিদির কাছে দাঁড়াইল। ননী বলিল—"মাষ্টার মশাই, জানেন, জুনু বেশ মজার পড়তে পারে। দেখবেন, এই দেখুন। জুনু, এই বইটে পড় দেখি।" জুনু মুখের মধ্য হইতে হাত নামাইয়া সেই বইখানি ধরিল ও একবার দিদির দিকে আর একবার মাষ্টার মহাশয়ের দিকে সহাস্য দৃষ্টিপাত করিয়া, পড়িতে সুরু করিল—"বাবা, মামা, দিদি, ননী, পিতি—" মাষ্টার মহাশয় হাসিয়া জুনুকে কোলে লইলেন। জুনু তাহার বিস্কুটের রসসিক্ত অঙ্গুলি মাষ্টার মহাশয়ের ছিন্ন পিরাণের একটী ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া বলিল—"তোমাল জামা ছেঁলা।" মাষ্টার জুনুর মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, কিন্তু তোমার বেশ জামা।" ননী বলিল—"জানেন মাষ্টার মহাশয়, ওর এর চাইতে আরো ভাল জামা আছে। এবারই পূজোর সময় বাবা জুনুর জন্য দুই রকমের পোষাক, আমার জন্য গরদের কোট আর দিদির জন্য—" রেণু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, "জুনুকে আমার কাছে দিন ত,—ওকে বাড়ীর মধ্যে রেখে আসি,—ও এখানে থাকলে কারো পড়া হবে না।"

ফিরিয়া আসিয়া রেণু বলিল, "মাষ্টার মশায়, জেঠাই মা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কয়টার সময় ভাত চাই?" রামলাল বলিলেন, "অনেকটা হেঁটে যেতে হবে,—ন'টার সময় হলেই সুবিধে হয়।" "আচ্ছা", বলিয়া রেণু আবার প্রস্থান করিল। ননী বলিল—"হ্যাঁ মাষ্টার মশাই, আপনার কোথায় কলেজ।" "কলকেতার উপর, এখান থেকে ৩৪ মাইল হবে।" "অতটা পথ আপনি হেঁটে যাবেন?" "কি আর করব।" "কেন, বাবা ত রোজ ষ্টীমারে যান।" "তাতে ত খরচ আছে।" "উঃ, ভারি খরচ,—চার টাকা করে মাস্থলী টিকেট।" "আচ্ছা, তুমি চটপট করে এইটুকুন এখন পড়ে নাও।"

ভিতরে দালানের রোয়াকে বসিয়া একজন সপ্তোত্থিতা বিধবা হাই তুলিতেছিলেন। রেণু জেঠাইমার ঘর হইতে ফিরিয়া আসিতেই, তিনি বলিলেন—"কিরে রেণু, তোর মাষ্টার কি ভোরেই কলেজে যাবেন?" "না পিসিমা, নটার সময় খেয়ে যাবেন।" "বলি, 'ন'টার সময় রোজ তার জন্য কে ভাত নিয়ে বসে থাকবে?" "জেঠাইমা বল্লেন, তার অনেক আগে হয়ে যাবে।" বলিয়া রেণু পড়িতে চলিয়া গেল।

(২)

রামলাল দুই দিন হইল আসিয়াছেন, কিন্তু কর্ত্তার সঙ্গে ভাল করিয়া আলাপ করিতে পারেন নাই। তৃতীয় দিন বিকালে ননী আসিয়া ডাকিল, "মাষ্টার মশাই, বাবা ডাকছেন, উপরে।"

সন্তোষ বাবু একরাশি কাগজপত্রের মধ্যে বসিয়া ছিলেন। রামলাল নিকটে যাইতেই বলিলেন, "এস, এস, মাষ্টার, বস। আজ সকালে এসেছ বুঝি?" "আজ্ঞে না, পরশু বিকেলে এসেছি।" "ওহো; দেখ-দেখি, কয়দিন এসেছ, অথচ কোন খোঁজ কর্ত্তে পারি নি। আর কি বলব,—যে কাজের ভিড়,—বাড়ীতে এসেও নিস্তার নাই।" সন্তোষ বাবু পুনরায় কাজে মন দিলেন। "তা' মাষ্টার, যখন যা অসুবিধে হয়, সব বলবে, বুঝলে?" "আচ্ছা।"

"বাবা, কাল সকালে ওস্তাদ আসবেন। আমার সেতারের তার সব ছিঁড়ে গেছে।" বলিয়া রেণু একটী ছোট্ট সেতার

আনিয়া হাজির করিল। "হ্যাঁ হে মাষ্টার, তুমি ভূতির দোকানটা চেন ত?" "বাবার সবই অদ্ভুত, মাষ্টার মশায় এই সেদিন এলেন,—উনি কি করে সে দোকান চিনবেন?" "বলি, একেবারে ছেলেমানুষটাও ত নয়,—কাউকে জিজ্ঞাসা করেও ত দোকানটা বের করা যায়?" পিসীমা পাশের ঘর হইতে টিপ্পনী করিলেন। "আজ্ঞে হ্যাঁ,—খুঁজলেই পাওয়া যাবে"। "তাই কর ত বাপু,—আমার মরবার অবকাশও নাই।"

মাষ্টার মহাশয় সেতারটী হাতে উঠাইয়া গমনোদ্যত হইলেন। "বলি, চলে ত যাচ্ছ; অথচ কি দিয়ে সেরে আনবে তা ত নিয়ে যাওয়া হল না। হ্যাঁ আহ্লাদি, তুমি মাষ্টার মশায়কে দামটা দিয়ে দাও ত।" আহ্লাদি বা আদরিণী ওরফে পিসীমা ভিতর হইতে কয়েক আনার পয়সা আনিয়া মাষ্টারের হাতে দিলেন।

রেণু বলিতে লাগিল, "দেখুন, এই মধ্যমের আর ষড়জের তার দু'টী নাই। সেই দু'টী তার নূতন লাগিয়ে আনতে হবে।" "আচ্ছা।" "আপনাকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। ননী বাসায় থাকলে সে-ই নিয়ে যেত। অন্ততঃ, আপনার সঙ্গেও যেতে পারত।" "না—না, কিছু না,—আমি নিজেই চিনে নেব এখন।"

ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয়ে অতি সন্তর্পণে মাষ্টার সেতার লইয়া পথ চলিতে লাগিলেন। "মশাই গো, শুনছেন? আপনাকে ডাকছি। বলি, এদিকে কার কাছে সেতার শেখেন?" রামলাল ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, আমি শিখিনে;—এ অপরের সেতার, সারাতে নিয়ে যাচ্ছি।" "বেশ, বেশ। আর আজকাল তারের বাজনা একেবারে উঠে যেতেই চলেছে। তার বদলে এখন হয়েছে পিয়ানো, হারমোনিয়াম, আর রবিবাবুর গান। ছিল এক সময়, যখন এমদাদ আলি খাঁ, কুকুভ খাঁ, উজির আলি খাঁ এরা সব ছিল এখানে। যুগীপাড়ার অশ্বিনী বাঁড়ুয্যে, চাঁপাতলার কোরো শিকদার, বাগবাজারের কেষ্ট রায়—এরাই হল ওদের বাছা-বাছা সাগরেদ। আমারও তখন কিছু-কিছু চর্চ্চা ছিল। কানাই মিস্ত্রিরের নাম শুনেছেন? শুনেন নি? তার সঙ্গে এক আসরে বসে শোভাবাজার রাজবাড়ীতে সেতার বাজিয়েছি। তা নমস্কার মশায়, আমাকে এখন এদিকে যেতে হবে।"

বুড়োর কথার চোটে রামলাল সেতার সম্বন্ধে সব কথাই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। কোন্-কোন্ তার যে ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তাহা আর তাঁহার মনে পড়িল না। ফিরিয়া আসিয়া, পিসীমার কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"আজ্ঞে, কি-কি তারের কথা বলা হইয়াছিল, আমি ভুলিয়া গিয়াছি।" পিসীমা হাসিয়া কুটীকুটী হইলেন। "ওরে রেণু, দেখে যা, তোর মাষ্টার কেমন সুন্দর সেতার সারিয়ে এনেছে।" রেণু আসিয়া দেখিয়া, সেতারটী নিয়া বলিল—"তা আমি তখনি বলেছিলাম!—উনি কি কিছু জানেন এ সব বিষয়ে, যে, মনে থাকবে। ওঁকে শুধু কষ্ট দেওয়া হলো।" বলিয়া রেণু সেতার লইয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিল।

(৩)

একদিন রবিবার প্রাতে কর্ত্তা উঠিয়া, তাঁহার সাপ্তাহিক আড্ডা-বিশেষে গমন করিয়াছিলেন। রামলাল বসিয়া একাকী বই পড়িতেছিলেন। এই সময়ে কাগজওয়ালা আসিয়া হাঁকিল—"বাবু, বাবু।" রামলাল বলিলেন, "বাবু বাহিরে গিয়াছেন। দশটায় ফিরবেন।" "আমার দুই মাসের দাম বাকী আছে। দাম না পেলে আর কাগজ দেব না।" "তা'হলে দশটার পর একবার এস।"

কাগজওয়ালা চলিয়া গেলে, ননী আসিয়া বলিল, "কাগজটা দিন ত,—পিসীমা চেয়েছেন।" "কাগজ ত দিয়ে যায় নাই; দশটার সময় এসে দেবে বল্লে।" "বেশ ত, তা'হলে বাবা এসে আজ কি পড়বেন?"

কর্ত্তা বাসায় ফিরিয়া কিছুক্ষণ পরে ডাকিলেন—"মাষ্টার, মাষ্টার, শোন ত। আহ্লাদ বলছিল, আজ তুমি কাগজ রাখ নাই,—ফেরত দিয়েছ?" "আজ্ঞে না, সে বল্লে—" "না—না, আর ওরকম কর না। জানলে মাষ্টার, কাগজ-টাগজ একটু পড়ো,—তাতে ইংরাজী পরীক্ষার অনেক উপকার হবে। হ্যাঁ তোমাদের অ্যানুয়াল্ পরীক্ষা শেষ হল কি?" "আজ্ঞে, সে ত এখন হয় না।" "কেন, রেণুদের ত পরশু শেষ হয়ে গেছে!" "সে কি, পরশু শেষ হয়েছে!" "হ্যাঁ, সে ত তাই বলছিল? রেণু!" "কি বাবা?" "তোদের পরশু দিন অ্যানুয়াল্ শেষ হয় নি?" রেণু হাসিয়া কহিল—"কই না, আমাদের সে পরীক্ষা ত ৭।৮ মাস হল শেষ হয়ে গেছে।" "তবে তুই সেদিন ক্লাসের জিনিষ দেখাচ্ছিলি?" "ও ..."

পরশু থেকে আমাদের কখানা নূতন বই ক্লাসে আরম্ভ করা হয়েছে, সে তারি লিষ্ট।" "বুঝলে মাষ্টার, আজকাল সবই উল্টো। আমাদের সময় ত' এই সময়েই পরীক্ষা হত; আর পরীক্ষায় পরই সব বইয়ের দরকার হ'ত। তা' যা দেখি, সেই লিষ্টখানা নিয়ে আসবি;—মাষ্টার মশায় একবার দেখবেন।" রেণু লিষ্ট আনিয়া দাখিল করিল। "মাষ্টার, তুমি কাল কলেজে যাবার সময় এখানা নিয়ে যাবে; আসবার সময় বইগুলি কিনে নিয়ে আসবে।" "আচ্ছা।"

কলেজে যাইবার সময় মাষ্টার মহাশয় ভিতরে গিয়া দাম চাহিলে, পিসীমা বলিলেন, "বলি, সেদিন সেতার যেমন সেরে এনেছিলে, আজ বইও ত সেই রকম কিনে আনবে?" "না, না,—আজ সঙ্গে লিষ্ট আছে।" মাষ্টার মহাশয় টাকা লইয়া লজ্জিত ভাবে প্রস্থান করিলেন।

রাত্রে পড়িবার সময় নূতন বই হাতে পাইয়া রেণু বলিল —"মাষ্টার মশায়, বইগুলিতে আমার নাম লিখে দিন না।" "আচ্ছা রাত্রিতে লিখে রাখব এখন; কাল সকালে পাবে।" বলিয়া রামলাল বই কয়খানিকে এক ধারে সরাইয়া রাখিলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর সকলে নিদ্রা গেলে, রামলাল বই-গুলিকে বাহির করিয়া নাম লিখিতে বসিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া আস্তে-আস্তে সব কয়খানিতে নাম লিখিলেন। তার পর সেগুলি বার-কয়েক দেখিয়া, টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া, মাষ্টার তাঁহার দৈনন্দিন কাজ লইয়া বসিলেন।

রেণু মাষ্টার মহাশয়কে যথারীতি চা দিয়া পড়িতেছিল। ননী দিদির কাছে নূতন বই দেখিয়া, একখানা টানিয়া লইল। প্রথম পাতা উল্টাইয়া বলিল:—"বাঃ! কি চমৎকার লেখা, ঠিক যেন কাকের ডিম, বকের ডিম।" রেণু ঠাস্ করিয়া ননীর গালে এক চড় মারিয়া, বইখানি কাড়িয়া লইল।

সময়ান্তরে মাষ্টার বইগুলি লইয়া দেখিলেন, তাঁহার লেখা প্রকৃতিকই ভাল হয় নাই। খুব ভাল করিবার জন্য অন্তরের সমস্ত শক্তি ও মনোযোগ প্রয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া, বোধ হয় ততটা সুন্দর হয় নাই।

রামলাল আহার শেষ করিয়া কলেজে যাইতেছিলেন; পিসীমা ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে বাপু, বলি, কাল ত সারা রাত্তির ঘরে আলো জেলে রেখেছিলে।" "আজ্ঞে, সারারাত্তির ত নয়।" "সারারাত্তিরই বৈ কি। ঝি কাল রাত দুটোর সময় উঠে দেখেছিল তোমার ঘরে আলো জলছে। যার বাড়ী থাকতে হয়, তার মুখের দিকেও একটু চাইতে হয়। এবার থেকে আলোর দরকার হলে, নিজের পয়সা খরচ কোরো, বুঝলে?"

রামলাল বিকালে আসিয়াই কতকগুলি বাতি কিনিয়া রাখিলেন। সেই দিন হইতে রাত্রি নয়টার পরে রামলাল বাতির আলোতেই সব কাজ করিতেন। রেণু একদিন বলিয়াছিল, "মাষ্টার মশায় আপনার এখানে এত বাতি কেন?" রামলাল জবাব দিয়াছিলেন, "ইলেকট্রিক লাইটে অনেক ক্ষণ পড়লে চোখ জ্বালা করে; তাই মাঝে মাঝে বাতি জ্বালি।"

(৪)

কয়দিন হইল রেণুদের স্কুলের গাড়ী তাহাকে লইতে আসে নাই। মাষ্টার একদিন বলিলেন—"রেণু তুমি কি আজকাল স্কুলে যাও না?" রেণু মুখ নত করিয়া বলিল, "না।" "কেন?" "তিনমাসের মাইনে বাকি, তাই হেড-মিষ্ট্রেস্ আর গাড়ী পাঠাচ্ছেন না।" "তোমার বাবাকে মাইনের কথা বলেছিলে?" "হাঁ, ফাইন না দিলে স্কুলে মাইনে নেবে না; অথচ বাবা ফাইন দিতে চান না।" "আচ্ছা, আমি তাঁকে বলব।"

কর্ত্তা চা খাইতে-খাইতে কাগজ পড়িতেছিলেন। রামলাল কাছে গিয়া বলিলেন—"রেণুর তিন মাসের মাইনে বাকি—" "হাঁ, বুঝলে মাষ্টার, সে বলে ফাইন না দিলে মাইনে নেয় না। মেয়ে-স্কুলে আবার ফাইন কি? তুমি কোন দিন কোথাও শুনেছ মাষ্টার,—মেয়েদের স্কুলে ফাইন আছে?" "আচ্ছা, আপনি আমার কাছে—" "না—না, বুঝলে, সব ওর বদমাইসি; জরিমানা বলে' আমার কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নেবে, আর স্কুলে গিয়ে তাই দিয়ে কত বাজে-খরচ করবে।" "আপনি মাইনে আমার কাছে দেবেন,—আমি স্কুলে গিয়ে দিয়ে আসব।" "তাই কর ত বাপু; আজই স্কুলে গিয়ে সব মাইনে মিটিয়ে দিয়ে এস ত। শুধু-শুধু ফাইন-ফাইন বলে, এ কয়দিন আমায় অস্থির করে তুলেছে।"

রামলাল স্কুলে গিয়া ক্লার্কের কাছে তিন মাসের মাহিনা জমা দিতে গেলে, তিনি বলিলেন—"তিন মাসের মাইনে

বাকী ! জরিমানা না দিলে মাইনে নেওয়ার নিয়ম নাই।” “কত জরিমানা ?” “এক টাকা।” রামলাল পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া দিয়া, রসিদ লইয়া চলিয়া আসিলেন। বাড়ী আসিয়া রসিদখানি তিন চারিবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া রামলাল তাহাকে একখানি খাতার মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

“মাষ্টার মশায়, পিসীমা ডাকছেন।” “যাচ্ছি।” “রেণুর মাইনে দিয়ে এলে ?” “আজ্ঞে হ্যাঁ,” “ফাইন লাগল ?” “না।” “বিল কই ?” রামলাল ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, “বিলখানা কোথায় রেখেছি,—খুঁজে পাচ্ছি না।” “এতখানি বয়েস হল,—একটা জিনিষ সাবধান করে রাখতে পার না !” রামলাল থতমত খাইয়া চলিয়া আসিলেন। পিসীমা বলিতে লাগিলেন, “এতগুলি টাকা দেওয়া হল,—বিলের সঙ্গে সম্পর্ক নাই ! আমার ত কিছু ভাল লাগে না বাপু !” রেণু পাশের ঘরে তাহার বাবার টেবিল পরিষ্কার করিতেছিল ; বাহিরে আসিয়া বলিল, “মাষ্টার মশায় সে রকমের লোক নয় ;—তার সম্বন্ধে ওসব কথা খাটে না।” “কে কি রকমের লোক, তা তোমরাই ভাল জান বাছা। আমরা থাকি বাড়ীর মধ্যে,—কারও সঙ্গে আলাপও নাই, পরিচয়ও নাই।”

পার্শ্ববর্ত্তী ললিত বাবু উকীলের বাড়ী হইতে কয়জন স্ত্রীলোক বিকালে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। পিসীমা তাহাদের সহিত নানা সুখ-দুঃখের কথা-প্রসঙ্গে বলিতে-ছিলেন,—“আজকালকার মেয়েরা কেউ আর গুরুজনকে মানতে চায় না। একপাতা ইংরেজী পড়েই তাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। তা না হ'লে, সেদিনকার মেয়ে রেণু,—যার মাকে হতে দেখেছি,—সেও সেদিন আমার মুখের উপর স্পষ্ট বলে গেল, আমি না কি লোক চিনি না। কোথা থেকে এক মাষ্টার এসে জুটেছে,—দু'বেলা কেবল তারি কথা মুখে লেগে আছে। এত বুড় সোমত্ত মেয়ে আইবুড় থাকলে, দিন-দিন আরো কত কি দেখতে হবে।”

রেণু কাছ দিয়া যাইতেছিল। কথাটা তার কাণে যাইতেই, সে চোখ-মুখ লাল করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। পরে কি ভাবিয়া দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল।

পরদিন রামলাল কলেজ হইতে আসিয়াছেন, এমন সময় পিসীমা ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন—“শীঘ্র একবার কলকেতা যাও ত। সিংহের বাড়ী থেকে আমার এই মাথা-ধরার ওষুধটা আনতে হবে। এখানে কোন ডাক্তারখানায় এটা পাওয়া যায় না।” মাষ্টার নীরবে আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেলেন।

রেণু সহসা পিসীমার সম্মুখে আসিয়া বলিল, “পিসীমা, তোমার আক্কেল ত বেশ ! একটা লোক সারাদিন পরিশ্রম করে, এতখানি পথ হেঁটে বাড়ী ফিরল,—আর অমনি তুমি আবার তাকে কলকেতায় পাঠালে ? কলেজে যাবার সময় তোমার ওষুধের কথা মনে ছিল না ?” “বলি, অসুখ বুঝি কারো সময় বুঝে আসে ! আর উনি ত জামাই বাবু নন যে, বসে বসে খাবেন আর কলেজে যাবেন,—কোন কাজ করবেন না। যার খেতে হয়, তাঁর কাজও কর্তে হয়।” “মাষ্টার মশায় ত তোমার কিছু খান না ; তুমিও বসে-বসে খাচ্ছ, তিনিও কাজ করে তারি খাচ্চেন।” বলিয়াই রেণু ঝড়ের মতন অদৃশ্য হইল।

“কি, কি বল্লি ! আমি বসে বসে খাচ্ছি ! আমি দু'টো ভাতের জন্যেই তোদের এখানে পড়ে আছি ! আমার শ্বশুরের ভিটেয় কি কেউ নেই ? এক্ষুনি চিঠি লিখে দিলে, ১০ জন লোক এসে নিয়ে যাবে। আমাকে কি তোরা তাই মনে করেছিস্ ? আসুন দাদা, আমি আজই চলে যাবার ব্যবস্থা করছি। আমাকে তুই খাওয়াবু খোঁটা দিলি ?”

রাত্রে দাদা ভোজনান্তে বিশ্রাম করিতে গেলে, ভগিনী আদরিণী খাটের কাছে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, “দাদা, আমায় এবার এখান থেকে পাঠিয়ে দাও,—আমি ত বসে-বসে—” দাদা পাশ ফিরিতে-ফিরিতে বলিলেন—“আঁা, কি বল্লে,—ক্ষুদিরাম বুঝি নিতে এসেছে ?” “নিতে না এলেও, চিঠি লিখে দিলে কাল নিতে আসবে। আমার কি সেখানে কেউ নাই ?” “আছে বৈ কি,—অবশ্যই আছে। তা বেশ, দু'দিন না হয় একটু ঘুরেই আসবে।” ভগিনী এবার এক পশলা অশ্রুমোচন করিয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—“দু'দিনের জন্য নয় গো, চিরদিনের জন্যই আমায় বিদেয় কর। তোমার মেয়ে বলে, আমি বসে-বসে তোমায় ভাত খাচ্ছি। বলি, আমার শ্বশুরের ভিটে কি পুড়ে একেবারে উচ্ছন্ন গেছে যে, তোমাদের এখানে বসে কথা শুনতে হবে ?” গতিক নেহাৎ মন্দ দেখে কর্ত্তা তাড়াতাড়ি বলিলেন—“ওহো, তুমি রেণুর কথা বলছ। বুঝলে আদু, তার জন্য আমাকেও কোন্ দিন ভিটে ছেড়ে যেতে হবে। সে গেছে,—একেবারে উচ্ছন্ন গেছে।”

কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিবার পর পিসীমা বলিতে লাগিলেন—“রেণু ত কোন দিনই এ রকম ছিল না ! ছোট থেকেই ত তাকে আমি দেখে আসছি। এই মাষ্টারটা, এসে অবধিই তার স্বভাব বিগড়ে গেছে। তুমি আর এ মাষ্টারকে রেখ না দাদা। যত শীঘ্র পার তাকে—” এদিকে খাটের উপর দাদার গভীর নাসিকা-গর্জ্জন শোনা যাইতেছিল ; সুতরাং ভগিনীকে সেদিনকার মত চলিয়া আসিতে হইল।

ইঙ্গিত

[শ্রী বিশ্বকর্ম্মা]

আমি ত প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া 'ভারতবর্ষের' মাননীয় পাঠকগণের নিকট ইঙ্গিত করিতেছি। আমার এই একঘেয়ে ইঙ্গিতে কাহারও বিরক্তি ধরিতেছে কি না, তাহা জানিতে পারিতেছি না; তবে অনেকের যে কার্য্যে উৎসাহ জন্মিতেছে, তাহা কিছু-কিছু জানিতে পারিতেছি। কেবল তাহাই নহে,—শুধু কার্য্যে উৎসাহ জন্মানো নয়,—কেহ-কেহ কোন-কোন নূতন ব্যবসায়ের সন্ধান দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিতেছেন। আজ আমি তাঁহাদের প্রদত্ত দুই-একটী ব্যবসায়ের কথা আমার পাঠকগণের নিকটে উপস্থিত করিতে চাহিতেছি। বস্তুতঃ, অনুসন্ধান করিলে, মাথা খাটাইতে পারিলে, অনেক নূতন ব্যবসায়ের ফন্দী বাহির করা যাইতে পারে। ইয়োরোপ-আমেরিকা-জাপান ত এমনি করিয়াই দিন-দিন নূতন-নূতন ব্যবসায়ের পত্তন করিতেছেন। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এখনও শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষা দিবার জন্য রীতিমত বিদ্যালয় স্থাপিত হইল না। যে দিকে চাহিয়া দেখি, সেই দিকেই প্রধানতঃ ফাঁকি দিয়া কাজ সারিবার চেষ্টা দেখিতে পাই। আন্তরিকতা, আগ্রহ, উৎসাহ, অধ্যবসায়—এ সকল বিষয়েই আমাদের এখনও অত্যন্ত অভাব রহিয়াছে। জনমতের দাবীতে কোথাও-কোথাও vocational educationএর প্রস্তাব হইতেছে, দেখিতে ও শুনিতে পাইতেছি। কিন্তু মনে বড়ই দুঃখ হইতেছে যে, এ সকল ক্ষেত্রেও সেই থোড়-বড়ি-খাড়া, আর খাড়া-বড়ি-থোড়। আমার মনে হয়, রীতিমত শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে—শিল্প-বাণিজ্য শিক্ষা দিবার নাম করিয়া ফাঁকি চালাইবার ব্যবস্থা না হইলে—আমাদের দেশের যুবকেরা অনায়াসে অনেক নূতন-নূতন ব্যবসায়ের পত্তন করিতে পারিবেন। তবে ফাঁকি নয়—রীতিমত এবং আসল ব্যবস্থা হওয়া চাই। সে যাহা হউক, এখন ইঙ্গিতের পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা নূতন ব্যবসায়ের সন্ধান দিতেছেন, তাঁহাদের কথা শুনুন। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত, পোষ্ট ভরদ্বাজহাট পোঃ, (Via Mirsarai, A. B. Ry) চট্টগ্রাম, হইতে লিখিয়াছেন :—

অল্প মূলধনে কয়েকটী লাভজনক ব্যবসায়

চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই ও ৺সীতাকুণ্ড থানার এলাকায় খুব আখের চাষ হইতেছে। প্রত্যেক বৎসরই অনেক আখ-মাড়াই লোহার কল কলিকাতা হইতে আমদানী হয়। এসকল কল গরুর দ্বারা চালান হয়; এবং প্রতি কেরোসিন টিন রস বাহির করিতে সাত পয়সা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত খরচ পড়ে। কলের ভাড়া, গরুর ভাড়া প্রভৃতিও আখের চাষের বিস্তৃতির সঙ্গে-সঙ্গে বাড়িয়া যাইতেছে। গরু পরিচালিত কলে রস ভালরূপ বাহির হয় না; এবং কাজ অত্যন্ত ধীরে-ধীরে হয় বলিয়া, অনেক রস গাঁজাইয়া (fermented) যায়। যদি কেহ ছোট অয়েল এঞ্জিন ও তদ্দ্বারা পরিচালিত আখ-মাড়াই কল লইয়া নবেম্বর মাসে এখানে আসেন, তবে বিস্তর লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করি। বর্ম্মা হইতে কেরোসিন আসে বলিয়া তেলের দর এখানে কলিকাতারই মত। অয়েল ইঞ্জিনে সংযুক্ত আখ-মাড়াই কলে যে কিরূপ লাভ দাঁড়াইতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্য সরকারী কৃষি-রিপোর্ট হইতে নিম্নলিখিত কথাগুলি উদ্ধৃত করা হইল।

"I erected a crushing mill and oil engine for a small zeminder in Gorakhpur Disirict last season. The mill crushes about 27 mounds per hour. The man after one season's working, has now come to me for a mill three times the size for next season's work. He dealt last season with at least one lakh of rupees' worth of produce with the plant I erected, and his profits must be in the neighbourhood of Rs 30000 for the season's work. The total cost of the plant, engine and mill, including erecting changes, was only Rs. 5000. He will be working next season with

much bigger plant, and in consequence, profits will be much bigger."—দেখা যাইতেছে, পাঁচহাজার টাকা মূলধনে কল স্থাপন করিয়া, এক বছরেই ত্রিশ হাজার টাকা লাভ দাঁড়াইয়াছে !! আর্থের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণী নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানিতে পারা যায়—

1. Burn & Co, Howrah, and Hasting Street, Calcutta.
2. Balmer, Lawrie & Co, 103 Clive Street Calcutta.
3. Jessop & Co. 93, Clive Street, Calcutta.

...নে চারি দিকেই শঠীর জঙ্গল রহিয়াছে। শঠীর পালো (starch) আজকাল বাজারে খুব বিক্রয় হইতেছে। পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ ঢেঁকী দিয়া কুটিয়া পালো বাহির করা হয়। ইহাতে অনেক পালো নষ্ট হইয়া যায়, এবং রংও খারাপ হয়। চট্টগ্রাম সহরে এক ভদ্রলোক কয়েক বৎসর হইতে অয়েল-এঞ্জিন পরিচালিত কলের দ্বারা শঠীর পালো বাহির করিয়া প্রচুর লাভ করিতেছেন। মীরসরাই ও সীতাকুণ্ড অঞ্চলের সর্ব্বত্র এত শঠী দেখিতে পাওয়া যায় যে, কয়েকটি কলে সারা বৎসর ধরিয়া কাজ চালাইলেও, উহার অভাব হইবে না। একবার কল স্থাপিত হইলে, চারিদিকের কৃষকদের মধ্যে শ্বেতসার (starch) যুক্ত অন্য ফসলের (যেমন arrow-root, sweet potato) আবাদ প্রচলন করাও কষ্টকর হইবে না; বিশেষতঃ মাটী ও আবহাওয়া ...ন উহার বিশেষ উপযোগী। মীরসরাই ও সীতাকুণ্ড অঞ্চলে রেল রাস্তা এবং ট্রাঙ্ক রোড সমান্তরাল ভাবে গিয়াছে; সুতরাং সর্ব্বত্রই যাতায়াতের খুব সুবিধা। শঠীর ...ল সম্বন্ধেও বিস্তারিত বিবরণ উপরিউক্ত কোম্পানী ...লের অফিসে অথবা Manager, "Industry" Shambazar Bridge Road, Calcutta এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন। যদি কেহ ...খ-মাড়াই বা শঠীর কল লইয়া এখানে আসেন, তবে আমরাও যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।"

অতঃপর ত্রিপুরা জেলার কুণ্ডা গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত ...ভূষণ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—

শুক্‌না মাছের ব্যবসা

পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ বিশেষ ভাবে অবগত আছেন যে, এই শুক্‌না মাছের ব্যবসা দ্বারা এদেশের কৈবর্ত্ত-দাসগণ কিরূপ ধনবান্ হইয়াছেন ও হইতেছেন। তাঁহাদের এ ব্যবসা অবশ্য অতীব শ্রমসাধ্য ও risky, বটে; কিন্তু, কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা ভিন্ন কোন দেশের কোন জাতিই অর্থাগমের পথ সুগম করিয়া উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে পারেন নাই।—দৃষ্টান্ত স্থলে, শুধু আমাদের বৃটিশ জাতিকে দাঁড় করাইলে অশোভন হইবে না। মোট কথা, মাথার ঘাম পায়ে পড়িলে তবে ত সিদ্ধি।

আমাদের এই কৈবর্ত্ত-দাসগণ অসীম ক্লেশভোগ করিয়া কিরূপে লক্ষপতি হইয়াছেন ও হইতেছেন, তাহার বিবরণ শুনিলে, নিস্তেজ, নিরাশ প্রাণেও চেতনার সাড়া দেয়।

এই ব্যবসায়ী কৈবর্ত্তগণ সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত স্বীয় আবাসভূমিতে থাকিয়া, কৃষি ইত্যাদি যাবতীয় সাংসারিক কার্য্য করিয়া থাকে; এবং পরবর্ত্তী ছয়মাসকাল বিল, নদী, হাওড় ইত্যাদি বন্দোবস্ত করিয়া, সেখানে খোলা* প্রস্তুত করতঃ, এই শুক্‌না মাছ তৈয়ার করিবার জন্য সপরিবারে সেখানে বাস করিয়া থাকে। অনেকেই আবার বেতনভোগিনী স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। এই স্ত্রীলোকগণের বেতনও নেহাৎ কম নয়; পনর টাকা হইতে বিশ টাকা পর্য্যন্ত। যাঁহারা শুকটীর (শুকনা মাছকেই বলা হয়) উপযুক্ত করিয়া ক্রত মাছ তৈয়ার করিতে পারে, তাহাদের আদর যত্ন দু-ই বেশী।

পুরুষ কামলাদের বেতনও ত্রিশ-চল্লিশ টাকা। ইহাদের খাটুনিও কিন্তু ভীষণ!—শুনিলে, হয় ত অনেকে শিহরিয়া উঠিবেন। তাহারা এই ছয় মাস কাল দিবারাত্রি মেসিনের মত সমান ভাবে পরিশ্রম করিয়া থাকে। পৌষ-মাঘ মাসের ভয়ঙ্কর শীতে, গভীর অন্ধকার রজনীকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া, সারারাত্রি জাল দ্বারা মাছ ধরিয়া থাকে—এবং কোনো বড় মাছ জালে আটক হইলে দ্বিধা মাত্র না করিয়া, সেই অন্ধকার রাত্রিতে গভীর জলে লাফাইয়া পড়িয়া ডুব দিয়া নীচে গিয়া, মাছ যেন ছুটিয়া না পলায় সেরূপ বন্দোবস্ত

---

* খোলা—যেখানে মাছ ধরিয়া শুক্‌না মাছ প্রস্তুত করে। নদী বা বিলের তীরেই সাধারণতঃ খোলা তৈরী হয়।

করিয়া, তবে নৌকায় চড়ে। ইহাদের ভিতর এমন ডুবারি'ও আছে, যাহারা পাঁচ মিনিট কাল পর্য্যন্ত অনায়াসে জলের নীচে শ্বাস-রোধ করিয়া থাকিতে পারে।

এই শুক্না মাছও আবার দুই প্রকার; (১) "শুক্‌টী"; (২) "সিদল"। উভয়েরই প্রস্তুত-প্রণালী ভিন্ন প্রকারের। সেইরূপ, মূল্যের তারতম্য ও গুণের প্রভেদও যথেষ্ট।

(১) শুক্‌টী—এইগুলি সাধারণতঃ রুই, কাতল, মৃগেল বোয়াল ইত্যাদি মাছ কাটিয়া, খরারৌদ্রের তাপে শুকাইয়া, প্রস্তুত করিই থাকে। অবশ্য মাছের তেল-ডিম, নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদিও বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। তার পর মাছ কাটার মধ্যেও যথেষ্ট বাহাদুরী ও কৌশল দেখা যায়। এইগুলি তত দুর্গন্ধযুক্ত নহে। সাধারণতঃ এ অঞ্চলে শুক্‌টী মাছ প্রতি সের ছয় আনা হইতে বারো আনা পর্য্যন্ত খুচরা হিসাবে বিক্রয় হইয়া থাকে।

(২) সিদল—এইগুলি পুটী ইত্যাদি ছোট ছোট মাছ দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। এইগুলি ভয়ানক দুর্গন্ধযুক্ত; সাধারণতঃ তিপ্‌রা খাসিয়া ইত্যাদি নিম্ন শ্রেণীর লোকদের ইহা খুব প্রিয় খাদ্য। ইহাদিগকে মাটীর 'মটকা' বা 'ঝলার' মধ্যে করিয়া মাছের তেলের সঙ্গে মাটীর নীচে পুঁতিয়া রাখে। মূল্যের পার্থক্য বিশেষ নাই।

'খোলা'—বিস্তর টাকা-পয়সা খরচ করিয়া খোলা প্রস্তুত করিয়া থাকে; জমিদারকে নজর, সেলামী ও খাজনাই দিতে হয় প্রচুর। কারণ, এই সব বন্দোবস্ত লইবার সময় বেশ প্রতিযোগিতা দাঁড়ায়। যাক্! তাহাদের "খোলা"গুলি দৃশ্যতঃ বড়ই সুন্দর। নদীর তীরে নিজেদের বাস-গৃহগুলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান। আর ইহারি সংলগ্ন বিস্তৃত মাঠ জাল দ্বারা ঘেরিয়া ছাউনি করা; যেন কাক, চিল প্রভৃতি মাছের শত্রুগুলি ইহা ভেদ করিয়া ভিতরে যাইতে না পারে। ইহা একটী দুর্গ বিশেষ। প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূর হইতেই খোলার গন্ধ বহিয়া পবন-রাজ পথিকের নাকে প্রবিষ্ট হয়। খোলাবাসীরা কিন্তু একটুও দুর্গন্ধ বোধ করে না। তাহারা প্রবাসে কর্ত্তব্য সাধন করিয়া, অত্যন্ত আনন্দের সহিত দিন যাপন করিয়া থাকে।

ছয় মাস পরে তাহারা যখন সব চালান দিয়া, বিক্রয় করিয়া, বস্তা ভরা-টাকা লইয়া দেশে ফিরে, তখন তাহাদের আনন্দ আর ধরে না। তাহাদের মধ্যে খুব বড় মহাজনেরা এখনো এক-দুই করিয়া অঙ্ক দ্বারা টাকা না গুণিয়া, বাঁশের তৈয়ারী পাত্র দ্বারা এক সের দুই সের হিসাবে গণনা করিয়া থাকে। এই প্রকার গণনার কথা শুনিলে আরব্যোপন্যাসের আলিবাবার কথা মনে আসে।

আজকাল আমাদের বাবু-ভায়াদের মধ্যেও অনেকে ব্যবসায়ের দালালী আরম্ভ করিয়া বেশ দু'পয়সা পাইতেছেন। ব্রহ্ম দেশেই শুকটী মাছ অধিক পরিমাণে চালান হইয়া থাকে।

এই শুষ্ক মৎস্যের ব্যবসায় ইয়োরোপে একটী মস্ত বড় ব্যবসায়; ইহাতে কেবল যে শুষ্ক মৎস্য প্রস্তুত-কারক-দিগেরই অর্থ লাভ হয় তাহা নহে; ইহার চালানী কাজের দ্বারা অপর অনেক লোকেও লাভবান্ হইয়া থাকে। ইয়োরোপে অনেক বন্দর কেবল শুষ্ক মৎস্যের ব্যবসায়ের জন্যই প্রসিদ্ধ। ইয়োরোপে এই মৎস্য শুষ্ক করার কার্য্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে সাধিত হইয়া থাকে। ধূম ও উষ্ণ বায়ু প্রয়োগ করিয়া মৎস্য শুকাইয়া লওয়া হয়। আমাদের দেশে শীতকালে টানের দিনে রৌদ্রোত্তাপে মাছ শুকাইয়া রাখা যাইতে পারে বটে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে শুষ্ক করিয়া লইলে, বারো মাস ধরিয়া কাজ চালানো যায়। আবার নদী, খাল, বিল, হাওড়ে মাছ কতই বা পাওয়া যায়? রীতিমত ব্যবসা করিতে গেলে সমুদ্রে মাছ ধরিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে; এবং সমুদ্রতীরে মাছ শুকাইবার কারখানা স্থাপন করিতে হইবে। মান্দ্রাজ প্রদেশের গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে বোধ হয় মাছ cure করিবার ও শুকাইবার কারখানা আছে। বঙ্গীয় মৎস্য বিভাগ হইতে চেষ্টা করিলে, অনেক সন্ধানও পাওয়া যাইতে পারে। বাঙ্গলার গবর্মেণ্ট বহু ব্যয়ে একটী মৎস্য-বিভাগ পোষণ করিতেছেন। কিন্তু কয়জন লোক এই বিভাগের সহায়তা গ্রহণ করেন, এখান হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করেন, তাহা জানি না। শুষ্ক মৎস্যের ব্যবসায়ের সঙ্গে সারের কারখানা, মাছের তেলের কারখানা, এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজও বোধ হয় করা যায়।"

শ্রীযুক্ত সত্য ভূষণ দত্ত মহাশয় আরও লিখিয়াছেন—

এড়ি বা এণ্ডির সূতা

"প্রতি মাসের ১লা তারিখের দৈনিক পত্রিকা হইতে আরম্ভ করিয়া, শেষ তারিখের মাসিক পত্রিকার বিজ্ঞাপনের পাতা উল্টাইয়া গেলে, আসামজাত এড়ি-মুগার বিজ্ঞাপনখানা

করিতে পারিবেই। তাছাড়া এই এণ্ডি-মুগার পোষাক পরিচ্ছদও আমরা নেহৎ কম ব্যবহার করি না। শীতকালে আজকাল এড়ির চাদর অনেকেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। কারণ, ইহা দৃশ্যতঃ যেমন সুন্দর, টেঁকার পক্ষেও তেমনি মজবুত। কিন্তু আমরা অনেকেই মনে করি, এড়ির সূতার চাষ আমাদের দেশে হইতে পারে না; ইহা শুধু আসামেই জন্মে, এবং সে দেশেই তৈরী হয়। প্রকৃত পক্ষে ইহা সব দেশেই উৎপন্ন করা যায়। এবিষয়ে ত্রিপুরা সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র রায়, বিনা-মূলধনে কি উপায়ে ইহার ব্যবসা করিয়া, সাংসারিক কার্য্যের সঙ্গে-সঙ্গে বেশ দু-পয়সা আয় করা যায়, তৎসম্বন্ধে নিজ অভিজ্ঞতা মূলক বিবরণী দ্বারা একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

এণ্ডি বা এড়ির সূতা এক প্রকার পোকা হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। এই এণ্ডি বা এড়ি পোকা এরেণ্ড, এড়ি বা ভেরাণ্ডা গাছের পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে; এবং রেশমের কোয়া বা গুটি প্রস্তুত করে। এই কোয়া বা গুটি কাটাই করা যায় না, অর্থাৎ ইহা হইতে একগাছি অবিচ্ছিন্ন সূতা বাহির করা যায় না। পশম বা কার্পাসের ন্যায় পিজিয়া, পরে টাকু বা চরকা দ্বারা কাটিয়া সূতা বাহির করিতে হয়।

পোকার প্রকার-ভেদে সূতারও তারতম্য ঘটে। উৎকৃষ্ট ভাল সূতার গুটী বা কোয়া মণ প্রতি প্রায় এক শত টাকা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। এই পোকার চাষ করিতে হইলে, নিজ বাড়ীতে কতকগুলি ভেরাণ্ডা গাছের চাষ করিয়া, পূর্ব্ব হইতেই পোকার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে হইবে। এই ভেরাণ্ডা গাছের ফল দ্বারা তৈল প্রস্তুত হয়। গাছও এক-একটী প্রায় তিন বৎসর কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। পোকার আহার ও যত্নাদি নিয়মিত রূপে করিলে, অল্প দিনের মধ্যেই বাড়িয়া বিস্তর হইয়া যায়। এই পোকা জন্ম হইতে, গ্রীষ্মকালে ১৫ হইতে ২০ দিনের ও শীতকালে ২৫ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে গুটী প্রস্তুত করে।

সূতা প্রস্তুত প্রণালী—"সূতা কাটার জন্য কোয়া বা গুটীগুলি ক্ষার জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। এই ক্ষার কলার পাতা, কলাগাছের খোলা বা অন্য কোন পাতা পোড়াইয়া বাহির করা হয়। আজকাল বাজারে এক প্রকার সুলভ সোডা কিনিতে পাওয়া যায়। তাহা ব্যবহার করিলেও চলে। একশত গুটীর জন্য এক ছটাক পরিমাণ সোডা পরিষ্কার জলে গুলিয়া, একটী মেটে হাঁড়িতে ঐ জল দিয়া জ্বালে চড়াইয়া দিতে হইবে। এখন গুটীগুলি একখানা ন্যাকড়ার পুটলী করিয়া তাহাতে কোন ভারি দ্রব্য দিয়া ঐ হাঁড়ির মধ্যে ডুবাইয়া দাও, এবং গুটিগুলি হাঁড়ির তলায় না লাগে এজন্য পুটলীটি ঝুলাইয়া দাও; এবং হাঁড়ির মুখে একখানি ঢাকনি দিয়া, তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত জ্বাল দাও। মধ্যে-মধ্যে ঢাকনি তুলিয়া দেখিতে হইবে। যদি জল কমিয়া গিয়া থাকে, তবে পুনরায় জল দিতে হইবে। তিন ঘণ্টা পরে নামাইয়া জল শীতল হইলে, ঐ পুটলীটি খুলিয়া গুটিগুলি ভাল করিয়া চটকাইয়া লইতে হইবে। ভাল রূপ চট্‌কান হইলে, ক্ষার-জল ফেলিয়া পুনঃ পুনঃ নূতন পরিষ্কার জল দিতে হইবে। বারে-বারে জল পরিষ্কার করিয়া ধুইতে হইবে। যখন আর পরিষ্কার জলে ময়লা বাহির হইবে না, তখন ধোয়া শেষ হইল, মনে করা যাইতে পারে। এখন অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে, এবং গুটিগুলি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পরিষ্কার কাপড়ে বাঁধিয়া রাখিবে। সূতা কাটিবার সময় পুনরায় একটু ভিজাইয়া, চরকা বা টাকুর সাহায্যে যেরূপ তুলা হইতে সূতা প্রস্তুত করে, সেইরূপই এড়ি রেশমের সূতা প্রস্তুত করিতে হয়"। চেষ্টা ও যত্ন থাকিলে আমাদের সোণার বাংলায় অনায়াসেই সব ফলানো যায়।

সন্ধ্যা

শ্রীকনকপ্রতিমা দেবী।

দিন পলাল, সন্ধ্যে এলো,
নূতন ভূষণ গায়
চাঁদের কিরণ অঙ্গে মাখা,
রূপার নূপুর পায়॥
সাঁজরাণী আজ, দুলিয়ে কাণে,
বকুল হীরার দুল।
এলিয়ে খোঁপা, বসায় সাধে,
অনেক তারার ফুল॥

সোনার বরণ দীপের আভা,
উজ্‌লে ওঠে জেনে
সলাজ ভরা নীলাম্বরীর,
ঘোমটা দিলে টেনে॥
(আবার) শশীর সাথে, এ সাঁজরাণীর,
প্রণয় কথা জেনে
দুষ্টু বাতাস বল্‌ছে চুপি,
আস্‌লো শেফার কাণে॥

(তাই) অভিমানে শেফালরাণী
মুখটী কোরে তার,
ছড়িয়ে দিলে নিদয় ভাবে,
ফুলের ভূষণ তার।
ঘরে, ঘরে, শাঁখের ধ্বনি
ফাটলো বুঝি কাণ,
মায়ের কোলে শুনছে খোকা,
ঘুম-পাড়ানি গান॥
ওগো আমার সাঁজ-রাণী,
তোমার হাসি দেখে

ইচ্ছা করে কুড়ায় লয়ে
রাঙাতে ঠোঁটে মেখে॥
জাগিয়ে দিতে শতেক হৃদে
বিদায়-ব্যথার গান,
ভাঙ্গিয়ে কারো সুখের স্বপন
মিলন স্মৃতির ধ্যান॥
(কিন্তু) ছাড়ব না'ক আজকে তোমা,
রাখবো আঁচল ধরে,
যখন আবির মাখা দুষ্টু ঊষা,
আসবে পূরব দ্বারে॥

সম্পাদকের বৈঠক

প্রত্নতত্ত্ব।

স্বাধীন ত্রিপুরা-রাজের কমলপুর বিভাগের গভীর বনে (Forest) ও নূতন আবাদী ভূমিতে অনেক ছোট, বড় বহু পুরাতন পুকুর ও বাড়ীর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দ্বারা বুঝা যায়, এ দিকে লোকের বসবাস ছিল। এক্ষণে প্রশ্ন এই—১। এ সব পুকুর কোন্ সময় কাহার আমলে হইয়াছিল? ২। এ দিকে পূর্ব্বে কোন্ জাতীয় লোকের বাস ছিল? ৩। কেনই বা এ সব জায়গার লোকেরা দেশ ছাড়িয়া গিয়াছিল? ৪। পুনরায় কোন্ সময় হইতে এ দিকে লোকে বসবাস আরম্ভ করিয়াছে?—শ্রীকিরণচন্দ্র সিংহ চৌধুরী—পোঃ কমলপুর, স্বাধীন ত্রিপুরা ষ্টেট।

চরকার সুতা

১। আমরা তাঁতের কাপড় প্রস্তুত করিবার জন্য বিলাতী অথবা দেশী মিলের সুতা ব্যতীত অন্য সুতা পাই না। যদি কোন স্থানে চরকায় কাটা সুতা পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমরা তাহা লইতে প্রস্তুত আছি। ঐরূপ সুতা কোথায় মিলে? কত নং পর্য্যন্ত মিলে ও মূল্য কিরূপ? ২। শ্রাবণের ভারতবর্ষে "ঠকঠকি" তাঁতের কথা জানিতে পারিলাম—ঐ তাঁত কোথায় পাওয়া যায়। অর্ডার দিতে হইলে কোন্ ঠিকানায় দিতে হয়? এবং কত দিনে পাওয়া যায়? ৩। আদার চাষ কিরূপ জমিতে করিতে হয় এবং বিঘা প্রতি কত আদা জন্মে। কোন্ সময় চাষ দিলে ভাল আদা জন্মায়। প্রতি বিঘায় খরচ কত? শ্রীঅনাথকান্ত বসু, নিতাড়া, ২৪পঃ।

উত্তর।

আপনার বর্ত্তমান মাসের পত্রে দেখিলাম, একজন পাঠক বিশ্বকর্ম্মার—প্রতি প্রশ্ন করিয়াছেন যে কলাগাছ হইতে লবণ প্রস্তুত হয়, এ সংবাদ ঠিক কি না। তদুত্তরে আমি জানাইতেছি, এ খবর সম্পূর্ণ সত্য। এই প্রদেশে (আসামে) প্রত্যেক ব্যক্তি—ধনী ও নির্ধন নির্ব্বিশেষে প্রত্যহ 'ক্ষার' দেওয়া কোন ব্যঞ্জন ভক্ষণ করিবেই। তাহাদের কাহারও মুখে অবগত হইলাম, 'ক্ষার' দ্বারা প্রস্তুত কোন ব্যঞ্জন একদিন না খাইলে কোষ্ঠ-কাঠিন্য হয়। অবশ্য, ইহা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে; এবং যাহারা হোষ্টেল, মেস প্রভৃতি স্থানে থাকিয়া অধ্যয়ন করে তাহাদের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। ক্ষারের প্রস্তুত-প্রণালী খুব সরল; যথা, সম্পূর্ণ কলাগাছটী চিরিয়া প্রখর রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। তৎপরে তাহা কোন পরিষ্কৃত স্থানে পোড়ান হয়; পোড়ান ছাই উত্তম রূপে চালনী দ্বারা ছাঁকিয়া অপরিষ্কৃত অংশ ফেলিয়া দিয়া মিহি ছাই রক্ষিত হয়। ইহাই 'ক্ষার'। লবণের পরিবর্ত্তে ইহা ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারের সময় ইহা জলে গুলিয়া লইয়া ১০।১২ ঘণ্টা রাখিয়া দেওয়া হয়; তৎপরে অপরিষ্কৃত অংশ তলায় পড়িয়া গেলে, উপরিভাগস্থ জলীয় অংশ লবণের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। কেহ-কেহ ন্যাকড়া দ্বারা ছাঁকিয়া লয়। তবে সাধারণতঃ উপর হইতে আস্তে-আস্তে জল ঢালিয়া লইয়া ব্যবহার করে। এইরূপে একদিন ভিজাইয়া রাখিলে কয়েকদিনের কাজ চলিয়া যায়। সর্ব্বপ্রকার কলাগাছ পোড়াইয়া ক্ষার হইতে পারে। তবে বীচে কলাগাছে ('আঠিয়া কলা') ক্ষারের পরিমাণ বেশী থাকে। এই প্রকারে, কলমি শাক, পুকুরের পানা, সিঙ্গাড়া (জলিকা) হইতে ক্ষার প্রস্তুত হয়; তাহাতে লবণের ভাগ খুব বেশী থাকে, এবং অনেকে এই প্রকারে প্রস্তুত ক্ষার শক্ত ভাল পাকাইয়া বিক্রয় করে। এদেশবাসীরা পেঁপে গাছ, নারিকেল গাছের ডাল এবং নারিকেলের খোবড়া হইতেও উপরিউক্ত উপায়ে ক্ষার প্রস্তুত করিয়া লবণের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করে। নারিকেল-ক্ষার খুব বেশী লবণাক্ত।

ক্ষার প্রস্তুত সাধারণতঃ কার্ত্তিক মাস হইতে আরম্ভ হয়; কারণ সে সময় হইতে প্রায়ই নিরুদ্ধ রৌদ্র পাওয়া যায়। ঐ সময়ে ক্ষার

করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থই কলসীতে সঞ্চয় করিয়া রাখে; এবং প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহার করে।

ক্ষারে প্রস্তুত তরকারী আমি খাইয়াছি; এবং এ দেশবাসী অনেকেই খাইয়াছেন। উহাতে ব্যঞ্জনটী একটু পিচ্ছিল বোধ হয়; অনভ্যস্ত মুখে একটু 'ছাই'এর গন্ধ লাগে। পরিষ্কৃত করিয়া লইলে খুব ভাল স্বদেশী লবণ হইবে সন্দেহ নাই।

বঙ্গদেশে গ্রামে কলাগাছের 'ছাই' দ্বারা কাপড় কাচিতে দেখিয়াছি। ইহাতে অধিক পরিমাণে Sodinm (Na) থাকে বলিয়াই—কাপড় পরিষ্কার হয়। শ্রীপবিত্রকুমার গুপ্ত, গৌহাটী (আসাম)।

আশ্বিন মাসের 'ভারতবর্ষ' পাঠ করিয়া অবগত হইলাম, শ্রীযুক্ত ...চরণ দত্ত মহাশয় লেবু পড়িয়া না যাইবার প্রতিকার আছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কার্ত্তিক মাসে বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে গর্ত্ত করিয়া ...সের ওজনের 'পুঁটী' মাছ পুতিয়া দিলে, লেবু পড়িয়া যায় না; এবং ...টাও বেশ সতেজ হয়। আমাদের দেশে আম্র বৃক্ষে এক প্রকার ...বর্ণের পিপীলিকা দৃষ্ট হয়। এইরূপ পিপীলিকা বৃক্ষে থাকিলে লেবু ...য়া যায় না। এই প্রকার পিপীলিকার উত্তেজনায় তথাকথিত পোকা ...ইয়া যায়। শ্রীদিগিন্দ্রনাথ দে, পোঃ বীরশ্রী, শ্রীহট্ট।

শাস্ত্রীয় প্রশ্ন

১। শুধ্যেদ্ বিপ্রো দশাহেন
দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন
শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥

এই প্রকার নিয়ম হইবার কারণ কি? এখন "বৈশ্য" ...রা কোন জাতি আছে কি না? যদি থাকে তবে কাহাদিগকে "...শ্য" বলা যাইতে পারে। সপ্রমাণ উত্তর দিবেন। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ...রী, মাজিগ্রাম, কোঁয়ারপুর, বর্দ্ধমান।

'জিজ্ঞাসা'

ভারতবর্ষের আশ্বিন সংখ্যায় সম্পাদকের বৈঠকে দেখিলাম পেঁয়াজ ...সার রঙের সহিত নীল তুঁতিয়া মিশাইলে সবুজ রং ও হীরাকষ ...াইলে সবুজ মিশ্রিত কাল রং পাওয়া যায়। কিন্তু পেঁয়াজ খোসা, ... তুঁতিয়া ও হীরাকষের পরিমাণ দেওয়া না থাকায় কোন প্রক্রিয়া ... আশানুরূপ ফল পাইলাম না। ... এই বস্তুসমূহের পরিমাণ ...াইলে বাধিত হইব। শ্রীকার্ত্তি... ...গীর ...টার্য্য, গ্রাম জোড়াপুকুর, ... ডাঃ রঘুনাথবাড়ী, জেলা মেদি...

কাঞ্চি কোথায়?

কোন-কোন গ্রন্থে কাঞ্চি দেশের নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু কাঞ্চি কোথায় ছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। কেহ বলেন উত্তরবঙ্গে কাঞ্চি নামে দেশ ছিল। অতএব প্রমাণ ইহার বিস্তৃত বিবরণ আপনি অথবা "ভারতবর্ষ"এর পাঠকগণ যথা... কেহ লিখিয়া ভারতবর্ষ পত্রে মুদ্রিত করিলে বাধিত হইব। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নলহাটী, বীরভূম।

চরকায়-কাটা সূতা

আমার নিকট চট্টগ্রামের প্রাচীনাদের দ্বারা চরকায়-কাটা সূতা বিস্তর জমা আছে। মাসিক ১০।১৫ মণ করিয়া সরবরাহ করিতে পারি। এই সূতা সাধারণতঃ তিন প্রকার। ১নং চিকন—বিলাতি ৪০নং সূতার সমকক্ষ। ২নং মধ্যম—বিলাতি ২৪নং সূতার সমতুল্য। ৩নং মোটা—বিলাতি ৫।৬ নং সূতার সমকক্ষ। মূল্য যথাক্রমে প্রতি সের ১নং ৩৲ ২নং ২৷৹ ৩নং ২৲ হিসাবে পাওয়া যাইবে। বিনি সূতা নামে এক প্রকার স্বভাবজাত রঙীন সূতাও পাওয়া যায়, ইহার কাপড় দেখিতে ঠিক এণ্ডির ন্যায়। এতদ্ব্যতীত কার্পাস, তুলা, বীজ, চরকা, ও সরবরাহ করিতে পারি। এম্, এ, রশিদ সিদ্দিকী সাধনা অফিস ৫, কলুটোলা লেন, কলিকাতা।

কাপড়ের কল

ভারতের কোন্ প্রদেশে কতগুলি—(ক) কাপড়ের মিল। (খ) সূতার মিল আছে? (গ) মিলগুলির নাম। (ঘ) মেনেজিং এজেন্টের নাম। (ঙ) কোন্ কোন্ মিলে দেশী সূতা এবং কোন্ কোন্ মিলে বিদেশী সূতায় কাজ হয়? (চ) কোন্ কোন্ মিলের স্বত্বাধিকারী ভারতবাসী ও কোন্ কোন্ মিলের স্বত্বাধিকারী বিদেশী? এ, সি, সাহা এণ্ড সন্স পাটুয়াটুলি, ঢাকা।

ভাতের মাড়ের সার

১। ভাতের মাড় গাছের সার রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে কি না? ২। উহাকে সারে পরিণত করিবার উপায় কি? ৩। তাহার ব্যবহার প্রণালী কি প্রকার? শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ সুজাসিত-রত্নাগার লাইব্রেরী, কামারপোল, সরষা, ২৪ পং জিলা।

জল সেচনের কল

আশ্বিনের ভারতবর্ষে সম্পাদকের বৈঠকে প্রকাশিত শ্রীরামানুজাচার্য্য মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছি যে, নিম্ন ঠিকানায় জল সেচনের একরূপ উৎকৃষ্ট কল পাওয়া যায়। মূল্য—৫০৲ টাকা। কল পাইবার ঠিকানা শ্রীযুক্ত ইসাহাক মোল্লা শঙ্করপুর আয়রন্ ওয়ার্কস পোঃ সিউড়ি (Suri) বীরভূম। শ্রীহবিবুল হক, হেতমপুর কে সি কলেজ, বীরভূম।

দেশী গুলি সূতা

আমার ভগিনী নিজ হস্তে কার্পাস তুলা হইতে গুলি সূতা তৈয়ারী করিতেছে। এই সূতা ইচ্ছা মত সরু মোটা নানা প্রকারের প্রস্তুত হয়। বাজারের গুলি সূতা, তাসা সূতা, কাটিম সূতা (গাড়ী সূতা) সমস্ত রকমেরই ভিন্ন ভিন্ন আধারে জড়াইয়া দিলেই চলিতে পারে। বাজারের প্রচলিত গুলিসূতার মত সরু, কিন্তু উহা অপেক্ষা শক্ত পাকা ... ... দুই পয়সার বিক্রয় করা যায়। প্রস্তুত-প্রণালী আরও সহজ করিতে পারিলে আরও সস্তায় দেওয়া যাইতে পারিবে। তাহারও চেষ্টা হইতেছে।